ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

সপ্তবিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়-অগ্রহায়ণ—১৩৪৬

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র সূচী—মাসানুক্রমিক

আষাঢ়—১৩৪৬

দ্বিবর্ণ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রাবণ—১৩৪৬

দ্বিবর্ণ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

ভাদ্র—১৩৪৬

বহুবর্ণ চিত্র

দ্বিবর্ণ চিত্র

আশ্বিন—১৩৪৬

দ্বিবর্ণ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

অগ্রহায়ণ—১৩৪৬

বহুবর্ণ চিত্র

দ্বিবর্ণ চিত্র

শিল্পাচার্য্য— শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

সূর্য্যোদয় (গণ্ডা পর্ব্বতে)

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

আষাঢ়—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও অদ্বৈতমতবাদ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

মানুষ আপাত-মনোরম জগতের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে ভাবে—ইহা কি সুন্দর, কি সুরম্য, আহা কত আরামের স্থান! এই জগতের জিনিষগুলি সব বুঝি চিরস্থায়ী! তাই সে—আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার বন্ধু, আমার ঘর, আমার বাড়ী, আমার জিনিষ, আমার দেশ প্রভৃতি কত প্রকারেই না, অহং মমরূপ বাসনা জালের সৃষ্টি করিয়া নিজেকে জড়ীভূত কচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই। পিতামাতার স্নেহে মুগ্ধ হয়ে ভাবে পিতামাতার এই স্নেহ তার উপর নিশ্চয়ই চিরদিন সমান থাকবে; কিন্তু হায় জগতের এমনি নিয়ম—পুত্র যখনই পিতামাতার মতে মত দিতে না পারে—তাঁদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে—তখন যে পিতামাতা তাঁদের আদরের দুলালের জন্য নিজেরা কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকে সন্তানের কল্যাণ কামনা করেছেন, তাঁরাই আবার নিজ পুত্রের সমস্ত সুখসুবিধা উপেক্ষা করে, ত্যজ্যপুত্র করে, এমন কি সেই আদরের দুলালের কথা কাণে শুনতেও ইচ্ছা করে না—বরং বিরক্তি-বোধ করে। ইহাই জগতের রীতি। ইহাই মহামায়ার মায়া। যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির জন্য মানুষ কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা সহ্য করছে, হায় অদৃষ্ট! তারাও আবার সুখ সুবিধার ব্যাঘাত দেখলে অমনি তাহাকে উপেক্ষা করে চলে যেতে সঙ্কোচবোধ করেনা। আজ যার আজ্ঞায় শত শত লোক চালিত হচ্ছে, দুদিন পরে তার কথায় কেহই কর্ণপাত করেনা। একদিন যে লক্ষপতি ছিল, যার দানে শত শত লোক জীবনধারণ করত, আজ সে ভিক্ষুক—পরের অন্নে জীবন ধারণ করে—ইহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। কিন্তু এই বৈচিত্র্যময় জগতের পারে, যেথায় চিরশান্তি নিলয়, সমস্ত দুঃখের অবসান—সেখানে যেতে আমরা কয়জন আগ্রহ-শীল? ইহাই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার মায়া। এই

মহামায়ার মায়ায় যাহারা বদ্ধ তাহারাই মুগ্ধজীব; আর যাঁহারাই এই মহামায়ার কুহকরাশি ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই মুক্ত—মহাপুরুষ, আচার্য্য বা ভগবান বলে পূজিত হয়েছেন।

মোহমুগ্ধ জীবের চেতনা আনিবার জন্য—আমাদের উদ্ধারের জন্য নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব—ভগবান স্বীয় কোন প্রয়োজন না থাকিলেও জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হয়ে এই মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হন। সার্দ্ধ ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে ৮৪২ সম্বতে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষের কেরল প্রদেশে পূর্ণানদীতটে কালাড়ী নামক পল্লীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিবগুরুর গৃহে বিশিষ্টাদেবীর গর্ভে এমন একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যাঁহার জ্ঞানের আলোতে জগতের তমসাচ্ছন্ন বহু মানব পথের সন্ধান পাইয়াছেন, জীবনমরণরূপ এই প্রহেলিকার পারে যেতে সমর্থ হয়েছেন। তাই সেই বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী আজ আমাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—ভয় নাই, এই পুণ্য তিথিতে ভব-ভয়হরী ভবতারণ শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতের তাপ-ক্লিষ্ট মুগ্ধ মানবকুলকে মাভৈঃ বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্কর যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম এই হিন্দুস্থানে এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, যদি ভগবান্ শঙ্করের মত তীক্ষ্ণধী মহামানব এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত না হতেন তাহা হইলে হয়ত আজ হিন্দুর অস্তিত্বই থাকিত কিনা সন্দেহ।

যাঁরা মাত্র পরদুঃখে কাতর হয়ে এই দুঃখ শোক তাপের নিলয় বহু বৈচিত্র্যময় জগতের মাঝে জীবের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হন, শাস্ত্র সেই পূর্ণকাম আপ্তকাম মহাপুরুষ-গণকেই অবতার নামে অভিহিত করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥৩।২২

হে পার্থ! ত্রিলোক মধ্যে আমার কর্ত্তব্য বলে কিছু নাই, কারণ আমার অভিষ্টদায়ক কিছু নাই। পাবারও কোন কিছু বাকী নাই, কিন্তু তবুও (লোকশিক্ষার নিমিত্ত) আমি কর্ম্ম করি।

ভগবান্ জীবের প্রতি করুণা করিয়া দেহ ধারণ করেন। নিজের কোন কামনা না থাকলেও তিনি যে অবতীর্ণ হন তাহাও তিনি গীতাতে বলিয়াছেন—

> অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৪।৬

আমি জন্মমরণরহিত পরমাত্মা, প্রাণীগণের ঈশ্বর হয়েও তবু নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিজের মায়ার দ্বারায় দেহ ধারণ করি।

এবম্বিধ যে ভাগবতী তনু তাহাকেই শাস্ত্র অবতার নামে অভিহিত করে। অবতার শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখলেও মনে হয় ইহাই সত্য। অব + তৃ ধাতু ঘঙ্ প্রত্যয়ে অবতার শব্দ সিদ্ধ হয়। অব পূর্ব্বক তৃ ধাতুর অর্থ অবতারণা করা বা নেমে আসা। পরম কারুণিক পরমেশ্বর বহুবার বহুরূপে অবতীর্ণ হয়ে, সন্ত্রস্ত, ভীত, মোহগ্রস্ত, পতিত মানবকুলকে উদ্ধার করেছেন। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ।" মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে আমিই তাহাদিগের উদ্ধার-কর্ত্তা। যুগে যুগে এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ভগবান্ নানারূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদিগকে পথ দেখিয়ে যান। ভাগবত বলে—ভগবানের অবতার অসংখ্য, 'অবতারাহ্যসংখ্যেয়া'।

ভগবান্ তথাগত বুদ্ধের বাণী ভুলে গিয়ে মানবগণ যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে প্রচার করতে লাগল—ঈশ্বর নাই—সমস্তই ক্ষণিক, সমস্তই শূন্য প্রভৃতি মতবাদ নিয়ে বৃথা কোলাহল সৃষ্টি করতে লাগল, ভগবান্ বুদ্ধের ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্য, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি ভুলে গিয়ে শুধু অনাচার, অত্যাচার, ব্যাভিচার প্রভৃতিতে দেশ সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠল, এক ভগবান্ বুদ্ধের বাণী অবলম্বন করে বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'লো, সকলেই নিজ নিজ মতানুযায়ী ভগবান্ বুদ্ধের বাণীর ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করল, তখন আবার জ্ঞানগুরু বিশ্বাধার বিশ্বপতি এই ধরাধামে আচার্য্য শঙ্কররূপে আবির্ভূত হলেন। শুকদেব চরিত্রে আমরা দেখতে পাই তিনি এই স্বার্থমলিনতাপূর্ণ ধরণীতে আসবেন না বলে মাতৃগর্ভেই থাকতে চেয়েছিলেন; কিন্তু জননীর প্রাণ-নাশের আশঙ্কায় যদিও ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপস্যার জন্য পলায়ন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্করে আমরা দেখতে

পাই তিনি জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এই অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য কত শীঘ্র সমাপন করিতে পারেন তাহার জন্য জন্মাবধি তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল ; তাই তাঁর জীবনের ঘটনাবলী পাঠ করিলে আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। ৭ বৎসর বয়সের মধ্যে সমস্ত বেদ-বেদান্ত পাঠ শেষ করিয়া দেখিলেন—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রূপ চারি প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ ; শ্রুতির নির্দ্দেশ "ন স পুনরাবর্ত্ততে" মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষ জন্ম-মরণরূপ সংসারে আর পুনরাবর্ত্তন করে না অর্থাৎ সে আর ফিরে আসে না। অন্যান্য জন্মের কৃতকর্ম্মের ফল যেরূপ এই জন্মে ভোগ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইহজন্মের পুণ্যফলে স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তি হইলেও তাহা বিনাশশীল ; অতএব মোক্ষলাভের উপায় যাহা, তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। যে পরম-পুরুষ পরমাত্মার প্রশাসনে সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যুলোক, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঠিক ঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, তিনিই সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত থেকে সকলকে পরিচালিত কচ্ছেন। তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁকে যে না জেনে এই লোক ত্যাগ করে—সে কৃপণ, কর্ম্মফলের ক্রীতদাসস্বরূপ। আর যে ব্যক্তি তাঁকে জেনে এই লোক ত্যাগ করে, তিনিই ধন্য তিনিই ব্রাহ্মণ। সমস্ত বেদরাশি যে পরমপাদ লাভ করিবার নির্দ্দেশ দিতেছে, ঋষিগণ যাহা লাভ করিবার জন্য তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন, যাহা পাইবার জন্য মানুষ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করে—আমিও সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করি না কেন ?

ন্যাস এব অত্যরেচৎ, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু। সন্ন্যাসের দ্বারাই জন্মমরণরূপ সংসার অতিক্রম করা যায়। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। অতএব আমিও এই সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করি না কেন ? সংশয় নিশ্চয়ে পরিণত হইল, তিনি ঠিক করিলেন এ সংসার ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া বৃদ্ধা জননীর অনুমতি পাইবেন তাহাই হইল সমস্যা। তিনি মনের আবেগ বেশীদিন চাপিয়া রাখিলেন না, একদিন জননীকে তাঁহার মনের ইচ্ছা জানাইলেন। মা সেই অষ্টম বৎসরের বালক শঙ্করের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাই তিনি প্রথমে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া পুত্রকে সংসার ত্যাগের ও সন্ন্যাসের বাসনা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু বয়সে শিশু হইলেও জ্ঞানবৃদ্ধ শঙ্করের সন্ন্যাসবাসনা বাধা পাইয়া বেশী শক্তিশালী হইল ; যখন দিবানিশি এক চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন তখন একদিন মাতাপুত্র নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, মাতা স্নান সমাপন করিয়া কূলে উঠিয়াছেন, শিশু শঙ্কর তখনও নদীতে, এমন সময় হঠাৎ এক ভীষণ কুম্ভীর আসিয়া বলপূর্ব্বক শঙ্করকে গভীর জলে লইয়া যাইতে লাগিল ; তখন আচার্য্য শঙ্কর কি যেন এক দৈববুদ্ধির প্রেরণায় মাকে ডাকিয়া বলিলেন—মা, এখন যদি তুমি আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দাও তাহা হলে দুষ্ট কুম্ভীর হয়ত আমাকে ত্যাগ করিবে। মা দেখিলেন—আচ্ছা, এখন ত ছেলে আমার কুম্ভীরের মুখ হইতে বাঁচুক—তা সন্ন্যাসের অনুমতি দিই না কেন ? এইরূপ ভাবিয়া বিশিষ্টা দেবী পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিবামাত্র দুষ্ট কুম্ভীরও শঙ্করকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মাতাপুত্রে পরম আনন্দিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ঘরে আসিয়াই শঙ্করের সেই ভীষণ আবদার, মা এখন আর বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি তাঁহাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখের সহিত তিনি সংসারের একমাত্র অবলম্বন সমস্ত গুণের আধারস্বরূপ একমাত্র পুত্রকে বিদায় দিবার সময় বলিলেন—আমি এতদিন যে আশা করিয়াছিলাম তাহা বৃথা হইল। আমি ভাবিয়াছিলাম অন্তিমকালে তোমার মুখ দেখিয়া সংসারের সকল জ্বালাযন্ত্রণা দুঃখকষ্টের অবসান করিব এবং তুমি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে, সে বাসনা আমার সফল হইল না। এই কথা শুনিয়াই আচার্য্য বলিলেন—আচ্ছা মা, আমি তোমার এই বাসনাসকল পূর্ণ করিব ; পরন্তু তোমার অন্তিমকালে তোমার ইষ্ট সাক্ষাৎকার করাইব। এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, তুমি তখন কোথায় থাকিবে তার কি ঠিক আছে ? পুত্র শঙ্কর অমনি বলিলেন, তুমি অন্তিমকালে স্মরণ করিবামাত্র আমি মুখে মাতৃস্তন্যের স্বাদ পাইব এবং তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইব। এই কথা শুনিয়া বিশিষ্টা দেবী কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। আচার্য্য শঙ্কর মায়ের অন্তিমকালে উপস্থিত হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

জননীর নিকট বিদায় লইয়া আচার্য্য শঙ্কর নর্ম্মদা তীরে গুরু গোবিন্দপাদের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। কিম্বদন্তি যে গুরু গোবিন্দপাদ আচার্য্য গৌড়পাদের শিষ্য ছিলেন এবং তিনি আচার্য্য শঙ্করের প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল সমাধিমগ্ন অবস্থায় নর্ম্মদা তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার সেই সুরম্য তপোবনে গিয়া কুটীরের দ্বার বন্ধ এবং গুরু গোবিন্দপাদকে সমাধিস্থ দেখিয়া একটু চিন্তিত হইলেন কিন্তু হতাশ হইলেন না। দৈবীমায়া প্রভাবে সহসা নর্ম্মদার বেগ এমন প্রখর হইল যে বন্যার মত বেগে তাহা গুরুদেবের আশ্রম ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার তপপ্রভাবে নর্ম্মদাকে শান্ত করিলেন; তাহা দেখিয়া গুরু গোবিন্দপাদ ধ্যানে বুঝিতে পারিলেন, যিনি কলনাদিনী জাহ্নবীকে শিরে ধারণ করিয়াছিলেন তিনিই আজ শঙ্কররূপে আমার আশ্রমে আসিয়া প্রবলস্রোতা নর্ম্মদার বেগ শান্ত করিয়াছেন। তিনি যে মহাপুরুষের প্রতীক্ষায় এখনও শরীর রাখিয়াছেন তিনি আজ আশ্রমে স্বয়ং উপস্থিত জানিয়া ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং শিষ্যকে কুশল প্রশ্ন করিলেন। শিষ্যকে সাদরে বরণ করিয়া তাঁহার আজীবন-লব্ধ জ্ঞান-রাশি এই মহামানবে ন্যস্ত করিয়া শিষ্যকে ভূর্ভুব স্বঃ ত্রিলোক-ত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া আদেশ করিলেন—কাশীধামে যাইয়া অদ্বৈত মত প্রচার কর। আচার্য্য শঙ্কর গুরুদেবের আদেশে কাশীধামাভিমুখে গমন করিলেন। আচার্য্য শঙ্করকে বিদায় দিয়া গুরু গোবিন্দপাদ তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে জানিয়া নশ্বর শরীর ত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন।

তখন ভারতবর্ষে কোন ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলেই কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাহা প্রচার করিতে হইত। কারণ কাশীধামই ছিল ভারতীয় সভ্যতার ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ জ্ঞানীগণ সকলেই তখন কাশীধামে বাস করিতেন। পণ্ডিতগণ জ্ঞানীগণ যে ধর্ম্ম বা মতবাদ মানিয়া লইতেন তাহা যে অচিরে বহুল প্রচারিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই আচার্য্য গীতাভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন "গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতি।" পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত এবং অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে।

সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য এবং তাঁহার গুরুর অনুভবরূপ অদ্বৈতমতবাদ প্রচারের দ্বারাই জীবের যথার্থ কল্যাণ হইবে ইহা অবধারণ করিয়া কাশীধামে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "নেহ নাশস্তি কিঞ্চন" "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতির নির্দ্দেশ শঙ্কর জন-সমক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়াই বেদব্যাস কৃত বেদান্তসূত্র সকলের শারীরক ভাষ্য প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। ঐকালে একদিন সূত্রকার বেদব্যাস আচার্য্য শঙ্করকে পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। একটি সূত্রের অর্থ শুনিয়া তাহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বেদ-ব্যাস ভাষ্যকারের সঙ্গে বিচার আরম্ভ করিলেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যা লইয়া উভয়ে কয়েকদিন পর্য্যন্ত বিচার করিয়াছিলেন; তাই ভাষ্যকার ঐ সূত্রের দুইটি ব্যাখ্যাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই প্রতিভার পরিচয়ে ভগবান ব্যাসদেব এতই তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি নিজ পরিচয় জানাইয়া আচার্য্য শঙ্করের পরমায়ু ষোড়শ বর্ষকে দ্বাত্রিংশৎবর্ষ হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্য যে অদ্বৈত-বাদের সূচনা করিয়া যান, আচার্য্য শঙ্কর তাহারই পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। অবশ্য ব্যাসসূত্র নামে অভিহিত বেদান্ত-সূত্রগুলি বেদব্যাস রচিত স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান কালে দ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সকলেই উহার উপর নিজ নিজ মতের পরিপোষক ভাষ্যটীকা প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। বেদব্যাসরচিত বেদান্তসূত্রেই আমরা আচার্য্য বাদরি, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়, ঔড়ুলোমি, আশ্মরথ্য, কাশকৃৎস্ন—আরো অনেক আচার্য্যের নাম দেখিতে পাই তাঁহাদের মধ্যে কাশকৃৎস্নের মতই আচার্য্য শঙ্কর সমর্থন করিয়াছেন। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে এ কথা বলিতে পারি যে, আচার্য্য শঙ্করে আসিয়া অদ্বৈত মত পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেও তৎপূর্ব্বে ঐ মতবাদের প্রভাব দেশে ছিল, তিনি অদ্ভুত কিছু একটা করিয়া যান নাই। শ্রুতির নির্দ্দেশ—তিনিই সকলের অন্তর্যামী অন্তরাত্মা, তিনি ছাড়া অন্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা আর কেহ নাই। (১) এক মাত্র তিনিই সর্ব্বভূতে গূঢ়-

(১) নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ, নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ, নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ।

রূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। (২) এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই পরমাত্মাই। (৩) এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে। (৪) দুইয়ের জ্ঞান হতেই ভয়, সন্দেহ, চিন্তা, ঘৃণা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। (৫) এই আত্মাই ব্রহ্ম। (৬) একমাত্র তাঁহাকেই জেনে জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অন্য পথ নাই। এই সকল শ্রুতিবাক্য সকল দেখিয়া তিনি নিশ্চয় করিলেন—এই সংসারে মৃত্যুর পারে যাবার একমাত্র উপায় তাঁর সাক্ষাৎকার করা। তুমিই সেই, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম এই বেদবাক্য-সকল হইতে সিদ্ধান্ত করিলেন—আমি মনুষ্য, দেবতা, যক্ষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি নই, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসী নই। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার আমি নই। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বাত্বক, বাক্‌পাণিপাদ পায়ু উপস্থ রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় আমি নই। ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম রূপ পঞ্চভূত আমি নই। প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান প্রভৃতি প্রাণ বর্গ আমি নই। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আমি নই। সকল প্রকার ধর্ম্ম বর্জ্জিত প্রজ্ঞান স্বরূপ নিজ বোধরূপ। শ্রুতি যাহাকে বিধিমুখে নির্দ্দেশ না করিয়া নিষেধ মুখে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আমি স্থূল সূক্ষ্ম নই, অণু মহৎ হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি কোন ইতিবাচক নই। দৃক পদার্থ আত্মা, পারমার্থিক এক হইয়াও উপাধি ভেদে ঈশ্বর, জীব এবং সাক্ষী বলিয়া অভিহিত হই।

অহং মম রূপ অভ্যাসবশতঃ শুক্তিতে রজত ভ্রমের মত, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত, মরীচিকাতে জলভ্রমের মত—নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব পরমাত্মা নিজেকে যেন অশুদ্ধ, অজ্ঞ, বদ্ধ, দেহাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলে মনে করি। এই ভ্রম যে কবে কখন কেন আরম্ভ হয়েছে তাহার কিছু ঠিক নাই। ইহা অনাদি হইলেও সান্ত। স্বরূপের জ্ঞানের দ্বারাই এই ভ্রমের অবসান হইবে, তাহা একদিন নিশ্চয়ই হইবে। আলোক এলে অন্ধকার যেমন আপনি চলিয়া যায় সেইরূপ জ্ঞানের প্রভাবে এই ভ্রমজ্ঞান দূর হইয়া আমি স্বরূপতঃ যাহা তহাই থাকিব। এই আলো আবার আমি নিজেই; বেদ বলে স্বয়ং জ্যোতি এই পুরুষ, অপরের জ্যোতিতে ইহাকে জ্যোতিষ্মান্ হইতে হয় না। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নিজের মহিমায় নিজেই প্রতিভাত হইবে। শাস্ত্র এই অবস্থাকেই মোক্ষলাভ বলিয়াছে। বাস্তবিক ইহা কিছু অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি নয়। প্রাপ্ত বস্তুরই প্রাপ্তি, যেমন গলায় হার থাকা সত্ত্বেও হার বুঝি নাই বলিয়া গলায় হাত দিয়া হার খুঁজে, তারপর যখন হাত দিয়া দেখে যে হার ঠিক আছে—এই মোক্ষলাভ ও সেইরূপ প্রাপ্ত বস্তুরই প্রাপ্তি। কবির ভাষায় 'নয়নে বসন বাঁধিয়া আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া' নয়নে বসন নিজেই বেঁধেছি নিজেই খুলিতেও পারি। কিন্তু কেন যে খুলিতেছি না তাহাই আশ্চর্য্য। নিজের স্বরূপের জ্ঞান হইয়া গেলেই মহামায়ার মায়া বা কুহকরাশি আর আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

এই মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর বলেন—

অব্যক্ত নাম্নী পরমেশ শক্তিরণাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে॥
বিবেকচূড়ামণি ১১৪

এই অব্যক্ত ঐশ্বরীয় শক্তি—যাহাকে ঈশ্বর ও বলা যায় না, তাহা ছাড়া পৃথকও বলা যায় না—যাহা সত্ত্বঃ রজঃ তমরূপ ত্রিগুণাত্মিকা পরাপ্রকৃতি—যাহা অনাদি, সুধীগণ যাহাকে কার্য্যনুমেয়ারূপে অভিহিত করিয়াছেন—যাহার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—এই অনির্ব্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী স্মরণ করিতে হইবে—মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। আমার অর্থাৎ পরমাত্মার যে শরণাপন্ন হয় সেই এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। আমাদের সেই ভবতারিণীর পূজক শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন—যাকে ভূতে পায় সে যদি জানে যে তাকে ভূতে পেয়েছে তাহলে ভূত চলে যায়। ছেলেরা যদি জানতে পারে যে এ আমাদের সেই হরে—তাহলে যতই মুখস পরে য়াক্ না কেন তাতে আর তারা তাকে দেখে ডরায় না। মহামায়ার মায়া জানতে পারলেই মায়ার পারে চলে যেতে পারবে। বাসনা ত্যাগই একমাত্র উপায়। দাহ্য পদার্থের অভাবে যেমন

---

(২) একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
(৩) ঐতদাত্মমিদং সর্ব্বং।
(৪) দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।
(৫) অয়মাত্মা ব্রহ্ম।
(৬) তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

অগ্নি নিজেই নির্ব্বাপিত হয়ে যায়, বাসনাক্ষয়ে জীব ও সেইরূপ মায়ার পারে যেতে পারে। মায়াযুক্ত জীবই মায়ামুক্ত হয়ে শিব হয়। এখন কি উপায়ে আমরা মায়ামুক্ত হইতে পারি, তাহার নির্দ্দেশে আচার্য্য শঙ্কর বলেন—ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—ইহ পরলোকের যাবতীয় ভোগের বাসনা ত্যাগ করা—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধারূপ ষট্ সম্পত্তি, আর মুমুক্ষুত্ব এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই মায়ামুক্ত হইতে পারিবে, স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারিবে। তপস্যা দ্বারা যারা পাপমুক্ত হয়েছে, চিত্তের ত্রিবিধ দোষ নাশ করে অর্থাৎ শুভকর্ম্মের দ্বারা চিত্তের মলরূপ দোষ নাশকরে উপাসনার দ্বারা বিক্ষেপের শান্তি করে জ্ঞানের দ্বারা আবরণ ভঙ্গ করে প্রশান্তচিত্ত হয়েছে, ইহপরলোকের যাবতীয় পদার্থে বীতরাগ হয়েছে এবং যারা মুমুক্ষু তাদেরই আত্মজ্ঞান লাভে অধিকার। অর্থাৎ তারাই আত্মজ্ঞান লাভে যোগ্য।

আচার্য্য শঙ্কর মানুষ কিসে সমস্ত হিংসা, দ্বেষ, ভেদ, বিভেদ ভুলে যেয়ে এক পরমাত্মাই বিভিন্নরূপে প্রতীত হচ্ছে বুঝতে পারে—তার জন্য যতপ্রকার সহজ উপায় থাকা সম্ভব তাহা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর নিজস্ব এই বিবেকচূড়ামণি উপদেশসহস্রী আত্মানাত্মবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে এবং দশোপনিষদ্‌ভাষ্য, গীতাভাষ্য, বেদান্তদর্শনের শারীরভাষ্য পড়লে মনে হয় বাক্যমনাতীত সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের জ্ঞান করাইবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর কি কঠোর পরিশ্রম না করেছেন। তিনি চাহিয়াছেন, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিমাত্রেই করামলকবৎ উহা প্রত্যক্ষ করুক।

সার্দ্ধ ত্রয়োদশ শতাব্দী পরে আজ আমরা তাঁর যতটুকু উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে মনে হয়, এই সমুদয় পুস্তকাবলী মঠসমূহে সযত্নে রক্ষিত ছিল। কারণ এই সমুদয় পুস্তকে মাত্র সন্ন্যাসাশ্রমোচিত উপদেশরাজীই নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাতে আরো মনে হয়, তাঁর যে সকল গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন তাঁদের জন্যও নিশ্চয়ই তিনি কিছু উপদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেগুলি লিপিবদ্ধ হয় নাই; অথবা তাহা বহু বৎসরের বহু বাধাবিঘ্নসঙ্কুল ব্যবধানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা আর আমরা পাইতেছি না। তবে ত্রৈবর্ণিক গৃহস্থদের নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ—ঋষিযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন সন্ধ্যা-বন্দনা উপাসনাদি দেবযজ্ঞ—অগ্নি হোত্রাদি ভূতযজ্ঞ—বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে বলিদান, নৃযজ্ঞ—অন্নাদির দ্বারা অতিথিসৎকার, পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা পিতৃপুরুষদের তুষ্টিবিধান—এগুলির আচরণ বহুপূর্ব্ব হতেই দেশে প্রচলন থাকিলেও বৌদ্ধবাদের প্রভাবে উহা অত্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হয়েছিল; তিনি ঐগুলির পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া হিন্দুধর্ম্মে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিলেন; তিনি স্ত্রী ও শূদ্রের বেদে অধিকার স্বীকার না করিলেও তাহারা যে পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই বলিয়াছেন।

তিনি কর্ম্মকাণ্ডের এবং বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য এবং বেদান্তোক্ত নিতান্ত নির্ম্মল অদ্বৈতবাদ প্রচার করিবার মানসে ভারতবর্ষের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, পশ্চিমে সারদা মঠ, উত্তরে যোশীমঠ এবং পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন মঠরূপ চারিটি দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সাধিত হইয়াছে—কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধবাদের বিলোপসাধন এবং অদ্বৈতমতবাদের বিস্তার। তাহা হইলেও কিন্তু ঐ মঠচতুষ্টয় এখন আচার্য্যের পবিত্র স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, এখনও তাহারা আমাদের নিকট আচার্য্যের কীর্ত্তিরূপে দণ্ডায়মান। কালের ভ্রুকুটিতে কত কত গিরিচূড়া ধ্বংস হয়ে গেলেও কিন্তু ঐগুলি ঠিক বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা কি তাঁহার মহিমার প্রকৃষ্ট পরিচয় নয়?

তাঁহার এই অদ্বৈতবাদ প্রচারের ফলে অন্য সমস্ত মতবাদ কিরূপ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, শৃগালগণ ততক্ষণই অরণ্যে কলরব করে যতক্ষণ না কেশরী গর্জ্জন করে। সিংহ গর্জ্জন করিলেই সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ হইয়া যায়। তাঁহার এই মতবাদের মূলে উপনিষদের বাণীরূপ দৃঢ় ভিত্তি ছিল বলিয়াই বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, ভেদাভেদ, নব্যন্যায় প্রভৃতি আধুনিক মতবাদ সকল বহু বাধা দিয়াও কিছুই করিতে পারে নাই। তাঁহার সেই অদ্বৈতবাদ হিমাচলের ন্যায় অচল অটল ভাবে অবস্থান করিতেছে। গঙ্গাধর শঙ্করের মস্তকস্থিত সুরধনী কোটী কোটী ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীকে যুগযুগান্তর হইতে শান্তি দিতেছে। আর এই আচার্য্য শঙ্করের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞানের আলোও কত

যুগ হইতে মানবকুলকে পথ দেখাইতেছে এবং আর কতকাল দেখাইবে তাহা কে নির্ণয় করিবে? পাশ্চাত্যজড়বাদী দার্শনিকগণও আজ আচার্য্য শঙ্করের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার এই অদ্বৈতবাদের মহত্ত্ব উপেক্ষা করিতে পারেন না, পরন্তু মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁর ঐ তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট চাকচিক্যময় ভাষ্যরূপ তরবারি যদি বৌদ্ধবাদ খণ্ডনে না নিয়োজিত হইত তাহা হইলে এই হিন্দুস্থান হয়ত বৌদ্ধস্থানেই পরিণত হইত। তাঁহার ঐ ভাষ্যরূপ জ্ঞানের বিমলপ্রভায় যদি বেদরূপ চিরশুভ্র গৌরীশঙ্করচূড়া উদ্ভাসিত না হইত তাহা হইলে কে জানে আজও ঐ বেদরূপ গৌরীশৃঙ্গ নৈশতমে আবরিত থাকিত কি না? সেই মহাযুগ সন্ধিক্ষণে যদি আচার্য্য শঙ্করের মত সুবিজ্ঞ নাবিক আসিয়া আমাদের এই জাতীয় অর্ণবপোতের কর্ণধার না হইতেন তাহা হইলে নিমজ্জমানপ্রায় জাতীয় তরণীর আর উদ্ধারের উপায় ছিল না। তাঁহার ভাষ্যের প্রশংসা করিতে গিয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—গঙ্গাপ্রবাহে মিলিত হইয়া যেমন নালার জলও পবিত্র হইয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার ভাষ্যে মিলিত হইয়া আমার এই টীকাও পবিত্র হইয়া যাইবে। আজ মহামনা ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্রের অনুবাদ করিয়া আমিও বলি—আজ এই মহাপুরুষের বিষয় লিখিয়া আমার হস্ত এবং লেখনী দুইই পবিত্র হইয়া গেল।

আষাঢ়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এলো নভে নবঘন, কাজ ফেলে রাখ্ গে,
কয়টা আষাঢ় দেখা আছে আর ভাগ্যে!
ফুটিছে মালতী কেয়া, ফুটিছে কদম্ব,
সমীরণে সুরভির এ কি পরিরম্ভ!
আগতে ও অনাগতে গণাগণি দৃশ্য
আঁখি ভরে দেখে নে রে অপরূপ বিশ্ব!

২

মরা নদী ভরা আজ, সবই প্রাণবন্ত,
বসুধার বসুধারা আজি অফুরন্ত,
যাহা ছিল আভাহীন, শুষ্ক ও সিক্ত
স্নিগ্ধ মধুর সব মমতায় সিক্ত,
যুগের আনন্দ যে করপুটে আন্‌ছে
গাত্র ভরিছে মম পুলক রোমাঞ্চে।

৩

হরিতে ধরার গ্লানি নাশিতে অমঙ্গল,
বরষে কোথায় হেন, আসে রে শ্যামল বল?
তৃণ হ'ল কুসুমিত, মূক পেলে ভাষ রে,
চঞ্চল চরাচর! কি দেখিতে চাস রে?
ঝুলনেতে দেয় দোল, অফুটে ফুটায় রে
চেনা রবে যেন সবে ডাকিয়া উঠায় রে।
মেঘ দেখে থির থাকে হিন্দুর প্রাণ কি
জলধর চরণের মোরা যে আকাঙ্খী?
সজল জলদ শিরে রামধনু দীপ্তি
জুড়ায় নয়ন মন, বুকে আনে তৃপ্তি,
মোহিনী দিতেছে আনি অমিয়ার পাত্র,
লভিবি জীবন নব দরশন মাত্র।

জঙ্গম

'বনফুল'

প্রথম পরিচ্ছেদ

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হ্যারিসন রোডে অসম্ভব রকম ভীড়। সেই ভীড় ঠেলিয়া শঙ্কর হাওড়া স্টেশনে চলিয়াছে। দ্রুতবেগেই চলিয়াছে। পাশের দোকানে একটা ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে তাহার গতি-বেগকে আরও একটু বাড়াইয়া দিল। ট্রেনের আর বেশী সময় নাই! হস্টেলের ঘড়িটা নিশ্চয় 'স্লো' ছিল। ফুলের তোড়াটা ভাল করিয়া কাগজ দিয়া ঢাকিয়া আবার সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। চারিদিকে যা ভীড়—ধাক্কা লাগিয়া তোড়াটা নষ্ট হইয়া না যায়।

নিউ মার্কেট হইতে ফুল কিনিতে গিয়া তাহার দেরীও হইয়া গেল—পকেটের সমস্ত পয়সাও শেষ হইয়া গেল। ট্রামের পয়সা পর্য্যন্ত নাই—হাঁটিয়া যাইতে হইতেছে। অথচ আজিকার দিনে সে উৎপলের সহিত শুধু হাতে দেখা করিতে পারে না ত! বাহিরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনতার মত তাহার মনের মধ্যেও নানা চিন্তা আসিয়া ভীড় করিতে লাগিল। একদিন এই উৎপলই তাহার জীবনে সব ছিল। তাহার কৈশোর জীবনটা উৎপলময় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি ভালই বাসিত তাহাকে! এই জনতার মধ্যে পথ চলিতে চলিতেও অকস্মাৎ তাহার মনে সেই বিগত জীবনের একটি স্মৃতি ভাসিয়া আসিল! দীর্ঘ দশ বৎসরেও তাহা মলিন হয় নাই। কত কথা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে কিন্তু এই ছবিটুকু শঙ্করের অন্তরে অকারণে এখনও সজীব হইয়া আছে। একদিন দুপুরে টিফিনের সময় উৎপল স্কুলের পিছনদিককার বারান্দায় বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া পেয়ারা খাইতেছিল এবং একফালি রোদ আসিয়া তাহার লাল ডোরা-কাটা জামায় পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে একটা আলো-ছায়ার রহস্য-সৃজন করিয়াছিল—এই ছবিটুকু শঙ্করের মনে কেমন করিয়া যেন এখনও অমলিন রহিয়াছে। আর একদিনের কথাও মনে আছে। সেদিন উৎপলের জন্মতিথি উৎসব। তাহার কপালে ও গালে চন্দনবিন্দুর সমারোহ। উৎপলের বোন শৈল আসিয়া শঙ্করের পরামর্শ চাহিল—দাদার জন্মদিনে নূতন রকম কি উপহার দেওয়া যায়।

"এই গ্যান্ড্রস—গ্যান্ড্রস—"

শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল।

ফিরিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ভণ্টুর গলা বলিয়া মনে হইল। ভণ্টুই নিশ্চয়। কারণ 'গ্যান্ড্র' শব্দটির এবং এই জাতীয় আরও নানা বিচিত্র শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা ভণ্টুই। নিজের মনের ভাবকে স্বরচিত নানারূপ অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করা ভণ্টুর একটা বিশেষত্ব। অভিধান বহির্ভূত এই সকল শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াই শঙ্কর ভণ্টুর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়।

শঙ্কর এদিক ওদিক চাহিয়া কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আবার চলিতে সুরু করিবে এমন সময় আবার ডাক আসিল—

"চাম্ গ্যান্ড্রস—"

শঙ্কর এবার পিছু ফিরিয়া দেখিল হ্যারিসন রোডের একটি অতি সঙ্কীর্ণ গলির অন্ধকারে ভণ্টু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

গোলগাল মুখটিতে একমুখ হাসি, বাঁ হাতে বাইসিকেল, ডান হাতে ছোট একটা প্যাকেট। নিতান্ত ছোটও নয়, মাঝারি গোছের। শঙ্কর আগাইয়া যাইতেই ভণ্টু তাহাকে বলিল—"বাইকটা একবার ধর ত—এই প্যাকেটটা বাঁধি পেছন দিকে—"

বিস্মিত শঙ্কর বাইকটা ধরিয়া বলিল—"তুই এখানে হঠাৎ ?"

"দাড়ি কিনতে এসেছিলাম।"

ভণ্টুর চোখ দুটিতে হাসি উপচাইয়া পড়িল।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইয়া বলিল—"দাড়ি ?"

"দাড়ি! চরম লদ্‌কালদ্‌কি।"

"এই এক পুঁটুলি দাড়ি!"

"জটাও আছে! জটিল লদ্‌কালদ্‌কি!"

শঙ্কর বলিল—"তুই আজকাল কলেজে যাস না কেন ? থিয়েটারে ঢুকেছিস না কি ?"

ভণ্টু কিছু না বলিয়া নিপুণভাবে প্যাকেটটি বাইকের পিছন দিকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শঙ্কর বলিল—"তাড়াতাড়ি শেষ করে নে ভাই। আমাকে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে। উৎপল বিলেত যাচ্ছে আজ—জানিস না ?"

"তাই না কি ? লদ্‌কালদ্‌কি করতে যাচ্ছিস বুঝি তুই! যা—আমার আজ আর সময় নেই। আটটার মধ্যে দাড়ি না পৌঁছলে প্যান্‌থার আমাকে খেয়ে ফেলবে—"

"প্যান্‌থার কে ?"

"ছোটবাবু—"

"ছোটবাবু কে ?"

"আরে গাড়োল, আমি যে আপিসে চাকরি করছি সেই আপিসের ছোটবাবু। ইয়া চোয়াল, ইয়া লাল চোখ চাম লদ্! থিয়েটারে ভারি ঝোঁক। প্যান্থার রসিক আছে। যাক্, চললাম ভাই আমি। উৎপলকে বলে দিস বিলেত যাচ্ছে যাক্—দক্‌চে না যায়। চললাম—দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।"

ভণ্টু বাইকে সওয়ার হইল।

শঙ্করের বিস্ময় কাটে নাই।

সে বলিল—"তুই চাকরিতে ঢুকেছিস না কি ? কিচ্ছু জানি না ত। পড়াশোনা ছেড়ে দিলি ?"

"আসচে বছর আবার সুরু করা যাবে।"

ভণ্টু বাইকে চড়িয়া জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভণ্টুদের অবস্থা সচ্ছল নয়। হয়ত দারিদ্র্যের জন্যই বেচারার পড়াটা হইল না। ভণ্টুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। বেঁটে মোটা আড়ময়লা বুকখোলা জামাপরা হাস্যমুখ ভণ্টুকে সে যেদিন প্রথমে ক্লাসে দেখিয়াছিল সেদিন তাহাকে ভারি অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল ভারি নোংরা ছেলেটা। এখনও ভণ্টু তেমনি নোংরাই আছে। কিন্তু আর ত তাহাকে তেমন খারাপ লাগে না। শঙ্কর ভণ্টুর অন্য পরিচয় পাইয়াছে। তাহাদের বাড়ীতেও সে গিয়াছে কয়েকবার।

হাওড়ার পুলের উপর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্করের মনে পড়িতে লাগিল উৎপলের কথা নয়, ভণ্টুর কথা। তাহার হঠাৎ মনে হইল, ভণ্টুর বাবা তাহাকে একদিন যাইতে বলিয়াছিলেন। নানা রকম গোলমালে তাহার যাওয়া হয় নাই। বেলেঘাটার এক অতি এঁদো গলির মধ্যে ভণ্টুর বাসা। যাওয়াই মুস্কিল। শঙ্কর ভাল করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিত যে ভণ্টুর ওখানে না যাওয়ার কারণ ভণ্টুর বাসার দূরত্ব নহে। অন্য কারণ রহিয়াছে। উৎপলের বিবাহের পর হইতেই শঙ্কর ভণ্টুর ওখানে যাওয়া একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎপলের বিবাহ হইয়াছে প্রায় মাস দুই হইল। উৎপলের শ্বশুর বড়লোক এবং শ্বশুরেরই অর্থে উৎপল বিলাত চলিয়াছে। শঙ্কর কিন্তু মাতিয়া উঠিয়াছে এসব কারণে নয়—শঙ্করের মাতিবার কারণ উৎপলের স্ত্রী সুরমা। সুশ্রী, তন্বী, যুবতী, সুশিক্ষিতা। কথাবার্ত্তায়, আচার ব্যবহারে পোষাক পরিচ্ছদে সুরুচিসঙ্গত শোভন সৌষ্ঠব।

সকল বিষয়েই বেশ কেমন একটা যেন সহজ অনাড়ম্বর কমনীয়তা। এমন মেয়ে শঙ্কর ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

সে পাড়াগাঁয়ে মানুষ। মফঃস্বলের স্কুলে পড়িয়াছে। আই-এস-সি, বি-এস-সি-টাও মফঃস্বলের কলেজেই কাটিয়াছে।

সুরমার মত মেয়ের সংস্পর্শে সে জীবনে কখনও আসে নাই। তাহার মোহগ্রস্ত মন তাই উৎপলের বিলাত যাওয়াটাকে উপলক্ষ করিয়া সুরমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়াই ঘুরিয়া মরিতেছিল। কিন্তু সে নিজে এ বিষয়ে সজ্ঞান ছিল না। এ বিষয়ে সে সচেতন হইয়াছিল অনেক পরে।

হাওড়া স্টেশনে শঙ্কর যখন পৌছিল তখন ট্রেন ছাড়িতে আর বেশী বিলম্ব নাই। মাত্র দশ মিনিট বুঝি বাকী ছিল। শঙ্কর দূর হইতেই দেখিতে পাইল উৎপল একদল নরনারী পরিবৃত হইয়া প্ল্যাটফর্মের উপরই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর কাছাকাছি আসিতেই উৎপলও তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বলিয়া উঠিল—"এই যে শঙ্কু, তুইও এসে পড়েছিস তা হ'লে। আমি ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে বুঝি আর দেখাই হ'ল না। ওহো, একটা ভারি ভুল হয়ে গেছে। স্লিপিং স্যুটটা বাক্সের ভেতরই থেকে গেছে। সুরমা বার করে ফেল না—ওই বড় স্যুটকেসটায় আছে। এখুনি ত দরকার হবে—"

সুরমা একটু ইতস্তত করিয়া গাড়ির কামরার মধ্যে গেল। ঠিক এই সময়টাতে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করিবার ইচ্ছা ছিল না তাহার।

শঙ্কর কাগজের আবরণ খুলিয়া ফুলগুলি বাহির করিল। বড় বড় লাল লাল গোলাপ। দেখিলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উৎপল বিস্মিত সুরে বলিল—"এ সব কার জন্যে এনেছিস তুই? আমার জন্যে? উঃ এত সেন্টিমেন্টাল তুই! ফুল না এনে ভাল একটা সিগারেট কেস আনতিস যদি, কাজে লাগত। ফুল ত একটু পরেই শুকিয়ে যাবে। সুরমা অবশ্য খুব খুশি হবে। সুরমা, শঙ্কর কি কাণ্ড করেছে দেখ—"

সুরমা নামিয়া আসিয়া স্মিত মুখে ফুলগুলি লইল।

উৎপল বলিল—"বিছানার একধারেই রাখ এখন। পরে ঠিক ক'রে নিলেই হবে। সুরমাও যাচ্ছে আমার সঙ্গে বম্বে পর্য্যন্ত—"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল—"ভালই ত।"

ছদ্ম গাম্ভীর্য্যভরে উৎপল কহিল—"তুমি কবি মানুষ, তুমি ত বলবেই। বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ কিন্তু বলেছেন অন্য কথা। পথি নারী বিবর্জ্জিতা—"

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল—"নারীর বেলায় শাস্ত্রটা মানা সুবিধের স্বীকার করি। তবে বিলেত যাবার মুখে শাস্ত্র আলোচনা ঠিক মানাচ্ছে না। থাম তুই—"

গাড়ীর ভিতর ফুলগুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে সুরমা শঙ্করের কথাগুলি মন দিয়া শুনিতেছিল। এই কথায় তাহার মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িল। সে গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল—"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শঙ্করবাবু। সত্যিই গোলাপগুলো লাভ্‌লি। আপনার রসবোধকে প্রশংসা না ক'রে পারলাম না।"

শঙ্কর উত্তরে শুধু হাসিল।

"উৎপলবাবু, আপনার বন্ধুদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন না? বিলেত যাচ্ছেন, এসব আদব-কায়দাগুলো শিখুন—"

উৎপল গাড়ির কামরায় ঢুকিয়া টিফিন কেরিয়ারটা লইয়া কি যেন করিতেছিল। এই কথা শুনিয়া নামিয়া আসিল। যিনি কথাগুলি বলিলেন তিনি একজন মহিলা। বয়স প্রায় পঁচিশ হইবে। পরিপাটিরূপে সুসজ্জিতা। কোথায় কি পরিলে এবং না পরিলে তাঁহাকে মানাইবে এ জ্ঞান যে তাঁহার আছে তাহা একবার তাঁহার দিকে তাকাইলেই বোঝা যায়। তাঁহার সঙ্গে আরও দুইজন তরুণী ছিলেন। তাঁহাদের বয়স আরও কম। একজনের বয়স বছর কুড়ি এবং আর একজনের বছর আঠারো।

উৎপল নামিয়া আসিয়া কহিল—"হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দেব বই কি। আমি বিলেত চললাম, আপনাদের ফাই-ফরমাস খাটবার মত একজন কাউকে দিয়ে যেতে হবে ত। এইবার আসুন, আদব-কায়দামত আপনাদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন শঙ্করসেবক রায়—আর ইনি হচ্ছেন মিসেস মিত্র। প্রফেসার বিশ্বেশ্বর মিত্রের স্ত্রী। আমাদের ইউনিভার্সাল মিষ্টি দিদি। আর ওই যে উনি—যিনি ও দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন—উনি হচ্ছেন মিষ্টিদিদির মাসতুতো বোন। ওঁর নাম হচ্ছে মিসেস রায়। ওঁর স্বামী দিল্লীতে চাকরি করেন। ডাক নাম ওঁর সোনাদিদি—আর ওঁর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনি হলেন মিস্ মিত্র। বেথুনে বি-এ পড়ছেন। ওঁর ডাক নাম হচ্ছে রিনি। আর আপনারা সবাই শুনে রাখুন, আমার এই বন্ধুটি একটি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র—ক্লাসের মধ্যে দল পাকাতে ওস্তাদ—সব দলেই পাণ্ডাগিরি করা চাই। তা ছাড়া, পরোপকারী এবং সর্ব্বোপরি কবি—"

শেষের কথাটা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

উৎপল তাহার পর দণ্ডায়মান পুরুষ দুইটির দিকে ফিরিয়া বলিল—"আর এই দুটি হচ্ছেন আমার বড় কুটুম্ব। এ দুজনকে তুই দেখিসনি শঙ্কু। এঁরা দুজনেই আজ সকালে

এসে পৌঁছেছেন। বিয়ের সময়ও আসতে পারেননি এঁরা—এত এঁদের পড়ায় মন! ইনি হচ্ছেন অশোক, আর উনি হচ্ছেন প্রবীর। দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন রুড়কিতে।"

শঙ্কর সকলকেই নমস্কার করিল।

শঙ্কর এবং উৎপল একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল। তাহার পর কিন্তু উভয়ের ছাড়াছাড়ি হয়।

উৎপল কলিকাতায় চলিয়া আসে—শঙ্কর মফঃস্বলের কলেজে যায়। সেইজন্য উৎপলের কলিকাতাবাসী পরিচিতদের সহিত শঙ্করের পরিচয় ছিল না। এতগুলি অপরিচিতা তরুণীর মধ্যে শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অস্বস্তিকর নীরবতা!

মিষ্টিদিদি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

সুমিষ্ট হাসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কবিতার বই কোন বেরিয়েছে না কি?"

"না, কোন কবিতাই ছাপা হয় নি আমার।"

ইহা শুনিয়া সোনাদিদি আগ্রহের সুরে বলিলেন, "নিয়ে আসবেন আপনার কবিতা একদিন আমাদের বাড়ীতে। এত ভাল লাগে আমার কবিতা! বিশেষ যে কবিতা ছাপা হয় নি। আসবেন একদিন? দিদি, ওঁকে চায়ে আসতে বল না একদিন।"

মিষ্টিদিদি বলিলেন—"কবিতার নাম যেই শুনেছে অমনি সোনার মন উস্‌খুস করছে। আসবেন আপনি শঙ্করবাবু একদিন। তা না হ'লে জ্বালিয়ে মারবে ও আমাকে।"

শঙ্কর বলিল—"হ্যাঁ, যাব একদিন। ঠিকানাটা কি আপনাদের?"

মিষ্টিদিদি ঠিকানা বলিলেন।

শঙ্কর উৎপলকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোর বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ী কাউকে দেখছি না যে—

"বাবা মা বর্দ্ধমানে দেখা করবেন, আর সুরমার বাবা মা উঠবেন আসানসোল থেকে। শ্বশুর মশায়কেও এইবার কাজে জয়েন্ করতে হবে ত।"

উৎপলের শ্বশুর বম্বেতে চাকুরি করিতেন।

ঢন্ ঢন্ করিয়া ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা হইল।

উৎপল ও সুরমা গিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

উৎপল বলিল—"তুইও একটা বিয়ে করে চলে আয় বিলেতে—বুঝলি শঙ্কর?"

তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নীচু করিয়া বলিল—'শোন্, রিনি মেয়েটিকে কেমন লাগছে তোর? বিয়ে কর্ না ওকে। প্রফেসার মিত্র বলছিলেন যে ভাল পাত্র পেলে বিলেতে পাঠাবেন।"

"চুপ কর তুই—"

গার্ডের হুইস্‌ল্ বাজিল।

ট্রেন চলিতে সুরু করিল।

সুরমা হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া শঙ্করকে বলিল—"চিঠি লিখবেন আমায় বম্বেতে। মিষ্টিদির কাছে ঠিকানা আছে। লিখবেন ত?"

শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

ট্রেনের গতি-বেগ বাড়িল। উৎপল জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া যথারীতি রুমাল নাড়িতে লাগিল।

যতক্ষণ রুমাল দেখা গেল সকলেই সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমশ রুমালও অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিষ্টিদিদি তখন শঙ্করকে বলিলেন—"এইবার আমরাও যাই চলুন। আপনি থাকেন কোথায়?"

"হস্টেলে।" হস্টেলের ঠিকানা সে দিল। "চলুন না নাবিয়ে দিয়ে যাই আপনাকে। গাড়ি আছে আমাদের সঙ্গে।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এখন হস্টেলে ফিরব না। আর এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে।"

"যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে। ভুলবেন না।"

"যাব।"

মিষ্টিদিদিরা চলিয়া গেলেন।

উৎপলের শ্যালক দুইটিও তাঁহাদের গাড়ীতে উঠিল।

সকলে চলিয়া গেলে শঙ্কর খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত মনটা যেন ফাঁকা হইয়া গেল। মনে হইল ভণ্টুর বাড়ী যাই। ভণ্টু হঠাৎ পড়া ছাড়িয়া চাকুরিতে ঢুকিল কেন? ভণ্টুর বৌদিদির মুখখানা একবার মনে পড়িল। এত রাত্রে ভণ্টুর বাড়ী হাঁটিয়া যাওয়াও মুস্কিল। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় যে পরিচিত টিকিট কলেকটারবাবুটির অনুগ্রহে শঙ্কর বিনা মাশুলে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াছিল তিনি আসিয়া বলিলেন—"এইবার আপনি বাইরে যান, সার। আর একখানা ট্রেন ইন্ করবে এক্ষুনি। আমার ডিউটিও ওভার হ'ল।"

শঙ্কর বাহিরে চলিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়াই তাহার চোখে পড়িল কিছুদূরে কতকগুলি লোক কি একটা বস্তুকে ঘিরিয়া কোলাহল করিতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য শঙ্করও আগাইয়া গেল। গিয়া দেখিল, একটি রমণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং সেই মূর্চ্ছিতা রমণীটির মাথা কোলে করিয়া লইয়া আর একটি নারী বিলাপ করিতেছে। তাহাদের ঘিরিয়া কৌতূহলী জনতা দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। দুই মিনিটের মধ্যে কয়েকটা মতামত শঙ্করের কানে গেল।

একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া বলিতে-ছিলেন—"মৃগি রোগ, বড় সঙীন ব্যায়রাম মশাই। ভালোর মধ্যে এই—ছোঁয়াচে নয়।"

একটি পাতলা লম্বা গোছের ভদ্রলোক তাঁহার অপেক্ষাও পাতলা ও লম্বা একটি ভদ্রলোকের কানে কানে ঘাড় উঁচু করিয়া বলিতেছিলেন—"টেনেছে—জোর টেনেছে—বুঝলে খুড়ো, দেখেই বুঝেছি আমি!"

খুড়ো কিছু না বলিয়া জিহ্বার প্রান্তটুকু তির্য্যকভাবে বাহির করিয়া বাম চক্ষুটি ছোট করিলেন। তাহা দেখিয়া পুলকিত ভাইপো খুড়োর পৃষ্ঠদেশে একটি চপেটাঘাত করিয়া সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া ফেলিলেন। মোটা গোছের একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকও মূর্চ্ছিতা নারীটির সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছেন দেখা গেল। তাঁহার থিয়োরি কিন্তু অন্য রকম। তিনি বলিতেছিলেন—"তারকেশ্বরে ধন্না দেওয়া কি সোজা ব্যাপার! সমস্তদিনের কঠোর উপবাস।"

শঙ্কর দেখিল মেয়েটির যাহাই হইয়া থাকুক, অবিলম্বে উহাকে জনতার চাপ হইতে উদ্ধার না করিলে দমবন্ধ হইয়াই মারা যাইবে।

সে সোজা ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল ও বলিষ্ঠ দুই বাহু দ্বারা অজ্ঞান মেয়েটিকে তুলিয়া লইয়া অপর মহিলা-টিকে বলিল—"আসুন, এঁকে কলের কাছে নিয়ে যাই। মাথায় মুখে জল দেওয়া দরকার আগে।" শঙ্করের সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া সকলে মনে করিল, শঙ্কর বোধ হয় ইহাদের নিজেদের লোক। সুতরাং জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

কলের কাছে লইয়া গিয়া চোখেমুখে জল দেওয়াতে মেয়েটির জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে সে অসম্বৃত বেশবাস ঠিক করিয়া লজ্জিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। শঙ্কর দেখিল মেয়েটি অল্পবয়সী। সতেরো আঠারোর বেশী হইবে না। অপর মহিলাটি বয়স্থা। তিনি বলিলেন—"বেঁচে থাকো তুমি বাবা। মেয়ের ফিটের ব্যারাম আছে। তুমি না থাকলে কি যে বিপদ হত আজ আমার!"

শঙ্কর বলিল—"আপনারা কোথা যাবেন?"

"আমরা কলকাতাতেই যাব বাবা।"

"আপনাদের একটি গাড়ি ঠিক ক'রে দিই তা হ'লে?"

"তাই দাও—"

শঙ্কর তাহাদের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করিয়া দিল। বয়স্থা মেয়েটি শঙ্করকে আর এক দফা আশীর্ব্বাদ করিয়া শেষে বলিল—"তুমি একদিন যেও আমাদের ওখানে বাবা। যাবে?"

"কোন্‌খানে থাকেন আপনারা?"

"কেরানীবাগানে। ১৮নং কেরানী বাগান। যেও একদিন, কেমন?"

"যাব।"

তরুণীটি চকিতে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইয়া অন্য-দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ঘোড়ার গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—কে ইহারা। ওই যুবতী নারীটির শরীরের ভার কি লঘু। জীবনে ইতি-পূর্ব্বে সে আর কোনদিন কোন যুবতী নারীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতা লাভ করে নাই। কত অক্লেশে সে মেয়েটিকে দুই হাতের উপর তুলিয়া কলের কাছে লইয়া আসিল। তাহার কোন সঙ্কোচ হইল না ত। ওই যে অপরা মহিলাটি ছিলেন, তিনিও ত কোন আপত্তির কারণ দেখিলেন না ইহাতে। মহিলাটি মেয়েটির কে হন? মেয়েটি কি বিবাহিতা?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে শঙ্কর আবার হাওড়ার পুল পার হইতে লাগিল। তাহার অন্তরের নিভৃত কন্দরবাসী কাহার যেন ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। কিসের যেন বিসর্পিত সঞ্চরণ সে সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি।

হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, ভণ্টু তাহার অপেক্ষায় কমন-রুমে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—"ঘোর জালে পড়ে ফের এসেছি ভাই?"

"কি হ'ল ?"

"ভীম জাল !"

"মানে ?"

"মানে, মেজকাকা ফিরে এসেছে।"

ভণ্টুর মেজকাকা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল—"তাই না কি ?"

"একেবারে থলথলে কান্ত ! মেজকাকার চেহারা যদি দেখিস এখন। ইয়া নদ্‌নদে ভুঁড়ি, মুখময় দাড়ি গোঁফ, গেরুয়া লুঙ্গি—জমজমাট ব্যাপার !"

শঙ্কর বলিল—"তাই না কি ?"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল—"ভালই ও হয়েছে, মেজকাকা ফিরে এসেছেন। ভীম জাল বলছিস কেন ?"

ভণ্টু হাসিয়া বলিল—"মেজকাকা চাকরিটা যদি পায় তবেই না ভালো ? সেই জন্যেই ত তোর কাছে এসেছি ভাই। তুই একটু বোস সায়েবকে যদি অনুরোধ করিস, ঠিক হয়ে যাবে। চাকরি না হলেই ভীম জাল। আমার পক্ষে একা ম্যানেজ করা শক্ত। তার ওপর শুনছি মেজকাকা আজকাল খাঁটি গব্যঘৃত ছাড়া ব্যবহারই করেন না অন্য কিছু। গুরুর আদেশ নেই—"

শঙ্কর শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল—"তুই পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকলি কেন হঠাৎ ? তোকে তখন জিগ্যেসই করা হয় নি। বিষ্ণুবাবু কেমন আছেন আজকাল ?"

"দাদাকে নিয়েই ত মুস্কিল। দাদার আবার জ্বর সুরু হয়েছে। ডাক্তার বললে, সমুদ্রের ধারে কোথাও চেঞ্জে পাঠাতে। সেই জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে চাকরি নিতে হ'ল। পেয়েও গেলাম একটা। কি করি বল্। দাদার হাফ্ পে-তে ছুটি। সংসার ত চালাতে হবে। তার ওপর মেজকাকা এসে হাজির হয়েছেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি তিনি পদ্মাসনে বসে প্রাণায়াম করছেন। গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছি ভাই। তুই উদ্ধার না করলে আর উপায় নেই। বোস সায়েবকে তুই যদি একটু বলিস, ঠিক মেজকাকার চাকরিটা হয়ে যাবে। যাবি এখন ? এই সময় বোস সায়েব বাড়িতে থাকে।"

"এখুনি ?"

"দেরি ক'রে লাভ কি ?"

"এখন ভাই রাত হয়ে গেছে। নটা বেজে গেছে বোধ হয়। এখন এত রাত্রে হস্টেল থেকে চলে যাওয়া ঠিক নয়। এই মাসেই আরও দুবার আমি রাত্রে ছুটি নিয়েছি। কাল যাওয়া যাবে।"

"আচ্ছা।"

ভণ্টু কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

সে যেন আশা করিয়া আসিয়াছিল, শঙ্কর এখনই তাহার সহিত বোস সায়েবের বাড়ি যাইবে।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

হঠাৎ ভণ্টু বলিল,"গোটা চারেক পয়সা দিতে পারিস ?"

শঙ্করের পকেটে যাহা কিছু ছিল ফুল কিনিতেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। পকেটে একটি পয়সাও ছিল না।

বলিল, "কাছে ত নেই ভাই।"

"ওপর থেকে নিয়ে আয়।"

"কি করবি পয়সা নিয়ে ?"

"কিছু খাব। সেই বেলা নটায় দুটি ভাত খেয়ে আপিসে বেরিয়েছিলাম। তারপর থেকে গ্লাস তিনেক জল ছাড়া আর কিছু খাই নি। পেটে এ রকম আগুন জ্বলচে যে, ফায়ার ব্রিগেড ডাকলেই হয়। যা, চট্ ক'রে নিয়ে আয় চারটে পয়সা—"

শঙ্কর উপরে গিয়া ভণ্টুকে পয়সা আনিয়া দিল।

ভণ্টু চলিয়া গেল।

শঙ্করও উপরে যাইতেছিল, এমন সময় একটি চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল।

"শঙ্করবাবু এখানে থাকেন ?"

"হ্যাঁ আমিই। কি চাই ?"

"চিঠি আছে।"

"কই দেখি—আমার নামে ?"

চাকর একখানি পত্র তাহার হস্তে দিল। খামের উপর অপরিচিত নারী হস্তের লেখা।

চিঠি খুলিয়া পড়িল।

শঙ্করবাবু,

নমস্কার। কাল বিকেল পাঁচটায় আমাদের বাড়িতে ছোটখাটো একটা টি-পার্টি আছে। আপনাকে আসতে

হবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলাম। কাল সমস্ত দিন হয়ত আপনি কলেজে থাকবেন, কোথায় আপনাকে খবর দেব, তাই এখুনি জানিয়ে দিলাম। আসতে ভুলবেন না কিন্তু। সোনা বলছে, আপনার কবিতার খাতাও যেন আনেন। খাতা আনুন আর নাই আনুন, নিজে কিন্তু নিশ্চয় আসবেন।

মিষ্টিদিদি

শঙ্করের সমস্ত অন্তরটা কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাকরটার দিকে ফিরিয়া সে বলিল—"আচ্ছা যাব।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

কমন রুমটায় শঙ্কর খানিকক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন যে সে দাঁড়াইয়া রহিল তাহা সে নিজেও বলিতে পারিত না। সে কি ভণ্টুর কথা ভাবিতেছিল? মিষ্টিদিদির কথা? আজ সকালে বাবার পত্র পাইয়াছিল যে তাহার মায়ের পাগ্‌লামি এত বাড়িয়াছে যে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে। তাহার উন্মাদিনী মায়ের কথাই সে কি ভাবিতেছিল? হাওড়া স্টেশনের সেই মূর্চ্ছিতা যুবতীটির কথা? না, কিছুই ত নয়। জ্ঞাতসারে সে কিছুই ভাবিতেছিল না। তাহার চমক ভাঙিল যখন টং টং করিয়া ঘড়িতে নটা বাজিল। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভণ্টুর বৌদিদি বসিয়া কুটনো কুটিতেছিলেন।

রান্নাঘর সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ বারান্দা, এইমাত্র ধোওয়া হইয়াছে। জল এখনও শুকায় নাই। সেই ভিজা বারান্দার উপরই একখানি পিঁড়ির উপর বসিয়া বৌদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। নিকটেই তাঁহার নবম বর্ষীয়া কন্যা বসিয়া আলুর খোসাগুলি জড়ো করিতেছিল। সেগুলিরও একটি তরকারি হইবে। খোসা চচ্চড়ি ভণ্টুর প্রিয় খাদ্য। রোজ তাহা হওয়া চাইই।

বারান্দা হইতে পা বাড়াইলেই যে ভূমিখণ্ড পদস্পর্শ করে তাহাকেই উঠান বলিতে হয়। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ওই স্থানটুকুতে দাঁড়াইলেই মাথার উপর আকাশ দেখা যায়। এই সঙ্কীর্ণ-পরিসর প্রাঙ্গণে তিনটি বালক -তাহার মধ্যে দুইটি একেবারে শিশু, খেলা করিতেছিল। আর একটি বছর এগারোর বালক হাঁটু গাড়িয়া দুই কান ধরিয়া সম্মুখস্থ মোড়ায় রক্ষিত উপক্রমণিকা হইতে শব্দরূপ মুখস্থ করিতেছিল। তাহার পড়া হয় নাই বলিয়া ভণ্টু তাহাকে শাস্তি দিয়াছে। বৌদিদিকে দেখিয়া বোঝা দুষ্কর যে তিনি পাঁচটি সন্তানের জননী। তাঁহার মুখখানি এত কচি যে আবার তাঁহার বিবাহ দিয়া আনা যায়। বৌদিদিকে সুন্দরী হয়ত কেহ বলিবে না, কারণ তাঁহার রঙ্ কালো। এত কালো যে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিয়া চালাইবার চেষ্টাও হাস্যকর হইবে। কিন্তু রঙে কি আসে যায়? বৌদিদির হাসিমাখা গোলগাল ঢলঢলে মুখখানিতে, ডাগর চোখ দুটিতে, তাম্বুলরঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুটিতে যে শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সকলকেই মুগ্ধ করিবে। যাহাকে করিবে না, তাহার রূপ দেখিবার চোখ নাই। বৌদিদি কুটনো কুটিতে কুটিতে কন্যা ফনতিকে আদেশ করিলেন, "ফনতি, আমার জন্যে একখিলি পান সেজে নিয়ে আয় ত আগে। দোক্তাও আনিস একটু—"

ফনতি চলিয়া গেল।

পানের রঙে বৌদিদির ঠোঁট দুইটি সর্ব্বদা টুকটুক্ করিতেছে। একবেলা না খাইয়া বরং বৌদিদির চলিতে পারে, কিন্তু পান না হইলে তাঁহার একদণ্ড চলা মুস্কিল। ওইটুকুই তাঁহার জীবনের একমাত্র সখ—যাহা তিনি বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। জীবনের কত সখই ত পূর্ণ হয় নাই, আর হইবেও না বোধ হয়। পানের সরঞ্জামকে কেন্দ্র করিয়া তাই তাঁহার নানারূপ আয়োজন। নানারকম টুকিটাকি জিনিসে তাঁহার পানের বাটাটি পরিপূর্ণ। ভাজা মশলা, কমলা লেবুর শুকনো খোলা, চুয়া-সুগন্ধি দোক্তা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, মৌরি, রকমারি পানের মশলা, নিখুঁত চুণ, ভিজে ন্যাকড়ায় জড়ান পান, গিহি করিয়া কাটা সুপারি, ভাল খয়ের—অতি নিপুণভাবে তিনি পানের বাটাটিতে গুছাইয়া রাখিয়াছেন। এই পিতলের বাটাটি কিনিয়া দিয়াছিল বলিয়াই শঙ্কর ঠাকুরপোর উপর বউদিদি এত প্রসন্ন। ভণ্টু ঠাকুরপোর এই বন্ধুটি বেশ মানুষ।

ভণ্টুর ক্রুদ্ধস্বর শোনা গেল।

"এই তোর পড়া হল, নিয়ে আয় দেখি—"

খানিকক্ষণ পরেই সপাসপ বেতের শব্দ এবং সঙ্গে স...

বালক-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ। মার এবং আর্ত্তনাদ সমানবেগেই খানিকক্ষণ চলিল। তাহার পর আবার সমস্ত চুপচাপ। বালক আবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া সুরু করিল—নরঃ, নরৌ, নরাঃ—

বৌদিদি অবিচলিতভাবে তরকারি কুটিয়া যাইতে লাগিলেন। পুত্রের এতাদৃশ নির্য্যাতনে তাঁহার কোন বিকারই লক্ষিত হইল না। এ সব তাঁহার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে দরাজ কণ্ঠে আদেশ আসিল—"বৌমা, চায়ের জল চড়াও, আটটা বাজল।"

তাহার পরই একটি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। দীর্ঘাকৃতি ঈষৎ-কুব্জ দেহ, গৌরবর্ণ, গোঁফ দাড়ি কামানো, শুকচঞ্চু নাসা, চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি। পুরু লেন্সের চশমা পরা। হস্তে একখানি খবরের কাগজ—বঙ্গবাসী। তিনি আসিয়া দাঁড়াইতেই বৌদিদি উঠিয়া তাঁহার কানের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "ডালটা নাবিয়েই চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি। বেশী দেরি নেই আর।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আচ্ছা—"

সুরটা যেন অপ্রসন্ন।

বৃদ্ধ ভণ্টুর পিতা। কানে কম শোনেন। বহুকাল হইতে বিপত্নীক। চায়ের দেরি আছে শুনিয়া তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং তামাক সাজিতে বসিলেন। ভোর তিনটায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন হইতে সুরু করিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত চা এবং তামাক লইয়া থাকেন। অবসর মত সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পাঠ করেন। বৃদ্ধ চলিয়া গেলে ভণ্টু আসিয়া দর্শন দিল। কৌতুকপূর্ণ চক্ষু দুইটি বৌদিদির মুখের উপর স্থাপন করিয়া সে প্রশ্ন করিল, "বাকু কি বলছিলেন?

বৃদ্ধ বাকু?

ভণ্টুর ভাষায় বাকু মানে বাবা।

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "বাকুর আর কি অন্য কথা আছে এখন? আটটা বেজে গেছে, চা চাই।"

ভণ্টু গা দোলাইয়া দোলাইয়া বলিতে লাগিল, "বা কুর কুর কুর কুর—"

বৌদিদি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। "তুমি থামো ঠাকুরপো, এখুনি হয়ত এসে পড়বেন!" ভণ্টু ও বৌদিদি সমবয়সী। বৌদিদি যখন বধূরূপে এ বাটীতে আসিয়া প্রথম প্রবেশ করেন তখন তাঁহার বয়স এগারো। ভণ্টুরও বয়স তখন এগারো। তখন হইতেই দুইজনে এক সংসারে এক সঙ্গে মানুষ হইয়াছে। ছেলেবেলায় দুইজনে মারামারি পর্য্যন্ত করিয়াছে। এখনও কথায় কথায় ইহাদের মনান্তর ও ভাব হয়। বাড়ীর গুরুজনস্থানীয় সকলের সম্বন্ধে ইহারা নিভৃতে যে সব আলোচনা করে তাহা শুনিলে বিস্ময় হয়। মনে হয়, গুরুজনদের প্রতি বুঝি এতটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা ইহাদের নাই। শ্রদ্ধার কথা বলিতে পারি না, কারণ শ্রদ্ধা জিনিসটা গুরুজনদেরও অর্জ্জন করিতে হয়, কিন্তু ভালবাসায় ইহারা কাহারও অপেক্ষা কম নয়। বৃদ্ধ বাকুর সামান্য সুখ সুবিধার জন্য ইহারা বহু কৃচ্ছ্র সাধন করিতে প্রস্তুত, করিতেছেও। বৃদ্ধ বাকুও বৌমাকে ছাড়িয়া কখনও কোথাও থাকেন নাই। থাকিতে পারেনও না।

বৌদিদি বলিলেন, "বাকুর তামাক ফুরিয়েছে, এনো আজ।"

"এই ত পরশু তামাক এনেছি—"

"কি জানি, বাবাজী আসার পর থেকে বাবা ভয়ানক ঘন ঘন তামাক খাচ্ছেন।"

বলিয়া বৌদি ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখে কাপড় দিলেন। বাবাজী মানে ভণ্টুর মেজকাকা।

ভণ্টু পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া বলিল—"এই নাও আমার আজ আফিস থেকে ফিরতে দেরি হবে। শণ্টুকে দিয়ে তামাকটা আনিয়ে নিও ওই মোড়ের দোকানটা থেকে। বাবাজীর জন্যে ঘি-ও আনিও কিছু। গাওয়া ঘির সঙ্গে অন্য ঘি-ও একটু মিশিয়ে চালাও না—"

বৌদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "কাল চালিয়ে ছিলাম একটু—"

"আর এই নাও একস্ট্রা দু-আনা। একটু ভালো মাছ আনিয়া শণ্টুকে খেতে দিও। রাগের মাথায় বড্ড মেরেছি ছেলেটাকে। কাল ঘি খেয়ে কি বল্‌লে বাবাজী? ধরতে পারে নি?"

বৌদিদি মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, "পারে নি আবার! বললেন, মানুষের অধর্ম্মাচরণের

চাটে গাইগুলো পর্য্যন্ত বিগড়ে গেছে। গাওয়া ঘিয়ে আর সে রকম গন্ধই নেই!"

"বাবাজী একেবারে চাম চামাটু! ফিরবে কখন বাবাজী?"

"গুরু-ভাইদের কাছে গেছেন, শিগগির কি আর ফিরবেন?"

"রান্নার কত দেরী?"

"ডালটা নাবিয়েই তরকারিটা চড়িয়ে দিচ্ছি। ভাত হয়ে গেছে। খোসা চচ্চড়ি ও-বেলা খেও, কেমন?"

"আচ্ছা।"

দুয়ারে কড়া নড়িল।

পিওন চিঠি দিয়া গেল।

ভণ্টু চিঠিখানি পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "লুত্নুর লুত্নুর—"

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি?"

"লুত্নুর, লুত্নুর—"

রান্নাঘর হইতে একটা পোড়া-গন্ধ ছাড়িল।

বৌদিদি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওই যাঃ, ডালটা বুঝি পুড়ল! ফনতি পোড়ারমুখিকে সেই যে একটা পান সাজতে বলেছি—যুগযুগান্ত কাটাচ্ছে মুখপুড়ি তাই নিয়ে-"

তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।"

ভণ্টু বলিল—"ফনতিকে ত কান ধরে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি। পায়ে পা ঠেকে গেছল, পেন্নাম করে নি।"

বৌদিদি কোন উত্তর দিলেন না।

ভণ্টু পত্রখানি পুনরায় পড়িতে লাগিল।

বৌদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলে ভণ্টু প্রশ্ন করিল—"ডাল 'গন্' ?"

"'গন্' কেন হবে। ফেনটা উথলে উনুনে পড়েছিল। ওটা কার চিঠি?"

"মোমবাতি আবার বিয়ে করেছে। এক পুলিশ অফিসারের মেয়েকে। বিয়ে করে সি. আই. ডি. হয়েছে। লুত্নুর, লুত্নুর।"

বৌদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন—"আবার বিয়ে করলে মৃণ্ময় ঠাকুরপো?"

ভণ্টু গম্ভীরভাবে বলিল, "এ বউটাও পালাবে।"

বৌদিদি বলিলেন, "আচ্ছা বউটার কোন খবরই পাওয়া গেল না, নয়? মৃণ্ময় ঠাকুরপো কিন্তু খুব ভালবাসত তাকে, যাই বল তোমরা!"

"লুত্নুর লুত্নুর—".

ভণ্টু ভঙ্গীভরে শরীরের উপরার্দ্ধ নাচাইতে লাগিল।

বৌদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

"ভালবাসত না?"

"নিশ্চয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বউ পালাবার এক বছর না যেতে যেতেই আবার বিয়ে করলে।"

বৌদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "পুরুষরা সব পারে। তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই।"

"লুত্নুর, লুত্নুর!"

"সত্যি, ভারি আশ্চর্য্য লাগছে কিন্তু—"

হাসিয়া বৌদিদি আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

ভণ্টু হাঁকিল—"এই ফনতি, পান দিয়ে যা মা-কে।"

ফনতি পান লইয়া আসিল।

বাকু আবার একবার তাগাদা দিলেন। "বৌমা, ডাল নাবল তোমার!"

বৌদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বাকুকে বলিতে গেলেন যে চায়ের জল চড়ানো হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহার চোখে মুখে হাসি।

ভণ্টু একটি ময়লা লুঙ্গি পরিয়া তেল মাখিতে বসিল।

(ক্রমশঃ)

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন

ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম্-এ, পী-এইচ্-ডী, পী-আর-এস্

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যেই তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুরূপ দার্শনিক পরীক্ষার প্রেরণা দেখিতে পাওয়া যায়। জীব ও জড় প্রকৃতির অন্তস্তত্ত্ব বা জীবাতিগ ও বিশ্বাতিগের জিজ্ঞাসা বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। এইরূপ জিজ্ঞাসার ফলে জিজ্ঞাসু যে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে তাহাই হইল তাঁহার দর্শন। আর যিনি সত্যদ্রষ্টা—তিনিই ঋষি। সত্যের যথার্থ সাক্ষাৎকার তর্কের সাহায্যে হয় না। তাহা হয় অন্তর্দৃষ্টি বা 'বোধি'র সাহায্যে। একজন বুদ্ধিমান তার্কিক তাঁহার প্রতিভাবলে যে তর্কের অবতারণা করেন অন্য কোনও তীক্ষ্ণধী তার্কিক তাহার দোষ ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। এইরূপে তৃতীয় বুদ্ধিমান আবার দ্বিতীয় বুদ্ধিমানের যুক্তিজাল ছিন্ন করেন। সুতরাং তর্কের শেষ কোথায়? এই জন্যই তর্ক দ্বারা সত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দুরাশা মাত্র।(১) কিন্তু তাহা বলিয়া দার্শনিক চিন্তা জগতে তর্ককে বাদ দিলেও তো চলে না। তর্ক ও বিচারই দর্শনশাস্ত্রের প্রাণ। এই জন্যই দর্শন শাস্ত্রের অপর নাম মননশাস্ত্র। শ্রুতি ও মননকে আত্মদর্শনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মার্জ্জিত বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির সাহায্যে যে সত্য-জিজ্ঞাসার পথ সুগম হয় ইহা তো কোন দার্শনিকই অস্বীকার করেন না, তবে তর্কের সাহায্যে সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে দুরাশা বলিব কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে তর্কের উদ্দেশ্য, গতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন। কেহ সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া তর্ক করে। কেহ জিগীষার বশে নানা প্রকার ছল ও অসত্তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিবার জন্যই তর্ক-জাল বিস্তার করে। কেহ বা শুধু তর্কের জন্যই তর্ক করে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথমশ্রেণীর তার্কিকের তর্কপদ্ধতির মূলে সত্যের প্রেরণা থাকায় ঐরূপ তর্ককে দার্শনিক পরীক্ষার অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়, কিন্তু অপরাপর তার্কিকগণের তর্কের মূলে সত্যজিজ্ঞাসা না থাকায় ঐরূপ শুষ্ক তর্ক দার্শনিক পরীক্ষার উপযোগী নহে বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। শ্রুতি ও আচার্য্যের উপদেশে ভারতীয় দর্শনে আমরা যেখানে তর্কের নিন্দা শুনিতে পাই তাহা ঐরূপ অসত্তর্ক বা শুষ্ক তর্ক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। নতুবা মননশাস্ত্রের প্রাণই তর্ক, দার্শনিক তাহা বাদ দিবেন কিরূপে? তর্কের এই বিভিন্ন রূপ তর্করহস্যবিদ্ নৈয়ায়িকগণ আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তর্কের বিভিন্ন স্বরূপ বুঝাইবার জন্য (ক) তর্ক (খ) বাদ (গ) জল্প (ঘ) বিতণ্ডা—এই চারটি তার্কিক পরিভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তর্ক ও বাদের মূলে তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রেরণা থাকায় ঐরূপ তর্ক দার্শনিকের অবলম্বনীয়; জল্প ও বিতণ্ডার মূলে সত্যের প্রেরণা না থাকায় ঐরূপ কুতর্ক সত্যজিজ্ঞাসুর সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।(২) কিন্তু তর্ক যতই সূক্ষ্ম, গভীর ও নির্দ্দোষ হউক না কেন তাহা দ্বারা যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা পরোক্ষ সত্য, তর্কের দ্বারা সত্যের প্রত্যক্ষ হয় না। সার্ব্বভৌম সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে বুদ্ধিলোকের উর্দ্ধে প্রজ্ঞালোকে চলিয়া যাইতে হয়। বুদ্ধিলোকে হয় সত্যের বিচার, প্রজ্ঞালোকে হয় সত্যের সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকার তর্কলভ্য নহে, অপ্রতর্ক্য, ইহা সাধনালভ্য। সাধনার ফলে প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হইলেই সত্যের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির ভূমি হইতে প্রজ্ঞার ভূমি সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। বুদ্ধির যুগ ভাষ্যকার ও টীকাকারের যুগ। এই যুগে আমরা দেখিতে পাই বিচারশক্তির অপূর্ব্ব লীলা, ভারতীয় দার্শনিক-প্রতিভা এখানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাশি রাশি গ্রন্থমালা

(১) আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রে (২।১।১১) তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তর্ক যে সুপ্রতিষ্ঠিত নহে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রুতিও বলিয়াছেন—নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া।

(২) তর্ক, বাদ প্রভৃতি বিভিন্ন তর্কপ্রণালীর বিশেষ বিবরণের জন্য ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়নভাষ্য (১।১।৪০—৪২) দ্রষ্টব্য।

নূতন নূতন চিন্তার সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছে। খণ্ডন ও মণ্ডনে বাণীর পাদপীঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। তর্ক কোলাহলে এই যুগ মুখরিত। এই কোলাহলের মধ্যে বোধির বাণী অস্ফুটই থাকিয়া যায়। জিগীষুর সদম্ভ আস্ফালনই হৃদয় অধিকার করে। কিন্তু একথাও এখানে অস্বীকার করিলে চলিবে না যে বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়াই দার্শনিক সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। তর্কের আলোকচ্ছটায় তত্ত্বজিজ্ঞাসার পথ যত সুগম করা যাইতে পারে ভারতীয় দার্শনিকগণ তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তবে সেই নিশিতবুদ্ধিভেদ্য-তর্কারণ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষত হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। তর্কের কণ্টকবনে জ্ঞানকুসুমের বিকাশ হয় না; সুতরাং মনে রাখিতে হইবে যে কুলিশকঠোর তর্কাহবেই দর্শনচিন্তার পরিণতি নহে। ভারতীয় দর্শন একদিকে যেমন তর্কবিজ্ঞান, অপর দিকে ইহা শাশ্বত শান্তিনিদান অধ্যাত্মবিজ্ঞান। বিচার, তর্ক ও সাধনার মধ্য দিয়া আত্মদর্শন ও আত্মমুক্তিই দর্শনের চরম লক্ষ্য। নিরাবিল আনন্দই দার্শনিকের একমাত্র কাম্য। সেই আনন্দের মাপকাঠী প্রত্যেক দার্শনিকের বিভিন্ন হইলেও ভারতীয় দার্শনিকগণ সকলেই আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত। দেহাত্মবাদী চার্ব্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তী পর্য্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিকই তাঁহার স্বীয় দর্শনচিন্তার অনুকূল আত্মিক সুখ ও মুক্তির সন্ধান দিয়াছেন। সমস্ত দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহই মহামানবের মুক্তিসাগরে ছুটিয়া চলিয়াছে। তর্ক ও বিচার জীবের মুক্তি অভিযানে পাথেয় হিসাবেই ভারতীয় দার্শনিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই ভারতীয় দর্শন পৃথিবীর অন্যান্য দর্শন হইতে স্বতন্ত্র। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তাহার নিজস্ব সম্পদ। ভারতীয়-ঋষির অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এই সম্পদের মূল। সত্য সর্ব্বতোমুখ। ঋষির জ্ঞাননেত্রে সর্ব্বতোমুখ সত্যের যে মুখ যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহাই ক্রমে বিভিন্ন দর্শনাকারে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এইজন্যই দার্শনিক রাজ্যে নানা মতবাদ ও প্রস্থানভেদের সৃষ্টি।

ভারতীয় দর্শনের ঐ সকল বিভিন্ন প্রস্থানের বিবরণ মাধবাচার্য্যকৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সংগ্রহগ্রন্থে মাধবাচার্য্য (১) চার্ব্বাক (২) বৌদ্ধ (৩) জৈন (৪) রামানুজ (৫) মাধ্ব (৬) পাশুপত (৭) শৈব (৮) প্রত্যভিজ্ঞা (৯) রসেশ্বর (১০) পাণিনীয় (১১) ন্যায় (১২) বৈশেষিক (১৩) সাংখ্য (১৪) যোগ (১৫) পূর্ব্বমীমাংসা ও (১৬) উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত এই ষোলটি বিভিন্ন দর্শনের প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ষোলখানি দর্শনের মধ্যে ষড়্-দর্শনই পরবর্ত্তী কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে ষড়্দর্শন বলিয়া আমরা কোন্ ছয়খানা দর্শনকে গ্রহণ করিব? জৈন পণ্ডিত হরিভদ্রসূরি তৎকৃত ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ে ষড়্দর্শন বলিয়া (১) বৌদ্ধ (২) ন্যায় (৩) সাংখ্য (৪) জৈন (৫) বৈশেষিক ও (৬) মীমাংসা এই ছয় দর্শনকে গ্রহণ করিয়াছেন (৩) এবং ইহাদেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে তিনি সাংখ্য শব্দে সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই উভয় দর্শনকে এবং মীমাংসা শব্দে পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা এই উভয়বিধ মীমাংসাশাস্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে তদীয় ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা — বৌদ্ধ ও জৈন ভারতের এই আটটী প্রসিদ্ধ দর্শন ষড়্দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে পণ্ডিত জিনদত্তসূরি তৎকৃত বিবেকবিলাস নামক গ্রন্থে এবং ঐ শতকেরই মধ্যভাগে জৈন পণ্ডিত মালাধারী শ্রীরাজশেখরসূরি তদীয় ষড়্দর্শনের ব্যাখ্যায় হরিভদ্রসূরির পূর্ব্বোক্ত মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন (৪)। হরিভদ্রসূরির ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ই দর্শনের আদি সংগ্রহ গ্রন্থ। সম্ভবতঃ তাঁহার গ্রন্থ হইতেই ষড়্দর্শন কথাটি জৈনসম্প্রদায়ে বিশেষ

---

(৩) বৌদ্ধং নৈয়ায়িকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেষিকং তথা।
জৈমিনীয়ঞ্চ ষড়্বিধানি দর্শনানামমূন্যহো॥
ষড়্দর্শন সমুচ্চয়—৩য় কারিকা।

(৪) জৈনং সাংখ্যং জৈমিনীয়ং যোগং (=ন্যায়শাস্ত্র) বৈশেষিকং তথা।
সৌগতং দর্শনান্যেবং নাস্তিকং ন তু দর্শনম্॥
—মালাধারী রাজশেখরকৃত ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, ১ম পৃষ্ঠা, যশোবিজয়-গ্রন্থমালা বেনারস্।

প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং পরে অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় ইহা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের ষড়্দর্শনের বিবরণ হরিভদ্রসূরির প্রদত্ত বিবরণের অনুরূপ নহে। বর্ত্তমান সময়ে ষড়্দর্শন বলিলে আমরা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়খানি দর্শনকেই বুঝি। জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন এখন আর ষড়্দর্শনের অন্তর্ভূত নহে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ও বিশ্বেশ্বরতন্ত্রের অন্তর্গত গুরু-গীতায় গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও ব্যাসের দর্শনকে ষড়্দর্শন বলা হইয়াছে। (৫) নৈষধ চরিতের টীকাকার নারায়ণ তাঁহার প্রকাশনামক টীকায় (নৈঃ ১০।৩৬) ষড়্দর্শনের কথা বলিতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত ষড়্দর্শনেরই নাম করিয়াছেন। এই ছয়-দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলা হইয়া থাকে। এই মতানুসারে জৈন ও বৌদ্ধ-দর্শন নাস্তিক-দর্শন।

এখন প্রশ্ন এই যে দর্শনের আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের মাপকাঠি কি? কি যুক্তিবলে আস্তিক ও নাস্তিক-দর্শনের ঐরূপ সীমারেখা অঙ্কিত হইয়া থাকে? আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা পরলোক, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা আস্তিক, আর যাঁহারা তাহা মানেন না তাঁহারাই নাস্তিক। দ্বিতীয়তঃ যাহারা ঈশ্বর বা বেদ মানেন না তাঁহারাও নাস্তিক। (৬)

নাস্তিক শব্দের উক্ত ত্রিবিধ অর্থের মধ্যে যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া বলা যায় যে যাঁহারা পরলোক, কর্ম্ম বা কর্ম্মফল মানেন না তাঁহারাই নাস্তিক, তবে জৈন ও বৌদ্ধ-দর্শনকে কোনমতেই নাস্তিক বলা যায় না। কারণ অন্যান্য আস্তিক-দর্শনের ন্যায় জৈন ও বৌদ্ধদর্শনেও কর্ম্ম, অদৃষ্ট ও পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। জৈন-দার্শনিকগণ বলেন যে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি; ঐ কর্ম্ম সূক্ষ্ম অদৃষ্টরূপে আত্মাতে সঞ্চিত হয় এবং আত্মার উপর একটী পাপ-পুণ্যের ছাপ আঁকিয়া দেয়। ইহারই নাম আত্মার 'কর্ম্মলেপ'। অতীত জীবনের অনাদিকাল সঞ্চিত ঐ কর্ম্মলেপের ফলে জীবের 'কর্ম্ম শরীরের' সৃষ্টি হয়। কর্ম্ম জীবকে জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে টানিয়া নেয় এবং স্বস্ব কর্ম্মানুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ করায়। জৈন দার্শনিকগণ ইহলোক ও পরলোকগামী স্থির-আত্মা স্বীকার করেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে বাসনার মূলোচ্ছেদই নির্ব্বাণ। যতদিন বাসনার মূলোচ্ছেদ না হইবে ততদিন জীবন-প্রবাহের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া অনন্ত দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। ইহলোক পরলোকগামী স্থির আত্মা না থাকিলেও অনাদি-বাসনা-বশতঃ যে জীবন-প্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে নির্ব্বাণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তই উহা অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিবে। সে চিরপ্রবহমান জীবন-স্রোতের গতিপথে জন্ম, মৃত্যু, জন্মান্তর প্রভৃতি এক একটী স্তর মাত্র। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এইরূপে পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না তাঁহাদিগকে যদি নাস্তিক বলা যায়, তবে কপিলের সাংখ্যদর্শন নাস্তিক দর্শন হইয়া দাঁড়ায়; কেননা মহর্ষি কপিল সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। জৈমিনির মীমাংসাদর্শনেও ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং বৈদিক কর্ম্মমীমাংসা ও নাস্তিক দর্শনই হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে যাঁহারা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড়্দর্শনকে আস্তিক দর্শন এবং জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনকে নাস্তিক-দর্শন বলেন তাঁহারা বেদ প্রামাণ্যের

---

(৫) গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥
রঘুনন্দন কৃত দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচন।

This verse is also quoted in the গুরুগীতা।

(৬) "অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ"—পাণিনি সূত্র—৪।৪।৬০ ও মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পরলোকঃ অস্তীতি যস্য মতিরস্তি স আস্তিকঃ, তদ্‌বিপরীতো নাস্তিকঃ—কাশীপ্রকাশিত কাশিকা, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতিযস্য স আস্তিকঃ। নাস্তীতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ। সিদ্ধান্তকৌমুদী।

পরলোক ইত্যভিধানা-স্বভাবাল্লভ্যম্।—শব্দেন্দুশেখর Vol II.
পৃঃ ২৮৭ (কাশীপ্রকাশিত)।

নাস্তিকঃ পরলোকতৎসাধনাদ্যভাববাদী।
তৎসাক্ষিণ ঈশ্বরস্য অসত্ত্ববাদী চ॥

নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্। ভীমাচার্য্য কৃত-ন্যায়কোষ-নাস্তিক শব্দ দ্রষ্টব্য।

"নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ"—মনুসংহিতা।

ভিত্তিতেই আস্তিক ও নাস্তিকদর্শনের সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ' এই মতের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বলেন যে, যাঁহারা বেদ মানেন তাঁহারাই আস্তিক, আর যাঁহারা বেদ মানেন না বেদের নিন্দা করেন তাঁহারা নাস্তিক, তাঁহাদের দর্শনই নাস্তিক দর্শন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন, তৃতীয় শব্দপ্রমাণ ও শব্দময় বেদের প্রামাণ্য তাঁহারা স্বীকার করেন না এবং কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বেদের নিন্দাই শুনিতে পাওয়া যায়; (৭) এই জন্যই বৌদ্ধদর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা হইয়া থাকে। জৈন দার্শনিকগণ শব্দপ্রমাণ স্বীকার করিলেও "বেদ যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য" এইরূপ বেদ প্রামাণ্য অঙ্গীকার করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের দর্শনও নাস্তিক দর্শন।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে বৌদ্ধদর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী মাত্র প্রমাণ মানে, শব্দ প্রমাণ মানে না, সুতরাং তাহা যেমন নাস্তিক দর্শন হইল সেইরূপ বৈশেষিক দর্শনও প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়ই মানিয়াছে, শব্দ প্রমাণ মানে নাই—অতএব বৈশেষিকদর্শন বৌদ্ধদর্শনের ন্যায় নাস্তিক দর্শন হইল না কেন? উহা আস্তিক দর্শন বলিয়া গণ্য হইল কিরূপে? এই আপত্তির উত্তরে আস্তিক দার্শনিকগণ বলেন যে বৈশেষিক দর্শন শব্দপ্রমাণ স্বতন্ত্রভাবে না মানিলেও (প্রকারান্তরে শব্দপ্রমাণ স্বীকার করিয়া) বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শনের মত বেদকে অপ্রমাণ বলেন নাই; এই জন্যই বৌদ্ধদর্শন নাস্তিক, আর বৈশেষিকদর্শন আস্তিক দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইল। বৈশেষিকদর্শন শব্দপ্রমাণ মানেন নাই অথচ শব্দময় বেদের প্রামাণ্য মানেন ইহার অর্থ কি? বৈশেষিক শব্দপ্রমাণ মানেন না ইহার অর্থ—তাঁহার মতে শব্দ অপ্রমাণ নহে তবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ন্যায় উহা একটী স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণও নহে। শব্দপ্রমাণ বৈশেষিকের মতে অনুমানেরই অন্তর্ভূ্ত, অনুমানেরই একটী প্রকার ভেদ মাত্র। ইহা শব্দে অনুমান, বৈশেষিকের মতে অনুমান প্রমাণ দ্বারাই 'শব্দ-অনুমানের' উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং শব্দকে একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া মানিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। শব্দপ্রমাণের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রে "অনুমান প্রমাণ দ্বারাই শব্দপ্রমাণ ও ব্যাখ্যা করা গেল" (এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্ বৈঃ সূত্র) এই উক্তি দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ প্রভৃতিও শব্দ, উপমান প্রভৃতি প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্ভূ্ত করিয়াছেন (শব্দাদীনামপ্যনুমানে ইন্তর্ভাবঃ)। শব্দপ্রমাণ তাহা হইলে বৈশেষিকের মতে দাঁড়াইল গিয়া একরকম অনুমান। এই শাব্দ-অনুমানের প্রয়োগবাক্য বা আকারটী কিরূপ তাহা সূত্রকার কণাদ বা ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ কেহই স্পষ্টতঃ বলেন নাই। বৈশেষিক মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নাই। নৈয়ায়িকগণের ন্যায় বৈশেষিকগণও শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কোন শব্দ শুনিয়া তাহা হইতে কোন অর্থের অনুমান করাও সম্ভব হয় না। এইজন্যই শব্দ-অনুমানের প্রয়োগবাক্য বা হেতুসাধ্য নির্দ্দেশ করা দুরূহ। সূত্রকার কণাদ বা ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ শব্দ-অনুমান প্রক্রিয়া প্রদর্শন না করিলেও শ্রীধরভট্ট প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈশেষিক আচার্য্যগণ অনেক যুক্তিতর্কের সাহায্যে বৈশেষিকের শাব্দ-অনুমান প্রণালী সমর্থন করিয়াছেন। প্রমাণরহস্যবিৎ মহর্ষি গৌতম কিন্তু কণাদের এই শাব্দ-অনুমান অনুমানেরই প্রকারভেদ এই মত সমর্থন করেন নাই। অধিকন্তু তিনি তাঁহার ন্যায়-দর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ে কণাদমত খণ্ডন করিয়া শব্দকে স্বতন্ত্র একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৮) মহর্ষি গৌতম বলেন যে আমরা জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই

(৭) যে তু সৌগতসংসারমোচকাগমাঃ কস্তেনু প্রামাণ্যমার্য্যোঽনুমোদতে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে হি বিস্পষ্টা দৃশ্যতে বেদবাহ্যতা।
জাতিধর্ম্মোদিতাচার পরিহারাবধারণাৎ।

ন্যায়মঞ্জরী, ২৬৫ পৃষ্ঠা

মহাজনশ্চ বেদানাং বেদার্থানুগামিনাং চ পুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বেদাবিরোধিনাঞ্চ কেষাঞ্চিদাগমানাং প্রামাণ্যম্ অনুমন্যতে, ন বেদবিরুদ্ধানাং বৌদ্ধাদ্যাগমানাম্। ন্যায়মঞ্জরী, ২৬৫ পৃষ্ঠা

(৮) শব্দোঽনুমানমর্থস্যানুপলব্ধেরনুমেয়ত্বাৎ ॥ ন্যায়সূত্র ২।১।৪৯
আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছব্দার্থসম্প্রত্যয়ঃ।২।১।৫২
২।১।৫০, ২।১।৫১ ন্যায়সূত্র দ্রষ্টব্য

বা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না; এইরূপ দেবতা, স্বর্গ, পরলোক প্রভৃতি অনেক অপ্রত্যক্ষ পদার্থেরও জ্ঞান শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐরূপ অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান অনুমানের সাহায্যে উৎপন্ন হইতে পারে না, কেননা অনুমান করিতে হইলে অন্ততঃ কোন না কোন স্থানে হেতু ও সাধ্যের একত্র অবস্থান বা ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করা একান্তই আবশ্যক। যে সকল বস্তু চিরদিন অপ্রত্যক্ষই থাকিবে তাহাদের কোন এক স্থলেও প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নহে। ফলে ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদির অভাববশতঃ অনুমানও হইতে পারে না এবং অনুমানের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর বোধও হইতে পারে না। আপ্ত মহাপুরুষগণের উক্তি হইতেই আমরা ঐ সকল অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে সত্য বলিয়া মানিয়া লই। কেননা যাহা আমাদের অপ্রত্যক্ষ, তাহাও মহাপুরুষগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আপ্ত মহাপুরুষের বাক্য শুনিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই শব্দপ্রমাণ। ইহা অনুমান নহে, অনুমান হইতে পৃথক্—ইহা একপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় জ্ঞান। (৯) শব্দ-প্রমাণ যে অনুমান নহে তাহার আরও কারণ এই যে, শব্দ-জ্ঞান যখন আমাদের প্রত্যক্ষ হয় তখন 'শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম' এইরূপেই উহা প্রত্যক্ষ হয়, শব্দ দ্বারা অনুমান করিলাম এইরূপে প্রত্যক্ষ হয় না। শব্দ-প্রমাণ অনুমান হইলে শেষোক্তরূপে সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। অতএব বলিতেই হইবে যে শাব্দবোধ অনুমান নহে তাহা পৃথক্ একটি তৃতীয় প্রমাণ। গৌতম ও কণাদের বিচারের ফলে দেখা যাইতেছে যে নৈয়ায়িকগণও শব্দপ্রমাণ মানেন, বিশেষ এই যে নৈয়ায়িকগণ শব্দপ্রমাণকে অনুমান প্রমাণ হইতে স্বতন্ত্র একটী ভিন্ন জাতীয় প্রমাণ মানেন। বৈশেষিক-গণ শব্দপ্রমাণকে অনুমান হইতে ভিন্নজাতীয় পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া মানেন না, অনুমান প্রমাণেরই একপ্রকার শাখা বলিয়া মানেন। কোনও প্রাচীন বৈশেষিক সম্প্রদায় কিন্তু শব্দপ্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন। এই সম্প্রদায়ের মতে শব্দপ্রমাণ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা পৃথক্ তৃতীয় প্রমাণ; প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণত্রয়ই বৈশেষিকের স্বীকার্য্য। প্রশস্ত-পাদ ভাষ্যের ব্যোমবতী বৃত্তিতে ব্যোমশিবাচার্য্য এই মত বিবৃত করিয়াছেন। (১০) হরিভদ্রসূরিকৃত ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্নসূরি তাঁহার টীকায় ব্যোমশিবাচার্য্যের মত সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া কথিত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহেও বৈশেষিক দর্শনকে স্পষ্টতঃ প্রমাণত্রয়-বাদী বলা হইয়াছে। (১১) ব্যোমশিবাচার্য্যের আলোচনা দেখিলে বুঝা যায় যে এই ব্যাখ্যা ব্যোমশিবাচার্য্যের স্বকপোল কল্পিত নহে। ইহা ও এক গুরুপরম্পরাগত সাম্প্রদায়িক মত। এই মতানুসারে শব্দকে স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া মানিয়া নিলে বৈশেষিক সূত্রকার কণাদের "অনুমান প্রমাণ দ্বারাই শব্দই প্রমাণ ব্যাখ্যা করা হইল" (এ তেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্) এই উক্তি কেমন করিয়া সমর্থন করা যায়? তারপর প্রাচীন ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ "শব্দাদীনামপ্যনুমানে ইন্তর্ভাবঃ" বলিয়া স্পষ্টতঃ শব্দপ্রমাণকে যে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহাই বা কেমন করিয়া সঙ্গত হয়? প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকাকার ব্যোমশিবাচার্য্য তদীয় বৃত্তিতে 'শব্দাদীনাম্' এই ভাষ্যোক্তির ব্যাখ্যায় 'শব্দাদি' পদটী 'অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি' করিয়া "শব্দ আদিতে যাহার" এই বলিয়া উপমান প্রভৃতি প্রমাণকে গ্রহণ করিয়া উপমান প্রভৃতি প্রমাণকেই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, শব্দপ্রমাণকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই; স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণ গণনায় উপমান প্রমাণের পূর্ব্বে শব্দপ্রমাণ থাকায় "শব্দ আদিতে যাহার" বলিয়া "শব্দাদি" পদে উপমানকেও অবশ্য গ্রহণ করা যায়, কিন্তু দ্রষ্টব্য এই, ইহাই কি প্রশস্তপাদভাষ্যের মর্ম্ম? প্রশস্তপাদভাষ্য কণাদকৃত বৈশেষিক-দর্শনের প্রাচীন ভাষ্য, সূত্রকার কণাদ অনুমান প্রমাণের দ্বারাই শব্দপ্রমাণ ব্যাখ্যা করিলেন।

(৯) স্বর্গঃ অপ্সরস ইত্যেবমাদেরপ্রত্যক্ষস্যার্থস্য ন শব্দ-মাত্রাৎ সম্প্রত্যয়ঃ কিন্তর্হি আপ্তৈরয়মুক্তঃ শব্দঃ ইত্যতঃ স প্রত্যয়ঃ। ন্যায়ভাষ্য ২।১।৫২

নহ্যয়ং শব্দমাত্রাৎ স্বর্গাদীন্ প্রতিপদ্যতে কিন্তু পুরুষবিশেষা-ভিহিতত্বেন প্রমাণত্বং প্রতিপদ্য তথাভূতাচ্ছব্দাৎ স্বর্গাদীন্ প্রতিপদ্যতে, ন চৈবমনুমানে। তস্মান্নানুমানং শব্দ ইতি। ন্যায়বার্ত্তিক ২।১।৫২

(১০) ব্যোমবতীবৃত্তি, কাশী সংস্করণ, ৫৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১১) ত্রিধা প্রমাণং প্রত্যক্ষমনুমানাসমাবিতি।
ত্রিভিরেতৈঃ প্রমাণৈস্তু জগৎকর্ত্তাবগম্যতে।
সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, বৈশেষিক দর্শন;
ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ের গুণরত্নসূরিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

সূত্রকারের উক্তির সহিত প্রশস্তপাদভাষ্যের উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে 'শব্দাদি' পদটী দ্বারা শব্দপ্রমাণকেই আদিতে ধরিতে হয় এবং তাহা হইলে ব্যোমশিবাচার্য্যের ব্যাখ্যাকে কষ্টকল্পনা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। ভাষ্যের স্বারসিক অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ব্যোমশিবাচার্য্যের ব্যাখ্যা যে প্রশস্তপাদের সম্মত নহে তাহা মনে করিবার আরও একটী কারণ এই যে, শব্দকে তৃতীয় পৃথক্ প্রমাণ মানাই যদি প্রশস্তপাদের অভিপ্রেত হইত তবে প্রমাণের গণনায় তিনি শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন না কেন? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর প্রশস্তপাদভাষ্যে বা ব্যোমবতীবৃত্তিতে পাওয়া যায় না। আর এক কথা, শব্দ স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণ হইলে সূত্রকার কণাদ যে অনুমানের দ্বারা শব্দ প্রমাণের ব্যাখ্যা করিলেন (এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্) তাহার সঙ্গতি রক্ষা হয় কিরূপে? ব্যোমশিবাচার্য্য তাঁহার বৃত্তিতে কণাদ সূত্রের কোন তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। সুতরাং ব্যোমশিবাচার্য্যের ব্যাখ্যা সূত্রকার ও ভাষ্যকারের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তবে তাঁহার বৃত্তি আলোচনা করিলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে প্রাচীন বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় শব্দ-প্রমাণকে স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণ হিসাবেই গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। (১২) পরবর্ত্তীকালে এই মত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। আমরাও এই মতের পক্ষপাতী নহি। এইমত প্রদর্শন করার তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা বৈশেষিক দর্শন শব্দপ্রমাণ মানে না, সুতরাং বৈশেষিকদর্শন ও নাস্তিক দর্শন বলিয়াই গণ্য এইরূপ ভ্রান্তমত প্রচার করেন —তাঁহাদিগকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে বৈশেষিকগণ কেবল অনুমানের প্রকারভেদ বলিয়াই শব্দ প্রমাণ সমর্থন করিয়াছেন এমন নহে। কোনও সম্প্রদায় শব্দপ্রমাণকে অতিরিক্ত তৃতীয় প্রমাণ বলিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব বৈশেষিক দর্শনকে শব্দ প্রমাণ মানে নাই বলিয়া নাস্তিকদর্শন বলা নিতান্তই অসঙ্গত।

পরম-আস্তিক বৈশেষিক যে পরমেশ্বরের বেদময়ী বাণীকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহা আমরা কণাদের সূত্র হইতেই জানিতে পারি। মহর্ষি কণাদ "তদ্বচনাদ্ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" "এই সূত্রে স্পষ্ট বাক্যেই আম্নায় বা বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের কিরণাবলী টীকায় আচার্য্য উদয়ন উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় 'তৎ' শব্দদ্বারা পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে পরমেশ্বর রচিত বলিয়াই বেদ প্রমাণ (তেন ঈশ্বরেণ প্রণয়নাৎ)। ন্যায়কন্দলীরচয়িতা শ্রীধরভট্টের মতে তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণই বেদের কর্ত্তা, পরমেশ্বর বেদের কর্ত্তা নহেন, সুতরাং সূত্রের 'তৎ'শব্দদ্বারা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের কথাই বলা হইয়াছে। সত্যদ্রষ্টা মহর্ষিগণের উক্তি বলিয়াই বেদ প্রমাণ। উদয়নাচার্য্য ও শ্রীধরাচার্য্যের সূত্রব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ইহার মধ্যে বাস্তবিক বিরোধ নাই। কেন না, পরমপিতা পরমেশ্বরই মহর্ষিগণের হৃদয়কন্দরে বেদজ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহেই মহর্ষিগণ বৈদিক সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া বেদবাণী প্রচার করিয়াছেন। এইজন্যই শাস্ত্রে কোথায়ও পরমেশ্বরকে বেদের কর্ত্তা বলা হইয়াছে, কোথায়ও মহর্ষি-গণকে বেদের কর্ত্তা বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সূত্রস্থ 'তৎ' শব্দদ্বারা যদি পূর্ব্বসূত্রোক্ত ধর্ম্মশব্দকে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও কণাদের মতে বেদ যে ঈশ্বর প্রণীত তাহাই বুঝা যায়। বৈশেষিক দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে গিয়া মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন যে লৌকিক বাক্যগুলি যেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে রচনা করেন সেইরূপ বৈদিক বাক্যসমূহও কোন তত্ত্বজ্ঞ মনীষী কর্ত্তৃক অসামান্য প্রজ্ঞাবলেই রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ লৌকিক ও বৈদিক উভয়প্রকার বাক্যেরই রচনাভঙ্গী তুল্যরূপ; কিন্তু কে সেই মনীষী যাঁহার অপূর্ব্ব মনীষার আলোকপাতে বৈদিক-মার্গ ও ধর্ম্মপথ আলোকিত হইতে পারে? নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের মতে বেদ রচয়িতা পরমেশ্বরেরই নিত্য বিভূতি। যে বস্তু ইহলোক ও পরলোকে আমাদের কল্যাণ সাধন করে তাহারই নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রতিপাদক বলিয়াই বেদ প্রমাণ। কিন্তু তাহার এই প্রামাণ্যের মূলে রহিয়াছে শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা পরমেশ্বরের নিত্য-প্রজ্ঞা। বেদ সেই ঐশী প্রজ্ঞারই প্রকাশ। শ্রীভগবানের বেদার্থ-বিষয়ক প্রজ্ঞা নিত্য। এইজন্যই ন্যায়বৈশেষিকদিগের মতে শব্দরাশি অনিত্য হইলেও শব্দময় বেদ নিত্য সত্য পরমব্রহ্ম।

বৈশেষিকদর্শনে এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধভাবে বেদের প্রামাণ্য সমর্থিত হইলেও কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত বৈশেষিক দর্শনকে নাস্তিকদর্শন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। ইহা কি সত্যের অপলাপ নহে? সুধী পাঠক বিচার করিবেন।

(১২) ব্যোমবতী বৃত্তি, ৫৭৭—৫৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

গান

আজি সহসা এলো বরষা
এলো ঘন বরিষণে।
এলো রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ নূপুর পায়ে,
বাদল সমীরণে ॥

এলো কে বিরহিণী পথ-হারা
নয়নে ঝরে অঝোর-ধারা,
আঁধার পথে চলে অভিসারে—
চমকে চপলা ক্ষণে ক্ষণে ॥

আজ প্রথম আষাঢ় দিনে বাদল সাঁঝে—
কোন্ বিরহীর বীণা
তারি স্মরণে বাজে।

আজি সে-সকরুণ তানে
কি ব্যথা তারি বুকে আনে,
কাহারে চাহি' একা কেঁদে মরে—
পূবালি হাওয়ায় মনে মনে ॥

[পনা না নর্সা -া] ||

মা মা II পা পর্সা না -র্সা | -া -া -ণণা -পা I মপা জ্ঞমা পণা মপা | পর্সা -া -া -া I
আ জি স হ ০ সা ০ ০ ০ ০০ ০ এ ০ লো০ ব ০ র ০ ষা ০ ০ ০ ০

I ণা -ণণা ণপা -া | মপা মজ্ঞা রা সা I ন্সা -রমজ্ঞা রা -া | -া -া {সা সা I
এ ০ ০ লো ০ ঘ ০ ন০ ব রি ষ০ ০০ ণে • ০ ০ এ লো

I প্া -সা প্া -সা | রা -সা রা -া I রা রমা মপধা মপা | মজ্ঞা -া } -া -া I
রি ম্ ঝি ম্ রি ম্ ঝি ম্ নূ পু র০০ পা০ য়ে০ ০ ০০

I রা রণা ধা ণা | পা ধা পমা -া II
বা দ০ ল স মি র ণে ০

পা পা II { মা -পা পণা মপা | পনা না না -র্সা I নর্সা -র্রা নর্সা -া | -া -া -া -া I
এ লো কে ০ বি০ র০ হি০ নী প থ হা০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সর্রা র্রা র্রা | র্রর্মর্জ্জা -া -র্রর্রা -র্সা I র্সা র্সনা র্সা র্সণা | ণপা ণা -া -া } I
ন য় নে ঝ রে০ ০ ০০ ০ অ ঝো০ র ধা রা০ ০ ০ ০

I ণা ণর্সা ণর্সণা ণধা | ধপা -া -া -া I মপা -জ্ঞমা মপা -া | -া -া -া -া I
আঁ ধা ০ র০ ০ প থে ০ ০ চ০ ০ ০ লে০ ০ ০ ০ ০ ০

I সরা সা রপা মপমা | মজ্ঞা -া -া -া I সা রা রমা মপা | পণা -ধণমা মপা -া I
অ০ ০ ভি০ সা০০ রে ০ ০ ০ চ ম কে চ প০ ০০ লা ০

I মপা -নর্সা র্রা র্রর্জ্জর্রা | র্সনা -র্সা -ণণা -পা II [ ]
ক্ষ০ ০ ০ ণে ক্ষ০ ০ ণে ০ ০ ০০ ০

সা -া II প্া পসা সা সরা | রণ্া রা রা সরা I রমা জ্ঞা -া -া | -া -া -া -া I
আ জ্ প্র থ ম আ০ ষা ০ ঢ় দি০ নে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা রা রজ্ঞা রা | রসা -া -া -া I পা পা পা পা | পধা মা পা পধা I
বা দ ল০ সাঁ ঝে০ ০ ০ ০ কো ন্ বি রা হী০ ০ র বী০

I ধর্সা ণা -া -া | -ধণধা -পা পধা ধমা I মপা পজ্ঞা জ্ঞসা জ্ঞমা | মপা -া -া -া I
ণা০ ০ ০ ০ ০০ ০ তা০ রি০ স্ম০ র০ ণে বা০ জে০ ০ ০ ০

I মা পা পণা মপা | পর্সা -া র্সা র্সা I নর্সা -র্রা নর্সা -া | -া -া -া -া I
আ জি সে০ স০ ক০ ০ রু ণ তা০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সর্রা র্রা র্রা | র্রর্মর্জ্জা -া -র্জ্জর্রা -র্সা I র্সা -র্সনা র্সা র্রর্সা | ণা -া -ধণধা -পা I
কি ব্য থা তা রি০ ০ ০০০ ০ বু ০ কে আ নে০ ০ ০ ০ ০

I পা ধা ণা পধা | ধর্সা ণা ণা ণা I ণা -ধণধপা মা পা | মজ্ঞা -া -া -া I
কা হা রে চা০ হি০ ০ এ কা কেঁ ০০০ দে ম রে ০ ০ ০

I সা রা মা মপা | পণা -ধণা মা পা I মপা -নর্সা র্রা র্রর্জ্জর্রা | র্সনা -র্সা -ণণা -পা II II [ ]
পূ বা লি হাও হা০ ০০ ০ য়্ ম০ ০০ নে ম ০ নে০ ০ ০০ ০

ভূস্বর্গ চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পঞ্চম স্তবক

অমরেন্দ্রনারায়ণ !

পঞ্চম স্তবকের বাণটি আপনাকে হানবার সাইকলজি আছে। অর্থ বা উদ্দেশ্য আদৌ না থাকলেও যে-ভালোবাসাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে অহেতুকী, এ তাই। এর আগে হীরেনকে যে-চিঠি লিখেছি তাতেও স্বার্থের যেন একটা ফিকে রঙ ধরেছে। ও একদা আমাদের বাংলা গানের বিরোধী ছিল—আজকাল খানিকটা বদলেছে (ভরসা হয়) বাংলা গান ক্রমাগত শুনে—তাই জেগেছিল একটা যেন আত্মপ্রসাদ। এ স্বার্থ নয় তো কী ?

কিন্তু আপনি ?
নহে নহে নহে বন্ধু।
তোমারি কাছে শিখেছি
যেন নতুন ক'রে নিত্য
কাহারে বলে স্বার্থহীন
প্রীতির আলো দীপ্ত
পেয়েছি এত তোমার
কাছে—কিন্তু গান-বন্ধু হে
চাহোনি কিছু—তোমারে
তাই বাথানিদান সিন্ধু যে।

তাছাড়া আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই তুমি বলা আমার ভাগ্যে ঘ'টে ওঠে নি। এ পত্রে সম্বোধনের একটু বৈচিত্র্যের আমদানি হ'লই বা।

যদি বলেন—ক্ষুণ্ণ হ'য়ে—যে, ঐ যাঃ স্বার্থ তাহ'লে আছে, তাহ'লে ফের বলব যে—না একে স্বার্থ বলে না। পরমহংসদেব বলতেন : সব "আমি"-ই ভগবানের পথে অন্তরায়, কেবল "দাস আমি" হ'ল সহায়। লৈখিক জগতে রসবৈচিত্র্যের অভিমান হ'ল এই "দাস আমি"—ওকে স্বার্থ বলা যায় না। কারণ—

অমল রসের নির্ঝরে তাই, ঝরে যখন উছল প্রীতি
যায় ঢেকে সব বেসুর বিবাদ নিরভিমান হয় সে গীতি।
তোমারে তাই করি বরণ, সুহৃৎজনের মধ্যে তুমি
আরো আপন—নিত্য সরস করো বলে চিত্তভূমি।
জীবনটা নয় মরু কেন ?—কারণ (আছে শাস্ত্রে লেখা)
আজও হেথায় সখা সখীর ওয়েসিসের মেলে দেখা।
ভেঁজে আলাপ এটুক—তোমায় শোনাই চিঠির রাগমালা
কবি গুণী দরদী শ্রোতা ! ভাবতেও প্রাণ
হয় উজ্বালা।

কাশ্মীরে মেঘের খেলা

মন-বাগানে একেকটি ফুল ফোটে আমরণ সাধনায়
তোমার মাঝে রচল বিধি ফুলের মেলা অজস্রতায়—
নাম তার কী ?—"ঢেউ জাগানো"—কারণ, তোমার
কাছে এলে
গান কবিতা হয় যে উধাও কৃতজ্ঞতার পাখা মেলে।

* *

আপনার সঙ্গে কথা কইতে আরো আনন্দ হয় দেখে যে

প্রায়ই আপনার সঙ্গে মতে মেলে না অথচ পথেও মেলে, রথেও। দেখুন, এ সম্পর্কে একটা কথা আমার মনে হয়— এই সুযোগে ব'লে নিলে রোখে কে?

বাল্যকাল থেকে "শুনে" আসছি: "মতান্তরে মনান্তর হবে কেন?" কিন্তু "দেখে" আসছি ঠিক উল্টোটা: কি না, মতান্তরই হ'ল মনান্তরের প্রথম ধাপ; থুড়ি, ভিৎ বনেদ—যাকে বাংলা ভাষায় বলে ফাউণ্ডেশন-স্টোন। আলডুস কোথায় যেন লিখেছেন যে যদি—

যদুবাবুর ভালো লাগে শ্যামবাবুকে, মনে হয়—সে কবি,
মধুবাবু ফেলল ব'লে—"ব্যর্থ কবি"-ই শ্যামের হায় পদবী,
অমনি রে ভাই দেখতে পাবি যদু-মধুর নেই আর চলাচলি,
স্নেহের গলাগলির মাঝে দিল হানা মতের দলাদলি।

ঝিলমে তরণী উৎসব

কথাটার মধ্যে যে অনেকখানিই সত্য আছে একথা কে না মানবে বলুন? সেদিন এখানে রুদ্ধনিশ্বাসে জ্যোতির্মালা আমাকে বলল হার্ডির Two on a Tower পড়তে। প'ড়ে আমারও ভালো লাগল। জ্যোতি হাঁফ ছেড়ে বলল: "দাদা, যে বই ভালো লাগে—বন্ধুজনের কারুর সে বই ভালো না লাগলে আমার যা কষ্ট হয়—বলব কি?"

ভাবিয়ে দিলে ফের, যদিও মনে হ'ল কথাটা কত সত্যি।. বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালি" আমার অত বেশি ভালো লেগেছে ব'লে সত্যিই আমি বন্ধু হারিয়েছি। সম্প্রতি ৺রাখাল সেনের "সপ্তপর্ণ" যৎপরোনাস্তি ভালো লেগেছে ব'লেও নিশ্চয় বাকি বন্ধুদের হারালাম ব'লে। বলবেন তাঁরা—এঃ, এমন বাজে বই প'ড়ে যে—দিলীপ এ হেন উচ্ছ্বসিত তাকে আর আমাদের মতন রসজ্ঞদের মাঝে কল্কে দেওয়া চলে না। শুনেছি আমার গান কারুর কারুর ভালো লাগে বলার দরুণও নাকি নানা আখড়ায় বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছে। তেম্‌নি ভীষ্মদেবের গান আমার খুব ভালো লাগে বলার দরুণ কত আত্মীয় ও বন্ধু যে আমার উপর বীতরাগ হয়েছেন! আরো কত দৃষ্টান্ত দিতে পারি। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। জানেন তো ভিক্টর হুগোকে একজন এসে গদ্‌গদ স্বরে বলেছিল: "ফরাসী ভাষায় দুজন বিরাট লেখক আছেন, এক ভিক্টর হুগো আর এক বালজাক।" তাতে হুগো শুধু বলেছিলেন: "কিন্তু বালজাক কেন? (Pourquoi Balzac?)"

কিন্তু তবু মানবো রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য যে "মানুষের মানস-জগতে মতের অনৈক্য থাকবে, অথচ সেই অনৈক্য নিয়ে বিরোধ হবে না, সংঘাত হবে কিন্তু অপঘাত হবে না এইটেই হচ্ছে প্রার্থনীয়। মতের সম্বন্ধ না থাকলেও প্রীতির সম্বন্ধ থাকতে পারে, এটার দ্বারাই প্রীতির গৌরব প্রকাশ পায়।"

মানব—কেন না, আমাদের অন্তরের অতলে এ কথার সঙ্গে সায় আছে অন্তরতমের: তিনি প্রতিধ্বনি করেন (রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়): "জিত মতামতে নয়, খ্যাতি অখ্যাতিতে নয়, জিত ভালোবাসায়—শক্তির রাজ্যে নয়— আনন্দের রাজ্যে।"

কিন্তু—ঐঃ—there is the rub—মানুষের প্রকৃতির গড়নই এই রকম যে, সে প্রায়ই প্রেমের চেয়ে শক্তিকে বেশি চায়। সবাই বলছি না—তবে অধিকাংশই। রাসেলের Power বইটিতেও সম্প্রতি তিনি এই নিয়েই সবচেয়ে দুঃখ করেছেন যে, "Of the infinite desires of man, the chief are the desires for power and glory."

মতভেদে আঘাত পায় মানুষ এই জন্যেই বেশি। প্রতি

মতবাদী যদি শক্তিধর পুরুষ হয় তবে স্বমতে অন্যকে টানতে না পারলে তার শক্তি পিপাসা মেটে না। দলাদলিরও গোড়াকার কথা এই আত্মমতপ্রতিষ্ঠা—আমারই ঠিক, ওরাই ভুল, এই-ই হ'ল প্রতি রোখালো মতবাদীর সাইকলজি।

কিন্তু এ ছাড়াও আরো একটা কারণ আছে মনে হয়। রুচির রাজ্য—বিশেষ ক'রে রসের ক্ষেত্রে—হ'ল ব্যথার রাজ্য যেহেতু প্রেমের রাজ্য। যেখানে মানুষ বেশি আনন্দ পায়, সেখানে তার মন সাড়া দেয় কৃতজ্ঞতার নৈবেদ্য সাজিয়ে। এ অর্ঘ্যদানে কেউ বাধা দিলে তাই মন আহত হয়—কাজেই পারে না এ-অনৈক্যকে "তুচ্ছ মতভেদ" বলে উড়িয়ে দিতে। আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে—নিজের ব্যথার তল পেতে গিয়ে—যে মতভেদের এদিকটার কথা সচরাচর লোকে তলিয়ে ভাবে না।—মতভেদ—(ফের বলি, বিশেষ ক'রে রসের জগতে)—হ'ল এই ভালোবাসার আপত্তি করা: যাকে আমি বলছি ভালোবাসার যোগ্য, তাকে আপনি বলছেন অযোগ্য। কোথায় ঘা পড়ে? প্রেমের দরদের ব্যথালোকে। তাই মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। পরিণাম পুনরুক্তি মন্তব্য—যদুবাবু ও মধুবাবুর গলাগলির জায়গায় দলাদলির সূত্রপাত।

কিন্তু তবু বলবই বলব যে স্নেহ যদি গভীর হয় তবে মতভেদে বাজলেও মানুষ তাকে কাটিয়ে উঠে বুঝতে পারে যে স্নেহই বড়, মতভেদ অবান্তর। কিন্তু ও শিক্ষাটা জীবনের একটা মস্ত শিক্ষা—তারও বেশি, দীক্ষা—কেন না এখানে টান পড়ে আমাদের আত্মাভিমান নিয়ে—মানুষ শিখতে বাধ্য হয় এই চিরন্তন সত্যটি যে প্রতি বন্ধুর ব্যথাই শ্রদ্ধেয়—তাই তার রুচির সঙ্গে না মিললেও তাকে বলতে নেই তুমিই ভুল, আমিই ঠিক। শুধু বলতে নেই না, মনে করতেও নেই।

আপনার মধ্যে আছে এই আশ্চর্য গুণটি। আমার সঙ্গে বহু মতানৈক্য সত্ত্বেও তাই আপনার প্রতি স্নেহ আমার বিচলিত হয়নি। কিন্তু তাতে যতটা তৃপ্তি পেয়েছি তার চেয়েও গভীর তৃপ্তি পেয়েছি অন্তরের এই উপলব্ধিটি এ সূত্রে সায় পেয়েছে ব'লে যে "জিৎ মতামতে নয়—জিৎ ভালোবাসায়—শক্তির রাজ্যে নয়, আনন্দের রাজ্যে।"

* * * *

ঐ দেখুন:

কোন্ ঢেউ যে কখন কোন্ তটে গিয়ে ঠেকে! তবে আমার সাফাই রয়েইছে—ভূস্বর্গচঞ্চলে আমি সব জবাবদিহির হাত থেকেই ছুটি নিয়েছি। তবু কাশ্মীরের প্রসঙ্গে ফিরি—মন বলছে:

ঘরের ছেলে ফিরবে কবে ঘরে?
কাশ্মীরেরি গল্পে এসো ফিরে
পেলে সেথায় কত কী অন্তরে।
এঁকে ফোটাও স্মৃতিচারণ-তীরে।

হুঁ। ফিরি—সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য রাজ্যের তীরে।

* * * *

এর আগের স্তবকে বলেছি তন্দ্রা-পরিবারের কথা। আরো দু-চারটে কথা বলাই চাই এঁদের সম্বন্ধে। কারণ

গুলমার্গের রাস্তা

এ-কথা শুনতে ব্যক্তিগত হ'লেও এর ক্ষেত্রব্যাপক, কাজেই ঔৎসুক্যও সাধারণ।

তন্দ্রা দেবীর নাম যাকে বলা যায় মিস্‌নোমার—ভুল খেতাব। এ ধরণের অতন্দ্র মহিলা জীবনে কমই দেখেছি। মনে পড়ে, প্রথম দিন তাঁর বজরায় যখন আমি ও ধরণীদা "পর্বতের চূড়ার মতন সহসা প্রকাশ" হ'লাম তন্দ্রা দেবী খালি পায়ে একটা কিমোনো প'রে অশ্রান্ত লিখে চলেছেন। ওখানে শ্রমিকদের একটা সঙ্ঘ করার জন্যে তিনি উঠে প'ড়ে লেগেছেন। ধরণীদাকে দেখতে দেখতে পটিয়ে নিলেন।

মানুষের নানা মূর্ত্তি নানা লোকের কাছে প্রকাশ পায়। গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণদেব:

যে যে-রূপে চায় আমাদের পুজিতে
সেইরূপে তারে দরশ দিই।
যে যে-ভাবে চায় অর্ঘ সঁপিতে
সে-ডালিও সেইভাবেই নিই।

ধরণীদাকে আমরা পুজেছিলাম সঙ্কটতারণরূপে, মহামহিম ভ্রমণকাণ্ডারীরূপে। সেই রূপেই তাঁকে পেয়েছিলাম। তন্দ্রা দেবী তাঁকে চাইলেন শ্রমিকদের দুঃখমোচক না হোক শোকশ্রোতারূপে। ধরণীদা শুনছেন তো শুনেই চলেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন। শ্রমিকদের কত দুঃখ—তন্দ্রা দেবী কত সভা করছেন—কত কী লিখছেন—কত বেশি শ্রমে কত কম কাজ হচ্ছে নানা লোকের বিরুদ্ধাচরণে। আর অপরাজেয় অদ্বিতীয় শ্রোতা ধরণীদা শুনছেন বিগলিত-হৃদয়ে যেমন জনমেজয় শুনতেন বৈশম্পায়নের কাছে
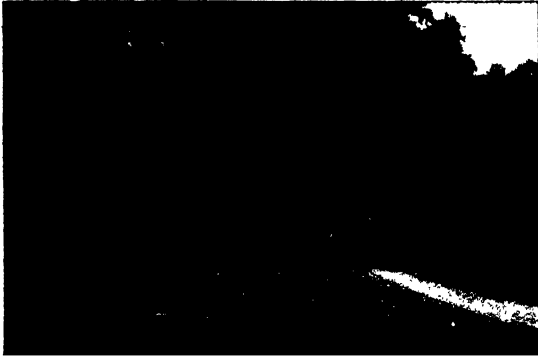
নিশার বাগ—মোগল স্থাপত্য

মহাভারত, যেমন ধৃতরাষ্ট্র শুনতেন সঞ্জয়ের কাছে কুরুক্ষেত্রের কাহিনী, যেমন পরীক্ষিৎ শুনতেন শুকদেবের কাছে ভাগবৎ। সে শোনার বহর দেখে থেকে থেকে প্রভাদি যে প্রভাদি—তিনিও ঝঙ্কার দিয়ে বলতেন আমাকে : "দেখ তো ভাই দিলীপ

আমরা এসেছি বেড়াতে এখানে
ওঁর যেন নেই খেয়ালও হায়!
খাবার নিয়ে যে ঠায় ব'সে আছি
একথাও ওঁকে বোঝানো দায়।
পরোপকারটা ভালো বটে মানি :
র'য়ে স'য়ে—যদি হামেশা ছোটে
শ্রমিকের দুখ ঘোচাতে কর্তা
ধনিক-গৃহিণী রাগে যে ফোটে।
যখনকার যা তখনকার তা
এসেছি বেড়াতে, ভালো রে ভালো!
জগৎজোড়া এ হাহাকারে ভাই
সভার পিদিমে কণিকা আলো।
জেলে কী যে হবে?—কথা কথা কথা!
হায় রে পুরুষে বুঝিবে কবে?
শাহারা মরুতে দুটো নলকূপে
গঙ্গা জাগে কি মহোৎসবে?

প্রভাদির কথা আমার মনে ধরেছিল ব'লেই বললাম এত কথা। মানি ধরণীদা স্বভাব-পরোপকারী এবং শাস্ত্রে বলে স্বভাবো নাতিরিচ্যতে—কি-না স্বভাব যায়না ম'লে। কিন্তু র'য়ে স'য়ে। নাঃ বন্ধুবর, মেয়েরা যে রিয়ালিস্ট এ কথা প্রভাদির সঙ্গে মিশে আরো বুঝেছিলাম। কারণ, তন্দ্রা দেবী দরদী পেয়ে তাঁর হেফাজতে ছিল যত যুগপুঞ্জিত শ্রমিকদের দুঃখের ঝুলি, যন্ত্রণার বস্তা—সবই চক্ষের নিমেষে দিলেন উজাড় ক'রে। ধরণীদা! ধরণীদা! ও ধরণীদা! আর ধরণীদা! বেচারি ম্লানমুখে শুনছে তো শুনছেই—

আহা কত লোক খেতে যে পায় না—
তাদেরি তো কথা অমৃত সমান
শুনিতে রক্ত গরম হৃদয় নরম—
তাইতো শুনে পুণ্যবান্।

কারণ, বাস্তবিক কাশ্মীরি শ্রমিকদের দুঃখ, সে কি একটা? একদিন মাত্র আমি শুনেছিলাম একটুখানি উপক্রমণিকা তন্দ্রা দেবীর কাছে। তাইতেই মনে হ'ল—হয় বিষ খাই, না হয় ঝিলমে ঝাঁপ দেই—এত দুঃখ শোনার দুঃখ সওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা কম দুঃখের।

কিন্তু ঠাট্টা যাক্। তন্দ্রা দেবীর এই সব কাজ করার অক্লান্তি দেখে আমি সত্যাই মুগ্ধ হয়েছিলাম। ওঁর লেখনী-চালনায় ওদের দুঃখের বেশি লাঘব হ'ত এ ভেবে নয়—এতে ক'রে তন্দ্রা দেবীর মহত্ত্বের পরিচয় পেতাম ব'লে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবাক লাগত দেখতে—ও জাতের কর্মিষ্ঠতা। ভাবুন বন্ধুবর, ভাবুন। প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসরের

বৃদ্ধা—দিনরাত কলম ধ'রে আছেন। কী? না, সভা-সমিতি প্রবন্ধ আবেদন এই সব লিখে ওদের শ্রমিকদের দুঃখ ঘুচিয়ে তবে জলগ্রহণ করতে হবে। সোজা কথা নয়। এ আমি তো পারিই না—আপনিও বোধ হয় পারেন না—মনে হয় প্রভাদির জ্ঞানগর্ভ কথা: "শাহারা মরুতে দুটো নলকূপে গঙ্গা কি জাগে মহোৎসবে?"

* * * *

কিন্তু না জাগুক। এ ধরণের অক্লান্ত কর্মের ফলে তন্দ্রা দেবীর মুখে বড় একটি সুন্দর আভা ফুটে উঠেছিল। সেদিন "মাদাম ক্লেয়ার" ব'লে একটি খ্যাতনামা উপন্যাস পড়ছিলাম। শ্রীমতী ক্লেয়ার এ গ্রন্থের নায়িকা—এক আশি বৎসরের বুড়ি। তাতে গ্রন্থকার লিখেছেন এক জায়গায় যে, যৌবনে রূপ থাকে অনেকেরই, কিন্তু রূপের সব চেয়ে মনোহর পরিণতি হয় যৌবন পেরুলে—যখন ফোটে মুখে জ্ঞান ও কর্মের ফল: "the character."

সত্যি কথা। তন্দ্রা দেবীকে দেখলে একথা যেন আরো বেশি ক'রে মনে হ'ত। তাঁর কমনীয় মুখে ছাপ পড়েছিল তাঁর পরহিতব্রতের—তাঁর নিরলসতার, উৎসাহের, একটা আদর্শের মোহানায় দিনের পর দিন জীবনতরী বেয়ে চলার। এ-বস্তু সংসারে বিরল। তন্দ্রা দেবীকে তাই শ্রদ্ধা না ক'রেই পারা যেত না: তাঁর চেষ্টায় খুব বেশি ফল ফলছিল ব'লে না—নিজের কাজটুকু তিনি নিখুঁৎ করে নিষ্পন্ন করছিলেন ব'লে। দিনের পর দিন এভাবে কোনো নীরস কাজ করতে করতে আমরা তা থেকে লাভ করি একটা মস্ত রহস্যের চাবি: যে, নিষ্ঠার ফলে জীবনের বহু মরুভূমিতেও মেলে সরোবরের দিশা। তন্দ্রা দেবীদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। আমাকে বলতেন তাঁদের পারিবারিক কথা। সে সব বলার আমার অধিকার নেই। কিন্তু তা থেকে প্রত্যক্ষ জীবনের নবভাষ্যে শিখেছিলাম ফের এই পুরোণো সত্যটি যেন নতুন ক'রে যে, মানুষের প্রাণ যখন বলে আমি হার মানব না—তখন তাকে হার মানায় সাধ্য কার? আধ্যাত্মিক জীবন বলতে তো শুধু নাক টিপে প্রাণায়াম বা চোখ বুঁজে ধ্যান বোঝায় না—বোঝায়, আত্মিক সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে বাস্তব নিয়তিকে বলতে পারা:

যত কেন তুমি হানো ব্যথা, যত
আনো না নিরাশা—মানি না আমি
তুমি যত দেবে বিষ—আমি করি
অমৃত-মন্ত্র দিবসযামী।

চেনার বাগ ও শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে মন্দির

তন্দ্রা দেবীর নানা কবিতাদিতেও তাঁর এই সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'তাম। এ-শ্রেণীর মানুষ সংসারে বেশি দেখা যায় না—বৃদ্ধ বয়সেও স্বপরিবারের স্বগোষ্ঠীর বাইরের জগতের কথা এত ভাবা কম কথা নয়, কি বলেন? ওদের দেশের সভ্যতার মন্দ দিক আছে অগুন্তি, কিন্তু এখানে দেখতে পাই একটি বড় সুন্দর বিকাশ—এই বহু-মানবের জন্যে জীবনকে নিয়োজিত করা একান্ত নিষ্ঠায়, কর্মিষ্ঠতায়, উৎসাহে, আদর্শবাদে।

* *

সত্যি, আমার যে কত সময়ে মনে পড়ে তন্দ্রা দেবীর এই অপরাজেয় উৎসাহের কথা! এক সময়ে এঁরা ছিলেন

ধনী—এখন অবস্থা অতি সামান্য। কাশ্মীরের শীতেও সত্যি সত্যি কষ্ট হয়, কেন না এখানে বিলেতের উত্তাপ-বিধায়ক সাজসরঞ্জামের অভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁরা সপরিবারে নদীবক্ষেই গত শীত কাটিয়েছেন, হয়ত এ-শীতও কাটাবেন। এ-ধরণের দারিদ্র্যকে দেখলে সমীহ আসে। কারণ এ হ'ল স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য। এঁর স্বামী—তাঁর কথা পরে লিখব—জন ফোল্‌ড্‌স্‌ এখন দিল্লীতে ভারতীয় রেডিয়ো অর্কেস্ট্রস গঠন করছেন। এদেশে এসেছেন তিনি ভারতীয় সঙ্গীতকে "তর্জমা" করতে। কিন্তু তাঁর কথা যথাপর্য্যায়ে। আপাতত বলি তন্দ্রা দেবীর কথা।

* *

ভুলব না তাঁর মুখের শান্তশ্রী। ভুলব না তাঁর ঘরময়-ছড়ানো কাগজপত্র, স্তূপীকৃত ফাইল, প্রবন্ধ, বই। ব্যস্‌। শুধু পঠন-পাঠন সভা-সমিতি এই সব নিয়েই আছেন। এসব থেকে এদেশে আয় হয় খুবই কম—কোনো মতে দিন গুজরান হয় মাত্র। তবু তাইতেই ইনি তুষ্ট। ছেলে প্যাট্রিক আঁকে, মেয়ে দুটি গৃহকর্ম দেখে, পোষ্যপুত্র উইলিয়াম এটা ওটা সেটা করে। পালিতপুত্রকে তন্দ্রা দেবী নিজের ছেলের চেয়ে একটুও কম ভালোবাসেন না। উইলিয়ামের জন্মে তাঁর মাতৃ হৃদয়ের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিত্যই চোখে পড়ত। ভালো লাগত আরো বেশি। কি জানি কেন, নিকটাত্মীয়ের জন্মে স্নেহ উৎকণ্ঠার আতিশয্য আমাকে খুব মুগ্ধ করে না। যে-স্নেহ বিধাতার কাছ থেকে পাওয়া, প'ড়ে-পাওয়া সে-স্নেহের নবজন্ম হয় নি—তাই সে "দ্বিজ" নয়। বড় স্নেহ হ'ল সে-ই যাকে মানুষ নিজে থেকে সৃজন করে। স্ত্রীপুত্রকন্যা—এদের প্রতি স্নেহকে বড় জোর বলা যায় "বেশ"—কেন না, এর ভারা ব'ন প্রকৃতিদেবী স্বয়ং। কিন্তু অনাত্মীয়ের প্রতি স্নেহকেই বলব বেশি সুন্দর—কারণ সেখানে মানুষ স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কানে বাজে যখন তিনি বলছেন ভগবানকে:

আর সকলেরে তুমি দাও
শুধু মোর কাছে তুমি চাও
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আপনি একটি পত্রে যে লিখেছিলেন যে, আত্মীয়ের ভালোবাসার চেয়ে অনাত্মীয়ের ভালোবাসা স্নেহ প্রেমের শ্রেষ্ঠতর বিকাশ—যেহেতু আত্মীয়ের ভালোবাসার পিছনে প্রায়ই দাবি হয় অত্যন্ত বেশি মুখর। একথায় আমার মনের আরো সায় আছে। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় দান হয়ে এসেছে—বন্ধুর ভালোবাসা—আত্মীয়ের নয়। আত্মীয়ের নাবালক ভালোবাসার দ্বিজত্ব লাভ ঘটে কেবল তখনই, যখন আত্মীয় তার আত্মীয়তার দাবি ভুলে বন্ধুত্বের পৈতে নেয়। অর্থাৎ যেখানে আত্মীয় প্রিয় হয়, আত্মীয় ব'লে না—বন্ধু ব'লে।

কিন্তু যাক—যা বলছিলাম। উইলিয়ামকে তন্দ্রা দেবী যে এত যত্নে রাখতেন তার আরো একটা কারণ ছিল। বলেছি ওর দেহে হ'ত বৈদেহী আবির্ভাব। এ নিয়ে বেশি লিখতে মানা—কারণ এখনো এসব নিয়ে বেশি লেখার সময় আসে নি—লোকে সহজেই ভুল বোঝে। কেবল এইটুকু বলি: উইলিয়ামের দেহকে এজন্মে অনেক বেগ পেতে হ'ত। তাই তাকে একটু বেশি রকম তদারক করতে হ'ত। কিন্তু ওর মধ্যে দিয়ে তন্দ্রা দেবী অনেক জ্ঞানের কথা শুনতেন—তাই স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধাও ছিল যথেষ্ট। এসব কথা থেকে তিনি লাভ করেছিলেনও কম না। শুধু জ্ঞানলোকেই নয়, প্রত্যক্ষলোকেও তিনি যথেষ্ট সহায়তা পেতেন প্রায়ই: যথা, অনেক সঙ্কট অসুখেও উইলিয়মের মধ্যে আবির্ভূত এই সব শক্তি তাঁকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, তিনি যে এই অসহায় যুবককে এত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন ও নিজে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও একে আশ্রয় দিয়েছিলেন এতে আমার তৃপ্তির অন্ত ছিল না। কারণ বলেছি, আমার বরাবরই মনে হয় যে ভালোবাসার সবচেয়ে বড় বাণী হ'ল পরকে আপন করা, সবচেয়ে বড় দীক্ষা হ'ল স্বার্থ ও সুখের মায়া কাটানো।

তাছাড়া আত্মীয়দের আত্মীয়তা সম্বন্ধে আমার একটা কথা কত সময়েই যে মনে হয়েছে! আত্মীয় স্নেহাস্পদকে ভালোবাসে অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু বোঝে কত কম ক্ষেত্রে বলুন তো? কারণ আত্মীয়তার মধ্যে আছে অতিপরিচয়ের একটা উদ্ধত অভিমান। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু সচরাচর অনাত্মীয়ের সঙ্গেই যে অন্তরঙ্গতা হয় বেশি, এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না। হওয়ার একটা

গূঢ় কারণ আছে। মানুষ স্বভাবস্রষ্টা। যে-জিনিষ তার কাছে পড়ে-পাওয়া তাতে তার স্বস্তি থাকতে পারে কিন্তু তৃপ্তি নেই। আত্মীয় স্নেহ, আত্মীয় মমতা হ'ল প'ড়ে-পাওয়া জিনিষ—অনেকটা ইনস্‌টিংটিভ। এতে খুব বেশি ডুবে থাকে যে সব মানুষ তারা শ্রেষ্ঠ মানুষের নমুনা নয়। শ্রেষ্ঠ মানুষ বলব তাকেই—যে ভালোবাসা অর্জন করে তার সহজ আত্মদানে সেবায় পরহিতৈষণায়। অন্য ভাষায়, যে ভালোবেসে ভালোবাসায়, ধ্বনি দিয়ে সৃষ্টি করে প্রতিধ্বনি। নীড়কে ভালো না বাসে কে? কিন্তু বাইরে যে ঘর বাঁধতে পারে তারই নাম স্রষ্টা। আমাকে ভুল বুঝবেন না: যে-স্নেহ ইনস্‌টিংটিভ মালমশলায় ঠাশা তার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নেই। এ-ও আমি বলি না যে, ঘরকন্নায় তার দাম নেই। খুবই আছে। এখানে আমি ঝোঁক দিচ্ছি স্নেহের মুক্তির দিকটায়। যে-স্নেহ যে-ভালোবাসা সাধে কিন্তু বাঁচে না, ধরা দেয় কিন্তু চাপ দেয় না, বাঁচায় কিন্তু আগলায় না—এক কথায়, যে-স্নেহের বাতি ধরে আত্মদান, আত্মসুখ নয়—সেই স্নেহই বড়। যে স্নেহের মধ্যে হিতৈষণার অনুপাতে প্রত্যাশা কম, দাক্ষিণ্যের অনুপাতে বাধ্যবাধকতা কম—সেই স্নেহই বেশি শুদ্ধ বেশি পবিত্র। আর এর চরম পরিণতি হ'ল অহৈতুকী প্রেমে যার মন্ত্র নিষ্কামনা, যে বলে (দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়):

"ভালোবাসো নাহি বাসো নইক তারো অভিলাষী
আমরা শুধু ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি।"

আর এই প্রীতিই হ'ল সৃজনী প্রীতি—অর্থাৎ এই স্নেহেই স্নেহ জাগে। এখানে যে আপনার সঙ্গে আমার মতৈক্য রয়েছে এতে আমি বড় খুশি।

* *

তন্দ্রা দেবীর মেয়ে মেরিও বড় চমৎকার। ছেলেমানুষ—ষোড়শী। ওর ভাই প্যাট্রিকের মতনই মন টানে। এর একটা প্রধান কারণ এই যে, মেরির মুখেও একটি চমৎকার ভাব আছে—যার গোড়াকার কথা হ'ল sensitiveness. এ শব্দটির বাংলা নেই। অভিমানী বললে ঠিক sensitive বোঝায় না। স্পর্শকাতর? না, ও হ'ল touchy কথাটিরই যথার্থ অনুবাদ। Mary has a sensitive face বাংলায় এর তর্জমা হওয়া শক্ত। তাই ইংরাজি বর্ণনাটিও মঞ্জুর করুন লক্ষীটি! সেন্সিটিভ শব্দটিও।

মেরির সেন্সিটিভ স্বরূপটির মাধুর্য ফুটেছে প্রধানত দুটি কারণে মনে হয়। এক, অল্প বয়সে সে অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে গেছে। ওদের জীবনের নানা কাহিনী শুনতে শুনতে হৃদয় উঠত আর্ত হ'য়ে। ষোল বছরের মেয়ে এত বোঝে—এত সেন্সিটিভ জীবনের নানা ছোঁয়াচ সম্বন্ধে! এ কথাটিকে অবশ্য ভুল বুঝবেন না। দুঃখ পেলেই যে মানুষ ফুলটি হ'য়ে ফুটে ওঠে, এমনতর সেন্টিমেন্টাল কথা আমি কবিত্বের খাতিরেও উচ্চারণ করব না। একটি মহিলাকে মনে পড়ে যিনি স্বামী সন্তান সব হারিয়ে অসহ্য দুঃখে বিলেত গিয়ে অসার জীবনযাপন সুরু করলেন। সংসারে বহু মানুষই দুঃখ পায়। অনেকের বিকাশে দুঃখ আসে সহায় হ'য়ে, কিন্তু অনেকে আবার কিছুই শেখে না। ইংরাজিতে বললে বলা যায়: "They take life as they find it." ব্যস্ চুকে বুকে গেল। দুঃখ এদেরকে অন্তর্মুখী করে না—আরো ধাওয়া করায় বাইরের দিকে—সান্ত্বনা খোঁজায় অবান্তর আমোদ প্রমোদের উঞ্ছবৃত্তিতে।

তানমার্গ

পরমহংসদেবের উপমা মনে পড়ে : "উট কাঁটা ঘাস খায়—খেয়ে মুখ দিয়ে দরদর ক'রে রক্ত পড়ে, তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে।"

মেরি এ-জাতের মেয়ে নয়! কিন্তু তার প্রধান কারণ ওর আধার। গড়পড়তা আধার যে নয়, তা ওকে একবার দেখলেই বলা যায়। সহজে কথা বলে না—ভারি চাপা মেয়ে। একদিন হঠাৎ তন্দ্রা দেবী বললেন : "মেরি ভারি চমৎকার কবিতা লেখে, জানো স্বামীজি?" আর যাবে কোথায়—আমি বললাম : "শুনি শুনি।"

তন্দ্রা দেবী হেসে বললেন : "ও মেয়ে আমাকেও সহজে দেখাতে চায় না ওর কবিতা, তোমাকে দেখাবে?"

নিরাশ হ'লাম। কিন্তু সেইজন্যই তৃষ্ণা জাগল আরো বেশি। একদিন মেরির সঙ্গে গেলাম বেড়াতে। অনেক কথা হ'ল। ও অনেক কথা বলল। উত্তরে আমি যা ভালো বুঝলাম বললাম। মেরি কেমন যেন আর্দ্র হ'য়ে উঠল। তার পরে রাজি হ'ল ওর কবিতা দেখাতে। কয়েক দিন বাদে দিল আমাকে ওর সে দুটি কবিতা যা আমাকে বেশি স্পর্শ করেছিল। শুনুনই না। কারণ এ কবিতা-যুগলের মধ্যে দিয়ে ওর কিশোরী হৃদয়ের স্বপ্ন ও বেদনা উঠেছে ফুটে। আপনার স্বভাবদরদী হৃদয়ের তারে এর সুর নিশ্চয় বেজে উঠবে। এ দুটি পড়বার সময় মনে রাখবেন, ষোলো বছরের একটি মেয়ে লিখেছে। আরো আশ্চর্য, ও বলত : আজকাল ওর মনে হয়—এ-আস্তিক্য-বুদ্ধি ওর মনে যে আলো নিয়ে ফুটেছিল সে আলো সত্য কি না কে জানে? কিন্তু শুনুন আগে প্রথমটি এই :

Thy will be done,
For we'll never shun;
Our banner strong will fly :

When sinks the sun,
Its duty done,
And death is stalking by :

Thy will shall stay,
Though all away,
In terror stark have fled :

We, dauntless, grim,
Would even swim
The ocean of the dead :

Thy will, O Lord,
By gun or sword,
By life or death we'll show :

Each human thing
Beggar to king
That we alone do know.

The truth which lasts,
And free from castes,
But one thing does demand :

The strength to share,
And follow where
Thy wisdom will command.

এটি ও লিখেছিল বছর দুই আগে, অর্থাৎ—চোদ্দ বছর বয়সে।

জানি না আপনাদের এ-কবিতাটি তেমন ভালো লাগবে কি না। কিন্তু আমার কাছে এ কবিতাটির দাম আরো এইজন্যে যে, এ কবিতাটি মেরি আমাকে শুনিয়েছিল একটি চেনার গাছের তলায় ঘাসের উপর ব'সে গোধূলির আলোয়। সূর্য তখন পাটে নেমেছে। ওর কণ্ঠে প্রথম তিনটি চরণ শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে এক অপূর্ব ভক্তিভাব জেগে উঠেছিল। মনে হয়েছিল যুগে যুগে এমন কত অন্তরেই না নিরাশার চরম মুহূর্তে বাস্তবের পরাজয়ের ধ্বংসস্তূপে বেজে উঠেছে অপরাজেয় আত্মার জয়ধ্বনি :

যাই তুমি চাও—করব মোরা
ছাড়ব না নাথ, ছাড়ব না
চলব তোমার উড়িয়ে ধ্বজা
হারব না নাথ, হারব না।

মনে পড়ে—সেদিনের কথা আরো বেশি ক'রে সেদিনের পটভূমিকায়। চায়ের কলরব সাঙ্গ হ'লে বলল সবাই—চলো যাই নৌকায়। হ'ল না যাওয়া। সুবিধাই হ'ল, মেরিকে বললাম বেড়াতে বেড়াতে : "মেরি, ভোলোনি তো?"

ও স্নিগ্ধ হেসে বলল : "না স্বামীজি, দাঁড়ান।"

কাছেই ওদের বজরা। গেল দৌড়ে। মনে রাখবেন একেবারে বালিকা। ওদের দেশের ষোলো বছরের মেয়ের মনের গড়ন জানেন তো—সচরাচর আমাদের দেশের দশবার বছরের মেয়েদের মতন হয় (অবশ্য ব্যতিক্রম আছে); সেদিন ও

শাড়ি পরেছিল আমাদের সম্মানার্থে। যখন ছুটে গেল এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল ওর কোমল মুখখানি হৈমন্তী সূর্যের অস্তরাগে! শাড়ি পরলে ওদের কী যে সুন্দর দেখায়!

পায়ের কাছে চলেছে সর্পছন্দিনী ঝিলম কুলুকুলু ধ্বনিতে। অদূরে শঙ্করাচার্য পাহাড়ের চূড়ায় শিবের মন্দিরের উপর পড়েছে গলানো সোনার আলো। একরাশ চেনাব গাছ এপারে—ওপারে দীর্ঘকায় ঋজু পপ্‌লার। কেউ কোথাও নেই। একটা গাছের নিচে বসলাম।

মেরি এল। খাতা এনেই ওর সে কী সঙ্কোচ। একেবারে বাইরের লোককে কবিতা ও কক্ষনো দেখায় নি। বলল: "স্বামীজি, কবিতা লিখতে এক সময়ে এত ভালো লাগত!"

"আজকাল লাগে না?"

"লাগে, তবে মনে হয় কী হবে লিখে?"

বুঝলাম, এখানে ওর একটা গভীর বেদনা আছে। কারণ একথা ব'লেই ওর মুখচোখ রাঙা হ'য়ে উঠল। ও তাড়াতাড়ি পড়ল এটি, পরে আরো কয়েকটি। আমি বললাম: "মেরি, একটি অনুরোধ আছে।"

"কী?"

"কবিতা লেখা তুমি ছেড়ো না। এ-শক্তি ভগবান্ যাকে-তাকে দেন না। তাই যাকে দেন, তার কাছে আশা করেন যে সে তাঁর এ-দানকে অবহেলা করবে না।"

"স্বামীজি," বলল ও সকুণ্ঠে, "আপনি গান গান সবাই চায় শুনতে। আমরা যে নগণ্য। শুনবে কে?"

"এমন কথা বলতে নেই। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখেছিলেন যে লাখে একজনও ভালো কবিতা লিখতে পারে না। এমন সব ভাব এমন সহজ আবেগে যার হাত দিয়ে বেরোয় সে নগণ্য নয়। এ-ও তুমি নিশ্চয় জেনো যে, হৃদয় থেকে গান গাইলে কবিতা লিখলে লোকে শুনবেই। তা ছাড়া কেউ না শুনলেই বা কি? আমার এক প্রিয় কবির একটি গান আমার মনে পড়ে:

মিছে তুই ভাবিস মন!
তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন
পাখিরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে
(ওরে) নাই বা যদি কেহ শোনে
তুই গেয়ে যা গান অকারণ।"…

কী? উচ্ছ্বাসপনা? কিন্তু বিশ্বাস করুন বন্ধুবর, এ-কথার পিছনে কোনো আতিশয্যই আমার নেই। তাছাড়া, কি জানেন? আমার মনে হয় যে আমাদের জীবনযাত্রার একান্ত গদ্যময় ঘর্ঘর আমাদের অন্তরের সুরটিকে ফুটতে দিতে চায় না। আমার কবি-বন্ধু হারীনের একটি কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। সে প্রায়ই বড় কবিত্বময় ভাষায় কথা কইত কেম্‌ব্রিজে। একদিন এমনি অস্ত-সন্ধ্যায় বলেছিল আমাকে মাঠে বেড়াতে বেড়াতে: "আমি ভেবে পাই নে দিলীপ, মানুষ কেন আলাপে কথাবার্তায় কবিত্ব করতে ডরায়। ঐ দেখ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে রাঙা সোনার স্বপ্নলোকে। একথা মুখে বললে কেন লোকে বলে কাব্যি? যদি মুখে না-ই বলতাম মনের সঙ্গে যখন কথা কইতাম তখন তো এই ভাষাই বেরুত ছন্দের নৃত্যলোকে।"

এ-কথা আমিও বহুবার অনুভব করেছি। আমার "রঙের পরশ" উপন্যাসে লিখেওছি। সুন্দর ক'রে কথা বলা যে কত সুন্দর, রবীন্দ্রনাথের কথা যে-ই শুনেছে সে-ই জানে।

তাছাড়া আমার আরো মনে হয় একটা কথা এই সম্পর্কে। যতদূর মনে হয়, এডোয়ার্ড কার্পেণ্টার বুঝি তাঁর Towards Democracy-র ভূমিকাতেই লিখেছেন যে কত ভালো কবিতা ঘরের মধ্যে লেখা যায় না—লিখতে হয় মাঠে-ঘাটে—যেখানে তাদের সহজ পরিবেশ।

আমি এজন্যে লজ্জিত নই যে, মেরির সঙ্গে ঝিলমের তটে এ-ধরণের কথা আমার কখনো কখনো হ'ত। আমার লজ্জা এইখানে যে, এ-ধরণের কথা কাশ্মীরে প্রায়ই হ'ত না। দৈনন্দিন ঘরোয়া কথা বলার সুযোগ কোথায় না মেলে? কিন্তু কাশ্মীরের মতন পরিবেশ জগতে ক'টা মিলবে—যেখানে সুন্দরের উদ্বোধন হয় এত সহজে—কী কথায়, কী গানে, কী কাব্যে? শ্রীঅরবিন্দকে লিখেছিলাম একথা। উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন: "তোমার সঙ্গে আমি একমত—কাশ্মীরের মতন সুন্দর দেশ আমিও কখনো দেখি নি এবং অশ্রান্ত কল্লোলিনী ঝিলমের উপরে ব'সে কবিতা লেখার গভীর আনন্দের তুলনা যে এ-জগতে কমই মেলে, এ-ও আমি জানি। কেবল আমার দুঃখ এই যে, গাইকবার এমন দেশে এসেও করতে চাইতেন বক্তৃতা—তা আবার আমাকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়ে। তবে—to each his Eden."

সত্য কথা। কিন্তু সেই জন্যেই তন্দ্রা-পরিবারের কাছে আমি এত কৃতজ্ঞ। প্যাট্রিকের সঙ্গে যে কত সুন্দর সুন্দর কথা হ'ত চিত্রকলা সম্পর্কে, তন্দ্রা দেবীর সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে, উইলিয়ামের সঙ্গে (তার আবিষ্ট অবস্থায়) নানা বিষয়ে, মেরির সঙ্গে কবিতা নিয়ে, জীবনের নানা বেদনা নিয়ে। বিশেষ ক'রেই মুগ্ধ হয়েছিলাম এত অল্প বয়সেই ওর হৃদয়ের অসামান্য পরিণতি দেখে। ওর মধ্যে শুধু কবি নয়—ভাবুকও বাস করে। এ-ভাবুকের একটু পরিচয় দেওয়াই চাই—যেহেতু আপনি জানেন আমি কাব্যের ভাবের দিকটাও চাই—শুধু এস্থেটিক কবিতায় আমার মন ভরে না। (মেরির ষষ্ঠ ও অষ্টম লাইনের মিল ক্ষমণীয়) :

No longer is perception dead
  No more a narrow space,
To prehistoric era's lead
  That we may calmly trace,
A thousand million billion years
  And feel not overcome,
By all the wonders, hopes and fears
  Of them whose life is done.

Uncounted ages pass away,
  Unmeasured time is lost,
Mightiest empires lose their sway,
  But till the humans last :
Yea, humans who from time unknown
  To time unknown will be ;
A moving, fighting, changing mass
  Of grim uncertainty.

A finer world, a greater life
  Of peacefulness and love,
Would be if every living thing
  Would hark to the above.
But yet, as always has been in
  The past, and always will :
No living, learning creature stays
  To listen to the still.—

Deep countless nights and endless days
  And myriad moods of wild
Life's ever-changing consciousness
  From the sage unto the child,
From icy mountain regions
  To the lonely sun-baked waste,
From marvel sky to marvel earth :
  O puny men, make haste !

Become as God intended :
  Calm in every way,
To learn and watch for wisdom
  The change from night to day.

ওদের কথা এত বললাম ব্যক্তিগতভাবে ওদেরকে আমার কতখানি ভালো লেগেছে শুধু সেই কথাটুকু জানাতেই নয়। বললাম, কেন না, আমি সত্যি মনে করি, বিদেশী বিদেশিনীকে ভালো ক'রে না জানলে, তাদের স্নেহ-প্রীতি না পেলে চরিত্রের সম্পূর্ণতা হয় না। অবশ্য আমি উপর উপর সুশীল বা সামাজিক আলাপের কথা বলছি না, বলছি ওদের মনের পরশ পাওয়ার কথা। তাই যখন দেখি বিদেশীকে কেউ প্রাণপণে এড়িয়ে চলেন তখন দুঃখ পাই। গেটে বলতেন কোনো বিদেশী ভাষাই যে জানে না সে নিজের মাতৃভাষাও জানে না। কথাটা বন্ধুত্ব সম্বন্ধেও সমান খাটে। বিদেশীর বন্ধুত্ব যে পেতে চায় না, তার স্বাদেশিক বন্ধুত্বের মধ্যেও কোথাও না কোথাও খাদ আছে ব'লে আমার সন্দেহ হয়। অবশ্য সুযোগ না হওয়ার কথা আলাদা। আমি বলছি সেই শ্রেণীর মনের কথা, যারা প্রীতির ক্ষেত্রে স্বাজাত্যবোধকে খুব বড় ক'রে ধরে। আমার মনে হয়, এ বড় লজ্জার কথা ; কেন না, আধুনিক মানুষের একটা মস্ত গৌরবই যে তার অবচেতনায় স্বাজাত্যবোধের ঘোর খানিকটা কেটে এসেছে—যে পরকে আপন করতে উৎসুক তাকেই আমি পুরো মানুষ বলি, যে শুধু আপন জনকে নিয়ে থাকে তার চরিত্রের সম্পূর্ণতা হয় নি।

বিদেশী বিদেশিনীকে সত্যি আপনার মনে করতে পারার মধ্যে এই মনোহর সত্য দীক্ষাটি আছে যে, স্নেহ-প্রীতির কাছে বাইরের সংস্কৃতির দুস্তর ব্যবধানও অবান্তর হ'য়ে দাঁড়ায়। একথা আমি অস্বীকার করি না যে, স্বদেশী ভাষায় কথাবার্তা কওয়া সহজও বটে, তাতে আরামও বেশি। কিন্তু তাই ব'লে এ কথা মানব না যে, এ আরামটা একটা মস্ত কিছু। বস্তুত ভাষার আংশিক ব্যবধান বা আড়াল সত্ত্বেও যে স্নেহের প্রীতির সহজ লেনদেনে বিদেশী সুহৃৎ স্বদেশীয় বন্ধুর মতনই আপন হ'য়ে উঠতে পারে—অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠতে পারে এ-অভিজ্ঞতা যার না হয়েছে সে এ জীবনের একটা মস্ত আনন্দরস থেকেই বঞ্চিত রয়ে গেল।

তন্দ্রা দেবী ও তাঁর পরিবারস্থ সকলের কাছেই তাই আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। দিনাতিপাতে তাঁদের স্মৃতি হয়ত ঝাপসা হ'য়ে আসবে, কিন্তু তাঁদের আতিথ্যে সাহচর্যে কাব্যে শিল্পে বিশেষ ক'রে তাঁদের সহজ অযাচিত স্নেহদানে আমি যে লাভ করেছি তার হিসেব যদি হারিয়েও যায় তবু তার রস আমার জীবনে একটি পরম সম্পদ হয়েই থাকবে। ইতি।

জৈনগুরু মহাবীরের ধর্ম্মোপদেশ

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

(আলোচনা)

গত মাঘ (১৩৪৫) সংখ্যক ভারতবর্ষে ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা মহাশয় একটী সুচিন্তিত ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে মহাবীরের ধর্ম্মোপদেশ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। ডক্টর লাহা মহাশয় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে বিশদ অনুশীলন করিতেছেন তাহা এই প্রবন্ধে পরিস্ফুট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনবধানতাবশতঃ উক্ত প্রবন্ধে কয়েকটী অসঙ্গতি থাকিয়া গিয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান আলোচনায় প্রদর্শিত হইতেছে।

এই প্রবন্ধে ১৭৮ পৃষ্ঠায় শেষের দিকে পাঁচটী অস্তিকায়ের নাম দেওয়া আছে, যথা :—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল, আকাশ এবং আত্মা। কিন্তু এই পাঁচটী দ্রব্যের মধ্যে "কাল" অস্তিকায় নহে।—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ, পুদ্‌গল ও জীব (আত্মা) এই পাঁচটী দ্রব্য অস্তিকায়। 'অস্তিকায়' শব্দের অর্থ 'যাহার অবয়ব প্রদেশের প্রচয় অর্থাৎ সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত।' সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশকে 'প্রদেশ' বলে। যে সকল দ্রব্য এইরূপ বহু প্রদেশের সমষ্টি তাহাদিগকে 'অস্তিকায়' বলে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জীব (আত্মা) দ্রব্য এরূপ অসংখ্য প্রদেশের সমষ্টি এবং আকাশ অনন্ত প্রদেশের সমষ্টি তজ্জন্যই উহাদিগকে অস্তিকায় বলা হয়। 'পুদ্‌গল' অর্থাৎ জড়দ্রব্যও 'অস্তিকায়'। পুদ্‌গলের মধ্যে পরমাণু কেবল একটী মাত্র অবয়ববিশিষ্ট; কিন্তু দুই পরমাণুর অনু হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সমস্ত বৃহত্তর পুদ্‌গল-স্কন্ধ (জড়দ্রব্য) সংখ্যেয়, অসংখ্যেয় বা অনন্ত পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া ইহাকেও 'অস্তিকায়'—পুদ্‌গলাস্তিকায় বলা হয়। কাল দ্রব্য সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। এক মতে 'কাল' দ্রব্যই নহে, ইহা কল্পিত দ্রব্য মাত্র। অন্য মতে 'কাল' দ্রব্য হইলেও তাহা কেবল মাত্র এক প্রদেশাত্মক—বহু প্রদেশের সমষ্টি নয়।—কালের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশকে 'সময়' বলা হয়। এইরূপ প্রত্যেক 'সময়' পৃথক পৃথক রূপে কাল দ্রব্য এবং তজ্জন্য ইহা 'অস্তিকায়' নহে। এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্‌গলাস্তিকায় এবং কাল এই পাঁচটী দ্রব্য অচেতন; একমাত্র জীবাস্তিকায়ই চেতন। একমাত্র পুদ্‌গল দ্রব্যই (জড়পদার্থ) রূপী, অর্থাৎ—যাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আছে। অন্য পাঁচটী দ্রব্যের অবয়ব থাকা সত্ত্বেও অরূপী।

১৬৯ পৃষ্ঠায় 'ক্রিয়াবাদ' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "জৈনধর্ম্মের মধ্যে ক্রিয়াবাদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।" কিন্তু ক্রিয়াবাদ জৈনধর্ম্মের সিদ্ধান্ত নহে। কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও জৈনধর্ম্মকে ক্রিয়াবাদ বলিয়াছেন কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, বিনয়বাদ, অজ্ঞানবাদ প্রভৃতি মত সকল মহাবীরের মত হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে[১]। সূত্রকৃতাঙ্গে যে স্থলে অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ, বিনয়বাদ প্রভৃতির বর্ণনা আছে সেই স্থলে ক্রিয়াবাদও একটী পৃথক মত স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে[২]।

১৮০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের নিম্নের দিকে 'লেশ্যা'য় যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভাব পরিস্ফুট হয় নাই।—বিশেষ "প্রাণীদিগকে ছয়টী রঙের অনুপাতে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে"—উক্তিটী ঠিক নয়। ছয়টী লেশ্যায় নাম যথা :—কৃষ্ণ, নীল, কাপোত, তেজঃ, পদ্ম ও শুক্ল। জৈন সিদ্ধান্তে এই ছয়টী লেশ্যার অনুপাতে প্রাণীদিগকে ভাগ করা হয় নাই, কিন্তু কোন্ কোন্ প্রাণীর মধ্যে কোন্ কোন্ লেশ্যার বাহুল্য তাহাই বলা হইয়াছে। নরকের জীবের মধ্যে প্রথম তিন লেশ্যা, পশুদের ও মনুষ্যদের মধ্যে ছয়টী লেশ্যার মধ্যে যে-কোন লেশ্যার ব্যক্তি পাওয়া যায়। আজীবকগণ ছয়টী রঙের অনুপাতে মনুষ্যজাতিকে বিভক্ত করিতেন। বোধহয় আজীবক মতের সহিত জৈন মত মিশ্রিত হইয়া এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।—মানসিক অধ্যবসায়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম বর্গনার[৩] অনন্তানন্ত সূক্ষ্ম পুদ্‌গলস্কন্ধ যখন আত্মার সহিত মিলিত হয় তখন অধ্যবসায়ের তারতম্যতা অনুসারে ঘনতম, ঘনতর, ঘন, মন্দ, মন্দতর ও মন্দতম রূপে কর্ম্মপুদ্‌গল উপস্থিত হয়। এই অবস্থাকে কৃষ্ণাদি রঙের সদৃশ বলিয়া এতদ্রূপ নাম-করণ করা হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্ম পুদ্‌গলের আগমনকে লেশ্যা বলা হয়—

১৮১ পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারাতে 'মনঃ পর্য্যায়" জ্ঞানের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।—এই জ্ঞান "অপরের মনের গতি আলোচনা করিয়া লাভ হয়" ইহা ঠিক নহে। কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করিলে 'অপরের মনের সমস্ত পর্য্যায় অর্থাৎ সমস্ত বিভিন্ন ভাব জানিতে পারা যায়' এবং তজ্জন্য ইহাকে মনঃ পর্য্যায় জ্ঞান বলে।

"মহাবীরের ধর্ম্মের সংক্ষিপ্তসার" শীর্ষক প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে স্থলে "ইহা (আত্মা) সকল বিষয় জানে, সকল বস্তু দেখিতে পায়, সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করে…" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে সে স্থলে ইহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত যে, আত্মা যে অবস্থায় সকল বিষয় জানে এবং সকল বস্তু দেখিতে পায় সে অবস্থায় ইহা সুখলাভের ইচ্ছা করিতে বা

---

(১) সূয়গড়াঙ্গ ১।৬।২৭

(২) সূয়গড়াঙ্গ ১।১২।১

(৩) যে বিশেষ প্রকারের অতি সূক্ষ্ম পুদ্‌গল কর্ম্মরূপে আত্মার সহিত মিলিত হয় তাহাকে কর্ম্ম বর্গণায় পুদ্‌গল বলে।—

দুঃখকে ভয় করিতে, মিত্রবৎ বা শত্রুবৎ কার্য্য করিতে এবং তাহাদের ফল ভোগ করিতে পারে না। কারণ যে আত্মা যখন সমস্ত দেখিতে ও জানিতে পারে তখন তাহার মুক্ত অবস্থা, সে তখন সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত অবস্থার অতীত। যে অবস্থায় আত্মা সুখাদির অভিলাস করে.সে অবস্থা সংসারী অবস্থা, তখন সে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হইতে পারে না।

আরও কয়েক লাইন পরে লেখা হইয়াছে "যে সকল ভিক্ষু অথবা গৃহস্থ তপস্যা ও আত্মসংযম আচরণ করিয়া মুক্তিলাভ করে তাহারা স্বর্গগামী হয়।" এ স্থলে ছাপার ভুল হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় নতুবা যিনি জৈন শাস্ত্রের এত গভীর অনুশীলন করিয়াছেন তিনি মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গগামী হন এরূপ লিখিতে পারেন না। নরক যেমন দুষ্কৃতির ফল, স্বর্গও সেরূপ সুকৃতির ফল। পুণ্যকর্ম্ম সঞ্চিত হইলে স্বর্গলাভ হয়। জৈনদর্শনে স্বর্গলাভ চরম উদ্দেশ্য নহে কিন্তু মুক্তিলাভ চরম উদ্দেশ্য। স্বর্গ ও নরক তির্য্যক লোকের (পৃথিবীর) ন্যায় সংসারী জীবের পরিভ্রমণের স্থান মাত্র। পাপকর্ম্মের আতিশয্যে নরকগামী এবং পুণ্যকর্ম্মের আতিশয্যে স্বর্গগামী হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ শুভাশুভ কর্ম্মের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত আনন্দের অধিকারী হওয়া মুক্তির অবস্থা—ইহার পরে সংসারে অর্থাৎ স্বর্গ, নরক বা তির্য্যকলোকে কোন স্থানে ফিরিয়া আসা সম্ভবপর নহে।

১৮৪ পৃষ্ঠায় "মোক্ষ" অধ্যায়ে দ্বিতীয় প্যারাতে "পুগ্‌গল" শব্দের অর্থ "ব্যক্তি" (ব্র্যাকেটের মধ্যে) করা হইয়াছে। জৈন শাস্ত্রে 'পুগ্‌গল' বা পুদ্‌গল শব্দের অর্থ "জড় পদার্থ"। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই শব্দের অর্থ 'ব্যক্তি'। বোধ হয় ভ্রমক্রমে জৈনশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুসরণ করা হইয়াছে। এ স্থলে ঐ শব্দের অর্থ হইবে 'জড়'—'ব্যক্তি' নহে।

আরও কয়েক স্থলে কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে কিন্তু সে সমস্ত তত প্রয়োজনীয় না থাকায় আলোচনার বিষয়ীভূত করা হইল না।

এমনি গহন রাতে কেহ কি ভাবিবে বসে!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তন্দ্রাতুর ক্লান্ত আশা, অন্তরের পাদপীঠে পড়িয়াছে ঘন যবনিকা।
অনন্ত স্তব্ধতা মাঝে একটি বিষণ্ণগীতি সঞ্চরিছে মোর অশ্রুলোরে,
যে ছিল প্রাণের প্রিয় সে আজ নাহিক বক্ষে, বাণী তার হ'ল স্বপনিকা,
বহুদূর প্রবাসীর পথের সন্ধান কেহ কহিল না কোনদিন মোরে।
দিগন্তের শূন্যপথে চেয়ে আছি, অন্তরের বিহঙ্গেরা নিদ্রিত কুলায়,
ভ্রাম্যমান ছায়াসম এ জীবন-মরীচিকা মূর্ত্ত রহে নিখিলের প্রাণে।
বাঁধিনু যে সুরে বীণা সে সুর হারায়ে গেছে, বীণা কাঁদে পথ-নিরালায়,
এই বিশ্বে একে একে যায় সব হারাইয়া নাহি ফিরে আমারি আহ্বানে।

আকাশে অতন্দ্র তারা, নিম্নে শ্যামশষ্পদল, অন্ধকার স্থাবর জঙ্গমে,
গভীর রহস্যভরা স্পন্দন তরঙ্গ ওঠে নিখিলের আয়ুস্রোতো মুখে,
সে তরঙ্গে কত চিত্ত ভেসে গেছে কোন্ দূর আনন্দের সাগর-সঙ্গমে,
পশ্চাতে মেখলাসম হংসবলাকার শ্রেণী উড়ে গেছে অসীম কৌতুকে।
নিশীথ গহন রাতি, পশিছে শ্রবণে কত দূরাগত শ্রুতি-বিভীষিকা,
কুঞ্জতরু-বীথিকায় কত আসে খদ্যোতিকা মিশে যায় দিগন্তের পারে,
তিমির গুণ্ঠনতলে চঞ্চল সমীরে কাঁপে কক্ষ-কেন্দ্রে শুভ্র দীপ শিখা,
স্বপনে জাগিছে কত অনাগত কল্পনার পদধ্বনি মৌন অন্ধকারে।

আমিও হারায়ে যাবো—জীবন চলিয়া যাবে, মোর ভগ্ন পান্থশালা মাঝে
এমনি গহন রাতে কেহ কি ভাবিবে বসে মোর প্রাণ কোথা মিশিয়াছে!

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীমেঘনাথ সাহা ডি-এসসি, এফ-আর-এস

(২)

"বিজ্ঞান ও চৈতন্য"

সমালোচক অনিলবরণের মতে "বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা নাকি বলিয়াছেন যে বিশ্বজগতের পশ্চাতে একটা বিরাট চৈতন্য আছে; যদিও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এই চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হন নাই।" যেহেতু ডাক্তার মেঘনাদ বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্য স্বীকার করেন নাই (যদিও কোথায় অস্বীকার করিয়াছি তাহা সমালোচক কোথায়ও দেখান নাই) সুতরাং তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক। এই সম্বন্ধে তিনি Napoleon ও Laplace সম্বন্ধীয় একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন।

সমালোচক কোথাও চৈতন্যে বিশ্বাসবান্ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের নামধাম বা তৎপ্রণীত পুস্তকাদির উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার সহিত বিচার, অনেকটা হাওয়ার সাথে লড়াই। তিনি Napolean-Laplace সম্বন্ধীয় গল্পটি ইংরেজী তরজমায় পড়িয়াছেন, কাজেই পরের মুখে ঝাল খাইলে যাহা হয়, গল্পের প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়া তাহার অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। আসল গল্পটি এই—Laplace তাঁহার সুবিখ্যাত Mecanique Celeste গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং প্রমাণ করেন যে গতিতত্ত্ব (Dynamics) ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি দিয়া পর্য্যবেক্ষিত সমস্ত গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়। তিনি যখন এই গ্রন্থ Napoleonকে উৎসর্গ করিবার অনুমতির প্রার্থী হন তখন Napoleon রহস্য করিয়া বলেন Mons. Laplace, you have so well described and explained the mechanics of heavenly bodies, but I find that you have nowhere mentioned the Creator. Laplace উত্তর দেন—"Monseigneur, je n'avais pas besoin de tel hypthese." "Sire, I had not the necessity of such a hypothesis."

Laplaceএর এই মন্তব্য সম্বন্ধে নানারূপ ভুল ধারণা হইয়াছে। যদি পূর্ব্বের context না জানা থাকে তাহা হইলে মনে হইবে যে Laplace ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মন্তব্যটিকে তাহার contextএর সহিত ধরিতে হইবে! Laplaceএর সময়ে তর্ক উঠিয়াছিল যে গ্রহউপগ্রহাদির গতি ব্যাখ্যার জন্য গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি যথেষ্ট কিনা। বাস্তবিক পক্ষে তাৎকালিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে গ্রহউপগ্রহাদির গতি এত জটিল প্রতীয়মান হইয়াছিল যে অনেক পণ্ডিত মনে করিতেন যে যদিও গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা স্থূলভাবে গ্রহাদির পথের ব্যাখ্যা মিলে, বাস্তবিক সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। অনেকে মনে করিতেন যে মধ্যে মধ্যে কোনও অদৃশ্য হস্তের প্রভাবে (unseen agency) গ্রহগতির সামঞ্জস্য সাধিত হয়। কিন্তু Laplace প্রমাণ করিলেন যে মাধ্যাকর্ষণ ও গতিতত্ত্বই যথেষ্ট, কোনও অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন নাই। তাই তিনি Napoleonকে উক্তরূপ জবাব দিয়াছিলেন। ইহা হইতে তিনি "ঈশ্বর আছেন বা না আছেন" তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এরূপ ধরিয়া লওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে। বাস্তবিকই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকেরা যে বিষয় লইয়া গবেষণা করেন, তাহার বাহিরে কোন বিষয়ে তাঁহারা যদি কিছু বলেন, তাহাকে যুক্তি ও তর্কের পরীক্ষা দিয়া যাচাই করিয়া নিতে হইবে। Sir J. J. Thompson বলিয়াছেন যে যদি কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ মত প্রকাশ করেন, সেই মত তাঁহার পরিবার বা সমাজপ্রদত্ত শিক্ষা হইতে সঞ্জাত মনে করিতে হইবে; তাঁহার এই মত যদি বিজ্ঞান-সঙ্গত প্রমাণপ্রয়োগসহ উপস্থাপিত না হয়, তাহা হইলে নেহাৎ ব্যক্তিগত মত বলিয়াই গণ্য করা হইবে। অর্থাৎ এই মতের উপর উক্ত বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব চাপান অন্যায় হইবে। কাজেই কোনও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যদি ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসবান্ হন এবং তজ্জন্য তিনি যদি নিছক

বিশ্বাস ব্যতীত বিজ্ঞানের স্বীকৃত প্রমাণাদি উপস্থিত না করেন, তাহা হইলে সেই মতের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা অসঙ্গত হইবে।

সুতরাং বিংশ শতাব্দীর কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের পশ্চাতে বিরাট চৈতন্য আছে এবং কি প্রমাণে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, তাহার সবিশদ্ বর্ণনা না পাইলে সমালোচকের অবান্তর বাগাড়ম্বরের প্রতিবাদ করিতে যাওয়া নিরর্থক। সমালোচকের লেখা দৃষ্টে মনে হয় যে তিনি একজন God-drunk লোক এবং বোধহয় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করারও দাবী করেন। আমার সেরূপ সৌভাগ্য হয় নাই,হইলে সুখী হইব।

আমাদের বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে "God is a subjective creation of the human mind" অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশেই লোকে নিজেদের মন হইতে "ঈশ্বরের স্বরূপ" কল্পনা করিয়া নেয়। সুতরাং এই সব "মনগড়া ঈশ্বরের" প্রকৃতি বিভিন্ন হয় এবং ঈশ্বরের ধারণা সেই জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের মনোভাব মাত্র ব্যক্ত করে। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রমাণসঙ্গত কোন objective ধারণা এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাত্", সাংখ্যকারের এই উক্তি বোধহয় একালেও চলে।

সমালোচক মনে করেন যে ভগবানে অচলা ভক্তি ব্যতীত ধর্ম্ম হইতে পারে না। তিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। এই সমস্ত ধর্ম্মে ভগবানের বা সৃষ্টিকর্ত্তার স্থান কোথায়? অথচ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া মানবজাতির একটা প্রকাণ্ড অংশের মনোবৃত্তি, রীতিনীতি, সমাজ সংগঠনের মূলভিত্তি গঠন করিয়াছে। এখনও চীন ও জাপান দেশে বৌদ্ধমতের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ। ভারতে অবশ্য পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে অভিভূত করিয়াছে; কিন্তু অনেকের মতে তাহাই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। বর্ত্তমানে রুসিয়া দেশ সম্পূর্ণ Godless এবং তাহারা গত ২০ বৎসরের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়শীল হইয়া যেরূপভাবে দেশের সর্ব্ববিধ বস্তুতান্ত্রিক উন্নতিসাধন করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং ভগবানের দোহাই ছাড়া ধর্ম্ম বা সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে না, পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে এই মত সমর্থন করা চলে না।

"প্রাচীনেরা ভাবিতেন যে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র··· নিয়ন্ত্রিত করেন।"

আমার বক্তৃতার উক্ত অংশের সমালোচনায় সমালোচক অনর্থক বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ এবং হিন্দু জ্যোতিষে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সমস্ত তত্ত্বই নিহিত আছে এই কথা বলিতে চাহিয়াছেন। এই ধারণা কত ভ্রমাত্মক তাহা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

"প্রাচীনেরা মনে করিতেন যে পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র" —আমার এই মন্তব্যের সমালোচক অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। context এর সহিত মিলাইয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে পৃথিবী যে বিশ্বজগতের জ্যামিতিক কেন্দ্র তাহা আমি কোথাও বলি নাই। বলবার উদ্দেশ্য যে প্রাচীনকালে এই ধারণা ছিল—"এই পৃথিবীই বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠ জিনিষ"। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা পৃথিবীস্থ জীবের বিশেষতঃ মানুষের কোনও বিশেষ প্রয়োজনবশতঃই ঈশ্বরনির্দিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে এই ধারণা অনেক ধর্ম্মেই বলবতী ছিল।

"তারকাগুলি ধার্ম্মিক লোকের আত্মা"

প্রাচীনকালের সমস্ত দেশেই এই ধারণা ছিল, এমন কি এই বেদপ্রবৃদ্ধ দেশেও। গ্রীস দেশের সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী মোটের উপর এই বিশ্বাস-প্রণোদিত। তারকাগুলির নামেও ইহার পরিচয়। মহাভারতেও এই বিশ্বাসের পরিচয় আছে। যথা বনপর্ব্বে (৪২ অধ্যায়ে) অর্জ্জুন যখন অস্ত্রলাভার্থ মাতলির সহিত রথে স্বর্গে প্রয়াণ করিতেছেন, তখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মাতলি বলিতেছেন :—

হে পার্থ! তুমি ভূমণ্ডল হইতে এই সমস্ত তারকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ। পুণ্যশীলেরা সুকৃতি ফলে তারকারূপে স্বস্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

সুতরাং উপরিউক্ত মন্তব্যে আমি কোন মনগড়া কথা বলি নাই বা হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করি নাই। বর্ত্তমান জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে তারকাগুলি এক একটি সূর্য্যমণ্ডল, এবং বর্ত্তমান লেখকের গবেষণায় (Saha's Theory of Ionisation) তাহাদের রাসায়নিক উপাদান, তাপমান, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মোটের উপর সূর্য্য হইতে তাহাদের বিভিন্নতা

কেবল তাপক্রম এবং ওজন ও পরিমাণজনিত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের এই সমস্ত আবিষ্কার সত্য ধরিয়া লইলে পৌরাণিক ধ্রুব উপাখ্যান (বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ), অগস্ত্যোপাখ্যান, প্রজাপতির কন্যাসক্তি, দক্ষযজ্ঞ—এক কথায় সমস্ত Pauranic Mythologyর ভিত্তি ভূমিসাৎ হয় এই আমার বক্তব্যের সারমর্ম্ম।

সমালোচক বলিয়াছেন :—

"গ্রহগণ মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে—এ কথাটা কি শুধু প্রাচীন দর্শনের কথা ? আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইউরোপে কি কেহ এ কথা বিশ্বাস করে না ?"

আমি কোথাও দর্শনের কথা বলি নাই, লোক প্রচলিত মতের কথাই বলিয়াছি। সম্ভবতঃ সমালোচক অস্বীকার করিবেন না যে আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৯৯ জন লোক পঞ্জিকা ও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসবান্। ইউরোপে কেহ কেহ বিশ্বাস করে—কিন্তু তাহাদের অনুপাত কত ? সম্প্রতি "Britain by Mass-observation" শীর্ষক Penguine Seriesএ প্রকাশিত পুস্তকে উক্ত হইয়াছে যে ইংলণ্ডে পুরুষের মধ্যে শতকরা ৫ জন ফলিত জ্যোতিষে পূর্ণ আস্থাবান্, ১৫ জন আংশিক এবং ৮০ জন লোকে মোটেই বিশ্বাস করে না। স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন পূর্ণ বিশ্বাস করে, ৩৩ জন আংশিক বিশ্বাস করে এবং বাকী ৩৩ জন মোটেই করে না। এই সমস্ত তথ্য বহু গবেষণার ফলে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা ৯৯ জন পুরুষ এবং ১০০ জন স্ত্রীলোক ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। এখনও তথাকথিত শুভদিন না হইলে, কোষ্ঠী না মিলিলে বিবাহ হয় না ! পঞ্জিকা কথিত শুভদিন না দেখিয়া অধিকাংশ লোকের বিদেশ যাত্রা হয় না। হাঁচি, টিকটিকি ও পাঁজি সমস্ত হিন্দুজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বিলাতের দু'চার জন দুর্ব্বলমস্তিষ্ক লোকে ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করে, এই তর্কে আমাদের সর্ব্বজনব্যাপী কুসংস্কারের ন্যায্যতা বা উপকারিতা প্রমাণ হয় না। আমার বিশ্বাস যে হাঁচি, টিকটিকি ও পঞ্জিকায় অন্ধবিশ্বাস জাতীয় জীবনের দৌর্ব্বল্যের দ্যোতক। এতদ্দেশে প্রচলিত পঞ্জিকা যে ভুল গণনা দ্বারা পরিচালিত এবং অর্দ্ধসত্যাত্মক কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা মৎ সম্পাদিত Science and Culture পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে তাহা দেখান হইবে।

Hindu Astronomy সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্যই প্রকাশ করি নাই ; অথচ সমালোচক অযাচিত মন্তব্য করিয়াছেন "ডক্টর মেঘনাদ সাহা এখানে Astronomy ও Astrology এই দুই এর মধ্যে গোলমাল করিয়াছেন।" কোথায় গোলমাল করিয়াছি এবং কোথায় আমি হিন্দু Astronomyর উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, তিনি দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।

লেখক হিন্দু-জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমাকে অনেক জ্ঞান দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বোধ হয় মোটেই জ্ঞাত নন যে আমি হিন্দু জ্যোতিষ (Astronomy) আজীবন অধ্যয়ন করিয়াছি এবং ভারতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা আছে। সুতরাং সমালোচকের হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে ধারণা যে প্রায়শঃ অমূলক ও বিরাট অজ্ঞতা প্রসূত তাহা দেখাইতে প্রয়াসী হইলাম।

সমালোচক অনিলবরণ ও হিন্দু জ্যোতিষ

সমালোচক ভারতবর্ষের লেখকদিগকে জানাইয়াছেন যে এই দেশে সূর্য্য যে সৌরজগতের কেন্দ্র এই মত জানা ছিল এবং গ্যালিলিওর বহু পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে জানা ছিল যে পৃথিবী সচল হইলেও স্থির বলিয়া মনে হয়, সুতরাং ইউরোপীয় বিজ্ঞান নূতন কিছুই করে নাই ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইলে প্রথম দরকার কালজ্ঞান। কোনও বিশেষ আবিষ্কার কোন লোক বা কোন জাতি প্রথম করিয়াছে, এই তর্ক উঠিলে প্রথম দেখিতে হয় যে কোন সময়ে উক্ত লোক বা জাতি এই বিশেষ আবিষ্কার দাবী করিয়াছে এবং তাহা কতটা প্রমাণসহ। সমালোচক অনিলবরণ কালের পৌর্বাপর্য্য কিছুমাত্র বিচার করেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহার কতটা অধিকার আছে জানি না। যদি অধিকার না থাকে, এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ। সুতরাং তাঁহার অবগতির জন্য ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইল।

জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে মিথ্যা বা মনগড়া কল্পনার স্থান নাই। কারণ জ্যোতিষে গ্রহনক্ষত্র বা কালগণনা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিতে

হয়, জ্যোতিষে সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই ঐ সমস্ত ঘটনার সময় নিরূপণ করা যায়। সুখের বিষয় ভারতীয় জ্যোতিষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্যতীত ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে পরলোকগত মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত, মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সমালোচক 'দেব ভাষায়', ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজী ভাষায় রচিত এই লেখকদের গ্রন্থ পাঠ করিলে ভারতীয় জ্যোতিষ (Astronomy) সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কত ভ্রান্ত বুঝিতে পারিবেন। বর্তমান লেখক এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে সমস্ত মৌলিক পুস্তকের জ্ঞান আছে বলিয়া দাবী করেন।

এই সমস্ত পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে ভারতীয় জ্যোতিষের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর আছে—

১। বেদকাল (খৃঃ পূঃ ১৪০০ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী)

২। বেদাঙ্গ জ্যোতিষকাল (খৃঃ পূঃ ১৪০০ শতাব্দী হইতে ৪০০ খৃঃ অব্দ)

৩। সিদ্ধান্ত কাল (৪০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দ)

বেদকালের জ্যোতিষ অতি সাধারণ রকমের এবং বহু স্থলেই অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তদপেক্ষা উন্নততর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা প্রণালী 'মহাভারতে' অনুসৃত হইয়াছে (বিরাটপর্ব, ৫২ অধ্যায়)। মহাভারতের সঙ্কলনকাল দীক্ষিতের মতে (এবং যাহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত) ৪৫০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ৪০০ খৃঃ অব্দ। সমালোচক যদি প্রমাণ চাহেন তাহা দেওয়া যাইবে। এই 'মহাভারতে' কুত্রাপি সপ্তাহ,বার, রাশিচক্রের (যাহা বর্ত্তমান পঞ্জিকার একটী প্রধান অঙ্গ) উল্লেখ নাই। মহাভারতে কোথাও পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্ত্তনবাদ বা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণবাদের উল্লেখ নাই; বরঞ্চ যে সমস্ত মতের উল্লেখ আছে তাহা উক্ত সমস্ত মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরকমের (ভীষ্মপর্ব, ৬ অধ্যায়) (বনপর্ব, ১৬২ অধ্যায়)। মহাভারতে পৃথিবীকে সমতল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সুমেরু উহার কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবী যতটা প্রসারিত, সুমেরু প্রায় ততটা উঁচু এবং সূর্য্য সুমেরুর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া দিবারাত্রি ঘটায়, এইরূপ বর্ণিত আছে। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে মহাভারত সঙ্কলনকালের অর্থাৎ ৪৫০ পূঃ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ভারতে পৃথিবীর গোলত্ব বা আবর্ত্তনবাদ, অথবা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণবাদ জানা ছিল না।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা প্রণালী বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অত্যন্ত স্থূল ও অশুদ্ধ। এই গণনাপ্রণালীই একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া খৃষ্টের কিছু পর পর্য্যন্ত "পৈতামহ সিদ্ধান্ত" নামে প্রচলিত ছিল এবং ইহাই পরবর্ত্তীকালে 'পিতামহ ব্রহ্মা' প্রণীত বলিয়া স্বীকৃত হয়। অন্যান্য সিদ্ধান্তের তুলনায় এই প্রাচীন সিদ্ধান্ত কতদূর অশুদ্ধ, ৫৫০ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বরাহমিহির লিখিত নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে তাহার ঠিক ধারণা হইবে। বরাহমিহির তাঁহার সময়ে প্রচলিত পাঁচখানা সিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম তাঁহার পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা নামক করণ গ্রন্থে বর্ণনা করেন এবং উক্ত পঞ্চসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তুলনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করেন।

"পৌলিশ রোমক বাশিষ্ঠাসৌরপৈতামহাস্ত সিদ্ধান্তাঃ।
পঞ্চভ্যো দ্বাবাদ্যৌ ব্যাখ্যাতৌ লাটদেবেন।
পৌলিশকৃতঃ স্ফুটোংসৌ তস্যাসন্নস্তু রোমকপ্রোক্তঃ।
স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ।"

এই শ্লোকের অর্থ যে বরাহমিহিরের সময় (৫৫০ খৃঃ অব্দে) পাঁচখানা সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল—পৌলিশ বা পুলিশ, রোমক, সৌর, বাশিষ্ঠ ও পৈতামহ। তন্মধ্যে প্রথম দুইখানি লাটদেব ব্যাখ্যা করেন; এই দুইখানির মধ্যে পৌলিশ-সিদ্ধান্ত স্ফুট অর্থাৎ শুদ্ধ, রোমক সিদ্ধান্ত তাহার আসন্ন অর্থাৎ তদপেক্ষা অশুদ্ধ; সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, কিন্তু অবশিষ্ট দুইখানি, বাশিষ্ঠ ও পৈতামহ সিদ্ধান্ত "দূরবিভ্রষ্ট" অর্থাৎ অত্যন্ত অশুদ্ধ।

এই মন্তব্যটি তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নাম দৃষ্টে প্রমাণ যে রোমক ও পৌলিশ-সিদ্ধান্ত বিদেশ হইতে আনুমানিক ৪০০ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার প্রমাণ চাহিলে দেওয়া যাইবে। বাস্তবিকপক্ষে পৌলিশ-সিদ্ধান্ত Paulus of Alexandria (376 A. D.)র জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাকী রহিল সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ সূর্য্য-সিদ্ধান্ত; কিন্তু ইহাও যে বিদেশ হইতে ধার করা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত-জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১ ॥
অল্পাবশিষ্টে তু কৃতে ময়নামা মহাসুরঃ।
রহস্যং পরমং পুণ্যং জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানমুত্তমং ॥ ২ ॥
বেদাঙ্গমগ্র্যমখিলং জ্যোতিষাং গতিকারণাং।
আরাধয়ন্ বিবস্বন্তং তপস্তেপে সুদুশ্চরং ॥ ৩ ॥
তোষিতস্তপসা তেন প্রীতস্তস্মৈ বরার্থিনে।
গ্রহাণাং চরিতং প্রাদান্ময়ায় সবিতা স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীসূর্য্য উবাচ

বিদিতস্তে ময়া ভাবস্তোষিতস্তপসা হ্যহম।
দদ্যাং কালাশ্রয়ং জ্ঞানং গ্রহাণং চরিতং মহৎ ॥ ৫ ॥
ন মে তেজঃ সহঃ কশ্চিদাখ্যাতুং নাস্তি মে ক্ষণঃ।
মদংশঃ পুরুষোহয়ং তে নিঃশেষং কথয়িষ্যতি ॥ ৬ ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবঃ সমাদিশ্যাংশমাত্মনঃ।
স পুমান্ ময়মাহেদং প্রণতং প্রাঞ্জলিস্থিতম্ ॥ ৭ ॥
শৃণুষ্বৈকমনাঃ পূর্ব্বং যদুক্তং জ্ঞানমুত্তমং।
যুগে যুগে মহর্ষীণাং স্বয়মেব বিবস্বতা ॥ ৮ ॥

সত্যযুগের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে, ময়নামক মহাসুর পরমপুণ্যপ্রদ, রহস্য, বেদাঙ্গশ্রেষ্ঠ, সমস্ত গ্রহদিগের গতি-কারণরূপ উত্তম জ্ঞানলাভে জিজ্ঞাসু হইয়া দুশ্চর তপস্যাদ্বারা সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। ২-৩

শ্রীসূর্য্যদেব বরার্থী ময়াসুরের তপস্যায় পরম প্রীত হইয়া তাহাকে গ্রহজ্ঞানবিষয়ক জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইলেন। ৪

সূর্য্য বলিলেন, হে ময়! আমি তোমার মনোগত ভাব অবগত হইয়াছি এবং তোমার তপদ্বারাও তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমি তোমাকে গ্রহদিগের স্থিতি চলনাদি প্রতিপাদক জ্যোতিষশাস্ত্র উপদেশ করিতেছি; কিন্তু কেহই আমার তেজ সহিতে পারে না এবং আমারও ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিবার অবকাশ নাই যে, তৎসমস্ত তোমার নিকট প্রকাশ করিব; অতএব আমার অংশসম্ভূত এই পুরুষ তোমার অভিপ্রেত বিষয়সকল অবগত করাইবে। ৫-৬

এই বলিয়া সূর্য্যদেব নিজ অংশসম্ভূত পুরুষকে ময়ের নিকট তাহার অভিপ্রেত বিষয়ে বর্ণনে আদেশ করিয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। সূর্য্যাংশের পুরুষও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত প্রণত ময়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ময়! সূর্য্যদেব যুগে যুগে মহর্ষিদিগের যে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উত্তম জ্ঞান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি; এক মন হইয়া শ্রবণ কর। ৭-৮

সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে যে ময়াসুর ব্রহ্মাকর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া রোমকপুরে যবনরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় সূর্য্যের আরাধনা করিয়া জ্যোতিষের জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং ময়াসুরের নিকট হইতে মহর্ষিগণ কাল ও জ্যোতিষজ্ঞান লাভ করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের শেষ অধ্যায়ে এইরূপভাবে পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে।—

ইত্যুক্ত্বা ময়মামন্ত্র্য সম্যক্ তেনাভিপূজিতঃ।
দিবমাচক্রমেঽর্কাংশ প্রবিবেশ সমণ্ডলম্ ॥
ময়োঽথ দিব্যং তজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা সাক্ষাদ্বিবস্বতঃ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে নির্ধূতকল্মষম্ ॥
জ্ঞাত্বা তমৃষয়শ্চাথ সূর্য্যলব্ধবরং ময়ং।
পরিবব্রুপেত্যাথো জ্ঞানং পপ্রচ্ছুরাদরাত্ ॥
স তেভ্যোঃ প্রদদৌ প্রীতো গ্রহাণাং চরিতং মহৎ।
অত্যদ্ভুতং লোকে রহস্যং ব্রহ্মপম্মিতম্ ॥

বঙ্গানুবাদ।—

এইরূপ ময়কে উপদেশ করিয়া, বাংময় দ্বারা পূজিত হইয়া সূর্য্যের অংশস্বরূপ পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

স্বয়ং সূর্য্যদেব হইতে এই দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ময় নিজকে কৃতার্থ এবং নিজকে পাপ বিনির্মুক্ত মনে করিতে লাগিলেন।

পরে ময় সূর্য্যদেবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিয়া ঋষিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া সম্মানসহকারে বিদ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ময় আনন্দিত হইয়া ঋষিদিগকে গ্রহাদির গুহ্য এবং আশ্চর্য্য ব্রহ্মাবিদ্যাতুল্য মহাবিদ্যা দান করিয়াছিলেন।

(বিজ্ঞানানন্দ স্বামীকৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনুবাদ হইতে গৃহীত)

এই পৌরাণিক গল্পের নীহারিকার ভিতর দিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে সূর্য্যসিদ্ধান্তে যে জ্যোতিষিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পশ্চিম-

দেশবাসী অসুরদিগের অর্জ্জিত জ্ঞান। হিন্দু পণ্ডিতগণ অসুরগণের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করেন। এই অসুরগণ কে?

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনাপ্রণালী ৪০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১০০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তিত এবং স্ফুটতর (more correct) হইয়াছে। মূল সূর্য্যসিদ্ধান্তের সহিত Babylonian Astronomyর ঐক্য আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রারম্ভিক শ্লোক তাহারই দ্যোতকমাত্র। সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি কোন পশ্চিমদেশীয় নগরে, ভারতে নয়—এই জ্ঞান প্রথমে অসুরেরা পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচন করিয়া বাহির করেন এবং অসুরদিগের নিকট হইতে আর্য্য-ঋষিরা শিক্ষা করেন। এই অসুরেরা রক্তমাংসের লোক, প্রাচীনকালে সমস্ত পশ্চিম এশিয়া জুড়িয়া তাঁহারা একটা মহান্ সভ্যতা গঠন করেন, যাহার কেন্দ্র ছিল Babylon, Ninevah, Ur ইত্যাদি Tigris ও Euphrates নদীদ্বয়ের উপর অবস্থিত নগরগুলি।

বর্ত্তমানকালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণ হইয়াছে যে প্রাচীন Babylon দেশে প্রথমে জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ ও গণনার সম্যক উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহার কারণ বেবিলোনীয়গণ সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে এইসব গ্রহদেবতাগণ মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সুপ্রাচীন কাল হইতেই তাঁহারা গ্রহাদির গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। প্রায় খৃঃ পূঃ ২০০০ শতাব্দীতেও যে বেবিলনে গ্রহনক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণ হইত তাহার লিখিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে (e. g. Venus Tables of King Amiza Dugga nearly 1900 B. C.)। ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে বেবিলনের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। কিন্তু তখন হইতে জ্যোতিষিক জ্ঞানের আরও উৎকর্ষ হয়। পরবর্ত্তী পারশীক (Achemenids) মেসিডোনীয় গ্রীক (Alexander and Selucids) এবং পার্থিয়ানবংশীয় রাজাদের অধীনে বেবিলোনীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ বহু নূতন আবিষ্কার করেন। তাঁহারাই প্রথমে সৌর ও চন্দ্রমাসের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ৩৮৩ পূঃ খৃঃ অব্দে প্রথম ১৯ বৎসরে ৭টী অধিমাস গণনার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন (Metonic cycle)। বেবিলোনবাসী Kidinnu প্রায় ৪০০ পূঃ খৃঃ প্রথম অয়নচলন (Procession of Equinoxes) আবিষ্কার করেন। Babylon এ আবিষ্কৃত জ্ঞান ক্রমে পশ্চিমে গ্রীসদেশে, পূর্ব্বে পারস্যের ভিতর দিয়া ভারতে ও চীন পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অনেক জ্যোতিষিক আবিষ্কার যাহাকে পূর্ব্বে গ্রীসদেশ হইতে লব্ধ মনে করা হইত, বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে তাহার উৎপত্তি বাস্তবিকই Babylonএ। এই জ্যোতিষীরা সাধারণতঃ Chaldean নামে পরিচিত। এ দেশেও জ্যোতিষশাস্ত্র মুখ্যতঃ "শাকদ্বীপী" বা মগ (Magi) ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হয় এবং নামদৃষ্টেই প্রমাণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া হইতে সমাগত। ইহাদের ভারতাগমন সম্বন্ধে কৌতূহলকর কাহিনী প্রচলিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ হইল না।

সুতরাং দেখা যায় যে ৫৫০ খৃঃ অব্দে যে পাঁচখানি সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য-ঋষিদিগের নিজস্ব ছিল মাত্র পৈতামহ, পিতামহ ব্রহ্মা প্রণীত বলিয়া খ্যাত। কিন্তু বরাহমিহির "পিতামহ ব্রহ্মাকে" ভাল কালজ্ঞানজ্ঞ বলিয়া Certificate দেন নাই, বরঞ্চ ৮০ খৃঃঅব্দে পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষের জ্ঞান সমসাময়িক ইংরাজি কৃষকদের জ্যোতিষজ্ঞান হইতে বিশেষ উন্নতস্তরের ছিল না ইহা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

এই ভারতীয় নিজস্ব জ্যোতিষ যাহা ১৪০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে শককাল (৮০ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহা কত অশুদ্ধ যে একটী সামান্য দৃষ্টান্তেই বোঝা যাইবে। এই সিদ্ধান্তমতে ৩৬৬ দিনে বৎসর হয় অর্থাৎ বৎসর গণনায় পিতামহ ব্রহ্মা প্রায় ১৮ ঘণ্টা ভুল করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই অর্থাৎ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতেই Egyptian, Babylonian, এবং কিছু পরে Greek ও Romanগণ প্রায় ৩৬৫¼ দিনে যে বৎসর হয় তাহা জানিতেন। প্রথম খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চবৎসরাত্মক যুগগণনাপ্রথা এবং পাঁচ বৎসরে দুই অধিমাস গণনার প্রথা চলিত ছিল—তাহাতে পাঁচ বৎসরে প্রায় ৩¾ দিনের ভুল হইত। অথচ খৃঃ পূর্ব ৪০০ অব্দে বেবিলোনে যে অধিমাস গণনাপ্রণালী প্রচলিত ছিল তাহাতে ১৯ বৎসরে

মাত্র ২১/৪ ঘণ্টার ভুল হইত। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে ৮০ খৃঃ অব্দ ও ৪০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে হিন্দু পণ্ডিতেরা পিতামহ ব্রহ্মার Authority সত্ত্বেও প্রাচীন গণনাক্রম পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক্, রোমান্ ও Chaldean Astronomy অনুসারে গণনা আরম্ভ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই সময়ের পরে ভারতীয় জ্যোতিষের সম্যক্ উন্নতি হয় এবং ইহাই দীক্ষিতের "সিদ্ধান্তযুগ"। কিন্তু যদিও সিদ্ধান্তজ্যোতিষ পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষ হইতে অনেক উন্নতস্তরের, উহাকে Galileoর সমসাময়িক European জ্যোতিষের সমতুল্য মনে করা প্রলাপ বই কিছুই নয়। কারণ বলিতেছি—

এখন সমালোচক কর্তৃক উদ্ধৃত পুরাণবচনের আলোচনা করা যাউক। প্রথমে দেখিতে হইবে যে পুরাণগুলি কোন সময়ের রচনা। পুরাণগুলি মহাভারতের পরবর্ত্তীকালে লিখিত একথা সম্ভবতঃ সমালোচক স্বীকার করিবেন। না করিলেও প্রমাণ দেওয়া কষ্টকর হইবে না। আমি ধরিয়া নিতেছি যে তিনি উহা স্বীকার করেন।

প্রায় সমস্ত পুরাণেই ভবিষ্যরাজবংশের বর্ণনাকালে অন্ধ্রদের বা আন্ধ্র ভৃত্য রাজাদের কথা আছে। অন্ধ্রদের পতন হয় প্রায় ২২০ খৃঃ অব্দে। অনেক পুরাণে গুপ্তরাজাদেরও কথা আছে। তাঁহাদের প্রাদুর্ভাবকাল ৩১৯ খৃঃ অব্দ। সুতরাং বলিলে ভুল হইবে না যে প্রাচীন পুরাণগুলি ১০০ খৃঃ অব্দ হইতে ৪০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে বা পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত পুরাণে যে সমস্ত জ্যোতিষিক বর্ণনা আছে, তাহাতেও দেখা যায় যে তাহারা সিদ্ধান্ত যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক এবং বেদাঙ্গজ্যোতিষের পরবর্ত্তী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বেদাঙ্গজ্যোতিষ ৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এখন হিন্দু জ্যোতিষের তথাকথিত উৎকর্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। (১)

পুরাণকার বলিয়াছেন যে—

সর্ব্বগ্রহাণামামেতেষামাদিরাদিত্যরুচ্যতে

(১) cf. Surya Siddhanta আদিত্যো হ্যাদিভূতত্বাৎ প্রসূত্যা সূর্য্য উচ্যতে॥ XII 15, পুরাণ বাক্য সূর্য্য সিদ্ধান্ত হইতে গৃহীত নয় তো?

এর অর্থ যে এই সমস্ত গ্রহের আদি আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য। কিন্তু 'পৃথিবী' যে গ্রহ তাহা পুরাণকার কোথায় বলিয়াছেন? হয়ত এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে সূর্য্য অপর পাঁচটি গ্রহের (মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির) কেন্দ্রস্থানীয়। কিন্তু তাহাই বা কোথায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে?

ইউরোপে 'গ্যালিলিও' (১৫৬৪-১৬৪২ খৃঃ অব্দ) যে সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবী 'চলমান' বলিয়াছেন, সমালোচক এই তথ্য কোথায় পাইলেন? তিনি বোধ হয় অবগত নহেন যে প্রথম Anaximander of Sparta প্রায় ৫৬০ পূঃ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদ গ্রীসদেশে প্রচার করেন। হয়ত এই বাদ তাহার বহুপূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল কিন্তু সেরূপ কল্পনারও কিছু দরকার নাই। মোটের উপর পুরাণকার যদি উক্ত উদ্ধৃত বাক্যে পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহার প্রায় ৮০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক পণ্ডিতদের মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। লেখকের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য এই বিষয়ের আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের পর পর ধারণা করিতে হইবে—প্রথমে পৃথিবীর গোলত্ব ও নিরাধারত্ব; দ্বিতীয়তঃ নিজের মেরুরেখার চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর আবর্ত্তন—যাহাতে দিনরাত্রি হয়। তৃতীয়তঃ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বার্ষিক প্রদক্ষিণ। প্রাচীন গ্রীসদেশে এই তিনটি বাদের কি রকম ভাবে পর পর উৎপত্তি হয়, তাহার সময়ানুযায়ী বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

Anaximander of Sparta	560 B.C.	ইনি গ্রীসদেশে প্রথমে, পৃথিবী যে নিজের মেরু-রেখার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে এবং তজ্জন্য দিবারাত্র হয় এই মত প্রচার করেন। ইনি প্রথমে পৃথিবীর ব্যাস মাপেন। তাঁহার দেওয়া পরিমাণ বর্ত্তমানে জানা পরিমাণ

Eratosthenes of Alexandria } 276-196 B.C. অপেক্ষা বিশেষ তফাৎ নয়। পৃথিবী যে গোল এই মত বোধ হয়, আরও ঢের প্রাচীনকালেও পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

Aristarchus of Samos } 275 B.C. ইনি প্রথম প্রচার করেন যে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করে। (২)

কিন্তু এই সমস্ত মত পাশ্চাত্যে গৃহীত হয় নাই। প্রায় ১৬০ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত Klaudius Ptolemy আলেকজান্দ্রিয়া নগরে প্রসিদ্ধ 'Syntaxis' গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি পৃথিবীর গোলত্ব অস্বীকার করেন নাই, পরন্তু বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ যেরূপ অক্ষরেক্ষা ও দ্রাঘিমা দ্বারা পৃথিবীর উপর কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করেন তিনিও সেইরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু Ptolemy পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদ ও Aristarchus of Samos কর্ত্তৃক পরিকল্পিত সৌরজগতের সৌর কৈন্দ্রিকতা অথবা Heliocentric Theory of the Solar system মানেন নাই। প্রধানতঃ Ptolemyর বিরুদ্ধতায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপে Aristarchusএর মত ত্যক্ত হয়। প্রায় তেরশত বৎসর পরে ১৪৪৪ খৃঃ অব্দে Poland দেশীয় সন্ন্যাসী Copernicus পুনরায় এই মতবাদ প্রচার করেন যে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে এবং সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্রে নিশ্চল হইয়া বর্ত্তমান থাকে। (৩)

কিন্তু Copernicus প্রবর্ত্তিত মতও তৎকালীন ইউরোপে গৃহীত হয় নাই। শুধু যে 'পাদ্রীরা' এই মতের পরিপন্থী হন তাহা নয়, Tycho Braheর মত প্রসিদ্ধ জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত এই মত মানিতেন না। Tycho বলিতেন পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্রে স্থির আছে এবং সূর্য্য ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে এবং অপরাপর গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। Tycho Braheর মত সুবিখ্যাত জ্যোতিষী বৈজ্ঞানিক কারণেই Copernicusএর মতবাদ অস্বীকার করেন এবং এই মতবাদ ইউরোপেও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইত, যদি Kepler না জন্মিতেন।

Kepler গ্রহগতি সম্বন্ধে তাঁহার সুপরিচিত তিনটী নিয়ম আবিষ্কার করিয়া সৌরজগতের 'পৃথিবী কেন্দ্রিকতা' বাদকে চিরকালের জন্য সমাধিস্থ করেন। তৎপর Galileo গতিতত্ত্ব ও Newton (1742-1727) মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করেন এবং Newton উভয়তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া গ্রহগণের গতির সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এখন সমালোচকের হিন্দু জ্যোতিষের উৎকর্ষের দাবী কতটা বিচারসহ তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি। প্রথমেই দেখিয়াছি যে 'পৈতামহ সিদ্ধান্তের' কাল অর্থাৎ খৃঃ অব্দের ৮০ সন পর্য্যন্ত ভারতীয় নিজস্ব জ্যোতিষ বা কালগণনা প্রণালী অতিশয় অশুদ্ধ ছিল এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে কুত্রাপি পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্ত্তনবাদ ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণবাদ স্বীকৃত হয় নাই। আনুমানিক ১০০ খৃঃ অব্দের পরে বোধহয় উজ্জয়িনীর শক রাজাদের সময় হইতে (যাহারা পারশিক প্রভাবান্বিত ছিলেন) পাশ্চাত্য Chaldean ও Greek জ্যোতিষ ভারতে আসিতে আরম্ভ করে। তখন ভারতীয় জ্যোতিষিকগণ পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্ত্তনবাদ ইত্যাদি স্থূলভাবে স্বীকার করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু এই মতবাদ যখন বেবিলোনে ও গ্রীসদেশে প্রায় ভারতের প্রথম প্রচলিত মতের অন্যূন তিনশত বর্ষ পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল এবং যখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে গ্রীক জ্যোতিষ সেই সময় ভারতে সম্যক্ প্রচারিত হইয়াছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবীর গোলত্ব, নিরাধারত্ব, আবর্ত্তন ও প্রদক্ষিণ-বাদ সম্বন্ধে যদি কিছু পরবর্ত্তীকালের হিন্দুপুরাণে বা জ্যোতিষে থাকে, তাহা বিদেশ হইতে ধার করা। পৃথিবীর গোলত্ব হিন্দু পণ্ডিতগণ চিরকালই স্বীকার করিয়াছেন, যদিও তাহাদের দেওয়া পৃথিবীর ব্যাস গ্রীকদের দেওয়া পরিমাণ হইতে বিশুদ্ধতর নয়। ভূভ্রমণবাদ সম্বন্ধে

(২) এই সমস্ত বিবরণ ও তারিখ Zinner কৃত Sternkunde নামক জার্ম্মান্ ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে নেওয়া হইয়াছে।

(৩) সমালোচক অনিলবরণ অজ্ঞতাবশতঃ Copernicusএর প্রাপ্য কৃতিত্ব Galileoকে দিয়াছেন।

প্রথম প্রামাণ্য উক্তি পাওয়া যায় কুসুমপুর অর্থাৎ পাটলীপুত্র নিবাসী আর্য্যভটের (জন্ম ৪৭৬ খৃঃ অব্দ) রচিত গীতিকাপাদে।

"অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্চাত্যচলং বিলোমগং যদবত্
অচলানি ভানি তদবৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্—"

ইহা পৃথিবীর আবর্ত্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ, কোন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষী সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে কোনওরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। আর্য্যভট্ট নিজে Epicyclic Theory দিয়া গ্রহগণের গতি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া ধরা হইয়াছে।

কিন্তু আর্য্যভটের ভূভ্রমণবাদ পরবর্ত্তী কোন হিন্দু জ্যোতিষী গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল, মুঞ্জাল, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালের সমস্ত খ্যাতনামা জ্যোতিষীই ভূভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। (বিশদভাবে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়কৃত আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষীগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক্‌দের ভূভ্রমণবাদের যে দশা হইয়াছিল, ভারতেও আর্য্যভটের ভূভ্রমণবাদেরও (যাহা সম্ভবতঃ গ্রীকদের নিকট হইতে ধার করা) সেই অবস্থা হয়। ভূভ্রমণবাদে আর্য্যভট পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন মাত্র বুঝিয়াছেন, তিনি অথবা কোন ভারতীয় পণ্ডিত যে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর্য্যভটকে তর্কের খাতিরে Copernicusর সমতুল্য ধরিলেও এদেশে পরবর্ত্তীকালে Kepler, Galileo, Newtonএর জন্ম হয় নাই, একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষকালে (৪০০-১১০০ খৃঃ অব্দ) ভারতে কালগণনার অনেক উন্নতি সাধন হয়। বৎসর ও মাসের পরিমাণ, গ্রহদিগের ভগণকাল হিন্দুপণ্ডিতেরা অধিকতর শুদ্ধভাবে নিরুপণ করেন। জ্যোতিষিক গবেষণা করিতে যাইয়া, তাঁহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণ মিতি, বীজগণিতে অনেক মৌলিক আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ সমস্ত আবিষ্কার Pre-renaissance যুগের ইউরোপীয় জ্যোতিষের সমতুল্য—এমন কি কোন কোন অংশে মধ্যযুগের আরব জ্যোতিষেরও সমতুল্য নয়। হিন্দু ও গ্রীকদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিখিয়া মধ্যযুগের আরবগণ (৭০০-১৫০০ খৃঃ অব্দ) জ্যোতিষে বহু উন্নতি সাধন করেন। প্রায় ১৭৩০ খৃঃ অব্দে সম্রাট মহম্মদ সাহের আদেশে জয়পুররাজ সবাই জয়সিংহ ভারতে উন্নততর আরব জ্যোতিষের প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার আদেশে তৈলঙ্গ পণ্ডিত জগন্নাথ সংস্কৃত ভাষায় 'সিদ্ধান্তসম্রাট' নামক গ্রন্থ রচনা করেন, উহা Ptolemy's Syntaxisএর আরব্য সংস্করণের (যাহা Almagest নামে বিখ্যাত) অনুবাদ মাত্র। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরসমূহ মধ্য এশিয়া উলুখবেগের মানমন্দিরের আদর্শে গঠিত।

জয়পুররাজ প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ পরিত্যাগ করিয়া আরব্য জ্যোতিষের প্রবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হন কেন? কারণ, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের গণনা প্রণালী ৪০০ খৃঃ অব্দের পক্ষে প্রশংসনীয় হইলেও সম্পূর্ণ শুদ্ধ ছিল না এবং প্রায় ১৩০০ বৎসরের গতানুগতিকতার ফলে, উহা সম্পূর্ণ "দৃববিভ্রষ্ট" হইয়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষকালের হিন্দু পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে অয়নচলন ক্রমান্বয়ে একদিকে নয়, খানিকদূর যাইয়া পেণ্ডুলামের গতির মত প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সেইজন্য তাহারা সায়ন বৎসর (Tropical) গণনা না করিয়া নিরয়ন বর্ষ (Sidereal) গণনা করিতেন এবং এখনও করেন। এইজন্য এবং নিরয়ন বৎসরের পরিমাণে যে ভুল ছিল দুইএ মিলিয়া তাহাদের বৎসরমান প্রকৃত সায়নবর্ষ মান অপেক্ষা প্রায় ·০১৬ দিন বেশী হয় এবং প্রায় ১৪০০ বৎসরে হিন্দু বর্ষ মানে ভুল প্রায় ২৩ দিনে পৌঁছিয়াছি। হিন্দু পঞ্জিকায় ৩১শে চৈত্রকে মহাবিষুব সংক্রান্তি বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিক মহাবিষুব সংক্রান্তি হয় ৭ই কি ৮ই চৈত্র। যদিও পৃথূদক স্বামী প্রায় ৮৫০ খৃঃ অব্দে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে অয়নচলন একদিকেই হয়, তথাপি একাল পর্য্যন্ত দুই একজন ব্যতীত কোন হিন্দু জ্যোতিষীই বর্ষমানের সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে ১২০০ খৃঃ অব্দের পর হইতে হিন্দু জ্যোতিষিক পণ্ডিতগণ বেহুলার মত মৃত সভ্যতার শব আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অতি ভুল পদ্ধতিতে বর্ষ গণনা করিতেছেন। মৎ-সম্পাদিত

'Science and Culture' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটী প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে হিন্দুর তিথি ইত্যাদি গণনা, শুভ অশুভ দিনের মতবাদ, কতকগুলি মধ্যযুগীয় ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত হিন্দুপঞ্জিকা একটা কুসংস্কারের বিশ্বকোষ মাত্র।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় জ্ঞানের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। আশা করি সমালোচক আমার বিবরণে ভুল বাহির করিবেন, না হয় তাঁহার হিন্দুজ্যোতিষের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি প্রত্যাহার করিবেন। সম্যক অধ্যয়ন ও বিচার না করিয়া অতীতের উপর একটা কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র এবং এরূপ 'আত্মপ্রবঞ্চকের' পক্ষে পরকে উপদেশ দিতে যাওয়া অমার্জনীয় ধৃষ্টতা।

সমালোচক পুনরায় বলিয়াছেন "এই বিশ্বজগতের পশ্চাতে এক বিরাট চৈতন্যশক্তি আছে, তাহা হইলে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদির পশ্চাতেও সে শক্তি রহিয়াছে, অতএব এই সকলকে দেবতা বলিলে ভুল হয় না।"

এই মন্তব্য বিশ্বাসের কথা, যুক্তির কথা নয়। যাঁহারা Shamanismএ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সমালোচকের মত মানিয়া লইতে পারেন। আমি যুক্তিবাদী, যুক্তি মানিতে রাজী আছি, Shamanism মানিতে আমার কোনও আগ্রহ নাই। এইরূপ বিশ্বাস যদি সভ্যতার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলে Mexico নিবাসী Aztecগণের মত সভ্যজাতি পৃথিবীতে জন্মে নাই, কারণ তাহারা সূর্য্যকে দেবতা বলিয়া মানিত এবং মনে করিত, যে পর্বে পর্বে নরবলি না দিলে সূর্য্যের ক্ষুধা মিটিবে না, সূর্য্যের শক্তি হ্রাস হইবে এবং তাপ বিকীরণের ক্ষমতা লোপ পাইবে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আরম্ভ হইবে। সুতরাং পর্বে পর্বে তাহারা সূর্য্যের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য সহস্র সহস্র নরবলি দিত।

সূর্য্যকে দেবতা মনে করা একটী প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারণা মাত্র, এই যুগে সেই ধারণার কোন সার্থকতা নাই। এখন অতি সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকে ও জানে যে সূর্য্য পূজা করিলে গ্রীষ্মের আধিক্য বা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দূরীভূত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসাদে সূর্য্যের উত্তাপকে যন্ত্রযোগে সর্ববিধ কাজে লাগান সম্ভবপর এবং উহাতে মানুষের সর্ববিধ সুবিধা, যেমন শক্তি উৎপাদন refriegeration (শৈত্যোৎপাদন) air-conditioning, cooking, (রন্ধন), water-raising (জলোত্তোলন) ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়। সুতরাং যাঁহারা সমালোচকের মত গ্রহাদিকে দেবতাজ্ঞান করেন, তাঁহারা শুধু একটী মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের মোহে নিমজ্জিত আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা যন্ত্রযোগে সূর্য্যের উত্তাপকে সর্ববিধ কাজে লাগাইতে সচেষ্ট আছেন, তাঁহারা অনেক উন্নতস্তরের জীব। বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্যই থাকুন বা অচৈতন্যই থাকুন, তাহাতে মানবসমাজের কি আসে যায়, যদি সে "চৈতন্য" কোনও ঘটনা নিয়ন্ত্রণ না করেন অথবা কোনও প্রকারে সেই 'চৈতন্যকে' আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে চালিত না করিতে পারি? প্রাচীন Chaldean জ্যোতিষীরা মনে করিতেন যে গ্রহগুলি দেবতার প্রতীক এবং সেই দেবতারা মানবের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করে; এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষ বা হোরাশাস্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং কোষ্ঠী, গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানজনিত ফলাফল গণনা করিতেন। ভারতে বৌদ্ধদের বাধা সত্ত্বেও তাহার উপর গ্রহপূজা আরম্ভ হয়। কিন্তু Chaldean সভ্যতার ধ্বংস ও ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতন হইতে মনে হয় যে ফলিতজ্যোতিষ সম্পূর্ণ নিরর্থক। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে ফলিত জ্যোতিষের কোন সার্থকতা উপলব্ধি হয় না। (ক্রমশঃ)

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুদিন পূর্ব্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন : "বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি ও ব্যাপ্তি সহকারে কেবল যে সমস্ত বাঙালীর হৃদয় অন্তরতম যোগে বদ্ধ হইবে, তাহা নহে—এক সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকেও বঙ্গ-সাহিত্য আপন জ্ঞানান্ন বিতরণের অতিথিশালায়, আপন ভাবামৃতের সদাব্রতে আকর্ষণ করিয়া আনিবে।" কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী সফলতা লাভ করিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্য ভারতবর্ষের মধ্যে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে দাঁড়াইবার উপযুক্ত হইয়াছে। যাঁহাদের ঐকান্তিক সাধনার ফলে বাংলা সাহিত্যের এই সম্মান, তাঁহাদের মধ্যে ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান নদীয়া জেলায়। তাঁহার পিতামহ ব্যবসার্থ বহরমপুর খাগড়ায় বসবাস করিতেন। পিতামহ ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় রেশমের কুঠি ছিল। তৎকালে মুর্শিদাবাদী রেশমের ব্যবসা বর্ত্তমান কালের ন্যায় মৃত হইয়া উঠে নাই। চন্দ্রশেখরের পিতা ৺বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় পিতৃ-ব্যবসায়ের দেখাশুনা করিতেন। সন ১২৫৬ সালের ১২ই কার্ত্তিক তারিখে মাতুলালয়ে চন্দ্রশেখর জন্মলাভ করেন। পিতার ইচ্ছা ছিল, পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষা দেন; কিন্তু পিতামহ ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি পৌত্রকে খাগড়া-নিবাসী পণ্ডিত ঠাকুরদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা লাভার্থে প্রেরণ করেন। তখন চন্দ্রশেখরের বয়স অনধিক আট বৎসর মাত্র। কিছুদিন পরে পিতা বিশ্বেশ্বর পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়া বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে তাঁহাকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। কলিকাতাপ্রবাসী পিতামহ এই সংবাদ পাইয়া সাতিশয় অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন এবং পুত্রের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেন। তিনি চন্দ্রশেখরের পিতাকে বলিয়াছিলেন: "আমার কথা না শোনার ফল ভাল হইবে না।" বাস্তবিক ভবিষ্যতে পিতৃ-আজ্ঞা-লঙ্ঘনের ফল ভালও হয় নাই। চন্দ্রশেখর পঠদ্দশাতেই মদ্যপানে আসক্ত হন এবং আজীবন এই পানাসক্তির বশীভূত ছিলেন। মদ্যপানের বিষময় পরিণতি—বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সারাজীবন তাঁহাকে শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষার সম্বন্ধে সেকালে অনেকেই বিরুদ্ধমত পোষণ করিতেন। কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে মানুষের নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। তবে ইংরেজী শিক্ষা না পাইলে চন্দ্রশেখর তাহার অমূল্য গদ্য-কাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' রচনা করিতে পারিতেন কি-না তাহা বলা যায় না। তাঁহার লিখিত বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান-সমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলী বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে পারিত কি-না তাহাও বলা সম্ভব নয়। ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই চন্দ্রশেখর বঙ্গবাসীকে বৈদেশিক বিভিন্ন বিষয়ের ভাব-ধারার সঙ্গে পরিচিত করাইতে পারিয়াছিলেন।

যথাকালে চন্দ্রশেখর কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় প্রেরিত হন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে যথাকালে যোগ্যতার সহিত এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁহাদের ব্যবসায়ে বহু ক্ষতি হওয়ায় অবস্থা খারাপ হইয়া যায় এবং চন্দ্রশেখরকে জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। প্রথমে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে এবং পরে রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি আইনের পরীক্ষা দেন এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর জজ আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু কার্য্য-শৈথিল্য ও অন্যমনস্কতার জন্য ওকালতীতে পসার করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতে যান। সেখানেও তিনি একই কারণে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই।

পাঠ্যাবস্থায় চন্দ্রশেখরের প্রথম বিবাহ হয়, মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের সন্নিকটস্থ দেবীপুর গ্রামে। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটি মাত্র পুত্র সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু

মাত্র দুই বৎসর বয়সেই পুত্রটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার অল্পকাল পরে তাঁহার প্রথমা পত্নীও নরধাম পরিত্যাগ করেন। প্রথমা পত্নীর বিয়োগের পর চন্দ্রশেখর তাঁহার অমর গদ্যকাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' রচনা করেন। লালবাগ-মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে বসিয়া তিনি তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তি রচনা করিতেন। লালবাগের ৺গঙ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কন্যার সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের ছয় মাস পরে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীও লোকান্তরিতা হন। তাঁহার তৃতীয় এবং শেষ বিবাহ হয়, যখন তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর। নদীয়া জেলার দেবগ্রাম নিবাসী ৺চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার শেষ বিবাহ। এই স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা জন্মলাভ করে। সেই কন্যাটিও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চন্দ্রশেখরের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার শেষ জীবন-সঙ্গিনীও পরলোকগমন করেন। 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' রচয়িতার স্ত্রী-ভাগ্য আদৌ সুখপ্রদ হয় নাই।

কলিকাতায় অবস্থানকালে চন্দ্রশেখরের সাংসারিক অনটন বর্দ্ধিত হয়। আইন-ব্যবসায় তাঁহার পক্ষে অর্থকরী হয় নাই, সাহিত্য-সেবা সেকালে অবৈতনিক ছিল। সাহিত্যিক সম্মান পাইলেও অর্থ পাইতেন না। কাজেই সংসার চালাইবার জন্য তিনি চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার তৃতীয় পত্নীর এক পিতৃব্যের চেষ্টায় চন্দ্রশেখর মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এষ্টেটে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পুণ্যশ্লোক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী চন্দ্রশেখরের আর্থিক দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন এবং এই দুঃস্থ সাহিত্যিকের সমস্ত ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বহরমপুরে ফিরাইয়া আনেন।

চন্দ্রশেখর তখন ওকালতী ছাড়িয়া সম্পূর্ণভাবে মহারাজের আশ্রিত। তাঁহাকে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সম্পাদকতায় 'উপাসনা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। চন্দ্রশেখর বঙ্কিম-মণ্ডলের একজন জ্যোতিষ্ক, বঙ্গদর্শনের লেখক ও সমালোচক, বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমের তিনি শিষ্য, কাজেই উপাসনা বঙ্গদর্শনের আদর্শে সম্পাদিত হইতে লাগিল। তৎকালীন সাহিত্য-পত্রিকার প্রবন্ধ-গৌরব অভূতপূর্ব্ব, বর্ত্তমানকালে কোনও পত্রিকাই প্রবন্ধ-গৌরবে এত বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু চন্দ্রশেখরের সাহিত্য-প্রতিভার কাছে রসিক সমাজ যতখানি আশা করিয়াছিল তেমন কিছু পায় নাই। তাঁহার রচনা কদাচিৎ প্রকাশিত হইত, কারণ সম্পাদনার কার্য্যে তিনি প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচন ছাড়া বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তবে সমালোচনার অংশটি তিনি নিজে লিখিতেন। মহারাজা চন্দ্রশেখরের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিতেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও চন্দ্রশেখর মহারাজের এই সাহায্য পাইয়া আসিয়াছেন। কয়েক বৎসর পরে 'উপাসনা'র সম্পাদন-ভার পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া চন্দ্রশেখর মুক্ত হন।

পঠদ্দশায় চন্দ্রশেখর 'মসলা-বাঁধা কাগজ' নামে যে পুস্তক রচনা করেন—তাহা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক—'কুঞ্জলতার মনের কথা', এই পুস্তকখানিও বর্ত্তমানকালে আর সহজপ্রাপ্য নয়। 'কুঞ্জলতার মনের কথা'য় চন্দ্রশেখর নর-নারীর প্রকৃতি, অধিকারভেদ ও স্বাতন্ত্র্য-বাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। কথোপকথন ছলে নর-নারীর মনস্তত্ত্ব লইয়া এই পুস্তকখানি লিখিত।

তাহার পর অমর গদ্যকাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' রচিত হয়। বঙ্গ-সাহিত্যে মাত্র এইখানিই তাঁর সুপ্রচারিত রচনা এবং এই পুস্তকখানিই তাঁহার নাম সাহিত্য-সমাজে অক্ষয় করিয়া রাখিবে। কাব্যে ৺অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' এবং গদ্য-সাহিত্যে 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' সমপর্য্যায়ভুক্ত। প্রথমা পত্নী বিয়োগের পর শোকসন্তপ্ত লেখক তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। সাতটি প্রস্তাবে বিরচিত গ্রন্থখানির প্রত্যেক প্রস্তাবই এক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। বিশেষ করিয়া 'শ্মশানে' শীর্ষক উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের পঞ্চম প্রবন্ধটির ন্যায় সুন্দর প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে আর আছে কি-না সন্দেহ।

বঙ্গদর্শনে তাঁহার 'সতীদাহ' নামীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "লেখকের লিপি-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি।" বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর সমালোচক ছিলেন, অযাচিত প্রশংসা তিনি করিতেন না। পরে যখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে রাজকার্য্য ব্যপদেশে বাস করিতেন তখন

চন্দ্রশেখরের সহিত বঙ্কিম-মণ্ডলের প্রত্যেক সাহিত্য-রথীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে এবং উত্তরকালে চন্দ্রশেখর নিজেও সাহিত্য-সম্রাটের নবরত্নের একটি রত্নরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় বঙ্কিম-মণ্ডলের সাহিত্যিকগণও নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে কালিদাস ইত্যাদি নামে পরিচিত হইতেন।

সমালোচনা করিতে চন্দ্রশেখরের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। 'যথার্থবাদং চরিতং হিতৈষীণাং'—সমালোচক হিসাবে তিনি এই বাণী মানিতেন। সেই সময়ে তাঁহার সম্পাদনায় 'মাসিক সমালোচক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদন কৌশলে পত্রিকাখানি সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎকালীন অনেক খ্যাতনামা লেখকের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এই সময়ে তাহার 'স্ত্রী-চরিত্র' এবং 'সারস্বত কুঞ্জ' নামক প্রবন্ধসঙ্কলন প্রকাশিত হয়। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত 'রস-গ্রন্থাবলী' চন্দ্রশেখরের রচনা।

বাংলা সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের সামান্য পরিচয়ও আছে, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের কাছে অপরিচিত নহেন্। তাঁহার সাহিত্য-সেবার বিষয় তাঁহারা ভালরূপই জানেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কাশীমবাজার রাজবাটীতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এবং সম্পাদক—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন যে প্রধানত তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে সম্ভব হইয়াছিল তাহা সাহিত্যসেবী মাত্রেই অবগত আছেন। সাহিত্য-সাধনা সৌখীন বৃত্তি নহে, সাহিত্য-সাধনা সুকঠিন ব্রত, চন্দ্রশেখর বিশেষভাবে তাহাই বলিতেন।

চন্দ্রশেখর সাহিত্যসেবীই ছিলেন। কখনও তিনি রাজনীতি বা সমাজনীতি লইয়া প্রকাশ্যে আত্মনিয়োগ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার রচিত সাহিত্যে, রাজনীতি ও সমাজ-তত্ত্বজ্ঞানের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। ওয়ালেসের বিশ্বসৃষ্টিবাদ, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, স্পেন্সারের অজ্ঞেয়-বাদ, কোমতের প্রত্যক্ষবাদ, জন স্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তদীয় প্রবন্ধাবলী তাঁহার সাক্ষ্য। সংস্কৃত শাস্ত্রে এবং ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রেও তাঁহার অধিকার ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ইংরেজী সাহিত্যের মত ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল। ফরাসী ভাষাও তিনি জানিতেন এবং ফরাসী বিদ্রোহ ও নেপোলিয়নের ইতিহাস তিনি ভালরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন।

আজীবন তিনি সাহিত্য-সেবায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার বাসগৃহে বহু পুস্তক ছিল এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি লিখন পঠনে কাটাইতেন। নিজেও তিনি যেমন সংযম সহকারে সাহিত্য-সেবা করিয়া গিয়াছেন, তেমনি তিনি সাহিত্যেও সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ জীবনে 'বিবাহের উৎপত্তি ও ইতিহাস' শীর্ষক সুচিন্তিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় তিনি রত ছিলেন। এই প্রবন্ধের অধিকাংশ 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রবন্ধটি তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইলে প্রবন্ধটি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য রত্নরূপে পরিগণিত হইত।

সন ১৩২৯ সালের ২রা কার্ত্তিক রাত্রি প্রায় এগারটার সময় মাত্র তিন দিন জ্বরে শয্যাগত থাকার পর চন্দ্রশেখর ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করেন (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ)। জাহ্নবীতীরে যে শ্মশানে তাঁহার প্রথমা পত্নীর চিতাশয্যা রচিত হইয়াছিল, সেই শ্মশানেই চন্দ্রশেখরও তাঁহার শেষ শয্যা পাতিয়াছিলেন।

'উদভ্রান্ত-প্রেম' গদ্যকাব্যের 'শ্মশানে' প্রবন্ধে চন্দ্রশেখর যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। মানুষ চলিয়া যায়, তাহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকে। চন্দ্রশেখর চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অমর কাব্য 'উদভ্রান্ত-প্রেম' তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ভাঙ্গাবাড়ীর ইতিহাস

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ইহাই নিয়ম। সৃষ্টির পরবর্ত্তী পর্য্যায় ধ্বংস। দু দিন আগে কিংবা দু দিন পশ্চাতে। কিন্তু এইখানেই সব শেষ হইয়া যায় না—পূর্ব্ব ইতিহাস থাকিয়া যায়। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য দুই-ই। বর্ত্তমানে যাহা শুধু বিবর্ণ বিধ্বস্ত ইটের স্তূপ, তারও একসময় অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল। পথ চলিতে চলিতে পথিক থমকিয়া দাঁড়াইত মুগ্ধ ঈর্ষান্বিত চোখে চাহিয়া দেখিত—গৃহস্বামীর রুচির তারিফ করিত, অর্থের হিসাব করিতে গিয়া অনর্থক সময়ের অপব্যবহার করিত। দেউড়ী, বাগান, দেশী-বিদেশী—ফুলের প্রাচুর্য্য, গ্রিক ভাস্কর-মূর্ত্তির ইতস্তত সন্নিবেশ, মহলের পর মহল, ঐশ্বর্য্যের উগ্র প্রকাশ। পুরুষানুক্রমে জমিদার। হিসাবে ভুল নাই—পরিবর্ত্তন তাই শ্রীবৃদ্ধির পথ ধরিয়াই অগ্রসর হয়; কিন্তু তারও একটা শেষ আছে। জমিদারীতে ঘুন ধরিল। যোগ করিতে বসিয়া দিনের পর দিন শুধু বিয়োগ করিয়াই চলে। সুযোগ এবং সুবিধাবাদীর দল এই সুযোগে তাহাদের অদৃষ্ট পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। চৌধুরী বাড়ীর সাবেক দিনের কোলাহল হঠাৎ একদিন থামিয়া গেল। আজ তাহারা নিঃস্ব। ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অদৃষ্টলিপিও ঘুরিয়া চলিয়াছে। চলিবেও।

প্রবল প্রতাপান্বিত চৌধুরী বংশের শেষ অবশিষ্ট—বিমান। অন্নাভাব আর তীব্র আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান সে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে—তাহা তাহার জীবনযাত্রার মূলধন।

ভাঙ্গাবাড়ীর একপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত বাসোপযোগী অংশটিতে বিমানের সংসার। বাকী কতক অযত্নে অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, কতক বুনোপায়রা, কাঠবিড়ালি এবং সাপ-খোপের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে কিন্তু একেবারে হাতছাড়া করে নাই। নইলে বর্ত্তমানের অভাব তাহার থাকিতনা। এই ভাঙ্গাবাড়ীর অতীত গৌরব এখনও বহুসহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করিবার মহাজনের অভাব নাই, কিন্তু বিমান তাহা চায় না। গৌরব যাইবে—টাকার বিনিময়ে—সে এ কাজ করিতে পারিবে না। মর্য্যাদাবোধ উদ্ধতভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। ইহা লইয়াই বিজয়ার সহিত তাহার যত বিরোধ।

বিজয়া বলে, যদি কোন কিছুই করবে না, তবে সংসার চলবে কি ক'রে?

স্ত্রীর কথায় বিমানের ভ্রূক্ষেপ নাই। দিনের অধিকাংশ সময় সে তাহার পাঠাগারে বই লইয়া কাটাইয়া দেয়। আজও নিঃশব্দে বসিয়াছিল। সম্মুখে একখানি বই খোলা অবস্থায় থাকিলেও মন তার অতীত দিনের এক স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—কত লোক জন, নায়েব-গোমস্তা, আত্মীয়-পরিজনে বাড়ী মুখর, চতুর্দ্দিকে কর্ম্মব্যস্ততা...

বিজয়ার কণ্ঠস্বর আর এক পরদা উচ্চে খেলিয়া গেল, আশ্চর্য্য লোক! কোন কথাই যদি কানে ঢোকে! দিনরাত বই নিয়ে থাকলেই কি চলবে?

বিমানের স্বপ্ন টুটিয়া যায়, সম্মুখে বিজয়া—জীবন্ত বাস্তব। বিমান একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আমাকে কিছু বলছ নাকি বিজু?

বিজয়া ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিল, নইলে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ আছে নাকি? পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে কহিল, বলছিলাম কি, যদি সবটা না পার, কিছু ছেড়ে দিয়ে, চল এখান থেকে অন্য কোথাও চ'লে যাই। এখানে আমি আর টিঁকতে পারছি না।

বিমান অকস্মাৎ চমকিত হইল—মৃদু সংযত কণ্ঠে কহিল, তুমি কি ক্ষেপেছ বিজয়া। পিতৃপুরুষের ভিটা বিক্রি করব! অর্থের বিনিময়ে খোয়াব গৌরব—আর সম্মান? অত উতলা হ'চ্ছ কেন বিজু. চ'লে ত একরকম যাচ্ছেই।

বিজয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তুমি থাম! যখনকার যা, তখনকার তা। যখন ছিল তখন ছিল—এখন নেই, অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলো।

বিমান ম্লান হাসিয়া কহিল, মেয়েরা তা পারে। সকল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলা তাদের স্বভাব, কিন্তু আমি পুরুষ বিজয়া। বিমান একটু থামিয়া পুনরায় কহিল,

তোমার কথাগুলো শুনলেও আমি কত দুঃখিত হই, তা কি তুমি বোঝ না? আমার পৌরুষে আঘাত লাগে। কেন তুমি ব্যস্ত হ'চ্ছ বিজয়া? কেন তুমি ভাবতে পার না, আবার আমাদের পূর্ব্বগৌরব ফিরে পাব? আবার তেমনই ক'রে নহবৎ বেজে উঠবে! পুণ্যাহের সময় নজরাণা নিয়ে তোমার বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রজাদের ভীড় লেগে যাবে, পরিবর্ত্তে তুমি কল্যাণী মূর্ত্তিতে তাদের মধ্যে আবির্ভূত হবে। যে হাতে গ্রহণ ক'রবে, সেই হাতে করবে বিতরণ। কথাটা ভাবতেও কত আনন্দ বিজয়া—

বিজয়া পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল, ভাবতে অনেক কিছুই ভাল লাগে কিন্তু তাতে সংসার চলে না। চ'লে ত যাচ্ছে—এ কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমার করে। স্বামী হ'য়ে তুমি ব'সে ব'সে খাবে—আর স্ত্রী যেমন ক'রে হোক খাওয়াবে—এতে তোমার আত্মসম্মানে ঘা লাগে না, পৌরুষে আঘাত লাগে না?

বিমান সোজা হইয়া উঠিয়া বসে, সারা অন্তর তার তিক্ততায় ভরিয়া যায়। কতকটা রূঢ় কণ্ঠে সে বলে, তুমি খাওয়াচ্ছ? কিন্তু কি ক'রে শুনি? একটা তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করিয়া সে পুনরায় কহিল, তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি বিজয়া, চৌধুরী বাড়ীর মানসম্মানে এতটুকু আঘাত লাগে এমন কাজ করবার তোমার কোন অধিকার নেই।

বিজয়ার আর সহ্য হইতেছিল না, সে-ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি করিল, সে কথা আমি ভুলব না।

বিমান উত্তেজিতভাবে বলিয়া চলিল, হ্যাঁ, কোন দিন সে কথা ভুলো না। যদি অসুবিধে মনে করো, তুমি বাপের বাড়ী চ'লে যেও, আমি বাধা দেব না।

সে কথা আমি জানি, বিজয়া কহিল। তার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া কতকটা শান্ত কণ্ঠে কহিল, বাবা তাঁর মেয়েকে দুমুঠো খেতে দিতে পারবেন; কিন্তু তাতে তোমাকে সকলে বাহাদুরী দেবে না, তোমার বা আমার গৌরবও কিছু বাড়বে না।

বিমান কহিল, সেও বরং আমার সহ্য হবে কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে দিনরাত উত্যক্ত ক'রো না।

বিজয়া আর একদফা কঠিন হইয়া উঠিল, কহিল, এ কথাটা সবিস্তার ক'রে ব'লে দিলেই হয়। তোমাকেও আজ একটা সত্য কথা বলছি, এই উঞ্ছবৃত্তি আমার আর ভাল লাগে না। দিনের পর দিন এ লাঞ্ছনা আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

বিজয়া মুহূর্ত্তের জন্য থামিল, পরে কহিল, আমি না হয় চলে যাব, কিন্তু তারপরে তোমার চলবে কি ক'রে শুনি?

বিমান কহিল, সে ভাবনা আমার—তোমার কাছে বুদ্ধি নিতে কোন দিন যাব না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

তা আমি জানি—বিজয়া কহিল, তা হ'লে সুবুদ্ধি পেতে যে—

বিমান পুনরায় উষ্ণ হইয়া উঠিল, তোমার বাবা পেন্সন পান, সে কথা আমার জানা আছে—তোমার দাদা সরকারী চাকুরে, সে কথাও আমি ভুলিনি—

বিজয়ার দু চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বিমান যে কি বলিতে চায় এ কথা সে চক্ষের পলকে উপলব্ধি করিল এবং আর একবার তীব্র প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইতেই বিমান ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

বিজয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাদের সংসারযাত্রা এই পথ ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। স্বামীর এই নীরব নিস্পৃহতা সে কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারে না। এ বাড়ীর অতীত ঐশ্বর্য্যের সহিত তাহারও পরিচয় ঘটিয়াছিল, তখন সবেমাত্র ভাঙ্গন ধরিয়াছে—বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু, সে ভাঙ্গন যে কত বড় ভাঙ্গন, তাহা জানা গেল শ্বশুরের আকস্মিক তিরোধানে। জমিদারী নিলামে উঠিল। সেদিনের কথা আজও বিজয়া ভুলিতে পারে নাই—স্পষ্ট চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। বিমান আসিয়া তাহার সম্মুখে অত্যন্ত অপরাধীর মত মুখ করিয়া বলিয়াছিল, আমাদের সব গেল বিজু! এই সব যাওয়া যে কত বড় যাওয়া তাহা তখন না বুঝিলেও এখন সে বড় মর্ম্মান্তিকভাবেই অনুভব করিতেছে। কিন্তু সেদিনে সে স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল, মিথ্যা চিন্তা ক'রো না—আবার হবে। তা ছাড়া, সংসার আমার, তার ভাবনা ভাবতে হয় আমি ভাবব—তখন সংসারের অভিজ্ঞতা তার ছিল না, কিন্তু আজ সে বুঝিতেছে…দীর্ঘ কয়েক

বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে বুঝিতে শিখিয়াছে···যাহা গিয়াছে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। নূতন করিয়া আরম্ভের দিন তাহাদের আসিয়াছে, কিন্তু বিমান এ কথাটা কিছুতেই বুঝিতে চাহে না। গোপনে সে পিত্রালয় হইতে হাতখরচার নাম করিয়া টাকা আনায়, ততোধিক সঙ্গোপনে একের পর এক গহনাগুলি বন্ধক রাখিতেছে। কিন্তু এইভাবে কত দিন চলিতে পারে! বিমানের কোন দিকে হুঁস নাই, দিনরাত শুধু বই লইয়া আছে—তাঁহার এই নির্লিপ্ততা সহজও নয় স্বাভাবিকও নয়। বিজয়া মাঝে মাঝে ভয় পায়। পদে পদে স্বামীকে আঘাত করে—যদি তার চেতনা হয়। কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। বিমানের নীরবতা তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তদুপরি কটূক্তি।

ন্যাকামী···বড় বড় কথায় আর আকাশ-কুসুম স্বপ্ন-রচনায় যেন তার সংসার চলিতেছে। তা ছাড়া, এ কথাটা সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে, পরিশ্রম করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করায় মর্য্যাদাহানি হয় কেমন করিয়া।

শৈলর স্বামী চাকুরে···সামান্য চাকুরী করে। সপ্তাহ-অন্তে একবার করিয়া বাড়ী আসে, দুইদিন কাটাইয়া পুনরায় কর্ম্মস্থলে চলিয়া যায়। এই দুইটি দিনের ইতিহাস শৈল তাহা কে কত ছন্দে ব্যক্ত করে। শুনিতে তাহার ভাল লাগে। মনে মনে শৈলকে সে হিংসা করে। তাহার স্বামী এমনটি কেন হয় না? আত্মাকে পীড়ন করিয়া মিথ্যা মর্য্যাদাবোধের দোহাই দেওয়ায় আর যাহাই থাকুক পৌরুষ যে নাই, ইহা বিজয়ার দৃঢ় ধারণা; অথচ স্বামীকে কিছুতেই সে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে না।

বিমানের এক কথা, আজীবন যাহারা লোক খাটিয়ে এসেছে সেই বংশের ছেলে হ'য়ে আমি গোলামি করতে পারব না বিজয়া! আমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

একই কথার পুনরাবৃত্তিতে বিজয়ার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিমান তেমনি অটল তেমনি স্থির। নিঃশব্দে শুনিয়া যায়, কখনও প্রতিবাদ করে, কখনও অন্যত্র প্রস্থান করিয়া দায় এড়ায়—কিংবা অনাবশ্যক খানিক চেঁচামেচি করিয়া ভাতের উপর রাগ করিয়া বসে।

শেষ পর্য্যন্ত বিজয়াকেই পুনরায় সুর নামাইতে হয়; না করিয়া উপায় কি। কিন্তু আজিকার ব্যাপারটার সমাপ্তি একটু নূতন ধরণের হইয়াছে। এমনি কটূক্তি বিজয়াকে বিমান কোন দিন করে নাই; বরং মাঝে মাঝে তাহাকে সস্নেহে কাছে বসাইয়া দর্শনশাস্ত্রের ভাল ভাল কথা শুনাইয়াছে, কখনও আশায় উত্তেজনায় ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়াছে, এমন দিন আমাদের থাকবে না বিজয়া। বিমান এ মাসে কখানা লটারির টিকেট কিনিয়াছে মুখে মুখে তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়া যায়। বিজয়া কতক শোনে কতকটা শোনে না। বিমান থামিতে পারে না, দ্বিগুণ উৎসাহে বিজয়ার সম্মুখে একটি কাগজের পুলিন্দা মেলিয়া ধরিয়া বলে, নূতন ধরণের বাড়ীর নকসা···বিমান কেমন একপ্রকার টানিয়া টানিয়া হাসিতে থাকে।

বিজয়ার মায়া হইত—উদ্যত তীক্ষ্ণ ভাষা সংযত করিয়া মৃদু গতিতে প্রস্থান করিত; কিন্তু ইদানিং তার মেজাজটাও কিছু নড়িয়া গিয়াছে।

আকাশে মেঘ সাজিয়া আসিয়াছে। হয় ত এখুনি বৃষ্টি আসিবে। লাইব্রেরি-ঘরের দরজা জানালাগুলি হাঁ করিয়া আছে। জল আসিলে সব ভিজিয়া একশেষ হইবে। বিজয়ার নিজের অজ্ঞাতে একটি নিঃশ্বাস পড়িল, ধীরে ধীরে সেই লাইব্রেরি-ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় সে ফিরিয়া আসিল—এমনি করিয়া আর সে পারে না। বিজয়া অস্থির পায় খানিক এ-ঘর ও-ঘর করিল। ভবিষ্যতের নিরুপায়তার একখানি ক্ষীণ বিবর্ণ ছবি তাহার চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল। চোখের সম্মুখে বিমানের ক্লিষ্ট মুখ সে দেখিতে পারিবে না, তার চেয়ে এখান হইতে সে চলিয়া যাইবে, যদি ইহাতে তাহার চৈতন্য হয়, যদি নিজের সম্বন্ধে একটু সজাগ হইয়া ওঠে, কিন্তু এ যুক্তিও মন মানিয়া লইতে চাহে না। যা আত্মভোলা লোক, উহাকে একলা কোথাও ফেলিয়া যাইবার কথা ভাবিতেও একটা করুণ অনুকম্পায় বিজয়ার সারা অন্তর পূর্ণ হইয়া ওঠে। ভবিষ্যতের চিন্তা তার ভাসিয়া যায় কিন্তু এ অনুভূতিও মুহূর্ত্তের জন্য, ভাঁড়ার-ঘরের নিঃস্ব লক্ষ্মীছাড়া মূর্ত্তি পুনরায় তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। আগামী কালের চিন্তায় তার সহজ কোমল বৃত্তিগুলি পর্য্যন্ত বিকাশ হইতে পারে না।

শেষ সম্বল হাতের কগাছা চুড়ি আর গলার একগাছা

হার। এদিকে যে একের পর এক তার অঙ্গ হইতে গহনাগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে সেদিকে বিমানের হুঁস্ নাই; শুধু মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় উদ্ব্যস্ত—কোন্ ছিদ্রপথ ধরিয়া তার পূর্ব্বপুরুষের অতীত গৌরব বিনষ্ট হইবে সেই দিকেই তার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি অথচ স্ত্রী যে কেমন করিয়া বছরের পর বছর এই সংসারের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছে—এ কথাটা একবারও ভাবিয়া দেখে না। এমন মানুষ লইয়া সংসার চলে কেমন করিয়া।

আজ সন্ধ্যার অন্ধকার কিছু পূর্ব্বেই নামিয়া আসিয়াছে। বাতাস নাই, গুমট মেঘ। বিজয়া পথের পানে চাহিয়া আছে। বিমান সকাল বেলা বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনও ফেরে নাই। আহার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। বিজয়াও অভুক্ত।

নিজের ঘরে আসিয়া বিজয়া বাক্স-পেটরা টানিয়া নামাইল। দিনকয়েকের জন্য বাপের বাড়ীই সে যাইবে। বাহিরে বিদ্যুৎ চমকিল। হাতের চুড়িগুলি জ্বলিয়া উঠিল। বিজয়া মনে মনে হাসিল—এই সোনার চুড়িগুলিও তার পরম শত্রু। এগুলি যত দিন আছে তত দিন এ বাড়ীর মায়া সে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। এখনও তাহারা একেবারে রিক্ত নয়, আরও কিছুদিন এই সংসারের ব্যয়ভার বহনে তাহারা সক্ষম। তারপর যে দিন তাহাদের চরম দুর্দ্দশার দিন আসিয়া দেখা দিবে—সেই দিন না হয় ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবে। এগুলি সঙ্গে লইয়া গিয়া কোথাও সে স্থির থাকিতে পারিবে না, বরং জানিয়া শুনিয়া নিজেই নিজের অশান্তির কারণ হইবে।

বিজয়া পুনরায় জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—শৈলর স্বামী এই পথ ধরিয়া চলিয়াছে। আজ শনিবার। ওদের সবই নিয়মে বাধা। এখুনি হয় ত শৈল ছুটিয়া আসিয়া খবরটা জানাইয়া যাইবে। শৈলর আনন্দ-উজ্জ্বল মুখখানা তার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

অভাব কার না আছে। ইহার জন্য বিজয়ার আফশোষ নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাদের রথের চাকা না হয় অচল হইয়া পড়িয়াছে, তাই বলিয়া নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চেষ্টতায় তার উদ্ধার সাধনার কল্পনা সে করিতে পারে না। চেষ্টা থাকিলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু বিমানের নীরব ঔদাসীন্য দিনের পর দিন তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে। যদিও কর্ত্তব্যপালনে স্বামীর প্রতি তাহার অবহেলা নাই—

শৈল আসিয়া সত্য সত্যই উপস্থিত হইল। হাতে তার ফিকা রংয়ের একখানি শাড়ী, মুখে সলজ্জ হাসি। শৈল কহিল, নিয়ে এলেন ভাই, নতুন ডিজাইন বেরিয়েছে—কোলকাতায় নাকি একেবারে ছেয়ে গেছে।

বিজয়া একবার শৈলর হাতের শাড়ীখানার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া বাহিরে দৃষ্টি রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈল বলিয়া চলিল, কি মানুষ ভাই···বলেন এখুনি চট্‌পট্ কাপড়খানা প'রে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াও! কথা কি আর কানে যায়, না একটু সবুর সয়, একেবারে নাছোড়বান্দা।

শৈল একদফা খুশীর আবেগে হাসিয়া উঠিল। বিজয়ার একটি নিঃশ্বাস পড়িল।

শৈল বলিয়া চলিল, না প'রে উপায় আছে কি, কিন্তু তাতেও কি রেহাই পাবার জো আছে—বলে, খাসা মানিয়েছে। কাছে এসো। তারপর, বুঝতেই ত পারছ ভাই—মাগো না, কি কাঙালপনা! শৈল টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

পুরুষের এই কাঙালপনার মধ্যেই যে নারীর কত বড় আত্মতৃপ্তি, শৈল তাহা অনুভব করিতে না পারিলেও বিজয়া তাহা বুঝিল। সম্ভবত সেইজন্যই বিজয়ার বুকের ভিতরটা অস্বাভাবিক দ্রুত তালে চলিতে লাগিল। এই দুই স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবনের ইতিহাস তাহাকে নীরবে শুনিয়া যাইতে হয়—ইহাতে কত বড় আঘাত যে বিজয়া পায়, তাহা শৈলর বুঝিবার উপায় নাই। নিজেতেই সে মগ্ন, অপরের কথা ভাবিবার সময় এটা তার নয়, কিন্তু আজ সহসা শৈলকেও থামিতে হইল। বিজয়ার এ মূর্ত্তি তার কোন দিনও চোখে পড়ে নাই। সে একটু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তোমার হ'ল কি বিজুদি?

অকস্মাৎ বিজয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কোথা দিয়া যে কি হইল, শৈল ঠিক তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও কতকটা বিস্মিত এবং ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, আমি কি তোমায় কিছু অন্যায় বলেছি বিজুদি? ···

বিজয়া নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইল, হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিল, দেখি তোমার শাড়ীখানা শৈল, চমৎকার পাড়টি কিন্তু। কত দাম নিলে ভাই? কাপড়খানা তোমায় বেশ মানাবে—

শৈল বিজয়ার এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে অনেকখানি বিস্মিত হইলেও সে ভাব গোপন রাখিয়া কহিল, ঠিক বলতে পারিনে ত। জিজ্ঞেস ক'রে কাল তোমায় জানাব।

বিজয়া কহিল, তাই জানিও।

ইহার পরে আর পূর্ব্বালোচনা চলিতে পারে না। শৈলকে বাধ্য হইয়া নীরব থাকিতে হইল, কিন্তু বিজয়ার চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। শৈলকে ভর করিয়াই আজও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে। চৌধুরীবাড়ীর তথাকথিত মর্য্যাদা শুধু ওরই সাহায্যে অক্ষুণ্ণ আছে··· তাহাদের দুরবস্থার কাহিনী আজও দশজনার মুখে মুখে আলোচিত হইতেছে না শুধু শৈলরই আন্তরিকতায়। এ কথা বিজয়ার স্মরণ আছে। আজিকার রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে পুনরায় তাহাকে ওরই কাছে গিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইতে হইবে—

একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিজয়া কহিল, দিনকয়েক বাবার কাছ থেকে ঘুরে আসব ভাবছি; শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না, মনটাও ভারী খারাপ। বিজয়া থামিল। কথাটা যে সময়োপযোগী হয় নাই তাহাও সে বুঝিল। শৈল বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

বিজয়া পুনশ্চ কহিল, সত্যি আর পারিনে শৈল—এর চেয়ে একটা পুতুল নিয়ে দিন কাটান ভাল। দিব্যি নির্ব্বিঘ্নে লাইব্রেরি নিয়ে তার দিন কাটছে। কথা বলতে গেলে তর্ক তুলে নিজের মতবাদকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু ঐ বাজে মতবাদ ভাঙ্গিয়ে কি আর মানুষের দিন চলে? অথচ কথাটা আমি বলব কাকে। বিজয়া থামিল। শৈল নিরুত্তর।

বিজয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, সবই গেছে—থাকবার মধ্যে এই বসতবাড়ীখানি—একথা না জানে কে? তবু যে কেন এই মৃত আভিজাত্য আর বনেদি বংশের মর্য্যাদার ধুয়া ধ'রে আত্ম-নিপীড়ন তা আমার মাথায় আসে না। জেনে শুনে নিজেকে এমনি ক'রে প্রবঞ্চনা করার যে কি সার্থকতা তা আমি বুঝিনে।

বিজয়া একটু থামিল পুনশ্চ বলিয়া চলিল, কোথা দিয়ে যে কি হ'চ্ছে তা সবই তুমি জান। তুমিই বল ত শৈল, এই যে দিনের পর দিন নিজেকেও নিঃস্ব করছি, এতে কি একটুও ব্যথা আমি পাই না—পাই···কিন্তু নিত্য নতুন নতুন আশার কল্পনায় নিজেকে ছলনা করি—তা হ'লেও এ ভাবেই বা আর কত দিন চলতে পারে?

এতক্ষণে শৈল কথা কহিল, সেইজন্যেই বুঝি বাপের বাড়ী যাবার কথা বলছ?

ঠিক সেইজন্যই—বিজয়া কহিল, হয় ত এতে ওর চোখ ফুটতে পারে।

শৈল একথার কোন উত্তর দিল না, কিন্তু অধিকমাত্রায় ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, কথায় কথায় বড্ড দেরী হ'য়ে গেল, উনি হয় ত পথ চেয়ে ব'সে আছেন।

শৈল আর দাঁড়াইল না—

বিজয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার মধ্যে তখনও শৈলর শেষ কথাটি ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। শৈলর স্বামী তার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে—সপ্তাহে একটিমাত্র ছুটির দিনে তার পাশে আসিয়া সহাস্যে দাঁড়ায়, হাসি মুখে কথা বলে, সাধ্যমত উপহার দেয়। শৈলর দেহে গহনার বাহুল্য নাই। সাধারণ চারগাছা চুড়ির পাশে এঁয়োতির প্রধান নিদর্শন একগাছি লোহা—কপালে সিঁদুরের টিপ, নাকের ডগায় তারই মৃদু আভা, মুখে সরল হাসি। স্বামী প্রেমে গরবিনী শৈল। নিঃশব্দ অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা—ভাবিতে ভাল লাগে। একটা ব্যথামিশ্রিত আবেগে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

ঐশ্বর্য্যের জন্য সে লালায়িত নহে, কিন্তু স্বামীর নিরাসক্তি তাহাকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দেয়। আঃ, বিজয়া পাগল হইয়া যাইবে নাকি! সে আপন মনে খানিক হাসিল। কিন্তু শৈলকে কিছুতেই সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। তার চলার পথে শৈলর প্রভাব তাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে, নিজের সম্বন্ধে বিজয়া সজ্ঞান হইয়া ওঠে। সংসারের কাছে তার অনেক পাওনা, একথাটা আরও বিশেষভাবে সে অনুভব করে। আজ বহুদিন পরে বিজয়া পুনরায় আসিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। কিসের জোরে শৈল তার স্বামীকে এমন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! সেও ত কুৎসিতা নয়!

বাহিরে অকস্মাৎ যেন উন্মত্ত প্রকৃতির তাণ্ডব নর্ত্তন সুরু হইল। বাহিরের সঙ্গে তার অন্তরের বড় নিবিড় সম্বন্ধ, বিজয়া তাহা অনুভব করে; কিন্তু প্রতিকারের উপায় কোথায়। শৈলর কাছে যাহা সহজ স্বাভাবিক, বর্ত্তমানে

বিজয়ার নিকট তাহা অচিন্তনীয়, নিছক একটা স্বপ্ন। কিন্তু তবুও সে আশা রাখে—কল্পনায় স্বর্গ রচনার স্বপ্ন দেখে। কিছু না হউক, এই স্বপ্ন-দেখাটাও তার জীবনে একটা সত্য। বিজয়ার মনের মধ্যে বিশৃঙ্খল চিন্তাধারা, কিন্তু তারই ফাঁকে আগামী কালের দুশ্চিন্তা তাহাকে সচকিত করিয়া তোলে। শৈল অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—তার প্রয়োজন হয় ত আজিকার মত ফুরাইয়াছে—কিন্তু বিজয়ার প্রয়োজন আজই—এই রাত্রে। শৈলর সাহায্য গ্রহণ রাতের অন্ধকারে সঙ্গোপনে তাহাকে করিতে হইবে—এমন কি বিমানেরও যাহাতে চোখে না পড়ে। হায় রে, মিথ্যাকে ধরিয়া রাখিবার কি নিখুঁত আয়োজন! বিমান কি বোঝে না, সে কি অনুমান করিতেও পারে না যে, এতগুলি বছর তাদের কেমন করিয়া কাটিয়া গেছে?

নীরব চিন্তায় বিজয়ার অনেকক্ষণ কাটিয়াছে। বাহিরের মাতামাতিও অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। বিমান এখনও ফিরে নাই। বিজয়া বাহির হইয়া আসিল, দরজা ভেজাইয়া দিয়া শৈলর উদ্দেশে চলিল। দু-গাছি চুড়ি রাখিয়া আসিবে—ভাণ্ডার তাহার একেবারে শূন্য। বিজয়া বৃক্ষ-শ্রেণীর অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। এখানকার রাস্তাঘাট তার মুখস্ত—কোথাও গতিরোধ হয় না—তা ছাড়া, এই পথে চলাফেরা তার নিয়মিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শৈলর ঘরের দরজায় আসিয়া বিজয়াকে থামিতে হইল। স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমানের পালা তখন রীতিমত জাগিয়া উঠিয়াছে। বিজয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেও এক পা নড়িল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার এই অতি পুরাতন অথচ লোভনীয় ঘটনাগুলি তার জীবনেও এক সময় আসিয়াছিল—যদিও আজ তাহা একটা মৃত স্মৃতি; কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের এই অভিনব মদির মুহূর্তগুলিকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না, বরং তার সমস্ত চেতনাকে সজাগ করিয়া সঙ্গোপনে আগ্রহের সহিত উহাদের লক্ষ্য করিতেছিল। শৈলকে সে ডাকিল না। তার অভাবগ্রস্ত সংসারের করুণ তিক্ত আবেদন লইয়া আজ আর বিজয়া তাহাকে বিরক্ত করিবে না। অবাধ্য চোখের জল সুযোগ পাইয়া বিজয়ার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া দিয়া গেল। বিজয়ার কোন দিকে হুঁস ছিল না।—সহসা শৈলর আহ্বানে চমকাইয়া উঠিয়া সম্মুখের দিকে পা বাড়াইতেই শৈল তাহার একখানি হাত ধরিয়া কহিল, কেন এসেছিলে সে কথা ত বললে না বিজুদি?

বিজয়াকে থামিতে হইল, সে কথা কি রোজই আমায় নতুন ক'রে ব'লতে হবে শৈল? এই দু-গাছা রইল, যা হয় ক'রো।

শৈল কহিল, উনি বলছিলেন, দিনের পর দিন যখন শুধু বন্ধকই পড়ছে—শৈল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—ছাড়িয়ে আনার কোন ব্যবস্থাই যখন হচ্ছে না, তখন মিছে সুদের টাকা না গুণে ওগুলো বিক্রি ক'রে ফেললে হয় না?

বিজয়া একটা উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া কহিল, একেবারে বেচে দিতে বলছেন উনি?

খানিক নীরবে কি চিন্তা করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া মৃদুকণ্ঠে বিজয়া কহিল—জিনিষগুলি একেবারে চ'লে যাবে কথাটা ভাবতেও ভারী দুঃখ হয় শৈল, নইলে আমি কি বুঝিনে, দিন দিন কোথায় এসে আমরা দাঁড়াচ্ছি!

শৈল নিরুত্তর। বিজয়ার কোথায় যে ব্যথা, তাহা সে এক নিমেষেই অনুভব করিল।

বিজয়া বলিয়া চলিল. সেই ভাল, যা দু দিন পরে যাবেই, তা না হয় দু দিন আগেই যাক্। দুলালবাবুকে ব'লো, এবারে শহরে গিয়েই যেন ওগুলোর একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলেন!

শৈল কহিল, করবেন বই কি, কিন্তু···একটু থামিয়া শৈল পুনরায় কহিল, শহর থেকে চমৎকার সুগন্ধি চাল এসেছে বিজুদি, একটু দাঁড়াও, অমন চাল একলা খাব, কিছু নিয়ে যাও—

এই উপায়েই শৈল বিজয়াকে সাহায্য করে, বিজয়া সবই বোঝে, শৈলও সে খবর রাখে, তথাপি এ অভিনয় তাহারা প্রায়ই করিয়া থাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শৈল ফিরিয়া আসিল, কহিল, একটা কফিও নিয়ে এলাম···অসময়ের জিনিষ কি না—

বিজয়াকে নিঃশব্দে গ্রহণ করিতে হয়। শৈলর আন্তরিকতাকে সে অপমান করিতে পারে না। তা ছাড়া, প্রয়োজন আজ সকলের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

শৈল পুনরায় কহিল, কাল সকালে আমি তোমার কাছে যাব।

পরদিন প্রাতঃকালে যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া শৈল একটা পরিচিত ইঙ্গিত করিল। বিজয়া ফিরিয়া চলিল। শৈল নিঃশব্দে তাহার চলার পথে চাহিয়া রহিল। চৌধুরীবাড়ীর গৃহলক্ষ্মী চলিয়াছে, আর অদূরেই তাহাদের অতীত গৌরবের মৃত কাঠামটা শুধু মাটি হইয়া যাইবার অপেক্ষায় দিন গুণিতেছে। জীবনের গতি এমনি আরও রচনা করিয়াই চলে।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বিজয়া চমকাইয়া উঠিল। বিমান ঠিক দোর গোড়ায় দাঁড়াইয়া। দুই চোখ তার লাল। বিজয়া ত্রস্তে তাহার সন্নিকটে সরিয়া আসিল এবং পর মুহূর্ত্তেই মুখে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া হাত কয়েক পিছাইয়া গেল।

বিমানের মুখে বক্র হাসি।

বিজয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি করিল, রক্তের ধারা! এর চেয়ে কত বেশী আর তোমার কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে? এক মুহূর্ত্ত থামিয়া অত্যধিক কঠিন কণ্ঠে পুনরায় কহিল— স্ত্রীর গহনা বেচা টাকায় যার দিন কাটাতে হয়, তার লজ্জা করে না ঐ ছাইপাঁশ খেয়ে মাতামাতি করতে? 'বাড়ীর নক্সাখানা যত্ন ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছে ত'! নির্লজ্জ—

বিমান একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া অর্দ্ধ-জড়িত কণ্ঠে কহিল, তোমার চেয়ে নয় বিজয়া। কৈফিয়ৎ তলব করা— কিন্তু কোথায় গিয়েছিলে তুমি এত রাত্রে?

বিজয়ারও সহ্য হইতেছিল না, উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, জমিদারবাবুর আগামী কালের রাজভোগের ব্যবস্থা করবার জন্যে।

কথাটা তাহাকে সমাপ্ত করিতে হইল না।

এর পরে ঘটনাটা একটা নাটকীয় পরিণতিতে শেষ হইল। শৈলর দেওয়া সুগন্ধি চাল ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িয়া আছে কিন্তু যে লোকটি সযত্নে ঐগুলি বহন করিয়া আনিয়াছে শুধু তাহারই সাক্ষাৎ মিলিল না।

বিজয়া তখন অন্ধকারে নিঃশব্দে পথ চলিতেছে—যথেষ্ট বিড়ম্বনা সে ভোগ করিয়াছে, আর না—

পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই গত রাত্রের সমস্ত ঘটনাটা বিমানের চোখের সম্মুখে ছায়াছবির মত মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। গত রাত্রের দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া সে ব্যথিত এবং শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ইদানিং কয়েক মাস যাবত বিজয়ার সহিত তাহার বাদানুবাদ লাগিয়াই ছিল, কিন্তু গতকল্য তাহার চূড়ান্ত করিয়াছে। বিমানের মধ্যে যে কেমন করিয়া এই পশু-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল এ কথাটা ভাবিতে গিয়াও আজ সে মরমে মরিয়া গেল।

ঝগড়াঝাটি, কথা কাটাকাটি এমন ত কত দিন গিয়াছে, কিন্তু গতকল্য কি জানি কেন তার বিদ্রোহী মন তাহাকে ভিন্ন পথে চালিত করিল। আজ কেমন করিয়া সে বিজয়ার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবে! বিমান বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু আজ আর বাহিরেও তাহার মন টিঁকিতেছিল না। অনুশোচনায় তাহার অন্তর ভরিয়া গিয়াছে। বিমান ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সারা বাড়ী অনুসন্ধান করিয়াও তাহার দেখা মিলিল না। শৈলর ওখানে গিয়াছে ভাবিয়া আপাতত একটা সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া সে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু তাহার এ অনুমান যে ভুল, তাহাও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রমাণিত হইয়া গেল। বিমান চিন্তিত হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কাহাকে বলিতে পারিল না। তার মন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিল যে বিজয়া তাহার পিত্রালয়ে গিয়াছে। তথাপি বিমান স্বস্তি পাইতেছিল না।

বিমান তাহার পাঠাগারে প্রবেশ করিল। তাহার অতি প্রিয় বইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিল কিন্তু সেদিকেও মন দিতে পারিল না।

দিনের পর দিন যায়। বিমানের আশা ছিল যে, বিজয়া অভিমানবশে চলিয়া গেলেও দুই-চারি দিনেই পুনরায় ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু বিজয়া আসিল না। বিমান তাহার একাগ্রতা হারাইয়া ফেলিতেছে। শুধু বাজে চিন্তায় তাহার সময় কাটে। তাহার জীবনে বিজয়ার প্রয়োজন যে কত বেশী, তাহা আজ বিমান বড় তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছে।

কথাটা কেমন করিয়া গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কুয়াশাচ্ছন্ন সন্দেহ উগ্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে; আভিজাত্যের অভিমান এবং মর্য্যাদাবোধের স্বরূপ একেবারে উলঙ্গভাবে তার চোখের সম্মুখে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিমান শিহরিয়া উঠিল এবং কেমন করিয়া যে বছরের পর বছর এই জীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত সংসারকে বিজয়া

আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল এ কথাটা বড় নির্ম্মমভাবেই সে উপলব্ধি করিতেছে। একটা স্বপ্নের ছায়ারূপকে কেন্দ্র করিয়া এতগুলি দিন যে সে অবহেলায় অপচয় করিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণের পথ কোথায়? চতুর্দ্দিকে অন্ধকার —নিরন্ধ্র অন্ধকারে বিমান শুধু অন্ধের মত হাতড়াইয়া ফিরিতেছে। পথ কোথায়?

শৈলর স্বামী সেদিন উপযাচক হইয়া শ'দুই টাকা দিয়া গেল। বিজয়ার গহনাবিক্রয়লব্ধ অর্থ। বিমানের চোখ সজল হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা এমন নগ্নরূপে কোন দিনই তাহার চোখে পড়ে নাই। বিমান একবার তাহার পেশীবহুল বাহু দুখানার পানে চাহিয়া দেখিল। এই বাহুতে তাহার যথেষ্ট শক্তি আছে কিন্তু সে শক্তি সে কোন্ কাজে ব্যয় করিয়াছে?

বিমান অকস্মাৎ সজলকণ্ঠে কহিল, ও টাকা আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান দুলালবাবু, আমার ঋণভার আর বাড়াবেন না—

দুলাল মৃদু হাসিল, কহিল, কিন্তু আপনার স্ত্রী শৈলকে এ টাকা আপনার কাছে পৌঁছে দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন—

দুলাল প্রস্থান করিল।

বিমানকে টাকা গ্রহণ করিতে হইল—ইহা বিজয়ার নির্দ্দেশ।

*   *   *   *

চৌধুরীবাড়ীর যে অংশটিতে বিমান তার সংসার রচনা করিয়াছিল তাহাও আজ আর অবশিষ্ট নাই, শুধু একটা মৃত কঙ্কাল পড়িয়া আছে। দুলালের দেওয়া দুই শত টাকা মূলধন লইয়া বিমান নূতন করিয়া সংসার রচনার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে। বিজয়াকে তার চাই। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে নূতন আলোর সন্ধান সে পাইয়াছে, সেই আলোর পথ ধরিয়াই বিমান অগ্রসর হইবে। এই নূতন আলোর জগতেই হইবে তাহার সংসারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। দূর হউক অতীত স্মৃতি! কিন্তু মন কাঁদিয়া উঠিতে চাহে। মোহের মায়া বড় কম নয়।

বিমান চলিয়া গিয়াছে, এখানে আর ফেরে নাই। চৌধুরীবাড়ীর পূর্ব্ব-ইতিহাস এখনও ধ্বংস-স্তূপের আড়াল হইতে উঁকি মারে। আজিও এই পথে পথিকের আনাগোনা চলে। চোখে মুখে তাদের সাবেক দিনের মতই বিস্ময় ফুটিয়া ওঠে, কিন্তু তাহাতে ঈর্ষার লেশমাত্র নাই। বরং একটা করুণ সহানুভূতির ভাব দেখা যায়—কি ছিল, কি হইয়াছে। এর বেশী ওরা জানে না, ভাবিতেও পারে না; কিন্তু এখনও ঐ ধ্বংস-স্তূপের দিকে দৃষ্টি পড়িলে শৈল থমকিয়া দাঁড়ায়—একের পর এক বহু সুখদুঃখবিজড়িত ঘটনা তার মনের দ্বারে আঘাত হানে—পুরাতন সঙ্গিনীকে মনে করাইয়া দেয়- একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় চলিতে থাকে।

দিন চলিয়া যায়।

ওতনু-মঞ্জরী

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

যদিও রয়েছ প্রিয়া আড়ালে গোপন,
তব প্রেম কান্তি ভরে
ঝরে মোর চিত্ত 'পরে ;
অপূর্ব্ব লাবণ্য স্রোতে প্লাবিয়া জীবন।

তোমারে স্মরিয়া গাথি কত রূপকথা,
রাজার কুমারী তুমি ;
ও অঙ্গ-মাধুরী চুমি'
ফুটে ওঠে মধু গন্ধে মোর তনুলতা।

বকুলমঞ্জরী হয়ে হৃদয়কানন
দুলে' ওঠে অবিরল
বিমোহিয়া তনুতল ;
কি যেন অমিয় ধারে ভরে প্রাণ মন।

এমনি করিয়া নিত্য সুরভি নির্ঝর,
ঢেলে দাও তুমি প্রিয়া
পূর্ণ করি মোর হিয়া,
ও অঙ্গ-কুসুম গন্ধে নিতি নিরন্তর

বাংলার লোক-সঙ্গীত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

বাংলার লোক-সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম। বাংলার লোক-সঙ্গীত, লোক-নৃত্য, লোক-ক্রীড়া, লোক-শিল্পকলার ভিতর জাতির অতীত গৌরবকাহিনী, অতীত শিক্ষা ও অতীত সভ্যতার ধারাগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। জাতীয় গৌরব লোক-সঙ্গীতগুলির রীতিমত সংগ্রহ ও অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা বাংলার জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইবে।

আজ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই লোক-সাহিত্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা দেখাইতেছে। ইংলণ্ড, আয়ারলণ্ড, জার্মানী, তুরস্ক, রুশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে স্বদেশের লোক-সঙ্গীতগুলির সংগ্রহ উদ্দেশ্যে শত শত সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি গণ-সাহিত্যের সংগ্রহ ও অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের সাময়িকপত্রগুলিতে লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম লোক-সঙ্গীত সংগ্রহে ব্রতী হন—খ্যাতনামা সাহিত্যিক পেপিস্। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক এডিসন "স্পেক্টেটার" সাময়িকপত্রে ইংলণ্ডের কতকগুলি লোক-সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর চিন্তাপূর্ণ রচনা প্রকাশ করেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে এডিসন গ্রাম্য-গীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। লোক-সঙ্গীত-গুলির মূল্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত লেখক সিসিল শার্প বলিয়াছেন—"সর্ব্বশেষে আছে আমাদের জাতির লোক-সঙ্গীত—যে সহজ, সরল গান ও সুরের উচ্ছ্বাস বনফুলের মতই অতি-স্বাভাবিক ও সহজভাবে আমাদের জাতির মানুষের প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে উঠেছে এবং যার ভিতরে আমাদের জাতির ভাষার মতই আমাদের গভীর চরিত্র ও ভাবধারার গভীর সন্নিবেশ রয়েছে। যদি প্রত্যেক ইংরেজ শিশু এই সব জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হবার সুযোগ পায়, তবে সে এখনকার চেয়ে আরও বেশী করে তার স্বজাতিকে চিনতে ও বুঝতে পারবে; এবং সেই চেনার ও বোঝার ফলে তাদের বেশী করে ভালবাসতে শিখবে এবং তাদের সঙ্গে তার আত্মার ও প্রকৃতির যে গভীর সংযোগ তা উপলব্ধি করে এখনকার চেয়ে আরও বেশী পরিমাণে আদর্শ পৌরজন ও স্বদেশপ্রেমিক হয়ে উঠবে। সুতরাং ইংরেজী লোক-সঙ্গীতের পুনঃ প্রচলনের ফলে যাঁরা স্বদেশপ্রেমিক ও যাঁরা দেশের শিক্ষার নেতা, তাঁদের হাতে একটি মহামূল্যবান্ শক্তি এসে পড়েছে। জাতির বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে স্বজাতীয় সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ কেবল যে দেশের সঙ্গীত ধারার প্রকর্ষ সাধন করবে তাই নয়, তাতে করে স্ব-ভূমির প্রতি এমন একটা গভীর প্রেমের এবং স্বজাতির প্রতি এমন একটি গৌরববোধের সৃষ্টি হবে যার অভাব আমরা আজকাল বিশেষ করে আক্ষেপ করি।"

বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে আধুনিক শিক্ষিত-সমাজের অনাদর ও অবহেলা সহ্য করিয়া আজও বহু লোক-সঙ্গীত বর্ত্তমান। এ যাবৎকাল যে সমস্ত লোক-সঙ্গীত সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সেইগুলি বাংলা দেশের লোক-সঙ্গীতসমূহের একটা অংশ মাত্র। শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও যদি এই সব মূল্যবান অতীত সংস্কৃতিধারাকে অশ্রদ্ধা করেন, তাহা হইলে সত্বরেই এই সব প্রাচীন সম্পদ বিলয়প্রাপ্ত হইবে। সাময়িক পত্রিকাগুলিতে এই লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতি-আধুনিককালে এই সব লোক-সঙ্গীত সংগ্রহের দিকে একটা প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে। এই লোক-সাহিত্যের সংগ্রহকার্য্য অতি দায়িত্বপূর্ণ। এই লোক-সঙ্গীতগুলির ভিতরই প্রাচীন ভাষার ধারা, প্রাচীন ভাব-প্রকাশভঙ্গীর ধারা, প্রাচীন রচনাকৌশলপ্রণালী অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং বাংলা ভাষার ইতিহাস লোক-সাহিত্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। লোক-সঙ্গীত সংগ্রহের ভিতর যদি কোনও ভুল বা গলদ রহিয়া যায়, তাহা হইলে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও ভুল থাকিয়া

* লেখক "বাংলা" শব্দ 'বৃহত্তর বঙ্গ" অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

যাইবে। সুতরাং লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ অতি নির্ভুল ও খাঁটি হওয়া দরকার। লোক-সাহিত্য সংগ্রহের দায়িত্বভার প্রাচীন সংস্কৃতিধারার উপর বিশ্বাসী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে যে সব লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ধামালী, সারি, পটুয়া-সঙ্গীত, বারমাসী, ভাটিয়ালী, কীর্ত্তন, বাউল, জারি, ধূয়া প্রভৃতি গানগুলির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন এই গানগুলির পরিচয় সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিব।

ধামালী

বাংলা দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধামালী গানের প্রচলন আছে। দুই হাতে তালি দিয়া গানের সুর বা তালকে লয় করার নাম 'ধামাইল'। ধামালী গানকে শ্রীহট্টে 'ধাম্বালী' ও উত্তরবঙ্গে 'ধামাইল' নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীহট্ট অঞ্চলে ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন বা বিবাহ-উৎসবে স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক ধামালী গান অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গে কীর্ত্তনীয়ারা দুই হাতে তালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে সব কীর্ত্তন গান গাহিয়া থাকে, সেগুলিকে সাধারণতঃ 'ধামাইল কীর্ত্তন' বলা হয়। কালক্রমে ধামালী গান বাংলা দেশের মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে মুসলমানদের অনেকেই এইগুলি পরিত্যাগ করার আন্দোলন চালাইতেছে। এই ধামালী গানগুলির লালিত্য ও মাধুর্য্য অতি আনন্দদায়ক।

সারি গান

বাংলা দেশের বড় বড় নদী বা বিলগুলির মধ্য দিয়া অতিক্রম করার সময় নৌকার মাঝিরা সমবেতভাবে যে সব গান গাহিয়া থাকে, গ্রাম্য অঞ্চলে সেগুলি 'সারি' গান নামে সুপরিচিত। এখনও রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলার পল্লীপ্রদেশে মনসাপূজা বা দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে যুবকগণ কর্ত্তৃক বাইচ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাইচ প্রতিযোগিতাকালে যুবকগণ নানাপ্রকার গান পাল্লা দিয়া গাহিতে থাকে। এইসব গানকেও সারিগান নামে অভিহিত করা হয়। এইসব সারিগান বিরহমূলক ও অতি কৌতুকপূর্ণ।

পটুয়া সঙ্গীত

পূর্ব্বে বাংলায় ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার পল্লীতে পল্লীতে পটুয়া সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। পটুয়ারা এই সঙ্গীতগুলি পল্লীর প্রতি গৃহে গৃহে আবৃত্তি করিয়া জীবিকার সংস্থান করিত। পটুয়ারা গ্রামের কোনও একটি বিষয়বস্তু নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছড়া বাঁধে এবং একটি সুদীর্ঘ পটে ঐ সম্বন্ধে নানা ছবি বিচিত্র বর্ণে অঙ্কন করে। পটুয়ারা জনসাধারণকে ছবি দেখাইবার সময় পটখানা উন্মুক্ত করিতে থাকে এবং ছবির কাহিনীকে নানা প্রকার সুরে আবৃত্তি করে। এই পট-চিত্র জনসাধারণের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করে।

ভাটিয়ালী

বাংলার সঙ্গীত-বিজ্ঞানের কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী ও বাউল সুর সমগ্র জগতে বিশিষ্ট পরিচিতি লাভ করিয়াছে। যত প্রকার রাগরাগিণীর প্রচলন আছে, তাহাদের মধ্যে কোনটির সহিতই এই ভাটিয়ালী সুরের সম্বন্ধ নাই। ইহা পল্লী-হৃদয়ের নিছক করুণ রসের পরিচায়ক। বাংলার মাঝিরা পদ্মা, যমুনা, ভৈরব, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথী, ত্রিস্রোতা নদীতে এই সুর গাহিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। এই ভাটিয়ালী গান নদীমাতৃক বাংলার নিজস্ব সম্পদ্। এই ভাটিয়ালী সুরের ভিতর এমন মনোমুগ্ধকারী মাধুর্য্য আছে যে, গভীর নিশীথে এই গান শুনিয়া রোগী যন্ত্রণা ভুলিয়া যায় ও শোকার্ত্তের মনোব্যথা দূর হয়, আর্ত্তের নৈরাশ্য দূরীভূত হয়।

বারমাসী

পল্লী-সাহিত্যের বারমাসী গানগুলিকে প্রেমের কবিতা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রাচীন বাংলার পল্লী-কবিরাই বারমাসী কবিতার রচয়িতা। পল্লীর অধিবাসীরা এই সকল বারমাসী সঙ্গীত গাহিয়া একটা অনাবিল আনন্দ লাভ করে। পল্লীপ্রদেশে বারমাসী সঙ্গীতগুলি খুবই জনপ্রিয়। নায়ক-নায়িকার বিরহ মর্ম্ম-

ব্যথার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গ্রাম্য কবি এই সব গান রচনা করিয়াছেন। কবিতাগুলির ভাষা নির্ঝরিণীর মত মুক্তপ্রাণ এবং উপমা ও চিত্রগুলি মনোরম, অতুলনীয়। এই গানগুলির ভিতর দিয়া আমরা প্রাচীন বাংলার পল্লীর নায়ক-নায়িকার সত্যকার সরল প্রেমের পরিচয় লাভ করি। এই কবিতাগুলিতে প্রাচীন সামাজিক রীতি-নীতির বহু উপকরণ পাওয়া যায়। নায়িকার বেদনাবিধুর চিত্তের অস্থিরতা কবি অশেষ রচনানৈপুণ্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

কীর্ত্তন

বাংলার পল্লী-সঙ্গীতগুলির মধ্যে কীর্ত্তন গানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশ্ব-সঙ্গীতের কলা ও বিজ্ঞানে এই গানগুলি বাংলার অপূর্ব্ব দান। শ্রীচৈতন্যপ্রভুর জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই বাংলা দেশে কীর্ত্তন গানের উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ এইগুলিকে নূতন রূপ দিয়া জনসমাজে প্রচার করেন। বাংলার বৈষ্ণব সাধনায় এই গানগুলি একটি বিশিষ্ট গৌরবময় স্থান লাভ করিয়াছে। এই কীর্ত্তন গানের আনুষঙ্গিক ভাব-দ্যোতক নৃত্য সার্ব্বজনীন। কীর্ত্তন গানের নৃত্যগুলির ভিতর ভারতীয় আধ্যাত্ম সাধনা ওতপ্রোত ভাবে রূপায়িত আছে। বাংলার নরনারী এই কীর্ত্তন গানে যে অনাবিল অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে তাহা অন্যরূপে বিরল। আজও বাংলার মাঠ, ঘাট, পল্লী ও নদীতে কীর্ত্তন গানের অভাব নাই।

বাউল সঙ্গীত

বাউল গানগুলি দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত। মানুষের দেহের ভিতরই ভগবানের অবস্থিতি, দেহের ভিতরই পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক বিরাজমান, স্বকর্ম্মানুসারে মানুষ ফল ভোগ করে, মানুষকে চেনাই প্রধান কাজ—এই সব কথাই বাউল সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত বস্তু। 'বাউল' কথার অর্থ হইতেছে 'আত্মহারা'। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে আত্মহারাভাবে যে পার্থিব জগতের সব কিছুই অসার মনে করিয়া সংসারের কার্য্যে নির্লিপ্ত হয়, তাহাকেই 'বাউল' বলা হইয়া থাকে। বাউল সঙ্গীতগুলিও ধর্ম্ম বিষয়ে উদারতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ভাবের প্রকাশ করে।

জারি গান

মহরম উৎসব উপলক্ষে মুসলমানেরা জারি গান গাহিয়া থাকে। কুরআন শরিফের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে আখ্যান লইয়া জারি গান রচিত হয়। অথবা হিন্দু-মুসলমানের মধ্য হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিদ্বেষ দূর হইয়া ঐক্য ও সখ্যভাব স্থাপিত হয়, এইরূপ কথা লইয়াও জারিগান রচিত হয়। জারিগানের সুর অতি সুললিত ও সতেজ। উত্তরবঙ্গে জারিগানগুলিকে সাধারণতঃ 'মরিচিয়া' গান বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ধূয়া গান

ধূয়া গান হিন্দু সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ্। তবে অনেক মুসলমান কবিও ধূয়া গান গাহিয়া থাকে। ধূয়া গানগুলি সাধনামূলক, বিষাদ বা প্রেমের গান। এই ধূয়া গান ফরিদপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত আছে। এই ধূয়া গানের ভিতর অনেক রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বা দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীতও প্রবিষ্ট হইয়াছে।

গীতা ও বাইবেল

শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা হিন্দুদিগের একখানি অপূর্ব্ব উপাদেয় ধর্ম্ম গ্রন্থ। কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপদেশ প্রদান উপলক্ষে শ্রীভগবান ইহাতে জগতের জীবকে কর্ম্মযোগের শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান কি ভাষায় শ্রীমান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা জানিবার আমাদের সুযোগ সুবিধা না থাকিলেও ভগবান বেদব্যাস গীতাতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই আমরা প্রকৃত বিষয় অবগত হইয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। ইহা দার্শনিকভাবে ও ভাষায় লিখিত হইলেও কাব্য হিসাবেও অতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে এমন আর একখানি গ্রন্থ আছে কি-না সন্দেহ। সমস্ত উপনিষদ মন্থন করিয়া উহার সার ভাগ ইহাতে গ্রহণ এবং দর্শন চতুষ্টয়ের (সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তের) সমন্বয় করা হইয়াছে। অপর দুই দর্শনের উল্লেখ ইহাতে বিশেষ দেখা যায় না। হিন্দুস্থানে গীতার আদর চিরদিনই আছে, অধুনা পাশ্চাত্য দেশেও ইহা তুল্যরূপে সমাদৃত। গীতার অসংখ্য অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনি বাহির হইয়াছে এবং বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গীতার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং গীতা সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

হিন্দুদিগের বেদের ন্যায় খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল। ইহা দুই অংশে বিভক্ত যথা—প্রাচীন বিধি (Old Testament), নব বিধান (New Testament)। প্রথম ভাগে সৃষ্টিবিবরণ, মুশা-সংহিতা, রাজাদিগের ও ভবিষ্যদ্বাদী সাধুদিগের বিবরণ, অন্যান্য বিবরণ প্রভৃতি সন্নিবেশিত আছে। দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ নব বিধানে ভক্তাবতার পরমযোগী শ্রীখ্রীষ্টের জীবনী, অলৌকিক কার্য্য, উপদেশ ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার লিপিবদ্ধ আছে। উহাতে খ্রীষ্ট শিষ্য ও ভক্তদিগের কার্য্যবিবরণও আছে। উহা পৃথকভাবে চার ব্যক্তি কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের তিরোভাবের বহু (ন্যূনাধিক অর্দ্ধ শতাব্দী) পরে সুসমাচার (Gospel) নামে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিরচিত। প্রথম মথি (Mathew), দ্বিতীয় মার্ক (Mark), তৃতীয় লুক (Luke), চতুর্থ জন (John) লিখিত সুসমাচার পর পর প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিনখানি বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া খ্রীষ্টান সমাজে গৃহীত। জন লিখিত সুসমাচারে খ্রীষ্টের ধর্ম্মমতের আধ্যাত্মিকতার দিক হইতেই বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বড় কিছু নাই। ইহার ভাষা ও ভাব পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অন্যগুলির ন্যায় সরল নহে এবং ইহা খ্রীষ্টের অশিক্ষিত শিষ্যবৃন্দের উপযোগী ছিল বলিয়াও মনে হয় না।

মথি ও জন খ্রীষ্টের দ্বাদশ জন শিষ্যের অন্তর্গত, মার্ক ও লুক নহে। মথি-লিখিত সুসমাচারই সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হয়। পরে মার্ক ও লুক উহারই অনুসরণে নিজ নিজ সুসমাচার লিপিবদ্ধ করেন। ইঁহাদের সুসমাচার পড়িলে প্রায়শঃ মথির অবিকল প্রতিলিপি বলিয়া মনে হয়, সুতরাং ঐ দুই ব্যক্তির খ্রীষ্টের কার্য্য ও উপদেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। লুকে অবশ্য মথি অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুই-চারিটি অতিরিক্ত অলৌকিক কার্য্য বর্ণিত আছে। দুঃখের বিষয়, ইহাতেও শ্রীখ্রীষ্টের শ্রীমুখের উক্তি জানিবার আমাদের কোনও উপায় নাই। তাঁহার উপদেশ তিনি কিম্বা সেই সময় অন্য কেহ যথাযথভাবে ও তাঁহার ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। বহুদিন (ন্যূনাধিক অর্দ্ধ শতাব্দী) পরে মথি প্রথমে উহা লিপিবদ্ধ করেন। আরও দুঃখের বিষয়, কোন সুসমাচারই খ্রীষ্টের ভাষায় অর্থাৎ হিব্রু ভাষায় লিখিত নহে। চারখানিই গ্রীক ভাষায় লিখিত। সৌভাগ্যক্রমে পরে উহার ইংরেজী অনুবাদ বাহির হওয়ায় আমাদের জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। তবে 'তিন নকলে আসল ভ্যাস্তা' হইলেও তাঁহার ভাষা না হউক, ভাবটা আমরা ধরিতে পারি।

এই প্রবন্ধে আমরা গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ও নববিধানের

শ্রীখ্রীষ্টের উক্তি তুলনা করিয়া দেখাইব যে, উহাদের মধ্যে বর্ণে বর্ণে না হইলেও ভাব-গত এত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে যে, দেখিলে হঠাৎ মনে হয় একের দ্বারা অন্যে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। সত্য বটে মহাকবিদিগের ন্যায় মহাপুরুষদিগের ভাবধারা তুল্যরূপ; কিন্তু যদি দেখা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তীর উক্তি সকল জানিবার সুযোগ সুবিধা পরবর্ত্তীর ছিল তবে ঐরূপ ধারণার আর স্থান থাকে না। কিন্তু ঐরূপ তুলনা করিবার সময় একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়সখা ও অনুগত শিষ্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ক্ষত্রিয় রাজপুত্র শ্রীমান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং উহার ভাব ও ভাষা দার্শনিক হইবারই কথা। পক্ষান্তরে, ভক্তাবতার ঈশা তাঁহার অশিক্ষিত ধীবর শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাদের সহজবোধ্য করিবার জন্য প্রাকৃত কথায় ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইয়াছিল। এ অবস্থায় উভয়ের ভাষার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মূল নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

নিম্নে উভয় গ্রন্থের সুবিদিত স্থল হইতে বঙ্গানুবাদসহ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
(গীতা, ২।৫৯)

ভোগের অভাবে ভোগ্যের নিবৃত্তি
রসের নিবৃত্তি নয়,
আত্ম দরশন হইলে তখন
রসের (ও) নিবৃত্তি হয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
(গীতা, ৩।৬)

কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমী যে ভোগ্যবস্তু ভাবে মনে,
মূঢ় সেই, সবে তারে মিথ্যাচারী বলি গণে।

এখানে মূল নীতির কথাই বলা হইয়াছে—

Whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. (Matthew, v, 28)

চাহে নারীপ্রতি যেবা কামাকুল মন
অন্তরেতে ব্যভিচার করেছে সে জন।

এখানে দৃষ্টান্ত দ্বারা মূল নীতি বুঝান হইয়াছে।

ভোগের অভাবে ভোগ্যবস্তুর নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং ভোগস্পৃহা রহিয়া যায় এবং উহা দ্বারাই মন কলুষিত হইয়া কায়িক না হউক মানসিক ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে। ফল উভয়েরই সমান।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
(গীতা, ৩।২৬)

কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ না করিবে,
আপনি আচরি কর্ম্ম বিজ্ঞ সবে শিখাইবে।

এখানে ফলের কথা বলা হয় নাই।

Give not that which is holy to the dogs, neither throw ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.
(Matthew, vii, 6)

দিও না পবিত্র যাহা সারমেয়গণে,
ফেলো না মুকুতা তব শূকর সদনে;
পায়ে দলি পাছে, তারা করে উহা নাশ,
ফিরিয়া তোমারে পুন করয়ে বিনাশ।

এখানে ফলের কথাও বলা হইয়াছে।

নিম্নাধিকারীকে উচ্চাধিকারের কথা বলিলে হিতে বিপরীত হইবারই সম্ভাবনা।

প্রঃ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥
(গীতা, ৩।৩৬)

উঃ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
(গীতা, ৩।৩৭)

আচরে পুরুষ পাপ নিয়োগে কাহার,
নাহি ইচ্ছা তবু যেন বলে দুর্নিবার ?
রজোগুণ সমুদ্ভূত কাম ক্রোধ হয়,
অত্যুগ্র দুষ্পূর বৈরী কামনা নিশ্চয়।

The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (Matthew, xxvi, 41)

জীব চায় উঠিবারে, টেনে রাখে দেহ তারে।

ভাবার্থ—আলোকের জীবদেহী আলোকে থাকিতে সে ত চায়,
আঁধার দেহের ধর্ম্ম আলোক দেখিলে ভয় পায়।

পুণ্য কর্ম্ম করিবার সময় আমাদের দেহ আমাদের আত্মার সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারে না পরন্তু অধিকাংশ সময় আত্মার ভার বোঝা হইয়া সৎকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। অর্থাৎ জীব স্বাধীন থাকিলে সৎকার্য্যই করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু দেহ উহাতে অনিচ্ছা ও অপারগতা প্রকাশ করিয়া কার্য্য হানি করিয়া থাকে।

সংক্ষেপে—জীবের প্রবৃত্তি সৎপথে, দেহের প্রবৃত্তি অসৎপথে।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥
(গীতা, ৬।৩২)

সকলের সুখ দুঃখ নিজ তুলনায়,
যে দেখে পরম যোগী জানিবে তাহায়।

...all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them :
(Matthew, vii, 12)

অন্যের নিকটে চাহ যথা আচরণ
তাহাদের প্রতি তুমি করহ তেমন।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
(গীতা, ৭।৩)

সহস্রের মধ্যে কেহ সিদ্ধিতরে যত্ন করে,
তার মাঝারে কচিৎ কেহ তত্ত্ব আমার জান্‌তে পারে।

Many are called but few are chosen.
(Matthew, xxii, 14)

আহূত অনেকে হয়, মনোনীত বহু নয়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
(গীতা, ৯।১১)

মানুষ বলিয়া মূঢ় ভাবয়ে আমারে,
ভূতেশ্বর ভাব মোর জানিতে না পারে।

And blessed is he, whosoever shall not be offended in me. (Matthew, xi, 6)

ধন্য সেই কভু যার নাহি অবিশ্বাস মোরে।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥
(গীতা, ৯।২৮)

শুভাশুভ কর্ম্মপাশে পাইয়া নিস্তার,
সন্ন্যাসযোগেতে লাভ হইবে আমার।

So likewise, whosoever he be of you that renounceth not all that he hath, he cannot be my disciple. (Luke, xiv, 33)

তোমাদের মাঝে যেবা পারিবে না
ত্যাজিবারে সর্ব্বস্ব তাহার,
সে কভু নারিবে শিষ্য হইতে আমার।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
(গীতা, ৯।২৯)

ভক্তি সহকারে যেবা ভজয়ে আমায়,
আমাতে তাহারা থাকে আমি থাকি তায়।

The father is in me and I in him.
(John, x, 38 ; xiv, 10)

আমাতে থাকেন পিতা আমি থাকি তায়।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্তেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
(গীতা, ১০।৩)

অজাত অনাদি মোরে লোকমহেশ্বর,
মোহ, পাপে, মুক্ত সেই জানে যেই পর।

But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins.

(Mark, ii-10)

জ্ঞান সবে অধিকারী মানবকুমার,
ক্ষমিতে পাতক যত জগতে সবার।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥

(গীতা, ৭।২৬)

অতীত ভবিষ্য আমি বর্ত্তমান জানি,
আমারে না জানে পার্থ জগতের প্রাণী।

All things are delivered to me of my father : and no man knoweth who the Son, is but the father ; and who the father is, but the son, and he to whom the son will reveal him.

(Luke, x, 22)

সকল (ই) আমারে পিতা বুঝায়ে দেছেন আনি,
তনয়ে জানেন পিতা আমিও পিতারে জানি।
(আর) সে জানে জানাই যারে, নাহি জানে অন্য প্রাণী।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

(গীতা, ৮।১৪)

যে সদা অনন্য চিত্তে স্মরয়ে আমায়,
নিত্যযুক্ত যোগী সেই সুখে মোরে পায়।

My yoke is easy and my burden is light.

(Mat ew, xi, 30)

হালকা অতি আমার বোঝা,
আলগা যোয়াল বইতে সোজা।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

(গীতা, ৯।১০)

নিয়োগে আমার প্রকৃতি প্রসবে
চরাচর সমুদয়,

এই সে কারণে হয় বারে বারে
জগতের স্থিতি-লয়।

All power is given unto me in heaven and in earth. (Matthew, xxviii, 18)

স্বর্গে, মর্ত্ত্যে যত অধিকার প্রদত্ত আমার।

সমঃ শত্রৌচ মিত্রে চ·········।
···········ভক্তিমান যে প্রিয়ো নরঃ॥

(গীতা, ১২, ১৮।১৯)

শত্রু মিত্র সম যার প্রিয়ভক্ত সে আমার।

Love your enemies. (Matthew, v, 41)

ভালবাস বৈরী কুলে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

(গীতা, ১৬।১৮)

অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধভরে
দ্বেষী নিজ পরদেহে মোরে হিংসা করে।

If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household. (Matthew, X, 25)

সয়তান বলিয়া যদি হয় অভিহিত,
গৃহস্বামী, লোক তার হইবে কি মত?

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥

(গীতা, ১৮।৫৭)

আমাতে অর্পিয়া চিত্ত বিবেক কৌশলে,
মচ্চিত্ত মৎপর হও বুদ্ধিযোগ বলে।

If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me (Mark, viii, 34)

কেহ যদি মোর সাথে আসিবারে চায়,
ভুলে যাক আপনারে, ধরিয়া মাথায়
আপদ, বিপদ, যেন মোর পাছে যায়।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ *
(গীতা, ১৮।৬২)

তাঁহার (ই) শরণ পার্থ লহ তুমি সর্ব্বভাবে
চিরশান্তি নিত্যধাম প্রসাদে তাঁহার পাবে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ *
(গীতা, ১৮।৬৬)

সর্ব্বধর্ম্মত্যজি একা আমার আশ্রয় ধর,
সর্ব্বপাপে তরাইব শোক তুমি নাহি কর।

Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
(Matthew, xi, 28)

পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত তোমরা যে জন,
দিব শান্তি সবে লহ আমার শরণ ॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং নচ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥
(গীতা, ১৮।৬৭)

তপস্যা শুশ্রূষাহীন অসূয়া আমায়,
অভক্ত যে জন গীতা না শুনাবে তায়।

And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. (Matthew, x, 14)

না হ'লে আদৃত সেথা সবে,
না শুনিলে কথা তোমাদের,
ত্যজিবার কালে সেই স্থান
ঝেড়ে ফেলো ধূলি চরণের।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতংচরাচরম্ ॥
(গীতা, ১০।৩৯)

সকল ভূতের পার্থ আমি মূলাধার,
আমি বিনা চরাচরে নাহি কিছু আর।

খ্রীষ্ট সম্বন্ধে প্রিয় শিষ্য জনের উক্তি :—

Allthings were made by him ; and without him was not any thing made that was made.
(John, 1, 3)

তাঁহারি রচিত বিশ্বচরাচর সমুদয়,
নাহিক কিছুই আর যাহা তাঁর করা নয়।

ইহা গীতার এই শ্লোকের অনুবাদ বলিয়া ভ্রম হয় না কি ?

অতঃপর আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

কৈফিয়ৎ

সেকালে অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় ভদ্রঘরের শিক্ষিত বহু যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া স্বৈরাচারী হইতেন। সে সময়ে গীতা ও বাইবেলের তুলনামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু একালে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এখন আর শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে প্রায় কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে না। এ অবস্থায় বর্ত্তমানকালে ঐরূপ প্রবন্ধ লিখিবার আবশ্যকতা কি, তৎসম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন মনে করি।

পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের স্কুল কলেজেই কেবল বাইবেল পড়ান হইত ; বর্ত্তমানে খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান উভয়বিধ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক-তালিকায় বাইবেলও অবশ্যপাঠ্যরূপে স্থান পাইয়াছে। ইহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তির কারণ নাই, যেহেতু নীতিশিক্ষার দিক দিয়া দেখিলে বাইবেল একখানি উৎকৃষ্ট নীতি পুস্তক। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষেও ইহা বিশেষ উপযোগী ; কারণ ইহার ইংরেজী সরল, সুখপাঠ্য ও বিশুদ্ধ। আরও সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য পাঠ করিতে হইলে যেরূপ রামায়ণ মহাভারত পাঠ করা আবশ্যক, সেইরূপ ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিতে বাইবেল পড়া আবশ্যক। তবে একটা কথা এই যে, বাইবেল শুধু নীতি পুস্তক নয়, উহা খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকও বটে। যদি বাইবেলের ন্যায় আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ গীতাও পড়ান হইত তাহা হইলে আমাদের কোন কথাই বলিবার থাকিত না, কিন্তু তাহা হয় না এবং হইবারও উপায় নাই। এ অবস্থায় যাহাতে আমাদের তরলমতি বালকবালিকাগণ কেবলমাত্র

* এখানে 'তম্', 'মাম্' ও 'me' ঈশ্বরবাচক।

বাইবেল পাঠ করিয়া ভ্রমবশত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ফেলে, ইহা নিবারণের জন্যই এইরূপ প্রবন্ধ লেখার ও প্রচারের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

এবারে আমরা গীতার উপদেশের সহিত বাইবেলের উপদেশের তুলনা করিয়া উহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বারান্তরে ঐরূপ সাদৃশ্যের কারণ কি, খ্রীষ্টের প্রচারিত মতবাদ কি, ঐ মতবাদের মূল উৎস কোথায়, উহা ইহুদি ধর্ম্মের (Judaism) আবরণে বৈদিক ধর্ম্ম কি-না, গীতার মতবাদ ও খ্রীষ্টের প্রচারিত মতবাদ একই উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া দেশ, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে কি-না ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পূর্ব্বে সময়ে সময়ে গীতা ও বাইবেল সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে, উহাতে বাল্যকালে খ্রীষ্টের ভারতে আগমন এবং তথায় মহাত্মাদিগের নিকট বৈদিকধর্ম্মের শিক্ষালাভ মন্তব্য করা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সমস্ত মন্তব্য উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা অসমর্থিত, দুর্ব্বল অনুমানের (presumtion) উপর স্থাপিত। এরূপ আলোচনায় উপকার ত হয়ই না, বরং উহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়া অপকার হইবারই সম্ভাবনা।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, খ্রীষ্ট প্যালেষ্টাইনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার পুনর্জ্জন্ম ভারতেই হইয়াছিল; তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন ভারতেই গঠিত সুতরাং তিনি আমাদিগের মহাত্মাদিগের মধ্যেই অন্যতম এবং ভারতীয় ধর্ম্মমত স্বদেশীয় ধর্ম্মমতের (Judaism) আবরণে কেবল স্বজাতিদিগের মধ্যেই প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যদিগকেও উহা অন্যত্র প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার পশ্চাতে যাইবার আমাদের কোন কারণ বা প্রয়োজন নাই। আমরা আশা করি, শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের এই মত ধর্ম্মাধিকরণে গ্রহণযোগ্য, প্রমাণ শাস্ত্রানুমোদিত, সন্তোষজনক প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিতে সক্ষম হইব।

বাদল-বাসর

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

বনে কে জ্বালিলে খদ্যোত-দীপিকা!
কোন্ পথিক প্রিয়ের লাগি দোলাইলে শাখে শাখে
আলোকের আহ্বান লিপিকা!

যদি আসিতে কানন-পথে বঁধুয়া হারায় দিশা
আঁধারে নয়ন তার না চলে
অভিসার সঙ্কেত ক্ষীণ দীপশিখা তাই
ঢাকিয়া রেখেছ বুঝি আঁচলে!

ওগো, হের গৃহ দীপ মোর তিলেক না রহে থির
রুদ্ধ দুয়ার মম ভবনে
কাঁপিয়া কাঁপিয়া হায় নিভে যায় বারে বারে
উতল অধীর ঘন পবনে।

বল কে তুমি মায়াবিনি, কোন্ যাদু মন্তরে
কোন্ ইন্ধন হবি ঢালিয়া
ক্ষীণ ওই দীপাবলি বাদল-ব্যাকুল বনে
রেখেছ অনিরবাণ জ্বালিয়া!

হেন ঘন ঘোর বরষায় স্মরণে জেগেছে কিগো,
এমন বাদল দিনে দয়িত
মুগ্ধ কপোত সম কূজনে ও গুঞ্জনে
কানে কানে যত কথা কহিত!

ধীরে তরল সে মুখরতা অনুরাগ ঘন হ'য়ে
আলসে আবেশ ভরে থামিত,
আঁখিতে মিলিত আঁখি, রুধিয়া কথার পথ
অধরে অধর আসি নামিত।

কেন দীর্ঘ নিশ্বাস তব কাননে তুলেছে ঝড়,
অঝোরে নয়নধারা ঝরিছে,
কোন দিন হেন বেলা কোন অনাদর হেলা
ক্ষণে ক্ষণে মনে কিগো পড়িছে?

ভয় চকিতা মৃগীর সম কভু কি চাহিয়াছিলে—
বিজলী উঠিলে মেঘে চমকি
লুকাতে বঁধুর বুকে, নিরদয় অভিমানে
দূরে সরেছিল প্রিয়তম কি?

হের, তোমার ব্যথায় ওই আঁধার ঘনায়ে এলো
বিষাদে ভুলিল হাসি দামিনী,
দীপালি মলিন হ'ল, নিঠুর এ অভিমানে
ব্যর্থ ক'র না হেন যামিনী!

ওগো, কি হবে অতীত কথা স্মরিয়া
এ মধু মিলন ক্ষণে কেতকী কদম রেণু
পড়ুক তাহার 'পরে ঝরিয়া।

শ্রীচরণদাসঘোষ

এক

বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক কোথাও পড়িয়াছে, কোথাও বা পড়ি-পড়ি করিতেছে, এমন সময়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এক বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ ত্রিবর্ণ বসন্তের এক পরিচ্ছন্ন ঊষায় শয্যাত্যাগ করিতেই ভিক্ষুরা আসিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। তারপর তাহারা সমস্বরে কহিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!"

ত্রিবর্ণ হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াই বাহিরে পুষ্পোদ্যানে আসিলেন—তাঁহার পরিধানে হরিদ্রা-বস্ত্র, গাত্রে হরিদ্রা-উত্তরীয়। ভিক্ষুরাও তাঁহার অনুসরণ করিল।

উদ্যানের একান্তে এক প্রস্তর-বেদী, তাহার পার্শ্বে স্তূপীকৃত বিল্বপত্র। মঠের নিয়ম—প্রতিদিন এই সময়ে ভিক্ষুরা জড় হইয়া অধ্যক্ষের হাত হইতে অনুমতি স্বরূপ এক-একটি বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া দিবসের প্রচারকার্য্যে চলিয়া যায়। ত্রিবর্ণ বেদীর উপর উপবেশন করিলেন এবং ভিক্ষুরা একে-একে অগ্রসর হইয়া বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। একজন মাত্র বাকী আছে, এমন সময়ে একটি ভিক্ষুণী প্রবেশ করিল। মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ। তাহার আকৃতি সংযম-কঠিন, মুখের গড়ন—নিখুঁত, রূপ—সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া। মস্তক অবনত করিয়া ত্রিবর্ণের পদস্পর্শ করিয়া কহিল, "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—"

ত্রিবর্ণ স্মিতমুখে হাত তুলিয়া যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিলেন, তারপর কহিলেন, "আদেশ ফিরিয়ে নিলাম।"

মেয়েটি বিস্ময়ে তাকাইতেই ত্রিবর্ণ কহিলেন, "প্রয়োজন নেই!"

"প্রয়োজন নে-ই?"

"না, কৌমুদি! নগরে বসন্ত-উৎসব!"

মেয়েটির নাম বিজ্ঞান-কৌমুদী, মঠে সে 'কৌমুদী' বলিয়াই অভিহিতা। ভিক্ষুণীদের ভিতর সে অগ্রণী।

কৌমুদী জানিতে চাহিল—"বাধা পড়বে?"

ত্রিবর্ণ সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন। কহিলেন, "তা' নয়! তুমি নারী!"

কৌমুদী মাথা নীচু করিল। একটু পরেই মাথা তুলিয়া কহিল, "অধিকার আপ্‌নি ত দিয়েছেন!"

মায়ের কোলে উঠিয়া শিশু যেমন করিয়া হাসে, তেম্‌নি করিয়াই হাসিয়া ত্রিবর্ণ জবাব দিলেন, "দিয়েছি সেইখানে, যেখানে তুমি—সকলের মা!"

কৌমুদী বিভ্রান্তনেত্রে ত্রিবর্ণের দিকে তাকাইল, যেন বা কথাটা সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই।

ত্রিবর্ণ তৎক্ষণাৎ অর্থ করিয়া দিলেন—"অর্থাৎ যেখানে সকলেই—মানুষ!"

কৌমুদী হাসিয়া কহিল, "মানুষ কি ওরা নয়?"

"এখনও হয়নি, ওরা—ভাগ্যহীন! ওদের চোখে তুমি লোভের বস্তু!" বলিয়াই ত্রিবর্ণ একটি বিল্বপত্র তুলিয়া লইয়া ভিক্ষুটিকে কহিলেন, "অঞ্জন, অনুমতি—"

অঞ্জন হাত পাতিল।

ত্রিবর্ণ তাহার চোখে চোখ মিলাইয়া কহিলেন, "নগরে যাবে—" বলিয়া অঞ্জনের হাতে বিল্বপত্রটি ফেলিয়া দিলেন। দিয়াই কহিলেন, "এখন নয়—অপরাহ্নে?"

অঞ্জন বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই ত্রিবর্ণ কহিলেন, "শোনো—" বলিয়াই কি যেন একটা বক্তব্যকে অকথিত রাখিয়া চিন্তিতভাবে উঠিয়া পড়িলেন এবং কুসুমিত লতাপল্লবের ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর গিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর স্নিগ্ধনেত্রে অঞ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রচারের কাযে নয়—অপরাহ্নে তোমাকে নগরে যে'ত হবে একজনকে আমন্ত্রণ করতে!"

"কাকে?"

অঞ্জন বিস্ময়ে তাকাইতেই ত্রিবর্ণ কহিলেন, "কঙ্কণ, নগরের ভার অর্পণ করবো—তারই ওপর!"

"কে তিনি?"

"এক তরুণ শ্রেষ্ঠীকুমার—তার মুখে পদ্মের পবিত্র প্রভা প্রতিভাত, চোখে চাঁদের আলো, দেহে রবির রূপ!"

অঞ্জন মূঢ়ের ন্যায় বলিল, "ওরা—"

ত্রিবর্ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা' জানি! ওরা ভোগী—গৃহী—কিন্তু, তুমি ত জানো অঞ্জন—তিনিও ছিলেন রাজার দুলাল!"

অঞ্জন আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। শুধু সংশয়ম্লান কণ্ঠে কহিল, "যদি না আসে!"

বুঝিবা তাহাকে নিশ্চিন্ত করিতে গিয়াই ত্রিবর্ণ তৎক্ষণাৎ সহাস্যে জবাব দিলেন, "আসবে! তার অন্তরাত্মা যে আমার কাছে হাত পেতেছে!" কথা শেষ করিয়া তিনি আর দাঁড়াইলেন না।

অঞ্জন কিয়ৎক্ষণ আবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর করপল্লবস্থ বিল্বপত্রটির উপর চোখ পড়িতেই ত্রস্ত হইয়া চলিয়া গেল—এ যে অধ্যক্ষের আদেশপত্র—শুধু অনুমতি ত নয়!

দুই

নগরে উৎসব লাগিয়াছে। বসন্ত উৎসব!—ঋতুরাজের নির্লজ্জ আবাহন!

চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া নরনারীর ফাগুন আগুনে মাতামাতি উৎসবের প্রধান অঙ্গ—সুরা আর নারী। পুষ্পবাটিকায়, পথেঘাটে সরোবরবক্ষে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের অধিবাসীর বিভিন্ন আয়োজন। বাধা নাই, বাঁধন নাই, নিষেধ নাই—অপ্রতিহত বিচিত্র বিলাসের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে অঙ্গনে। কোথাও চলিয়াছে অশ্রান্ত নৃত্য, কোথাও উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত, কোথাও বা অফুরন্ত রঙ্গরস ও হাস্যকৌতুক? নগরের প্রতি পথে উভয় পার্শ্বের প্রত্যেক বিপণি বিচিত্র শৃঙ্খলায় সাজানো সারি সারি দোকান—ফলফুল, মিষ্টান্ন, রত্ন, অলঙ্কার, জীবজন্তু—নানাবস্তুর।

যে-রাস্তাটা রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া নগরের তোরণে আসিয়া ঠেকিয়াছে, সেই রাস্তায় আকস্মিক এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তখন বেলা পড়িতে সুরু হইয়াছে, রৌদ্রে ততটা ঝাঁঝ নাই। একটি মিষ্টান্নের দোকানের সম্মুখে ব'ছর ছয়েকের একটি ছেলে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহার দেহ শীর্ণ, মাথায় রুক্ষ কেশ, পরিধানে ছিন্ন-মলিন বস্ত্র। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে তাহার ঠিক নাই, হঠাৎ চারিদিক ছাপাইয়া বহু কণ্ঠের কলরোল আসিল—'রাজা আস্‌ছেন!' 'রাজা আস্‌ছেন!' সঙ্গে-সঙ্গে পথের সমস্ত পথিক উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া ছিট্‌কিয়া রাস্তা ছাড়িয়া দিল, কিন্তু ছেলেটির সেদিকে হুঁস্ নাই। দেখিতে-দেখিতে অদূরে অশ্বপদ ধ্বনি শ্রুত হইল এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই একজন অশ্বারোহী রাজ-সৈনিক তীরবেগে পথের ধূলা উড়াইয়া আসিয়া ছেলেটির সুমুখে পড়িয়া গেল ও পথে তাহাকে দেখিয়াই ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার কঠোর আদেশের সঙ্গে তাহার পিঠে এক কশাঘাত করিয়া আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

মিষ্টান্নের দোকানটির পাশেই একটি প্রমোদশালা ছিল। রাজদর্শনের লোভেই হোক্, অথবা রাস্তার ভিড়-ভাঙার আতঙ্ক-দৃশ্যটা দেখিবার জন্যই হোক্—তথাকার সমস্ত দর্শকের চক্ষুই তখন পথের দিকে ফিরিয়াছিল, ছেলেটি পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই তথা হইতে একটি দিব্যদর্শন যুবক ছুটিয়া আসিয়া ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইল—যেন এক তরুণ কান্ত দেবদূত! তাহার অঙ্গে রত্নখচিত পরিচ্ছদ, চক্ষে অসাধারণ দীপ্তি, মুখে অভয় সত্যের স্তব-স্তুতি! তাড়াতাড়ি দোকান হইতে মুঠি ভরিয়া মিষ্টান্ন তুলিয়া লইয়া ছেলেটির হাতে গুঁজিয়া দিয়াই মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

মুহূর্ত্তেই রাস্তার দুই পার্শ্বে আবার আনন্দ কোলাহল উঠিল—'রাজা', 'রাজা!'

যুবকটি ছেলেটিকে বুকে করিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল—অদূরেই পাশাপাশি তিনটী অশ্ব, মাঝে একটী পঞ্চ-কল্যাণযুক্ত শ্বেত অশ্বে বসিয়া রাজা—দীর্ঘদেহ এক তরুণ নৃপতি! তাঁহার একপার্শ্বে একজন আরোহী মস্তকে ছত্র ধরিয়া, অপর পার্শ্বের আরোহিটীর হস্তে চামর।

এম্‌নিই সময়ে আর একটী যুবক পার্শ্বের ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া প্রথমোক্ত যুবকটীর হাতে একটান দিয়াই ত্রস্তকণ্ঠে ডাকিল, "কঙ্কণ, কঙ্কণ—"

কিন্তু কঙ্কণের সেদিকে দৃকপাত নাই।

পুনশ্চ আর একবার ব্যাকুল কণ্ঠের ডাক পড়িল—"শীঘ্র সরে এসো—"

তথাপি কঙ্কণ সেই রাজ-আগমন দৃশ্যের দিকে চোখ পাতিয়া তেমনিই তন্ময়।

দেখিতে-দেখিতে অশ্ব তিনটী কাছে আসিয়া পড়িল। তিনজন অশ্বারোহীর তিনজোড়া রক্ত চক্ষু বিদ্যুৎ চমকের মত কঙ্কণের উপর পড়িয়া যেমন পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যাইবে, অমনি সে লাফ দিয়া সুমুখে পড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে রাজ-অশ্বের লাগাম ধরিয়া রাজাকে বলিয়া উঠিল, "প্রশ্ন রয়েছে—"

রাজার চোখ দিয়া যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইল—অপমান! পার্শ্বচরেরা চম্‌কিয়া উঠিল! উভয় পার্শ্বের ভিড় হইতে অস্ফুষ্ট আতঙ্কধ্বনি বাহির হইল। রাজা বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, "কি প্রশ্ন?"

"রাজপথ কার?"

"পথ ছাড়ো—"

"না। জবাব দিন—রাজার, না, রাজার যারা আশ্রিত—তাদের?"

'একজন পার্শ্বচর কহিল, "রাজার!"

কঙ্কণ তাহাকে অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠে ভৎ র্সনা করিল, "তুমি চুপ কর, তুমি রাজার অন্নদাস—প্রশ্ন তোমাকে করিনি!" রাজার দিকে ফিরিয়াই বুকের ছেলেটীকে একহাতে রাজার চোখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কশাক্ষত পিঠ দেখাইয়া কহিল, "চেয়ে দেখুন—আপনার রাজগর্ব্ব! আপনার অশ্বারোহী পথরক্ষী এম্‌নি কোরেই আপনার পথ মুক্ত করেছে!"

রাজা সদম্ভে জবাব দিলেন "রাজ-আজ্ঞা!"

কঙ্কণও প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "চমৎকার! আপনি রাজা—প্রজাপালক—বিচারক!" বলিয়াই পথ ছাড়িয়া দিল।

রাজাও কঙ্কণের উপর পুনরায় অগ্নি-বৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

তিন

কাহার জয় হইল, কাহার পরাজয় হইল—সে আলোচনা এখন থাক্‌। ছেলেটিকে নামাইয়া দিয়াই কঙ্কণ এদিক ওদিক একবার চাহিয়াই আনমনে খানিকটা গিয়াছে, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত যুবকটী একটী বৃক্ষ শাখা হইতে লাফ দিয়া সুমুখে পড়িয়াই তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কঙ্কণ হাসি চাপিতে পারিল না, কহিল "কি দেখছ নন্দন?"

"অপদেবতা কি না?"

"আমিও ভাবছি বুঝি বা বৃন্দাবনেই এলাম নইলে, এখানে 'শাখামৃগ' এল কেমন করে!"

"চিরজীবী হোয়ে থাক্‌ আমার বৃন্দাবন, ধ্বংস হোক তোমার কুরুক্ষেত্র! চল, এইবার বাড়ী—"

কঙ্কণ হাসিয়া কহিল, "এখ্‌খুনি?"

নন্দন প্রবীণের ন্যায় কহিল, "আজ যাত্রা খারাপ!"

"সেকি! রাজ-দর্শন—"

"হ্যাঁ, এইবার রক্তদর্শন!"

কথাটা কাণে যাইবার পূর্ব্বেই কঙ্কণের দৃষ্টি অদূরে কাহার উপর পড়িয়াছিল স্থির হইয়া। ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া সে নন্দনকে কহিল, "দেখদিকিনি চেয়ে, কে একজন—"

নন্দন ঠাহর করিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিল, "একটা কাছাখোলা সন্ন্যিসী!"

"হুঁ!" বলিয়া কঙ্কণ যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তারপর নন্দনের পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক হয়েছে! চলো—"

নন্দন বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "কোথায়?"

"ওইখানে—"

"হেতু?"

"ওকে ফেরাতে হবে।"

নন্দন মাটীতে বসিয়া পড়িল। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, "পদমেকং ন গচ্ছামি! যত হাবাতে কি পড়ে ছাই তোমারই নজরে?"

কঙ্কণ আদর করিয়া নন্দনকে তুলিয়া কহিল, "বল্‌তে নেই! সন্ন্যিসী—মহাপুরুষ!"

নন্দন কৃত্রিম রোষে বলিয়া উঠিল, "তোমার নজরে ওরা এত পড়ে কেন?"

সমস্যা বটে! কিন্তু উপস্থিত যখন পড়েছে—তখন বিহিত একটা করতে হবে ত!

"লাভ?"

"কলহ!"

নন্দন যেন বিশেষ বুঝিয়া জবাব দিল, "মুখরোচক বটে! কিন্তু ওকে ফেরাতে তুমি পারবে না! দেখ, রাজার চেয়েও আমার অধিক ভয়—ওই সব তোমার 'মহাপুরুষকে!'

'বাবাঠাকুর' বলেছ কি, চেয়ে বসেছে—আধখানা রাজত্ব, আর আস্ত এক রাজকন্যে !"

কঙ্কণ সহাস্যে কহিল, "বেশত ! কাছেই ত রাজবাড়ী—দেখিয়ে দেব'খন !" পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, "এক ফন্দি বার করেছি --"

"ওদের কাছে -"

"ছাই, শোনোই না—" কঙ্কণ নন্দনের কাণে-কাণে কি বলিতেই নন্দন আসন্ন এক বিজয়ের গর্ব্বে লাফাইয়া বলিয়া উঠিল, "চলো—"

অতঃপর উভয়ে তাহাদের মনোমত অভিযানে যাত্রা করিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

* * *

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা অগ্রসর হইল সে—অঞ্জন। একমনে চলিয়াছে। উৎসবের রাত্রি—রাস্তায় আলোর অনটন নাই। কি ব্রত গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে, সে জানে, কিন্তু জানে না—কোথায় গিয়া সে ঠেকিবে! লক্ষ্যহীন পথ, তত্রাপি সে নির্ভয়। মুখে গান। ইহাই সে গীতবাণী যে, দিবসের আলোক ধরিয়া দেয়—প্রকৃতির অহঙ্কার; মোক্ষের মুখে যে আলোকবর্ত্ম', তাহা মেলিয়া ধরে রাত্রির কালোরূপ !

এম্‌নি করিয়া কতখানি আসিয়াছে, অঞ্জনের হুঁস নাই, রাস্তার এক বাঁকের মুখে আসিয়া পড়িল। সেখানে কতকগুলি গাছপালা, চারিদিকে আবছাওয়া! তাহারই ভিতর দিয়া তাহার পথ—যাত্রার নির্দ্দেশ। দুই একটী গাছ পিছন করিয়া যেম্‌নি পা ফেলিবে, চমকিয়া উঠিয়া দেখিল—সুমুখেই একটি গাছে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া একটী তরুণী—নারীমূর্ত্তি ! তাহার মুখে আবরণ—নতমুখী !

পথে অবরোধ !

খানিক পিছাইয়া আসিয়া অঞ্জন প্রশ্ন করিল, "আপ্‌নি কে ?"

'মেয়েটী' কথা কহিল না। শুধুই হাত দুইটী জড় করিয়া তাঁহার দিকে প্রসারিত করিল, যেন কি-এক মর্ম্মান্তিক নিবেদন !

অঞ্জন পুনশ্চ কহিল, "রাস্তা ছাড়ুন !"

মেয়েটী এবারেও তেম্‌নি নীরব।

"শুনছেন ?—"

অঞ্জনের মুখের কথাটা শেষ হইতে না হইতেই, 'মেয়েটী' সহসা অঞ্জনের পদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িল।

পায়ে সরীসৃপ ঠেকিলে মানুষ যেমন চমকিয়া লাফ দিয়া পা ঝাড়িয়া সরিয়া আসে অঞ্জনও তেম্‌নি পিছাইয়া আসিয়াই আপন মনে বলিয়া উঠিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—"

'মেয়েটী' হাতে ভর দিয়া ঈষৎ একটু নিজেকে উঠাইয়া একান্ত কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "প্রার্থনা—"

"প্রার্থনা ?"—অঞ্জনের বুকের ভিতর আঘাত পড়িল। এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের সাধনায় সে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে—প্রার্থনায় কাতর জীবকে দেখিয়া সে পিছাইয়া আসিবে কি করিয়া ? অগ্রসর হইয়া কহিল, "নিবেদন করুন !"

"সন্তান---"

দ্বিধা হও বসুমতী ! অঞ্জন থর্‌থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—একি ! পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইল—কোথায় তার মঠ, কোথায় তার অধ্যক্ষ, কোথায় তার 'মহাপ্রাণ ?' সে কি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে ! কিন্তু পা ভাঙ্গিয়া পড়িল—তাহার ধর্ম্মের রীতি ইহা ত নহে ! মৃত্যুর মুখে ভিক্ষু নিজেকে বলি দেয়—পশ্চাৎপদ হয় না ত ! তবে ?

* * * কম্পিতনেত্রে 'মেয়েটীর' দিকে চাহিয়া কহিল, "ক্ষমা করুন !—আমি সন্ন্যাসী—"

মেয়েটীর মাথাটা যেন মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "আর কিছুই না ! শুধু এই একটি রাত্রির জন্য আজ আমি আপনার স্ত্রী—আপনি স্বামী !"

বিষ ! হাতের গোড়ায় যদি বিষ থাকিত, অঞ্জন নিশ্চয়ই তাহা পান করিত ! কিন্তু নাই, সুতরাং সে নিরুপায় ! একদিকে তাহার জীবনে সন্ন্যাস, অপর দিকে ধর্ম্মের নামে এই প্রার্থী ! আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া কণ্ঠে জোর দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—" তার পর মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "এই নাও মা—আজ হ'তে আমিই তোমার সন্তান !"

বলিয়াই যেমন সে মেয়েটীর পদতলে নত হইয়া পড়িতে গেল, একটী গাছের আড়াল হইতে অকস্মাৎ কঙ্কণ বাহির হইয়া অঞ্জনকে ধরিয়া ফেলিল। অতঃপর অঞ্জনের মুখের কাছে মুখ আনিয়া এক মুখ হাস্যোজ্জ্বল আলো ফেলিয়া কহিল, "মা নন্; উনি শ্রীমৎ পিতাঠাকুর !" বলিয়াই আবার হাসিয়া উঠিয়া "মেয়েটীর" মুখের গুণ্ঠন খুলিয়া দিল—সে নন্দন !

অঞ্জন লজ্জায় পড়িয়াছিল ; কি বলিবে, কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া কঙ্কণের মুখের দিকে মূঢ়ের ন্যায় তাকাইতে, কঙ্কণ সুস্থির কণ্ঠে কহিল, "আমরাই ঠকিয়াছি !"

এক বিস্ময় ! অঞ্জন চিত্রার্পিতের ন্যায় মিনিট খানেক চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন ?"

কঙ্কণ এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া জবাব দিল, "যে বস্তু জন্মের মতই ত্যাগ করেছ, তার প্রয়োজনে অবহেলা তাকে তুমি করলে না ! স্ত্রীলোক জেনেও তবুও ঝাঁপিয়ে পড়লে !"

অঞ্জন নতমুখ হইয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, "আমি ভিক্ষু !"

"তুমি নির্ব্বোধ ! এ মাটী তোমার নয় ! এখানে উৎসব—এখানে রাজা !" বলিয়াই কঙ্কণ নন্দনের হাতে এক টান দিয়াই চলিয়া গেল ।

চার

সেই রাত্রেই, দ্বিতীয় প্রহরে সুবৃহৎ এক পুষ্পবাটিকায় উৎসবের এক বিরাট অনুষ্ঠান চলিয়াছিল । সম্ভ্রান্ত মহল—ইঁহারাই এখানকার নির্ব্বাচিত অতিথি । দেখিলেই মনে হয়—অজস্র আলেখ্য, সুন্দর নরনারী—তাহাদেরই মেলা । এই উৎসব আনন্দের মধ্যেও যেন নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিতেছিল—মাত্র একজন—সে কঙ্কণ । একান্তে বসিয়া কি ভাবিতেছিল, সেই-ই জানে ! সম্মুখে, পার্শ্বে, চতুর্দ্দিকে—আসর জুড়িয়া মানুষের কলরব, মানুষের প্রীতি-বিনিময়, মানুষের দৌরাত্ম্য ; কিন্তু একমনে বসিয়া কঙ্কণ—কোনোও দিকে তাহার লক্ষ্য নাই ; আসক্তি নাই—যেন তাহার সৌখীন আত্মা কোথায় নিরুদ্দেশে দৌড় দিয়াছে । এম্‌নিই সময়ে একটি তরুণী ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "একলাটি এখানে থাক্‌তে নেই !"

কঙ্কণ চম্‌কিয়া চাহিল, দেখিল—মেয়েটির অঙ্গে রূপ আর ধরে না, প্রতিভা মুখ বহিয়া ছাপাইয়া পড়িতেছে । কহিল, "আপ্‌নি কে ?"

মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, "নাগরিকা ।"

কঙ্কণ মুখ নামাইল ।

নাগরিকা পুনশ্চ কহিল, "বাসর সাজিয়েছি—উৎসবের রাত্রি ! আসবে না ?"

"না ।"

"না—কেন ?" বলিতে বলিতে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে বিদ্যুতের ন্যায় উভয়ের সুমুখে আবির্ভূত হইল । মুখে তাহার হাসি, চোখে তাহার হাসি !

নাগরিকা বিহ্বল হইয়া পড়িল । হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—'এত রূপ !' পরমুহূর্ত্তেই আবার নিজেকে সংযত করিয়া লইল । আবার কঙ্কণের দিকে ফিরিয়া আড়চোখে চাহিয়া তারপর ওই মেয়েটির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, "ওঃ ! তাই ব-লুন !" আর দাঁড়াইল না ।

হেতু ছিল না, তথাপি কঙ্কণের মুখের উপর যেন এক অপরাধের ছায়া পড়িল । তাড়াতাড়ি নিজেকে সহজ মাত্রায় দাঁড় করাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল, "পারলে আস্‌তে ?"

মেয়েটি যেন কি খোঁচা মারিয়া কহিল, "ছিল ত একজন !"

"চিত্রা—"

"কঙ্কণ—"

এরপর কি জবাব, কহিবার কি কথা—কঙ্কণের যেন জিহ্বাগ্রে আসিয়াই থামিয়া গেল । একদৃষ্টে চিত্রার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিল—'বোসো' !

চিত্রা বসিল, পাশাপাশি—কঙ্কণের হাতটি কোলের উপর টানিয়া । কিন্তু, কথা নাই কাহারো মুখে, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চায়, মুখ টিপিয়া হাসে—আবার মুখ নামায় । এম্‌নি করিয়া কতক্ষণ কাটিয়াছে, তাহা তাহাদের হুঁস্ নাই । যখন হুঁস্ হইল তখন উভয়েই টের পাইল—অবসন্ন কঙ্কণ, আর তাহারই বুকের উপর হেলিয়া পড়িয়া চিত্রার অলস—অবশ দেহ ।

এম্‌নি সময়ে তাহাদের চোখে পড়িল, সুমুখের একটি কুঞ্জে কয়েকজন পুরুষের মধ্যে নৃত্যরতা সেই নাগরিকা !

এই দৃশ্যে যেন বা আগুনের ঝাঁঝ ছিল, কঙ্কণের চোখে আসিয়া লাগিল । তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "চলো—এখান থেকে উঠে যাই—"

"কেন ?"

"দেখ্‌ছ না ?"

চিত্রা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "বেশ্ ত !"

কঙ্কণ কোন জবাব না দিয়াই চিত্রাকে টানিয়া তুলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু, মনোমত স্থান—ইহা আর কঙ্কণের মিলে না। যেখানেই পা বাড়ায়, সেইখানেই সেই একই দৃশ্য—বিভীষিকার সেই একই মৃত্যু মধুর ছবি! কঙ্কণের তাহা চোখে পড়ে, আর অম্‌নি চিত্রাকে সজোরে বুকের কাছে টান দেয় !

এম্‌নিভাবে বহুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া এক পত্রপুষ্পের ছাউনির কাছাকাছি হইতেই, ভিতর হইতে কে একজন ডাকিয়া উঠিল, "কঙ্কণ—"

কঙ্কণ চাহিয়া দেখিল—নন্দন।

ভিতরে এক বিরাট আসর। খণ্ড-খণ্ড মসৃণ প্রস্তর বেদী, প্রত্যেকটির উপর সুচিক্কণ বস্ত্রাবরণ, আর প্রত্যেকটির উপর সাজান নানাবিধ আহার্য্য—এক-একজনের মনোনিবেশ এক-একটি পাত্রের উপর।

নন্দন ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া এর-ওর ঘাড়ে পড়িয়া ভোজনপাত্র ইত্যাদি-প্রভৃতি যথাসম্ভব ফেলিয়া ছড়াইয়া ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তারপর এক ছুটে কঙ্কণের কাছে আসিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "এসো—"। চিত্রার দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে কহিল, "আপনারও যথারীতি—" বাকী কথাটা আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া ভিতরকার পথ দেখাইল।

আপত্তি ছিল না। কঙ্কণ ও চিত্রা নির্দ্দিষ্টপথে অগ্রসর হইল এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াই উভয়ে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—সেই নাগরিকা, এখানেও !

নাগরিকার লক্ষ্য তাহা এড়াইল না। সে চোখের পলকে সকলকে ফুঁড়িয়া আসিয়া কঙ্কণের হাত্‌টা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর চিত্রার দিকে একটিবার আড়চোখে চাহিয়াই মুচকিয়া হাসিয়া কঙ্কণকে কহিল, "স্বাগতং—

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া একটু পিছাইয়া গেল।

মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। নাগরিকা তেম্‌নি করিয়াই কহিল, "ভয় নেই! মেয়েমানুষ বটে—আমরা সস্তা নই !" মুখটি চিত্রার দিকে ফিরাইয়া কহিল, "বলুন ত—হ্যাঁ, কি, না ?"

চিত্রা মুখ নামাইয়া লইল।

এইবার কঙ্কণ কথা কহিল। বলিল, "এখানেও আপ্‌নি ?"

এর সরল জবাব নাগরিকার মুখে যেন প্রস্তুতই ছিল। কহিল, "যেহেতু আপ্‌নিও এখানে।" তারপর চিত্রার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এসো ভাই—" বলিয়াই চিত্রাকে টানিয়া লইয়া গিয়া স্বীয় পার্শ্বে বসাইল। কঙ্কণও যন্ত্র-চালিতের ন্যায় চিত্রার অপর পার্শ্বে গিয়া বসিয়া পড়িল। তখন আর-আর সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইবার পালা পড়িল নন্দনের। বক্তৃতা দিবার ভঙ্গি করিয়া কঙ্কণও চিত্রার পরিচয় দিয়া দিল—"ইনি বর, ইনি কনে—"

উচ্চ হাসিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, "তাই না কি ?"

নন্দন গম্ভীর হইয়া কহিল, "বাকী—মালা-বদল !"

নাগরিকা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "তাও বুঝি লোক-দেখিয়ে !"

চিত্রার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহা চোখে পড়িতেই নাগরিকা যেন এক বিজয়-গর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "পেয়েছি জবাব ?"

পুরুষ-মহল সাগ্রহে জানিতে চাহিল—"প্রশ্নের ?"

"হ্যাঁ !"

"কে ?"

নাগরিকা নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল—"নাগরিকা।"

অপর পক্ষ নাগরিকার দিকে চাহিয়াই ছিল, এইবার যেন তন্ময় হইয়া গেল।

রহস্যটা কঙ্কণকেও আচ্ছন্ন করিল। মূঢ়ের ন্যায় নাগরিকার দিকে তাকাইতেই নাগরিকা একমুখ হাসিয়া কহিল, "শুন্‌বেন ?—এঁরা আমাকে জিজ্ঞেস্ করেছেন—ইহলোকে কাব্যের প্রতিমূর্ত্তি কে ?' আমার জবাব—'অহং !"

"আপ্‌নি ?"

"একশো·বার !—বলিয়াই নাগরিকা কঙ্কণের প্রতি এক মধুর কটাক্ষ করিল। তারপর চিত্রাকে দেখাইয়া যেন এক অকাট্য প্রমাণ দিয়া কহিল, "দেখুন চেয়ে—ওঁর ওই মুখ! উনি 'নারী' আর আমি ওঁর 'বাণী' স্ত্রীলোকের বাক্যই পৃথিবীর কাব্য কিনা!" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

চিত্রা এইবার কথা কহিল। নিছক ভদ্রতার খাতির, তাই—নাগরিকাকে বলিল, "উঠ্‌লেন ?"

নাগরিকা কঙ্কণের পানে একটিবার চাহিয়াই চিত্রার দিকে ফিরিয়া জবাব দিল, "আর একদিন—তাদেরও মন যোগাতে হবে !" বলিয়াই হাসি চাপিয়া বাহির হইয়া গেল। চিত্রার মুখখানা ঘৃণায় বিকৃত হইয়া উঠিল।

ঠিক এম্‌নি সময়ে বাহির হইতে এক ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ আসিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"—

কঙ্কণ চম্‌কিয়া উঠিল, যেন এক অদৃশ্য প্রেতমূর্তি অকস্মাৎ তাহার মুখে ছায়া মেলিয়া দিল। কঙ্কণের সেই আকস্মিক ভাবান্তর চিত্রার দৃষ্টি এড়াইল না। সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

"কিছুই না" বলিয়া কঙ্কণ হাসিবার চেষ্টা করিল।

অতঃপর কঙ্কণ ও চিত্রা উভয়েই চোখ মেলিয়া দেখিল— সুমুখে দাঁড়াইয়া নাগরিকা, তাহার দুই হাতে দুইটি পাত্রে—ফলমূল—মিষ্টান্ন।

নন্দন বলিয়া উঠিল, "আবার চাঁদ উঠেছে !"

কঙ্কণ হাসিয়া নাগরিকাকে কহিল, "তাহলে বলুন— আপ্‌নি মিথ্যুক !"

নাগরিকাও সেই হাসিতে যোগ দিয়া কহিল, "কাব্য কি সত্যি হয় ?" বলিয়া উভয়ের সুমুখে পাত্র দুইটি ধরিয়া দিল।

চিত্রা তখনো স্পর্শ করে নাই, কঙ্কণ মাত্র পাত্রে হাত দিয়াছে—ইত্যবসরে বাহিরে এক কলরব উঠিল। কঙ্কণের হাত আর মুখে উঠিল না, আতঙ্কে তার মুখখানা সহসা রক্তহীন হইয়া গেল !

চিত্রারও বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "অমন হয়ে গেলে ?"

কঙ্কণ জবাব দিল না, যেন তাহার সমস্ত অনুভূতি বাহিরের জন কল্লোলে কখন্ কোন্ ফাঁকে গিয়া মিশিয়া নীরব হইয়াছে।

চিত্রা জেদ্ ধরিল—"বল না ?"

ঠিক এম্‌নি সময়ে একজন বাহির হইতে আসিয়া খবর দিল—এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা এক ভিক্ষুকে ধরিয়া—

স্বামীর পাতে ভাত দিতে আসিয়া স্ত্রীর যদি কাণে যায়—তাহার সন্তান রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়িয়াছে, তখন যেমন সে ভাতের থালা আছড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বাহির হইয়া যায়, ঠিক তেম্‌নি করিয়াই কঙ্কণ উন্মত্তের ন্যায় উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাহার সমস্ত আকর্ষণ !

পাঁচ

প্রথম প্রতিবাদ প্রতিহত করিয়া অঞ্জন সেই যে সোজা রাস্তায় পড়িল, তারপর সে আর বাধা পায় নাই। শান্ত রাত্রির পথঘাট হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু ওই আত্মবিকৃত জনপদের পথে কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, করিলেও ভ্রূক্ষেপ করে নাই। সুতরাং নির্ব্বিবাদেই অঞ্জন এতক্ষণ খুঁজিয়া আসিয়াছে তাহার লক্ষ্যের বস্তু।

ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রাত্রিতে অঞ্জন ওই পুষ্প বাটিকার প্রবেশ পথে আসিয়া পড়িতেই এক নরবাহিনীর লক্ষ্য তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ হইয়া তাহার উপর পড়িল—ভিক্ষু ! তাৎপর তাহাকে ঘিরিয়া যাহা সুরু হইল তাহারই বিবরণ ভিতরের ওই উৎসব-বাসরে এইমাত্র প্রচার হইয়াছে।

কঙ্কণ আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, দেখিল একজন অঞ্জনকে ধরিয়া আছে, আর একজন তাহাকে মুহুর্মুহুঃ বেত্রাঘাত করিতেছে ! মুহূর্ত্তও অপব্যয় হইল না, কঙ্কণ জনতার ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং অনুনয়ের মূর্ত্তি ধরিয়া দুই হাতে এক-একটা লোককে টানিয়া, ছুড়িয়া রাস্তা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; তারপর আততায়ীদ্বয়কে একটানে ঝট্‌কা মারিয়া নিক্ষেপ করিয়া এক হাতে অঞ্জনকে টানিয়া বুকের ভিতর পুরিয়া গুঁজিয়া রাখিল ও অপর হাতে অপরটার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'শয়তান !'

"ও নয়—" সঙ্গে সঙ্গে আর একটী হাত কঙ্কণের প্রসারিত হাতের উপর পড়িল।

কঙ্কণ চাহিয়া দেখিল—একখানি মুখ, রক্তে মাথামাখি ! সে-মুখে অবিশ্রান্ত মিনতি।

পুনশ্চ দাবী আসিল, "ছাড়ো—"

"এরা রাক্ষস !"

অঞ্জন চম্‌কিয়া উঠিল, যেন ওই কলঙ্ক তাহারই মুখে পড়িয়াছে। কহিল, "বলতে নেই ! মানুষ হয়ে মানুষের গায়ে হাত দিয়েছে—ওরা ভাগ্যহীন !"

কঙ্কণের হাতের মুঠি খুলিয়া গেল। আস্তে আস্তে বুক হইতে অঞ্জনকে খুলিয়া ঈষৎ দূরে সরাইয়া দাঁড় করাইয়া

তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। করিয়াই আবার উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষু—"

অঞ্জনের মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। কহিল, "ওদের কিছু বলো না যেন!"

নিষেধ! ক্ষোভে ও দুঃখে কঙ্কণের মুখটা ভারি হইয়া ঝুলিয়া পড়িল। ক্ষণকাল মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত—"

প্রশান্ত কণ্ঠে অঞ্জন জবাব দিল, "ওরা মানুষ, মানুষের এই কলঙ্ক আমি উঠিয়ে নিয়েছি!"

এক পরিচয়হীন বিস্ময়! কঙ্কণ ভাবিতে লাগিল—সেও মানুষ, আর সম্মুখের ওই মূর্ত্তিটা? দেহে এর একদেহ রক্ত, বেত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ফাটিয়া মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মুখে এক পরিপূর্ণ তৃপ্তি! কেন? মানুষের দেহে যে বিষ, তাহাই ও নিজে চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিয়া মানব-সমাজের সকলকেই নির্ব্বিষ করিবে বলিয়া? * * * * নিষ্পলক নেত্রে ওই মূর্ত্তিটার পানে চাহিয়া থাকিয়া ওর এই পরিচয়ই বুঝি বা কঙ্কণ গ্রহণ করিল যে, খাম-খেয়ালি সৃষ্টিকর্ত্তা ঝোঁকে পড়িয়া একদিন কোনো এক অবসন্ন মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে খানিক পাপ, খানিক কলঙ্ক, খানিক আত্মহত্যা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, যাহা মানুষ একদিন আচম্কা লুট করিয়া নিয়াছিল—তিনিই আজ তাহা এই অবোধ ধরিত্রীবাসীর হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া লইতেছেন। অথবা পাপ, কলঙ্ক, আত্মহত্যা—ইহাও প্রয়োজন, মানুষের নয়—সৃষ্টিকর্ত্তার! নতুবা মানুষের রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে আসিয়া মানুষের মুখে মুখ রাখিবার তাঁর সুযোগ মিলে না!

এদিকে ওই রুক্ষ জনতা—উহাও যেন কঙ্কণের দিকে নিঃশব্দে তাকাইয়া আবিষ্টের ন্যায়! ভিক্ষুর প্রতি এই নির্য্যাতন—নূতন নয়, ইহা যেন তাহাদের ধর্ম্মের নির্দ্দেশ, রাজার অনুজ্ঞা। কোনও দিন প্রতিবাদ হয় নাই, বিদ্রোহ উঠে নাই। আর, আজ অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত হইল কেন? কঙ্কণকে সবাই জানে, জানে—ঐশ্বর্য্যে সে নৃপতি, সম্ভ্রমে অদ্বিতীয়! নগরের এক অতি বিশ্বাসী অধিবাসী সে! এ হেন লোক আজ এমন বাঁকিয়া দাঁড়াইল কেন, কোন হিসাবে? প্রত্যেকেরই হৃদ্‌পিণ্ডে যেন হাতুড়ির আঘাত পড়িতে লাগিল—কেন? * * *

একটু পরেই একজন লোক কঙ্কণের কাছে আসিয়া কহিল, "ও ভিক্ষু!"

কঙ্কণের চমক ভাঙ্গিল। আস্তে-আস্তে মুখ তুলিয়া লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল।

লোকটা পুনশ্চ কহিল, "আমাদের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য! ও তার শত্রু!"

কঙ্কণের মুখখানা সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কহিল "আর মানুষের ধর্ম্মে তোমরা ঘাতক!"

ঠিক এই সময়ে কোথা হইতে এক খণ্ড পাথর সজোরে আসিয়া অঞ্জনের মাথায় লাগিতেই সে ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

কঙ্কণ আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দেখিল—তাহার চেতনা নাই!

অতঃপর যেমন করিয়া নিপুণ চিত্রকর তাহার সমস্ত ছবিটার পানে চোখ ফেলিয়া তন্ময় হইয়া থাকে, ঠিক তেম্‌নি করিয়াই কঙ্কণ সেই বান্ধবহীন "রণক্ষেত্রে" এক সার্থক মানব মূর্ত্তির দিকে নির্নিমেষ নেত্রপাত করিয়া রহিল। কতক্ষণ রহিল তাহা সে জানে না, অকস্মাৎ এক সময় জানিতে পারিল—এক মূর্ত্ত মানবাত্মার প্রয়োজনহীন অচেতন দেহ কাঁধে তুলিয়া নিঃশব্দে পা বাড়াইয়া-বাড়াইয়া সে চলিতে সুরু করিয়াছে। তখন অপর পক্ষের আর কেহই সেখানে নাই।

ছয়

এদিককার উৎসব বন্ধ ছিল মাত্র ততক্ষণ, যতক্ষণ কঙ্কণ উহাদের চোখের আড়াল হয় নাই। তারপর আবার তেমনই কলহাসি, তেমনিই মাতামাতি, তেমনিই সমস্ত শব্দ।

নীরব হইয়াছিল মাত্র একজন—সে চিত্রা। এতক্ষণ সে সকলের সুমুখেই বসিয়াছিল। একটু পরে উঠিয়া গিয়া এককোণে একখানা কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, তাহার অন্তস্থলে এক ঝড় বহিয়াছে—যাহার উৎপত্তি বহির্ম্মুখ—নিরুদ্দেশ অনর্থের মূলে। দেখা গেল মুহুর্মুহুঃ তাহার মুখের রং পরিবর্ত্তন হইতেছে। একসঙ্গে অভিমান, রোষ, অনিশ্চিত গুরুতর এক সংকল্প—পরস্পর পরস্পরের প্রতি রেষারেষি করিয়া তাহার মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে।

স্বর্গের দেবতারা অমর হইয়াছেন অমৃত পান করিয়া।

কিন্তু এই বস্তু তাঁহাদের মুখে উঠিত না, যদি না নারী বলিয়া ত্রিলোকে একটি মূর্ত্তি থাকিত! দেব-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এক পক্ষকে ঠকাইয়া স্বর্গের মুখ রাখিতে কিছুতেই পারিতেন না, যদি না তিনি ধরিতেন নারীরূপ! অর্থাৎ ইহলোকের মানুষ ত তুচ্ছ, স্বর্গের দেবতারাও ঋণ করিয়াছেন নারীর কাছে—তার মূর্ত্তি, তার রূপ, তার ঠমক! সুতরাং এ হেন নারীজাতির এক চরম প্রতিনিধিকে পিছন করিয়া কঙ্কণ যে নির্ব্বিবাদে বাহির হইয়া গেল, সে ত্রুটী চিত্রা কেমন করিয়াই বা সহিয়া যাইবে? কাজেই স্বর্গের দেবতা, পৃথিবীর মানুষ, পাতালের রাক্ষস—কেহই বুঝি তাহার কাছে আর নিস্তার পাইবে না।

আর নন্দন? কোথা হইতে কি হইয়া গেল, তাহা সে সহসা ঠিক করিতে পারে নাই। একটু পরেই সুস্পষ্ট বুঝিল—ইহা আর এক বিভ্রাট! চিত্রা যখন ও-ধারে গিয়া আসন গ্রহণ করিল, নন্দনেরও চোখের গতি সেই দিকে চিত্রার উপর ফিরিয়া বিঁধিয়া রহিল। কিন্তু সে অত্যল্পক্ষণ! চিত্রার কাছে উঠিয়া গিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি বসুন, আমি আস্‌ছি—"

চিত্রা মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল। মুখ তুলিয়া তাকাইতেই, নন্দন আবার বলিয়া উঠিল, "ওঁকে খুঁজিয়া আনি, এই এলাম বলে—"

প্রস্থানোদ্যত হইতেই চিত্রা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিয়া কহিল, "না। কাউকে তিনি নিমন্ত্রণ করে যান নি!"

নন্দন তাহা হাড়ে-হাড়ে জানে। মুখখানা ম্লান করিয়া কহিল, "আমাদের বরাত!"

পুনশ্চ বাহিরের দিকে পা ফেলিতেই চিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শাসন কঠিন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার নিষেধ!"

এইবার নন্দন একটু থতমত খাইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "যেমন পুতুল, তেমনি নাচ!"

টিপ্পনির জবাব দিল—নাগরিকা। ওদিক হইতে এদিকে যেন উড়িয়া আসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "নইলে কি মেয়েমানুষের দর বাড়ে?" চিত্রার দিকে ফিরিয়া মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "নিজেকে অত হাতছাড়া কোরো না!"

নাগরিকার বেচাল কিছু না দেখিলেও, চিত্রার মনে এক স্বাভাবিক ধারণা ছিল—নিছক কলঙ্কই এদের পরিচয়! সুতরাং নাগরিকার এই অযাচিত আত্মীয়তা চিত্রার বিসদৃশ ঠেকিল। তাহার দিকে সে দৃষ্টিপাতও করিল না, বসিয়া পড়িল।

কিন্তু নাগরিকা ছাড়িবার পাত্রী নয়। চিত্রার পানে কৌতুক কটাক্ষ করিয়া নন্দনকে হাসিয়া কহিল, "মেয়েমানুষের যা নিষেধ তাই অনুমতি! সুতরাং—"

কথাটা শেষ হইতে-না-হইতেই নন্দন গোটা কয়েক লাফ মারিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রারও মুখ চোখ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। যেন খুব রাগিয়া উঠিয়াছে এমনি ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "কাউকে আমি ডাকিনি—আপনি এলেন কেন?" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিল।

নাগরিকা সুমুখে বসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "কেন এলাম?—তোমার আশীর্ব্বাদ কুড়োতে!"

"মিথ্যে কথা!" চিত্রা একবার মুখ তুলিয়াই আবার নামাইয়া লইল।

নাগরিকা সহাস্যে কহিল, "না! ঠকিয়ে জয় করতে আমাকে কেউ পারেনি, তুমিও পার না।"

তীর্থ-প্রত্যাগত যাত্রীর মুখে নানারূপ লৌকিক-অলৌকিক দেবমাহাত্ম্য শুনিয়া অল্পবয়সী বউ-ঝির মনে যেমন শিহরণ জাগে, ঠিক তেমনি ধারা চিত্রা চমকিয়া নাগরিকার মুখের দিকে তাকাইল—কি যেন প্রশ্ন করিবে, কি যেন বুঝিয়া লইবে, কিন্তু বুকে ভাষা নাই, মুখে কথা নাই!

বুঝিতে পারিয়া নাগরিকা স্মিতমুখে কহিল, "ও চোখ আমি চিনি, আসলে তুমি মেয়েমানুষ! তোমার যা গর্ব্ব, তোমার কাছে তা' তুমি রাখনি!"

কথা কহিবার প্রবৃত্তি নাই। যেন আপনিই চিত্রার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—"কি?"

নাগরিকা আজ বুঝি বা নারীজীবনের অভিধান খুলিয়াই বসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ কহিল, "ভালবাসা!" অতঃপর মনোমত এক কটাক্ষ করিয়া আবার সুরু করিল, "বিধাতার দান এ বস্তু—পরকে বিলিয়ে বুক খালি করবার অধিকার তোমার নেই! বল্‌তে পার, কতখানি নিজেকে ভালবেসেছ তুমি?"

চিত্রা মুখ নামাইল।

বলিয়া উঠিল, "একটুও না। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার পরমাত্মীয় কে—তুমি নিজে, না আর কেউ?"

চিত্রা এবার আর নিজেকে সংযমের গণ্ডীর ভিতর রাখিতে পারিল না। প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষ নিজের জন্যে জন্ম নেয় না। তাই বোলেই সে মেয়েমানুষ!"

"আর তাই বোলেই তার চোখে অত জল!" বলিয়াই নাগরিকা থামিল। ক্ষণপরেই কি যেন মনে করিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "নিজেকে ঠকিয়ে পরকে বশ করা যায় না! নারী—তার আর একটী নাম 'প্রেম'। প্রেমকে হাতছাড়া করলে নারী হয় অ-নারী।"

চিত্রার বুকে যে সৎ চেতনটির অবশিষ্ট ছিল তাহা আগুনের আঁচ্ লাগার মত বাষ্প হইয়া উঠিয়া গেল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ঘা দিয়া বলিয়া উঠিল "ওকথা তোমারই মুখে মানায়, কেননা তুমি—"

"গণিকা, কুলটা—বলে যাও!"—নাগরিকা একমুখ হাসিয়া উঠিল। তারপর গম্ভীর হইয়া কহিল, "আজ আমি প্রতিমা! জগতের একটি মেয়েও বলেছে—'তুমি আমাদের নও'!"

চিত্রা এইবার অপ্রতিভ হইয়া পড়িল! মেয়েটি তাহার আত্মীয়া নহে—অনর্থক মনান্তর ওর সঙ্গে কেন? অনুতপ্ত কণ্ঠে নাগরিকাকে কহিল, "ক্ষমা করবেন। মেয়েমানুষ আমিও! আপনার ও-অপবাদ অন্ততঃ আমার কাছ থেকে আপনি নেবেন না!"

নাগরিকার মুখে তেমনিই হাসি, তেমনিই নির্ভয়। কহিল, "দিলেও নেব না। নিলে, কি হবে জানো?—তোমার মত, আমাকেও অমনি হয়ত একদিন হাতছাড়া করতে হবে!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "জীবন যাত্রা এই তোমার সুরু হয়েছে, তাই এই কথাটাই তোমাকে বলে রাখছি বোন্—মেয়েমানুষের জন্ম আত্মরক্ষা করতে,—আত্মহত্যা করতে নয়!"

চিত্রার ভিতরটা আবার ভেস্তা হইয়া গেল। প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

"মানে? তুমি মেয়েমানুষ—ভালবাসার প্রতীক! যতটা ভালবাসা পরকে বিলিয়ে দেবে, নিক্তির ওজনে ঠিক ততটাই তছরূপ করবে নিজেকে! আর ততটাই হবে—শ্রীহীন!"

"সেই যে—তৃপ্তি!"

"না—চোখের জল।"

বুঝি বা ইহার স্বপক্ষে কথা নাই, বিপক্ষেও প্রতিবাদ নাই। তাই চিত্রা মূঢ়ার ন্যায় তাকাইতেই, নাগরিকা কথাটার অর্থ করিয়া দিল। কহিল, "বুঝলে না? আচ্ছা এসো আমার সঙ্গে—" বলিয়াই উঠিয়া প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে এক প্রস্ফুটিত পুষ্পের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চিত্রাও মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পুষ্পটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এর কাছে আমরাই আসি—এ নিজে যায় না! অর্থাৎ মানুষই ভালবাসে একে—মানুষকে এ ভালবাসে না! মানুষের স্পর্শে—এর হয় মৃত্যু! অস্বীকার কর?"

চিত্রা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'না।'

নাগরিকা সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষ অবিকল এদের জাত! যার গরজ পড়বে—ভালবাসা সেই দেবে! আমরা মেয়েমানুষ, গ্রহণ করবো—আলগোছে!"

চিত্রার মনের ভিতর পুনশ্চ বিদ্রোহ দেখা দিল। কহিল, "অপরাধ হয়!"

নাগরিকাও প্রস্তুত হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "হয় না! দেবার মেয়েমানুষের হাতে কিছুই নেই—অহঙ্কার!"

"অহঙ্কার?"

"হ্যাঁ! দান তুমি আমি করতে পারিনে!"

চিত্রা বুক ভরিয়া ভালবাসা রাখিয়াছে, কাহার জন্য? নিজের জন্য ত নয়! যাহার কাছে বসিয়া তৃপ্তি, কথা কহিয়া তৃপ্তি—দেহ, রূপ—অন্তর-বাহির সমস্তই যাহাকে নিবেদন করিয়া তৃপ্তি, তাহাকে সে কেমন করিয়া বলিবে—'আমি তোমার নই, তুমিই আমার'! তটিনীর যে নিবেদন আবহমান কাল ধরিয়া স্রোত বহিয়া প্রিয়তমের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, নারীসমাজের এই অনিশ্চিত, অস্থায়ী অমাময়ী মেয়েটার হাতছানি মানিয়া কেমন করিয়া সে আবার মুখ ফিরাইয়া উজান বহিয়া চলিয়া আসিবে? তাহা সে কি পারে? না ত!

চিত্রার বুকের ভিতরটা মুচ্ড়িয়া উঠিল। আশে পাশে চারিদিকে ছিন্ন চাহনি ফেলিয়া নাগরিকার দিকে

ফিরিয়া হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না! 'দান' নয়—'নিবেদন'!"

ইত্যবসরে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ হইতেই উভয়ে চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল—নন্দন!

নন্দন যেন ঝড় মাথায় করিয়া আসিয়াছে। আসিয়াই যাহা বিবৃত করিল, তাহার মর্ম্মার্থ ইহাই যে—সহস্রাধিক নর-ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া এক ভিক্ষুকে বাঁচাইতে গিয়া কঙ্কণের মাথার খুলিটা উড়িয়া গিয়াছে। তারপর কাহিনীটা সমাপ্ত না করিয়াই যেমন প্রস্থান করিবে, নাগরিকা বাধা দিয়া কহিল—"দাঁড়ান—"

নন্দন বিপদে পড়িল। বলিয়া উঠিল, "ওই যে ছাই বল্‌লাম—'ইতি গজ'টা বাদ দিয়ে!"

"কোথায় তিনি?"

"বাড়ীতে। এতক্ষণ আছে, কি নেই—" নন্দন আর অপেক্ষা করিল না।

তখন চিত্রার দিকে আর চাওয়া যায় না। একটি গঙ্গায়, একটি যমুনায় এত বড় ভারতবর্ষের অভাব বুঝিবা মিটে না, তাই তাহার চক্ষু দুইটি দিয়া আর একটি করিয়া পবিত্র তটিনী এখনি যেন প্রবাহিত হইবে! ক্ষণকাল মাটির দিকে স্থির-নেত্র হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নাগরিকার পানে একটিবার তাকাইল; তারপর আস্তে আস্তে গাত্র হইতে অলঙ্কারগুলি এক এক করিয়া খুলিয়া কহিল, "আমার একটি অনুরোধ রাখবেন?"

নাগরিকার মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন তার বিস্ময়ের অবধি নাই। কহিল, "কি?"

"এইগুলো যদি রেখে দেন!"—চিত্রা দুই হাত ভরিয়া অলঙ্কারগুলি নাগরিকার সম্মুখে ধরিল!

নাগরিকা কহিল, "আমি?"

"হ্যাঁ!"

"কিন্তু, আমি যে প্রতিমা!"

চিত্রার মুখে যেন কে কালি ঢালিয়া দিল। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আজ উৎসবের দিন—দীন-দরিদ্রকে দেবেন!"

"ভালো কাজ! কিন্তু, হঠাৎ এমন গা খালি করলে?"

ম্লান হাসিয়া চিত্রা জবাব দিল, "সেজেগুজে আর তাঁর সুমুখে দাঁড়াতে পারিনে!"

"তোমার অপরাধ?"

"পাপ—ভেতরের!"

বলিয়াই চিত্রা অলঙ্কারের গোছাটা নামাইয়া রাখিয়া অবসন্নার ন্যায় বাহির হইয়া চলিতে সুরু করিল, যেন তাহার সম্মুখে পড়িয়া এক পৃথিবী পথ, সে-পথ, আর ফুরাইবে না।

(ক্রমশঃ)

প্রলয় বরাভয়

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিশ্বজুড়ে' পাপের আগুন উঠলো জ্বলে হিংসা এবং রক্তে
মানবনারী উঠছে কেঁদে নিত্য—হা—হা—ছন্দে,
আপন পাপে দগ্ধ সবে ছুটছে মাগি' দেহের লাগি' শান্তি
কাঁপছে মহাশূন্য—নিখিল ভরলো নিরানন্দে।

লক্ষ হাজার বৎসরেরি লক্ষ কোটি পাপের কালো ধূম্রে
এই জীবনের পাতাল থেকে উঠলো জ্বলে অগ্নি,
সৃষ্টিতে আজ ঊর্দ্ধশিখায় লক্‌লকিয়ে উঠ্‌ছে তারি জিহ্বা
রক্ষা নাই আজ বিশ্বে কোথাও—কাঁদছে ভ্রাতা ভগ্নী।

ছুট্‌ছে সবাই লক্ষ্যহারা জান্‌ছে না কো মিলবে কোথা আশ্রয়
চৌদিকেতে অট্টহাসি প্রলয় দেছে লম্ফ,
ঝড়ের দাপে গর্জ্জে মড়ক মত্ত রোষে গর্জ্জে' আসে বন্যা
পায়ের তলায় অট্টহাসি তুলছে ভূমিকম্প।

কোথায় যাবে ঠাঁই যে নাহি, মাথার 'পরে আকাশ ছেড়ে ঊর্দ্ধে
রক্ত আঁখি চাইছে গ্রহ চাইছে রোষে সূর্য্য,
নরের পাপের অগ্নিদাহে পাহাড় সম উঠ্‌ছে ফুলে সিন্ধু
মৃত্যুদানব চৌদিকেতে বাজায় ঘনতূর্য্য।

সঞ্চিত এই যুগের যুগের আপন পাপের উত্তাপেরি ধূম্রে
উঠ্‌লো জ্বলে অগ্নিতে এই প্রলয় রোষের মন্দ্র,
লক্ষ দিনের অবজ্ঞাতে ক্রুদ্ধ হোল দেবদেবী আজ স্বর্গে
রক্ষিতে আজ বিরূপ তারে আশীর্ব্বাদ আর মন্ত্র।

রক্ষা নাই আজ রক্ষা নাহি মানবনারী কাঁদছে হতভাগ্য
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিতে এই সবা্ই তারা জ্বল্‌বে,
মিথ্যা কথা অত্যাচার আর হিংসাঘাতের রক্তঝরা বক্ষে
ধর্ম্মদেবের রুদ্র অভিসম্পাত আজি ফল্‌বে।

দুঃখহরা বারির পাথার শুষ্ক হোল কোন্ পাপে এই বিশ্বে
খুঁজ্‌লো না কেউ কোথায় সে পাপ রইল হয়ে গুপ্ত,
দেহের দেশের যাত্রী ওরা জান্‌লো না কোন্ উর্দ্ধটানের সূত্রে
বুভুক্ষার ওই সুধার ধারা আকাশে হোল লুপ্ত।

হাজার কোটি লক্ষপাপে অন্ধ তারা বক্ষে ক্ষত দগ্‌দগ্‌
তাই যে তাদের কর্ম্মজুড়ে রচল তারা অগ্নি,
তীর্থনদীর পুণ্যসলিল বহ্নিদাহে করছে আজি টগ্‌বগ্‌
ভাইয়ের পাপে মরবে আজি বিশ্বে যত ভগ্নী।

আজ এই প্রলয়-পর্ব্ব-তলে বিশ্বে নিয়ে আশীর্ব্বাদের সরবৎ
জাগ্‌বে শুধু ভক্ত কবি এবং যোগীভক্ত,
জ্বলছে সারা সৃষ্টিখানা মর্ত্ত হবে রক্তে প্রলয়ক্ষেত্র
বিশ্বে যারা ভাগবত ওরে তারাই রবে শক্ত।

আগুন জ্বলে—আগুন জ্বলে—শুকিয়ে গেল মন্দাকিনী গঙ্গা
তপ্ত নিখিল ক্ষুধার দাহে মরণপথে গর্জ্জে,
দেখনু গো সেই অগ্নিমাঝে গুপ্ত হ'ে ভগবানের মূর্ত্তি
নরের লাগি' নারীর লাগি' ঢালছে অভয় বর যে!

সর্ব্বনাশা পাপের তলে এই জীবনের গুপ্ত পূতিগন্ধে
মিথ্যা এবং অধর্ম্মেতে হয় নি যারা বিদ্ধ,
বিশ্বগ্রাসী এই প্রলয়ের সৃষ্টিনাশা অগ্নিলীলার বক্ষে
সেই নারী নর অজর অমর তারাই হবে সিদ্ধ।

দেখ্‌নু গো এই পাপ আগুনের প্রলয় দাহের শিখার রাঙা বক্ষে
রুদ্র ভগবানের কৃপা গোপনে রহি ছদ্ম,
মৃণাল হয়ে উঠ্‌ছে বেড়ে বিশ্বে নবীন আবির্ভাবের গন্ধে
নতুন মহা-সৃষ্টিলীলার ফুট্‌ল যে তায় পদ্ম।

সেই অতলের পদ্মহিয়ায় গুপ্ত রহি বাজাও তুমি বংশী
প্রকট হয়ে উর্দ্ধে তুমি শূল ধর আজ হস্তে,
গর্জ্জে উঠুক অগ্নিপ্রলয় নিয়ে তোমার ফুটুক রাঙা সৃষ্টি
অগ্নিতে আজ সাঁতার কেটে সূর্য্য যাউক অস্তে!

হিংসাঘাতে রক্তমাখা অধর্ম্মেতে দীর্ণ জরাজীর্ণ
কাজ নাহি আর বিশ্বে বেঁচে মনুর পচাবংশ,
জ্বলছে আগুন—জ্বলুক আজি—পূর্ণ আজি পাপের মহাযজ্ঞ
কান্না বৃথা—ধ্বংস আজি—ধ্বংস ওরে ধ্বংস!

প্রলয়-ভীত আর্ত্ত ওরে ধ্বংসমুখে বাঁচার বৃথা চেষ্টা
তার চেয়ে আয় প্রলয় শিবে চিত্ত সঁপে ডাক্‌বি,
ভাগ্‌বতেরি সঙ্গে এসে কান্না ভুলে' তাল বাজা আজ রঙ্গে
ধ্বংসমুখে বাঁচতে গেলে তারির সাথে বাঁচবি।

প্রহ্লাদ এবং পার্থসম বিশ্বে যারা সর্ব্বজয়ী বীরদল
আয় রে তারা তাল বাজা আজ জ্বলুক প্রলয় অগ্নি,
ঝড়ের নাচে বাজছে মাদল্—নাচছে ঈশান—
কাঁপছে মহী থর থর
বীরের মতন আয় রে দাঁড়া—আয় রে ভ্রাতা-ভগ্নী।

ডাক-ঘর

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

৩

পার্লামেণ্ট বারলামচীর হস্তে ডাকের কার্য্য ছাড়িয়া দিলে পর উইদারিঙ্গস্ ইহাতে মগা আপত্তি তুলেন। কিন্তু ইহাতে যখন কোনই ফল হইল না তখন তিনি ওয়ারউইক্ পরিবারভুক্ত রবার্ট রীচীকে, আইন অনুসারে তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করিয়া নিজের ক্ষমতা বলবৎ রাখিতে চেষ্টা করেন। লর্ডস এবং কমন্স সভার উপর রবার্ট রীচীর কিছু প্রভাব ছিল। এই কারণে পার্লামেণ্ট ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকেই মনোনীত করেন এবং ডাকের সমস্ত হিসাব ইঁহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য বারলামচীর প্রতি আদেশ প্রেরণ করেন: বারলামচী ইহার উত্তরে পার্লামেণ্টকে জানাইয়া দেন যে ডাকের কার্য্য এক্ষণে যদিও আমার অফিস হইতে চলিতেছে, তাহা হইলেও ইহার সম্পূর্ণ অধিকার প্রীডোর। তিনি আমার অফিস লোকজন সমস্তই ভাড়া লইয়া এই কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। এই উত্তর লাভে কিন্তু লর্ডস সভা বারলামচীর উপর খুব চটিয়া ওঠেন এবং বল-প্রকাশের দ্বারা উহার অফিস কাড়িয়া লইবার জন্য রবার্ট রীচীকে এক আদেশ প্রদান করেন। ইহার ফলে ইংলণ্ডে পাশাপাশি দুইটা ডাক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরস্পর আক্রোশ থাকায় ডাক লুট প্রভৃতি চলিতে থাকে। শেষে এই দোষে অভিযুক্ত বলিয়া বারলামচী, তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং রবার্ট রীচীর দুই-একজন ভৃত্য কমন্স সভা কর্ত্তৃক হাজতে প্রেরিত হন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বারলামচী দেহত্যাগ করিলে পর পার্লামেণ্ট রবার্ট রীচীকে সরাইয়া দিয়া মিঃ এডমণ্ড প্রীডোকে ডাক অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে রবার্ট রীচী বিচারকদিগের নিকট গিয়া আইনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিচারে ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে বিচারকগণ এই মর্ম্মে এক রায় প্রকাশ করেন যে, পার্লামেণ্ট উপযুক্ত বোধে যাঁহাকে এই কার্য্যভার অর্পণ করিবেন তিনিই ইহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইবেন। ডাক-ঘরের কার্য্যভার অন্য হস্তে ন্যস্ত করিবার অধিকার পার্লামেণ্ট ভিন্ন অপর কাহারও নাই। ডাক অধ্যক্ষগণ কার্য্যের সুবিধার জন্য যে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন বা করিতেছেন পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে যে-কোন মুহূর্ত্তে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া নূতন করিয়া এই অফিস গড়িয়া লইতে পারেন। ইহার পর রবার্ট রীচীর আর কোন দাবীদাওয়া থাকিল না।

প্রীডো ডাক-অধ্যক্ষপদ লাভ করিয়াই উইদারিঙ্গস প্রবর্ত্তিত ডাকের নিয়মগুলি আরও কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। উইদারিঙ্গস ডাক চলা-ফিরার সময় ঠিক নিয়মিত করেন, কিন্তু ডাক প্রেরণ জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট দিন এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই; প্রীডোই প্রথম প্রতি বৃহস্পতিবার লণ্ডন হইতে সর্ব্বত্র ডাক প্রেরণ ব্যবস্থা করেন। নরউইচ, ইয়ার মাউথ প্রভৃতি যে সকল শহর এই সময় বেশ সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিতেছিল সেই সকল স্থানে ডাক প্রেরণ জন্য শাখা পথগুলিরও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। তাহা হইলেও প্রীডো প্রথমে সাধারণের মন জয় করিতে পারেন নাই। ব্যবসা বাণিজ্যর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকে ইহার আরও সুবিধা খুঁজিয়া ছিলেন। এই কারণে কমন্স সভা জন হীলের সাহায্যে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে এডিনবরা পর্য্যন্ত ঘোড়ার ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। প্রীডো ইহাতে প্রথমে খুব আপত্তি জানাইয়াছিলেন এবং নিজের কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া কাউন্সিল অফ ষ্টেট-এর বৈঠকে এক আবেদন পেশ করেন। ইহার উত্তরে কাউন্সিল তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে, তাঁহার ডাকের উন্নতি কল্পে যে ৫।৬টী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে তাঁহারা সেই সকল প্রস্তাব অনুযায়ী দিনকতক ডাক-ঘরের কার্য্য চালাইয়া দেখিবেন— ইহার পর আর কোনও উন্নতি এ অবস্থায় সম্ভবে কি-না। ইহাতে আপত্তি তুলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। প্রীডো তখন ইহাতে তাহার যে লোকসান হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ জন্য কর্ম্মচারীদিগের মাহিনার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কমন্স সভা এই সুযোগই খুঁজিতে ছিলেন। ইহাতে

তাঁহারা প্রীডোকে তাঁহার আয়-ব্যয়ের হিসাব কাউন্সিলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলেন। প্রীডো কাউন্সিলের আদেশ মত সমস্ত হিসাব কাউন্সিলে উপস্থিত করিলে পর, কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ইহা দেখিয়া অতঃপর ডাক-ঘরের কার্য্যভার অন্যূন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থায় ইজারা দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং প্রীডোকে তাহা জানাইয়া দেন। তখন তাহার হস্ত হইতে এই লাভবান কার্য্যটি হস্তান্তর হইবার ভয়ে প্রীডো নিজেই ঐ রাজস্ব দিয়া কার্য্যটি রক্ষা করেন। ইতিমধ্যে প্রীডো এটর্ণি জেনার্ল পদ লাভ করিয়াছিলেন, ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে কাউন্সল অফ ষ্টেটের একজন সভ্য বলিয়া মনোনীত হন। তিনি এই সুবিধা লাভ করিয়াই ক্লিমেণ্ট অক্সনব্রীজ, রীচার্ড ব্ল্যাকওয়েল, ফ্রান্সিস টমসন, উইলিয়ম ম্যালন প্রভৃতি যে পাঁচ ছয়জন ব্যক্তি ডাকের উন্নতির চেষ্টায় এক একটি উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইয়া যাহাতে ডাক খরচ কমাইতে এবং আরও শীঘ্র শীঘ্র ডাক প্রেরণ করা যাইতে পারে তাহারই চেষ্টায় যত্নবান হন।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে অলিভার ক্রমওয়েল প্রীডোকে সরাইয়া জন ম্যানলের উপর ইহার কার্য্যভার অর্পণ করেন। এই সময় দশ হাজার পাউণ্ড বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হয়। ম্যানলে এই ইজারা পাইয়াই অলিভারের একদল সৈন্য লইয়া প্রীডোর ডাক-ঘরে উপস্থিত হইয়া সকলকে শাসন ও মারধর করিয়া ডাক-ঘর অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহাকেও দুই বৎসরের বেশী স্থায়ী হইতে হয় নাই। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ইজারার সময় কাটিয়া গেলে পর ক্রমওয়েল-এর সভাসদগণ মিঃ সেক্রেটারী থার্লোকে ডাক-ঘরের কার্য্য-ভার অর্পণ করেন।

থার্লো ডাক-ঘরের কার্য্যভার লাভ করিলে পর তিনি ক্লক্ লেন হইতে ডাক-ঘর উঠাইয়া আনিয়া বিসপ্‌স্ ষ্ট্রীটে ইহা স্থাপন করেন এবং ইহার পরিচালনভার অক্সনব্রীজের উপর ইজারা দিয়া দেন। অক্সনব্রীজ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ডাক-খরচ কমাইয়া ইংলণ্ডের মধ্যে তিন পেনি; স্কটল্যাণ্ড চারি পেনি; আয়রল্যাণ্ড ছয় পেনি; বোর্দ্দো—ফ্রান্স), নানটিস্—(ফ্রান্স), কেডিজ—(স্পেন), মেড্রিড-(স্পেন), লেগহর্ণ—(ইটালী), জেনোয়া—(ইটালী), ফ্লোরেন্স—(ইটালী), লিঁয়—(ফ্রান্স), মার্শেল—(ফ্রান্স), স্মার্ণা—(তুরস্ক), আলিপ্পো—(তুরস্ক), কন্সটানটিনোপল—(তুরস্ক), ডানজীগ—(পোল্যাণ্ড), লুবেক—(বেলজিয়ম) ষ্টক্‌হলম—(সুইডেন), কোপেনহেগেন—(ডেনমার্ক), বোর্দ্দো, নানটিস, কেডিজ, মাদ্রিদ নয় পেনি; লেগহর্ণ, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, লিয়ঁ, মার্শেল, স্মার্ণা, আলিপ্পো, কন্সটান্টিনোপল, ডানজীগ, লুবেক, ষ্টক্‌হলম্ এবং কোপেন-হেগেন এক শিলিং ইত্যাদি ক্রমে ধার্য্য করেন এবং সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সর্ব্বত্র ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। শেষে কিন্তু ইনিও ক্রমওয়েল কর্ত্তৃক বিতারিত হন। তখন থার্লো নিজেই ডাক-ঘরের কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে থার্লোর নিকট বাৎসরিক চৌদ্দ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হয়।

জন হীল ইংলণ্ডে "পেনি পোষ্ট" প্রবর্ত্তনের সুবিধা দেখাইয়া এই সময় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি বলেন, "Though a man will willingly pay three-pence to have an account of his family or business rather than want such an account; yet certainly no man will, or ever did willing pay three pence, for which he need pay but a peny. And if for reasons of State Posts must be erected, certainly he is not the fittest man that will give the most money for it, but rather he that will undertake the service at the cheapest rate, which must be the best advantage to the commonwealth ইত্যাদি। ইহার ফলে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস ডাক-খরচ কমাইয়া লণ্ডন হইতে বারউইক্ আশী মাইলের মধ্যে দুই পেনি, তদূর্দ্ধে তিন পেনি: বারউইক্ হইতে স্কট্‌ল্যাণ্ডের চল্লিশ মাই-লের মধ্যে দুই পেনি, তদূর্দ্ধে চারি পেনি; লণ্ডন হইতে ডাবলিন ছয় পেনি; ডাবলিন হইতে আয়রল্যাণ্ডের চল্লিশ মাইলের মধ্যে দুই পেনি, তদূর্দ্ধে চারি পেনি ধার্য্য করিয়া দেন। কিন্তু তাহা হইলেও প্রধান ডাকপথ হইতে দূরে অবস্থিত শহরগুলির মধ্যে পরস্পর পত্র আদানপ্রদান করিতে হইলে তাহার জন্য অতি উচ্চহারে মাশুল আদায় হইত। কারণ সে সময় ইংলণ্ডে "ক্রশ পোষ্টের" ব্যবস্থা না থাকায় সকল দেশের সকল পত্রই প্রথমে লণ্ডন শহরে আসিয়া জমা হইত, পরে তথায় ছয় জন সর্টার কর্ত্তৃক ছয়টী পথের পত্র বাছাই

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মজুমদার   তুষারগিরি   ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
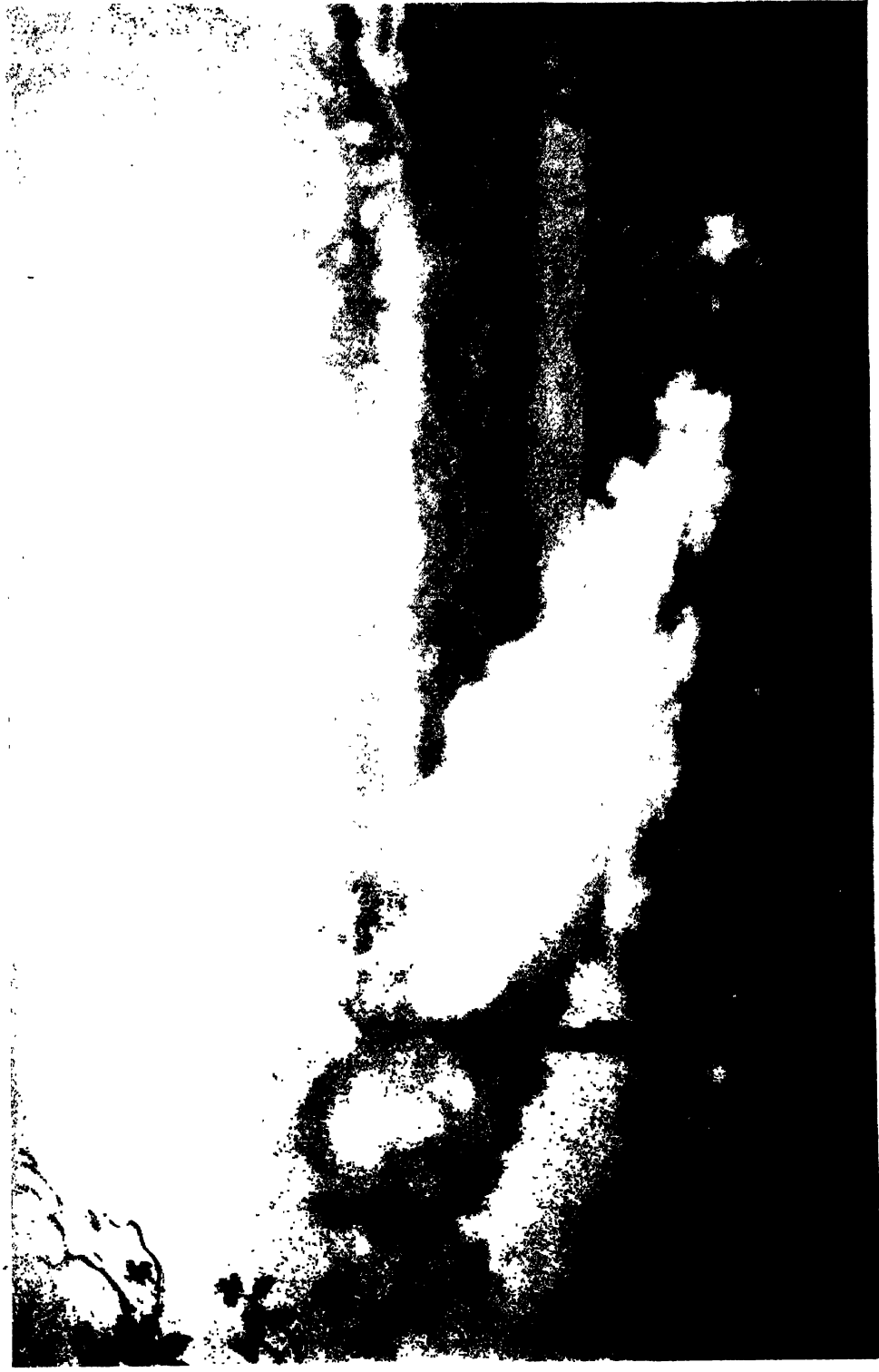
হইয়া তাহা পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে ভাগ করিয়া, ছোট ছোট থলীর মধ্যে ভরিয়া প্রেরণ করা হইত: এই কারণে ঐ দেশটি অতি সন্নিকট হইলেও পত্র প্রেরণ করিলে ঐ পত্র পৌছানর জন্য একবার ঐ দেশ হইতে লণ্ডন, পরে লণ্ডন হইতে যে স্থানে পত্র যাইবে সেই স্থানের খরচ দিতে হইত। যেমন ব্রিষ্টল হইতে এক্সটার যদিও পঞ্চাশ মাইল, তথাপি এই উভয় দেশের মধ্যে পত্র আদানপ্রদান খরচ দুই পেনি না হইয়া ব্রিষ্টল হইতে লণ্ডন আশী মাইলে তিন পেনি, পরে লণ্ডন এক্সটার পুনরায় আশী মাইলে আর তিন পেনি উভয়ে মিলিয়া ছয় পেনি আদায় হইত।

যাহা হউক, অতঃপর থার্লোর ইজারার সময় কাটিয়া গেলে সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস্ হেনরী বিশপ্‌স্‌কে বাৎসরিক একুশ হাজার পাঁচশত পাউণ্ড রাজস্ব আদায় দিবার ব্যবস্থায় ইহার ভার অর্পণ করেন। এই সময় ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে স্থির হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি উর্দ্ধতন রাজ-কর্ম্মচারী এবং পার্লামেন্টের সময় এই সভার সভ্যবৃন্দের পত্রের জন্য আর ডাকমাশুল আদায় হইতে পারিবে না এবং সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ যখন ইচ্ছা নিজে গিয়া অথবা কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন। বিশপ ডাক-ঘরের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া মাত্র দুই বৎসর স্বহস্তে ইহা পরিচালনা করেন। অতঃপর ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি ডানিয়াল-ওনাইলকে ইহার স্বত্ব ছাড়িয়া দেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখের একখানি সরকারী বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়, থার্লোর সময় পুলিশের সাহায্যের জন্য ডাক-ঘরে পত্র খুলিয়া পড়ার যে রীতি ছিল তাহা এই সময় আইন দ্বারা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর নিজের

মোহরাঙ্কিত করিবার যন্ত্র

পত্র ভিন্ন অপর কাহারও পত্র খুলিয়া দেখিবার কাহারও অধিকার রহিল না। এই বৎসর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস ডিউক অফ ইয়র্কের খোরপোষ জন্য ডাকের সমস্ত আয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার মধ্যরাত্রে লণ্ডন
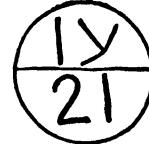
উইলিয়ম ডাকওয়ারার সময় হইতে পর পর
উপরোক্ত ছাপগুলি চলিয়া আসিতেছে

শহরে যে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল, তাহার ফলে বিশপ ষ্ট্রীটের ডাক-ঘরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন কন্‌ভেণ্ট গার্ডেনের নিকট সাময়িক কার্য্য চালাইয়া লইবার জন্য একটি ডাক-ঘর খোলা হয়।

১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ওনাইলের ইজারার সময় কাটিয়া গেলে পর আর্লিংটন পরিবারভুক্ত হেনরী বেনেটর্লে ইহার পরিচালন ভার ইজারা প্রাপ্ত হন। ইঁহার ভ্রাতা সার জন বেনেট প্রথমে ইঁহার সহকারী থাকিয়া মিঃ ফক্সলের প্রস্তাবিত উপায়ে পেনি পোষ্ট প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা করেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হন। ইঁহাদিগের সময় কেণ্টে নিত্য একবার, স্কটল্যাণ্ডে সপ্তাহে তিন বার এবং আয়রল্যাণ্ডে সপ্তাহে দুই বার ডাকপ্রেরণের ব্যবস্থা হয় হয়। তবে কোন্ স্থানটি কোথায় অবস্থিত এবং তাহা কোন্ ডাক-ঘরের এলাকাভুক্ত ইহা জানিবার কোন উপায় না থাকায় এবং বাড়ীঘরের নম্বর—অথবা রাস্তা ঘাটের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম না থাকায় পত্রপ্রেরণ এবং বিলির যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। মিঃ ন্নোম্ সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা দুর করিবার মানসে

তাঁহার ব্রিটেনিয়া নামক সংবাদপত্রে কয়েকখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়া তাহাতে ডাক-পথ এবং ডাক-ঘরগুলির

হরকরারা ডাক লইয়া রওনা হইতেছে

অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ইহার পর ডাক-ঘরের কর্ত্তৃকপক্ষগণও ইহার সুবিধা দেখিয়া একখানি মানচিত্র প্রকাশ করেন। ইহার ফলে ডাকে পত্র প্রেরণ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং বিলি ব্যবস্থারও অনেক সুবিধা হয়। ইহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই লণ্ডন শহর পুনর্গঠিত হইয়া ওঠে। তখন ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে কনভেণ্ট গার্ডেন হইতে লম্বার্ড ষ্ট্রীটে একটি বড় বাড়ীতে ডাক-ঘরটিকে স্থানান্তরিত করিয়া আনা হয় এবং "জেনার্ল পোষ্ট অফিস অফ্ লণ্ডন" নামে ইহাকে অভিহিত করা হয়। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমারা যাঁহাদিগকে ডাক অধ্যক্ষ অর্থাৎ—"মাষ্টার অফ্ দি পোষ্ট" নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি এই সময় হইতে তাঁহারা "পোষ্ট মাষ্টার জেনার্ল" এবং প্রত্যেক ডাক-ঘরের অধ্যক্ষগণ পোষ্ট মাষ্টার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। লম্বার্ডির ডাক-ঘরের প্রথম পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন কর্ণল রজার হোয়াইট হল, ইঁহার অধীনে সেই সময় এই ডাক-ঘরে প্রায় ৭৭ জন কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেন। অন্যান্য সকল স্থানের ডাক-ঘরে ডাক অধ্যক্ষগণই সকল কার্য্য চালাইয়া লইতেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে লম্বার্ডির জেনার্ল পোষ্ট অফিস ছাড়া লণ্ডনের মধ্যে আরও ৮টী রিসিভিং হাউস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহার বাহিরে ইংলণ্ড এবং স্কট্ল্যাণ্ডের মধ্যে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসমেত প্রায় ১৮২টী, আয়রল্যাণ্ডে ৪৫টী এবং ডাবলিনে ১২টী সর্ব্বসমেত ২৩৯ ডাক-ঘর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইত্যবসরে আর্লিংটনের ইজারার সময় শেষ হইয়া যাওয়ায় তিনি পুনরায় নূতন করিয়া ইহার ইজারা গ্রহণ করেন, এই সময় বাৎসরিক ৪৩,০০০ পাউণ্ড রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হয়।

এই ভাবে লণ্ডনের ডাক-ঘরের ক্রমান্বয় উন্নতি হইতে থাকিলেও শহরের মধ্যে এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে পত্রপ্রেরণের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত লণ্ডনের ডাক অধ্যক্ষগণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রবার্ট মূর নামক একজন আবগারী কর্ম্মচারী লণ্ডন শহরের মধ্যে ১ পেনি খরচে আদালত এবং ব্যবসার স্থানগুলিতে দিন ৬।৮ বার এবং দূরে ৪ বার পত্র বিলি ব্যবস্থার জন্য বেসরকারীভাবে এক ডাক-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর উইলিয়ম ডাকওয়ালা নামক কাষ্টম হাউসের জনৈক কর্ম্মচারীও ইহার সহিত আসিয়া মিলিত হন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ সোমবার Mercurious Cinicus No. 1 লিখিতেছেন—

We are informed some ingenious persons and good citizens, for the benefit of the City and Suburbs in point of charge and quick conveyance of Notes and Letters, have projected a method for doing the same through-out for 1d. a Letter one with another, further or nearer, which may be termed a a Foot post, whereof our next may give your more particular account.

টমাস-ডিলনে তাঁহার "Present State of London, 1681"-য়ে বলিয়াছেন—মিঃ ডাক্‌ওয়ারা লাইম ষ্ট্রীটে তাঁহার

একজন প্রাচীন পিওন

বাসভবনে প্রধান ডাক-ঘর স্থাপিত করিয়া শহরের অন্যান্য পল্লীতে গিয়া সাতটি সর্টিং হাউস এবং প্রায় চারি পাঁচশত

হাত রিসিভিং হাউস স্থাপন করিয়া আসেন। এই সকল রিসিভিং হাউস হইতে প্রতি ঘণ্টায় ধাবকেরা পত্র সংগ্রহ করিয়া সর্টিং হাউসে পৌছাইয়া দেয়। ইহার মধ্যে যেগুলি রাজকীয় ডাক-ঘরের মারফৎ বিদেশে প্রেরণের জন্য থাকে, সেইগুলিকে প্রথমেই লম্বার্ডির জেনার্ল পোষ্ট অফিসে পাঠাইয়া দিয়া পরে বাকীপত্রগুলির বিলি বন্দোবস্ত করা হয়। এক পাউণ্ডের অতিরিক্ত ওজনের অথবা দশ পাউণ্ডের অতিরিক্ত মূল্যের কোন মোড়ক অর্থাৎ পার্শেল এই ডাকে লওয়া হয় না। লণ্ডন, ওয়েষ্টমিন্ষ্টার, সাউথওয়ার্ক, রেডরিফ, ওয়েপিং, ব্যাট-ক্লিপ, লাইমহাউস, ষ্টিপ্‌নে, পপলার, ব্ল্যাক্‌ওয়েল প্রভৃতি স্থানে এক পেনি খরচে পত্রাদি বাড়ী বাড়ী পৌছাইয়া দেওয়া হয়। ইহার বাহিরে হেক্‌লে, ইসলিংটন, সাউথ-নিউ-ইসলিংটন, লেম্বেথ প্রভৃতি স্থানের পত্র এক পেনি খরচে ঐ সকল স্থানের রিসিভিং হাউসে পৌছায়। ঐ স্থান হইতে তাহা বাড়ী বাড়ী পৌছাইতে হইলে পুনরায় তাহার জন্য এক পেনি খরচ ধার্য্য হয়—অর্থাৎ দুই পেনি খরচ পড়ে। পত্রাদির উপর মোহর চিহ্নিত করার যে রীতি ডাকওয়ারাই তাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই সময় ক্রিষ্টমাসের ৩ দিন, ঈষ্টার ও হুইটসানটাইডের

একজন প্রাচীনা স্ত্রী-পিওন

দুই দিন, সম্রাটের জন্মদিন (৩০শে জানুয়ারী) এবং রবিবারে কেবল ডাক-ঘর বন্ধ থাকে। অন্যান্য সকল দিনই রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত দিনে প্রায় ছয়-আট বার আদালত এবং ব্যবসাস্থান-গুলিতে এবং চারি-পাঁচ বার অন্যান্য স্থানগুলিতে পত্র বিলি

hereas upon the on[e] and twentieth of March, One thouſand ſix hundred forty and nine, It was reſolved by the then Parlament, That the Office of Poſt Maſter, Inland and Foreign, were and ought to be in the ſole power of the Parlament; and ſeveral Orders were made by the ſaid Parlament, whereby the management thereof was referred to the Council of State. And whereas on the thirtieth day of June, One thouſand ſix hundred fifty and three, the then Council of

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে জোন ম্যানলেকে সরকার ডাকঘরের কাজ ইজারা দেওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে যে লেখাপড়া হইয়াছিল, তাহারই কিয়দংশের নকল

ব্যবস্থা করা হয়। পার্লামেণ্টের অধিবেসনের সময় তথায়ও দিন ৮।১০ বার পত্র প্রেরণ করা হয়।

এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া ডাকওয়ারা নিজেও একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত এই ডাক ব্যবস্থার প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রথমে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোন ফল হয় নাই। ২ বৎসর ক্রমান্বয় বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত ইহার কার্য্য পরিচালিত হইলে পর ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর ডিউক্ অফ্ ইয়র্ক এই ডাক-সমিতির বিরুদ্ধে এক মামলা আনয়ন করিয়া ১১ই ডিসেম্বর উহা আইনের সাহায্যে বাজেয়াপ্ত করেন। অতঃপর এই ডাক সমিতি জেনার্ল পোষ্ট অফিসের অধীনে চলিয়া যায়।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে আর্লিংটন ডাক-ঘরের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর লরেন্স হাইড অফ রচেষ্টার ইহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ইনি ফিলোফ্রড্‌কে সহায়করূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ইঁহার সময়ের একখানি সরকারী বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারি যে, এই সময়ে মুটে, মাঝি, ফেরিওয়ালা, ঘোড়ার গাড়ীর চালক প্রভৃতি সকলেই বেসরকারীভাবে পত্রাদি বহন করিতে আরম্ভ করে। এই

কারণে সম্রাট্ দ্বিতীয় জেম্‌স্, ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম জেম্‌স্ কর্ত্তৃক যে আইন প্রবর্ত্তিত হইয়া পরে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হইয়া
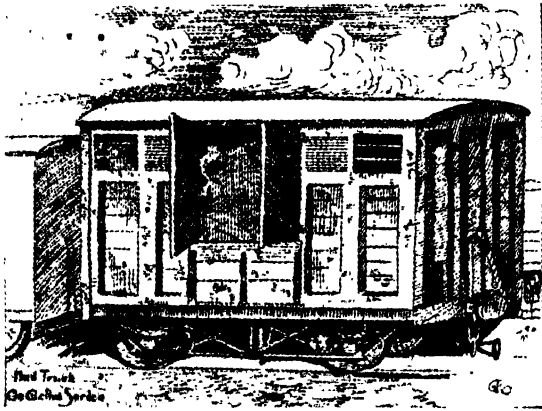
ডাক বহনে প্রথম রেলগাড়ী

যায়, তাহা পুনস্থাপিত করেন এবং এই সকল ডাক বহনকারীর গতিরোধ করিবার জন্ত কয়েকজন "সারচার" নিযুক্ত করেন। কোন পথিকের নিকট পত্র আছে এমন সন্দেহ হইলেই তাহার সহিত পেটরা-পুঁটলী যাহা কিছু থাকিত সকলই ইহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন। ইহাতে যদি কাহারও নিকট কোন পত্র পাওয়া যাইত তাহা হইলে সেই পত্র-বাহককে, এমন কি, সেই পত্র-লেখককে পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করিয়া আইন অমান্য করার দরুণ ভীষণ শাস্তি দেওয়া হইত।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহার কার্য্যকাল শেষ হয়। তখন জন উইডম্যান ডাক-ঘরের কার্য্য পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ের বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইনি মাত্র ৮ মাসকাল ডাক-ঘরের কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। অতঃপর পার্লামেণ্ট ইঁহার হস্ত হইতে ঐ কার্য্য উঠাইয়া লইয়া স্যর রবার্ট কটন ও মিঃ ফ্রাঙ্ক ল্যাণ্ড-এর উপর এই কার্য্যভার ন্যস্ত করেন।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কটন ও ফ্রাঙ্ক ল্যাণ্ড ডাক-ঘরের কার্য্য বাৎসরিক ৫৫০০০ পাউণ্ড রাজস্ব আদায় দিবার ব্যবস্থায় গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের সময় ইংলণ্ডের ডাক-ঘরের যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। কারণ ইঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, বে-সরকারী ডাক শুধু বন্ধ করিলেই চলিবে না, তাহার স্থানে যাহাতে সরকারী ডাক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। ইঁহারা ডাক-অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াই সমগ্র ইংলণ্ডটি ৯ ভাগে ভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগের মধ্যস্থ ডাক-ঘরগুলির পরিচালনভার এক একজন ব্যক্তির উপর ইজারা দিয়া দেন। ইহাতে এই সুবিধা হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ইজারাদার তাঁহার আয় বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন দ্বারা যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। ফলে বে-সরকারী ডাক-প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং রাজকীয় ডাক-বিভাগের সাহায্যে রাজ্যের সকল পত্র ও পার্শ্বেলাদি আদানপ্রদান চলিতে থাকে। এইভাবে পত্রাদির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সপ্তাহ মধ্যে সোম, বুধ ও শুক্র এই তিনদিন লণ্ডন হইতে প্রধান ৬টী রাজপথে এক্সটার বারমিংহাম, ইয়র্ক প্রভৃতি শহর পর্য্যন্ত ঘোড়ায় টানা মাল-গাড়ীতে ডাক প্রেরণের চেষ্টা চলে; পরে তথা হইতে ঐ সকল দেশের আরও উত্তরের পত্রাদি ঘোড়ার পিঠে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এই সকল গাড়ীতে যে যাত্রী যাইবার সুবিধা ছিল তাহা আমরা জনৈক ফরাসী ভদ্রলোকের নিকট জানিতে পারি; তিনি ঐ গাড়ী ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—That I might not take post, or be obliged to use the stage-coach. I went from Dover to London in a waggon. It was drawn by six horses, one before another and driven by a waggener, who walked by the side of it. He was clothed in black, and appointed in all things like another George. He had a brave Montero on his
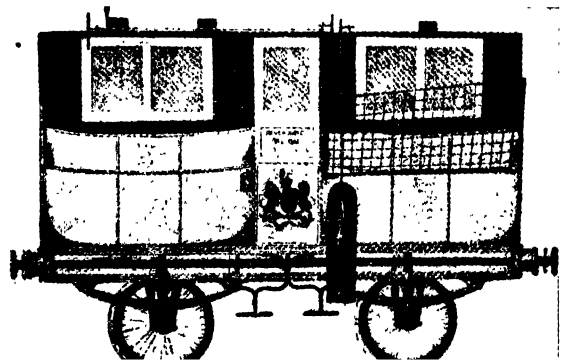
লণ্ডন বারমিংহাম রেলপথে ব্যবহারের জন্য প্রথম নির্ম্মিত ডাক গাড়ী

head, and was a merry fellow, fancied he made a figure and seemed mightily

pleased with himself. তবে ইহাতে কিন্তু পত্রোত্তর আসিতে ৭।৮ দিনের স্থানে ১১।১২ দিন বিলম্ব হইতে থাকিল। কারণ এই সকল গাড়ী আধুনিক কালের ন্যায় হালকি এবং স্প্রিংযুক্ত না হওয়ায় ইহা ঘণ্টায় ৪ মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারিত না। এইভাবে ঘোড়ার গাড়ীতে এবং ঘোড়ার পালের সাহায্যে ডাক গড়ে গ্রীষ্মকালে দিন ৫০ মাইল এবং শীতে ও বর্ষায় ৩০ মাইল করিয়া যাইত। ইহার অধিক শীঘ্র গতিতে কাহারও কোন সংবাদ পৌছাইবার থাকিলে ডাক-অধ্যক্ষগণকে তাহা জানাইলে তাঁহারা তাহার ব্যবস্থাও এই সময় করিয়া দিতেন। তবে ইহার জন্য অতিরিক্ত কিছু খরচ করিতে হইত। এই সকল পত্র ঘোড়ার ডাকের সাহায্যে পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল ; এই ব্যবস্থায় সাধারণত ৮২ ঘণ্টায় লণ্ডন হইতে এডিনবরায় ডাক পৌছাইত।
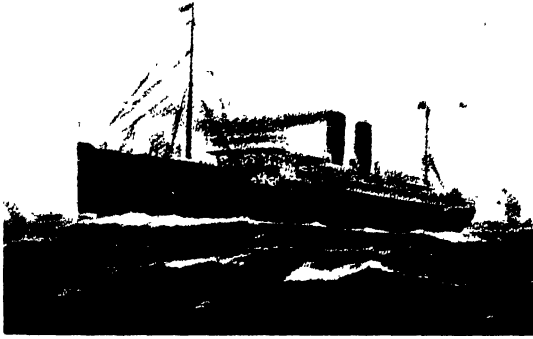
পি এণ্ড ও কোম্পানীর প্রথম জাহাজ

এইভাবে ইংলণ্ডের ডাক-ঘরের কার্য্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকায় ডাক ঘরের কর্ম্মচারীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ব্বে লম্বার্ড ডাক-ঘরে যে স্থানে ৭৭ জন মাত্র কার্য্য করিতেন, এই সময় সেই স্থানে ১৮৫ জন নিযুক্ত ছিলেন। এতৎব্যতীত বিদেশের ডাক-ঘরগুলিতে ২৩৯ জন, জাহাজে ডাক প্রেরণ ব্যবস্থায় ফ্রান্সের জন্য ২ জন, ফ্লেণ্ডার্সদের জন্য ২ জন, হলাণ্ডের জন্য ২ জন, স্পেন ইটালী প্রভৃতি দেশের জন্য ২জন, আয়রল্যাণ্ডের জন্য ৩ জন এবং ডক্‌ওয়ারা প্রতিষ্ঠিত পেনি পোষ্ট-ডাকঘরের কার্য্য পরিচালন জন্য শহরে নানান অঞ্চলে "ইন হাউস" ও বড় বড় দোকানগুলিতে প্রায় ৭৪ জন রিসিভার, ৭টী ডাক-ঘরে ১৪ জন সর্টার, ৫৭ জন পত্রবাহক, ১ জন কণ্ট্রলার, ১জন একাউণ্টেণ্ট এবং ১জন কালেক্টর নিযুক্ত ছিলেন।

জাহাজ হইতে ডাক নামান

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে কটন এবং ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড তাঁহাদিগের ইজারার সময় শেষ হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা তৃতীয় উইলিয়মের নিকট হইতে পুনরায় নূতন করিয়া ইজারা গ্রহণ করেন। এই সময় রাজস্বের হার আরও বৃদ্ধি পাইয়া বাৎসরিক ৫৯, ৯৭২ পাউণ্ড ধার্য্য হয়।

এই সময় স্কটল্যাণ্ডের ডাক-ঘর ইংলণ্ডের ডাক-ঘরের অধীনে থাকিলেও ইহার পরিচালনভার অপর হস্তে ন্যস্ত ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসের সময় ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের

জাহাজের ডাক মিলানো

সেপ্টেম্বর মাসে বাৎসরিক ৫০০ পাউণ্ড মাহিনা দিবার ব্যবস্থায় পেট্রিক্ গ্রাহাম্ নামক জনৈক ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথম

ইহার পরিচালনভার দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রাহাম ঠিক-ভাবে ইহা পরিচালন করিতে না পারায় স্কটিস প্রিভি-

রেলে ডাক বোঝাই দেওয়া

কাউন্সেল রবার্ট ম্যানকে স্কটল্যাণ্ড হইতে লিনলিথগো, কিলসিথ, গ্লাসগো, কিল্‌মারনক্‌, ডামবাগ্‌, বলেন্টি, পোর্ট পেট্রিক্‌ হইয়া আয়রল্যাণ্ডের ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে বলেন। ইহাতে ঐ সকল দেশের মধ্য দিয়া ঘোড়ার ডাক সাহায্যে পোর্ট পেট্রিক্‌ পর্য্যন্ত—পরে তথা হইতে খোলা নৌকায় ডোনাগাদিতে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। পরে এই ব্যবস্থার আরও উন্নতি হইয়া ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে গ্লাসগো পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা হইতে এবারডেন এবং পরে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বারউইক ও পোর্ট পেট্রিক পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়িতে ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সে সময় ইংলণ্ড বা স্কটল্যাণ্ড কোথায় বেশ প্রশস্ত পথ না থাকায় এবং যাহা ছিল তাহাও উভয় পার্শ্বের বড় বড় গাছগুলিতে আলোক-রৌদ্রশূন্য, অন্ধকার এবং জলকাদায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখায় সর্ব্বদাই গাড়ীর চাকা উহাতে বসিয়া যাইত, বন্ধুরা তার জন্য অনেকক্ষেত্রে গাড়ী উল্টাইয়াও পড়িত, এই সকল কারণে এই ব্যবস্থা কি ইংল্যাণ্ড, কি স্কটল্যাণ্ড কোথাও বেশীকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই; শেষে ঘোড়ার ডাকে ডাক যাওয়ার ব্যবস্থাই বলবৎ থাকে।

আয়রল্যাণ্ডের ডাক-ঘরগুলির পরিচালনভার ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনার্লের হস্তে থাকিত। প্রথম চার্লসের সময় ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে এই দেশে সর্ব্বপ্রথম ডাক প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর ক্রমওয়েল ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে ডাবলিন হইতে চেষ্টার এবং মিল্‌ফোর্ড হইতে ওয়াটারফোর্ড ডাক-পারাপারের জন্য জাহাজ নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কিছুকাল চলিয়াই বন্ধ হইয়া যায় এবং পরে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে তাহা পুনঃ স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে খোলানৌকায় ডাক-পারাপার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লণ্ডনের জেনার্ল পোষ্ট অফিসের ন্যায় এই দেশেও ডাবলিন শহরে একটি প্রধান ডাক-ঘর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই ডাক-ঘর হইতেই লণ্ডনের নর্থরোড, হলিহেড রোড, ওয়েষ্টার্ণ রোড, কেণ্ট রোড, ব্রিষ্টল রোড, ইয়ারমাউথ রোড প্রভৃতির ন্যায় মলষ্টার রোড, আলষ্টার রোড, কলিউড রোড ধরিয়া ডাক যাত্রা করিয়া পুনরায় ঐ পথেই ঘুরিয়া আসিত। হল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত ইংলণ্ডের পত্র আদান-প্রদানব্যবস্থা যে ইংলণ্ড সরকার থার্ণ এণ্ড টেক্সিস এবং ফ্রান্সের ডাক-অধ্যক্ষর হস্তে কয়েক বৎসরে জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ঐ ব্যবস্থা ইংলণ্ড সরকারের হস্তে পুনরায় ফিরিয়া আসিলে

ডাক কর্ম্মচারীদের পদানুসারে পোষাকের পার্থক্য

পর তাঁহারা ডোভার হইতে ক্যালে ও অষ্ট্রেণ্ড বা নিউপোর্ট এবং হারউইচ হইতে ব্রীল এই তিনটি ডাক-পথ প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু ফ্রান্সে যুদ্ধ বিদ্রোহাদির জন্য এই ব্যবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারেন নাই। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ডোভারের ডাক বন্ধ হইয়া ফালমাউথ হইতে প্রায়নি ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা হয় এবংছোট ছোট খোলা নৌকার স্থানে বড় বড় নৌকা এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় যাহাতে ৫০ হইতে ৮০ জন যাত্রীরও ঐ সকল নৌকায় পারাপার করা চলিতে পারে। অতঃপর ফ্রান্সের যুদ্ধ অবসান হইলে ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ডোভার হইতে ক্যালে এবং অষ্ট্রেণ্ডের পথ পুন স্থাপিত হয়। এই সময় ইংলণ্ডের বহির্দেশ হইতে যে সকল জাহাজে পত্র আসিত, সেই সকল জাহাজের মালিকেরা পত্র প্রতি ১ পেনি করিয়া খরচ পাইতেন। এই হিসাবে দেখা যায় যে, ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড সরকার কর্ত্তৃক ডাক-পথ প্রবর্ত্তিত হইলে পর তাঁহারা বৎসর শেষ সর্ব্বসমেত মোট ২৫১ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৩ পেনি পাইয়া ছিলেন অথাৎ ৬০, ৪৪৭ খানি পত্র আদান-প্রদান হইয়াছিল।

প্রথম পোষ্টাল ইউনিয়নের গৃহ

বার্লিন পোষ্টাল মিউজিয়াম

ইউরোপের বাহিরে ডাক প্রেরণ ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড বা অন্য কোনও দেশের ডাক-অধ্যক্ষগণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে বাণিজ্যাদি ব্যাপারে যে সকল জাহাজ সেই সময় ঘুরিয়া ফিরিত সেই সকল জাহাজের মালিকদের মারফৎ বর্হির্দেশ গুলির সহিত আবশ্যক মত পত্রাদি আদান-প্রদান চলিত। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মাসাচুসেট্‌ সরকারের একখানি বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়, সেই সময় বোষ্টন শহরের (আমেরিকা) রিচার্ড ফেয়ার ব্যাঙ্কের নিকট সমুদ্রপারের পত্রাদি জমা করিয়া দিতে পারিলে তিনি তাহা যথাস্থানে পৌছাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ইংলণ্ডের কফি হাউসেও এই রকম এক ব্যবস্থা ছিল। তথায় একটি থলী ঝুলান থাকিত, এক পেনি খরচ সমেত ঐ থলীর মধ্যে কোন পত্র জমা করিয়া দিলে তাহাও যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছিত।
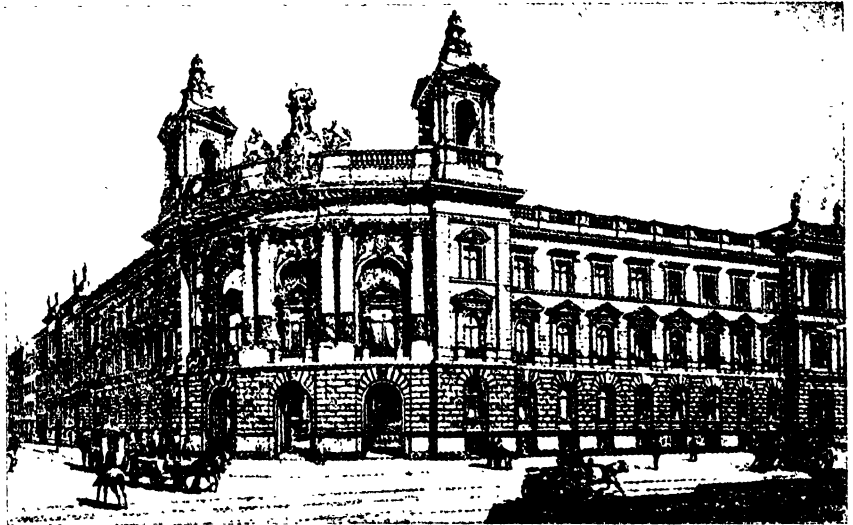
ইংলণ্ড সরকার কিন্তু এই ব্যবসার জন্য সে সময় কোন আপত্তি অথবা ইহার লাভের উপর কোন দাবীদাওয়া করিতে পারিতেন না। অতঃপর ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। তাঁহারা ইতিমধ্যে জামাইকা দেশ জয় করিয়াছিলেন, এই কারণে এই সময় হইতে দেশ মধ্যে পত্র আদান-প্রদানের উপর ৬পেনি করিয়া কর ধার্য্য করেন। যে কোন জাহাজেই পত্র আসুক না কেন, পত্র প্রতি ঐ খরচ তাহাকে ইংলণ্ডের ডাঁক-ঘরে জমা করিয়া দিতে হইত। পরে ১৭০২ খৃষ্টাব্দের হিসাব হইতে জানিতে পারি, ইতিমধ্যে ইংলণ্ড সরকার সাধারণের হস্ত হইতে ডাকবহন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিজেই উভয় দেশ মধ্যে জাহাজ স্থাপন করিয়া পত্র প্রতি ১ শিলিং ৩ পেনি করিয়া মাশুল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও অন্যান্য দেশের সহিত পত্রাদি আদান-প্রদানের উপর ইংলণ্ড সরকারের কোনরূপ লাভালাভ ছিল না। তবে যদি ঐ সকল পত্র ইংলণ্ডে পৌছিলে পর, সরকারী ডাক-মারফৎ তাহা বিলি ব্যবস্থায় মাশুলের যে হার নির্দ্দিষ্ট ছিল তদনুযায়ী ন্যায্য খরচ আদায় করিয়া লইতেন। এই জন্য ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে সরকার লানসিলট পামার ও উইলিয়ম ব্যারেট নামক দুইজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। ইহারা নৌকা লইয়া লণ্ডন বন্দরে থাকিয়া বিদেশীয় বাণিজ্য পোতগুলি হইতে পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেন।

সরকারী জাহাজে এই সময় যে সকল পত্র এবং যাত্রী বাহিত হইত তাহারও হিসাব রাখিবার নিয়ম এই সময় প্রবর্ত্তিত হয়। কি ভাবে ঐ হিসাব রাখা হইত, নিম্নের হিসাবটি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন—

28 April, 1705

Recieved on board the Prince Packet Boat the following Packets and letters.

Zech : Rogers···Commander.

From my Lord Ambassador···a Bag of Letter directed to Mr. Jones.

Sixteen packets and letters for her majestis service

From the King of Spain···a very large packet.

From London and Holland···Double and Single letters···Two hundred and ninetysix.

Thirteen Packets do.

Devonshire letters···Double and single··· Twenty-nine and three packetts.

For Falmouth···Double and single letters ···six.

Two mail for London.

Outward bound.
No Passenger.
Homeward bound.
One English marchent.
Three Dutch Gentleman.

Four poor sailors discharged from His Majestics Ship Antilope being encapable for the service.

এইভাবে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কটন এবং ফ্রাঙ্ক ল্যাণ্ড উভয়ে ডাক-ঘরের কার্য্য পরিচালন করেন। অতঃপর কটন্ বাতগ্রস্ত হইয়া পড়ায় এবং তাঁহার ইজারার সময় অতিবাহিত হওয়ায় তিনি এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন জন এভিলিন বাৎসরিক ৬৬,৮২২ পাউণ্ড রাজস্ব আদায় দিবার অঙ্গীকারে ঐ কার্য্যভার ইজারা লইয়া কটনের পরিত্যক্ত শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া তোলেন।
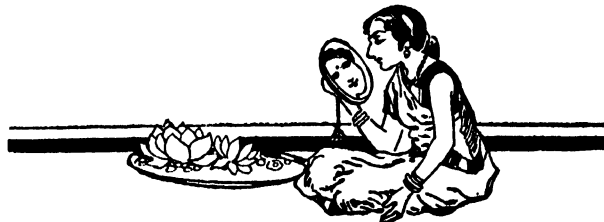
চেতন ও অচেতন

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আমি সিনেমা আর্টিষ্ট। অভিনয় শিখেছিলাম পটে ছবি দেখে, সিনেমার প্রেক্ষা-গৃহে। কারণ অভিনয় শিক্ষার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা এ দেশে নাই।

পরের কথা জানিনা। আমার ক্ষুদ্র সাফল্যের মূলে ছিল—প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পীদের ভাব-ভঙ্গীর নীরব অনুকরণ—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আদর্শ শিষ্য একলব্যের মত।

বহু-বর্ষ চিত্র-পটে দেখেছি প্রসিদ্ধ রূপ-স্রষ্টাদের অসাধারণ সৃষ্টি—লোমহর্ষক বিভীষিকা, মনোরম প্রণয়-চিত্র। কিন্তু বাস্তব-জীবনে যে এক অপূর্ব্ব কাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছি, তদনুরূপ ঘটনার কোনো অভিনয় কুত্রাপি দেখিনি। সে ঘটনা আজ সংক্ষেপে বলব। কিন্তু নাম-ধাম কাল্পনিক—অনিবার্য্য কারণে।

দিল্লীর চাঁদনী চকে বিলাসবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়—পাশ্চাত্য প্রথায় উভয়ের পরিচিত ব্যক্তির সাহচর্য্যে নয়—দেশী প্রথায়। আমি একটা দোকানে ফটকিরি কিনছিলাম—ক্ষৌরকার্য্যকে অবিষাক্ত কর্ব্বার মানসে। তিনি কিন্‌ছিলেন জবা-কুসুম তৈল—মস্তিষ্ক শীতল ও কেশের শ্রী-সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদনের উচ্চাশায়।

ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন—মশায়কে যেন কোথায় দেখেছি।

—সে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষ যখন আমি পরদার অন্তরালে নিজেকে আবদ্ধ রাখিনা। মহাশয়ের নাম?

—শ্রীবিলাসমোহন পাল। মশায়ের নাম?

—শ্রীনটবর বিশ্বাস।

—ওঃ!—ব'লে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে দৃঢ়ভাবে তাকালে।—বটে!

—মশায় কি আমাকে চেনেন?

—খুব চিনি। যে কেহ—হট্টগোল—দেখেছে সে আপনাকে চেনে। আপনার দামামা ঘোষের ভূমিকা, যদি চার্লি চ্যাপলিন অভিনয় কর্ত্ত, ঠিক্ ঐ রকমই করত। একেবারে—হুবহু।

বুঝতে পারলাম না ভদ্রলোক পরিহাস করলেন কিনা। কারণ সত্যের অনুরোধে অবশ্য স্বীকার্য্য যে আমি হট্টগোলের মহলা দেবার সময় প্রত্যেক চাল-চলন হাব-ভাবে বিশ্ববিশ্রুত চার্লি চ্যাপলিনকে অনুকরণ করতাম। আমাকে একটু মৌন দেখে শ্রীযুক্ত বিলাসমোহন পাল আর এক দফা ব্যাজস্তুতির উপক্রমণিকা আরম্ভ করলে, কিন্তু দোকানদারের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম হ'ল। সে বল্লে—বাবুজী বাঁধ দুঁ।

কেনা-বেচার অন্তে কিন্তু বিলাসবাবু আমাকে ছাড়লেন না। একখানা তাঙ্গায় বসিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলেন নব-দিল্লী!

মন্দ কি? এসেছিলাম একজন নাচ-শিল্পী শ্রীমতী উত্তাল মণ্ডলের সঙ্গে স্থানীয় এক রঙ্গালয়ে পাঁচ-মিশালী রঙ্গরস দেখাতে। আমাদের যিনি কলিকাতা হতে আমদানী করেছিলেন তিনি শ্রীমতীকে একটা বড় হোটেলে রেখে-ছিলেন। আমি ছিলাম ভিন্ন হোটেলে। কারণ বিদেশে উভয় শিল্পীর একত্র বাস কুলোকে কু-কথা রটনার অনিবার্য্য কারণ হবে।

পরে বুঝে ফেল্লাম—শ্রীবিলাসমোহন পাল—এদেশে মিঃ বি-এম্-পল, এম-এস্ সি, ফলিত বিজ্ঞানের প্রফেসার। ইনি ঢাকা হ'তে মাত্র এক বৎসর ভারতের রাজধানীতে শুভাগমন করেছেন।

মানুষটি ফলিত বিজ্ঞানের অধ্যাপক হ'লেও চারু-শিল্পের অনুভূতিতে তার প্রাণ মন সরস। কলিকাতায় যারা সঙ্গীত-কলায় প্রসিদ্ধ, হলিউড্ থেকে টলিউড্ অবধি যারা নির্ব্বাক ও সবাক চিত্রে প্রখ্যাত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৃত্যে যারা কুশল—তাদের নামের তালিকা তার জিহ্বাগ্রে। তার গৃহে পৌছিবার পূর্ব্বেই আমার গা ছম্ ছম্-ভাব তিরোহিত হ'ল। শিশুর মত সরল, কুসুমের মত কোমল, অথচ ভদ্রলোক বৃহস্পতির মত বিজ্ঞ।

আসল কথা ঐ শ্রেণীর লোক আমাকে একটু সন্ত্রাসিত করে। যে সব শিক্ষিত লোক মাসিক পত্রিকা হাতে

পেলেই দেখেন তাতে বিলাস-বিলোল-কটাক্ষ, আঁকা ভুরু, যথাসম্ভব স্বল্প-বসনা অভিনেত্রীর চিত্র আছে কি না—প্রকাশ্য ভাবে তারা অভিনেতাদের সঙ্গে মেশবার সময়, নিজেদের চতুর্দ্দিকে একটা তুলসী-বীথির গণ্ডী দেবার ভঙ্গী করে। বিশেষ শিক্ষা-বিভাগের শিক্ষাভিমানীরা। প্রফেসার পাল এ সব ভণ্ডামীর বাহিরে। তাই বিদেশে নিজের ভাষায় প্রবাসী বাঙ্গালীর সঙ্গে শিল্প-কলা-কুশলদের প্রসঙ্গে অভিভূত হ'লাম ; আর মনে মনে বল্লাম—ভগবান ভাল কর পালের।

কিন্তু পথের যত্ন তার গৃহের যত্নের মাত্র অগ্রদূত। আর গৃহসজ্জা! এমন না হ'লে মানুষের মনে এত সুষ্ঠু কোমল ভাব বিরাজ করতে পারে ?

ছোট বাড়ি। সামান্য একটু বাগান। কিন্তু ডেলিয়া, জিনিয়া, চন্দ্র-মল্লিকা নানা রঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিশে এমন একটা মনোরম ব্যাপারের সৃষ্টি করেছে—যার কমনীয়তায় আমার প্রবাসী মন মুগ্ধ হ'ল।

তার ঘরের সরঞ্জাম—সম্পদের বিজ্ঞাপন নয় মোটে। প্রত্যেকে গৃহ-স্বামীর স্বচ্ছন্দের সহায়ক। খোলা র‍্যাকে সাজানো তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে পুস্তকের সারি। ঘরে চিত্র ছিল মাত্র দু'খানি—একখানি রবীন্দ্রনাথের, অপরখানি দেশবন্ধুর।

আমাকে বসিয়ে ফয়জাবাদী পরদা সরিয়ে সে ভিতরে গেল। যার সঙ্গে কথা কহিল তিনি মধুর-ভাষিণী।

মধুর-ভাষিণী কে—এ সম্বন্ধে হাটে-বাজারে সিনেমার প্রেক্ষা-গৃহে এবং হেদোর চাতালে—নানা রকম মতামত শুনতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, কণ্ঠস্বর প্রতিযোগিতায় মানুষকে লুকিয়ে রাখা উচিত। কারণ কণ্ঠস্বর বিচারে আমাদের অজ্ঞাতে বিচারশক্তিকে ম্লান করে পরীক্ষার্থীর রূপ, গুণ, বংশ-মর্য্যাদা—আর অধিক মাত্রায়, হাসি ও চোখের চাহনী।

যখন মিসেস পালকে দেখিনি তখনই সিদ্ধান্ত করলাম যে তার কণ্ঠস্বর সু-মধুর। তাতে দুটা সুর—একটা খাদ আর একটা উঁচু, মোলায়েম ওতঃপ্রোত ভাবে পাক খেয়ে গেছে, দুই তারের পাকানো সূতার মত। সে সম্মিলিত সুরটি চিত্তাকর্ষক। এই রকম কণ্ঠ আমাকে আকৃষ্ট করে। আবার গম্ভীর খাদের সঙ্গে উপরকার মিহি সুর একাঙ্গ হ'লে আমাকে মত্ত করে।

যখন শ্রীমতী রেবা পাল আমাকে অভ্যর্থনা করলেন বুঝলাম আমার মন তুষ্ট। তাঁর চোখের চাহনী লজ্জা ও আক্রমণের বিচিত্র সংমিশ্রণ। তাঁর চলনও প্রতিপদে হেঁকে বলছিল—আমার নারীত্ব চাহে না চলতে—কিন্তু আমার মানবতা ভয় করে না সাধু বা দুষ্ট, ধনী বা শ্রমিক কারও সম্মুখীন হ'তে।

বলছিলাম—আমি তুষ্ট। কারণ এ মূর্ত্তি আমার নয়ন-পথে পড়বামাত্র মনে হল—পটে এ চিত্র প্রতিফলিত হ'লে এবং লাউড্ স্পীকারে এ কণ্ঠস্বর প্রচার হ'লে—রামী বামী অনেক শিল্পীকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে গজে মেপে কাপড় ও লজঞ্জেস বেচ্‌তে হবে।

ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে এরকম একটা ভাব যে মনকে কলুষিত করলে—সে মনের মনে মনে কান মলে দিলাম। আরে ছ্যা! সত্যই এই জন্য আমাদের মত দুষ্ট স্রষ্ঠু সমাজে মেশবার অযোগ্য।

(২)

দ্বিতীয় দিন যখন অভিনয় শেষ হ'ল—থিয়েটারের বাহিরে পাল-দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ল্াম প্রতিশ্রুতি মত। তার পর তাঁদের মোটরে চড়ে গেলাম—নব-দিল্লী।

পথে শ্রীমতী আমার অভিনয়ের সুখ্যাতি করলে। প্রাণ-খোলা প্রশংসা—খাতিরের সুখ্যাতি নয়।

—ধন্যবাদ। উত্তাল মণ্ডলের নাচ কেমন লাগ্‌লো ? ভারি দক্ষ শিল্পী উত্তাল—সুরে তালে বেশ পাকা।

সে আমার দিকে তাকালে। পথের আলোকে তার চোখের চাহনী দেখলাম। তার ভাব—আমি ঘরের বউ পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে লজ্জা পাই। কিন্তু আমি—আমি কি ডরাই সখি ইত্যাদি সমরে আহ্বান ক'র না।

হাতের ঢিল ছুঁড়েছি—তাকে উত্তেজিত করেছি। সে তখনই আমার কথার প্রত্যুত্তর দিলে—প্রতি-প্রশ্নে।

—আপনার সঙ্গে ওঁর কি কোনো সম্পর্ক আছে না কি ?

গোলা গড়িয়ে দিয়েছি ময়দানে—এখন তাকে প্রহার ক'রে গোলের মধ্যে পাঠাতেই হ'বে। লজ্জা ক'রে আমিই বা কি করব।

আমি বল্লাম—আজ্ঞে দু'জনে একসঙ্গে নাচি—সহকর্ম্মী। সম্পর্ক আর কি থাকবে ওর সঙ্গে ? ও মণ্ডল, আমি বিশ্বাস।

—ওঃ—বল্লে শ্রীমতী রেবা পাল। বাকীটুকু তার চক্ষু বল্‌লে—আমি খুকী নই, এমন কি বিদ্যালয়ের ছাত্রীও নই।

কাজেই আমি প্রত্যুত্তর দিলাম শব্দ ও দৃষ্টির।

—আজ্ঞে মানে হচ্চে, ওর সঙ্গে শিল্পীরা কেহ ভাব করতে সুবিধা পায় না। ওর পিতা—যে ওর মা-র—ওর অর্থাৎ-পিতা—মহল্লা এবং অভিনয়ের পরেই উত্তালকে নজর-বন্দী ক'রে রাখে।

এবার সে প্রাণ খুলে হাসলে। মোটর-চালক অর্থাৎ তার স্বামী হেসে বল্লে—আ—হা!

শ্রীমতী বল্লে—সত্য কথা নটবরবাবু। উত্তান আর একটু সজীব হলে লাজকী নাচটা জম্‌তো ভাল। আপনি যখন বাঁশী বাজিয়ে নেচে তাকে তুষ্ট কর্ব্বার সময় পাহাড়ের মাথায় মারখর ভেড়া দেখে লাফিয়ে উঠ্‌লেন—বেচারা উত্তাল—অর্থাৎ-বাপের ভয়েই হ'ক, কি নির্ব্বুদ্ধিতার ফলেই হ'ক, আপনার দিকে বা মারখরের দিকে না তাকিয়ে ওড়না টেনে নিজের দেহ ঢাক্‌তে ব্যস্ত হল।

স্বামী সামনে থেকে বল্লে—কি করা উচিত ছিল?

—উচিত ছিল? যে প্রেমিক রামছাগল দেখে উপেক্ষা করে সেই প্রণয়িণীকে যার মনস্তুষ্টির জন্য সে বাঁশী বাজাচ্ছিল—যার অনুভূতি গভীর—পাহাড়ী লাজকী রমণী, যার জেলাসী নিজেকে ব্যক্ত করে ছুরি মেরে—সে ঐ উপেক্ষার সময় বাঁশরী-বাদককে বা ভেড়াকে ভস্ম কর্ব্বার একটা চাহনী ও ভঙ্গী না দেখায় যদি—দর্শক টিকিটের মূল্য ফেরত পাবার অধিকারী।

লে লুল্লু! আমাদের গর্ব্বিত অধিকারী মশায় একথা শুনলে কি রকম বোকার মত তর্ক করত—তা ভেবে নিলাম।

সারথি বল্লে—ব্র্যাভো! রেবা তোমার অনুভূতি ভারি সূক্ষ্ম।

শ্রীমতী বল্লেন—পথের দিকে মন দাও। না হ'লে লোক চাপা দেবে।

আমাকে বসিয়ে রেখে তারা যখন বাড়ির ভিতর গেল—কানে কথা পৌঁছিল—আড়ি পাতার ফলে নয়।

—তোমার কথাবার্ত্তা শুনে ভারি গর্ব্ব হয় রেবা।

—তোমার কাছেই তো শেখা কথা। তুমিই তো আমার মনকে জাগিয়েছ—গুরুমশায়।

তারপর শব্দ শুনলাম—গভীর চুম্বনের—প্রাণে প্রাণে মেশামিশির—অমল সহজ সঙ্কেত। সিনেমার ভাড়া-করা ঘটা-করা প্রাণ-হীন আবেগের ইঙ্গিত নয়।

(৩)

ভোজনের পর অধ্যাপক বল্লে—চলুন কুতবের নির্জ্জন পথে খুব খানিক দূর বেড়িয়ে আসি। আপনি এবং মিসেস পাল যে সব গুরুতর বিষয় আলোচনা করেছেন—আমার চিত্তের পক্ষে সে-টা হ'য়েছে গুরু-পাক।

আমি বল্লাম—মিসেস পাল পথের ভবঘুরে ধ'রে এনে মনের ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন তা' নয়। তিনি দেহের পুষ্টির যে ব্যবস্থা করেছেন হফ্‌তা খানেক অনাহারে দেহ প্রকৃতিস্থ হবে।

রেবা পাল হেসে বল্লে—মানুষের পেশা তার চিন্তা এবং বাক্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজা উজীর সেজে আপনাদের ভাষাও হ'য়েছে লম্বা চওড়া।

তর্ক নিষ্প্রয়োজন। বল্লাম—সার, কিন্তু আমাকে গাড়ি চালাতে দিতে হবে।

মিসেস রেবা বল্লে—যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে অক্ষত দেহে পথে জীবহত্যা না ক'রে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌বেন, আমার আপত্তি নাই।

—দেখুন সকল কর্ম্মফলের মালিক বিধাতা—আমার পক্ষে সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে দারুণ ধৃষ্টতা।

একথা যখন বল্লাম—চমকে উঠ্‌লো প্রাণটা।

যে কারণে গাড়ি চালাতে চাহিলাম—সে ইষ্ট সিদ্ধ হ'ল। বহুকাল-মৃত প্রাচীন সহরের ধ্বংশ স্তূপের ভিতর দিয়ে যাবার সময় বুঝলাম—অমৃতের সন্ধান কেবল একনিষ্ঠ সর্ব্বগ্রাসী প্রেমই দিতে পারে। জ্যোৎস্নার আলোক এবং পথিক বাতাস তাদের আত্ম-বিস্মৃত করে দিলে। তারা অধিক পথ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চল্‌লো—মুখে তৃপ্তির অব্যক্ত মৃদু হাসি—দেহে মোক্ষের আত্ম-বিস্মৃতি।

সফদর জঙ্গ পার হয়ে দেখলাম একটা বটগাছের তলায় ধুনি জ্বলছে। ধ্যান-স্তিমিতনেত্র এক সাধু। তাঁর সম্মুখে সিঁদুর মাথানো নর-মুণ্ডের কঙ্কাল আর একটা ত্রিশূল।

প্রেমিকদের ধ্যান ভেঙ্গে বল্লাম—একবার ভাগ্য পরীক্ষা করলে হয়—চার্লি চ্যাপলিন হোতে পার্ব্ব কিনা।

তারা চেতনা পেয়ে হাসলে। অধ্যাপক বল্লে—ক্ষতি কি? পুরুষস্য ভাগ্যম।

গাড়ি রাখলাম গাছতলায়।

সাধুর মাথায় প্রকাণ্ড গৈরিক পাগড়ি—মুখে অসভ্য দাড়ি—তৈল-হীন, অপরিস্কার।

গাড়ি যেমনি থামলো সাধু আমাদের তিনজনকে দেখ্‌লে। রেবা একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করলে। সাধুর চক্ষু জ্বলে উঠ্‌লো।

এসব হলো নিমেষে। সন্ন্যাসী বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্র পদে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। মরার খুলিটা ধ'রে এত জোরে রেবার মাথায় মারলে যে দুটা কাঠে-কাঠে ঠুকলে যেমন ভীষণ শব্দ হয় তেমনি ভীষণ একটা শব্দ হল।

সে মূর্চ্ছিতা হ'ল। আমি লাফিয়ে পড়ে বজ্র মুষ্টিতে পাপিষ্ঠর হাত ধরলাম।

—পাপিষ্ঠ—ভণ্ড—খুনী!

তার অঙ্গের ক্ষিপ্রতা অসাধারণ। চকিতে কঙ্কালটা বাম হস্তে ধ'রে সে টিপ করে আবার মারলে রেবাকে।

মাথার খুলির দাঁতগুলা লাগলো রেবার গালে। সে ভীম আর্ত্তনাদ করলে। পাগলটা বিকট অট্টহাস্য করলে।

চমকে উঠ্‌লো প্রফেসার।

আমি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে তার থুত্‌নী লক্ষ্য ক'রে একটা ঘুষা চালালাম প্রাণপণ শক্তিতে।

পালোয়ান যেমন শিশুর হাত ধরে তেমনি স্বচ্ছন্দ অনায়াসে সে আমার হাত ধরলে। আবার অট্টহাস্য করলে। তারপর বল্লে—ভারি সুখ হচ্চে নয় বেলা দেবী? তোমার গালে চুমু খেলে কে জান? অনিল রায়। শয়তানের দিব্যি এ মাথার খুপড়ি তার—নিজের হাতে কেটেছিলাম—যখন আমার বিছানায় দুজনে মুখোমুখি করে শুয়েছিলে।

বুঝলাম কি একটা গভীর রহস্যর মধ্যে পড়েছি। বল্লাম—প্রফেসার গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাও। পালাও।

সে মন্ত্র-মুগ্ধের মত গাড়ি চালিয়ে দিলে।

সাধু বল্লে—তুমি কে বাবা? চার নম্বর?

আমি বল্লাম—তুমি কে? যদি প্রাণও যায় ছাড়ব না। এ নারী-হত্যা হ'ল আমার কুবুদ্ধিতে। আমিই গাড়ি দাঁড় করালাম। কে জান্‌তো তোমাকে স্ত্রীহত্যা করতে দেবার অবসর দেবার জন্য ঐ দুর্ব্বুদ্ধি জাগ্‌লো মাথায়! পাষণ্ড!

সে বল্লে—হত্যা হবার নারী নয়। সেবার বে-মালুম পালিয়েছিল। আমি তার পতি। তার উপ-পতির গলা কেটে মুণ্ড নিয়ে ভেগেছিলাম—তারই মত বে-মালুম।

—বল্লাম—তোমার কথা সত্য হ'লেও এ-মহিলা অন্য। এর নাম বেলা দেবী নয়।

সে বিকট হাস্য করলে। খুব বড় সিনেমা আর্টিষ্টের মত মুখ-ভঙ্গী ক'রে, পুরাতন বন্ধুর মত বল্লে—সে পতি বদলায় যে নাম বদলে উপ-নাম নিতে পারে না।

—তুমি পাগল। ওঃ! অনায়াসে স্ত্রী-হত্যা—

সে বল্লে—দেখ বাবা চার নম্বর। দু নম্বরের মুণ্ড সামনে রেখে তিন বৎসর ধ্যান করেছি—শ্মশান-কালির, বেলা-দেবীর আর দু'নম্বর অনিল রায়ের।

—পিশাচ—শয়তান।

তাকে ধরে চীৎকার করলাম—ডাকু—খুন। কোই হায়। ডাকু। খুন।

সে বল্লে—দেখ বাবা এমন সু-সময় চেঁচিয়ো না। আজ সাধুর মোক্ষ হ'ল। সন্ন্যাস শেষ হ'ল। চড়ক সংক্রান্তি। হাসি মুখে চড়ক গাছে ঝুলবো। চেঁচিও না। পালাব না।

কি বল্‌ব? মহাবলী লোকটা। ইচ্ছা করলে হাত ছাড়িয়ে নিশ্চয় পালাতে পারে। তবু ধরে রইলাম।

সে বল্লে—জজ কোর্টের নাজিরের মুহুরি ছিলাম—বেলা বড় বড় বই পড়েছিল—উঁচু উঁচু কথা বলত।

তারপর চুপি চুপি বল্লে—আমাকে কেন পছন্দ হবে বল। জমিদারদের মেজোবাবু অনিল রায়ের সঙ্গে ফেঁসে গেল। একদিন ধরলাম—এক বিছানায়—আমার দীন শয্যায়। অনিলের বুকে ছুরি মারলাম। তার মুণ্ডটা কেটে নিলাম। বুঝ্‌লে?

আমার মাথা ঘুরছিল। শিল্প সমালোচনা কানে বাজছিল। রেবার উন্মাদক কণ্ঠস্বর! এই উন্মত্তের রুক্ষ ধ্বনি দামামার রোলের মত প্রবিষ্ট হ'ল কর্ণে।

সে বল্লে—বেলা পালিয়েছিল। আমিও মুণ্ড নিয়ে দে ছুট্। যেমন দুধ মরে ক্ষীর হয়, মুণ্ড শুকিয়ে কঙ্কাল হয়। কিন্তু ছাড়িনি। এই দিনের জন্য অপেক্ষা

করছিলাম। সাধনা কর্ত্তাম—অনিলের মুণ্ড দিয়ে রেবার মুণ্ড ভাঙ্গব। তান্ত্রিক সাধনা।

—চোপ্।

—ধম্‌কেও না বাবা। আচ্ছা তিন নম্বরটা নীলু পালের বেটা বিলাস পাল না? ওটা বেলাকে পেলে কোথায়? ও যখন কলেজে পড়ত—ঘুরতো আমার বাড়ির চারিদিকে, আনাচে কানাচে।

আমি বল্লাম—চল। তোমার হাতে মরবার সময় অবধি আঁকড়ে থাক্‌ব।

—আচ্ছা চল—ছুঁড়ির মাথাটা ভেঙ্গেছে ঠিক। কি বল? ফটাস্!

তার পর আনন্দে হাস্‌লে—বিকট পিশাচের হাসি।

এবার লক্ষ্য সার্থক হল। আমার ঘুসি খেয়ে সে ঘুরে পড়লো।

অচৈতন্য!

গাড়ি ঘুরে এলো। বিলাস বল্লে—চলে এস। ও থাক্।

গাড়িতে উঠ্‌লাম—তখন লোকটা উঠে বসে আর একবার বিকট হাসলে।

তার চৈতন্য হ'ল। রেবার কিন্তু চৈতন্য হ'ল না। সাত দিন সাত রাত—বহু চেষ্টা করলে দিল্লীর সকল ডাক্তার মিলে।

লোল-জিহ্বা লক্-লকে বহ্নি পারলে না—আমার চোখের জল শুকাতে। ভাবলাম এ অভিনয়ে আমি না নাম্‌লে কে জানে জীবন-মরণের হিসাব-খাতার খরচের দিকে এ-রত্ন উল্লিখিত হত কিনা।

চৈতন্যের গৃহত্যাগ

শ্রীঅমল সেন

ঘুমাও ঘুমাও প্রিয়া!—শুকতারা নিভে নিভে আসে,
শারদ-পূর্ণিমা চাঁদ ম্লান হেসে মিলালো আকাশে।
বসুন্ধরা শ্যামলিমা প্লাবিয়া নেমেছে জ্যোৎস্নালোক,
তন্দ্রিত নিখিল-বিশ্ব, ঘুমাইছে দ্যুলোক ভূলোক।
দেবতা-মন্দির তলে সন্ধ্যারতি সমাপ্ত এখন,
নিভে গেছে দীপালোক—সুপ্তি মৌন ধরার অঙ্গন;
রাজপথে লোক নাহি, রাজদ্বারে প্রহরীরা যত
সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি জেগে আছে স্তব্ধ তন্দ্রাহত।
রজনীগন্ধার বুকে শিশিরের অশ্রু-মাল্যখানি
শুভ্র এই জ্যোৎস্নালোকে চুপে চুপে কে দিয়েছে আনি'?
সহকার শাখে শুধু জাগে মৃদু মলয়-স্পন্দন,
মর্ম্মরে পল্লব-দল, কাঁপে দূরে দেবদারু বন।
উচ্ছ্বসিতা ভাগীরথী প্রবাহিয়া চলিয়াছে ধীরে—
কুলু কুলু কলগান ভেসে আসে উদার সমীরে।
যাবার এসেছে লগ্ন—আমারে মাগিছে বিশ্ব-লোক,
ডাকে স্তব্ধ নীলাকাশ, ডাকে দূর নীহারিকা-লোক।
মহাসাগরের বুকে শুনিতেছি আকুল আহ্বান,
ডাকে মোরে কোটি কণ্ঠে লক্ষ শত ব্যথাতুর প্রাণ।
অন্ধকারাগৃহ মাঝে বন্দী যারা—অশ্রুসিক্ত আঁখি
মুক্তি মাগে প্রতিক্ষণ মোর কাছে, নির্ব্বাসনে থাকি
লক্ষ নরনারী ওই রুদ্ধ ঘরে যাপিতেছে দিন,
রুগ্ন-দেহ ভগ্ন-স্বাস্থ্য কাঁদে বন্ধু ব্যথায় মলিন,
দারিদ্র্যের অত্যাচারে মৃত্যু মুখে চলেছে অবাধে
আমার আপন যারা—তার লাগি প্রাণ মোর কাঁদে
বঞ্চিত যাহারা বিশ্বে, সর্ব্বহারা, রিক্ত, অসহায়;
পঙ্কিল আবর্ত্তে যারা, নেমে গেছে ধ্বংসের সীমায়,
তাদের মুক্তির বাণী মোর মাঝে উঠিবে উদ্ভাসি—
বিদায়, বিদায় প্রিয়া! তুমি হাসো সকরুণ হাসি
তন্দ্রায় সুখের স্বপ্নে; বাহু ডোরে কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া।
যখন জাগিবে তুমি, আমি রব বহুদূরে প্রিয়া!
পুরীর সমুদ্র মাঝে দেখিয়াছি আলোক-শিশিরে
তরুণ অরুণ-দীপ্তি—ধরিত্রীর নীলাম্বর ঘিরে
উদ্বেল তরঙ্গরাজি শূন্যপানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
মানবের ব্যথাবিষে নীলসিন্ধু, ক্ষুব্ধ জল রাশি।
সীমার মোহানা হ'তে চলিয়াছে অকূল সীমায়।
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু দিশেহারা দূর নীলিমায়।
সেই মত চলি মোরা পথের পাথেয় করি ক্ষয়—
চলি মোরা রাত্রিদিন—বিলাইয়া, করি না সঞ্চয়।
স্নেহের বন্ধন হ'তে আপনারে লই অপসারি,
কাঁদে কত শচীমাতা—অশ্রু আঁখি বিষ্ণুপ্রিয়া নারী
প্রেয়সী সে প্রিয়তমা বাহুপাশে বাঁধিবারে চায়—
সকল বন্ধন টুটি' মৃত্যুহীন দূর লোকে ধায়।
বিহঙ্গ-কুজিত কণ্ঠে নিশীথের ভাঙিবে স্বপন,
যাই প্রিয়া, প্রিয়তমা! ছিন্নকর ব্যগ্র আলিঙ্গন।

রাত্রি হ'লো অবসান—ম্লান শশী মিলালো আকাশে,
ঘুমাও ঘুমাও প্রিয়া! শুকতারা নিভে নিভে আসে।

হরিহর ছত্রে

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ

হাক্স্‌লী সাহেবের 'Along the Road'-এ লিখিত "Why not Stay at Home" প্রবন্ধটি বহুলাংশে মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হইল। নিজের উপর ইহার সত্যতা আর একবার সপ্রমাণিত করিয়া লইলাম। আমরা যে দেশভ্রমণে বাহির হই, দল বাঁধিয়া হল্লা করিয়া টুরিষ্ট হইয়া বহু-খ্যাত, বহু-আকাঙ্খিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াই, তাহার পশ্চাতে সত্যিকার কতখানি ভ্রমণের নেশা থাকে, কতটুকু তত্ত্ব এবং তথ্য শিখিবার ও জানিবার আগ্রহ থাকে? 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল্‌ ইন্‌টেন্‌সিটি' শব্দ দুইটির প্রচলন ইদানীং আশ্চর্য্যরকম বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছে—দেশভ্রমণের পশ্চাতে ইহার কোন গোপন দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত নাই ত? অনেক প্রবীণ, অভিজ্ঞ পরিব্রাজকের মুখে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি,—'দেখুন, সত্যিই নতুন দেশ দেখায় কোন আনন্দ নেই, কোন প্রেরণাও পাই নে; যা-কিছু আছে তাহা দেশ দেখে এসে গল্প বলবার এবং গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবার!'

'অমুক ভদ্রলোক অনেক দেশ ঘুরে এসেছেন'—এই শ্রদ্ধা-সম্বলিত বিস্মিত দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসা যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনি যশবর্দ্ধক। আমরা সবাই কম-বেশী অনুরূপ খ্যাতি লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকি। না হইলে, বহুবিধ শারীরিক ও আর্থিক ক্লেশ-যাতনা সহ্য করিয়া কোন-একটি বিশেষ স্থানে কয়েকঘণ্টা বা কয়েকটা দিন অতিবাহিত করিয়া আসিতেই যে সেই স্থানটির যাবতীয় রস ও মাধুর্য্য সংগৃহীত হইয়া রহিল, ইহা কল্পনা করাও যেমন হাস্যকর, এই উৎকট অভিজ্ঞতার বাহাদুরী লওয়াও তেমনি অনমুশীলিত মনের পরিচায়ক। অথচ মজা এই যে, উক্ত ময়্যাল্‌-টি আমরা সবাই জানি এবং জানিয়া শুনিয়াই পুনরায় দেশভ্রমণে বহির্গত হই।

"পান্থের অন্তরে জ্বলে দীপ্ত আলো জাগ্রত নিশীথে"—ইহা শুধু কাব্যেই সম্ভব। শূন্য গগনে কাহারও বারতা কোন পান্থ কোন দিন পাইয়াছেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই; তবুও সমস্ত পান্থেরই সেই চঞ্চলতা…বহির্গমনে একই প্রকারের উৎফুল্লতা ও ব্যস্ততা। পুস্তকের শ্রীকান্তে ও বাস্তবের শ্রী পরিব্রাজকে এখনও অনেকখানি তফাৎ রহিয়া গিয়াছে।

এবম্বিধ চিন্তাধারার মধ্যেও হেমন্তের এক অনতিপ্রখর মধ্যাহ্নে কম্বলখানা দেহের একধারে ফেলিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম; গৃহস্বামী আসিয়া যাত্রারম্ভেই বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন—'কোথায় চললেন?'

—এই, একটু ঘুরে আসব ভাবছি।

—সে কি? আবার কোথায় ঘুরতে যাবেন? এই তো সেদিন চিত্রকূট-মন্দার থেকে ফিরলেন?

হাসিয়া বলিলাম—'অনেকদিন তো নিরুপদ্রবে আপনার অন্নধ্বংস করা গেল; এবার অপর এক স্থানে 'লাক ট্রাই' ক'রে দেখা যাক।'

—রাখুন মশাই, আপনার চালাকি! এখন দাবার থলেটা বে'র করুন দেখি।

দাবার পুঁটলিটা বাহির করিয়া গৃহস্বামীর হস্তে দিতে দিতে বলিলাম—'এই কাণীর সেট্‌টা আমার স্মারক স্বরূপ আপনার নিকট গচ্ছিত রহিল। যদি কোন দিন আবার এ পথ দিয়ে ফিরি, তখন নূতন কিস্‌মতে কিস্তীমাত্‌ করা যাবে, কিন্তু আমাকে এবার সত্যিই যেতে হ'বে। নমস্কার!'

পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার সাহস নাই। বাঙালী বিরল পশ্চিমের শহরটিতে এই ভদ্র সজ্জন বৃদ্ধটির আতিথেয়তা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে রুচিতে বাধিল। দ্রুতপদে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। দীর্ঘপথ একটানা ট্রেনে অতিবাহিত করিতে হইবে। আবার বদ্‌লী, আবার ছোট গাড়ী। তারপর, পাটনা। পাটনার অন্তঃস্থলে মহেন্দ্রঘাট। মহেন্দ্রঘাট হইতে গঙ্গা পার হইয়া পালেজাঘাট স্টেশন। সেখান হইতে বি-এন্‌-ডব্‌লিউতে সোনপুর। ক্লান্তিকর বঙ্কিম পরিভ্রমণ। হরিহরনাথের মন্দির সোনপুর স্টেশন হইতে কয়েকমাইল দূরে দণ্ডায়মান; এইবারকার লক্ষ্যস্থল সেই দিকেই। মহেন্দ্রঘাট হইতে

গঙ্গা পার হইতে গিয়া কিন্তু আচমকা শিহরিয়া উঠিলাম। বেশ ত, নির্ঝঞ্ঝাটে ছিলাম। কেন আবার এই নিরর্থক শ্রমভোগ? কোথাও যে তিল ধারণের স্থান নাই! দেহাতীক (গ্রাম) ও শাহরিক সভ্যতা সমস্ত আসিয়া এই ক্ষুদ্র ষ্টীমারখানার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই বৎসর নাকি বিশেষ শুভযোগ আছে। গণ্ডক নদীতে স্নান, হরিহরনাথের পূজা প্রদান এবং সোনপুরের বিখ্যাত মেলার বাণিজ্য সম্পাদন একই সময়ে উদ্‌যাপিত হইবে। মানুষের জন্য মানুষের স্নেহ-মমতা করুণা-সহানুভূতি নাই, একের জন্য অন্যের বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? ঠেলাঠেলি, ভীড়, গাঁট্‌কাটা, বোঁচ্‌কা, ঘটি প্রভৃতির সংমিশ্রণে একটা অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। নিষ্ঠাব্রতী তীর্থযাত্রীর দল ভারতের বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-আচার-নির্ব্বিশেষে পুণ্যসঞ্চয়ে চলিয়াছে। ষ্টীমারে কোনপ্রকারে পদার্পণ করিতে পারিয়াছি, কিন্তু ট্রেনের সঙ্কীর্ণ প্রবেশদ্বার দ্বারা গহ্বরিত হইতে পারিব ত? না পারিলে আর কি করা যাইবে? হরিহরনাথ দর্শন করিয়াই বা এমন কোন্ মোক্ষলাভ হইবে!

নাঃ, ফিরিয়াই যাইতে হইল দেখিতেছি। পাথরের দেবতার নিকট পুণ্যকামীরা সিদ্ধিলাভ করিতে যাইতেছেন—মানুষের প্রতি আকর্ষণ থাকিলে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে! কোথাও যে ব্যূহ-ভীড় ভেদ করিয়া প্রবেশলাভ করিতে পারিব এমন মনে হইল না। এ-ই বা মন্দ কী? গঙ্গার তীর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিব। অব্যবহার্য্য দুস্তর পথ, উচ্ছিষ্ট ময়লায় প্রতি পদক্ষেপে সমস্ত শরীর ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে। পয়দালের যাত্রীও ন্যূন নহে, সকলেরই অবিচলিত নিষ্ঠা, অদম্য উৎসাহ। তাহাদের সঙ্গী হইতে পারিলে রাস্তাটুকু বেশ উত্তেজনায়ই কাটাইতে পারিব।

—"এই যে নমস্কার! আপনিও মেলার যাত্রী নাকি?"

পিছনে ফিরিয়া তাকাইলাম। পাটনার ধনী ব্যবসায়ী মিঃ চ্যাটার্জ্জী গাড়ীর মধ্য হইতে নমস্কার জানাইতেছেন। হাত তুলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলাম।

—"অভিপ্রায় তো সেই রকমই ছিল, তবে—"

—"আবার তবে কি? ভেতরে চলে আসুন, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

যাওয়া ত যাবে, কিন্তু যাই কেমন করিয়া? দরজার সুদৃঢ় অর্গল মুক্ত করিবার শক্তি আমার মতন ক্ষীণকায়দের নাই। একমাত্র ভরসা স্বল্প-পরিসর জানালা কয়টি। অগত্যা তাহার উপর দিয়াই acrobatic feats প্রদর্শন করিতে হইল।

সোনপুর ষ্টেশনে আসিয়া যখন গাড়ী থামিল, তখন বেলা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। সেই স্বল্পালোকে ভারতের দীর্ঘতম প্লাট্‌ফর্মটির একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তাকাইতে গিয়া আর একবার শিহরিয়া উঠিলাম—এক মাইল-ব্যাপী প্লাট্‌ফর্মটির দুই দিকই যে অগুন্তি মাথা ও মালের ঠাস্‌বুনানি। ইহার পরেও ত মাইল দুই আন্দাজ রাস্তা আছে, রাস্তার পার্শ্বেও নিশ্চয়ই বিশাল শাল্মলী তরুর অভাব নাই। তাহা ছাড়া, একপক্ষ কাল ধরিয়া যে-মেলার পূর্ণাধিষ্ঠান হইবে তাহার নিমিত্ত অস্থায়ী পর্ণকুটির এবং পাকা ধর্ম্মশালাগুলির অবস্থা ভাবিতেও যে ভয় হইতেছে!

—'আসুন না, দাড়িয়ে রইলেন কেন?' মিঃ চ্যাটার্জ্জী দুই হাতে ভীড় ঠেলিতে ঠেলিতে অগ্রসর হইলেন।

সস্ত্রীক ধর্ম্মসংস্থানে চলিয়াছেন—আপনার পথ আপনি নিজে দেখুন মশাই। পশু-পক্ষীর হাট দেখিয়া কোন্ স্বর্গ লাভ হইবে? বরঞ্চ, আলো থাকিতে থাকিতে সোনপুরের বিখ্যাত প্লাট্‌ফর্মটিতে বারকয়েক পায়চারি করিয়া লই, রাত্রি বাড়িলে মেলার আসল রূপটা না হয় একবার দেখিয়া আসা যাইবে!

—'দেখেছেন কি রকম ভীড়! চট্ ক'রে এদিকে চলে আসুন, লাইট্ যা পাওয়া গেছে তাতেই গোটা কয়েক স্ন্যাপ্ নেওয়া যাবে।'—মিঃ চ্যাটার্জ্জী ক্যামেরার তোড়জোড় ঠিক করিতে লাগিলেন।

পা-মাপিয়া দূরত্ব ঠিক করা হইল, হাত আড়াল করিয়া দেখা হইল 'ইমেজ্'। কিন্তু, খট্ করিবার পূর্ব্বেই চট্‌পট্ বহু লোক আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সবাই-ই তস্‌বীর উঠাইতে চায়; ফলে সমস্ত ব্লার্ড্। পরে শোনা গিয়াছে, উহারই মধ্যে একখানা নাকি বহুমূর্ত্তির রূপ পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট 'অব্‌জেক্টের' সম্মান রক্ষা করিয়াছে।

ক্যামেরার মোহ ছাড়াইয়া মেয়েরা ইতিমধ্যে জনারণ্যে মিশিয়া গিয়াছিল। মিঃ চ্যাটার্জ্জী সচকিত হইয়া বলিলেন, —'তাই ত, ওঁরা গেলেন কোথা?'

ওঁরা মানে স্ত্রী ও শ্যালিকা। কোথায় গেলেন তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব, নিজে খুঁজিয়া দেখুন কোথায় তাঁহারা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। মেলার ভীড়ে ও পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে মেয়েদের লইয়া বাহির হইলে চল্‌তি—পথের সঙ্গীদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে কেন? আমি ত মশাই সরিয়া পড়িলাম।

'–আপনি তা হ'লে ও দিকটা খুঁজুন, আমি বাইরে যাবার সুড়ঙ্গটা দেখি।' মিঃ চ্যাটার্জ্জী অত্যন্ত অস্থির হইয়া ছুটিয়া চলিলেন।

এই জনসমুদ্রে কে কাহাকে অন্বেষণ করিবে? এইমাত্র আমরা যে-গাড়ীখানা হইতে অবতরণ করিলাম, তাহারই কয়েক সহস্র যাত্রী এখনও প্লাট্‌ফর্ম্‌ পার হইতে পারে নাই। ইহা ছাড়া প্রতিমুখ যাত্রীরা আছেন। সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে ওয়েটিংরুমের দিকে অগ্রসর হইলাম। যদি সেখানে পাওয়া যায়, ভালই। নচেৎ, রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে রিফ্রেশ্‌ড্‌ হইতে ঢুকিয়া পড়িব। ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সোনপুরের ওয়েটিং রুমে তীর্থকামীরা অপেক্ষা করিতেছেন। যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহারা ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। পুণ্য ও পণ্যের ভারে অবনমিত। কতক্ষণে ট্রেন্‌ আসিবে, কখন গঙ্গার ওপার গিয়া পাটনার ট্রেন্‌ ধরা যাইবে ইত্যাদি নানা উদ্বিগ্নতায় তাহারা উদ্বাস্ত। বহু বিনিদ্র রজনীর ক্লিষ্ট ছাপ সকলের চোখেই পরিস্ফুট; দেহের বসন মলিন, পর্য্যাপ্ত আহারের অভাবে শরীর শ্রীহীন। বৃদ্ধারা ক্লেশ-সহিষ্ণু, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কাদের পানে তাকাইতে সাহস হয় না। বহু বাঙালী রমণীর এবম্বিধ দুর্ভোগের মধ্যে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। যাঁহারা দর্শনেচ্ছু তাঁহারাও পশ্চাদপদ নহেন। তাঁহারাও অনুরূপ অবস্থায় বিপদগ্রস্ত হইতে প্রস্তত। বহুদুর দেশ হইতে তাঁহারা বাবা হরিহর-নাথকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। গণ্ডক নদীতে স্নান করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। গাড়ীর ভীড়ে, রাস্তার অসুবিধায় ফিরিয়া আসিতে হইলে তীর্থযাত্রার আকর্ষণ রহিল কোথায়? বস্তত ইদানীং রেল কোম্পানীর দ্রুত প্রসারলাভহেতু যাত্রীদের তীর্থের মোহ দিনে দিনে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। আজ আর রামেশ্বর সেতুবন্ধ যাইতে হইলে পরিজনদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া যাত্রা করিতে হয় না। শ্রীক্ষেত্রের পথের প্রান্তে রোগযন্ত্রণায় প্রাণ হারাইতে হয় না, গামছা বাঁধিয়া চিড়া-মুড়ি-কলা (স্থানবিশেষ ও আচারবিশেষ বাদ দিয়া) বাঁধিয়া লইবার প্রশ্নই ওঠে না। মানুষ কি ক্রমেই শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িতেছে, না সভ্যতার সংস্কৃতিতে তীর্থের দুর্ব্বার মোহ হইতে ভারতীয় মন ধীরে ধীরে নিস্কৃতি পাইতেছে?

বিহার প্রদেশের রমণীরা ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে অতিশয় নিপুণা। কায়িক পরিশ্রমে তাহারা আজিও ভারতের অন্য প্রদেশস্থিত স্ত্রীজাতি (পার্ব্বত্যশ্রেণী বাদ দিয়া) হইতে দৃঢ়মনা ও উন্নত রহিয়া গিয়াছে, শারীরিক সৌন্দর্য্যে এবং পরিচ্ছন্নতায় তাহারা হয় ত প্রিয়দর্শিনী নহে (এমন কি সময়-বিশেষে তাহাদের পানে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত নারীজাতির উপর বিতৃষ্ণা জন্মে), তবুও তাহাদের বলিষ্ঠ দীপ্তি, সতেজ দেহভঙ্গিমা পুরুষমাত্রকেই সশ্রদ্ধ করিয়া তোলে, সর্ব্বত্রই তাহাদের উন্মুক্ত গতিবিধি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু সব চাইতে নয়নবিদারক দৃশ্য উলঙ্গ এবং অর্দ্ধোলঙ্গ শিশুদের ব্যাকুল চীৎকার ও অব্যবহার্য্য আহার্য্য গ্রহণ। বিহার প্রদেশের পিতামাতারা বোধ হয় এই বিষয়ে নিকৃষ্টতম কর্ত্তব্যপরায়ণ। বহু সম্ভ্রান্ত বিহারী-পরিবারে ছেলেমেয়ের যত্নের অভাব অত্যন্ত মলিনভাবে প্রকটিত হইতে দেখিয়াছি। অর্থের অভাব নাই, অথচ আদরের অভাব প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দেয়।

—'এই, এক-কাপ্‌ চা লে আও ত', রিফ্রেশমেণ্ট রুমে ঢুকিয়া একমাত্র ভারতীয় পানীয়ের অর্ডার দিলাম।

—'শুধু চা, আর কিছু খাবেন না?' ফিরিয়া দেখি মিঃ চ্যাটার্জ্জী ইতিমধ্যে সকলকে খুঁজিয়া লইয়া আহারে বসিয়াছেন—'ফির্‌বার গাড়ী কিন্তু অনেক রাতে, এই বেলা যা হয় কিছু খেয়ে নিন্‌।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'এদের কোথায় পেলেন? হারিয়ে যায় নি তা হ'লে!'

—'নাঃ, এদিকেই পাওয়া গেছে! চলুন, তাড়াতাড়ি প্রথমে মন্দিরটা দেখে আসি, তারপর ঘুরে-ঘুরে মেলা দেখা যাবে।'

—'আপনারা অগ্রসর হোন্‌, আমি আস্তে আস্তে পদব্রজেই এই পথটুকু পার হব।'

—'বলেন কি? রাত হয়ে যাবে যে! অন্ধকারে পথ চলবেন কেমন ক'রে—পাক্কা দুই মাইল, সে খেয়াল আছে?'

তাহা হউক, শ্লথগতিতে উন্মত্ত জনারণ্যে মিশিয়া গেলাম। সোনপুর স্টেশন হইতে মেলার প্যাণ্ডেলে পৌছিতে প্রায় এক ক্রোশ পথ হাঁটিতে হয়। রাস্তা ধূলি-ধূসরিত, কিন্তু দুর্গম নয়। পদব্রজে প্রায় আধঘণ্টা লাগে। পথপ্রান্তে চুল্লী জ্বলিতেছে দেখিলাম। ভস্মমাখা কৌপীনবস্ত সন্ন্যাসীরা এখানে-ওখানে আস্তানা পাতিয়াছেন, যাত্রীরাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। মাটির হাঁড়িতে নৈশভোজ প্রস্তত হইতেছে; প্রব্রজ্যাদের চেলাগণ উত্তেজক ধূম্রে প্রবৃত্ত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের সুদৃশ্য তাঁবু দেখিতে পাওয়া গেল। আইন ও শৃঙ্খলার কর্তারাও আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। ডাকবিভাগের অস্থায়ী অফিস খোলা হইয়াছে। সবাই ব্যস্ত, মেলার সুসামঞ্জস্য রক্ষায় যারপরনাই আগ্রহপরায়ণ, অপেক্ষাকৃত এই কোয়ার্টারটাই

জনতার রূপ—সোনপুর মেলা

সোনপুর মেলার সুপরিচ্ছন্নতা প্রস্ফুট করিয়া রাখিয়াছে; ইহারই পার্শ্বে রাজা-মহারাজাদের তাঁবু; সশস্ত্র সান্ত্রীদ্বারা সুরক্ষিত। সোনপুর মেলার বিশেষত্ব, ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের শুভ পদার্পণ, কেহ-কেহ শুধু অমাত্য-আর্দালী পাঠাইয়াই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন। উদ্দেশ্য, মেলার কয়েকটি উৎকৃষ্ট হাতি ও ঘোড়া সওদা করা। পশু-পক্ষীর ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সোনপুরের মেলা ভারতের বৈশিষ্ট্য অম্লান রাখিয়াছে। কত রকম-বেরকম পাখীই যে আমদানি করা হয়, কোন চিড়িয়াখানায় তাহার একত্র সংরক্ষণও একান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়। জঙ্গলা পাখী, দেশী ও বিলাতী টিয়া-কাকাতুয়া—একই পাখীর অদ্ভুত বর্ণবৈচিত্র্য প্রতি দর্শককে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

—'হাতির বাজার দেখ্‌বেন না, বাবু?'

দেখব বইকি! হাতিবাগানে প্রবেশ করিলাম। বিশালকায় হস্তীবৃন্দ অত্যন্ত নির্লিপ্তমনে বিশাল বিশাল কদলীবৃক্ষ ভোজন করিতেছে। তাকাইতে ভয় হয়, গজদন্ত দুইটি শ্বেত, সুমার্জ্জিত হইয়া চকচক্ করিতেছে। রক্ষকেরা স্নেহাধিক্যে শুণ্ড লইয়া আদরে ব্যাপৃত। মোটা মোটা লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা প্রত্যেক হস্তীর প্রতিটিপদ দৃঢ়বদ্ধ। শোনা গিয়াছে, কোন-কোন হাতি নাকি হঠাৎ ক্ষেপিয়া যায়, মাহুতেরা নিজ নিজ পণ্যের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। 'খুব শান্ত, আহার অত্যন্ত পরিমিত এবং মূল্য আশ্চর্য্য রকম সস্তা।' আমাদের মধ্যে হাতি-ক্রয়ের মতন আগ্রহ কাহারও পরিলক্ষিত হইল না। এক ফাঁকে

মহেন্দ্র ঘাট—পাটনা

একজন বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কেমন হে, এবার কিছু সওদা করতে পারলে?"

—'না বাবু, বাজার একেবারেই মন্দা।'

সব চাইতে ভাল হাতিটা এবার নাকি মাত্র হাজার টাকায় বিক্রী হইয়াছে। লক্ষ টাকার কথা শুধু শিশুকালে উপকথারই শুনিয়াছি। নিতান্ত দুরবস্থার কাহিনী বিক্রেতা ইতিবৃত্ত করিল। একমাস—দেড়মাসেরও উপর পথে তাহারা বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া এখানে আসিয়াছে; পুনরায় ঐভাবেই তাহাদের ফিরিতে হইবে। হাওদার উপর ঘর, তাহার উপরই রাত্রি যাপন। এমন কি, পথের নদ-নদী-নালা হাতির পিঠেই ইহারা পার হইয়া আসে। একটা হাতীর বাচ্চা হইয়াছে শুনিয়া সবাই সেখানে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। নবজাত শিশুটির জন্য পৃথক একটি তাঁবু

করা হইয়াছে ; ভেটের্নারী সার্জ্জেনের উর্দ্দিপরা আর্দ্দালীকে আশেপাশে ঘুরিতে দেখিলাম।

অতঃপর ঘোটক বিক্রয় দেখিতে অগ্রসর হইলাম। নানা জাতীয় ঘোড়া আসিয়া জুটিয়াছে। চঞ্চল হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে সব কয়টি লেজ-পা নাড়িতেছে! সুন্দর, বলিষ্ঠ, ওয়েব্‌লার, আরবী ঘোড়াও নাকি আছে। সেখানকার অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইল না! বাণিজ্য-সম্পাদনে গরুর বাজারই নাকি সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে। আশ্চর্য্য নয়! মুলতানী গাইগুলির দিকে তাকাইলে আর চোখ ফিরানো যায় না।

অন্ধকার ক্রম ঘনায়মান। রাত্রি বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে

হরিহরনাথের মন্দির

সঙ্গে জনতার কোলাহলও যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। দ্রুতপদে হরিহরনাথের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। মেলায় অপরাংশে মন্দিরটি অবস্থিত। পার্শ্বেই ক্ষীণস্রোতা, বিশীর্ণা গণ্ডক নদ। ঐখানেই স্নান ও তর্পণাদি সমাপনান্তে হরি ও হরনাথের যুগ্ম মূর্ত্তি দর্শন এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। ভীড় ঠেলিতে ঠেলিতে চলিয়াছি। দুই দিকে পণ্যের যথাসম্ভব সজ্জিত বিপণি—মাঝখানে সঙ্কীর্ণ রাস্তা। উহারই মধ্য দিয়া টমটম, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর যাতায়াত করিবে। কখন কোন্‌টা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে, ইহা ভাবিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে সবাই সন্ত্রস্ত হইয়া আছে। কলিকাতার বহু বাঙালী ব্যবসায়ী স্টল্‌ ভাড়া লইয়াছে দেখিলাম। রাত্রি বেলাই নাকি বাজার জমিয়া ওঠে। ক্রেতা-বিক্রেতাদের বচসা এবং টানাটানিও তাই উত্তরোত্তর তীব্র হইয়া উঠিতেছে। কোনপ্রকারে শেষপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হরিহরনাথের মন্দিরটি বহু পুরাতন; কালীঘাট মন্দিরের মতন দুই ধারে ভিখারী, সাধু ও পূজারীদের অত্যাচারে চক্ষু মেলিয়া অগ্রসর হইতে সঙ্কোচে বাধে। সাধুবাবাদের কিছু দক্ষিণা না দিলে নয়, নির্লিপ্ত যোগাসনে বসিয়া তাহারা ত্যাগেরও প্রত্যক্ষ মোক্ষলাভের উপদেশ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন; ভিখারীরা নাছোড়বান্দা, পূজারী ঠাকুরেরা ত এক-একজন গাইড্‌; মন্দিরের অপূর্ব্ব মহিমা ও পুরাতন ইতিবৃত্ত তাহারা না থাকিলে কাহাদের নিকট শোনা যাইবে; সুতরাং কাহাকেও পরিত্যাগ করা গেল না। মন্দিরের ভিতরেও ভোগের সুব্যবস্থা আছে; বাবার চরণামৃত, নির্ম্মাল্য-প্রসাদীর আয়োজনে এতটুকু কৃপণতা লক্ষ্য করিলাম না! যুগ্ম-মূর্ত্তি করজোড়ে প্রণাম করিলাম। একই মূর্ত্তির একদিকে বিষ্ণু, অপরদিকে শিব। নিকষ কালো পাথরের নিখুঁত ভাস্কর্য্য। তেলে ফুলে জলে হরি ও হরের অঙ্গ দুইটি ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান। আরও কয়েকটি ছোট ছোট মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। পূজারী ঠাকুর আগ্রহের সহিত একগাছা গাঁদা ফুলের মালা গলায় পরাইয়া দিলেন, চরণামৃতটুকু ঠোঁটে স্পর্শ করাইয়া মস্তকে সিঞ্চন করিলাম। প্রসাদীটুকু আপাতত পকেটে রহিল। মন্দিরের চত্বরটুকু প্রদক্ষিণ করিয়া আসা গেল। মাঝখানে মন্দির, তাহারই চতুঃপার্শ্বে পূজারী ঠাকুর ও সন্ন্যাসীদের থাকিবার স্থান। সংশ্লিষ্ট ধর্ম্মশালাও একটি আছে। মন্দিরের উপরে ছাদ আছে, ইচ্ছা করিলে সেখানেও উঠিতে পারা যায়। দেবমন্দিরের মিনারটি বাস্তবিকই সুদৃশ্য কারুকার্য্যে খোদিত। প্রাচ্যকলা আজও ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে অন্বেষণ করিলে আশ্চর্য্যভাবে প্রকটিত হইয়া পড়ে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্তই দেখিলাম। মন্দিরের সংলগ্ন খাবারের দোকানগুলিতে অসম্ভবরকম ভীড় জমিয়া গিয়াছে। পুণ্যার্থীরা এই স্থানেই পূজা-পার্ব্বণ সমাপনান্তে জলযোগ করেন। অন্তরে বিশ্বাস

থাকিলে, কিছুতেই রুচির ব্যতিক্রম হয় না। না হইলে, ঐ খাবারগুলিতে যে-সমস্ত বীজাণু মিশিয়া থাকে (বা থাকা সম্ভব)—তাহা কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ফিরিয়া চলিলাম। মেলার রূপ এতক্ষণে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। আলোতে, কোলাহলে সমস্তই উজ্জ্বল ও উন্মত্ত। কাহাকেও মেলার উপহার যখন দিতে হইবে না, তখন আর বৃথা দোকানের দরজায় শারীরিক শক্তির অপব্যবহার করিয়া ফল কি? অন্যমনস্কভাবে জনতার প্রবাহে মিশিয়া গেলাম। একস্থানে কয়েকটা সুবিন্যস্ত হোটেল-রেস্তরাঁ দেখা গেল। অপেক্ষাকৃত অভিজাত সম্প্রদায়ও এইখানেই পানাহার সমাধা করেন। দিশী সরাব এবং তাড়ির দোকানগুলিও যথোপযুক্ত স্থানে নির্দ্দিষ্ট আছে। পানের দোকানগুলি ইহাদের মধ্যে সব চাইতে উদ্দীপ্ত ও উদ্ব্যস্ত। ডানদিকের রাস্তাটির দুই দিকে ভীড় তখন কেন্দ্রীভূত। আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, দুই ধারের তাঁবুগুলিতে বিভিন্ন শহর হইতে বাঈজী এবং বারনারীরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছে। মুরজা ও মাইফেলে সমস্ত রাস্তাটা তখন সরগরম। গানের মজলিস্, মদ্যপায়ীদের বিকৃত হাসি ও হল্লা, ফিস্‌ফিস্ করিয়া আলাপ, সন্ত্রস্তগতিতে চলাফেরা—সমস্তই ইহাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। বারনারী ও ভিখারী ভারতের বৈশিষ্ট্য; দুইটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রতি শহরে, মেলায়, প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রগুলিতে জড়াইয়া রহিয়াছে। যে-দেশ যত বেশী দরিদ্র, সেই স্থানেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। কেবলমাত্র কৃষ্টি এবং সুরুচিপরায়ণতার প্রভাবে ভিখারী ও বারনারী বিতাড়ন আজ পর্য্যন্ত কোথাও সম্ভব হয় নাই।

গাড়ী ছাড়িবার সময় প্রায় সন্নিকট! আস্তে আস্তে স্টেশনের দিকে পা চালাইলাম। রাত্রির অন্ধকারে একা একা হাঁটিতে বেশ লাগে! 'সোনপুর মেলা দেখিয়া কি এমন আনন্দলাভ হইল'—নিজের মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম···হরিনাথের মন্দির সত্যই কি ভক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করাইতে সমর্থ হইয়াছে? পকেট্ হইতে প্রসাদীটুকু বাহির করিয়া মুখে পুরিলাম। দিনের পর দিন খুশীর খেয়ালে ঘুরিয়া বেড়াইতে এখন আর মোটেই ত উত্তেজনা বোধ করি না। তবুও কেন গৃহবিমুখ মন অকারণ বাহির হইতে চায়! যাযাবরপ্রবৃত্তি দেহের রক্তবিন্দুর মধ্যে বাসা বাঁধিল কি? কিন্তু কোথাও ত অন্তরের মধ্যে ইহার আলোড়ন অনুভব করি না—কোথাও বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতেও দ্বিধাবোধ হইতেছে!

সোনপুর স্টেশনের আলোকমালা ক্রমেই নিকটতর হইয়া আসিতেছে। পাটনার বন্ধুদের কথা বারংবার মনে হইতে লাগিল! পুনরায় গঙ্গা পার হইয়া বিশ্রাম করিয়া যাইব নাকি? স্টেশন-প্লাটফর্ম-এর বিস্তীর্ণ রাস্তায় পায়চারি করিতে করিতে পিছনের দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম; মেলার কোলাহল দুই মাইল দূরেও ভাসিয়া আসিতেছে। আগামী কল্য নাকি পাটনার গভর্ণর বাহাদুর মেলা পরিদর্শনে আসিবেন; স্টেশন-স্ট্যাফ্ তাই রাত্রি জাগিয়া রঙিন কাগজের চেন্ ঝুলাইতেছে। মিঃ চ্যাটার্জ্জী ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সোনপুর মেলা

—'আপনিও আমাদের সঙ্গে ফির্‌ছেন ত?' উত্তর দিতে পারিলাম না। গাড়ী আসিবার এখনও বিলম্ব আছে—দেখি, পাটনা না পশুপতিনাথ? এ-পার, কি ও-পার?

রাত্রির মধ্যপ্রহরে মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম—'ফিরিবার পথে নিশ্চয়ই পাটনাতে বিশ্রাম করে যাব, ছেলেদের বল্‌বেন আমার কথা।'

গাড়ীখানা ধীরে ধীরে স্টেশন্ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। নেপালের গাড়ীর জন্য আমাকে আরও দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। ইত্যবসরে আর এক পেয়ালা ভারতীয় পানীয় সেবন করিতে রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমের দিকে অগ্রসর হইলাম।

একটি ময়ূর

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

আমার বাড়ীর ছাদে কোথা থেকে একটা ময়ূর এসেছে।

উলঙ্গ ছাদ। না আছে টবে-বসানো ফুলগাছ, না তরুলতার বাহার। এই সময় সেখানে প্রচুর ঘুড়ি উড়ে এসে পড়ে। আমার মেজ ছেলে পণ্টু একটা লাঠির আগায় ঝাঁটা বেঁধে সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, সমস্তক্ষণ ঘুড়ি ধরছে। নিজেকে সে ঘুড়ি ওড়ায় না, কাকেও দেয় না, তবু অকারণে ঘুড়ি ধরাটা তার একটা নেশা—শিকারের নেশার মতো। গৃহিণী দিনরাত্রি ভয়ে ভয়ে থাকেন, তাঁর সুবোধ পুত্র কখন উৎসাহের আধিক্যে ছাদ থেকে প'ড়ে যায়।

এমনি ছাদ। তার একমাত্র সার্থকতা—কাপড় মেলে দেওয়ায়, আর বড়ি শুকোতে দেওয়ায়। এ সংসারে যা আমার দ্বিতীয় পুত্রের শিকারসঙ্কুল বৃক্ষলতাহীন অরণ্য রূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ছাদে—কাক নয়, চিল নয়—আস্ত ময়ূর সাহারা মরুভূমিতে একতাল মেঘের মতোই অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর।

ক'লকাতা শহরে বন্য ময়ূরের আবির্ভাবের কোনোই সম্ভাবনা নেই। নিশ্চয়ই কারো পোষা ময়ূর, কোনো গতিকে ছাড়া পেয়ে নগর-পরিভ্রমণে বেরিয়েছিল। কিন্তু তার আর আবশ্যক হোল না। গোটা নগর তাকে দেখবার জন্যে আমার এই ছোট বাড়ীতে ভেঙে পড়েছে। সে ভিড় ছাদের দরজা থেকে নীচে এবং সেখান থেকে বহুদূর রাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। আর ক্রমেই আশঙ্কাও উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে।

সে ভিড়ও দেখবার মতো। হিন্দুস্থানী ঝাঁকা-মুটে, মেসের উড়িয়া চাকর, আলখাল্লা পরিহিত কাবুলীওয়ালা, পাড়ার ছেলে, এমন কি কর্ম্মক্লান্ত আফিসের বাবুও একবার ঊর্দ্ধমুখে চেয়েই ক্ষুৎপিপাসা ভুলে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ছে। পথে গাড়ী-ঘোড়া চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম।

দাঁড়িয়ে দেখবার মতোই দৃশ্য! ছাদের আলসেতে ব'সে ময়ূরটা নীচের দিকে যেন আলগোছে ঝুলিয়ে দিয়েছে তার বিচিত্র বর্ণের পুচ্ছ। মাঝে মাঝে নীচের ঊর্দ্ধমুখ ভক্ত জনতার দিকে যখন গ্রীবা বেঁকিয়ে কৃপাকটাক্ষে চাইছে, তার অপরূপ গ্রীবা ঝিক্‌মিকিয়ে উঠছে অপরাহ্নের রঙিন আলোয়। আমার নিরাভরণ ছাদ যেন একটা সম্রাটের আবির্ভাবে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

বৈশাখের খররৌদ্রের পর এমনি একটি জীবের আবির্ভাব সকলের চোখ যেন জুড়িয়ে দিয়েছে। নইলে মোটভারাবনত ঝাঁকা-মুটে কিম্বা মেসের চাকরের কথা ছেড়েই দিলাম, কাবুলীওয়ালা কখনও খাতকের সন্ধানে নিযুক্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি অন্যমনস্কভাবে ময়ূরের দিকে নিবদ্ধ করত না। কাবুলীওয়ালার আত্ম-বিস্মৃতি সহজে ঘটে না।

সকলেই খুশী হয়ে উঠেছে। বিব্রত হয়েছি কেবল আমি। এই অত্যন্ত স্নিগ্ধদর্শন জীব আমার বাড়ীর দরজা দিয়েছে খুলে। ভক্তবৃন্দের অনুদ্ধত নিঃসঙ্কোচ অভ্যাগমে আমার অন্দরের মর্য্যাদা ধূল্যবলুণ্ঠিত। অথচ বহু চেষ্টাতেও এদের বিদায় করার কোনো প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে না পেরে আমি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলাম। ভগবান আমার কণ্ঠে যথেষ্ট শক্তি দেন নি। ভিড় হঠাবার জন্যে যে রূঢ়তা প্রয়োজন, তা বহু চেষ্টাতেও আমি সংগ্রহ করতে পারি না। সুতরাং এমন একটা অপদার্থ লোকের মনে মনে উত্তপ্ত হওয়া ছাড়া সান্ত্বনা লাভের আর কি উপায় থাকতে পারে!

এমন সময় এ বাড়ীর মালিক ব্রজরাজবাবুকে হন্তদন্তভাবে এই দিকেই ছুটে আসতে দেখে আমি যেন অকূলে কূল পেলাম।

ব্রজরাজবাবুকে এ পাড়ার বাঘ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ রাস্তার অধিকাংশ বাড়ীই তাঁর। লক্ষ্মীর করুণা যে তাঁর উপর কতখানি বর্ষিত হয়েছে, তা তাঁর চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই। স্থূলতনু, খর্ব্বাকৃতি মানুষ—পরিধানে একখানি মলিন বোম্বাই চাদরের অর্দ্ধাংশ। কখনও কখনও পায়ে জুতাও থাকে। মাথার চুল ছোট ছোট

করিয়া ছাঁটা। কিন্তু এদিকের ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে পরিপুষ্ট গুম্ফে এবং উদাত্ত কম্বুকণ্ঠে।

আমি সাগ্রহে ডাকলাম, এই যে এদিকে, এদিকে।

ডাকবার আবশ্যক ছিল না। উনি এই দিকেই আসছিলেন এবং লক্ষ্য ওই ময়ূর।

বললেন, কি ব্যাপার?

করুণ কণ্ঠে বললাম, দেখুন তো কাণ্ড। কাজ-কর্ম্ম, এমন কি রান্না-বাড়া পর্য্যন্ত বন্ধ।

আর বলতে হ'ল না। পাশেই একটি বাঙালী পানওয়ালা ছোকরা দাঁড়িয়ে ছিল। ব্রজরাজবাবু প্রচণ্ড হিন্দিতে তাকেই ধমক দিলেন:

—এই উল্লু, কেয়া দেখতা হ্যায়?

—আজ্ঞে ময়ূর।

—অ্যাঃ! ময়ূর! ভাগো।

ব্রজরাজবাবু আর তার দিকে চাইলেনও না। জনতা উভয় পাশে যথাসম্ভব নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে তাঁর জন্যে সঙ্কীর্ণ এক ফালি রাস্তা ক'রে দিলে, আর ব্রজরাজবাবু চক্ষের পলকে তেতলায় উঠে এলেন। হতাশভাবে আমি আবার আমার নিজের নিভৃত জায়গাটিতে এসে বসলাম। শুনতে লাগলাম:

—ও-রকম ক'রে নয়, ও-রকম নয়। আগে দুটিখানি ছোলা ছিটিয়ে দাও। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত থাক ব'সে ব'সে।

—বেশ বললেন! খেয়ে-দেয়ে যদি পালায়?

— অন্ধকার হয়ে গেলে আর পালাতে পারবে না।

—কেন?

—ওরা অন্ধকারে চোখে দেখতে পায় না।

—তাই নাকি? ওরে ছোলা নিয়ে আয় না কেউ। এ বাড়ীতে ছোলা নেই?

—না থাকে নেই নেই। আমার নাম ক'রে সামনের দোকান থেকে আধ পোয়া ছোলা নিয়ে আয় তো!

(অনেকগুলি পায়ের দুমদাম শব্দ হ'ল। বোধ হয় একাধিক লোক ছোলা আনতে ছুটল।)

আমার বড় ছেলে প্রসাদ এবার ম্যাট্রিকুলেশন দেবে। সে কোথায় গিয়েছিল। বাড়ীতে ভিড় দেখে সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

—কি ব্যাপার?

—ময়ূর।

—কোথায়?

—তোমাদের ছাদে।

— কাদের ময়ূর?

—কে জানে।

প্রসাদ উল্লসিত হয়ে উঠল:

—ময়ূর? ময়ূর ব্যংসকাদি কর্ম্মধারয়? আমাদেরই ছাদে? হুররে! (প্রসাদের কাছে ময়ূর কি ময়ূর-ব্যংসকাদি কর্ম্মধারয়ে পরিণত হ'ল অবশেষে?)

কয়েকটি বাঙালী ছোকরা কাবুলীওয়ালাকে নিয়ে আমোদ করছে:

—ক্যায়সা চিড়িয়া?

—আচ্ছা চিড়িয়া। ভালা, ভালা।

—ক্যায়সা রং?

—রংগ্? বহুত খুবসুরৎ?

—তুমারা মুল্লুকমে হ্যায়?

—হ্যায়।

—ময়ূর, ময়ূর হ্যায়?

—হাঁ, হ্যায়। বউর হ্যায়।

—হাঁ হ্যায়, না আরো কিছু!

—জরুর হ্যায়। ইস্‌সে বড়া। এৎনা বড়।

(ব'লে লাঠিটা মাথার উপর উঁচু ক'রে দেখিয়ে দিলে কত বড়।)

—ওৎনা বড়!

(লোকগুলো হো হো ক'রে হেসে উঠল।)

চোখে চশমা-পরা কয়েকটি ছেলে বলছিল:

—এই সময় যদি মেঘ উঠতো ভাই?

—আঃ!

কেতকী কেশরে কেশ পাশ করো সুরভি
ক্ষীণ কটি তটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্ব রেণু বিছাইয়া দাও শয়নে
অঞ্জন আঁকো নয়নে।

তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত বিকশিত বয়নে,
কদম্ব রেণু বিছাইয়া ফুল শয়নে।

কি আনন্দই হোত তাহ'লে! ওরা মেঘ দেখলেই নাচে, না?

—কাদের ময়ূর কে জানে? ছাদ যেন আলো ক'রে দাঁড়িয়েছে! এই সময় একবার পেখম মেলত!

—যদি বা মেলত, এত লোক দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কেন যে এরা দাঁড়িয়ে আছে! আশ্চর্য্য!

—হুজুক আর কি!

—"ভবন-শিখীরে নাচাত গণিয়া গণিয়া।"

—পুরুষ-ময়ূর, না?

—হুঁ। ময়ূরী এত সুন্দর না।

(ঠিক ওদেরই উপরে সামনের বাড়ীর দোতালার বারান্দায় ক'টি তরুণী দাঁড়িয়ে ছিল। তারা কখনও দেখছিল ময়ূর, কখনও দেখছিল রাস্তার জনতা। ছেলেগুলির কথা বোধ হয় তারা শুনতে পেলে। চুপি-চুরি একজন আরেকজনকে বললে:)

—শুনছিস? পুরুষ-ময়ূর। ময়ূরী এত সুন্দর হয় না।

—হবার দরকার কি? ওদের তো আর আমাদের মতো এত বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ী থাকতে হয় না। যৌবন জাগতে জাগতেই দুয়ারে ময়ূর এসে পেখম তুলে দাঁড়ায়।

—আর আমাদের?

—আমরা কখন ময়ূর এসে ফিরে যায় ব'লে দিনরাত্রি পেখম তুলে দাঁড়িয়ে আছি। সাজ-সজ্জার আর বিরাম নেই।

(দু'জনে হাসল।)

(ব্রজরাজবাবুর চোখ শিকারীর মতো একাগ্রতায় জ্বলছিল। ময়ূরের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, কখনো উপরে, কখনো নীচে ঘুরছিল।)

—আর ঘণ্টাখানেক বাবা, তারপরে একবার অন্ধকার হয়ে এলেই···

—আপনি ময়ূর বুঝি খুব ভালোবাসেন?

—ওঃ!

—বড় বাড়ী নইলে ময়ূর মানায় না। তা আপনার বাড়ীতে মানাবে। বেশ বড় বাড়ী।

—অনেক দিন থেকেই আমার ময়ূর পোষবার সখ আছে। কিন্তু সুবিধামত···

(এতদিন সুবিধামত দরে পাচ্ছিলেন না ব'লেই মনের সখ মনেই চাপা ছিল। এতদিনে সুবিধা যদি হ'ল, কিন্তু যে ভিড়! ময়ূরটা খুঁটে খুঁটে ছোলা খাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে উচ্চকিত হয়ে চারিদিকে ভয়ে ভয়ে চাইছিল।)

—ভয় পেয়ে গেছে বোধ হয়। এত লোক, ভয় পাবে না?

—বাস্তবিক।

—বাবাসকল, একটু আড়ালে যাও দিকি। ময়ূর ধরি, তারপরে আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে দিনরাত্রি দেখো। ওই সামনেই আমার বাড়ী, ১৪ নম্বর।

(কিন্তু বাবাসকলের সরবার লক্ষণ দেখা গেল না। তারা শুধু, যাকে বলে, গা মারলে।)

—যা হোক বাবা!

চশমা-পরা ছেলেটি বলছিল:

—আমার মামার বাড়ীতে একটা ময়ূর ছিল। তার জন্যে গোছা গোছা সাপ নিয়ে আসতে হ'ত।

—কেন?

—খেত।

—সাপ খায়! কি সর্ব্বনাশ! ওকে দেখে দেখে যতগুলি কবিতা আবৃত্তি করছিলাম, সব সুর কেটে গেল!

—কেন?

—যাবে না? তুই যদি দেখিস, একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে ডাষ্টবিন থেকে খুঁটে খুঁটে···

—কি ভয়ানক! সেই উপকথার রাক্ষসী সুয়োরাণীর মতো। দিনে পরমাসুন্দরী রাণী, রাত্রে হাতীশালা থেকে হাতী, ঘোড়াশালা থেকে ঘোড়া টপাটপ গিলছে! ভয়ঙ্কর কল্পনা!

—না, তুই ময়ূরের সম্বন্ধে ঘেন্না ধরিয়ে দিলি ভাই। অমন সুন্দর জন্তু সাপ খায়!

—আরও শোন্। অমন বিষধর সাপ পরমানন্দে ভোজন করছে, কিন্তু কুকুরে ছুঁলেই বাস্!

—ম'রে যাবে ?

—হ্যাঁ। আর দেখতে হবে না।

দোতালার বারান্দায় তরুণীটি বলছিল :

—আমাদের বারে ময়ূরের সম্বন্ধে রচনা লিখতে দিয়েছিল। আমি লিখিনি। এখন একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছা করছে।

—কি কবিতা ?

—'ময়ূরের অপমৃত্যু'। মানুষের প্রেমে ময়ূর ম'রে গেল—যেমন ক'রে মরল পদ্মিনী, মরল কৃষ্ণকুমারী। চেয়ে দেখ, লোকগুলো কি হিংস্র ভালোবাসায় থাবা গেড়ে ব'সেছে।

—লেখ তুমি। চমৎকার হবে।

সন্ধ্যা আর কিছুতে যেন হ'তে চায় না। ভয়ে অথবা কি জানি কি ভেবে ময়ূরটা ডেকে উঠল। ক'টি ছোট ছেলে, যারা এতক্ষন মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অপূর্ব্ব জীবটিকে দেখছিল, এই অশ্রুতপূর্ব্ব কর্কশ শব্দে চমকে দু পা পিছু হ'টে এল।

প্রসাদ আপন মনেই আর একবার বললে, হুঁ। ময়ূর বংসকাদি কর্ম্মধারয়।

ময়ূর নামের সঙ্গে ব্যাকরণের এই ভীতিকর সমাস যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কেকাধ্বনিতে বুঝি তারই সাড়া মিলল।

—কি খোকাবাবু, নেবে ? (কথাটা বোধ হয় মুদি বললে।)

—না।

—না, কেন ? অমন সুন্দর দেখতে।

—আমার এগজামিন।

পাশের বাড়ীর বৌটি অনেকক্ষণ থে'কে জানালার আড়াল থেকে দেখছিল। কাজকর্ম্ম সেরে তার শাশুড়ী এসে পাশে দাঁড়ালেন।

—ওমা, একটা ময়ূর যে!

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ থেকেই ওইখানে রয়েছে। ধরবার জন্যে কত লোক ছুটেছে দেখুন। কি সুন্দর ময়ূর!

—ভারী সুন্দর! আহা! বলে, 'যশোদা নাচাত তোরে ব'লে নীলমণি'।

—সে ময়ূরকে নয় মা, নাচাত গোপালকে। (বৌটি হাসল।)

—সে একটি কথা বৌমা। যে গোপাল সে-ই ময়ূর। নইলে কি আর ভগবান শিখীপুচ্ছ মাথায় নেন ? বৃন্দাবন যেতে কত ময়ূরই দেখলাম মা, বন যেন আলো ক'রে রয়েছে।

—অনেক ময়ূর ?

—ঝাঁকে ঝাঁকে। যমুনার ধারে···

—কদম গাছ আছে ?

—আছে বই কি।

—সবই আছে, কেবল বৃন্দাবনচন্দ্রই নেই।

—তিনিও আছেন মা। সবই যখন আছে তখন তিনিও আছেন বই কি! এসব ছেড়ে কি কোথাও যেতে পারেন!

—ছবিতে যখন দেখি, যমুনার নীল জল, ফুলে ভরা কদম গাছ, শ্রীকৃষ্ণ বাজাচ্ছেন বাঁশী আর-ময়ূর ময়ূরী নাচছে,—এমন অদ্ভুত লাগে আমার!

(বৌটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে বোধ হয়।)

মুদি জিজ্ঞাসা করলে ব্রজরাজবাবুকে :

—ময়ূরের মাংস খেয়েছেন কখনও ?

(ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে ব্রজরাজবাবু এবার প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চমকে বললেন :)

—ময়ূরের মাংস ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—খায় নাকি ?

—ওঃ! খুব পেয়ার ক'রে খায়। এমন চমৎকার মাংস!

—তাই নাকি ?

(ব্রজরাজবাবু ময়ূরটার দিকে চেয়ে ওর কথার সত্যতা পরীক্ষা করলেন।)

—তুমি খেয়েছ ?

—অনেক। আমাদের মুল্লুকে…

—কার ময়ূর কে জানে !

—কত সখের জিনিস! সেও ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে নিশ্চয়ই।

—তার আর কথা! কালই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে দেখবেন।

—নিশ্চয়।

—তখন তো যার ময়ূর তাকে ফেরত দিতে হবে ?

—তা ছাড়া আর উপায় কি ?

—চাই কি, এখনও এসে পড়তে পারে।

—তা তো পারেই।

—এলে ভালো হয়। বুড়োটা যে রকম তাক্ ক'রে ব'সে আছে, ভারি জব্দ হয়ে যায়।

(সেই সম্ভাবনায় দু'জনে খুশীর সঙ্গে হেসে উঠল।)

—এই, ও রকম ক'রে হাসবেন না, হাসবেন না।

(অন্ধকার হয়ে এসেছে। ব্রজরাজবাবু বুড়োকেই ওস্তাদ স্থির ক'রে তার উপরই ময়ূর ধরার ভার দিয়েছেন। মুদি ওস্তাদ শিকারীর মতো গুটি গুটি চলেছে।)

—এই ওরকম ক'রে হাসবেন না। ময়ূরটা উড়ে পালাতে পারে।

—পালাবে কি ক'রে? অন্ধকারে দেখতে পায় না যে !

—না, পায় না আবার !

—সত্যি পায় না। শ্রীরাধার অভিশাপ আছে।

—আছে !

—নেই তো দেখতে পায় না কেন ? তার উত্তর দাও।

(লোকটা তার উত্তর দিতে না পেরে চুপ ক'রে রইল।)

রাস্তার ভিড় এখন অনেকটা হালকা হয়েছে। সেখান থেকে এখন আর অন্ধকারে ময়ূরটাকে দেখা যায় না। নিতান্ত যারা উৎসাহী তারা ছাড়া আর সকলেই চ'লে গেছে।

ব্রজরাজবাবু আছেন। আর আছে সেই মুদি। কখনও উত্তর দিক থেকে, কখনও দক্ষিণ দিক থেকে, কখনও সে গুটি গুটি এগুচ্ছে, কখনও পিচুচ্ছে। অন্ধকারে তার কালো দেহের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কৃষ্ণকায় শিকারী কুকুরের মতো।

ব্রজরাজবাবু ক্রমেই অধৈর্য্য হয়ে উঠছেন।

হঠাৎ একটা ঝটপট শব্দের সঙ্গে মুদি চীৎকার ক'রে উঠল : এইবার !

ময়ূরটা ধরা পড়েছে !

কালিদাসের যুগে ভারতবর্ষ

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এম-এ

প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা এখনও সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে আজকাল ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, কালিদাস খুব সম্ভব খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে তাঁর অমর কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন। সে সময়ে উত্তর-ভারতে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের অখণ্ড প্রতাপ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাংক আর্যাবর্তের রাজাদের পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত ক'রে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তারপর তিনি দক্ষিণাপথ জয় করার উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম তীরপথে অগ্রসর হ'য়ে দক্ষিণ-কোশল প্রভৃতি বহু জনপদের অধিপতিদের পরাভূত ক'রে আধুনিক মাদ্রাজ নগরের নিকটবর্তী কাঞ্চী রাজ্যে উপনীত হলেন। কিন্তু তিনি দক্ষিণাপথের বিজিত জনপদগুলি স্বীয় অধিকারভুক্ত করলেন

না ; আনুগত্য স্বীকারের পর পরাজিত রাজাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। এই অস্ত্র বিজিত ভূখণ্ডের বাইরেও সমুদ্রগুপ্তের রাজশক্তি বহু বিভিন্ন জনপদে স্বীকৃত হয়েছিল। পূর্বে সমতট অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ এবং কামরূপ বা আসাম, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পঞ্জাব ও রাজপুতানার অন্তর্গত মালব, যৌধেয় প্রভৃতি জাতিদের রাজ্যেও সমুদ্রগুপ্তের রাজপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা-ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কুষাণ রাজা এবং মালবের শক রাজারাও মগধের গুপ্ত রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। আর সুদূর সিংহল-দ্বীপেও সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি, কামরূপ থেকে গন্ধার (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) এবং নেপাল থেকে সিংহল পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রান্তেই সমুদ্রগুপ্তের শক্তি ও খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। একমাত্র অশোক ছাড়া সমুদ্রগুপ্তের পূর্ববর্তী আর কোনো রাজার আমলেই এমন সমগ্র ভারতব্যাপী শক্তি ও খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায় না। মৌর্য যুগের পর ভারতীয় রাজশক্তি বহুধা খণ্ডিত হ'য়ে পড়ে এবং অখণ্ড ভারতের ধারণাও সম্ভবত কিছুকালের জন্য তিরোহিত হয়। কয়েক শতাব্দী পরে আবার অখণ্ড-ভারত-বোধের পরিচয় পাই গুপ্তযুগের সাহিত্যে। আর ওই সাহিত্যের মধ্যে এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে সমুদ্রগুপ্তের মহা সেনাপতি কবি হরিষেণের একখানি প্রশস্তিকাব্য এবং মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত ও রঘুবংশ নামক দুখানি কাব্য। হরিষেণের প্রশস্তিখানি প্রয়াগে মৌর্যরাজ অশোকের একটি স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ আছে ; ওই উৎকীর্ণ লিপি থেকেই আমরা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয় কাহিনী ও তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রবিভাগের কতকটা পরিচয় পাই। সমুদ্রগুপ্তের পর তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৮০-৪১৩) সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি আরও বেড়ে যায়। রাজ্যগ্রহণের অল্পকাল পরেই চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য সুরাষ্ট্র (কাঠিয়াবার) ও মালবের শক রাজাকে পরাজিত ক'রে ওই দুই জনপদ স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। গুপ্তসম্রাট্‌গণের আদি রাজধানী ছিল মগধের (দক্ষিণ বিহারের) পাটলিপুত্র নগরে। মালব রাজ্যাধিকারের পর শকারি বিক্রমাদিত্য অর্থাৎ সম্রাট্‌ চন্দ্রগুপ্ত উক্ত রাজ্যের প্রধান নগরী উজ্জয়িনীকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে গ্রহণ করেছিলেন ব'লে মনে করার হেতু আছে। মহাকবি কালিদাস এই চন্দ্রগুপ্তের আমলে উজ্জয়িনী নগরীতে অন্তত কিছুকাল বাস করেছিলেন ব'লে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। মেঘদূত কাব্যে কালিদাস উজ্জয়িনীকে স্বর্গগামীদের পুণ্যবলে ধরাতলে আনীত একখানি অতি সুন্দর স্বর্গ-খণ্ড ব'লে বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষের আর কোনো স্থানকে কালিদাস এত খানি মর্যাদা দেন নি। এর থেকেই মনে হয়, কালিদাস খুব সম্ভব বিক্রমাদিত্যের রাজধানী বিশাল উজ্জয়িনী নগরীর অধিবাসী ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, মৌর্যযুগের পরে এই সময়ে আবার সমগ্র ভারতবর্ষের চেতনা ভারতবাসীর মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালিদাসের কাব্যেই তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শুধু অখণ্ড ভারতবর্ষের চেতনা নয়, কালিদাসের কাব্যে যে গভীর ও নিবিড় ভারত-প্রীতির পরিচয় পাই সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। ভারতবর্ষের প্রতি প্রান্তের নদী পর্বত জনপদ প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের এই শ্রেষ্ঠ কবির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর কাব্যগুলিতে পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর। সুদূর বংক্ষুনদী বা আমুদরিয়া থেকে তাম্রপর্ণী নদী এবং আসামের অন্তর্গত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর থেকে কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তী মলয় পর্বত পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক অংশই কবিচিত্তের প্রীতিরসে অভিষিক্ত হ'য়ে যে মহিমা অর্জন করেছে আজও তা আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে। বস্তুত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, কালিদাসের কাব্য, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে আয়ত্ত ও উপলব্ধি করার যে ঐকান্তিক প্রয়াস দেখ্‌তে পাই, আধুনিক ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যে তার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। এটা সত্যই বড় আক্ষেপের বিষয়। প্রাচীন কালে তীর্থ পর্যটন প্রভৃতি নানা উপলক্ষে সমগ্র দেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়-স্থাপনের যে ব্যবস্থা ছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও তার পরিবর্তে কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থার উদ্ভব হয় নি। তার ফল এই হয়েছে যে, আজকাল আমরা স্কুলপাঠ্য ভূগোল-পুস্তকের সাহায্যে ভারতবর্ষকে চিন্‌তে পারলেও তাকে অন্তরের মধ্যে কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারিনে।

কালিদাস তাঁর কাব্যগুলিতে নানা উপলক্ষে তৎকালীন

ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে বর্ণনা করেছেন। এই সবগুলি বর্ণনা একত্র মিলনে গুপ্তযুগের ভারতবর্ষের যে চমৎকার চিত্রটি ফুটে ওঠে তা সত্যই অপূর্ব। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনা উপলক্ষে কবি ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্তেরই একটি অতি মনোরম বিবরণ দিয়েছেন। আবার ঐ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় আগত রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী নরপতিদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বহু জনপদের উল্লেখ করেছেন। তারপর ঐ কাব্যেরই ত্রয়োদশ সর্গে রাক্ষসপুরী থেকে সীতাকে উদ্ধার ক'রে রামচন্দ্র যখন পুষ্পক-রথে আরোহণ ক'রে আকাশমার্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন, তার বর্ণনা উপলক্ষে কবি সিংহল থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রামচন্দ্রের পথরেখার একটি অপূর্ব চিত্র অংকন করেছেন। আর তাঁর মেঘদূত-কাব্যে বিরহী যক্ষের বার্তাবাহী দূতরূপী মেঘের পথ নির্দেশ উপলক্ষে বিন্ধ্যপর্বত ও নর্মদা-নদীর দক্ষিণস্থিত রামগিরি থেকে হিমালয়ের পরপারস্থিত কৈলাসপর্বত ও মানস সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের যে ছবিটি এঁকেছেন, তা যুগে যুগে ভারতবর্ষের চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তরসীমাব্যাপী বিশাল হিমালয় পর্বতের একটি বর্ণনা পাই কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গে; আর ভারতবর্ষের দক্ষিণদিক্‌বর্তী মহাসমুদ্রের একটি বর্ণনা পাই রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে। এই সবগুলি বর্ণনা একত্র মিলিয়ে পাঠ করলে তদনীন্তন ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড ছবি যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষবৎ ভেসে ওঠে। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে দেখি রাজা রঘু দিগ্‌বিজয়-বাসনায় ষড়্‌বিধ সেনাদল নিয়ে প্রথমেই পূর্বদিকে অগ্রসর হ'লেন। সুহ্ম অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসীরা বেতস লতার ন্যায় নত হ'য়ে আত্মরক্ষা করল। তৎপরে রঘু গঙ্গাস্রোতোন্তরবর্তী বঙ্গদেশে (আধুনিক প্রেসিডেন্সী বিভাগ) উপনীত হ'য়ে নৌযুদ্ধ-নিপুণ বাঙালীদের পরাজিত ক'রে ঐ দেশে জয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন এবং বাংলা দেশের কলম ধান্য অর্থাৎ রোয়া ধান যেমন প্রথমে উৎখাত ও পরে প্রতিরোপিত হ'য়ে প্রচুর শস্য দান করে বঙ্গদেশের রাজাও তেমনি প্রথমে রাজ্যচ্যুত ও পরে রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রাজা রঘুকে প্রচুর উপহার দিয়ে সংবর্ধনা করেছিলেন। তৎপরে তিনি কপিশা অর্থাৎ মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাসাই নদী উত্তীর্ণ হ'য়ে উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) দেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে কলিঙ্গ অর্থাৎ বৈতরণী ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেশে উপস্থিত হ'লেন। তাম্বুল, নারিকেল ও মহেন্দ্রপর্বতের জন্য কলিঙ্গ বিখ্যাত। এই দেশের অধিপতিকে পরাভূত ও স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে ধর্মবিজয়ী রঘু আরও দক্ষিণে কাবেরী নদী অতিক্রম ক'রে মরীচ, এলা ও চন্দন-সুরভিত মলয়-পর্বতের উপত্যকাস্থিত পাণ্ড্য (দক্ষিণ তামিল) দেশে গিয়ে তাম্রপর্ণী-সাগর সংগমে জাত প্রচুর মুক্তা উপহার গ্রহণ করলেন। তৎপরে তিনি ক্রমে দর্দুর (সম্ভবত নীলগিরি) ও সহ্য (পশ্চিম ঘাট) পর্বত অতিক্রম ক'রে কেরল (ত্রিবাংকুর ও মালাবার) দেশে প্রবেশ করলেন। তৎপরে অপরান্ত (কোংকন) দেশের চিত্রকূট পর্বতের পার্শ্ব দিয়ে এগিয়ে পারসীকদের দেশে গিয়ে যবনদের অর্থাৎ পারসীকদের অসংখ্য শ্মশ্রুমণ্ডিত শির ভূপতিত করেন। পরে তিনি উদীচ্য দেশ জয়ে অগ্রসর হ'য়ে বংক্ষু অর্থাৎ আমুদরিয়ার তীরবর্তী কুংকুম-রঞ্জিত বাহ্লীক দেশে উপনীত হলেন। সেখানে হূণদের যুদ্ধে পরাজিত ক'রে রাজা রঘু আধুনিক কাশ্মীরের অন্তর্গত কাম্বোজ দেশের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের উপত্যকায় প্রবেশ করেন। ক্রমে পূর্বদিকে অগ্রসর হ'য়ে গঙ্গা নদী অতিক্রম ক'রে ও কিরাত প্রভৃতি পার্বত্য জাতিদের বিধ্বস্ত ক'রে তিনি লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কালা গুরুদ্রুম শোভিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যে প্রবেশ করেন। তৎপর ভয়ত্রস্ত কামরূপাধিপতি অসংখ্য রত্ন পুষ্পোহার দ্বারা দিগ্‌বিজয়ী রঘুর চরণ বন্দনা করেন। এভাবে সুহ্ম বা রাঢ় দেশ থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে কামরূপ বা আসামে এসে রঘুর দিগ্‌বিজয় সমাপ্ত হয়। এই বর্ণনাটিতে শুধু ভারতবর্ষের সীমান্তস্থিত নদী-পর্বত জনপদগুলিরই উল্লেখ আছে, ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী জনপদসমূহের কোনো উল্লেখ নেই—এটা লক্ষ্য করার বিষয়।

রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে বিদর্ভ (অর্থাৎ আধুনিক বেরার) দেশের রাজার ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভার বর্ণনা উপলক্ষে ভারতবর্ষের আর একটি চিত্র আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্বয়ংবর-সভায় বহু জনপদের রাজন্যবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন, তার মধ্যে রঘু-পুত্র কুমার অজও উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় বিবাহবেশে সজ্জিতা পতিম্বরা রাজকন্যা

ইন্দুমতী পরিচারিকা-সহ স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হলেন। নৃপতিগণের চরিত্র ও বংশ বিষয়ে অভিজ্ঞা এবং পুরুষের মত প্রগল্‌ভা সহচরী সুনন্দা ইন্দুমতীকে একে একে রাজাদের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের পরিচয় দিতে লাগ্‌ল এবং ইন্দুমতী যখন রাজাদের অতিক্রম ক'রে যেতে লাগলেন তখন তাঁদের আশা-সমুজ্জ্বল মুখগুলি একে একে নৈরাশ্যের অন্ধকারে কালো হ'য়ে গেল। যাহোক্, সুনন্দা প্রথমেই ইন্দুমতীকে মগধের (দক্ষিণ বিহারের) রাজার কাছে নিয়ে মগধরাজের পরিচয় দিলে; সব শুনে ইন্দুমতী তাঁকে একটি শুষ্ক প্রণাম ক'রে অন্য রাজার দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর অঙ্গ (মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলা) দেশের অধিপতিকেও প্রত্যাখ্যান ক'রে সিপ্রানদীতীরস্থিত অবন্তি (অর্থাৎ মালব)-রাজের নিকট গেলেন। তারপর অনূপ বা দক্ষিণ মালবের অধিপতির পালা, ঐ জনপদের রাজধানী রেবা অর্থাৎ নর্মদা নদীর তীরস্থিত মাহিষ্মতী (আধুনিক মান্ধাতা) নগরীর খ্যাতিও ইন্দুমতীর চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারল না। তারপর ক্রমে ক্রমে কালিন্দী অর্থাৎ যমুনার তীরবর্তী শূরসেন বা মথুরা রাজ্য, পূর্ব সমুদ্রের তীরস্থিত মহেন্দ্র পর্বত শোভিত কলিঙ্গ দেশ, মলয় পর্বতের উপত্যকাস্থিত তাম্বুল লতা ও গুবাক বৃক্ষ এবং এলা লতা ও চন্দন বৃক্ষ শোভিত পাণ্ড্য (রাজধানী উরগপুর) প্রভৃতি জনপদের অধিপতিদের উপেক্ষা ক'রে অবশেষে ইন্দুমতী উত্তর কোশলের অধিপতি রঘুর পুত্র অজের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন। এই বর্ণনাটিতে ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী কতক-গুলি নূতন জনপদের নাম পাওয়া গেল।

ভারতবর্ষের তৃতীয় ভৌগোলিক বিবরণ পাই রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে। রামচন্দ্র রাবণ বিনাশের পর সীতাসহ পুষ্পকরথে আরোহণ ক'রে আকাশ-পথে লংকা থেকে অযোধ্যায় ফিরে চলেছেন। পুষ্পক রথ দ্রুতবেগে উড়ে চলেছে এবং দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ঘন ঘন পটপরিবর্তনের মত একে একে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, আর রামচন্দ্র সীতার নিকট ঐ সব দৃশ্যের বর্ণনা করছেন। লংকা ছেড়ে প্রথমেই চোখে পড়ল রামেশ্বর সেতুবন্ধ। শরৎকালে ছায়াপথ যেমন তারকাখচিত সুনীল আকাশকে দ্বিধা বিভক্ত করে, মলয় পর্বত থেকে লংকা পর্যন্ত বিস্তৃত ঐ সেতুটিও তেমনি ফেনখচিত নীল সমুদ্রকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। তারপর নক্র-শংখসংকুল সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে দূর থেকে তমাল ও তালবন-শোভিত বেলাভূমি একটি বৃহৎ লৌহচক্রের প্রান্তস্থিত কলংক রেখার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হ'ল। অতঃপর পম্পা অর্থাৎ তুঙ্গভদ্রা এবং গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী জনস্থান, পঞ্চবটী প্রভৃতি জনপদ ও মাল্যবান্ পর্বত আবির্ভূত হ'য়ে রাম ও সীতার মনে বনবাসকালের কত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি জাগিয়ে ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রয়াগের নিকটবর্তী চিত্রকূট পর্বত এসে উপস্থিত হ'ল; অদূরে স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন চিত্রকূটের পার্শ্ববর্তী ভূমি কণ্ঠদেশে একছড়া মুক্তার মালা পরেছে। তারপরেই এল শুভ্রসলিলা গংগা ও নীল-সলিলা যমুনার অপূর্ব সংগমস্থল। সর্বশেষে উত্তর কোশলের সুবিখ্যাত সরযূ নদী দৃষ্টিগোচর হ'ল—দেখা মাত্রই রামচন্দ্রের মনে হ'ল যেন জননী কৌশল্যার মতই ঐ নদীটি তাঁকে তরঙ্গহস্ত প্রসারিত ক'রে বুকে টেনে নিতে ব্যাকুল হয়েছে। অতঃপর রাম ও সীতা পুষ্পক রথ থেকে অবতরণ ক'রে প্রতীক্ষমান বশিষ্ঠ, ভরত ও প্রজাবৃন্দ কর্তৃক অভ্যর্থিত হ'য়ে অযোধ্যার সংলগ্ন সাকেত নগরের একটি সুরম্য উপবনে গিয়ে কিছুকাল অবস্থান করলেন। এই বর্ণনাটিতে সুস্পষ্ট কারণবশত কালিদাসের যুগের চেয়ে রামায়ণের যুগের ভৌগোলিক চিত্রটিই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে।

কালিদাসের যুগের ভারতবর্ষের আর একটি ভৌগোলিক বিবরণ পাই মেঘদূত কাব্যের পূর্ব খণ্ডে। এটি স্পষ্টতই কালিদাসের নিজের যুগের বর্ণনা এবং এ বর্ণনার অনেকটাই কবির নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাজাত ব'লে মনে হয়। ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে ব'লেই মেঘদূতের দেশ বর্ণনা রঘুবংশের দেশ বর্ণনার চেয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকতর আকর্ষণ করে। কোনো সময়ে এক যক্ষ কর্তব্যে অবহেলা করার দরুণ প্রভু কর্তৃক এক বৎসরের জন্য নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে রামগিরি (আধুনিক নাগপুরের নিকটবর্তী রামটেক্) পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েক মাস পরে নব বর্ষার আবির্ভাবকালে পত্নী-বিরহ-কাতর যক্ষ একটি মেঘকে দৌত্যে বরণ ক'রে হিমাদ্রির পরপারস্থিত অলকা পুরীতে পতি-বিরহবিধুরা পত্নীর নিকট প্রেরণ ক'রে এবং মেঘ কোন্ পথ ধ'রে অলকায় যাবে তার

নির্দেশ দান করে। এই নির্দেশদান উপলক্ষেই কবি তৎকালীন ভারতবর্ষের একাংশের একটি অতি অপূর্ব বর্ণনা করেছেন। রামগিরির নিকট বিদায় নিয়ে উত্তরদিকে মালভূমির উপর দিয়ে একটু এগিয়েই পক্ক আম্র শোভিত আম্রকূট পর্বত। আর একটু অগ্রসর হ'লেই হস্তী দেহে অংকিত শ্বেত রেখার ন্যায় বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে শীর্ণকায় রেবা অর্থাৎ নর্মদা নদী দেখা যাবে। তারপরেই সুবিখ্যাত দশার্ন (পূর্ব মালব) দেশ, সেখানে বাগানে বাগানে কেয়া ফুটেছে, গাছে গাছে কালো জাম পেকেছে, গ্রামের বড় বড় গাছে গৃহবলিভুক্‌ পাখীরা বাসা বেঁধেছে ; এই দশার্ন দেশেই বেত্রবতী (অর্থাৎ বেতোয়া) নদীতীরে সুবিখ্যাত রাজধানী বিদিসা নগরী (আধুনিক বেস্‌ নগর) অবস্থিত। তারপর মেঘ নীচৈঃ নামে একটি পাহাড় ও একটি ধননদী অতিক্রম করে একটু বাঁকা পথে উজ্জয়িনীর দিকে অগ্রসর হবে ; পথে পড়বে নির্বিন্ধ্যা অর্থাৎ আধুনিক নিবাঝ্‌ ও কালীসিন্ধু নদী। তারপর অবন্তি (পশ্চিম মালব) দেশে পৌঁছে ধরাতলে স্বর্গতুল্য শিপ্রা নদীতীরে অবস্থিত বিশাল উজ্জয়িনী পুরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। উজ্জয়িনীর অনতিদূরে শিপ্রার শাখা গন্ধবতীর তীরে সুবিখ্যাত মহাকালের মন্দির অবস্থিত। এই বিশাল নগরীর অতুল ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য দর্শন ক'রে একটু এগিয়েই মেঘ ক্ষীণকায় গম্ভীরা নদী ও তৎপরে দেবগিরি (আধুনিক দেবগড়)-স্থিত কার্তিকেয়ের মন্দির দেখতে পাবে। আরও অগ্রসর হ'য়ে চর্মন্বতী অর্থাৎ আধুনিক চম্বলা নদী অতিক্রম ক'রে মেঘ দশপুর (সিন্ধিয়ার রাজ্যের মন্দশোর) নগরে উপনীত হবে। অতঃপর মেঘ দ্রুতগতিতে ব্রহ্মাবর্ত অর্থাৎ আধুনিক থানেশ্বর অঞ্চল ও সরস্বতী নদী পার হ'য়ে কনখলের নিকটে যেখানে জাহ্নবী হিমালয় থেকে অবতীর্ণ হচ্ছেন সেখানে যাবে। তারপরে হিমালয়ের সানুদেশের সমস্ত সৌন্দর্য দর্শন ক'রে যক্ষের দূতরূপী মেঘ অবশেষে ক্রৌঞ্চ রন্ধ্র নামক গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে তিব্বতের অন্তর্গত সুবিখ্যাত মানস সরোবর ও তার নিকটবর্তী কৈলাস পর্বতের উপরে অবস্থিত কবি কল্পিত অলকাপুরীতে পৌছোবে। মেঘদূতের পাঠককেও এখানে বাস্তব জগৎ থেকে কল্পনা জগতে প্রবেশ করতে হয়। এই বর্ণনাটিতে দশার্ন ও অবন্তির ছোট খাটো পরিচয়গুলিও কবি অতি সযত্নে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন, অন্যান্য জনপদের বর্ণনায় কবির এমন পুংখানুপুংখ প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় না। 'তার থেকেই মনে হয় দশার্ন ও অবন্তি জনপদের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। এই পরিচয়ের জন্যেই পূর্ব মেঘের জনপদ-বর্ণনার রস এমন নিবিড় হ'য়ে উঠেছে।

যাহোক্‌, বংক্ষু নদী থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং সিংহল দ্বীপ থেকে মানস সরোবর পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কালিদাসের যে গভীর জ্ঞান ও প্রীতির আকর্ষণ ছিল, আশা করি এই আলোচনা থেকে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে। বস্তুত প্রাচীন বা আধুনিক আর কোনো কবির কাব্যেই ভারতবর্ষের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে অখণ্ড ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন গভীর উপলব্ধির পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কালিদাসের কাব্যে 'ভারতবর্ষ' এই নামটি কিংবা তার কোনো প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না। কিন্তু নাম না থাক্‌লেও ভারতবর্ষের যে রূপটি তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে তা চিরকাল অক্ষয় হ'য়ে বিরাজ করবে।

পৃথিবী ছাড়িয়ে

প্রবোধকুমার সান্যাল

রাত নয়টার সময় দিল্লী স্টেশনে আমাদের এক্সপ্রেস ট্রেন পৌছিল। বোম্বাই-বরোদা লাইন দিয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় টুণ্ডলা হইতে এই গাড়ী ধরিয়াছি, সুতরাং মনে করিয়াছিলাম দিল্লী স্টেশনেই রাত্রির আহার সাঙ্গ করিব। গাড়ী পনেরো মিনিটকাল দাঁড়াইবে, অতএব স্টেশনের হোটেলে কিছু খাইয়া কিছু-বা সঙ্গে লইয়া এক রকম করিয়া ব্যবস্থা করিব।

মে মাসের মাঝামাঝি। গতকাল সন্ধ্যা হইতে ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছি—বালুর ঝড়ে, ধূলিরাশির ঝাপটে, জলের অভাবে আজ সারাদিন ধরিয়া রাজপুতনার সমস্ত পথটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহে সিদ্ধ হইয়াছিলাম, রাত নয়টায় এখনও ঠাণ্ডা বাতাস কোথাও নাই, বরং চারিদিক-অবরুদ্ধ দিল্লী স্টেশনের ভিতরটায় যেন একটা গুমটের সৃষ্টি হইয়াছিল। আগুনের খাপরার ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আমি প্রথমে একটু শীতল পানীয়ের অন্বেষণে এদিক ওদিক ছুটিলাম।

ঠাণ্ডা জল হয়ত পাইতাম কিন্তু ক্লান্ত দেহে খুঁজিয়া বাহির করিবার আর উৎসাহ নাই; সুতরাং স্টেশনের এক রেষ্টুরেণ্টে ঢুকিয়া বরফ জল হুকুম করিলাম। জল আসিল। জল খাইয়া কিছু মালাই রুটি মিঠাই ও ফল অর্ডার করিয়া খাইতে বসিয়া গেলাম।

মনে করিয়াছিলাম আহারাদি শেষ করিয়া যদি মিনিট পাঁচেক সময় পাই তবে প্লাটফরমের পাইপে স্নান করিয়া লইব, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। আলীগড় স্টেশনের বাথরুমটা অবহেলা করিয়া খুবই ভুল করিয়াছি, তখন সময়ও হাতে ছিল। আগামী কাল প্রভাত ছাড়া স্নান করিবার আর কোনো উপায় নাই।

আহার শেষ করিয়া পয়সা চুকাইয়া এক লোটা জল হাতে লইয়া যখন বাহির হইয়া আসিলাম তখন আর সময় নাই, গাড়ীর তৃতীয় বেল্ পড়িয়া গিয়াছে। দূরে সবুজ সিগ্নাল্ দিল, গার্ড বাঁশী বাজাইল—আমি তাড়াতাড়ি আমার কামরায় আসিয়া উঠিলাম।

চালাক-চতুর যুবক হইয়া এমন একটা দ্রুত মুহূর্ত্তে যে এমন ভুল করিব তাহা জানিতাম না। নিজের কামরায় না উঠিয়া অন্য কামরায় তাড়াতাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছি প্রথমেই তাহা উপলব্ধি করিলাম। সকল তৃতীয় শ্রেণীর চেহারা একই, কেবল চাক্ষুষ পরিচয়ের যে-সকল আরোহী তাহাদেরই চেনামুখের সঙ্কেত পাইয়া কামরা চিনিয়া লই, কিন্তু এক্ষেত্রে নূতন মানুষ ও স্ত্রীলোক দেখিয়া ভুল বুঝিলাম। গাড়ী নড়িতে ও দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি দ্রুত নামিয়া নিজের কামরার দিকে ছুটিব—এমন সময় দরজায় বাধা পাইলাম। একব্যক্তি আমার পথ অবরোধ করিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। লোকটি আমাকে বাধা দিয়া জানাইল—ইহাই আমার কামরা, ঠাহর করিতে না পারিয়া নামিয়া যাইতেছিলাম। গরমের চোটে মাথার ঠিক ছিলনা, এইবার ভালো করিয়া চাহিলাম। দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া যাহাদের দেখিয়াছিলাম তাহারা অনেকেই আছে, নূতন যাত্রীও দুই চারিজন উঠিয়াছে। নিজের জায়গায় আসিয়া নিজের পাতা বিছানাটা চিনিলাম বটে, কিন্তু তাহা একটি স্ত্রীলোককে দখল করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

স্ত্রীলোকটির অভিভাবক কে তাহা বুঝিতে না পারিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, ই হমারি সীট্ হ্যায়, ছোড় দিজিয়ে।

মেয়েটি মুখ তুলিল। বয়স তাহার অল্প, চেহারাটা সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গে রেশমের পরিচ্ছদ; মনে হইল গলায় এক ছড়া শাদা মুক্তার মালা ঝিকমিক করিয়া উঠিল। বিপরীত বেঞ্চের উপর একখানা পা সে তুলিয়া দিয়াছিল—সেই পায়ে তাহার অলক্তক এবং মখমলের ফিতা-বাঁধা জুতা। তাহার মুখে এক মুখ পান, দুই কানে দুইটা দুল। মুখ তুলিয়া সে হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, আপকো বিছওয়ানে?

জী।

বুঝিলাম এই গরমে জানালার ধারের বাতাস ছাড়িয়া তাহার উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহার হাসিমুখের উত্তরে আমার গম্ভীর ও সংযত মুখের চেহারা দেখিয়া সে বসিতে সাহস করিল না।

মাঠের ভিতর দিয়া ট্রেন তখন দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া সে বিপরীত বেঞ্চে আমার আসনের সম্মুখেই নিজের জায়গা করিয়া লইল। আমি তখনও বুঝিলাম না—কে মেয়েটির অভিভাবক। এক সময় তাহার দুইখানা হাত নড়িতেই লক্ষ্য করিলাম, দুই হাতে প্রচুর সোনা ও জড়োয়ার অলঙ্কার। গাড়ীতে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই, কিন্তু সেজন্য তাহাকে আড়ষ্ট হইতে দেখিলাম না, বরং মাথার ঘোমটা একটু কমাইয়াই সে সপ্রতিভভাবে বসিয়া রহিল।

আমার আচরণে সে খুশি হয় নাই শীঘ্রই তাহার প্রমাণ পাইলাম। কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উষ্মা মিলাইয়া এক সময়ে সে প্রশ্ন করিল, শামান্ হটায় লেঁই ?

বুঝিলাম তাহারই মালপত্রে দুইটা বেঞ্চের মধ্যস্থল প্রায় ঠাসাঠাসি, হাত পা ছড়াইতে আমার খুবই অসুবিধা হইবে, কিন্তু তাহাকে আর ব্যস্ত না করিবার জন্য সংক্ষেপে জবাব দিলাম, রহেন দিজিয়ে।

মেয়েটি সহসা পুনরায় প্রশ্ন করিল, আপ কিৎনা দূর যায়ঙ্গে ?

বলিলাম, শিম্‌লা। কাল্‌কেমে উতর্‌না।

ফজিরমে ?

জী।—এই বলিয়া সৌজন্যের খাতিরে আমিও জিজ্ঞাসা করিলাম, আপ্ কিধর্ চল্ রহা হেঁ ?

লুধিয়ানে।—সে জবাব দিল। বলিল, বদ্‌লি হায় বীচ্‌মে। ম্যা আতা হুঁ বোম্বাইসে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার বলিবার আগেই বুঝিয়াছিলাম সে বোম্বাই হইতে আসিতেছে। আমেদাবাদ, ওয়াধওয়ান ও আজমীঢ় হইয়া সে দিল্লীতে আসিয়া এই গাড়ী ধরিয়াছে। ভাবিলাম, বোম্বাই না হইলে আর এমন স্বাধীন তরুণী কোথা হইতে আসিবে ?

আবার একসময়ে সে কথা কহিল। বয়সের দোষে এবার আমি একটু পুলকিত হইলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল, কসুর ন লিজিয়ে, আপকো নাম ?

জবাব দিলাম, বিরিজলাল শেঠী। আপ্‌কো ?

সে হাসিয়া কহিল, জেনানেকো নাম বোল্‌না কুছ সরম লাগ্‌তা হুঁ।

মনটা সরস হইয়া উঠিল। বলিলাম, কুছ নেহি।

সলজ্জকণ্ঠে সে কহিল, রামকুমারী।

নিজের কাছেই আমি চরিত্রবান বলিয়া পরিচিত ছিলাম, কিন্তু নিজের নাম বলিতে গিয়া রামকুমারীর মুখের উপরে যে রক্তাভাস ফুটিল তাহারই চিত্র নিজের মনে মুদ্রিত করিয়া একটুখানি চিত্তবিলাস করিতে ইচ্ছা জাগিল। মুখে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া একবার মনে করিলাম, আমার জায়গাটা পুনরায় তাহাকে ছাড়িয়া দিই, কিন্তু আশপাশে দুই চারিজন কৌতূহলী যাত্রীর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া নিজেকে সংযত করিলাম। একবার যাহাকে তাড়াইয়াছি পুনরায় তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে মন উঠিল না। হৃদয়বৃত্তির দুর্ব্বলতা বরং চাপিতে পারিব ; কিন্তু আমার কোনো গভীর বাসনা ইহাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে একেবারে মাথা হেঁট হইয়া যাইবে। তাহা পারিব না।

আলাপের যবনিকা ওইখানেই পড়িল না। আমার চোখে ও মুখে যদি সুদূর অনুরাগের কোনো চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত তাহা হইলে কি ঘটিত বলিতে পারিনা, কিন্তু সম্ভবত আমার মুখে আত্মসম্ভ্রমবোধ ও সংযমশ্রী লক্ষ্য করিয়া রামকুমারী সহজকণ্ঠে পুনরায় আলাপ সুরু করিল। আলাপের মধ্যে অন্তরঙ্গতার রং বুলাইবার চেষ্টা পরস্পরের দিক হইতেই ছিলনা, কেবলমাত্র এই ক্ষণস্থায়ী পথযাত্রায় উভয়কে মোটামুটিভাবে জানিবার একটি আগ্রহ জন্মিল। আমি চরিত্রবান হইলেও এমন একটি সুন্দরী তরুণীর সহিত আলাপ দীর্ঘতর করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না এবং নিজের একাকীত্বকে এড়াইয়া সময়টা যে ভালোই কাটাইতে পারিব এই মনে করিয়া বেশ ভব্য হইয়া তাহার সহিত প্রশ্ন ও উত্তরের খেলা খেলিতে লাগিলাম।

তাহাকে জানাইলাম, আমার বাড়ী কাথিয়াবাড়ে, রাজকোট হইতে ষাট মাইল পশ্চিমে নন্দগাঁও নামক স্থানে। আমরা বিখ্যাত শেঠী পরিবার। আমাদের ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র আমেদাবাদ এবং পুরুষানুক্রমে

আমরা রেশম ব্যবসায়ী। জয়পুর, আজমীঢ়, আগ্রা ও দিল্লীতে আমাদের শাখাপ্রতিষ্ঠান আছে। সম্প্রতি শিমলায় যাইতেছি একটি শাখাকেন্দ্র খুলিবার জন্য। আমার পিতামাতা জীবিত। আমরা পাঁচ ভাই ও এক ভগ্নী। বীজনৌরের রাজপরিবারে আমার ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছে। আমার উপরে তিন ভ্রাতাও বিবাহ করিয়াছেন।

নিজের পরিচয় দিয়া তাহার পরিচয় লইব ভাবিতেছি—এমন সময় ও-পাশের একটি লোক রামকুমারীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। লোকটি দীর্ঘাকার এবং আমার অপেক্ষা বলিষ্ঠ। এতক্ষণ কোনো রকমেই বুঝিতে পারি নাই যে, লোকটি রামকুমারীর অভিভাবক, এইবার জানিতে পারিয়া আমি যেন সহসা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাহার সহিত কোনোরূপ অভব্য আচরণ করিয়া ফেলি নাই। এত ঘটা করিয়া নিজের পরিচয় দিবার আমি যেন কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না এবং রামকুমারীরও অধিকতর পরিচয় পাইবার আগ্রহ আমার কমিয়া গেল। নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করিব না। যতই চরিত্রবান বলিয়া বড়াই করি না কেন, রামকুমারীর সঙ্গী কেহ নাই এই মনে করিয়া আমার যুবক-পুরুষের মন একটু অহেতুক উল্লাসে মাতিয়াছিল, কিছু পুলক-শিহরণেরও সাড়া পাইয়াছিলাম, কিন্তু এতক্ষণে সহসা ভুল ভাঙিয়া গেল। বলা বাহুল্য ইহার পরে আমি ভোঁতা মুখ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া অন্ধকারের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। বোকা বনিয়া গিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু কৃত্রিম মহানুভবতা প্রকাশ করিয়া মেয়েটাকে যে নিজের জায়গাটা ছাড়িয়া দিই নাই এইকথা মনে করিয়া কতকটা সান্ত্বনা পাইলাম। স্বার্থপরতার জন্যই এ যাত্রায় আত্মসম্মানটা বাঁচিয়া গেল।

মুখ ফিরাইয়া তাহাদের আলাপটা দেখিবার সাহস ছিল না, তবু নড়িয়া চড়িয়া বসিবার ভান করিয়া এক সময় দেখিলাম, লোকটি পানের কৌটা বাহির করিল এবং পান ও কিমাম বাহির করিয়া সে সাদরে রামকুমারীকে খাইতে দিল। যে-বিবেচনাটা আমি এতক্ষণ রামকুমারীর প্রতি প্রকাশ করিতে পারি নাই, দেখিলাম লোকটি তাহাকে সেই স্বাচ্ছন্দ্য দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজে সঙ্কীর্ণভাবে থাকিয়া রামকুমারীকে আরাম করিয়া বসিবার জন্য অনেকখানি জায়গা করিয়া দিল, বিছানাটা এলাইয়া পাতিয়া দিল এবং বাতাস খাইবার জন্য একটি ঝালর-বাঁধা পাখা বাহির করিল। যত্ন, আরাম ও তোষামোদ পাইলে স্ত্রীলোকরা যে কেমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারে তাহারই একটা জাজ্বল্যমান উদাহরণ দেখিয়া আমার মনে মনে যেন একটু ঈর্ষার উদ্রেক হইল। এখন হইতে এই কথাটা মনে রাখিব, সম্মান দেখাইয়া নারীর হৃদয় জয় করা কঠিন, বরং তাহার রূপশ্রীর যোগ্য মূল্য দিলে স্ত্রীলোক সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। বুঝিলাম আমি উহার মনে কোনো দাগ কাটিতে পারি নাই। একবার যেন আমার সন্দেহ হইল, অভিভাবক বলিয়া যাহাকে মনে করিয়াছি তাহার সহিত অভিভাবকত্বের সম্পর্ক অপেক্ষা বন্ধুত্বের অনুরাগের সম্পর্কটাই যেন অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

অন্ধকার রাত্রি বিদীর্ণ করিয়া আমাদের এক্‌স্‌প্রেস ট্রেণ পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া ছুটিতেছিল। বাতাসে গরমের ভাব অনেকটা কাটিয়াছে। হাতঘড়িতে দেখিলাম রাত্রি এগারোটা বাজে। একাকী থাকিলে সময় কাটিত না, কিন্তু নারীর ছোঁয়াচ থাকার জন্য দুইটা ঘণ্টা যেন পলকের মধ্যেই পার হইয়া গেল। বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম বটে, কিন্তু বালকের ন্যায় আমার যেন মনে হইতে লাগিল আমি মস্ত বড় একটা সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, অনেকদিন অবধি আমার ভিতরটা হায় হায় করিতে থাকিবে। আমি যেন মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলাম, আমার পিছন দিকে বসিয়া ওই কদাকার ষণ্ডামার্ক লোকটা পান চিবাইতে চিবাইতে আমাকে লইয়াই রামকুমারীর সহিত হাসাহাসি করিয়া আসর জমাইতেছে।

নব্য যুবকের এই অবস্থায় যাহা মনে হয় আমারও তাহাই মনে হইল। খামোকা এই তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ভাবিলাম, এই সুন্দরীর সহিত যখন আমার অন্তরঙ্গতা হইল না তখন অবশ্যই আমার জীবন ব্যর্থ। দ্রুতগতিশীল ট্রেণের ভিতরে বসিয়া রাত্রির এই দোলায়মান ক্ষণস্থায়ী মোহ-মুহূর্ত্তগুলির উপরে নিজের ব্যর্থতাটা ঘসিয়া যখন পরীক্ষা করিতেছিলাম এমন সময়

সহসা রামকুমারীর মধুর কণ্ঠস্বর কানে বাজিল—বিরিজলালজী ?

মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিলাম এবং তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে কহিলাম, ফরমাইয়ে ?

সে কহিল, ঘুম পাচ্ছে না আপনার ?

বলিলাম; এখনও পায়নি।

উত্তরটা শুনিয়া দুইজনে যেন কৌতুকবোধ করিল। আমার নিদ্রার সংবাদ লইতে তাহাদের এই আগ্রহ ও কৌতুক কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি পুনরায় মুখ ফিরাইয়া লইলাম। তাহাদের হাসির আওয়াজ আমার কানে আসিল, আমি যেন তাহাতে চাবুকের আওয়াজ অনুভব করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

এইবার যে দৃশ্যের বর্ণনা করিব তাহাতে নীতি ও রুচির প্রশ্ন উঠিবে জানি; কিন্তু ভয় নাই, যেখানে বিপদের সম্ভাবনা ঘটিবে সেখানে ইঙ্গিতেই কাজ সারিয়া আমি নীতিবিদের সম্ভ্রম বাঁচাইয়া যাইব। আমি নিজে রুচি ও চরিত্রবত্তা প্রকাশ করিয়া এখনই এই কাহিনীর সমাপ্তি-রেখা টানিয়া দিতে পারি—কিন্তু যাহারা শ্লীলতা ও সম্ভ্রম-বোধকে গ্রাহ্যই করে না, যাহারা ভদ্রসমাজের গায়ের উপর পড়িয়া দুরন্তপনা করিয়া যায়, তাহারাও জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহাদের বাদ দিয়া চলিতে হইলে পৃথিবীর মোটা অংশটার সহিত কাজ-কারবার চলে না—ইহা অস্বীকার করিবে কে ?

বোধ করি সমস্ত কামরার যাত্রীগুলি ঘুমাইয়া পড়িবে এমনি একটা অবস্থা দুইজনে কল্পনা করিতেছিল। শীতকাল হইলে তাহাদের সে-কল্পনা সত্য হইত, কিন্তু গ্রীষ্মের গুমটে তাহা আর হইয়া উঠিল না, দুই চারিজন জাগিয়া রহিল। আমিও ঘুমাইয়া পড়িতাম, কিন্তু কানের কাছে মৃদু চুড়ির আওয়াজ, টুক্‌রা হাসি, গদগদ কণ্ঠ, শাড়ির মরমরানি, পরিহাস-সরস আলাপ—এইগুলি শুনিতে পাইলে নব্য যুবকের চোখে ঘুম আসিবে এতবড় অপৌরুষ আমার নাই। আমি ঘুমাইবার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলাম। আমি যেমন ভদ্রতা করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলাম, আমাদের কামরার জাগ্রত যাত্রীরা তাহা করিলনা, তাহারা সকৌতুক পরিহাসের সহিত রামকুমারী ও তাহার সঙ্গীর প্রণয়কাণ্ডের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি ও নির্লজ্জ ভঙ্গী অনুভব করিয়া আমি পাথরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি, পাকা-ফলের মাধুর্য্য আস্বাদ করিতে হইলে ফল পাকিবার সময় দেওয়া দরকার; কিন্তু প্রণয়কাহিনীতে বোধ হয় ইহার বিপরীত, একসঙ্গে অনেকগুলি ধাপ ডিঙাইয়া দ্রুত অগ্রসর না হইলে সুফল পাওয়া যায় না। ইহাদের কোনো কোনো কথার ছিটা আমার কানে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা মাদকতারসে এতই জড়িত ও অপরিস্ফুট যে তাহার অর্থসঙ্গতি খুঁজিয়া পাইলাম না। এক সময়ে তাহারা সহসা চুপ করিলে আমি ভয় পাইয়া অলক্ষ্যে চোখ খুলিলাম। দেখিলাম, স্বামী স্ত্রী যেমন অন্তরঙ্গ হইয়া বসে উহারা তেমনিভাবে বসিয়া অতিশয় চাপা কণ্ঠে আলাপ করিতেছে এবং রামকুমারী মাথার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়াছে। অনেকেই তাহাদের পিছন দিক হইতে লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু আমিই একমাত্র যাত্রী তাহাদের সম্মুখস্থ বেঞ্চে আড় হইয়া বসিয়া আছি, সুতরাং আমি যতটা তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে পাইব এমন আর কেহ পাইবে না। আমি ঘুমাইয়া পড়িলেই তাহারা খুশি হইত।

এক সময়ে পুনরায় চোখ বুজিলাম। সত্য বলিব, বাতাস লাগিলে যেমন নদীতে তরঙ্গদল জাগিয়া উঠে আমার মনের অবস্থা সেইরূপ হইল। প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু ঘুম আসিল না। উহারা কথাবার্ত্তা হাসি-তামাসা করিলে বরং ঘুম আসিত, কিন্তু নীরব হইয়া গেলেই ছাঁৎ করিয়া আমার তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়। ইহা অনুভব করিলাম আমি না ঘুমাইলেও উহাদের কিছু আটকাইবে না এবং যেহেতু উহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, লজ্জা-সরম, নীতি রুচি, সভ্যতা ও ভদ্রতা কিছুই মানিবেনা—সেই হেতু আমাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া উহারা সকলের চোখের উপর নিজেদের জন্য একটা পৃথক জগতের সৃষ্টি করিয়া লইল। সকলে উহাদের দেখিলেও উহারা কাহাকেও লক্ষ্য করিবে না। এমনি করিয়া দৃশ্যটা যখন ইতর হইতে ইতরতর হইয়া উঠিল, আমি তখন সমগ্র পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম এবং গাড়ীখানা সকলকে কোলে লইয়া প্রচণ্ড দোলায় দোলাইয়া গমগম করিয়া ছুটিতে লাগিল।

কতকক্ষণ পরে জানিনা, এক সময় রেল-লাইন পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া যাহা সহসা আমার চোখে পড়িল তাহাতে সত্য সত্যই বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম সমস্ত জায়গাটা জুড়িয়া রামকুমারী তাহার সুন্দর দেহখানি ছড়াইয়া শুইয়া আছে এবং তাহার সঙ্গীটি তাহার নিকট নাই। এদিক ওদিক চাহিলাম কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বিদ্যুৎলতাটি নিশীথিনীর কোলে যেন স্থির হইয়া আছে। রাত দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আমাদের ট্রেন আম্বালা স্টেশনে পৌছিল। আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া একরূপ অদ্ভুত বৈরাগ্য ও বিতৃষ্ণায় ডুবিয়া ছিলাম—এমন সময় রামকুমারী উঠিয়া আমাকে ডাকিল, বিরিজলালজী ?

হয়ত আমার মনেরই ভুল হইবে, আমি তাহার কোমল ও শান্ত কণ্ঠস্বরে একপ্রকার অসহায় ও করুণ আবেদন শুনিলাম। উত্তর দিলাম, কেন ?

লুধিয়ানার গাড়ী কখন জানো ?

আমি তাহার সহিত পুনরায় আলাপ করিব কিনা বিচার করিতে লাগিলাম।

সে পুনরায় কহিল, এদিকের রাস্তাঘাট আমি ভালো জানিনে, একবার মাত্র এসেছিলাম।

বলিলাম, তোমার সঙ্গী কোথায় গেল ?

সঙ্গী ?—রামকুমারী কহিল, সঙ্গী আমার কেউ নেই, বিরিজলালজী।

আমার বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া মায়াবিনী হাসিল, বলিল, তার সঙ্গে পথেই আলাপ, সে নেমে গেছে। বিরিজলালজী, এই আমার পেশা।

যে-আন্তরিকতা ও সত্যের প্রেরণায় সে লোক-লজ্জাকে অস্বীকার করিয়া দীর্ঘ রাত্রি ধরিয়া এক বর্ব্বরের সহিত বিলাস করিয়াছে, সেই আন্তরিকতা ও অকপটতা তাহার কোমল কণ্ঠস্বরে আমি শুনিতে পাইলাম। এমন করিয়া সে আমার দিকে চাহিল যে, সেই দৃষ্টির ভিতর আমি আবহমানকালীন নারীপ্রকৃতির পরাশ্রিতপরতার চেহারা দেখিতে পাইলাম। সমস্ত অন্তর ভরিয়া একটু আগে পর্য্যন্ত যাহাকে ঘৃণা করিয়াছি, সমস্ত হৃদয় তাহার প্রতি করুণায় ভরিয়া উঠিল। বলিলাম, এই রাত্রে একা কোথা যাবে তুমি, রামকুমারী ? গায়ে এত অলঙ্কার, এত জিনিসপত্র—

গাড়ী তখন স্টেশনে থামিয়াছে। সে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর কহিল, যদি ভরসা দেন্ তবে একটি কথা বলি।

নতমস্তকে সে কহিল, আপনার চোখের সামনে আমি নোংরামি করেছি, বড় অধম আমি, তবু আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।

বলিলাম, আমিও ত' মন্দ লোক হ'তে পারি। জানো, তোমার প্রতি আমারো লোভ রয়েছে ?

সে কহিল, শেঠজী, লোভীর হাতেই হয়ত একদিন আমাকে মরতে হবে। লোভী ছাড়া 'মরদের' অন্য চেহারা আমি দেখিনি। আপনার লোভের বস্তুই আমি হ'তে চাই।

আমাকে কি করতে বলো ?

রাত 'আঁধিয়ারা'—একলা যাওয়া বড়ই শক্ত। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন লুধিয়ানায়।

সময় তখন অল্প। হিসাব করিয়া কিছু বলিবার অবকাশ ছিল না। সম্মুখে একাকিনী রমণী, চক্ষু দুইটি নিদ্রারসে ভরা, রেশমী পরিচ্ছদের উপর স্টেশনের আলো পড়িয়া তাহাকে রূপলোকবাসিনীর ন্যায় মনে হইতেছিল। আমার বুকের ভিতরটা এই দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত জগতের সকল নব্য যুবকের মতোই তোলপাড় করিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, চলো।

কি কাণ্ড করিয়া বসিলাম জানিনা, কেহ আমাকে দেখিয়া কি মনে করিতেছে তাহাও বুঝিলাম না, আমার এই কার্য্যের পুরস্কার অথবা গৌরব কি, তাহাও বিচার করিয়া দেখিলাম না—ঘুম চোখে নিশি পাওয়ার মতো প্রেতিনীর সঙ্কেতে পথ হাতড়াইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতে লাগিলাম। দিবালোক হইলে হয়ত একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমি আমার এই নির্ব্বোধ হঠকারিতাকে সংযত করিতে পারিতাম, যুক্তিশাস্ত্র হইতে নজীর তুলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতাম, নীতি ও চরিত্রবত্তার প্রশ্ন আনিয়া আমার এই নিঃসঙ্কোচ লজ্জাহীনতাকে চাবুক মারিতাম, কিন্তু সেই নিবিড় রাত্রে স্টেশনের সেই রহস্যময় প্রদীপালোকে অজানা দেশের স্বপ্নময় পথে পরমাসুন্দরী এক রমণীর

ইসারায় আমি আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইলাম। সে আমাকে কোন্ কল্পলোকে লইয়া চলিল কিছুই ঠাহর করিতে পারিলাম না।

মালপত্র সমেত কোন্ গাড়ীতে কখন উঠিয়াছি, কখন গাড়ী ছুটিতে শুরু করিয়াছে, কোন্ পথ কোথা দিয়া পার হইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যখন চৈতন্য ফিরিল, দেখিলাম, লুধিয়ানা স্টেশনে নামিয়াছি। পূর্ব্বকাশে ঈষৎ শাদা রঙ ধরিতেছে।

বলিলাম, কোথায় যাবে এবার?

রামকুমারী বলিল, অনেক 'তখলিপ্' তোমাকে দিলাম, বিরিজলালজী। আমার কাজ এখানে সামান্য, এখুনি কাজ সেরে আবার ফিরে যাবো।

সামান্য কাজের জন্য সে বোম্বাই হইতে এই প্রায় একহাজার মাইল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিতে আমার মন উঠিল না। বলিলাম, সেটা কি ভালো হবে? বরং দুদিন বিশ্রাম ক'রে যেয়ো।

বিশ্রাম?—রামকুমারী হাসিয়া কহিল, বেশ, তুমি যা বলবে তাই হবে। ম্যানে আপ্‌কো বাঁন্দী বন্‌গৈ!

রাত্রে যাহা লক্ষ্য করি নাই, এখন তাহা চোখে পড়িল। দেখিলাম, তাহার অনেকগুলা লগেজের সহিত একটুক্‌রি পরিপূর্ণ ফুল! সেই রাশীকৃত নানাবিধ ফুলগুলি তাজা রাখিবার জন্য জলের ঝারির বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলাম, হাজার মাইল দূর থেকে এত ফুল এনেছ কেন?

সে কহিল, ঠাকুরের পায়ে এই ফুল দেবো, শেঠজী।

কথাটা আমার ভালো লাগিল না, ইহা যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হইল। জীবনে যাহার শুচিতার অভাব আছে এবং যাহার দৈনন্দিন আচরণে কপটতা ও লোভ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো উদ্দেশ্য নাই—সে যত বড় সুন্দরীই হউক, তাহার এই আত্ম-প্রতারণাশীল ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়া আমার গা জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রভাতের রাঙা রৌদ্রে স্টেশনের বাহিরে আসিয়া রামকুমারী আমার ও তাহার লগেজগুলি স্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় রাখিল এবং একখানা টাঙাগাড়ী ডাকিয়া আমাকে উঠিতে বলিল ও নিজে ফুলের সেই বড় টুক্‌রিটা লইয়া আমার পাশে উঠিয়া বসিল। বলিল, এবার আমিই বোধ হয় তোমাকে চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

প্রশ্ন করিলাম, কোথায় যাবে?

সে কহিল, পৃথিবী ছাড়িয়ে।

বলিলাম, বাৎলাইয়ে ক্যা মত্‌লব?

রামকুমারী হাসিয়া কহিল: যাবো মৃত্যুর মন্দিরে।

বলিলাম, মেরি পিয়ারী, দিনের আলোয় তোমার কথায় আর নেশা লাগবে না। কোথায় যাবে বলো শুনি?

সে কহিল, বেহেস্ত্।

গাড়ী দ্রুতগতিতে শহরের প্রান্ত দিয়া চলিয়াছে। সেই নিরুদ্দেশ পথের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলাম, যেতে রাজি আছি, তবে ঘোড়ার গাড়ী ততদূর যেতে পারবে না।

উত্তরে সে কেবল আমার কাঁধের পাশে মাথা রাখিয়া বলিল, কী সুন্দর তোমার ব্যবহার, বিরিজলালজী?

বলিলাম, এই কথা তুমি শত শত লোককে বলেছ, রামকুমারী!

রামকুমারীর মুখের হাসি মরিয়া গেল, সে সোজা হইয়া বসিল। মনে হইল সে একটু আঘাত পাইয়াছে। ধীরে ধীরে এক সময় বলিল, সাচ্চি বাত্ শেঠজী।

অনেকদূর পথ অতিক্রম করিয়া একসময়ে রামকুমারীর ইঙ্গিতে টাঙাগাড়ী একটা জনবিরল প্রকাণ্ড বাগানের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিকটে একজন অন্ধ ভিক্ষুক বসিয়াছিল। আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া রামকুমারী গাড়ী হইতে নামিল এবং সেই ফুলের টুক্‌রিটা লইয়া বাগানে প্রবেশ করিবার পথে বৃদ্ধ ভিক্ষুককে কিছু ভিক্ষা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল, কিন্তু এই যাত্রার শেষ পরিণতি দেখিয়া যাইবার জন্য আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম, সূর্য্যের আলো দেখিতে দেখিতে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া দুই একজন সব্জীওয়ালাকে মোট মাথায় লইয়া শহরের দিকে যাইতে দেখিলাম, বার বার হাতঘড়ি তুলিয়া সময় গণিতেছি, কিন্তু রামকুমারী সেই যে গিয়াছে আর দেখা নাই। সমস্তটাই যেন রহস্যময় মনে হইল। আমি ইহার ফাঁদে পড়িয়াছি কিনা তাহাও সভয়ে ভাবিতে লাগিলাম।

একটা হেস্তনেস্ত করিব এই মনে করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আমিও বাগানে প্রবেশ করিলাম। পাঞ্জাবের এই রুক্ষ ও ধূসর ভূভাগে এমন একটি বৃক্ষলতাপরিপূর্ণ মধুর বায়ুহিল্লোলিত সুন্দর উদ্যান দেখিব আশা করি নাই। গাছে গাছে প্রভাতী পাখীর কলকাকলী তখনও চলিতেছিল, তখনও দূরে কোথায় শিখগণ গ্রন্থসাহেবের ওঙ্কারধ্বনি তুলিয়া উদাত্তকণ্ঠে প্রভাতী গাজন গাহিতেছিল। আমি সেই পুষ্পলতাচ্ছাদিত বনময় উদ্যানের একটি জলধারা-যন্ত্রের পাশ দিয়া আসিয়া এক সময় স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। যে দৃশ্য দেখিলাম তাহার সহিত চারিদিকের লতাবৃক্ষের শোভা, পাখীগণের প্রভাত-বন্দনা, তরুণ সূর্য্যের রক্তরশ্মি, জলধারাযন্ত্রের অবিশ্রান্ত মর্ম্মরধ্বনি, বায়ুর মধুর স্পর্শ, বসন্তপুষ্পদলের সুগন্ধ-সমারোহ—এই সমস্ত না মিলাইয়া দেখিলে তাহার মূল্য বুঝা যাইবে না। দেখিলাম, একটি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত পুষ্পাচ্ছাদিত সমাধির উপরে স্বর্ণলতার ন্যায় রামকুমারী পড়িয়া আছে। তাহার সেই নিশ্চল প্রণতি-মূর্ত্তি দেখিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলাম, রামকুমারী ?

সে সাড়া দিলনা। কাছে গিয়া সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া তুলিলাম। দেখিলাম অশ্রুপ্লাবিত দুই চক্ষু; ফুলিয়া ফুলিয়া সে কাঁদিতেছে।

বলিলাম, তুমি ত' হিন্দুর মেয়ে, রামকুমারী ?

সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, দেবতার পায়ের কাছে কোনো জাত নেই, শেঠজী।

কে আছে এই সমাধিতে ?

আমার প্রিয়। মেরে দেওতা'।

ইহার পরে আর কিছু জানিবার ও বলিবার প্রয়োজন ছিল না। তাহাকে লইয়া বাগানের বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। শুনিলাম আজ তাহার প্রিয়ের মৃত্যু তিথি, দুই বৎসর পূর্ব্বে রামকুমারীর সেই প্রণয়ীর মৃত্যু হইয়াছে। এই উদ্যান তাহার সম্পত্তি এবং প্রতি বৎসর তাহার মৃত্যুতিথিতে রামকুমারী বোম্বাই হইতে এখানে আসিয়া ফুল দিয়া যায়। প্রেমিকের মৃত্যুর পর রামকুমারী বোম্বাইতে গিয়া অভিনেত্রীর জীবন যাপন করিতেছে। যে কাহিনীটুকু আহরণ করিলাম তাহা সংক্ষিপ্ত। ধনীর পুত্র তাহার প্রণয়ী পাঞ্জাব হইতে গোয়ালীয়র অরণ্যে ব্যাঘ্রশিকার করিতে গিয়াছিল—রামকুমারী গোয়ালীয়রের কোন্ এক সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা—দুর্গপ্রাকারের বাহিরে নৌকাবিহার করিতে গিয়া দুইজনে সাক্ষাৎ হয়—তারপর সে এক মধ্যযুগীয় অত্যাশ্চর্য্য প্রণয়-কাহিনী। কালক্রমে মহাকাল তাহাদের দুইটি জীবনের পটভূমি ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।

স্টেশনের নিকট আসিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিয়া ভারাক্রান্ত-কণ্ঠে রামকুমারী কহিল,কোন্ হোটেলে উঠতে চাও,শেঠজী ?

বলিলাম, না, কোনো হোটেলেই নয়, এবার আমি বিদায় নেবো, রামকুমারী।

লোভের বস্তু আমি যে ছাড়িয়া দিব তাহা সে ভাবে নাই; মাংসখণ্ডের প্রতি ব্যাঘ্রের আসক্তি নাই ইহাও অপ্রত্যাশিত। বিস্মিত হইয়া সে কহিল, থাকতে চাওনা দুদিন আমার সঙ্গে ?

বলিলাম, না, অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে।

পুরুষ হইয়া এমন অবহেলায় তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম, তাহাতে হয়ত তাহার অহমিকায় কিছু আঘাত লাগিয়া থাকিবে। কিন্তু সে আর মুখ তুলিল না, নতমুখেই কহিল, তোমার উপকার আমি চিরদিন মনে রাখবো, বিরিজলালজী।

বলিলাম, লালসার প্রেরণায় তোমার সঙ্গে আমি এসেছিলাম, উপকার করতে আসিনি। আমাকে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই, বরং আমাকেই তুমি ক্ষমা ক'রো, রামকুমারী।

তাহার চোখে পুনরায় উদ্গত অশ্রুর চিহ্ন দেখিলাম। কিন্তু সে আর জবাব দিলনা।

আমি লাহোর হইয়া কাল্কায় যাইব, সে দিল্লী হইয়া বোম্বাই যাইবে। তাহার গাড়ী আগে আসিল। আমি তাহার মালপত্র তুলিয়া তাহাকে ভালো জায়গা দেখাইয়া দিলাম।

কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য স্ত্রীলোকের কোমল হৃদয় সহজেই উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে, রামকুমারী আর কিছু না পারিয়া আমার দুইখানা হাত লইয়া সাষ্টাঙ্গে নত হইয়া নিজের কপালে ঠেকাইল এবং তাহার পর আমি সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিলাম না—দ্রুতপদে লাহোরের ট্রেন অনুসন্ধান করিবার জন্য অন্যত্র চলিয়া গেলাম।

শটী

শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ

দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা ও বেকার-সমস্যার কথায় মনে হয়, আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার আমাদের-ই সম্মুখে অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত এমন কিছু আছে কি-না যাহাকে আশ্রয় করিলে হয়ত অন্ন-সমস্যার আংশিক সাহায্যও হইতে পারে। এই কথা ভাবিতে গিয়া মনে পড়ে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের পথে-ঘাটে, কাননে-কান্তারে পাহাড়ে-পর্ব্বতে দিগন্ত-বিস্তৃত শটীর বনের কথা। এই অযত্ন-সম্ভূত অজ্ঞাত-প্রায় শটী যুগ-যুগান্ত ধরিয়া জন্ম-মৃত্যুর খেলার সামগ্রী হইয়া লীলা সাঙ্গ করিতেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির এই অযাচিত লক্ষ লক্ষ টাকার বনজ বিত্ত ভূগর্ভে হতাদরে বিলীন হইয়া যাইতেছে; অথচ ইহার প্রয়োজনীয়তা যে আমরা মোটেই জানি না এমনও নয়। বহু প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে শটীর ব্যবহার জানা আছে। শটীর জন্ম-ভূমিতে মেয়েরা অবসর সময়ে তাহাদের স্বকপোলোদ্ভাবিত প্রাচীন পদ্ধতিতে একটু আধটু শটীর পালো প্রস্তুত করিয়া শিশু ও রোগীর পথ্যরূপে অথবা পিষ্টকাদিতে ময়দার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবশ্য কোনও কোনও জায়গায় শটী ক্রয়-বিক্রয়ও হয়। ইহার মধ্যে বরিশালই উল্লেখযোগ্য। ব্যবসা-ক্ষেত্রে আমরা যে শটী দেখিয়া থাকি উহার প্রায় সমস্তই বরিশাল হইতে আমদানি করা হয়। পথ্যরূপে ইহার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা একাধারে পথ্য ও ভেষজ। পেটের অসুখে জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া খাওয়াইলে অথবা কোষ্ঠকাঠিন্যে পাতলা করিয়া খাওয়াইলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার দর্শে, বসন্তের প্রতিশেধক বলিয়া আবিরের মধ্যেও ইহা প্রাচীনকাল হইতেই দোলোৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গৃহস্থরা তাহাদের গরুর পেটের অসুখে এই শটীর পালোই আবির রূপে ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইয়া উপকার পায়। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে 'কচুর' বলে। তাহারাও বসন্তের মর্ম্মন্তুদ গাত্রদাহে ইহা গায়ে মাখিলে যে গাত্রদাহের উপশম হয় তাহা বিশেষ রূপেই জানে।

অন্যত্র, এমন কি, কোন কোনও স্থানে শটীর জন্ম-ভূমিতেই, কলিকাতা হইতে আনীত কাগজের বাক্সে ভরা শটীর পালো প্রতি সের আট আনা, দশ আনা দরে বিক্রীত হইলেও অজ্ঞতা প্রযুক্ত সেই স্থানেই শটীর বন ব্যাঘ্রের আবাসভূমি রূপে অথবা অপরাজেয় বলিয়া ভীতির কারণ হইয়া রহিয়াছে। উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গের বহুস্থানে আবাদের উপযুক্ত ভূমিতেও উহার দৌরাত্ম্য এমনই উৎকট যে শস্য উৎপাদন অসম্ভব হইয়া জমি পতিত থাকিতে বাধ্য হয়। অনেক স্থানে ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বাঁধের সাহায্যে বৃষ্টির জল আটকাইবার পরে ক্ষেত চাষ করিয়া আবদ্ধ জলের সাহায্যে শটী পচাইয়া ধ্বংস করার পর জমি আবাদ করা সম্ভব হয়। স্থানবিশেষে শটী নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে এই অঙ্গীকারে জমি বর্গা দেওয়া হয় যে, বর্গাদার এক বৎসরে জমির শটী ধ্বংস করিয়া পরবর্ত্তী দুই বৎসর উহার সম্পূর্ণ শস্য ভোগ করিবার অধিকারী হইবে। অজ্ঞতা হেতু ও উপযুক্ত উপায় অভাবে এমন মূল্যবান জিনিষের এমন দুর্গতি।

বর্ত্তমানে মেয়েরা এক খণ্ড টিন তার-কাটা লোহার সাহায্যে চালুনীর ন্যায় ছিদ্র করিয়া উহার ধারাল পৃষ্ঠে শটী ঘসিয়া ঘসিয়া কাটিয়া থাকে। পরে কর্ত্তিত অংশ জলে বার বার ধুইয়া উহার শ্বেত-সার বাহির করে। এই উপায়ে প্রস্তুত করিতে টিনের ধারাল পৃষ্ঠে লাগিয়া অঙ্গুলি ক্ষত-বিক্ষত হইবার ভয়ে শটী অর্দ্ধেক কর্ত্তিত হইবার পরেই অবশিষ্টাংশ পরিত্যক্ত হয়। যে পরিমাণ আয়াস স্বীকার করিয়া শটী মাটির নীচ হইতে সংগ্রহ করা হয় ও পরিষ্কার করা হয়, তাহাতে অকর্ত্তিত অর্দ্ধাংশ ফেলিয়া দেওয়া যে কতটা ক্ষতিজনক তাহা সহজেই অনুমেয়। কেহ কেহ শটী ঢেঁকিতে কুটিয়া পালো বাহির করিয়া থাকেন। এই উপায়ে পালো যেমন অপরিষ্কৃত হয় পরিমাণেও তেমনই অনেক কম বাহির হয়। কাহারও কাহারও মতে টিনে ঘসিয়া যে পরিমাণে পালো পাওয়া যায় ঢেঁকিতে কুটিলে তাহার দুই-তৃতীয়াংশেরও কম বাহির হয়। এই সব কারণে শটীর পালো অতি অল্প মাত্রায়

উৎপাদিত হয় বলিয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তার তুলনায় উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহার আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিশেষ দিক আছে। এই পালো কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিবার সময়। ইহার আগে বা পরে শটীর কন্দে এই শ্বেত-সারের অস্তিত্ব দেখা যায় না। অথচ এই সময় বিশেষ করিয়া শেষের তিন মাস, সাধারণ গৃহস্থের হাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ থাকে না এবং অর্থাভাবও এই সময়ই বিকটাকার দেখা দেয়। বর্ত্তমান পদ্ধতিতে শটীর পালো উৎপাদন করা গুরুতর আয়াসসাধ্য ও লভাহীন বলিয়া পুরুষেরা এদিকে প্রায় লক্ষ্যশূন্য। এই জন্যই অবসর সময়ে মেয়েরা যেটুকু পালো তৈয়ার করেন সেই পালোর জন্য শটী সংগ্রহ করিতে তাঁহাদিগকে পুরুষের করুণার উপরে নির্ভর করিতে হয়।

যদি কোনও সহজ-লভ্য ও সহজে মেরামত করার উপযুক্ত জটিলতাহীন যন্ত্র-সাহায্যে অনায়াসে অধিক পরিমাণে শটীর পালো উৎপাদন করা সম্ভব হয় তবে বিদেশাগত এরারুট, ফেরিনা (Farina), ডেক্‌স্‌ট্রিন (Dextrin), সাগুর ময়দা (Sago flour), আলুর ময়দা (Potato flour) প্রভৃতির সহিত মূল্যে ও কার্য্যকারিতায় এই শটী অনায়াসে প্রতিযোগিতা করিয়া বহু বেকারের অন্ন-সংস্থানে সমর্থ হইবে। কেবল শিশু ও রোগীর পথ্য রূপে নয়, এরারুটের পরিবর্ত্তে উচ্চাঙ্গের বিস্কুটে অধিকতর কার্য্যকরী রূপে এই শটীর পালো ব্যবহৃত হইবে এবং নিত্য ব্যবহার্য্য ময়দার স্থান বহুল পরিমাণে অধিকার করিতে পারিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমাত্র শটীর পালোই আবিরের মূল উপাদান। কিন্তু দুর্ম্মূল্যতা হেতু ব্যবসায়ীরা শটীর পালোর পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত অল্প দামের এরারুট ময়দা ও আলুর ময়দার সহিত রং মিশাইয়া বর্ত্তমানে আবির প্রস্তুত করিয়া থাকে। শটীর পালো সহজ-লভ্য হইলে ইহা দ্বারা যেরূপ খাঁটি আবির প্রস্তুত হইতে পারিবে, তেমনই মূল্যের স্বল্পতা হেতু আবিরও অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া বসন্তের প্রতিষেধক রূপে সকলেরই কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইবে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক বৈদেশিক বাণিজ্য-বিবরণী হইতে জানা যায়—পোল্যাণ্ড, জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং অন্য আরও দেশ হইতে শ্বেত-সার (starch), ফেরিনা, আলুর ময়দা, সাগুর ময়দা ও ডেক্‌স্‌ট্রিন প্রভৃতি মুখ্যত কাপড়ের কলে ও কাগজের কলে ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত হারে বৃটিশ ভারতবর্ষে আমদানি করা হইয়াছিল :

সন	পরিমাণ	মূল্য
১৯৩৪—৩৫	৩, ৬৩, ৬৮০ হন্দর	২৬, ০৮, ০২৬ টাকা
১৯৩৫—৩৬	৩, ৩৭, ০৬২ „	২৭, ৮৩, ০২৭ „
১৯৩৬—৩৭	৩, ৬৭, ৫৩৫ „	২৭, ৮৪, ০৩৪ „

ইহার মধ্যে একমাত্র বাংলার ভাগে পড়িয়াছে নিম্নলিখিত হারে :

সন	পরিমাণ	মূল্য
১৯৩৪—৩৫	১, ৪৪, ৩২৪ হন্দর	৯, ৩২, ৬০১ টাকা
১৯৩৫—৩৬	১, ৮৬, ০৪০, „	১১, ৮২, ৫২১ „
১৯৩৬—৩৭	১, ৯৪, ৪০৫, „	১২, ৯১, ৯২৬ „

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের বৃটিশ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য-বিবরণী হইতে জানা যায়, ১৯৩৮এর ১লা এপ্রিল হইতে ৩০এ নভেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে ৪,২১,৮২০ টাকা মূল্যের ৬৪,৯৪১ হন্দর ঐ সমস্ত দ্রব্য আমদানি করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এ দেশে মাড় প্রস্তুত করার সমস্ত দ্রব্যই বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। কিন্তু ইদানিং মাড় প্রস্তুতের ২১-টী ছোট-খাট কারখানা গড়িয়া উঠিলেও এখনও উপরোক্ত হারে আমদানি করা হইতেছে। সূতায় মাড় রূপে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহৃত হয় উহাদের মধ্যে যাহারা বায়ু হইতে জলীয় অংশ শোষণ করিতে পারে তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। শটীর পালোর এই বিশেষ গুণ থাকায় উহা অধিকতর দামী ফেরিনা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ফেরিনাও শটীর ন্যায় কন্দ-প্রসূত শ্বেত-সার। শটী কাপড়ের কলে ফেরিনার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইলে উহা বর্ত্তমানের ন্যায় বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিষ্কৃত করিতে হইবে না। কাজেই উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়া যাইবে। গতানুগতিক শিশু ও রোগীর পথ্যের দিক ছাড়িয়া বিস্কুটের কারখানা কাপড় ও কাগজের কল প্রভৃতি সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের কথা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক না কেন, শটীর ভবিষ্যৎ যে সমূহ উজ্জ্বল, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এখন এদিকে কাহারও

তেমন লক্ষ্য না থাকায় নামমাত্র যে কয়জন ব্যবসায়ী ইহার ব্যবসায়ে রত আছেন তাঁহারা মফঃস্বলে অতি নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া একমাত্র পথ্যরূপে বিক্রয় করিয়াই প্রভূত লাভবান হইতেছেন।

এই সব বিষয় বিস্তারিত অবগত হইয়া যাহাতে সহজে বেশী উৎপাদন করা যায় তাহার উপযুক্ত কল-কারখানার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই, বাজারে কেবল শটী তৈয়ার করার জন্যই কোনও কল নাই। তবে ঐ কাজ করা যাইতে পারে এমন কল যাহা দেখিয়াছি তাহা মূল্যাধিক্য হেতু শটীপ্রস্তুতকারী সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে একান্ত অলভ্য। উপরন্তু উহার কোনও একটি অংশ হারাইলে বা নষ্ট হইলে বিদেশ হইতে অর্ডার দিয়া না আনাইলে আর পাওয়ার উপায় নাই। তাহাতেও যে সময় লাগিবে তাহা প্রাগুক্ত পালো উৎপাদনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরমায়ুতে কুলাইবে না। যে দেশে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর ন্যায় মহামহিম প্রতিষ্ঠানেরও টিউব-ওয়েলের ন্যায় অতি সাধারণ জিনিষের একটা বল্টু বা মহুরি স্থানচ্যুত হইলেও অনেক স্থলেই বহু মূল্যের ও বহু পরিশ্রমের টিউব-ওয়েলটি অকেজো অবস্থায় চিরতরে ভূগর্ভে লয় পায় সে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কুটিরশিল্পে দামী ও জটিলতাপূর্ণ মেসিনের স্থান কোথায়? শটী প্রস্তুতকারীদিগের আর্থিক ও কারিগরী বুদ্ধির যেরূপ অভাব তাহাতে এমন কিছু হওয়া দরকার যাহা তাহারা স্থানীয় সহজ-প্রাপ্য জিনিষে গ্রাম্য সূত্রধর দ্বারা অনায়াসে মেরামত করাইতে পারে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া আমি সাধারণ কাঠ, টিন, তার-কাটা প্রভৃতি দিয়া স্থানীয় সূতার মিস্ত্রী দ্বারা দুইটি মেসিন প্রস্তুত করাইয়াছি। উহার একটি শটীর কন্দগুলি প্রাথমিক পরিষ্কার করিবার জন্য এবং অপরটি কাটিবার জন্য। হাতে ঘসিয়া সমস্ত দিনের গুরুতর পরিশ্রমেও একজনের পক্ষে যে স্থলে এক পোয়া বা দেড় পোয়ার বেশী উৎপাদন করা সম্ভব নয়, এই মেসিনে সে স্থলে ঘণ্টায় দুই সের অনায়াসে তৈয়ার করা যাইবে। ইহা ঘরে ঘরে কুটির শিল্পরূপে অবসর সময়ে হাতে চালাইবার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করা হইয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিলে আখের কলের ন্যায় কতকগুলি কল ভাড়া দিয়া ভাড়া স্বরূপ শটী অথবা নগদ টাকা লইয়া লাভজনক ব্যবসা করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শটীর ব্যবসাও চালাইতে পারেন। ইহাতে দরিদ্র উৎপাদনকারীদের আর মেসিন কিনিবার মূলধনের ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

অনায়াস-লভ্য উপাদানে গঠিত বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, মেসিনটি খেলনা জাতীয়। শটীর মধ্যে পার্ব্বত্য শটীই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বৃহৎ। উহার শিকড়-গুলিও স্থূল ও শক্ত। আমি এই পার্ব্বত্য শটীই এই কলে অনায়াসে কাটিয়াছি। উহাদের অধিকাংশই ওজনে পাকার তিন ছটাক ছিল। এখানে শটী সম্বন্ধে একটু না বলিলে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে মনে করি। শটী হরিদ্রা জাতীয় গাছ। দেখিতে হরিদ্রা গাছের সহিত কোনই প্রভেদ নাই। উহার কন্দও দেখিতে অবিকল হরিদ্রার ন্যায়। ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—এক জাতীয়ের কন্দের ভিতরের রং সম্পূর্ণ সাদা; ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শ্বেত-সার দেখা যায়। আর এক জাতীয় কন্দ হরিদ্রাভ সাদা; ইহাতে পালোর ভাগ পূর্ব্বোক্ত জাতীয় হইতে অপেক্ষাকৃত কম। অবশিষ্ট জাতীয় শটী দেখিতে অবিকল হরিদ্রার ন্যায় রং বিশিষ্ট; ইহাতে পালোর ভাগ উপরোক্ত দুই জাতি অনেক কম। শটী এবং হরিদ্রা, উহাদের বিশিষ্ট গন্ধ দ্বারাই নিরূপিত হয়।

উপসংহারে আমি বাংলা গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ মহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে চাই। ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মাননীয় এ, টি, ওয়েস্টন্ সাহেব এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার নিকট এ বিষয়ে এক বিস্তারিত পত্র লিখিয়া আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যেই খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ উত্তর পাই। তাহাতে তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখিয়াছিলেন ও মেসিন স্থায়িত্বে এবং কার্য্যকারিতায় উপযুক্ত হইলে সাহায্য দেওয়ার ইঙ্গিত ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অপরিহার্য্য কারণে তাঁহার সহিত আর দেখা করা সম্ভব হয় নাই। সেই লক্ষ্য করিয়াই কিছুদিন আগে বর্ত্তমান ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট প্রাগুক্ত দুই পত্রের নকলসহ এক পত্র দেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন কি প্রাপ্তি স্বীকারটা পর্য্যন্ত, স্মারকলিপি দেওয়ার পরেও এ পর্য্যন্ত ভাগ্যে জুটিয়া উঠিল না। ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ ডিপার্ট্মেণ্ট যেরূপ উৎকট উৎসাহে পুতুল তৈয়ারি, ছাতা তৈয়ারি, বাঁশের কাজ প্রভৃতি নানা জাতীয় কাজে মহড়া দিতেছেন তাহাতে শটী সম্বন্ধে একটু অবহিত হইলে যে সময়ের ও স্বার্থের অপব্যবহার হইবে এমন মনে করিবার কারণ দেখি না। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ও ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ ডিপার্ট্মেণ্টের হাতে এই সব বিষয়ে যে পরিমাণ ব্যাপক ক্ষমতা, তাহাতে তাঁহারা এ বিষয়ে অগ্রণী হইলে দেশের একটি বড় সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আশা করি।

প্রতিবাদ

স. চ.

"ভারতবর্ষের" বৈশাখ, (১৩৪৬) সংখ্যায় শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ রায় "সর্প" নামক প্রবন্ধের একস্থানে (৭৫৬ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"শ্রবণের নিমিত্ত সর্পের কর্ণ নাই, শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য ইহারা জিহ্বা দ্বারা সম্পন্ন করে।"

সর্পের কর্ণ নাই ইহা সত্য, কিন্তু কর্ণের অভাবে ইহারা জিহ্বা দ্বারা শ্রবণ কার্য সম্পন্ন করে, লেখকের এই উক্তির আমরা প্রতিবাদ করিতেছি। সর্প শুনিতে পায়, কোনো প্রাণীতত্ত্ববিদ্ একথা স্বীকার করিবেন না ; সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, শ্রবণযন্ত্র না থাকায় সর্প চির-বধির। সুতরাং সর্প গান শুনিতে ভালোবাসে, বাঁশীর মধুর সুরে মুগ্ধ অথবা সম্মোহিত হইয়া যায়, প্রচলিত এই বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক-যুক্তি অথবা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা যায় না। সুমধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া সর্প উপস্থিত হইয়াছে এই প্রকারের জনশ্রুতি ভৌতিক গল্পের ন্যায় প্রায়ই আমাদের গোচরে আসে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ইহা অসম্ভব ; যে বদ্ধকালা সে আবার গান শুনিবে কি করিয়া ?

যে কোনো প্রামাণিক গ্রন্থে ক্ষেত্রনাথবাবু নাগজাতির বধিরতার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। সর্প আমাদের ভয়ংকর শত্রু। সুতরাং সাধারণের মন হইতে ইহার সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণাটি দূর করিবার চেষ্টাও বিজ্ঞানীরা করিয়াছেন। পাঠ্যপুস্তকেও ইহাদের এই বধিরতার উল্লেখ দেখা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ববিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন— "সাধারণ লোকের ধারণা জিহ্বা দিয়া ইহারা (সর্প) শুনিতে পায়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। জিহ্বা দিয়া শুনিবার কাজ মোটেই চলিতে পারে না" (প্রকৃতি পরিচয়, ২য় ভাগ, ১১৪ পৃঃ)। সর্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা পণ্ডিত Dr. Boulenger বলিয়াছেন—সর্পের কোনো শ্রবণ যন্ত্রই নাই। সাপুড়ের বাঁশী তাহার ব্যবসার একটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। সাপের এই তথা-কথিত নৃত্য আপনাআপনিই সাধিত হয়, ইহার সহিত বাদ্যসঙ্গীতের কোনও সম্পর্ক নাই। বিষয়টি তাঁহার নিজের কথায় শুনিলে আরও পরিষ্কার হইবে—

Since the snake is virtually without a hearing apparatus, the gourd flute which usu lly accompanies a charmer's display is regarded as a piece of professional bluff, the so-called dancing being usually performed independent of the Orchestral accompaniment. (Natural History, by Tate Regan, Director, British Museum. P 384-385.)

প্রতিবাদের উত্তর

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসৌকর্যতা বশতই হয়ত এ সমস্যা আজও অমীমাংসিত, আর তাহারই ফলে আমাদের মত জিজ্ঞাসুদের এ হেন বাদ প্রতিবাদ।

প্রথমেই বলিয়া রাখি কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি বিজ্ঞান কোথাও সকলের মত সকল বিষয়ে এক হইতে পারে নাই। সাহিত্য ও রাজ-নীতির মতভেদ দৈনন্দিন ব্যাপার। বিজ্ঞানেও এ জিনিষের অভাব নেই। গুরুতর ব্যাপারে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদেরও মতভেদ শোনা যায়।

সর্পের কোন কোন বিষয় লইয়াও প্রাণীতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে।

প্রতিবাদী প্রসঙ্গক্রমে হিমাদ্রিবাবু ও Dr. Boulengerএর মত উল্লেখ করিয়াছেন। হিমাদ্রিবাবুর মত প্রতিবাদী যেভাবে উল্লেখ করিয়া-ছেন তাহা অস্পষ্ট অর্থাৎ তাহা পড়িয়া এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় না যে, সর্প চিরবধির (প্রতিবাদীর যাহা বলিবার উদ্দেশ্য)। সাধারণ লোকের যে একটা ধারণা আজ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, সর্প জিহ্বা দ্বারা শুনিতে পায়—এই ধারণার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদস্বরূপ হিমাদ্রিবাবু বলিয়াছেন "জিহ্বা দিয়া শুনিবার কাজ মোটে চলিতে পারে না।" এখানে চিরবধিরতার উল্লেখ কোথায় ? জীবজগতে কোন কোন জীব অবশ্য প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয় হইতে বঞ্চিত হয়, সেই জন্য তাহারা অন্য উপায়ে সেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া লয়। সর্পের কর্ণ নাই সুতরাং ইহারা যে একেবারে শুনিতে পায় না ইহা হিমাদ্রিবাবুর উল্লিখিত মতের মধ্যে পাওয়া যায় না। জানি না ইহার পর তিনি আরও কিছু লিখিয়াছেন কি না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বক্তব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্পের জিহ্বা দ্বারা শ্রবণ কার্য্য সম্পন্ন—সাধারণের এই ধারণার উপর হিমাদ্রি-বাবুর আস্থা নাই ; কিন্তু সর্প যে জিহ্বা দ্বারা শ্রবণ করে তাহা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত প্রাথমিক বিজ্ঞান পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন—"...জিভ দিয়াই সাপ কানের কাজ করে। সাপের ঠোঁটের মধ্যে একটি ফুটা আছে। সেই ফুটা দিয়া সাপ জিভটি সর্বদা বাহির করিয়া, কোথায় কোন শব্দ হইতেছে তাহা শুনিয়া লয় এবং এই জিভ বাহির করিয়াই তাহার সম্মুখে কোন জিনিষ আছে কি না জানিয়া লয়।" (—"প্রকৃতিপাঠ" পৃষ্ঠা ৮৮)

অবশ্য যাঁহারা সর্পের শ্রবণ শক্তি আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মধ্যেও দুই মত পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক বলেন, সর্প শ্রবণ করে জিহ্বার সাহায্যে—আর একশ্রেণী বলেন চক্ষু সাহায্যে। আর সেই জন্যই সর্পের অপর নাম "চক্ষুঃশ্রবা"। অভিধানে এই শব্দ ও তাহার অর্থ পাওয়া যায়।

খ্যাতনামা ডাঃ রায় বাহাদুর শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এসসি, এম-বি, বি-এস লিখিয়াছেন—

"সাপের কাণ নাই। ঐ যে তাহাদের জিহ্বাখানি অনবরত লক্ লক্ করিতেছে দেখিতে পাও, ঐ জিভ দিয়াই তাহারা শব্দ বুঝিতে পারে।"

"শিশুভারতী" পৃষ্ঠা ১৮৩৩।

"তাহা ছাড়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এইরূপ উপদেশ আছে যে রাত্রিকালে ও দিনের বেলা ছাতা এবং ঝন্ ঝন্ ও ঝুন ঝুন শব্দ করে এমন লাঠি হাতে করিয়া পথে চলিবে। তাহা হইলে ছায়া ও শব্দে ভয় পাইয়া সাপেরা পলাইয়া যাইবে। "শিশুভারতী" পৃষ্ঠা ১৮৩৮।

Clude E. Benson তাঁহার সর্পবিষয়ক প্রবন্ধে সর্পের কর্ণ নাই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু লেখার মধ্যে চিরবধিরতার কথা না পাইয়া হতাশ হইয়াছি। সর্পবিষয়ক প্রবন্ধে বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ Dr. Burgess Barnettও সর্পের চিরবধিরতার কথা উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার লেখায় পাই—"The belief, however, that snakes respond to musical sounds is ancient and widespread. "The deaf adder (বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের একজাতীয় সর্প) that stoppeth her ear, which will not hearken to the voice of the charmer's was considered an exception by the psalmist." এ ছাড়া "Pliny and seneca believed that snakes could be drawn away from their lairs by the seductive power of music." আমাদের দেশেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। সর্প যে চিরবধির নহে তাহা আরও বহু লেখকের লেখায় উল্লেখ পাই।

প্রতিবাদী একস্থানে বলিয়াছেন "সুমধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া সর্প উপস্থিত হইয়াছে…কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ইহা অসম্ভব।" ইহা ছাড়া তিনি পণ্ডিত Dr. Boulenger-এর মত উল্লেখ করিয়াছেন "—সর্পের কোনো শ্রবণ যন্ত্রই নাই। সাপুড়ের বাঁশী তাহার ব্যবসার একটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়"—অনেকের সহিত এই উক্তিরও যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। আমাদের দেশে সুমধুর সঙ্গীতে সর্প যে আকৃষ্ট হয়—ইহা বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ একটি বহু দিনের প্রচলিত মতবাদকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেননা সর্প যে বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে—এইরূপ কোন কথা আমি আমার প্রবন্ধে লিখি নাই।

এইরূপ একটি জটিল ব্যাপারের সঠিক মত প্রতিবাদকারীর জানিবার ইচ্ছা সত্যসত্যই প্রশংসনীয়।

তোমারে বাসিব ভাল

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল

তোমারে বাসিব ভাল
দুনিয়ার সব কিছু চেয়ে ;
স্মরিতে তোমার কথা,
দু নয়নে অশ্রু যাবে বেয়ে।

তোমারে ডাকিতে প্রভু
কণ্ঠরোধ হ'য়ে যাবে মোর,
স্তব্ধ হবে ভাষা যত
তব প্রেমে হইয়া বিভোর।

চেতনা হারাবে হৃদি
থর থর দেহের কম্পন,
পুলকে ভরিবে প্রাণ,
ধ্যানে আঁখি মুদিব যখন।

সকল করম মাঝে
সারা প্রাণ তোমাতে স'পিয়া,
তোমারি আদেশে জানি
বিশ্বপথে চলিব ছুটিয়া।

কান্না হাসি জীবনের—
প্রতি স্তরে প্রতিটি স্পন্দনে,
প্রেমের ফল্গুটি তব
ব'য়ে যাবে নীরব গোপনে।

সুখ দুঃখ নাহি কিছু
সারা বিশ্ব মূরতি তোমার
তোমারে বাসিব ভাল
তোমা সনে হব একাকার।

ছত্রাক ও তাহার স্বজাতি

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রকৃতির রাজ্যে কত যে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ রহিয়াছে তাহা গণনায় শেষ করা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, আদিম যুগে উদ্ভিদ ও প্রাণী একত্রে জলাশয়ে বাস করিত। সেই সময় তাহাদের বিচ্ছিন্নভাবে গণ্য করা হইত না। তাহার পর কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী পৃথকরূপ ধারণ করায় একদল উদ্ভিদ নামে এবং অপরদল প্রাণী নামে অভিহিত হইল। উভয়ের জীবনযাত্রা প্রণালী পৃথক হইলেও উভয়েই উভয়ের প্রতিবেশী। প্রাণীজগতকে জীবন ধারণের জন্য পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। প্রাণীজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবজাতি আজ যে সভ্যতার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহার চতুর্দ্দিকে উদ্ভিদ জগতের প্রভাব রহিয়াছে। যাহার অভাবে মানবের জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়ে সেই একান্ত পরোপকারী প্রতিবেশী উদ্ভিদ-জাতির জীবনযাত্রা ও গুণাগুণের বিষয় আমাদের জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু পৃথকভাবে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা বা আলোচনা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য উদ্ভিদবিদগণ সপুষ্পক ও অপুষ্পক এই দুই শ্রেণীতে সমস্ত উদ্ভিদ জগতকে ভাগ করিয়াছেন। এই দুই শ্রেণী আবার কয়েকটী উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত। সপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদের ফুল ফল হয়। ইহারা উচ্চশ্রেণীর। অপুষ্পক নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ। ফুল ফল ইহাদের হয় না; একপ্রকার বীজরেণু (Spore) দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হয়। আবার এই শ্রেণীর উদ্ভিদের অনেকের কাণ্ড মূল প্রভৃতি থাকে না। অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ আবার ছত্রাক (Fungi) শৈবাল, মস ও ফার্ণ এই কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। আমাদের আলোচ্য ছত্রাক বা ছাতা ও তাহার স্বজাতি অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ। বর্ষাকালে গাছ, গাছের পাতা, ভিজা জুতা, পচা ফল, পুরাতন আচার, দোয়াতের কালি, পুরানো ভিজা খড় ও গোবর প্রভৃতির উপর নানা আকারের ছাতা পড়িতে সকলেই দেখিয়াছেন। এই সকল ছত্রাক বিভিন্ন আকৃতিতে জন্মলাভ করিয়া নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। পৃথিবীতে বহু প্রকারের ছত্রাক দেখা যায়। এই সকল ছত্রাক গোত্রের মধ্যে ক্লোরোফিল (সবুজ পত্র) ও শ্বেতসার পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। সেইজন্য ইহারা পরজীবী (Parasites) অথবা মৃতজীবী (Saprophytes) হয়। কযেক শ্রেণীর ছত্রাক এত ক্ষুদ্র যে তাহাদের চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেহের আকারের পার্থক্য হেতু ছত্রাক উদ্ভিদকে

বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা। টুপির নিম্নদেশে গিল (gill) ও দণ্ডে অঙ্গুরীয়ক দেখা যাইতেছে। টুপির উপরিভাগ রঞ্জিত এবং আঁইসযুক্ত।
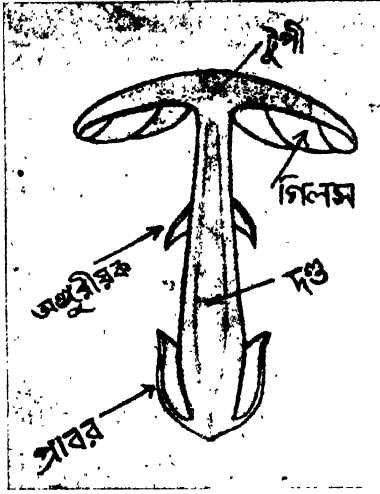
ছত্রাকের দেহ।

উদ্ভিদবিদ্গণ প্রধান চারভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) আরচিমাইসিটিস (Archimycetes) (২) ফাইকো-মাইসিটিস (Phycomycetes)—আলু ও রুটীর উপর এই শ্রেণীর ছাতা পড়ে। (৩) এসকোমাইসিটিস (Ascomycetes) ও (৪) ব্যাসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes)-ব্যাঙের ছাতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ব্যাসিডিওমাইসিটিসকেও উদ্ভিদবিদগণ এগার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—(১) এগারিকস (২) পলিপোরস (৩) ট্রেমেল্লা (৪) লাইকোর্পাডন (৫) হিডনম (৬) থিলিফোরা (৭) ক্লাভেরিয়া (৮) ফ্যালাস (৯) সক্লেরোডার্মা (১০) হাইমেনোগেসটার (১১) নিডিউলেরিয়া। ইহাদের মধ্যে এগারিকস বংশ অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ষাকালে গোচারণভূমি, পুরাতন খড়ের উপর ছাতা (Umbrella) আকারে যে ছত্রাক দেখা যায় তাহা ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত। ইহারা উদ্ভিদবিদ্গণের নিকট ও সহর অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত হইলেও বাংলার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ইহাদের ছাতু বলে। কোন কোন জেলায় আবার কোঁড়ক নামেও অভিহিত হয়। লম্বায় (ডাঁটা সমেত) ছয় সাত ইঞ্চির উপরও হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছত্রাক বীজরেণু দ্বারা বংশ বিস্তার করে। ছত্রাকের বিভিন্ন শ্রেণী অনুসারে বীজরেণুর আকারও বিভিন্ন

মৃগ-শৃঙ্গ (Stag's horn) ছত্রাকের জন্ম বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে। পুরাতন কাঠের উপর ইহাদের পাওয়া যায়। দণ্ডের রং কাল ও অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ।
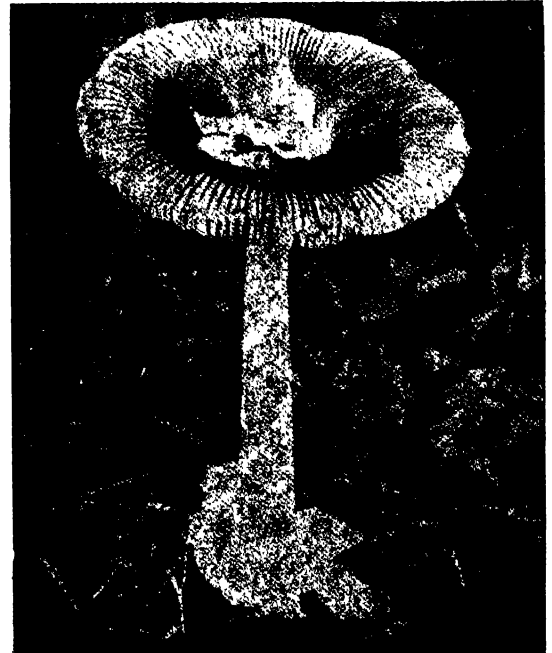
বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের এক জাতীয় আহার্য্য-ছত্রাক আহার্য্য ছত্রাক হইলেও ইহাদের গিল শ্বেত বর্ণের।

মাটির তারা (Earth Star). বাঙ্গলা দেশের কুড়কুড়ি ছাতু। জঙ্গলে এই শ্রেণীর আহার্য্য-ছত্রাক পাওয়া যায়।
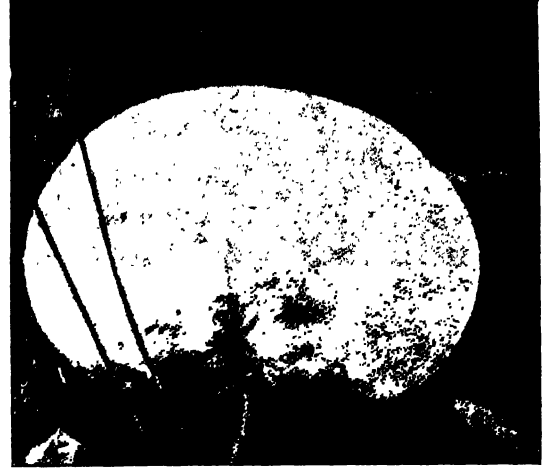
লাইকোপাডন বংশের বৃহৎ ছত্রাক (লাইকোপাডন জাইগানটিয়াম)। বাঙ্গলা দেশে এই জাতীয় আহার্য্য ছত্রাক কদাচিৎ গৃহস্থ বাড়ীতে জন্মাইতে দেখা যায়।

হয়। উপযুক্ত স্থানে ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে বীজরেণুর উপরিভাগের আবরণ (Volva) হইতে ছত্রাক মুক্ত হইয়া দণ্ডাকারে উর্দ্ধে বর্দ্ধিত হয়। দণ্ডের উপরিভাগের অপরিণত অংশ যথাসময়ে ছাতার ন্যায় বিস্তৃত হয়। ছত্রাকের মূল শিকড় (Real roots) থাকে না। বীজরেণু হইতে অতি সূক্ষ্ম আকারের অনুসূত্র বাহির হইয়া মৃত্তিকার চতুর্দ্দিকে দেহ বিস্তার করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছত্রাকের আশ্চর্য্যরূপ বংশ বিস্তার হয়। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে স্থানে কোন ছত্রাকের চিহ্ন ছিল না, সেই স্থানে কিছু সময়ের মধ্যে অসংখ্য ছত্রাকের আবির্ভাব সম্ভব হয়। দণ্ডের (ডাঁটার) উপরিভাগের টুপি (ছাতার উপরিভাগের আকারের ন্যায় আচ্ছাদন) দণ্ডের গাত্রে অঙ্গুরীয়ক (Ring) বা বলয়াকারে কিয়দংশ রাখিয়া নিজের দেহ বিস্তার করে। এই টুপিকে আমাদের দেশে সময়ে সময়ে তিনচার ইঞ্চি

এই জাতীয় ছত্রাকের দণ্ডে অঙ্গুরীয়ক ও প্রাবর (Valva) না থাকা সত্ত্বেও ইহারা আহার্য্য-ছত্রাক বলিয়া প্রমাণিত।

শৃঙ্গ ছত্রাকের গিল নাই। ইহাদের টুপির উপরিভাগ কুঞ্চিত আঠাযুক্ত। একপ্রকার দুর্গন্ধ ইহাদের গাত্র হইতে বাহির হয়।

ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার হইতে দেখা যায়। গোলাকার টুপির নিম্নভাগের চতুর্দ্দিক পাতলা গিল (gill) দ্বারা সজ্জিত হইয়া বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যেই ছত্রাকের বীজরেণু (spore) উৎপন্ন হয়। ছত্রাকের বিভিন্ন শ্রেণী অনুসারে বীজরেণুর আকার যেমন ভিন্ন হয়, আবার বীজরেণু প্রকোষ্ঠ বা স্থলীও সেইরূপ নানা প্রকার হয়। সাধারণতঃ বিষাক্ত ছত্রাকের দণ্ডে অঙ্গুরীয়ক থাকে। আহার্য্য-ছত্রাকে অঙ্গুরীয়ক থাকিলেও আবরণ (volva) থাকে না। বিষাক্ত-ছত্রাকের টুপির উপরিভাগে একপ্রকার আঁইস থাকে এবং নিম্নদেশের গিল (gill) শ্বেতবর্ণ। এগারিকস বংশের কয়েক শ্রেণীর ছত্রাককে পরিপাটীরূপে রন্ধন করিয়া আহার করা হয়। ফ্রান্স, ইউরোপ, চীন, জাপান ও আমেরিকা অঞ্চলে ছত্রাকের কৃষিকার্য্য প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। ইহা একটি লাভবান ব্যবসা। আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে ইহার চাষ হয় না। জঙ্গল হইতে ছত্রাক সংগ্রহ করিয়া কৃষকেরা বিক্রয় করে। বাঙ্গলা দেশে এগারিকস বংশের কয়েক শ্রেণীর আহার্য্য-ছত্রাক পাওয়া যায়। আহার্য্য-ছত্রাকের মধ্যে এদেশে পোয়াল, কাড়ান, উই, মৌচাল ও দুর্গাছাতুর নামই উল্লেখযোগ্য।

বর্ষার সময় পুরাতন খড়-স্তূপের উপর যে সকল ছাতুর জন্ম হয় তাহারা পোয়াল ছাতু নামে পরিচিত। পোয়াল ছাতুর টুপির নিম্নদেশ ঈষৎ রঞ্জিত। আউস ধান্যের খড়েই পোয়াল ছাতু প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। বর্ষাকালে ঐ পুরাতন খড়েই নাকি দ্রুত পচন কার্য্য আরম্ভ হয়। কাড়ান ছাতু বর্ষার সময়ে জঙ্গল অঞ্চলে খুব বেশী পরিমাণে জন্মাইতে দেখা যায়। উইঢিপির উপরিভাগে একত্রে বহু ছত্রাক ফুটিতে দেখা যায়। ইহারা এক ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। এগারিকস্ বংশের ছত্রাকের মধ্যে বোধহয় আকারে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। গুচ্ছাকারে উইঢিপির উপর একসঙ্গে হাজার হাজার উই ছাতুর দৃশ্য দূর হইতে সুন্দর দেখায়। মৌচাল ছাতু মোল গাছের (মহুয়া বৃক্ষ) পাদদেশে জন্মিয়া থাকে। সেইজন্য ইহার মৌচাল নামকরণ হইয়াছে। মৌচাল ছাতু মহুয়া (মোল) গন্ধযুক্ত। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে জ্বালানি কাঠের জন্য মোল গাছ কাটিয়া বাড়ীর আশ পাশে ফেলিয়া রাখা হয়। বর্ষার সময়ে তাহার চারি পাশে মৌচাল ছাতু জন্মায়। দুর্গা ছাতু বা অষ্টমী ছাতুর আবির্ভাব শরৎকালে। দুর্গা ছাতুর ডাঁটা লম্বায় অনেক বড়।

ব্রাকেট ছত্রাকের জন্ম বৃক্ষে। কোন কোন দেশে এই শ্রেণীর কয়েক জাতীয় ছত্রাক খাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

লাইকোর্পাডন বংশের দুই শ্রেণীর ছত্রাক বাংলা দেশেও পাওয়া যায়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের লাইকোর্পাডন জাইগানটিয়াম (Lycoperdon giganteum) পল্লীগ্রামে গৃহস্থ বাড়ীতে সময়ে সময়ে জন্মাইয়া থাকে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে ইহাদের দুই ফিট ব্যাস পরিমাণে দেখা গিয়াছে। বৃটেনে লাইকোপার্ডন বংশের এক শ্রেণীর ছত্রাক মাটির তারা (Earth star) নামে পরিচিত। আমাদের দেশে ইহাদের কুড়কুড়ি ছাতু

এগারিকস বংশের এই জাতীয় ছত্রাক আহার্য্য হইলেও খাদ্য-রূপে গ্রহণ করা উচিত নহে। কারণ আর এক জাতীয় ছাতা (mould) ইহাদের সময়ে সময়ে আক্রমণ করে ও বিষাক্ত করিয়া দেয়।

বৃক্ষবাসী ওসটার ছত্রাক আহার্য্য-ছত্রাক শ্রেণীভুক্ত।

বলে। আকারে ইহারা গোল আলুর ন্যায়। মৃত্তিকার তলদেশ হইতে মৃত্তিকা ফাটাইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইহার উপরিভাগে শ্বেতবর্ণের একটি মসৃণ, চামড়ার ন্যায় আবরণ থাকে। আবরণ মুক্ত করিলে শ্বেতবর্ণের গোলাকার শাঁস বাহির হয়। এই জাতীয় ছত্রাকের আবরণ যথাসময়ে আপনা হইতেই ফাটিয়া যায় এবং মাটির বুকে ইহাদিগকে তখন সত্য সত্যই তারার ন্যায় দেখায়। আমাদের দেশে ছত্রাক একই স্থানে দুই তিন দিনের বেশী জন্মাইতে দেখা যায় না। একদিনের হইলেই ছত্রাকে কীটের আবির্ভাব ও তাহাতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহা আহারের পক্ষে অনিষ্টকর। সেইজন্য টাটকা ছাতুই আহারের উপযোগী। ছত্রাক গোত্রের মধ্যে আবার বহু বিষাক্ত ছত্রাকও রহিয়াছে। ইহারা মানুষের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক উহা রন্ধন করা উচিত। পূর্ব্বে বিষাক্ত ছত্রাক নির্ণয় করিবার কয়েকটী উপায় উল্লেখ করিয়াছি।

যে সকল ছত্রাক বিচিত্র বর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত অথবা যাহাদের গাত্র হইতে রস নির্গত হয় তাহা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। রন্ধন সময়ে যদি রৌপ্য নির্ম্মিত চামচ বিবর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে ছত্রাক বিষাক্ত বুঝিতে হইবে। ছত্রাক যে কোন উজ্জ্বল বর্ণের হইলে তাহা যে বিষাক্ত হইবে ইহা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ক্যানথারেলাস কিবা-রিয়াস নামক (cantharellus cibarius) ছত্রাকের বর্ণ পীত। সেখানকার অধিবাসীরা ইহাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ছত্রাকের গীলের বর্ণ শ্বেত হইলেও তাহা আহার্য্য বলিয়া জানা গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের এ্যামানিটপ্‌সিস ভ্যাজিনাটার (Amanitopsis vaginata) নাম করা যায়।

বৃক্ষবাসী ছত্রাকের মধ্যে বৃটেনের ওস্‌টার অর্থাৎ শুক্তি ছত্রাক যেমন দেখিতে সুন্দর তেমনি মুখরোচক। ইহারা আকারে ঝিনুকের ন্যায় এবং বৃক্ষের গাত্রদেশে সুন্দররূপে সজ্জিত থাকে। মৃগশৃঙ্গ ছত্রাক (stag's horn) বিষাক্ত না হইলেও খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে। ইহাদের দেহ অনমনীয়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই পুরাতন কাঠের উপর দেখা যায়। ডাঁটার রং কাল এবং লম্বায় প্রায় দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ফ্যালাস বংশের

বৃক্ষবাসী ছত্রাক—এই শ্রেণীর ছত্রাক বিচিত্র বর্ণের। (দক্ষিণে) জুর কর্ণ—মানুষের কানের ন্যায় দেখিতে; পুরাতন গাছে ইহারা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

দুর্গন্ধময় ছত্রাকের টুপি কুঞ্চিত। ইহাদের কোন গিল থাকে না। কুঞ্চিত টুপি সবুজ বর্ণ ও একপ্রকার দুর্গন্ধ আঠাযুক্ত। ইহাদের বীজরেণুগুলি আঠায় আট্‌কাইয়া থাকে। বৃক্ষবাসী ছত্রাক শ্রেণীর সংখ্যা অনেক। তাহাদের মধ্যে কয়েক শ্রেণী সত্য সত্যই সুন্দর। কয়েক জাতীয় ছত্রাক বৃক্ষের সর্ব্ব দেহ আক্রমণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের মৃত্যু ঘটায়। বৃক্ষবাসী ছত্রাকের মধ্যে পলিপোরস

গাছের পাতায় এক জাতীয় ছত্রাক।

বংশের ব্রাকেট আকারের ছত্রাকই দর্শনযোগ্য। ট্রেমেল্লা বংশের এক শ্রেণীর ছত্রাক ঠিক মানুষের কানের ন্যায় দেখিতে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে এই জাতীয় ছত্রাক জুর কর্ণ (Jew's ear) নামে পরিচিত। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে বৃক্ষের পাদদেশে যে শ্রেণীর ছত্রাক জন্মিয়া থাকে তাহারা বৃক্ষের বিশেষ উপকারী বন্ধু। বৃক্ষের নিম্নভাগের ভূমি পাতার আচ্ছাদনে উপযুক্ত আলো ও বৃষ্টির জল হইতে বঞ্চিত হওয়ায় ভূমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে—বিশেষ করিয়া নাইট্রোজনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর ছত্রাক কিছু পরিমাণে নাইট্রোজন সরবরাহ করিয়া ভূমির অনুর্ব্বরতা দূর করে। কি রাসায়নিক উপায়ে ইহারা এই কার্য্য সমাধান করে তাহা বৈজ্ঞানিকদের নিকট আজও অজ্ঞাত। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ভারতবর্ষে প্রায় দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে খাদ্য ও ঔষধরূপে ছত্রাকের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। এমন কি সুশ্রুতেও ইহার বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আহার্য্য ছত্রাকের যথেষ্ট চাহিদা আছে। বর্ত্তমানে শিক্ষিত কৃষি-শিল্পবিদের অভাব নাই। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-কার্য্য দ্বারা ছত্রাক উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন —ইহাতে বিশেষ লাভবান হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সাধু সালবেগ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

মা?

কি বাবা?

আর আমি বাঁচবো না।

ছি বাছা, এমন কথা কি বল্‌তে আছে।

মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া পুত্র মাতার নিকট এইরূপ খেদ করিতেছিল।

কটক সহরের সন্নিকটে লালবাগ নামক স্থানে মোগল লালবেগের ঘাঁটি। গজপতি বংশের রাজাদের রাজধানী তখন কটকে। কিন্তু রাজপাট পর্য্যুদস্ত হইতেছিল মোগলদের দ্বারা। লালবেগের উৎপাতে উৎকল কাঁপিতে-ছিল। গজপতিদের সঙ্গে তাহার প্রবল যুদ্ধবিগ্রহ হইতেছিল। এই লালবেগের পুত্র সালবেগ। সালবেগই তাহার মাতাকে উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছিল।

তাহার অন্যান্য ভ্রাতাদের অপেক্ষা সালবেগ অধিক যুদ্ধনিপুণ ছিল। একদিন সে-ও পিতার সহিত যুদ্ধে গিয়া সৈন্যগণের পুরোভাগে দাঁড়াইল। তাহার রণ-কৌশলে হিন্দু সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ তরবারির দারুণ আঘাতে তাহার মস্তক হইতে দরবিগলিত রক্তধারা প্রবাহিত হইল। সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। বীর সন্তানকে গৃহে আনিয়া তাহার পিতা উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু তাহার ক্ষত উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সে দুর্ব্বল ও জীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহার পিতা তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল।

সালবেগের মাতার প্রাণে ইহা মর্ম্মন্তুদ হইল। স্বামী কর্ত্তৃক তিনিও উপেক্ষিত, পুত্রও উপেক্ষিত। তাঁহার রূপ-যৌবন ও বিগত, পুত্রও যুদ্ধকার্য্যে অসমর্থ। সুতরাং লালবেগ কিসের মোহে আদর করিবে? কিন্তু একমাত্র সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য মাতার ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। একদিন পুত্রের নিকট তিনি অকপটে আত্মপরিচয় দিয়া ফেলিলেন। আর তাহার সঙ্গে বলিলেন, নিজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা। সে কথা যেমন করুণ, তেমনিই শিক্ষাপ্রদ। আজ সালবেগের জীবনচরিত অবলম্বনে আমরা সেই রসাস্বাদ করিবার প্রয়াস করিব।

মাতা বলিলেন, তিনি পুত্রের ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ কথা বলিবেন। কিন্তু পুত্র যদি তাঁহার কথামত কার্য্য করে তবে জীবন ফিরিয়া পাইবে। পুত্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তথাপি প্রতিজ্ঞা করিল সে মাতার উপদেশ শিরোধার্য্য করিবে। মাতা তখন বলিলেন তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা ও বালবিধবা। কটকের সন্নিকটে দান্তমুকুন্দপুর তাঁহার

সাধু সালবেগের সমাধি

শ্বশুরালয়। শ্বশুরের ভিটা আগলাইয়া তিনি একাকী অসহায় অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। কারণ তাঁহার স্বামীর শোকে তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্নানার্থে নদীতে গিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন উর্দ্ধশ্বাসে সকলে গ্রামত্যাগ করিতেছে। কারণ লালবেগের সৈন্যদল গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি পলাইতে পারিলেন না, যেহেতু লালবেগের সৈন্যদল

তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। স্বয়ং লালবেগও সেখানে আসিয়া পড়িল। তাঁহার রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হইয়া সে তাঁহাকে নিজের ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া লইল। তিনি তাহার বহু স্ত্রীর মধ্যে আরও একজন বলিয়া গণ্য হইলেন।

সালবেগকে তিনি বলিলেন, যবন ঔরসে জন্ম হইলেও সে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব—নয়নের মণি। সে না বাঁচিলে অভাগিনীর আর যে কোনো সম্বল নাই। তাঁহারা আজ অনাথ-অসহায়। কিন্তু তিনি জানেন একজনকে, যিনি অনাথের নাথ। তিনি সেই সর্ব্বেশ্বর, রাধিকার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণসুন্দর হরি। স্বরূপটি তাঁহার এত সুন্দর যে কামদেবও বিমোহিত হন। নীলকান্তমণির সঙ্গেও যে সে রূপের তুলনা হয় না। তাঁহার কুঞ্চিত কেশকলাপে শিখিপুচ্ছ শোভা পায়, কর্ণে মকরকুণ্ডল, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় নয়নযুগল, কামধনুর ন্যায় ভ্রুযুগ কমনীয়, নাসিকাগ্রে সুন্দর মুক্তাটি দুলিতেছে, দন্তপাতি দাড়িম্ব বীজের অপেক্ষা মনোহর, রক্তিম অধরোষ্ঠে সুধাশ্রাবী মৃদুহাস্য শোভা পাইতেছে। প্রভুর সে সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রমাও লজ্জিত হন। গ্রীবাটি অতীব সুন্দর, গলদেশে মনোমুগ্ধকর বনমালা, আজানুলম্বিত বাহু রত্নালঙ্কারভূষিত, দশাঙ্গুলীতে সুবর্ণ অঙ্গুরীয়, কটীতে পীতবাস, চরণে নূপুর, চরণতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদির চিহ্ন, সর্ব্বোপরি তাঁহার সেই মধুর মুরলী সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। ব্রজবনিতাগণ সেই বাঁশীর ধ্বনিতে আত্মহারা হইয়া যায়। মাতা বলিলেন, শেষনাগও প্রভুর রূপ বর্ণনা করিতে পারে না। দেবগণ নিরন্তর সে চরণ ধ্যান করেন, অখিল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সে চরণ বুকে ধরিয়া আছেন, ঋষিগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে আরাধনা করিতেছেন। পুত্র, আজ হইতে তুমিও একান্তে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর। সব রোগযন্ত্রণা তিনি নিরাময় করিবেন। তাঁর কৃপা ব্যতীত জগতে আর কোনো উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের নামই যে তাঁর মন্ত্র। আজ হইতে দ্বাদশ দিন তুমি সেই নাম ও রূপ জপধ্যান কর, তোমার অভিলাষ তিনি পূর্ণ করিবেন—ইহাতে সংশয় নাই।

"মাতা বোলইরে তনুজ।
বিশ্বাস সিনা মূল বীজ॥
* * তো মনে সংশয় ন কর।
বিশ্বাসে ভজ বংশীধর॥"

—দার্ঢ্যতা ভক্তি, ২য় ভাঃ, ১৭ অঃ।

সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সালবেগও চক্ষু মুদ্রিত করিল। সে মাতাকে বলিল—মা, স্বহস্তে আমার চোখ বাঁধিয়া দাও! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল—প্রভু, কৃপা করিতে বিলম্ব করিও না, বিলম্ব করিলে মাতাপুত্রে মরিয়া যাইব দেব।

"মো আর্ত্ত খণ্ড দেবরাজ।
বিলম্বে নাহুঁ আউ কাজ॥
নিশ্চে মরিবু মাএ পোএ।
হত্যা হোইবু তুম্ভ পাএ॥
এ মন্ত দ্বাদশ দিবস।
আসি হোইলা যহুঁ শেষ॥
মরিবা কথা কলে মূল।
তাহা জানিলে আদি মূল॥"

—দাঃ ভং

দ্বাদশ দিন কিন্তু গতপ্রায়। ভক্তের কাতরতায় ভক্তপ্রাণ থাকিতে পারিলেন না। ভক্তকে দর্শন দিয়া তিনি নিজ পদরজ বিভূতি প্রদান করতঃ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

"বেগে তু উঠরে কুমর।
ছাড় সকল চিন্তা তোর॥
ধর এ বিভূতি মুঠাএ।
লগাই দিঅ তোর ঘাএ॥
* * *
প্রভুঙ্ক কলা দরশন
হরি হোইলে অন্তর্দ্ধান॥

—দাঃ ভঃ

দ্বাদশ রাত্রি প্রভাতে সালবেগ দেখিলেন তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়াছে, ক্ষত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—আছে কেবল ক্ষতচিহ্ন। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াই মাতাকে তিনি বলিলেন—মাগো মা, তোমার কথাই যে সত্য, পরম সত্য। প্রাণ যখন পাইলাম, তখন বিদায় দাও মা—সেই প্রাণারামের সন্ধানে যাই।

"দেখে তা ঘাআ নাহি কিছি।
কেবল চিহ্ন মাত্র অছি॥
* * *
মাতাঙ্কু বোইলা লো শুন।
তো কথা হোইলা প্রমাণ॥
* * *
মুই সন্ন্যাসী হোইবই।
সংসার সুখ তেজিবই॥"

—দাঃ ভঃ

পুত্র মাতার চরণে প্রণাম করিলেন, ডোর কৌপীন চীরবসন সম্বল করিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলেন।

"এমন্ত কহি বস্ত্র চিরি।
ডোর কৌপুনি আশ্রে করি॥
মাতাঙ্কু দণ্ডবৎ কলা।
শুন গো জননী বোইলা॥
* * *
এমন্ত করি অনুকূল।
করি চলিলা নীলাচল॥
প্রবেশ হেলা ক্ষেত্রবরে।
সাধু বৈষ্ণবঙ্ক সঙ্গরে॥
কেতেহেঁ দিন তহু রহি।
প্রতিমামান ত দেখই॥
শ্রীজগন্নাথ দর্শন।
করিন চলিলা দক্ষিণ॥"

দাঃ ভঃ

পঞ্চক্রোশী পুরীধামে সাধু-সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে দেবায়তনসকল দেখিতে দেখিতে শ্রীমন্দিরের নিকট আসিতে লাগিলেন। এই অকিঞ্চন বৈষ্ণব নিজেকে মুসলমান কুলোদ্ভব জানিয়া চিরাচরিত প্রথামত নিশ্চয় জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। রথের ও স্নানযাত্রার সময়ে প্রভুকে দর্শন করিয়া মনোভিলাষ তৃপ্ত করিয়াছেন। পুরীতে গুণ্ডিচার পথপার্শ্বে বসিয়া রৌদ্রাতপ উপেক্ষা করিয়া একান্তে শ্রীকৃষ্ণ ভজনধ্যানে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। এই সিদ্ধ বৈষ্ণবের সমাধি স্থান পুরীধামের একটি অবশ্য দর্শনযোগ্য পীঠ। তিনি যেখানে সাধনা করিতেন সেইখানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছিল। অদ্যাপিও জগন্নাথদেবের রথ আদর্শ ভক্তের সমাধির অদূরে অপেক্ষা করে এবং প্রভুর প্রসাদি মাল্য এই সমাধির উপর অর্পিত হইলে রথ অগ্রসর হইয়া থাকে।

লোকমুখে মহাত্মা সালবেগ রচিত অনেক ভক্তিগাথা সুপ্রচলিত আছে। এখানে তাহার একটি লিখিত হইল।

"আহে নীল শৈল প্রবল মর্ত্ত বারণ।
মু আর্ত্ত নলিনী বনকু কর দলন॥
গজরাজ ডাক দেলা গ্রাহ যুদ্ধ বেলন।
চক্রপেয়ী নক্রনাশী কৃপা কল আপন॥
দ্রৌপদী যে চিন্তা কলে কুরুসভা তলেন।
কটি চন্দ্র দেই তাঙ্ক লজ্জা কল বারণ॥
হরিণী কি ঘোর বনে পড়িথিলা কষণ (১)।
ডাকিলা মাত্রক হরি রক্ষা কল আপন॥
রাবণর ভাই বিভীষণ গলা শরণ।
কেতে কেতে বিপত্তিরু রক্ষুঅছু আপন॥
অজামিল ডাক দেলা জীব যিবা বেলন (২)।
কেড়ে বড় পাপী গলা বৈকুণ্ঠ ভবন॥
কহে সালবেগ হীন জাতিরে মু দমন (৩)।
শ্রীরঙ্গা চরণতলে রথ মোরে শরণ॥"

পুরীতে এইরূপে দুইটি বৈষ্ণব মুসলমানের সমাধি আছে। একটি সাধু সালবেগের, অন্যটি হরিদাস ঠাকুরের। সালবেগ অবশ্যই হরিদাস ঠাকুরের পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি চৈতন্যদেবের সমকালের বা পরবর্ত্তী কালের নহেন। কারণ তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন এবং চৈতন্য সম্প্রদায়ের কোনো-না-কোনো গ্রন্থে তাঁহার নাম পাওয়া যাইত। আমরা যতদূর জানি তাহাতে ঐরূপ কোথাও তাঁহার উল্লেখ নাই। কিন্তু সাধু সালবেগ "দাঢ়্যতা ভক্তি" নামক উড়িয়া গ্রন্থে অমর হইয়া আছেন। উড়িষ্যার ঘরে ঘরে পূতচরিতময় এই গ্রন্থ বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে পঠিত হয়। সালবেগের সমাধি লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছিল।

(১) কষণ=কষ্ট।
(২) জীব যিবা বেদন=মৃত্যুর পূর্ব্বে।
(৩) দমন=যবন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ভাস্কর মহাপাত্র এই সমাধির উপর ক্ষুদ্র একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ায় ইহার অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছে। এখানে সেই মন্দিরের একখানি আলোক চিত্র দেওয়া হইল। তবে সালবেগের সমাধির বৈষ্ণব মতে কোনোরূপ সেবার ব্যবস্থা দেখিলাম না। তিনি চৈতন্যভক্ত হইলে অবশ্যই সে ব্যবস্থা থাকিত। কারণ বেশী দিনের কথা নয়—সম্ভবতঃ ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে হরিদাস ঠাকুরের সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া জনৈক বৈষ্ণবপ্রবর (৪) তথাকার সেবা পূজার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন জানিতে পারিলাম। পুরীর অন্যতম এই মুসলমান-সাধু সালবেগের সমাধির সেবার জন্যও আমরা বৈষ্ণব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "দার্ঢ্যতা ভক্তি" গ্রন্থে উল্লেখ আছে—সালবেগ সাধনবলে চর্ম্ম চক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করেন। সুতরাং তিনি বৈষ্ণব জগতের পূজ্যপাদ ব্যক্তি। দার্ঢ্যতাভক্তিকার শ্রদ্ধাস্পদ রামচন্দ্র শর্ম্মা লিখিয়াছেন—

"জীবন্তে শ্রীনন্দ কহ্নাই।
দেখিলা চর্ম্মনেত্রে চাহি ॥
তা গতি মুক্তি যেবা হেউ।
তাহা জানিবে মহাবাহু (৫) ॥
এ দার্ঢ্যভক্তি রসামৃত।
সুজনে এথেঁ দিঅ চিত্ত ॥
*　　*　　*
কহই বিপ্র রামচন্দ্র।
মো প্রভু বৃন্দাবনচন্দ্র ॥"

(৪) সংকীর্ত্তন ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয়।
(৫) মহাবাহু=জগন্নাথদেব।

তোমারে দিয়েছি ব্যথা—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

তোমারে দিয়েছি ব্যথা, মর্ম্মে-মর্ম্মে করি অনুতাপ ;
অশ্রুর উৎসার জাগে উদ্বেলিত হৃদয়ের তলে,
আঁখিযুগ শুষ্ক রাখি। জানি না ত কি যে অভিশাপ
বহিতেছি চিরদিন ; চিরদিন এ অন্তর জ্বলে।

কখনো সমুদ্রসম ছুটে যাই বাসনা-অধীর,
বাধা পাই শুষ্ক তটে, ফিরে আসি অতৃপ্ত-তিয়াস ;
উদাসীন হ'তে চাই, অন্তর সে নাহি মানে থির,
উন্মুখ আগ্রহভরে খুঁজি তব ব্যগ্র বাহুপাশ।

প্রথম মিলন হ'তে হৃদয়ের ছিনিমিনি খেলা !
কত বার হারিলাম, কত বার মুছিলাম আঁখি !
সহিতে পারি না তবু ! দিবানিশি, ভোর সন্ধ্যাবেলা
হয়ে গেল একাকার—অশ্রুবাষ্পে মেঘছায়া আঁকি।

দুর্ব্বল এ হিয়া ল'য়ে কি করিব ? কারে আর দিব ?
সহিতে পারিবে জ্বালা ? হয় ত জ্বলিবে আজীবন।
তুমিও সহিবে, আর বুক বাঁধি আমিও সহিব,
কি করিব ? ভাঙে বুক, ছিন্ন তবু না হয় বন্ধন।

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

সত্যেন সেনের আপনার বলতে সংসারে বিশেষ কেউ ছিল না। মৃত্যুকালে তার বাবা বেশ কিছু টাকার কোম্পানীর কাগজ রেখে যান। তার কতক টাকা সে নিজের জন্যে ব্যয় করে, বাকীটা জামিন রেখে সিটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পদে বহাল হয়।

বন্ধুবান্ধবের সংসর্গে পড়ে সত্যেন অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঘোড়দৌড় ও জুয়া খেলায় অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অতি-আধুনিক আভিজাত্যের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে গেল। সাধারণ রঙ্গালয়ে যে সব আধুনিকারা প্রাচ্য নৃত্যকলার রস পরিবেশনে পাশ্চাত্য স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখায় সত্যেন তাদের একনিষ্ঠ ভক্ত। চালচলন ও পোষাক পরিচ্ছদে সে সর্ব্বদাই নিজের অবস্থা লঙ্ঘন ক'রে চলে। বন্ধু ও বান্ধবীদের নিয়ে প্রায়ই সাহেবী হোটেলে ডিনার খায়। ক্রমে তার ঋণ বৃদ্ধি হয়ে চরম সীমায় দাঁড়াল। মাসিক আয় যখন সে ব্যয় সঙ্কুলনের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়াল তখন সত্যেন অতি-মাত্রায় ঝুঁকে পড়ল ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে। ফলে বাজারে দেনা বেড়ে গেল, অগত্যা আপিসের তহবিল তস্রুপ ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। সত্যেন আশা করে ঘোড় দৌড়ে এক দিন হঠাৎ অনেক টাকা পেয়ে রাতারাতি ব্যাঙ্কের টাকা পূরণ ক'রে রাখবে। কিন্তু ঘটল অন্য রকম। নিকাশে তহবিল তস্রুপি ধরা পড়ে গেল। বিচারে তার চাকরি গেল, জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হল, আর দু বছরের কারাদণ্ড হ'ল তার সঙ্গে ফাউ।

জেল থেকে বেরিয়ে সত্যেন সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়ল। পরিচিত ও বন্ধু-মহলে আর সে মুখ দেখাতে পারে না। একজন বাল্যবন্ধুর সাহায্যে দু-একদিন অতি কষ্টে কাটল। কিন্তু সেও অত্যন্ত দরিদ্র, কাজেই সত্যেন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে পড়ল। দিনকয়েক অনশনক্লিষ্ট হয়ে পথে পথে ঘুরেও সত্যেন চাকরি জোগাড় করতে পারল না। কুলীগিরি করবার চেষ্টাও সে করল, কিন্তু জুটল না। শেষে একটি ভিখারী মেয়ের অনুগ্রহে সত্যেন একটু আশ্রয় পেল। তখন অনন্যোপায় হয়ে তাকে পেটের দায়ে ভিক্ষাবৃত্তিই অবলম্বন করতে হ'ল।

ভিখিরীদের বস্তিতে বাস ক'রে ও ভিখিরী জীবনের মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখে সত্যেন এই সর্বহারাদের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করল তাতে পৃথিবীর উপর তার অন্তর বিদ্রোহ ক'রে উঠল। সারাদিন রৌদ্র ও বৃষ্টিতে কেঁদে কেঁদেও এরা পেট ভরে খেতে পায় না। এদের নিয়েও লোকে ব্যবসা করে, সুস্থ সবলকায় মানুষকে পেটের দায়ে কুৎসিত বিকলাঙ্গ করে। গুণ্ডারা কত অসহায় শিশুকে এনে অন্ধ করে ভিখিরী তৈরি করে। মানুষের নিঃস্বতার সুযোগ নিয়ে লেলিহান মানবের ক্ষুধা সর্বগ্রাসী আগুনের মত পৃথিবীর নিভৃত কন্দরে তিলে তিলে মনুষ্যত্বকে ধ্বংস ক'রে চলেছে—আর পৃথিবীর বাইরে চলেছে শত উৎসবের আনন্দ কোলাহল, প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি। পেটের দায়ে পথচারিণী কুষ্ঠরোগী ও কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীর কাছেও দেহ বিক্রয় করে এক টুকরা বাসি রুটির বিনিময়ে।

সত্যেন গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করে। ভিখারিণী অতসী পরিচালিত করে তার জীবন। সত্যেনকে সে নিজের ভিক্ষার সম্বল নিঃশেষে দিয়ে একটি একতারা কিনে দিয়েছে।

অতসী ও তার অন্ধ পিতা যে ঘরখানিতে বাস করে তার পাশের অপরিসর ঘরখানিতে থাকে সত্যেন। ভিখিরী সত্যেনের নতুন নামকরণ হয়েছে—দীনু। ঘরের ভাড়া দৈনিক মিটিয়ে দিতে হয়, অতসী তার অন্ধ বাপের হাত ধরে ভিক্ষা করে, দিনান্তে একবার তাদের রান্না হয়। সত্যেন অতসীর কাছেই খায়, অতসী ও সত্যেন সম্পর্কে বস্তির অন্যান্য ভিখিরীরা ঈর্ষান্বিত। ভিক্ষায় বেরিয়ে সত্যেন কত রকমের ভিখারী দেখে। দিনে যারা ভিক্ষা করে, রাত্রে তারা করে গুণ্ডামি; ফুটপাথে শুয়ে ভিখারীরা শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে যাপন করে। তারই মধ্যে চলে যত ব্যভিচার। কাঙ্গালী বিদায়ের যে সব দৃশ্য সত্যেন স্বচক্ষে দেখেছে, তাতে সে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ডাষ্টবিন থেকে পচা ভাত কুড়িয়ে খেতে দেখে সে শিউরে ওঠে।

পরিচিত পল্লীতে ভিক্ষা করতে সত্যেন খুব কমই যায়। ভিক্ষা করতে গিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের কোন শহরতলীতে সত্যেন একদিন স্যর সি-কে-রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। স্যর সি-কে-র একমাত্র কন্যা ব্রততী সত্যেনের গান শুনে মুগ্ধ হন। তিনি মাঝে মাঝে এসে গান শোনাতে বললেন ও বেশী পয়সা ভিক্ষা দিলেন।

ব্রততী অতি-আধুনিক অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়ে। প্রাচ্য নৃত্যে সে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। স্যর সি-কে-র একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ব্রততীকে ঘিরে নায়ক ও বান্ধবীর ভিড়। কিন্তু ব্রততী ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল সেই অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃত্রিমতাপূর্ণ

মিথ্যা আচরণে। ব্রততীর মনে হয়, তাদের আগাগোড়া যেন রাংতা মোড়া। ব্রততীর মা নেই, তিনি ছিলেন পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ কন্যা; ব্রততীর মনে সুপ্ত মানবতা উদ্‌গ্রীব হয়ে জেগে উঠতে চায়।

সত্যেনের মুখে গ্রাম্য বাউলের গান শুনতে ব্রততী ভালবাসে। সত্যেন মাঝে মাঝে তাকে গান শুনিয়ে ভিক্ষা নিয়ে যায়। সত্যেনের কাছে অবসর সময়ে ব্রততী ভিখিরীদের জীবনকাহিনী শোনে। তার কোমল চিত্ত ক্রমে পরিচিত হয় ভিখারী-জগতের সঙ্গে। মানুষের বেদনায় সে মর্মাহত হয়ে পড়ে। সত্যেনের চালচলনে ব্রততী প্রথম থেকেই বুঝেছিল যে ভিখিরী হলেও সে কোন ভদ্রবংশজাত, অবস্থার ফেরে ভিখিরী হয়েছে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতসীর শরীরটা সত্যি অসুস্থ। তবু মাথায় পটি বেঁধে উনুনে ফুঁ দিতে হয়। ভিজে খড়-কুটো একগুণ জ্বলে ত দশগুণ জ্বালায় তীব্র ধোঁয়ার প্রাচুর্য্যে। চোখ দুটো লাল হ'য়ে ওঠে : কপালের শিরাদুটো দপ্‌ দপ্‌ করে, মনে হয় ছিঁড়ে যাবে বুঝি হঠাৎ কখন।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। ঘরের ভিতর একলাটি অন্ধকারে ব'সে উপেন গুন্‌গুন্‌ সুরে গান করে; গান ঠিক নয়, একটা করুণ আবৃত্তি। অতীত জীবনের শবদেহটা নিয়ে হয় ত আপন মনে করে তার পোষ্ট্‌মরটেম। গায়ের রুক্ষ চামড়ার মাঝে মাঝে বাতাসের যে স্পর্শ লাগে, তাতে কখন কখন মনে হয় বাইরের জগতে বুঝি নেমেছে এবার রাত্রের ঘন অন্ধকার, বাতাসের চেয়ে নিজের নিশ্বাসই যেন হ'য়ে উঠেছে উষ্ণতর।

ভাত হ'য়ে এলো : কিন্তু দীনু তখনও ফিরল না দেখে অতসী ক্রমেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে। কখন সূর্য্য ডুবে গেছে, তবুও ফিরল না। এত দেরী কোন দিনই হয় না ওর। —হয় ত সাধ্‌তে সাধ্‌তে অনেক দূরে গিয়ে প'ড়েছে আজ : না-হয়……। বাকীটুকু ভাব্‌তে মাথাটা ওর কেমন যেন পাক খেয়ে যায়। ভাব্‌তে পারে না। হয় ত সেদিনের মত মাথা ঘুরে প'ড়ে গেছে রাস্তার পাথরে; কপালটা কেটে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়াচ্ছে রক্ত। অতসীর বুকের ভিতরটা শির্‌ শির্‌ ক'রে ওঠে। ভাতের ফেনটুকু ভালভাবে ঝরানোও হয় না। আন্‌মনে গলিটার দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে কখন ভুলে যায় ভাতের কথা।

অন্য দিন এইটুকু সময়ের ভিতরেই অতসী অন্তত দশ-বার এ-ঘর ও-ঘর করে, কিন্তু আজ আর একটি বারও ওঠে নি উনুন ছেড়ে।

ওর প্রাত্যহিক জীবনে এইটুকু ব্যতিক্রমও উপেনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। চোখ নেই, তবুও অতসীর সম্পর্কে অনুভূতির প্রখরতা যেন অদ্ভুত। হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়—"মাথাটা কি বড্ড বেশী ধ'রেছে মা?"

"না ত।"—অতসী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। হয় ত খিদে পেয়েছে ওর বাবার।

"আজ আর না-ই বা রাঁধ্‌তিস মা! চালগুলো বদল দিয়ে দোকান থেকে মুড়ি-মুড়্‌কি আন্‌লেও রাতটা কেটে যেত।"

"তা হোক্‌ বাবা, দিনান্তে একবার বই ত নয়। ওই একমুঠো ভাত ফোটাতে কোন কষ্টই হয় না আমার।"—হাঁড়িটা একপাশে সরিয়ে রেখে অতসী উপেনের জন্যে জায়গা পরিষ্কার ক'রতে লাগ্‌ল।

দীনুর ঘর অন্ধকার দেখেই বোধ হয় গন্নাকাটী বারবার এসে উঁকি মারে দরজার ফাঁক দিয়ে। অতসী ইচ্ছা ক'রেই কোন কথা বলে না। পদ্মকে যেন কোনরকমেই সইতে পারে না ও। দীনুর কথা নিয়ে রাতদিন যে খোঁচা সে দেয় ওকে, তাতে অতসীর আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। তবুও অতসী মুখ বুঁজে সয়ে' যায় তার সেই ছোটলোকপনা। আগে পদ্মকে দেখে হ'ত ওর ভয়; এখন হয় ঘেন্না।

"দীনু কি এখনও ফেরে নি অতসী?"—উপেন কান খাড়া ক'রে পাশের ঘরের শব্দ শুন্‌বার চেষ্টা করে।—"রাত বুঝি বেশী হয় নি এখনো?"

—"রাত? না।"—কি ব'ল্‌তে গিয়ে অতসী থেমে যায়; উপেনের মুখের ভাবটা লক্ষ্য ক'রবার চেষ্টা করে, তারপর গলিটার দিকে আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলে—"ন'টা বেজেছে বোধ হয়।"

—"তা হোক্‌। সারাটা দিন ঘুরে' ঘুরে' হয় ত ঘুমিয়ে প'ড়েছে কোম্পানীর বাগানে। আসবে; ঘুম ভাঙ্‌লে, আপনি আস্‌বে মা।"

উপেনের কথাগুলো শুনে' অতসী যেন হঠাৎ কেমন

বিব্রত হ'য়ে পড়ে। দীনুর সম্পর্কে ওর যে দুর্ব্বলতাটুকু নিজের কাছেও পরিষ্কার ছিল না, সেটা যে অন্ধ বাপের চোখেও এতখানি ধরা প'ড়েছে সে কথা অতসী ভাব্‌তে পারে নি।

কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে অতসী অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিয়ে বসে—"আপনি সে আস্‌বে না বাবা; আসেও নি কোন দিন। মন যদি না থাকে তার, কারো মুখ তাকিয়েই সে ক'রবে না কোন কাজ।"—অতসী ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। কিছুই ওর ভাল লাগে না আজ; কথা ব'ল্‌তেও কেমন একটা বিরক্তি যেন চেপে বসে বুকের ওপর।

দীনুর দেরী দেখে, অতসী ক্রমেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌ছিল। ছেঁড়া একখানা শালপাতায় দু'মুঠো ভাত উপেনের সাম্‌নে ধ'রে দিয়ে তেমনি অন্যমনস্কভাবে সে উঠে গেল ঘরে।—আস্‌বে না, আজ আর নিশ্চয়ই আস্‌বে না ফিরে। আর কেনই বা আস্‌বে! ওরা ভিখিরী, ভিখিরীদের বস্তিতে এ কয়টা দিনও যে ছিল দীনু, সেও হয় ত অতসীদের ওপর দয়া ক'রে।

অতসী ভাবে: বস্তির ওই ভিখিরীগুলো, রাস্তার ওই হা-ঘরে' ক্যাঙলাগুলো—ওদের কারো সঙ্গে যেন দীনুর এতটুকু মিল নেই। দীনু যেন অন্য দেশের মানুষ! পেটে ভাত নেই, না খেয়ে দিনের পর দিন পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, তাও ভাল; তবুও এতটুকু ছোট হবে না ও কারো কাছে। অতসী কত দিন দেখেছে, দীনু যা বলে, যা ভাবে, ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখপানে তাকিয়ে থেকেও বোঝে না তার বিন্দুবিসর্গ।

—"অতসী!"

অতসী চম্‌কে ওঠে—"তোমাকে কি আর একমুঠো ভাত দেবো বাবা?"

"না মা, ভাত আর লাগ্‌বে না আমার। গলার ভিতরটা যেন দিন দিন কেমন শুকিয়ে আস্‌ছে রে; খেতে ইচ্ছে করে না। তবু না খেলে নয় মা, তাই"—কথা বলা হয় না। কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে আসে। বুক ঠেলে উঠ্‌তে চায় হিক্কা।—সেই ভাত, আজও মুখে তুল্‌তে হয় প্রতিটি দিন!

—"কি যেন ব'ল্‌ছিলাম রে? ও হাঁ! তুই-ও না-হয় খেয়ে নে মা, দীনুর হয় ত আস্‌তে দেরীই হবে আজ।"—বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসটা রোধ ক'রে উপেন উঠে প'ড়ল।

ওদিকের ঘরগুলো এর মধ্যেই নিশুতি হ'য়ে প'ড়েছে: শুধু প্রদীপ জ্বলে রাঁধি বোষ্টমির ঘরে। পদ্মর গলার আওয়াজ আর শোনা যায় না; ওদের খাওয়া-দাওয়া মিটে গেছে অনেক আগে। মাণিক পেয়াদা আর গোলাম কি নিয়ে যেন তর্কাতর্কি করে। বিলিতি-খরসান আর গাঁজা-পোড়ার উগ্র গন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসটাকে ঝাঁঝাল ক'রে তোলে।

দশটা বেজে গেল, তবুও দেখা নেই দীনুর। সারা বস্তিতে থমথম করে মৃত্যুর ছায়া। ভাতের হাঁড়িটা তখনও তেমনি পড়ে আছে উনুনের ধারে। অতসী খায় নি, হয় ত খাবেও না আজ। মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে উঠেছে। তলগড়ে আঁচলটা বিছিয়ে মাথাগুঁজে পড়ে' ছিল এতক্ষণ। দীনু যে আস্‌বে না আর ফিরে, সে কথা কিছুক্ষণ আগেও যেন ঠিক বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু এখন আর ও অবিশ্বাস ক'রতে সাহস করে না।

মনটা অস্বস্তিতে তোলপাড় করে। দীনু যে পালাবে এক দিন, ঠিক এমনি ক'রেই পালাবে তা ও জান্‌ত। কিন্তু একটিবার, শুধু একটিবার মাত্র ব'লে যেতে তার কি বাধা ছিল? অতসী ত রাখ্‌ত না তাকে আট্‌কে। কেনই বা যাবে সে আট্‌কাতে? যা থাক্‌বার নয়, তা থাকে না; তবুও ত জানাত দুটো কথা! ভিক্ষে চেয়ে নিত সে, দীনুর কাছে যে কথা কোন দিন মুখফুটে ব'ল্‌বার সাহস হয় নি ওর, আজ অন্তত যাবার বেলায় চাইত ও সেই ভিক্ষে।—অতসী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

উপেন তখনো ঘুমোয় নি। অতসী পা-টিপে টিপে দীনুর ঘরের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। শিকলটা বাইরে থেকে তেমনি আট্‌কানো; দীনু আসে নি। আস্তে দরজাটা খুলে ঘরের ভিতর গিয়ে ও একবার দাঁড়ায়; চোখ দুটো বড় ক'রে দেখ্‌বার চেষ্টা করে—সেই অন্ধকারে কোথাও কেউ ঘুমিয়ে আছে কি-না! কান পেতে শোনে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

না। নেই, কেউ নেই ঘরে। আসে নি দীনু; আস্‌বে না আর। অতসীর রাগ হয় পদ্মর ওপর। ওই গন্নাকাটীই পুড়িয়েছে ওর কপাল: ওর শোলার ঘরে দিয়েছে ও টিকের আগুন।—সশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে অতসী শুয়ে প'ড়ল মেঝেয়; ছেঁড়া আঁচলটুকু বিছিয়ে হাতে

মাথা দিয়ে পড়ে' পড়ে' ভাবে আকাশপাতাল। চোখে জল আসে। দীনুকে চায় নি সে কোন দিনও ওর জীবনে। আপনা-আপনি এসে উঠেছিল দীনু ওর খেয়াঘাটে; আবার আপনি চ'লে গেছে কোন্ জোয়ারের মুখে।

তা যাক্। অতসী আর ভয় করে না। আবার হয় ত ভাগাড়ের মাংসের মত ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রবে খেঁকি কুকুরগুলো। ওর মুখে, বুকে—সারা গায়ে ঘেয়ো কুকুরের নিশ্বাস ফঁস্ ফঁস্ ক'রবে রাত্রিদিন।

—তিনটে মাস তবুও নিশ্চিন্তে ছিল ওরা একই জায়গায় আস্তানা গেড়ে। দীনুর শক্ত লম্বা চেহারাটা দেখে, হাতের চওড়া কব্জিদুটোর দিকে চেয়ে, হয় ত মাণিক-পেয়াদার মনেও হ'ত ভয়। নইলে, নইলে অনেক আগেই ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ত এই বস্তি। তেমনি ক'রেই ত কেটেছে ওদের পুরোপুরি চারটে বছর।

—"অতসী!" -ওর বাবা ডাকে।

অতসী একবার ভাব্‌ল সাড়া দেবে না। কথা ব'ল্‌তে, এমন কি, সাড়া দিতেও ওর কেমন শৈথিল্য আসে। আবার পরক্ষণেই মনে হয়, এখুনি হয় ত বুড়ো হাতড়ে হাতড়ে উঠে আস্‌বে বিছানা ছেড়ে; অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে প'ড়বে কোথায় ঠোক্কর লেগে।

—"দীনু কি এখনো আসে নি মা?"

এবার আর অতসী উত্তর না দিয়ে পারে না;—"আজ আর আস্‌বে না বাবা।"—ওইটুকু ব'লেই কথা ওর থামে না; আপনমনে বিড়বিড় করে—"আজ কেন! কোন দিনই আস্‌বে না সে, আস্‌বে না আর ফিরে।"—শরীরটা টান ক'রে ছড়িয়ে দেয় মাটির ওপর।

বুড়ো বোধ হয় তখনও ব'লছিল ওকে শুনিয়ে—"গোটা গোটা উপোস ক'রে সারা শহর ভিখ্ মেগে বেড়ানো কি সহজ রে! রাতের উপোসে পাহাড় ভেঙে পড়ে। কাল সকালে আবার ফিরতে হবে পাঁচ বাড়ী সেধে।"

অতসী নির্ব্বাক্ হ'য়ে শোনে। চোখে ঘুম নেই, আস্তে আস্তে নেমে আসে খুব হাল্‌কা একটু তন্দ্রা। স্বপ্ন নয়, কল্পনা; ওর অবসন্ন চেতনা ছাপিয়ে ভেসে ওঠে অতীত বাস্তবের বিচ্ছিন্ন টুক্‌রো: 'মাথাটা দু'হাতে চেপে ধ'রে দীনু কাঁদে; কপাল ব'য়ে গড়ায় রক্তের ধারা। কেটে গেছে! বাঁ-দিকের কপাল—ভ্রূর ওপরটা প্রায় চার-আঙুল লম্বা হ'য়ে কেটে গেছে পাথরের চোট লেগে। —উঃ!

অতসী আঁৎকে ওঠে, অবসাদগ্রস্ত স্নায়ুগুলো ওর হঠাৎ চন্‌চন্ ক'রে ওঠে পর্য্যাপ্ত রক্তপ্রবাহে। দীনু! দীনু কাঁদে অন্ধকার পথের একপাশে ব'সে।

—না না; দীনু কে? কে ওর? ওরই মত একটা হা-ঘরে' কাঙাল। শুধু পথের আলাপ বই ত নয়! সেই ছাতাওয়ালা, মুদির দোকানের খোট্টা ছোঁড়াটা—ওদেরই মতন সে-ও এসে জুটেছে ওর জীবনে। তা ছাড়া আর কি?

তবু পারল না। চেষ্টা ক'রেও অতসী পারল না মনের লাগামটা শক্ত ক'রে ধ'রতে। ধড়ফড়িয়ে উঠে ব'স্‌ল।—কিন্তু রাত হ'য়েছে তখন অনেক। সারা বস্তি অচেতন হ'য়ে পড়েছে। একলা বাইরে বেরোতেও ওর ভয় করে।

চৌকাঠ ধ'রে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে অতসী ত্রস্তপদে এগিয়ে গেল পদ্মর ঘরের দিকে। ওর যত রাগ, যত অভিমান নিমেষে উবে গেল। -হয় ত জানে পদ্ম! দীনুর কথা ও নিজে পারে না সব সময় বুঝ্‌তে, কিন্তু পদ্ম বোঝে। সে ওর চেয়ে অনেক বেশী চালাক।

পদ্ম ঘুমচ্ছে। মনে হ'ল, ডাকে; চীৎকার ক'রে ডাকে ওর দরজায় ঘা দিয়ে। কিন্তু পারে না। স্থাণুর মত দরজার সাম্‌নে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ধীরে ধীরে অতসী ফিরে এলো নিজের ঘরে।—ওর বাবা তখন ঘুমিয়েছে।

অতসী অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল। পাগলের মত চারিদিকে চায়; কিন্তু কোথাও পায় না খুঁজে তার মনের এক তৃণ অবলম্বন। সারাটা বস্তি যেন দুপুর রাতের ঘন অন্ধকারে শাঁ শাঁ করে। কপালের পটিটা ছিঁড়ে ফেলে, রুক্ষ চুলগুলো জড়িয়ে নিয়ে, এলোমেলো পায়ে এবার সে এগিয়ে চল্‌ল গলির দিকে।—পায়ের শব্দে কুকুরটার ঘুম ভেঙে যায়, ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো পাখার ঝাপ্‌টা দিয়ে উড়ে যায় এ-পাশ হ'তে ও-পাশে।

* * * *

তিন দিন সমানে পথে পথে ঘুরে অতসী আবার ফিরিয়ে এনেছে দীনুকে। ফিরিয়ে এনেছে সত্যি, কিন্তু আগেকার সেই দীনু যেন এই তিনটি দিনেই নিঃশেষে হারিয়ে

গেছে মহানগরীর প্রশস্ত রাজপথে। এখন আর সে ভিখিরী নয়। ভিখিরী যে কোন দিন ছিল সে, সে-কথা আজ স্পষ্ট ক'রে ভাব্‌তেও যেন দীনুর ধাঁধা লাগে।

অতসী যখন ভিক্ষে-করা চালের অগ্রভাগ থেকে ফেন-মাখা ভাতের দলাটা ওর সাম্‌নে ধ'রে দেয়, দীনু বিকৃতের মত হাসে; ওর মুখ পানে চেয়ে হাসির ঝোঁকটা নিমেষে কাটিয়ে নিয়ে বলে—"দাও, পেটের দায়ে মানুষের কাছে ভিখ্‌ মেগে নেওয়া পিণ্ডির ভাগ দিয়ে জ্যান্তের সৎকার কর।"

অতসী থতমত খেয়ে যায়। বিব্রত দৃষ্টিতে দীনুর মুখপানে চেয়ে ভাবে, কি উত্তর দেবে ওর কথার।—ভাতগুলো গ'লে পাঁক হ'য়ে গেছে। সেই কখন নামিয়েছে ওই ফেনসুদ্ধ ভাত!

ও কি ব'ল্‌তে চায়। কিন্তু দীনু ওর মুখের কথা নিমেষে কেড়ে নিয়ে আবার বলে' ওঠে—"আমরা কি, জানো? প্রেতাত্মা! মানুষের সংসারে বায়ুচারী নিরাশ্রয় অপদেবতা আমরা। হা-পিত্যেশ ক'রে চেয়ে থাকি ওদের মুখপানে, কতক্ষণে ঝরবে এক ফোঁটা করুণা ওদের দরকারের অঞ্জলি ছাপিয়ে। সেই দয়া, ওদের সেই এক ফোঁটা দয়া নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি, আমাদের আত্মার সৎকার হয় অতসী, সৎকার হয়।"

অতসী বোঝে না। ওর মনে হয়, দীনুর কষ্ট হ'চ্ছে। ওই অখাদ্য আর হয় ত ও পার্‌ছে না সইতে। পারবেই বা কেমন ক'রে? এমনি কাঙালের ঘরে ত জন্মায় নি ও।—কান্না আসে, নিজের অসহায়তার কথা ভেবে অতসীর কান্না আসে। নিতান্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে—"পাঁচমিশিলি চা'ল কি-না, তাই ভাতগুলো অমন দলা পাকিয়ে যায়।"

অতসীর বেদনার্ত্ত মুখখানার দিকে চেয়ে দীনু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে। বুঝ্‌তে ওর দেরী হয় না যে, অতসী ব্যথিত হ'য়েছে। কথাটা বেশ পরিষ্কার ক'রে অতসীকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বলে—"না রে পাগ্‌লি। আমি তা ব'ল্‌ছি না। ব'ল্‌ছি—পশু-পক্ষী, এমন কি তার চেয়েও নিকৃষ্ট—শেয়াল কুকুরগুলোরও বাঁচ্‌বার অধিকার মানুষের চেয়ে বেশী। ওরা ভিক্ষে করে না, পেটের দায়ে একজন আর-এক জনের কাছে পাতে না হাত।"—দীনু হাসে, খুব জোরে হো হো শব্দে হেসে ওঠে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভাতের গ্রাসটা গলাধঃকরণ ক'রে আবার বলে—"ভগবানের সঙ্গে একবার দেখা হ'লে, তাঁর শাসন-দণ্ডটা নিতাম ছিনিয়ে। নরকের বন্দীগুলোকে মুক্ত ক'রে এনে ছেড়ে দিতাম মানুষের সমাজে। আগুন জ্বলে' উঠ্‌ত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আগুন জ্বলে' উঠ্‌ত ওই প্রাসাদগুলোয়।"—দীনু হাসে, আবার তেমনি জোরে হেসে ওঠে অতসীর মুখপানে চেয়ে।

অতসী বিমূঢ় দৃষ্টিতে চায়। বোঝে না; ওর কথার বিন্দুবিসর্গও প্রবেশ করে না ওর মগজে। একটু ইতস্তত ক'রে জবাব দেয়—"তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি পার না এর উপায় ক'রতে? আমার বাবা অন্ধ, তাই আমরা ভিক্ষে করি।"

"পারি অতসী, পারি। এক নিমেষে পারি ওদের সুখে আগুন জ্বালিয়ে দিতে। ওদের ওই পালঙ্কের এক এক টুক্‌রো কাঠ সেই আগুনে একটু একটু ক'রে পুড়বে চিরকাল ধ'রে। কিন্তু কেন করি না জানো? করি না এই ভেবে যে, ওদের কান্নায় তোমাদের পাঁজরার হাড় এক একখানা ক'রে ঝরে' পড়বে পথের ধূলোয়। আকাশের বুক চিরে অসংখ্য বাজ ভেঙে প'ড়বে মানুষের মাথায়।"

—"তা পড়ে পড়ুক। তাই কর দীনু, তাই কর। আর চাই না বাঁচ্‌তে। কি হ'বে এমনি ক'রে বেঁচে? তার চেয়ে একসঙ্গে সবাই মিলে মরাই ভাল। তা বাজ প'ড়েই হোক আর ব্যামোতে ভুগেই হোক। না, ভুগে ভুগে মরার চেয়ে হঠকারি মরা ঢের ভাল।"—অতসী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। ওর মনে হয়, এতক্ষণে দীনুর কথার ও দিয়েছে একটা মানানসই উত্তর। এত কষ্টের ভিতরেও ওর মন যেন ভ'রে ওঠে অপরিসীম তৃপ্তিতে। মুখখানা উজ্জ্বল হয়, চোখ দুটো জ্বল্‌ জ্বল্‌ ক'রে ওঠে আনন্দে।

দীনু খাওয়ার কথা ভুলে যায়; নিতান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মতই দু হাত দিয়ে চেপে ধ'রতে চায় অতসীর মুখখানা।

অতসী যেন চোখে-মুখে কথা বলে—"আমরা চাই না বাঁচ্‌তে। তুমি বাঁচ দীনু, তুমি বেঁচে ওঠ ওই ওদের মত জোর ক'রে।"

বাইরের জগৎটা নিমেষে মুছে যায় চোখের সম্মুখ থেকে। অতসীর বড় বড় চোখ দুটো এবার জড়িয়ে আসে তন্দ্রায়; রক্তহীন পাণ্ডুর ঠোঁট দুখানা কাঁপে।

হঠাৎ দীনু ছিট্‌কে পিছিয়ে যায়। মুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে—"ভূত দেখেছ অতসী? প্রেত!—কঙ্কাল? দেখেছ কখনো? চামড়া নেই, মাংস নেই; শুধু হাড়! হাড়ে হাড়ে গাঁট-বাঁধা মস্ত শরীরটা নিয়ে হাত বাড়ায় লোকের দরজায় দরজায়। সেই কঙ্কালের পেটের ভিতর জ্বল্‌ছে আগুন, রাত্রিদিন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে। আগে পাকস্থলী, তারপর ফুসফুস—হৃৎপিণ্ড সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাই হ'য়ে যায় পুড়ে; শেষে—শেষে চোখের কোটর দিয়ে উঁকি মারে তার শিখা! দপ্‌ দপ্‌ করে, অন্ধকারে পেত্তার মত ঘুরে বেড়ায় সেই দৃষ্টি।—ভাত। নর্দ্দমায় নর্দ্দমায় খুঁজে মরে একমুঠো পচা ভাত!"

অতসী ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক চেয়ে দীনুর গা-ঘেঁষে ব'স্‌বার চেষ্টা করে। তবুও যেন ভয় ওর কম্‌তে চায় না। ওর মনে হয়, দীনু বোধহয় দেখেছে কিছু আশেপাশে।

অতসীর মনের অবস্থাটুকু বুঝ্‌বার মত প্রকৃতিস্থতা বোধহয় দীনুর তখন ছিল না। ওর চোখের সাম্‌নে যেন সত্যি ভেসে উঠেছিল আর একটা স্বতন্ত্র জগৎ। তেমনি হাত নেড়ে নেড়ে আপন মনে ব'লে—"দেখ নি? ওই দেখ। তোমার চারপাশে আর্ত্তনাদ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে তারা। ডানে, বাঁয়ে, সাম্‌নে, পিছনে—খট্‌খট্‌ করে সেই লম্বা লম্বা হাড়গুলো। গায়ে গায়ে ঠোকা লেগে চকমকির মত ছোটে আগুনের ফুল্‌কি।"

সর্ব্বাঙ্গ বিকল হ'য়ে আসে। অতসী ভয়ে আর চাইতে পারে না চোখ মিলে। মনে হয়, সত্যি বুঝি ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অম্‌নি সব ছায়ামূর্ত্তি।—আরও সরে' বসে; একবারে দীনুর গায়ে গা দিয়ে।

দীনু খিলখিল ক'রে হাসে—"ওরাও মানুষ ছিল অতসী, একদিন ওদেরই মত ছিল মানুষ। আজ!—আজ আশ্রয় নিয়েছে তোমাদের এই আস্তাকুঁড়ে এসে। রাস্তার ওই ডাষ্টবিনের ধারে, ফুটপাথে, গলিতে—তোমাদের এই বস্তির ঘরে ঘরে—প্রেতাত্মা, মানুষের প্রেতাত্মা সব।" কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দীনুর মুখ-চোখ, ওর দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে।

অতসী শিউরে উঠ্‌ল। প্রাণপণ শক্তিতে দীনুর হাতখানা চেপে ধ'রে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল ভয়ে।

উপেনের ঘুম তখনো বোধহয় গাঢ় হয় নি। অতসীর চীৎকার শুনে সে চম্‌কে উঠে ব'স্‌ল।—"ভয় পেয়েছিস্‌ মা? অতসী!"

দীনুর হাতখানা আরও একটু শক্ত ক'রে ধ'রে অতসী কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দেয়—"না বাবা।" কিন্তু ওর সর্ব্বশরীর তখনও থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপে।

অতসীর অবস্থাটা এতক্ষণে সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রে দীনু অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ে। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ ওর মুখপানে চেয়ে থেকে, আস্তে আস্তে সান্‌কিখানা আবার টেনে নেয় কোলের কাছে।

পদ্ম তখন এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক ওদের সাম্‌নে। কাটা ঠোঁটখানা যেন বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে অদ্ভুত একটা হাসিতে। ক্রমশঃ

মুসোলিনীর দিগ্বিজয়

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু এম-এ

প্রায় দু হাজার বছর আগে খৃষ্টীয় সভ্যতার জন্মের পূর্বে রোমকে কেন্দ্র ক'রে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল বহু শতাব্দীর অন্তরালেও তার গৌরব-কাহিনী ইতালী--তথা ইউরোপ ভুল্‌তে পারে নি। অগস্টাসের আমল থেকে প্রায় চারশ বছর ধ'রে আটলান্টিক থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত রোমের যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিভিন্ন বর্বর জাতির আক্রমণে তা বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও তার প্রভাব কিছুমাত্র বিলুপ্ত হয় নি। রোম-সাম্রাজ্য যুগে যুগে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে তার প্রভাব বিস্তার ক'রে এসেছে ; অতীতের তিমির ভেদ ক'রে তার প্রদীপ্ত শিখা বহু রাষ্ট্র-নায়কের যাত্রাপথ আলোকিত করেছে, কখনও বা মরীচিকার মতো তা কাউকে টেনে নিয়ে গিয়েছে ব্যর্থতার পথে। রোমের প্রেতাত্মা হোলি-রোমান-এম্পায়ার (Holy Roman Empire) রূপে সারা মধ্যযুগে ইউরোপের স্বাভাবিক অগ্রগতি প্রতিহত করেছিল ; তার জাতীয় সংস্কৃতিকে করেছিল পঙ্গু। বর্তমান যুগের সাম্রাজ্যবাদীরা সেই প্রাচীন রোমান অধিনায়কদেরই স্বগোত্র। রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তারা তাদের বিজয়-কেতন উড়িয়েছে ঊষর আফ্রিকার মরুভূমিতে, এসিয়ার নদী-বহুল জনপদে, আমেরিকার সুবিশাল প্রান্তরে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এই সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয়-গৌরবের কাহিনী।

মনে করা গিয়েছিল, ইউরোপীয় মহাসমর এই সাম্রাজ্য-বিস্তার নীতির শেষ পরিচ্ছেদ ; এই মহাযুদ্ধের অবসানে ইউরোপের পররাজ্যলিপ্সার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আশা করা গিয়েছিল, ভার্সাই সন্ধি এবং জাতিসঙ্ঘ ইউরোপের প্রাচীন-পন্থী বৈদেশিক নীতির পরিহার এবং নতুন প্রগতিশীল নীতির অনুসরণ সূচনা করছে। বিশেষ ক'রে জাতিসঙ্ঘের প্রাথমিক সাফল্য শান্তিবাদী এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীতে বিশ্বাসী জনগণকে উল্লসিত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট মতবাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে। পৃথিবীতে শান্তিরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ফ্যাসিষ্ট অধিনায়কেরা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বিচূর্ণ করেছে। জাপান-জার্মানী-ইতালী যে রকম অপ্রতিহত গতিতে তাদের বিজয়-রথ পরিচালনা করছে—তাতে দেখা যাচ্ছে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ নতুন রূপ নিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। তার তীব্রতা ও বর্বরতা কিছুমাত্র লোপ পায় নি : বরঞ্চ তার নির্লজ্জ উলঙ্গ রূপ পূর্বের থেকে আরও ভয়াবহভাবে আমাদের চোখের সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ছে—স্পেনে, চীনে, ইথিওপিয়ায়।

ইতালীর সাম্রাজ্য

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইতালী ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত - ফরাসী এবং অষ্ট্রিয়ার কবলে ছিল তার কিছু অংশ। শতাব্দীব্যাপী আন্দোলনের ফলে কাভুর-গ্যারিবল্‌ডীর প্রচেষ্টায় ইতালী পেল মুক্তি, পেল রাষ্ট্রীয় ঐক্য। তখন সে তার প্রতিপত্তি ও মর্যাদা-বৃদ্ধি মামলায় পরিসর-বিস্তারের সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। প্রবল শক্তিগুলি এর বহু পূর্বেই আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়েছে ; কাজেই লোলুপ দৃষ্টিতে সেদিকে

তাকালেও ইতালী অভিলাষ-পূরণের বিশেষ কোনও সুবিধা খুঁজে পায় নি। ফ্রান্স একরকম তার মুখের গ্রাস—টিউনিস অধিকার ক'রে নিল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়ার (বর্তমান আবিসিনিয়া) উত্তরে, লোহিত সমুদ্রের তীরে ইরিত্রিয়ায় ইতালী তার প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করলে আফ্রিকায়। সাত বছর পরে (১৮৮৯এ) ইথিওপিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হ'লে ইতালীর দ্বিতীয় বিজয়-স্তম্ভ—ইতালীয়ান সোমালীল্যাণ্ডে। এই দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী ইথিওপিয়া অধিকার করতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি; নেগাস (সম্রাট্) মেনেলিকের হাতে ইতালীয়ান বাহিনী শোচনীয়রূপে পরাভূত হ'ল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আদোয়ার রণক্ষেত্রে; সে পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা মুছে ফেলা ইতালীর পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এই আদোয়ার জ্বালাময়ী স্মৃতিই পরবর্তী যুগে ইতালীয়ানদের উদ্দীপিত করেছে ইথিওপিয়া আক্রমণে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের কবল থেকে ত্রিপলি-বিজয়ও ইতালীর লুপ্ত-গৌরব ফেরাতে পারে নি।

আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করলেও সাম্রাজ্য-বিস্তারের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ইতালীর ছিল, তা অপরিতৃপ্তই রয়ে গেল। ইতালী তাই বিগত মহাযুদ্ধে মিত্র শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সহযোগিতা করে নতুন রাজ্য-জয়ের প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ হয়ে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে ইতালীর যে গোপন চুক্তি হয় তার সর্তই ইতালীকে নতুন জনপদ দেওয়া। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন বিরূপ; ইউরোপের রাষ্ট্রীয় আসরে ইতালীর স্থান তখনও বিশেষ উঁচুতে নয়। তার ফলে যুদ্ধের অবসানে বৃটেন ও ফ্রান্সের তুলনায় ইতালীর অদৃষ্টে জুটল নিতান্তই ছিটে ফোঁটা। আফ্রিকায় জার্মানীর বিশাল উপনিবেশের অংশ কিছুই মিল্‌ল না; ইউরোপে মিল্‌ল ট্রেন্টিনো, আর দক্ষিণ টাইরেলি যা পূর্বে ছিল অস্‌ট্রিয়ার অংশ—এবং আড্রিয়াতিক উপকূলে ইস্‌ত্রিয়া উপদ্বীপ। বলা বাহুল্য, ইতালীর জনসাধারণ এতে তুষ্ট হয় নি। তাদের ব্যর্থ কামনার আবেগ প্রকাশ পেল যখন সেনানী কবি দানুন্‌ৎসিও একদল স্বেচ্ছা-সৈনিক নিয়ে রাসলো সন্ধির (১৯ ০) বিরুদ্ধাচরণ করে হঠাৎ ফিউম অধিকার করে বস্‌লেন।

ফ্যাসিস্‌ট্ মতবাদের অভ্যুদয় ইতালীর সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতি পুনরুদ্দীপিত করেছে, তার যে অপরিতৃপ্ত কামনা এতদিন ব্যর্থ হয়ে ফিরছিল, তা সার্থক হবার সুযোগ পেয়েছে মুসোলিনীর নেতৃত্বে। মুসোলিনীর আধিপত্য স্থাপিত হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে—যখন তাঁর কৃষ্ণ বেশধারী অনুচর-বৃন্দের রোম-অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হ'ল। এই সাফল্যের মূলে ছিল ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা। রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দুই-ই ছিল তাঁর অনুকূল। বৃটিশ-শাসনতন্ত্রের অনুকরণে পরিকল্পিত পার্লামেণ্টের শাসন-বিধি ইতালীয়ানদের মনোমত হয় নি; কেন না, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র ইতালীর সমস্যা মেটাতে পারে নি। কাযেই তার বনিয়াদ ইতালীতে মোটেই দৃঢ় হয় নি। গণতন্ত্রী সরকারের 'দোলাচল-চিত্তবৃত্তি' জনসাধারণকে উদ্বিগ্ন এবং বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ক'রে তুল্‌লে। তাদের অকর্মণ্যতা প্রমাণ হ'ল ঘরে-বাইরে—অর্থনৈতিক সঙ্কট দিনের পর দিন গুরুতর রূপ ধারণ করলে এবং বামপন্থী মনোভাবের প্রসার বেড়ে চলতে লাগল। কিন্তু বামপন্থীদের মধ্যে ছিল অনৈক্য এবং নেতৃত্বের অভাব; তারই সুযোগ নিয়ে মুসোলিনী তাঁর সুসংগঠিত ফ্যাসিস্‌ট্ বাহিনী নিয়ে হানা দিলেন রোমের সিংহদ্বারে। আতঙ্কিত ভিক্টর ইম্যানুয়েল ফ্যাসিস্‌ট্ নেতাকে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ ক'রে নিলেন। মুসোলিনী প্রথমে অন্যান্য দলের নেতাদের নিয়ে এক কোয়ালিশন ক্যাবিনেট (মিশ্র মন্ত্রিসভা) গঠন করলেন। তারপর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিতাড়িত ক'রে হয়ে উঠ্‌লেন—ইতালীর সার্বভৌম নায়ক (Dictator)। বিশেষ ক'রে, সোস্যালিস্ট দলপতি মাত্তেয়ত্তির হত্যাকাণ্ডের পর মুসোলিনীর পথ হ'ল নিষ্কণ্টক। অনেকেই মনে করেন, এই নৃশংস ব্যাপার মুসোলিনীর হুকুমে না হ'লেও তিনি যে এজন্য পরোক্ষভাবে দায়ী তা নিঃসন্দেহ। এ ব্যাপার মুসোলিনীর সৌভাগ্য-সূর্যের ওপর ছায়াপাত করলেও তা ক্ষণস্থায়ী প্রতিপন্ন হ'ল এবং সগৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি।

মুসোলিনী-শাসিত ইতালী গণতন্ত্রের আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়ে যে নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছে—তা হচ্ছে সর্বময়-রাষ্ট্র-তন্ত্র Corpora tive State। রাষ্ট্র এখানে সর্বময়প্রভু; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে বিলুপ্ত; ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এখানে সাধারণের জীবন-যাত্রা নিয়ন্ত্রিত।

সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার অবশ্য বিলুপ্ত হয় নি এবং উৎপন্ন সম্পদ্ রাষ্ট্রের সম্পত্তি ব'লে গণ্য হয় না। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবন অনেকটাই রাষ্ট্র পরিচালিত। সোভিয়েট রুশিয়ার মত ইতালীতেও এক-নায়কত্ব থাক্‌লেও রুশিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য ওখানেই শেষ; কেন না, ফ্যাসিজ্‌মের মূলমন্ত্রই হচ্ছে সাম্যবাদের বিলোপ-সাধন। রুশিয়ার এক-নায়কত্ব হচ্ছে সর্বহারার কর্তৃত্ব (Dictatorship of the Proletariat)। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ক'রে শ্রেণীবিহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ফ্যাসিজ্‌ম্ এই আদর্শের পরিপন্থী এবং ধনিক সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে অভিলাষী। সাম্য-বাদের ভিত্তি-স্বরূপ যে সমস্ত মতবাদ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ফ্যাসিস্ট্ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সে সবই ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর প্রতিভাত হয়েছে। অতএব নির্মমভাবে তাদের গতি প্রতিরোধ করা ফ্যাসি-জমের উদ্দেশ্য।

জনবলে বিশেষ বলীয়ান্ হ'লেও ধনবলে ইতালী অন্যান্য মহাশক্তির তুলনায় হীন। জনসংখ্যা তার বর্তমানে ফ্রান্সকে অতিক্রম করে গেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত সম্পদ তার নিতান্তই অপ্রচুর, যার ফলে বৃটেন ফ্রান্স জার্মানীর তুলনায় শিল্পকলা বিশেষ প্রসার লাভ করে-নি। ইতালীর বহু অঞ্চল শৈলসঙ্কুল ও বন্ধুর;—কাজেই কৃষিকার্যের অনুপযোগী। কয়লা এবং লোহা যা বর্তমানকালে আর্থিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য তা এখানে নেই বললেই চলে। এর ফলে ইতালীর পক্ষে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়, যদি না সে বিদেশ থেকে প্রচুর কাঁচামাল পায়। রবার, টিন, অভ্র, তামা, তুলো, পেট্রল—ইতালীতে এ সবেরই অভাব। কাজেই ইতালীর দারিদ্র্য দূর করে তাকে আত্মনির্ভরশীল করতে হ'লে চাই নতুন অঞ্চলে অধিকার বিস্তার—যেখানে এই সমস্ত পণ্য-সম্ভার পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলবে। শুধু তাই নয়, ইতালীর জনসংখ্যা যে রকম দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে তার অতিরিক্ত অধিবাসীদের বসবাসের জন্য নতুন অঞ্চল নিতান্তই প্রয়োজন—নয় ত আর্থিক অবনতি অনিবার্য। মহাসমরের পূর্বে চোদ্দ বছরে প্রায় সাড়েআশী লক্ষ ইতালীয়ান তাদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে বিদেশবাসী হয়। বর্তমান বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট এই বিদেশ-গমন বন্ধ করেছে। ইতালীর এমন কোন উপনিবেশ নেই যেখানে এই জনপ্রবাহের আশ্রয় মিলতে পারে। ইতালী তাই চায় নতুন সাম্রাজ্য—পুরাতন রোম-সাম্রাজ্যের পুনর্জন্ম—যা' তার অর্থনৈতিক সঙ্কটের অবসান ঘটাবে।
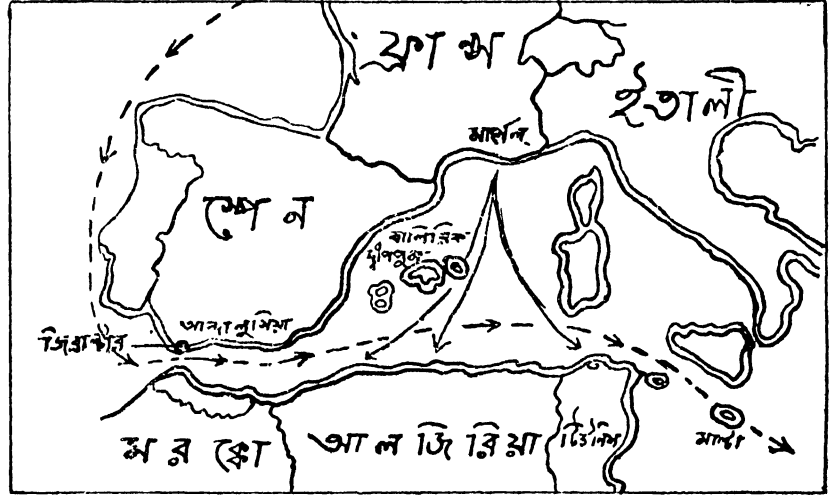
স্পেনের অবস্থান

——→ ফ্রান্সের সঙ্গে তার উপনিবেশের যোগসূত্র

· → ভারতের পথ

মুসোলিনীর দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য কতকটা অর্থনৈতিক, কতকটা রাষ্ট্রনৈতিক, কতকটা বা সামরিক। অর্থনৈতিক দিক থেকে কাঁচা মাল সরবরাহ করার উৎস ইতালীর প্রয়োজন; বাড়্‌তি প্রজাবৃন্দের আস্তানাও একটা চাই; সবচেয়ে বড় কথা, রাষ্ট্রীয় আসরে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উপনিবেশ। বৃটেন ও ফ্রান্সের কথা ছেড়ে দিলেও বেলজিয়ম-হল্যাণ্ড-পর্তুগালের মত স্বল্পায়তন রাষ্ট্রগুলিরও রয়েছে সাগর-পারে বিস্তীর্ণ উপনিবেশ;

ইতালীর মত মহাশক্তির তা না থাক্‌লে মানহানি ঘট্‌বার কথাই। ইতালী তাই তার কলঙ্ক মোচন কর্‌বার জন্যে বিশেষ ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। সামরিক প্রয়োজনও তুচ্ছ নয়; কেন না, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি যদি ইতালীর পদানত হয় তাহলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা তার পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে ফ্যাসিজ্‌মের আত্মরক্ষার উপায়। সর্বহারা জনসাধারণের ওপর ফ্যাসিষ্ট মতবাদ আধিপত্য বিস্তার করেছে অনেক প্রলোভনে ভুলিয়ে। ফ্যাসিষ্ট ধুরন্ধরেরা অন্নহীনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের ক্ষুধার জ্বালা মেটাবার, কর্মহীনদের সান্ত্বনা দিয়েছেন তাদের জীবিকার সংস্থান ক'রে দেবার; ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দিয়েছেন তাদের মূলধন জোগাবার। সংক্ষেপে তাঁরা ধূলির পৃথিবীতে সোনার স্বর্গ-রচনার স্বপ্ন দেখিয়েছেন জনসাধারণকে। তারই মোহে পড়ে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের দুর্বলতায় বীতশ্রদ্ধ কর্মহীন, অন্নহীন সর্বহারার দল ভিড় জমিয়েছে মুসোলিনীর পতাকার নীচে। ইতালীর অবস্থা খানিকটা ফিরেছে ফ্যাসিষ্ট আমলে তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তার বহু সমস্যার সমাধান আজও ভবিষ্যতের গর্ভে রয়ে গেছে এবং তাদের সম্পূর্ণভাবে মেটানো মুসোলিনীর পন্থায় অসাধ্য। ফ্যাসিজ্‌মের এই ব্যর্থতা গোপন কর্‌বার জন্যই নতুন ক'রে বিংশ-শতাব্দীতে রোম-সাম্রাজ্যের পত্তন করতে হয়েছে।

মুসোলিনীর প্রতিপত্তি ও প্রভাব নির্ভর করে তাঁর জনপ্রিয়তার ওপর—আর সেই জনপ্রিয়তার ভিত্তি হচ্ছে তাঁর কর্মকুশলতা, তাঁর নীতির সাফল্য। যদি তাঁর কর্মপন্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তা হ'লে অসন্তোষের আগুন উঠ্‌বে জ্বলে, উদ্যত-ফণা সর্পের মত জেগে উঠ্‌বে বিদ্রোহীদল; তাসের প্রাসাদের মতই ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রতন্ত্র পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়্‌বে। তাঁর ওপরে প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রদ্ধা অবিচলিত রাখ্‌বার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে সমর-অভিযান। বিগত যুগের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিয়ে জনসাধারণকে মোহগ্রস্ত করে রাখ্‌তে পারলে তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির বিফলতার দিকে আর কারুর নজর পড়্‌বে না। যুদ্ধের মাদকতায় উত্তেজিত জনমণ্ডলী তাদের অভাব ভুলে থাকবে—অগ্নি-শিখা হবে অন্তর্হিত; আর মুসোলিনীর আধিপত্য থাক্‌বে অটুট। অতএব সুরু হ'ল মুসোলিনীর দিগ্বিজয়! ইথিওপিয়া-অধিকার; তারপর স্পেন-অভিযান এবং তারও পরে আলবেনিয়া-গ্রাস।

ইতালীয়ান বিজয়-অভিযানের প্রথম বলি হ'ল ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া। খনিজ-সম্পদ সম্বন্ধে খ্যাতি থাক্‌লেও ইথিওপিয়ার পর্বতমালা তার স্বাধীনতা অব্যাহত রেখেছিল। তার উষরভূমি ইউরোপীয় উপনিবেশের উপযোগী নয়; এরই ফলে অন্যান্য জাতির লুব্ধ দৃষ্টি তাকে এড়িয়ে চলেছিল। তার উপরে ফ্রান্স-বৃটেন-ইতালীর পরস্পরবিরোধী স্বার্থ তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখ্‌তে সহায়তা করেছিল এবং ইথিওপিয়ার জাতিসঙ্ঘের সদস্য পদ লাভ তারই প্রকাশ। মুসোলিনীর উদ্যত বজ্র গিয়ে পড়ল প্রথম ইথিওপিয়ার ওপর, তার কারণ হচ্ছে আফ্রিকায় সে-ই ছিল একমাত্র নিরাপদ আক্রমণের ক্ষেত্র। তার ওপরে ইতালী একবার ও দেশ জয় করতে গিয়ে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কাজেই পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ-স্পৃহা সহজেই ইতালীয়ানদের উত্তেজিত ক'রে তুল্‌লে। হাইলে সেলাসী অনেকটা জাতি-সঙ্ঘের সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বেই জাপানের মাঞ্চুরিয়া-অভিযান লীগের দুর্বলতা প্রমাণ করেছিল; কাজেই জাপানের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে মুসোলিনী জাতি-সঙ্ঘকে উপেক্ষা করে ইথিওপিয়া আক্রমণে মন দিলেন। কিন্তু যে বৃটেনের প্রভাবে জাতি-সঙ্ঘ জাপানের বেলায় ছিল নিষ্ক্রিয়, সেই বৃটেনের নেতৃত্বে জাতি-সঙ্ঘ এবার সক্রিয় হয়ে উঠ্‌ল এবং মুসোলিনীর অভিযান নিষ্ফল হবার উপক্রম হ'ল। বৃটেনের ইথিওপিয়া সম্বন্ধে এতটা উৎকণ্ঠা অবশ্য বৃটিশ-স্বার্থ বজায় রাখ্‌বার জন্য। উত্তর ইথিওপিয়াস্থিত টানা হ্রদ থেকে জলপ্রবাহ এসে পুষ্ট করে নীল নদকে। ইথিওপিয়া ইতালীর কবলে এসে পড়লে সেখানে বাঁধ-রচনা করে তারা অনায়াসে জলস্রোতের গতি ফিরিয়ে বৃটেনের স্বার্থহানি ঘটাতে পারে। অতএব জাতি-সঙ্ঘের মৌলিক চুক্তি (Covenant) অনুযায়ী জাতি-সঙ্ঘের সদস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অজুহাতে ইতালীর ওপর আর্থিক চাপ প্রয়োগ (Sanctions) করা হ'ল। কিন্তু তা ব্যর্থ হ'ল ফ্রান্সের ঔদাসীন্যে। ইতালীকে পেট্রোল সরবরাহ বন্ধ করা যেতে পারত এবং তা হ'লে ইথিওপিয়ার স্বাতন্ত্র্য

বজায় থাক্‌ত। কিন্তু কার্যত তা ঘট্‌ল না। বিমান-বহর, বিষাক্ত গ্যাস ও যন্ত্রচালিত বাহিনী দুরধিগম্য ইথিওপিয়া সহজেই জয় ক'রে ফেল্‌লে। আদ্দিস্ আবাবার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হ'ল। হাইলে সেলাশী হলেন রাজ্যচ্যুত; ইতালীর অধিপতি পেলেন—ইথিওপিয়া-সম্রাট্ আখ্যা। বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন রোমের প্রেতাত্মা জেগে উঠ্‌ল আবিসিনিয়ার দুর্গম প্রান্তরে।

নবযুগের সীজারের দৃষ্টি এবার ফির্‌ল—ইউরোপের দিকে। ভূমধ্য-সাগর হচ্ছে ইতালীয়ানদের More Nostrum "আমাদের সাগর;" কিন্তু তা পরিণত হয়েছে বৃটিশ হ্রদে। কেন না, এটি ভারত-সাম্রাজ্যের দ্বার রূপে গণ্য হয়ে থাকে। "আমাদের সমুদ্রে" ইতালীর একচ্ছত্র অধিকার-বিস্তার হ'ল মুসোলিনীর সঙ্কল্প। ইথিওপিয়া বিজয় এক হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে, কেন না স্বাধীনতা-প্রিয় ইথিওপিয়ার অধিবাসীরা ইতালীর কর্তৃত্ব নির্বিবাদে মেনে নেয় নি। দুর্ধর্ষ হাব্‌সীরা আজও গরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে চলেছে। বস্তুত কয়েকটি শহরে এবং তারই চতুঃসীমানায় ইতালীর অধিকার সীমাবদ্ধ। যে সোনার হরিণের পেছনে তিনি ছুটেছিলেন তা মরীচিকা হলেও 'দুচের' (Duce) একটি উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কেন না, ইথিওপিয়া তাঁকে লোহিত-সমুদ্রের চাবিকাঠি এনে দিয়েছে, ওপারে ইয়েমেনের সঙ্গে ইতালী বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। কাজেই যুদ্ধ বাধ্‌লে বৃটেনের বাণিজ্য-পথ-নিয়ন্ত্রণ তার পক্ষে সুকঠিন হবে না। ইতালী তাই 'ইস্‌লাম-রক্ষক' আখ্যা নিয়ে লোহিত সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে তাঁর প্রভাব-বিস্তার করতে ব্যস্ত; তা হ'লে লোহিত সমুদ্র তার মুঠির মধ্যে এসে পড়্‌বে।

ইথিওপিয়ার পর স্পেনের ভাগ্যাকাশে দুর্দিনের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সেখানে সুরু হ'ল এক নিদারুণ অন্তর্বিপ্লব: বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘাত। সাম্যবাদের উচ্ছেদ কামনায় অভিজাতসম্প্রদায়, পুরোহিতমণ্ডলী ও সেনানীবর্গ ধনিক-তন্ত্রের কর্তৃত্ব বজায় রাখ্‌বার জন্য গণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করলে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে। এই ঘরোয়া বিবাদের সুযোগ নিয়ে দুই ফ্যাসিষ্ট নেতা এলেন দক্ষিণপন্থীদের সহায়তা করতে। নিরপেক্ষতার ভাণ ক'রে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি রইল উদাসীন; প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির পথ হ'ল প্রশস্ত। ফলে মাদ্রিদের পতনের (১৯৩৯) সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে হ'ল গণতন্ত্রের সমাধি—বাজ্‌ল ফ্যাসিজ্‌মের বিজয়-ডঙ্কা। শুধু যে স্পেন ফ্যাসিজ্‌মের প্রভাবে এসে পড়্‌ল তাই নয়, ব্যালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ এল ইতালীর হাতে। বৃটেন ও ফ্রান্স একযোগে চেষ্টা করলে রুশিয়ার সহায়তায় স্পেনকে অনায়াসে বাঁচানো যেতে পারত—ফ্রাঙ্কোর পতন ছিল অনিবার্য। কিন্তু সাম্যবাদী জুজুর ভয়ে কম্পমান বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসক-সম্প্রদায় কর্‌ল নিরপেক্ষতার প্রহসন এবং ইতালীর হাতে তুলে দিল নিজেদের মরণ-কাঠি।

স্পেন হচ্ছে বর্তমানে বৃটেন এবং ফ্রান্সকে বিপন্ন করবার সবচেয়ে সুবিধাজনক কেন্দ্র। ব্যালিয়ারিক দ্বীপ-পুঞ্জ থেকে অনায়াসে ছিন্ন করা যাবে ফ্রান্সের সঙ্গে তার উত্তর-আফ্রিকার উপনিবেশগুলির যোগ-সূত্র—যুদ্ধের সময় এরা ফ্রান্সের প্রধান সহায়—রোধ করা যাবে বৃটেনের ভারত-গমনের পথ। উত্তর-স্পেন থেকে অক্লেশে দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণ করা চল্‌বে বিমানপথে। আন্দালুসিয়া এবং স্প্যানিশ্ মরক্কো ভূমধ্য-সাগরের ঘাঁটি আগ্‌লে রাখ্‌লে জিব্রাল্‌টার হবে শক্তিহীন। ওদিকে ইয়েমেন-ইথিওপিয়া যোগাযোগ হ'লে লোহিতসাগর হবে দুষ্প্রবেশ্য। তার ওপরে স্পেন হাতে থাক্‌লে ইতালী-জার্মানী ডুব-জাহাজের অত্যাচারে বিরোধী-দেশগুলিকে বিপর্যস্ত করে তুল্‌বে বিস্কে উপসাগরে এবং ভূমধ্যসাগরে। কাজেই স্পেন অভিযানের সাফল্য গণতন্ত্রী রাজ্যগুলিকে করেছে সঙ্কটাপন্ন এবং ইতালীকে করেছে উল্লসিত।

মুসোলিনীর তৃতীয় অভিযান—আড্রিয়াতিক উপকূলে আলবেনিয়ায়। এটি একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র বল্‌কান রাজ্য; জনসংখ্যা দশলক্ষের বেশী নয় এবং তার অধিকাংশই মুসলমান। জীবনযাত্রা নিতান্তই সরল এবং এরা ইউরোপের দরিদ্রতম জাতি বলেই পরিগণিত। পশুচারণই এদের প্রধান অবলম্বন হলেও এরা প্রায়ই নিরামিষাশী। বহুকাল আলবেনিয়া ছিল তুরস্কের অধীনে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে আলবেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে; প্রিন্স্ উইলিয়ম হ'লেন রাজপদে অভিষিক্ত। মহাসমরের পর ইতালীর সহায়তায় গণতন্ত্র স্থাপিত হ'ল—কিন্তু

অন্তর্বিপ্লব মিট্‌ল না। যুগোশ্লাভিয়া এবং ইতালীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চল্‌ল এখানে প্রভাব বিস্তার নিয়ে। সাম্যবাদী ফ্যান্ নোলিকে বিতাড়িত করে আমেদ জোগু হলেন রাষ্ট্র-নায়ক (১৯২৫ খৃষ্টাব্দে) যুগোশ্লাভিয়ার সাহায্যে। তারপর গণতন্ত্রে জলাঞ্জলি দিয়ে হ'লেন ইতালীর সহযোগিতায় রাজা প্রথম জোগ। আলবেনিয়া এর পর থেকে বরাবরই ইতালীর আশ্রিত-রাজ্য বলে গণ্য হয়ে এসেছে। সুতরাং এ দেশে আধিপত্য স্থাপন করতে মুসোলিনীর কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। ইতালীয়ান অভিযানের সূচনাতেই রাজা জোগ সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে আশ্রয় নিলেন গ্রীসে। বিনা রক্ত পাতে আলবেনিয়া ইতালীর কুক্ষীগত হ'ল।

আপাতদৃষ্টিতে এই দরিদ্র দেশটিতে লোভনীয় কিছুই নেই। তার পণ্যসম্ভার কিছুমাত্র মূল্যবান্ নয়। তার উৎপন্ন ফসল এখানকার লাখ দশেক অধিবাসীর আহার্য জোগায়—এই মাত্র। কিছু পেট্রল হয় ত মিল্‌তে পারে; কিন্তু তা এত নীচুদরের জিনিষ যে মজুরী পোষায় না। সুস্পষ্ট রূপেই বোঝা যাচ্ছে, আর্থিক লাভ এ অভিযানের উদ্দেশ্য নয়;—উদ্দেশ্য হচ্ছে আদ্রিয়াতিকে ইতালীর একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপন করা। আলবেনিয়া দখলের ফলে আদ্রিয়াতিক এল ইতালীর কবলে, ফলে যুগোশ্লাভিয়ার সমুদ্রদ্বার রইল ইতালীর হাতে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের সীমান্তে এসে পড়ল ইতালী। এবার গ্রীসের ওপর চাপ দেওয়া চল্‌বে অনায়াসে, যুগোশ্লাভিয়া আস্‌তে বাধ্য হবে ইতালীর প্রভাবে এবং ভূমধ্যসাগরের ওপর অধিকারটা হবে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত। More Nostrum (Our Sea) 'আমাদের সমুদ্র' সত্যই ইতালীয়ান লীলাভূমিতে পরিণত হবে।

মনে হচ্ছে, গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়ার দুর্দিন ঘনিয়ে আস্‌ছে। যদিও বর্তমানে ইতালী এবং জার্মানী মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ তবুও ভবিষ্যতের কথা কে বল্‌তে পারে? জার্মানী যে রকম দেশের পর দেশ অধিকার করে শক্তি বৃদ্ধি করছে তাতে মুসোলিনীর আশঙ্কার সঞ্চার হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কাজেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ইতালী চাইছে রাজ্য-বিস্তার—বল্‌কান্ উপদ্বীপে—যাতে সে জার্মানীর সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে পারে। তা হ'লে প্রীতিতে না হোক ভয়ে অন্তত জার্মানী তার মিতালী চাইবে। নইলে জার্মানী হয় ত ইতালীকেই পদানত করে ফেল্‌বে—তাকে জার্মানীর করদ রাজ্যে পরিণত করবে। সেই পরিণামের শঙ্কায় ইতালী তার দৃষ্টি দিচ্ছে আশে-পাশে রাজ্য-বিস্তারের আশায়। অতএব অচিরেই যদি গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়া মুসোলিনীর রোম-সাম্রাজ্যের অংশ বলে গণ্য হয় তাতে বিস্মিত হবার বিশেষ কিছুই নেই।

কেন ঘুম ভাঙালে না ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুমি যে আসিয়াছিলে কাল রাত্রে; বিষণ্ণ প্রভাতে
তাহারি নিবিড় ছায়া পড়িয়াছে এ মনোদর্পণে,
সমস্ত রাতের ক্লান্তি রেখে গেলে বেদনার সাথে
ফিরিয়া গিয়াছ তুমি নতমুখে অতি সন্তর্পণে।

কাল রাত্রে জ্যোৎস্না ছিল, মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ
গন্ধদীপ জ্বালা ছিল সারা রাত্রি বাতায়ন তলে,
মঞ্জরিত মল্লিকার মর্ম্মরিত সুরভি নিঃশ্বাস
সারা রাত্রি শুনিয়াছি ব্যথাতুর নয়নের জলে।

সন্ধ্যা মালতীর বনে কাল ছিল রঙের উৎসব
উতলা মনের কোনে রাঙা হয়ে ফুটেছিল আশা,
প্রমত্ত মাধবী তার অন্তরের সুগন্ধ বৈভব
দুই হাতে বিলাইয়া মৌন মুখে জাগাইল ভাষা।

নিশুতি রাত্রির মোহে জেগে ছিনু কাল সারা রাতি
নয়ন-পল্লব ছেয়ে নেমেছিল স্বপ্নের জড়িমা
বন-বীথিকার মন পরিশ্রান্ত, ছিল নাক সাথী
কুসুম-আস্তীর্ণ পথ, সে পথের ছিল নাক সীমা।

না জানি কখন ঘুম নেমে এল ক্লান্ত আঁখিপাতে,
গন্ধ-দীপ নিবে গেল, উবে গেল কুসুম-সৌরভ
তুমি কি আসিয়াছিলে তখনি সবার অসাক্ষাতে ?
শুনিতে পাওনি তুমি দখিনার ব্যথিত নিঃশ্বাস ?

আজি প্রভাতের আলো ম্লান হ'ল মেঘের ছায়ায়
কুসুম ঝরিয়া গেল তোমার পথের দুই ধারে,
ইন্দ্রধনু রচেছিনু হায় বন্ধু, কাহার মায়ায়
স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল —নিরাশায় চাহি বারে বারে।

কেন ফিরে গেলে প্রিয়—প্রিয়তম তোমারি সকাশে
এ মোর বাসর-সজ্জা দীপান্বিতা উজল ভবন,
উতলা নিশীথ রাত্রি জেগে ছিল পরম আশ্বাসে
সুগন্ধ-বিধুর বনে মেতেছিল দখিনা পবন।

দুয়ার ছিল না বন্ধ, আমি শুধু অচেতন ঘুমে
মুক্ত বাতায়ন তলে সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নার জোয়ার
কেন ভাঙিলে না ঘুম, হে নিঠুর, অকৃপণ চুমে
রজনীগন্ধার মালা সে যে প্রিয় একান্ত তোমার।

অসীমের সীমা

শ্রীশরদিন্দু সেনগুপ্ত

(কথানাট্য)

বাণীর ঘর। ছোট একটা লিখিবার টেবিল, খান দুই চেয়ার। মেহগেনি পালিশ করা সেকেলে ধরণের একটা জবড়জঙ ড্রেসিং-টেবিল। খাটটাও একটু পুরানো আমলের; ফুলতোলা একটা বেড্‌স্প্রেড্ দিয়া ছোট বিছানাটি ঢাকা। দেয়ালে একটা বিলাতি কুকুরের ছবি—তার নীচে ছোট্ট একটা ক্যালেণ্ডার ঝুলিতেছে: দেখিলেই বোঝা যায়, তারিখ দেখিবার প্রয়োজনে সেটা টাঙানো হয় নাই—কুকুরের ছবিটাই মুখ্য, তারিখ দেখাটা গৌণ! এপাশের দেয়ালে দুখানি অয়েলপেন্টিং—দুখানাই ল্যাণ্ডস্কেপ্—ছবির চেয়ে ফ্রেমের ঐশ্বর্য্যই চোখে বেশি পড়ে। ল্যাণ্ডস্কেপ্ দুখানির মাঝখানে বাণীর বাবা আর মার একসঙ্গে বাঁধানো একটা ছবি একটু উঁচু করিয়া টাঙানো। খানিকটা নীচে সমবয়সী পাঁচটি মেয়ের একটা গ্রুপ ফটো; সবারই পরণে কন্‌ভোকেশন গাউন ও টুপি। ইহাদের মধ্যে বাণী সেনকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ঘরের ওপাশের দেয়াল ঘেঁসিয়া কোণের দিকে একটা আলমারি, তার পাশে একটা আলনা, অন্য দিকে মাঝারি একটা টেবিল, তাহার উপর কয়েকখানি বই সাজানো, কয়েকটা বই ছড়ানো। একটা চকোলেট্ রং-এর উলের বাণ্ডিল, অর্দ্ধসমাপ্ত একটা স্কার্ফ্, তাহাতে দুটি বুনিবার কাঁটা বেঁধানো।

শীতের বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। বাণী ঘরে আসিল—হাতে কয়েকখানি খাতা, সঙ্গে তার বন্ধু উমা। উমাকে কোথায় যেন দেখিয়াছি মনে হইতেছে!...বাণীদের গ্রুপ ফটোর মধ্যে ওই মেয়েটিই ত বাণীর কাঁধে হাত রাখিয়া বসিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া বাণী টেবিলের উপর হাতের খাতাগুলি রাখিল—আর ব্লাউসের সঙ্গে ক্লিপে আঁটা কলমটি খুলিয়া রাখিল লিখিবার টেবিলের উপর। হাতের মুঠিতে ছোট্ট রুমালটাও সেইখানেই স্থান পাইল। উমা আসিয়া বাণীর বিছানায় বসিল—বাণী একটা চেয়ারে—সেখান হইতে ড্রেসিং টেবিলের আর্শীতে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। বাণী মাঝে মাঝে চকিতে এক-একবার আয়নায় প্রতিফলিত নিজের মুখখানি দেখিয়া লইতেছে। শ্যামবর্ণা হইলেও চোখের দীপ্তিতে, মুখের লাবণ্যে, অঙ্গের স্বাস্থ্য, সৌষ্ঠব ও কমনীয়তায় তাহাকে অপূর্ব্ব মনে হয়।· সে-ই প্রথম কথা কহিল—

বাণী। তাই ভাবছি, আজ এলে কি বলবো!· এসে অবধি আমার সঙ্গে একরকম কোন কথাই হয়নি—পুনা যাওয়া অবধি এমনি ক'রেই যদি চলে, আমি বেঁচে যাই।

উমা নিরুত্তর

বাণী। সেদিন একবার একটু আভাস দিয়েছিল, আমি তাড়াতাড়ি কথাটাকে ঘুরিয়ে দিলাম।

উমা। ঘুরিয়ে দিলি?···সত্যি কথাটাকে এড়িয়ে গেলি বল্।

বাণী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল; অর্থাৎ সে এত সীরিয়াস্ যে উমাকে পর্য্যন্ত 'তুমি' করিয়া বলিতে সুরু করিল

যা তোমরা মনে কর!··মিছিমিছি অপ্রিয় প্রসঙ্গ কারই বা ভাল লাগে? তোমাদের কথা ঢের শোনা গেছে। মামাবাবু হেসে উড়িয়ে দিলেন, মামীমা আমার কোন কথা কানেই তুললেন না!···আমিও তেমনি তোমাদের দেখিয়ে দেব যে যত সাধারণ তোমরা আমাকে ভাবো আমি তা নই!

উমা। এই অহঙ্কারেই তুই গেলি! কিন্তু বিশ্বজিৎ চৌধুরীও কিছু সাধারণ ছেলে নয়। এটুকু অসাধারণত্ব তোর না থাকলে এত মেয়ে থাকতে বাণী সেনকেই বা সে এতখানি ভালবাসবে কেন?···কিন্তু কা'কেই বা এ-সব বলা?

বাণী। সবই বোঝা গেছে তোমাদের!···অনাথা হ'লে যা হয় আর কি!...আমার মা-বাবা বেঁচে থাকলে ·

উমা। কি বললি তুই!···অনাথা?···ছি, ছি, বাণী, —মামীমা-মামাবাবু শুনলে কি মনে করবেন?···অত অধঃপতন হয়েছে তোর! দেবতার মত মামা, দেবীর মত মামীমা—'বাণী' 'বাণী' ক'রে অস্থির—তোর একটু বাধলো না?···ছিঃ···

বাণী চেয়ার হইতে উঠিয়া উমার পাশে বসিল

বাণী। সত্যিই কি আমি তাই বলেছি নাকি? মাপ কর্ ভাই!···তোরাই ত আমায় বলাস এসব কথা!···

বাণীর চোখে জল

উমা। মামাবাবুকে আজই আমি ব'লে দেব মৃত্যুঞ্জয়, পশুপতি এদের যেন আর এ-বাড়ীতে ঢুকতে না দেন।···

বাণী। কেন শুনি?

উমা। কেন আবার কি? ওরাই ত তোর মাথা খেয়েছে। ·বাণীদি!·· দেবী বাণীদি! ধ্যানী বাণীদি!··· একটা ছেলে ত সেদিন তোকে প্রণাম পর্য্যন্ত করতে গিয়েছিল! মজা হচ্ছে যে তুই এ-গুলো খুব উপভোগ করিস—মনে করিস যে এমন একটা কিছু তুই হয়েছিস যার জন্যে এগুলো তোর প্রাপ্য!···

বাণীর মুহূর্ত্তকাল আগেকার চোখের জল অন্তর্হিত হইয়াছে। চোখে-মুখে একটা চাপা হাসি।··দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষীণ হাসিটুকু যেন কুটিল হইয়া উঠিল

বাণী। এসব কথা যত কম বলিস্ ততই ভাল। একথা আমি এই প্রথম শুনছি না—বহুবার শুনেছি। কিন্তু তোর মুখ থেকেও যে শুনতে হ'বে—ভাবিনি!· দেখছি তুই-ও আমাকে হিংসে করিস্। আমাকে সম্মান করে, সমীহ করে, ভক্তি করে—অনেকেরই এটা সহ্য হয় না—আমি তা জানি। আজ জানলাম তুইও সেই দলে।···

উমা। চমৎকার!···তোর দর্প আজ তোকেও ছাড়িয়ে গেল বাণী!···

বাণীর মামীমা ঘরে ঢুকিলেন। তাঁর পরণে চওড়া লালপাড় শাড়ী—উজ্জ্বল তাঁর বর্ণ। কপালে প্রকাণ্ড সিঁদূরের ফোঁটা। তাঁর সমস্ত মুখখানি ভরিয়া যেন হাসি ছড়াইয়া আছে

উমা। দেখুন মামীমা, বাণী কি বলছে!···আমি নাকি ওকে হিংসে করি!···

যেন পরিহাস করিয়াই বলিয়াছে—বাণী এমনি একটা নির্লিপ্ত হাসি টানিয়া আনিল

বাণী। করিস্-ই ত!···হিংসে করলে বলবো না?··

মামীমা। বেশ করেছিস বলেছিস।···এখন দু'জনে যা মুখ-হাত ধুয়ে নে। তোদের মামা ব'সে আছেন একসঙ্গে চা খাবেন ব'লে।···আর উমি, তুই আজ রাত্তিরে এখানেই খেয়ে যাবি। আমি তোদের ওখানে খবর পাঠাচ্ছি।···

উমা। (ব্যস্তভাবে) না, না, মামীমা—সে আর একদিন হ'বে। প্রায়ই ত' খেয়ে যাচ্ছি। আজ চা খেয়েই আমি চ'লে যাবো!···

বাণী। ইস্!··ওমনি ওঁর গেলেই হ'ল কি-না!

উমা। তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না।· আমি ত তোকে হিংসে করি!···বাড়ীতে পেয়ে যে অপমান করে, তার সঙ্গে আমি কথা কই না।

বাণী। (উমাকে জড়াইয়া ধরিল) সত্যি তুই রাগ করেছিস্?···

উমা। (একটু কঠিন স্বরে) না, ছাড়্!···

মামীমা। মান-অভিমান ঝগড়া-ঝাঁটি পরে করিস্। এখন শীগগির আয়, উনি ব'সে আছেন।···

বাণীর ঘর, শূন্য পড়িয়া রহিল। জানালা দিয়া শীতের গোধূলির সোনালী আলোর আভা দেয়ালে পড়িয়াছে। মালী আসিয়া একগুচ্ছ বিচিত্র বর্ণের গন্ধহীন ফুল ফুলদানীতে রাখিয়া গেল।··একটু পরেই তুষার-শীতল অন্ধকার নামিয়া আসিল—নিস্তব্ধতা যেন কথা কহিয়া উঠিতেছে। প্রায় আধঘণ্টা পরে সহসা স্নিগ্ধ নীলাভ আলোয় ঘরখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইলেক্‌ট্রিক্ সুইচ হইতে বাণীর হাত নামিয়া আসিতেছে—উমাও ঘরে আসিয়াছে। বিছানায় বসিতেই বোধ হয় উমার ভাল লাগে—বাণী ড্রেসিং-টেবিলের সামনে একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া উমার পাশে আসিয়া বসিল

উমা। আমার লজ্জা নেই তাই বলছি—বিশ্বজিৎ-এর ঋণ তুই এ-জীবনে শুধতে পারবি না।···মনে কর্ আই-এ ক্লাশের কথা, কার জন্যে তুই অত ভাল নম্বর পেয়েছিলি! আজ তুই হয়তো বলবি—মামাবাবুর জন্যে। কিন্তু, সেদিন এই বাণীই বিশ্বজিৎ চৌধুরীর প্রশংসায় শতমুখ হ'য়ে উঠতো। মামাবাবুর পাণ্ডিত্য তোর কাছে বিস্বাদ লাগতো—কিন্তু বিশ্বজিৎ-এর জ্ঞান তোর কাছে কত লোভনীয় ছিল তা তুই-ই কতবার স্বীকার করেছিস।

বাণী। পরীক্ষায় ভাল ফল করাটাই তখন জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষ ছিল। আজ আর তা মনে করি না। যে-জীবনের স্বাদ আমি পেয়েছি—ভাল ছাত্রী হবার মোহ তার কাছে তুচ্ছ হ'য়ে গেছে। ঠিক সেই জন্যেই তখন যা মনে করতাম এখন তা মনে করি না!···ওসব কথা এখন তাই মনেও হয় না।

উমা। কিন্তু আমি মনে করিয়ে দেব।···এম্-এ পরীক্ষায় বিশ্বজিৎ যখন হিষ্ট্রিতে ফার্ষ্ট হ'ল—তুই বলেছিলি —ও মামাবাবুর মুখ রেখেছে!···তারপর আমার কানের

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্য কালের তুই পুরাতন —রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—নরেন্দ্র বসু, বেলিয়াঘাটা

শকুনির স্বর্গ

শিল্পী—শ্রীদেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী
প্রিন্সিপাল, মাদ্রাজ আর্টস্কুল

ঝড়ের পূর্ব্বে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মাদ্রাজ

কাছে মুখ এনে বলেছিলি—'বিশ্বজিৎ আমার বিশ্ব!…' কি হারাতে বসেছিস্ তুই নিজেই তা জানিস্ না!…

বাণী। তুই বুঝবি না উমা, কত বড় আমার দায়িত্ব, কত আমার কাজ!…হ্যাঁ, একদিন বলেছিলাম—বিশ্বজিৎ আমার 'বিশ্ব'। তখন তাই ছিল। তার প্রশংসায় মামাবাবু মুখর হ'য়ে উঠতেন। বি-এ পরীক্ষায় সে একটা মাঝারি সেকেণ্ড্ ক্লাশ অনার্স্ পেয়েছিল—কিন্তু এম্-এতে সে ফার্ষ্ট হ'ল! পরিচিতদের মধ্যে কেউ কোন কৃতিত্ব দেখালে আনন্দ হয়—আমারও হয়েছিল।

উমা। শুধুই আনন্দ?…আর কিছু নয়?…

বাণী। আবার কি!…আর এতে ওর চেয়ে মামাবাবুর কৃতিত্বই ঢের বেশী!…মাঝারি সেকেণ্ড্ ক্লাশ অনার্স্ পাওয়া আর পাস্-কোর্স্-এ পাশ করা প্রায় একই! তার চেয়ে বরং ডিষ্টিংশনে পাশ করা ঢের শক্ত।…সেই ছেলেকে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট করানো—এ শুধু মামাবাবুই পারেন।…

উমা। তাঁর আরো ছাত্র ছিল, তারা সবাই তলিয়ে গেছে। তারপর লণ্ডন ইউনিভার্সিটির পি-এইচ্ ডি!… সেখানে ত মামাবাবু ছিলেন না!…কিন্তু কৃতিত্বের কথাই যদি বললি—সেটা হয় ত আর কারও নয়—তোর!…

বাণী। আমার?

উমা। হাঁ, তোরই!…তুই ছিলি তার প্রেরণা।…সে জানত তোকে পেতে হ'লে গুরুর কৃপা চাই। মামাবাবুকে তুষ্ট না করলে ঈপ্সিত বরলাভ হ'বে না!…সে বুঝেছিল, তাঁর তুষ্টি আপন শিষ্যের কীর্ত্তিতে!…বাণী, ভুল করবি, ভয়ানক ভুল করবি!…এই মোহ ক দিনের?…এই ত ছ-সাত মাস পরে এম্-এ দিবি—তারপর? এসব কত দিন টিঁকবে!…কয়েকটা হুজুগপ্রিয় ছেলেমেয়ে আজ মাতামাতি করছে, তোকে দেবী বানাচ্ছে, পূজো করছে। (একটু থামিয়া) কিন্তু বিসর্জ্জনেরও আর দেরী নেই।… সেদিন কোথায় থাকবে তোর 'শক্তি-সঙ্ঘ'!…

বাণী। শক্তি-সঙ্ঘ আমার প্রাণ!…যদি জানতিস্ একে আমি কত ভালবাসি—এ আমার কত বিনিদ্র রাত্রির কল্পনার রূপ!…

উমা। সব জানি। কিন্তু একটু ভুল হ'ল; সঙ্ঘ তোর প্রাণ নয়, তুইই তার প্রাণ। সমস্ত দেহমনের উত্তাপ দিয়ে তুই একে বাঁচিয়ে রেখেছিস্।…আমি তোকে বলছি—তুই আজ চ'লে আয়, দেখি কোথায় থাকে এই প্রতিষ্ঠান! ওই মৃত্যুঞ্জয় পশুপতি ওরা কি তোর আদর্শের কথা বোঝে মনে করিস্? ওদের কথা শুনে বুঝিস্ না, ওরা কত অন্তঃসারশূন্য—কত হাল্কা!…সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে তোর সমস্ত প্রস্তাবে ওরা সায় দেয়। অতসী, মণিকা, শান্তা—এরা ত কোন কথাই বলে না!… 'বাণীদি বলেছেন'—সুতরাং এর ওপর আর কোন কথাই চলতে পারে না!…

বাণীর ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ-এর মত হাসি খেলিয়া গেল—উমা চুপ করিল

বাণী। আচ্ছা, আজ হঠাৎ তুই এত উঠে-প'ড়ে লাগলি কেন বল্ ত?…

উমা। আর যে সময় নেই বাণী—আর সময় নেই!… আমার মন বলছে তোর চেতনা ফিরে আসবে, তোর মোহ ভাঙবে।…

বাণী। এ আমার মোহ নয়—আমি অচেতনও নই!… তুই যেন মরিয়া হ'য়ে কথা বলতে সুরু করলি!…

উমা। প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটছে আর বিশ্বজিৎ এগিয়ে আসছে। আর একঘণ্টার মধ্যেই সে এসে পড়বে।… বাণী, অনেক দিন আগেকার সত্য যে আজও মিথ্যে হ'য়ে যায় নি, আমি তা জানি।…আমি তোকে দেবী ভাবি না, কিন্তু ভালবাসি—তাই তোকে আমি জানি!

ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ শোনা গেল। বাণীর মামা—প্রোফেসার মজুমদার—বাহির হইতে উমাকে ডাকিতে ডাকিতে ঘরে ঢুকিলেন। বাণী ও উমা উঠিয়া দাঁড়াইল। চাইনীজ্‌দের মত পীতাভ তাঁর বর্ণ, প্রকাণ্ড চওড়া কপাল, মাথার অবিন্যস্ত কেশ বিরল হইয়া আসিয়াছে। তাঁর গায়ে অতি সাধারণ ফ্লানেল্-এর শার্ট,—গলা হইতে বুকের এবং হাতের সব কটি বোতাম আঁটা। পায়ে ব্রাউন চামড়ার চটি

মামা। উঠে পড়লে কেন, বোস, বোস!…উমা, তারা এসেছে।…

উমা। কারা মামাবাবু?…

মামা। পশুপতি আর মৃত্যুঞ্জয়।…জানো ত তোমার মামীমা আজ নিজে সব রান্না করছেন;—বললাম, ওদের তোমার রান্নার নমুনা কিছু পাঠিয়ে দাও, তা উনি একেবারে তেড়ে এলেন!…বিশ্ব না খেলে কারুরই কিছু

ছোঁবার জো নেই, সে না আসতে আধখানা ফ্রাই-ও আমরা পাবো না!…তা যাই বলি না কেন, বিশ্বকে খাইয়ে কিন্তু আনন্দ হয়।…

উমা। বিলেত যাবার আগে এখানে একদিন ওঁর খাওয়া দেখেছিলাম—পাঞ্জাবীর ডানহাতের আস্তিন তুলে খাওয়া আরম্ভ করার ভঙ্গীটা আমার এখনো মনে আছে—ঠিক যেন লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন!

বাণী। আচ্ছা, আমি তা হ'লে একটু নীচে যাচ্ছি। চ্যারিটির টিকিট বিক্রী আরম্ভ হ'য়ে গেছে, অথচ কাজ কিছুই এগোয় নি, আজই সব প্ল্যান শেষ ক'রে ফেলতে হ'বে কি-না!…আমার একটু দেরী হ'তে পারে।…

মামা। দেরী হ'বে?…কত দেরী?…

বাণী। কত আর?… ঘণ্টাখানেক।…

মামা। একঘণ্টা!…কেন?…দেখ, ওদের বরঞ্চ কাল আসতে ব'লে দাও। বিশ্বর আসার সময় হ'য়ে এলো যে!…

বাণী। বা-রে!…যে খুশী আসুক না, তাই ব'লে আমার কাজ বন্ধ থাকবে নাকি?…

বাণীর কথায় কেমন একটা আবদারের সুর! সে চলিয়া গেল। তাহাকে কি একটা বলিতে গিয়া মামাবাবুর আর বলা হইল না। সহসা তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, উমার দিকে চাহিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন

মামা। লজ্জা পেয়েছে, না?…তাই অমন ক'রে পালিয়ে গেল!…

উমা নিরুত্তর

মামা। (একটু শঙ্কিত কণ্ঠে) কি হয়েছে উমা?

উমা। ও বিয়ে করবে না বলছে।…

মামা। ওঃ, এই কথা!…সে ত আমাদেরও বলেছে।…তুমি বুঝছ না, এসব মনের কথা নয়!…তুমি ভেবো না, এ-রকম সবাই বলে।

উমা। আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু ওর জনসেবার সৌখীন আদর্শ আজ এত বড় হ'য়ে উঠেছে যে আর কোন চিন্তাকেই ও ঠাঁই দেবে না।

মামা। পাগল আর কি!

উমা। তবু বিশ্বজিৎ এখানে থাকলে কি করত বলা যায় না! কিন্তু তাঁর পুনা কলেজে কাজ হওয়ায় যতটা সহজ আপনারা মনে করছেন, ঠিক তা নয়!…

মামা। কি মুস্কিল্!…সেখানে প্রস্‌পেক্টস্ কত বেশি!…পাঁচ বছরের মধ্যেই সে হেড্ অফ্ দি ডিপার্টমেণ্ট্ হ'বে!…সত্য!…সত্য—না ছাই—যত সব হুজুগ আর ফাঁকা কথার ঝড়! (একটু চুপ করিয়া অপেক্ষাকৃত নীচু গলায়) বিশ্ব আমার কত প্রিয় বাণী তা জানে, আর আমিও জানি সে বাণীরও কত প্রিয়, কত শ্রদ্ধার!…ও যেদিন বিলেত চ'লে গেল, বাণীকে আমি সেদিন কাঁদতে দেখেছি।…উমা, আমরা বুড়ো হয়েছি, কিন্তু চিরদিন বুড়ো ছিলাম না।…যে কাঁদায় নারীর মন তাকেই চায়!

ভৃত্য দীনবন্ধু প্রবেশ করিল

দীন। বিশ্ব-দাদাবাবু এয়েছেন—মা খবর দিতে বললেন।

মামা। (বিরক্তভাবে) 'বিশ্ব-দাদাবাবু!' 'বিশ্ব-দাদাবাবু!'…বিশ্রী শোনায় দীনবন্ধু!…কেন, শুধু 'দাদাবাবু' বলতে পারিস্ না?…বাড়ীতে কি পঞ্চাশটা দাদাবাবু আছে নাকি?…দিদিমণি এখনও লাইব্রেরী ঘরে?…

দীন। আজ্ঞে!

মামা। (অন্যমনস্কভাবে) কেন?…ও—আচ্ছা তুই যা।

দীনবন্ধু তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কথা নাই।…একটা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। উমা উঠিয়া কাঁচের শার্সিগুলি বন্ধ করিয়া দিল

মামা। (অনেকটা আপনমনে) পশুপতি আর মৃত্যুঞ্জয়!…চমৎকার নাম! 'পশু' আর 'মৃত্যু'! দুইই মানুষের বর্জ্জনীয়। নাঃ, বাণীকে আমি বারণ ক'রে দেব। সে ত এমন ছিল না। তুমি হয় ত ঠিকই বলছ উমা!…গেল হপ্তায় বিশ্বজিৎ কলকাতা পৌঁছেচে, এর মধ্যে দুদিন এখানে এলো—রোজই মনে হয়েছে বাণী যেন নিজেকে কেমন আড়াল ক'রে যাচ্ছে!…

উমা। অই ত ভাবছিলাম, আপনার চোখে কি এটা পড়েনি?…আপনি ঠিকই দেখেছেন, বাণী নিজে এ-কথা আমায় বলেছে।

মামা। কিন্তু তাই বা কি ক'রে হ'বে? সে ত অত সহজে নিভে যাবার ছেলে নয়!

বাণী ঘরে আসিল। মামাবাবুও উমার দিকে একটু সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া টেবিলের এলোমেলো বইগুলি গুছাইতে লাগিল

বাণী। ছাত্রের প্রশংসা ত তোমাদের মুখে ধরে না। আটটার মধ্যে আসবার কথা—সাড়ে আটটা বাজতে চলল! তোমরা ব'লে তাই এত আগ্রহ ক'রে ব'সে থাক!

উমা ও মামাবাবু পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন

মামা। তার জন্যে আর কেউ যে আগ্রহ ক'রে ব'সে থাকার নেই। কিন্তু তোর মামী যে সন্ধ্যে থেকে রান্নাঘরে ঢুকেছেন—একবার দেখেও এলি না!

বাণী। ইচ্ছে ক'রেই যাই নি! অত কি!

উমা। বাড়ীতে কে এল, কে যাচ্ছে—এত সব দেখবার সময় কোথায়?…তারপর শক্তি-সঙ্ঘের নতুন খবর কি? কত টাকার টিকিট বিক্রী হ'ল?

বাণী। শুধু বিদ্রূপ করতেই পারিস্।…মৃত্যুঞ্জয় আর পশুপতি সারাদিন কি ঘোরাটাই ঘুরছে! আজই ত প্রায় দেড়শো টাকার টিকিট শেষ হ'য়ে গেছে! মৃত্যুঞ্জয় বললে, গাড়ীটাকে সকাল থেকে একটু রেষ্ট্ দিইনি বাণীদি! সঙ্ঘের জন্যে ওরা যা করছে উমা!…আমাদের কাজ যদি এ-রকমভাবে এগোতে থাকে, যে-কোন রিলিফ-ওয়ার্কে আমরা স্বাধীন ইউনিট্ পাঠাতে পারব।

মামা। কেন, মিলে-মিশে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ত কাজ করা যায়। কো-অপারেশন হ'লেই শক্তি বাড়ে! ছোট একটা স্বাধীন ইউনিট কতটুকু কাজ করতে পারবে?

বাণী। যতটুকু পারে! কিন্তু তা ব'লে বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আমাদের চাপা দিয়ে রাখতে চাই না।

উমা। তোর সঙ্ঘ থেকে তুই যে আজ বড় হ'য়ে উঠেছিস্ এই সত্যটা তুই নিজেই প্রমাণ করলি! তোর জন্যেই সঙ্ঘ, তুই সঙ্ঘের ন'স্!…

বাণী। অন্যের কর্ম্মপদ্ধতিতে আমরা বিশ্বাস করি না, আমাদের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। দেশের বড় প্রতিষ্ঠানের আদর্শের সঙ্গে আমাদের আদর্শের প্রভেদ আছে, সুতরাং নিছক কো-অপারেশন-এর খাতিরে আমরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিতে পারি না!… তাই যদি করব, তবে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়লাম কেন—সেই সব মহাসমিতিতে যোগ দিলেই পারতাম। আমি চাই সবাই আমাদের সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব জানুক, আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি যাদের প্রাণে সাড়া জাগাবে তারা আমাদের কাজে যোগ দিক। ছোট ছোট সঙ্ঘের সম্মিলনে যে অস্বাভাবিক মহাসঙ্ঘ গঠিত হয় তার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য!…এই গৃহ-বিবাদ বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে বেশি সময় নেয় না। ইতিহাস থেকে এর অনেক প্রমাণ আমি দিতে পারি।

মামা। তুই ত দিব্যি বক্তৃতা দিতে পারিস দেখছি!

বাণী। আমি যা বুঝি তাই বলতে চেষ্টা করি। কেউ মেনে নেয় ভাল—না মানে তা'র সঙ্গেও আমার বিবাদ নেই। আদর্শ—তর্ক ক'রে বোঝাবার জিনিষ নয়। এই ত দেখ না, যুক্ত-পরিবার-প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের কয়েকটা যুক্তি আছে, কিন্তু প্রচার করার মত শক্তি ও সামর্থ্য এখনো হয়নি—উপযুক্ত শক্তি সঞ্চিত না হ'তেই যারা কাজ আরম্ভ করে নিজেদের তারা শুধু দুর্ব্বল ক'রে ফেলে!…

মামা। আমাকে ত কই কোন দিন তোদের মেম্বার হ'তে বলিস নি!

বাণী। সঙ্ঘের নিয়ম অনুসারে তুমি সভ্য হ'বার অনুপযুক্ত।

মামা। বিশ্বকে মেম্বার করেছিস্?

বাণী। সে-ও বোধ হয় উপযুক্ত নয়!…

উমা। চলুন, আমরা নীচে যাই।…বিশ্বজিৎ অনেকক্ষণ এসেছে।

তাহারা বাণীর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মামাবাবুর শেষ কথাটির রেশ যেন তখনও সমস্ত ঘরখানিতে ভাসিয়া ফিরিতেছে। একটু পরে উমা আবার ঘরে ঢুকিল

বাণী। ফিরে এলি যে বড়!…

উমা। তোকে একবার দেখতে এলাম। বিশ্বজিৎকে নীচে গিয়েই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু প্রকাণ্ড একটা ভুল করবার ঠিক আগে মানুষকে কেমন দেখায় দেখছি!

বাণী। কিসের ভুল?

উমা। বিশ্বজিৎকে ভুল বোঝানোর ভুল!… 'পরমারাধ্যা বাণীদি', 'সীমাহীন বাণীদি', 'চির-স্নেহময়ী বাণীদি' আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন, এর চেয়ে অধিকতর দর্শনীয় বস্তু আর কি হ'তে পারে?

বাণী। না-রে, আত্মপ্রবঞ্চনা করতে যাব কেন?··· ভাল আমি বাসি উমা—তাকে কি না-ভালবেসে পারা যায়? কিন্তু ভালবাসলেই কি বিয়ে করতে হ'বে?··· তুই-ও ত তাকে কত ভালবাসিস্!···সে-কথা থাক—কি হয়েছে জানিস্—তুই আমাকে ভালবাসিস্ ব'লে আমার সুখের কথাটাই ভাবছিস্, আর আমি ভাবছি আমার আদর্শের কথা! বিয়েটাও একটা আদর্শ। কিন্তু সবার জীবনের উদ্দেশ্য ত এক হ'তে পারে না ভাই! (অনেকটা যেন আত্মসমাহিত ভাবে) দিনের পর দিন মহত্তর এবং বৃহত্তর আদর্শের দিকে মানুষের মন ছুটে চলে। অনেক দিন আগে—যখন জীবনে বিশ্বজিৎ আসে নি—তখন আমার আদর্শ ছিল, মামীমা-মামাবাবুর সেবা করবো, যতদিন বাঁচব তাঁদের কাছে থাকব, তাঁদের সুখই হ'বে আমার সুখ, আমার গৌরব!···তারপর এল বিশ্বজিৎ।··· সে এল অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে আমার জীবনকে আলোকিত ক'রে।···মামাবাবুর কাছে কত ছেলে এসেছে, কিন্তু তাকে দেখে, তার সান্নিধ্যে এসে মনে হ'ল এমনটি আর দেখিনি! আদর্শ সেদিন রূপান্তরিত হ'ল।···মনে হ'ল, (একটু থামিয়া) কি মনে হ'ল তুই তা জানিস্। তারপর সে বিলেত চ'লে গেল। একদিন শক্তি-সঙ্ঘের স্বপ্ন দেখলাম! সেই শক্তি-সঙ্ঘ আজ রূপ নিয়েছে—এর চেয়ে বড় আর কিছুই মনে হয় না।· মূলে কিন্তু আমাদের সেই চিরন্তন ধর্ম্ম—সেবা!···মামা-মামীমার সেবায় তৃপ্তি হ'ল না—এল প্রেম। নারীর প্রেম ত সেবারই নামান্তর!·· সেই অতৃপ্ত সেবার আকাঙ্ক্ষাই আজ বহুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে!···

উমা। কিন্তু বিবাহিত জীবনেও ত জনসেবা করা যায়!

বাণী। যায়, কিন্তু বহু ত্রুটি থাকে। বিয়ের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব আছে—কর্ত্তব্য আছে। দুদিক বজায় রাখতে গিয়ে কোনটাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না।···না উমা, এসব তর্কের জিনিষ নয়।···আজ তাকে বলব; সে কি আমায় ভুল বুঝতে পারে?

উমা। জানি না—কিন্তু যদি সে তোর কথাই মেনে নেয়!···থাক্—অনেক রূঢ় কথা আজ তোকে বলেছি, আর আমার কিছুই বলবার নেই!

উমা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাণী উঠিয়া বন্ধ কাঁচের জানালা আবার খুলিয়া দিল—এক ঝলক শীতল বাতাসে তাহার সুন্দর চূর্ণকুন্তল দুলিতে লাগিল। জানালার ওপারের অন্ধকার পটভূমিকা হইতে রাজপথের বিশীর্ণ আলোক তাহার কমনীয় মুখখানিতে রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে!···

বিশ্বজিৎ ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ে ঢিলে হাতার সাদা সার্জ্জ-এর পাঞ্জাবী—বাঁ কাঁধের উপর একটা সাদা শাল অবিন্যস্তভাবে ফেলা রহিয়াছে। স্বাস্থ্য-সমুন্নত অবয়বে তাহার স্নিগ্ধ-শ্যামল বর্ণটিই সুন্দর মানাইয়াছে। সে ঘরে ঢুকিতেই বাণী জানালার পাশ হইতে হাসিমুখে আগাইয়া আসিল

বাণী। বসুন।

বিশ্বজিৎ। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ ত?···শীতের সময় প্রায়ই ত তোমার আবার টন্‌সিল্ ফোলে!· এতটুকু সাবধান যদি হ'বে!···এখনো ছেলেমানুষী গেল না?···

বাণী। যত দিন ছেলেমানুষ থাকতে পারি, বুড়ো হ'য়ে গেলেই ত ফুরিয়ে গেল!· কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে ছেলেমানুষ ভাবে না, সবাই আমাকে ভয় করে।···

বিশ্বজিৎ। আমিও ত' তোমাকে ভীষণ ভয় করি!·· হ্যাঁ, উমা বলছিল বটে—ষ্টুডেণ্ট্ মহলে তুমি নাকি মস্তবড় লীডার হয়েছ—কী একটা সঙ্ঘ গড়েছ বলল—সত্যি নাকি?

বাণী। (একটু গম্ভীর-মুখে) লীডার হবার যোগ্যতা কোথায় আমার; আর একা কোন প্রতিষ্ঠান গড়বার শক্তিও আমার নেই। সাধ্যমত সবাই কিছু ভাল কাজ এবং বড় কাজ করতে চেষ্টা করে, আমরাও করছি। এতে কারো ক্ষতি করছি না ত!

বিশ্বজিৎ। এই দেখ, তুমি রাগ ক'রে বসলে! সত্যি বাণী, তুমি এখনও ছেলেমানুষই আছ।···কাদের নিয়ে তোমার সঙ্ঘ, কি তার কাজ কিছুই আমি জানি না;—এই দু দিন এলাম, কই এক দিনও ত তুমি আমায় কিছু বল নি! উমা যা বলেছে তাই শুধু বললাম—এতেই তুমি রাগ করলে!

বাণী। বা-রে, রাগ করলাম কখন? সঙ্ঘের কথা আপনাকে বলিনি, বলবার মত কিছু নয় তাই!

বিশ্বজিৎ। থাক, বলবার মত যখন নয়, শুনতে চাই না।

বাণী। না, না, আপনি ভুল বুঝবেন না···

ঘরের নিস্তব্ধতা ক্রমেই অস্বস্তিকর মনে হইতেছে। বিশ্বজিৎ-এর মুখে চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে

বিশ্বজিৎ। এবার এম-এ এগজামিন কবে?

বাণী। জুলাই-এর মাঝামাঝি।

বিশ্বজিৎ। এখনো প্রায় ছ মাস আছে, কেমন হ'বে আশা করছ?

বাণী। শুনলে আপনি রাগ করবেন—কিছুই তৈরী হয়নি!...ক মাস ত বই ছুঁতেই পারিনি।

বিশ্বজিৎ। অবিশ্যি এম-এ পাশ করাটা এমন কিছু মহৎ কাজ নয় যে এগজামিন তোমায় দিতেই হবে।··· তবে এখন আর ইস্কুলের ছাত্রী নও, যা করবে ভাল ক'রে করাই উচিত। তারপর তোমার মামার কত বড় আকাঙ্ক্ষা, তোমাকে দিয়ে তাঁর কত আশা!·· টেনে-টুনে একটা সেকেণ্ড ক্লাশ পাওয়া যে তোমাকে মানায় না এটা ত বোঝ!···

আবার সেই অসহনীয় নিস্তব্ধতা। বিশ্বজিৎ ঘড়ি দেখিল—প্রায় ন'টা বাজে

বিশ্বজিৎ। আমি কালই পুনা রওনা হচ্ছি,—অগাষ্ট মাসেই কি তবে ছুটি নেব?

বাণী। ছুটি নেবেন?

বিশ্বজিৎ। ছেলেমানুষী রাখো!

বিশ্বজিৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে ছোট্ট মখমলের কৌটা বাহির করিয়া খুলিতেই প্ল্যাটিনাম্ ব্যাণ্ড্ বিদ্যুৎ-এর মত ঝলসিয়া উঠিল। ···সে বাণীর দিকে আগাইয়া গেল।···বাণীর সমস্ত শক্তি কে যেন হরণ করিয়াছে!···দীপ্তিহীন চোখে সে বিশ্বজিৎ-এর দিকে চাহিয়া আছে।···ডান হাতখানি তুলিয়া বিশ্বজিৎ বাণীর অনামিকায় আংটি পরাইয়া দিল। বিবর্ণমুখে বাণী কি যেন বলিতে গেল—বলা হইল না। হাতখানি রাখিয়া প্রশান্ত পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বিশ্বজিৎ বাণীর মুখের দিকে চাহিল

বাণী। এ কি করলেন?

বিশ্বজিৎ। আংটি পরিয়ে দিলাম।

বাণী। কেন এমন করলেন?···কেন···

পরম তৃপ্তিতে বিশ্বজিৎ-এর সমস্ত মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে ধীরে ধীরে দেয়ালের কাছে আগাইয়া গিয়া বাণীর বাবা-মা'র যুগল ফটোখানির দিকে চাহিয়া রহিল

বিশ্বজিৎ। (বাণীর দিকে মুখ ফিরাইয়া) মনে হচ্ছে, ওঁরা হাসছেন!··

বাণী নিজের অজ্ঞাতেই যেন সেদিকে চোখ ফিরাইল: অদম্য অশ্রুতে তাহার দুই চোখ ভরিয়া গিয়াছে

বিশ্বজিৎ। আমি নীচে যাচ্ছি, তুমিও আর বেশী দেরী ক'রো না।

বিশ্বজিৎ স্মিতমুখে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই উমা ঘরে ঢুকিল। শাণিত তাহার দৃষ্টি, মন্থর তাহার চলিবার ভঙ্গী।·· বাণীর হাতের আঙ্গুলে তাহার চোখ পড়িল—প্ল্যাটিনামের আংটির দীপ্তি যেন উমার দুই চোখে প্রতিফলিত হইয়াছে;—সে বাণীর চোখের দিকে চাহিল। নিমেষের মধ্যে এ কি পরিবর্তন বাণীর!···সে নববধূর ভঙ্গীতে নতমুখে বসিয়া আছে

উমা। ভারি শুনতে ইচ্ছে করছে সে কি বলল···

বাণী। কিছুই সে বলেনি—উমা, আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে!

উমা। দেখাবি না;—দু হাতে মুখ ঢেকে রাখবি, সবার চোখ পড়বে আংটির ওপর—আংটির আড়ালে তোর মুখ লুকিয়ে থাকবে!···

বাণী। ব'লে গেল, অগাষ্টে ছুটি নিয়ে আসবে।... উমা, ভেবেছিলাম সহস্র প্রশ্ন উঠবে, সহস্র যুক্তি নিয়ে আমি তাই প্রস্তুত হ'য়ে ছিলাম। কিন্তু এ কি হ'ল!···

উমা। পরশপাথর শুধু ছোঁয়া দিয়ে যায়···

বাণী। তোরই জিত হ'ল উমা···

উমার মুখে সহসা যেন বিষাদের ছায়া পড়িল; কিন্তু পরমুহূর্তেই সে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

উমা। হ'লই ত!···(বাণীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল) কিন্তু রাত সাড়ে ন'টা বাজে—শীগ্‌গির নীচে চল্।

বাণীর ঘর আবার শূন্য পড়িয়া রহিল। খোলা জানালা দিয়া কোথা হইতে একটা পথহারা প্রজাপতি আসিয়া ঘরময় উড়িয়া বেড়াইতেছে; ক্লান্ত হইয়া সে ফুলদানীর উপর বসিল।···কিন্তু শুধু বর্ণের ঐশ্বর্য্য ভাল লাগে না—আবার উড়িল। বাণীদের গ্রুপ্ ফটোটার চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে বাণীর ছবিখানিই বুঝি তাহাকে আকৃষ্ট করিল!···শ্রান্ত প্রজাপতি বর্ণময় বিচিত্র পাখায় শুধু বাণীর মুখখানি আড়াল করিয়া বসিয়া রহিল।

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

৩০

ঠাকুর হরদাসের সঙ্গে আলোচনার পর কেমন একটা দ্বিধার আন্দোলনে বিমানের চিত্ত বেশ একটু বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সাম্যবাদের যে আদর্শ সে গ্রহণ করিয়াছিল, আন্তরিক একটা বিশ্বাস তাহার ছিল ইহা অপেক্ষা মানবত্বের উচ্চতর আদর্শ আর কিছু হইতে পারে না; এই আদর্শ ধরিয়া চলিবার, চলিয়া মানবসমাজকে তাহার নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার অধিকার তরুণ সম্প্রদায়েরই আছে। ইহার ভাবে সে বিভোর হইয়া থাকিত, নির্ভীক আগ্রহে ইহার সব কথা প্রচার করিত, ইহার পন্থা অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিত। কঠিন কি সব সমস্যা তাহার ফলে উপস্থিত হইতে পারে, মনেই বড় উঠিত না, কখনও কিছু উঠিলেও আমল দিতে চাহিত না, ভাবিত, নির্ভীক উচ্ছ্বাসে নিঃসৃত তরুণদের বাণীর সম্মুখে খড়-কুটার মতই সব উড়িয়া যাইবে। কেন যাইবে না? কেন লোকে সহজ এই সত্যটা বুঝিবে না? বুঝিয়া কেন ইহার পথে চলিবে না? ইহার বিরুদ্ধে চক্ষুখোলাকে কি বলিতে পারে? আর কি বলিবার থাকিতে পারে? অন্ধ প্রাচীন যদি চক্ষু খুলিয়া না দেখে, এই নবারুণ ভাতির সম্মুখে তাহার তামস জাল বিস্তার করিয়া দাঁড়াইতে চায়, তরুণের এই আলোকাভিমুখ অগ্রগামী উদ্দাম অভিযান সে জালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে; আজ সেই প্রাচীনই লুপ্ত অতীতের তমিস্র গহ্বরে চিরতরে ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু যে সব প্রশ্ন সেদিন ঠাকুর হরদাস তুলিলেন, তাহারই কথায় তাহাকে ঠকাইয়া তাহার অতি আদরে পোষিত আদর্শবাদের লঘুত্ব অসারত্ব অসামঞ্জস্য কেবল নহে—বিষময় ফল কি হইতে পারে ও হইতেছে; যেভাবে সব যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, তাহাতে তাহার ভাবুকতায় অতি তীব্র একটা আঘাত গিয়া লাগিল! মধুর মোহে যে স্বপ্নজাল সে রচনা করিয়াছিল, তাহা টুটিয়া গিয়া বাস্তব জীবনের কঠোর সব সত্য তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। প্রথম আজ তাহার মনে হইল, এ সব সমস্যা অতি সহজ ও উপেক্ষা করিয়া চলিবার মত সমস্যা নহে; তাহার আদর্শবাদের পথ সত্যই কেবল কোমল মধুরস্পর্শ ফুলের পথ নহে, তীব্র বিষমুখ অনেক কাঁটাও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। যতই তরতাজা আজ মনে হউক, ফুলের সব পাপড়িগুলি সহজেই শুকাইয়া উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু কাঁটাগুলি অত সহজে শুকাইয়া উড়িয়া যাইবার নহে; আর সেই সব কাঁটায় বিদ্ধ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পথের ধূলোয় লুটাইবে, সত্যই তাহারা তেমন নহে, যত বা যেমন নাকি তাহাদের সব লেডী কমরেড—যেমন সুকুমার লুটায় নাই, কেবল ফুলের পাপড়িগুলির উপর দিয়া হালকা পায়ে স্ফূর্ত্তিতে নাচিয়া খেলিয়াই চলিয়া গিয়াছে; আর সেই কাঁটায় বিঁধিয়া ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহে লুটাইতেছে অভাগী ফুল্লরা! এমন কত সুকুমারই এইভাবে এড়াইয়া যাইতে পারে, আর কত ফুল্লরাই কাঁটায় বিঁধিয়া পথে লুটাইতে পারে। আর এই সব ফুল্লরাই ত দেশের মা—তাহার মা যেমন ছিলেন, যেমন সব মা গ্রামাঞ্চল ভরিয়া ঘরে ঘরে সে দেখিতে পায়, তেমনই সব মা—অন্তত তেমনই মা হইতে পারিত যদি—যদি—এই 'যদি'র কথাটা মনে হইতেই বিমান যেন কেমন চট ফট করিয়া উঠিল। এই 'যদি'র সত্যটাকেই কি আজ তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে? তাই যদি হয়, তাহারই সম্মুখে যদি মাথা নোয়াইতে হয়—এই 'যদি'র কড়াবিধির বাঁধনে বাঁধা না পড়িলে কোনও তরুণীর মাতৃত্ব যদি না মর্য্যাদা পায়, তবে—তবে তাহাদের এই সাম্যবাদের সবুজ ধারার, অবাধ গতিমুক্ত জীবন ত অতি দুদিনের, অতি অসার একটা স্বপ্নবিলাস মাত্র—আর সে বিলাস-বিভ্রম বিষকুম্ভের মুখে একটুখানি পয়ঃফেন মাত্র!—

কিন্তু সত্য কি তাই! এই যে সব কথা এতদিন শুনিতেছে, কত যে রস-কল্পনার ভাবরস সে আগ্রহে পান করিয়াছে, মোহন সবুজের কত যে মোহন বাণী ভাববিভোর হইয়া সে প্রচার করিয়াছে, সব কি সত্য এতই অসার! এমনই বিষকুম্ভের মুখাবরণ পয়ঃফেন মাত্র! মাতৃত্ব? মাতৃত্ব যদি অনিবার্য্যই হয়, এই গণ্ডীর বাহিরে কোনও তরুণীর মাতৃত্ব মর্য্যাদা কি পাইতেই পারে না! কেন পাইবে না? ধূসর জীর্ণ প্রাচীন সমাজ দিবে না? কিন্তু তাহাদের সবুজ সমাজ—কেন দিবে না? কি বলিয়া অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু কোথায় সে সমাজ? ঠাকুর বলিয়াছেন, নাই!—সত্যই কি নাই? তবে তাহারা কী করিতেছে?—কোথায় তাহাদের ভাবধারা লইয়া বিচরণ করিতেছে। তাহারাই কি নারী? কাহাদের লইয়া নূতন একটা সবুজ সমাজ কি লক্ষণে প্রাচীন সমাজ হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে? সত্যই কি তাহাদের সমাজ একটা নাই?—কেবল ভূয়া কতকগুলি কথার ফুৎকার করিয়াই কতকগুলি ছোকরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। না না, দেখিতে হইবে সত্য কিছু, কল্যাণ কিছু তাহাদের সবুজ-পথে আছে কি-না, বাস্তবতায় তাহার ভাবধারা সার্থক কোথাও হইয়াছে কি-না, সত্য হইয়া কোনও সবুজ সমাজ দেখা দিয়াছে কি-না, আর তরুণীর এই মাতৃত্ব সত্যই সে সমাজে মর্য্যাদা পায় কি-না—দেখিতে তাহাকে হইবে!

কিন্তু তবু—তবু—সেই তরুণী মা। সন্তান যাকে মা বলিয়া ডাকিবে, মা বলিয়া যাহার মুখপানে চাহিবে, শ্রদ্ধায় যাহার স্মৃতি মনে ধরিয়া রাখিবে, যেমন চোখে সে তার মাকে ডাকিয়াছে, মার স্মৃতি মনে ধরিয়া রাখিয়াছে, তেমনই মা! ধিক! এই মা কি নাই? তা কি হইতে পারে?

ঠাকুর বলিয়াছেন স্ত্রী যেমন তার স্বামীর নর্ম্মসখী, তেমনই সহধর্ম্মিণী। কিন্তু বন্ধনমুক্তা এই সব তরুণী তরুণ-কমরেডের নর্ম্মসখী মাত্র, সহধর্ম্মিণী ত নয়। ধর্ম্ম কোথায় যে সহধর্ম্মিণী হইবে। পিতার সহধর্ম্মিণী নয় এমন মায়ের পানে সন্তান মুখ তুলিয়া কখনও চাহিতে পারে? সন্তান যে 'মা'তে দেখে পিতার কেবল সহধর্ম্মিণীরই রূপ, নর্ম্মসখী রূপের একটু আভাসও ত কোনও সন্তানের সম্মুখে কখনও ভাসিয়া ওঠে না। আর এই সব তরুণী তাহাদের তরুণ-কমরেডের নর্ম্মসখী মাত্র—বন্ধনমুক্তা সকল ধর্ম্মের অতীতা নর্ম্মসখী মাত্র! না, নর্ম্মসখীও ঠিক নয়, নর্ম্মসখিত্বেরও স্থায়ী একটা প্রীতির যোগ, দরদের বাঁধন, একটা অন্তরতার সমতা আছে, আর বন্ধনমুক্ত এই সব কমরেড পরস্পর দুদিনের ভোগসহচর—সত্যই কেবল ভোগসহচর—আর কিছু নয়—আর এই সম্বন্ধ হইতে যে মাতৃত্ব—সে মাতৃত্ব মাতাকে লজ্জা দেয়, সন্তানকে লজ্জা দেয়, বিরাগবক্র মুখে লোক সমাজে ধিক্কৃত হয়। হাঁ, ধিক্কৃত হয় বটে, লজ্জাও দেয় বটে, কিন্তু কেন হয়? কেন দেয়? সত্যই যদি হইতে পারে, দিতে পারে, লুপ্তপ্রায় জীর্ণ প্রাচীনতার একান্তবর্জ্জনীয় একটা কুসংস্কারের প্রভাব মাত্র না হইয়া সত্যই যদি চিরন্তন কোনও ন্যায়যুক্তি ইহার পিছনে থাকে, তবে তাহাদের সবুজবাদের, সাম্যবাদের, স্বচ্ছন্দগতি মানবতাবাদের সার্থকতা কি? সাম্যবাদী রুশ-সমাজ নাকি এই ধিক্কারকে এই লজ্জাকে আইনের বলে নিরসন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু পারিতেছে কি? পারিবে কি? আবার তখন মনে পড়িল, তার নিজের মাকে—মনে পড়িল ঠাকুর যখন হঠাৎ সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে তার মার কথা তুলিয়াছিলেন, দারুণ লজ্জায় কেবল সে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছিল!—মা—মা—তার সেই মা—তার পিতার সহধর্ম্মিণী, পিতৃগৃহের মর্য্যাদাবতী গৃহিণী, মাতৃত্বের গৃহিণীত্বের পূর্ণ গৌরবে গৌরবিনী। সে যে সত্যকার মর্য্যাদা, সত্যকার গৌরব, আর সেই মর্য্যাদার, সেই গৌরবের যে অনুভূতির স্মৃতি তার প্রাণে জাগিয়া রহিয়াছে, সে যে সত্যকারই একটা অনুভূতি। ধিক তার এই সবুজবাদ—সাম্যবাদ—স্বচ্ছন্দগতি—মানবতাবাদ—সন্তানের চক্ষে সন্তানের স্মৃতিতে মাকে যা এমন হীন করিয়া তোলে, মার নামে সন্তানের মাথা এমন হেঁট করায়, 'মা' তাকে তার রসনাকে স্তব্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু ঐ ফুল্লরা আজ যে তার মাতৃত্বের সম্ভাবনায় সকলের ধিক্কারে নিজের চিত্তভরা লজ্জায় গ্লানিতে কোথায় গিয়া মুখ লুকাইয়াছে, তার প্রতি, আরও কত যে এমন ফুল্লরা এই ধিক্কার এই গ্লানিতে মুখ লুকাইতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদের প্রতি কোনও কর্ত্তব্য কি তাহাদের নাই! তাহাদের এই সবুজবাদের সাম্যবাদেরই ফলে আজ এই দুর্গতি তাহাদের, নারী বলিয়াই এই দুর্গতি তাহাদের, আজ পুরুষ তাহাদের কার কি হইতেছে। আজ এই সবুজবাদ, সাম্যবাদ বর্জ্জন তাহারা করিলেও, এই ফুল্লরাকে, আর এইরূপ সব ফুল্লরাকে এই কলঙ্কপঙ্ক হইতে উদ্ধার না করিয়া তাহারা কি তা পারে?

রাত্রি ভরিয়া এইরূপ অনেক কথাই বিমান ভাবিল। পর দিনই সন্ধ্যায় এই সব দলের অগ্রণী কতিপয় যুবককে লইয়া এক বৈঠকে বসিল। বিমান তাহার সব কথা পাড়িল। শক্ত কথাই বটে! কিন্তু তাহারা কি করিতে পারে? তবে কর্ত্তব্য যদি তাহাদের কিছু থাকে—

সত্যেন্ তখন কহিল, "এ সব হ'চ্ছে আমাদের লেডী-কমরেডদের problem (সমস্যা), তাঁরা নিজেরাই solve (সমাধান) ক'রে নিন না?"

অক্ষয় বলিয়া উঠিল, "হাঁ, ঠিক কথা বলেছ সত্যেন্, তাঁদেরই problem solve ক'রেও তাঁদেরই নিতে হবে। হস্তক্ষেপ ক'র্তে যাব, সে অধিকারই বা আমাদের কি আছে!"

"অধিকার কি আছে—তার মানে?"

বিমানের এই প্রশ্নের উত্তরে অক্ষয় কহিল, "তার মানে অধিকার নাই। থাকুতে পারে না।"

"কেন?"

"কেন—তার কারণ এটা সাম্যবাদের যুগ, তাঁরা আমরা সব সমান। সমান অধিকার তাঁরা দাবী ক'র্ছেন, তাঁদের কোনও সমস্যায়—যত কঠিনই তা হ'ক—হস্তক্ষেপ ক'রতে যাব কি দাবীতে? অমনি তাঁরা ব'ল্বেন, ব'ল্তে বেশ পারেনও—অনধিকার চর্চ্চা ক'রতে কেন তোমরা আস্ছ?"

বরেন্ কহিল, "হাঁ, বড় একটা insult (অপমান) ব'লেও তাঁরা এটাকে মনে ক'রতে পারেন। ক'রতে গেলে এইটেই তাঁদের বুঝতে দেওয়া হবে, তাঁদের সমস্যা তাঁরা সমাধান ক'র্তে পারছেন না, আমাদের সহায়তা চাই, অর্থাৎ তাঁরা হীন, নারীজাতি—পুরুষের protection (পরিরক্ষণ) ব্যতীত তাঁদের চলে না। সাম্যবাদের মূলেই কুঠারাঘাত! —আর সঙ্গে সঙ্গে নারীত্বের প্রতি এই অসম্মান—না, সাম্যের মর্য্যাদায় উপলব্ধি ক'রেছেন, তাতে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন, কি ক'র্তে চাইছেন, এমন কোনও নারীই এটা ক্ষমা ক'রতে পারেন না!"

সত্যেন্ কহিল, "ঠিক কথা।—এই নতুন সব আইনসভায় আর তার নির্ব্বাচনে ত' লেডীদের জন্যে ভোটের কি আসনের পৃথক্ আর বিশেষ বন্দোবস্তের কথা যে হ'চ্ছে, তাঁরা আপত্তি ক'র্ছেন। সোজা চ'লছেন, না, ওসব অনুগ্রহ আমরা চাই না।—সমান ভোটে আসন লাভে সমান প্রতিযোগিতার অধিকারই আমরা চাই।"

একটু হাসিয়া যতীন তখন কহিল, "ও সব বড় বড় কথা, যাই বল দাদা, এঁরাও যেই যা বলুন, এই সত্যিটা ত ভুললে চ'ল্বে না, এসব বিপদে তাঁরাই পড়েন, আমরা পড়ি না। আর যখন পড়েন,—"

বরেন্ বলিয়া উঠিল, "They should boldly face it (সাহস ক'রে তার সম্মুখীন হ'য়েই তাঁদের দাঁড়াতে হবে।) বিপদ! বিপদ ব'লেই কেন তাঁরা এটাকে গণনা ক'রবেন! তাঁদের natural lot (স্বাভাবিক ভাগ্য) এই, পুরুষ কেউ ভাগ নিতেও পারে না।—নিজেদেরই শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে হবে, লোককে দেখাতে হবে, natureএর এই obstruction (প্রকৃতির এই বিধান) exclusively (পৃথক্‌ভাবে কেবল) তাঁদের সঙ্গেই হ'লেও, তাঁদের পক্ষে সেটা লজ্জার কথা কি বিপদের কথা কিছু নয়!"

যতীন্ উত্তর করিল, "কিন্তু সেটা পারছেন না যে তাঁরা। কেউ বা সময় থাকতে চম্পটীর Secret Chamberএ (গুপ্তগৃহে) গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন, কোনও মতে যিনি পারছেন, উদ্ধার পেয়ে আসছেন, কেউ বা একদম ঘর ছেড়ে কোথায় যে গিয়ে লুকোচ্ছেন, পাত্তাই আর পাওয়া যায় না।"

বিমান কহিল, "তাই ত ব'লছিলাম, এই সব বিপদে যারা প'ড়ছেন, রক্ষা নিজেদের ক'র্তে পারছেনই না দেখ্ছি, তাদের পেছনে আমাদের গিয়ে দাঁড়াতেই হবে, উদ্ধারেরও একটা চেষ্টা কর্তেই হবে।"

অক্ষয় কহিলেন, "কি ক'র্বে? কি ক'রে ক'র্বে? কি অধিকারেই বা ক'র্বে? তাহ'লে ব'ল্তে চাও, সত্যই তাঁরা অবলা জাতি, আর সবল পুরুষ আমাদের নিয়ে protectionএর (রক্ষার) ভার তাঁদের নিতে হবে!"

"কথার ছলে আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছ অক্ষয়—তাঁরা অবলা, সুতরাং সবল আমাদের—রক্ষা গিয়ে তাঁদের ক'র্তে হবে, এ কথাই হ'চ্ছে না। তবে এই সত্যটা স্পষ্ট আমরা এখন দেখ্তে পাচ্ছি, এই একটা বিপদ কেবল তাঁদেরই ঘট্‌ছে, আমাদের ঘট্‌ছে না। আর ঘট্‌ছে তার কারণ সাধারণ সমাজ বিবাহ ব্যতীত তরুণ তরুণীর মিলনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, কোনও তরুণীর এই মাতৃত্বকে মর্য্যাদা না দিয়ে লজ্জা দেয়, না, কলঙ্কিনী ব'লে সর্ব্বত্রই তারা নিন্দিত আর বজ্জিত হন, পিতামাতার গৃহেও একটু স্থান তাদের হয় না—স্থান কেউ দিতে সাহসও করেন না ক'র্লে সমাজে তাঁরাও নিন্দিত আর বজ্জিত হন্। আর ব'ল্তে কি, নিজেরাও তাঁরা তাঁদের কন্যাকে কলঙ্কিনী ব'লে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, সংস্পর্শেই থাক্তে চান না।—অথচ এটা দেখ্তে পাচ্ছি, পুরুষ যারা তাঁদের এই অবস্থার জন্য দায়ী, গায়ে তাদের আঁচড়টি লাগে না জানাশুনো হ'লেও কেউ তাদের কিছু বলে না। একটু নিন্দে বা দণ্ড কেউ তাদের কিছু দেয় না, সমান মর্য্যাদায় লোকসমাজে তারা চলাফেরা করে, বিবাহ ক'রেও খাসা এক একজন সামাজিক গৃহস্থ হ'য়েও বসে। আর অভাগী এই সব মেয়েরা এই মাতৃত্বের অপরাধে একদম ভেসে যায়! সাম্যবাদী আর সবুজবাদী সত্যি যদি আমরা হই, তবে ব্যবহারের এই বৈষম্যকে আমাদের দূর ক'র্তে হবে। তরুণতরুণীর মিলনে স্বাধীনতাই যদি কাম্য হয়, বিবাহ-বন্ধনের প্রয়োজন যদি আমরা স্বীকার না করি, তবে সঙ্গে সঙ্গে এই নীতিও সমাজে আমাদের প্রতিষ্ঠা ক'র্তে হবে, এই সব মিলনে পুরুষের পিতৃত্ব যদি লজ্জা না পায়, দণ্ডনীয় না হয়, নারীর মাতৃত্ব লজ্জা পাবে না, দণ্ডনীয় হবে না!"

হাতে তালি দিয়া বিনোদ বলিয়া উঠিল, "ব্রাভো! ব্রাভো! খাসা ব'ল্লে দাদা!—বক্তিমেতে তোমার কাছে কেউ আমরা দাঁড়াতে পারি না। সভায় হ'লে 'হিয়ার' 'হিয়ারে' উঁচু একটা 'চিয়ার'ও (Cheer) উঠত, বিশেষ লেডী-কমরেডের সব মধুরোজ্জ্বল হাসিমুখে চটাপট তালিও প'ড়ত তাদের সব কোমল করপল্লবে। তবে কি-না কেউ ডুব দিয়ে জল খায়, একাদশীর বাবাও টের পায় না—আবার কেউ অতল জলে ডুবেও ফোঁটাটি তলাতে পারে না, ভেসে উঠ্‌লেই ধরা পড়ে!—পুরুষদের এই যে একটা position of advantage (সুবিধের স্থান) র'য়েছে—"

"তার advantage (সুযোগ) তাদের নেওয়া উচিত নয়, লেডী-কমরেডদের বঞ্চিত ক'রে, সত্য যদি সাম্যবাদী তাঁরা হয়। ধরা পড়েন ব'লেই এই যে লাঞ্ছিত তাঁরা হ'চ্ছেন লোকসমাজে, আমাদের দেখ্তে হবে সেটা যাতে তাঁরা না হন।"

সত্যেন্ কহিল, "আমাদের—মানে?—কেবল পুরুষ আমাদের? লেডীদের কি ক'র্বার কিছু নেই? সাম্যবাদী হ'য়ে বাইরে এসে আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, সমান পায়ে তাল ঠুকে ব'ল্ছেন, আর এই লাঞ্ছনা থেকে তাঁদের উদ্ধারের দায়টা কেবল আমাদের ঘাড়ে ফেলেই স'রে দাঁড়াবেন?—হাঁ, এই যে একটা position of advantage আমাদের র'য়েছে, এটা 'নেচারের (natureএর) দেওয়া, জোর ক'রে কি ফাঁকি দিয়ে তাদের থেকে আমরা কেড়ে নিইনি? সাম্যবাদী হ'য়ে সমান আসরে যদি এসে নেমেছেন, এ দায়টা সামলাতে তাঁদের যা করা দরকার, তাও তাঁরা করুন। হাঁ, আমরা কমরেড, দরকার মত তাঁদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু initia-tive (কাজের সূচনায় দায়িত্ব) আগে তাঁদেরই নিতে হবে!"

"কিন্তু তাঁরা ত পারছেন না—সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়—সামাজিক মতিগতি, তার সব prejudice (কুসংস্কারের প্রভাব), এখনও যে রকম আছে তাতে ক'রে পারাও বড় সহজ নয়।"

সত্যেন উত্তরে কহিল, "আমাদের পক্ষেই-বা সহজ তবে হবে কিসে? সমাজ যাকে ব'লছ সেটা কি আমাদের হাতের পুতুল—যা হুকুম করব তাই অমনিই ক'র্বে?"

"কিন্তু এই যে একটা position of advantage আমরা occupy ক'রে আছি—"

"আছি সেটা 'নেচার' (nature) বনিয়ে রেখেছেন, তাই আছি। সে positionটা ত আমরা তাঁদের ইচ্ছে ক'র্লেই অম্‌নি দিতে পারি না।"

"এই positionটা ঠিক দিতে পারিনা, তবে এতে ক'রে সামাজিক লাঞ্ছনা দণ্ড এড়িয়ে যাবার যে সুযোগ আমাদের ঘটছে, সেটা তাঁদেরও দিতে হবে।"

বরেন্ কহিল, "নিন না তাঁরা সেই সুযোগ, নিতে যে পার্‌ছেন না সেটা তাঁদের দুর্ব্বলতা, সাহসের অভাব। কেন, তাঁরা—এই তথাকথিত বিপদটায় ত অনেকেই এসে প'ড়ছেন—একটা combination (বাঁধা দল) নিজেরা ক'রে, সমাজ যে লজ্জা দিতে চাইছে, সাহস ক'রে লজ্জা না পেয়ে মুখ তুলে তার সম্মুখীন হ'য়ে দাঁড়ান না? উচ্চকণ্ঠে সমাজকে বলুন না, এই যে মাতৃত্ব আমরা লাভ ক'রছি, এটা প্রকৃতির বিধান, স্বভাবেরই সহজ গতি, লজ্জা পাবার আমাদের কিছু নাই, লজ্জা দেবার তোমরা কে?—হাঁ, তখন আমরা গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, লজ্জা যারা দিতে আসে, লাঠি মেরে তাদের মাথাও ভাঙ্গতে পারি।"

যতীন্ কহিল "কটা লাঠি মেরে কটা মাথা ভাঙ্গবে দাদা? সমাজ ত

দুটি-চারটি লোকের একটা মেলা নয়? কতকগুলি ছোকরাছুকরী যতই চ্যাচামেচি ক'রে আমরা বেড়াই, আর হোমরা-চোমরা নেতারা সভায় এসে দুটো-চারটে ব্যক্তিমে খাই ক'রে যায়—সমাজ তার বিরাট বিশাল দেহটা নিয়ে দেশ জুড়ে র'য়েছে—প্রকাণ্ড এক Liveathan? দেশের আইনও তাদের পক্ষে,সে আইন এই মাতৃত্বকে কোনও মর্যাদা দেয় না তা নয়, লজ্জাই বরং দিচ্ছে।"

টেবিলটি চাপড়াইয়া অক্ষয় কহিল "চাই আমাদের এই আইনগুলো একদম বদ্‌লে দেওয়া—সাম্যবাদী রুশদেশে যেমন দিয়েছে।—সেখানে মাতৃত্বমাত্রই সমান মর্য্যাদা পায়, সন্তান মাত্রই সমান অধিকার ভোগী ষ্টেটের প্রজা। এমনধারা অবস্থাও হ'য়েছে, কলেজের তরুণ ছাত্রছাত্রীরা যদি প্রেমে মিলিত হ'য়ে সন্তান তারা চায় কোনও বাধা নাই! কলেজের সব বাড়ীতেই creche (ক্রেশ—শিশু পালন স্থান) আছে, তরুণী মায়েরা শিশুদের সেখানে রেখে চলে যায়।—আবার সম্ভাবনা ঘটলেও মাতৃত্বের দায়িত্ব যদি কোনও নারী না নিতে চায়, ষ্টেটেরই সব clinic (ডাক্তারী কেন্দ্র) আছে, চাইলেই সরকারী ডাক্তারেরা মুক্ত ক'রে তাদের দিতে বাধ্য।—কোনও বান্ধবীর (secret chamberএ গিয়ে) লুকিয়ে দায় এড়াতে কারও হয় না!"

বরেন্ কহিল, "বেশ ত? লেডীরা সব ভোট্ পাচ্ছেন, কৌন্সিল এসেম্বলীতে যাচ্ছেন, এম্‌নি সব আইন ক'রে নিন না। আমরা তাঁদের পিছনে আছি।"

বিমান কহিল, "আগুতে গিয়ে দাঁড়াতে পার না তাদের চালিয়ে নিতে?"

"কোন্ অধিকারে, কি দাবীতে নেব? আমাদের আগুয়ানী সর্দ্দারী তারা স্বীকার ক'র্‌বেন কেন? অপমান ব'লে প্রত্যাখ্যানই বরং ক'রবেন।"

"তাঁরা ত ভাব্‌ছেন না এসব কিছু। অন্ততঃ বাত্‌লে আমরা দিতে পারি এই ভাবে অগ্রসর তাঁরা হ'ন। কিন্তু—এই সব আইন-কানুন কদ্দিনে হবে—আবার এই সব আইন-কানুনে সায় দেবে—এর পক্ষে ভোট দেবে—এত বড় একটা revolutionary change of mentality (মনোভাবের বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন) দেশের লোকের কদ্দিনে হবে—হবেই কি-না কেউ ব'ল্‌তে পারে না, তা সে যা হ'ক, যদ্দিন না হয়, তদ্দিন—যারা এই বিপদে গিয়ে প'ড়ছেন, তাঁদের কি হবে?"

অক্ষয় কহিল, "Transition stageএ (পরিবর্ত্তনের যুগটায়) এসব বিপদ-আপদে প'ড়ে কিছু দুখে কারও কারও পেতেই হবে।

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিমান কহিল, "কিন্তু এই দুঃখটা যে প'ড়ছে কেবল মেয়েদেরই ভাগে।"

"না দাদা! কোনও উপায় নাই। তাদের মাতৃত্বের দায়টা ত ব্যাটাছেলে আমরা নিতে পারি না, সমাজের mentality দুদিনে বদ্‌লে দিতে পারছি না।"

"তাহ'লে এই সাম্যবাদ সবুজবাদ একদম আমাদের ত্যাগ করা উচিত?" "কে ত্যাগ ক'র্‌বে দাদা? তুমি আমি আজ ত্যাগ ক'রলেও সবাই ত্যাগ ক'র্‌বে কি? মেয়েরাই ত্যাগ ক'র্‌বে কি!—ঢেউএর ওপর ঢেউ আস্‌ছে রুশিয়া থেকে, আমেরিকা থেকে—ক'জনে সামলাবে দাদা?"

"তা হ'লে একটি প্রস্তাব আমার আছে।"

"বল।"

"বড় একটা সভা ক'রতে চাই। নেতাদের সবাইকে ডেকে লেডী লিডার যাঁরা আছেন সবাইকে এনে, সেই সভায় এই একটা প্রস্তাব তুল্‌তে চাই—"

"কি?"

"এই সমস্যাটার কথা তাঁরা বিবেচনা করুন। যদি সাম্যবাদী তাঁরা হ'ন তবে আমাদের তরুণী-কমরেড যাঁরা এইভাবে বিপন্ন হ'চ্ছেন—না হ'ন তার একটা ব্যবস্থা করুন।"

"কি ক'রে ক'রবেন?"

"তাঁরা ঘোষণা করুন, এই মাতৃত্ব সমাজে মর্য্যাদা পাবে, এই মর্য্যাদা অন্তত তাঁরা তাদের দেবেন।"

"দেখ!"

"একা আমি কি দেখ্‌ব। তোমাদের সহযোগিতা চাই, তাই না তোমাদের ডেকেছি।"

যতীন কহিল, "ডেকেছ বেশ ক'রেছ। আলোচনা একটা হ'ল ভাল। কথাটা ভাবা যাবে। কিন্তু সভা-টভা—who will go and bell the cat (বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধ্‌তে কে যাবে)? নেতারা সব হেসে উড়িয়ে দেবেন। লেডীরা শিউরে উঠবেন—রেগে-মেগে কেউ-বা দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দেবেন। আর সভা যদি একটা ক'র্‌তেও পার, শেম শেমের সম্ভাষণ কেবল পেয়ে নয়, জুতো খেয়েই আস্‌তে হবে।—"

"কিন্তু তবু চেষ্টা একটা—ক'রে একবার দেখ্‌তে পার—বেশ ত, যাও না নিজেই একবার ঐ সুকেশবাবুর কাছে; রতনবাবু, নিতাইবাবু, রমেশবাবু, মিসেস্ আচার্জ্জি, মিস্ চাকলাদার, লেডী হোম—এঁদের কাছেও বরং একবার যেতে পার। দেখ এঁরা কি বলেন?—যদি encouragement (উৎসাহ) কিছু পাও, বেশ এসে জানিও, দেখা যাবে কি করা যায়?"

"তাহ'লে একাই আমাকে যেতে হবে? তোমরা কেউ জোর দিতে আমার সঙ্গে যাবে না।"

সত্যেন্ কহিল, "একা তোমার মুখে যে জোর আছে, আমরা মনে করি তাই আপাততঃ যথেষ্ট, কি বলহে সবাই?"

"ঠিক! ঠিক।" সমস্বরে সকলের মুখেই ধ্বনি উঠিল।

যতীন কহিল, "আপাতত কেবল একটু sound করা (মনের ভাবটা একটু বুঝে নেওয়া) বই ত নয়, দল বল নিয়ে যাবার কোনও দরকার দেখ্‌ছি না। বড় একটা সভা-টভা যদি হয়, তখন তোমার পেছনে আমরা থাকব—এটা জেনো।"

বিনোদ কহিল, "তাহ'লে এখন মধুরেণ সমাপয়েৎ হ'লে ভাল হয় না! তোমার বাড়ীতে আমরা 'গেষ্ট' বরেন, একটু চা টা কিছু জোগাড় কর না?"

"বেশ, চল, পাশেই রেস্তরাঁয় তবে যাওয়া যাক্।"

সকলে উঠিয়া কলরব করিতে করিতে বাহির হইল। বিমান যারপর নাই মনভাঙ্গা হইয়াই তখন পড়িয়াছিল, এই প্রমোদ-ভোজে গিয়া যোগ দিতে পারিল না, বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল। (ক্রমশঃ)

মিউনিসিপাল বিল—

মৌলবী ফজলুল হ্কের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইবার পর ব্যবস্থাপক সভায় অকস্মাৎ খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। হক মন্ত্রীমণ্ডলের বিধানে এই বিলে মুসলমানের সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া ১৮ হইতে ২২ করা হইল। কারণ যেহেতু তাহারা কলিকাতার লোকসংখ্যার শতকরা ২৪, সেহেতু তাহারা সদস্য সংখ্যার শতকরা ২৪ পাইবার অধিকারী। ইউরোপীয়েরা সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও যেহেতু তাহারা কর্পোরেশন ট্যাক্সের শতকরা ১২ ভাগ দিয়া থাকে, সেহেতু তাহারা আসন সংখ্যার শতকরা ১৫ পাইবার অধিকারী। কেবল হিন্দুদের বেলাতেই তাহাদের জনসংখ্যা অথবা ট্যাক্সের পরিমাণ কিছুই ধরা হইল না। তাহারা কলিকাতার জনসংখ্যার শতকরা ৭০ এবং কর্পোরেশন ট্যাক্সের শতকরা ৮০ ভাগ দিয়া থাকে। তত্রাচ তাহাদের সদস্য সংখ্যা ৪৬ হইতে একটিমাত্র বাড়াইয়া ৪৭ করা হইল। কার্য্যত এই ৪৭টি আসনের মধ্যেও হিন্দুরা মাত্র ৪৫টি আসন দখল করিতে পারিবে। কেন যে হিন্দুদের সম্বন্ধে এই অবিচার করা হইল ঢাকার নবাব অথবা হক সাহেব তাহার সন্তোষজনক কোনো কৈফিয়ৎই দিলেন না। খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন কেবল বলিয়াছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া হিন্দুরা যদি এইটুকু স্বার্থত্যাগ না করিতে পারে তাহা হইলে তাহাদের জীবনই বৃথা।

বহু জনসভায় হিন্দুরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। এক শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভাতেই ত্রিশ হাজারের উপর লোক সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু হক সাহেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সততার সহিত ঘোষণা করিলেন যে, এই বিলের বিধানে হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হওয়া দূরে থাক, হক মন্ত্রীমণ্ডলকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। তিনি হিন্দুর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেন নাই। কংগ্রেসীরাই প্রভাব হ্রাসের আশঙ্কায় সভা করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যতই করুন, বিল পাস হইবেই।

হিন্দু মন্ত্রীগণের মনোভাব—

বাঙ্গলার মন্ত্রীসভায় যে কয়জন আছেন, তাঁহাদের মন বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, সুতরাং মনোভাবেরও বালাই নাই। তাহা ছাড়া তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মন্ত্রীদ্বয় ছাড়া অপর সকল হিন্দু মন্ত্রীই কোনো না কোনো বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত। চারিদিকে এত যে গোলযোগ, এত যে বিক্ষোভ চলিতেছে, সকল কিছুর দিকে চক্ষু বন্ধ করিয়া তাঁহারা প্রাণপণে চাকুরী আঁকড়িয়া পড়িয়া আছেন। জনসভায়, সংবাদপত্রে এবং আইন সভায় তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ চাকুরীর মমতা ত্যাগ করিবার চাপ দেওয়া হইলেও তাঁহারা নির্ব্বিকার। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার "ব্যক্তিগতভাবে" স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বিলে হিন্দুদের উপর যে অবিচার করা হইয়াছে তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু "সরকারী ভাবে" ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে, এখনও চাকুরী ত্যাগ করার মত ঘনীভূত অবস্থা হয় নাই। ঘনীভূত অবস্থা বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন জানি না। তাঁহার কথায় মনে হয়, অপমান একেবারে চরমে না উঠিলে তিনি চাকুরী ছাড়িবেন না। তপশীলভুক্ত মন্ত্রীদের তো কথাই নাই। তাঁহারা কার্য্যতঃ হিন্দুদের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়। নূতন বিলে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য ৬টি আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাছে সাধারণ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে "আসল" তপশীলভুক্ত যাইতে না পারে, সেজন্য ইহারই মধ্যে ৩টি আসন মনোনীত করার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার কীর্ত্তি—

ইতিমধ্যে বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় আসিতেই অকস্মাৎ সব উলট-পালট হইয়া গেল। খান সাহেব আবদুল হামিদ চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন, মনোনীত আসন সংখ্যা ৮ হইতে

কমাইয়া ৪ করা হউক। প্রস্তাবটি ২১-২০ ভোটে গৃহীত হইয়া গেল। সরকার পক্ষ এই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা ফাঁপরে পড়িলেন। খান সাহেব তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবের সঙ্গে আরও সুপারিশ করেন যে, অবশিষ্ট চারিটি আসনের মধ্যে ৩টি সাধারণ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে তপশীলভুক্তদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিলে এবং ১টি মুসলমানদের জন্য রাখিলে ভাল হয়। অত্যন্ত নিরীহ প্রস্তাব। আপাতদৃষ্টিতে ইহাতে বিলের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। তপশীলভুক্তদের জন্য সেই ৬টি আসনই রহিল, মুসলমানদের আর একটি আসন বাড়িল। কিন্তু বিলের আসল হুলটিই কাটা যাইতে দেখিয়া মন্ত্রীমণ্ডল ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তপশীল সমান থাকিলেই বা কি, আর মুসলমানের সদস্য সংখ্যা বাড়িলেই বা কি—হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধনের মূল যে উদ্দেশ্য তাহাই যদি ব্যর্থ হইয়া যায় তবে আর রহিল কি! এই সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রীমণ্ডল কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

চাকুরীর হার নির্দ্ধারণ—

কিন্তু শুধু কলিকাতা কর্পোরেশনের গতি করিলেই হইবে না। সরকারী চাকুরীরও একটা সুব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বেই হক সাহেব তাহার জনৈক বন্ধুকে "গোপনীয় পত্রে" লিখিয়াছিলেন, সরকারী হিন্দু কর্ম্মচারীদের কৃতঘ্নতার ও বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি এবং তাঁহার মুসলীম মন্ত্রীমণ্ডল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। পরে এজন্য দুঃখ প্রকাশ এবং ত্রুটি স্বীকার করিলেও তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মুসলমানদের জন্য শতকরা পঞ্চাশটি চাকুরী নির্দ্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি এক সম্মেলন আহ্বান করেন। কংগ্রেস সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে। হক সাহেবের ক্রমবর্দ্ধমান উৎকট সাম্প্রদায়িকতায় বিরক্ত হইয়া পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সম্মেলনে যোগদান করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু কোয়ালিশন দলের সমর্থনে ও শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীর পৃষ্ঠপোষকতায় বলীয়ান হক সাহেব দমিলেন না। হিন্দু জনসভায় এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ উঠিল। বিশিষ্ট হিন্দু-জননায়কগণ ইহার অন্যায্যতা, অসঙ্গতি ও অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। একটি জনসভায় স্থির হইল, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের নেতৃত্বে একদল হিন্দু প্রতিনিধি এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদে বাঙ্গলার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

এই সিদ্ধান্তে হক সাহেবের টনক নড়িল। নিজের এবং নিজের সহযোগীদের সম্বন্ধে এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁহার আছে যে, 'টিনের দেবতা' দেবতা নয়। শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া যেটুকু শক্তি তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাহার দৌড় বেশী নয়। গভর্ণর এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে যদি তিনি যুক্তির পথে চলেন এবং এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে মত তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন যদি তাহার পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে "settled fact" unsettled হইবার সমূহ আশঙ্কা আছে। তিনি তাঁহার মন্ত্রীসভার মুসলমান সদস্যগণের পক্ষ হইতে গভর্ণরের নিকট মেমোরাণ্ডাম পাঠাইলেন যে, এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তাঁহার নাই। মন্ত্রীসভার অভিমতই তাঁহার পক্ষে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পৃথক এক মেমোরাণ্ডামে জানাইলেন, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের অধিকার রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করার শুধু যে গভর্ণরের অধিকার আছে তাহাই নয়, তাহা Instrument of Instruction-এ তাঁহার অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়াই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, তাঁহার নেতা হক সাহেব এবং অন্যান্য সহকর্ম্মীগণ সকলেই উদারহৃদয় সুবিবেচক লোক। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তোষজনক আপোষ একটা নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে। এক কথায়, তিনি থাকিতে হিন্দুদের ভয়ের কোন কারণ নাই।

হক সাহেবের যুক্তি—

নলিনীবাবু এ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা মোটামুটি এইরূপ: যেখানে বৎসরে মাত্র ৩০০ হইতে ৩৫০ জন মুসলমান ছাত্র বি-এ, বি-এস্‌সি পাস করে সেখানে মুসলমানের চাকুরীর হার শতকরা ৪৫-এর বেশী করার কোন অর্থ হয় না। টেকনিকাল চাকুরীতে মুসলমান কর্ম্মচারীর শতকরা হার ৩৩⅓এর বেশী করা চলিতে পারে না। পুলিস সাব-ইন্সপেক্টার ও সাব-রেজিষ্ট্রারের চাকুরীতে

বর্ত্তমানে যথাক্রমে শতকরা ৫০ ও ৪৬ জন মুসলমান চাকুরীয়া আছে। উহা ঠিকই আছে। অন্যান্য বিভাগে মুসলমানের চাকুরীর হার তিনি শতকরা ৪৫ করিতে প্রস্তুত, যদিও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার দ্বারা চাকুরীর efficiency নষ্ট হইবে। মফঃস্বলে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগে "নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য" ৫০ দেওয়া যাইতে পারে। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৪০ ও বর্দ্ধমান বিভাগে ৩৩$\frac{১}{৩}$ দেওয়া যাইতে আরে। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই শতকরা হার কেবল চাকুরী দিবার সময়ই অবলম্বিত হইবে। প্রোমোশনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারিবে না।

হক সাহেব এবং অন্যান্য সহকর্ম্মীগণের ঔদার্য্য ও সুবিবেচনার গুণ-গান করিয়া নলিনীবাবু হিন্দুসমাজকে যে ভরসাই দিয়া থাকুন, হক সাহেব তাঁহার সঙ্কল্পে এতটুকুও বিচলিত হন নাই। নলিনীবাবুর প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ও সব হইবে না। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছাড়া প্রত্যেকটি সরকারী বিভাগে মুসলমানদের জন্য ৫৫ চাকুরী নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে "efficiency" বা যোগ্যতার প্রশ্ন তিনি একেবারেই উড়াইয়া দিয়াছেন। একটা "minimum qualification" থাকিলেই হইল। তাঁহার বৃহত্তম যুক্তি এই যে:

"We find that the population in Bengal consists of a little over 54 per cent. of Mussalmans; and almost the entire bulk of the agriculturists comes from that community. Such being the case, Government should not be manned by people who are not capable of evincing that sympathy which is likely to foster the aspirations of the bulk of the agriculturists of the Province and of the majority of its population. The land must be administered by persons who are in entire sympathy with the bulk of the population."

অর্থাৎ বাঙ্গলার জনসংখ্যার শতকরা ৫৪ যখন মুসলমান, তখন তাহাদিগকে ৫৫টি চাকুরী দিতেই হইবে। এই ৫৪টির অধিকাংশই কৃষক। মুসলমান ছাড়া কে তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে পারে?

যুক্তির বাহাদুরী—

এই যুক্তির বাহাদুরী আছে সন্দেহ নাই। প্রথমত যেখানে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য, সেখানে সেই সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারী ছাড়া তাহাদের স্বার্থরক্ষা অসম্ভব, ইহাই যদি হক সাহেবের নীতি হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে এবং তাঁহার স্বসম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে প্রশ্ন করি যে, সেই নীতি কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও অবলম্বিত হইবে? যদি হয়, তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানের চাকুরীর অবস্থা কিরূপ হইবে?

আরও একটা কথা। এই কথাটার উপর লাট দরবারে হিন্দু প্রতিনিধিগণও জোর দিয়াছেন। যদি ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, হিন্দু কর্ম্মচারী ছাড়া হিন্দুর স্বার্থ কিম্বা মুসলমান কর্ম্মচারী ছাড়া মুসলমান স্বার্থ রক্ষিত হইবার আশা নাই, তাহা হইলে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের তল্পী গুটাইতে হয়। তাহারা আর কাহার স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য থাকিবে? হক সাহেবের সমর্থনকারী শ্বেতাঙ্গদল কিম্বা বাঙ্গলার গভর্ণর এই নীতি কতখানি সমর্থন করিতে পারিবেন জানিতে ইচ্ছা হয়।

হিন্দুদের দাবী—

বাঙ্গলা দেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। তথাপি তাহাদের কোনো নির্দ্দিষ্ট দাবী নাই। তাহারা সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই মনে করে। কি চাকুরীর হার নির্ণয়ে, কি সদস্যসংখ্যা নির্ণয়ে, কোন দিন তাহারা সাম্প্রদায়িকতার ধূয়া তোলে নাই। এমন কি, এই বাঙ্গলা দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও তাহারা যুক্ত নির্ব্বাচনেরই পক্ষপাতী। কিন্তু হকসাহেব তাঁহার আত্মঘাতী এবং জাতীয় স্বার্থহানিকর সাম্প্রদায়িক কার্য্যকলাপের দ্বারা হিন্দুদের মনেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ সংক্রামিত করিবার চেষ্টায় আছেন।

চাকুরীর ক্ষেত্রেও হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক হারাহারি চাহে না। তাহারা যোগ্যতাকেই চাকুরী প্রদানের একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই ইহার একমাত্র সমাধান। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যদি না থাকে, তাহা হইলে কে বলিতে পারে

আত্মীয়স্বজন ও পোষ্যবর্গের দাবী মিটাইয়া প্রসাদের কণিকা-মাত্র বৃহত্তর মুসলমান সমাজের মধ্যে বিতরিত হইবে না? বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় বলিয়া-ছিলেন, যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ বৃহত্তর মুসলমান সমাজের যদি সত্যসত্যই উপকৃত হইবার নিশ্চয়তা থাকে, তাহা হইলে তিনি মুসলমানদের জন্য আরও বেশী চাকুরীর হার সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছেন। এই একটা কথায় শরৎবাবু যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই বোঝা যায়, তিনি সাম্প্রদায়িক তুচ্ছতার কতখানি উর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই, ইহাতে nepotism অর্থাৎ স্বজন প্রতিপালনের আশঙ্কা দূর হইলেও efficiency নষ্ট হইবার আশঙ্কা দূর হইবে না। জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া efficiency'র যোগ্যতা কম নয়।

পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বিতর্ক তুলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এক শ্রেণীর মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। ব্যক্তিগত আপাত স্বার্থের প্রলোভন বড় সহজ নয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে হিন্দু সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। যে সকল সম্প্রদায় ইতিপূর্ব্বে নিজেদের অনুন্নত বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই, লাভের সম্ভাবনায় তাঁহারাও শেষ পর্য্যন্ত লাভের লোভে অনুন্নতের খাতায় নাম লিখাইতে দ্বিধা করিলেন না।

এই মনোভাব এখন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসারিত হইতেছে। শিয়া-সুন্নী বিরোধ উত্তরোত্তর প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। শিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সুবিচারের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া এখন পৃথক নির্ব্বাচন দাবী করিতেছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ে মোমিন-দের সংখ্যা অনেক। মুসলমান সম্প্রদায়ে তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা অনেকটা হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুন্নতদের মতই। বিহার ও বাঙ্গলায় তাঁহাদের পর পর যে কয়টি সম্মেলন হইয়া গেল, সর্ব্বত্রই তাঁহারা পৃথক নির্ব্বাচন দাবী করিয়াছেন।

যাঁহারা হিন্দুসমাজে দুইটি পৃথক সম্প্রদায়-ব্যবস্থা সমর্থন করেন, ন্যায় ও যুক্তির দিক দিয়া তাঁহারা শিয়া ও মোমিন-দের দাবী কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিধান দিবার ভারও যখন তৃতীয় পক্ষের হাতে এবং বিরোধ সৃষ্টির সাহায্যে সাম্রাজ্য রক্ষাই যখন তাহাদের নীতি, তখন এই দাবী প্রবলতর হইবে তাহারা কি ব্যবস্থা করিবে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতৃবর্গ নিজেদের স্বার্থলোভ সঙ্কুচিত করিয়া দৃষ্টি আরও প্রসারিত করিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, পৃথক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা জাতিকে ধীরে ধীরে এবং অজ্ঞাতসারে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে।

ইতিহাস সংস্কার—

যুক্তপ্রদেশ সরকার সম্প্রতি ভারতবর্ষের ইতিহাস (পাঠ্য পুস্তক) সংশোধন ও সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া-ছেন। আমাদের দেশে সুসম্বদ্ধ ইতিহাস বলিয়া কিছু ছিল না। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানত ইংরেজ ঐতিহাসিকদেরই রচনা। এদেশে ইংরেজ রাজত্ব যে ভগ-বানের বিধানে ভারতের কল্যাণ কল্পেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইতিহাসের সাহায্যে সে কথা নানভাবে নানা স্থানে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তরলমতি বালকগণকে ইংরেজের মহিমা উপলব্ধি করাইবার লোভে সর্ব্বত্র তাঁহারা ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। সেগুলির সংশোধন যে প্রয়োজন তাহাতে আর ভুল নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্ধকূপ হত্যা যে অলীক এবং নিছক কপোল-কল্পনা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তকে তাহার সংশোধন এখনও হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে ঔরঙ্গজীব ও আফজল খাঁর হত্যা সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক কারণে যেভাবে সংশোধিত হইয়াছে তাহাতে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ইংরেজ চটাইবার সাহস হয় নাই, কিন্তু অন্যত্র নাচার শিক্ষকেরা জানিয়া-শুনিয়াও ছাত্রদের ভুল শিক্ষা দিতেছেন, আর ছাত্রেরা চোখ বুজিয়া তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া পরীক্ষা পাস করিতেছে।

ইতিহাস—উপন্যাস নহে। রাজনৈতিক আগ্রহে অন্ধ হইয়া যুক্তপ্রদেশ সরকার সে কথা যেন বিস্মৃত না হন ইহাই

আমাদের অনুরোধ। ভারতের মহিমা প্রচার অন্য বহুভাবে করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই মহিমা প্রচারের জন্য সত্যের বিকৃতি সাধনের প্রশ্রয় দিতে আমরা প্রস্তুত নই। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জ্ঞান তাহাই জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

রাজকোট—

রাজকোটের সমস্যা ধীরে ধীরে থিতাইয়া আসিতেছে। কূটনৈতিক যুদ্ধে দরবার শ্রীবীরবলের নিকট পরাজয়ের পর মহাত্মাজি অকস্মাৎ স্যার ম্যরিস গায়ারের রায় প্রত্যাখ্যান করিয়া নূতন চাল চালিলেন। এই চালের পরে সমস্ত সমস্যাটির সমাধান-ভার বিনা সর্ত্তে ঠাকুর সাহেব এবং তাঁহার সচিব শ্রীবীরবলের হাতে গিয়া পড়িল। রাজকোটের প্রজাবৃন্দের দাবী মিটানো অথবা না-মিটানো সম্পূর্ণভাবে ঠাকুর সাহেবের সদিচ্ছার উপর তিনি ছাড়িয়া দিলেন। এত বড় একটা সংগ্রামের এই প্রকার পরিণতিতে স্বয়ং জওহরলাল পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, মহাত্মার নীতি তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

মহাত্মার "আত্মসমর্পণের" (?) পর দরবার শ্রীবীরবল তাঁহার সম্বন্ধে যে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে খানিকটা মাতব্বরী ছিল এবং শ্লেষও ছিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে হাওয়া আশ্চর্য্যরূপে হাল্কা হইয়া গেল। যবনিকার অন্তরালে কোথায় কি যেন ঘটিল, বোঝা গেল না। দরবারের দিন ঠাকুর সাহেব নিজে তাঁহাকে সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন, নিজে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতে ও পৌছাইয়া দিতে লাগিলেন এবং দরবার বীরবল ভক্তিগদগদ ভাষায় জানাইলেন, মহাত্মাকে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। সত্যই তিনি ঠাকুর সাহেবের পিতার মত।

জানা না গেলেও বোঝা যাইতেছে, কি যেন একটা কোথাও হইয়াছে। শাসন-সংস্কার দিতে ঠাকুর সাহেব সম্মত হইয়াছেন। সেজন্য একটা কমিটিও গঠিত হইয়াছে। দরবার বীরবল সেই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। পরে এজেন্সির নির্দ্দেশে তিনি কমিটির সভাপতিত্ব এবং সদস্যপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গান্ধী-নীতির অভ্রান্ততা ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন, "মহাত্মাজি ভুল করিতে পারেন না।" শাসন-সংস্কার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে তখন বোঝা যাইবে মহাত্মাজি ভুল করিয়াছেন কি না। তবে পর পর কয়েকটি "Himlayan blunder"-এর পর তিনি যে ভুল করিতে পারেন না, ভুল করা যে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করা যায় না।

দেশীয় রাজ্য—

ভারতের ছোট-বড় বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্যের প্রায় সমস্তগুলিতেই প্রজা-আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতেও দেশীয় রাজ্যে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা মধ্যযুগীয় শাসন-ব্যবস্থা। রাজাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহার আদেশই আইন। প্রজার তাহাতে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। এই শাসন-ব্যবস্থা-সংস্কারের জন্যই প্রজা-আন্দোলন।

কংগ্রেসের এতকালের নীতি ছিল দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু আসন্ন প্রজা-ফেডারেশনের সম্মুখে প্রজা-আন্দোলন যখন প্রবল হইয়া উঠিল এবং দমননীতি মাত্রা ছাড়াইয়া গেল তখন কংগ্রেসও স্থির থাকিতে পারিলেন না। নীতির আংশিক পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বেই মহাত্মাজি দেশীয় রাজ্যসমূহে সত্যাগ্রহ স্থগিদ রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়া স্বয়ং রাজকোট সংগ্রাম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে মাত্র। কংগ্রেস্ দেশীয় রাজ্যের কথা ভুলেন নাই। তালচেরের বহু সহস্র প্রজা আঙ্গুলের জঙ্গলে কেহ অনাহারে, কেহ অর্দ্ধাহারে শীতাতপ সহ্য করিতেছে। শেঠ যমুনালাল বাজাজ এখনও জয়পুরের কারাগারে। অন্যত্রও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু রাজকোটের অভিজ্ঞতার পরে মহাত্মাজি অহিংসা ও সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় রাজ্যের সমস্যা-সমাধানে সংগ্রাম অপেক্ষা আবেদন-নিবেদন এবং আপোষের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। রাজকোটে তিনি যেভাবে তাঁহার অনশনের মধ্যেও 'জবরদস্তি' এবং সাধারণ আবহাওয়ার মধ্যে হিংসা আবিষ্কার করিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করিতে ভরসা

হয় না যে, অচিরে দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার কোন সঙ্কল্প তাঁহার আছে।

পণ্ডিত জওহরলাল অহিংসার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত নহেন। বোম্বায়ের সাংবাদিক সম্মেলনে (অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে) অহিংসার যে ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন তাহা অনেকটা শিথিল। তিনি বলিয়াছেন, "No, the creed of non-violence has nothing to do with defence from external invasion." অর্থাৎ তাঁহার কাছে অহিংসা creed নয়, policy মাত্র। তাঁহার মতে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনায় মহাত্মার কথাই শেষ কথা। যে আবহাওয়ায় তিনি সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে দেশীয় রাজ্যে কেন, বৃটিশ ভারতেও সেই নিষ্কলঙ্ক এবং পবিত্র আবহাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করিতে সাহস হয়না।

এসিয়াটিক বিল—

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য আর এক ধাপ উপরে উঠিল। ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে এসিয়াটিক বিলের শেষ আলোচনা হইয়া গেল। স্বরাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন, "ভারতীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে" ভারতীয়েরা যত খুশী সম্পত্তি করুক তাঁহার তাহাতে আপত্তি নাই। এই আইনের ফলে বাণিজ্য-ব্যাপারেও তাহাদের কোন অসুবিধা হইবে না। তবে "There must be some control so that they will not take a way the opportunities of every white man to trade." অর্থাৎ ইউরোপীয় বণিকদের স্বার্থ ষোল আনার উপর আঠার আনা বজায় রাখিয়া এবং তাহাদের অঞ্চল ত্যাগ করিয়া তাহারা পরমানন্দে বাণিজ্যও করিতে পারিবে। এক কথায়, প্রভু-ভৃত্যের মধুর সম্পর্ক বংশপরম্পরায় বজায় রাখিয়া যাহাতে তাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে "একত্র" বাস করিতে পারে তাহারই জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার ও ইউনিয়ন সরকারের মধ্যে যে কেপটাউন চুক্তি হয়, তাহার একটা সর্ত্ত এই ছিল যে, ভারতীয়দের সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে সে বিষয়ে এজেণ্ট-জেনারলের সম্মতি লইতে হইবে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে সর্ত্ত পালিত হয় নাই। ইউরোপীয় দলের নেতা ডঃ মালান ইহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, বর্ত্তমান আইন মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য সাময়িকভাবে বিধিবদ্ধ হইল। কেপটাউন চুক্তিরও একটা অভিনব ভাষ্য রচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই নয় যে ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভারত সরকারের দয়ার উপর সমর্পণ করিয়াছেন।

ভারতীয়দের উপর এই অন্যায়ের প্রতিবাদে মিঃ হফমেয়ার মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। বর্ণবিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া সমস্যাটিকে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার স্বার্থের দিক হইতে আলোচনা করিয়া তিনি ইহার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক সুবিধাজনক অঞ্চল হইতে ভারতীয়গণকে বিতাড়িত করার যে প্রতিক্রিয়া ভারতীয়দের মধ্যে দেখা দিবে তাহার ফল শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে কখনই শুভ হইবে না।

মিঃ হফমেয়ার অরণ্যে রোদন করিয়াছেন। কিন্তু প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ও নীরবে এই অপমান গ্রহণ করিবে না। জোহানবার্গে ইহার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে তাহারা এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত অ-শ্বেতকায় জাতিদের লইয়া শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার আয়োজনও চলিতেছে। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের প্রস্তাব সমর্থন করেন। অত্যাচার সত্যসত্যই এমন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, স্যার সৈয়দ রেজা আলীর মত নরমপন্থীও সত্যাগ্রহের যৌক্তিকতা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। ভারত সরকার এ সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যখন মহাত্মাজি দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের একটা ভ্রূকুটিতেই দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট আপোষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিপদ—

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের বস্ত্রশিল্পের অবস্থা নানা কারণে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। শেষোক্ত বৎসরে এ দেশের কলসমূহে অধিক কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল, বিদেশে ভারতীয় কাপড় অধিক পরিমাণে রপ্তানি

হইয়াছিল ও বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে কাপড়ের আমদানিও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে বস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইবে। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে এই শিল্পের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এখন অনেকেই সন্দিহান হইয়াছেন—(১) ঐ সময়ে ভারতে আমদানি বৃটীশ বস্ত্রের শুল্ক প্রথমে সরকারী নির্দ্দেশ দ্বারা ও পরে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি দ্বারা তুইবার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, (২) চীন-জাপান যুদ্ধের অনেকটা অবসান হওয়ায় জাপান পুনরায় ভারতের ভিতরে ও বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে, (৩) বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি করা তূলার উপর শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ভারতের বাজারে ইংলণ্ড ও জাপানের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা সহজ হইয়াছেও (৪) দেশের অভ্যন্তরে কাপড়ের কলগুলিতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ফলে ও অন্যান্য কারণে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির খরচ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ সঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে—আমেরিকার সস্তা তূলার সাহায্যপুষ্ট কাপড়ের কলে উৎপন্ন বস্ত্র ভারতে আমদানি হইলে তাহার উপর এবং যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে ভারতে বিদেশ হইতে আমদানি সমস্ত বস্ত্র ও সূতার উপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হউক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ল্যাঙ্কাসায়ারের ক্ষতি করিয়া ঐরূপ কোন ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায় দেশবাসীকে বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণভাবে বয়কট করিতে হইবে। বস্ত্রশিল্পের এই নূতন বিপদ উপস্থিত হওয়ায় বিদেশী বস্ত্রের বয়কটের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের সকল প্রদেশের কাপড়ের কলওয়ালা সমিতিগুলিকে এখন এ বিষয়ে সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহাদের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই।

পাটচাষীদের দুরবস্থা—

কিছুদিন হইতে কলিকাতার বাজারে পাটের দর বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু আগামী জুলাই মাসে নূতন পাট বাজারে উপস্থিত হইলে তাহা যে কম মূল্যে বিক্রীত হইবে, অনেকেই এখন হইতে তাহার সূচনা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে পাটকলসমূহের গুদামে প্রচুর চট মজুত আছে, ওদিকে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চটের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় চটেরও আর কোন অর্ডার আসিতেছে না—এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়াই পাটের দর কমিবার সম্ভাবনা দেখা যায়। তাহার উপর কলিকাতার ফাটকা বাজারের বাহিরে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সরবরাহের সর্ত্তে যে পাট ক্রয় করা হইতেছে, তাহার মূল্য ফাটকা বাজারের দর অপেক্ষা গাঁট প্রতি সাত-আট টাকা কম। এই ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পাটচাষীদিগকে ফাঁকি দিয়া কম মূল্যে তাহাদের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিবার জন্যই ব্যবসায়ীরা এই ভাবে কাজ করিতেছে। এ বিষয়ে কিন্তু গভর্ণমেণ্ট একেবারে নীরব—অথচ গত নভেম্বর মাসে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন—"ফাটকা বাজারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং শীঘ্রই গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিধি ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।" তাহার পর সাত-আট মাস হইয়া গেল, এখনও এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কিছু করেন নাই। অথচ পাটের দালালগণ দরিদ্র চাষীদিগকে ঠকাইবার জন্য এখন হইতে সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছে। এখনও সময় আছে—যাহাতে নূতন পাটের দর না কমে, গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।

ইলেকট্রিক কোম্পানী ও গভর্ণমেণ্ট—

গত বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত যখন কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় তখন কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীকে আরও দশ বৎসর ব্যবসা চালাইবার সুযোগ করিয়া দেন। বলা বাহুল্য, উক্ত কোম্পানী সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশী এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে উক্ত কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার থাকায় কলিকাতাবাসীকে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য দিয়া বিদ্যুৎ ক্রয় করিতে হয়। সম্প্রতি আবার জানা গিয়াছে, ইলেকট্রিক কোম্পানী বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনে জানাইয়াছেন, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট যদি বহু দিনের জন্য চুক্তি পত্রে আবদ্ধ হইতে রাজী হন

প্রকৃতি

শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটী

নয়নের মণি

শিল্পী—কুমারী আই খাঁ, মাদ্রাজ

মন্দির দ্বার
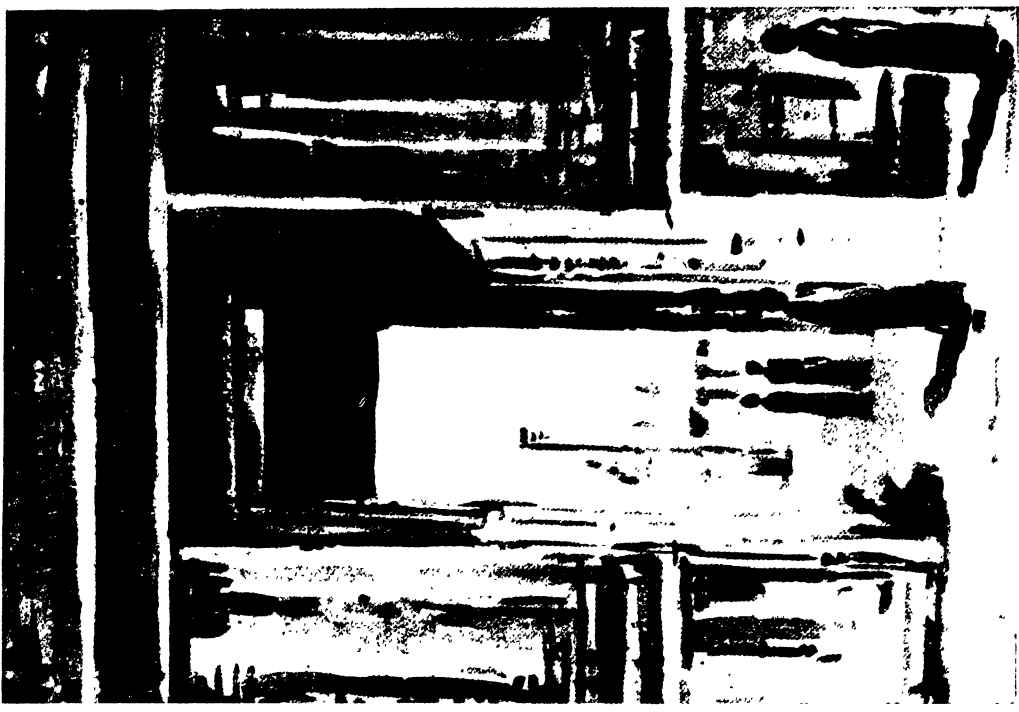
শিল্পী—পাঞ্চভরনম, মাদ্রাজ

তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার লইতে রাজী আছেন। গত বৎসর যেভাবে গভর্ণমেণ্ট উক্ত কোম্পানীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে মনে হয় কোম্পানীর এই প্রস্তাবেও হয় ত গভর্ণমেণ্ট সম্মত হইবেন। কিন্তু বাঙ্গলার মফঃস্বলে বহুস্থানে দেশীয় লোকের চেষ্টায় ও অর্থে অনেকগুলি বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী গঠিত হইয়া কাজ করিতেছে; ভবিষ্যতেও ঐরূপ আরও অনেক দেশীয় কোম্পানী গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীকে সমগ্র বঙ্গদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার দিলে ঐ সকল ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলারই ব্যবস্থা করা হইবে। একটি বিদেশী কোম্পানীকে ঐরূপ একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার কারণ বুঝিতে আমরা অসমর্থ।

বাঙ্গলায় রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ—

গত কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গলা দেশে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য বার্ষিক প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতেছে। পেট্রল ট্যাক্স ও মোটর ট্যাক্সের দরুণ প্রাপ্ত টাকা হইতেই ঐকাজ চলিতেছে। কিন্তু ঐ কাজের কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত না হওয়ায় সে জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট রাস্তাঘাটের একটি পরিকল্পনা স্থির করিবার উদ্দেশ্যে একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়—(১) বাঙ্গলা দেশের মধ্য দিয়া যানবাহন চলাচলের সুবিধা, (২) বিভিন্ন জেলার প্রধান শহরগুলিকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করা, (৩) প্রত্যেক জেলার ভিতরে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা ও (৪) রেল ষ্টেশন ও ষ্টীমার ঘাটগুলিতে মালপত্র প্রেরণের সুবিধা—এই চারি প্রকার প্রয়োজন অনুসারে তিনি চারি প্রকার পথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ জন্য বাঙ্গলা দেশে তিনি মোট নয় হাজার মাইল নূতন পথ করিতে উপদেশ দিয়াছেন ও সে জন্য ৩৯ কোটি হইতে ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ঐ সকল পথ মেরামতের জন্য বার্ষিক এককোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া তিনি অনুমান করেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ ব্যবস্থামত বৎসরে ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলে সমস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ শেষ হইতে দেড়শত বৎসর সময় লাগিবে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন ও দশ বৎসরে যাহাতে উক্ত ৯ হাজার মাইল নূতন পথ নির্ম্মিত হয়, সে জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে ঋণদ্বারা অর্থসংগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আগামী চারি বৎসরে যাহাতে এ বাবদে সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় হয়, অর্থসচিব সেরূপ ব্যবস্থায়ও অগ্রসর হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত রাজনীতিক কারণেই এ দেশে সকল নূতন পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখন নূতন পথ নির্ম্মাণ করিলে তদ্দ্বারা দেশবাসী প্রকৃতই উপকৃত হইবে। অর্থসচিবের এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে তিনি ধন্যবাদার্হই হইবেন। তবে গভর্ণমেণ্টের অধিকাংশ পরিকল্পনাই কার্য্যে পরিণত না হইয়া কাগজে-কলমেই থাকিয়া যায়।

জহরলালের সংশয়—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ের 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন—"ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে সব কাণ্ড ঘটিয়াছে, পন্থ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে যে ভাবে অপমান করা হইয়াছে, দেশবাসী তাহাতে ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছে। তারপর কলিকাতায় সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতির আসন হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য দক্ষিণপন্থী বিশিষ্ট নেতারা যে সব অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার মধ্য দিয়া তাঁহাদের প্রতিহিংসামূলক প্রবৃত্তিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।" নেতাদের মধ্যে যে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ক্ষুদ্রাশয়তা তিনি ত্রিপুরীতে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। জহরলাল আশা করিয়াছিলেন যে, এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে যে ভেদবিভেদ দেখা দিয়াছে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পরস্পরের সহযোগিতায় তাহার পরিসমাপ্তি হইবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতাদের প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব, অশোভন জিদ ও ঔদ্ধত্যের ফলে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। সুভাষচন্দ্র ঐক্য ও মিলনের জন্য শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে জহরলাল বলিয়াছেন—গান্ধীজির আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে

কাজ করা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনটি উপায় তাঁহাদের সম্মুখে আছে—(১) চিন্তাহীনভাবে আত্মসমর্পণ, (২) বিরোধিতা ও (৩) কর্ম্মহীনতা। পণ্ডিত জহরলালের মতে বর্ত্তমানে এই তিন উপায়ের কোনটিই অবলম্বন করা সঙ্গত নহে। চিন্তাহীন-ভাবে কোন আদর্শ বা কর্ম্মনীতির নিকট আত্মসমর্পণ করিলে মানসিক পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, উহার বিরোধিতা করিলে কংগ্রেসে ভেদ ও বিভেদ বাড়িবে ও (৩) কর্ম্মহীনতার পথ অবলম্বন করিলে ধ্বংস সুনিশ্চিত।

জহরলাল এখন তবে কি করিবেন? ত্রিশঙ্কুর মত থাকাও আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহার ভবিষ্যত কার্য্য-পদ্ধতি জানিবার জন্য দেশবাসী উৎসুক হইয়া আছে।

কর্পোরেশনের উপ নির্ব্বাচন—

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর পদ ত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে ১৮নং ওয়ার্ড হইতে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দত্ত বিপুল ভোটাধিক্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতার হিন্দু সমাজে কংগ্রেসের প্রভাব কিরূপ তাহা নির্ব্বাচন ফল হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্মিলন—

আগামী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে লাহোরে ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মিলনের যে দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে তাহাতে সভাপতিত্ব করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব মিণ্টো অধ্যাপক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রমথবাবু প্রবীণ কর্ম্মী—শুধু অধ্যাপক হিসাবে নহে, নানা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী হিসাবেও কলিকাতায় তাঁহার খ্যাতি আছে। এবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মিলনে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইবে—(১) রাজনীতির বর্ত্তমান ধারা, (২) ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কার্য্যক্রম ও (৩) আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ও কার্য্য।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলন—

এবার খুলনা জেলায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সে জন্য খুলনায় সম্প্রতি এক জনসভায় যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে, আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আচার্য্য রায় মহাশয় এই পরিণত বয়সে অসুস্থ শরীর লইয়াও যে এই গুরু কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা খুলনাবাসীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মিলন সর্ব্বাংশে সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

প্রতিভাবান ছাত্র—

নোয়াখালি অরুণচন্দ্র হাইস্কুলের শিক্ষক বিক্রমপুর ফেগুনাসার নিবাসী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান অরুণচন্দ্র এবার কলিকাতা সেণ্ট পল্‌স কলেজ

অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হইতে আই-এ পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। অরুণচন্দ্রের অগ্রজ অনিলচন্দ্র সিটি কলেজের অধ্যাপক। আমরা শ্রীমানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

প্রধানমন্ত্রী-পুত্রের দণ্ড—

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খান সাহেব কংগ্রেস পক্ষের লোক। তাঁহার পুত্র ওবেদুল্লা খাঁ একস্থানে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় তাঁহাকে

গ্রেপ্তার করা হয় ও বিচারে তাঁহার ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ঘটনাটি সত্যই অসাধারণ। ঐ সম্পর্কে ওবেদুল্লার গ্রেপ্তারের পর আরও তিনশত লোক ধৃত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহারা যে একযোগে গভর্ণমেণ্টের একটি অন্যায় ব্যবস্থার প্রতীকারপ্রার্থী—তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এ অবস্থায় ওবেদুল্লাকে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান না করিয়া তাঁহাদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তাহার প্রতীকার করিলেই বোধহয় শোভন হইত। কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলও কি এ বিষয়ে কিছু করিতে অসমর্থ ?

সঙ্গীতজ্ঞা বালিকা—

কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদারের (কালী) নাম কলিকাতার সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে সুপরিচিত। ইনি কয়েকখানি রেকর্ডের সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম অনুযায়ী সঙ্গীতের যে প্রাথমিক শিক্ষা দান

বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার

করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব ও সুন্দর। কুমারী বিজনবালা বহু সঙ্গীত সম্মিলনীতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। প্রার্থনা করি, বিজনবালার সঙ্গীত সাধনা জয়যুক্ত হউক।

কংগ্রেসে সংস্কার—

কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহ ব্যাপারে অনাচার ও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন সম্পর্কে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে যে সাব কমিটী গঠিত হইয়াছিল, জুন মাসের প্রথমেই বোম্বায়ে তাহার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অনাচার দূর করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। একদল স্বার্থান্ধ লোক যাহাতে কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া কংগ্রেস তাহাদের কুক্ষীগত করিতে না পারে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা থাকা বিশেষ দরকার। কিন্তু শুধু আইনের বাঁধাবাঁধি করিলে ত সুফল ফলিবেনা—লোক যাহাতে অনাচারী না হয়,সেজন্য দেশের সর্ব্বত্র প্রচার কার্য্য পরিচালন প্রয়োজন। ব্যক্তি বা দল বিশেষের হাতে পড়িয়া কংগ্রেসের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলে, তাহা বাস্তবিকই সকলের পক্ষে বিশেষ পরিতাপের বিষয় হয়।

উলেমা সম্মিলন—

কলিকাতায় মৌলানা ওবেদুল্লা সিন্ধীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় উলেমা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম দিন সভায় বেশী গণ্ডগোল হয় নাই। দ্বিতীয় দিন লীগপন্থীরা সভায় যাইয়া এরূপ গণ্ডগোল সৃষ্টি করে যে পুলিস তাহা থামাইতে না পারিয়া শেষ পর্য্যন্ত সভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। উলেমাগণ ধর্ম্মপ্রচারক এবং জাতীয়তাবাদী—আর লীগপন্থীরা জাতীয়তার বিরোধী ও ধর্ম্মের বিরোধী। পুলিস না থাকিলে দ্বিতীয় দিনে সভায় মুসলমানে মুসলমানে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত, তাহা সুনিশ্চিত। লীগপন্থীরা শুধু হিন্দুদের সভায় যাইয়া গণ্ডগোল করিয়াই সন্তুষ্ট হয় না—সর্ব্বত্রই এখন তাহারা গণ্ডগোল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক শ্রেণীর মুসলমানকে তাহাদের নেতারা সকল প্রগতির বিরোধী করিয়া তুলিতেছে—শেষ পর্য্যন্ত তাহারা কি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

আষাঢ়ে

কাদের নওয়াজ

১

রিম্ ঝিম্ ঝরে নীর,
গুরু গুরু গরজন,
দুরু দুরু হিয়া মোর,
উড়ু উড়ু তনু-মন।
পল্বলে পাথারে,
বালিহাঁস সাঁতারে,
দল্‌পিঁপী দীঘি-নীরে
দল্‌মলি চলে ওই,
অশথ্-তলার হাটে
জল করে থই থই।

২

হুদ্দম থম্ থম্
গম্-গম্ শুনি রব,
ভরিয়াছে নদী নালা
খাল্-বিল আজি সব,
পাকে আম, জামরুল,
কেয়াফুল বেয়াকুল
ডাকে দেয়া, নাচে কেকা,
একা একা লাগে আজ;
কদম কাঁটালে-চাঁপা
ফুটিতেছে বন-মাঝ।

৩

ঝমর্ ঝমাং ঝম্
বাজায়ে পায়েতে মল্,
কে ঐ তড়িৎ-গতি
আলোকিয়া নভোতল;
আসিল আষাঢ়ে আজি,
সিক্ত অলক-রাজি,
নিঙাড়ি নিঙাড়ি নভে,
ঢালিছে কাজল জল,
পিচ্‌কারী দেয় সে যে,
লয়ে যূথী পরিমল।

৪

সোনার বাংলা দেশ,
আষাঢ় সেথায় ওই,—
এসেছে অতিথি বেশে,
তার সে রভস কই?
সোনার সে ক্ষেত নাই,
খ্যাক্-শিয়ালীরা তাই,—
ডাকিতেছে ঝোপে ঝাড়ে,
সাঁঝেতে চাষার গান—
শুনিলে 'আইল্'-পথে
মশা শুধু ধরে তান।

৫

আষাঢ়ের মেঘ হেরি,
গগনেরি আঙিনায়,—
মনে পড়ে 'রামগিরি'
'অবন্তী' 'অলকা'য়।
সব চেয়ে মনে পড়ে,
বাঙালীর ঘরে ঘরে,
কাঙালী বাড়িছে আর
বাড়িতেছে রোগ-শোক,
আষাঢ়ে দীনতা-সরে
সাঁতারে যে সব লোক।

সিল্কের পাঞ্জাবী

শ্রীবামাদাস চট্টোপাধ্যায়

পর্দ্দার আড়াল থেকে সরমার হাসির শব্দ শুন্‌লাম—উচ্ছ্বসিত হাসি। অনেকদিন এমন হ'য়েছে--আফিস থেকে ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে বাড়ী ফিরেছি ; কিন্তু তা'র হাসিমুখ দেখবামাত্র হাতমুখ ধোয়া ও চা জলখাবারের প্রয়োজনীয়তা ভুলে গেছি এবং চিত্তের অবসাদ, শরীরের ক্লান্তি—সব তা'র হাসির লহরে ভেসে গেছে। কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে হাসি কেন!—পর্দ্দা সরা'বার জন্য হাত বাড়াতেই মনে হ'ল পাগল না হ'লে কেউ কখনও একলা বসে বসে হাসে না ; হয়ত আর কোন মহিলা বন্ধু অথবা প্রতিবেশিনী এসেছেন। আস্তে আস্তে অন্য ঘরে চ'লে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কানে এল সরমার কথা—"আপনি আমাকে ভালবাসেন না তাই—" সঙ্গে সঙ্গে একটি শব্দ এল—"হুঁ!" ও "ফুঃ" এ দু'টির মাঝামাঝি শব্দ। কোন কথার পর এরূপ শব্দ উচ্চারণ ক'রলে কথাটা যে নেহাৎ বাজে তাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। এই শব্দটি কিন্তু আমার মাথায় খাণ্ডব বনের আগুন জ্বেলে দিল। শব্দটি কোন পুরুষ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরমা ও একজন পুরুষ মানুষ পর্দ্দার আড়ালে!—হাসির লহর ও ভালবাসার কথা! মাথা ঘুরতে লাগল ও বোধ হয় ঘুরতে ঘুরতেই চক্ষু সমেত পর্দ্দার পাশের ফাঁকটুকুর দিকে ঝুঁকে পড়ল। চোখে পড়ল সরমার সুরচিত, অনাবৃত খোঁপা ও তা'র ওপর কতকগুলো মোটা ও ফর্সা আঙ্গুল। আঙ্গুলগুলোর আর একটু ওপরে কব্জির কাছে সিল্কের পাঞ্জাবীর আস্তিন। এইটুকু দেখবার পরই চোখদুটো জবাব দিল ও আমি বারান্দা হ'তে একেবারে সিঁড়ির নীচে উপস্থিত হ'লাম। হন্ হন্ ক'রে নেমে আসি নাই। সিন্ধু বিজয়ের সময় মহম্মদ্ বিন্ কাশিম যেমন অতিকায় গুল্‌তির সাহায্যে দরায়ুসের দুর্গে প্রস্তর নিক্ষেপ ক'রেছিলেন, আমাকেও বোধ হয় এই রকম একটা গুলতির সাহায্যে কেহ নীচে ফেলে দিল। আরও দূরে প'ড়তাম, যদি না চাকরটা সামনে প'ড়ত। সম্বিত সাম্‌লে মুখটাকে যতদূর সম্ভব অপ্রিয়দর্শন ক'রে, জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"কা'কে বাড়ীতে ঢুকিয়েছিস্?" সে বল্‌লে—"আজ্ঞে, বৌরাণী তাঁকে নিজে হাত ধ'রে নিয়ে গেলেন যে—"

*　　*　　*　　*

অনেকক্ষণ পার্কে ঘুরপাক খাবার পর ক্লান্তিবোধ ক'রে নিস্তেজভাবে একটা বেঞ্চিতে ব'সে পড়লাম। বায়োস্কোপের ছবির মত আমাদের বিবাহিত জীবনযাত্রার এক একটি দৃশ্য একের পর এক মস্তিষ্কের পর্দ্দায় আসতে লাগল। কালও ব'লেছিল—"হ্যাগা! আমরা বুড়ো বুড়ী হ'য়ে গেলেও কি পরস্পরকে এমনিই ভালবাসব?" তা'র সে সময়কার মুখ দেখ্‌লে পৃথিবীর সবচেয়ে দিগ্‌গজ মনস্তত্ত্ববিশারদও বলতে পারত না যে এই নারী কখনও বিশ্বাসঘাতিনী হ'তে পারে। যাক্, এমন ক'রে বসে কোন লাভ নাই। এর একটা হেস্ত নেস্ত করা দরকার। পুনরায় বাড়ীর দরজায় ফিরে এলাম। মাথা তুলে দেখি, বারান্দার ওপর সরমা ও সে। সরমার মুখটা রাস্তার দিকেই ছিল, কিন্তু আমার দিকে দৃষ্টি প'ড়বার ফুর্সৎ তা'র কোথায়! মুখ চোখ তা'র আনন্দে উদ্ভাসিত, হাতে তা'র পানের থালা। সেই ফর্সা ও মোটা আঙ্গুলগুলো থালা হ'তে দুটি পান তুলে নিল। পান আমরা দুজনেই খাই না, বাড়ীতেও থাকে না। তবে এর জন্য পান এল কোত্থেকে! নিরীহপ্রকৃতির মানুষ ব'লে আমার একটা সুনাম (?) আছে। কিন্তু এ দৃশ্য দেখার পর আর তা' বজায় রাখা সম্ভব হ'ল না। 'লোকটার আঙ্গুলগুলো যথেষ্ট মোটা'—একথা ভুলে গিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় সিঁড়ির ওপর দ্রুতবেগে উঠ্‌তে লাগলাম। আয়ান ঘোষ এসে প'ড়বার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নতজানু হ'য়েছিলেন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্যামও শ্যামা হ'য়েছিলেন। সরমাকেও দেখ্‌লাম হঠাৎ লোকটার সম্মুখে নতজানু হ'য়েছে। কিন্তু লোকটার সিল্কের পাঞ্জাবী অন্তর্হিত হওয়ার বা তা'র মুষ্টির মধ্যে অসির আবির্ভাব হওয়ার কোন লক্ষণই দেখ্‌লাম না। বরং ফর্সা মোটা আঙ্গুলগুলো আবার সরমার অনাবৃত খোঁপার দিকে এগিয়ে গেল ; কিন্তু বোধহয় আমার জুতোর আওয়াজ পেয়ে আর স্পর্শ ক'রবার ফুর্সৎ পেল' না। বেশ প্রসন্নবদনে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল'। সরমা নতজানু অবস্থাতেই মাথার কাপড়টা টেনে নিল'। বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত সিল্কের পাঞ্জাবী ও মিহি ধুতি পরার বিরুদ্ধে আন্দোলন ক'রব মনস্থ ক'রে আমিও সরমার পাশে নতজানু হ'য়ে বোকার মত শ্বশুর-মশায়কে প্রণাম ক'রলাম।

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল ঃ

বার্ষিক ইন্টার-ন্যাসনাল-ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় লীগ ক্লাবের খেলায় উভয় পক্ষে দু'টি করে গোল হওয়ায় খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। টসে ইউরোপীয় দলের ক্যাপ্‌টেন জয়ী হওয়ায় তারা বিজয়ী বলে গণ্য হয়েছে। খেলার গুণানুসারে তাদেরই জয়ী হবার কথা। খেলারম্ভের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়। মাঠ পিছিল থাকায় নন্দী ব্যতীত সকল ভারতীয় খেলোয়াড় বুট পরে নামে। ইউরোপীয় দলের ক্যাপ্‌টেন মোন্‌রো না নামায়, জি কার্ভে অধিনায়কত্ব করেন। ইউরোপীয় দল বেশ ভালই খেলেছেন, মাঠ তাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। ভারতীয় দলের খেলা ভাল হয় নি। ফরওয়ার্ডে সাবু প্রভৃতি কারো খেলা উচ্চাঙ্গের হয় নি, এমন কি করুণা ভট্টাচার্য্যের খেলাও তার নামোচিত হয় নি। হাফ ব্যাকে নূরমহম্মদ ও শেষার্দ্ধে বেণীপ্রসাদের খেলা কথঞ্চিৎ ভাল হয়েছিল। ব্যাকে প্রমোদ দাশগুপ্ত শ্রেষ্ঠ। কে দত্তের দোষে প্রথম গোল হয়।

কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপ্‌টেন)

জি কার্ভে (ক্যাপ্‌টেন)

ইউরোপীয়দের ফরওয়ার্ডে জে মিলসের সেণ্টারগুলি নিখুঁত হয়েছে। কিংসলি ও আর লামস্‌ডেন গোলে বেশ তৎপরতার সঙ্গে সট করেছে। তারা দু'জনে একটি করে গোল দিয়েছে। ক্যাপটেন কার্ভের খেলা ভাল হয় নি, রে বেশ ভাল খেলেছে। গোলে রাসেল কয়েকটি ভাল সট রক্ষা করেছিল।

রেফারিং অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। ভারতীয়দের দু'টি গোলই অফ্‌সাইড থেকে হয়। প্রথমটি এত পরিষ্কার অফ্‌সাইড ছিল যে তা রেফারির চক্ষে না পড়াই আশ্চর্য্য।

ক্রমশই এই খেলাটিতে দর্শক সমাগম কমে যাচ্ছে। সাধারণের আগ্রহ আর এই রকম আন্তর্জ্জাতিক খেলাতে নেই বলে মনে হয়। মাত্র ৩০৯৩৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছে।

কে দত্ত — বেণীপ্রসাদ — কিংসলি — নুর মহম্মদ

রাজার জন্মদিন ছুটির দিনে এই খেলাটি স্থির করায় যে ভুল হয়েছিল তা' বেশ প্রমাণিত হয়েছে। শনিবারে হলে ইহা অপেক্ষা অধিক দর্শক সমাগত হতো বলে মনে হয়। মফঃস্বলের লোকে এই খেলা দেখবার জন্য বাড়ী থেকে কলিকাতায় আসতে ইচ্ছা করে নি।

আই এফ এর সভাপতি নিকলস্ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে তিনি এবার চ্যারিটি লব্ধ অর্থ প্রাপ্তিতে রেকর্ড স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন এবং এই মহদুদ্দেশে সকলের সাহায্য আশা করেন। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক দর্শনীয় ম্যাচগুলিকে চ্যারিটি না করলে বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এও দেখবার বিষয়, যে ঐরূপ করলে সেই সকল ক্লাব মেম্বারদের প্রতি অন্যায় করা হয়। ক্যালকাটা ক্লাবের সভ্যরা বিশেষ বিশেষ খেলা বিনা মূল্যে দেখবার সৌভাগ্য পায়, আর অন্য ক্লাবগুলি তাদেরই খেলায় অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়, চ্যারিটির খাতিরে। ইষ্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের মহমেডানদের সঙ্গে খেলা চ্যারিটি করলে যথেষ্ট অর্থাগম হবে ইহা সুনিশ্চিত, কিন্তু তাতে ঐ ক্লাবদের সভ্যদের প্রতি অবিচার করা হবে না কি ?

লীগ খেলা ঃ

মহমেডান স্পোর্টিং ২-০ গোলে ইষ্ট বেঙ্গলের কাছে এবার প্রথম পরাজয় স্বীকার করেছে। খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল সকল বিভাগেই উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেছিল। পূর্ব্ববারের

মুর্গেশ

আব্বাস

মতন এবারও মুর্গেশ প্রথমার্দ্ধেই আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, আর খেলতে পারে নাই। এমন কি এখনও পর্য্যন্ত খেলতে পারছেনা। মহমেডানদের সঙ্গে খেলায় জয়ী হলেই বিজয়ী দলের খেলোয়াড় আহত এবং রেফারি ও লাইন্সম্যানদের প্রাণ বাঁচান দায় হয় কেন ? রেফারি গিবসন ও লাইন্সম্যান সুশীল ঘোষ ও জে চক্রবর্ত্তীকে পুলিস পাহারায় বাড়ী পাঠাতে হয়েছিল, পুলিসের সম্মুখেই তাদের গাড়ীতে ইট পড়েছে। সংবাদপত্র মারফৎ জানা গেলো, কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাদের বিচার ফল বের হয় নি, হয়তো হবেও না। গতবারের গোলযোগের পরেও ফলাফল বের হয় নি। মহমেডানদের পরবর্ত্তী হার হয় নবাগত রেঞ্জার্স'দের কাছে ২-১ গোলে। নবাগতদের কাছে তাদের হার এই প্রথম নয়, পূর্ব্ব-নবাগত পুলিসের নিকটও তারা ৪-৩ ও ৫-১ গোলে হেরেছিল। তারা এখন চতুর্থ স্থানে আছে।

এবার মোহনবাগান প্রথম থেকেই ভাল খেলছে এবং ১২টা খেলে ১৯ পয়েণ্ট করে প্রথম আছে, রেঞ্জার্স ১৮ করে দ্বিতীয় এবং ইষ্ট বেঙ্গল ও মহমেডান ১৬ করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। মোহনবাগানের প্রথম পরাজয় ঘটেছে

এস মিত্র মোহিনী ব্যানার্জ্জী

ভবানীপুরের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে। মোহনবাগানের ফরওয়ার্ডরা অনেকগুলি সুযোগ নষ্ট করে। প্রথম দু একটা ম্যাচে তাদের ফরওয়ার্ড, বিশেষ ল্যাংচা ও মোহিনীতে যেরূপ নিখুঁত আদান-প্রদান দেখিয়েছিল, সে খেলা ক্রমশই ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ভালো খেলবো এবং জিত্‌বো এই মনোভাব নিয়ে খেলতে নামা উচিত। হার হবে, বিপক্ষ বড়ই দুর্দ্দান্ত, গোড়া থেকেই যদি এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় তবে কখনই খেলা উচ্চাঙ্গের হয় না। মোহনবাগানের প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই এবার বিশেষ প্রাণপণ করে প্রতি খেলায় চেষ্টা করা উচিত, যাতে তারা এবার লীগ জয়ী হতে

পারে। অতীতে বহুবার তারা খেলায় লীগ হারিয়েছে। এ সুবর্ণসুযোগ ত্যাগ করলে নিকট ভবিষ্যতে আর সুযোগ আসবে না। হাফ ব্যাকে বেণী খুব উচ্চাঙ্গের খেলা খেলছে, প্রেমলাল সব দিন সমানভাবে না খেলতে পারলেও অদম্য উৎসাহী ও পরিশ্রমী। রাইট হাফ এখনও উপযুক্ত পাওয়া যায় নি। বিমল দু'একদিন খেলছে, কিন্তু পূর্ব্ব যোগ্যতানুযায়ী নয়। ব্যাকে দরবারী ও পরিতোষ চক্রবর্ত্তী মন্দ নয়। পরিতোষের একটা দোষ, যে সে বড় এগিয়ে খেলে, সময়মত ফিরে আসতে পারেনা। হাফ ব্যাকের আগে গিয়ে খেলবার কোন দরকার মনে হয়না। মাঝে মাঝে মারাত্মক মিস্ কিক্ও করে। গোলে কে দত্ত বেশ বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল।

প্রেমলাল

ইষ্টবেঙ্গল মুগেশ ও লক্ষ্মীনারায়ণকে আনিয়ে উন্নতি করেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুগেশ আহত হয়ে খেলতে পারছে না। হাফ ব্যাকে নন্দি ও বেবি গুহ বেশ দক্ষতার সঙ্গে খেলছে। ব্যাকে পি দাশগুপ্ত সব দিন ভাল না খেললেও নির্ভরযোগ্য, আর মজুমদার জল কাদাতেও মন্দ খেলে না। গোলে ডি সেন বেশ নির্ভরশীল। ইষ্টবেঙ্গল লীগ পেতে বিশেষ চেষ্টা করবে।

ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়গণ। লীগখেলায় মহামেডান স্পোর্টিংকে দু' গোলে পরাজিত করেছে

ইউরোপীয়দের মধ্যে নবাগত রেঞ্জার্স'ই এবার বিপুল উদ্যমে লীগ পাবার জন্যে চেষ্টা করছে। তাদের পাবার খুব আশা আছে; তারাই এখন মোহনবাগানের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী। মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের দ্বিতীয় খেলায় বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। নামবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে, ক্যালকাটা, এরিয়ান্স ও পুলিসে। দেখা যাক, কে কৃতকার্য্য হয়। ক্যালকাটা যদি আবার নামে তো আই এফ এরই বিপদ ঘটবে। কোন ছুঁতায় তাদের প্রথম বিভাগে রাখবে তা' ভাবতে হবে—না হ'লে খেলার জৌলুষ চলে যাবে যে! ক্যালকাটা মোহনবাগানের সঙ্গে যেরূপ গায়ের জোরে খেলেছিল, সেরকম খেলা কিন্তু একদিনও আর খেলতে পারে নি। তাদের নূতন Oxford Blue সেণ্টার ফরওয়ার্ড কিংসলি বেশ খেলে।

কালীঘাট প্রথম আরম্ভ করেছিল বেশ ভাল, কিন্তু ক্রমশই নেমে যাচ্ছে জনের মৃত্যুর পর। জোসেফ প্রথম দিকে সুন্দর ক্রীড়া চাতুর্য্য দেখিয়েছিল।

রুল নম্বর ৩৩ ঃ

মহীশূর 'ফুটবল এসোসিয়েশন রুল নং ৩৩ অনুসারে তাদের প্রদেশের পনের জন বিভিন্ন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গলার বিভিন্ন ক্লাবে খেলবার জন্য প্রতিবাদ করে আই এফ একে পত্র দেন। আই এফ এর সভাপতি ২৫শে মে তারিখের সভাতে জানান যে মহীশূর এসোসিয়েশনকে টেলিগ্রাফ করা হয়েছে ঐ সকল খেলোয়াড়দের স্বাক্ষরিত রেজিষ্ট্রেশন ফর্ম্ম ও আবশ্যকীয় কাগজপত্র পাঠাতে। একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছেন আই এফ এ। সেই কমিটি গত ৭ই জুন তারিখে প্রথম সভা করেন 'ক্যামেরায়'। কোন সংবাদ সাধারণে তাঁরা প্রকাশ করেন নি। গতিক

দেখে অনুমান হয়, যে আই এফ এ রুল ৩৩কে নানা অজুহাতে এ বৎসরও ধামা-চাপা দেবেন, কার্য্যকরী হবে না। সেদিনও বাঙ্গালোর থেকে খেলোয়াড় এসে খেলায় যোগ দিয়েছে। যে সকল ক্লাব এই সকল খেলোয়াড়দের খেলাচ্ছে, তাদের কর্ম্মকর্ত্তাদের আই এফ এতে যে বিশেষ প্রতিপত্তি আছে, তা' বোঝা যায়।

কালীঘাট ক্লাবের খেলোয়াড়গণ

প্রথম আই এফ এ রুল ৩৩এর interpretation চাইলেন এ আই এফ এফ এর কাছে। তাঁরা স্পষ্টভাবে জানালেন যে, খেলোয়াড় যে প্রদেশের habitual resident সেই প্রদেশের হয়েই তাকে খেলতে হবে, তার কোন option থাকবে না কোন্ প্রদেশ হয়ে সে খেলবে। এর পরেও আই এফ এর এই রুল সম্বন্ধে মতানৈক্য হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ আই এফ এর বিচারের ক্ষমতাও নেই, তা' যদি হয় তবে তাঁরা যে সকল খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে, তাদের সংক্রান্ত কাগজপত্র এ আই এফ এফ একে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁদের আদেশ চান না? অনর্থক বিলম্ব করে সময় কাটানই বোধ হয় ইচ্ছা। যদি লীগ খেলার শেষাশেষি বা পরে এ আই এফ এফ কর্ত্তৃক ঐ সকল খেলোয়াড়দের বাঙ্গলায় খেলা নামঞ্জুর হয় এবং তারা দোষী বলে গণ্য হয়ে শাস্তি পায়, তা'হলে সেই দলের সঙ্গে খেলার ফলাফলগুলি কি রকমে ধর্ত্তব্য হবে? আইন হ'লো, কিন্তু যে অন্যায় বন্ধের জন্য হ'লো তার কোনই প্রতিকার হ'লো না!

দিল্লী প্রভিন্সিয়েল ইণ্টার স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজেতা রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ

দ্বিতীয় বিভাগ—

দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থানে র'য়েচে জর্জ্জ টেলিগ্রাফ এবং দ্বিতীয় স্থানে স্পোর্টিং ইউনিয়ান। তাদের মধ্যে তফাৎ এক পয়েণ্টের। স্পোর্টিং বহুদিন আগে প্রথম বিভাগে খেলতো। আশা হয়, তারা আবার প্রথম বিভাগে স্থান ক'রে নিতে পারবে।

বিশিষ্ট খেলোয়াড়দ্বয়ের মৃত্যু ঃ

ইষ্টবেঙ্গলের বিখ্যাত গোলরক্ষক মণি তালুকদার এবং

তালুকদার

কালীঘাটের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় জন ইহলোক ত্যাগ ক'রেচেন। তালুকদার ছয়বার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছিলেন এবং জনও একাধিকবার প্রতিনিধিমূলক খেলায় যোগদান করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রেছিলেন। তালুকদার বহুদিন যাবৎ দুরারোগ্য রোগে ভুগেছেন, কিন্তু জনের মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক, তাই আরো বেদনাদায়ক।

জন

লারি সাফি ঃ

ইংলণ্ডের বড় বড় টেনিস-সমালোচকদের মতে ফ্রয়েড-পেরীর পর সাফির মত টেনিস খেলোয়াড় ইংলণ্ডে দেখা যায়নি। অষ্টিনের চেয়েও নাকি তাঁর খেলা অনেক উচ্চস্তরের। ডেলি-এক্সপ্রেসে রোগার্স লিখেচেন, সাফি ইংলণ্ডে তাঁর সমসাময়িক সব খেলোয়াড়দের হারাতে সক্ষম হয়েচেন অবশ্য অষ্টিনের সঙ্গে তাঁর এখনো খেলা হয়নি তবে রোগার্সের বিশ্বাস সাফি নিশ্চয় অষ্টিনকে হারাতে পারবে।

প্রথমবিভাগ লীগের ফলাফল ঃ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বি	পয়েণ্ট
মোহন বাগান	১২	৮	৩	১	১৭	৫	১৯
রেঞ্জার্স	১২	৯	০	৩	২৩	৯	১৮
ইষ্টবেঙ্গল	১২	৬	৪	২	১৬	৬	১৬
মহমেডান	১২	৬	৪	২	১৮	৯	১৬
কাষ্টমস	১২	৫	৩	৪	১৫	১৩	১৩
কালীঘাট	১০	৪	৪	২	১২	৮	১২
ই বি আর	১১	৫	২	৪	১৪	১৩	১২
ক্যামারোনিয়ন	১২	৩	৩	৬	৮	১৩	৯
ভবানীপুর	১১	৩	৩	৫	৯	১৬	৯
এরিয়ান	১২	৩	২	৭	৯	১২	৮
পুলিশ	১২	৩	২	৭	১২	২০	৮
বর্ডার রেজিমেণ্ট	১২	২	২	৮	১৫	২৩	৬
ক্যালকাটা	১২	১	৪	৭	১৪	২৩	৬

১১ই জুন পর্য্যন্ত

আন্তর্জাতিক ফুটবল ঃ

ইংলণ্ড বনাম রুমানিয়া ঃ

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় ইংলণ্ড ২-০ গোলে রুমানিয়াকে পরাজিত করেছে। দর্শক সংখ্যা হ'য়েছিল চল্লিশ হাজার। খেলা আরম্ভের আট মিনিটে ইংলণ্ডের গুলড়ন প্রথম গোল দেন। বিশ্রামের আট মিনিট পরে ওয়েলস দলের শেষ গোলটি করেন। ইংলণ্ড গোল দেবার বহু সুযোগ নষ্ট করেছিল।

জার্ম্মাণি বনাম আয়ার ঃ

উভয় পক্ষেই একটি ক'রে গোল হওয়ায় খেলা ড্র হয়।

হাঙ্গেরি—২, আয়ার—২ :—খেলা ড্র ;

ফ্রান্স—২, ওয়েল্স—০ :—ফ্রান্স ২-০ গোলে বিজয়ী।

ইটালী—২, ইংলণ্ড—২ :—খেলা ড্র।

হারপেণ্ডেন টেনিস টুর্ণি ঃ

গাউস মহম্মদ ৩-৬, ৭-৫, ৬-২ গেমে বাট্‌লারকে ফাই-নালে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু ডবলস্ ফাই-

গাউস মহম্মদ সাবুর

নালে, বাট্‌লার ও কোম্বে ৮-৬, ১১-৯ গেমে গাউস মহম্মদ ও সাবুরকে পরাজিত করেছেন।

হারলিংহাম টুর্ণি ঃ

হারলিংহাম টুর্ণির ফাইনালে গাউস মহম্মদ ৩-৬, ৭-৫, ২-৬ গেমে ডিলোফোর্ডের নিকট পরাজিত হ'য়েছেন।

ডেভিস কাপ ঃ

দ্বিতীয় রাউণ্ডে গ্রেট বৃটেন ৩-২ ম্যাচে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে।

তৃতীয় রাউণ্ডে হেয়ার (গ্রেট বৃটেন) ৬-২, ৬-৩, ৩-৬, ১৪-১২ গেমে ডেসত্রিমোঁকে (ফ্রান্স) পরাজিত করেন।

ফ্রান্স ৩-০ ম্যাচে চীনকে পরাজিত করেছে।

আস্‌ডেয়ান টীমের ক্যাপটেন লর্ড লুইস মাউণ্টব্যাটেন পোলো ফাইনালে বিজয়ী হয়ে হুইট্‌নে কাপ নিচ্ছেন

জার্ম্মাণি ২-১ ম্যাচে পোলাণ্ডকে পরাজিত করেছে।

জার্ম্মাণি ৩-০ ম্যাচে বৃটেনকে পরাজিত ক'রেচে।

কুস্তি প্রতিযোগিতা ঃ

জুন মাসের মধ্যভাগে দিল্লীতে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের সম্মিলিতভাবে এক কুস্তী প্রতিযোগিতা হবে। ভারতীয় কুস্তিগীরদের ব্যবস্থার ভার নিয়েচেন ফেলিনো কোয়াগলিয়া। নিম্নলিখিত ইউরোপীয়ান কুস্তিগীররা যোগদান করবেন ;—ভন ক্রেমার, মাইকেল গিল, কিং কং,

চ্যাম্পিয়ান হরবন্ সিং দিল্লী কুস্তি প্রতিযোগিতায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী জুলানদারের সর্দার খাঁকে ভূতলশায়ী করছেন

জেজি গোল্ডসটেগ, টোনি লামারো, কোরেস্কেজ্ঞি, কন্সেল, চার্লস ড্যাগলেন।

অল্ বেঙ্গল ইণ্টার স্কুল বক্সিং টুর্ণামেণ্ট ঃ

এই বৎসর বাঙ্গলার তরুণ উদীয়মান মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীযুত

দাঁড়িয়ে (বাম থেকে) ব্রজেন্ রায়, বি লাল্ ; ব'সে (বাম থেকে) সন্তোষ চ্যাটার্জ্জী (ব্যান্টাম্ ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ান্), সুবোধ সেনগুপ্ত, ও সুশীল সেনগুপ্ত (ফ্লাই ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ান্)

ব্রজেন্ রায়ের শিক্ষাধীনে কলিকাতার আর্ব্বান্ ইন্‌ষ্টিটিউসন হ'তে চারজন ছাত্র অল্‌বেঙ্গল ইণ্টার স্কুল বক্সিং টুর্ণামেণ্টে (এস্ ও পি সি পরিচালিত) যোগদান করেছিল। তাদের মধ্যে দু'জন বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে ফাইন্যালে বিজয়ী হয় এবং একজন সেমিফাইন্যালে পরাজিত হয়েছে।

ইউনাইটেড কিংডাম প্রফেসান্যাল বিলিয়ার্ডস্ চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

জো ডেভিস টম নিউম্যানকে পরাজিত করে উক্ত চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন। জো ডেভিস ২১৬০১ ও টম নিউম্যান ১৮৩৪৩ পয়েণ্ট করেছেন।

বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন ঃ

ভারতের বিলিয়ার্ড এসোসিয়েশনের নিমন্ত্রণে গ্রেটবৃটেনের অবৈতনিক বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ান, কিংস্‌লে কেনারলে সস্ত্রীক কলিকাতায় এসেছেন। তিনি ভারতের সকল প্রধান সহরে প্রদর্শনী খেলা খেলবেন।

বোম্বাইয়ে প্রথম খেলায় কিংসলে কেনারলে হিন্দু জিমখানা চ্যাম্পিয়ান জি এ পটগাওকারকে (+৩০০)

গ্রেটবৃটেনের অবৈতনিক বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন কিংসলে কেনারলে

৮৯৭—৪৮৮ পয়েণ্টে পরাজিত করেন; দ্বিতীয় খেলায় তিনি পি এড্ওয়ার্ডসকে (+৩০) ৭৭৯—৫৭৭ পয়েণ্ট হারাইয়াছেন।

পৃথিবীর ওয়ালটার ওয়েট চ্যাম্পিয়ান আর্মষ্ট্রং বৃটিশ চ্যাম্পিয়ান আরনিক রোডারিককে পয়েণ্টে পরাজিত করে 'পৃথিবীর টাইটেল' পেয়েছেন

হেনরী লুই ঃ

হেনরী লুই সম্প্রতি চোখের দোষের জন্য লেন হার্ভের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অনুমতি পান নি। ন্যাশানাল বক্সিং এসোসিয়েশন তাঁকে চক্ষু পরীক্ষা করানোর আদেশ দিয়েচেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিয়েচেন যে, লুই যদি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে না পারেন তাহ'লে পৃথিবীর 'লাইট-হেভি-ওয়েট টাইটেল' তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে এবং এই পদটি খালি থাকবে। তবে নিউইয়র্কে জ্যাক হার্ভে ও মেলিজ-বেটিনার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তাতে এই শূন্য স্থান পূর্ণ করবার আশা রয়েচে। লুইয়ের পক্ষে খবরটি অত্যন্ত বিপদের। অবশ্য এখন সমস্তই নির্ভর ক'রচে তাঁর চক্ষুর উপর।

টমি-ফার ঃ

৩৫ হাজার দর্শকের সামনে টমি ফার বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা লারিগেনকে পরাজিত ক'রেচেন। খেলা ১২ রাউণ্ড হবার কথা; কিন্তু লারি পঞ্চম রাউণ্ডে ভগ্ন দক্ষিণ হস্ত নিয়ে অবসর গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হন। এঁদের দুজনেরই ওজন ১৪ ষ্টোন ৮½ পাউণ্ড। টমি লারির চেয়ে প্রতি বিষয়েই উন্নততর খেলা দেখিয়েছে।

দিল্লী ওয়াই এম সি এ স্পোর্টসের চ্যাম্পিয়ানসিপ কাপ বিজয়ী রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ

হাইজাম্পে নূতন রেকর্ড ঃ

ব্রেণ্টউডে কুমারী ডরাথী ওডাম ৫ ফিট ৫·৭৫ ইঞ্চি

লাফিয়ে মেয়েদের পৃথিবীর নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেচেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ছিল আমেরিকার কুমারী জিন সার্লিও কুমারী ডিডরিক্সন এবং জার্মানীর কুমারী ডোরা রাটজেনের। এঁরা সকলেই ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি অতিক্রম ক'রেছিলেন।

বাজের জয়লাভ ঃ

উইমব্লিতে বাজ ১৩-১১, ২-৬, ৬-৪ গেমে, হান্স-নাসেলিনকে হারিয়ে টুর্ণামেণ্ট বিজয়ী হ'য়েচেন। বাজ সর্ব্বসমেত ৫ হাজার পাউণ্ড ও একটি রূপোর কাপ পেয়েচেন। উইমব্লিতেই বাজ 'ইংলিশ প্রফেস্যানাল টুরে' টিলডেনকে ৬-২, ৬-২ গেমে হারান।

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

অনেক নূতন বিষয় আগামী 'হেলসিনকি' অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় গ্রহণ করা হয়েচে, কিন্তু এতকালের পুরাতন ও প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতা হকিকে বাদ দেওয়া হ'য়েচে। এটা যদি কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাকৃত না হয় তাহ'লে এতে তাঁদের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়, আর স্বেচ্ছাকৃত হ'লে, খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় নয়। অবশ্য হকি প্রতিযোগীতা 'হেলসিনকি'তে না হ'লেও বন্ধ থাকবে না; আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে আমষ্টার্ডামে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশকেই নিমন্ত্রণ করা হ'য়েচে এবং ভারতবর্ষ যাতে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে সেজন্য তাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েচে। ইণ্ডিয়ান হকি এসোসিয়েশনের গত সাধারণ অধিবেশনে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের প্রস্তাব প্রাথমিক ভাবে গৃহীত হ'য়েচে এবং আগামী জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ক'লকাতায় যে সভা হবে তাতে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে বলে জানা গেছে।

দিল্লী অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় চ্যাম্পিয়ানসিপ কাপ বিজয়ী রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুলের 'বি' শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ

ডেভিস কাপ ও ভারতবর্ষ ঃ

ডেভিস কাপের দ্বিতীয় রাউণ্ডে বেলজিয়াম ভারতবর্ষকে ৩-২ ম্যাচে পরাজিত ক'রেচে।

সিঙ্গলসে :

গাউস মহম্মদ (ভারতবর্ষ) ১০-৮, ৬-২ ও ৬-৩ গেমে নাইয়ার্টকে পরাজিত ক'রেন।

লাকরোইক্স (বেলজিয়াম) ৬-২, ৬-২, ৬-৪ গেমে সাবুরকে পরাজিত ক'রেন।

নাইয়ার্ট সাবুরকে পরাজিত ক'রেন ৬-০, ১০-৮, ১-৬ ও ৬-৩ গেমে।

গাউস মহম্মদ লাকরোইক্সের নিকট পরাজিত হন ৬-১, ৬-৪, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে।

ডবলসে :

গাউস ও সাবুর ৬-৪, ৬-৪, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে গিলহাগু ও এইগুিকে পরাজিত করেন।

এছাড়া বার্মিংহামের প্রাইয়োরী হোয়াইটসান টুর্ণামেণ্টের তৃতীয় রাউণ্ডে খোসিনকির (চীন) কাছে সাবু ৬-৩, ৬-২ গেমে এবং বাডিনের (রুমানিয়া) কাছে গাউস ৬-৩, ১-৬ ও ৭-৫ গেমে পরাজিত হ'য়েচেন।

অমরসিংএর কৃতিত্ব ঃ

অমরসিং প্রতি বারের ন্যায় এবারেও ইংলণ্ডে বোলিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাচ্চেন। টডরডেনের বিরুদ্ধে খেলে

তিনি ২৯ রানে সাতটা উইকেট পান। টডমরডেনের ৬৭ রানে ইনিংস শেষ হয়। লাঙ্কেসায়ার লীগে লোয়ার হাউসের বিরুদ্ধে খেলে তিনি ৪১ রানে ৮ উইকেট পেয়েছেন।

নিউ দিল্লী চেমসফোর্ড ক্লাবে রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্রদের কাঠি নৃত্য

মোহনবাগানের বে-বন্দোবস্ত ঃ

মোহন বাগান ও মহমেডানদের খেলা মোহনবাগান মাঠে হয়। এদিন মোহনবাগানের সভ্যদের প্রবেশদ্বারে বিশেষ নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল বলে বহু অভিযোগ আমাদের নিকট এসেছে। মোটামুটি তাঁদের অভিযোগ এই ঃ—সভ্যরা পাঁচটার পূর্ব্বে ক্লাব গেটে এলেও কর্ত্তৃপক্ষ মিলিটারী গেটের পাশের গেট দিয়ে হেডওয়ার্ডের গ্যালারীতে প্রবেশ করতে বলেন। সেখানে গেলে দেখা যায় লোকারণ্য, প্রবেশদ্বারের সন্নিকটেও পৌছান সম্ভব নয়। তাঁরা ক্লাব গেটে ফিরে এসে দেখেন, সেখানে তখন প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সংখ্যা বেশী হয়ে এত ভীড় জমেছে এবং মাত্র একটি দ্বার খোলা থাকায় গ্যালারীতে প্রবেশের চেয়েও ব্যাপার দুরূহ হয়েছে। সভ্যরা ভীড়ের চাপে পিশে যাচ্ছে, কিন্তু অন্য দু'টি দ্বার খোলা হচ্ছে না। এরূপ বে-বন্দোবস্তের কারণ কি? কেন তাঁদের প্রথমে ক্লাব গেট থেকে অন্যত্র যেতে বলা হলো? নিজস্ব মাঠে নিজেদের সভ্যদের স্থান না হবার কারণ কি? ক্লাবের যত সংখ্যক মেম্বার আছে, তাঁদের জন্য গ্যালারীতে নিশ্চিত স্থান থাকা উচিৎ, সে স্থান রেখে তবে কর্ত্তৃপক্ষ আত্মীয়স্বজনদের কম্প্লিমেণ্ট টিকিট বিতরণ করবেন। সভ্যদের ঢুকতে প্রথমে বাধা দেওয়ায় এবং গেট বন্ধ করায় ক্রমশঃ ভীড় জমে যায়, তাতে মেম্বারদের এবং এমন কি মহিলাদেরও বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁরা জানতে চান, কত জনের বস্‌বার স্থান

নিউ দিল্লী চেমস্‌ফোর্ড ক্লাবে রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্রদের 'কার্ট হুইল' কসরৎ

ক্লাবের গ্যালারীতে আছে (ভিজিটিং দলের ব্লক বাদে) এবং উপস্থিত সভ্য সংখ্যাই বা কত ? তা' ছাড়া হেডওয়ার্ডের যে গ্যালারী মূল্য বিনিময়ে লওয়া হয় তাতে কত জন বসতে পারে এবং ঐ জন্য ক্লাবের ব্যয় কত লাগে ? মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলায় কেবলমাত্র কম্প্লিমেণ্টারী টিকিটেই হেডওয়ার্ডের ব্লক ভর্ত্তি করা হয়েছিল। সে তবু ভাল ছিল, যাদের বিনামূল্যে টিকিট দেবেন তাদের যেখানে হয় যেতে বলতে পারা যায়, কিন্তু সভ্যদের ক্লাব গ্যালারীতে স্থান না দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের খুসিমত অন্যত্র যেতে বলা সঙ্গত কি ?

আমরা মোহনবাগান কর্ত্তৃপক্ষকে এই সকল অভিযোগের প্রতিকার করতে অনুরোধ করছি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সেদিন সত্যসত্যই সভ্যরা ও মহিলারাও অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং কর্ত্তৃপক্ষও ইহা স্বীকার করেছেন সংবাদপত্র মারফৎ দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু শুধু দুঃখ প্রকাশ করলেই প্রতিকার হলো না, যাতে ভবিষ্যতে এরূপ অপ্রিয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সভ্যদের স্থান নিজস্ব মাঠের গ্যালারীতে সঙ্কুলান না হবার কোন কারণই থাকতে পারে না। স্থান না থাকলে, কর্ত্তৃপক্ষ কিছুদিন পূর্ব্বে শতাধিক নূতন মেম্বর নিতে পারতেন না। তা' হলে বুঝতে হবে যে নিমন্ত্রিত লোকের সংখ্যা এত অধিক হয়েছিল যাতে সভ্যদের বেলায় গেট বন্ধ করতে হয়। স্থানাভাবে গেট বন্ধ করলে, পরে আবার অত সংখ্যক সভ্যদের ঢুকতে দেওয়া যায় কিরূপে ! তবে কি স্থান থাকতেও তাদের অন্যত্র যেতে বলে নাকাল করান হয়েছে ! আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে সভ্যদের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "ললিতের ওকালতী"—২৲
শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত ছেলেদের গল্প "রাঙ্গা আমার ভাঙ্গা আসর"—॥৵৹
আশালতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "দুরন্ত যৌবন"—১॥৹
শ্রীবিনরেন্দ্রপ্রসাদ বাগচী প্রণীত "হিন্দু স্ত্রীলোকগণের সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ক আইন"—১৲
শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত ছেলেদের উপন্যাস "এল্ ডোর‍্যাডোর বন্দী"—১৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের জন্য "দুর্গম পথে"—॥৵৹
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত শিশুপাঠ্য পুস্তক "হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষধ্বনি"—॥৹
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "আধুনিক সমাজ"—২॥৹
শ্রীবরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত গল্প পুস্তক "বৃহত্তর সম্ভাবনা"—১৲
শ্রীরাইমোহন সাহার উপন্যাস 'প্রথম প্রশ্ন'—১৲
শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য "গল্প শোন"—।৹
শ্রীগৌতম সেন প্রণীত উপন্যাস "প্রিয়া ও মানসী"—১॥৹
ডাঃ বিমলচন্দ্র পাল প্রণীত রোমাঞ্চ গ্রন্থ "সাকো পাঞ্জা'—১৲
শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত উপন্যাস "পূর্ণিমা"—১।৹
শ্রীকালীপদ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত হলায়ুধ প্রণীত "কবি রহস্যম্"—॥৵৹
বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "সাপ আর মেয়ে"—১।৹
শ্রীরবিদাস সাহা রায় প্রণীত কবিতা পুস্তক "জয় যাত্রা"—॥৹
শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসার সুধাকণা"—৵৹
শ্রীপ্রভাতসমীর রায় প্রণীত কবিতা পুস্তক "মন-মর্ম্মর"—১৲
শ্রীলীলাময় দে প্রণীত গল্প পুস্তক "অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা"—১৲
এম্ এন রায় প্রণীত "Our Problems"—২॥৹
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত "শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান"—১০৲
শ্রীপুলকেশ দে সরকার প্রণীত "The Black Prince of Wardha—।৹

সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

শিল্পী — শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত | কালরাত্রি | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রাবণ—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্ম্ম

শ্রীঅরবিন্দ

ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতির মধ্য হইতে গুণত্রয়ের অতীত পরম দিব্য প্রকৃতিতে আত্মার যে মুক্তিপ্রদ বিকাশ, তাহাই হইতেছে আমাদের অধ্যাত্মসিদ্ধি ও মুক্তিতে উপনীত হইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহাও উৎকৃষ্টভাবে সংসাধিত হইতে পারে—যদি ইতিপূর্ব্বে উচ্চতম সাত্ত্বিকগুণের প্রাধান্যের এমন বিকাশ হয় যাহা দ্বারা সত্ত্বও অতিক্রান্ত হয়, নিজের অপূর্ণতা সকলের উর্দ্ধে চলিয়া যায় এবং গুণত্রয়ের দ্বন্দ্বের অতীত এক উর্দ্ধতম মুক্তি, পরমতম জ্যোতি, আত্মার শান্ত শক্তির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। মুক্ত বুদ্ধিতে আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাসকল সম্বন্ধে যে উচ্চতম মানসিক ধারণা করিতে পারি তদনুযায়ী এক উচ্চতম সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও লক্ষ্য আমাদের সত্তাকে নূতনভাবে গঠন করিয়া দেয় এবং সেই শ্রদ্ধাই উক্ত পরিবর্ত্তনের দ্বারা আমাদের নিজ সত্য সত্তা সম্বন্ধে দৃষ্টিতে অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞানে পরিণত হয়। ধর্ম্মের আদর্শ ও নীতি, আমাদের প্রাকৃত জীবনের যথাযথ বিধির অনুসরণ এক মুক্ত সুদৃঢ় স্ব-প্রতিষ্ঠ সিদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়, সেখানে সকল নীতির আবশ্যকতাকে অতিক্রম করা হয় এবং অমৃত আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্ম দেহ প্রাণ মনের নিম্নতন নীতির স্থান গ্রহণ করে। সাত্ত্বিক মন ও সঙ্কল্প সেই ঐক্যাত্মক জীবনের জ্ঞান ও তপঃ শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইবে—যেখানে সমগ্র প্রকৃতি তাহার ছদ্মবেশ পরিহার করে এবং তাহার অন্তরস্থিত ভগবানের মুক্ত আত্ম-অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মী তাহার উৎসের সহিত মিলিত, পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত জীবাত্মা হইয়া উঠে; সে নিজে আর কর্ম্মটির কর্ত্তা থাকে না, পরন্তু বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পুরুষের কর্ম্মের অধ্যাত্ম যন্ত্র স্বরূপ হয়। তাহার রূপান্তরিত

ও জ্ঞানালোকিত প্রাকৃত সত্তা এক বিশ্বগত ও নির্ব্যক্তিক কর্ম্মের নিমিত্তস্বরূপ, দিব্যযোদ্ধার ধনুস্বরূপ ব্যবহৃত হইবার জন্য বর্ত্তিয়া থাকে। যাহা ছিল সাত্ত্বিক কর্ম্ম, তাহাই হয় সিদ্ধপ্রকৃতির মুক্ত ক্রিয়া; সেখানে আর ব্যক্তিগত কোন খণ্ডতা থাকিতে পায় না; এই গুণ বা ঐ গুণটিতে কোনরূপ আসক্তি থাকে না—থাকে শুধু এক পরমতম অধ্যাত্ম আত্মরূপায়ণ। ভগবৎসন্ধানী ও অধ্যাত্মজ্ঞানের দ্বারা একমাত্র দিব্যকর্ম্মী ভগবানে সমর্পিত কর্ম্মসকলের ইহাই হয় চরম পরিণতি।

এখনও একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন আছে; প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে সেটির খুবই গুরুত্ব ছিল, আর সেই প্রাচীন মতের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার সাধারণ প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী; গীতা ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়াছে, এখন তাহা যথাস্থানে উত্থাপিত হইতেছে। সাধারণ স্তরে সকল কর্ম্মই গুণত্রয়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়; যে-কর্ম্মটি করিতে হইবে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম, তাহার তিনটি রূপ—দান, তপ ও যজ্ঞ এবং ইহাদের প্রত্যেকটি কিম্বা সবগুলিই যে কোন একটি গুণের প্রকৃতি অনুযায়ী হইতে পারে। অতএব ঐগুলিকে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চতম সাত্ত্বিক স্তরে তুলিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহার পর আরও অগ্রসর হইয়া এমন এক প্রসারতায় উপনীত হইতে হইবে যেখানে সকল কর্ম্মই হইবে অবাধ আত্মদান, দিব্য তপের শক্তি, অধ্যাত্মজীবনের নিত্য যজ্ঞ। কিন্তু ইহা হইতেছে একটি সাধারণ নিয়ম, আর এই সকল আলোচনা দ্বারা কেবল সাধারণ তত্ত্বগুলিই বিবৃত হইয়াছে, সেগুলিই নির্ব্বিশেষে সকল কর্ম্ম এবং সকল মনুষ্যের পক্ষেই প্রযুজ্য। সকলেই কালক্রমে অধ্যাত্মবিকাশের দ্বারা এই দৃঢ় সংযম, এই উদার সিদ্ধি, এই উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। কিন্তু যদিও মন ও কর্ম্মের সাধারণ বিধিসকল মনুষ্যের পক্ষে সমান তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, সর্ব্বদা বৈচিত্র্যের একটা নীতি রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে কেবল মানবীয় আত্মা, মন, সঙ্কল্প, প্রাণের সাধারণ নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করে তাহাই নহে; পরন্তু নিজের বিশিষ্ট প্রকৃতিরও অনুসরণ করে; প্রত্যেক মনুষ্য তাহার নিজের পরিস্থিতি, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ও শক্তি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম সম্পাদন করে—অথবা বিভিন্ন ধারার অনুসরণ করিয়া চলে। এই যে বৈচিত্র্য, প্রকৃতির এই ব্যষ্টিগত নীতি, ইহাকে অধ্যাত্ম সাধনায় কোন স্থান দিতে হইবে?

এই জিনিষটার উপর গীতা কতকটা জোর দিয়াছে; এমন কি প্রারম্ভে যে ইহার খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহা বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। প্রথমেই গীতা অর্জ্জুনের স্ব-ধর্ম্মের কথা, ক্ষত্রিয় হিসাবে তাহার প্রকৃতি, নীতি ও কর্ম্মের কথা বলিয়াছে; বিশেষ জোরের সহিত বিধান দিয়াছে যে, যাহার যাহা নিজস্বপ্রকৃতি, নীতি, কর্ম্ম তাহা পালন ও অনুসরণ করা কর্ত্তব্য—ইহা দোষযুক্ত হইলেও সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয় (১); পরের ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া বিজয়লাভ করা অপেক্ষা নিজের ধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়। পরের ধর্ম্ম অনুসরণ করা আত্মার পক্ষে বিপজ্জনক; অর্থাৎ তাহার বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক ধারার বিরোধী, সেটি হয় যন্ত্রবৎ আরোপিত—অতএব বাহির হইতে আরোপিত, কৃত্রিম এবং আত্মার যে প্রকৃত মহত্ত্ব সেইদিকে ক্রমবর্দ্ধনের পক্ষে বিনষ্টিকর। সত্তার ভিতর হইতে যাহা আইসে তাহাই যথাযথ ও স্বাস্থ্যকর জিনিষ, তাহাই অকৃত্রিম কর্ম্মধারা; বাহির হইতে ইহার উপর যাহা জোর করিয়া আরোপ করা হয় অথবা প্রাণের তাড়না বা মনের ভ্রান্তির দ্বারা চাপাইয়া দেওয়া হয় সেইটি নহে। প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক সংস্কৃতির চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্মে এই স্বধর্ম্মের বাহ্যিক মোটামুটি চারি বিভাগ করা হইয়াছে। গীতা বলিয়াছে, সেই প্রথা একটি ভগবৎ বিধানের অনুযায়ী, মায়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। অন্য কথায়, সক্রিয় প্রকৃতির চারিটি সুস্পষ্ট শ্রেণী আছে, অথবা প্রকৃতি—অধিষ্ঠিত পুরুষের চারিটি মূলরূপ বা স্বভাব আছে; আর প্রত্যেক মানুষের উপযোগী কর্ম্ম হইতেছে তাহার প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপের অনুযায়ী। এইটিই এখন আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। গীতা বলিতেছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক ভাব, মূল স্বরূপ (স্বভাব) হইতে জাত

---

(১) শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩। ৩৫

গুণানুসারে তাহাদের কর্ম্মসকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে (২)। শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য—এই সকল ব্রাহ্মণের কর্ম্ম—তাঁহার স্বভাব হইতে জাত। শৌর্য্য, তেজ, দৃঢ়সঙ্কল্প, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান এবং ঈশ্বরভাব (শাসন কর্ত্তা ও নেতার ভাব), এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষিকর্ম্ম, গোপালন, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্ম, এই সকল বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। সকল প্রকার পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহার পর গীতা বলিতেছে, (৩) যে-ব্যক্তি জীবনে আপন স্বভাবানুরূপ কর্ম্ম করে সে অধ্যাত্ম সংসিদ্ধি লাভ করে; অবশ্য ঐ সিদ্ধিলাভ কেবল কর্ম্মটির দ্বারাই হয় না—পরন্তু যদি সে যথাযথ জ্ঞান ও যথাযথ প্ররোচনা লইয়া ঐ কর্ম্ম করে, বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার অর্চ্চনারূপে যদি সে ঐ কর্ম্ম করিতে পারে, যে বিশ্বেশ্বর হইতে জীবগণের সকল কর্ম্ম-প্রচেষ্টা উৎপন্ন হয় তাঁহাকেই যদি ঐকান্তিক ভাবে ঐ কর্ম্ম নিবেদন করিতে পার কেবল তাহা হইলেই সে সিদ্ধিলাভ করে। যে প্রচেষ্টা, যে ক্রিয়া ও কর্ম্মই হউক না কেন, সবই এইরূপ কর্ম্মার্পণের দ্বারা সমস্ত জীবন, আমাদের ভিতরে ও বাহিরে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে আত্মনিবেদনে পরিণত হইতে পারে এবং তাহাই অধ্যাত্ম-সিদ্ধিলাভের উপায়ে পরিণত হয়। কিন্তু যে-কর্ম্ম কোন ব্যক্তির নিজ স্বভাবের অনুযায়ী নহে, যদিও তাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয়, কোন বাহ্যিক ও কৃত্রিম নীতি অনুসারে বিচার করিলে যদিও তাহা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীত হয় অথবা জীবনে অধিকতর সাফল্য আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও তাহা আভ্যন্তরীণ বিকাশের পক্ষে নিকৃষ্টতর—ঠিক এই কারণেই যে তাহার প্ররোচনা বাহ্যিক, তাহার প্রেরণা যন্ত্রবৎ (৪)। নিজের স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্মই শ্রেয়, যদিও অন্য কোন দিক দিয়া দেখিলে সেইটি দোষযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। মানুষ যখন সত্য অভিসন্ধি লইয়া এবং নিজের প্রকৃতির ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করে তখন সে কোনরূপ পাপ বা মালিন্যের ভাগী হয় না। গুণত্রয়ের ক্ষেত্রে সকল ক্রিয়াই ত্রুটিযুক্ত, সকল মানবীয় কর্ম্মই দোষ, চ্যুতি ও অপূর্ণতার অধীন; কিন্তু সে-জন্য আমাদের নিজ নিজ কর্ম্ম এবং স্বাভাবিক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত হয় না (৫)। কর্ম্ম হওয়া চাই সুনিয়ন্ত্রিত, নিয়তং কর্ম্ম, কিন্তু তাহা হওয়া চাই মানুষের স্বরূপতঃ নিজস্ব, ভিতর হইতেই বিবর্ত্তিত, তাহার সত্তার সত্যের সহিত সুসমঞ্জস, স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম।

গীতার সঠিক তাৎপর্য্যটি এখানে কি? ইহার যে বাহ্যিক অর্থ সেইটিকেই প্রথমে ধরা যাউক—গীতা যে নীতিটি বিবৃত করিয়াছে ভারতীয় জাতি ও সেই যুগের ধ্যানধারণার দ্বারা ইহা কিরূপ অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, প্রাচীন সংস্কৃতিতে ইহার কি অর্থ ছিল প্রথমে সেইটিই বিবেচনা করা যাউক। এই শ্লোকগুলি এবং এই বিষয়ে গীতা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছে, জাতিভেদ সম্বন্ধে বর্ত্তমান বাক্‌বিতণ্ডায় তাহা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে, কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া প্রচলিত প্রথার সমর্থন করিতেছে, আবার কেহ কেহ জাতিভেদের বংশানুক্রমিতা অপ্রমাণ করিতেই ইহার সাহায্য লইতেছে। বস্তুতঃ গীতার শ্লোক-গুলি প্রচলিত জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে, কারণ ইহা হইতেছে প্রাচীন সামাজিক চাতুর্ব্বর্ণ্যের আদর্শ আর্য্য-সমাজের চারিটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ এবং গীতার বর্ণনার সহিত ইহার কোন

(২) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভাবৈর্গুণৈঃ ॥১৮।৪১
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানংবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রাহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩
কৃষি গৌরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যং কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪

(৩) স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্ম নিয়তং সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬

(৪) শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭

(৫) সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮

মিলই নাই। কৃষি, গোরক্ষা এবং সকল প্রকার বাণিজ্যকে গীতায় বৈশ্যের কর্ম্ম বলা হইয়াছে; কিন্তু পরবর্ত্তী জাতিভেদ প্রথায় যাহারা কৃষি এবং গোরক্ষায় ব্যাপৃত, শিল্পী, ক্ষুদ্র-কারিগর এবং অন্যান্য অনেকেই বস্তুতঃ শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে; কোথাও বা তাহারা সমাজের গণ্ডীর বাহিরে পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়িয়াছে; আর কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত কেবল বণিক শ্রেণীই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাও সর্ব্বত্র নহে। কৃষি, রাজকার্য্য, চাকুরী, এই সব বৃত্তি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই অবলম্বন করিতেছে। এই ভাবে অর্থনীতিক কর্ম্মবিভাগে এমন গোলমাল হইয়া গিয়াছে যে তাহার আর সংশোধনের কোন সম্ভাবনাই নাই; আর গুণানুসারে কর্ম্মের নীতির স্থান ত জাতিভেদ প্রথায় আরও কম। এখানে আছে শুধু আচারের দৃঢ় বন্ধন, ব্যষ্টিগত প্রকৃতির প্রয়োজনের কোন হিসাবই লওয়া হয় না। আর জাতিভেদ প্রথার সমর্থকগণ ধর্ম্মের দিক্ হইতে যে তর্ক উত্থাপন করেন তাহা বিবেচনা করিলেও আমরা নিশ্চয়ই গীতার কথাগুলির উপর এমন অদ্ভুত অর্থ আরোপ করিতে পারি না যে, মানুষ তাহার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যের কোন হিসাব না লইয়াই তাহার পিতামাতার বা নিকট বা দূর পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবে, গোয়ালার ছেলে গোয়ালা হইবে, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হইবে, মুচির বংশধরগণ আবহমান কাল পর্য্যন্ত বরাবর জুতাই তৈয়ারী করিবে—এইটিই হইতেছে তাহার স্বধর্ম্ম; আর নিজের ব্যক্তিগত প্রেরণা বা গুণাগুণের হিসাব না লইয়া এইরূপ নির্ব্বোধ ও গতানুগতিক ভাবে পরধর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিলে আপনা হইতেই সে বিকাশের পথে অগ্রসর হইবে এবং অধ্যাত্ম মুক্তিলাভ করিবে—গীতার শিক্ষার এরূপ ব্যাখ্যা করা ত আরও অসমীচীন। প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রথা আদর্শ বিশুদ্ধ অবস্থায় যেমনটি ছিল অথবা ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় (কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইহা কখনই একটা আদর্শ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না অথবা ইহা ছিল একটা সাধারণ নিয়ম; বাস্তব জীবনে লোকে অল্পাধিক শৈথিল্যের সহিতই ইহার অনুসরণ করিত) সেইটিই হইতেছে এখানে গীতার কথাগুলির প্রকৃত লক্ষ্য এবং কেবল সেই প্রথার সম্বন্ধেই গীতার কথাগুলি বিবেচনা করিতে হইবে। আবার এখানেও বাহ্যিক অর্থটি যে ঠিক কি ছিল তাহা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার তিনটি দিক ছিল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক। অর্থ-নীতির দিক দিয়া ইহা সমষ্টি জীবনে সামাজিক মানুষের চারিপ্রকার কর্ম্ম ঠিক করিয়াছিল, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও বুদ্ধি-বিষয়ক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম। অতএব কর্ম্ম চারি প্রকারে—পৌরহিত্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চ্চার কর্ম্ম, রাজ্যশাসন, রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালন ও যুদ্ধের কর্ম্ম, উৎপাদন, অর্থোপার্জ্জন এবং বাণিজ্যের কর্ম্ম, মজুর ও পরিচারকের কর্ম্ম। চারিটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে এই চারি প্রকার কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দেওয়ার উপর সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই প্রথা শুধু যে ভারতেরই বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা নহে; সামাজিক ক্রম বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ অবস্থায় কিছু বৈষম্যের সহিত এই প্রথা অন্যান্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজেরও প্রধান লক্ষণ ছিল। এখনও সাধারণতঃ সকল সমাজের জীবনেই এই চারি প্রকার কর্ম্ম অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাগ আর কোথাও নাই। প্রাচীন প্রথাটি সর্ব্বত্রই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছিল একটা অধিকতর শিথিল ব্যবস্থা, অথবা যেমন ভারতে হইয়াছে—একটা বিশৃঙ্খল ও জটিল সামাজিক আড়ষ্টতা ও অর্থনৈতিক অচলতার উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহা শেষ পর্য্যন্ত জাতিভেদের বিষম গোলমালে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক কর্ম্মবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ছিল একটা কৃষ্টিগত আদর্শ; তাহা প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তাহার ধর্ম্মবিষয়ক আচার, তাহার মর্য্যাদার ধারা, নৈতিক বিধি বিধান, উপযোগী শিক্ষা ও অনুশীলন, বিশিষ্ট চরিত্র, বংশগত আদর্শ ও সাধনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বাস্তব জীবনের সত্য সকল সময়েই যে পরিকল্পনাটির অনুরূপ ছিল তাহা নহে (মানসিক আদর্শ এবং প্রাণ ও দেহের ক্ষেত্রে ব্যবহার, এই দুইয়ের মধ্যে সকল সময়েই কতকটা ব্যবধান থাকে), কিন্তু যতদূর সম্ভব আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার একটা অবিশ্রান্ত ও অদম্য প্রয়াস চলিয়াছিল। এই প্রয়াসের এবং অতীতে সামাজিক মানুষের শিক্ষা ও সাধনায় ইহা যে কৃষ্টিগত আদর্শ ও পরিবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী ছিল;

কিন্তু অতীতের সমাজ-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে ইহার যে মূল্য আছে তাহা ছাড়া আজিকার দিনে ইহার আর কোন সার্থকতাই নাই। শেষতঃ যেখানেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানেই ইহা ধর্ম্মভাবের দ্বারা অল্পাধিক সমর্থিত হইয়াছিল (প্রাচ্যদেশে অধিক, ইউরোপে খুবই অল্প) এবং ভারতে ইহাকে এক গভীরতর আধ্যাত্মিক উপযোগিতা ও অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। এই আধ্যাত্মিক অর্থটিই হইতেছে —গীতার শিক্ষার যথার্থ মর্ম্ম কথা।

গীতা যখন রচিত হয় তখন এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল এবং ইহার আদর্শটি ভারতীয় মনকে অধিকার করিয়াছিল ; গীতা এই আদর্শ এবং ইহার আধ্যাত্মিক ভিত্তি দুইটিই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারিবর্ণ আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে" (৪।১৯)। কেবল এই উক্তিটির উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে পারা যায় না যে, গীতা এই প্রথাটিকে শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ এইরূপ স্বীকার করে নাই ; বরং তাহারা স্পষ্টই বলিয়াছে যে, আদিতে ইহা ছিল না এবং যুগ বিবর্ত্তনে পরবর্ত্তীকালেও ইহা থাকিবে না। তথাপি এই উক্তিটি হইতে এমন বুঝা যাইতে পারে যে, সামাজিক মানুষের যে চতুর্ব্বিধ কর্ম্মবিভাগ—ইহা সাধারণতঃ প্রত্যেক সমাজেরই মানসিক ও অর্থ নৈতিক প্রয়োজনের অন্তর্নিহিত ; অতএব যে বিশ্বপুরুষ সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত মানব জীবনে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন, এইটি তাঁহারই একটি দিব্য বিধান। বস্তুতঃ গীতার এই পদটি হইতেছে সাধারণ বুদ্ধির ভাষায় বেদের পুরুষ সূক্তের বিখ্যাত রূপকটির * বিবৃতি। কিন্তু তাহা হইলে এই সকল কর্ম্মবিভাগের স্বাভাবিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক রূপ কি হইবে? প্রাচীন কালে বংশানুক্রমিক নীতিটিই কার্য্যতঃ ভিত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম মানুষের সামাজিক কর্ম্ম ও পদমর্য্যাদা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সুযোগ, জন্ম ও সামর্থ্যের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; এখনও মুক্ততর এবং অপেক্ষাকৃত শিথিলবদ্ধ সমাজে এইরূপই হইয়া থাকে ; কিন্তু সামাজিক স্তরবিভাগে যেমন বেশী বেশী বাধাধরা হইয়া পড়িল, মানুষের পদমর্য্যাদাও কার্য্যতঃ জন্মের দ্বারাই প্রধানতঃ কিম্বা কেবল তাহারই দ্বারা নির্দ্ধারিত হইল এবং পরবর্ত্তী জাতিভেদ প্রথায় জন্মই পদমর্য্যাদার একমাত্র বিধি হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণের ছেলে পদমর্য্যাদায় সকল সময়েই ব্রাহ্মণ, যদিও ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও চরিত্রের কিছুই তাহার মধ্যে না থাকে—বুদ্ধিগত শিক্ষা বা অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যোগ্যতা বা জ্ঞান না থাকে, তাহার আপন শ্রেণীর যথার্থ কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধই না থাকে, তাহার কর্ম্মে বা তাহার প্রকৃতিতে ব্রাহ্মণত্বের কিছুই না থাকে।

এইরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল ; কারণ কেবল বাহ্যিক লক্ষণগুলিই সহজে এবং সুবিধামত নির্ণয় করা সম্ভব এবং ক্রমশঃ বেশী বেশী যন্ত্রভাবাপন্ন জটিল ও গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থার জন্যই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক লক্ষণ। কল্পিত বংশানুক্রমিক গুণের সহিত মানুষের প্রকৃত সহজাত চরিত্র ও সামর্থ্যের যে পার্থক্য হওয়া সম্ভব তাহা শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা পূরণ করিবার বা যথাসম্ভব কম করিবার চেষ্টা কিছুকাল হইয়াছিল ; কিন্তু কালক্রমে এই প্রয়াস বন্ধ হইয়া যায় এবং বংশানুক্রমিক প্রথাই অনতিক্রমণীয় বিধান হইয়া পড়ে। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ বংশানুক্রমিক প্রথা স্বীকার করিলেও বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, গুণ, চরিত্র এবং সামর্থ্যই হইতেছে একমাত্র সুদৃঢ় ও যথার্থ ভিত্তি ; এইগুলি না থাকিলে বংশগত সামাজিক পদমর্য্যাদা আধ্যাত্মিক মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়—কারণ তাহার প্রকৃত সার্থকতা নষ্ট হইয়া যায়। গীতাও যেমন সর্ব্বত্র তেমনিই এখানে আভ্যন্তরীণ সত্যটির উপরেই তাহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গীতা একটি শ্লোকে মানুষের জন্মের সহিত জাতকর্ম্মের কথা বলিয়াছে বটে, সহজম্ কর্ম্ম, কিন্তু কেবল ইহা হইতেই বংশানুক্রমিক ভিত্তি বুঝায় না। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে ভারতীয় তত্ত্বটিই গীতা গ্রহণ করিয়াছে এবং তদনুসারে মানুষের সহজাত প্রকৃতি এবং জীবনের ধারা মূলতঃ তাহার অতীত জন্ম সকলের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, এ-সব হইতেছে তাহার অতীতের কর্ম্ম এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তনের দ্বারা ইতিপূর্ব্বেই সম্পাদিত আত্মবিকাশ ; এ-সব কেবল তাহার বংশ, পিতামাতা, শারীরিক জন্মরূপ স্থূল ব্যাপারের উপর নির্ভর করে না, এইগুলি কেবল একটা

---

* ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

পরিচায়ক লক্ষণ মাত্র হইতে পারে, কিন্তু মুখ্যশক্তি নহে। 'সহজ' শব্দটির অর্থ যাহা আমাদের সহিত জন্মিয়াছে, যাহা কিছু স্বাভাবিক, সহজাত, অন্তর্নিহিত ; গীতা অন্য সকল স্থানে ইহার পরিবর্ত্তে "স্বভাবজ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। মানুষের কর্ম্ম বা বৃত্তি তাহার গুণের দ্বারাই নির্দ্ধারিত ; ইহা হইতেছে তাহার স্বভাব হইতে জাত কর্ম্ম, স্বভাবজম্ কর্ম্ম এবং তাহার স্বভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম। কর্ম্ম ও বৃত্তির ভিতর দিয়া যে আভ্যন্তরীণ গুণ ও ধর্ম্ম প্রকট হইতেছে তাহার উপর জোর দেওয়াই হইতেছে গীতার কর্ম্ম-বাদের সমগ্র তত্ত্ব।

আর গীতা স্বধর্ম্মের অনুসরণের যে আধ্যাত্মিক সার্থকতা ও শক্তি দেখাইয়াছে, বাহ্যিক রূপটির উপর জোর না দিয়া আভ্যন্তরীণ সত্যের উপর এই জোর দেওয়া হইতেই তাহার উৎপত্তি। এইটিই হইতেছে গীতার এই অংশটির বাস্তবিক প্রয়োজনীয় মর্ম্মকথা। বাহ্যিক সামাজিক ব্যবস্থার সহিত ইহার সম্বন্ধের উপর সাধারণতঃ অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে, যেন ঐ বাহ্যিক ব্যবস্থাটিকে তাহার উৎকর্ষতার জন্যই সমর্থন করা কিম্বা দার্শনিক ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বারা উহার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করাই ছিল গীতার লক্ষ্য। বস্তুতঃ বাহ্যিক ব্যবস্থাটির উপর গীতা খুবই কম ঝোঁক দিয়াছে ; পরন্তু বর্ণব্যবস্থা যে আভ্যন্তরীণ নীতিকে বাহ্যিক ব্যবহারে সুনিয়ন্ত্রিত রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল গীতা তাহারই উপর খুব বেশী ঝোঁক দিয়াছে। আর ব্যষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনে এই নীতিটির যে উপযোগিতা—এখানে সেইটিরই উপরে রহিয়াছে গীতার দৃষ্টি, সমষ্টিগত ও অর্থনৈতিক জীবনে অথবা অন্য কোন সামাজিক ও কৃষ্টিগত প্রয়োজনে ইহার যে উপযোগিতা আছে তাহার উপরে নহে। গীতা বৈদিক যজ্ঞের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাকে গভীর-ভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে ইহার এমন এক আভ্যন্তরীণ, অন্তর্মুখী ও সার্ব্বজনীন অর্থ—এমন একটা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য দিয়াছে যাহাতে ইহার সমস্ত মূল্যের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখানেও ঠিক ঐভাবে গীতা মানুষের চারিবর্ণ বিভাগকে গ্রহণ করিয়াছে, তবে ইহাকে গভীরভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে—ইহার এক আভ্যন্তরীণ, অন্তর্মুখী ও সার্ব্বজনীন অর্থ, একটা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ভাবটির মূল্য অনুরূপ হইয়াছে এবং তাহা এক স্থায়ী ও জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আর কোন বিশেষ অস্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। যে আর্য্যসমাজ ব্যবস্থা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে তাহার বৈধতা প্রতিপাদন করাই গীতার লক্ষ্য নহে—যদি শুধু তাহাই হইত তাহা হইলে গীতার স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্ম্মের নীতিতে কোন চিরন্তন সত্য বা মূল্য থাকিত না—গীতার লক্ষ্য হইতেছে মানুষের বাহিরের জীবনের সহিত তাহার অন্তর্জীবনের সম্বন্ধ, তাহার অন্তরাত্মা হইতে, তাহার প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ধারা হইতে তাহার কর্ম্মের বিবর্ত্তন।

আর আমরা বস্তুতঃ দেখি যে, গীতা নিজেই তাহার উদ্দেশ্যটি খুবই স্পষ্ট করিয়াছে ; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম বাহ্যিক বৃত্তির দিক দিয়া বর্ণনা না করিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা, পৌরোহিত্য এবং শাস্ত্রচর্চ্চা বা শাসনকার্য্য,যুদ্ধ এবং রাজনীতি এইরূপ নির্দ্দেশ না করিয়া সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির দিক দিয়াই বর্ণনা করিয়াছে। এখানে গীতার ভাষাটি আমাদের কাছে কেমন একটু বিচিত্রই লাগে। শান্তি, আত্মসংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমাশীলতা, সরলতা, জ্ঞান, অধ্যাত্ম সত্য গ্রহণ ও অনুশীলন—সাধারণতঃ এইগুলি মানুষের বৃত্তি, কর্ম্ম বা পেশা বলিয়া কথিত হয় না। অথচ গীতা ঠিক এইটিই বুঝিয়াছে এবং বলিয়াছে—বলিয়াছে যে, এই সব জিনিষ, ইহাদের বিকাশ, ব্যবহারের ভিতর দিয়া ইহাদের অভিব্যক্তি, সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধর্ম্মকে রূপ দিবার পক্ষে ইহাদের ক্ষমতা এই সবই হইতেছে ব্রাহ্মণের প্রকৃত কর্ম্ম ; শিক্ষা, পৌরোহিত্য এবং অন্যান্য বাহ্যিক কর্ম্মগুলি হইতেছে কেবল ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্র, এই আভ্যন্তরীণ বিকাশের অনুকুল উপায় স্বরূপ, ইহার যথাযথ আত্ম-অভিব্যক্তি, সুনির্দ্দিষ্ট বর্ণগত আদর্শে এবং বাহ্যিক চরিত্রের সুদৃঢ়তায় ইহার স্থায়ী রূপলাভের পন্থা-স্বরূপ। যুদ্ধ, রাজধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, নেতৃত্ব ও শাসন হইতেছে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অনুরূপ ক্ষেত্র এবং উপায় ; কিন্তু তাহার প্রকৃত কর্ম্ম হইতেছে সক্রিয় যুযুধান রাজোচিত বা বীরোচিত প্রকৃতির ধর্ম্মকে বিকাশ করা, ব্যবহারে অভিব্যক্ত করা, বাহ্যরূপে এবং গতির ওজস্বান ছন্দে প্রকট করা। বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্ম্ম বাহ্যবৃত্তির দিক দিয়াই

বর্ণিত হইয়াছে, আর এই যে বৈপরীত্য ইহারও কিছু অর্থ থাকিতে পারে। কারণ যে প্রকৃতি উৎপাদন ও উপার্জ্জনের দিকে চলে, কিম্বা শ্রম ও পরিচর্য্যার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, বণিকের ও দাসের মনোবৃত্তি—ইহারা সাধারণতঃ হয় বহির্মুখী, কর্ম্মের চরিত্র গঠন করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা ইহার বাহ্যিক মূল্য লইয়াই অধিক ব্যাপৃত থাকে; আর প্রকৃতির সাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার পক্ষে এই প্রবৃত্তি তেমন অনুকূল নহে। আর এই কারণেই ব্যবসা ও যন্ত্র-শিল্পের যুগ অথবা কর্ম্ম ও উৎপাদনের চিন্তায় ব্যাপৃত সমাজ নিজের চারিদিকে এমন একটা আবেষ্টনের সৃষ্টি করে যাহা অধ্যাত্ম-জীবন অপেক্ষা ঐহিক জীবনেরই অধিকতর অনুকূল; উর্দ্ধগামী মন ও আত্মার সূক্ষ্মতর সিদ্ধি অপেক্ষা স্থূল জীবনে দক্ষতার পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। তথাপি এই ধরণের প্রকৃতি এবং ইহার কর্ম্মেরও আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে এবং তাহাদিগকেও সিদ্ধিলাভের উপায় ও শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। অন্যত্র যেরূপ বলা হইয়াছে, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মণ এবং মহানুভবতা, শৌর্য্য ও মহৎ চরিত্র শক্তির আদর্শ লইয়া ক্ষত্রিয়, শুধু ইহারাই নহে—পরন্তু ধনোপার্জ্জনব্রতী বৈশ্য, শ্রম পাশে বদ্ধ শূদ্র, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ ও পরাধীন জীবন লইয়া নারী, এমন কি পাপ-যোনিসম্ভূত চণ্ডাল, ইহারাও এই পথ ধরিয়া অচিরাৎ উচ্চতম আভ্যন্তরীণ মহত্ত্ব ও অধ্যাত্ম স্বাধীনতার দিকে, সিদ্ধির দিকে, মানুষের মধ্যে যে দিব্য সত্তা রহিয়াছে তাহার মুক্তি ও পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। *

---

* Essays on the Gita হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনুদিত।

কালিদাস

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

উজ্জয়িনীর রঙ্গমঞ্চে,
নব রত্নের সভাতে—
রাজা বিক্রম বিষণ্ণ মন
বসিয়া আছেন প্রভাতে।

হয়ে গেছে কাল শকুন্তলার
সর্ব্ব প্রথম অভিনয়,
নট নটী দল বিদায় মাগিছে,
প্রণতি জানায়ে সবিনয়।

কি সুধার পরিবেশন করেছে
সে কি আদর্শ চারু তার,
দিকে দিকে ছোটে যশ সৌরভ
সেই অপূর্ব্ব বারতার।

তন্ময় আজ গোটা রাজধানী,
একই কথা সব ভবনে,
'মৃদু মৃগ দেহে মেরোনা ক শর'
এখনো পশিছে শ্রবণে।

শকুন্তলার বিরহে যেমন
অবসাদ লীন তপোবন,
বিশাল বিশালা তেমনি হয়েছে
শিথিল সবার দেহ মন।

বলিলেন রাজা হে কবি তোমার
প্রতিভা দিয়েছে যে আভাষ
সেই ত যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি
সেই ত মোদের ইতিহাস।

যা কিছু রম্য, যাহা সুমধুর,
তুমি রেখে গেলে কুড়ায়ে,
কাল ভাণ্ডারে তব অবদান
দানেতে যাবে না ফুরায়ে।

শত সহস্র বরষ পরে ও
এই সুধারস গড়াবে,
জন্মান্তর সৌহার্দ্দ্য কি
স্মরাবে হে সখা স্মরাবে ?

বন জ্যোৎস্নার কুসুমোদ্গম,
মৃদু গুঞ্জন ভ্রমরের,
হংস পদীর ও গীত লহরী
ভোগ্য করিলে অমরের।

তরু আলবালে জল দেয় বালা,
মৃগ করে কার পথ রোধ,
তাদের ও চিত্র অমর করেছে
নিবিড় তোমার রস বোধ।

মোদক খণ্ড-লোভী মাধবৎ,
মোর কঞ্চুকী সারথি,
অনন্ত প্রাণ লভিয়া আজিকে
হেরিছে তোমার আরতি।

পরভৃতা তব শুনিয়াছে শ্লেষ,
আতপত্র ও হাসিছে,
মূক ও মৌন তোমার পরশে
মুখর হইয়া আসিছে।

সে দিনের সেই উৎসব প্রাতে
দেখিনু দাঁড়ায়ে দুজনায়,
একদিকে উঠে রাঙ্গা হ'য়ে রবি
আন্ দিকে শশী ডুবে যায়।

লোক ভাগ্যের ব্যসন উদয়
কি ছবি ফুটালে তুলিতে,
অতুলন তব প্রকাশ ভঙ্গি,
কিছু যে দেবে না ভুলিতে।

সিপ্রা আনিলে কি মন্ত্র দিলে
মূর্ত্তি রচিলে কি রসের ?
মোদের ক্ষণিক সুখ দুখ হল—
আনন্দ চির দিবসের।

অতি সন্ধানী কঠিন বড়ই
তোমার নিকট করা বাস,
মরমের ব্যথা, সরমের কথা,
কিছুই রাখ নি অপ্রকাশ।

নভো ঘেরা তব ইন্দ্রজালেতে
সকলি ধরেছ যাদুকর,
তত্ত্ব খুঁজিয়া মোরা হারা হই
কৃতী ত তুমিই মধুকর।

আজিকার আমি প্রবল মালিক,
কেহ নই আমি বালিকার,
জীর্ণ তুচ্ছ লৌহ তন্ত্র—
নব রত্নের মালিকার।

হে মহামানব চিনেও চিনেনি
হয়ত কয়েছি কুভাষণ,
কাল কালিমার অনেক উর্দ্ধে
উজ্জ্বল তব সুখাসন।

অনন্ত পথে উঠ জয় রথে
কত করিয়াছি পরিহাস,
তুমি যে আমার এই গৌরব
আমরা তোমার কালিদাস।

হে কবি এ যুগ ধন্য করিলে,
সজীব করিলে আঁকিয়া
মহাকাল ভালে অমৃতক্ষরা
শশি-কলা গেলে রাখিয়া।

রাজ্য ও রাজা মিলাইয়া যাবে
কাল সাগরেতে পাবে লয়,
তুমি আমাদের মরণ সুহৃদ
তুমি আমাদের পরিচয়।

বিনীত বেশেতে যেতে হবে কবি
পরাইয়া দাও তব চীর,
অকূলের কূলে দেখাইয়া দাও
কোথা আশ্রম মরীচির।

বন্ধুর দেওয়া বিজয় তিলক
মুছনা হে কবি মুছনা
আসে অনাগত গুরু গৌরব
এ কেবল তারি সূচনা।

কালরাত্রি

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পুঁটুরাণীর ভালো নাম বিজনবাসিনী। এ নাম রাখিয়াছে তাহার স্বামী। অখ্যাত এক পল্লীগ্রামের শেষপ্রান্তে তাহাদের খড়ে ছাওয়া মাটির কুটীর—সোনারপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। রাংচিতার বেড়ায় ঘেরা তাহাদের সেই কুটীরের কিছু দূরে দামোদরবাহিনী শাখানদী সুবর্ণরেখা। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে সে, বৃদ্ধ পিতার শেষ বয়সের একমাত্র সন্তান। পিতা মারা গিয়াছেন আজ প্রায় এক বৎসর, আপনার বলিতে তাহার এখন আর কেহ নাই, সংসারে সে একান্ত একা।

পুঁটুরাণীর বয়স পনেরো। হরিণীর মতো আয়ত মদির তাহার চোখের তারা দুইটি নিবিড় কালো, বৃষ্টিধৌত স্নিগ্ধ শ্যামল পল্লবের মতো গায়ের রঙ, চাঁপার কলির মতো কোমল আঙুল, নিটোল উজ্জ্বল কপাল, জোড়া ভ্রূর নীচে ভ্রমরের মতো দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ চোখের পাতা, বাঁশির মতো উন্নত নাসিকা, শাঁখের মতো গ্রীবা, বলয়িত দুই বাহু এবং নবকিশলয়ের মতো লাবণ্যে ঢলঢল মুখখানির বুঝি তুলনা নাই।

পুঁটুরাণীর সৌভাগ্যেরও বোধ করি সীমা নাই। সাহেবগঞ্জের এক রাজা উপাধিধারী বিরাট ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র বরুণেন্দ্রনাথ সেবার বাহির হইয়াছিল বাঙলাদেশের পল্লী-ভ্রমণে। সুবর্ণরেখা নদীপথে নৌকাবিহার করিতে করিতে সেদিন যখন ছায়ানিবিড় স্বপ্নময় মাধুরীভরা ছোট একখানি গ্রাম এবং এই নদী জলরেখার উপরে ধীরে ধীরে ধূসর সন্ধ্যা-গোধূলির ছায়া ঘনাইয়া আসিল, তখন আচ্ছন্নের মতো মাঝিকে সে সেখানেই নৌকা বাঁধিতে বলিল। তখন পটে আঁকা ছবির মতো সেই পল্লীর চারিদিকে ঝিম্‌-ঝিম্‌ করিতেছে অসীম বিজনতা, ঘনায়মান গোধূলি-অন্ধকারের সেই আশ্চর্য্য রমণীয় স্তব্ধতার মধ্যে রামধনু-রঙীন আকাশে ক্ষান্ত-বর্ষণ শ্রাবণ শেষ হইয়া শেফলি-শুভ্র শরৎকালের আগমনীর বাঁশি বাজিতেছে। পুঁটুরাণী তখন কলসী লইয়া নদীর ঘাটে জল লইতে আসিয়াছিল। এই শ্যামায়মান রহস্যময় গোধূলি-আলোকের পরম মুহূর্ত্তে সহসা বরুণেন্দ্রনাথের সহিত পুঁটুরাণীর শুভদৃষ্টি ঘটিয়া গেল। মুগ্ধের মতো বহুক্ষণ বরুণ এই অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরীর আরক্তিম প্রফুল্ল মুখের দিকে অনিমেষ চোখে চাহিয়া রহিল। পুঁটুরাণী তখন সলজ্জ সঙ্কোচে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিতে সুরু করিয়াছে।

চমক ভাঙিলে বরুণ ডাকিল, শোনো!

পুঁটুরাণী সম্ভ্রমে সরমে সেই উন্নত গ্রীবা ফিরাইয়া সপ্রশ্নদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

আবেগকম্পিত অস্ফুটকণ্ঠে বরুণ কহিল, তোমার নাম কি?

পুঁটুরাণীর কপালে তখন মুক্তাবিন্দুর মতো ঘাম দেখা দিয়াছে। আনতমুখে অস্ফুটমধুর কণ্ঠে সে কহিল, পুঁটুরাণী।

বরুণের এবার একটু ভয় ভাঙিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বাড়ী কত দূরে!

পুঁটুরাণীর অপরিচয়ের রহস্যভরা লজ্জাও যেন একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতেছে। অদ্ভুত প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব সুন্দর তরুণের এই অভাবিত প্রশ্নে তাহারও বিস্ময়ের অবধি নাই। এবার একটু স্পষ্টকণ্ঠেই সে কহিল, এই ত, কাছেই।

বরুণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, কে কে আছেন তোমার?

পুঁটুরাণীর সারল্যভরা করুণ ভীরু চোখ দুইটি সহসা ছলছল করিয়া উঠিল। ধরা গলায় সে কহিল, কেউ না।

ব্যথিত বিস্ময়ে বরুণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর সহসা বলিয়া উঠিল, আমি বিদেশী। আজ রাত্রে এই গাঁয়ে কোথাও আশ্রয় চাই। তাই ··

সহসা পুঁটুরাণী বলিয়া ফেলিল, আপনি চলুন, পাশের বাড়ীতে আমার গ্রাম-সম্পর্কে পিসীমা আছেন, তিনি আমার মায়ের মতো, আপনার কোনো কষ্ট হবে না।

বরুণের মনে হইল, এই অপরিচিতা কিশোরীর কণ্ঠস্বর

বীণাবিনিন্দিত, তাহার এই সহজ, ব্যগ্র, ব্যাকুল আবাহন যেন উন্মাদক মোহের মতো তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই ছায়াশ্যামলা নদীমেখলা অপরূপ মাধুরীমদির মৌন গ্রামশ্রী, কুমারীর শুভ্র সিঁথির মতো দীর্ঘ পায়ে-চলা পথ, সজলকোমল শ্যাম দূর্ব্বাদলে বিকীর্ণ নদীতীর এবং মূর্ত্তিমতী গ্রামলক্ষ্মীর মতো আল্‌তা-রাঙা পায়ে দাঁড়াইয়া এই বয়ঃসন্ধিগতা কিশোরী—বরুণের মনে হইল, বুঝি এই রহস্যময়ী বিজনবাসিনী পুঁটুরাণীর রূপের অবধি নাই।

গ্রাম-সম্পর্কে পিসীমা মহামায়া দেবীর আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বয়সও হইয়াছে, পুঁটুরাণীর ভাবনায় তাঁহার বিন্দুমাত্র স্বস্তি ছিল না। তিনি যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন।

গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পুঁটুরাণীকে স্নেহ করিত। তাহার করুণ সুন্দর মমতাময় ভীরু চোখদুটির দিকে চাহিয়া অপরিসীম ভালোবাসায় তাহাদের বুক ভরিয়া উঠিত।

বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী চপলাঠাকরুণ বলিলেন, আহা বাপ-মা-মরা মেয়েটার ভাগ্যি ছিল গো! হবেই না বা কেন, লক্ষ্মীর মতো রূপ যেন গা ফেটে পড়ছে, ওর কি কষ্ট হতে পারে কখনো?

পুঁটুরাণী তখন রান্নাঘরে বসিয়া আপন মনে ক্ষণে ক্ষণে অজানা আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। পিছন হইতে কমলা আসিয়া তাহার দুই চোখ টিপিয়া ধরিল।

পুঁটুরাণী সহসা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, উঃ, ছাড়ো ছাড়ো লাগছে কমলদি!

চোখ ছাড়িয়া দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানে-কানে কমলা কহিল, সত্যি তোর পছন্দ আছে রাণী।

লজ্জায় তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া পুঁটুরাণী বলিয়া উঠিল, যাঃ।

পাশের ঘরে কমলার মা সুনয়নী তখন মহামায়া দেবীকে বলিতেছিলেন, জ্যাঠামশাই যে বলতেন ও রাজরাণী হবেই, সে কথা ত সত্যি হয়ে গেল!

কমলা কহিল, যাঃ কি, ওই শোন্। চল তোর বর দেখে আসি। বেচারী বড় ফাঁপরে পড়ে গেছে। দূরের কোন্ মাঠ হইতে যেন গাভীর হাম্বারবকে ডুবাইয়া রাখাল-ছেলের বাঁশির সুর ভাসিয়া আসিতেছে। আমনধানের গন্ধে ভরা এই অপরূপ শ্যামলী প্রকৃতির উচ্ছলিত শরীর হইতে যেন একটি করুণ শেফালি-সৌরভ শিশির-সজল পূবালি বাতাসে ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছে।

তখনও বেলা বেশি হয় নাই। রাংচিতার বেড়ায় ঘেরা দাওয়ার পাশে বরুণেন্দ্রনাথ বসিয়া আছে। অপূর্ব্ব সুন্দর আরক্তিম গৌরকান্তি, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, বিস্ফারিত বক্ষ, খড়্গের মতো নাসা, প্রশস্ত ললাট এবং বিশাল দুই চক্ষুর আশ্চর্য্য উজ্জ্বলতা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন নিপুণ ভাস্করের হাতে মর্ম্মর-খোদিত সজীব প্রতিমূর্ত্তি! তাহার দৃষ্টি তখন বহু দূরে প্রসারিত। সুমুখে কোমল দূর্ব্বাদলে ঢাকা দিগন্তলীন প্রান্তরে প্রজাপতি উড়িতেছে। রামধনু-রঙীন ক্ষণ-চপল রৌদ্রকরোজ্জ্বল স্ফটিকস্বচ্ছ অবারিত প্রসন্ন নীল আকাশে বিচিত্র পাখীর কাকলী যেন মূর্চ্ছিত, স্বপ্নাতুর গ্রামশ্রীকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে।

ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য স্নান-আহ্নিক সারিয়া খড়ম পায়ে দিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামের মধ্যে তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রাজর্ষি জনকের মতো জ্যোতির্ম্ময় তাঁহার জীবন। পুণ্যের একটি অচঞ্চল শুভ্র দিব্য দীপ্তিতে তাঁহার বিশাল দেহ হইতে যেন অপরূপ একটি প্রসন্ন মহিমা বিকীর্ণ হইতেছে। গম্ভীর অথচ বিরাট পুরুষ, কপালে চন্দনলেখা, গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালার নীচে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ দেখা যাইতেছে।

বরুণ উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

মধুর হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন, থাক্, থাক্, বোসো বাবা বোসো। তোমার নাম কি?

নতমুখে বরুণ বলিল, শ্রীবরুণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, পুঁটুরাণীকে তুমি বিবাহ করতে চাও?

বরুণ জবাব দিল না, মুখ নীচু করিয়া তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল। কপালে তাহার তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে।

ভবানীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাবাকে জানাতে হবে ত? পরশুই ভাদ্রমাস পড়ে যাচ্ছে।

বরুণ বলিল, তাঁকে না জানালেও বিশেষ ক্ষতি নেই। বিয়েতে আমার মত ছিল না ব'লে তাঁর বড় দুঃখ ছিল, তাঁর অমত হবে বলে মনে হয় না।

গম্ভীরকণ্ঠে ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, ও, বুঝলাম। বেশ। দেখি তোমার হাত।

ধীরে ধীরে বরুণ তাহার দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিয়া তাহার সুমুখে ধরিল।

তাহার করতলের রেখা বিচার করিতে করিতে ভবানী-প্রসাদের চোখ দুইটি ক্ষণে ক্ষণে আশ্চর্য্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, কখনো-বা সেই মুখে মেঘম্লান অপরাহ্ণের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

বরুণের হৃদয় আশা-আশঙ্কার ব্যাকুলতায় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে। ওদিকে সহসা পুঁটুরাণীর ডান চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল।

ভবানীপ্রসাদ হাত সরাইয়া কহিলেন, উঁহু, এ বিবাহ তুমি কোরো না বাবা, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। অবশ্য এ বিবাহে পুঁটুরাণীর ভবিষ্যৎ খুব ভালো, কিন্তু তোমার পক্ষে ফল শুভ হবে না।

বিবর্ণমুখে বরুণ কহিল, কারণটা জানতে পারলে আর তার প্রতিকার করলেও কি—

বাধা দিয়া ভবানীপ্রসাদ কহিলেন, হ্যাঁ, প্রতিকার অবশ্য নেই, কিন্তু মুক্তি আছে। যদি পুঁটুরাণীর অদৃষ্টের জোরে তোমার সে অমঙ্গল কেটে যায়, তবে তোমাদের আর কোনও ভয় নেই। তোমরা সুখী হবে।

তারপর গম্ভীরকণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, পুঁটুরাণী, এদিকে একবার শুনে যাও ত মা।

জানালার পাশেই তাহারা দাঁড়াইয়াছিল। কমলা ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহাকে বলিল, দেখবো তোর বরাতের জোর কেমন।

পুঁটুরাণী সলজ্জসঙ্কোচে নতমুখে কম্পিতবক্ষে ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া দাঁড়াইল।

ভবানীপ্রসাদ সস্নেহে তাহাকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, দেখি মা, দেখি তোমার হাতটা। না, না, লজ্জা কি?

পুঁটুরাণী তাহার বামহাতখানি তাঁহার দিকে আগাইয়া দিল। ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন, তাহার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

বহুক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টচিত্তে তিনি তাহার রেখা বিচার করিলেন। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, যাও মা ঘরে যাও, এ বিয়ে তোমাদের হবে।

লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া হরিণীর মতো চঞ্চল লঘু পায়ে পুঁটুরাণী ছুটিয়া পলাইল।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, ওর হাতেও তোমার অমঙ্গলের কিছু ছায়া আছে, কিন্তু নিয়তি, দেখলাম তোমাদের বিবাহ হবেই, কেউ রোধ করতে পারে না। তবে কালরাত্রিতে একটু সাবধানে থাকবে, তোমার বিশেষ আশঙ্কার সময় সেই রাত্রে—তবে পুঁটুরাণীর হাতের যা লক্ষণ দেখলাম, আমার বিশ্বাস, তুমি সেই অমঙ্গল কাটিয়ে উঠতে পারবে।

কম্পিতবক্ষে বরুণ তাঁহাকে প্রণাম করিল।

ভবানীপ্রসাদ মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, ভয় কোরো না, তোমরা সুখী হবে।

অসীম রহস্যময় নির্জ্জন পল্লীকুটীরের সুমুখে দিগ্বলয়লীন শ্যামল প্রান্তরে মধ্যাহ্নরৌদ্র তখন প্রখর হইয়া উঠিতেছে। নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখার অন্তরাল হইতে দূরাগত মধুর মর্ম্মরধ্বনি, সুবর্ণরেখার ধীর জলকলস্বরে সুর মিলাইয়া উজান বাহিয়া চলিয়াছে—চাষী ও জেলের দল—তাহাদের সারিগানের অস্ফুট সুর-ঝঙ্কার, বিজনবাসিনী তন্বী কিশোরী পুঁটুরাণীর অনন্ত বিস্ময়ভরা কালো চোখের চকিত চাহনি, তুলসীমঞ্চের বেদী ঘেরিয়া অপূর্ব্ব শেফালি-সৌরভ—সমস্ত মিলিয়া বরুণকে যেন মদির চঞ্চলতায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মনে হইল যেন তাহার জীবনের একমাত্র সাধের বস্তু ছোট বাঁশের বাঁশিটি বাহির করিয়া সেই গভীর করুণ রাগিণীর রোমাঞ্চকর মূর্চ্ছনায় এই পরম প্রিয়, একান্ত আত্মীয় গ্রামশ্রীকে আপন করিয়া লয়। তাহার এই বাঁশির আকর্ষণে সুরমূর্চ্ছনাহত বিমুগ্ধ সর্পের মতো এই নিরুপমা গ্রামলক্ষ্মী ঘুমাইয়া পড়িবে। এই বাঁশির তীব্রমদির সুরে তাহার সেই প্রেম, সেই মধুর স্বপ্নকে মূর্ত্তিমতী করিয়া এই মুহূর্ত্তটিকে অমর করিয়া রাখিবে।

সে তাহার বাঁশি বাহির করিল।

এমন সময়ে কমলা আসিয়া কহিল, ও কি অতিথি-ঠাকুরের কি আনন্দে বাঁশি বাজাবার ইচ্ছে হলো নাকি? নিন, উঠুন আপনার আসন পাতা হয়েছে।

মৃদু হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বরুণ কহিল, চলুন।

সৌভাগ্যক্রমে পরদিনই বিবাহের একটি ভালো দিন ছিল। শুভ গোধূলিলগ্নে বরুণেন্দ্রনাথের সহিত পুঁটুরাণীর বিবাহ হইয়া গেল। ভবানীপ্রসাদই সম্প্রদান করিলেন।

পর দিন বরুণ পুঁটুরাণীকে লইয়া দেশে রওনা হইল।

বর-বধূ যাত্রা করিতেছে, সকলেই অশ্রুসজল চোখে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। আয়ুষ্মতী বধূদের ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনিতে সুবর্ণরেখা নদীতীরে অপরাহ্নের আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। সানাইয়ের একটানা করুণ ইমন্ রাগিণী শোনা যাইতেছে। সীমন্তে সিন্দুর, পরণে রক্তচেলী, নববধূবেশে পুঁটুরাণীকে মানাইয়াছে বড় চমৎকার। চন্দনের পত্রলেখায় তাহার শুভ্রসুন্দর কপালে, রক্তিম কপোলে, বাসর-স্বপ্নোজ্জ্বল দুইটি অঞ্জনলেখা-অঙ্কিত মদির চক্ষে একটি মধুর বিষাদ-শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

মাঝি তাহার শঙ্খধবল পাল তুলিয়া দিয়াছে উজানী বাতাসে। বরুণ ও পুঁটুরাণী ভবানীপ্রসাদ ও মহামায়াকে প্রণাম করিয়া সজলচক্ষে নৌকায় গিয়া বসিল। সকলে অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া বর-বধূকে বিদায় জানাইল। নৌকা চলিতে সুরু করিল।

দাঁড়ের শব্দে নৌকা আগাইয়া চলিতেছে, ওপারে ছায়াবৃত অস্পষ্ট সবুজ গ্রামরেখা, নদীর বাঁকে বাঁকে ভাঙা মন্দির, বট-অশথের ঝুরি নামিয়া পড়িয়াছে তীরের মুখে, একঝাঁক শঙ্খচিল উড়িয়া চলিয়াছে কাশবনের উপর দিয়া। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। দূরে কোথায় যেন তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বলিতেছে। এই স্বর্ণাভ গোধূলি আলোকে বরুণ হঠাৎ পুঁটুরাণীর ঘোম্টা ফেলিয়া দিয়া নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি করিল।

মুগ্ধের মতো তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে দেখিয়া লজ্জারুণ আনন্দে পুঁটুরাণী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, যাও—

বরুণ তাহার খোঁপা খুলিয়া দিয়া একরাশ কালো চুল এলো করিয়া কহিল, যাও কি বলতে আছে, বলো, এসো।

চঞ্চলা বালিকার মতো মাথা নাড়িয়া পুঁটুরাণী বলিল, না, এসো না।

বরুণ তাহার কাছে আর একটু সরিয়া গিয়া বলিল, রাগ না কি?

পুঁটুরাণী উদাস চোখে তরঙ্গায়িত সুবর্ণরেখার নীল জলের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

বরুণ বলিল, কি, চুপ করে' রইলে যে!

মৃদু হাসিতেই পুঁটুরাণীর আকর্ণপ্রসারী কালো চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুক্তার মতো সুন্দর দাঁতগুলি দেখা গেল, পাতলা সেই ওষ্ঠাধরের এককোণে রক্তাভ কপোলে ছোট্ট একটি চমৎকার টোল পড়িল এবং সেই উচ্ছল তরল হাসির শব্দে কানের দুলের মাঝখানকার তারা দুইটি ঝিক্‌মিক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

আবিষ্টের মতো আবেগকম্পিত কণ্ঠে বরুণ বলিল, কি আশ্চর্য্য আমাদের বিয়ে—তোমাকে পাবার জন্যেই যেন ভগবান জোর ক'রে আমায় এখানে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক যেন স্বপ্নের মতো।...আজ থেকে তোমার নাম রাখলাম, বিজনবাসিনী।

পুঁটুরাণী কোনো কথা কহিল না। আনন্দে তাহার সর্ব্বশরীর তখন ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

শ্রাবণ-পূর্ণিমার দেরী নাই—মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ছায়াপথের তরল মদির রূপালি জ্যোৎস্না আকাশে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিয়াছে। নিশীথরাত্রির এই রমণীয় নিঃশব্দতার মধ্যে অবিশ্রাম জলকলস্বরের গান শুনিতেছে শুধু বরুণ আর পুঁটুরাণী।

ঘুমে পুঁটুরাণীর শরীর এলাইয়া পড়িয়াছে, চোখ দুইটি ঢুলিয়া আসিতেছে।

গভীর স্নেহে বরুণ কহিল, তোমার ঘুম পেয়েছে? ঘুমোও না। আমার চোখে ঘুম নেই। আমি বাঁশি বাজাই, তুমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ো।

বরুণ বাঁশি বাজাইতে সুরু করিল। বাঁশিতে সে কি অপূর্ব্ব সুরের ঝঙ্কার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। পুঁটুরাণী তাহার সমস্ত শ্রবণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সেই সুরের উচ্ছল মদির সুধারস পান করিতে লাগিল—মায়াবী বাঁশুরিয়ার বাঁশী ইমনে বাজিতেছে, শিরায় শিরায় উদ্দাম ফেনিল সুরের স্রোতস্বিনী তরল তীব্র বিদ্যুৎশিখার মতো তাহার মূর্চ্ছিত প্রাণ-তন্ত্রীতে সঞ্চারিত হইয়া ফিরিতেছে। তীব্র আনন্দের আবেগে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, সর্ব্বশরীর যেন পূবালি বাতাসে আন্দোলিত নতুন ধানের মঞ্জরীর মতো শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। নিস্তব্ধ নির্জ্জন এই নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন এই অপার্থিব সুরের মোহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। মনে হইল, এই আশ্চর্য্য অনুভব বুঝি বাস্তবজগতের নয়, বোধ করি স্বপ্নে সে কোন্ ব্যাকুল হৃদয়ের অশান্ত বাসনা বাঁশির রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া করুণকণ্ঠে কি যেন প্রার্থনা করিতেছে।

তাহার মনে পড়িল, তাহার বাবা বাঁচিয়া থাকিতে তাহাদের বাড়ীতে একবার কীর্ত্তনের আসর বসিয়াছিল। কীর্ত্তনীয়ার সে কি মধুর বেশ, মাথায় শিখীচূড়া, হাতে চামর, পায়ে নূপুর, আর কি তাহার অপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠস্বর—ললিতকোমল কণ্ঠে সে যখন আখর দিয়া কীর্ত্তনে তান ধরিত, চোখের জল কাহারও আর বারণ মানিত না।

একটি গান সে আজও ভুলিতে পারে না। শ্রীমতী রাধা শ্যামের কাছে কেমন করিয়া বাঁশরীতে তান তুলিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিবার জন্য মিনতি জানাইতেছেন। মুরলী বাজাইবার মন্ত্র তাহাকেও শিখিতে হইবে। এই বাঁশি শোনাতেই তাহার চরম বাঁশির সুর সাধা হউক, এই বাঁশিই তাহার প্রাণ হউক, এই বাঁশি বাজাইতে আজ সে শিখিবেই।

মনে মনে সে সেই গানের কলি আবৃত্তি করিতে লাগিল :

মুরলী করাও উপদেশ,
কোন্ রন্ধ্রে কি ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশি অতি অনুপম,
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম।
কোন্ রন্ধ্রে রসাল ফুটায়ে পারিজাত,
একে একে শিখাইয়া দাও প্রাণনাথ ॥

দুই চোখের অবারিত অশ্রুধারায় কপোল তাহার ভাসিয়া গেছে, নিষ্পলক চোখে সে বরুণের মুখের দিকে চাহিয়া নিস্পন্দের মতো বসিয়া আছে। বাঁশির সুর ক্রমশ মৃদু হইয়া আসিতেছে। দুই তীরে কুয়াশাবৃত গ্রামরেখা স্বপ্নাচ্ছন্ন মায়াপুরীর মতো জাগিয়া আছে। পুঁটুরাণী এবার ঘুমাইবে।

ঘুমের ঘোরে বোধ করি সে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

রূপকথার রাজপুত্র সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া তেপান্তরের মাঠের উপর দিয়া পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটাইয়া রাজকন্যার সন্ধানে আসিয়াছে স্বপ্নপুরীর দেশে। সেই ঘুমন্ত রাজপুরীতে তখন রাজকন্যা শিয়রে সোনার কাঠি রাখিয়া গভীর ঘুম ঘুমাইতেছে। বনস্পতির ছায়াঙ্কিত পল্লবের আড়াল দিয়া নিঝুম জ্যোৎস্না যেন পথ ভুলিয়া তাহার স্ফুটকমলের মতো মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ঘুমের ঘোরে সে শুনিতেছে ঝরণার গান, বনৌষধির উন্মাদক গন্ধে সে কস্তূরীমৃগের মতো চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। বহু দূরে কোথায় বুঝি জিরিজিরি বেতসের বনে অবিশ্রাম কুহুস্বরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাঁশি বাজিতেছে। কে যেন রূপার কাঠি ছোঁয়াইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার শিয়রে বসিয়া অনিন্দ্যসুন্দর এক রূপকুমার রাজপুত্র—মাথায় তাহার শিরস্ত্রাণ-শোভিত কনক-মুকুট, হাতে ধনু, কাঁধে বর্শা, বুকে বর্ম! চোখ মেলিয়া সে চাহিতেই চারি চক্ষে তাহারা হাসিয়া উঠিল। তারপর সহসা কোথা হইতে যেন একটি কুৎসিত ভীষণ-দর্শন দানবাকার মূর্ত্তি আসিয়া তাহাদের সম্মুখে খিলখিল করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। তারপর দুইজনে সে কি ঘোর যুদ্ধ! রাজকন্যার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।...

ঘুমের ঘোরে সহসা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়া পুঁটুরাণী চোখ মেলিল। দারুণ আতঙ্কে আপাদমস্তক তাহার তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেছে। দুঃস্বপ্নের সেই শ্বাসরোধকারী ভয়ে তাহার দুই চোখ যেন জ্বালা করিতেছে।

নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল লইয়া মুখে-চোখে দিয়া সে কিছু শান্ত হইল। তারপর বরুণের দিকে তাকাইয়া দেখিল সে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে, প্রশান্ত হাসিতে জ্যোৎস্নাস্নাত সুন্দর মুখখানি তাহার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। পুঁটুরাণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া পরম নির্ভরতার সহিত বরুণের একপাশে মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ পরেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি বোধ করি শেষ প্রহর। তাহারা দুইজনেই গভীর ঘুমে ঘুমাইতেছে। নৌকা চলিতেছে ধীর মন্থরগতিতে। সহসা শ্রাবণরাত্রির অন্ধকার আকাশ পুঞ্জ পুঞ্জ নিবিড় কালো মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া দূর দিগ্বলয়ের প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। ঝিল্লীবিদার সূচীভেদ্য নিরন্ধ্র ঘন অন্ধকারে আসন্নবর্ষণ মেঘ থমথম করিতে লাগিল। গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চকিত বিদ্যুৎশিখা জ্বলিয়া

উঠিতে লাগিল। নদীর স্রোত প্রখর দুর্ব্বার হইয়া উঠিতেছে, সেই অসীম মসীবর্ণ অন্ধকারে অসহায় পাখীর মতো তাহাদের নৌকা দুলিতেছে। সহসা দুরন্ত বৃষ্টিধারা শাণিত করকার মতো উদ্দাম দ্রুতবেগে নামিয়া আসিল। ঝমঝম করিয়া অশান্ত ধারাপতনধ্বনি অপার অন্ধকার ভরিয়া বাজিতে লাগিল।

মাঝি চীৎকার করিয়া উঠিল, কত্তা উঠুন, উঠুন, দেখুন একবার কি মেঘ উঠেছে—

বরুণ আর পুঁটুরাণী হঠাৎ এই দুর্য্যোগের মধ্যে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে একেবারে হিম হইয়া গিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

বরুণ বলিল, কাছে কোথাও গাঁ আছে মাঝি? কোনোরকমে পারে যাওয়া যাবে?

মাঝি বলিল, মেঘ দেখেই সেদিক পানে যাচ্ছি কত্তা, আর বেশি দূর নেই।

ভয়ে পুঁটুরাণীর মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেছে। বরুণ তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল, ভয় কি রাণী, পারে নেমে আমরা না হয় একটু ভিজলামই বা! আমার ত চমৎকার লাগছে, ঠিক যেন স্বপ্নের মতন। একঘেয়ে একটানা জীবনে আমাদেরই ত সত্যিকারের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হ'লো—সেই অদ্ভুত বিয়ে—আর তোমার জ্যাঠামশাই ভবানীপ্রসাদ থেকে সুরু ক'রে এই ঝড়জলের মাঝখানে নদীর ওপরে তুমি আর আমি!

স্বপ্নের কথা মনে পড়িতেই পুঁটুরাণী সভয়ে শিহরিয়া বরুণের বুকে মুখ লুকাইল। সমস্ত শরীর তখন তাহার বেতসলতার মতো কাঁপিতেছে।

বরুণ কহিল, এ কি কাঁপছো তুমি, শীতে না ভয়ে? আমি রয়েছি পাশে, ভয় কি তোমার?

অস্ফুটকণ্ঠে পুঁটুরাণী বলিল, না, ভয় না।

নৌকা তীরে ভিড়িয়াছে। তাহারা দুইজনে হ্যারিকেন হাতে করিয়া তীরে নামিয়া কাছেই বিরাট বনস্পতির নীচে ঘন লতাগুল্মে ঘেরা একটি পাথরের উপরে গিয়া বসিল। পল্লবের ফাঁক দিয়া ঝিরঝির করিয়া বৃষ্টির ছাট আসিয়া তাহাদের মুখে লাগিতেছে—নিবিড়, নির্জ্জন সেই বনৌষধির গন্ধে ব্যাকুল অন্ধকার বনভূমি, শ্রাবণ-রাত্রির অবিশ্রাম রিমঝিম বর্ষণ-মুখরতার মধ্যে তাহাদের স্তম্ভিত, মৌনী হৃদয় স্পন্দমান হইয়া উঠিয়াছে।

অভিভূত আচ্ছন্নের মতো বহুক্ষণ তাহারা সেই অপার নীরবতায় নিমগ্ন হইয়া রহিল। সহসা অস্ফুট একটি চীৎকার করিয়া বরুণ সেই পাথরের উপর বিবর্ণ হইয়া শুইয়া পড়িয়া দুঃসহ যন্ত্রণাময় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, রাণী আমাকে কিসে যেন কাটলো—তোমার জ্যাঠামশায়ের কথাই ঠিক হ'লো, আজ কালরাত্রি, কালসাপেই বুঝি কাটলো আমাকে—তোমার কি হবে?

এই আকস্মিক আঘাতে পুঁটুরাণী যেন বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হইয়া গেল। দারুণ প্রাণ-পিপাসায় দুই চোখ যেন তাহার জ্বলিতে লাগিল। না, এ নিয়তি সে ব্যর্থ করিবে। স্বপ্নের ভয়কে সে আর ভয় করিবে না। তাহার সর্ব্বশরীরে কোথা হইতে যেন অসীম বেদনাময় সাহসিকতা, আশ্বাসভরা তেজ জাগিয়া উঠিল। মৃত্যুমুখীর তৃণ অবলম্বনের মতো সেই বিজয়িনীর দুর্ব্বার প্রাণ-বন্যা তীব্র উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিল। বাঁশি বাজাইতে সে শিখিয়াছে, সে ধ্যান করিয়াছে তাহার এই প্রাণ-স্পন্দী বাঁশিতে বিশ্বপ্রকৃতি মোহাচ্ছন্ন করিবার সাধনা, আজ তাহার চরম পরীক্ষার দিন। সে শুনিয়াছিল, এই বাঁশীর মোহনিয়া সুরের মূর্চ্ছনায় সাপুড়িয়া শিবকন্যা দেবী মনসাকে প্রসন্ন করিতে পারে।

মাঝি কোথা হইতে কয়েকটি লতা সংগ্রহ করিয়া বরুণের পায়ে বাঁধিয়া দিল।

আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজিয়া মনে মনে নীলকণ্ঠ মহেশ্বর এবং আস্তিকজননী বিষহরী দেবীকে স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে বাঁশিতে তান ধরিল পুঁটুরাণী। সে বাঁশির সুরে বর্ষণ-ক্লান্ত প্রকৃতি যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল, খণ্ড মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঠিয়া পল্লবান্তরাল দিয়া মুগ্ধের মতো চাহিয়া রহিল, দূরে নীল নদীজলধারা কুলুকুলু শব্দে সুর মিলাইতে সুরু করিল। সে কি করুণ প্রাণ-স্পন্দন, বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই মদির মোহ-সঞ্চারিণী তীব্র মধুর আনন্দ-বেদনা লীলায়িত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

সহসা এক অভাবনীয় দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে

ভাসিয়া উঠিতেই আনন্দে তাহার বাঁশি, তীক্ষ্ণ ঝঙ্কারে উচ্চকিত হইয়া উঠিল। সে দেখিল, অপরূপ ভীষণ-সুন্দর এক কালসর্প গভীর আনন্দে তাহার বিশাল ফণা উন্নত করিয়া ধীরে ধীরে আবেশমুদিত মদিরচক্ষে দুলিতেছে। জ্যোৎস্নার রূপালি আলোর রেখা তাহার মাথার মণিতে পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। প্রদীপ্ত সেই নীলকান্ত মণির চারিপাশে বোধ করি ব্রজপুরীর চিরকিশোর মুরলীধর কৃষ্ণের কোমল চরণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন! সে-রূপ দেখিয়া পুঁটুরাণী রোমাঞ্চিত আনন্দে আরো জোরে বাঁশি বাজাইতে লাগিল। মুখে তাহার করুণ মধুর হাসি, বাঁশির সুরের নেশায় সে যেন উন্মাদ হইয়া গেছে।

অপার্থিব দুর্লভ সেই সুরের ঝঙ্কারে সেই কালসর্প ক্রমশ নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে—বোধ করি এই অধীর বংশীরবের কারণ সে এইবার বুঝিল। এই অসহ আনন্দের বিনিময়ে প্রতিদান যে কিছু দিবে। ধীরে ধীরে সে তাহার মুখ লইয়া গেল বরুণের নীল বিবর্ণ বিশাল দেহের কাছে। পায়ের কাছে ক্ষতস্থানে মুখ লাগাইয়া সে বিষ তুলিতে লাগিল। বাঁশি শুনিতেছে, আর দুই চোখ বাহিয়া তাহারও জলধারা নামিয়া আসিতেছে। বহু ক্ষণ পরে সে তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া মূর্চ্ছিতের মতো শুইয়া পড়িল। মাঝিটি একটি ঝাঁপি রাখিয়াছিল তাহার পাশেই। পুঁটুরাণী তখনও বাঁশি বাজাইতেছে। শিথিল গতিতে সেই সাপ ঝাঁপির কাছে আগাইয়া যাইতেছে। বাঁশির সুর ক্রমশ মৃদু হইয়া আসিতেছে। মাঝিটি ঝাঁপির মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

ধীরে ধীরে সেই মাঝির সাহায্যে পুঁটুরাণী বরুণকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া গেল। তাহার পর সে সাপের ঝাঁপিটি ধরিয়া মাথায় ঠেকাইয়া নৌকার পাটাতনের নীচে রাখিয়া দিল।

তখন বর্ষণ থামিয়া গেছে। পূর্ব্ব দিগন্ত রঞ্জিত করিয়া সদ্যোজাত সূর্য্যের রক্তিম অরুণজ্যোতি জাগিয়া উঠিতেছে। কালরাত্রি মিলাইয়া গেছে অতীতের অন্ধকারে।

ঝিরঝির করিয়া শরৎকালের ভোরের মৃদুমধুর বাতাস বহিতেছিল। ধীরে-ধীরে চোখ মেলিয়া বরুণ দেখিল, তাহার সুমুখে নির্নিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আরক্তিম প্রফুল্লসুন্দর মুখখানি আনত করিয়া পুঁটুরাণী চাহিয়া আছে। বরুণের দুই চোখে আনন্দের অশ্রু জমিয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া সে কহিল, তোমার জ্যাঠামশাই কিন্তু এমনিই আভাস দিয়েছিলেন। শেষে কিন্তু বলেছিলেন, তোমরা সুখী হবে।

বিনম্র প্রেমে ও মধুর মমতায় ভরা মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া পুঁটুরাণী বলিল, কিন্তু তোমার কাছে বাঁশি শিখেছিলাম বলেই ত?...বাড়ী আর কতদূর?

দূরের অস্পষ্টপ্রায় ত্রিশূল-চিহ্নিত অরুণ-কিরণোজ্জ্বল শিবমন্দিরের স্বর্ণচূড়ার দিকে তর্জ্জনী সঙ্কেত করিয়া বরুণ বলিল, ওই যে, ওই মন্দির। আমরা এসে পড়েছি।

কবিতা

শ্রীমতী গীতা দেবী আচার্য্য চৌধুরী

কবি তব ব্যথার বাণী—
আমার সুরে গাঁথা,
সিক্ত তব অশ্রুনীরে
আসনখানি পাতা।
কোন্ বনানীর অন্তরালে
কোন্ সাগরের তীরে,
ছবি তব আঁক্‌ছে কেবা
সংগোপনে ধীরে!

ভাঙ্গা বীণার ছিন্ন তারে
তোমার বাণী সাধা,
শুদ্ধ প্রাণের গোপন সুরে,
কণ্ঠ আমার বাঁধা।
যেথায় অসীম আকাশ পথে
শ্যামল মেঘের খেলা,
সেথায় তব করুণ বাণীর
নিত্য রূপের মেলা।

প্রাচীন ভারত

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্‌-এ, বি-এল, পি এইচ্‌-ডি

সামাজিক অবস্থা

এই প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ধর্ম্ম বিষয়ে ভারত প্রাচীনকালে কতদূর উন্নত ছিল তাহাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতে চারি প্রকার বর্ণ ছিল, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বৌদ্ধ সাহিত্যে ক্ষত্রিয়ের স্থান সর্ব্বপ্রথম। ইহা ব্যতীত বৌদ্ধ সাহিত্যে আরও দুইটী জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—চণ্ডাল ও পুক্কুস। কতকগুলি বৌদ্ধসূত্র হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিত। বৌদ্ধদিগের মতে এই শ্রেণী-বিভাগ ন্যায়সঙ্গত। ধর্ম্মই শ্রেণী-বিভাগের একমাত্র ভিত্তি। ধর্ম্মগুণে ক্ষত্রিয়রাই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য বৌদ্ধগ্রন্থে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন ভারতের জাতি সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে কেবল বৌদ্ধ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।[১] বুদ্ধ ও অম্বষ্ঠ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবকের মধ্যে বর্ণ সম্বন্ধে তর্ক হইয়াছিল এবং এই তর্কে অম্বষ্ঠ পরাজিত হয়।

বৌদ্ধজাতক হইতে জানা যায় যে প্রাচীন ভারতে জাতিভেদের কঠোরতা ছিল না। সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিবাহের প্রচলন ছিল। বারাণসীর জনৈক রাজা একজন অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চ বর্ণের লোকেরা নীচ বর্ণের লোকের সহিত আহার করিত না।

সেকালে জাতিধর্ম্ম অনুসারে বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। যে কোন ব্যক্তি যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত; তাহাতে তাহার মর্য্যাদার হানি হইত না। একজন ব্রাহ্মণ সামান্য ধনুর্বিদ্যার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কোন একজন ব্রাহ্মণ সূত্রধরের কার্য্য করিত এবং অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আনিয়া যান নির্ম্মাণ করিয়া জীবন ধারণ করিত।

বৌদ্ধসূত্রে পেশার একটী বিশদ তালিকা পাওয়া যায়:—হস্তরেখার বিচার, শুভাশুভ লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলা, শরীরের চিহ্ন দেখিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করা, অঙ্গুলীর দ্বারা গণনা, ভাগ্য গণনা করা, গুপ্তবিদ্যা, অস্ত্রোপচার বিদ্যা, বৈরীভাব নিষ্পত্তি করা, গজারোহী, অশ্বারোহী, রথচালক, ধনুর্দ্ধর, ক্রীতদাস, পাচক, নাপিত, মোদক, মালাকার, রজক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, মালী, মূল্যনিরূপক, সূত্রধর, ধাবর, কৃষক, গায়ক, নাবিক, কর্ম্মকার, ওস্তাগর, ভেরিবাদক ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতে বহু সমিতি ছিল। যাহারা একই ব্যবসা অবলম্বন করিত তাহারা একত্র বাস করিত এবং যে স্থানে তাহারা বাস করিত সে স্থানের নামকরণ বৃত্তি অনুসারেই হইত, যথা—কর্ম্মকারদের গ্রাম, শিকারীদের গ্রাম, ব্রাহ্মণ গ্রাম ইত্যাদি। এই সকল সমিতি হইতে প্রাচীন ভারতের সমবায় জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক জীবন সংক্রান্ত কতকগুলি অনুষ্ঠান ছিল। শিশুদের নামকরণ প্রথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা নামকরণ পালি ভাষায় নামগহন বলিয়া পরিজ্ঞাত। গর্ভরক্ষার জন্য একটী বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল। বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া যখন কথাবার্ত্তা চলিত, তখন জন্ম অথবা বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইত। সাধুশীল জাতকে বহু-বিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে। নারীদের একের অধিক বিবাহ করিবার অধিকার ছিল। সহোদরসহোদরা ভাইভগিনী ভিন্ন অন্যান্য ভাইভগিনীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। অম্বট্‌ঠ জাতক হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, জনৈক ব্যক্তি তাহার সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিল। অবশ্য ইহা একটী স্বতন্ত্র ঘটনা; ইহাকে প্রাচীন

১। এই সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে মৎপ্রণীত "Concepts of Buddhism," তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

ভারতের প্রচলিত প্রথা বলিয়া ধরা উচিত নহে। সেকালে স্বয়ম্বর প্রথাও চলিত ছিল। একজন কুমারীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইত এবং উহাদের মধ্য হইতে উক্ত কুমারী আপন স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া লইত। এই প্রথা কেবল রাজবংশের মধ্যেই চলিত ছিল তাহা নহে, অন্যান্য জাতির মধ্যেও ইহার প্রচলন ছিল। একজন ধনী তাহার কন্যাকে আপনার মনের মত স্বামী নির্ব্বাচন করিতে বলিয়াছিল।[১]

প্রাচীন ভারতেও অবরোধপ্রথা বিদ্যমান ছিল। ধর্ম্মপদট্‌ঠ কথার একটী অংশ পাঠে জানা যায় যে, এদেশে মুসলমানদের আগমনের বহু পূর্ব্বে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে অম্বট্‌ঠ সূত্র হইতে বিভিন্ন শিক্ষা-শাখার একটী তালিকা পাওয়া যায়। সেকালে ব্রাহ্মণ যুবকেরা গুরুগৃহে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষার বিষয় ছিল তিনটী : বেদ, ক্রিয়াপদ্ধতি, স্বরবিজ্ঞান, ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষ্য, পুরাবৃত্ত, বাক্‌পদ্ধতি এবং ব্যাকরণ। সে সময়ে তক্ষশিলায় একটী সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য বহু যুবক বহুদেশ হইতে তথায় আসিত। তখনকার নিয়মানুসারে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে বেতন দিয়া পাঠ করিত অথবা শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকের পরিচর্য্যা করিত। বারাণসীতেও একটী শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল। বারাণসীর লোকেরা দরিদ্র বালকদিগকে প্রত্যহ খাদ্যদান করিয়া তাহাদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিত। সেকালের রাজারা পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহু দূরদেশে পাঠাইতেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে তাহারা জগতের রীতি নীতির সহিত পরিচিত হইতে পারিত।

সেকালে কিরূপ ভাবে শবদাহ করা হইত তাহার একটী বিবরণ পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের মৃতদেহ একটী সাধারণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইত। ঐ স্থানকে সিবথিকা অথবা আমকসুসান বলা হইত। উক্ত মৃতদেহ বন্য জন্তরা ভক্ষণ করিত। উচ্চপদস্থ লোকের মৃতদেহ (যথা—সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক অথবা রাজন্যবর্গের মৃতদেহ) দাহ করা হইত এবং ভস্মের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইত। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মৃতদেহ-দাহের উল্লেখ আছে। নূতন বস্ত্রের দ্বারা মৃতদেহটী আবৃত করিয়া উহা একটী লৌহ পাত্রে রাখিয়া দাহ্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্তূপে শবদেহ রাখা হইত এবং কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করা হইত।

আর্থিক অবস্থা

অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। শিল্পকারগণ সমস্ত লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত এবং ব্যবসায়ীরা স্বদেশে ও বিদেশে ব্যবসা করিত।

সেকালে স্থলপথ ও জলপথ ব্যবসায়ী উভয়ই ছিল। স্থলপথ ব্যবসায়ীরা পাঁচ শত গোযানে মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে বিক্রয় করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইত। বহু বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের পথ ছিল। ঐ সকল স্থানে দস্যু, দানব, সিংহ এবং অন্যান্য বন্য জন্তুর বিশেষ ভয় ছিল। তথায় জলাশয়, ফলমূল অথবা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিরল। ষাট যোজনব্যাপি জলশূন্য মরুভূমির মধ্য দিয়াও ঐ পথ বিস্তৃত ছিল। বণিকগণ মরুভূমির মধ্য দিয়া রাত্রিকালে ভ্রমণ করিত। মরুভূমির কাণ্ডারীরা নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া দিক্‌নির্ণয় করিত। রাত্রি প্রভাত হইলে বণিকগণ পথে বাহির হইত না। তাহারা যানগুলিকে বৃত্তাকারে সাজাইয়া শিবিরের মত করিত এবং তাহার উপরে একটী চন্দ্রাতপ খাটাইয়া সমস্ত দিন তথায় বিশ্রাম করিত। সুপ্পারক (সোপারা) হইতে শ্রাবস্তী (সহেৎ মহেৎ) পর্য্যন্ত একটী বাণিজ্যপথ ছিল। উহাদের মধ্যে দূরত্ব প্রায় একশত বিশ যোজন ছিল।

প্রাচীন ভারতে সমুদ্রপথের ব্যবসায়ীও ছিল। বণিকগণ ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ব্যাবিলনের বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বারাণসী হইতে বাবেরু প্রদেশে লইয়া আসিত। সমুদ্রপথে দিক্‌নির্ণয় করিবার জন্য বণিকেরা জাহাজে কাক লইয়া যাইত। নাবিকেরা যখন মধ্যসমুদ্রে দিশাহারা হইয়া দিক্‌-নির্ণয় করিতে না পারিত, তখন তাহারা একটী কাককে উড়াইয়া দিত এবং উহাকে জাহাজে আর বসিতে দিত না।

১। এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ মৎপ্রণীত "বৌদ্ধ রমণী" শীর্ষক গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং ঐ কাক অবতরণস্থান খুঁজিবার জন্য উড়িতে থাকিত এবং যদি উহা উড়িতে উড়িতে কোন স্থলে পৌঁছিতে পারিত, তাহা হইলে আর ফিরিয়া আসিত না। যদি সেরূপ অবতরণস্থান খুঁজিয়া না পাইত, তাহা হইলে আবার জাহাজে ফিরিয়া আসিত। এইরূপে নাবিকগণ দিক্‌নির্ণয় করিত এবং নিকটে কোন নঙ্গরস্থান আছে কি-না তাহা বুঝিতে পারিত। ভরুকচ্ছ (বর্ত্তমান ব্রোচ) এবং সুবর্ণ ভূমির (ব্রহ্মদেশ) মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। ভরুকচ্ছ সেকালকার একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। ভরুকচ্ছ হইতে সুবর্ণ ভূমি পর্য্যন্ত জলপথে বাণিজ্য চলিত। বণিকগণ চম্পা (অঙ্গদেশের রাজধানী) হইতে সুবর্ণ ভূমি পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। সমুদ্রপথে ব্যবসায়ীরা বঙ্গ, তক্কোল, চীন, সৌবীর, সুরাষ্ট্র, আলেক্‌জান্দ্রিয়া, চোলপট্টন এবং ব্রহ্মদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য যাইত।

প্রাচীন ভারতে ব্যাঙ্কের সুবিধা মোটেই ছিল না। লোকে মাটীর নীচে তাহাদের সঞ্চিত ধন পুঁতিয়া রাখিত এবং কখনও কখনও বিশ্বস্ত বন্ধুদের নিকট গচ্ছিত রাখিত। রাজা বলপূর্ব্বক ধন কাড়িয়া লয় অথবা চোরে চুরি করিয়া লয়, এই সকল আশঙ্কা করিয়া ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অথবা ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু সঞ্চয় রাখিবার জন্য উহারা মাটীর নীচে ধন লুকাইয়া রাখিত।

সেকালে বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। আমরা কতকগুলি মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাই, যথা,—কাকনিক, মাসক, অর্দ্ধমাসক, পদ, অর্দ্ধপদ, কহাপণ এবং অর্দ্ধকহাপণ। এইগুলি ছিল তাম্রমুদ্রা। রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন ছিল কি-না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মুদ্রা ব্যতীত অঙ্গীকার বা আদেশপত্রেরও প্রচলন ছিল। বড় বড় শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা পরস্পরের মধ্যে (মুদ্রাপ্রাপ্তির জন্য) আদেশপত্র ব্যবহার করিত। মধ্যে মধ্যে অঙ্গীকার-পত্রও ব্যবহার করিত।

সেকালের ধর্ম্মের অবস্থা

পণ্ডিতগণ বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রারম্ভের পূর্ব্বে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই সময়ের সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অথবা বৈদিক ধর্ম্ম একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল।

অধিকাংশ লোকই যাদুমন্ত্র ও ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করিত। প্রেতেরা বৃক্ষে বাস করিত এবং লোকেরা বৃক্ষ-দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দিত। পুষ্করিণী এবং হ্রদেও প্রেত ও যক্ষ বাস করিত।[১]

সাধারণতঃ এই কয়টী বিষয়ে লোকের গভীর বিশ্বাস ছিল :—হস্তরেখা দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলা, চিহ্ন দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলা, বজ্র এবং অন্যান্য নৈসর্গিক লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ, স্বপ্নব্যাখ্যা করিয়া ভবিষ্যৎ বলা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দিবার জন্য জানু হইতে রক্ত বাহির করা, পিশাচ-বশীকরণমন্ত্র, ভূত-ঝাড়ামন্ত্র সর্প-বশীকরণমন্ত্র, শান্তিলাভের আশায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে দান, চামচ হইতে লইয়া হোম দেওয়া এবং মুখ হইতে সরিষা বাহির করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ইত্যাদি। প্রাচীন কালে মৃত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে খাদ্যদান ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

সেকালে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের উল্লেখ পাওয়া যায় :—(১) অহেতুবাদ, (২) ঈশ্বরকারণবাদ, (৩) পূর্ব্বকর্ম্মবাদ, (৪) উচ্ছেদবাদ এবং (৫) ক্ষত্রিয়বীর্য্যবাদ।

যিনি হেতুবাদের বিরুদ্ধবাদী, তাঁহার মতে এই জগতের প্রাণীরা পুনর্জন্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্ববিষয়ের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার মতে এই জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। যিনি পূর্ব্বকর্ম্মবাদের সমর্থক, তাঁহার মতে সুখ অথবা দুঃখ মানুষের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল। যিনি উচ্ছেদবাদ বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার মতে এই জগৎ হইতে কেহ তিরোহিত হয় না ; এই জগৎই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যিনি ক্ষত্রিয়বীর্য্যবাদী, তাঁহার মতে পিতৃমাতৃ হত্যা করিয়াও স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বুদ্ধের সমসাময়িক ছয় জন বিরুদ্ধমতবাদী ধর্ম্মপ্রচারকের উল্লেখ আছে :—

(১) পুরণ কস্‌সপ—ইনি অক্রিয়াবাদের সমর্থক। সৎকর্ম্মের ফলে পুণ্য হয় এবং অসৎ কর্ম্মের ফলে পাপ হয়, ইহা ইনি বিশ্বাস করিতেন না।

(২) মক্‌খলি গোসাল—ইনি বলিতেন, জন্মান্তর

---

১ মৎপ্রণীত "The Buddhist Conception of Spirits" (revised edition) দ্রষ্টব্য।

পরিগ্রহের দ্বারাই আত্মশুদ্ধি হয়। কর্ম্ম ও উহার ফল ইনি বিশ্বাস করিতেন না। ইঁহার মতে জ্ঞানী, মূর্খ সকলেই পুনর্জন্মের মধ্য দিয়া দুঃখ কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

(৩) অজিত কেস কম্বলী—ইনি উচ্ছেদবাদের সমর্থক। কর্ম্মের প্রভাব ইনি বিশ্বাস করিতেন না। ইঁহার মতে জ্ঞানী, মূর্খ, সকলেই দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না।

(৪) পকুধ কচ্চায়ন—ইনি শাশ্বতবাদী। ইঁহার মতে চারিটী উপাদান, স্বচ্ছন্দতা, কষ্ট এবং আত্মা স্বয়ংভূ বলিয়া পরিগণিত।

(৫) সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত—ইনিই প্রথমে জীবন ও বস্তু সম্বন্ধীয় প্রচলিত নিয়মের প্রতি নিরপেক্ষ ভাব ধারণ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, জীবন ও বস্তুনিচয়ের সত্যতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অমূলক হইতে পারে না। ইনিই প্রথমে মানুষের চিত্তকে আসার মতবাদের দিক্ হইতে ফিরাইয়া আনেন।

(৬) নিগণ্ঠনাতপুত্ত—নিগণ্ঠ শব্দের অর্থ—যিনি জীবনের সমস্ত কণ্টককে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিগণ্ঠনাতপুত্তের মতে চারি প্রকার অত্মসংযমের দ্বারা নিগণ্ঠেরা সংযত। জল, অশুভ, প্রভৃতি বিষয়ে ইহারা সংযত হইয়া বাস করে। চারি প্রকার অত্মসংযমের দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া নিগণ্ঠকে গতত্তো, যতত্তো এবং ঠতত্তো বলা হয়।

বিশাল পালি সাহিত্যের অন্তর্গত ব্রহ্মজাল সূত্রে অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার মতবাদের তালিকা পাওয়া যায় :—

(১) সস্‌সতবাদ (শাশ্বতবাদ)—যাঁহারা এই মতের পোষক, তাঁহারা বলেন আত্মা এবং জগৎ অবিনশ্বর। (২) একচ্চ-সস্‌সতিকা একচ্চ অসস্‌সতিকা (অর্দ্ধশাশ্বত-বাদ)—যাঁহারা এই মতের সমর্থক তাঁহারা বলেন, আত্মা এবং জগৎ অবিনশ্বর ও বিনশ্বর, (৩) অন্তানন্তিকা (অন্ত ও অনন্তবাদ)—এই মতের সমর্থকগণ বলেন, এই জগৎ সান্ত অথবা অনন্ত, (৪) অমরা বিক্খেপিকা—যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহাদিগকে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে দ্ব্যর্থবোধক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। (৫) অধিচ্চ সমুপ্পনিকা—যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন, আত্মা ও জগৎ কারণপ্রসূত নহে। এইগুলি অতীত সম্বন্ধে মতবাদ।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় মতবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

(১) প্রথম মতের সমর্থকগণ বলেন, মৃত্যুর পরও আত্মা সচেতন থাকে, (২) দ্বিতীয় মতের সমর্থকগণ বলেন যে মৃত্যুর পর আত্মার চেতনা থাকে না, (৩) তৃতীয় মতের পোষকগণ বলেন যে মৃত্যুর পর আত্মা সচেতন অথবা অচেতন কিছুই থাকে না, (৪) চতুর্থমতবাদীরা বলেন, সমস্ত প্রাণীই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, এবং (৫) পঞ্চম মত পোষকের মতে এই প্রত্যক্ষ জগতেই সমস্ত প্রণী নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে।
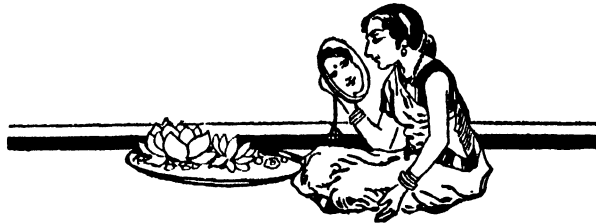
শ্রীচরণ দাসঘোষ

সাত

এক অক্লেদ অভিজাত-গৌরবে বাড়িয়া কঙ্কণ বড় হইয়াছে। তদুপরি আশেপাশে তার ঐশ্বর্য্যের দেউল। পিঠের উপর চাবুকের বালাই ছিলনা—সংসারে সে একা, আর তার বেতনভুক্ লোকজন।

হোক্ তা। তবু তার চরিত্রে ছিল এক সবিস্ময় স্বাতন্ত্র্য। আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যের ভিতর যাঁহাদের বসবাস, লোকালয়ে চলিবার পথ তাঁহাদের স্বতন্ত্র—তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রথা ও প্রণালী পৃথক। কঙ্কণের পদক্ষেপ কিন্তু সে-দিকে বড় একটা পড়িতনা, বেশী করিয়া সে মিশিয়া থাকিত দরিদ্রের ভীড়ে—সাধারণের দলে। অধিকন্তু নিজেকেই চিনিত সে নিজে বেশী করিয়া, আত্মপরিচয়ের অনুগ্রহ অপরের কাছে সে গ্রহণ করিতনা। তাহার একরোখা জীবন এমনিই এক ছন্দের মুখে অকস্মাৎ আসিয়া ঠেকিয়াছিল—চিত্রা। ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্য-গৌরবে সেও কঙ্কণের অপেক্ষা খাটো নয়। অতঃপর কাণা-খোঁড়া যেমন খালবিল পার হইতে গিয়া রাস্তার পথিককে একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করে, তেম্‌নিই একদিন কঙ্কণ টের পাইল—তাহার চলাফেরা, গতিবিধির সমস্ত নির্দ্দেশ ও শাসন এই মেয়েটিরই হাতে। চিত্রাও ইহা নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছিল যে, এই মানুষটির নিশ্বাস-প্রশ্বাস সে-ই। সুতরাং, সেই কঙ্কণ দশের সম্মুখে চিত্রাকে ঝট্‌কা মারিয়া ফেলিয়া রাখিয়া বুঝিবা অধিকতর এক আকর্ষণের দিকে ছুটিয়াছিল, তাহা তার নারীগর্ব্বে সহিবে কেন? কিন্তু, সে কথা এখন থাক্।

কঙ্কণ কোথাও দাঁড়ায় নাই। সটান গৃহে ফিরিয়া স্বীয় শয়ন কক্ষে অঞ্জনকে আনিয়া নামাইল। তখন তার নিজেরও পোষাক-পরিচ্ছদ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে—রক্ত আর রক্ত! কিন্তু, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই, আহতের সময়োচিত সেবা-শুশ্রূষায় সে আত্মনিয়োগ করিল। ভৃত্যেরা ছুটিয়া আসিল, কিন্তু, তাহাদের উপর পড়িল মনিবের নিষেধ। বুঝিবা, তাহার অর্থ ইহাই যে, ও-দেহের বর্ত্তমান মালিক সে নিজেই—আর কেহই নয়। আনাড়ি হাত—তথাপি সেবায় খোঁচ নাই, কৌশলে ভ্রান্তি নাই।

এইভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই, এক সময়ে অঞ্জনের চেতনা হইল, চোখ মেলিয়া তাকাইল। মুখের কাছেই বসিয়াছিল কঙ্কণ; তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, অঞ্জন তাড়াতাড়ি হাতে ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। কঙ্কণ হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে কহিল—"আর একটু!"

কিন্তু অঞ্জনের দৃষ্টি নামিলনা। বিহ্বল নেত্রে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি?" বলিয়া কক্ষের চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিয়াই উঠিয়া বসিয়া আকস্মিক উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "তুমি দেবদূত।"

"কঙ্কণ হাসিয়া জবাব দিল, "আপাততঃ আমি কঙ্কণ!"

কঙ্কণ?—আর এক অপরিমিত উচ্ছ্বাস! অঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর দেহের সমস্ত অনুভূতি, সমগ্র চেতনা যেন নিঙড়াইয়া চোখ দিয়া বাহির করিয়া সম্মুখের ওই লোকটির দিকে তন্ময় হইয়া তাকাইয়া রহিল, যেন প্রয়োজনের অতিরিক্তই সে সুস্থ। এক দুর্লভ তৃপ্তির আবেগে বলিয়া উঠিল, "তুমিই কঙ্কণ?"

"এইবার কঙ্কণ যেন এলোমেলো হইয়া পড়িল। বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "আমাকে চেন?"

"আমি?—না! তুমিই চিনিয়ে দিয়েছ! সেবা নেবার দুর্ভোগ ভিক্ষুর ধাতে সয়না! কিন্তু, তুমি নিয়েছ আমার জাত!" বলিয়াই অঞ্জন একমুখে হাসিয়া উঠিল। তার পর আবার সেই চাহনি—সেই স্থির, পলকহীন নেত্রপাত। তার পর গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওই চোখ, ওই মুখ—কঙ্কণ! বলিয়াই একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, যেন কি-এক কঠিন চিন্তায় হঠাৎ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। একটু পরেই চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বিদ্রোহী?"

"বিস্ময়ে কঙ্কণের চোখ দুটি বড় হইয়া উঠিতেই অঞ্জন কথাটার অর্থ করিয়া দিল, "দেশের! সকলে মিলে যা

চায়, দেশের কল্যাণ ত তাই। আজ তুমি কিন্তু তার গলা টিপে ধরেছ!"

"বুঝ্‌লাম না!"

"ছাদে এসো—" বলিয়াই অঞ্জন বাহির হইয়া কক্ষ সংলগ্ন একটি ছাদের উপর গেল, কঙ্কণও তদনুসরণ করিল। তার পর অঞ্জন একটি দেব-মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "বল্‌তে পার, ও কি?"

"মন্দির!"

"তা জানি, কিন্তু কাদের?"

"আমাদের!"

তারপর দৃষ্টির সীমানায় অবস্থিত আরও কয়েকটি মন্দির দেখাইয়া অঞ্জন যেন এক কঠিন প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা করিয়া বলিয়া উঠিল, "মন্দির, ধর্ম্ম—এই সবের কল্যাণে ছিল আমার বলির প্রয়োজন!"

"হেতু?"

"আমি নাকি শত্রু!"

"শত্রু?"—কঙ্কণ হাসিয়া উঠিল। অতঃপর হাসিমুখেই জবাব দিল, "তাই বুঝি পড়ে-পড়ে মার খেলে। বলি, যে শত্রু হয়, সে ত বেশী করেই পাল্টা হাত তোলে।"

"আমার ধর্ম্মের নিষেধ!"

"তোমার ভেতর তোমার নিজের নিষেধ নয়?"

"আমি বলে আমাদের কিছুই নেই—দেহও নয়, জীবনও নয়!"

কঙ্কণ চমকিয়া উঠিল। যেন মাটির উপর, তার চোখের সুমুখে, এক বজ্র পড়িয়া সহসা বাঁশির আওয়াজ ধরিয়াছে!

মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষু! তোমার বাড়ী-ঘর আছে?"

"রাখতে নেই!"

"আত্মীয়-স্বজন?"

"তোম্‌রা!"

কঙ্কণের মুখখানা আবার ঝুলিয়া পড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কি এক সুস্থির চিন্তায় তন্ময় হইয়া গেল। তারপর এক সময়ে আচম্‌কায় মুখ তুলিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, "নারী—?"

"মা!"

এইবার কঙ্কণের দুটি চোখই বড় হইয়া উঠিল। তারপর সে কি প্রশ্ন করিতে যাইবে, পারিল না—যেন আর প্রয়োজন হয় না, যেন বা ওই পরমাশ্চর্য্য আত্মীয়ের নির্ব্বাক্ মুখ মুহুর্মুহুঃ তাহার সারা প্রশ্নেরই মীমাংসা করিয়া দিতেছে!

এম্‌নি ভাবেই কঙ্কণ তাকাইয়া আছে, এমন সময় অঞ্জন আস্তে-আস্তে বলিয়া দিল, "আজ তোমার নব-জীবন!"

আকাশে মেঘ নাই, নীল রঙ্—তাহারই গায়ে অকস্মাৎ খেলিয়া গেল যেন এক বিদ্যুৎ চমক! অবশ কণ্ঠে কঙ্কণ কহিল, "আর একটু বুঝিয়ে বল না?"

"শাক্যঠাকুর, রাজার ছেলে, গৃহত্যাগী—তাঁরই পাশে আজ থেকে তুমি ভিক্ষু!"

"ভিক্ষু?"—এক ঝলক হর্ষ, এক ঝলক বিস্ময় কঙ্কণের কণ্ঠ দিয়া উপ্‌ছিয়া পড়িল।

অঞ্জনের সারা মুখ তখন এক অলৌকিক আভায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কহিল, "অসমাপ্ত মানুষ—তুমি নও!"

কঙ্কণ স্থিরনেত্র হইয়া অঞ্জনের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর যতদূর দৃষ্টি চলে নিজের দেহের উপর দৃষ্টি নামাইয়া সহসা আত্মহারা হইয়া উটিল। মুখ দিয়া প্রবল এক উচ্ছ্বাস যেন তরল হইয়া নির্গত হইল, "আমিও—"

"ভিক্ষু!"—অঞ্জন এক কটাক্ষ করিল। তারপর হাতছানি দিয়া সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। কঙ্কণও মন্ত্রচালিতের ন্যায় তদনুসরণ করিল। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—তাহার ঐহিক জীবন-যাত্রার পরিপূর্ণ এক সংস্থান!

—আট—

শাক্যসিংহের চক্ষে নাকি মানবের দুর্দ্দশা ও তাহার অন্তিম পরিণামের কয়েকটি বাছাই করা দৃশ্য পড়িয়াছিল—তাই তিনি বিবাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আসলে, তাহা নহে। তাহা যদি হইত, হাসপাতালের চিকিৎসকেরা প্রত্যেকেই এক-একজন করিয়া "বুদ্ধদেব" হইয়া পড়িতেন। জন্মান্তরবাদ লইয়াও তর্ক তুলিব না। সঠিক করিয়া এই কথাটাই বলি, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাটির যে রস তাঁর অঙ্গে ঠেকিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাণের বিষ! সেই বিষেই বিষিয়া বিষিয়া তিনি বড় হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁর জন্ম-

পত্রিকার এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে অকস্মাৎ টক্কর খাইয়া পড়িয়া গিয়াই তিনি বেহুঁস হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্নাম কিনিল, তাঁর চোখে-পড়া পৃথিবীর অতি সাধারণ, নিত্য-নৈমিত্তিকের কতিপয় ছবি! সুতরাং, কঙ্কণও এই যে এমন আচম্‌কায় গৃহত্যাগ করিয়া বসিল, পার্থিব হেতু তার কিছুই ছিল না। হেতু, একমাত্রই—ইহলোকে তাহার আবির্ভাব!

অগ্রে অঞ্জন, পশ্চাতে কঙ্কণ—উভয়েই নির্ব্বাক্। কোথায় যাইবে, গিয়া কিঁ করিবে, কঙ্কণ তাহা প্রশ্ন করে নাই, যেন চলিতে হয় চলিয়াছে। বলিবার আর কিছু অঞ্জনেরও যেন নাই। যাহা বলিবার, বলিয়া-কহিয়া যেন সে সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছে।

দ্বিতলের সোপানশ্রেণী যেখানে নীচে শেষ হইয়াছে, সেইখানে একটি হরিণ শিশু নিদ্রিত ছিল। পদশব্দে উঠিয়া পড়িয়া কঙ্কণকে দেখিয়াই তাহার সম্মুখে গিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পুলকের সীমা যেন তাহার আর নাই! কঙ্কণ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল এবং আচম্‌কায় নীচু হইয়া যেমন উহার মুখটা বুকে চাপিয়া ধরিবে, অঞ্জনের নিষেধ পড়িল—'আর নয়!'

ছাড়িয়া দিয়া কঙ্কণও সোজা হইয়া দাঁড়াইল—কতই না অপ্রতিভ! পুনশ্চ পা ফেলিল। দুয়ারের মুখেই প্রহরী—প্রভুকে দেখিয়াই সে সসম্ভ্রমে তাজা হইয়া দাঁড়াইল, মাথা নীচু করিয়া। চোখো-চোখী হইতেই কঙ্কণের চোখ দুটি ছল্‌ছল করিয়া উঠিল "এরা ত জানে না!"

অঞ্জনের চোখ এড়াইল না। হাসিয়া কহিল, "এসব পিছনের বস্তু—ছিঃ!"

কঙ্কণ একমিনিট কাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কহিল, "চলো!"—বলিয়াই পুনরায় যাত্রা সুরু করিল—তখন সম্মুখে কঙ্কণ, পশ্চাতে অঞ্জন।

বিস্তৃত অঙ্গণ—তাহারই বুক চিরিয়া রাস্তা। বেশী দূর যায় নাই, কঙ্কণের আবার গতিরোধ হইল। দেখিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে নন্দন ছুটিয়া আসিতেছে এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই, সে যেন পটে-আঁকা ছবির মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটিবার কঙ্কণের দিকে আর একটিবার অঞ্জনের দিকে তাকাইয়াই যেন ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'তোমরা মরনি!'

কঙ্কণের মুখে হাসির ঈষৎ রেখা পড়িল। কহিল, "নিশ্চয়ই।" বলিয়াই অঞ্জনকে দেখাইয়া কহিল, "ইনি আগেই—আমি আজ!"

"তা হ'লে, তোমরা ভূত?"

এবার জবাব দিল অঞ্জন। সহাস্যে কহিল, "কাছা-কাছি! ভয়ের কোঠায়—ভিক্ষু!"

"ভিক্ষু—কঙ্কণ?"—নন্দন চমকিয়া উঠিল, যেন সহসা এক ব্রহ্মাণ্ড ভাঙিয়া চুরমার হইয়া তাহার চোখের উপর একাকার হইয়া গেল।

কঙ্কণ ধীরপদে অগ্রসর হইয়া নন্দনের হাত ধরিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "আজ ডাক পড়েছে কি-না!"

নন্দন হাত ছাড়াইয়া একটু পিছাইয়া গিয়া আপনমনে বলিয়া উঠিল, "হুঁ, বুঝিছি!" বলিয়াই অঞ্জনের দিকে এক রোষতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়াই তাহার কাছে আসিয়া মার-মুখ হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভাল চাও তো সরে পড়ো! নইলে—" বদ্ধ মুষ্টি উঠাইয়া কথাটা শেষ করিল, "তোমার একদিন, কি আমার একদিন!"

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি উভয়ের মাঝখানে আসিয়া নন্দনের দিকে ফিরিয়া মৃদু ভৎ'সনা করিয়া বলিল, "অপরাধ হবে!"

"শ্রাদ্ধ হবে আমার!"—নন্দন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তারপর অসুরের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া অঞ্জনের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মন্তর ঝেড়ে মানুষ ধরতে এসেছ—মুণ্ডুপাত—"

মানবের এ আবার এক পাশবিক উত্তাপ! কঙ্কণ শিহরিয়া উঠিল, যেন তাহার বুকে হাতুড়ির আঘাত পড়িয়াছে। নন্দনের হাতদুটা ধরিয়া ফেলিয়া অস্থির কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মানুষের পাপ অনেক জমা হয়েছে! এ আর বাড়িও না, ভাই! রব মুখথেকে বেরুলেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে—নোংরা কথায় পৃথিবীকে বিষিয়ে আর তুলো না! অঞ্জনকে নির্দ্দেশ করিয়া অপরাধীর ন্যায় কহিল, "ইনি নিরপরাধ! ভিক্ষার ঝুলি আমি নিজেই নিয়েছি!"

অতঃপর কঙ্কণ যেমন অঞ্জনকে সঙ্কেত করিয়া পুনশ্চ রাস্তা ধরিবে, নন্দনের পিঠে যেন বেত্রাঘাত পড়িল। লণ্ড-ভণ্ড হইয়া কঙ্কণের সম্মুখে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

কঙ্কণ স্থির অথচ স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, "জানিনে! শুধু এই জানি—ও আমার জান্‌বার নয়!

এইবার নন্দনের চোখদুটি হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, "আর ফিরবে না ?"

প্রশ্নটার জবাব দিল অঞ্জন ! মৃদুকণ্ঠে কহিল "না ভাই ! কেউ আর ফিরতে চায় না !"

"তুমি মহাপুরুষ ! আমাকে মাপ করো !"—বলিয়াই নন্দন অঞ্জনের পাদুটি জড়াইয়া ধরিল।

অঞ্জন তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইয়া দুই হাতে নন্দনকে তুলিয়া মৃদু তিরস্কার করিয়া কহিল, "পাগল তুমি ! মানুষকে চালান্ আর একজন ! তিনি কাউকে পায়ে হাত দেবার অধিকার দেন নি !" বলিয়াই কঙ্কণের হাতে একটা টান দিয়াই অগ্রসর হইল।

নিথর নিস্পন্দবৎ দাঁড়াইয়া রহিল—নন্দন ! কি মনে করিয়া, কে জানে !

ইহারা বেশি দূর যায় নাই নন্দনের চমক ভাঙ্গিল—যেন তাহার চারিদিকে শ্মশান, তাহারই মাঝে দাঁড়াইয়া সে—এক মাত্র প্রাণী ! দূর বিস্তৃত পৃথিবী—তাহারই বুকে নেত্র পাত করিতেই দেখিল,—ওই ত কঙ্কণ চলিয়াছে ! ওই সেই চিরদিনের 'অন্তর্ধান' ! কিন্তু—

চম্‌কিয়া উঠিল, যেন কি মনে পড়িয়াছে। এবং তৎক্ষণাৎ এক লাফ দিয়া ওই ওদেরই দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কাছে আসিয়াই সুমুখে পড়িয়া কঙ্কণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত, স্খলিত, ত্রস্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও ! এক পল—"

আবার এক পিছনের বাধা ! কঙ্কণের মুখখানা শুকাইয়া গেল। ম্লান মৃদু কণ্ঠে কহিল, "বল—"

"তোমার বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি ?"

মুহূর্ত্তেই কঙ্কণ জবাব দিল, "তুমি নেবে ?"

নন্দনের বুকের ভিতরে এ জিজ্ঞাসা কি ভাবে পৌছিল, জানি না, কিন্তু তাহার মুখের আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িয়াছে—আস্তে আস্তে দৃষ্টিনত করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিয়া কহিল, "নেব।"

"দিলাম।"

"টাকাকড়ি, দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন—"

"সমস্ত।"

"সমস্ত ?"

সংকল্প-কঠিন মুখে কঙ্কণ একটু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, যা কিছু—সব !"

নন্দনের ব্যস্ততার যেন সীমা নেই ! তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তবে দাঁড়াও একটুখানি—কাগজ-কলম নিয়ে আসি—"

পিছন ফিরিতেই কঙ্কণ হাসিয়া কহিল, "সাক্ষী আমি নিজেই, সুতরাং ও-সবের প্রয়োজন নেই !"

নন্দন একটু যেন অপ্রতিভ হইবার ভাণ করিয়া কহিল, "মোটেই না ! তবে ওই যে একটা রাক্ষুসে গোলযোগ আইন !"

কঙ্কণের মুখখানা হঠাৎ বিকৃত হইয়া উঠিল, যেন আগুনের ফুল্‌কি পড়িয়াছে—আইন ! পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "নিয়ে এসো—"

নন্দন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। এক দৌড়ে একখণ্ড কাগজ ও কলম আনিয়া কঙ্কণের সম্মুখে ধরিল। কঙ্কনও আর দ্বিরুক্তি করিল না ; নিরুদ্বেগে নিজেকে নিঃস্ব করিয়া এক খানি 'দানপত্র' লিখিয়া নন্দনের হাতে অর্পণ করিল।

দানপত্রখানা আদ্যন্ত একবার পড়িয়াই নন্দন মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "উঁহু, হয়নি—বাদ পড়েছে !"

কঙ্কণ প্রবল সংশয়ে প্রশ্ন করিল, "কি ?"

কাগজখানার উপর মনোনিবেশ করিয়া নন্দন কহিল, "তুমি কি আমাকে দান করেছ—সমস্তই ?"

কঙ্কণ সহাস্যে জবাব দিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমার বল্‌তে—"

নন্দন বাধা দিয়া পশ্চাদ্দিকে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, "চেয়ে দেখ, কঙ্কণ, পিছনের পানে—আর কিছুই কি তোমার নেই ?—কোন বস্তু, কোন রত্ন, কোন মানুষ—"

"যদি থাকে, তাও—তোমার !"

"চিত্রাও !"

"চিত্রা ?"—কঙ্কণ চমকিয়া উঠিল।

নন্দন মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "ও বুঝি তোমার পিছনে ফেলে-যাওয়া সব কিছুর মধ্যে নয় ?"

নির্ব্বাণের পথ, সেই পথের যাত্রী !—কঙ্কণের মুখখানা ঝুঁকিয়া পড়িল। একটু পরেই মুখ তুলিয়া কহিল, "আমার অধিকার ?"

"সে কার ?"

কঠিন প্রশ্ন! কোনও দিন কঙ্কণ চিত্রার কাছে জানিয়া লয় নাই—সে কার? তার দেহ আছে, মন আছে! কোনও দিন কোনও কথায় সেও ত বলিয়া রাখে নাই, ও—সব কার? * * * * হঠাৎ কি ভাবিতে গিয়া কঙ্কণ শিহরিয়া উঠিল; সম্মুখে নন্দন, যে তার বুকে হাত দিয়াছে। পার্শ্বেই আর একজন—সে অঞ্জন! তার মনে ছোঁয়া দিয়াছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। চোখ তুলিতেই দেখিল—সম্মুখেই এক দুর্লঙ্ঘ্য বিভীষিকা, অতীতের দুর্দ্দান্ত তৃপ্তি! যেন এক জনহীন কুসুমিত ধরিত্রী, তাহারই উপর স্পষ্ট দিবালোক, তাহারই মাঝে মাত্র দুইটি প্রাণী—একটি নর, একটি নারী! উভয়ে তারা একাত্ম—সে আর চিত্রা!

কঙ্কণের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে দিকটায় হাত চাপা দিয়া নিজেকে টানিয়া ছিঁড়িয়া পিছন করিয়া নন্দনকে কহিল, "সে আমার!"

নন্দন রীতিমত গম্ভীর হইয়া কহিল, "তবে?"

কঙ্কণের মুখে আর চাঞ্চল্য নাই, উদ্বেগ নাই, বিস্ময় নাই। হাত ছড়াইয়া 'দানপত্রখানা' টানিয়া লইয়া পুনশ্চ লিখিয়া দিল, "আমার চিত্রা—তোমাকে দান করিলাম!"

তারপর এক মুহূর্ত্ত—এক মুহূর্ত্ত পরেই অঞ্জনের হাতে একটা টান দিয়া অঙ্গনের বাহির হইয়া গেল।

—নয়—

নন্দনের মুখ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল, এই যে 'রামায়ণ', ইহা রচনা হইবার পূর্ব্বাহ্ণেই তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটা যেন জানা ছিল—কঙ্কণটা এমনিইভাবে একদিন মাটি হইয়া যাইবে। সুতরাং, এই আকস্মিক দুর্দ্দৈব অধিকক্ষণ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিল না। উহারা দৃষ্টির অন্তরাল হইতেই, 'দানপত্রখানা' একবার সে পাঠ করিল, করিয়াই কি মনে করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, তার পর মুখ ফিরাইয়া পায়ে জোর দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। তখন আর রাত নাই।

স্তব্ধ অন্ধকার, আকাশ ও মৃত্তিকা স্তব্ধ। এ বাড়ীতে পদার্পণ নন্দনের আজ প্রথম নহে, কিন্তু আজ তার মনে হইল—এক দুর্লভ স্বপ্নের আবেশে দেবলোকে গিয়া সে হঠাৎ এক অমর নিকেতনে আসিয়া পড়িয়াছে! কঙ্কণের সংসারটি ছিল দাস-দাসী লইয়া, কিন্তু আজ উৎসবের রাত্রি, তাহাদের ছুটি। ছিল মাত্র প্রবেশদ্বারে প্রহরী, সেও এখন নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত—প্রভু বাহিরে, তদুপরি শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া! নন্দন এক ধাক্কা মারিতেই সে চমকিয়া লাঠি উঁচাইয়া মারিতে গিয়াই নন্দনকে চিনিয়া ফেলিল এবং আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, "সীতারাম, সীতারাম—"

নন্দনের যেন ক্রোধের অবধি নাই। বলিল, "তোমরা জবাব!"

"কসুর মাফ্ কী জিয়ে! মালিককো মৎ বোল্‌না—"

"মালিক?—আজ থেকে আমিই তোমার মালিক!"

মুহূর্ত্তে প্রহরীর মুখ হইতে আতঙ্কের ছায়াটা সরিয়া গেল। লাঠি গাছটা উঠাইয়া কাঁধে ফেলিয়া বিদ্রূপকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপ্ বাউরা হো গিয়া!"—বলিয়াই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নন্দন এইবার এম্‌নিভাব দেখাইল যেন দুর্জ্জয় ক্রোধে সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। বলিয়া উঠিল. "নিকালো. তোমরা জবাব—আভি জবাব—"

ভোরের ঠাণ্ডায় বে-এক্‌তার—প্রহরীর তখন একটু 'নেশার' ইচ্ছা হইয়াছিল। আপন খেয়ালেই একটু শুখা তৈরী করিয়া মুখে ফেলিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "আরে, সাত-পুরুষ এহি মোকাম্‌মে নক্‌রি করতা হ্যায়—কাম্ লেনেকো আয়া কোন্ শ্বশুরাকা লেড়কা?"

"গালাগাল?"

"মিঠা বাত বল্‌নে হোগা—জরুর! কাঁহেনা—হামরা সাত্-সাত্ পুরুষকা মালিককো আপ্ আজ হঠানে আয়া!"

নন্দন দেখিল, গতিক সুবিধা নয়—পথ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে! গলায় আওয়াজ নরম করিয়া কহিল, "বাবা, বংশধর—"

"কেয়া, বংশোধর্?"

"তা নয়? অমন একখানি বংশ ধরে রয়েছ, বাবা?"

প্রহরীর বুঝি-বা পুলক হইল। হাসিয়া কহিল, "ঠিক হ্যায়! আচ্ছা—"

নন্দন একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল, তার পর একটু দূরে লইয়া গিয়া আদ্যন্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া 'দানপত্রখানা' তাহাকে দেখাইল।

প্রহরীর তখন সেদিকে চাহিবার প্রবৃত্তি ছিল না। হঠাৎ

অসুরের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া মাটীতে সজোরে লাঠি ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল, "বহুৎ আচ্ছা, চলিয়ে "

"কোথায় ?"

"বৈরাগীকো মঠ মে !"

নন্দন সভয়ে তাহার শ্রীমূর্তিটার দিকে চাহিতেই প্রহরী বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌তা কেয়া ? এহি ডাণ্ডামে মঠ্ তোড়কে হামরা কলিজাকো আভি হিঁয়া হাজির করেগা ! চলিয়ে—"

"তা হলে কঙ্কণ আত্মহত্যা করবে !"

প্রহরী আঁতকিয়া উঠিল। কহিল, ঠিক বাত্—এভি ঠিক। তব্ কেয়া হোগা—মালিক আউর আবেগা নেহি ? তার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল।

নন্দন একবার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়াই গলা ঝাড়িয়া কহিল, "আসবে বৈকি !"

প্রহরী লাঠির উপর ভর দিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ ফোঁপাইয়া উঠিল। কহিল, "জরুর ! লেকেন, এহি একঠো মোকামকে নেহি ! হাজার মোকামকো, হাজার আদমীকো, হাজার কলিজাকো অন্দরমে—" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

ভোরের বাতাস ! নন্দনের বুঝিবা ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। নাক ঝাড়িয়া কহিল, "তোমার আমার কলিজাতে আগে !" একটু থামিয়াই যেন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ ! আমি ওপরে যাচ্ছি। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার—মাইজি যদি আসে—"

প্রহরী শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "উন্‌কা দম্ ছুট্ যায়েগা—"

"আহা-হা ! সেই জন্যেই ত বল্‌ছি, কথা শোনো—এলে, তুমি কিছু বোলোনা, শুধু বোলো—'বাবুজি ওপরে।' তার পর, ওপরে গেলেই আমি বুঝিয়ে দেব ! বুঝ্‌তা হ্যায়?"

প্রহরী কিন্তু কথাটা বুঝিলনা। নন্দনও আর অপেক্ষা করিলনা, উপরে উঠিয়া গেল।

উন্মুক্ত কক্ষ। ঢুকিয়া নন্দন চারিদিকে তাকাইতে লাগিল ; দেখিল—বিছানা এলোমেলো, এখানে-ওখানে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা, ছড়ানো জল, রক্তের দাগ। বুঝিতে পারিল, এইখানে আহতের সেবা চলিয়াছিল। ভৃত্যেরা তখন কেহই ছিলনা, নন্দন নিজেই সে-সমস্ত উঠাইয়া পরিষ্কার করিতে গেল এবং এক টুকরা কাপড়ে হাত দিতেই থম্‌কিয়া পিছাইয়া আসিল—না থাক্। এমনিই সময় সিঁড়িতে কার পদশব্দ হইতেই সে তাড়াতাড়ি খাটের উপর আসিয়া একখানা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। তার পর এক মুহূর্ত্ত ! এক মুহূর্ত্ত পরেই চঞ্চল পদে একটি অস্থির নারী মূর্ত্তি আসিয়া প্রবেশ করিল—চিত্রা। তাহার মাথার চুল এলোমেলো, বিশৃঙ্খল বেশভূষা, চোখে আতঙ্ক ! ঘরে পা দিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল—ছেঁড়া কাপড়, জল, রক্ত ! আর—

পা দু'টা বুঝি ভাঙিয়া গিয়াছে, নিজেকে যেন ধরাধরি করিয়াই খাটের কাছে দাঁড় করাইয়া শায়িত ওই বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তির দিকে স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া আস্তে-আস্তে গায়ে হাত দিল।

নিথর !

চিত্রার বুকটা উড়িয়া গেল ! মুখখানা বিবর্ণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখের কাছে মুখ রাখিল—যেন সে জানে সহস্র সর্ব্বনাশ হইলেও এইবার সাড়া মিলিবেই মিলিবে !

কিন্তু, না ! নিস্পন্দ ওই নরদেহ ! * * * চিত্রা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলনা। থর থর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর ভিতর মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল।

শেষ ! তাহার জীবনের যাহা কিছু উৎসব, যাহা কিছু গৌরব, যাহা কিছু ভ্রান্তি—সবই কি তবে শেষ ? অজস্র আশ্বাস—তাহার কি ছাই কোন মূল্যই নাই ? তরুণ দেহ—ইহার বিচিত্র সফর, নির্ম্মুক্ত বুক—ইহার সাজানো ফলফুল, কাহাকে দিয়া তবে সে আত্মহারা হইবে ? জীবনের কল্পতরু—এম্‌নি করিয়াই সে কেন হেলিয়া ভাঙিয়া শুকাইয়া যাইবে ?—কেন ? কঠিন শপথ—'তুমি আমার !' ইহাও কি—

চিত্রা চমকিয়া উঠিল এবং ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া আর একবার বস্ত্রাবৃত মুখের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই মুখের আবরণটা খুলিয়া ফেলিল—

এ কে ?

একটু পিছাইয়া আসিয়া চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নি ?"

নন্দনের যেন কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। ঘন-ঘন হাই তুলিয়া গা ভাঙিয়া বার কয়েক এপাশ-ওপাশ করিয়া বলিল, "তাইত !"

"তিনি কোথায় ?"

নন্দন এইবার উঠিয়া বসিল। তার পর সুবিধা ও

অবসর মত স্বীয় বুকের উপর আঙুল রাখিয়া কহিল, "এই ত !"

চিত্রা অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যগ্রব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বলুন—"

চিত্রা খাট হইতে নীচে নামিয়া মেঝের উপর এক অর্থপূর্ণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

আকাশ হইতে পড়ন্ত বজ্রকেও হাতুড়ি মারিয়া সায়েস্তা করিতে চিত্রা প্রস্তুত! তাই সে আজ নিজেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিলনা। অকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "তবে তিনি নেই?"

"যা বোঝো!"

প্রয়োজন মিটিয়াছে। চিত্রা দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইল, তার পর পা উঠাইয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে, নন্দন ডাকিল, "শোনো—"

চিত্রা মুখ ফিরাইল।

নন্দন কহিল, "কি বল্‌ছিলাম—হ্যাঁ, তুমি চলে যাচ্ছ?"

এ প্রশ্নের বুঝিবা জবাব নেই। তাই, পুনশ্চ ফিরিয়া চিত্রা পা বাড়াইল।

নন্দন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মাটী করলে! আরে, না—না! সবটা সে মরেনি।"

কলের পুতুলের ন্যায় চিত্রা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন নন্দনের মুখে হাসি আর ধরেনা।

চিত্রা যেন তাহার বুকের খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নন্দনের পায়ে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনার পায়ে পড়ি! বলুন—তাঁর কোন অকল্যাণ হয়নি ত?"

"রাম বল! তিনি স্বশরীরে স্বর্গে গেছেন?" বলিয়াই নন্দন চিত্রার কাছে গিয়া কানের গোড়ায় মুখ নামাইয়া কহিল, "এই আজ থেকে—বুঝেছ, এই অদ্য হইতে—তুমি আমার—মমস্ত!"

দাবানল! চিত্রার চারিদিক ঘিরিয়া যেন এক দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মুখ সংযত করবেন! বুঝিছি, তিনি নেই—সেই সুযোগ পেয়েছেন আপনি!"

নন্দন তখন মুখটিপিয়া হাসিতেছিল। পলকেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা বেয়াড়া লোকত? কথাটাই ছাই শোন আগে?—শুধু তুমি নও—ঐ দারোয়ান পাঁড়েজি পর্য্যন্ত আমার!"

এইবার চিত্রার বুকের ভিতরটা খানিক এলো মেলো হইয়া গেল—যেন এক পরিচিত সন্দেহ হঠাৎ মুর্ত্তি ধরিয়া উঁকি মারিয়াছে। মূঢ়ের ন্যায় নন্দনের দিকে তাকাইতেই নন্দন বলিয়া উঠিল, "শুধু পাঁড়েজি নয়—ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-কড়ি, চাকর চাকরাণী—মায় হরিণ ছানাটাও!"

চিত্রার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল! কহিল, "কারণ?"

"আইনের কাব্য—কঙ্কণ হাত বদ্‌লে হয়েছে নন্দন!" বলিয়াই নন্দন চিত্রার দিকে এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিল। কহিয়াই আবার সুরু করিল, "বুদ্ধদেব, মঠ,—বিবাগী! এতক্ষণ মঠে গিয়ে মন্ত্র পড়ছেন!"

ভূমিকম্পের সময় মানুষের মুখের চেহারা যেমন হয়, চিত্রারও মুখখানা তদ্রূপ হইয়া গেল। যেন তার চোখের উপর সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া, ভাঙিয়া, চৌচির হইয়া রসাতলে যাইতে বসিয়াছে! পা দুইখানা ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কোনরূপে নিজেকে খাড়া রাখিয়া এক পল্‌কা সাহসকে আশ্রয় করিয়া অস্থির বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তা' হোতে পারে না! আমাকে লুকিয়ে রাজসিংহাসনেও বস্‌তে তিনি পারেন না!"

"কথাইত তাই! ওই—সব পারে না বলেই ত গেরুয়া নিয়েছে!"

"মিথ্যে কথা

"যদি সত্যি হয়!"—এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই নন্দন 'দান পত্রখানা' বাহির করিয়া বলিল, "এই দেখ—" বলিয়াই সরিয়া আসিয়া উহা চিত্রার হাতে ফেলিয়া দিল; দিয়াই একান্ত নিরীহের ন্যায় কহিল, "ভাল করে অম্‌নি দেখে নিয়ো—তুমি এখন কার!"

'দানপত্র' তাহার কৃষ্ণবর্ণ অক্ষর—তাহার উপর চোখ পড়িতেই চিত্রার মুখখানা ছাই হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই তাহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া কাঁপিয়া উঠিল, যেন পিঠের উপর আচম্‌কায় কোথা হইতে তীর আসিয়া বিঁধিয়াছে! তারপর—পৃষ্ঠের দিকটায় চোখ পড়িতেই ক্রোধে তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল এবং 'দানপত্র'খানা ছিঁড়িয়া

খণ্ডখণ্ড করিয়া মাটীতে নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া যেমন বাহিরের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, নন্দন যেন চোখ মুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা—হা, করলে কি ?"

চিত্রা সর্পিনীর ন্যায় ফিরিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া কঠিন কণ্ঠে কহিল, "পুরুষ জাতির সৎকার !" বলিয়াই হাউয়ের ন্যায় বাহির হইয়া গেল।

নন্দনের মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। তারপর দানপত্রের কুচিগুলা কুড়াইয়া লইয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "এঁদের নাম—বলে কিনা—অবলা !" তারপর নীচে নামিয়া গেল।

দশ

বাহির হইয়া চিত্রা যখন রাজপথে পা দিল তখন চারিদিকেই প্রভাতের প্রথম নমস্কার।

উৎসব ভাঙিয়াছে—রাস্তার কোন অংশে অতিরিক্ত ভিড়, কোন অংশ জন-বিরল। সেই পথ ঠেলিয়াই চিত্রা চলিয়াছে। একস্থানে——ঠিক রাস্তার উপর কতকগুলা লোক অচৈতন্যভাবে পড়িয়াছিল, অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া। চিত্রা তাহাদের সুমুখে পড়িয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া পার হইয়া আবার চলিতে লাগিল। খানিকদুর গিয়াছে, দেখিল একটা ছাউনির ভিতর একটি তরুণ, একটি তরুণী—মেয়েটি ছেলেটির বুকে মাথা রাখিয়া—উভয়েই নিদ্রায় অচেতন, যেন বা তাহাদের হুঁস্ নাই—রাত্রির পর এক রাক্ষুসে দিন আসে! চিত্রা পায়ে জোর দিল। বেশিদুর যায় নাই, দেখিল এক পুষ্পোদ্যান হইতে একদল তরুণী বাহির হইতেছে—তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া ফুলের সাজ, মুখে প্রভাতী গান—সে-গানে ইহারই আভাস যে, পথ চলিয়া দুর-প্রেমিকের কাছে হাজির হইতে দেরি হইবে বলিয়া গানের রেশের মুখে কল্পনায় স্বীয় মূর্ত্তি গড়িয়া ঠেলিয়া লইয়া অগ্রেই নিজেদের উপহার দিয়াছে! কাছাকাছি হইতেই চিত্রাকে দেখিয়া তাহারা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। একজন চিত্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "তুমিও রাজবাড়ীর যাত্রী নাকি ?"

চিত্রা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ার ন্যায় মেয়েটির দিকে তাকাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "অবাক্ হয়ে রইলে ?"

চিত্রা ধীরকণ্ঠে কহিল, "রাজবাড়ী ?—না। তোমরা যাচ্ছ বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

মেয়েটি গালে আঙুল ঠেকাইয়া কহিল, "অবাক্ করলে ! আমরা যে কুমারী—জাননা তুমি ?"

অতিকষ্টেও চিত্রার মুখে হাসি আসিল। কহিল, "না।"

মেয়েটি চোখের এক বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া কহিল, "এই, কাল উৎসব গেছে কিনা—উৎসবের পরদিন, রাজা 'বউ' বেছে নেন—এক বছরের খোরাক !"

"তারপর ?"

মেয়েটি কি বলিতে যাইতেই আর একটি মেয়ে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই থাম্ ! এইবার আমি বলি—"

এই অবকাশে অপর একটি মেয়ে মুখস্থ বলার মত তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "তারপর, ফিরে বছরে এম্‌নি দিনে—আবার ! হ্যাঁ ভাই, তুমি যাবে না ?"

কাতর-মলিন মুখে ঈষৎ হাসিয়া চিত্রা কহিল, "না।"

"বাঁচলুম ! যে রূপ !"—বলিয়াই মেয়েটি সঙ্গিনীদের ডাক দিয়া ছাড়া-গানটি আবার ধরিয়া চলিয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল—একি পাশবিক আচার! শুনিবার কেহই নাই, তত্রাপি সে যেন নিজেকেই নিজে শুনাইয়া কহিল, "এই পুরুষ, এই তার 'বলি' !"

চিত্রা অধিকতর দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। কতদুর গিয়াছে, তাহা তাহার হুঁস্ নাই, রাস্তায় এক বাঁকের মুখে পড়িয়াই চম্‌কিয়া উঠিল—সুমুখেই একখানা গাড়ি! তৎক্ষণাৎ গাড়িখানার গতিরোধ হইল এবং চিত্রাও তাড়াতাড়ি নিজেকে হিঁচ্‌ড়িয়া আনিয়া রাস্তার একপাশে ঠেলিয়া গুঁজিয়া ধরিল। গাড়ির ভিতরটায় চিত্রার লক্ষ্য পড়ে নাই, কিন্তু গাড়ির ভিতর হইতে আর একজনের লক্ষ্য পড়িল চিত্রার উপর—সে সেই গতরাত্রির নাগরিকা। নাগরিকা ত্বরিদ্বেগে নামিয়া আসিয়া চিত্রার হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি ?"

বিস্ময়ে ও আনন্দে চিত্রার চোখদু'টা বড় হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমিও যে—হঠাৎ ?"

নাগরিকার মুখে একমুখ হাসি। কহিল, "এইত সকলের মন কুড়িয়ে ফিরছি!" গাড়িতে বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়া একটি যুবককে দেখাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "ওই দেখনা ?"

চিত্রা গলা চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কে—তোমার স্বামী ?"

নাগরিকা তাড়াতাড়ি চিত্রার মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, "চুপ্! ও-সব বালাই আমার নেই! মালা আমি নিই—দিইনে!"

আবার সেই বিষ! গত রাত্রির প্রথমক্ষণে এক বিষ-দর্পণে এই মেয়েটির প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেও পরক্ষণেই তাহার কথাবার্ত্তায় চিত্রার বুকের ভিতর এক মৃদু-সমীরণের স্পর্শ পড়িয়াছিল, তাই সে নিজের অনেকখানিই উহাকে ধরিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আজ আবার তাহার সমগ্র মন ঘৃণায় বিষিয়া উঠিল—ছি, ছি! * * * অস্পৃশ্যার নিশ্বাস—চিত্রা মুখ ফিরাইল; ফিরাইয়া যেমন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবে, নাগরিকা দুই হাত বাড়াইয়া বাধা দিয়া কহিল, "তা হয় না! এইবার তোমার কথা—একলাটি কোথায় ?"

আপদকে এড়াইতে হইবে, অথচ মিথ্যাবাক্য তাহার মুখে আসেনা। কাজেই তাহাকে বলিতে হইল, "মঠে।"

এক পরিচিত বিস্ময়! যেন এক পরিচিত বিস্ময়ের বাষ্পে নাগরিকার চোখদুটি ভরিয়া উঠিল। পথ ছাড়িয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "মঠে—কেন ?"

"তিনি গেছেন, তাই!"

নাগরিকা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তারপর চিত্রার পানে এক ক্ষোভ কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "মাটি করবে নিজেকে ?" বলিয়াই ফিরিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। চিত্রাও রেহাই পাইয়া আবার পথ ধরিল।

অদূরেই নগরের তোরণ, তারপরই প্রান্তর—দূর-বিস্তৃত। তাহারই ওপারে—মঠ! নগর ছাড়িয়া চিত্রা মাঠে পড়িল—বিশ্রী পাথুরে রাস্তা। মাথার উপর চন্‌চনে রোদ। চিত্রা এক নিঃশ্বাসে নিজেকে যেন জোর করিয়া খানিকটা ঠেলিয়া লইয়া যায়, আবার থামে। এম্‌নি করিয়াই চলিতে লাগিল। কোনোও দিন সে হাঁটিয়া পথ চলে নাই, কিন্তু আজ যেন সে বাজী রাখিয়াই নিজেকে উপহাস করিয়া চলিয়াছে—পৃথিবীর কোনোও বাধা সে মানিবে না। বুঝিবা এই সত্যই বড় হইয়া তাহার সুমুখে আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার দেহের মূল্য নাই—মহাপ্রাণ এই পথেই ভাঙিয়া গিয়াছে। সুতরাং, ইহাই তার পথ! কিয়দ্দূর গিয়াছে, হঠাৎ একখানা পাথরে জোর আঘাত লাগিয়া পা কাটিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু, সে এক মুহূর্ত্ত! তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থানে খানিক ধূলা চাপা দিয়াই আবার চলিতে সুরু করিল। বেলা যখন অপরাহ্ন তখন সে মাঠ পার হইল। এইবার মঠ! চিত্রার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, দেহটা অবশ হইয়া গেল—ওই মঠ! কয়েক পদ গিয়াই হঠাৎ তাহার গতিরোধ হইল—পায়ের নীচেই এক খরস্রোতা! অপর পারেই—মঠ!

চিত্রা চাহিয়া দেখিল, ওপারে একখানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। হাতছানি দিয়া ডাকিতেই মাঝি এ-পারে নৌকা আনিল এবং উঠিবার জন্য নৌকায় চিত্রা পা বাড়াইতেই, মাঝি বাধা দিয়া হাত পাতিল—'ভাড়া ?'

তাইত! চিত্রা চম্‌কিয়া উঠিল—নাই ত কিছুই! মনে করিল, একখানা অলঙ্কার দিবে, কিন্তু পরক্ষণেই হুঁস্ হইল—তাহাও সে গত রাত্রে নাগরিকাকে সমস্ত খুলিয়া দিয়াছে। চুপ করিয়া রহিল।

মাঝি তাড়া দিল।

চিত্রা শুষ্ক মুখে কহিল, "হাতে কিছুই নেই!"

"নেই, তবে রূপ দেখিয়ে পার হবে নাকি ?" বলিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া উঠিল। তারপর এক বিশ্রী কটাক্ষ করিয়া কহিল, "নগরে গিয়ে কিছু উপার্জ্জন করে এনে পার হতে এসো—হয়রাণ!" বলিয়াই নৌকার মুখ ঘুরাইয়া আবার ও-পারে চলিয়া গেল।

ও-পারে—ওই মঠ, তাহার উপর অপরাহ্নের রক্তিম-রাগ পড়িয়াছিল, সঙ্গে-সঙ্গে উহা যেন সরিয়া গিয়া অন্ধকারের এক কালো ছোপে রূপান্তর গ্রহণ করিলল। চিত্রা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, পা দুটা ভাঙিয়া পড়িল, তারপর অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল—সুমুখেই কালো জল, ও-পারে—

উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন তাহার দেহে কে এইমাত্র এক মুঠি শক্তি গুঁজিয়া দিয়া গিয়াছে।

তারপর লাফ দিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারপর—তারপর যখন সে সাঁতার দিয়া পার হইয়া ও-পারে গিয়া উঠিল, তখন টের পাইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ গড়াইয়া জল পড়িতেছে—টস্, টস্, টস্!

পড়ুক্! সেদিকে তাহার দৃক্পাত করিবার সময় ছিল না। মুখের উপর কতকগুলা ভিজা চুল আসিয়া পড়িয়াছিল, সেগুলা মাথার উপর ঠেলিয়া তুলিয়াই নিজেকে যেন ধরাধরি করিয়া মঠের মুখে দাঁড় করাইয়া দিল।

দ্বার খোলাই ছিল—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটি প্রিয়দর্শন তরুণ ভিক্ষু। চিত্রাকে দেখিয়াই সে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই সেদিকে চিত্রার। বিশ্বব্যাপী এক এলোমেলো ঝড়ের ন্যায় যেমন ভিতরে প্রবেশ করিবে, ভিক্ষু তাহার সুমুখে পড়িয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল—'নিষেধ!'

চিত্রা চম্‌কিয়া ভিক্ষুটির দিকে তাকাইল, তখন তাহার বুকটা উড়িয়া গিয়াছে—নিষেধ?

সেই চাহনি—ভিক্ষুর নিকট গোপন রহিলনা। তৎক্ষণাৎ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "স্ত্রীলোক!"

নিস্পন্দের ন্যায় মিনিটখানেক ভিক্ষুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া চিত্রা কহিল, "মানুষ—স্ত্রীলোক কি মানুষ নয়?"

"নিয়ম!"

চিত্রার মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমাদের নিয়ম—আমাদের এই অপমান?"

ভিক্ষুর চোখদুটি ছলছল করিয়া উঠিল। কহিল, "তা কেন—আপনি মা!"

"তবে?"

"আপনি ফিরে যান?"

ফিরিয়া যাইতে চিত্রা আসে নাই। কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া কহিল, "যাবো না—পথ ছাড়ো—"

"না, মা! তা হয় না! এ মঠ, আর আপ্‌নি গৃহস্থ-লক্ষ্মী—এর ভিতর যাবার আপনার অধিকার নেই!"

এইবার চিত্রার সর্ব্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাহার সর্ব্বস্ব যে ইহারই ভিতর! ব্যগ্র-কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার সন্তান—"

"আমি মাতৃহীন!"

চিত্রা পিছাইয়া আসিল, যেন তাহার মুখে এক চড় পড়িয়াছে। অতঃপর তাহার ভিতর যে সুস্থপ্রকৃতি অবশিষ্ট ছিল, তাহা নিমেষেই কর্পূরের মত উবিয়া গেল। বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমরা পাপিষ্ঠ!"

ভিক্ষু আস্তে-আস্তে মাথা নীচু করিল, যেন ওই পরিচয়হীনা মায়ের তিরস্কার সে নতশিরেই গ্রহণ করিয়াছে—আশীর্ব্বাদ!

চিত্রা কণ্ঠে ঈষৎ জোর দিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "ছাড়বে না পথ?"

ভিক্ষু নিরুত্তর হইয়া রহিল, তেম্‌নি করিয়াই।

দলিতা সর্পিনীর ন্যায় ব্যর্থরোষে এদিক-ওদিক শূন্য-দৃষ্টিতে বারকয়েক তাকাইয়া আকাশের দিকে চোখ তুলিতেই চিত্রা শিহরিয়া উঠিল—আর যে বেলা নাই! তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া ভিক্ষুকে অস্থিরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কথার একটা জবাব দেবে?"

ভিক্ষু শান্তকণ্ঠে কহিল, "প্রতিশ্রুতি দিতে আমাদের নেই—বলুন?"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিল, "কেউ আজ 'বলি' হয়েছে এখানে—বলিদান?"

কথাটা বুঝিবা ভিক্ষু বুঝিতে পারিল না। বিস্মিতনেত্রে তাকাইতেই চিত্রা তেম্‌নি করিয়াই বলিয়া উঠিল, "কাউকে কপ্‌নি পরিয়েছ?"

ভিক্ষু হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তাই বলুন—ভিক্ষু?"

শ্লেষকণ্ঠে চিত্রা সায় দিল, "হ্যাঁ! তাঁর কাছে তোমরা দাঁড়াতে পার না—'রাজার ছেলে?"

এম্‌নি সময়ে মঠের ভিতর ঘণ্টাধ্বনি হইতেই ভিক্ষু ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "উপাসনার ডাক পড়েছে—নমস্কার!" বলিয়া দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেই চিত্রা যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, "এও—না?"

"ভেতরের কথা বাইরে প্রকাশ—এও না!" বলিয়াই ভিক্ষু হাতদুটি জড় করিয়া একবার মাথায় ঠেকাইল, তারপর চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পায়ে জোর দিয়া চিত্রা আর দাঁড়াইতে পারিল না। ঝরে-পড়া পাতার ন্যায় কাঁপিতে-কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। তাহার চলিবার পথে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কি অবরোধ!

কতক্ষণ বসিয়া আছে তাহা তার হুঁস্ নাই, এক সময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল—এই মঠ, ইহারই ভিতর তাহার অন্তরাত্মা

রহিয়াছে! উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় অগ্রসর হইয়া প্রাচীর গাত্রে হাত দিল—কি তৃপ্তি! ইঁট-পাথর—ইহার ভিতর রক্তমাংসের দেহের স্পন্দন যে! প্রাচীর ধরিয়া উহার গায়ে-গায়ে অগ্রসর হইতে লাগিল, কেন যে তাহা সে জানেনা—যেন ইহাই তাহার উপস্থিতকার যাত্রা। খানিক যায়—আকস্মিক আবেগে প্রাচীর গাত্র চুম্বন করে, পরক্ষণেই আবার অবশ হইয়া তাহার উপর মাথা দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে! এম্‌নিভাবে কতদূর গিয়াছে তাহা সে জানে না, হঠাৎ গতিরোধ হইল—গাছ!

গাছটা বেশি বড় নয়—গোড়া হইতেই ঘন-ঘন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। চিত্রার মুখখানা এক অপ্রতিহত উৎসাহে আবার সতেজ হইয়া উঠিল—সেই সন্ধ্যায় আকাশে যে চাঁদ উঠিবার কথা, তাহা যেন তাহারই মুখে অন্তরের মেঘ ঠেলিয়া উঁকি মারিয়াছে। মাথায় বিক্ষিপ্ত কেশরাশি—তাহা গোছা করিয়া গাঁট বাঁধিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া একবার গাছটার দিকে তাকাইল, তারপরেই বাজীকরের ন্যায় উহার উপর উঠিয়া পড়িল। অনুচ্চ প্রাচীর—দেখিতে-দেখিতে সে প্রাচীরের উপর পা দিল। সেই চিত্রা! তখন মুছিয়া গিয়াছে তাহার পশ্চাতের পৃথিবী, সম্মুখের যাহা-কিছু একমাত্র তাহাই তাহার বর্ত্তমান ইহলোক!

চিত্রার পায়ের নীচেই মঠের ভিতর—দূর-বিস্তৃত প্রস্তরবেদী, তাহার একধারে সারি দিয়া বসিয়া ভিক্ষু, বিপরীত দিকে তদ্রূপ বসিয়া ভিক্ষুণী—উপাসনায় তন্ময়। উভয় শ্রেণীর মাঝে বসিয়া ত্রিবর্ণ—এক প্রান্তে। সকলেই মৌন, সকলেই স্তব্ধ—ইহজগতের মৃত্তিকার সহিত তাহাদের যেন পরিচয় নাই। চিত্রা একবার সেইদিকে নেত্রপাত করিল, করিয়াই বেদীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ হইতেই ভিক্ষুরা ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং সহসা এক নারীকে ভূপতিত দেখিয়া সকলেই যুগপৎ আতঙ্কে ও বিস্ময়ে চম্‌কিয়া উঠিল। তখন চিত্রার জ্ঞান ছিল না। ত্রিবর্ণের আসন একটু দূরে ছিল, তিনি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া একটি মেয়েকে ইঙ্গিত করিতেই সে যেন উড়িয়া আসিয়া চিত্রার কাছে বসিয়া তাহার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইল। সে কৌমুদী। অপর ভিক্ষুণীরাও মাতিয়া উঠিল—কেহ লইয়া আসিল জল, কেহবা তালপত্র, কেহবা শুধুই বিবর্ণমুখে চিত্রার মুখের দিকে তাকাইয়া।

এই সমারোহের অনতিদূরেই দাঁড়াইয়া—কঙ্কণ। তখন তাহার পুরাতন জীবনের অবসান হইয়াছে—সেও ভিক্ষু। তাহার পদদ্বয় নগ্ন, পরিধানে হরিদ্রাবস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তকে হরিদ্রার প্রচ্ছাদন—পিঠ লতাইয়া। সে আজ নির্ম্মম, নির্ব্বিকার—সুমুখেই যে পৃথিবীর এক স্তোকবাক্য, ইহজন্মের 'দিলেশা'! কঙ্কণ আর চিত্রা, চিত্রা আর কঙ্কণ—এই সে, সেই এ!

ক্ষণেক পরেই চিত্রার চেতনা ফিরিল। ফিরিতেই কৌমুদীর সারা মুখ হর্ষে চক্‌চক করিয়া উঠিল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—'আর একটু!'

শত্রুপক্ষ! ইহাদের নিষেধ মানিতে চিত্রা আসে নাই। দেহটা অবশ হইয়া গিয়াছিল, তত্রাপি সে বুকে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল।

এতক্ষণ আর-সকলেই মূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া ছিল। এইবার সেই দ্বার-রক্ষী ভিক্ষুটি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, "আপনি?"

ত্রিবর্ণ তাহার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিলেন, "তুমি এঁকে চেন?"

ভিক্ষু বিনীত কণ্ঠে জবাব দিল, "একটু আগেই এঁর সঙ্গে দেখা, মঠের মুখে—প্রবেশ পথ চাইছিলেন!"

"প্রয়োজন জেনেছিলে?"

"না! তবে, উনি নিজেই আভাস দিয়েছিলেন—"

ত্রিবর্ণের দৃষ্টি পুনশ্চ সপ্রশ্ন হইয়া উঠিতেই ভিক্ষুটি কহিল, "কোন ভিক্ষুর সঙ্গে সাক্ষাৎ!"

ত্রিবর্ণ চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "ভিক্ষুর সঙ্গে সাক্ষাৎ! কে?"

একপার্শ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ এক নির্ভীক কণ্ঠের উত্তর আসিল—"আমি।"

চমকিত হইয়া সকলেই সেইদিকে চাহিয়া দেখিল—নতমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া কঙ্কণ! (ক্রমশঃ)

কথা ঃ—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু

মিশ্র-দেশ—দাদ্‌রা

এই বারি ঝরা বাদলে
কত কথা পড়ে মনে গুরু মেঘ মাদলে।
মেঘের গভীর নাদে থেকে থেকে প্রাণ কাঁদে
আঁখি জলে ভ'রে আঁখি ধরে রাখি কি ছলে ॥
বিজলী চমকি চায় হাহা রবে ডাকে বায়
বিরহী ডাহুক বঁধূ কাঁদে আজি উভরায়।
দিশি দিশি ঘন ঘোর
আঁধার এ গৃহ মোর
শূন্য পরাণ মনে প্রবোধিব কি বলে ॥

II রা -ণা ণা | ধা পা ধা I গা পা মা | গা রা -া I
এ ই বা রি ঝ রা বা ০ দ লে ০ ০

I রা পা মা | গরা রগা গরা I সা -ন্‌া সা | মা রা মা I
ক ত ক গা প ড়ে ম ০ নে গু রু মে

I পা না র্সা | না র্সা -া I পনা -র্সর্া ণা | ধা পা -া I
ঘ মা ০ দ লে ০ মা ০ ০ দ লে ০ ০

I মা -পধা গা | গা রা -সা II
মা ০ ০ দ লে ০ ০

II { না [illegible] ধপা -া -ধা ধা I না র্রা র্সা | -না না -া I
মে [illegible] ০ ০ ০ গ ভী র না ০ দে ০

I র্সা র্সর্গা র্রা | র্সা ধনা না I র্রা -া র্সা | র্সা -া -া } I
থে কে ০ থে কে প্রা ০ ণ ০ ০ কাঁ দে ০ ০

I পা না র্সা | র্রা র্সা না I ধা পা -া | মণা ণা ধা I
আঁ খি জ লে ভ রে আঁ খি ০ ধ০ রে রা

I পা গা -পা | মা গা -রা II
থি কি ০ ছ লে ০

II {রা রপা পধা | পা মপমা গা I গা রা -া | -া -া -া I
বি জ লী০ চ ম০০ কি চা ০ ০ ০ য়্ ০

I রা গা মা | পধপা মগা রগা I রা -া -া | সা -া -া I
হা হা র বে০০ ডা০ কে০ বা ০ ০ ০ য়্ ০

I মা মরা মা | পা পধা ধা I ধা পধা -র্সণা | -া -ধণধা -পা I
বি র০ হী ডা হু০ ক বঁ ধূ০ ০০ ০ ০০০ ০

I পা -মপধা -পা | -া মগা রসা I রা রপা পা | -া -া -া} I
কাঁ ০০ ০দে ০ আ০ জি০ উ ভ০ রা ০ য়্ ০

I {না না ধা | পধা না র্সা I না -া -া | -া -া -া I
দি শি দি শি ঘ ন ঘো ০ ০ ০ ০ র্

I র্সা র্সর্গা র্রা | র্সা নধা না I না -া র্রা | র্সা -া -া} I
আঁ ধা০ র এ গৃ০ হ মো ০ ০ ০ ০ র্

I পা -না র্সা | র্রা র্সনা র্সা I ণধা পা -া | মা মণা ধা ট
শূ ০ ন্য প রা০ ণ ম০ নে ০ প্র বো ধি

I -পা গা পা | -মগা গরা -া II II
ব কি ০ ব০ লে০ ০

এই গানটী লেখিকার অনুমতিক্রমে রেকর্ডের জন্য সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত। অতএব অন্য কেহ গান রেকর্ড করিতে পারিবেন না।

ভূস্বর্গ-চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ষষ্ঠ স্তবক

অর্চনা দিদি,

তোমার চিঠিতে তোমার মনের সদাকৃতজ্ঞ ভাবটি এমন ফুটেছে! বড় সুন্দর ক'রেই তুমি বলেছ যে, যখন দুঃখ আসে তখন মানুষ প্রায়ই ভোলে যে সে চিরদিন কিছু দুঃখকেই পথের পাথেয় ক'রে চলে নি। এ আলো-আঁধারী জীবনপথে শুধু মরুই নেই সরোবরও আছে, শুধু কাঁটাই নেই, ফুলেরও দেখা মেলে।

খুব সত্য কথা। কিন্তু একথা আমরা প্রায়ই ভুলি কেন জানো দিদি? কারণ মানুষের মনোরাজ্যে একটা সহজ ঢালু আছে অকৃতজ্ঞতার দিকে। ৺পিতৃদেবের প্রতাপসিংহে ইরা শক্তসিংহকে বলছে এক জায়গায়: "পিতৃব্য, সংসারে উপকার-গুলো কি কিছুই নয় যে অকাতরে ভুলে যেতে হবে, শুধু অপকারগুলোই রাখতে হবে চিরস্মরণীয় ক'রে?"

নিজের নানা ক্ষোভ দুঃখের সময় একথা কে না উপলব্ধি করেছে বলো, যে আমরা বেশি মনে রাখি সেই নিশ্বাসটির কথা যা টানতে ব্যথা লাগে—ভুলি দিনের পর দিন অগুন্তি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছি কত আনন্দে। আরব সাধিকা প্রাতঃস্মরণীয়া রাবেয়ার জীবনী তুমি পড়েছ? না প'ড়ে থাকলে পোড়ো। সংসারে আমরা প্রতিপদে ভুলি ভগবানের নানা করুণা। মনে রাখি স্বকৃত কর্মফলের দুঃখটুকুই বেশি ক'রে। রাবেয়া তাই বলেছিল:

প্রতি দীরঘশ্বাসে
বহে মলয়-প্রীতি,
হায় দুখ-বিলাসে
তারি হারাই স্মৃতি।
যবে জলদ কালো
ঢাকে আকাশ-আলো
মোরা তারি তরাসে
ভুলি ওগো অতিথি,
তুমি মেঘ মায়া ছলে
আনো নীলিমা নিতি।

সত্যি আজো মনে পড়ে, রাবেয়ার জীবনী পড়তে পড়তে কৈশোরে বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠত, আশ্চর্য হ'য়ে মুগ্ধ হ'য়ে ভাবতাম: শুনি হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভগবৎভক্তির আলো নামলে কাঁটাকেও কাঁটা মনে হয় না, একথা কি সত্যি? যদি হয় তা হ'লে দাঁড়ায় যে, এ ধূলিবাস্তব দীন যন্ত্র-জগতে এমন চেতনা মানুষ লাভ করতে পারে যার প্রসাদে তীব্র বেদনাও গভীর আনন্দে রূপান্তরিত হয়। একথা অনেক দিন সম্ভব মনে হয় নি। কিন্তু পরে জেনেছি যে, এ সত্যিই সম্ভব। শুধু মানসিক বেদনাও নয়—তীব্র দৈহিক

ডালহ্রদ

বেদনাও নিবিড় আনন্দের অনুভবে রূপান্তরিত হ'তে পারে—শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন আমাকে একবার। এ তাঁর কাছে কথার কথা নয়, পরীক্ষাপ্রত্যক্ষ।

জীবনে বেদনা আনে একটা মস্ত সমস্যা। মানুষ যদি স্বভাবে আনন্দময়—অমৃতের সন্তানই হবে তা হ'লে বেদনা আসে কোন্ পথ দিয়ে? ধাঁধা লাগে বৈ কি প্রথমটায়! কিন্তু তবু এ-ও সত্য যে ক্রমে এই বেদনার মধ্যে দিয়েই আমরা বেশি ক'রে চিনে নিই শুধু আনন্দের মাধুর্যমন্ত্রই না, করুণার মর্মবাণীটিও। শুধু কল্পনায় নয়—জীবনের অনুভবলোকেও। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে, দুর্বিনীত উদ্ধত মানুষও ভগবানের চরণে সহজে নত হয় বেদনারই মন্দিরে। তাই তো যোগী সাধক মহাত্মা ঋষিরা সবাই

উলার হ্রদ—কাশ্মীর

বলেছেন: ভগবানের করুণা চাইতে হয় অশ্রুজলে। কারণ নিবিড় চাওয়াটাই হ'ল হৃদয়ের দুয়ার খোলা। অবিশ্বাসীরা বলে প্রায়ই—যদি ভগবানের করুণা আলো হাওয়ার মতনই আমাদের চারদিকে প্রবহমান, তবে চাইতে হবে কেন?—আমরা সেটা অনুভব করি না কেন? শ্রীকৃষ্ণপ্রেম এ প্রশ্নের বড় চমৎকার উত্তর দিয়েছেন তাঁর গীতা-ভাষ্যে: "একথা সত্য বটে যে বিধাতার করুণার আলো চির সমারোহে চলেছে আমাদের চারদিকেই, কিন্তু অন্ধকার গুহার মধ্যে ব'সে থাকলে তো সে-আলোর দেখা মিলবে না। বেরিয়ে আসতে তো হবে আমাদের কামনা বাসনা অহঙ্কারের তামস গুহা থেকে।" *

সত্যি, দিদি, কাশ্মীরে যেন নতুন ক'রে চাক্ষুষ করেছিলাম বিধাতার এই করুণা—তাঁর রূপরাজ্যের প্রসাদে। কাশ্মীরের শোভা আমার চোখকে খুশি করেছিল মানি এবং এটা একটা কম লাভ নয় এ জগতে যেখানে প্রকৃতির রূপমঞ্জুষা প্রায়ই ঢাকা পড়ে শহুরে জীবনের মালিন্যে। কিন্তু কাশ্মীরের রূপরাজ্য আমাকে আনন্দ দিয়েছিল বেশি ক'রে এই জন্যে যে, তারই প্রসাদে জীবনের অনেক অসঙ্গতির বেদনা দূর হয়েছিল মুহূর্তে।

এ আমার একটা গভীর অনুভূতি। তাই বলতে চেষ্টা করি একটু।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির ভঙ্গি বদলায়—কে না জানে? কিন্তু কী ভাবে বদলায় এবার কাশ্মীরে গিয়ে যেন নতুন ক'রে টের পেলাম নরওয়ে ও কাশ্মীরের তুলনায়।

আমি এ পর্যন্ত যত সুন্দর দেশ দেখেছি তার মধ্যে রূপ-সম্পদে সেরা বলব দুটি দেশকে: নরওয়ে ও কাশ্মীর। নরওয়ের একটি ফিওর্ড ও কাশ্মীরের ঝিলমের ছবি পাশা-পাশি ছাপতে পাঠাচ্ছি দেখো। ছবি থেকে অবশ্য বোঝা যাবে না এ দুটি দৃশ্যের মহিমা। কিন্তু এছাড়া তো আর বর্ণনার উপায় নেই। তাই ছবি দুটির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি কী বলো?

যা বলছিলাম। নরওয়েতে মনে আছে এক দিন একলা ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম আট মাইল। সে আনন্দের মাপজোখ হয় না। দুধারে—সময়ে সময়ে চারধারে—পাহাড়ের সহস্র-শীর্ষে ঝলকে উঠেছে অগণ্য সোনার মুকুট—প্রাতঃসূর্যের ছোঁওয়ায় জলে স্থলে লেগেছে আগুন। মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশ নীল মন্ত্র জপছে। নীচে ফিয়োর্ড তার লাখো স্বর্ণনেত্রে দেখছে সে শোভা থর থর ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠে।

বাড়ি যখন ফিরলাম মনে ঘোর লেগেছে। মানব সে একটা অন্য চেতনা। কিন্তু তবু সে চেতনার মধ্যে কই ছিল না তো অন্তরের কোনো প্রার্থনার সাড়া! মনে হয় নি তো--এ বিধাতার করুণা! হয়ত তখন উচ্ছল যৌবনের মাদকতা রক্তে রথ চালিয়ে চলত ব'লেই এ আনন্দকে আমার প্রাপ্য মনে করতে বাধে নি। সংসারে আমাদের কত পাওয়াই ব্যর্থ হয়, আমরা সে সবকে আমাদের প্রাপ্য ভাবি ব'লে—সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করি না ব'লে?—কিন্তু যা বলছিলাম, নরওয়েতে সেদিন আবেশ জেগেছিল, প্রণাম

* The Yoga of Bhagabadgita.

না। কিন্তু কাশ্মীরে মনের মন্দিরে প্রায়ই বেজে উঠত শাঁকঘণ্টা। এক একটা দৃশ্য দেখতাম আর মনে হ'ত এত আনন্দ পাবার আমি অযোগ্য। করুণার অনুভবের মধ্যে ফোটে এই দীনতার দিব্যদৃষ্টি, যেমন ফোটে যখন মানুষ গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে। শিখর ও গহ্বর যে হাত ধরাধরি ক'রে চলে সে এই করুণারই প্রসঙ্গে। গৌরবের সঙ্গে তাই তো আসে দীনতা, উল্লাসের সঙ্গে আসে নিজের অযোগ্যতার মধুর অনুভূতি। গভীর ভালোবাসার মুহূর্তেও তাই তো সব আগে মনে হয়—এর আমি যোগ্য নই, এ আমি পেতে পারি না—কেন না, এরই নাম বিধাতার বরদান। কাশ্মীরের উলার হ্রদে যেদিন সদলবলে অভিযান করেছিলাম সেদিনও এম্নি মনে হয়েছিল আমার। কৃতজ্ঞতায় মন যেন নুয়ে পড়েছিল। এ-ঈর কবিতার একটি চরণ মনে গুনগুনিয়ে উঠেছিল গানের সুরে: This earth's heart-choking magic. সত্যি ভাব লাগে।

মনে পড়ে ঝিলমে নৌকায় সেদিন পাড়ি দেওয়া। শ্রীনগর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল মোটরযোগে গিয়ে ফের ঝিলমকে ধরতে হয় মোহানার কাছে। এ পথটুকুরও তুলনা নেই। আকাশে আলোর রাগালাপের সঙ্গে নদী চলেছে তাল দিয়ে। দুপাশে চেনার উইলো আর কত ঝিকমিকে গাছ সুরু করেছে সবুজের জয়ধ্বনি, আর উপরে নীল আকাশ রয়েছে চেয়ে। ধরণীর আনন্দে অধরারও সায় উঠেছে বেজে সোনার মৃদঙ্গে। মনের কোলে বিছিয়ে গেছে গৌরব ও শান্তি। মনে পড়ে লায়নেল জনসনের:

Could we but live at will upon this
perfect height!
Could we but always keep the passion
of this peace!

মনটার চারিপাশে যেন জড়িমার লেশও নেই আর। হঠাৎ দেখা যায়, একটা বিরাট সমতল হ্রদ। জলে জলময়। নদী গিয়ে মিশেছে হ্রদে। হ্রদের ওপারে শুভ্র তুষার মুকুটি ও পিঙ্গল তনু পর্বতশ্রেণী ঢেউ খেলে নেমেছে। এধারে খোলা মাঠ ও গাছপালা। সে যে কী দৃশ্য দিদি—ব্যাপ্তি তার মন্ত্র—যেও একবার। তোমার আর ভাবনা কী বলো—চলো বললেই লোকলস্কর নিয়ে যেতে পারবে। যা দেখবে ভুলবে না কোনো দিন। দেখতে দেখতে মনে হয় কেবলই ব্লেকের আক্ষেপ:

If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as infinite. For man has closed himself up, till he sees all things through narrow chinks of his cavern.

হৃদয়-দুয়ার খুলে দাও—খুলে দাও।
দেখ—প্রতি ধূলিকণা অনন্ত-উধাও।
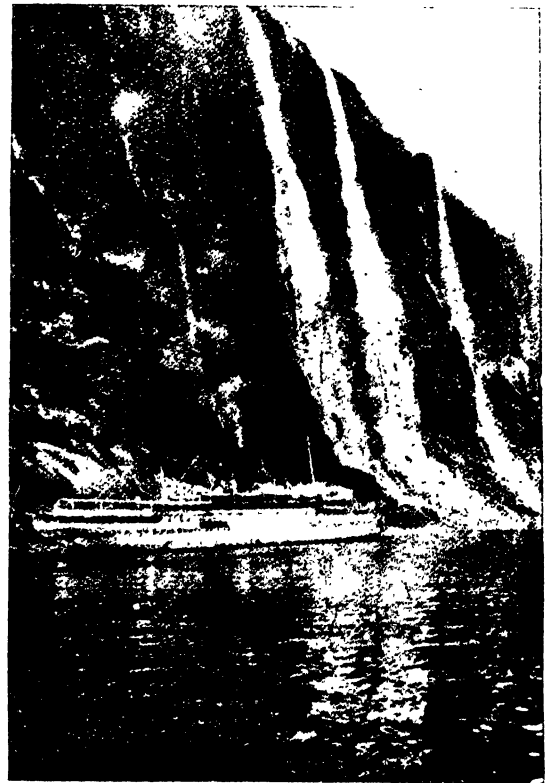
নরওয়ের ফিওর্ড

গৃহকারাবন্দী রহি' মানি' পরাজয়
ভুলি মোরা—বিশ্বলীলা আনন্দ-তন্ময়।

কাশ্মীরে এ-অনুভব প্রায়ই হ'ত। নরওয়েতেও হ'ত, কিন্তু ঠিক এভাবে না। তাই কাশ্মীরে আমার প্রথম প্রথম দিনগুলো কাটত যেন মণি কুড়িয়ে। প্রতি দৃশ্যই শিহরণ জাগিয়ে চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধরত যেন নব নব আনন্দলোক। মনে পড়ে একদিন প্যাট্রিক নিয়ে

গেল আমাদের পরীমহলের পাহাড়ে। লীলা, এষা, হাসি ও আমি সঙ্গে উঠলাম চূড়ায়। এখানে আগে ছিল একটি প্রাসাদ। তার ধ্বংসশেষ রয়েছে। কিন্তু এ স্থানটির মাহাত্ম্য এর ঐতিহাসিকতায় নয়—যদিও পরিমাণ নাকি ঐতিহাসিক স্থান—কী সব কাণ্ডকারখানা আমি শুনতে শুনতেই ভুলেছিলাম। মনে যার রেশ রইল সে হচ্ছে এখান থেকে নীচের দৃশ্য। শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের শিখর থেকেও শ্রীনগরের দৃশ্য দেখা যায়—তবে সে আরো উদার ব্যাপ্তি। পরীমহল থেকে ডাল লেকের দৃশ্য তেমন মহীয়ান নয়, তবে কোমল। উদার নয়, তবে মনোহর। কি রকম জানো? শ্রীনগরের রূপতনুর একটা দিকের চমক—একটা পাশের আত্মপ্রকাশ। এক একটি সুন্দরী মেয়েকে এক একটি কোণ থেকে ভালো লাগে, তার এক একটা বিশেষ ভঙ্গিই তখন ফুটে ওঠে। পরীমহল থেকে কাশ্মীরের এম্নিতর একটি ভঙ্গি ফুটেছিল। শঙ্করাচার্য পাহাড়ের শিবমন্দিরের বিস্তীর্ণ গাম্ভীর্য না—এ যেন—কি বলব—তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী? হ্যাঁ, অনেকটা ঐ রকমই।

নরওয়েের ফিওর্ড

কিন্তু চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। তাই দুঃখও পেয়েছি বৈ কি ওদেশে। যেমন সেদিন গেলাম রেনাব ওখানকার চশমোশাহি, নিষার ও শালিমার বাগান দেখতে। দুঃখের চেয়েও বেশি হ'ল অনুতাপ: যে সেদিন নাহক ছুটোছুটি ক'রে সব হারালাম।

দিদি, তোমার কেমন লাগে—এই যা কিছু দেখবার আছে দেখ-দেখ-দেখ-ভাবটা? এই I have done it মনোভাব? আমার যে কী যন্ত্রণা হয় বলতে পারি না। বলো তো, দেখি আমরা কী জন্যে? ভোগের জন্যে তো? কিন্তু যখন টুরিষ্ট হই তখন দেখি একেবারে উল্টো উদ্দেশ্যে: স—ব দেখেছি এই ডাক ছাড়তে জাঁক করতে। সেদিন যদি একটি বাগানে চুপ ক'রে ব'সে থাকতাম মন উঠত কানায় কানায় ভ'রে। কিন্তু বাসে ক'রে তিন তিনটে অপরূপ সুন্দর বাগানে বিত্তবান্ প্রত্যাশীর মতন নমো নম ক'রে পূজা সাঙ্গ ক'রে ফেরা—উঃ, নিজের উপর সেদিন যা ধিক্কার হয়েছিল কী বলব! এর নাম দেখা? বাড়ি ফিরে সত্যি অনুতাপ হ'ল। মনে হ'ল, জাপানীদের কথা। ফুলের কেউ অনাদর করল তারা বিষণ্ণ হয়, সত্যি সত্যি মনে করে এতে ক'রে সুন্দরের অপমান করা। আমরা সেদিন কাশ্মীরের বাগান তিনটিকেই এইভাবে অমর্য্যাদা ক'রে যেন পর পর কাণ ম'লে বাড়ি ফিরে ভাবলাম—আঃ, কী বাহাদুরিই না ক'রে এসেছি—যা দেখবার স—ব দেখে নিয়েছি নক্ষত্রবেগে।

মনের কোণে এ-বাহবা এখনো ওঠে সলজ্জে কবুল করছি। কিন্তু মন খুশি হ'লে হবে কি—অন্তর একেবারে ছি ছি ক'রে ওঠে যে। একেই বলে মার্কিন যাযাবর: নোটবুক হাতে ক'রে টুকে রাখা—স্বগত হাঁক দেবার জন্যে—অমুক দেখলাম তমুক দেখলাম। পরীমহলে গিয়ে ফিরেছিলাম আত্মপ্রসাদ নিয়ে। কাশ্মীরের বাগান তিনটি দেখে ফিরলাম গভীর আত্মধিক্কার নিয়ে: সুন্দর জিনিষকে সত্যি অপমান ক'রে ফিরলাম। হুড়োহুড়ি ক'রে মজা ক'রে

এলাম—ভুলে গেলাম এদের প্রণামী দেওয়াটাই পড়ল বাদ। অন্তর ছি ছি করবে না তো কি গাইবে—"দেখেছ তুমি শুনিয়া ধন্য ধন্য ধন্য হে?"

তবে জীবনে অনুতাপ তো সব সময়ে সাজা হ'য়ে আসে না দিদি—অনেক সময়েই আসে বর হ'য়ে। কারণ আত্মগ্লানির আলোতে আসে চিত্তশুদ্ধি। আমারও এল: আমি সেদিন মনে মনে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করলাম—টুরিষ্ট-বৃত্তি আর না—তাতে যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব। এল প্রলোভনের পরীক্ষা: সবাই ধরল—পাহালগাঁ যেতে হবেই হবে। শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল দূরে এই শ্রীমন্তিনী বিরাজমানা। আমি বললাম, যদি যেতে হয় তো সেখানে রাত কাটাব—বাসে হৈ হৈ ক'রে গিয়ে সাততাড়াতাড়ি পাহালগা চক্র দিয়ে তক্ষণি ফেরা—ওতে আমি নেই—তবে যার অভিরুচি যাক, আমি বজরায় ব'সে পরমানন্দে গান বাঁধব একেবারে একলা। শুধু তাই নয়, পরে পেশোয়ারে গিয়েও এ-প্রতিজ্ঞা ভাঙি নি—দেখি নি খাইবার পাস—মোটরাদির হাজারো সুবিধা থাকা সত্বেও। বললাম—কী হবে খাইবার পাশ দেখে? তার চেয়ে যাই মহাত্মাজীর কাছে। তবে না আমার হারানো আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছিলাম দিদি। তুমি আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো আর যেন কখনো এভাবে হৈ হৈ ক'রে সুন্দরের অপমান না করি। সুন্দরকে দেখতে চাই যেন জীবনে রূপেশ্বরের প্রসাদ পেতে। টুরিষ্টবৃত্তির কর্মভোগ হে চতুরানন, অতঃপর শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

নিশার বাগ—শ্রীনগর

নিশার বাগ—শ্রীনগর

এ থেকে আরো একটা মস্ত লাভ হ'ল। আমি বুঝতে পারলাম—এ দশ বৎসর নির্জনবাসে কত বদ্‌লে গেছি। এখন আর ভালো লাগে না এ ধরণের হট্টগোল। যাদের ভালোবাসি তাদের স্নেহসঙ্গ ভালো লাগে, হাসির গান ভালো লাগে, এষার নাচ ভালো লাগে, লীলার প্রফুল্লতা ভালো লাগে, ধরণীদার ভ্রমণ-প্রতিভা ভালো লাগে, মায়ার কলহাস্য ভালো লাগে, প্রভাদির স্বভাব-মাধুর্য ভালো লাগে, মানুদার রসিকতা ভালো লাগে—কিন্তু ভালো লাগে না আর এই ভিড় ক'রে হৈ হৈ করা। সুন্দর দৃশ্য এখন দেখতে চাই নির্জনে—প্রণাম করতে। তার মধ্যে পেতে চাই ধ্যানের স্পর্শ—বাঘের সিংহনাদ না। এক কথায় জীবনে অসুন্দরতাই চোখে পড়ে বেশি—কাশ্মীরের মতন সৌন্দর্যনিকেতনে চাই তারই ক্ষতিপূরণ, কিন্তু কলরবে কোলাহলে না—ভগবানের করুণাকে গভীর ভাবে পেতে। শ্রীঅরবিন্দের কথা কেবলই মনে হ'ত কল্পলোকে ভগবানের বিভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ রূপে। রূপের

মধ্যে দিয়ে তাই তাঁকে আরো বেশি পাবার কথা—সেইখানেই না রূপের পরমতম সার্থকতা। কিন্তু এ সার্থকতার আস্বাদ পাওয়া যায় কি পিকনিকে পার্টিতে বাসে বিদ্যুৎগতি ব্যস্ততায়? এ আনন্দের জন্যে চাই যে সমাহিতি, নীরবতা, অবসর। বেশি দেখতে আর সাধ নেই—তাতে লাভও নেই লোভও না। তবে যেটুকু দেখব তার আশে পাশে যেন অবকাশের অলস শান্তি থাকে।

এসব হট্টগোলের পরে গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম (বোধ করি, অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত যথোচিত হয়েছিল ব'লে) কাশ্মীর থেকে বিদায় নেওয়ার আগের দিনে সন্ধ্যায়। পরদিন ছাড়ব কাশ্মীর—পাড়ি দেব পেশোয়ারে, মনটা ছিল সকরুণ। না, ভুল বলেছি। সে ভাবকে ঠিক করুণ

শালিমার বাগান—শ্রীনগর

বলাও যায় না—আসন্ন বিরহের লগ্নে যে উদাস ভাব ঘনিয়ে আসে অনেকটা তারি সুর। সন্ধ্যাবেলা নৌকা ছেড়ে বেরুলাম একলা যেমন প্রায়ই বেরুতাম। আমার একলা বেড়াতেই ভালো লাগে, বিশেষত সুন্দর রাজ্যে। সুন্দরকে আমার মনে হয় প্রেমাস্পদ, জনতার কল্লোলে তার সঙ্গে লেন-দেন চলে না। সে-শুভদৃষ্টি নিঃসঙ্গ লগ্নের অপেক্ষা রাখে যে-লগ্নে আবছায়া বিষাদের সুর মনে বিছিয়ে যায় আলোর মতন। কেবল তখনই প্রকৃতির শান্ত চাহনি খুলে বলে তার মনের কথাটি। বড় লাজুক তার বাণী শুভ্রা কুমারী মেয়ের অন্তরের কথাটির মতন। তাকে দিয়ে বলাতে হয়—অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে—নইলে সে ধার দেবে কেন? আমার বড় ভালো লাগে দিদি, তন্ত্রের কুমারী-পূজা। কৌমার্যের মধ্যে যে পরম সুন্দর পবিত্রতা রয়েছে তার স্পর্শ আমাদের বড় দরকার। বিবেকানন্দ একবার এই কাশ্মীরেই কুমারী পূজা করেছিলেন মন্দিরে। যাকেই আমরা পূজা করি, তার সত্তার কিছু না কিছু ছোঁয়াচ লাগে আমাদের সত্তায়। তাই আমি আজও সর্ব্বান্তঃকরণে পৌত্তলিক—বিবেকানন্দের কথায় আমার সমগ্র প্রাণমন সাড়া দেয় যে: "প্রতিমাকে ভগবান্ বলবে বৈ কি—কেবল ভগবানকে প্রতিমা বোলো না।" পরমহংসদেবের বাণীও আমার হৃদয়ে শিহরণ তোলে: "মাটি কেন গো—চিন্ময়ী প্রতিমা!" দিদি, সত্যের পরখ না-মনগড়া থিওরিতে না-ডগমাতে, সত্যের কষ্টিপাথর হ'ল অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি—experience. লক্ষ লক্ষ নরনারী সাধুসন্ত ভক্তযোগী মহাত্মারা প্রতিমা পূজায় পেয়েছেন ভাবের আবেশ; ভক্তির উচ্ছ্বাস, প্রেমের আনন্দ। শ্রীঅরবিন্দ বছর তিনেক আগে আমাকে একটি পত্র লিখেছিলেন জহরলালের সম্বন্ধে:

"I do not take the same view of the Hindu religion as Jawaharlal. Hindu religion appears to me as a cathedral-temple half in ruins, noble in the mass, often fantastic in detail, but always fantastic with a significance—crumbled and wearisome in places, but a cathedral-temple in which Service is still done to the Unseen and Its real Presence can be felt by those who enter with the right spirit."

কত সত্যি কথা। যাঁরা নরপূজা, প্রতিমা পূজাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাঁরা এ-পূজাকে ঠিক চোখে (in the right spirit) দেখেন না। কারণ, এ আমি প্রত্যক্ষ অনুভবে জানি যে গুরু, প্রতিমা, ছবি, বিগ্রহ প্রভৃতির পূজা চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে—এ সবে শুষ্ক মনে নামে প্রেমের ঢল। নামে-কেন না ভগবান ভাবগ্রাহী, তার্কিক থিওরি নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। কুমারী পূজায়ও তাই পূজারী প্রত্যক্ষভাবে পায় (যদি ঠিক মতন চায়) চিরকৌমার্যের পবিত্রতার স্পর্শ—যেটা হ'ল কুমারীপূজার অন্তর্বাণী। ভাবছ এ উচ্ছ্বাস? না। এ আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাই নাস্তিক্যবুদ্ধি একথায় হাসলে আমি আরো হাসি। কল্পনাই ভয়তরাসে—পাছে

লোকে তাকে বিশ্বাস না করে। সত্য উপলব্ধি অকুতোভয়।

সত্যি, সেদিন অস্তগোধূলির স্বপ্নালোকে আমার মনটা এসেছিল গাঢ় হ'য়ে। ঝিলমের সর্পতনু চলেছে এঁকে বেঁকে প্রতি বাঁকে নতুন নতুন দৃশ্য, ঝল্‌কে তুলে: এখানে তুষারাবৃত শিখর মহিমা, ওখানে মন্দির, সেখানে তরুবীথিকা। আর পায়ের নীচে নেচে চলেছে অশ্রান্ত-নটিনী ঝিলম তার সুষমার নূপুর প'রে ধীরচ্ছন্দে—স্বপ্নাবেশে। এখানে ওখানে পাহাড়ের বাঁকে তন্দ্রালসা মেঘবালার এলানো দেহ। গোধূলির আলোতে মন ভ'রে এল এ উদাস পরিবেশে। এক একটা দৃশ্য আছে যারা আয়নার মতন কামনা নিজেকে মেলে ধরে—তার পটে ফুটে ওঠে নিজের বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নভঙ্গের ছবি। বিদায় সন্ধ্যায় কাশ্মীরের এই রূপভঙ্গিটি তেম্‌নি আয়নার মতন চিকিয়ে উঠেছিল যেন। তাই হঠাৎ মাটিতে ব'সেই লিখলাম :

ঝিলমের বাঁকা-নদী-আঁকা ছবিখানি ধীরে ধীরে
ম্লান হ'য়ে আসে আধজাগরণে স্বপ্নসম ফিরে
ফিরে চাই শৈলশিখরের পানে—যেথা ঢেউ হ'য়ে
মেঘের অসাঙ্গ দোলা অফুরন্ত তরঙ্গের লয়ে
নব নব রূপ ধরে।
. . . . দীর্ঘচ্ছায়া তরুবীথিকার . . .
কায়া ফলি ছায়া-জল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বার বার।
বিদায়লগ্নের বেলা মনে হয়—জীবনের পথে
সৌন্দর্যের কত রাগ বেজে গেছে আলোছায়াব্রতে
এমনি অস্তাভ ছন্দে। উন্মুখ আগ্রহে মর্মপুরে
বরণ করেছি যারে—এমনিই স'রে গেছে দূরে।
সুষমা! তোমারে আমি জীবনে চেয়েছি প্রতিদিন।
কামনার গাঢ়বন্ধে রাখিতে পারিনি ধ'রে। লীন
হ'য়ে গেছে অঞ্জলির বন্দীজলসম তব সুধা,
দেখা দিয়ে মরীচিকা সম শুধু বাড়ায়েছে ক্ষুধা—
অধরা দেয়নি ধরা। চুম্বনের পেয়েছি আভাষ
অধরবঞ্চিত ভালে। সুনিবিড় হয়েছে পিয়াস

গুলমার্গ

শুধায়েছি—"প্রশ্নপথে আছে কি নির্ঝর-অঙ্গীকার ?
আকুল আশার দোলে জ্যোতির্ময়ী করে কি বিহার ?"
কে যেন গেয়েছে গান—"চাওয়ার মন্ত্রেরি মাঝে প্রিয়
বাঞ্ছিত ঝঙ্কারে কাঁপে।" শুধু হায়, নেয়নি আজিও
সে-ঝঙ্কার সঙ্গীতের পূর্ণধ্বনি-সার্থকতা। তবু
এনেছে সে বহ্নি' আলোকের পূর্বরাগ কভু কভু
অন্তরের অঙ্গুরীয়-অঙ্গীকারে। হয়েছে বাগ্‌দান,
মিলেনি মিলনসিদ্ধি। তবু জানি—মিলেছে সন্ধান
বেদনারি আন্দোলনে বারবার।
. . . . আজি এ-প্রণতি .
সুরে তাই প্রার্থি : "ওগো প্রার্থনীয়, তোমার আরতি
দীপখানি রেখো মোর বেদনার মন্দিরে জাগায়ে
লক্ষ রূপোৎসব মাঝে। কলোচ্ছ্বাসে রূপেশ্বর পায়ে
রেখো মোরে ধ্যানমৌন। রেখা রঙে গানে আলাপনে
তোমার স্মরণশিখা জ্বলে যেন অনির্বাণ মনে।
যত আকর্ষণলীলা বাহিরের দিকে যায় নিয়ে
কোরো তব কেন্দ্রমুখী। অচিহ্নিত পথে চিহ্ন দিয়ে

কোরো ধ্রুবমুখী এজীবন। উদ্‌ভ্রান্তির ঢেউদোলে
নিয়ে যেয়ো গভীরের অকল্লোল শান্তিস্নিগ্ধ কোলে।

* * * * *

ওখানে ভারি অভাবনীয় ঘটনা ঘটল যেদিন উলার হ্রদে যাচ্ছিলাম। বলেছি, নদীপথে নৌকা ক'রে পাড়ি দিচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ঘাটে দেখি একটা প্রকাণ্ড বজরা বাঁধা। মনে হ'ল কে এ রসিক পুরুষ যে এমন সুন্দর ঘাটে নৌকা রেখেছে—

যেথা সুষমা নয় ক্ষণ-অতিথি, দুঃখসুখসাথী,
যেথা তটিনী আলোছায়ার গান গায় দিবসরাতি,
যেথা এপারে ডাকে শ্যামল শোভা, ওপারে ডাকে গিরি,
যেথা তুষার-চূড়া আকাশ ছোঁয় মেঘের ব্যূহ চিরি',

পাহাল গাঁ

যেথা বীথিকা দোলে সবুজ লতাপাতার শাড়ি পরি'
যেথা জীবন ভোলে ধূলিবেদনা ফুলচেতনা বরি'!

এমন সময় দেখি, একটি সুদর্শন যুবক সেই নৌকা থেকে আমাদের নৌকার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। দ্রষ্টা—পুরুষ, কাজেই ভাবলাম বুঝি এষা কিম্বা মায়া কিম্বা প্রভাদির পরেই তার অখণ্ড অভিনিবেশ। কিন্তু দেখি কি—তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিবাণ আমাকেই করছে নিশানা! কিমাশ্চর্যমতঃপরম!! আমি তাকাতেই সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল: "Isn't that Dilip Ray?"

চমকে গেলাম। একটু প্রীত বোধ করেছিলাম বললেও আশা করি ক্রটি নিজগুণে মার্জনা করবে দিদি—যেহেতু তুমি ভক্তিমতী হ'লেও রসজ্ঞা।

নামতে হ'ল তার ওখানে। না "পধারলে" ছাড়েন না। বন্ধুর নাম জ্যোতিপ্রকাশ। মস্ত জমিদার। লক্ষ্ণৌ ও সাজাহানপুরে বিপুল সম্পত্তি। (সেখানেও সবাইকার নিমন্ত্রণ হ'ল দেখতে দেখতে) কাশ্মীরেও জমিদারী যথেষ্ট। বললেন: "ঘাটে ডিঙা লাগায়ে সবাই পান খায়ে যান।"

পান ব'লে পান! তাজা সাজা পান—যথাবিধি সুরভিত
স্নিগ্ধ আদর হাসি-সিঞ্চিত—কে না হ'ল পুলকিত!
তবে পুলকেও সবাই কিছু এ-ভুবনে সমান নয়
"ক"-য়ে প্রহ্লাদ শোনেনি ক-কার, শুনিল "কৃষ্ণজয়।"

কাজেই তাম্বুলানন্দে লীলার প্রাখর্যের সঙ্গে আমাদের আনন্দ যে উপমিত হ'তে পারত না এ আশা করি বলতেও হবে না। ধরণীদা আমাকে বলল ফিশ ফিশ ক'রে: "দিলীপ, ভাই লক্ষ্মীটি, একটু চোখ রেখো—মূর্ছা না যায়। একেবারে অথই জল এখানে।"

দিদি, তুমি খানিকটা দার্শনিক। তাই জানো মানুষ তার আনন্দের প্রকৃত পরিচয় পায় আনন্দবৈষম্যের মাঝে। অর্থাৎ তুলনা ক'রে তবে। লীলার তাম্বুলানন্দ দেখলে বোঝা যায় সে এ-আনন্দের স্বরূপ আরো জেনেছিল কাশ্মীরী সৌন্দর্যের মাঝে। কাশ্মীরের রূপরাস সে সত্যিই ভালোবাসত। কিন্তু সে ভালোবাসা কেমন? না, নিঃসন্তান বধূ যেমন পরের শিশুকে ভালোবাসে। কিন্তু যখন তার কোল জুড়ে আসে নতুন অতিথি, তখন সে বোঝে না কি আর যে—

অভ্র যদিও করে ঝিকিমিকি—লাগে বড় বিস্ময়!
কিন্তু বিজলি ধাঁধিলে নয়ন কে গাহে জোনাকি-জয়?

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা

মৎস্য শিকার

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
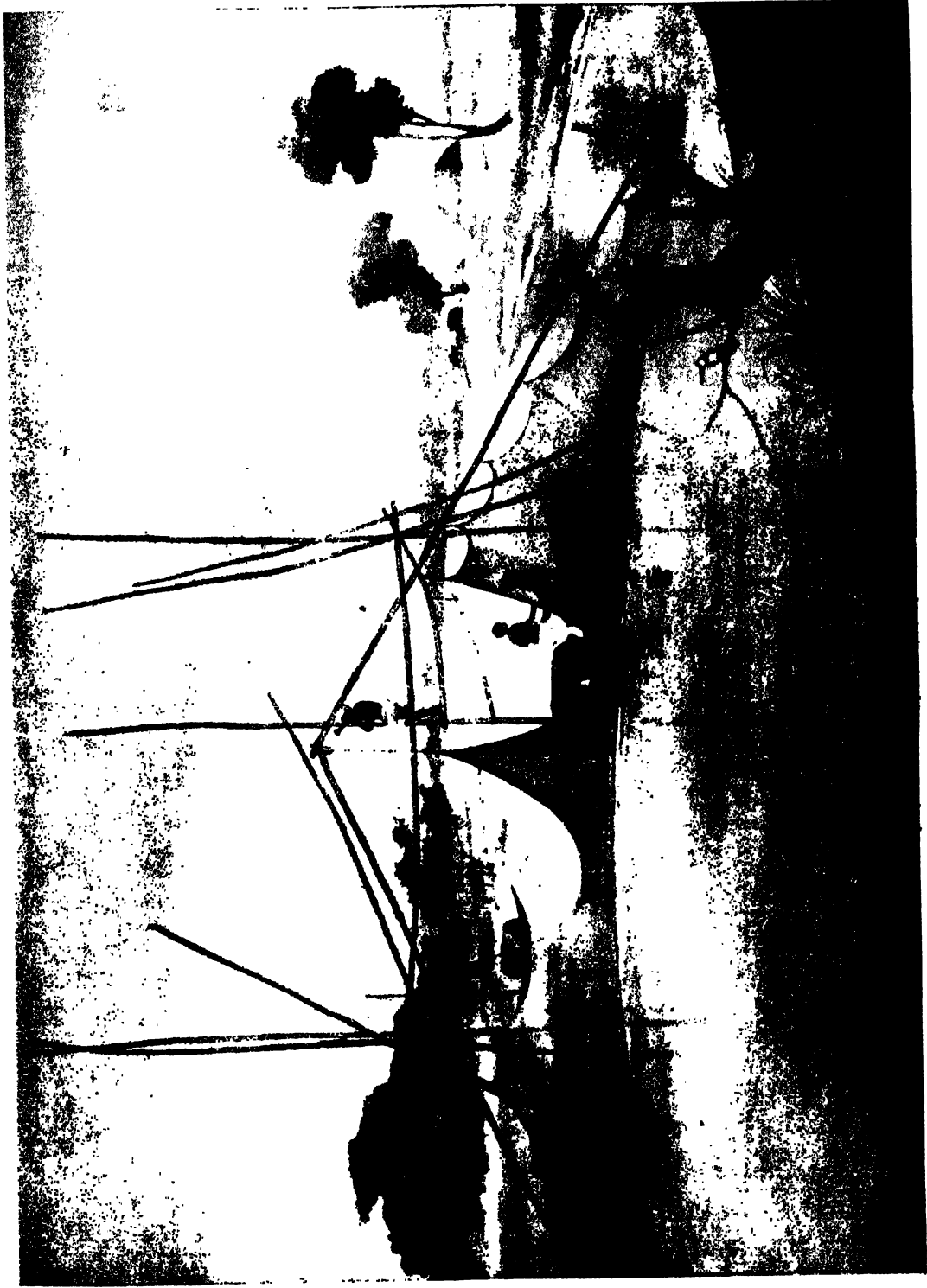
"অথ, লহ পাঠ," উছসিয়া লীলা বলিল, "কি জানো ভাই ?
আপন যে কত আপন জানিতে পরকেও জানা চাই।"

*   *   *   *   *

কিন্তু লীলা বাদে আমরা বাকি সবাই মুগ্ধ হ'লাম বেশি জ্যোতিপ্রকাশ-জায়াকে দেখে। সত্যি এমন পরমাসুন্দরী বধূ কদাচ চোখে পড়ে। আর মনে হ'ল সঙ্গে সঙ্গে—এ-ই তার পরিবেশ।

আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে দিদি, যে প্রতি রূপসী মেয়েকেই দেখতে হয় তার নিজের পরিবেশে। জ্যোতিপ্রকাশিনীকে যেন হঠাৎ দেখলাম ওর সহজ পরিবেশে। তাই সবারই যেন কি রকম চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আমার জ্যোতির্মুগ্ধতায় লীলা যে কী খুশি! পানের শোধ তুলল এবার চুটিয়ে। যা ক্ষেপাতে লাগল! সলজ্জে স্বীকার করতে হ'ল মুগ্ধ হয়েছিলাম শ্রীমন্তিনীর অসামান্য রূপজ্যোতিতে। কিন্তু শুধু রূপই নয়। তার হাসি, অতিথিবৎসলতা, তার চাহনি, সহজ অথচ লাজুক অভ্যর্থনা—কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই, অথচ জাহিরিপনারও লেশ না—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন মেয়েলি মাধুরী ওরফে হ্লাদিনী মূর্তি। সব জড়িয়ে সে উঠেছিল ছবিখানি হ'য়ে, ছবির পরিবেশে ছবি :

রঙটি যাহার ফলে শুধু মেঘে, মনের আকাশে যেই
রঞ্জিতে যাও—অমনি উধাও, এই ছিল—এই নেই!
'চিনি চিনি' করি মাধুরীমেলায় করি বিকিকিনি যেই :
খুশি প্রাণ বলে : "পেয়েছি", অমনি গান বলে : "কই, নেই!"

রাজদম্পতি পরে শ্রীনগরেও এলেন বৈ কি। বলাই বেশি, আমাদের বজরায় শিকারায় তখন গানবাজনা শুধু জ'মে উঠল না—উঠল জমাট হ'য়ে। ষোলোকলা সম্পূর্ণ একেই বলে। কারণ ওরা যে শুধু অমায়িক সুদর্শন ও মিশুক তা নয়, তার ওপর গানভক্ত—লক্ষ্ণৌয়ের লোক খানিকটা সমজদারিয়ানাও আছে রক্তে মিশে। জ্যোতিপ্রকাশকে বলা চলে গানপাগল। কী রকম গান ভালোবাসে একটা দৃষ্টান্ত দেই। বলল আমাকে কবে লক্ষ্ণৌয়ে শুনেছিল আমার মুখে একটি গজল বার বৎসর আগে। কোন্ গানটি জানো?—যেটি গ্রামোফোনে শুনে তোমার চোখে জল আসে ব'লে তোমার মেয়ে ফাঁশ ক'রে দিল—সেই—

তু নে ক্যা কিয়া মুঝে বতা তো সহি
মেরা চৈন গয়া মেরি নিদ গয়ি হো।

গান শুনতে শুনতে জ্যোতিপ্রকাশের মুখ চোখ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। প্রকাশিনীরও। কাজেই বুঝতে পারছ ভাব হ'তে খুব দেরি হয় নি। কাশ্মীর থেকে পেশোয়ার রওনা হওয়া একদিন পিছিয়ে গেল—ওরা না খাইয়ে কিছুতে ছাড়বে না। ওদের বজরা ছিল প্রায় চৌদ্দমাইল দূরে, ওরা আসত মোটর যোগে। ঠিক হ'ল পেশোয়ারের পথে ওদের বোটে প্রাতরাশ সেরে তবে পাড়ি দেওয়াই বিধি—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে সুখায়।

বলা বাহুল্য এতে আমরা কেউই খুব ম্রিয়মান হই নি। তাই লিখেছিলাম দিদি—সুভাষ সম্পর্কে—যে, সুভাষ শাসন করলে হবে কি, সৌন্দর্যময়ী যখন বলেন আমি কিছু দিতে চাই নেবেন?—তখন খুব বর্বর না হ'লে "বিলক্ষণ" ব'লে হাত পাতা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। থাকে কি? তুমিই বলো না ভাই। আনাতোল ফ্রাঁসের একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়—পুরুষরা স্বভাবতই একটু মোলায়েম ভাষায় বললে বলা যায় "বেদরদী", খাঁটি ভাষায়—বর্বর, মেয়েদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে তবেই সে শেখে সভ্য হ'তে।

আমি আর একটু জুড়ে দিই : সুন্দরী মেয়ের সংস্পর্শে পুরুষের সভ্য সংস্কৃত হবার ভেলসিটি আরো বাড়ে। জ্যোতি প্রকাশিনীর আবির্ভাবে একথা সবাই অনুভব করল। আমরা সবাই প্রায় দেবদূতের মতন অনিন্দ্য ব্যবহার করতে সুরু করলাম। এমন কি, অমন গম্ভীর শিতুর মুখেও ফুটে উঠল সুধামাখা হাসি। দেখেশুনে রসিক মানুদা বলল :

ওগো শীতাংশু চন্দ্রমা-হাসি কোথা রেখেছিলে গুপ্ত?
হেন প্রীতিপাখি বৈরাগ্যের কোন্ নীড়ে ছিল সুপ্ত?
রোজ বলো তুমি—আপিস আপিস, এখন কোথা
সে রইল?
একদিন দেরি হ'ল—তবু হাসি ঝর্ণা কেমনে বইল?

কিন্তু আমি শীতাংশুর দিকে—শুকদেবদের দিকে যে থাকে থাকুক। সেদিন কি একটা বইয়ে পড়ছিলাম যে, যে রূপের চমক সহজ নয়—সে শুধু নিজেকে জানান দিতে না দিতে চায় সাড়ার নজর। আর চাইতে না চাইতে সবাই শশব্যস্ত হ'য়ে হাজিরি দেয়। না দিলে রক্ষে আছে?

বাস্তবিক কাশ্মীরে গিয়ে এই কাশ্মীরী সুষমাময়ীর রূপপূর্ণা ও অন্নপূর্ণা মূর্তি একত্রে না দেখলে মনে হয় কোথায় একটা ফাঁক থেকে যেত।

* * *

সত্যি, কাশ্মীর থেকে বিদায়ের পালা সুরু হ'তে কষ্ট হ'য়েছিল বৈ কি। শুধু নিসর্গ সৌন্দর্যই তো নয়—কত সুন্দর ব্যবহার, কত সুন্দর কথাবার্তা, কত সুন্দর নাচগানের স্মৃতি জড়িয়ে রইল কাশ্মীরের সঙ্গে। হঠাৎ এত রকম আনন্দ যে একসঙ্গে পাব ভাবি নি। বিশেষ ক'রে ধরণীদাদের জন্যে। এত আনন্দে কাটত দিনগুলি। কাশ্মীরে দল বেঁধে যেতে হয় তো এম্‌নি বন্ধুর সঙ্গেই যাওয়া চাই। সবাই স্নেহ পরিচর্যায় আমাদের যেন ঘিরে রেখেছিল—শুধু ধরণীদা, প্রভাদি, লীলা হাসিরাই নয়—দুনিচাঁদ, তন্দ্রা দেবী, মেরি, প্যাট্রিক, জ্যোতিপ্রকাশ, প্রকাশিনী, আরো কত লোক।

সময়ে সময়ে ভারি কৃতজ্ঞ মনে হ'ত জীবনদেবতার কাছে। মনে হ'ত এত শত পাই তাঁর কাছে নিত্যই, তবু কেন ভুলি বেদনার মুহূর্তে! (তুমি বলেছ একেবারে লাখ কথার এককথা দিদি, জয় তোমারি জয়।)

ভুলি। অথচ ভুলিও না। কেমন করে ভুলব? যে-পরশে যে-প্রলেপে অন্তরে স্নিগ্ধতা গেছে বিছিয়ে সে কি ইচ্ছা করলেও ভোলা যায়? হারীনের একটি অপরূপ কবিতায় আছে—যে-বাতি একবার জ্বলে সে নিভেও নেভে না। মানে, তার আলো প্রভাতী রবিরাগের মতন মনের গোপনে কিছু না কিছু ফুল ফুটিয়ে তবে যায়। তাই সে আলো নিভলেও তার দান হ'য়ে থাকে চিরন্তন। কোনো সুষমার অনুভব, কোনো স্নেহের উপলব্ধি, কোনো আনন্দের আবেশই তাই ক্ষণজীবী নয়। তবে—ব্লেকের কথা ফের মনে হয়—চেতনা খানিকটা না জেগে উঠলে এধরণের কথা ঠিক বোঝা যায় না—কেন না, চেতনার দীপ্তি একটু গভীর না হ'লে খুব স্পষ্ট দেখা যায় না মনের কত বালুচরে বইল কত ঢেউ, প্রাণের কত আঁধার গুহায় জাগল কত জ্যোতি।

* * *

তাই তো আমি আরো দুঃখ পাই দিদি, যখন বন্ধুদের মুখে শুনি তারা চায় রকমারি চীজ—কিন্তু ভগবানকে না। ভগবানকে না-চাওয়া মানে চেতনায় অসীমের দীপ্তিপরশ না চাওয়া, অর্থাৎ নিঃসম্বল হ'য়েই থাকতে চাওয়া দিনের পর দিন দিনগত পাপক্ষয় ক'রে। অথচ যারা চায় না তারা জানেও না কী জিনিষকে তারা রোখ ক'রে প্রত্যাখ্যান করছে। যে-আলো অনুক্ষণ পথ চেয়ে থাকে আমাদের আঁধার ঘরে সন্ধ্যা দিতে, যে শুধু চায় আরো মনের জানলা খুলি, তাকেই কি-না আমরা বাহাদুরি ক'রে বলি "খুলব না জানলা, থাকব রুদ্ধ ঘরেই বদ্ধ হ'য়ে!" ওয়র্ডসওয়ার্থের কথা ফের ভেসে ওঠে স্মৃতিতে:

যে-কারা আপনি করি বরণ স্বেচ্ছায়
মৃত্যুরূপ তার চোখে পড়ে না তো হায়।

* * *

অথচ সবচেয়ে দুঃখ এই যে, একথা বোঝাবারও উপায় নেই। আরো দুঃখ এই যে, করুণাময়ের যে-করুণার স্পর্শে মনের জানলা খোলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই সে-করুণার কথা বললেও কেমন যেন অবাস্তব শোনায় তাদের কানে যারা এসব বিশ্বাস করে না বা চায় না।

তবু মনে হয় এসব শোনা ভালো। তোমার মনে হয় না? মনে হয় না—কে জানে কখন কার কানের মধ্যে দিয়ে কোন্ গভীর কথা মরমের ছাড়পত্র পাবে? আমরা প্রায়ই যে চাই না, চাইতে শিখি না, সে তো শুধু জানি না ব'লেই—চেতনা অসাড় হ'য়ে রয়েছে ব'লেই। তাই তো দিনের পর দিন এই রসরাসের পূর্ণকুম্ভ মেলায় চাক্ষুষ করি কেবল ছাই আর জটা আর নাগা সন্ন্যাসীদেরকে। তাকাই না একটিবারও আমাদের অন্তরের অতলে মণিবাসরটির পানে—যেখানে সঞ্চিত রয়েছে পরম অনুভবের পরশমণি, যার ছোঁওয়ায় অন্তরের প্রতি জমাট আঁধার হ'য়ে ওঠে তরল সোনা, অশ্রুর কুয়াশা হ'য়ে ওঠে আলোর হাসি।

অথচ তবু দেওয়া যায় না—পেলেই বিলোনো যায় না যা বিলিয়ে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি:—এই অনুভবের অনন্ত ঐশ্বর্য। শ্রীঅরবিন্দকে সামনা সামনি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে—কেন এমন হয়? তিনি বলেছিলেন: "মানুষ চায় না যে। ভগবান জোর করেন না। অমৃত পাওয়ার সর্ত—চাইতে হয়।" এই কথাই বলেছিলেন খৃষ্ট সে কবে: "Seek and thou shalt find, ask and it shall be given unto you, knock and the door will be open."

অথচ তবু এধরণের কথা বলতেও বাধে। তুমি ভক্তিমতী ব'লেই তোমাকে বলতে পারলাম—নৈলে নিশ্চয় শুধু "ঝোপেঝাপে ঘা মেরেই চলতাম"—আসল কথাটিই উহ্য রেখে—যেটা আজকালকার দস্তুর। ভগবানের কথা স্পষ্টাস্পষ্টি বলা একটু দুঃসাহসের কাজ বৈ কি—it is not done!

* * *

তুমি হয়ত বলবে : বেশ ভালো ভালো কথা হচ্ছিল, হঠাৎ আবার ক্ষোভের সুর কেন? তোমার মধ্যে আছে একটি স্নিগ্ধ সুষমা—দুঃখের মধ্যেও তুমি তাই আনন্দময়ী। এতে মেয়েদের খানিকটা জন্মস্বত্ব, কিন্তু তোমার মধ্যে এ-গুণটির কিছু প্রাচুর্য আছে সেটা বুঝতে দেরি হয় না। তাই তুমি দিদি, সময়ে সময়ে বুঝতে পারো না যে পুরুষরা এসব বিষয়ে অনেক সময়েই মেয়েদের সমান নয়। আমার অনেক পুরুষ বন্ধু আছেন যাঁরা খুব জাঁক ক'রেই বলেন যে, তাঁরা মেয়েদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয় কোনো গুণই দেখতে পান নি। এঁদের জন্যে আমার ঠিক তেম্‌নিই দুঃখ হয় যেমন দুঃখ হয় তাদের জন্যে—যারা জাঁক ক'রে বলে ভগবানকে তারা চায় না ভগবানকে তাদের কোনো দরকার হয় নি ব'লে। সেদিন একটি ইংরেজ লেখিকার লেখা একটি উপন্যাস পড়ছিলাম। তাতে লেখিকা বড় সুন্দর দেখিয়েছেন এক আমেরিকান স্ত্রীর অতৃপ্তি—যেহেতু তাঁর স্বামীর অজস্র টাকা ও স্নেহ থাকলেও ভালো ব্যবসায়ী (salesman) হওয়া ছাড়া আর কিছুরই দরকার ছিল না। মানুষের সারবত্তা মাপি তো তোর তৃষ্ণা দিয়ে—সে কী কী চায় তারই হিসেব খতিয়ে? পাওয়া তো ঢের পরের কথা—মানুষের মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান তো চাওয়া।

হয়েছে কি, আমরা যে সব জিনিষ খুব বেশি ভালোবাসি বা বরণীয় মনে করি, চাই যে প্রিয়জন সবাই তাকে ভালোবাসুক। রুচির ক্ষেত্রেও এ নিয়ে মানুষের বেদনার অন্ত নেই। তা-ও তবু সওয়া যায়—মনকে বুঝিয়ে যে মানুষ কথনই যা চায় তার সবটা পায় না। কিন্তু যেখানে খুব বড় আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন নিয়ে বাধে সেখানে এ সান্ত্বনায় মন মানে না কিছুতেই। সেখানে যদি টানও থাকে, ক্রমে ক'মে আসে। আমি তাই মনে করি না দিদি, যে, ভগবানকে যে সর্বান্তঃকরণে চায় আর ভগবানকে যে সর্বান্তঃকরণে পরিহার ক'রে চলতে চায়—মানে ভগবানে ভক্তিকেও যে বর্জনীয় ব'লেই মনে করে তাদের মধ্যে স্নেহবন্ধন অটুট থাকতে পারে। তোমরা অনেক সময়েই দুঃখ করো যে, সাধুসন্তরা কেন সংসার থেকে দূরে চ'লে যায়। যেতে বাধ্য। কারণ, সংসার যে সব বস্তুকে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় মনে করে, যথা—স্বজন, ধন, দেহ, সুখ, মান, বিলাস প্রভৃতি, সাধুসন্তরা সেসব আদৌ চায় না। তাই পরমহংসদেব জগন্মাতার কাছে কেঁদেছিলেন এই ব'লে : "মা, ভক্তরা কই কেউ তো আসছে না, কাদের সঙ্গে কথা কইব তা হ'লে?" গভীরে মিল না থাকলে কি সত্যিকারের মেলামেশা সম্ভব?

রাগ কোরো না দিদি, বোলো না ঠোঁট ফুলিয়ে যে, এই-ই তো পারলৌকিকতা—otherworldliness. তা নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা সত্য সম্বন্ধ আছে—সে সম্বন্ধ সেই অনুপাতেই তৃপ্তিকর হয়, যে-অনুপাতে স্বার্থের খাদ থেকে সে উত্তীর্ণ হয় শুদ্ধিলাভ ক'রে। কিন্তু ভাবো কি দিদি, স্নেহ সম্বন্ধে স্বার্থগন্ধ কাটিয়ে ওঠা মুখের কথা? বলবে কি যে, যে-ভালোবাসা যত চকচকে সে তত খাঁটি সোনা! তাই যদি হ'ত তাহ'লে সংসারে কি মানুষ সবচেয়ে হাহাকার করত ঐ ভালোবাসারই কাঁটাবনে? কাঁটাবন বলছি ব'লে আমাকে ভুল বুঝো না—আমি এখানে বিশুদ্ধ ভালোবাসার কথা বলছি না যে-নন্দনে শুধু পারিজাতই ফোটে, বলছি যে-ভালোবাসার এত নামডাক তারই কথা—অর্থাৎ যার জপমন্ত্র হ'ল আদায় করা। কিন্তু চোখ চেয়ে বলো তো, সংসারে যারা এই ভালোবাসার জয়ঢাক সবচেয়ে বেশি বাজায়, তারা একে সত্যি সত্যি চেনে?

তা ছাড়া, আরো দেখ, ভালোবাসা স্নেহ-প্রীতির ঠিক ছন্দটি প্রায়ই আমরা ধরতে পারি না। পারলে সবচেয়ে বেশি অতৃপ্তি পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠত কি ভালোবাসারই এলাকায়? যুগে যুগে মানুষ যে ভগবানকে এত ক'রে চাইল তার মূলে এই অতৃপ্তির বেদনা কি নেই বলতে চাও? না, বলবে যে-শান্তির জন্যে আমরা চিরতৃষিত সে-অমৃত মানবিক স্নেহপ্রীতিতে নিত্যই উপছে পড়ে? তা যদি পড়ত তাহ'লে যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মহাত্মারা কি সবাই চাইতেন

এর বেশি কিছু ? কেউ কি ভুলেও চাইত সেই অমৃততরুকে (গীতার ভাষায়) যার মূল আকাশে, শাখা মাটিতে !

যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষরা সবাই অনুভব করেছেন যে, মানব-প্রেম নিটোল নিখুঁৎ হয় তখনই—যখন প্রতি মানুষের মধ্যে দেখি আমরা ভগবানকে, নৈলে নয়। এ সার্বজনীন শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিটি ভুল হ'তেই পারে না। কারণ এ শুধু আমাদের গীতা-উপনিষদ তন্ত্র-পুরাণের বাণী নয়, এ হ'ল জ্ঞানগরিষ্ঠদের চিরন্তন অনুভূতি—ঠেকে-শেখা উপলব্ধি। তাই তো যখনই মানুষ এ-অমৃতের স্বাদ একটুও পায় তখনই সে এ-স্বাদ দিতে চায় তার স্নেহাস্পদকে, চায় যে তারাও ভালোবাসুক ভগবানকে। কাজেই তারা দুঃখ পায় যখন তারা দেখে যে তাদের স্নেহাস্পদরা আর যা-ই চাক না কেন ভগবানকে চায় না।

অবশ্য এ জন্যে দুঃখ করা অনুচিত না হ'লেও নিষ্ফল, এ আমি মানি। কিন্তু তবু দুঃখ তো দুঃখই থাকে—বেদনা তো বেদনাই থাকে, অন্তত ততদিন যতদিন না ভগবানের একান্ত সান্নিধ্য অন্য সব দূরত্বের ক্ষতিপূরণ করেছে। তাই এ-দুঃখকেও তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা কোরো।

কাশ্মীরে বহুবার উপলব্ধি করেছি এই নিঃসঙ্গতার বেদনা। শুধু কাশ্মীরে কেন—অন্যত্রও। বিশেষ ক'রে আত্মীয়দের মধ্যে। আর এ শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও নয়, এ-ও একটি সার্বভৌম সত্য যে আত্মীয়রা প্রায়ই তাদের আত্মীয়তার অভিমানে স্নেহাস্পদের শ্রেষ্ঠ সত্তাটুকু বুঝতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বছর বারো আগে বোলপুরে বলেছিলেন যে, তাঁর আত্মীয়রা চিরদিনই তাঁকে এত নগণ্য মনে করত যে, তাঁর কোনো দিন বিশ্বাসই হয় নি যে তাঁর মধ্যে কোনো কিছু সার থাকতে পারে। বলেছিলেন যখন প্রথম তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে যান তখনই তাঁর সর্বপ্রথম পরিচয় হয় নিজের আসল সত্তাটির সঙ্গে। আমি বহুবার ঠেকে শিখে তবে এ-সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হয়েছি যে আত্মীয়দের সম্বন্ধের অভিমান প্রায়ই তাঁদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে, যার ফলে তাঁরা পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলেন স্নেহাস্পদের সম্বন্ধে। অবশ্য এ কথার ব্যতিক্রম আছে—(সংসারে কোন্ কথারই বা নেই ?)—তবু এ কথা তুমিও নিশ্চয় মানবে যে, মানুষ সত্যিকার আপন হ'য়ে ওঠে তখন যখন সে খানিকটা পরিমাণে স্বত্বাধিকার ছাড়ে। ফুলকে যে মুঠোয় বড় বেশি চেপে ধরে সে-ই যে ফুলের ফুলত্ব সম্বন্ধে বেশি জানল এ কথা তো সত্য নয়। কাউকে সত্যি চিনতে হ'লে চাই (খানিকটা অন্তত) শ্রদ্ধার অবকাশ : মমত্ববোধের অতি-ঘেঁষাঘেঁষি সত্য পরিচয়ের মস্ত অন্তরায়।

কিন্তু এটুকু বললেও সব বলা হ'ল না। আত্মীয়ের চেয়ে বন্ধু আমাদের বেশি আপনার—একথা অপ্রতিপাদ্য। কিন্তু বন্ধুও পারে না আমাদের অন্তরের অতৃপ্ত তৃষ্ণা মেটাতে। বন্ধুত্ব জানায় যে স্নেহ প্রীতির মধ্যে অমৃতের আভাষ আছে—কিন্তু এ অমৃততৃপ্তি পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে না যদি না বন্ধুত্বের ভালোবাসার মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ স্পর্শ থাকে। এই স্পর্শকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেন সাইকিক (psychic) : এর রেশ যত গাঢ় হ'য়ে ওঠে প্রীতি স্নেহ ততই আনন্দময় হ'য়ে ওঠে। মানুষ যত মহৎ হয় যত নিঃস্বার্থ হয় তার স্নেহস্পর্শে সে ততই এ-আনন্দের স্বাদ দেয় বটে, কিন্তু এ-আনন্দও পুরোপুরি কৃতার্থ হ'তে পারে না ভগবানের মধ্যস্থ বিনা। তাই বহু বন্ধুর মধ্যেও মানুষ যে একলা সেই একলা। ও বছর সুভাষও আমাকে বলছিল, সে সময়ে সময়ে এত একলা বোধ করে যে—!

কে না করে দিদি ? নিজেকে দিয়েই তো জানো। আর তুমি আমি তো কোন্ ছার, যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষরা সবাই একলা হ'য়ে এসেছেন এই জন্যে। রবীন্দ্রনাথ কত বার আমাকে বলেছেন তিনি কত একলা ! অথচ তাঁর কিসের অভাব ছিল বলো ? ডি. এইচ. ল্যরেন্সের সমৃদ্ধ জীবনেরও বাদী সুর এই একান্ত একাকিতা।

প্রতি মানুষ এসেছে একলা, যাবে একলা। এক ভগবান ছাড়া তার সাথী আর কে আছে ? জীবনের তুফানে চরম গতি আর কোন্ ধ্রুবতারার বন্দরে বলো ?

কাশ্মীরে এত স্নেহ এত বন্ধুত্ব মিলেছিল ব'লেই বোধ হয় এ একাকিত্ব আরো প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল। অস্ত সূর্যের আলোয় মন্দগামিনী ঝিলমের শ্রান্তকাকলি শুনতে শুনতে, মেঘে-ঢাকা শিখরমন্দিরের ছায়া-আহ্বানে, চন্দ্রালোকে ধূসরাভ শৈলমালার বিবাগী শোভায় কেবলই যেন বেজে উঠত কানে—এ বিশ্বে সবাই কত একলা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠির কথা :

"মানুষের নিসঙ্গবোধ ঘুচতে পারে না মানবিক স্নেহসঙ্গে—একমাত্র ভগবানের মিলনেই লুপ্ত হয় এ ভেদবুদ্ধি।" শ্রীমার একটি প্রার্থনার কথা মনে পড়ে :

"Without the Divine life is a painful illusion, with the Divine all is bliss."

তাঁরে বিনা হায় জীবনে ঘনায়
আলেয়ামায়ায় বেদনা কালো
সে-মিলনময় এ-জীবন হয়
আনন্দময় চেতনা-আলো।

সত্যি দিদি, আমি কাশ্মীরে প্রায়ই শুনতাম এ-বাঁশির আবছা রেশ যে-বাঁশি বাজে শুধু বিজনে। তাই একদিন অস্তসূর্যের আলোয় শ্রীনগরে লিখেছিলাম এই পূরবীটি :

একেলার পথে বাজায়ো তোমার বাঁশি
তাহ'লে মনের বনে জানি নাথ,
ফুটিবে হারানো হাসি।
কালো বুকে তুমি জ্বালো
তোমার অকুল-আলো
বিলাস-দুলালও তারি ডাকে হয়
যুগে যুগে বনবাসী।
বনবেদনায় বাজে তব ফুলবাঁশি।

সবে চায় সুখ-সাথী,
ঘনায় নিরালা রাতি,
মিলনের মেলা ভাঙে অবেলায়
বিরহ ওঠে উছাসি'।
শুধু একেলার পথে বাজে নীল বাঁশি।

বিনা তব চিরসুধা
মিটে কি প্রাণের ক্ষুধা ?
আজ শুধু করো চিরবৈরাগী
অমৃতের অভিলাষী।
ব্যথা দিয়ো—শুধু বাজায়ো বিজন বাঁশি।

ইতি

সমুদ্রের খেলা

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার এম-এ

মাটীর বুকেতে বসি' মনে আজি জাগে,
হে জলধি, লক্ষ কোটি বরষের আগে
যে দিন ছিল না মাটী কঠিন কোমল
ধরণীর বুকে, বিশ্বব্যাপী শুধু জল—
বায়ুর প্রবাহ গলি' নবপ্রাণ ধারা—
অস্পষ্ট আভাস তারি—বাধাবন্ধহারা
সেদিনো কী ছিলে তুমি অশান্ত উচ্ছল ?
গগন বিদারী কলরোলে অবিরল
ঝাঁপায়ে পড়িতে তুমি আজিকার মত
মহাশূন্য মাঝে ? অনন্ত তরঙ্গব্রত
সেদিনো কী ছিল তব ? অন্ধ ব্যাকুলতা
গুমরি' মরিত সদা অর্থহীন ব্যথা
অন্তরে তোমার ? বন্ধন-বেদনা জ্বালা
দুলায়ে দিত কী কণ্ঠে ফেনপুঞ্জমালা ?
চেয়ে আছি দিগন্তের পানে। সীমাহীন
ব্যগ্র দুই বাহু মেলি' তুমি রাত্রিদিন
আকাশে বাঁধিতে চাও আকুল আবেগে
নভোনীল বক্ষে তব। ওঠে মনে জেগে
সুদূরের পানে চাহি'—তোমার নীলিমা
হারায়ে গিয়াছে যেথা, লভিয়াছে সীমা
সুনীল গগনে—তব কম্বুকণ্ঠ হ'তে
পাই যেন সাড়া আজি। ওই জলস্রোতে
ভাসিয়া উঠিছে যেন বালিকা বসুধা
বারিময়ী স্থির অচঞ্চলা। যেই ক্ষুধা
বক্ষে জ্বলে নিরন্তর, তাহার প্রকাশ
নাহি যেন কোনখানে। প্রচণ্ড প্রয়াস
তরঙ্গবন্ধনে তব লভিয়া মূরতি
দেশে দেশে নাহি করে প্রলয়-আরতি।

'বনফুল'

৩

শঙ্কর এতটা প্রত্যাশা করে নাই।

সামান্য চা-খাওয়ানো ব্যাপারটা যে এতদূর কবিত্বময় করা সম্ভব, সদ্য-মফঃস্বল-আগত শঙ্করের তাহা ধারণাতীত ছিল। কি পরিপাটি আয়োজন।

গৃহসংলগ্ন উদ্যান প্রাঙ্গণে ছোট ছোট কয়েকটি টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে সুদৃশ্য আস্তরণ। তাহার উপর এক একটি ফুলদানী, প্রত্যেকটিতে দেশী বিদেশী নানারকম ফুল। ইহা ছাড়া প্রতি টেবিলে সিগার, সিগারেট, ছাই ফেলিবার পাত্র ও ছোট ছোট কাচের জলপূর্ণ বাটি। বাটিগুলির পাশে পাটকরা পরিষ্কার ছোট ছোট তোয়ালে। প্রত্যেক টেবিলে দুইটি করিয়া বেতের চেয়ার। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহার মন এই মার্জ্জিত-রুচি পরিবারটির উপর সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

শঙ্কর একটু আগেই গিয়াছিল। তখনও অন্যান্য অতিথিবর্গ আসিয়া পৌছান নাই। এমন কি, প্রফেসর মিত্র তখনও পর্য্যন্ত কলেজ হইতে ফেরেন নাই। শঙ্কর গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া উদ্যানে সজ্জিত টেবিলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে সলজ্জকণ্ঠে কে বলিল, এই যে আপনি এসে গেছেন—আসুন, নমস্কার।

শঙ্কর পিছন ফিরিয়া দেখে রিণি।

একটা ট্রেতে অনেকগুলি খালি পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পিছনে একজন বেয়ারা, তাহার হাতেও একটি ট্রে এবং তাহাতেও পেয়ালা, দুধ রাখিবার পাত্র, চিনির পাত্র, ছাঁকনা প্রভৃতি চায়ের সরঞ্জাম। শঙ্কর প্রতি নমস্কার করিয়া আগাইয়া গেল এবং রিণির হাত হইতে ট্রে-টা লইবার জন্য হাত বাড়াইল---দিন আমাকে দিন—

রিণি মৃদু হাসিয়া লজ্জায় মুখটি একটু নত করিল, ট্রে কিন্তু শঙ্করের হাতে দিল না। তাড়াতাড়ি নিজেই গিয়া তাহা একটি টেবিলের উপর রাখিল এবং বেয়ারাটার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুই এগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখ্ ততক্ষণ। দেখিস্ আবার যেন ভাঙিস না কিছু। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আসুন।

শঙ্কর রিণির পিছন পিছন চলিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কাউকে দেখছি না।

বৌদি, সোনাদি সব ওপরে। দাদা এখনও ফেরেনি কলেজ থেকে—

ইহার পর আর কি বলিবে শঙ্কর ভাবিয়া পাইল না। নীরবে রিণির দোদুল্যমান বেণীভঙ্গিমা দেখিতে দেখিতে তাহার পিছন পিছন আসিয়া সে ড্রয়িং রুমে ঢুকিল। বেণীদোলানো রিণি আর স্টেশনে-দেখা রিণি দুইজনে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রসাধনের সামান্য ইতরবিশেষে মানুষটাই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। অতি সাধারণ একটা আটপহুরে রঙীন শাড়ি, কাঁধের কাছে সাধারণ রকম এমব্রয়ডারিকরা একটা ব্লাউস, হাতে দুগাছি করিয়া পাতলা সোনার চুড়ি, কানে দুল, পায়ে স্যাণ্ডাল, মাথায় দোদুল্যমান বেণী।

এই অতি সাধারণ বেশেই রিণিকে অত্যন্ত অসাধারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ড্রয়িং-রুমে ঢুকিয়া রিণি বলিল, আপনি বসুন। আমি এগুলো ফেলে দি ততক্ষণ।

কি ফেলে দেবেন?

এই যে—

শঙ্কর দেখিল একটা ভাঙা পোর্সিলেনের বাসনের টুকরা চতুর্দ্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে।

রিণি বলিল, বেয়ারাটার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল টি-পটটা।

রিণি টেবিল হইতে একটা খবরের কাগজ লইয়া টুকরাগুলি কুড়াইতে লাগিল। শঙ্করও হেঁট হইয়া কুড়াইতে সুরু করিল।

রিণি বলিল, আপনি বসুন না।

সেটা ভাল দেখায় না।

রিণি কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, প্রতিবাদ করিল না। দুজনেই কুড়াইতে লাগিল।

কুড়ানো শেষ হইলে রিণি টুকরাগুলি খবরের কাগজটাতে মুড়িয়া বলিল, আপনি তাহলে বসুন একটু। আমি বৌদিদিদের খবর দি।

রিণি চলিয়া গেল।

শঙ্কর একা বসিয়া বসিয়া ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্রাদি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সুন্দর দামী 'সেটি', মেঝেতে কার্পেট পাতা। সামনের দেওয়ালে একটি ছোট কিন্তু দামী আয়না। সেই দেওয়ালেই দুইখানি বড় বড় অয়েল-পেন্টিং ছবি, দুইখানিই নারীমূর্ত্তি, এলিজাবেথান যুগের পোষাকপরিহিতা স্বাস্থ্যবতী তরুণী দুইটি। চোখের নীলিমা ও গালের লালিত্য মুগ্ধ করে। অপর একটি দেওয়ালে বিরাট একখানা দেওয়ালজোড়া ছবি, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য। সেকালের যুদ্ধক্ষেত্র। নানাভাবে উত্তেজিত অশ্ব ও অশ্বারোহীর দল একটা নিষ্ঠুর সংঘর্ষকে যেন মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। ভিতর হইতেই দেখা যাইতেছে বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট হ্যাট-র্যাক এবং তাহার সঙ্গেই ছড়ি রাখিবার র্যাক। ঘরের এক কোণে ছোট একটি গোল শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর কালো পাথরের নটরাজ, আর এক কোণে অনুরূপ টেবিলের উপর একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, পাথরের নয় পিতলের। আয়নার দুইপাশে ছোট ছোট দুইটি সুদৃশ্য কাঠের ব্র্যাকেট। ব্র্যাকেটের উপর উন্মুক্ত-বক্ষা বঙ্কিমতনু প্রস্তরময়ী দুইটি রমণী। অজন্তা শিল্পের নিদর্শন। দেওয়ালে একটি বড় ঘড়ি। পাশের ঘরেই টেবিলের উপর 'ফোন' দেখা যাইতেছে। হঠাৎ ঝন্ ঝন্ করিয়া ফোনটা বাজিয়া উঠিল। কাছেপিঠে বোধহয় কেহ ছিল না, অন্ততঃ ফোনের ডাকে কেহ সাড়া দিল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শঙ্কর অবশেষে উঠিয়া গিয়া ধরিল।

হ্যালো, কে আপনি ?

আমি ? আমি অপূর্ব্ব। আপনি কে ?

আমাকে চিনবেন না, চা খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছি, আমার নাম শঙ্কর।

ও, আমারও যাওয়ার কথা, কিন্তু আই অ্যাম সো সরি, মিস্ রিণি দুঃখিত হবেন জানি, কিন্তু আই কান্‌ট্ হেল্‌প। এইটে জানাবার জন্যেই ফোন করছি।

আচ্ছা, ওঁরা কেউ এখন নীচেয় নেই, এলে আমি বলে দেব। শঙ্কর রিসিভারটা রাখিয়া দিল।

কে এই অপূর্ব্ববাবু! মেয়েমানুষের মত গলার স্বর।

তাহার একা ড্রয়িংরুমে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আদি সাজানো প্রায় শেষ করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সে বিনীতভাবে বলিল, বসুন, হুজুর। দিদিকে ডেকে দি—

না, ডেকে দেবার দরকার নেই। বাগানটা আমি ঘুরে ঘুরে দেখি, আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

বেয়ারা ভিতরে চলিয়া গেল।

শঙ্কর এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নানা-জাতীয় মরশুমি ফুলের বাহার দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া সে গেট দিয়া আবার সদর রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ তাহার মনে কৈশোরের একটা স্মৃতি ভাসিয়া আসিল। শৈলদের বাড়ীতেও ঠিক এমনি একটা গেট ছিল। স্কুল হইতে ফিরিবার পথে প্রতি অপরাহ্নে শৈল গেটে দাঁড়াইয়া থাকিত। ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়িতেছে একদিন শৈলকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কার জন্যে তুই রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস শৈল ? আমার জন্যে নাকি ?

ভারি বয়ে গেছে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার! দাদাদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি আমি—

শৈলর দুইটি দাদা পঙ্কজ ও উৎপল শঙ্করের সহপাঠী ছিল। পঙ্কজ বেচারা মারা গিয়াছে। শৈলও কি বাঁচিয়া আছে ? সেই দুরন্ত বালক-স্বভাব শৈল, কোথায় আজ সে ? সে স্বচ্ছন্দে পেয়ারা গাছে চড়িত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়িত, প্রাচীর ডিঙাইয়া মিত্তিরদের বাগান হইতে ফলসা চুরি করিয়া আনিত, কথায় কথায় খামচাইয়া কামড়াইয়া খেলার সাথীদের অস্থির করিয়া তুলিত—সেই শৈলও ত আর বাঁচিয়া নাই। সে-ও মরিয়াছে। যে তরুণী আজ বোস সায়েবের পত্নী সে অন্য লোক, অতিশয় নকল একটা আনন্দকে সে যেন জোর করিয়া চোখে মুখে ফুটাইয়া

রাখিয়াছে। শঙ্করের কবিমন এই গেটটাকে উপলক্ষ করিয়া বিগত কৈশোর-জীবনের স্মৃতি-স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িল। অতীতকালে যে প্রশ্ন সে বহুবার নিজেকে করিয়াছে, সেই প্রশ্নটাই আবার তাহার মনে জাগিল—শৈল কি তাহাকে ভালবাসিত? কই কোনদিন ত তাহাকে বলে নাই। কিন্তু সে ত তাহার কবিতার খাতাখানা চুরি করিয়াছিল। কেন? যখন তখন লুকাইয়া সে তাহার পড়ার ঘরে আসিয়া হাজির হইত। কেন? সে বহুবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে কোন উত্তর পায় নাই; একটা না একটা ছুতা করিয়া শৈল প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়াছে। শঙ্কর কি তাহাকে ভালবাসিত? বাসিত বই কি! কমলা রঙের শাড়িটি পরিয়া শৈল যেদিন শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল শঙ্করের রাত্রে ঘুম হয় নাই। ইহা কি ভালবাসার লক্ষণ নয়? কিন্তু শঙ্করও ত শৈলকে কোনদিন কিছু বলে নাই। বরং শৈল শ্বশুরবাড়ি যাইবার আগে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার জন্যে মন কেমন করবে, শঙ্করদা? ছদ্ম বিদ্রূপের সুরে সে উত্তর দিয়াছিল—ঘুম হবে না আমার! সত্যই ত ঘুম হয় নাই। অনর্থক বিদ্রূপ করিতে গেল কেন তবে? মনখানি মেলিয়া ধরিলে ক্ষতি কি ছিল? কিশোরকালের প্রথম প্রেম এমন ভাবে নষ্ট হইয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর নাই। পৃথিবীর বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে ইহাও একটি।····· শৈলকে ভুলিতেও দেরি হয় নাই ত। খল্‌সি আসিয়াছিল। শৈলর দুরসম্পর্কের বোন খলসি। শৈল চলিয়া গেলে খলসিই হইয়াছিল তাহার সঙ্গিনী। সেই একদিন অন্ধকারে রাত্রে পিছন দিকের বারান্দার সিঁড়ির ধারে দুজনে দুজনের হাত ধরিয়া বসিয়া থাকা অপূর্ব্ব অনুভূতি!······তাহার পর আর একদিন রাত্রে, সেদিনও ঘন গাঢ় অন্ধকার। শঙ্কর শ্মশানে বসিয়া ছিল—সম্মুখে খল্‌সির চিতা। খলসিও থাকে নাই। শঙ্করের আনন্দ-অনুসন্ধিৎসু অমৃত-পিপাসী কবি-মন সুধার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।. আজও মিলিল না। জ্যোৎস্না-স্নাত সাগরে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে তাহার মুগ্ধ মন মাতিয়া ওঠে। জ্যোৎস্না কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না, চাঁদ ডুবিয়া যায়। নববর্ষার মেঘোদয়ে তাহার মনের ময়ুর পেখম মেলে, কিন্তু মেঘ কতক্ষণ থাকে? বৃষ্টি নামে, মেঘ মিলাইয়া যায়। সব আসে কিন্তু থাকে না।

চাই কমলালেবু, ভালো কমলালেবু—

শঙ্করের স্বপ্ন টুটিয়া গেল।

সে অকারণে কমলালেবুওলাকে ডাকিয়া কমলালেবু কিনিতে লাগিল। সুন্দর বড় বড় কমলালেবু। তাহার পকেটে ও হাতে যতগুলা আঁটিল সে কিনিয়া লইল। তাহার পর গেট দিয়া সে আবার ভিতরে গেল। সহসা তাহার মনে হইল এমনভাবে চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই, কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিছুদুর আসিয়া দ্বিতলের একটা খোলা জানলা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল অসম্বৃতবসনা একটি নারীমূর্ত্তি, তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র জানালা হইতে সরিয়া গেলেন—প্রসাধন করিতেছিলেন বোধহয়। শঙ্কর চোখ নামাইয়া লইল—ছি, ছি, সে ওপরের দিকে তাকাইতে গেল কেন! কি মনে করিলেন উনি। দেখিতে পাইয়াছেন কি? সে দ্রুতপদে আসিয়া ড্রয়িংরুমে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আশ্চর্য্য লোক আপনি শঙ্করবাবু! এত আগে এলেনই বা কেন, আর এলেন যদি বেরিয়েই বা গেলেন কেন?

শঙ্কর কহিল, এত আগে মানে? আমি এসেছি সাড়ে চারটের সময়—

সাড়ে তিনটের সময়—

শঙ্কর নিজের হাতঘড়িটা দেখিল—তাইত! সাড়ে তিনটাকে তাহার সাড়ে চারটে বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। একটু অপ্রস্তুতভাবে সে বলিল, আরে-সাড়ে তিনটেকে আমি সাড়ে চারটে ভেবে ঊর্দ্ধশ্বাসে হাজির হয়েছি!

তাতে আর কি হয়েছে। ভালোই ত, আসুন না একটু গল্প করা যাক—

সোনাদিদির মুখে একটা চাপা হাসি চিকমিক করিতেছিল।

কমলালেবু কোথায় পেলেন?

কিনলাম, রাস্তায়!

কিনলেন? খিদে পেয়েছে বুঝি আপনার! কলেজ থেকে সোজা এসেছেন বুঝি?

শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রত হইল। মুখে কিন্তু সে হটিবার পাত্র নয়। বলিল, কেমন সুন্দর দেখতে বলুন ত। দেখলে কি খাওয়ার কথাই মনে হয়? আমার ত কমলা-

লেবু খাওয়ার চেয়ে হাতে করে বসে থাকতেই বেশী ভাল লাগে।

সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

আমাকে একটা দিন, খাই—

শঙ্কর তাঁহাকে একটা কমলালেবু দিল এবং প্রশ্ন করিল, মিষ্টিদিদি কোথায়, তাঁকে দেখছি না!

তিনি এইমাত্র স্নান করে এলেন, আসচেন এখুনি—

চকিতে শঙ্করের উন্মুক্ত বাতায়নের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সোনাদিদি লেবুটি ছাড়াইয়া শঙ্করের হাতে কয়েকটি কোয়া দিয়া বলিলেন, নিন, খেয়ে দেখুন, আপনি খান আগে।

রিণি আসিয়া প্রবেশ করিল। কাপড়জামা বদলাইয়া বেশ পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। কমলালেবু দেখিয়া সে কৌতূহল প্রকাশ করিল না। সোনাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে টেবিলগুলো ঠিক সাজানো হয়েছে ত? দেখেছ তুমি সোনাদি?

আমি বাইরে যাইনি, তুই দেখ না গিয়ে—

শঙ্কর বলিল, অপূর্ব্ববাবু ফোন করেছিলেন, তিনি আসতে পারবেন না।

এই বার্ত্তায় রিণির মুখখানি সলজ্জ হইয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

সোনাদিদি কমলালেবুর কোয়াগুলি পরিষ্কার করিতে করিতে উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কখন ফোন করেছিলেন অপূর্ব্ববাবু?

এই একটু আগে। আপনারা কেউ নীচে ছিলেন না তখন—

ও, যাক বাঁচা গেল—নিন্ খান দুটো কোয়া।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, আপনি খান আগে—

আচ্ছা, এক-গুঁয়ে লোক ত আপনি!

মিষ্টিদিদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মিষ্টিদিদি আসিতেই সোনাদিদি অনুযোগ মিশ্রিত বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, শঙ্করবাবুর কথা শুনেছ মিষ্টিদি। কমলালেবু নাকি ওঁর হাতে করে ধরে থাকতেই ভাল লাগে, খেতে ভাল লাগে না।

মিষ্টিদিদির আগমনে শঙ্কর মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, খোলা জানালার কথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। মিষ্টিদিদির দিকে তাহার চাহিতেও সঙ্কোচ হইতেছিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া উত্তর দিলেন, ঠিকই ত বলেছেন উনি! কবির মত কথাই বলেছেন।

সোনাদিদি বলিলেন, হ্যাঁ ভাল কথা মনে পড়েছে, আপনার কবিতা এনেছেন, কই দেখি!

না, আজ আনিনি, আর একদিন আনব এখন। কলেজ থেকে সোজা চলে এসেছি কিনা—

অভিমান-ভরা সুরে সোনাদিদি বলিলেন, কাল অত করে বললাম আপনাকে—

মিষ্টিদিদি ফোড়ন দিলেন, কবির মন অত সহজে পাওয়া যায় না সোনা—

এই স্বল্প পরিচিতা নারী দুইটির প্রগল্‌ভতা শঙ্করের ভাল লাগিতেছিল না; আবার ভাল লাগিতেও ছিল। তাহার ভদ্র মন এই ধরণের কথাবার্ত্তায় সঙ্কুচিত হইতেছিল, কিন্তু তাহার অন্তরবাসী বন্য বর্ব্বরটা ইহা উপভোগ করিতেছিল। শঙ্কর ভাবিতেছিল, কেমন মানুষ ইহারা।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন, না? বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি?

শঙ্কর একটু সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আপনাদের ফুলগুলো।

এবার ডালিয়াগুলো তেমন ভালো হয় নি—

শঙ্কর এবার মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া দেখিল, এতক্ষণ সে সঙ্কোচে তাঁহার দিকে তাকাইতে পারে নাই। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই ভদ্রমহিলা প্রসাধনশিল্পে নিপুণা। চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখাটি কি সুন্দর মানাইয়াছে। পীতাভ জরিপাড় শাড়িটি পরিবার কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী, সর্ব্বাঙ্গে তাহা যেন আবেশভরে স্বপ্ন দেখিতেছে। শঙ্করের কবিমন প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

মিষ্টিদিদি বলিতে লাগিলেন, ডালিয়াগুলো তেমন সুবিধে হয় নি যদিও, পিটুনিয়াগুলো কিন্তু খু—ব ভালো হয়েছে। দেখেছেন আপনি ওই দিকের কোনটাতে?

শঙ্কর সত্য কথা বলিল।

বিলিতি ফুল, একটাও চিনি না আমি।

তাই নাকি? আসুন এক্ষুণি চিনিয়ে দিচ্ছি আমি। চলুন যাই, আয় সোনা!

সোনাদিদি কিন্তু অভিমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,. তোমরা যাও, শঙ্করবাবু আমার একটা কথাও যখন রাখলেন না, তখন আমার সরে থাকাই ভাল!

মিষ্টিদিদি অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত দুইটি উলটাইয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, নিন, সামলান এখন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিল, সে কি! কোন কথা রাখলাম না আপনার?

সোনাদিদি নীরব।

আচ্ছা দিন নেবু খাচ্ছি! আপনিও ত আমার কথা রাখলেন না। একটা কোয়া যদি আগে খেতেন, কি এমন ক্ষতি হত তাতে?

শঙ্কর হাসিয়া সোনাদিদির হাত হইতে কয়েকটি কোয়া লইয়া মুখে পুরিল। সোনাদিদি যেন বিগলিত হইয়া গেলেন। অপরূপ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে মৃদু হাস্যসহকারে তিনি বলিলেন, আমার জন্যেও রাখুন দুএকটা! সব খেয়ে ফেলছেন যে—

এই যে নিন না! চলুন, বাগানখানা এইবার দেখা যাক। মিষ্টিদিদি আপনিও নিন—

তিনজন লেবু খাইতে খাইতে ড্রয়িংরুম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে রিণি চায়ের টেবিলগুলি সাজাইতেছিল।

মিষ্টিদিদি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাবা রে বাবা, রিণির মত খুঁতে মেয়ে আর যদি দুটি দেখেছি আমি! সেই আড়াইটে থেকে মেয়ে লেগেছেন চায়ের টেবিল সাজাতে, এখনও পর্য্যন্ত পছন্দমত সাজানো হল না।

হয়ে গেছে আমার—

এই বলিয়া রিণি ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

রিণি চলিয়া গেলে সোনাদিদি মৃদুস্বরে বলিলেন, আহা, বেচারির এত যত্ন আজ সব পণ্ড হল। অপূর্ব্ববাবু আজ আসবেন না ফোন করেছেন!

বলিয়া তিনি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

ছদ্মবিস্ময়ে মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি! আহা, বেচারি!

শঙ্কর এ বিষয়ে মনে মনে কৌতূহলী হইলেও মুখে কিছু বলিল না। তিনজনে মিলিয়া বাগানের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। শঙ্কর মরশুমি ফুল সম্বন্ধে যতটা না হউক, মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করিল। 'সুইটপি'র বর্ণ, বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, রোপণ ও লালন করিবার প্রণালী ও কৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে মিষ্টিদিদি বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় প্রফেসার মিত্রের মোটর গেটে প্রবেশ করিল। শঙ্কর একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কোন প্রকার চঞ্চলতা দেখা দিল না। তিনি সুইটপির সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যেন স্বামীর আগমন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সচেতন হওয়াটা অতিথির সম্মুখে অশোভন! অবিচল ভাবটা বেশীক্ষণ কিন্তু টিকিল না। সোনাদিদি টিকিতে দিলেন না। সোনাদিদি বিস্মিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—ওমা, অপূর্ব্ববাবু যে এসেছেন দেখছি।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি?

সকলে তখন মোটরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রফেসার মিত্র ব্যতীত মোটর হইতে আরও তিনজন ভদ্রলোক অবতরণ করিয়াছিলেন। একজন অপূর্ব্ববাবু এবং অপর দুইজন অবাঙালী। অবাঙালী দুইজন প্রফেসার মিত্রের প্রাক্তন বন্ধু, বিলাতে অবস্থানকালে ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। একজন মাদ্রাজি মিষ্টার পিলে এবং অপরজন পাঞ্জাবি সরদার প্রতাপসিং। দুইজনেই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং দুই জনেই ছুটিতে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইহাঁদেরই সম্বর্দ্ধনা-কল্পে এই টি-পার্টির আয়োজন। মিষ্টিদিদি সস্মিতমুখে ইহাঁদের অভ্যর্থনা করিলেন। কথায় বার্ত্তায় বোধ হইল ইতিপূর্ব্বেই ইহাঁদের আলাপ পরিচয় ছিল। কারণ পাগড়ি-মণ্ডিত শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত প্রতাপ সিং মিষ্টিদিদির সহিত কি একটা রসিকতা করিয়া দরাজ গলায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। মিষ্টার পিলে মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারও হাস্যদীপ্ত ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি এই আগন্তুকদ্বয়কে লইয়া যখন ব্যস্ত, সোনাদিদি তখন অপূর্ব্ববাবুকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে কি যেন বলিতে লাগিলেন।

প্রফেসার মিত্র আসিয়াই বন্ধুদ্বয়কে পত্নীর হস্তে সমর্প করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছিলেন। শঙ্কর সুইটপি বেডগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বো

করি এই সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি সে মিষ্টিদিদির নিকট এইমাত্র শুনিয়াছিল সেইগুলিই রোমন্থন করিতে লাগিল।

বেশীক্ষণ অবশ্য নয়। একটু পরেই সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আসুন শঙ্করবাবু, অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, ইনিই ফোন করেছিলেন—

পরিচয় হইল।

শঙ্কর দেখিল অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত সত্যই একটি দেখিবার মত বস্তু। খর্ব্বকায় ক্ষুদ্র মানুষটি, কিন্তু সাজসজ্জা ছোট মাপের নয়। পায়ে জরিদার নাগরা, পরণে মিহি কোঁচানো ধুতি, গায়ে মিহি ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি। সমস্ত মুখখানি একেবারে যেন চুণকাম করা স্নো এবং পাউডারে, কিন্তু তাঁহার বহুক্ষৌরীকৃত গণ্ডদেশের কর্কশতা ঢাকিতে পারে নাই। মুখখানি গোল, নাকটি খাঁদা খাঁদা, নাকের নিম্নে সামান্য একটু গোঁফ। চক্ষু দুইটিতে বুদ্ধির জ্যোতি আছে, কিন্তু লাজুক। অপূর্ব্ববাবু কাহারও মুখের দিকে বেশীক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারেন না।

সোনাদিদি অপূর্ব্ববাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন।

শঙ্কর শুনিল যে অপূর্ব্ববাবু লোকটি বিদ্বান, সাহিত্য-রসিক, মার্জ্জিতরুচি ও প্রগতিবাদী। সরকারি আপিসে চাকুরি করেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া অপূর্ব্ববাবু চুপ করিয়া রহিলেন। বলিবার মত কথা তাঁহার জোগাইল না। চোখ দুটি নীচু করিয়া সস্মিত মুখে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনারা দুজন আলাপ করুন ততক্ষণ, আমি রিণিকে ডেকে নিয়ে আসি—সোনাদিদি চলিয়া গেলেন। ইহাদের আলাপ কিন্তু তেমন জমিল না। শঙ্কর মামুলি ভদ্রতাসূচক দুই চারিটি কথা বলিল এবং অপূর্ব্ববাবু 'হঁা' 'না' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই বিরত হইতে লাগিলেন। অপরিচিত লোকের কাছে অপূর্ব্ববাবু বড়ই অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হয়, হয়ত এমন কিছু অনবধানতাবশতঃ বলিয়া ফেলিবেন যাহা অসঙ্গত। সুতরাং অপরিচিত লোকের সম্মুখে তিনি সাধারণত চুপ করিয়াই থাকেন।

শঙ্কর হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, আপনার কতদিন আলাপ এঁদের সঙ্গে ?

বছর দুই হবে।

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবেই কেন জানিনা অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, মিস্ মিত্রকে পড়াতাম আমি।

ও।

শঙ্কর সহসা চুপ করিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল—ঠিক কি যে মনে হইতে লাগিল তাহা ঠিক বর্ণনীয় নয়। কিন্তু একটা পোকা একটা মর্ম্মর প্রতিমার গা বাহিয়া উঠিতেছে দেখিলে একটা শিল্পীর যে ধরণের ক্ষোভ উপস্থিত হয় শঙ্করের তাহাই হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শঙ্কর আকস্মিকভাবে অপূর্ব্ববাবুকে আবার একটি প্রশ্ন করিল, প্রশ্নটির অসৌজন্যে শঙ্কর মনে মনে সঙ্কুচিত হইলেও প্রশ্নটি না করিয়া সে পারিল না। তখন আপনি ফোন করলেন যে আসতে পারবেন না, আবার এসে পড়লেন যে—

প্রশ্নটি শুনিয়া অপূর্ব্ববাবু নারীসুলভ লজ্জায় শির অবনত করিলেন এবং পরে অতি কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, বড়-বাবু ছুটি দিতে চাননি প্রথমে, শেষটা অনেক বলা কওয়ার পর ছুটি দিতে যখন রাজি হলেন তখন দেখি আর আসবার সময়ও নেই—শেষে শঙ্কর বলিল--আপনি এলেন ত প্রফেসার মিত্রের সঙ্গে দেখলাম—

অকারণে লজ্জিত অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, হ্যাঁ উনি গাড়ি নিয়ে ভাগ্যিস্ আমার মেসে গিয়েছিলেন তাই আসতে পারলাম।

কোথায় থাকেন আপনি ?

নেবুতলায় একটা মেসে।

প্রফেসার মিত্র কাপড় বদলাইয়া বাহিরে আসিলেন। প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রিণি ও সোনাদিদিও আসিলেন। মিষ্টিদিদি সরদার প্রতাপসিং ও মিষ্টার পিলেকে লইয়া হাস্য পরিহাসে মশগুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রফেসার মিত্র কাছে আসিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইতেই তাঁহার শঙ্করের সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল। তিনি অভিভাবকী সুরে শঙ্করকে ডাকিয়া বলিলেন, আসুন না শঙ্করবাবু, আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন ?

স্থইটপিগুলো দেখছিলাম আর একবার। অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গেও আলাপ হল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের সঙ্গে সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রফেসার মিত্রকে শঙ্কর ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই, নাম শুনিয়াছিল। ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে ভদ্রলোকের নাম আছে। দেখিলেই লোকটিকে ভাল লাগে, সদা-হাস্যমুখ, উপরের দন্তপাঁতি সর্ব্বদাই বিকশিত হইয়া আছে। শঙ্করের সহিত পরিচয় হইতেই'তিনি উচ্ছ্বাসভরে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে বলিলেন, ভারি খুশি হলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করে'! উৎপলের বন্ধু তুমি, উৎপল আমাদের বাড়ির ছেলের মত ছিল। সেদিন আমি একটা মিটিংএ আটকে পড়লাম—তাই উৎপলকে 'সি-অফ্' করতে আর যেতে পারলাম না। বস বস—

এমন সময় আর একটি মোটর আসিয়া প্রবেশ করিল। সে মোটরে আরও কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনজন আধুনিক মহিলা ও তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন পুরুষ মানুষ।

শঙ্কর ও সোনাদিদি একটি টেবিলে বসিয়াছিলেন। ঠিক তাহার পাশের টেবিলেই ছিলেন তিনি ও অপূর্ব্ববাবু। অপর পাশে ছিলেন দ্বিতীয় মোটরে সমাগতা একটি মহিলা ও তৎসঙ্গে আগত ভদ্রলোক দুইজনের মধ্যে একজন। এই ভদ্রলোক সোনাদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মিসেস্ রায়, একটা খুব ভাল ফিল্ম্ হচ্ছে, দেখেছেন? Man, Woman, Marriage?

সোনাদিদি বলিলেন, কাগজে দেখেছি বটে, পরদায় দেখা হয় নি!

দেখে আসুন তাহলে, ওয়াণ্ডারফুল প্রোডাক্শান্। আজই লাস্ট্ ডে—

সোনাদিদি হতাশভাবে বলিলেন, তাহলে আর হয় না। পার্টি শেষ হতেই ত সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সেকেণ্ড শো'তে যেতে পারেন।

দেখি—

সোনাদিদি চুপ করিয়া গেলেন। কোথাও যাওয়া না যাওয়ার মালিক তিনি নহেন। মিষ্টিদিদি যদি না যান, তাহা হইলে তাঁহারও যাওয়া হইবে না।

একটু পরে সোনাদিদি শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি দেখেছেন ফিল্ম্টা?

না—

যান, দেখে আসুন।

হস্টেলে রাত্রিবেলা ত ছুটি পাব না—

একটু দুষ্টামিভরা হাসি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ওহো, আপনি যে ভাল ছেলে সে কথা মনে ছিল না।

শঙ্কর গম্ভীর ভাবে বলিল, মনে থাকা উচিত ছিল!

সোনাদিদি পাশের টেবিলে রিণিকে বলিলেন, প্রকাশ-বাবু বলছেন খুব ভাল একটা ফিল্ম্ হচ্ছে, যাবি?

তোমরা যাও ত যাব।

অপূর্ব্ববাবু যাবেন? সোনাদিদি প্রশ্ন করিলেন।

মিহি গলায় অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, খুবই সুখী হতাম যেতে পারলে! কিন্তু আমার টুইশনি আছে, মিস্ বেলাকে পড়াতে যেতে হবে—

শঙ্কর চকিতে একবার রিণির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না।

সোনাদিদি বলিলেন, মিস বেলা? মানে, বেলা মল্লিক? সে ত দু'দুবার ম্যাট্রিক ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল শুনলাম। আবার পড়া সুরু করেছে না কি?

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া নিতান্ত লাজুক কণ্ঠে অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, আমি গান শেখাই তাঁকে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রিণির দিকে চাহিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ও—

ইহার উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে অপূর্ব্ববাবু কি একটা বলিলেন, কিন্তু চতুর্থ টেবিলে উপবিষ্ট আনন্দিত সর্দার প্রতাপ সিংহের অট্টহাস্যে তাহা আর শোনা গেল না। চতুর্থ টেবিলে প্রতাপ সিং ও মিষ্টিদিদি বসিয়া আলাপ আপ্যায়ন সহকারে চা-পান করিতেছিলেন।

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল অস্তগামী রক্ত-কিরণ-রেখা মিষ্টি-দিদির জরির আঁচলাটায় পড়িয়া জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

পাশের টেবিলের প্রকাশবাবু সোনাদিদিকে বলিলেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না ত, এঁকে এর আগে আপনাদের বাড়ীতে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

সোনাদিদি আলাপ করাইয়া দিলেন।

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, এই সুসজ্জিত ফ্যাসান-দুরস্ত

অধিবেশনে প্রকাশবাবু লোকটি একটু বেমানান গোছের সাদাসিধা। গলাবন্ধ গরমের কোট গায়ে এবং তদুপরি একটি মোটা গোছের খদ্দরের আধময়লা চাদর। দাড়িটা পর্য্যন্ত যেন দুই দিন কামানো হয় নাই।

সোনাদিদি পরিচয়-সূত্রে বলিলেন, প্রকাশবাবু হচ্ছেন আমাদের অগতির গতি, কোন বিপদে পড়ে প্রকাশবাবুর শরণাপন্ন হ'লে বাস্ নিশ্চিন্ত! তাছাড়া জানেন, উনি একজন খুব ভাল হোমিওপ্যাথ!

প্রকাশবাবু হাত জোড় করিয়া বলিলেন, মিসেস্ রায়, অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি ত এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন; আমার ওপর এত বেশী মনোযোগ দিলে ওঁদের অপমান করা হবে যে—

প্রকাশবাবুর টেবিলে যে মহিলাটি ছিলেন তিনি এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, ব্যাচিলার মানুষকে একটু জ্বালাতন করে মিসেস রায় আনন্দ পান, তার থেকে ওঁকে বঞ্চিত করবেন না। বেশ তাহলে করুন।

প্রকাশবাবু সস্মিতমুখে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

শঙ্কর হেদুয়ার ধারে একটা বেঞ্চে একা বসিয়াছিল। প্রফেসার মিত্রের বাড়ী হইতে সে হস্টেলে ফেরে নাই। আজিকার দিনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাহার মন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের সংসর্গে তাহার বৈকালটা কাটিল তাহারা যেন অন্য জগতের প্রাণী—স্বপ্ন-জগতের। কথাবার্ত্তা ব্যবহার কেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ষ্ট সজীব সুন্দর। সুরমা এই জগতের লোক। ইহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া সে মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করিল।··· স্টেশনে উৎপল সেদিন যাহা বলিয়াছিল তাহা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু তাহা ত একেবারেই অসম্ভব। কল্পনা করাও বাতুলতা। রিণির মত মার্জ্জিতরুচি যুবতী তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে কেন? কিন্তু ওই অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিতকে ত রিণি সহ্য করিতেছে। এই কথা মনে হওয়ায় শঙ্কর সোজা হইয়া বসিল। রিণিকে সে নিজে বিবাহ করিতে পারুক আর না পারুক, অপূর্ব্বকৃষ্ণের হাত হইতে তাহাকে সে রক্ষা করিবে।

কে রে শঙ্কর, এখানে একা কি করছিস? আজ কলেজ থেকে তুই হস্টেলে পর্য্যন্ত ফিরিস নি, ব্যাপার কি বল ত?

শঙ্করের রুম-মেট কানাই।

শঙ্কর বলিল, একটা নেমন্তন্ন ছিল।

চল এবার যাওয়া যাক্, আটটা ত বাজে—

চল্।

দুইজনে গল্প করিতে করিতে হেদুয়া হইতে বাহির হইল। হেদুয়ার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে সহসা কানাই বলিল, ওহো, তোর তিরিশটা টাকা এসেছে আজ মণি-অর্ডারে। সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট তোকে দিতে এসেছিলেন, তোকে না পেয়ে আমাকেই দিয়ে গেলেন। বললেন তোকে দিয়ে দিতে। সঙ্গেই আছে আমার—এই নে—

কানাই পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া তিনটি নোট ও একটি কুপন শঙ্করের হাতে দিল। শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে তাহা পকেটে পূরিল।

ট্রাম আসিল।

উভয়েই চড়িয়া বসিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কানাইকে বলিল, আমার একটু দরকার আছে, তুই যা, আমি আসছি একটু পরে। চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

ট্রাম চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

অপরাধতত্ত্বে নারীর স্থান

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

সাধারণ উপলব্ধি হইতে বোঝা যায় যে, পুরুষ অপেক্ষা নারী অপরাধের পর্য্যায়ে অনেক নিম্নে। অনেকের মতে নারীর অপরাধীর শ্রেণীভুক্ত হইবার বয়স দুইটী—একটী হইল যখন তাহার সবে যৌবনে পদার্পণ করিবার সময় হইয়াছে অর্থাৎ ১৪ বা ১৫ বৎসর; আর একটী হইল যখন বয়সের আধিক্য হইয়াছে অর্থাৎ অন্যান্য উপায়ে সহজে রোজগার করার সম্ভাবনা চলিয়া যায়। ওটিঞ্জেন (Œttingen) বলেন নারী সাধারণত পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে বিপথগামিনী হইয়া থাকে। কোয়েটলেটের (Quetlet) অভিমত হইল, ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমই নারীর অধঃপাতে যাইবার প্রধান সময়। এক দিক হইতে যেমন দেখা যায়, পুরুষ অপেক্ষা নারী একটু অধিক বয়সেই অপরাধীর শ্রেণীভুক্ত হয়, অপর দিক হইতে আবার বলা চলে যে, পুরুষ যখন কিছুই জানে না, তারও পূর্ব্বে নারী অপরাধ করিতে পারে অর্থাৎ ১৪ বা ১৫ বৎসর বয়সে। এই সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ-ভাবে আলোচনা করিবার জন্য নিম্নে ভারতবর্ষের বয়ঃক্রম অনুপাতে নারী-অপরাধীর সংখ্যা দেওয়া গেল[১]—

নারী-অপরাধীর বয়ঃক্রম

প্রদেশ	* ২২শ বৎসরের নিম্নে	২২শ হইতে ৪০শ বৎসরের মধ্যে	৪০শ হইতে ৬০শ বৎসরের মধ্যে	৬০ বৎসরের উর্দ্ধে
মাদ্রাজ	১৬২	১,২৮৮	৫৭৪	৪৬
বোম্বে	৮৭	৩০২	৯৬	১৫
এডেন	১	৬	১	×
বাঙ্গলা	৮১	৫৩২	১৭৫	১৬
যুক্তপ্রদেশ	৬৪	২৮০	১২৮	৮
পাঞ্জাব	৩৫	২৩৪	৫৫	৮
ব্রহ্মদেশ	৯৯	৫৮৯	১৯৮	২৪
বিহার ও উড়িষ্যা	৭৫	৪০৭	১৫৬	৪৩
মধ্যপ্রদেশ	২২	১৯২	৬৪	২
আসাম	৯	৪২	১৯	৩
দিল্লী	২৩৭	৯	১	×

উপরিউক্ত অপরাধীর শ্রেণী বয়ঃক্রম অনুপাতে ভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে অর্থাৎ "২২শ বৎসরের নিম্নে"

(১) ষ্ট্যাটিসটিক্যাল এব্‌স্‌ট্রাক্ট ফর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ১৯২৬-২৭ হইতে ১৯৩৫-৩৬ পর্য্যন্ত।

অপরাধীর যে সংখ্যা তাহা হইতে ১৪ বৎসর কি ১৫ বৎসর বয়সে ভারতীয় নারীর অপরাধ সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। তারকা চিহ্নিত ঘরটী সম্বন্ধে ষ্ট্যাটিসটিক্যাল এব্‌সট্র্যাক্টে একটী মন্তব্য দেখা যায় যে, ১৯২৯ সনের পূর্ব্ব অবধি উক্ত ২২ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়স স্থলে ১৬ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়ঃক্রম বলিয়া লিখিত ছিল। এই পরিবর্ত্তনের যথাযথ কারণ কিছু উহা হইতে বোঝা যায় না। তবে সাবালিকা হইবার বয়ঃক্রম পরিবর্ত্তন হওয়ার জন্য যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, নাবালিকা অবস্থায় নারী কতদূর অপরাধ করিয়া থাকে। উক্ত নাবালিকার কথা মানিয়া লইলে কোয়েটলেট বা অন্যান্য ইউরোপীয় অপরাধতত্ত্ববিদের অভিমত ধরিয়া লওয়া কঠিন। উপরিউক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, ২২ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়ঃক্রমের নারী অপরাধীর সংখ্যা অপেক্ষা ২২ হইতে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের অপরাধীর সংখ্যা অধিক। মাদ্রাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নারী অপরাধী সংখ্যা দৃষ্ট হয়। মাদ্রাজে দেখা যায় যে ২২ বৎসর অবধি বয়ঃক্রম নারী অপরাধীর সংখ্যা হইল ১৬২; কিন্তু ২২ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে যাহাদের বয়স তাহাদের সংখ্যা হইল ১,২৮৮। যখন ৪০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে তখন উহাদের সংখ্যা কমিয়া ৪৭৪ হইয়াছে, আবার যখন ৬০ বৎসর পার হইয়াছে তখন উহাদের সংখ্যা হইয়াছে মাত্র ৪৬জন। দেখা গেল যে মধ্য-বয়স্ক অর্থাৎ ২২ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে অপরাধ সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বয়োধিক্যে উহার সংখ্যা লঘিষ্ঠ হইয়াছে। বোম্বে প্রদেশেও ২২ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়সের নারী অপরাধীর সংখ্যা হইল ৮৭, ২২ হইতে ৪০ বৎসরের অপরাধীর সংখ্যা হইল ৩০২, ৪০ বৎসর পার হইলে উহার সংখ্যা কমিয়া ৯৬ হইয়াছে এবং ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে নারী-অপরাধীর সংখ্যা হইল মাত্র ১৫জন। এখানেও একই কথা প্রমাণ হইতেছে যে, মধ্য বয়সে নারী-অপরাধীর সংখ্যাধিক্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও ঠিক একই ফলাফল দেখা যাইবে—২২ বৎসরের নিম্নে উহার সংখ্যা হইল ৮১, তাহার উর্দ্ধে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের নারী-অপরাধীর সংখ্যা হইল ৫৩২ এবং ৪০ বৎসর পার হইলে উহার সংখ্যা কমিয়া ১৭৫ হইয়াছে। তৎপরে ৬০ বৎসরের অধিক হইলে উহার সংখ্যা কমিয়া মাত্র ১৬ হইয়াছে। এখানেও প্রমাণিত হইল যে, মধ্যবয়সেই অপরাধ করিবার প্রবণতা অধিক এবং বয়স বেশী হইলে উহা কমিয়া আসে। বিহার ও উড়িষ্যার সংখ্যা লইলেও ঐ একই জিনিষ প্রমাণিত হইবে। প্রথমে ৭৫, তৎপরে ৪০৭ (২২শ হইতে ৪০ মধ্যে), তাহার পর ১৫৬ এবং ৬০ বৎসরের অধিক হইলে সংখ্যা মাত্র ৪৩ জন। বাঙ্গলা এবং বোম্বে অপেক্ষা মাদ্রাজ এবং বিহার-উড়িষ্যাতে অধিক বয়সের নারীর অপরাধ সংখ্যা অধিক। ব্রহ্মদেশেরও নারীর অপরাধের গতি একই প্রকারের। ২২ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়সে দেখা যায় যে, উহার সংখ্যা ৯৯, তাহার পর ২২ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের নারী-অপরাধীর সংখ্যা হইল ৫৮৯, ৪০ হইতে ৬০ বৎসরের নারী-অপরাধীর সংখ্যা হইল ১৯৮ এবং ৬০ বৎসরের অধিক হইলে উহার সংখ্যা হইয়াছে মাত্র ২৪জন। মধ্যপ্রদেশেও প্রথমে উহার সংখ্যা ২২, তাহার পর ১৯২, তাহার পর ৬৪ এবং শেষে মাত্র ২ জন।

কাজেই ইহা এখন বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের সংখ্যা লইয়া পরীক্ষা করিলে প্রমাণিত হইবে যে, বয়সের আধিক্যের সহিত অপরাধ সংখ্যা কমিয়া যায় কিন্তু বৃদ্ধি পায় না। আর এক কথা হইল মধ্যবয়সেই অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি বা আবেগ অধিক, কিন্তু অল্প বয়সে অর্থাৎ ২২ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়সে অপরাধসংখ্যা স্বল্প। উপরে উক্ত ইউরোপীয় অপরাধতত্ত্ববিদগণের মন্তব্যের সহিত এখানে যে সিদ্ধান্ত করা গেল, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক; কারণ তাঁহাদের মতে নারী-অপরাধের আধিক্য দুইটী সময়ে পরিলক্ষিত হয়—একটী প্রাক্‌যৌবনে (১৪-১৫ বৎসর বয়সে) আর একটী বেশী বয়সে অর্থাৎ (৪০এর উপরে) ইহার কোনটীই ভারতের সহিত মেলে না।

এ স্থলে সাদারল্যাণ্ডের মতও উপরিউক্ত কোয়েটলেট বা ওটিনজেনের মতের বিরুদ্ধ। তিনি বলেন, "females are committed most frequently, as are males, in the age group 21-24, but the ratio of female commitments to male commitments is highest at the age of fifteen, probably because girls reach puberty at an earlier age than boys. The ratio of commitments of females to commitments of males is lowest

in the groups below the age of twelve and after the age of forty-five." ([২])(বাঙ্গলা—যেরকম ভাবে পুরুষের ২১-২৪ বয়ঃক্রম কালে অভিযুক্ত হওয়ার সংখ্যা অধিক, সেই অনুপাতে স্ত্রীলোককেও উক্ত বয়ঃক্রমের মধ্যে অভিযুক্ত হইতে খুব বেশী দেখা যায়, কিন্তু ১৫ বৎসর এবং তন্নিম্ন বয়সে পুরুষের অপরাধ অনুপাতে স্ত্রীলোকের অপরাধ সংখ্যা অধিকতর ইহার কারণ, খুব সম্ভবত ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের অল্প বয়সে দৈহিক পূর্ণতা লাভ করে। বারো বৎসরের নিম্নে এবং পঁয়তাল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধে পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের অপরাধ সংখ্যা নিম্নতম।) ভারতবর্ষের প্রধান প্রদেশগুলিতে নারীর অপরাধ সংখ্যা যোজনা করিয়া পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বেশী বয়সে নারীর অপরাধ সংখ্যা কমিয়া যায়, তাহার সহিত সাদারল্যাণ্ডের বক্তব্য প্রায় একই রকমের। কিন্তু ১৫ বৎসর বয়সে কি হয় তাহার সম্বন্ধে মতবাদ নির্দ্ধারিত করিয়া বলা সুকঠিন, কারণ আমাদের দেশে ঠিক ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের অপরাধীর সংখ্যা পাওয়া যায় না।

নারী-অপরাধের একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়, যাহা পুরুষের মধ্যে একেবারে নাই যেমন গর্ভনাশ করা। দ্বিচারিণী হওয়া, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, পুরুষের অপরাধে সাহায্য করা, বিষ ভক্ষণ করান, বাড়ীতে অগ্নি দেওয়া, এবং ছোটখাট চুরি প্রভৃতি অপরাধের সহিত নারীর সংযোগ অধিক মাত্রায় দেখা যায়। খুন, জখম, মারপিট, জুয়াচুরি —এই সকল অপরাধে নারীকে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায় না। যেখানে শারীরিক শক্তি ও মানসিক শক্তির বেশী দরকার সেখানে নারী অগ্রসর হয় না। অষ্ট্রিয়াতে স্ত্রীলোক অপরাধীর মধ্যে গর্ভনাশ, অন্যের অপরাধে যোগদান, বাটীতে অগ্নিদান এবং চুরি প্রভৃতি বিষয়ে অধিক পরিমাণে অভিযুক্ত হইতে দেখা যায়। ফরাসী দেশে স্ত্রীলোকে শিশুহত্যা, গর্ভনাশ, বিষ খাওয়ান, স্বামীহত্যা, শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতি অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইংলণ্ডের নারীকে জাল টাকা চালাইবার সাহায্য করিতে, মিথ্যা অভিযোগ বা দোষারোপ করিতে এবং নরহত্যা করিতে অধিকাংশ সময়ে দেখা যায়। কিন্তু নারীকে জটিল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বিজড়িত থাকিতে খুব কমই দেখা যায়। এ সম্বন্ধে Lombroso বলেন, "To conceive an assassination, to make ready for it, to put it into execution demands, in a great number of cases at least, not only physical force, but a certain energy and a certain combination of intellectual functions. In this sort of development women almost always fall short of men." অর্থাৎ একটা হত্যার পরিকল্পনা করিতে, তাহার জন্য তোড়জোড় করিতে এবং তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য শুধুই দৈহিক শক্তির যে আবশ্যক তাহা নহে, উহার সহিত কতকটা উৎসাহ এবং বুদ্ধিবৃত্তির সংমিশ্রণও প্রয়োজন। পুরুষ অপেক্ষা নারী এই সকল বিষয়ে একেবারে পশ্চাৎপদ।

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষের নারীদের মধ্যে যে সকল অপরাধ প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোকের একটী ইংরেজী অনুবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সেই সকল অপরাধের জন্য স্ত্রীলোককে সমাজচ্যুত করা হইত। শ্লোকের ইংরেজী অনুবাদের কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল, যেখানে দেখান হইয়াছে কোন্ কোন্ অপরাধে নারীকে উপরিউক্ত শাস্তি দেওয়া বিধিগত ছিল— "Sexual intercourse with a low caste man, causing abortion of a child in her wombs and killing her husband : these are certainly additional causes of women's special degradation.[৩]—অর্থাৎ, নিম্নজাতির সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকায়, গর্ভনাশ করায় এবং স্বামীহত্যা করায় স্ত্রীলোকের বিশেষ অপরাধের সূচনা হয়। ইহা ব্যতীত গণিকাবৃত্তি বা অসৎচরিত্রা নারীর জন্যও বহুবিধ নিয়ম হিন্দুশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই স্থলে স্ত্রীলোকের শাস্তির বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের মত আরও লিখিত হইয়াছে—"A woman guilty of unchastity shall be deprived of her position and possessions, shall wear dirty clothes, shall live upon starving maintenance, shall be humiliated and made to sleep on bare ground···A woman guilty of

---

(২) "ক্রিমিনলজি" : এডউইন সাদারল্যাণ্ড, ১৯২৪, পৃঃ ৯২-৯৩ দ্রষ্টব্য।

(৩) যাজ্ঞবল্ক্য, iii, ২৯৮ পৃঃ

adultery is purified by catemenia; but abandont is ordained in case of conception by adultery and in case of causing abortion or killing the husband as well as in case of committing heinous sins."[৪]—অর্থাৎ সতীত্বহীনতার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে নারী পদচ্যুতা ও সম্পত্তিচ্যুতা হইবে, কাপড় পরিধান করিবে, কেবলমাত্র জীবনধারণের উপযোগী সে ময়লা আহার্য্য পাইবে, বিনিন্দিত হইবে এবং নগ্নভূমিতে শয়ন করিবে। যে-স্ত্রীলোক অপর পুরুষের সহিত ব্যাভিচারিণী হইয়াছে তাহার ঋতু হইলে মুক্ত হইতে পারে কিন্তু ব্যাভিচারজনিত গর্ভাধান হইলে, গর্ভনাশ করিলে অথবা স্বামীহত্যা করিলে অথবা ঐ ধরণের অতি নীচ পাপ করিলে, তাহার সমাজচ্যুতি হওয়া অনিবার্য্য।

স্ত্রীলোকের অপরাধের বিশেষত্বের মধ্যে দুইটী প্রধান এবং সেই দুইটী স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভবপরও নহে। তন্মধ্যে প্রথমটী হইল গণিকাবৃত্তির অপরাধ এবং দ্বিতীয় হইল গর্ভনাশ করা এবং তৎসম্পর্কে সাহায্য করার অপরাধ। নিম্নে পর পর দুইটী বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

নাইন্টীন্থ সেঞ্চুরি চেম্বার্স ডিকস্‌নারিতে গণিকা বা "প্রস্‌টিটিউট" কাহাকে বলে তাহার বর্ণনায় লিখিয়াছে, "to expose for sale for bad ends."—অর্থাৎ অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য নিজেকে বিক্রয়ার্থে মুক্ত রাখা। এখানে অসৎ উদ্দেশ্য অর্থে কামপ্রবণতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে। গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রীর "হিন্দুল" নামক পুস্তকে "প্রস্‌টিটিউট" (গণিকা) সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল: "When a woman leaves her father's or husband's house where she has been living and goes away with a paramour and lives with him elsewhere, she is ordinarily called a prostitute by the Hindus and as such is assumed to be degraded."—অর্থাৎ যখন কোন স্ত্রীলোক পিতা কিম্বা স্বামীর বাটী, যেখানে সে বসবাস করিয়া থাকে, পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়ীর সহিত চলিয়া গিয়া অন্যত্র বাস করে, তাহাকে হিন্দুমতে সাধারণত বেশ্যা বলিয়া গণ্য করা হয় এবং সেইজন্য সমাজচ্যুতা বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু মেনের হিন্দুল (পৃঃ ৬১-৬২) হইতে মনে হয় যে, গণিকাবৃত্তিকে হিন্দুরা এককালে মানিয়া লইয়াছিল এবং তাহাদের জীবনের ও তাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য বিশেষ আইনও দৃষ্ট হয়। হিন্দু আইন অনুসারে তাহাদের জাতিচ্যুতি এবং সমাজচ্যুতি হইত সত্য, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইত না। ১৮৬১ খৃঃ অঃ পেন্যাল কোড না হওয়া পর্য্যন্ত গণিকাবৃত্তির কোন অংশই আইনবিরুদ্ধ ছিল না।[৫] অপরাধ-বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে গণিকাবৃত্তি সামাজিক অপরাধ বলিয়া সর্ব্বত্রই গণ্য হইয়া আসিতেছে। সকল দেশেই ইহাকে অন্যায় বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু তথাপি ইহার স্থানও কিছু না কিছু মানিয়া লওয়া হইয়াছে। সভ্য দেশের মধ্যে কোথাও কোথাও ইহার মূল উৎপাটন করিবার চেষ্টা যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু ফলে দেখা গিয়াছে যে তাহার পরিণতি শুভ না হইয়া অশুভই হইয়াছে। ফরাসী দেশে একাদশ লুইর রাজত্বকালে ইহার দূরীকরণের জন্য প্রকৃষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। বেত্রাঘাত করা, ফাঁসি দেওয়া প্রভৃতি ভীষণ ও ভয়াবহ শাস্তিও এই অপরাধের পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই। আইনের সহিত সমাজ-বিজ্ঞানের যতটা সম্বন্ধ তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আইন দ্বারা কোথাও ইহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং কোথাও ইহার নিবারণ করা ব্যর্থ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কাজেই এখন অপরাধ-বিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহার নিবারণ প্রচেষ্টা কত দূর সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা সন্দেহের কথা। বিজ্ঞানের কার্য্য হইল প্রত্যেক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা এবং কার্য্য-কারণ নিরূপিত হইলে একটা সাধারণ তথ্য স্থির করা। এখানেও আমরা প্রথমে চেষ্টা করিব যে, ইহার কারণ কি কি হইতে পারে এবং তৎপরে দেখিব যে, তাহা কোন উপায়ে নিবারিত হইতে পারে কি-না।

গণিকাবৃত্তির কারণ কি কি হওয়া সম্ভব তাহা লইয়া মতদ্বৈধ থাকিলেও মূল নীতি বিষয়ে সকলেই একমত।

(৪) যাজ্ঞবল্ক্য, i, ৭০-৭২ পৃঃ

(৫) "On the other hand, until the passing of the Penal Code in 1861, no aspect of prostitution was illegal; and the Courts recognised and gave effect to the usages of that class as relating to rights of property, etc. p, 62.

সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থাই যে একমাত্র কারণ তাহা বলিলে হয় ত ভুল থাকিয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে উপরিউক্ত কারণ দুইটাই অবশ্যম্ভাবী, যদিও অন্যান্য কারণ উহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। এ স্থলে ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রের মতে আমরাও আলোচনা বুঝাইতে গেলে বলিব, The existence of all the necessary conditions (including the positive and the negative) to bring about a particular phenomena together form a cause.—অর্থাৎ একটী বিশেষ ঘটনার জন্য যে যে আবশ্যকীয় অবস্থার (অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থা ধরিয়া) প্রয়োজন তাহাদিগকে একত্রে লইলে কারণ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কাজেই কোন একটী অবস্থা বা দুইটী অবস্থাই যে কারণ তাহা নাও হইতে পারে; হয় ত একের অধিক অবস্থার অস্তিত্বই অনেক সময়ে কারণস্বরূপ হয়। এ স্থলেও কেবলমাত্র সামাজিক বা কেবলমাত্র আর্থিক বা মানসিক অবস্থাই কারণ তাহা বলিলে বিজ্ঞানসম্মত হইবে না। এসাফ্যানবুর যেমন দেখাইয়াছেন, অপরাধীর মনস্তত্ত্ব যে সকল নারীর মধ্যে অধিক তাহাদের অধিকাংশই গণিকা-বৃত্তি অবলম্বন করে। কারণ উহাতে চুরি, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধ করিবার বিশেষ সুযোগ পায় এবং গণিকাবৃত্তির দ্বারা সহজে ও বিনা পরিশ্রমে রোজগার করা যায়। "Prostitution does absorb a considerable percentage of criminality minded women. Those few prostitution who make a practice of robbing, he believes to be first of all, thieves, who have turned to prostitution because it affords the easy way of stealing." ষ্ট্রম্বার্ (Strrohmberg) বেশ্যাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী দেখাইয়াছেন—একটী হইল অলস শ্রেণীভুক্ত এবং আর একটী হইল গণিকাবৃত্তির সহিত আরও দু-একটী কার্য্য করিয়া থাকে। তিনি বলেন বেশ্যাবৃত্তির সহিত "অপরাধ" একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত। এতক্ষণ অবধি আলোচনার মূল নির্দ্দেশ হইল—আর্থিক অবস্থাই গণিকাবৃত্তির মূল কারণ। কিন্তু এসাফানবুর এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে, "But we must not forget that a large number are led to adopt these dangerous occupations by their strong sexual impulses and their lore of dress and an apparently comfortable life."—অর্থাৎ, কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে ইহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক নারী এই বিপদসঙ্কুল ব্যবসায় অবলম্বন করে নিজেদের কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য, ভাল সাজসজ্জার বাসনা মিটাইবার জন্য এবং আপাতমধুর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। এখানেই এসাফানবুর স্থির হন নাই, তিনি আরও বলিয়াছেন, "undoubtedly our social conditions—miserable economic circumstance and the fact that prostitutes are not restricted to certain localities—are the cause of prostitution—" অর্থাৎ, ইহা নিঃসন্দেহ যে আমাদের সামাজিক অবস্থা, শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এবং বারবণিতারা যে একটী বিশেষ স্থানে আবদ্ধ থাকে না এই সকলই বেশ্যাবৃত্তির কারণ। বনহফার (Bonhoffer) বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বারবণিতার অপরাধভুক্ত হওয়ার কারণ হইল বিকৃত মানসিক অবস্থা। তবে মূলত ইহার দুইটী কারণ চোখে পড়ে; প্রথম হইল, নারী বিক্রয় ব্যবসা অথবা নারীকে বিপথে লইয়া যাওয়ার ব্যবসা এবং দ্বিতীয় হইল, তাহাদের অর্জ্জনের উপর নির্ভরশীল পুরুষের দল পিছনে থাকে তাহারা। লোকাটেল (Locatell) বলেন যে, তাঁহার মতে গণিকাবৃত্তি চুরি অপরাধের মত কতগুলি ব্যক্তিগত স্বাভাবিক কু-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভুত। শিক্ষার অভাব, পরিত্যজ্য হইয়া জীবনযাপন করা, দারিদ্র্য এবং কু-আদর্শ প্রভৃতিকে প্রাথমিক কারণরূপে গণ্য করা যায় না বরং সাহায্যকারী অবস্থা বলা চলে।

কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া উপরে যে মতামত আলোচনা করা গেল তাহা নিয়মিতভাবে শ্রেণীভুক্ত করিলে তিনটী হয়—প্রথম সামাজিক, দ্বিতীয় আর্থিক এবং তৃতীয় মানসিক। সামাজিক কারণের মধ্যে দেখা গেল যে, পরিত্যক্তা নারী, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কু-আদর্শ এবং পৃথকীকরণের ব্যবস্থা-শূন্যতা। কিন্তু ইহার সহিত আরও একটী কারণ সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, তাহা হইল সমাজের গোঁড়ামি বা ভাল হইবার পথরুদ্ধকরণের ব্যবস্থা। শেষোক্ত কারণটী বিশদ ভাবে বলিলে দেখা যাইবে যে, যে সকল বালিকা কোন কারণে একবার পদস্খলিত হইয়া বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভবতী হইয়া পড়ে তাহাদিগকে হয় ভ্রূণহত্যার পাপে বিজড়িত হইতে হয় অথবা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। অনেক সময়েই তাহারা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে, কারণ দেখে যে হয় ত তাহার জীবনে আর ভাল হইবার আশা নাই অথবা সমাজে মাথা নীচু করিয়া থাকা অপেক্ষা মৃতভাবে আর একটী দলভুক্ত হওয়া ভাল। দ্বিতীয় কারণ, আর্থিক কারণ আলোচনা করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, সহজ রোজগার, ভাল সাজসজ্জা এবং দারিদ্র্যই হইল ইহার বিভিন্ন রূপ। এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য যে, দারিদ্র্যই নারীকে অধিকাংশ সময়ে বিপথে লইয়া যায়। যেখানে স্বাধীনভাবে সংস্থানের উপায় থাকে সেখানেও অপ্রাচুর্য্যের জন্য বহু নারী গুপ্তভাবে এই জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও কার্য্য পাইবার লোভেও নারীকে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির আশ্রিতা হইতে হয়। ধাত্রী, নার্স, বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, ক্যানভাসার প্রভৃতি কার্য্যে

প্রায়ই এইরূপ একটা বিচিত্র অথচ দৈনন্দিন অবস্থার সমাবেশ হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতে কারখানার স্ত্রী-মজুরদের, আসামে চা-বাগানের কুলিমজুরদের মধ্যে এইরকম চরিত্র-শৈথিল্য অধিক লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তৃতীয় কারণ হইল মনস্তত্ত্ববিষয়ক। মানসিক বিকার হেতু অনেকেই এই ভুল পথ অবলম্বন করে। উত্তেজনাও বহুল পরিমাণে গণিকা-বৃত্তির কারণ বলিয়া দেখা যায়, তবে অধিকাংশ স্থলে কু-প্রবৃত্তিকে কারণ বলিয়া অপরাধতত্ত্ববিদগণ দেখান, তাহার মধ্যে আরও একটু বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। প্রবৃত্তির মূলে দুইটী জিনিষের প্রভাব অধিক—শিক্ষা এবং জন্মগত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। পিতামাতা যদি মদ্যপান অথবা কোন দোষযুক্ত হয় তাহা হইলে সন্তানের মধ্যে পানদোষ আসিতে পারে এবং সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে নারীকে বারবণিতা হইতে দেখা গিয়াছে। শিক্ষার অভাবে যে শত সহস্র নারী এই পথে আসিয়া পড়ে তাহা বলা বাহুল্য। নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া গেল যাহা হইতে বোঝা যাইবে যে, অভিযুক্ত নারী অপরাধীর মধ্যে কত পরিমাণে অশিক্ষিতা এবং কত পরিমাণে শিক্ষিতা নারী আছে। অবশ্য তালিকা হইতে গণিকাবৃত্তির অপরাধে শিক্ষার অভাবে কতজন নারী অভিযুক্তা তাহা বোঝা যাইবে না কিন্তু সাধারণ অপরাধের ধারা ও শিক্ষার কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে কতকটা নির্দেশ করিবে মাত্র।

প্রদেশ হিসাবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অপরাধীর সংখ্যা তালিকা নিম্নে দেওয়া (ক) গেল।

প্রদেশ	শিক্ষা			
	যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে		যাহারা লিখিতে বা পড়িতে কিছুই জানে না	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
মাদ্রাজ	৫,৭২৪	৪	২৮,৬০৩	১,৯৬৬
বোম্বাই	৩,৫৭৯	৩	১৪,৯৬১	৪৯৭
এডেন	৬৭	×	২৭৪	৮
বঙ্গদেশ	৭,২৬৩	১৫	৩২,৪৭৭	৭৮৯
যুক্ত প্রদেশ	১,০৪২	৩	৩০,৭৯০	৪৭৭
পাঞ্জাব	১,৪৮৫	২	৩০,৭৬৫	৩৩০
ব্রহ্মদেশ	১৬,৭০৬	১৫১	৫,৮৬১	৭৫৯
বিহার এবং উড়িষ্যা	২,৫১৫	৫	২০,৫৫৯	৬৭৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,২২৮	১	৬,৫৬৯	২৭৯
আসাম	১৬১	১	৫,০১৭	৭২
উঃ-পঃ-সীমান্ত প্রদেশ	২২৫	×	৭,৮৪৫	১৪৭
বৃটিশ বেলুচিস্তান	৮৫	×	৮৩৭	১২
আজমির-মেরওয়ারা	১০২	১	৪৯৩	১৬
কুর্গ্	২৭	×	৩৮	২
দিল্লী	১৬০	×	১,০৩৬	১০

(ক) তালিকার সংখ্যা "ষ্ট্যাটিসটিক্যাল এবসট্রাক্ট অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ১৯২৬ হইতে ১৯৩৬-৩৭," পৃঃ ২৭১ হইতে গৃহীত

উপরিউক্ত তালিকা হইতে বোঝা যাইবে যে, অপরাধীর শ্রেণীর মধ্যে লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোক সংখ্যা কত বিরল। ব্রহ্মদেশে কেবল ১৫১ জন এবং অন্যান্য দেশে ১ হইতে ১৫ জনের মধ্যে সংখ্যা রহিয়াছে। কিন্তু লেখাপড়া না-জানার সংখ্যা কত অধিক তাহা তুলনামূলকভাবে দেখিলে আতঙ্কিত হইতে হয়। ৭৮৯ জন স্ত্রীলোক অপরাধী বাঙ্গলার ভাগ্যে রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোকের সংখ্যা হইল মাত্র ১২ জন। এ স্থলে অধিক বলা বাহুল্য যে, শিক্ষার অভাব আমাদের দেশে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে কতকটা সাহায্য করে। এই কথা প্রত্যেক প্রদেশের বিষয়ে সমান ভাবে উপযোগী।

এতক্ষণ দেখা গেল যে, কি কি সম্ভবপর কারণের জন্য নারী গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। বাস্তবিক পক্ষে বিচার করিলে বোঝা যায় যে, গণিকাবৃত্তি আর্থিক এবং সামাজিক কারণের মধ্য পথে রহিয়াছে এবং ইহাও বলা চলে যে বাস্তব অপরাধ ও সাধারণ কর্ম্মস্তরের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করিতেছে। যদিও যৌনসম্বন্ধ লইয়াই ইহার উৎপত্তি কিন্তু প্রকৃষ্ট সংশ্রব হইল অর্থের সহিত। যে দিন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় গঠনে আমূল পরিবর্ত্তন হইবে এবং অর্থের অভাব হেতু মানুষকে মনুষ্যত্ব বলি দিবার পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যবস্থা হইবে সেই দিনই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান সম্ভব। প্রচলিত সমাজবন্ধনের মধ্যে সামান্য উন্নতি যদি আনয়ন করিতে হয় তাহা হইলে প্রকৃত সমাজের অস্তিত্ব থাকা বা সঙ্ঘের সৃষ্টি হওয়া বিশেষভাবে আবশ্যক এবং সমাজের সাধারণের মধ্যে অন্ধ বা অজ্ঞতা নিবন্ধন পতিতা ভগ্নীদিগকে সহানুভূতি ও জ্ঞানের স্পর্শে আবার দেবীত্বে বরণ করিয়া লওয়ার চেষ্টা থাকা কর্ত্তব্য। যদি ক্রমান্বয়ে একজনকে "পাগল" সকলেই বলিতে থাকে তাহা হইলে সে পাগল না হইলেও তাহাই সাব্যস্ত হইয়া যায়, তদনুরূপ পতিতার দেহ সাময়িকভাবে কলুষিত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে যদি অবজ্ঞার চোখে পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকে তাহা হইলে সে অবজ্ঞার ভাজনই হইয়া থাকিবে নিশ্চয়। অন্যায়ের জন্য শাস্তিও যেমন আবশ্যক, ভ্রান্তির জন্য ক্ষমাও তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজন। লোকমত বা সামাজিক আবহাওয়ায় জীবনের রুদ্ধ দ্বারটী মুক্ত হইয়া গেলে আজ যে পদদলিতা সেও সমাজকে নানাভাবে পরিপুষ্ট করিতে পারে। জ্ঞানের আলোক যদি স্পর্শ করে অজ্ঞতার তিমির অপসারিত হইতে কতক্ষণ? সহস্র চেষ্টার ফলে যদি দুটী লাঞ্ছিত প্রাণী সত্যই উদ্ধার হয় তাহা হইলেও সমাজ যে কত উচ্চে স্থান পাইবে সে কথা চিন্তাশীলের প্রাণে স্পষ্টই জাগিয়া উঠে।

নারী-অপরাধের বৈশিষ্ট্য আর একটী শ্রেণীর কার্য্যে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। তাহা হইল ভ্রূণ-হত্যার অপরাধ। এ স্থলে ভারতীয় পেন্যাল কোডের যাহা আইন এখানে উদ্ধৃত করা গেল—"Voluntarily causing a woman with child to miscarry otherwise than in good faith for the purpose of saving the life of the woman" all under offences relating to the birth of children. —অর্থাৎ, স্ত্রীলোকেরা জীবন বাঁচাইবার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে গর্ভনাশ করিলে শিশু-জন্ম বিষয়ক অপরাধ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর অপরাধে স্ত্রীলোকেই অধিকাংশ সময়ে সাহায্যকারিণী অথবা নিজেরাই উক্ত অপরাধ করিয়া থাকে। ইহার মূলেও সমাজের খড়্গ-হস্ত রহিয়াছে। অন্যায় যদি হঠাৎ হইয়া যায় ও তাহার জন্য যদি ক্ষমা না থাকে, তখনই মানুষে সাধারণতঃ পাপের লুক্কায়িত অন্ধকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চায়।

সমাজ বা লোকলজ্জার ভয়ে স্ত্রীলোককে যে কি ভীষণ পথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহা ভাবিলেও রোমাঞ্চিত হইতে হয়। পাপের বা অপরাধের কথা বাদ দিয়া ধরিলেও দৈহিক কষ্ট এবং লুক্কায়িত কার্য্যের গুপ্তভাব সংরক্ষণের জন্য অর্থলোলুপ সমাজান্তর্গত লোকেরই নিকটে যে অর্থব্যয় করিতে হয় উভয়ই কি সাঙ্ঘাতিক বলিয়া বিবেচিত হয় না? ইহা যে শুধু ভারতেই প্রচলিত আছে তাহা নহে, ইহার বিস্তৃতি সমস্ত দেশেই কিছু না কিছু আছে। এ স্থলে একটী লাইন মেডিক্যাল জুরিস্প্রুডেন্স হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"Abortionists are of varying degrees of skill, from the black-sheep of the medical profession, who may perform the deed secundum artem, through the midwife (who has some superficial acquaintance with the anatomy of the parts) down to the totally

ignorant layman."[৬] অর্থাৎ, যাহারা গর্ভনাশ করায় তাহাদের মধ্যে নানা স্তরের নিপুণতাবিশিষ্ট লোক থাকিতে পারে। চিকিৎসকদের মধ্যে দুষ্ট লোকও করিতে পারে। ধাত্রীর সাহায্যে উহা সমাধান করাইতে পারে, (ইহাদের তবু দেহের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বাহ্যিক একটা ধারণা আছে) আবার একেবারে অজ্ঞ লোক দিগের সাহায্যেও ইহা হইয়া থাকে। এই ঘৃণিত কার্য্য এমন ভাবে সমাধা করে যে, অতি অল্প স্থলেই উহা আইনের নজরবন্দী হইতে পারে। আর একস্থলে মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সে লিখিত আছে—"To detect the action of the first class and even the sober attempts of the midwives, is usually quite impossible by strictly medical evidence; it can only be done by enquiry into motives and fees and surrounding circumstances, inquiries more in the province of the detective than of the medical jurist." সমাজের স্কন্ধে যে কত গুরুতর ভার রহিয়াছে এবং সমাজান্তর্গত প্রতি এককের শিক্ষা এবং তৎপরতা কত অধিক হইলে এইসকল স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ হইতে যে সমাজকে মুক্তি দেওয়া যায় তাহা প্রত্যেকেরই চিন্তাকরা বাঞ্ছনীয়। একধারে যেমন শিক্ষার প্রয়োজন আর এক দিকে তেমনই সহৃদয় ক্ষমার প্রয়োজন; একদিকে যেমন অন্যায়ের শাস্তির আবশ্যক আর একদিকে তেমনি প্রকৃত ভ্রান্তির জন্য মুক্তি থাকা আবশ্যক।

আমাদের শাস্ত্রে অনেক সময়ে অন্যায়কে কত সাধারণভাবে এবং সহানুভূতির চক্ষে দেখিত তাহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী শ্লোক উল্লেখ করা গেল। পরাশর কলিযুগের জন্য বলিয়াছেন—

"রজসা শুদ্ধতে নারী বিকলং যা ন গচ্ছতি ॥ (৭)

গর্ভবতী না হইলে অপর পুরুষের সঙ্গমজনিত দোষ ঋতুর সহিত চলিয়া যায়। তবে গর্ভবতী হইয়া পড়িলে তাহার জন্য বিশিষ্ট শাস্তির নির্দ্দেশ আছে। অবশ্য ইহা বলিয়া যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেওয়াও মহা-অপরাধ। এ সকল কথা অকস্মাৎ বা অজ্ঞানতা নিবন্ধন পতনের জন্যই উপযোগী, স্বেচ্ছাচারীদের জন্য নহে।

(৬) টেলর কর্ত্তৃক "প্রিন্সিপ্লস্ এণ্ড প্র্যাকটিস্ অফ মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স", দ্বিতীয় খণ্ড, লণ্ডন (১৯০৪), পৃঃ ২২৯

(৭) Parasara, "A woman (committing adultery) is purified by catamenia provided she did not conceive."

বিস্ময়

শ্রীঅমিয়মোহন বসু

নীলাভ আকাশ চিরে সোনার ছবি
নেমে আসে ধরণীর শ্যামল বুকে,
আবিরের রঙে রাঙা তরুণ রবি
মধুর হাসিটি লেগে রয়েছে মুখে !

সোহাগে কাঁপিয়া ওঠে কনক লতা—
খোঁপায় খোঁপায় জাগে ফুলের হাসি,
বনের আঁচল-ভরা 'মনের কথা'—
উজাড় করিয়া অলি শুধায় আসি' !

আঁখির আবেশ-মাখা ঘুমের শেষে
পালক মেলিয়া জাগে বনের পাখী,
পুলক মাতন তার নাচন বেশে—
কথার ফোয়ারা যায় পরশ রাখি' !

চকিতে চপল ভাবে বধূরা চলে—
কলসী তুলিয়া ওঠে কোমল কাঁখে,
অলস হাতের ছোঁয়া নদীর জলে—
না জানি গোপনে কার আনন আঁকে !

কি জানি অজানা কোন্ রাখাল ছেলে
বাতাস মিলায়ে দেয় বাঁশীর সুরে,
মাঠের পথে কি মোর দেবতা এলে—
দ্বাপর যুগের সেই মোহনপুরে ?

স্বপনে রাঙিয়া ওঠে প্রভাত বেলা—
নিখিল ধরণী যেন আমায় ডাকে,
যেদিকে তাকাই, দেখি কাহার খেলা—
খুঁজিয়া পেলাম এ কি পেলাম তাকে ?

ঘাতে প্রতিঘাতে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

কিন্তু সে একেবারেই হাল ছাড়িল না। পর দিনই সন্ধ্যায় গিয়া সুকেশবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। সে যখন জানাইল, সুকেশবাবু তাহাদের প্রধান একজন নেতা, সুতরাং এই সব সমস্যার সমাধান-চেষ্টায় অগ্রণী হইয়া তাঁহার দাঁড়ান চাই, বড় একটা দায়িত্বও তাঁহার আছে, দাবীও তাহারা করিতে পারে, একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "আমি তোমাদের নেতা কিসে?—তোমাদের এসব সবুজবাদী সাম্যবাদী দল আমি গড়িনি, কাজকর্ম্মেরও পরিচালনা কখনও কিছু করি না। হাঁ, তবে তোমাদের সভায় টভায় ডাক; যখন ডাক, গিয়ে দু কথা বলি—এই মতগুলোর পক্ষে দু কথা যেমন বলা যায়। আর মাঝে মাঝে কিছু আর্থিক সাহায্য যখন এসে চাও সাধ্য মত দিয়ে দিই। তার বেশী কি সম্বন্ধ তোমাদের এই সব দলের সঙ্গে আমার আছে বলতে পার?"

কেমন অপ্রতিভ হইয়াই বিমান পড়িল; একটু থতমত খাইয়া শেষে কহিল, "কিন্তু আমরা ত সর্ব্বদাই আপনার আদেশ মেনে চ'লছি। ভলান্টিয়ারী করতে কি পিকেটিং করতে যখনই ডাকছেন, অমনি এসে হাজির হচ্ছি—"

"অনেক ইস্কুল কলেজের, আরও কত ক্লাবের ছেলেদেরও ডাকি, তারাও আসে। কিন্তু তাতে কি এটা প্রমাণ হয় বিমান যে, আমি এই সব ইস্কুল কলেজের আর এই সব ক্লাবের কর্ত্তা? আর যেথায় ছেলেমেয়েদের যা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হবে, কেলেঙ্কারী যা কিছু যখন হবে, তার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে—এ দাবী কেউ করতে পারে?"

"না, তা পারে না। তবে আমাদের এই সব দলে—"

"হাঁ, ওদের চাইতে বেশী একটু মেলামেশা হয় ত করি। তোমরা আসছ-যাচ্ছ সর্ব্বদা, সভায় ডাকছ যখন তখন, আর অর্থ সাহায্যও যখনই দরকার হয়—এসে চাইলেই যা পারি দিয়ে দিই। তা ছাড়া, ব'লতে পার বিমান, তোমাদের কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ আমি কখনও গ্রহণ করেছি? কোনও কমিটিতে কখনও যোগ দিয়েছি? তোমাদের কোনও সভা আমি আহ্বান করেছি কখনও? এসব দূরে যাক, তোমাদের কোনও দলের patron (পৃষ্ঠপোষক) ব'লেও আমার নাম কখনও বেরোয় নি।"

"Patron ব'লে সবুজবাদী সাম্যবাদী আমরা কাউকে স্বীকার করি না—সবাই আমরা সমান—"

"তবে আজ নেতা ব'লে এ দাবী এসে কেন ক'রছ? এ দায়িত্বই বা কেন মাথায় চাপাতে চাইছ?"

মুখখানি বিমানের লাল হইয়া উঠিল; একটু কাল থমকিয়া থাকিয়া কহিল, "দেখুন, আমাদেরই একজন ব'লে আপনাকে আমরা মনে করি। অধিকারে সমতার দাবী যাই করি, বুদ্ধিতে শক্তিতে আর সামাজিক প্রতিপত্তিতে উচ্চনীচ একটা ভেদ যে আছে, সেটা অস্বীকার করতে পারি না।—যাঁরা উচ্চ, সঙ্কটে তাঁদের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশাও বেশী করি, করতে মানুষকে হয়।"

"ঠিক কথা। কিন্তু আমি ত বাস্তবিক—বুঝিয়েই বল্লাম—তোমাদের একজন কেউ নই। হাঁ, তাহলে এ দায়িত্ব আমার থাকত, এ দাবীও তোমরা করতে পারতে।"

হাতে মাথাটি রাখিয়া বিমান কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল—ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "বলতে ভরসা পাচ্ছি না, আপনাকে offence (অসন্তোষের কারণও কিছু) দিতে চাই না। কিন্তু আপনার যে ঐ নারী-কর্ম্মিসঙ্ঘ—সেটাও এই দলের একটি অঙ্গ বটে—আর সেখানেও শুনতে পাই—"

একটু ভ্রূকুটি ললাটে উঠিল। যাহা হউক, বিরক্তির এই ভাব চাপিয়া ধীর ভাবেই সুকেশবাবু কহিলেন, "নারী-কর্ম্মিসঙ্ঘ আমার নয় বিমান। মিস্ মিটার ওটা করেছেন, তিনিই চালাচ্ছেন। তবে, হাঁ, আমার উপদেশ সদা সর্ব্বদাই এসে চান, দেখতেও মাঝে মাঝে ডাকেন, আর দরকার মত অর্থ সাহায্য যখন চান, পারি নিজে দিই, কি যোগাড় ক'রে দিই। বহুদিনের একজন বন্ধুও তিনি আমার।"

বিমান তখন কহিল, "ভাল, সাক্ষাৎ দায়িত্ব কিছু আপনার না থাক, দেশের একজন শক্তিমান্ মানুষ আপনি, দেশহিতকর বহু কর্ম্মে বিশেষ অগ্রণীও বটেন। এই যে আমাদের লেডী কমরেডরা এইভাবে বিপন্ন হ'য়ে পড়ছেন, মর্য্যাদা সব হারিয়ে, আশ্রয় কোথাও একটু কিছু না পেয়ে, একদম অকূল পাথারে ভেসে যাচ্ছেন, অতল পঙ্কে নিমজ্জিত হ'য়ে পড়ছেন, এদের উদ্ধারের একটা চেষ্টা করা লোকসমাজে একটা স্থান এঁদের যাতে হয় তার পক্ষে সহায়তা করা, এটাও কি বড় একটা কর্ত্তব্য ব'লে আপনি মনে করেন না?"

"দুঃখের কথা—অতিবড় দুঃখের কথা বিমান, যে কালস্রোতে নূতন যে ভাবের বন্যা দেশে এসে পড়েছে, তাতে গিয়ে প'ড়ে এইভাবে অতি বিপন্ন হ'য়ে এঁরা পড়ছেন। কিন্তু আমি কি ক'রতে পারি? এ বন্যা দেশে আমি আনিনি, এর আঘাতের বেগকে প্রতিহত ক'রে ফেরাব সে শক্তিও আমার নাই। সমাজ এদের একটা মর্য্যাদা দিতে এখনও প্রস্তুত নয়। নিজেরাও এরা মর্য্যাদা একটা—অন্তত মর্য্যাদা যে হারায়নি—এটা অনুভব ক'রে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারছে না। আইনে এর কোনও প্রতিকার হবে সে আশা সুদূরপরাহত। আর তা হ'লেই বা কি? মানুষ যেটাকে দুর্নীতি ব'লে পরিহার করতে চায়, আইন তাকে সুনীতির স্থানে তুলে দিতে পারে না।"

"তা হ'লে সত্যই আপনি প্রতিকার কিছু করতে পারেন না? চেষ্টাও কিছু—"

"না, আমার সাধ্যাতীত। অধিকারেরও বহির্ভূত। বড় দুঃখিত হচ্ছি বিমান। কিন্তু করতে কিছুই পারছি নি। তবে তোমরা যদি কিছু পার, আর অর্থসাহায্য দরকার যদি হয়—"

বিমান বলিয়া উঠিল, "আমরা আর কেউ নেই। একা আমি কি করতে পারি? আচ্ছা, তা হ'লে উঠি এখন। নমস্কার!"

"হাঁ, দাঁড়াও একটু। তোমাদের খরচ-পত্তর—একটা চেক্—না নগদই এই পঞ্চাশটা টাকা বরং আজ নিয়ে যাও।"

হাত গুটাইয়া লইয়া বিমান কহিল, "না, দরকার হবে না কিছু।"

"থাক্‌বে ত এখানে কিছু দিন?"

"থাক্‌ব না।"

"সে কি? এসেছ—পিকেটিং ত চলছেই, কদ্দিন আরও চল্‌বে—"

"পিকেটিং আর কর্‌ব না।"

"তবু খরচ-পত্তর ত কিছু হয়েছে। দুটো-একটা দিন যাই থাক, আরও হবে। আবার ফিরে যেতেও খরচ কিছু লাগবে।"

"একেবারে নিঃসম্বল হ'য়েও আসিনি। ফিরে যেতে—তা খরচ সামান্য যা দরকার হয় যোগাড় ক'রে নিতে বোধ হয় পারব। না পারি, হেঁটেই যাব। নমস্কার!"

বলিয়াই বিমান বাহির হইয়া গেল। চক্ষু দুটি দিয়া টস্ টস্ করিয়া তখন জল পড়িতেছিল। অন্য কাহারও কাছে—না, বৃথা আর কেন যাইবে? এই একই ছলের একটা উত্তর পাইবে।—ঠাকুর মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন! সব ভুয়া!—গ্রাম অঞ্চলে তবু একটু প্রাণের সাড়া, আদর্শবাদে সরল সত্যনিষ্ঠা তবু কিছু আছে। আর এই কলিকাতা শহর বিরাট একটা ছলের বাজার মাত্র!

৩১

"তোমার কাজ হ'য়ে গেলেই ত চ'লে যাবে দিদি?—আমি তখন কি করব? কার কাছে থাক্‌ব?"

পাশাপাশিই দুইজনে বসিয়াছিল। স্নেহে একখানি হাত ফুল্লরার কাঁধে রাখিয়া আর একখানি হাতে হাত ধরিয়া লতা কহিল, "আমি যাব না ফুলু।"

"কিন্তু আমি তোমাকে রাখব কি ক'রে দিদি?—আমার যে—"

কাঁদিয়া ফুল্লরা দুই হাতে লতার গলাটি জড়াইয়া ধরিল।—গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া লতা কহিল, "কেঁদো না, কেঁদো না বোন। তোমাকে রাখ্‌তে হবে না, আমিই থাক্‌ব।"

"থাক্‌বে!—কি ক'রে থাক্‌বে?" বলিতে বলিতে মুখখানি তুলিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে কহিল, "তোমার ত কাজ ক'রে খেতে হবে।"

"থাক্‌তেও ত কোথাও হবে।—তোমার সঙ্গে একবাড়ীতেই পাশাপাশি ঘরে দুজনে থাক্‌ব।"

"এর আগে যেখানে থাক্‌তে—"

"আগে—এই তোমার এখানে আসবার আগে—মিসেস চম্পটীর ওখানে ক'দিন ছিলাম। তা—সেখানে আর থাক্‌ব না, সুবিধেও হবে না।"

"এই কাজ কদ্দিন করছ?"

একটু হাসিয়া লতা কহিল, "সবে এই সুরু করেছি ভাই—তোমারই কাছে?"

"ও!—তা সে ত মিসেস্ চম্পটীই লাগিয়ে দিয়েছেন। তা এখন নতুন কাজকর্ম্ম—"

"তিনিই বোধ হয় যোগাড় ক'রে দেবেন। আপাতত তাঁর উপরেই নির্ভর করতে হবে। তার পর দেখি—একটু জানাশুনো যদি হ'য়ে যায়, নিজেই বোধ হয় যোগাড় ক'রে নিতে পারব।—তাই বলছিলাম, তোমার সঙ্গে একবাড়ীতে পাশাপাশি থাক্‌তে কোনও অসুবিধে আমার হবে না। একসঙ্গেই তোমাকে নিয়ে থাক্‌তে পারতাম।—তবে আমার বিধবা মা আছেন কাশীতে আমার ছেলেটিকে নিয়ে, তিনি যখন এখানে আস্‌বেন—"

"না, একসঙ্গে আমাকে নিয়ে কি ক'রে তিনি থাক্‌বেন?"

চক্ষু দুটি ছল ছল হইয়া উঠিল। আঁচলে মুছিয়া কহিল, "তা একবাড়ীতে—পাশাপাশি থাকতে ত আপত্তি তিনি করবেন না?"

"না, তা করবেন না।"

কিছুক্ষণ কি ভাবিতে ভাবিতে লতার মুখপানে চাহিয়া ফুল্লরা কহিল, "একটা কথা ভাব্‌ছি দিদি, তা কিছু মনে ক'রো না—তুমি ত দেখ্‌ছি সধবা। নিজে কাজ ক'রে খেতে হ'চ্ছে, ছেলেটিও রয়েছে তোমার মার কাছে কাশীতে। তোমার স্বামী—"

"স্বামী আমায় ত্যাগ করেছেন বোন্।"

"ত্যাগ করেছেন! ওমা, কেন? তোমার মত এমন ভাল মেয়ে—কেন, কি ব'লে ত্যাগ করেছেন?"

"কি ব'লে—না, অপরাধ কিছু ধ'রে ত্যাগ করেন নি।—তবে করেছেন, আমার দুর্ভাগ্য। অপরাধী তাঁকেও করতে পারিনে বোন্।"

"তবে—"

"বিবাহ করেছিলেন আমায় তাঁর বাবাকে কিছু না জানিয়ে। তিনি আমাকে তাঁর ঘরের বউ ব'লে ঘরে নিতে চান না?—ছেলেকে আবার বিয়েও দিয়েছেন।"

"কি সর্ব্বনাশ! তা—যাই করুন, তোমার খরচপত্রের একটা ব্যবস্থা—"

"করতে চেয়েছিলেন। এখনও শুন্‌ছি, করতে চান। তবে আমি তা নিতে চাই নি, এখনও চাই না। দেখি যদি কাজকর্ম্ম ক'রে চালিয়ে নিতে পারি। এ সব কাজে শুনেছি আয় মন্দ হয় না। আবার আমার মাও আস্‌ছেন, তিনি খুব ভাল রাঁধেন—রেঁধেই ওখানে খান। এখানে এসেও রাঁধুনীর কাজে যা পান—দুজনায় মিলে চালিয়ে নিতে বোধ হয় পারব। পারতেই হবে, উপায় আর কি আছে?"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ফুল্লরা কহিল, "কিন্তু আমি কি করব দিদি? মন গেছে ভেঙ্গে—শরীরেও বল পাই না। কতদিনে আর

পাব, পাবই কি-না আর এ জীবনে জানি না।—সম্বল যা আছে মাস তিনেক আর কোনও মতে চল্‌বে। কিন্তু তারপর—তারপর—কি করব দিদি—"

ফু'করাইয়া ফুল্লরা কাঁদিয়া উঠিল। দু'টি হাতে লতার গলাটি আবার জড়াইয়া ধরিল।

"কেঁদো না, কেঁদো না বোন্। ধৈর্য্য ধর। ভয় কি? মাথার উপরে দেবতা আছেন—তাঁকে ডাক"—

"কাকে ডাকব দিদি?—মাথার উপরে—আমার মাথার উপরে দেবতা কেউ নেই। তাঁর রাজ্যের বাইরে যে এসে আমি প'ড়েছি—"

"তাও কি কেউ যেতে পারে বোন? তোমা'র আমার—সবারই মাথার ওপরে সমান তিনি আছেন; জগতের জীব তাঁর রাজ্যের বাইরে কে কোথায় যেতে পারে বল? পতিতপাবন দয়াময় তিনি দীন-দুঃখীর পরম বন্ধু। ডাক, পায়ে ভক্তি রেখে, বুকে বিশ্বাস ধ'রে, মনে প্রাণে তাঁকে ডাক, দয়া তাঁর পাবে—ভাঙ্গা মন আবার জুড়ে উঠ্‌বে, ভাঙ্গা শরীরে আবার বল আসবে, উপায় তখন তিনিই ক'রে দেবেন।"

"দেবেন? সত্যি, দেবেন দিদি?—ভাঙ্গা মন আমার আবার জুড়বে?—ভাঙ্গা শরীরে আবার বল পাব? চাইতাম না, কিছুই চাইতাম না দিদি।—মনটা আমার পু'ড়ে পু'ড়ে বোধ হয় শুধ্‌রেই গেছে। পাপ এই দেহটা এখন ছেড়ে যদি যেতে পার্‌তাম দিদি, তাঁর পায়ে একটু শান্তি যদি গিয়ে পেতাম! না, তাও চাই না দিদি—পাবও না। জীবনের এই স্মৃতি সঙ্গেই ত থাক্‌বে। শান্তি কি ক'রে পাব? আহা, দেহটার সঙ্গে মনটাও যদি অমনি লোপ পেয়ে যেত দিদি!—ঐ যে শেষ ঘুম—সে যদি চিরতরের একটা ঘুমই কেবল হ'ত!"

"যদি হ'ত বোন্, সে ঘুম আমিও চাইতাম!—" গভীর একটি নিশ্বাস বুক ভরিয়া উঠিল। একটু থামিয়া আবার লতা কহিল, "কিন্তু মায়াটাও যে কাটাতে পারিনে বোন্।—আমি ঘুমোব—কিন্তু ঐ যে বাছাটুকু কোলে পেয়েছি তাকে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কার কাছে ফেলে যাব?"

চক্ষু দুটি ছল ছল হইয়া উঠিল।—ফুল্লরার চক্ষেও জল আসিল। চাহিয়া দেখিয়া লতা কহিল, "সে দায় যে তোমারও আস্‌ছে বোন।"

চক্ষু মুছিয়া ফুল্লরা উত্তর করিল, "তোমার এ দায় কেবল দায়ই নয়, দিদি, জীবনের একটা আনন্দও বটে। কিন্তু আমার এ দায়—এখনও আসেনি—কিন্তু যখন আস্‌বে, সারা জীবনের একটা লজ্জা হ'য়েই থাক্‌বে, যা নিয়ে মুখ তুলে কারও সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।—আর আমি যে মা—যখন বুঝবে আমিও হব তার লজ্জা। নিজেই হবে নিজের লজ্জা—যাতে নিজেও সে মুখ তুলে কোথাও গিয়ে এ পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারবে না। ব'ল্‌তে কি দিদি—মনে হয়—মনে হয়—যদি দেখ্‌তে পাই, জ্যান্ত সে মাটিতে প'ড়েনি—তার বড় একটা ভাগ্য ব'লেই সেটা আমি বরণ ক'রে নেব। কিন্তু কত জন্মের কত পাপের ফলে মহাপাপিনীর পেটে এসেছে, এ ভাগ্য কি তার হবে?"

লতার মনে হইল, তার সেই বাছাকেও এই লজ্জার ভাগী হইয়া এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে! কিন্তু তবু—তবু—ওমা! এ কামনার কথা মনের কোণেও যে আনিতে পারি না।—সে যে তার বাছা—তার কোলের বাছা—বুকভরা স্নেহের ধন—আহা, কতদিন বাছার মুখখানি চোকে দেখে নাই, বুকে ধরিয়া তার হাসিমুখে চুমো খায় নাই—সেই মুখের আধ আধ মা ডাক শোনে নাই।—তবে ফুল্লরা এখনও তার বাছাকে কোলে পায় নাই, মুখখানি তার চোকে দেখে নাই। আর তার সে বাছা—ঘটনাচক্রে যাই আজ লজ্জার ভাগী হউক, সত্যকার ধর্ম্মে লজ্জার হেতু তাহার কিছু নাই। যখন বড় হইবে, সব শুনিবে, বুঝিবে সত্যই লজ্জার কিছু তার ঘটে নাই; মাকেও শ্রদ্ধাবান্ সন্তানের চোখে দেখিবে, লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে না, ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে না।—কিন্তু ফুল্লরার বাছা—হায় অভাগী! কি বলিয়া তার লজ্জা সে দূর করিবে? ঘৃণায় ফিরান মুখখানি কি বলিয়া ঘুরাইয়া শ্রদ্ধায় তার পানে উঁচু করিয়া তুলিবে। নীরবে কতক্ষণ লতা বসিয়া ভাবিল। ফুল্লরাও নীরব। চক্ষু দুটি অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিতেছিল। কি ভাবিতেছিল, সে-ই জানে!

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া লতা কহিল, "তোমার মা বাবা কেউ নেই ফুলু?"

"আছেন। মা আছেন, বাবা আছেন, দাদা আছেন"—

ফু'ফরাইয়া উঠিয়া দুই হাতে ফুল্লরা মুখ ঢাকিল।

"তারা তোমার খবর কিছু পাননি?"

"না!—খবর কি দেব? কোন্ মুখে কি দেব!—বাবার শরীর বড় খারাপ ছিল—ক'মাস এই হ'য়ে গেল—কে জানে কেমন আছেন, কি হ'য়েছে—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—আর পারিলনা। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।—লতাও আর কিছু বলিলনা। কতক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া ফুল্লরা কহিল, "খবর কিছু দিতে চাইনে দিদি।—যদি দিতে পারতাম—এই খবরটা যদি দিতে পারতাম—তাঁদের মুখে কালি নিয়ে এই পৃথিবী থেকে আমি বিদায় হ'য়ে গেছি—যাতে একটা সোশ্তির নিশ্বেস ফেল্‌তে পারতেন! কিন্তু আজ কি খবর দেব? তবে খবর পেলে—যদি জান্‌তে একটিবার পারতাম—তাঁরা ভাল আছেন, বাবা একেবারে ভেঙ্গে পড়েননি, আর—আর আমার কথা একদম মন থেকে তাঁর মুছে ফেলতে পেরেছেন—"

"তাও কি সম্ভব বোন্?—তুমি কেমন আছ, কোথায় কি অবস্থায় আছ, কি ক'রছ, এটা কি না ভেবে তাঁরা পারেন? না জান্‌তে পেরে সোস্তি একটু মনে ধ'রতে পারেন? আর জান্‌তে পারলে তোমার যা হয় একটা অবস্থাও তাঁরা করবেন।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফুল্লরা কহিল, "কি ব্যবস্থা ক'রবেন? দুটি খাওয়া-পরা—না দিদি, তাঁদের মুখে এই কালি দিয়ে আবার তাঁদের ভারবোঝা হ'য়ে থাক্‌ব—না, তা আর পারবনা দিদি!—বরং ঝি'গিরি ক'রে খাব, তবু তা পারবনা। মান অপমান—না, আমার আবার মান অপমান কি? মেয়েমানুষের যে মান—সেত জন্মের মত হারিয়েছি!"

মুখ ফিরাইয়া লতা চক্ষু দুটি মুছিল—কথা কিছু মুখে ফুটিলনা। একটু সামলাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ পরে ফুল্লরা কহিল, "না, তাঁদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ আমার চুকে গেছে দিদি—আছি কেবল তাঁদের কলঙ্ক হ'য়ে। তাও যদি চুকে যেত!—কিন্তু যাবেনা, সেই জ্বালায়ই ত পুড়ে আজ খাক্ হ'য়ে যাচ্ছি! শান্তি একটু ম'লেও কি পাব? কে ব'লে দেবে? কার কাছে এ আশাটুকুও পাব?—একএকবার ইচ্ছে হয়—প্রাণটা কেঁদে কেঁদে ওঠে—গুরুদেবকে যদি একটিবারের তরে একদিন পেতাম!"

"গুরুদেব।"

"বাবার গুরুদেব—অতি বড় একজন সাধু মহাপ্রাণ ঠাকুর।—ক'বছর তাঁকে দেখিনি—নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বড় ভালবাসতেন আমাকে, কত আসতেন আমাদের বাড়ী, আর কত যে সব ভাল কথা শেখান! তখন দেশেই আমরা থাক্‌তাম। সেই ঘর বাড়ী, সেই ঠাকুর-ঘর—লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ, সেই তুলসীমঞ্চ, বেলতলার বেদী, সেই ফুলের বাগান! ভোরে উঠে সাজি হাতে নিয়ে ফুল তুলতাম—স্নান ক'রে এসে পূজোর সাজ ক'রে দিতাম।—সেই কত ব্রত—পুণ্যিপুকুর মাঘমণ্ডল চাঁপা-চন্দন—পাড়ার সব ঘরে ঘরে এখনও সব র'য়েছে—মেয়েরা এখনও ফুল তোলে, পূজোর সাজ ক'রে, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেয়, ব্রত করে—ব্রতকথা শোনে—কামনা করে রামের মত পতি পায়, সীতার মত সতী হয়।—কিন্তু আমার সব ফুরিয়ে গেছে—সেই যে সব আশা, সেই যে তার আনন্দ—তার সাড়া এ জীবনে আর পাবনা?—কোনও জন্মে কোনও জীবনেও কি আর পাব দিদি?"

'পাবে—পাবে বই কি? একটা এই জন্মে যাই তোমার ভাগ্যে ঘটে থাক্—ঠাকুর দয়াময়—জন্ম জন্ম সে ভাগ্যে তোমাকে ফেলে রাখবেন না। মানুষ যা ভাবতেও পারে, দয়াল ঠাকুর ক'রতে তা কখনও পারেন?"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফুল্লরা কহিল, "ক'লকেতায় এলাম—কি কুক্ষণেই এলাম—কি মোহেই যে এসে প'ড়লাম? সব ভুলে গেলাম!—গুরুদেবের সেই সব কথা—ওরা ব'ল্‌ত, দাদাও ব'লত—সব বাজে কথা—মেয়েদের ছোট ক'বে দাবিয়ে রাখবার যত ছল! আর কি সব বই এনেই প'ড়্‌তে দিত!—মনে হয় আজ—দিদি, কি বিষই অমৃত ব'লে পান ক'রেছি! আর তার ফলে ওদের কি হ'য়েছে? ডুবেছি বিষের সাগরে আসি!—ডুব্‌ছি আমরা?"

ঝি আসিয়া কহিল, "একটী ঠাকুর এয়েছেন বৌমা।"

"ঠাকুর কে—কে ঠাকুর! গুরুদেব!" চমকিয়া কেমন বিভ্রান্ত-দৃষ্টিতে ফুল্লরা চাহিল—একটা রক্তোচ্ছ্বাস উঠিয়া দেখিতে দেখিতে মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত শরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল। ঝি কহিল, "তা হবেন। দেবতার তুল্যি জাজ্বল্যি ভোলা মহেশ্বর রূপ! দেখ্‌লেই মনে হয় পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ি?—তা সত্যিই লুটিয়ে পেন্নাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে ব'লে এনু, একটুখানি দাঁড়ান ঠাকুর, বৌমাকে খবরটা দিই। বৌমা আবার—"

"যাও—যাও!—দাঁড়িয়ে র'য়েছেন—শীগ্‌গির গিয়ে সিঁড়ি ফেলিয়ে নিয়ে এস!"

ঝি ধাবিত হইয়া গেল। ফুল্লরা বলিয়া উঠিল, "দিদি! দিদি! কি ক'রব দিদি! গুরুদেব এয়েছেন—কি ক'রে এ মুখ তুলে তাঁর পানে চাইব, এ হাতে তাঁর পায়ের ধুলো নেব?—চাইছিলাম—কিন্তু না, কাজ নেই পারবনা দিদি! যাও, যাও, তুমি যাও, গিয়ে বল—ওমা!—ঐ বুঝি আস্‌ছেন—পায়ের সাড়া পাচ্ছিনা?—না পারবনা দিদি! আমি—আমি পালাই!—তুমি—তুমি যা হয় ব'লো!"

বলিতে বলিতে ত্রস্ত ফুল্লরা উঠিতে গেল; কিন্তু পারিল না—পা কাঁপিয়া আবার বসিয়া পড়িল।—দরজা খুলিয়া হস্ত সঞ্চালনে ঝিকে বাহিরেই থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া হরদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুটি হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুল্লরা মাটিতে উবুড় হইয়া পড়িল। লতা উঠিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

৩২

"ফুলু! মা আমার!"

কাছে আসিয়া বসিয়া হরদাস দুই হাতে তুলিয়া ফুল্লরাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"কেঁদোনা, কেঁদোনা মা, একটুখানি শান্ত হও দিকি!—দুটি কথা আমার সঙ্গে কও। আমি যে সেই গুরুদেব তোমার, তোমার কাছে এসেছি মা।"

"আপনি সেই গুরুদেব—এসেছেন বড় দয়া আপনার—কিন্তু আমি আমি—"

"তুমিও সেই ফুলু মা আমার, সেই আমার বড় স্নেহের লক্ষ্মী মেয়েটি! কই একটিবার বাবা ব'লে ত আমাকে ডাক্‌লেনা? প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো ত নিলেনা।

"বাবা! বাবা!"

"হাঁ, ডাক ডাক, আবার ডাক—বাবা, বাবা! মুখ তুলে আমার মুখ-পানে চেয়ে ডাক, বাবা, বাবা!"

"বাবা! বাবা! বড় দয়া আপনার, এই ঘরে এসেও বুকে আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন। কিন্তু মুখ তুলে যে চাইতে পারছিনি বাবা!—বুকে ঠাঁই পেয়েছি, কিন্তু পা দুখানি যে এ হাতে—"

"পাগল! যে মেয়ে বুকে ঠাঁই পেয়েছে, পা দুখানি সে হাতে ছুঁতে পার্‌বেনা?—না, সে হবেনা মা। সোজা হ'য়ে ব'সো, প্রণাম ক'রে আমার পায়ের ধুলো আগে নেও,—তার পর যা কথা আছে হবে। নইলে ব'লছি রাগ ক'রে এক্ষুণি আমি যে পায়ে এসেছি সেই পায়ে অম্‌নি ফিরে চ'লে যাব।"

অমনি সঙ্কুচিতভাবে ফুল্লরা উঠিয়া প্রণাম করিল; পায়ের ধুলো লইয়া একটু সরিয়া বসিল।

"না, আমার কাছে এসে ব'স, এস।"

বলিয়া কোলের কাছে ফুল্লরাকে টানিয়া আনিলেন। বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া ফুল্লরা কহিল, "আমার কি হবে বাবা?—আমি এখন কি ক'রব?"

মাথায় হাত বুলাইয়া হরদাস কহিলেন, "ভয় কি মা? কিছুই ভাব্‌তে

হবেনা তোমাকে। মেয়ে তুমি, আমি বাবা। বুকে তোমাকে তুলে নিয়েছি, ভয় কি? ক'র্‌তে যা হয় আমি ক'রব। কিছু ভেবো না মা। যা হবার হ'য়ে গেছে, ফেরাবার ত উপায় নেই মা। এখন তোমার কল্যাণ কিসে হয় আমি দেখ্‌ব।"

"কল্যাণ! কল্যাণ আর আমার কি হ'তে পারে বাবা?—সব কল্যাণের বাইরে যে আমি এসে প'ড়েছি। তবু তবু যদি এখন আপনার আশ্রয় পাই—"

"পাবে মা, পেয়েছ! কল্যাণের বাইরে—কি ব'লছ মা? পরম কল্যাণের আধার যিনি, তাঁর রাজ্যে তাঁর সৃষ্ট জীব কেউ, তাঁরই সন্তান—কল্যাণের বাইরে কখনও যেতে পারে?"

ফুল্লরা কহিল, "বুঝ্‌তে পারি নি বাবা তখন—কিন্তু তবু যে অপরাধ আমি ক'রেছি, তার যে ক্ষমা নেই—"

"ক্ষমা নেই এমন কোনও অপরাধ মানুষ কারও হ'তে পারে না মা।"

"কে ক্ষমা ক'রবে বাবা? নিজে আমি নিজেকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারছিনি—"

একটু হাসিয়া হরদাস কহিলেন, "নিজে যে নিজেকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারে না, সকলের আগে দয়াময় এসে তাকে ক্ষমা করেন, তার কল্যাণের আশ্রয়ে তাকে তুলে নেন। তাঁর দাসানুদাস আমি আজ তাঁরই সেই ক্ষমা নিয়ে এসেছি, আমার এই আশ্রয়ে তাঁরই আশ্রয়ে তোমাকে তুলে নিচ্ছি। নইলে আমি কে মা?"

দুটি হাত বাড়াইয়া ফুল্লরা ঠাকুর হরদাসের গলাটি আবার জড়াইয়া ধরিল। স্নেহে হরদাস ফুল্লরার শিরোচুম্বন করিলেন।

"শোন মা, একটু স্থির হয়ে ব'সে শোন।"

গলাটি ছাড়িয়া দিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে ফুল্লরা একটু সোজা হইয়া বসিল। হরদাস কহিলেন, "শোন মা। অপরাধ—না, যা হ'য়েছে তোমাকে তার জন্যে অপরাধী ক'র্‌তে পারি না। তবে ভুল বড় একটা ক'রেছ—কিন্তু তার জন্যেও তুমি দায়ী নও মা। দায়ী তারা, যারা এই ভুল তোমাকে করিয়েছে, বহু জনে ভুলের পথে তোমাকে টেনে নিয়েছে, তোমায় মত আরও কত অভাগীকে টেনে নিচ্ছে, মায়ের জাতটাকে ধ্বংসের পথে নামিয়ে দিচ্ছে, এদের যে প্রশ্রয় দিচ্ছে—সমাজ দমন করছে না, তার প্রায়শ্চিত্ত সমাজকে ক'রতেই হবে।—তবু এই সত্যকে অস্বীকার ক'রতে আজ পারি না, তোমার আচরণে নারীর বিহিত, কুলনারীর পক্ষে অলঙ্ঘনীয়, সমাজধর্ম্ম লঙ্ঘিত হ'য়েছে। দুঃখ পেওনা মা, কুলনারীর মর্য্যাদা দিয়ে লোক-সমাজ আজ তোমাকে গ্রহণ ক'র্‌তে পারে না, তোমার এই মাতৃত্বকেও মাতৃত্বের মর্য্যাদায় তুলে নিতে পারে না।—সামাজিক গৃহস্থ তোমার পিতাও পারেন না।"

ফুল্লরা উত্তর করিল, "না, তা পারেন না—সেটা বুঝি বাবা, মেনেও নিচ্ছি। কিন্তু আপনি—"

"আমি পারি। সামাজিক গৃহস্থ আমি নই, সন্ন্যাসী। নামে ঠিক না হ'লেও কার্য্যতঃ আমি সংসারত্যাগী পরিব্রাজক, সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংসৃষ্ট সকল বিধি-নিষেধের অতীত। আমি পারি। পারি, তাই তোমাকে গ্রহণ ক'রেছি। তোমার পিতার না হ'তে পার, কিন্তু তুমি আজ আমার মেয়ে।—আর তোমার আজ এই মাতৃত্ব—লজ্জা পেওনা মা—তাকেও যতদূর পারি একটা মর্য্যাদায়ই আমি তুলে নেব। তুমি তোমার গর্ভস্থ সন্তানের কেবল নও, আমারও মা। কেবল তুমিই নও মা, দুষ্টের দমনে, দুর্নীতির প্রচার বোধে সমাজের এই অবহেলার ফলে তোমার মত যত মেয়ে, যত মা, আজ নারীর মর্য্যাদা হারিয়ে সমাজের বাইরে এসে প'ড়েছে, সবাই তারা আমার মেয়ে, সবাই তারা আমার মা। বাইরেই একটা মর্য্যাদায় তাদের স্থিতি করব, সন্ন্যাসজীবনের ব্রত আমার আজ এই।"

যারপর নাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া লতা হরদাসের কথা শুনিতেছিল। বলিয়া উঠিল, "অসীম দয়া আপনার বাবা, মহত্ত্বের পার নাই। কিন্তু একজন মাত্র সন্ন্যাসী আপনি, কত পারবেন? ক'দিনই বা পারবেন? এই সব অভাগীর অন্ত নাই দেশে আজকাল। সমাজ ভিতরে একটা মর্য্যাদার স্থান এদের না দিতে পারে। কিন্তু বাইরে যখন এসে পড়ে, একেবারে ভাসিয়ে না দিয়ে সেই বাইরের একটা স্থান তারা পায়—ঠিক সামাজিক মর্য্যাদায় না হ'ক, ধর্ম্মপথে শান্তিতে তারা জীবনটা কাটাতে পারে, এটা দেখা কি সমাজের বড় একটা কর্ত্তব্য নয়? যদি না করে, না পারে, তাতে কি সমাজের সমাজধর্ম্ম লঙ্ঘিত হয় না?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া হরদাস কহিল "কে মা তুমি?"

"আমি নার্স—ওঁর সেবায় নিযুক্ত হ'য়েছি।"

অগ্রসর হইয়া লতা গলবস্ত্রে হরদাসকে প্রণাম করিল।

"সুখে থাক মা! মঙ্গল হ'ক! হাঁ, যে প্রশ্ন তুমি ক'রেছ, প্রশ্নর মতই একটা প্রশ্ন বটে।—হাঁ, সমাজ এদের ভিতরে কুলনারীর মর্য্যাদায় গ্রহণ ক'রতে পারে না, ক'রবার পক্ষে গুরু বাধাও র'য়েছে। কিন্তু তাই বলে একেবারে ত্যাগ ক'রে অসহায় অবস্থায় দারুণ দুর্গতিতেও ফেলে দিতে পারে না। শান্তিতে সুপথে যাতে এরা জীবনযাপন ক'রতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা সমাজকে ক'রতেই হবে। না ক'রলে, না পারলে, সামাজিকের সমাজধর্ম্ম কেবল নয়, মানবের মানবধর্ম্মই লঙ্ঘিত হবে; আর তার জন্যে সেই মহাধর্ম্মরাজের বিচারাসনের সম্মুখে তাঁরা দায়ী হবেন। কিন্তু সমাজ সেটা ভাবছে না, এই ধর্ম্ম অবহেলা ক'রেই চ'লছে। তা—কি ক'রব মা, তিনিই প্রেরণ ক'রেছেন, এঁদের রক্ষার চেষ্টা কিছু ক'রছি। তারপর—তিনিই জানেন ফলাফল কি হবে! কি ক'রব মা?—দেশের সব লোক ধর্ম্মবুদ্ধি ভ্রষ্ট হ'য়ে দেশের সব নারীকে—মায়ের জাতটাকেই—তাদের চিরন্তন ধর্ম্মপথের ধারা থেকে বিচ্যুত ক'রে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। অতি প্রবল ব্যাপক এক অভিযানই এই উদ্দেশ্যে আরম্ভ হ'য়েছে। মায়ের জাতকে এখন আত্মরক্ষার তরে আপন ধর্ম্মে আপনাদেরই শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে এই অভিযানকে প্রতিহত ক'রতে হবে।"

"এরা কি তা পারবে বাবা?"

"পারতে এদেরই হবে। ছেলেরা মায়েদের নিত্য এই মোহের দ্বারে বলি দিচ্ছে।—খাঁড়া কেড়ে নিয়ে তাদের দাঁড়াতে হবে, সেই মোহকে

তাদের ধর্ম্মের দ্বারে বলি দিতে হবে। কেন পারবে না? এরা যে সেই খড়্গমুণ্ডধর বরাভয়কারী মহাশক্তিরই অংশ।—তাঁর মূর্ত্তি ধ'রেই দাঁড়াতে হবে। ফুলু!"

"বাবা।"

"আমি ভরসা করি মায়েদের এই প্রতি-অভিযানে এমনি একখানি খাঁড়া ধ'রে তুমিও একদিন দাঁড়াবে।"

দুটি হাতে পা ধরিয়া মাথাটি পায়ের উপরে নোয়াইয়া ফুল্লরা কহিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ বাবা।"

"হাঁ, এই আমার আশীর্ব্বাদ মা! হাঁ, ঐ অভিযানে এই খাঁড়া তুলে তোমরাই ঠিক আগু হ'য়ে দাঁড়াতে পার। তোমরাই হুঙ্কার ছেড়ে পাষণ্ডদের ব'লতে পার, স্তব্ধ হও, দূর হও, সর্ব্বনাশ আমাদের যতদূর যা ক'রেছ, আর ক'রতে পারবে না। অভয় হাত তুলে মায়েদেরও ব'ল্‌তে পারি, সাবধান! স্বধর্ম্মে স্থির থাক, ওদের ছলে বিপথে এসোনা; রক্ষাকবচ সব আঁকড়ে ধ'রে থাক, বিপদ হবে না।—আমাদের দেখে শেখ।"

উজ্জ্বল একটা ভাতি ফুল্লরার মুখ ভরিয়া ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "যদি পারি বাবা, এ জীবনও আমার ধন্য হবে, এই ভাগ্যকেও তখন বরণ ক'রে মাথায় তুলে নেব।"

"তাই হ'ক মা—আমিও তখন ধন্য হব। আমার এই ব্রত তখন পূর্ণ হবে।—হাঁ, এখন শোন মা, দেখে তোমাকে গেলাম একটা সোস্তিই এখন পাব। তোমার মা বাবা—"

"কেমন আছেন তাঁরা?"

"আছেন—খুব ভাল, সে ত আর ব'লতে পারি না মা—তবে হাঁ, এখন থাকবেন, সোস্তিও একটা পাবেন—সেটা আমিও দেখ্‌ব।—প্রসবকাল তোমার নিকট; তার পর সূতিকার কাল যদ্দিন না উত্তীর্ণ হয়, এইখানেই তুমি থাক, নি-চন্ত হ'য়ে থাক, মনে ক'রো এ তোমার বাবার বাড়ীতে বাবার হেফাজতেই আছ। হাঁ, তোমার খরচপত্র—"

"দু-তিন মাসের সংস্থান আমার আছে।"

"কোথায় পেয়েছ! কে দিয়েছে?"

"আমার গহনা কিছু ছিল, বিক্রী ক'রেছিলাম।"

"বেশ। আপাততঃ তাই চালাও। হাঁ মা, তুমি রয়েছ, তোমার হাতেই ওকে আমি রেখে যাচ্ছি। ডাক্তার যিনি আছেন, তাঁর যা ক'রবার ক'রবেন; কিন্তু ভার রে ়া যাচ্ছি আমি তোমার ওপরে। বড় লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, আর অতি সুবুদ্ধি। ঐ একটি কথাতেই তোমাকে চিনে নিয়েছি আমি। আমার এই ব্রতে তোমার সহায়তাও হয়ত পাব। হাঁ মা, তোমার নামটা—"

"কনকলতা।"

"সধবা ত তুমি!"

"হাঁ বাবা।"

"হুঁ! খুব দুঃখেই বোধ হয় প'ড়েছ—নইলে স্বামী থাক্‌তেই বাইরে এই সব কাজে আস্‌তে হয়। আর দিনকাল যা প'ড়েছে, মেয়েরাও এই সব কাজে বেরিয়ে উপার্জ্জন কিছু না করলে অনেক সংসারই চলে না। তবে তুমি যে কাজে এসেছ, এটা মেয়েদেরই কাজ বটে।—তা সে যাই হ'ক্ মা, ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি, ভার ওর তোমার ওপরেই রইল।—ফিরে এসে খবর নেব। চিঠিও লিখব। আর এর ভেতর খবর যদি কিছু দিতে হয়, এই ঠিকানায় চিঠি লিখো—দেখি একটু কাগজ মা।"

লতা একটুকরা কাগজ ও দোয়াত কলম আনিয়া দিল—হরদাস ঠিকানা লিখিয়া লতার হাতে দিলেন। পড়িয়া লতা চমকিয়া উঠিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—"নন্দগ্রাম—শ্রীযুক্ত শিংকিঙ্কর শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ী!—ইনি আপনার কে হন বাবা?"

"আমার গুরুদেব। ওঁর কাছেই এখন যাচ্ছি—তুমি ওঁকে জান মা?"

"জানি বাবা, ঐ নন্দগ্রামে—এই আমার মার সঙ্গে একবার গিয়েছিলাম—কদ্দিন ছিলাম।"

"ও তাহ'লে এও নিশ্চয়ই জান মা, কত বড় এক পণ্ডিত, আর তার চাইতেও বড়—কত বড় একজন সাধু মহাপুরুষ ইনি। আমার এ জীবনের যা কিছু শিক্ষা, কর্ম্মের যা কিছু প্রেরণা, ওঁর কাছেই পেয়েছি! আর আজ—থাক্ সে কথা মা, তাহ'লে উঠি এখন; আসি আজ মা ফুলু। নির্ভয়ে থাক, নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক। আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার মা। আর সবার মাথার উপরে আছেন মা জগদম্বা! ভয় কি মা?"

বলিয়া হরদাস উঠিলেন। ফুল্লরা আর লতা চরণপ্রান্তে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। হাসিমুখে দুজনের মাথায় দুখানি হাত রাখিয়া হরদাস আশীর্ব্বাদ করিলেন "স্বস্তি।"

হরদাস বাহির হইয়া গেলেন। ফুল্লরা আর লতা উভয়েরই মনে হইল, কোন্ পুণ্যলোকের নির্ম্মল একটা বায়ুপ্রবাহ যেন ঘরখানির মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে, আর তার কি শান্তি, কি আনন্দ।—ঘরখানিই যেন এক মহাতীর্থের দেবায়তনে পরিণত হইয়াছে!

কুরঙ্গ আসিয়া একখানি পত্র লতার হাতে দিল। সুকেশবাবু লিখিয়াছেন, ক'দিন তোমাকে দেখ্‌ছিনা। একটা সভায় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব বলেছিলাম মনে আছে বোধ হয়। আজ সেই সভার দিন। সময়ও হ'য়ে এল। যদি আসতে পার, বিশেষ সুখী হব।"

মুখখানি কেমন একটা বিরাগের বক্ররেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।—উত্তরে ঐ চিঠির নীচেই লিখিয়া দিল, "মাফ করবেন আমাকে—আজ আর যাওয়া সম্ভব হবেনা।"

কুরঙ্গ উত্তর লইয়া চলিয়া গেল।—ফুল্লরা কহিল, "মিসেস্ চম্পটি'র চিঠি দিদি? কি লিখেছেন তিনি?"

"না, তাঁর চিঠি নয়;—আর একটি লোক—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তা এখন যেতে পারবনা।—এস তোমাকে কথামৃত পড়িয়ে শোনাই।"

৩৩

হরদাস ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, বিমান একা বসিয়া রহিয়াছে। উঠিয়া বিমান প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

"এস বিমান ! সুখে থাক। ব'স।" বলিয়া নিজের আসনে গিয়া বসিলেন। বিমান নিকটেই গৃহতলে বসিল। একটু হাসিয়া হরদাস চাহিলেন।

"তারপর ? খবর কি বাবা ? ভাল আছ ত !"

"আজ্ঞে—শরীর-গতিক—আপনার আশীর্ব্বাদে আছি একরকম ভালই।"

"তাহ'লে—মনের গতিকে বোধ হয় খুব ভাল নও ?"

একটু হাসি হরদাসের মুখে ফুটিল।

বিমান উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, মোটেই ভাল নয়। স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেছে, মোহ একদম টুটে গেছে।—বড় আঘাতে একেবারে মর্ম্মাহত হ'য়ে আপনার পায়ে এসেছি বাবা।"

"বটে।—তা কি হ'য়েছে বাবা, খুলে বল ত সব।"

তাঁহার সঙ্গে সেই আলাপ আলোচনায় মনে যে একটা ধাক্কা বিমান পাইয়াছিল, তারপর বন্ধুদের সঙ্গে আর সুকেশবাবুর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা তার হইয়াছিল সব বিমান খুলিয়া বলিল।

"হুঁ।—নতুন কিছু নয় বিমান। জানতাম এই উত্তরই তুমি সবার কাছে পাবে। সুকেশবাবুর কাছে কেবল নয়, তোমার বন্ধু এই যুবাদের কাছেও। তবু বড় সুখী হ'চ্ছি বিমান, এত বড় একটা মোহজালে প'ড়েও মনুষ্যত্ব তুমি হারাওনি। হারাওনি, আছে, তাই এই দায়িত্ববুদ্ধি তোমার মনে আজ জেগে উঠেছে, আর সে দায়িত্বের ভার নিতেও তুমি প্রস্তুত।"

"কিন্তু নিতে যে পারলাম না বাবা ! একা অসহায় আমি—পথও ভুল পথ—"

বিমানের চ'ক্ষে জল আসিল।

"ঠিক ! ভুল পথ—করতেও কিছু পারনা। এ ভুল পথে কেউ পারেনা ; যারা ম'রছে তারা মরছে। তবু দায়িত্বটাই এরা বোঝেনা, কথার ছলে ফাঁকি দিয়ে এড়াতে চায়। কিন্তু সত্যটা তুমি সরল মনে স্বীকার ক'রছ, ভুলের দায়িত্বও নিতে চাইছ। অসহায় ? তবু ব'লছি বিমান, একা এখন একটি যুবার মূল্য এদের হাজার যুবার উপরে। মূল্যই এদের কিছু নাই।"

দুই হাতে বিমান চক্ষু দুটি মুছিল। হরদাস চাহিয়া দেখিলেন—মুখে মৃদু একটু হাসির রেখা ফুটিল।

"তাহ'লে এখন কি ক'রতে চাও বিমান ?"

"আপনার আশ্রয় চাই।"

"আশ্রয়—মানে ?"

"আপনার শিষ্যত্বে আমাকে গ্রহণ করুন।"

"ভাল, তাই তবে ক'রলাম।"

সম্মুখে সরিয়া আসিয়া বিমানের মাথায় হরদাস হাত দুখানি রাখিলেন। রোমাঞ্চিত দেহে নত হইয়া বিমান পায়ে মাথাটি রাখিল ; অশ্রুধারায় সে পায়ে ভক্তশিষ্যের পূজার অর্ঘ্য অর্পিত হইল।

স্নেহে বিমানকে তুলিয়া হরদাস পাশে আনিয়া বসাইলেন। কহিলেন, "শিষ্যত্বে তোমাকে গ্রহণ ক'রলাম। এখন শিষ্যের ধর্ম্ম কী তুমি পালন ক'রতে চাও ?"

"আজ্ঞে যদি দয়া করেন, সেবক হ'য়ে আপনার সঙ্গেই থাকতে চাই। আপনার যে 'মিশন' (mission)—"

"মিশন !—না, ভুল ক'রেছি বিমান ! আমার শিষ্যত্বের যোগ্য তুমি নও।" বলিয়া একটু সরিয়া বসিলেন।

"বাবা !" অতি ব্যাকুল দৃষ্টিতে বিমান চাহিল।

হরদাস কহিলেন, "'মিশন' ! ঐ এক 'মিশন' কথাটিতেই বুঝতে পারছি বিমান, মোহমুক্ত তুমি হওনি, হ'তে পারনি।"

করজোড়ে বিমান কহিল, "মুক্ত তবে দাসকে ক'রে নিন বাবা। ভুলে ক'রলেও শিষ্যত্বে গ্রহণ ক'রেছেন, ত্যাগ এখন ক'রতে পারেন কি। শুনেছি গুরু রামানন্দ কবীরকে এইভাবেই শিষ্যত্বে গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলেন।"

হরদাস হাসিয়া উঠিলেন।

"হাঁ, এইবার পরাজয়ই আমার ক'রেছ বিমান। দেখছি গুরুমারা বিদ্যেটা সুরুই তোমার হ'য়েছে। ভাল, এই বিদ্যেয় সিদ্ধিলাভ কর, গুরুবৃত্তি তাতেই আবার সত্যকার গৌরব লাভ ক'রবে।"

একটু হাসিয়া নতমুখে বিমান কহিল "শিষ্যের অধিকারে তবে পাকা দখলই পেলাম বাবা ?"

"না, এখনও পরীক্ষা শেষ হয় নাই।"

"তাহ'লে—"

হরদাস কহিলেন, "শোন বিমান, 'মিশন' আমার কিছুই নাই। ওসব মিশনটিশনের বুলিও কিছু বুঝি না। তবে মনে মনে একটা ব্রতের সংকল্প ক'রেছি, এখন সব সেই মা জগদম্বার ইচ্ছা।"

বলিয়া গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিমান কহিল, "সেই ব্রত যখন গ্রহণ ক'রবেন, সেবক হ'য়ে আপনার সঙ্গে থেকে—"

"না, আমার সে ব্রতের সঙ্গে তোমার কোনও সম্বন্ধই থাকতে পারেনা বিমান। সে অধিকারই তোমার নাই ; তোমাদেরই নাই।"

"আজ্ঞে—"

"আমার এই ব্রত আমার এই সব অভাগী মায়েদের সেবা। আর মায়ের জাতটাকেই যে এরা এই মোহজালে জড়িয়ে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বধর্ম্মে ফিরে এসে নিজেরা যাতে রক্ষা পায়, দেশকে সমাজকে রক্ষা ক'রতে পারে, তারই একটা প্রাণপণ চেষ্টা। আঘাতের পর আঘাত যে আসছে, তার প্রতিঘাতের অভিযানে দল বেঁধে অগ্রসর হ'তে হবে মায়েদের। যাতে তাঁরা পারেন, তাই আমি ক'রতে চাই—সেই আমার ব্রত। এ ব্রতে আমার সহায় তুমি—তোমরাই কেউ হ'তে পারনা বিমান। সে অধিকারই তোমাদের নাই !"

ধীরে ধীরে বিমান কহিল, "আমারও যে এই লক্ষ্য ছিল বাবা—"

"না, সে লক্ষ্য এ লক্ষ্য নয়। তুমি যা চেয়েছ, এ তা নয়। এর ভেতর তোমরা আসতেই পার না, দূরেই থাকতে হবে। তবে দূরে থেকেও পরোক্ষভাবে সহায়তা যথেষ্ট ক'রতে পার।"

"কি ভাবে পারি বাবা, বলুন।"

"বিবাহ ক'রেছ বিমান?"

"আজ্ঞে, না।"

"যাও। তবে ঘরে ফিরে যাও।—বিবাহ কর। বিবাহের বয়স তোমার হ'য়েছে।"

"আজ্ঞে, বয়স হয়ত হ'য়েছে। তবে—তবে—"

"তবে—কি? ব'লতে চাও সামর্থ্য হয়নি, পরিবার প্রতিপালন ক'রতে পারবে না?"

"আজ্ঞে—"

"হাঁ, শুনেছি তোমাদের ওসব ধুয়ো অনেক। সংসারে কেবল একলাটি তুমি নও, আরও পাঁচজন র'য়েছেন, খেয়ে প'রে আছ ত সবাই? কি ক'রে চ'লছে তোমাদের?"

"আজ্ঞে, জমাজমি কিছু আছে, আর দাদা কাকা—যিনি যা পারেন, আনেন। মোটা ভাত কাপড় একরকম চ'লে যাচ্ছে।"

"একটা বৌ এসে কত ভারবোঝা আর বাড়াবে? এসব হুজুগ ছেড়ে কাজ যদি কিছু কর, কিছু কি তুমিই আন্‌তে পারবে না?"

"আজ্ঞে, তা—পারব বই কি?—তবে এখুনি ত এমন বেশী তা কিছু হবে না।"

"কত বেশীই বা এখুনি তোমার লাগ্‌বে? যখন লাগবে, গা তেমন থাকলে রোজগারও ক'রতে পারবে। তোমার দাদা কাকা এঁরা মেলাই রোজগার ক'রতে পারবার আগে কি তোমার বিবাহ দিতে চান না?"

"আজ্ঞে, তা চান বই কি? আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ ক'রেই তুলেছেন।"

"তবে যাও, বিবাহ ক'রে সংসারে স্থিত হ'য়ে ব'স। সেকেলে সরল সেই গ্রাম্যচালের মোটা ভাত কাপড়ই যথেষ্ট। ছেলেরা যদি বাঁচতে চায় গ্রাম্য চালের মোটা ভাত কাপড়েই আবার ফিরে যেতে হবে, সহরের ফিন্‌ফিনে বাবুগিরি ছেড়ে। মেয়েদেরও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, ফুরফুরে বিবিয়ানা ছাড়িয়ে আবার সেই মোটা সাড়ী শাঁখা সিন্দুরে! তোমাদের ফিরতে হবে পুরোণো সেই ক্ষেতখামারে বাগবাগিচেয় গোয়াল ঘরে মাছের দীঘি-পুকুরে, তাদেরও ফিরিয়ে আন্‌তে হবে সেই ধানের গোলায় ঢেঁকিশালায় ডালাকুলোয় পাকের ঘরে।"

বিমান কহিল, "হালচাল একদম বদলে গেছে বাবা। সহরে গিয়ে সবাই জমেছে, বাবুগিরিতে বিবিয়ানায়, সহরের আরাম বিরামে, গা ছেড়ে দিয়েছে। ফিরতে কি ফেরাতে আর সহজে কেউ পার্‌বে?"

"পারতেই হবে! নইলে ম'র্‌বে, এদেরও মার্‌বে। শোন বিমান! এই যে মেয়েরা সব যা তা হুজুগে মেতে উঠ্‌ছে, ঘর ছেড়ে বাইরে হৈ হৈ ক'রে বেড়াচ্ছে, আর তাতে ক'রে শেষে এই সব দুর্বিপাকে গিয়ে প'ড়ছে, তার বড় একটা কারণ, সময়মত সংসারে এরা স্থিতিলাভ ক'রতে পারছেনা; ছেলেরা হ'য়ে উঠেছে বিবাহে বিমুখ, স্ত্রী-পুত্রাদি পোষ্যপালনের দায়িত্বই গ্রহণ ক'রতে চাইছে না। প্রত্যেকেই যদি চায় নাগরিক উঁচু চালের পৃথক্ এক একটি সংসার না হ'লে সেটা সুখের সংসারই হ'তে পারে না, হয় কেবল একটা বিড়ম্বনা, তবে এ দায়িত্ব সহজে কেউ নিতে পারে না, এ বিমুখতাও অনিবার্য্য। অথচ যথাসময়ে দারপরিগ্রহ ক'রে গার্হস্থ্য আশ্রমে পুরুষরা না যদি গিয়ে বসে, নারীধর্ম্মে মাতৃধর্ম্মে স্থিতিলাভ ক'রে নারী কেউ প্রকৃত কল্যাণের ভাগিনী হয়ত পারেনা, সমাজও উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারে ধ্বংস হ'য়ে যায়। সুতরাং এ দায়িত্ব-গ্রহণ পুরুষের অলঙ্ঘনীয় সামাজিক ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম অবহেলা ক'রবার, এড়িয়ে চ'লবার অধিকার তার নাই, মানুষ হ'য়ে মানুষের, সামাজিক হ'য়ে সামাজিকের, কর্ত্তব্য যদি পালন ক'রতে চায়। প্রাচীন ভারতে দুর্লঙ্ঘ্য বিধিই এই ছিল, বিদ্যাশিক্ষার পর যুবা হয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা আজীবন সন্ন্যাসী হবে যদি গুরুর অনুমতি পায়, নতুবা দারপরিগ্রহ ক'রে গৃহস্থ তাকে হ'তেই হবে। বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত, বিষয়ভোগী অকৃতদার পুরুষ লোকসমাজে যথেচ্ছা বিচরণ ক'রতেই পারত না। এরূপ সব পুরুষ থেকে বহু অকল্যাণের সৃষ্টি সমাজের হয়।"

বিমান উত্তর করিল, "জীবিকাসমস্যা তখন এত কঠিন ছিলনা বাবা।"

"না, তা ছিল না। এখন হ'য়েছে, আর সেইটেই হ'চ্ছে সমাজের অতিবড় একটা কঠিন সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যাকে সমাধান ক'রে তোমাদের নিতেই হবে, সমাজকে যদি রক্ষা ক'রতে চাও, মানুষ হ'য়ে মানুষের ধর্ম্ম, পুরুষ হ'য়ে পুরুষের ধর্ম্ম যদি পালন ক'রতে চাও, আর তার একটা পথ ঐ যে জীবনের কথা ব'ললুম, এ দেশের পুরোণো জীবনে ফিরে আসা। অনেক লম্বা লম্বা কথা তোমরা আজকাল কও,—দেশ উদ্ধার ক'র্‌বে, জাতটাকে বড় ক'রে তুল্‌বে, পৃথিবীর সব বড় বড় জাতের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চ'ল্‌বে, অথচ একটি নারীর ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রবার বেলায় ভ'য়ে পিছিয়ে এস। রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারনা, অথচ ছলে ভুলিয়ে নষ্ট এদের ক'রতে এতটুকু দ্বিধা কেউ বড় ক'রছ না! ধিক্ তোমাদের! কি ক'র্‌বে তোমরা? কি ক'রতে পার? ঘরে ঘরে এইসব মায়েদের যারা মায়ের আসনে মায়ের মানে রক্ষা ক'রতে পারে না, আসনভ্রষ্ট ক'রে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে, তারা আবার দেশমাতৃকার নাম করে কোন্ মুখে?"

বিমান নতমুখ নীরব। অগ্নিদৃষ্টিতে হরদাস চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বিমান কহিল, "তা হ'লে আপনার আদেশ বাবা—"

"হাঁ, আমার আদেশ, যাও, ঘরে যাও, বিবাহ কর, সংসারধর্ম্মে স্থিত হও। তোমার সহযোগী বন্ধু যারা তাদেরও বিবাহ ক'রে সংসার-ধর্ম্মে স্থিত ক'রতে চেষ্টা কর। কাজকর্ম্ম যেভাবে যে যা পারে করুক, চাষ করুক, মজুরী করুক। ভাবনা ক'রো না বিমান, প্রাণের আগ্রহে যদি খোঁজ, কাজের পথ পাবে, মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। সংসারধর্ম্মে স্থিতি দিয়ে মায়ের জাতকে রক্ষা কর। পুরুষ হ'য়ে জন্মেছ, বীরের মত পুরুষের মত মাথা তুলে নেও, কাপুরুষের মত ভয়ে এড়াতে চেওনা; নিজের অলস আরামে, কেবল নিজের স্বার্থসুখ-ভোগ-লিপ্সায়, মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিওনা, দেশকে ডুবিও না। সবুজ দল

ক'রেছ বিমান? এই সবুজই সত্যকার সেই চিরন্তন সবুজ ধর্ম্মে সার্থক হ'ক্। তোমার নতুন এই সবুজ দলের সাধনমন্ত্র হ'ক মোহবিভ্রান্ত. ধর্ম্মভ্রষ্ট দেশকে তার স্বধর্ম্মে আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলবে!"

"যে আজ্ঞে বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন, এই মন্ত্র নিয়ে এই ব্রত যেন গ্রহণ ক'রতে পারি।—"

পায়ে লুটাইয়া বিমান গুরুদেবকে প্রণাম করিল। দুটি হাত তার মাথায় রাখিয়া হরদাস কহিলেন,

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত!"

উঠিয়া বিমান কহিল, "কবে আবার দর্শন পাব বাবা?"

"বৌমাকে নিয়ে যেদিন আস্‌তে পারবে, তার আগে নয়।"

(ক্রমশঃ)

মহাশান্তি

শ্রীকালিদাস রায়

আজি শুধু মনে হয় চেয়ে চেয়ে দেখে অই
বাড়ীটার পানে,
বাড়ীতে কি কেহ নাই? গেল কি পলায়ে সবে
আর কোনখানে?
পালিত কুকুর গাভী ঝিমাতেছে চোখ বুজে
খুঁজে না আহার,
খাঁচার পাখীটা সেও ডাকেনিক সারা দিন
কি হলো তাহার?
কয় দিন হ'তে কোথা দেখেছি সকলি যেন
চঞ্চল অস্থির
বন্ধুজন যায় আসে কমে নাক সারা দিনে
অঙ্গনের ভীড়।
প্রহরে প্রহরে গাড়ী নিয়ে আসে তাড়াতাড়ি
কতই ডাক্তার,
চাকরের হাত হতে শিশি কেড়ে নিয়ে ছুটে
দাদা বাবু তার।
ছোট ছোট দল বেঁধে ফিসফিস করে সবে
এখানে ওখানে,
সকলেরই ম্লান মুখ ঘন ঘন সাইকেল
ছুটিছে দোকানে।
এক প্রশ্ন মুখে মুখে সবাই শুধায় শুধু
রোগীর সংবাদ,
মাঝে মাঝে শুনিয়াছি মায়ের প্রবোধ সাথে
ক্লিষ্ট আর্ত্তনাদ।
সারা রাত্রি আলো জ্বালা, নিদ্রাহীন গৃহখানি
আরক্ত নয়নে
তৃষা ক্ষুধা সব ভুলে চাহিয়া আছিল শুধু
রোগীর শয়নে।
আজ কি গভীর শান্তি, রুদ্ধ বাতায়নগুলি,
সকলি নিঝুম,
কোন গৃহে নাই আলো রান্নাঘর হতে আজ
উঠে নাক ধূম।
উদ্বেগ, অস্বস্তি, ভয়, ব্যস্ততা, সংশয়, আশা,
ত্রস্ত কলরব
সব সাথে নিয়ে গেছে, চিতার অনলে আজ
পুড়ে গেছে সব।
একটি মাসের নিদ্রা ঘনায়ে মুদায় আজ
নয়ন অলস
একটি মাসের ক্লান্তি করে আজি অবসাদে
সর্ব্বাঙ্গ অবশ।
একটি মাসের চিন্তা বুকের কুলায়ে আজ
লভেছে বিশ্রাম,
একটি মাসের ভ্রান্তি ছুটে ছুটে শ্রান্ত হয়ে
পেয়েছে বিরাম।
পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ হতো না যাহার লাগি
সে পেয়েছে লয়
দেহ আজি প্রাপ্য তার বুঝে লয় কড়া ক্রান্তি
মনে করি জয়।
কোথা শয্যা কোথা খাট? ধূলায় পড়িয়া সব
ঘুমে অচেতন,
শূন্য সে রোগীর গৃহ, চূড়ায় উড়িছে তার
শান্তির কেতন।
মহাশোকও শ্রান্ত হয়ে গলিয়া ঢলিয়া পড়ি
নয়ন আসারে
মিশে গেছে সুষুপ্তির উদার অগাধ স্থির
শান্তি পারাবারে।
আর অই স্বপ্ন পথে রোগমুক্ত সুস্থ দেহে
প্রিয়জন এসে
ঢুকে পড়ে অঙ্ক পর গলায় জড়ায়ে কর
কথা কয় হেসে।

যশোহরের অখ্যাতনামা কবি গঙ্গারাম দত্ত

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বঙ্গদেশের গ্রামগুলি অনুসন্ধান করিলে বহু গৃহস্থের ঘরে পুরাতন পুঁথি পাওয়া যাইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। এই উপেক্ষিত, লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত পুথিরাশি যদি সমস্তই আমাদের দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব হইত, তবে বোধ হয় আমরা দেখিতে পাইতাম যে, বাংলাদেশ একাধিক কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াই কত প্রাচীন লেখকের বহুকষ্টরচিত হস্তলিখিত গ্রন্থাবলী কীটদষ্ট হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, অথবা গৃহদাহ প্রভৃতি বিপৎপাতের ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিবে? যাঁহারা পূর্ণ অথবা আংশিকরূপে কালের অব্যাহত প্রভাব হইতে রক্ষা পাইয়াও অজ্ঞাতনামা রহিয়া গিয়াছেন, বক্ষ্যমানপ্রবন্ধের বিষয়ীভূত কবি গঙ্গারাম দত্ত সেই প্রাচীন কবিদিগের অন্যতম।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের বাতিক লইয়া পুরাতন পুথির তল্লাস করিতে গিয়া কবি গঙ্গারামের সন্ধান মিলিয়াছিল। ন্যূনাধিক দুই শতাব্দী পূর্ব্বে কবি গঙ্গারাম দত্ত জীবিত ছিলেন। ইঁহার নিবাসস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত নড়াইল গ্রাম। নড়াইলের সুবিখ্যাত জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপরাম দত্ত ইঁহার অগ্রজ। গঙ্গারামের বংশধরগণ এখনও নড়াইলে বাস করিতেছেন। দৈবের প্রতিকূল প্রভাবে গঙ্গারামের রচিত গ্রন্থাদি লোকের অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। সময়ও সুবিধামত ঐগুলি উপযুক্ত বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকগণের মধ্যে গঙ্গারামের নাম হয়ত আমরা সসম্মানে উল্লিখিত দেখিতাম।

গঙ্গারামের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইটুকু জানা যায় যে, মহারাজ আদিশূর দ্বারা আনীত পুরুষোত্তম দত্ত ইঁহাদের আদিপুরুষ! এই দত্তবংশ হাওড়ার নিকটস্থ বিখ্যাত বালিগ্রামে বাস করিতেন। এইজন্য ইঁহারা "বালির দত্ত" বলিয়া পরিচিত। মহারাষ্ট্রগণের অর্থাৎ "বর্গীর" উৎপাতের ফলে দত্তরা মুর্শিদাবাদের নিকট "চৌরা" নামকস্থানে গিয়া বাসস্থাপন করেন। তারপর আরও দূরে সরিয়া গিয়া দত্তরা আবার নূতন বাসস্থানের পত্তন করেন। এই নূতন নিবাস হইল "নড়াল" গ্রাম এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা মদনগোপাল দত্ত। মুর্শিদাবাদে নিবাসকালে মদনগোপাল দত্ত। মুর্শিদাবাদে নিবাস কালে মদনগোপাল নবাব সরকারে চাকুরী করিতেন। চাকুরী-অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা তিনি একটী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত হয় যে, তাঁহার ভূসম্পত্তির পরিমাণ ছিল মাত্র বার বিঘা জমি, যাহার উপর বসতবাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। মদনগোপালের পুত্র রামগোবিন্দ। নড়াইল জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপরাম দত্ত এই রামগোবিন্দের পুত্র। রূপরাম নাটোর-রাজের প্রতিনিধিরূপে নবাবসরকারে কাজ করিতেন এবং তিনিই নাটোর-রাজসরকার হইতে পাট্টা লইয়া নড়াইলে কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কালীশঙ্কর রায় এই রূপরামের পুত্র। কালীশঙ্করের বিক্রমেই কয়েকশত বিঘার সামান্য সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইয়া বহু লক্ষ টাকার বিরাট জমিদারীতে পরিণত হয়।

রূপরাম নাটোর-রাজসরকার হইতে যে পাট্টা লইয়াছিলেন তাহার তারিখ বঙ্গাব্দ ১১৯৮ (খৃঃ ১৭৯১) এবং তিনি বঙ্গাব্দ ১২০৯ (খৃঃ ১৮০২) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, বলিয়া বোধ হয়।* গঙ্গারাম রূপরামের কনিষ্ঠ।

গঙ্গারাম নিজের রচনার মধ্যে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন:

> বাণী বাগেশ্বরী দেবী আদ্যা সরস্বতী।
> গঙ্গারাম ভণে তার পদে রাখি মতি॥
> বালী সমাজীর দত্ত শ্রীপুরুষোত্তম।
> সেই বংশে নারায়ণ নারায়ণ সম॥

---

* Westland সাহেব প্রণীত Report on the District of Jessore (1874). Westland সাহেব গঙ্গারামের নামও উল্লেখ করেন নাই।

মদনগোপাল নাম তাহার নন্দন।
সুত রামগোবিন্দ কির্ত্তির বিবর্দ্ধন॥
রূপরামদত্ত নাম তাহার তনয়।
তাহার অনুজে এই ভাষা করি কহে॥
নিবাস নড়াল গ্রাম নলদ্বিপ মাঝে।
চাকলে ভুষণা নাম (মহিদেব ?) রাজে॥
সুন্দরাকাণ্ডের কথা হইল সমাপ্ত।
এখন লঙ্কার কথা হইবে (যে যাপ্ত ?)॥

("বিজ্ঞাপিত" কথা লিপিকরপ্রমাদে ঐরূপ হইয়া থাকিবে)
—গঙ্গারামের রামায়ণের পুথি—পত্র ২৪৪

অন্যত্র, অর্থাৎ উক্ত পুঁথির লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে, কবি স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের নাম উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন :

সমাপ্তঞ্চেদং লঙ্কাকাণ্ডমিতি।
ইহার পশ্চাতে হবে উত্তরা প্রকাশ।
অগস্ত্যের মুখে রাম সুনে ইতিহাস॥
ভল্লুক বানর আর রাক্ষসের জন্ম।
রাবণ তপস্যা করি কৈল জত কর্ম্ম॥
দিক বিজয়ের কথা বহু ইতিহাস।
উত্তরাকাণ্ডেতে সর্ব্ব আছয় প্রকাশ॥
গঙ্গারাম দত্ত কহে সুনহ ভারতী।
শ্রীনন্দকিশোরে মাতা কর সুদ্ধমতি॥
কালীশঙ্করের মতি রামনিধি দত্তে।
ধনধান্যে পূর্ণ করি রাখিবা মহত্তে॥
গদাধর শ্রীধর কিঙ্কর তব পায়।
প্রথমে করিবা দয়া মূর্খতার দায়॥
পঞ্চভাই একমতি সুদ্ধে সুদ্ধাচার।
পদছায়া দিয়া রাখ তনয় তোমার॥
কবিতার ভালোমন্দ কিছুই না জানি।
জে বোল বোলাও তুমি বাগ্ময়ি রাণী॥
শশাঙ্ক বাসনে ধরিবারে যেই আশ।
তেন রামায়ণ কহে গঙ্গারাম দাস॥

(পুঁথি—৩৩৫ পত্র)।

উপরিলিখিত রচনার মধ্যে, নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি এই তিনজন রূপরামের পুত্র, গদাধর ও শ্রীধর গঙ্গারামের পুত্র। অধিক বয়সে (বোধ হয় শেষ বয়সেই) গঙ্গারামের একপুত্র হইয়াছিল। রামায়ণ রচনার পরে হইয়াছিল বলিয়া এই পুত্রের নাম রাখা হইয়াছিল রামকুমার। রামকুমার পিতার জীবদ্দশাতেই মারা যান।

গঙ্গারাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সঞ্চিত পুস্তকভাণ্ডারে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, বিরাট্ (পৃথক্‌ভাবে), জ্যোতিষগ্রন্থ ইত্যাদি রাশি রাশি হস্তলিখিত পুথি ছিল। ইহা ব্যতীত অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাংলা পুথিও ছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থগুলি—ক্ষুদ্র ও খণ্ড খণ্ড সংস্কৃত রচনাও ছিল। অযত্নে ও প্রায় অজ্ঞাতেই ঐ পুস্তকরাশি প্রায় দুই শত বৎসর পড়িয়া ছিল। বহু লোকে কৌতুহলচাপল্যের বশে কতক কতক পুথি নাড়াচাড়া ও ওলট্-পালট্ করিয়াছেন, কেহ বা এটা-সেটা বাড়ীতে লইয়া গিয়া আর ফেরত দেন নাই। কতকগুলি পোকায় কাটিয়াছে, কতক বা একচাপে বহুদিন থাকায় এমন ভাবে জুড়িয়া গিয়াছে যে, পত্রগুলি টানিয়া পৃথক্ করা যায় না; করিতে গেলে সেগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়। এই বিপর্য্যয় অবস্থা হইতে গঙ্গারামের স্বরচিত গ্রন্থাবলীর উদ্ধারের চেষ্টা করিতে গিয়া দেখা গেল, তাঁহার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম রচনা বাংলা রামায়ণ অধিকাংশস্থলেই বিনষ্ট—পাঠ-উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই : "উষাহরণ কাব্য" একেবারেই পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে, আর কোন বাংলা রচনা ছিল কি-না তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না—অর্থাৎ অনুমান হইলেও তাহার প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিবেশীগণের অযথা কৌতূহলের দৌরাত্ম্য এবং কালের সর্ব্ববিনাশকর প্রভাব, এই দুইয়ের ফলে এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

কিন্তু "উষাহরণ কাব্যের" দলিল অপ্রত্যাশিতরূপে পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিভাণ্ডারের মধ্যে "উষাহরণ কাব্যের" কয়েকটি ছিন্নপত্র ও রচয়িতার নাম "গঙ্গারাম" এইরূপ দেখিতে পাইয়াছিলাম। "গঙ্গারাম" লিখিত "সত্যনারায়ণের কথা"রও কয়েকখানি ছিন্নপত্র ঐ স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। গঙ্গারামের রামায়ণের সহিত লিপিসাদৃশ্যবশতঃ আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে এই তিন পুস্তকের রচয়িতা একই ব্যক্তি। ইহার পর, জমিদার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার রায় মহাশয়ের 'নড়াইলস্থ

বাটীতে কতকগুলি পুরাতন পুস্তক দেখিতে দেখিতে "আচার্য্য"† নামক একখানি মাসিকপত্রের কয়েক সংখ্যা একত্র বাঁধান দেখিতে পাই। উক্ত পত্রিকার ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় গঙ্গারাম দত্ত সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে তৎপ্রণীত "উষাহরণ কাব্য" হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উক্ত রচনা সম্বন্ধে পাঠকগণের একটা ধারণা জন্মাইবার জন্য নিম্নে দু-এক স্থল তুলিয়া দিতেছি :—

উষা নামে তার কন্যা, বরাঙ্গনা মাঝে ধন্যা,
রূপে গুণে লক্ষ্মীর সমান।
চমের গঞ্জিত কেশে, ফলক ললাট দেশে,
ভুরু যুগ কামের কামান॥
শিশু মৃগ জিনি আঁখি, নাচয়ে খঞ্জন পাখী,
শ্রুতিপুট গঞ্জিয়া গিধিনী।
নাসা তিল ফুলজিনি, মুখছটা সুনলিনী,
দন্তরুচি জিনি সৌদামিনী॥
অধরে প্রবাল আভা, ওষ্ঠে জিনি বিম্বজবা,
গণ্ডে জিনি কনক দর্পণ।
মৃণাল নিন্দিত ভুজে, চম্পক অঙ্গুলি মাঝে,
নখে তায় যেন তারাগণ॥
* * *
জঘন করির শুণ্ড, চরণে নূপুর খণ্ড,
রাজহংস জিনি করে গতি।
উর্ব্বসী মেনকা আদি, দেব কন্যা যথাবিধি,
উষা যেন মদনের রতি॥
বাক্যের ঈশ্বরী মাতা, হও মোরে বরদাতা,
মতি রহে বিমল চরণে।
গঙ্গারাম দত্ত গায়, বন্দিয়া ব্রাহ্মণ পায়,
উষারূপ উষাহরণে॥

অনিরুদ্ধের সহিত দৈত্যগণের যুদ্ধ :—

তবে ত প্রমথগণ দানব বিস্তর।
তাহা সবাকারে আজ্ঞা দিল নৃপবর॥
রণরঙ্গে বিশারদ নানা অস্ত্র ধরে।
আষাঢ়ের মেঘ যেন বর্ষে ভূমিপরে॥
বিদ্যুৎ সমান বাণ করে চকচকি।
একাকারে পড়ে বাণ অনিরুদ্ধে ঢাকি॥
প্রমথ দানবগণ যুদ্ধে বিশারদ।
যার যুদ্ধে দেবগণ গনেন আপদ॥
কেহ মহীপথে যায় কুঞ্জর আকার।
কেহ বা গগনে যেন মেঘের সঞ্চার॥
প্রদ্যুম্ননন্দন বীর বিক্রমে অপার।
নির্ভয় শরীর, যেন-সমরে কুমার॥
বলভদ্র সমবলে ধাইল সম্মুখে।
পরিঘ লইয়া বীর ঘুরয়ে কৌতুকে॥
ছিন্ন ভিন্ন করি সবে নানা দিক ধায়।
কার মাথা কার হাত পরিঘের ঘায়॥
কার নাসা কার কান কার ভ্রূবক্ষ।
রণমাঝে পড়িলেক সেনা লক্ষ লক্ষ॥ ইত্যাদি।

রামায়ণ, উষাহরণ, সত্যনারায়ণের কথা ব্যতীত সুদাম চরিত্র নামক একখানি পুস্তকও গঙ্গারাম কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের এক পত্রের একটি মাত্র টুক্‌রা আমি দেখিয়াছি, উহাতে এইটুকুমাত্র পাওয়া যায় :

মুকুন্দ মংগল নাম, পুণ্যকথা……ধাম,
পরকাল নিস্তর শ্রবণে।
ধ্যান করি বাণি পায়, গংগারাম দাস গায়,
প্রণমিয়া ব্রাহ্মণ (চরণে ?)॥

এই পুস্তকখানি লিপিকার দেবনাগরী অক্ষরে লিখিয়া ছিলেন। ইহার শেষ কয়েক পঙক্তিতে একটা তারিখের উল্লেখ আছে।

ইতি সুদাম চরিত্র সমাপ্ত :

সন ১১৭৭ (অক্ষরেও লেখা) ৮ শ্রাবণ, শনিবার লিখিতং শ্রীবৈষ্ণবদাস পঠনার্থী শ্রীরামহরি দাস। বাংলা ১১৭৭ সাল ইংরাজি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ। সুদাম চরিত্র ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ—পলাশীর যুদ্ধের সময়ে এবং সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যকালে গঙ্গারাম জীবিত ছিলেন।

† "আচার্য্য" মাসিক পত্রিকা নড়াইলের কতিপয় ভদ্রলোক ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত করেন। ১২৮৯ সালের ভাদ্র সংখ্যার পর পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত "গঙ্গারাম দত্ত" প্রবন্ধের লেখক ছিলেন গঙ্গারামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র কুঞ্জবিহারী দত্ত।

এক্ষণে গঙ্গারামের বাংলা রামায়ণের কথা আলোচনা করা যাউক। ইহা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পুথির ৩৩৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত পত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক পত্রে দুই পৃষ্ঠা। পুথির আকার ক্ষুদ্র নহে—পুরা এক হাতের বেশী লম্বা এবং ৪।৫ আঙ্গুল চওড়া। লেখাগুলি খুব ঘন এবং অক্ষর আকারে ছোট। তুলট কাগজের উপর সেই প্রাচীন কালীতে লেখা যাহার বর্ণ ও উজ্জলতা দুই শত বৎসরেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নিমকাঠের দুইখানি ফলক পুথির আবরণ। এই ফলকের উপর প্রাচীন চিত্রকলার রীতি অনুসারে রামায়ণের কতিপয় ঘটনা নানাবর্ণে চিত্রিত। চিত্রের রং একটু মলিন হইলেও বেশ স্পষ্ট। রামায়ণখানি পড়িলে স্বতঃই এই কথা মনে হয় যে, যথারীতি একটু মার্জ্জনঘর্ষণ করিয়া লইয়া পুথিখানি উপযুক্ত সময়ে ছাপাইলে প্রচলিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট হইত না। দুঃখের বিষয়, উত্তরাকাণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ গ্রন্থকার লঙ্কার পরে উত্তরা লিখিবেন স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন। গঙ্গারামের এই সুবৃহৎ রামায়ণের কয়েক স্থান হইতে রচনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে দেখাইতেছি :—

রামরাজত্ব—

বেদবেদাঙ্গের মত ভ্রাতৃগণসনে।
নিবিষ্ট হইলা রাম প্রজার পালনে॥
ধর্ম্মের করেন রক্ষা সামদণ্ডভেদে।
হৃষ্টপুষ্ট জনসর্ব্ব রামের প্রসাদে॥
হইল প্রথিবী সর্ব্ব ধনধান্যময়।
বিধবা না হয়ে নারী নহে সর্পভয়॥
নাহি রোগ শোক তথা চোর দস্যু ভয়।
পিতায় না করে শ্রাদ্ধ না মরে তনয়॥
সর্ব্বলোক হরশিত ধর্ম্মপরায়ণ।
ধর্ম্মময়ে দেখে রাম জেন নারায়ণ॥

* * * *

নিত্য পুষ্প নিত্য ফল হয়ে তরুগণে।
কালে বরিষয়ে মেঘ হিত চিন্তি মনে॥
সুখস্পর্শ সমীরণ রামরাজ্যে সদা।
নাহি ব্যাধি দুষ্ট ভয়ে নারীগণে মুদা॥

* * * *

বাপ খুড়া ভক্তি করে কুলের নন্দন।
মান্য জ্যেষ্ঠা ভগ্নী (সেবা) অন্য নাহি মন॥
শষুর মাতুল সেবা দেবগুরু দ্বিজ।
অতিথির পূজা আর বর্ণধর্ম্ম নিজ॥

* * * *

কুবেশ মলিন নাহি রামের নগরে।
নৃত্যগীত আনন্দিত প্রতি ঘরে ঘরে॥ ইত্যাদি

সীতাহরণ প্রয়াসী রাবণের প্রতি সীতার উক্তি :

মহাবর পতি মোর মহেন্দ্র সমান।
মহোদধি সমগুণে মহাবলবান॥

* * * *

পূর্ণচন্দ্র নিভানন শূর বলবান।
রাজপুত্র জিতেন্দ্রিয় নরেন্দ্র বাখান॥
প্রথুকির্ত্তি মহাতেজ প্রতাপে তপন।
সিংহপরাক্রম বীর ধর্ম্মপরায়ণ॥
তার অনুগতা আমি সতী কুলবতী।
বিদিত নাহিক তোর মোর জেই পতি॥

* * * *

শৃগাল হইয়া তুমি ব্যাঘ্র পত্নিইচ্ছা।
হেন আশা নিরাকার পাপমতি মিছা॥ ইত্যাদি।

সাগর বন্ধন :

সুগ্রীবের মন্ত্রী জত পাত্র হনুমান।
তাহা সভা প্রতি রাম কহিল বিধান॥
সমুদ্রের কথা সভে সুনিলে বিদিত।
শেতুবন্ধ কর সভে নলের সহিত॥

* * * *

রামের আদেশে তবে ধায় প্লবঙ্গমা।
সাগরে তরঙ্গ জেন নাহি তার শিমা॥
মহাবনে প্রবেশিল হাজারে হাজার।
ধাইল সকল সেনা বানর রাজার॥
আস্ফোটন্তি হরশিতে কিনকিনা ধ্বনী।
বানরের বেগে জেন কাপেন মেদিনী॥
পর্ব্বত আকার সভে আনয় পর্ব্বত।
বনের করয়ে শূন্য শিলাতরু জত॥

মূলসনে মহাতরু উফারিয়া আনে।
তার গর্ত্তে রসাতল জেন বিদ্যমানে॥
শাল তাল তমাল কদম্ব অশ্বকর্ণ।
সরল অর্জ্জুন বৃক্ষ কুটাজ বিবর্ণ॥
সমূলে উন্মূল করি লয়ে তরুগণ।
ইন্দ্রধ্বজ চলে জেন বহিয়া বারণ॥

* * * *

দশ কোটি পরিমাণ ষষ্ঠীগুণ তার।
এত সংখ্যা ধায় কপি সাগর মাঝার॥
সভে মেলি বহে তরু পর্ব্বত শিখর।
একানল করে বন্ধ সাগর উপর॥ ইত্যাদি।

লঙ্কার বর্ণনা ঃ

দেখিয়া লঙ্কার শোভা নানা রত্ন শাজে।
কাঞ্চন রচিত দ্বার মণি মাঝে মাঝে॥
বিবিধ তোরণ নানা বর্ণে বিভূষিত।

* * * *

প্রাকার পরম শোভা বিবিধ পরিখা।
বিস্ময় বানরগণ দেখে অনিমিখা॥
প্রাচির বিবিধ ছন্দে পূর্ণকুম্ভ তাহে।
দ্বারে দ্বারে তমনাশে (দীপগণ ?) জাহে॥
অষ্ট দ্বার লঙ্কাপুরী প্রাকার বেষ্টিত।
অষ্ট জে প্রাকার সেই পরম শোভিত॥
শরতের আভ্র জেন শোভে পুরীখান।
পরম সুন্দর বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
সুবর্ণ রচিত দিব্য উদ্যান শোভিত।
প্রবাল মুকুতা মণি পতাকা ভূষিত॥
নানাবর্ণে শোভে লঙ্কা অতি রুচিময়।
দেখিয়া বানরগণ পরম বিস্ময়॥ ইত্যাদি।

রাবণ বধ ঃ—

ইন্দ্রের সারথী সেই আপনী মাতলী।
রামেরে কহেন বীর হৈয়া কৃতাঞ্জলি॥

* * * *

জেই অস্ত্র পিতামহ করিল নির্ম্মাণ।
ব্রহ্মশির নামে তার জগতে আখ্যান॥

* * * *

অন্য অস্ত্রে রাবণের নাহি হবে বধ।
না কর অবজ্ঞা তুমি দেবের বিপদ॥
মাতলীর বাক্যে রাম হয়ে অবহিত।
লইলা সারঙ্গ ধনু বৈকুণ্ঠ পুজীত॥

* * * *

জাহে গুণ দিতে মহি করে টলমল।
সেই ধনু হাতে করি উঠে মহাবল॥
অগস্ত্যের দত্ত বাণ হাতে করি লয়।
মহাসর্প গর্জ্জে জেন শর রুচিময়॥
ব্রহ্মার নির্ম্মিত শর ইন্দ্রের কারণে।
ইন্দ্র তাহা অগস্ত্যেরে দিল ঘোর বনে॥
অগস্ত্য রামেরে দিল ধনুক সহিত।
পবন জাহার পায়ে বহে সাবহিত॥
(ফলে তার) অগ্নি সূর্য্য রহে ত্যাগকালে।
আকাশ শরীর জার গৌরব বিশালে॥

* * * *

হেমময় পুংখ সেই শরে বিভূষিত।
সকল দেবের তেজ তাহাতে জড়িত॥
সর্ব্বভূত বীর্য্য তাহে কেহ না এড়ায়।
সহস্র সূর্য্যের সমো বাণ শোভা পায়॥
সধূন (আগুন) কাল (জন জিহ্বা) খেলে।
সাক্ষাত তক্ষক জেন ভিষণ গরলে॥

* * * *

বেদমন্ত্র পড়ি রাম সেই অস্ত্র এড়ে।
অস্ত্র দেখি দেবাসুর মোহ হৈয়া পড়ে॥

* * * *

মহাঅস্ত্র দেখিয়া রাবণ জড়ী (?) হয়ে।
নাহি চলে হস্তপাদ মুগ্ধ হৈয়া রহে॥
বেগে গিয়া সেই বাণ লাগে তার বুকে।
নদী জিনি রক্তধারা নিকলিল মুখে॥ ইত্যাদি

উপরি-উক্ত উদ্ধৃত অংশগুলি দেখিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, গঙ্গারামের কবিত্ব শক্তি নগণ্য নহে। দেশকালপাত্রের সুবিধা পাইলে গঙ্গারামও কৃত্তিবাস, কাশীরাম এবং ভারতচন্দ্রাদির মত বিখ্যাত হইতে পারিতেন, মনে হয়।

পরিশেষে, গঙ্গারামের রামায়ণের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। গঙ্গারামের বাংলা রামায়ণ মূল সংস্কৃত রামায়ণের এত নিকটগামী যে, স্থানে স্থানে রচনা ঠিক যেন অনুস্বারবিসর্গবর্জ্জিত সংস্কৃত। গঙ্গারাম যে সংস্কৃত ভাল জানিতেন এবং মূল রামায়ণের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ রাখিয়া বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত মিলগুলি দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে:

মূল সংস্কৃত—(অযোধ্যা বর্ণনা)

কপাট তোরণবর্তীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।

*   *   *   *

দুর্গগম্ভীর-পরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্॥

গঙ্গারাম—গম্ভীর পরিখদুর্গ নানা অস্ত্রধারী।
কপাট তোরণ রত্নে বেড়ী শারী ২॥

মূল— গোলাঙ্গুলেষু চোৎপন্নাঃ কিঞ্চিদুন্নতবিক্রমাঃ।
ইত্যাদি—আদিকাণ্ড।

গঙ্গারাম—
গোলাঙ্গুল আদি কপি দেবতার তেজে। ইত্যাদি।

মূল— পূর্ণচন্দ্রাননং রামং রাজবৎসজ্জিতেন্দ্রিয়ম্।

*   *   *   *

পৃথুকীর্ত্তিং মহাবাহুং ...
মহাবাহুং মহোরস্কং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।

(অরণ্য)

গঙ্গারাম— পূর্ণচন্দ্র নিভানন শূর বলবান।
রাজপুত্র জিতেন্দ্রিয় নরেন্দ্র বাখান॥
প্রথুকীর্ত্তি মহাতেজ প্রতাপেতপন।
সিংহ পরাক্রম বীর ধর্ম্মপরায়ণ॥

মূল— নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা।

গঙ্গা— আদিত্যের প্রভা যেন ছুঁইতে না পারি।
রামঅনুগতা তেন আমি কুলনারী॥

মূল— কালকুট বিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তু মিচ্ছোসি।

গঙ্গা— কালকুট বিষ পিয়া সুখে হবে গতি।

মূল-- ক্রহি ক্রহীতি রামস্য ব্রুবাণস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
ত্যক্ত্বা শরীরং গৃধ্রস্য প্রাণা জগ্মু বিহায়সম্॥

(জটায়ুর প্রাণত্যাগ)

গঙ্গা— প্রাণ ত্যজে পক্ষীরাজ দেখেন সাক্ষাত।
কহো ২ বলি রাম জোড় করে হাত॥

মূল— সৌমিত্রে হরকাষ্ঠানি নির্ম্মথিষ্যামি পাবকম্।

(অরণ্য)

গঙ্গা— লক্ষ্মণ আনহ কাষ্ঠ অগ্নিকর দীপ্ত।

মূল— অনুতিষ্ঠতি মেদিন্যাং পনসঃ পনসো যথা।

(লঙ্কা)

গঙ্গা— পনস বানর ফাঠে পনস সমান।

মূল— খরহন্তা স তে ভর্ত্তা রাঘবঃ সমরে হতঃ।

(লঙ্কা)

গঙ্গা— খরহন্তা তোর পতি বধিলাম রণে।

ইত্যাদি বহু বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

অনুমান হয়, এই গঙ্গারামই "মহারাষ্ট্র পুরাণ" রচয়িতা। কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপাতত উপস্থিত না থাকায় ঐ বিষয় আলোচনা করিলাম না।‡

---

‡ গঙ্গারামের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার দত্ত মহাশয় কবির সমস্ত পুথিরাশি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিতে দিয়া এবং মৌখিক তথ্য প্রদান করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

হয় ত

শ্রীগৌতম সেন

নদীর ঘাটে কাঙ্গালীর মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিয়াছে। ভোর না হইতেই খেয়াঘাটে লোকে লোকারণ্য। খবর পাইয়া রমানাথও আসিল।

—কাঙ্গালীর বৌটা গেলো কোথায়? জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে রমানাথ কাঙ্গালীর ঘরের দিকে চাহিল।

সত্যই সে-খেয়াল কাহারও এতক্ষণ ছিল না। নায়েব মশায়ের প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই সচেতন হইয়া উঠিল। বৌটা সত্যই নাই: কাঙ্গালীর ঘর খালি পড়িয়া আছে।

—বৌটাকে নিয়ে কাঙ্গালীর কিছু গোলমাল হ'য়ে থাক্‌বে বোধ করি। সকলকেই শুনাইয়া রমানাথ একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের দিকে চাহিল।

ঘটনা এই পর্যন্ত। কিন্তু ইহার পর কাঙ্গালীর স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া যেসব কাহিনী পল্লবিত হইয়া উঠিল তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই এবং গল্পও নহে। গল্প হয় ত এইটুকু:

নূতন নায়েব রমানাথ অতি অল্প মূল্যে কেন যে কাঙ্গালীকে ঘাট বিলি করিয়াছিলেন, তাহা অন্যে না জানিলেও চরণ জানিত। তাই একদিন সে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল, ঈশান দাসের সাহস ছিল, কিন্তু বুদ্ধি ছিল না।

হয় ত সত্য। কেবল বুদ্ধির দোষেই ঈশানের মত পাকা লোককেও অকালে মরিতে হইল। ঘোড়ায় চড়িয়া সেই যে বাহির হইয়া গেল আর ফিরিল না।

কিন্তু রমানাথ ঈশানের মত নির্বোধ নয়। অল্প বয়সটাকে সে এমন করিয়া পাঁচজনের সম্মুখে দাঁড় করাইল যে, সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণের ছেলে—বংশগুণ যাবে কোথায়!

রমানাথ ঈশান দাসের পরিত্যক্ত আসনে ভাল হইয়া বসিল। বসিয়াই দেখিল কাঙ্গালীর বৌকে: হাল্কা একখানি সাদা মেঘ—পল্লীর নীল বুকে যেন উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে।

চরণ কাঙ্গালীর কানে মন্ত্র দিয়াছে, ঘাট যদি পেতে চাস্, বৌকে দে মা-ঠাকরুণের কাছে পাঠিয়ে।

রমানাথের খ্যাতি—বিনয় এবং সদাচারকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে কাঙ্গালীর ধারণা হইয়াছিল, এই দেবতার চরণ ধরিয়া পড়িলে কি না হয়!

রমানাথ স্বপ্ন দেখে: সেই সাদা মেঘের স্বপ্ন। ঘোড়া ছুটাইয়া সেও চলিয়াছে, আর ফিরিল না।

কাঙ্গালীর বৌ আসিয়া যখন নায়েব-বাড়ী প্রবেশ করিল, তখন রমানাথ কি-একটা কাজে নীচে নামিতেছিল। সিঁড়ির পথে হইল দেখা।

কাঙ্গালীর বৌ লজ্জায় জড়সড় হইয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

রমানাথের ইচ্ছা হইল তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দুটি কথা বলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তাহার সেই সাদা মেঘের স্বপ্ন। হয় ত কাঙ্গালী এইখানেই কোথাও ওৎ পাতিয়া আছে: ঈশান দাসও ত একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।—রমানাথ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, ওপরে এসো।

উপরে আসিয়া কাঙ্গালীর বৌ একবার চারিদিকটা দেখিয়া লইল। ঘরগুলি প'ড়ো-বাড়ীর মতই ভয়াবহ! যেন কতকালের কুৎসিতকাহিনী তাদের প্রতিটি দেওয়ালে আঁকা রহিয়াছে!

রমানাথ বুঝিল, বৌটা ভয় পাইয়াছে। বলিল, তোমাদের মা-ঠাকরুণের এখনও পুজো শেষ হয়নি।

—যাক্, মা-ঠাকরুণ তা হ'লে আছেন—আপন মনে উচ্চারণ করিয়া বৌটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

—তুমি কে, তা ত বল্লে না? তোমার নাম কি? রমানাথের চোখে ক্ষুধিত দৃষ্টি।

—আমরা বড় গরীব। বলিয়া বৌটা মুখ নামায়।

—তোমার নাম ত বল্লে না?

—আমার নাম সখিয়া।

—বাঃ, বেশ নাম ত।

সখিয়া লজ্জায় লাল হইয়া ওঠে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও হয় ত আসে, সেইটুকু ঢাকিতেই সে মুখ নীচু করিল। বলিল, গোমস্তাবাবু জানেন—ঐ ঘাটই আমাদের সম্বল।

—ও, তুমি কাঙ্গালীর বৌ?

—হুজুর—বলিয়া কাঙ্গালীর বৌ রমানাথের পায়ের উপর পড়িয়া গেল।

রমানাথ সখিয়ার অনেক খবরই একটু একটু করিয়া জানিয়া লইল। কোথায় তাহার বাড়ী, কেই বা তাহার আর আছে। কিন্তু কাঙ্গালী সম্বন্ধে সখিয়া একটি কথাও ভাঙিল না। তা না ভাঙুক—রমানাথ বুঝিল, তাহার কাছে কাঙ্গালী অতি তুচ্ছ। মুখখানিকে যথাসম্ভব হাসিতে সুশ্রী করিয়া রমানাথ দুটি টাকা বাহির করিয়া সখিয়াকে দিল।

সখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

—এখন এই নে।

সখিয়া নড়ে না। রমানাথ হাসিয়া ফেলিল। সখিয়ারও তা হ'লে আত্মমর্যাদা আছে! বলিল, ঐ দুটো টাকা দিয়েই বিদায় দেবো না রে—ঘাটের ব্যবস্থা আমি করব। কাল কাঙ্গালীকে একবার পাঠিয়ে দিস্।

সখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বার বার তাহার মাথাটি রমানাথের পায়ের উপর রাখিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল।

—ছাড়্ ছাড়্, আমাকে এখন পূজো করতে হবে।

সখিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, রমানাথ তখন নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে। টাকা দুইটি আঁচলে বাঁধিয়া সখিয়া ধীরে ধীরে নায়েব-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন কাঙ্গালী আসিল। রমানাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। স্বপ্নের সেই কালো-দেহের সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য আছে কি-না, বোধ-করি তাহাই দেখিতেছিল। বলিল, খেতে দিতে পারবি না ত বিয়ে করেছিলি কেন?

কাঙ্গালী 'আজ্ঞে আজ্ঞে' করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না।

—মাঝির কাজ কত দিন করছিস?

—আজ্ঞে, ছোট থেকেই।

—তবে টাকা দিতে পারবি না কেন?

—আজ্ঞে, কিছু নেই হুজুর।—বিয়ে করতেই শোথানেক বেরিয়ে গেল।

রমানাথ মুখ বাঁকাইয়া হাসিল। বলিল, তবে আর কি! এখন বৌ-ই তোকে খাওয়াক।

—হুজুর!

রমানাথ ধমক দিয়া বলিল, চোপ! কত টাকা দিবি?

কাঙ্গালী তাহার কাপড়ের গিঁট খুলিয়া পঞ্চাশটি টাকা বাহির করিয়া রমানাথের পায়ের কাছে রাখিল। বলিল, আমার আর একটি পয়সাও রইল না হুজুর!

চরণ ঠিকই বলিয়াছে, তাহাদের খুবই ভাগ্য তাই এমন মনিব পাইয়াছে। কাঙ্গালীর খুশী আর ধরে না। সারাদিন নৌকার কাজ করিয়া একটু অবসর পাইলেই কাঙ্গালী নায়েব-বাড়ী আসিয়া হাজির হয়। ইচ্ছা—কত তুচ্ছ কাজই ত রহিয়াছে, যাহা হয় নিজের হাতে করিয়া দিয়াও যদি একটু কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারে। রমানাথ কোনদিন যদি বলে, কি রে, কাজকর্ম্ম কেমন চল্‌ছে কাঙ্গালী? কাঙ্গালী অম্নি আহ্লাদে গলিয়া পড়ে। ঐ একটুমাত্র কথা—কাঙ্গালী যেন উহার মধ্যে কত অনুগ্রহের সন্ধান পায়। আস্তে আস্তে রমানাথের পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার পা টিপিয়া দেয়।

সেদিন কাঙ্গালী আসিতেই রমানাথ বলিল, আরে, একটা ঝি ঠিক ক'রে দিতে পারিস—দু-এক দিনের জন্যে? ঝি-টার কাল থেকে হয়েছে জ্বর—

—বৌকে পাঠিয়ে দেব, আমরা আপনারই ত খাচ্ছি হুজুর! বলিয়া কাঙ্গালী যেন পরম তৃপ্তি অনুভব করিল। তাহার মত লোক মনিবের একটা উপকারে আসিবে ইহা কি কম কথা?

সখিয়া আবার আসিল। কিন্তু আসিয়াই মনে করিল, না আসিলেই ছিল ভাল।

সখিয়া নীরবে কাজ করিয়া যায়, রমানাথ একটি কথাও বলে না। শুধু আড়ালে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখে। দেখে, কি আছে ঐ নীরবতার মাঝে? ওকি আমার কথা একবারও ভাবে না? আমার এই রূপ, এই ঐশ্বর্য—ইহার কোনটিই কি উহাকে মুগ্ধ করে নাই? এখনও কি ও কাঙ্গালীর কথা মনে-প্রাণে ভাবিতে পারিতেছে?

হঠাৎ চোখো-চোখি হইয়া যায়। সখিয়া চোখ নামায়।

—বাঃ, সব কাজ শেষ হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি! বলিয়া রমানাথ একমুখ হাসি লইয়া দুটি টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল।

সখিয়া কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, রমানাথ বাধা দিয়া বলিল, আমি মনিব, 'না' বল্‌তে নেই।

কাঙ্গালী টাকা দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসে। বলে, রাজা—রাজা। ওদের কাছে কি এর দাম আছে রে!

পরদিনও যথাসময়ে সখিয়া আসিয়া কাজে লাগিল। রমানাথ তাহার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে—ইচ্ছা করিয়াই, একখানি পাঁচটাকার নোট যেন পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছে এইভাবে ফেলিয়া গেল।

ফিরিতে তাহার দেরী হইল না। আসিয়া দেখিল, সখিয়া কাজ সারিয়া তাহারই ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

—কি গো সখি?

সখিয়া নোট বাহির করিয়া সম্মুখে ধরিল: আপনার পকেট থেকে প'ড়ে গিয়েছে।

রমানাথ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, পকেট থেকে! বলিয়াই মৃদু হাসিল।

বলা বাহুল্য রমানাথ সে টাকা আর লইল না।

সখিয়ার বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। ভাবিল, কোন রকমে একবার এই বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতে পারিলে আর সে ইহার ছায়াও মাড়াইবে না।

রমানাথ ইহার অর্থ বোঝে। বলিল, যা, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে না। কেউ দেখে ত—

কিন্তু সখিয়াকে আবার যাইতে হইল। তাহার শত অনুনয় বিনয় কাঙ্গালীর উচ্চকণ্ঠের নীচে চাপা পড়িয়া গেল। বলিল, হারামজাদি! তোর রূপ দেখে আমার পেট ভর্‌বে? খাবি কি? এই ঘাট যদি আজ কেড়ে নেয়—যা লক্ষ্মী, অমন বাবু আর হয় না। ঝিটার অসুখ হ'লো, ভাবলাম, আমরা থাকৃতে বাবুর কষ্ট হবে—তা হারামজাদির দুদিন খেটে দিলে গতর ক্ষয়ে যাবে!

সখিয়া কাঁদিতেও পারিতেছিল না: তাহার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে।

—তাও তুই মাগনা খাটিসনি, বাবু টাকা দিয়েছে।

সখিয়ার আর সহ্য হইল না। ঘৃণায় সর্বশরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পাঁচ টাকার সেই নোটখানা কাঙ্গালীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঘরে বসিয়াই রমানাথ টের পাইল, সখিয়া আসিয়াছে এবং কাজও করিতেছে। কিন্তু আজ সে ঘর হইতে বাহিরই হইল না। শুধু সিন্দুকটার দিকে চোখ রাখিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কাজ সারিয়া সখিয়া নিজেই উপরে আসিল। বলিল, কই, টাকা দেবে না বাবু?

রমানাথ হাসিতে হাসিতে সিন্দুক খুলিল।

সখিয়া চোখের নিমেষে টেবিলের উপর হইতে একটি পিতলের তালা তুলিয়া লইয়া রমানাথকে ছুঁড়িয়া মারিল।

রমানাথ আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কপাল কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। সখিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

একটু পরে চরণ আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই সখিয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল।

সারাদিন তার উদ্বেগের আর অন্ত রহিল না। তাহার কেবলই থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, হয় ত একটু পরেই তাহাদের উভয়েরই ডাক আসিবে: হয় ত একটা ভীষণ শাস্তি তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াই আছে। একটা ভীরু দৃষ্টি লইয়া সে যেন প্রতিটি চেতন-অচেতন বস্তুকে নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া ফিরিতেছে।—কেন সে অমন করিল? হয় ত তাহারই বুঝিবার ভুল। টাকা দিয়াছে, তাহাতে কি হইয়াছে? তাহারা গরীব, হাত পাতিতেই ত জন্মিয়াছে!

কাঙ্গালী ইহার কিছুই জানিল না, সখিয়াও বলিল না।

শুধু তাহার অনুতপ্ত মন সারাক্ষণ রহিয়া রহিয়া আপন সীমাটুকুর মধ্যে গুম্‌রাইয়া কাঁদিয়াছে।

সকালবেলায় কাঙ্গালীর মুড়িগুড় নামাইয়া দিয়া সখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কাঙ্গালী মুখ বাঁকাইয়া হাসিল।

সখিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া যেন ছুটিতে লাগিল। অনেক দয়াই ত করিয়াছেন, এবার কি তিনি ক্ষমা করিবেন না? রমানাথের রক্তমাখা মুখ মনে করিতে তাহার বুক শুকাইয়া যায়।

সখিয়া উপরে আসিয়া দেখিল, রমানাথ তখনও বিছানায় শুইয়া আছে। কপালটা নেকড়া দিয়া বাঁধা। স্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ দরজার কাছে সে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। রমানাথ একবার চোখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, জ্বর হয়েছে।

সখিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিয়া তাহার পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিল।

রমানাথের বেশ লাগিতেছিল। চোখ বুজিয়া পরম তৃপ্তির সহিত তাহার আহত স্থানটিতে হাত বুলাইতে লাগিল।

—বাবু!

—হয়েছে, হয়েছে। বলিয়া রমানাথ উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মাথাটা বড় ঘুরিতেছে, জ্বরটাও আছে।

সখিয়া কাছে সরিয়া আসিল। চোখ দুটি তাহার জলে টল টল করিতেছে।

—আমি বোধ হয় আর বাঁচ্‌ব না সখি! রমানাথ বলিল।

সখিয়ার চোখের সম্মুখ হইতে কে যেন বাহিরটাকে লেপিয়া পুছিয়া দিয়া গেল। তারপর আর তাহার কিছু মনে নাই। হয় ত সমস্ত অবচেতনার মধ্যে একটি মমতা-মাখা হাত ধীরে ধীরে ঐ পীড়িতের কপাল স্পর্শ করিয়াছিল।

—ছাড়ুন। বলিয়া রমানাথের বাহুপাশ ছাড়াইয়া সখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বালিসের তলা হইতে কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া রমানাথ বলিল, আমাকে ক্ষমা করঃ অসুখে আমার মাথার ঠিক নাই।

সখিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার যেন কত যুগ এখানে কাটিয়া গিয়াছে! বাহির হইবার জন্য সে দরজা খুঁজিতে লাগিল।

—বল, ক্ষমা কর্‌লে? রমানাথ উঠিয়া তাহার হাত ধরিল।

—আপনার আবার রক্ত পড়্‌ছে!

—পড়ুক। বলিয়া রমানাথ তাহার কপালের ব্যাণ্ডেজ টান মারিয়া খুলিয়া ফেলিল।

সখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

—বল, একবার নিজের মুখে ব'লে যাও, ক্ষমা কর্‌লে?

সখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন।

রমানাথ শুইল, কিন্তু রক্ত পড়িতেই লাগিল।

সখিয়া তাড়াতাড়ি সেই রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ তুলিয়া লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার কপালে বাঁধিয়া দিল।

—সখি! রমানাথের হাতে টাকা।

—না।

—না, এ তোমাকে নিতেই হবে। আমাকে বুঝ্‌তে দাও, তুমি ক্ষমা করেছ।

সখিয়া টাকা লইয়া টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দু দিন সখিয়া শুধু নীরবে অশ্রুই ফেলিয়াছে। তাহার কাহিনী ত কাহাকেও বলিবার নয়। এ যে তাহার গোপনকাঁটা। ফেলিবারও উপায় নাই, বহিবারও সাধ্য নাই!

রমানাথের অসুখ আর লুকানো রহিল না। কাঙ্গালীও শুনিল। কিন্তু সখিয়ার মুখ শুকাইয়া গেল।—কাঙ্গালী যদি আরও কিছু শুনিয়া থাকে?

সন্ধ্যা হইতেই কাঙ্গালী আসিয়া চুপ-চুপ করিয়া বলিল, একবার যা না সখি, খবরটা নিয়ে আয় মনিব আমাদের—

সখিয়া একবার কাঙ্গালীর দিকে চাহিল। সে চোখে কি ছিল, ঘৃণা? না, নিরুপায় দরিদ্র স্বামীর প্রতি মমতা?

সে রাত্রি সখিয়া গৃহে ফিরিল না। কাঙ্গালী সারারাত্রি প্রতীক্ষাই করিয়াছে, কিন্তু খোঁজ লইতে পারে নাই। কি করিয়া পারিবে? গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি—নায়েব-বাড়ীর সমস্ত অর্গল বন্ধ হইয়া গিয়াছে: দূর বাহিরের ক্ষীণকণ্ঠ ধনীর প্রাসাদ-দ্বারে হয় ত মাথা ঠুকিয়াই মরিবে! তাহার কণ্ঠ পৌছাইয়া দিবার জন্য একটি প্রাণীও হয় ত জাগিয়া নাই!

কাঙ্গালীর কত কথাই মনে হইল। হয় ত রাধুর অসুখ বাড়িয়াছে, হয় ত সখিয়া রাগ করিয়াই মা-ঠাকরুণের কাছে থাকিয়া গেল। কিম্বা---

এই 'কিম্বা' মনে হইতেই কাঙ্গালীর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরে নিজের ভুলে নিজেই লজ্জিত হইয়া তাহার দুর্বল মনটাকে ছি ছি করিতে লাগিল। তাহাদের যে দেবতা মনিব।—

ভোরের আঁধারে পা টিপিয়া টিপিয়া সখিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কাঙ্গালী তখনও জাগিয়া আছে। হয় ত এই ভোরের প্রতীক্ষাই করিতেছিল সে। সখিয়া হাসিল। বলিল, ভাবনা হয়েছিল বুঝি?

—বাবু, বাবু কেমন আছে? কাঙ্গালী জিজ্ঞাসা করিল।

সখিয়া তেম্নি করিয়াই হাসিয়া উত্তর দিল, ভাল আছে।

কাঙ্গালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এই প্রথম শিহরিয়া উঠিল।

নির্বোধ কাঙ্গালী যেদিন সমস্তই টের পাইল, সেইদিনই তাহার জীবনে যবনিকা পড়িল।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কাঙ্গালী নৌকা লইয়া সেই যে গঞ্জে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

আর সখিয়া? সখিয়া হয় ত তখন রমানাথের শুভ্র-শয্যায় অনাগত আর এক মধুযামিনীর স্বপ্ন দেখিতেছিল।

কাঙ্গালী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সখিয়াও হয় ত শুনিয়াছে: হয় ত কাঁদিয়াছেও। কিন্তু সে কান্না শুনিল ভগবান।

হবো আমি সাবধান

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

প্রিয়া ওগো প্রিয়তমা,
তব অজানিত অপরাধগুলি'
কর আজি তুমি ক্ষমা!
কর, কর ক্ষমা কর'
হৃদয়ের বোঝা নামাইতে দাও—
ব্যথা দুঃসহতর!
যতবার যাই, ফিরে আসি পুনঃ,
আগাইয়া পিছু আসি;

মনে হয় যেন বিচ্ছেদ সুরে—
বাজে মিলনের বাঁশী!
শুনিয়া চমকি! শিহরিয়া উঠি!
মনে মনে ভাবি কত;
কবে কোন্‌দিন অজ্ঞাতে তব
দোষ করিয়াছি শত!
সংশয় যত হৃদয়তে জাগে,
বাড়ে তত ব্যবধান—

ক্ষম, ক্ষম প্রিয়া, এইবার মোরে,
হবো আমি সাবধান।

জাপানের শিক্ষানীতি

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ

আমাদের আধুনিক শিক্ষানীতির গলদ জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দীর্ঘকাল শিক্ষা-বিভাগের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিয়া আমরা ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি। সুখের বিষয়, দেশের অনেক চিন্তাশীল মনীষী গুরুতর ও জটিল শিক্ষা-সমস্যার সুসঙ্গত সমাধানের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন বিশ্বভারতীর মারফৎ সারা বিশ্বের সভ্যতা ও কৃষ্টির আদান-প্রদানের বিপুল আয়োজনে। ওয়ার্দ্ধা-শিক্ষা-পরিকল্পনার সাহায্যে শিক্ষাকে কর্ম্মজীবনের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে মহাত্মা গান্ধীর প্রাণে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিতর দিয়া দেশের অন্ন-সমস্যার মীমাংসায় তাঁহার বিরাট কর্ম্মশক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার নিয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরাট ব্যবধানই আমাদের শিক্ষার প্রধান ত্রুটি। সুতরাং বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষা সংস্কারকগণের চেষ্টার মূলে রহিয়াছে—জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় সাধন। আধুনিক জাপানের শিক্ষানীতি—জ্ঞান ও কর্ম্মের সুন্দর সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাপানকে সভ্যজগতে মহীয়ান ও গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। এই শিক্ষানীতির ভিতর হয়ত ভারতের শিক্ষা-সমস্যা-সমাধানের পন্থা আবিষ্কারের আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। তাই জাপানের শিক্ষানীতি আলোচনার প্রয়োজন।

আজ জাপানের বিপুল শৌর্য্যবীর্য্য ও উগ্র রাজ্যলিপ্সার তাড়নায় চীন বিপন্ন। কিন্তু একদিন চীনই ছিল জাপানী সভ্যতা ও সাধনার সূতিকাগৃহ। চৈনিক সভ্যতাই জাপানের আদি শিক্ষা-দীক্ষার জননী। প্রাচীন জাপানীরা ছিল সিণ্টো ধর্ম্মাবলম্বী। প্রকৃতি পূজার ভিতর দিয়াই সিণ্টো ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখন শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল ধর্ম্মযাজক পুরোহিতগণের হস্তে। তাঁহারা এই ধর্ম্মমূলক শিক্ষাই আদিম জাপানীদের ঘরে ঘরে প্রচার করিতেন। এখানে-সেখানে দুই-একটা বিদ্যায়তনও ছিল। পুরোহিতগণই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যাপনা করিতেন। প্রাচীন ভারতের অধ্যাপকদের ন্যায় তাঁহারাও ছাত্রগণের নিকট হইতে আর্থিক দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু ছাত্রবেতনের পরিবর্ত্তে তণ্ডুল গ্রহণের রীতি তখন প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কনফিউসিয়ানিজম্ জাপানের শিক্ষিত সমাজের রীতিনীতি ও শিক্ষা-পদ্ধতির অনেকটা সংস্কার সাধন করিল। জাপান যখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল তখনও ধর্ম্মযাজকরাই ছিলেন জাপানের শিক্ষাগুরু।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকালে জাপানের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। "গুণকর্ম্ম বিভাগ" অনুসারে জাপানী-সমাজে শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জাপানী সমাজ—(১) রাজকর্ম্মচারী ও যোদ্ধা, (২) কৃষক, (৩) শিল্পী, (৪) বণিক ও (৫) এইনু (Ainu)—এই পাঁচভাগে বিভক্ত হইল। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া রাজকীয় ও সামরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তাহারা দাইমিয়ো (Daimios)-দিগের অধীনে যথাযোগ্য বেতনে চাকুরী করিত। তখন দাইমিয়োদিগের হাতেই ছিল রাজশক্তি। এই রাজকর্ম্মচারী ও যোদ্ধাশ্রেণীর লোকেরা প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। তাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ লেখাপড়া ও শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা করিত। মধ্যশ্রেণীর শিক্ষালয়ে তাহাদের শিখিতে হইত—চীন-জাপানের ইতিহাস ও আপিসের পত্রাদি লিখিবার রীতিনীতি ইত্যাদি। অবশিষ্ট চারি শ্রেণীর লোকদের জন্য কেবল প্রাথমিক শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে পিণ্টো নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ নাবিক প্রথম জাপানে পদার্পণ করেন। তখন হইতেই ইউরোপের সহিত জাপানের পরিচয়ের সূত্রপাত হইল। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ জাপানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার সুরু করিল। দিনে দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনা জাপানকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল। চৈনিক সভ্যতার জড়তা যেন নবীন জাপানের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হইয়া উঠিল। কাজেই কর্ম্মকুশল জাপান কর্ম্মপ্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। ইহার ভিতর দিয়াই যেন জাপান আপন মুক্তি-পথের সন্ধান খুঁজিয়া পাইল।

শিক্ষা মানব-সভ্যতা ও সাধনার ভিত্তিভূমি। যখন কোন জাতির সভ্যতার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হয় তখন শিক্ষা-

দীক্ষার আমূল সংস্কার অনিবার্য্য হইয়া ওঠে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব যখন জাপানী সভ্যতার সর্ব্বস্তরে আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল তখন জাপানের শিক্ষার সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সময়োপযোগী শিক্ষা-সংস্কারের ফলেই জাপান আজ সভ্যজগতে ধন্য ও বরেণ্য। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানে ইউরোপীয় আদর্শে জাতীয় শিক্ষার সূত্রপাত হয়। জাপানে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তনে জাপানী শিক্ষানীতির অনেক সংস্কার হইল। জাপানের শিক্ষা-দীক্ষা নূতন আদর্শে গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

বর্ত্তমান জাপান প্রাথমিক শিক্ষায় আমেরিকার ও উচ্চশিক্ষায় জার্ম্মানীর আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছে। জাপান অন্যের আদর্শকে নিজের ছাঁচে না ঢালিয়া কখনই বিজাতীয় কোন কিছুর অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত নয়। জাপান আপন সভ্যতা ও সাধনার মূলভিত্তির উপরই পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জাপানের শিক্ষা-সংস্কারকগণ সাধারণ বিদ্যালয়গুলির সহিত টেকনিকেল স্কুলসমূহের বেশ একটা সুন্দর সমন্বয় ও সংযোগের সূত্র বাঁধিয়া দিয়াছেন। প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে। একের সহিত অপরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। নিম্নলিখিত চিত্র হইতে ইহাদের সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইবে।
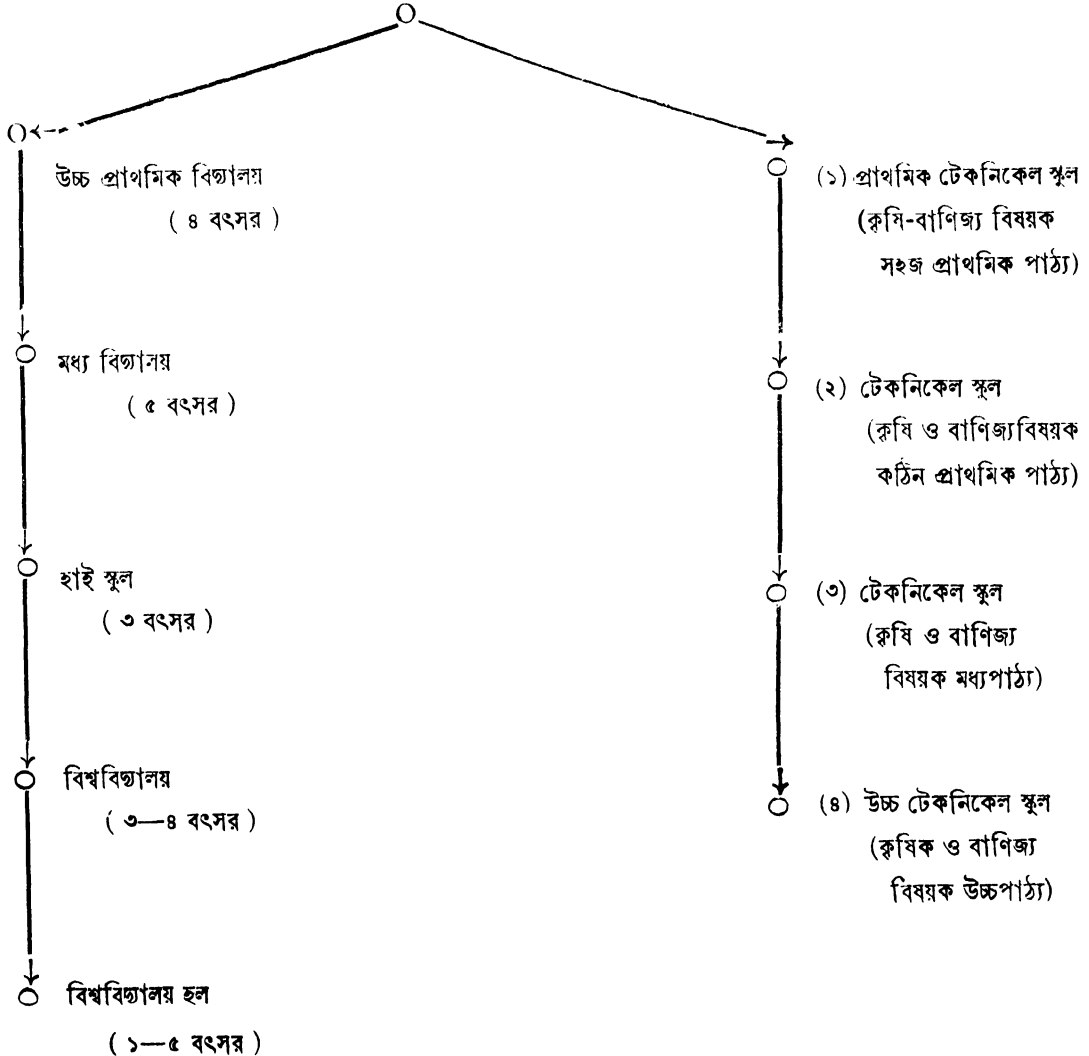
জাপানে ছয় বৎসর বয়সে বালক-বালিকা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এখানে ছাত্রগণ সাধারণ লেখাপড়া, গণিত, নৈতিক উপদেশ, শারীরিক ব্যায়াম, চিত্রাঙ্কণ ও হস্তশিল্প শিক্ষা করে। এখানকার পড়া শেষ হইলে শিক্ষার্থী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা প্রাথমিক টেকনিকল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারে। উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য ব্যতীত জাপানের ইতিহাস, ভূগোল ও ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রগণকে চারি বৎসর পড়িতে হয়। কিন্তু কেহ ইচ্ছা করিলে দুই বৎসর পড়িয়াই মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে অথবা উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা দুই নম্বর টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে। উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মধ্য শ্রেণীর তিন নম্বর টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করিতে কোন আপত্তি নাই। উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ছাত্রছাত্রী সাধারণ নর্ম্ম্যাল স্কুলে পড়িতে পারে এবং সেখানকার শিক্ষা শেষ হইলে তাহারা উচ্চ নর্ম্ম্যাল স্কুলেও ভর্ত্তি হইতে পারে।

উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে অন্ততঃ বার বৎসর বয়সে মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে পাঁচ বৎসর শিক্ষালাভ করা দরকার। উচ্চাঙ্গের নৈতিক উপদেশ, জাপানী ও চীনা সাহিত্য, বিদেশী ভাষা (ইংরেজী), ইতিহাস, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, শারীরিক ব্যায়াম, আইন, অর্থনীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সকল বিষয়ই মাতৃভাষার সাহায্যে শেখানো হয়। ইংরেজী ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বিদেশী ভাষায় পড়ান হয় না। মধ্য শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ সতর বৎসর বয়সে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য হাই স্কুলে, উচ্চ নর্ম্ম্যাল স্কুল ও মেডিকেল স্কুলে অথবা উচ্চ টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে। হাই স্কুলের পাঠ্য তিনভাগে বিভক্ত:—

(১) আইন কলেজে প্রবেশ করিবার উপযোগী পাঠ্য।

(২) কৃষি-বিজ্ঞান ও ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিবার উপযোগী পাঠ্য।

(৩) মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিবার উপযোগী পাঠ্য। জাপানের আইন কলেজে কেবল আইন শিক্ষা দেওয়া হয় না; সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিও পড়ান হয়। জাপানের আইন কলেজ আমাদের আর্ট কলেজের অনুরূপ। হাই স্কুলে তিন বৎসর পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। তখন বয়স অন্ততঃ উনিশ বৎসর হওয়া চাই। সেখানে তিন-চার বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া বি-এ পাশ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় হলে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে।

টেকনিকেল স্কুলগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে। প্রাথমিক টেকনিকেল স্কুল হইতে ক্রমে উচ্চতর টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করা যায়। সাধারন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লইয়া যদি কেহ প্রাথমিক টেকনিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া সেখানকার পাঠ্য যথাযথরূপে অধ্যয়ন করে তবে সে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর টেকনিকেল স্কুলে পড়িতে পারে। তজ্জন্য উচ্চপ্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে তাহার পড়িবার প্রয়োজন হয় না। ভারতে কিন্তু এ সুবিধা ও সুযোগের নিতান্ত অভাব। এখানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন ছাত্র ইন্‌জিনিয়ারিং অথবা মেডিকেল স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করিলেও আই-এ অথবা আই, এস্‌-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ইন্‌জিনিয়ারিং কিংবা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে না।

জাপানে যাহারা খুব মেধাবী ছাত্র কেবল তাহারাই সাধারণত হাই স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। একবার যাহারা হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়, তাহারা বোধ হয় আর টেকনিকেল স্কুলে পড়ে না। জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছাত্রগণের মৌলিক গবেষণার সাহায্য করা অথবা উচ্চ রাজকার্য্যের উপযোগী মানুষ গঠন করিয়া তোলা। জাপানে টোকিও ও কাইটো এই দুইটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় ছয়টি কলেজ ও কাইটো বিশ্ববিদ্যালয় চারিটি কলেজ লইয়া গঠিত। জাপানে দুইটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। পুরুষদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। মেয়েদের জন্য মনাকায় একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রতিভাশালী ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় হলে প্রবেশ করে। প্রত্যেক কলেজ হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র হলে পড়িবার জন্য মনোনীত হইয়া থাকে। ভারতের ন্যায় জাপানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে-কোন ছাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয় হলে প্রবেশ করিবার

অনুমতি দেওয়া হয় না। সেইজন্য জাপানে উচ্চশিক্ষিত যুবকগণের সংখ্যা খুব বেশী নহে এবং তাহারা বেকারও বসিয়া থাকে না। বেকার-সমস্যার জন্য জাপানকে এতটা মাথা ঘামাইতে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় হলে পাঁচ বৎসর মৌলিক গবেষণা করিয়া ছাত্রগণকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এই প্রবন্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে ছাত্রগণ হাকুসি (Hakushi) অথবা গাকুসি (Gakushi) অর্থাৎ পি-এইচ্ ডি কিংবা এম্ এ উপাধি পাইয়া থাকেন।

জাপানের শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোপরি কর্ত্তা—একজন কেবিনেট মন্ত্রী। একজন সম্পাদক, কয়েকজন আইন পরামর্শদাতা ও পরিদর্শক কর্ম্মচারী মন্ত্রী মহাশয়কে শিক্ষা বিভাগের কার্য্য পরিচালনায় সাহায্য করিয়া থাকে।

জাপানে যাহারা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হইতে শিক্ষকতা করিবার সনদ না পায়, তাহারা শিক্ষক হইতে পারে না। ভারতের ন্যায় জাপানে বি-টি অথবা এল-টি পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত নাই। উচ্চ নর্ম্ম্যাল স্কুলের বি-এ উপাধিধারী শিক্ষকগণ ললিতকলা ও সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এবং যাহারা সনদ পাওয়ার উপযোগী শিক্ষাবিভাগের পরীক্ষা পাশ করিতে পারেন—কেবল তাঁহারাই হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সনদ পাইয়া থাকেন। জাপানের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই একটা নর্ম্ম্যাল স্কুল আছে। কয়েক বৎসর হইল সমগ্র জাপানে সাতান্নটি নর্ম্ম্যাল স্কুল ছিল। আমাদের বাংলায় মাত্র পাঁচটি নর্ম্ম্যাল স্কুল। তন্মধ্যে গত বৎসর একটির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ভারতের নর্ম্ম্যাল স্কুলের ন্যায় জাপানের নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্রগণকেও বেতন দিতে হয় না। তাহাদের আহারাদির সমস্ত ব্যয় নর্ম্ম্যাল স্কুলের কর্তৃপক্ষ বহন করিয়া থাকে। নর্ম্ম্যাল স্কুলে পুরুষদের চারি বৎসর ও মেয়েদের তিন বৎসর পড়িতে হয়। উচ্চ নর্ম্ম্যাল স্কুলের ব্যয়ভার জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। সেখানে মেয়ে-পুরুষ সকলকেই চারি বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়।

ভারতের ন্যায় জাপানেও শিক্ষকতার আদর নাই। অন্য কোন কাজের সুবিধা না হইলেই মানুষ গুরুগিরি খুঁজিয়া লয়। সেখানে শিক্ষকগণ এক স্কুলে দীর্ঘকাল কাজ করেন না। যদি কেহ পনর বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং তাহার বয়স ষাট বৎসর হয়, তবে তিনি পেন্সন্ ভোগ করিতে পারেন। জাপানে শিক্ষকগণের পারিবারিক পেন্সনের প্রথা প্রচলিত আছে। দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর কোন শিক্ষকের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গ পেন্সন্ ভোগ করিতে পারে। জাপানে হাইস্কুলের শিক্ষকের মাসিক বেতন এক হইতে সাত পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কলেজের অধ্যাপকের মাসিক বেতন পাঁচ হইতে পঁচিশ পাউণ্ডের বেশী হয় না।

জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কিন্তু অবৈতনিক নহে। মার্কিন যুক্তরাজ্যে, কানাডায় ও ফ্রান্সে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। জার্ম্মানীতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলেও অবৈতনিক নহে। জাপানে গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর গড়ে একজনের শিক্ষার জন্য চৌদ্দ আনা ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট এক আনার কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় করিয়াও শিক্ষাবিভাগে ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার পন্থা খুঁজিয়া থাকেন।

জাপানে জেলা বোর্ড অথবা গবর্ণমেণ্ট হইতে বিদ্যালয়ে সাহায্য দেওয়ার রীতি নাই। দুই-একটা সরকারী বিদ্যালয় ব্যতীত প্রায় সকল স্কুলই সর্ব্বসাধারণের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। জাপানে ছাত্রগণকে বৃত্তি অথবা পুরস্কার দেওয়া হয় না। একান্ত প্রয়োজন হইলে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণকে অর্থসাহায্য করা হয়। কিন্তু এই সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়।

ভারতের ন্যায় জাপানী বিদ্যালয়ে বিরাট লিখিত পরীক্ষা-প্রণালী নাই। ছাত্রগণের প্রমোশন পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিলেও সেখানে হাতে কলমে লিখিয়া পরীক্ষা দিতে হয় না। সকল পরীক্ষাই মৌখিক। ছাপান প্রশ্নপত্রও নাই, পরীক্ষার ফিসও নাই। জাপানী ছাত্রগণ পরীক্ষায় কম নম্বর পাইলে অথবা অকৃতকার্য্য হইলে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। ছাত্রগণকে কড়া শাসন করিলে তাহারা ধর্ম্ম-ঘট করিয়া বসে। জাপানে শাসনশৃঙ্খলা রক্ষা করা বড়ই দুষ্কর।

রাজ-বিধি অনুসারে জাপানের ছোট-বড় সকলকেই ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয়। ভারতে কিন্তু এমন কোন বাধাবাধি নিয়ম নাই। জাপানে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স আছে। আমাদের দেশে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ

করিবার সময় বয়সের কড়াকড়ি আছে কিন্তু বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার কালে বয়সের কোন বিশেষ বিধান নাই।

জাপানী শিক্ষার আর একটি সুবিধা—সকল বিষয়ই মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতে বিজাতীয় ভাষায় সকল বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। সম্প্রতি অনেক আবেদন-আন্দোলনের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনরূপে গণ্য হইয়াছে। বিদেশীর ভাষায় সকল বিষয় শিখিতে হইলে বিদেশী ভাষাটিকে ভালরূপে আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কেবল বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে করিতেই ভারতীয় ছাত্রগণের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় চলিয়া যায়। পরে স্বাস্থ্য ও বলবীর্য্যের অভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা অনেক সময় তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে না। কেবল বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে বিদ্যা আয়ত্ত করিলে ভাবপ্রবণ যুবকহৃদয়ে স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার প্রতি অনাস্থা ও অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া ওঠে। দেশাত্মবোধের তীব্র অনুভূতি যেন বৈদেশিক কৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে।

পুতুল খেলা

শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র

গজনীর হাটে এবার রথের দিনে
আমার ছেলের ছোট মেয়ে নিজে গিয়ে,
একটি মোমের পুতুল এনেছে কিনে
এক টাকা আর সতেরো পয়সা দিয়ে ;
মহা আনন্দে তার সাথে করি খেলা
কেটে যায় তার সারা বরষার বেলা,
আহারের কথা আজ আর মনে নাই
খালি ঘুরে' ফেরে পুতুলটি বুকে নিয়ে।

বহু পুরাতন সামিয়ানাখানি ছিঁড়ে
পুতুলের ধুতি করেছে সে তৈয়ার ;
গায়ের চাদর করেছে পুরাণো চীরে
নয়নে মাথায় কাজল বারংবার।
শুধালে তাহারে বলে : এটা মোর খোকা,
পরম আদরে গালে দেয় মৃদু টোকা,
চুমো খেয়ে বলে, ঘুমো তুই সোনামণি,
গুন্ গুন্ গান গায় ঘুম-পাড়াবার॥

আমি বসি আজ জীবনের পথ-মাঝে
চেয়ে চেয়ে দেখি মহা বিস্ময় মানি,
কী যে অপরূপ স্নেহময়ী রূপে রাজে
মোমের খোকার মায়ের মূরতিখানি!
চেয়ে চেয়ে দেখি, কত সুখ-সমাদরে
খোকাটিরে তার দোলায় বক্ষে ক'রে
কানে কানে তার অফুরান মমতায়
শুনায় কত না স্নেহের প্রলাপ-বাণী॥

মায়ের জাতি যে—হোক্ না বয়স কম,
আছে বুকভরা স্নেহের পীযূষ-ধার ;
আছে প্রেম, আছে ভালবাসা মনোরম,
আছে মায়া, আছে মমতার পারাবার।
মায়ের জাতির মা না হওয়া বড় লাজ,
তাই সযতনে চাপিয়া বক্ষ-মাঝ
রাখিয়াছে ধরে মোমের পুতুলটিকে,
ওরি মাঝে দেখে স্বপন কোন্ খোকার॥

—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য

শ্রীঅবনীনাথ রায়

আজকাল আমাদের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন যে, বাঙালীরা বিদেশে পূর্ব্বের ন্যায় আর সম্মান পাইতেছেন না। তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা প্রবাসে যেরকম প্রতিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা লাভ করিয়া গিয়াছেন আজকাল তাহা দুষ্প্রাপ্য। কথাটা সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ সম্বন্ধে কেহ কোন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি-না জানিতে পারি নাই। আমার ধারণা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ যে চরিত্রবলের প্রভাবে এই অযাচিত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহার একান্ত অভাব হইয়াছে। First deserve, then desire—এই নীতি এক্ষেত্রে পুরাপুরিভাবে খাটে।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে এই চরিত্রবলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্যের কিছু পরিচয় দিব। তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা এবং পণ্ডিত বলদেবরাম দাভের কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। যুক্তপ্রদেশের হিন্দুস্থানী মহলে তিনি কিরূপ সম্মানের সহিত পূজিত হইয়াছেন এই মন্তব্যের অংশ হইতে তাহা বোঝা যাইবে। মদনমোহন মালবীয়ের নাম ভারতবর্ষে বিখ্যাত। তাঁহার পরিচয়ের প্রয়োজন করে না। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝার নামও অনেকে শুনিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন। পণ্ডিত বলদেবরাম দাভে এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্যতম জজ স্যর সুন্দরলালের ভ্রাতা, কৃতী উকীল এবং এলাহাবাদ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় লিখিয়াছেন, "পণ্ডিতজী (আদিত্যরাম) বাল্যাবস্থা সে হি বলিষ্ঠ, তেজস্বী অউর উদ্যমশীল থে। ছাত্রাবস্থা সে প্রৌঢ়াবস্থা-তক বরাবর ব্যায়াম করতে রহে। বাদাম কা সেবন উন্ হোনে নিয়মপূর্ব্বক আজন্ম কিয়া। গৃহস্থী মে রহকর ভী ওয়ে ব্রহ্মচর্য্য কা পালন করতে থে। উন্‌কে ওজপূর্ণ নেত্র উনকে নাম কো সার্থক করতে থে। ওয়ে সত্যভাষী অউর স্পষ্টবক্তা থে। ঘুমাফিরাকর বাতেঁ করনা নহি জানতে থে। পরন্তু ব্যক্তিগত ভাব্‌সে ন তো কিসিকা প্রতিবাদ করতে থে অউর ন কটুবচন কহকর কিসিকো দুখী করতে থে। ওয়ে পরমার্থ সাধন মে নিয়মপূর্ব্বক লগে রহতে থে। অপনে জীবন কী নিত্যচর্য্যা মে ওয়ে ইয়ে বাত দিখ্‌লা গয়ে হেঁ কি অপনী গৃহস্থী কা কাম, জনতা কা কাম অউর পরমার্থিক কাম, ইন্ সভী কি তরফ ধ্যান রাখ্‌কর অউর ইনকা সামঞ্জস্য কর মনুষ্য কো কিস তরহ্ কর্ম্মশীল হোনা চাহিয়ে। বস্তুতঃ ওয়ে এক গৃহস্থ-যোগী থে।"

ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা লিখিয়াছেন, "ইস্‌কে রচয়িতা থে এক এইসে মহাপুরুষ জো মেরে শ্রদ্ধেয় পূজনীয় চিরস্মরণীয় মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্যজী কে শ্রদ্ধাপাত্র হুয়ে।"

পণ্ডিত বলদেবরাম দাভে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত আদিত্যরামজী স্বয়ং ভগবানকে ভক্ত অউর ভক্তজনো কে প্রেমী থে।"

উপরের উদ্ধৃত হিন্দী এত প্রাঞ্জল যে তাহার বাংলা অনুবাদ দেওয়ার প্রয়োজন হইল না।

আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য ইংরেজী ১৮৪৭ সালের ২৩এ নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগণা জেলায় রাজপুর গ্রামে তাঁহাদের নিবাস ছিল। ইঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ আদিশূরের সময়ে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। আদিত্যরামের গোত্র ছিল ঘৃতকৌষিক, ইঁহারা শুক্ল যজুর্বেদান্তর্গত কণ্বশাখা। আদিত্যরামের মতামহের নাম পণ্ডিত রাজীবলোচন ন্যায়ভূষণ। ইনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের প্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিত কাশীরাম বাচস্পতির পৌত্র। রাজীবলোচনের বাড়ী ছিল বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর গ্রামে। একমাত্র পুত্র যুবাবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পর সেই শোকে মুহ্যমান হইয়া রাজীবলোচন সপরিবারে বাংলাদেশ ছাড়িয়া কাশী চলিয়া

দান। কাশীতে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে কাশীতেও মন না টেঁকায় তিনি শেষ জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিবেন মনস্থ করিয়া কাশী ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে কয়েক দিনের জন্য প্রয়াগে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটে যাহার ফলে তাঁহার প্রয়াগে বসবাস চিরস্থায়ী হইয়া যায়।

এই সময় রেওয়ার রাজা ছিলেন মহারাজা জয়সিংহজু দেব। তিনি প্রতি বৎসর মকর-স্নান উপলক্ষে মাঘ মাসে যমুনার দক্ষিণ তীরে মাসাধিক কাল কল্পবাস করিতেন। রেওয়া রাজ্যের পরিধি তৎকালে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একদিন স্নানের পর রাজীবলোচন নদীতীরে পূজা আহ্নিক এবং স্তোত্রপাঠ করিতেছিলেন। মহারাজা জয়সিংহ তাহা দেখিতে পান এবং রাজীবলোচনের ভক্তিভাব দেখিয়া মুগ্ধ হন। পরিচয় গ্রহণান্তর মহারাজা জয়সিংহ রাজীবলোচনকে বৃন্দাবন যাওয়ার সংকল্প হইতে নিরস্ত করেন এবং তাঁহার বসবাসের জন্য এলাহাবাদে কীডগঞ্জে একটি ছোট বাড়ী কিনিয়া দেন। আর তাঁহার চরণ পূজার বৃত্তি স্বরূপ নিজরাজ্যের একটি গ্রাম দান করেন। ইহা সংবৎ ১৮৯১-এর কথা।

ত্রিবেণীর জলে জপ করিতে করিতে রাজীবলোচনের দেহান্ত হয়। আদিত্যরামের পিতার নাম ছিল পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য। রাজীবলোচনের কন্যার সঙ্গে রামকমলের বিবাহও এক আশ্চর্য্যভাবে সংঘটিত হয়। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া রামকমল তাঁহার পিতৃব্যের সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এলাহাবাদে আসিয়া পণ্ডিত রাজীবলোচনের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। রাজীবলোচনের এক কন্যা ছিল, তাঁর নাম ধন্যগোপী দেবী। রাজীবলোচন কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক সংস্কৃত শাস্ত্রে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কুলশীল ইত্যাদি মিলিয়া যাওয়ায় রাজীবলোচন দৈব-প্রেরিত রামকমলের সহিত স্বীয় পুত্রীর বিবাহ দেন। রামকমলের তিন পুত্র—বেণীমাধব, ঘনশ্যাম এবং আদিত্যরাম। ইঁহাদের মধ্যে দুই পুত্র এলাহাবাদেই থাকিয়া যান—মধ্যম ঘনশ্যাম বাংলা দেশে বাস করিতে আসেন।

ধন্যগোপী দেবী তাঁহার পিতার কাছে যথেষ্ট লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। সূতিকাগারেই তিনি আদিত্যরামের জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই জন্মকুণ্ডলী অদ্যাবধি সুরক্ষিত আছে। ধন্যগোপী দেবী এত দানশীলা ছিলেন যে তিনি অনেকবার নিজের গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দান করিয়াছেন। শোনা যায় যে যখন আদিত্যরাম গর্ভে ছিলেন তখন ধন্যগোপী স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর গর্ভে এক বিশিষ্ট পুরুষ আসিয়াছেন। বাংলা দেশে ভাটপাড়ায় গঙ্গাতীরে ধন্যগোপী দেবীর মৃত্যু হয়।

বেণীমাধব প্রয়াগে সরকারী কর্ম্ম করিতেন। তৎকালে এলাহাবাদে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা না থাকায় আদিত্যরামকে ইংরেজী এবং সংস্কৃত পড়িবার জন্য তিনি কাশী পাঠান। কাশীতে বিখ্যাত পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, পণ্ডিত বেচনরাম ত্রিপাঠী এবং পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কারের নিকট তিনি সংস্কৃত পড়েন। ১৮৬ খৃষ্টাব্দে আদিত্যরাম কাশীর সরকারী স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ সাহেব (R. T. H. Griffiths) খুব বিদ্বান এবং সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। গ্রিফিথ সাহেব বেদ, বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ এবং আরও অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। গ্রিফিথ সাহেবের দুইজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন—একজন পণ্ডিত লক্ষ্মীশঙ্কর মিশ্র, আর একজন আদিত্যরাম। কাশী হইতে বি-এ পাশ করিবার পর আদিত্যরাম স্থির করেন যে, তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পড়িবেন। কারণ তাহা হইলে তিনি গ্রিফিথ সাহেবের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইতে পারিবেন। কিন্তু গ্রিফিথ সাহেব নিজেই তাঁহাকে সংস্কৃতে এম-এ পড়িবার জন্য আদেশ করিলেন। সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত এদিকে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। আগ্রা পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা ছিল। সেই কারণে আদিত্যরাম কলিকাতা আসিয়া এক বৎসর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া এম-এ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় আদিত্যরাম অনেক বৃত্তি, সুবর্ণপদক এবং পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তাঁহার পড়ার জন্য পৃথক ব্যয় লাগিত না। এই সময়

বিশ বৎসর বয়সে কাঁঠালপাড়ায় তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রীর নাম শ্যামাঙ্গিনী দেবী।

এম-এ পাশ করিবার পরই গ্রিফিথ সাহেবের চেষ্টায় আদিত্যরাম সাগর কলেজে (মধ্যপ্রদেশ) সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু সেখানে ৩।৪ মাসের বেশি থাকিতে হয় নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গ্রিফিথ সাহেব যুক্ত-প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Public Instruction) হইয়া আসেন। ঐ সময় "মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ" নাম দিয়া এলাহাবাদে সরকারী কলেজ স্থাপিত হয়। গ্রিফিথ সাহেব সাগর হইতে আদিত্যরামকে ডাকিয়া পাঠাইয়া উক্ত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। কাশীর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে আড়াই বৎসর কাল আদিত্যরাম ইংরেজীর অধ্যাপকতা করেন। তৎকালে ঐ পদ ইংরেজদের জন্য সুরক্ষিত ছিল। আদিত্যরামের পর ঐ পদে থিবো সাহেব (G. Thibeaut) নিযুক্ত হন। তখন আদিত্যরাম পুনরায় এলাহাবাদে তাঁহার পুরানো পদে ফিরিয়া আসেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যথেষ্ট সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া এম-এ পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃতের পরীক্ষক হইতেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ এবং স্পষ্টবক্তা ছিলেন। সেই কারণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। ৫৫ বৎসর বয়সে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন এক সভা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। উক্ত সভায় যুক্তপ্রদেশের তৎকালীন গবর্ণর, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার, মিওর কলেজের অধ্যক্ষ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকবর্গ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

হিন্দি ভাষা এবং হিন্দি সাহিত্যের প্রতি আদিত্যরামের বিশেষ অনুরাগ ছিল। এ সময়ে হিন্দি ভাষায় কোন উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রিকা ছিল না। তাঁহার সময়েই ইণ্ডিয়ান প্রেস "সরস্বতী" নামক হিন্দি মাসিকপত্র বাহির করেন। তিনি কাশী নাগ্‌রী প্রচারিণী সভার সদস্য এবং শুভার্থী ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে আদিত্যরামের অচল প্রতিষ্ঠা ছিল। ছাত্রদের পক্ষ হইয়া তিনি অনেকবার কর্তৃপক্ষের সহিত ঝগড়া করিয়াছেন। ইংরেজী সংবাদপত্রে তিনি মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তখনকার দিনে দেশভক্তি, দেশসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কেহ উচ্চবাচ্য করিত না। আদিত্যরাম কিছুকাল অস্থায়ীভাবে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান (Indian Union) পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। দেশী জিনিষ ব্যবহার করা সম্বন্ধে তিনি খুব একনিষ্ঠ ছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার যে তখনও বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই। আদিত্যরামের চেষ্টায় এবং উৎসাহে এলাহাবাদে "হিন্দুসমাজ" স্থাপিত হয়। তাঁহার উৎসাহ পাইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ঐ সমাজের সদস্য হইয়াছিলেন। ঐ সময় পণ্ডিত মদনমোহন এলাহাবাদ মিওর সেণ্ট্রাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। আদিত্যরাম মদনমোহনকে খুব স্নেহ করিতেন। মদনমোহন লিখিয়াছেন যে, তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির বীজ আদিত্যরাম বপন করিয়াছিলেন।

ছাত্রাবস্থাতেই যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে সেই উদ্দেশ্যে মিসেস য়্যানি বেশান্ত, বাবু গোবিন্দদাস, ডক্টর ভগবানদাস, উপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের কথা। পণ্ডিত আদিত্যরাম এই কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্যোগীদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাহার পর কলেজের পরিচালক-মণ্ডলী যখন স্থির করিলেন যে এই কলেজের অধ্যক্ষতা একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হিন্দু বিদ্বান ব্যক্তির উপর অর্পিত হউক, তখন আদিত্যরামের ডাক পড়িল। পণ্ডিত আদিত্যরাম সরকারী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার অধ্যক্ষতা করিলেন। তাহার পর যখন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প হইল তখন আদিত্যরামের মনের বল যেন দ্বিগুণ হইয়া গেল। তখন আদিত্যরামের বয়স ৭১ বৎসর। কিন্তু ঐ বৃদ্ধবয়সেও তিনি এক নবীন আদর্শ স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আদিত্যরাম কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্‌চান্সেলারের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইলেন এবং প্রয়াগে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর তিনি আর তিন বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই তিন বৎসর তিনি আর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই। নিজের বাড়ীর সংলগ্ন

একটি সংস্কৃত পাঠশালা করাইয়াছিলেন, সেখানেই তিনি থাকিতেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়া আদিত্যরামকে সম্মানিত করেন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর আদিত্যরাম দুইটি বড় বড় পারিবারিক শোক পান। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ঘনশ্যাম বাংলাদেশে মারা যান এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যব্রান ভট্টাচার্য্য মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এত মর্ম্মান্তিক বেদনার ফলেও আদিত্যরামকে অশ্রুপাত করিতে দেখা যায় নাই বা তাঁহার নিয়মিত কর্ম্মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁহার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যাইত এবং ছয়মাসের মধ্যে তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ চুলের অর্দ্ধেক শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

যতদিন শরীরে বল ছিল, সন্ধ্যার সময় আদিত্যরাম ত্রিবেণী যাইতেন। রাত্রি তিনটার সময় উঠিতেন, পূজা-পাঠ করিতেন এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টোত্তর শতনাম জপ করিয়া সূর্য্যদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। আদিত্যরামের সঙ্গে একটি ঘটিতে সর্ব্বদা গঙ্গাজল থাকিত। যেখানেই সূর্য্যাস্ত হইত সেখানে জুতা খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গঙ্গাজলে সূর্য্যার্ঘ্য দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি মিটিং-এ কাজ করিতে করিতেও এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মকেই তিনি সমান সমাদর করিতেন। এলাহাবাদে দারাগঞ্জ মহল্লায় দশাশ্বমেধের নিকট তাঁহার বাসস্থান ছিল। এখানকার বাড়িখানি তিনি ১৮৭৯ সালে খরিদ করেন। যখন ঐ জায়গায় কোন বাড়ি তৈয়ার হয় নাই তখন শিবশর্ম্মা নামক একজন নেপালী সাধু কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ঐখানে থাকিতেন। ঈশ্বরের এমন লীলা যে, ঐ সাধু শিবশর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত "বাসুদেবরসানন্দ" নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ এক নিলামে পুরাতন গ্রন্থ ক্রয় করিবার ফলে আদিত্যরামেরই হস্তগত হয়। এই কারণে আদিত্যরাম নিজব্যয়ে এলাহাবাদে যে সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম "শিবশর্ম্মা সংস্কৃত পাঠশালা" দিয়াছেন। সাধু শিবশর্ম্মার নাম জাগ্রত রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য। "বাসুদেবরসানন্দ" নামক অমূল্য ধর্ম্মপুস্তক আদিত্যরামের সুযোগ্য পুত্র সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য টীকা-সহিত সুন্দরভাবে পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। আদিত্যরাম নিজের উপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিয়া গিয়াছেন। ঐ সংস্কৃত পাঠশালায় পড়িয়া কাশী সংস্কৃত কলেজে আচার্য্য পরীক্ষা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। ঐ পাঠশালা সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস আছে, যেখানে বিদ্যার্থীগণ বিনামূল্যে থাকিতে এবং খাইতে পায়। ঐ সংস্কৃত পাঠশালায় আদিত্যরাম নিজের মাতৃদেবীর নামে "ধন্যগোপী পুস্তকালয়" স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আমলের সমস্ত সংস্কৃত বই, হাতে লেখা পুঁথি প্রভৃতি ঐ পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইয়াছে। পাঠশালা, ছাত্রাবাস, লাইব্রেরি প্রভৃতির ব্যয় হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় আদিত্যরামের উক্ত গচ্ছিত অর্থ হইতে নির্ব্বাহ করেন।

১৯২১ সালে ১৮ই অক্টোবর ৭৪ বৎসর বয়সে আদিত্যরামের দেহান্ত হয়। মৃত্যুর দুই তিন মাস পূর্ব্বে রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইত না। তাহার জন্য বলিয়াছিলেন যে ভালই হইয়াছে, নিদ্রা দ্বারা আমার আর জপোভঙ্গ হয় না। মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত সায়ংকালে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়াছিলেন এবং হোম করিয়াছিলেন। অধিক রাত্রে শরীর যায় যায় হইল, সময় কত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাত্রি তখন তিনটা বাজিয়াছিল। শুনিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। মনে করিলেন রাক্ষসী সময়টা পার হইয়া যাইবে ত, রাত্রেই না মৃত্যু হয়। রাত্রি প্রভাত হইল, পূর্ব্বগগন রক্তিম আভায় ছাইয়া গেল, ঠিক সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পুণ্যশ্লোক আদিত্যরাম মনুষ্যজীবন সমাপ্ত করিলেন।

আদিত্যরামের একমাত্র পুত্র সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য এলাহাবাদে দারাগঞ্জে পৈত্রিক বাড়িতে বাস করেন। তিনি ইতিহাসশাস্ত্রে এম-এ পাশ করিবার পর অনেক বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন। বিপত্নীক হওয়ার পর আর তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার সন্তানাদি নাই। ইঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যাহা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একবার বলিয়াছিলেন, 'আপনাকে দেখিলে সত্যযুগের কথা মনে পড়ে।'

পণ্ডিত আদিত্যরাম আজ নাই, তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি আছে। আমি কেবল আশ্চর্য্য হইয়া এই কথাটাই ভাবিতেছি যে আদিত্যরামের স্বদেশপ্রীতি এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ভিত্তি কত সুদৃঢ় ছিল যাহাকে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর শত প্রলোভন এবং সুবিধাবাদও বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে নাই।

রতনের দিদি

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

খিড়কির পুকুর হইতে স্নান সারিয়া মালতী সবেমাত্র উনানে আগুন দিয়াছে, এমন সময় রতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া পিছন হইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। হঠাৎ ধাক্কার টাল সামলাইয়া মালতী রতনকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে রতন, কি ক'রে এলি ? সঙ্গে কেউ এসেছে নাকি ?"

রতন তখনও হাঁপাইতেছিল। দীর্ঘ পথ ছুটিয়া আসিয়া মুখখানা তাহার লাল হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে ধূলা কাদা মাখানো, হাতে একটা বাঁশের কঞ্চি। দিদির পিঠে মুখ গুঁজিয়া সে বলিল, "দিদি, আমি আর ওদের ওখানে যাবো না। তোমার কাছেই থাকবো দিদি।"

তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া মালতী বলিল, "বেশ, তাই থাকবি এখন। তোকে আর যেতে হবে না। বল্ ত কার সঙ্গে এলি ?"

আনন্দের আতিশয্যে মন তাহার নাচিয়া উঠিল। দিদির শেষের প্রশ্নটা না শুনিয়াই বলিল, "সত্যি বলবো ? আমাকে আর ওখানে যেতে দেবে না ? ওরা আমাকে ভয়ানক মারে। এই দেখো না, আজকে আমাকে বেত দিয়ে কি রকম মেরেছে।" বলিয়া পিঠের দাগ দেখাইল। ফর্সা পিঠের উপর বেতের দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। মালতীর চোখে জল আসিল। পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কে মেরেছে রে রতন ? কি করেছিলি ? মারামারি করেছিলি বোধ হয়।"

"মারামারি করবো কেন, বুড়ী আমার হাত থেকে পেয়ারাটা কেড়ে নিয়েছিল বলে মেরেছিলাম এক ধাক্কা। ছিঁচকাঁদুনী কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে জ্যাঠাইমার কাছে নালিশ কল্লে। জ্যাঠাইমা অম্নি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শপাং শপাং করে পাঁচ-ছ ঘা বেত বসিয়ে দিয়ে বল্লে—পড়তে যাসনি কেন ?"

মা হইয়া এতটুকু ছেলের পিঠে যে কেমন করিয়া মানুষ বেত মারিতে পারে মালতী ভাবিয়া পাইল না। সস্নেহকণ্ঠে রতনকে বলিল, "তা তুই স্কুলে যাসনি কেন ?"

"আমার ভালো লাগে না। বইগুলো আমার মোটেই মুখস্ত হয় না, পড়া বলতে না পাল্লে তোমাদের ঐ খেতু পণ্ডিত এম্নি মার দেয় যে স্কুলে যেতে ভয় করে। তার চেয়ে আমি তোমার কাছে পড়বো।"

"বেশ, তাই হবে। আচ্ছা, তুই এতখানি পথ এলি কি ক'রে।"

রতন তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। দিদির কোল হইতে নামিয়া সে তাহার বীরত্বের কাহিনী বলিতে লাগিল। সে যে এখন আর ছোট নয়, তাহার যে দিনের বেলায় কিছুতে ভয় নাই, এমন কি ঘোষেদের ভূতুড়ে বাড়ীটার পাশ দিয়াও সে একলা ছুটিয়া যাইতে পারে—সবিস্তারে তাহা বর্ণনা করিল। জ্যাঠাইমার কাছে মার খাইয়া কাঁদিবার সময় বুড়ী মুখ ভ্যাঙচাইলে কেমন করিয়া তাহার পিঠে কঞ্চির বাড়ি বসাইয়া দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা বলিতে ত্রুটি করিল না। এতটুকু মেয়ে হইয়া সে নাকি রতনকে মুখ ভ্যাঙচাইবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা! তার শাস্তি সে দিয়া আসিয়াছে। তারপর এই দীর্ঘ চারি ক্রোশ পথ প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই সে আসিয়াছে। পালেদের বস্তীটার কাছ দিয়া আসিবার সময় একবার পড়িয়া গিয়াছিল মাত্র, তাহাতে লাগে নাই। পথে আসিবার সময় কেবলই মনে হইয়াছে জ্যাঠাইমা বুঝি ধরিয়া লইয়া গিয়া বেত মারিবে। কেষ্টপুরের মোড়ে আসিয়া যখন সে রাস্তা ঠিক করিতে পারিতেছিল না তখন পার্ব্বতীপুরেরই একটা বুড়ো-মত লোক যে তাহাকে সঙ্গে করিয়া পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, রতন দিদিকে সে কথাও বলিল। আবার এ কথাও জানাইয়া দিল যে, ও বুড়ো লোকটা রাস্তা না দেখাইলেও যে সে এখানে আসিতে পারিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মালতী অবাক হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল।

বীরত্বের কাহিনী শেষ হইলে উনানে ডাল চড়াইয়া দিয়া সে রতনকে জিজ্ঞাসা করিল, "সকালে কি খেয়েছিলি রতন?"

"বা রে, খেলাম আবার কখন! মুড়ি খেতে বসেই তো বুড়ী আমার হাত থেকে পেয়ারাটা কেড়ে নিলে। আমিও দিলাম এক ধাক্কা। আমার সঙ্গে পারবে ঐ পুঁটকে বুড়ী। আবার বলে কি-না মার খাওয়াবো।"

এই দুর্দ্দান্ত ভাইটির পানে সস্নেহ দৃষ্টি দিয়া মালতী তাহার সকল ব্যথা মুছিয়া দিতে চাহিল। রতনকে স্নানের ঘাটে লইয়া গিয়া ভাল করিয়া গা মুছাইয়া তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিল।

নাহিয়া আসিয়া রতন মুড়ি খাইতে বসিয়াছে। আজ আর তাহার আনন্দ ধরিতেছিল না। আজ সে এমন এক জায়গায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে যেখানে স্নেহ আছে তিরস্কার নাই, ভালোবাসা আছে মার খাইবার ভয় নাই। তাহার সমস্ত মুখ এক অনাস্বাদিত আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। এত আদর সে কোনদিন পায় নাই।

রান্নাঘর হইতে মালতী তাহার এই পিতৃমাতৃহীন ভাইটিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। আর সেই সঙ্গে নিজ মাতার নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

রাধাবল্লভপুরের বিশু পাগলার বৌ যেদিন একমাত্র পুত্র রতনকে রাখিয়া মারা গেল সেদিন হইতে তাহার দেখাশুনার ভার পড়িল বিশুর বড় ভাই শম্ভুনাথ ও তাহার স্ত্রী সরলার উপর। রতনের বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর। সরলা নিজের কচি-কাচা লইয়া ব্যস্ত থাকিত বলিয়া কন্যা মালতীই তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল।

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর নারী আছে—মাতা ও প্রিয়া —সঙ্গিনী ও স্নেহময়ী। ছেলেবেলা হইতেই মালতী স্নেহময়ী, মাতার মত স্নেহ দিয়াই সে সকলকে ভালবাসে। তাই কিশোরী মালতীর হাতে রতনের অযত্ন হইল না। মাতার স্নেহ দিয়া সে এই ক্ষুদ্র শিশুটিকে ঘিরিয়া রাখিল। মাতা ইহা দু চক্ষে দেখিতে পারিত না। মালতীকে সে প্রায়ই শাসন করিত, "আহা ছুঁড়ীর রকম দেখ। যেন পাকাবুড়ী! পরের ছেলেকে নিয়ে এত আদর মাখামাখি কেন? নিজের ভাইবোনেদের দিকে ত ফিরেও চাও না।" উত্তরে মালতী বলিত, "ওর যে কেউ নেই মা।" সরলা আরও জ্বলিয়া উঠিত, "আহা দয়াময়ী গো!" বলিয়া অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইত।

মালতী মাতার স্বভাব জানিত, কিছু বলিত না। বয়সের তুলনায় মালতীর বুদ্ধি বেশী। কাকীর কথা তাহার প্রায়ই মনে পড়ে। ভালোমানুষ কাকীকে তাহার পিতামাতা নির্য্যাতনে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, স্মরণ করিয়া তাহার চোখে জল আসিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাকা বিশ্বনাথ পাগল হইয়া গেলে কাকীমার অক্লান্ত সেবা আজও তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। পল্লীগ্রামের গরীবের সংসার, উপার্জ্জনের মানুষ যে, তাহারই এই অসুখ। এমন অবস্থাতেও বড় ভাই হইয়া তাহার বাপ-মা যে কি করিয়া নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়াছিল, একটি দিনের জন্যও কিছু সাহায্য করে নাই, তাহা মনে করিয়া মালতী পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিত। তথাপি কাকীমার মুখে সে কোন দিন অভিযোগ শুনে নাই। ত্রিসংসারে আপনার বলিতে তাহার কেহ ছিল না। নিজের সাধ্যানুকূল স্বামীর চিকিৎসা সে করাইতে লাগিল। কিন্তু পাগলা বিশু যেদিন নিষ্ঠুর উন্মাদনায় গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল সেই দিন হইতে শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়িল। একান্ত স্নেহের রতনের প্রতি দৃকপাত না করিয়া সে স্বামীর অনুসরণ করিল।

সরলা যে রতনকে দেখিতে পারিত না তার আরও একটা কারণ ছিল। সে আশা করিয়াছিল বিশ্বনাথ ও রতনের মায়ের মৃত্যুর পর সম্পত্তিটা তাহাদেরই হইবে। দু বছরের শিশু রতন যে বেশী দিন ইহজগতে থাকিতে পারিবে না এইরূপ একটা আশা সে অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছিল।

মালতীর আদরযত্নে রতনকে দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে দেখিয়া সে হিংসায় ছটফট করিতেছিল। এইজন্য মালতীও তাহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল। মালতীর নামে স্বামীর কাছে প্রায়ই অভিযোগ চলিতে লাগিল, "ধিঙ্গি মেয়ে, নিজের ভাবেই বিভোর হয়ে আছেন। সংসারের কুটোটি নাড়েন না। কোথাকার কে একটা একরত্তি ছেলে, তাকে নিয়েই দিন রাত্তির সোহাগ। আমার এত ভালো

লাগে না বাপু! ও মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। বড় হয়েছে আর রাখা ভালো দেখায় না।"

কথাটা সত্যি। মালতী বড় হইয়াছিল। বয়স তাহার পনেরো হইলে কী হয়, বাড়ন্ত গড়নের জন্য তাহাকে আরও বড় দেখাইত। তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ে পনেরো বছরের আইবুড়ো মেয়ে রাখা যায় না। তবে কি-না তাহারা রামাইৎ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। সংখ্যায় কম বলিয়া একটু বেশী বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত।

শম্ভুনাথ মালতীর জন্য পাত্র দেখিতে লাগিল। পার্ব্বতী-পুরের বিনোদ দাসের ছেলে অভয়ের সঙ্গে মালতীর বিবাহ হইয়া গেল। অভয় ছেলে ভালো। গ্রামের জমিদার বাড়ীতে মুহুরীর কাজ করে, জমিজমাও কিছু আছে। সংসারে—বৃদ্ধা মা, আর পাঁচ-ছয় বছরের একটি ছোট বোন। মালতী দেখিতে সুন্দরী না হইলেও কুৎসিত নহে। শ্যামবর্ণ দেহলতাতে তার যৌবনের জয়-শ্রী, কৃশতনু ঘিরিয়া নামিয়াছে জোয়ার, স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে মাতৃত্বমাখা। এ মুখ না ভালবাসিয়া থাকা যায় না। অভয় মালতীকে ভালো-বাসিল। মালতীও অল্পকাল মধ্যেই স্বামী ও শাশুড়ীকে আপন করিয়া লইল।

দেখিতে দেখিতে ছয়টি বৎসর অতীত হইল। স্বামীর সংসারে মালতী যে স্থান অধিকার করিল তাহার তুলনা হয় না। সেবা, যত্ন ও স্নেহ দিয়া শাশুড়ী, স্বামী ও ছোট্ট ননদীটিকে সে এম্নি বশীভূত করিল যে, মালতী না হইলে কাহারও একদণ্ড চলে না।

অভয় বলে, "কি অপূর্ব্ব তুমি, মালতী! তুমি না এলে আমাদের চলতো কি ক'রে ভাবতে পারি না।" শাশুড়ী বলেন, "মালতী, আর জন্মে তুমি আমার মা ছিলে। তা নইলে বুড়ো মেয়ের এত আদর যত্ন কে আর কত্তে পারে।" ননদী রাণু বলে, "বৌদি, তুমি খুব ভালো মেয়ে। আচ্ছা বৌদি, রতনকে তুমি খুব ভালবাস, না?" সকলের উত্তরে মালতী হাসে, গর্ব্বে তাহার বুক ভরিয়া যায়। তবু মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা তাহার খালি মনে হয়। রতনকে কাছে পাইবার জন্য মন তাহার ব্যাকুল হইয়া ওঠে। বিবাহের পর দু-একবার সে বাপের বাড়ী গিয়াছে বটে, কিন্তু দুই-তিন দিনের বেশী থাকিতে পারে নাই। তাহার অভাবে অভয়ের সংসার অচল হইয়া পড়ে।

সুযোগ পাইলেই মালতী অভয়কে বলিয়া রতনকে আনাইত। দিদির গৃহে আসিয়া রতন যে আনন্দ পাইত তাহার তুলনায় দৌরাত্ম্য করিত ঢের বেশী। মালতী তাই বেশী দিন তাহাকে এখানে রাখিতে সাহস করিত না, নিজেই আবার পাঠাইয়া দিত। ইহা লইয়া কোন দিন কোন কথা ওঠে নাই; উঠিলে যে অপমান তাহা মালতীর মত মেয়ে সহ্য করিতে পারে না।

কিছু দিন হইতে রতনকে পার্ব্বতীপুরে আনানোও বন্ধ হইয়াছে। অভয় একদিন রতনকে আনিতে গেলে সরলা তাহাকে যে ভাষায় আপ্যায়িত করিয়াছিল তাহা জামাতার প্রতি প্রযোজ্য নহে। অভয়কে সেদিন শুষ্কমুখে একলা ফিরিতে দেখিয়া মালতী কিছু একটা ঘটিয়াছে অনুমান করিয়াছিল। পরে অভয়ের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মন তাহার ধিক্কারে পরিপূর্ণ হইল। স্ত্রী হইয়া স্বামীকে সে অপমানিত হইতে দিয়াছে। মাকে তো সে ভাল করিয়াই চিনে, তবুও কেন সে স্বামীকে সেখানে পাঠাইয়াছিল? এখন হইতে সে স্থির করিল যে রতনের কথা সে ভাবিবে না। এই সঙ্কল্পের কয়েক দিন পরেই রতন পার্ব্বতীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়াছে। অভয়কে আজ কাছারী যাইতে হইবে না। বড় ঘরের রোয়াকে বসিয়া সে তামাক টানিতেছিল। রতন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, রাণু খিড়কির পুকুরে ডুবে গেছে। আমি তুলতে পাচ্ছি না। আসুন না একবার।"

তামাক টানা বন্ধ করিয়া অভয় বলিয়া উঠিল, "ডুবে গেছে কি রে! তুই বুঝি ডুবিয়ে দিয়েছিস। পাজী ছোকরা, আজ আর তোমায় আস্ত রাখবো না।"

মালতী রান্নার উদ্যোগ করিতেছিল, অভয়ের উদ্দেশে বলিল, "আস্ত না হয় না রাখলে কিন্তু মেয়েটাকে তো আগে বাঁচাতে হবে। যাবে না আমাকে যেতে হবে বল।"

"এই যে যাচ্ছি।" বলিয়া অভয় তাড়াতাড়ি গিয়া দেখে একগলা জলে রাণু হাবুডুবু খাইতেছে। চুলের মুঠি ধরিয়া অভয় তাহাকে তুলিয়া আনিল। জল খাইয়া তাহার পেট ফুলিয়া গিয়াছে, চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল।

দাদাকে দেখিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া বলিল, "আমি কিছু করিনি দাদা। রতন আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে বলেছিল। আমি শিখবো না বলেছিলাম বলে আমাকে চড় মেরেছে। তারপর টেনে জলে নামিয়ে দিলে।"

অভয় রতনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই ওকে জলে টেনে নিয়ে গেছলি কেন?" ভয়ে রতন কাঁপিতেছিল। দুই চারিটা ঢোঁক গিলিয়া যাহা বলিল তাহাতে কিছু বুঝা গেল না।

মালতীকে অভয় বলিল, "রতনটার কাণ্ড দেখেছ, রাণুকে সাঁতার শেখাবে বলে ডুবিয়ে মেরেছিল আর কি। খিড়কীর পুকুর বলেই রক্ষে। অন্য পুকুর হ'লে দুটোই ডুবে মরত।"

আর কিছু না বলিলেও মালতী বুঝিতে পারিল অভয় রতনের উপর সন্তুষ্ট নয়। রাণুকে অভয় খুব ভালবাসে। তাহার প্রতি রতনের এই অত্যাচার সে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। বরদাস্ত সে নিজেও করে না। কারণে অকারণে যখন তখন রাণুর উপর তাহার মার-হাত উঁচাইয়াই ছিল। এই কয়দিনের মধ্যে তাহার অত্যাচারে বাড়ীর সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাই মালতী আজ মনস্থ করিল লোক দিয়া রতনকে রাধাবল্লভপুরে পাঠাইয়া দিবে।

তুচ্ছ ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া সংসারে এমন সব অঘটন ঘটে যে তাহা যেমন অচিন্তনীয় তেম্নি অনিষ্টকর। রতনের পার্ব্বতীপুর আগমনকে অবলম্বন করিয়া দুইটি পরিবারে এইরূপ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরের আহারাদি সম্পন্ন করিয়া মালতী একটু গড়াইয়া লইবে বলিয়া বাহিরের কাজগুলি সারিয়া লইতেছিল, এমন সময় মাতা সরলার আকস্মিক আবির্ভাবে ভিতরটা তাহার কাঁপিয়া উঠিল। মূর্ত্তিমান দুঃস্বপ্নের মত মাতার উপস্থিতি তাহাকে বিচলিত করিল। বিবাদের সঙ্কল্প লইয়াই যে মাতা তাহার এই দ্বিপ্রহরের রোদ অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে মালতী তাহা এক নিমেষেই বুঝিতে পারিল। মাতা যে তাহার কলহনিপুণা মালতী তাহা ভাল করিয়াই জানিত, কিন্তু ঝগড়া করিবার জন্য কোন মেয়ে যে জামাইবাড়ী তাড়া করিয়া আসিতে পারে সে কল্পনা করিতে পারে নাই। তথাপি মাতাকে সে সাদর-সম্ভাষণের ত্রুটি করিল না, তাড়াতাড়ি জল আনিয়া পা ধোয়াইয়া দিতে গেল।

পা ছাড়াইয়া লইয়া ঝাঁঝাল গলায় মাতা বলিল, "আর এত আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। খুব হয়েছে। বলি তোমাদের মতলব খানা কি? এমন শত্রুকেও পেটে ধরেছিলাম! আমাদের সব আশা-ভরসায় ছাই পড়লো।"

মালতী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "কি হয়েছে মা? তুমি এত রাগ করেছ কেন? চল, আমরা ঘরে গিয়ে বসি।"

সরলা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। গলার স্বর আরও একমাত্রা চড়াইয়া বলিল, "আহা, যেন কিছু জানেন না। কি শয়তান তুমি মা। তোমার পেটে পেটে এতও ছিল। কেন আমরা তোমার কি শত্রুতা করেছি। দশমাস দশদিন পেটে ধরেছি, খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করেছি, তারই কি এই পুরস্কার।"

সরলার চীৎকারে অভয় ও তাহার মা ঘরের বাহির হইয়া অবাক হইয়া শুনিতেছিল। রতন ভয়ে ভয়ে দিদির পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল জ্যাঠাইমার হাত হইতে একমাত্র দিদিই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।

সরলা সমানে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "লজ্জা করে না মা-বাপের শত্রুতা কত্তে। গলায় দড়ি জোটে না? রতনাকে হাত করে তার সম্পত্তি নেবার ফন্দী করেছ। সরি বোষ্টুমী বেঁচে থাকতে তা হচ্ছে না।"

মালতী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। এইবার রাগে সে জ্বলিয়া উঠিল। একে আজ সকালে রতনের অত্যাচারে মেজাজ তাহার ঠিক ছিল না, তার উপর সেই রতনকেই উপলক্ষ করিয়া মাতার এই বিষ-উদ্গীরণ—তাহার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া গেল। রতনকে টানিয়া মায়ের কাছে দিয়া বলিল, "নাও, মেরে ফেলো গে—যাও।"

এই একটি মাত্র কথাতেই সরলা বোষ্টুমী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ তা তো এখন বলবিই। আমিই তো সবাইকে মেরে ফেলি। বলি, এত বড় হলি কোত্থেকে? আজ কদিন না হয় শ্বশুরবাড়ী হয়েছে।"

কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইল সে তখন আর সেখানে নাই। ঘরের ভিতর মেজেতে শুইয়া

পড়িয়াছে। প্রতিপক্ষকে বিমুখ দেখিয়া সরলাও নিরস্ত হইল। রতনকে হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে রাধা-বল্লভপুরের পথে রওনা হইল। অভয় ও তাহার মাতার শত অনুরোধও তাহাকে পার্ব্বতীপুরে রাখিতে পারিল না।

আশ মিটাইয়া ঝগড়া করিতে না পারিয়া সরলার রাগ পড়ে নাই। গৃহে ফিরিয়া রতনের উপর আক্রোশ মিটাইয়া প্রহার করিল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে এতখানি পথ আসিবার পর এই প্রহারের ফলে রতনের জ্বর হইল। অনাদরে জ্বর বাড়িয়াই চলিল, কেহ বিশেষ লক্ষ্য করিল না।

এদিকে কয়েক দিন হইতেই মালতীর শরীরটা ভাল যাইতেছিল না। অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল। জ্বর লইয়াও সংসারের সকল কাজই সে করিতে লাগিল। কিন্তু তৃতীয় দিনে আর শয্যা ত্যাগ করিবার ক্ষমতা রহিল না। জ্বর ক্রমশ বিকারে পরিণত হইল। অভয় জমিদারবাড়ীর মুহুরী। পাড়া গাঁ হইলেও ভাল ডাক্তার আনিল। ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হার্ট খুব দুর্ব্বল। সাত দিন পার না হইলে কিছু বলা যায় না।"

চতুর্থ দিন হইতেই মালতী বিকারে প্রলাপ বকিতেছিল। বার বার সে একই কথা: "ওরা রতনকে মেরে ফেল্লে—না,না, রতনকে মেরো না—ওগো, তুমি ছেলেটাকে নিয়ে এসো না।"

অভয় আশ্বাস দেয়, "আচ্ছা, তুমি ভাল হয়ে ওঠো। আমি রতনকে এনে দেবো। তুমি ভেবো না।"

মালতী ম্লান হাসিয়া বলে, "ছাখো, আমার কি মনে হচ্ছে জানো। আমি আর বাঁচবো না। অনেক কষ্ট দিলাম তোমাকে। ক্ষমা ক'রো। পায়ের ধুলো দাও।"

অভয় বলে, "তুমি বাঁচবে। ও কথা বলো না।"

মালতী করুণ হাসি হাসে।

সাত দিনের দিন। মালতী আজ সারাদিন ভাল আছে। জ্বর তাহার নাই বলিলেই চলে। আজ সে সকলের সঙ্গে কথা বলিল। শাশুড়ীর পায়ের ধুলা লইল, রাণুকে আদর করিল। অভয়ের সহিত বহুক্ষণ গল্প করিল। অভয় ভাবিল, বিপদ বুঝি কাটিয়া গেল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় রোগ হঠাৎ বাঁকিয়া বসিল। মালতী প্রলাপ বকিতে সুরু করিল।

রাত্রি প্রায় বারটা। মালতীর শিয়রে অভয় জাগিয়া বসিয়া আছে। অকস্মাৎ মালতী বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "রতন এসেছিস! তোকে আর আমি যেতে দেবো না ভাই। আঃ।" তারপর সমস্ত নীরব। অভয় মালতীকে শোয়াইয়া দিতে গিয়া দেখিল রতনের দিদি কোন্ রতনের সন্ধানে তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে।

সামনের আম গাছটায় তখন একটা পেঁচা ডাকিতেছিল।

পরের দিন যে লোক রাধাবল্লভপুরে সংবাদ দিতে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া সে জানাইল যে গতকল্য রাত্রি বারটার সময় রতন মারা গিয়াছে।

চিত্রা

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

নয়ন কল্পনা করি' যারে প্রতিদিন
আঁকিয়াছে দৃষ্টিপটে চিত্র অতুলন,
অয়ি চিত্রা, কল্পাঙ্গনা, চির অমলিন,
তুমি মোর কল্পনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মনে হয় যেন কত জন্ম জন্ম ধরি'
রচিয়াছি চিত্র তব, ব্যগ্র প্রতীক্ষায়
পথ চাহি' কেটে গেছে কত বিভাবরী
দৃষ্টির প্রদীপ জ্বালি মিলন-আশায়।

আজো কি হ'বেনা সাঙ্গ তুলির লিখন!
তেমনি রহিবে বসি' মায়া-উপবনে
ছলনা-কুসুম রাজি, করিয়া সৃজন
হাসিবে কৌতুকহাসি আপনার মনে?

কল্পনার ধন ওগো মায়াবী প্রেয়সী,
দৃষ্টির অতীত, আছ অন্তর পরশি'।

বাঙ্গলা গদ্যের ইতিহাস

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

বাংলা মুদ্রিত গদ্যের আদি লেখক বহু হইলেও বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তই যে বাংলা গদ্যরীতির স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেন এরকম একটা ধারণা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইয়া আসিয়াছে।" বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচয়িতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাঙ্গলা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারি উপার্জ্জিত সম্পত্তি লইয়াই আমরা নাড়াচাড়া করিতেছি।" বাংলা গদ্যের যশস্বী লেখক রজনীকান্ত গুপ্তের মতে বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের পিতা না হইলেও মাতা। "দশভূজা প্রতিমার খড়, বাঁশ ও দড়ির উপর সামান্য মাটির কাজ হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর ঐ মাটী যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া এবং মৃত্তিকাময়ী মূর্ত্তি নানা বর্ণে সুরঞ্জিত ও বিচিত্র বেশে সজ্জিত করিয়া দেবমণ্ডল শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলেন।" হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক হিসাবে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে খ্যাতি নেহাত কম ছিল না। তাঁহার মতে "চলিত বাঙ্গলা সাহিত্যে একাধিপত্য লাভ করিবার পূর্ব্বে এবং কাদম্বরীর একরূপ মৌরশীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই—এই দুইয়ের মাঝামাঝি সময়ে নবীন গদ্যসাহিত্যে যে অনন্ত জ্যোতি বঙ্গসাহিত্যে পরিদৃষ্ট হয়, সেই জ্যোতি বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ নির্ণয় করিয়া দিল। অর্থাৎ খুব চলিত নয়, অথচ খুব সংস্কৃতবহুলও নয়—এ দুইয়ের মাঝামাঝি বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ জ্যোতির অধিবাসী বঙ্গের দুইটি শক্তিশালী মহাত্মা। প্রথম স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।"

রবীন্দ্রনাথের মতও অনেকটা এইরূপ। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েটারে বিদ্যাসাগর বার্ষিকী উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহাতে কবি বলিয়াছিলেন যে—"গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বঙ্গভাষাকে বিদ্যাসাগর পৃথিবীর ভদ্র সভার উপযোগী আর্য্য ভাষারূপে গঠন করিয়া দিয়াছেন।"

উপরে যে মতগুলি উদ্ধৃত করা গেল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারই বাংলা গদ্যরীতির স্রষ্টা। এ কথার মানে এই নয় যে, বিদ্যাসাগরের পরবর্ত্তী সকল বাংলা গদ্যের লেখকের স্টাইল বা প্রকাশভঙ্গি অভিন্ন এবং সে ভঙ্গি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাদর্শে লিখিত। গদ্যরীতি এক, প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র। প্রকাশভঙ্গির ক্রমিক পরিবর্ত্তনের ফলে যে গদ্যাদর্শের পরিবর্তন হয়, এ কথা অস্বীকার না করিলেও প্রত্যেক ভাষার গদ্যরীতির মধ্যেই যে একটা শব্দগত, শব্দ যোজনাগত, বিভক্তিগত ও অন্বয়গত মোটামুটি আদর্শ আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই আদর্শকেই স্থূলভাবে গদ্যরীতির আদর্শ বলা যাইতে পারে এবং যাঁহারা বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারকে বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের মতে বাংলা গদ্য-রচনার এই সব লক্ষণগুলি ঐ দুই মহাত্মার রচনাতে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়।

কথাটা ঐতিহাসিক ভাবে বিচার করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "বেতাল পঞ্চবিংশতি।" ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থ হইতে বিদ্যাসাগরের রচনার উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক্।

> "রমণীয় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজকুমারী উপবন বিহারে অভিলাসিনী হইয়া পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন রাজা সম্মত হইলেন এবং রাজধানীর অনতিদূরে, যোজন বিস্তৃত অতি রমণীয় উপবন ছিল, উহাকে বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন।"

ইহা অপেক্ষাও পরবর্ত্তী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "শকুন্তলা" হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক্—

> "ইহারা তিন সখীতে কি অবলোকন করিতেছেন, লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ শ্রবণ ও অবলোকন করি, এই বলিয়া রাজা উৎসুক মনে শ্রবণ ও সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন করিতে লাগিলেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য-রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁহার "বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবে।" উহাও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। কয়েকটি ছত্র এইরূপ—

"তোমরা প্রাণতুল্যা কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার রিপু বশীভূত হইয়া ব্যাভিচার দোষে দুষ্ট হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপ ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া তাহাদের দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনা-দিগকে সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নও। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জ্জয় রিপুবর্গ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক আচার রক্ষা করাই পরমধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাগণ জন্মগ্রহণ না করে।"

উদ্ধৃতিবাহুল্যের আশঙ্কায় অক্ষয়কুমারের রচনার কোন উদাহরণ এখানে আর লইলাম না। বিদ্যাসাগরের উদ্ধৃত রচনাগুলিতে, বিশেষতঃ "বিধবাবিবাহ" হইতে গৃহীত অংশে ভাষার যে গঠনপ্রাঞ্জলতা ও ধ্বনিলালিত্য রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় "পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য ও সরস শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া" বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব গদ্যভঙ্গী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই ভঙ্গিমার চমৎকারিত্ব যতই থাক, যে গদ্যরীতির উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার প্রতিষ্ঠা তাহা কি তিনিই প্রথম বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কালে কি এই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবহৃত গদ্যরীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বাঙ্গলার গদ্যভাষা বিকাশ লাভ করিয়াছে? আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়, অসামান্য গদ্যশিল্পী হইলেও ঐতিহাসিক-ভাবে বলিতে গেলে তাঁহারা কোন গদ্যরীতি সৃষ্টি করেন নাই এবং কোন গদ্যরীতিকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী করিয়াও যান্ নাই।

প্রথমতঃ ধরা যাক তাঁহাদের শাব্দিক সম্পদের কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম পুস্তক ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত; অক্ষরকুমারের "তত্ত্ববোধিনী" ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইলেও তাহার গদ্যরীতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে পরিপক্ক হয় নাই। শুধু তাহাই নহে—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত আরও দুইখানি গ্রন্থ—"বাঙ্গলার ইতিহাস" ও "বোধোদয়" সম্পূর্ণই শিশুপাঠ্য পুস্তক। এই সকল পুস্তকের রচনার কোন প্রভাব সমসাময়িক গদ্যলেখকের উপর না থাকাই সম্ভব। কাজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের যে গদ্যরীতির উদাহরণ আমরা দেখিতে পাই, তাহা ঠিক বিদ্যাসাগর কিংবা অক্ষয়কুমারের আদর্শপ্রণোদিত নহে। নিম্নে দ্বারকানাথ রায় সম্পাদিত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র মাসের "সুলভ" পত্রিকা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করা গেল—

"বিদ্যার প্রধান ফল জ্ঞানচর্চ্চা। ধনাগম তাহার আনুসঙ্গিক ফল বটে। কিন্তু এদেশীয় অধিকাংশ বিদ্যোজ্জ্বল ব্যক্তিকে প্রায় তদ্দ্বারা ধনার্জ্জন করিতেই হয়। জ্ঞানচর্চ্চার সহিত তাঁহারা প্রায় সম্পর্কই রাখেন না। ভাল। যদি তাঁহারা সেই ধন সৎকর্ম্মে ব্যয় করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের বিদ্যালাভের একপ্রকার সার্থকতা হয়। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, তাঁহারা কেবল অত্যন্ত দুরাচার বয়স্যদিগের সহিত সে সমুদয় অর্থ ক্ষয় করেন।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক—

"সাধারণতঃ মনুষ্য মাত্রেই অনুকরণে রত। অন্যের অবস্থা, অন্যের ভাব বা অন্যের রাগ দ্বেষাদি ধর্ম্ম উত্তমরূপে মনে বিকশিত হইলেই সেই ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের অনুকরণ করিতে প্রায়ই সকলের প্রবৃত্তি হয়। কদাপি ইচ্ছা না হইলেও এই প্রবৃত্তি স্বত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুকরণ ক্রিয়া মনুষ্যমাত্রেরই আনন্দজনক। বালকেরা সর্ব্বদাই ইহাতে তৎপর, পিতৃমাতৃ বয়স্য পরিজন প্রভৃতিরা জীবনযাত্রায় যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করেন, বালকেরা তাহার অনুকরণ করিতে নিয়ত অনুরত থাকে; তাহাদের অত্যন্ত প্রমোদজনক ক্রিয়ার মধ্যে ঐ অনুকরণ কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান। ক্ষুদ্র গৃহের স্থাপন করা, তাহাতে মৃত্তিকাদি পদার্থদ্বারা কাল্পনিক অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করা, পরিবেশন করা, কাষ্ঠপুত্তলিকাকে পুত্রকন্যার ন্যায় লালনপালন করা, তাহার বেশভূষা ও কল্পিত বিবাহাদি সংস্কার সমাধা করা অপেক্ষা বালিকার পক্ষে প্রিয়তর আর কিছুই দেখা যায় না।"

উপরে উদ্ধৃত এই উভয় রচনায়ই ভাষা আড়ষ্ট ও লালিত্যহীন, কিন্তু গদ্যরীতির উদাহরণ হিসাবে দ্বারকা-

নাথের কিংবা রাজেন্দ্রলালের রচনার কোনটিই বিদ্যাসাগর কিংবা অক্ষয়কুমারের রচনা হইতে শব্দনির্ব্বাচনের হিসাবে অধিক সংস্কৃতানুরাগী নহে। বিশেষতঃ দ্বারকানাথের রচনায় "ভাল" এবং "সম্পর্কেই রাখেন না," এ দুইটি চলিত প্রয়োগের (idiom) উদাহরণ দেখিতে পাই। তা ছাড়া, এই উদ্ধৃতাংশ "বিদ্যোজ্জ্বল" এই পদটি ভিন্ন কথ্য বাঙ্গলায় ব্যবহার হয় না এমন একটীও সমাসসিদ্ধ পদের ব্যবহার নাই। রাজেন্দ্রলালের রচনায়ও "বৃত্তি" ও "প্রমোদজনক" প্রভৃতি সংস্কৃতানুরাগী বিশেষ্য বিশেষণ পদের ব্যবহার থাকিলেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় "ব্যবহিত হইয়া" ও "অবলোকন করিলেন" প্রভৃতি সংস্কৃতানুরাগী ক্রিয়াপদের ব্যবহার নাই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "বিবিধার্থ সংগ্রহে" প্রকাশিত সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের রচনা পড়িলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। একটি অংশ এইরূপ—

"বাহকগণের ক্লান্তি দূর হইলে তিনি পুনরায় যানোপরি আরোহণ করিলেন এবং অরণ্যের শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। সেই সম্মুখে একটি ধূমাকৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছিল; ক্রমে ক্রমে ধূম অপসৃত হইলে তাহা কোন দুর্গের ন্যায় বোধ হইল। তাহাতে কৃষ্ণকুমারীর কতদূর যে ভয়ের সম্ভাবনা তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর; তাহাতে আবার এ সময় একদল অশ্বারোহী সেনা কিঞ্চিৎ দূরে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল।"

এ রচনার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব এক-প্রকার নাই বলিলেই চলে। এখানে "যানোপরি" ভিন্ন একটিও সংস্কৃতানুরাগী পদের ব্যবহার নাই এবং এ প্রকার শব্দ সংস্কৃত লব্ধ হইলেও বাঙ্গলা ভাষায় ইহার প্রয়োগ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। কাজেই শব্দনির্ব্বাচন হিসাবে বিচার করিতে গেলে একথা বলা চলে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন গদ্যরীতি প্রবর্ত্তন করিয়া যান নাই, কেন না তাঁহার সমসাময়িক অনেক বাংলা রচনার মধ্যেও সমাসহীন শুদ্ধ ও সহজবোধ্য পদ নির্ব্বাচনের পর্য্যাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শব্দযোজনা, বিভক্তি ও অন্বয়ের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন নিজস্ব গদ্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনায় সমাসবহুলতা ছিল না সত্য কিন্তু তাহা হইলেও তিনি শব্দযোজনায় সংস্কৃত গদ্যের প্রভাব একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, বিশেষণবাহুল্যে তাঁহার রচনা ভারাক্রান্ত ছিল। তাহার কারণ, সংস্কৃত গদ্য-রচনার বাক্যার্থের অনেকখানি ভারবহন করে বিশেষণ পদ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাই দেখিতে পাই তাঁহার বক্তব্য কথার অনেকখানি ভার বহন করেন বিশেষণের ও ক্রিয়া-বিশেষণের (Predicative) সাহায্যে, যথা—"রাজকুমারী উপবন বিহারে অভিলাষিণী হইয়া ইত্যাদি", "ধর্ম্মরাজ সেই স্থলে অবস্থিত আজ্ঞানুবর্ত্তী ভ্রাতৃগণের কাতর শব্দ শ্রবণ করিলেন ইত্যাদি," "করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া স্পন্দহীন মুদ্রিতনয়না চিত্রার্পিতার ন্যায় উপবিষ্টা আছেন।" এই বিশেষণ প্রয়োগপন্থা ও সমকর্ত্তৃক একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বিদ্যাসাগরের ন্যায় ১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দের রাজেন্দ্রলালের রচনায়ও দেখিতে পাই। বিভক্তি, লিঙ্গ ও ক্রিয়া রূপকের ব্যবহার সম্বন্ধেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার আসন্ন সমসাময়িক লেখকের রচনার প্রভেদ অল্পই আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন "কন্যা ব্যাভিচার দোষে দুষ্ট হইলে", রাজেন্দ্রলাল তেমনি "ঐন্দ্রিজালিক শক্তি" ব্যবহার করেন। রাজেন্দ্রলাল "ক্ষুদ্র গৃহের স্থাপন" প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু অক্ষয়কুমারের ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকেও "অধর্ম্ম বংশের বৃদ্ধি করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্রিয়ারূপ অতিশয় সংস্কৃতানুরাগী, যথা—"লিখন সমাপন।" "সান্ত্বনা করিয়া ক্ষান্ত রাখিবার অবসর নাই।" "সম্বোধিয়া" "জিজ্ঞাসিলেন" ইত্যাদি। এই হিসাবে সমসাময়িক লেখকের রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাক্যের অন্বয় হিসাবে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার কোনরূপ বৈয়াকরণিক সঙ্গতি ছিল বলিয়া হয়ত বিশ্বাস করিতেন না; যদি করিতেন তবে কমা চিহ্নের এত মারাত্মক অপব্যবহার করিতেন কি-না সন্দেহ। আমরা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুনঃ মুদ্রিত "শকুন্তলা" হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। "একদিন, মধ্যাহ্নকালে, রাজা, নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, শকুন্তলার দর্শন ব্যতিরেকে, আর আমার প্রাণরক্ষার উপায় নাই।" বাক্যের প্রথম এগারটি শব্দের মধ্যে ছয় বার কমা চিহ্ন ব্যবহার হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কোন নিজস্ব গদ্যরীতির সৃষ্টি করিয়া যান্ নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় আর

অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। আর তাঁহার রচনায় যে গদ্যাদর্শ স্থান পাইয়াছে তাহার উপর যে পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যের গদ্য-রচনা প্রতিষ্ঠিত নয় তাহা বোধ হয় একেবারেই কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বাংলা গদ্যরীতি যথার্থ-ভাবে পরিণতি লাভ করে ১৮৭৫ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে—আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আদি রচনার মধ্যেও পরিণত বাংলা গদ্যরীতির যথার্থ উদাহরণ পাওয়া যায় না। এই দশ বছরেরর মধ্যে বাংলা গদ্য "ভুঁই ফোঁড় হইয়া জন্মায় নাই।" বাংলা নাটক ও বাংলা সাময়িকপত্র হইতে প্রকৃত বাংলা গদ্যরীতির উৎপত্তি। ঈশ্বর গুপ্তের শব্দ-সম্ভার ও রামনারায়ণ-মধুসূদনের ব্যবহৃত কথ্য বাংলার কাঠামো লইয়াই "বঙ্গদর্শনের" শেষ যুগে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার প্রভৃতি লেখকের হস্তে যথার্থ বাংলা গদ্য-রীতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। যাঁহারা এই গদ্যরীতি-গঠনে সাময়িক-পত্রের প্রভাব স্বীকার করিতে অসম্মত, তাঁহাদের নিকট শুদ্ধ ১৮৭১ ইংরেজীতে প্রকাশিত "সাহিত্য মুকুর" নামক সাপ্তাহিক পত্র হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। ২৮ জানুয়ারীর সংখ্যায় এইরূপ লেখা আছে :—

"বাংলাভাষার গদ্য তিন প্রকারের—প্রথম গৌড়ী, দ্বিতীয় চলিত সাধুভাষা, তৃতীয় সামান্য। গদ্যরচনা প্রথমতঃ গৌড়ীয় রীতিতে ছিল। ঐ রীতিটা অবিকল সংস্কৃত হইতে নকল করা। যে সকল পুরাতন গদ্য পুস্তক আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই প্রায় গৌড়ীয় সাধুভাষায় রচিত এবং আমরা ঐ গৌড়ীয় সাধুভাষাকেই গৌড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। গৌড়ীরীতি আজকাল লোকে বড় পছন্দ করে না এবং পূর্ব্বের ন্যায় শক্ত শক্ত কথা দিয়া এইরূপ কঠিন রচনায় আর আমাদের তত আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় চলিত সাধুভাষা। এইটী আধুনিক কিন্তু প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার নামগন্ধও ছিল না—এখন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সহজ হইয়া এই রচনাটী প্রচলিত হইয়াছে। বক্তৃতা কোন বিষয়ের রচনা ও আপরাপর কাব্য (নবাখ্য) প্রভৃতি আজকাল এই রীতিতে রচিত হইতেছে। বস্তুতঃ এইটীই এ সকল রচনায় যথার্থ উপযুক্ত। ইহাতেই চলিত ভাষা অধিক মিশ্রিত করিয়া সংবাদপত্রাদি লিখিত হয়।"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয় নাই এবং বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" ও "কপালকুণ্ডলা" মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য "সোমপ্রকাশ"ই এই যুগের একমাত্র সাময়িকপত্র ছিল না।

নূতন-পথে

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

'ঘর ছেড়ে আজ' শুধাও প্রিয়, 'যাচ্ছি কোথায় আমি ?'
শুনছ নাকি ? বাঁশীর সুরে ডাকছে স্বামীর স্বামী ?
বাঁশীর ও সুর শুনি কানে,
থাকি বলো কোন্ পরাণে,
তোমার কোলে রাখি মাথা বদ্ধ দিবসযামী !

থাকবে কোথায় ছেলেমেয়ে ? ভাবনা কিগো তার !
রইল তাদের জগন্মাতা, খেয়ার পারাবার।
বিপদ যদি কভুই আসে,
থাকবে তুমি তাদের পাশে ;
সময় হ'লে এসো পরে রইবে খোলা দ্বার।

ঘরের বধূ একা যাব ? নাইক কোন ভয় ?
বাঁশীর ও সুর লজ্জা সরম সব করে যে জয়।
সবার চোখে দিয়ে ফাঁকি,
অসীম পথে দৃষ্টি রাখি,
চলব নিয়ে বিশ্বজয়ী-সাহস পরাণময়।

চাইছ দিতে ধনদৌলত ? মলিন কেন মুখ ?
পাওয়ার যা তা সব পেয়েছি, পাইনি শুধু সুখ।
যদিই পথে বিপদ ঘটে,
যদিই কোন কুৎসা রটে,
যদিই মরি তাঁকে পেতে নাহিক কোন দুখ।

যাবার পথে তোমার চোখে অশ্রুবারি নামি',
যেতে আমায় দেবে নাকি ? যাব কি গো আমি ?
কি হবে আর হেথায় থাকি !
নাইক কিছু, সবই ফাঁকি ;
অচিন্ পথে চলব আমি—সে পথ উর্দ্ধগামী।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১১৬নং প্যাঁচ

১১৬নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

১১৬নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

অপরের পিছনে গিয়া তাহার ডান পায়ের গোছটি নিজের ডান হাত দিয়া ও বাঁ পায়ের গোছটি বাঁ হাত দিয়া জোরে ধরিয়া টানিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথা দিয়া তাহার পাছায় জোরে ধাক্কা মারিলে (১১৬নং—১ম চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১১৬নং—২য় চিত্র)

১১৭নং প্যাঁচ

যদি কেহ পিছনে গিয়া দুই হাত দিয়া কোমরটি জোরে জড়াইয়া ধরে তবে নীচু হইয়া দুই পায়ের মধ্য দিয়া হাত দুইটি

১১৭নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

চালাইয়া দিয়া তাহার আগান পায়ের গোছটি জোরে ধরিয়া (১১৭নং—১ম চিত্র) সোজা ভাবে উপরে তুলিতে তুলিতে সামনে আগাইয়া দিয়া তাহার হাঁটুর উপর জোরে চাপ দিলে তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১১৭নং—২য় চিত্র)।

১১৭নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

১১৮নং প্যাঁচ

অপরের পিছনে গিয়া নিজের বাঁ হাত দিয়া তাহার বা কব্জি ও ডান হাত দিয়া তাহার ডান কব্জি জোরে ধরিয়া তাহার হাত দুইটি সোজা রাখিয়া টানিবার সঙ্গে সঙ্গে

১১৮নং প্যাঁচের চিত্র

নিজের ডান পা-টি তুলিয়া তাহার কোমরে লাগাইয়া জোরে টানিলে (১১৮নং—চিত্র) তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১১৯নং প্যাঁচ

অপরে যদি তাহার দুই হাত দিয়া কোমরটি জড়াইয়া ধরে এবং তাহার মাথাটি যদি নিজের ডান ধারে থাকে

১১৯নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

১১৯নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

একটু নীচু হইয়া ডান ধারে ঘুরিয়া বাঁ হাতখানি তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান উরুতে রাখিয়া (১১৯নং—১ম চিত্র) জোরে ডান ধারে ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের জোরে তাহার ডান পা-টি তুলিয়া (১১৯নং—২য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১২০নং প্যাঁচ

অপরে যদি কোন প্যাঁচ মারিবার জন্য নিজের ডান বগলের নীচু দিয়া মাথাটি লইয়া যায় তৎক্ষণাৎ নিজের ডান

১২০নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

বাহু দিয়া তাহার গলাটি জোরে জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডান পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান হাঁটুর পিছনে লাগাইয়া (১২০নং—১ম চিত্র) জোরে ঝোঁক দিয়া পিছনে তুলিতে তুলিতে (১২০নং—২য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১২০নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

১২১নং প্যাঁচ

অপরে যদি কোন প্যাঁচ মারিবার জন্য নিজের ডান

১২১নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

বগলের নীচু দিয়া মাথাটি লইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ নিজের ডান বাহু দিয়া তাহার গলাটি জোরে জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নীচু হইয়া ডান ধারে ঘুরিয়া তাহার কোলের মধ্যে গিয়া বাঁ হাতটি তাহার দুই পায়ের মধ্যে চালাইয়া

১২১নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

দিয়া তাহার বাঁ হাঁটুর পিছনে জোরে ধরিয়া (১২১নং—১ম চিত্র) ডান হাঁটু নীচে ও বাঁ হাঁটু উপরে তুলিয়া জোরে বসিয়া (১২১নং—২য় চিত্র) ডান দিকে কাৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ডান বাহু দ্বারা ধরা তাহার গলাটি জোরে টানিলে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১২২নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

১২২নং প্যাঁচ

নীচু হইয়া অপরকে কোন প্যাঁচ মারিতে গেলে অপরে যদি নিজের দুই বগলের মধ্যে তাহার দুই হাত চালাইয়া দেয় তৎক্ষণাৎ দুই বগল দিয়া তাহার দুই হাতটি জোরে চাপিয়া ধরিয়া (১২২নং—১ম চিত্র) সঙ্গে সঙ্গে নীচু হইয়াই বাঁ হাঁটু মাটিতে রাখিয়া ও ডান হাঁটু তুলিয়া বাঁ দিকে কাৎ হইলে (১২২নং—২য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১২২নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

১২৩নং প্যাঁচ

নীচু হইয়া অপরকে কোন প্যাঁচ মারিতে গেলে অপরে যদি নিজের দুই বগলের মধ্যে তাহার দুই হাত চালাইয়া দেয় তৎক্ষণাৎ দুই বগল দিয়া তাহার দুই হাতটি জোরে চাপিয়া ধরিয়া (১২২নং—১ম চিত্র) সঙ্গে সঙ্গে নীচু হইয়াই

১২৩নং প্যাঁচ

বাঁ হাঁটু মাটিতে ও ডান হাঁটু তুলিয়া রাখিয়া তাহার পেটের কাছে মাথাটি রাখিয়া (১২৩নং চিত্র) তাহার শরীরটিকে নিজের পিছন দিকে উল্টাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে পিছনে শুইয়া পড়িলে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১২৪নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে তাহার দুই হাত দিয়া গলাটি টিপিয়া ধরে এবং যদি তাহার বাঁ পা-টি আগান থাকে, তবে সেইরূপ ধরা অবস্থাতেই নিজের দুই হাত দিয়া তাহার মুঠো দুইটি জোরে ধরিয়া নিজের বাঁ কনুই দিয়া তাহার ডান কনুইয়ে জোরে মারিয়া ও বাঁ পা-টি আগাইয়া তাহার বাঁ হাঁটুতে মারিয়া তৎক্ষণাৎ জোরে ডান দিকে ঘুরিয়া (১২·নং চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১২৪নং প্যাঁচের চিত্র

বিহ্বল

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

যে জীবন ভেসে যায় অজানার পানে
কোথা হতে কাল স্রোতে কোথা ভেসে যায়,
যে উৎসব দু দিনের অশ্রু ও আশায়—
নয়ন সলিলে তারে বাঁধিব কেমনে ?

যে স্বপন মুছে যায় আঁধার-মরণে,
যে কুসুম যায় ঝরে—কালের পাথায়
ভেসে চলে যে জীবন কোন অজানায়—
ফিরাব কেমনে তারে ফিরাব কেমনে ?

সেই স্মৃতিটুকু শুধু—যা গিয়েছে ঝরে
ভরিয়া রেখেছে মোর স্বপ্ন-জাগরণ,—
ছিল যে আমারই চির একান্ত আপন
গিয়েছে সে কোথা আজ অজানা আঁধারে !

আমি হেথা বসে আছি বেদনা-বিহ্বল,
অতীতের পানে চেয়ে ফেলি অশ্রুজল।

বেতার বা রেডিও

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য এম্-এস্-সি

(২)

পূর্ব্বে বেতার বা রেডিওর মূল তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি খুবই জটিল।

বার্ত্তা-প্রেরকযন্ত্রের সহিত আরও একটু সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হইতে হইলে বিজ্ঞানের কতকগুলি সাধারণ কথার সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। এস্থলে যতটুকু না বলিলে নয়, তাহাই শুধু বলা হইল।

বার্ত্তাপ্রেরক কিম্বা বার্ত্তা-গ্রাহকযন্ত্রে একটি বায়ুস্থ তার, ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স্ ভ্যাকুয়াম্ টিউব্ অথবা বিশেষ কোন স্ফটিক, টেলিফোন, মাইক্রোফোন্—মূলত এই কয়েকটি জিনিষেরই প্রয়োজন হয়। ইহারা কি এবং কি ইহাদের কাজ, এখানে তাহাই বলা হইবে।

কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে আমাদের জানা উচিত—বিদ্যুত যে প্রবাহিত হয়, তাহা কি করিয়া ঘটে। প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই অণু (molecule) আছে এবং অণু পরমাণু দ্বারা (atoms) গঠিত। এই পরমাণুও আবার ইলেকট্রন্ ও নিউক্লিয়াস্ হইতে সৃষ্ট। প্রত্যেক ইলেকট্রন্ ঋণাত্মক বিদ্যুতের একটি অংশ (Negative charge)। ইহা বিদ্যুতযুক্ত ক্ষুদ্র পদার্থ নয়, ইহা নিজেই বিদ্যুত। সে যাহা হোক্, এই ইলেকট্রন্ চলিলেই বিদ্যুত প্রবাহিত হয়। বিদ্যুত তামার তার দিয়া ভাল চলে, তার অর্থ—তামার তারে অনেকগুলি আল্‌গা (loosely bound) ইলেকট্রন্ আছে—ডায়নামো বা ব্যাটারী হইতে একটা ধাক্কা পাইলেই এই ইলেকট্রন্‌গুলি চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমাদের ঘরে সুইস্-বোর্ডে যে দুইটি "প্লাগ্ হোল্" আছে, উহারা খুব নিকটবর্ত্তী, তবু যে কোন বিদ্যুত প্রবাহিত হইতেছে না তার কারণ বাতাসের ইলেকট্রন্ অত আল্‌গা নয়। ভোল্ট্ কথাটি আমরা হয় ত শুনিয়াছি। কলিকাতায় ২২০ ভোল্টে আলো জ্বলে—রাজসাহী কলেজে ১১০ ভোল্টে বিদ্যুত চলে; কোন কোন স্থলে আমরা হয় ত ইহাও লেখা দেখিয়াছি যে "বিপদ্, চল্লিশ হাজার ভোল্ট"—অর্থাৎ সেখানে চল্লিশ হাজার ভোল্টে বিদ্যুত চলে। কত জোরে ইলেকট্রন্‌কে ধাক্কা দেওয়া হইতেছে ভোল্ট্ তাহারই পরিমাণ। যত বেশী ভোল্ট্, তত বেশী জোরে ইলেকট্রন্‌কে ধাক্কা দেওয়া হয়।

ইহা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে "ক" হইতে ইলেকট্রন্ যদি "খ"-তে যায়, তবে "ক" ও "খ"-এর মধ্যে বিদ্যুত প্রবাহিত হইবে।

"কন্‌ডেন্‌সার" জিনিষটি কি করিয়া তৈরী করে, তাহা আমাদের না জানিলেও চলিবে—কিন্তু কন্‌ডেন্‌সারের কি কাজ তাহা আমাদের জানা চাই। ইহা আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। (১নং চিত্র দেখুন)।
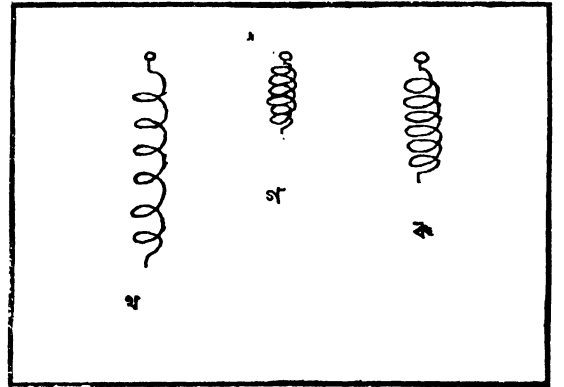
১নং চিত্র

১নং চিত্রে "ক" অংশে একটি স্প্রীং ঝুলিতেছে, ইহার উপরের দিক্‌টা একটা হুকে আট্‌কানো। নীচের দিকে ধরিয়া ইহাকে টানিলে ইহার যে আকার হইবে, তাহা চিত্রের "খ" অংশে দেখানো হইতেছে। এখন যদি ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে ইহা তৎক্ষণাৎ চিত্রের "গ" অংশের অনুরূপ হইবে অর্থাৎ ইহার দৈর্ঘ্য "ক" অংশের দৈর্ঘ্যের (স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য) চেয়ে কম হইবে; স্প্রীংটি কাঁপিতে থাকিবে অর্থাৎ ইহার দৈর্ঘ্য একবার ছোট, একবার বড়

হইতে থাকিবে—এই রকম কাঁপিতে কাঁপিতে স্প্রীংটি অবশেষে থামিয়া যাইবে। ইহাও দেখা যাইবে যে, স্প্রীংয়ের স্পন্দনমাত্রা ক্রমে কমিয়া আসিবে। এই যে স্প্রীং কাঁপে, ইহা স্প্রীংয়ের একটি ধর্ম্ম—ইহাকে "springiness" বলা যাইতে পারে।

কন্‌ডেন্‌সারের ভিতর দিয়া সাধারণত বিদ্যুত যাইতে পারে না। স্প্রীংকে টানিয়া ধরিলে ইহা শক্তি (energy) সংগ্রহ করিয়া রাখে। স্প্রীংকে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে ইহা যে কাঁপে তাহা এই সংগৃহীত শক্তির বলেই। ইহাই springiness. কন্‌ডেন্‌সারও তাহার গঠনজনিত বৈশিষ্ট্যের ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে। ইহার নাম "ক্যাপাসিটি" বা ধারণ-ক্ষমতা। স্প্রীংয়ের বেলায় যাহা springiness, কন্‌ডেন্‌সারের বেলায় তাহাই ক্যাপাসিটি। স্প্রীংকে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা কাঁপিতে কাঁপিতে অবশেষে থামিয়া যায়; কম্পন-মাত্রা ক্রমে কমিতে থাকে। কন্‌ডেন্‌সারের বৈদ্যুতিক শক্তিও এই রকম কাঁপিয়া কাঁপিয়া নষ্ট হয়। ইহাই কন্‌ডেন্‌সারের ডিস্‌চার্জ (এইখানে "নষ্ট" কথাটি ব্যবহার করিলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কোন শক্তিরই নাশ নাই—ইহা শুধু অন্য আকারে রূপান্তরিত হয়—সেই শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তির আকারে থাকে না বলিয়াই "নষ্ট" কথাটি ব্যবহার করিয়াছি)।

কিন্তু, স্প্রীংটিতে (১নং চিত্র) যদি একটা ভারী জিনিষ ঝুলাইয়া দেওয়া হইত এবং পরে তাহাকে একটু টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলেও স্প্রীংটি এদিক্ ওদিক্ কাঁপিত সত্য, কিন্তু কম্পনের পৌনঃপুন্য কমিয়া যাইত। সুতরাং এই ওজনের মাত্রা বাড়াইয়া বা কমাইয়া আমরা স্প্রীংয়ের কম্পনের পৌনঃপুন্য বাড়াইতে বা কমাইতে পারি।

স্প্রীংয়ের ক্ষেত্রে ওজনের সাহায্যে আমরা যাহা করিতে পারি, বিদ্যুতের বেলায় আমরা "ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স" সাহায্যেও তাহাই করি। "ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স"-এর সাহায্যে কন্‌ডেন্‌সারের ডিস্‌চার্জের পৌনঃপুন্য বাড়ানো বা কমানো হয়—ঠিক যে ভাবে ওজনের সাহায্যে স্প্রীংয়ের কম্পনমাত্রা পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে।

এইরূপেই অর্থাৎ কন্‌ডেন্‌সার ও ইন্‌ডাক্‌ট্যান্সের সাহায্যে বার্ত্তা-প্রেরকযন্ত্রের বায়ুস্থ তারে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কম্পনমাত্রা সংযুক্ত দোলায়মান বিদ্যুত প্রস্তুত করা হয়। কন্‌ডেন্‌সার একটি স্প্রীংয়ের কাজ করে এবং ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স একটি ওজনস্বরূপ। কন্‌ডেন্‌সারের ডিস্‌চার্জ হইল স্প্রীংয়ের কম্পনের অনুরূপ।

২নং চিত্রে একটি বার্ত্তাপ্রেরকযন্ত্রের ছবি দেখানো হইল।
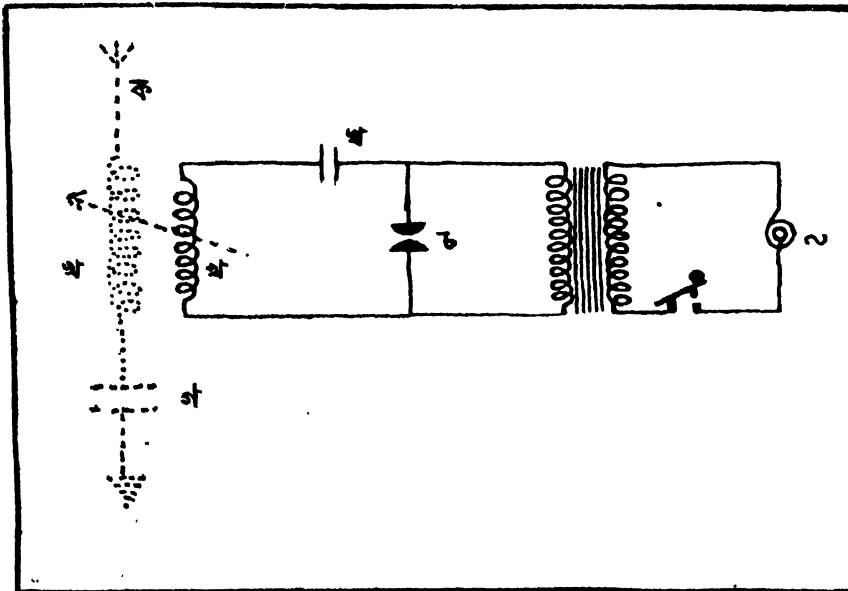
২নং চিত্র

"ক"—বায়ুস্থ তার; খ, খ—ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স; গ—বায়ুস্থ তারে কন্‌ডেন্‌সার; ঘ—কন্‌ডেন্‌সার। যন্ত্রের অন্যান্য অংশের সহিত আমাদের বর্ত্তমানে কোন প্রয়োজন নাই।

এই অংশে যন্ত্র সাহায্যে দোলায়মান বিদ্যুত প্রস্তুত করা হয় এবং এই কন্‌ডেন্‌সার ও ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স সাহায্যে উহার কম্পনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

বার্ত্তা-গ্রাহক-যন্ত্রেও এই ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স ও কন্‌-

ডেন্সার সাহায্যে বায়ুস্থ তারকে সহধ্বনিত করা হয়। (৩নং চিত্র দেখুন)।
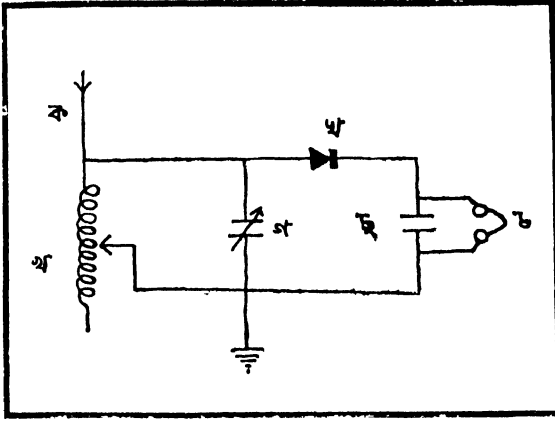
৩নং চিত্র

ক—বায়ুস্থ তার ; খ—ইন্ডাক্‌ট্যান্স্ ; গ—কন্‌ডেসার। অন্যান্য অংশের সহিত আমাদের বর্ত্তমানে কোন প্রয়োজন নাই। সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে রেডিও-বিদ্যুতকে কথায় পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই কন্‌ডেন্সার ও ইন্ডাক্‌ট্যান্স সাহায্যে বায়ুস্থ তারকে সহ-ধ্বনিত করিয়া রেডিও-ঢেউ গ্রহণোপযোগী করিয়া তোলা হয়।

কন্‌ডেন্সার ও ইন্ডাক্‌ট্যান্স্‌এর এই ধর্ম্ম যে বিদ্যুতের চলার পথে যতই বেশী কন্‌ডেন্সার দিব, ততই বিদ্যুতের পথের "springiness" বাড়িবে এবং "ইন্ডাক্‌ট্যান্স্" বাড়ানো অর্থ স্প্রীংয়ের নীচে ওজন বাড়ানো। যেমন, রেডিও বিদ্যুতের ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য যদি ১০০ মিটার হয়, (এক মিটার এক গজের কিছু বেশী) তবে তাহার স্পন্দনসংখ্যা হইবে সেকেণ্ডে ত্রিশ লক্ষ। গ্রাহক যন্ত্রের কন্‌ডেন্সার ও ইন্ডাক্‌ট্যান্সের সাহায্যে এমন অবস্থা করা হইবে যে বায়ুস্থ তারে যে বিদ্যুত হইবে—সেই বিদ্যুতের কম্পনসংখ্যাও সেকেণ্ডে ত্রিশ লক্ষ হইবে। এইরূপে শুধু একশত মিটারের রেডিও-ঢেউই যন্ত্রে ধরা পড়িবে—অন্য কোন ঢেউ যন্ত্রে সাড়া দিবে না।

সহধ্বনিত করার পর—"ডিটেক্‌শন" অর্থাৎ রেডিও বিদ্যুতকে একাভিমুখী করিয়া লওয়া। ৩নং চিত্রের "ঘ"-অংশ দেখুন। ইহা একটি "ক্রীষ্ট্যাল্"। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কতকগুলি ক্রীষ্ট্যাল্ আছে, যেমন, "কারবোরেণ্ডাম্", "গেলেনা"—যাহার ভিতর দিয়া শুধু এক দিকেই বিদ্যুত প্রবাহিত হইতে পারে। এইরূপে রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করিয়া পরে টেলিফোনে পাঠানো হয়। ৩নং চিত্রের "চ"-অংশ একটি টেলিফোন বা লাউড্-স্পীকার। এই যন্ত্র বিদ্যুত হইতে অনুরূপ কথার সৃষ্টি করে। এই ক্রীষ্ট্যাল-ব্যবহার-করা-যন্ত্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ; বহু দূরের রেডিও ঢেউ-এর পক্ষে ইহা কার্য্যকরী নয়। কাজেই এবং অন্যান্য কারণে ইহার ব্যবহার আজকাল খুব কমিয়া গিয়াছে। তবু ইহা খুব স্বল্প-আয়াসসাধ্য এবং এই রকম বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্র তৈরী করিতে খরচও বেশী পড়ে না।

বর্ত্তমানে ভ্যাকুয়াম্ টিউব্ সাহায্যে বার্ত্তাপ্রেরক ও বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্র উন্নত ধরণের করা হইয়াছে। আধুনিক বার্ত্তাপ্রেরক ও বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের বর্ণনা করা কঠিন। কিন্তু ইহার মূল তথ্যটি অপেক্ষাকৃত সহজ, সুতরাং এখানে সংক্ষেপে তাহাই বলা যাইতেছে।

ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌বে যে তার জ্বলে, তাহাকে ফিলামেণ্ট্ বলে। ইহার ভিতর দিয়া বিদ্যুত চলিলে ইহা উত্তপ্ত হয় এবং পরিশেষে সাদা আলো দেয়। এডিসন্ সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করিলেন যে এই জ্বলন্ত তার হইতে ইলেক্‌ট্রন্ বাহির হইয়া আসে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইলেক্‌ট্রন্ ঋণাত্মক বিদ্যুত। কাজেই এই তারের নিকটে যদি একটি ধনাত্মক বিদ্যুত-বিশিষ্ট তার থাকে, তবে ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি এই শেষোক্ত তারে আসিয়া পড়িবে ; কারণ ধনাত্মক বিদ্যুত ঋণাত্মক বিদ্যুতকে আকর্ষণ করে। তেমনি এই তারের নিকট যদি ঋণাত্মক বিদ্যুত-বিশিষ্ট কোন তার থাকে, তবে যে সমস্ত ইলেক্‌ট্রন্ জ্বলন্ত তার হইতে বাহিরে আসিতেছে, তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যাইবে ; কারণ ঋণাত্মক বিদ্যুত ঋণাত্মক বিদ্যুতকে বিকর্ষণ করে। কোন্ বিদ্যুত কোন্ বিদ্যুতকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিবে, সে সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, সমধর্ম্মীর সমধর্ম্মীর উপর বিকর্ষণ এবং বিধর্ম্মীর উপর আকর্ষণ। আমরা ইহাও জানি যে ইলেক্‌ট্রন্ চলিলেই বিদ্যুত চলে, আর তাহাদের সংখ্যার তারতম্যের উপরেই বিদ্যুতের শক্তি কম বা বেশী হইয়া থাকে। এইরূপে বাল্‌বের উত্তপ্ত তারের নিকটে আর একটি ধনাত্মক বিদ্যুত-বিশিষ্ট "প্লেট্" রাখিয়া বৈজ্ঞানিকপ্রবর ফ্লেমিং একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন—এই যন্ত্র সাহায্যে রেডিও-বিদ্যুতকে

অতি সহজে একাভিমুখী করা যাইতে পারে। ইহার পরে এই বাল্‌বের আরও উন্নতি করা হইল। "ফিলামেণ্ট্" ও "প্লেট্"—ইহাদের মাঝখানে আর একটি তারের জাল (ইহাকে "গ্রিড্" বলে). দিয়া ইলেক্‌ট্রন্-প্রবাহকে আরও সংযত ও করায়ত্ত করা হইল। আমরা এই প্রকার বাল্‌বের কার্য্য-প্রণালী চিত্র সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিব। (৪নং চিত্র দেখুন)।
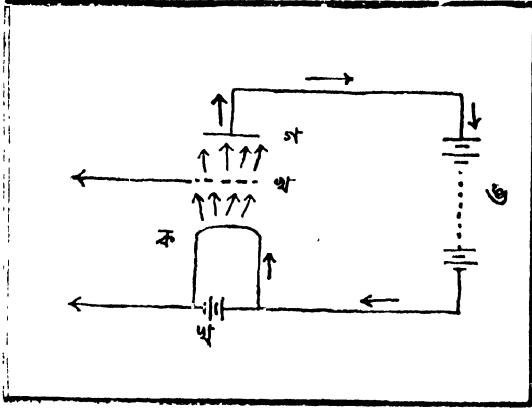
৪নং চিত্র

এই চিত্রের ক, খ, ও গ অংশ লইয়া বাল্‌ব্‌টি তৈরী। ক—ফিলামেণ্ট্; খ—গ্রিড্; গ—প্লেট্; ঘ ও ঙ—ছুইটি ব্যাটারী অর্থাৎ বিদ্যুত-সরবরাহ করার যন্ত্র। "ঘ" হইতে বিদ্যুত "ক" ফিলামেণ্টে গিয়া ইহাকে উত্তপ্ত করে; কাজেই "ক" হইতে ইলেক্‌ট্রন্ বাহির হইতে আরম্ভ করে। এই ইলেক্‌ট্রন্ তারের জাল "খ"-এর ফাঁকের মধ্য দিয়া "গ" প্লেটে আসে। "ক" হইতে ইলেক্‌ট্রন্ "গ"-তে আসে, কাজেই "ক" ও "গ"-এর মধ্যে বিদ্যুত প্রবাহিত হয়। এখন মনে করা যাক্ যে "খ"-তে ধনাত্মক বিদ্যুত আছে; এই ধনাত্মক বিদ্যুত "ক"-এর ইলেক্‌ট্রন্‌কে আকর্ষণ করিবে, কাজেই এবার বেশীসংখ্যক ইলেক্‌ট্রন্ "ক" হইতে আসিয়া "খ"-এর ফাঁক দিয়া "গ"-তে আসিয়া পৌছিবে। বেশীসংখ্যক ইলেক্‌ট্রন্ আসা অর্থই বেশী শক্তির বিদ্যুত প্রবাহিত হওয়া। তেমনি "খ"-তে যদি ঋণাত্মক বিদ্যুত থাকে, তবে এই বিদ্যুত "ক"-এর ইলেক্‌ট্রন্‌কে বাধা দিবে এবং খুব কম সংখ্যক ইলেক্‌ট্রনই "গ"-তে যাইবে এবং প্লেটের বিদ্যুতের শক্তি কমিয়া যাইবে। সুতরাং "খ"-এর বিদ্যুতের রকমের উপর প্লেটের বিদ্যুতের শক্তি নির্ভর করে। রেডিও-বিদ্যুত একবার এক দিকে, আর একবার অন্যদিকে প্রবাহিত হয়; কাজেই এই বিদ্যুত যদি "খ"-এর উপরে পড়ে, তবে "খ"-এর বিদ্যুতের প্রকৃতি যখন ধনাত্মক হইবে, তখনি শুধু প্লেটে বিদ্যুত হইবে, অন্য সময়ে হইবে না; কাজেই দ্বিরাভিমুখী রেডিও-বিদ্যুতের শুধু এক-দিকে-প্রবাহিত হওয়া অংশটুকুর অনুপাতেই প্লেটে বিদ্যুত সৃষ্টি হইবে, অন্য দিকে প্রবাহিত-হওয়া অংশটুকু কার্য্যত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। এইরূপেই বাল্‌ব সাহায্যে রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করা হয়।

রেডিও-বিদ্যুতকে শক্তি-বর্দ্ধিতও এই বাল্‌ব্ সাহায্যেই করা হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, "খ" যদি ঋণাত্মক বিদ্যুত হয়, তবে প্লেটে এক রকম কোন বিদ্যুতই প্রবাহিত হইবে না এবং "খ" যদি ধনাত্মক বিদ্যুত হয়, তবে প্লেটের বিদ্যুতের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। একথা বলাই বাহুল্য যে "খ"-এর উপরে অর্পিত বিদ্যুতের শক্তির (Voltage) উপর প্লেটের বিদ্যুতের শক্তি নির্ভর করিবে। নানা কারণে (Space charge) প্লেটের বিদ্যুত যথেচ্ছ বাড়ানো যায় না। যদি "খ"-এর ভোল্ট্ "নিগেটিভ্" হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে "পজিটিভে"র দিকে ওঠে, তবে "গ"-এর বিদ্যুতের মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া সর্ব্বশেষে আর বাড়িবে না। এই প্রক্রিয়া (experiment) হইতে আমরা ইহাও লক্ষ্য করিব যে, "খ"-এর উপরে একটি বিশেষ ভোল্ট্ অর্পিত হইলে "গ"-তে যে বিদ্যুত সৃষ্ট হয়, সেই বিদ্যুত "খ"-এর ভোল্টের সামান্য একটু পরিবর্ত্তনে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়। আরও একটি বিশেষ ভোল্ট্ আছে, যে সময়ে "গ"-এর বিদ্যুত হঠাৎ-বেশী করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করে। এই ছুইটি বিশেষ ভোল্ট্‌কে আমরা "প্রথম" ও "দ্বিতীয়" বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের অন্যান্য অংশ এমনভাবে তৈরী যে, যে বাল্‌বে রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করা হয়, সেই বাল্‌বে "খ"-এর উপর "দ্বিতীয়" বিশেষ ভোল্ট্‌টি অর্পিত হয়; যে বাল্‌ব্ রেডিও-বিদ্যুতকে শক্তিসম্পন্ন করে, সেখানে "খ"-তে "প্রথম" বিশেষ ভোল্ট্ ব্যবহৃত হয়। কেন এইরূপ করা হয়, তাহা আমরা রেডিও-বিদ্যুতকে শক্তি-সম্পন্ন করা বা একাভিমুখী করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেই বুঝিতে পারিব। যে বাল্‌ব্ রেডিও-ঢেউকে শক্তি-বর্দ্ধিত করিবে, সেই বাল্‌ব ছুইদিকে প্রবাহিত রেডিও-ঢেউয়ের উভয় দিককেই সমভাবে

বৰ্দ্ধিত করিবে—তাহা না হইলে নিশ্চয়ই শব্দবিকৃতিদোষ ঘটিবে—এই জন্যই "খ"-এর উপর "প্রথম" বিশেষ ভোল্ট্ অর্পিত হয়, কারণ "খ"-এর ভোল্ট্ যদি এই বিশেষ ভোল্ট্ হইতে সমপরিমাণে বাড়িয়া বা কমিয়া যায় তবে "গ"-এর বিদ্যুতও সমপরিমাণে বাড়িবে বা কমিবে। এই বাল্‌বের পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই—রেডিও বিদ্যুতের উভয় অংশকেই ইহা সমান চোখে দেখে; কাজেই এই "প্রথম" বিশেষ ভোল্টের ব্যবহার। কিন্তু যে বাল্‌ব্ রেডিও বিদ্যুতকে একাভিমুখী করিবে তাহার পক্ষপাতিত্ব দোষ থাকা চাই; সে উভয় দিকে প্রবহমান রেডিও-বিদ্যুতের এক-দিকে প্রবাহিত অংশকেই শুধ্ বৰ্দ্ধিত করিবে, অন্যদিকে-প্রবাহিত অংশটিকে তেমন বৰ্দ্ধিত শক্তি করিবে না—কাজেই মোটের উপর রেডিও-বিদ্যুত-একাভিমুখী হইয়া যাইবে। এই জন্যই এই স্থলে "খ"-এর উপরে "দ্বিতীয়" বিশেষ ভোল্ট্‌টি ব্যবহৃত হয়। "খ"-এর ভোল্ট্ যদি এই বিশেষ ভোল্ট্ হইতে সমপরিমাণে বাড়িয়া বা কমিয়া যায়, তবে "গ"-এর বিদ্যুত সমপরিমাণে বাড়িবে বা কমিবে না। এক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে হইবে, অন্যক্ষেত্রে হ্রাস শুধ্ নাম মাত্র হইবে; কাজেই উভয়মুখী সম্পূর্ণ রেডিও-ঢেউয়ের শুধ্ একদিকের অংশ-অনুপাতেই "গ"-এর বিদ্যুতের শক্তি কমিবে বা বাড়িবে। এইরূপেই রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করা হয় এবং এই জন্যই "দ্বিতীয়" বিশেষ ভোল্টের ব্যবহার।

রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করা কথাটি আমরা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, রেডিও-বিদ্যুতের কম্পনসংখ্যা সেকেণ্ডে দেড় লক্ষ হইতে ত্রিশ লক্ষ বা আরও বেশী হইতে পারে—এই সমস্ত ঢেউয়ের বিস্তার উভয় দিকেই সমান—কাজেই আমরা দেখিয়াছি যে, টেলিফোনে এই বিদ্যুত গেলে—ইহার বিস্তার উভয় দিকেই সমান বলিয়া টেলিফোনের পর্দ্দা একরকম নিশ্চলই থাকিবে; অথবা যদি উহা কাঁপেই, তবু উহার কম্পনসংখ্যা এত বেশী হইবে যে উহাতে কোন শব্দ শোনা যাইবে না। কাজেই রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করার উদ্দেশ্য দুইটি—(১) রেডিও-ঢেউয়ের একদিক্—হয় উপরের দিক (crest), নয় নীচের দিক্ (through) মুছিয়া ফেলিতে হইবে; এবং (২) অনেকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ঢেউকে মিশাইয়া একটি ঢেউ-এ পরিণত করিতে হইবে।

ক্রীষ্ট্যালের বেলায় আমরা দেখিয়াছি যে ইহার একদিকে বিদ্যুত অতি সহজে যায়, অন্যদিকে যায় না। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাক্ যে, একটি ঢেউয়ের উপরের দিকে (crest) ধনাত্মক এক ভোল্ট্ এবং নীচের দিকে (through) ঋণাত্মক এক ভোল্ট্। যখন ধনাত্মক বিদ্যুত আসিয়া ক্রীষ্ট্যালের গায়ে পড়িবে, তখন মনে করা যাক্ যে, বিশ মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার (এইগুলি বিদ্যুত মাপিবার পরিমাপ, যেমন দূরত্ব—গজ ফুট্ বা ইঞ্চের সাহায্যে মাপে, অথবা সময় মাপে ঘণ্টা, সেকেণ্ড্ বা পল অনুপল দিয়া) বিদ্যুত প্রবাহিত হইবে; এই ক্রীষ্ট্যালের উপরে যখন ঋণাত্মক বিদ্যুত আসিয়া পড়িবে তখন হয় ত শুধ্ তিন মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুত এই ক্রীষ্ট্যালের মধ্য দিয়া যাইবে। কাজেই ক্রীষ্ট্যালের মধ্য দিয়া মোটের উপর সতের মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুত প্রবাহিত হইল, এবং রেডিও-বিদ্যুত প্রকৃত পক্ষে একাভিমুখী হইয়া গেল। টেলিফোনের সঙ্গে একটি কন্‌ডেন্‌সার ব্যবহার করা হয়। (৩নং চিত্রের "ছ"-অংশ দেখুন)। একাভিমুখীকৃত রেডিও-বিদ্যুত আসিয়া কন্‌ডেন্‌সারে পড়িলে তবে টেলিফোনে একবার বিদ্যুত যাইবে—কন্‌ডেন্‌সারের এই ধৰ্ম্ম তাহার চরিত্রগত—ইহা তাহার "ক্যাপাসিটির" উপরে নির্ভর করে এবং এইরূপে অনেকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রেডিও-ঢেউকে একটি ঢেউয়ে পরিণত করা হয়, তবেই আমরা কথা শুনি। টেলিফোনের সঙ্গে এই "কন্‌ডেন্‌সার" ব্যবহার না করিলেও হয়, সে সময়ে এই "কন্‌ডেন্‌সারের" কাজ টেলিফোনে ব্যবহৃত বিদ্যুতবাহী তারগুলিই করিয়া থাকে।

বাল্‌বের বেলাতে পদ্ধতিটি একটু ভিন্ন; কিন্তু উদ্দেশ্য একই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে "খ"-এর উপরে একটি ভোল্ট্ দিলে "গ"-এর বিদ্যুতের (৪নং চিত্র) শক্তি হঠাৎ বাড়িয়া যায় এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, কেন এই বিশেষ ভোল্ট্‌টি রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করার সময় বাল্‌বের "গ্রীড্" "খ"-তে ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষ ভোল্ট্‌টির এই রকম বিশেষ গুণ যে, "খ"-এর ভোল্ট্ যদি ইহার চেয়ে সমপরিমাণে কমে বা বাড়ে, তবে "গ"-এর বিদ্যুতের পরিবর্ত্তন খুবই অসমান হইবে; কাজেই গড়-

পড়তায় দ্বিরাভিমুখী বিদ্যুত হইতে একাভিমুখী (যদিও সামান্য কম শক্তিশালী) বিদ্যুতই এই বাল্‌ব্‌ সাহায্যে সৃষ্ট হইবে। গ্রাহক-যন্ত্রে অন্যান্য যন্ত্রের সমাবেশে যে বাল্‌ব্‌ রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করিবে, সেই বাল্‌বে যাহাতে "খ"-এর উপর এই বিশেষ ভোল্‌ট্‌টি অর্পিত হয়, সেই ব্যবস্থাই করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমানে "গ্রীডের" সঙ্গে একটি "কন্‌ডেন্‌সার" ব্যবহার করা হয় এবং গ্রীড্‌কে একটি খুব সরু তার দিয়া মাটীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। (৫নং চিত্র দেখুন।) এই চিত্রের "ত"-অংশ একটি সরু তার, এবং "ণ" অংশ একটি কন্‌ডেন্‌সার। অন্যান্য অংশ বিষয়ে পরে বলিতেছি।

গ্রীডে ইলেক্‌ট্রন্‌ জমা—কাজেই, গ্রীড্‌ ক্রমে ক্রমে ঋণাত্মক-বিদ্যুত-বিশিষ্ট হইয়া পড়িবে এবং প্লেটের বিদ্যুতের শক্তি কমিয়া যাইবে। গ্রীডে বিদ্যুতের মাত্রা বেশী হইয়া পড়িলে ইহা সরু তারের সাহায্যে মাটীতে চলিয়া যাইবে।

কাজেই দেখা গেল যে এই রকম ব্যবস্থাতে দোলায়মান বিদ্যুতের ঋণাত্মক অংশটুকুই বেশী কার্য্যকরী ও একটার পর একটা বিদ্যুত আসিয়া গ্রীডের উপরে ঋণাত্মক বিদ্যুতের সৃষ্টি করে এবং এই বিদ্যুত বাড়িলে প্লেটের বিদ্যুত কমিয়া যায়। এইরূপে রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করা হয় এবং অনেকগুলি রেডিও-বিদ্যুত মিলিয়া একটি বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়।

৫নং চিত্রটি একটি সাধারণ বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের ছবি। চ—বায়ুস্থ তার; ঠ, ছ, জ—ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স; ঝ, ড—পরিবর্ত্তনীয় কন্‌ডেন্‌সার; ক-ফিলামেণ্ট্‌; খ—"গ্রিড্‌", গ—প্লেট্‌। ঞ, ট—ছোট ব্যাটারী; চ, থ—বড় ব্যাটারী; ণ—গ্রিড্‌ কন্‌ডেন্‌সার: ত—সরু তার; দ—টেলিফোন্‌ বা লাউড্‌ স্পীকার।

৫নং চিত্র

রেডিও ঢেউ চ-এরউপরে পড়ে; ছ, জ ও ঝ সাহায্যে বায়ুস্থ তারকে সহধ্বনিত করা হয়; ক, খ গ ও ঞ এবং ঠ, ড, ঢ সাহায্যে রেডিও-বিদ্যুতের শক্তি-বর্দ্ধিত করা হয়। ণ, ত, ক, খ, গ, ট, থ সাহায্যে ইহাকে একাভিমুখী করা হয়। পরে "দ" বিদ্যুতকে কথায় রূপ দেয়।

এই "গ্রীড্‌" কন্‌ডেন্‌সারের ফলে গ্রীডে শুধু দোলায়মান বিদ্যুতই প্রবাহিত হইতে পারে। মনে করা যাক্‌ যে, এই দোলায়মান বিদ্যুতের ঋণাত্মক অংশ আসিয়া গ্রীডের উপর পড়িয়াছে—"ক" হইতে যখন ইলেক্‌ট্রন্‌ বাহির হইয়া আসিবে তখন ইহাদের কিছু অংশ এই গ্রীডে আট্‌কা পড়িবে। এখন যদি দোলায়মান বিদ্যুতের ধনাত্মক অংশ আসিয়া গ্রীডে পৌঁছে, তাহা হইলে এই সঞ্চিত ইলেকট্রন্‌গুলির খানিকটা নষ্ট হইয়া যাইবে (কারণ, ইহারা বিপরীতধর্মী বিদ্যুত)। তখন "ক" হইতে "খ" পর্য্যন্ত বিদ্যুত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিবে। এখন এই বিদ্যুত-প্রবাহ অর্থই

বার্ত্তাপ্রেরক-যন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি, বর্ত্তমানে এই যন্ত্রেও বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের মত বাল্‌ব্‌ ব্যবহৃত হয়। নিম্নে একটি সহজ পন্থার কথা বলিতেছি। (৬নং চিত্র দেখুন।) ঝ—বায়ুস্থ তার; চ, ছ, জ—ইন্‌ডাকট্যান্স্‌; ক, খ ও গ—বাল্‌বের তিনটি অংশ; ণ—পরিবর্ত্তনীয় কন্‌ডেন্‌সার। ড—কন্‌ডেন্‌সার। ঢ—লো-ফ্রিকোয়েন্সি ট্র্যান্‌স্‌ফরমার; ট—ছোট ব্যাটারী; ঠ - বড় ব্যাটারী; ত—মাইক্রোফোন।
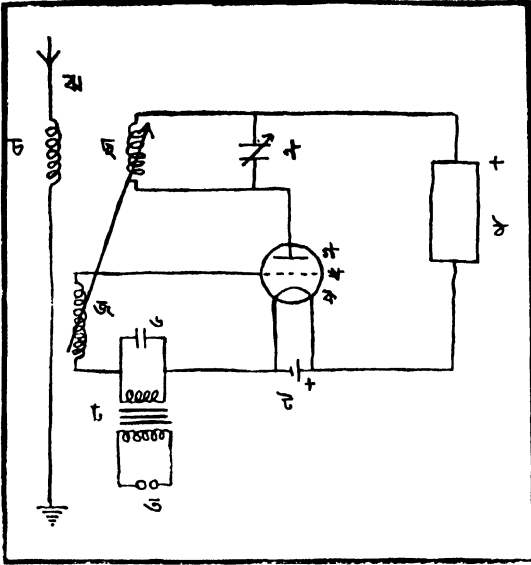
৬নং চিত্র

মাইক্রোফোনে কথাকে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। "ড"-এর ভিতর দিয়া বহুকম্পনযুক্ত বিদ্যুত যাইতে পারে। ইহা আছে বলিয়াই অবিচ্ছিন্ন ঢেউ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়। "ণ"কে পরিবর্ত্তন করিয়া রেডিও-ঢেউয়ের কম্পন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। ইহার সাহায্যেই একটি বিশেষ বেতার প্রতিষ্ঠান হইতে একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের রেডিও-ঢেউ প্রেরণ করা হয়। এস্থলেও আমাদিগকে ১নং চিত্রের স্প্রীং ও ওজনের কথা মনে করিতে হইবে।

ছ ও জ এমনভাবে সংযুক্ত যে একটিতে বিদ্যুতের পরিবর্ত্তন হইলে অন্যটিতেও অনুরূপ বিদ্যুতের পরিবর্ত্তন হয়। ইহার সাহায্যেই নিরবচ্ছিন্ন ঢেউ প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়। যেমন, মনে করা যাক্ যে কোন কারণে "জ"-তে ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়িয়া গেল; তাহাতে আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, "স"-তে বেশী বিদ্যুত প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ "ছ"-তেও বিদ্যুতের মাত্রা বাড়িয়া গেল। "গ"-এর বিদ্যুত বাড়িয়া বাড়িয়া এক সময়ে আবার কমিতে থাকিবে, কাজেই "জ"-এর বিদ্যুতও কমিতে থাকিবে—পরে এক সময়ে "গ"-এর বিদ্যুত একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে। পরেই আবার "গ"এর বিদ্যুত বিপরীত দিকে বাড়িয়া বাড়িয়া ইহার আবার কিছুক্ষণ পরে কমিতে কমিতে শূন্য হইয়া যাইবে। এইরূপে একটি দ্বিরাভিমুখী বিদ্যুতের সৃষ্টি হইবে। "ঘ"এর সাহায্যে এই বিদ্যুতের কম্পন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে এবং "চ"এর সাহায্যে এই বিদ্যুতকে "ঝ"-এর মধ্যে সঞ্চারিত করা হইবে। এইরূপে বায়ুস্থ তারে বার্ত্তাবাহী ঢেউয়ের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে ত, ঢ ও ড সাহায্যে এই বার্ত্তাবাহী ঢেউয়ের উপর কথার ঢেউ ফেলা হইবে। ফলে বাগাশ্রিত ঢেউয়ের সৃষ্টি হইল।

নিম্নের ৭নং ও ৮নং চিত্রে আমরা ঢেউগুলিকে আঁকিয়া দিতেছি।

৭নং চিত্রে—ক—বার্ত্তাবাহী ঢেউ; খ—শব্দের ঢেউ; গ—বাগাশ্রিত ঢেউ।

৮নং চিত্রে ক-অংশে রেডিও-ঢেউকে বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রে বর্দ্ধিতশক্তি করা হইতেছে; "খ"-অংশে—ইহাকে একাভিমুখী করা হইতেছে; গ-অংশে ইহাকে পুনরায় শক্তিবর্দ্ধিত করা হইতেছে।

রেডিও-ঢেউ কি করিয়া প্রেরিত ও গৃহীত হয়, সে সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে এই সব কথা বলা হইলেও প্রকৃত
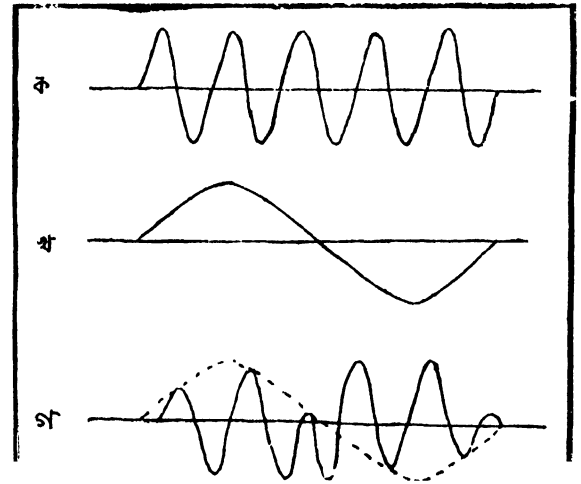
৭নং চিত্র

ব্যাপারটি আরও জটিল। আমরা এখানে কয়েকটি উপায়ের শুধু নাম বলিয়া যাইব মাত্র। প্রথম—বার্ত্তা-প্রেরক-যন্ত্র। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, কি করিয়া রেডিও-ঢেউ প্রস্তুত করে? পূর্ব্বে—রেডিওর অতি শৈশবে—বিদ্যুতের স্পার্ক সাহায্যে রেডিও-বিদ্যুত প্রস্তুত হইত। (২নং

চিত্রের "চ"-অংশ)। এই ঢেউগুলির ধাবনমাত্রা অতি অল্প সময়েই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। কাজেই এই ঢেউগুলি
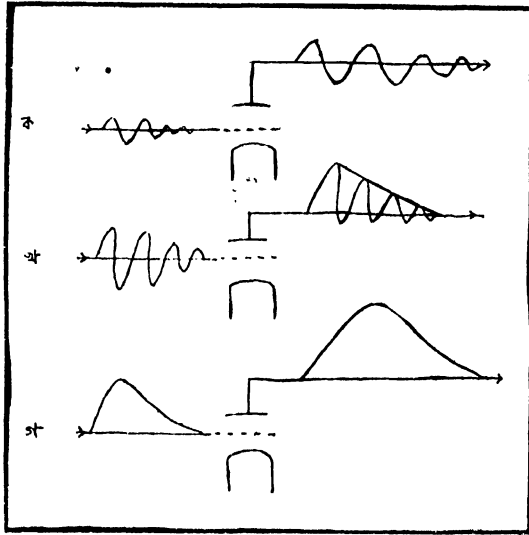
৮নং চিত্র

বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়। কিন্তু আজকাল অবিচ্ছিন্ন রেডিও-ঢেউই বার্ত্তাপ্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা নিম্নলিখিত উপায়গুলি দ্বারা উৎপাদিত হয়—(১) হাই-ফ্রিকোয়েন্সি অল্টারনেটার, (২) অসিলেটিং ইলেক্‌ট্রিক্ আর্ক; (৩) ভ্যাকুয়াম্ টিউব্। বহুশক্তিসম্পন্ন বড় ঢেউ প্রেরণে প্রথম উপায় ব্যবহৃত হয়; কম শক্তিসম্পন্ন ছোট ঢেউ প্রেরণে তৃতীয় উপায়টিই ভাল। পূর্ব্বে আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। অবিচ্ছিন্ন রেডিও-ঢেউ কেন ভাল ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, (১) বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রকে সহধ্বনিত (tuned) খুব ভালভাবে করা যায় এবং (২) অল্পশক্তি ব্যয়ে বহুদূরে রেডিও-ঢেউ প্রেরণ করা যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাগাশ্রিত ঢেউ কি করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহা মাইক্রোফোন্ যন্ত্র সাহায্যে হয় এবং ইহার অনেক পন্থা আছে, যেমন—Heising system ; Microphone in the antenna circuit ; Microphone in the grid circuit. আমরা একটি উপায়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তার পর—সাধারণত কোনও একটি বিশেষ বেতার প্রতিষ্ঠান হইতে একটি বিশেষ সংখ্যক পৌনঃপুন্য সম্বলিত ঢেউ প্রেরিত হয়। যেমন কলিকাতা হইতে যে ঢেউ প্রেরিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ৩৭০·৪ মিটার্ অর্থাৎ চারশত গজের কিছু বেশী। সুতরাং বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের বায়ুস্থ তারকে কি করিয়া সহধ্বনিত করা হয় সেইটাই প্রশ্ন। ইহাও জটিল। যে যে উপায়ে ইহা করা যায় তাহা এই :—(১) ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স্ কয়েল্ মেথড্, (২) ভেরিওমিটার মেথড্ (৩) ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স্ এণ্ড ক্যাপাসিটি কম্বাইণ্ড্ মেথড্ (৪) ডাবল্ সার্‌কিট্ ওয়্যারিং, (৫) ভেরিয়েবল্ কন্‌ডেন্‌সার্ ইন্ সিরিজ্ এণ্ড পেরালেল্ সার্‌কিট্‌স্। এ সম্বন্ধেও মূল তথ্য আমাদের বলা হইয়াছে।

আর একটা দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে—বার্ত্তাপ্রেরক-যন্ত্রের বায়ুস্থ তারে যে বিদ্যুত প্রবাহিত হয় তাহার পৌনঃপুন্য এমন বেশী হওয়া উচিত যাহাতে উহা হইতে শ্রবণযোগ্য কোনও শব্দ সৃষ্টি না হয়। কারণ, তাহা হইলে এই শব্দেও প্রেরিত শব্দে দ্বন্দ্ব (interference) উপস্থিত হইবে। মানুষের কথার ঢেউয়ের পৌনঃপুন্য সাধারণত প্রতি সেকেণ্ডে আটশত। অবশ্য ইহা যে স্বরের কোমলতা ইত্যাদির উপরে নির্ভর করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তারপর, বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের খুঁটিনাটির কথা। প্রথমত রেডিও-বিদ্যুত কমশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে ডিটেক্‌টারে পাঠাইবার পূর্ব্বে শক্তিবর্দ্ধিত (amplified) করিয়া লওয়া হয়। যে যন্ত্র সাহায্যে ইহা করা হয় তাহার নাম আমরা জানি। ইহা "বাল্‌ব্"। তিনটি বিভিন্ন উপায়ে (যেমন, (১) রেজিষ্ট্যান্স্ কাপ্‌লিং, (২) ইন্‌ডাক্‌টান্স্ কাপ্‌লিং ও (৩) ট্র্যান্‌সফরমার্ কাপ্‌লিং) ইহা ব্যবহৃত হইয়া রেডিও-বিদ্যুতকে শক্তিবর্দ্ধিত করিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়টিতে অনেক অসুবিধা থাকায় তৃতীয় উপায়টিই সাধারণত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেডিও-ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য পাঁচশত মিটারের অর্থাৎ প্রায় পাঁচশত বিয়াল্লিশ গজের বেশী হইলে প্রথম উপায়টিই ব্যবহৃত হয়।

এই রকম ভাবে রেডিও-বিদ্যুতকে বর্দ্ধিতশক্তি করিতে অনেকগুলি ভ্যাকুয়াম্ টিউবের প্রয়োজন হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বর্ত্তমানে তিনটি টিউব্ দিয়াই এই কাজ সাধিত হয়। উপরন্তু তৃতীয় টিউব্‌টি ডিটেক্‌টারের কাজ করে।

আর্মষ্ট্রং রেডিও-বিদ্যুতকে বর্দ্ধিতশক্তি করার আর একটি উপায় (super-heterodyne amplification)

উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই উপায়টিতে বায়ুস্থ তারের রেডিও-বিদ্যুতের বহুসংখ্যক কম্পনকে যন্ত্রসাহায্যে (Local generator or Oscillator) কমসংখ্যক কম্পনে পরিবর্ত্তিত করিয়া পরে শক্তিবর্দ্ধিত করা হয়। পরবর্ত্তীকালে এই উপায়কে আরও উন্নত করা হইয়াছে (Reflex arrangement and the use of an oscillator-detector tube)। তার পর ইহাকে ডিটেক্টারের ভিতর দিয়া পাঠাইয়া একাভিমুখী করিয়া লওয়া হয়। এই বিদ্যুতের শক্তিও যথেষ্ট নয়। কাজেই পুনরায় ইহাকে শক্তি-বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া দরকার। রেডিও-বিদ্যুতকে ডিটক্টারে পাঠাইবার পূর্ব্বে শক্তিবর্দ্ধিত না করিলে—পরে তাহার শক্তিবর্দ্ধিত করা যায় না; তবু অনেক রকম উপায় অবলম্বন করিয়া রেডিও-বিদ্যুতকে ডিটেক্টারের ভিতর পাইয়া পরে শক্তিবর্দ্ধিত করা হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের তিনটি উপায় আছে—১। ট্রান্স্ফরমার কাপ্লিং ২। রেজিষ্ট্যান্স্ কাপ্লিং ৩। ইন্ডাক্ট্যান্স্ কাপ্লিং। দ্বিতীয় উপায়টিতে শব্দ বিকৃতি না ঘটিলেও ইহা দ্বারা বিদ্যুতের শক্তি বিশেষ বাড়ানো যায় না। প্রথম উপায়টিতে শব্দ-বিকৃতি দোষ আছে, কিন্তু তৃতীয় উপায়টিতে এই দোষের মাত্রা অনেক বেশী বলিয়া প্রথম উপায়টিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আধুনিক গবেষণার ফলে তিনটি ভ্যাকুয়াম্ টিউব্ দিয়াই রেডিও-বিদ্যুতকে বর্দ্ধিতশক্তি করা হয় এবং রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি য়্যাম্প্লিফিকেশন্ (অর্থাৎ ডিটেক্টারে পাঠাইবার পূর্ব্বে ও পরে রেডিও-বিদ্যুতকে যে ভাবে বর্দ্ধিতশক্তি করা হয়)—এই দুইটা কার্য্যই একসঙ্গে সাধিত হয়। এই উপায়কে ইংরেজীতে Reflex circuit বলে। এই উপায়গুলির নাম—(১) Acme Reflex circuits; (২) Harkness Reflex circuits; (৩) Erla Reflex circuits (৪) Four tube Acme Reflex circuits, এবং (৫) Grimes Inverse duplex circuits.

রেডিও-বিদ্যুতকে শক্তিবর্দ্ধিত করার যন্ত্রে অনেক সময় যে অদ্ভুত ও বিকট শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় তাহা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যন্ত্রের দোষ। এই দোষের নাম "রি-জেনারেশন।" ইহা কিরূপে ঘটে তাহা সহজ বাংলাতে বলা শক্ত; তবে এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, রেডিও-বিদ্যুত টেলিফোনে যাইবার পথে ইহার কিছু অংশ ফিরিয়া যায় এবং পুনরায় ভ্যাকুয়াম্ টিউবে পতিত হইয়াই এই দোষ ঘটায়। নানা উপায়ে এই অসুবিধা দূর করা যায়—যেমন:

১। Grid potentiometer for regeneration control. এই উপায়টি সহজসাধ্য বলিয়া অনেকে পছন্দ করেন।

২। Shunt resistance on transformers.

৩। High resistance transformer windings.

৪। Iron-core transformers.

৫। Tickler coil control of regeneration in superdyne receiver.

৬। Reversed capacity control of regeneration i. e., Neutrodyne receiver, এই উপায়টিও জনপ্রিয়। তাহা ছাড়া ইহার আর একটু সুবিধা এই যে, এই জাতীয় গ্রাহক-যন্ত্র কোন শক্তি (অর্থাৎ energy) বিকীরণ (radiate) করে না বলিয়া নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রাহক-যন্ত্রের সহিত কোনো দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না।

৭। Inductance coupling for regeneration control. এই উপায় অনেক উপায় হইতে সুবিধাজনক।

৮। Capacity for regeneration control. ফ্রান্সে এই উপায়ই বেশী ব্যবহৃত হয়।

৯। Balanced circuit for regeneration control.

১০। Rice circuit—ইহা নয়-চিহ্নিত উপায়েরই প্রকারান্তর।

এই সমস্ত "খটমট" ইংরেজী ও বাংলা কথা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, যদিও ঘরে বসিয়া "সুইস্" টিপিলেই আমরা বহুদূরের কথা, গান, বাজনা ইত্যাদি শুনিতে পারি, তবু এই যন্ত্রটির কলকব্জা খুবই জটিল এবং রেডিওকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে অনেক চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি ব্যয়িত করিতে হইয়াছে।

ভবিষ্যতে গবেষণা রেডিও যন্ত্রকে আরও কত দূর উন্নত মজবুত করিয়া তুলিবে তাহা বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকের বহুমুখী প্রতিভা রেডিওকে জগতের কাজে আরও কতদূর ব্যাপৃত করিয়া তুলিতে পারিবে, তাহাও অনিশ্চিত। কিন্তু ইহা ঠিক যে রেডিও যদি আবিষ্কৃত না হইত, তবে আমরা যে রকম পৃথিবীতে বর্ত্তমানে বসবাস করিতেছি, পৃথিবী ঠিক তেমন হইতে পারিত না এবং মানুষের সভ্যতাও অন্তত পক্ষে পাঁচশত বৎসর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। রেডিও আবিষ্কারকদের পক্ষে ইহা খুব গৌরবের কথাই বটে।

উপনিবেশ-আবদার

শ্রীতারানাথ রায়চৌধুরী

বিগত পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপীয় শক্তিনিচয় এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ছলে বলে কৌশলে এবং অস্ত্রবলে দেশের পর দেশ দখল করিয়া বহু জাতির সমাজ, ধর্ম্ম এবং অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। সম্প্রতি জার্মানীও উপনিবেশের দাবী লইয়া জোর আন্দোলন সুরু করিয়াছে, জার্মানীর কথা এই যে, ইউরোপের অন্যান্য শক্তি যখন নানা দেশে বিপুল উপনিবেশ স্থাপন করিয়া অজস্র কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, তখন জার্মানী কেন উপনিবেশ অধিকার করিতে দাবী করিবে না? এখন ধরা যাক্, পৃথিবীর বর্ত্তমান্ অধিবাসীগণ ঐ সকল ইউরোপীয় শক্তিবর্গ দ্বারা কে কতটা পদানত হইয়াছে।

চার কোটী সত্তর লক্ষ ইংরেজ। এই ইংরেজ জাতি তাহাদের মাতৃভূমির একশত চল্লিশ গুণ বড় স্থান উপনিবেশ হিসাবে দখল করিয়া আছে।

চার কোটী ফরাসী তাহাদের জন্মভূমি ফ্রান্সের একুশ গুণ বড় দেশ রাজ্য উপনিবেশ হিসাবে শাসন করিতেছে।

আশী লক্ষ ডচ্ (হলাণ্ডবাসী) তাহাদের জন্মভূমির ষাট গুণ বড় উপনিবেশ হিসাবে শাসন করিতেছে।

আশী লক্ষ বেলজিয়ান্ তাহাদের দেশের আশী গুণ রাজ্য উপনিবেশ হিসাবে শাসন করিতেছে।

সত্তর লক্ষ পর্টুগিজ তাহাদের রাজ্যের ছাব্বিশ গুণ রাজ্য উপনিবেশস্বরূপ শাসন করিতেছে।

চার কোটী ত্রিশ লক্ষ ইতালীয়ান তাহাদের জন্মভূমির দশ গুণ বড় রাজ্য উপনিবেশরূপে শাসন করিতেছে।

সাত কোটী আশী লক্ষ জার্মান—কিন্তু বলিতে গেলে তাহাদের কোন উপনিবেশ নাই।

জার্মানীর এখন উপনিবেশ চাই। কেন না, সে কাঁচা মাল পাইতেছে না। তার শিল্পবাণিজ্যের অসুবিধা হইতেছে। কাজেই তাহাকে রাজ্যবিস্তার করিতেই হইবে।

ইতালী যেমন তিউনেশিয়া, জিবুতি এবং উত্তর আফ্রিকার আরও কতিপয় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য দখল করিতে চায়, জার্মানীও আফ্রিকায় এবং মধ্য ইউরোপে তেমনি রাজ্য বিস্তার করিতে চাহিতেছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পূর্ব্বে আফ্রিকায় ক্যামারুন প্রভৃতি রাজ্য জার্মানীর দখলে ছিল; তারপর সবই গিয়াছে, এখন আবার সবই চাই, কিন্তু দেয় কে?

প্রায় আঠারো লক্ষ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও ধোঁকাবাজীতে পড়িয়া চেকোশ্লাভ-রা জার্মানীকে আপনাদের রাজ্য ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। এখন তাহার ইউক্রেনিয়া চাই, কেন না শস্য-সম্ভারে ও খনিজসম্পদে ইউক্রেনিয়া সমৃদ্ধিশালী। অপর দিকে জুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে জার্মানী লালায়িত। ইতালী আবিসিনিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াও ক্ষান্ত নহে, এখন ফরাসী-সোমালিল্যাণ্ড, তিউনেসিয়া এবং পারে ত ব্রিটিশ-সোমালিল্যাণ্ড, এমন কি মিশর রাজ্য আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত নহে।

ইউরোপের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয় জাতি ভারত মহাসাগরস্থিত বহু দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়াছে, প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপপুঞ্জও ইউরোপীয় শক্তিসমূহের কবলে পড়িয়া আছে।

অন্য দিকে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দখলে পাইয়াও সুখী নয়। এখন চীন সাম্রাজ্য দখল করিতে চায়। ইংরেজ যেমন পঁয়ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর দেশ ভারতবর্ষ দখল করিয়া নির্ব্বিবাদে শাসন করিতেছে, তেমনি জাপানও চল্লিশ কোটী চীনার বিরাট দেশ অধিকারে আনিতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।

এই কয় শতাব্দীর ভিতরে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ পৃথিবীর নানা দেশের জনসাধারণের কি পরিমাণ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে প্রায় ধ্বংস করিয়াছে, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগের রাজ্য, ধন ও সম্পত্তি সকলই কাড়িয়া লইয়াছে, ভারতবাসীর ন্যায় প্রাচীন সুসভ্য জাতিকে অসভ্যতার পথে চালিত করিয়াছে, এখনও

যে দুই-একটি দেশ নিজেদের সীমাবদ্ধ ধনসম্পদ লইয়া বাস করিতেছে, ইতালী ও জার্মানী তাহাদেরও ধন-সম্পদ লুঠ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

কথাটা হইতেছে এই: কার ধনে কে পোদ্দারী করে। বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা প্রকার মারণ অস্ত্র আবিষ্কার করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ আজ পৃথিবীর উপরে দানবীয় লীলা প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। আবিসিনিয়ায় ইতালী যে বর্ব্বরতা দেখাইয়াছে, সুসভ্য জার্মানীও মধ্য-ইউরোপে, এমন কি, নিজেদের দেশেই তাহা দেখাইতেছে।

ইহারাই আজ ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা-বোধ করিতেছে না। অস্ত্রবলে বলীয়ান এই সকল জাতি আজ যে নিষ্ঠুরতা লইয়া দেশের পর দেশ দখল করিতেছে, তাহাদিগকে বাধা দিবার মতন শক্তি কোন প্রাচীন জাতিরই নাই।

পৃথিবীর দুইটি পুরাতন সভ্যজাতি এবং দুইটি রত্ন-প্রসবিনী দেশ—ভারতবর্ষ ও চীন, হিন্দুজাতি ও চৈনিকজাতি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের ন্যায় আজ অকর্ম্মণ্য। হিন্দুস্থানে হিন্দু আজ নন্‌-মহমেডান। স্বাধীন হওয়া দূরের কথা—আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনীতিকরা এই প্রাচীন সুসভ্য জাতিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতেও কাতর নহে। হিন্দু বলিয়া তাহাদের পরিচয় লোপ পাইতেছে।

ভারতের সমৃদ্ধিতে ইংরেজ ধনী। ভারতের ধনরত্ন কাঁচা মাল এবং অগণিত লোকবলে ইংরেজ আজ পৃথিবীতে প্রথমশ্রেণীর শক্তিশালী রাজ্য। আর সাতাশ কোটী হিন্দু গোলামী করার সৌভাগ্যকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। জাপানও আজ লোলুপ দৃষ্টিতে ভারতের দিকে চাহিয়া আছে, আজ তাহারা প্রায় ব্রহ্ম-সীমান্তে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। দক্ষিণ-চীন জয় করিতে পারিলেই তাহারা একেবারে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং অনায়াসে বঙ্গসাগরের তীরস্থ প্রসিদ্ধ বন্দর রেঙ্গুন ও চট্টগ্রাম দখল করিতে চেষ্টা করিবে। ভারতে উপনিবেশের দাবী লইয়া যদি জাপান ব্রহ্মসীমান্ত দিয়া অগ্রসর হয়, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

জার্মানী ও ইতালী যদি একযোগে মধ্য-ইউরোপ দিয়া এসিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হয় তাহা হইলে এমন শক্তি এশিয়ার নাই যে তাহাদের গতিরোধ করে। ইংরেজ যদি পেলেস্তাইনে স্বাধীন আরব রাজ্য ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলেও জার্মানীর উপনিবেশ-ক্ষুধার নিকটে আরবগণ কতক্ষণ টিকিতে পারিবে?

আমাদের কথা ছাড়িয়া দিতেছি; আজ পৃথিবীর যে-কোন শক্তিই আমাদিগকে পদানত করিতে পারে। আমরা রাজ্যরক্ষার উপযোগী কোন শক্তিই অর্জ্জন করিবার অভিলাষ করি নাই। আমরা নির্বীর্য্য অজগর সর্পের ন্যায় বিশাল দেহ লইয়া হিমালয়ের প্রান্তদেশে পড়িয়া আছি। আজ যদি ইংরেজ সরিয়া যায়, ক্ষুদ্র আফ্‌গানিস্তানও আজ অস্ত্রবলে ও শক্তিবলে ভারতবর্ষ দখল করিতে পারে। ডজন ডজন কলম লইয়া এবং দিস্তা দিস্তা কাগজের দ্বারা আমরা ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে পারিব না! বোমা ও গ্যাস, তরবারি ও বন্দুকের নিকটে আমাদিগের অবনত হইতে কতক্ষণ লাগিবে? কাজেই পৃথিবীর শ্বেত জাতি-সমূহের কোন দাবীই মিটাইতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। এই বৈষ্ণবের দেশে আমরা নীরবে শ্বেতজাতির পদভার মস্তকে তুলিয়া লইব।

জার্মানী বা ইতালীর উপনিবেশের দাবী আজ বড় সমস্যা। এই দাবী হইতেই যুদ্ধ বাধিবে, নতুবা ইংরেজকে ও ফরাসীকে তাহার বহু রাজ্য বিনাযুদ্ধে ছাড়িয়া দিতে হইবে। অবশ্য ভারতীয় উপনিবেশ রক্ষার জন্য ইংরেজ প্রাণপণ করিবে। যদি কোন রাখালকে ত্রিশকোটী ভেড়ার পাল রক্ষা করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে গুটি কতক নেকড়ে বাঘই ভেড়ার দলকে নিধন করিতে পারে।

আজ এই 'দাবী'র বহর দেখিয়াও যদি ভারতীয় হিন্দুরা ঘুমাইয়া থাকিতে চায়, তবে তাহাদের নিশ্চিহ্ন হইবার দিন কত দূরে আছে তাহারই প্রশ্ন ওঠে নাকি?

৩রা জুলাই

শ্রীজনরঞ্জন রায়

এক ফোঁটা ফেল—এক ফোঁটা। এখনও যদি তোমার চোখে জল থাকে তবে এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করো বাঙালী। আজ ৩রা জুলাই[১]। আজ সিরাজের স্মৃতি-তর্পণের দিন। বাঙলার শেষ স্বাধীন অধীশ্বরের রাজমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইয়াছিল এই দিনে। ১৮২ বৎসর পূর্ব্বে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ১৭৫৭, ৩রা জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কে করিল, কেন করিল তাহা জানিতে চাও? কিন্তু সে কথা জানিয়া তোমার কি লাভ?

> "যে আশা ভারতবাসী চিরদিন তরে
> পলাশির রণ-রক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,
> কহিবে, স্মরিবে, নাহি ভাবিবে অন্তরে,
> কল্পনে! সে কথা মিছে কহ কি কারণ?"
>
> —'পলাশির যুদ্ধ,' নবীন সেন

হে দুর্ভাগা বাঙালী, তুমি এই জানিয়া রাখ যে, সিরাজ ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা বীর যোদ্ধা যুবক। সুজলা সুফলা বাঙলার রসশোষণোন্মুখ ফিরিঙ্গী বণিকদের যমস্বরূপ ছিলেন তিনি। আলিবর্দ্দীর শেষ উপদেশ, বিশেষ করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে তাঁহাকে অবহিত করিয়াছিল[২]। আর এই ইংরেজবণিক ও জগৎশেঠের স্বার্থে আঘাত দেওয়ায় সিরাজকে মস্তক দান করিতে হইয়াছিল[৩] —ইহাই ইতিহাস বলে। যদিও হত্যা ব্যাপারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগৎ শেঠকে কোথাও পাওয়া যায় না।

ইতিহাস বুঝি কখনও কখনও ভুলিয়া এক-আধটা সত্য কথা বলে। নিজের দিকে ঝোল টানিয়া কত ইতিহাস কত সময়ে সত্য ঘটনাকে মসীময় করিয়া দিয়াছে। নিজেকে মহৎ সাজাইতে গিয়া প্রায়ই অন্যকে হেয় ঘৃণিত প্রতিপন্ন করিয়াছে। শত্রুকে পাপের মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে প্রচার করিতে সকল দেশে সকল সময়ে একই প্রকার আগ্রহ দেখা যায়। বিশেষত পরাস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অকথ্য কুকথ্য বলিবার বাধা কোথায়? কারণ, সেখানে আপত্তি করিবার কেহই নাই।

পরাজিত শত্রু সিরাজের চরিত্রেও এইরূপ মসীলেপন করা হইয়াছিল। অনায়াসে তিনি গর্ভবতী নারীদের পেট কাটিয়া দিয়া আনন্দলাভ করিতেন। নদীবক্ষে লোক পরিপূর্ণ নৌকা ডুবাইয়া দিয়া অট্টহাস্য করিতেন। কুল-নারীদের তাঁহার ভয়ে সতীত্ব রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। এইসব গল্পের রচয়িতা জনৈক ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণর। এই কর্ম্মচারীটি নীচ স্বভাব ও মাতাল ছিল। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ইংলণ্ড হইতে তাহার অসচ্চরিত্রের জবাবদিহি চাহেন। সে তখন নিজের সব দোষ সিরাজের ঘাড়ে চাপাইয়া সাধু সাজে[৪]। আর এই সাধুটিরই লেখায় বিশ্বাস করিয়া আজ পর্য্যন্ত সকলেই সিরাজকে শয়তানের মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিল। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। অন্ধকূপহত্যার কাহিনীও যে ঐতিহাসিকগণের কল্পিত একটি অসম্ভব মিথ্যা রটনা তাহাও ভালভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

সুচতুর ক্লাইব জানিতেন যে, ২৩শে জুন যে যুদ্ধ হইল তাহা অভিনয় মাত্র[৫]। মীরজাফর এখনও ইচ্ছা

---

(১) মুতক্ষীরণের মতে ১৭৫৭ সালের ৩রা জুলাই, কিন্তু স্ক্রাফ্‌টনের মতে তাহার পরদিন সিরাজের হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(২) "ইংরেজদিগকে দমন করিতে পারিলে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা আর মাথা তুলিয়া উৎপাত করিতে পারিবে না। ইংরেজদিগকে কিছুতেই দুর্গ নির্ম্মাণ বা সেনা সংগ্রহ করিবার প্রশ্রয় দিও না;—যদি দাও, এদেশ আর তোমার থাকিবে না"—*Ive's Journal.*

(৩) "Sirajadoula was put to death at the instigation of the English chiefs and Jagat Set"—*Riyaz-us-Salateen.*

(৪) Hill's Bengal in 1756-57.

(৫) "Plassy can never be considered a great battle."—*Decisive Battles of India*: Col. Malleson. "It was not a fair fight."—*Ibid,*

করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিতে পারেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা—বাঙলার কি অপরিসীম লজ্জার কথা! পলাশি যুদ্ধের পর মীরজাফর এক অপূর্ব্ব 'ভেট' লইয়া ক্লাইবের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সিরাজের অন্তঃপুর-চারিণীগণকে তিনি ক্লাইবকে উপহার প্রেরণে ব্যস্ত[৬]—বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর যে তাঁহার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে তাহাও ক্লাইভ নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, মীরমদন মরিয়াছে বটে কিন্তু সিরাজের অন্যতম বিশ্বাসী সেনাপতি মোহনলাল তখনও জীবিত আছে। আর সিরাজ যদি এখনও মঁসিয় লা'র সহিত মিলিত হইতে পারেন তাহা হইলেও দারুণ অশান্তির কথা।

ক্লাইবের তাড়নায় মীরজাফর যখন সিরাজকে কারারুদ্ধ করিতে রাজধানীতে আসিলেন তখন সিরাজ পলায়ন করিয়াছেন। প্রাণভয়ে নহে—তাহা করিলে তিনি ভিন্ন পথে যাইতেন। তিনি হৃতরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টায় বাহির হইলেন। সঙ্গে পতিপ্রাণা বেগম লুৎফ্-উন্নিসা ও জনৈক বিশ্বাসী অনুচর মাত্র। তিনি নৌকাযোগে গোদাগাড়ীর পাদদেশবাহিনী মহানন্দা হইয়া উত্তর দিকে চলিলেন। মঁসিয় লা'কে পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল। তাঁহার সৈন্যসহ সিরাজের বিহারে যাওয়ার সংকল্প ছিল। বিহারের শাসনভারপ্রাপ্ত রাজা রামনারায়ণের সেনাদলকে পাটনা হইতে লইয়া পুনর্ব্বার বঙ্গ জয় করিবেন এই আশায় তিনি বহির্গত হইলেন[৭]। তিনি কালিন্দী দিয়া নাজিরপুরের মোহনায় আসিলেন। সেথান দিয়া বড় গঙ্গায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জলশূন্য নাজিরপুরের নদী-মুখে তাঁহার নৌকা আটকাইয়া গেল[৮]। সেই স্থানে বরহাল নামক গ্রাম। সিরাজের বজরার মাঝি-মাল্লারা নদী হইতে বাহির হইবার পথ চারিদিকে খোঁজ করিতে লাগিল। স্বয়ং সিরাজও গ্রামের মধ্যে গিয়া আহার্য্যের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজমহল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সিরাজের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত হইয়াছে। মীর দাউদ রাজমহলের ফৌজদার। সেখানকার সেনাধ্যক্ষ মীরকাশিম। এরূপ একটা বজরা এখানে আসিয়া আটকাইল। তাহাতে এক বেগমসহ অপূর্ব্ব সুন্দর এক যুবক। লোকপরম্পরামুখে মীরকাশিম এই সংবাদ পাইল। ভোজনরত সিরাজকে লুৎফ্-উন্নিসা সহ মীরকাশিম বন্দী করিল। ভাগ্যের কি পরিহাস! মঁসিয় লা তখন ঐ স্থান হইতে পনের ক্রোশের মধ্যে ছিলেন। সসৈন্যে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌছিতেন[৯]। মীরজাফর-পুত্র মীরণ সেখান হইতে সিরাজকে বাঁধিয়া আনিল।

২৯শে জুন ক্লাইব মুর্শিদাবাদে আসিয়াছেন এবং মীরজাফরকে নবাব বলিয়া কুর্ণিশ করিয়াছেন। ক্লাইব না আসা পর্য্যন্ত মীরজাফর সিংহাসনে বসেন নাই। ক্লাইবও রক্ষীদলের সহিত বিশেষ সাবধানে আসিলেন, সঙ্গে দুই শত গোরা সৈন্য ও পাঁচ শত ভারতীয় সিপাহী ছিল। ক্লাইব নিজে বলিয়াছেন যে, এক মুর্শিদাবাদ শহরে সেদিন যত লোক জড় হইয়াছিল তাহারা ইচ্ছা করিলে ইট লাঠি দ্বারাই ইংরেজদের ধ্বংস করিতে পারিত[১০]। কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই। কারণ পলাশীর আম্রশাখার পশ্চাতে ভারতে মুসলমানের সৌভাগ্য-সূর্য্য তৎপূর্ব্বে ২৩শে জুন তারিখে চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে[১১]। আর সে সূর্য্য উঠিবে না।

মোহনলালকেও ভগবানগোলার পথে বন্দী করা হইল। তিনি সিরাজের সন্ধানে ঐ পথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

(৬) "Many of Suraj-a-Dowla's women…had been offerd to Clive by Mirjaffier immediately after the battle of Plassy."—*Travels of Hindu.*

(৭) "It was his intention to escape to Mr. Law and with him to Patna, the Governor of which province was a faithful servant of the family."—*Orme, ii.*

(৮) "Sirajudowla was obliged to stop at Bahral as the Nazirpur mouth was found closed."—*Beveridge.*

(৯) M. Law and his party came down as far as Rajmehal to Surajuddaula's assistance and were within three hour's march when he was taken.—*Clive's Letter*, 26-7-1757.

(১০) "…if they had had an inclination to have destroyed the Europeans, they could have done it with sticks and stone."—*Clive's Evidence.*

(১১) "This is the battle in which India was lost for Islam."—*Trikh-i-Mansuri.*

মীরজাফরের সেনাধ্যক্ষ রায়দুর্ল্লভ তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করিল[১২]।

সিরাজকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। এইবার এই বিয়োগান্ত ঘটনার যবনিকাপাত হইবে। ঐতিহাসিকগণ এখানে অতি সাবধানী। প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক সকলেই ইংরেজ। তাঁহারা ক্লাইবের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগিতে দেন নাই। এমন কি, ক্লাইবের গাধা মীরজাফরের[১৩] কাঁধটা যেন আলগোছে ছুঁইয়া সতেরো বছরের ছোকরা মীরণের ঘাড়ে সব দোষটা চাপাইলেন। 'মুতক্ষরীণ' লেখকও ইংরেজ কোম্পানীর অর্থভোগী। সুতরাং বিচার করিয়া ঠিক ঘটনাটি বাহির করিতে হইবে। যেহেতু কেহই নিরপেক্ষ নহে সন্দেহ হয়।

মীরজাফরের নিকট সিরাজ জীবন ভিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কৃতঘ্ন মীরজাফর তাহা দিতে পারেন নাই, ইহা স্বাভাবিক। জাফ্‌রাগঞ্জের প্রাসাদে সিরাজ অবরুদ্ধ হইলেন! দেশের লোক না-কি তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিল—বিশেষত সিপাহীরা[১৪]। সিরাজকে হত্যা করিতে কাহাকেও সম্মত করা অসম্ভব হইল। কিন্তু অর্থলোভে এই অধম কার্য্য করিতে রাজী হইল এমন একটা লোক যে মীরজাফরের মতই চিরদিন সিরাজের মাতামহ ও মাতামহীর দ্বারা প্রতিপালিত। পাপাত্মা কলির অবতার মহম্মদী বেগ খড়্গ উত্তোলন করিয়াছে। সিরাজ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—স্তব্ধ হইয়া বলিলেন, একটু জল দাও, উজু করিয়া নমাজ করিব। কিন্তু মহম্মদী বেগ অপেক্ষা করিতে পারিল না। নিরস্ত্র অসহায় অন্নদাতা বীর যুবকের স্কন্ধে সজোরে খড়্গ বসাইয়া দিল। মস্তক ছিন্ন হইল না। আবার—আবার আঘাত করিল। হোসেন কুলী তোমার প্রতিহিংসা মিটিল—মিটিল কি?—যথেষ্ট—যথেষ্ট। আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

তারপর কি হইল? যাঁহার রচনা অদ্য আমাদের প্রধান অবলম্বন, সিরাজদ্দৌলার সেই পরম দরদী জীবনচরিতকার অক্ষয়কুমারের ভাষাতেই বলি—"তাহার পর কি হইল? মুর্শিদাবাদের নরনারী এই রাজহত্যার আকস্মিক সংবাদে হাহাকার করিয়া উঠিল। ** বিদ্রোহীদল তখন বিজয়োৎসবে উন্মত্ত হইয়া সিরাজের ক্ষতবিক্ষত শবদেহ হস্তিপৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়া নগরপ্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছিল। রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সিরাজ-জননী হাহাকার করিতে করিতে লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া রাজপথে আসিয়া ধূলি বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শববাহক হস্তী সহসা রাজপথে বসিয়া পড়িল; স্নেহময়ী জননী সন্তানের মাংসপিণ্ড বুকে ধরিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন।"

মুর্শিদাবাদের খুশবাগে পিতামহ আলিবর্দ্দীর সমাধির পাশে তাঁহার আদরের দৌহিত্রের সমাধি হইল। স্বামীর আটত্রিশ বৎসর কাল বিরহ সহ্য করিয়া লুৎফ্-উন্-নিসা ১৭৯০ সালে নবেম্বর মাসে দেহত্যাগ করেন। প্রবাদ এই যে, সিরাজের সমাধিস্থল মার্জ্জনা করিয়া সজ্জিত করিবার কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। স্বামীর সমাধি পার্শ্বেই তিনি সমাহিত হইলেন।

---

(১২) "The Divan Mohun Lal had before this been seized at Moorshidabad and his effects and life were taken by Doolubram."—*Scott's History of Bengal.*

(১৩) "A very few months after Meer Jaffier's accession, he was nick-named, by one of the wits of the Court—'Col. Clive's ass' and retained the title till his death."—*Stuarts History of Bengal.*

(১৪) "It is said that several jammadars, as he passed their quarters, were so penetrated with grief and anger, as to prepare to rescue him, but were prevented by their superiors."—*Ibid.*

"Meer Jaffier apologised for his conduct, by saying that he (Sirajadowla) had raised a mutiny among the troops."—*First Report of Clive,*

কৃষি

শ্রীসুরপতি জানা

আমাদের দেশ হচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্যই বা এতদিনে হয়েছে কি? শোনা যায় পাঞ্জাবে নাকি অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায়, সেখানে কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রতি হাজার অধিবাসীর উপর সরকারী খরচ হয়েছে মাত্র ৭৯৲ উনাশী টাকা, আর ইংলণ্ড আমেরিকা শিল্পপ্রধান হলেও ইংলণ্ডে প্রতিহাজার অধিবাসীর উপর ৯৬০৲ টাকা এবং আমেরিকায় ১০২০৲ টাকা সেই সেই দেশের সরকার খরচ করেন।

সেইরূপ সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় এবং দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও কতক কৃষক জনসাধারণের অজ্ঞতার দরুণ আমাদিগকে তাই প্রাক্‌সভ্যযুগের কৃষি পদ্ধতির উপর নির্ভর করে থাক্‌তে হয়। ২০০ বছর পূর্ব্বে এদেশের অধিবাসীরা শুধু যে কৃষির উপর নির্ভর কর্‌ত তা নয়। এদেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদি এদেশের অভাব মিটিয়ে বিভিন্ন দেশ বিদেশে চালান যেত। কিন্তু বিদেশী প্রতিযোগিতায় এদেশে শিল্প আজ ধ্বংস প্রাপ্ত। তাই মাটী ছাড়া উপায় নাই দেখে এদেশের লোকেরা কৃষিকার্য্যের দিকে কিরূপ ঝোঁক দিয়াছে তার হিসাব দেখ্‌লেই আপনারা বুঝ্‌তে পারবেন।

১৮৮১ সালে ভারতের লোক সংখ্যার শতকরা ৫৮ জন কৃষিকর্ম্মের উপর নির্ভর করত। ১৯২১ সালে অনুপাত ছিল শতকরা ৭১·৬; ১৯২৭ সালে রয়াল কমিশনের হিসাবে হল শতকরা ৭৩·৯। যে দেশের ১০০ জনের ৭৪ জন কৃষক, যারা এই প্রচণ্ড রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতকে অগ্রাহ্য করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাঠে খাটে, সেই সমস্ত কৃষক পরিবার কি ভাবে দৈন্য ও অভাব অনটনের মাঝখানে তাদের দিনগুলি কাটায়, তার একটা সরকারী হিসাব আপনারা জেনে রাখুন। যুদ্ধের পর থেকে ভারতের প্রত্যেক কৃষক পরিবার বছরে গড়ে ২২৲ টাকা মূল্যের শস্য উৎপাদন করে। তার সিকি যায় ট্যাক্স খাজনায় ও দেনার সুদে, আর সিকি যায় শস্য উৎপাদন খরচে। কাজেই মাসে বাকী ১১৲ টাকায় প্রতি মাসে গড়ে পড়ে ৳৵৮ পাই। প্রত্যেক কৃষক পরিবারের গড়ে লোকসংখ্যা প্রায় ৬ জন; প্রতিমাসে এই ৳৵৮ পাই আয়ে কৃষক পরিবারের ছয় জন লোকের খোরাক আর পোষাক চালাতে হয়।

আবার দেখুন কৃষক পরিবারের এই ছয় জনের ঋণের ভার ১৮৭৲ টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু ৩১ টাকার উপর; সারা ভারতের কৃষক পরিবারের মোট ১০শত কোটী টাকা ঋণ। এই অবস্থায় এই দেশ থেকে প্রতি বছর ৬৮ কোটী টাকা বিলাতে চলে যায়। এটা সারা ভারতের কৃষকদের প্রায় দুমাসের আয়। এক কালে সত্যই যে এই বাংলা দেশ সুজলা সুফলা ছিল, ইতিহাসে তার বহু নজির আছে। সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক বার্নিয়ার সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গদেশের উর্ব্বরতা, ধন সম্পদ ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বলেছেন—

"প্রাকৃতিক সম্পদে মিশরই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই কথাই চিরকাল প্রচার হয়। কিন্তু আমি মনে করি, সে গৌরব এই বঙ্গদেশের প্রাপ্য। এই দেশে এত প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় যে দেশের অভাব পুরণ করিয়াও বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করিবার মত শস্য বহু পরিমাণ উদ্‌বৃত্ত থাকিয়া যায়। সুস্বাদু বিস্কুট তৈয়ারির জন্য এখানে প্রচুর পরিমাণে গমও উৎপন্ন হয়। জিনিষ এত সুলভ যে অতি সামান্য ব্যয়ে লোকেরা প্রত্যহ তিন চারি প্রকার ব্যঞ্জন সহ অন্ন ঘৃত প্রভৃতি আহার করিতে পারে। এক কথায় বলিতে গেলে মানুষের জীবন যাত্রার যাহা কিছু প্রয়োজন বঙ্গদেশে সবারই প্রাচুর্য্য রহিয়াছে।"

কিন্তু আজ সেই দেশের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণসমূহ আলোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হয় যে এ দেশের প্রধান শিল্প কৃষিকার্য্যকে প্রকৃতির উপর অতি মাত্রায় নির্ভর করিতে হয়। বাংলা নদীমাতৃক দেশ, ইহার নদনদীর গতিবিধি যদি সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়, তা হলে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে; বাংলার কৃষককুলকে বর্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে হয় না। এজন্য যাহাতে কৃষিকে বৃষ্টির উপর একান্ত নির্ভর না করিতে হয় তজ্জন্য অতীত কালের

শাসকগণ খাল খননের ব্যবস্থা করিতেন। পর্য্যটক বার্ণিয়ার বলেন যে তাঁহার ভ্রমণ কালে রাজমহল হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গার দুইধারে তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত খাল দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যবস্থার লোপ পাইয়াছে। অন্যদিকে কৃষককুল আর্থিক দুর্গতিবশতঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতে অক্ষম। পুনঃ পুনঃ কর্ষিত জমির উর্ব্বরতাশক্তি উপযুক্ত সার অভাবে বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কৃষকেরা অজ্ঞতাবশতঃ নূতন প্রণালীতে শস্য বপন করিতেও অক্ষম। অথচ ক্রমবর্দ্ধনশীল জনসংখ্যার জীবনধারণের জন্য একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

নদীমাতৃক বাংলা দেশের কৃষিকার্য্যের জন্য যদি নদ-নদীর গতি সুচারু রূপে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা দেশের প্রচুর অনিষ্ট সাধন হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে পদ্মার হার্ডিং পুলের কথা উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর পূর্ব্বে এই পুল রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট এককোটি টাকার অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। ঐ টাকা যদি ঐরূপে ব্যয় না করিয়া গবর্ণমেণ্ট পদ্মার যে সকল শাখা নদী মজিয়া গিয়াছে তাহার উদ্ধার সাধন এবং নূতন খালসমূহ খননে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে মনে হয় পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা আজ এরূপ হইত না। কৃষির অবস্থা ত ভালই হইত, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মার গতি নিয়ন্ত্রিত হইত।

বাংলার কৃষিকার্য্যের এই দুর্গতির জন্য কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিয়া কাজ নাই, আমাদের দেশের লোক ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ আমাদের দেশের কৃষক পরিবারের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্যের জন্য ছয় মাস খাটে, আর ছয় মাস বেকার বসে বসে কাটায়। এই ছয় মাস তারা কুটীরশিল্পের দিকে নজর দিলে সারা বছরে তাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করেও অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত হতো। বিহার ও যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি দেশে সেখানকার কৃষকেরা একই মাঠে বছর বছর ২।৩টা ফসল উঠায়। কিন্তু আমাদের দেশে বছরে একটা ফসল—এক ধান্য ছাড়া অন্য কোন ফসল উঠাইবার আমরা চেষ্টা করি না। এর মূলে আমাদের কৃষককুলের অবহেলা ও অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছুই নাই। সাধারণতঃ আমাদের দেশের অগভীর মাঠে অর্থাৎ যে মাঠে আমাদের সরুধানের চাষ আবাদ হয়, তাহাতে কলাই দিলে প্রচুর পরিমাণে কলাই উৎপন্ন হইতে পারে। তবে কলাই চাষের মজা হচ্ছে এই যে আপাততঃ ২।৩ বছর তেমন ভাল ফসল উৎপন্ন হবে না। কেবল বীজ সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কিছুই চলিবে না। ২।৩ বছর প্রত্যেক গৃহস্থকে ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিতে হইবে। কারণ সুঁটী জাতীয় উদ্ভিদ একপ্রকার সার মাটীতে রেখে যায়। ২।৩ বছর ক্রমাগত সে সার জমিতে সংগৃহীত হলে, তবে ঐ কলাই জাতীয় জিনিষ ভাল উৎপন্ন হয়। আর তা ছাড়া কলাই জাতীয় জিনিষ জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে, এই জন্য যে জমিতে কলাই হয়,' সে জমিতে ধানও ভাল হয়। এইরূপ একটা ভাল জিনিষ আমাদের দেশের লোক হেলায় অগ্রাহ্য করছে। আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেক বাড়ীতে ধান রাখবার জন্য মরাই আছে, সেইরূপ কলাই চাষ করিলে আমাদের দেশে প্রত্যেকের বাড়ীতে মরাই বাঁধতে হবে। কলাই যেমন মানুষে খেয়ে বাচবে, তেমনি গৃহপালিত পশু গরুছাগলও খেয়ে বাঁচবে।

দেশে আজ দুধের অভাব কেন? গরু না খেতে পেলে কোথা থেকে দুধ দেবে। যে গাভী প্রতিদিন এক সের দুধ দেয়, সে প্রতিদিন একসের কলাই সিদ্ধ খেলে দৈনিক দু সের দুধ দেবে। এটা কি কম দুঃখের কথা, যে কলাইর উপর গরু ও মানুষের স্বাস্থ্যসুখ নির্ভর করছে, সেই কলাই চাষ আমরা করছিনা। এই অজুহাতে যে গরুছাগল সব নষ্ট করে বলে, অথচ যদি ধান্য ক্ষেত্র রক্ষার জন্য আমরা মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত গরু ও ছাগল বেঁধে রাখতে পারি, তাহা হইলে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আর একমাস গরু ছাগল রক্ষা করে কলাই চাষের মত এত বড় একটা লাভজনক চাষ থেকে কেন আমরা বঞ্চিত হব। পরাধীন জাতি বলেই আমাদের এই অধঃপতন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতি, তারা এই মাটী খুঁড়েই সোনা দানা ফলিয়ে নেয়; আজ আমাদের প্রধান শস্য কম ফলার কারণ শুধু অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নয়, প্রধানতঃ ধান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত সারের অভাব। বছরের পর বছর পুনঃ পুনঃ আবাদী জমিতে যদি ভূলেও একবার সার না দেওয়া হয়, তা হলে সেই জমি থেকে আমরা কতটুকু ফসল আশা করতে পারি। যে মাটীর ফলে জলে আমরা মরতে মরতেও বেঁচে আছি, তার উন্নতির জন্য

আমরা কতটুকু ভাবি ? বরং পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করে তার উপর আমাদের অত্যাচারের অন্ত নাই। ধিক্—আমাদের যে গরুর গোময় আমরা দেশে একমাত্র শ্রেষ্ঠ সার বলে গণ্য করি, তার কতটুকুই বা আমরা ভূমিতে দেই। বরং মাঠের মধ্যে গরু বাছুরের দেওয়া অযাচিত সার আমরা কুড়িয়ে এনে জ্বালানির জন্ম ব্যবহার করি ; স্বাধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট হলে আইন করে এ প্রথা উঠিয়ে দিত। দেশের ও দশের উন্নতির জন্ম আমরা হিসেব করে দেখেছি—আমাদের দেশের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে যে গরু বাছুর আছে, তাদের মোট ৩ মাসের গোময় হলে প্রতি বৎসর তাদেরই আবাদী জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বাকী ৯ মাসের গোময় আমরা জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহার করলেও কোন ক্ষতি হয় না। পোড়ান ঘুঁটের ছাই প্রত্যেক বাড়ীর আনাচে কানাচে পড়ে আছে ; সেগুলি জল পেলে একপ্রকার জল-সারের কার্য্য করে, তাও আমরা জমিতে দিই না। এর চেয়ে কৃষিকার্য্যের পক্ষে আমাদের কি অজ্ঞতা থাকতে পারে, তা আমরা বুঝিনা। মানুষের বিষ্ঠা এক প্রকার উত্তম সার, অথচ তাকে আমরা যেখানে সেখানে ত্যাগ করি, গর্ত্ত পায়খানা করে আমরা তাতে যদি মলত্যাগ করি, সেখানকার মাটীর উর্ব্বরতা শক্তি সহস্র গুণ বাড়বে।

বেশী দূরের কথা বলিব না, কল্‌কাতার ধাপার মাঠের যে বড় বড় কফি খান তা এই মানুষের বিষ্ঠার সারে জন্মে এত বড় হয়েছে। কলিকাতার সহরবাসীর বিষ্ঠা জার্ম্মাণী কিনে নিয়ে গিয়ে সার তৈরি করে টিনে ভর্ত্তি করে দেশবিদেশে চালান দিচ্ছে ; ভগবান এই মানুষের হাতের কাছে উন্নত ধরণের জীবন যাত্রা চালাবার সব রকম কিছু উপাদান দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের এই অবহেলা ও অজ্ঞতার দরুণ তার রীতিমত সদ্ব্যবহার না করতে পেরে জীবনযাত্রার প্রণালীকে খাটো করে বসেছি।

সুজলা সুফলা বঙ্গজননী রত্নপ্রসবিনী, তাই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দীক্ষাগুরু সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী বঙ্গজননীর যে চিরঅভিনব চিরঅপরূপ মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সার্থক হউক, কবে সেইদিন আসিবে তাহার প্রতীক্ষায় আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্, বন্দেমাতরম্।

মেঘদূতের কবি

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

কাজল্ মেঘের বাদল্-নাচন
জাগায় কবি তোমার কথা,
জানাও তুমি মেঘের মুখে
যক্ষরাজের বুকের ব্যথা !

আষাঢ়েরই বিষাদ ঘোরে
কোন্ বিরহীর নয়ন ঝোরে
সেই কাহিনী বাণীর কৃপায়
লভেছে আজ অমরতা !

যুগ পরে যুগ গেছে চ'লে
মেঘ উঠেছে মেঘের কোলে
তুমি ছাড়া আর কে রচে
মেঘদূতেরই কাব্য-গাথা—
ধন্য কবি, তোমার পায়ে
বিশ্ব আজি লুটায় মাথা !

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সকাল থেকেই মনটা কেমন এলোমেলো, কেমন একটা বিশ্রী বিশৃঙ্খলতায় বিকল হ'য়ে আছে। ভোরের বিপ্লবটা দিনের আলোয় মাঝে মাঝে প্রখর হ'য়ে ওঠে। দীনুর সব অনুভূতি ছাপিয়ে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে রাত্রিশেষের সেই অপ্রীতিকর ক্লেশটুকু। ওর চোখের পাতায় তখন ঘুমটুকু সবেমাত্র গাঢ় হ'য়ে এসেছে; স্নায়ুর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জমে উঠেছে চেতনাহীন অবসাদ; হঠাৎ সারা গা শিরশির্ ক'রে উঠ্‌ল উষ্ণ কোমল ছোঁয়ায়: বুকে-মুখে লাগল কার ঘন নিঃশ্বাস! দীনু চম্‌কে উঠ্‌ল; সুপ্তি আর চেতনার মাঝখানে মগজটা কেমন একটু পাক খেয়ে গেল।

অতসী! মাথার মধ্যে তখনও ঘুমের নেশায় চেতনাটা মূর্চ্ছিত হ'য়ে আছে; আকস্মিক আলোড়নেও এতটুকু জেগে উঠ্‌তে চায় না। অন্ধকারেই দীনু হাত বাড়িয়ে আধ-ঘুমে অনুভব ক'রবার চেষ্টা করে। একবার মনে হয়, হয়ত অতসী কখন উঠে এসেছে ও-ঘর থেকে। অতসী, যার দেহের প্রত্যেকটি অনুপরমাণুর জন্যে অতর্কিত মুহূর্ত্তে ওর রক্তে—ওর সারা দেহমনে জাগে অদম্য লালসা, সে যে হঠাৎ অম্‌নি ক'রে উঠে আস্‌বে ওর শয্যায়—একথা দীনু কোনদিন ভাব্‌তেও পারে নি, স্বপ্নেও না। ভাব্‌বার শক্তি ওর সত্যি ছিল না তখন; তবু মনে হ'ল—কেন এলো অতসী অমন অযাচিতভাবে ওর বিছানায়? মনটা বিষিয়ে উঠ্‌ল। নিমেষে দীনুর অর্দ্ধ-জাগ্রত অনুভূতিগুলো সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়ল ঘৃণায়। অতসীকে একটু দূরে ঠেলে দিয়ে ও আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল ছেঁড়া মাদুরখানার বাইরে, একেবারে মাটিতে।—কেন এলো, কেন এলো ও এমন ক'রে না চাইতে? এর চেয়ে বরং দীনু থাক্‌ত অনন্তকাল ধ'রে ওর প্রতিটি লোমকূপের প্রতীক্ষায়। ক্ষতি ওর ছিল না, লাভও ও চায় নি কোনদিন। কিন্তু আজকে হঠাৎ এই লাভ ক্ষতির বাইরে অপ্রত্যাশিত পাওনায় দীনুর সারা গা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠ্‌ল।

চোখের পাতাদুটো আবার নিবিড় হয়ে আসে ঘুমে। হয়ত তেমনি ক'রেই কেটে যায় নিস্তব্ধ রাত্রির বিলম্বিত পলগুলি। হঠাৎ আবার কখন লাগে বুকের ওপর অতসীর হাতের ছোঁয়া। এবার আর দীনু উৎক্ষিপ্ত হ'য় না। আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্ত আগে যে বিরক্তি ওকে অকস্মাৎ পেয়ে বসেছিল, সেই বিরক্তি যেন নিমেষে ধুয়ে যায় নতুনতর অনুভূতির প্রবাহে। দীনুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাণপণে কাটিয়ে উঠ্‌তে চায় সেই গুরুভার ঘুমের জড়তা। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে; অতসীর গায়ে গা দিয়ে ছেঁড়া মাদুরখানার ওপর আগের মতই স্বচ্ছন্দে ছড়িয়ে দেয় দেহটা। তারপর আস্তে আস্তে বুকের কাছে টেনে নেয় অতসীর মাথাটা; রুক্ষ চুলগুলোয় বারবার হাত বুলিয়ে দেয় প্রগাঢ় মমতায়।

কপালে একটী রেখাও পড়ে নি এই কঠোর দারিদ্র্যের। মসৃণ ভ্রূর নীচে চোখের পাতাদুটো প্রদীপের শীষের মত দপ্ দপ্ ক'রে কাঁপে। চুলগুলো নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে দীনু দু'হাত দিয়ে সযত্নে চেপে ধরে অতসীর মুখখানা। ঠোঁটের ওপর চঞ্চল গতিতে আঙুলগুলো চালিয়ে যায় ঠিক অর্গ্যানের রীডের জলদ সুরে গৎ বাজানোর মত।—তারপর? তারপর আচম্বিতে সাপের গায়ে হাত লাগার মত চম্‌কে ওঠে। ওপরের ঠোঁটখানা লম্বালম্বি কাটা! মস্ত বড় একটা দাঁত মাড়িসুদ্ধ মাথা জাগিয়ে আছে সেই কাটা ঠোঁটের মাঝখানে। দীনু ভয় পেয়ে যায়; ওর পাশে এসে শুয়েছে পদ্ম! সেই গন্নাকাটা ছিপ্‌ছিপে মেয়েটা।

অস্ফুট শব্দের সঙ্গে দীনু একটু পিছিয়ে আস্‌তেই, পদ্ম ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আঁচলের ঝাপ্‌টা লেগে কানিস্তারের কপাটটা ঝন্ ঝন্ ক'রে ওঠে। সে শব্দ দীনুর কানে যায়, কিন্তু কোন কথা ব'লবার মত, এমন কি এক ইঞ্চি এ-পাশ ও-পাশ হ'য়ে শোবার মত শক্তিটুকুও তখন লুপ্ত হ'য়েছে। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে দীনু চেয়ে থাকে সেই অন্ধকারে।

সকাল থেকে যতবার কথাটা মনে হ'য়েছে, ততবারই

যেন ওর চিন্তাশক্তি ঘোলা হ'য়ে উঠেছে বিক্ষিপ্ততায়। দীনু ভাব্‌তে পারে না; চেষ্টা ক'রেও ভেবে উঠ্‌তে পারে না, সেটা ওর স্বপ্ন না প্রত্যক্ষ বাস্তব! সারাদিন মনটা শুধু তোলপাড় করে। সেই সূত্র ধ'রে ছোট বড় নানা কথার স্তূপ জমে' ওঠে বুকের ভিতর। অতসীর মুখপানে ভাল ক'রে চাইতেও যেন ওর আজ লজ্জা হয়। হয়ত জানে অতসী! হয়ত সেই ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ভেঙেছে অতসীর ঘুম। দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছে পদ্মকে বেরিয়ে যেতে।

দিনের আলো নিবে যায়: আবার ধীরে ধীরে নামে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার কালো পর্দ্দা। দীনু ইচ্ছে ক'রেই ঘরের আলোটা আজ জ্বাল্‌তে দেয় নি। পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে প্রচণ্ড সূর্য্যের তীব্র কটাক্ষে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, সে আগুনের জ্বালা এখনো হু হু করে ওর হৃৎপিণ্ডে।

ভাড়াটেদের কলরবে বস্তিটা আবার জেগে উঠেছে। ওপাশের ঠিকে ভিখিরীরা তখনো ফেরে নি। বাড়ীওয়ালার খোট্টা দারোয়ানটা ঘরে ঘরে ভাড়া আদায় ক'রে বেড়ায়। দীনু বিছানায় পড়ে কানপেতে শোনে। কেউ জানায় কাতর মিনতি, কেউ বা ভয়ে লুকিয়ে বেড়ায় এ ঘর থেকে সে-ঘরে।

অতসীর রান্না তখনো শেষ হয় নি। চৌকাঠে ঠেস দিয়ে বসে' উপেন আপন মনে কি যেন ব'লে চলেছে অতসীকে। কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যায় না, তবুও তাৎপর্য্যটুকু গ্রহণ করতে দীনুর কষ্ট হয় না। হয়ত পয়সার কথা। এখুনি আস্‌বে দারোয়ান; চোখ রাঙিয়ে ব'ল্‌বে—"তিন রোজের ভাড়া বাকী প'ড়েছে। আবার বাকী?—নেই হোগা।"

দীনু আর এখন ভিক্ষে করে না। অতসী বারণ করে লোকের দরজায় হাত পাত্‌তে। তার চেয়ে চাক্‌রি, না-হয় যে কোন একটা কাজ খুঁজে নিতে পারলে সত্যি থাক্‌বে না দীনুর কোন ভাব্‌না; হয়ত অতসীও হবে নিশ্চিন্ত। সে চায় না দীনুর রোজগার খেতে। ওরা যেমন ভিক্ষে করে, তেমনিই ভিক্ষে ক'রে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবনটা। উপেন গেরস্ত ঘরের ছেলে, কিন্তু অতসী ত তা নয়। ও জাত-ভিখিরী। অতসীর যখন আপন-পর জ্ঞান হ'য়েছে, তখন আর আপন ব'ল্‌তে কিছুই ছিল না ওদের।

সত্যিই তাই! দারোয়ানটা বুঝি চোখ রাঙিয়ে তর্জ্জন করে! অতসী কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলে—"এ ক'দিন ভিক্ষেয় বেরিয়ে যা পাই, তাতে একবেলার খোরাকীও জোটে না। শুধু চাল দু'মুঠো পাই ব'লেই রক্ষে। নইলে—"

দারোয়ানটা শোনে না ওর অনুনয়। পয়সাগুলো ছড়িয়ে ফেলে দেয়। ভাঙা ভাঙা বাংলায় সুর কেটে কেটে বলে—খোরাকী জুটুক আর না-জুটুক, সে চায় ভাড়া। তিন দিনের ভাড়া বাকী প'ড়েছে, আবার বাকী সে রাখ্‌বে না, কিছুতেই না; মনিবের হুকুম নেই তার।—দু'খানা ঘরের ভাড়া, মোটে সাতটা পয়সা! বাকী পয়সা কা'ল মিটিয়ে না দিলে, ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে ওদের।

দীনু উঠে এসে দরজার সাম্‌নে দাঁড়ায়; মুখ বাড়িয়ে দেখে দারোয়ানটার চেহারা আর অতসীর অসহ দীনতা। হেঁটমুখে কেরোসিনের ডিবে হাতে নিয়ে পয়সাগুলো একটী একটী ক'রে কুড়িয়ে সে দারোয়ানটার হাতে তুলে দেয়। সেই ক্ষীণ আলোকেও স্পষ্ট দেখা যায় ওর চোখের জল। ওর মুখপানে চাইলে হয়ত স্থবির ভগবানের চোখও ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠ্‌ত জলে।

*   *   *   *

রাত্রি তখন প্রায় দুটো। সারা বস্তি ঘুমে অচেতন। দীনুর চোখে ঘুম নেই। একটানা ঘুম ওর একটি রাতের জন্যেও হয়না আর। মগজটায় ঘুরে বেড়ায় কখনো দুঃস্বপ্ন, কখনো অতীত আর বর্ত্তমানের সংমিশ্রণে গ'ড়ে ওঠা অদ্ভুত কতকগুলো চিন্তার কবন্ধ। অশ্রু ওর শুকিয়ে গেছে ব'লেই যেন কতকটা স্বস্তির সঙ্গে বাঁচে। নইলে, কতকাল আগে ধুয়ে যেত ওর এই অকিঞ্চিৎকর বেঁচে থাকা, জীবন্ত মানুষের চোখের জলে। দীনুর সন্দেহ হয়, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে বর্ত্তমান আর অতীতকে পাশাপাশি রেখে নিজের কথা ভাব্‌তে সত্যি ওর সন্দেহ হয় যে, আজও সে বেঁচে আছে কিনা! ওর আশে-পাশে যারা বেঁচে আছে, তারা কি মানুষ, না মানুষের প্রেতাত্মা!—মানুষ হ'তেই পারেনা। তবে ছিল, কোন-দিন; বোধহয় ছিল তারা: পৃথিবীর ওই চলমান জীবন

স্রোতের মাঝখানে মানুষের মত বেঁচে। ওদের সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে কখন হঠাৎ পড়েছে অন্ধকারে পিছিয়ে। ধাক্কা খেয়ে দেহগুলো লুটোপুটি ক'রে গড়িয়ে এসেছে পিছনের পথে, কিন্তু ওদের এই দুর্দ্দম চলার আবর্ত্ত থেকে অসহায় ক্ষীণ জীবনগুলোকে পারেনি তারা ছিনিয়ে আন্‌তে।—They were men. That's there only solace.

..

চোখ দুটো কেবল জমে' এসেছে; হঠাৎ দীনুর ঘুম ভেঙে গেল ভয়ার্ত্ত শিশুর আর্ত্তনাদে। কে কাঁদে! করুণ কান্নায় নিশুতি রাতের নিস্তব্ধ বাতাস যেন শিউরে ওঠে। তারই সঙ্গে নারীকণ্ঠের কাতর মিনতি, আর নির্ম্মম পুরুষের ক্রুদ্ধ আস্ফালন!

দীনু ধড়ফড়িয়ে উঠে ব'স্‌ল। সে কান্না যেন থাম্‌তে চায় না। ছেলেটা অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে কাঁদে। আলোটা জ্বাল্‌বে ব'লে দীনু হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই কুড়িয়ে নিল; কিন্তু আলো আর জ্বালা হ'ল না। হঠাৎ কি ভেবে ছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।—ওদেরই বস্তির পূব-দিকের ঘরগুলো থেকে আসে সেই কান্নার শব্দ।

উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শব্দটা লক্ষ্য ক'রে সেই দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ পিছন থেকে কে শক্ত মুঠোয় চেপে ধ'রল ওর ডান হাতের কব্জিটা। দীনু চম্‌কে উঠল: "কে?"

অতসী তাড়াতাড়ি দীনুর মুখের ওপর হাতখানা চাপা দিয়ে বলে—"চুপ!"

দীনু থতমত খেয়ে যায়। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উ্‌ঠতে পারেনা। "অতসী?"

"হাঁ। যেও না ওদিকে।" অতসী অনুনয় করে, প্রাণপণ শক্তিতে টানে ওর হাতখানা ধ'রে।

দীনু হতভম্বের মত জিজ্ঞেস ক'রে —"কেন?"

"কেন! এখুনি ছুরি মারবে তোমার বুকে। ফিরে চল; যেন টের না পায় ওরা।"—অতসী হাঁপিয়ে ওঠে। কথা ব'ল্‌তে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসে।

অতসীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে দীনু বলে—"শুন্‌তে পাচ্ছনা, ছেলেটার কান্না? যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রছে।"

অতসী তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দেয়—"তা ক'রবে না? চোখ! সব্বের সেরা ধন চোখ ওর জন্মের মত গেল।"

"তোমার কথা বুঝ্‌তে পারছি না অতসী। কি হ'য়েছে ওর চোখে? অত কান্না!"—বিহ্বলভাবে দীনু অতসীর মুখপানে চায়।

অতসী দুহাত দিয়ে দীনুর হাতখানা আরও শক্ত করে ধ'রে বলে—"ঘরে চল; সব ব'লছি।"

ওর ভাব দেখে দীনু অস্থির হ'য়ে ওঠে; ভাব্‌তে পারে না, এমন কি আতঙ্ক লুকিয়ে আছে ওই শিশুর করুণ আর্ত্তনাদের পিছনে। এবার জোর ক'রে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরে দাঁড়ায়—"না। আগে বল, কি হয়েছে ওর?"

অতসী জবাব দিতে পারে না। কথা ব'ল্‌তে কান্নায় ওর কণ্ঠস্বর ভারি হ'য়ে আসে। দু'হাত বাড়িয়ে দীনুকে আট্‌কাবার চেষ্টা করে: "না, না। যেও না তুমি।"

এবার দীনু দৃঢ়তার সঙ্গে অতসীর হাত দুখানা সরিয়ে দিয়ে বলে—"পাগ্‌লামি ক'র না অতসী। ফিরে যাও।"

"না। সব পারে ওরা। পরশু রাস্তা থেকে ছেলেটাকে ভুলিয়ে এনেছে ভিখিরী ক'রবে ব'লে। চোখ দুটো গালিয়ে অন্ধ ক'রে দিচ্ছে।"—অতসীর নিশ্বাস ঘন হ'য়ে ওঠে; কথার চেয়েও স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

"অন্ধ! অন্ধ তৈরি ক'র্‌ছে?"—দীনু বজ্রাহতের মত অসাড় হ'য়ে গেল।

"হাঁ; লোহার কাঁটা দিয়ে চোখদুটো উপ্‌ড়ে দিয়েছে।"

বিশ্বাস হয়না। ওর মরচে-ধরা তন্ত্রীগুলো কেঁপে কেঁপে থেমে যায়। একটুক্ষণ কি ভেবে দীনু উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠল—"তুমি ঘরে যাও অতসী, আমি দেখে আসি। মানুষ মানুষকে অন্ধ তৈরি ক'রছে! না না, মিথ্যে—মিথ্যে অতসী!"

অতসী শঙ্কিত হয়ে একহাতে দীনুর হাতখানা জড়িয়ে ধ'রে, আর-এক হাত পায়ের দিকে বাড়িয়ে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলে—"তোমার পায়ে ধরি যেও না ওদিকে। ওরা সব পারে। এখুনি খুন ক'রে ফেল্‌বে।"

"তা হোক।"—দীনু মানে না; অতসীর হাত ছাড়িয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়। অতসীও চলে তার পিছু পিছু।

দরজা বন্ধ। ঘরের ভিতর একটা মেটে প্রদীপ মিট্ মিট্ করে। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে। ও-পাশের ভাঙা জানালাটার ধারে গিয়ে দীনু চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়ায়।

রাধা বোষ্টুমি কাকুতি-মিনতি করে—"ওগো দিও না অমন রাজপুত্তুর ছেলেটাকে একেবারে জখম ক'রে। আর কখনো ত বলি নি। দুধের ছেলে—"

মাণিক পেয়াদা! যমদুতের মত কটমটিয়ে রাধির মুখপানে চায়। ওর চোখের দিকে চাইলে সত্যি বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে ভয়ে। ছেলেটার বুকের ওপর চাপ দিয়ে ব'সে এক হাতে মুখটা টিপে ধ'রেছে; নড়বার শক্তিও নেই তার। দুই গাল বয়ে গড়াচ্ছে তাজা রক্ত।

ছেলেটার চোখে তুঁতের গুল ছড়িয়ে দিতেই সে আবার চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল প্রাণপণে। রাধি তখন মাণিকের হাত দুটো জড়িয়ে ধ'রেছে; মাণিক হাঁটু দিয়ে এমন জোরে ধাক্কা দিল রাধির বুকে যে রাধি হুমড়ি খেয়ে উল্টে পড়ল মেঝেয়। শিশুর করুণ আর্ত্তনাদে সে কর্ণপাতও করে না।—তারপর ছেলেটাকে জোর ক'রে গিলিয়ে দিল খানিকটা কালো জল; হয়ত আফিং-ঘোঁটা।

দীনুর সংজ্ঞা বোধহয় তখন লুপ্ত হ'য়ে আসছিল। আপাদমস্তক থর থর ক'রে কাঁপে। অতসী তার অবস্থা বুঝে জোরে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এলো উঠানের এপারে। দীনু দাঁড়াতে পারে না; পা দুটো অসাড় হ'য়ে গেছে। সারা গা চব্‌চব্ করে ঘামে।

অতসীর ঘাড়ে ভর দিয়ে দীনু বিভ্রান্ত স্বরে বলে—"অতসী, পৃথিবীটা চৌচীর হ'য়ে যাবে। শোন! কান্না! নিশুতি রাতে দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ কাঁদ্‌ছে।"

দীনুকে ধ'রে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে এনে অতসী আঁচলের বাতাস দিতে লাগ্‌ল। ওর কপাল ব'য়ে তখন ঘাম ঝরছে। মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস্ করে—"এখনো গা-ঘুরছে দীনু?"

—"না।"

—"তবে অমন ক'রছ যে?"

—"কই? করিনি ত কিছু; ভাব্‌ছি। ভাব্‌ছি, মানুষের খিদের আগুনে এখনো পৃথিবীটা পুড়ে ছাই হয় নি কেন!"—কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দীনু হঠাৎ থেমে যায়। অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবে; তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবার ব'লে ওঠে—"ভূমিকম্প—বিহারের মত অম্‌নি একটা ভূমিকম্প হ'ত!"

"কি ব'লছ?"—অতসী অভিভূতের মত জিজ্ঞেস করে। দীনুর অবস্থা দেখে ওর ভয় হয়। বোধহয় মাথার গোলমাল হ'য়েছে।

"বলিনি কিছু। ওই বাড়ীগুলো, জোঁকের বাচ্চার মত কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে পথের দু'পাশে ওই যে অসংখ্য লোক—ওই সব জ্যান্ত মানুষগুলো সব ম'রত ইট-কাঠ চাপা পড়ে, তা হ'লে পৃথিবীটা দু'দণ্ড নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ত। আর পারে না, পারে না ওদের ভার সইতে।—হায় রে!"—দীনু হেসে ওঠে। হাসির বেগে ওর জীর্ণ পাঁজরাগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে।

অতসী এমনিতেই বোঝে না দীনুর সব কথা; তার ওপর আবোল-তাবোল! এ সবের একবর্ণও প্রবেশ করে না ওর মগজে। দীনুর কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে চিন্তিত ভাবে বলে—"উপোসে উপোসে মাথা তোমার খারাপ হয়ে গেছে। খিদেয় পেট পুড়ে যায়; ঘর-বাড়ী পোড়ে কখনো?"

"সব পোড়ে অতসী, সব হয়। আস্ত আস্ত মানুষ পুড়ে যায়; পাকস্থলী, ফুস্‌ফুস্, কল্‌জে, পাঁজরার হাড়—তাজা মগজটা পর্য্যন্ত পুড়ে ছাই হ'যে যায়। অন্ধ অসহায় শিশু পথে পথে কেঁদে যোগাবে সেই ক্ষুধার অন্ন!"—দীনু আবার চঞ্চল হ'য়ে ওঠে; সিধে হ'য়ে উঠে ব'স্‌তে চায়।

এক হাতে দীনুর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে, আর-এক হাত মাথায় বুলোতে বুলোতে অতসী বলে—"একটু থির হও। আচম্‌কা মাথাটা গরম হ'য়ে উঠেছে।"

দীনু হেসে ওঠে, সেই বিকৃত হাসি। অতসীর কোল থেকে মাথাটা টেনে নিয়ে উঠে বসে। ওর পেশিগুলো তখন শক্ত হ'য়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ লেগে এমন একটা কিট্‌কিট্ শব্দ হয় যে অতসী ভয় পেয়ে যায়। মনে হয়, হয়ত দাঁতি লাগ্‌বে এখুনি।—"বেঁচে গেছ অতসী, তোমার চোখ নেই। আমার চোখের সাম্‌নে কলরব ক'রছে লাখ লাখ ভিখিরী; অন্ধ পঙ্গু প্রেতাত্মা সব! পথের দু'পাশে ভিড় ক'রে চলেছে। মাথা ঠুকে মরে; হুমড়ি খেয়ে কে কার গায়ে উল্টে পড়ে, ঠিক নেই। রাস্তার

পাথরে ঠোকা লেগে লেগে মাথাগুলো থেঁতো হ'য়ে গেছে। এমন এক ফোঁটা রক্ত নেই যে ঝরে' পড়ে।"

এবার অতসী বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। শাসনের সুরে বলে—"চুপ ক'রে শোও দেখি চারদণ্ড। অত ব'কো না।"

"না। আর বক্‌ব না। তুমি শোওগে যাও।"—দীনু অবসন্নভাবে মাদুরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দেয়।

অতসী নিশ্চল হ'য়ে ব'সে থাকে বিছানার পাশে। কখনো আঁচল দুলিয়ে একটু বাতাস দেয়, কখনো বা হাতখানা শিথিল হ'য়ে আসে অন্যমনস্কতায়।—'বেশ থাকে দীনু। থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ যেন কেমন বিগ্‌ড়ে যায়। ওদের ঘর-বাড়ী, টাকা-পয়সার কথা হয়ত এখনো ভুল্‌তে পারে নি ও।—এম্‌নি ক'র্‌তে ক'র্‌তেই আবার যাবে পালিয়ে। কখন পালাবে, অতসী টেরও পাবে না।'

—"অতসী!"

—"ঘুমোও নি এখনো?"

—"না। ঘুম আমার চোখে আসে না অতসী। তুমি শোও গে যাও। একা একা চুপটি ক'রে শুয়ে থাক্‌লে যদি আসে একটু ঘুম।"—দীনু পাশ ফিরে শুলো।

অতসী কি ভেবে আস্তে আস্তে উঠে গেল। দীনুর কথার আর কোন প্রতিবাদ ক'রল না সে। ওর অবস্থা দেখে মনটা এতক্ষণ আতঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল। দরজাটা টেনে দিতে দিতে আপনমনে বিড় বিড় ক'রে বলে—"যারা কাঙাল, তাদের আবার শান্তি!"

দীনু হাসে। অতসীর কথাগুলো বেশী স্পষ্ট না হ'লেও ওর কানে যায়।—ছেলেটা আর কাঁদে না। আফিমের নেশায় ঘোর হয়ে ঘুমিয়েছে এবার। এই ঘুমের সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনে নেমে এলো অনন্ত রাত্রি। কে জানে, কতকাল পরে প্রভাত হবে ওর ওই চিরন্তন অমানিশা!

ভুল। ভগবানের সৃষ্টিতে ভাঙা কাঁচের স্তূপ ওরা। ভুল ক'রে গড়া অসংখ্য দেহপিণ্ড এসে জমেছে এই দুনিয়ার কবরখানায়। তার চেয়েও বড় ভুল ক'রেছে ওরা ওদের সেই অক্ষম বিধাতাকে বাঁচিয়ে রেখে।

দীনু বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করে, ঘুম আসে না চোখে, স্পর্শও করে না ওর ব্যথিত অস্তিত্বকে। চোখের সাম্‌নে চলচ্চিত্রের ছবির মত ভাসে জগতের অগণিত অন্ধ শিশু: ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে পথে পথে কেঁদে বেড়ায়—একমুঠো চাল, না-হয় একটী আধ্‌লার আশায়।

বুকের ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি: দীনুর মনে হয়, বস্তির এই বদ্ধ বাতাসে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। আবার উঠে বসে; বিমূঢ়ের মত বসে' ভাবে কত কি এলোমেলো। আকাশ-পাতাল সে চিন্তার যেন কূল কিনারা নেই কোন। মগজের মধ্যে পিল্‌ পিল্‌ ক'রে ওঠে অশান্তির বৃশ্চিকগুলো। ঘরের ভিতর অন্ধকারটা যেন আরও বেশী জমাট বেঁধেছে।

এবার দীনু পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়; দরজাটা অতি সন্তর্পণে টেনে দেয় বাইরে থেকে, যেন অতসী শব্দ না পায়।

নিস্তব্ধ পথ। গাড়ী ঘোড়ার ভিড় নেই। দিনের জীবন্ত রাজপথ রাতের অন্ধকারে শ্মশান হ'য়ে উঠেছে। কোলাহল থেমে গেছে। ভিখিরীদের করুণ ক্রন্দন শোনা যায় না। অলকাপুরীর উৎসব ঘুমের কোলে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। ক্বচিৎ দু'একজন পথবাসী পথের এদিক থেকে ওদিকে উঠে যায়। ফুটপাথের বুকে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে গৃহহীন ভিখিরীদের শয্যাহীন সুখশয্যা।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দীনু একবার যন্ত্রপুতুলের মত উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে ফুটপাথ ধ'রে চল্‌তে লাগ্‌ল। বড় রাস্তার মোড়ে দু'একজন পুলিস টহল দিচ্ছে: তন্দ্রালু অবসন্ন পদে পায়চারি করে। গাড়ীবারান্দাগুলোর নীচে পথচারীদের ভিড়। যুদ্ধশ্রান্ত নগ্ন সৈনিকদের মত গায়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

চল্‌তে চল্‌তে দীনু থম্‌কে দাঁড়ায়। ওদিকের ফুটপাথে কতকগুলো ভিখিরী কলরব সুরু ক'রেছে। সবাই মিলে ঘিরে ধ'রেছে একটা ছোঁড়াকে। একবার মনে হ'ল কর্ণপাত ক'রবে না; আবার কি ভেবে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।—ছোড়াটা দীনুর চেনা। অনেকবার দেখেছে তাকে গলায় খাদি বেঁধে পিতৃদায়ের ভিক্ষে ক'র্‌তে। কখন কখন দাঁতে খড় নিয়ে গোবধের প্রায়শ্চিত্ত সেধে বেড়ায়। বয়েস চোদ্দ-পনরর বেশী নয়।

ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিতে দীনুর দেরী হয় না। এই বয়েসেই জেগেছে ওর প্রচণ্ড যৌনক্ষুধা। ওর অত্যাচারে কানা মেয়েটা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। মেয়েটা বোধহয় বয়েসে ওর চেয়ে দশ বছরের বড়। দীনুর ইচ্ছে হ'ল ছোঁড়ার মাথাটা জোর ক'রে ঠুকে দেয় দেয়ালের গায়ে, খুলিটাকে ভেঙে দু' টুক্‌রো ক'রে ফেলে; কিন্তু পরক্ষণেই কি ভেবে আবার এগিয়ে চলে ফুটপাথ ধ'রে।—দীনু মোড়টা ছাড়িয়ে যেতে না-যেতেই সে কোলাহল আপনি থেমে যায়।

দীনু ভাবে ওর জীবন পথের এই সব মৃত্যুহীন সঙ্গীদের কথা। ক্ষুধার্ত্ত, উলঙ্গ নিঃস্ব মানুষের দল! এরা যেন মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে ব'সে আছে জগতের পথ রুদ্ধ ক'রে। এরা মরে না, মরবেও না কোন দিন।

* * * *

চল্‌তে চল্‌তে পা দুটো অবসন্ন হ'য়ে আসে। শরীরের রক্তস্রোত যেন এবার খুব কমে' এসেছে: চেষ্টা ক'রেও পা দুটো আর সাম্‌নের দিকে টেনে নেওয়া যায় না। গীর্জ্জার সাম্‌নে এসে দীনু একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। স্তিমিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে আকাশের দিকে। পাণ্ডুর বিবর্ণ চাঁদটুকু হেলে পড়েছে চূড়ার ওপারে। অবসাদগ্রস্ত তারাগুলো যেন রাত্রিশেষের ম্রিয়মান আলোকে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ক্ষণেক কি ভেবে দীনু এগিয়ে গেল গীর্জ্জাটার দিকে। একেবারে কাছে গিয়ে দুই হাত দিয়ে অনুভব ক'রল সেই ধবধবে দেয়ালের শীতল স্পর্শটুকু।—ওপারের ফুটপাথে গাছতলাটায় আশ্রয় নিয়েছে অনেক ভিখিরী। সারাদিনের ক্লান্তির পর ঘুমিয়ে পড়েছে; ওদের বেদনাতুর নিশ্বাস মিলিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে।—দীনু ব'সে প'ড়ল পৈঠার একটী পাশে।

ওদের শিয়রে শিয়রে ঘুরে বেড়ায় একটা মেয়ে; ওদেরই কেউ। দেহ তার যৌবনের প্রান্তে এসে দাঁড়ালেও, এখনো সীমারেখা ছাড়িয়ে যায় নি। জীর্ণ কাপড়ে লজ্জা ঢাকা পড়ে না। রুক্ষ চুলে জটা বেঁধেছে। গ্যাসের আলোতে এপার থেকেও বেশ স্পষ্ট দেখা যায় তার মুখ-চোখ। ওর ওই দেহে হয়ত কিছুদিন আগেও ছিল জীবনের প্রচুর সম্ভাবনা। কিন্তু এবার ভাঙন ধ'রেছে।

ভিখিরীদের মাথার কাছে গিয়ে মেয়েটা যেন কানে কানে কি বলে! ওর গতিভঙ্গী দেখে দীনু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ্‌ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে; অবস্থা দেখে সন্দেহ হয়।—একে একে অনেকের মাথার কাছে ফিরে, মেয়েটা শেষে এলো এদিকের ঘেঁয়ো ভিখিরীটার কাছে। সে বোধহয় তখনো ঘুমোয় নি। দেহের যন্ত্রণায় ঘুম আসে নি তার চোখে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে মেয়েটা কি ব'ল্‌তেই সে তাড়াতাড়ি উঠে ব'স্‌ল কলের পুতুলের মত। শিথানের ছেঁড়া ঝোলা-ঝাঁপির ভিতর থেকে খুঁজে খুঁজে বের ক'র্‌ল দু'টুক্‌রো চাপাটি রুটি!—বোধহয় ওরই ভুক্তাবশেষ। মেয়েটার চোখে মুখে অতৃপ্ত ক্ষুধার কি লেলিহান দৃষ্টি! ওই উচ্ছিষ্ট রুটির টুক্‌রো দুটোর দিকে চেয়ে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত হাসে; চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে প'ড়তে চায়।

মেয়েটা ইসারায় আবার কি বলে।

রুটির টুক্‌রো-দুটো কোলের ওপর নামিয়ে রেখে, লোকটা এবার ভাল হ'য়ে ব'স্‌ল। সর্ব্বাঙ্গে সিফি-লিসের ঘা দগ্‌দগ্‌ করে; নাকটা ব'সে গেছে; চোখের কোণে শাদা শাদা ঘায়ের চটা। ওর পানে চেয়ে দীনুর সর্ব্বশরীর শিউরে ওঠে।—ট্যাঁক থেকে দুটো পয়সা বের ক'রে মেয়েটাকে দেখায়। মেয়েটার মুখ আরও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। রুটিটুকু তার হাতে তুলে দিয়ে আবার সযত্নে পয়সা দুটো গুঁজে রাখে ট্যাঁকে!

কি বীভৎস উল্লাস! মেয়েটা সবুর সইতে পারে না। দু'হাতে রুটির টুক্‌রো-দুটো নিয়ে এক মুহূর্ত্তে গুঁজে দেয় মুখের ভিতর। পেটে যেন বিসুভিয়সের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে।

মেয়েটার খাওয়া হ'লে দুজনেই উঠে গেল। হাসপাতাল আর পাদ্রীদের কলেজের সাম্‌নে পথটা যেখানে অন্ধকার, সেইখানে গিয়ে ওরা বড় গাছটার আড়ালে শুয়ে প'ড়ল পাশাপাশি।—দীনু ভাব্‌তে পারে না; ওর আপাদমস্তক আবার তেমনি ঝিম্‌ঝিম্ করে: 'পেটের জ্বালায় জীবন্ত মানুষের ভিড় জমেছে পথের শ্মশানে।'

দীনু উঠে প'ড়ল; রাস্তাটা পার হ'য়ে আবার ফিরে চ'ল্‌ল ফুটপাথ ধ'রে।

মোড়ের কাছে এসে লাইট-পোষ্টটার পাশে দাঁড়াতেই ওর দৃষ্টি প'ড়ল একটা শীর্ণকায় লোকের দিকে। লোকটা যেন ওর দিকেই এগিয়ে আসে। পরণে জীর্ণ একখানা কাপড়, গায়ে ছেঁড়া শার্ট, পায়ে জুতো নেই।—সবে, সবে সুরু হ'য়েছে। হয়ত এখনো আছে ওর ফিরে যাবার পথ। মুখখানা খুব চেনা, তবুও ঠিক চিনে উঠ্‌তে পারে না।

সাম্‌নে, একেবারে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চায় দীনুর মুখপানে। দীনু হঠাৎ অনুমানের ওপর জিজ্ঞেস্‌ ক'রে ব'স্‌ল—"বিমল বোস্‌?"

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। একটুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বলে—"হাঁ। আপনি—?"

"আমার কথা যাক্‌। আপনার সে চাকরিটা গেছে বুঝি? য়ুনিভার্সিটির চাকরিটা!"

"ছেড়ে দিয়েছি। দাদা ষড়যন্ত্র ক'রে চাকরিটা খেয়েছে।"—ব'লে বিমলবাবু হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌ল।

"বেশ। দাদা ষড়যন্ত্র ক'রে চাকরিটা খেয়েছে; শৈলবালা খেয়েছে ভিটেমাটি; আর পাকস্থলীটা ষড়যন্ত্র ক'রে খেয়েছে বাকী সব—মান, ইজ্জৎ, মস্তিষ্ক!"—উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দীনু হন্‌হনিয়ে চলে গেল।

লোকটা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল ওর দিকে চেয়ে।

আবার জমে' ওঠে অবসাদ। ভোরের বাতাসে কন্‌কন্‌ করে শীত। চলার বেগে দীনু শীতটা কাটিয়ে উঠ্‌তে চায়, কিন্তু পারে না। পায়ে-পায়ে জড়িয়ে যায় সাম্‌নের পথে এগিয়ে যেতে।

পথ ভিখিরীগুলো নড়ে' চড়ে' হাতপা গুটিয়ে শোয়। কেউ বা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে গুব্‌রে পোকার মত তাল পাকিয়েছে শীর্ণ দেহটাকে নিয়ে, কেউ পরণের শতছিন্ন আবরণটুকু দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকেছে।

দীনু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। চোখের পাতা ভারি হ'য়ে আসে ক্লান্তিতে; পায়ের শিরাগুলো কেমন আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ে, হাত-পায়ের আঙুল টিস্‌টিস্‌ করে ব্যথায়।

—একটা গেঞ্জি, না-হয় যেমন-তেমন একখানা ছেঁড়া কাপড়ও যদি জড়াতে পার্‌ত গায়ে, তা হ'লে ওর মুহ্যমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোধহয় আবার সচল হ'য়ে উঠ্‌ত।—আর পারে না; ও পারে না আর এই বিলীয়মান সত্ত্বাকে জোর ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে।

লাল বাড়ীটার ভিতর থেকে ত্রস্তপদে বেরিয়ে আসে একটা প্রৌঢ়া! হাতে কাপড়ের একটা গাঁট্‌রি। মেয়েটা চকিত দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক চায়। হয়ত ওদেরই বাড়ীর ঝি। কেউ জাগ্‌বার আগে ওর খুঁটিনাটি দরকারের জিনিষগুলো চুরি ক'রে সরিয়ে ফেল্‌ছে।—

দীনুর ইচ্ছে করে গাঁটরিটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, কেড়ে নেয় একখানা ভাল আস্ত কাপড়। শীত-ভোর গায়ে দিয়ে বাঁচ্‌বে। নিজের পরণের কাপড়খানা একবার নেড়েচেড়ে দেখে।—জরাজীর্ণ হ'য়ে গেছে, সুতোগুলো ঢাকা প'ড়েছে ময়লায়।

মেয়েটা এগিয়ে আসে; ভীত সন্ত্রস্তপদে এগিয়ে আসে ওরই পথে। মগজটা চঞ্চল হয়, হাতদুটো অস্থির হ'য়ে ওঠে।

—এলো না, এলো না ওর কাছ পর্য্যন্ত। কোণের ডাষ্টবিনটার ভিতর গাঁটরিটা ফেলে দিয়ে, ভীতিচঞ্চল ক্ষিপ্র-গতিতে ফিরে গেল। পায়ে যেন ওর অমানুষের শক্তি! নিমেষের মধ্যে চলে গেল দীনুর দৃষ্টিপথ ছাড়িয়ে।

দীনু ভাবে, কিন্তু ভাব্‌নার কোন সূত্র নেই। নিতান্ত অজ্ঞাতসারে স্বপ্নাবিষ্টের মত এগিয়ে যায় ডাষ্টবিনটার কাছে। তিলমাত্র ইতস্তত না ক'রে, টেনে তোলে সেই কাপড়ের গাঁটরিটা। ওর শরীরে তখন ফিরে এসেছে অনেকখানি সজীবতা। কাপড়গুলোর স্পর্শ-আকাঙ্খায় শীতার্ত্ত ত্বক ওর উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছে।

—কতকগুলো নেকড়া, একখানা কাপড়; রক্তাক্ত! তারই ভিতর তোয়ালে জড়ানো একটী সদ্যোজাত শিশু! দীনু দুহাত দিয়ে তুলে ধরে চোখের সাম্‌নে। ছেলেটা নড়ে! ধব্‌ধবে শাদা হাতপাগুলো তখনো একটু একটু নড়্‌ছে। দীনুর বিশ্বাস হয় না। তুলে ধরে আরও কাছে, একেবারে মুখের কাছে নিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে সেই মোমের পুতুলটা।—বেঁচে আছে, এখনও বেঁচে আছে।

চোখের সাম্‌নে থেকে পলকে পৃথিবীটা মুছে যায়। হাত-পা অসাড় হ'য়ে আসে। প্রাণপণ চেষ্টাতেও দীনু নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারে না। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। আপাদমস্তক ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপে। ওর পেশিতে, স্নায়ুতে, এমন কি হাড়ের মধ্যেও সুরু হ'য়েছে প্রলয়। সে কম্পনের বেগ দীনু কোনমতেই পার্‌ল না সাম্‌লে নিতে। সংজ্ঞা লুপ্ত হ'য়ে এলো।—ছেলেটা হাত থেকে পড়ে গেল পেভ্‌মেণ্টের পাথরে। দীনু সর্পাহতের মত মত ঢ'লে পড়ল ডাষ্টবিনের ধারে।

তখন ভোর হ'য়ে এসেছে। ব্যবসাদার বস্তিওয়ালারা অন্ধ-নুলো ভিখিরীগুলোর হাত ধ'রে ধ'রে এনে বসিয়ে দিয়ে যায় রাস্তার মোড়ে; কোনটাকে টবের গাড়ীতে বসিয়ে টান্‌তে টান্‌তে এনে গড়িয়ে দেয় ফুটপাথে। তাদের বেদনার্ত্ত করুণ কাৎরানি ভোরের অলস বাতাসে মিলিয়ে যায়। (ক্রমশঃ)

—·—

প্রকৃতির সমতা ও জলজীবের শিকার-কৌশল

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

বস্তু জগতে ধ্বংস যেমন অনিবার্য্য জীবজগতেও সেইরূপ মৃত্যুর হিমস্পর্শে চিরনিদ্রা অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, জরা, বার্দ্ধক্য প্রভৃতির ফলে জীবজগতে মৃত্যু সংঘটিত হয়। তাহা ছাড়া কোন কোন জীবের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় অতি নিরীহ জীবকেও মৃত্যুবরণ করিতে হয়। এইরূপ হিংসামূলক হত্যাকাণ্ডে যে অকালমৃত্যু, তাহাও সৃষ্টি রহস্যে প্রয়োজন। মায়াবাদী মানুষের মনকে মৃত্যুর এই অনিবার্য্যতা সততই চঞ্চল করিয়া তুলে কিন্তু মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। মৃত্যুর ধ্বংস-স্তূপ হইতে বর্ত্তমানের সৃষ্টি এবং অনাগত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের গর্ভে নিমজ্জমান। এক-কথায় বলিতে হইলে আমরা যে প্রকৃতির মানদণ্ড (The balance of Nature) জীবজগতে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখিতেছি তাহার মূলে মৃত্যুর অবশ্য প্রয়োজন স্বীকার্য্য এবং এই প্রকৃতির মানদণ্ডের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান তাহার পক্ষে বিপদজনক।

বর্ত্তমানে সেভার্ণ উপত্যকায় ও উত্তর স্কট্‌ল্যাণ্ডে গন্ধ-

মাছের দেহ হইতে জোঁকের রক্ত শোষণ

'টাইগার বিট্‌লে'র শিকার আক্রমণ

মূষিকের (Muskrat) আবির্ভাব প্রমাণ করিল প্রকৃতির আধিপত্যকে বিপর্য্যস্ত করার ফল মানুষের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লোমের ব্যবসার জন্য আদি জন্মস্থান ক্যানাডা হইতে কয়েক জোড়া গন্ধমূষিক ব্যাভেরিয়ার কোন বে-সরকারী রাজ্যে আমদানী করা হয়। অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে ইহাদের বংশ এরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা আর সম্ভব হইলনা। সুতরাং ব্যাভেরিয়ার জলাশয়ের সর্ব্বত্রই ইহারা বাসভূমি করিয়া লইল। আর সেভার্ণ উপত্যকার মধ্যে গন্ধমূষিকের বাসভূমি সীমাবদ্ধ নয়। ক্রমশঃ সাসেক্স ও হামশায়ারের জলাশয়গুলি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের এইরূপ অবাধ স্বাধীনতায় শস্যক্ষেত্র রক্ষণ করা সেখানকার কৃষকদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িল। শাক, আলু প্রভৃতি শাকশব্জী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া কৃষকদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিল। কিন্তু বংশ হ্রাসের নিমিত্ত সেখানে তাহাদের কোন শত্রু না থাকায় ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশঃই এত বৃদ্ধি পাইল যে অবশেষে ব্যাভেরিয়ার গভর্ণমেণ্ট ইহাদের দমনের নিমিত্ত বাৎসরিক ৩০,০০০ মার্ক ব্যয় করিতে বাধ্য হইলেন।

অজ্ঞাত অবস্থায় কখন কখন প্রকৃতির মানদণ্ডের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ করায় কিরূপ বিপরীত ফল দাঁড়াইয়াছে তাহা বহু ঘটনার বিবরণ হইতে জানা যায়। সর্ব্বপ্রথম ডারউইন ঘোষণা করিলেন সকল প্রাণীর জীবন এক ঐক্যবিশিষ্ট সমগ্রের মধ্যে একসূত্রে গ্রথিত; সেখানে কোন জীবই নিঃসঙ্গভাবে জীবন ধারণ করিতে পারেনা। প্রত্যেকেই অপর কোন না কোন প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির মধ্যেও এক অচ্ছেদ্য ঐক্য রহিয়াছে যেখানে অপর কাহারও প্রভাব ব্যতীত আমরা কোন কিছু বিচ্ছিন্ন বা সংযুক্ত করিতে পারিনা। যদি আমরা প্রকৃতির এই নিয়মকে বিশৃঙ্খল করি তাহা হইলে ইহার ফল বিপরীত অবস্থায় আসিয়া পড়ে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষকে ইহার জন্য বেশী ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

'পাইকে'র খাদ্য ভক্ষণ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জামাইকায় ইঁদুর ও বেজীর আগমনের বিস্তৃত ঘটনা হইতে প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে জামাইকায় কোন ইঁদুরের অস্তিত্ব ছিলনা। পরে বিদেশীয় জলযান হইতে কয়েকটী ইঁদুর সেখানের স্থলভূমিতে আসিয়া পড়ে। অনুকূল অবস্থার মধ্যে ইহাদের বংশ দ্রুত বাড়িতে লাগিল এবং দ্বীপে ইহাদের বংশ সংযত করিবার কোন শত্রু না থাকায় অল্পদিনের মধ্যে শাকশব্জীর মাঠে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইল। ফলে নিরামিষ-ভোজী ইঁদুরের অত্যাচারে সেখানের কৃষকেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ইঁদুর দমনের নিমিত্ত ভারতীয় বেজীর আমদানী করিতে বাধ্য হইল। মাংসপ্রিয় বেজীর কবলে পড়িয়া দেখা গেল ইঁদুর বংশ ধ্বংস হইতে

বসিয়াছে। কৃষকেরা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু অপর দিকে বেজীর বংশ অদ্ভুতরূপে বৃদ্ধি পাইল এবং প্রায় চার বৎসর পরে দেখা গেল বেজীর খাদ্য-উপযুক্ত ইঁদুর সেখানে লোপ পাইয়াছে। খাদ্যাভাব প্রবল হওয়ায় বাধ্য হইয়া ইহারা গৃহপালিত পায়রা, মুরগী, হাঁস প্রভৃতি শিকারে মনোনিবেশ করিল। এমন কি সময়ে সময়ে ছোট ছাগল, কুকুর, বেড়াল হত্যা করিতেও বাধ্য হইত। কয়েক শ্রেণীর পাখী, সাপ, টিকটিকী যাহাদের এক সময়ে সচরাচর দেখা যাইত তাহাদেরও বংশ লোপ পাইতে বসিল। আবার কোন কোন জীব বেজীর ভয়ে দ্বীপ পরিত্যাগ করিল। দ্বীপের উত্তর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কচ্ছপ লক্ষিত হইত তাহাদের আর সহজে দেখা মিলিল না। অনুসন্ধানে জানা গেল কচ্ছপের ডিম বেজীর সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে চলিতেছে, ফলে কচ্ছপের বংশ লোপ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে পাখী, সাপ, টিক্‌টিকীর অবর্ত্তমানে কীটপতঙ্গের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে তাহাদের আক্রমণে শস্যক্ষেত্র নষ্ট হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দিল।

শেষে দেখা গেল প্রায় কুড়ি বৎসরের মধ্যে প্রকৃতির সমতা (Nature's balance) দ্বীপের চতুর্দ্দিকে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিরুপায় হইয়া এখন বেজী বংশ ধ্বংস করিতে সেখানের অধিবাসীরা মনোযোগ দিল। কিন্তু বেজীর বংশ এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহা ধ্বংস করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য এবং দমনের নিমিত্ত কার্য্যপ্রণালীর গতিও খুব মন্থর।

অনুরূপ কারণে ক্যানেডার প্রিন্স অফ্ এডওয়ার্ড দ্বীপের কৃষকেরা Skunk বংশ নির্ম্মূল করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এক সময়ে ঐ অঞ্চলে Skunkএর লোম-সম্বলিত চর্ম্ম বিলাসিতার সামগ্রী ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে যখন ইহা বিলাসিতার কোন প্রয়োজনে আসিল না তখন বহু ব্যবসায়ী ইহাদের হত্যা না করিয়াই ছাড়িয়া দিল। ঐ সকল জন্তু জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া প্রথমাবস্থায় ইঁদুর ও বুনো ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিত। ইহাদের কোনরূপ শত্রু না থাকায় অসম্ভবরূপ বংশ বৃদ্ধি পাইল। ফলে খাদ্যাভাবে গৃহপালিত পাখী, ছাগল ও শস্য ধ্বংস করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেখানের অধিবাসীদিগের সমূহ ক্ষতি করিল। কৃষিকার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট Skunk দমনে মনোযোগ দিলেন এবং প্রত্যেক মৃত Skunkএর বিনিময়ে দুই শিলিং মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন।

সময়ে সময়ে এক দেশ হইতে অন্য নূতন দেশে গৃহপালিত পশু স্থানান্তরিত করায় যে প্রকৃতির সমতাকে বিশৃঙ্খল করা হইয়াছে তাহার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ বহু গৃহপালিত ছাগল সমভিব্যাহারে সেণ্ট হেলানায় অবতরণ করে। ঐ সময়

ড্রাগন ফ্লাই পতঙ্গ ও তাহার শিকার

দ্বীপটী বৃহৎ বৃক্ষ ও সতেজ তৃণগুল্মে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ঐ সকল ছোট ছোট সতেজ উদ্ভিদ ছাগলের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় কয়েকবৎসর পরে ক্ষুদ্র দ্বীপটী বৃক্ষশূন্য হইয়া পড়িল। বর্ত্তমানে এখনও সেখানে বসন্তকালে বৃক্ষে নূতন পত্রের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ভূমির অনুর্ব্বরতা-বশতঃ নিরামিষভোজী জীব কোনরূপে জীবন ধারণ করে।

প্লেগ রোগের বাহক ইঁদুর জাতির আবির্ভাবে মানুষ

কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছে তাহাও কয়েকটী ঘটনার উল্লেখে বুঝিতে পারা যায়। নিউসাউথ ওয়েল্‌সে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ইঁদুর বিনষ্ট করিবার কার্য্যকরী উপায় আবিষ্কারের জন্য ২৫,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত পুরস্কার লাভ করিতে কেহ সমর্থ হয় নাই। ইঁদুর-নিবারণী বেড়া, বিষাক্ত ঔষধ এবং ইঁদুর ধরিবার ফাঁদ প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য প্রণালী অবলম্বনে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমানে ইঁদুরের অত্যাচার হ্রাস পাইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ইঁদুর দৃষ্ট হইলেও সামুদ্রিক বন্দর-সমূহে ইহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আংশিক কারণ প্রকৃতির সমতার উপর মানুষের হস্তক্ষেপ। যদিও এ ক্ষেত্রে ইহা মানুষের অজ্ঞাতে ও আকস্মিকভাবে ঘটিয়াছে। কাল ও পিঙ্গল এই দুই জাতীয় ইঁদুর জাহাজ ও লোকালয়ের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নাকি এসিয়ার অধিবাসী।

প্রকাশ ১২০০ খৃঃ অব্দে এসিয়ার জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে অথবা অন্য কোন কারণে এক জাতীয় ইঁদুর এসিয়া ত্যাগ করিয়া ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হয়। মধ্যযুগীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে কিরূপে বৃহৎ ইঁদুরের দল ডানিউব (Danube) নদী সন্তরণে অতিক্রম করিয়া ইঁদুর-শূন্য দেশসমূহে গমন করিয়াছিল। বর্ত্তমানে সর্ব্বদেশে জলযানের গমনাগমনে ইঁদুরের বংশ বৃদ্ধি পাইতেছে। উপস্থিত এই ইঁদুর বংশ ধ্বংস করিতে সকল সভ্য দেশই মনোযোগ দিয়াছে। কারণ ঐ সকল ইঁদুরের দ্বারাই প্লেগ নামক মারাত্মক ব্যাধির বিস্তার হইয়া থাকে।

অনেকেই কোন না কোন জীবজন্তুর শীকার ধরিবার কৌশল দেখিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে কয়েকশ্রেণীর জলজীবেরা কিরূপ কৌশলে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবজগতে প্রকৃতির তুলাদণ্ড বা সমতা (Nature's balance) রক্ষা করে তাহার কয়েকটী চিত্র দেওয়া হইল। চিত্রগুলি কেবলমাত্র প্রকৃতির রাজ্যে হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইরূপ হত্যাকাণ্ডে অকালমৃত্যু সৃষ্টি-রহস্যে প্রয়োজন। কোন কোন জীব অতি নিরীহ জীবকে হত্যা করিয়া থাকে। যদিও এ দৃশ্য উপভোগ্য নহে তথাপি ইহার প্রয়োজন স্বীকার্য্য। তাহা না হইলে পৃথিবী জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত ফলে সর্ব্বত্রই প্রকৃতির সমতা (nature's balance) বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িত।

কাঁকড়ার সুদৃঢ় দাড়ায় মাছের আত্ম-সমর্পণ

বৃটেনের জলাশয়ে বহুভোজী পাইক (Pike) মৎস্যের

শীকার কৌশল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লম্বায় ইহারা পাঁচ ছয় ফিট ও ওজনে ত্রিশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয়। মাথার উপরিভাগের মধ্যস্থলে বড় বড় চক্ষু দু'টী অবস্থিত। ইহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টির মধ্যে শীকার একবার পড়িলে সহজে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না।

পাইক অলক্ষিতে শীকারের পশ্চাৎ অনুধাবন করে এবং হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুখ গহ্বরে শীকারকে পুরিয়া লয়।

শীকারের প্রথম দর্শনে আক্রমণের পূর্ব্বে পাইক স্থিরভাবে অপেক্ষা করে। সে অবস্থায় তাহাদের দেখিয়া ইহাদের শক্তির ও হিংস্র স্বভাব অনুমান করা যায় না। এক-

ইহারা শীকারের শরীর মধ্যস্থ রক্ত শোষণ করিয়া লয় যে শীকার নিজেও তাহা অনুভব করিতে পারে না। যতখানি রক্ত না ইহাদের উদর পূর্ত্তির প্রয়োজনে লাগে তাহা অপেক্ষা বেশী রক্ত জোঁক শীকারের দেহ হইতে শোষণ করিয়া নষ্ট করে। ফলে অনেক সময় জোঁকের আক্রমণে মানুষকেও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। আফ্রিকার জঙ্গলে জোঁকের রক্ত শোষণে বলশালী জীবকেও মৃত্যু বরণ করিতে হয়। আমাদের দেশের জলাশয়ে বিশেষতঃ অব্যবহৃত জঙ্গলাকীর্ণ জলাতে ভীষণ মারাত্মক জোঁকের দর্শন পাওয়া

কচ্ছপের নিকট হইতে শীকারের আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা

জাতীয় পাইক জীবিত রাজহংসের মাথাও গলাধঃকরণ করিতে পারে। এইরূপ সংবাদও পাওয়া যায় যে কোন কোন জাতীয় পাইকের পাকস্থালী হইতে বহুবার মানবশিশু আবিষ্কার করা হইয়াছে। লণ্ডন-পশুশালায় পাইকের খাদ্য ধরিবার কৌশল দেখিবার জন্য দর্শকদের বেশ ভীড় জমিয়া যায়।

জোঁকের স্বভাব আরও হিংস্র। ছোট বড় শীকার কাহাকেও ইহারা বাদ দেয় না। পল্লীগ্রাম অঞ্চলের সকলেই ইহাদের ভাল করিয়া জানে। এরূপ কৌশলে

যায়। জলে কোন জন্তুজানোয়ারের আগমনে ইহারা সুযোগ বুঝিয়া দেহের উপরে বসিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত শোষণ করে। মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতিকেও বাদ দেয় না। একবার যদি পুকুরে ইহাদের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে মাছের বংশ ধ্বংস করিতে নাকি বেশী দিন লাগে না। সেইজন্য বিলাতের মৎস্য ব্যবসায়ী-গণ ইহাদের ডিম পাড়িবার সময় সমস্ত পুকুর হইতে আগাছা পরিষ্কার করিয়া দেয় এবং আগাছা না থাকায় ডিমগুলি নষ্ট হইয়া যায় ফলে নূতন করিয়া জোঁকেরা বংশ বিস্তার করিতে

পারে না। কুমীরের শরীরের উপরিভাগের আবরণ ভেদ করিয়া রক্ত শোষণের কোন উপায় না থাকায় জোঁক ইহাদের মুখগহ্বর আক্রমণ করে। কুমীর ইহাদের আক্রমণের তাড়নায় মাঝে মাঝে ডাঙ্গায় উঠিয়া 'হাঁ' করিয়া পড়িয়া থাকে। কয়েক জাতীয় পাখী আছে যাহারা কুমীরের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। তাহারা নির্ভয়ে কুমীরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল জোঁক খাইয়া ফেলে। উপকারের বিনিময়ে কুমীর ইহাদের কোনরূপ ক্ষতি করে না।

সকল জলবাসী কচ্ছপই মাংসাশী। আমেরিকার জলাশয়ে লম্বায় ইহারা কয়েক ফিট পর্য্যন্ত হয়। ইহাদের আত্মগোপন কৌশল অদ্ভুত বলিয়া সহজে শীকার ইহাদের উপস্থিতি বুঝিতে পারে না।

বৃটেনে সেপ্টেম্বর মাসের কাছাকাছি সময়ে 'টাইগার ওয়াটার-বিটল' নামক গোবরে-পোকা জাতীয় পতঙ্গের আক্রমণ হইতে সেখানের মৎস্য ব্যবসায়িগণ লাল মাছ রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। এই জাতীয় পতঙ্গের শুককীটও খাদ্য সংগ্রহে বিশেষ পারদর্শী। ইহাদের পরমায়ু কয়েক বৎসর মাত্র। রাত্রিকালে জলাভূমিতে আহারের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং উপযুক্ত স্থান পাইলেই আগাছার উপর ডিম পাড়ে। ইহাদের কাস্তে আকারের একজোড়া চুয়াল আছে। চুয়ালগুলির ভিতর ফাঁপা। শীকারের শরীরে এই চুয়াল দৃঢ়রূপে প্রবেশ করাইয়া রক্ত শোষণ করিয়া লয়। জলীয় পোকা, মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য।

গ্রীষ্মকালে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আরও কয়েক জাতীয় দুষ্প্রাপ্য

'মাতা মাতা' টেরাপিন শীকারকে প্রলোভন দেখাইতেছে

গিয়ানের কিম্ভুত কচ্ছপের শীকার-চাতুর্য্য অতুলনীয়। ইহাদের মুখের সম্মুখ ভাগের কিয়ৎ অংশ অদ্ভুত দেখিতে। সহজে প্রতারিত মাছ ঐরূপ অংশকে খাদ্য ভাবিয়া অগ্রসর হয়। কচ্ছপ মাছকে প্রতারণার জন্য সম্মুখ ভাগে মাথা অগ্রসর করিয়া এই অংশটীকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে। পরে ইহার প্রলোভনে আসিয়া শীকার যতক্ষণ না সুদৃঢ় চুয়ালের নাগালে আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত আক্রমণের কোন লক্ষণ বুঝিতে দেয় না। এই জাতীয় কচ্ছপ 'মাতামাতা' টেরাপিন নামে পরিচিত।

পতঙ্গকে শীকার অন্বেষণে ব্যস্ত দেখা যায়। ইহাদের ডানা ও শরীর বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। মশা, মাছি প্রভৃতির বংশ নাশ করিয়া সে সময় মানুষের বিশেষ উপকার করে। শীকার ধরিবার কৌশলও ওয়াটার বিট্‌লের অনুরূপ। ছোট বড় মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি জলীয় জীব ইহাদের খাদ্য। প্রকৃতির এই বিচিত্র জগতে এইরূপ কত যে জীব খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত নিজ নিজ স্বভাবজাত কৌশল তৎপরতার সহিত অবলম্বন করিতেছে তাহা মানুষের পক্ষে সকল সময়ে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না।

স্পেন-বিপ্লবের পটভূমিকা

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

স্পেন-বিপ্লবের নাটকীয় আকস্মিকতা বিশ্ববাসীকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করলেও যাঁরা স্পেনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের কাছে এ একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়। যে অগ্নিপ্রবাহ সমস্ত স্পেনকে বিধ্বস্ত করেছে এবং যার জ্বলন্ত শিখা এক সময় সারা ইউরোপকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, তা যে সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত নয় তা বলাই বাহুল্য। এর উৎস নিহিত রয়েছে সুদূর অতীতের তিমিরাচ্ছন্ন গর্ভে। স্পেনের আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক জীবন বিশ্লেষণ করলে এ কথাই মনে হবে যে, এই পরিস্থিতিতে এ রকম সংঘাত ছিল অনিবার্য। অবিচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্পেনে বহু শতাব্দী ধরে যে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, আচম্বিতে তা প্রকাশ পেয়েছে এই প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে।

বহু দিন ধরে স্পেন ইউরোপের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিল ; ফলে অপরিচয়ের আবরণে সে বিদেশীর চোখে এক রহস্যময় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিশেষ ক'রে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—তার শৈলবন্ধুর জনপদের রোমাণ্টিক আবহাওয়া স্পেনকে ঘিরে একটি স্বপ্নময় আবেষ্টনী রচনা ক'রে রেখেছিল। স্পেন বল্‌তে তাই মনে হ'ত এক বিচিত্র বর্ণরাগরঞ্জিত চিত্র ; সেখানে নীলাভ আকাশের নীচে আঙুরের বন স্প্যানিশ রূপসীদের চটুল নৃত্যে চঞ্চল ; গোলাপকুঞ্জগুলি মেষপালকদের গীটার-ধ্বনিতে মুখর। তার উন্মুক্ত প্রান্তর আর নিভৃত গিরি-কন্দর রোমান্সের লীলাভূমি। বিভিন্ন পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে স্পেনের একটি শান্ত-মধুর পরম রমণীয় রূপ ফুটে উঠেছে।

সূর্যকরোদ্ভাসিত স্পেনের (Sunny Spain) এ নিতান্তই বাইরের রূপ। তার দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং গোলাপ-বীথির পিছনে লুকান ছিল অপরিসীম দারিদ্র্য ; আপাত-দৃষ্টিতে সরল জীবনযাত্রা গোপন করেছিল তার দৈন্য ও হীনতা। রূঢ় বাস্তবের কঠিন আঘাতে যখন তার রোমাণ্টিক পটভূমিকা বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বিশ্ববাসীর চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল অত্যন্ত প্রখর ভাবে। কল্পনার রঙীন জাল গেল ছিঁড়ে—প্রকাশ পেল সর্বহারা স্পেনের যথার্থ মূর্তি।

স্পেনের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে—যখন ফার্দিনান্দ এবং ইসাবেলার পরিণয়ের ফলে স্পেনের দুটি অঞ্চল কাস্টিল এবং এরাগন একসূত্রে গ্রথিত হ'ল। মধ্যযুগে স্পেন ছিল মুসলমান সাম্রাজ্যের অংশ—তার ছাপ আজও তার জাতীয় জীবনে রয়ে গেছে। ফার্দিনান্দ-ইসাবেলার শাসনকালে স্পেনে ইসলামের শেষ অধিকার গ্রানাডার পতন ঘট্‌ল এবং একটি অখণ্ড স্পেন রাষ্ট্রের পত্তন হ'ল। এঁদেরই আমলে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার ক'রে নতুন মহাদ্বীপে বিস্তীর্ণ স্পেনীয় উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত করেন। স্পেনের শ্রীবৃদ্ধি তাতে কিছু ঘট্‌ল বটে ; কিন্তু সে সমৃদ্ধি জাতীয় জীবনের সমস্ত শ্রেণীকে স্পর্শ করে নি। মুষ্টিমেয় অভিজাত-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গই এতে বিশেষ লাভবান্ হ'ল। ফলে ব্যাপক আর্থিক উন্নতি ঘটে ওঠে নি। আমেরিকা থেকে যে ঐশ্বর্য-ধারা এসে স্প্যানিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিল, তা যদি সহস্র-ধারায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়্‌ত, তা হ'লে স্পেনের আর্থিক জীবনের বনিয়াদ হ'ত সুদৃঢ়, ঘট্‌ত শিল্পকলার প্রসার এবং দারিদ্র্যের কলঙ্ক থেকে স্পেন পেত মুক্তি। কিন্তু শ্রমবিমুখ অভিজাত-সম্প্রদায়ের আচরণ হ'ল আর্থিক উন্নতির পরিপন্থী। বিলাসের জালে জড়িয়ে পড়ে শিল্পকলার দিকে তাঁরা রইলেন উদাসীন। সনাতন-রীতির পরিবর্তন ক'রে জাতীয়-কল্যাণের ভিত্তি স্থাপন করার কোনও প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে দেখা যায় নি। তার ওপর, প্রচণ্ড ধর্মান্ধতা আর্থিক অবনতির আর একটি কারণ। গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে শিল্পনিপুণ ইহুদী এবং মূরদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার ফলে শিল্প-প্রসারের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হয়ে দাঁড়াল।

এরই পরিণামে ইউরোপের বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আয়তনে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও স্পেন আজও অত্যন্ত দরিদ্র এবং সর্ব বিষয়ে অনুন্নত। শিল্প-বিপ্লবের পর অন্যান্য

ইউরোপীয় দেশ অগ্রসর হয়ে গেলেও স্পেন তাদের সঙ্গে পা ফেলে চল্‌তে পারে নি; ফলে সে রয়ে গেল মধ্যযুগীয় অন্ধকারে। ধনিকতন্ত্রের আবির্ভাব যখন একে একে ইউরোপের সমস্ত দেশগুলির সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাল তখনও স্পেনে অটুট রইল প্রাচীন-পন্থী সমাজ-শাসন। সামন্ততন্ত্রের শেষ আশ্রয় হ'ল স্পেন। এই অভিজাতবর্গের প্রতিপত্তির সঙ্গে বজায় রইল যাজক-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য—অক্ষুণ্ণ রইল প্রাচীনপন্থী সেনানীবৃন্দের দোর্দণ্ডপ্রতাপ।

জমিদারবর্গ, যাজক-মণ্ডলী এবং সেনানীবৃন্দ—এই ত্রিশক্তি স্পেনের পুরাতনপন্থী সমাজের তিনটি স্তম্ভ। এই ত্রিশক্তির সহযোগিতায় স্পেনে বহুদিন (১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজতন্ত্র। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও স্পেন তার চারশো বছর আগেকার দুঃস্থ অবস্থার বিশেষ উন্নতি-সাধন কর্‌তে পারে নি। অত্যাচারী শাসক-সম্প্রদায়ের উৎপীড়নে স্পেন ছিল পূর্বের মতোই নিষ্পীড়িত। দেশের শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন লোকই ছিল নিরক্ষর। জমিদারদের অত্যাচারে কৃষাণকুল ছিল জর্জরিত; পুঁজিপতিদের স্বৈরাচারে নিঃস্ব শ্রমিকবৃন্দ ছিল ক্রীতদাসের মতই হীনদশাগ্রস্ত। দেশের দুরবস্থা প্রশমিত হওয়া দূরে থাক, তা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্পেনের রাষ্ট্রবিপ্লবের পটভূমিকা হচ্ছে এই ক্রমবর্ধমান দেশব্যাপী নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য - তার অনুন্নত সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা। বহুবর্ষ ধরে স্পেনে যে শোষণ-কার্য চল্‌ছিল এ অন্তর্বিপ্লব তারই প্রতিক্রিয়া।

অথচ সুনিয়ন্ত্রিত হ'লে স্পেনের আর্থিক জীবন এত নিম্নস্তরের হবার কথা নয়; কেন না, প্রকৃতিদত্ত সম্পদ তার শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে সুপ্রচুর। কয়লার অভাব থাক্‌লেও অন্যান্য খনিজপদার্থের প্রাচুর্য যথেষ্ট। কিন্তু সে সবের খনি প্রায়ই বিদেশীর কবলে। ফলে তা দেশীয় শিল্প-গঠনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পেন কৃষি-প্রধান দেশ। অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিকর্মের ওপর নির্ভর করে উপজীবিকার জন্য। গম ও যব এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি-প্রণালী এখানে অজানা বল্‌লেই হয় এবং এর জন্য দায়ী সামন্তবৃন্দ—যাঁরা জমির মালিক। এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে স্পেনের অবস্থার সাদৃশ্য বিস্ময়কর। স্পেনের বহু অঞ্চলে বৃষ্টির অভাব—কৃত্রিম উপায়ে সেচের বন্দোবস্ত না করলে কৃষিকর্ম অসম্ভব। অথচ, ভারতের মতই এখানে সেচের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। দেশের অধিকাংশ জমিই কয়েকজন ধনশালী জমিদারের হাতে। হিসাব ক'রে দেখা গিয়েছে, মাত্র পঞ্চাশ হাজার জমিদারের অধিকারে রয়েছে দেশের অর্দ্ধেকেরও ওপর জমি অর্থাৎ জনসংখ্যার শতকরা একভাগের দখলে রয়েছে শতকরা একান্ন ভাগ ভূমি। কৃষাণদের অধিকাংশেরই কোনও জমি নেই; লোকসংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগই এই দলে পড়ে। যাদের আছে তাদেরও অধিকাংশেরই ভাগে মাথা-পিছু তিন একরের বেশী জোটেনি। এ অবস্থায় কৃষিকার্যে যথেষ্ট লাভ হওয়া সম্ভব নয়। ফলে, সাড়ে আট লক্ষ কৃষাণের দৈনিক আয় গড়পড়তা সাড়ে পাঁচ আনার অতিরিক্ত ছিল না। ভারতীয় জমিদারের মত অধিকাংশ জমিদারই গ্রামের মায়া কাটিয়ে শহরে প্রবাসী হয়ে থাকেন; বৃটিশ জমিদারদের মত তাঁরা জমিদারীর উন্নতি কর্‌তে বিন্দুমাত্র প্রয়াস পান না। জমির উন্নতির জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় করা প্রয়োজন তা কৃষাণদের সামর্থ্যের বাইরে; সুতরাং কৃষিকার্য যে নিতান্ত নিম্নস্তরের হবে এ আর বিচিত্র কি? অথচ চাষীর কাছ থেকে পাওনা আদায় কর্‌তে কেউই পশ্চাৎপদ নন। ফলে এদের জীবনযাত্রার নিরিখ যে খুবই সাধারণ তা সহজেই বোঝা যায়।

স্পেনের স্বেচ্ছাতন্ত্রের দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল তার সেনা-বাহিনী। সেনাপতিদের সংখ্যাধিক্য তার একটা বৈশিষ্ট্য। সমগ্র স্প্যানিশ্‌ বাহিনীতে সর্বসুদ্ধ ছ'শো বত্রিশ জন সৈন্যা-ধ্যক্ষ এবং প্রায় একুশ হাজার উচ্চপদাধিকারী কর্মচারী ছিল অর্থাৎ ছ'জন সাধারণ সেনার জন্য ছিল একজন ক'রে নায়ক। গুন্‌থার বল্‌ছেন, বোধ করি কাইজারের বিরাট বাহিনীতেও এত বেশী অফিসার ছিল না। সরকারী আয়ের সিকি ভাগ যেত এই শ্বেতহস্তী পোষণ কর্‌তে। এদের প্রতাপ ছিল অসামান্য এবং সামন্ততন্ত্রের বিশেষ সুবিধা সমস্তই এরা ভোগ ক'র্‌ত সাম্প্রতিক কালেও।

স্পেনের জাতীয় জীবনে যাজক-সম্প্রদায় চিরকালই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে এসেছে। ষোড়শ শতাব্দীর যে ধর্মগত বিরোধ ইউরোপের জীবনীশক্তির ব্যর্থ অপচয় ঘটিয়ে-ছিল তার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল স্পেন। ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্ট্‌দের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা উঠ্‌লেই মনে পড়ে স্পেনের পাষণ্ডসংযম সভার (Spanish Inquisition) নৃশংস

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায় | মনসার গান | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

নির্মমতা—যার অমানুষিক অত্যাচারের ফলে বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রাণহীন দেহ স্পেনের মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সেই পাষণ্ডদলন সংসদ আজ ইতিহাসের পাতায় স্পেনের কলঙ্ককাহিনীরূপে বিরাজ করছে বটে—বাস্তবে তার অস্তিত্ব আজ আর নেই—কিন্তু তার অতীত প্রভাবের সাক্ষ্য-স্বরূপ ক্যাথলিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। স্পেনের ধর্মসমাজ (Church) এবং যাজক-গোষ্ঠি সুসংবদ্ধ এবং অমিত প্রভাব-শালী; আচার্যেরা (Priests) রাষ্ট্রের আশ্রিত এবং সরকারী বৃত্তিভোগী এবং ধর্মসমাজ রাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্পেনে মঠ ছিল অগণিত এবং ধর্মযাজকদের সংখ্যা চল্লিশ হাজারের উর্ধ্বে। এই দীক্ষাগুরুরা সুধু পাষণ্ড-দলন ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, স্পেনের শিক্ষাগুরুও ছিলেন এঁরাই। স্পেনের শিক্ষাদানকার্য সম্পূর্ণ ছিল চার্চের হাতে; ফলে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও শতকরা পঞ্চান্ন জন অজ্ঞানের তিমিরে রয়ে গেল। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়-গুলির অর্থ-সম্পদও ছিল প্রচুর এবং বহু শিল্প এঁরা করতলগত করেছিলেন। ব্যাঙ্ক, রেলপথ, কমলালেবুর চাষ—কিছুই এঁদের শ্যেন-দৃষ্টি এড়াতে পারে নি; ফলে স্পেনীয় জনসাধারণের শুধু পারমার্থিক নয়, আর্থিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনযাত্রাও অনেকটা ধর্মসমাজই নিয়ন্ত্রিত ক'রে এসেছে। ধর্মসমাজের এই প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রচুর ঐশ্বর্য যাজক-সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতি ঘটিয়েছিল এবং তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে জনসাধারণকে শোষণ করবার যন্ত্র-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দী হচ্ছে ইউরোপে গণতন্ত্রের প্রসারের যুগ। একে একে বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি ধসে পড়্‌ল এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসন-বিধি প্রতিষ্ঠিত হ'ল প্রায় সর্বত্র। এই প্লাবনের মুখে স্পেনের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের আসন উঠল কেঁপে এবং সেখানেও গণ-জাগরণের সূচনা দেখা দিল। ফলে নিয়মতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের একটা কাঠামো স্পেনেও খাড়া হ'ল। কিন্তু সমর-নায়কদের প্রভাবে গণতন্ত্র এখানে বিশেষ মাথা তুল্‌তে পারে নি; স্পেনের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীতে গড়ে তোলে সামরিক নেতৃবৃন্দই।

রাজা ত্রয়োদশ আলফন্‌সো রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়ে শাসন-বিধি (constitution) উপেক্ষা ক'রে সুরু কর্‌লেন স্বেচ্ছাচারের অভিযান। তাঁর স্বৈরাচারে স্পেনে জ্বলে উঠ্‌ল অশান্তির অনল। ধ্বংসোন্মুখ রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ প্রাইমো দ্য রিভেরা অতর্কিতে শাসনক্ষমতা নিলেন স্বহস্তে (১৯২৩); প্রতিষ্ঠিত করলেন সামরিক কর্তৃত্ব (military dictatorship)। কিন্তু এ ব্যবস্থাও স্থায়ী হ'ল না। জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষে শঙ্কিত হয়ে প্রাইমো দ্য রিভেরা স্পেনের শাসনতন্ত্রের স্বরূপ গোপন করবার চেষ্টা করলেন গণতান্ত্রিক আবরণের অন্তরালে। স্থাপন করা হ'ল এক ব্যবস্থা-পরিষদ, যার সদস্যেরা হলেন নির্বাচিত নয়—ডিক্‌টেটরের মনোনীত। কিন্তু স্পেনের বহুবিধ সমস্যার কোনটিরই এ ব্যবস্থায় সমাধান ঘট্‌ল না। ফলে, প্রাইমো দ্য রিভেরার প্রভাবের ঘট্‌ল অবসান—হ'ল তাঁর ডিক্‌টেটরী শাসনপ্রণালীর অন্তিম দশা (১৯৩০)।

এবার আসরে এলেন আর এক সৈন্যাধ্যক্ষ—বেরেঙ্গুয়ের (General Berenguer)। কিন্তু রাজতন্ত্রের দিন তখন ঘনিয়ে এসেছে। পিরেনিজের ওপার থেকে উদারনৈতিক ভাবধারা ধীরে ধীরে স্পেনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল। জনসাধারণ দাবী করছিল পুরাতন সমাজবিধির আমূল সংস্কার—স্বেচ্ছাতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে কাটালোনিয়াতে সাম্যবাদ প্রসার লাভ করছিল; জনসাধারণ সামন্ততন্ত্রের অক্ষমতায় এতই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, ক্রমেই সর্বহারা শ্রমিক এবং কৃষাণের দল নৈরাষ্ট্রবাদে (Anarchism) বিশ্বাসী হয়ে উঠ্‌ছিল।

১৯৩১এ স্পেনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের অবতারণা হ'ল। এপ্রিল মাসে পৌর-নির্বাচন দ্বন্দ্বে সর্বত্র গণতন্ত্রীরা অপূর্ব সাফল্য লাভ কর্‌ল। ফলে তাসের প্রাসাদের মত ডিক্‌টেটরী শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে পড়্‌ল; রাজা ত্রয়োদশ আল্‌ফন্‌সো সিংহাসন ত্যাগ ক'রে হলেন পলাতক। প্রায় পাঁচশো বছর যে বুর্বঁ বংশ স্পেনে রাজত্ব ক'রে এসেছিল এতদিনে তাদের আধিপত্যের পরিসমাপ্তি ঘট্‌ল। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনমত এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করবার জন্য এক বিন্দুও রক্তপাত হয় নি; একটি

কামানও ছুঁড়তে হয় নি। ছিন্নমূল তরুর মত তা আপনিই ধূলায় লুটিয়ে পড়ল।

এবার এল গণতন্ত্রের যুগ। ক্ষমতা এল বামমার্গীয় নয়—মধ্যপন্থীদের হাতে। সেনর আজানার নেতৃত্বে একটি গঠনতন্ত্র রচিত হ'ল। কর্টেজ বা জাতীয় পরিষদ হ'ল একটি মাত্র—ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত তার দুটি গৃহ নয়। সর্বশ্রেণীর নাগরিককে দেওয়া হ'ল ভোটের অধিকার। ল্যাটিন দেশগুলির কোথাও নারীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার নেই; এমন কি প্রগতিশীল ফ্রান্সেও না। স্পেনেই প্রথম সে রীতির ব্যতিক্রম ক'রে ভোটের অধিকার দেওয়া হ'ল মহিলাদের এই নতুন শাসন-ব্যবস্থায়।

শাসনতন্ত্র রচিত হবার পরই গণতন্ত্রী সরকার দৃষ্টি দিলে স্পেনের সমস্যাগুলি মেটাবার দিকে। তাদের প্রথম কাজ হ'ল রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম সমাজের সম্পর্ক ছেদ করা। জেস্যুইট সম্প্রদায়ের যে বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি ছিল স্পেনে তা বাজেয়াপ্ত করা হ'ল। তাদের হাত থেকে শিক্ষা বিস্তারের ভার দিয়ে দেওয়া হ'ল রাষ্ট্রের হাতে। কিন্তু তাদের প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি গণতন্ত্রী আমলেও; স্পেনীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে তারা সরকারের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

স্পেনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য থাক্‌লেও কোন কোনও অঞ্চলের উগ্র প্রাদেশিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য-কামনা একটি অখণ্ড স্পেনীয় জাতি গড়ে তুল্‌তে দেয় নি। পূর্বে কাটালোনিয়া এবং উত্তরে বাস্ক প্রদেশগুলি স্বাতন্ত্র্য দাবী করে। এদের দাবী পূর্ণমাত্রায় মেটাতে গেলে স্পেনকে বহু ভাগে বিভক্ত করতে হয়—লোপ পায় তার অখণ্ড জাতীয়তা। তাই কাটালানদের তুষ্ট করবার জন্য গণতন্ত্রী সরকার দেয় এদের পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্ত-শাসন এবং তাদের স্বতন্ত্র ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি, যদিও এদের ওপর জাতীয় পরিষদের আধিপত্য রইল অব্যাহত।

গণতন্ত্রী সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানে। শিক্ষামন্ত্রী ফার্ণান্দো দ্য লস রাইও স্বল্প-কালের মধ্যে স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে দশ হাজার বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। সুদূর গ্রাম্য প্রদেশে শিক্ষা বিস্তার কল্পে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হ'ল। গ্রামে গ্রামে পাঠান হ'ল ভ্রাম্যমান শিক্ষা-সংসদ: এরা নিরক্ষর গ্রাম-বাসীদের বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। এক বৎসরে দেড় হাজার গ্রাম্য পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি হ'ল আমূল সংস্কৃত। প্রগতিশীল ছাত্র-সমাজও এই শিক্ষাপ্রসার-আন্দোলনে সানন্দে যোগ দিলে। মাদ্রিদ, সেভিল, সেগোভিয়া এবং ভ্যালেন্সিয়াতে গড়ে উঠল 'গণ বিশ্ববিদ্যালয়' বা People's University. এখানে তরুণ বিদ্যার্থীরা নিরক্ষর কৃষাণ এবং শ্রমিকদের মধ্যে অধ্যাপনা কার্যে ব্যাপৃত রইল।

আর্থিক-সঙ্কট দূর করবার চেষ্টায় গণতন্ত্রী সরকার কৃষিকর্মের উন্নতির দিকে নজর দিলে। কিন্তু এখানে জমির-সমস্যা মেটাতে গিয়ে ঘট্‌ল বিপত্তি। বিস্তীর্ণ জমিদারী ভাগ ক'রে চাষীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করার প্রস্তাব হ'ল। সরকারের অভিপ্রায়ের আভাষ পেয়ে সৈন্যাধ্যক্ষ সানযুরো করলেন বিদ্রোহ। একদিনের মধ্যেই এ বিদ্রোহ প্রশমিত হ'ল; বিদ্রোহী জমিদারদের দখল থেকে জমি আদায় ক'রে নিয়ে তা কৃষাণদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'ল। সেচের বন্দোবস্তও হ'ল কিছু, ফলে কৃষাণের আর্থিক দুর্দশার অবসান হবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

স্বল্পকালের মধ্যে গণতন্ত্রী সরকার যা-কিছু করেছিল তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়া-শীল দলগুলি বিচলিত হয়ে উঠেছিল। বিক্ষুব্ধ ধর্মযাজক-গোষ্ঠী, জমিদারবর্গ এবং অভিজাত-সম্প্রদায়ের চেষ্টায় আজানার শাসনকালের হ'ল অবসান—ক্ষমতা এল দক্ষিণপন্থীদের হাতে। সেনর লেরু হলেন এদের নেতা। বামপন্থীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল সরকারের দমন-নীতির প্রতিবাদে ১৯৩৪ সালে। নিতান্ত নির্মমভাবে তা ঠেকান হ'ল। আষ্টুরিয়াসে নির্যাতিত শ্রমিকমণ্ডলীর অভ্যুত্থান দমন করতে গিয়ে প্রায় চোদ্দশো লোক নিহত করা হ'ল। স্পেনে প্রগতির যে দ্যুতি দেখা গিয়েছিল তা বিদ্যুৎশিখার মতই চকিতে নির্বাপিত হ'ল—সুরু হ'ল আবার প্রতিক্রিয়া-পন্থীদলের অবাধ লীলা।

এর জন্য বামপন্থীরা কতকটা যে দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের মধ্যে ছিল অনৈক্য এবং নেতৃত্বের অভাব। লেনিনের যে দূরদৃষ্টি এবং নেতৃত্ব রুশ-বিপ্লবকে সাফল্য-মণ্ডিত করেছে সেই সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং কর্মপটুতা স্পেনের সংস্কারকামী নেতাদের মধ্যে ছিল না। গণতন্ত্রের প্রথম যুগে তাদের মধ্যে খানিকটা একতা দেখা গেলেও তা স্থায়ী

হয় নি। এনার্কিস্ট, সিণ্ডিক্যালিস্ট এবং সোস্যালিস্ট—এই ত্রিবিধ বামপন্থীদলের মিলন হ'লে দক্ষিণপন্থীদের পরাভূত করতে পারা যেত গণতন্ত্রের সুরুতেই এবং অক্ষুণ্ণ রাখা যেত বরাবর বামপন্থীদের প্রতিপত্তি। কিন্তু এই মিলন সম্ভব না হওয়ায় ক্যাথলিক নেতা গিল রোব্ল্স্ এবং প্রতিক্রিয়া-শীল লেরুর হাতে পড়্ল গণতন্ত্রের শাসনভার।

এই দক্ষিণপন্থী সরকারের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বামমার্গীয়েরা পপুলার ফ্রন্ট গঠন করতে বাধ্য হ'ল ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। এই বাম-সংহতি ঐ বৎসর নির্বাচন-দ্বন্দ্বে বিজয়-গৌরব লাভ করল—আবার প্রাচীনপন্থীদের হ'ল শোচনীয় পরাভব। ক্ষমতা-বিলোপ অনিবার্য দেখে দক্ষিণপন্থীরা আর নিয়মতান্ত্রিকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রইল না—তাদের মুখোস খুলে ফেলে তারা খোলাখলি অগ্রসর হ'ল স্পেন-গণতন্ত্রের ধ্বংস-সাধনে। দেখা দিল ফ্যাসিজ্‌মের বর্বর রূপ—তাদের উদ্দেশ্য স্পেনের কল্যাণ নয়—তাদের অভীষ্ট, কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখা। তাদের উদ্দেশ্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা নয়—অবিচার কায়েম করা। তাদের অভিপ্রায় স্পেনের জাতীয় প্রগতি নয়—তাদের অভিসন্ধি, সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ করা।

এই হচ্ছে স্পেন বিপ্লবের পটভূমিকা। এই বিপ্লবের একদিকে ছিল—আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত স্পেনের গণতন্ত্রী সরকার; উদারনৈতিক এবং সাম্যবাদী সমস্ত দলই ছিল সরকার পক্ষে এবং তাদের পিছনে ছিল স্পেনের নির্যাতীত কৃষাণ এবং শ্রমিকমণ্ডলী। স্বাতন্ত্র্যকামী কাটালান ক্যাথলিক বাস্করাও ছিল এই দিকে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও সরকারের সহায়তা করেছে। অন্যদিকে ছিল—সেনাবাহিনী, যাজক সম্প্রদায় এবং জমিদারবর্গ অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী সমাজের তিনটি স্তম্ভ। এদের নেতৃত্ব করেছে ফ্যালান্‌জিষ্টরা—যারা হচ্ছে স্পেনের ফ্যাসিস্ট্ সম্প্রদায়। বিদ্রোহী স্পেনবাহিনীতে ছিল প্রচুর জার্মান, ইতালীয়ান এবং মুর সেনা। কাজেই একে অন্তর্বিপ্লব না বলে, বলা উচিত প্রগতি-বিরোধী স্পেনীয়দের সহায়তায় স্পেনে ফ্যাসিষ্ট অভিযান।

এই অভিযানের সুরু হয় ১৯৩৬ এর ১৮ই জুলাই। এর ভূমিকা নিতান্ত সাধারণ। ৪ঠা মার্চ তারিখে লেফ্‌টেনান্ট কাস্তিলো নিহত হন আততায়ীর গুলিতে। তিনি ছিলেন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী; তাঁর হত্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁর কয়েকজন বন্ধু হত্যা করে সেনর সোতেলোকে—সোতেলো ছিলেন স্পেনের ফ্যাসিষ্টদের নেতা। ফলে যে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল তা অচিরেই ছড়িয়ে পড়্‌ল স্পেনে এবং স্বল্পকালের মধ্যে এক বিরাট দাবানল প্রজ্বলিত হ'ল যার সমগ্র পরিসমাপ্তি ঘটেছে মাদ্রিদের পতনের পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে।

জেনারেল ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কো এই বিপ্লবে ছিলেন দক্ষিণ-পন্থীদের নেতা এবং তাঁরই আধিপত্য এখন স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রাঙ্কো ছিলেন স্প্যানিশ মরক্কোতে স্পেনীয় বৈদেশিক বাহিনীর অধিনায়ক। এ বিপ্লব সহসা ঘটে ওঠেনি; বরঞ্চ তা পূর্ব-প্রকাশিত। একই দিনে মাদ্রিদ, বার্সেলোনা এবং ভ্যালেন্সিয়া প্রভৃতি বৃহত্তর শহরে একই সঙ্গে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে; সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এদের হাতে থাকায় এদের সাফল্যলাভ কিছুমাত্র কঠিন হয়নি। সমস্ত শিক্ষিত সেনা বিপক্ষে যোগদান করায় সরকার পক্ষের অসুবিধা অত্যন্ত তীব্র হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু স্বল্প-শিক্ষিত সামরিক স্বেচ্ছাসেবকেরা যেভাবে অটল বিক্রমে বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে তা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আর এখানে ফ্যাসিষ্টরা অসামরিক জনসাধারণকে নির্মমভাবে বোমা-বর্ষণ করে যেভাবে হত্যা করেছে তারও তুলনা ইতিহাসে অল্পই মেলে। শ্রেণী-সংঘর্ষের তীব্রতম উলঙ্গ রূপ দেখা গিয়েছে স্পেনের এই ঘরোয়া বিবাদে।

স্পেন-বিপ্লব একটি অনন্যসংলগ্ন স্বতন্ত্র ঘটনা নয়। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে দ্বন্দ্ব চলেছে বাম ও দক্ষিণ পন্থীদের মধ্যে এ তারই একটি বিকাশ। এখানে দ্বন্দ্ব ব্যক্তি-বিশেষ বা জাতিবিশেষকে নিয়ে নয়—এখানে বিরোধ মানব-জাতির ভবিষ্যৎ প্রগতি এবং কল্যাণ নিয়ে। এ কথা আজ অজানা নেই যে, ফ্রাঙ্কোর বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র দুটির আন্তরিক সহ-যোগিতা এবং গণতন্ত্রী রাজ্যগুলির উদাসীনতা। বাস্তবিক পক্ষে এখন ফ্রান্স ও বৃটেনের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরা হচ্ছেন প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিষ্ট্, কাজেই ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে তাঁদের রয়েছে নীতিগত ঐক্য এবং আদর্শের মিল। যদিও ফ্রাঙ্কো গণতন্ত্রের পরি-পন্থী এবং সার্বভৌম নায়কত্বের পক্ষপাতী, তবুও শ্রেণীগত

স্বার্থের দিক থেকে তাঁর মিল যেমন হিট্‌লার-মুসোলিনীর সঙ্গে, তেমনই চেম্বারলেন-দালাদিয়ের সঙ্গে। সুতরাং যে নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন ক'রে বৃটেন এবং ফ্রান্স প্রকারান্তরে স্পেনীয় সরকারের বিরোধিতা এবং ফ্রাঙ্কোর সহায়তা করেছে তা তাদের পক্ষে বিশেষ অসঙ্গত মনে করা ভুল হবে।

স্পেনে বিজয়লাভ করলেও ফ্যাসিজ্‌মের স্থায়ী সাফল্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়ে যায়নি। নির্যাতীত সর্বহারার দল সর্ব দেশেই আত্ম-অবিশ্বাসী এবং সংহতিহীন। বহু যুগের অত্যাচারে তাদের আত্মা হয়ে উঠেছে নিষ্পেষিত; ফলে জাগরণের আলো এখনও এদের মধ্যে সর্বত্র পৌঁছয়নি। পক্ষান্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শোষক সম্প্রদায় সর্বত্রই সুসংবদ্ধ এবং আত্ম-সচেতন। আত্মরক্ষার সমস্ত অস্ত্রই এদের হাতে; কাজেই ন্যায়ে হোক, অন্যায়ে হোক তারা স্বাধিকার অটুট রাখ্‌বার চেষ্টা করছে। কিন্তু যখন দেখা যাবে আর্থিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে পুরাতন-পন্থী সমাজ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব তখন তা খসে পড়্‌বে জীর্ণ বস্ত্রের মত। নতুন রূপ পরিগ্রহ করে তখন এক নবীন মানব-সমাজ জেগে উঠ্‌বে, ন্যায় এবং সত্যে হবে যার প্রতিষ্ঠা এবং সাম্য ও ঐক্য হবে যার ভিত্তি। কল্যাণের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'—এ কথাই স্পেন মনে করিয়ে দিচ্ছে। কাজেই স্পেনে গণতন্ত্রের পতনে নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই; কেন না, সাময়িকভাবে প্রতিহত হলেও মানব সভ্যতার বিজয়-রথ সগৌরবে এগিয়ে চল্‌বে বহু সঙ্কট অতিক্রম করে এবং বহু বিপর্যয় পিছনে ফেলে।

শ্রাবণের দীঘি

কাদের নওয়াজ

১

শ্রাবণের দীঘি, ভরিয়াছে জলে, কানায় কানায়
কূলে কূলে ঢেউ ফুলে ফুলে উঠে' সোহাগ জানায়;
পানিকো'র উড়ে, ডাকপাখী ডাকে,
ডুবুরী বেড়ায় শেওলার ফাঁকে,
ভেসে উঠি' জলে সফরী লুকায় 'টোপর্-পানায়'।

২

হে দীঘি! তোমার দুই তট যেন প্রেমিক প্রিয়া,
চুম্বন দিতে আসিতেছে সরি' তৃষিত হিয়া;
কিন্তু সলিল প্রহরীর মত,
মধ্যে দাঁড়ায়ে আছে অবিরত,
মুখোমুখী চেয়ে তাই তারা কাঁদে বিরহ নিয়া।

৩

"কমলে কামিনী"—জানিনে আজিকে কোথায় রাজে,
"কালিদহ"—সে কি ছিল এ দীঘির বক্ষ মাঝে?
সে সব খবর কেউ নাহি জানে,
অমল কমল শুধু এইখানে;—
দেখি, আর ভাবি অতীতের কথা সকাল সাঁঝে।

৪

হে দীঘি! তোমার বুকে বারিরাশি অঝোর ঝরে,
কেয়াবধূ তার ঘোম্‌টা খুলিয়া সোহাগ ভরে—
ঢলি' পড়ে সাঁঝে কভু তব তীরে,
'কোয়া'-পাখী ডাকে, হাওয়া বহে ধীরে;
শ্রাবণের দীঘি শ্রাবণ তোমারে আদর করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। ছাত্রদত্ত পরীক্ষার ফি অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাওয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য এই আয়বৃদ্ধি একটা সাময়িক ঘটনা। ইহার উপর নির্ভর করা চলে না বলিয়াই শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের যে মোটামুটি হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের আয়ের পরই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদত্ত পরীক্ষার ফি'র উপরই সব চেয়ে বেশী নির্ভর করিয়া থাকেন। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ সর্ব্বসমেত পাঁচ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। এই অবস্থায় বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে পন্থার আশ্রয় লইয়াছেন তাহা জন-শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরীক্ষার ফি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দরিদ্র অভিভাবকদের পক্ষে ফি'এর টাকা জোগানো কি রকম কঠিন হইয়া উঠিতেছে তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। কিন্তু তথাপি কুলাইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশ করিতেছেন এবং টানিয়া টানিয়া তাহার আয়ও তিন লক্ষ টাকায় তুলিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহা মাড়োয়ারী বুদ্ধিকেও হার মানাইয়াছে। যাহাতে কোন বই পরবর্ত্তী বৎসরে কাজে না লাগে, তাহার জন্য দুই-একটি অংশের অদল-বদল করিয়া প্রতি বৎসরই অভিভাবকদের বই কিনিতে বাধ্য করিতেছেন। অভিভাবকদের পক্ষে তাহা যে কতদুর কষ্টকর তাহা হিসাব করিয়া দেখিবারও তাঁহাদের অবকাশ নাই। সরকার পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা কিনিয়া রাখিয়াছেন,কিন্তু যাহারা বাকি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা জোগাইয়া চোর সাজিয়াছে তাহাদের কথার কোন মূল্যই দেওয়া হয় না।

যদি জ্ঞান এবং শিক্ষার আলো বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সার্থকতা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেই শিক্ষা সুলভ এবং সহজলভ্য করিতে হইবে। সরকারী সাহায্য বৃদ্ধির আশা বোধ হয় নাই। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-বাহুল্য ছাটিয়া ফেলাই একমাত্র পন্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস। ভদ্রলোকদের যখন ছেলে না পড়াইয়া উপায় নাই, তখন যেখান হইতে পারেন শিক্ষার কড়ি তাঁহারা জোগাড় করিবেনই, এ মনোভাব একচেটিয়া ব্যবসাদারদের সাজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়।

সত্যাগ্রহ শাসন—

এবারের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই বৈঠকে যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার একটি এই যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মতি গ্রহণ না করিয়া কোন কংগ্রেস সদস্য সত্যাগ্রহ করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে বামপন্থীগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাব এবং আরও কয়েকটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য নিখিল ভারত দিবসও ধার্য্য করিয়াছেন।

এ কথা সত্য যে, রাজকোটের পরে "নব নব আলো দর্শনের" ফলেই এই প্রস্তাবের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য সত্যাগ্রহ শাসন। দেশীয় রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহের যে আগ্রহ উঁকি দিতেছে, নানা প্রকার বিধি-নিষেধের বেড়াজালে মহাত্মাজি তাহা শৃঙ্খলিত করিতে চান। ইতিপূর্ব্বে সত্যাগ্রহীর জন্য কি কি আবশ্যকীয় গুণপনার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে হরিজন পত্রে অনেকগুলি প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন। এখন সেই গুণপনা

যাঁহাদের আছে তাঁহাদিগকেও প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনুমতি খোঁটায় বাঁধিয়া রাখিলেন।

কিন্তু ইহার স্বপক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে। কংগ্রেসের শক্তি ও মর্য্যাদা আজ অনেক বাড়িয়াছে। তাহার একটা শৃঙ্খলাও আছে। যে কোন কংগ্রেস-সেবককে তাঁহার ইচ্ছামত সত্যাগ্রহ করিতে দিতে কংগ্রেস এখন আর পারে না। কংগ্রেস-সেবকের কার্য্যের সহিত কংগ্রেসের মর্য্যাদা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দ্বিতীয়ত, সত্যাগ্রহ করিবার পূর্ব্বে যে কংগ্রেস-সেবক তাঁহার নিজের প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মতি এবং সমর্থন সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে সত্যাগ্রহ করিতে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর একটা কথা আছে। যে সকল কংগ্রেস-সেবক দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ করিতে যাইতেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা তাঁহাদের প্রযুক্ত হইবে কি-না? হইলে দেশীয় রাজ্যের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

সিংহলে ভারতীয় বিদ্বেষ—

সিংহলে ভারতীয় বিদ্বেষ মাত্র কয়েক বৎসরের প্রচার কার্য্যের ফল। সম্প্রতি সিংহল সরকারও ভারতীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাহার মধ্যে সরকারী ও আধা-সরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগের হার বাঁধিয়া দেওয়া একটি। ইহা ভারতীয় বিতাড়নের প্রথম পর্ব্ব। তাহা ছাড়া ধনিক স্বার্থরক্ষার গূঢ় উদ্দেশ্যও আছে। ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচারের জন্য সিংহলের নারিকেল বর্জ্জন করিয়া প্রতিশোধমূলক পন্থা গ্রহণের কথা উঠিয়াছিল। কংগ্রেস বহু বিবেচনার পর এখনই সেই চূড়ান্ত পন্থার আশ্রয় লইতে চান না। তৎপূর্ব্বে তাঁহারা আপোষের পথে একটা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী লইয়া ১৫ই জুলাই বিমানপথে সিংহল যাত্রা করিবেন।

সিংহল ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী। স্মরণাতীত কাল হইতে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য এবং সংস্কৃতিগত ঐক্য বর্ত্তমান। এমন দুইটি নিকট প্রতিবেশীর মধ্যে বিরোধ এবং বিদ্বেষ বাঞ্ছনীয় নয়। এ অবস্থায় কংগ্রেসের প্রস্তাব সর্ব্বাংশে সমীচীন হইয়াছে। দৌত্যের ভারও যোগ্যতর ব্যক্তির উপর অর্পিত হইতে পারিত না। আমরা আশা করি, সিংহলের প্রধান মন্ত্রী ব্যারন জয়তিলক তাঁহার পন্থার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা—

সিংহল সম্বন্ধে কংগ্রেস শান্তির নীতি অবলম্বন করিলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম নীতিই সমর্থন করিয়াছেন। এই ব্যবহার-বৈষম্যের কারণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বলেন, সিংহলে ভারতীয় বিতাড়নের আন্দোলন কয়েক বৎসর হইতে চলিলেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে যে অপচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের স্মাট্‌স্‌-গান্ধী চুক্তি, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কেপটাউন চুক্তি, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ফিট্‌হাম কমিশনের চেষ্টা, মিঃ হফমেয়ারের উক্তি, সমস্ত কিছু সত্ত্বেও তাহা এখনও পুরাদমে চলিতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের মধ্যে শতকরা আশী জনের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকাতেই। সেইখানেই তাহাদের বাড়ী ঘর, অন্য গৃহ নাই। যে ভাবে বুয়রেরা দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী, যে ভাবে অন্য ইউরোপীয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী, সেই হিসাবে ভারতীয়েরাও দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী। একদা ইংরেজেরাই নিজেদের গরজে ও প্রয়োজনে তাহাদের ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই প্রয়োজন চুকিয়া যাইতেই এখন ভারতীয়দের নানাপ্রকার হীনতার মধ্যে ফেলিয়া আফ্রিকা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার জঘন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

এই হীনতা ও অপমানসূচক আইনের বিরুদ্ধে আত্মসম্মান ও ভারতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রবাসী ভারতীয়গণ যে সংগ্রাম করিতেছেন, কংগ্রেস তাহা সমর্থন করিয়াছেন এবং অন্যান্য অ-শ্বেতকায় জাতিদের সহিত যুক্তভাবে সিগ্রিগেশন আইনের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে সংগ্রাম করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্য ও মহাত্মা গান্ধী—

দেশীয় রাজ্যের আন্দোলন স্থগিত এবং রাজকোটের অভিজ্ঞতার পরে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার "নূতন আলোক"

সম্বন্ধে 'হরিজন' পত্রে যে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা শুধু আমাদের কাছেই নয়, পণ্ডিত জওহরলালের মত লোকের কাছেও দুর্ব্বোধ্য ঠেকিয়াছে। সম্প্রতি ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া সেই দুর্ব্বোধ্য সত্যটি সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সত্যাগ্রহ স্থগিতের পক্ষে তাঁহার যুক্তি এই যে, বৃটিশ ভারতের নাগরিকগণ বহু দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার এবং বহু গঠনমূলক কাজের অভিজ্ঞতা লাভের পর সত্যাগ্রহ করিবার যে অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন, দেশীয় রাজ্যের নাগরিকগণ এখনও তাহা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখনও সত্যাগ্রহ করিবার উপযুক্ত হন নাই। কিন্তু তার চেয়েও তাঁহার বড় যুক্তি এই যে, সত্যাগ্রহ মন্ত্রের ঋষি মহাত্মাজি। এই মহাত্মাজি অলৌকিক শক্তিশালী ব্যক্তি। তাঁহার কথা ও কাজ সাধারণ যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচার না করিয়া নির্ব্বিবাদে ও অন্ধভাবে তাঁহার অনুসরণ করাই শ্রেয়।

বোঝা যাইতেছে, ভারতের রাজনীতিতে আজও গুরুবাদই প্রবল।

হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ ও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট—

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে মাদ্রাজে সমস্ত সভাসমিতি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে মহাত্মার সহানুভূতি নাই, সুতরাং মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীরও না থাকিবারই কথা। কিন্তু হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহের দায়িত্ব কংগ্রেসের নয়। উহা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলিতেছে না এবং হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের কোন আত্মীয়তাও নাই। এমন অবস্থায় মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনাহূত ভাবে হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিতে যাওয়া শুধু অনাবশ্যক নয়, বিসদৃশ।

বর্ম্মা বিচ্ছেদ—

শাসনতন্ত্রের দিক দিয়া বর্ম্মা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও উহা এতদিন ভারতীয় কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবারে বোম্বাই বৈঠকে উহা ভারতীয় কংগ্রেস হইতেও বিচ্ছিন্ন করা হইল। ফলে উভয় দেশের মধ্যে যে শেষ রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিল তাহাও এতদিনে ছিন্ন হইল। বলা বাহুল্য, ইহাতে উভয় দেশেরই ক্ষতির আশঙ্কা আছে, বিশেষ করিয়া বর্ম্মার। বর্ম্মায় ভারতীয় বিদ্বেষও বাড়িতে পারে।

জনসভায় পুলিশ—

জনসভায় পুলিশের উপস্থিতি—এ কেহই পছন্দ করেন না। তাহাদের উপস্থিতিতে বাধা সৃষ্টির জন্য পুলিশের নিকট হইতে তাহাদের বসিবার ভাল জায়গা, চেয়ার টেবিল ইত্যাদির জন্য টিকিটের মূল্য হিসাবে বেশী টাকা লওয়া হয়। স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন পুলিশের প্রতি এই অবিচারে ব্যথিত হইয়া তাহাদের জন্য জনসভায় বিনামূল্যে প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমলাতন্ত্রেও পুলিশের যে অধিকার ছিল না, স্বায়ত্তশাসনে তাহাও পুলিশের আয়ত্তে আসিল। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে বাঙ্গলা দেশ যে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আর ভুল নাই।

আইনের অপপ্রয়োগ—

বর্দ্ধমানে ক্যানেল কর পাঁচ টাকা হইতে দেড় টাকায় কমাইবার জন্য যাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের একজনকে জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া ট্যাক্স না দিতে প্ররোচিত করার অপরাধে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধন আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হাইকোর্টে আপীল করা হইলে মিঃ জাষ্টিস হেণ্ডার্সন বলেন, আইনের এমন অপপ্রয়োগ তিনি আর দেখেন নাই। জনসাধারণকে সরকারী ট্যাক্স দিতে বাধ্য করিবার জন্য ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধন আইনের ৭ ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছে! বলা বাহুল্য, আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। কাহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে উক্ত আইনটিকে এইভাবে প্রয়োগ করিবার কৌশল প্রথম আবিষ্কৃত হয় সে বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

মুসলমান রাজত্বের স্বপ্ন—

কলিকাতা মিউনিসিপাল বিলের আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোয়ালিশন দলের নেতা খাঁ

বাহাদুর আবদুল করিম উৎসাহ ও উত্তেজনার মুখে তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্যের কথাটা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"আমাদের লক্ষ্য ভারতের মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। ১৭৬৫ সালে ইংরেজেরা দেওয়ানী লাভ করিয়া মুসলমানদের নিকট হইতে বাঙ্গলার শাসনভার কাড়িয়া লয়। তখন পর্য্যন্তও আমাদেরই আধিপত্য ছিল। এখন তাঁহারা যখন সেই অধিকার দেশের জনসাধারণের হাতে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া ফেরত দিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন পূর্ব্বের অবস্থা (status quo ante) ফিরিয়া আসাই স্বাভাবিক"।

এখানে মুসলমানের আধিপত্য মানে মুসলীম লীগের আধিপত্য। এমনই স্বপ্ন দেখিয়া একদা মীরজাফর ইংরেজের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। পৌনে দুই শত বৎসর পরে আবার তাহারই পুনরাবৃত্তি চলিয়াছে। কিন্তু এ স্বপ্ন খাঁ বাহাদুর অথবা মুসলমান মন্ত্রীরা দেখিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু মন্ত্রীরাও কি এই স্বপ্নে বিভোর থাকিবেন?

শ্রীযুক্ত কামাথের পদত্যাগ—

শ্রীযুক্ত হরিবিষ্ণু কামাথ আই-সি-এস ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া বল্লভ পন্থীগণের বিরোধিতা করায় তাঁর সে "চাকুরী" রহিল না। তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে তাঁহার যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল তাহাতেও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, বল্লভ-পন্থীগণের বিরোধিতা করিয়া কংগ্রেসের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা চলিবে না। শ্রীযুক্ত কামাথ তাঁহার পত্রের একস্থানে লিখিয়াছিলেন, "এক জেল হইতে অন্য জেলে যাওয়ার জন্য আমি আই-সি-এস ছাড়ি নাই।" অনেকদুঃখেই তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। কংগ্রেসের এই স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিবার জন্য বামপন্থীদের লইয়া নূতন দল গঠন করা হইতেছে।

ডিগবয় ধর্ম্মঘট—

ডিগবয় ধর্ম্মঘটের এখনও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ধর্ম্মঘটের মীমাংসার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং মৌলানা আবুল কলাম আজাদও এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আসাম অয়েল কোম্পানী শ্রমিকদের একটা দাবীতেও সম্মত হন নাই। এমন কি, এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সালিশী বোর্ড নিয়োগের যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল তাহাও তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্যর্থকাম হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন।

অবশেষে তিনি এই ব্যাপারটি ওয়ার্কিং কমিটির গোচরে আনেন। ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোম্পানী যদি এখনও মনোভাব পরিবর্ত্তন না করেন তাহা হইলে আসাম গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে শ্রমিক বিরোধ বিল বিধিবদ্ধ করিয়া আইনের বলে কোম্পানীকে সালিশী বোর্ড মানিতে বাধ্য করিবেন।

আমরা আশা করিয়াছিলাম, ওয়ার্কিং কমিটির এই দৃঢ় মনোভাব কোম্পানীর মনোভাব পরিবর্ত্তনে সহায়তা করিবে। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিয়াছে, নিরীহ ও নিরুপদ্রব ধর্ম্মঘটকারীদের উপর গুণ্ডার তাণ্ডব চলিতেছে। কয়েকজন শ্রমিক গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হইয়াছে এবং তাহাদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীও লওয়া হইয়াছে। এই আবহাওয়া নিশ্চয়ই আপোষের অনুকূল নয়। শ্রমিক ইউনিয়ন অবিলম্বে এ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য ও অপরাধীগণকে শাস্তি দিবার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমরা আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট তৎপরতা আশা করি।

মাধ্যমিক শিক্ষার দুরবস্থা—

বাঙ্গলার মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯৩২-৩৭ সালের যে পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। ১৯৩৬ সালে একা বাঙ্গলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১৮৮, অর্থাৎ মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম এই পাঁচটি প্রদেশের মোট বিদ্যালয় সংখ্যার (১০৯৯) চেয়েও বেশী। কিন্তু সংখ্যায় বেশী হইলে কি হয়, অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে মাত্র একচল্লিশটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সরকারেরও চারিটি মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে এবং

৫৪০টি সরকারী সাহায্য পায়। অবশিষ্ট ৫৯৫টি কোন সাহায্যই পায় না। ছাত্রদত্ত বেতন ছাড়া ইহাদের দ্বিতীয় সম্বল নাই।

বাঙ্গলা দেশের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শোচনীয় অবস্থার সহিত সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন অত্যন্ত অল্প। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রেরা কেহই শিক্ষকতার দিকে ঝোঁকেন না। কোথাও কোন চাকুরী না পাইয়াই লোকে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এই প্রকার মনোভাবসম্পন্ন শিক্ষকদের নিকট হইতে ছাত্রেরা বেশী কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে না। অথচ আমাদের শিক্ষালয়ে ইঁহাদেরই সংখ্যা অধিক। কিন্তু যাঁহারা বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার ঔৎকর্ষ রক্ষার পক্ষপাতী, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নই। বাঙ্গলা দেশে শিক্ষিতের যে হার তাহাতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। সরকারের উচিত সেগুলির অর্থসাহায্যের দ্বারা উন্নতি বিধান করা। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন তো হইল না, এখন মনোযোগের অভাবে যদি উচ্চ বিদ্যালয়গুলির অর্দ্ধেকও উঠিয়া যায় তাহা হইলে শিক্ষার দুরবস্থার আর বাকি থাকিবে না।

বামপন্থী ঐক্য—

বোম্বায়ে বিভিন্ন বামপন্থী দলকে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম, ইহার ফলে আর কিছু যদি নাও হয় বল্লভপন্থীদলের স্বেচ্ছাচারিতা অনেকখানি সংযত হইবে। কিন্তু সে আশাও বুঝি ব্যর্থ হইয়া যায়। বোম্বাই বৈঠকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্ত মাসানীর দল সরিয়া পড়িলেন। এখন কংগ্রেসের শাস্তির ভয়ে আরও অনেকেই বুঝি-বা সেই পন্থাই অনুসরণ করেন।

কংগ্রেসের কয়েকটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য বামপন্থী ঐক্য সম্মেলনে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র তদনুসারে ৯ই জুলাই তারিখ নিখিল ভারত প্রতিবাদ দিবস বলিয়া ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া তার প্রেরণ করেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আচার্য্য কৃপালনী সেই সময় এই ফতোয়া জারী করেন যে, কোন কংগ্রেস অথবা কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি কংগ্রেস বিরোধিতাসূচক এই কার্য্যে যোগদান করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র জানাইয়া দেন যে, কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের অথবা মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে। তাঁহারা কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে যাইতেছেন না, তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন মাত্র। নিখিল ভারত প্রতিবাদ দিবস প্রত্যাহার করিয়া লইতে তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশনারায়ণ নীরব। সম্ভবত তিনি এই গোলযোগে নামেন নাই; শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় নিজে তো ইহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেনই, পণ্ডিত জওহরলালকেও সমাজতন্ত্রী দলকে দূরে রাখিবার অনুরোধ করিয়াছেন। একমাত্র বোম্বায়ের শ্রীযুক্ত নরীম্যান ছাড়া বামপন্থী "ঐক্য" দলের উল্লেখযোগ্য আর কাহাকেও সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা যাইতেছে না। পণ্ডিত জওহরলাল অন্য অনেক ব্যাপারে বামপন্থীদলের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেও এ ব্যাপারে সুভাষবাবুর সম্পূর্ণ বিরোধী।

ডাক্তার সাহার প্রবন্ধ—

গত আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ডি-এস-সি, এফ-আর-এস মহাশয়ের প্রবন্ধের ৪২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ২১ লাইনে 'ইরাকি' (Babylonian) স্থলে 'ইংরাজি' ছাপা হইয়াছে। অধ্যাপক সাহাকে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর সভা উপলক্ষে প্রায় এক মাস বোম্বায়ে বাস করিতে হইয়াছিল—সেজন্য তাঁহার প্রবন্ধের শেষাংশ শ্রাবণে প্রকাশিত হইল না।

ঢাকা মেডিকাল স্কুলের পুরাতন কাসুন্দী—

ঢাকা মেডিকাল স্কুলের ছাত্রীগণ স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ মৈজুদ্দীনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছিলেন মিঃ টাইসন অনেক দিন পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে তাঁহার তদন্ত-ফল গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছেন। মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ জানাইয়াছেন, "জনস্বার্থের কল্যাণে" উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হইবে না; ডাঃ মৈজুদ্দীনকেও কোন প্রকার শাস্তি দেওয়াও হইবে না। ইহার পর মন্ত্রীমণ্ডলের উপর সাম্প্রদায়িকতা-আরোপ করা বৃথা।
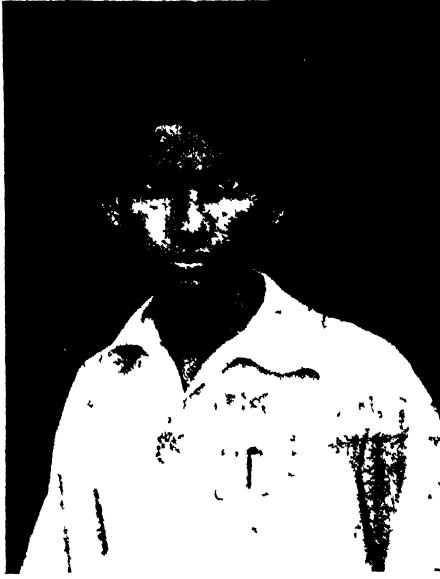
শ্রীশান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

গত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৬০৫ নম্বর পাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন

শ্রীএন জি-দত্ত

যুক্তপ্রদেশপ্রবাসী নব্বই হাজার বাঙ্গালীর পক্ষে আন্দোলন পরিচালন জন্য এলাহাবাদে বাঙ্গালী সমিতি করিয়াছেন

কুমারী বাণী ঘোষ

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র দশ বৎসর সাত মাস বয়সে প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছেন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে

কাশীহিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছেন

শ্রীসুশীলকুমার রায়

ইনি আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক ; সম্প্রতি অজৈব রসায়নে ডি-এস-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। বয়স ৩২ বৎসর।

রামবল্লভ নন্দন

হুগলী, বাঁশবেড়িয়ার প্রবীণ কর্ম্মী—বহু অর্থ দান করিতেন। সম্প্রতি ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

৺ধরণীকুমার বসু

(১)

যে-তোমার কাছে বন্ধু পেয়েছি শুধুই সমাদর,
বিশ্বাস-নিবিড় প্রীতি আনন্দের দাক্ষিণ্য-সৌরভে ;—
যে-তুমি বিলাতে নিত্য আতিথেয় আলো শুভংকর
জীবনের ছায়াব্যথা প্রাণতলে লুকায়ে নীরবে ;—

যে-তোমার শুভ্র হাসি নূপুরের ম'ত ঝংকারিয়া
অশ্রু-রাগিণীর সুরে দিত তাল—কান্ত, কমনীয় ;—
যে-তুমি অপরিচিতে আত্মীয়তা-তিলকে বরিয়া
অন্তরের অন্তরঙ্গ করি' নিতে ওগো সর্বাত্মীয় !—

যে-তোমার নির্বিচল শ্রদ্ধা চিরউচ্ছল, উদার
অক্লান্ত নির্ঝরসম উর্বরিয়া স্বপ্নহীন মন
বিছাত শ্যামল শান্তি বসন্তের ছন্দে অনিবার
অচিরতা-মর্মে যাহে উঠিত বাজিয়া চিরন্তন ;—

সে-তোমার বিসর্জন-ব্যথা থাক্ আমারি আপন :
তোমার সুন্দর স্মৃতি জনে জনে করুক অর্চন।

জুলাই, ১৯৩৯

(২)

প্রসিদ্ধি যাহারে বলে চাহো নি তো কর্মে বন্ধু তুমি।
কীর্তির কনকমাল্য, করতালি, যশোজয়ধ্বনি,
বিলাসরঙিণ রাগ প্রাণে তব ওঠে নি কুসুমি'।
ধনজন মাঝে ছিলে আপনারে একান্তে গোপনি'।

যারা তব শুভনীড়ে পেয়েছিল আত্মীয়-আশ্রয়
তাদের আপন করি' রেখেছিলে স্নেহপক্ষপুটে,
যেথা তোমারেই সখা কেন্দ্র করি' প্রীতির প্রণয়
উঠিত গড়িয়া গানে—সেথা সবে ফুল হ'য়ে ফুটে

শোষিত বসন্তব্রতী ! তব আতিথ্যের কোজাগরে।
নগণ্যেও দিতে মান জননীর ম'ত আলোহেসে :
শ্রদ্ধার মন্দিরে তব অখ্যাতেরো মাঝে যে সুন্দরে
দেখিতে হে গুণগ্রাহী ! গুণী তুমি ছিলে ছদ্মবেশে।

মুখরতা-রোলে শুনি তোমার বিনয়মন্ত্র বাজে।
খ্যাতি নহে—চরিত্রের মর্মবাণী তব রূপে সাজে।

স্নেহকৃতজ্ঞ—দিলীপ

* সিলেটে মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে—৫,৭,৩৯

ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ঃ—২৭৭ ও ২২৫

ইংলণ্ড ঃ—৪০৪ (৫ উইকেট ডিক্লিয়ার্ড) ও ১০০ (২ উইকেট)

ইংলণ্ড ৮ উইকেটে বিজয়ী।

দশ হাজার দর্শকের সামনে লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড আর

আর গ্রান্ট (ক্যাপটেন—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ সুরু হ'ল। আকাশে বেশ মেঘ র'য়েচে ; জল যে কোন সময় হ'তে পারে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জিতে ব্যাট ক'রতে নাবলো। ২৯ রানের মাথায় প্রথম উইকেট গেল, ষ্টোলমেয়ার ও হেডলে খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলে লাঞ্চের সময় রান তুললেন ১ উইকেটে ৯৫। মেয়ার ৫৯ ক'রে আউট হ'লেন, হেডলে তখনো খেলচেন। চায়ের সময় রান উঠলো ৪ উইকেটে ২২৬। দর্শক সংখ্যা বেড়ে ২০ হাজার হ'ল। আকাশও বেশ পরিষ্কার। এবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ভাঙ্গন সুরু হয়ে সব উইকেট গেল ২৭৭ রানে। হেডলে নিজস্ব ১০৬ রান ক'রে উডের বলে কপসনের হাতে ধরা দিলেন। কপসন ৮৫ রানে পাঁচটা উইকেট পেয়েচেন। ইংলণ্ড ৫ উইকেটে ৪০৪ ক'রে প্রথম ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড ক'রলে। হাটন মাত্র চার রানের জন্য ডবল সেঞ্চুরী করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রতে পারলেন না। কম্পটন ক'রলেন ১২০। ক্যামেরন তিনটে উইকেট পেলেন ৬৬ রানে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ২২৫ রানে শেষ হ'ল। হেডলে এবারেও সেঞ্চুরী ক'রলেন, ২৩০ মিনিট

জর্জ্জ হেডলে

খেলে। লর্ডস মাঠে টেষ্ট খেলায় দু' ইনিংসে সেঞ্চুরী ইতিপূর্ব্বে কোন ব্যাটস্‌ম্যান ক'রতে পারেন নি। কপসন চার উইকেট পেয়েচেন ৬৭ রানে। ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় ১০০ রান তুলতে মাত্র দু' উইকেট পড়ে ; হাটন বিশেষ সুবিধা ক'রতে পারেন নি।

নদীর বাঁক　　শিল্পী—সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, মাদ্রাজ আর্ট স্কুল

চাঁদিনী রাত্রি　　শিল্পী—কে সি এস পানিক্কার মাদ্রাজ

খুদে পণ্ডিত

শিল্পী—নরেন্দ্র বসু, বেলিয়াঘাটা

দুষ্ট বুদ্ধি

শিল্পী—সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা

ষ্টোলমেয়ার

সি বি ক্লার্ক

আগামী অলিম্পিক ঃ
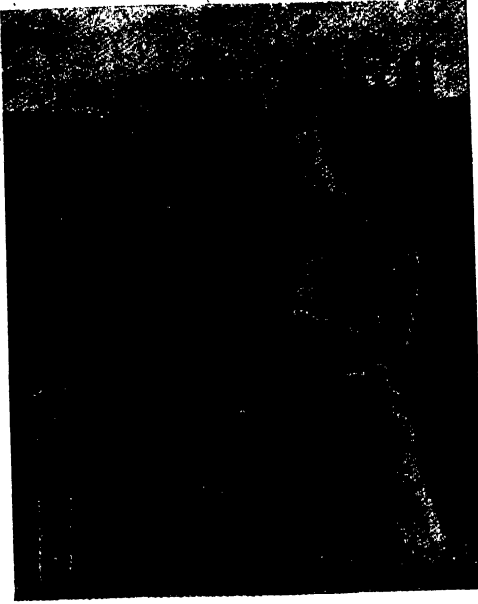
১৯৪০ সালে হেলসিনকিতে যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে তাতে ভারতবর্ষ যোগদান করবে কি না এ নিয়ে মতভেদ দেখা গেছে। ইণ্টারন্যাসনাল অলিম্পিক কমিটির সদস্য মিঃ জি ডি সোন্ধি কয়েকটী প্রবন্ধে ভারতবর্ষের এ্যাথেলেটদের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন বর্ত্তমান অবস্থায় অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের যোগদান করার কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। কারণ অন্যান্য দেশের এ্যাথেলেটস ও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে এ্যাথেলেটস কর্ত্তৃক যে সকল রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে তার তুলনায় ভারতবর্ষের রেকর্ড মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর মতে অলিম্পিক ষ্ট্যাণ্ডার্ডের তুলনায় ভারতবর্ষ এত পিছনে আছে যে বিশেষ যোগ্যতা অর্জ্জন না করে এবং উপযুক্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ডে উন্নত না হয়ে যোগদান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মিঃ জানকী দাসেরও মতে কোনরূপ নিম্ন শ্রেণীর সাফল্য লাভ করাও যখন ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব নয় তখন অর্থব্যয় করে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের কোন মূল্য থাকতে পারে না। তাঁর মতে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহে বিশিষ্ট 'কোচে'র তত্ত্বাবধানে ভারতীয় এ্যাথেলেটদের শিক্ষাদান অবশ্য প্রয়োজন। অপর দিকে পাতিয়ালার মহারাজা অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের যোগদান করার সপক্ষে মত দিয়াছেন। (১) অলিম্পিক শপথ গ্রহণ
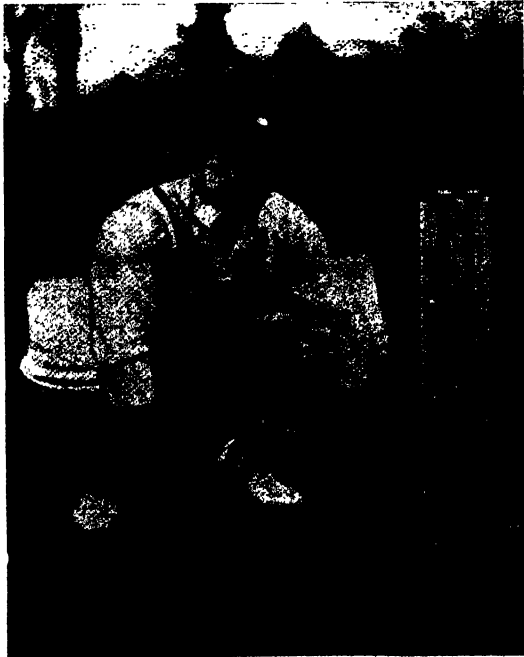
আর্থার উড্ (উইকেট রক্ষক—ইংলণ্ড)

পদ্ধতি (২) এ্যাথেলেটদের উৎসাহ ও (৩) বিশেষ অভিজ্ঞতার দিক থেকে তিনি ভারতবর্ষের যোগদান প্রয়োজন মনে করেন।

মিঃ দাস উল্লিখিত তিনটি কারণের একটিকেও উপযুক্ত বলে মনে করেন নি। তিনি লিখেছেন মাত্র কয়েকজন এ্যাথেলেট ও ম্যানেজারকে উৎসাহ দেবার জন্য অর্থ ব্যয় না করে উপযুক্ত কোচের তত্ত্বাবধানে এ্যাথেলেটদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাই উপযুক্ত উৎসাহ দেওয়া। ইহা ছাড়া অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় এ্যাথেলেটদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড এতই নিম্নশ্রেণীর যে তাহারা অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিশেষ অভিজ্ঞতা (Big Experience) অনুধাবনের উপযুক্ত নয়।

নিম্নলিখিত তালিকাটী আন্তর্জ্জাতিক কার্য্যকরী সমিতির জনৈক সভ্য প্রকাশিত করেন, এ থেকে বুঝা যায় ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কত নিম্নস্তরে।

বিষয়	আন্তর্জ্জাতিক রেকর্ড	ভারতীয় রেকর্ড
হাই জাম্প	৬ ফিট্ ১-১।৪ ইঞ্চি	৫ ফিট্ ৪-৩।৪ ইঞ্চি
ব্রড্ জাম্প	২৩ ফিট্ ৭ ইঞ্চি	২২ ফিট্ ৬-১।২ ইঞ্চি
পোল ভল্ট	১২ ফিট্ ৯-½ ইঞ্চি	১১ ফিট্ ৩-৩।৮ ইঞ্চি
হপ্ ষ্টেপ্ ও জাম্প	৪৫ ফিট্ ১০ ইঞ্চি	৪৪ ফিট্ ৩-১।২ ইঞ্চি
ডিস্‌কাস্	১৪৭ ফিট্ ৬ ইঞ্চি	১১৯ ফিট্ ৬-১।৮ ইঞ্চি
জেভ্‌লিন্	২১৩ ফিট্	১৬৭ ফিট্ ৬ ইঞ্চি
হ্যামার	১৬০ ফিট্	১২৪ ফিট্ ৭ ইঞ্চি

সাউথ ক্লাবের প্রচেষ্টা ঃ

প্রতিবারের ন্যায় এবারও সাউথ ক্লাব বিখ্যাত খেলোয়াড় আনাবার ব্যবস্থা ক'রচেন। ভন ক্রাম, পুনসেক ও মিটিক যে আসবেন তা' সুনিশ্চিত। খোসিনকিরও আসবার সম্ভাবনা আছে; তিনি যদি না আসতে পারেন তাহ'লে
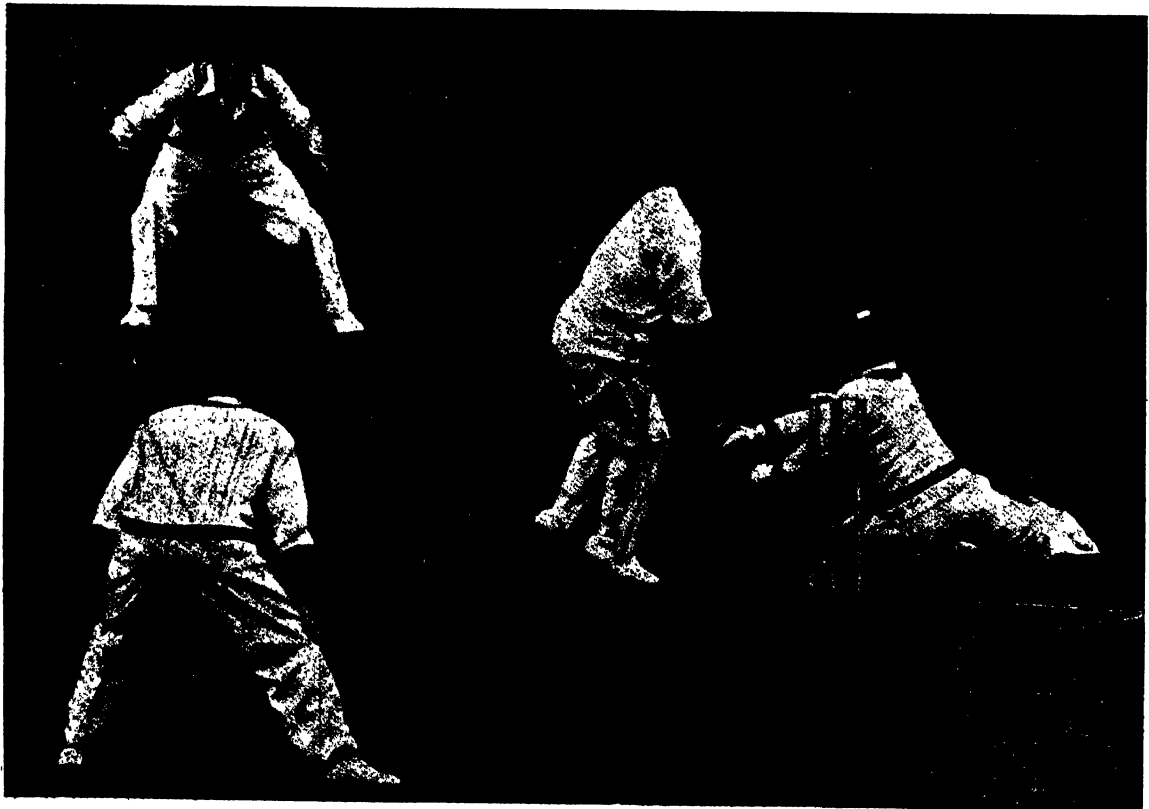
ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের প্রথম টেষ্ট খেলায় জে হেডলে (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) বোলার রাইটের একটা বল বাউণ্ডারীতে পিটে উইকেটের সামনে পড়ে গেছেন

তাঁর স্থলে অন্য একজন নামকরা খেলোয়াড় আসবেন। এঁরা সবাই আগামী শীতকালে সাউথ ক্লাব পরিচালিত ইষ্ট

মিডলসেক্স ও ইয়র্কসায়ারের খেলায় এ মিচেল ভেরিটির বলে ই কিলিককে (মিডলসেক্স) স্লিপে সুন্দর ভাবে লুফছেন। খেলায় ইয়র্কসায়ার এক ইনিংস ও ২৪৬ রানে বিজয়ী হয়। ইয়র্কসায়ারের ইহা উপর্য্যুপরি পঞ্চমবার ইনিংস বিজয়

ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়ানসিপে যোগদান ক'রবেন। ভন ক্রাম এরপর পেশাদার হ'বার মনস্থ ক'রেচেন। অতএব ভারতবর্ষের এই অভিযানই সখের খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর শেষ অভিযান।

সাটক্লিফের সাফল্য ঃ

ইয়র্কসায়ার ও ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড় হারবার্ট সাটক্লিফ এ বৎসর পর পর চারটি খেলায় সেঞ্চুরী করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, চতুর্থ খেলায় ১০৭ রান হলে তাঁর বিশ বৎসর ক্রিকেট খেলার জীবনে ৫০,০০০ রান পূর্ণ হয়। লর্ডস মাঠে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ইয়র্কসায়রের হ'য়ে প্রথম ইনিংসে তাঁর ১৭৫ রান সত্যসত্যই প্রমাণ ক'রল যে তিনি এখনও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড় নামের যোগ্য। বর্ত্তমানে সাটক্লিফের বয়স ৪৪ বৎসর। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার রান সংখ্যা এবং এম সি সির হ'য়ে তিনি অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা ও জামাইকার বিরুদ্ধে প্রত্যেক ইনিংসে যে রান সংখ্যা তুলেছিলেন তাহা ৫০,০০০ রানেরই অন্তর্গত। উক্ত রান সংখ্যা তুলতে জ্যাক হবসের ২৯ বৎসর, প্যাটসি হেনড্রেন ও মিডের ৩১ বৎসর এবং বব উলির ৩২ বৎসর লেগেছিল।

সাটক্লিফ, হবস্ হেনড্রেন, মিড, উলি এবং ডবলউ জে গ্রেস এই কয়জন ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রথম শ্রেণীর খেলাতে এ পর্য্যন্ত ৫০,০০০ রান তুলতে সক্ষম হ'য়েছেন। লিসেষ্টারের বিরুদ্ধে ইয়র্কসায়ারের হ'য়ে তিনি সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা খেলে ২৩৪ নট্ আউট থাকেন। প্রখর রৌদ্রে দর্শকরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল কিন্তু তিনি স্বাচ্ছন্দের সহিত দর্শনীয় ক্রীড়া-চাতুর্য্যে উইকেটের চারিদিকে বল চালনা করে দর্শকদের আনন্দ জুগিয়েছিলেন। সাটক্লিফের যে সকল রেকর্ড হ'য়েছে তার মধ্যে (১) এ বৎসর পর পর চারটি খেলায় সেঞ্চুরী (২) ১৯৩১ সালে পর পর চারটি সেঞ্চুরী এবং সেই বৎসরই আরও তিনটি খেলায় উপর্য্যুপরি শতরান করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিলেন।

কুড়িবৎসরে সাটক্লিফের রান সংখ্যার তালিকা :—

ইনিংস্	নট্ আউট	সর্ব্বোৎকৃষ্ট	মোট রান	এভারেজ
১,০৭৮	১২৩ বার	৩১৩	৫০,০৬৮	৫২·৪২

বিলেতের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই পর পর তিনটি টেষ্ট ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরী করেছেন। (সিডনিও মেলবোর্ণ, ১৯২৪-২৫ সালে ৫৯, ১১৫, ১৭৬ ও ১২৭।)

সাটক্লিফ

ও'রেলী ঃ

১৯৩১ সাল থেকে মোট ৬বার এবং এ বৎসর নিয়ে পর পর দু'বার ডবলউ জে. ও'রেলী নিউ সাউথ ওয়েলসের বোলিংএ প্রথম স্থান অধিকার করার

সম্মান লাভ ক'রেছেন। বোলিংএ তাঁর ৪৬ উইকেটে ৯'৮৯ এভারেজ। তিনি সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন প্যাডিংটনের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ১৪ উইকেট নিয়ে। ঐ খেলার প্রথম ইনিংসেই মাত্র ১৫ রানে ৫টা উইকেট পেয়েছিলেন। ও'রেলী সম্প্রতি সিডনির গ্রামার স্কুলের শিক্ষকতার পদত্যাগ ক'রে টেষ্ট খেলোয়াড় ম্যাক্কাবের সিডনির স্পোর্টসের দোকানে যোগদান করবেন স্থির ক'রেছেন। ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ ও'রেলীর এই প্রথম। পূর্ব্বে তিনি শিক্ষাবিভাগে শিক্ষকতা করতেন, ১৯৩৬ সালে সাউথ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে উক্ত পদত্যাগ করে সিডনির গ্রামার স্কুলে যোগদান করেন।
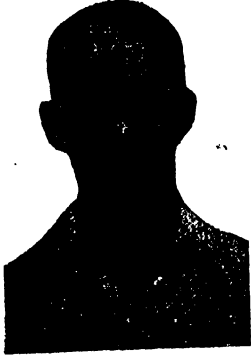
ও'রেলী

অমরনাথ ও অমর সিংয়ের সাফল্য ঃ

ল্যাঙ্কসায়ার ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতায় বার্ণলে এক রানে লাওয়ার হাউসকে পরাজিত করে। অমরনাথ বার্ণলে দলের হ'য়ে ১০৬ রান তুলে বাটিংএ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লাওয়ার হাউসের পক্ষে অমরসিং ৫৩ রানে ৬টা উইকেট পেয়েছেন।

নিকলস্ (এসেক্স) সাসেক্সের বিরুদ্ধে ১৪৬ রান পূর্ণ করছেন। এ বৎসর এই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী

ফ্রেঞ্চ লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—ম্যাকনীল (আমেরিকা) ৭-৫, ৬-০, ৬-৩ গেমে আমেরিকার এক নম্বর খেলোয়াড় রিগসকে পরাজিত করে বিশেষ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। ম্যাকনীলের নিখুঁত সার্ভিস ও ফোরহ্যাণ্ড ড্রাইভ রিগসকে বিপর্য্যস্ত করেছে।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউণ্ডে ইংলণ্ডের খেলোয়াড় সি হেয়ারের একটা বল আটকাতে গিয়ে ফ্রান্সের বি ডেসরেমাঁ ভূতলশায়ী হ'য়েছেন

মহিলাদের সিঙ্গলসে—ম্যাথু (ফ্রান্স) ৬-৩, ৮-৬ গেমে পোল্যাণ্ডের পাম্না জেডরিজোসকাকে পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডবলসে—ম্যাকনীল ও হ্যারিস ৪-৬, ৬-৪, ৬-৩, ২-৬, ১০-৮ গেমে বরোটা ও ব্রাগনন্‌কে হারিয়েছেন।

মিক্সড ডবলসে—মিসেস

সন্ধ্যা সৌন্দর্য্য

আনন্দের আতিশয্যে

শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটী

পেশোয়ারে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের অভ্যর্থনা

মহেশে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা

ছবি—পান্না সেন, কলিকাতা

ফ্যাবিয়ান ও কুক ৪-৬, ৬-১, ৭-৫ গেমে ম্যাথু ও কুকুলজেভিককে পরাজিত করেছেন।

কুইনস্ ক্লাব টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—গাউস মহম্মদ ৬-১, ৬-৩ গেমে ভনক্রামের নিকট পরাজিত হ'য়েছেন। গাউস কোয়াটার-

কুইন্‌স ক্লাব টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলার ফাইনালে ক্রীড়ারত গাউস মহম্মদ—ভনক্রামের নিকট পরাজিত হয়েছেন

ফাইনালে বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় কুকুলজেভিককে ৬-২, ৬-২ গেমে পরাজিত করেন। কলিন্সকে সেমি-ফাইনালে গাউস ৬-৪, ৬-২ গেমে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠেন। কলিন্স উইম্বলডন খেলায় ১৯৩২ সালে কোসেকে এবং গ্রিনহগন্সএ ১৯২৭ সালে অষ্টিনকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—পান্না জেডরিজোসকা (পোল্যাণ্ড) ৬-১, ৬-৪ গেমে ফ্রে স্পার্লিকে (ডেনমার্ক) হারিয়েছেন।

পুরুষদের ডবলসে—জে এস ওলিফ (গ্রেটবৃটেন) ও ভনক্রাম কলিন্স ও টিনলোরকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে—ডি বি এণ্ড্রুস (আমেরিকা) ও এস হেনরোটিন (ফ্রান্স) ৬-২, ৬-২ গেমে পান্না ও এ এম ইয়র্ককে (গ্রেটবৃটেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে—ই টি কুক ও মিসেস ফ্যাবিয়ান ৯-৭, ৬-২ গেমে রবার্ট রিগস ও পান্না জেডরিজোসাকাকে পরাজিত করেছেন।

উইম্বলডন টেনিস্ ঃ

টেনিস জগতে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব আর একব্যার প্রতিপন্ন হ'ল। আমেরিকার ১নং খেলোয়াড় রিগস পুরুষদের সিঙ্গলস, রিগস ও কুক পুরুষদের ডবলস এবং কুমারী এলিস মার্বেল মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী হ'য়েছেন। ফাইনালে রিগস আমেরিকার খেলোয়াড় কুককে ২-৬, ৮-৬, ৩-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে হারান। রিগস ও কুক ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩, ৯-৭ গেমে হেয়ার ও ওয়াইল্ডকে (বৃটেন) পরাজিত করেছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী এলিস মার্বেল ৬-২, ৬-০ গেমে ষ্টামারকে পরাজিত করেছেন। ষ্টামার এলিসের কাছে মোটেই দাঁড়াতে পারেন নি। রিগস কোয়াটার ফাইনালে ও সেমি-ফাইনালে যথাক্রমে গাউস মহম্মদ ও পুনসেককে এবং কুক, অষ্টিন ও হেঙ্কেলকে পরাজিত করেন। ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস এবার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচেন। একাধিক খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে হারিয়ে তিনি কোয়াটার ফাইনালে উঠেছিলেন। হাঙ্গেরীয়ান খেলোয়াড় সিগেটির সঙ্গে ২ ঘণ্টা ১৫ মিঃ খেলে গাউস বিজয়ী হন। গাউসের এ বৎসরের খেলায়

মার্বেল
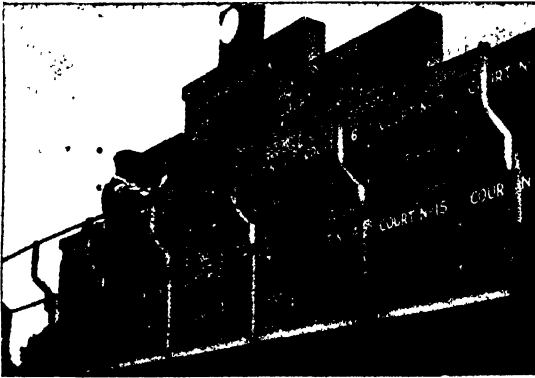
উইলিয়াম টার্ণে উইম্বলডন টেনিস খেলার ফলাফলের বোর্ড প্রস্তুত করছেন। মেরামত খরচা ও বোর্ড আঁকার জন্য বাৎসরিক ৪৫০০ পাউণ্ড ব্যয় হয়

যন্ত্র সাহায্যে টেনিস বল পরীক্ষা করা হ'চ্ছে। ওজন ও আকারের তারতম্য থাকলে বল বাতিল করা হয়। উইলম্বডন প্রতিযোগিতায় প্রতি বৎসর প্রায় ৮০০ ডজন বল লাগে

বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। এদিকে আমেরিকার ৭নং খেলোয়াড় কুক, অষ্টিন ও হেঙ্কেলকে হারিয়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রেছিলেন। গতবারের ফাইনালিষ্ট ও বৃটেনের ১নং নম্বর খেলোয়াড় অষ্টিন কুকের কাছে দাঁড়াতেই পারেন নি। তিন সেটে অষ্টিন মাত্র চারটি গেম পেয়েছিলেন। ফ্রেঞ্চ টেনিস চ্যাম্পিয়ন ডন্ ম্যাকনীল কুকুলজেভিকের কাছে হেরে গিয়ে সকলকে আশ্চর্য্য ক'রেচেন। তিনি উইম্বলডন বিজয়ী রিগসকে ফ্রেঞ্চ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপের ফাইনালে হারান। গত দু'বৎসরের উইম্বলডন বিজয়ী বাজ এবার খেলায় যোগদান করেননি; তিনি এখন পেশাদার খেলোয়াড়। গত বৎসরের মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী মুডীও এবৎসর যোগদান করেন নি। ভারতবর্ষের যে সব খেলোয়াড় প্রথম খেলাতেই হেরে যান তাঁদের ভেতর পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার তরুণ খেলোয়াড় যথাক্রমে ইফতিকার ও দিলীপ বসু প্রশংসনীয় খেলেছিলেন। ইফতিকার ষ্ট্রেট সেটে হারলেও ১৮টা গেম পেয়েছিলেন। দিলীপ বসু পাঁচ সেট খেলে হেরে যান। তাঁর খেলা দর্শনযোগ্য হ'য়েছিলো।

আম্পায়ার সীটের নিম্নভাগে ঠাণ্ডা রাখবার যন্ত্র (Refrigerator) রেখে দেওয়া হয়। বাম দিকে টেনিস বল, মধ্যভাগে খেলোয়াড়দের পানীয় ঠাণ্ডাজল এবং দক্ষিণভাগে ঠাণ্ডা রাখবার যন্ত্র দেখা যাচ্ছে

দক্ষিণ চীন বনাম বর্ম্মা ঃ

দক্ষিণ চীন বনাম বর্ম্মা দলের দ্বিতীয় ফুটবল খেলাটি উভয় পক্ষে একটি করে গোল হওয়ায় অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে। চীন খেলোয়াড়দের আদান প্রদান সুন্দর এবং বিপক্ষ দলের গোল সম্মুখে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর বর্ম্মা দল অপেক্ষা উন্নততর হলেও তারা কয়েকটি অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করায় জয়লাভে সমর্থ হয় নি। বর্ম্মা দলের গোলরক্ষক বা সিন

কয়েকটি অব্যর্থ গোল রক্ষা করে নিজ দলকে পরাজয় হ'তে রক্ষা করেন।

বিদ্রোহীতা ঃ

আই এফ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীতা করেছে, মহমেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট। তাদের শাস্তি দিয়াছে আই এফ এ সর্ব্বসম্মতিক্রমে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ পর্য্যন্ত সস্‌পেণ্ড করে। এরিয়ান ক্ষমা চেয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে। তাদের অভিযোগপত্র সকাল ৮টায় প্রেসিডেণ্ট নিকলসের নিকট পৌছায়, কিন্তু তার পূর্ব্বে অধিকাংশ সংবাদপত্রে ঐ পত্র প্রচারিত হ'য়েছে। সেই দিনই কোনরূপ প্রতিকার

প্রেসিডেণ্ট নিকলস সংবাদ পত্রে ঐ ক্লাবদের অভিযোগ পত্রের সকল বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন। ক্যালকাটা ফুটবল লীগ কমিটির বিগত সভায় (যাতে মহমেডান ক্লাবের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন) লীগ তালিকার পরিবর্ত্তন করা হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হয় যে, এই নূতন তালিকার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হবে না। অতএব খেলার তারিখ বা মাঠ পরিবর্ত্তন এক্ষণে অসম্ভব। ইহা গোলা লোকেও স্বীকার করবে যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা কারও ইচ্ছানুযায়ী বারবার পরিবর্ত্তন করলে কোন অনুষ্ঠানই চলা সম্ভব হয় না। ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় খেলোয়াড়গণ

না হলে মহমেডান ও ইষ্টবেঙ্গল তাদের সেইদিনের খেলায় যোগ দেবে না এবং ভবিষ্যতে কোন খেলায় নামবে না বলে ঐ পত্রে আই এফ একে শাসায়। খাজা নাজিমুদ্দীন সেদিন পার্ক রেষ্টুরেণ্টের সভায় বলেছেন যে একজন পাহারাওয়ালাকেও বরখাস্ত করতে হ'লে তাকে তার বিরুদ্ধের অভিযোগ জানাতে হয়। কিন্তু তিনি এটা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না যে একটা এসোসিয়েশনকে নোটীস দিয়ে অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিকার করানোও বিশেষ সময় সাপেক্ষ।

স্পোর্টিংয়ের প্রতিনিধির সেই সভাতেই ঐ তারিখ ও মাঠ সম্বন্ধে এবং কালীঘাটের প্রতিনিধির তাদের উপর্য্যুপরী খেলার বিপক্ষে প্রতিবাদ করে, যদি সম্ভবপর হতো, তার প্রতিকার করে নেওয়া উচিত ছিল। তা যখন তারা করেনি, তখন খেলার দিন বা তার পূর্ব্ব দিনে তাদের খুসি মত আই এফ একে চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেবার সাহস তাদের মনে কি করে সঞ্চার হয়, ইহাই আশ্চর্য্য। বোধ হয় আই

এফ এর পূর্ব্বের দুর্ব্বলতাই তাদের এইরূপ সাহসের কারণ।

কালীঘাটের উপর্য্যুপরি কয়েকদিন খেলার জন্য দায়ী তারাই। জনের মৃত্যুর জন্য তাদের খেলা স্থগিত রাখতে হয়। আবার ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাটের খেলার তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় তাদের অনেকগুলি খেলা বাকী পড়ে। গত বৎসরেও কালীঘাট কয়েকবার উপর্য্যুপরি খেলেছে। এ সম্বন্ধে আমরাই লিখেছিলুম, কিন্তু কালীঘাট কোন উচ্চবাচ্য করেছে বলে জানতে পারে নি। এ বৎসরে হঠাৎ তাদের বিদ্রোহীদলে যোগদানের কি গূঢ় ও গুপ্ত কারণ থাকতে পারে?

মোহনবাগান ও ক্যামেরোনিয়ান্সের খেলায় রাসেল চমৎকারভাবে একটি বল রক্ষা করছেন ছবি—আনন্দবাজার

এরিয়ান যে তাদের ভুল বুঝে সময়ে সরে পড়তে পেরেছে, তাতে তাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ।

ইষ্টবেঙ্গলের মহমেডানদের সঙ্গে যোগদানের কারণ কতকটা বোধগম্য হয়। কারণ, লীগে তাদের একমাত্র সুহৃদই যে মহমেডানস্পোর্টিং! প্রতিবারই তারা মহমেডানদের হারালেই তাদের বিখ্যাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড মুর্গেশকে হারাতে বাধ্য হয়। খেলার শেষে বিপক্ষের মাঠ থেকে পুলিস প্রহরী বেষ্টিত হয়ে তাদের জাঁক-জমকের সঙ্গে ফিরে আসতে হয় নিজের ঘরে, যেখানে তারা তাদের প্রতিবেশী শত্রু (তাদের মতে) মোহনবাগানের সভ্যদের কাছ থেকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা পেয়ে এসেছে। তারা চিরদিনই পরের মাঠে খেলতে ভালবাসে, পরের মাঠেই নাকি তাদের খেলা ভাল খোলে, কারণ মোহনবাগানরা সেখানে থাকে না। মোহনবাগান কিন্তু নিজ মাঠেই (নিয়ম মত যেগুলি তারা খেলতে পায়) খেলে, তাতে তাদের প্রতিবেশী সভ্যদের খেলা দেখতে দিতে আপত্তি নেই। শোনা যায়, অনেক ইষ্টবেঙ্গলের সভ্য শুধু মোহনবাগানের খেলা দেখবার জন্যে ইষ্টবেঙ্গলের সভ্যভুক্ত হয়েছেন, কারণ মোহনবাগানের সভ্য হওয়া এক্ষণে অসম্ভব ব্যাপার। ইষ্টবেঙ্গলের উচিত মোহনবাগানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করা। ষ্টেটসম্যান কাগজও লিখেছে, মোহনবাগানের নিজস্ব মাঠ হওয়া উচিত। আমাদেরও মত যে দু'টো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবকে এক মাঠে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। মোহনবাগানের খেলা দেখতে অত্যধিক ভিড় হয়। কিন্তু সে তুলনায় ঐ মাঠে যাতায়াতের রাস্তার ব্যবস্থা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। হয় মোহনবাগানকে অন্য কোন রাস্তাঘাটের সুবিধাজনক বিস্তৃর্ণ মাঠে স্থান দেওয়া হউক, আর না হয় ইষ্টবেঙ্গলকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হউক। আচ্ছা, মহমেডানদের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলকে স্থান দিলে তো সোনায় সোহাগা হয়!

বিদ্রোহীদের আর একটি অভিযোগ খারাপ রেফারিং—এ সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট নিকলস যা' বলেছেন তাই যথেষ্ট।

What you say regarding the supervision of League matches has been heard over a period of years and as I have pointed out before, the job of refereeing is an unenviable task. The best of referees are abused, threatened and have to be provided with Police escorts and your great interest in football in this town prompts me to ask you to propose, from your own club. members or other suitable men, who, in your opinion, would be more capable than the referees we have at present to control games.

প্রেসিডেণ্টের একটি অতি সত্য কথায় বিদ্রোহীদলের বিশেষ আপত্তির কারণ হয়েছে। এতে তাদের অন্তরের নিভৃত কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 'If, by withdrawal from your engagements in C. F. L. you wish to belittle another club's performance in winning the league, and I can see no other reason for your present attitude, I believe you will be disappointed * * *"—মোহনবাগানের লীগ পাবার জন্ত তোমাদের যে কত দরদ, তা' বেড়ার ধারের দর্শকদের মোহনবাগানের পরাজয় বা ড্র হলে আনন্দ প্রদর্শনেই মালুম হয়। ইষ্টবেঙ্গল তাবুতে ঢোকবার সময় ক্যামারোনিয়নদের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে "You must win" বলে উৎসাহিত করাও বোধ হয় মোহনবাগানের প্রতি ঐ ক্লাবের দরদেরই নিদর্শন। মার চেয়ে যে দরদী তাকে যা বলে তোমরা মোহনবাগানের তাই। মিটিংয়ে ভারতীয় ক্লাব মোহনবাগানের লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে না বললেই দেশের লোক তোমাদের ভুল বুঝবে না। যখন দেখলে যে আর মোহনবাগানের গতিরোধ করা চলে না, তখন খেলা বন্ধ করে লীগটা ভেঙ্গে দেবার ফন্দি ছাড়া আর কি বলা যায়। তাতেও না হ'লে, পরে বলা যেতেও তো পারবে যে আমরা খেলি নি তাই ওরা পেয়েছে। সব চাল যে বান-চাল হয়ে যাবে, তা তখন বোঝা যায় নি। ভেবেছিলে যে সন্তোষের মহারাজার আমলে যে রকমে কার্য্য উদ্ধার করে, আবার তাঁকেই দোষী বলে গালাগালি দিয়ে এসেছিলে সেই রকমই চলে যাবে। কিন্তু এবার শক্ত ঘানি—স্বাধীন জাতির মানুষ, ভুল বুঝিয়ে চোখ রাঙিয়ে বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে না। সাবাস মিষ্টার নিকলস—এতদিনের পরে তুমি আই এফ এর মান রাখলে। যদিও বিদ্রোহী দলদের ঘোঁটেই আই এফ এর ৩৩নং রুল, এমন কি আই এফ এর ৬৬নং রুলেরও ন্যায্যতা রক্ষা করা হয় নি। এই সব কারণেই বিদ্রোহীদের মনে বল সঞ্চার হয়েছিল যে তারা যা করাবে আই এফ এ তাই করতেই বাধ্য হবে।

কালীঘাট বনাম মহমেডান স্পোর্টিং খেলায় কালীঘাটের গোলরক্ষক একটি অব্যর্থ গোল রক্ষা করছেন ছবি—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড

বিদ্রোহী দলের সভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছে যে সন্তোষজনকরূপে আই এফ এর সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি না হ'লে নূতন ফুটবল এসোসিয়েশন গঠন এবং নূতন একটি ফুটবল লীগ খেলার বন্দোবস্ত করা হবে। বিভিন্ন প্রদর্শনী ফুটবল খেলা ও চ্যারিটি ম্যাচ খেলারও ব্যবস্থা হবে।

দোষী বলে অভিযুক্ত হ'য়ে শাস্তি পাবার পর সন্তোষজনকরূপে আপোষ-নিষ্পত্তির আশা করার অভিলাষ বাতুলতা নয় কি? সঙ্গে সঙ্গে ভয় দেখানও আছে, নূতন লীগ হবে, নানা রকম বাজী হবে···ইত্যাদি। বেশ, তবে তাই হোক্। আবার আপোষের কথা তোলো কেন? যা হয় কর—আপত্তি নেই। আই এফ একে অনুরোধ—তাঁরা ন্যায় রক্ষার্থ যে শাসন-দণ্ড উত্তোলন করেছেন তার যেন অমর্য্যাদা আর না করেন। অপাত্রে দয়া প্রদর্শনও পাপ। মাফ্ চাইলেই তা পাওয়া যায় না। কঠোর দণ্ডে ক্রমশঃ মাঠের আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে, খেলার মাঠে শান্তি আসবে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। সত্য ও ন্যায়ের বিচার করতে কারো মুখ চাইবার দরকার নেই। দৃঢ়তার সঙ্গে ন্যায় বিচার করলে তাতে মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

রেফারিং ঃ

চিরকালের মতন এবারও রেফারিং ভাল হয় নি, এ সত্য। কিন্তু রেফারিংয়ে দোষ ত্রুটি থাকলেও এবার

রেফারিদের অভ্যবারের অপেক্ষা বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। ইংরাজ রেফারিও বাদ যান নি। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাতেই বিশেষ করে রেফারির লাঞ্ছনা হয়। কর্পোরাল হ্যাণ্ডিসাইড মহমেডানদের বিরুদ্ধে কাষ্টমসের পক্ষে পেনালটি দেওয়ায় ক্লাবের মেম্বাররাও তাকে রেহাই দেয় নি। সার্জ্জেণ্টদের এসে তাকে রক্ষা করতে হয়। মহমেডানদের পক্ষের কথা, জলকাদার মাঠে একটু পা পিছলে পড়লে পেনালটি দেওয়া উচিত হয় নি। কোন কাগজে লেখা হয়েছিল, it appeared to be a foul which was not of very serious nature. It might have been unintentional. অনিচ্ছাকৃত ফাউলও যদি পেনালটি সীমানার মধ্যে হয়, তাতেও পেনালটি হয়। রেফারির মতে হ্যাণ্ডবল ইচ্ছাকৃত না হলে রেফারি তা' না ধরতে পারেন, পিছন থেকে ধাক্কা দিলেই তা' ফাউল হয়, তাতে বিপক্ষ পড়ুক আর না পড়ুক এবং সে ফাউল পেনালটি সীমানার মধ্যে হলেই তাতে পেনালটি দিতে হয়।

কেণ্ট বনাম সারের মহিলাদের ক্রিকেট খেলায় কুমারী এম হাউড (সারে) ব্যাট করছেন

রেফারি গিলসনও একটি খেলাতে লাঞ্ছিত হন। সেই জন্য এই দুই জন মিলিটারী রেফারি মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা পরিচালনা করতে অস্বীকার করে আই এফ একে পত্র দিয়েছেন। কলিকাতার ফুটবল জগতে এ ঘটনা নূতন। পূর্ব্বেও কখন কখন রেফারিরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। কিন্তু একই দলের খেলা পরিচালনা করতে হলে তাদের যে প্রাণান্ত হ'তে হবে এরূপ ভাব পূর্ব্বে ছিল না। মোহনবাগান ও মহমেডানদের চ্যারিটি খেলা পরিচালনায় রেফারি পাওয়া দুর্ঘট হয়েছিল। যদি না ভারতীয় রেফারি প্রাণের মায়া উপেক্ষা করে পরিচালনা করতে নামতো। যেরূপ বিপুল পুলিস বাহিনী মাঠের মধ্যে এবং আসে পাশে সজ্জিত রাখা হয়েছিল, তাতে খেলাধুলা যাঁরা দেখেন না তাদের অন্তরূপ ব্যাপার ঘটবার আভাস মনে এসেছিল। ইহাও বোধঃ হয় কোন দলের পক্ষে সম্মানজনকই বলে মনে হবে।

লীগ চ্যাম্পিয়ন ঃ

লীগ খেলা এখনও সমাপ্ত হয় নি। জগাখিচুড়ি হয়ে আছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে না আই এফ এ অপরাধী দলগুলির পয়েণ্ট বণ্টন সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা ক'রবেন। দু'রকম ব্যবস্থা হ'তে পারে। হয় দলগুলির সঙ্গে যাদের খেলা বাকী আছে তারা পূর্ণ পয়েণ্ট পাবে, অথবা লীগের খেলার গোড়া থেকে তাদের সঙ্গে খেলায় অন্য ক্লাবগুলির হারজিতের সব পয়েণ্ট বাদ যাবে। এখনও এরিয়ানের সঙ্গের খেলা বাকী, তা' হ'লেও মোহনবাগান লীগ বিজয়ী, কেন না রেঞ্জার্সের সঙ্গে তাদের অনেক পয়েণ্টের তফাৎ। অবশ্য এরকম বিশেষ অবস্থা না হ'য়ে যদি মহমেডান, ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট তাদের পরবর্ত্তী খেলাগুলি খেলতো তাহ'লেও মোহনবাগানেরই লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার আশাই অধিক ছিল। কারণ বাকী তিনটী খেলায় তিন পয়েণ্ট পেলেই মোহনবাগান বিজয়ী হতো, অন্য দলরা সবগুলি খেলায়

জয়ী হলেও। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের উপর বিশেষ অধিকার বিস্তার ক'রতে পারেনি। মোহন-বাগানের বিশেষ বাহাদুরি যে তারা প্রথম থেকেই শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। একদিনের জন্যও কেউ তাদের

ওভাল মাঠে গোভারের বলে গ্রেগারী এক হাতে সুন্দর ক্যাচ নিয়ে ক্রমকে আউট করেছেন

স্থানচ্যুত করতে পারে নি। তারা মাত্র ভবানীপুরের সঙ্গে খেলায় একবার পরাজিত হয়েছে, আর কেহ পরাজিত করতে পারে নি। ২১টি খেলে তারা ৩৩ পয়েন্ট পেয়েছে। তাদের শেষ খেলা আজ এরিয়ান্সের সঙ্গে হবে।

লীগে দ্বিতীয় স্থানে আছে রেঞ্জার্স। দ্বিতীয় বিভাগ থেকে স্পোর্টিং ইউনিয়ান প্রথম বিভাগে উঠবে। বহুদিন পরে তারা প্রথম বিভাগে আসবার যোগ্যতার্জ্জন করলে।

শীল্ড খেলা ঃ

আজ ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবারের বারবেলা থেকে শীল্ড খেলা আরম্ভ হবে। বিয়াল্লিশটি দল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। মাত্র তিনটি বাইরের সামরিক দল, ইষ্টইয়র্ক (গতবারের বিজয়ী), রয়েল ফুজিলিয়ার্স ও ডি সি এল আই, আঠারটি স্থানীয় ক্লাব এবং বাকীগুলি ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ক্লাব। এ বারের নূতনত্ব, নানা ছোট ছোট ক্লাব যোগদান না করে প্রতি জেলার সম্মিলিত দল যোগদান করেছে। এতে প্রথম রাউণ্ড থেকেই খেলাগুলি বেশ প্রতিযোগিতা- মূলক হবে বলে আশা হয়।

মুষ্টিযুদ্ধ ঃ

জো লুই ও গালেনটো ঃ

ইয়াঙ্কি ক্রীড়ামঞ্চে জো লুই তার প্রতিদ্বন্দ্বী টনি গালেনটোকে চতুর্থ রাউণ্ডে টেকনিক্যাল নক্ আউটে

পরাজিত করে পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গালেনটো প্রথম ও তৃতীয় রাউণ্ডে বিজয়ী হ'ন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর ঠোঁট কেটে যায় এবং নাক হ'তে অতিরিক্ত রক্ত পড়া সত্ত্বেও তিনি নির্ভীকভাবে খেলে-ছিলেন। এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখবার জন্য দর্শক সমাগম হ'য়েছিল ৩৪,৮৫২ এবং টিকেট বিক্রয়ে ৪৮, ৬০ ষ্টালিং উঠেছিল। জো লুইয়ের ওজন—১৪ ষ্টোন ৪·৭৫ পাউণ্ড এবং গালেনটোর ওজন ১৬ ষ্টোন ৯·৭৫ পাউণ্ড।

ফ্রাঙ্ক ম্যালিনো ও ইয়ং ফ্রিস্কো ঃ

ভারতীয় লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতি-যোগিতায় ফ্রাঙ্ক ম্যালিনো ও ইয়ং ফ্রিস্কোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'য়েছে। ইয়ং ফ্রিস্কো প্রাচ্যের চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা এবং ম্যালিনো ভারতের লাইট হেভিওয়েট বিজয়ী। বাঙ্গলাদেশে এই দুইজন মুষ্টিযোদ্ধার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইহাই প্রথম। সিঙ্গাপুরে ফ্রিস্কো দু'বার ম্যালিনোকে পরাজিত করেছিলেন। ফ্রিস্কোর ওজন ১১ ষ্টোন ২ পাউণ্ড এবং ম্যালিনোর ওজন ১১ ষ্টোন ১০ পাউণ্ড। ফ্রিস্কো ওজনে ম্যালিনো অপেক্ষা ৮ পাউণ্ড কম। কিন্তু তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণে বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত ক'রেছেন। খেলাটি বার রাউণ্ড পর্য্যন্ত হ'য়েছিল এবং বেশীর ভাগ সময়েই ম্যালিনো ফ্রিস্কোকে আক্রমণে ব্যস্ত রাখিলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। ফ্রিস্কোর ঘুঁসির জোর বেশ তীব্র এবং তিনি

দু'একবার 'আপার কাট' মারবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম রাউণ্ডে ম্যালিনোর লড়াই ভাল হ'য়েছিল কিন্তু শেষের দিকে ক্রিস্কোই ভাল লড়েছিলেন।

লাইট ওয়েট প্রতিযোগিতায় রবিন সরকার ও মরিস কোনরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরকার পঞ্চম রাউণ্ডে টেকনিক্যাল নক্ আউটে কোনারকে পরাস্ত করেন। প্রথম রাউণ্ডে রবিন ধীরভাবে খেলতে থাকেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে উভয়েই বেশ আক্রমণ করেন এবং মরিস বাম হাতের 'সুইং' দ্বারা সরকারের মুখে আঘাত করতে থাকেন। এই সময় রবিন 'রাইট সুইং' চালিয়েও কোনরকে আঘাতে সক্ষম হন নি। তৃতীয় রাউণ্ডে রবিনকে দুবার ভূতলশায়ী হ'তে হয়। চতুর্থ রাউণ্ডে কোনর রবিনকে দড়ির ধারে ভীষণ আঘাত করেন। পঞ্চম রাউণ্ডে কোনর ভাল লড়লেও রাউণ্ড শেষ হ'বার আগে দু'বৎসর পূর্ব্বে এপেণ্ডিসাইটিসের জন্য যে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল পেটের সেলাইগুলি খুলে যাওয়ায় তার যন্ত্রনায় পুনরায় লড়তে অসমর্থ হন। ষ্ট্রেচারে তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

পৃথিবীর ওয়ালটার ওয়েট চ্যাম্পিয়ান আর্ম্মষ্ট্রং

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "শেষের পরিচয়"—২॥০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মরুর মাঝারে বারির ধারা—১॥০
সুধীরেন্দ্র সান্যাল প্রণীত (উপন্যাস) "পথ ও পথিক"—২৲
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ অনুদিত "দিওয়ান-ই-মথ্‌ফী" (জেব্-উন্নিসা)—১৲
শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত "তীর্থঙ্কর" (কথোপকথন)—২৸০
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আত্মসমর্পণ"—২৲
শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "নষ্টতারা"—১৲
ডাঃ শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র প্রণীত "রামায়ণ বোধ" বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ"—২৲
শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত গল্পগ্রন্থ—"তৃষা"—১৲
দীপিকা দে প্রণীত উপন্যাস "বর্ম্মা দেশের মেয়ে"—১॥০
শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত পৌরাণিক নাটক "রামকৃষ্ণ"—১॥০
প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত (গল্প পুস্তক)—"কয়েক ঘণ্টা মাত্র"—১৲
শ্রীগৌতম সেন প্রণীত উপন্যাস "প্রিয়া ও মানসী"—১॥০
রায় বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত মুস্লিম নারী চিত্র "পুরাতনী"—১।০
ডাঃ প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত হাইড্রোপ্যাথি মতে "শিশু-চিকিৎসা"—১৲
ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত Gospel of Buddhaর অনুবাদ "বুদ্ধবাণী"—৸৴০
শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রহস্য সিরিজের "মৃত্যুচক্রের মায়াবিনী"—৸০
ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স্ প্রণীত পুস্তকের অনুবাদ "সমাজতন্ত্রবাদ-কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক"—১।০
শ্রীজগদীশ গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা"—১।০
শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "মরণ মহল"—১।০
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "পাশ্চাত্য পাকপ্রণালী ও বেকারী দর্পণ"—১।০
কার্ল মার্কস্ প্রণীত পুস্তকের অনুবাদ "কেপিটেল—সংক্ষিপ্তসার"—১॥০

সম্পাদক

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjee & Sons,
at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শৈলেন দাশ

পিঞ্জরে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
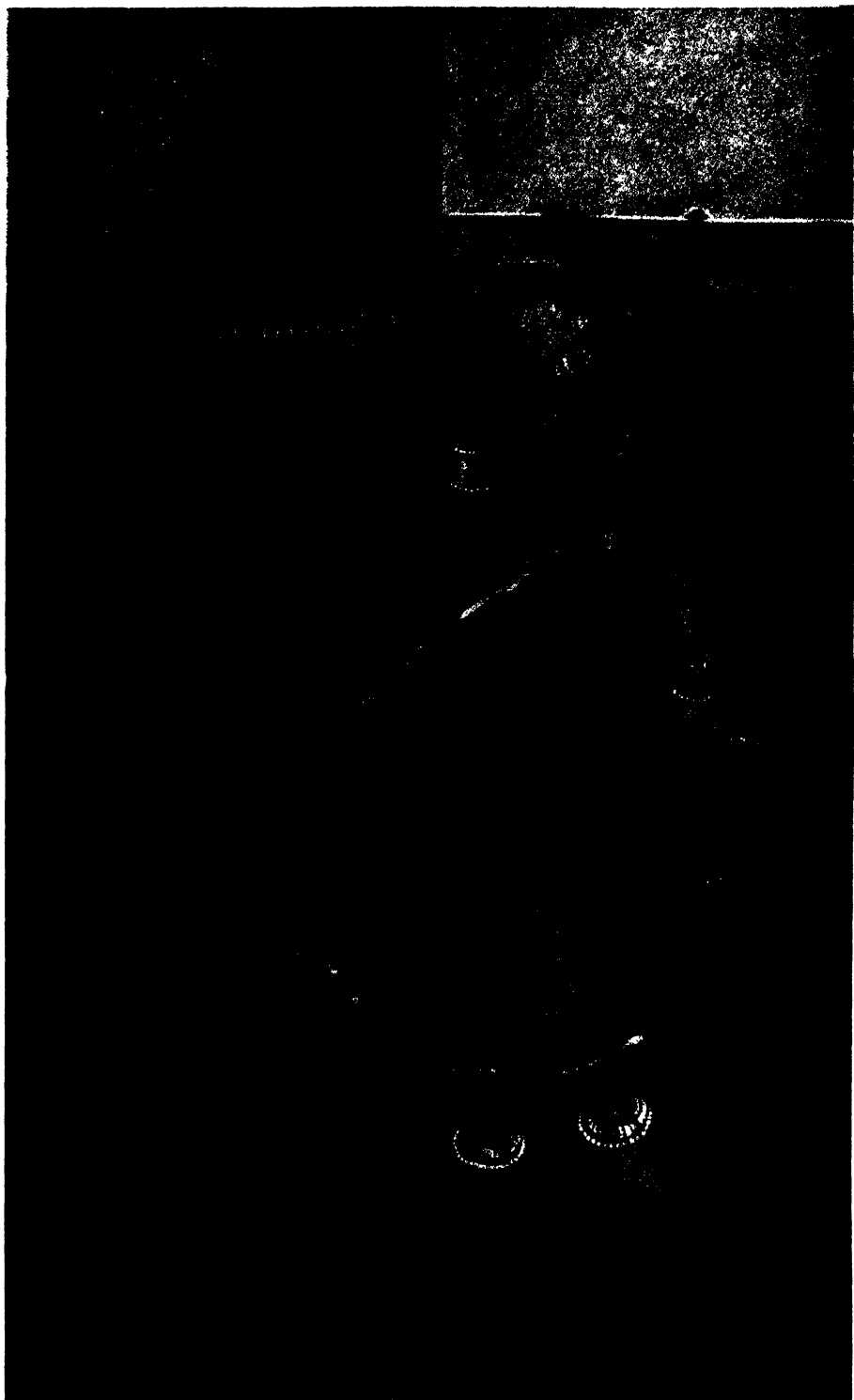
ভাদ্র—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য। ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব জিনিষ। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বৈষ্ণব-প্রধান দেশ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য রামানুজ হইতে বল্লভাচার্য্য পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ভক্তিবাদ বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এই অবিচ্ছিন্ন ভক্তিসাধনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাধাভাবদ্যুতি শবলিত ভক্তিতত্ত্বে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতবর্ষের সকল প্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে বিলক্ষণ ও বিশিষ্ট। মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি দার্শনিক কিম্বা ভক্তমণ্ডলী সকলেই মোক্ষকে চরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিকে কোথাও সাধ্য বলেন নাই, মুক্তির সাধনরূপেই ইহার স্থান। সুতরাং ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম পরম পুরুষার্থ ইহা একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রচার করিয়াছেন। আর্য যুগে, বিশেষতঃ পৌরাণিক যুগে, চরম পুরুষার্থরূপে যে সকল সিদ্ধান্ত রহিয়াছে তাহার যে পরিমাণ গভীর গবেষণার প্রয়োজন ততটা এখনও হইতেছে না। সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে বৈদিক সংহিতাদি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহাতে ভক্তিকে অথবা মুক্তিকে চরম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আমাদের যাহা উদ্যম হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

বৈদিক যুগে কি সিদ্ধান্ত ছিল তাহা জানিতে হইলে আচার্য্যগণের গ্রন্থ প্রণিধানযোগ্য। দর্শনযুগে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, মোক্ষই চরম পুরুষার্থ। বৌদ্ধযুগেও মুক্তিকে অধ্যাত্ম জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করা হয়। আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানবাদী। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, বেদান্ত-

সূত্র, গীতা ও উপনিষদের মুখ্য প্রতিপাদ্য প্রয়োজন মুক্তি। অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তিনি দ্বৈতপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন বটে কিন্তু তাঁহার মতে মুক্তিই অধ্যাত্ম সাধনার চরম পরিণতি। মধ্বাচার্য্যও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহারও সিদ্ধান্ত ছিল মোক্ষ্ই মনুষ্য জীবনের চরম আপ্তব্য, পরম পুরুষার্থ। কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ইহাই হইল যে, মুক্তি হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ সমধিক। অর্থাৎ ভক্তিই চরম ও পরম পুরুষার্থ। বঙ্গের এই বিলক্ষণ ভক্তিতত্ত্ব শ্রীরূপ শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বয় প্রচার করিয়া বঙ্গীয় দার্শনিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামীও ভক্তিতত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণ দ্বারা মোক্ষবাদী ভারতবর্ষকে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব অভিনব রসসম্ভার দান করিয়াছেন। বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পর হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মোক্ষবাদ প্লাবিত ভারতবর্ষ এইরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষার সন্ধান পায় নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামী অতি পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন—

"ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তি সুখ স্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু

যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যহৃদয়ে ভোগস্পৃহার মত মুক্তিস্পৃহা পিশাচী তুল্য বাস করিবে ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিসুখ তাহাতে প্রবেশ করিবে না। যে ভারত যুগযুগান্তর হইতে উদাত্ত-কণ্ঠে মুক্তির মহিমা প্রচার করিয়া আসিতেছে, সেই ভারতেই কন্থা কৌপীনধারী একজন বাঙ্গালী বৈরাগী দৃঢ়কণ্ঠে নিঃসঙ্কোচে বলিলেন—মুক্তিস্পৃহা পিশাচী তুল্য। ইহাই হইল বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তিসমৃদ্ধ শ্রীসনাতন তদীয় বৃহদ্ ভাগবতামৃত গ্রন্থে এই ভক্তিবাদ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল, শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ভক্তিশাস্ত্র এবং ইহা উপনিষদের সার। সেই সমস্ত উপনিষদের মর্ম্মার্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিধৃত রহিয়াছে। অনেকগুলি শ্লোক দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের বা জীবন্মুক্তের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়, যেমন—দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ, এই প্রকার বহু উক্তি দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্ম করিবেন বটে কিন্তু কর্ত্তৃত্বের অভিমান তাঁহাতে থাকিবে না। অথচ শ্রীভগবানের উপদেশ হইল, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ"—কেহই এক মুহূর্ত্তও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীভগবদুপদেশ অনুসারেই তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া লোকহিতার্থ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তাঁহার দেহ সক্রিয় হইলেও অন্তরে তিনি 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অহঙ্কার দ্বারা সর্ব্বথা অস্পৃষ্ট। যন্ত্রি-চালিত যন্ত্রবৎ তিনি ভগবৎ প্রেরণানুসারেই কর্ম্ম করিয়া যান। "শান্তিং নির্ব্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি"—এই শ্লোকে নির্ব্বাণমুক্তির কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা খুব সংক্ষেপেই উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বাণমুক্তির অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য তিরোহিত হয়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত, উহা সুতরাং অবিদ্যারই কার্য্য ও অপারমার্থিক। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। এই তত্ত্বের অনুশীলন জীবভাব দূর করিবার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু ব্রহ্মাত্মবোধ সম্পাদন অত্যন্ত দুষ্কর। তাই শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" নিরুপাধিক ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি যতক্ষণ দেহাত্ম বুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ হইবে না। উপর্য্যুক্ত মুক্তির দ্বৈবিধ্য থাকা সত্ত্বেও সাধকসম্প্রদায় জীবন্মুক্তির দিকেই সবিশেষ আকৃষ্ট হন। মনের এমন একটা অবস্থা আসিবে যখন সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব চলিয়া যাইবে, চিত্তে অনুদ্বেগময় প্রশান্তি বিরাজ করিবে, দেহ আছে তাহার প্রযত্নও রহিয়াছে অথচ আভিমানিক কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি নাই, পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবাত্মা শীতোষ্ণাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট অবিকৃত রহিয়াছে শ্রেষ্ঠ সাধকগণ এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই যত্নশীল হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীসনাতন গোস্বামী মুক্তি ও ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন স্বারামতা অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থার প্রাপ্তি ত সহজ। অহঙ্কার পরিত্যাগক্রমে তাহা সু-করই হইয়া উঠে। ভূয়োদর্শন ও বিবেক দ্বারা সংসারের অবস্থার সম্যক্ উপলব্ধি হইলে জীবের ভ্রান্ত কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি চলিয়া যাইতে পারে। সৃষ্টির অভাবনীয় বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করিলে একটি বিলক্ষণ শক্তি যে তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে এইরূপ বোধ আপনিই

আসে। তখন সাধক আপনার কর্ত্তৃত্ব যে নিতান্তই আভিমানিক তাহা বুঝিতে পারেন। ঈশ্বরের বিভুত্ব ও অমিত শক্তিমত্তা সাধককে বুঝাইয়া দেয় যে আবার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব কোথায়? আমি ত যন্ত্রিচালিত একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র মাত্র!

সুতরাং ভগবদ্‌ভক্তি যতই প্রগাঢ় হইবে—ততই কর্ত্তৃত্বের মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপ জীবন্মুক্ত অবস্থার দিকে সাধক অগ্রসর হইবেন। মুক্তি দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়। ভক্তির চরম ফল পাইবার পূর্ব্বে ইহা সাধকের কাম্য হইতে পারে। কিন্তু ইহা ভক্তির একটি অবান্তর ফল। মনে রাখিতে হইবে, ভক্তের পক্ষে এই আত্মারামত্ব অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থাও গ্রাহ্য নহে, কেন না ইহা প্রেমবিরোধী—তথাপি নাত্মারামত্বং গ্রাহ্যং প্রেমবিরোধিয়ৎ।" (—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত)। শ্রীভগবানের প্রতি নিরবধি প্রীতিই হইল প্রেম। তজ্জন্য প্রেমে অনন্ত অতৃপ্তি। স্বভাবতই উহা তৃপ্তির অভাব "তৃপ্ত্যভাব-স্বভাবতং।" আত্মারাম কৃতকৃত্যতা আনে, এই অবস্থায় সাধক নিষ্ক্রিয় হন। তাঁহার নিকট প্রাপঞ্চিক ব্যাপার স্বপ্নবৎ ঐন্দ্রজালিক মনে হয়। জীবের সাক্ষাৎস্বরূপ চৈতন্যের উপলব্ধি করিয়া তিনি আত্মরতি আত্মক্রীড়, সুতরাং পরিতৃপ্ত থাকেন। "আত্মন্যেব সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"—এই হইল তাঁহার অবস্থা। নিবিড় জ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা দেহাত্মবাদ দূর করিয়া তিনি কৃতকৃত্যতা বোধ করেন মাত্র। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" প্রভৃতি গীতোক্তি জীবন্মুক্তের চরিতার্থতা প্রচার করিতেছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে-হৃদয়ে চরিতার্থতা আসিয়াছে তাহাতে ভক্তি প্রবেশ করে না। সর্ব্বপ্রকার যুক্তির অনুশীলন দ্বারা তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—প্রেমে কৃতকৃত্যতা নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকার সিদ্ধান্ত রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রামানুজাচার্য্য হইতে বল্লভাচার্য্য পর্য্যন্ত সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মুক্তিকেই সাধ্য বলিয়াছেন, ভক্তি মুক্তির সাধন। ভক্তি উপায়, মুক্তি উপেয়। কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত হইল ভক্তি সাধ্য, সাধন নহে। ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ব্যতিরিক্ত—ইহাদের অতীত অবস্থা। নামকীর্ত্তন আত্মসমর্পণাদি দ্বারা এই প্রেম ভক্ত-হৃদয়ে অনুভূত হয় এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে পরশ না গেল॥" ইহাই হইল ভক্তের অনন্ত অপরিসীম অতৃপ্তি বা সর্ব্বাত্মভূত সচ্চিদানন্দরসঘন মূর্ত্তি। শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমলক্ষণাভক্তি, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনর্পিতচরী ভক্তির অসাধারণ সিদ্ধান্ত।

ভক্তি হ্লাদিনী শক্তির পরিণামবিশেষ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি আর হ্লাদিনী তাঁহার অন্তরঙ্গ শক্তি। ভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গ শক্তি দ্বারা এই বিপুল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রপঞ্চের উৎপত্তি-বিলয়-প্রসঙ্গে শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি কিন্তু তাঁহার স্বরূপভূতা। ভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইলেও আনন্দের অনুভবিতা নন। হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা তিনি স্ব স্বরূপ আনন্দের অনুভবিতা হন। বিষ্ণুপুরাণে হ্লাদিনী শক্তির পরিচয় আছে। মানুষের জীবনের উপর হ্লাদিনী শক্তি সক্রিয় আছেন। প্রত্যেক মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে আপনাকে বিমল আনন্দরসের অধিকারী করিয়া তুলে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" আনন্দ যেমন রহিয়াছে তাহার অনুভবেরও প্রয়োজন। আনন্দের সাক্ষাৎক্রিয়মানত্ব না থাকিলে চরিতার্থতা কোথায়? চরিতার্থতার অভাব অতৃপ্তি আনয়ন করে। হ্লাদিনী আনন্দকে অনুভবের বিষয়ীভূত করিয়া অতৃপ্তির পর্য্যবসান করে।

ভক্ত চান জ্ঞানও থাকুক, ভাবও থাকুক। জ্ঞান হইল প্রমাণজন্য বৃত্তি। ভাব আসে জ্ঞানের পর। বিষয়ের অনুভূতি প্রমাণের ফল। অনুভূতির পর বিষয়ের প্রতি আনুকূল্য জন্মে। বিষয় অধিগত না হইলে বিষাদ, ব্যাকুলতা ও অতৃপ্তিতে চিত্ত ভরিয়া উঠে। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানকে পাইয়া সন্তুষ্ট কিন্তু প্রেমমার্গী বৈষ্ণব জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল না পাইলে অতৃপ্ত। বিধাতা মস্তিষ্কও সৃষ্টি করিয়াছেন হৃদয়ও সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং হৃদয়রাজ্যের ব্যাপার মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। জ্ঞানের জন্য তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে জ্ঞানমার্গী সংসার পরিত্যাগ

করেন—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।" ভক্ত কিন্তু আভিমানিক কর্ত্তৃত্ববোধ দূর করিয়া নিত্য কৃষ্ণ কৈঙ্কর্য্যে তন্ময় হইয়া থাকেন। তাঁহার নিকট ভগবানই সব ; তিনি অকর্ত্তা, ভগবানই একমাত্র কর্ত্তা—নিয়ন্তা। ভক্ত হ্লাদিনীর প্রভাবে প্রপঞ্চের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীভগবানের সেবা করেন।

জ্ঞান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলে মানুষের পরিণতি হয় উন্মত্ততা। দুই পথ রাখিয়া চলিবার যে পথ সেইটিই হইল ভক্তিমার্গ। নির্ব্বাণবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তিবাদ তখন তাহাতে আসিয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব, অমিতাভ প্রভৃতি বৌদ্ধগণের উপাস্য হন। বোধিসত্ত্ব বা অমিতাভের কল্পনা (conception) বৌদ্ধসংস্কৃতির পরিণতি নহে, উহা হিন্দু ভক্তিশাস্ত্রের অবদান।

শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের নিরন্তর এই প্রার্থনা, "হে ভগবন্, আমি সুখৈশ্বর্য্য চাই না, অপুনর্ভব চাই না। আমি সকলের আর্ত্তি—নিজের করিয়া নিতে চাই। যেখানে দুঃখের অনুভূতি, তুমি শক্তি দাও আমি যেন সেখানে প্রবিষ্ট হইতে পারি।" কেবলমাত্র ভোগরাগের আড়ম্বরেই শ্রীহরির সেবা হয় না। সকল প্রাণীর যিনি সেবা করিতে পারেন তিনিই যথার্থ শ্রীহরিভক্ত। ভগবান্ যে বিরাট বিশ্ব সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার সেবার ভার ভক্তের উপর। ভক্ত সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সকল লাবণ্যের আশ্রয়, মাধুর্য্যময় ভগবৎস্বরূপের অনুভূতি করিয়া তাঁহার সেবার জন্য নিত্য উন্মুখ থাকিবেন। ভক্তের অনুভূতি আকাঙ্ক্ষাবিমিশ্র। 'যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥'—এই বুদ্ধি লইয়া ভক্ত কর্ম্মে নিরত থাকিবেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তাই এই প্রেমভক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"স্তোত্রং যত্রতটস্থতামুপনয়ৎ চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাম্
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসপ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন পৃথুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্নঃ স্বরেসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥"

—বিদগ্ধমাধব

যাঁহার প্রেম স্বারসিক হইয়াছে তিনি ভাবিবেন, যে ব্যক্তি তাঁহার স্তুতি করেন তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে আপনার বলিয়া ভাবেন না। যিনি তাঁহার নিন্দা করেন তিনি যেন তাঁহার স্বজন বন্ধু। বন্ধুর মত তাই পরিহাস করিতেছেন। দোষ দর্শনে প্রেমিকের প্রেমক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। গুণ বর্ণনে প্রেমিকের প্রেম বৃদ্ধিও লাভ করে না। এই অহেতুকী প্রীতির বিবর্ত্তই হইল বাঙ্গালীর প্রেমধর্ম্ম। ইহাই হইল বাঙ্গালার প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য অসাধারণ দান বা অনর্পিতচরী ভক্তি।

আজ বাঙ্গালীর চতুর্দ্দিকে দুরবস্থা। আমাদের জীবন প্রেমহীন কলহমুখর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালী আপনার নিজস্ব প্রেমধর্ম্ম ভুলিয়াছে বলিয়া আজ তাহার সর্ব্বত্র বিড়ম্বনা! পুনর্ব্বার প্রেম মহাবৃক্ষের শীতল ছায়ায় না আসিলে কি আমাদের অশান্তি দূরীভূত হইবে? বর্ত্তমানে প্রেম কামে পরিণত হইয়াছে, ভোগবাসনাকেই আমরা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম মনে করি। আমাদের এই জাতীয় দুর্দ্দিনে প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। প্রেমধর্ম্মের রাধাভাবদ্যুতি—শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলে আমরা এই প্রেমের অপ্রাকৃত বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব, অন্যথা নহে। এই মহান্ সত্যের প্রতি অনাদর বা উপেক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশের পথকে আরও প্রশস্ত ও আরও সুগম করিয়া তুলিবে।
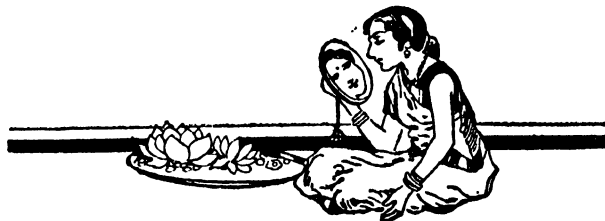
বারিদবরণ

(নাটিকা)

শ্রীঅশোক সেন এম-এ

চরিত্র

বারিদবরণ—অবসরপ্রাপ্ত দর্শনের অধ্যাপক। আজীবন হিপ্‌নোটিজম্‌, স্পিরিচুয়ালিজম্‌ ইত্যাদি সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমান বয়স পঞ্চান্ন—এযাবৎ অবিবাহিত।

অসীম—বিলাতী ডিগ্রিপ্রাপ্ত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। বয়স ছাব্বিশ বৎসর।

অতনু—অসীমের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ব্যারিষ্টার। অসীমের থেকে কিছু বড় কি ছোট।

অমিতা—বারিদবরণের বন্ধু-কন্যা। অত্যন্ত শিশুকালে মা মারা যান। দশ বৎসর বয়সের সময়ে অমিতার পিতা দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া বন্ধু বারিদবরণের হস্তে কন্যার লালনপালনের ভার দিয়া যান। অমিতার বর্ত্তমান বয়স বাইশ বৎসর, উচ্চশিক্ষিতা।

মিসেস্‌ রায়—মধ্যবয়সী বিগতযৌবনা লেডী ডাক্তার, বালবিধবা; এক সময়ে সৌন্দর্য্য ছিল, এখন উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে সমস্ত মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যুথিকা—অতনুর স্ত্রী।

প্রথম অঙ্ক

অসীমের বসিবার ঘর। সময়—সন্ধ্যা

অসীম (মৃদুস্বরে পড়িতেছিল)—

How do I love thee ?
Let me count the ways.
I love thee to the depth and
breadth and height
My soul can reach—

অতনুর প্রবেশ

অতনু। এই সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ Love, love ক'রে ক্ষেপে উঠ্‌লে কেন হে? বিকালে কি বারিদবরণের বাড়ী গিয়েছিলে না কি? তা দিল্লী-আগ্রা কেমন দেখা হ'ল বল—

অসীম। বসো, বসো, সব বল্‌ছি। দিল্লী, আগ্রা সবই অপূর্ব্ব কলাশিল্পের নিদর্শন। তবে সব চেয়ে সুন্দর জিনিষ যা দেখ্‌লাম—আগেই অবশ্য চিঠিতে সে কথা তোমাকে জানিয়েছি—বারিদবরণের পালিতা বন্ধু-কন্যা অমিতাকে।

অতনু। 'প্রোপোজ্‌'-'ট্রোপোজ্‌' করেছ না কি?

অসীম। দিন পনের'র আলাপে 'প্রোপোজ' কি হে?

অতনু। তাতে কি। কত বড় বড় ব্যাপার এর থেকে অল্প সময়ে করা যায়, আর এ ত সামান্য প্রোপোজ করা। আলাপও কম পক্ষে পনের দিনের। প্রথম সাক্ষাৎ যে-সে জায়গায় নয়—প্রেমিকের তীর্থস্থান আগ্রার তাজমহলে—যার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নীল যমুনা—

অসীম। আরে থামো থামো। গোড়াতেই ভুল করে বস্‌লে। প্রথম আলাপ আগ্রায় নয়—ফতেপুর সিক্রীতে, অবশ্য পরে একসঙ্গে তাজ দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।

অতনু। সে যা হোক্‌, এবার বিশদভাবে আলাপের বিবরণী দাও দেখি।

অসীম। আগ্রা থেকে ভোরবেলা রওনা হলাম ফতেপুর সিক্রীর দিকে। ষ্টেশনে নেমে দেখি একটা সরাই গোছের—সেখানে বিক্রী হচ্ছে চা এবং দুধ। ঢুকে দেখ্‌লাম এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক—সঙ্গে ফিকে সবুজ শাড়ী পরিহিতা একটি যুবতী। Sharp features—লম্বা টানা টানা চোখ। মোটের উপর ঐ রকম শুষ্ক ধূলিধূসরিত মরুতে ঐ আনার-কলির মত মেয়েটিকে দেখে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল বুঝতেই পারছ।

অতনু। সে দৃশ্য কল্পনা ক'রে আমিও যে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছি। Go on, তারপর কি হল বল, থেমো না—

অসীম। তারপর আর কি, যথারীতি আলাপ পরিচয়। একসঙ্গে ফতেপুরের শিল্পকলা উপভোগ, যতদূর ইতিহাসের জ্ঞান ছিল—প্রদর্শন। Impress করতে যথাসাধ্য চেষ্টা, ইত্যাদি ইত্যাদি…

অতনু। মেয়েটি কেমন ?

অসীম। আমার কাছে She is a phantom of delight. অতনু, তুমি অনেক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, আমি বিয়ে করব কবে। আমি উত্তর দিয়েছি, মনের মত পেলে—অর্থাৎ সুন্দরী এবং উদার মনোবৃত্তি-সম্পন্না মেয়ে পেলে তবেই বিয়ে করব। তুমি তার উত্তরে বলেছ, আমার মানসসুন্দরীকে ফরমাস দিয়ে তৈরী করতে হবে। অতনু, এতদিনে সেই মানসসুন্দরীর দেখা পেয়েছি।

অতনু। দেখ অসীম, যখনই কেউ কারো সঙ্গে 'লভে' পড়ে, তার মধ্যেই দেখতে পায় তার আকাঙ্খিত সব। এ তুমিই নূতন দেখছ না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে দেখে এসেছে প্রেমিক এ ভাবে তার প্রেমিকাকে।

অসীম। তর্কে কাজ নেই। অমিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেই বুঝবে।

অতনু। Guardian-টির নাম কি বললে ? রুদ্রবরণ নাকি—তিনি তোমাদের এই আলাপটাকে কি ভাবে দেখছেন ?

অসীম। বারিদবরণবাবু একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। কথা বলেন কম। সব সময়েই অন্যমনস্ক। হয় ত তিনজনে কিছু দেখছি—আমি অমিতাকে কিছু বোঝাচ্ছি, অমিতা নিবিষ্ট মনে শুনছে, হঠাৎ চোখ পড়ল বারিদবাবুর ওপর। দেখি কঠোরভাবে তিনি আমার দিকে চেয়ে আছেন। কিন্তু তক্ষুণি সামলে নিয়ে একটু হেসে আমাকে বললেন—ইতিহাসের জ্ঞান আপনার প্রগাঢ়, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় অমিতার এসব বোঝবার সুবিধা হচ্ছে। আমার কিন্তু তাতেও অস্বস্তি গেল না। যাক্, একই গাড়ীতে ফিরে এলাম আগ্রায় এবং সেখান থেকে দিল্লীও আমরা একই সঙ্গে দেখলাম ঘুরে ঘুরে। এর মধ্যে একদিন দিল্লীতে এক সিনেমা হলে বারিদবাবু আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁর ইচ্ছাশক্তি দেখাতে। সত্যই অদ্ভুত ক্ষমতা এ বিষয়ে ভদ্রলোকের। তাঁর দিকে একবার চাইলে লোকে যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে।

অতনু। তোমার দিকটাই ত এতক্ষণ বললে। অমিতার মনোভাব কি ?

অসীম। পরিষ্কার যদিও কথা হয়নি এ বিষয়ে তার সঙ্গে, তবে আমার মনে হয় অমিতার আপত্তি হবে না।

অতনু। কবে আলাপ করিয়ে দিচ্ছ ?

অসীম। আজ রাত্রে ওদের ওখানে নেমন্তন্ন। অমিতাকে বলব আসছে রবিবার তোকে নিয়ে যাব ওদের বাড়ী।

অতনু। ওঠা যাক্ তাহ'লে আজ।

অসীম। আমিও তৈরী হয়ে নিই যাবার জন্য।

অতনুর প্রস্থান

যবনিকা পতন

দ্বিতীয় অঙ্ক

[বারিদবরণের পাঠকক্ষ। দর্শন, স্পিরিচুয়ালিজম্, হিপনোটিজম্, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে নানা পুস্তকে পরিপূর্ণ। সময় সন্ধ্যা। একটি টেবিলের দুই পার্শ্বে দুইটি চেয়ারে বারিদবরণ ও মিসেস্ রায়। টেবিলের উপরের ল্যাম্পটি হইতে স্বল্প নীল আলোকে সামান্য একটু স্থান আলোকিত। তাহা ভিন্ন ঘরটির বেশীর ভাগ স্থানই অন্ধকারে ভরা। চারিদিকেই যেন এক ভয়াবহ আবহাওয়া।]

বারিদবরণ ও মিসেস্ রায়

বারিদবরণ। তুমি এতদিন পরে হঠাৎ কোথা থেকে এবং কি অভিপ্রায়ে এসে হাজির হয়েছ লতিকা ?

মিসেস্ রায়। আমার এখানে আসাটা যে তোমার অভিপ্রেত নয়, তা বুঝতে পারছি।

বারিদবরণ। ওসব বাজে কথা রেখে তোমার এখানে আসার কারণ কি বল।

মিসেস্ রায়। কারণ আর কিছুই না। বর্ত্তমানে আমি অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছি, আমার কিছু টাকার প্রয়োজন।

বারিদবরণ। তোমাকে যথেষ্ট টাকা আমি দিয়েছিলাম। নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে সে সব টাকা তুমি নষ্ট করেছ। আর এক পয়সাও তুমি আমার কাছে পাবে না।

মিসেস্ রায়। আমাকে সর্ব্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে এখন আমার ভরণপোষণ চালাতে অস্বীকার করা তোমার মত বীরপুরুষেরই শোভা পায়। ভদ্রঘরের বালবিধবা আমি। কোন কিছুর অভাব ছিল না আমার। কুক্ষণে আমার দেওরের সঙ্গে আমাদের বাড়ী তুমি এসেছিলে। কুক্ষণে তোমার প্রলোভনে আমি ভুলেছিলাম, তা না হ'লে ভদ্রঘরের বউ আমি, নিজের শ্বশুরবাড়ীতে সম্মানে থাকতে পারতাম।

বারিদবরণ। মিথ্যা কতগুলি বাজে কথা বলে পাপ বাড়িও না লতিকা। আমি তোমাকে প্রলোভিত করেছিলাম, না তুমি আমাকে প্রলোভিত করেছিলে নানা রকমে! অবশ্য আমারও দোষ হয়েছিল। তোমার প্রলোভনে উত্তেজিত হয়ে তোমাকে ঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে আসা আমার উচিত হয় নি। তবু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি তোমাকে নিয়ে ঘর করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম তুমি একজনকে নিয়ে সুখী নও। তোমাকে ডাক্তারী পড়ালাম—যাতে ভবিষ্যতে বিপদে পড়লে তুমি স্বাধীনভাবে চালাতে পার নিজেকে। সর্ব্ববিষয়ে তোমাকে আমি স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। কিন্তু ভদ্রভাবে থাকতে তুমি রাজী হলে না। দেখলাম উচ্ছৃঙ্খলতায় তুমি পশুর মত হয়ে উঠলে। তখনই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করলাম। তাও আমি তোমার প্রতি অবিচার করি নি। তোমাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলাম—আর এও তোমাকে বলেছিলাম, ভবিষ্যতে তুমি আর এক পয়সাও আমার কাছ থেকে পাবে না।

মিসেস্ রায়। আমি আমার দোষ স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এসো না—আবার আগের মত আমরা একসঙ্গে থাকি?

বারিদবরণ। না, সে হতে পারে না।

মিসেস্ রায়। কারণ?

বারিদবরণ। নানা কারণ আছে—সব তোমাকে আমি বলতে চাই না। তবে প্রধান কারণ এই যে, তোমার মত বদ স্ত্রীলোকের সঙ্গ আমি অতি ঘৃণ্য মনে করি।

মিসেস্ রায়। ওসব নীতিকথা তোমার মত চরিত্রহীন লম্পটের···

দরজা ঠেলিয়া অমিতার প্রবেশ। মিসেস্ রায় থামিয়া গেলেন। অমিতা মিসেস্ রায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসু-ভাবে বারিদের দিকে চাহিল

বারিদবরণ। কোথায় গিয়েছিলে অমিতা?

অমিতা। এই একটু সিনেমায় গিয়েছিলাম।

বারিদবরণ। আচ্ছা তুমি এখন যাও। আমি এঁর সঙ্গে একটু গোপনীয় আলোচনায় ব্যস্ত আছি।

অমিতার প্রস্থান

মিসেস্ রায়। এতক্ষণে বুঝলাম কেন আমাকে রাখতে রাজী নও। বয়স হয়ে গেছে, আমার ভেতর আর আছে কি? এদিকে নূতন নাগরিকাটি পূর্ণ-যৌবনা, টানা টানা চোখ, রসে ভরপুর। তা একে কোথা থেকে জোটালে? যাক্, আমি তোমার আমোদ নষ্ট করতে চাই না। আমি চলে যাই। তারপর তুমি যত ইচ্ছা আমোদ ক'র।

এতক্ষণ বারিদবরণ কট্‌মট্ করিয়া মিসেস্ রায়ের দিকে চাহিয়াছিলেন। মিসেস্ রায় ক্রমশই যেন নিজশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন এবং দুর্ব্বল বোধ করিতেছেন

টাকা না পেলে আমি কিছুতেই যাব না এবং তোমার নাগরিকাটিকে বলে দেব আমার তুমি কি দশা করছ।

বারিদবরণ। চুপ্ কর।

কিছুক্ষণ কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। মিসেস্ রায় নিজের সমস্ত শক্তি হারাইয়া ফেলিলেন। বারিদবরণ ধীরে ধীরে তাঁহার চোখের কাছে হাত নাড়িতে লাগিলেন। সমস্ত সময় তাঁহার চক্ষু মিসেস্ রায়ের চক্ষুর উপর নিবদ্ধ।

যাক্ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে পারবে না—Completely hypnotised.

উঠিয়া ভিতরের দরজাটা আটকাইয়া দিয়া আসিলেন। মিসেস্ রায় মড়ার মত বসিয়া—দেহ যেন প্রাণহীন। চোখে যেন দৃষ্টিশক্তি নাই। তাহার পর বারিদবরণ মিসেস্ রায়ের কাছে আসিয়া কহিলেন—

লতিকা, তুমি আমার কাছে কি জন্য এসেছিলে?

মিসেস্ রায়। (যেন কোন যন্ত্রের ভিতর হইতে উত্তর আসিতেছে) তোমাকে চাপ দিয়ে কিছু টাকা আদায় করতে।

বারিদবরণ। তোমার কি সত্যিই টাকার দরকার?

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ, বর্ত্তমানে ভয়ানক অর্থকষ্ট পাচ্ছি।

বারিদবরণ। কত টাকা হ'লে তোমার চলে?

মিসেস্ রায়। হাজার টাকা হ'লেই চ'লে যাবে।

বারিদবরণ উঠিয়া আলমারি হইতে দুই হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া মিসেস্ রায়ের হ্যাণ্ড্ব্যাগে পুরিয়া দিলেন।

বারিদবরণ। (লতিকার দিকে ক্ষণকাল কঠোরভাবে

চাহিয়া) লতিকা, আমার কথার উপর কথা বলার সাহস আছে তোমার ?

মিসেস্ রায়। না।

বারিদবরণ। (দৃঢ়স্বরে) আমি বল্‌ছি, তোমার গত জীবনের কথা মনে কর্‌বার শক্তি তোমার নেই। আমি কে, আমার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ছিল তুমি ভুলে গেছ। বল ত দেখি তোমার গত জীবনের কথা।

মিসেস্ রায়। কিছুই মনে কর্‌তে পার্‌ছি না।

বারিদবরণ। আমি বল্‌ছি বাড়ী ফিরে তোমার এই বিহ্বলভাব কেটে যাবে। কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি তোমার লোপ পাবে। এখন তুমি আস্তে আস্তে বাড়ী চলে যাও।

ধীরে ধীরে মিসেস্ রায়ের প্রস্থান

মূর্খ স্ত্রীলোক, তুমি এসেছিলে বারিদবরণের সঙ্গে খেলা কর্‌তে, সমুচিত শাস্তি সেই জন্য তোমায় দিতে হ'ল। কিন্তু অমিতা ওকে দেখে কি মনে কর্‌ল! যাক্, সে একটা কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। অমিতা আমার নাগরিকা—হাঃ, হাঃ, হাঃ, পূর্ণযৌবনা, টানা টানা চোখ, সুন্দর দেহের গড়ন, মন্দ কি! ওকে বিয়ে করে জীবনে কটা দিন সুখ ক'রে নিলেই বা ক্ষতি কি? (হঠাৎ সচকিত হইয়া) না, না, না—এ আমি কি ভাব্‌ছি! বন্ধু কন্যা, মেয়ের মত যাকে পালন করেছি এতদিন—যাক্, দূর হোক্ যত বাজে চিন্তা।

যবনিকা পতন

তৃতীয় অঙ্ক

বারিদবরণের বাড়ীর ড্রয়িং রুম। বারিদ, অসীম, অতনু ও অমিতা। সকলে চা পানে রত

অতনু। খুবই আনন্দিত হলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যলাভ ক'রে।

অমিতা। আমরাও কম আনন্দিত হইনি আপনার সঙ্গে আলাপে। আপনার বন্ধু ত প্রতি কথায় একবার আপনার কথা উল্লেখ কর্‌বেনই।

অতনু। আপনাদের কথাও ইদানীং আমার বন্ধুর কাছে প্রায়ই শুন্‌তাম। যে অসীম কোন মেয়েকেই আমল দিত না, যার প্রতি কথায় মেয়েদের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাবই দেখা যেত বরাবর, সেও যখন আপনার গুণগানে মুখর হয়ে উঠ্‌ল, তখন ভাব্‌লাম, দেখ্‌তে হবে এ মেয়েটিকে। তা দেখ্‌লাম সত্যিই আপনি একটি রত্ন।

অমিতা ও অসীমের একবার চোখাচোখি হইল—দুজনেই লজ্জিত হইয়া চোখ নামাইল। হঠাৎ যেন বারিদবরণের চোখের ভাব কঠোর হইল—আবার সেই মুহূর্ত্তে কঠোরভাব দূর হইয়া তাঁহার মুখচোখ এক অপূর্ব্ব করুণ ভাবে ভরিয়া গেল।

বারিদ। আমার অমিতাকে এ পর্য্যন্ত যে দেখেছে সেই প্রশংসা না করে পারে নি। (একটু যেন শ্লেষের ভাবে) বিশেষ অসীমের কথা ছেড়েই দিন। অমিতার সঙ্গে অসীমের বন্ধুত্ব যদিও অল্প দিনের, কিন্তু দেখ্‌লে মনে হয় যেন কতকালের পরিচিত এরা।

অতনু। আপনার অদ্ভুত শক্তির কথাও প্রায়ই শুনি অসীমের মুখে। আপনার ইচ্ছাশক্তির কথা, স্পিরিচ্যুয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে আপনার প্রগাঢ় জ্ঞানের কথা। আচ্ছা বারিদবাবু, আপনি স্পিরিট এনেছেন কখনও ?

বারিদ। এ সব বিষয় আপনি বিশ্বাস করেন ?

অসীম। অতনুর মত হচ্ছে, না প্রমাণ পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করবে না—তবে কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তবে বিশ্বাস কর্‌তে কোন আপত্তি নেই।

বারিদ। অতনুবাবু, একটা কথা আপনাকে বলি। ক্ষুদ্র মানবের জ্ঞানবুদ্ধি কতটুকু? আজ যা অসম্ভব মনে হয়, কাল দেখ্‌বেন তা যেন জলের মত সহজ। অনেক জিনিষের অস্তিত্ব বিজ্ঞানকেও প্রমাণ অভাবে প্রথম প্রথম স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে—তারপর আস্তে আস্তে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এ সব বিষয়ে যদি প্রমাণ না পাওয়ার দরুণ তাদের অস্তিত্ব স্বীকার না করা হ'ত, তবে বিজ্ঞান সমর্থ হ'ত না এদের প্রমাণ কর্‌তে। আমার এসব কথা আপনার মনে লাগ্‌বে না জানি। ভবিষ্যতে যদি সুযোগ পাই, আপনাকে দেখিয়ে দেব কত কিছু অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায় যা বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর।

অতনু। তা যদি দেখাতে পারেন আমিও তাতে কম আনন্দিত হ'ব না। আশা করি, শীগ্‌গির সে সুযোগ

আস্‌বে। আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি, আমাদের আবার আর এক বন্ধুর বাড়ী যেতে হবে।

অমিতা। (অসীমের প্রতি) আপনিও যাবেন নাকি এখনই ওর সঙ্গে ?

অসীম। হ্যাঁ, আমাদের দুজনেরই ওখানে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন।

বারিদ। আমার ইচ্ছা আপনারা দুজনে একদিন আমার এখানেও রাত্রে আহার করেন।

অতনু। তাতে আর আপত্তি কি ? একদিন কেন—যে কয়দিন বল্‌বেন সন্তুষ্টচিত্তে সে কয়দিনই আস্‌ব—এ আর এমন কথা কি ?

অসীম। আচ্ছা, আজ তা হ'লে আমরা যাই।

নমস্কার করিয়া অসীম ও অতনুর প্রস্থান। অমিতা উভয়কে দ্বার পর্য্যন্ত দিয়া ফিরিয়া আসিল। বারিদ এই সময়টা চিন্তামগ্নচিত্তে বসিয়া ছিল।

বারিদ। (অমিতার পুনঃপ্রবেশে সচকিত হইয়া) ওঁরা চলে গেলেন, না অমিতা ? আচ্ছা অমিতা, তোমার এখন বিয়ে দেওয়া দরকার, না ? (অমিতা মুখ নামাইল) তোমার বাবা আর আমি বাল্যবন্ধু ছিলাম। ইণ্টারমিডিয়েট্ পাশের পর তোমার বাবা ডাক্তারি পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, আর আমি গেলাম জেনারল্ লাইনে। ডাক্তারী পাশের পর তোমার বাবা এলাহাবাদে গিয়ে প্রাকটিশ সুরু করেন। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ এবং চিঠিপত্র বন্ধ ছিল দুজনের মধ্যে। এলাহাবাদেই তোমার জন্ম। ওখানেই তোমার মা মারা যান, না ?

অমিতা। হ্যাঁ, আমার বছর চার-পাঁচ বয়সের সময়ে আমার মা মারা যান। সেকথা আমার এখনও মনে আছে।

বারিদবরণ। হঠাৎ একদিন এক চিঠি পেলাম তোমার বাবার কাছ থেকে—'আমি কল্‌কাতায় এসেছি। অত্যন্ত অসুস্থ, বোধ হয় বাঁচব না। অত্যন্ত জরুরি একটি কাজের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। অবশ্য আস্‌বে।' তক্ষুণি গেলাম তোমাদের বাড়ী। সত্যিই দেখ্‌লাম তোমার বাবা যক্ষ্মারোগে মরণাপন্ন। তোমার তখন বয়স বোধ হয় সাত-আট বছর।

অমিতা। না, তখন আমার বয়স ছিল ঠিক দশ বছর। সে দুর্দ্দিনের কথা মনে হ'লে এখনও শিউরে উঠি। আমার ভার কার ওপর দিয়ে যাবেন এই চিন্তাই বাবাকে তখন তাঁর রোগের থেকে বেশী যন্ত্রণা দিচ্ছিল। সে সময়ে আপনি এসে পড়াতে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। মারা যাবার আগের দিন বাবা বলেছিলেন, বারিদ আমার নিজের ভাইয়ের থেকেও বেশী। ওর ওপর তোমার ভার দিয়ে আমি যেন স্বস্তি পেলাম। ঠিক আমার মতই দেখো ওকে।

বারিদ। (এই কথা শুনিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন)—তোমার ভরণপোষণ এবং শিক্ষার জন্য যথেষ্ট টাকা তোমার বাবা আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল তোমার যেন একটি সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। সকলেই তোমার শিক্ষার প্রশংসা করে। বাকী আর একটি কাজ ছিল—একটি সৎপাত্র দেখে তার হাতে তোমাকে সম্প্রদান করা। তা এতদিনে ভগবানের কৃপায় তাও বোধ হয় জুটে গেল। মনে করছি, অসীম সব দিক থেকেই তোমার যোগ্যপাত্র। তুমিও অসীমকে মনে মনে ভালবাস, না অমিতা ?

অমিতা মুখ নীচু করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না

বারিদ। বুঝেছি মা। যাক্ এ কাজটা হ'লেই আমার ছুটি—আমি নিশ্চিন্ত, সমস্ত ভার থেকে আমি মুক্ত।

অমিতা। কেন, আমি কি আপনার ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছি কাকাবাবু ?

বারিদ। হাঃ, হাঃ, হাঃ—তুই আমার ভার অমিতা ? ওটা একটা কথার কথা বল্‌ছিলাম। তুই ত জানিস্ মা, তোকে ছেড়ে দিতে কত কষ্ট আমার। তবু কর্ত্তব্য কর্‌তে হবে।

অমিতা। আমি জানি কাকাবাবু, আপনি আমাকে কত ভালবাসেন।

বারিদ। আচ্ছা মা, দেখা যাবে বিয়ের পর কাকাবাবুকে কতখানি মনে থাকে। তুমি এবার তোমার ঘরে যাও, আমি এখন একটু একলা থাক্‌ব।

অমিতার প্রস্থান

শিশুর মত মন ! মনে করে আমি ওকে মেয়ের মত দেখি। তা যদি হতে পার্‌ত সে যেন হ'ত স্বর্গীয়। তা ত কই পারি না। ওর সুন্দর দেহের আকর্ষণে আমি যেন ক্রমশ পাগল হয়ে উঠ্‌ছি ; আমার মধ্যেকার সুপ্ত পশু জাগ্রত

হয়ে উঠেছে। তাকে যেন কিছুতেই বশে রাখ্‌তে পারছি না। না—কিছুতেই না—বন্ধুর অপমান আমি করব না, যেমন ক'রে হোক্ নিজেকে দমন করব। যত শীঘ্র পারি ওই অসীমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে চোখের থেকে দূরে সরিয়ে দেব। কাছে কাছে থাক্‌লে আর বেশীদিন নিজের পশুত্বকে চেপে রাখ্‌তে পারবো না।

যবনিকা পতন

চতুর্থ অঙ্ক

তিন মাসের কিছু পরের ঘটনা। অতনুর বাড়ী—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে সকলে ড্রয়িং রুমে বসিয়া ধূমপান এবং গল্প করিয়া সময় কাটাইতেছে। অতনু, যূথিকা ও অসীম

যূথিকা। তারপর অসীমবাবু, আগে ত বিয়ের নামে নাক কোঁচকাতেন। আজকাল এ বিষয়ে মত নিশ্চয়ই বদলেছেন!

অসীম। বিয়ের সময়ে ভেবেছিলাম হয় ত মত সত্যিই বদলাবে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই দেখ্‌ছি কি ভুলই করে বসেছি।

যূথিকা। কেন, দাম্পত্য কলহ চল্‌ছে বুঝি বর্ত্তমানে? তা আজকার সন্ধ্যাটা কিন্তু বেশ কাট্‌ল। এই সঙ্গে অমিতাও যদি থাক্‌ত আনন্দ লাগত আমাদের।

অতনু। সত্যিই অসীম, কি এমন দরকার পড়্‌ল অমিতার? আমি এত ক'রে ব'লে এলাম—

অসীম। তবে সব বলি শোন অতনু। এতক্ষণ প্রকৃত কারণ কিছুই বলিনি। তা শুন্‌লে তোমরা ব্যথা পাবে বলে। অতনু, বিয়ে করবার সময়ে ভেবেছিলাম কি সুখেই ভবিষ্যত জীবন কাটাব। মাত্র কয়েকদিনের পথের আলাপে সম্পূর্ণ অচেনা অমিতাকে ভাল ক'রে না জেনেই বিয়ে ক'রে যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছি, তার ফল এখন হাতে হাতে পাচ্ছি। বারিদবাবুর আচরণ তখনই আমার কেমন রহস্যময় লেগেছিল। ক্রমশ অমিতাও যেন আমার কাছে হয়ে উঠ্‌ছে একেবারে রহস্যে ভরা।

অতনু। তুমিও বোধ হয় সেই ছোঁয়াচ পেয়েছ। তোমার কথাবার্ত্তাগুলিও ত আমার কম রহস্যময় মনে হচ্ছে না। সব কথা পরিষ্কার ক'রে বল দেখি।

অসীম। বিয়ের পর মাস তিনেক বেশ সুখেই কাটিয়েছিলাম। কিন্তু তার পর থেকেই যেন অমিতা কি রকম বদলে যাচ্ছে। আমাকে যেন আজকাল সইতে পারে না। সব সময়ে আমাকে এড়িয়ে চল্‌তে পারলেই যেন সুখী হয়। সদাই একটা বিহ্বল ভাব। ও যেন নিজের মধ্যেই নেই। ওকে যেন অন্য কেউ চালাচ্ছে। যখন তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায় জিজ্ঞাসা করলে কিছুই উত্তর দেয় না। যেন ওসব প্রশ্নে ভয়ানক বিরক্ত হয়। আমিও আজকাল সেজন্য ওকে কখনও কিছু প্রশ্ন করি না ওর গতিবিধি সম্বন্ধে। এক দিন রাত বারোটার সময়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখি বিছানায় অমিতা নেই। ভাব্‌লাম হয় ত বাথরুমে গেছে। মিনিট পনের গেল তবুও আসে না। উঠে সমস্ত বাড়ী খুঁজে দেখ্‌লাম—কোথাও নেই। ভয়ানক চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লাম। আলো জ্বেলে বসে বসে ভাবতে লাগ্‌লাম কি করা যায়। সমস্ত দিন কলেজে লেক্‌চার দেবার পর কি রকম পরিশ্রম হয় বুঝতেই পার। কখন ঝিমোতে আরম্ভ করেছি। হঠাৎ 'খট্' ক'রে একটা আওয়াজ হওয়ায় চোখ চেয়ে দেখি অমিতা এসেছে। একটু বিরক্তভাবে বল্‌লাম—এত রাত্রে না বলে কোথায় গিয়েছিলে? বলে গেলে ত এসব হাঙ্গামো হয় না। কিন্তু ওর কানে যেন আমার কথা ঢুক্‌ল না। আমাকে যেন ও তখন চিন্‌তেই পারছে না এমন ভাব করল।

যূথিকা। বলেন কি? তারপর কি হ'ল?

অসীম। তারপর আলো নিভিয়ে দুজনেই শুয়ে পড়্‌লাম। হঠাৎ খানিকক্ষণ পরে জেগে উঠে দেখি অমিতা বালিশে মুখ চেপে গুঙ্গিয়ে গুঙ্গিয়ে কাঁদছে। উঠে বসে কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লাম কি হয়েছে বল অমিতা। অনেকক্ষণ এভাবে জিজ্ঞাসা করবার পর বল্‌ল—কে যেন আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সব কাজ করাচ্ছে। আমি যেন নিজের সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেল্‌ছি। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি হয়েছে খুলে বল, আমি সব ঠিক ক'রে দেব। তারপর বল্‌লাম—আজ এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে অমিতা?

অতনু। কি বললে?

অসীম। বল্‌লো—কিছুই আমার মনে নেই। তবে

কে যেন আমাকে মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে টানে, তখন আমার কোনই শক্তি থাকে না। আমার মনে হয়, কারা যেন আমার এবং তোমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করছে। তা থেকে রক্ষা পাবার শক্তি তোমার-আমার কারুরই নেই।

যূথিকা। কিছুই স্মরণ করতে পারল না অমিতা?

অসীম। না।

অতনু। পরদিন সকালে জিজ্ঞাসা করলে না কেন, কিছু মনে পড়ে কি-না?

অসীম। পরদিন এমন ভাব করল যেন রাত্রে আমার সঙ্গে ওর কোন কথাই হয় নি। একটু বেশ রুক্ষ আচরণ করল, আমিও তাতে বিরক্ত হয়ে আর কিছু বললাম না।

অতনু। এতে মান-অভিমানের স্থান নেই অসীম। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তোমার স্ত্রী এমন কোন বিপদে পড়েছেন যা পরিষ্কারভাবে বলবার শক্তি বা সাহস তাঁর নেই। তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে এর প্রকৃত কারণ। এবার থেকে রাত্রে একটু সজাগ থেকো। তোমার স্ত্রী যদি আবার রাত্রে বাইরে যান কোন দিন, নিঃশব্দে তাঁর অনুসরণ ক'রে দেখে আসবে প্রকৃত ব্যাপার কি। তারপর যথোচিত প্রতিবিধান করবার চেষ্টা করবে।

অসীম। তাতে কোন ফল হবে বলে তোমার মনে হয়?

অতনু। নিশ্চয়—এক্ষেত্রে সেই হচ্ছে ঠিক পথ।

অসীম। অনেক রাত হ'ল—আজ তা হ'লে উঠি।

অতনু। চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

যবনিকা পতন

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাত বারোটা। বারিদবরণের পড়িবার ঘর। নীল আলোকে ঘর আলোকিত—চারিদিকে একটু ভয়াবহ আবহাওয়া। বারিদবরণ চেয়ারে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

বারিদবরণ। (চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—টেবিলের উপরের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া) রাত বারোটা। এইবার ঠিক সময় হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী এখন নিদ্রামগ্ন। অমিতা হয় ত এখন সুখে স্বামীর পাশে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। কি অদ্ভুত শক্তি এই মেয়েটার। প্রায় মাস চারেক ধরে চেষ্টা করছি এখনও সম্পূর্ণভাবে আমার ইচ্ছার বশীভূত করতে পারছি না। আগে ত কাউকে এতদিন লাগেনি আমার মুঠার মধ্যে আনতে। এদিকে আমিও যেন আর পারছি না। আমার সমস্ত শক্তি যেন ক্ষয় হয়ে এসেছে। সব সময়েই যেন একটা ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করছি। যাক্, কাজ আরম্ভ করা যাক্। (খানিকক্ষণ ধ্যানমগ্নের মত চুপ করিয়া রহিলেন—তারপর অস্ফুটভাবে বলিতে লাগিলেন) অমিতা, তুমি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকো, আস্তে আস্তে উঠে আমার এখানে চলে এসো। জগতে কারো সাধ্য নেই তোমায় বাধা দেয়। তোমার ইচ্ছা না থাকলেও তোমাকে আসতেই হবে।··কিন্তু আজ এত দুর্ব্বল লাগ্ছে কেন? যেন একটা ভয় আস্ছে প্রাণে—যাক্, ওসব কিছু না। অমিতা, বারিদবরণের ডাক উপেক্ষা করবে এমন শক্তি তোমার নেই। (সামনের দিকে দুই হাত দোলাইয়া ডাকিতে লাগিলেন) এসো—এসো—এসো···

যবনিকা পতন

দ্বিতীয় দৃশ্য

অতনুর বাড়ী। রাত বারোটার কিছু বেশী। ড্রয়িংরুমে অতনু এবং অসীম।

অতনু। এই রাত্রে এরকম বিহ্বলভাবে হঠাৎ? কি ব্যাপার বল ত?

অসীম। অতনু, কি যে ব্যাপার আমি কিছুই বুঝছি না। আজ রাত্রে হঠাৎ দেখি অমিতা আবার কোথায় বেরোচ্ছে। কিছু না বলে আমিও নিঃশব্দে তার অনুসরণ করলাম। দেখি অমিতা এসে থামল বারিদবাবুর বাড়ী। এত রাত্রে বারিদবাবুর বাড়ীতে কি প্রয়োজন থাকতে পারে? কি করা যায়, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। তারপর স্থির করলাম, তোমার কাছে এসে পরামর্শ ক'রে যথাকর্ত্তব্য ঠিক করা যাবে।

অতনু। দেখ অসীম, প্রথম দিন থেকেই তোমার ঐ বারিদবরণটিকে আমার কেমন-কেমন লেগেছে। ওর ওই রহস্যপূর্ণ ভাব আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ ক'রে এসেছি। এখন যেন আমার মনে হচ্ছে, বারিদবরণই অমিতার এই

অবস্থার জন্য দায়ী। লোকটা হিপ্‌নোটিজম্ জানে। আমার মনে হচ্ছে ও অমিতাকে হিপ্‌নোটাইজ করে।

অসীম। কি উদ্দেশ্য নিয়ে ও কাজ করছেন উনি? কি স্বার্থ থাক্‌তে পারে এতে ওঁর?

অতনু। তা এখন পর্য্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। চল দুজনে যাই বারিদবরণের বাড়ী এবং সেই কথাটাই পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌ব। কত বড় শক্তিশালী এই বারিদবরণ আজ একবার দেখে নেব।

অসীম। আজ এই রাত্রেই যাবে?

অতনু। আজ না গেলে আর সহজে হাতে হাতে ধর্‌তে পারব না।

যবনিকা পতন

তৃতীয় দৃশ্য

বারিদবরণের বাড়ী

বারিদবরণের পড়বার ঘর, নীল আলোকে ঘর আলোকিত। দুটি চেয়ারে মুখোমুখি বারিদবরণ এবং অমিতা বসিয়া। অমিতা যেন আত্মচেতনাহীন। তীক্ষ্ণভাবে বারিদবরণ অমিতাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন

বারিদবরণ। অমিতা, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করবার তোমার সাহস আছে?

অমিতা। (যেন কলের ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে) না।

বারিদবরণ। আমাকে তুমি চিন্‌তে পারছ?

অমিতা। আপনি কাকাবাবু।

বারিদবরণ। তুমি কি বিবাহিত জীবনে সুখী?

অমিতা। হ্যাঁ, খুব সুখী।

বারিদবরণ। তুমি অসীমকে ভালবাস?

অমিতা। ভালবাসি।

বারিদবরণ। শোন অমিতা, তোমাকে মেয়ের মত পালন করেছিলাম কিন্তু তোমার দেহে যৌবন আসার সঙ্গে সঙ্গে আমারও প্রাণে জেগে উঠ্‌ল অতৃপ্ত ক্ষুধার আগুন। নিজেকে অনেক বোঝালাম—যাকে মেয়ের মত দেখে এসেছি তার সম্বন্ধে এরূপ কল্পনাও পাপ। কিন্তু আমার ভিতরকার পুরুষ এ কথায় সায় দিলে না। সে চাইল তোমার ভিতরকার নারীকে পেতে। নিজেকেই নিজে অনেক বোঝালাম। শেষে ভাব্‌লাম, তোমাকে দুরে সরিয়ে দিলেই এভাব কেটে যাবে। তাই তোমার বিয়ে দিলাম। কিন্তু দেখ্‌লাম তাতেও শান্তি পেলাম না। (স্বগত) কিন্তু উঃ, সমস্ত দেহে এ কি জ্বালা অনুভব করছি! মনে হচ্ছে যেন আজই আমার শেষ দিন উপস্থিত। (অনেক কষ্টে নিজেকে যেন আবার স্থির করিয়া লইলেন) যাক্ সে কথা। শোন অমিতা, তোমাকে আমি ভালবাসি। ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, তোমারও আমাকে ভালবাস্‌তে হবে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার শক্তি তোমার নেই। তোমাকে নিয়ে আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাব দুরে—বহু দুরে। সেখানে গিয়ে তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধব নূতন ক'রে। বুঝেছ? তোমাকে যেতে হবে অনেক দুরে আমার সঙ্গে।

অমিতা। বুঝেছি, যাব আপনার সঙ্গে অনেক দুরে।

বারিদবরণ। কিন্তু এ কি জ্বালা! সমস্ত দেহ যেন পুড়ে যাচ্ছে!

কে দরজায় ধাক্কা দিল

বারিদবরণ। কে? কে এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা দেয়? না—না—আমারই ভুল—আমারি ভুল। কে আবার আসবে এত রাত্রে!

আবার দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ

না, সত্যিই ত কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে—তবে কি···

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে অসীম এবং অতনুর সম্মুখে পড়িলেন। ভয়ে তাঁর মুখ নীল হইয়া গেল। সমস্ত দেহ যেন উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল

বারিদবরণ। এত রাত্রে কি প্রয়োজন এখানে?

অতনু। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা আসিনি। আমরা জান্‌তে চাই, কিসের জন্যে এত রাত্রে অমিতাকে এখানে এনেছেন?

বারিদবরণ। তোমার কাছে সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই। এক্ষুনি এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার বাড়ী থেকে দুর হও। তা না হ'লে যোগ্য শাস্তি পাবে।

অতনু। সাবধান বারিদবরণ, আমাকে ভয় দেখাতে এসো না। আমি দুর্ব্বলচিত্ত কাপুরুষ নই যে, আমাকে

চোখ রাঙিয়ে যা বল্‌বে তাই কর্‌ব তোমার পোষা কুকুরের মত। শোন, অমিতা কোথায় আছে শীগ্‌গির তাকে এনে দাও…যাও…

বারিদবরণ বাহিরের দিকে হাত দেখাইয়া বাহির হইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিতে গেলেন। দুই বার প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন দম লইবার, তাহার পর টলিয়া পড়িলেন

অসীম। (ব্যস্ত হইয়া) এ কি ব্যাপার? (বারিদের দেহের কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া) অতনু, He is dead!

অতনু। ক্ষমতার অতিরিক্ত শক্তি দেখাতে গেলে হিপ্‌নোটিষ্টদের পরিণাম অনেক সময়েই এরকম হয়। শয়তানের সাজা একেই বলে। চল, এখন অমিতাকে দেখি গিয়ে…

উভয়ে ঘরে ঢুকিল। অমিতার বিহ্বল ভাব যেন আস্তে আস্তে কাটিয়া আসিতেছে। অসীম অমিতার কাছে গেল। অমিতা চোখ খুলিয়া অসীমের দিকে চাহিল। আস্তে আস্তে ভোরের আলো ঘরে ঢুকিতেছে। অমিতা অবাক্ হইয়া চারিদিকে চাহিল। তারপর একবার অতনুর দিকে চাহিয়া অসীমকে জিজ্ঞাসা করিল

অমিতা। এ কি? আমি কোথায়?

অসীম। এতক্ষণ বোধ হয় নরকেই ছিলে। চল, এবার বাড়ী যাই। চল অতনু…

যবনিকা পতন

পদ্মবন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

(মাঠের পথে যাইতে দেখিলাম দীঘীটি একেবারে পদ্মবনে পরিণত হইয়াছে। শোভায় ও গন্ধে মুগ্ধ হইলাম)

দীঘিভরা কমনীয় পদ্মের বন—
অধিকার করে নিল মোর সারা মন।
পত্রের কি বাহার!
শুকোদর সুকুমার!
নিবিড় শোভায় একি শিবির রচন।

২

মিলিল—সহসা শুভ যাত্রার ফল—
আমার নয়নে শত নয়ন কমল।
ভ্রমর বাঁধিছে চাক্
পাখীদের হাঁক ডাক
এত বড় উৎসব দেখা যে বিরল।

৩

জীবনে পেলাম এক স্মরণীয় ক্ষণ
মরু মাঝে সুমেরুর সোনার স্বপন।
বলে কে হতশ্রী—?
অতিথি কমলাগৃহে,—
দেবতার দৃষ্টিতে—তিলেক যাপন!

৪

শোভার সায়রে একি মরকত দ্বীপ!
শেষ পুণ্যেতে হৃত খণ্ড ত্রিদিব।
যেন সাধকের হৃদি
ধন্য করিছে ক্ষিতি,
মুকুলিত ভালবাসা মূর্ত্ত সজীব।

৫

পলকের প্রীতি বুকে রেখে গেল দাগ
মনকে রঙায়ে দিল পদ্ম পরাগ।
আছে আর কি অভাব
সরোজ স্বরাজ লাভ,
পদ্মরাগের খনি আমারি বেবাক।

৬

কমল কানন পানে চাই যতবার
কমলে কামিনী রাজে যেন মাঝে তার।
যেথা শোভা আছে যত
চরণেতে হয় নত
পদ্ম বাড়ায় পাদপদ্ম বাহার।

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

মধ্যমা জাতি

এই জাতিতে গান্ধার ও নিষাদ ভিন্ন অপর পাঁচটি (স রি ম প ধ) স্বরের যে কোন একটি অংশ ও গ্রহস্বর হইতে পারে। এই জাতিতে ষড়জ ও মধ্যম স্বরের বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাতে গান্ধারের ব্যবহার অল্প, এই জাতি গান্ধার লোপে ষাড়ব এবং নিষাদ ও গান্ধারের লোপে ঔড়ুব হইয়া থাকে। ইহার কলা আটটি, প্রত্যেকটি কলায় পূর্ব্বোক্তরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করিতে হয়। মূর্চ্ছনা ঋষভাদি তাল চঞ্চৎপুট। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ধ্রুবা গানরূপে ইহা প্রযুক্ত হয়। মধ্যম ইহার ন্যাসস্বর। যখন যেটি অংশ স্বর হয় সেই স্বরটিই তখন অপন্যাস স্বরও হইয়া থাকে। এই জাতির গান কালে শুদ্ধ ষাড়ব, দেশী ও আন্ধালী এই সদৃশ রাগগুলির ছায়া-পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এই জাতির প্রস্তার লিখিত হইতেছে—

এই জাতির ও কলা সমূহে অষ্ট লঘু যোজনা পূর্ব্বের ন্যায়ই করিতে হইবে, যথা—

প্রথম কলায়—মা ১ + মা ১ + মা ১ + মা + পা ১ + মিলিত ধনি ১ + নী ১ + মিলিত ধপ ১ = ৮, এইরূপে অষ্ট লঘু যোজিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কলায়—অষ্ট লঘু প্রয়োগ নিম্নলিখিতরূপে করা হইয়াছে। মা ১ + মিলিত পম ১ মা + সা ১ + মা ১ + গা ১ + রী ১ + রী ১ = ৮।

তৃতীয় কলায়—নিম্নলিখিতরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে—১ + মা মা ১ + মিলিত রিম ১ + মিলিত গম ১ + মা ১ + মা ১ + মা ১ + মা ১ = ৮।

মধ্যমা জাতির প্রস্তার

মা	মা	মা	মা	পা	ধনি	নী	ধপ	১
পা	০	০	তু	ভ	ব০	মূ	০০	
মা	পম	মা	সা	মা	গা	রী	রী	২
র্দ্ধ	জা০	০	০	ন	নং	০	০	
পা	মা	রিম	গম	মা	মা	মা	মা	৩
কি	রী	ট০	০০	০	০	০	০	
মা	নিধ	নিস	নিধ	পম	পধ	মা	মা	৪
ম	ণি০	দ০	০০	র্প০	০০	ণং	০	
নী	নী	রী	রী	নী	রী	রী	পা	৫
গৌ	০	রী	০	ক	র	প	০	
নী	মপ	মা	মা	সা	সা	সা	সা	৬
ল্ল	বাং০	০	০	শু	লি	০	সু	
র্গা	নী	র্সা	র্গা	ধপ	সা	ধনি	র্সা	৭
তে	০	০	০	০০	০	জি০	তং	
পা	র্সা	পা	নিধপ	মা	মা	মা	মা	৮
সু	কি	র	০০০	ণং	০	০	০	

চতুর্থ কলায়—মা ১+মিলিত নিধ ১+মিলিত নিস ১+ মিলিত নিধ ১+মিলিত পম ১+মিলিত পধ ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮ এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করিতে হইবে।

পঞ্চম কলায়—নী°-নী°-রী-রী-নি-রী-রী-পা এই আট স্বরের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া আটটি লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ কলায়—নী ১+মিলিত মপ ১+মা ১+মা ১+সা ১+সা ১+সা ১+সা ১=৮ এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

সপ্তম কলায়—গা' ১+নী ১+সা' ১+গা' ১+মিলিত ধপ ১+সা ১+মিলিত ধনি +সা ১=৮ এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

অষ্টম কলায়—পা ১+সা' ১+পা ১+মিলিত নিধপ ১+মা ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করিতে হইবে।

যে পদ্যটি পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তারে পরিণত করা হইয়াছে সে পদ্যটি এই—

পাতুভব মূর্দ্ধজাননং কিরীট মণি দর্পণম্।
গৌরীকর পল্লবাঙ্গুলি স্তুতোজিতং সুকিরণম্॥

পঞ্চমী জাতি

এই জাতিতে ঋষভ ও পঞ্চম এই দুইটি স্বরের যে কোন একটি অংশ স্বর হইয়া থাকে। সগ ও ম এই তিনটি স্বরের এই জাতিতে স্বল্প প্রয়োগ হয়। ঋষভ ও মধ্যমের সঙ্গতি। সম্পূর্ণ অবস্থায় এই জাতিতে গান্ধার—নিষাদেরও সঙ্গতি হইয়া থাকে। অংশ স্বর ঋষভ হইলে এই জাতি ঔড়ুব হয় না। এই জাতি গান্ধার বর্জ্জনে ষাড়ব ও নিষাদ-গান্ধার বর্জ্জনে উড়ুব হয়। ইহারও কলা আটটি। মূর্চ্ছনা ঋষভাদি, তাল চঞ্চৎপুট। পঞ্চম ন্যাস স্বর, ঋষভ, পঞ্চম ও নিষাদ ইহাদের যে কোনও একটি অপন্যাস স্বর হইয়া থাকে। শুদ্ধ পঞ্চম, দেশী ও আন্ধালী রাগে এই জাতির ছায়া পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ইহার প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে—

এই প্রস্তারে কিরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে তাহা পর পৃষ্ঠায় দেখান হইল :—

পঞ্চমী জাতির প্রস্তাব

পা	ধনি	নী	নী	মা	নী	মা	পা	১
হ	র০	মূ	০	র্দ্ধ	জা	০	ন	
গা	গা	সা	সা	মা°	মা°	পা°	পা°	২
নং	ম	হে	০	শ	ম	ম	র	
পা°	পা°	ধা°	নী°	নী°	নী°	গা	সা	৩
প	তি	বা	০	হু	স্ত	০	স্তু	
পা	মা	ধা	নী	নিধ	পা	পা	পা	৪
ন	ম	নং	০	তং	০	০	০	
পা	পা	রী'	রী'	রী'	রী'	রী'	বী'	৫
প্র	ণ	মা	০	মি	পু	রু	ষ	
মা	নিঁগ	সা	সধ	নী	নী	নী	নী	৬
মু	খ০	প	দ্ম০	০	ল	০	ক্ষ্মী	
সা'	সা	সা'	মা	পা	পা	পা	পা	৭
হ	র	ম	০	স্থি	কা	০	পা	
ধা	মা	ধা	নী	পা	পা	পা	পা	৮
তি	ম	জে	০	য়ং	০	০	০	

প্রথম কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা এইরূপ - পা ১+ধনি ১+নী ১+নী ১+মা ১+নী ১+মা ১+পা ১=৮।

দ্বিতীয় কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা—গা ১+গা ১+সা ১+সা ১+মা ১+মা ১+পা ১+পা ১=৮।

তৃতীয় কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা—পা ১+পা ১+ধা ১+নী ১+নী ১+নী ১+গা ১+সা ১=৮।

চতুর্থ কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা—পা ১+মা ১+ধা ১+নী ১+নিধ ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮।

পঞ্চম কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা—পা ১+পা ১+রী′ ১+রী′ ১+রী′ ১+রী′ ১+রী′ ১+রী′ ১=৮।

ষষ্ঠ কলায়—মা′ ১+নিগ ১+সা ১+সধ ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮।

সপ্তম কলায়—সা ১+সা ১+সা ১+মা ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮।

অষ্টম কলায়—ধা ১+পা ১+ধা ১+নী ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮।

নিম্নলিখিত শ্লোকের উপর প্রস্তার করা হইয়াছে—

হরমূর্দ্ধজাননং মহেশমমরপতি বাহুস্তম্ভনমনন্তম্।
তং প্রণমামি পুরুষমুখপদ্মলক্ষ্মীহরমম্বিকা পতিমজেয়ম্॥

ধৈবতী জাতি

ধৈবতী জাতিতে ঋষভ ও ধৈবত এই দুইটি স্বরের মধ্যে যে কোন একটি অংশ ও গ্রহ স্বর হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ অবস্থায় এই জাতিতে আরোহি বর্ণগত 'স' ও 'প' স্বর অল্পতররূপে অর্থাৎ লঙ্ঘনের নিয়মে প্রয়োগ করিতে হয়। আর আরোহি বর্ণে স ও প স্বর অল্পরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। স্বর সমূহের এই অল্পতর ও অল্প প্রয়োগের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে জাতি সমূহের সাধারণ লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। এই জাতি পঞ্চম লোপে ষাড়ব এবং ষড়জ ও ও পঞ্চমের লোপে ঔড়ুব হইয়া থাকে। ষড়জ গ্রামের ঋষভাদি অভিরুদ্‌গতা মূর্চ্ছনা--রে গা মা পা ধা নি সা—সানি ধাপা মাগারে। তাল, মার্গ গীতি ও বিনিয়োগ ষাড়জী জাতির ন্যায়। ইহার ন্যাস স্বর ধৈবত, ঋষভ মধ্যম ধৈবত এই তিনটি স্বরের মধ্যে যে কোন একটি অপন্যাস স্বর হইয়া থাকে। শুদ্ধ কৈশিক, দেশী ও সিংহলী রাগে এই জাতির ছায়া পরিলক্ষিত হয়। এই জাতির কলা দ্বাদশটি, প্রত্যেকটি কলায় পূর্ব্বোক্তরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করিতে হয়। নিম্নে এই জাতির প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে—

ধা	ধা	নিধ	পধ	মা	মা	মা	মা	১
ত	রু	না০	০০	ম	লে	০	ন্দু	
ধা	ধা	নিধ	নিস	সা	সা	সা	সা	২
ম	নি	ভু০	০০	ষি	তা	০	ন	
সধ	ধা	পা	মধ	ধা	নিধ	ধনি	ধা	৩
ল০	শি	রো	০০	০	০০	জ০	০	
সা	সা	রিগ	রিগ	সা	রিগ	সা	সা	৪
ভু	জ	গা০	০০	ধি	পৈ০	০	ক	
ধা·	ধা·	নী·	পা·	ধা·	পা·	মা·	মা·	৫
কু	০	ণ্ড	ল	বি	লা	০	স	
ধা·	ধা·	পা·	মধ·	ধা·	নিধ·	ধনি·	ধা	৬
ক্র	ত	শো	০০	০	০০	ভং০	০	
ধা	ধা	নিস	নিস	নিধ	পা	পা	পা	৭
ন	গ	সু০	০০	মু০	ন	০	ক্ষী	

রিগ	সা	সা	সা	নী	নী·	নী·	নী·	৮
দে০	হা	০	০	র্দ্ধ	মি	০	শ্রি	
সা	রিগ	রিগ	সা	নী'	সা	ধা	ধা	৯
ত	শ০	রী০	০	০	০	র	০	
রী·	গরি·	মগ·	মা·	মা·	মা·	মা·	মা·	১০
প্র	ণ •	মা০	০	মি	ভূ	০	ত	
নী	নী	ধা	ধা	পা	রিগ	সা	রিগ	১১
গী	০	তো	০	প	হা০	০	র০	
পা	ধা	সা	মা	ধা	নী	ধা	ধা	১২
প	রি	তু	০	০	০	ষ্টং	০	

উপরিলিখিত প্রস্তারে অষ্ট লঘু যোজনা নিম্নলিখিত প্রণালীতে করা হইয়াছে—

প্রথম কলায়—ধা ১+ধা ১+নিধ ১+পধ ১+মা ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮।

দ্বিতীয় কলায়—ধা ১+ধা ১+নিধ ১+নিস ১+সা ১+সা ১+সা ১+সা ১=৮।

তৃতীয় কলায়—সধ ১+ধা ১+পা ১+মধ ১+ধা ১+নিধ ১+ধনি ১+ধা ১=৮।

চতুর্থ কলায়—সা ১+সা ১+রিগ ১+রিগ ১+সা ১+রিগ ১+সা ১+সা ১=৮।

পঞ্চম কলায়—ধা ১+ধা ১+নী ১+পা ১+ধা ১+পা ১+মা ১+মা ১=৮।

ষষ্ঠ কলায়—ধা ১+ধা ১+পা ১+মধ ১+ধা ১+নিধ ১+ধনি ১+ধা ১=৮।

সপ্তম কলায়—ধা ১+ধা ১+নিস ১+নিস ১+নিধ ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮।

অষ্টম কলায়—রিগ ১+সা ১+সা ১+সা ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮।

নবম কলায়—সা ১+রিগ ১+রিগ ১+সা ১+নী ১+সা ১+ধা ১+ধা ১=৮।

দশম কলায়—রী ১+গা রি ১+মগ ১+মা ১+মা ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮।

একাদশ কলায়—নী ১+নী ১+ধা ১+ধা ১+পা ১+রিগ ১+সা ১+রিগ ১=৮।

দ্বাদশ কলায়—পা ১+ধা ১+সা ১+মা ১+ধা ১+নী ১+ধা ১+ধা ১=৮।

নিম্নলিখিত পদ্যটির উপরে এই প্রস্তার করা হইয়াছে—

তরুণামলেন্দুমণিভূষিতামলশিরোজং,
ভুজগাধিপৈক কুণ্ডলবিলাসকৃতশোভং
নগসুনুলক্ষ্মী দেহার্দ্ধ মিশ্রিতশরীরং
প্রণমামি ভূতগীতোপহার পরিতুষ্টম্।

নৈষাদী জাতি

এই জাতিতে নিষাদ, ঋষভ ও গান্ধার এই তিনটি স্বরের যে কোনও একটি অংশ স্বর হইয়া থাকে। যখন যেটি অংশ স্বর হয় তখন তাহার বহুল প্রয়োগ এবং অপর স্বরগুলির অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়াগ হইয়া থাকে। এই জাতিতে ষাড়ব ঔড়ব ও লঙ্ঘনের নিয়ম ধৈবতী জাতির ন্যায়, বিনিয়োগ ষাড়জী জাতির ন্যায়। ইহার তাল চঞ্চৎপুট, কলা ষোলটি মূর্চ্ছনা ষড়জ গ্রামে গান্ধারাদি। নিষাদ ন্যাস স্বর, অংশ স্বরগুলিই অপন্যাস স্বর হইয়া থাকে। শুদ্ধ সাধারিত, দেশী ও বেলাবলী রাগে এই জাতির ছায়া পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে।

নী	নী	নী	নী	সা	ধা	নী	নী	১
তং	০	স্থ	র	ব	০	ন্দি	ত	
পা	মা	সা	ধা	নী	নী	নী	নী	২
ম	হি	য	ম	হা	০	স্থ	র	
সা	সা	গা	গা	নী	নী	ধা	নী	৩
ম	থ	ন	মু	মা	০	প	তিং	
র্সা	সা'	ধা	নী	নী	নী	নী	নী	৪
ভো	০	গ	যু	তং	০	০	০	
সা	সা	গা	গা	মা	মা	মা	মা	৫
ন	গ	স্থ	ত	কা	০	মি	নী	
নী	পা	ধা	পা	মা	মা	মা	মা	৬
দি	০	ব্য	বি	শে	০	ষ	ক	
রী	র্গা	র্সা	র্সা	রী'	র্গা	নী	নী	৭
স্থ	০	চ	ক	শু	ভ	ন	থ	
নী	নী	পা	ধ নি	নী	নী	নী	নী	৮
দ	০	র্প	ণ '	কং	০	০	০	
সা	সা	গা	সা	মা	মা	মা	মা	৯
অ	হি	মু	থ	ম	নি	থ	চি	
সা	সা	সা	সা	নী	ধা	সা	সা	১০
তো	০	জ্জ্ব	ল	নূ	০	পু	র	
ধা	ধা	নী	নী	রী	গা	মা	মা	১১
বা	ল	০	ভু	জ	ঙ্গ	০	ম	
মা	মা	পা	ধা	নী	নী	নী	নী	১২
র	ব	ক	লি	০	তং	০	০	
পা	পা	নী	নী	রী	রী	রী	রী	১৩
দ্রু	ত	ম	ভি	ব্র	জা	০	মি	
রী	মা	মা	মা	রী	গা	সা	সা	১৪
শ	ব	ণ	ম	নি	০	ন্দি	ত	
ধা	ধা	রী	গা	সা	ধা	নী	নী	১৫
পা	০	দ	যু	গ	প	০	ঙ্ক	
র্পা	র্মা	রী'	র্গা	নী	নী	নী	নী	১৬
জ	বি	লা	০	সং	০	০	০	

এই নৈষদী জাতিতে নিম্নলিখিতরূপে অষ্ট লঘু যোজন করা হইয়াছে।

প্রথম কলায়—নী ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ + তার সা ১ + ধ ১ + নী ১ + নী ১ = ৮।

দ্বিতীয় কলায়—পা ১ + মা. ১ + সা ১ + মন্দ্র ধা ১ + মন্দ্র নী ১ + মন্দ্র নী ১ + মন্দ্র নী ১ + মন্দ্র নী।

তৃতীয় কলায়—সা ১ + সা ১ + গা ১ + গা ১ + নী ১ + নী ১ + ধা ১ + নী ১ = ৮।

চতুর্থ কলায়—তার সা ১ + তার সা ১ + ধা ১ + পাঁচটি নী ৫ = ৮।

পঞ্চম কলায়—দুইটি সা ১ + ১ = ২ + দুইটী গা ১ + ১ = ২ + চারিটি মন্দ্র মা ৪ = ৮।

ষষ্ঠ কলায়—নী পা ধা পা মা মা মা মা এই আটটি মন্দ্র স্বরে লঘু = ৮।

সপ্তম কলায়—রী' ১ + গা' ১ + সা' ১ + সা' ১ + রী ১ + গা' ১ + নী ১ + নী ১ = ৮।

অষ্টম কলায়—নী ১ + নী ১ + পা ১ + ধ নি ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ = ৮।

নবম কলায়—সা ১ + সা ১ + গা ১ + সা ১ + মা ১ + ম ১ + মা ১ + মা ১ = ৮।

দশম কলায়—মন্দ্র মা ১ + মা ১ + মা ১ + মা ১ + নী ১ + ধ ১ + মা ১ + মা = ৮।

একাদশ কলায়—ধা ১ + ধা ১ + নী ১ + নী ১ + রী ১ + গ ১ + মা ১ + মা ১ = ৮।

দ্বাদশ কলায়—মন্দ্র মা ১ + মা ১ + পা ১ + ধা ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ = ৮।

ত্রয়োদশ কলায়—পা ১ + পা ১ + নী ১ + নী ১ + রী ১ + রী ১ + রী ১ + রী ১ = ৮।

চতুর্দ্দশ কলায়—রী ১+মা ১+মা ১+মা ১+রী ১+গা ১+সা ১+সা ১=৮।

পঞ্চদশ কলায়—ধা ১+মা ১+রী ১+গা ১+সা ১+ধা ১+নী ১+নী ১=৮।

ষোড়শ কলায়—তার পা′ ১ মা′ ১ রী′ ১ গা′ ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮।

নৈষাদী জাতির উল্লিখিত প্রস্তারটি নিম্নলিখিত পদ্যের উপর রচনা করা হইয়াছে।

তং সুরবন্দিত মহিষ মহাসুর মথনমুমাপতিং ভোগযুতম্,
নগসুত কামিনী দিব্য বিশেষক সূচক শুভনখদর্পণকম্।
অহিমুখমণিখচিতোজ্জ্বল নূপুর বালভুজঙ্গমরবকলিতং
ক্রতমভিব্রজামি শরণমনিন্দিত পাদযুগপঙ্কজবিলাসম্॥

ষাড়জী জাতি হইতে এই নৈষাদী জাতি পর্য্যন্ত যে সাতটি জাতির প্রস্তার প্রদর্শিত হইল এই সাতটি শুদ্ধ জাতি। অতঃপর শুদ্ধ জাতির পরস্পর সংসর্গে যে বিকৃত জাতিগুলি উৎপন্ন হয়, তাহাদের লক্ষণ ও প্রস্তার লিখিত হইতেছে—

ষড়জ কৈশিকী জাতি

এই জাতিতে ষড়জ, গান্ধার ও পঞ্চম এই তিনটি স্বরের যে কোনও একটি অংশ স্বর হইয়া থাকে। ঋষভ ও মধ্যম স্বরের অল্পত্ব, ধৈবত ও নিষাদ স্বরের অংশস্বর (স গ প) অপেক্ষা অল্পত্ব এবং ঋ ও ম অপেক্ষা বহুত্ব ব্যবহৃত হয়। তাল চঞ্চৎপুট, কলা ষোলটি, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রাবেশিকী ধ্রুবারূপে এই জাতির বিনিয়োগ বা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। গান্ধার ইহার ন্যাসস্বর, ষড়জ, নিষাদ ও পঞ্চম অপন্যাস স্বর। গান্ধার-পঞ্চম, হিন্দোল, দেশী ও বেলাবলী রাগে এই জাতির সাদৃশ্যমূলক ছায়া পরিলক্ষিত হয়। এই জাতির প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে

সা	সা	মা	পা	গরি	সগ	মা	মা	১
দে	०	०	०	০০	০০	०	०	
মা	মা	মা	মা	সা	সা	সা	সা	২
বং	०	०	०	०	०	०	०	
ধা	ধা	পা	পা	ধা	ধা	রী	রিম	৩
অ	স	ক	ল	শ	শি	তি	ল০	
নী	রী	নী	নী	নী	নী	নী	নী	৪
ধা	ধা	পা	ধনি	মা	মা	পা	পা	৫
দ্বি	র	দ	গ০	তিং	०	०	०	
ধা	ধা	পা	ধনি	ধা	ধা	পা	পা	৬
নি	পু	ণ	ম০	তিং	०	०	०	
সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	৭
মু	०	গ্ধ	०	মু	খা	०	ম্বু	
ধা	ধা	পা	ধা	ধনি	ধা	ধা	ধা	৮
রু	হ	দি	०	ব্য০	কা	०	স্তিং	
সা	সা	সা	রিগ	সা	রিগ	ধা	ধা	৯
হ	র	ম	০০	ম্বু	দো০	०	দ	
মা	ধা	পা	পা	ধা	ধা	নী	নী	১০
ধি	নি	না	०	দং	०	०	०	
রী	রী	গা	সা	সা	সা	সা	গা	১১
অ	চ	ল	ব	র	সূ	०	নু	
ধা	রিস	রী	সরি	রী	সা	সা	সা	১২
দে	০০	হা	০০	র্দ্ধ	মি	०	শ্রি	
সা	সরি	রী	সরি	রী	সা	সা	সা	১৩
ত	শ০	রী	০০	রং	०	०	०	
মা	মা	মা	মা	নিধ	পধ	মা	মা	১৪
প্র	ণ	মা	०	মি০	তম	হং	•	
নী	নী	পা	পম	পা	পম	পধ	রিগ	১৫
অ	নু	প	ম০	মু	খ০	ক০	ম০	
গা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	১৬
লং	०	०	०	०	०	०	०	

এই প্রস্তার অষ্টলঘু যোজনা নিম্নলিখিতরূপে করা হইয়াছে।

১ম কলায়—সা ১+সা ১+মা ১+পা ১+গরি ১+মগ ১+মা ১+মা ১=৮

২য় কলায়—মা ১+মা ১+মা ১+মা ১+সা ১+সা ১+সা ১+সা ১=৮

৩য় „ —ধা ১+ধা ১+পা ১+পা ১+ধা ১+ধা ১+রী ১+রিম ১=৮

৪র্থ „ —রী ১+রী ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮

৫ম „ —ধা ১+ধা ১+পা ১+ধ নি ১+মা ১+মা ১+পা ১+পা ১=৮

৬ষ্ঠ „ —ধা ১+ধা ১+পা ১+ধনি ১+ধা ১+ধা ১+পা ১+পা ১=৮

৭ম „ আটটি 'সা' স্বরে একটি করিয়া অষ্টলঘু যোজিত হইতেছে।

৮ম „ —ধা ১+ধা ১+পা ১+ধা ১+ধনি ১+ধা ১+ধা ১+ধা ১=৮

৯ম „ —সা ১+সা ১+সা ১+রিগ ১+সা ১+রিগ ১+ধা ১+ধা ১=৮

১০ম „ —মা ১+ধা ১+পা ১+পা ১+ধা ১+ধা ১+নী ১+নী ১=৮

১১শ „ —রী ১+রী ১+গা ১+সা ১+সা ১+সা ১+সা ১+গা ১=৮

১২শ „ —ধা ১+রিস ১+রী ১+সরি ১+রী ১+সা ১+সা ১+সা ১=৮

১৩শ „ —সা ১+সরি ১+রী ১+সরি ১+রী ১+সা ১+ +সা ১+সা ১=৮

১৪শ „ —মা ১+মা ১+মা ১+মা ১+ নিধ ১+পধ ১+মা ১+মা ১=৮

১৫শ „ —নী ১+নী ১+পা ১+পম ১+পা ১+পম ১+পধ ১+রিধ ১=৮

১৬শ „ আটটি 'গা' স্বরে একটি করিয়া অষ্টলঘু যোজনা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত পদ্যের উপরে প্রস্তার করা হইয়াছে।

দেবমসকলশশিতিলকং দ্বিরদ গতিং
নিপুণমতিং মুগ্ধমুখাম্বুরুহ দিব্যকান্তিম্।
হরমম্বুদোদধি নিনাদমচল বর সুন্দেহার্দ্ধ-
মিশ্রিত শরীরং
প্রণমামি তমহমনুপমমুখকমলম্॥

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

রজনী-জাগর-রাগ নয়নে তোমার!
ওষ্ঠপুটে প্রণয়ের স্মৃতিচিহ্নখানি
রয়েছে অঙ্কিত; চূর্ণ চিকুরসম্ভার
অসম্বৃত; চেলাঞ্চল কেন নাহি জানি
বিলোল শিথিল। গতি—শ্লথ মদালস
কেলিশ্রান্ত ক্লান্তপক্ষ কলহংসী প্রায়
মন্দাকিনী তটে! আজি সারাটি দিবস
যামিনীর নর্ম্মলীলা স্মরি' বুঝি হায়,
হৃদয় হয়েছে তব ব্যাকুল উদাস।
তাই নাহি বিম্বাধরে কলহাস্য রেখা
ফেলিতেছ নিরজনে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,—
মুছে গেছে অশ্রুধারে কজ্জলের লেখা
আঁখিকোণে? মুছে ফেলি' নিশীথ স্বপন
এবে সখি, কর্ম্মস্রোতে ঢালো প্রাণমন!

শ্রীমাকড়সা

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর

আমার এই কাহিনীর starting point, অর্থাৎ কি-না, সূত্রপাত হইল একটী কুষ্মাণ্ড। আপনারা হাসিতেছেন—হাসিবারই কথা। নারী, প্রেম, রেস, সুরা, খুন, ডাকাতী, রাহাজানি ইত্যাদি অনেক জিনিস লইয়া গল্প লেখা হইয়াছে। কিন্তু এমন গল্প আপনারা কখনও পড়েন নি, যার গোড়াকার কথা হইল কুমড়ো। বুঝুন কতখানি নতুনত্ব ইহার মধ্যে রহিয়াছে। এটী আবার যে-সে কুষ্মাণ্ড নহে—"আগরপাড়া কৃষি-প্রদর্শনী"র প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত কুষ্মাণ্ড। এত বড় কুষ্মাণ্ড নাকি বাঙ্গলা দেশে শুধু বাঙ্গলা দেশে কেন, ভারতবর্ষে কখনও উৎপন্ন হয় নাই। এই নীরস আরম্ভের পরিণতি কি ভীষণ exciting, আপনারা এখন কল্পনা করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই অতি-বৃহৎ কুষ্মাণ্ডের জন্য বাঙ্গলাদেশের এই সর্ব্বজনবিদিত লেখক প্রায় কালের করতলগত হইয়াছিল আর কি! নিশ্চয়ই এইবার আপনাদের গল্পটী শুনিতে ভয়ানক ইচ্ছা হইতেছে, না?

আমাকে তখনকার দিনে কেউ চিনিত না বটে, কিন্তু এখন সকলেই চেনে। আমার পরিচয়টা আপনাদের কাছে আগে হইতে দিয়া রাখি। পাঠকদের কাছে নিজেকে গোপন রাখা আমি পছন্দ করি না। আমার নাম সেবক শ্রীগোপীজনবল্লভপদরেণু দাস-ঘোষ মহাশয়। চিনিতে পারিলেন? না পারিবারই কথা। এটী আমার পৈত্রিক নাম। সাহিত্যক্ষেত্রে এ নাম অচল। তাই আমার এখনকার নাম—"শ্রীমাকড়সা"। এবার নিশ্চয়ই চিনিয়া ফেলিয়াছেন। এ নামে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধাবনিতা আমার লেখা বই পড়ে। পথে-ঘাটে-মাঠে আমার বইয়ের পাতা আপনি দেখিতে পাইবেন। খেলার মাঠে ও ঘোড়দৌড়ে আমার লেখা বইয়ের পাতায় চিনের বাদাম বিক্রয় হয়। বলুন—এত publicity আর কোনও লেখক কখনও পাইয়াছেন কি? 'রহস্যজাল' সীরিজ আমারই সম্পাদিত। তাদের সব বইই প্রায় আমারই রচিত। "টিকটিকির টিটকারী", "জালিয়াৎ রাজার সাজা", "সাপে-নেউলে" ইত্যাদি এ সবই আপনারা পড়িয়াছেন। সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক।

অবশ্য যখনকার ঘটনা আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি তখন আপনারা আমায় চিনিতেন না। আমি তখন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম reporter.—"হুক্কাহুয়া" কাগজে কাজ করি। সে সময় ওর চেয়ে নামজাদা কাগজ আর ছিল না। মাস দু-তিন অন্তর আমাকে তাঁরা টাকা পঁচিশেক দিতেন। দৈনিক দু-আনা চার-আনা তখনকার দিনে দেওয়া চলিত না। সম্পাদক মহাশয় কিন্তু বেশ মোটা রকম মাহিনা পাইতেন—বোধ হয় পঁচিশের পিঠে শূন্য। তাঁর নাম আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। দুঃখের বিষয় তিনি আমার রচনার তারিফ করা তো দূরে থাকুক, সর্ব্বদা নিন্দা করিতেন। একবার এক ফুটবল ম্যাচের খবর লিখিবার সময় উপরে দু-লাইন পদ্য যোগ করিয়া দিয়াছিলাম। তাতে তাঁর সে কি রাগ। যাই হোক, এটুকু বুঝিয়াছি যে আমার প্রতিভা—যা তিনি লুক্কায়িত ছিল বলিয়া চিনিতে পারেন নাই—আজ প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

সেদিন—বেলা সাড়ে দশটা হইবে। মেড়ার লড়াইয়ের এক দু পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম- আমি দু পৃষ্ঠা লিখিলে কি হইবে, সম্পাদকের নিষ্ঠুর কলমাঘাতে দু পৃষ্ঠার মাত্র দু লাইন বাঁচিয়া থাকে, আর সব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়—এমন সময় খবর পাইলাম যে সম্পাদক মহাশয় আমায় ডাকিতেছেন। যদিও এই সম্পাদক সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই খারাপ ছিল--তাঁকে আমি একটা অপদার্থ মনে করিতাম—তবুও তিনি ডাকিতেছেন শুনিয়া আমার বুক টিপটিপ করিতে লাগিল। আমার মূল্য তিনি বোঝেন না। তিনি যে আমায় ডাকিয়া বলিবেন, "ওহে দাস ঘোষ, তোমার অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মপটুতায় আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি" এবং এই বলিয়া পদোন্নতি ও বেতনোন্নতির জন্য

ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন তাহা সম্ভব নয়। সে গুড়ে বালি। তাই তাঁর ডাক আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাইতে লাগিল। পৃথিবীতে শত্রুর অভাব নেই। রাস্তায় হয় ত আমার এই চাকুরীটির জন্য পঞ্চাশজন লোক চিলের মত বসিয়া আছে। আমি সরিলেই তাহারা ছোঁ মারিবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমার হৃৎপিণ্ড যে ঈষৎ বেগে ক্রিয়া করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অতঃপর "দুর্গা এবং তস্যা পুত্র গণেশ"কে স্মরণ করিতে করিতে আমি গন্তব্য স্থানে গমন করিলাম।

আমি পঁহুছিবামাত্র সম্পাদকপুঙ্গব হাড়িচাঁচা কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার চেয়ে অপদার্থ লোক আজ অবধি আমাদের আপিসে আসে নাই। কি যে সব যাচ্ছেতাই লেখ, তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু।"

আমি বুদ্ধিমানের মত চুপ করিয়া রহিলাম—প্রতিবাদ করা বিচক্ষণতাহীন হইবে এবং স্বমত প্রকাশ অপ্রয়োজনীয়। আমায় নিরুত্তর দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, "এ সম্বন্ধে তুমি কি বলিতে চাও?" এবার আমায় কথা কহিতে হইল। আর চুপ করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। মনের রাগ ক্ষোভ দমন করিয়া, 'আমি তো কহিনি কিছু, দুয়ার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিনু মাথাটি করিয়া নীচু'-ভাব ত্যাগ করিয়া, ঈষৎ কাঁপিয়া, ঈষৎ কাসিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, আমি যে এতটা অপদার্থ তা তো জানিতাম না। আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি আরও বেশী চেষ্টা করিব—প্রাণপাত পরিশ্রম করিব। আমার লেখার এ স্টাইলটা যদি আপনার পছন্দ না হয় তবে আর এক রকম স্টাইল আরম্ভ করি—"

আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া তিনি বলিলেন, "না না, স্টাইলের কথা বলিতেছি না। যা আছে থাক আর বদলাইতে হইবে না।" আমার মন গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল, যাক্ আমার স্টাইলটা পছন্দ হইয়াছে। কিন্তু সে নিমিষের জন্য। পরমুহূর্ত্তেই তিনি বলিলেন, "আজ পঁচিশ বছর এই কাগজের আমি সম্পাদনা করিতেছি। তোমার চেয়ে খারাপ স্টাইল শুধু এতদিনে একজনের দেখিয়াছি।" আমার হৃদয় আবার পাহাড় হইতে মূষিকরূপ ধারণ করিল। চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি বলিয়া চলিলেন, "তোমার সংবাদ জোগাড় করিবার ক্ষমতা একেবারেই নাই। রিপোর্টারদের সেইটাই সবচেয়ে দরকারী। কাল কি করছিলে সন্ধ্যার সময়?" আমি উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হাড়গিলেদের (Argyle) সঙ্গে কসবীদের (K.O.S.B.) চর্ম্ম নির্ম্মিত বৃহদাকারের কন্দুক ক্রীড়া দেখিতে গিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন, "বেশ করিয়াছিলে। ভবিষ্যতে ওটাকে ফুটবল ম্যাচ লিখ। মাঠের বাহিরে যে বেটিং-এর ফল স্বরূপ একজন খুন এবং দু'জন জখম হইয়াছিল সে খবর রাখিয়াছিলে? না রাখ' নাই—তার কারণ তোমার খবর জোগাড় করিবার ক্ষমতা নাই। এই ক্ষমতা না থাকিলে জার্নালিজম্ করা যায় না। পাবলিক আমাদের কাছ থেকে কি চায়—খবর। আমরা যদি তা না দিতে পারি—কি করে তবে চলিবে বল?"

আমি ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "ভবিষ্যতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

তিনি বলিলেন, "হুঁ। আচ্ছা, তোমাকে আরও দু মাস সময় দিলাম। এর মধ্যে যদি তোমার কাজের উন্নতি দেখি—ভাল, নচেৎ তোমাকে দিয়া আমার চলিবে না। যাক্—আজ তোমায় একটা কাজে আগরপাড়া পাঠাইতে চাই। সেখানে গঙ্গার ধারে এক জমিদারের বাগানে "কৃষি-প্রদর্শনী" হইতেছে। তার একটা ভাল করিয়া রিপোর্ট লিখিবে—এই আধ কলমটাক্। শেষের এই লাইনটা যোগ করিয়া দিবে। এখন বাঙ্গালী মাত্রেরই—বিশেষ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর উচিত গ্রামে গিয়া চাষ বাস করা। দেশকে স্বাধীন এবং উন্নত করিতে হইলে চাষী হইতে হইবে।"

অতঃপর তিনি একটী প্রুফে মন দিলেন। আমিও তাঁর কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

ইহাই আমার জীবনের একটী উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনীর সূচনা।

তখনও কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর বাস সার্ভিস হয় নাই। শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে চাপিলাম এবং আগরপাড়ায় নামিলাম। তখন বেলা তিনটা। যেমন রৌদ্র তেমনি ধূলি। হাঁটিতে হাঁটিতে ধূলাক্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোড অবধি পৌঁছিলাম তখন তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিবার উপক্রম। বড় রাস্তা পার হইয়া গঙ্গাভিমুখে যাইতেছি এবং ভাবিতেছি বুঝি বা আজি গঙ্গালাভ ঘটিবে

এমন সময়ে পথের বাঁ ধারে একটী বিশাল অট্টালিকা দেখিলাম। বাড়ীটা পুরাতন, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সামনে প্রকাণ্ড বাগান, অনেক রকম ফুল গাছগাছড়ায় পূর্ণ। একটু জল চাহিয়া পান করিব এই অভিলাষে ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম কয়েকটী গাছের আড়াল হইতে এক ভদ্রলোক স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে ঐভাবে চাহিবার জন্য আমি কোন কৈফিয়ত তলব করিতে পারি না। আমি, বাহিরের লোক যদি ওঁর বাড়ীর দিকে চাহিতে পারি তবে ওঁরই বা বাহিরে চাহিবার অধিকার থাকিবে না কেন? তবুও ওঁর চাউনি আমার বিশেষ পছন্দ হইল না। বাঘের শিকারের উপর লাফাইবার পূর্ব্বে যে চাউনি হয় অনেকটা সেইমত। একটা সন্দেহপূর্ণ ক্রুর হিংস্র ভাব। তৃষ্ণা আমার উবে গেল।

ক্রমেই তিনি অগ্রসর হইয়া আমার দিকে আসিতে লাগিলেন। ফটকের ধারে আসিয়া পৌছিতে আমার কিছু বলা উচিত মনে হইল। তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "আপনার উদ্যানের স্বর্গীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম।" তিনি আমার কথা বোধ হয় শুনিতে পাননি, কারণ মোটে সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়?" আমি আবার মুচকিয়া হাসিয়া উত্তর দিলাম, "আমি কলিকাতায় থাকি।" দেখিলাম তাঁর দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "ওঃ। আমিও এখানকার লোক নই। শরীরটা সারাবার জন্য এইখানে বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিয়াছি। তা মহাশয়ের এই গরমের দিনে দুপুর বেলা আগরপাড়ায় আসিবার কারণ!" আমি গর্ব্বভরে বলিলাম—"আমি 'হুক্কাহুয়া' কাগজের লোক। আপনাদের এখানে কি একটা প্রদর্শনী হইতেছে তার রিপোর্ট লিখিবার জন্য আসিয়াছি। আমি কি ছাই এই রৌদ্রে আসিতে চাই, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় কিছুতেই ছাড়িলেন না। বলিলেন আমি ছাড়া এই রকম একটা ইম্পর্টেণ্ট জিনিষের রিপোর্ট আর কেউ লিখিতে পারিবে না। অগত্যা আসিতে হইল। এই মেলাটী কোথায় হইতেছে বলিতে পারেন?"

"আর একটু এগিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে। আচ্ছা নমস্কার" বলিয়া তিনি বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

আমি ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ, হতমান্য হইলাম। আমার মূল্য এ লোকটাও বুঝিতে পারিল না। মনে মনে বলিলাম, "হায় হতভাগ্য বাঙ্গলা দেশ, এখনও রতন চিনিতে শিখিলে না!" এইরূপে নিজেকে প্রবোধ দিতে দিতে প্রদর্শনীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রদর্শনীর রূপ বর্ণনা এবং যাঁহারা দর্শন করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের কথা লিখিলে এক মহাভারত সৃষ্টি হইয়া যাইবে। সে সব বাদ দিয়া শুধু সংক্ষেপে আমার কথা বলি। এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দেখি একস্থানে অনেক লোক ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমিও অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, পদ দ্বারা ক্রীড়া নিমিত্ত যে চর্ম্ম-নির্ম্মিত গোলাকার বস্তু তৈরী হয় তার ছ গুণ বৃহৎ একটী প্রায় গোলাকার পদার্থ। চর্ম্ম নির্ম্মিত নহে এবং রঙ ঈষৎ পীতাভ। খোঁজ করিয়া জানিলাম, উহা একটী কুষ্মাণ্ড। সকলে তার চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছে। আমিও সেইমত করিলাম। একজন অতিবৃদ্ধ লোক মধ্যে মধ্যে কুষ্মাণ্ডটীকে জলসিক্ত করিতেছে এবং একটী বস্ত্রখণ্ড দিয়া তাহার গাত্র মর্দ্দন করিতেছে। একটী দানবের তৈলসিক্ত টাকসম কুষ্মাণ্ড শোভা ধারণ করিয়াছে। বার চারেক প্রদক্ষিণের পরে বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ হইল। আলাপ বলা ঠিক হইবে না, কারণ শুধু সে-ই বক্তৃতা দিয়াছিল। আমি কেবল শুনিয়াছিলাম এবং মধ্যে মধ্যে শিরসঞ্চালন করিয়াছিলাম মাত্র। বৃদ্ধ কালা—তাকে শোনাইবার মত কণ্ঠস্বর ভগবান আমায় দেন নাই। তার বক্তৃতা হুবহু লিখিবার উপায় নাই, কারণ সে যা বলিয়াছিল অতি কষ্টে তার একটা মানে করিয়া লইয়াছি। কথাগুলো বুঝিতে পারি নাই। কথা অনেক কহিয়াছিল বটে কিন্তু তাহা বিশেষ কার্য্যকরী এবং অর্থকরী হয় নাই। তার বাঁধান দাঁত একটু ঢিলা থাকার দরুণ হাত দিয়া ধরিয়া কথা কহিয়াছিল। সুতরাং কথার চেয়ে বেশী মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল থুতু। যাই হোক, শুধু সারাংশটুকু আপনাদের জানাইতেছি।

"সে মালী। 'নাম বদল কর' নামক রাস্তার ধারে যে

বড় বাড়ীটা আছে সেইখানে সে কাজ করে। এই অতি বৃহৎ কুষ্মাণ্ড সেই বাগানে উৎপন্ন। তার বয়স এখন পঁচাত্তর। জীবনে কখনও সে কলিকাতা দেখে নাই, তবে নাম শুনিয়াছে। বাড়ীর বাগানটার অবস্থা এখন মোটেই ভাল নয়। সে একলা বুড়া মানুষ সব পেরে ওঠে না। আর দু'টো জোয়ান মালী ছিল আগেকার বাবুর আমলে। তখন বাগানটা খুব ভাল ছিল। বছর খানেক আগে এই নতুন বাবু আসিয়াছেন। আসিবামাত্রই ইনি তাহাদের ছাড়াইয়া দিয়াছেন। কারুর সঙ্গে মেশেন না। বাড়ীতে শুধু একটী মাত্র চাকর আছে। সে-ই রান্না বান্না করে। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে দু'জন আসে, দু-চার দিন থাকিয়া চলিয়া যায়।" আরও সব অনেক কথাই হয় তো সে বলিয়াছিল কিন্তু মনে নাই। মাথার ভিতর কেবল আমার সেই বাড়ীর কথাই ঘুরিতেছিল—এবং এত জোরে ঘুরিতেছিল যে, আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোমার বাবুর চেহারাটা কেমন বল তো। গোটা ত্রিশ বয়স, রুক্ষ চেহারা, রোগা দেখতে--"

সে বল্লে, "না। বাবুর বয়স পঁয়তাল্লিশের ওপর। মাথার চুল কিন্তু সব পাকা। দাড়ী গোঁফ আছে। খুব জোয়ান চেহারা। আপনি যার কথা বলছেন তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন।"

"ওঃ" বলিয়া আমি বিদায় লইলাম। গাছতলায় বসিয়া রিপোর্ট লিখিতে গিয়া দেখিলাম সব গুলাইয়া যাইতেছে। খালি সেই বাড়ী এবং সেই লোকটার কথা মনে পড়িতেছে। "দুত্তোর" বলিয়া একটী চায়ের দোকানে গিয়া ঢুকিলাম। চা পান সারিয়া গঙ্গার ধারে একটু বিশ্রাম করিয়া সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ধীর মন্থরগতিতে ষ্টেশনের দিকে চলিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ সেই বাড়ীটার সামনে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। 'ভেতরে আসুন না' এই রকম একটা অস্পষ্ট কোন কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি সম্মুখে কুষ্মাণ্ড পরিচর্য্যাকারী বৃদ্ধ। ঝাঁপ খুলিয়া আমার নিকট আসিয়া হড়বড় করিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল। মানে বুঝিলাম এই যে, আমার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা করিলে ভিতরে গিয়া বাগানের শোভা এবং অমূল্য সম্পদ দেখিতে পারি।

মুহূর্ত্তের জন্য আমি ইতস্তত করিলাম। ঘড়িতে দেখিলাম তখন মাত্র পৌনে ছ'টা। সাতটা চল্লিশে আমার ট্রেন সুতরাং সময়ের অভাব ছিল না। যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা। যাওয়াই স্থির করিলাম। আমার রিপোর্টের মধ্যে এই বাগানের কথা এবং এই বৃদ্ধের কথা যদি ঢুকাইয়া দিই তবে সম্পাদক মহাশয় একেবারে থ' হইয়া যাইবেন। 'কৃষি প্রদর্শনীর রিপোর্ট লিখিতে আসিয়া একজন পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধের কথা—যে-সে বৃদ্ধ নয়, এমন এক বৃদ্ধ যে-জীবনে কলিকাতা চোখে দেখে নাই, শুধু কানে শুনিয়াছে মাত্র—লিখিলে তিনি আমার প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। তাছাড়া বাড়ীটা ভিতর থেকে দেখিবার এবং অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা মনে জাগিতেছিল। সেইজন্য বৃদ্ধের সঙ্গে ফটক পার হইয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

বাগানটা বড়। অনেক রকম ফুল এবং ফলে ভরা। বৃহৎ কুমড়া, লাউ, বেগুন ইত্যাদি অনেক হইয়াছে। বাড়ীর নিকটে পৌছিয়া আমি একদৃষ্টিতে বাড়ীর দিকে দেখিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ নিজের মনে বক্তৃতা দিয়া যাইতে লাগিল। আমিও মধ্যে মধ্যে 'হুঁ' 'তাই নাকি' 'সত্যি' ইত্যাদি বলিতে ও মাথা নাড়িতে লাগিলাম। কি বলিল তার এক রত্তি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না।

আমি যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখান হইতে সম্মুখের কিছু অংশ এবং বাড়ীর একধার দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ ছিল। জনমানবের চিহ্ন কোথাও ছিল না। বৃদ্ধকে গৃহস্বামী বাড়ী আছেন কি-না প্রশ্ন করিতে যাইব এমন সময় দেখি দোতালার একটা জানলা খুলিল। একটী মনুষ্যমূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। পক্ককেশ গৃহস্বামীও নন এবং ফটকে যাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম তিনিও নন। আর এক নূতন ভদ্রলোক। মোটা কালো চেহারা, চোখে চশমা। নিবিষ্ট মনে ফটোগ্রাফিক প্লেটের মত কি একটা জিনিষ লইয়া আলোর দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখা শেষ করিয়া হাতটী নামাইতে আমার উপর তাঁহার নজর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানলা হইতে সরিয়া গেলেন। আমি কবি কিংবা ভাবুক নহি—তবুও আমার মনে হইল যে, সরিয়া গেলেন বলা ঠিক নয়, তিনি যেন অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এবং এত তাড়াতাড়ি যে আমার মনে হইল যেন ভেল্কী দেখিতেছি। আমি বিস্মিতভাবে ভাবিতে লাগিলাম আমাকে দেখিয়া এত দ্রুত অপসরণের কারণ কি ?

আর একটা জিনিষ আমার বিস্ময়কে আরও বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিল। এতক্ষণ একটা গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ হইতেছিল, অনেকটা দূর হইতে মোটরের শব্দের মত—যা আমি ঠিক লক্ষ্য করি নাই। থামিতে টের পাইলাম। লোকটির জানলা হইতে সরিয়া যাবার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজও থামিয়াছিল। চিন্তা যেন আমায় গ্রাস করিয়া বসিল।

কতক্ষণ এই রকম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না, পিছনে 'আপনি কে' শুনিয়া চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। পিছন ফিরিয়া দেখি তিনজন ভদ্রলোক। একজনের সঙ্গে প্রদর্শনীতে যাবার সময় দেখা হইয়াছিল, আর একজনকে এইমাত্র জানলায় দেখিলাম। তৃতীয় ব্যক্তির মাথায় সাদা চুল এবং দাড়ী গোঁফ দেখিয়া বুঝিলাম ইনিই গৃহস্বামী। চেহারাটা রাক্ষসের মত ভীষণ এবং দেখে মনে হইল গায়ের শক্তিও ভীষণ। বড় বড় ভাঁটার মত চোখ। আমার দিকে কটমট ক'রে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কে ? কাহাকে চাহেন ?" আমার প্রাণপাখীর তখন প্রায় খাঁচা-ছাড়া অবস্থা। অনেক কষ্টে তাহাকে আটকাইয়া ঈষৎ মুচকি হাসিয়া (মুচকি হাসি আমার অমোঘ অস্ত্র। সকলে বলেন, আমাকে নাকি মুচকি হাসিলে অতিশয় ভাল দেখায়) বলিলাম, "আপনার অনুমতি না লইয়া আপনার উদ্যানে প্রবেশ করা আমার অন্যায় হইয়াছে। আমি দোষী, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি কলিকাতা হইতে কৃষি-প্রদর্শনী সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখিতে এইখানে আসিয়াছি। 'হুক্কাহুয়া' কাগজের নাম আপনি নিশ্চয় শুনিয়াছেন। আমি তাহাদেরই লোক।" ভাবিয়াছিলাম, এই কথার পর তিনি নিশ্চয়ই আমাকে খুব খাতির করিয়া বলিবেন, "তাই নাকি! আমার কি সৌভাগ্য। আসুন, ভিতরে আসুন—" কিন্তু এ ধরণের কিছুই ঘটিল না। তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আমার বাড়ীতে তো আর প্রদর্শনী হইতেছে না। এখানে কি করিতে আসিয়াছেন তাহার উত্তর দিন।" আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, "আপনার মালীর সঙ্গে আমার প্রদর্শনীতে সাক্ষাৎ ঘটে এবং কিঞ্চিৎ পরিচয়ও হয়। সে-ই আমাকে ভিতরে আসিয়া আপনার উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিতে বলে।" পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "এ রকম বৃহৎ কুষ্মাণ্ড, অলাবু ইত্যাদি জীবনে কখনও নয়নগোচর হয় নাই। দেখিয়া আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কাগজে দু' কলম সুখ্যাতি লিখিয়া দিব।" ইহাতেও বিশেষ ফল হইল বলিয়া মনে হইল না। কারণ তিনি অতি উষ্ণভাবে বলিলেন, "তোমার কতক-গুলো বাজে কথা শুনিবার আমার প্রয়োজন নাই। মালীর কথায় কেহ কখনও কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ করে না। সত্যি করিয়া বল এখানে তোমায় কে পাঠাইয়াছে এবং কেন আসিয়াছে ?" বলিতে বলিতে তাঁহার ক্রোধের স্রোতে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি লাফাইয়া আমার নিকট আসিয়া জামার কলার ধরিলেন। আমি তখন মনে মনে ইষ্ট নাম ধ্যান করিতেছি। মনে পড়িতেছে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা। এমন সময় বাকী দুইজনে আসিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। ফটকে যাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তিনি তাঁহার কানে কানে কি যেন বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল। সব রাগ যেন জল হইয়া গেল। আমার দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দেখুন, কিছু মনে করিবেন না—আমার মেজাজটা অতিশয় খারাপ। ক্রমাগত ভুগিয়া ভুগিয়া অতিশয় খিটখিটে হইয়া গিয়াছি। নতুন লোক দেখিলেই আমি চটিয়া উঠি। আপনি কাগজের লোক বলিলেন না—আপনার নামটা কি জিজ্ঞেস করিতে পারি ?" আমার মানইজ্জৎ তো আগেই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। যাই হোক, তাহা আবার ধূলি হইতে তুলিয়া ঝাড়িয়া এক রকম মানান সই করিয়া লইলাম। শ্লেষের সহিত "আর নামে দরকার নাই মহাশয়, ঢের হইয়াছে" বলিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মুখ হইতে সম্মুখের ত্রিমূর্ত্তি দেখিয়া আপনা হইতেই নিজের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গেল, "অধমের নাম গোপীজনবল্লভপদরেণুদাসঘোষ। 'হু ক্কা হু য়া'র রিপোর্টার।" গৃহস্বামী বলিলেন, "আমার দুর্ব্ব্যবহারের জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমার বাগানের বড় সখ গোপীবাবু। এই যে সব প্রদর্শনীতে আমার বাগানের বৃহদাকার ফল দেখিলেন তাহা আমার তৈরী একটী সারে উৎপন্ন হয়।

আমার সন্দেহ হইয়াছিল, বুঝি বা আমার মালীর কাছ হইতে আপনি সেই তত্ত্ব জানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। সেইজন্য আমার মেজাজটা হঠাৎ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন।"

অতঃপর আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি সমস্ত বাগানটী ভাল করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইলেন। প্রত্যেক সব্জীর ইতিহাস, রোজ-নামচা, পরিচর্য্যা ইত্যাদি বলিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। আমিও মনে মনে সে গুলিকে সাজাইয়া কেমন একটী সুন্দর রিপোর্ট লেখা সম্ভব হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কতক্ষণ এইভাবে কাটাইয়াছি জানি না, হঠাৎ হাত-ঘড়ির দিকে নজর পড়িতে দেখি সাতটা বাজিয়া চল্লিশ মিনিট হইয়াছে। "ঐ যাঃ, ট্রেণ মিস্ করিয়াছি। হ্যাঁ মশাই, এর পরের ট্রেণটা কখন আসে?" আমি বলিয়া উঠিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, "পরের ট্রেণ! আজ রাত্রে আর ট্রেণ নাই। আবার কাল সকালে পাইবেন।" আমি হতাশভাবে বলিলাম, "এ্যাঁ, তবে কি হইবে? আমার তো আজ কলিকাতায় না পঁহুছিলেই নয়। এই প্রদর্শনীর একটা রিপোর্ট আজ রাত্রে দিতেই হইবে। না দিতে পারিলে আমার চাকুরী যাইবে।" তিনি বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ। আমার জন্যই আপনার দেরী হইল। আমি বড়ই দুঃখিত। তবে এক কাজ করা যায়। আপনি রিপোর্টটাকে টেলিগ্রাম করে দিন।" আমি তাঁহাকে প্রায় কাঁদ কাঁদ ভাবে [এতে লজ্জার কিছু নাই। চাকুরী যাবার সম্ভাবনায় কার না কান্না পায়] বলিলাম, "অত্যাবশ্যকীয় খবর ছাড়া কাগজ টেলিগ্রামের খরচ দেয় না। আগড়পাড়া কৃষি-প্রদর্শনীর খবরকে তাঁহারা সে পর্য্যায়ে কিছুতেই ফেলিবেন না।" তিনি বলিলেন, "গোপীবাবু, আপনি রিপোর্ট লিখুন। টেলিগ্রামের খরচ আমি দিব। আমিই দোষী, আমার জন্যই আপনাকে এই মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া ওজর আপত্তি করিবেন না। আর আজ রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিবেন। কাল সকালের ট্রেণে কলিকাতা যাইবেন।" এই বলিয়া আমায় লইয়া তিনি অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমাকে দোতালার একটী বড় ঘরে বসাইয়া বলিলেন, "এইটী আমার বসবার ঘর। টেবিলে কাগজ, কালী, কলম সবই রহিয়াছে। আপনি লিখুন। আমি এক কাপ চা আর কিছু মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিতেছি। লেখা হইলে আমায় ডাকিবেন, আমি চাকরকে দিয়া আপনার টেলিগ্রামটী পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি ঘরটী ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। বেশ সুসজ্জিত। গৃহস্বামী ধনী বলিয়া মনে হইল। চারটী জানলা—সবগুলিই বন্ধ এবং মোটা পরদায় আচ্ছাদিত। আমি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে চাকর আমায় চা ও মিষ্টান্ন দিয়া গেল। আমি চা-খোর। চায়ের বাটী সামনে পাইয়া এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিলাম। পরে মিষ্টি খাইতে খাইতে লিখিতে লাগিলাম। হঠাৎ যেন মাথাটা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। ক্রমেই হাত পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। চোখে চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম। উঠিবার চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না। চীৎকার করিবার উদ্যোগ করিলাম, স্বর বাহির হইল না। মনে হইল কে যেন আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া আছে। জ্ঞান ছিল কিন্তু নড়িবার বা চক্ষু উন্মীলন করিবার ক্ষমতা ছিল না। এমন সময় ঘরের দরজা খুলিয়া কয়েকজন লোক ঢুকিল। একজন আমাকে দড়ি দিয়া চেয়ারের সঙ্গে খুব ভালভাবে বাঁধিল। আমি তাহাদের মুখ দেখিতে পাই নাই, কিন্তু কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম। যেন মনে হইল তাহারা কোন কারণে ভয় পাইয়াছে। একজন বলিতেছে "ভোঁদার খবরটা ঠিক তো?" আর একজন বলিল---"ঠিকই হোক আর ভুলই হোক, সাবধানের বিনাশ নেই। গঙ্গার ধারে পোড়ো বাড়ীটায় আমরা এখন গিয়ে লুকোই। ভূতের বাড়ী বলে লোকে সে ধারটায় যায় না। কাল যা-হোক একটা কিছু করা যাবে।"

"ইহাকে এখানে রাখিয়া যাওয়াটা কি ঠিক হইবে?"

"কিছুক্ষণ পরে আপনিই অক্কা পাইবে? আর যদি নাও পায়, তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি? এখন আর দেরী করা উচিত নয়।" এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিবার পর বিশ্ব যেন ধীরে ধীরে সুপ্ত হইয়া গেল। অন্ধকার—আরও অন্ধকার। আমার মনে হইল আমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

যখন আবার বাঁচিয়া উঠিলাম তখন দেখি আমার চারিধারে পুলিশ। সম্মুখে একজন শ্বেতাঙ্গ। আমাকে

চক্ষু চাহিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Well Babu, who are you?" আমি বলিলাম—"Your Honour sir, I am an humble reporter of the 'Hukka Hua', Sir. আমি ত এখন dead." তিনি হাসিয়া আমাকে ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন, "You are not dead Babu, you are alive all right. তারপর আপনার নাম কি? এখানে কি করিতেছিলেন?" আমি একে একে সব কথাই বলিলাম, একজন লোক সব খাতায় টুকিয়া লইল এবং শেষে যখন আমাকে বাঁধিবার সময় তাহাদের কথোপকথন উল্লেখ করিলাম, সাহেব লাফাইয়া উঠিলেন। "Thank you Babu," বলিয়া তিনি কয়েকজন কনস্টবলকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তুজন কনস্টবল আমার কাছে রহিল। কিছুক্ষণ পরে আমি আবার ঢলিয়া পড়িলাম। মাথা ঘুরিতেছিল—বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

হঠাৎ নাড়া পাইয়া চোখ খুলিতে দেখি সামনে সেই সাহেবটী দাঁড়াইয়া ও তাঁহার পিছনে হাতকড়ি বাঁধা সেই তিনজন লোক—যাহারা আমাকে আর একটু হইলেই শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিল আর কি। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "Can you identify them." আমি উত্তর দিলাম, "Yes, I saw them in the morning, in the evening sir and not identify them."

"Thank you very much, you have helped us immensely. সরকার বাহাতুর এর জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে। আপনার জন্যই আজ এই most notorious forgery gang ধরা পড়িল।"

এই বলিয়া তিনি হাসিলেন, আমিও আমার বিখ্যাত মুচকি হাসি হাসিলাম। এই ব্যাপার সংক্রান্ত হাসি এই আমার শেষ নয়। পরে আরও তুইবার হাসিয়াছি। দ্বিতীয় বার হাসিয়াছি যখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম, কারণ প্রথম হাসির সময় কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সাহেব হাসিয়াছিল সুতরাং আমার কর্ত্তব্যবোধে আমিও হাসিয়াছিলাম। তৃতীয় বার হাসিলাম, যখন সরকারের নিকট হইতে একটী প্রশংসা-পত্র পাইলাম। যে ব্যাপারের আমি বিন্দুবিসর্গ জানি না, সেই ব্যাপারে প্রশংসিত হইলে সকলেরই হাসি পায়। আমিও হাসিয়াছি।

সেই থেকে আমি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করি। প্রথম পাতায় আমার প্রশংসা-পত্রের একটী প্রতিলিপি ছাপাইয়া দিই। কভারের উপর লিখি "শ্রীমাকড়সা রচিত" এবং তলায় "সরকার বাহাতুরের নিকট হইতে অপূর্ব্ব সাহস এবং গোয়েন্দা কার্য্যের বুদ্ধির জন্য প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত।"

সেই অশ্রুত গোপীজনবল্লভপদরেণুদাসঘোষ আজ আপনাদের সুপরিচিত "শ্রীমাকড়সা"।

আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "মহাশয়, যদি তাহারা আপনাকে পুলিশের লোক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল তবে হত্যা করিল না কেন? যদি বিষই দিল তবে এত কম দিল কেন যে আপনি বাঁচিয়া উঠিলেন? পুলিশই বা সেই সময়েই কিরূপে আসিয়া হাজির হইল?" ইত্যাদি। আমি তার উত্তরে কেবলমাত্র আপনাদের এই কথা জানাইতে চাই যে, আমি হীরো, নায়ক। কোন ডিটেকটিভ গল্পে নায়ককে মরিতে দেখিয়াছেন কি? নায়কের বুকে গুলি করিলে পকেটস্থিত সিগারেট কেসে লাগিয়া গুলি ফিরিয়া যাইবে, উচ্চ ছাদ হইতে লাফাইলে নীচে দিয়া সে সময়ে তুলোর গাড়ী যাইবে, অকূল অতল জলে হাবুডুবু খাইলে ঠিক সেই সময় একটী খালি নৌকা সেইখান দিয়া ভাসিয়া যাইবে, হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে ইন্দুর আসিয়া রজ্জু কাটিয়া দিবে। এসব না হইলে নায়ক হওয়া যায় না।

আপনারা এইবার আমায় পরামর্শ দিতে পারেন যে, গল্পে একটী নায়িকা থাকিলে ভাল হইত। গৃহস্বামীর একটী রূপসী ষোড়শী, বিতুষী কন্যা। ধীরে ধীরে আমার কক্ষে আসিয়া আমার শুশ্রূষা করিতেন। আমার জ্ঞান হইলে চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিতাম, "আমি কোথায়? আপনি দেবী না মানবী?" তিনি উত্তর দিতেন—"আপনি শত্রুপুরী মাঝে। আমি দেবী নহে—মানবী।" আমি আবার তাঁহার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতাম। এমন সময়ে গৃহস্বামী প্রবেশ করিতেন। রূঢ়স্বরে কন্যাকে বলিতেন, "এস্থানে কি করিতে আসিয়াছ? ইহাকে ছাড়িয়া দিয়া এই মুহূর্ত্তে এই স্থান পরিত্যাগ কর।" তিনি উত্তর দিতেন, "না পিতা, অনেক সহিয়াছি, আর সহিব না। ইহাকে আমি মুক্ত করিয়া দিব।" তাঁহার পিতা তখন থিয়েটারী ভঙ্গিতে বলিতেন, "মূঢ় বালিকা, জীবনের কূট-

নীতি তুমি কি বুঝিবে ? অবিলম্বে এই স্থান কর পরিত্যাগ। কে এই বন্দী, যার তরে পিতৃ সনে করিতেছ তুমি বৃথা বাদানুবাদ ?" তখন তিনি বলিবেন, "শুনিতে কি চাও পিতঃ ? একান্ত বাসনা যদি শুনিতে তোমার, তবে বলি শোন, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।" ইত্যাদি ইত্যাদি। সুবর্ণে সোহাগা মিলিত।

আমিও ইহা অস্বীকার করিতেছি না। আমারই কি মহাশয় মনে সাধ হয় নাই, কিন্তু কি করিব বলুন উপায় নাই। আপনাদের সন্তোষসাধন করিতে গিয়া গৃহে চির অসন্তোষের অনল তো আর জ্বালিতে পারি না। আমার উনি তৃতীয় সংস্করণের। আমাকে অনেক সাবধানে চলিতে হয়।

আপনারা হয় ত আমার বাসস্থান জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন। হওয়াটাও আশ্চর্য্য নয়। আপনাদের নিরাশ করিব না। আমার বাসস্থান—"বাগবাজার, কলিকাতা।"

প্রাচীন ভারত

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

প্রাচীন যুগের এই ভারতের ইতিহাস পড়ি
পরিতৃপ্ত নহে মন, জন্মে ক্ষোভ দৈন্য তার স্মরি'।
ভগ্ন-শীর্ণ শিলালিপি ; জীর্ণ মুদ্রা, ধাতুর ফলক
দূর হতে ভাসাভাসা দেখে শুনে চীন পর্য্যটক
টিপ্পনী লিখিয়া গেছে করচায় করে লীলাচ্ছলে
—ইহাই সম্বল শুধু। তাই দিয়ে গাঁথা অতিক্ষীণ
সূত্রহারা, ছন্নছাড়া, ভাসা ভাসা শৃঙ্খলাবিহীন
কৃচ্ছ্রগন্ধ ইতিবৃত্ত, তাতে মন তৃপ্তি নাহি মানে
মনে হয় ধমনীর রক্তধারা ঢের বেশি জানে
এর চেয়ে, উড়ে যায় সেই যুগে কল্পনা আমার
শিল্প সাহিত্যের পথে অবরুদ্ধ নহে গতি তার,
স্বপ্নের মাধুরী দিয়ে ভরে তোলে সব ব্যবধানে
প্রাচীন ভারতে পুন গড়ে' তুলে নব উপাদানে।

সে স্বপ্নভারতে হেরি নরনারী বসন্ত উৎসবে
মাতে ফাল্গুনের দিনে। নব মেঘোদয় হয় যবে
গগন দিগন্ত ভরি' দূতরূপে মেঘেরে বরিয়া
কুটজ কুসুমরাশি অর্ঘ্য দিয়া অঞ্জলি ভরিয়া
পাঠায় বিরহী তার দয়িতার লাগি আকিঞ্চন।
উদয়ন কথা কয় গৃহদ্বারে গ্রামবৃদ্ধগণ।
অভিসারিকারা চলে পুরমার্গে গুণ্ঠিত আননে,
সংবরি' মঞ্জীরধ্বনি। কাত্যায়নী আরাধে কাননে
জনপদবধূগণ। সন্ধ্যাপ্রাতে বৈতালিক দল
শ্রদ্ধরা ছন্দের শ্লোকে গায় রাজপ্রশস্তি মঙ্গল।
নাগরী শুকায় বেশ ধূপধূমে, ধারাযন্ত্র জলে
স্নান করি,' যৌবনের জয়লেখা পত্র লেখাচ্ছলে
আঁকে উরসিজতটে। সীধু পান করিয়া সন্ধ্যায়
মুরজবাদনে যত নাগরেরা প্রেমগান গায়।
প্রতিটি মুহূর্ত্ত তারা যৌবনের করে উপভোগ,
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ নাহি দৈন্য নাহি শোক রোগ।

অর্হৎ শ্রমণগণ শ্রাবকের দ্বারে দ্বারে গিয়া
দশশীল ব্যাখ্যা করে। আভরণ সজ্জা তেয়াগিয়া
পরিয়া চীবরবেশ নটীগণ হয় মহাথেরী
মুড়ায়ে মাথার কেশ। ছিন্ন করি সংসারের বেড়ী
জুটে দলে দলে গৃহী সংঘারামে। বুদ্ধের শরণ
লভিয়া তাহারা করে ভিক্ষু ব্রত দৈন্যের বরণ।
এ দিকে স্বগৃহে রচি ব্রাহ্মণেরা অর্দ্ধ তপোবন
পরাবিদ্যা লয়ে করে সারস্বত জীবন যাপন।
প্রতিটি মুহূর্ত্ত তারা জীবনেরে করে যে সফল,
নাহি ক্ষোভ নাহি লোভ নাহি দ্বন্দ্ব নাহি কোলাহল।

আল্পনা ও পিঁড়িচিত্র

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি যখন ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকলা সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করবার প্রয়াস পাই, সেই সময় আমার নৃতাত্ত্বিক চক্ষের সম্মুখে গৃহে গৃহে পূজাপার্ব্বণ বা কোন উৎসবে মেয়েদের দ্বারে অঙ্গনে আল্পনা বা পিঁড়িতে চিত্রাঙ্কন করা নক্সাগুলির মূল্য এমন বৃদ্ধি পায় যে, সাধারণের নিকট "বাজে সময় নষ্ট করা অকেজো লোক" এইরূপ একটী গালি খেয়েও মেয়েমহল থেকে কতকগুলি আল্পনা সংগ্রহ করি।

এই সময়ে 'গোধূলি সংঘ' বলে আমাদের একটী কাল্চার ক্লাব ছিল—সেই সংঘের উদ্যোগে একটী আলিম্পন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে অনেকগুলি নক্সা পাওয়ার সুবিধা হয়। পুস্তক অনুসন্ধানে রবিবাবুর সাহিত্য পত্রিকাতে ছড়া এবং শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ছড়া ও আল্পনা এই দুটীর সঙ্গে সাহিত্যপরিষদে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রতের' উল্লেখ পাই। এই বইখানির ইংরেজী অনুবাদ পেলাম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কিন্তু বাংলা বই কোথাও পেলাম না। শেষকালে আড়াইটী টাকা ব্যয় করে একখানি বই সংগ্রহ করা গেল। পড়ে দেখলাম শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথও এইরকম করে মেয়েদের কাছ থেকে মূল নক্সা জোগাড় করেছিলেন। তখন মেয়েরা এত স্কুলমুখো ছিল না। আমার আল্পনাগুলি বেশীর ভাগ স্কুলের মেয়েদের।

বাছাই করে ত্রিশখানি আল্পনা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে দেখাই, তারপর দেখেন শিল্পী শ্রীচারু রায়। এঁদের বিচারে যেগুলি দাঁড়িয়ে যায়, সেইগুলি আমি শিল্পীদের উপযুক্ত পারিতোষিক দানের পরে নিজের কাছে রেখে দিই। কিন্তু উপস্থিত সেগুলি নাই—ভাগ্যিস সে গুলির কপি রেখেছিলাম —ক্যামেরা এবং স্কেচের সাহায্যে, তাই এখানে আপনাদের দেখাতে পারছি।

খাঁটি আল্পনা বল্‌তে যা বুঝি, তা অনেকেই আজকাল অনুসরণ করেন না। চিত্রকলার উন্নত উপায় অবলম্বনে কল্‌কাতার আল্পনা অন্যরূপ ধারণ করেছে, ফলে তাদের পিঁড়িচিত্র বল্লেই ঠিক হয়। প্রকৃত আল্পনা যা এখনও পল্লীগ্রামের মেয়েরা দিয়ে থাকে—তাতে শুদ্ধ পিটুলিগোলা সাদা রং, তুলি (ব্রাশ্ নয়) এবং হাতের আঙ্গুল—এই তিনটীর প্রয়োজন। কাঠির সাহায্য চল্‌বে না এবং কারুর নকল করাও চলবে না—সহজাত গতিতে এবং ভঙ্গীতে গতানুগতিক নক্সাগুলি এঁকে যেতে হবে। যাঁরা ভাল আল্পনা দিতে পারেন—তাঁরা এইতেই এমন সুন্দর সুন্দর আল্পনা দেন যে বহু সময়ে সামঞ্জস্য ও ছন্দ এই দুটী জিনিষে আর্ট স্কুলের ছেলেদেরও তাঁদের কাছে হার মান্‌তে হয়।
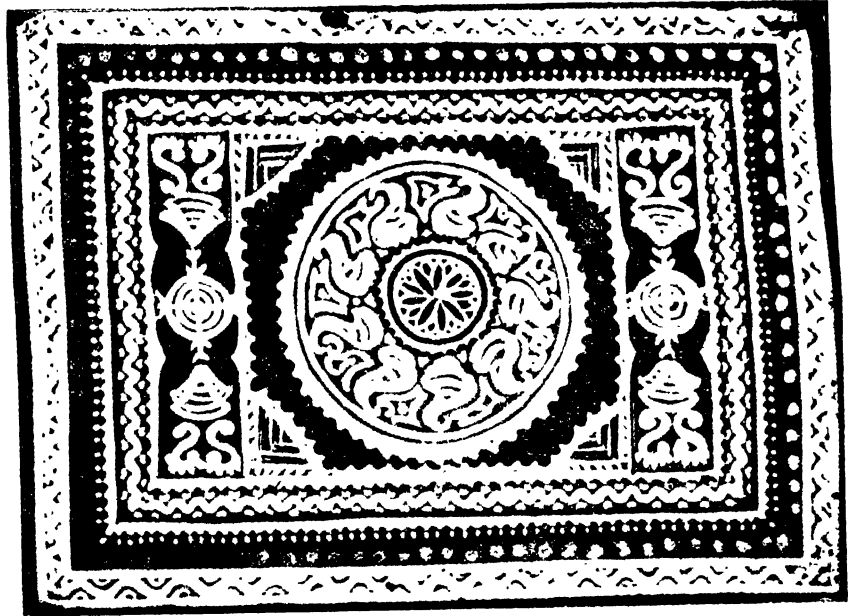
লক্ষ্মীর পিঁড়ি—তমিস্রা গাঙ্গুলী

আল্পনা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বল্বার পূর্ব্বে আমি ছবিগুলির কিছু পরিচয় দিই।

প্রথম চিত্রটী লক্ষ্মীর পিঁড়ির আল্পনার একটী নক্সা। ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, শিল্পী অনেকস্থানে তুলির (brush) সাহায্য নিয়েছেন। মধ্যে পদ্ম, তার চতুর্দ্দিকে শঙ্খ, দুটী পাশে লক্ষ্মীর পাঁড়া। রুল-কম্পাসের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে নিশ্চয়, কারণ সহজ অনাড়ম্বর অঙ্কনের ছাপ নেই, সেইজন্য এটীকে আল্পনা না বলে পিঁড়িচিত্র বল্লেই ঠিক হত।

২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর চিত্রের চারিটী আল্পনাতেই মেয়েরা
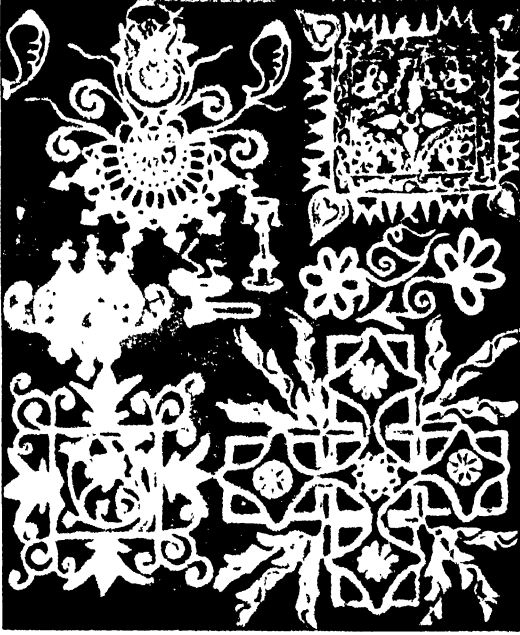
পুজা-পার্ব্বণের নক্সা—মিসেস্ নাগ

সকলেই সরু কাঠির সাহায্য নিয়েছেন। ২ ও ৩ নম্বর আল্পনার নক্সাগুলি মেজে এবং পিঁড়ি উভয়েরই উপর আঁকা চলে। ২ নম্বর আলপনার নক্সাটীতে কতকগুলি গতানুগতিক জৈমিতিক (geometrical figures) আলঙ্কারিক নক্সার সমাবেশ আছে। মধ্যে চারিটী সারি আড়াআড়িভাবে শঙ্খলতা, চার রকমের পদ্ম, লক্ষ্মীর ধানছড়া এবং বিভিন্ন ফুলের চিত্র। প্রচুর পরিমাণে শঙ্খলতা এঁকেছেন শ্রীমতী সরকার চার নম্বর চিত্রে; মাঝখানের পদ্মটীতেও ভারী সূক্ষ্মকাজের পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণে টপ্ করে কিছুতেই শঙ্খলতা আঁকতে পারবেন না—কি মেঝেতে মেয়েদের সঙ্গে পিটুলীগোলা জলে, কি কাগজের উপর পেন্সিলে, আমি ত প্রথম প্রথম কিছুতেই শঙ্খলতার সামঞ্জস্য আন্‌তে পারতাম না—যদিও অতি কষ্টে টানটা দিতে পারতাম। ৬, ৭ ও ৮ এই তিনটী চিত্রের আল্পনাকে পিঁড়িচিত্র বলাই সমীচীন, তবে কি-না আজকাল আল্পনা কথাটী খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে—যার মধ্যে মেয়েদের আঁকা-জোকা অনেক কিছু জড়াজড়ি করে থাকে। ছয় নম্বর চিত্রটী কাজের দিক থেকে অপূর্ব্ব, যিনি এঁকেছিলেন তিনি আল্পনা দিবার প্রয়োজনীয় দক্ষতার অনেক উপরে উঠে গেছেন; কারণ তার ভঙ্গিমা সাধারণ মেয়েদের আল্পনা দেওয়ার চাইতে ঢের উন্নত - যা চিত্র-শিল্পীদেরই উপযুক্ত। এই কটী নক্সাতেই নানাপ্রকার রং ব্যবহার হয়েছিল, সেগুলি ফটোতে যতটা পেরেছি তুলে আপনাদের দেখাচ্ছি।

৬ নম্বরটী পাঠিয়েছিলেন বালীগঞ্জের কোন মেয়ে স্কুলের ছাত্রী—অঙ্কনের দিক দিয়ে খুব নিখুঁত, রঙের সমাবেশও মন্দ ছিল না, কিন্তু তুলি এবং কাঠির সাহায্য এতই নিয়েছিলেন শিল্পী ফ্রেস্কোর মত যে, আমরা তাঁকে খাঁটি আল্পনার কোন পুরস্কার দিতে পারি নি।

৭।৮ নম্বরের চিত্র দুটী বরক'নের পিঁড়িচিত্র—আমার কোন বান্ধবীর বিবাহে নক্সা দুটী সংগ্রহ করি। লক্ষ্য করে দেখ্‌লে বিবাহের কতকগুলি মাঙ্গলিক নিদর্শন চোখে পড়ে—চাঁদমালা, চাঁদোয়া, ফুলের মালা, কদলীপত্র ও গুঁড়ি, বরণডালা, শঙ্খ, পদ্ম এবং প্রজাপতি। এই সমস্ত নিদর্শনের স্বাভাবিক চিত্ররূপে পিঁড়ি দুটী বিবাহ অনুষ্ঠানের মাঙ্গল্য এবং অর্থ বহন করে আছে।

আল্পনা সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই বাংলার পল্লীগ্রামে অধুনা প্রায়শঃলুপ্ত ব্রতানুষ্ঠান, বিশেষ করে কুমারী ব্রতের কথা উল্লেখ করতে হয়। কুমারী ব্রতগুলি ঠিক খাঁটি ধর্ম্মানুষ্ঠান নয়, এগুলি কতকগুলি কল্পিত ব্রত, ধর্ম্মানুষ্ঠানের আচরণে প্রচলিত—যা আমাদের দেশের মেয়েরা বিবাহের পূর্ব্বে কিছুকাল ধরে পালন করত, এখনও পল্লী-গ্রামের মেয়েরা কতকগুলো পালন করে—এতে মেয়েদের মনে ধর্ম্মভাব ফুটে উঠ্‌ত এবং সুগৃহিণী হবার একটা আকাঙ্খা জেগে উঠ্‌ত। এই ব্রতগুলির মন্ত্র হল ছড়া এবং প্রতিচ্ছবি

হল আল্পনা—সেইজন্য আল্পনার উৎপত্তি প্রথমে এই ব্রত থেকেই।

বিবাহ, অন্নপ্রাশন, পূজা-পার্ব্বণ বা কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আল্পনার মূল্য শুধু আলঙ্কারিক, কিন্তু কতকগুলি ব্রতে আল্পনার মূল্য অনেকখানি- সে সব আল্পনাতে বাহারী আঁকাজোকার অর্থপূর্ণ ছবিই সব। ব্রত অর্থে মনের কোন কামনা পূরণের জন্য একটী অনুষ্ঠান—ধর্ম্মানুষ্ঠানের ছাঁচে—ব্রতের আল্পনা সেই সমস্ত কামনার প্রতিচ্ছবি। এই সূত্রে আল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সারা বৎসরের কতকগুলি ব্রতের উল্লেখ করছি।

লক্ষ্মীপূজা মধুমথামের গোড়ায়—মিসেস্‌ পুরকায়স্থ

বৈশাখ মাসে হরির চরণ, রণে এয়ো এবং পুণ্যি পুকুর—এই তিনটী ব্রতের মধ্যে রণে এয়ো ব্রতে শুধু মেয়েরা অতি সরল একটী আল্পনা দেয়। আল্পনা দেওয়ার ঘটা জ্যৈষ্ঠ মাসে বসুধারা এবং ভাদ্র মাসে ভাদুলী ব্রত—এই দুটীতে বিশেষ ভাবে দেখা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামের জল আসে শুকিয়ে—বৃষ্টিকে কামনা করে ইন্দ্রদেবের কৃপালাভে অঙ্গনের এককোণে তিনটী গাছের মাঝে আল্পনা এঁকে মাটীর ঘট একটী ফুটো করে গাছের মাথায় ঝুলিয়ে দেয় অনুকরণ করে জলের ঝারি করে মেয়েরা বসুদেবকে বারিধারার জন্য মিনতি করে ছড়া বলে যায়, বসুধারা ব্রতের আল্পনায় আটটী তারার উপর ফুল রেখে।
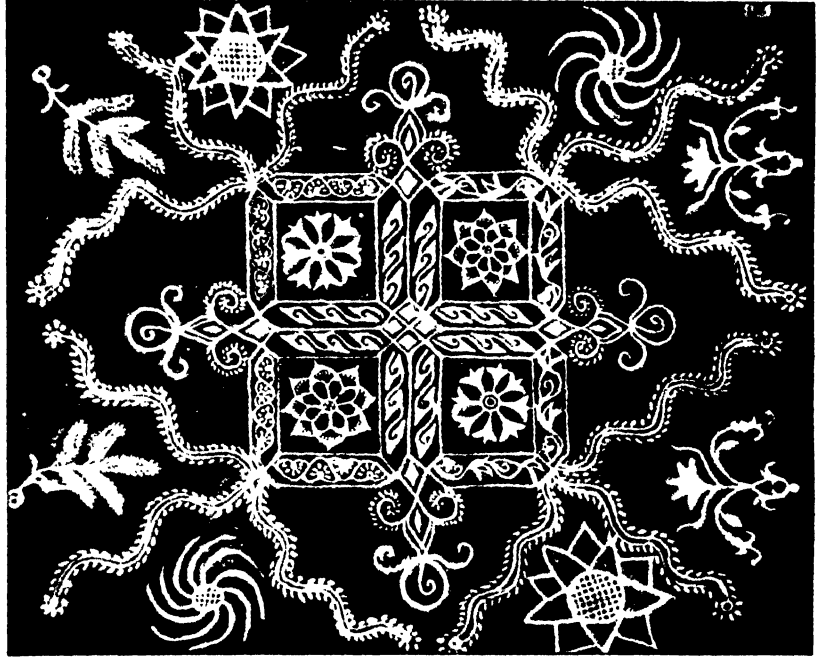
পিঁড়ির নক্সা—মিসেস্‌ সরকার

অষ্টবসু, অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী
আটদিকে আটফল আমরা রাখি

* * * *

কামনা— বসুধারা ব্রত করলাম
তিন বৃক্ষের মাঝে
মায়ের কুলে ফুল বাপের কুলে ফল
শ্বশুরের কুলে তারা।
তিন কুলে পড়বে জল
গঙ্গার ধারা॥

এই ব্রতটীতে উর্ব্বরতার তুক্‌ আছে। দুটী কামনা প্রকাশ পাচ্ছে—বৃষ্টি হয়ে ধরণী শস্যশ্যামলা হোক এবং ব্রতীর পরিবারেও আশীর্ব্বাদ করুক যাতে সংসার ফলে ফুলে বা সন্তানসন্ততিতে ভরে উঠুক। বৃষ্টির আনুকরণিক অনুষ্ঠানটীর মত জাসব ফ্রেজার সাহেবের 'গোল্ডন বুক্‌
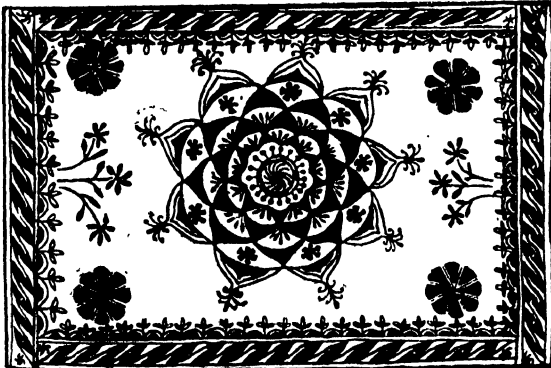
পুস্তকে আদিম কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় উল্লিখিত আছে। আমাদের পাঁড়াগায়েও অনেক সময় চাষারা এইরূপ করে থাকে। ইহা একটী হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিক্।

ভাদ্র মাসে ভদ্রালীব্রত সারা মাস ধরে মেয়েরা উদ্‌যাপন করে। এই ব্রত বৃষ্টিবাদলার পরে আত্মীয় স্বজনের বিদেশ থেকে, সমুদ্রযাত্রা থেকে জলপথে স্থলপথে নিরাপদে ফিরে আসার কামনায় মেয়েরা ভাদুলীঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে ছড়া কেটে এবং আল্পনা দিয়ে পূজা করে।

এ নদী সে নদী একখানে মুখ
ভাদুলী ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ।
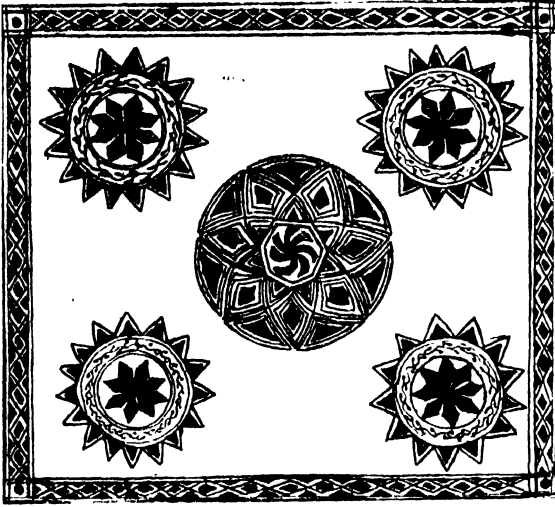
জলচৌকির নক্সা—রাণী সরকার

এ নদী সে নদী একখানে মুখ
দিবেন ভাদুলী তিনকুলে সুখ।

আল্পনাতে তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তেরটী নদীর মুখ একটি বড় নদীর কূলের ফাঁকে ফাঁকে—ভরা ভাদ্র মাসে সবকটাই টলমল অবস্থায় সমুদ্রে মিশেছে গিয়ে—তার উপর ভেলা আঁকা—যেন ব্রতীর পিতামাতা তাতে চড়েই গেছেন বাণিজ্যে।

ভেলা! ভেলা! সমুদ্রে থেকো
আমার বাপ-ভাইরে মনে রেখো।

আল্পনায় একটী ভরা নদীতে দুটী নৌকায় দুটী পা রেখে অঙ্কিত ভাদুলী ঠাকুরাণী (ভাদ্রঋতুকে এইরূপভাবে দেবীর মত পূজা করা হয়) তাঁর মাথায় জোড়া ছত্র (quanti-religious diety).

জোড়-জোড়-জোড় সোনার ছত্তর জোড় নৌকায় পা।
আস্‌তে যেতে কুশল করবেন ভাদুলী মা॥

ভাদুলী ব্রতের আল্পনায় কুমারীমনের অর্থহীন বা অর্থপূর্ণ বহু দ্রব্যের ছবির সমাবেশ থাকে। আল্পনাও কতকগুলি, একটীতে ধরুন বনের ছবি, গাছপালা, তালগাছ, কাক বা বাবুয়ের বাসা, কাঁটার পাহাড়, বন্য মহিষ বা বাঘ ইত্যাদি (zoomorphic) নক্সা। ব্রতীরা জোড় হাত ক'রে বল্‌বে—

"বনের বাঘ বনের বাঘ
তোমরা নিও না আমার বাপ-ভায়ের দোষ।"

পাছে বনের পথে আস্‌তে আসতে পিতা কি ভায়েরা আক্রান্ত হয় এই ভয়ে তাদের মঙ্গলকামনায় ব্যাঘ্রদেবকে আল্পনায় প্রতিমূর্ত্তি করে ছড়ার মন্ত্রে পূজা দেওয়া হচ্ছে। বনদেবীকেও মিনতি—তারা যেন কুশলে ফেরে, তাহলে

'তোমার হোক সোনার পিঁড়ি
যদি কুশলে তারা আসেন আপন বাড়ী।'

আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় বাংলাদেশে যে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান হয় সেটী শস্যশ্যামলা পৃথিবীকে নমস্কার জানানো সাধারণভাবে হৈমন্তিক উৎসব (harvest festival) বল্লেও অন্যায় হবে না। এই দিনে কুমারী এবং বিবাহিতা মেয়েরা শাস্ত্রীয় ব্রত উদ্‌যাপন করে। এই লক্ষ্মীপূজায় আল্পনা একটী প্রধান অঙ্গ। "সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মী সকাল হতে মেয়েরা ঘরগুলি আল্পনায় বিচিত্র পদ্ম, লতাপাতা এঁকে সাজিয়ে তোলে—লক্ষ্মীর পাঁড়া বা পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপ্যাচা এবং ধানছড়া হল আল্পনার প্রধান বস্তু।"* মধুমথামের গোড়ায় নানা আল্পনা দেওয়া লক্ষ্মীর চৌকি পাতা—তার উপর আঁকা লক্ষ্মীর মুকুট, পা, পেঁচা, ধানছড়া, গহনা, পদ্ম, কড়ি, ফুল, সিঁদুর-চুবড়ি, চিরুণি, দর্পণ ইত্যাদি। গহনার মধ্যে পুরাতনী তাবিজ, পাসা, হাঁসুলী, বাজু, নূপুর, নথ, কঙ্কন এবং কানবালা কিছুই বাদ যায় না দেখেছি।

লক্ষ্মীদেবী আসবেন তাই তাঁর আগমনের পথে ধানছড়া,

* বাংলার ব্রত—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লক্ষ্মীরচরণ, পদ্ম, কল্মিলতা, শঙ্খলতা, দোপাটিলতা, খুন্তিলতা বা খইয়ে লতা, পদ্মপাতা, কদলীপত্র প্রভৃতি শিল্পীর খুশীমত আঁকা দেখ্‌তে পাই—আমাদের শহরে এটী শুধু চৌকাটের উপর একটী দুটী করে লতা বা ঢেউ-খেলানো সরল রৈখিক অঙ্কনে এসে ঠেকেছে। তার মাঝে খুন্তিও পাবেন না, খইও পাবেন না, বড় জোর হয় ত কতকগুলি ফোঁটা (punch marks) মাদ্রাজী আল্পনার মত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মাদ্রাজী আল্পনা বলাতে আমি তামিল কানারী মেয়েদের আল্পনার নিন্দা করছি না—কারণ যেরকম শুনি তাতে দক্ষিণভারতে বেশ খুব সুন্দর সুন্দর আল্পনা দেওয়ার চলিত আছে তার পরিচয় পাই।

অন্নপ্রাশনের পিঁড়ি—মাধুরী দাশগুপ্তা

৭। বিবাহে বরের পিঁড়ি—কল্যাণী দেবী
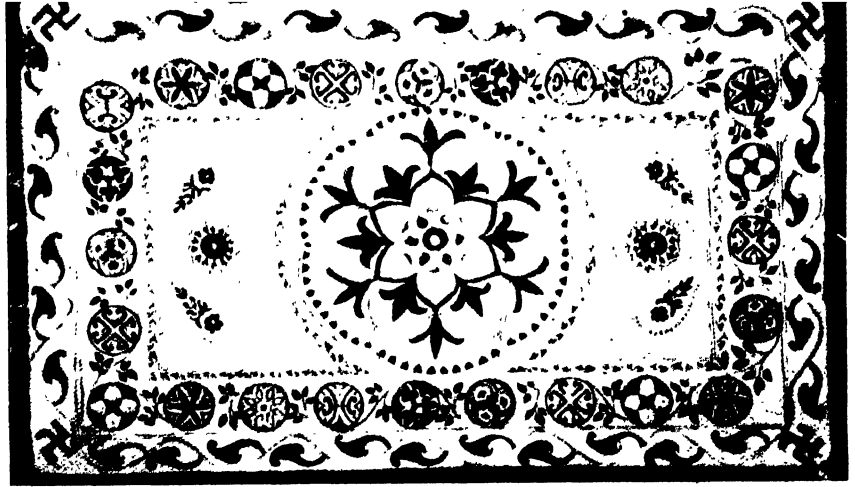
মা-ঠাকুরমাদের কাছে শুনেছি, কার্ত্তিক অগ্রাণ মাসে তাঁরা সেঁজুতি ব্রত করতেন কুমারী বয়সে। পল্লীগ্রামের মেয়েরা কোন কোন জায়গায় এখনও করে থাকে। এই ব্রতটীও একটী মাস ধরে উদ্‌যাপিত হয়। সেঁজুতি ব্রতে আল্পনা হল অন্যতম প্রধান অঙ্গ—বেশ বড় গোছের ব্রত বলে সেঁজুতির আল্পনায় চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের জিনিষ রূপায়িত হয়ে ব্রতীর মনস্কামনা পূরণে ছড়ার সহিত সংযুক্তভাবে সহায়তা করে। এই চল্লিশ-পঞ্চাশ রকম দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুতের পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্য, চন্দ্র, গঙ্গা, যমুনা, বেগুনপাতা, কাকুলিগাছ, অশত্থবৃক্ষ, মাকড়সা, ময়না, উদ্‌বেরালী, সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু প্রভৃতি। সাধারণত গৃহপালিত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ—যাদের সঙ্গে ব্রতীর চাক্ষুষ পরিচয় থাকে তাদেরই আঁকা আকার সেঁজুতি আল্পনায় চোখে পড়ে।

ছড়াগুলিও তেমনি একসুরে ছেলেমানুষী অর্থহীন ভাব প্রকাশ করে—বেগুনপাতায় আল্‌পনার হাত রেখে মেয়েরা বলে—

"বেগুনপাতা ঢোলা-ঢোলা
মার কোলে সোনার তালা।"

মাকড়সায়—"মাকড়সা, মাকড়সা চিত্রের ফোঁটা
মা যেন বিয়োয় চাঁদপানা বেটা।"

অনেক সময় এই সব ধরণের ছড়া কিশোরীদের মুখে

পাকামোর মত শোনায় বটে, কিন্তু তৎকালীন ধনধান্যভরা ফলে ফুলে ভরা বাংলাদেশের সুখী একান্নবর্ত্তী সংসারের মেয়েদের মুখে এমনি সব সরল কামনা ফুটে উঠ্‌ত ছড়াতে।

গঙ্গা যমুনা জুড়ি হয়ে,
সাত ভেয়ের বোন হয়ে,
সাবিত্রী সমান হয়ে
গঙ্গা যমুনা পূজ্যন্
সোনার থালে ভুজ্যন্।

সম্প্রদানে ক'নের পিঁড়ি—প্রতিমা দাশগুপ্তা

চন্দ্র সূর্য্য পূজ্যন্
সোনার থালে ভুজ্যন
সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু,

ইত্যাদি—

ছন্দ মেলাতে বহু বাছাই বস্তুর আবির্ভাব হয়ে থাকে। যেমন—

ময়না, ময়না, ময়না
সতীন যেন হয় না

বিবাহিত জীবনে সতীন থাকা কোন্ মেয়ে সহ্য করে? সেই কামনা প্রকাশ করতে ময়নারই ডাক পড়েছে ছন্দ মেলাবার জন্য—যদিও টিয়া বা কাকাতুয়া ও ব্রতীর বাড়ীর অঙ্গনে আছে। দু-এক জায়গায় শুনেছি, ছন্দ মেলাতে হাতের কাছে চুল বাঁধবার আয়নারও খোঁজ পড়ে আলপনাতেও আঁকা হয়।

আয়না আয়না, আয়না
সতীন যেন হয় না
অশথ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আল্‌তা পরি
বঁটী বঁটী বঁটী
সতীনের শ্রাদ্ধে কুট্‌নো কুটি।

ঘরকন্নার কাজে প্রতিদিনকার ব্যবহার্য্য দ্রব্যের ছবি চোখে পড়ে বেশী, কারণ ব্রতীর ক্ষুদ্র পৃথিবীর মাঝে তাদেরই স্থান অধিক।

পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় তারা ব্রত পালন করে মেয়েরা। প্রথমেই আল্পনা আঁকা—চন্দ্র, সূর্য্য, তারা—সূর্য্য মস্ত গোলাকার, চন্দ্র অর্দ্ধগোলাকৃতি তারা ফোঁটা ফোঁটা। তারা থাকে ষোলটী, সবগুলিই সাঙ্কেতিক চিত্র—এ ছাড়া মান্দার, চিরুনি, কৌটা, আয়না, পালকী, আসন, বলয়, নোয়া প্রভৃতিও আল্পনায় থাকে। আল্পনা এঁকে ব্রতীরা ছড়া বলতে থাকে—

ষোল ষোল তারা তোমরা হয়ো সাক্ষী
ঘৃত দিয়া করি মোরা পঞ্চগ্রাসী
*　　*　　*　　*
চন্দ্র সূর্য্যে দিয়া ফুল
ভরিয়া উঠুক তিন কুল

ম্যালথসের থিওড়ি বোধ হয় তখনও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েনি, নইলে বংশে বংশে সন্তান কামনার অতি-বাহুল্য ব্রতীদের ছড়াতে এতটা প্রকাশ পেত না।

তার পূজা করে যে সাত ভাইয়ের বোন সে
সাবিত্রীর সমান সে।
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী
কালো পুতে সরু শাঁখা জন্ম জন্ম আয়ুষ্মতী।

আল্পনায় তারা ব্রতের ভূমণ্ডল অনেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে মেয়েরা এঁকে থাকে। পদ্ম এবং অনেক রকমের সূক্ষ্ম আলঙ্কারিক চিত্র বিচিত্রতার সমাবেশে বা খুঁটি নাটি দ্রব্যের অমন সহযোগে যাদের অর্থ গ্রহনক্ষত্রদের তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

মাঘ মাসের দুটী চতুর্থী তিথিতে ত্রিভুবন চতুর্থী বলে একটী ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রতে চাল, সরা, জল, কাঁটাল পাতা, আমের পল্লব, সলতের আগুন, ফুল, দূর্ব্বা, চন্দন প্রভৃতি পার্ব্বণ দ্রব্যের সহিত আল্পনারও অস্তিত্ব থাকে। প্রাতঃকালে ব্রতীরা স্নান সমাপন করে শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরিধান করে পরিষ্কৃত উঠানে আল্পনা আঁকে—যেটী পুরাদস্তুর জৈমিতিক নক্সার একটী গোলাকার মণ্ডল ত্রিভুবন বা পৃথিবীকে অর্থ করে। এই ব্রতটীই আমার মনে হয় চৈত্র সংক্রান্তির পৃথিবী ব্রত। ছোট-বড় কুমারী-সধবা সব মেয়ে মিলেই বর্ষশেষ দিনটীতে বসুন্ধরা ত্রিভুবনকে এই ব্রত পালন করে নমস্কার জানায়। আল্পনা সহজ ধরণের হলেও অর্থসূচক এবং ভাবের প্রকাশ তাতে বিশেষ পাওয়া যায়।

পদ্মের ঝাড়, পদ্মের ঝাড়ে পদ্ম পুষ্প—পদ্ম পাতার উপর বসুমতীর মণ্ডল—এই কটী জিনিসের আল্পনায় পৃথিবী সম্বন্ধে এমন সুন্দর ভাব বহন করে।

এস পৃথিবী, বস পদ্মপাতে
শঙ্খ চক্র গদা হাতে।

দুঃখিনী ব্রতী বলে—

বসুমতী দেবী গো, করি নমস্কার
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।

ব্রতের সঙ্গে জড়িত আল্পনাগুলি মূলত অর্থপূর্ণ এবং প্রতীক ভাবাপন্ন; কিন্তু আলঙ্কারিক আল্পনা যা বর্ত্তমানে বেশী চলতি—তাতে বিশেষ কোন অর্থ সব সময় থাকে না—বরঞ্চ তাদের সৌন্দর্য্যবিধায়ক মূল্যের জন্ম মেয়েদের রস-শিল্প-জ্ঞানের উচ্চ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রতজড়িত আল্পনাগুলিতে বহু সময় দেখেছি একটু আদিম কালোচিত প্রাচীন বা অপরিপক্কতা চোখে পড়ে—সেইজন্যই বোধ করি ব্রতের আল্পনা আজকাল হ্রাস পেয়েছে।

হাতে পো, কাঁখে পো, তোরে পুজলে কি হয়?
শাঁখা হয়, সুখো হয়, সাত পুতির মা হয়।

শহুরে মেয়েদের কাছে এরূপ ছড়া যেমন রুচিবিগর্হিত এর আল্পনাও তেমনি সভ্য মানবের কাছে অচল; হাতে পো, কাঁখে পো এবং মাতা এদের রূপ আল্পনার নক্সায় যা রূপায়িত তার ঠিক সমান মনুষ্য আকার Mas-D-Azil এ (স্পেনের) আজিলিয়ান যুগের গহ্বরে, ঘাটশীলার রক্ কার্ভিং * প্রভৃতি প্রস্তর যুগের অঙ্কন শিল্পে (Palaeolithic
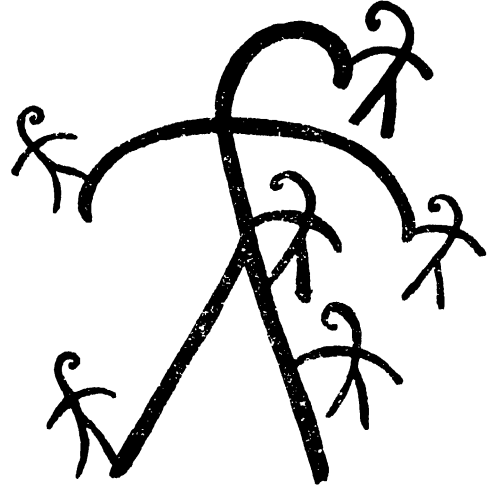
হাতে পো কাঁখে পো—"বাংলার ব্রত"

art) পাওয়া গেছে। জন্তু জানোয়ারের মূর্ত্তিও পাড়াগাঁয়ে ব্রত আল্পনাতে যে রকম পাওয়া যায় তার হুবহু মিল আমি কয়েকটী প্রস্তর যুগের শিল্পে লক্ষ্য করেছি। সেইজন্য ব্রতের আল্পনার কতকগুলি নক্সা যে পল্লীশিল্পের খুব নিম্নস্তরের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু কতকগুলি আবার যেমন পৃথিবী ব্রতের বা তারার ভূমণ্ডলে পল্লীশিল্পের উন্নত নমুনাই মেলে।

আমার সংগৃহীত আল্পনাগুলি অলঙ্কারের দিক থেকে অতি সুন্দর বলতে পারি। এই রকম অসংখ্য ধরণের বাহারী সূক্ষ্ম পদ্ম—বৌছত্র পদ্ম, যাত্রা কলসের পদ্ম, বরযাত্রীর পদ্ম, জোড়া পদ্ম ইত্যাদি সবই মেয়ে শিল্পীরা আঁকেন—যার কদর হয়ত কেউ করেন না, কিন্তু কলারসিক

* Prehistoric India : Panchanan Mitra.

মহলে যে তার দাম কত, তা শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্তগুরুসদয় দত্ত মহাশয়দের কার্য্যাবলীর যাঁরা খোঁজ রাখেন তাঁরাই জানেন।

এই সহজাত শিল্পী মেয়েদের কাছ থেকে যে আমরা কত শত নক্সা পাই তার হিসাব থাকে না—বাহারী করতে পঞ্চাশ রকমের লতারই আমদানি হয়েছে। নামও কেমন—দোপাটি লতা, পদ্ম লতা, খুন্তি লতা, দালানী লতা, খইয়ে লতা, চালতা লতা, করঞ্চ লতা, বাউটি লতা, চাঁপা লতা, শঙ্খ লতা, মুক্ত লতা প্রভৃতি—লতার মত আঁকাবাঁকা ঢেউ (waveline) রেখা এঁকে তার মধ্যে ফুল, পদ্ম ফুল, খুন্তি, চালতা, মুক্ত এই সব আঁকা থাকে বলে অদ্ভুত লতার আবির্ভাব।

নক্সার অন্ত নেই—"New patterns are constantly originated by the women who in this case dream the new designs."—Goldenwiser ছড়াব্রতের আল্পনার ধরণে পল্লীর শিল্প আমরা আদিম সমাজের মেয়েদের মধ্যে প্রচুর দেখ্‌তে পাই, নিকটেই

খুন্তিলতা ও কদলীলতা
—সুধাংশু রায়

আমেরিকার পুরাতন সভ্যতার
মৃৎশিল্পে আলঙ্কারিক চিত্র

সাঁওতাল পরগণা বা ছোটনাগপুরের সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, বীরোহড়, হো প্রভৃতি আদিম জাতির বসতিতে আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন তাদের মেয়েরা দেয়ালে কত রকমের জ্যামিতিক চিত্র এঁকে থাকে সাদা রঙে। সেইজন্য ব্রত আল্পনার চিত্রগুলি আমি পল্লীশিল্পের খুব আদিম স্তর বলেই ধরে থাকি—সেই সমস্ত চোখে না পড়ায় দুঃখ করবার নেই। তবে আড়ালে তার চর্চ্চা নিতান্তই দরকার এইজন্য যে, চিত্রশিল্পের সঙ্গে যাঁরা (যে সব মেয়েরা) ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবেন তাঁদের এই ধরণের আল্পনা এঁকেই হাতে খড়ি এবং শিক্ষারম্ভ হবে।

শহরে শ্বেতপাথরে ফুলকাটা বেদীতে যে দেবীপূজা হয় তার চেয়ে অনেক সুন্দর লাগে সাধারণ মেঝের উপর আল্পনার বেদী। সে সমস্ত প্রসাধনের দাম দেওয়া যায় না, কিন্তু সাধারণে তার কদর করে না বলেই আজ আল্পনা শিক্ষা লুপ্ত হতে বসেছে। আজকাল মেয়েরা চর্চ্চা করেন না, তার কারণ তাঁরা নিজেরাও শিল্পানুরাগী নন এবং তাঁদের আল্পনার গুণ বুঝবার মত কলারসিকও অতি অল্প।

ঘাটওয়ালা

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

ওদিক হইতে দু'খানা নৌকা ছপছপ শব্দ করিয়া দাঁড় বাহিয়া ক্রমশ গঙ্গার দিকে আগাইয়া আসিতেছিল। ঘুমের ঘোরে শব্দ পাইয়া ঘাটওয়ালা বুড়া ফকিরচাঁদ সজাগ হইয়া উঠিয়া সাড়া দিল, হেই! কোথায় এতরাত্রে?

নৌকারোহীদের মধ্যে একজন সাড়া দিল, যাত্রী গো—তুমি উঠে এস –

যাত্রী—অর্থাৎ কোন দূর গ্রামের বাসিন্দা তাহার কোন আত্মীয় বা আত্মীয়ার পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাস কামনায় তাহার মৃতদেহ এই সুদূর দেশের গঙ্গাতীরে বহন করিয়া আনিতেছে।

গঙ্গার উভয়তীরে শ্মশান—ফকিরচাঁদের জমিদারী। জায়গাটা অবশ্য ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের, তবে ফকিরচাঁদ জমা লইয়াছে; নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে, এমন কি, বহু দূর দূরান্তর হইতেও লোকে এখানে মৃতদেহ দাহ করিতে আসে। কারণ এদিকে শ্মশান বলিতে এই একটিই। প্রত্যেকটি মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য মৃতদেহ আনয়নকারী ব্যক্তিকে পাঁচসিকা হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত ফকিরচাঁদকে দিতে হয়···অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। কাহার কি রকম অবস্থা, ফকিরচাঁদ তাহা কথার ধরণেই বুঝিতে পারে।

নৌকারোহার কথায় ফকিরচাঁদের আনন্দ হইবারই কথা। গোমড়কে মুচির পার্ব্বণ···মানুষ যত মরিবে ফকিরচাঁদের ততই লাভ, কিন্তু ফকিরচাঁদ খুশী হওয়ার পরিবর্ত্তে বিরক্তই হইল; তাহার বিরক্ত হইবার কারণ, তাহার বয়স হইয়াছে, ঘাটেরও উপর তাহার বয়স। এ বয়সে সে আর রাত্রিকালে উঠিয়া মড়ার খবরদারী করিতে পারে না। তাই মাচার উপরকার সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া সে আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, "পারি না বাপু, যত লোকের মরণ হতে হয় কি এই রাত্রে? এতবড় দিনটা গেল সেই সময়ে ত আসতে পারতিস, তা নয়··· কোথায় এই শীতের রাত্রে বেশ একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমব, তা নয়, এল জ্বালাতন করতে—"

কিন্তু বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে উঠিয়া বসিল। একটা পুরান কোট গায়ে দিয়া মাথায় একখানা ছেঁড়া গায়ের কাপড় জড়াইয়া সে ঘাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া স্ত্রীকে ডাকিল, "ও ফুলটুসির মা, ফুলটুসির মা, শুনচিস্—আমি ঘাটে চললাম—উঠে দরজাটা দে।"

ফুলটুসির মা'র তখন নাসিকা গর্জ্জন সুরু হইয়াছে। সে ফকিরচাঁদের ডাকে সাড়া দিল না। ফকিরচাঁদ কিছুক্ষণ হতাশভাবে নিদ্রিতা স্ত্রীর পানে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিল, "মরেছে রে, মাগী নাক ডাকাচ্ছে—এখন কি আর ওর ঘুম ভাঙ্গবে। শালী যেন কুম্ভকর্ণ, পড়েছে কি মরেছে—আর ওর কানের কাছে নথ্যিগণ্ডা জয় ঢাক বাজালিও সাড়া পাওয়া যাবে না। ইচ্ছে করে, দিই ওই মা গঙ্গার জল মাগীর গায়ে ঘড়া ক'রে ঢেলে!"

তখন সে দরজাটা বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া তাহার য়্যাসিষ্ট্যান্ট রতনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

নিকটেই রতনের ঘর—সেও তখন নিদ্রিত; ফকিরচাঁদের ডাকাডাকিতে রতনের স্ত্রী রতনকে ডাকিতে লাগিল। দুই-তিন ডাকেও যখন রতনের সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ফকিরচাঁদ বাহির হইতে রতনের স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও হারামজাদার ঘুম ভাঙ্গানো কি আর তোমার কম্ম মা—ও তোমার কম্ম নয়, তুমি বরং দরজাটা খুলে দাও, আমিই একবার দেখি।"

রতনের স্ত্রী দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। ফকিরচাঁদ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হাতের মোটা লাঠিটা দিয়া রতনের পশ্চাদ্দেশে গুঁতা মারিতে মারিতে বলিল, "হেই-হেই রত্না, হেই শালা, ওঠ ওঠ, যাত্রী এয়েছে—"

ফকিরচাঁদ সম্পর্কে রতনের খুড়া হয়।

গুঁতা খাইয়া রতনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তন্দ্রাজড়িত চোখ না মেলিয়া একটা শব্দ করিল, "উঁক!"

ফকিরচাঁদ ভেংচি কাটিয়া বলিল, "উঁক! সুমুদ্ধিরপো

আজও তাড়ি খেয়ে মরিচিস্—ও শূয়োরের গু মুচির গু না খেলেই নয় ?”

এইবার রতনের ঘুম একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল, “কেঁ, খুঁড়োমশায় ?”

“হ্যাঁরে শালা হ্যাঁ—মরিচিস্ ত তাড়ি খেয়ে, তবে চ’ আজ তোকেই ওই চিলুতে দিয়ে আসি—”

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বধূটি একবার হয় ত শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু ফকিরচাঁদ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, বলিল, “চ, যাত্রী এয়েছে।”

চোখ রগড়াইয়া রতন বলিল, “হ, এই শীতের রাত্রে যাচ্ছে।”

হাসিয়া ফকির বলিল, “পয়সা পালি যে সব শীত গরম হয়ে যাবে বাপধন। নে চ—”

অগত্যা রতনকেও উঠিতে হইল।

দুইজনে শ্মশানে আসিয়া দেখিল শববাহীর দল ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইয়াছে; এমন কি, সকলে গঙ্গাতীরে অবতরণ করিয়া শবদাহ করিবার জন্য জোগাড় যন্ত্র করিতেও সুরু করিয়াছে। একজন লোক একপাশে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে নিজের নির্দ্দেশানুসারে সকলকে কাজ করিবার জন্য আদেশ করিতেছিল, ফকিরচাঁদ তাহাকে চিনিল, সে গুরুচরণ বাড়ুয্যে; বহুবার বহু শব লইয়া সে এই ফকিরচাঁদের ঘাটে আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ফকিরচাঁদ আগাইয়া গিয়া বলিল, “পেরণাম দাঠাকুর, এত রাত্রে এ গরীব ফকিরচাঁদের কাছে কি মনে করে আসা হল ? দ্যান, একটা বিড়ি দ্যান্—”

বলিয়া গুরুচরণের হাত দুই তফাতে উঁচু হইয়া বসিল। গুরুচরণ একটা বিড়ি বাহির করিয়া ফকিরের প্রসারিত হাতের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, “হ্যাঁ, তোমার কাছেই এলাম ফকিরচাঁদ।”

“আজ্ঞে আসতিই যে হবে—এ সময়ে যে মোর জমিদারী ছাড়া আপনাদের ঠাঁই নেই, মুই যে আপনাদের শ্যাষের দিনের ফকিরচাঁদ·· তারপর, ক’গণ্ডা হল ?”

অর্থাৎ এই মৃতদেহটি লইয়া গুরুচরণের কয়টি মৃতদেহ দাহ করা হইল।

গুরুচরণ হাসিয়া বলিল, “শটকে গণ্ডাকের কোঠা অনেক দিন ছাড়িয়ে এসেছি ফকিরচাঁদ, এখন বুড়ি-পণ যদি কিছু থাকে ত তাই বল”।”

ফকিরচাঁদ মূর্খ, বুড়ি-পণ কথা দুইটার অর্থ সে বুঝিল না, তথাপি টানিয়া টানিয়া হাসিয়া বলিল, “বুড়ি, পণ, হ হ—”

মৃতদেহকে স্নান করাইবার জন্য তীরে নামান হইল। রমণীর মৃতদেহ, বয়স তাহার উনিশ কি কুড়ি বৎসর, সিঁথিতে সিন্দূর, পরণে লাল পাড় শাড়ী। ফকিরচাঁদ বলিল, “এঃ! এ যে মেয়েছেলে, একেবারে কচি বাচ্চা—”

দুজন লোক একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে গুরুচরণের সহিত কি পরামর্শ করিতেছিল। পরামর্শ সাঙ্গ হইলে গুরুচরণ আগাইয়া আসিয়া বলিল, “একটা কাজ করতে হবে যে ফকিরচাঁদ।”

—“আজ্ঞে করেন—”

—“মানে, মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা ছিল, এই দশ মাস, তা ছেলেটা বার করতে হবে ত।”

উৎসাহ সহকারে ফকিরচাঁদ বলিল, “আজ্ঞে, তা হবেনই ত—তা সে আর বেশী কথা কি, আপনি হুকুম করলেই এখুনি সব ব্যবস্থা ক’রে দিচ্ছি, কিন্তু এ কাজে যে আমাদের কিঞ্চিৎ পাওনা-থোওনা আছে দাঠাকুর—”

গুরুচরণ হাসিয়া বলিল, “সে কি আমার জানা নেই—বলে এই ক’রে বুড়ো হলাম।”

“আজ্ঞে, বটেই ত—”বলিয়া সায় দিয়া ফকির ডাকিল, “রত্না, অ রত্না! এই মরেছে—আবার ঘুমুচ্ছে—”

রতনের বোধ হয় একটু তন্দ্রামত আসিয়াছিল, ডাক শুনিয়া বলিল, “কি কও ?”

—“মা লক্ষ্মীর প্যাট থেকে ছেলেটা বার করতি হবে।”

—“সে আর বেশী কথাডা কি ?” রতন বলিল, “ট্যাকা দাও, আর একখানা ছুরি দাও।”

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজনের নিকট হইতে একখানা পেন্সিলকাটা ছুরি পাওয়া গেল। রতন ছুরি লইয়া বলিল, “বাবুমশায়রা ট্যাকা আগে দাও, নইলে যে শ্যাষে খচাই করবা, সিটি হবে না—এককুড়ি ট্যাকার কম এ কাজ হবে না।”

কিছুক্ষণ দর কষাকষির পর শেষে একখানি পাঁচ টাকার নোট হাতে পাইয়া রতন ছুরি ধরিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গর্ভস্থ শিশু সুকৌশলে বাহির করিয়া আলোকে শিশুর মুখ দেখিয়া বলিল, “ইঃ! বেটাছেলে—ছেলে নয় ত যেন

রাজপুত্তুর, মুখখানা লাল টকটক্‌ করছে, টুস্‌কী মারলে রক্ত পড়বে—"

ভোর রাতে সকল কার্য্য সমাপ্ত হইল। গুরুচরণ চিতা নিভাইয়া আসিয়া ফকিরচাঁদের সম্মুখে টাকা ধরিতেই ফকির-চাঁদ অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "কও কথা, এ তুমি কি দেচ্ছ দাঠাকুর, এ কাজ এককুড়ি পাঁচের কম হবারই নয়—"

গুরুচরণ গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওকথা আর বল না ফকিরচাঁদ।" তারপর একজন প্রৌঢ়কে দেখাইয়া বলিল, "এঁয়ার মেয়ে—এই সেদিন এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, এখনও দুটো বছর পার হয়নি। রাজরাণীর্‌ মত মেয়ে চলে গেল, আর উনি বুড়ো বাপ রইলেন—এ ক্ষেত্রে ও কথা আর বল না—"

অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও ফকিরচাঁদকে পাঁচসিকা পয়সা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। গুরুচরণ তাহার দলবল লইয়া গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ফকিরচাঁদও রতনকে লইয়া তাহার ছোট্ট ডিঙি'খানিতে উঠিয়া বসিল। ডিঙি বাহিতে বাহিতে রতন বলিল, "ইঃ! কথা কয় কি—বলে কি না এই সিদিনে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে এক কাঁড়ি ট্যাকা খরচ করে; হ, তাই বুঝি মোদের হক্কের ধন মারা যাবে? ইঃ! লো—মোরা এক কাঁড়ি ট্যাকা দে ঘাট জমা নেইনি—"

ফকিরচাঁদ বুঝিল যে শ্রীমান রতনচন্দ্রের তাড়ির নেশা এখনও কাটে নাই; কিন্তু তাহারও অন্তর হইতে গুরুচরণের কথার ঝঙ্কারগুলি এখনও সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায় নাই। যাহারা শবদাহ করিতে আসে তাহারাও মানুষ, আর সেও মানুষ; যদিও সে দরিদ্র অস্পৃশ্য, তথাপি সেও মানুষ; কিন্তু তাহাদের সহিত ফকিরচাঁদের কত প্রভেদ। একদল যখন শোকে মুহ্যমান, সে সময়ে সে অন্তরে আনন্দ অনুভব করে। কি, না সে কিছু পয়সা পাইবে। অথচ অপর সকলেরই মত তাহারও সুখ আছে, দুঃখ আছে, অনুভূতি আছে, নিজের প্রিয়জনের বিয়োগে সেও ব্যথা অনুভব করে।

রতন বলিল, "শালার মানুষ মরে কই? না হয় মার দয়া, না হয় ওলাবিবির পেরকোপ···হি · হি···ওলাবিবির পেরকোপে একেবারে গাঁকে গাঁ উজোড় হয়ে যায় ত হি—হি—কি পয়সাই লুটি খুড়ো—"

ফকিরচাঁদ তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "তোর মাতলামি এখন বন্দ কর্‌ রত্না—"

দিন তিন-চার পরে ফকিরচাঁদকে ভোরবেলায় নিজের কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া ধূমপান করিতে দেখা গেল। আজ আবার ভোর রাত্রে একজনেরা শবদাহ করিতে আসিয়াছিল। ফকিরচাঁদ তাহার পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। ফকিরচাঁদের একপার্শ্বে তিনগাছি নীল কাঁচের চুড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। চুড়ি কয়গাছি দেখিলেই বোঝা যায় যে, কোন বালিকার চুড়ি। প্রকৃত ঘটনাও তাহাই। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাহার মৃতদেহ গঙ্গার পরপারে চিতার আগুনে ভস্মসাৎ হইয়া গেল, সে একটি বছর সাতেকের বালিকা, চুড়ি কয়গাছি তাহারই। বালিকার পিতা সযত্নে কন্যার হাত হইতে চুড়ি কয়গাছি খুলিয়া লইয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছিল, নষ্ট করিতে পারে নাই, তাই ফকিরচাঁদ কুড়াইয়া আনিয়াছে। তাহার কন্যা ফুলটুসীর রং ফর্সা—তাহাকে এ চুড়ি পরিলে বেশ মানাইবে।

একটা সমস্যায় পড়িয়াছে ফকিরচাঁদ, একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। বালিকার পিতা, কন্যার মৃতদেহটাকে অনায়াসেই দাহ করিয়া গেল; অথচ কন্যার হাতের চুড়ি কয়গাছিকে নষ্ট না করিয়া সযত্নে খুলিয়া রাখিয়া গেল কেন? ভাবিল, হয় ত বা এই বালিকার পিতাও তাহারই মত দরিদ্র। একদিন ফুলটুসি ফকিরচাঁদের কাছে একটি সিল্কের জামা চাহিয়াছিল, কিন্তু ফকিরচাঁদ দরিদ্র বলিয়াই তাহা দিতে পারে নাই। তাহার জন্য ফুলটুসি কত কাঁদিয়াছে, কত উপবাস দিয়াছে। এই বালিকাটির পিতাও হয় ত কন্যার ক্রন্দনে উপবাসে বিচলিত হইয়া এই কয়গাছি কাঁচের চুড়ি কন্যাকে উপহার দিয়াছিল; সে স্মৃতি যে কত দুঃখের, কত ব্যথার, যে ভুক্তভোগী নয় সে তাহা বুঝিবে না। আজ সে তাহার কন্যাকে সংসার হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত করিয়া দিয়া গেল, বালিকার অস্থিকঙ্কাল, এই শ্মশানের অস্থিকঙ্কাল করোটির সহিত মিশিয়া গেল, তথাপি সেই দিনের সেই বেদনাহত মুহূর্ত্তটির কথা স্মরণ করিয়া আর সে এই চুড়ি কয়গাছিকে নষ্ট করিতে পারে নাই। ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া গেল। ফকিরচাঁদ বিকৃত কণ্ঠস্বরে আপন মনে গাহিতে লাগিল—

"জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর—"

ফকিরচাঁদের চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ফুলটুসির মা নয়নতারা স্বামীর অপূর্ব্ব কলাময় কণ্ঠস্বরে জাগিয়া উঠিয়া সাড়া দিল, "বলি, রাত্ পোয়াতে না পোয়াতে কি বলদের মত না চেঁচালেই নয় ?"

ফকিরচাঁদ, নয়নতারা যাহাতে না শুনিতে পায়, এমন ভাবে আপন মনে বলিল, "এঃ! তেজ দেখ না, যেন নবাবজাদী, তাই এইবেলা তিন পহর পর্য্যন্ত সোনার খাটে গা'দে, রূপোর খাটে পা'দে পড়ে পড়ে ঘুম মারবেন—"

কিন্তু নয়নতারার কানে সে কথা প্রবেশ করিলে এখনই মহাপ্রলয় সুরু হইবে, তাই ফকিরচাঁদ নিজের কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিল, "ভোর কোথায় রে—বাইরে এসে দেখ্ না, চারিদিকে সূর্য্যির আলো ফট্ ফট্ করছে—"

—"হ্যাঁ করছে"—বলিয়া নয়নতারা স্বয়ং সশরীরে ফকিরচাঁদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া 'ঢুম্' করিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল। ফকিরচাঁদ বুঝিল যে নয়নতারা তাহার উপর রাগ করিয়াছে। তাই একখানি হাত নয়নতারার কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া বহু দিন আগে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রায় শোনা একটি গানের এককলি গাহিয়া উঠিল,—

"পেরভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখনু
দিন যাবে আজি ভালো—"

নয়নতারা স্বামীর হাত সরাইয়া দিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "যাও যাও, ঢং দেখে আর বাঁচিনে, বয়েস বাড়ছে, না কমছে—"

ফকিরচাঁদ সকৌতুকে নয়নতারার দিকে চাহিয়া বলিল, "আরে আমিই না হয় বুড়ো-হাবড়া হইচি, কিন্তু তুই—তোর তো এখন ভরা যৈবন—হক্ কথা বল্ মাইরি—"

নয়নতারা স্বামীর রকম দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাবাপের সাড়া পাইয়া ফুলটুসিও উঠিয়া আসিল। ফকিরচাঁদ কন্যাকে দেখিয়া সযত্নে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুড়ি তিন গাছি পরাইতে লাগিল। যতক্ষণ চুড়ি পরানোর কাজ চলিল, ততক্ষণ ফুলটুসি মুগ্ধদৃষ্টিতে চুড়ি তিন গাছির সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। পরানো হইয়া গেলেও সে নিজের হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল তাহাকে কেমন মানাইয়াছে। চুড়ি কয় গাছি দেখিয়া তাহার সাধ মিটিতেছে না!

নয়নতারা বলিল, "চুড়ি কোথায় পেলে ?"

—"ঘাটে।"

—"ঘাটে কোথায় পেলে ?"

—"ওই ভোর রাত্রে একদল যাত্রী একটা ছোট মেয়েকে নিয়ে এসেছিল, তারই চুড়ি।"

নয়নতারা চুপ করিয়া রহিল, হয় ত বা তাহার মাতৃহৃদয় সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে কিছু বলিল না। কারণ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর তাহাদেরই অধিকার—আর সেই অধিকারের দাবী তাহার স্বামী বহু বর্ষ ধরিয়া চালাইয়া আসিতেছে। এত দিন যখন কিছু হয় নাই, তখন আজিও কিছু হইবে না। তথাপি সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটা বুঝি খুব ছোট ?"

ফকিরচাঁদ গম্ভীরভাবে বলিল, "হুঁ।"

ফুলটুসি ততক্ষণে চুড়ি পরার আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য উঠানে নামিয়া গিয়াছিল। পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়া একটুখানি রোদ উঠানে আসিয়া পড়িয়াছে, ফুলটুসি সেই রৌদ্রটুকুর উপর নিজের চুড়ি ধরিয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছে—রৌদ্রে চুড়িগুলি চিক্ চিক্ করিতেছে আর সে আনন্দে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া মাঝে মাঝে নাচিয়া উঠিতেছে। তাহার সেই আনন্দময় নৃত্য দেখিয়া বৃদ্ধ ফকিরচাঁদের অন্তর নাচিয়া উঠিল। সে আনন্দে গাহিয়া উঠিল—

"আমার কালো মেয়ের কালো রূপে
ভোবন করেছে আলো।"

সে মূর্খ সমাজের অস্পৃশ্য জাতি, তবু আজিকার এই আনন্দময় মুহূর্ত্তটিতে তাহারও অন্তরে বোধ হয় নিখিল বিশ্বের আনন্দ সঙ্গীতের সুরের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে 'ভোবন' কথাটির শেষে একটি অনাবশ্যক ওকারের টান দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহির হইতে রতন ডাকিল, "খুড়োমশায় !"

—"কি রে রত্না—"

—"আবার যাত্রী আসিতেছে।"

এই আনন্দময় মুহূর্ত্তটি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লী-সংসার ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

পারিল না দেখিয়া ফকিরচাঁদ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার সাত বৎসরের কন্যা ফুলটুসির পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "চল্ যাই।"

এইভাবে বৃদ্ধ ফকিরচাঁদের দিনগুলি কাটিয়া যায়। তাহার বাল্যের ও যৌবনের ব্যর্থ দিনগুলি যেন আজ বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় আসিয়া ফুলটুসি ও নয়নতারাকে কেন্দ্র করিয়া সার্থক হইয়া উঠিতে চায়, কিন্তু তাহাকে বাধা দেয় তাহার পেশা। তাহারই চোখের উপরে মাতা পুত্রকে ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়, পিতা কন্যাকে রাখিয়া যায়, স্ত্রী স্বামীকে রাখিয়া যায়, ভ্রাতা ভগ্নীকে রাখিয়া যায়। এক দিকে সকলে চিতা ধুইয়া তাহার বক্ষে কলসীপূর্ণ গঙ্গাজল ও পাঁচটি পয়সা রাখিয়া যখন চিরদিনকার মত পার্থিব জীবনের যত কিছু বন্ধন ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হয়, তখন অন্য দিকে ফকিরচাঁদ নির্ম্মম পাষাণের মত বলিতে থাকে—আজ্ঞে পাঁচসিকেয় কি আর এ কাজ হয়, এ কাজে পাঁচটা ট্যাকা তো চাই-ই—কত বধূ স্বামীর মুখাগ্নি করিবার জন্য এই শ্মশান ঘাটে আসিয়াছে, তখনও তাহার সীমন্তে সিন্দূর রেখা, পরণে লাল পাড় শাড়ী। তাহার ব্যথাক্লিষ্ট রোরুদ্যমান মুখ, তবু বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ বুঝিতে পারে যে এই সদ্যবিধবা কাল পর্য্যন্তও ছিল স্বামীসোহাগিনী, স্বামীর সোহাগগর্ব্বে গর্ব্বিতা···সেও ভালবাসিত তাহার স্বামীকে—কত বিনিদ্র রজনী দুইজনে যাপন করিতে করিতে নব নব সুখের, নব নব ভালবাসার কল্পনা করিয়াছে, দুইজনে দুইজনার প্রতি অভিমান করিয়াছে, রাগ করিয়াছে—আবার একে অপরের অনুরোধে সমস্ত রাগ অভিমান ত্যাগ করিয়াছে। এই বধূরই মুখে ছিল হাসি···রূপে গুণে সে ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু সে-ই যখন এই শ্মশান ঘাট হইতে ফিরিয়া যায়, তখন মনে হয় যেন কোন এক বিশ্ববিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক তাহার যাদুদণ্ডের স্পর্শে বালিকা বধূর আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। লাল পাড় শাড়ীর পরিবর্ত্তে সে পরিয়াছে সাদা থান, সিঁথির সিঁদুরের চিহ্ন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, অধরের শিশির বিন্দুর মত উজ্জ্বল লূতাতন্তুর রহস্যময় সে হাসির রেখা কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে, সে স্থান অধিকার করিয়াছে মুক্তাফলকের ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু। তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন তপঃক্লিষ্টা পার্ব্বতী বহু তপস্যাতেও দয়িতের সন্ধান না পাইয়া অবশেষে সর্ব্বহারা যোগিনীর বেশে গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে। গঙ্গার কূলে ওই যে নূতন চিতাটি কাটা রহিয়াছে, সে চিতা এক যুবকের—তাহার মা নিজে আসিয়াছিল তাহার মুখাগ্নি করিতে। সন্তানহারা জননীর আকুল আর্ত্তনাদ ফকিরচাঁদ যেন আজিও শুনিতে পাইতেছে। ওই যে চিতার লেলিহান শিখা, যাহা শত শত সহস্র সহস্র সোনার দেহকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে, ফকিরচাঁদ তাহা অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুর।

রতন আসিয়া বলিল, "খুড়ো, পাঁচসিকে পয়সা দাও।"

—"কেন রে কি হবে?"

—"মা ওলাবিবির পূজো দেবো।"

—"তা হঠাৎ?"

—"হঠাৎ?" রতন যেন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল; বলিল, "হঠাৎ তুমি বলছ কি খুড়ো—গাঁয়ের আশেপাশে যে মা ওলাবিবির দয়া হচ্ছে—ওঃ! কি নোকটাই যে মরছে খুড়ো—হি হি—দু বার দাস্ত আর একবার বমি, বাস্! নাড়ী একেবারে ঠাণ্ডা···হুই হুড় হুড় করে সব ঘাটে পোড়াতি আসবে ··হি হি, কি পয়সাই না লুটবো; তুমি কিন্তু আড়াই ট্যাকা করে দর দিবা—হি হি—"

তাহার এই বীভৎস কুৎসিত হাসি ফকিরচাঁদের মোটেই পছন্দ হইল না। সে রতনকে এক তাড়া লাগাইয়া বলিল, "তোর মাতলামি থামা রত্না—বেটা ছোটলোক·· একদিকে গণ্ডালে গণ্ডালে লোক মরতিছে, আর তুই শালা এলি কি-না 'জমির দর আড়াই ট্যাকা কয়'! হান্তোর ট্যাকার নিকুচি করেচে। ভদ্দরলোকেরা যে মোদের ছোটলোক কয়, সে কি আর মিছে কয়, এই জন্যিই কয়—"

তাড়া খাইয়া রতনের আস্ফালনের সঙ্গে সঙ্গে মা ওলাবিবিও অন্তর্ধান হইলেন। সে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে ফকিরচাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল। ফকিরচাঁদ বলিল, "খুব ত ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই-করচিস, তারপর শালা, যদি তোর হয়, তখন তোর কোন্ বাবা ঠ্যাকাবে?"

রতন বলিল, "মোরা গঙ্গা-পুত্তুর—মোদের কি আর কিছু হয়, হয় না। ও শালা কাগের মাংস কি আর কাগে খায়?"

—"তাই খায় কি-না দেখিস, যে দিন যমরাজা 'নুটিস্' দেবে সেই দিন টের পাবি কাগের মাংস কাগ খায় কি-না—" বলিয়া ফকিরচাঁদ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তামাক খাইতে

লাগিল। রতন গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া গেল। বেড়ার বাহিরে আসিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঃ, শালা আমার ধার্ম্মিক হয়েছেন, সেদিনও যে শালা বেশী করে ট্যাকা নেবার জন্য ঝুল পেটাপিটি করতিস্ আর আজ তুমি ধম্মপুত্তুর' যুধিষ্ঠির হয়েছ, আ আঁটকুড়ির পুত, তবু যদি পাঁচসিকের চাকায় আড়াই ট্যাকা না চাইতিস্—"

ফকিরচাঁদের কল্পনাই কিন্তু সত্য হইল। এক দিন কাল ওলাউঠা হইয়া ফকিরচাঁদের সাত বৎসরের কন্যা ফুলটুসি ফকিরচাঁদের মায়া কাটাইল। নয়নতারা হাহাকার করিয়া উঠিল, কিন্তু ফকিরচাঁদ নির্ব্বিকার, অন্তরে অসহ্য বেদনা বোধ করিলেও সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "চল্ রে রত্না, মাকে আমার দিয়ে আসি।"

সেই গঙ্গাতীর—সেই শ্মশানঘাট। এখানে বহুলোককেই নিজের কন্যাকে দাহ করিতে আসিতে ফকিরচাঁদ দেখিয়াছে। আজ সে নিজে আসিয়াছে নিজের একমাত্র কন্যাকে দাহ করিতে।

রতন চিতায় কাঠ ঠেলিয়া দিতেছিল, আর বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ মুখাগ্নি সারিয়া অদূরে বসিয়া জ্বলন্ত চিতার লেলিহান শিখার পানে চাহিয়াছিল। ধীরে ধীরে ফুলটুসির সমস্ত দেহটা ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে, তথাপি যেন ওই নরমাংস-লোলুপ লেলিহান অগ্নিশিক্ষার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না, দারুণ বুভুক্ষায় সে আরও জোরে গর্জ্জন করিতেছে,…সোঁ-সোঁ-সোঁ!

রতন বলিল, "চস খুড়ো, স্নান সেরে নিইগে।"

ফকিরচাঁদ চাহিয়া দেখিল, কার্য্যশেষ, চিতা নিভিয়া গিয়াছে।

—"চল্"—বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু সহসা কোথা হইতে তাহার অন্তরে যেন ওই নির্ব্বাপিত চিতার আগুনের জ্বালা দ্বিগুণ জোরে জ্বলিয়া উঠিল। সে বুঝিল যে এই অগ্নি-চিতার জ্বালাই সে বহুবর্ষ ধরিয়া বহুলোকের অন্তরে জ্বালিয়া দিয়াছে—তাহার যে কি জ্বালা তাহা সে এত দিন বোঝে নাই, আজ বুঝিতেছে। এ জ্বালা কোন দিনই শীতল হইবে না, এ অনির্ব্বাণ বহ্নিশিখা চিরদিনই জ্বলিবে। সে চলিতে চলিতে বলিল, "কাল থেকে ঘাটের পয়সা তুই-ই আদায় করিস রতন, আমি এ কাজ ছেড়ে দিলাম।"—

সমুদ্র সৈকতে—

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ফেনিল উচ্ছ্বাসময় কোটি বাহু প্রসারিয়া দিয়া
দাবদগ্ধ ধরণীর তপ্ত বক্ষ দাও জুড়াইয়া—
শান্ত ও শীতল তব আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করি;
হে বারিধি—কি স্নিগ্ধতা রাখিয়াছ বক্ষ তব ভরি।
যুগ যুগান্তর গেছে—কালের হল না পরিমাণ
ফুরাল না আজও তব দান।
ঊষর উর্ব্বর করি যুগে যুগে ধরণীর বুক
ধুয়ে দাও সব ব্যথা, মুছে নাও না পাওয়ার দুখ।
প্রাচুর্য্যে করেছো পূর্ণ শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা তাই—
নদ নদী বক্ষপূর্ণ কর যুগে যুগে—
ধরণীরে ধৌত করি জলস্রোত নমিছে তোমায়,
পদতলে পড়ে পৃথ্বী শ্রদ্ধাপূর্ণ চক্ষে তোমা চায়।
ধরণীর পাপ—
যত অকল্যাণ আর অশান্তি ও তীব্র অভিশাপ
ঘুচাইয়া এনে দাও শান্তিপূর্ণ অশেষ কল্যাণ,
হে রাজর্ষি, হে মহৎ, তবু তো ফুরায় নাকো দান।
কত কবি গান রচি বসি তব তীরে গেয়ে গেছে,
কত শিল্পী তীরে বসি নম্র চিত্তে চিত্র এঁকে নেছে।
ইন্দ্রনীল আকাশের বক্ষে রচ নব মেঘমালা
এক করে লও তুলি, অন্য করে সুরু হয় ঢালা।
অনন্ত বিশাল সূর্য্যে সযতনে রাখ বক্ষপুটে,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য যত হে তপস্বী, চরণেতে লুটে।
তোমার চরণে করিলাম,
ভক্তি নম্র চিত্তে প্রভু, একটী প্রণাম।

বের্লিনে এক সপ্তাহ

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌-এ

ষ্টেশন থেকে অনেকখানি রাস্তা পেরিয়ে প্রিন্‌স্‌ উইলহেল্‌ম হোটেলে আসা গেল। কিন্তু সেখানে তারা বল্‌লে স্থানাভাব। অলিম্পিক উৎসবের জন্য হোটেলে স্থান পাওয়া শক্ত হবে, তারা বললে। নানা দেশ থেকে লোক আগে হ'তে 'বুক' করে রেখেছে। কাজেই বুঝলাম যে ব্যাপার গুরুতর। যা হোক ঐ ষ্ট্রীটেই আর একটি হোটেলে স্থান পেলাম এই ব'লে' যে অলিম্পিক ক্রীড়া আরম্ভ হবার আগেই ঘর ছেড়ে দেবো। তার নাম Europaischer Hotel. হোটেল কথাটি আন্তর্জাতিক—অর্থাৎ সব জাতির মধ্যেই প্রচলিত।

জার্মান অপেরায় হিট্‌লার ও তাঁর পারিষদবর্গ

গাড়ীতে আমার ডিনার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, কাজেই খাবার তত প্রয়োজন না থাকলেও হোটেলে জিনিষপত্র রেখে বেরিয়ে পড়্‌লাম। রাত্রি তখন ১২টা। কিন্তু রাস্তায় লোক চলাচলের ভীড় এত যে সন্ধ্যার মতই বোধ হ'তে লাগলো। আসবার সময় উণ্টার ডেন লিণ্ডেনের বিখ্যাত রাস্তা হয়ে আসা গেল। সেখানে এত লোক চলছে যে মনে হলো এইমাত্র কোনো বড় রকমের সভা বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে।

রাত্রি ১২টায় বেরিয়ে বিশেষ কিছু দেখবার সখ ছিল না। সারাদিন গাড়ীতে বসে' হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই একটু সঞ্চালন করবার ইচ্ছা মাত্র। কিন্তু একটু দূর গিয়েই দেখি এক রেস্তঁরা এবং সেখানে বহু নরনারী পানাহার করছে। আমিও ঢুকে পড়লাম, একটা টেবিলে বস্‌তেই হোটেলের পরিচারক এসে জিজ্ঞাসা করলে 'কি চাই?' আমি সামান্য কিছু খেতে পারি বলতেই সে এক ফর্দ্দ এনে উপস্থিত করলে, যার সবগুলি দফা কটমট

বের্লিন গির্জা

জার্মাণ ভাষায় লেখা। একটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো নামটি দেখে। তার গোড়াটা হচ্চে বিসমার্ক। কিন্তু বিসমার্ক কথাটির সঙ্গে আর যে ডজনখানেক ব্যঞ্জন বর্ণ ও স্বরবর্ণ তাকে ঘোরালো করে' তুলেছে, রাত্রি ১২টায় তার অর্থোদ্ধার করা আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। শেষটা সেই পরিচারককেই জিজ্ঞাসা করলাম দ্রব্যটা কি? সে জার্মাণ ভাষায় যা বল্‌লে তার অর্থ আমার মস্তকে প্রবেশ করলো না। তখন সে দৌড়ে গেল অন্যত্র। মনে করলাম বোধ হয় জিনিষটা এনে উপস্থিত করবে। কিন্তু তা নয়। সে আর একজনকে সঙ্গে করে' নিয়ে এলো এবং দুইজনে মিলে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলো। জার্মাণীর রেস্তঁরা-

গুলিতে পরিচারিকা অপেক্ষা পরিচারক বেশী। শেষোক্ত পরিচারকটি ইংরেজি জানে, কিন্তু সে যা বললে তা জার্মাণের চেয়ে কোনও অংশে সহজ বলে মনে হলো না। শুধু অনুমান বা আন্দাজ করলাম যে মাছের কিছু ব্যাপার হ'তে পারে। তখন তাকে আনতে বলে দিলাম। কিন্তু মুখে দিয়ে দেখি—সে কি টক্! মাছ হ'তে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে আগুনের সম্বন্ধ যে কখনও ঘটেছে, তা মনে হলো না। সুতরাং খাওয়া সেখানেই স্থগিত করতে হলো। শেষে এক পেয়ালা কফি আনতে বলে দিলাম। জার্মাণীর কফি খুব ভাল। কিন্তু খাওয়াটাই ও-সব যায়গায় বড় কথা নয়। হরেক রকম লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সময় কাটাবার সুযোগ খুব। সেই জন্যই যাওয়া। খাওয়া শেষ

সরকারী অপেরা—বেলিন

করে' উজ্জ্বল আলোকে শোভিত রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করে' শেষে হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন প্রাতে আমেরিকান এক্সপ্রেস্ কোম্পানীতে গিয়ে দেশে এক টেলিগ্রাম পাঠালাম—খরচ দিলাম ৬ মার্ক ৪০ ফিনিস্ (Phenigs) অর্থাৎ অর্দ্ধ পাউণ্ডের কিছু অতিরিক্ত। তার আগে ব্যাঙ্কে—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক্—রেজিষ্টার্ড মার্ক ভাঙিয়ে নিতে হয়েছিল। রেজিষ্টার্ড মার্ক মানে এই যে জার্মাণীতে গমনাভিলাষী ব্যক্তিদের সুবিধা করে' দেবার জন্য জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট সস্তাদরে মার্ক বিক্রয় করেন। জার্মাণীর সঙ্গে বাণিজ্য করতে গেলেও বোধ হয় এই সুবিধা পাওয়া যায় অর্থাৎ জার্মাণীর মধ্যে ১টি ইংলিশ পাউণ্ডে যখন ১২ মার্ক পাওয়া যায়, তখন বাইরে রেজিষ্টার্ড মার্ক পাওয়া যায় প্রায় তার ডবল। আমি পেয়েছিলাম ২৩ মার্কের কিছু বেশী। ক'দিন থাকবো, কিরূপ ভাবে খরচ করবো এই সব ভেবে রেজিষ্টার্ড মার্ক কিন্‌তে হয়। বেশী আন্‌লে শেষে ফিরে যাবার সময় জমা দিয়ে যেতে হয় সীমান্তে। তারপর লেখালেখি করে' তার সমান মূল্যের পাউণ্ড শিলিং কবে পাওয়া যাবে, তার ঠিকানা নেই।

কুক কোম্পানীর অফিস, আমেরিকান এক্সপ্রেস্ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বড় বড় বাড়ী এই উণ্টার ডেন লিণ্ডেনে। এর অর্থ হচ্চে লিণ্ডেন গাছের তলায়। নামটি কবিত্বময়। একটি বিখ্যাত সঙ্গীতের নামও উণ্টার ডেন্ লিণ্ডেন—বোধ হয় মোজার্টের তৈরী। রাস্তাটি প্রায় দু'শ ফিট

জার্মাণী পার্লিয়ামেণ্ট, বিস্‌মার্কের প্রতিমূর্ত্তি

চওড়া। মাঝখানে বেশ প্রশস্ত ঘাসের মনোরম লন্ অর্থাৎ রাস্তার দুধারে ফুটপাথ, দুধারে রাস্তা, গাড়ী ও লোক চলাচলের জন্য, আর তার মাঝে সবুজ দ্বীপ এবং মাঝে মাঝে লিণ্ডেন গাছের ছায়া। চমৎকার! এর এক প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড তোরণ দ্বার। তিনটি বড় বড় খিলানের উপর এই ফটকটি রয়েছে। তার উপরে চারটি তেজস্বী অশ্ব ও বিজয়লক্ষ্মীর মূর্ত্তি। খিলানের মধ্য দিয়ে রাস্তা চলে গেছে একটি পার্কে। কিন্তু উণ্টার ডেন লিণ্ডেনের আরম্ভ এই ব্রাণ্ডেনবুর্গ তোরণ। নেপোলিয়ন যখন জার্মাণী জয় করেছিলেন, তখন এই তোরণটির উপরকার মূর্ত্তিগুলি তিনি প্যারিসে নিয়ে যান। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ব্লুকার আবার এগুলি নিয়ে এসে যথাস্থানে স্থাপন করেন।

রাস্তাটি পূর্ব্বদিকে সোজা চলে গেছে স্প্রী (Spree) নদীর প্রায় কিনারা পর্য্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়টি এই রাস্তার ধারেই। প্রথম উইলিয়মের সু-উচ্চ মূর্ত্তি তাহারই নিকট। বের্লিনের প্রসিদ্ধ অপেরাও এখানে। আর একটু পূর্ব্বে গেলে বিস্মৃত সৈন্যদের স্মৃতিমন্দির। গৃহটি বেশ বৃহৎ ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। চার জন সৈন্য বন্দুক স্কন্ধে পাহারা দিচ্ছে। সেই হর্ম্ম্যতলে প্রকাণ্ড একটি সমাধি এবং তার পশ্চাতে বহু জাতির (মিত্র ?) পতাকা ঝুলিয়েছে। বহুলোক ভিতরে গিয়ে টুপী খুলে সম্মান দেখিয়ে আস্‌ছে সেই স্মৃতি-সমাধির প্রতি। ইয়ুরোপ থেকে মহাযুদ্ধের স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নি। যে সকল অজ্ঞাতনামা বীর দেশমাতৃকার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে অজ্ঞাত অখ্যাত ভাবে বিদায় নিয়েছে

ফ্রেডারিক দি গ্রেট—উন্টার ডেন লিণ্ডেন

পৃথিবী থেকে—তাদের জন্য সমগ্র জাতির উষ্ণ অশ্রু এখনও প্রবাহিত হচ্চে! উন্টার ডেন্ লিণ্ডেন রাস্তাটি বড় ভাল লাগলো। রাস্তার দুধারের সৌধগুলি বেশ সুদৃশ্য ও সু-উচ্চ। সবটাই যেন এই সুবৃহৎ রাজপথের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে' গড়ে উঠেছে। কিন্তু আজ এর চেহারা আরও চমৎকার। সমস্ত রাজপথটি আজ জার্ম্মাণীর স্বস্তিক পতাকায় সুসজ্জিত হয়েছে। প্রত্যেক পতাকাটি বোধ হয় ১৫ কি ২০ গজ হবে। সাদা কাপড়ের উপর লাল বৃত্ত। সেই বৃত্তের মধ্যে কালো ক্রস্। অনেকের ধারণা যে আমাদের 'স্বস্তিক' ওরা নিয়ে তাকে সম্মান করছে। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। প্রথমতঃ স্বস্তিক যে ঠিক আমাদের ভারতীয় চিহ্ন, তা বলা যায় না। স্বস্তিক চিহ্ন বহু প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমাদের পূজাঅর্চনায় যে স্বস্তিক-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তা কত পুরাতন এবং কোথা হতে এসেছিল তা বলা যায় না।

আমাদের স্বস্তিক সোজা, ওদের স্বস্তিক বাঁকা।

তার পরে ওদের ঐ চিহ্নের জার্ম্মাণ নাম হচ্চে Hacken Kreuz এবং তার অর্থ বাঁকা ক্রস। যতদূর মনে হয় তাতে নাৎসীরা এই চিহ্ন গ্রহণ করেছিল মহাযুদ্ধের পরে। মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর একজন সেনাধ্যক্ষ টুপীতে এই চিহ্ন পরেছিলেন—তাঁর থেকেই নবীন জার্ম্মাণী এই রহস্যপূর্ণ

ব্রাণ্ডেনবুর্গ ফটক—উন্টারডেন লিণ্ডেন

চিহ্ন তাদের পতাকায় গ্রহণ করেছে। আমাদের স্বস্তিক চিহ্ন কেবল মঙ্গলের। আলিপনায় পর্য্যন্ত মাঙ্গলিক রূপে এ চিহ্ন অঙ্কিত হয়। কিন্তু এদের এই চিহ্ন বিদ্রোহের, যুদ্ধবিগ্রহের এবং দৃপ্ত তেজের।

যাই হোক জার্ম্মাণী যেন আজ এই স্বস্তিকে মোড়া। জার্ম্মাণীর রাজধানী থেকে বেরুলে, বহুদূর পর্য্যন্ত সৌধচূড়ায়, স্তম্ভগাত্রে এমন কি জানালায় পর্য্যন্ত স্বস্তিক চিহ্ন ঝুল্‌ছে দেখা যায়। এই পতাকামণ্ডিত রাজপথে জার্ম্মাণীর নৌসৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে' ব্যাণ্ড বাজিয়ে চলে গেল। আমি তখন রাস্তার ধারে এক রেস্তরাঁয় বসে' কফি পান করছি। এই রেস্তরাঁগুলি বিশেষতঃ উন্টার ডেন লিণ্ডেনের ধারে সব সময়ে লোকে গিস্ গিস্ করে। প্যারিসে রেস্তরাঁগুলি

যেমন ফুর্ত্তিবাজের দলে পূর্ণ থাকে, এখানে তা দেখলাম না। অনেকে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে এসেছেন সেখানে। জার্ম্মাণরা ফরাসীদের অপেক্ষা বোধ হয় পারিবারিক জীবনের প্রতি বেশী অনুরক্ত। মেয়েদের বেশ-বিন্যাসেও সেটা লক্ষ্য করা যায়। আমি দুই একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্তে এদের সম্বন্ধে কুৎসাজনক বর্ণনা পড়েছি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। জার্ম্মাণীর মেয়েরা ফরাসী মেয়েদের মত বিলাসী নয়। এমন কি ইংরেজ মেয়েদের মধ্যে যতটা ঠোঁট রঙানো দেখতে পাওয়া যায়, এদের মধ্যে বোধ হয় তার চেয়েও কম। তার একটি কারণ হচ্ছে এই যে এদের চেহারা অনেক সময়

বের্লিনের বিজয়স্তম্ভ

বিলাসিতার অনুকূল নয়। জার্ম্মাণ স্ত্রী পুরুষ প্রায় সকলেই ওজনে ভারি। তলো-পানা মুখে রঙের বাহার দিয়ে আর কতদূর এগোবে? এও একটা কারণ হতে পারে। চেহারা ভারি বলে' এদের মেয়েরা তেমন হাল্‌কা চালে চলে না। বিলাতে ও ফ্রান্সে যা দেখে ও শুনে এসেছি, সে অনুপাতে জার্ম্মাণরা কতকটা সংযত মনে হলো।

সেদিন সান্ধ্যভোজনের পরে ফ্রিড্‌রিশ ষ্ট্রাসে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ফ্রিডরিশ ষ্ট্রাসে (Fredrisch Strasse) বের্লিনের একটি নামজাদা রাস্তা। অনেক বড় বড় দোকান এই রাস্তায় আছে। বের্লিনের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে ষ্টেশন (Banhof) এই রাস্তার শেষে। রাত্রি ১২টার সময় সিনেমা যখন ভাঙ্গলো, তখনও রাস্তার জনতা বিশেষ কমে নি। আসবার সময় কতকগুলি মেয়ে দেখলাম; তাদের ঐ সময়ে রাস্তায় বিচরণ আমার মোটেই ভাল লাগলো না। মোটের উপর সময়টা সিনেমায় মন্দ কাটে নি। তার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যা কেটেছিল হিন্দুস্থান হাউসে। আমাদের দেশের যুবকেরা অনেকে সেখানে থাকেন। কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ হলো। মিঃ চক্রবর্ত্তী বৈদ্যুতিক শিক্ষা লাভ করবার জন্য বের্লিনে রয়েছেন। বের্লিনের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুব ভাল শুনেছি। ওরা যে শিক্ষা দেয় তার দাম আছে। মিঃ চক্রবর্ত্তী এদেশে কৃতবিদ্য হয়ে ওখানে গিয়ে প্রায় চার বছর আছেন। মিঃ গুপ্ত ওখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি রাঁধাবাড়ার ভার থেকে আর সকলের তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত সমস্তই নিজে করেন। তিনি আমাদের চা দিলেন। রাত্রের খাবারও সেখানে নিষ্পত্তি করেছিলাম। বাঙ্গালীর খাদ্য পেয়ে মুখটা অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করেছিল।

আমি বেশীক্ষণ হিন্দুস্থান হাউসে থাকতে পারি নি। কিন্তু যতটুকু সময় ছিলাম, তার মধ্যে দেশীয় লোকের সঙ্গ পেয়ে অনেকটা আরাম অনুভব করেছিলাম। দু'জন মান্দ্রাজী ও একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকও সে সময়ে সেখানে ছিলেন। মিঃ রক্ষিত বলে' আমার একজন আলাপী ভদ্রলোক জার্ম্মাণীতে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে' সেই দিনই দেশে রওনা হলেন। আর একজন শিক্ষার্থীকে দেখে দুঃখ হলো। তিনি সেখানে শিক্ষালাভ করেছেন এবং চাকরীও পেয়েছেন। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা তাঁর যে ভাবে কাটানো উচিত, ঠিক সেভাবে যেন কাটাচ্চেন না। তিনি বাঙালী, তাই আরও দুঃখ হলো যে যারা অজস্র অর্থব্যয় করে' উচ্চ আশার স্বপ্ন দেখে' অশ্রুজলে স্নেহের দুলালদের বিদেশে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, তাদের দুর্ভাগ্যের আর অন্ত নাই।

জার্ম্মাণীর নৈতিক আদর্শ যে খারাপ, তা মনে হলো না। বরঞ্চ অনেক জাতি অপেক্ষা ভাল বলেই বোধ হলো। তবে এর ভিত্তি খুব দৃঢ় কিনা সে বিষয় সন্দেহ হ'তে পারে। কারণ জার্ম্মাণীর একমাত্র দেবতা এখন State রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই তাদের সব। রাষ্ট্রের জন্য তারা না করতে পারে, এমন

কর্ম্ম নেই। সমগ্রজাতিটা এই রাষ্ট্রদেবতার পূজার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। ওরা মিলনের, ঐক্যের পন্থা আবিষ্কার করেছে জাত্যভিমানের ভিতর দিয়ে। জার্মাণীর বর্ত্তমান সবল পক্ষের অভিমান এই যে তারা সব একটি উত্তর দেশাগত (Nord) আর্য্যজাতি হতে উদ্ভূত এবং যারা একই জাতির লোক, তাদের মধ্যেই ঐক্য সম্ভব। সুতরাং জার্মাণীতে যে সকল বিদেশী আছে, তারা এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা থেকে বাদ পড়লো। আর বাদ পড়লো লক্ষ লক্ষ ইহুদী—যারা বহু শতাব্দী ধরে' জার্মাণীতে বাস করে' জার্মাণ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

জার্মাণীতে বর্ত্তমান জাত্যভিমান এত উৎকটরূপে দেখা দিয়েছে যে আমাদের দেশের জাতিভেদ বা তার অনুষঙ্গী

শার্লটেনবুর্গ দুর্গ

হিংসাদ্বেষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। এরা ইহুদীদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে। শুধু তাই নয়, যাদের রক্তে ইহুদীদের কোনো গন্ধ আছে তাদের পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া হচ্চে। এইরূপে অসংখ্য ইহুদী পৃথিবীর নানা স্থানে ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায় বেরিয়েছে—দেশে তাদের স্থান নেই। বিলাতে বহুলোক আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েচে। আমাদের দেশেও অনেক পরিবার চলে' এসেছেন। প্যালেষ্টাইনে এই সব ইহুদীরা গিয়ে ভীড় করেছে এবং সেখানকার রাজনীতিক সমস্যা জটিলতর করে' তুলেছে। জার্মাণীর বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্ব (Theory of Relativity) জগতের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জ্ঞানমন্দিরে আলোচিত, ব্যাখ্যাত ও সযত্নে পঠিত হয়। কিন্তু তিনিও ঐ ইহুদী রক্তের অভিযোগে নির্ব্বাসিত হয়েচেন। জ্ঞানের পবিত্র মন্দিরেও এই বৈষম্যের বিষাক্ত বায়ু প্রবেশ করেছে। জার্মাণীর দু'জন পণ্ডিত ফিলিপ লেনার্ড এবং জোহানেস্ ষ্টার্ক—দুজনই নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত—তাঁরা আইনষ্টাইনের বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, কারণ সে বিজ্ঞান ইহুদীর দ্বারা কলুষিত (Jewish Physics)। বের্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব্বে ছাত্রসংখ্যা একলক্ষের উপর হয়েছিল, এখন তার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী। সমস্ত ইহুদী ছাত্র ও অধ্যাপক বিতাড়িত।
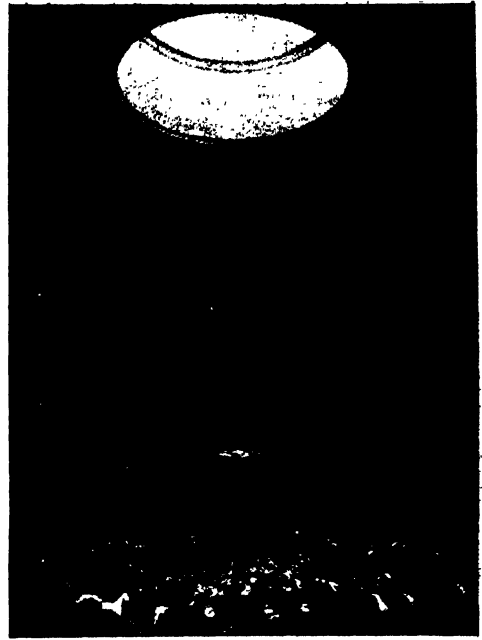
অজ্ঞাত সৈনিকের সমাধি অভ্যন্তর

বোধ হয় ১৫০০ অধ্যাপক এই ভাবে বিতাড়িত হয়ে অন্নের জন্য ছুটে ছুটে বেড়াচ্চেন।

ভারতবর্ষের আদর্শ চিরদিনই এই যে ম্লেচ্ছর কাছ থেকেও বিদ্যা গ্রহণীয় এবং বিদ্যার মন্দিরে জাতিবিচার নাই। জার্মাণী জগতে এই এক নূতন ভেদবাদের শিক্ষা প্রচার করছে। এর ফলে সব দিকেই যেন অশান্তি, সব দিকেই আশঙ্কা, সন্দেহ ও বিদ্বেষের ছায়া। কিন্তু মুখে কারও টুঁ শব্দ করবার জো নেই। বড় কড়া শাসন। গুপ্ত সমিতি যে নেই, তা বলা যায় না। লোকের মনোভাব

প্রকাশ করবার বাধা যেখানে, সেখানেই গুপ্ত সমিতির আবির্ভাব হবে, এ বিষয় সন্দেহ নেই। জার্মাণীর সংবাদপত্র সমস্ত গভর্ণমেণ্টের হাতে। সমস্ত সংবাদ, সমস্ত আলোচনা, সমস্ত মন্তব্য কড়া পাহারার বিষয় (censorship)। যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে, তবে সে বিদেশে গিয়ে বল্‌তে পারে। কিন্তু সেখানেও বিপদ্। জার্মাণীর মিত্র রাজ্যে বসে' জার্মাণীর তীব্র নিন্দা করা বেআইনী হ'বার আশঙ্কা আছে। জার্মাণীর এই যে ইহুদীবিদ্বেষ—বিশেষতঃ জ্ঞানের চর্চ্চায়—এটা জগতের শিক্ষিত সমাজে যে নিন্দিত হচ্চে না, তা নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫০ তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ওরা বহু বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যানিকেতনে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিল। কিন্তু কেম্ব্রিজ
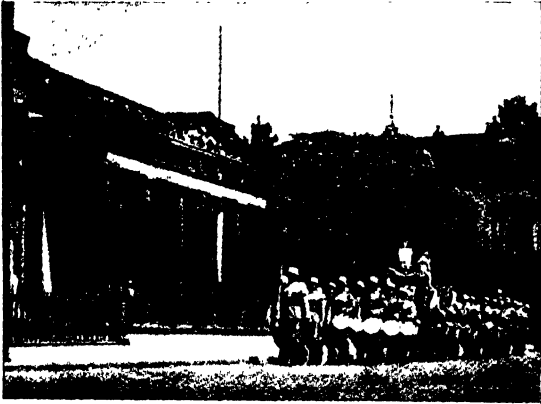
অজ্ঞাতসৈনিকের সমাধি—রক্ষীর দল

ও বার্মিংহামের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি। মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাওয়া যায় যে হের হিট্‌লার নিজেও এই ইহুদী-দোষে দুষ্ট। তাঁর মায়ের দিক্ থেকে ইহুদী রক্ত এসেছে!

পরদিন সকালে বেড়াতে গেলাম উইলহেল্‌ম্ ষ্ট্রাসে। এই রাস্তাটি বেরিয়েছে উণ্টার ডেন লিণ্ডেন থেকে। এই রাস্তাটি জার্মাণীর ডাউনিং ষ্ট্রীট—অর্থাৎ রাষ্ট্রসচিব এবং অধ্যক্ষদের অফিস এবং প্রাসাদ। একটি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত ভবন জার্মাণীর প্রেসিডেণ্টের। বিখ্যাত সেনাপতি হিণ্ডেন্‌বার্গ ছিলেন এই পদে। তিনি ১৯৩৩ সালে পদত্যাগ করবার পর এডল্‌ফ্ হিট্‌লার এ পদ তুলে দিয়েছেন—অথবা চ্যান্‌সেলার ও প্রেসিডেণ্টের পদ মিশিয়ে এক করে' দিয়েছেন। এখন হের হিট্‌লার প্রেসিডেণ্টও বটে, চ্যানসেলারও বটে। কিন্তু তিনি চ্যান্‌সেলার নামেই বেশী পরিচিত। কাজেই প্রেসিডেণ্ট্ পদটি একরূপ উঠে গেছে বল্‌লেই হয়। হিট্‌লার জার্মাণীতে চ্যান্‌সেলার অপেক্ষা 'ফিউরার' (Fuhrer) বা জননায়ক নামেই বেশী পরিচিত। পররাষ্ট্রে তিনি 'ডিক্টেটার' নামেই সাধারণতঃ অভিহিত হন। এই Fuhrer Prinzip এর পূর্ব্বে ছিল না। এর অর্থ নেতৃত্ববাদ। উইলহেল্‌ম্ ষ্ট্রাসের কাইসার হোটেলের সম্মুখেই চ্যান্‌সেলারের প্রাসাদ। একটি বারান্দা আছে, সেখানে হিট্‌লার এসে যখন দাঁড়ান, তখন রাস্তায় জনতা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সেদিন প্রায় পাঁচ হাজার লোক রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল 'দর্শনে'র জন্য। এর মধ্যে বিদেশী অনেক ছিলেন। লোকের কি উৎসাহ এই দর্শনের ব্যাপারে।

ভাবলাম বিধাতার ভাগ্যচক্র কি রহস্যময়! যারা একদিন গণতন্ত্রের মন্ত্র জগতে দুন্দুভি-নিনাদে ঘোষণা করেছিল, যারা স্বাধীনতা বল্‌তে গণমতের প্রাধান্য বুঝ্‌তো, তারাই আজ 'নেতৃত্ববাদ'কে সমর্থন করছে। শুধু সমর্থন করছে নয়, সমস্ত ক্ষমতা তুলে' দিচ্ছে একজনের হাতে। কোনও রাজা রাজড়ারও এত ক্ষমতা ছিল না। সমস্ত সৈন্য, সমস্ত শাসনতন্ত্র, সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য—একজনের অঙ্গুলি-সঙ্কেতের উপর নির্ভর করে। হিট্‌লার প্রথমে ছিলেন, কুলি, তার পরে ছুতোর ও গৃহ-চিত্রকর (house painter) ; তার পরে রাজদ্রোহের জন্য তিনি জেলে যান। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে ফিরে' এসে তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন। সমস্ত জার্মাণী তাঁর বক্তৃতা কান পেতে শোনে। এমন বক্তৃতা তাঁর, যে লোক সে ওজস্বিনী বাগ্মিতা শুনে' ক্ষেপে ওঠে। বক্তৃতার শক্তি চিরদিনই অসাধারণ। শেক্‌স্‌পীয়র পর্য্যন্ত দেখিয়ে গেছেন যে রোমে বক্তাদের বক্তৃতায় কি অসম্ভব রকমে জনতা (mass) ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌তো (Julius Cæsar)।

এই উইল্‌হেল্‌ম্ ষ্ট্রাসেতে আরও অনেক বড় বড় বাড়ী আছে, যথা রাসীয়ার রাজদূতের প্রাসাদ, কৃষ্টি-সচিবের অফিস (Culture Ministry), প্রচার-সচিবের অফিস (Propaganda Ministry) এবং বায়ুযান-সচিবের অফিস (Air Ministry) ইত্যাদি। প্রচার-বিভাগ জার্মাণীর এক অদ্ভুত নূতন কার্য্যক্ষেত্র। জনমত বা গণমত যেখানে শাসন-যন্ত্রের চরম নিয়ামক, সেখানে প্রচারের প্রয়োজন আছে

এ কথা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের বিবাহের মন্ত্রে আছে :—অন্যা দোষাঃ ক্ষন্তব্যাঃ গুণাঃ প্রকাশয়িতব্যাঃ, অর্থাৎ দোষ গোপন করব এবং গুণ প্রকাশ করব। প্রচার-বিভাগের কার্য্যও তাই। আরও ব্যাপকভাবে এই কাজ করতে হলে দেশের মুদ্রাযন্ত্র অর্থাৎ সংবাদপত্র হাতে থাকা আবশ্যক। জার্মাণী যে ভাবে তার শাসন যন্ত্র পরিচালন করছে, তাতে সংবাদপত্রের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করা, সরকারী কার্য্যের প্রতিবাদ করা বা বিরুদ্ধ সমালোচনা করা—এ সকল জার্মাণীতে অপরিজ্ঞাত বললেই চলে।

জার্মাণীর বায়ুজান বিভাগ এক বিরাট ব্যাপার। জার্মাণরাই সেপলিন (Zepplin) প্রথমে আবিষ্কার করেছিল। এখনও বোধ হয় জার্মাণীর বায়ব শক্তি সব জাতি অপেক্ষা বেশী। ক্রমেই আরও বাড়াচ্চে। আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন বিলাতের সরকারী বাজেটে বহু কোটী টাকা মঞ্জুর করিয়ে নিতে হয়েছিল—কারণ পার্লামেণ্টে ষ্ট্যান্লি বল্ড্উইন পরিষ্কার বললেন যে আত্মরক্ষার বন্দোবস্তে তাঁরা এতদিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন। এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। সেই সময়ে এক নূতন পদেরও সৃষ্টি হলো, তার নাম Ministry of Co-ordination. প্রথম মন্ত্রী হলেন সার চার্লস্ ইনস্কিপ্। তিনি এসে এরোপ্লেন অনেক বাড়িয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ইংলণ্ড জার্মাণীর সমকক্ষ হতে পারবে কি? জার্মাণী ত নিশ্চিন্ত নেই। তার বায়ব-সচিবের কার্য্যালয়টি এত বড় যে, কোনও জরুরি প্রয়োজন থাকলে দুই একখানা এরোপ্লেন তার ছাদের উপর নামতে পারে। ঐ প্রাসাদটিতে নাকি দু হাজার ছয় শত কক্ষ আছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধবিগ্রহ যে আর জলে বা ডাঙ্গায় নয়, তা সকলেই বুঝতে পারছে এবং সেই জন্য উড়ুক্কু জাহাজের জন্য সব দেশে মারামারি কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।

উইলহেলম্ ষ্ট্রাসে দেখে এলাম উন্টার ডেন লিণ্ডেন দিয়ে ব্রাণ্ডেনবুর্গ তোরণে। এ তোরণের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। গোল গোল থামের উপর সোনালি রঙের চারটি ঘোড়া রৌদ্রকিরণে ঝল্মল্ করেছিল। খিলানের মধ্য দিয়ে যে প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে, তাতে অনায়াসে বড় বড় বাস চলে—একটি খিলানের মধ্য দিয়ে বাইরে যাবার পথ, আর একটি দিয়ে প্রবেশ করবার পথ। এতদ্ভিন্ন পদাতিকদের জন্যও সুপ্রশস্ত রাস্তা রয়েছে।

উন্টার-ডেন-লিণ্ডেনের প্রত্যেক স্তম্ভগাত্রে বিভিন্ন রাজ্যের পতাকা রয়েছে। এ সজ্জা অলিম্পিক উৎসবের জন্যই। সমস্ত জাতির পতাকা দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে ভাবছি যে ভারতবর্ষ কি এই পতাকা-সভায় অপাংক্তেয়? বিচিত্র কি? তার পরেই একটি পতাকা দেখ্লাম, তার নীচে লেখা রয়েছে 'Indien'; দেখে' যেমন আনন্দ হলো, তেমনি দুঃখও হলো। কেন না ভারতবর্ষের পতাকা Union Jackই! শুধু তার মধ্যে একটি তারকা। বুঝলাম যে ভারতবর্ষের ভাগ্যনক্ষত্র ঐ ইউনিয়ন্ জ্যাকের অন্তরালে অস্ত গেছে!

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তোরণের অপর দিকে। এখান থেকে বের্লিনের বিখ্যাত উদ্যান টিয়ার গার্ডেনের আরম্ভ। এরই মধ্যে রিপাব্লিক্ প্লাজা (Plaza de Republique); এই পার্কটির ধারেই জার্মাণীর পার্লামেণ্ট-ভবন (Reichstag), পার্লামেণ্ট্ ভবনের সম্মুখে একটি বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত হয়েছে এবং তার গায়ে জার্মাণীর বিজয়-কাহিনী উৎকীর্ণ রয়েছে। এর কাছেই দেখলাম কতকগুলি বড় বড় রাজ্যের রেসিডেণ্টের অফিস। এগুলি ছাড়িয়ে গিয়ে একটি বড় রাস্তা পড়ে—তার নাম বোধ হয় টিয়ার গার্ডেন ষ্ট্রাসে। এখানে অনেক বড় লোকের বাস এবং রাস্তাও বেশ চওড়া। অনেক প্রস্তর এবং ধাতুমূর্ত্তি এই রাস্তায় রয়েছে—বীরপুরুষ ও স্মরণীয়-কীর্ত্তি ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্ত্তি। এর পরে বিস্তৃত উদ্যান চলেছে এবং তার মধ্য দিয়ে একটি ছোট খাল গিয়েছে এঁকে বেঁকে।

এখানে নতুন প্রণালীতে রাস্তা ও বাড়ী তৈরী হচ্চে দেখলাম। রাস্তা খুব প্রশস্ত। একধারে শুধু অশ্বারোহীর জন্য, একধারে ট্রামের জন্য, একধার বাস ও মোটরের জন্য ও একটি ধার পাদচারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। সুতরাং একটি রাস্তা কতকগুলি রাস্তার সমষ্টি। আর তার মাঝে মাঝে ঘাস ও গাছ লাগিয়ে বেশ বাগানের মত করা হয়েচে। রাস্তার ধারে ধারে পার্ক বা প্লাজা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকের নামেই এগুলির নামকরণ হয়েচে। দেখলাম একটির নাম 'হিট্লার প্লাজা', আর সেই পার্কটিকে রক্ত

পতাকায় এমন করে' ঢেকে দিয়েছে যে বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। হিট্‌লারের জন্য জার্মাণীর অনুরাগের রক্তিম লেখা সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি বাড়ী করে দিয়েছেন নতুন প্ল্যানে। যারা খেটে খায় বা অল্প উপার্জ্জন করে, তাদের বাসের জন্যই এই প্রকাণ্ড ভবনগুলি কল্পিত। দেখ্‌তে বড় বড় রাজপ্রাসাদের মত। কিন্তু অতি সামান্য যাদের আয়, এমন কি মুটে মজুররাও এখানে বাস করতে পারে। অথচ বন্দোবস্ত সমস্তই প্রথম শ্রেণীর। দীনহীন গণনারায়ণের জন্য এমন দরদ না থাকলে নেশন্যাল সোসালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট কি দেশের হৃদয়ে এমন গভীর রেখাপাত করতে পারতো? যারা গরীব, যারা দীন দরিদ্র তারাই যে দেশের মেরুমজ্জা এ কথা আমরা বহু দিন ভুলে গেছি।

(আগামী বারে সমাপ্য)

মীর্ণা

শ্রীগৌতম সেন

যাহার রচনা লাগি সৃষ্টি মোর হ'ল উতরোল
আপন সৃজন-বেদনায়:
আপনার দেহাতীত দানে, মোর তিলোত্তমা
আপনি উঠেছে ফুটি প্রস্ফুটিতা যৌবন-চঞ্চলা
তারে তুমি করিও না হেলা!
তুমি তো এসেছো বন্ধু ধরার ধূলায়—
হয়ত বেসেছো ভাল, তোমারে যে বেসেছিলো ভাল;
কিম্বা ভ্রম' ফুলে ফুলে - -
একেরে করিয়া জয় আর জয়ে উল্লাস তোমার:
দেহের বেদীতে তুমি বলি দাও নিত্য আপনারে।
হয়ত বেসেছো ভাল—
কাঁদিয়াছ আপনার প্রেমে;
কিন্তু সখি, মোর ছবি তারো ঊর্দ্ধে চলে:
সে যেন অনন্ত নীল আকাশের বিহগ-সঙ্গীত
মূর্চ্ছিয়া পড়েছে ধরাতলে
লক্ষ শত গ্রহের আঘাতে কক্ষচ্যুত দেবতা-প্রেয়সী।
জানি বন্ধু জানি—
আমারি রচনা কাঁদে মাটির আঁধারে,
যেন কোথা দূরে যুগ-যুগান্তের পারে
গুমরি উঠিছে তার লক্ষ শত ফণা!
তারি লাগি বেদনা প্রচুর
আপনি বহিয়া চলি জীবনান্ত কাল:
মৃত্যুসম করি অনুভব—
সে যন্ত্রণা, সেই ক্ষমা, সেই প্রেম তার।
তাহারে বেসেছি ভাল—
তার লাগি করিও না রোষ:
যে আঘাত হানিবারে চাও, লব বক্ষ পাতি
করিব না ক্ষোভ।
যদি বল ঐ নামে ডাকিতে তোমারে,
কানে কানে বলা মোর দুটি ছোট কথা
কেহ জানিবে না, শুধু তুমি আর আমি—
বিশ্বের ভ্রূকুটি রবে পশ্চাতে তোমার।
বল, ডাকি ঐ নামে?—
মীর্ণা তোমারই নাম, কণ্ঠলগ্না আমারই মানসী-
আমারই কল্পনা ল'য়ে বধূ শুচিস্মিতা:
স্বপ্নে তুমি লোকোত্তরা, কবির প্রেয়সী।

'বনফুল'

৪

এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর তাহাতে চড়িয়া বসিয়া প্রফেসার মিত্রের বাড়ীর ঠিকানাটা বলিয়া দিল এবং জোরে চালাইতে বলিল। গলা বাড়াইয়া রাস্তার একটা ঘড়িতে দেখিল আটটা বাজিয়া দশ মিনিট। বেশী সময় ত নাই!

ড্রাইভারকে সে আবার বলিল—জোরসে হাঁকাও।

প্রফেসার মিত্রের বাড়ী পৌঁছিয়া শঙ্কর সোজা ড্রয়িং রুমের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই সোনাদির সঙ্গে দেখা। মোটর থামিবার শব্দে তিনি বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন—শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

এ কি, শঙ্করবাবু, আবার ফিরলেন যে! আমি ভাবলাম জামাইবাবু বুঝি ফিরে এলেন স্টেশন থেকে।

প্রফেসার মিত্র বাড়ীতে নেই নাকি?

না, তিনি তাঁর বন্ধুদের স্টেশনে তুলে দিতে গেছেন। আপনি এলেন যে আবার?

শঙ্কর বলিল, চলুন ফিল্‌মটা দেখে আসি।

সোনাদিদির মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন এমনই কিছু একটা তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন। মুখে কিন্তু সে কথা বলিলেন না। একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, এই না তখন বললেন, হস্টেলের ছুটি পাওয়া যাবে না?

শঙ্কর কিছু না বলিয়া হাসিমুখে শুধু চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনি একটু বসুন তাহলে, ওদের খবর দি আমি—

সোনাদিদি ভিতরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর নিকটস্থ সোফাটায় বসিয়া পড়িল। তাহার রগের শিরগুলা দপদপ করিতেছিল।

ম্যান, উওম্যান, ম্যারেজ।

অদ্ভুত ছবি।

আদিম অসভ্য মানব-মানবী হইতে সুরু করিয়া মানব সভ্যতার প্রতি স্তরে নর-নারীর প্রেমলীলা নানা বর্ণে অপূর্ব্ব শিল্পসম্পদে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল। একপাশে রিণি, অন্য পাশে সোনাদিদি। রিণির পাশে মিষ্টিদিদি বসিয়াছিলেন। রিণির হাত মিষ্টিদিদির হাতের মধ্যে ছিল। ছবি দেখিতে দেখিতে অজ্ঞাতসারে রিণির হাতখানা মিষ্টিদিদি সজোরে চাপিয়া ধরিলেন, এত জোরে যেন নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চান। রিণি কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে?

সলজ্জ রিণি কোন উত্তর দিল না।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ও কিছু নয়।

ছবি চলিতে লাগিল। রোমের দৃশ্য। সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ় রোম তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য দুই হাতে মুঠা মুঠা করিয়া ছড়াইয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না। বিলাসসজ্জার প্রধান উপকরণ নারী নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে স্বপ্নলোকে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, লাবণ্যময়ী জ্বলন্ত-যৌবনা রূপসীর দল সবল পেশী বলিষ্ঠ দেহ পুরুষদের দৃপ্ত মহিমার নিকট নিজেদের বিলাইয়া দিয়া হাসিকান্নার ক্ষিপ্রস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কেহ ক্রীতদাসী, কেহ সাম্রাজ্ঞী। শঙ্কর অনুভব করিল তাহার দক্ষিণ জানুটায় কিসের যেন চাপ লাগিতেছে। যদিও সে বুঝিতেছিল ইহা কিসের চাপ—তথাপি সে ভাল করিয়া একবার দেখিল, হ্যাঁ সোনাদিদির জানুটাই এদিকে একটু বেশী সরিয়া আসিয়াছে যেন। সোনাদিদি একেবারে আত্মহারা হইয়া ছবি দেখিতেছেন। শঙ্কর একটু সরিয়া বসিল, সরিয়া বসিতে গিয়া আবার রিণির গায়ে গা ঠেকিয়া গেল। রিণি সলজ্জভাবে একটু সরিয়া বসিল। ছবি চলিতে লাগিল।

ইণ্টারভ্যাল।

চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর দেখিল মিষ্টি-দিদির চক্ষু দুইটি চকচক্ করিতেছে, সোনাদিদি চঞ্চল

হইয়া উঠিয়াছেন। রিণি সাধারণতই একটু স্থিরস্বভাব, ছবি দেখিয়া সে আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর নিজেও কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিল। সোনাদিদির বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে বলিলেন, একটু চা খেলে হ'ত। রিণি খাবি?

রিণি মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বাহিরে যাইতে যাইতে শঙ্করের হঠাৎ চোখে পড়িল যে, প্রথম শ্রেণীতে কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গৈরিকধারী ভণ্টুর মেজকাকাও বসিয়া রহিয়াছেন। শঙ্কর হঠাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, চেহারার বেশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শঙ্করকেও মেজকাকা দেখিতে পাইলেন না। শঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া চায়ের ফরমাস দিতে দিতে আচম্বিতে শঙ্করের মনে পড়িল—তাহার যে আজ ভণ্টুর সহিত বোস সাহেবের বাড়ী যাওয়ার কথা, মেজকাকার চাকুরির জন্য। হাতঘড়িটা দেখিল, দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এখনও ভণ্টু নিশ্চয় তাহার জন্য হস্টেলে বসিয়া নাই। এতরাত্রে হস্টেলে ফিরিয়াই বা সে কি জবাবদিহি করিবে, কানাইটা কি ভাবিবে কে জানে। তাহাদের ব্লকের মনিটার রামকিশোরবাবু লোকটিও ভরসা করিবার মত নহেন। যে স্বপ্নলোকে সে বিচরণ করিতে-ছিল বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তাহা চুরমার হইয়া গেল। কবিতার যে দুইটি লাইন মনের নিভৃত কোণে গুঞ্জন তুলিয়াছিল তাহারা হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।⋯ একটি ট্রে-তে তিন পেয়ালা চা লইয়া একটি খানসামা একটু পরেই মিষ্টিদিদির সম্মুখীন হইল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও আসিল, তাহার হস্তে একটি প্রকাণ্ড ঠোঙায় ডালমুট।

ইণ্টারভ্যাল শেষ হইল।

আবার ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। শঙ্করের কিন্তু মনের সুর কাটিয়া গিয়াছিল। এই যৌবনমত্ত নর-নারীদের নর্ত্তনকুর্দ্দন আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সমস্ত ছাপাইয়া তাহার মনে হইতেছিল ভণ্টু হয় ত আপিস হইতে ফিরিয়া তাহার আশায় প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ভণ্টুর বৌদিদির মুখখানিও তাহার মনে পড়িল, দারিদ্র্য-নিপীড়িতা—মুখের হাসিটি কিন্তু মরিয়া যায় নাই।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। সোনাদিদিকে চুপি চুপি বলিল, আমি বাইরে থেকে এখুনি আসচি, আপনারা দেখুন।

সে বাহিরে আসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল যে বিশ্বাসযোগ্য চেনা-শোনা কাহাকেও যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে এই তিনটি নারীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবার ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া সে ভণ্টুর খোঁজে বাহির হইবে।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—অপূর্ব্ববাবু বারান্দার একধারে দাঁড়াইয়া আছেন। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও ছবি দেখ্‌তে এসেছেন দেখছি।

অপূর্ব্ববাবু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, এইমাত্র এলাম আমি। টুইশনি থেকে ছুটি পেতেই বড্ড দেরি হয়ে গেল, তার ওপর ওঁদের ওখানে গিয়ে দেখি ওঁরা সব চলে এসেছেন এখানে, রাস্তায় ট্রামটাও এমন আটকে গেল—ভাবছি এখন টিকিট কিনে আর ঢোকাটা কি ঠিক হবে!

শঙ্কর বলিল, না এখন আর ঢুকে কি হবে? ছবি ত প্রায় শেষ হয়ে এল।

শঙ্কর আবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। অপূর্ব্ববাবুকে দেখিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে স্থির করিয়া ফেলিল যে ভণ্টুর খোঁজে যাওয়াটা এখন বৃথা। অপূর্ব্ববাবু অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বড়বাবুর অনেক খোসামোদ করিয়া চায়ের নিমন্ত্রণটা তিনি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু মিস বেলার নিকট হইতে ছাড়া পাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গেল। তাছাড়া ট্রামটা⋯

সিনেমা শেষ হইল প্রায় রাত্রি বারোটায়।

ট্যাক্সি করিয়া শঙ্কর যখন মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি ও রিণিকে বাড়ী পৌছাইয়া দিল তখন প্রফেসার মিত্র ফিরিয়াছেন। রিণি মৃদুকণ্ঠে বলিল, দাদা এখনও লাইব্রেরিতে রয়েছেন, আলো জ্বলছে—

শঙ্করের মনে একটু শঙ্কা ছিল হয় ত প্রফেসার মিত্র রাগ করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এ ভাবে সকলে মিলিয়া সিনেমায় চলিয়া যাওয়াটা শঙ্করের নিজের কাছেই একটু খারাপ লাগিতেছিল। কিন্তু শঙ্করের শঙ্কা শীঘ্রই অপসারিত হইল। মোটরের শব্দে প্রফেসার মিত্র বাহির হইয়া আসিলেন এবং নাক হইতে চশমাটা কপালের উপর তুলিয়া বলিলেন, ও শঙ্করবাবুর সঙ্গে তোমরা গিয়েছিলে!

আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম অপূর্ব্ব বুঝি এই হুজুগ তুলেছে। কিন্তু তোমরা চলে যাওয়ার একটু পরেই অপূর্ব্বও এসে হাজির, তখন বেয়ারাটা বললে যে তোমরা শঙ্করবাবুর সঙ্গে গেছ! বলিয়া তিনি মোটা বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বিকশিত দন্তপাঁতিকে আরও বিকশিত করিয়া বলিলেন, কেমন লাগল ছবিটা!

সকলেই একবাক্যে বলিল যে ছবিখানি সুন্দর।

প্রফেসার মিত্র তখন শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি এখন কোথায় ফিরবে?

হস্টেলে।

শঙ্কর তাহার হস্টেলের নামটাও বলিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, তুমি এখন ওঁকে উদ্ধার করো, উনি হস্টেল থেকে ছুটি না নিয়েই চলে এসেছেন।

মিত্র মহাশয়ের চোখে ক্ষণিকের জন্য একটা কৌতুকদীপ্তি জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। ভালমানুষের মত হাসিয়া তিনি বলিলেন, আচ্ছা, ফোনে বলে দেব আমি।

রিণি উপরে চলিয়া গেল।

প্রফেসার মিত্র মিষ্টিদিদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমরা সব শুয়ে পড় গিয়ে। আমার শুতে আজও রাত হবে; শেলির ওপরে ক্রিটিসিজ্‌মের এ বইখানা ভারি চমৎকার লিখেছে, শেষ না করে শোব না।

মুচকি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, দেখবেন, কালকের মত আবার ইজিচেয়ারে শুয়েই ঘুমিয়ে থাকবেন না যেন—

প্রফেসার মিত্রের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হইয়া উঠিল।

শঙ্কর নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের প্রতি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার আসছেন কবে?

আসব একদিন।

শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায় জনহীন রাজপথ দিয়া শঙ্কর একাকী হাঁটিয়া চলিয়াছে। কলিকাতা নগরী নিদ্রাচ্ছন্ন। রাস্তার দুই ধারে ইলেকট্রিক বাতিগুলি শূন্য পথটিকে আলোকিত করিয়া কাহার যেন অপেক্ষা করিতেছে। সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর দ্বিতল কক্ষে সহসা একটা নীল আলো দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কাচের জানালা দিয়া অস্পষ্ট দেখা গেল, সেই নীলালোকিত আবেষ্টনীতে দুইটি মূর্ত্তি সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতার পিচঢালা রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে শঙ্করের মনে হইল যে যেন তেপান্তরের মাঠ পার হইতেছে। আর একটু গেলেই যেন জটিল জটাজুটধারী বটবৃক্ষের দেখা পাওয়া যাইবে এবং তাহার শাখায় রূপকথার বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী যেন বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য কোন অপরূপ বার্ত্তা লইয়া বসিয়া আছে।

টুং টুং টুং টুং।

একটা রিক্‌শাওয়ালা মন্থরগতিতে বামদিকের গলিটা হইতে বাহির হইল। শঙ্কর রূপকথার রাজ্য হইতে সহসা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ফুটপাথে নামিয়া আসিল।

৫

ঝামাপুকুরের একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটি ছোট বাড়ী। সেই বাড়ীর বাহিরের ঘরে একটি চৌকির উপর বসিয়া গভীর মনোনিবেশসহকারে এক ব্যক্তি কোষ্ঠিবিচার করিতেছিলেন। বামহস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। সম্মুখেই বোতলের মুখে গোঁজা একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি। ঘরটির মধ্যে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। চৌকিটির কাছেই একটি শ্রীহীন কাটের টেবিল এবং ঘরের কোণে প্রকাণ্ড একটা কাঠের আলমারি। আলমারির কপাট দুইটি খোলা রহিয়াছে। আলমারিতে বই ছাড়া বিশেষ কিছুই নাই। বইও নানারকম। অধিকাংশই অবশ্য পুরাতন পঞ্জিকা, কিন্তু অন্য নানা প্রকার পুস্তকেরও অভাব নাই। ডিটেকটিভ উপন্যাস, শেক্সপীয়ারের একখানা নাটক, প্যারাডাইস লস্ট, ক্যালকুলাস, অ্যাষ্ট্রনমি, ঘোড়দৌড় বিষয়ক দুই-চারিখানি পুস্তক, ছবির য়্যালবাম প্রভৃতি নানাজাতীয় বহি অগোছাল ভাবে আলমারিটিতে ঠাসা রহিয়াছে। আলমারির ঠিক নীচেই মেঝের উপরও দুই-একখানা বই পড়িয়া আছে। মেঝের উপর অসংখ্য সিগারেট ও বিড়ির টুকরা ছড়ানো। টেবিলের উপর খানকয়েক বিলাতি মাসিকপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং রহিয়াছে একবোতল মদ ও তাহার পার্শ্বে কাচের একটি গ্লাস। গ্লাসটিও ফাটা। তক্তাপোষটি নিতান্ত ছোট নয়, বেশ প্রশস্ত। তক্তাপোষের উপর

কোষ্ঠিবিচারক ব্যতীত আরও একজন ছিলেন। তিনি ওপাশে শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন; এত ঘুমাইতেছিলেন যে তাঁহার নাক ডাকিতেছিল। বেশ জোরেই ডাকিতেছিল। কিন্তু এই নাসিকাগর্জ্জন সত্ত্বেও কোষ্ঠিবিচারক নিবিষ্ট মনে আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছিলেন।

কোষ্ঠিবিচারকের নাম করালীচরণ বক্‌সি। ভদ্রলোকের চেহারা এমন যে, দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে দীর্ঘ অবিন্যস্ত কেশ, শীর্ণ লম্বা দেহ। একটি চক্ষু কাণা, অপরটি একটু বেশীরকম প্রদীপ্ত, যেন দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। চিবুকটা সূচালো এবং বক্রভাবে সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, মনে হইতেছে যেন তাহা সূক্ষ্মাগ্র সুবৃহৎ নাসাটার অনুকরণ করিতেছে। মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগ সুস্পষ্ট। বসন্তরোগেই একটি চক্ষু তাঁহার গিয়াছে। সমস্ত মুখে কোন রোম নাই। শ্মশ্রু গুম্ফ ত নাইই, ভ্রূরও অভাব। অত্যধিক সুরাপানের ফলে ঠোঁট দুইটি হাজিয়া গিয়াছে। করালীচরণ বক্‌সিকে সকলেই ভয় পাইত, কিন্তু অনেকেই তাঁহার কাছে আসিত; তাহার কারণ, মন দিয়া গণনা করিলে তাঁহার গণনা নাকি একেবারে নির্ভুল। জ্যোতিষশাস্ত্রে এতবড় গুণীলোক সচরাচর নাকি দেখা যায় না।

পাশের বাড়ীর একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল। চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে একবার তাকাইয়া বক্‌সি মহাশয় সিগারেটটা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং উঠিয়া গিয়া টেবিল হইতে মদের বোতল তুলিয়া লইয়া গেলাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন এবং নির্জ্জলাই সেটুকু পান করিয়া ফেলিলেন। বিকৃত মুখটা র‍্যাপার দিয়া মুছিতে মুছিতেই তিনি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলেন এবং নিপুণভাবে সেটি ধরাইয়া স্বস্থানে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। একটি পুরাতন পঞ্জিকা খোলা অবস্থাতেই কাছে পড়িয়াছিল। সেটি হইতে একটি খাতায় তিনি নানারূপ অঙ্ক টুকিতে সুরু করিলেন। টুকিতে টুকিতে তাঁহার চোখে বিচিত্র এক কৌতুহল ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ কোষ্ঠিখানি আরও খানিকটা প্রসারিত করিয়া নিবিষ্টমনে কি যেন তিনি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্রায়িত চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। উত্তেজিত হইলেই করালীচরণের চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, অধরোষ্ঠ দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া ওঠে। কিছুক্ষণ কোষ্ঠিখানির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর নীরব হাস্যে করালীচরণের মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। হাসিমুখে কিছুক্ষণ কোষ্ঠিখানির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আবার তিনি উঠিলেন, বোতলটা হইতে আরও খানিকটা সুরাপান করিলেন এবং বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন যে আর কতটা অবশিষ্ট আছে। তাহার পর হঠাৎ তিনি ডাকিলেন, ভণ্টুবাবু, উঠুন, কত ঘুমুবেন!

চেরা বাজখাঁই আওয়াজ।

ভণ্টুর নাসিকা-গর্জ্জন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। পায়ের পাতাটা মৃদু মৃদু নাচাইতে নাচাইতে ভণ্টু বলিল, না, আমি ঘুমুই নি ত।

কর্কশ কণ্ঠে হাস্য করিয়া করালীচরণ বলিলেন, কি করা হচ্ছিল তাহলে এতক্ষণ? বাই নারায়ণ, এর নাম যদি ঘুম না হয়, তাহলে—

ভণ্টু উঠিয়া হাই তুলিয়া বলিল, থিঙ্ক্ করছিলাম।

করালীচরণ এই কথায় অত্যন্ত জোরে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইতে লাগিল শুষ্ক শক্ত কাষ্ঠখণ্ডে কে যেন করাত চালাইতেছে।

ভণ্টু বলিল, লদ্‌কা-লদ্‌কি রাখুন, কুষ্টির কি হল?

দুটো কুষ্টিই দেখেছি।

দাদারটা কি রকম দেখলেন?

ভালই, কোন ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন। আপনার এই বন্ধুর কুষ্টি কিন্তু ভয়ানক, বাই নারায়ণ!

শঙ্করের? কেন?

উত্তরে করালীচরণ চিবুকটি একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিলেন এবং একমাত্র চক্ষুটির তীব্র দৃষ্টি ভণ্টুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এর বেশী এখন আর কিছু বলব না!

ভণ্টু আর একবার হাই তুলিয়া বলিল, কি দেখলেন?

করালীচরণ নীরবে হাসিতেই লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ভণ্টু হাসিমুখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল, দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্।

হঠাৎ করালীচরণ উঠিয়া টেবিল হইতে মদের বোতলটা তুলিয়া লইলেন এবং বোতলেই মুখ লাগাইয়া বাকি মদটুকু

নিঃশেষ করিয়া বিকৃত মুখে বলিলেন,শেষ হয়ে গেল ! পকেটও আজ একদম খালি। কিছু দেবেন না কি ভণ্টুবাবু ?

ভণ্টু দ্বিরুক্তি না করিয়া বুক পকেট হইতে মণিব্যাগটি বাহির করিয়া করালীচরণের হাতে দিল এবং হাসিয়া বলিল, আমার যথাসর্ব্বস্ব দিচ্ছি ! কালকের বাজার করবার জন্যে কিছু রেখে বাকি সবটা আপনি নিয়ে নিন—

করালীচরণ সাগ্রহে ব্যাগটি খুলিয়া মোমবাতির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্যাগটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া ধরিলেন। একটি সিকি ও দুইটি পয়সা বাহির হইল।

করালীচরণ ভণ্টুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কত চাই আপনার বাজারের জন্য ?

যা দেবেন,

দু আনায় হবে ?

হবে।

যান তাহলে এই সিকিটা ভাঙিয়ে দু আনার সিগারেট আনুন, আর বাকি দু আনা আপনি নিয়ে নিন—

কোন্ সিগারেট আনব ?

যা খুশি।

করালীচরণ প্যাকেট হইতে শেষ সিগারেটটি বাহির করিয়া ভণ্টুর দিকে পিছন ফিরিয়া সেটি ধরাইতে লাগিলেন। সেই সুযোগে ভণ্টু পিছন হইতে নানা রূপ মুখভঙ্গী করিয়া করালীচরণকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। করালীচরণ সিগারেট ধরানো শেষ করিয়া বাকি পয়সা দুইটিও ভণ্টুর হাতে দিয়া বলিলেন, এ দুটোও নিয়ে যান, একটা ছোট পাঁউরুটি কিনে আনবেন।

দিন।

ভণ্টু বাহির হইয়া গেল।

ভণ্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ বামহস্তে জ্বলন্ত সিগারেটটি ধরিয়া নিজের দক্ষিণ করতলটি নির্ব্বাপিতপ্রায় মোমবাতির আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং সেইদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সহসা তাঁহার নজরে পড়িল মোমবাতিটি আর বেশীক্ষণ টিকিবে না। আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, দু-একটা মোমবাতি আনতে বললে ঠিক হত ! বাই নারায়ণ, হাতে একদম কিছু নেই আজ !

নির্ব্বাণোন্মুখ শিখাটি কাঁপিতে লাগিল। একচক্ষু মেলিয়া করালীচরণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ক্যাঁচ করিয়া একটা মোটর বাহিরে থামিল।

করালীবাবু বাড়ী আছেন ?

আছি।

করালীচরণ বাহিরে গেলেন। বাহিরে একটি প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়াইয়াছিল। মোটরের ভিতর একজন মোটা গোছের ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশে আর একজন যিনি ছিলেন—করালীবাবু আসিতেই তিনি নামিয়া আসিলেন এবং সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন, আপনার নামই কি করালীচরণ বক্‌সি ? রেস সম্বন্ধে আপনিই কি গণনা করেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শাল্‌কের পরেশবাবুকে কি আপনিই গণনা করে দিয়েছিলেন ? তাঁর কাছে আপনার নাম শুনে আমরা এসেছি।

কি দরকার—

গোণাতে চাই।

করালীচরণ একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন।

বলিলেন, আমার কাছে গোণাতে হলে পঞ্চাশ টাকা লাগে। আপনাদের নির্দ্ধারিত বলে দেব, রেস খেললে জিতবেন কি-না।

মোটরে উপবিষ্ট স্থূলকায় ভদ্রলোকটি এবার নামিয়া আসিলেন। ভদ্রলোক স্থূলকায় হইলেও অল্পবয়স্ক, মুখখানি নিতান্ত কচি। কচি মুখটিতেই বিজ্ঞতার ভাব ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, আপনার দক্ষিণা নিশ্চয়ই দেব। তবে আমরা হলাম মধ্যবিত্ত লোক, ঠকতেও চাই না, ঠকাতেও চাই না—

করালীচরণ তাঁহার এক চক্ষুর দৃষ্টি তুলিয়া এমনভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন যেন কোন মহারাজা কোন গরীব প্রজার নিবেদন শুনিতেছেন।

আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে থাকি, তবে কাউকে পীড়ন করতে আমি চাই না। যা সাধ্যে কুলোয় দেবেন, দর কষাকষি করা আমার স্বভাব নয়।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করিয়া দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন এবং বলিলেন, এই আমার প্রথম

কাজ আপনার সঙ্গে, যদি পরস্পর পটে যায়, টাকার জন্যে আটকাবে না।

আচ্ছা, দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নোট দুইটি লইয়া তাঁহার ছিন্ন জামার পকেটে রাখিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, কাল সকালে আসবেন তাহলে, আজ এত রাত্রে হবে না। নোট দুইটি এভাবে করালীচরণের পকেটে অগ্রিম চলিয়া গেল দেখিয়া স্থূলকায় ভদ্রলোকটি মনে মনে বোধ হয় একটু বিচলিত হইলেন। বলিলেন, কাজটা আজ রাত্রেই মিটে গেলেই ভাল হ'ত না?

করালীচরণ উত্তর দিলেন—আজ হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে নোট দুইখানি ফেরত দিয়া বলিলেন, কালও আর আসবার দরকার নেই আপনার। আপনার কাজ আমি করব না। আমার ওপর যখন বিশ্বাসই নেই, তখন আমার কাছে আসাই আপনার পণ্ডশ্রম হয়েছে! বাই নারায়ন, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না!

সে কি কথা—সে কি কথা—

ত্রস্ত হইয়া উভয় ভদ্রলোকই আগাইয়া আসিলেন। স্থূলকায় ভদ্রলোক নোট দুইটি করালীচরণের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, রাগ করবেন না করালীবাবু, টাকাটা রাখুন। বেশ, কাল সকালেই হবে, কখন আসব বলুন।

করালীচরণ বঙ্কি কখনও কাউকে কথা দেয় নি আজ পর্য্যন্ত! কাল সকালে দশটার ভেতর আসবেন যদি বাড়ীতে থাকি এবং মেজাজ ঠিক থাকে দেখা হবে—

স্থূলকায় ভদ্রলোকের সঙ্গীটি আড়াল হইতে চোখের কি একটা ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত অনুসারে স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন—আচ্ছা বেশ, বেশ, তাই হবে! কাল সকালেই আসব এখন। আচ্ছা, চলি তবে—নমস্কার!

তাই আসবেন, নমস্কার!

মোটরকার চলিয়া গেল। মোটরখানার দিকে তাকাইয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন—শ্‌শালা!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভণ্টু আসিয়া পড়িল। পাঁউরুটিটা করালীবাবুর হাতে দিয়া ভণ্টু বলিল, দু'আনায় হাতী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

করালীবাবু সঙ্গে সঙ্গে ভণ্টুর হস্তে নোট দুইখানি দিয়া বলিলেন—এই নিন। হাতী ফেরত দিয়ে আসুন। এক টিন নাইন নাইন নাইন আর এক বোতল হুইস্কি চট করে এনে দিয়ে যান। আপনার পয়সাটাও ফেরত নিয়ে নেবেন, নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম বলেই আপনার কাছে হাত পাততে হয়েছিল, বাই নারায়ণ!

ভণ্টু চট্ করিয়া হেঁট হইয়া করালীচরণের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। করালীচরণ একটু সরিয়া গিয়া বলিলেন, আঃ কি যে করেন আপনি রোজ!

ভণ্টু হাত জোড় করিয়া কহিল, এ সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন না দাদা।

করালীচরণ বলিলেন, আপনার কাছ থেকে পয়সা নেওয়াটা সত্যিই আমার উচিত নয়। আমার বসন্তরোগে আপনি যে সেবাটা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। নৈহাটি স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা না হলে মরেই যেতাম আমি, বাই নারায়ণ! সে কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

ভণ্টু আবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

করালীচরণ পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া বলিলেন, যান দেরি হয়ে গেছে। চিৎপুর অঞ্চলে না গেলে মাল পাবেন না।

ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা পেলেন কোথা থেকে হঠাৎ?

করালীচরণের প্রদীপ্ত চক্ষুটি টর্চের মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, এসেছিল দু শালা—

ভণ্টু আবার বাইকে চড়িয়া রওনা হইয়া পড়িল।

ভণ্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সেই শুকনো পাঁউরুটিটা কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিলেন। নিমেষের মধ্যে রুটিটা শেষ হইয়া গেল। জল খাইবার জন্য ভিতরে ঢুকিয়া করালীচরণ দেখিলেন যে মোমবাতি নিভিয়া গিয়াছে, ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার এবারও ভণ্টুকে মোমবাতি আনিতে বলা হইল না—বাই নারায়ণ!

স্বল্পালোকিত গলিটির মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত করালীচরণ একা একা প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। করালীচরণের পৃথিবীতে আপনার জন কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এই জীর্ণ বাড়ীখানা। বিধবা মা কাশীতে ছিলেন, সেদিন দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিধবা মা-ই বহুকষ্টে করালীচরণকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বাবার

কথা করালীচরণের মনেও পড়ে না। বাল্যকাল হইতে যতদূর মনে পড়ে সবই মা। করালী একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। কিন্তু একথা আজ কেহ জানে না। করালীচরণও ইহা কাহাকেও বলেন না। আধুনিক পরিচিত মহলে করালীচরণ বক্রি বুদ্ধিমান জ্যোতিষী বলিয়া বিখ্যাত। কেহ বলে লোকটা পাগল, কেহ বলে পণ্ডিত, কেহ বলে শয়তান।

ভণ্টু সেদিন রাত্রে যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বউদিদি জাগিয়া ছিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত মুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

উঃ, কত রাত তুমি করলে ঠাকুর-পো!

ঘোর কেতুর পাল্লায় পড়েছিলাম, বাইকটা একটু ধর ত।

ভণ্টু বাইকটা দুই হাতে ধরিয়া বউদিদির সাহায্যে সেটা বারান্দার উপর তুলিয়া ফেলিল।

তোমার দাদার কুষ্ঠিটা নিয়ে গেছলে না কি জ্যোতিষীর কাছে?

হ্যাঁ, কেতুশ্রেষ্ঠ করালীই ত ডোবালে আজ! বিরাট কৈতুকি য়্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম।

বউদিদির কোলের ছেলেটা ঘরের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। বউদিদি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন ও ছেলেটাকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বললেন দেখে, কোন ভয় নেই ত!

না।

বউদিদি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ না ত, লুকিয়ো না লক্ষীটি—

ইহার উত্তরে নেপথ্য হইতে ভণ্টু ঠোঁট দুইটি বিকৃত করিয়া বউদিদিকে ভ্যাংচাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে বউদিদি আবার প্রশ্ন করিলেন, কোন উত্তর দিচ্ছ না যে?

ভণ্টু মুখটা বিকৃত করিয়া রাখিয়া বলিল, বাইরে এসো।

বউদিদি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

লদ্‌কা-লদ্‌কি রেখে এখন খেতে দাও।

খাবার ত ঢাকা রয়েছে, ওই সামনেই দেখতে পাচ্ছ না!

আর একটা থালায় কার খাবার?

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, আমিও এখনও খাইনি।

ভণ্টু আর একবার মুখবিকৃতি করিয়া ভ্যাংচাইল।

আহা, মুখ করা হচ্ছে দেখ না!

ভণ্টু হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। বউদিদি বাতিটা একটু উস্কাইয়া দিয়া বলিলেন, জ্যোতিষীর নাম করালীচরণ! কি অদ্ভুত নাম গো!

সেই কানা করালী!

ও, সেই যাকে তুমি নৈহাটি স্টেশন থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে? খুব ভাল জ্যোতিষী?

অসাধারণ! চাম লদ্—

উভয়ে খাইতে বসিল।

খাইতে খাইতে বউদিদি হঠাৎ বলিলেন—ওহো, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, শঙ্কর ঠাকুরপো এসেছিল, রাত বারোটার পর!

ভণ্টু বলিল, চোর কোথাকার! সমস্ত সন্ধ্যেটা আমার মাটি করে দিয়ে রাত বারটার পর আসা হয়েছে! কিছু বলে গেছে নাকি!

একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

কোথায় চিঠি?

বউদিদি এঁটো হাতেই উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটি পত্র আনিয়া ভণ্টুর হাতে দিলেন। ক্ষুদ্র পত্র।

ভাই ভণ্টু,

সন্ধ্যের সময় এক জায়গায় আটকে পড়েছিলাম। কাল সকালে উঠেই বোস সায়েবের ওখানে যাব। তুই বিকেলে আসিস শঙ্কর।

ভণ্টু পুনরায় বলিল, চোর কোথাকার!

কিছুক্ষণ পরে ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজির খবর কি?

বাবাজি আজ সিনেমা দেখতে গেছে, কে কে সব ডাকতে এসেছিল যেন, কোথায় নেমন্তন্ন আছে, বলে গেছে সকালে ফিরবে।

পাশের ঘরে খুট খুট করিয়া আওয়াজ হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেশলাই কাঠি জ্বালার শব্দ পাওয়া গেল। বাবু উঠিয়া তামাক সাজিতেছেন। একটু পরেই দরাজ গলায় কাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, বড় বৌমা, উঠেছ না কি? চা চড়াও তাহলে—

বউদিদি হাস্য-দীপ্ত চক্ষে ভণ্টর পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি স্টোভটা ধরিয়ে দিয়ে শোও ঠাকুরপো! আমি ও ভাল ধরাতে পারি না—বড্ড তেল উঠে পড়ে! তোমাকে বলে বলে হেরে গেছি, কিছুতেই তুমি ওটা সারিয়ে আনলে না!

ভণ্টু উত্তরে কিছু না বলিয়া বউদিদির পাত হইতে মাছের একটা কাঁটা তুলিয়া লইয়া চিবাইতে লাগিল।

বাঃ, ওটা আমি চিবোব বলে আলাদা করে রেখে দিয়েছি, বেশ ত তুমি!

ভণ্ট বলিল—খুজবুজ্!

ক্রমশঃ

একা

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

পিছনের বন্ধনেরে দূরে দূরে দূরে ফেলে চলিতেছি কোথা যাযাবর?
নয়নের প্রান্তে কেন ঘনাতেছে গাঢ় মেঘ? সে কি নহে মায়ার নিশ্বাস?
এপারে বৈশাখী ঝড়ে চলিতেছি পথবাহি, ওপারেতে এলো মধুমাস;
কঠিন পর্ব্বতশিরে প্রণাম জানাতে গিয়ে বক্ষ পাতি নিনু বিষ-শর?
চলিতেছি কোথা যাযাবর?

পুষ্পবিতানে বসি' স্বপন দেখেছি শুধু বিলাসের মধুর স্বপন—
আকাশের চাঁদ যেন বালুবেলাতটে পড়ি' ডেকেছিল তাই বারেবার—
স্বপন-যমুনা জলে অযুত স্বপনী বালা মালা দেছে গলে বেদনার;
কুতূহলি আঁখি মেলি নিরালা বিতানে বসি' মধুময় করেছি লগন।
বিলাসের মধুর স্বপন।

সব কি রে টুটে গেছে, এমন রূপালী রাতে, এত ত্বরা নিভে গেছে সব?
মানুষ মানুষী হেরে নয়নে শিহর কই? দাবানলে পুড়িল কি বন?
গানের পিঞ্জর হ'তে চলে গেছে সুরপরী, শ্মশান যে হ'ল তপোবন!
কোথায় হারানো মেঘ? তৃষিত চাতক সম বৃথা কাঁদা, বৃথা কলরব।
এত ত্বরা নিভে গেছে সব?

কুঞ্জদুয়ারে বুঝি এখনো জোনাকি কাঁদে, গভীর আঁধার রাতে হায়
আমার হারানো বাঁশি অনামী রাধার নামে কেঁদে কেঁদে ফিরিতেছে যেন;
লজ্জাবতীর পাতা বিমলিন আঁখি তুলি বলিল কি 'দশা কেন হেন?'
নগরে ফেলিয়া দূরে সরোবর তীরে কেউ বাজালো কি বেহাগে সানাই?
গভীর আঁধার রাতে হায়?

শ্রমের অনেক দাম, স্বপনেতে জ্বালা শুধু আজ যেন সবি বুঝিলাম।
'ঝড় এল, ঝড় এল, তপ্ত বালুকা ওড়ে, ঘরে এস, এস যাযাবর?'
আমারে মরণ মাঝে ঠেলে দিয়ে সাবধানী, দাম কোথা রহে এ কথার?
তোমাদের বিষ-শরে অবশ হতেছে দেহ, শুভাশীষ বলে মানিলাম।
আজ যেন সবি বুঝিলাম।

তোমাদের এ শ্যামল প্রান্তর ছাড়িয়া আমি চলিতেছি আজ কেন একা,
সেকথা স্মরণে এলে কাজল মেঘের পানে আমার ছায়ারে দেখে নিয়ো।
পার তো নিভৃতে বসি' আমার নামেরে ডাকি' বহুবার অভিশাপ দিয়ো;
সকলি থাকিতে তবু হারানু সবারে ভাই; মুছে যায় স্মরতির রেখা।
চলিতেছি আজ কেন একা!

জাপান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জাপান।—আজ সারা দুনিয়ার নজর পড়েছে তার উপর। তার শিল্প, তার বাণিজ্য, তার সংস্কৃতি, তার শৌর্য্য, আজ সারা বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আজ সে তার মস্তিষ্কের উর্ব্বরতায়, কর্ম্মের পটুতায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিকল্পনায় সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে।

অথচ বেশীদিনের কথা নয়, জাপানের এ সব কিছুই ছিল না। না ছিল তার সাহিত্য, না ছিল তার শিল্প; বাণিজ্য যা-কিছু, সে ছিল তার নিজের সীমানায় সীমাবদ্ধ। শৌর্য্য তার ছিল, সে শুধু "সামুরাই" বা সামন্ত-রাজাদের খেয়োখেয়ি—যেমন ছিল মধ্যযুগে ভারতবর্ষে। সে একটা উৎকট আত্মাভিমানের যুগ—পরস্পরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের অপচেষ্টার কাহিনী,—যেমন ছিল একদিন আমাদের দেশে রাজপুতানায়!

প্রথম বাইরের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করলে রুষ-জাপান যুদ্ধের সময়। সেই সময়, জাপানে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর নাম সম্রাট মেইজি! তাঁর প্রভাবে জাপান যেন রাতারাতি বদ্‌লে গেল—ঠিক যেন যাদুকরের যাদুদণ্ডের স্পর্শে! বদ্‌লে গেল তার রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা, তার সামাজিক বিধি-নিষেধ, বদ্‌লে গেল তার অশন, বসন, এমন কি তার ব্যক্তিগত জীবন পর্য্যন্ত! তার প্রাচ্য সংস্কার-বহুল ভাবপ্রবণ জীবনের উপর লাগ্‌ল পাশ্চাত্য জড়বাদী জীবনের রঙ! কলাকুশল জাপান সে রঙকে সুন্দর মানান-সই করে' তুল্‌লে তার নিপুণ তুলিকা দিয়ে! কোথায়ও খাপছাড়া রঙের আঁচড় রইল না।

এ জিনিসটা আমাদের দেশে আমরা পারিনি। যেখানেই আমরা পাশ্চাত্যের রঙ লাগিয়েছি, সেইখানেই রয়ে আছে তা খাপছাড়া, বেমানান। আমাদের প্রাচ্য পটভূমিকায় উপর পাশ্চাত্য রঙের তুলি যেখানেই আমরা টেনেছি, সেইখানেই মিল খাওয়াতে পারিনি! ছবির রূপ-বিন্যাসের সঙ্গে সে টানগুলি সর্ব্বত্রই অতি তীব্র, অতি উগ্র হয়েই দেখা দিয়েছে। রবিবর্ম্মার তুলি দিয়ে রাফায়েলের ছবি আমরা আঁক্‌তে পারিনি!

কিন্তু জাপান তা পেরেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার এই সুশোভন সম্মিলনই জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব। কেমন করে দিনের পর দিন সে বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে সে ইতিহাসের কথা। কিন্তু ইতিহাসের গবেষণা ঐতিহাসিকের উপরেই থাকুক্। বর্ত্তমানে কি রূপ নিয়ে সে চিত্র ফুটে উঠেছে, প্রাচ্যের বনিয়াদের উপব পাশ্চাত্য ইমারত কি ভাবে গড়ে উঠেছে, তাই দেখ্‌বার জন্যই আমি জাপান গিয়েছিলাম এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

মুগ্ধ হয়েছি তার ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য্য দেখে—তার শৌর্য্যে নয়, রাজনীতিতে নয়। গত কয়েক বৎসর ধরে' তার রাজনীতির অভিযান যে পথে চলেছে, তার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে নানারকমের মতামত আছে, যেমন সকল ব্যাপারেরই থাকে। স্যর রোজার-এর জ্ঞানগর্ভ অমূল্য উক্তি—Much may be said on both sides জগতের কোন ব্যাপারেই অপ্রযোজ্য নয়। জাপানের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির বিপক্ষে যেমন জাহাজ-প্রমাণ যুক্তি আছে—স্বপক্ষেও তেম্‌নি। সে জাহাজের খবরে আমার মত আদার ব্যাপারীর আবশ্যক নাই।

সকল দেশেই রাজনীতির একটা আলাদা জাতি থাকে। তাদের পেশাই রাজনীতি। সাধারণ লোকের সঙ্গে তার বড় একটা সম্বন্ধ নেই। তাদের উদর-নীতির কাছে রাজনীতির স্থান নেই। সর্ব্বত্রই তাই। যেমন রাজতন্ত্রের দেশে, তেম্‌নি প্রজাতন্ত্রের দেশে; যেমন প্রাচ্যে, তেম্‌নি পাশ্চাত্যে।

প্রাচ্যের লোক, যেরূপেই হৌক, একভাবে না একভাবে তারা আদর্শবাদী, আর সেই জন্যই তারা প্রতিমাবাদী! হিরো-ওয়ারশিপ তার অতি নিকৃষ্ট রূপ নিয়েই তাদের রক্তে-মাংসে জড়িয়ে আছে। সংস্কৃতির দিক দিয়ে তাদের অধিকাংশ এখনও—এই বিংশশতাব্দীতেও, সেই মধ্যযুগের

মিষ্টিসিজ্‌ম্‌-এর গণ্ডী পেরিয়ে যেতে পারেনি। তাই যেখানেই তারা দেখ্‌তে পায় কোন অনন্য-সাধারণ শক্তির বিকাশ—সে ধর্ম্মের হোক, নীতির হোক, জ্ঞানের হোক, অথবা অর্থেরই হোক, সেইখানেই তারা মস্তক অবনত করে শ্রদ্ধায়! তারা ভুলে যায় তাদের ইষ্টানিষ্ট, ভুলে যায় তাদের ব্যক্তিগত মতামত। মানুষের এই প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার হাত থেকে কোন দেশই বাদ পড়েনি। সেই জন্যই, মানুষের এই দৈহিক ও মানসিক গঠন-ক্রটির ফলেই, গণতন্ত্রবাদ সর্ব্বত্রই শুধু ডিক্টেটরশিপ প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। মহাত্মা রুষো বলেছিলেন, গণতন্ত্র স্বাধীনতা ভোগ করে কেবল একদিন—শুধু ভোটের দিন। বোধ হয় তাও সত্য নয়। ভোটাধিকারের অস্ত্রে তারা বলি দেয় স্বাধীনচিন্তার অধিকারকে তাদের শ্রদ্ধার প্রতিমার চরণ-তলায়!

অতি পুরাতন যুগে আমাদের দেশে যে গণতন্ত্রের কাঠামো ছিল, তারও মূলে ছিল এই হিরো ওয়ারশিপ; ভোটের বলে গ্রাম-প্রধানগণের নির্ব্বাচন হ'ত না, তাদের প্রধানত্ব আপনিই গড়ে উঠ্‌ত গ্রামবাসিগণের শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর। তার পুষ্টি ও বৃদ্ধি হ'ত রাজতন্ত্রের আওতায়। যেমন বর্ত্তমানে আছে বৃটেনে, যেমন আছে জাপানে!

কিন্তু বৃটেনের পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সঙ্গে জাপানের প্রাচ্য গণতন্ত্রের তফাৎ আছে। প্রাচ্যের এই হিরো-ওয়ারশিপ মনোবৃত্তি জাপানে যতখানি আছে, বৃটেনে তা নেই। জাপানের শাসনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল অনেকটা ভারতের জাতিভেদ প্রথার ভিত্তির উপর। এখনও সেই কাঠামো আছে, শুধু রূপের কিছু রকমফের হয়েছে মাত্র। জাপানী ব্রাহ্মণ দেবমন্দিরে পূজা-অর্চ্চনা, শাস্ত্রালোচনা নিয়েই এখনও দিন কাটান—ভারতের ব্রাহ্মণের মতই। কিন্তু রাজারা রাজকার্য্যে আর তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন না, যেমন ভারতে তেম্‌নি জাপানে! জাপানের ক্ষত্রিয়—মিলিটারী। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যবিস্তার তাঁদের কাজ। তা তাঁরা পুরাদস্তরই করছেন। জাপানী বৈশ্য সারা দুনিয়ায় আজ তাদের বাণিজ্য বিস্তার করেছে। জাপানী শূদ্র অতি উষর পর্ব্বতগাত্রকেও শস্য-শ্যামল ক'রে তুলেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই কর্ম্ম-বিভাগ তাদের বংশগত হয়ে দাঁড়ায়নি, অথবা তাদের ভিতর বর্ণ-বৈষম্যের সৃষ্টি করেনি।

রাজা তাদের সমস্ত জাতির উপর। তাঁকে জাপানীরা ভক্তি করে দেবতার মত। রাজপ্রাসাদের বহুদূরে দাঁড়িয়েই রাজভক্ত জাপানী অদৃশ্য রাজার উদ্দেশে তার অভিনন্দন জানিয়ে আসে। আধুনিক জাপানের অনেকে দেবতা মানে না, কিন্তু রাজা মানে। রাজার উপর এই দেবোচিত শ্রদ্ধা জাপানী চরিত্রের একটা মস্তবড় বিশেষত্ব!

প্রাচ্যের এই প্রকৃতিগত রাজভক্তির সঙ্গে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রবাদের সুশোভন সংমিশ্রণ করেছে এই জাপানীরা। তার পেছনে আছে তাদের প্রচণ্ড দেশাত্মবোধ, আর আছে তাদের অতি তীব্র আত্মসম্মানজ্ঞান। সে জ্ঞান এত তীব্র যে তার জন্য জাপানীরা 'হারিকিরি' বা আত্মহত্যা করাও গৌরবের মনে করে। এক কথায়, হ্যামলেটের সঙ্গে নেপোলিয়ানকে এক কড়ায় চাপিয়ে, তাতে টলষ্টয়ের ফোঁড়ন দিলে যে পদার্থটি তৈরী হয়—তাই জাপানী চরিত্র!

কিন্তু রাজনীতির কথা থাক্‌। রাজনীতির গবেষণা করতে আমি জাপান যাইনি। ইচ্ছা থাক্‌লে, আমাদের দেশেই সে আলোচনা কর্‌বার যথেষ্ট সুযোগ আছে। প্রবুদ্ধ ভারতে 'ইজ্‌ম্‌'-এর এখন আর অন্ত নাই। একদিন শুভ সুপ্রভাতে ভারতের যে-কোন দুর্ভাগ্য নিপীড়িতের জন্য প্রাণটাকে কাঁদিয়ে তুল্‌তে পার্‌লেই নাম-কামের আর অভাব থাকে না—দুর্ভাগ্যের দুঃখ-বিমোচন যতটা হোক্‌ আর নাই হোক! অনাহারীর দুঃখের চেয়েও আমরা বড় ক'রে তুলেছি স্বল্পাহারীর দুর্গতিকে! তাই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা না বাড়িয়ে আমরা বেশী ঝুঁকে পড়েছি ট্রেড-ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়াতে! জীবন-সংগ্রামের পদাতিক সৈন্যদের সন্তোষের সুধা পান না করিয়ে আমরা তাদের মাতাল করে তুল্‌তে চাই ধর্ম্মঘটের সুরা দিয়ে! সে জন্য জাপান যাওয়ার আবশ্যক ছিল না। গিয়েছিলাম দেখতে দেশটাকে, আর তার ছোট্ট বেঁটে মানুষগুলোকে!

শুনেছি, বেঁটে লোকগুলোই নাকি খুব চালাক হয়। কোন্‌ চালাকির বলে এই বেঁটে জাপানীরা সারা পৃথিবীকে তাক্‌ লাগিয়ে দিয়েছে, তার সন্ধান নেওয়ার বড় একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁদের সেই আধ-বোঁজা চোখের ভিতর কি এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লুকিয়ে আছে, যার প্রভাবে হঠাৎ তারা এমন বড় হয়ে উঠেছে, জানবার বড় আগ্রহ ছিল।

সেই আগ্রহ নিয়ে যখন জাপানে উপস্থিত হলাম, তখন

মার্চ্চের শেষাশেষি। তখনও সেখানে প্রচণ্ড শীত। তাপমান যন্ত্র ৩৮ ডিগ্রীতে নেমে ব'সে আছেন, গরম হওয়ার কোন লক্ষণই নাই। এক বন্ধু বল্‌লেন—জাপানের যন্ত্র কি না, এদের প্রকৃতিও জাপানীদের মত। সহজে এরা গরম হয় না।

হংকং থেকেই শীত সুরু হয়েছিল। আমাদের জাহাজে একজন হনলুলু-যাত্রী আমেরিকান ছিলেন সস্ত্রীক। হিটারের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁর ট্রাউজার পুড়িয়ে ফেল্‌লেন। এই উপলক্ষে তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী পুরুষের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর এমন সব মন্তব্য প্রকাশ কর্‌লেন, যা এই নারী-প্রগতির যুগে সচরাচর আমরা যেখানে-সেখানে শুনে থাকি। তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই ছিল না। শুধু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম এই ভেবে যে, নারীদের যুক্তিগুলি কি এতই মামুলি! নতুবা সকল নারীর মুখ থেকে গোটা কয়েক বাঁধাবুলি ছাড়া আর নতুন কিছু কখনও শুন্‌তে পাওয়া যায় না কেন?

পথের পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। বল্‌তে বসেছি জাপানের কথা, পথের কথা নয়। অতএব কোথায় কোন্ বাঙালী কত যত্ন ক'রে আমাদের চুনা মাছের ঝোল খাইয়েছিলেন, কোন্ হিন্দুস্থানী হিন্দুস্থানের লোক দেখে আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়েছিলেন ডাল-রুটি খাইয়ে, কোন্ জাপানী কতবার আমাদের দুধ-চিনির বালাই-বর্জ্জিত চা পান করিয়েছিলেন—অকৃতজ্ঞ আখ্যা পাওয়ার ভয় থাক্‌লেও সে পরিচয় দেওয়ার আমি চেষ্টা করব না। আমার আগে, অনেক মুগ্ধ অতিথি তা সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে ভাষার এবং আতিথ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছেন।

জাপানের দর্শনীয় স্থানগুলির বিবরণ দিতেও আমি বিরত থাকব। জাহাজ কোম্পানিগুলি তা' সরবরাহ করে থাকে প্রত্যেক দ্রষ্টব্য এবং অদ্রষ্টব্য স্থানের তালিকা-সহিত। কিন্তু অনেকস্থলেই দেখা গিয়েছে—দ্রষ্টব্য বস্তু এতই সাধারণ, এতই অকিঞ্চিৎকর যে তা' দেখবার আনন্দের চেয়ে পরিশ্রম ও ট্যাক্সি ভাড়ার আপ্‌শোষটা মাত্রায় অনেক বেশী ব'লে মনে হয়।

প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশই ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করবার জন্য বিজ্ঞাপনের বহর ছুটিয়েছে। সামান্য জিনিসটাকেও রং-ফলিয়ে তারা এমন অসামান্য ক'রে উপস্থিত করে যে, সকলেরই আগ্রহ হয় তা দেখ্‌তে। তাতে দেশের লাভের পরিমাণ বড় কম হয় না। তাই, সে-সব দেশে Tourist Industry ব'লে একটা জিনিস গড়ে' উঠেছে। তারা একে শিল্পপর্য্যায়ে স্থান দিয়েছে। আমাদের দেশে এ শিল্প নেই। অথচ আমাদের যা আছে, জগতের আর কোথায়ও তা নাই। কোথায়ও নাই তাজমহল, কোথায়ও নাই অজন্তা! কোথায়ও নাই দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস! কোথায়ও নাই মাদুরার তুঙ্গ মন্দির, ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য! কোথায়ও নাই কাশ্মীরের কান্ত বনশ্রী, অথবা বিগলিত-হেমকান্তি কাঞ্চনজঙ্ঘা! অতীতের সমাধিস্তূপে সমাকীর্ণ ভারতভূমির মালমশলা আছে প্রচুর, নাই শুধু তা কাজে লাগাবার শিল্প-প্রতিষ্ঠান! ভ্রমণকারীকে আকর্ষণ করবার কোন বন্দোবস্তই আমাদের নাই। শুনেছি, কিছুদিন আগে আমেরিকায় এক টুরিস্ট আফিস খোলা হয়েছিল। কিন্তু সে পয়সা রোজগারের জন্য কি খরচের জন্য, সে খবর নিতে হ'লে রীতিমত নোটিস্ চাই—কেন না, অনেক দপ্তর ঘাট্‌তে হবে!

টুরিস্ট যারা এখানে আসেন, তাঁরা দেখ্‌তে আসেন আজব ভারত। আমাদের হিতৈষী বন্ধুরা অনেক আজগুবি গল্প এদেশ সম্বন্ধে তাঁদের শুনিয়েছেন। তাই তাঁরা দেখ্‌তে আসেন, এ দেশের লোক সাপ খায় কি ব্যাং খায়, এ মেয়েরা সন্তানের জননী হয় নয় বৎসরে কি সাত বৎসরে! এ দেশের দেব-মন্দিরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক'টা ক'রে নরবলি হয়! শুধু আজব ভারতই তাঁরা দেখে' যান—প্রকৃত ভারত দেখ্‌তে পান না।

ভারত সম্বন্ধে এই আজগুবি ধারণার সদ্ব্যবহার আমরা করতে পারিনি। সে সুযোগ আমরা হেলায় হারিয়েছি। সমস্ত ভারতজোড়া অতীতের যে সম্পদ আমাদের আছে, তাকে ঠিকমত টুরিস্টের সাম্‌নে উপস্থিত ক'রে এ শিল্পকে আমরা গড়ে' তুল্‌তে পারিনি। অথচ ভারতের যেখানে সেখানে যে সিঁদুরমাথা বটগাছগুলো আছে, তাদেরও দ্রষ্টব্য বস্তু ক'রে তোলা হয় ত আমাদের পক্ষে খুব অসম্ভব হ'ত না।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে জাপানের তুলনা নাই। প্রত্যেক সুন্দর জায়গাটিকে অতি বিচিত্ররূপে তারা বিদেশীর সাম্‌নে উপস্থিত করে। তারপর, ঋতুর আকর্ষণও তাদের চমৎকার।

তাদের চেরীফুলের কথা, ম্যাপেলের কথা, ক্রিসান্থিমামের কথা, যারা জাপান দেখেনি তাদেরও মুখে মুখে ফেরে!

এই চেরীফুলের বসন্তঋতু আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি জাপানে উপস্থিত হয়েছিলাম। জাপানের চেরীফুল নিয়ে গর্ব্ব করবার কারণ আছে। বাস্তবিক জাপানের এ একটা মস্ত বড় সম্পদ। জাপানের বৃক্ষ-সম্পদ খুব বেশী নাই। পাহাড়ের গায়ে ছোট-বড় পাইন গাছের সারি ছাড়া অন্য জাতীয় গাছের সংখ্যা জাপানে খুব কম। বাংলা-দেশের মত—"পথের দুধারে কত গাছ আর গাছে গাছে কত ফুল"—জাপানের নাই। তাই বৃক্ষবিরল জনস্থলীতে সযত্ন-রক্ষিত চেরিগাছগুলির নিষ্পত্র শাখা বিদীর্ণ করে' যখন ফুলগুলি ফুটে ওঠে, তখন সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। মনে হয় তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ফুলের সওগাত উপহার দেওয়ার জন্যই বুঝি সে তার পাতার ঝামেলাকে সযত্নে ঝেড়ে ফেলেছে—পাছে তার সম্পূর্ণতার এতটুকুও ব্যাঘাত হয়! মনে হয়, ওই বিশুষ্ক-প্রায় শাখাগুলির ভিতর কোথায় লুকিয়েছিল এত ফুলের সম্ভার! ছোট ছোট ফুলগুলি রাতারাতি সমস্ত গাছটাকে যেন হঠাৎ ছেয়ে ফেলে, আবার তেম্নি হঠাৎ-ই তার সমস্ত উপহার নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে যায়।

আমাদের দেশে চেরীফুল নাই। অথবা এমন আর কোনও ফুল নাই, যাকে চেরীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ছোট্ট সাদা ফুল—অনেকটা শিউলি ফুলের মত—কিন্তু তার পাঁপড়ির স্তবক আছে, যেমন থাকে বেল-ফুলের! তার মাঝে আছে ছোট ছোট কেশর, যা বেলফুলের নাই। কেশরের চারিপাশে আছে সুন্দর লাল্‌চে আভা—যা শিউলির নাই, বেলের নাই। আবার শিউলি-বেলের গন্ধ আছে, চেরীর তা নাই। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, যে ফুলের—"গন্ধ নাই কেহ তাকে করে না আদর!" আমাদের দেশে হ'লে কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু চেরীকে সকলেই ভালবাসে!

আমাদের দেশেও নিষ্পত্র গাছে ফুল ফোটে। কিন্তু চেরীর সৌন্দর্য্য শিমূল-পলাশে নাই। তারা যেন প্রকাণ্ড পালোয়ান, টেকো মাথায় লালফুলের জালি পরে দাঁড়িয়ে থাকে। কমনীয়তা না আছে তাদের দেহে, না আছে তাদের ফুলে! তারা যেন যাত্রাদলের গোঁফ-কামানো সখী, প্রাচ্যনৃত্যের কসরৎ দেখাবার জন্য দখিন হাওয়ায় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে—না আছে তাদের শীলতা, না আছে সম্ভ্রম। কিন্তু চেরীফুলের পাতার ঘোম্‌টা না থাক্‌লেও, তার লাবণ্য আছে, কমনীয়তা আছে!

এক দেশের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আর এক দেশের সৌন্দর্য্যের তুলনা করতে যাওয়াই বোধ হয় ভুল—কি মানুষের, কি ফুলের! প্রত্যেক দেশের সৌন্দর্য্য তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুন্দর হ'য়ে ওঠে। সাধারণ সূত্র দিয়ে বিচার কর্‌তে গেলে তার কোন্‌টির ভিতর কতখানি মিল পাওয়া যায়, তা বলা বড় শক্ত। সৌন্দর্য্যকে অস্ত্রোপচার করা চলে না। পৃথক্ ভাবে প্রতি অঙ্গে তার সন্ধান কর্‌তে গেলে হয় ত রূপ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় না। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে রূপ, তার মানান-সই সম্মিলনই সৌন্দর্য্য। দেশভেদে তার প্রকার-ভেদ হ'তে পারে, কিন্তু প্রকৃতি-ভেদ হয় না।

কিন্তু সৌন্দর্য্যতত্ত্বের গবেষণার ভার বিশেষজ্ঞদের উপরেই থাকুক। আমরা জাপানের যে সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে এসেছি—তা চেরী নয়, ম্যাপেল নয়, ক্রিসান্থিমাম নয়। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ বা বিনাশ নাই। যুগ-যুগান্তর ধরে' সে সৌন্দর্য্য জাপানের গিরিদরী-সাগরে, তার স্বচ্ছতোয়া সরোবরে, তার নীলাম্বু-পরিসরে, তার গগনচুম্বী তরুবিতানে, কলনাদিনী স্রোতস্বিনীতে চিরন্তন হয়ে আছে! সে সৌন্দর্য্য অনাদিকালের সংস্কার নিয়ে তার ভদ্র, নম্র, ভাবপ্রবণ, রূপবিলাসী, সৌন্দর্য্য-পিয়াসী জনগণের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে ভাস্বর হয়ে আছে। সে সৌন্দর্য্য বিকশিত হ'য়ে আছে প্রোদ্ভিন্ন স্থলকমলের মত তার শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, কলাবিদ্যায়—তার জীবন-যাত্রার প্রতিপাদক্ষেপে, তার জীবন-নাটকের প্রতি অঙ্কে-গর্ভাঙ্কে! তার উৎসাহে, তার নিষ্ঠায়, তার শ্রমে, তার কর্ম্মে, সেই সৌন্দর্য্যরসের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি! আমরা পান করতে চেষ্টা কর্‌ব সেই রস—

"মানব-জীবন-রসে যত আছে স্বাদ
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে
আনন্দ-মদিরা-ধারা নব নব স্রোতে!"

জাপানের বর্ত্তমান আব্-হাওয়ায় সে আনন্দ-রসধারা-পানের কতখানি সুযোগ পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে বড় সন্দেহ ছিল। আশঙ্কা ছিল, ব্রিটিশ-ভারতের কালা-আদ্‌মি আমরা, সাধারণত পাশ্চাত্য দেশে যে সৌজন্যের পরিচয় পেয়ে থাকি, নব-অভ্যুদয়ের নেশায় মত্ত জাপানের কাছে হয় ত পাওয়া যাবে তারই একটা রাজ-সংস্করণ! হয় ত বা আনন্দের সুধা পান করতে গিয়ে এই পীত জাতির কাছ থেকে অপমানের বিষ পান ক'রে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু সে ভুল ভাঙ্‌তে বেশীক্ষণ লাগেনি।

জাপানের লোক ভারতকে মনে কর্‌ত দেবভূমি। ভগবান বুদ্ধের দেশকে তারা শ্রদ্ধা কর্‌ত, সম্মান কর্‌ত। আধুনিক জাপানের কথা বল্‌ছি না—যে যুগে জাপান খৃষ্টান পাদরীদের তার ত্রিসীমানায় ঢুক্‌তে দেয়নি সেই যুগের কথা বল্‌ছি। আধুনিক জাপান দেবতাকে জীবনে বড়-একটা আমল না দেওয়ার চেষ্টায় আছে। সুতরাং দেবভূমির নাম কর্‌লে দু হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকানো তার কাছ থেকে আর আশা করা যায় না। আমরা তবুও, আমাদের স্বর্গকে সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে রেখে, এখনও তার উদ্দেশে কল্পনার ধূনো জ্বালিয়ে রেখেছি! কিন্তু জাপান বাস্তব চোখে তার তেঞ্জাকু বা স্বর্গ থেকে ভারতের যে দুর্গতি দেখ্‌তে পাচ্ছে, তাতে প্রত্নতাত্ত্বিকের খনন-খাতের ভিতর তার শ্রদ্ধা যদি বিকৃত অঙ্গ নিয়ে গবেষণার বস্তু হয়ে পড়ে থাকে, তাতে দুঃখ কর্‌বার কিছুই নেই।

আধুনিক জাপানের বাপ-ঠাকুর্দ্দারা যে ভারতকে শ্রদ্ধা কর্‌ত, সে বৌদ্ধ-ভারত; যে ভারত দেশ-দেশান্তরে তার ধর্ম্মের, তার কৃষ্টির, তার সংস্কৃতির শুভ্র বৈজয়ন্তী উড়িয়েছিল; যে ভারত সারা দুনিয়ার সাম্‌নে ধরেছিল সভ্যতার পঞ্চ-প্রদীপ। সেই মহিমান্বিত ভারতকে তারা জানে। আজও তাকে মনে মনে তারা শ্রদ্ধা করে। তারা জানে, ভারত ছিল কালিদাসের যক্ষপুরীর মতই সুন্দর। তার ছিল ভ্রমর-মুখর নিত্য-পুষ্প পাদপ-শ্রেণী, মরাল-মেখলা নিত্য-কমল নীল-সরোবর! তার ছিল "নিত্য-জ্যোৎস্না-প্রতিহত-তট বৃত্তি-রম্যা প্রদোষাঃ।" এখন সে ভারত আর নাই! তার পাদপ আছে, পুষ্প নাই! সরোবর আছে, মরাল নাই, জ্যোৎস্না আছে, রমণীয়তা নাই! তার স্মৃতি আছে, সংস্কৃতি নাই। তার বিগত গৌরবের বিকৃত মূর্ত্তি শুধু জিয়োনো আছে যাদুঘরে! কিন্তু জাপানের সে সংস্কার এখনও যায় নি। তাদের বংশধরেরা ভারতে এলে, ভগবান্ বুদ্ধের দেশে যাচ্ছে বলে' তারা গৌরব অনুভব করে। কিন্তু বিগত-বৈভব ইণ্ডিয়াকে জাপান সে শ্রদ্ধা দেখাবার কোন কারণ খুঁজে পায় না।

জাপান ইণ্ডিয়াকে জান্‌ত না—জান্‌ত হিন্দুস্থানকে। যে দুর্ভাগ্যের ফলে হিন্দুস্থান ইণ্ডিয়ায় পরিণত হয়েছে, সেই দুর্ভাগ্যই তাদের শ্রদ্ধাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অবশেষ রেখেছে মাত্র কৌতূহল। তাই আধুনিক জাপানের ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে যতখানি আছে কৌতূহল, ততখানি নেই শ্রদ্ধা! আর এই কৌতূহলটুকু অবশিষ্ট আছে বলেই, শ্রদ্ধার অভাব এখনও ঠিক অশ্রদ্ধাকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারে নি। অতীত সম্পদের তক্‌মা দেখে, এখনও তারা ধূলোয় আমাদের আসন পেতে দেয়নি।

জানি না, কোন্ অশুভ দিনে হিন্দুস্থান ইণ্ডিয়ায় পরিণত হয়েছিল। কার দুষ্কৃতির ফলে সর্ব্বহারা দেশের একমাত্র শেষ সম্বল, তার বিগত বৈভবের একমাত্র নিদর্শন, তার লুপ্ত ইতিহাসের একমাত্র স্মৃতি, দেশের নামগুলো পর্য্যন্ত এমনভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছে! রাজনৈতিক পরাধীনতায় দেশের তত সর্ব্বনাশ হয় না, যত হয় সংস্কৃতির ধ্বংস-সাধনে। ভারতের সমৃদ্ধ অতীতকে ভোলাবার এ প্রচেষ্টা কার দ্বারা হয়েছিল, জানি না। এ কি ক্ষমতাশালী বিদেশীর পর-ভাষা উচ্চারণের অক্ষমতা, না বিজিত দেশকে সর্ব্বপ্রকারে আত্মবিস্মৃত করবার এ একটা অতি হীন পরিকল্পনা—যেমন হিট্‌লার বর্ত্তমানে করছে চেকোশ্লোভাকিয়ায়!

যে জাতি বার্চগার্ডেন উচ্চারণ কর্‌তে পারে, কাম্‌স্কাট্‌কা, মাসাসিচিউট, ভ্লাডিভাষ্টক্ উচ্চারণ কর্‌তে যাদের জিহ্বায় এতটুকু জড়তা আসে না, তারা যে হিন্দুস্থান উচ্চারণ কর্‌তে না পেরে তাকে ইণ্ডিয়া বানিয়ে সহজ করে নিয়েছে, বারাণসীর রস নিংড়ে তাকে বেনারস করে ভুলেছে, হরিদ্বারকে হার্ডোয়ার-এ পরিণত করেছে, কালিঘাটকে ক্যালকাটায় পর্য্যবসিত করেছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ বিজয়নগরম্-এর চেয়ে ভিজিয়ানাগ্রাম উচ্চারণ করা সহজ নয় এবং বিশাখা-পত্তনকে ভিজাগাপট্টম্ বলায় আর যাই থাকুক, উচ্চারণ-অক্ষমতা যে নাই একথা জোর ক'রে বলা চলে।

অথচ বিশাখাপত্তন এখন ভাইজাগ-এ (Vizag) পরিণত হয়েছে।

শুধু বিদেশীর উপর দোষ চাপান চলে না, আমাদের হীন অনুকরণ-প্রিয়তাও তার জন্য কম দায়ী নয়। যে মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা আমাদের সন্তানের নাম বেবী রাখি, মেয়েদের ডলি বলে ডাকি, নিজেদের বংশগত পদবীগুলোকেও বদ্‌লে ভোঁস্‌, গ্যাংলি, মুখার্জ্জি করে ছেড়েছি বা সেই মনোবৃত্তিই রাতারাতি ভারতকে বিলেত ক'রে তুল্‌তে চেয়েছিল—তার পৌরাণিক নাম, তার পিতৃপিতামহের পদবী বদ্‌লে ফেলে! এত বড় দুর্ভাগ্য আর কোন দেশের হয়নি। অনেক দেশই তার স্বাধীনতা হারিয়েছে, কিন্তু নাম হারায় নি। আমরা রাস্তার নাম সানি পার্ক, ম্যাণ্ডেভাইল গার্ডেন, ডোভার পার্ক রাখতে স্বরু করেছি, বাড়ীর নাম আলয়-নিলয় ছেড়ে কোর্ট-ম্যানসান করে ফেলেছি—এখনও যে কালিঘাটকে ক্যাল্‌-সায়ার ক'রে তুলিনি, সেজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

জাপানও পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেছে অনেকখানি, কিন্তু নিজের সত্তাকে সে এমন ক'রে জবাই করবার চেষ্টা করে নি। পাশ্চাত্যকে সে তার নিজের ছাঁচে ঢেলেছে, নিজেকে পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢেলে দেয় নি। ইউরোপীয় পোষাক তারা গ্রহণ করেছে—কায়দার জন্য নয়, কাজের জন্য। জাপানীরা এফিসিয়েন্সি বা কর্ম্মপটুতাকে বড় বেশী গণনা করে। সেই কর্ম্মপটুতার খাতিরে তারা তাদের অনেক কিছুই বদ্‌লে ফেলেছে। তাদের পোষাকের পরিবর্ত্তনও সেই কর্ম্মপটুতার প্রয়োজনে। আল্‌খেল্লার মত লম্বা ঝুলের কিমনো (kimno) প'রে মিলের কলকজার ভিতর চলাফেরা কর্‌তে, আপিসে ছুটোছুটি করতে স্ববিধা হয় না বলেই, সে ক্ষেত্রে তারা তা বর্জ্জন কর্‌তে যেমন এতটুকু গতানুগতিকতা দেখায় নি, তেম্‌নি নিজের ঘরে গিয়ে তাদের আদরের কিমনোকে জড়িয়ে নিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌তে তারা একটুও অস্থবিধা বোধ করে না। ঘরে-বাইরে তারা সাহেব সাজে না। ঘরে তারা পুরোদস্তর জাপানী, বাইরে তারা পুরোদস্তর সাহেব। এ যেন তাদের ভিখ্‌-মাঙার ভেক—তাদের অভিনয় কর্‌বার সাজ-পোষাক। তাই, তাদের সাহেবী-পণা আছে, কিন্তু সাহেবী-আনা নেই।

কোট-প্যাণ্ট তাদের সাহেবী অহমিকাকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারে নি। তাদের চোখের চাহনি, কথা বল্‌বার ভঙ্গী, চল্‌বার কায়দা, এমন কি মেজাজ পর্য্যন্ত বদ্‌লে দিয়ে, তাদের মনে উৎকট সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স-এর সৃষ্টি কর্‌তে পারেনি। সাহেবী পোষাক পরেও তারা দিব্যি পা মুড়ে' বসে, প্যাণ্টের ভাঁজ নষ্ট হওয়ার দুশ্চিন্তা না করেই! দেব-মন্দিরে গিয়ে তারা জুতো খুলেই মন্দিরে প্রবেশ করে, জুতো খোলার ভয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে না। দেবতার চেয়ে জুতোকে তারা বড় সম্মান দেয় না। জাপানীদের ম্যাটিং-পাতা ঘরে চেয়ার-টেবিলের বালাই নাই, কাজেই কারও বাড়ীতে গেলে তাদের জুতো খুলেই ঘরে ঢুক্‌তে হয়। তাতে তারা এতটুকুও অমর্য্যাদা বোধ করে না। তাই জাপানীদের কোটের পকেট হাত্‌ড়ালে একটা ক'রে শু-হর্ন পাওয়া যায়,' এ খবর বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই!

অনেকেই বোধ হয় জানেন না, জাপানে পাশ্চাত্য এটিকেট্‌ বা আদব-কায়দা ঠিক কলা-বিদ্যা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। তার জন্য রীতিমত ক্লাস আছে। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তারা তা শিক্ষা করে—কোথায়ও এতটুকু ভুলচুক থাকে না। দিনের বিভিন্ন সময়ে পোষাকের পরিবর্ত্তন থেকে স্বরু ক'রে দাঁত খোঁটার খড়্‌কে-কাঠিটি ব্যবহারের কায়দা পর্য্যন্ত তারা এমনভাবে দোরস্ত করে যে উৎকট রীতি-প্রিয়তার আপশোষ কর্‌বার কিছুই থাকে না। কিন্তু সে-সব শিক্ষা শুধু দরকার মত কাজে লাগাবার জন্য। তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।

নারীদের ভিতরেও পাশ্চাত্যের অনুকরণ কিছু কম হয় নি। শর্ট স্কার্ট ও বব্‌-হেয়ার ক্রমশই জাপানে পসার জমিয়ে তুল্‌ছে। অবশ্য তারা এর স্বপক্ষে কর্ম্মপটুতার কৈফিয়ৎ দিয়ে থাকে। হয় ত তার ভিতরে কিছু সত্যও আছে। সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে-রাখা কিমনো এবং পেটে জোর-ক'রে-বাঁধা ওবি (obi) নিয়ে ঘরের কাজ করা চলে, বাইরের কাজ চলে না, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জাপানী মেয়েদের চুল বাঁধার যে প্রথা, তাদের খোঁপার যে ধরণ সারা বিশ্বের গল্পের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাতে যে সময়ের অনেকখানি অপব্যয় হ'তো এবং

বর্ত্তমানের সর্ব্বক্ষেত্রে কর্ম্মনিরত জাপানী মেয়েরা যে ততখানি সময়ের অপব্যবহার করতে পারে না, সে কথাও স্বীকার করি। আমি দেখেছি, মেয়েরা আপিসে এসে কিমনো ছেড়ে স্কার্ট পরে, আবার কর্ম্মান্তে আফিসেই স্কার্ট ছেড়ে রেখে দিয়ে তারা কিমনো প'রে বেরিয়ে যায়। কিন্তু. স্কার্ট-কিমনোর বিচারই শেষ বিচার নয়। তাদের জীবনের অন্য ক্ষেত্রে যা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে যেন পুরুষের চেয়ে নারীদের উপরই অত্যুগ্র আধুনিকতা বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। আধুনিক সভ্যতার ভিতর মণীষী কার্লাইলের সূক্ষ্ম দৃষ্টি যে hydra-headed serpent দেখেছিল, সেই সহস্রশীর্ষ বিষধরের বিচিত্র ফণা জাপানের উপরেও উদ্যত হয়েছে। এখনও জাপানের নারী তার প্রাচ্য প্রকৃতিকে বদ্‌লাতে পারে নি। শিষ্টতায়, শালীনতায়, সেবায়, আন্তরিকতায়, প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য এখনও তার পুরোমাত্রায় বজায় আছে। জানি না, আর দশ বৎসর পরে কি হবে। উগ্র-আধুনিকতার তীব্র বিষক্রিয়া কত দিনে তাদের এই প্রশান্ত প্রকৃতিকে বিষাক্ত ক'রে তুল্‌বে, অথবা আদবেই করবে কি-না—ভবিষ্যতই সে প্রশ্নের উত্তর দেবে। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মতই জাপানেও সভ্যতার প্রদীপের নীচেতে অতি গাঢ় অন্ধকার জমা হয়ে আছে। সে অন্ধকারে দৃষ্টি দিয়ে নালা-নর্দ্দামার সন্ধান ক'রে ড্রেন-ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট লেখ্‌বার প্রবৃত্তি আমার নেই।

অপরের অনুকরণে সাধারণত এই একটা মস্ত দোষ থাকে যে অনুকৃতের দোষ-ত্রুটি সমস্তই অনুকারীর ভিতরে এসে পড়ে। জাপানের তা আসেনি। কারণ জাপান aping করে না—নিজের আব্‌হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে তার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন ক'রে তারা তা গ্রহণ করে এবং করেও খুব তাড়াতাড়ি। কোন দেশে নতুন কিছু প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান তাকে নিজের মত ক'রে নেয়, একটুও পিছিয়ে পড়ে না। সাধারণত এক দেশে কোন কিছু একেবারে পুরানো হয়ে যখন বর্জ্জিত হয়, তখন অন্য দেশে তার অনুকরণ হয় বিপুল উদ্যমে। তাই, সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে তার চারি পাশে যত আবর্জ্জনা জড় হয়, তার হাত থেকে অনুকারী রেহাই পায় না। শুধু বিভিন্ন দেশে কেন, একই দেশে, শহরে যা পুরানো পরিত্যক্ত হয়, পল্লীগ্রাম তা অতি উৎসাহে গ্রহণ করে আধুনিক সাজ্‌তে। যেমন কম্‌ফর্টার। শহরে যখন সে পুরানো হয়ে গেল, পল্লীগ্রামে গিয়ে সে তখন আপ্‌-টু-ডেট্‌ বাবুদের মাথায় মাথায় জড়িয়ে রইল আধুনিক ফ্যাসানের ধ্বজা হ'য়ে। জাপান বিদেশের অনুকরণ করলেও যেমন তার সঙ্গে সমান তালে চল্‌তে পারে—আমরা তেম্‌নি তার অনেক পিছনে প'ড়ে থাকি, এই কম্‌ফর্টারি সভ্যতার গর্ব্ব নিয়ে!

পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমান তালে চল্‌তে গিয়ে জাপানকে তার অনেক কিছুরই পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে! শুধু বদ্‌লায় নি তার ভদ্রতা, নম্রতা—বদ্‌লায় নি তার সম্মান-বোধ, তার আতিথেয়তা। অতিথিকে জাপানীরা বড় যত্ন করে, বড় আদর করে। আমাদের দেশে একদিন যেমন ছিল—"সর্ব্বত্রোঽভ্যাগতো গুরুঃ।" জাপানে আজও তা আছে। গুরুর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা হারিয়েছি, অতিথিকেও আর আমল দিতে চাই না। অতিথিকে সৎকার করতে হয় ত রাজি আছি—তবে গৃহে নয়, অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে। জাপান কিন্তু অতিথিকে তেম্‌নি সমাদর করে—সাহেবী-আনা শেখার আগে আমরা যেমন করতুম আমাদের গুরুকে!

আত্মসম্মানবোধ আছে বলেই জাপানীরা অপরকেও সম্মান দিতে পারে। কটু কথা, কড়া ব্যবহার জাপানীদের কাছ থেকে কখনই পাওয়া যায় না। উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাক্‌লেও তারা তাদের ভদ্রতা ভোলে না। অপরের সহিত ব্যবহারে তারা অতি সতর্ক, অতি সাবধানী—পাছে তাদের কোন কথায়, কোন কাজে, কেউ বিন্দুমাত্র আঘাত পায়। অপরের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এত বড় সচেতন বোধ হয় জগতের আর কোন জাতি নাই। অপরকে আহত করাই তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ব'লে মনে করে না।

অনেকের কাছে তাদের এই ভদ্রতা ও নম্রতা যেন একটু অতিরিক্ত বলেই মনে হবে। তাতে মিষ্টতা হয় ত পাওয়া যেত না, যদি না তার সঙ্গে থাক্‌ত প্রবল আন্তরিকতা। আমরা যেমন বজ্রাসনে কখনও কখনও বসে থাকি, জাপানীদের সাধারণত সেইভাবে বসাই নিয়ম। আধুনিক পুরুষেরা কখনও কখনও তার ব্যত্যয় করলেও, নারীরা পুরাদস্তুরই তা মেনে চলে। এমন কি, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে হ'লে মেয়েদের বজ্রাসনে বসে' দরজা খুলে, দাঁড়িয়ে উঠে ও-ঘরে গিয়ে, আবার বজ্রাসনে বসে' দরজা বন্ধ করতে

হয় অতি ধীরে ধীরে। ব্যস্ততা প্রকাশ পেলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে ধীরতার অভাব হ'লে অভদ্রতা বলে' গণ্য হয়। আগন্তুকের সাম্‌নে বজ্রাসনে বসে' নীচু হয়ে মেয়েরা যখন অভিবাদন করে, তখন অনেকটা আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের মত দেখায়। তাদের সেবার সতর্ক সমারোহ অতিথি অনেক সময় যেন বিব্রতই ক'রে তোলে।

একটা দিনের কথা বল্‌ব। আতিথেয়তা কেমন ক'রে যে জাপানের অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে তারই একটা ছোট্ট উদাহরণ। আরাসিয়ামা ব'লে একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছুটীর দিন। ছুটীর দিনে জাপানীরা বেড়াতে বেরোয় সপরিবারে। আমাদের মত একটা পাহাড় দেখ্‌তে হ'লে তাদের পাঁচশ' মাইল ছুট্‌তে হয় না। সহর থেকে পাঁচ-দশ মাইল গেলেই একটা না একটা সুন্দর জায়গা পাওয়া যায়, যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মনোমুগ্ধকর। কোথায়ও নীল জলরাশি বালুকা-বেলায় ঢেউয়ে-ঢেউয়ে উপঢৌকন দিয়ে যাচ্ছে নানা বর্ণের মীনমিথুন, কোথায়ও বা দুধারে সু-উচ্চ পাহাড়ের সঙ্কীর্ণতার মাঝখান দিয়ে খরস্রোতা নদী তীর গতিতে নেমে এসে হঠাৎ সমতল ভূমির মুক্ত পরিসরে দিশেহারা হয়ে পড়েছে—ছড়িয়ে গেছে, গুলিয়ে গেছে তার উদ্দাম চঞ্চলতা! কোথায়ও বা উষ্ণ প্রস্রবণ অবিশ্রান্ত ঢেলে দিচ্ছে তার দ্রবীভূত অন্তর্জ্বালা—শাদা শাদা ফুল্‌কির ফুল-ঝুরির মত। এমনই কোন একটা মনোরম স্থানে ছুটীর দিনে তারা সারাদিন বনভোজন, খেলাধূলা আমোদ-আহ্লাদ করে কাটিয়ে দেয়। সে-দিনও তেমনি শত শত নর-নারী গিয়েছিল তাদের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে একটুখানি বৈচিত্র্যের সন্ধানে!

ফের্‌বার সময় ট্রেনে ছিল ভয়ানক ভিড়—এমন কি, দাঁড়াবার পর্য্যন্ত স্থানাভাব। তারই একটা গাড়ীতে যখন কোনরকমে উঠে পড়্‌লাম, সাম্‌নের দু'খানা বেঞ্চি থেকে পাঁচ ছয় জন নরনারী একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বস্‌বার জন্য আমন্ত্রণ কর্‌লে—এবং আমার প্রতিবাদ সত্বেও আমাকে না বসিয়ে ছাড়্‌লে না, কারণ আমি বিদেশী, জাপানের অতিথি।

আসন গ্রহণ ক'রে তাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌ছি, এমন সময় পেছনের বেঞ্চি থেকে একখানা ছোট্ট হাত আমার সাম্‌নে প্রসারিত হ'ল—সেই হাতে ছোট কাগজের রেকাবির উপর কয়েকখানা বিস্কুট ও চকলেট। চমকিত হয়ে পেছন ফিরে দেখি, একটি ন-দশ বছরের বালিকা রেকাবি হাতে ক'রে আমার দিকে চেয়ে আছে। মুখে তার মৃদু মৃদু হাসি। তার পাশে ও পেছনে আরও অনেকগুলো মেয়ে সকৌতুকে আমার দিকে চেয়ে আছে। তাদের সামান্য উপহার গ্রহণ কর্‌বার জন্য তারা আমায় অনুরোধ জানালে। ধন্যবাদ জানিয়ে রেকাবিটি গ্রহণ কর্‌তে তাদের চোখে-মুখে যে আনন্দ ফুটে উঠ্‌ল, তা অপূর্ব্ব! জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—এর কারণ কি? একটি মেয়ে অতি নম্রভাবে জবাব দিলে--"বিদেশীকে অভ্যর্থনা কর্‌বার আর কোন সুযোগ আমরা পাব না ব'লে ট্রেনেই সে সুযোগ আমরা গ্রহণ কর্‌লাম।" জানি না, জগতের আর কোন দেশে এর তুলনা পাওয়া যায় কি না? এ সমাদর শেখানো নয়, গড়াপেটা নয়, কোন রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে এর যোগ নেই—এ শুধু সরল হৃদয়ের পরিপূর্ণ আন্তরিকতার অভিব্যক্তি। সে অভিব্যক্তি সেইখানেই স্বতঃস্ফুরিত হয়, যেখানে আছে হৃদয়ের যোগ, ধ্যান ও ধারণার মিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ—যেখানে ফন্দি-মতলবের সন্দেহ নেই, ঘাত-প্রতিঘাতের আশঙ্কা নেই। তাই যে সমাদর দিতে পারে তারা প্রাচ্যের অতিথিকে, দিতে পারে না তা পাশ্চাত্যের সন্ধানীকে!

তথাপি মনে যা-ই থাকুক, সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাদের ভদ্রতাকে কখনও আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে না। অনেক ইউরোপীয় বন্ধুর সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু জাপানীদের সদ্ব্যবহারের সুখ্যাতি সকলেই করেছে শত মুখে। মনে যা-ই থাকুক্‌, বাইরের ব্যবহারে তাদের সহিষ্ণুতা অপরিসীম।

কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজে, কি ধর্ম্মে, জাপানীদের সহিষ্ণুতার তুলনা নেই। অপরের সুখ-সুবিধার খাতিরে নিজেরা অনেক কিছুই সহ্য কর্‌তে পারে। অপরের মতামতকে তারা যেমন উপযুক্ত সম্মান দিতে জানে, অন্যের ধর্ম্মমতকেও তারা তেমনি শ্রদ্ধা কর্‌তে পারে। ব্যক্তিগত মতের অমিল হ'লে তাদের ভিতর যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বেধে যায় না, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতরেও তেমনি কোন উগ্র অসহিষ্ণুতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। জাপানের ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রধানত তিনটি। জাপানের আদি ধর্ম্ম সিণ্টো

(Shinotism) হ'লেও বৌদ্ধের সংখ্যাই সেখানে বেশী। ক্রিশ্চিয়ানও কিছু আছে, দু-দশজন মুসলমানও পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধদের কর্ণ-বধিরকারী ঢক্কা-নিনাদে ক্রিশ্চিয়ান বা মুসলমানদের উপাসনার ব্যাঘাত হয় না, অথবা ঢাক ভাঙ্‌তে গিয়ে মাথা ভাঙ্গে না।

জগতে ধর্ম্মমত-সহিষ্ণুতার উদাহরণ নাই বলাই চলে। ইউরোপে সে প্রশ্ন ওঠে না, কেন না সেখানকার অধিকাংশ লোকই ক্রিশ্চিয়ান। তবুও প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকেরা ভাই ভাই এক ঠাঁই হয়ে বাস করেনি। দু-চার জন ইহুদি যারা আছে, স্বয়ং খৃষ্ট তাদের যতখানি সহ্য করেছিলেন, তাঁর উপাসকেরা তা যে করেন না, খবরের কাগজের পাতা খুল্‌লেই তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। নিকট-প্রাচ্যে মুসলমানেরই একাধিপত্য, কাজেই সেখানে ধর্ম্মদ্বন্দ্বের কোন কারণই উপস্থিত হয় না। একমাত্র প্যালেষ্টাইনে কিছু ইহুদি আছে, তাদের রক্তাক্ত কাহিনী নতুন ক'রে বল্‌বার দরকার করে না।

ভারতের মত এত বিভিন্ন ধর্ম্মমত আর কোন দেশে নাই। আর এত বিভিন্ন সমস্যাও আর কোন দেশে উপস্থিত হয় না। ভারতের ধর্ম্ম-সহিষ্ণুতার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় রঞ্জিত হয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, জাপানে এতগুলি ধর্ম্মমত থাকা সত্ত্বেও, ধর্ম্ম এখনও তাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি। এক ধর্ম্মের লোক অন্য ধর্ম্মকে যথোচিত শ্রদ্ধা করে বলেই তা হয়নি। ধর্ম্মকে তারা ব্যক্তিগত অধিকার ব'লে জানে বলেই তা হয়নি। সে অধিকারকে তারা সমষ্টিগত জীবনের উপর উৎপাত করতে দেয়নি বলেই তা হয়নি। অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যার মত ধর্ম্মকে তারা সমস্যা করে তোলেনি।

আমি দেখেছি, বৌদ্ধ-মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে যেতে ক্রিশ্চিয়ানেরা পর্য্যন্ত মাথার টুপী খুলে বুদ্ধমূর্ত্তিকে অভিবাদন ক'রে যায়, অথচ পৌত্তলিকতার কলঙ্ক-কালিমায় তারা একেবারেই কলঙ্কিত হয় না। বৌদ্ধ-সিণ্টোদেরও দেখেছি গীর্জ্জার সাম্‌নে মাথা নত করতে, অথচ তাদের ম্লেচ্ছ বলে' জাতিচ্যুত হওয়ার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। পরধর্ম্ম-সম্পর্কে এই বিচিত্র সহিষ্ণুতা জাপানী চরিত্রকে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছে।

তার চেয়েও বড় বিশেষত্ব জাপানীদের কাব্যপ্রিয়তা। তাদের কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই শিল্পী সকলেই অল্পবিস্তর কবি। চিত্রাঙ্কন তাদের একটা খেয়ালের মত, তাদের আবাল্যের একটা প্রিয় অভ্যাস। প্রায় সকল জাপানীরই একটা ক'রে ক্যামেরা আছে এবং এমন কোন গৃহস্থ নেই যার ঘরে দু-চারটে ছবির এলবাম্ নেই। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই বাড়ীর সঙ্গে একটি করে ছোট বাগান তারা সযত্নে সাজিয়ে রাখে। আশ্চর্য্য এই, এতবড় কাব্যানুরাগী জাতি কি ক'রে শিল্পে-বাণিজ্যে এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পার্‌লে। তাদের ঘরে, তাদের বাইরে, তাদের বেশভূষায়, এমন কি তাদের অক্ষরগুলিতে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় সৌন্দর্য্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

জাপানের লিখন-পদ্ধতির একটু বৈচিত্র্য আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি লেখে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। আরবী পারশী বা উর্দ্দু ভাষার নিয়ম ডাইনে থেকে বাঁয়ে লেখা। কিন্তু জাপানীরা বাঁ থেকে ডাইনে যেমন লেখে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে লেখে তার চেয়ে বেশী—এবং সাধারণত তারা লেখে উপর থেকে নীচের দিকে। ছোট বড় লাইনগুলি তারা সাজিয়ে যায়। দেখ্‌লে মনে হয়—ঠিক যেন ফুলভরা বনলতার ঝুরি নেমেছে!

তাদের অক্ষরগুলিও যেন এক-একটি ছবি। তুলি দিয়ে তারা সে ছবি আঁকে—কলম দিয়ে নয়। আগেকার দিনে কলমের ব্যবহারই ছিল না। এখনও তুলি দিয়ে লেখার প্রথা তাদের প্রচলিত আছে। তবে, সে কেবল কোন পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানের উপলক্ষে। যেমন এখনও আমরা সময়-সময় তুলোট কাগজের ব্যবহার ক'রে থাকি। কালিও তাদের আলাদা। পুরাকালে আমাদের দেশে যেমন চাল পুড়িয়ে কালি তৈরী হ'ত, এও চাল পুড়িয়ে তৈরী হয়। নিমন্ত্রিত হ'য়ে অনেক জায়গায় আমাকে অটোগ্রাফ দিতে হয়েছে। সেই তুলি ও চাল-পোড়ানো কালির সাহায্যে ব্লটিংয়ের মত চুপ্‌শে-নেওয়া মোটা কাগজের উপর ইংরেজী ও বাংলা হরপে আমার নামের যে চিত্র আমি এঁকে এসেছি, ফটোগ্রাফ নেওয়ার সুযোগ হয় নি বলেই তার নমুনা আপনাদের দেখাতে পার্‌লুম না। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে হয় ত কোন দিন কোন আর্ট-এক্‌জিবিসনে তার সৌন্দর্য্য দেখে আপনারা মুগ্ধ হ'তে পার্‌বেন।

ঘাতে প্রতিঘাতে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

৩৪

কাশী গয়া করিয়া, ভাগীরথীকুললগ্ন মহাপীঠ কালীঘাটেও কিছুকাল তীর্থ-বাসে থাকিয়া, পাপরিক্তা ও পুণ্যসঞ্চিতা বিন্দী দেশে ফিরিল এবং ফিরিয়াই দেশবাসিনী নারীবৃন্দকে উপঢৌকন দিল লতার সব গুহ্য-কথামৃত-রস এবং নারীরাও আগ্রহে তাহা পান করিল, উদ্গীরণ করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইল ; রটন্তী যে পুত্রের উপনয়নে সকলকে অমন জব্দ করিয়া ছিলেন সুদে আসলে তাহার ঝাল তুলিয়া লইতে লাগিল।

বিন্দী হারামজাদী কোথা হইতে কি একটা উড়ো খবর লইয়া কিম্বা কার কি মতলবে মনে গড়িয়া একটা কুৎসা আনিয়া রটাইয়াছে তাহাও আবার কাহারও কানে তুলিতে আছে? মাগী আবার গরব করে, কত পুণ্য করিয়া আসিয়াছে!—ঝ্যাটা মার ওর পুণ্যের মুখে! কেহ কেহ পাল্‌টা জবাব দিল, কলিকাতায় ঐ চৌধুরীদের বাড়ী কি লতির মনিববাড়ী গিয়া একটা খবর লইলেই বুঝা যাইবে, বিন্দী আসিয়া সত্য কি মিথ্যা বলিয়াছে। এম্‌নি যেমনই হউক, বিন্দী অমন কাঁচা মেয়ে নয়। চৌধুরীদের বাড়ীতেই ত ছিল, লতার মনিববাড়ীতেও আনাগোনা করিত ; সব জানিয়া শুনিয়া আসিয়াই বলিয়াছে। তা যাক্ না, কলিকাতা ত ন'মাস ছ'মাসের পথ নয়, তার মামা একবার গিয়া জানিয়াই আসুক না. তার ভাগ্নী কোথায় চাকরী করিতেছে—যেথায় করিত সেথায় আছে কি-না, না থাকিলে কোথায় গিয়াছে! হাঁ, গরীব অনেক বামুনের মেয়ে কাশীতে রাঁধুনীর কাজ করিয়া খায়। তা এই কাঁচা বয়েস, মাকে ছাড়িয়া কোলের ঐ ছেলেটাকে পর্য্যন্ত ফেলিয়া কাদের সঙ্গে অমনই কলিকাতায় চলিয়া আসিল, কুলের মেয়ে কাহারও এত বড় দুঃসাহস হয়? আগেই জানিতে পারিয়াছিল, ঐ ঘরেই তার নাগর মিলিবে ; তাই আসিয়াছিল।—

মুখে যাই বলুন, মনে মনে রটন্তী সত্যই কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ননদের এক পত্রে সংবাদ পাইয়াছিলেন, লতা কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভাল লাগে নাই। হাজার হউক, সোমত্ত বয়সের মেয়েকে একা এমন পরের বাড়ীতে রাখিতে নাই ; আগলাইয়াই সর্ব্বদা রাখিতে হয়। কেন, রাঁধুনীর একটা কাজ কি কাশীতেই তাহার আর কোথাও মিলিত না? তবে লতা নাকি অমন শক্ত ধাতুর খাঁটি মেয়ে, এই যা ভরসা। কিন্তু এখন—বিন্দী আসিয়া যাহা রটাইল—সত্যই যদি সে বাড়ী ছাড়িয়া গিয়া থাকে, কেন গেল? কোথায় গেল? বিন্দী আসিয়া যাহা বলিয়াছে—না, সে জাতীয় নষ্টামি লতার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। তবে কি হইয়াছে? কি হইতে পারে? একটা খবর লইতে হয়। অবিলম্বে স্বামীকে রটন্তী কলিকাতায় পাঠাইলেন। ফিরিয়া আসিয়া যে সংবাদ তিনি দিলেন, যাহা মোটের উপর বিন্দী যাহা বলিয়াছে, তাহাই বটে!—

স্তব্ধ হইয়া কতক্ষণ রটন্তী বসিয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন "কি নাম ব'ল্লে না ছেলেটার?"

"বিরিঞ্চি—বিরিঞ্চিমোহন।"

"বিরিঞ্চি—মোহন।—'মোহন'ও আছে। না, এ হ'তেই পারে না—লতি যদি নষ্ট-দুষ্ট মেয়ে হয়, ধর্ম্ম ব'লেই এ পিথিমীতে কিছু নেই।—মোহন—বিরিঞ্চিমোহন—হুঁ—বুঝতে পেরেছি—এখন সব। ঐ হতভাগাই 'মোহন' নামে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে ওকে বিয়ে ক'রে এসেছিল! বড় ঘরের ছেলে—ধরা প'ড়ে শেষে বাপে বেটায় কি হ'য়েছে—বাপটা শেষে ছেলে আট্‌কে ফেলেছে, সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে ওদের খরচপত্রের একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে এমনি এক কায়দা ক'রে, যেন কেউ না ধ'রতে পারে।—"

"কিন্তু পালিয়ে কেন গেল? কোথায়ই বা গেল?"

"যাবে না কি ক'রবে? ও বাড়ীতে আর থাকে কি ক'রে? তেজী মেয়ে—হয় একদম কোথাও পালিয়ে গেছে, না হয় ঐ হতভাগাই আর কোথাও নিয়ে রেখেছে। কি বাপ মাই সব জান্‌তে পেরে আলাদা কোথাও থাকবার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে। ঘরে ওদের সেদিন কাণ্ডটা ঠিক কি ঘটেছিল, বাইরের লোক ত কেউ সব জান্‌তে পারে না! —চাকর-চাকরাণীগুলো—যা তারা আঁচ ক'রে নিয়েছে, তাই রটিয়েছে।—"

"হুঁ—সেটা সম্ভব বটে।"

রটন্তী কহিলেন, "যদি ঐ হতভাগাই আর কোথাও নিয়ে রেখে থাকে, কি বাপ-মা এই বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে থাকে, ভয়-ভাবনার কিছু নেই, সোয়ামীর কাছেই আছে।—'

"কিন্তু কুচ্ছোটা ত এই রটল!"

"সেইটেই হ'চ্ছে বড় একটা গোলমালের কথা।—কি করা যায় এখন? আর যদি একলা কোথাও পালিয়ে গিয়ে থাকে—না, সোস্তি ধ'রেই থাক্‌তে পারছি নি—চল, কাশীতে যাই।"

"কাশীতে!"

"হাঁ, ঠাকুরঝির কাছে খবর সব নিশ্চয়ই গেছে। পালিয়ে যদি এক কোথাও গিয়ে থাকে, মাকে অবিশ্যি লতি সব জানিয়েছে।—হয়ত কাশীতে গিয়েই মার কাছে এদ্দিন পৌঁছেচে।—যাই হ'য়ে থাক, সব জান্‌তে হবে, আর জেনে গাঁয়ে এসে সব ব'ল্‌তেও হবে। আপনার ভাগ্নী—ভাগ্নীই বা কি মেয়েই বা কি—লতির নামে এই কুচ্ছো গাঁ ভ'রে সবাই গেয়ে বেড়াবে, আর তাই চুপচাপ সয়ে থাকব ঘরে

ব'সে থাকব, না সে হ'তেই পারে না !'—তেমন রক্তে এ রটন্তী বামনী জন্মায় নি।"

বলিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া শিথিল কবরী রটন্তী শক্ত করিয়া বাঁধিলেন।—

যোগেশ বাঁড়ুয্যে কহিলেন, "কাশী যাব আবার আসব দুজনে ফিরে —খরচ-পত্তর—"

"যে ক'রে হয় যোগাড় করে নিতেই হবে। ওপ্‌নার পৈতেয় ভিক্ষের যে পাঁচটা টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তুলে রেখেছিলাম। আর নাকের এই নথটা আছে, বাঁধা দিয়ে দশ বারোটা টাকা যদি নাও। খালি নাকে সধবাকে থাক্‌তে নেই—তা কি ক'রব? একটা আংটা আছে তাই বরং নাকে দিয়ে রাখব।—হাঁ, তাহ'লে উদ্‌যুগ কর, কালই রাত্তিরের গাড়ীতে রওনা হব। ভোরে উঠেই গিয়ে সদিকে নিয়ে এস। সে এসে কদিন ওদের নিয়ে বাড়ীতে থাক্‌। আর ঐ পুণোর পিসীকে বলব, সে এসে রেতে ওদের কাছে শুয়ে থাকবে।"

পরদিন সকালের ডাকে মন্দাকিনীর একখানা পত্র আসিল। লিখিয়াছেন, বড় একটা সঙ্কটে তিনি পড়িয়াছেন, অবিলম্বে বৌকে লইয়া দাদা যেন ক'দিনের জন্য আসেন। খরচের বাবদ টাকাও কিছু মনি অর্ডারে আসিল।—তা মহাতীর্থ কাশীধাম, নিকটেই আবার গয়াধাম ! জীবনে কখনও হয় নাই, আর হইবেও না। সুযোগ যদি একটা ঘটিল, তীর্থকৃত্যাদিও যথাসাধ্য করিয়া কেন না আসিবেন?—নথের আর এমন কি মায়া? একটা আংটাতেও এয়োস্তীর লক্ষণ বজায় থাকিবে। বাঁধা দিয়া বারোটি টাকা পাওয়া গেল, আর সেই ভিক্ষার ঐ পাঁচটি টাকা ছিল। সতেরটি টাকা লইয়া অন্যান্য বন্দোবস্ত যাহা প্রয়োজন সব করিয়া রাখিয়া পরদিন সস্ত্রীক যোগেশ বাঁড়ুয্যে অথবা স-ভর্তৃকা রটন্তী কাশী চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাপড় কাচিয়া এক ঘড়া জল তুলিয়া আনিবেন বলিয়া রটন্তী এবারে পুকুর ঘাটে গেলেন। শুনিলেন, প্রতিবেশিনীরা কেহ কেহ তাঁহার কাশী যাত্রার কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন ; একজন বলিতে-ছিলেন, "কাশী যাচ্ছে, ভগ্নীর নামে কাশীতে মঠ দিয়েই আস্‌বে।'

রটন্তী বলিয়া উঠিলেন, "তা দিয়ে আসব বই কি দিদি, দিয়ে আসব বই কি ! কাশীতে কেবল কেন, দেশে এসেও দেব।"

প্রতিবেশিনী উত্তর করিলেন, "তা দিস্‌। ঐ শিরোমণি ঠাকুর গিয়ে মাথা মুড়ে প্রাচিত্তি ক'রবেন, আর গাঁ ভেঙ্গে সব লোক গিয়ে পুজো দেবে—ভাঙ্গা কুলোয় ঘেঁটুফুল বাসী উনুনের পাঁশ আর ইটপাটকেল নিয়ে !"

রটন্তী কহিলেন, "শিরোমণি ঠাকুর মঠ পিত্তিষ্ঠে ক'র্‌বেন। মাথা মুড়ে ঘোল ঢেলে প্রাচিত্তি ক'রবে বিন্দী, গাঁ ভেঙ্গে লোক গিয়েও পুজো দেবে—তাঁবার পুষ্পপাত্তরে জবা অপরাজিতে বেলপাতা দুব্বো চন্দন আর ধূপ দীপ নৈবেদ্যি সাজিয়ে নিয়ে।"

বলিয়াই রটন্তী দুপদাপ পা ফেলিয়া ঘাটে নামিলেন, কাপড় কাচিয়া জল তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

৩৫

লতা বলিয়াছিল, ইলাকে সে পত্র লিখিবে। সুকেশবাবুর নিকট হইতে ইলার পিতৃ-গৃহের ঠিকানাও সে লইয়াছিল। পত্রে লতা লিখিল,

"বোন,

আমার জন্য কিছু ভাবিও না ; আমি নিরাপদ আশ্রয়েই আছি এবং কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত যাহা করিয়া লইতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় দিন আমার একরকম চলিয়া যাইবে। তোমাদের সংবাদ সর্ব্বদা পাইতে পারি, এইরূপ একটা সুযোগও পাইয়াছি।—শুনিলাম, তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছ। তুমি নাকি চাও, খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়া আমাকে লইয়াই উনি সংসার করুন। কিন্তু বড় ভুল বুঝিতেছ বোন্‌। সবই শুনিয়াছ। এ অবস্থায় ওঁর সঙ্গে এরূপ কোনও সম্বন্ধ আমার সম্ভবই হইতে পারে না। দেখা কখনও হয়, এটাও আমি চাই না। তাই এইভাবে আত্মগোপন করিয়া আছি। কাশীতে আমার মাকেও আমার ঠিকানা এখনও আমি জানাই নাই ; অন্য উপায়ে তাঁহাদের সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতেছি। আমার কোনও সন্ধান উনি সহজে পাইবেন না, পাইলেও দেখা আমার সঙ্গে হইবে না—তখনই এই আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও আমি চলিয়া যাইব ; হয়ত এমন একটা আশ্রয় আর কাজকর্ম্মের এমন সুযোগ সহজে আর পাইব না। তাঁকে বলিও, তিনি যেন সন্ধানের চেষ্টায় বৃথা শ্রম আর না করেন। ফলে হয়ত শেষে আমিই বিপন্ন হইয়া পড়িব। ভাগ্যে আমার এ বিড়ম্বনা আমারই কর্ম্মফলে ঘটিয়াছে, তিনি নিমিত্তের ভাগী মাত্র। দোষী তাঁহাকে আমি করি না। ভুল যাহা একটা করিয়াছিলেন, নিজেই তাহার জন্য যথেষ্ট পরিতাপ ভোগ করিতেছেন এবং তাহাতেই আমি বড় দুঃখ পাইতেছি। নিজের জন্য কিছুই ভাবিতাম না। বোন মাথার উপরে ধর্ম্ম আছেন, দেবতা আছেন, এ জীবনে জ্ঞাতসারে তাঁদের কাছে কোনও অপরাধে অপরাধিনী আমি হই নাই। তবে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল কেউ এড়াইতে পারে না। এ প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হইবে—আর তার ভার বহিতেও আমি পারিব। তবে ঐ খোকাটি—তার ভবিষ্যৎ জীবনের এই বিড়ম্বনা—বড় হইয়া যখন সব বুঝিবে, কোনও পরিচয় দিয়া লোক-সমাজে দাঁড়াইতে পারিবে না—কি করিয়া সে তা সহিবে, ভাবিয়া কুল পাই না। দুঃখ আমার এই, ভয়ভাবনাও এই। তবে উপায় নাই, কর্ম্মফলেই এই অভাগীর গর্ভে আসিয়া সে জন্মিয়াছে, এ প্রায়শ্চিত্ত তাহাকেও করিতে হইবে।—সে ভার বহন করিবার শক্তি তার যেন তখন হয়, দেবতার কাছে এই প্রার্থনাই আমি করি। তোমরাও এই আশীর্ব্বাদ তাকে করিও।—

আমার একান্ত অনুরোধ—প্রার্থনাই এই জানিবে, স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাও। স্বভাবের পরিচয় যেটুকু পাইয়াছিলাম, ভুল ত্রুটি যাহাই করিয়া থাকুন, অমানুষ তিনি নন ; বেশ বুঝিতে পারিতেছি, এই ঘটনায়

লজ্জায় ক্ষোভে পরিতাপে মর্ম্মে তিনি মরিয়া আছেন। ফিরিয়া তাঁর কাছে যাও, একটু শান্তি স্বস্তি যাতে পান তাই কর।—নারী তুমি, স্ত্রী তুমি, এটা তোমার ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘন করিতে পার না।

এই কথাটা স্থির তুমি বুঝিও, তাঁকে বুঝিতে দিও, এ জীবনে তাঁর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই আমার আর হইতে পারে না। বর্ত্তমান এই অবস্থায় ত সম্ভবই নয়—যদি ওঁরা কখনও ঘরের বউ বলিয়া স্বীকারও আমাকে করেন, প্রাণান্তেও ও, সংসারে একটা কাঁটা হইয়া গিয়া বসিব না। সংসারে ও সব সুখের স্পৃহাও আর এতটুকু আমার চিত্তে এখন নাই। আমাদের যে বিবাহ হইয়াছিল, সেটা যে সিদ্ধ বিবাহ নয়, কেন নয়, এটা আমি এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।—তবে আমি অবোধ অজ্ঞ একটা মেয়েমানুষ, আর ওঁরা জ্ঞানী। এই বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, কি করিব? গ্রহণ যদি আবার কখনও করেন, আবার বলিতেছি বোন্, ও সংসারে একটা কাটা হইয়া গিয়া বসিব না—সে স্পৃহাও আমার কখনও হইবে না। এইটুকু কেবল বলিতে পারি, যদি তা কখনও সম্ভব হয়, আমার খোকাটিকে তখন তোমার কোলে দিয়ে কৃতার্থ হইব। এ জীবনে সকল আকাঙ্ক্ষা তখন পূর্ণ হইবে। বাইরে এখন যেমন আছি, বাইরেই তেমনই থাকিব। ওঁদের অর্থসাহায্যও কিছু চাই না। মায়ে ঝিয়ে আমরা উদরান্নের দুটি সংস্থান নিজেদের শ্রমে করিয়া লইতে পারিব। আর যদি দীনদুঃখীর সেবার কোনও কাজ পাই, তাতেই চরিতার্থ হইব।

সুতরাং স্বামীর সঙ্গে তোমার মিলনে কোনও অন্তরায়ই আমি নই।—অন্তরায় যদি করিয়া থাকি, তাতেই দুঃখ পাইব; শান্তি যেটুকু পাইতে পারি, তাতেই বঞ্চিত থাকিব। তাই বলিতেছি, অন্তরায় করিয়া আর আমাকে রাখিও না, এ দুঃখ আর দিও না, এটুকু শান্তিতে বঞ্চিত আমাকে করিও না।—

সংবাদ তোমাদের আমি পাইতেছি, পাইবও। অচিরেই যেন এই সংবাদ পাইয়া আমি খুসী হই, অন্তরায় বলিয়া আর আমাকে গণনা করিতেছ না, স্বামীর ঘরে ফিরিয়া গিয়াছ, স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছ।"

তোমার স্নেহের দিদি

লতা

পত্রখানি ইলা পড়িল—বার বার পড়িল—পড়িল আর কাঁদিল। কাঁদিয়া আর কুল পাইতেছিল না। একটু শান্ত হইয়া পত্রখানি সে মাতাকে দিল, তিনি গিয়া স্বামী ললিতবাবুকে দেখাইলেন। মনট দুজনেরই বড় নরম হইয়া পড়িল—অশ্রুর উচ্ছ্বাসও রোধ করিতে পারিলেন না। মনে হইল, এই যে সাক্ষাৎ দেবীতুল্যা মেয়েটি, তাহার এই অমর্য্যাদা এই দুঃখ তাঁহাদের কন্যার পক্ষেও কল্যাণকর হইবে না। আর সেই কন্যাই মনের তাপে স্বামীর সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছে, একেবারে দেহপাতই করিতে বসিয়াছে। গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ললিতবাবু শেষে কহিলেন, "কি আর ক'রব? ওকে গিয়ে বল, বিরুকে একটা খবর দিক; সে আসুক, চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে দিক্। তারপর সে তার মা বাপের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা ভাল হয় করুক। মেয়ে বাঁচবে, তবে না তার সুখ?"

খবর পাইয়া বিরিঞ্চি আসিল।—দেখিয়াই ইলা চমকিয়া উঠিল।

"এ কি! কি সর্ব্বনাশ! এই ক'দিনে তুমি কি হ'য়ে গেছ!—অসুখ-বিসুক ক'রেছে কিছু?"

"না! তুমিও যে একেবারে পাত হ'য়ে গেছ ইলা!"

কাঁদিয়া ইলা দুটি হাতে মুখ ঢাকিল। বিরিঞ্চি আসিয়া কাছে বসিল।—স্বামীর গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখখানি রাখিয়া ইলা কাঁদিতে লাগিল—অনেকক্ষণ কাঁদিল। বিরিঞ্চির দুটি চক্ষেও অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া ইলা কহিল, "ওগো, শরীরটি অমন ক'রে ছেড়ে দিও না। একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রো না। পারলাম না, সইতেই পারলাম না; ছেড়ে তোমাকে চ'লে এলাম। এসে অবধি কি আগুনে যে পু'ড়ে ম'রছি। কি ক'রব? লতাদির কথা যখন মনে হয়—"

"থাক্, থাক্, আর বলো না ইলা।—ভাবতেই আমি পারি না—তোমার মুখে ও-কথা যেন বিষের কাঁটা এসে বুকে বিঁধল!"

"কিন্তু না ভেবে কি পার? ভুলে থাক্‌তে কি পার? এই যে সর্ব্বনাশটী তার হ'ল—"

"থাক্, থাক, আর নয় ইলা, আর নয়! আমি মানুষ নই, মানুষের মত কাজ করিনি, কেন যে এ পৃথিবীর ভারবোঝা হ'য়ে এখনও বেঁচে আছি জানি না।"

স্বামীকে আবার জড়াইয়া ধরিয়া ইলা বলিয়া উঠিল, "দোহাই—দোহাই তোমার—অমন কথা মুখেও এনো না!—ওমা! ভাবতে যা পারি না, তাই তুমি মুখে ব'লছ! ওমা, কি হবে? কি ক'রব আমি?"

"ভয় নেই ইলা?—আমার মত কোনও হতভাগা সহজে কেউ মরে না।—কিন্তু কেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও! কি সুখ তোমার হবে?—আমার মত একটা অমানুষ—"

"না না, অমানুষ তুমি নও, অমানুষ তুমি নও। লতাদিও লিখেছে, অমানুষ তুমি নও।"

"লতা লিখেছে! কি লিখেছে! কোত্থেকে লিখেছে?"

"লিখেছে—কোত্থেকে লিখেছে—ঠিকেনা কিছু দেয় নি। তবে ঠিক ক'রে জানি না, আমাদের সব খবর সে নিচ্চে, খবর সব পাচ্ছে। এই যে চিঠি।"

উঠিয়া গিয়া একটি দেরাজ খুলিয়া লতার পত্রখানি আনিয়া ইলা বিরিঞ্চির হাতে দিল। পড়িয়া বিরিঞ্চি কাঁদিয়া ফেলিল, হাত হইতে চিঠিখানি পড়িয়া গেল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পালঙ্কের রেলিংএর উপরে মাথাটি রাখিল। ইলা কহিল, "কেঁদো না, কেঁদো না, অমন ক'রে আর কেঁদো না! ওগো, আমি যে সইতেই পারছিনি আর!"

কাছে ঘেঁসিয়া স্বামীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আঁচলে ইলা অশ্রুধারা পুছিতে লাগিল। কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে শেষে কহিল, "তাহ'লে কি ক'রবে এখন?"

"কি ক'রব? কিছুই ভাবতে পারছি নি ইলা!—ছেড়ে যখন তুমি এলে, মনে বড় ব্যথাই পেয়েছিলাম। কিন্তু শেষে মনে হ'য়েছে, না, ঠিকই হ'য়েছে।—ঠিকই ক'রেছ তুমি। লতাকে এই দুঃখে, এই অসম্মানে ফেলে রেখে, কোনও সন্ধানই তার না পেয়ে, তোমাকে নিয়ে থাকতেই আমি আর পারি না। তবু যদি তার দেখা একটিবার পেতাম, দুটি কথা যদি তাকে ব'লতে পারতাম, পায়ে ধ'রেও যদি তার ক্ষমা পেতাম—তাতেই বা কি? জানি তার স্বামীর যোগ্য আমি নই, স্বামী ব'লে এতটুকু শ্রদ্ধা সে আমাকে আর ক'রতে পারে না, সংসারে তার কোনও স্পৃহা নাই যে লিখেছে, তার কারণ আমার মত স্বামীর সংসারে কোনও স্পৃহা তার মত কোনও মেয়ের থাকতেই পারে না। না, তাকে আমার সংসারে আনব, স্বামীর পদ গ্রহণ ক'রব, সে অধিকারই আমার নেই। কিন্তু তবু—তবু মুখোমুখি যদি দুটো কথা ব'লতে পারতাম—দেখা তার পেতাম!—ধিক! পেলেই বা কি? নারীর যে মর্য্যাদায় বঞ্চিত ক'রেছি, তা যে আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারছি নি ইলা। তাকে এই অমর্য্যাদার গ্লানিতে ফেলে, কি ক'রে কোন মুখে, কোন্ সুখে আমি তোমাকে নিয়ে স্বামীস্ত্রীর মত এক সংসারে থাকব ইলা?"

"কিন্তু সে লিখেছে বড় দুঃখু পাবে। কত ক'রে আমাকে লিখেছে, এ দুঃখু তাকে না দিই। তারপর—তারপর—থাকতেই যে পারছি নি আমি। এই ত তোমার শরীর হ'য়েছে, মনের অবস্থা এই। কি ক'রে আমি ছেড়ে এখানে থাকব"

বলিতে বলিতে ফুঁকরাইয়া ইলা কাঁদিয়া উঠিল। বিরিঞ্চি নীরব। কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া ইলা কহিল, "শোন, এক কাজ কর। এই চিঠিখানা নিয়ে যাও, মাকে বাবাকে নিয়ে গিয়ে দেখাও। আমার মা বাবা এখানে চোখের জল রাখতে পারেন নি, আর ওঁদের প্রাণ কি একটু গ'লবে না? এইটুকু অন্তত করুন, তার মানটা তাকে দিন, ঘরের ছেলে ব'লে ছেলেটিকে ঘরে আনুন, বুকে তুলে আমি নেব। আর—আর—সে যদি আসে, তার দাসী হ'য়ে থেকেও কৃতার্থ হব। তার হাতে তোমাকে রেখে এখানে এসেও নিশ্চিন্ত আমি থাকতে পারব।"

কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল; চক্ষু মুছিতে মুছিতে পত্রখানি তুলিয়া স্বামীর হাতে দিল।

বিরিঞ্চি কহিল, "দেখি কি বলেন ওঁরা। মা চাইবেন, পেড়াপীড়িই বরং ক'রবেন। কিন্তু বাবা কি ব'লবেন জানি না। যদি পারতাম ইলা—সত্যই অমানুষের মত যে ভীরুতা, যে দুর্ব্বলতা আমার ছিল—আজ আর তা নাই—ধিক্কারে ধিক্কারে সব তা কেটে গেছে আজ—যদি পারতাম, তাঁর ত্যাজ্যপুত্র গৃহতাড়িত পথের ভিখারী হ'য়েও এ মর্য্যাদা যদি তাকে দিতে পারতাম, এতটুকু কুণ্ঠিত হ'তাম না। কিন্তু তিনি বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালে পারি না।"

"আমি গিয়ে পায়ে ধ'রে কাঁদব, পায়ে জড়িয়ে লুটিয়ে প'ড়ে থাকব।—বিরোধী হ'য়ে আর দাঁড়াতে পারবেন না।"

বিরিঞ্চি একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "যাই ত আজ এই চিঠিখানা নিয়ে। দেখি কি বলেন—"

"যাই বলুন, আমি যাব।—কালই আমি যাব—থাকতে আর পারব না। লতাদির কথাও ঠেলতে আর পারছি নি। সে ত শুনবে, কত দুঃখ পাবে, ভাববে এই সোয়াস্তিটুকুও তাকে দিলাম না। যদি দেখাও একটিবারের তরে পেতাম—দুটি কথাও তাকে বুঝিয়ে ব'লতে পারতাম—"

পিঠে হাতখানি রাখিয়া বিরিঞ্চি কহিল, "উঠি আজ তবে ইলা?"

"এস।"

বলিয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিল। অশ্রুর উচ্ছ্বাসে আকুল হইয়া কোনও মতে বিরিঞ্চি বাহির হইয়া গেল।

৩৬

পরদিন আফিসে গিয়া হরমোহনবাবু সুকেশবাবুকে সংবাদ পাঠাইলেন। বেলা তিনটায় সুকেশবাবু আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে গিয়া খাসকামরায় বসিলেন।

"কি বলুন ত? আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?"

"ব'স, ব'লছি।" বলিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "হাঁ, ঐ মেয়েটি—এই লতা—এখন কোথায় আছে?"

"আছে একটি প্রসূতির কাছে, তার নার্সের কাজে।"

"তোমার জামিনেই এখনও আছে, না পুলিসকোর্টথেকে discharge (খালাশ) করিয়ে এনেছ?"

"না, এখনও আনা হয় নি। সে যেদিন হয় থানায় গিয়ে একটা রিপোর্ট লিখিয়ে করিয়ে আনলেই হ'ল।"

"সেটা এখন করিয়ে ফেলেও পার। ওদের—কেন রেতে একা পথে বেরিয়েছিল, এসব খবর কিছু বোধ হয় দিতে হবে না?"

"না। দারোগাবাবু ব'লেছিলেন, এমনিই সাধারণভাবে একটা রিপোর্ট দেবেন, ঘটনাচক্রে এই রকম হ'য়েছিল, সন্দেহ করবার মত সন্ধানে কিছু পাওয়া যায় নাই।"

"হুঁ—সর্ব্বদা বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখাশুনো হয়?"

"তা হয়। যে লেডীডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে রেখেছিলাম, তিনিই ঐ কাজে তাকে লাগিয়ে দিয়েছেন। আমাদের 'নক্'টাও পাশাপাশি ফ্লাটে থাকে কি না—"

"কে, মিসেস্ চম্পটী?"

"হাঁ।"

"স্থানটা খুব ভাল নয়—"

"না, তা নয়। তবে কি করব, বলুন? তাড়াতাড়িতে আর জায়গা না পেয়ে ঐখেনে নিয়েই রাখতে হল। আবার জামিন হ'য়েছি, আমার চোখের সামনেও রাখা দরকার—"

"হুঁ—তা হ'লে নার্সের কাজই ক'রবে, এই স্থির ক'রেছে?"

"আপাতত তাই ত তার অভিপ্রায় দেখ্‌তে পাই। ক'রবেই বা আর কি?"

"কাজের জন্য নির্ভর ত ক'রতে হবে ঐ চম্পটীর ওপরে? নার্স'ও ত হবে গিয়ে ঐ চম্পটীর সব 'পেসেণ্ট'দের?"

একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "তা ছাড়া কাজ এখুনি কোথায় আর পাবে?"

"একটু দৃষ্টি রাখ্‌ছ ত?"

"তা রাখ্‌ছি বই কি? তা ছাড়া, জানেন ত, মেয়েও খুব ভাল, আর খুব শক্তও বটে। ভয়ের কারণ কিছু নেই।"

"খালাশ পেলে তোমার হাতছাড়া হ'য়ে যাবে না ত?"

"না, তা যাবে না। নির্ভরও আমার ওপরে খুব করে।"

"যেখানে এখন আছে, কদ্দিন আর থাক্‌বে?"

"মাসখানেক আর ত থাক্‌তেই হবে। শুন্‌লাম সবে কাল একটি সন্তান সে প্রসব ক'রেছে। কেন বলুন দিকি? কি হ'য়েছে? বিরু কি খোঁজখবর কিছু—"

"না, সে কিছু পায় নি। তবে পাবার চেষ্টায় ঘোরাঘুরি খুব করে দেখ্‌তে পাই। খোঁজ খবর আমারই কিছু নেবার দরকার হ'য়ে প'ড়েছে।—"

"দরকার হ'য়ে প'ড়েছে।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে—আবার কেমন একটু শঙ্কিত ভাবেও সুকেশবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তবে কি কোনও গুপ্তচর তাঁহার উপরে রহিয়াছে? অনেক অতি কুশল চর পাকা এটর্ণীদের হাতে থাকে, তাঁদের কাজে ফেরে। কৌন্সিলীদের সূক্ষ্ম জেরার যত মালমশলা ইহারাই সংগ্রহ করিয়া আনে। হাজার হইলেও লতা তাহার ঘরেরই বউ বটে। তাঁহার হেপাজতেই রাখিয়াছেন, আর তিনি যে এসব বিষয়ে কত বড় একজন বেপরোয়া বেতমিজ পাকা ঘুঘু, তাহাও হরমোহনবাবু বেশ জানেন। যাহা হউক, হরমোহনবাবুর দৃষ্টি ওসব দিকে বড় পড়িল না, তেমন মনও তখন ছিল না। কহিলেন, "দেখ এই চিঠিখানা, সব বুঝতে পারবে।"

লতার চিঠিখানা বাহির করিয়া তিনি সুকেশবাবুর হাতে দিলেন। পড়িয়া মুখে একটু হাসিও ফুটিল। হরমোহনবাবু কহিলেন, "খবর-টবর বুঝি তোমার কাছেই সব পায়।"

"হাঁ, দেখাও গিয়ে করে সর্ব্বদা খবর-টবর নেবে ব'লে।"

"কোথায়? নুকে?"

"হাঁ। চম্পটীর কাছে তাঁর পেসেণ্টের খবর নিয়ে যায়, নুকে আমি থাকলে আমার সঙ্গে গিয়েও দেখা করে। সন্ধ্যেবেলায়ই প্রায় যায় যদি আমার সঙ্গে দেখা হয় আর খবর কিছু পায়।"

"হুঁ—"

"তাহ'লে কি ক'রতে চান এখন?"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া হরমোহনবাবু কহিলেন, "Resist ক'রতে (বাধা দিয়ে দূরে ঠেলে রাখ্‌তে) আর তাকে পারছি নি বাবা। নিঃসম্বল নিঃসহায় ঐ অতটুকু মেয়ে আজ হার মানিয়েছে আমাকে। তার মহাপ্রাণতায়, আগের মহিমায়, একেবারে আমাকে জয় ক'রেছে! শক্ত যত প্রাচীর তুলেছিলাম, অলক্ষে সব আজ ভেঙ্গে প'ড়েছে, আমার ঘরে এসে সে ঢুকেছে!"

মনটা সুকেশবাবুর কেমন তীব্র একটা আঘাতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া পড়িল; বুকটা দুরুদুরু করিতে লাগিল; মুখখানিও বিশুষ্ক বিবর্ণ হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলেন, হরমোহনবাবুর চক্ষু দুটিও ছলছল হইয়া উঠিয়াছে। কি ভাবিয়া কহিলেন, "বৌ কি ফিরে এসেছে?"

"না, আসেনি এখনও। তবে আস্‌বে, আস্‌তে চাইছে। ভাব্‌ছি আজই সন্ধ্যেয় নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আস্‌ব। শুন্‌লাম, একদম শরীর ছেড়ে দিয়েছে, খায়-দায় না, বিছানা থেকেই উঠ্‌তে চায় না। অমন তক্‌তকে ফুলের মত টলটলে ডবকা চেহারা,—শুকিয়ে একেবারে পাত হ'য়ে গেছে। বিরুও যেন আধখানা হ'য়ে গেছে; দিনের বেলায় পাগলের মত পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ছটফট ক'রে রাত কাটায়!"

সুকেশবাবু কহিলেন, "বৌ ফিরে এলে তখন হয়ত একটা সোস্তি পাবে, সামলেও উঠ্‌বে।"

"না, বৌএর অভাবটা অভাব ব'লেই অনুভব ক'র্‌ছে ব'লে মনে হয় না। পরিতাপে দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। হবারই ত কথা, সত্যিই ত একেবারে পাষাণ মনুষ্যত্বহীন পাষণ্ড একটা নয়। তবে দুর্ব্বল নরম মন, তাই এই জ্বালাটা সইতেই পার্‌ছে না। সোস্তি কিসে পাবে? বউ এসে যে সোস্তি তাকে এতটুকু দেবে না, আমাকেও দেবে না। আবার কড়া উত্তরসাধক র'য়েছেন গিন্নী। না, এড়াতে আর পারব না, পারছিও না।"

"ললিতবাবু কি বলেন?"

"কি আর ব'ল্‌বে? এসেছিল আজ সকালে, ব'লে গেল, মেয়ে আগে প্রাণে বাঁচলে ত তার সুখ। যা আপনি ভাল মনে করেন, করুন।"

"তাহ'লে এখন বউ ব'লে ঘরেই তাকে ফিরিয়ে আনবেন?"

গলায় একটা ফলের বিচি কি পাথরের নুড়ী আটকিয়া গিয়াছে, এমন ভাবে সুকেশবাবুর মুখে কথাটা বাহির হইল।

"তাই ত ভাব্‌ছি বাবা। ঘরে ওকে আন্‌তে পারলে ঘরের অত্যুজ্জ্বল গৌরব, কুলবংশের চূড়ামণি, ও হ'ত—"

একটু কাষ্ঠহাসি কোনওমতে মুখে ফুটাইয়া ঢোক গিলিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "তবে দুটি সতীন, একঘরে—আজকালকার এই দিনে—"

"ওতে এমন আটকাত না কিছু। অবস্থাবিশেষে সবই মানিয়ে নিতে হয়। মানিয়ে নিয়ে চ'ল্‌তে ওরা পারতও। তবে কি-না, মনের সেই খুঁতখুতিটা একেবারে দূর ক'রে ফেল্‌তে পারছি নি। বিয়েটা ওদের ঠিক সিদ্ধ বিয়ে হয় কি-না বুঝতেই পারছিনি। ব্রাহ্মণপণ্ডিতও দুই-একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, সমস্যা অতি জটিল, দৃষ্টান্তও বড় পাওয়া যায় না—সন্তোষজনক উত্তর কারও কাছে পাইনি। এখন ভাল ক'রে একবার

দেখ্‌তে হবে। কিন্তু কার কাছে যাব? অপেক্ষাও ত বেশী দিন ক'র্‌তে পারছিনি—"

"তা—টাকা খরচ ক'র্‌তে পারলে অনেক বড় বড় পণ্ডিতের ব্যবস্থা অনায়াসে পাবেন।"

"না, টাকা দিয়ে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিন্‌তে চাই না বাবা। মনকে কোনও মতে চোকঠার দিতে চাই না। পরিষ্কার এইটে বুঝে নিতে চাই, অকার শাস্ত্রীয় প্রমাণে, সাধু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সরল ব্যবস্থায় বিবাহটা অসিদ্ধ বিবাহ হয় নি, লোকত কেবল নয় ধর্ম্মতও আমার কুলবংশের কোনও গ্লানি ওদের থেকে হবে না।"

"ও ত লিখেছে, বিবাহটাকে স্বীকার ক'রে নিলেও আপনার সংসারে এসে থাকবে না।"

"কিন্তু ছেলেটিকে ত সংসারে আন্‌তেই হবে। আর সে হবে এসে জ্যেষ্ঠের অধিকারী। দেখি কি করা যায়? মেয়েটিকেও আর এই দাগা দিয়ে কুলের বাইরে ফেলে রাখ্‌তে পারছি নি।"

বলিয়া গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মন-মরাভাবে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ঘড়ীটি দেখিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "তাহলে—উঠি আজকে?"

"এস।—হাঁ, ওকে এখুনি এ সব কথা কিছু ব'লো না যেন।—"

"না, তা কিছু ব'লব না। কেন ব'লব? মিছে একটা আশা তার মনে তুলব—শেষে যদি কিছু ক'রে উঠ্‌তে আপনি না পারেন—"

"হুঁ! আচ্ছা, এস। পুলিশ কোর্ট থেকে discharge orderটা (খালাসের হুকুমটা) কাল পরশু তকই করিয়ে নিও। শেষে এ সব পরিচয়ের একটা রেকর্ড, না হয় রিপোর্ট কাগজে না বেরোয়।"

"যে আজ্ঞে।"

সুকেশবাবু বাহির হইয়া গেলেন।—বুঝিয়া গেলেন, হরমোহনবাবুকে কেবল হার মানিতে হয় নাই—তাঁহাকেও হইতেছে।—'বন্ধুত্বে' লতাকে লাভ করিবেন, আকুল প্রাণে এই যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিলেন, তাহা—না, আর পূর্ণ হইবার নহে, এত কৌশলে যে যাদুজাল তিনি বিস্তার করিয়াছেন, 'নুকে'র নিভৃত গৃহে সেই যত তাঁহার বাক্‌ছল, লালসাকুল দৃষ্টিতে, রসোচ্ছল কথার ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে, প্রচ্ছন্ন প্রেম-নিবেদন—সব—সব ব্যর্থ হইয়াছে! পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, আজ লতার এই পত্রখানি পড়িয়া স্পষ্ট বুঝিয়া গেলেন, সে জালে লতা পড়ে নাই, ছলে ভোলে নাই, সে প্রেম-নিবেদন এতটুকু রেখাপাতও তাহার চিত্তে করিতে পারে নাই। ইহাও বুঝিলেন, স্বামীর প্রতি গাঢ় প্রেম কি অতি বড় একটা শ্রদ্ধার আকর্ষণ না থাকিলেও সত্যকার একটা দরদ আছে, অশ্রদ্ধার ভাবও এমন কিছু জন্মে নাই। তারপর ধর্ম্মনিষ্ঠা, হিন্দুনারীর ধর্ম্মনিষ্ঠা, হিন্দু প্রাণের অন্তর্নিহিত লোকপরম্পরাগত সব সংস্কার—এমন একটা উচ্চস্তরে তাহার চিত্তকে তুলিয়া রাখিয়াছে, আজ বৈরাগ্যের এমন একটা প্রেরণায় তাহার চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, চরিত্রকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিতেছে, যে এ জাতীয় কোনও প্রভাব সেথায় গিয়া পৌছিতেই পারে না,—কোনও প্রলোভন তাঁহার সঙ্গে এরূপ বন্ধুত্বের স্তরে তাহাকে নামাইয়া আনিতে পারে না!—আজ কয়দিন আবার সন্ধ্যায় সে আসে না; খবর যাহা দিয়া যায়, দিনের বেলায়। সভায় যাইতে সেদিন ডাকিলেন, তাহাও আসিল না। হয়ত তাহার ভাবসাবে কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে এমন কিছু একটা আভাস তাঁহার অভিপ্রায়ের পাইয়াছে যাহাতে সে এখন তাহাকে এড়াইয়াই চলিতে চায়। না, চেষ্টা আর বৃথা! জাল তাহাকে এখন গুটাইতেই হইবে। সুযোগও আর ঘটিবে কি-না সন্দেহ! বাড়াবাড়ি করিয়া নোংরা মোটাচালে কিছু করিতে গেলে যে শ্রদ্ধাটুকু এখনও তাহার চিত্তে হয়ত আছে, তাহাও হারাইবেন। তারপর এদিকে হরমোহনবাবু বধূ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, হয় ত করিবেনও। যাহাই আজ বলুন, মনকে চোখ ঠারিয়া এ খুঁৎখুতিও তিনি চাপিয়া দিবেন, না দিয়া পারিবেন না। ছেলের চাপ, বৌএর চাপ, গৃহিণীর চাপ—আবার নিজের মনটারও চাপ আসিয়া পড়িয়াছে। খুঁৎখুতি সব একদম চাপিয়া পড়িবে। আর লতাও—যাই আজ বলুক—স্ত্রী হইয়া বিরিঞ্চির সঙ্গে আসিয়াও মিলিবে, বধূ হইয়া হরমোহনবাবুর গৃহে গিয়াও বসিবে। আর তখন—বাড়াবাড়ি এখন যদি গিয়া তিনি কিছু করেন, স্পষ্ট যদি লতাকে বুঝিতে দেন তাঁহার অভিপ্রায় কি, অতি অপদস্থ তাঁহাকে হইতে হইবে, চিরজীবনের তরে বিশ্বাস হারাইয়া হরমোহনবাবুরও বিরাগভাজন হইয়া তাঁহাকে থাকিতে হইবে। আর সেই বাড়াবাড়ি—এখন এই অবস্থায় চেষ্টা কিছু—যে ভাবে যে কৌশলে কি ছলে বলে তাঁহাকে করিতে হইবে, তাহাও ব্যর্থ হইবে নিশ্চয়। এ দিকে আবার লতার শ্রদ্ধা, হরমোহনবাবুর বিশ্বাসও ব্যাবসায়িক সহায়তা যাহা হারাইতে হইবে, তাহারও মূল্য কম নয়। পাকা বিষয়বুদ্ধির অতি হিসাবী লোক তিনি, বেশ বুঝিলেন, হার মানিয়া এখন তাঁহাকে হাল ছাড়িতেই হইবে! লালসাকুল ভাবপ্রবণ তরুণ যুবা তিনি নন, যে এরূপ কোনও উন্মাদনায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বস্বপণে তিনি প্রবৃত্তির এই স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন, ফলাফল কিছুই গণনা করিবেন না। উপাদেয় ভোগের অভাবে বুভুক্ষার তাড়নাও সত্য এমন কিছু নাই, যাহাতে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তিনি হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তবু—তবু—লতার মত নারীর 'বন্ধুত্ব' কোনও উপায়েও যদি তিনি লাভ করিতে পারিতেন! আর এই পরাভব—এরূপ পরাভব প্রথম আজ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু উপায় নাই!—এই আশাভঙ্গের, এই ব্যর্থ প্রয়াসের, বেদনাকে চাপিয়া রাখিতে হইবে, এই পরাভবকে ধীরভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। হিতৈষী বন্ধুর স্থায় হাসিমুখেই লতাকে তাঁহার অভিনন্দন করিতে হইবে। তীব্র একটা ছটফটানিতে মনটা আজ যতই তোলপাড় হইতে থাক, বুঝিলেন, এইভাবেই তাঁহাকে এখন প্রস্তুত হইতে হইবে এবং সকল শক্তি সংগ্রহে সেই চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

আশ্চর্য্য মেয়ে বটে। নিঃসহায় নিঃসম্বল একরূপ পথের কাঙ্গাল হইয়াও একখানি পত্রের দুটি কথায় তাঁহাদের মত দুইজন অতি কৌশলী

শক্তিমান্ পুরুষকেও সে আজ এমন পরাভূত—একেবারে যেন ধূলিসাৎ করিয়াই ফেলিল !

৩৭

বেলা প্রহরাধিক অতীত হইয়াছে ; গুরু শিরোমণি মহাশয় এবং শিষ্য ঠাকুর হরদাস বারান্দায় বসিয়া আছেন। শিরোমণি মহাশয় বলিতেছিলেন, "যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছ হরদাস, দারুণ এই যে বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে তা থেকে ধর্ম্মের উদ্ধারের আর সেই ধর্ম্মে ফিরিয়ে এনে দেশরক্ষার সমাজরক্ষার পক্ষে এর চাইতে মহৎ ব্রত আর হ'তে পারে না। নারীকে আশ্রয় ক'রেই ধর্ম্ম অটল হ'য়ে লোকসমাজে দাঁড়াতে পারেন। যে দেশ যতটা এই আশ্রয় পায়, সেই দেশকে ততটা ধর্ম্ম তার কল্যাণের পথে স্থির রাখতে পারে। এদেশে এতকাল তাই করেছে। এই যে অধর্ম্মের অভিযান আরম্ভ হ'য়েছে, বাল্য বয়স হ'তেই আমরা দেখ্‌ছি, এতদিন শুদ্ধান্তপুরে প্রবেশ করে নারীকে—মায়ের জাতিকে—টলাতে পারে নি, ধর্ম্মও তাই বড় টলে নি, সমাজও তাই ভাঙ্গতে পারে নি। কিন্তু অধুনা দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই অভিযান শুদ্ধান্তপুরচারিণী নারীর উপরেই অতি প্রবল বেগে এসে পড়েছে, প্রলোভন-কুটছলে ধর্ম্মবুদ্ধি থেকে তাদের ভ্রষ্ট ক'রে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। ফেরাতে তাদের হবে। কিন্তু ফেরাবে কে ? রক্ষক হ'য়েও পুরুষ আজ ভক্ষক হ'য়ে উঠেছে। নারী যে মায়ের জাত এইটেই তারা ভুলেছে, সামাজিক যে দায়িত্ব গ্রহণ এঁদের রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য, তাই অনেকে গ্রহণ ক'র্‌তে চাইছে না। কেউ উদাসীন, কেউ আজ গত স্বার্থ সুখের উপরে কিছুই আর দেখ্‌তে চায় না, কেউ বা দুষ্টবুদ্ধি পরিচালিত—আপন ধর্ম্মে আপনাদের রক্ষার প্রয়াস নারীকেই এখন ক'র্‌তে হবে। ধর্ম্মবুদ্ধিতে যারা স্থির আছে, তাদের এখন সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এই অভিযোগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। সময়ও ঠিক সুসময় হ'য়ে উঠেছে। বুদ্ধিভ্রষ্ট কেবল নয়, বিপথে গিয়ে কার্য্যতও বহু নারী অতি বিপন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। এদের দৃষ্টান্ত অপর পক্ষে শিক্ষার স্থল হ'য়ে উঠেছে। এরাও এঁদের বড় সহায় হ'তে পারে, যদি সত্যই সুশিক্ষায় এদের সুপথে ফিরিয়ে আন্‌তে পার, অধর্ম্মে কেবল বিরতি মাত্র নয়, ধর্ম্মে যদি সত্যই ব্রতপরায়ণা ক'রে এদের তুল্‌তে পার।"

হরদাস কহিলেন, "তাই আমি চাই বাবা। যে আশ্রমটা প্রতিষ্ঠা ক'রব সংকল্প ক'রেছি, সেখানে মায়ের মন্দিরে পূজা ব্রতপরায়ণাই ক'রে তুল্‌তে চাই এদের—এদের 'উদ্ধার-আশ্রম' দেশে স্থানে স্থানে হ'চ্ছে। কিন্তু এভাবে এদের ধর্ম্মে ফিরিয়ে নেবার, ধর্ম্মে সত্য ব্রতপরায়ণা ক'রে তুলবার একটা চেষ্টা কি লক্ষ্যও কোথাও দেখ্‌তে পাই না। এই যে সব আশ্রম—যতদূর দেখ্‌ছি বাবা—পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে যেন এক একটা জেলখানায় এদের কোনও মতে আটকে রাখা হয়। কাজকর্ম্ম যা শেখান হয়, জেলের কয়েদীদের কাজকর্ম্মের মত। শান্তি এরা একটু পায় না, মন বসে না, ফাঁক পেলেই পালিয়ে যেতে চায়।"

একটু হাসিয়া শিরোমণি মহাশয় কহিল, "সে ত উদ্ধার নয়, একটা দুঃখদুর্গতি থেকে আর একটা দুঃখদুর্গতির আগে নিয়ে বন্দী ক'রে রাখা। মন বসবে কেন ? শান্তি এরা পাবে কেন ? পরিণাম যাই হ'ক্ ঐ পাপের পথেও তবু একটা স্বাধীনতা তাদের আছে, আর এত একেবারে বন্দীর দশা ! আর এই যে বন্দীর দশা, তার-ই বা পরিণাম কি ? কি সুখ-শান্তির প্রত্যাশা এরা ক'রতে পারে। না না বাবা, তুমি যে পথে এদের নিয়ে যেতে চাইছ, শান্তির পথ কল্যাণের পথ এদের এই-ই বটে ! কিন্তু বড় একটা কঠিন সমস্যাও তোমার সাম্‌নে উপস্থিত হবে। এদের যে সব সন্তানসন্ততি—বড় হ'য়ে যখন উঠবে, আমাদের এই সমাজে, কোথায় কোন্ জাতিতে কোন্ কুলবংশে তাদের স্থান হবে ? বিবাহ দিয়ে সংসার ধর্ম্মেও এদের স্থিত ক'র্‌তে হবে। কার সঙ্গে কার কি ব্যবস্থায় কি আচারে বিবাহ হবে ? আমাদের এই যে হিন্দু সমাজ—প্রত্যেকটি গৃহস্থ এর ভেতর কোনও না কোনও জাতির পরিচয়ে, কোনও না কোনও কুলবংশের আচার নিয়মে সামাজিক জীবনযাপন করে। এই সব ধরেই পৃথক্ এক একটি সমাজ হ'য়েছে। হিন্দুগৃহস্থ এইরূপ কোনও না কোনও সমাজের সামাজিক। বাইরে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কারও স্থানই কোথাও নাই, সামাজিক ধর্ম্মে কি ক্রিয়াকর্ম্মাদিও কেউ কিছু নির্ব্বাহ ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু এদের স্থান কোথায় হবে ?—স্থান একটা না হ'লে না পেলে, সংসারধর্ম্মে প্রবেশ ক'রে সামাজিক জীবনই বা এরা কি ভাবে যাপন ক'র্‌বে ?"

একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া হরদাস উত্তর করিলেন, "সমস্যা কঠিনই বটে। আমিও ভেবেছি, কিন্তু সমাধানের পথ এখনও কিছু পাইনি। পাইনি, তবে মা জগদম্বার কৃপায় সময়মত পাব এই ভরসা করি। এই পথ তিনি দেখিয়েছেন, পথযাত্রায় যে সব সঙ্কট-সমস্যা উপস্থিত হবে, তার কিনারা কিসে হ'তে পারে সে পথও তিনিই দেখিয়ে দেবেন। মানুষ হ'য়ে এরা জন্মেছে, সুশিক্ষায় ধর্ম্মপথে মানুষ যদি হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, মানুষের মত একটা স্থানও লোকসমাজে এরা পাবে, ব্যবস্থা মা জগদম্বাই ক'রে দেবেন। আজ আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছিনি ; ব্যবস্থা তিনি ক'রেই রেখেছেন।"

সাশ্রু নয়নে হরদাসকে আলিঙ্গন করিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, রেখেছেন—নিশ্চয়ই রেখেছেন ! সন্তানের যদি স্থান তাঁর গৃহে না হয়, স্থান না তিনি ক'রে দেন, কিসের তিনি মা জগদম্বা ? হাঁ, হবে হবে ! মানুষও মানুষকে চিরদিন মনুষ্যত্বের, মানবসমাজের, গণ্ডীর বাইরে ফেলে রাখ্‌তে পারে না। এই যে আমাদের হিন্দু-সমাজ—আজ মৃতবৎ যতই অসাড় অকর্ম্মণ্য, আত্মরক্ষায় আত্ম-প্রতিষ্ঠায় আত্মপ্রসারে শিথিল অশক্ত হ'য়ে পড়ুক, যোগ্যকে যোগ্যের স্থান দিতে কুণ্ঠিত কখনও হয়নি, বিপর্য্যয় যখনই যা ঘটুক, ধর্ম্মের বলে একটা সামঞ্জস্যের শৃঙ্খলায়ও আন্‌তে পেরেছে। তা যদি না পারত, বহু সহস্র বৎসর স্বকীয় ধারায় তার অস্তিত্বই রক্ষা ক'রতে এদেশে পারত না। যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছ হরদাস, মা জগদম্বার পায়ে মতি রেখো, ভক্তিতে আত্ম-নিবেদন ক'রে একমনে তাই পালন কর,—যখন যা প্রয়োজন হবে, মাই তার ব্যবস্থা ক'রবেন। কাজ তাঁর। তুমি আমি কে বাবা ? নিমিত্ত মাত্র।"

প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া হরদাস কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন বাবা, তাই যেন পারি। আপনার আশীর্ব্বাদই আমার বল, উপদেশ আমার পথের আলো—তাই এই সংকল্প গ্রহণ ক'রে আপনার চরণ-প্রান্তেই উপনীত হ'য়েছি।"

"আশীর্ব্বাদ প্রাণ ভ'রে উঠ্‌ছে বাবা। উপদেশ—তোমাকে আর কি দেব বাবা। জ্ঞানে তুমি বরং আমারই উপদেষ্টা হ'তে পার, উপদিশ্য আর নও। সমর্থন আমার সর্ব্বদাই পাবে। তবে বৃদ্ধ হ'য়েছি, কার্য্যতঃ সহায়তা কিছু ক'রব সে সামর্থ্য আর নাই।"

একটু হাসিয়া হরদাস কহিলেন, "একটি দাবী কিন্তু ক'রব বাবা। আশ্রমের জন্য যে স্থান পেয়েছি শীঘ্রই মায়ের একটি মন্দির সেখানে প্রতিষ্ঠা ক'রবার ইচ্ছা। আয়োজন সব হ'লে ক্রিয়াটি আপনাকে গিয়েই সম্পাদন ক'রতে হবে।"

"ক'রব। ক'রে কৃতার্থই হব।"

"হাঁ, আর মধ্যে মধ্যে যখন আপনার সুবিধে হয় আশ্রমে গিয়ে আপনি থাক্‌বেন—আপনার দুটি মুখের কথা, পায়ের ধূলা, আপনার সান্নিধ্য—বহু কল্যাণ আমার ঐ আশ্রমবাসিনীদের সাধন ক'রবে।"

"থাকব, মনে ক'রব তীর্থবাসে আমিই কল্যাণের ভাগী হ'চ্ছি। হাঁ তোমার এই আশ্রমের স্থান কোথায় পেয়েছ?"

"আমার এই সংকল্পের কথা জেনে ধনী একজন শিষ্য ক'ল্‌কেতার নিকটেই প্রশস্ত একটি বাগানবাড়ী দান ক'রেছেন। দেশের এই দুর্গতিতে সাধুবন্ধি সকলেই বড় শঙ্কিত ও বিচলিত হ'য়ে উঠেছেন। প্রতিকারের সমীচীন উপায়ে সহায়তা ক'রতেও অনেকে প্রস্তুত। কর্ম্মে যদি অগ্রসর হ'তে পারি, অর্থের অভাব আমার হবে না।"

গৃহমধ্য হইতে রটন্তী তখন আসিয়া গলবস্ত্রে উভয়কে প্রণাম করিলেন।

"কে! ও, এস মা। ব'স।"

রটন্তী একটু আড় হইয়া আড়ঘোমটা টানিয়া বসিলেন।

শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, "কাশী গিয়েছিলে শুন্‌লাম, কবে ফিরলে?"

চাপাস্বরে রটন্তী উত্তর করিলেন, "এই ত আজ সকালে বাবা।—তা, পথেই জর হ'য়ে প'ড়েছে, এসেই অম্‌নি বিছানা নিতে হ'য়েছে। পাঠাতে কাউকে পারলাম না, লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকেই আস্‌তে হ'ল। কি ক'রব বাবা? দেরী ত আর ক'র্‌তে পারি না.—"

"তা, খবর কি মা?"

"খবর—তা এই লেখনটা নিয়ে এসেছি, প'ড়লেই সব বুঝতে পার্‌বেন। আমার ননদকেও অনেক ক'রে ব'লেছিলাম, তুমি নিজে একটবার চল। তা কিছুতেই এল না। শেষে এই লেখনটা চেয়ে নিয়ে এলাম, ভাবলাম আপনাকে এনে দেখাব, আপনি একটা বিহিত যা হয় ক'রবেন। বিন্দী এই সব কুকথা এসে গাঁয়ে রটিয়েছে—আর বেদবাক্যি ব'লে সবাই তাই ধ'রে নিয়েছে—আপনিও কোন্ না শুনেছেন সব—"

বলিতে একখানি পত্র আঁচলের খুঁট হইতে খুলিয়া রটন্তী শিরোমণি মহাশয়ের হাতে দিলেন। হরমোহনবাবু মন্দাকিনীকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাই রটন্তী লইয়া আসিয়াছিলেন।

"হাঁ, শুনেছি সব। তা বিশ্বাস ক'রতে প্রবৃত্তি হয় নি মা।"

বলিয়া পত্রখানি শিরোমণি মহাশয় পড়িলেন—পড়িয়া হরদাসের হাতে দিলেন। পড়িয়া হরদাস কহিলেন, "হুঁ—! তা এই কন্যাটি কে? ঘটনাটাই বা কি?"

শিরোমণি মহাশয় লতার পরিচয় দিয়া ঘটনা সব সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। পত্রখানি আর একবার পড়িয়া হরদাস কহিলেন, "কিন্তু যে সব কারণ ইনি দেখিয়েছেন, বিবাহ ত তাতে অসিদ্ধ হয় না। হয় কি?—আপনি কি বলেন বাবা?"

শিরোমণি কহিলেন, "কি ক'রে হ'তে পারে বুঝ্‌তে পারছি না. নান্দীমুখ, কুলাচার, স্ত্রী-আচার—এসব বিবাহের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র, অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। নান্দীমুখে আভ্যুদয়িক ক্রিয়া কল্যাণকামনায় পরলোকগত পিতৃপুরুষবর্গের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হয়। কুলাচার, স্ত্রী-আচার—এসব উৎসব-সৌষ্ঠবের অলঙ্কার মাত্র। বিবাহের কর্ত্তা বর, পিতার অনুমোদন সামাজিক আচারে বাঞ্ছনীয় যতই হ'ক, প্রাপ্তবয়স্ক বর যদি তার অপেক্ষা না ক'রেও বিবাহ করে, ক্রিয়া অঙ্গহীন কি অসিদ্ধ হয় না—যদি সেই ক্রিয়াটি তার বিধিমত সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। হাঁ মা,—বিবাহ ত অনেক দেখেছ, ভাল ক'রে সব খবর নিয়েছিলে যা যা ক'র্‌তে হয়, সর্ব্বদা হ'য়ে থাকে—"

"সব খবর নিয়েছি বাবা। ছেলে নান্দীমুখ ক'রেছেল কি না, ওরা জানে না। তবে ওদের বাড়ীতে কিছুই বাদ যায় নি—দধিমঙ্গল থেকে অধিবাস, নান্দীমুখ, চুড়ো, কন্যাস্নান, গঙ্গাপুজো সব হ'য়েছে; ধোপা নাপিত তাদের কাজ যা সব ক'রেছে। রেতে বিয়ের সময় আমার নন্দাই নিজে সম্প্রদান ক'রেছেন, পুরুত মন্তর ব'লেছে, নাপিত পৌরবচন আউড়েছে, হোম সপ্তপদীগমন সব হ'য়েছে। শালগ্রাম ছিলেন, সহরের সব ভদ্দর লোকও সভায় এসে ব'সেছিলেন।"

হরদাস কহিলেন, "তবে ত ক্রিয়া পূর্ণাঙ্গভাবেই সম্পন্ন হ'য়েছে।"

শিরোমণি কহিলেন, "হাঁ,—এক আপত্তি তুলেছেন নাম। নাম-করণে বিধিমত যে নামটা রাখা হয়, সেইটেই বৈধ নাম, দৈব-পৈত্রাদি সকল কর্ম্মে সেই নামই ব্যবহার ক'রবার বিধি আছে।"

"কিন্তু রীতিতে এ বিধি আজকাল অনেকে মেনে চলে না। যার যেমন খুসী নাম বদলে ফেলে। কেবল পরিচয়ে নয়, ক্রিয়াকর্ম্মাদিতেও সেই নূতন নাম ব্যবহার করে। কোনও ক্রিয়া তাতে অসিদ্ধ হ'ল বলে কেউ মনে করে না। তারপর এক্ষেত্রে বর এসে কন্যা প্রার্থনা ক'রেছে,—যে নামেই সে পরিচয় দিক, কন্যাকর্ত্তা তার জন্য দায়ী হ'তে পারেন না। সরল বিশ্বাসে ধর্ম্মতঃ তিনি কন্যা দান ক'রেছেন।"

"হাঁ,—এটা যদি ত্রুটিই কিছু হয়, ত্রুটি হ'য়েছে বরের পক্ষে, জ্ঞাতসারে কন্যাকর্ত্তার পক্ষে কিছু হয় নাই। সুতরাং বিবাহ অসিদ্ধ হ'তে পারে না।"

একটু ঘুরিয়া দুটিহাত জোড় করিয়া রটন্তী তখন কহিলেন, "তাহ'লে বাবা, দুজনেই মহাপণ্ডিত আপনারা উপস্থিত র'য়েছেন, একটা বিহিত এর ক'রবেন না? এই যে অনাথা একটা মেয়ে এই কলঙ্কের ভাগী হ'য়ে র'য়েছে, আর লোকে যা না ব'লতে আছে, তাই ব'লছে—"

"না না, বিহিত যা দরকার এর ক'রতেই হবে। হাঁ, প্রমাণ সব উল্লেখ ক'রে ওদের ছল-যুক্তি কাটিয়ে ব্যবস্থাপত্র একটা লেখ হরদাস। আমি স্বাক্ষর ক'রব, তুমি স্বাক্ষর করবে, আরও কাছাকাছি পণ্ডিত যাঁরা আছেন, তাঁদেরও স্বাক্ষর নিচ্ছি। আজই বিকেলে সবাইকে ডাকব। এই ভদ্রলোকের এই পত্র, আমাদের এই ব্যবস্থা সকলকে প'ড়ে শোনাব, ঘোষণা ক'রব, মা মন্দাকিনীর এই কন্যাটি কোনও প্রকারে কলঙ্কের ভাগিনী কিছু হয় নাই, তার বিবাহ সিদ্ধ বিবাহ হ'য়েছিল, এই ভদ্রলোকের বৈধ কুলবধূ সে। তিনি তাকে গ্রহণ করুন, কি ত্যাগ করুন, তাঁর কুলবধূত্বের মর্য্যাদায় তাকে বঞ্চিত ক'রে রাখতে পারেন না।"

হরদাস কহিলেন, "আজ এই গ্রামে এই সভায় এই ঘোষণা হ'ক্, এই ব্যবস্থাপত্র আমি নিয়ে যাব, আরও বড় বড় পণ্ডিতদের স্বাক্ষর নেব। চুঁচড়োয় গিয়ে—বেশীদিনকার কথা ত নয়—দ্বারকানাথবাবুর পরিচিত ভদ্রলোক যাঁরা আছেন, তাঁদের ঠেঁয়ে বিবাহ সভায়ও উপস্থিত ছিলেন, অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গতা সম্বন্ধে লিখিত প্রমাণ সংগ্রহ ক'রব। তারপর এই হরমোহনের সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রব। দেখব, তিনিই বা কি ক'রে বিবাহের বৈধতা স্বীকার না ক'রে পারেন, তারাই বা কি ক'রে ওর কুলবধূকে ক'রতে পারেন।—হাঁ, এই কন্যাটি এখন কোথায় আছে?"

রটন্তী কহিলেন, "সেই ত বাবা, শুনলেন ত ওঁর ঠেঁয়ে সব—সেই যে কোথায় পালিয়ে গেছে, ঠিকেনা কিছু পাওয়া যায় নি। কাশীতে মাকে চিঠি লিখেছে—ভাল যায়গায়ই আছে কি কাজেকর্ম্মে পয়সা-কড়িও মন্দ পাচ্ছে না, শীগ্‌গির তাদের ক'লকেতায় আনতে পারবে। লিখেছে, ঠিকেনা এখনও জানাতে পারছে না, লুকিয়েই আর কদ্দিন থাকতে হবে।—ক'লকেতায় নাকি আতুড়ে পোয়াতীদের সেবা শুশ্রূষা ক'রে বেশ পয়সা রোজগার অনেক মেয়ে করে—'নার্‌সি' কি বলে তাদের—"

"বটে!"

থামিয়া কেমন একটা আশার উৎফুল্ল দৃষ্টিতে হরদাস কহিলেন, "এই কন্যাটিকেই বোধ হয় আমি দেখেছি তবে!"

"দেখেছেন! কোথায় বাবা, কোথায়? কবে?"

"এই ত ক'দিন আগে কলকেতায় আসন্নপ্রসবা আমার একটি শিষ্য-কন্যার কাছে। অতি সুবুদ্ধি ব'লে মনে হ'ল। এই গ্রামেও সে ছিল, আপনাকেও চেনে বাবা। নামটা কি ব'ল্লেন তার?"

রটন্তী উত্তর করিলেন, "লতা।"

"লতা!—সে ব'লেছিল কনকলতা।"

"সেই তার পুরো নাম বাবা। তবে আমরা লতা ব'লেই তাকে ডাকি।"

"হাঁ, হাঁ,—ঐ পত্রখানাতেও কনকলতা ব'লেই নামের উল্লেখ আছে বটে। আর কথা নেই মা! সেই কন্যাটিই এই। আর ভয় নেই মা—নিশ্চিন্ত হ'য়ে আপনারা থাকুন—তার সব ভার আমিই গ্রহণ ক'রলাম। আজ থেকে সে আমারই মেয়ে—শীঘ্রই সংবাদ পাবেন, তার শ্বশুর তাকে তাঁর কুলবধূর মর্য্যাদায় গ্রহণ ক'রেছেন।"

লুটাইয়া হরদাসের ও শিরোমণি মহাশয়ের পায়ে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে গদ্‌গদকণ্ঠে রটন্তী কহিলেন, "কি আর ব'লব বাবা—অবোধ একটা মেয়েমানুষ আমি—কথাই বা কি জানি? ম'রে ছিলাম, আজ প্রাণ দিয়ে আমাদের বাঁচালেন। আর ঐ যে লতি—কি ব'লব বাবা, অমন মেয়ে ভূভারতে আর হয় না। কি দুঃখটাই পেয়েছে, কি মুখ ছোটই না তার হ'য়েছে, আর লোকে কি না তাকে ব'লছে! হাঁ বাবা, বিকেলে তবে আজ সভাটা হবে ত?—কাণে শুনতে পাব ত সবাই ব'লছে, হাঁ, লতি আমাদের সতীলক্ষ্মী মেয়ে—অগ্নিপরীক্ষার মা জানকী!"

"পাবে, পাবে মা—শান্ত হও, কেঁদোনা! আজ বিকেলে এখানে সভা হবে—সবাইকেই ব'লতে হবে লতা আমাদের সতীলক্ষ্মী মেয়ে, সত্যই অগ্নিপরীক্ষার মা জানকী।—এসো, বৈকেলে যখন সভা হবে তখন এসো, নিজের কাণেই সভার ঘোষণা, উত্তরে সামাজিকদের মুখে 'সাধু' 'সাধু' ধ্বনি শুনে যেও। যোগেশ যদি পারে কোনও মতে তাকেও আসতে ব'লো।"

"যে আজ্ঞে বাবা—তাহ'লে আসি এখন।"

"এস মা।"

ভূলুণ্ঠিতা হইয়া শিরোমণি মহাশয় ও হরদাস উভয়ের চরণপ্রান্তে প্রণাম করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে রটন্তী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। পথে অদূরে একবার বিন্দীকে দেখিয়াছিলেন, প্রতিবেশিনী যাহারা বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহাদেরও দুই একজন চক্ষে পড়িল। কিন্তু গিয়া কড়া দুটা কথা বলিবেন, ঝাঁটা মারিয়া বিন্দীকে গায়ের ঝাল মিটাইবেন, সে দণ্ডনীতি চিত্তে তখন ছিল না, ঝালও তেমন কিছু গায়ে কিছু জ্বলিয়া উঠিল না।

রটন্তীতে মহাকালী চণ্ডী আজ মহাসরস্বতীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন!

৩৮

হরমোহনবাবুর পত্রখানা হরদাস সঙ্গে লইয়া গেলেন। প্রথমেই চুঁচড়ায় গিয়া যথাপ্রয়োজন প্রমাণাদি সংগ্রহ করিলেন। তার পর ভট্টপল্লী ও নবদ্বীপ গিয়া ব্যবস্থা পত্রে প্রধান কয়েকজন পণ্ডিতের স্বাক্ষর লইয়া সাত আট দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। দুইজন শিষ্যের উপরে ভার ছিল; আশ্রমের জন্য যে বাড়ীটি পাইয়াছিলেন, যথা প্রয়োজন সংস্কারের পর তাঁহার নির্দ্দেশমত যথাযোগ্যভাবে তাহারা সেটিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কর্ম্মভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রবীণ-বয়স্কা বিধবা দুইজন শিষ্যা আসিয়াও গুরুদেবের অপেক্ষা করিতেছিলেন। হরদাস সেইখানে গিয়াই উঠিলেন, বন্দোবস্ত সব দেখিয়া বেশ প্রীতও হইলেন। বৈকালে গিয়া ফুল্লরার সংবাদ নিলেন।—লতাকে

…কছু তখন বলিলেন না, কেবল কহিয়া একটু হাসিলেন।—লতা আসিয়া প্রণাম করিল, মাথায় হাতখানি রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন সৌভাগ্যবতী হও মা।"

একটু হাসিয়া লতা কহিল, "আমার সব সৌভাগ্য বাবা, এখন আপনার চরণে একটু আশ্রয়।"

"আমারও সৌভাগ্য মা, তোমার আশ্রয়। ছেলেকে মনে রেখো মা।"

"মনে যে আপনার পা দুটি ধ'রে সেদিন থেকে পূজো ক'রছি বাবা! আপনিই এখন আমার ইষ্টদেবতা।"

"তোমার ইষ্টদেবতা তোমার স্বামী—আর কাউকে সে আসন দিতে নাই মা।"

ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া লতা কহিল, "তাঁর আশ্রয় এ জীবনের মত হারিয়েছি বাবা। আপনাকে লুকোবার মত কিছু আমার নেই—তিনি—তিনি আমায় ত্যাগ ক'রেছেন।"

চক্ষু দুটিও ছল ছল হইয়া উঠিল। স্মিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া হরদাস কহিলেন, "তবু তিনিই তোমার ইষ্টদেবতা মা।—এদেশের মেয়ে তুমি, প্রাচীন আচার্য্যদের এই উপদেশটি সর্ব্বদাই মনে রেখো।"

"যে আজ্ঞা বাবা।"

হরদাস কহিলেন, "তোমার মাকে এখন এখানে আনাতে পার মা। একখানা চিঠি লিখে দেও, আমি লোক পাঠাচ্ছি। গিয়েই তাঁকে আর তোমার খোকামণিটিকে নিয়ে আসবে।"

আঁচলে চক্ষু মুছিয়া লতা কহিল, "কোথায় এসে তাঁরা থাক্‌বেন?"

"আমাদের আশ্রমে।"

"আশ্রম—আশ্রম কি হ'য়েছে বাবা?"

"হাঁ, মায়ের কৃপায় আশ্রয় নেবার মত একটা যায়গা হ'য়েছে। বিধবা দুটি শিষ্যা সেখানে গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বেশ এসে উনি থাক্‌তে পারবেন। তার পরে তুমি নিজে র'য়েছ—"

"আমি ত ফুলুকে ছেড়ে এখুনি যেতে পারছি নি বাবা!"

"ফুলুকে নিয়েই যাবে। সেই যে হবে মা আমার প্রথম আশ্রম-বাসিনী শিষ্যা।—কেমন, কবে যেতে পারবে মা ফুলু?"

সূতিকা শয্যার এক পাশে ফুল্লরা বসিয়াছিল; নতমুখে উত্তর করিল, যে দিন আদেশ করেন বাবা।"

শিশুটি তখন মোড়ামুড়ি দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"দেখি—দেখি, দাদুটি আমার কেমন হ'য়েছে? হাঁ—বেশ।"

কাছে গিয়া শিশুর মাথায় হরদাস হাতখানি রাখিলেন!—মুখখানি একটু ফিরাইয়া মৃদুস্বরে ফুল্লরা কহিলেন, "এখনও আঁতুড়ের অশৌচ কাটে নি বাবা—"

হাসিয়া হরদাস কহিলেন, "সন্ন্যাসীর এ সব শৌচাশৌচ কিছু নেই মা।—হাঁ, চিঠিখানি তবে লিখে দেও মা, আজ সন্ধ্যায়ই আমি লোক পাঠাব, ঠিকঠাক ক'রেই রেখে এসেছি।"

লতা চিঠি লিখিয়া দিল—লইয়া হরদাস বিদায় হইয়া গেলেন।

পরদিন সকালেই হরদাস হরমোহনবাবুর সঙ্গে গিয়া দেখা করিলেন। শিবকিঙ্কর শিরোমণি প্রমুখ বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত সেই ব্যবস্থাপত্র এবং চুঁচড়ায় যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সব তাঁহার হাতে দিলেন। পড়িয়া হরমোহনবাবু বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। বিস্ফারিত নেত্রে নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আপনি—আপনি—কে বাবা!—"

"আপাততঃ আপনার এই বধূটির অভিভাবক—নাম শ্রীহরদাস দেবশর্ম্মা।—"

"অভি—ভাবক! হরদাস দেবশর্ম্মা—দেখেছি আপনাকে কোথায়—কোনও সভায় বোধ হয়।—আপনি—আপনিই কি সেই ঠাকুর হরদাস?"

একটু শির নোয়াইয়া করযোড়ে হরদাস কহিলেন, "আজ্ঞে ঐ নামেও অনেকে আমার কথা উল্লেখ ক'রে থাকেন।"

উঠিয়া হরমোহনবাবু প্রণাম করিলেন।

"জয়োঽস্তু। তাহ'লে—সব ত দেখ্‌লেম। এখন আপনার অভিপ্রায়—"

"অভিপ্রায়! অভিপ্রায়ের কথা আর কি ব'লব ঠাকুর? এই-ই আমি চাইছিলাম—কি যে আগ্রহে এই ক'দিন চাইছিলাম, সে আর ব'ল্‌তে পারি না। কোনও আপত্তি দূর থাক্, মেয়েটিকে আমার কুলবধূ ব'লে গ্রহণ ক'রবার জন্যে অতি ব্যাকুল হ'য়েই উঠেছি আমি। বাইরে এই অমর্য্যাদায় তাকে আর রাখ্‌তেই পারছি না। সে তার চরিত্র-মহিমায় মনটাকে আমার জয় ক'রে নিয়েছে। ছেলেটিকে আর শেষে যে বউটিকে ঘরে এনেছি, তাদেরও হারাতে ব'সেছি। তবে সত্যি ব'লছি ঠাকুর, মনে সত্যিকার একটা খুঁৎখুঁতি আমার ছিল, বিবাহটা সিদ্ধ বিবাহ হয় কি না। ভাব্‌ছিলাম, বড় কোনও কোনও পণ্ডিতের ব্যবস্থা নেব, যাঁরা কোনও খাতিরে নয়, অর্থলোভে নয়, কেবল শাস্ত্র-বিধির নির্দ্দেশে, সরল শুদ্ধ মনে তাই বিচার ক'রে আমাকে দেবেন। আজ সেই ব্যবস্থা অযাচিত ভাবে দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই আপনা-থেকে পেলাম। এর পর কি আর কথা আছে কিছু? আজ সকল দ্বিধাশূন্য হ'য়ে পরিষ্কার সরল মনে এই কন্যাটিকে আমার কুলবধূত্বে আমি গ্রহণ ক'রলাম। আর আপনার কথা কি—কি ব'লব বাবা—এ ঋণ জীবনে কখনও শুধতে পারব না।"

"যার পর নাই আনন্দিত হ'লাম বাবা—আমার মাকে আজ তার কুলমর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে পারলাম—যা সে বিনা অপরাধে হারিয়েছিল।"

চক্ষু দুটি মুছিয়া হরমোহনবাবু কহিলেন, "আমি গ্রহণ ক'র্‌লাম। কিন্তু মা আমাকে গ্রহণ ক'রবেন কি না, ঘরের লক্ষ্মী হ'য়ে আমার ঘর আলো ক'রে এসে ব'সবেন কি না জানি না।"

"কেন এসে ব'স্‌বেন না? বাধা ত আর কিছু দেখ্‌তে পাই না।"

"তাহ'লে—দেখুন তার এই পত্রখানা"—বলিয়া দেরাজ খুলিয়া লতার সেই পত্রখানা হরমোহনবাবু ঠাকুর হরদাসের হাতে দিলেন। পড়িয়া হরদাসের চক্ষু দুটি ছল ছল হইয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "হুঁ!—তা—মার কি ইচ্ছা এখন হবে ব'লতে পারি

না।—স্বেচ্ছায় মনের টানে যদি না আসেন, বাধ্য তাঁকে আমি ক'র্‌তে পারব না।—"

একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া হরমোহনবাবু কহিলেন, "বেশ বুঝতে পারছি ঠাকুর, তার কোনও অনুরোধে কি আগ্রহে নয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়েই আপনি এই ব্যবস্থা, এই সব প্রমাণ, সংগ্রহ ক'রেছেন। জানিনা বাবা, কোথায় কোন্ সূত্রে কি ভাবে তার সঙ্গে আপনার এই পরিচয় আর এত বড় ঘনিষ্ঠ একটা স্নেহের সম্বন্ধ ঘ'টেছে।"

সংক্ষেপে হরদাস লতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর নন্দগ্রামে গিয়া যাহা সব জানিতে পারিয়াছিলেন, সব বিবৃত করিলেন। তারপর কহিলেন, "তাহ'লে আজ উঠি বাবা—মাকে গিয়ে সব বলি, তিনি কি বলেন শুনি, তারপর আপনাকে সংবাদ দেব।"

"যে আজ্ঞে।"

উঠিয়া হরমোহনবাবু হরদাসকে প্রণাম করিলেন।

৩৯

আশ্রমে ফিরিয়া আহারাদির পর বৈকালের দিকে হরদাস গিয়া লতাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন, তাহার মাতুল-মাতুলানীর কথা, শিরোমণি মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে যে ঘোষণা হয়, সব বিবৃত করিলেন। আড়ষ্ট হইয়া কিছুক্ষণ লতা বসিয়া রহিল, তারপর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, কাঁদিয়া সে হরদাসের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। নিঃশব্দে হরদাস তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া লতা উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে কহিল "আপনি এখন কি আদেশ করেন বাবা?"

"আদেশ।—কি আদেশ আর করব মা? তোমার স্বামী তোমাকে চাইছেন, শ্বশুর তার কুলবধূত্বে গ্রহণ করছেন, আকুল হ'য়েই উঠেছেন, আমি তার কি আদেশ ক'রব মা?"

লতা উত্তর করিল "আমার বাসনা যা ছিল পূর্ণ হ'য়েছে, বাবা। ছেলেটিকে তাঁরা তাঁদের ঘরের ছেলে ব'লে ঘরে নেবেন, এই-ই আমি চেয়েছিলাম, আর কিছু নয় বাবা। এখন ইলার কোলে তাকে তুলে দিতে পারলেই কৃতকৃতার্থ আমি হব। আর ত কোনও বাসনা—সংসারে আর কোনও স্পৃহা ত—আমার নাই বাবা।"

"হুঁ—দেখেছি মা, তোমার পত্রখানা। তোমার শ্বশুরের কাছেই ছিল, বের ক'রে তিনি দেখালেন।"

"তাহ'লে আর কি ব'লব বাবা? আমার সে সংকল্প, সত্য সংকল্প ব'লেই গ্রহণ ক'রেছিলাম, অনেক ভেবে মনটাকেও বেশ বুঝে নিয়ে। ত্যাগ ক'রতে যে আজ পারছিনি। দয়া করুন বাবা, আপনার এই মহাব্রতে ব্রতচারিণী একজন শিষ্যা ব'লে আমাকে গ্রহণ করুন, আর কোনও কামনা জীবনে আমার নাই।"

"ভাল, স্বামীর অনুমতি আগে নেও। তিনি তোমার গুরু, আর তাঁর গুরু তোমার শ্বশুর। দুজনেরই অনুমতি আগে নেও। যদি পাও, আমার ব্রত সহকারিণী শিষ্যা ব'লে আনন্দে তখন তোমায় গ্রহণ ক'রব।"

"অনুমতি—পাব ত বাবা?"

"পাবে। কেন পাবে না? প্রাণের আগ্রহে যদি চাও, অবশ্য পাবে।"

একটু কি ভাবিয়া লতা কহিল "বড় লজ্জা করে বাবা। কি ব'লব? কি ব'লে চাইব? আপনি—আপনি—আমার এই নিবেদন একটিবার গিয়ে যদি তাঁদের জানান—"

"বেশ, তাই জানাব মা।"

"তারপর একটি দিন দয়া ক'রে যদি তাঁরা আশ্রমে আসেন—"

"তারা আস্‌বেন—কেন, তুমি নিজে যাবে না?"

"এসে না নিতে চাইলে যেচে কি যেতে পারি বাবা? আপনিই কি মেয়েকে তাই পাঠাতে পারেন?"

একটু হাসি লতার মুখে ফুটিল।—হরদাসও হাসিয়া উঠিলেন।

"হাঁ, ঠিক ব'লেছ মা! সে ত পারিই না। আচ্ছা, যাব একবার কাল সকালেই তোমার শ্বশুর বাড়ী।"

চরিত্রমহিমার পরিচয় পাইয়াছিলেন, পত্রখানা পড়িয়াও সকলে বুঝিয়াছিলেন, আজ আবার ঠাকুর হরদাসের মুখেও সকলে সব শুনিলেন। আপত্তি কেহই কিছু করিলেন না, স্পষ্টই সকলে বুঝিলেন সাক্ষাৎ দেবশক্তি-রূপা এই নারীকে কোনও অধিকারে, বিধির কোনও বাঁধনে, ঘরে আনিয়া তাহারা বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না।

মন্দাকিনীও আসিয়া পৌছিলেন। সব শুনিয়া কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন; শেষে কহিলেন, "তুই হ'লি সন্ন্যাসিনী, ছেলেটিকে দিয়ে দিবি পর ক'রে পরের হাতে। কোন্ সুখে, কিসের বাঁধনে আজ এখানে থাকব মা? কাশীতেই ফিরে যাই। বাবা বিশ্বনাথ আছেন, তাঁর দয়াই এখন আমার শেষ জীবনের সম্বল। তবে মুখখানি যেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই মা।"

লতা কহিল, "জোর ক'রে তোমায় ধ'রে রাখ্‌তে চাই না মা,—যদি ইচ্ছে হয়, তাই যেও। মাঝে মাঝে এসো—আমিও যখন পারি যাব। কিন্তু কোথায় থাক্‌বে?"

চক্ষু মুছিয়া মন্দাকিনী উত্তর করিলেন "ঐখেনেই থাকব। কোথায় আর যাব? উনিও ছাড়্‌তে চান না—বলেন, তুই আমার মেয়ে, বুড়ী মাকে একেবারে ত্যাগ ক'রে গিয়ে থাকিস্ না। আমার যে কেউ আর এ ধরাধামে নেই।"

"তাই তবে থেকো। তবে যাবার আগে মামারবাড়ী একবার হ'য়ে এস। মামীমার সঙ্গে দেখা ক'রে সব তাঁকে ব'লো, অত বড় দরদের যে আমাদের আর কেউ নেই মা।"

"যাব, তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"যাব, তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে আসব।"

দিন একটা স্থির হইল। লতার শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী ও ইলা সকলেই আসিলেন।

বিরিঞ্চি ও ইলা আসিয়া বসিল—স্বামীকে প্রণাম করিয়া ইলার কোলে ছেলেটিকে তুলিয়া দিয়া লতা কহিল, "আজ থেকে ও তোমারই

ছেলে বোন্। নিজের ঘরে মার কোলে আজ ও ঠাঁই পেল, কোনও দুঃখ, কোনও আকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই দিদি।"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে ইলা কহিল, "দিদি, কোলে তুলে ওকে নিলাম, বুকে ধ'রে রাখব। ওর বড় কেউ আর আমার হবে না। কিন্তু দিদি—দিদি—আর ব'ল্‌তে পারছিনি—ব'লবারও কিছু নেই—কিন্তু তুমি—তুমি—এ কি ক'রলে দিদি?"

ধীরভাবেই লতা উত্তর করিল, "মাথার উপরে ধর্ম্ম আছেন দেবতা আছেন। যেমন মাথার ওপরে, তেমন বুকের ভেতরও আছেন। যা তাঁরা করিয়েছেন, তাই ক'রেছি। আর যে কিছু ক'রবার যো নেই বোন্! ভেবো না কিছু, কেঁদো না, মন শান্ত কর। এতেই মঙ্গল হবে, তোমার মঙ্গল হবে, আমার মঙ্গল হবে—ওঁরও মঙ্গল হবে।"

বিরিঞ্চি কহিল, "কি হবে ভগবান্ জানেন। মঙ্গল যদি তোমার প্রার্থনায় হয়, ভাল। না হয় ক্ষতি নেই। মঙ্গলামঙ্গলের কথাও কিছু আজ ভাবতে পারছিনি লতা। ব'লবার আমার কিছুই নাই, প্রস্তুত হয়েই এসেছি। কেবল—কেবল—একটি প্রার্থনা—তোমার ক্ষমা—"

"ক্ষমা! কেন ও কথা বলছ? কি ক্ষমা ক'রব?—অপরাধ ত তোমার কিছু হয়নি। যে ক'দিন তোমাকে পেয়েছিলাম, প্রাণের যে পরিচয় তখন পেয়েছিলাম, তাতে কখনও মনে ক'রতে পারিনি, ফাঁকি দিয়ে তুমি যেতে পার, স্বেচ্ছায় আমাকে ত্যাগ ক'রতে পার।—তবে দোষ দুর্ব্বলতা মানুষ মাত্রেরই আছে,—আমারও আছে। দুঃখ হয়েছে, রাগ হ'য়েছে, অভিমানও হ'য়েছে। তবে মনকে এই ব'লে বুঝিয়েছি ভাগ্যে যা আমার ঘটল, সব আমারই কর্ম্মফল। তুমি—তুমি তার নিমিত্ত মাত্র। একটি যা বড় ব্যথা ছিল, ভাবনা ছিল, ঐ ছেলেটা। তাও ঘুচে গেল। তোমাদের ঘরের ছেলে, ঘরে তোমরা নিলে,—আর কোনও দুঃখ, কোনও ভাবনা আমার আজ নাই। অনুমতি পেয়েছি, আজ আশীর্ব্বাদ কর, যেন—যেন—এই ব্রতের ধর্ম্ম আমি পালন ক'রতে পারি।"

বলিয়া স্বামীর চরণে লতা প্রণাম করিল। চক্ষু দুটি বিরিঞ্চি মুছিল; উত্তরে কোনও কথা আর মুখে ফুটিল না।

হরমোহনবাবুও কমলিনী তখন গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিরিঞ্চি ও ইলা উঠিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মাথার কাপড় টানিয়া লতা শ্বশুরশাশুড়ীকে প্রণাম করিল।

হরমোহনবাবু কহিলেন, "কল্যাণ হ'ক মা। সবই শুনেছি, কিছু আর আমাদের ব'লবার নাই। বড় দুঃখ আজ, ঘরে তোমাকে পেলাম না। কি ক'রব মা? আমার দুর্ভাগ্য, কর্ম্মফল, নইলে এমন রত্ন পেয়েও হারালাম! তা সে যাই হ'ক মা, যেখানেই থাক, যে ব্রতেই জীবন যাপন কর, আমারই ঘরের বউ তুমি, আমার ঐ বংশধরের মা, এ গৌরব আমার চিরদিনই থাক্‌বে।"

বলিয়া ইলার কোল হইতে ছেলেটিকে নিজের কোলে তুলিয়া নিলেন।

লতা নীরব। কমলিনী কহিলেন, "একটিবার তোমার ঘরে যাবে না মা। আজ এসেছি—যাবে আমাদের সঙ্গে?"

হাতজোড় করিয়া লতা কহিল, "আজ পারবনা মা,—বড় লজ্জা করে। যাব বই কি, যখন ইচ্ছে হয় যাব, যখন ডাকবেন্ যাব। না গিয়ে কি পারব মা?—তবে আজ পারছি না।"

"ভাল, নাই গেলে তবে আজ।—তবে যেও, সর্ব্বদাই যেও,—যাবে বই কি? না গিয়ে পারবে কেন? বড় টান যে তোমার ঐ ঘরেই রইল।—"

বলিয়া পৌত্রটিকে স্বামীর কোল হইতে নিজের কোলে লইলেন।

হরমোহনবাবু কহিলেন, "কিন্তু একেবারে নিঃস্ব ক'রে তোমাকে যে বিদায় ক'রে দিতে পারি না। তোমার সব দাবী মেনে নিলাম, আমার এই একটা দাবীও তোমাকে মেনে নিতে হবে। যে সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দিয়েছিলাম—"

লতা কহিল, "আমার যে প্রয়োজন কিছু আর নাই বাবা। সম্পত্তি—ভাল, এই আশ্রমে দিয়ে দিন, তাতেই আমার পাওয়া হবে।"

"ভাল, তাই তবে দেব মা। সিদ্ধি তোমার হ'ক্, কল্যাণ হ'ক্! তোমার এই সিদ্ধিতে, কল্যাণে, দেশের কল্যাণ হ'ক্, জগতের কল্যাণ হ'ক, আজ সরল প্রাণে এই আশীর্ব্বাদ তোমাকে ক'রে যাচ্ছি মা!"

সম্পূর্ণ

সিক্তা

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

১

বরষা-সজল আগমনী সুরু
হল গো
খোল হৃদয়ের রুদ্ধ কবাট
খোল গো।
জাগিল প্রকৃতি সরসা
এসেছে এসেছে বরষা
আজি গগনের গুরু গম্ভীর
শাসনে
সাজিল ধরণী ধূসর ধূম্র
বসনে,
নাহি বিরহীর ভরসা
এসেছে এসেছে বরষা

২

কেয়া চম্পক ব্যস্ত ব্যাকুল
উতলা
গন্ধ-পাগল হৃদয়ের ভারে
উছলা
এসেছে অতীত-বয়না
চপল-চকিত-নয়না।
রিমি ঝিমি ভরা বাদল ব্যাকুল
স্বপনে
প্রেমের খেলনা শুধু ভাঙা-গড়া
গোপনে
নিরজনে ব্যথা-চয়না
চপল-চকিত-নয়না।

৩

গেয়ে যায় ঐ সজল গজল
গীতিকা
চরণ-চিহ্নে ব্যথিত কোমল
বীথিকা,
কদম-কেশর শিহরে
উদাসী কে আজি বিহরে,
পূবালি বাতাস হৃদয় দোলায়
সঘনে
প্রজাপতি শুধু ফিরে চায় মধু
লগনে
মধু মধুকর নিকরে
উদাসী কে আজি বিহরে !

৪

ঝর ঝর ঝর অশ্রু-সজল
কপোলা
শ্যাম তনু ঘিরি স্নিগ্ধ শ্যামল
নিচোলা,
বাঁকা ভুরুযুগে তড়িত
আবেশ-শীকর জড়িত
হৃদয়-দুয়ারে অচেনা-পথিক
এসেছে
জানি না কখন অন্তর তারে
ডেকেছে,
সুদূরে কি প্রেম গড়িত
আবেশ-শীকর-জড়িত।

৫

অজানা অচেনা হউক তবু সে
এসেছে
দীনের কুটীরে দীনতর সুখে
ভেসেছে
আননে তৃপ্তি ফুটেছে
প্রাণের শঙ্কা টুটেছে,
শূন্য-কুটীর ঝুরু ঝুরু ঝরা
বাদলে
ভয়াল নৃত্য বাজিছে মেঘের
মাদলে,
পবনে মাতন উঠেছে
প্রাণের শঙ্কা টুটেছে।

৬

সজ্জা নাহিক শুধু ফুলদল
ছড়ানো
সরম জড়িত পরাণের মধু
ঝরানো
তবু ভাল তার লেগেছে
খুশীর দীপ্তি জেগেছে,
আঁখিতে তাহার ভাষার আঁখর
সাজায়ে
চেয়েছে দরদী মুখপানে হিয়া
নাচায়ে,
সঞ্চিত বাণী জেগেছে,
খুশীর দীপ্তি লেগেছে !

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র দাস

বারি-আহরণ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভূস্বর্গ-চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীমতী রাণী মৈত্র

স্নেহের রাণী,

তোমাকে চিঠি লিখিনি অনেক দিন। কারণ দর্শিয়ে বা সাফাই গাইবার ব্যর্থপ্রয়াসে চিঠির বহর বাড়ানোর প্রয়োজন দেখি না। সংসারের অশেষ ট্রাজিডির মধ্যে এই একটা সান্ত্বনা যে এই ঘোর কলিতেও এমন দু-চারজন মানুষের দেখা মেলে যারা ভুল বোঝে না। সুতরাং—

কী ঘ'টে গেল তুমি কাগজে পড়েছ, শোকসন্তপ্ত পরিবারকে স্বচক্ষে দেখেও এসেছ। তুমি ৺ধরণীদাকে জানতে খুবই ভালো ক'রে। তোমার গুণকীর্তনে তাঁর ক্লান্তি ছিল না—অর্থাৎ তিনিও জানতেন তোমাকে খুবই কাছ থেকে। কাশীতে তোমাদের শ্রীনিকেতনে ধরণীদা সপরিবারে ছিলেন তোমার কত যত্নপরিচর্যার মাঝে, সে কথাও তিনি যে কী ঘটা ক'রে বলতেন তা-ও তোমার অজানা নেই। তাই তুমি জানো যে, তিনি ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ—বিরল মানুষ—যে সহজে কারুর কাছ থেকে কিছু চায় না, কিন্তু যা-ই কেন পাক্ না—ভোলে না। এই জীবনের বিধানে দুঃখাবহ শোচনীয় যোগাযোগের ঘাটতি নেই। তাদের মধ্যে একটি প্রধান দুঃখও এই যে, আমাদের মন অনেক কিছুই কত চায়, তবু পায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমান সত্য যে, আমরা জীবনে অনেক কিছুই পাই যার কোনো হিসেব আমরা রাখতে শিখি না ব'লেই দৈনন্দিন লেন-দেনের ঠিক্ দেওয়ার সময়ে প্রায়ই না-পাওয়ার দিকটাই দেখি বড় ক'রে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—আমরা অনেক "পাওয়াকেই" ঠিকমতন "পাই না" পাওয়াকে পাওয়া ব'লে চিনতে শিখি না ব'লে। এই স্বীকৃতি হ'ল প্রাণক্ষেত্রের সারবিশেষ—এ আমাদের চরিত্রকে উর্বর করে ব'লে। ধরণীদা জানতেন একথা। সেইজন্যেই প্রতি পাওয়ার অঙ্গীকার করতে তাঁর এত আনন্দ ছিল। আর সেই আনন্দের আলোয়ই তিনি প্রতি প্রাপ্তিকে ক'ষে নিতেন তাঁর হৃদয়ের সদাসজাগ কৃতজ্ঞতাবৃত্তির নিকষে। এই কৃতজ্ঞতার চেতনা জীবনের একটা মস্ত চেতনা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—কৃতজ্ঞতা হ'ল সাইকিক চেতনার আত্মপ্রকাশ। এখানে সাইকিক বলতে তুমি ভৌতিক কিছু বুঝবে না জানি, কেন না, তুমি শ্রীঅরবিন্দের পরিভাষা বেশ ভালো ক'রেই জানো। তাই তোমার কাছে ব্যাখ্যা করার নিশ্চয়ই দরকার নেই যে—কৃতজ্ঞতা একটি মস্ত সাইকিক গুণ বলতে শ্রীঅরবিন্দ বোঝেন এমন একটি গুণ যা আমাদের অন্তর্বিকাশের সহায়। ওয়র্ডসওয়র্থের সেই কাঠুরের ওপর কবিতাটি মনে পড়ে? এক বৃদ্ধ কাঠুরে গাছের শাখায় কোপ মারছিল, কিন্তু কাঠ কাটতে পারে না—স্থবির হস্ত দুর্বল। কবি যাচ্ছিলেন কাছ দিয়ে—এককোপে শাখাটি কেটে দিলেন তাকে উপহার। বৃদ্ধ কাঠুরে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। সে কবিকে কোনো অনুরোধ করে নি, সহায়তার কোনো প্রত্যাশাই ছিল না—একথাও সত্য যে, কবির যৌবন-বলিষ্ঠ হস্তে শাখাটি কাটতে তাঁকে এমন কিছু ত্যাগ বা শ্রম স্বীকার করতে হয় নি। তবু কাঠুরের হৃদয়ের সাইকিক বৃত্তি জানান দিল নিজেকে। সে বলল—"এতে উপকারীর কতটা খর্চা হ'ল তা দিয়ে হবে না আমার জমার বিচার, আমি কতকটা পেলাম সেই নিয়েই আমার মাথাব্যথা।" কিছুদিন আগে একটি আত্মীয়াকে আমি লিখেছিলাম এই কথা যখন সে আমাকে লিখেছিল যে, তার কোনো লেখা আর একজন সংশোধন ক'রে দিয়েছে এজন্যে সে কোনো কৃতজ্ঞতার ঋণই স্বীকার করতে রাজি নয়—যেহেতু তার যুক্তি বলে যে, সে যখন এ-উপকার যাচ্ঞা করে নি তখন অযাচিত প্রাপ্তিকে স্বীকার করবার কোনো বাধ্যবাধকতাই তার রইল না। কথাটা যুক্তির দিক দিয়ে নিখুঁৎ বটে—কিন্তু তবু বলতেই হবে যে এ হ'ল গোণাগুন্তির চেতনা—স্বভাবকৃতজ্ঞতার যে-চেতনা তার শুধু ছন্দ আলাদা নয়—জাতই আলাদা। একথা লিখেছিলাম তাকে।

বলা বাহুল্য, লিখে ফল হয় নি—যেহেতু আমার এ-আত্মীয়া একে নব্যা তার ওপর স্বভাবে বুদ্ধিমতী, যুক্তিবাদিনী। কিন্তু এ তো যুক্তির কথা নয় ভাই। সংসারে বিচক্ষণ যুক্তির দাম যথেষ্ট—মানি, কিন্তু তাই ব'লে যদি বলি এ-পাথেয় আমাদেরকে খুব বেশি দূর নিয়ে যায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই একটু বাড়াবাড়ি হবে। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার যৌক্তিক হিসাব কিতাবের তীক্ষ্ণ শক্তি নয়—আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হ'ল আন্তর অনুভব-শক্তির গভীরতা ও গ্রহিষ্ণুতা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের রাজ্যে, খুঁটিনাটি নিয়ে যে-মানুষ যত বেশি সচেতন সে-মানুষকে ততই উচ্চবিকশিত মানুষ বললে ভুল হবে না। কাজেই এ বিকাশের ফলে আমাদের নানান্ উজ্জ্বল আত্মবিকাশকে উচ্ছ্বাস ব'লে হেসে উড়িয়ে দিলে ঠকে সে-ই যে হাসে, সে নয় যে তুচ্ছ অঙ্গীকার নিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। তোমার সম্বন্ধে ধরণীদার উচ্ছ্বাসকে তাই আমি "অত্যুক্তি" লেবেল দিয়ে নামঞ্জুর করতে পারব না ; এমন কথাও বলতে পারব না যে, কৃতজ্ঞতা নিয়ে ঐ যে-বুদ্ধিমতী আমার কাছে খুব বিজ্ঞ যুক্তি দিয়ে তর্কে আমায় হারিয়ে দিল খতিয়ে সে-ই জিৎল। এতে শুধু প্রমাণ হ'ল তার হৃদয়বৃত্তি যথেষ্ট জাগে নি ব'লেই কৃতজ্ঞ হওয়া নিয়ে সে এত সাত-সতেরো টাকা-আনা-পাইয়ের ছক-কাটা সুরু করল। যার হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তির দাসত্ব করতে নারাজ সে-ই জানে অন্তরচেতনা মুক্তি পেলে সে কী আনন্দ মানুষের।

এবার শিলঙে ধরণীদার অতিথি হ'য়ে আমরা একথাটি বার বারই অনুভব করেছি তাঁর নিজের দৃষ্টান্তে। একটা উদাহরণ দেই।

শিলঙে আমরা ছিলাম এবার সদলবলে ধরণীদারা সপরিবারে আটজন—ধরণীদা, তাঁর স্ত্রী প্রভা দেবী, তাঁর দুই মেয়ে উমা ও রুণু, ছেলে বাবুল, দুই শ্যালক শীতাংশু ও শুভ্রাংশু, শালিকা লীলা—আর আমরা পাঁচজন—আমি, গিটার-তবলা বাদক বিখ্যাত জ্ঞান ঘোষ, স্বনামধন্য মীরাবল্লভ পাহাড়ি, মীরা ও আমাদের এক কিশোর বন্ধু লাটু ওরফে মণিময়। একুনে তেরজন। পাহাড়ি সস্ত্রীক ধরণীদার বাকায়দা অতিথি না হ'য়েও আসলে ছিল অতিথির বাড়া—সর্বদা আমাদের ওখানেই ওরা আসর সরগরম রাখত। পাহাড়িদের সঙ্গে ধরণীদার আগে আলাপ ছিল না বেশি—অনেকটা আমার সূত্রেই পরিচয়। কিন্তু পাহাড়ি যে উমার গানের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করত এতে ধরণীদার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। শুধু তাই নয়, পাহাড়ি যে তাঁকে তার সঙ্গদান করত তার পরিবর্তে ওকে তাঁর স্নেহময় প্রাণের সমস্ত স্নেহটুকু দিয়েও তিনি যেন নিরন্তরই ঋণী বোধ করতেন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা আমার কাছে খুবই বড় মনে হ'ত—তিনি অপরকে যা দিতেন সে সম্বন্ধে ছিলেন যতটা নিশ্চেতন, অপরের কাছে যা পেতেন সে-সম্বন্ধে ছিলেন ঠিক সেই অনুপাতেই সচেতন। পাহাড়ির গুণের দিকটাই তিনি বড় ক'রে দেখতেন, ও যে প্রকৃতিতে দিলদরিয়া এতে কী যে খুশি! পাহাড়িকে কত যে খাওয়াতেন, বেড়াতে নিয়ে যেতেন, নিত্য তার কত আবদার যে সইতেন দেখে এত ভালো লাগত যে কী বলব। শুধু তা-ই নয়, পাহাড়ি ও মীরাকেও তিনি প্রায় নিজের পরিবারভুক্তই ক'রে নিয়েছিলেন। আর এর মূল কারণ ছিল—প্রথম তাঁর সজাগ স্নেহশীলতা, দ্বিতীয় নিবিড় কৃতজ্ঞতাবোধ।

সংসারটা নেহাৎ কম দেখি নি ভাই। কিন্তু খুব কম লোককেই দেখেছি পরকে এত সহজে আপন ক'রে নিতে। না—শুধু নিজের আপন বললেও যথেষ্ট বলা হবে না। পরকে তিনি সহজেই নিজের পরিবারবর্গের কাছেও আপন ক'রে নিতে পারতেন। এ আরও দুরূহ। সাংসারিক জীবন-যাত্রায় সামাজিক মানুষ প্রায়ই দোমহলা বাড়িতে বাস করে, সদরে রাখে বন্ধুকে, অন্দরে—আত্মীয়কে : বিশেষ আমাদের দেশে—যেখানে "ঘরের" চেতনা "বাইরের" চেতনার চেয়ে ঢের বেশি তীক্ষ্ণ ও সাবধানী। আমাদের দেশে অন্তঃপুর বিশেষ ক'রেই অন্তঃপুর—যেখানে ছোঁওয়া ছুঁইয়ি জানাজানি পছন্দ করবার মতন উদারতা খুব কম লোকেরই আছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে হিন্দুয়ানির এই ছুঁৎমার্গবৃত্তি কিছু ঘা খেয়েছে, এ জন্যেও ব্রাহ্মসমাজের কাছে আমাদের ঋণ খুব বেশি ব'লেই আমি মনে করি। কিন্তু ধরণীদাকে আরো প্রশংসা করি এই জন্যে যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হ'য়েও এবং বাড়ির নানান্ অতি-হিন্দু আত্মীয়-আত্মীয়ার নৈযুজ্য সত্ত্বেও সপরিবারে তিনি অকুতোভয়ে ঠাঁই দিতেন একেবারে অপরিচিতকে। ঔদার্যে অসামান্য বলিষ্ঠ না হ'লে মানুষ এ পারে না। আর শুধু

উদার হ'লেই যে এ সম্ভব হয় তা-ও নয়--স্ত্রীপুত্র কন্যাকে খানিকটা নিজের ভাবের ভাবুক ক'রে তুলতে না পারলেও এতটা পারা সহজ হয় না। এ-পারাও সম্ভবপর হয় কেবল তখনই—যখন মানুষ নিজের পরিবারভুক্তদেরকে সত্যি আপন মনে করে। যেখানে ভালোবাসা গভীর সেখানে মানুষ নিজেকেই মেলে ধরে, যেমন গুঁড়ি নিজেকে মেলে ধরে তার হাজারো শাখার মধ্যে। ধরণীদার সৌভ্রাত্রশক্তি তাঁর পরিবারভুক্তদের মনেও চারিয়ে গিয়েছিল প্রথামত তাঁর নিজের চরিত্রের বলিষ্ঠতার ছোঁয়াচে—দ্বিতীয়ত তাঁর মনের উদারতার প্রভাবে। শিলঙে তাঁর অতিথি হ'য়ে মাসখানেক বাস করবার সময় একথা আমাদের সবারই মনে হ'ত—না হ'য়েই উপায় ছিল না।

তাই আরো ভালো লাগত এ-পরিবারটির সহজতা। কারণ এ সহজতা ছিল সরল ও খোলা—বাপ মা ছেলে মেয়ে শালা শালী সবাই ছিল এক রঙে রঙিয়ে—একই ধোপা ঘরের কাপড় কেউ কারুর চেয়ে কম শাদা নয়। যেমন মিষ্ট প্রভাদি, তেম্‌নি লীলা, তেম্‌নি হাসি, বাবুল, রুণু, শীতাংশু ও শুভ্রাংশু। পাহাড়ি মীরা জ্ঞান লাটু ও আমি তো এ-পরিবারভুক্ত নই সত্যি সত্যি। কিন্তু কই আমাদের কখনো তো ভুলেও মনে হয় নি—আমরা বাইরের লোক! শুধু তাই নয়, ধরণীদা তার করেন টেলিফোন করেন চিঠি লেখান—"ডাকো ভীষ্মকে, ডাকো অমরেন্দ্রকে, ডাকো শচীনকে, ডাকো সত্যেন বোসকে—" কাকে নয়? আতিথেয়তার এমন জীবন্ত প্রতিমূর্তি অতুলপ্রসাদের পরে আর আমার চোখে পড়ে নি। এই শ্রেণীর মহৎ উদার মানুষ সমাজকে কত যে দেয় সমাজ সব সময়ে তার খবর রাখে না, এ একটা কম দুঃখ নয় ভাই। কারণ এ-খবরদারি করতে না-পারার মধ্যে আছে চেতনার একটা অসাড়তা। ঘুমন্তর সঙ্গে জীবন্তের সেই চিরন্তন বে-বনতি। তোমাকেও ডাক দিতে তিনি যে কতবার বলেছেন আমাকে! জানোই তো তুমি এলে তিনি কী খুশিই হ'তেন। শিলঙে আরো কত বাঙালি পরিবারই যে তাঁর কাছে যখন তখন আসত ও সধরণীদা প্রভাদির স্নেহানুকূল্যে নিত্য নব আনন্দের পাথেয় নিয়ে ফিরত!

শুধু কি বাঙালি? শিলঙে নানা অসমিয়া ছেলেমেয়েদেরকেও তিনি ঐভাবেই স্নেহ করতেন, সহজেই নিতেন আপন ক'রে। উষা ব'লে এক অসমিয়া কুমারীর সঙ্গে আমার ভাব হয় ওখানে। বড় চমৎকার মেয়ে। যেমন বিদ্যা তেমনি বুদ্ধি তেমনি মিষ্ট স্বভাব—আর সব ছাপিয়ে তার আদর্শবাদ। ধরণীদা শুধু যে তাকে ভালোবাসতেন তা-ই নয়—তার বৃদ্ধা মা-কেও ডাক দিতেন প্রায়ই। বৃদ্ধাও তাঁকে অভিষেক করেছিল নিজের পুত্রপদে। এ বিষয়ে প্রভাদিও ছিলেন ধরণীদার শুধু সহধর্মিণী নয়, সহমর্মিণীও বটে। এমন সুন্দর দাম্পত্য-মিলন কমই দেখেছি। এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ। আহা, সেই

প্রভাদেবী উমা ধরণীকুমার

প্রভাদির নিষ্করুণ শোক স্বচক্ষে দেখতে হ'ল! একে তো ভালোই অতি বিরল এ জগতে। ভালোয় ভালোয় মিলন আরো কত বিরল বল দেখি। উষার মার মুখে প্রভাদির গুণকীর্তন ধরে না। উমাকে আর তার গানকেও তিনি যে কী ভালোই বাসতেন! এসব কথা বলছি আরো দেখাতে ধরণীদার ব্যক্তিস্বরূপ—পার্সনালিটি—কী ভাবে নিজেকে উপলব্ধি করত পারিবারিক পরিবেশে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁর ব্যষ্টি চেতনা নিরন্তর নিজেকে ছাড়িয়ে দিয়ে যেন চাইত একটা বৃহত্তর সমষ্টিগত চেতনার বিকাশ।

এ আত্মকেন্দ্র সাংসারিক জগতে এ যে কত বড় কথা তুমি জানো। কারণ সংসারের সাংসারিক দিকটার সঙ্গে তোমার পরিচয় আশৈশব ব'লে সাংসারিকতার শুষ্কতম দুঃসহতম রূপটিকে তুমি চেনো।

ধরণীদার সঙ্গে আমার পরিচয় কত দিনের তা-ও তোমার অবিদিত নেই: সবে দুবছর—তার মধ্যেও বছরখানেক বাদ দাও—আমার পণ্ডিচেরি-স্থিতি। তা হ'লে এই বাকি বছরখানেকের সম্প্রসারণেই আমাদের বন্ধুত্বকে মাপতে হবে।

সময়ের অনুপাতে ঘনিষ্ঠতা হয় না এ মানুষের প্রায় একটা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু তবু একথাটা প্রীতির লেন-দেনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রেই স্মরণীয়—যেহেতু এ-সত্যের সাক্ষ্য প্রীতির একটা মস্ত গৌরবের দিককেই প্রমাণ করে। ধরণীদার গভীর প্রীতির নিবিড় তৃপ্তি এ-গৌরবের দিকটাকে আমার কাছে যে আরো কত উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেছে! শুধু উজ্জ্বল না—স্মরণীয়।

না! ধরণীদার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা আমার স্মরণীয় বললেও সবটুকু বলা হয় না। বলা চাই—বরণীয়, কেননা এ-বন্ধুত্বের জোগান দিয়েছে তাঁর সমস্ত পরিবার। এক অমরেন্দ্রনারায়ণের পরিবার ছাড়া আর কোনো পরিবারের প্রতি অন্তরঙ্গের কাছ থেকে আমি এ হেন সজাগ শ্রদ্ধা ও প্রীতি পেয়েছি ব'লে তো কই মনে হয় না। আমার আত্মীয় পরিবারদের কাছ থেকে তো নয়ই। বলতে কি, ধরণী-পরিবারের অচল প্রীতি ও সর্বাঙ্গীন শ্রদ্ধা আমার আত্মীয়দের নানা অকারণ বেদরদী অবিচারেরই ক্ষতিপূরণ করেছে—আমাকে আরো বুঝিয়ে দিয়েছে যে মানুষকে প্রায়ই সবচেয়ে কম চেনে তার আত্মীয়। তারা স্নেহশীল হ'তে পারে কিন্তু দরদী প্রায়ই হয় না। ধরণীদা—শুধু ধরণীদা না, তাঁর পরিবারের প্রত্যেকে ছিল স্বভাব-দরদী। তাই ওদের বন্ধুত্বের গাথুনিতে এমন কি কোনো ফাটলও ছিল না—কিন্তু এ পাকা কাজের কৃতিত্ব বিশেষ ক'রে তাঁরই, আমার নয়। কারণ আমার সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট ছিল ওঁদের কারুর 'পরেই না—ধরণীদার মেয়ে আমার ছাত্রী উমার গীতিসাধনার দিকে। এর একটা কারণ—আমার বয়স হয়েছে অসম্ভব—এখন নতুন বন্ধুত্ব বন্ধন গ'ড়ে-তোলার সে যুবন্ উৎসাহে ভাঁটা প'ড়ে এসেছে প্রায়। আরো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশই অন্তর্মুখী হ'য়ে ওঠে—হৃদয়বৃত্তি যতই থিতিয়ে আসে গভীরের দিকে, ততই নিজেকে আমরা গুটিয়ে আনি ব্যাপ্তির দিক থেকে। তাই ধরণীদার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার কোনো সজাগ চেষ্টাই আমি করি নি—তুমি জানো, যতক্ষণ তাদের বাড়িতে থাকতাম উমাকে গান শেখানোতেই কাটাতাম—বেশির ভাগ সময়। এ নিয়ে অনেকেই রাগ করত, মান করত—কিন্তু ধরণীদা বুঝত কেন এধরণের রাগারাগি মান-অভিমান আমি গ্রাহ্য করি না। তাছাড়া, ইদানীং গান ও লেখার দিকে আমি আমার সমগ্র উদ্বৃত্ত শক্তি খাটাব ঠিক ক'রে চলেছিলাম—বহুর সঙ্গে মেলামেশা ও বহুর হিতসাধনের আগেকার উৎসাহ আমার স্তিমিত হ'য়ে এসেছিল।

ওদিকে ধরণীদা নিজেও ছিল ব্যস্ত মানুষ। কত ব্যস্ত—তুমি জানো। প্রকৃতিতে নির্বিলাসী কর্মিষ্ঠ, কর্তব্য-পরায়ণ এ-মানুষটির মধ্যে ছিল একটা সরল হৃদ্যতা, কিন্তু মৌখিক অঙ্গীকারের জাহিরিপনা একেবারেই না। তাই আমার বহুদিন এমন সন্দেহও হয় নি যে, ও আমাকে ভালোবাসত বা শ্রদ্ধা করত। পরে হঠাৎ যখন জানতে পারলামও অতর্কিতে—উষার কাছে। আমাদের ধরণীদা দিয়েছে তার নানান্ সেবা ও ভাষা, নানা বিষয়ে অকৃপণ সমবেদনা—আরো অনেক কিছু, কিন্তু কখনো ভাবেভঙ্গিতেও প্রকাশ করে নি যে আমাকে তার কোনো প্রয়োজন আছে নিজের দিক থেকে।

হয়ত ছিলও না। আমি ও পাহাড়ি প্রায়ই বলাবলি করতাম যে ধরণীদা আমাদের কাছে অতুলদার স্থান নিয়েছে। কিন্তু অতুলপ্রসাদের সঙ্গে এখানে ধরণীদার একটু তফাৎ ছিল। অতুলপ্রসাদ ছিলেন স্বভাব-শিল্পী। প্রকাশ ছিল তাঁর স্বধর্ম। গানে ও রুচিতে তাঁর সঙ্গে আমার মিল ছিল এত বেশি প্রত্যক্ষ যে চোখে না প'ড়েই পারত না।

ধরণীদার সঙ্গে কিন্তু বাইরের দিকে আমার কোনো মিলই ছিল না। তুমি তো জানো আমি কী রকম অন্যমনস্ক প্রকৃতির জীব: ধরণীদা অতিমনস্ক—আঁটসাঁট। সময়ানুবর্তিতা আমাকে কোনো দিনো তাঁবে রাখতে পারে নি, কিন্তু ধরণীদা ছিল সময়ভীরু লোক—যে-কাজটি যে সময়ে করবার কথা ত্রস্ত চিত্তে করবেই করবে। সময়কে

আঘাত করতে ওকে তেম্‌নি বাজত যেমন ধর্মভীরু লোককে বাজে ধর্মকে অনাদর করতে। তাই আমার সঙ্গে কত বিতণ্ডাই যে ও করেছে আমার এই চিরকেলে "শোচনীয়" অননুতপ্ত সময়-শৈথিল্য নিয়ে। কত সময়ে তাকে কত অসুবিধেতেই না আমি ফেলেছি—সে-বেচারির সময়ভীরুতার মর্য্যাদা রাখতে না পেরে। ইচ্ছে ক'রে নয় অবশ্য—আমার ধাতে নেই ব'লে। এতে ধরণীদা প্রথম প্রথম সত্যি দুঃখ পেত—সময়ে সময়ে স্নিগ্ধ হেসে এমনও বলেছে, আর্টিস্টদের সঙ্গে আগে মিশি নি কখনো তাই পদে পদে ঠেকি, তবু শিখি না। পাহাড়ি, ভীষ্ম ও জ্ঞান (ঘোষ) তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল—এদের গাফিলিতেও ধরণীদা কিছু কম ভোগে নি। কিন্তু আমরা বহুবার তাকে বিব্রত করলেও কখনো উদ্‌ব্যস্ত বা বিরক্ত ক'রে তুলতে পারি নি। চেষ্টার ত্রুটি করি নি—কিন্তু ওর সহ্যশক্তি ছিল যে অসামান্য, পেরে উঠব কেন বলো? শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর বাধে প্রায়ই—লড়াইও হয় তো সমানধর্মীদের মধ্যেই বেশি। কিন্তু জীবনের বিচিত্র বিধান—অসমপ্রকৃতির মানুষই সবচেয়ে বেশি মিলেমিশে থাকতে পারে পরস্পরের সঙ্গে! তাই ধরণীদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে একটিবারও মনান্তর হয় নি। ওকে আমি অসুবিধায় ফেলেছি অগুন্তিবার, কিন্তু আমার সব ঝক্কিই ও হাসিমুখে সইত। প্রথম প্রথম অবশ্য শিশুশিক্ষার পাঠ দিতে চেষ্টা করত, "মণ্টু, অমুককে কথা দিয়েছ অমুক সময়ে যাবে—দেরি কোরো না।" কিন্তু পরে হাল ছেড়ে দিয়েছিল—অথচ বিরক্তিভরে নয়—প্রায় ধরণীর জননীর স্নেহপ্রশ্রয়ভঙ্গিমায়।

সত্যি, ধরণীদার বাইরের শুষ্ক আবরণের নিচে ছিল তাঁর এই অতি কোমল প্রকৃতি। আমার ৺পিতৃদেব, এক মেশোমহাশয় গিরিশ শর্মা ও ৺অতুলপ্রসাদ ছাড়া কোনো বয়স্ক লোকের মধ্যে এমনতর কোমল হৃদয় কখনো দেখি নি। এই জন্যেই ও এত চেষ্টা করত সবাইকে সুখ দিতে—নিজে হাজারো অসুবিধা সইত হাসিমুখে। একটা উদাহরণ দিই।

আমি বাইরের দিকে খুব মিশুক হ'লেও অন্তরে যে সত্যিই নির্জনতাপ্রিয় তুমি অন্তত জানো। গানের পরেই আমার কাছে বিলাসের চরম হ'ল সময়ের অবকাশ ও সুপ্রচুর নিঃসঙ্গতা। ধরণীদা এটা জানত। তাই ওর সঙ্গে যখনই যেখানে গিয়েছি ও নিজে সবাইয়ের সঙ্গে ভিড় ক'রে থাকবে কিন্তু আমাকে একটি গোটা ঘর একা ছেড়ে দেবে। নির্জনতা ওর দরকার ছিল না, কিন্তু আমার ছিল এ ও বুঝত ও হৃদয়ের সহজাত দরদ দিয়ে।

শুধু আমার কথাই যে দরদ দিয়ে ভাবত তা নয় অবিশ্যি। সবাইকেই ও চাইত সুখ দিতে—তাই নানান্ ব্যস্ততার মধ্যেও ও ছদ্মবেশী হারুণ-অল-রশীদের মতন গোপনে সন্ধান নিত ওর কোন্ অতিথি-প্রজার কোন্‌খানে আরাম—কোথায় ব্যথা। লীলা পান ভালবাসে, ভীষ্ম পক্ষিমাংস, আমি সন্দেশ, জ্ঞান চিংড়িমাছ—ইত্যাদি প্রতি কথাটি ওর স্মৃতিকক্ষে বড় বড় হরফে টাঙানো থাকত। একটা উদাহরণ দেব? ধরো, গানের আসরে পাহাড়ি বড় জল খেত শিলঙে। আমরা তেমন খেয়াল করিনি,

শিলঙে ধরণীকুমার

কিন্তু ওমা দেখি কি—ধরণীদা কী আসরে গিয়ে এক জাগ্ জল নিয়ে ব'সে। কী? না, পাহাড়িকে পরিবেশন করতে হবে। গানের আসরে চাকর বাকরকে খেদিয়ে দিয়ে স্বহস্তে ট্রে হাতে ক'রে চা পরিবেশন করা তো ছিল ধরণীদার প্রায় নিত্য কর্ম। হয়েছে কি, ও লোকটি মুখে স্নেহ প্রকাশ করতে জানত না—উচ্ছ্বাসমুখর হৃদ্যতার রীতিতেও হাত পাকাবার অবসর পায় নি বহু কর্মের মাঝখানে। তাই ওর কোমল হৃদয়টি নিজেকে জানান দিত নীরব অলক্ষিত সেবার মধ্যে দিয়ে। একদিন দেখি কি, পাহাড়ির চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে দেখে ও নিজের শালের মধ্যে ঢেকে রেখেছে সদ্যোজাত এক পেয়ালা চা!

সেবার দুটো দিক আছে। একটা সামাজিক—একটা আধ্যাত্মিক। সামাজিক সেবার দিকটা ছোট নয়, মানি—

কিন্তু তার স্বধর্ম হচ্ছে নিজেকে ফাঁপিয়ে-তোলা। যা করব হৈ চৈ ক'রে করব—ধন্যবাদ দেব, গলদ্‌ঘর্মকলেবরে পরিবেশন করব—চাকরদের নিরবচ্ছিন্ন তর্জন করব কেন পরিচর্যায় গলতি হচ্ছে—এইধরণের "অমায়িক" ডাকসাইটে জাহিরি-পনার সঙ্গেই আমরা সচরাচর পরিচিত। এই সব যারা খুব লোক দেখিয়ে করে সমাজে তারাই তখমা পায়—"সেবাব্রত।" অন্তত আমাদের মধ্যবিত্ত তথা অভিজাত সমাজে।

কিন্তু ধরণীদার সেবার সহজ প্রবণতা ছিল আত্ম-গোপনের দিকে। ও ছোটখাট রকমারি ব্যবস্থা ক'রে রাখবে ভেবেচিন্তে—ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিষটি হাজির। কী ক'রে হ'ল? না ধরণীদা। আমাদের গানের আসরে ধরণীদা ভার নেবে হার্মোনিয়াম নিয়ে যাবার, তবলা নিয়ে যাবার, এমন কি তব্‌লা বাঁধবার হাতুড়িটি পর্যন্ত নির্ভুল পৌঁছবে যথাস্থানে। উৎসবান্তে এদের স্বস্থানে ফেরাবার অতি-গত্যময়, চির-বিরক্তিকর অথচ বহুবাঞ্ছিত কাজটিও ও-ই করবে। কিন্তু কাউকে জানিয়ে না, দেখিয়ে না, কোনো তারিফ পেতে না। বলতে কি, এসব আমরা খেয়ালই করতাম না বড় একটা। ট্রেনে যাব—কুলি, গাড়ি, টিকিট এসব দেখাশুনোর ভার যে ধরণীদার—এ এতই সহজ হ'য়ে গিয়েছিল যে আমাদের কাছে ভাবাই কঠিন হ'ত যে একাজ আর কেউ করতে পারে। আরে, আমার বাক্সের কোনোদিনো চাবি নেই—দেখি একদিন ধরণীদা কোত্থেকে একটা মিলারের তালা লাগাচ্ছে! অথচ এত সহজে যে ধন্যবাদ দিতেও রীতিম'ত বাধে। এই সেবা-সহজতা ছিল ওর একটা মস্ত চরিত্র-লক্ষণ। এই জন্যেই ওর কাছে সেবা নিতে কারুরই বাধত না। হয়েছে কি, সেবা নিতে কুণ্ঠা আসে তারই কাছে সেবা যার নয় স্বধর্ম। মোটরকে দ্রুত হাঁকাতে কার মমতা হয়?—দ্রুত না চালালেই বরং নজরে পড়ে। কিন্তু শীর্ণ পক্ষিরাজকে জোরে হাঁকাতে মায়া হয় না! ধরণীদাকে আমরা অননুতপ্ত চিত্তে খাটিয়ে নিতাম সেবার্থে গলদ্‌ঘর্মকলেবর হওয়ায় ওর গভীর আনন্দ ছিল ব'লে। বাঁশি বাজাই চড়া সুরে—গান গাইবার সময় বেশি চড়িয়ে গাইতে মন চায় না তেমন। যে ঢঙে যার লীলা সহজ সে-ঢঙকে মেনে নিতেও বাধে না। সেবার উঁচু পর্দায় ধরণীদার মনের তার সর্বদাই বাঁধা থাকত, তাই সে-তার-সপ্তকে ওর চরিত্রের তানালাপ খেলত এত সহজে। কেবল এই কথাটা এখানে মনে রাখবার যে যা দেখতে যত সহজ আসলে তত শক্ত। এরই নাম art conceals art : এরই নাম leaders are born, not made. ধরণীদা ছিল স্বভাব-সেবক—নিরভিমান, সদাস্নিগ্ধ অথচ আত্মবিজ্ঞপ্তি-বিরোধী। করবে সবই, পানটি থেকে চুনটি খসতে দেবে না, অথচ কেউ টেরটি পাবে না কার স্নেহনিবিড় অভিনিবেশে সব চলছে জলের ম'ত। তাই বলছি ধরণীদার সেবা আধ্যাত্মিক পর্যায়ে পড়ে—যেহেতু এ সেবা ছিল ওর অন্তরাত্মার কনকোজ্জ্বল স্নেহের উচ্ছ্বলিত উৎসার। অতুলদার মতন লোক সেবা করতে পারবেন না—করবেন যে তা ভাবাও যায় না। এঁদের স্বধর্ম সেবা দেওয়া নয়—আনন্দ দেওয়া, তাই অতুলদা সেবা করতে এলে মন কুণ্ঠিতই হ'ত। তাঁকে মানাত না এসব—একেবারেই না। যার কম তারে সাজে—অপিচ যে পারে সে আপ্‌নি পারে।

* * *

* * * *

ধরণীদার কথা কত বলব? খুঁটিনাটি ক—ত কথাই যে রয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে আমি নিজে এত ব্যক্তিগতভাবে জড়িত যে বলতে বাধে। কেবল একটা কথা বলতেই হবে—ওর শ্রদ্ধা করবার অপরিসীম শক্তি।

তুমি মর্মে মর্মে জানো, রাণী, এযুগের জলহাওয়া কি রকম প্রতিকূল দুটি হৃদয়বৃত্তির : এদের নাম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। এযুগের একটা তথাকথিত মহৎ বাণী হ'ল ইন্‌ডিভিডুয়ালিস্‌ম্‌। এ মনোবৃত্তিটির মধ্যে কিছু সত্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু বলব এর গোড়ায় (সব সময়ে না হ'লেও) খুব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে একটা বিপুল আত্মস্ফীতি। শ্রীঅরবিন্দ তোমারও গুরু—তাই তুমি জানো একথা নিজে ঠেকে। কারুর কাছে মাথা হেঁট করলে পুরুষকারের মাথা হেঁট। হিরো-ওয়র্শিপ। ধিক্‌!

তুমি জানো আমার অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত বন্ধুর সঙ্গেই গভীরে আমার কতখানি অমিল—এখানে আমি কী একলা! মনে আছে দার্জিলিঙে ওবছর এক শিক্ষিতা বর্ষীয়সী আমাকে সিংহিনীবিক্রমে কোণ্‌ঠেসা ক'রে ধরেছিলেন

—"দিলীপ, তুমি তো খুব বোকা ছেলে নও—তবে গুরুকরণের এ দুর্মতি কেন হ'ল বৎস ?"

"দুর্মতি কেন ভদ্রে ?"

"বাঃ !—ইনডিভিডুয়ালিটি যে ছারেখারে গেল ! গুরুকে তুমি না কি পূজা করো ?"

"করি ভদ্রে। প্রতিমাকেও করি। আমার মধ্যে তাল পরিমাণ মন্দ আছে নিশ্চয়ই -কিন্তু কেউ কেউ বলেন তিল পরিমাণ ভালোর ছিটেফোঁটা হয়ত লুকিয়ে থাকতেও পারে বা। সেটুকুর আবির্ভাব হয়েছে এই গুরুপূজায়ই—পৌত্তলিকতায়ই—মহতের চরণে প্রণামে—হিরো ওয়র্শিপে।"

"এ অগ্রসারী (progressive) যুগে এমন রিয়াক্শনরি কথা জাঁক ক'রে বলার নাম বাহাদুরি নয়—মূঢ়তা। ধিক্।"

"নাম নিয়ে রাগারাগি কেনই বা ভদ্রে ? আমি তো মেনেই নিয়েছি আমি স্বভাবে অননুতপ্ত পৌত্তলিক। কিন্তু গাছের নামডাক কি বীজ-বিচারে না ফল-বিচারে ?"

"গুরুপূজার কুফল মানো না ?"

"কী কুফল ?"

"ইনডিভিডুয়ালিটির মূলোচ্ছেদ।"

"আচ্ছা ভদ্রে ! আমাকে পুঁথিপড়া শিশুপাঠের পাঠ না দিয়ে একটা সাদা উত্তর দেবেন ?"

"দেব।"

"বিবেকানন্দ স্বামীর চরিত্রে ফুটেছে কী ? দুর্বলতা, না তেজস্বিতা ? আর তিনি সবচেয়ে জাঁক ক'রে বলতেন কোন্ কথাটি ? -'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি দৃষ্টিতে লাখো বিবেকানন্দ গ'ড়ে উঠতে পারত'—এই কথাটিই নয় কি ? এ-ও কি আপনি জানেন না যে তাঁর জীবনে বিপ্লব ঘ'টে গিয়েছিল শুধু ঐ নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে পৌত্তলিক গুরুটির দীক্ষায় ও দৃষ্টান্তে ?"

*　　*　　*　　*

আধুনিক মানুষ—বিশেষ ক'রে শিক্ষিত মানুষের কাছে একথা পেশ করা কঠিন। অন্তত বেশির ভাগ প্রগতিশীল উচ্চশিক্ষিতের কাছে তো বটেই। কারণ তাঁরা প্রায়ই ভোলেন যে সত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিকষ বুলি বা ডগ্‌মা নয়—অভিজ্ঞতা। এ-বর্ষীয়সীটি আমাকে এ-ও বলেছিলেন যে, সন্ন্যাসী হওয়া মহাপাপ। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তা হ'লে আপনি কি অকুতোভয়ে বলবেন যে বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ছিলেন পাপিষ্ঠ ?" কি জানো রাণী ? অধিকাংশ চিন্তাহীন মানুষ দু-চারটে চল্‌তি মনগড়া আ-প্রায়রি থিওরির গজকাঠিতে সমস্ত জীবনকেই মাপতে চায়। তাছাড়া যুক্তিবাদ সহজ, শ্রদ্ধাবাদ কঠিন। তাই আধুনিক শিক্ষিতম্মন্যরা শ্রদ্ধার মর্মবাণীটিই বিশ্বাস করেন না—বলেন যে, আমার আমিত্ব রসাতলে যায় ভক্তির ভূমিকম্পে। এ-যুগে লয়ালটি শব্দটি প্রায়ই অনাদৃত এই কারণেই। যাকে যার প্রাপ্য দাও—রাজি, কিন্তু ভক্তি করা, পথসন্ধানে দিশারি খোঁজা—এ সব কী সেকেলিয়ানা শুনি ! ভক্তির যুগ যে মিরাক্লের যুগের মতনই গত। এ যে নয়া আলোকের যুগ—গেটে বলেননি—"আরো আলো আরো আলো ?" মানে, ইনডিভিডুয়ালিটির আলো।

এ নিয়ে তর্কাতর্কি করতাম এক সময়ে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বেড়েছে কি-না বলতে পারিনে, তবে ব্যর্থশ্রম যদি নির্বুদ্ধির নিদর্শন হয় তবে যৎসামান্য সুবুদ্ধি বেড়ে থাকবে বা। অন্তত এটা বুঝেছি যে, একজনের অন্তরের গভীর তৃষ্ণা আর একজনকে তর্ক ক'রে বোঝানো যায় না—যার নেই সে-তৃষ্ণা। এই জন্যেই গীতায় বলেছে : "ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন, ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি"—অর্থাৎ গভীর কথা গভীর সুরে বলতে নেই তাদেরকে—যারা চায় না শুনতে, যারা বিশ্বাস করে না ভক্তিকে, বুঝতে পারে না তপস্যাকে।

ধরণীদার মজা ছিল এই যে, সে বাইরে গুরুবাদী ছিল না—কিন্তু অন্তরে ছিল পূজাধর্মী। তাই শ্রীঅরবিন্দর নাম করতে তার চোখ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ছল ছল ক'রে উঠত। "সাধুসঙ্গ" কথাটি সে প্রায় জপমন্ত্রের মতনই উচ্চারণ করত। আমি জানি এ নিয়ে কত শিক্ষিতম্মন্যের কাছে ওকে কত কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু তবু ওর এ উজ্জ্বল বিশ্বাস একটুও ঝাপসা হয় নি যে সাধুসঙ্গ খুব দরকার। গত বছর যখন তোমাদের তদারকে ধরণীদা, হাসি ও লীলাকে এলাহাবাদে পাঠায় তখন ও আমাকে একটি চিঠি লেখে। চিঠি ও বড় একটা লিখত না—দীর্ঘ চিঠি তো নয়ই। কারণ কোনো কথা গুছিয়ে বলা ওর স্বধর্ম ছিল না। কিন্তু তবু ওর সহজ ভক্তিতে একটা কথা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল ওর পত্রে। আদরিণী কন্যাকে একলা ও বাইরে কখনো পাঠায় নি এর আগে। সে সময়ে এলাহাবাদে ছিল আমার প্রিয় বন্ধু

জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ওরফে রোনাল্ড্ নিক্‌সন। ধরণীদা লেখে—হাসি এই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গ পাবে এ-লোভ সংবরণ করা কঠিন—তাই হাসিকে জোর ক'রেই পাঠাল তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ওর শ্রদ্ধাশীলতার আর একটি দৃষ্টান্ত দেই। আমার কোনো আত্মীয়া কিছুদিন আগে ধরণীদার কাছে এসে শ্রীঅরবিন্দর ও আশ্রমের খুব নিন্দা করে। আমি ধরণীদাকে লিখি—এ সব কথা আদ্যন্ত মিথ্যা—তবে বিশ্বাস করা না করা তার হাত—আর কারুর নয়। তাতে গত ডিসেম্বরে ধরণীদা আমাকে আর একটি চিঠি লেখে। তাতে ছিল—"মণ্টু, আমি স্বভাবে ধার্মিক না হ'তে পারি—কিন্তু খাঁটি সোনা ও মেকি গিল্টির তফাৎ চিনি। সে যা যা বলেছে তার একটি কথাও আমার মনকে ছোঁয় নি—যেদিন ফের সুযোগ পাব শুধু যে হাসিকে পাঠাব তা-ই নয়—নিজেও যাব শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে।"

তাই বলছি ধরণীদার প্রকৃতিতে ভক্তি ছিল সহজ। নিজের পিতামাতাকে সে অত্যন্ত ভক্তি করত—তাই যেখানেই এ শ্রেণীর ভক্তি দেখত বিচলিত হ'ত। আর সে শুধু একটু আধটু মামুলি নমো-নমো নয়—ওর মূল শিকড় অবধি টনটনিয়ে উঠত। একটা দৃষ্টান্ত দেই এ কথার।

উষার কথা বলেছি। এ ধরণের মেয়ে আমি ওদেশেও খুব কমই দেখেছি। তীক্ষ্ণধী,সংশয়শীলা (যেহেতু বিদুষী) অথচ স্বভাব-ভক্তিমতী। আধুনিক টলারান্স ওর মজ্জায় না হোক—রক্তে। কাজেই বেচারি সেকেলে ভক্তির সঙ্গে আধুনিক বিদ্রোহের সামঞ্জস্য করতে বিষম বেগ পায়। শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়ে গভীর ভক্তিভরে—অথচ হাল আমলের প্রগতিশীলদের সঙ্গে তর্কে এঁটে ওঠে না—যখন তারা চোখা চোখা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে ভক্তি হ'ল সেকেলে কুসংস্কার—সংসারে একমাত্র সত্য হচ্ছে বল্‌শেভিস্‌ম্ ও বুর্জোয়া আদর্শগুলিকে নির্বিশেষে নির্বংশ করা।

এহেন এক কালাপাহাড়—উষাকে একদিন বলেন যে শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সবই নির্বোধ তথা ভণ্ড—যেহেতু পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খাওয়া এদের পেশা—ইত্যাদি অকথা কুকথা।

উষা স্বভাব-সহিষ্ণু, বলেছি। দুর্মুখমহোদয়ের এ ধরণের গালিগালাজ নীরবে শুনে গেল। সেদিন দুপুরে এসে খাওয়ার টেবিলে করল এ গল্প আমাদের সবাইয়ের সামনে। বলশেভিক ভদ্রলোকের অন্য অন্য মহাজন কুৎসা এতই নোংরা যে উদ্ধৃত করতেও সাধ যায় না। কিন্তু এ ধরণের কথা উষা বিনা প্রতিবাদে শুনে গেল এতে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। ধরণীদা বলল: "তা উষা কী করবে বলো? এ ক্ষেত্রে তর্ক ক'রে তো ফল নেই। যার যা মত।"

আমি উত্তপ্তকণ্ঠে বলেছিলাম: "ধরণীদা, উষা শ্রীঅরবিন্দকে নিজের গুরু ব'লে যদি না মানত আমি তোমার টলারাণ্ট নিরীহবাদে সায় দিতাম। কিন্তু যাকে গুরু বলি, সহিষ্ণুতার থিওরি মেনে তার নিন্দা শুনে যাওয়ায় প্রত্যবায় ঘটে। কেউ যদি তোমার বাবা মাকে এ ভাবে নিন্দা করত, সইতে তুমি এ উদার থিওরি মেনে? গুরুবাদের গোড়াকার কথা এই যে, গুরু সবার বড়—বাপ মা, ভাই বোন, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব কেউ তাঁর আগে না।"

ধরণীদা শুনে চম্‌কে ওঠে। পরে বলে লীলাদের সবাইকে: "কথাটা এভাবে আমি ভেবে দেখি নি কবুল করছি। সত্যিই তো আমার বাবা মাকে নিয়ে যদি কেউ এ রকম জঘন্য ভাষায় আলোচনা করত তা হ'লে আমি যে অহিংস থাকতাম না এ ধ্রুব। দিলীপের কথাকে তাই শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না—যেহেতু গুরুকে ও পিতারও অধিক মনে করে।"

উষাও বোঝে তৎক্ষণাৎ। বিকেলে আমাকে লেখে এ নিয়ে অনুতপ্ত হ'য়ে—প্রতিজ্ঞা ক'রে যে, গুরুনিন্দা আর কখনো শুনবে না।

উষাও ধরণীদাকে আন্তরিক ভালোবেসেছিল এই জন্যেই: মানে, ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রবণতায় ওদের গভীর মিল ছিল ব'লে। ধরণীদার মৃত্যুর পরে উষা, আমাকে লেখে:

"হাসিদের দুঃখের সাথে আজ আমার দুঃখ এক হয়ে গিয়েছে দিলীপদা, আমিও যে পিতৃহীন। ধরণীদাকে চিনেছিলাম এ-কয়দিন যে, তাঁর কাছে এসে তাঁকে জানতে পেরেছিলাম এর জন্যে ভগবানের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। তাঁকে যে আমি কত শ্রদ্ধা করেছিলাম আমার মা যে তাঁকে কত ভালোবেসেছিলেন তা কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দিলীপদা?"

শুধু উষাই নয়। এবার শিলঙে আমাদের বিরতিহীন

আনন্দোৎসবের সূত্রে যে-ই ধরণীদার কাছে এসেছিল সে-ই মুগ্ধ হয়েছিল তাঁর স্নেহসদয় আচরণে, আন্তরিক অভ্যর্থনায়। দীপ নিভবার আগে জ্ব'লে ওঠে ব'লে একটা প্রবচন আছে না? ধরণীদার সুন্দর চরিত্র শিলঙে শত দাক্ষিণ্য-শিখায় জ্ব'লে উঠেছিল যেন এম্নি ভাবেই। তার কারণ তার চরিত্রের অশেষ সদ্গুণ ও স্নেহকারুণ্য ক্ষেত্র পেয়েছিল নিজেদেরকে বিলিয়ে যাবার, জানান দেবার। বিশেষ ক'রে খুঁটিনাটিতে তাঁর নিরভিমান সদা-সজাগ স্নেহপরিচর্যা সবাইকে এমন মুগ্ধ করেছিল। গান তিনি আগে ভালোবাসতেন না তেমন—ওস্তাদি গান তো নয়ই। কিন্তু আদরিণী কন্যার অসামান্য গীতিপ্রতিভার দীক্ষায় তাঁর সাঙ্গীতিক রুচি এতই উন্নত হয়েছিল যে ভীষ্মর ওস্তাদি গানও তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতেন কাজ টাজ সব ফেলে। তাঁর কাছে আমরা সবাই পেয়েছি অজস্র। প্রতিদানে দিতে পেরেছি সামান্যই। শুধু এইটুকু সান্ত্বনা রইল যে আমরা গানে-উদাসীনকে গান ভালোবাসার আনন্দদীক্ষা দিতে পেরেছিলাম খানিকটা। তিনি ছিলেন আমার পরম বন্ধু। তাই তাঁকে আমার এই পরম উপলব্ধির অংশীদার করতে পেরে আমি ধন্য হয়েছিলাম।

তিনি আমার আনন্দের সরিক ছিলেন না—ছিলেন একজন মস্ত সহযোগী ও সহায়। আমার সত্যিকার বন্ধু বা স্বজন খুব বেশি নেই তুমি জানো। অবশ্য মৌখিক বন্ধু ও আত্মীয়তাকামী সংসারে অগুন্তি—কিন্তু যে friend in need-কে সাহেব-পুরাণে বলেছে খাঁটি বন্ধু সে রকম বন্ধু স্পর্শমণির ম'তই বিরল। ধরণীদা ছিলেন এই বিরলদেরই অন্যতম—খাঁটি সোনা। তাই তাঁর সঙ্গে আমার সখ্য-সম্বন্ধের নানা কথা বলতে বাধে—তার দরকারও দেখি না। কেবল একটা ঘটনা বলি সকুণ্ঠে। এবার শিলঙে স্নিগ্ধহৃদয় বন্ধু পাহাড়ি একদিন বলে ধরণীদাকে: "দেখ তো ধরণীদা, মণ্টুদার জালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। একেই আমি মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, নিজের চা পার্টির জলশার ঝক্কি সামলাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত—এদিকে মণ্টুদা লোক লেলিয়ে দেয়—যাও পাহাড়িকে নেমন্তন্ন ক'রে এসো গানের আসরে। না বলতেও বাধে—"

ধরণীদা বাধা দিয়ে হেসে বলল: "ঐ তো পাহাড়ি। ঐ গরু রোগেই ঘোড়া মরেছে—আমারও অবিকল ঐ অবস্থা। ও যেখানে যেতে বলবে আমাকে যেতেই হবে—যতই শরীর খারাপ থাক—অনিচ্ছা থাক—অসুবিধা হোক্—ও পাগ্‌লাটার মুখের দিকে চাইলে না বলা যায় না জানোই তো।"

একথা উদ্ধৃত করতে সত্যই কুণ্ঠা বোধ করছি। তবু উল্লেখ করলাম শুধু দেখাতে, স্বল্পবাক্ ধরণীদার স্নেহপ্রীতি কি ধরণের অন্তঃশীলা ছিল। অথচ বলেছি, আমি তাঁর বন্ধুত্বের জন্যে কোনো চেষ্টাই করি নি, বা ভাবিনি যে এমন না চাইতে পাব। তবে জীবনের সব শ্রেষ্ঠ দানই তো পাই আমরা আকাশের দাক্ষিণ্যে, আলোর ঔদার্যে।

কেবল একটা বেদনা বাজে তবু।

এহেন স্নিগ্ধ সত্যনিষ্ঠ খাঁটি পরোপকারী নিরভিমান মানুষটি কী যন্ত্রণা পেয়েই যে দেহত্যাগ করল রাণী! আর কী পরিবেশে! একটু বর্ণনা না করলেই নয়—কেন না ধরণীদার মহত্ত্বের ছবিটি ফোটাতে এ বর্ণনার প্রয়োজন আছে।

আমরা সদলবলে শিলঙ রওনা হবার দিন তুমি ষ্টেশনে গিয়েছিলে। মনে আছে তোমার—কী আনন্দ নিয়ে রওনা হয়েছিলাম আমরা সাতজন—ধরণীদা, প্রভাদি, লীলা, বাবুল, উমা, রুনু ও আমি? ট্রেনে উঠতেই দেখা বিখ্যাত অস্ত্রভিষক্ শ্রীললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে। তখন কে জানত ফের তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কোথায় ও কী ভাবে।

শিলঙে গিয়ে আমরা উঠেছিলাম কোথায় তুমি জানো—ধরণীদারই তৈরি রেইনফোর্স্‌ড্-কংক্রীটে-গাঁথা সুরম্য অট্টালিকায়। তোমাদের বাড়ির কাছেই।

সেখানে বন্ধুবর পাহাড়ি সান্যালের অভ্যুদয়। সঙ্গে তাঁর পত্নী সুবাসিনী সুহাসিনী মীরা। দুজনে চেঞ্জে গিয়েছিল ছুটিতে। "চেঞ্জ" চুটিয়েই হ'ল বৈ কি—তবে ফর্ দি বেটার্ কি-না সে বিচারের ভার কার উপরে জানি না।

পাহাড়ির আবির্ভাবে পাহাড় আরও সরগরম হ'য়ে উঠল। জায়া মীরা পতির ছায়া হ'য়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা আমাদের ওখানেই কাটাত। শেষে এমন হ'ল যে, (ধরণীদার ও প্রভাদির স্নেহাধিক্যে) ওরা দুবেলাই আমাদের এখানে খেত। পতির মুখে শুনতাম কত যে হাসির গল্প—পত্নীসংক্রান্ত। বললে: "জানো মণ্টুদা, মীরা কী ওরিজিনাল ইংরাজি বলে? এক বাড়িতে গিয়েছি, সেখানে সবাইয়েরই

একটু অল্পবিস্তর ভুঁড়ি আছে। নীরা বলল ফিশফিশিয়ে—'দেখেছ, এ-পরিবারে ভুড়িটা কী কম্পালসরি!'" ব'লে সে কী হাসি! হাসতে ওর জুড়ি মেলা ভার। উর্দু গল্প ও যে কী চমৎকার বলত! আর এ ও পারত ধরণীদার আনন্দ-সহযোগে—সপরিবারে হাস্যোৎসাহে।

পাহাড়ি তব্‌লাও বাজায় সুন্দর। উমা গাইত হয় ভীষ্মর শেখানো খেয়াল, নাহয় আমার শেখানো বাংলা বা হিন্দি গান। পাহাড়ি ওর গানে এতই মুগ্ধ হ'য়ে গেল যে রোজই তবলা ধরত বাকায়দা বেঁধে—প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক ক'রে সময় আমরা ওর এই তবলা বাঁধার জন্যে বাদ দিয়ে রেখেছিলাম। কাজেই আমাদের অহোরাত্র ছিল আসলে তেইশ ঘণ্টা ব্যাপী।

ক্রমশ আমাদের দল আরো পুরু হ'ল: ধরণীদার অতিথি হ'লেন আরো চারজন :—তাঁর মেজ শ্যালক শীতাংশু—এর কথা বলেছি গত সংখ্যায়, লীলাকে ক্ষ্যাপানোয় এর জুড়ি নেই সত্যিই—রসবোধে তথা দরদেও এর চরিত্র মনোরম; তাঁর ছোট শ্যালক শুভ্রাংশু—এর যেমন প্রিয়দর্শন কান্তি, তেম্‌নি মধুর স্বভাব ও উজ্জ্বল বুদ্ধি; স্বনামধন্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ—এর মতন গিটারী সারা ভারতে আছে কি না সন্দেহ, তেম্‌নি তবল্‌চি, তেম্‌নি হার্মোনিয়মী; আর আমাদের সর্বকর্মপণ্ডকারী মণিময় ওরফে লাটু—যার স্বধর্ম বিনা মূলধনে সব্বার কাছ থেকে খাতিরের সুদ আদায় করা: আশ্চর্য এই যে ওকে এই আক্রাগণ্ডার দিনে সবাই অম্লানবদনে চড়া হারে সুদ দিত না কর্জ ক'রে! আঁতুড় ঘরে বিধাতাঠাকুর নিশ্চয় ওর ললাটে লিখেছিলেন:

যদিও তোমার নেই মালা হার তিলক কবচ কুণ্ডল—
টিপ্পনি রণে শিশু তব সনে যে যুঝিবে হবে দুর্বল।

ভীষ্মর আসার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে লিখল ফিলম-জগতে দু-দুটো ছবি রুখে উঠেছে আত্মপ্রকাশ করব ব'লে—সুতরাং মণ্ট্‌দা, মাফ করবেন ইত্যাদি। এ মধুর-চরিত্র অপূর্ব গায়কটির গীতিশক্তি ছাড়াও আর একটি আশ্চর্য শক্তি আছে—ভোজনশক্তি তথা ভোজ্য বর্ণনা। আহা পক্ষি-মাংসের গুণকীর্তনে ওর কণ্ঠে গান উছ্‌লে ওঠে: "কত কত ভালোবাসা গো মা মানব সন্তানে, মনে হ'লে প্রেমধারা বহে দুনয়নে!" ধরণীদা নিত্য ওর কথা স্মরণ ক'রে আমাদের অজস্র দানাপানির সরবরাহ করার সময়ে বলত:

(আহা!)

ভীষ্ম এলোনা খেতেও পেল না এই র'য়ে গেল দুঃখ।
নাম যার হেন—তার বলো কেন বুদ্ধি হ'ল না সূক্ষ্ম?
ছুটি-অবকাশে কেন সে না আসে খাওয়া যার কাছে মুখ্য?
যত ভাবি তার গাফিলি—আমার মেজাজ হয় যে রুক্ষ।

যাই হোক্, সিলচরে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল এক সঙ্গীত সভায় যোগদান করবার। পথে সিলেটেও নিমন্ত্রণ "প্রগতি সঙ্ঘে" তথা "সংস্কৃতি মণ্ডলে"। ওরা বলল সাহিত্য সঙ্গীত দুয়েরই উদ্বোধন করতে হবে আমাকে। তথাস্তু ব'লে সিলেট রওনা হ'লাম চৌঠা জুলাই মোটরে।

সিলেটের পথ অতি সুদৃশ্য। কেবল দুঃখ এই মেঘরাজ সদলে হানা দিলেন—কেউ কিছুই দেখতে পেলাম না।

পথে কী যে কষ্ট! অমন ঘোরালো পার্বত্যপথ কখনো দেখিনি। শীতাংশুর ও রুণুর অন্নপ্রাশনের অন্ন এল উঠে। লাটু, শুভ্রাংশু ও আমার অবস্থাও তথৈবচ। বাকি সবাই ছিল খাড়া হ'য়ে কোনোমত প্রকারে। কেবল ধরণীদা ছিল—পূর্ণোৎসাহী বিমলকরুণাবন্দনে দীপ্তকণ্ঠঃ।

সমতল ভূমিতে নেমে আমাদের বাঙালি প্রাণ উঠল গান গেয়ে। খরস্রোতা নীলাঞ্চলা ডাহুকি নদীতে পাহাড়ি, আমি ও লাটু স্নান করলাম। কী মধুর জল আর কী সে দৃশ্য! আহা!

সিলেটে উঠলাম ওখানকার বিখ্যাত বর্ধিষ্ণু ডাক্তার শ্রীহোসেন পাল মহাশয়ের ওখানে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী শান্তিলতা দেবী আমাদের তেরজন যাত্রীর কী সেবাটাই যে করলেন! বিশেষ ক'রে শান্তিলতা দেবীর শান্তশ্রী কল্যাণী মূর্তি ভুলবার নয়।

ধরণীদা সেখানে ঐ ভিড়ের মধ্যেও নিজে সবাইয়ের সঙ্গে শুল কষ্ট ক'রে—আমার জন্যে ছেড়ে দিল সবচেয়ে ভালো ঘর ও মশারিওয়ালা খাট। এ ওর স্বভাব—আমি যত বলি না না না না, ও তত বলবে হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ।

সিলেটে যাহোক দিলাম একটা বক্তৃতা। পরে উমা ও আমি গাইলাম, পাহাড়ি তবলা বাজালো, জ্ঞান—হার্মোনিয়ম।

পরদিন রওনা হ'লাম সিলেট—বাসে ক'রে—৫ই জুলাই—সকাল সাতটা।

* * * *

ধরণীদা আমাকে দিল ফের শ্রেষ্ঠ আসন—সারথির বাঁ পাশে। পা মেলে বসা যায়। আমার ঠিক পিছনে পাহাড়ি, তার ডাইনে জ্ঞান, তার পর লাটু, তার পর হাসি, লীলা ও মীরা। তৃতীয় পংক্তিতে একেবারে বাঁ দিকে—অর্থাৎ পাহাড়ির ঠিক পিছনে ধরণীদা, তাঁর পাশে শীতাংশু, তার পর শুভ্রাংশু, বাবুল, কুমু ও প্রভাদি। সব পিছনে দুটি চাকর, সিলচরের গাইড, আর একটি লোক, সারথির বন্ধু হবে। একুনে আঠার জন।

বলা বাহুল্য বাসের ছাদেও হিমালয় প্রমাণ মাল স্তূপীকৃত।

গাড়ি চলল হু হুশ্ শব্দে। চমৎকার রাস্তা—সুর্মা নদীর পাশ দিয়ে। বর্ষা কালের "উচ্ছল জলদল কলরব!" দুধারে ধানক্ষেত, সবুজ গাছ পালা; কৃষাণের কুটীর খাত বিল ডোবা নালা। লাল রাস্তা—সমতল। ঝাঁকুনি লাগে কদাচ। আর একেবারে সোজা। একটিও বেঁক নেই কোথাও। পাহাড়ি ও জ্ঞান আমার পিছনে ব'সে আহিরি টোড়ি আলাপ করছে তার-স্বরে, আর কদরদান লাটু তার বিনা মূলধনী কারবার চালাচ্ছে শুধু বাহবাধ্বনির নিখর্চা বখশিসের হরির-লুটে। আমি দেখছি—বাসের কাঁটা কাঁপছে ৪০ থেকে ৪৫ মাইলের মধ্যে।

হঠাৎ একটা বেঁক। সারথি নিশ্চয় জানত না—নইলে গতি মন্দা করত। কিম্বা হয়ত আন্‌মনা ছিল। কারণ যাই হোক ঐ উল্কাবেগেই সে বেঁক নিল। গাড়ি বেঁকল ঐ—ঐ—ঐ। ব্রেক কষল। পিছনে ক্রন্দন আর্তনাদ কানে এল। গাড়ি টাল সামলাতে না পেরে একবার সমারসল্ট খেয়ে ছাদহারা হ'য়ে মালপত্র প্রায় সব ডুবিয়ে পড়ল বাঁ দিকে একটা ডোবায়—বাঁ কাতে। আমি ঘোর বেগে ছিটকে পড়লাম আমার বাঁ কাঁধের উপর। হাড়টা ভেঙে যায় নি এ আশ্চর্য, গেলে উঠতে পারতাম না হয়ত। বুকেও চোট লাগল হাঁটুতেও, রগেও এক জায়গায় খুব কেটে গেল—রক্তে মুখ ভেসে গেছে। গাড়িটা একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে গেছে বললে সত্যিই একটুও বাড়ানো হবে না। ছাদ উড়ে গিয়ে, চাকা ভেঙে, তাল পাকিয়ে তার চেহারা যা দাঁড়াল—দেখলে কে বলবে কোনোকালে এ-পিণ্ডটার কোনো রূপ মূর্তি ছিল।

কিন্তু সব ভুলে গেলাম মেয়েদের কান্না শুনে। তাড়াতাড়ি উঠে পিছল কাদায় ডোবায় নামবার চেষ্টা করছি আগে ছোটদের ওঠাতে—কিন্তু এত কাদা পা দাঁড়ায় না। দেখি সাম্‌নে লাটু নেমেছে, বলছে—মেয়েদের তোলো তোলো। পাহাড়িও উত্তীর্ণ—বলছে—"কিচ্ছু ভয় নেই।" দেখতে দেখতে প্রায় দশ পনের জন গ্রামবাসী লাফিয়ে পড়ল ডোবাটার মধ্যে ও একে একে তুলল সবাইকে। লীলার চোখের নিচে কেটে গেছে, কমুয়ের কাছেও। উমার হাত কেটে গেছে। মীরার কপাল হাত কব্জি বেয়ে রক্ত পড়ছে। কেবল শুভ্রাংশুকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে অজ্ঞান হয়ে ডোবার জলে ডুবে ছিল খানিকক্ষণ। যাহোক গ্রামবাসীরা সবাইকেই যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ডাঙায় টেনে তুলল।

কিন্তু সব গোলমাল থম্‌কে গেল ধরণীদাকে দেখে। সবাইয়েরই অল্প বিস্তর চোট লেগেছে, কিন্তু সাংঘাতিক লাগল শুধু ঐ একটি মানুষের। পাঁজরার পাচ পাচটা হাড় ভেঙে গেছে, কণ্ঠারও একটা। পাহাড়ি প্রথম চেঁচিয়ে ওঠে: "ধরণীদাকে সব আগে তোলো।" কারণ ধরণীদা উঠতে পারছিল না—ধরণীদা পাহাড়ির দিকে চেয়ে বিস্ফারিত নেত্রে বলছে "পাহাড়ি—I am undone."

সবাই মিলে ধরণীদাকে তুললাম কাছের একটা ডিস্পেন্সারিতে। পাড়াগেঁয়ে ডিস্পেন্সারি—মেটো ঘর।

দেখি, ধরণীদার বুকের পাঁজরা ক'টা ভেঙে ভিতরের দিকে একেবারে ঢুকে গেছে। বুকটার মাঝখানে গত। নিঃশ্বাস ফেলছে—হাপরের মতন—থাক সে বর্ণনা। উমা প্রভাদি লীলা প্রভৃতির অবস্থাও বর্ণনীয় নয়—কল্পনীয়।

কাছেই ছিল পোস্ট্ আফিস—নইলে চক্ষে অন্ধকার দেখতে হ'ত সে-বিভূঁয়ে। গ্রামটির নাম চুরখাই। সিলেট থেকে মাইল কুড়ি হবে। টেলিফোন নেই—তার করা হ'ল হোসেন পাল মহাশয়কে। ঘণ্টা খানেক বাদে তিন-চার খানি মোটর নিয়ে এলেন ডাক্তার হোসেন পাল, ডাক্তার সেন, ডাক্তার কর ও মহিরুদ্দিন সাহেব। আরো হয়ত কেউ এসে থাকবেন মনে নেই। এ ঘণ্টাখানেক আমাদের যে ভাবে কেটেছিল তার পরে স্মৃতিশক্তির কোন ভুলকেই ভুল মনে হয় না।

ডাক্তার সেন আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে যা

বললেন তার মর্ম এই যে, ধরণীদার জীবনের কোনো আশাই নেই, দুধারের ফুশফুশই জখম হয়েছে—তাই এত নিশ্বাসের কষ্ট ইন্‌টর্নল হেমরেজের দরুণ।

আহা! সে কী কষ্ট! চোখে দেখা যায় না। অথচ আশ্চর্য এই ধরণীদার মস্তিষ্ক স্বচ্ছ—কথায় নেই একটুও জড়তা।

কিন্তু যারা এ দৃশ্য দেখছে পাশে ব'সে, তাদের বুকের মধ্যে না জানি কী হচ্ছে! বিশেষ ক'রে প্রভাদির ও উমার! চোখের জলে বুকের বেদনার কতটুকুই বা ধরা দেয়!···

ধরণীদার আর্তধ্বনি শুনতে শুনতে একথা আরো মনে হচ্ছিল। এ-বর্ণনার পালা তাই সাঙ্গ করি। কেবল এইটুকু বলবার মতন যে ঐ অসহ্য যন্ত্রণায়ও ধরণীদা কান্নাকাটি করেন নি; এমন কি সারথিকেও অভিশাপ দেন নি, বারবারই জিজ্ঞাসা করেছেন কে কেমন আছে। একটি বুড়ি ওঁকে পাখা করছিল। আমরা তাকে সরিয়ে দিতে যেতে ধরণীদা বলল: "আহা, থাক ও বড় ভালোবেসে পাখা করছে।"

দুবার বলেছিলেন "শ্রীঅরবিন্দ।"

শ্রীঅরবিন্দকে তার করলাম ধরণীদার আত্মার শান্তির জন্যে।

* * * *

হাসপাতালেও ধরণীদা মৃত্যুর খানিক আগেও বলেছিল নার্সদের (আমার সাম্‌নে): "I am causing so much trouble to the hospital—sorry, but I can't help it."

* * * *

সকাল আন্দাজ আটটার সময় মোটর দুর্ঘটনা ঘটে—ধরণীদা মারা গেলেন বেলা দুটোর কাছাকাছি। পরিবারবর্গের শোকের কথা বর্ণনীয় নয়—কল্পনীয়।

* * * *

লোকে লোকারণ্য। সবাই কত যে করেছিল। টেলিফোন করা হ'ল বিধানবাবুকে কলিকাতায়, ললিত-বাবুকে শিলঙে। ললিতবাবু মোটরে তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন। পৌছলেন শিলঙে সন্ধ্যা ছটার সময়ে।

* * * *

শিলচরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীগুরুপ্রসাদ বড়ুয়া আমার তার পেয়ে স্ত্রী ও কন্যা লিলিকে নিয়ে এলেন। লিলির সঙ্গে আমার চিঠিতে ও টেলিফোনে ট্রাংক কলে আলাপ ছিল। লিলির সখী উষা ওর কথা প্রায়ই বলত। লিলিও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি গভীর ভক্তিমতী। বলল আমাকে একটি বড় আশ্চর্য স্বপ্ন:

"দিলীপদা, কাল রাতে আমি প্রথম স্বপ্ন দেখি আপনাকে। আপনার মুখ এত বিষণ্ণ! আমি শুধলাম: 'উষার কাছে কত যে শুনেছি আপনি আনন্দময় পুরুষ, কিন্তু আপনার এ কী বিষণ্ণ চেহারা!' আপনি বললেন করুণ হেসে: 'কী হ'য়ে গেল লিলি জানোই তো—তার পরে কি আর কেউ আনন্দ করতে পারে, বলো তো।'"

মোটর দুর্ঘটনা ঘটল পাঁচই জুলাই সকালে, লিলি স্বপ্ন দেখেছিল চৌঠা জুলাই রাতে। স্বপ্নে প্রিমনিশনের কথা বইয়ে অনেক পড়েছি—এ-ভাবে প্রত্যক্ষ করিনি কখনো। বুদ্ধি এ-হেঁয়ালির কী সমাধান করবে?

* * * *

এ নিয়ে অনেক সংশয়ীর চিঠি পেয়েছি বৈ কি। কুইনি আমাকে লিখেছে—ভগবানের এ কী অবিচার—ভালো লোকেরই বা কেন এত কষ্ট, প্রভাদির মতন স্ত্রীর, উমার মতন মেয়ের কপালে এত দুঃখ কেন? কী সার্থকতা এ হেন যন্ত্রণার?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? মঙ্গলময়ের সৃষ্টিতে অমঙ্গল কেন? সত্যময়ের সৃষ্টিতে মিথ্যা কেন? আনন্দময়ের সৃষ্টিতে নিরানন্দ কেন? অব্রণ অস্নাবির অপাপবিদ্ধের সৃষ্টিতে জরা মরণ পাপ কেন? মন কি পায় কোনো পরম প্রশ্নের চরম জবাব?

* * *

জাগতিক দিক দিয়ে এহেন ধাঁধার কোনো সমাধান করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয় রাণী। এমন কি তুমি যদি প্রশ্ন করো—"এ-ঘটনায় কি তুমি খুশি হয়েছ?" তাহ'লেও বলতে পারব না—"হয়েছি।"

তবু একটা কথা বলতে পারি। বলা কঠিন, হয়ত বোঝাতে পারব না কী বোঝাতে চাইছি—তবু এ-ধরণের গভীর অনুভূতির যদি কিছুও প্রকাশ করতে পারি তৃপ্তি

পাব। তোমায় কাছে বলতে যাওয়া সহজ হবে—যেহেতু তুমি আমার গুরুবোন—বুঝবে, বিশ্বাস করবে।

* * *

যখন আমাদের বাসটি প'ড়ে যায় তখন আমার বেশ মনে আছে আমার চেতনার প্রতি তন্ত্র ছিল তীক্ষ্ণ সজাগতার সুরে বাঁধা। স্পষ্ট মনে আছে ভয় আসে নি, যদিও মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। সে দর্শনের বর্ণনা অসম্ভব —কারণ সে অনুভবের আলোর সঙ্গে ছায়া মিশে। কিন্তু মরণের গহ্বরে কই অন্ধকার তো চোখে পড়ে নি! মনে হয় নি তো একবারও—সে-রাজ্য আঁধারে-ঘেরা!

বরং—পরিষ্কার মনে আছে—একটা অপূর্ব নির্ভরের ভাব মন এল ছেয়ে। সে সময়ে আমার নার্ভাস হবারই কথা—আরো এই জন্যে যে আমি দেহবিলাসী লোক—দৈহিক যন্ত্রণা একেবারেই সইতে পারি না—হয়ত আরো এই জন্যে যে অসুখ আমার করে খু—বই কম। কিন্তু তবু মনে আছে মনের অতলে এক অননুভূতপূর্ব শক্তি ছিল নিটোল হ'য়ে। প্রকৃতিতে আমি জ্ঞানী নই—আমি জানি. যদিও জ্ঞানের দিকে আমার ঔৎসুক্য অকৃত্রিম, তবু আমার তৃষ্ণার জল জ্ঞান নয়—সে ভক্তি। এসময়ে সেই ভক্তির ভাবই আমাকে আশ্রয় দিয়ে থাকবে।

তাই হয়ত এসেছিল অমন সমাহিতি: মনে হয়েছিল—কী যায় আসে! মনে হয়েছিল—কিছু চাই না আর, কারণ সবচেয়ে বড় চাওয়ার যা তা পাবই কোনো অলক্ষ্য প্রসাদে। আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে ঢল নেমেছিল কৃতজ্ঞতার। সে কী কৃতজ্ঞতা যে—অবর্ণনীয়!

কেন এ-কৃতজ্ঞতা? গুছিয়ে বলা শক্ত। কেন না যুক্তি দিয়ে ফলিয়ে তোলা যায় না এর মর্ম-মূর্তিটিকে। কারণ বলেছি, আমার মৃত্যু আসন্ন একথা একবারও মনে হয় নি। এ আশ্চর্য, কিন্তু আরো আশ্চর্য এই যে, আমার স্নায়ু এতটুকুও চঞ্চল হয় নি। কারণ পতনের মুহূর্তে যদিও আমি বোধ করেছিলাম যে, আমি এক অলক্ষ্য মারণশক্তির কবলে পড়ছি পাতালে—তবু সঙ্গে সঙ্গে এও অনুভব করেছিলাম যে আমায় কে ধারণ করে আছে বর্মের মতই আগ্‌লে। আমার কোনো যোগ্যতায় এ ঘটে নি এ চেতনাও আমার ছিল—অযোগ্য না হ'লে করুণার অবকাশ কোথায় বলো?

কৃতজ্ঞতা এসেছিল এই গভীর করুণার অনুভবেই। জানি একথায় আমার বুদ্ধিমান বন্ধুরা প্রায় সবাই হাসবেন। তাঁদের বুদ্ধি নিশ্চয় যথোচিত তীক্ষ্ণ ও যুক্তি যথোচিত অকাট্য। কিন্তু আমার এ-অনুভবকে অপ্রমাণ করতে পারে এমন কোনো এক্তিয়ারই তো নেই কোনো বুদ্ধির। অবশ্য অবিশ্বাসের কথা আলাদা। তবে আমি তো বলেছি আমি কিছুই প্রমাণ করতে কোমর বেঁধে বসি নি। আমি শুধু বলতে চাই এ-সময়ে অনুভবের একটা অন্য ছন্দ আমার কাছে গোচর হয়েছিল—সে-ছন্দ আলোর নয়, সে ছন্দ ছায়ার অথচ কী স্নিগ্ধ সে-ছায়া—শান্তির উদ্ভাসে-ভরা—ওতপ্রোত। এর পাশে আমোদ আহ্লাদ, গল্পগুজব, হিসাবকিতাবের ছন্দকেই মনে হয় মায়া, সাঁঝের অনুরাগে যেমন মনে হয় মধ্যাহ্নের প্রাণদীপ্তিকে। আর শুধু তখনই নয় তার পরেও—বার বার হাসি-গল্পের সময়ে মনে হয়েছে—আমাদের জীবনের চপলকল্লোল মরণের গভীর ছন্দকে কী আশ্চর্য ঢেকে রাখে!

রাখে, কেন না আমরা সচরাচর চাই এই মামুলি ছন্দই —চেনা পথের বিশ্বস্ত প্রবোধ, সহজ ইশারা। চেতনার যে লোকে আমরা বাস করি তার মধ্যে নেই কোনো অচিন পথের হাতছানি। তাই আমাদের জীবনের এত বেশি লীলা-খেলা গড়পড়তার রাজ্যেই, নয় কি? দেখাশুনো, গল্পশল্প, আমোদআহ্লাদ, গানবাজনা, আসাযাওয়া, লেখাপড়া, খেলাধুলো, নিন্দাস্তুতি, ভাবনাচিন্তা—এই সব নিয়েই আমরা ঘর করি। কিন্তু কেন? কারণ আমাদের দৈনানুদৈনিক জীবনের খেলা ঘর—তাসের ঘর—সচরাচর আমরা বাঁধি এই নৈশ্চিত্যের বালুভিত্তির পরে যে, এ-জীবন চিরদিনের। মৃত্যুর কথা রোজ শুনি, রোজ পড়ি, কিন্তু কোনোদিনই "ভাবি" না—মানে, ও নিয়ে সত্যি মাথা ঘামাই না। তাই জীবনের মুখরতা মৃত্যুর সমাহিতিকে তেম্‌নি ঢেকে রাখে যেমন দিবালোকের পর্দা ঢেকে রাখে তারালোকের জ্যোতিকে। এ সে পারে শুধু এই জন্যেই যে সমীপের ছন্দ আমাদের কাছে বেশি সত্য, সুদূরের ছন্দ বেশি ঝাপ্‌সা। কিন্তু ঝাপ্‌সা যে সব রাজ্য তারা ঝাপ্‌সা এ জন্যে নয় যে তাদের বাণী কম সত্য কম বাস্তব। তাদের মর্ম বাণীটি ঢের বেশি জীবন্ত স্পন্দমান—কেবল সে আমাদের কাছে হাজিরি দিলেও আমরা টের পাই না আমাদের

চেতনার তন্ত্রী সে-সুদূরের সুরে বাঁধতে আমরা শিখি নি ব'লে। দৈনন্দিন জীবনের বাণীর সুর কাছের সুর কি-না—তাই সে-সুরে চেতনা তন্ত্রী বাঁধা সহজ। কিন্তু অভাবনীয় আকস্মিক সুদূর যখন হঠাৎ রূপ নেয় সমীপে—যখন অচিন-চেনা সুরে গান বেজে ওঠে :

"সুদূর যখন বাজায় নূপুর প্রাণে তখন বাজে বাঁশি
আকাশ বাতি ধরলে তবেই ধরার ধুলা হয় উদাসী—"

তখনই বোঝা যায় যে সুদূরের চেয়ে আপনার আর কেউ নয়। জীবনের কলরোল প্রায়ই ঢাকে এই পরমাত্মীয় গভীর সুরটিকে। তাই তাকে প্রকাশ করতে হ'লে চাই মরণের স্বয়ম্প্রকাশ নীরবতা।

মৃত্যুর এই অভয়-সুরটি আমার জীবনের তারে প্রথম কেঁপে ওঠে ঐদিন। তাই হয়ত ভয় পাই নি। তাই হয়ত সহযাত্রী ও সঙ্গিনীদের সবাইকার সঙ্গেই একটা গভীর বন্ধনের কোমলতা অনুভব করেছিলাম—যে-বন্ধন জীবনের প্রখরতার মাঝে যায় শুকিয়ে। তাই হয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি হ'য়ে আনন্দের যে মন্দ্রধ্বনিটি আমার কাছে সেদিন কানে এল তার মধ্যে বেজে উঠেছিল অমন সুন্দর, সমাহিত ও গভীর দীনতার ওঙ্কার মন্ত্র। কৃতজ্ঞতা ছেয়ে এসেছিল এই জন্যেই—মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নয়। তাই বন্ধুর মৃত্যুযন্ত্রণায় বেদনা পেলেও ভগবানের কাছে কোনো অনুযোগ করবার কথা মনেও হয় নি। শুধু এই প্রার্থনাই জেগেছিল :

অকূল পানে মনকে আমার দাও ফিরিয়ে হে কাণ্ডারী!
মেলতে শেখাও উদাস প্রাণের পালগুলি সব তোমার মুখে।
তরী আমার আজকে তোমায় বরণ ক'রে হে দিশারি,
ছুটুক উধাও অসীমতায়—আলোয় ছায়ায়, দুঃখে সুখে।

স্বপ্ন হেন ভুলেও না স্বার্থ-রঙিন মালা গাঁথে।
আশা যেন ভুলেও না চায় মরীচিকা ফিরে ফিরে।
ছায়া আমার যত আছে চলুক তোমার আলোর সাথে।
লাজুক যত প্রণাম-কলি ফুটুক তোমার চরণ-তীরে।

তুমি যদি হাত না ধরো—একলা পথে কোথায় সাথী?
তোমার মলয় বিনা প্রেমেশ, বাসন্তী-প্রশান্তি কোথা?
শুধু তোমার প্রসন্নতার উষায় কাটে অশ্রু-রাতি।
শুধু তোমার স্পর্শ-প্রভায় যায় মিলিয়ে আঁধার-ব্যথা।

হৃদয় মাঝে থেকে তুমি হৃদয় দিয়ে চাও আপনি
হৃদয় তোমার—তাই না জাগে বুকে বুকে গগন তৃষা!
কাঁটার কালো আর্তনাদে গাও গোলাপের জয়ধ্বনি,
চিহ্নহারা পারাবারে তাই না মেলে তারা-দিশা!

মেঘে মেঘে ওঠে বেজে তোমার মন্ত্রমেদুর মাদল।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলে তোমার নৃত্যনিবিড় রূপের বাহার।
পাতায় পাতায় চমকে ওঠে তোমার শোভা—স্নিগ্ধ শ্যামল।
প্রাণ যদি গায় গান দুরাশার—কণ্ঠে জাগে সুরের পাথার।

মোরা চলি ভাববিলাসই গেয়ে অলস কলধ্বনি'
নিভিয়ে ছোট সাধের মেলায় দূর-সাধনার বিশালশিখা।
বালুচরে তাসেরি ঘর বেঁধে তারে পরম গণি।
ক্ষণিক নেশার আবেশ নিয়ে সাজাই অলীক দীপালিকা।

চির চেনায় তাই মনে হয় অপরিচয়-ছায়ায়-ঘেরা।
দীপ্ত শিখর হয় মনে হায় শুভ্র-নিঠুর, তীক্ষ্ণ-কঠিন।
সর্বহারা বাঁশি ডাকে—দায় হয় যে ঘরে ফেরা।
বরণমালা তাই না গাঁথি—অলখ প্রিয় নয় তো অচিন।

আড়াল স'রে আজ গেছে, তাই উঠলে ফুটে স্মরণীয়!
করালী আজ কিরণমালী—মরণে জয়শঙ্খ বাজে।
আঘাত দিয়ে দেখালে—কে ব্যথার মাঝে বরণীয় :
শূন্যতারো একাকারে সার্থকতা আছেই আছে।

ইতি।

কথা ঃ—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য   সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানা দেবী

ভীমপলশ্রী—তেওরা (ঠায়ে)

গভীর নীরবতা মন্থি' তব বাণী
সুপ্ত অন্তরে উঠিল জাগি'
অন্ধ তমোরাশি নিমেষে দিলে নাশি'
আসিনু তব পাশে মিলন লাগি'।
প্রণয় মধুরসে স্বপন সিঞ্চিয়া
তোমারি সঙ্গীতে সে সুর ঝঙ্কয়া
ধরিল ধ্বনি তব এ-অনুরাগী।
যাপিয়া ছিনু কত অনিদ বিভাবরী
তৃষিত আঁখি মেলি' তোমারি আশে,
আসিলে আজি তুমি শ্রাবণ বরষণে
তাপিত চিত্ত নিলে সে-রস-রাসে।
হে প্রিয় কাঙ্ক্ষিত, হে প্রাণ-রঞ্জন
অর্ঘ্য লহ তব লহ এ তনু মন
লহ এ রঞ্জিত জীবন-রাগী ॥

[মণ্ া]
II { সণ্ া ণ্ া সা ¦ মজ্ঞা মজ্ঞা | সরা সা | পাঃ মঃ ধপা | মজ্ঞা মজ্ঞা ¦ সরা সা |
গ ভী র নী র ব তা ম ন্ থি ত ব বা ণী

পা -া পাম | পমা ধপর্সণা | পধা পা | পমা পা মজ্ঞা | মজ্ঞা -া ¦ মা জ্ঞমা | }
সু - প্ত অ ন্ ত রে উ ঠি ল জা - - গি'

{ পণা -া ণা | ণাধ র্সণা | পধা পা | পণা ণর্সা ণর্সা | ণর্সা ণা | পধা পা | }
অ ন্ ধ ত ম- রা- শি নি মে ষে দি- লে না শি

মজ্ঞা মা পা | মণ্ া সা | মজ্ঞা পমা | ধপা ণধা পা | মজ্ঞা -া | মা জ্ঞমা II
আ- সি নু ত ব পা শে মি ল ন - - - গি'

{ পা পা^ম ধণা | মজ্ঞা মজ্ঞা | জ্ঞা মা | পণা ণা ণা | ণপা র্সণর্সা | র্সা র্সা |
প্র ণ য় ম- ধু র সে স্ব প- ন সি -ন্ চি য়া
হে প্রি য়- কা -ঙ্ ক্ষি ত- হে প্রা ণ র ন্ জ ন

পণর্সর্রা ণর্সজ্ঞা জ্ঞা | র্রা র্সা | র্সা র্সা | ণর্সা ণর্সা র্সা | র্সণা -া | পধা পা | }
তো - মা - রি স ঙ্ গী তে সে- সু- র ঝ ঙ্ কৃ য়া
অ - - র ঘ্য ল হ ত ব ল হ এ ত নু ম ন

মা পা মজ্ঞা | জ্ঞণ্া ণ্া | সা সা | মজ্ঞা পমা ধপা | র্সণা পধা | মপা মজ্ঞা II
ধ রি ল ধ্ব নি ত- ব এ অ নু রা - - গী
ল হ এ র ন্ জি ত জী ব ন রা - - খী

পা মজ্ঞমা মপাম | পা মজ্ঞা | রসা জ্ঞজ্ঞা | জ্ঞণ্া সা মজ্ঞা | জ্ঞমা মপা | পা পা |
যা পি য়া ছি নু ক- ত অ নি দ বি ভা ব রী

পমা ধধা পমা | পা মজ্ঞা | মপা মপা | পণা ণা ণা | পধা -া | ণপা পা |
তৃ ষি ত- আঁ খি মে লি তো মা রি আ - - শে

মজ্ঞমা পণা ণাধ | পা র্সা | ণর্সা র্সা | ণর্সা ণা পধা | পধা মপা | মজ্ঞা মা
আ - সি লে আ জি তু মি শ্রা- ব ণ ব- র- ষ- ণে

ণা পধা পা | মপা মজ্ঞা | মাপ মপা | মজ্ঞা মজ্ঞা রসা | সরা -া | জ্ঞা সা
তা পি ত চি- ত- নি লে সে- র- স রা- - সে -

গানটির সুরটি বেশ দুলিয়ে দুলিয়ে গাইতে হবে

শ্রীচরণদাস ঘোষ

এগারো

"তুমি ?"

তখনও কাহারো চোখের পলক পড়ে নাই, চিত্রা হাওয়ার ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে উঠিয়া আসিল, পটে-আঁকা ছবির মত কঙ্কনের সুমুখে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি ?" অতঃপর ওই মানব-বিগ্রহের নব-নির্ম্মিত আকৃতির পানে তাহার পরিপূর্ণ দৃষ্টি পড়িতেই সে শিহরিয়া একটু পিছাইয়া আসিল। তারপর আর একবার কঙ্কনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তেজ কণ্ঠে কহিল, "সব শেষ ?"

চিত্রা উঠিয়া আসিতেই কৌমুদীও তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া চিত্রার মুখে দৃষ্টি ফেলিয়া কহিল, "ইনি তোমার—"

"স্বামী !"

সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই সপ্রশ্ন কটাক্ষ উদ্যত হইয়া ফিরিল কঙ্কনের উপর। বেশি করিয়া পড়িল ত্রিবর্ণের।

কঙ্কন নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল। মুখ তুলিয়া মুখ দিয়া শুধু একটি কথা উচ্চারণ করিল—'না।'

"না ?"—অস্ফুট কণ্ঠে কঙ্কনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই বিবর্ণমুখে চিত্রা থরথর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা সমাগত। ত্রিবর্ণ একবার আকাশের দিকে চাহিয়াই ব্যস্ত হইয়া শিষ্যদের এক আসন্ন কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, "দীপালোক—"

মুহূর্ত্তেই কৌতূহলীর দলে ভাঙন ধরিল। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা তটস্থ হইয়া একে-একে চলিয়া যাইতে লাগিল। কঙ্কনও যেমন চলিয়া যাইবে ত্রিবর্ণ বাধা দিয়া কহিলেন, "তুমি নও !" তারপর চিত্রাকে দেখাইয়া বলিতে সুরু করিলেন, "উনি অসুস্থ—ওঁর সেবার ভার নেবে তুমি !" দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া কহিলেন, "তুমি ভিক্ষু—ভিক্ষুর কাজ মানুষকে জয় করা, আঘাত দিয়ে নয় বুকে বুক দিয়ে !" আর দাঁড়াইলেন না।

ঘনকৃষ্ণ এক যবনিকা কঙ্কনের মুখের উপর নামিয়া পড়িল—তাহার ভিতর দিয়া পৃথিবীর কোনোও দৃশ্য আর দেখা চলে না ! নিশ্চল হইয়া কঙ্কন দাঁড়াইয়া রহিল। যেন পা বাড়াইতে আর সে পারে না, অথচ না বাড়াইলেও নয় ; যেন কহিবার কথা আর তাহার নাই, অথচ না কিছু কহিলেও চলে না ; যেন বা প্রতিমা পূজার অধিকার তাহার বিলোপ হইয়াছে, অথচ অবহেলা করিতেও সে পারে না। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া চিত্রার কাছে সে সরিয়া গেল। তখন চিত্রা ছিল মাটির দিকে নত মুখে বসিয়া। আরও কিছুকাল অপেক্ষার পর অকস্মাৎ মরিয়ার মতো ডাকিয়া ফেলিল, "চিত্রা—"

চিত্রা মুখ তুলিল—তার দৃষ্টি শূন্য, উদাস !

কঙ্কন কহিল—'আমি !'

"তু-মি !"—চিত্রা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল ; বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন সে এক বিষবর্ষী সরীসৃপ দেখিয়াছে। পরক্ষণেই যেন সম্মুখে তাহারা মানুষ বলিয়া কে-একজন বুঝিতে পারিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল, "না তুমি নও !" বলিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া সুমুখেই যে পথ পাইল সেই পথ ধরিল।

অধ্যক্ষের আদেশ—সেবা, আতিথ্য ! কঙ্কন বিব্রত হইয়া পড়িল। কি বলিতে হইবে, কি বলিলে ভালো হয়, কোন্ আচরণে তাহার ভিক্ষুধর্ম্মের নিয়ম পালন হয়, কঙ্কন ঠিক করিতে পারিল না। আনাড়ির ন্যায় বলিয়া উঠিল, "একটা কথা শুনবে ?—আচ্ছা, দাঁড়াও না ?"

চিত্রা মুখ ফিরাইয়া রোষ-কটাক্ষ করিয়া কহিল, "স্মরণ রাখবেন—আমি স্ত্রীলোক !" বলিয়াই আবার দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিপদে পড়িল কঙ্কন ! একদিকে উপরওয়ালার নির্দ্দেশ, অপরদিকে অতিথির এই বিদ্রোহ ! কিন্তু, ভিক্ষু হইয়াছে—হাল ছাড়িলে চলিবে না ত ! কাজেই সেও পশ্চাদনুসরণ করিল। তখন মঠের চারিদিকেই দীপের মালা ঝুলিয়াছে—আলোয় আলো !

সে-টুকু শক্তি ধরিয়া চিত্রা প্রত্যাবর্ত্তনের দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, তাহা বুঝিবা নিঃশেষ হইয়াই আসিয়াছিল, তাই সে আর চলিতে পারিল না! পুনশ্চ অবসন্ন দেহে টলিয়া পড়িয়া গেল।

কঙ্কনের বুকটা উড়িয়া গেল—অতিথি যে! এই অচল মুহূর্ত্তে কি করিবে সে, করা কি প্রয়োজন, করিলে কি মানানসই হয়, তাহা গুছাইয়া সে মনের ভিতর আনিতে পারিল না। না পারিয়া থতমত খাইয়া বিবর্ণ মুখে চিত্রার মুখের গোড়ায় বসিয়া পড়িল—ব্যাকুল দুই চোখে অসহায়ের ন্যায় মেয়েটির দিকে তাকাইয়া।

আবার সেই কাছাকাছি! চিত্রা ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন অকস্মাৎ এক দৈবশক্তি মিলিয়াছে।

কঙ্কনও উঠিয়া দাঁড়াইল, উঠিতে হয় বলিয়া। তারপর ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অসুস্থ হয়ে পড়ছ! আজ থাকো না, থাকবে?"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিল, বোঝা গেল এক চাপা কান্না হঠাৎ তার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিজেকে সংযত করিয়া শ্লেষ কণ্ঠে কহিল, "এখানে?—এখানে তুমি ধার্ম্মিক, আমি কুলটা!"

কঙ্কন মুখ নীচু করিল। একটু পরেই মুখ তুলিয়া কহিল, "তা কেন?—হ্যাঁ, দেখ—আমি ভিক্ষু!"

"উত্তম!"

"তুমি বিয়ে কোরো নন্দনকে—না, না!—যাকে হোক্!"

দপ্ করিয়া চিত্রার চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল। কঠিন কণ্ঠে কহিল, "চুপ্ করো। আমার মর্য্যাদা আমি নিজেই রাখ্‌তে জানি!"

বিভ্রাট! কিন্তু দমিলে চলিবে না—'জয়' করিতে হইবে, 'বুকে বুক দিয়া'! কঙ্কন জবাব দিল, "তা জানি! তোমার রূপ আছে!"

রূপ? * * * টক্‌টকে রাঙা রঙে চিত্রার মুখখানা রাঙিয়া উঠিল—রূপ! কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত! পরমুহূর্ত্তেই উহা একেবারে গম্ভীর ও অতিরিক্ত কঠিন হইয়া উঠিল। তারপর কঙ্কনের প্রতি এক শপথ-কঠিন ভ্রূকুটি করিয়াই পিছন ফিরিল এবং উল্কার ন্যায় অনল ঝলকে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। * * * কঙ্কনের আর পা উঠিল না। হঠাৎ যেন সে টের পারল—ওই দূরযাত্রী নারীটির নির্ব্বিবাদে অন্তর্ধানই তার আতিথ্যের অর্থ, অধ্যক্ষের উহাই নির্দ্দেশ!

কেহই লক্ষ্য করিল না। চিত্রা চঞ্চল চরণে মঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল। সম্মুখেই আবার সেই নদী, নদীর কালো জল, জলের ওপারে প্রান্তর, প্রান্তরের কোলে নগর, নগরে মানুষ, মানুষের ভিতর—নাগরিকা!

'রূপ!'—চিত্রা চম্‌কিয়া উঠিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—মঠের প্রাচীর। আস্তে-আস্তে পিছনদিকে হাঁটিয়া আসিয়া প্রাচীরে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল চুপ করিয়া; যেন আকস্মিক কি-এক গুরুতর চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। তারপর তাহার মুখে থাম্‌কা এক মারাত্মক হাসির ছটা উথলিয়া পড়িল। তারপর—তারপর তাহার কণ্ঠ হইতে এক অস্ফুট, অধীর শব্দ বাহির হইল—'রূপ!'

বারো

কথাটা নিমেষেই ছড়াইয়া পড়িল—কঙ্কন ভিক্ষু! আর, তাহার পার্থিব সম্পদের মালিক—নন্দন।

চিত্রা চলিয়া যাইবার পরই নন্দনও বাহির হইয়া গিয়াছিল, যখন ফিরিয়া আসিল তখন অপরাহ্ণ—হাতে একখানা কম্বল, একটা কমণ্ডলু, লম্বা একটা চিম্‌টা। উপরে উঠিয়া ঘরে হাতের জিনিষগুলা সবে নামাইয়াছে, বাহিরে এক বিকট কোলাহল উঠিল। সকাল বিকাল উৎপাত! নন্দনের মুখে বিরক্তির রঙ ধরিল। খানিক নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আহৃত জিনিষগুলাকে ঘরের এককোণে সরাইয়া রাখিয়া চাপা দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, গৃহ প্রাঙ্গণে এক বিরাট বিশৃঙ্খল জনতা, যেন সকলেই মারমুখ!

একজন প্রৌঢ় ভিড়ের ভিতর হইতে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তিলক-ছাপ, গাত্রে নামাবলী, মস্তকে লম্বিত সুস্পষ্ট শিখা। নন্দনের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অবজ্ঞায় বলিয়া উঠিলেন, "কিহে, ছোক্‌রা—রাতারাতি যে অযোধ্যার রাজা হ'য়ে বসেছ?"

নন্দনের মুখে এম্‌নি ভাব প্রকাশ পাইল যে তাহার বিনয় ও কুণ্ঠার অবধি নাই। কহিল, "দেখছি তাই! একেবারে রামচন্দ্রের দরবার! নল, নীল, গয়, গবাক্ষ— সবাই এসে হাজির!"

লোকটির মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—অপমান!

ক্রোধে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমি কে জান ?"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া নন্দন লোকটির দিকে তাকাইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের রক্ষক, সমাজপতি—"

এইবার নন্দনের মুখে এমনই ভাবপ্রকাশ পাইল, যেন সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কহিল—"শুভাগমনের হেতু ?"

সমাজপতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "কঙ্কন ভিক্ষু হ'লো যে—কার ষড়যন্ত্রে ?"

নন্দন যেন অনাসক্তভাবেই জবাব দিল, "যদি না বলি !"

সমগ্র জনতা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "রাজ-দরবারে শাস্তি পাবে !"

নন্দনের মুখখানা এইবার কঠিন হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, "আপনাদের !"

"আমাদের ?"—জনতার মুখদিয়া যুগপৎ রোষ, সংশয় ও বিস্ময় মিশ্রিত এক অস্ফুট রব বাহির হইল।

নন্দন কহিল, "প্রমাণ চাই ? আসুন—" বলিয়াই জনতাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। তারপর সেই ঘরটির ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘরময় রক্তের দাগগুলার উপর আঙুল বাড়াইয়া জনতার দিকে ফিরিয়া কহিল, "ওই দেখুন—"

সকলেই চম্‌কিয়া উঠিল—রক্ত !

নন্দনের মুখে এক নিষ্প্রভ হাসির আভা দেখা দিল, কহিল, "রক্ত ! মানুষের—নিরীহ ভিক্ষুর !"

উত্তেজিত অবয়ব, এক-একটি লোকের—এক-এক করিয়া সহসা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তাহারা নন্দনের মুখের দিকে একবার চাহিতে গেল, যেন আরও কি দেখিবে, যেন আরও কি শুনিবে—আরও কত কথা, কিন্তু পারিল না, চোখ ভারি হইয়া নামিয়া পড়িল। কিন্তু সমাজপতি দাঁড়াইয়াছিলেন—যেন এক মূর্ত্তিমান বজ্র। এক আসুরিক গর্ব্বে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে আমাদের ধর্ম্মের বিদ্রোহী ! তাকে খুন করবার হুকুম ছিল আমার। সেই তার দণ্ড—তার উপযুক্ত শাস্তি !"

নন্দন বিনীতকণ্ঠে জবাব দিল, "সেই শাস্তি নিয়েছে কঙ্কন !" এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই আবার ধীরে ধীরে এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া কহিল, "ভিক্ষুর গায়ে কিন্তু আঁচড়টিও পড়েনি ! খুন হ'য়েছে আপনাদেরই একজন—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী, রাজাধিরাজ' !"

আবার এক আকস্মিক উত্তেজনায় সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং সকলেই যুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ঠিক !"

সমাজপতি যেন বিশ্বামিত্র ঋষির ন্যায় একবার জনতার দিকে শাসন-কঠিন দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই নন্দনের উপর সেই দৃষ্টি রাখিলেন।

নন্দন যেন এইবার আত্মহারা। মুখরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মের প্রয়োজন—ধার্ম্মিকের ভেতর থেকে কাউকে পূজো দিতে ! কিন্তু কঙ্কনের জন্ম হ'য়েছে—পূজো দিতে নয়, পূজো নিতে ! ভিক্ষু শাস্তি নেয়, দেয় না !"

এবার আর সমাজপতিকে ধরিয়া রাখা যায় না ! অসুরের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তার অনন্ত নরক !"

"তার নয়—তোমার, আর তোমার পাপে—আমাদের !"—সমগ্র জনতা যেন মারমুখ হইয়া সমাজপতির দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। পরক্ষণেই নিজেদের সংযত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, ধর্ম্ম আর অহঙ্কার—এক নয় ! তা যদি হয়, সে ধর্ম্ম আমরাও চাইনে !" বলিয়াই সকলে দল বাঁধিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আর নন্দন ?—তাহার মুখখানা এক দুঃসহ তৃপ্তির আলোকে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তারপর এক ভৃত্যকে ডাকিয়া ঘরটা পরিষ্কার করিতে বলিয়াই নীচে নামিয়া গেল। তাহার পূর্ব্বেই সমাজপতি এক ফাঁকে নন্দনের চোখের আড়াল হইয়াছিলেন।

*　*　*　*

অতঃপর নন্দনের জীবনের আর-এক পরিচ্ছেদ খুলিল।

নূতন বোঝা ! বিব্রত হইয়া পড়িবারই কথা। কিন্তু সে সব বালাই নন্দন আদৌ গ্রহণ করিল না। কঙ্কনের জীবনযাত্রার নিয়ম তার সবিশেষ জানা ছিল, তদ্রূপ সেও বোঝা ফেলিয়া দিল বেতনভুক্ লোকজনেরই উপর।

দ্বিতীয় দিন সুরু হইয়াছে।

শয্যাত্যাগ করিয়া ওধারকার ছাদে বারকয়েক পায়চারি করিয়াই নন্দন ফিরিয়া ঘরে আসিয়া বসিল। হাতে কোন কাজ নাই, মন ফাঁকা-ফাঁকা, কোথায় যেন কি তার অতৃপ্তি

পড়িয়া, কোথায় কে এম্‌নিই ডাক দিবে—তাই সে কান পাতিয়া আছে, অথচ কারণ নাই, হেতু নাই, সঙ্কেত নাই!

এম্‌নিই ভাবে বসিয়া, অনেকক্ষণ—কতক্ষণ তাহা তাহার হুঁস নাই, সহসা নীচে এক নারীকণ্ঠ শুনিয়াই সে স্প্রীংয়ের মত লাফাইয়া উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে পূর্ব্বদিনের আহৃত সেই কম্বল, কমণ্ডলু ও চিম্‌টা বাহির করিয়া আনিল। তারপর আল্‌না হইতে একখানা চাদর টানিয়া লইয়া মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া কম্বলখানা গায়ে ফেলিয়া হাতে কমণ্ডলু ও চিম্‌টা লইয়া একটী আয়নার সুমুখে দাঁড়াইল। পরক্ষণেই সে মহাপ্রস্থানের যাত্রী! অতঃপর সে যেমন ঘর হইতে বাহির হইবে, সম্মুখেই—চিত্রা!

একি সেই চিত্রা! কাল আর আজ—আজ তাহার এ যে এক নূতন মূর্ত্তি! পরিধানে রত্নখচিত সাড়ি, গা-ময় অলঙ্কার, মাথায় মুকুট, এলায়িত চুল, মুখে একমুখ হাসি, দেহে এক-দেহ—রূপ!

চিত্রা!

ঠিক মুখোমুখী দুইজন—নন্দন আর চিত্রা, চিত্রা আর নন্দন!

অভিনব মূর্ত্তি—এরও, ওরও। চোখোচোখী হইতেই নন্দন তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল—নিষেধ! কিন্তু একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল চিত্রা। তাহার মনের ভিতর কি হইল, সেই-ই জানে, মুখে বলিল, "একদিন আড়াল হ'য়েছি, আর অম্‌নি এই কাণ্ড?"

সন্ন্যাসধর্ম্মের আইন—নারীর মুখের দিকে তাকাইতে নাই। সুতরাং মেয়েটির পায়ের দিকেই চোখ রাখিয়া নন্দন কহিল, "পথ ছাড়ো—"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া পথ ছাড়িয়া একপাশে দাঁড়াইল।

পথের বাধা সরিয়াছে। সুতরাং নন্দনের আর অপেক্ষা করা চলে না। বেগে প্রস্থানের ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "হিমালয়ে যাচ্ছি!"

চিত্রা গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "সাধনোচিত ধাম!"

অসাবধানে অনেক কাজই মানুষ করিয়া ফেলে, তাই দৈবাৎ নন্দনের এক ঝলক দৃষ্টি চিত্রার মুখের উপর পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই মুখ নামাইয়া লইয়া কহিল, "কিন্তু যেতাম না!"

অপর পক্ষও জবাব দিল, "সাধু সঙ্কল্প!"

"কিন্তু—"

"তাই ত!"

তুমি যদি বল—"যেয়ো না!"

চিত্রা হাসি চাপিয়া কহিল, "তা কি পারি! আপনি যে গুরুজন!" বলিয়াই কাছে আসিয়া কহিল, "বরং এই কথা বলি—প্রভু যাবেন না!" বলিয়াই একে-একে কম্বল, কমণ্ডলু ও চিম্‌টা কাড়িয়া লইয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিল।

নন্দন বাধা দিল না, নির্ব্বোধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, "আবার ত পায়ে ঠেল্‌বে?"

চিত্রা জিব্‌ কাটিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশ! তাহ'লে আমার কি যে হবে!" বলিয়াই এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিল।

নন্দন আস্তে-আস্তে চোখ নামাইয়া লইল। একটু পরেই আবার চোখ তুলিয়া কহিল, "তা না-হয় বুঝ্‌লাম! কিন্তু—" হঠাৎ যেন ভয় পাইয়া খাটের উপর গিয়া বসিল বলিয়া উঠিল, "অমন মারাত্মক মূর্ত্তি যে হঠাৎ?"

"ফাঁদ!"—চিত্রা হাসিয়া উঠিল এবং তেমনি হাসিমুখেই কহিল, "কেন জানেন?—আজ থেকে নিজেকে যাচাই করবো!"

হিমালয়ের সাজ-সরঞ্জাম তখন অনাদরেই পড়িয়াছিল; খাট হইতে উঠিয়া কম্বলখানাকে তুলিয়া ভাঁজ করিয়া কাঁধে ফেলিয়া কহিল, "কার কাছে?"

চিত্রার মুখে হাসি আর ধরে না। বলিয়া উঠিল, "তাও ছাই জানেন না?—মেয়েমানুষ যাদের কাছে নিজেদের যাচাই করে—পুরুষমানুষ?"

"দানপত্র—"

চিত্রা যেন কথাটা বিস্মৃত হইয়াই গিয়াছিল, এই মুহূর্ত্তে তার হঠাৎ মনে পড়িয়াছে। এম্‌নিই ভাব দেখাইয়া কহিল, "আমার জন্য সে তো নয়!"

নন্দন আর গৃহবাসী হইবে না! কমণ্ডলু ও চিম্‌টা উঠাইয়া লইতেই চিত্রা বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল। তারপর মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া আবার আসিয়া সেগুলাকে কাড়িয়া লইয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া শাসন-কণ্ঠে বলিল, "হিমালয় যাওয়া অত সহজ নয়।" বলিয়াই একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। কিন্তু, সে এক মুহূর্ত্ত। পর মুহূর্ত্তেই যেন অতিরিক্ত আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "আপনি

আমাকে পারেন নিতে—একজনের মনের মানুষ আর একজন ?"

"পারি ! তুমি যদি পার—নিজেকে দিতে !"

প্রচণ্ড কৌতুক !

এক প্রচণ্ড কৌতুকে চিত্রার মুখখানা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "এর মানে এই দাঁড়ালো—কেউ কিছুই পাবে না ! সুতরাং আমি—" আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, যেন কি বলিতে গিয়া সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে ? ক্ষণকাল পরেই সঙ্কল্প কঠিন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি—নাগরিকা !"

নন্দন চম্‌কিয়া উঠিল, "—নাগরিকা !"

যেন আচম্‌কা তার পিঠে তীর আসিয়া বিঁধিয়াছে ! আর চিত্রার মুখময় ছড়াইয়া পড়িল এক বিচিত্র হাসি ! কহিল, "নির্দ্দেশ তাঁরই, আমি যাঁর মানুষ !"—মুখখানা একটিবার কাঁপিয়াই স্থির হইয়া গেল।

তেম্‌নিই স্থির হইয়া গেল নন্দনের চোখের পলক, মুখের বিস্ময়, বুকের আতঙ্ক !

চিত্রা একটু ম্লান হাসি হাসিল। অসম্বদ্ধ প্রলাপের মত কহিল, "অন্ধকার—আমি ! হ'তেই হবে—প্রয়োজন ! নইলে, তাঁর রূপ খোলে না—আলো ?" আর দাঁড়াইল না।

এইবার নন্দনের চমক ভাঙিল। প্রবাসী মানুষ গৃহে ফিরিবার মুখে গ্রামে ঢুকিয়াই যদি শুনিতে পায় যে তাহার গৃহে আগুন ধরিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে যেমন সে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সেইদিকে ছুটিয়া যায়, নন্দন তেমনিতরই উঠি-পড়ি করিয়া চিত্রার অনুসরণ করিল।

চিত্রা তখন নীচে নামিয়াছে। নন্দন সিঁড়ি হইতে দেখিতে পাইয়াই ডাক দিল, "চিত্রা।"

চিত্রা ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "ডাক্‌ছেন ?"

"হাঁ !"

"কেন ?"

"একটা কথা ছিল—"

চিত্রা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "থাক্‌বারই ত কথা !"

নন্দন মুখ নীচু করিল। পরক্ষণে আবার মুখ তুলিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "কঙ্কনের মুখে কালি পড়বে !"

চিত্রার মুখখানা সহসা কঠিন হইয়া উঠিল ! শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "বিলিয়ে দিয়ে গেছেন না তিনি ?"

"আমি যদি বলি—আমিই চেয়েছিলাম ?"

"নারী পুরুষের খেল্‌না মাত্র—চাইলেই দেওয়া চলে !" ঘা দিয়া কথাটা বলিয়াই চিত্রা এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল। অতঃপর কণ্ঠ অধিকতর কঠিন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাজারের ফল-মূল, হাটের তরি-তরকারি ! সবাইকার সমান অধিকার !" বলিয়াই উল্কার ন্যায় চলিয়া গেল।

তেরো

পরস্পরের প্রয়োজন মিটিয়াছে।

চিত্রা চোখের আড়াল হইতেই কঙ্কন যেমন মুখ ফিরাইবে, দেখিল সুমুখেই দাঁড়াইয়া কৌমুদী। তাহার চোখে-মুখে যেন ঝড় উঠিয়াছে। কহিল, "আপনি একা—তিনি ?"

"চিত্রা ?"

"তাঁর নাম—ওই বুঝি ?"

কঙ্কন নত চোখে কহিল—"হুঁ !"

"কৈ তিনি ?"

"চলে গেছে।"

কৌমুদী চোখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "সুমুখে রাত ! আপ্‌নি ছাড়লেন ?"

"আমি ছাড়িনি।"

"তাই বলুন ! এখনো পেলে ধরে রাখেন !"

অপ্রীতিকর মন্তব্য ! কঙ্কন ক্ষুব্ধ হইয়া প্রশ্ন করিল, "তার মানে !"

কৌমুদীর মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "আচ্ছা ! আপ্‌নি আসুন, আমার সঙ্গে-সঙ্গে—"বলিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া অগ্রসর হইল, কঙ্কনও যন্ত্রচালিতের ন্যায় অনুসরণ করিল। কিয়দ্দূর গিয়াই কৌমুদী পিছন ফিরিল, কৌতুকময় এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "যেন হারিয়ে যাবেন না—" বলিয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া পায়ে জোর দিল।

বিস্তৃত অঙ্গন। তাহারই একপ্রান্তে ভিক্ষুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কক্ষ। একান্তে একটি কক্ষের মুখে আসিয়াই কৌমুদী থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া কঙ্কনকে কহিল, "এই আপনার ঘর—বসবাস করবার।" বলিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে মেঝেয় এক বোঝা ঘাস, একটা

খড়ের বালিস ও একখানা কম্বল। প্রাচীর গাত্রে চিত্রিত বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি—বিভিন্ন অবস্থার।

একপক্ষ নীরব, অপর পক্ষ মুখর। কঙ্কনের দিকে চাহিয়া কৌমুদী কহিল, "একটু দাঁড়ান—একটুখানি!" বলিয়াই ঘাসের বোঝাটা বিছাইয়া খড়ের বালিসটা যথাস্থানে রাখিয়া তাহার উপর কম্বল পাতিয়া স্মিতমুখে কহিল, "এইবার শুয়ে পড়ুন ওইখানে। ঘুম পেলে—ঘুমোবেন কিন্তু!"

বিচিত্র শয্যা! একটিবার সেইদিকে তাকাইয়াই কঙ্কন কৌমুদীর দিকে ফিরিল। কহিল, "আপনি?"

কৌমুদী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর ন্যায় গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "ছিঃ! আপনি বল্‌তে নেই—আমি যে আপনার ছোট!"

একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি। মঠই হোক্ আর আশ্রমই হোক্—লোকালয়ের কল্পনায় উহা হিমালয়ের নামান্তর। উহার মুখ্য উদ্দেশ্য—আকাশের অদৃশ্য 'ঠাকুর-দেবতাকে' হাতে আনা! মঠ—আশ্রম, এ সব নাম শুনিলেই বাহিরের লোকে মনে করিয়া লয়—উহা এক কঠোর কৃচ্ছ্র তপস্যার কারাগার। ইহার অধিবাসীদের হয় দস্যু রত্নাকরের ন্যায় বল্মীক চাপা পড়িতে হইবে, নয় কঙ্কালসার হইয়া নশ্বর দেহের পুঁজিপাটা নিঃশেষ করিতে হইবে—হয়ত বা অভীষ্টের 'দর্শন' অন্তিমকালে মিলিবে, নয়ত বা আগামী জন্মের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। কিন্তু কঙ্কন যে-মঠে প্রবেশ করিয়াছে তাহার জাতি স্বতন্ত্র। ইহার উদ্দেশ্য দেবতার পরিবর্ত্তে পৃথিবীর 'মানুষকে' হাতে আনা! ভগবানকে—সাক্ষাৎ সাকার ক'রে তোলা! অর্থাৎ মানুষকে মানুষ বলিয়া চেনা, নিজেকে নিঃস্বত্ব করিয়া পার্থে নিবেদন করা, অপরের পাপকে প্রকৃতির উপহার বলিয়া নির্ব্বিকার মনে গ্রহণ করা। ইহারই অনুষ্ঠানে বসিত এই শ্রমণ ভবনে প্রত্যেকের জীবনে মহামহোৎসব—ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীর।

আনাড়ি মানুষ—কঙ্কন। কৌমুদী তাহার নির্ব্বোধের ন্যায় প্রশ্নের উত্তরে আবার এক কৌতুক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "আমি? আমাকে কি থাকৃতে দেবেন এখানে আপনি?" বলিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

* * * * *

কয়েক দিন কাটিয়াছে। ইতিমধ্যে যেন যাদুস্পর্শে মোহ-গ্রস্তের ন্যায় কঙ্কন দলে মিশিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে—যেন উহাই তাহার আজন্মের নির্দ্দেশ, যেন সে জানে না ইহার পূর্ব্বে তাহার আরও একটি জীবনযাত্রার পৃথিবী ছিল। একদিন অপরাহ্নে নিত্য-নৈমিত্তিক তালিকানুযায়ী সমবেত উপাসনা হইল। তাহার পর হইল ভিক্ষুণীদের গান—ধরিত্রীর সন্তান যাহারা, তাহাদের যাহা-কিছু কলুষ, যাহা-কিছু অপবাদ, যাহা-কিছু পাশবিক আচরণ ও প্রবৃত্তি—সমস্তই যেন ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে গ্রহণ করিতে উহারা পারে, নিঃশেষে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া। দেহ-ধারণে দেহীর আতঙ্ক তাহা হইলে ইহলোকে আর রহিবে না! সঙ্গীতে ইহাই তাহাদের কামনা।

অতঃপর সুরু হইল—পরদিনকার 'প্রচার অভিযানের' পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন। এই ভার প্রথমেই পড়ে—পুরাতন ও পাকা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরই উপর। ভিন্ন-ভিন্ন লোকালয়ের ভার ভিন্ন-ভিন্ন পাত্র-পাত্রীকে অর্পণ করিয়া ত্রিবর্ণ কঙ্কনের নাম ডাকিতেই সকলেই চমকিয়া উঠিল—কঙ্কন যে কাঁচা! ত্রিবর্ণ বুঝিতে পারিয়া গম্ভীর অথচ মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "সহজাত ভিক্ষু—কঙ্কন! 'বিহারে'র প্রাথমিক শিক্ষা ও সংযম অভ্যাস ওর নিষ্প্রয়োজন।" বলিয়াই কঙ্কনের দিকে ফিরিয়া আদেশ দিলেন—"নগর।"

"নগর?"—আতঙ্কে বিব্রত মুখ কৌমুদী থর্‌থর করিয়া কাঁপিয়া বলিয়া উঠিল—"পিতা!"

ত্রিবর্ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ওর আবির্ভাব, এইখানে—এই জন্যেই ত, মা!"

"তা জানি বাবা, কিন্তু—প্রথমেই—নগর?"

"রাক্ষসপুরী-পিশাচ—দুর্ভাগা লোকালয়! ভয় হচ্ছে, নয় মা?"

নেহাৎ অকারণেই বুঝিবা কৌমুদীর সারা মুখটি রাঙা হইয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি মুখ নামাইয়া লইল। সেই নির্ব্বাক, নতমুখ বুঝি বা নিঃশব্দে ইহাই ব্যক্ত করিল—ভয় হবারই ত' কথা! কিন্তু, কেন? রুক্ষ তপস্যা, কর্কশ সংযম, আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য—এই সব কৃচ্ছ্রের কারবারে যে নিজের স্বত্ব নিঃশেষ ত্যাগ করিয়া নিঃস্ব হইয়া বসিয়াছে, তাহার এই অকপট ব্যথা কেন? এই 'ধর্ম্মবিহার'—ইহারই দায়িত্বে তাহার নারী জীবনের আত্মনিবেদন। সুতরাং, ইহারই স্বার্থে যে-'বলি' আজ আহুত হইয়াছে, সহসা

তাহার প্রতি এতখানি দরদ কোন্ হিসাবে এক নিস্পৃহ ভিক্ষুণীর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে?

কৌমুদীর নত মুখটির দিকে তাকাইয়া ত্রিবর্ণ ঈষৎ হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন, "লজ্জা করো না মা! এ প্রতিবাদ শুধু তোমার নয়—তোমাদেরই পক্ষে সঙ্গত! এ নইলে, তোমাদের নাম 'মা—বোন' হতো না!" একটু থামিয়াই আবার কহিলেন, "আমিও জানি! কিন্তু একথা বোধ হয় জান না মা, যে ভিক্ষু ও আজই হয়নি—হয়েছে এই মাটীর কোলে ভূমিষ্ঠ হ'য়েই!" বলিয়াই কঙ্কনের দিকে সরিয়া গিয়া তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "শুধু একটা কথা মনে রেখো, কঙ্কন—শাক্যসিংহ অহিন্দু ছিলেন না।"

ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়াছে। কঙ্কন সপ্রশ্ন চক্ষে ত্রিবর্ণের দিকে তাকাইতেই তিনি স্মিত মুখে বলিয়া উঠিলেন, "হিন্দুর যা প্রকৃত ধর্ম্ম, তার বিদ্রোহী তিনি ছিলেন না! এর যা' সহজ পরিচয়—লোক সমাজে তাই তিনি প্রচার করেছিলেন!"

এক অপরিমিত বিস্ময়ে ও সংশয়ে কঙ্কনের চোখ দুটি বড় হইয়া উঠিল—তবে কি এই উভয় ধর্ম্মের ভিতর কোন প্রভেদ নাই? তাহার মনের ভিতর সহসা যেন এক লক্ষ প্রশ্ন মূর্ত্তি ধরিয়া এ-ওর ঘাড়ে পড়িয়া মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইল—"ধর্ম্ম—সব-ই এক?"

ত্রিবর্ণ গম্ভীর হইয়া জবাব দিলেন, "গ্রহিতার রুচি অনুসারে স্বতন্ত্র! হিন্দুধর্ম্ম যেমন মানুষকে পরিচালিত ও সংযত রাখবার এক আশ্চর্য্য 'শাসন', ভিক্ষুর ধর্ম্ম তেমনি মানুষকে দেবত্বে তুলে এনে তার চরণে নমস্কার নিবেদন! হিন্দুর হৃদয় সিংহাসনে বিরাজ করেন ঈশ্বর, আর ভিক্ষুর অন্তর দর্ভাসনে ধ্যানস্থ তারই সঙ্কেত—মানুষ!" অতঃপর কৌমুদীর দিকে ফিরিয়া সহাস্যে কহিলেন, "এরপর একে যা কিছু শেখাতে হবে, তার শিক্ষক হবে তুমি!" অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। মুহূর্ত্ত পরেই সকলে নিঃশব্দে এক-এক ত্রিবর্ণকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

আজ যেন একটু সকাল করিয়াই রাত্রি নামিয়াছে, হয়ত সত্বরই প্রভাত হইবে।

নিশীথ রাত্রি, চারিদিক স্তব্ধ। কঙ্কন স্বীয় কক্ষে বসিয়া আছে—বিনিদ্র, সচঞ্চল। বাহিরে গাছপালাও যেন জাগিয়া—সেখানে ক্বচিৎ যেমনি একটি পাখী ডাকে, অমনি তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া গিয়া জানালায় মুখ দিয়া দাঁড়ায়—ওই বুঝি রাত্রি শেষ! বাহিরে যে দৃষ্টি পড়ে, তাহা চলিয়া যায় নগরে, যেখানে বাড়ীর গায়ে বাড়ী, মানুষের গায়ে মানুষ, যাহাদের কাছে সে প্রভাতেই ছুটিয়া গিয়া কহিবে—"আমি এসেছি!" অপরিমেয় আনন্দময় এক নব-জীবন—মুঠি-মুঠি ভরিয়া দ্বারে-দ্বারে বিলাইয়া সে কাল তার এই আনন্দ পসরা নিঃশেষে খালি করিবে!

এমনিই সব উৎসাহ ও উত্তেজনাময় ভাবনায় অজ্ঞাতে অনেকক্ষণ কাটিয়াছে, দুয়ার সম্মুখে কাহার পদশব্দে সে চম্‌কিয়া উঠিল। ঘরের ভিতর একটি প্রদীপ তখনও মিটি মিটি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে কঙ্কন দেখিতে পাইল, কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া এক বিচিত্র নারীমূর্ত্তি। তাহার পরিধানে গেরুয়া, সর্ব্বাঙ্গে সজ্জিত পুষ্পের অলঙ্কার, গলদেশে ফুলহার। মুখের দিকে চোখ পড়িতেই কঙ্কন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঠিয়া গিয়া বলিল, "কৌমুদী, তুমি—"

"যদি বলি—চিত্রা!"—বলিয়াই কৌমুদী একমুখ হাসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কঙ্কন সলজ্জ মুখখানি নীচু করিল।

কিন্তু এই চপলা মেয়েটি কঙ্কনকে রেহাই দিল না। তাহার অবনত মুখখানি আদরে তুলিয়া ধরিল, স্বীয় গলদেশ হইতে মালাগাছটি খুলিয়া লইয়া কঙ্কনের গলায় পরাইয়া দিল, তারপর মুখের দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "মালা-বদল!"

কঙ্কনের সমস্ত মুখটি নিমেষে সাদা হইয়া গেল। বিহ্বল-আতঙ্কে মেয়েটির দিকে তাকাইতেই সে তেম্‌নি করিয়াই সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে নয়—চিত্রার সঙ্গে!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "চর পাঠিয়ে—তোমাদের ঘরের খবর স-ব জেনে নিয়েছি! জানি, চিত্রা তোমার কে!"

কঙ্কন কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "এ-সবেরও কি প্রয়োজন ছিল?"

এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া কৌমুদী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "ছিল বৈ কি! নইলে, মালা, আমার গলার মালা অত

সস্তা নয়!" বলিয়াই বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, "আঃ, বেশ্ নিঝুম রাত! চমৎকার চাঁদ উঠেছে—বাইরে চলো না?" বলিয়াই কঙ্কনের হাতে একটা টান দিয়া বাহিরে আনিয়া এক শিলাখণ্ডে বসিল, উভয়ে পাশাপাশি—মাথার উপর চন্দ্রাতপ, আশেপাশে কুসুমসুরভিত ফুলের গাছ।

উভয়েই চুপচাপ—এ ওর পানে চায়, মুখ নামায়, ও এর পানে চায়, মুখ নামায়। কৌমুদী হাসে, কঙ্কন বিহ্বল হইয়া চাহিয়া থাকে। ক্ষণ পরে কৌমুদী কহিল, "কেন শুনবে? অসম্পূর্ণ মানুষ, জগতের অসম্পূর্ণ 'স্তব'! সৃজন শিল্পীর লজ্জা! তারা পৃথিবীর কোন কাজেই আসে না! তুমি মানুষ—'তোমাকে' তুমি ভুলতে পার না! যে পারে, সে 'মার—শয়তান!" সহসা তার চোখ দুটি আলোকিত হইয়া উঠিল এবং সেই-চোখের এক পরিপূর্ণ দৃষ্টি কঙ্কনের উপর নিক্ষেপ করিয়া পুনশ্চ কহিল, "এখানে এসেছ বটে, কিন্তু অখণ্ড আসতে পারোনি; এসেছ—তোমার খানিক নিয়ে! খানিক রেখে এসেছ—চিত্রার কাছে! তাই প্রয়োজন—তোমাকে পূর্ণ ক'রে নেবার!"

প্রভাতেই যে পাখী মুখর হইবে, তাহাকে আর নিশীথে নীরব হইয়া থাকা মানায় না। তাই বুঝি বা কঙ্কন বলিয়া ফেলিল, "পূর্ণ ক'রে নিতে চাও কি তোমার খানিক দিয়ে?"

"ইস্! এত লোভ?" কৌমুদী মুচ্‌কিয়া হাসিয়া এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, "ও মালা চিত্রার! কিন্তু তার হাত দিয়ে ত' আর তুমি ও পেতে পার না—ভিক্ষু হয়েছ যে!"

"আমি ত চাই নি!"

"ইহলোক চায়—পরলোক তাকিয়ে থাকে!"

"কেন?"

"আকাঙ্ক্ষা! আকাঙ্ক্ষাকে একদিকে বাগিয়ে রেখে, আর এক দিকে 'মহাপুরুষ' হওয়া চলে না! সমাজের মানুষকে বুক দিতে চলেছ, আর চিত্রার চিত্তের দান গ্রহণ করবে না তুমি?"

"আমি যে ভিক্ষু!"

"দান—ভিক্ষুই গ্রহণ করে।"

"এই কি সে দান?"—বলিয়া কঙ্কন মালাগাছটা খুলিয়া কৌমুদীর চোখের উপর ধরিল।

কৌমুদীর মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ! তোমার রিক্ত ঝুলির ওই প্রথম সঞ্চয়!" থামিল। একটু পরেই আবার বলিয়া উঠিল, "প্রেম! অপ্রমেয় প্রেমে পৃথিবীর মানুষকে তুমি মাতিয়ে দেবে, তাই ওই মালা তোমার নব যাত্রা পথের প্রথম পাথেয়! বরদাত্রী নারীর নিকটে নেওয়া প্রথম ঋণ!" বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "চিত্রা, তার অভিমান চন্দনে—অঙ্গে এর প্রেমের প্রলেপ দিলে, অস্ত্রের নির্ম্মম আঘাত টের পাবে না।" বলিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল।

অস্ত্রাঘাত এখনো পিঠে পড়ে নাই, সুতরাং তাহার পরিচয় কঙ্কনের জানা ছিল না। কিন্তু তাপসী উমার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী এই মেয়েটির রুক্ষ-কৃচ্ছ্র ভিক্ষুণী-দেহের অন্তরাল হইতে যে-মানুষটি এইমাত্র আত্মপরিচয় দিয়া গেল, আপাততঃ তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে সে অভিভূত হইয়া পড়িল। বারংবার এই প্রশ্নই তাহার মনে উঠিতে লাগিল, 'মানুষকে নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতে সঙ্কেত করে কোন প্রলোভন —মানুষের নিকট সংসার-বিরাগী মন, না ছলনাময়ী নারীর অজানা ইঙ্গিত? সৃষ্টির সুরু হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহাই ত প্রমাণ হইয়া আসিয়াছে—মোক্ষের পথে পুরুষের গতিরোধ করে নারী, নারীর অনুগ্রহ যাহার জীবনকে স্নেহে প্রেমে সেবায় সাহচর্য্যে যত বেশী ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছে, শৃঙ্খলের বন্ধন তাহাকে বেড়িয়া তত বেশী সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু এই যে আশ্চর্য্য মেয়েটি—এর মুখ দিয়া যে দুর্লঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ এই মাত্র বাহির হইল, ইহাই বা সে কোন্ যুক্তি দিয়া কেমন করিয়া উপেক্ষা করিবে? নিজেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিতে গিয়া যদিই বা অবিজ্ঞাত কোনো এক কাল্পনিক পরমার্থকে স্পর্শ করিতে হয়, তাহা হইলে যাহার দৈহিক স্পর্শে ইহারই প্রেরণা সেই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমতীকেই বা সে অস্বীকার করিবে কেন? * * * এই সব যুক্তিতর্কের চিন্তাতরঙ্গে বিপর্য্যস্ত হইয়া কঙ্কন শিলাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া পুনরায় কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল—সম্মুখেই শাক্যসিংহের নিষ্কাম মূর্ত্তি, ইন্দ্রিয় জয়ের পুরুষোত্তম প্রচারক! কঙ্কন চমকিয়া উঠিল, তারপর কি মনে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল, দ্রুতপদে অঙ্গন পার হইয়া অপর প্রান্তে ভিক্ষুণী-বাসের একটি ক্ষুদ্র কুটীরের সমুখে আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—

ভিতরে কৌমুদী, তার মুখে স্তব গান! নারীর

পরিচয়—আকাশের দেবতাকে আত্মনিবেদন করা নয়, মাটির জন্মভূমিকে জীবন উৎসর্গ করা নয় বা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধির লোভে নিজেকে ধর্ম্মের আলিঙ্গনে সমর্পণ করা নয়! এই সমস্ত পরিচয়ে যাহার পরিচয়, আসলে সে নারী নয়—নারীর ছদ্মবেশে কোনো বিকৃত জীব! নারীর রাজধানী—পুরুষের অন্তর্লোকে বিরাজিত সেইখানেই তাহার সাম্রাজ্ঞীর স্বর্ণ সিংহাসন—যাহার উপর নিশ্চিন্ত নির্ভরে বসিয়া সে আপন রাজমুকুট খুলিয়া রাখে পুরুষের পাদমূলে, তাহাকে শিখাইয়া দিতে—'নির্ব্বাণ-রহস্য?'

গান থামিতেই কঙ্কন ডাকিল, "কৌমুদী—"

কৌমুদী জানালায় মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফিরিয়া কঙ্কনকে দেখিয়াই মাথায় কাপড় দিল। তারপর শশব্যস্তে সরিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে কঙ্কনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আর এক প্রহেলিকা! ভিক্ষুণীরা মাথায় কাপড় দেয় না—কৌমুদীকেও দিতে কঙ্কন ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই। তারা থাকে আজীবন অনবগুণ্ঠিতা! তাই কৌমুদীর সহসা এই সকুণ্ঠ ব্যবহারে সেও মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। উভয়েই বাক্যহারা, উভয়ের কাছে উভয়েই 'বিস্ময়'।

মিনিট কয়েক পরেই কৌমুদী বালিকার ন্যায় হাসিয়া উঠিল—একমুখ সুমিষ্ট হাসি! কহিল, "অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রয়েছ যে?"

কঙ্কন মুখ নীচু করিল। একটু পরেই মুখ তুলিয়া বলিল, "একটা কথা বল্‌বে?"

"যদি 'না' বলি নিশ্চয় রাগ কর্‌বে, সুতরাং বল্‌তেই হবে—"

"আচ্ছা, প্রভু গৌতম—আমাদের বুদ্ধদেব, ইনিও ত ত্যাগ করে এসেছিলেন—"

"নারীকে?"

কঙ্কন আকারে-ইঙ্গিতে জানাইল—'হুঁ!'

কৌমুদী এক মিনিট কাল কঙ্কনের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া স্থিরকণ্ঠে কহিল, "মনেও করো না, বুদ্ধদেব ত্যাগ করেছিলেন নারীর বাহিরের এই মন্দিরটা—ভেতরে যে পরমা প্রকৃতি মূর্ত্তি, তাকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন নিজ মর্ম্ম-বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে, নইলে ইহলোকের পূজা তাঁকে আর পেতে হতো না!" মাথার কাপড়টা একটু সরিয়া গিয়াছিল, টানিয়া কহিল, "ছেলেকে নিজের বুকের দুধ দেয় যে মা—মাকেও বাঁচিয়ে রাখে ছেলে! নারী গর্ভে ধারণ না করলে গৌতমের জন্ম কি সম্ভব হ'ত, আমাকে বল্‌তে পার?"

কঙ্কন চম্‌কিয়া উঠিল।

কৌমুদীর মুখে তখন হাসি আর হাসি। কহিল, "না পার, আমিই বলি—এই যাকে তোমরা নারী, মায়াবিনী, নরকের দ্বার—বল, সে সরে দাঁড়ালে তোমাদের এই পুরুষ জাতটার কোনো অস্তিত্ব থাকত না! গোপাকে ছেড়ে এলে শাক্যঠাকুর কল্পতরুর মত নিজেকে অমন বিলি কর্‌তে পার্‌তেন না!"

এমন সময়ে চারিদিকে পাখী ডাকিয়া উঠিল। কৌমুদী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আর না! ঘরে যাও—"

"আর একটা কথা—"

"বলে ফেলো—"

"মাথায় কাপড়—তোমায় এর আগে কখনো দেখিনি ত?"

"সে কি গো! এই গভীর রাতে এত কাছে তুমি! একটু লজ্জা—তাও কি ছাই রাখ্‌তে দেবে না?"—বলিয়াই কৌমুদী মাথার কাপড় নামাইয়া মুখ ভারি করিয়া পুনশ্চ জানালায় গিয়া মুখ রাখিল।

কঙ্কন স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল স্থাণুর ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখ ফিরাইয়া তরল অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

ক্রমশঃ

স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্ম্ম

শ্রীঅরবিন্দ

(২)

তিনটি কথা প্রথমেই মনে উঠে, গীতা এইস্থলে যাহা বলিয়াছে সেই সবের মধ্যেই এই তিনটি নিহিত রহিয়াছে। প্রথমত, সকল কর্ম্মই ভিতর হইতে নির্দ্ধারিত হওয়া চাই, কারণ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তাহার নিজস্ব কিছু রহিয়াছে, তাহার প্রকৃতির একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও সহজাত শক্তি রহিয়াছে। সেইটিই হইতেছে তাহার আত্মার সিদ্ধিপ্রদ শক্তি, সেইটিই প্রকৃতিতে তাহার অন্তর্পুরুষের ক্রিয়াত্মক রূপ সৃষ্টি করিয়া দেয় এবং কার্য্যের ভিতর দিয়া সেইটিকে বিকশিত ও সিদ্ধ করিয়া তোলা, সামর্থ্যে ও ব্যবহারেও জীবনে সেইটিকে কার্য্যকরী করিয়া তোলাই হইতেছে তাহার প্রকৃত কর্ম্ম ; সেইটিই তাহাকে তাহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যজীবনের সত্য ধারাটি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, সেইটিকে ধরিয়াই তাহার উচ্চতর বিকাশের সূচনা হয়। দ্বিতীয়ত, মোটামুটি চারিশ্রেণীর প্রকৃতি আছে ; প্রত্যেক শ্রেণীরই আছে বিশিষ্ট কর্ম্মধারা এবং কর্ম্ম ও চরিত্রের আদর্শ বিধি, শ্রেণীই মানুষের উপযোগী ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং তাহার বাহ্য সামাজিক জীবনে তাহার কর্ম্মের যথাযথ সীমারেখা তাহার শ্রেণী অনুসারেই নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। শেষত, মানুষ যে-কোন কর্ম্মই করুক না কেন, যদি তাহা তাহার সত্তার ধর্ম্ম অনুযায়ী, তাহার প্রকৃতির সত্য অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, সেইটিকেই ভগবদ্‌মুখী করা যায়, অধ্যাত্মমুক্তি ও সংসিদ্ধিলাভের সাফল্যপ্রদ উপায়ে পরিণত করা যায়। এই তিনটি মন্তব্যের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি যে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তাহা সুস্পষ্ট। মানুষের ব্যষ্টিগত ও সামাজিক জীবনের যে সাধারণ ধারা তাহা এই সকল নীতির বিরোধী বলিয়াই মনে হয়, কারণ আমাদিগকে যে বাহ্যপ্রয়োজন, বিধান ও আইনের ভীষণ বোঝা বহন করিতে হয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, আর আমাদের আত্মপ্রকাশের যে প্রয়োজন, আমাদের সত্য ব্যক্তিত্ব, আমাদের সত্য আত্মা, আমাদের অন্তরতম স্বভাবগত জীবনধারার বিকাশের যে প্রয়োজন তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের দ্বারা প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ব্যাহত হয়, যৎসামান্যই সুযোগ বা ক্ষেত্রলাভ করে। জীবন, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, সমস্ত পারিপার্শ্বিক শক্তি যেন ষড়যন্ত্র করিয়াছে আমাদের আত্মার উপর তাহাদের শৃঙ্খল পরাইয়া দিতে, আমাদিগকে বলপূর্ব্বক তাহাদের ছাচে গড়িয়া তুলিতে, তাহাদের গতানুগতিক স্বার্থ এবং স্থূল সাময়িক সুবিধার বাহন করিতে। আমরা একটা যন্ত্রের অংশ হইয়া পড়ি, আমরা যে মনুষ্য, পুরুষ, আত্মা, মন, আমরা যে অমৃতের পুত্র, আমাদের সত্তার বিশিষ্ট সিদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ করিতে এবং ইহাকে সমস্ত জাতির সেবায় নিয়োগ করিতে সমর্থ, আমরা আর প্রকৃতপক্ষে তাহা থাকি না, আমাদিগকে থাকিতে দেওয়া হয় না। মনে হয় যেন আমরা নিজদিগকে গড়িয়া তুলি না, আমাদিগকে গড়িয়া দেওয়া হয়। অথচ যতই আমরা জ্ঞানে অগ্রসর হইব ততই গীতার সূত্রটির সত্যতা প্রকট হইতে বাধ্য। শিশুর শিক্ষা এমন হওয়া চাই যেন তাহার প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান, সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও প্রাণময় যাহা কিছু আছে তাহা প্রকট হইতে পারে ; মানুষের কর্ম্ম ও বিকাশধারা যে ছাঁচে গঠিত হইবে তাহা যেন হয় তাহার সহজাত গুণ ও শক্তিরই ছাঁচ। তাহাকে নূতন জিনিষ অর্জ্জন করিতেই হইবে, কিন্তু তাহার নিজস্ব বিকশিত স্বরূপ ও সহজাত শক্তির ভিত্তিতেই উৎকৃষ্টভাবে, জীবন্তভাবে সে-সব জিনিষ সে অর্জ্জন করিতে পারিবে। আর সেই ভাবেই মানুষের কর্ম্মও তাহার স্বভাবের গতি ও শক্তির দ্বারাই নির্ণীত হওয়া উচিত। যে-ব্যক্তি এইরূপ স্বাধীন-ভাবে বিকাশলাভ করিতে পাইবে সেই জীবন্ত "পুরুষ" ও "মনুষ্য" হইয়া উঠিবে এবং জাতির সেবার জন্য অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। আর এখন আমরা আরও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি যে, এই নীতি কেবল ব্যষ্টি

বা ব্যক্তির পক্ষেই নহে পরন্তু সমাজ ও জাতির পক্ষে, সমষ্টিগত আত্মা, সমষ্টিগত মানবের পক্ষেও সত্য। চারি শ্রেণী এবং তাহাদের কর্ম্মধারা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মন্তব্যটি আরও বেশী তর্কের বিষয়। বলা যাইতে পারে যে, ইহা অতিমাত্রায় সরল ও নিঃসন্দিগ্ধ, জীবনের বহুমুখীনতা এবং মানব প্রকৃতির নমনীয়তার যথেষ্ট হিসাব ইহাতে লওয়া হয় নাই, আর ইহার তত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ যাহাই হউক না কেন, বাহ্যিক সমাজ ব্যবস্থায় ইহা স্বধর্ম্মের সমুদয় নীতিরই যাহা বিরোধী ঠিক সেই গতানুগতিক আচারের অত্যাচারে পরিণত হইবে। কিন্তু বাহিরে যতটুকু দেখা যায় তাহার অন্তরালে ইহার এমন একটা গভীরতর অর্থ রহিয়াছে যাহাতে ইহার উপযোগিতায় আর ততটা সন্দেহের বিষয় থাকে না। আর যদিই আমরা এইটি বর্জ্জন করি, তৃতীয় মন্তব্যটির সাধারণ সার্থকতা অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়। জীবনে মানুষের কর্ম্ম ও বৃত্তি যাহাই হউক না কেন, যদি তাহা ভিতর হইতে নির্দ্ধারিত হয় অথবা যদি সেইটিকে সে তাহার প্রকৃতির আত্ম-অভিব্যক্তি করিতে পায়, তাহা হইলে সেইটিকে সে বিকাশ ও মহত্তর আভ্যন্তরীণ সিদ্ধির উপায়ে পরিণত করিতে পারে। আর ইহা যাহাই হউক না কেন, যদি সে তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম যথাযথ মনোভাব লইয়া সম্পাদন করে, যদি ইহাকে সে জ্ঞানদীপ্ত মনের দ্বারা পরিচালিত করে, ইহার ক্রিয়াকে অন্তরস্থিত ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করে, বিশ্বমাঝে অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে ইহার দ্বারা সেবা করে, অথবা ইহাকে মানবসমাজের মধ্যে ভগবানের অভিপ্রায়ের সজ্ঞান যন্ত্রে পরিণত করে, তাহা হইলে সে ইহাকে উচ্চতমঅধ্যাত্ম সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবার উপায়ে রূপান্তরিত করিতে পারে।

কিন্তু যদি আমরা এইটিকে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি বিচ্ছিন্ন কথা বলিয়া ধরিয়া না লই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপই করা হয়) পরন্তু, যেরূপ করা উচিত, সমস্ত গ্রন্থটিতে বিশেষতঃ শেষ দ্বাদশ অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত মিলাইয়া ইহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে এখানে গীতা শিক্ষার আরও গভীরতর অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার দার্শনিক মত হইতেছে এই যে, সমস্তই ভাগবত সত্তা হইতে, বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় অধ্যাত্ম সত্তা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। সবই হইতেছে ভগবানের, বাসুদেবের প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্, আর অন্তরে ও জগতে যে অবিনশ্বর রহিয়াছে তাহাকে প্রকট করা, বিশ্বের আত্মার সহিত ঐক্যে বাস করা, চৈতন্যে, জ্ঞানে, সঙ্কল্পে, প্রেমে, অধ্যাত্ম আনন্দে উন্নীত হইয়া পরমতম ভগবানের সহিত একত্ব লাভ করা, ব্যষ্টিগত ও প্রাকৃত সত্তাকে অপূর্ণতা ও অজ্ঞান হইতে মুক্ত করিয়া এবং ভাগবত শক্তির কর্ম্মসাধনের সচেতন যন্ত্রে পরিণত করিয়া উচ্চতম অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে বাস করা—এই সিদ্ধিটাই মানুষের অধিগম্য এবং অমৃতত্ব ও মুক্তিলাভের জন্য এইটিই হইতেছে প্রয়োজনীয় বিধান। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বস্তুতঃ প্রাকৃত অজ্ঞানে সমাবৃত রহিয়াছি, আত্মা অহংয়ের কারাগারে বন্দী, পারিপার্শ্বিকের দ্বারা অভিভূত, অবরুদ্ধ, মথিত এবং গঠিত হইতেছে, প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার দ্বারা অবশে চালিত হইতেছে, আমাদের নিজ নিগূঢ় অধ্যাত্ম-শক্তির সত্তায় আমাদের যে-প্রতিষ্ঠা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে—ততক্ষণ ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, এই সব প্রাকৃত ক্রিয়া এখন সমাচ্ছন্ন ও বিপরীত ক্রিয়াপরম্পরায় যতই পরিবৃত থাকুক না কেন, তথাপি ইহা নিজের বিকাশশীল মুক্তি ও সিদ্ধির তত্ত্বটি নিজের মধ্যেই ধরিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যেই ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং তিনিই প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য কর্ম্মধারার অধীশ্বর। আর এই বিশ্ব-আত্মা, এই যে অদ্বিতীয় সত্তা, এক হইয়াও সব, যদিও ইহা মায়া শক্তির দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় আমাদিগকে জগৎচক্রে ঘুরাইতেছে, কুম্ভকার যেমন কুম্ভ তৈয়ারী করে, তন্তুবায় যেমন তন্তু বয়ন করে, সেইরূপ এক যান্ত্রিক কৌশলের দ্বারা আমাদের অজ্ঞানে আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছে, তথাপি এই আত্মা হইতেছে আমাদের নিজেদেরই মহত্তম সত্তা, আর আমাদের যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, আমাদের সত্তার সত্য, যাহা জন্মে জন্মে পশুজীবন, মানবজীবন ও দিব্যজীবনে আমরা যাহা ছিলাম, যাহা হইয়াছি এবং যাহা হইব তাহাতে আমাদের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে এবং সর্ব্বদা নূতন ও অধিকতর উপযোগী রূপ গ্রহণ করিতেছে—এই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য অনুসারেই আমাদের এই অন্তর্ব্বাসী সর্ব্বদর্শী

সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ আমাদিগকে ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিতেছেন, যখন আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিবে তখনই আমরা ইহা দেখিতে পাইব। এই যে যন্ত্রস্বরূপ অহং, গুণত্রয়, মন, দেহপ্রাণ, ভাবাবেগ, বাসনা, দ্বন্দ্ব, চিন্তা, অভীপ্সা, প্রচেষ্টার গ্রন্থিল জটিলতা, দুঃখ ও সুখের, পুণ্য ও পাপের চেষ্টা ও সাফল্য ও বিফলতার, আত্মা ও পারিপার্শ্বিকের, আমি ও অপরের পারস্পরিক বিজড়িত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—ইহা হইতেছে আমার মধ্যে এক উচ্চতর অধ্যাত্ম শক্তি কর্ত্তৃক গৃহীত বাহ্য, অপূর্ণরূপ মাত্র; আমি আমার আত্মার নিগূঢ়তায় যে দিব্য ও মহান সত্তা এবং প্রকৃতিতে প্রকাশ্য ভাবে আমাকে যাহা হইতে হইবে, ঐ অধ্যাত্ম শক্তি তাহার সকল বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া ক্রমবর্দ্ধমানভাবে সেই সত্তারই আত্ম-অভিব্যক্তিকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই ক্রিয়ার মধ্যেই ইহার নিজের সাফল্যের নীতি নিহিত রহিয়াছে, তাহাই হইতেছে স্বভাব ও স্বধর্ম্মের নীতি।

জীব আত্ম-অভিব্যক্তিতে পুরুষোত্তমেরই একটি অংশ-বিশেষ। প্রকৃতিতে সে পরমাত্মার শক্তির প্রতিভূ স্বরূপ, তাহার ব্যক্তিত্বে সে সেই শক্তিই; সে ব্যষ্টিগত জীবনে বিশ্বপুরুষের সম্ভাবনাগুলিকেই প্রকট করে। এই জীব নিজেও আত্মা, প্রাকৃত অহং নহে; অহংরূপ নহে পরন্তু আত্মাই আমাদের প্রাকৃত সত্তা এবং আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম তত্ত্ব। আমরা বস্তুতঃ যাহা এবং আমরা যাহা হইতে পারি তাহার প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে ঐ ঊর্দ্ধতন অধ্যাত্ম শক্তির মধ্যে, আর ইহার কর্ম্মধারার যে অন্তরতম ও মূলগত সত্য তাহা ত্রিগুণময়ী মায়ার যন্ত্রবৎ ক্রিয়া নহে; এই মায়া হইতেছে কেবল বর্ত্তমান কার্য্যকরী শক্তি, নীচের স্তরে সুবিধার জন্য একটা সরঞ্জাম, বাহ্যিক অনুশীলন ও অভ্যাসের একটা ব্যবস্থা। যে অধ্যাত্ম প্রকৃতি বিশ্বমাঝে এই বহু রূপ গ্রহণ করিয়াছে, পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা, তাহাই হইতেছে আমাদের জীবনের মূল উপাদান; বাকী আর সব কিছুই হইতেছে অধ্যাত্মের এক উচ্চতম প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া হইতে নিম্নতর সৃষ্টি এবং বাহ্যতররূপ। আর প্রকৃতিতে আমাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজ নিজ বিবর্ত্তনের একটা মূল নীতি ও সঙ্কল্প; প্রত্যেক জীব হইতেছে একটি আত্ম-চৈতন্যের শক্তি, সে নিজের মধ্যে ভাগবতের একটি পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করে এবং তাহার দ্বারা নিজের কর্ম্ম ও ক্রমবিকাশ, নিজের ক্রমবর্দ্ধমান আত্মোপলব্ধি, নিজের নিত্য বৈচিত্র্যময় আত্ম-প্রকাশ, পূর্ণ সংসিদ্ধির দিকে নিজের দৃশ্যত অনিশ্চিত কিন্তু নিগূঢ়ভাবে অবশ্যম্ভাবী প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেইটিই হইতেছে আমাদের স্বভাব, আমাদের নিজ সত্য প্রকৃতি, সেইটিই হইতেছে আমাদের সত্তার সত্য, তাহা জগতে আমাদের বিচিত্র বিবর্ত্তনে এখন কেবল নিরন্তর আংশিক ভাবেই প্রকট হইতেছে। কর্ম্মের যে-নীতি এই স্বভাবের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় তাহাই হইতেছে আমাদের আত্ম-সংগঠন, কর্ত্তব্য কর্ম্মধারার যথার্থ ধর্ম্ম, আমাদের স্বধর্ম্ম।

সমস্ত বিশ্বেই এই নীতি পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বত্রই কাজ করিতেছে এক অদ্বিতীয় দিব্যশক্তি, এক সাধারণ বিশ্ব-প্রকৃতি, কিন্তু প্রত্যেক স্তর, রূপ, শক্তি, গণ, জাতি, ব্যষ্টিগত জীবের মধ্যে সে একটি প্রধান ভাব এবং নিত্য ও জটিল পরিবর্ত্তনের কয়েকটি অপ্রধান ভাব ও নীতি অনুসরণ করিতেছে, প্রত্যেকের স্থায়ী ধর্ম্ম এবং অস্থায়ী ধর্ম্ম দুই-ই ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহারাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় বিবর্ত্তনের মধ্যে প্রত্যেকের সত্তার ধারা, তাহার উদ্ভব, স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের মার্গ, তাহার আত্মরক্ষা ও আত্ম-বিবর্দ্ধনের শক্তি, তাহার সুপ্রতিষ্ঠ ও ক্রমবিকাশশীল আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির গতি, বিশ্বমাঝে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির অবশিষ্ট অংশের সহিত তাহার সম্বন্ধের বিধি। নিজ সত্তার ধর্ম্ম স্বধর্ম্ম অনুসরণ করা, নিজ সত্তায় নিহিত ভাবের স্বভাবের বিকাশ করা—ইহাই হইতেছে তাহার নির্ব্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠা, তাহার যথাযথ পন্থা ও পদ্ধতি। পরিশেষে তাহা জীবকে কোন বর্ত্তমান রূপায়নের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে না, পরন্তু বিকাশের এই পথ অনুসরণ করিয়া জীব নিজ ধর্ম্ম ও নীতির সহিত সমঞ্জসীভূত নূতন নূতন অভিজ্ঞতায় নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত ভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে এবং প্রবলতম শক্তিতে বর্দ্ধিত হইয়া যথাসময়ে বর্ত্তমান অবয়ব সকলকে ভেদ করিয়া উচ্চতর আত্ম-প্রকাশে উপনীত হইতে পারে। নিজ ধর্ম্ম ও নীতিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়া, যাহাতে পারিপার্শ্বিককে নিজের সহিত মিলাইয়া লইতে পারা যায় এবং তাহাকে নিজ প্রকৃতির উপযোগী করিয়া তোলা যায় এইভাবে পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজেকে মিলাইতে না পারা—ইহা হইতেছে নিজেকে হারাইয়া

ফেলা, আত্ম-আবিষ্কারে বঞ্চিত হওয়া, আত্মার পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া, ইহা বিনষ্টি, মিথ্যা, মৃত্যু, ক্ষয় ও ধ্বংসের বেদনা, অনেক সময়েই এইভাবে নির্ব্বাণ ও বিলুপ্তির পর আত্মাকে পুনরুদ্ধার করিবার কষ্টকর সাধনা আবশ্যক হয়, ইহা ভ্রান্তপথে বৃথা পরিভ্রমণ, আমাদের প্রকৃত প্রগতির পরিপন্থী। এই নীতি প্রকৃতির সর্ব্বত্র কোন না কোন আকারে প্রচলিত রহিয়াছে; যে সাধারণত্বের নীতি ও বৈচিত্র্যের নীতির ক্রিয়াবিজ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে সে-সবেরই মূলে ইহা রহিয়াছে। মানুষের জীবনে তাহার বহু মানবীয় শরীরে বহু জন্মে ঐ একই নীতি কার্য্য করিতেছে। এখানে ইহার একটা বাহ্যিক ক্রিয়া রহিয়াছে এবং একটা আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য রহিয়াছে; আর যখন আমরা ঐ আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যটি লাভ করি এবং আমাদের সমুদয় কর্ম্মকে আধ্যাত্মিক সার্থকতায় উদ্ভাসিত করি—তখনই ঐ বাহ্যিক ক্রিয়া তাহার পূর্ণ ও সমগ্র অর্থলাভ করিতে পারে। আত্মজ্ঞানে আমাদের প্রগতির অনুপাতে এই মহান ও বাঞ্ছনীয় রূপান্তর দ্রুত ও বলিষ্ঠভাবে সম্পাদিত হইতে পারে।

আর প্রথমেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বভাব বলিতে উচ্চতম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এক জিনিষ বুঝায়, আর ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতিতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ও অর্থ গ্রহণ করে। এখানেও উহা কর্ম্ম করে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পায় না, যেন অর্দ্ধ আলোকে বা অন্ধকারে তাহার নিজস্ব সত্য ধর্ম্মটির সন্ধান করে এবং বহু নিম্নতন রূপ, বহু মিথ্যারূপ, অন্তহীন ত্রুটি, বিকৃতি, আত্মহানি, আত্মলাভের ভিতর দিয়া নিজের পথে চলিতে থাকে, অবশেষে সে আত্ম-দর্শন ও সিদ্ধিতে উপনীত হয়। এখানে আমাদের প্রকৃতি হইতেছে জ্ঞান ও অজ্ঞানের, সত্য ও মিথ্যার, সফলতা ও বিফলতার, ন্যায় ও অন্যায়ের, লাভ ও ক্ষতির, পাপ ও পুণ্যের মিশ্রিত রচনা। এই সবের ভিতর দিয়া স্বভাবই আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রাপ্তির অনুসন্ধান করিতেছে, স্বভাবস্ত প্রবর্ত্ততে—এই সত্য হইতে আমাদের সর্ব্বতোমুখী ঔদার্য্য এবং সমদৃষ্টি শিক্ষা করা উচিত, কারণ আমরা সকলে ঐ একই বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের অধীন। এইসব ক্রিয়া আত্মার নহে, প্রকৃতির। পুরুষোত্তম এই অজ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি উর্দ্ধ হইতে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জীবকে তাহার সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিচালিত করেন। শুদ্ধ অক্ষর আত্মা এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, সে তাহার অলক্ষ্য শাশ্বত প্রতিষ্ঠা হইতে ক্ষর প্রকৃতিকে তাহার বিপর্য্যয় সকলের মধ্যে দর্শন করে, ধরিয়া থাকে। ব্যষ্টিগত জীবের যাহা প্রকৃত আত্মা, আমাদের মধ্যে যাহা কেন্দ্রীয় সত্তা, তাহা এই সকল জিনিষ হইতে মহত্তর, কিন্তু প্রকৃতিতে তাহার বাহ্যিক ক্রমবিকাশে এই সকলকে স্বীকার করিয়া লয়। আর যখন আমরা এই প্রকৃত আত্মাকে লাভ করি, যে অপরিবর্ত্তনীয় সর্ব্বগত আত্মা আমাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহাকে লাভ করি এবং যে পুরুষোত্তম—আমাদের যে হৃদিস্থিত ঈশ্বর—প্রকৃতির সমুদয় কর্ম্মের উপর অধ্যক্ষরূপে বিরাজ করিয়া সব কিছু পরিচালন করিতেছেন তাঁহাকে লাভ করি তখনই আমরা আমাদের জীবনের ধর্ম্মের সমগ্র অধ্যাত্ম অর্থটির সন্ধান পাই। কারণ যে জগদীশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার অনন্তগুণে সর্ব্বভূতের মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে অবগত হই। আমরা ভগবানের চতুর্ব্যূহ সত্তা সম্বন্ধে সজ্ঞান হই—আত্ম-জ্ঞানও বিশ্ব-জ্ঞানের সত্তা; বল ও শক্তির যে-সত্তা, নিজের শক্তিসকলের সন্ধান করিতেছে, আবিষ্কার করিতেছে, প্রয়োগ করিতেছে; অন্যোন্যাশ্রয় ও সৃষ্টি ও সম্বন্ধ ও জীবে জীবে আদান প্রদানের সত্তা; কর্ম্মের যে সত্তা বিশ্বে শ্রম করিতেছে। আবার আমাদের মধ্যে ভগবানের যে ব্যষ্টিগত শক্তি রহিয়াছে সে-সম্বন্ধেও আমরা সজ্ঞান হইয়া উঠি, তাহা এই চতুর্বিধ শক্তিকে সাক্ষাৎভাবে ব্যবহার করিতেছে, আমাদের আত্ম-অভিব্যক্তির ধারা নির্দ্দেশ করিতেছে, আমাদের দিব্যকর্ম্ম ও দিব্যপদ নির্দ্ধারণ করিতেছে এবং এই সবের ভিতর দিয়াই তাঁহার বৈচিত্র্যময় সার্ব্বিকতার মধ্যে আমাদিগকে উত্তোলন করিতেছে যেন ইহা দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার সহিত এবং বিশ্বমাঝে তিনি যাহা কিছু হইয়াছেন সেই সবের সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক একত্ব লাভ করি।

মানুষের মধ্যে চারিবর্ণের যে বাহ্যিক পরিকল্পনা তাহা দিব্য কর্ম্মধারার এই সত্যের কেবল অপেক্ষাকৃত বাহ্যিক ক্রিয়ার সহিতই সংশ্লিষ্ট; গুণত্রয়ের ক্রিয়ার মধ্যে ইহার কার্য্যপ্রণালীর কেবল একটি মাত্র দিকেই উহা সীমাবদ্ধ।

ইহা সত্য যে, এই জীবনে মানুষ মোটামুটি চারিশ্রেণীর মধ্যে পড়ে—জ্ঞানের মানুষ, কর্ম্মের মানুষ, উৎপাদনশীল প্রাণিক (vital) মানুষ এবং রূঢ় শ্রম ও সেবার মানুষ। এই শ্রেণীবিভাগগুলি মূল প্রকৃতিগত নহে, পরন্তু ইহারা আমাদের মানবত্বের আত্মবিকাশে বিভিন্ন স্তর। মানুষ যথেষ্ট অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির বোঝা লইয়া যাত্রারম্ভ করে, তাহার প্রথম দশা হইতেছে রূঢ়শ্রমের, শরীরের প্রয়োজন, প্রাণের সম্প্রেরণা, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম তাহার পশুসুলভ আলস্যকে এই শ্রমে বাধ্য করে, আর প্রয়োজনের একটা সীমা ছাড়াইয়াও সমাজ সাক্ষাৎভাবে অথবা গৌণভাবে তাহাকে এই শ্রমে বাধ্য করে; যাহারা এখনও এই তামসিকতার অধীনে তাহারাই শূদ্র, সমাজের দাসশ্রেণী, তাহারা সমাজকে তাহাদের শারীরিক শ্রম দেয়, তাহা ছাড়া সামাজিক জীবনের বহুমুখী খেলায় তাহারা অন্যান্য অধিকতর উন্নত মানুষের তুলনায় আর কিছুই দিতে পারে না অথবা খুব কমই দিয়া থাকে। ক্রিয়াশীলতার দ্বারা মানুষ নিজের মধ্যে রজঃগুণের বিকাশ করে এবং আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ পাই, সে প্রয়োজনীয় সৃষ্টি, উৎপাদন, সঞ্চয়, অর্জ্জন, অধিকার ও ভোগের নিরন্তর প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হয়, সে হইতেছে মধ্যবিত্ত আর্থিক ও প্রাণিক মানব, বৈশ্য। আমাদের সাধারণ প্রকৃতির রাজসিকতা বা সক্রিয়তার আরও উচ্চতর স্তরে আমরা পাই এমন কর্ম্মশীল মানব—যাহার আছে অধিকতর প্রবল ইচ্ছাশক্তি, স্পর্দ্ধিততর উচ্চাশা, কর্ম্ম করিবার, যুদ্ধ করিবার, নিজের ইচ্ছাকে জয়ী করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা এবং উচ্চতম স্তরে নেতৃত্ব করিবার, প্রভুত্ব করিবার, শাসন করিবার, নিজের পথে জনমণ্ডলীকে চালিত করিবার প্রেরণা—সে যোদ্ধা, নেতা, শাসক, সামন্ত, রাজা, সে-ই ক্ষত্রিয়। আর যেখানে সাত্ত্বিক মনেরই প্রাধান্য সেখানে আমরা পাই ব্রাহ্মণ, তাহার প্রবৃত্তি জ্ঞানের দিকে, সে জীবনে লইয়া আইসে চিন্তা, বিচার, সত্যের অনুসন্ধিৎসা এবং একটা বুদ্ধিসঙ্গত বিধান, অথবা উচ্চতম স্তরে একটা আধ্যাত্মিক বিধান এবং ইহার আলোকে সে জীবনের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নির্ণয় করে।

মানব প্রকৃতিতে সকল সময়েই বিকশিত অবস্থাতেই হউক কিম্বা অবিকশিত অবস্থাতেই হউক, উদার হউক কিম্বা সঙ্কীর্ণ হউক, দমিত থাকুক কিম্বা বাহিরে প্রকট হউক, এই চারিটি চরিত্রের কিছু না কিছু রহিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষে এই চারিটির কোন একটি প্রাধান্যলাভ করিতে চায় এবং কখনও কখনও প্রকৃতির ক্রিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রটিকেই অধিকার করিয়া লইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর সকল সমাজেই আমরা এই চারি শ্রেণী পাইব—এমন কি, বর্ত্তমান যুগে যেমন চেষ্টা করা হইয়াছে, আমরা যদি সমাজকে কেবলই উৎপাদনশীল ও ব্যবসামূলক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি, অথবা আধুনিকতম মন যেদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইউরোপের এক অংশে যে বিষয়ে এখন পরীক্ষা চলিতেছে এবং অন্যত্র সমর্থিত হইতেছে, যদি একটা শ্রমিক সমাজ, জনসাধারণকে লইয়া একটা শূদ্র সমাজই গড়িয়া তুলি, তাহা হইলেও সেখানে এই চারি শ্রেণী থাকিবে। তখনও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থাকিবে, তাহারা সমস্ত প্রয়াসটির নীতি, সত্য ও নিয়ামক বিধির অনুসন্ধান করিতে ব্রতী হইবে; শ্রমশিল্পের অধ্যক্ষ ও নেতা থাকিবে, তাহারা এই সব উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকে নিমিত্ত করিয়া নিজেদের সাহসিকতা ও সংগ্রাম ও নেতৃত্ব ও প্রাধান্যের প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবে; শুধুই উৎপাদন ও ধনোপার্জ্জনে যাহারা ব্রতী এইরূপ সাধারণ ধরণের বহুলোক থাকিবে; আবার সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী থাকিবে, তাহারা সামান্য কিছু শ্রমমূলক কর্ম্ম এবং তাহাদের শ্রমের পুরস্কার পাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে। কিন্তু এ-সমস্তই হইতেছে বাহিরের জিনিষ, আর ইহাই যদি সব হইত, তাহা হইলে মানব জাতির এই অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের কোনই আধ্যাত্মিক উপযোগিতা থাকিত না। বড় জোর, ইহার কেবল এই অর্থ হইতে পারে যে, আমাদিগকে জন্মে জন্মে ক্রমবিকাশের এই সকল স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, ভারতে কখনও কখনও এইরূপ মতই দেখা গিয়াছে; কারণ আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে তামসিক, রজোতামসিক, রাজসিক বা রজোসাত্ত্বিক প্রকৃতির ভিতর দিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়, আভ্যন্তরীণ ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে উঠিতে ও প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় এবং তাহার পর সেই ভিত্তি হইতে মোক্ষলাভের জন্য সাধনা করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে গীতা যে বলিয়াছে, শূদ্র ও চণ্ডালও তাহার জীবনকে ভগবদ্‌মুখী করিয়া সোজা অধ্যাত্মমুক্তি ও সিদ্ধির মধ্যে উঠিতে পারে,এই কথার আর কোনই যুক্তিযুক্ততা থাকে না।

মূল যে সত্য সেটি এই বাহিরের জিনিষ নহে, তাহা হইতেছে আমাদের সচল আভ্যন্তরীণ সত্তার শক্তি, অধ্যাত্ম প্রকৃতির চতুর্ব্বিধ সক্রিয় শক্তির সত্য। প্রত্যেক জীব তাহার অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এই চারিটি দিক লইয়া আছে, সে হইতেছে জ্ঞানের সত্তা, বল ও শক্তির সত্তা, পরস্পরের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদানের সত্তা এবং কর্ম্ম ও সেবার সত্তা; কিন্তু কর্ম্মে এবং অভিব্যক্তির ধারায় কোন একটি দিকই প্রাধান্য লাভ করে এবং জীবাত্মার সহিত তাহার আধারভূত প্রকৃতির সম্বন্ধকে বিশিষ্টতা প্রদান করে; সেইটিই পথ দেখায় এবং অন্য শক্তিগুলির উপর নিজের ছাপ মারিয়া দেয়, সে-সবকে কর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও অনুভূতির প্রধান ধারাটির প্রয়োজনে নিয়োগ করে। তখন স্বভাব এই ধারাটির ধর্ম্মই অনুসরণ করে, সামাজিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী স্থূল ও বাঁধাধরা ভাবে নহে, পরন্তু সূক্ষ্ম ভাবে, নমনীয় ভাবে, এবং ইহাকে বিকশিত করিতে গিয়াই অন্য তিনটি শক্তিকেও বিকশিত করিয়া তোলে। এইরূপে কর্ম্ম ও সেবার প্রেরণাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিলে তাহা জ্ঞানকে পুষ্ট করে, শক্তিকে বর্দ্ধিত করে, অনন্যপরতার ঘনিষ্টতা ও সামঞ্জস্যকে এবং সম্বন্ধের কৌশল ও পারম্পর্য্যকে সুষ্ঠু করিয়া তোলে। চতুর্ম্মুখী দেবতার প্রত্যেকটি দিকের মুখ্য স্বাভাবিক তত্ত্বটি অন্য তিনটির দ্বারা প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়, এইভাবেই তাহা সমগ্র সিদ্ধির অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই যে ক্রমবিকাশ, ইহা গুণত্রয়ের ধর্ম্ম অনুসরণ করে। জ্ঞানময় সত্তার যে ধর্ম্ম সেইটিকেও তামসিকভাবে অথবা রাজসিকভাবে অনুসরণ করা যায়। শক্তির যে ধর্ম্ম সেইটিকেও পাশবিক ও তামসিকভাবে অথবা সমুচ্চ সাত্ত্বিকভাবে অনুসরণ করা যায়, সেইরূপ কর্ম্ম ও সেবার ধর্ম্মকেও প্রবল রাজসিক ভাবে অথবা সুন্দর ও উদার সাত্ত্বিকভাবে অনুসরণ করা যায়। আভ্যন্তরীণ ব্যষ্টিগত স্বধর্ম্মের যে ধারা তাহাতে উপনীত হওয়া এবং জীবনের পথে সেই ধারা আমাদিগকে যে-কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া—ইহাই হইতেছে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন। আর এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঐ আভ্যন্তরীণ স্বধর্ম্ম কোন বাহ্য সামাজিক বা অন্য প্রকার কর্ম্ম, বৃত্তি বা অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে কর্ম্মশীল সত্তা সেবাতেই তৃপ্তি পায় অথবা আমাদের মধ্যে এইরূপ যে কর্ম্মীর ভাব রহিয়াছে তাহা তাহার শ্রমের দিকে, সেবার দিকে ভাগবত প্রেরণাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপায়রূপে জ্ঞানচর্চ্চার জীবন, সংঘর্ষ ও শক্তির জীবন অথবা অনন্যপরতা, উৎপাদন ও আদান-প্রদানের জীবন গ্রহণ করিতে পারে।

আর পরিশেষে এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার দিব্যতম রূপায়নে এবং সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বান অধ্যাত্মশক্তিতে উপনীত হওয়াই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা সমুচ্চ অধ্যাত্ম সিদ্ধির দ্রুততম ও উদারতম সত্যে প্রবেশ করিবার প্রশস্ত দ্বার। আমরা ইহা করিতে পারি যদি আমরা স্বধর্ম্মের ক্রিয়াকে আভ্যন্তরীণ ভগবানের, বিশ্বপুরুষের এবং বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমের পূজায় পরিণত করি এবং শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র কর্ম্মটিকেই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি, ময়ি সংন্যস্য কর্ম্মাণি। তখন যেমন আমরা গুণত্রয়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাই, তেমনিই আমরা চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ এবং সকল বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের সীমাও অতিক্রম করিয়া যাই, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। তখন বিশ্বপুরুষ ব্যষ্টিগত জীবকে বিশ্বগত স্বভাবের মধ্যে তুলিয়া লন, আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে চতুর্ম্মুখী সত্তা রহিয়াছে সেইটিকে সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ ও একীভূত করিয়া দেন এবং তাহার স্ব-নিয়ন্ত্রিত কার্য্যাবলী ভাগবত ইচ্ছা অনুসারে এবং জীবের মধ্যে ভাগবতের যে-শক্তি সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তদনুসারে সম্পন্ন করিয়া দেন।

গীতার আদেশ হইতেছে আমাদের নিজ কর্ম্মের দ্বারা, স্ব-কর্ম্মণা ভগবানের উপাসনা করা, আমাদের অর্পণ যেন হয় আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির নিজস্ব ধর্ম্মের দ্বারা নির্দ্ধারিত কর্ম্ম। কারণ ভগবান হইতেই সকল সৃষ্টির ধারা ও কর্ম্মের প্রেরণা উৎপন্ন হয় এবং তাঁহার দ্বারাই এই সমুদয় বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে এবং জগৎসমূহকে সংগ্রথিত রাখিবার জন্য তিনি স্বভাবের ভিতর দিয়া সকল কর্ম্ম পরিচালন করিতেছেন, তাহাদের রূপ গড়িয়া দিতেছেন। আমাদের আন্তর ও বাহ্য কার্য্যাবলীর দ্বারা তাঁহাকে উপাসনা করা, আমাদের সমগ্র জীবনকে পরমতমের উদ্দেশে কর্ম্মযজ্ঞে পরিণত করা—ইহা হইতেছে আমাদের সকল সঙ্কল্প ও সত্তা ও প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত এক হইয়া উঠিবার জন্য নিজে-দিগকে প্রস্তুত করিবার সাধনা। আমাদের কর্ম্ম হওয়া চাই আমাদের ভিতরের সত্য অনুযায়ী, তাহা যেন কোন বাহ্যিক

ও কৃত্রিম আদর্শের সহিত আপোষ না হয়, তাহা যেন হয় অন্তরাত্মা ও তাহার সহজাত শক্তিসকলের জীবন্ত ও যথার্থ অভিব্যক্তি। কারণ আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতিতে এই অন্তপুরুষের যে জীবন্ত অন্তরতম সত্য তাহার অনুসরণ করিলে তাহা যথাকালে আপাত-অতিচেতন পরাপ্রকৃতির মধ্যে ঐ অন্তপুরুষেরই যে অমৃত সত্য তাহাতে উপনীত হইতে সাহায্য করে। সেখানে আমরা ভগবানের সহিত এবং আমাদের সত্য সত্তার সহিত এবং সর্ব্বভূতের সহিত একত্বে বাস করিতে পারি এবং সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ হইয়া অমৃতধর্ম্মের মুক্তির মধ্যে দিব্য কর্ম্মের অনবদ্য যন্ত্র হইয়া উঠি।*

* যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮।৪৬

Essays on the Gita হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

বর্ষা নেমেছে সন্ধ্যাবেলা

শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী

১

দুলাস্‌নে আর এলোচুল ওলো রাতি
ভুলাস্‌নে আর এমন করিয়া সাথি,
চঞ্চল তোর বুকের তৃষায়
আমার মনের বাসনা মিশায়
উদ্বেল হই ব্যথার বেদনে কাহার লাগি
না জানি লো তোর মমতায় কেন শিহরি জাগি ?

২

আসিস্ কেবল বারেকের তরে ধরণী 'পর
গোপনে কোথায় থাকিস্ লুকায়ে, কোথায় ঘর ?
সারাদিনমান কোন্ নিরালায়
কাহারে ভুলাস মোহিনী মায়ায়
আমারে কেবল মিছে ছলনায় বেলার শেষে
এসো ঢাকি মুখ অবগুণ্ঠনে বধূর বেশে।

৩

কপালে পরিয়া ঝিঙের ফুলের সোনালী টিপ
জ্বালিয়া আকাশ তুলসীর তলে সন্ধ্যা দীপ
আসিস্ নে আর কাজল পরিয়া
আসিস্ নে সখি রূপ উজাড়িয়া
মিনতি করি লো তোরে বারে বারে আমি চপল
বারণ করি গো ভিজাস্‌নে তোর লঘু আঁচল।

৪

রঙীন বসন আজ কেন তোর সিক্ত হ'লো
চলে যা কুঞ্জে একা অভিসারে সময় গেলো
এ প্রিয় কবিরে ডাকিস্‌নে আর
হাতছানি দিয়ে মিছে বারবার
কল্পনা শুধু জাগাতে দে মোরে নিরালা গেহে
বাঁধিস্ নে আর বাঁধিস্ নে মোরে ভ্রান্ত স্নেহে।

৫

ফুটীবে পারুল বকুল তোমার পরশ পেয়ে
দুলিবে দোদুল করবীগুচ্ছ পূরবী গেয়ে
ইমনের যত অজানা গমক
বারে বারে তোর জাগাবে চমক
বিজলী গাঁথিবি আকাশ গলের মেঘমালায়
আমি ঘরে একা আনমনে রব' স্মৃতি খেলায়।

৬

ওরে তোরা দেখ বর্ষা নেমেছে সন্ধ্যাবেলা
দেখ্ চেয়ে ঐ গগনের কোলে কিসের খেলা
জীবনের আজ যত ব্যথা গান
বাসনায় ঘেরা যত অভিমান
আলাপে জমিয়ে গুঞ্জনতানে ব্যক্ত কর
ওলো সখি তোরা বঁধুয়ার পায়ে লুটায়ে পড়॥

রায়সাহেবের চিঠি

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

এক সময় যদু পণ্ডিত মহাশয়ের বেতের ভয়ে গ্রামশুদ্ধ ছেলেরা ভয় করিলেও নিজের ছেলে শ্রীমান্ পরাণকে তিনি শাসন করিতে পারেন নাই। লেখাপড়া শেখানর যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি দেখিলেন, কিছুতেই কিছু হইবার নহে—তখন হাল ছাড়িয়া দিলেন।

পরাণ বাল্যকালে হাতে গুল্তি লইয়া মাঠে মাঠে শিকার সন্ধানে ঘুরিয়াছে। যৌবনে গাঁয়ের যাত্রাদলে একাধিকবার গোঁফ্ কামাইয়া রাণী সাজিয়া মেডেল লাভ করিয়াছে। কিন্তু যদু পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আজ তাহার জীবনে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পৈতৃক যৎসামান্য জমিজমা যাহা ছিল তাহা ভাগে খাটাইয়া, পরে নিজে চাষ আবাদ করিয়া এবং পাটের দালালি ও তেজারতি কারবারে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যাকে বলে একেবারে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ—তাহাই হইয়াছে।

অনেকে এই লেখাপড়া না-জানা গণ্ডমূর্খ্য লোকটির অসম্ভব উন্নতি দেখিয়া পশ্চাতে হিংসা করিলেও সম্মুখে সকলেই তাহার ব্যবসাবুদ্ধির তারিফ করে। কেহ বলে, আজ সে লাখপতি; কেহ বলে কেবল সুদে খাটেই লাখ টাকা; আবার কেহ বলে, হাজার পঞ্চাশেকের বেশী নহে। সে যাহাই হউক, পঞ্চাশ হাজার হউক আর এক লাখই হউক গত বৎসরে অজন্মাজনিত যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল তাহাতে সে মহকুমা ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে এক-আধ পয়সা নহে, একেবারে দশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়া রাজার জন্মদিনে 'রায়সাহেব' খেতাব পাইয়াছে। এই খেতাবপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কদরও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশেপাশে কয়েকটি মোসাহেবও আসিয়া জুটিয়াছে। আজ তাহাকে সকলে অন্তরের সহিত সম্মান করুক আর নাই করুক, বাহিরে সম্মান দেখাইতে কেহ কার্পণ্য করে না।

পরাণের এ হেন সৌভাগ্য যদু পণ্ডিত মহাশয় দেখিয়া যাইতে না পারিলেও তাঁহার স্ত্রী দীনতারিণী নয়ন ভরিয়া দেখিয়া সম্প্রতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আজ তাঁহারই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সারা গ্রামে মহা ধূমধাম হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। দীন দুঃখী হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবিত্ত এমন কি, বড়লোকেরাও চাহিয়া আছেন—রায় সাহেব পরাণ তাহার মাতৃ-শ্রাদ্ধে কি ঘটা করে।

পরাণের বাল্যবন্ধু হরলাল যদু পণ্ডিতের পাঠশালা শেষ করিয়া অর্থের অভাবে আর পড়াশুনা করিতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সে বিষয়-আশয় দেখাশুনার কাজে ভারী পাকা লোক হইয়া উঠিয়াছে। শিরদাঁড়ির জমিদারের সেরেস্তায় সে অন্ততঃ আট-নয় বৎসর সুনামের সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। পরাণ তাহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিয়া তাহার এই বন্ধুটিকে হিসাব-পত্র লেখার জন্য লইয়া আসিল।

হরলাল হিসাব-পত্র লেখার কাজে পাকা লোক হইলে কি হয়? একটি দোষ তাহার আছে—সব কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ততা।

পরাণ হরলালকে পরামর্শের জন্য যখন ডাকিল যে তাহার মাতৃশ্রাদ্ধে কি করা যায়, হরলাল পরাণের কথা শেষ হইতেই স্বভাবোচিত ব্যস্ততায় বলিয়া বসিল, এ আর বেশী কথা কি! দাঁড়াও সব ঠিক করে দিচ্ছি—একটা নেমন্তন্ন চিঠি ছাপানর দরকার, এই চিঠি অন্তত হাজার খানেক জেলার বড় বড় লোকদের দেওয়া দরকার। পান-সুপুরি দিয়ে নেমন্তন্ন করার কাল এখন আর নেই—বুঝলে, এখন এই রীতি। সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম লইয়া হরলাল চিঠি লিখিয়া ফেলিল—

৺গঙ্গা

সময়োচিত নিবেদন—

বিগত ২২শে আষাঢ় সন ১৩৪৬ সাল রবিবার আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ৺লাভ করিয়াছেন। আগামী ২রা শ্রাবণ তাঁহার আদ্যকৃত্য হইবে। অতএব সানুনয়

নিবেদন এই যে, আপনি সবান্ধবে অনুগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া আমাকে দায়মুক্ত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

স্মারকলিপি :

২রা—পূর্ব্বাহ্নে আদ্যকৃত্য ও সভাধিরোহণ

৩রা—সায়াহ্নে ব্রাহ্মণ, আত্মীয় কুটুম্ব ভোজন।

৪ঠা—নিয়মভঙ্গ ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা।

কুসুমপুর	ভাগ্যহীন
২৮শে আসাঢ়	পরাণ দেবশর্ম্মণঃ
১৩৪৬ সাল	(রায়সাহেব)

উপরোক্ত পত্রখানি লিখিয়া হরলাল পরাণকে পড়িয়া শুনাইয়া দিল। পরাণ শুনিয়া বলিল—ঠিক আছে। কিন্তু পরাণের অন্যতম বাল্যবন্ধু ও যৌবনের যাত্রাদলের প্রধান পাণ্ডা সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উঠিল, তা বললে কি হয়। তোমার মায়ের শ্রাদ্ধে দীনদাস বাবাজীর কীর্ত্তন আর গৌরাঙ্গ অপেরাপার্টির 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা—এদুটো দিতেই হবে। সুতরাং সিদ্ধেশ্বরের কথা রাখিয়া প্রথম দিন কীর্ত্তন ও দ্বিতীয় দিন পালাগান হইবে পত্রে তাহা লিখিয়া দেওয়া হইল। হরলাল বলিল, আর ত দিন নেই, সুতরাং এখুনই এই চিঠি ছাপানর জন্যে শহরে লোক পাঠানর দরকার। সিদ্ধেশ্বর হরলালকে বলিল, দেখ, অনেকে পরাণের মাতৃশ্রাদ্ধে লৌকিকতা করতে পারে কিন্তু পরাণের তা নেওয়া উচিত হবে না। সুতরাং পত্রের শেষে সেটা লিখে দাও যে লৌকিকতা গ্রহণ করা হবে না।

হরলাল এইবার বিপদে পড়িল। সে বিবাহের চিঠির শেষে লেখা থাকিতে দেখিয়াছে লৌকিকতার পরিবর্ত্তে নবদম্পতির শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়। কিন্তু শ্রাদ্ধের চিঠির শেষে কি বয়ান লেখা হয়, তাহা তাহার জানা নাই। যাহাই লেখা হউক না কেন, প্রেসের তাহা জানা আছে। প্রেস তাহা বসাইয়া দিবে এই বিশ্বাসে সে নানারূপ ইন্‌তাম্ করিয়া পত্রের শেষে একটি লাইন টানিয়া, তাহার নীচে লিখিয়া দিল—লৌকিকতার পরিবর্ত্তে ইত্যাদি বসিবে।

তখনই সদরে লোক ছুটিল পত্রগুলি ছাপাইয়া আনিতে। এদিকে হরলাল খামে জেলার বড় বড় লোকেদের নাম-ঠিকানা লিখিতে বসিল। পত্রগুলি ছাপাইয়া আসিলেই তাহা এই খামে ভরিয়া তৎক্ষণাৎ ডাকে দিবে।

শহরের প্রেসে হরলালের হাতের লেখা পত্রটি লইয়া যখন লোক আসিল তখন প্রেসে বিবাহের বহু প্রীতি-উপহার, পত্র ইত্যাদি ছাপা হইতেছে। একটি মাত্র প্রেস। তাহার এখন ভারী মরশুম লাগিয়াছে। দিনে রাতে কাজ। রায়সাহেবের চিঠি। সুতরাং বিবাহের চিঠি ছাপিতে ছাপিতে নামাইয়া রাখিয়া এই চিঠি ছাপানর ব্যবস্থা করা হইল। কম্পোজ শেষ হইলে কম্পোজিটর দেখিল কপির শেষে লৌকিকতা ইত্যাদি বসিবে লেখা আছে। সুতরাং সে অপর একটি বিবাহের চিঠি হইতে লৌকিকতা ইত্যাদি লাইনটি লইয়া রায়সাহেবের চিঠির শেষে তাহা জুড়িয়া দিল। কোন রকমে একবার প্রুফ দেখিয়া চিঠিটি ছাপার অর্ডার হইল। ছাপা শেষ হইলে একটি কাগজে মুড়িয়া রায়সাহেবের লোকের হাতে প্রেসের ম্যানেজার তাহা দিয়া দিলেন।

লোক পত্র লইয়া ফিরিয়া আসিলে হরলাল তাড়াতাড়ি পত্রগুলি ভাঁজ করিয়া ঠিকানা লেখা খামে পুরিয়া টিকিট আঁটিয়া রাতারাতি তাহা ডাকে দিতে শহরে লোক পাঠাইল।

পরের দিন প্রাতঃকালে সিদ্ধেশ্বর পত্র দেখিয়া অবাক! বলিল, যাঃ সর্ব্বনাশ হয়েছে।

পরাণ জানিতে চাহিল কি হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বর বলিল, তুমি বুঝতে পারবে না। হরলালকে বলিল, চিঠিগুলো বিলি হয়নি তো?

হরলাল জানাইল, প্রায় পাঁচশত চিঠি কাল রাত্রে ডাকে দেওয়ার জন্য পাঠান হইয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর বলিল, সর্ব্বনাশ হয়েছে। মারাত্মক ভুল! রায়সাহেবের নিন্দা হবে! শহরে লোক পাঠাও—চিঠিগুলো ফেরত আসুক।

কি হইল, কি সর্ব্বনাশ হইল রায়সাহেব তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

হরলাল হন্তদন্ত হইয়া শহরে ছুটিল।

হরলাল যখন শহরের ডাক-ঘরে আসিয়া পৌছিল তখন ডাক-ঘরে মহা ভিড়! মনিঅর্ডার সেভিংস্ ব্যাঙ্কের টাকা জমা দেওয়া, খাম পোষ্টকার্ড বিক্রয়ের কাজে সকলেই ব্যস্ত। হরলাল কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করে, আর কাহাকেই বা কি

বলে। এমন সময় সে দেখিতে পাইল ডাক-ঘরের ঘরের মধ্যে একটি লোক তাহার হাতের লেখা খামগুলির উপর অবিরাম শীলমোহর করিয়া চলিয়াছে। হরলাল বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, ওতে ছাপ দেবেন না, ওগুলো ফেরত নেবো—

কিন্তু লোকটি তাহার কথায় মোটেই কর্ণপাত না করিয়া যথারীতি শীলমোহর করিতে লাগিল।

হরলাল তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। কিন্তু কি করিবে? কাহাকে বলিবে? যাহার কাছে যায়—কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করে না। সে দেখিল শীলমোহর হইয়া গেলে পত্রগুলি ব্যাগে ব্যাগে পুরিয়া একটি লোক বাহির হইয়া আসিতেছে। হরলাল আর স্থির থাকিতে পারিল না। পিয়নকে ধরিয়া বসিল, তাহার চিঠিগুলি ফেরত দিতে হইবে। নহিলে রায়সাহেবের লজ্জার কারণ হইবে। পিয়ন বিরক্ত হইয়া জানাইল সে পারিবে না। পোষ্ট মাষ্টারের অর্ডার চাই। আর তাহা ছাড়া এখন সময়ও নাই। হরলাল জানাইল তাহা বলিলে সে শুনিবে না। যখন সময় ছিল তখন শুনিলে না কেন? এ ভুল না শুধরাইলে তাহার মুখ দেখান ভার হইবে। শেষে পিয়নের হাত ধরিয়া বুঝাইয়া বলিল, বুঝলে রায় সাহেবের চিঠি। কুসুমপুরের রায়সাহেব পরাণ দেবশর্ম্মা! তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধের চিঠিতে মারাত্মক ভুল! 'লৌকিকতার পরিবর্ত্তে নবদম্পতির শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়।' তুমি চিঠি ক'টা ফেরত দাও—নইলে রায়সাহেবের মুখ রক্ষা হয় না।

পিয়ন শুনিলনা। ব্যাগ লইয়া চলিয়া গেল।

হরলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল লৌকিকতার পরিবর্ত্তে ত শুভাশীর্ব্বাদ হইয়াছে, কিন্তু নবদম্পতির পরিবর্ত্তে কি হইবে?

নির্ভীক

শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী

(১)

মাঝ দরিয়ায় উঠছে ঝড়—দুল্‌ছে তরীখান
ডুব্‌তে পারে ডুব্‌তে পারে—ও মাঝি সাবধান।
গহন মেঘে-গগন ঢাকা
দিক্‌বিদিকে আঁধার মাখা
দুল্‌ছে নদী, দুল্‌ছে তরী কাঁপ্‌ছে আমার প্রাণ
ডুব্‌তে পারে নৌকা তোমার ও মাঝি সাবধান।

(২)

সামাল্ সামাল্ ও মাঝি ভাই ওরে ও নির্ভীক
দ্যাখ্‌রে আবিল কুহেলিকায় ঢেকেছে দশদিক্
বাঁচতে যদি ইচ্ছা থাকে,
ভিড়াও তীরে নৌকাটাকে।
কুল ছাপিয়ে জল ছুটেছে ঐ ডেকেছে বাণ।
নৌকা তোমার ডুবতে পারে—ও মাঝি সাবধান

(৩)

বাদল ধারা আস্‌ছে নেমে বিজলী খেলায়
মত্তমাতাল বাদল বাতাস ছুটেছে দমকায়
ছিন্ন হ'ল পালের দড়ি
মরণ নাচন নাচছে তরী
উদাস মাঝি নির্ভয়ে ঐ গাইছে বসে গান
রাখবে রাখো মারবে মারো দয়াল ভগবান॥

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

"মনুষ্য জীবন অনন্ত রহস্যময়। কোথায় কোন্ সূত্রে মানবের জন্ম হইল, কোম্ কোন্ অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনাপুঞ্জের কিরূপ সম্মিলন বা বিয়োগে প্রাণবায়ু তাহার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিল; কিরূপে শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অবস্থা-সমূহ নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে প্রকাশ পাইল এবং শেষে ইহজীবনে কিরূপেই বা তাহার অবসান হইল······বিজ্ঞান জন্মমৃত্যুর এই মূল রহস্য আজিও উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই।"—'উপাসনা" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে পরলোকগত পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তির সহিত তাঁহার জীবনের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

নীরবে আজীবন সাহিত্য-সাধনা করিয়া বঙ্গবাণীর রত্ন-ভাণ্ডারে কত অমূল্য রত্নই যে স্বর্গীয় পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দান করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানকালের সাহিত্য-সমাজে তাহার পরিচয়ও অনেকের অজ্ঞাত। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা একান্ত নিভৃতে, সাধারণের প্রশংসা-নিন্দার বাহিরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বঙ্গ সাহিত্যে যাঁহার দান অপরিমিত, যাহার আজীবন ঐকান্তিক সাধনা বঙ্গ-বাণীর মন্দিরের অমূল্য ঐশ্বর্য্য—তাঁহাকে যে এত অল্প দিনে সাহিত্য-রসিকবৃন্দ বিস্মৃত হইয়া যাইতে পারেন—ইহা কল্পনা করা যায় না। জনসমাজে তিনি আপনাকে সুপরিচিত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রকার প্রচারের ব্যবস্থা করেন নাই, আপনার গুণপণা কীর্ত্তন করাইবারও তিনি ক্যেনও প্রয়াস করেন নাই। তিনি ছিলেন যথার্থ সাধক ও জ্ঞানান্বেষী, কাজেই সম-সাময়িক সাহিত্য-সেবী ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যিকগণের নিকট তিনি একরূপ অখ্যাত, অপরিচিত এবং অবজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছেন।

ইংরেজ কবি ফিটজেরাল্ড একমাত্র ওমর-খৈয়াম অনুবাদ করিয়াই ইংরেজী সাহিত্য-সমাজে বিখ্যাত হইয়াছেন। পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বহু পুস্তকের রচয়িতা ও অনুবাদক। বিশেষ করিয়া 'টডের রাজস্থানের অনুবাদ' বঙ্গ ভাষায় তাঁহার অমূল্য দান। রাজস্থান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রথমে রবার্ট প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। এই প্রেস হইতে তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই শাস্ত্র গ্রন্থ। কাশীখণ্ড, মহাভারত, নারদীয় পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও বরাহ পুরাণের বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত মহাশয়ের অসীম শাস্ত্রজ্ঞান ও অনুবাদ করিবার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার বহু রচনা আছে। এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রেরও অনেকাংশ তিনি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

নানা প্রকার অভব্য আচরণে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া শেষ জীবনে পণ্ডিত মহাশয় দারুণ মানসিক কষ্টভোগ করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দুশ্চিন্তার জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেই সময় যাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত—তাহাকে ধরিয়া বলিতেন, "আমার রচিত পুস্তকের সহিত নাকি আমার কোনও সম্বন্ধ নাই! ইহার কোনও প্রতিকার নাই!" কথাগুলি বলিবার সময় অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিত। ক্রমে তিনি বালকের ন্যায় উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেন।

বঙ্গদেশে সাহিত্য-সেবীর ভাগ্য চিরদিন রাহুগ্রস্ত। যাহারা বাণীর চরণ পূজা করিবার মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের শেষ জীবন নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। বাংলা দেশে এরূপ ঘটনা একাধিক বার ঘটিয়াছে। এই সকল মনীষীর শেষ জীবনের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। বঙ্গ-সাহিত্যে যাঁহাদের দান মণিমুক্তার অপেক্ষাও মূল্যবান, যে সমস্ত মনীষী বাংলা ভাষার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর, রজনীকান্ত প্রমুখ সেই শ্রেষ্ঠ বঙ্গ-সন্তানগণের এইরূপ শোচনীয় পরিণামের কথা চিন্তা করিতেও বেদনায় মুহ্যমান হইতে হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' নামক বাংলা সঙ্গীত পুস্তকে পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি ক্ষুদ্র জীবনী সন্নিবেশিত আছে। এতদ্ব্যতীত আশুতোষ দেব প্রণীত নূতন বাংলা অভিধানেও তাঁহার একটি ক্ষুদ্র জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। আমার পরিচিত

জন্ম—৯ই ভাদ্র, ১২৬৬ সাল　　বজ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়　　মৃত্যু—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ সাল

এক সাহিত্যরসিক—অগ্রজপ্রতিম কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনিও পণ্ডিত মহাশয়ের জীবৎকালে তাঁহার নিকট তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত জানিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন: "আমি বঙ্গ-সাহিত্যের কতটুকুই বা করিয়াছি। মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণ-প্রান্তে বসিয়া যাহা লাভ করিয়াছিলাম, তাহারই সাহায্যে বাণীর সেবা করিতে চিরদিন প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। আমি অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য ব্যক্তি—আমার মত ব্যক্তির জীবনীর প্রয়োজনই বা কি ?"

বাংলা সন ১২৬৬ সালের ৯ই ভাদ্র তারিখে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বেলুন গ্রামে মাতুলালয়ে ঐতিহাসিক পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। (ইংরেজী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ)। তাঁহাদের পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত বেলে শিখিরা গ্রামে। মাতুলালয়েই তাঁহার শৈশব কাটিয়াছিল। মাত্র পঞ্চম বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতা মাধবচন্দ্র পরলোকগমন করেন। কলিকাতায় তাঁহার মাতামহের এক ভাগিনেয় থাকিতেন। পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর সেই আত্মীয় ভবনে থাকিয়া বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই গদ্য পদ্য রচনায় তাঁহার হাত ছিল। মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তদানীন্তন 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় তাহার 'সমর-শেখর' নামক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তাহার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভ এই উপন্যাস প্রকাশের পর হইতে সূচিত হয়। যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও অক্লান্ত সাহিত্য-সেবার নিদর্শন তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত দেখা যায়, 'আর্য্য দর্শন' পত্রিকা হইতে সেই জীবনের সূত্রপাত। তৎপূর্ব্বে তিনি 'রক্তদন্ত' নামক একখানি পদ্য নাটক রচনা করেন। এই 'রক্তদন্ত' বা 'আহ্লাদ নগরের পতন' বোধ করি বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম পদ্য নাটক।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে যজ্ঞেশ্বরবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক ময়মনসিংহ শেরপুর হইতে প্রকাশিত চারুবার্ত্তা পত্রিকা সম্পাদনার্থে প্রেরিত হন্। এই সময়ে তদীয় 'রাবণ বধ' নামক পদ্য নাটক বেঙ্গল থিয়েটর রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টডের রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ-করণে প্রবৃত্ত হন্ এবং দুই বৎসরের মধ্যেই মুদ্রিত ১২০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদ সমাধা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের ইতিহাস অবলম্বনে 'রসমালা' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। পরের বৎসর তিনি পাঞ্জাব ও রাজপুতানা পরিভ্রমণ করিয়া পাঞ্জাবের ইতিহাস প্রণয়নের জন্য প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করেন।

'হিতবাদী' সংবাদপত্রের জন্ম-দিন হইতেই তিনি ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদকের কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি ইংরেজী হইতে বাংলা ও ইংরেজী এবং বাংলা হইতে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত এক বিরাট অভিধান সঙ্কলিত করেন। সর্ব্বসমেত ১০,০০০ পৃষ্ঠায় এই অভিধান-খানি সম্পূর্ণ। বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মহাভারত, কাশীখণ্ড, বরাহপুরাণ ও ভবিষ্য পুরাণের বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ এবং 'ভারতে রুশ' নামক ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বরের 'বীরমালা' গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের ভারতীয় বীরবৃন্দের জীবনকাহিনী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুমহিলা' নামক ভারতীয় নারীগণের জীবনী সম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হয়। 'পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস' নামে তাঁহার আর এক বিরাট গ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থ ২৫,০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সম-সাময়িক বহু মাসিক ও সংবাদপত্রে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

'উপাসনা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব পরলোকগত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরে যজ্ঞেশ্বর-বাবুর হস্তে ন্যস্ত হয়। এই সময় তিনি কাশীমবাজারের দানবীর মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্রের সংসারে 'পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস' রচনা-ব্যপদেশে প্রতিপালিত হইতে-ছিলেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক এবং বর্ত্তমান মহারাজার বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার গৃহশিক্ষক ছিলেন। বহরমপুর সাহিত্য-সভার সহ-সম্পাদকের কাজও তিনি করিতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি প্রথমদিকে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু পরে তিনি স্বীয়মত পরিবর্ত্তিত করেন এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি আস্থাবান হইয়াছিলেন।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-ধারার মধ্যে প্রভেদ আছে। যজ্ঞেশ্বরবাবু উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ধারাকে আদর্শ বলিয়া মানিয়াছিলেন এবং বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত ভাষার প্রতি একান্ত আস্থাবান ছিলেন।

তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। কলেজে অধ্যাপনা কালে তাঁহার হাস্য-রহস্যের সহিত ছাত্রবৃন্দের পরিচয় ছিল। তাঁহার শিক্ষাদানের পদ্ধতি মধুর ছিল, তাঁহার অধ্যাপনা-কালে ছাত্রবৃন্দ বিমল আনন্দ সহযোগে হাস্যপরিহাসের মধ্যে শিক্ষালাভ করিত। যে কালে পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপনা করিতেন, সে কালের ছাত্র-সাধারণ বঙ্গভাষা শিক্ষা-বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন ছিল। যাহাদের বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার প্রকৃত অভিলাষ ছিল, তাহারাই তৎকালে বাংলার অধ্যাপনা-কালে উপস্থিত থাকিত। শেষ বয়সে অক্ষমতা নিবন্ধন কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য হইতে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। এই সময় তাঁহার আর্থিক অবস্থাও অস্বচ্ছল হইয়া পড়ে।

পণ্ডিত মহাশয় প্রথমা পত্নী বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী অদ্যাপি জীবিতা আছেন এবং বর্দ্ধমান জেলার বেলেডাঙ্গা গ্রামে বসবাস করেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদি ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষের সাধ্বী স্ত্রীর ঐকান্তিক সেবা ও যত্নে তাঁহার শেষ জীবনের দুঃখ কষ্টের লাঘব হইয়াছিল। মানসিক দুশ্চিন্তা এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা শেষ জীবনে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করে, তজ্জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটিয়াছিল। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সাহিত্য-সেবীর আশ্রয়স্থল বঙ্গ-বিক্রমাদিত্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহায্যলাভে তিনি বঞ্চিত হন নাই এবং মহারাজের মাসিক বৃত্তির সাহায্যে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরের সাহিত্যিক জীবনেও যেমন মহারাজা সাহায্যদানে অকুণ্ঠ ছিলেন, শেষজীবনেও অক্ষম সাহিত্যসেবীর তেমনই আশ্রয়স্থল ছিলেন। সুদিনে দুর্দ্দিনে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং মৃত্যুকালাবধি তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৩৩২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকার সময় তদীয় কাশীমবাজারস্থ বাটীতে বঙ্গ-মাতার সুসন্তান বঙ্গের এই খ্যাতনামা প্রবীণ ঐতিহাসিকের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর সহিত বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইয়া যায়।

বঙ্গদেশে সাহিত্যসেবীর ভাগ্যে যশ ও অর্থ লাভ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। সাহিত্যিক মাত্রেই দীনদশায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হন। এই দেশে সাহিত্য সেবার পুরস্কার মিলে না। বিশেষ করিয়া যে সকল সাহিত্য-রথী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানার্থ আমরণ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নাম পর্য্যন্ত সাহিত্য সমাজে অখ্যাত এবং অবজ্ঞাত রহিয়া গেল। জাতীয় সাহিত্যের জন্য যাঁহারা আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি চির-স্থায়ী করিয়া রাখিতে জাতির কর্ত্তব্য আছে, এই বিষয়ে বঙ্গবাসী মাত্রেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যজ্ঞেশ্বরবাবুর দান, বঙ্গসাহিত্যে অসামান্য ও অতুলনীয়; কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়-দিগের জন্য তাঁহার নামটিও যাহাতে সাহিত্য-সমাজে চিরস্থায়ী থাকে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা আমাদের উচিত।

মুমূর্ষু পৃথিবী
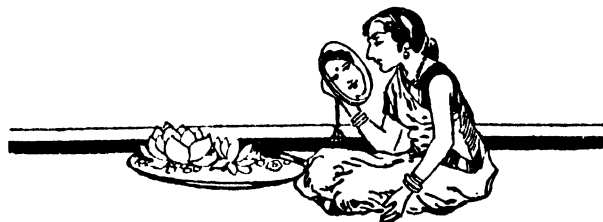
শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(৩)

*　　　*

ব্রততীদের মহলে তেমনি উৎসবের ভিড় : কিন্তু ব্রততীর লাল পেয়ালায় জমে মাকালের তলানি। ওর ভাল লাগে না ; এক তিলও ভাল লাগে না আর ওই দুর্বিসহ আনন্দের দোল-খাওয়া রাংতার পুতুলগুলোকে। ওদের সরু সুতো আলোর রঙে মিশে আত্মগোপন করে মানুষের দৃষ্টি থেকে, তাই মনে হয় ওরা জীবন্ত। মনে হয়, ওদের যাওয়া-আসার সবুজ পথে ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়ার ঝরা পাঁপড়ি। ওদের হাসিকান্নার মহলা-দুরন্ত রূপ লোলুপ ক'রে তোলে দূর পথের যাত্রীকে। কিন্তু ওর চোখে কখন আপনা-আপনি ধরা দিয়েছে ওরা।—ব্রততী ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে ; সইতে পারে না ওই প্রাণহীন জড়পিণ্ডদের চেতনাহীন উল্লাস। মনটা দ্রুতপদে পিছিয়ে আসে ; তর্‌তর্ ক'রে নেমে পড়ে ওদের সেই বসন্ত উৎসবের আসর থেকে একেবারে দীনুদের কদর্য্য বস্তির একটা অন্ধকার ঘরে। ওর চোখের সাম্‌নে নিমেষে ভেসে ওঠে সেই অন্ধ ছেলেটা ; হয়ত কাঁদ্‌ছে সে, চোখের যন্ত্রণায় এখনও হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদে একলাটি প'ড়ে।—দীনু সেদিন ছেলেটার কথা বল্‌তে কান্নায় দিশেহারা হ'য়ে উঠেছিল।

পেটের জ্বালায় মানুষ মানুষকে অন্ধ তৈরি করে! ভাব্‌তে গিয়ে সত্যি ব্রততী শিউরে ওঠে আতঙ্কে। ওর সারা গা. রোমাঞ্চিত হ'য়ে আসে। মানুষকে বিশ্বাস করতেও ওর এখন ভয় হয়, ঠিক ভয় না হ'লেও সন্দেহ হয় আগেকার চেয়ে অনেক বেশী।

ও ছিল ভোরের পাখীর মত মুখর। ওর প্রভাতী গানে ক্ষণে ক্ষণে সজীব হ'য়ে উঠেছে স্যার সি, কে'র জীবনের পরিস্থিতি : ঐশ্বর্য্যের পরিবেশে সমুজ্জ্বল ওর স্বতন্ত্র জগৎ—যেখানে চেনা-অচেনার সমারোহে ওর জীবন সূর্য্যমুখীর মত একটি একটি ক'রে বিকশিত করেছে সোনালি শতদল। স্যার সি, কে এখন আর চেষ্টা ক'রেও ফিরিয়ে আন্‌তে পারেন না ব্রততীর সেই দিগন্তপ্রসারী সজীবতা।

কথা বল্‌তে বল্‌তেও যেন ও কেমন উন্মনা হ'য়ে পড়ে। ওর অভ্যস্ত সুরটুকু এমনভাবে হারিয়ে যায় কথার মাঝখানে যে, নতুন বান্ধবী শিপ্রাও বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে বলে—"তোমার কি ইনার্‌সিয়া এসেছে তাতু ?"

ব্রততী সজাগ হ'য়ে ওঠে ; একটু না হেসে পারে না।—"ইনার্‌সিয়া ঠিক নয়, রিভ্যুলেট্, বরং বল্‌তে পারো—ফিলিয়া।"

শিপ্রা হেসে ওঠে।—"ফিলিয়া ?"

"হাঁ।"—ব্রততী আবার তেমনি একটু হাসে। হাসিটা যেন কেমন নিষ্প্রাণ ; বিকাশ আছে, অথচ রূপ নেই।

"অটো-ফিলিয়া বুঝি ? নইলে, তোমার ভালবাসা লাভ করবার মত ভাগ্যবান কেউ আছে ব'লে ত মনে হয় না। শুধু নেই কেন, অনাগত ভবিষ্যতেও হয় ত থাকবে না কেউ।—অবশ্য এটা আমার অনুমান।"

ব্রততী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিপ্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে—"হোক না অনুমান ; তবুও সত্যি। যে সত্যিকারের সাপুড়ে, সে ঢোড়া সাপ নিয়ে খেলা ক'রে আনন্দ পায় না কখনো। আনন্দ কেন, প্রবৃত্তিই হয় ত আসে না তার। একটা জাতসাপের খোলস দেখ্‌লে যে কৌতূহল তার মনে জেগে ওঠে, একশোটা হেলে সাপের বাচ্চা দেখেও সে কৌতূহল জাগে না কোন দিন।"

"খোলসের সন্ধান কি পেয়েছ তাতু ? আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখবার অন্তত কোন ইঙ্গিত ?"

"পাই নি। তবে খুঁজবার নেশাটা যেন রাতারাতি কেমন পেয়ে বসেছে শিপু। ফিলিয়া যদি কিছু এসে থাকে, সেটাকে 'লাম্‌বার' বলা চলে। খুঁজ্‌তেই আমি চাই, তোমাদের এই গণ্ডীর বাইরে আমি খুঁজে নিতে

চাই পৃথিবীর ওই অপরিচ্ছন্ন জনস্রোতের ভিতর থেকে সত্যিকারের মানুষ, য়্যান আন্‌কাট্‌ ডায়মণ্ড।”

“কি লাভ? নতুন ক’রে পালিস দুরস্ত করবার ঝঞ্ঝাট স’য়ে শেষ পর্য্যন্ত ইম্‌ম্যাচিওর হীরেও তো বেরুতে পারে। তার চেয়ে বরং যাচাই-করা জুয়েল ঢের ভাল।”—শিপ্রার দৃষ্টি কুটিল হ’য়ে ওঠে।

ব্রততী তেমনি হেসে জবাব দেয়—“ব্যানারজিকে তো দিয়েছি ট্রায়েল।”

“ট্রায়েল!”

“তা ছাড়া আর কি? আমি জানি, সে টি’কবে না শেষ অবধি। তবুও মান রক্ষে করব বাবার। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বন্ধুপুত্রের হাতে অগাধ ঐশ্বর্য্য তুলে দেবার মিডিয়াম করবেন আমাকে। মিডিয়াম দিয়ে প্রেতাত্মাকে প্ল্যান্‌চেট্‌ করা চলে, কিন্তু মানুষ বা দেবতাকে করা চলে না, এটা ত ঠিক।”

“কিন্তু তুমিই ত নিজে য়্যাক্‌সেপ্ট ক’রেছ তাঁর প্রোপোসাল।”

“করলুমই বা! প্রোপোসাল্‌ য়্যাক্‌সেপ্ট করা মানেই ত নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করা নয়। হাতের কাছ থেকে যখন মানুষ স’রে যায় দূরে, তখন তার ফসিল-টাই হ’য়ে ওঠে পূজোর আধার। কিন্তু সেই ফসিল নিয়ে যে জীবন গ’ড়ে তোলা চলে না, সে কথা তুমিও জানো, আমিও জানি।”

শিপ্রা বিস্মিত হ’য়ে জিজ্ঞেস করে—“ওঁদের তুমি ফসিল্‌ ব’ল?”

“তা ছাড়া আর কি বলা চলে? আছে ত শুধু অবয়বটা। ভিতরের মানুষ যে কতকাল আগে মিলিয়ে গেছে, ওই ফসিলেরাও হয় ত রাখে না তার খবর। যাক, ওকথা রেখে দাও, একটা মেয়েলি-পুরুষের লাগাম ধ’রে যে আনন্দ, তার চেয়ে পুরনো একখানা ভাঙা বেবি অষ্টিন্‌ ড্রাইভ করার আনন্দ ঢের বেশী। অন্তত ম্যাল্‌-য়্যাড্‌জাস্টমেণ্ট-এর ভয় থাকে না।”—ব্রততী হেসে ওঠে।

“সাবাস্‌ তাতু! এবার সত্যি হাসালে তুমি। মেয়েলি-পুরুষের চেয়ে ভাঙা বেবি অষ্টিনও ভাল, একথা অন্য দেশের মেয়েরা বল্‌তে পারে, কিন্তু—”

—“কিন্তু নেই, দরকার হ’লে এ দেশের মেয়েরাও পারে। তবে, পুরুষের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া যাঁরা জীবনের দ্বিতীয় কোন পরিণতি ভাব্‌তে পারেন না, তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ক্লিন্‌ শেভ্‌ড্‌ ছোটখাট একটি মোলায়েম পুরুষ যখন ঠাণ্ডা গলায় দুটো গজল গেয়ে, বাঁ হাতের চেটোটা উল্টে দিয়ে মেয়েলি ঢঙে ভাবের একটু আমেজ দেবার চেষ্টা করে, তখন তাকে দেখে আত্মসমর্পণ করবার প্রবৃত্তি কোন মেয়ের জাগে কি-না জানি না। যেটুক্‌ অনুভূতি মনে জাগে, সেটা অন্তত আমার মতে মমতা। তাতে ক’রে বড় জোর নিজের হাতে তৈরি দুখানা মাছের কচুরি, না-হয় থিন্‌ এরোরুট বিস্কিটে মাখানো একটু জ্যাম বা পেয়ারার জেলি সযত্নে হাতে তুলে দেবার বৃত্তিটা জেগে ওঠাই বোধ হয় মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক।”—ব্রততী আবার হাসে।

—“ব্যানারজিকে তুমি নিশ্চয়ই পার না সেই ক্যাটাগোরিতে ফেল্‌তে।”

—“পারি না ব’লেই ত ডেমি-য়্যাপ্‌রুভাল-এ কন্‌ডিসেণ্ড করেছি।”

—“কন্‌ডিসেণ্ড?”

—“হাঁ। বাইরের চাহিদা আমার কম শিপ্রা, তাই বাইরেটা দেখে আমি পারি না ষোল আনা অনুমোদন করতে। আমি খুঁজি মানুষ। মানুষকে আমার বড্ড ভাল লাগে শিপারিন্‌। মানুষ, অন্তত, পুরুষ হবে বজ্রের মত তীব্র। স্নিগ্ধ, কালো মেঘের অন্তরালে বাষ্প-সজল পরিবেশ তার পুরুষত্বকে ভিজিয়ে দিতে পারে না। যে পুরুষ, সে জীর্ণ অনশনক্লিষ্ট হ’লেও তার পুরুষত্ব বেঁচে থাকে ইলেক্‌ট্রিক চাবুকের মত। তেলচিট ধরা লইন্‌ ক্লথ-এর পার্সনালিটি তার চাপা পড়ে না কোন দিন।” কথা বল্‌তে বল্‌তে ব্রততী আবার কেমন উন্মনা হ’য়ে যায়।

শিপ্রা আপনমনেই বলে—“ওটা তোমার পার্‌ভার্সন তাতু, তুমি বোধ হয় নিজেই জানো না, কি চাও!”

“তা হবে।”

“হবে নয়, তা-ই।” শিপ্রা উৎসুক দৃষ্টিতে ব্রততীর মুখপানে চায়।

ব্রততী কি ভেবে নিয়ে বলে—“নিজের কথা অতখানি ভাববার অবসর আমি পাই না শিপ্রা। আমার ভাল লাগে না; নিজেকেও যেন ভাল লগে না আর। হয় ত ভাববে ইনারসিয়া কিংবা কম্‌প্লেক্স, কিন্তু তা নয় মোটেই।

ঐশ্বর্য্য আমার সত্যি ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, পৃথিবীর অসংখ্য লোককে বঞ্চিত ক'রে আমরা কেড়ে নিয়েছি তাদের সুখের গ্রাস। তাদেরই সেই কেড়ে নেওয়া অন্নের এককণা ফিরিয়ে নেবার জন্যে তারা হাত পেতে কাঁদে আমাদের দরজায় দরজায়। সেই কান্নার সুর জোগাতে মানুষ মানুষকে তৈরি করে অন্ধ। দুগ্ধপোষ্য শিশুর চোখ উপড়ে দেয় লোহার কাঁটা দিয়ে—"

শিপ্রার চোখ দুটো আরও প্রখর হ'য়ে ওঠে। সে বোঝে না, ব্রততীর কথার একবিন্দুও প্রবেশ করে না তার মগজে। কিন্তু এটুকু অক্লেশে অনুমান করে যে, তাতুর জীবনে কোথায় যেন সুরু হয়েছে একটা বিপ্লব। তার প্রচণ্ড আঘাতে ওর সতেজ অনুভূতিগুলো থেকে থেকে জ্বলে উঠ্ছে। ওর বসন্তের শেষে শাখায় শাখায় লেগেছে দৈবাৎ শীতের ছোঁয়া। ওদের কথা শেষ না হ'তেই বেয়ারা এসে খবর দিল যে, বাইরের ঘরে এসেছে দীনু।

"দীনু?"—শিপ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

ব্রততী একটু থেমে বলে—"ভিখিরী বল্‌লে অপমান করা হয়, একটি বাউল।"

"বাউল! ভাল গাইতে পারে বুঝি?"—শিপ্রা যেন কিছু অনুমান করবার চেষ্টা করে!

"বাউল আখ্যার সঙ্গে ভাল গাইতে পারার কি কোন অচ্ছেদ্য অভিধান আছে শিপার?"

"না। ওটা আমার ইন্‌ফারেন্স, ওই ধরণের কোন একটা বিশেষ গুণ না থাক্‌লে মিস্ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই ইন্‌ফারেন্স-এর ডেটা-ও আছে।"—শিপ্রা হাসে। শুধু কথাটুকু বলার আত্মপ্রসাদ ছাড়া হয়ত অন্য কিছু ছিল না তার সেই হাসিতে।

তবুও ব্রততী বলে—"হাসলে যে? ওরা কাঙাল; পথ-ভিখিরী না হ'লেও—ভিখিরী। কিন্তু ওই দীনুকে দেখ্‌লে আজও স্পষ্ট মনে হয় শিপ্রা, ভিখিরী হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না বলেই বোধ হয় ও হয়েছে ভিখিরী। নইলে—"

"নইলে হ'ত বাংলা দেশের একজন লিডার, কিম্বা ওই রকম একটা বড় কিছু?"—শিপ্রার কথায় কেমন একটু শ্লেষ; ঠিক প্রচ্ছন্ন না হ'লেও প্রকট নয়।

ব্রততী ঈষৎ তপ্ত সুরে বলে—"লিডার না হ'লেও ভিখিরী হ'ত না সে। নিজের দারিদ্র্যকে নিয়েও এতটুকুও বিব্রত নয়; বরং অদ্ভুত তার অহঙ্কার। ওর দারিদ্র্যের অহঙ্কার তোমার আমার যৌবনের অহঙ্কারকেও ছাপিয়ে যায় শিপারিন্। ওর সেই অহঙ্কারের প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের এই ঐশ্বর্য্যের দেমাক্ হাজার বাতির স্যাণ্ডেলিয়ারের মত ঝন্‌ঝন্ ক'রে ভেঙে পড়ে।"

"আশ্চর্য্য!"

"মোটেই নয়। নিতান্ত অদৃষ্টের বিপাকে কাঙালের ঘরে তার জন্ম, তাই ব'লে নিজে সে নয় একটি পয়সারও কাঙাল। এমন কি, ওকে দেখে অবধি শুধু এই কথাটাই আমার মনে হ'য়েছে যে, কাঙাল হওয়া ওর জীবনে হয়ত অপরিহার্য্য একটা অভিশাপ। তাই ঐশ্বর্য্যের বিরুদ্ধে জীবন্ত রেবেল্ হ'য়ে দেখা দিয়েছে ও।"

"ঐশ্বর্য্যের বিরুদ্ধে সে রিবেলিয়ন করুক তাতু, তার ভয় করি না। কিন্তু তোমার জীবনেও যেন দীনু বিদ্রোহের সূচনা করেছে ব'লে মনে হয়।" উত্তরের আশায় শিপ্রা সকৌতুক দৃষ্টিতে ব্রততীর মুখপানে চায়।

ব্রততী বেশ শান্তভাবেই বলে—"বিদ্রোহের সূচনা করুক আর না করুক, অন্তত একটা নতুন জগতের সঙ্গে যে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ওই দীনু, সেটা অস্বীকার করব না কোন দিনই।"

শিপ্রা হেসে জবাব দেয়—"আমরাও বল্‌ব না কোন দিন অস্বীকার করতে। বরং মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখ্‌ব চেয়ে: তুমি হবে তোমার সেই নতুন জগতের ফ্লোরেন্স নাইটিংগেইল, আর দীনু—"

কথা বল্‌তে বল্‌তে ওরা দুজনেই নেমে এলো নীচে। দীনু তখনও দাঁড়িয়ে বাইরের ঘরের দরজার সাম্‌নে।

এবার দীনু অনেক দিন পর এসেছে, চেহারাটা ওর বদ্‌লে গেছে। মাথার লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল আর একমুখ দাড়ির আওতায় মুখখানা যেন হ'য়ে গেছে এতটুকু। চোখ দুটো আগুনের মত প্রখর হ'য়ে উঠেছে; হেঁট মুখে মাটির দিকে চেয়ে থাকলেও ওর দৃষ্টি চাপা থাকে না, ভ্রূর ফাঁক দিয়ে ছাপিয়ে ওঠে সেই আগুনের শিখা।

"দীনু!" ব্রততী থম্‌কে দাঁড়ায়।

শিপ্রা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে। এরা সত্যি যেন আর এক জগতের মানুষ। ওদের সর্ব্বাঙ্গে অতীত মানুষের

ছাপ: তারই ভাঁজে ভাঁজে পড়েছে বর্ত্তমানের ভাঙা-গড়ার দাগ।

শিপ্রা ব্রততীর চেয়েও আধুনিক, ও শাড়ি পরে না। দামী পাড়-বসান পেটি-কোটের ওপর জড়িয়ে নেয় পাঁচ হাত একখানা ভিনিসিয়ান ওড়না; শিঙ্গল্ করা বেণী দুলিয়ে দেয় চিবুকের পাশ দিয়ে। ওর ফিরোজা রঙের ব্লাউস ভেদ ক'রে দেখা দেয় স্কিন্-কলারের কর্সেট। হাতে ছোট্ট একটি জাপানী ছাতা, অন্য হাতে লিজার্ড-চামড়ায় ওরিয়েণ্টাল ছবি এম্‌বস্-করা একটি নতুন ডিজাইনের ভ্যানিটি ব্যাগ। হাসির সঙ্গে ওর হিল-তোলা জুতোর এমন একটা সঙ্গৎ বাঁধা যে, হাস্য-কৌতুকের প্রত্যেক ভঙ্গীমায় হিলের শব্দটা ঠিক সমানে তাল দিয়ে যায়।

সযত্ন রচিত পরিচ্ছদটার সম্পর্কে ও যেন ইচ্ছে ক'রেই উদাসীন হ'য়ে থাকে। হয়ত নিজেই জানে না শিপ্রা, এ বেলা ওর ওড়নার কি রঙ।—কিন্তু দীনুর দিকে চেয়ে ও যেন আজ আপনা-আপনি উঠ্‌ল সজাগ হ'য়ে। শিপ্রা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে; ওর পরিচ্ছদ নিতান্ত অকারণ ওকে বিব্রত ক'রে তোলে দীনুর সাম্‌নে। এমন অস্বস্তি ও আর কোন দিনও অনুভব করে নি। মনে মনে শিপ্রা বার বার আবৃত্তি করে—পথ ভিখিরী না হ'লেও দীনু ভিখিরী; হ'লই বা ব্রততীর মতে একটা ডাইনামিক্ পার্সনালিটি। ভিখিরীর আবার পার্সনালিটি! একটা পয়সার জন্যে যারা রাস্তার লোকের পায়ে ধরে!

ব্রততী দীনুর সঙ্গে কথা পাড়বার আগেই শিপ্রা বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।—দীনু তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে; ব্রততী কি বল্‌বার চেষ্টা করে, কিন্তু ভেবে উঠ্‌তে পারে না প্রথম আলাপের জিজ্ঞাস্যটা। দ্রুতপদে ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতেও শিপ্রা শঙ্কিত দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে চায়; মনে হয়, দীনুর ওই ক্ষুধিত দৃষ্টিতে বুঝি হঠাৎ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌বে ওর স্কার্ট—ওর ভিনিসিয়ান ওড়নার হাল্‌কা আঁচল!

ওদের সম্পর্কে নতুন ক'রে কোন কথা জান্‌বার না থাক্‌লেও ব্রততীর ইচ্ছে হয়—জিজ্ঞেস করে একবার সেই অন্ধ ছেলেটির কথা। কিন্তু সাহস হয় না, পাছে দীনু সেদিনের মত আবার যায় বিগ্‌ড়ে। ছেলেটার কথা বল্‌তে বল্‌তে সেদিন যেন দীনুর চোয়ালের হাড় দুখানা লোহার এঙ্গেলের মত শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল; মনে হ'চ্ছিল—ওর দাঁতে দাঁতে আঘাত লেগে চক্‌মকির মত ফিন্‌কি ছুট্‌বে।

ব্রততী জোর ক'রে গছিয়ে দিল একটি টাকা। টাকা দীনু চায় না; এমন কি, একটা পয়সারও আর দরকার হয় না ওর। ব্রততীর অনুরোধ ও না মেনে পারে না, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকাটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে।

ব্রততী হেসে বলে—"আর ত গান গাও না তুমি। এদিকে আসাও কমিয়ে দিয়েছ। তাই দিলুম, যে ক'দিন বাদ গেছে, মনে কর সেই ক'দিনের পয়সা একসঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ আজ।"

—"আমি না এলেও আর পাঁচজন ত এসেছে। পাওনা হিসেবে তাদের আর আমার পাওনায় তফাৎ নেই কিছু। ভিখিরীকে দেবার পয়সা, একজনকে দিলেই আর-একজনের পাওনা শোধ হয়। তবে—" কথা বল্‌তে গিয়ে দীনু হঠাৎ কি ভেবে থেমে যায়।

ওর মুখপানে চেয়ে ব্রততী বুঝ্‌তে পারে। একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—"থাম্‌লে যে?"

"বল্‌ছিলাম কি"—দীনু ইতস্তত করে।

"বল।"

"আপনি ইচ্ছে করলে অনায়াসেই হয়। সবারই পাওনা রোজ রোজ খয়রাৎ না ক'রে যদি একসঙ্গে একদিন শোধ করেন ওদের ঋণ, অম্‌নি ভিখিরী অনেকে আশ্রয় পায় সারাটা জীবন।"—দীনু যেন অতি কষ্টে কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেল্‌ল।

ব্রততী ওর কথাটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারে নি। ঈষৎ বিস্ময়াবিষ্টের মত চুপ ক'রে থেকে পুনরায় জিজ্ঞেস্ করবার উপক্রম করতেই হঠাৎ ফিরে এলো শিপ্রা।

এবার আর দীনু নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল না। শিপ্রা ওদের কাছে এগিয়ে আস্‌বার আগেই দীনু ব'লে উঠ্‌ল—"যারা অক্ষম, তারা ভিখ্ মেগে মেগে রাস্তায় গড়িয়ে বেড়ায় আশ্রয় নেই ব'লে। আর আমার মত যে সব ভিখিরী লোকের দরজায় হাত পাতে, তারা বেকার। খাট্‌তে চাইলেও কেউ খাটায় না তাদের। এত বড় দেশে ওই অসহায় কাণা-খোঁড়াগুলোর মাথা গুঁজ্‌বার একটু ঠাঁই নেই!"

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দীনু দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। ব্রততী স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর পথপানে।

শিপ্রা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে তাতুর পাশে।—"আবার ফিরে আস্‌তে হ'ল ব্রতী!"

—"এসো।"—দীনুর কথাগুলো রিম্‌ঝিম্ করে ব্রততীর মনের ভিতর; এত বড় দেশে ওদের একটু মাথা গুঁজ্‌বার ঠাঁই নেই! একটা অনভ্যস্ত অনুভূতিতে মনটা ওর সজল হ'য়ে ওঠে বারবার।

"একৃজাক্টলী হোয়াট্ ইউ সেইড্ তাতু!"—একটু থেমে শিপ্রা আবার বলে—"লোকটা অদ্ভুত।"

"হুঁ।"—ব্রততী আর কোন উত্তর দেয় না।

ওরা দুজনেই যাচ্ছিল ব্রততীর পড়ার ঘরের দিকে; হঠাৎ গেটের ভিতর মোটরের হর্ণ শুনে থম্‌কে দাঁড়াল।

একটু পিছিয়ে ফিরে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই দ্রুতপদে সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন ডাক্তার অধিকারী।—"গুড্‌ডে, মিসেস্!"

ব্রততী অভ্যর্থনা জানাবার আগেই ডাঃ অধিকারী ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ব'লে উঠ্‌লেন—"কে বেরিয়ে গেল বলুন ত, এক্ষুণি—এই মাত্র? ছেঁড়া-ময়লা কাপড়-পরা, লাইক্ এ বেগার?"

অধিকারীর মুখচোখের দিকে চেয়ে ব্রততী হঠাৎ থতমত খেয়ে বলে—"ভিখিরী, একজন বাউল। আগে গান গাইত; এখন এম্‌নি ঘুরে বেড়ায়।"

—"আই ডোণ্ট বিলীভ্। হি ইজ্ সেন—নিশ্চয়ই মিঃ সেন।"—ডাক্তার অধিকারী চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। কথা বল্‌তে ওঁর কণ্ঠস্বর যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।—"মোটরটা থামাবার আগেই ও তাড়াতাড়ি সরে' পড়েছে। আই রিকগ্‌নাইস্‌ড্ হিম রাইট। হ'তে পারে না—কিছুতেই হ'তে পারে না আমার ভুল। গাড়ীটা থামিয়ে যখন চারিদিকে চাইলুম, ও তখন পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়েছে কোন একটা গলিতে কিম্বা আর কোথাও।"

অধিকারীর কথা শুনে ওরা দুজনেই হতভম্ব হ'য়ে যায়; ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারে না ওর বক্তব্যের আগাগোড়া। ব্রততী বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠ্‌বার পূর্ব্বেই শিপ্রা সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করে—"হোম্ ইউ মীন্ ডক্টর অধিকারী?"

"আই মীন্ সেন—সত্যেন সেন, যিনি আপনাদের চেরি ক্লাবের ছিলেন সেক্রেটারী, সবুজ সঙ্ঘের ফাউণ্ডার-প্রেসিডেণ্ট।"

ব্রততী চম্‌কে ওঠে—"সত্যেন সেন!"

"একৃজাক্টলী।" এই মাত্র বেরিয়ে গেল এ বাড়ী থেকে। মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, পরনে ছেঁড়া নেকড়া, মুখে দাড়ি! —এ কার্স্‌ড্ সোল, য়্যান্ আন্‌ফরচুনেট্ এঞ্জেল!"

"এঞ্জেল্!"—শিপ্রা কপালটা কুঁচ্‌কিয়ে বলে—"চোখে না দেখ্‌লেও শুনেছি সব ডক্টর ক্যারী, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। হি ডিফাল্‌কেটেড্ ব্যাঙ্ক মানি; য়্যাণ্ড ইজ্ নাউ রীপিং দি কন্‌সিকোয়েন্স। সেই ফলই তা হ'লে ভোগ করছেন এখনো। সেদিনও সুরেখাদি বলছিল—"

"সুরেখাদি?"—ডাক্তার অধিকারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন শিপ্রার মুখপানে।

"হাঁ, সুরেখা খাণ্ডেলওয়াল।"

"খাণ্ডেলওয়াল! হ্যাট্ মিস্ মজুমদার?—এ সাক্রিলিজাস ভারলেট্।"

ডাক্তার অধিকারী আবার এগিয়ে চল্‌লেন গেটের দিকে। ব্রততী ও শিপ্রা কতকটা মন্ত্রমুগ্ধের মত চল্‌ল তাঁর পিছু পিছু। ব্রততী যেন কেমন নন্‌প্লাস্‌ড্ হ'য়ে গেছে।

চল্‌তে চল্‌তে ডাক্তার অধিকারী আপন মনেই বলেন—"হি হ্যাজ্ বীন্ ডিউপড্ অল্ থ্রু। রিয়েলী এ গ্রেট্ সোল্। বাঙালীর ছেলের অতবড় হৃদয় আমি দেখিনি আর। আমার সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা তার কোন দিনই ছিল না। তবু, বিলেত যাবার সময় এক কথায় সে আমায় সাহায্য করেছে থ্রি থাউজেণ্ড রূপিজ। তখন সে ব্যাঙ্কের চাকরি নেয় নি।"—চাপা দীর্ঘশ্বাসে অধিকারীর ঠোঁট দুখানা কেঁপে ওঠে।

ব্রততী একটু থেমে জিজ্ঞেস করে—"অবস্থা ওঁর ভাল ছিল বুঝি?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি যখন ফিরলুম ইংল্যাণ্ড থেকে, তখন ও রিক্ত; শুন্‌লুম, জেল থেকে বেরিয়ে ও অন্তর্ধান করেছে কোথায়। কেউ কেউ বলেছিল—হয়ত নেই। তার সম্ভাবনাই ছিল বেশী। অতবড় ট্র্যাজেডি মানুষ সইতে পারে না।"

গেট ছাড়িয়ে ওরা এলো রাস্তায়। কিন্তু কোথায় দীনু! ওই মহানগরীর জনস্রোতে ও তখন কোথায় মিলিয়ে

গেছে। ডাক্তার অধিকারী হঠাৎ ব্রততীর দিকে মুখ ফিরাতেই দেখ্‌লেন, তার মুখখানা কেমন শক্ত হ'য়ে গেছে; একবিন্দু রক্তও যেন নেই ওর চোখে।

* * * *

দুপুরটা যেন কাট্‌তে চায় না। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে দীনু ধীরে ধীরে এসে বসল পার্কের একখানা বেঞ্চে। ওর অতীতের রুদ্ধ দ্বারে আজ অকস্মাৎ যে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে, তার জেরটা ও কোন রকমেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। মণি অধিকারীর মোটরখানা যখন দুঃস্বপ্নের মত এসে পড়ল দীনুর চোখের সাম্‌নে, তখন নিমেষে ওর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হ'য়ে গেল বিমূঢ়তায়।—মণি ফিরেছে বিলেত থেকে ডাক্তার হ'য়ে!—নতুন একখানা হিলম্যান কিনেছে; নিজেই ড্রাইভ্‌ করে!

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দূরে ঠেলে নিয়ে ও করেছে মণির দৃষ্টিপথ থেকে আত্মগোপন। কিন্তু সেই আকস্মিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়াটা এখনও অবসাদের মত জমে আছে দীনুর প্রত্যেকটি তন্ত্রীতে। মণি অধিকারী থেকে আরম্ভ ক'রে ওর অতীত পথের প্রত্যেকটি মাইল-ষ্টোন, এমন কি, দৈনন্দিন খুঁটিনাটির অগভীর রেখাগুলি পর্য্যন্ত যেন পলকে পিল পিল করে উঠ্‌ল মগজের ভিতর।—মণি, তড়িৎ, তপন, সুরেখা, মঞ্জরী, টেম্পল্‌, চাংওয়াহ্‌, ডমিনিয়ন, এম্পায়ার, গার্ষ্টিন প্লেস্‌,—গ্রে-ক্রহাম্‌,ক্যামেরন!—কপালের শিরা দুটো টিপে ধরে দীনু একবার মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহটা দেখে নেয়।

পার্কে লোক নেই ব'ল্‌লেই চলে। ক্বচিৎ দু-একজন যায়-আসে; কেউ বা এদিকের ফটক দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যায় ও-পাশের চরখি গেটের পাশ দিয়ে, হয়ত চলার পথে বাইরের রাস্তাটা সংক্ষেপ করে। কোণে গাছতলার বেঞ্চখানা দখল ক'রে ঘুমুচ্ছে একজন হিন্দুস্থানী: কোন আপিসের দারোয়ান কিম্বা বেয়ারা, চিঠি জারি ক'রতে বেরিয়ে পথের পরিশ্রমটা একটু লাঘব ক'রে নিচ্ছে।

দীনু পা-দুটো গুটিয়ে একটু আরাম ক'রে বস্‌বার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। এতখানি পথ উর্দ্ধশ্বাসে হেঁটে এসে পায়ের গ্রন্থিগুলো যেন কেমন জড় হ'য়ে গেছে। বাসায় ফির্‌তে পারলে একটু শুয়ে পড়ত সেই ছেঁড়া মাদুরখানায়। কিন্তু তাও আর ইচ্ছে করে না। দিনরাত সেই বস্তির অন্ধকার ঘরে ব'সে থেকে, বাইরের আলো দেখে চোখ দুটো ওর টাটিয়ে ওঠে। পারে না ও ওই দুর্ব্বিসহ জীবনের নির্ম্মম একঘেয়েমি সইতে।—অতসী ফেরেনি এখনও; বাসায় আছে হয়ত দু-একটা মুলো ভিখিরী, আর গন্নাকাটি পদ্ম!

অবসাদে মাথাটা আস্তে আস্তে হেলে পড়ে বেঞ্চের হাতলে। দীনু আন্‌মনে ভাবে ওর বর্ত্তমানের প্রতিটি দিন: গত কাল, আজ আর আগামী কাল। জীবনের ক্যালেণ্ডারে দিনগুলো যেন ঠাসাঠাসি বোনা; কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। সাম্‌নের পথে অগণিত দিন পাশাপাশি রেল লাইনের মত একসঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়েছে কোন্‌ দূর দিক্‌চক্রে; পিছনের পথে জ্বল্‌ছে কতকগুলো লাল আলো, আর থম্‌থম্‌ করে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে চোখ দুটো কেমন ভারি হ'য়ে আসে।—ট্যাঁক থেকে টাকাটা বের ক'রে দীনু একবার হাতের মুঠোয় চেপে ধরে; নিবিড়ভাবে অনুভব করে সেই প্রাণহীন ধাতুখণ্ডের স্পর্শ। টাকাটা পেয়ে অবধি কেমন একটা অস্বস্তি ওকে মাঝে মাঝে পীড়িত ক'রে তোলে। এক বার, দু বার, তিন বার,—এমনি কত বার টাকাটা ট্যাঁক থেকে বের করে আর নাড়াচাড়া ক'রে গুঁজে রাখে আবার ট্যাঁকে।

অমনি ক'রে বসে থাক্‌তে থাক্‌তেই কখন একটু ঘুম আসে চোখের পাতায়। ওর স্বস্তি আর অস্বস্তির এক সঙ্গে সমাধি হয় সুপ্তির ছোঁয়ায়।

—ওর ভাল লাগে না, তবুও তড়িৎ জোর ক'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যায়। তপনের গাড়ীখানা সে বাগিয়েছে আজ মস্ত একটা ধাপ্পা দিয়ে। ওর নাম শুনে তপন এতটুকুও আপত্তি করে নি।

তড়িতের পিছনে সুরেখা আর রেবা সোম। তড়িৎকে জবাব দেবার আগেই সুরেখা অভ্যস্ত-হাসির ফিন্‌কি ছড়িয়ে বলে—"আজ ইম্‌প্রিণ্টের শিওর টিপ্‌। যাবে না তুমি?"

"জেকিউট্‌, কিউপিড, ফ্লেয়ার! সঙ্গে যাবেন মিস্‌

মজুমদার আর রেবা। এমন শনিবারটা স্পয়েল্ করবে তুমি?"—তড়িৎ টানে ওর হাত ধ'রে।

ওরা উঠে বসে। তড়িৎ ড্রাইভ করে। তড়িৎ-এর পাশে বসে রেবা, আর পিছনে ওরা দু'জনে পাশাপাশি। ওর হাতখানা কোলের ওপর টেনে নিয়ে সুরেখা আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করে। সুরেখার কোলের ভিতরটা কি উষ্ণ! সে উত্তাপের স্পর্শ ওর প্রতিটি লোমকূপের অন্তর দিয়ে এসে পৌঁছয় হৃৎপিণ্ডে।

শহরের জনপ্রবাহ ছাড়িয়ে গাড়ী এসে পৌঁছয় ব্যারাক্‌পুরের প্রশস্ত পথে। এখন আর গাড়ীর গতি প্রতি চক্রক্ষেপে ব্যাহত হয় না। শহরের চেয়ে গাড়ী ঘোড়ার ভিড় কম; পরিচ্ছন্ন সমতল পথ; এশ্‌ফল্টামের ঝক্‌ঝকে বুকে যেন গাড়ীর প্রতিবিম্ব চলমান ছায়ার মত কাঁপে!

"সেন!"—সুরেখা বড় বড় চোখ দুটো তুলে চায় ওর মুখপানে। এমনি পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে সে যেন পৃথিবীতে এই প্রথম চাইল। সদ্য ফোটা কুমুদ ফুলের মত চোখের পাতায় পাতায় জড়ানো সজল জড়িমা। ওর ইচ্ছে করে, আস্তে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে সুরেখার ওই সদ্যস্ফূর্ত্ত চোখের পাতাগুলো।

হাতখানা টেনে নেবার চেষ্টাও করে না; তন্দ্রালু অবসন্নতায় মাথাটা হেলিয়ে দেয় কুশানের ওপর। ওর চোখে নামে হাল্‌কা নেশার লঘু ঘুম।

—"মল্লিকা আর সেন রয় ফিরেছে বুধবার বিকেলে। ওদের এন্‌গেজমেণ্ট ভেস্তে গেছে মন-ভাঙাভাঙিতে।"

"মন-ভাঙাভাঙি?"

"হাঁ।"

"মল্লিকাকে বাদ দিয়ে শুধু ওর গানটুকু নিয়েই মানুষ বেঁচে থাক্‌তে পারে অনন্তকাল।"—চোখ দুটো মেলে একবার সত্যেন দেখে নেয় সাম্‌নের পথ আর আশ-পাশের নির্জ্জন বাগানগুলো।

সুরেখা ওর হাতখানা বুকের কাছে তুলে নিয়ে বলে—"কাল সাঁ-সুচি স্টেজে হবে মল্লিকার লীরিক্ ডান্স। নতুন স্টেজের উদ্বোধন করবেন কবিগুরু! পরশু হবে অভিনয়,—'তাসের দেশ'। যাবে না?—নিশ্চয়ই যাবে। মল্লিকা জানিয়েছে সাদর নিমন্ত্রণ!"

'যাবে; নিশ্চয়ই যাবে ও। ইম্‌প্রিণ্টকে টিপ দেবে উইন, আর বাকী তিনটের প্লেস্! জেকিউট, কিউপিড্ আর ফ্লেয়ার!'—চোখ দুটো আবার বন্ধ হ'য়ে আসে। তড়িৎ-এর মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভেসে আসে স্যাম্পেনের ঈষৎ গন্ধ!

সত্যেন অনুভব করে, দু হাত দিয়ে অনুভব করে এক গোছা নোট, সেই সঙ্গে অনেকগুলো টাকা। ওর দুই পকেটে মুঠো মুঠো সিকি দু-আনি, আধুলি। বিরক্তিকর কতকগুলো রেজ্‌কির বোঝা!

ভিড় ঠেলে ভিতরে যাওয়া যায় না। তবুও যায় ওরা দু'জনে। সুরেখা আর রেবা ব'সে থাকে বাইরে, গাড়ীতে।

স্টার্ট দিয়েছে! ঘোড়াগুলো তীর বেগে এগিয়ে আসে ওদিকের কার্ভ ছাড়িয়ে। সকলের আগে বেরিয়ে আসে জেকিউট! তার পিছনে ফ্লেয়ার আর কিউপিড্ পাশাপাশি; আরও পিছনে ইম্‌প্রিণ্ট। ইম্‌প্রিণ্টের জকিটা যেন ইচ্ছে ক'রেই রাশ আল্‌গা দিচ্ছে না। কিউপিড্‌কে ছাড়িয়ে ফ্লেয়ার জেকিউটের সঙ্গ ধরেছে। জকিটা নাইস কন্‌ট্রোল্ করে!—কিন্তু ইম্‌প্রিণ্ট? জকিটার ওপর রাগে ওর আপাদ-মস্তক জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে হয়, ছুঁড়ে মারে ওর ঘাড়ে একটা হাণ্টার।

ব্র্যাভো! বাক্ আপ্ ইম্‌প্রিণ্ট! এবার ছেড়েছে রাশ। ইম্‌প্রিণ্ট মেক আপ্ করে—চোখের নিমেষে মেক্ আপ করে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাড়িয়ে গেল সবগুলোকে। ব্রিলিয়াণ্ট গেট! থ্রি্‌লিং!

গেল! গেল! দর্শকরা আশঙ্কায় চীৎকার ক'রে ওঠে। —সেভ্‌ড্! গোল্ডকুইনের জকিটা খুব সেভ্‌ড্ হ'য়ে গেল আজ।—ইম্‌প্রিণ্ট! ইম্‌প্রিণ্ট! ইম্‌প্রিণ্ট উইন করে। দ্যাট্'স্ ইট্!—উল্লাসে সত্যেনের সর্ব্বাঙ্গ উতরোল হ'য়ে ওঠে। তড়িৎ ওর পিঠে হাত-থাব্‌ড়া দিয়ে বলে' ওঠে—"বাক্-আপ বন্ধু, বাক্-আপ!"

কোথা থেকে যেন সুরেখা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ওর গলাটা!—কখন্ ঢুকে পড়েছে সে ওর পিছু পিছু।

ওর সর্ব্বাঙ্গে লাগে সুরেখার স্পর্শ! এত নিবিড়,

এমনি একান্ত স্পর্শ ওর জীবনে এই প্রথম! ওর লালায়িত দেহ মন—

ঘুম ভেঙে যায়।

দীনু চমকে ওঠে। পার্কে লোক চলাচল বেড়ে গেছে। সূর্য্যটা হেলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশে। ওর মুখে এসে পড়ে অপরাহ্ণের রুক্ষ রৌদ্র।

মনটা কেমন গ্লানি আর অস্বস্তিতে ভ'রে যায়। হাতের তেলোটা ঘেমে উঠেছে।—ওর হাতের মুঠোয় তখনও রয়েছে সেই টাকাটা।

না, না; ও পারে না সইতে। কোন দিনও পারবে না আর। দীনু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গায়ের চামড়ায় কেমন একটা জ্বালা! মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গে যেন কেউ জলবিছুটি মাখিয়ে দিয়েছে।

সাম্‌নের পুকুরে গাছের ছায়াগুলো কাঁপে। ছোট ছোট ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বাঁধানো ঘাটের রানায় চোট খেয়ে।

টাকাটা দীনু তুলে ধরল চোখের সাম্‌নে। বেশ ক'রে দেখে চেয়ে। ধারের দাগগুলোয় নখ দিয়ে শব্দ ক'রে, একবার নিয়ে এলো কানের কাছে; তার পর কি ভেবে সেটা জোরে ছুঁড়ে মারল পুকুরের মাঝখানে।—ও পারে না, পারে না সইতে এই একটা গোটা টাকা।

ক্ষীণ একটা শব্দ! ঢেউগুলো তেমনি নির্ব্বিকার। গাছের ছায়াগুলো যেন আরও বেশী দুলে উঠ্‌ল একবার। তারপর দীনু অবসন্নভাবে আবার ব'সে পড়ল বেঞ্চখানার একটি পাশে। (ক্রমশ)

বন্দী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

খাঁচা যে কঠিন সত্য জানে তাহা পাখী।
তবু থাকি থাকি
মরে ঝাপটিয়া পাখা কী আবেগ ভরে!
শুধু ঝরে
দু-চারিটি পালক কেবল,
নিস্পন্দ অচল
পড়ে থাকে খাঁচার তলায়,
কভু আর চঞ্চলতা জাগিবে না তায়!

তুমি আসি কৌতূহলভরে
তুলি' লও করে
সে ঝরা পালক।
যার হাতে অন্তরীণ হ'ল পলাতক
পলক পড়ে না চোখে তার!
কি ভাবিছ পর্ণটিরে কপোলে বুলায়ে বার বার?
রাখিবে খোঁপায়,
কবরী বন্ধনে বন্দী করিবে সে ছিন্ন পাখ্‌নায়?

দৃষ্টিশক্তির স্বাস্থ্য

ডাঃ শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় এফ-আর-সি-এস, ডি-ও, ডি-ও-এম-এস
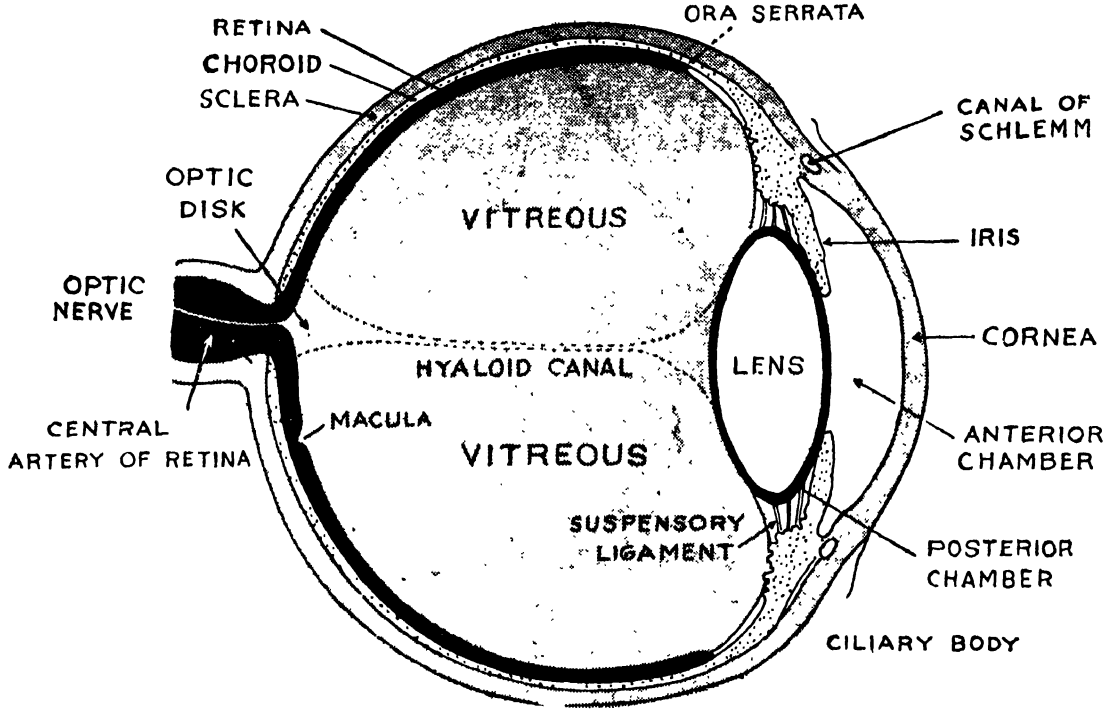
HORIZONTAL SECTION OF THE EYE-BALL

ভারতীয় সাধারণ বাড়ী কিম্বা স্কুলে প্রায়ই দৃষ্টিশক্তির স্বাস্থ্যের দিকে অবহেলা দেখা যায়। পাড়াগাঁয়ে এ বিষয়ে নজর নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতা। দৃষ্টিশক্তির কোন দোষ থাকিলে যত শীঘ্র ইহা বুঝিতে পারা যায় ততই ভাল, কেন না অবহেলাবশতঃ দোষ ধরা না পড়িলে দৃষ্টিশক্তি আরও খারাপ হইতে পারে।

দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকিলে কি হয়? দৃষ্টিশক্তি শিশুর সমস্ত সুখের কারণ এবং ইহা লাভ করিবার শিশুর জন্মগত অধিকার আছে। স্কুলের ছাত্রকে ইহা বিদ্যা উপার্জ্জনের পথে দ্রুত লইয়া যায় এবং পরিণত বয়সে অর্থ উপার্জ্জনের ইহা প্রধান সহায়।

স্কুলে যাইবার পূর্ব্বের সময়—এই সময়ে শিশুদিগের দৃষ্টিশক্তির উপর নজর রাখা পিতামাতা বা অভিভাবকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই শিশু কোন জিনিষের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারে না। অনবরতই তাহার দৃষ্টি এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে। শিশু ৬ মাসের হইলেই চিত্তাকর্ষক বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখিতে শিখে। এই বয়সের পরেও যদি দেখা যায় যে শিশু কোন বস্তুর উপর দৃষ্টি স্থির রাখিতেছে না, কোন আলো স্থির ভাবে দেখিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে যে শিশুর চোখের কিছু দোষ হইয়াছে এবং সেই জন্য তাহাকে কোন চক্ষু চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইতে হইবে।

এই সময়ে শিশুর দর্শন ইন্দ্রিয়ের একটি প্রয়োজনীয় ক্রিয়ার বিকাশ হয়। দৃষ্ট পদার্থের দুই চক্ষুতে দুইখানি

চিত্রকে শিশু একখানি করিয়া দেখিতে শিখে। এই শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশু ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের বিভিন্ন আকার ও অবস্থা দেখিতে শিখে এবং তাহাদের দূরত্ব, উচ্চতা, গভীরতা প্রভৃতি দেখিতে অভ্যাস করে। শিশুর দৃষ্টির দোষ থাকিলে দৃষ্ট পদার্থগুলিকে বিশেষ ভাবে দেখিবার সময় চক্ষুর মাংসপেশীগুলির ক্রিয়া অযথাভাবে হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে একটি চক্ষুর মাংসপেশী নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং ইহাতেই শিশু ট্যারা হয়। শিশুর চোখ ট্যারা হইতে আরম্ভ হইলে প্রায় সন্ধ্যার সময় চোখের বিকলতা ধরিতে পারা যায়, কেন না এই সময়ে সমস্ত দিনের অঙ্গচালনার পরে সর্ব্ব শরীরের মাংসপেশীগুলির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর মাংসপেশীগুলিও অবসন্ন হইয়া পড়ে। শিশুর জননী বা অভিভাবক ইহা দেখিলেই শিশুকে চিকিৎসার জন্য চক্ষু চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইবেন। যদি চিকিৎসা না হয় তাহা হইলে ট্যারা চোখটিতে শিশু ভাল দেখিতে পাইবে না। আর যদি শিশুর ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে আদৌ চিকিৎসা না হয় তাহা হইলে ট্যারা চোখের দৃষ্টির সংশোধন হইবে না।

স্কুলে অধ্যয়নের সময়—এই সময়টি দৃষ্টিশক্তির পক্ষে বড় বিপজ্জনক সময়; কেন না লেখাপড়ার অতিরিক্ত কাজটি চক্ষুর উপর অতিরিক্ত ক্রিয়া করে। ভৃত্যের মত চক্ষু দ্বারা অতিরিক্ত কাজ করাইয়া লই। দিনের বেলায় শিশু স্কুলে থাকে বলিয়া তাহার দৃষ্টির উপর দেখাশুনা করিবার ভার শিক্ষকগণের বা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের হাতেই থাকে। য়ুরোপ বা আমেরিকার অধিকাংশ দেশে স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে মধ্যে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর দৃষ্টির দোষ আছে তাহাদের চিকিৎসা করা হয় এবং যাহাদের দৃষ্টিশক্তি এক বিশিষ্ট পর্য্যায়ের নিম্নে পড়ে তাহাদিগকে দৃষ্টিশক্তিরক্ষোপযোগী শ্রেণীতে পাঠান হয়। এই সকল শ্রেণীর পঠিতব্য বিষয়গুলিতে চক্ষু চালনার প্রয়োজন খুব কমই আছে, সুতরাং এখানে দৃষ্টিশক্তি অধিকতর খারাপ হইতে পারে না। এই সকল দেশে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদিগের চক্ষু পরীক্ষার ভার একটি শিক্ষা বিষয়ক সরকারী বোর্ড ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সরকারী বোর্ডের হাতে ন্যস্ত এবং বৎসরে একবার করিয়া পরীক্ষা লওয়া হয়। ভারতবর্ষে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদিগের চক্ষু পরীক্ষা করিবার নিয়মিত ব্যবস্থা নাই। সুতরাং পিতামাতার, অভিভাবকগণের এবং শিক্ষকগণের এ বিষয়ে দায়িত্ব খুবই বেশী।

পিতামাতার এবং অভিভাবকদিগের কর্ত্তব্য কি?

১। শিশুকে স্কুলে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহার দৃষ্টিশক্তি যে স্বাভাবিক এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত। এ পরীক্ষা করিতে হইলে শিশুকে একটু দূর হইতে ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে। (ঘড়ি হইতে দূরত্ব ঘড়িতে লিখিত অঙ্কের আকারের উপর নির্ভর করে)। শিশুর উত্তর একজন স্বাভাবিকদৃষ্টি লোকের উত্তরের সঙ্গে মিলাইয়া লইবে! এইভাবে প্রত্যেক চক্ষুকেই পরীক্ষা করিতে হইবে। একটি চক্ষু হাত দিয়া কিম্বা একখানা মোটা কাগজ দিয়া চাপা দিয়া অপরটি পরীক্ষা কর। তাহার পর এক ফুট দূর হইতে শিশুকে সূচে সুতা পরাইতে হইবে—এক একটি চোখ দিয়া। এই সব কাজের মধ্যে শিশু কোন একটি না পারিলে তাহাকে স্কুলে পাঠাইবার পূর্ব্বে কোন চক্ষু-চিকিৎসকের নিকট পাঠাইতে হইবে, কেন না চোখের দোষ না সারিলে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইবে। শিশুকে চশমা পরাইতে দরকার হইলে পিতামাতার কিম্বা অভিভাবকের চশমা দিতে যেন কোনরূপ সঙ্কোচ না হয়। অনেক শিশুকে লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার জন্য কিম্বা বুদ্ধিহীনতার জন্য শিক্ষকেরা শাস্তি দেন; তাঁহারা জানেন না শিশুর চোখের দোষ থাকিতে পারে, যাহার জন্য সে পড়া বা লেখার কাজ রীতিমত করিতে পারে না।

২। শিশুর পড়িবার ঘরে রীতিমত আলো থাকা দরকার।

৩। শিশু মাথাটি সামনের দিকে একটু নোয়াইয়া খাড়া হইয়া বসিবে। বিছানায় শুইয়া শিশুকে পড়িতে দিবে না, কিম্বা মাদুরে বা খাটিয়ায় বসিয়া বইখানির উপর ঝুঁকিয়া কিম্বা হাতে বই লইয়া ঝুঁকিয়া বসিয়া শিশুকে পড়িতে দিবে না।

৪। রাত্রে কৃত্রিম আলোকে শিশুকে যথাসাধ্য অল্প কাজ করিতে দিবে।

৫। প্রাতরাশের পূর্ব্বে খালি পেটে শিশুকে কোন কাজ করিতে দিবে না।

৬। শিশুর স্বাস্থ্য ক্ষীণ হইলে তাহার পড়াশুনা করিবার সময় কমাইয়া দেওয়া উচিত, কিম্বা পড়াশুনা বন্ধ

করিয়া দেওয়া উচিত, কেন না স্বাস্থ্য ক্ষীণ হইলে যেমন শরীরের মাংসপেশীগুলি ক্ষীণ হয়, সেইরূপ চোখের মাংসপেশীগুলিও ক্ষীণ হয়।

৭। দৃষ্টি যন্ত্রের উপর চাপ বা জোর পড়িতেছে এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই যেমন পড়িতে পড়িতে চোখ দিয়া জল পড়িলে বা মাথা ধরিলে, কিম্বা পড়িবার পর চোখ লাল হইলে,এরূপ লক্ষণকে অবহেলা না করিয়া শিশুকে নিকটস্থ চোখের হাসপাতালে বা চক্ষু চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার জন্য লইয়া যাইবে।

স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের কি করা উচিত—১। স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁহারা একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিবেন এবং তিনি যেন অন্তত বৎসরে একবার ঐ ছাত্রছাত্রীগণের চক্ষু পরীক্ষা করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যেক স্কুলে ইহা অতি সহজেই হইতে পারে। যদি প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হয় তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসককে অবৈতনিকভাবে পাওয়া যাইতে পারে।

২। তাঁহাদের দেখা উচিত যেন স্কুলের প্রত্যেক ঘরে যথেষ্ট আলো থাকে অথচ চক্ষুর পীড়াদায়ক তীক্ষ্ণ আলো (glare) না থাকে।

৩। দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার উপযোগী একখানি চার্ট (ফলক) রাখিবেন—একখানি ঈ চার্ট, অর্থাৎ "ঈ" অক্ষর দিয়া একখানি চার্ট—ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন "ঈ" অক্ষরগুলির বাহুগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসারিত।

শিক্ষকগণের কি করা উচিত—স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণের দৃষ্টিশক্তি রক্ষারূপ প্রয়োজনীয় কার্য্য শিক্ষকগণ করিতে পারেন এবং ছাত্রছাত্রীগণের কোন চক্ষুরোগ হইলে শিক্ষকগণ রোগের প্রারম্ভেই সাধারণ লক্ষণগুলি ধরিতে পারিবেন আশা করা যায়। তাঁহারা ছাত্রগণকে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে দেখেন, সুতরাং তাহাদের চোখের দোষ হইলে সহজেই তাঁহারা ধরিতে পারেন।

১। চক্ষুর গঠনপ্রণালী ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষকগণের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার।

২। কি উপায়ে চক্ষুকে সুস্থ রাখা যায় ও স্কুলের ঘরগুলিতে কি রকম আলো থাকা দরকার তাহা শিক্ষকগণের জানা উচিত।
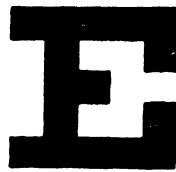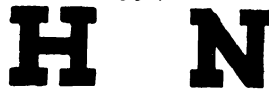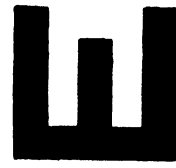
৩। "ঈ" চার্টের সহযোগে কিরূপে দৃষ্টিশক্তি নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করা যায় তাহা শিক্ষকগণের জানা উচিত।

৪। যে চিহ্ন ও লক্ষণগুলি থাকিলে চক্ষুরোগের সম্ভাবনা প্রকাশ পায় সে চিহ্ন ও লক্ষণগুলি শিক্ষকগণের মোটামুটি ভাবে জানা উচিত। সে লক্ষণগুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

(ক) চক্ষুর উপর চাপ বা ভারের (strain) লক্ষণ—মাথা ধরা, ক্লান্ত চক্ষু, মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট বা জ্যাব্ড়া দেখা, পড়িবার পর চোখ লাল হওয়া, চোখের পাতা ফুলা বা ভারি হওয়া, চোখের দৃষ্টি অস্থির হওয়া।

(খ) লিখিবার ও পড়িবার সময় মাথাটি অস্বাভাবিক ভাবে রাখা এবং চোখ ভিন্ন ভিন্ন দিকে থাকিলে দৃশ্যমান পদার্থের আকারের পরিবর্ত্তন (astigmatism)।

(গ) বোর্ডের দিকে চাহিবার সময় একটু একটু চোখ বুজান কিম্বা পড়িবার সময় বইখানা একেবারে চোখের কাছে লইয়া যাওয়া (বার ইঞ্চির মধ্যে)—এগুলি অ-দূর-দৃষ্টির লক্ষণ (short-sightedness)।

(ঘ) লেখাপড়ায় অপটুতা

(ঙ) চোখ অস্বাভাবিক রকম লাল হওয়া, চোখ দিয়া জল পড়া, আলোর দিকে চাহিতে অক্ষমতা—এগুলি চক্ষু রোগের লক্ষণ—যাহা এই রোগাক্রান্ত ছাত্রদিগের জন্য অবহেলা করা উচিত ত নয়ই, অপরাপর ছাত্রদিগের জন্যও অবহেলা করা উচিত নয়, কেন না এই সকল লক্ষণযুক্ত অনেক চক্ষুরোগ সংক্রামক।

৫। দৃষ্টিশক্তির দোষের কিম্বা চক্ষুরোগের পূর্ব্ববর্ণিত চিহ্ন ও লক্ষণগুলির মধ্যে যদি কোন চিহ্ন বা লক্ষণ প্রকাশ পায় শিক্ষকের কর্ত্তব্য ইহা স্কুলের ডাক্তারের গোচরে আনা। যদি স্কুলের ডাক্তার না থাকে, তাহা হইলে ইহা শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবককে বলিতে হইবে, যেন অবিলম্বে তাহার চোখের চিকিৎসা হয়। শিশুকে কোন চক্ষুচিকিৎসার হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্যও অভিভাবককে পরামর্শ দিতে পারেন।

৬। শিক্ষকগণ দেখিবেন যে সমস্ত ছাত্রকে চশমা ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন ক্লাসে চশমা ব্যবহার করে, আর সেই সব ছাত্র যেন সম্মুখের বেঞ্চে বসে, তাহা হইলে তাহাদের চোখের উপর চাপ বা ভার (strain) যথাসম্ভব কম হইবে।

৭। যে সব ছাত্র নূতন ভর্ত্তি হইবে শিক্ষকগণ তাহাদের দৃষ্টি পরীক্ষা করিবেন এবং দেখিবেন যেন ছয় মাস অন্তর একবার এইরূপ পরীক্ষা করা হয়।

৮। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চশমা ব্যবহার করা ভাল নয় এরূপ কুসংস্কার অনেক পিতামাতার ও অভিভাবকের থাকিতে পারে। শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য এই কুসংস্কার দূর করা। কোন কোন অজ্ঞ লোক মনে করে, শিশুকে চশমা ব্যবহার করিতে দিলে তাহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ খারাপ হইয়া যায়; আর যদি তাহাকে চশমা ব্যবহার করিতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে সময়ে তাহার চোখের দোষ কাটিয়া গিয়া দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হইয়া যাইবে—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

স্কুলের ঘরে আলোক—ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। চোখের উপর চাপ বা ভার (strain) পড়ে দুই কারণে :—প্রথমত অল্প আলোক এবং দ্বিতীয়ত বেশী আলোকে (glare) অর্থাৎ চক্চকে আলোকে, যে আলোকের দিকে হঠাৎ চাওয়া যায় না। ক্লাসে যেন এই দুই কারণের কোন কারণই না থাকে। আদর্শ স্কুল-ঘরের আলোক চলাচলের ব্যবস্থা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। স্কুলবাড়ীর সর্ব্বত্র যেন প্রচুর দিনের (সূর্য্যের) আলো থাকে।

২। ছাত্রদিগের বসিবার স্থান ও ডেস্ক এরূপ ভাবে সাজাইতে হইবে যেন আলোক উপর দিয়া এবং ছাত্রদিগের বাম স্কন্ধের উপর দিয়া আসে, যাহাতে লিখিবার সময় যেন কলমের ও হাতের ছায়া কাগজের উপর পড়িয়া কাগজখানি অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় করিতে না পারে।

৩। স্কুলের দরজা বা জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতে যেন ছাত্রদিগকে না হয়, শিক্ষককেও না হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের স্কুলে এরূপ প্রায়ই হইয়া থাকে।

৪। শিক্ষক কখনও খোলা দরজা বা জানালার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইবেন না, কেন না তাহা হইলে ছাত্রদিগকে আলোকের পথের দিকে সোজাসুজিভাবে চাহিতে হইবে।

৫। যদি কোন ক্লাসের ঘরে উচ্চে অবস্থিত জানালা দিয়া আলো প্রবেশ করে তাহা হইলে সেই ঘরটি আদর্শরূপে আলোকিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

৬। যে সময়ে মরশুমি বাতাস বহিতে থাকে অর্থাৎ বর্ষা বাদ্লার দিনে অধিকাংশ ক্লাসের ঘর অন্ধকার হয়, সে সময়ে রীতিমত কৃত্রিম আলোকের ব্যবস্থা না থাকিলে লেখাপড়ার কাজ বন্ধ দেওয়া উচিত। কৃত্রিম আলো উপযুক্ত প্রখর হওয়া উচিত। ইহা একটু হলদে রংএর

হইবে এবং ইহাতে একটি আবরণ থাকিবে, যেন ইহার চাক্‌চিক্য (glare) চোখে না লাগে।

অপরাপর কারণ যাহা চোখের চাপ বা ভার (strain) উপস্থাপিত করে :—১। (glare)

(ক) পালিশ করা জিনিষের উপর আলোক প্রতিফলিত হইয়া চোখের glare উপস্থাপিত করে। এইজন্য স্কুলের আসবাব পত্র যেন পালিশ করা না হয়। বোর্ডগুলি শ্লেটের তৈরি হওয়া উচিত, আর যদি কাঠের তৈরি বোর্ড থাকে তাহা হইলে সেগুলিতে মধ্যে মধ্যে কাল রং দেওয়া উচিত যেন সেগুলি চক্‌চকে না হইয়া যায়। পালিশ করা কাগজে ছাপা বই ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নয়।

(খ) আলো সোজাসুজিভাবে চোখে পড়িলে glare উপস্থিত করে। এই কারণে স্কুলে ছাত্রদিগের বসিবার স্থান ও ডেস্ক এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যেন ছাত্রদিগকে খোলা দরজা, জানালা বা আলোকের দিকে মুখ করিয়া বসিতে না হয়। রাত্রে ছাত্রেরা প্রায় আলোটি সাম্‌নে রাখিয়া পড়িতে বসে—এ অভ্যাসটিও ত্যাগ করাইতে হইবে।

(গ) তীক্ষ্ণ অসামঞ্জস্য glare উপস্থিত করে। এইজন্য দরজা বা জানালার মধ্যে বোর্ড রাখিবে না। ডেস্কগুলি সমানভাবে আলোকিত হওয়া উচিত।

ছাত্রদিগের অবস্থিতি—ছাত্রদিগকে ঝুঁকিয়া কোন কাজ করিতে দিবে না। তাহারা মাথাটি একটু সাম্‌নে নোয়াইয়া খাড়া হইয়া বসিবে; এই ভাবে বসিতে সুবিধা হয় এরূপ উচ্চতার ডেস্কগুলি হওয়া চাই। ছাত্রদিগের উচ্চতা অনুসারে যে সব ডেস্কের উচ্চতা কমাইতে ও বাড়াইতে পারা যায় সেইগুলিই আদর্শ ডেস্ক। শিশুদিগকে শুইয়া পড়িতে দিবে না, কিম্বা তাহাদের খেয়াল মত নানা অদ্ভুত ভাবে অবস্থান করিয়া পড়িতে দিবে না।

পুস্তকের ছাপা—এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। ছাত্রের বয়স যত কম হইবে ছাপাও তত বড় হওয়া দরকার। লাইনগুলি বিশেষ ভাবে ফাঁকফাঁক থাকিবে এবং অক্ষরগুলির মধ্যেও যেন ফাঁক থাকে।

বোর্ডের লেখা—বোর্ডের লেখাগুলি যেন বেশ বড় বড় হয় এবং ছাত্রেরা যেন বোর্ড হইতে বেশি দূরে না বসে। যে সমস্ত ঘরে ছাত্রদিগকে বোর্ড হইতে বিশ ফুটের অধিক দূরে বসিতে হয় সেই সমস্ত ঘরের বোর্ডে সাধারণ ক্লাসের ঘরে সচরাচর যে পরিমাণ আলোকের দরকার হয় তাহা অপেক্ষা শতকরা ষাট ভাগের বেশি আলোকের দরকার।

দৃষ্টি পরীক্ষা বা দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা—ছোট ছোট শিশুদিগের বেলায় "ঈ" চার্ট ব্যবহৃত হইবে এবং বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য সাধারণ snellen চার্ট ব্যবহৃত হইবে। প্রত্যেক চক্ষু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরীক্ষা করা উচিত। একখানি মোটা কাগজ (card board) নাকের উপর বাঁকা ভাবে ধরিয়া একটি চোখকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকিয়া ফেলিবে। যে চোখটি কার্ড বোর্ডের সাহায্যে ঢাকা দেওয়া হইল সে চোখটি বুজাইবে না বা তাহার উপর কোন চাপ দিবে না। এই ভাবে শিশুরা খোলা চোখ দিয়া দেখিবে। চোখের উপর সোজা ভাবে বা পাশ দিয়া যেন আলো আসিয়া না পড়ে। চার্টের উপর আলো সোজা ভাবে আসিয়া পড়িবে, অথচ যেন চক্‌চক্ না করে (যেন glare না হয়)। চার্টখানি ছয় মিটার (বিশ ফুট্) তফাতে ঝুলান থাকিবে এবং চার্টে লিখিত "ছয়" অক্ষরটি যেন চোখের সঙ্গে এক সমতলে থাকে। যে লাইনটিতে "ছয়" অক্ষরটি লেখা আছে সেই লাইনটি ছয় মিটার দুর হইতে পড়িতে পারিলে বুঝিতে হইবে যে দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে অর্থাৎ সুস্থ আছে। সমস্ত চার্টখানিতে যেন সমানভাবে আলো পড়ে।

দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষার ফলগুলি এই ভাবে লিখিত হয় :—৬/৬, ৬/৯, ৬/১২, প্রথম অঙ্কটি চার্ট হইতে কত মিটার দূরে পরীক্ষা লওয়া হইল বুঝাইবে (এক মিটার ৩৯ ইঞ্চি) এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি চার্ট লিখিত কোন লাইনটি পঠিত হইল বুঝাইবে।

যে সমস্ত শিশু ৬।৬ অপেক্ষা ভাল পড়িতে পারে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ বুঝিতে হইবে; কিন্তু যদি বুঝা যায় যে উহা পড়িতে তাহাদের চোখে একটু কষ্ট হইয়াছে (strain হইয়াছে) তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক নয় বা সুস্থ নয় এবং তাহাদিগকে বিশেষ পরীক্ষার জন্য চক্ষু হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে। যদি কোন শিশুর দৃষ্টি শক্তির দোষ থাকে তাহা

হইলে তাহাকে তাহার পিতামাতার বা অভিভাবকের নিকট একখানি পত্রসহ পাঠাইয়া দিতে হইবে; ঐ পত্রে শিশুর দৃষ্টিশক্তির দোষের কথা লেখা থাকিবে এবং কোন চক্ষু চিকিৎসকের দ্বারা তাহার চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া তাহার রীতিমত চিকিৎসা করাইবার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইবে।

পরিণত বয়স—স্কুলে পড়িবার সময় যেমন আলোকে থাকিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, glare ত্যাগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এবং যে আলো একবার নিবিয়া যায় ও একবার জলে সে আলোর দিকে চাহিতে বারণ করা হয়, পরিণত বয়সেও সেইগুলি প্রযোজ্য। পরিণত বয়সে লোকে নিজেদের চোখের যত্ন লইতে পারে বলিয়া দায়িত্ব তাহাদের নিজেদের উপরেই থাকে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর কিম্বা একটু বেশি বয়সে মানুষের চাল্‌শে (চল্লিশে) ধরে, অর্থাৎ পড়িবার সময় বা সূক্ষ্ম কাজ করিবার সময় চশ্‌মার প্রয়োজন হয়। চশ্‌মা যেন কোন চক্ষু চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে লওয়া হয় এবং সোজাসুজি চশ্‌মা বিক্রেতার নিকট হইতে না লওয়া হয়। সাধারণের ধারণা আছে, যদি কেহ কিছু কাল চশ্‌মা না লইয়া চালাইতে পারে, তাহা হইলে আবার তাহার দৃষ্টিশক্তি ভাল হইবে এবং তাহার চশ্‌মা লইবার দরকার হইবে না। এই ধারণা ভিত্তিহীন। পড়িবার জন্য এই বয়সে চশমা লইতে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়, কেন না ইহা চোখের কোন রোগ নয়, ইহা পরিণত বয়সের চোখের স্বাভাবিক পরিণতি।

বৃদ্ধ বয়স—এই বয়সে চোখের অনেক বিপদ ঘটে। এ সময়ে চোখে ছানিপড়া এরূপ সাধারণ যে, এ বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গেলেই লোকে মনে করে ছানি পড়িয়াছে এবং বন্ধুরা চোখের তারাগুলি সাদা দেখিয়া তাহাদের ঐ বিশ্বাস দৃঢ় করে। অনেক লোক এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চিরকালের মত অন্ধ হইয়া যায়, কেন না এই দৃষ্টিশক্তিহীনতা একেবারেই ছানির জন্য না হইতে পারে। চোখের গোলকের মধ্যে কোন রোগ হইলে কিম্বা বার্দ্ধক্য সুলভ গ্লকোমা রোগ হইলে দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়; বৃদ্ধ বয়সে চোখের তারা সাদা হওয়া স্বাভাবিক। অতএব যদি গ্লকোমার জন্য কিম্বা চোখের গোলকের মধ্যে কোন রোগের জন্য দৃষ্টিশক্তিহীনতা জন্মে, আর ছানি হইয়াছে মনে করিয়া কবে ছানি পাকিবে ইহার জন্য অপেক্ষা করা যায় তাহা হইলে চক্ষুচিকিৎসার অতি মূল্যবান সময় নষ্ট করা হয়। তাহার পর যখন দৃষ্টিশক্তির সম্পূর্ণ লোপ হয় এবং রোগী মনে করে ছানি পাকিয়া অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত হইয়াছে তখন সে চক্ষু-চিকিৎসকের কাছে যায় এবং শুনে যে তাহার অন্ধতা ছানির জন্য নয় আর সে অবস্থায় ইহা চিকিৎসাসাধ্যও নয়। চিকিৎসার জন্য চক্ষু হাসপাতালে আগত অনেক রোগীর এই দুঃখের কাহিনী শুনা যায়। এই বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমিতে আরম্ভ করিলেই কোন চক্ষুচিকিৎসকের দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার যে ছানির জন্য দৃষ্টিশক্তি কমিতেছে। তাহা হইলে রোগী নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করিতে পারে এবং পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবার আশাও পোষণ করিতে পারে।

দৃষ্টি শক্তির উপর সিনেমা দর্শনের ক্রিয়া—পুনঃ পুনঃ সিনেমা দেখিতে গেলেও দৃষ্টিশক্তির কোন অনিষ্ট হয় না যদি দর্শক পর্দ্দা (screen) হইতে অন্তত বিশ ফুট তফাতে বসে এবং পর্দ্দার উপর ছবিখানি না কাঁপে। ভারতবর্ষে গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ সূর্য্যের বক্র কিরণগুলি চক্ষুর অনিষ্টকারক। ভারতীয়দিগের চক্ষু অধিক পরিমাণ রংএর দ্বারা স্বাভাবিক উপায়ে রক্ষিত হয়। য়ুরোপীয়দিগের চক্ষু উপযুক্ত টুপি ও চশ্‌মা (glare glasses) দ্বারা রক্ষিত করিতে হইবে। য়ুরোপ কিম্বা আমেরিকা অপেক্ষা ভারতবর্ষে ছানি পড়া একটি সাধারণ রোগ এবং ইহার কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অনিষ্টকর সূর্য্যকিরণ; কিন্তু শিক্ষিত ভারতীয়দিগের মধ্যে, যাঁহারা সূর্য্যকিরণ হইতে চক্ষুকে রক্ষা করেন, এই রোগ শীতপ্রধান দেশের লোকদিগের অপেক্ষা বেশি দেখা যায় না।

যাহারা সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যের দিকে চায় তাহাদের মধ্যে আংশিক অন্ধতার কারণ দেখা যায়। সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে একখণ্ড কাচে ধোঁয়ার কালি ফেলিয়া সেই কাচের মধ্য দিয়া দেখিতে হইবে এবং এই ভাবেও অল্পক্ষণের জন্য দেখিবে।

মাকড়সা ও তাহার স্বজাতি

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রকৃতির রাজ্যে কত যে বিচিত্র জীবের সমাবেশ তাহা গণনায় শেষ করা যায় না। এই বিচিত্র জীব জগতের মধ্যে মানুষের তুলনায় অনেক নিম্ন শ্রেণীর জীব রহিয়াছে যাহাদের শিল্প চাতুর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাহাদের শিল্পকলা নৈপুণ্য দেখিয়া শ্রেষ্ঠ মানবকেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। জন্মগত শিল্পচাতুর্য্য লইয়া যে সকল নিম্নশ্রেণীর জীব জন্মগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে মাকড়সা অন্যতম। অনেকেই ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, প্রাণিতত্ত্ববিদগণ মাকড়সাকে পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন না। পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের দেহ মাথা, বুক ও উদর এই তিন-ভাগে বিভক্ত এবং তাহাদের ছয়টি পা থাকে। কিন্তু মাকড়সার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত এবং তাহাদের সর্ব্ব-সমেত আটটি পা আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ সেইজন্য ইহাদের Arachnida শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া থাকেন। মাকড়সার ন্যায় কাঁকড়াবিছা, একজাতীয় অতি ক্ষুদ্র প্রাণী (mite), শস্যচ্ছেদক পোকা (Hervester) এবং অন্যান্য কয়েকজাতীয় জীব Arachnida শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

মাকড়সার জাল

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মাকড়সা দৃষ্ট হয়। কোলাহলময় সহর হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গম অরণ্য এবং উচ্চ গিরিশিখরে পর্য্যন্ত মাকড়সার খোঁজ পাওয়া যায়।

একমাত্র দেহের আয়তন ও বর্ণের তারতম্য ব্যতীত পৃথিবীর সকল মাকড়সার দৈহিক গঠন একরূপ। প্রাণিতত্ত্ব-বিদগণের মতে প্রকৃতির রাজ্যে এইরূপ দৈহিক গঠনের অভিন্নতা খুব কম শ্রেণীর জীবের মধ্যে দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর কোন কোন জীব যাহারা সর্ব্বত্রই বিস্তৃত রহিয়াছে তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দৈহিক গঠনের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়; গ্রীষ্মপ্রধান ও শীত প্রধান দেশের জীবের মধ্যে বিভিন্নতা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য হয়। ডিম হইতে আত্মপ্রকাশ করিবার পর মাকড়সার দৈহিক গঠনের আর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। পরিণত অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে ইহাদের কয়েকবার দেহের খোলস পরিবর্ত্তন হয়। মাকড়সা শাবক প্রথম খোলস পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে খাদ্যগ্রহণ এবং জাল নির্ম্মাণে সক্ষম হয় না।
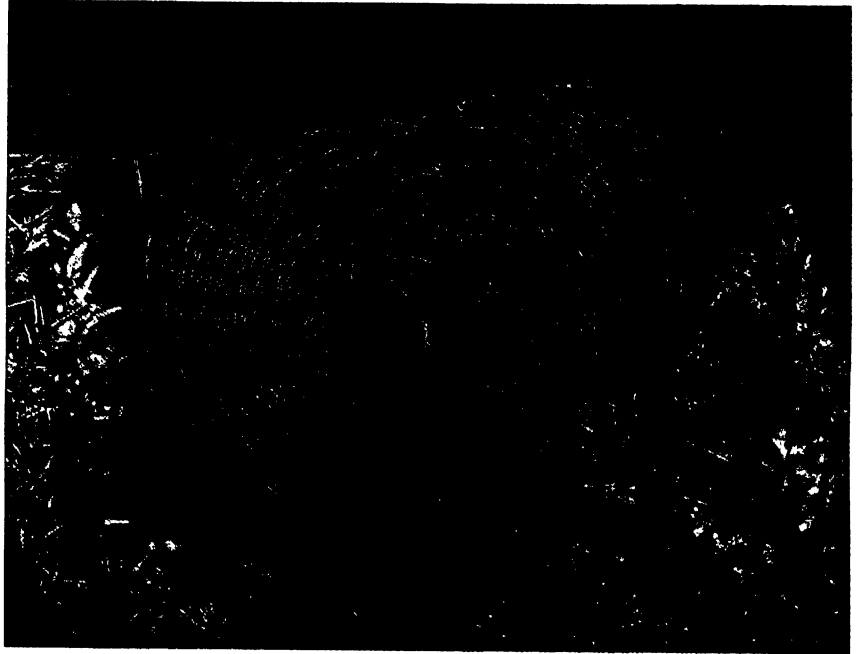
বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জস্থিত মাকড়সার ছয় হইতে আটটি চক্ষু থাকে। অন্যান্য দেশে দুই চক্ষুবিশিষ্ট মাকড়সা পাওয়া যায়। কপালের উপরিভাগে চক্ষুগুলি এইরূপভাবে সজ্জিত থাকে যে, যে কোন দিক হইতে কোন বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করিতে পারে। ফলতঃ এতগুলি চক্ষু থাকা সত্ত্বেও ইহাদের দৃষ্টিশক্তি সেই অনুপাতে শক্তিশালী নয়। চক্ষুগুলির আকারও বিভিন্ন; কোনটির আকার খুব বড় আবার কোনটির এত ছোট যে, অনুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে তাহার

লম্ফদানপটু মাকড়সার জাল

প্রকৃত রূপ নির্ণয় করিতে হয়। কোন কোন শ্রেণীর মাকড়সার চক্ষু হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল। আবার কয়েক জাতীয় মাকড়সার চক্ষু পীত বর্ণের আবরণে আবৃত। এই জাতীয় মাকড়সার চক্ষু দেখিয়া তাহাদের অন্ধ বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে মাকড়সার দৃষ্টিশক্তি খুবই সীমাবদ্ধ। কদাচিৎ কয়েক জাতীয় মাকড়সা মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরের বস্তুর উপস্থিতি বুঝিতে পারে। বিশেষভাবে স্পন্দিত অথবা উজ্জ্বল বস্তু না হইলে সংখ্যাধিক্য মাকড়সাই এক ইঞ্চির বেশী দূরের জিনিষ দেখিতে সক্ষম হয় না।

বাৎসল্য প্রীতি মাকড়সা জাতীর মধ্যে বিশেষ করিয়া অনুভূত হয়। ইতরপ্রাণীর মধ্যে অনেক জাতীয় প্রাণী আছে যাহাদের ডিম প্রসবের পর ডিমের উপর আর কোন অনুরাগ থাকে না। সেই জন্য তাহাদের ডিমগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু স্ত্রী মাকড়সার সন্তান প্রীতি অতুলনীয়। সন্তান প্রতিপালনে তাহাদের কোনরূপ পরিশ্রান্ত হইতে দেখা যায় না। ডিম থেকে সন্তান আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে ডিমগুলির উপর উত্তাপ দানে এবং শত্রুর হাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে ইহারা বিশেষ মনোযোগ দেয়। স্ত্রী উলফ্ মাকড়সাকে (Wolf-spider) ডিমের থলিটিকে যত্নসহকারে বহন করিয়া আহার ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিশ্রান্ত হইয়া থলিটি পরিত্যাগ করে না। একমাত্র ডিমে উত্তাপ দেবার সময় থলিটি নামাইয়া রাখে। এইরূপে যখন ডিম হইতে মাকড়সা শিশুর আবির্ভাব হয় তখন স্ত্রী মাকড়সাকে নূতন উদ্যমে সন্তান পালনে ব্যস্ত দেখা যায়। ঐ জাতীয় স্ত্রী মাকড়সা তাহার প্রায় শতাধিক শিশুকে নিজ পৃষ্ঠের উপর বহন করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করে। যতদিন না শিশুগুলি বড় হইয়া আত্মনির্ভরশীল হয় ততদিন নিজের তত্ত্বাবধানে রাখে।

প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে অনেক সময় এই সকল ডিমের থলিগুলি প্রকৃত মালিকের অধিকারচ্যুত হয়। কিন্তু স্ত্রী মাকড়সা সন্তানসহ ভ্রমণে বাহির হইয়া তাহাদের স্বজাতীয় মাকড়সার ডিমের থলি এইভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেই যত্নের সহিত নিজ তত্ত্বাবধানে উহা গ্রহণ করে। নূতন ডিমের থলি এবং নিজের সন্তানদের পৃষ্ঠে বহন করিতে স্ত্রীমাকড়সাকে বিশেষ কষ্টস্বীকার করিতে হইলেও তাহারা ডিমের থলির উপর কোনরূপ অযত্ন করে না। আপন সন্তানদেরই মত অপরের সন্তানদের যত্ন লইয়া থাকে।

সকল মাকড়সাই বিষাক্ত। তবে মাত্র কয়েক জাতীয় মাকড়সার দংশন মানুষের পক্ষে মারাত্মক। মাকড়সার মুখ বিবর দুইভাগে বিভক্ত। একভাগে একজোড়া বিষাক্ত চুয়াল এবং অপরভাগে সাঁড়াসী আকারে একজোড়া অনুভব যন্ত্র। পৃথিবীর কোন কোন দেশে কয়েক মিনিটের মধ্যে

পাখীরও মৃত্যু ঘটাইতে পারে এইরূপ বিষাক্ত মাকড়সা পাওয়া যায়। সকল শ্রেণীর পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সা অপেক্ষা আকারে ছোট ; এবং তাহাদের অনুভব-যন্ত্রের (pedipalp) গঠন বিশেষভাবে জটিল। যৌনসঙ্গমের সময়ে এই সকল অনুভব-যন্ত্র শুক্রকীটের আধারে পরিণত হয় ; এবং ইহার দ্বারাই স্ত্রী ও পুরুষ মাকড়সার মিলন সংঘটিত হয়। প্রধানতঃ এই সকল যন্ত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। মাকড়সার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি খুবই সীমাবদ্ধ হইলেও অনুভব শক্তি অদ্ভুত।

মাকড়সার তলপেটে (Abdomen) চার হইতে ছয়টি সূক্ষ্ম সংযোজিত বস্তু (appendage) থাকে এবং ইহারাই প্রকৃতির খেয়ালে মাকড়সার সূতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রে (Spinneret) পরিণত হয়। প্রত্যেক সূতাপ্রস্তুত যন্ত্রে প্রায় একশটি করিয়া সূতার নলী (Spinner's spools) থাকে। সূতার নলীগুলি আবার একটি মাংসগ্রন্থির (Gland) সহিত সংযুক্ত। এই মাংস গ্রন্থিই লালা প্রস্তুত করে এবং এই লালা হইতে রেশমী সূতা প্রস্তুত হয়। মাকড়সা তাহার যন্ত্র হইতে প্রায় একশত ফিট সূতা তৈয়ার করিতে সক্ষম হয়। লালা প্রস্তুতকারী মাংস গ্রন্থিটি আবার পেশীযুক্ত প্রকোষ্ঠের মধ্যে রক্ষিত। পেশীর সঙ্কো-

গৃহবাসী মাকড়সা

চনে রেশম জলীয় আকারে নালা বাহিয়া সূতার নলীতে আসিয়া পড়ে। কোন কোন জাতীয় মাকড়সার তিন প্রকারের লালা পূর্ণ মাংস গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থিগুলি নানা আকারের সূতা বয়ন করে।
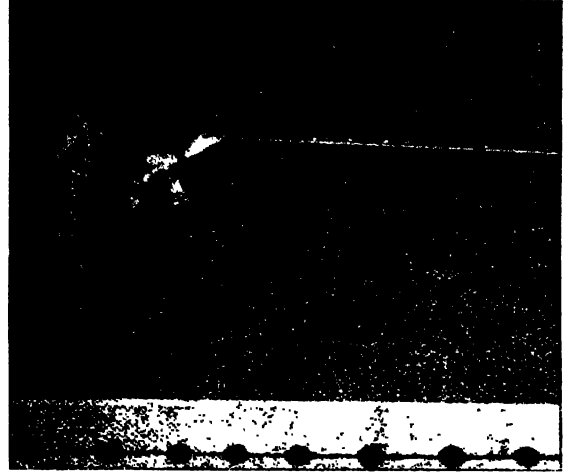
উপরিভাগে বাগানবাসী মাকড়সা তাহার সূতা প্রস্তুত করিবার (spinneret) হইতে সূতা বয়ন করিতেছে ; নিম্নে মাকড়সার সূতাকে বৃহত্তর আকারে দেখান হইয়াছে। সূতায় সুস্পষ্ট আঠাল বর্ত্তুলগুলি শীকারকে আয়ত্বের মধ্যে আনিয়া থাকে

জলীয় রেশম সূতার আকার ধারণ করিলে উহা বাতাসে সঙ্কুচিত হইয়া শক্ত হয়। মাকড়সা যখনই বিপদে পড়ে এবং আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে যাইয়া তাহার পদস্খলন হয় তখনই সে রেশমের সূতা বুনিয়া ফেলে ; এবং তাহার সাহায্যে দুরত্ব পথ অল্প সময়ে সমাপ্ত করিয়া আত্মগোপন করে। এই সূতা বয়ন করিয়া মাকড়সা শিকারের জন্য ফাঁদ পাতে, নিজদের ও সন্তানদের রক্ষা করে।

মাকড়সার অতি সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিবার এবং জটিল জাল বুনিবার অদ্ভুত কৌশল মানুষ স্মরণাতীত যুগ হইতে দেখিয়া আসিতেছে। গ্রীক পুরাণতত্বে Arachne নামক গল্পে মাকড়সার জন্ম ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গল্পের নাম হইতেই মাকড়সা যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহার নামকরণ হয়। গল্পে প্রকাশ, Arachne নামে একজন কুমারী বয়ন শিল্পে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। বয়ন শিল্প প্রতিযোগিতায় দেবী এথেনী তাঁহার নির্ভুল বয়নশিল্পে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার রচিত সুন্দর কাপড়খানি ছিঁড়িয়া ফেলেন। দেবীর এইরূপ কার্য্যে অতিশয় নিরাশ হইয়া কুমারী Arachne রজ্জু বন্ধনে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত

হইলেন। কিন্তু দেবতারা তাঁহার প্রতি দয়াপরবেশ হইয়া গলদেশের সংলগ্ন রজ্জু শিথিল করিয়া দিয়া মাকড়সার জালে

গোপনীয় স্থানে শীকারের অপেক্ষায় মাকড়সা

রূপান্তরিত করিলেন। ইহার পর হইতে কুমারী Arachne মাকড়সায় রূপান্তরিত হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া জাল বুনিতে লাগিলেন।

সকল মাকড়সাই তথাকথিত রেশমী সুতা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়; এবং প্রস্তুত রেশম তাহাদের বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তবে সকল মাকড়সাই ডিমের জন্য রেশমের গুটী ব্যবহার করে। সেইজন্যই মনে হয় প্রধানতঃ ইহার জন্য প্রকৃতি মাকড়সাকে রেশম প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। মাকড়সা নানা উপায়ে সুতার গুটীর দ্বারা ডিমগুলিকে রক্ষা করে। কয়েক জাতীয় মাকড়সা গাছের পাতার নিম্নভাগে পাতার উপর ডিম প্রসব করিয়া তাহার উপরিভাগে রেশমের আবরণ বুনিয়া দেয়। আবার কোন কোন শ্রেণীর মাকড়সা প্রথমে সূক্ষ্ম সুতার দ্বারা প্রস্তুত রেশমী চাদরের উপর ডিম প্রসব করে, পরে উপরিভাগে আবরণ তৈয়ার করিয়া একটী ছোট প্রকোষ্ঠ তৈয়ার করে। উপরিভাগ ও নিম্নভাগের চাদরের চারিধার আবার সংযুক্ত করিয়া দেয়। কোন কোন সময়ে রেশমী সুতার সহিত গাছের গুঁড়া ছাল, ছোট মাটির পিল লইয়া মাকড়সা গৃহ নির্ম্মাণ করে।

মাকড়সার জাল নির্ম্মাণ কৌশল সত্য সত্যই তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়। প্রকৃত পক্ষে যাহাদের চিন্তা করিবার কোন ধারা নাই তাহাদের এইরূপ কৌশলের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

মাকড়সার জালের বহির্ভাগের সুতাগুলি যে সুসামঞ্জস্য ভাবে নিকটস্থ বস্তুতে সংলগ্ন থাকিবে এইরূপ অবশ্য কোন কারণ নাই। সুতার দ্বারা বাহিরের কাঠাম প্রস্তুত হইলে গাড়ীর চাকার স্পোকের আকারে সুতা বুনিয়া জালের মধ্যস্থলে আসে এবং একই কেন্দ্র হইতে চক্রাকারে সুতা বুনিয়া মাকড়সা যখন তাহার জাল বুনা শেষ করে তখন তাহা দেখিয়া মনে হয় ইহা যেন নিখুঁতভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে।

ডারউইন উল্লেখ করিয়াছেন মাকড়সার জাল বুনা স্বয়ং গতিশীল। মাকড়সার পক্ষে ইহা কোন বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় নহে। যখনই তাহারা কোন জাল নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করে ইহাদের পায়ের দৈর্ঘ্য সুতার প্রসারতা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ফলে সুতা যখন আঁটা হয় তখন আপনা হইতেই জালের প্রকৃত আকার ধারণ করে।

এই উক্তি কতদূর সত্য তাহা লইয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ-গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। যাঁহারা মাকড়সার জাল বুনা কৌশলে মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা মাকড়সা সঠিক কিরূপ ভাবে জাল নির্ম্মাণ করে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারেন। সমস্ত ঘটনাটি সম্যক উপলব্ধি করিয়া এই অনুমান সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন।
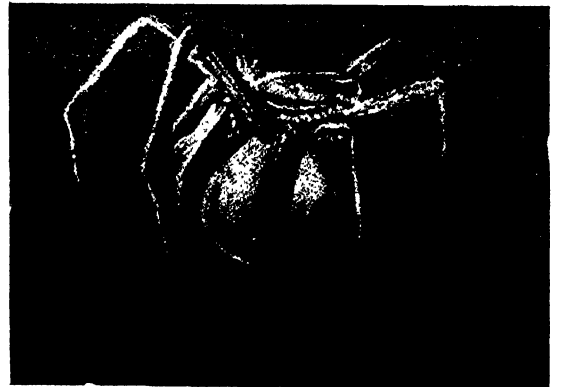
মাকড়সা ও তাহার ডিমের থলি

মাকড়সা উপযুক্ত স্থান ঠিক করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করে। প্রথমে কোন নির্ব্বাচিত স্থানের উপর হইতে

অমরনাথের পথ

শিল্পী—স্থনীলকুমার দাসগুপ্ত, কলিকাতা
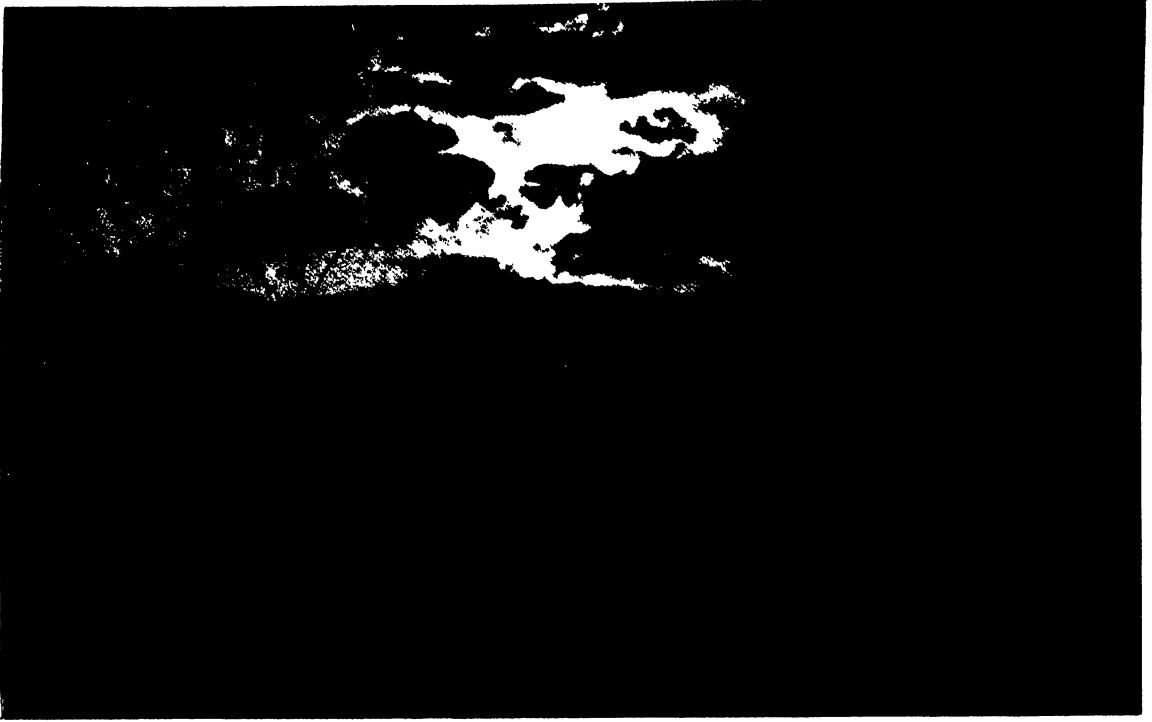
মিলন-সন্ধ্যা শিল্পী—দিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা

"হেথা দুইবেলা ভাঙ্গা-গড়া-খেলা
—অকূল সিন্ধুতীরে—"

শিল্পী—সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, মাদ্রাজ আর্ট স্কুল

নিম্নদেশে সূতা বয়ন করিতে করিতে নামিয়া আসে। তাহার পর সূতার শেষভাগ যথাসময়ে নিম্নদেশে উপযুক্ত স্থানে আটকাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় দুই প্রান্তে সংলগ্ন সূতাটিকে চক্রবালের ন্যায় দেখায়। ইহার পর মাকড়সা সূতা বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়; এবং পুনরায় উপর হইতে সূতা বুনিতে বুনিতে নিম্নভাগে নামিয়া গিয়া প্রথম প্রস্তুত সূতার বিপরীত দিকের নিম্নভাগের কোন স্থানে সূতার শেষ প্রান্ত সংলগ্ন করে। এইরূপে সূতার দ্বারা মাকড়সা প্রথমে চতুর্ভুজ আকারে একটি কাঠাম তৈয়ার করে। ইহার পর চতুর্ভুজের মধ্যভাগে গাড়ীর চাকার স্পোকের মত সূতা বুনিয়া চতুর্ভুজক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়। মধ্যস্থল হইতে প্রায় চক্রাকারে (চতুর্থ চিত্রে বর্ণিত উপায়ে) কিছুদূর সূতাবুনিয়া বাতাস গমনাগমনের জন্য খানিক অংশ ছাড়িয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া ঐরূপে সূতা বুনিতে আরম্ভ করে। এইরূপে সূতা বুনা শেষ হইলে মাকড়সা পুনরায় মোটা [আঠাল সূতা দ্বারা পূর্ব্ব নির্ম্মিত সূতার উপর পুনরবয়ন করিয়া জালটীকে শক্ত করে। মাকড়সা ইহার পর জালের কেন্দ্রস্থল হইতে কতকগুলি সূতা বয়ন করিয়া নিকটস্থ বৃক্ষের গোপনীয় স্থানে লইয়া যায়। সর্ব্বক্ষণ জালের উপর উপস্থিত না থাকিয়াও শিকারের আগমন এই সূতা সাহায্যে বুঝিতে পারে। জালটী কেহ স্পর্শ করিলে এই সূতা সাহায্যে তাহা বুঝিতে পারিয়া মাকড়সা তৎক্ষণাৎ জালের উপর উপস্থিত হয়।

(১)
মাকড়সা তাহার জালের প্রথম সূতা বয়ন করিয়াছে

কয়েক জাতীয় মাকড়সা ঘাস কিম্বা শাকশব্জীর ভিতর সুড়ঙ্গ আকারে জাল বুনিয়া যায়। আবার মাটির নীচেও সুড়ঙ্গ আকারে গৃহ নির্ম্মাণ করে। যাহাতে গর্ত্তের ভিতরে মাটি ঝরিয়া না পড়ে সেইজন্য মাকড়সা পুরু রেশমের আচ্ছাদন তৈয়ার করিয়া গর্ত্তটী আবৃত করে। অনেক সময় আবার সুড়ঙ্গের শেষ দিকে রেশমের একটি আবরণে দরজা প্রস্তুত করে। দরজাটির কেবলমাত্র ভিতর দিক হইতে খুলিবার পথ রাখায় সুড়ঙ্গ মধ্যে অন্য কাহারও অনধিকার প্রবেশ সম্ভব হয় না। এই সকল আবরণ খুব সূক্ষ্ম সূতার দ্বারা প্রস্তুত হয়; এবং কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ

(২)

(৩)
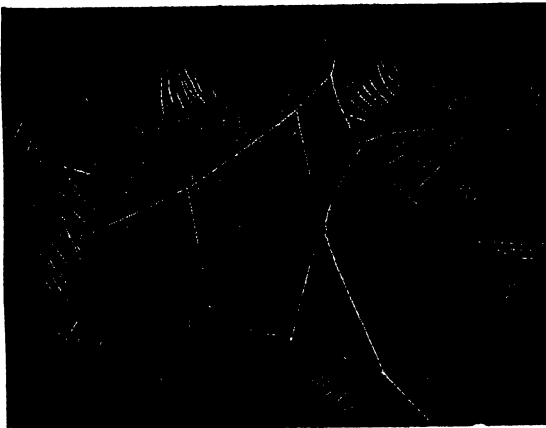
(বামদিকে) জালের কাঠামো শেষ হইলে উহাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া গাড়ীর চাকার স্পোকের আকারে সূতা বয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। (ডানদিকের চিত্রে) চতুর্ভুজের মধ্যভাগে গাড়ীর চাকার স্পোকের আকারে সূতা বুনা শেষ করিয়া মাকড়সা জালের মধ্যস্থলে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম লইতেছে

(৪) (৫)
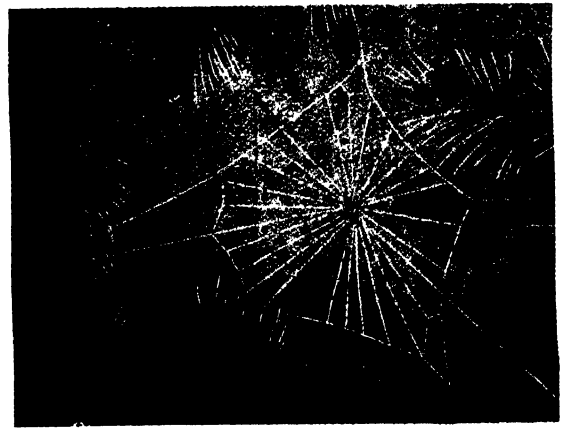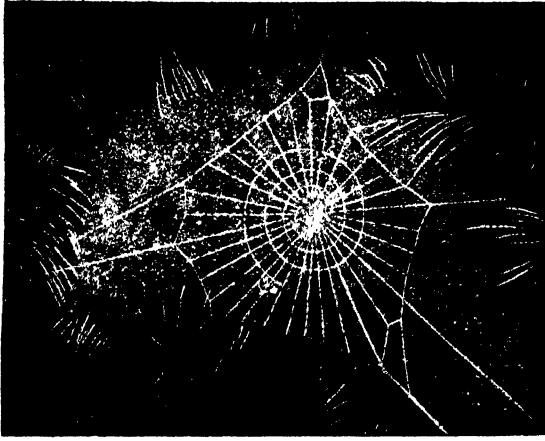
(বামদিকে) জালের মধ্যস্থল হইতে চিত্রে বর্ণিত আকারে সূতা বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে।
(দক্ষিণদিকে) মাকড়সার সম্পূর্ণ তৈয়ারী জাল

যন্ত্র সাহায্যে নিয়মিত স্থানে সূতায় ক্ষুদ্র বর্ত্তুলগুলি লক্ষিত হয়।

নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে মাকড়সা কয়েক প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। শত্রুর আক্রমণের সম্ভবনা থাকিলে শত্রুর নাগালের বাহিরে উচ্চ স্থানে জাল রচনা করে। কয়েক জাতীয় মাকড়সা জলের তলদেশে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে। যে সকল শত্রুর আক্রমণ বেশী সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে মাকড়সা ছলনা অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করে। মাকড়সার এই ছলনা অবলম্বন কৌশল লক্ষ্য করিবার বিষয়। শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা পাগুলি গুটাইয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়া থাকে। শত্রু একটু অন্যমনস্ক হইলেই সুযোগ বুঝিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

কয়েকজাতীয় মাকড়সা অপরিণত অবস্থাতেও বহু দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে সক্ষম হয়। এক জাতীয় মাকড়সা খুব উচ্চস্থান হইতে সূতা বুনিয়া শূন্যে ঝুলিতে থাকে। পরে বাতাসের সাহায্যে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া যায়। শুনা যায় এই জাতীয় মাকড়সা না কি শত শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে এইভাবে আকাশ পথে ভ্রমণ করে। উচ্চস্থানের বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য একবার আমেরিকায় এ্যারোপ্লেন সাহায্যে ২৫০০ ফিট উচ্চে আরোহণ করা হইয়াছিল। এ্যারোপ্লেনটি মাটিতে অবতরণ করিলে দেখা যায় ছাকনির ঝিল্লিতে জালসহ বহু মাকড়সা রহিয়াছে। এইরূপ ঘটনার খবর বহুবার পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা বহুবার দেখা গিয়াছে যে, রঞ্জিত মাকড়সার জাল শূন্য হইতে নিক্ষেপ করায় বেশীর ভাগ সময়ে জালটী শতমাইল দূরবর্ত্তী স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।
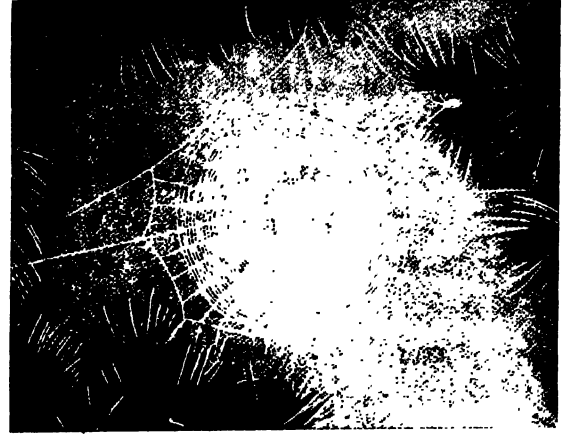
প্রায় সকল জাতীয় মাকড়সাই গৃহ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু জলবাসী মাকড়সার বাসগৃহ নির্ম্মাণ কৌশল অতুলনীয়। জলবাসী মাকড়সা জলের তলদেশে বেশীর ভাগ সময়েই অতিবাহিত করে। এই জাতীয় মাকড়সার গাত্র লম্বা লম্বা লোমে আবৃত। এই লম্বা লোমগুলি বাতাসের বুদ্বুদ ধারণ করিতে পারে এবং জলের তলদেশে অবস্থানকালে মাকড়সাকে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে সাহায্য করে। জলবাসী জাতীয় মাকড়সার মধ্যে জলদস্যু মাকড়সার

জলের তলদেশে দুইটি জলবাসী স্ত্রী মাকড়সার যুদ্ধ

(Pirate spider) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের শরীর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমে আবৃত থাকায় শরীরের ভিতর জল প্রবেশ করিতে পারে না। জলদস্যু মাকড়সা জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারে, ডুবিয়া যায় না। বিপদের সঙ্কেত বুঝিতে পারিলেই ইহারা জলের তলদেশে ডুবিয়া যায় ; এবং বিপদ না যাওয়া পর্য্যন্ত জলীয় উদ্ভিদের মধ্যে আত্মগোপন করে। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বায়ু এইরূপ সুব্যবস্থায় থাকে যে, জলের নীচে প্রয়োজনীয় সময়ে লং বুক (বইয়ের আকারে ইহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের যন্ত্র) লোমে সামান্য আঘাত দ্বারা অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে পারে। ভেলা-তৈয়ারকারী জলবাসী মাকড়সা (Raft spider) কতকগুলি ছোট পাতা রেশমী সূতা দ্বারা বাঁধিয়া একটি ছোট ভেলা প্রস্তুত করিয়া লয়। এই ভেলার উপর চড়িয়া জলের চারিধারে পরিভ্রমণ করে এবং শীকারের খোঁজ পাইলেই জলের উপর লাফাইয়া শীকার নিজ আয়ত্তের মধ্যে লইয়া আসে। প্রকৃত জলবাসী মাকড়সা বলিতে Silver spindle জাতীয় মাকড়সাই বুঝায়। এই জাতীয় মাকড়সার দৈহিক গঠন টেকোর (spindle) ন্যায় দেখিতে। জলে ডুব দিবার সময়ে ইহাদের গাত্রস্থ লোমের বায়ু বুদ্‌বুদ শরীরে রৌপ্য বর্ণচ্ছটার

জলবাসী মাকড়সা পশ্চাৎভাগের পা সাহায্যে বৃহৎ জন্য বুদ্‌বুদ আনিতেছে

সৃষ্টি করে। জলবাসী মাকড়সা জলের তলদেশে রেশমী গুটী প্রস্তুত করে এবং বাসগৃহ বায়ুপূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। কিরূপ কৌশলে ইহারা তাহাদের বাসগৃহ বায়ুপূর্ণ করে তাহা দেখিয়া তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

জলবাসী মাকড়সার গৃহের ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে বায়ু বুদ্‌বুদ।
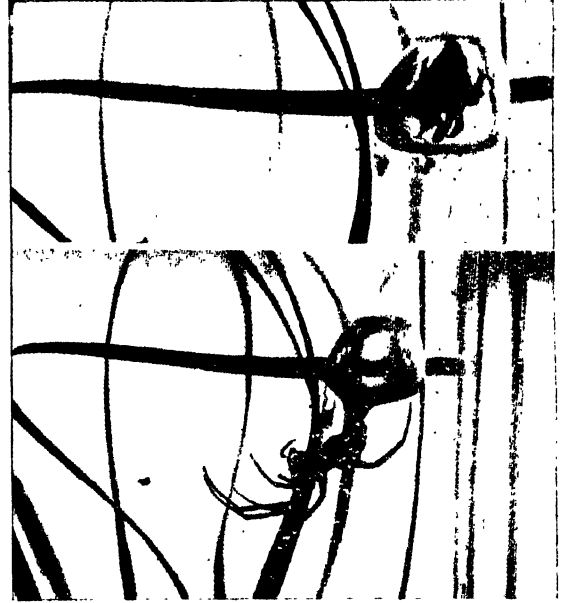
উপরিভাগের চিত্রে জলবাসী মাকড়সার বাসগৃহ। সূক্ষ্ম রেশম দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করায় গৃহ মধ্যস্থ মাকড়সাকে চিত্রে দেখা যাইতেছে। (নিম্ন চিত্রে) মাকড়সা বাসগৃহ হইতে বাহির হইতেছে

বাসা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে জলের কিছু তলদেশে জলীয় উদ্ভিদের সহিত মাকড়সা কতকগুলি সূতা বাঁধিয়া লয়। এই সূতাগুলিকে নোঙ্গরের কাছি (Mooring lines) বলা চলে। মাকড়সা সেই সূতাগুলির সাহায্যে সাঁতার কাটিয়া জলের উপরিভাগে বায়ু আনিবার জন্য উপস্থিত হয় এবং লোমপূর্ণ পায়ের সাহায্যে দেহের জল দূর করিয়া শীঘ্রই দেহ শুষ্ক করিয়া লয়। এইরূপ অবস্থায় দেহের লম্বা লোম সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে বায়ু বুদ্‌বুদ সংগ্রহ করিয়া বুদ্‌বুদ ফাটিয়া যাইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ জলে ডুবিয়া যায়। মাকড়সাকে বায়ুর উপরিভাগে ঠেলিয়া তুলিতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাকড়সা নোঙ্গর কাছি অবলম্বনে জলের তলদেশে গমন করিতে সক্ষম হয়।

নির্ব্বাচিত জলীয় উদ্ভিদের নিকট পৌঁছিয়া মাকড়সা অদ্ভুত কৌশলে বায়ু বুদ্‌বুদগুলিকে ঠিকমত যথাস্থানে রেশমী

সূতার মধ্যে বাঁধিয়া ফেলে। বুদ্বুদ আকারে বড় হইলে মাকড়সা পশ্চাৎভাগের পা সাহায্যে উহাকে জলের তলদেশে আনিয়া থাকে। এইরূপে প্রচুর বায়ু সংগ্রহ হইলে মাকড়সা ঠিকমত গৃহ নির্ম্মাণে মন দেয়। সূক্ষ্ম সূতার দ্বারা বায়ু বুদ্বুদগুলিকে চারিধারে অতি কৌশলে নিপুণতার সহিত বুনিয়া উদ্ভিদের উপর একটি ছোট তাঁবু তৈয়ার করিয়া ফেলে। তাঁবুটীকে জলে উজ্জ্বল ঘণ্টার ন্যায় দেখায়।

কয়েক জাতীয় মাকড়সা জাল বুনিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ উৎসাহিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ শিকারী মাকড়সা (Hunting spider), লম্ফদানপটু মাকড়সা (Jumping spider) ও উল্ফ মাকড়সার নাম করা যায়। অনেকের অনুমান ইহাদের পায়ের গঠনপ্রণালী অন্য জাতীয় মাকড়সার পা হইতে কিছু ভিন্নরূপ হওয়ায় ইহারা জাল বুনিতে পারে না। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নহে। বাগানবাসী মাকড়সার (Garden spider) ন্যায় ইহাদের পায়ে চিরুণীর দাঁড়ার মত নখ নাই। পাগুলি লোমদ্বারা আবৃত। তবে লম্ফদানপটু মাকড়সা একেবারে গৃহহীন নহে। এই জাতীয় মাকড়সা জাল বুনিয়া তাহাদের ডিমের থলিটিকে লুক্কায়িত রাখে। শিকারী মাকড়সা কিন্তু ডিমগুলিকে রক্ষার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। এই জাতীয় স্ত্রী মাকড়সা ডিমের থলিটী পায়ের সাহায্যে শরীরের নিম্নদেশে রাখিয়া সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে সময়ে সময়ে ডিমের থলিটী তাহাদের অধিকারচ্যুত হয়। এইরূপ অবস্থায় স্ত্রী মাকড়সার মধ্যে দুঃখজনিত সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়। কিন্তু অপরের ডিমের থলি তাহাকে দেওয়া হইলে সে সন্তুষ্ট চিত্তে অদৃশ্য হইয়া যায়। অপরের ডিম হইলেও স্ত্রী মাকড়সা নিজের ডিমের মতই ইহার উপর যত্ন লয়। লম্ফদানপটু মাকড়সার (Jumping spider) শিকার ধরিবার কৌশল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের দেহে সাদা ও বাদামী রংয়ের ডোরা পর্য্যায়ক্রমে অঙ্কিত। ইহার জন্য ইহাকে জেব্রা মাকড়সা নামেও অভিহিত করা হয়। লম্বায় ইহারা ⅛ ইঞ্চি। মার্চ্চের প্রথম হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত মশা মাছির সচরাচর যেখানে অবস্থান সেখানে ইহাদের আবির্ভাব হয়। এই জাতীয় মাকড়সার আটটি চক্ষু তিনটি সারিতে অবস্থিত। চক্ষুগুলি চওড়া কপালের উপর সজ্জিত এবং মনে হয় অন্যান্য জাতীয় মাকড়সা অপেক্ষা ইহাদের চক্ষু শক্তিশালী। কারণ ইহারা এক ফুট দূরের ছায়া কিম্বা আলো দেখিতে সক্ষম হয়। লম্ফদানপটু মাকড়সা একই সময়ে প্রতি তিন ইঞ্চি মাপে প্রায় ১২ বার লম্ফদান করিতে পারে। লম্ফদানপটু মাকড়সার আর এক জাতীয় বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহে বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সমাবেশ দেখা যায়। এই জাতীয় মাকড়সার পশ্চাৎভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ এবং দেহের কৃষ্ণবর্ণ লোমের কয়েক স্থানে সবুজ ও সুবর্ণ বর্ণের লোম ইহাদের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করে।

পৃথিবীতে প্রায় ২০,০০০ হাজার শ্রেণীর মাকড়সা

কাঁকড়া মাকড়সা শিকারের জন্য ফুলের পশ্চাৎভাগে অপেক্ষা করিতেছে

পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের গর্ত্তবাসী মাকড়সা প্রায় আট বৎসরকাল জীবিত থাকে।

মাকড়সা জাতীর মধ্যে ইহারাই দীর্ঘজীবী বলিয়া পরিচিত। কাঁকড়া জাতীয় মাকড়সাও লম্ফ দিয়া তাহাদের শিকার

কাঁকড়া মাকড়সা ও তাহার শিকার

ধরিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের বর্ণ হলুদে এবং উপরিভাগ নানা বর্ণে চিত্রিত। কাঁকড়া মাকড়সা ফুলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং মৌমাছি কিম্বা প্রজাপতি মধু সংগ্রহে ফুলের উপর বসিলেই লাফাইয়া শিকারকে ধরিয়া ফেলে। Misumena Vatia নামে পরিচিত মাকড়সা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় মাকড়সাকে বহুরূপী বলা যাইতে পারে। ইহারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী গায়ের রং নানা বর্ণে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। যে কোন রংয়ের ফুলের উপর বসিয়া প্রায় তিনদিনের মধ্যে সেই ফুলের রংয়ের ন্যায় নিজের শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। ইহাদের আক্রমণ করিলে কাঁকড়ার ন্যায় চারিদিকে পাশ দিয়া হাঁটিয়া যায়। আলোর ন্যায় সুন্দর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এক জাতীয় মাকড়সা 'আলো তৈয়ারকারী' মাকড়সা নামে পরিচিত হইয়াছে।

মাকড়সার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্ত্রী ও পুরুষ মাকড়সার মিলনকাল (Mating Season). সকল জাতীয় পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সা অপেক্ষা দৈহিক গঠনে খর্ব্ব। মিলনকালে পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সার বাসস্থান এবং সঙ্কেত পাঠাইবার সূতার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। পরে বাসস্থান ও সঙ্কেত পাঠাইবার সূতা খুঁজিয়া পাইলে বাসস্থানের কিছু দূরে পুরুষ মাকড়সা অপেক্ষা করে; এবং স্ত্রী মাকড়সা রচিত যে রেশম সূতাগুলি তাহার রচিত জালের মধ্যস্থলে সংলগ্ন থাকিয়া সঙ্কেত পাঠাইবার কার্য্য করে সে সূতাগুলিকে সম্মুখ ভাগের পা দ্বারা টানিয়া স্ত্রী মাকড়সাকে নিজের আগমনের সঙ্কেত পাঠায়। এই আগমন সঙ্কেত পাঠাইবার কারণ স্ত্রী মাকড়সার নিকট সুপরিচিত। স্ত্রী মাকড়সা সঙ্কেত পাইয়া সূতার উপর দিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া আসে। পুরুষ মাকড়সা পূর্ব্ব হইতেই তাহার লম্বা পায়ের দ্বারা সঙ্কেত সূতা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারে স্ত্রী মাকড়সার নিকট হইতে সে কিরূপ ব্যবহার পাইবে। সেই অনুযায়ী তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে হয়।

বিপদসঙ্কুল মিলনে ব্যাপৃত হইতে হয় বলিয়াই পুরুষ মাকড়সার এইরূপ সঙ্কোচের কারণ। তাহার দিক হইতে কোনরূপ ত্রুটী থাকায় যে কেবল স্ত্রী মাকড়সার ভালবাসা হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয় এমন নহে, বেশীর ভাগ

আলো তৈয়ারকারী মাকড়সার গৃহ

সময়েই স্ত্রী মাকড়সার হস্তে তাহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। পুরুষ মাকড়সা মিলনের পূর্ব্বে স্ত্রী মাকড়সাকে সন্তুষ্ট করিতে

না পারিলে স্ত্রী মাকড়সা তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে। মাকড়সার জীবন-ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

এইরূপ বিপদ জানিয়াও পুরুষ মাকড়সা কামচরিতার্থের নিমিত্ত স্ত্রী মাকড়সার জন্য অপেক্ষা করে। ভীতিপ্রদর্শনের নিমিত্ত নানারূপ অঙ্গভঙ্গি, লজ্জাশীলতার ভাব দেখাইবার পর স্ত্রী মাকড়সা উভয়ের মিলন ঘটাইবার অনুমতি দেয়।

কিন্তু মিলনের শেষেও পুরুষ মাকড়সার জীবন নিরাপদ থাকে না। স্ত্রী মাকড়সার সঙ্গ শীঘ্র ত্যাগ করিতে না পারিলে ইহারা পুনরায় তাঁহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে পুরুষ মাকড়সার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মিলনের পূর্ব্বে মক্ষিকা শিকার করিয়া লইয়া যায়। স্ত্রী মাকড়সা রাগান্বিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে পুরুষ মাকড়সা শিকারটী তাহাকে উপহার দেয়; এবং স্ত্রী মাকড়সা যখন তাহা ভক্ষণে ব্যস্ত থাকে সে সময় সুযোগ বুঝিয়া পুরুষ মাকড়সা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। এই জাতীয় স্ত্রী মাকড়সারা সুতার বন্ধনে পুরুষ মাকড়সাকে বন্দী করিয়া জীবন্ত অবস্থায় নিজ বাসস্থানের নিকট ঝুলাইয়া রাখে।

প্রকৃতির এই কুহেলীকাপূর্ণ জগতে কত আশ্চর্য্য ঘটনাই না সংঘটিত হইতেছে আর মানুষ তাহার অদম্য অধ্যবসায় সহকারে প্রকৃতির উন্মোচন খুলিয়া ফেলিয়া তাহার ইতিহাসের কথা লিখিয়া যাইতেছে।

নিশিকান্ত করকমলে

সৌম্য

হে তরুণ!
মানুষেরে জানিবার মাঝে কিছু নাই,
তুচ্ছ সে সঞ্চয়।
মানুষেরে জানিবার মাঝে
রয়েছে মনের পরিচয়—অম্লান আনন্দঘন।
বৃথা শ্রম তারে দেখিবার
তারো চেয়ে বড় সত্য—প্রাণ ভ'রে
ভালোবাসিবার অধিকার পাওয়া।
কে মোরে দিবে সে-অধিকার—
স্মরণের তীক্ষ্ণসূত্রে সমন্বিত মণির ঝঙ্কার?
তাই দেবে তাই দেবে হে অচেনা কবিবন্ধু মোর
তোমারে আমার সাথে বেঁধে দেবে অভিন্ন সে-ডোর
বিশ্বপরিচয়হীন।
বাহিরের পরিচয়মাঝে
অবহিত উচ্ছ্বাসের নিষ্প্রাণ ছন্দই শুধু বাজে
নয়নের কল্পিত স্পর্ধায়।
অন্তরের প্রশান্ত সন্ধ্যায়
জাগে এই মরমের মুক্তিগন্ধে বিকশিত রজনীগন্ধায়
সলজ্জ সরমরাগে
সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার পানে তাকাবার সাধ।
বলো বন্ধু, সেথা তারে না-জানার ক্ষুদ্র পরমাদ
থাকে কি সুদৃঢ় হ'য়ে?
তোমারে জানার আগে তাই
তোমারে মানার পালা সমাপ্ত হয়েছে · জেগে নাই
তোমার আমার মাঝে ব্যবধানে লুপ্তির নির্দেশ।
তব মধুচক্র তরে মর্ম মোর হ'ল নিরুদ্দেশ।

সৌম্যেন্দ্র করকমলে

নিশিকান্ত

হে কিশোর!
সঙ্গোপন উৎস হ'তে তোমার ছন্দের গতি প্রবাহিত,
অন্তরের কেন্দ্রাসীন অন্তরতমের আত্মসমাহিত
মগ্নতায় অবিচ্ছিন্ন তোমার চেতনা।
তাই তব বিকাশের পুলকবেদনা
বিমৌন রহস্যলীন গভীরের মর্মবিমন্থিত

আনন্দতরঙ্গময় ধ্বনির সংঘাতে
ওঠে উচ্ছলিয়া
অনাহত রাগিণীর সঙ্গীতলীলাতে
তোলে ঝলকিয়া
চিরন্তন অমলতা, স্বচ্ছ সুররাশি।
আত্মার অম্বর হ'তে উঠিল উদ্ভাসি'
তোমার প্রকাশচন্দ্র, হে সৌম্যেন্দ্র! দাও নির্ঝরিয়া
মাধুরীমদির তব: জ্যোতির আসব:
সোমরসধারা।
জীবনের মৃন্ময়তা আলোক-উৎসব
লভি' আত্মহারা
হোক সেই দীপ্তরসে, জীবন তোমার
প্রতি পলে হোক অবিশ্রান্ত—অনিবার
বিকাশের প্রেরণায়। ধরণীর যে-কালের কারা

মৃত্যুর প্রাচীর রচি' রুধিয়া দাঁড়ায় মর্ম-অমরতা,
বিচূর্ণ করুক তারে তব অভীপ্সায় দৃপ্ত দুর্দমতা,
অবহিত প্রগতির অভিলাষ তব
বিলাক মর্ত্যের পথে নিত্য নব নব
উপলব্ধ বৈভবের অনশ্বর প্রোজ্জ্বল বারতা।

অনশন ত্যাগ—

আলিপুর ও দমদম জেলের যে ৮৯ জন রাজনৈতিক বন্দী বিনাসর্ত্তে এবং অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানাইয়া গত ৭ই জুলাই তারিখে অনশন অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় গত ৩রা আগষ্ট সন্ধ্যায় তাহার অবসান হইয়াছে। এই সংবাদে শুধু বাঙ্গলা নয়, সমগ্র ভারত আশ্বস্ত হইবে।

পূর্ণ চারি সপ্তাহকাল অনশন চলিয়াছিল। দুই জন বন্দীর অবস্থা এমনই সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। অন্যান্য সকলের শক্তিও অতি দ্রুত কমিয়া আসিতেছিল। তাঁহাদের জীবনের কথা ভাবিয়া দেশের লোকের উদ্বেগের আর অন্ত ছিল না। বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল পুরাতন আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টি দিয়া দেখিতে এবং আমলাতান্ত্রিক বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে অভ্যস্ত। এই সর্ব্বত্যাগী অপরাধীদের তাঁহারা সাধারণ অপরাধী ছাড়া আর কিছু বলিয়া ভাবিতে পারেন না। কিন্তু দেশবাসী ইঁহাদিগকে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও সস্নেহ দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন।

চারি সপ্তাহ অনশনের দ্বারা যে দৃঢ়তা ইঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং গান্ধীজির প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই অনুরোধ করিয়াও রাজনৈতিক বন্দীগণকে অনশন ত্যাগ করাইতে পারেন নাই। তাঁহারা দৃঢ় পণ করিয়াছিলেন যে, হয় তাঁহাদের প্রত্যেকের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনাসর্ত্তে মুক্তির আশ্বাস দিতে হইবে, নয় তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত অনশন চালাইবেন।

মহাত্মা ও পণ্ডিতজি—

রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ও মুক্তিসমস্যা লইয়া ভারতের ছোট-বড় সকল নেতাই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি এবং পণ্ডিত জওহরলালের উক্তির আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বাঙ্গলার রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য গান্ধীজি অনেক সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। বস্তুত বাঙ্গলার যে বহু সহস্র রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার চেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছে। এবারেও অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তিনি নিজে আসিতে না পারিলেও শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বন্দীদের অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া বাণী পাঠাইয়াছিলেন। বাঙ্গলার বন্দী মুক্তি সমস্যাকে সর্ব্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত করিয়া প্রত্যেক কংগ্রেসী প্রদেশে মন্ত্রী-সঙ্কট উপস্থিত করা হইবে কি-না, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মতামত তিনি প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটি যদি এ বিষয়ে মন্ত্রী-সঙ্কট সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব গ্রহণও করেন, তথাপি অবিলম্বে বন্দী-মুক্তি হইবে না। সত্যাগ্রহের ফলাফলও সময়-সাপেক্ষ। গান্ধীজির এই উক্তিতে বাঙ্গালী সন্তুষ্ট হয় নাই। তিনি যদি বাঙ্গালাকে এ অবস্থায় কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতি গ্রহণের উপদেশ দিতেন, বাঙ্গালা তথা ভারত তাহা সানন্দে গ্রহণ করিত এবং তাহাই গান্ধীজির উপযুক্ত কার্য্য মনে করিত। গান্ধীজির বর্ত্তমান উক্তি পাঠ করিলে মনে হয়—পূর্ব্বের গান্ধীজি আর এই গান্ধীজি এক ব্যক্তি নহেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে উক্তি করিয়াছেন তাহা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। বাঙ্গলাতে কংগ্রেসী-মন্ত্রিত্ব যে সম্ভব হয় নাই তাহার জন্য ম্যাকডোনাল্ডের বাঁটোয়ারা যেমন দায়ী, পুণা চুক্তিও ততখানি না হইলেও অনেকখানি দায়ী। কিন্তু সে কথা যাক। বাঙ্গলাতে কংগ্রেসী-মন্ত্রিত্ব সম্ভব হয় নাই বলিয়াই অন্য প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের জন্য ব্যাকুলতার যে কদর্য্য ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব

মিথ্যা। বন্দী-মুক্তি সম্বন্ধে মন্ত্রী-সঙ্কট সৃষ্টি করিবার যে দাবী বাঙ্গলা হইতে উঠিয়াছিল তাহা শেষ পন্থা হিসাবেই উঠিয়াছিল। নহিলে পন্থজিকে মন্ত্রীর মসনদ ত্যাগ করাইয়া বাঙ্গলার কোন লাভ হইত না। বাঙ্গলার সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের যে ভাবে সমর্থন করিয়া থাকে, তাহা দেখিলেই তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিতেন।

মন্ত্রী-সঙ্কটের দ্বারা ঈপ্সিত ফল লাভ সম্ভব হইত কি-না সে স্বতন্ত্র কথা। তর্কের খাতিরে যদি পণ্ডিতজির যুক্তি মানিয়াই লওয়া যায় যে, ফল হইত না, তথাপি যে সময়ে বাঙ্গলার ৮৯জন বন্দী জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া, সেই সময়ে কি তাহা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিবার অনুকূল সময়! ভগবানের ইচ্ছায়, সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় অনশনের অবসান হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার অসময়োচিত উক্তির দ্বারা বন্দী-মুক্তির কতখানি ক্ষতি করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কৃষির আয়কর বিল—

গত ৪ঠা আগষ্ট আসামের উভয় আইন সভার যুক্ত বৈঠকে (৬৫-৫৬) অধিক ভোটে কৃষি আয়কর বিল পাশ হইয়াছে। এই ব্যাপারে সমগ্র আসামে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

এই আয়কর সাধারণ কৃষককে স্পর্শ করিবে না। যাহাদের কৃষি আয় ৩০০০৲ টাকার অধিক কেবল তাহাদেরই উপর এই আয়কর বসিবে। ইহার প্রধান আঘাতটা চা-বাগানের মালিকদের উপরই পড়িবে। সেই কারণে তাঁহাদের মধ্যেই বিক্ষোভ বেশী হইয়াছে। চা-বাগানের মালিকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করেন। যেখানে সাধারণ কৃষকেরা বিঘা প্রতি গড়ে বারো আনা হারে কর দিয়া থাকে, সেখানে চা-বাগানে খাজনার হার মাত্র ছয় আনা। ইহারও উপর শোনা যাইতেছে, কোন কোন চা-বাগানের মালিক যত জমি বন্দোবস্ত লইয়াছেন, ভোগ করেন তাহার চেয়ে বেশী জমি।

নূতন একটা কর স্থাপনের কারণ বিবৃত করিয়া জানানো হইয়াছে যে, রাজস্বের ঘাট্‌তি পূরণের জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল কৃষকের খাজনা শতকরা ৫০৲ টাকা মকুব করিয়াছেন, বন্যায় সাহায্য করিয়াছেন এবং শীঘ্রই আফিম বর্জ্জনে হাত দিতে চলিয়াছেন। নূতন ব্যবস্থার কল্যাণে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ২০ লক্ষ টাকা আয়বৃদ্ধি হইবে।

সকলের চেয়ে পরিতাপের বিষয়, এই কৃষি আয়কর বিলকে উপলক্ষ করিয়া আসামে মন্ত্রীমণ্ডল ধ্বংসের একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ইউরোপীয় দল। অন্যান্য দলের এই বিলের বিরুদ্ধে বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু মন্ত্রিত্বের লোভে তাঁহারা ইউরোপীয় পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিলেন। কিছু কিছু দল ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়াছিল এবং যাহাতে কোরাম না হয় সে চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

সিংহলে ভারতীয় বিতাড়ন—

সিংহলে ভারতীয় বিতাড়ন সম্বন্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ভারতে গভীর বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পন্থা গ্রহণের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিগত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই স্থির হয় যে, কোন প্রকার সংঘর্ষমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে আপোষ-মীমাংসার জন্য একটা শেষ চেষ্টা করা হইবে। সেজন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে কংগ্রেসের দূতরূপে সিংহল পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়।

পণ্ডিতজি সিংহল গিয়া মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকারও এই সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সিংহলের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করিতে দৃঢ়ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই সময় শোনা গেল, সিংহল গবর্ণমেণ্ট নীতি হিসাবে ভারতীয় বিতাড়নের সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলেও এই ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন যে, যে কয়েক সহস্র ভারতীয় শ্রমিক স্বেচ্ছায় সিংহল ত্যাগের জন্য আবেদন করিয়াছে তাহারা ছাড়া আর কাহাকেও বিতাড়িত করা হইবে না। বিতাড়ন আইন পাশ হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে না।

এখন শোনা যাইতেছে, এ সমস্ত ভূয়া কথা। সিংহল ভারতের মৈত্রী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। পণ্ডিতজির দৌত্য

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। সিংহল গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বিতাড়নে দৃঢ়সঙ্কল্প। মাদ্রাজের শ্রমমন্ত্রী জানাইয়াছেন, প্রত্যহই সিংহল হইতে বহুসংখ্যক ভারতীয় দিনমজুর মাদ্রাজ আসিতেছে। ভারত সরকারের পরামর্শ অনুসারে মাদ্রাজ সরকার স্থির করিয়াছেন, কোন অনিপুণ শ্রমিককে (unskilled labour) মাদ্রাজ বন্দর হইতে সিংহলের জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে না।

ইহা ভারতীয় শ্রমিককে অপমানের হাত হইতে রক্ষা করিবার একটা উপায় হইতে পারে, কিন্তু সিংহলের ভারতীয় শ্রমিক সমস্যা সমাধানের পন্থা নয়। তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। ত্রিবন্দ্রমে সিংহলের শুষ্ক নারিকেল-শস্য বর্জ্জনের একটা আন্দোলন ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আশা করি, কংগ্রেস এ সম্বন্ধে এবার জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জনের অনুরূপ একটা ব্যাপক এবং কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিবেন।

বোম্বায়ে মদ্যবর্জ্জন—

গত ১লা আগষ্ট হইতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মদ্য-বর্জ্জন নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্য বিশেষ পুলিশ ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে। ৩১শে জুলাই তারিখের শেষ মদ্যপান রাত্রির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে একটি "করুণ প্রহসন" বলা চলিতে পারে। ইউরোপীয়দের, সৈন্যদের এবং যে সকল ব্যক্তির পক্ষে মদ্য ত্যাগ অসম্ভব, মদ্য ত্যাগ করিলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে, তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের প্রতিপক্ষ জুটিয়াছে দুইটি সম্প্রদায়—পার্শী ও মুসলমান। পার্শীগণ বোম্বায়ের সব চেয়ে ধনীসম্প্রদায়। সেখানে মদের ব্যবসায় তাহাদের একচেটিয়া বলিলেও হয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহাদের আর্থিক ক্ষতি হইবে বলিয়াই তাহারা উত্তেজিত হইয়াছে। সংসারে দুর্নীতির প্রশ্রয়কারী ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অনেকে জীবন ধারণ করে। জীবিকানির্ব্বাহের উপায় বলিয়া তাহার সাত খুন মাপ হইতে পারে না। পার্শীসম্প্রদায়ের ক্রোধ অহেতুক। জীবিকা-নির্ব্বাহের সাধুবৃত্তির অভাব নাই। তাহাদের টাকা আছে। স্বচ্ছন্দে সেইরূপ কোন ব্যবসায়ে তাহারা আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রোধও সম্পূর্ণ অহেতুক। ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন মুসলমান মদ্যপান করিলেও সম্প্রদায় হিসাবে তাহারা পানদোষ হইতে মুক্ত। এ বিষয়ে মুসলমান-শাস্ত্রের কঠোর নিষেধ আছে। সেই নিষেধ হজরত মহম্মদ কেবল তাঁহার মতানুবর্ত্তী বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের জন্যই করেন নাই, আপামর সাধারণের জন্যই করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া মদ্যপান নিবারণের কোন ব্যবস্থা মুসলমান সাধারণের সমর্থনীয়। কিন্তু রাজনীতি আজ ধর্ম্মনীতি এবং ধর্ম্মবোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যেহেতু এ ব্যবস্থা কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, সুতরাং পয়গম্বরের ঈপ্সিত কার্য্যকেও বাধা দিতে হইবে। সেজন্য একটা যুক্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা এই যে, মদ্যপান নিবারণের জন্য রাজস্বে যে ঘাটতি পড়িবে তাহা সম্পত্তির উপর নূতন একটা কর বসাইয়া পূরণ করা হইবে। একদল মুসলমান আপত্তি করিয়াছেন, তাঁহারা যখন মদ্যপান করেন না, তখন সম্পত্তি-করের বোঝা বহিতে নারাজ।

শুধু ধর্ম্মনীতি কেন, সাধারণ যুক্তির দিক দিয়াও ইহা অচল। একটা প্রদেশের কোন একটা অংশে দুর্ভিক্ষ অথবা বন্যা হইলে রাজকোষ হইতে অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সেই ঘাটতি পূরণের জন্য যদি একটা বিশেষ করের আবশ্যক হয়, অন্য অংশের লোকেরা কি আপত্তি জানাইয়া বলিতে পারে যে, আমাদের অংশে যখন দুর্ভিক্ষ হয় নাই, তখন আমরা এই নূতন কর দিব কেন? বলাবাহুল্য সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির প্ররোচনাতেই একদল মুসলমান এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করিতেছেন। সুখের বিষয়, সে বিরোধিতা ইহার মধ্যে অনেক কমিয়া আসিতেছে।

মিঃ জিন্নার আশঙ্কা—

মিঃ জিন্নার আশঙ্কা হইয়াছে, কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। আশঙ্কা হইবার কথা বটে। চিরকাল কংগ্রেসের অসহযোগ নীতিকেই তিনি তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। এখন যদি কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে সহযোগিতা করে, তাঁহার ব্যবসা একেবারেই মাটি হইয়া যাইবে। তাই তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন, কাজটা ভাল হইবে না। কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আলোচনা করিও না। আর দেশীয়

রাজন্যগণকে জানাইয়াছেন, শক্ত থাকিও। কিছুতেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিও না। আমরা জানি না, যে ভারত গবর্ণমেণ্ট এতকাল জিন্না সাহেবকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার অস্ত্ররূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া আসিলেন, শেষ বয়সে তাঁহারা জিন্না সাহেবের প্রাণে দাগা দিবেন কি-না।

লর্ড সিংহের দাবী—

পরলোকগত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পুত্র লর্ড অরুণ সিংহ গত ১৩ বৎসর হইতে পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় তাঁহার ন্যায়সঙ্গত আসনের জন্য দাবী জানাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার লর্ড উপাধি গ্রহণে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু লর্ড সভায় আসন দিতে আপত্তি উঠিয়াছিল। এতদিন পরে লর্ড সভার প্রিভিলেজ কমিটি তাঁহার দাবী সমর্থন করিয়া তাঁহাকে লর্ড সভায় আসন গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন।

কর্ম্মচ্যুতদের পুনর্নিয়োগ—

রাজনৈতিক কারণে যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছিলেন, অথবা যাঁহারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছিলেন বিহার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পুনর্নিযুক্ত করিতেছেন। যাঁহাদের নূতন করিয়া কাজ করিবার বয়স নাই, তাঁহাদের পূর্ব্বতন কর্ম্মকালের হিসাবে কাহারও জন্য পেন্সন, কাহারও জন্য গ্র্যাচুয়িটির বন্দোবস্ত হইয়াছে। গ্র্যাচুয়িটির টাকা তাঁহারা এককালীন পাইবেন। ইহার দ্বারা শুধু যে পূর্ব্বতন সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি সুবিচার করা হইল তাহাই নয়, কংগ্রেসের জয় ঘোষণাও করা হইয়াছে।

পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা হইবে, কি যথা নিয়মে নূতন নির্ব্বাচন হইবে ভারত সরকার সে সম্বন্ধে কিছুদিন হইতেই বিবেচনা করিতেছিলেন। যদি যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে অনর্থক নূতন নির্ব্বাচন করিয়া লাভ নাই। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পরিষদের নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল অন্তে নূতন নির্ব্বাচনই বিধেয়। সম্প্রতি বড়লাট ঘোষণা করিয়াছেন, ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বৎসরের জন্য পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা হইল। ইহাতে বোঝা যাইতেছে, আগামী বৎসরের শেষের দিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের আশা করেন। সমস্ত ভারতের বিরোধিতা সত্ত্বেও এইরূপ আশা করিবার হেতু কি আমরা জানি না। হয় তাঁহারা ভারতের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া গায়ের জোরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করিবেন, অথবা তাঁহারা বিশ্বাস করেন আগামী বৎসরের মধ্যে বিরোধিতার ভিত্তি শিথিল হইবে। আসলে ব্যাপারটা কি হইবে, তাহা কালক্রমে জানা যাইবে। কিন্তু আপাততঃ দেখা যাইতেছে, এক মিঃ জিন্নার অন্তঃকরণ ছাড়া আর কোথাও বড়লাটের ঘোষণায় বিন্দুমাত্রও তরঙ্গ ওঠে নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ—

গত ১লা আগষ্ট হইতে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের নূতন এসিয়াটিক বিলের প্রতিবাদে প্রবাসী ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ ঘোষণার কথা ছিল। এ বিষয়ে তাঁহারা গান্ধীজির আশীর্ব্বাদও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনের দুই দিন আগে গান্ধীজি অকস্মাৎ সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি আশা করেন, সত্যাগ্রহের আর আবশ্যক হইবে না। ভারত ও বৃটিশ সরকারের সহিত ইউনিয়ন সরকারের যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাইতে পারে। পাওয়া গেলে তাহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সময়ে আকস্মিকভাবে স্থগিত রাখিবার নির্দ্দেশ সত্যাগ্রহের পক্ষে যে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি—

১৯৩৯ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রথম সাধারণ সভায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয় এবং নূতন কার্য্যকরী সমিতি ও কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনের অধিকার তাঁহাকে প্রদান করা হয়। তদনুসারে সেই সময় তিনি কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিলে শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় খাদি-দলের সহযোগে তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—ঐ সমিতি গঠনের সময় সুভাষচন্দ্র তাঁহাদের

সহিত পরামর্শ করেন নাই, কাজেই উহা পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছে। কার্য্যকরী সমিতির প্রথম বৈঠকেই তাঁহারা আবার এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন যে, সমিতি বৈধভাবে গঠিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের সে আপত্তি অধিকাংশের ভোটে বাতিল হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় হইতেই শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের দল বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির বিরুদ্ধে নানাভাবে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ প্রচার করিতেছিলেন। সুভাষচন্দ্রই যখন এই সমিতি গঠনের জন্য দায়ী, তখন তাঁহাকেই ইহার জন্য বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অপবাদ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের মৌলিক অধিকার গণতন্ত্রসম্মতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাগ্রেস কমিটীর ১৭৫ জন সদস্যের অনুরোধে গত ২৯শে জুলাই কমিটীর এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় কমিটীর ৫৪৬জন সদস্যের মধ্যে ২৬৩জন উপস্থিত ছিলেন; নূতন যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহাতে ২৩শে এপ্রিল তারিখে সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক গঠিত সমিতির প্রায় সকল সদস্যই আছেন; কেবল শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের দলের সদস্য সংখ্যা আরও কম করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে যে দলের সদস্য সংখ্যা অধিক, কার্য্যকরী সমিতি গঠনের সময় সমিতিতে সেই দলেরই সমস্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন ইহাই সাধারণ অলিখিত নিয়ম। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালার সকল দলের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য ২৩শে এপ্রিল সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন দেখিলেন যে তাহার ফলে সর্ব্বদাই কার্য্যে বাধাপ্রাপ্ত হইতে হয়, তখন তিনি শুধু নিজের দলের অধিকাংশ সদস্য লইয়া নূতন সমিতি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার জন্য বিরুদ্ধবাদীরা সুভাষচন্দ্রের উপর দোষারোপ করিলেও আইনের দিক দিয়া সুভাষচন্দ্রের কার্য্যের নিন্দা করিবার কিছু নাই। অধিকন্তু ২৯শে জুলাই গঠিত নূতন কার্য্যকরী সমিতিতেও তিনি বিরুদ্ধবাদী দলের নেতাদের গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এখন সমিতিতে বিরুদ্ধবাদী দলের সদস্য সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে যে সমিতির কার্য্যে আর তাঁহাদের বাধা দিবার সুবিধা নাই। সেই অভিমানে শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ নেতারা নূতন সমিতির সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। পুরাতন সদস্যদিগের স্থানে যে সকল নূতন সদস্য গৃহীত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রীদলভুক্ত। কাজেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিক দিয়াও কোনরূপ আপত্তি হইবার কারণ নাই। যাঁহারা সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াও সংখ্যাল্পতার জন্য অভিমানে পদত্যাগ করিলেন, তাঁহারাই গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

প্রতিহিংসার জন্য হীন পন্থা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলারগণের মধ্যে অধিকাংশই সুভাষচন্দ্রের দলভুক্ত। সে জন্য ১৯৩৯-৪০ বর্ষের প্রথমে অর্থাৎ গত ১লা এপ্রিলের পর কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য যে সকল ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী গঠিত হইয়াছিল, সেগুলিতে সুভাষচন্দ্রের দলের সদস্য সংখ্যাই অধিক ছিল। শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের দল ঐ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না; কিন্তু কংগ্রেসী কাউন্সিলারগণের ভোটে ঐ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেজন্য শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় তথা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের দলের কয়েকজন কাউন্সিলার কর্পোরেশনের মনোনীত ও শ্বেতাঙ্গ কাউন্সিলারগণের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতায় পূর্ব্ব-গঠিত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন করিয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী গঠন করিয়াছেন। ইহার ফলে কর্পোরেশনে কংগ্রেসের প্রভাবই ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য এবং বাঙ্গালায় কংগ্রেসের সম্মান রক্ষার ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত আছে। তাঁহার মত লোককে ব্যক্তিগত ক্রোধের বশে এইভাবে কংগ্রেসের বিরোধী শ্বেতাঙ্গ দল ও মনোনীত কাউন্সিলারদিগের সহিত সহযোগিতা করিতে দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রই ক্ষুব্ধ হইয়াছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যখন সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের পর সাগ্রহে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার স্বরূপ বুঝা গিয়াছিল—কাজেই তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশের আমরা কোন কারণ দেখি না। কিন্তু কর্পোরেশনের অন্যান্য যে সকল কংগ্রেসদলভুক্ত কাউন্সিলার বিধানবাবুর দলে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বা যে কোন কংগ্রেসী কাউন্সিলার জনমত পদদলিত করিয়া পরে তাহার যত কৈফিয়তই প্রদান করুন না কেন, কলিকাতার করদাতারা তাঁহাদের কিছুতেই ক্ষমা করিবে না।
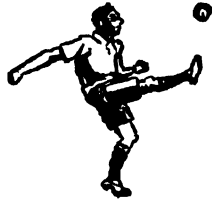
আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৩ই জুলাই শীল্ড খেলা আরম্ভ হয় জল-কাদায় এবং ৫ই আগষ্ট শুক্‌নো মাঠে সমাপ্ত হয়েছে। ঐ দিনই মোহনবাগান তাদের লীগের শেষ খেলায় এরিয়ানদের হারিয়ে লীগ-চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

১৯৩৯ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হ'লো কলিকাতা পুলিশ ২-১ গোলে কাষ্টমসকে হারিয়ে। ১৯৩৭ সালে পুলিশ শীল্ড ফাইনালে ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেডের কাছে ৪-১ গোলে পরাজিত হয়। ফাইনালে কাষ্টমসের এটি চতুর্থ পরাজয়। ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে গর্ডনের কাছে ১-০ ও ১-০ গোলে এবং ১৯১৫ সালে ক্যালকাটার সঙ্গে প্রথম দিন ড্র ক'রে দ্বিতীয় দিনে ৩-০ গোলে তারা পরাজিত হয়েছিল। কাষ্টমস ক্যামারোনিয়ান্সকে ২-১ গোলে এবং পুলিশ ই বি আরকে ১-০ গোলে হারিয়ে এবার ফাইনালে ওঠে। কে ভট্টাচোর্য্যের ক্যামারোনিয়ান্সের বিরুদ্ধে বিজয়সূচক গোলটি এবারে শীল্ডে সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় গোল নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ই বি আরের দুর্ভাগ্য তারা পর পর দু'বার শীল্ডের সেমিফাইনালে হেরে গেল। তারা যাদের কাছে হেরেচে, তারাই দু'বার শীল্ড পেয়েচে।

১৯৩৯ সালের শীল্ড বিজয়ী পুলিশদল ছবি—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড
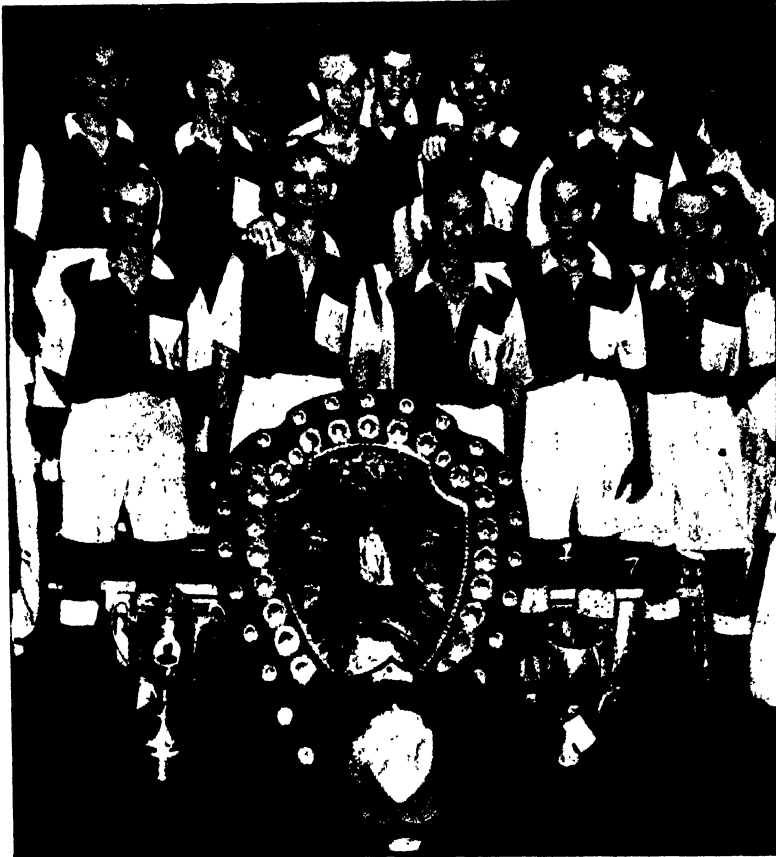
পুলিশের শীল্ড-বিজয় অনেকটা অপ্রত্যাশিত। সকলেই আশা ক'রেছিলো কাষ্টমস শীল্ড পাবে; দল হিসাবেও কাষ্টমস তাদের চেয়ে শক্তিশালী। ফাইনালে পুলিশের কোন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ভাবে অসাধারণ না খেললেও তাদের দলগত সহযোগিতা ছিল ভাল। ফরওয়ার্ডরা সুযোগ-সন্ধানী এবং তাদের আক্রমণে বিশেষ তীব্রতা ও ক্ষিপ্রতা ছিল। সুযোগ পেলেই তারা গোলে সট করেছে। কাষ্টমসের খেলা প্রথম কয়েক মিনিট ব্যতীত অত্যন্ত নিকৃষ্ট হয়েছে। এরকম খেলা তারা কোন কালে খেলে নি,

সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব পরিলক্ষিত হ'য়েছিলো। একমাত্র ডেভিস, কে ভট্টাচার্য্য ও হজেসের খেলা ভাল হয়েছিল। ডেভিসের খেলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হাফ ব্যাকদের অকৃতকার্য্যতাই কাষ্টমসের পরাজয়ের কারণ। আউটে নীল ও রাদারফোর্ডের খেলা অত্যন্ত হতাশজনক। রেণ্টনের অভাবে কাষ্টমসের আক্রমণ ভাগ দুর্ব্বল ছিল। প্রথমার্দ্ধ শেষ হবার ঠিক আগেই রবিন্সনের পাশ থেকে মায়ার্স প্রথম গোলটি করে। বিশ্রামের পর খেলা আরম্ভ হ'লে কাষ্টমস খুব চেপে ধরে। কে ভট্টাচার্য্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে অকৃতকার্য্য হন, খেলাও তাঁর নামোচিত হয় নি। তিনি বার বার রাদারফোর্ডকে পাশ করেছেন, আর সে সব বলগুলি নষ্ট করেছে, কিন্তু সীম্যানকে মোটেই খেলান নি। ১৮ মিনিট খেলা চলবার পরে সীম্যান ডিফোণ্টসের কাছ থেকে বল পেয়ে ফাষ্ট-টাইম সটে গোলটি পরিশোধ করেন। কিছুক্ষণ পরে পুলিশ আবার অগ্রবর্ত্তী হয়, ডিমেলোর একটা সট জার্ডিন ঠিক মত ধরতে না পারায় বলটি পায় টেম্পল্টন এবং জার্ডিনকে পরাভূত করে। শেষ সময়ে ভট্টাচার্য্য বহু চেষ্টা ক'রেও গোলটি পরিশোধ ক'রতে পারেন নি।

খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন. ছবি—আনন্দবাজার

পুলিশ :—জে মিলস ; ওয়েক ও ওয়াট ; ফলস, রবিন্সন ও জে ডি মেলো ; টেম্পল্টন, জোনস, পি ডি মেলো, মায়াস' ও এলেন।

কাষ্টমস :—জার্ডিন ; ডেভিস ও হজেস ; স্মিথ, রেবেলো ও ভৌমিক ; নীল, ডিফোণ্টস, সীম্যান, কে ভট্টাচার্য্য ও রাদারফোর্ড।

এবারের সেমি ফাইনালের দলগুলি স্থানীয় হওয়ায় দর্শক সমাগম বেশী হয়নি। শীল্ডের একটা খেলাও উচ্চাঙ্গের বা আকর্ষণীয় হয়নি। মিলিটারী দল যে তিনটি এসেছিল, তারাও অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়। বাইরের সিভিল দলের ভেতর ই আই আর এবং বি এন আর ভাল ছিল। বি এন আর পুলিশের কাছে হেরে যায়, আর ক্যালকাটা ভাগ্যক্রমে ই আই আরের কাছে জেতে। বর্ত্তমান বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দুর্ভাগ্যক্রমে এরিয়ান্সের কাছে প্রথম দিন গোল শূন্য ড্র করে দ্বিতীয় দিনে এক গোলে হেরে যায়। গোলটি সম্পূর্ণ অফ-সাইড থেকে হয়েছিল। ব্যাক ও গোলরক্ষক কেহই গোল রক্ষা করতে চেষ্টা করেন নি। অফ-সাইড ভেবে চুপ করে থাকা উচিত নহে, যতক্ষণ না রেফারি বাঁশী বাজায়। প্রথম দিন এরিয়ান্স ভাল খেলে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন মোহনবাগান তাদের চেয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট খেলেও হেরে যায়। তারাই সর্ব্বক্ষণ বিপক্ষকে চেপে থাকে ; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছুতেই গোল করতে পারে না। গোল রক্ষক এস দাস অত্যাশ্চর্য্যরূপে গোল রক্ষা করেছিল। লীগের শেষ খেলায় মোহনবাগান এই এরিয়ান্সকেই ৩-১ গোলে হারিয়েছিল। গতবারের বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক দলে পূর্ব্বের অনেক খেলোয়াড় ছিল না। তারা প্রথম দিন ড্র করে দ্বিতীয় দিনে অপ্রত্যাশিতভাবে এক গোলে হেরে যায় বি এন আরের কাছে। অনেকের মতে গোলটি সন্দেহজনক। ইষ্ট ইয়র্কের গোলরক্ষক ওয়াটকে রেল দলের খেলোয়াড় ধাক্কা দেওয়ায় বল তার হস্তচ্যুত হয়। ধাক্কাটি ন্যায্য হ'য়েছিলো কিনা সে সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে।

১৯৩৯ সালের আই এফ এ শীল্ডের ফলাফলঃ

প্রথম রাউণ্ড

- কানপুর ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ০ — বি এন আর এথলেটিক এসোঃ ৯ … বি এন আর
- মহারাণা ক্লাব (গৌহাটী) ০ — পুলিস এ সি ১ … পুলিস এ সি
- রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ১ — ফরিদপুর ক্লাব ০ … রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ
- হাওড়া ইউনিয়ন (০-০) — ওয়ারী ক্লাব (ঢাকা) (০-১) … ওয়ারী ক্লাব
- ভবানীপুর ক্লাব (০-২) — অরোরা এথলেটিক এসোঃ (০-০) … ভবানীপুর ক্লাব
- কুমিল্লা স্পোর্টিং এসোঃ (১-০) — উড়িষ্যা ক্লাব (১-৩) … উড়িষ্যা ক্লাব
- বরিশাল ফুটবল এসোসিয়েশন ২ — এলায়েন্স ক্লাব (গয়া) ০ … বরিশাল এফ এ
- বেঙ্গল আর্টিলারী ২ — বনবিহারী ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ ১ … বেঙ্গল আর্টিলারী

দ্বিতীয় রাউণ্ড

- ১ম ইষ্ট ইয়র্কস্ রেজিমেণ্ট ২-০ — বি এন আর ২-১ … বি এন আর
- পুলিস এ সি ৪ — ১ম রয়েল ফুসিলিয়ার্স ১ … পুলিস এ সি
- রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ ০ — ক্যালকাটা এফ সি ২ … ক্যালকাটা এফ সি
- ছোটনাগপুর স্পোর্টিং এসোঃ ০ — ই আই আর ৫ … ই আই আর
- কাণ্টনমেণ্ট জিমখানা (পেশোয়ার) (আসে নি) — মহমেডান স্পোর্টিং (মৈমনসিং) (আসে নি) … ... ...
- ২য় বর্ডার রেজিমেণ্ট ০ — হবিগঞ্জ টাউন ক্লাব ১ … হবিগঞ্জ টাউন
- ই বি আর স্পোর্টস্ ক্লাব ১ — স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব ০ … ই বি আর
- জর্জ্জ টেলিগ্রাফ ২-১ — কলিকাতা রেঞ্জার্স ২-২ … কলিকাতা রেঞ্জার্স
- ১ম ডি সি এল আই (W. O) — চিটাগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ (Scr.) … ডি সি এল আই
- ওয়ারী ক্লাব ১ — ডালহৌসী এ সি ০ … ওয়ারী ক্লাব
- ভবানীপুর ক্লাব ০ — কাষ্টমস এ সি ১ … কাষ্টমস এ সি
- উড়িষ্যা ক্লাব ১ — দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশন ৪ … দিল্লী এফ এ
- বরিশাল এফ এ ০ — ১ম ক্যামারোনিয়ান্স ১ … ক্যামারোনিয়ান্স
- বেঙ্গল আর্টিলারী ০ — কুলটি ক্লাব ১ … কুলটি ক্লাব
- খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ (১—৩) — কুমারটুলি ইন্‌ষ্টিটিউট (১—০) … খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ
- এরিয়ান্স ক্লাব (০—১) (০—০) … এরিয়ান্স ক্লাব

তৃতীয় রাউণ্ড

- বি এন আর ০ — পুলিস এ সি ২ … পুলিস এ সি
- ক্যালকাটা এফ সি ২ — ই আই আর ১ … ক্যালকাটা
- ... ... — হবিগঞ্জ টাউন … হবিগঞ্জ টাউন
- ই বি আর (১—০—২) — কলিকাতা রেঞ্জার্স (১-০-০) … ই বি আর
- ডি সি এল আই ০ — ওয়ারী ক্লাব ১ … ওয়ারী
- কাষ্টমস এ সি ২ — দিল্লী এফ এ ০ … কাষ্টমস
- ক্যামারোনিয়ান্স ২ — কুলটি ক্লাব ১ … ক্যামারোনিয়ান্স
- খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ ০ — এরিয়ান্স ক্লাব ৪ … এরিয়ান্স

চতুর্থ রাউণ্ড

- পুলিস এ সি ৩ — ক্যালকাটা ১ … পুলিস এ সি
- হবিগঞ্জ টাউন ০ — ই বি আর ৩ … ই বি আর
- ওয়ারী ০ — কাষ্টমস ১ … কাষ্টমস
- ক্যামারোনিয়ান্স ১ — এরিয়ান্স ০ … ক্যামারোনিয়ান্স

সেমি-ফাইনাল

- পুলিস এ সি ১ — ই বি আর ০ … পুলিস এ সি
- কাষ্টমস ২ — ক্যামারোনিয়ান্স ১ … কাষ্টমস

ফাইনাল

- পুলিস এ সি ২ — কাষ্টমস ১ … পুলিস এ সি

গঙ্গাবক্ষে সন্ধ্যা

শিল্পী—পান্না সেন, কলিকাতা

১৯৩৯ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

ছবি—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড

চ্যারিটি ক্ষতিগ্রস্ত ঃ

বৃষ্টির জন্য এবং জনপ্রিয় কোন দল সেমিফাইনালেও উঠতে না পারায় চ্যারিটিতে টাকা উঠেছে অত্যন্ত কম। শীল্ড ফাইনালও দর্শনীয় হয় নি। দর্শকসমাগমও হ'য়েছিল অন্যবারের অপেক্ষা কম। ফাইনালে বিক্রয়লব্ধ অর্থ উঠেছিল মাত্র ৬৪৮০৷৷৵০ আনা।

লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ঃ

১৯১৫ সালে মোহনবাগান প্রথম বিভাগ লীগে খেলতে অনুমতি পান। এতকাল পরে ১৯৩৯ সালে তাঁরা লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে দেশবাসীর আনন্দবর্দ্ধন করেছেন। তাঁদের লীগ চ্যাম্পিয়ন প্রাপ্তিতে ভারতবাসীরা শান্তভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত ইহাকে ঢক্কানিনাদিত করা হয় নাই। কর্পোরেশনও নীরব আছেন পৌর সম্বর্দ্ধনা দেন নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ীদের যেমন দিয়েছিলেন।

লীগ কাপ

১৯১৬, ১৯২০, ১৯২১ ও ১৯২৫ সালে মোহনবাগান রানার্স আপ্ হতে পেরেছিল। ১৯২৫ সালে মাত্র এক পয়েণ্টের জন্য তাদের লীগ ফস্কে যায়, ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯২০ ও ১৯২১ সালে তু' পয়েণ্টের ব্যবধান হয় ক্যালকাটা ও ডালহৌসীর সঙ্গে। এবার মোহনবাগান হেরেছে মাত্র একটা ম্যাচে। তাদের বিপক্ষে গোল হয়েছে মাত্র ৭টা, তারা সপক্ষে গোল করেছে ৩১টা। সর্ব্বাপেক্ষা কম গোল খেয়েছিল ক্যালকাটা ১৯২২ সালে, মাত্র একটা। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কম গোল হয়েছিল ৮টা ১৯৩৬ সালে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ২০টা ১৯৩৮ সালে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গোল দিয়েছে ডারহাম্স্ ১৯৩১ সালে ৫১টা।

মোহনবাগানের বিশেষ কৃতিত্ব যে তারা প্রথম থেকেই অগ্রগামী থাকে, একদিনের জন্যও তাদের কেহ অতিক্রম করতে পারে নি। বিদ্রোহী দলদের আই এফ এ কর্তৃক লীগ থেকে বিতাড়নের জন্য তাদের সঙ্গে তু'টি খেলা বাকী থাকে, কিন্তু তার ফলাফলের উপর চ্যাম্পিয়ন পাবার কোন ব্যতিক্রম ঘটতো না।

মোহনবাগানের পক্ষে কে কয়টি গোল দিয়েছেন:—এ রায়চৌধুরী ১১, এম ব্যানার্জ্জি ৮, এস মিত্র ৪, এস গুঁই ২, এস চৌধুরী ২, এস দেব রায় ২, ডাঃ এস দত্ত ১, বি মুখার্জ্জি ১।

মোহনবাগান হারিয়েছে ও ড্র করেছে:—রেঞ্জার্সকে ১-০, ২-০, বর্ডারস্কে ১-০, ০-০, পুলিশকে ২-০, ৫-০, কাষ্টমসকে ৩-০, ০-০, এরিয়ান্সকে ২-০, ৩-১, ক্যামারোনিয়ন্সকে ২-০, ১-০, ক্যালকাটাকে ১-০, ১-০, ই বি আরকে ০ ০, ১-১,

এম ব্যানার্জী

এ রায় চৌধুরী

বিমল মুখার্জী

কে দত্ত

মহমেডানকে ০-০, ০-০, কালীঘাটকে ১-১, ইষ্টবেঙ্গলকে ২-১, ভবানীপুরকে ১-০ ; হরেছে ভবানীপুরের কাছে ২-১।

প্রথম বিভাগ লীগের ফলাফল ঃ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বি	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	২৪	১৬	৭	১	৩১	৭	৩৯
রেঞ্জার্স	২৪	১৬	২	৬	৩৬	১৯	৩৪
কাষ্টমস	২৪	১০	৮	৬	২৭	২১	২৮
ই বি আর	২৪	১১	৬	৭	৩৪	২৮	২৮
মহমেডান	২৪	১০	৫	৯	৩১	১৫	২৫
ইষ্টবেঙ্গল	২৪	৮	৮	৮	২৩	১০	২৪
কালীঘাট	২৪	৯	৫	১০	৩১	১৯	২৩
ক্যামারোনিয়ান্স	২৪	৭	৮	৯	৩০	২৮	২২
পুলিশ	২৪	৮	৫	১১	২০	৩৬	২১
এরিয়ান্স	২৪	৭	৪	১৩	২১	৩৭	১৮
ভবানীপুর	২৪	৭	৪	১৩	২২	৩৯	১৮
ক্যালকাটা	২৪	৩	৮	১৩	২৩	৪০	১৪
বর্ডার রেজিমেণ্ট	২৪	৫	৪	১৫	১৯	৩৯	১৪

লীগ চ্যাম্পিয়ান ঃ রেষ্ট

সন্তোষ মেমোরিয়াল ফণ্ডের সাহায্যার্থ লীগ চ্যাম্পিয়ান ও রেষ্টের খেলায় লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ৩-১ গোলে পরাজিত হয়। জল কাদায় পরিপূর্ণ মাঠে মোহনবাগান তাদের নিয়মিত খেলোয়াড় নাবাতে পারে নি। ব্যাকে ডাঃ এস দত্ত, হাফে প্রেমলাল ও বেণীপ্রসাদ এবং ফরওয়ার্ডে এস্ মিত্র খেলেন নি। এঁরা সকলে খেললে খেলার ফলাফল কি হ'তো বলা যায় না। রেষ্টের ড্রিসকল অত্যাশ্চর্য্য খেলে একাই তিনটি গোল করেন। দু'টি গোল চ্যাম্পিয়নদলের ব্যাকের দোষে হয়। টিকিট বিক্রয় করে মাত্র ২৯৩৪/০ টাকা পাওয়া গেছে। রেষ্টের পক্ষে ড্রিসকল, মুলার, প্রসাদ, আলিহোসেন ও এন ঘোষের খেলা ভাল হ'য়েছিল। রায়চৌধুরীর গোলটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোহনবাগান—কে দত্ত; পি শেঠ ও পি চক্রবর্ত্তী: বিমল, কে ব্যানার্জ্জী ও আর সেন; গুঁই, মোহিনী ব্যানার্জ্জি, রায়চৌধুরী, প্রেমলাল ও এস চৌধুরী।

রেষ্ট—আলিহোসেন (ভবানীপুর); রে (ক্যামারোনিয়ান্স) ও আর্ল (রেঞ্জার্স); জে লামসডেন (রেঞ্জার্স), রেবেলো (কাষ্টমস্) ও কক্স (বডার্স); এন ঘোষ (এরিয়ান্স), জে মিলস্ (পুলিশ), ড্রিসকল (ক্যামারোনিয়ান্স), মুলার (রেঞ্জার্স) ও কে প্রসাদ (এরিয়ান্স)। রেফারী—এম আমেদ।

রেফারিং ঃ

রেফারিং যথাপূর্ব্বং দোষশূন্য হয় নি। কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি শীল্ড খেলা পরিচালনায় লক্ষিত হয়েছে। রেফারি গিলসন কাষ্টমসের বিপক্ষে ভবানীপুরের একটি ন্যায়সঙ্গত গোল অফসাইডের অজুহাতে নাকচ করে দেন। জার্ডিন সামসেরের সট্ ফেরালে সেই বল পেয়ে সাম্পাঞ্জি গোল করেন। ফাইনালে জার্ডিনের কাছ থেকে ঠিক ঐ রকমে বল পেয়ে টেম্পলটন দ্বিতীয় গোলটি করে, কিন্তু সেটি অফসাইড হয় নি।

দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ছবি—আনন্দবাজার

মোহনবাগানের বিপক্ষে এরিয়ানের গোলটি সম্পূর্ণ অফসাইড থেকে হয়। এ দিন কর্পোরাল হ্যাণ্ডিসাইড রেফারি ছিলেন।

ক্যামারোনিয়ন্স বরিশাল এফ এর বিরুদ্ধে পেনালটি পায় এবং গোল করে; কিন্তু রেফারি পুনরায় সট করতে আজ্ঞা দেন, কারণ গোলরক্ষক নড়েছিল। দ্বিতীয়বারের সটে গোল হয় না। আইনে পরিষ্কার ভাবে আছে,—for an infringement of this nature the benefit should go to the offended and the goal should have been allowed although the goalkeeper was guilty of an offence by moving his feet at the time the kick was being taken. রেফারি হচ্ছেন লেফ্‌টেনেণ্ট থ্রাসার, ইষ্টইয়র্ক রেজিমেণ্টের।

ইষ্টইয়র্ক ও বি এন আরের রিপ্লে খেলায় রেফারি বদলের কারণ কি? দ্বিতীয় দিনের রেফারি ছিলেন ইউ চক্রবর্ত্তী। বি এন আরের পক্ষে গোলটিও গোলযোগ বিহীন নয়। ইষ্ট ইয়র্কের গোলরক্ষক ওয়াট was charged when he was in the process of clearing the ball. The ball had dropped from his hands and R. Carr shoved it into the net. গোলরক্ষককে ধাক্কা দেওয়া সম্বন্ধে আইন এই,—"The goal-keeper shall not be charged excepting when he is holding the ball or obstructing an opponent or when he has passed out-side the goal area".

কাষ্টমস ও ক্যামারোনিয়ন্সের খেলায় কাষ্টমসের স্মিথের বিপক্ষে 'জাম্পিং' ফাউলের জন্য পেনালটি দেওয়া অনুচিত হয়েছে। স্মিথ ডেভিসকে বল মারতে দিয়ে লাফিয়ে সরে যায়, কোন বিপক্ষের খেলোয়াড় তার দু'তিন গজ দূরেও ছিল না। রেফারি ছিলেন গিলসন।

কাষ্টমস ও ই বি আরের সেমিফাইনাল খেলায় কাষ্টমসের গোলটি অফসাইড থেকে হয়েছিল। রেফারি হ্যাণ্ডিসাইড।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা বেশ বেলা থাকতেও অতিরিক্ত সময় খেলান হয় নাই,—মোহনবাগান ও এরিয়ান্সের খেলা, রেঞ্জার্স ও ই বি আরের ও ইষ্ট ইয়র্ক ও বি এন আরের খেলা। কয়দিনই সামরিক রেফারি ছিলেন। অথচ ওয়ারী ও কাষ্টমসের খেলায় জল-কাদার মাঠে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে, ক্ষীণালোকেও ভারতীয় রেফারি অতিরিক্ত সময় খেলিয়ে ওয়ারীর পরাজয় ঘটিয়েছেন।

ফ্রাঙ্ক উলি কিংস স্কুলের ছাত্রদের ক্রিকেট শিক্ষা দিতেছেন

সি বি ক্লার্ক

ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের

ইংলণ্ড ঃ— ১৬৪ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ১২৮ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ— ১৩৩ ও ৪৩ (৪ উইকেট)

খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে।

২২শে জুলাই শনিবার, আকাশের অবস্থা ভাল নয়। লাঞ্চের আগে ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা আরম্ভ হ'ল না। বেলা ১-৩০ মিনিটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জিতলেও ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে দিলে।

হেডলে

হাটন ও ফ্যাগকে দিয়ে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ২-১৫ মিনিটে আরম্ভ হ'ল। বত্রিশ মিনিট খেলবার পর কোন উইকেট না খুইয়ে ইংলণ্ডের ১১ রান হ'য়েছে তখন বৃষ্টি নাবলো খেলা বন্ধ হ'য়ে গেল। হাটন ও ফ্যাগ যথাক্রমে ৬ ও ২ রান করে নট্ আউট রইলেন। দর্শকসংখ্যা হ'য়েছিল ১১০০০ হাজার।

দ্বিতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হ'ল ১২-১৫ মিনিটে; কিন্তু বৃষ্টির জন্য কয়েকবার খেলা বন্ধ রাখতে হ'য়েছিল। আরম্ভে দর্শক সমাগম হয় ৭০০০ হাজার। পূর্ব্ব দিনের ৬ রানের সঙ্গে মাত্র ৮ রান যোগ হওয়ার সঙ্গেই অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হ'লে খেলা আলো অভাবে ও বৃষ্টির জন্য আধ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকে।

খেলা সুরু হ'লে পর, ফ্যাগ সাত রানে হাইলটনের বলে আউট হ'লেন। লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের ১ উইকেটে ৩৪ রান উঠেছে। উইকেটের অবস্থা খুবই খারাপ। ব্যাটস্‌ম্যানরা স্বচ্ছন্দভাবে খেলতে পারছেন না; কোন রকমে উইকেট রক্ষা করছেন। পেণ্টার ৯ রান করে ক্লার্কের বলে সীলের হাতে ধরা দিলেন। পরের ওভারে মাত্র এক রান যোগ হ'লে হাটন সর্ট-লেগে গ্রাণ্টের বলে ক্যাচ তুললে মার্টিনডেল তাঁকে লুফ্‌লেন। হ্যামণ্ড ও কমটন জুটি হ'য়ে খেলতে লাগলেন। বৃষ্টির জন্য কিছু সময় খেলা বন্ধ রইল। কমটন ৪ রানে আউট হলেন। হার্ডষ্টাফ যোগ দিলেন। হ্যামণ্ড ২২ রানে ক্লার্কের বলে ষ্টাম্পড হ'লেন। উড্ হার্ডষ্টাফের সঙ্গে যোগ দিলেন।

চা-পানের সময় ইংলণ্ডের ৬ উইকেটে ১৫১ রান উঠল। দর্শক-সংখ্যা ১০,০০০ হাজারে দাঁড়াল। হার্ডষ্টাফ ৭৬ রান করে গ্রাণ্টের বলে উইলিয়ামসের কাছে ধরা

গ্রাণ্ট

পড়লেন, ১টা ছয় ও ৭টা চার ছিল। তিনি ১০০ মিনিট খেলেছেন। ইংলণ্ড তাদের ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড করলে।

হার্ডষ্টাফ

বাউস

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল ষ্টোলমেয়ার ও গ্রাণ্টকে দিয়ে। ৩৫ রানে ষ্টোলমেয়ার ৫ রান করে গডার্ডের বলে তারই কাছে ধরা দিলেন। গ্রাণ্ট ৪৭ রানে গডার্ডের বলে আউট হ'লেন। দিনের শেষে ৩ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৮৫ রান উঠল। হেডলে ১৬ রান করে নট্ আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনে আকাশের অবস্থা ভাল। কিন্তু রাত্রের বৃষ্টির জন্য উইকেটের অবস্থা সুবিধা নয়। আরম্ভ সেইজন্য দেরী ক'রে হ'ল। কালকের নট্-আউট ব্যাটসম্যান হেডলে ও সীলে খেলা আরম্ভ করলেন। সূর্য্যের তেজে উইকেট শুকুলেও খেলার অবস্থা ভাল হলো না; খুব তাড়াতাড়ি উইকেট পড়তে লাগল। তা'হলেও হেডলে তৃতীয় পর্য্যায়ে এসে শেষ ব্যাটসম্যানের সঙ্গে খেলে গেলেন। ১৪০ মিনিটে ৫১ রান করে হেডলে বাউসের বলে উডের হাতে আউট হ'লে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ১৩৩ রানে শেষ হ'ল। বাউস মাত্র ১৪ রান দিয়ে ৫টি উইকেট পেলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ছটা উইকেট ৩ রানে নিয়েছেন।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করল হ্যাটন ও ফ্যাগ। হ্যাটনের ১৬ রান উঠলে তাঁর এ বৎসরে ২০০০ রান পূর্ণ হ'ল। চা পানের সময় ৪ উইকেটে ইংলণ্ডের ১০৪ রান উঠেছে। হ্যাটন ১৭ রানে, পেণ্টার ০ রানে, ফ্যাগ ও হ্যামণ্ড ২ রানে আউট হ'য়েছেন। ৬ উইকেটে ১২৮ রান উঠলে ইংলণ্ড ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড করলে। কম্‌টন ৩৪ ও রাইট ০ রানে নট্ আউট রইলেন। কন্সট্যাণ্টাইন ৪২ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। জয়লাভ করতে তাদের ১৬০ রান তুলতে হ'বে, সময় মাত্র ৭০ মিনিট; ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৪ উইকেটে দিনের শেষে ৪৩ রান করলে দ্বিতীয় টেষ্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'ল।

ইংলণ্ড:—হ্যামণ্ড (ক্যাপটেন), পেণ্টার, কম্পটন, উড, বাউস, কপসন, গডার্ড, হ্যাটন, ফ্যাগ, হার্ডষ্টাফ ও রাইট।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ:—গ্রাণ্ট (ক্যাপটেন), ষ্টোলমেয়ার, হেডলে, গোমেজ, সীলে, ক্যামেরন, উইলিয়ামস, কন্সট্যাণ্টাইন, মারটিনডেল, হেলটন ও ক্লার্ক।

ক্রিকেট মনোনয়ন কমিটি ঃ

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বোম্বাই অধিবেশনে মনোনয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে, উহাতে নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন ডাঃ কাঙ্গা, সি রামস্বামী এবং জাহাঙ্গীর খাঁ। আশ্চর্য্য হবার কথা, যেখানে প্রফেসার দেওধর ও মেজর নাইডু

লর্ডস মাঠে দর্শকদের সুবিধার জন্য স্কোর কার্ড ছাপা হবার পূর্ব্বে খেলোয়াড়দের নামের তালিকা দেখান হচ্ছে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সেখানে জাহাঙ্গীর খাঁ অথবা রা ম স্বা মী নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচন ভোট দ্বারা সম্পাদিত হয়। মনোনয়ন কমিটিতে নিম্নলিখিত নামগুলিও প্র স্তা বি ত হয়েছিল—এ এল হোসী, সি কে নাইডু, এস ডি মেলো, এস এন হাদি ও এ ইউ বোটাওয়ালা। হোসী ৫, নাইডু ৪, এস ডি মেলো ২ ভোট পেয়েছিলেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে জাহাঙ্গীর খাঁ জিমখানার অধিনায়ক হ'য়ে ভাল খেলেছেন, কিন্তু সেজন্যে মনোনয়ন কমিটির সদস্য হবার যোগ্যতা হয় না। তিনি ভা র তে র খেলোয়াড়দের খেলা সম্বন্ধে

হিউম্যান

ওয়েলার্ড

বিশেষ পরিচিতও নন। পৃ থি বী র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্রাডমানও বহুকাল ম নো ন য় ন কমিটির সদস্যপদ লাভ করতে পারেন নি। এমন কি অধিনায়কের পদও পেয়েছেন তিনি অতি অল্পদিন। রা ম স্বা মী র যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। তবে ডাঃ কাঙ্গার যো গ্য তা সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

এম সি সি ঃ

নিম্নলিখিত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিয়ে আগামী এম সি সি দল গঠিত হ'য়েছে, এঁরা ভারতে খে ল তে আসবেন।

এ জে হোমস (সাসেক্স ও এম সি সি), জে এম ব্রোক্‌লব্যাঙ্কস (এম সি সি ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়), এইচ টি বার্টলেট (কেমব্রিজ, সারে ও সাসেক্স), এস সি গ্রিফিথ (কেমব্রিজ, সারে ও সাসেক্স), আর এইচ সি হি উ ম্যা ন (কেমব্রিজ এবং উষ্টার্স), আর ই এস ওয়্যাট (ওয়ারউইকসায়ার), ই ডেভিস (গ্লামোরগান), এইচ ই ডো লা রী (ওয়ারউইকসায়ার), এইচ গিম লে ট (সোমারসেট),

জেমস্ ল্যাংরিজ

জেমস ল্যাংরিজ (সা সে ক্স), জন ল্যাংরিজ (সাসেক্স), জি এস মোবে (সারে), এম এস নিকলস্ (এসেক্স), জে এফ পার্কার (সারে), এ ডবলউ ওয়েলার্ড (সমারসেট), পিটার স্মিথ (সাসেক্স)।

নিকলস্

ওয়্যাট

ভা র ত ব র্ষে র ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ পি সুব্বারায়ন এম সি সির দল গঠন সম্বন্ধে বলেছেন, এম সি সির দলের তালিকা দেখে আমি হতাশ না হয়ে পারি না। কেহই অ

কার করতে পারবেন না যে এই নির্ব্বাচিত দল ইংলণ্ডের প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক দল নহে। ইংলণ্ড ক্রিকেট খেলায় যে পর্য্যায়ে উঠেছে, তাতে দু'টি সমান শক্তিশালী দল গঠন করতে পারে। কিন্তু এইরূপ নির্ব্বাচিত দলের তালিকায় প্রমাণিত হয়, কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে ক্ষীণ ধারণা পোষণ করেন। গিমলেট ব্যতীত কেহই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে খেলতে মনোনীত হন নাই। ইংলণ্ডের পক্ষে নিয়মিত যে সব খেলোয়াড় খেলে থাকেন, তাদের কেহই এই দলে নেই। এমন কি, ইংলণ্ডের তিনটি প্রধান কাউন্টি, ইয়র্কসায়ার, গ্লষ্টারসায়ার ও মিডলসেক্সের কোন খেলোয়াড় দলভুক্ত হন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় লাঙ্কাসায়ারেরও কেহ নেই!

তবে এই দল খুব নিম্নস্তরের নহে। ইংলণ্ডের সম্মান কোনরূপে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। অধিনায়ক এ জে হোমস একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। দল পরিচালনা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এম সি সি দলের ম্যানেজার হিসাবে গিয়াছিলেন।

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ এই দলের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় সাফল্য লাভ করবেন বলে আমার ধারণা। টেষ্ট খেলায় ভারতের সফলতাই ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের সমুচিত প্রত্যুত্তর হবে। তাঁরা তখন বুঝবেন যে ভারতীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে তাঁদের পোষিত ধারণাপেক্ষা উচ্চতর ধারণা ভারত দাবী করে।

এই দলে বোলার ও ব্যাটসম্যানের অভাব নেই। ওয়েলার্ড ও নিকলস দক্ষ ওপনিং বোলার। পার্কার মিডিয়াম পেস বোলার। পিটার স্মিথ ও জে এম ব্রোকলব্যাঙ্কস স্পিন বোলার। জেমস ল্যাংরিজ লেফট হ্যাণ্ড স্পিন বোলার। ব্যাটিং শক্তিও মন্দ নহে। জন ল্যাংরিজ ও এমারী ডেভিস ওপনিং ব্যাটসম্যান। পর্য্যায়ক্রমে ওয়্যাট, গিমলেট খেলবেন। গিমলেট সম্প্রতি ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, প্রথম খেলোয়াড় হিসাবেও খেলতে পারেন। ডোলারী ও হিউম্যানও বিশেষ শক্তিশালী ব্যাটসম্যান। ১৯৩৬ সালে উষ্টারস্ দলে খেলে ইহারাই ভারতীয় দলের পরাজয় ঘটিয়েছিলেন। উইকেট রক্ষক হিসাবে তিনজন আছেন। তার মধ্যে বার্টলেট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইনি উইকেট রক্ষা ও ব্যাটিংয়ে বিশেষ দক্ষ। অধিনায়ক এজে হোমস সুদক্ষ খেলোয়াড়, খেলা পরিচালনা বিষয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা আছে।

গৌরীসেনের যে বিপুল অর্থ ইঁহাদের ভারত আগমন উপলক্ষে ব্যয়িত হবে তা' শুধু মোটের উপর চলনসই বা

নিপিজ্ রেস

ভারতীয় ক্রিকেট দলকে পরাস্ত করবার মত শক্তিশালী এইরূপ দলের জন্যই কি? ভারতবাসী আশা করেছিল যে বিপুল অর্থব্যয়ের বিনিময়ে, হ্যামণ্ড না হোক অন্তত পক্ষে হ্যাটন, পেণ্টার, কম্পটন ও লেল্যাণ্ডের খেলা তারা দেখতে পাবে। ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের এম সি সিকে জানান উচিত যে, নামজাদা খেলোয়াড় না এলে গ্যারাণ্টি অর্থের গ্যারাণ্টি নেওয়া দুষ্কর হবে। মনে হয়, অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে এই দলের আকর্ষণ বিশেষ কার্য্যকরী হবে না।

কীটনের সাফল্যঃ

নটসের ওপনিং ব্যাটসম্যান কীটন মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে নট আউট ৩২১ রান তুলে হ্যামণ্ডের নট আউট ৩০২

কীটন

রানের রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। নট্‌সের ব্যাটসম্যানদের পক্ষেও ইহা নূতন রেকর্ড; পূর্ব্বে ১৯০৩ সালে জোন্স ২৯৬ রান করে নট্‌স ক্লাবে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

ক্লিনটন-অন-সী টুর্ণামেণ্ট ঃ

ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ ৩-৬, ৭-৫, ৬-০ গেমে ব্রিটিশ ইণ্টার ন্যাশানাল খেলোয়াড় জন ওলিফকে পরাজিত করে ক্লিনটন-অন-সী টুর্ণামেণ্ট বিজয়ী হ'য়েছেন।

বাজ পরাজিত ঃ

আষ্টিন ভিলা মাঠে এক প্রদর্শনী খেলায় এলস্ ওয়ার্থ ভাইন্‌স্ ৬-২, ৭-৯, ৭-৫ গেমে বাজকে পরাজিত করেছেন। খেলাটিতে ১০,০০০ হাজার দর্শক সমবেত হ'য়েছিল।

আইরিশ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পুরুষদের ডবলসে ভারতীয় খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ ও সাবুর ৬-২, ৬-৪, ৬-২ গেমে জি এল রোর্গাস (আয়ার) ও ডি সি কোম্বকে (নিউজিল্যাণ্ড) পরাজিত করে আইরিশ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ডিলেফোর্ড (গ্রেট বৃটেন)

গাউস মহম্মদ সাবুর

৬-৪, ৫-৭, ৬-৪, ৬-২ গেমে গাউস মহম্মদকে পরাজিত করতে সক্ষম হ'য়েছেন।

জো লুই ঃ

জো লুই টনি গ্যালোনটোর সহিত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় প্রায় বিশ হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করেছেন। গত চারটি খেলাতে তাঁর মোট আয় হ'য়েছে এক লক্ষ পাউণ্ড। তাঁর সঙ্গে গ্যালোনটো ১১ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড লড়ায় তাঁর এভারেজ নষ্ট হয়েছে। ম্যাক্স স্মেলিং, জন হেনরী লুইস ও জ্যাক রোপারকে পরাজিত করতে জো লুইয়ের এভারেজ ২ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড সময় লেগেছিল। ঐ খেলাগুলিতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৬৫ পাউণ্ড উপার্জ্জন করেছিলেন। গ্যালোনটোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁর এভারেজ আয় প্রতি সেকেণ্ডে ১০৮ পাউণ্ড দাঁড়িয়েছে।

জো লুইস্

জো লুই নিজের পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপ অক্ষুন্ন রাখবার জন্য আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নিউ-ইয়র্কের বব্ পাস্তোরের সঙ্গে কুড়ি রাউণ্ডের মুষ্টি যুদ্ধ করবেন।

৮০০ মিটারে নূতন রেকর্ড ঃ

জার্ম্মানীর আর হারবিগ ৮০০ মিটার দৌড় ১ মিনিট ৪৬.৬ সেকেণ্ডে শেষ করে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ছিল উডারসনের ১ মিনিট ৪৮.৪ সেকেণ্ড।

আমেরিকায় পেশাদার গল্‌ফ প্রতিযোগিতা ঃ

হেনরী পিকার্ড আমেরিকার গল্‌ফার' এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ানসিপের ফাইনালে বাইরন নেলসনকে পরাজিত করেছেন।

রুল নং ৩৩ ঃ

রুল নং ৩৩ নাকি জারী না হতেই উহার উদ্দেশ্য প্রায় সাধিত হয়েছে। ফেডারেশনের সভ্যরা দূর দেশে অবস্থান করায় ফেডারেশনের পক্ষে ঐ রুল ভঙ্গকারীর সম্বন্ধে বিচার করা অসম্ভব বিধায় এই আইন তুলে নেওয়ার পক্ষে এ আই এফ এফের প্রেসিডেণ্টের সম্মতি এবং পাশ্চাত্য ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনের সম্পাদকের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

বাহবা যুক্তি! আইন করলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পৃথিবীতে বোধ হয় এই প্রথম দেখা গেল। জারি করতে

হলো না বা জারি করা গেল না; অপরাধকারীরা ভয়ে পালিয়ে গেল। রাম রাজত্ব ফিরে এলো বোধ হয়। ফেডারেশনের সভ্যরা দূরে থাকায় যে অসুবিধা তা' তো সব রুলের ক্ষেত্রেই ঘটবে। প্রত্যেক সভাতেই তো তাঁরা সমবেত হয়ে থাকেন। রুলে গলতি থাকে তো তাকে পুনরায় সংশোধিত আকারে গঠন করতে হবে। বাঙ্গলা দেশে এই রুল গঠনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেখা যায় নি। ঐ রুল অমান্য করে এবারও দলে দলে প্রতিদিনই বিদেশ থেকে খেলোয়াড় আমদানী হয়েছে—উদ্দেশ্য ছিল কি, বেশী করে খেলোয়াড় আমদানী করা ?

পশ্চিম ভারতের সেক্রেটারীর মতে, প্রদেশ থেকে প্রদেশে খেলোয়াড় আমদানী রীতিতে খেলোয়াড়দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়। অতএব উহা চলুক। দলকে শুধু জয়ী করবার জন্য সারা ভারত বা ভারতের বাইরে থেকে বিদেশী আমদানী করে নিজ প্রদেশের ছেলেদের আখের মাটী করে দিলেই বুঝি খেলার উন্নতি সাধন করা হয়। এখানেও প্রদেশিকতা রয়েছে—বাঙ্গলাই খেলোয়াড় আমদানীতে ক্ষতিগ্রস্ত বেশী হচ্ছে। ভারতের সকল প্রদেশ থেকে খেলোয়াড় এসে বাঙ্গলা ভরে গেছে। অন্য প্রদেশের তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। তাদের দেশবাসী এখানে এসে বেশ দু' পয়সা কামাচ্ছে। সেখানে ফুটবল খেলার এত সরগরমও নেই, আর পয়সা দেবার লোকেরও অভাব।

বিহার অলিম্পিক এসোসিয়েশন ঐ রুল বাতিল করার পক্ষপাতী নহেন। তাঁরা লিখেছেন, দু'টি কারণ দেখান হয়েছে, প্রথম—এই রুল প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়—প্রেসিডেন্ট ও পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশন এই রুলের বাতিল অনুমোদন করছেন। প্রথমটি যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে যে এ আই এফ এর ব্যবস্থায় দুর্ব্বলতা আছে। দ্বিতীয়টি—আবেগের ব্যাপার। আইনতঃ কোন রুল বদলান যায় না রুল নং ৩৪এর অনুসরণ ব্যতীত।

আমরা বিহারের যুক্তি সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করি। আই এফ এ এই বিষয়ে মতামত দিবার ভার প্রাদেশিক সাব কমিটির উপর দিয়েছেন। দেখা যাক, তাঁরা কি মতামত দেন।

শীল্ড ফাইনাল স্থগিত ঃ

এই প্রথমবার শীল্ড ফাইনাল স্থগিত হলো। কয়েক দিন-ব্যাপী বারিপাত এবং সেই দিন দুপুরের বারিপাতের জন্য ৩রা আগষ্ট তারিখে নির্দ্দিষ্ট শীল্ড খেলা আই এফ এর আদেশে বন্ধ থাকে। দুপুরে উভয় দলকে এই সংবাদ ফোন যোগে জানান হয়।

এরূপ জলকাদায় ফাইনাল না খেলিয়ে আই এফ এ সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯২৩ সালের ফাইনালের কথা। তিন দিন ধরে প্রবল বারিপাত চলেছে। ফাইনাল খেলার দিন বৃষ্টির বেগ

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা বিজয়ী আর এল রিগ ও বিজিত ই টি কুক (বামে)

আরো বর্দ্ধিত হয়ে মুষলধারে চললো খেলারম্ভের আধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। সারা ক্যালকাটা মাঠ জলে ভাসছে। আউট লাইন, গোল লাইন সব ধুয়ে মুছে গেছে। খেলা হবার সম্ভাবনা নেই। রেফারি এলেন, মাঠ দেখে মন্তব্য করলেন—playable, খেলা চলবে। মোহনবাগান খেলোয়াড়ী মনোভাব দেখিয়ে খেলতে নামলে। বল ভাসছে, নগ্নপদে বাঙ্গালীর পক্ষে খেলা একেবারেই অসম্ভব।

ক্যালকাটা সুনিশ্চিত জয় জেনে আনন্দের সঙ্গে খেলছে, তাদের জিত হ'লো তিন গোলে।

১৯৩৭ সালে বৃষ্টির জন্য চতুর্থ রাউণ্ডের চ্যারিটি মোহনবাগান বনাম ডি সি এল আইয়ের শীল্ড খেলা আই এফ এ স্থগিত করে পরের পর দিন নির্দ্ধারিত করেন। ডি সি এল আই দল তাতে যেরূপ খেলোয়াড়ি মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল, তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তখন একটি মুসলিম পত্রও ডি সি এল আইয়ের পক্ষে ওকালতী করেছিল এই বলে যে রেফারির আদেশ ব্যতীত খেলা স্থগিত রাখা চলে না। আমরা তখনও ইহার প্রতিবাদ করেছিলুম, কারণ খেলা হবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আই এফ এর খেলা স্থগিত করবার ক্ষমতা আছে বা থাকা উচিত। নইলে ড্র খেলার জন্য অন্য খেলার তারিখও পিছিয়ে দিতে তাঁরা পারেন না। মাঠে খেলোয়াড়রা নামবার পর রেফারির খেলা চালান বা বন্ধ করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা। কিন্তু এবার ফাইনালের দু' দলই বুটধারী (দু' একজন ব্যতীত) তখন জলকাদায় দু' দলেরই সমান সুবিধা ও অসুবিধা। আর কোন দল মোহনবাগান নয়, তাই এবার আর সেই পত্র constitution এর কথা তোলে নি।
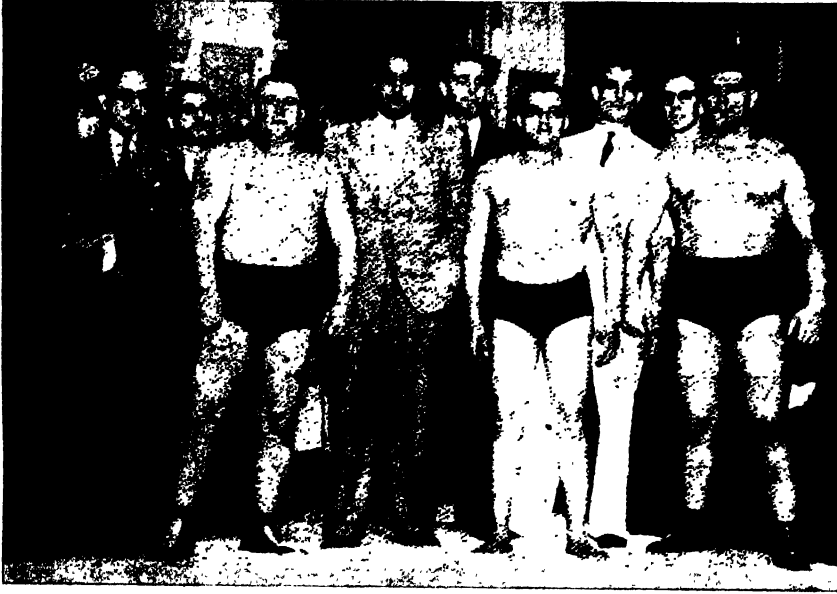
১০.৮.৩৯

কুস্তি প্রতিযোগিতা :—জর্জ্জ (রুমেনিয়ার চ্যাম্পিয়ান), বাবিয়েন (বুলগেরিয়ার চ্যাম্পিয়ান), রামপুরের রাজা সাহেব বাহাদুর এবং জিবিস্কো (পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ান) দিল্লীতে সম্প্রতি তাঁদের খেলা দেখিয়েছেন

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী প্রণীত নাটক "ডক্টর মিস কুমুদ"—১৲
শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সরীসৃপ"—মূল্য ১৷৷৹
লেডি ডাক্তার প্রণীত "দেশ-বিদেশের যৌন-বোধ—১৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত "সর্ব্বগ্রাসী-প্রেম"—২৷৷৹
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীমন্মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী ও উপদেশাবলী" ১ম খণ্ড—১৷৹
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "আমাদের দেশে"—৷৵৹
শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অচিন-দেশ"—৷৷৹
শেখ ফজলুল করীম সাহিত্যবিশারদের "বিবি রহিমা"—১৷৹
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অজানা অতিথি"—২৲
শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত নাটক "বক-ধার্ম্মিক"—১৲
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত "বাঙ্গলার ধর্ম্মগুরু"—২৲
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস "জীবন-নদীর তীরে"—১৷৷৹
শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "সরমা"—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য-লহরী উপন্যাস "পিশাচের কূটচক্র"—৷৹
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "গুপ্ত সংবাদ বিক্রেতা"—৷৹
শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ প্রণীত "সহপাঠিনী"—১৷৷৹
শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নাটক "মাকড়সার জাল"—১৲
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত "নগ্নতার ইতিহাস"—১৷৹
শ্রীকেশব সেন প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক "কেদার রায়"—৷৵৹
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "বিদ্রোহিণী"—২৲
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত উপন্যাস "তরুণ গুপ্তে বিচিত্র কীর্ত্তিকথা"—৷৹
শ্রীগোপাল বটব্যাল প্রণীত গল্প সংগ্রহ "অলৌকিকা"—৷৷৹
শ্রীপ্রমোদকুমার বসু প্রণীত উপন্যাস "পরাগড়ি"
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "মুক্তি-পাগল বঙ্কিমচন্দ্র"—১৲
শ্রীহৃষীকেশ শীল প্রণীত "শ্রীগীতার ভক্তিব্যাখ্যা"—২৲
শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "পদ্মা—প্রমত্তা নদী"—৩৲
শ্রীমাখনলাল ধর প্রণীত "সাঁতারের চিঠি"—১৲
শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ছোটদের "অচিন দেশের রাজকন্যা"—৷৵৹
শ্রীপ্রবোধ ঘোষ প্রণীত ছোট গল্প "আরতি"—১৲
শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ধর্ম্ম বিজ্ঞান"—১৲
শ্রীসমর দে প্রণীত ছোটদের ছড়া "খেলা ঘর"—৷৹

সম্পাদক

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ‖ শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত

সুরে ও কাব্যে এস আজ রচি'

বনতলে রূপলোক—

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
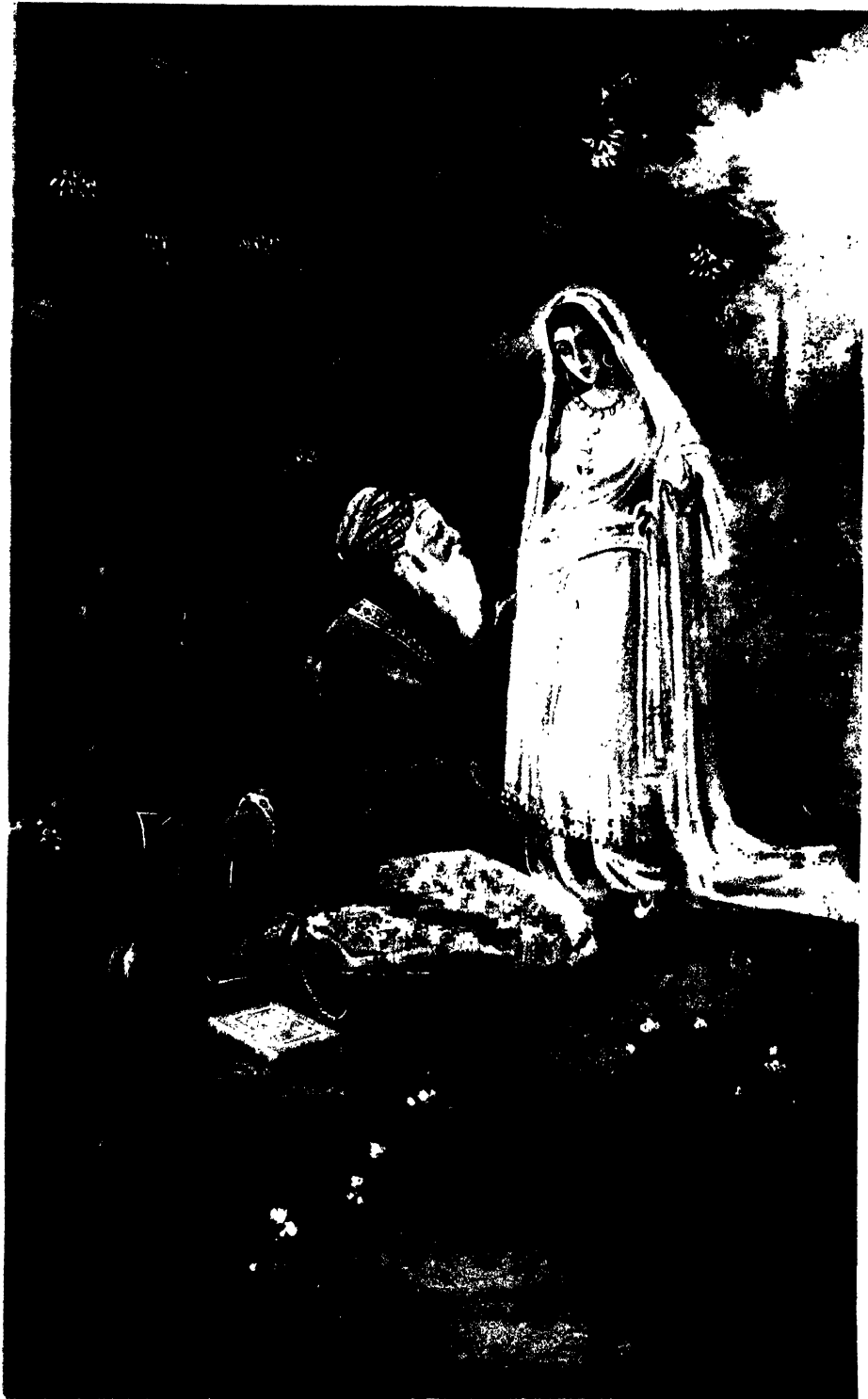
আশ্বিন—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী

ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ডাক আসিয়াছে মনে হইতেছে। যাঁহার অমোঘ বিধানে জাতির উত্থানপতন নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি কোন্ মাপকাঠিতে, কেমন করিয়া ইউরোপের এই প্রবল সভ্যতার বিচার করিবেন তাহা তিনিই জানেন। তবে মনে হয়, বর্ত্তমান সভ্যতার লীলা-ভূমি ইউরোপকে একটা প্রকাণ্ড নর-মেধ-যজ্ঞের রক্ত-স্নানে (blood-bathএ) পবিত্র ও পরিমার্জ্জিত হইয়া সভ্যতা ও কৃষ্টির নূতন 'অভিষেক' গ্রহণ করিতে হইবে এবং নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নূতন আলোকে তাহার অভিব্যক্তির নূতন পথ খুঁজিতে হইবে। সে কথার আলোচনা এখন করিয়া কোন লাভ নাই; এখন ইউরোপের অতি প্রাচীন সভ্যতার কথা কিছু আলোচনা করিব।

ইউরোপে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের বহু পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। তখনও যীশুখৃষ্ট জন্ম-গ্রহণ করেন নাই; তখনও গ্রীক ও রোমের বীরদর্পে মেদিনী কম্পিত হয় নাই; ক্রীট্যান্ বা মিশরীয় সভ্যতার ক্ষীণআলোকরশ্মি ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তে হয়তো বা তখন একটু একটু করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; অন্ধকার যুগের ইউরোপের সেই প্রাগৈতিহাসিক অতি প্রাচীন যুগের কথা আমি বলিতেছি। সেই যুগে ইউরোপের অধিকাংশ স্থানে কেল্ট (Celt) নামে একটী জাতি ও কেল্টিক ধর্ম্ম এবং ঐ নামে একটী বিশিষ্ট সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল।

গ্রীকেরা ও রোমানেরা নিজেদের ছাড়া আর সকল জাতিকেই অশিক্ষিত ও বর্ব্বর বলিত, টিউটনিকেরাও তাই। সুতরাং গ্রীক ও রোমানদের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী যুগে কেল্টিকেরা ইহাদের নিকট সম্মান পাইত না।

পশুশক্তি প্রবল হইয়া উঠিলে আধ্যাত্মিক শক্তি সঙ্কুচিত হইতে থাকে। উলঙ্গ শাণিত তরবারির যুক্তি যখন বড় হইয়া উঠে, তখন জ্ঞান, ভক্তি ও ধর্ম্মের শান্ত আলোক স্বভাবতই সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া যায়। প্রবল শক্তিসম্পন্ন গ্রীক, রোমীয় ও টিউটনিক সভ্যতার চাপে পড়িয়া কেল্টিক ধর্ম্ম এবং আদর্শের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও সেই সভ্যতা, ধর্ম্ম ও আদর্শের তত্ত্ব-কাহিনী কোন কোন স্থানের জনপদের ভিতর আত্মগোপন করিয়া আছে। এখনও সেই প্রাচীন কেল্টদের উত্তরাধিকারী খুঁজিয়া বাহির করা যায় এবং কেল্টিকেরা একেবারে নির্ব্বংশ বা ধ্বংস হইয়া যায় নাই। ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন কেল্টিক সভ্যতার নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। এক সময়ে ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালীর উত্তরাংশ, জার্মানী, স্পেন, সুইট্জর্ল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে কেল্টিক সভ্যতা ও ধর্ম্ম বিপুল গৌরবের সহিত তাহাদের উচ্চ আদর্শ ও বাণী প্রচার করিত। ইউরোপের পণ্ডিত ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন ইউরোপের পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া এই কেল্টিক (Celtic) সভ্যতার অনুসন্ধান করিতেছেন। ফ্রান্সের রেনে (Rennes) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Celtic ধর্ম্মমত ও দেবদেবীতত্ত্ব সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ বাহির হইতেছে। আয়র্লণ্ডে কেল্টিক জাগরণের বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

কেল্টিক সভ্যতার বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, কেল্ট (Celt) ও হিন্দু সভ্যতার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রাচীন কেল্টের প্রকৃতি-পূজা, তাহার ভগবদ্ভক্তি, তাহার ধর্ম্ম-মত, দেবদেবীতত্ত্ব প্রভৃতির সহিত হিন্দু আদর্শের এত সাদৃশ্য যে, মনে হয় যেন এই দুই জাতির চিন্তার ধারা একই উৎস হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিদৃশ্যমান প্রত্যেকটী বস্তুতে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা, এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যেক বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া তাঁহার অপরূপ লীলার রসাস্বাদন করা—হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। তিনি সিংহাসনে বসিয়া শুধু বিচার করিতেই পারেন না, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাবে, তাঁহার বিচিত্র প্রসব-ধর্ম্মিণী মহামায়ার অনন্ত শক্তিবলে তিনি অনন্তরূপে ও বিরাজ করিতে পারেন। তাঁহার এই লীলা হিন্দু নানা রসে আস্বাদন ও উপভোগ করে। ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য।

> সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
> ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
>
> —শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২

যিনি ভগবৎস্বরূপকে চেতন ও অচেতন সর্ব্বভূতে আছেন বলিয়া অনুভব করেন তিনিই ভক্ত। তিনি "খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ", সর্ব্ব ভূতাধিকরণে অভীষ্ট ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন এবং প্রত্যেকটী সৃষ্ট বস্তু তাঁহার ঈপ্সিতের অধিষ্ঠান-ভূমি স্বরূপ তিনি মনে করেন। তাহার ভিতর তিনি আকাশ বায়ু সলিল গাছ পাথর মাটী বা স্থাবর জঙ্গমের কোন মূর্ত্তি দেখেন না; তিনি দেখেন, ঐ স্থাবর জঙ্গমের ভিতর তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত দেবতার চির-মধুর সুন্দর সত্তা এবং তাহাই তিনি স্বরূপত আস্বাদন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীগণও তাহাই বলিয়াছেন :—

> বনলতাস্তরবঃ আত্মনি বিষ্ণুং
> ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
> নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
> মাবর্ত্ত লক্ষিত মনোভবভগ্নবেলাঃ। ১০।২১

এইজন্য উত্তম ভাগবতেরা ভগবদ্বিদ্বেষীজনকেও সম্মান করেন; ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভগবানের নিন্দাকারী নাস্তিককেও তাঁহারা পীড়া দেন না। এইজন্য পরম ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব দুর্য্যোধনকে নমস্কার করিতেন। এই ভগবৎপ্রেম, সাধনার এই বিশিষ্ট ভাবধারা, হিন্দুর ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে।

কেল্টদের সভ্যতার ভিতর দিয়াও এই রকম একটী ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কেল্টিক আন্দোলন আয়র্লণ্ডেই প্রবলভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ডাব্‌লিন্ মিউজিয়মে কেল্টিক সভ্যতার নিদর্শন বিশেষ যত্নের সহিত সংগৃহীত ও রক্ষিত হইতেছে। কেল্টিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী আইরিস জাতি কেল্টিকদের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন গৌরব-কাহিনীর উদ্ধার ও প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

একথা আমরা খুব কম লোকেই জানি যে, এক যুগে আয়র্লণ্ডই ইউরোপের শিক্ষাগুরু ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে

খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তৎপূর্ব্বে এবং তার পরেও নবম শতাব্দীতে দিনেমারদের আক্রমণ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ শত বৎসরাধিক কাল আয়র্লণ্ড ইউরোপের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এবং এই স্থান হইতেই সভ্যতার আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইত। খৃঃ নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও এই সভ্যতার প্রভাবে ইউরোপের বহু জনপদ নিয়ন্ত্রিত হইত।

কেল্টিকেরা অসীমের অনন্ত ব্রহ্মের উপাসক। এই বহির্জগতের ভোগবিলাসের উপকরণই যে একমাত্র চিন্তার বিষয় তাহা তাহারা মনে করিত না। তাহারা মনে করিত, ইহার পশ্চাতে একটা অন্তর্জগত আছে—যাহার রহস্য, যাহার অসীম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার এবং সেই ভূমানন্দ লাভ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করাই মানব-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আয়র্লণ্ডের কোন এক চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন—"কেল্টিক সাহিত্যের সহিত প্রাচীন কোন চিন্তারাশির তুলনা করিতে হইলে ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। Mysticism, ভাবুকতা, প্রকৃতিপূজা ও অধ্যাত্মবাদ এত সহজভাবে জগতের আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই। কেল্ট ও হিন্দু বোধ হয় একই অধ্যাত্মশক্তির সন্তান।" *

এই কেল্ট সভ্যতা এবং কেল্ট জাতি গ্রীক রোমান ও টিউটনিক সভ্যতার প্রবল আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ পাহাড় পর্ব্বত এবং বন জঙ্গল আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়। অনেক স্থানেই তাহাদের বিশিষ্টতা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের ব্রিটানী, ইংলণ্ডের ওয়েল্‌স্ ও কর্ণওয়াল, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে টিউটনিকদের প্রবল প্রভাব হইতে দূরে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল বলিয়া কেল্টিক সভ্যতার চিহ্ন বা বিশিষ্টতা এখনও রক্ষিত হইয়া আছে এবং এই জন্যই এই সব স্থানে বর্ত্তমান কালে নব্য-কেল্টিক জাগরণ (Celtic Revival বা Celtic Renaissance) দেখা দিয়াছে। পশুবলদৃপ্ত নব-সংগঠিত জাতির নিকট পুরাতন সভ্য জাতির এই পরাভব জগতের ইতিহাসে অভিনব ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষের হিন্দুদিগকেও এই অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে। বিজিত সভ্যজাতির সভ্যতার আদর্শ বা কৃষ্টি যে নিকৃষ্ট এবং বিজেতা জাতিদের কৃষ্টিই যে শ্রেষ্ঠতর, এই পরাভবে তাহা প্রমাণিত হয় না। বরং দেখা যায়, সুসভ্য প্রাচীন জাতির পশু-শক্তি ক্রমেই কমিতে থাকে। তাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা, শান্ত এবং সংস্কৃত জীবনধারা তাহাদের ক্ষাত্রশক্তিকে ক্রমেই ক্ষীণ করিতে থাকে। পশুশক্তিই যদি সভ্যতা পরীক্ষার মাপকাঠি হয়, হীন জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার কৌশল, ষড়যন্ত্র, নির্লজ্জতা ও সামর্থ্যই যদি কৃষ্টির বিচারের আদর্শ হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, গরিলা-বাহিনী সংগঠিত করিয়া মানব-সমাজকে যদি কেহ বিধ্বস্ত করিতে পারে, গরিলাদের আরণ্য কৃষ্টিই মানব সভ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠতর, ঐ আদর্শ অনুযায়ী তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তেমনি আবার একথাও ঠিক যে, কোন জাতি যদি তাহার ক্ষাত্রশক্তি হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার আদর্শ, ধর্ম্ম, সত্যপ্রচার করিবার ক্ষমতা সে সবই ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলে। The nation that loses its political right, also loses its right to be heard—এ কথা অতি সত্য। সত্ত্বগুণকে রক্ষা করিবার জন্য রজঃগুণের অনেক প্রয়োজন হয়; আশ্রমপীড়া হইতে তপোবনকে রক্ষা করিতে হইলে বিচিত্রবীর্য্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রশক্তি চাই। অহিংসা দ্বারা উদ্ধত পশু-শক্তি সংযত হয় না। অবশ্য সত্যের বিনাশ নাই; Thesis, Anti-thesis, Synthesis চলিতে থাকে কিন্তু যাহা সত্য তাহা ধ্বংস হয় না, সত্য ব্রহ্ম। ইউরোপের এই কেল্টিক জাগরণের আন্দোলন হয় তো ইউরোপের আর এক নবযুগেরই সূচনা করিতেছে।

অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে অতি প্রাচীন একটী কেল্টিক (Celtic) স্তোত্র বা গাথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

কেল্টিক স্তোত্র

I am the wind which breathes upon the sea,
I am the wave of the ocean,
I am the murmur of the billows,
I am the ox of the seven combats,
I am the vulture upon the rock,
I am a beam of the sun,
I am the fairest of plants,
I am a wild boar in valour,
I am a salmon in the water,
I am a lake in the plain,

* বর্ত্তমান জগৎ—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার।

I am a word of science,
I am the point of the lance of battle,
I am the God who creates in the head
(i.e., of man) the fire (i.e., the thought),
Who is it who throws light into the
meeting on the mountain ?
Who announces the ages of the moon
(if not I) ?
Who teaches the place where couches
the sea (if not I) ?

এই প্রাচীন কেল্টিক স্তোত্রটী পড়িয়া মনে হয় ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তটী কতকটা যেন কেল্টিক ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

দেবীসূক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের প্রথমে পাঠ করার প্রথা আছে। এই ঋক্ মন্ত্রের দ্রষ্টা অম্ভৃনী ঋষির দুহিতা বাক্ নামে ব্রহ্মবিদুষী মহিলা। তুলনা করিয়া দেখার জন্য দেবী-সূক্তটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেবী-সূক্তম্

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরা-
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্য-
হমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥২

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩

* * *

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হংত বা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ ॥৬

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্
মম যোনিরপ্ স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥৭

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমানা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সংভূব ॥৮

দেবীসূক্তের বঙ্গানুবাদ

১। আমি রুদ্র, অষ্টবসু, আদিত্য ; আমিই সমস্ত দেবতাগণ ; আমিই ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ; এই সমুদয়ের আত্মস্বরূপ আমি।

২। আহরণীয় সোম আমি ; আমিই ত্বষ্টা, পূরণ ও ভগদেব ; হবির্যুক্তকে, হবিদ্বারা দেবগণের তৃপ্তি-সাধনকারীকে, সোম-যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যজমানকে আমিই যজ্ঞফল প্রদান করি।

৩। আমিই জগতের ঈশ্বরী ; উপাসকগণকে আমিই ফল প্রদান করি ; পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ নিজ আত্মা মধ্যেই আমারই কৃপায় হয় ; যজ্ঞে যাঁহাদিগকে আহ্বান করা হয় তন্মধ্যে আমিই প্রধান ; বহুভাবে আমিই জীবদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছি ; সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য আমি বহুদেশে যজমানগণ ইহাই বিধান করেন।

* * * *

৬। রুদ্রের ধনুতে আমি, ব্রহ্মবিদ্বেষীকে ধ্বংস করিতে আমি সজ্জন রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়া থাকি, স্বর্গ মর্ত্ত্যে আমিই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি।

৭। ঐ উপরের আকাশকে আমিই প্রসব করিয়াছি, সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির মধ্যে আমারই কারণ নিহিত ; আমি সমুদয় ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি ; ঐ দূরে অবস্থিত স্বর্গলোক পর্য্যন্ত সমস্ত আমার দেহ দ্বারা অনুস্পৃষ্ট।

৮। সমস্ত বিশ্বকে কারণরূপে উৎপাদন করিয়া আমি একাকী স্বচ্ছন্দ-গতি বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই ; পৃথিবীরও উপর আকাশেরও উপর পর্য্যন্ত আমি সকল বস্তুর সহিত মায়ারূপ মহিমা দ্বারা সম্ভূত হইয়া থাকি।

দুইটী স্তোত্রের চিন্তার প্রকৃতি একই রকম।

হিন্দু ও কেল্ট এই দুইটী চিন্তার ধারা কি একই উৎস হইতে প্রবাহিত হইয়াছে ? অথবা এই দুইটী সভ্যতার

আধ্যাত্মিক রূপ, বিভিন্ন আবেষ্টনের মধ্যেও একই বর্ণে, একই ছন্দে, স্বাধীন ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে? ঐতিহাসিক, বিশেষত হিন্দু ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের এই দিক দিয়া একটা অনুসন্ধানের ক্ষেত্র রহিয়াছে।

প্রাচীনকালে ইউরোপের সহিত এসিয়ার তথা ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পারস্য দেশ ও কাস্পিয়ান সমুদ্র এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশের ভিতর দিয়া অনেকটা আধুনিক এরোপ্লেনের রাস্তায়, গান্ধার রাজ্যের ভিতর দিয়া রুশিয়ার পথেও ভারতের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য চলিত। গান্ধার রাজ্য এখন তো ভারতের মধ্যেই। স্কন্দ-নাভ (Scandenavian) জাতিরা অনেকে এই ব্যবসা চালাইত। এই পথে ভাবের বাণিজ্যও নিশ্চয়ই চলিয়াছে। এই দীর্ঘ পথের ইতিহাস যদি পণ্ডিতেরা বাহির করিতে পারেন তাহা হইলে অনেক তথ্য বুঝা যাইবে।

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ মহেন-জো-দারো, হারাপ্পা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান খনন করিয়া অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছে। তাহাতে ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, ভারতের এই প্রাচীন সভ্যতার সহিত Near Eastএর সুমেরিয়ান সভ্যতা (Sumerian civilization) ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বদ্ধ—দুই সভ্যতার যোগ আছে। ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি ইউরোপের পূর্ব্বদিকের সীমান্ত প্রদেশগুলিকে ইউরোপীয়ানেরা Near East বলে। Sir Leonard Woolley কিছুদিন হইল এই সব প্রদেশে প্রাত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। তিনি উর (Ur)-এর খনন-কার্য্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি উত্তর-পশ্চিম সিরিয়াতে মেসোপটেমিয়ান ও ক্রীট্যান সভ্যতার সম্বন্ধের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। ক্রীট্যান সভ্যতার সহিত সুমেরিয়ান এবং সুমেরিয়ানের সহিত ভারতীয় সভ্যতার যোগ আছে দেখা যাইতেছে। ওদিকে ক্রীট্যান সভ্যতার সহিত গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সম্বন্ধ আছে।

এই সব প্রাত্নতাত্ত্বিক তথ্যের আলোচনার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট Sir Leonard Woolleyকে আমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন। তিনি মহেন-জো-দারো, হারাপ্পা, চান্‌হোদারো, আম্‌রি, তক্ষশীলা, সারনাথ, নালন্দা, পাহাড়পুর এবং আরও অন্যান্য স্থান পরিদর্শনও করিয়াছেন।

ভারতীয় সভ্যতার বয়স এখনও ঠিক হয় নাই। এমন দিন ছিল যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতের যা কিছু—সবই খৃষ্ট জন্মের পরে লইয়া আসিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন মহেন-জো-দারো, হারাপ্পা প্রভৃতি স্থানের প্রাত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সভ্যতার বয়স পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট যে এই সব তথ্য আলোচনার জন্য Sir Leonard Woolley-কে আমন্ত্রণ করিয়াছেন ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। অবশ্য এ আমন্ত্রণ মূল্যবিহীন নয়, এর জন্য অনেক টাকা আমাদিগকে দক্ষিণা দিতে হইবে। ইউরোপীয়ান বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিশেষ দক্ষিণা না পাইলে কোন কার্য্যে ব্রতী হন না। এ বিষয়ে তাঁহারা আমাদের প্রাচীন কুলীন ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাও অনেক বেশী কুলীন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে ক্রমে ইহা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইবে যে, জগতের সভ্যতার উৎস ক্ষেত্র এই ভারত ভূমি এবং এই ভারত-মাতাই সভ্যতার আদি-জননী।

আধুনিক ইউরোপীয় যন্ত্র-সভ্যতা ব্যর্থ হইয়াছে। সভ্যতার এই যে ব্যভিচার ঘটিয়াছে, এই যে জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস, দ্বেষ, হিংসা—দুর্ব্বল জাতির উপর প্রবল জাতির অত্যাচার, এক জাতির আর এক জাতিকে গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা—জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার জন্য নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতা—ইহার জন্য দায়ী বর্ত্তমান ইউরোপীয় যন্ত্র-সভ্যতা। মনে হইতেছে যেন নরকের বিষ-বহ্নির একটা তপ্ত শ্বাস, পাশবিকতার একটা রক্ত-স্রোত সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। এই নারকীয় দানব-লীলার অবসান ঘটাইতে হইলে সভ্যতার আদি-জননী ভারতের সাধনার বাণী দিকে দিকে আবার প্রচার করিতে হইবে; প্রচার করিতে হইবে যে, এই বিশ্ব-গ্রাসী দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মত ইহা ক্রমে বাড়িয়াই চলিবে। সমস্ত মানব জাতিকে ডাকিয়া বলিতে হইবে, তোমরা ভারতের নিকট আবার সভ্যতার, মহামানবতার দীক্ষা গ্রহণ কর তোমাদের মনের মুক্তির সন্ধান ভারতের সাধনার মধ্যে নিহিত আছে। মনের মুক্তি না হইলে জাতির মুক্তি হইবে না। সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের ইহাই একমাত্র পথ।

মোহ-মুক্তি
নাটক
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

"মোহ-মুক্তি" সামাজিক ঘটনামূলক নাটক। নাটকের ঘটনাস্থল—ভাগীরথী তীরবর্ত্তী অভিরামপুর জনপদ।—কথোপকথন সৌকার্য্যার্থে কোথাও কোথাও—"এ গ্রামে" বা "এ গাঁয়ে" ব্যবহৃত হয়েছে। সেটা 'স্থান' অর্থে-ই বসেছে।

নাটকখানিকে প্রথামত—অঙ্কে, গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করা হয়নি;—এখন কেবল "দৃশ্য" সংখ্যাই দেওয়া হ'ল।

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ, সময় বৈকাল। দিনের কর্ম্মান্তে—কেহ কর্ম্মস্থল হ'তে, কেহ বাজার কোরে ফিরছেন, কেহ বেড়াতে বেরিয়েছেন।

মিউনিসিপালিটির ওভারসিয়ার তারিণী তরফদার একতাড়া নোটিস্ হস্তে পথচারী ভদ্রলোকদের সেই নোটিস্ বিলি করতে করতে চলেছেন। কেহ তা দাঁড়িয়ে পড়ছেন, কেহ তাতে তামাকটা মুড়ে নিচ্ছেন, কেহ তা পথেই ফেলে যাচ্ছেন।

পশ্চাতে মিউনিসিপালিটির কুলি—ধন্মা। এক কাঁধে মই, এক হাতে দড়িতে ঝোলানো একহাঁড়ি লেই, আর তার মধ্যে একখানা লেই লাগাবার বাঁটওলা বুরুস্। বগলে একতাড়া 'পোষ্টার্'। সুবিধা মত স্থান পেলেই ধন্মা লোকের দ্বালে দোরে পোষ্টার্ আঁটছে। সামনে হারাণ-মুদীর মুদিখানার দোকান পেয়ে—

তারিণী। (ক্লান্ত ও বিরক্তভাবে) যতো ব্যাগারের কাজে ওভারসিয়ার চাই—না হলে যেন পদ্যের মিল হয় না! হারাণ, ভাল কোরে একছিলিম তামাক খাওয়া বাবা। আর পারছি না, সেই ১২টায় ছুটো অন্ন মুখে দিয়ে বেরিয়েছি। নোটিসের তাড়া যেন দ্রৌপদীর বস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে···

কয়েকজন প্রবীণকে আসতে দেখে

নাঃ তামাকে শনির দৃষ্টি পড়েই আছে, খেতে আর দেবে না, —থাক্ হারাণ—

ছু' পা এগিয়ে

নিন দুর্গাদাসবাবু—গোপালবাবু যাবেন না।

উভয়কে নোটিস্ প্রদান

দুর্গাদাস। কি বলোদিকি—কিসের নোটিস্ তারিণী?

তারিণী। দয়া কোরে পোড়ে দেখুন না—তাই না আমি ভদ্রলোকদের বিলি করছি—

গোপালবাবু। টেক্সো বাড়ছে না তো, তা হলেই হোলো। বুড়ো হয়েছি, সভাসমিতি কি প্রাইজ্ বিতরণ দেখবার সখও নেই সামর্থ্যও গিয়েছে। চশমাও সঙ্গে নেই—

হরলাল বাগচী, শেখর চৌধুরী, পরাশর গোঁসাই, গঙ্গা দর্শনে যাচ্ছিলেন—দাঁড়িয়ে গেলেন

পরাশর। কি হে দুর্গাদাস—ব্যাপার কি? এ যে মিউনিসিপালিটির ঢোল্ দেখছি। স্বয়ং তারিণীর গলা? না? সমন্ নাকি!

দেখতে দেখতে আরো কয়েকজন উপস্থিত হলেন।
সকলের মুখেই—"ব্যাপার কি!"

তারিণী। আপনারা কর্ত্তাস্থানীয়—মাপ্ করবেন; নোটিস্খানা একবার পড়েই দেখুন না। এই যে শিবনাথ পণ্ডিতমশাই—নিন্তো (নোটিস প্রদান), দয়া কোরে একটু চেঁচিয়ে পড়ুনতো।

গোপালবাবু। বলেছি তো—টেক্স্ বাড়ার নোটিস্ যখন নয়, তখন নাই-বা দেখলুম তারিণী—

পরাশর গোঁসাই। হ্যাঁ, তবে যদি ধর্ম্মসভাদির নোটিস্ হয়—যেমন কোনো সিদ্ধ সাধু বা প্রসিদ্ধ ভাগবত ব্যাখ্যাকার কিছু শোনাবেন—সে স্থলে আপত্তি নেই। কি বলো শেখর?

শেখর চৌধুরী। হাঁ, যে বয়সের যা—

তারিণী। এই তো আপনাদের যোগ্য কথা। তা হলে আমিই নোটিস্খানি একবার পড়ি—আপনারা দয়া কোরে শুনুন।

শেখর। আচ্ছা, পড়ো পড়ো—

তারিণী নোটিস্খানি মাথায় ঠেকিয়ে—পড়তে আরম্ভ করলে

নিবেদন-পত্র

এতদ্বারা ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে—এতাবৎ যাঁকে আমরা চিনিতে পারি নাই—যিনি আত্মগোপন করতঃ সাধারণের মত সংসারে বিচরণ করিতেন অথচ 'তুরীয়' অবস্থায় থাকিতেন,—যিনি কেবল লোক-হিতার্থে আজিও সংসার ত্যাগ করিতে পারেন নাই, বিবেকের বাধায় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে তাঁহাকে আর সংসারে আবদ্ধ রাখা কঠিন! সেই চিন্তাকুল অশান্ত অবস্থায় আমাদের কলিকাতার কুটীরে একরাত্র অবস্থান কালে সহসা তাঁহার সেই অজ্ঞাতপূর্ব্ব অলৌকিক ভাব উপস্থিত হয়। আমরা ভীত ও বিচলিত হইয়া—ডাক্তার বৈদ্য ডাকি। শেষ তাঁহাদেরি উপদেশ মত—সিদ্ধ, শাশ্বক্ত কেশাম্বরী বাবার শরণাপন্ন হই। অবস্থা শুনিয়া, সিদ্ধাসন ছাড়িয়া তাঁহাকে আসিতে হয়। দর্শনান্তে বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া বলেন—"শাস্ত্রেই এ-সব লক্ষণ পড়া ছিল, মহাভাগ্যে কলিতে সমাধি এই প্রথম চাক্ষুস কোরে ধন্য হ'লাম! অতি উচ্চ অবস্থা, ইনি কে?" শুনিয়া বলিলেন—"সাবধান, ওঁকে এই অবস্থার কথা—বিস্তারিত জানাবেন না।—পরমৈশ্বর্য্য লোভে, কোন্ দিন নির্ব্বিকল্পে এ দেহ ত্যাগ হয়ে যেতে পারে।" ইত্যাদি।

রাত্র দ্বিতীয় প্রহর গতে তিনি পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসেন। অনেকেই তখন তাঁহাকে—সাংসারিক প্রশ্নে অশান্ত করে। সে কারণ—আমাদের অজ্ঞাতেই কখন তিনি চলিয়া যান।

ইনিই আপনাদের পুণ্য অভিরামপুর নিবাসী লোকহিতপ্রাণ মহাজন শ্রীযুক্ত রমণচন্দ্র মিত্র মহাশয়—যিনি আমাদের মত ঘোর নাস্তিক ও অবিশ্বাসীকে মুহূর্ত্তে পদানত করিয়াছেন।

মহাপুরুষকে প্রণাম করা ছাড়া তাঁর যোগ্য পূজা ও সম্মান দেওয়া আমাদের সাধ্য নয়। তথাপি আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি মত, তাঁহাকে স্মরণ ও বরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য, নচেৎ জ্ঞানকৃত প্রত্যবায় আছে। সে-কারণ তাঁরি পুণ্য মন্দিরে আমরা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সমবেত হইয়া—'সমাধি' উৎসবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি,—ও কর্ত্তব্যবোধে ধর্ম্মপ্রাণ জনগণকে উক্ত উৎসব সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদনে নিজেরা ধন্য হইতে ও জন্ম সার্থক করিতে সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি। আশা করি হিন্দু আপন গৌরব-কথা ও কর্ত্তব্য ভুলিবে না।

স্থান—অভিরামপুর, রমণ-নিবাস (ভক্তিভূষণাশ্রম) সাধন-সভা।
সময়—১২ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা।

বিনীত নিবেদক—
শ্রী টি রায়—ব্যারিষ্টার্
শ্রী ডি সেন—এড্ভোকেট্
কলিকাতা

নোটিস্ পাঠান্তে তারিণী তরফদার সেখানি ভক্তিভরে মাথায় ঠেকালেন।
সকলে এতক্ষণ একাগ্র ও উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন, তাঁরাও
মহাপুরুষের উদ্দেশে শূন্যে হাত তুলে নমস্কার
করিলেন। পরে প্রত্যেকেই—

"ওহে তারিণী—আমাকে একখানা—আমাকে একখানা—"

বলতে বলতে এগিয়ে হাত বাড়ালেন এবং তা হাতে
পেয়ে—মাথায় ঠেকালেন

তারিণী। (কুলি ধম্মার প্রতি) বসলে চ'লবে না বাবা, এখনো অনেক রয়েছে। পোষ্টারগুলো রাস্তার ধারে প্রকাশ্য স্থানে সেঁটে দিয়ে ফ্যালো বাবা। এও ধর্ম্মকর্ম্ম—

ধম্মা—মই, কাগজ আর আটার হাঁড়ি নিয়ে ছুটলো

গোপালবাবু। কোথায় কোথায় বিলি করলে? দেখো তারিণী, এত বড় সৌভাগ্য হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়—

তারিণী। আজ্ঞে সেই ইষ্টেসন্ থেকে আরম্ভ কোরে—পোষ্টাপিস্, কাছারি, বাজার, দোকান, ক্লাব, লাইবেরী, স্কুল, দেবালয়, কিছু বাকি রাখছি না কর্ত্তা—মেয়েদেরও বাদ দিচ্ছি না—

শেখর চৌধুরী। এ দু'টি বড় কাজ করেছ—তোমার ভুল হবে না জানি—

তারিণী। আজ্ঞে তাঁদেরি তো নিজ্জলা ভক্তি।

দুর্গাদাস। না তারিণী—তা বোলো না। গ্রামের মাতব্বরেরা সকলেই তাঁর ভক্ত—

তারিণী। তরুণদের তেমন আগ্রহ দেখলুম না—

বাগচীমশাই। তারা এখন আধ্যাত্মিক কথার কি বুঝবে? ও-বয়সে আমরাই কি বুঝতুম! ওরা এখন সব কথা তো শোনেনি—রমণ মিত্তির সাহেবের চাকরি করে, এইটুকুই তারা জানে। জানে না যে বাইরে তাঁর কি প্রতিপত্তি। এই সেদিন নবদ্বীপ থেকে কেশব ন্যায়রত্ন প্রমুখ ১০৮ জন বড় বড় পণ্ডিতের স্বাক্ষরযুক্ত, তাঁর "ভক্তিভূষণ" উপাধি এসে পড়েছে! গ্রাম ধন্য হয়েছে। হ্যাঁ—একবার গঙ্গাতীরে নোটিস্ বিতরণে যেতে যেন ভুল না —রাজ্যের ভক্তের দর্শন পাবে। ঐ সাধন-চক্রে তাঁরাই

তো নিত্য নিয়মিত যান—সংকীর্ত্তনে আত্মহারা হয়ে' পড়েন।

তারিণী। যে আজ্ঞে। এই গয়লাপাড়াটা সেরে নিশ্চয়ই যাবো--

গোবিন্দ রায়। কেমন বাগচী, সে কত পূর্ব্বের কথা! মিত্র মহাশয়ের মহাভাবের সূচনার কথা তোমাকে বলতুম না। এখন দেখে নাও।

পরাশর গোঁসাই। কঠোর সাধন ভিন্ন কি এতটা সম্ভব হয়েছে!—আমাদের জীবনটা—(দীর্ঘনিশ্বাস)

গোবিন্দ রায়। আমি ওঁর কঠোর সাধন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি। শুনলে আপনারা স্তম্ভিত হবেন। ইচ্ছা করেন তো···

গদাধর গাঙ্গুলী। খুব ইচ্ছা করি, অমৃত পানে কার অনিচ্ছা!

গোপালবাবু। বেশ কথা—চলো আজ, সাধুপ্রসঙ্গই শোনা যাবে—

দুর্গাদাস। সেই ভালো —

সকলে গমনোন্মুখ। চন্দ্র চৌধুরী ও হারু পুরোহিতের প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। কি ব্যাপার, হাতে ওসব কি?

গোপালবাবু। (নমস্কারান্তে) বড় সুখবর দাদা! আমাদের গর্ব্বের বস্তু ভক্তিভূষণের সমাধি উৎসব এই বৃহস্পতিবার। এ তারই নোটিস্—

চন্দ্রবাবু। তাই নাকি? আশ্চর্য্য ব্যাপার গোপাল, ---আগুন আর কতদিন ছাই চাপা থাকবে। গত রাত্রে তাঁর এমন অবস্থা হয়েছিল—আমি আর বাড়ী ফিরতে পারি না!—এখন ঘন ঘন মুচ্ছে হয় কি-না—(তারিণীর প্রতি) এই যে তারিণী, আর বাকি কতো? স্ত্রী পুরুষ কেউ যেন না বাদ পড়েন।

তারিণী। এ মহাপুরুষের কাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন;—তিনিই করিয়ে নেবেন---

হারু। এই তো কথা। শাস্ত্রও বলছে—"যতই করিবে দান---"

চন্দ্র চৌধুরী। (সহাস্যে তারিণীর প্রতি) দ্বাদশ মন্দিরকেও বাদ দাওনি দেখলুম---

তারিণী। যা তিনি করাচ্ছেন—সাধ্যমত কোরে চলেছি—

চন্দ্রবাবু। বেশ বেশ, এই বিশ্বাসই চাই—

তারিণী। (এদিক ওদিক দেখে নিয়ে) পর পর তিনটে হোলো, তিনটেই গেলো—আবার এসেছে! কৃপা না হোলে এবার ঢাকি সুদ্ধ‌ই—

চন্দ্রবাবু। ওকথা মুখে এনো না তারিণী। সুযোগ পেলেই ওঁর মুখ থেকে কইয়ে নেবো—

তারিণী পায়ের ধুলো নিলে। চন্দ্রবাবু চলে গেলেন।
পূর্ব্বেই এক এক কোরে সব এগিয়ে ছিলেন

তারিণী। হারাণ, শিগ্‌গির্ দে বাবা। আবার কোন্ মহাশয় দেখা দেবেন।

হারাণ। নিন্—তয়েরিই আছে—

হুঁকাটি তারিণীকে প্রদান। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ ঘোষালের প্রবেশ

তারিণী। চুলোয় যাক্—রেখে দাও হারাণ।

হারাণের হস্তে প্রদান

রঘুনাথবাবু। খুব কাজ কোরচো তারিণী! রাস্তা, ঘাট, হাট কোথাও বাকি রাখনি! আবার বটগাছটার গায়েও পোষ্টার্ দেখলুম!

তারিণী। আজ্ঞে মহাপুরুষের কাজ—

রঘুনাথ। গাঁয়ের হাওয়া কি রকম বুঝচো?

তারিণী। আজ্ঞে প্রবীণেরা, মহিলারা—সকলেরি তো আস্থা আর আগ্রহ দেখ্‌ছি। দশ বিশ জন ভিন্ন-গোত্রের যে নেই তা নয়।

রঘুনাথ। (ঈষৎ চাপা হাসি টেনে) ভয় কি, একটু বুদ্ধি খেলিয়ে এদেশে যা চালাবে তাই চলে' যাবে—ধর্ম্মের সুগন্ধ থাকলেই হোলো! বেশ বেশ—

বলতে বলতে চলে' গেলেন

তারিণী। না না হারাণ—আর না! তামাকে আজ অভদ্রা পড়েছে। এখনি আর এক মহাত্মার আবির্ভাব হবে, —থাক্। প্রফেসর মানুষ কি-না, একটু লেক্‌চার্ ঝেড়ে গেলেন। একপাল্ ছেলেমেয়ে আর পরিবারের সূতিকা না হোলে ধর্ম্মের সুগন্ধ কেই বা পেতো!—আচ্ছা, চললুম হারাণ—

হারাণ। সাজা তামাকটা,...আপনি কিন্তু লাক্ কথার এক কথা শুনিয়ে গেলেন। (নমস্কার)

তরফদার কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীরে একটি ছোট বাগান-বাড়ী। সময়—প্রভাত.
উপস্থিত—বৃদ্ধ যাদব শিরোমণি

নামাবলী গায়ে, খড়ম পায়ে, সাজি হস্তে পুষ্প চয়ন করতে করতে—
রমণ মিত্রের প্রবেশ। মুখে—হরের্নামৈব কেবলম্

শিরোমণি। এসো এসো—রমণ ভাই এসো—অনেক দিন দেখিনি! নিজের সামর্থ্য গিয়েছে, এলে—তাই দেখতে পেলুম। দেহ আর থাকতে চাইছে না ভাই, তা'রো তো অপরাধ নেই—বহুদিন বহন করেছে। কেমন আছ? পরিবারবর্গ কেমন?—কাছে এসো, কাছে এসো, —বোসো।

রমণ। (দাঁড়িয়ে থেকেই) স্নান করেছি—এখন আর...

শিরোমণি। (সহাস্যে) তুমি যে ক্রমেই কঠোরতা আরম্ভ করলে দেখছি! স্নানান্তে কি পথে পথেই থাকো!

রমণ। হরি-মার্গে বটে। যাক্—সে বুঝতে তোমার বিলম্ব আছে যাদব।

শিরোমণি। বুঝতে তো আপত্তি ছিল না ভায়া—দেহ যদি অপেক্ষা কোরতো; সময় কই!

রমণ। ওটা সাধারণ কথা হে। তাঁর কৃপা হ'লে —মুহূর্ত্তের কথা যাদব—কৃপাই মূল। তা না তো স্ত্রীলোক —তায় বিধবা, তাকে এত বড় বুকের পাটা কে দিলে! আমি তো আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছি যাদব ..

শিরোমণি। কার্ কথা বোল্‌চো?

রমণ। শোন নি! আমাদের ব্রজ লাহিড়ীর স্ত্রী হে। কী ভাগ্য! পুণ্যবতী ওই অতো টাকার বাগানবাড়ী— রাধারাণীর নামে লিখে-পোড়ে একদম্ উৎসর্গ কোরে দিচ্ছে! একে বলে ভগবৎ কৃপা! এক মুহূর্ত্তে দিন কিনে নিলে ..

শিরোমণি। বলো কি! হ্যাঁ—ত্যাগ বটে! বাঃ...

রমণ। (বাধা দিয়ে) শুধু বাহবা দিয়ে আর কি হবে? নিজের নিজের কর্ত্তব্যের কথাও ভাবতে হয়।

শিরোমণি। কর্ত্তব্য তো অনেক আছে ভাই, ছিলও অনেক! কিন্তু কর্ত্তব্য থাকা, আর কর্ত্তব্য পালনের ক্ষমতা থাকা যে এক জিনিস্ নয় রমণ! তুমি ঠিকই বলেছ—তাঁর কৃপাই মূল...

রমণ। আবার তাঁর কৃপার মজা এই—যাকে যতটুকু দিয়েছেন তার সেই অনুপাতে ত্যাগই, অন্যের বড় বড় ত্যাগের চেয়ে তাঁর বেশী আদর পায়। লোক বুদ্ধির দোষে নিজেকে ছোট আর অক্ষম ভাবে! যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি কি তোমাকে লক্ষ টাকার পরীক্ষায় ফেল্‌বেন? তুমি কি চুরি করতে যাবে? বিদুর কি আর ভগবানকে সোনার খুদ খাইয়েছিলেন?

শিরোমণি। (অন্যমনস্কে—নিশ্বাস ফেলে, আপন মনে) অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ—

রমণ। ওসব তোমাদের পুঁথি-মুখস্ত উপসর্গ ছাড়ো। এখন কাজের সময় এসেছে যাদব—বলছিলে না—দেহ আর থাকে না...

শিরোমণি। তাতে সন্দেহ নেই ভাই। ছেলে উপায়ক্ষম নয়, তার আবার কতকগুলি ছেলে-মেয়ে; তাদের চিন্তা যে এড়াতে পারি না...

রমণ। (বিরক্তভাবে) পুঁথি-ঘাঁটা বিদ্যেয় ওর বেশি আর কি হবে! কার কি হবে ভাবতে গেলে—নিজের পরকালে শূন্য পড়ে! এখন নিজের কি হবে ভাবো। রত্নাকরের অবস্থাটাও কি ভুলে গিয়েছ?

শিরোমণি। (উদাসভাবে) না ভুললেও, ভেবেও তো কূল পাই না রমণ—

রমণ। সিদ্ধগুরু না পেলে, অনেক পণ্ডিতেরই ঐ দশা দাঁড়ায়। জোর কোরে যে একটা কিছু পুণ্যকর্ম্ম কোরে যেতে পারে, সে-ই বেঁচে যায়। অন্তে সেটা সাহায্য করে। "আট্‌কে" বেঁধে নিশ্চিন্ত হ'তে হয়। পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিরিম্—জানো তো—

শিরোমণি। তা তো জানি...

রমণ। জানো ছাই আর পাঁশ্—ছেলে আর নাতী! তারা তোমায় স্বর্গের সিংহাসনে বসাবে!

শিরোমণি। সিংহাসন তো লোভের আসন নয় রমণ, —আমি একটু শান্তি চাচ্ছি ভাই—

রমণ। শুধু চাইলেই তো পাওয়া যায় না যাদব—মূল্য দিতে হয়।

শিরোমণি। ব্রাহ্মণের ভিক্ষাই যে ভরসা—

রমণ। তার পাওনাও তেমনি! দেওয়া নেওয়াই নিয়ম…

শিরোমণি। (উচ্ছ্বসিতভাবে) বাঃ কথাটা লাখ টাকা দামের—বাঃ!

রমণ। তোমার যে ভাব লেগে গেলো। সমাজে থাকতে গেলে পরস্পরের একটা কর্ত্তব্য আছে, স্বীকার করো তো?

শিরোমণি। খুব করি—তা না তো সে…

রমণ। "তা না তো"টা এখন থাক্। তোমার শরীরের অবস্থা যা দেখছি তাতে কর্ত্তব্যবোধে বলতেই হয় —বছরে একটা বই দুটো "অক্ষয়-তৃতীয়া" আসে না—(এই পর্য্যন্ত বলেই কেঁপে চমকে উঠলেন) আমি চললুম…

শিরোমণি। কি হোলো! হঠাৎ অমন কোরে উঠলে যে?

রমণ। (হাত জোড় কোরে উর্দ্ধে নমস্কার) দয়াময় আমাকে লাগাম লাগিয়ে রেখেছেন—অন্যমনস্ক হ'লেই টান্ পড়ে, সচেতন ক'রে দেন! পাঁচ জনের মোট্ মাথায় নিতে গেলেই ডুবতে হয়…

চিন্তাকুল নিম্নদৃষ্টিতে

বেলা কতো হোলো?

শিরোমণি। বেলা কোথা! এখনো সাতটা হয় নি, প্রায় বটে—

রমণ। ওঃ তাই। নিয়মভঙ্গ তিনি সইতে পারেন না। আসন শূন্য রাখা…

শিরোমণি। বুঝলুম না ভাই!

রমণ। পারবে না তা জানি! যাদের নিত্য নিয়মিত লক্ষ জপের শরীর, তাদের নিয়মভঙ্গটা যে কত বড় পীড়া, তা তুমি বুঝবে কি কোরে! যেখানে শাস্ত্র নেই—শ্লোকের অভাব—সেইখানেই তোমাদের অন্ধকার। ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য যে গুরুমুখী—আধ্যাত্মিক। সে সারা শাস্ত্র চষে ফেললেও মিলবে না। সদ্‌গুরু চাই…

শিরোমণি। তার আর দিন কই—পাই বা কোথায়। ভগবৎ কৃপা ভিন্ন তো মেলে না।

রমণ। (সহাস্যে) আবার দোরে এলেও তো চিনতে পাবে না। যাক্ তোমার মত সাধারণের পথ খুব সোজা।

শিরোমণি। তা হ'লে তো বেঁচে যাই—সেই সোজাটাই বলো ভাই…

রমণ। নাম আর দান্—পারবে? এই দুটি দয়াময় আমাদের জন্যে ব্যবস্থা কোরে দিয়েছেন। দানের মধ্যেই সব রয়েছে। তাতে আনন্দ লাভ ও পরলোক পরিষ্কার। অক্ষয় তৃতীয়া সামনে। দানের অমন প্রশস্ত দিন আর নেই। বিশেষ, নিদাঘে জল দান। এই অক্ষয় তৃতীয়াটিই তোমার ভরসা!

শিরোমণি। তুমি বন্ধুর কাজই করলে ভায়া। ও কাজটি বরাবরই কোরে এসেছি, এবার দেহের অবস্থা দেখে ইতস্তত আসছিল—তুমি সচেতন কোরে দিলে ভাই—

রমণ। (আশ্চর্য্যভাবে) তুমি বুঝি কলসী উৎসর্গের কথা বুঝলে! ও-তো দুলে মালীতেও কোরে থাকে হে। যদি শ্রদ্ধা থাকে—ভগবানের উদ্দেশে জলাশয় উৎসর্গ করো। তোমার আছে বলেই বলছি। মোহে পুত্রাদির মুখ চেয়ে ওটা রেখে তোমার লাভটা কি! সাধারণে উপকৃত হবে—ভগবান তাদের ভিতর দিয়েই গ্রহণ করেন। তোমার সেটা আবশ্যক, মলিন-আত্মার শান্তি—তাও পাবে। তোমার জন্যে এর চেয়ে সহজ আর কিছু তো দেখছি না যাদব—

শিরোমণি। কথা ঠিক্ ভাই, একটা পুষ্করিণী আছেও সত্য। কিন্তু ওটি যে পূর্ব্বপুরুষদের শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা করা। সকলেই জল ব্যবহার করেন—কারো কোনো বাধা তো নাই। পিতামহের উৎসর্গ করা জিনিস্, দ্বিতীয়বার আমি কি কোরে…না ভাই, আমার দ্বারা সে কাজ সম্ভব নয়—শাস্ত্রসম্মতও নয়। পুণ্যকর্ম্ম সুকৃতিসাপেক্ষ, আমার সে ভাগ্য নয়। না · জ্ঞানকৃত অপরাধের ক্ষমা নেই। ও-তো ভাই সকলের জন্যেই রয়েছে—ব্যবহারে কারো তো মানা নাই—তবে আবার ··

রমণ। (মুখখানা কদাকার হ'য়ে উঠলো—ক্রুর হাসি টেনে) তোমার বিপরীত বুদ্ধি এসেছে কি-না, সেইটে দেখবার উদ্দেশ্যেই ভাল কথা কোয়ে দেখলুম। শেষ সময়ই বটে, ওটা শেষ সময়েই এসে থাকে—ঠিকই এসেছে।

তোমার এখন যা কর্ত্তব্য ও উচিত—তাই সেই প্রস্তাবই করে' ছিলুম। ভাগ্য কেউ কারুকে দিতে পারে না—

শিরোমণি। খুব ঠিক্ কথা ভাই—

উক্ত কথাগুলি বলেই, মিত্র মশাই আহত সর্পের মত গর্জ্জনসহ সাজি হোতে (বাগান থেকে তোলা ফুলগুলি) মুটো মুটো কোরে অপবিত্র বোধে ঘৃণা ভরে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন!

রমণ মিত্রের ভাব, কথা ও কাজ দেখে শিরোমণি স্তম্ভিতভাবে অবাক হয়ে' চেয়ে রইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—তিনকড়ির বহির্ব্বাটী (রোয়াক)। সময়—বেলা আটটা, উপস্থিত—তিনকড়ি, বিমল, অনাথ, হিমাংশু প্রভৃতি বন্ধুগণ। প্রবেশ—সুকেশ, শিরোমণি-পুত্র কালাচাঁদ, নিতি গয়লানী

সুকেশ। এই তোমাদের গাঁয়ে জন্মে আর তোমাদের বদ্ হাওয়ায় থেকে ফ্লরিশ্ করতে পারলুম না—দরকোঁচা মেরে গেলুম্; কেউ চিন্‌লে না বুঝলে না। হোতো আজ জার্ম্মণি—মাথার মণি কোরে রাখ্‌তো—

তিনকড়ি। আর পত্নী, ভনী ম্যাভরোজিনী হ'তে পারতেন! গাঁয়ের কি অপরাধটা হোলো শুনি? গাঁয়ের বদনামটা দিও না বাবা! সকলেই স্বীকার করে—তাদের পরকালটার গোড়ায়—তোমার ইহকালটা প্রচুর কাজ করেছে।

সুকেশ। ওটা আমার স্বভাব ভাই—পরের জন্যেই খেটে মরি। যাক্—আত্ম-প্রশংসা শুনতে চাই না, তোমরা কৃতজ্ঞ থাকলেই হোলো! শুনলুম My Lord এসে গেছেন এবং ফতে কোরেও! কেয়াবাৎ ব্রেন্—

তিনকড়ি। হেঁয়ালী ছাড়ো, খুলে বলো—

সুকেশ। আমাদের poor ব্রজ লাহিড়ীর বাগান বাড়ির disposal হে। মনে আছে শর্ম্মার ভবিষ্যৎ বাণীটা—"ভূতের জেম্মায় গেলো"!

বিমল। কুকল্পনা তোমার মাথায় খুব আসে—তা জানি!

সুকেশ। (চম্‌কে) Who হে-বিমল! নাম লিখিয়েছ নাকি? Beg your pardon Savant!

তিনকড়ি। সুকেশের কথাটা শুনতেই দাও বিমল—

বিমল। বাজে কথা আর কি শুনবে? পরের ভার মাথায় কোরে, এক সপ্তাহে সাতদেশ ঘুরে তিনি ফিরেছেন। এর মধ্যেই সুকেশ, না শুনেই সব অনুমান কোরে নিয়েছে! তার অনুমানের মূল্য কতটুকু?

সুকেশ। (গম্ভীরভাবে) যত্র প্রতিভার সমঝদার আর আদর নেই, তত্র মৌনম্হি সম্মতম্!—এইবার তোমাদের মূল্যবান কথাই চলুক্—শোনা যাক্—

হিমাংশু। সাত দেশ ঘোরা মানে যদি—দর্জ্জিপাড়া, হাতীবাগান, হেদো হয়, তাহলে বিমল ঠিকই বলেছে! তাতে কিন্তু টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটিকে ফ্যাসাদে পড়তে হয়—দেশের ডেফিনিসন্ বদ্‌লাতে হয়!—আমি কিন্তু মিত্র মশাইকে নিত্যই কলকেতার রাস্তায় দেখেছি—

বিমল। তাতে—হাওড়া, শিবপুর, বালিগঞ্জ ঘোরা আটকায় না। ঐ সব স্থানেই বাগানবাড়ী কেনবার মতো লোক্ থাকেন—

অনাথ। বিমলের কথায় প্রতিবাদ চলে না। তবে আমাদের আপিসের গায়েই মিত্র মশায়ের আপিস কি-না—আপিসেও তাঁকে নিত্য দেখেছি ভাই—

সুকেশ। আহা—বলে' যাও বন্ধু-অমৃত সমান ঠেক্‌ছে।

বিমল। মনটা একটু পরিষ্কার করো সুকেশ। জানো—তাঁর অবস্থাটা কি?

সুকেশ। (বেশ সহজভাবে) একদম্ বৃহস্পাতির—

বিমল। তার মানে?

সুকেশ। যাতে হাত লাগান তাই সোনা হয় এবং যা করেন তাই শোভা পায়—

বিমল। কেনো শোভা পায়?

সুকেশ। সেটা এ গাঁয়ের বুদ্ধির সার্টিফিকেট্!

বিমল। পরশ্রীকাতরতা আমাদের মজ্জাগত—

তিনকড়ি। (বিমলের প্রতি) তুমিও কি পাগল হ'লে? বুঝচো না ও তোমাকে তাতাচ্ছে!

বিমল। ওর সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে চাই না—সময়ে নিজেই ওঁকে বুঝবে। আমার বেলা হ'ল—চললুম্—

সুকেশ। আমিও ওই কথাই বলি বিমল—সময় হ'লে নিজেই বুঝবে।

মুখখানা গম্ভীর কোরে বিমল চলে গেল

তিনকড়ি। সুকেশ—তুমি বড় ছেলেমানুষ! তুমি জান না বিমলের বাবা চক্রসভার সম্পত্তিরূপে ছ-ছটা ফলন্ত নারকোল গাছ মিত্তির মশাইকে লিখেপোড়ে দিয়েছেন! মিত্র মশাই এখন গাঁয়ের গুরুস্থানীয়, সকলেই ভক্তি করে ··

সুকেশ। আমি ভাই সত্যিই জানতুম না যে আমাদের মধ্যে ভি, আই, ডি, অর্থাৎ ভণ্ড ঢুকেছে! বয়সে দু-তিন বছরের বড় হলেও ব্রজ লাহিড়ী ছিল আমাদের পার্টির লোক। বেচারা হাড়ভাঙা খেটে, সতেরো হাজার টাকায় ওই সখের বাগানবাড়ী বানালে—ভোগ করতে পেলে না—মরে' গেল। পরিবার বেচারী সেই বাড়ী বিক্রি কোরে দেবার জন্যে মাতব্বর ধরেছেন—ওই রাঘব-বোয়ালকে! (চারদিকে চেয়ে নিয়ে) আর কেউ আছো নাকি!—ব্রজর মক্কেল-মারা পয়সার এইবার সদ্ব্যবহার হবে—

হিমাংশু। তোমার এইসব অনুমানের জন্যেই তো বিমল চটেছিল—

সুকেশ। কি কোরবো· প্রতিভা যে ঠেল্ মারতে থাকে, রুক্‌তে পারি না—

অনাথ। তা বউঠাকরুণ যে বড় ওঁকেই ধরলেন? চন্দ্রবাবু তো ছিলেন।

সুকেশ। চন্দোর বাবুর আর সেদিন নেই—জমিদারী লাট খাচ্ছে! তিনিও দৈবের দোর্ ধরেছেন—মিত্তিরের শরণাগত! তাঁরই সুপরামর্শে এটা হয়েছে। ব্রজর লাইফ্ বীমার টাকা বার কোরে দিতে মিত্তির খরচ টেনেছেন—সাসাত! বুঝলে।

তিনকড়ি। থাক্—ওসব কথায় কাজ নেই। বেলাও হোলো—বেরুতে হবে—

কালাচাঁদকে আসতে দেখে

এই যে কালাচাঁদ—এসো ভাই।

কালাচাঁদ। কি করি বলো দিকি—একটা পরামর্শ দাও। কিছু না করলে আর নয়। যে অবস্থায় পড়েছি—কিছুই ঠিক্ করতে পারছি না। বাবার শরীর ভগ্ন—কয়দিনই বা আছেন। শিষ্যের গঙ্গাতীরের বাড়িতে গিয়ে রয়েছেন। সংসারের কথা তাঁকে শোনাই না। জানই তো—বাবার সঙ্গে মিত্তির কাকার মৌখিক আলাপ থাকলেও অন্তরের মিল্ নেই—হারু-দা আমাদের বাড়িতেই থাকতেন, বাবার কাছে কিছু কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম শিখতেন। ইদানিং বাবার যজমানদের কাজ করাতেন। সাত বছর থাকবার পর কি হোলো বুঝলাম না—মিত্তির কাকা তাঁকে টেনে নিয়েছেন—আশ্রয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে যজমান-গুলিও তাঁর হাতে গিয়েছে। তাঁরও তো দরকার। তবে বাঁচতে হ'লে, এক মুঠো যে পেটেও দিতে হয়—তার উপায় দেখতে যে পাচ্ছি না ভাই—

তিনকড়ি। হারু ভট্‌চাজ, সাত বছর শিরোমণি মশায়ের অন্ন খেয়ে—পুত্রবৎ পালিত হয়ে, সব জেনে শুনে নিয়ে শেষ এতবড় বেইমানীটা করলে!

সুকেশ। প্রভুর খপ্পরে পোড়ে গেছে, দেখো আরো কি করে। তার ভালোর জন্যে তো প্রভু টানেন নি! সমাজে গরীব আর মূর্খের যে বড় দরকার! তারাই যে বুদ্ধিমানদের অস্ত্র। কালাচাঁদ—আর যেন ঐ তোমার হারু দাদাটিকে বাড়িতে ঢুকতে দিও না, কাগজপত্র সাবধান! প্রভুর ইচ্ছার গতি কোন্ দিকে তা বলা যায় না। আমাদের জমিদারীর একটু গন্ধ আছে—মনও তাই সন্দেহশূন্য নয়।

কালাচাঁদ। আচ্ছা, এখন চললুম ভাই—আমার জন্যে একটু ভেবো—

হিমাংশু। তোমার জন্যে কে না ভাববে ভাই—

তিনকড়ি। একটি নিষ্পাপ নিরীহ লোকের উপর কি অত্যাচার! ওঁদের পুকুরটা প্রভুর চাই!—যাক্ ও পাপ কথা। সকলে কিন্তু কালাচাঁদের জন্যে উপায় দেখো ভাই—

কালাচাঁদ উদাসভাবে চলে' গেল। নিতি গয়লানীর প্রবেশ

নিতি। যেও না যেও না বাবুরা, আমায় নির্ব্বংশটা কোরে যাও—আমি যে গেলুম। সারা বছর ধোরে সতেরো গণ্ডা টাকার দুধ খেয়ে পয়সা দেবার নাম করে না। বলে এতো তাড়া কেনো! আমার এখন মাথার ঠিক্ নেই—সভার উচ্ছোব আসছে—বিশ মোণ দুধ চাই, তেরো মোণ দই! বলেন "সব টাকা—একসঙ্গে চুকিয়ে নিয়ে যাস্, কাজে লাগবে। নিলেই খরচ্ করে ফেলবি।" শুনলে কথা? ইদিকে ঘরে আমার ছেলে শুষছে, ডাক্তার দেখাতে পারি না। বলে খরচ করে ফেলবি! ও টাকা কি আমার ছাদ্দে লাগবে?

সুকেশ। নেত্য, কার কাছে পাবে? সতেরো গণ্ডা টাকা ফেলে রাখতে যে সদরালারা পারে না! গৌরী সেন মরে জন্মেছ দেখছি—

নেত্য। আমি মরি, আর তোমার কেবল তামাসা সেজোবাবু।

সুকেশ। ভাবনা কি—ছাদ্দোর টাকা তো রয়েছে। কার কাছে শুনি?

নেত্য। তা ভালো লোকের কাছেই আছে—তা বলছি না। কিন্তু না পেলে আমার চলে কি কোরে?

সুকেশ। এক বছর চল্‌লো কি ক'রে নেত্য?

নেত্য। তোমার যেমন কথা! দশ মাস পেটে ধরেচে বোলে ছেলেটাকে আরো পাঁচ মাস পেটে রাখতে 'বাড়িতে' ব'লে দেখ না—কেমন পারে!

সুকেশ। ও—তোমার সেই অবস্থা! তা সাধুপুরুষ বললে থাকে নেত্য থাকে। তোমার মঙ্গলের জন্যেই জমাচ্ছেন। কই বললে না কে?

নেত্য। ওই তো নাম করলে! তাই তো জোর ক'রে চাইতে পারি না।

সুকেশ। বাপরে, খবরদার—ওঁরা সব পারেন। তুষ্টি থাকলে তোমার এঁড়েই কেঁড়ে কেঁড়ে দুধ দেবে—

নেত্য। দেখুন না আপনারা? এলুম দুঃখু জানাতে, আমি মরছি আর সেজবাবুর তামাসা দেখা! সেখানে চাইতে পেলুম—দেবতা বললে—হরিকে খাওয়াচ্ছিস, তোর বাপের ভাগ্যি তা জানিস? ও টাকা মুখ ফুটে কি চাইতে আছে? সে আমি তোকে গোপনে ডেকে দেবো; —বুঝলি? ও চাইতে নেই। হ্যাঁ রে, গয়লার মেয়ে হ'য়ে গরুর দেবতাকে চিনলিনি? ওরা কার বাঁশী শুনে হুড়্ হুড়্ করে দুধ দিতো? সেই দুধে দুধে বৃন্দাবনের মাটি ভিজে হোড়্ হয়ে গোপি চন্দন দাঁড়িয়ে গেল। সেই দেবতাকে একটু দুধ খাইয়েচিস্ তারি তাগাদা করিস? এমন কাজ আর করিসনি। সে আমি অন্য নাম করে দিয়ে দেব'খন। আগে তাঁর উৎসবটা মিটিয়ে দে। দুধ, দই, ছানা, ননী, মাখন যা তোর প্রাণে চায় আনিস। ওই সবই তাঁর প্রিয় আহার। যা এখন যা—

সুকেশ। কথাটি কওনি তো?

নেত্য। কথা কইবো? লজ্জায় মরে গেলুম। কিছু তো কেউ শেখায়নি –

সুকেশ। (গম্ভীর) ঠিক্, ঠিক্, করেছ। তবে আবার কি? এইবার সব শিখবে। এঁড়ে আছে কটা?

নেত্য। যাও যাও! (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) ওগো আমার সতেরো গণ্ডা টাকা যে গো!···

অনাথ। কেঁদ না গয়লা-বউ। তোমরা হ'লে গোপিকার জাত—তুমি কেনো গিয়েছিলে? বিধুকে পাঠাওনি কেন?

ত্যে। আ আমার পোড়া কপাল। সে মিন্সেও যে কণ্ঠি পোরে মরেছে গো! সে পোড়ারমুকোও যে 'মেম্বর' গো—(কান্না) আমি দুঃখের কথা জানাতে তোমাদের কাছে এলুম, আর সেজোবাবু কি-না এঁড়ের খোঁজ নেন—আমি আর কোথায় যাবো গো?

সুকেশ। কাঁদিসনি—কাঁদিসনি। তোর টাকা মারে কে। যা—বেলা হয়েছে, আমাদেরও তাড়া আছে। যখন শুনলুম, যা হয় কোরব'খন—

নেত্য। যা হয় করো সেজবাবু, আমি মরে যাব—তোমার দুটি পায় পড়ি—

সুকেশ। চ' এখন।

সকলের প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

কালিদাসের কবিত্ব-গৌরব ও পুরাণকার

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার এম্-এ

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় গত বৎসর ভাদ্র-সংখ্যার "ভারতবর্ষ"-এ মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের সৌন্দর্য্য ও দার্শনিক-তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবির কাব্যকথায় প্রকৃতি-পুরুষ মিলনের যে সূক্ষ্ম আদর্শ নিহিত রহিয়াছে বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহারও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কবির এই সৌন্দর্য্যানুভূতির মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে গেলে যে স্বতই পুরাণকাব্যের কথা মনে পড়ে সেই সম্বন্ধে দু-চার কথা বলিব বলিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা। পুরাণকার যে দক্ষশিল্পী ও রূপকার এবং মহাকবির সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও রসানুভূতি যে পুরাণাবগাহী এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলে পুরাণকে আমরা নূতন চক্ষে দেখিতে শিখিব। এই প্রবন্ধে আমি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অসমাপ্ত কথাগুলি শুনাইয়া দিব।

রস মানবজীবনের শাশ্বত অবলম্বন। রসই মানবের উপজীব্য ও আনন্দস্বরূপ। এই রসানুভূতি যাহার নাই সে চেতনাবিশিষ্ট জীব হইয়াও জড় ও মুক অথবা প্রাকৃত জীবনের বীভৎস পঙ্কিলতায় পরিতৃপ্ত। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-ময়ী বিশ্বপ্রকৃতি ভাবের রসায়ন। রসাস্বাদনে মানবের চিত্তে যেখানে শাশ্বত ভাবের সমাবেশ হয় না সেখানে রসসৃষ্টি নাই; তাই রস অপ্রাকৃত এবং এই অপ্রাকৃত রস সমাবেশেই আদর্শবাদের সৃষ্টি। যে রসসৃষ্টি মানবচিত্তকে কদর্য্যতার গ্লানিতে অভিভূত করে তাহাই বাস্তবতা। মানুষের আদিম বর্ব্বর মনই কেবল এই বাস্তবতার অনুভূতিতে বিকল। সৃষ্টির আদিকাল হইতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া এই দুই অনুভূতি মানব-মনকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে, পরস্পরে অনুস্যূত হইয়া কবির সৃষ্টিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া নির্দ্বন্দ্বের আভাস দিতেছে। যার ভিতর এই অনুপ্রেরণা নাই, এই দ্যোতনা নাই, এই আভাস নাই সে রসসৃষ্টি ব্যর্থ। এই দুয়ের আনাগোনাতেই কবিত্বের জন্ম,—এই দুয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণেই রসের সৃষ্টি। রামায়ণের ট্রাজেডি মানব-মনকে ক্ষত, বিক্ষত, রুধিরাক্ত করিলেও মানবচিত্ত শুধু এই দ্যোতনায় অমৃতনিস্যন্দিনী ধারায় অভিষিক্ত হয়।

সমাধিকুঞ্জে অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাব। বিস্ময়-বিমুগ্ধ শঙ্কর বসন্তের এই আকালিকী প্রবৃত্তি দেখিয়া বিক্ষিপ্ত মনকে ধ্যানপ্রবণ করিতে চেষ্টা করিলেন। দেবপ্রয়োজনে রতিপতি মদন দেবদেব মহাদেবের বামপার্শ্বে আসীন,—মহেশ্বরকে কামবাণে ব্যথিত করিতে প্রয়াসী। এই মানসিক বিপর্য্যয়-সঙ্কটে সখীসমন্বিতা পুষ্পাভরণা পার্ব্বতীর আবির্ভাব। হৃদয়,—ভক্তিবিনম্র, হস্তে,—পুষ্পসম্ভার। আর তাঁর রূপ? পুরাণকার সে রূপ বর্ণনা করিতে অক্ষম।

> পৃথিব্যাং যাদৃশং লোকে সৌন্দর্য্যং বিবিধং মহৎ।
> তৎ সর্ব্বৈকৈকতস্তস্যাং পার্ব্বত্যাস্তু বিনিশ্চিতং॥
> আর্ত্তবাণি চ পুষ্পাণি ধৃতানি চ তয়া তদা।
> তৎ সৌন্দর্য্যং কথং ধর্ন্যমপি বর্ষ শতৈরপি॥

—পার্ব্বতীর শিবপূজা সমাপ্ত। পঞ্চশরের ত্রিভুবনবিজয়ী শরও জ্যামুক্ত। অর্দ্ধনারীশ্বর নিজের মায়ায় নিজেই মুগ্ধ। ইহাই তাঁহার সৃষ্টি-বিলাস। চিরসুন্দরের তপস্বী ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতির রূপচ্ছটাকে উপেক্ষা করিলেন না। জগৎপিতা জগন্মাতার ত্রিলোকবিজয়ী সৌন্দর্য্যগানে ছন্দোমুখর হইলেন;—

> কিং মুখং কিং শশাঙ্কশ্চ কিং নেত্রে চোৎপলে মতে।
> ভ্রূকুট্যৌ ধনুষী চৈব কন্দর্পস্য মহাত্মনঃ॥
> অধরঃ কিঞ্চ বিম্বঞ্চ কিং নাসা শুকচঞ্চুকা।
> কিং স্বরঃ কোকিলালাপঃ কিং মধ্যঞ্চৈব বেদিকা॥
> কিং গতি বর্ণ্যতে হ্যস্যাঃ কিং রূপং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
> পুষ্পাণি বর্ণ্যতে কিঞ্চ বস্ত্রাণি চ পুনঃ পুনঃ
> লালিত্যঞ্চৈব যৎ সৃষ্টৌ তদেকত্র বিনির্ম্মিতম্॥

বিচলিত শঙ্কর,

> "ইত্যেবং বর্ণয়িত্বাতু তপসো বিররামহ।
> হস্তং বস্ত্রাঞ্চলে যাবৎ তাবচ্ছ দূরতো গতা।"

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া হাস্যোদ্ভিন্ন অধরে মায়াজিৎ শঙ্করের এই বিমুগ্ধভাব সন্দর্শনে নারীসুলভ সহজভাব পরিত্যাগ করিলেন না।

> স্ত্রী স্বভাবাৎ তদা সা চ লজ্জিতা সুন্দরী স্বয়ম্।
> বিবৃণ্বতী তথাঙ্গানি পশ্যন্তী চ মুহুর্মুহুঃ॥

পুরাণকারের এই সৃষ্টি সুষ্ঠু, সুসামঞ্জস, স্বচ্ছ, সাবলীল ও সহজ। জগৎপিতাকে সহজ মানুষের পর্য্যায়ে আনিয়া সহজ চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাই বাস্তবের চিত্র। বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হয়,—হাসি, কান্না, শোক, দুঃখ, হর্ষ, বিবাদ, প্রেম, অনুকম্পা, স্নেহ ও ভালবাসা। এই দ্বন্দ্বময় বাস্তবকে মন্থন করিয়া যে অমৃতের পরিবেষণ তাহাই আদর্শবাদ, তাহাই রস। এই রসবর্জ্জিত কাব্য, কাব্য নয়, এই রসবর্জ্জিত মনের কবিত্বগৌরব বৃথা।

মানুষ-ভাবাশ্রিত শঙ্কর স্ব-রূপের চ্যুতি আশঙ্কা করিয়া আত্মস্থ হইলেন।—

> এবং চেষ্টাং তদা দৃষ্ট্বা শম্ভুর্মোহমুপাগমৎ॥
> যস্যালিঙ্গন মেতস্যাঃ করোমি কিং পুনঃ সুখম্।
> ক্ষণমাত্রং বিচার্য্যেবং কিমহং মোহমাগতঃ॥
> ঈশ্বরোঽহং যদীচ্ছেয়ং পরাঙ্গ স্পর্শনং মুদা।
> তর্হি কোঽন্যস্তমঃ ক্ষুদ্রঃ কিং কিং নৈব করিষ্যতি
> এবং বিবেক মাসাদ্য পর্য্যঙ্ক বন্ধনং দৃঢ়ম্।
> রচয়ামাস সদ্ধাত্মা ঈশ্বরঃ কিং পতেদিহ!

মহাকবি কালিদাসের সৃষ্টির প্রথম চিত্র,—নিশ্চল, নির্ব্বিকল্প, সমাধিবান যোগী মানুষ-ভাববর্জ্জিত হইয়া আত্মারাম। এ সৃষ্টি মহিমময়, গৌরবোজ্জ্বল। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুরাশির মতই গম্ভীর, উদার, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপক। এ সৃষ্টির সম্মুখীন হইলে পাঠকের চিত্ত স্বতই অনন্তত্বে লীন হইয়া যায়, সবিকল্প মন নির্ব্বিকল্পত্বে লয় প্রাপ্ত হয়। নির্গুণ, নির্দ্বন্দ্ব, নিরাকার ব্রহ্ম!

> অবৃষ্টি সংরম্ভমিবাম্বু বাহমপামি বাধারমনুত্তরঙ্গম্।
> অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নির্বাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥
> কপাল নেত্রান্তর লব্ধ মার্গৈর্জ্যোতিঃ প্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ
> মৃণাল সূত্রাধিক—সৌকুমার্য্যং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ
> মনো নবদ্বার-নিষিদ্ধ-বৃত্তি-হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্
> যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥

—ত্রিলোচন শরীর মধ্যবর্ত্তী বায়ুগণকে রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, একারণ তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তিনি যেন বৃষ্টির আড়ম্বর নাই এতাদৃশ একখানি জলসম্বৃত গম্ভীরাকৃতি মেঘ, অথবা তরঙ্গসংঘাতবিহীন প্রশান্ত জলনিধি, কিংবা বায়ুপ্রচার রহিত স্থানবর্ত্তী, সুতরাং নিশ্চল শিখাধারী একটি প্রদীপ। কন্দর্প দেখিলেন, সেই সমাধিমগ্ন ত্রিলোচনের ললাটনেত্রের বিবর দিয়া একটা কেমন জ্যোতির শিখা,—আলোর ধারা বাহির হইতেছে। সেই যোগমগ্ন ত্রিপুরারি যোগবলে, দেহের নবদ্বার হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বীয় মনকে হৃদয়রূপ অধিষ্ঠানে অবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ যাঁহাকে অবিনাশি ও সনাতন বলিয়া জানেন, সেই স্বকীয় আত্মাকে স্বকীয় আত্মার মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেছেন।

মহাকবি এই ত্রিগুণাতীত "আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্" মহেশ্বরে মানসিক বিকার কল্পনা করিয়াছেন! নবদ্বার-নিষিদ্ধ-বৃত্তি সমাধিমগ্ন তাপস অদ্বৈতোপলব্ধিরত হইয়াও পঞ্চশরের তীক্ষ্ণ বাণে ব্যথিত ও চঞ্চল! কালিদাস অতি সন্তর্পণে শ্রদ্ধাবিগলিত অন্তরে জগৎপিতার এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্ম-লীন, ব্রহ্মস্বরূপ মদনান্তক শূলপাণির মদনের নিকট এই শোচনীয় পরাজয় তাঁহার জগৎপিতৃত্বে ও ঈশ্বরত্বে মানব-মনকে স্বতই কি সন্দেহাকুল করিয়া তোলে না? বস্তুত মহাকবি তাঁহার কাব্যের প্রথম ঝঙ্কার এমন চড়াসুরে বাধিয়াছেন যে, কবির কাব্যগানে গমকে গমকে সে ঝঙ্কার মূর্চ্ছনাহারা, —সহসা ছিন্ন বীণার তারে কাব্যজননীর বুকফাটা আর্ত্তনাদ! সন্তানের মুখে জনকজননীর শৃঙ্গারলীলা কীর্ত্তন! হরগৌরীর বিহার,—সে যে বিংশশতাব্দীর নায়ক-নায়িকার নগ্ন কামলীলা!

কাব্য-সুষমা যেখানে মানব-মনকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুরভিত করিবে, ভাষার ললিত ঝঙ্কার, কাব্যের ছন্দো-মাধুর্য্য ও উপমা-গৌরবের অন্তরালে সেখানে রহিয়াছে শুধু নারীর আসঙ্গলিপ্সার অনুপ্রেরণা! রসজ্ঞ কবি লেখনীমুখে স্বাদুজলধারা প্রবাহিত করিতে করিতে কাব্যের চরম বিকাশের সন্ধিক্ষণে যে পঙ্কিল স্রোতাবর্ত্ত রচনা করিয়াছেন, অরসজ্ঞ পাঠক সেই সন্ধিক্ষণে কবিত্বের চরম সমাধি রচনা করিবে। মানবচিত্তে যাবতীয় রসের স্ফুরণ করা কবিত্বের চরম গৌরব সন্দেহ নাই, মহাকাব্যের সেও এক বিশিষ্ট

লক্ষণ বটে, কিন্তু সন্তানের মুখে যদি জনকজননীর অনুপম ও অনবদ্য চরিত্র আদি রসাত্মক কদর্য্যগ্লানিতে ভরিয়া ওঠে এবং কুমার জন্মকথায় যদি তাহা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে তবে বাংলার বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ সে দৃষ্টিতে অধিকতর নিপুণ শিল্পী। শিশুর অভাবনীয় প্রশ্নে,—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে, "এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে"।

সপ্রতিভা জননীর হাস্যোজ্জ্বল অধর,—মুখে তার চন্দ্রালোক-শুভ্র ধরণীর মায়া। শিশুর কচিমুখে কাব্য-কল্প-লোকের ছায়াপাত করিয়া জননী উত্তর করিলেন,—

মা শুনে কয় হেসে কেঁদে, খোকারে তার বুকে বেঁধে,
ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।
ছিলি আমার পুতুল খেলায়
প্রভাতে শিব পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি॥
আমার চিরকালের আশায়, আমার সকল ভালবাসায়
আমার মায়ের, দিদিমায়ের পরাণে
পুরানো এই মোদের ঘরে, গৃহদেবীর কোলের 'পরে
কতকাল যে লুকিয়েছিলি কে জানে॥
যৌবনেতে যখন হিয়া, উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে॥
নির্নিমেষে তোমায় হেরে, তোর রহস্য বুঝিনে রে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।
ওই দেহে এই দেহ চুমি মায়ের খোকা হ'য়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে॥

হর-নেত্র-বহ্নি-জ্বালায় মদন ভস্মীভূত। ব্যর্থকামা পার্ব্বতী বিক্ষুব্ধা হইলেন। ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতির পরাজয় ঘটিল। মহামায়া তাঁর প্রাকৃতশক্তির অভাবনীয় ও শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া নিজেকে ধিক্‌কৃতা মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহেশের নাম মুহূর্ত্ত মাত্র বিস্মৃতা হইলেন না।

নিনিন্দ চ স্বকং রূপং হা হতোস্মি তদাব্রবীৎ
স্বপন্তী চ পিবন্তী চ গৃণন্তী গচ্ছতী তদা।
তিষ্ঠন্তী চ সখী মধ্যে দিগ্‌রূপঞ্চ মদীয়কম্॥
ইতি সা দুঃখিতা তত্র স্মরন্তী হরচেষ্টিতম্।
সুখং ন লেভে কিঞ্চিদ্বৈ শিব শিবেতি সাব্রবীৎ॥

নারদ কহিলেন, "তপঃ সাধ্যোঽয়ঃ স্বয়ম্। নান্যথা লভ্যতে দেবি দেবৈর্ব্রহ্মাদি কৈরপি"। নারদের নিকট মহাদেবী তপস্যায় দীক্ষিতা হইলেন।

তপস্যায় জগৎ সৃষ্টি। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা, নর,—সবই তপস্যার উদ্ভূত। ভূলোকে, দ্যুলোকে শুধু তপস্যার মহিমাই বিঘোষিত।

সঙ্কল্পাদ্ দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষামভবন্ প্রজাঃ
তপোবিশেষৈঃ সিদ্ধানাং তদাত্যন্ত তপস্বিনাম্॥

—পূর্ব্বে সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্বী সিদ্ধগণের তপোবিশেষ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইত।

যদা পুনঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন ব্যবর্দ্ধন্ত বেধসঃ
তদা মৈথুনজাং সৃষ্টিং ব্রহ্মা কর্ত্তুমমন্যত
ন নিগতং পুরা যস্মান্নারীণাং কুলমীশ্বরাৎ
তেন মৈথুনজাং সৃষ্টিং ন শশাক পিতামহঃ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য বিশ্বাত্মা তপঃ কর্ত্তুং প্রচক্রমে
তদাদ্যা পরমা শক্তিরনন্তা লোকভাবিনা।
তয়া পরময়া শক্ত্যা ভগবন্তম্ ত্রিয়ম্বকম্।
সঞ্চিন্ত্য হৃদয়ে ব্রহ্মা ততাপ পরমং তপঃ॥
তীব্রেণ তপসা তস্য যুক্তস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
ততঃ কেন চিদংশেন মূর্ত্তিমাবিশ্যকামপি
অর্দ্ধনারীশ্বরো ভূত্বা যযৌ দেবঃ স্বয়ং হরঃ॥

—যখন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মন হইতে সৃষ্ট প্রজাগণের আর বৃদ্ধি হইল না তখন তিনি মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। যেহেতু প্রথমে ঈশ্বর হইতে নারীকুল নির্গত হয় নাই; এই নিমিত্ত ব্রহ্মা প্রথমে মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আদ্যা পরমাশক্তি লোককর্ত্রী ব্রহ্মার মনে উদিত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পরমা-শক্তির সহিত হৃদয়ে ভগবান ত্র্যম্বকের ধ্যান করতঃ উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই যোগযুক্ত ব্রহ্মার তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব আপনার এক অংশে কোন এক মূর্ত্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন।

সৃষ্টিকাম ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি ব্যর্থ। সে শক্তি ফিরিয়া পাইলেন কঠোর তপস্যায়। তপস্যাই শক্তি। তপস্যায়

অনুভূতা শক্তিই—আদ্যাশক্তি—নারী, জগৎপ্রসবিনী রূপে, জগৎরক্ষয়িত্রী রূপে। তপস্যায় আবির্ভূতা নারী—শক্তিপ্রতীক। দ্বিধাকৃত সেই শক্তিপ্রতীকই—অর্দ্ধনারীশ্বর।

আত্মবিস্মৃতা হিমালয়-রাজদুহিতা উমা আজ এই তপস্যায় উদ্বুদ্ধা। মহাতাপসের কঠোর প্রত্যাখ্যানে বিক্ষুব্ধা হইলেও বুঝিলেন কে আজ তাঁহার চেতনার দুয়ারে করাঘাত করিতেছে, বুঝিলেন, সৃষ্টি দেহবিলাস নয়—দেহাতীত সত্তার বিস্ময় উদ্বোধনই সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির মূল তপস্যা। দেহরূপে চিদাভাসই সৃষ্টি; চিদাভাস তপস্যা সাপেক্ষ। দেহ ও রূপাভিমান লইয়া নর—নর, নারী—নারী। শুধু রূপ ও দেহ-গৌরবে কুল সার্থক হয় না, ইষ্ট-কামও লাভ হইবার নহে। ক্ষোভ, দুঃখ, নৈরাশ্য, পার্ব্বতীর হৃদয় মথিত করিতে লাগিল। অবসন্ন হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা,"—সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়-সংকল্পা নারী অনুধ্যান করিতে লাগিলেন,—"তপসারাধনীয়োঽসৌ নান্যথা বশ্যতাং ব্রজেৎ"। অবিচলিত-চিত্তা পার্ব্বতী তপস্যাভিমুখী মন লইয়া মাতার নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিতে পারিলেন না। শুধু নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,—শ্রদ্ধা, বিনয় ও লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া উমা মায়ের নিকট নতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পুরাণকার তপস্বিনী উমার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। জগতের সাহিত্যভাণ্ডারে সে নারী-চিত্র বিরল। রাজকুমারী যৌবনে যোগিনী সাজিলেন। মাতাপিতার পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও উমার মন টলিল না। "সুখং নৈবাত্র সম্পেদেহ্যনারাধ্য শিবংতদা।" কবি কালিদাসের ভাষায় "পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

বিজ্ঞানের দুর্দ্ধর্ষ অভিযানকে ব্যর্থ করিয়া যে অপরাজেয় মহিমায় গৌরীশিখর স্কন্ধোন্নতশিরে আজও দণ্ডায়মান, সেই গৌরীশৃঙ্গে উমা তপস্যায় চলিলেন। মানবের দম্ভপদবিক্ষেপে যে হিমালয় শৃঙ্গ আজও অনতিক্রান্ত, পুরাণ-কবির লেখনী-মুখে সেই সতী-চরিত্র মহিমা তেমনি অনতিক্রান্তা। পার্ব্বতীর এই তাপসী মূর্ত্তি, সূর্য্যকিরণ সম্পাতে তুষার-কিরীট হিমাচল শৃঙ্গের ন্যায়, ভারতের নরনারীকে চিরকাল বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়া আসিয়াছে।

> বল্কলঞ্চ তদা ধৃত্বা মৌঞ্জীং বদ্ধা সুশোভনাম্।
> হিত্বা হারং তদা চর্ম্ম মৃগস্য পরমং শুভম্॥
> ভূমিশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা বিধায় বেদিকাং শুভাম্।
> তয়া তপঃ সমারব্ধং মুনীনামপি দুষ্করম্॥
> চাঞ্চল্যঞ্চ তদা ত্যাপ্য শরীরস্য বিশেষতঃ।
> সূর্য্যে দৃষ্টিং সমাক্ষিপ্য চকার পরমং তপঃ॥
> দীপ্তানাঞ্চ তথাগ্নীনাং মধ্যে স্থিত্বা তু ঘর্ম্মকে।
> বর্ষাসু স্থণ্ডিলে স্থিত্বা, শীতে জল সমীপগা॥
> এবং তপঃ প্রকুর্ব্বাণা বৃক্ষাণারোপয়ৎ তদা।
> সিঞ্চতী প্রত্যহং তত্র হ্যাতিথ্যঞ্চাপ্যকল্পয়ৎ॥
> বাতশ্চৈব তথা শীতো বৃষ্টিশ্চ বিবিধা তদা।
> দুঃখঞ্চ বিবিধং তত্র গণিতং ন তয়া তথা॥

পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যার কথা বয়োবৃদ্ধ ঋষিদের কর্ণে পৌঁছিল।

> শ্রুত্বা তু ঋষয়স্তত্র বিস্ময়ং পরমং গতাঃ
> দর্শনার্থং সমাজগ্মুঃ কীদৃক্ তপ্তং তপোঽনয়া।

বিস্ময়-বিমূঢ় ঋষিগণ ভাবিতে লাগিলেন—

> মহতাং ধর্ম্মবৃদ্ধেষু গমনং শ্রেয় উচ্যতে
> প্রমাণং বয়সো নাস্তি মান্যো ধর্ম্মঃ সদা বুধৈঃ
> শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তপস্তস্যাঃ কিমন্যৈঃ ক্রিয়তে তপঃ॥

ইতর জীবজন্তুগণও উমার তপস্যায়—"বিরোধিসত্ত্বোজ্ঝিত পূর্ব্বমৎসরম্"—

> তদাশ্রমগতা যে চ বিরোধ রহিত স্তদা॥
> সিংহা গাব স্তথান্যে চ রাগাদি দোষ সংযুতাঃ।
> তন্মহিম্নৈব তে তত্র নাবাধন্ত পরস্পরম্॥

পার্ব্বতীর এই 'লোকশোষণী' তপস্যার কথা নারদ-প্রমুখাৎ মহাদেব অবগত হইয়া বলিলেন, "তয়া পর্ব্বতরাজস্য সুতয়া তপসা হ্যহম্ ক্রীতোঽস্মি।" বৃদ্ধ জটিল ব্রাহ্মণের বেশে মহেশ্বর চলিলেন গৌরীশিখরে অপর্ণার দর্শনমানসে। কি আশ্চর্য্য! শঙ্কর আজ উপেক্ষিত তাপসীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী! কোন্ যাদুমন্ত্রবলে সর্ব্বত্যাগী উমানাথ আজ প্রত্যাখ্যাতা উমার আশ্রমতীর্থে অতিথি?

লোকমুখে শুনি পরমযোগী আজ স্বামীত্বের দাবী লইয়া মহেশ্বরীকে যাচাই করিয়া লইতে আসিয়াছেন। বুঝি বা নারীকে যাচাই করিয়া লইবার এই প্রবৃত্তি পুরুষের পক্ষে চিরন্তন, সনাতন পুরুষত্বাভিমানী আমরা, আমরাও বুঝি সেই লোকোত্তর চরিত্রে এই প্রবৃত্তির ছায়াপাত করিতে কখনও ভুলি না। কবির মুখেও সেই কথারই প্রতিধ্বনি—

কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরি বিদ্যতে, মমাপি পূর্ব্বাশ্রম সঞ্চিতং তপঃ।
তদর্দ্ধভাগেন লভস্ব কাঙ্ক্ষিতং, বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্॥

বিদ্যারত্ন মহাশয় কবির কাব্যলক্ষণায় কি ধ্বনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন জানি না। আমরা কিন্তু যে ধ্বনি খুঁজিয়া পাইয়াছি, সে ধ্বনি—"আমার তপস্যার অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থা হও।" কবি কালিদাসের সৃষ্টি—প্রেমিক শঙ্কর! কিন্তু যে নারীর 'লোকশোষণী' তপস্যায় ঋষিকুল সন্ত্রস্ত, শ্রদ্ধাবনত, বনের পশুও পশুভাববিরহিত, সেও আজ পুরুষের নিকটে প্রসাদভিখারিণী! পুরাণকার কিন্তু তপস্বিনীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ত্বয্যেব তপসো দেবি ফলং সর্ব্বং প্রদৃশ্যতে
বরার্থে চ তপশ্চেদ্ধে তিষ্ঠতু তপ এব তৎ।
রত্নস্তু গ্রহীতারং বৈ ন পৃচ্ছতি গ্রহীষ্যতি॥

—সকল তপস্যার ফল তোমার আয়ত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি মনোমত পতির কামনায় এইরূপ তপঃ-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে এক্ষণে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। কেন না, রত্ন কখনও গ্রহীতার কামনা করে না, গ্রহীতা নিজেই রত্নকে খুঁজিয়া লয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেহ-বিলাসে নারী—নারী। দেহাতীত সত্তার চিন্ময় ভাববিলাস স্ফুরণে নারী মহাশক্তিময়ী, আদ্যাশক্তির প্রতীক। তপস্যা সেই শক্তির জননী। মায়াময়ী প্রকৃতির প্রাকৃত লীলাবিলাসে রাজকুমারী প্রত্যাখ্যাতা, উপেক্ষিতা। তপস্বিনী উমা অকামলীলা-বিলাসে চিন্ময় ভাববিগ্রহস্বরূপিনী। মায়াধর শিব তাপসী উমার সংযোগে অর্দ্ধনারীশ্বর। মহাতাপসের আজ এই যে তপস্বিনী নগদুহিতার পুণ্যাশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ—সে শুধু তপস্যার মর্য্যাদা দান, হৃদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন, শক্তিহীন শিবের শক্তিগ্রহণ। নারী এখানে পুরুষের প্রসাদ-ভিখারিণী নয়!

কবির সূক্ষ্ম রসবিচারে শিবশক্তির এই লীলাবিলাস—নর-নারীর মিলন-যজ্ঞের আর এক রহস্যময় ইঙ্গিত। সে নিগূঢ় সঙ্কেত কবির বীণার ঝঙ্কারে মুক্তি লাভ করিয়া হিন্দু নর-নারীর দাম্পত্যজীবনের রহস্যজাল ছিন্ন করিয়াছে।

অনেন ধর্ম্মঃ সবিশেষমদ্য মে, ত্রিবর্গ সারঃ প্রতিভাতি ভাবিনি
ত্বয়া মনোনির্বিষয়ার্থ কাময়া, যদেক এব প্রতিগৃহ্য সেবতে॥

ত্রিবর্গের সার ধর্ম্ম হে ভাবিনি! আজি মর্ম্ম
তোমার তপস্যা হেরে মোর মনে ধরেছে,
যেহেতু ত্যজেছ তুমি অর্থ কাম ভোগভূমি
মন তব একমাত্র ধর্ম্মাশ্রয় লয়েছে॥
—পদ্যানুবাদ—'ভারতবর্ষ', পৃঃ—৩৮১)

পুরাণকার যেখানে শুধু এক সূক্ষ্মতত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়া নীরব হইয়াছেন কবি কালিদাস সেই ইঙ্গিতের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়াছেন স্পষ্ট ভাষায়। তপস্যার মর্ম্ম কথা কি? কামার্থবিষয়ী ভোগভূমিকে ধর্ম্মসাধনায় লীলায়িত করিবার নামই তপস্যা। এই তপস্যাই জীবন। নর-নারীর জীবনে এই দিব্যচেতনার অভিব্যক্তি বা অবতরণ জীবন-সাধনার চরম কথা। তপস্যায় উমার জীবনে এই দিব্যচেতনা জাগ্রত—"হে ভাবিনী, ধর্ম্মই ত্রিবর্গসার, সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া জীবনের সাধনা তোমার সার্থক!" "দেহাতীত সত্তার চিন্ময় উদ্বোধনই তপস্যা"—পূর্ব্বে কথিত এই উক্তির যদি কোথাও হেঁয়ালী থাকে, তবে কবি কালিদাসের এই সরস নির্ভীক উক্তি—"ত্বয়া মনোনির্বিষয়ার্থ কাময়া যদেক এব প্রতিগৃহ্য সেব্যতে"—তাহা দিনের আলোকের মতই স্পষ্ট করিয়াছে।

তপস্যা-মুগ্ধ শঙ্করের "আলাপে প্রলাপে হাসি উচ্ছ্বাসে" গৌরীশিখরের তপোবন মুখর হইয়া উঠিয়াছে। দয়িতার দগ্ধ মনকে লইয়া ছিনিমিনি খেলা প্রণয়-মুগ্ধ নায়কের চিরকালই স্বভাব। আশা, নিরাশা, হর্ষ, পুলক ও বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে কবি এই অসাধারণ নর-নারীর মিলনের যে পটভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যেমনই রস-নিবিড়, তেমনি ভাব-গম্ভীর। কবির এই মনোজ্ঞ সৃষ্টি উপভোগ্য, উপাদেয়। কিন্তু কবি এখানেও ভক্ত-শিষ্যের ন্যায় পুরাণকারের অনুগামী।

পার্ব্বতীর আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া মহেশ্বর বলিলেন, "রহস্যং বদ মে শুভে" (হে শুভে, রহস্যটা কি আমাকে খুলিয়া বল।)—কেন? "পূজাবিধিস্ত্বয়া দেবি কৃতো বৈ সর্ব্বথাত্মনা। তস্মান্মৈত্রী চ সঞ্জাতা" (হে দেবী, তুমি যখন সর্ব্বান্তঃকরণে আমার পূজা করিয়াছ তখন তোমার সহিত আমার মৈত্রী উৎপন্ন হইয়াছে।)। কিন্তু কেন এসব ব্যাপার? "ঈদৃশস্যৈব সৌন্দর্য্যং সর্ব্বং ব্যর্থীকৃতং ত্বয়া" (তোমার এ অলৌকিক সৌন্দর্য্য সব ব্যর্থ) "তৎ সর্ব্বং

কারণং ব্রূহি দৃষ্ট্বা হর্ষমুপাগমে"। পার্ব্বতীর মুখে আবার সেই লজ্জারুণ রাগ! বিংশ শতাব্দীর প্রগল্‌ভা যুবতী নহে। সখীকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি পার্ব্বতীর মর্ম্ম কথা ব্যক্ত করিলেন।

> হিত্বেন্দ্র প্রমুখান্ দেবানৈশ্বর্য্য সংযুতানপি।
> পতিং পিনাকপাণিং বৈ প্রাপ্তুমিচ্ছতি সাম্প্রতম্॥
> ইয়ং সখী মদীয়া বৈ বৃক্ষানারোপয়ৎ পুরা।
> তেষু বৃক্ষেষু সঞ্জাতং ফলং পশ্য পুরঃ প্রভো॥
> মনোরথাঙ্কুরস্তস্যাঃ পশ্যামি ন কথঞ্চন।
> রূপহার্য্যং শিবং দেব মদনস্যাপহারিণম্॥
> তস্মাচ্চ নারদাদেশাৎ তপস্তপ্যতি দারুণম।

পরিহাস-রসিক শঙ্কর উমার স্বমুখোচ্চারিত স্বীকৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্ত নন। "সখ্যেদং কথিতং সত্যং পরিহাস উতাপি বা" (সখী যাহা বলিল—এ কি সত্য না পরিহাস?)। পার্ব্বতীর মহা সঙ্কট—কথা না বলিলে নয়, এ যে জীবন-মরণ সমস্যা। নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। বলিলেন

> মনসা বচসা সাক্ষাদ্‌বৃতো বৈ শঙ্করো ময়া।
> জানামি দুর্লভং বস্তু কথং প্রাপ্যং ময়া ভবেৎ॥
> তথাপি মনসৌৎসুক্যং কথ্যতে চ ময়াধুনা।

বক্তব্য শেষ করিয়া পার্ব্বতী দারুণ উৎকণ্ঠায় লক্ষ্য করিলেন ভণ্ড তাপসের মুখে—তীব্র শ্লেষ, নয়নে চটুল পরিহাস। মহেশ্বরকে গমনোদ্যত দেখিয়া পার্ব্বতী বলিলেন, "কিং গমিষ্যসি" ?" কঠোর বিদ্রূপবাণে উত্তর আসিল

> এতাবৎ কাল পর্য্যন্তং মমেচ্ছা মহতী হ্যভূৎ।
> কিং বস্তু কাম্যতী দেবী দৃষ্ট্বা যামিস্তবন্ ব্রতম্।
> অবগতং ময়া সম্যক্ ত্বন্মুখাৎ সুন্দরি শ্রুতম্॥
> ইতশ্চ প্রথমং ত্বং মে মান্যা পূজ্যা সদা শুভা
> ইদানীং তদ্বিপরীতং জাতং মে নাত্র সংশয়ঃ।

জটিল ব্রাহ্মণ যতখানি শ্রদ্ধা লইয়া পার্ব্বতীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বুঝি বা তাঁহার উপর ততোধিক অশ্রদ্ধা লইয়া স্থানত্যাগে উদ্যত হইলেন। তপস্বিনী উমার মুখে গভীর বেদনার ছায়া, নয়নে নৈরাশ্যের ম্লান দীপ্তি। রুদ্ধশ্বাসে তাহার পর যাহা শুনিলেন, পার্ব্বতীর কর্ণে তাহা যেন বিষ ঢালিয়া দিল।

> দত্ত্বা সুবর্ণ মুদ্রাঞ্চ কাচং গ্রহীতু মিচ্ছসি।
> হিত্বা চ চন্দনং শুভ্রং কর্দ্দমং লেপ্তুমীহসে॥
> নাগঞ্চ বাহনং ত্যক্ত্বা বলীবর্দ্দং ত্বমিচ্ছসি।
> গাঙ্গং জলম্পরিত্যজ্য কূপোদকং সমীহসে॥
> সূর্য্যতেজঃ পরিত্যজ্য খদ্যোত দ্যুতিমিচ্ছসি।
> চীনাংশুকং বিহায়ৈব চর্ম্মাম্বর মুপাসসে।
> গৃহে বাসশ্চ বৈ দিব্যং ত্যক্ত্বা বনং সমীহসে॥
> করোমি ত্বঞ্চ দেবেশ ন যুক্তং কর্তুমুদ্যতা॥
> তথা ত্বং সর্ব্বদেবানাং হিত্বা চ সন্নিধিং পুনঃ।
> ইচ্ছসি ত্বহরাণাঞ্চ ন যুক্তং ক্রিয়তে ত্বয়া॥
> ইন্দ্রাদি লোকপালাংশ্চ হিত্বা শিবমনুব্রতা
> নৈতদ্ যুক্তং হি লোকেষু বিরুদ্ধং দৃশ্যতেঽধুনা॥
> ক ত্বং কমলপত্রাক্ষি ক চাসৌ চ ত্রিলোচনঃ;
> শশাঙ্কবদনা ত্বঞ্চ পঞ্চবক্ত্রঃ শিবঃ স্মৃতঃ॥
> কবর্য্যাশ্চৈব তে রূপং বর্ণিতুং নৈবশক্যতে।
> জটাজুটং শিবস্যৈব প্রসিদ্ধং পরিচক্ষতে॥
> চন্দনঞ্চ ত্বদীয়েঽঙ্গে চিতাভস্ম শিবস্য চ।
> ক দুকূলং ত্বদীয়ং বৈ গজাজিন মথা শুভম্॥
> ক্বাঙ্গদাদীনি দিব্যানি কঃ সর্পাঃ শঙ্করস্য চ।
> ক চ বা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ ক চ ভূতা বলিঃ প্রিয়ে॥
> ক্বাসৌ মৃদঙ্গনাদো বৈ ক চাপি ডমরুস্তদা।
> ক চ ভেরী কলাপশ্চ ক চ শৃঙ্গীরবোঽশুভঃ॥
> ক চ ঢক্কাবয়ঃ শব্দো গল্লনাদঃ ক চাপি হি।
> ভবত্যাশ্চ শিবস্যৈব ন যুক্তং রূপমুত্তমম্॥
> বপুশ্চৈব বিরূপাক্ষং জন্ম ন জ্ঞায়তে কদা।
> যদি ধনং তস্য ভবেৎ কথং দিগম্বরো ভবেৎ॥
> বরেষু যে গুণাঃ প্রোক্তা একোঽপি ন শিবেস্মৃতঃ।
> বাহনঞ্চ বলীবর্দ্দো বসনং চর্ম্ম এব চ॥
> যদি জ্ঞানী ভবেৎ সো হি কথঞ্চ মদনং দহেৎ।
> সহায়াস্তু পিশাচাশ্চ বিষং কণ্ঠে বিরাজতে॥
> অনাদর স্তথা দৃষ্টো হিত্বাবনমুপাগতঃ।
> জাতি র্ন লভ্যতে তস্য বিদ্যাজ্ঞানং ন দৃশ্যতে॥
> একাকী চ সদা নিত্যং বিরাগী চ বিশেষতঃ।
> তস্মাৎ ত্বন্তু শিবে নৈব মনোযোক্তু মিহার্হসি॥
> ক চ হারস্তদীয়ো বৈ ক চ বৈ রুদ্রমালিকা।
> সর্ব্বং বিরোধী রূপঞ্চ তব চৈব শিবস্য চ
> মহ্যং ন রোচতে দেবি যদিচ্ছসি তথা কুরু॥

ছদ্মতাপসের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া পার্ব্বতীর আর ক্রোধের সীমা রহিল না। দক্ষাত্মজা সতী পিতৃমুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই

দক্ষনন্দিনী এখন তপস্যায় রূপান্তরিতা হিমালয় দুহিতা উমারূপে। তপস্যায় পাইয়াছেন তিনি অসীম ধৈর্য্য, অমিত তেজ।

পুরাণকার ও কবির লেখনীমুখে আমরা পার্ব্বতীকে দেখিয়াছি শ্রদ্ধা-বিনম্রা ভক্ত-শিষ্যা—ইষ্টের চরণে হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য ঢালিয়া দিতে দণ্ডায়মানা, কখনও বা প্রণয়-পীড়িতা নারী—ভীতা, চকিতা, প্রিয়তমের আসন্ন মিলনে বেপথুমতী, কখনও বা প্রত্যাখ্যাতা, বিরহ-বিদগ্ধা অভিমানিনী, কখনও বা তপস্যায় আত্মনিগ্রহকারিণী। কবির সৃষ্টিকে সার্থক করিয়া তুলিতে নতমুখী তপস্বিনী আজ দৃপ্তা সিংহীর তেজে তেজস্বিনী, অবাঙ্মুখী নারী পতিনিন্দায় ধৈর্য্যহারা, বাঙ্ময়ী। ব্রাহ্মণের প্রত্যুত্তরে প্রগল্ভা যুবতী বেদনা-বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে শিবমহিমা গান করিতে লাগিলেন।

বস্তুতো নির্গুণঃ সাক্ষাৎ সগুণঃ কারণে ন চ
কুতো জাতির্ভবেৎ তস্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥
উচ্ছ্বাসরূপিণো বেদা যস্যাস্য বিষ্ণবে পুরা
কিং তস্য বিদ্যয়া কার্য্যং পূর্ণস্য পরমাত্মনঃ।
তস্যৈব পক্ষপাতেন দেবা দেবত্বমাগতাঃ।
দর্শনার্থং শিবস্যৈব যদা গচ্ছতি দেবরাট্ ॥
সপ্তজন্ম দরিদ্রঃ স্যাৎ সেবতে যদি শঙ্করম্।
তস্যৈব দুর্লভা লোকে লক্ষ্মীঃতস্যানপায়িনী ॥
যদগ্রে সিদ্ধয়োঽষ্টৌ চ নৃত্যন্তি প্রতিবাসরম্।
অবাঙ্মুখাঃ সদা তত্র কুতো বিত্তং সুদুর্লভম্ ॥
যদ্যপ্যমঙ্গলানীহ সেবতে শঙ্করঃ সদা
তথাপি মঙ্গলং তস্য স্মরণাদেব জায়তে ॥
শিবেতি মঙ্গলং নাম মুখে যস্য নিরন্তরম্।
তস্যৈব দর্শনাদন্যে পবিত্রাঃ সন্তি নিত্যশঃ ॥
যদপূতং ভবেদ্ভস্ম চিতায়াশ্চ ত্বয়োদিতম্।
নৃত্যান্তাপগমে দেবৈঃ শিরোভি ধার্য্যতে কথম্ ॥
অগম্য ব্রহ্মণো রূপং শিবস্য পরমাত্মনঃ।
কথং তত্ত্বং বিজানন্তি ত্বাদৃশা হি বহির্ম্মুখাঃ ॥

ভাষার মাদকতা, উপমার সৌন্দর্য্য ও ছন্দের মুখরতায় কবি যে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত নন্দনকানন সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সৃষ্টি-মহিমার কল্পলোক পুরাণকারের সুনিপুণ শিল্প-বৈচিত্র্যে, অনুপম রস-বিশ্লেষণে ভাবের মূর্চ্ছনায় পূর্ব্বেই সুরঞ্জিত। দিগন্ত-বিস্তৃত নীল আকাশের বুকে শুভ্র মেঘখণ্ড!

শিবনিন্দামুখর জটিল ব্রাহ্মণের সম্ভাষণে কবির কাব্যঝঙ্কার!—

অবস্তু নির্ব্বন্ধ পরে কথং নু তে, করোয়মামুক্ত বিবাহ কৌতুকঃ।
করেন শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা, সহিষ্যতে তৎ প্রথমাবলম্বনম্ ॥
ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং, কদাচিদেতে যদি যোগমর্হতঃ।
বধূ দুকূলং কলহংস লক্ষণং, গজাজিনং শোণিত বিন্দুবর্ষি চ ॥
চতুষ্ক পুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ, পরোঽপি কো নাম তবানুমন্যতে।
অলক্ত কাঙ্ক্ষাণিপদানি পাদয়ো বিকীর্ণ কেশাসু পরেত ভূমিষু ॥
অযুক্ত রূপং কিমতঃ পরং বদ, ত্রিনেত্র বক্ষঃ সুলভং তবাপি যৎ।
স্তনদ্বয়েঽস্মিন্ হরিচন্দনাস্পদে, কথং চিতাভস্মঃ রজঃ করিষ্যতি ॥
ইয়ং চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা, যদূঢ়য়া বারণরাজহার্য্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া, মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি ॥
দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং, সমাগম প্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবতস্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী ॥
বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা, দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যদ্ বাল মৃগাক্ষি মৃগ্যতে, তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে ॥
নিবর্ত্তয়াস্মাদসদীপ্সিতান্মনঃ ক্ব তদ্ বিধস্ত্বং ক্ব চ পুণ্যলক্ষণা।
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী শ্মশানশূলস্য ন যূপসৎক্রিয়া ॥

শিবতত্ত্ব নিষ্ণাতা পার্ব্বতী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন। মহেশ্বর প্রীত হইলেন।

কুত্র যাস্যসি মাং হিত্বা ন ত্বং ত্যাজ্যা ময়াপুনঃ।
প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহি নাদেয়ং বিদ্যতে তব ॥
অদ্য প্রভৃতি তে দাসস্তপোভিঃ প্রেমনির্ভরৈঃ।
ক্রীতোঽস্মি তব সৌন্দর্য্যং ক্ষণমেকং যুগায়তে ॥
ত্যজ্যতাম্ ত্বয়া লজ্জা এহি ধামো গৃহং মম।

সংশিতব্রতা উমা তপস্বিনীর মতই উত্তর করিলেন,

পিতুর্গৃহে ময়া গম্যাগ গম্যতে তদনুজ্ঞয়া
প্রসিদ্ধৈঃ ক্রিয়তে যদ্বদ্বিবাহঃ পরমঃ শুভঃ ॥
তথা চৈব ত্বয়া কার্য্যং লোকেষু খ্যাপয়ন্ যশঃ।
পিতুর্মে সফলং সর্ব্বং কুরুষ্বেহ গৃহাশ্রমম্ ॥
বিবাহস্য যথা রীতিঃ কর্ত্তব্যং তৎ তথা ধ্রুবম্।
জানাতি হিমবান্ সম্যক্ কৃতং পুত্র্যা শুভং মম ॥

—যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি কৃপা করিবার মানস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার উপর কৃপা করিয়া আপনিই এইরূপ করুন—আমি এক্ষণে আপনার অনুজ্ঞা-ক্রমে পিতৃগৃহে গমন করিতেছি। প্রসিদ্ধ পুরুষেরা যে রীতিতে শুভবিবাহ করিয়া থাকেন, আপনিও লোকে সুকীর্ত্তি ঘোষিত করিয়া সেইরূপ রীতিতে বিবাহ করিবেন।

তাহাতে আমার পিতার গৃহ ও আশ্রমাদি সফল হইবে। বিবাহের যেরূপ রীতি আছে তদনুসারে আপনার কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে হিমবান্ নিজ পুত্রী আমার শুভকরী হইয়াছে বলিয়া জানিবেন।

কবি কালিদাসের কুমারসম্ভব দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা। এই জন্মকথার অন্তরালে কোন সূক্ষ্ম দর্শনতত্ত্ব নিহিত আছে কি-না, সে কথা দার্শনিকের বিচার্য্য। অমর কবি বিরচিত মধুচক্র রসপিপাসু মনকে যুগ যুগ ধরিয়া তৃপ্তিদান করিতেছে। সে মধুপান করিতে করিতে মানব-মন এই অপূর্ব্ব কাব্যরসের ভিতর আর কোন তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছে কি-না জানি না, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যে মহাতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া এই বিরাট কবিত্ব-সৌধ রচিত হইয়াছে, সে তত্ত্ব—নর-নারীর মহামিলন তত্ত্ব। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা বিশ্ব-প্রকৃতির অদৃশ্য শক্তিসমূহের নিকট ধন, মান, যশ ও অর্থ ভিক্ষা করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। কালের দুর্নিবার গতিতে সেই যাজ্ঞিক প্রথা আর নাই। কিন্তু সৃষ্টির উষাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নর-নারীর এই মিলনযজ্ঞ তেমনই অব্যাহত। এই যজ্ঞের স্বাভাবিক পরিণাম—সৃষ্টি। এই সৃষ্টি তপস্যাসম্বলিত। আমার প্রবন্ধের মধ্যভাগে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

হরগৌরীর লীলাবিলাসে আদর্শ মিলনতত্ত্ব নিহিত। এ মিলন শুধু দেবতার লীলা নয়। এ মিলনের পরিণামে, অমিতবিক্রম কার্ত্তিকেয়ের জন্ম। উদ্দেশ্য—অসীমশৌর্য্য-সম্পন্ন তারকাসুরের নিধন। পুরুষ-প্রকৃতির এ সংযোগ অপ্রাকৃত মনে করিয়া, মানুষ যদি তার প্রাকৃত জীবন হইতে ইহাকে দূরে রাখিয়া শুধু মাত্র সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায়, তবে "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়", "লোকস্তদনুবর্ত্ততে"—এই আপ্তবাক্যাবলীর সার্থকতা কোথায়? দেব ষড়ানন জগৎপিতার মানসসৃষ্টি নয়। অত্যাচারী অসুরের হাত হইতে সমাজকে অব্যাহতি দিবার জন্য পুরুষ-প্রকৃতির এই সংযোগ।

ইহা ব্যতীত ব্যক্তজগৎ যদি অব্যক্তের সত্তায় সত্তাবান্ হয় তবে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবও সেই একের অস্তিত্বে অস্তিত্ববান্। আবার সেই এক সত্তারই দ্বৈতবিকাশ—পুরুষ-প্রকৃতি, নর-নারী। এই পুরুষ-প্রকৃতির, নর-নারীর মৈথুনজক্রিয়ায় জগৎসৃষ্টি।

স্ত্রীপুংস প্রভবং বিশ্বং স্ত্রীপুংসাত্মকমেব চ।
স্ত্রীপুংসয়োর্বিভূতিশ্চ স্ত্রীপুংসাভ্যামধিষ্ঠিতম্॥

শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা মহেশ্বরী।
সর্ব্বে স্ত্রীপুরুষাস্তস্মাৎ তয়োরেব বিভূতয়ঃ॥

ঐ অসাধারণ দাম্পত্যলীলা নামিয়া আসে মানুষের জীবনে—নর-নারীর যৌনজীবনে, শুধু তপস্যার হোমানল-শিখায়। তপস্যার অগ্নিময় পথ গ্রহণ করিয়াই নর-নারীর জীবন হয় লীলায়িত হরগৌরী লীলায়। দেহ-গৌরবে নর—নর; নারী—রমণী, কামিনী। তপস্যায় সেই নর—শিব; নারী—শক্তি, মহেশ্বরী। শিব মহেশ্বর এই দেহ গরবিনী নারী পার্ব্বতীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তপঃ পরিশুদ্ধসত্তা উমাকে গ্রহণ করিয়া মহাতাপস নীলকণ্ঠ অর্দ্ধনারীশ্বর হইলেন। এই অর্দ্ধনারীশ্বর আখ্যায় জগতের নর-নারী মাত্রেরই জন্মগত অধিকার।

হরগৌরীর এই আদর্শ মিলনে যে সৃষ্টিসম্ভব হইয়াছিল সে সৃষ্টি সার্থক করিয়াছিল দেব-সমাজকে, মানব-সমাজকে। এই অসাধারণ দম্পতীর মিলনলীলায় সাধারণ নর-নারীর মিলন-সমস্যার যে ইঙ্গিত পুরাণকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সমস্যার সমাধানও তাহাতে পরিস্ফুট। হিন্দুর জীবনছন্দ যে বিচিত্র, বহুমুখী ধারায় ছন্দায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সে ছন্দের মূল উৎস ঐ মিলনকেন্দ্র। জাতিকে গতিশীল করিতে, সমাজকে সংহত ও সঞ্জীবিত করিতে, মানুষকে বীর্য্যবান্ করিতে, হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী নিহিত ছিল এই শিবশক্তির মিলনতত্ত্বে।

আজ হিন্দুসমাজ যেমন এক দিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বৈরাচারে ঘোরতর আচ্ছন্ন, অন্যদিকে তার সমষ্টি জীবন তেমনই শিথিল ও ধ্বংসমুখী। ব্যক্তির ভোগমুখী প্রচেষ্টায় সমাজ পরিণত আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভোগক্ষেত্রে। শ্রীমণ্ডিত ব্যক্তির সকল সাধনায় ফুটিয়া উঠিবে সমাজের বুকে কল্যাণশ্রী। ব্যক্তি ও সমাজ—এক ও বহু। একের ভাব, রস ও সাধনা তরঙ্গ তুলিবে বহুর বুকে—স্তরে স্তরে, ছন্দে ছন্দে। একের সাধনায় সমাজ হইবে পুণ্যময় কর্ম্মক্ষেত্র, মহাসাধকের সাধনপীঠ। এই বহুর ভিতর একেকে মিলাইতে হইলে এবং একের ভিতর বহুকে প্রকট করিতে হইলে, চাই কঠোর তপস্যা, চাই ভাবোন্মুখী সাধনা। পরমযোগী মহেশ্বরের এই বহুরই কল্যাণ কামনায় 'শক্তিগ্রহণ। *

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও কালিদাসের গ্রন্থাবলী হইতে গৃহীত।

যবনিকার অন্তরালে

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

শহরের সৌখীন সম্প্রদায়ের সখের অভিনয়!

তরুণ কবি শশাঙ্কশেখরের নাটক, ভূমিকায় কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের নরনারী অভিনয় করবেন। সারা প্রেক্ষাগৃহ কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে। কৌতূহলী দর্শকদের মুখে অজস্র প্রশ্ন! বিশিষ্ট নাগরিকবর্গ, পেশাদার সমালোচকবৃন্দ, সাধারণ দর্শক—সকলের সে এক বিচিত্র সমাবেশ। ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী সবাই এসেছেন—আমন্ত্রণে কোন ত্রুটি হয় নি।

প্রেক্ষাগৃহের সাড়ম্বর সাজসজ্জা—বিলাসের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র মহানগরীর বুকে এক অনুপম শোভার সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির বুকে প্রকৃতির সন্তানের স্বহস্ত রচনার সুন্দরতম অভিব্যক্তি যেন একটি অপরূপ আকর্ষণের মত অভিনব। তার মাঝে সংখ্যাহীন উদ্‌গ্রীব জনতার আশ্চর্য্য কৌতূহল দেখে মনে হয়—পাষাণে প্রাণসঞ্চারের এ এক সার্থক প্রয়াস!

সহসা আলোর ঝলমলানি নিভে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহে অন্ধকার নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য জনতার মুখর রসনা মূক হয়ে গেল। কৌতূহল জেগে রইল মাত্র কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে সমগ্র চেতনাকে একীভূত ক'রে। পাথরের বাড়ী আবার পাথর!

কিন্তু সে একমুহূর্ত্ত মাত্র! তার পরেই অভিনয় আরম্ভ হ'ল।

যবনিকার অন্তরালে উইংসের একধারে একখানি চেয়ারে বসে তরুণ কবি শশাঙ্কশেখর। প্রথম নাটক, তার প্রথম অভিনয়। শঙ্কাকম্পিত দুরু দুরু বুকে, প্ল্যাটিনামের চশমার ভিতর দুই চক্ষুর দৃষ্টিকে প্রদীপ্ত ক'রে সে তাকিয়ে। এই বই, এই বইয়ের অভিনয়ের ওপর নির্ভর করছে তার যশ ও অর্থলিপ্সা; একমাত্র এই বইয়ের জোরে একরাত্রেই সে শহরের সৌখীন সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেতে পারে; তার নাম উচ্চারিত হ'তে পারে কলেজফেরতা তরুণ-তরুণীদের মুখে মুখে! সংবাদপত্রের সমালোচকদের অনাকাঙ্খিত মন্তব্য তার ভবিষ্যতের একটা মস্ত ভরসা! কি বলবে ওরা, কি জানি কি কাল লিখবে; হয়ত অভিনয় ভাল হ'বে না, ওরা লিখে দেবে তার জন্য দায়ী নাট্যকার! নাটকের মধ্যে নাটকত্ব নেই কিছুই, আছে শুধু অর্থহীন সংলাপের ছড়াছড়ি! বস্তাপচা কথাবার্ত্তা আর সস্তা চরিত্রের সমাবেশে এই নাটকের হয়েছে সৃষ্টি!—এই সব সাত-পাঁচ ভেবে গতরাত্রে সে ভাল ঘুমোতে পারে নি। নাম-করা লেখক সে নয়, খ্যাতি তার নেই, খ্যাতির দুর্গম পথে এই নাটকই হবে তার প্রথম পরিচয়-পত্র; এই তার একান্ত কামনা।

প্রথম দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছিল। আলোর খেলায় মঞ্চটাকে যেন মায়ালোক ব'লে মনে হচ্ছে। সেই মায়ালোকের মধ্যে দণ্ডায়মানা নায়িকার ভূমিকায় শহরের নাম-করা মেয়ে নমিতা সেন। নমিতার বিচিত্রবরণ বেশ-বাসে যেন তাকে প্রাচীন গ্রীসীয় দেবীমূর্ত্তির মত পবিত্র ব'লে মনে হচ্ছে। শশাঙ্কশেখর সেইদিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে। তার নাটক আর সেই নাট্যের নায়িকা—না, এর চেয়ে সুন্দর আর কিছুই হ'তে পারে না!

তার জাগ্রত কৌতূহল আর উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে নাটকের প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হ'ল। সে আত্মহারা হয়ে দেখছিল। তার লেখা নাটক, আর সেই নাটকের অভিনয় এত অপূর্ব্ব হ'বে একথা সে কেন ঈশ্বরও কোন-দিন ভেবেছেন কি-না সন্দেহ! এ পর্য্যন্ত তার ত খুব ভালই লেগেছে। এত ভাল—যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু···! প্রেক্ষাগৃহের কোলাহলে সে সচকিত হয়ে উঠল। তার মনে পড়ল—তার ভাল লাগাই প্রথম এবং শেষ কথা নয়। আছেন অজস্র দর্শক, সমালোচক আর বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ—মন্তব্য প্রকাশ করবেন তাঁরা। সেখানে একটা কথা বলার অধিকারও তার নেই। সেথা সে একজন নেপথ্য-পথিক মাত্র। সে লিখেছে, লিখেই তার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এখন সে লেখার ফল কি, কি তার প্রাপ্য—স্তুতি না নিন্দা, সে বিচার করার ভার অন্তত তার ওপর নেই।

—চমৎকার লিখতে পারেন আপনি !

শশাঙ্ক একটু চমকে উঠল। নমিতা সেন তার সঙ্গে কথা কইছে।

প্রথম পরিচয়, নমিতার মত নাম-করা মেয়ের সঙ্গে। সে একটু বিব্রত হয়ে উঠল। মুস্কিল, সেখানে আর একখানা চেয়ার পর্য্যন্ত নেই। সে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললে—চমৎকার বই কি, লোকে যে এখনও দেখছে এই ঢের !

বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করলে নমিতা। বললে—বসুন বসুন, আপনি উঠছেন কেন? আমার কি এখন বসার সময় আছে ?

শশাঙ্ক হতবুদ্ধির মত বসে পড়ে নমিতার দিকে চেয়ে দেখলে। দেখলে—তার অপরূপ রূপের প্রকাশ ! রাকায়েলের আঁকা ছবির মত বিচিত্র এই তরুণীর রূপ! সমগ্র দেহশ্রী ভরে একটি মনোহর তন্ময়তা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। সে মৃদু হেসে বল্‌লে—মাফ্‌ করবেন, আমার লেখার চেয়ে চমৎকার আরও একটা জিনিষ চোখে পড়ল। সে হচ্ছে আপনার অভিনয়! হ'তে পারে চরিত্র আমার সৃষ্টি, কিন্তু তাতে প্রাণসঞ্চার করলেন আপনি! কৃতিত্ব আমার নয়, আপনার !

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে নমিতা হেসে উঠল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের তরে! তার পরে সহসা গম্ভীর হয়ে বললে—ওহো, আর যে সময় নেই! আমায় যে আবার কাপড় বদ্‌লাতে হ'বে।

তার গতিশীল গমনভঙ্গীর দিকে চেয়ে শশাঙ্কশেখর একথা না ভেবে পারলে না—বিদ্যুতের মত এর যাওয়া আর আসা, বিদ্যুতের মতই এর রূপ !

*

অসংখ্য দর্শকের সপ্রশ্ন, মূক দৃষ্টির সম্মুখে দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হ'ল। শশাঙ্ক একবার তার চশমাটা মুছে নিলে। নায়িকা মায়ার ভূমিকায়—নমিতা।

অভিনয় এত স্বাভাবিক হচ্ছে যে, মায়াকে তার সজীব বলে মনে হচ্ছে। একটি প্রাণচঞ্চলতার তরঙ্গে সমগ্র রঙ্গালয় মূক! নাটকের বাকী চরিত্রগুলির কিছুই তার চোখে পড়ছে না। সে দেখছে, একাগ্র হয়ে তন্ময় হয়ে দেখছে—তার সাধের সৃষ্টি, স্বপ্নের সঞ্চয়, কথার অক্ষয় স্তূপ দিয়ে অঙ্কিত—মায়াকে !

...দৃশ্যের পর দৃশ্যের অভিনয় !

একটা ব্যর্থ প্রেমের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী! একটি অযোগ্য পুরুষ ভালবেসেছে, সমস্ত মন আর আত্মা দিয়ে ভালবেসেছে—আকাশস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সুদূরতম নক্ষত্রের মত দুর্লভ নারী মায়াকে। মায়া তাকে করেছে প্রত্যাখ্যান। কিন্তু আকর্ষণের মত বিকর্ষণও একটি বৈজ্ঞানিক সত্য! সহসা একদিনের কয়েক ঘণ্টার অবসরে—মেঘে ঢাকা আকাশে যখন সজল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, তখন মায়া সেই অযোগ্য ব্যক্তির মধ্যে এক অসাধারণত্ব করেছে আবিষ্কার। অন্ধকারের শিহরণে তার প্রেম উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে অযোগ্য হতভাগ্য তার নাগালের বাইরে—দূরে, অনেক দূরে চলে গেছে। রেখে গেছে—স্মৃতির বৃশ্চিক দংশনভরা একটি অবসরপূর্ণ অখণ্ড কালো রাত, আর কালো মেঘ, বজ্র ও বিদ্যুত। এম্‌নি সময় সেই আঁধার রাতে ঝড় উঠল।

শশাঙ্কশেখরের দুই চক্ষুর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। নমিতার অভিনয়, প্রাণঢালা অভিনয়—কিছু তার চোখে পড়ছে না। সে দেখছে, দেখছে—সেই আঁধার রাতে, বর্ষার জল-কল্লোলে, ঝড়ের মত্ততায়—মায়াকে, বিরহিনী মায়াকে।

—সত্যি, অদ্ভুত আপনার লেখার ক্ষমতা !

নমিতার সর্ব্বাঙ্গে তখনও উত্তেজনা। মঞ্চে তখনও শোনা যাচ্ছে কৃত্রিম ঝড়ের শব্দ, মুহুর্মুহু বজ্রের আওয়াজ।

সে শশাঙ্কর সামনে এসে দাঁড়াল বিদ্যুতের মত।

শশাঙ্ক বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখলে। নমিতা, অদ্ভুত নমিতা, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। তার বিশাল চোখ দুটিতে সজল সন্ধ্যার ছায়া।

—আচ্ছা, এ কি কল্পনা ?

আকস্মিক এই প্রশ্ন! শশাঙ্ক সচকিত হয়ে উঠল। কি বলবে সে, কি বলবে! সত্যি, এ ত কল্পনা নয়; এ যে একেবারে বাস্তব! তার চোখের সামনে, তারই জীবনে ঘটে-যাওয়া ঘটনা—নিদারুণ, মর্ম্মান্তিক! তাই ত এত দরদ, এত বেদনার প্রকাশ! সে বিহ্বল হয়ে বললে—না !

—না? অস্বাভাবিকভাবে নমিতা বললে। কিন্তু সে অস্বাভাবিকতা শশাঙ্কর চোখে পড়ল না। সে তখন বহুদূর অতীতের স্মৃতির অন্ধকার হাতড়ে আবিষ্কার করেছে—আর একটি নারীকে। সে নমিতা নয়, মায়া। সেই অন্ধকারের

মধ্য থেকেই শশাঙ্ক কথা কইলে অপ্রকৃতিস্থের মত—এ কাহিনী, এ কাহিনী আমারই জীবনের !

—সত্যি ? নমিতার চীৎকারে শশাঙ্ক বাস্তব জগতে ফিরে এল। সে চারিদিক চেয়ে দেখলে। নমিতা সেখানেই। মঞ্চে—তখনো ঝড় ! শশাঙ্কর চারিদিকেও ঝড় উঠেছে ! ঝড়···ঝড়···ঝড় !

কিন্তু নমিতা চীৎকার করলে কেন ! গেলই বা কোথা ! বিস্মিত শশাঙ্ক ভাবলে—বজ্র আর বিদ্যুত !

* * *

শেষ রাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। শশাঙ্ক তক্তপোষে অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় অতন্দ্র নয়নে মেসের বিবর্ণ দেয়ালটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। দেয়ালটার স্থানে স্থানে চটা উঠে গিয়ে বালি বেরিয়ে পড়েছে। সে ভাবছে—মায়া আর ঝড় !

সেখান থেকে অনেক দূরে, কল্‌কাতার আর এক অংশে, একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত ঘরে—তন্দ্রাহীন নয়নে জেগে বসে—আর একটি নারী ! সে ভাবছে—আজকের অভিনয়, এ কি সত্যিই অভিনয় ? কি অদ্ভুত ! যবনিকার অন্তরালবর্ত্তী নিষ্ঠুর সত্য—অতীত, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর অতীত—এত রাত্রির বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের পরে—একটি ভূমিকার রূপে এসে—তার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা—অভিনেত্রীর জীবনকে বিষাক্ত ক'রে দিয়ে গেল ! আশ্চর্য্য, কেউ কি আজ বুঝতে পারেনি—এত রাত্রির প্রাণঢালা অভিনয়ের পরে—আজকের রাত্রিই তার প্রথম রাত্রি—যে রাত্রিতে—সে অভিনয় করেনি ?

তার বিশাল চোখ সজল হয়ে উঠল।

ঝড় ! ঝড় উঠেছে !

বিপ্লব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

আনো বিপ্লব, বিপ্লব আমি চাই—
অনাগত মহা-প্লাবনের ঢেউ খাই।
উন্মাদনায় মাতুক ভূলোক
এ শান্তিপুর ডুবু ডুবু হোক,
রস বাদরের পাথার দেখিয়া যাই।

২

আগের দীপালী দেখিতে আমার আশ,
নগরে নগরে নব 'রঘুনাথ দাস'।
করুণ আমার 'রূপ সনাতন'
ভারতের নব যুগ পত্তন
ফিরিয়া আসুক সে গভীর বিশ্বাস।

৩

প্রেমের প্রবাহে হোক দেশ তোলপাড়,
আবার বাড়ুক ঝুলির অহঙ্কার।
মহতের পদ রজ অভিষেক—
সিংহাসনের জাগাক বিবেক,
বিশ্ব হউক মৈত্রীতে একাকার।

৪

ভক্তির বলে বলী হক দুর্ব্বল,
কুণ্ডল কাছে আসুক কমণ্ডল।
ভারতী হউক মধুচ্ছন্দা,
বহাক ভাবের অলকনন্দা,
অনুরাগে রাঙা হউক ভূমণ্ডল।

৫

নব সাহিত্য, নব সুর, নব গান,
জীবনে করুক নবীন জীবন দান।
এক হয়ে যাক শ্বেত পীত সব,
দধি হলুদের মহা উৎসব,
হিংসা ঘৃণার হয়ে যাক অবসান।

জাতিবিভাগ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ঢাকায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে "জাতিভেদ ও তাহার বিষময় ফল" নামে তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, জাতিভেদ ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জাতিবিভাগের ব্যবস্থাসকল মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে ঘৃণার ভাব ছিল না। এজন্য ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, এই সকল ব্যবস্থা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর।

মনুর আদর্শ কিরূপ উচ্চ তাহা মনুসংহিতার ১২।৯১ শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ঐ শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ:—যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন এবং আত্মার মধ্যে সকল প্রাণীকে দর্শন করেন, যাহার দৃষ্টিতে সকল প্রাণীই সমান, যিনি আত্মার পূজা করেন—তিনি স্বরাজ্য লাভ করেন।

মূল শ্লোকটির ভাষাও খুব সরল—

সর্বভূতেষু চ আত্মানং সর্বভূতানি চ আত্মনি।
সমং পশ্যন্ আত্মযাজী স্বারাজ্যম্ অধিগচ্ছতি॥

মনু ১২।৯১

মনুসংহিতায় জাতিবিভাগের যে বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই সমদর্শন লাভ করা। প্রকৃত সমদর্শন লাভ করিবার পক্ষে জাতিবিভাগ কিরূপ সহায়ক হইয়াছে একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা দেখান যাইতে পারে।

পার্শীদের পূর্বপুরুষগণ পারস্যদেশে বাস করিত। মুসলমানগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বলিয়াছিল, "তোমরা মুসলমান হও, নচেৎ তোমাদিগকে বধ করিব।" অধিকাংশ পার্শী মুসলমান হইল। যে সকল পার্শী স্বধর্ম রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আশ্রয় লইল, ভারতের হিন্দু রাজা তাহাদিগকে সাদরে আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং অবাধে নিজ ধর্ম অনুসারে পূজা করিবার অধিকার দিলেন। মুসলমানগণ যে পার্শীদের সহিতই এরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহা নহে, কাশ্মীরেও করিয়াছিল, অন্যত্রও করিয়াছিল। "এক হাতে তরবারি, এক হাতে কোরাণ।" অথচ মুসলমানগণের মধ্যে জাতিবিভাগ নাই, তাহাদের "সার্বজনীনতা ও ভ্রাতৃত্বে" আচার্য রায় "মুগ্ধ হইয়াছেন।" দুঃখের বিষয় আচার্য রায় বুঝিলেন না যে, মুসলমানগণের এই যে উক্তি, "তুমি মুসলমান হও তোমার সহিত ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিব, মুসলমান না হইলে তোমাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিব।"—ইহাই ভেদের অতিশয় অশোভন ও উগ্র অভিব্যক্তি। হিন্দুদের মনের ভাব এইরূপ—আমাদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি পাঁচটি জাতি আছে, সেইরূপ আর একটি জাতি পার্শী বা মুসলমান থাকিতে পারে, সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করুক, পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসা যেন না থাকে। যে ব্যক্তি যে ধর্মই পালন করুক কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিব না—ইহাই প্রকৃত সমদৃষ্টি। তোমাকে আমার ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, করিলে তোমার সহিত ভেদব্যবহার করিব না, যদি আমার ধর্ম গ্রহণ না কর তাহা হইলে তোমার ন্যায্য অধিকারও তুমি পাইবে না—ইহা প্রকৃত সমদৃষ্টি নহে। ভেদরক্ষা করিয়া যে সমদৃষ্টি তাহাই যথার্থ সমদৃষ্টি। জোর করিয়া ভেদলুপ্ত করিয়া যে সমদৃষ্টি তাহা প্রকৃত সমদৃষ্টি নহে।

জার্মানগণ য়িহুদিদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা সকলেই জানেন। পাশ্চাত্য সকল দেশের লোকই য়িহুদিদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পোষণ করেন, অল্পবিস্তর য়িহুদি-পীড়ন সকল দেশেই চলে, জার্মেনীতে ইদানীং তাহা খুব বীভৎস মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যদেশে জাতিভেদ নাই। তবে এত ভেদ দৃষ্টি কেন? হিন্দুগণ কখনও কোনও জাতির সহিত এরূপ অন্যায় অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন কি?

আজকাল এইকথা শোনা যায় যে, সকল মানুষের সহিত সমান ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপী ও অসাধু তাহার প্রতি যে ব্যবহার করা উচিত, যে ব্যক্তি সাধু ও পরোপকারী তাহার প্রতিও সেই ব্যবহার করা উচিত, নচেৎ সাম্যবাদ নষ্ট হইবে একথা কেহ বলেন না। সুতরাং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা কর্তব্য ইহা যথার্থ নহে। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত, ইহাই যথার্থ। সকল সমাজেই এই নীতি গৃহীত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করিয়াছে তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই নীতির উপর হিন্দুর জাতিবিভাগ প্রথাও প্রতিষ্ঠিত। অন্য সমাজে কেবল ইহজন্মের কর্মের হিসাব করা হয়। হিন্দুসমাজে পূর্বজন্মের কর্মেরও হিসাব করা হয়। জীব পূর্বজন্মে যেরূপ কর্ম করে তদনুসারে পরবর্তী জন্মলাভ করে—ঋষিগণ তপস্যার প্রভাবে এই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। অন্য দেশের ধর্মপ্রচারকগণ এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই।

পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিতে জন্ম হয় ইহা বেদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫-১০-৭ বাক্যের অনুবাদ এইরূপ :—'যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিতে জন্মগ্রহণ করে।' মূল বাক্যটি এইরূপ ;—রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যন্তে, ব্রাহ্মণ-যোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা, কপূয়চরণা কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যন্তে শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

জাতি বিভাগের মূল কথা এই যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে তাহার ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করিবার স্বাভাবিক যোগ্যতা থাকে। সে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বর্দ্ধিত হয়—তাহাও তাহাকে ঐরূপ কর্ম শিক্ষা করিবার অধিকতর সুযোগ প্রদান করেন। তাহার ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করাই কর্তব্য। সেইভাবে সে সমাজের যত বেশী সেবা করিতে পারিবে, যুদ্ধবিগ্রহ বা কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম দ্বারা সে তত বেশী সেবা করিতে পারিবে না। অপর পক্ষে তন্তুবায়ের পুত্রের পক্ষে তন্তুবায়ের কর্মের দ্বারা সমাজের সেবা করা স্বাভাবিক। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করিবে যে, সে যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই জাতির নির্দিষ্ট কর্ম তাহার পক্ষে সমাজসেবার এবং সমাজের মধ্য দিয়া ঈশ্বরসেবা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। গীতা ১৮।৪৬ শ্লোকে এই ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে।

এইভাবে জীবিকার সহিত ঈশ্বরারাধনা করিবার ভাব সংযুক্ত করিয়া দেওয়াতে প্রাচীন ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারতে একদিকে যেমন জ্ঞান ও ভক্তিতে উন্নতি হইয়াছিল, অপর দিকে সেইরূপ কারুকার্য এবং সকল প্রকার শিল্পকলাতেও জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল।* ভারতের যে পতন হইয়াছে, বর্ণাশ্রমধর্ম সে পতনের কারণ নহে, বৌদ্ধযুগের ধর্মবিপ্লবের পর বর্ণাশ্রম ধর্মে অবহেলাই ভারতের পতনের কারণ। কারণ ধর্মযুদ্ধ করা যে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কর্ম, ধর্মযুদ্ধে শত্রুবধ করিলে যে পাপ হয় না—বৌদ্ধধর্মে অহিংসা-ধর্মের অতিরিক্ত প্রচারের ফলে লোকে এ কথা ভুলিয়া গেল। হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কাহাকেও সন্ন্যাস প্রদানের পূর্বে তাহার সন্ন্যাসলাভের অধিকার আছে কি-না, অর্থাৎ তাহার মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে কি-না ইহা বিচার করিতে হইত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে অবিচারে সকলকে সন্ন্যাসী হইতে বলা হইল। ইহার ফলে সমাজে দুর্নীতির প্রসার হইল। এই সকল কারণে হিন্দুসমাজের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনিষ্টকর হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, যখন বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষিত হয় তখন দেশের সকল বিষয়েই উন্নতি হয় এবং বর্ণাশ্রমে অবহেলা হইলে দেশের অবনতি হয়, তখন ভগবান অবতীর্ণ হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করেন, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বর্ণাশ্রমধর্মে আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয় ইহা সত্য। কিন্তু কোনও লোকের স্পর্শ করা অন্ন না খাইলে যে তাহাকে ঘৃণা করা হয় তাহা সত্য

---

* মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "জাতিভেদ প্রচলত থাকায় ভারতবর্ষের সমুদয় শিল্পকার্য্য বহুপূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে তুলনারহিত হইয়াছে।" (সামাজিক প্রবন্ধ, ১০৪ পৃঃ)

নহে। বিধবা নিজের পুত্রের বা কন্যার স্পর্শ করা অন্ন অনেক সময় খান না। তাই বলিয়া তিনি যে পুত্র বা কন্যাকে ঘৃণা করেন তাহা নহে। ভাব শুদ্ধ রাখিবার জন্য এরূপ নিয়ম পালন করা প্রয়োজন এইরূপ বিশ্বাসেই খাওয়া ছোঁওয়ার নিয়মগুলি পালন করা হয়। একত্র আহার না করিয়াও এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়াও পরস্পর প্রীতি রক্ষা করা সম্ভব। ভারতবর্ষে চিরকাল তাহা হইয়া আসিয়াছে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, জাতিবিভাগের জন্য ভারত পরাধীন হয় নাই। এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। মুসলমানগণ যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষই জয় করিয়াছিল তাহা নহে! তাহারা মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি নানা দেশ জয় করিয়াছিল, ঐ সকল দেশে জাতিবিভাগ ছিল না, অতএব ইহা কিরূপে বলা যায় যে জাতিবিভাগই ভারতের পরাজয়ের কারণ? বিশেষতঃ অন্যান্য দেশ মুসলমান আক্রমণে যে পরিমাণে বাধা ছিল, ভারতবর্ষ তদপেক্ষা অনেক বেশী বাধা দিয়াছিল। এই কথা বঙ্কিমবাবু "ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?" এই প্রবন্ধে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। এ বিষয়ে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। মুসলমানেরা যে সকল দেশ জয় করিল প্রায় সকল দেশেই মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান রাজত্ব স্থায়ী হইল, কেবল ভারতবর্ষেই তাহা হয় নাই। জাতিবিভাগ যদি হিন্দুকে দুর্বল করে তাহা হইলে পাঠান বিজয়ের পর হিন্দুর দুর্বলতা ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। পরন্তু পাঠান বিজয়ের তিন-চারি শত বৎসর পরে পাঠানেরাই দুর্বল হইয়াছিল, হিন্দুরাজগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল। মোগল আক্রমণের সময় পাঠানদিগকে পরাস্ত করিতে বাবর কিছুমাত্র বেগ পান নাই। কিন্তু রাণা সঙ্গের সহিত যুদ্ধের পূর্বে বাবর খুব ভীত হইয়াছিলেন, সারা রাত্রি জাগিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আর কখনও মদ খাইবেন না, মদ্যপানের সুবর্ণ পাত্রগুলি দরিদ্রদিগকে দান করিবেন—এই প্রকার অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পুনরায় মোগল বিজয়ের দুই শত বৎসর পূর্বে মোগলশক্তি খর্ব হইল, পাঠান-শক্তিরও পুনরভ্যুদয় হইল না, হিন্দু-শক্তিরই পুনরুত্থান হইল। উত্তরে শিখজাতির অভ্যুদয় হইল, দক্ষিণে কাবেরি হইতে উত্তরে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের গৈরিক পতাকা বিজয়গর্বে উড্ডীন হইল। ইংরেজেরা ভারত জয় করিলেন, মোগলের নিকট হইতে নহে, মহারাষ্ট্র ও শিখদের নিকট হইতে। হিন্দুজাতির বার বার এইরূপ উত্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুর সমাজ-গঠনপ্রণালী (সবর্ণাশ্রম ধর্ম) হিন্দুর পরাজয়ের কারণ নহে, পরাজয়ের অন্য কোনও আকস্মিক কারণ ছিল। ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুর সমাজগঠনপ্রণালী হিন্দুর জীবনে শক্তিসঞ্চার করে, তাই পাঠান ও হিন্দুর সংঘর্ষে প্রথমতঃ হিন্দু হারিয়া গেলেও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুরই জয় হইয়াছিল এবং মোগল ও হিন্দুর সংঘর্ষে প্রথমে হিন্দুর পরাজয় হইলেও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুর জয় হইয়াছিল।

কিন্তু জাতিভেদ কি জাতীয় ঐক্যবোধ নষ্ট করে না? না, করে না। স্বয়ং ভগবান্ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, মুনি ঋষিরা যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা কখনও ঐক্যবোধ নষ্ট করিয়া সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। একটী সমাজের মধ্যে সকলের অধিকার সমান হইলেই যে ঐক্যবোধ থাকিবে তাহা বলা যায় না। যে পরিবারের মধ্যে পুত্রগণ পিতামাতাকে মান্য করে, পুত্রগণের মধ্যে ছোট বড়কে মান্য করে, সেই পরিবারের মধ্যে ঐক্যবোধ বেশী—না, যে পরিবারে সকলেই সমান অর্থাৎ কেহ কাহাকেও মানে না, সে পরিবারে ঐক্যবোধ বেশী?

জাতিবিভাগের সৃষ্টি যিনিই করুন তাঁহার এই বুদ্ধি ছিল যে, সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, এই ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই তিনি জাতিবিভাগ করিয়াছেন। ঐক্যের জন্য শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশে জন্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগ নাই, অর্থ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ আছে। অর্থ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ হইলে সমাজে অর্থের গৌরব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, ধনী ব্যক্তিগণ দরিদ্রদিগকে ঘৃণা করেন, দরিদ্র ব্যক্তিরা ধনী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, সমাজে শান্তি বিনষ্ট হয়। জন্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগ অর্থের ঔদ্ধত্য সংযমিত করে; এক জাতির ধনী ও দরিদ্র একত্র আহার করে ও বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় এজন্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে ধনী ও দরিদ্র একত্র আহার বিহার করে না। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায় দরিদ্রের সহিত একত্র আহার-বিহার বর্জ্জন করিতেছেন।

অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থাও মনুসংহিতাতে আছে। মনুর আদর্শ কত মহান্ তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। যাঁহার আদর্শ এত মহান্ তিনি কখনও ঘৃণামূলক ব্যবস্থা দিতে পারেন না। সুতরাং অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থাও ঘৃণামূলক হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। ইহা যে ঘৃণামূলক নহে তাহা মনুসংহিতার যে শ্লোকে অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা আছে সে শ্লোকের অর্থ আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে। শ্লোকটির অনুবাদ এইরূপ: ঋতুমতী রমণী, চণ্ডাল, শব যে ব্যক্তি শব স্পর্শ করিয়াছে, সদ্যপ্রসূতা রমণী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

চণ্ডালের সহিত ঋতুমতী ও সদ্যপ্রসূতা পত্নী বা ভগিনীকেও এক পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে। ঘৃণার ব্যবস্থা হইলে এরূপ হইত না। অন্যত্র মনুসংহিতার ৩।৯২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, চণ্ডালকে যত্নপূর্বক আহার দিবে। যাঁহার মনে ঘৃণার ভাব আছে তিনি একথা বলিবেন না। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির জীবিকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অন্য জাতির লোক যাহাতে সে জীবিকায় হস্তক্ষেপ না করে তাহার ব্যবস্থাও আছে। তাহার ফলে ভারতে অস্পৃশ্যজাতীয় লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া চারি-পাঁচ কোটি হইয়াছে। যদি তাহাদিগকে ঘৃণা করা হইত, তাহাদের উপর অত্যাচার করা হইত তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যাইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া রেড ইণ্ডিয়ান, হোটেনটট্ প্রভৃতি জাতি লুপ্তপ্রায়। ট্যাস্‌ম্যানিয়ার শেষ আদিম অধিবাসীর মৃত্যুসংবাদ সেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশের অস্পৃশ্যতা বাস্তবিক ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য সেখানে অস্পৃশ্যজাতির বিলোপ হইতেছে। হিন্দু শাস্ত্রবিহিত অস্পৃশ্যতা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যে মন্দ কর্ম করে তাহার মন অপবিত্র হয়, পরজন্মেও মনের অপবিত্রতা বিদ্যমান থাকে, তাহার সংস্পর্শে অন্য ব্যক্তির মনে অপবিত্রতা সঞ্চারিত হয়—এই সকল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা এক দিকে উচ্চবর্ণের পবিত্রতা রক্ষার সহায়ক, অপর দিকে নিম্নবর্ণের পবিত্রতা উৎপাদনের সহায়ক, কারণ পূর্বজন্মের মন্দ কর্মের জন্য দেহ অপবিত্র মনে করিয়া অনুতাপ করিলে পূর্বজন্মকৃত কর্মজনিত মলিনতা শীঘ্র দূর হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন যে, বিড়াল ঘরে আসিলে ঘর অপবিত্র হয় না, চণ্ডাল আসিলে কেন হইবে? মানব বুদ্ধিমান জীব, বিধিনিষেধ মানবের জন্যই করা হয়; বুদ্ধিহীন পশুর জন্য করা সম্ভবপর হয় না। এক ব্যক্তি অপরের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে তাহার দণ্ড হয়, বিড়াল অনধিকার প্রবেশ করিলে দণ্ড হয় না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে বিড়াল অপেক্ষা মানবকে ঘৃণা করা হয়। মানসিক পবিত্রতার দিক হইতেও বিচার করিলে দেখা যায় যে, অন্যায় কর্মকারী মানবের সাহচর্যে যেরূপ মনের অধোগতি হয় পশুর সাহচর্যে সেরূপ হয় না। একটি দুশ্চরিত্র রমণীর প্রৌঢ়বয়সে ধর্মানুরাগ হইয়াছিল। সে রামকৃষ্ণ পরমহংসের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়াছিল বলিয়া পরমহংসদেব অত্যন্ত আপত্তি করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায়, যে-ব্যক্তি পূর্বে অন্যায় কর্ম করিয়াছিল সে অন্যায় কর্ম ত্যাগ করিবার পরও অস্পৃশ্য থাকে। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সে পরজন্মেও অস্পৃশ্য থাকে, কারণ দুষ্ট সংস্কারযুক্ত মন পরজন্মেও বিদ্যমান থাকে। অনুতাপ এবং ভক্তিতে মন নির্মল হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্মল হইয়াছে কি-না তাহা সচরাচর বুঝিতে পারা যায় না। যাহার মন নির্মল হয় সে পরজন্মে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করে।

আচার্য রায় বলিয়াছেন, "সমস্ত পৃথিবী আজ আত্মোন্নতি সাধনায় মগ্ন।" পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা অনেকেই বিশ্বাস করিত। কিন্তু জার্মানী ইটালী প্রভৃতি যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে এখন আর একথা বলা যায় না। এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও পাশ্চাত্যজাতিসকলের বিজ্ঞানে উন্নতি হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে উন্নতি হয় নাই। জাপানের উন্নতির পরিচয়স্বরূপ আচার্য রায় বলিয়াছেন যে তাহারা "সুবৃহৎ রণতরী নির্মাণ করিয়াছে; কামান বন্দুক বিস্ফোরক প্রস্তুত করিয়াছে।" কিন্তু চীনের সহিত যুদ্ধে জাপান যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে কি বুঝিতে পারা যায় নাই যে, প্রকৃত যাহা উন্নতি, মনের উন্নতি—তাহা জাপানের হয় নাই? আচার্য রায় বলিয়াছেন, "হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতি জীবনের কোনও লক্ষণ দেখাইতে পারিল না।" জীবনের লক্ষণ কি রণতরী, কামান, বন্দুক, বিস্ফোরক প্রস্তুত না করিলে দেখান যায় না? এই হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে শঙ্করাচার্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ

পরমহংসের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাতে কি জীবনের লক্ষণ দেখান হয় নাই? রাণা প্রতাপ, শিবাজি, পুত্ত, জয়মল্ল, প্রতাপাদিত্য—ইঁহারা কি জীবনের লক্ষণ দেখান নাই? আচার্য রায় বলিয়াছেন যে, জাতিবিভাগের ব্যবস্থা পৃথিবীর কোনও দেশে, কোনও কালে ছিল না বা নাই কিন্তু যাহা পৃথিবীতে অন্য কোনও দেশে কোনও কালে ছিল না, তাহা যে অবশ্যই মন্দ হইবে তাহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যায়? কর্মফল এবং পুনর্জন্ম তত্ত্বের উপর জাতিবিভাগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। গভীর তপস্যার ফলে আর্যঋষিগণ এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আচার্য রায় বলিয়াছেন যে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তাহার কারণ "হিন্দুসমাজের অসহনীয় উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া অস্পৃশ্য হিন্দুগণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।" কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বত্রই ত অস্পৃশ্যতা প্রচলিত। অন্য প্রদেশের অস্পৃশ্যরা কেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নাই? প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইবার কারণ এই যে, ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধের সংখ্যা বেশী ছিল। বৌদ্ধধর্মের সেরূপ শক্তি ছিল না যাহাতে মুসলমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। হিন্দুধর্মের সে শক্তি ছিল। এজন্য ভারতের অন্য প্রদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয় নাই। আচার্য রায় বলিয়াছেন যে শাস্ত্রে জাতিভেদের বিরুদ্ধেও নিদর্শন পাওয়া যায়, কারণ "ব্যাসদেব পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ও সত্যকাম কুমারী জবালার পুত্র।" কিন্তু এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, জাতিবিভাগ অনিষ্টকর এবং বর্জন করা উচিত। মৎস্যগন্ধা ক্ষত্রিয় রাজা বসু উপরিচরের কন্যা। পরাশরের তপঃশক্তি প্রভাবে তাঁহার ঔরসজাত পুত্র মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ এবং মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইহা সত্য। কিন্তু সেজন্য বিশ্বামিত্রকে অনেক তপস্যা করিতে হইয়াছিল। তপস্যার দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়, সুতরাং জাতিপরিবর্ত্তনও হইতে পারে। জবালা কুমারী ছিলেন একথা উপনিষদে নাই। জবালা এই কথা বলিয়াছেন "বৎস, তোমার গোত্র আমি জানি না, কারণ যৌবনে যখন গৃহকর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম তখন তোমাকে লাভ করিয়াছি।" (আচার্য শঙ্কর এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন)। শাস্ত্রে যখন স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, বর্ণশঙ্কর অমঙ্গলজনক তখন এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণসঙ্কর মঙ্গলজনক বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না।

আচার্য রায় এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন

সর্বত্র শাস্ত্রম্ আশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে॥

আচার্য এই বাক্য কোন্ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। উদ্ধৃত করিতে বোধ হয় একটু ভুল হইয়াছে। মূল বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে যুক্তি সহকারে বিচার করা প্রয়োজন। বিচারের দ্বারা প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করা উচিত। এই বাক্যের এরূপ উদ্দেশ্য হইতে পারে না যে শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করা উচিত। গীতা ১৬।২৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদ এইরূপ: "অতএব কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রের বিধান কি তাহা জানিয়া কর্ম করা উচিত।"

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত সর্বত্রই জাতিবিভাগের প্রশংসা আছে। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রম-ধর্মের রক্ষাকর্ত্তা। ব্যাস বাল্মীকি মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ ইহা প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য রামানুজ তুলসীদাস শ্রীচৈতন্য রামকৃষ্ণ সকলেই ইহা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং এই ব্যবস্থা অনিষ্টজনক হইতে পারে না। এই ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া টিকিয়া আছে। পাশ্চাত্য-দেশে প্রকৃত সামাজিক ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই বলিয়া বার বার নূতন ব্যবস্থা প্রচারিত হইয়াছে এবং অশান্তির শেষ নাই। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসরণ করিয়া ভারতের অবনতি হয় নাই, বর্ণাশ্রম-ধর্ম অবহেলা করিয়া অবনতি হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে, দরিদ্রের জীবিকা রক্ষা করিয়াছে, সমগ্র জাতিকে পরিশ্রম-শীল করিয়া প্রাচীন কালে শিল্পবাণিজ্যের অশেষ উন্নতি করিয়াছে, বর্ত্তমান সময়েও ইহা আমাদের উন্নতির পথে কিছুমাত্র অন্তরায় নহে। ইহা পরিত্যাগ করিলে ধর্ম এবং ইহলোকে উন্নতি উভয় বিষয়েই অনিষ্ট হইবে।

ভূস্বর্গ চঞ্চল *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

স্নেহময়ী !

তোমার সঙ্গে সেদিন তোমার বাড়িতে যে সব কথা হ'ল তার রঙে মনটা আমার এখনো যেন রঙিয়ে আছে, যদিও এ দুদিনের মধ্যেই তোমার আমার মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান এনে ফেলেছে বাষ্পযান ও পেট্রোল যান দুয়ে মিলে। এখন আমি শিলঙের একটি অতি রমণীয় উদ্যানে ব'সে তোমাকে লিখছি এই চিঠি। আমার সামনেই ধরণীদার রেইনফোর্স'ড্-কংক্রীটে-গাঁথা ঘড়িওয়ালা বিজলি হৌস শোভমান। দশ বৎসর বাদে দেখি, এই কংক্রীটের অভ্যুদয় যেখানে সেখানে—অথচ আমি এ হেন কোনো সৌধে এ যাবৎ বিরাজ করি নি এ কি কম দুঃখের কথা।

দুঃখ কেন? যেহেতু এ-কংক্রীটের পরিচ্ছন্নতা যৎপরোনাস্তি কংক্রীট—এমন পরিষ্কার পরিপাটি! মহাত্মা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা আমার অকৃত্রিম, কিন্তু তিনি যা-ই বলুন না কেন—পর্ণপত্র, গোরুর গাড়ি, আর চরকার যুগ যে আর ফিরবে না এ ভাবতেও বুকে বল আসে না কি? কাশ্মীরেও একথা মনে হ'ত বার বারই। ধরো যদি বজরাটিতে বিজলি বাতির বদলে থাকত টিমটিমে তেলের কুপি? তাহলে ঝড়-ঝাপটা তো দূরের কথা, একটু হাওয়া উঠলেও টাল সামলানো দায় হ'ত না কি? এই শিলঙের কথাই ধরো না। এমন সুন্দর রাস্তা ঘাট কি পায়ে চলা মেঠো পথের চেয়ে ভালো না? মেঠো পথে অবশ্য আপত্তি নেই, ঘেসো রাস্তায় হাটতেও খুবই ভালো লাগে আমার। কিন্তু তা ব'লে যদি ধরো এই জগতে ঘেসো পথই হ'ত একছত্র অধিপতি, তাহ'লে কবির কবিত্বও কি বেশ একটু ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত না?

ঠাট্টা নয়। তোমার সঙ্গে সেদিন যে সব কথা হচ্ছিল সে সূত্রে আমার মনে হয়েছে কত বারই আধুনিক সভ্যতার কথা। আমাদের বিশ্বাসের নানান্ গভীর মূলই যে আজ আলগা হয়ে গেছে—এ কম দুঃখের কথা নয়। তুমি ঠেকে শিখেচ—এ যুগে ভক্তিকে ভক্তি করলে কত বিপদ, গুরুকে গুরু বললেও কত গুরু গঞ্জনাই না সইতে হয়। জীবনের পরম লক্ষ্য অনেকটা ঝাপসা হ'য়ে গেছে এ-ও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ কি? তবু তুমি যে বলছিলে এসেন্স ভালোবাসো, সুন্দর জিনিষ ভালোবাসো—এ সবের কি কোনো সুরাহা হ'ত কোনো দিনো, যদি আধুনিক সভ্যতার নানা উদ্ভাবনী প্রতিভা সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজে বাহাল না হ'ত? আধুনিক যুগের আনুষঙ্গিক দোষ আছে অনেক—মানি, কিন্তু সনাতন যুগের সবই যে নিখুঁৎ ছিল একথাও তো মেনে নেওয়া যায় না। কালিদাসের কথাই তাই প্রামাণ্য ধ'রে নেওয়া যাক যে, পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্—আধুনিক যা কিছু সবই অনিত্য। সাধু সাধু হে কালিদাস! যদি আরো হাল আমলের দার্শনিক নজির চাও তো এডিসনের সার রজার ডি কভার্লির জয়জয়কার ক'রে বলি এসো—Much can be said on both sides.

আধুনিক সভ্যতার একটা হ'তে-পারত-চমৎকার-অভ্যুদয় হ'ল স্বয়ংসিদ্ধ যানবাহন। শিলঙে যখন এহেন বায়ুগতি রথে আমরা সদলবলে হুহুশ্ শব্দে "দূরের জিনিষ এনে কাছে কাছের জিনিষ ফেলে পাছে" ছুটি—তখন একথা মনে না হ'য়েই পারে না; তবু এ-অভ্যুদয়কে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন করতে পারি না, যেহেতু এ আজো শুধুই ধনীচর্যা করে। রোসো রোসো, আমি জানি যা তুমি বলতে যাচ্ছ: এ দোষ মোটরের কোনো মোটরত্বে নয়। এও মানি যে এর মূলে সমাজবিধির হাজারো গলদ লুকিয়ে। তবু সবাই যা পেতে পারে না, সমাজের ব্যবস্থা তার জন্যে দায়িক হ'লেও তাকে ভোগ করতে মনের কোথায় খচ খচ করে না কি? একজনের সঙ্গে কালই হচ্ছিল এই কথা মোটরে। আমি বলছিলাম: "বিলাস ক্ষতি করেই।" সে বলল: "কিন্তু বিলাসের সীমান্তরেখা টানা যাবে কোথায়?"

* ধরণীকুমার বসুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লিখিত; শিলঙে তাঁর ওখানে যখন অতিথি ছিলাম সেই সময়েই।

এ ধরণের সাধারণ প্রশ্নের উত্তর পুরোপুরি দেওয়া কঠিন, বিশেষ অভাব-অভিযোগের ক্ষেত্রে। কারণ একজনের কাছে যা অত্যাবশ্যক আর একজনের কাছে যে তাই বিলসন একথা অপ্রতিবাদ্য। তা ছাড়া, বিলাস সাধারণ লভ্য হ'লে এ নিয়ে "বিবেকদরশনে ভাই আসে না ক্রন্দন।" তাই তো সোশ্যালিস্‌মের মূলনীতিটি না মেনেই উপায় নেই: মানুষ শক্তিতে সমান নয় বটে কিন্তু তাই ব'লে তাদের মধ্যে ধনবাঁটোয়ারা সমান হ'লে সে লাভের বখ্‌রা পায় সমগ্র সমাজ। ধরো আমরা "শিলঙ-পীকে" উঠলাম ধরণীদার মোটরে, কিন্তু আমার মোটরহীন বন্ধুদের মধ্যে অনেককেই তো পায়ে হেঁটে উঠতে হ'ল। অবশ্য দুর্গমের অভিযানের আনন্দ অস্বীকার নয়, কিন্তু তবু বলা চলে যে মোটরে শিলঙ-পীকে আরোহণ করে যে অপরূপ দৃশ্য দেখলাম তারও মূল্য যথেষ্ট। আধুনিক সভ্যতার প্রধান দোষ তো তার উপকরণবাহুল্যে নয়—উপকরণ-বাঁটোয়ারার বৈষম্যে। কিন্তু সমাজতত্ত্ব নিয়ে এ গুরুগম্ভীর গবেষণা থাকুক এখন, বিশেষ যখন এ-তত্ত্বের তাত্ত্বিক আমি সত্যিই নই। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' গীতার এ রুলিং আমি শিরোধার্য মনে করি বরাবরই। তবে যানবাহনের প্রসঙ্গটি টেনে আনা অবান্তর হয় নি, কেন না বক্ষ্যমান বিষয়বস্তুটি কাশ্মীর হ'লেও কাশ্মীরকে আমরা তো কম পাই নি এই যানবাহনের প্রসাদে।

শুধু কাশ্মীরই নয়। কাশ্মীর থেকে পেশোয়ারের পথে যে-অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম—বিশেষ ক'রে দুমেল ছাড়িয়েই—তার নেই তুলনা। দুমেল থেকে একটা পথ নেমেছে রাওলপিণ্ডির দিকে, আর একটা—পেশোয়ারের দিকে।

গুলমার্গ অঞ্চল ছাড়া কাশ্মীরের জাঁকালো দৃশ্য যে-সব আছে সেদিকে আমরা বড় ঘেঁষি নি—যথা অমরনাথ বা আরো কত জায়গা—মনে নেই নাম। কারণ সে সব স্থল দুর্গম—শুধু ব্রজবাবুর জুড়ি ক'রেই যাওয়া যায়—(কি-না পদব্রজে) তাই মনে একটা দুঃখ ছিল। আমি প্রবৃত্তিতে দুরারোহী নই। দৈহিক ক্লেশ অযথা সওয়ার বা কৃচ্ছ্রসাধনের মহিমাও আমার মন টানে না খুব বেশি। আমি মনে করি মানুষের স্বধর্ম বন্যতা নয়—তার স্বধর্ম তথা স্বভাব হ'ল নাগরিকতা। অরণ্য তার কাছে উপভোগ্য হয় তখনই যখন সে পোষ মানে। আলডুসের লেখায় প্রায়ই লাখ-কথার-এক-কথাদের দেখা মেলে ব'লে তাঁকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। এ রত্নবাণীদের একটি হচ্ছে তাঁর এই উক্তি যে, মানুষ বন নিয়ে কবিত্ব করে ততক্ষণই, যতক্ষণ বন ষোলো আনা বন হ'য়ে না ওঠে। তিনি লিখেছেন—একবার জাভায় এক দুর্গম পত্রসঙ্কুল অরণ্যে ঢুকে তিনি বেরুতে আর পথ পান না। উঃ শ্বাস আসে আটকে—কোথায় লোকালয় কোথায় লোকালয় ক'রে প্রাণ ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। কবিরা বন নিয়ে মাতামাতি করেন, বন কাকে বলে জানেন না ব'লে। বনের মতন বন মনের মতন হয় কেবল শ্বাপদের বা খেচরের। মানুষ স্বভাব-আরণ্যক নয়—অন্তত স্বভাবে সভ্য মানুষ নয়। কী? সেকালের তপোবন? কিন্তু সে সবও ঐ যে বললাম নির্ভেজাল বন ছিল না—তাদের নাম কানন। সেখানে হিংস্র পশুপক্ষীর প্রাদুর্ভাব ছিল না; নীবার, আলবাল, শকুন্তলা, বালব্রহ্মচারী, গুরু, তাপস, তাপসী, ধেনু, উদ্যান—এসবই ফুটে উঠত আনন্দ ও শান্তির রসে রসিয়ে।

কিন্তু তবু সভ্য মানুষের মধ্যেও আছে তার আদিম আবির্ভাবের প্রবণতা। তাই দুর্গম বিপদসঙ্কুল গিরিবর্ত্ম পর্বতচূড়া মেরুযাত্রা আরো তার কাছে বরণীয়, ভয়াবহ জলপ্রপাত বা গহ্বর তাকে আগে মুগ্ধ করে। উপনিষদে বলেছে সেই পরম পুরুষের ভয়েই বায়ু বয়, আগুন পোড়ায়, গ্রহউপগ্রহ স্বকক্ষপথে ঘোরে। ভয়াবহ কিছুর মধ্যে তাই তো পাই বিরাটের স্পর্শ। আমরা নিত্যই থাকি নিজেদের সসীমতার গণ্ডীবদ্ধ—সসীমতা আমাদের ক্ষুণ্ণ করে, ব্যাহত করে, বাড়তে দেয় না। তাই থেকে থেকে ছাড়া পেতে ছুটে যাই গহন অরণ্যে—তুঙ্গ পর্বতে—অপার জলযাত্রায়।

পেশোয়ারের পথে এই শ্রেণীর বিপুলকায় খাত, গহ্বর—ravine দেখলাম। স্থানে স্থানে স্রোতস্বিনী এসে মিলিয়েছে তার নাগরিক সুরটি। যেন তপস্বীর দুশ্চর তপশ্চর্যার বর দিতে এসেছে কোনো অপ্সরী। বড় মনোহর কঠোরে-কোমলে এ-সঙ্গম। সচরাচর রসভোগে দ্বৈতই আমাদের মন টানে। সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, আলো ছায়া, মেঘ রৌদ্র—এদেরই আঙনে আমরা বাসা বাঁধি—অল্প নিয়েই ঘর করি। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই তো অনল্পের এত আদর। পেশোয়ারের পথে শৈলমালার বিপুলবিস্তীর্ণ মূর্তির অপরূপ মহিমার দৃশ্যে একথা আরো মনে হ'ল—যেন

নতুন ক'রে। মনে হ'ল মানুষের স্বভাব বিচিত্র—কত ভাবে যে সে রস চায়, কত রূপে যে সে নিজেকে দেখতে চায়! পর্বতের চূড়া থেকে অকারণ ঝাঁপ দিতে পারে যে উন্মাদ কেবল সেই বটে, কিন্তু কে না কল্পনায় ঝাঁপ দিয়েছে বলো? আকাশে উড়তে যদি সত্যিই হ'ত—মানে দেহসম্বল হ'য়ে—তাহ'লে মাথা যে ঘুরত এ নিশ্চয়, কিন্তু তবু পাখি দেখে কে না কল্পনায় পাখি হয়েছে? আকাশ আমাদের আপন নয়—তবু কে বলবে সে মাটির চেয়ে আমাদের কম আপন? না স্নেহময়ী, তুমি তো জানো ভাই, ধ্যানে অনন্তপথের জয়যাত্রী হওয়ায় কী আনন্দ। জীবনে সবচেয়ে বড় উপলব্ধিদেরকে বলতে গেলে প্যারাডক্সের মতন শোনায়। শোনাবেই, কেন না মহৎ উপলব্ধিগুলি বড় ব'লেই গড়পড়তাদেরকে করে নামঞ্জুর, আর তাতে অনাদৃতরা জোট পাকিয়ে রুখে ওঠে। এইখানেই প্যারাডক্সের মনস্তত্ত্ব নিহিত।

* * * *

একথার আর একটা প্রমাণ পেলাম সিন্ধুনদে এসে। এপথে পেশোয়ার যেতে হ'লে সিন্ধুনদকে না ডিঙিয়ে লক্ষ্যসিদ্ধি অসম্ভব। আমাদের পেট্রলযানকেও তাই যেতে হ'ল সিন্ধুনদের উপর দিয়ে।

আহা কী সে দৃশ্য স্নেহময়ী! নদীর সঙ্গে পাহাড়ের সে কী সমন্বয়! নীলাঞ্চলা আবর্তসঙ্কুলা উদারকিঙ্কিণি সিন্ধু! ব্যাকরণ ভুবল—ক্ষমণীয়, সিন্ধু নদ নদী নয় যে! অথচ নীলাঞ্চলা না ব'লে নীলাঞ্চল বললে মন গালে যেন চড় মারে, অভ্যেস স্নেহময়ী, অভ্যেস। সেই যে রাজপুত্তুর বলেছিল না—কী শীত কী গ্রীষ্ম তাঁর দুটি ক'রে বোম্বাই আম চাইই চাই ক্ষীরযোগে? কোটালপুত্তুর আপত্তি ক'রে উঠল: "কিন্তু শীতকালে বোম্বাই আম পান কোত্থেকে?" রাজপুত্তুর উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল: "কি জানো? ও কেমন অভ্যেস!" তাই নদের বিশেষণে স্ত্রীত্ব আরোপ।

অসম্ভব নিত্য হয় সম্ভব সমান
অভ্যাসের ইন্দ্রজালে—শোনো পুণ্যবান্

কিন্তু যা বলছিলাম। সিন্ধুনদী—থুড়ি নদের—সে মহিমময় দৃশ্য ভুলব না। হরিৎ নীলাভ জল যেন ডাকছে নীলাম্বতাভ ফেনমালার হাততালি দিয়ে। ওখানে পাহাড়—চলেছে অশ্রান্তনটিনী তার নীল নূপুর বাজিয়ে—দেখলে প্রাণের কণ্ঠে জেগে ওঠে গান:

সুপ্তির সাথী শান্তিরে করো আদর যে কত ছন্দে!
চিরজাগ্রতা চিরচঞ্চলা গতির অধীরানন্দে!
শ্যামলের কায়া ধরো কলকান্না মিটাতে মরুর পিপাসা
রূপরাগ তব কণ্ঠে উছল, মরমে—অরূপ দুরাশা।
সুনীল লহরী মুকুরে ফলিয়া নীলিমার জয় যাত্রা
আনিলে ধরার অঙ্গনে কোন্ অধরার বরবার্তা?

* * * *

পেশোয়ার শহরটি গোলাপ ফুলের জন্যে বিখ্যাত জানো বোধ হয়। কিন্তু এছাড়া এর আর একটি বস্তু উৎকৃষ্ট—জলহাওয়া। পেশোয়ারে পৌছতে না পৌছতে—

কণ্ঠে জাগিল সঙ্গীত, প্রতি অঙ্গে জাগিল শিহরণ
অম্বর হ'তে আলো-অপ্সরী করে আনন্দ বিতরণ।

ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা কে না পড়েছে শিশুকালে? হঠাৎ মানুষের জন্মভূমির আবহাওয়া তার দেহমনের আবহাওয়াও গড়ে তোলে এ-কিম্বদন্তী অংশত সত্য সন্দেহ কি? দৈহিক গড়ন সম্বন্ধে একথা বললে বেশি কেউ আপত্তি করবে না, কিন্তু আমাদের মনের প্রকৃতিও যে বাইরের প্রকৃতির প্রভাবে অনেকখানি গ'ড়ে ওঠে, একথা হ'ল সেই শ্রেণীর "প্রতিজ্ঞা" যাকে পুরোপুরি প্রতিপন্ন করা অসাধ্য না হ'লেও দুঃসাধ্য সন্দেহ নেই। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের মূল দৃষ্টি, বস্তুতাত্ত্বিক—মেটীরিয়ালিস্ট—কাজেই যদি বলি—"ঐ দেখ, জলহাওয়ার গুণে পেশোয়ারি বা কাবুলিরা কী বলিষ্ঠ", তা হ'লে হয়ত একথাও বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্তহিসেবে মানবেন যে এ-দেহবলের ছোপ মনেও লাগে। কারণ, অভিজ্ঞতায় একথাও সবাই জানে, প্রকৃতি যেখানে বেশি প্রশ্রয়দাত্রী নন সেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব বেশি সমৃদ্ধ। পেশোয়ারীদের ধরণধারণ দেখে ভালো লাগে আরো এই জন্যে। এরা দেখতেও যেমন জোয়ান মনেও তেমনি উদার। এ সম্পর্কে এদের অধিনায়ক আবদুল গফুর খাঁ ওরফে সীমান্ত গান্ধির কিছু বর্ণনা করলে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি।

বহুদিন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল, এই নির্ভীক বলিষ্ঠ

উদার মানুষটির সঙ্গে আলাপ করব। ছবিটবিতে এঁর চেহারা আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল। পেশোয়ারে আমি এসেছিলাম খাইবার পাস দেখতে নয়—এই মানুষটিকে দেখতে—তাঁর নিজকীয় পরিবেশে—তাঁর ভিটেয়—উৎমানজই গ্রামে। এ সময়ে (অক্টোবরে) মহাত্মা গান্ধিও তাঁর অতিথি ছিলেন। কাজেই দুই মহাত্মাকে এক সঙ্গে দেখার লোভ সামলাতে পারি নি।

পেশোয়ারে আমরা উঠেছিলাম তত্রত্য হিসাবনায়ক—কন্‌ট্রোলার—শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী মহাশয়ের অতিথি হয়ে। চৌধুরী মহাশয় সহধর্মিণী সহ যথোচিত আতিথ্যধর্মিষ্ঠ হ'তে ত্রুটি করেন নি, এ কথা বোধ হয় না বললেও চলতে পারে। কারণ ও অঞ্চলে তাঁর আতিথ্য-বদান্যতা একটা দ্রষ্টব্য বস্তু: বিশেষ, বাঙালীরা আসে পেশোয়ারে প্রথম, খাইবার পাস দেখবার দুর্ভোগ সইতে (পেশোয়ারে এলে ঐ নীরস পাসটি দেখাই চাই, নইলে লোকে বলবে কি এই ভয়ে··সেই সনাতন টুরিস্টীয় কর্মভোগ!) দ্বিতীয়, চৌধুরী মহাশয়ের আতিথ্য উপভোগ করতে। এ হেন অতিথি-বৎসলতা দাতাকর্ণের পরকমই দেখা গেছে। ধরণীদা যেমন ভ্রমণ স্পেশালিস্ট, চৌধুরী মহাশয় তেমনি অতিথি-স্পেশালিস্ট, আতিথ্য গ্রহণে না অবশ্য—আতিথ্য দানে। এঁর সহধর্মিণীও এ বিষয়ে সত্যিই পতিমর্মিণী। কি না, উভয়ে কম্পীট করেন কে বেশি অতিথিবৎসল দেখতে ও দেখাতে। কেবল এক বিষয়ে এঁদের মধ্যে ঈষৎ মতভেদ আছে—(no rose without a thorn বলে না?)—সে হচ্ছে, ভোজ্য-বিধানে। চৌধুরী মহাশয় সংযমী পুরুষ, কাজেই অতিথিদের পাকস্থলী অত্যধিক ভারাক্রান্ত না হয় এদিকে তাঁর দৃষ্টি প্রখর। চৌধুরাণীর মতিগতি উল্টো। তিনি আটাশটির কম ব্যঞ্জন রাঁধেনই না। এতে বড় মজা হ'ত সময়ে সময়ে। ধরো, দুপুরে চৌধুরাণী আমাদের খুব খাওয়ালেন গণ্ডেপিণ্ডে। বিকেলেও চা-যোগে তিনি বিপুলপস্থিনী হ'তে চান, বলেন :

"হে অতিথি জেনো
যত খাই তত বল দেহে পাই, তাই কম খেতে চাই না।"

অম্‌নি চৌধুরী মহাশয় হাঁ হাঁ করতে করতে পাদপূরণ করেন :

"না অতিথি শোনো,
যত খাই তত মোটা হ'য়ে যাই, তাই বেশি খেতে ধাই না।"

সময়ে সময়ে এহেন প্রশ্রয় নিরুৎসাহের আলো-ছায়ায় বেশ একটা আমোদের ছবি ফুটে উঠত।

* * * *

চৌধুরী সাহেবের কৃপায় মোটরের অভাব ছিল না।

ঝিলম ও বজরা

কাজেই মোটরে ক'রে দুদিন গেলাম মহাত্মা গান্ধি-সন্দর্শনে আবদুল গফুর খাঁর বাড়ি।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ি। খাঁ সাহেবের ছেলে করল অভ্যর্থনা। মহাত্মাজি স্নানের ঘরে গেছেন। খাঁ সাহেব এলেন ধীরে ধীরে। কথা বলছিলেন আশ পাশের গ্রামবাসীদের সঙ্গে—কুঁড়ে ঘরে বেঞ্চিতে ব'সে। তিনি শুধু জীবন নয়, প্রতি আচরণেই তাদের সপাংক্তেয়। মহাত্মাজিকে এই ধরণের পল্লী-পরিবেশে দেখতে পেয়ে ভাগ্য গণলাম। তার উপর সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ও শিষ্য আবদুল গফুর খাঁ। সব জড়িয়ে এ-যাত্রাটা আমাদের হয়েছিল জয়যাত্রা। (এখানে তোমাকে চুপি চুপি ব'লে রাখি, মহাত্মাজিকে হাল আমলে

অশ্রদ্ধা করার যে ফ্যাসানের চল হয়েছে বাংলা দেশে সে-ফ্যাশনে আমি সায় দিই না, মহাত্মাজিকে ঠিক আগেকার মতনই ভক্তি করি)।

এমন অনেক সময়েই হয় যে, দর্শনীয়কে কল্পনায় এত রাঙিয়ে রেখেছি যে চোখে দেখলে ধূসর লাগে—যেমন উল্টোটাও হয়—অর্থাৎ বাস্তব কল্পনাকেও মানায় হার। খাঁ সাহেব এই শেষের দলের লোক। আসল মানুষটিকে কল্পিত মানুষের চেয়েও বেশি ভালো লেগে গেল। পেশোয়ারীদের পৌরুষ, দীর্ঘকায়, ঈষৎ রক্তিম স্বাস্থ্যদীপ্তির আভা গৌরবরণ শ্মশ্রুল মুখটিকে মনোহর ক'রে তুলেছে।

আলাপ করলেন হিন্দিতে।

শ্রীমতী দে জায়া ও তাঁর পোষা বাঘ

কত দুঃখ তাঁকে সইতে হয়েছে শুনলাম তাঁর মুখে। কতবারই যে জেলে গেছেন ও বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। তখন জেলের ব্যবস্থা ছিল জঘন্য। খাবার ছিল এমনই অখাদ্য যে খেয়ে তাঁর সমস্ত দাঁতের মাড়ি উঠল প'চে—সব কয়টি দাঁত তুলে ফেলতে হ'ল। আরো কত ক্লেশ। অথচ সেজন্যে কোনো ক্ষোভ নেই এঁর মনে। খাঁ সাহেব মার্টার স্বধর্মে। বহুবার কারাবরণ করেছেন জেনে শুনেই। কিন্তু সেখানে যে দুঃখ পেয়েছেন সে-দুঃখকে প্রাপ্য ব'লেই বরণ করতে পেরেছেন। স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের ম'তই স্বেচ্ছাবৃত দুঃখ তাঁর চরিত্রকে করেছে উজ্জ্বলতর—তাঁর চেহারায়ও লেগেছে এই ঔজ্জ্বল্যের ছোপ। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের কি একটা লেখায় পড়েছিলাম—দুঃখকে যখন মানুষ আত্মসাৎ করে তখন দুঃখের তাপ ফুটে ওঠে আলো হয়ে। ক্ষোভ হ'ল এই তাপ—তেজ হ'ল আলো। খাঁ সাহেব তাঁর দুঃখের সমস্ত ইন্ধনটুকুর তাপ আলোয় রূপান্তরিত করেছেন তাঁর প্রসন্ন গ্রহণশক্তির রসায়নে। কিন্তু দুঃখ নিয়ে যখন মানুষ ক্ষুব্ধ হয় তখন সে আলো না বিলিয়ে বিলোয় শুধু তাপ। এই সত্যটি খাঁ সাহেবের সংস্পর্শে এসে যেন নতুন ক'রে প্রত্যক্ষ করলাম।

কথায় কথায় তিনি তুললেন পেশোয়ারীদের প্রসঙ্গ। বললেন, এরা সহজেই বিশ্বাস করে। এদের হিংস্রতা সম্বন্ধে যত সব রচনা তার সাড়ে পনর আনাই ভুয়ো। তবে এরা কথা দিয়ে কথা না রাখলে অগ্নিশর্মা হ'য়ে ওঠে। তাই এদেরকে অহিংস রাখা শক্ত বই কি। কিন্তু তা ব'লে প্রকৃতিতে এরা মোটেই অশান্ত নয়। তবে কি-না তেজস্বিতার যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ প্রবৃত্তিদমন তথা আত্মসংযমে, তার খবর এরা বড় একটা রাখে না। এরা হৃদ্যতায় সাড়া দিতে যতখানি তৎপর, অসদাচরণের শোধ তুলতেও ঠিক তেমনিই পটু। কিন্তু মোটের উপর এরা প্রকৃতিতে সরল, একরোখা, বিশ্বস্ত।

আরো অনেক কথাই হ'ল তাঁর সঙ্গে। তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা শান্ত অথচ কঠিন দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে যে সময়ে সময়ে অভিভূতি আনে। এঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে বেশ বোঝা যায়, কেন এঁকে পেশোয়ারীরা তাদের "বাদশা"—বাচা—শিরোপা দিল। যারা বহুকে চালায় তাদের মধ্যে থাকে একটা আশ্চর্য চুম্বক। তার বর্ণনা হয় না। বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সত্য থাকলেও সে-ভাবের ভাবুকদের এ-মত অগ্রাহ্য যে, যুগই গড়ে তার মানুষকে। রাসেলের বিশ্লেষণই সত্যের বেশি কাছ ঘেঁষে যায় যে, মস্ত পার্সনালিটিরা অনেক সময়েই স্বয়ম্ভু, যুগ তাদের গড়ে নি—বরং তারাই যুগধর্মের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে বার বার, বার বার, বার বার। আজকের দিনে একথা কে অস্বীকার করবে যে, লেনিনের জন্ম না হ'লে রুষদেশে এত বড় একটা আন্দোলন এত তাড়াতাড়ি রূপপরিগ্রহ করতে পারত না? ধর্মের এলাকায় একথা যে আরো হাজার গুণে

সত্য, তা কি আর বলার দরকার আছে? বুদ্ধ বা খৃষ্ট যদি না জন্মাতেন তো মানবসভ্যতার চেহারা যে বদ্‌লে যেত এটা অনুমান নয়—এরই নাম নৈশ্চিত্য। কিন্তু এ গবেষণা থাক্, খাঁ সাহেবের কথাই বলি! কথায় কথায় বললাম: "খাঁ সাহেব, আপনার মতন এমন মানুষই তো আমাদের চাই —যাঁর মধ্যে রয়েছে প্রেমের সঙ্গে সত্যের যোগ। আপনি মিল ক'রে দিন হিন্দু-মুসলমানের। নইলে ভারতবর্ষের গতি কী হবে বলুন?"

খাঁ সাহেবের মুখে ফুটে উঠল করুণ হাসি, বললেন: "আমি কী করব বলুন? মিল হয় তখনই যখন অন্তরে আসে নির্ভর—যখন মানুষ প্রেমের মন্ত্রকে দলের মন্ত্রের চেয়ে বড় ব'লে মানে। ভিতরে প্রীতির ভিৎ পাকা না হ'লে বাইরে মিলনের ইমারৎ শুধু তাসের ঘরই হ'য়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ে যতদিন আচারগত ধর্মের চেয়ে আন্তর মৈত্রীকে বড় ক'রে না দেখবে ততদিন হ'তে পারে শুধু সুবিধে-গড়া সন্ধি —সৌভ্রাত্রের রাখীবন্ধন না।"

এমন সময়ে স্নান সেরে মহাত্মাজি ঢুকলেন। উঠে দাঁড়ালাম সবাই।

একগাল হেসে মহাত্মাজি ইঙ্গিত করলেন বসতে। মুখে খুশির কী যে দীপ্তি! জহরলালের কথা মনে পড়ে— মহাত্মাজির শিশুসরল হাসি যে না দেখেছে মহাত্মাজির মাহাত্ম্যের অনেকখানিই তার কাছে অগোচর র'য়ে গেল।

ওমা, মহাত্মাজি আজ মাস দুই হ'ল মৌনী! কথাটিও কইবেন না। প্রায় ব'সে পড়লাম।

বললাম: "আমরা বড়ই বিপন্ন বোধ করছি—মহাত্মাজি কথা বলেন না কতদিন?"

মহাত্মাজি হেসে একটি কাগজে লিখলেন: "মাস দুই। এতে শুধু যে আমারই ভালো হয়েছে তাই নয়, অপরেরও মঙ্গল" (My silence is good for me and certainly good for everybody else)। ঘরে হাসির ধুম প'ড়ে গেল।

একথা সেকথার পরে মহাত্মাজি কাগজে লিখে প্রশ্ন করলেন: "Why have you not brought the Nightingale?"

আমি বললাম: "উমাকে কাল আনব, সে গেছে আজ খাইবার পাস দেখতে।"

* * * *

সেদিন উৎমানজইয়ে গিয়েছিলাম শুধু আমি, মায়া ও মানুদা। পরদিন গেলাম সদলবলে—চৌধুরী-দম্পতীও সঙ্গ নিলেন।

মহাত্মাজিকে প্রণাম করতেই তিনি তাকালেন এষার দিকে। বললাম: "এরই কথা আপনি লিখেছিলেন আপনার পোস্টকার্ডে। ও আপনাকে আজ ওর নাচ দেখাতেই পণ ক'রে এসেছে।"

মহাত্মাজি সায় দিয়ে খুব একগাল হাসলেন।

বললাম: "এতে আপনি খুশি, না অখুশি, মহাত্মাজি?"

কাশ্মীরে সিন্ধুনদে তুষার দৃশ্য

মহাত্মাজি কাগজে ফের লিখলেন: "গীতার ভাষায় বলতে গেলে আমার হওয়া উচিত না-খুশি, না-অখুশি।" (In the language of the Gita I should be neither glad nor sorry.)

বললাম: "কিন্তু হৃদয়ের ভাষায়?"

মহাত্মাজি তৎক্ষণাৎ লিখলেন: "হৃদয়ের কোনো ভাষা নেই, কেন না, হৃদয় কথা কয় শুধু হৃদয়ের সঙ্গে। (The heart has no language, it speaks to the heart).

প্রথমে উমার সঙ্গে আমি গাইলাম ডুয়েটে "চাকর রাখো জি।" তারপর এষা নাচল ওর গানের সঙ্গে :

আজ সখী স্থন বাজত বাঁসরিয়া
নির্মল নীরে যমুনা তীরে গাবত সাঁবরিয়া।
ইত্যাদি

বিশেষ ক'রে এ গানটির সার্গমের সঙ্গে এষার নাচ উঠল জ'মে। এ-সার্গমটি শুনো গ্রামোফোনে। অনেকের এ নতুন ধরণের সার্গমটি অত্যন্ত ভাল লেগেছে ব'লেই শুনতে বলছি।

এবার বিদায় নেবার পালা। মহাত্মাজি কাগজে লিখলেন: Do you want me to say—'many thanks'? It looks so utterly ridiculous. But if you

গান্ধীজি, আবদুল গফুর খাঁ প্রভৃতি

want the ridiculous you may have them. (তোমরা কি চাও আমি বলি—'বহু ধন্যবাদ'? এক্ষেত্রে ধন্যবাদ জ্ঞাপন যে কী হসনীয়! তবে যদি তোমরা হসনীয়কেই চাও—তবে নেও)।

*　*　*　*

ফিরবার সময়ে মান্নুদা আমি বাবুল ও হাসি ফিরলাম একটি মোটরে। সে মোটরের সারথি ছিলেন যিনি তাঁর নামকরণে হয়েছিল একটুখানি চুক। কারণ, নিশ্চয়ই তাঁর নাম হওয়া উচিত ছিল শ্রীমৎ বিদ্যুৎবীর্য। উঃ কী হাঁকানোটাই না তিনি হাঁকালেন! মান্নুদা বেচারীর তো চক্ষু চড়কগাছ। বাবুলের, হাসি-র ও আমার খুব ভালো লাগছিল মোটরের সে-উল্কাবেগ—কিন্তু আরো ভালো লাগছিল সারথিকে। মান্নুদার সেই গলদ্‌ঘর্ম উপদেশ, সানুনয় উপরোধ—সর্বোপরি সর্বনাশা বেগের অজস্র কুফলের অপ্রতিবাদ্য ব্যাখ্যা :

ঐ ঐ ঐ—করছ কী হে?—সাম্‌নে ও যে গরুর গাড়ি!
চললে সোজা টিপ ক'রে তায়? সুস্থ কি আর ফিরব বাড়ি?
এখানে হাসপাতালো নয় ভালো শুনি—ঐ ঐ—আঃ—
কী করো হে? ডাইনে বেঁকো—ঐ যে ডোবা—
সাম্‌লাও—যাঃ—
গেল গেল ঘোলা জলে হায় পৈতৃক প্রাণটা গেল—
না যাক্, গেছি বেঁচে—ও কী! ডাইনে কেন? বাঁয়ে হেল।
দুগ্‌গা দুগ্‌গা—এমন ফেরেও হায় বিভূঁয়ে মানুষ পড়ে!
এমন করলে কেমন ক'রে আত্মারাম আর থাকেন ধড়ে?
ও কি—হাসি! অত হাসা মানায় না বালিকায় মোটে ··
গান গাও তাই রক্ষে পেলে—নৈলে যেতাম বিষম চ'টে।
কী মণ্টু? তুমিও ব্রুটাস্! এ-ও কি হ'ল হাসির কথা?
কবি তুমি নও—হ'লে হায় ব্যথার ব্যথী বুঝতে ব্যথা।
স্কিড্ করা কার নাম জানো কি? পিছ্‌লে গেলে কী যে—ইয়ে
হবে জানো? ফুঁ যদি দিই মণ্টু-গুঁড়ো ফরফরিয়ে
যাবে উড়ে—আর বাবুলের হাস্যবদন হবে যে কী—
গেল গেল—এই দুষ্‌মণ সারথিটা ভেবেছে কী?
ও কী? হাসি! ও হাসি নয় বোদ্ধা হাসি—ওর যে কী নাম
জানো কি গো? নির্বোধ যে সারে কি তার হাসির ব্যারাম?
উল্টোলে এ রথ সরলা, কী যে হবে জানো কি তা?
উল্টে যাবে বিধির রীতি—নিচে মাথা ওপরে পা।
এই—ড্রাইভার!—গেছি গেছি—হায় দুর্গা, ও শ্রীহরি!
বেঘোরে প্রাণ গেল মা বাপ,—বাঁচাও আমায় কৃপা করি
দিচ্ছি কথা মগের দেশে আসব না আর—বেলতলাতে
ডুবার কি সে যায় হায়—নেই কেশের লেশও যার মাথাতে!
জানো কি হে "ক্যাপসাইজিং" কাকে বলে সায়েবেরা!
মোটর মানুষ চড়ে কেন? ইঞ্জিয়ার সবার সেরা।
থাম্ রে শোফার, একটুও কি নেই রে দয়া তোদের ডেরায়?
নেই ফোরসাইট? কত ফ্যাসাদ আছে জানিস বেগের নেশায়?
এম্‌নি যদি ফাটে টায়ার—থাম্‌বে গাড়ি, আর কিছু না।
বেগের মাথায় ফাট্‌লে রে ভাই, কী হবে—
কেউ জানে কি তা?

তার ওপরে তোমরা শিশু—ভাঙলেও হাড় লাগবে জোড়া।
বৃদ্ধ হ'লে রোগা—সে যে গোদের ওপর বিষের ফোঁড়া।
বেগ্‌যান এই সৃষ্টি ক'রেই হ'ল মানুষ কপাল-পোড়া।
মোটর শোফার হায় হ'ল তাই আমারি শিল আমার নোড়া।
এবারটি ভাই দে ক্ষ্যামা—তোর কানে কথাও যায় না কি রে?
ঝাঁকুনিতে পায়ের রক্ত চিংড়ি সম উঠল শিরে।
এই হাসি! ফের্! জানবে কবে—এম্‌নি ক'রেই ডিগবাজিতে
মরে মানুষ গ্রহের ফেরে বাহাদুরীর কারসাজিতে।
ও—ও—ওঃ—গিছি গিছি—দুগ্‌গা নাম আর কেন জপা?
হাড়গুলো সব ভেস্তে গেল—নই তো মুনি মহাতপা :
"মানু" আমার নাম মোটে ভাই, "মানুষ" হওয়ার
একটু বাকি—
সে-চেষ্টায়ো হ'লাম ব্যর্থ—হায় রে, এ-খেদ কোথায় রাখি?
মিথ্যে এলাম হেথায়—গেলাম—প'লাম—ম'লাম—
থাম্‌রে চাষা!
হাসি!—আমি উঠব রেগে—না থামলে অভব্য হাসা!
মণ্টু! তুমি বোঝাও ওকে—বোঝাও অবোধ সারথিকে
ভেবেছ কি তুলব পটল আমিই—থাকবে তোমরা টিঁকে!"

* * * *

কিন্তু দরদীর কাছে সত্যিই এ হাসির কথা নয় স্নেহময়ী! মানুদার সেদিনকার মুখ যদি দেখতে তোমার নিশ্চয় স্নেহ হ'ত। মানুদা বেচারী প্রকৃতিতে বেজায় সাবধান—তাই বেগের নেশায় যত য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে সেইগুলিই মনে টাঙিয়ে রেখেছে, ভুলে গেছে যে দ্রুতগমনে যত দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের সংখ্যা খুবই কম। মানুষ যে নিশ্বাসটি বেদনায় ফেলে সেটিই মনে রাখলে যে হাজার লক্ষ নিশ্বাস সহজে ফেলে তাদের ভুলে যায়। কাশ্মীরেও তাই ও বহুক্ষেত্রেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠত—পাছে বিপাকে পড়ে। যুক্তির দিক দিয়ে একথা অস্বীকার করাও যায় না যে, আস্তে চলায় বিপদ কম, জোরে চলায় বিপদ বেশি। একথাও অপ্রতিবাদ্য—যুক্তির দিক দিয়ে—যে সাবধানের মার নেই। কিন্তু এই জীবনটা বড় বিচিত্র। তার আনন্দের তহবিল প্রায়ই খালি থেকে যায় যদি বিপদকে একেবারে খারিজ ক'রে দেওয়া যায়। এখানে কাল গিয়েছিলাম এক আর-এন-দে নামে অরণ্যরক্ষী (forest officer) উচ্চপদস্থ বন্ধুর বাড়ি। তাঁর স্ত্রী পুষেছিলেন বাঘের বাচ্চা। ব্যাঘ্রশাবকের সঙ্গে তাঁর ছবি দেখলাম। সত্যি কথা বলতে কি, বাঘ পুষতে আমি তেমনি ডরাই, মোটরে ছুটতে মানুদা যেমন ডরায়। কিন্তু কল্পনা করতে বাধে না যে—বাঘ পোষায় দে-জায়া বিড়াল পোষার চেয়ে বেশি আনন্দ পেতেন। এই ব্যাঘ্রশিশু তাঁকে কাম্‌ড়েও দিয়েছে দু-একবার—তবু তাকে তিনি অনেক দিন তাঁবে রেখেছিলেন শুধু এই জন্যেই নয় কি যে, বিড়ালকের চেয়ে শার্দ্দূলককে তাঁবেদার রাখায় বেশি আনন্দ?—এই জন্যেই না কবি লিখেছিলেন :

সীমান্ত গান্ধী ও তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেব

জানো না কি বিপদ এবং আমোদেই ঘেঁষাঘেঁষি?
যেখানে ভাই বিপদ অধিক সেইখানেতেই আমোদ বেশি?
মানুষ-ঠেলা গাড়ি ক'রেও যাওয়া যায় না কোনো গতিক?
তবুও তার চেয়ে তেজী ঘোড়শোয়ারেই আমোদ অধিক।
তাকে দমন করতে পারায়, তাকে নিজের বশে আনায়
(যদিও তা করতে গিয়ে অনেক প্রভুই পড়েন খানায়)
তবু তাতে ফুর্‌তি একটা বিশেষ রকম আছে যেন
বিপদ আছে ব'লেই ফুরতি নইলে লোকে চড়ে কেন?

লাঠির চেয়ে তরোয়ালের খেলাই কেন করতে আসে ?
শশক শিকার চেয়ে কেন বাঘ শিকারই ভালোবাসে ?*

অবশ্য ভালোবাসে যে তার একটা প্রধান কারণ এই যে, বিপদে আছে উত্তেজনা, আর উত্তেজনার মধ্যে আছে যে-উত্তাপ তাকে অনেক সময়েই প্রথমটায় আনন্দ ব'লে ভুল হয়। কারণ এর মধ্যে আমাদের স্নায়বিক চেতনা অনেকখানি খোরাক পায়। সব ক্ষুধাতৃপ্তির মধ্যেই খানিকটা সুখ তো থাকেই।

তাছাড়া এ-যুগে স্নায়বিক আনন্দেরই প্রতিষ্ঠা বেশি। তাই না স্পীডের জয়জয়কার। এ আনন্দ গভীর নয়, কিন্তু ধীর। বেশির ভাগ মানুষ পথচলায় চায় তীব্রতাই বেশি গভীরতার চেয়ে। স্পীডের আনন্দ দেয় এই তীব্রতা। তীব্রতা আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে—মানে, তার প্রসাদে আমরা বেশি ক'রে উপলব্ধি করি যে আমরা বেঁচে আছি।
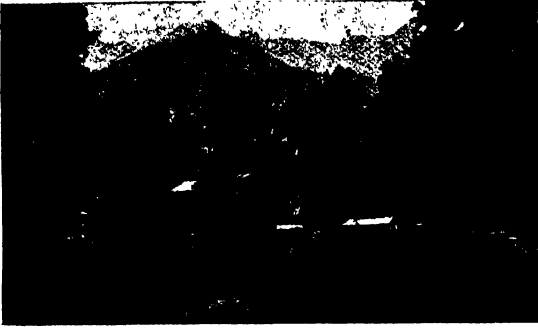
ডালহ্রদ ও শঙ্করাচার্যের পাহাড়

কিন্তু গভীরতার মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনার প্রশ্রয় নেই। তারা দেয় শান্তি। সচরাচর লোকে স্বস্তি আর শান্তিকে সমার্থক মনে ক'রে থাকে—ঠিক যেমন করে তামসিকতা ও সাত্ত্বিকতার বেলায়ও। এ ভুলের কারণ এই যে, বাইরে থেকে দেখতে ওদের চেহারা ভারি এক ধরণের। কিন্তু তলিয়ে দেখতে গেলে ধরা পড়ে যে ওদের মধ্যে প্রভেদ আশমান-জমিন। শান্তি হ'ল জীবনের মূলের সঙ্গে প্রাণের মৈত্রী, স্বস্তি হ'ল গতিচক্রের থেকে সাময়িক অব্যাহতি। একটা সদর্থক—positive, আর একটা নঙর্থক—negative. (সাত্ত্বিকতা ও তামসিকতার মূল ভেদও এইখানেই)। মানুষ তার গভীর প্রবৃত্তিতে চায় এই শান্তির রস। শান্তিতে তার প্রতিষ্ঠা। শান্তি বিনা কি সে বাঁচতে পারে ভাই? স্নায়বিক আনন্দ স্নায়বিক ব'লেই সাময়িক—ক্ষণিক অশান্ত। যুরোপ আমাদের আজ এই শিক্ষা দিতে চায় যে, ক্ষণসুখ বহুবাঞ্ছিত যদি তা তীব্র হয়। তীব্র বলতে তারা প্রায়ই গভীর বোঝে। কিন্তু তীব্রতা ও গভীরতা সমানধর্মী নয়। গভীরতার চাহিদা অন্তরের কাছে, তাই স্বাদ পেতে দেরি হয়।—তীব্রতা সহজেই আকৃষ্ট করে—কেন না, তার আবেদন প্রাণের চঞ্চলতার কোঠায়। এই জন্যেই গীতায় বলেছে যে গভীর সাত্ত্বিক আনন্দের চাখনদার হওয়া কঠিন—বহু অনুশীলনে তবে এ-রসের রসিক হওয়া যায়, যেখানে রাজসিক আনন্দকে গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু তবু বলব যে, রাজসিক উল্লাস তামসিক তন্দ্রালুতার চেয়ে বড়। মানুষ ঝিমিয়ে পড়ে সহজেই—তাই বিপদবরণকে ভালো ব'লেই মানি—এজন্যে নয় যে, তাতে উত্তেজনা আছে; এইজন্যে যে, এতে ক'রে আমরা চেতনার উচ্চতর স্তরে উঠি। তাই মানুদার অজস্র অকাট্য যুক্তি সত্ত্বেও আমি বলব যে যারা নিরাপদে ঝিমোয় তাদের স্বস্তির চেয়ে যারা উধাও পথের পথিক হ'তে চেয়ে আরামের নোঙর কাটতে চায় তারা ঊর্ধ্বতর চেতনার মানুষ। একথা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা শক্ত, কেন না, এধরণের উপলব্ধির প্রেরণা আসে যুক্তিলোক থেকে নয়, তার চেয়ে ঊর্ধ্বতর জগত থেকে। কাজেই এ-ধরণের উপলব্ধি বা নৈশ্চিত্যকে যুক্তিতর্ক দিয়ে সাব্যস্ত করতে গেলে হয়ত নিরাপদপন্থীই জিৎবেন জমা-খরচের ওকালতিতে। কিন্তু জীবনের বিচিত্রতা এইখানেই যে যারা বেশি চালাক তারাই বেশি হারায় কম দেখে'—যারা এককথায় ধ্রুবকে ছাড়ে অধ্রুবকে পেতে, তারা অধ্রুবকে যদি না-ও পায় তবু না-পাওয়ার মধ্যে দিয়ে এমন কিছু পায়ই যা পায় না তারা যারা সাবধানতার ঘাঁটি আগলে ব'সে রইল। তবে হয়েচে কি, এ ধরণের উপলব্ধিকে প্রমাণ করবার কোনো বাঁধা শড়কট নেই। কেবল একটা কথা বলা চলে যে, যারা সব আগলে খাসা নিরাপদে ব'সে থাকে তারা জীবন থেকে তাদের দীর্ঘজীবী সঞ্চয়ে যতটা জমা করে হারায় তার চেয়ে অনেক বেশি খোয়ায়। রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীছাড়ার দলের" সম্বন্ধে স্তবগানে তাই আমি যোগ দেই সর্বান্তঃকরণে—যদিও সঙ্গে সঙ্গে একথা ব'লে রাখতেই হবে যে, জীবনে সবচেয়ে বড় প্রবণতা উত্তেজনার নয়—গভীরতার। তবে কি না, গভীরতার পসারীদের চেয়ে উত্তেজনার খরিদ্দাররা চিরদিনই দলে পুরু হ'য়ে এসেছে—হয়ত থাকবেও বরাবরই। তাই যদি মানুদা বিদ্যুৎগতির উল্লাসকে এদিক দিয়ে নামঞ্জুর করতে চায় তাহ'লে বলতেই হবে সে ভুল বলছে না। ইতি

তোমার মণ্টুদা

* দ্বিজেন্দ্রলালের—"আলেখ্য" পুস্তকে মন্তপ কবিতা।

কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানা দেবী

গান

আমি স্বপনের মালা গাঁথি,
ওরে অসীম যে মোর সাথী।

আমি চলি তারি গান গেয়ে গেয়ে
সে যে চলে মোর তরীখানি বেয়ে
আমি আকাশ-কামনা গাঁথি
ওরে অসীম আমার সাথী।

আমি তপনের সুর সাধি'
বাঁধি অধরারে সুরে বাঁধি
তারি কণক-রশ্মি যানে
চলি চাহি' তার মুখপানে

সে যে চলে কূলে কূলে দুলে দুলে
আমি চলি অকূলের পাল তুলে
আমি আলোক-মন্ত্র গাঁথি
মোর সূর্য্য চন্দ্র সাথী॥

[সমা সমা সমা | সা]
ণ্া সা II { সমা জ্ঞা সা | ণ্সা ণ্দ্া ণ্া | (সমা জ্ঞা মা | জ্ঞমা জ্ঞমা সা) } সা মজ্ঞা মা
আ মি স্ব প নে র মা লা গাঁ - - থি - - গাঁ - -

মা মা মা | জ্ঞমা মা দা | দা মা -া | জ্ঞমদা ণর্সা দণর্সা | ণদা মা জ্ঞা | II
থি ও রে অ সী ম্ যে মো র্ সা - - থী- আ মি

[ণদা] [জ্ঞমদণা র্সণদমা জ্ঞমদণা | র্সা]
{ মা মা | জ্ঞা মা দা | ণা র্সা -া | র্জ্ঞর্জ্ঞর্সণা দা ণা | র্সা র্সা র্সা
আ মি চ লি তা রি গা ন্ গে - য়ে গে য়ে সে যে
সে যে চ লে কূ লে কূ লে দু - লে দু লে আ মি

সর্মা মর্া জ্ঞর্া |
র্সজ্ঞর্া জ্ঞর্া জ্ঞর্সা | র্মা জ্ঞর্মা মর্া | সর্মর্া জ্ঞর্মর্া জ্ঞর্মর্া | জ্ঞর্সর্া } {র্সা র্সা | সর্মর্া জ্ঞর্া র্সা |
চ লে মো র্ ত রী খা নি বে য়ে আ মি আ কা শ
চ লি অ কূ লে র পা ল তু লে চ লি আ লো ক

সর্জ্ঞা জ্ঞর্া র্সা | ণর্সা ণা দা]
ণর্জ্ঞা র্সা ণা | দর্সা ণা দা | মা } মা মা | মা জ্ঞমদা ণর্সা | ণর্সা ণর্সা -া
কা ম না গা - - থি ও রে অ সী- ম্ আ মা র
ম ন্ ত্র গাঁ - - থি মো র স্ব - প্ন চ ন্ দ্র

সা মা জ্ঞমা | সা ণ্া সা | II II
সা - থী - আ মি
সা - থী - আ মি

[জ্ঞা মা দা | মা ণা দা]
{সা সা | সা মা জ্ঞা | মা সা জ্ঞা | সমা জ্ঞা মা | -া মা মা | জ্ঞা মা মদা | দমা জ্ঞা মা
আ মি ত প নে র সু র সা ধি' - - বাঁ ধি অ ধ রা রে সু রে

র্সা দণা -া | া } ণদা ণা | ণা র্সা র্সা | মজ্ঞা দমা র্সণা | ণা দা মা | -া জ্ঞা মা
বাঁ ধি - তা রি ক ণ ক র - শ্মি যা নে - - চ লি

সদা দা দা | মা জ্ঞমা জ্ঞমা | সমা জ্ঞা মা | -া
চা হি' তা র্ মু খ পা নে - -

এ গানটির সুর মালকোষ, ছন্দপ্রধান, একটু নতুন ধরণের। সঙ্গীতশাস্ত্র মতে হয় তো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। মালকোষের জমকালো বা টুকরো নানা তানে, অথবা প্রতি ছত্রে কখনো সুরের কখনো ছন্দের নানা বৈচিত্র্যেই এ গানটির রূপ এবং রস ঠিক ফুটবে, নইলে শুধু মূল সুরে নয়। গানের কোনও এক একটি টুকরো নিয়ে সুরের নানা কারুকার্য্য ক'রে তাইতেই আবার ঘুরে ফিরে আসতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল সুরটিতে সে লাইনটি বা কলিটি এক একবার গেয়ে নিতে হবে, তাহ'লেই এই গানে যে-রসটি আনতে চেয়েছি তা ফুটে উঠবে। সব স্বরলিপিতে দেওয়া সম্ভব নয় ব'লে আমি শুধু মূল সুরটির স্বরলিপি দিলাম—বাকি গায়কের রস-সৃষ্টির ক্ষমতার হাতে। তাল—একতাল।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মিত্র

গীতিকাব্য

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

শ্রীচরণদাস ঘোষ

চৌদ্দ

সন্ধ্যা হইয়াছে। নগরের সুবৃহৎ এক অট্টালিকায় অতিরিক্ত সজ্জিত এক কক্ষে চিত্রা বসিয়া আছে—তাহার অঙ্গ ভরিয়া অলঙ্কার, পরিধানে সুচিক্কণ বিচিত্র-রঙের বস্ত্র। এখন সে নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরিকা।

কতক্ষণ বসিয়া তাহা হুঁস নাই, এক সময়ে চিত্রার মুখে হাসির ঈষৎ আভা দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়া অস্ফুট নির্গত হইল—"অসমাপ্ত মানুষ, অসমাপ্ত হাহাকার!"

এমনি সময়ে খাস ভৃত্য কঙ্কন প্রবেশ করিয়া চিত্রার হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিল—কাহার নাম লেখা।

পড়িয়াই চিত্রার মুখখানা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তেই সে-ভাবটা গোপন করিয়া কহিল, "নিয়ে আয়।"

প্রবেশ করিল নন্দন।

চিত্রা ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, লোকজনকে গৃহে তুলিবার—আবাহন ও বরণ করিয়া। হাসিয়াই কহিল, "হঠাৎ?"

"দরকার আছে।"

"খু—উ—ব?"

"নইলে আস্‌বো কেন?"

"হুঁ!" বলিয়া চিত্রা এক চাপা নিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর চকিত হইয়া পার্শ্বের একটি কাষ্ঠাধার হইতে একখণ্ড কাগজ তুলিয়া লইয়া নন্দনকে দেখাইল—তাহাতে লেখা চিত্রার আসন্ন সাক্ষাৎপ্রার্থীদের নাম ও সময়।

নন্দন মূঢ়ের ন্যায় কাগজখানার উপর চোখ বুলাইয়া প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

"এই—এত বিশিষ্ট ভদ্র লোক, শ্রেষ্ঠ নাগরিক, শ্রেষ্ঠী, রাজপুরুষ, সমাজপতি—একের পর একজনকে সময় দেওয়া আছে।"

"আমি তা জান্‌তে আসিনি।"

"বাজে লোক যারা তাদের সঙ্গে কথা কইবার অবসর আমার খুবই কম!"

নন্দন চমকিয়া উঠিল। মুখ খুলিয়া হঠাৎ আর কোনো কথা কহিতে পারিল না। বুঝি-বা তন্মুহূর্ত্তে এই কথাটাই তাহার সারা অন্তর ছাইয়া ছিল—'এই সে! ধরিত্রীর ধারাবাহিক ইতিহাসে ইহাদেরই নাম গৃহলক্ষ্মী!' * * * নন্দন চিত্রার দিকে তাকাইল, দেখিল—তাহার সুন্দর মুখে সেই অতুলনীয় রূপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই শাশ্বত শ্রী, যাহা কঙ্কনকে অহর্নিশ তন্ময় করিয়া রাখিত! বাহিরের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে—সবই সেই! তত্রাপি সে—এই? সহসা অবজ্ঞা ও ঘৃণায় তাহার অন্তঃস্থল ভরিয়া উঠিল—ছি, ছি!

নন্দনকে নীরব থাকিতে দেখিয়া চিত্রা পুনশ্চ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বল্‌বার কিছু থাকে ত' বলুন—সময় কম!"

"কঙ্কন নগরে এসেছে—"

কাহার নাম করিয়া কি কাহিনী নন্দন নিবেদন করিল, তাহা চিত্রা যেন বুঝিতেই পারে নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া কহিল, "কার কথা বল্‌ছেন?

"'কঙ্কন' ব'লে কাউকে তুমি চেন?"

অনাসক্ত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ চিত্রা জবাব দিল, "কত লোক আসে যায়! সবার নাম কি মনে রাখা সম্ভব?"

নন্দন মাটির দিকে মুখ নামাইল, তাহার মনে হইল পদতল হইতে যেন বসুমতী সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু হটিয়া পিছাইয়া যাইতে সে আসে নাই, পরক্ষণেই নিজেকে দৃঢ় করিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "আমার কথার সঠিক জবাব দাও—কোনও দিন নিজের সবটা সাজিয়ে দেবপূজার নৈবেদ্যর মতো কাউকে ধ'রে দিয়েছিলে কি-না?"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইল, যেন এক ভদ্র নারী সদর রাস্তায় হঠাৎ এক দুশ্চরিত্রের মুখ দেখিয়াছে!

নন্দন তেমনি করিয়াই আবার সুরু করিল, "কবে জান? যেদিন সে ছিল গৌতম, আর তুমি ছিলে অহল্যা! দিয়েছিলে—ওই রূপ?"

চিত্রা মুখ ফিরাইল। শ্লেষকণ্ঠে জবাব দিল, "রূপ?

একজনকে দিলে এর দাম ওঠে না, রূপের পূজারী প্রত্যেকের এতে অধিকার আছে!”

পরিষ্কার সরল কথা! এর প্রতিবাদ চলে না। সুতরাং, নন্দন চুপ করিয়াই রহিল। ক্ষণকাল পরে কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, “আমাকে চেন, এই তোমার সামনে যে দাঁড়িয়ে —এই আমাকে?”

ঘরময় শত বাতির আলো, সেই আলোকে চিত্রার মুখখানা চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। হঠাৎ অট্ট হাসিয়া বলিয়া উঠিল, “নিশ্চয়ই!”—বলিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল এবং চোখের পলক পড়িতে-না পড়িতেই একটি স্বর্ণ পাত্র ভরিয়া সুরা আনিয়া নন্দনের সম্মুখে ধরিল।

“ও কি!”—নন্দন খানিকটা পিছাইয়া গেল।

চিত্রার মুখে হাসি আর ধরে না—সেই হাসি! কহিল “তুমি দয়া করে চিনে এসেছ, আর আমি চিন্‌বো না?”

“ও-আবার কি?”

“পরিচয়! সুরাপাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়েছে দেখছ না? আমি নাগরিকা, এ আমার নবজন্ম, এ পথে প্রথম লম্পট—এসেছিলে তুমি!”

নন্দনের মুখখানা ঝুলিয়া পড়িল। অন্তত এ মেয়েটির কাছে এই অভিযোগের বুঝি-বা প্রতিবাদ নাই। কিন্তু কি করিয়া সে আজ বুঝাইয়া দিবে ‘আমি তা নই!’ একটু পরে মুখ তুলিয়া কহিল, “চিত্রা, তুমি এখন আমার—এ কথা একদিন বলেছিলাম, তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমাকে আমিই চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু কেন—তা বলবার অবসর দাও নি, আজ দেবে?”

চিত্রা আসক্তিহীন চক্ষে নন্দনের পানে একটিবার তাকাইল, তাকাইয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দন কিন্তু হাল ছাড়িল না। কহিল, “তুমি আর কঙ্কন! আমি জানতাম—তুমি তার কে! এও জানতাম, ছাড়াছাড়ি তোমাদের হবার নয়! কিন্তু তাই যখন হ’য়ে দাঁড়ালো তখন ভেবেছিলাম কি, শুন্‌বে?”

চিত্রা মুখ ফিরাইয়া বিদ্রূপের কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “আত্মহত্যা করবো—এই ত?”

“তাই করে থাকে! কিন্তু, সে কে, জান? পুরুষের মন নিয়ে যে মেয়ের জন্ম হয়!” বলিয়া নন্দন একটু থামিল। পরক্ষণেই আবার সুরু করিল, “বোধহয় এর চেয়ে তা ভাল ছিল। কিন্তু আমার কি মনে হলো, জান? মনে হলো, তাই যদি হয়, সে শোচনীয় মৃত্যু কঙ্কনকেও বাঁচিয়ে রাখ্‌বে না, হোক্ না সে যতই সাক্ষাৎ বুদ্ধদেব!” এক কটাক্ষ করিয়া আবার বলিয়া উঠিল, “তাই সাবিত্রী-সমাজের এক গোপন-অস্ত্র চুরি ক’রে তোমাকে জয় করতে গিয়েছিলাম—‘স্বামীর আদেশ—ইহলোকে তোমার ‘তুমিটি’ এখন থেকে আমার!”

চিত্রার মুখের উপর ঘন ঘন রঙ্ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—রোষের, বিদ্রূপের—ঘৃণা ও অবিশ্বাসের! ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, “আর একজন—তার—”

“হ্যাঁ! যার রক্ত মাংসের দেহ অন্তত তোমার কাছে একেবারেই নিষ্প্রাণ!”

চিত্রার চোখে আকস্মিক বিস্ময়ের এক ছোঁয়াচ পড়িল। পড়িতেই নন্দন কহিল, “শুন্‌বে, কেন?—এক জনের আত্মহত্যা বাঁচাতে আর একজনের আত্মহত্যার প্রয়োজন হয়! চিত্রা, যার সুনাম থাকে, মৃত্যু তাকে নিতে পারে না। কিন্তু, আমি লম্পট!”

চিত্রার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “আপনি চলে যান! বাজে কথা শোনবার অবসর নেই। আমার সময়ের দাম—অনেক!”

এক নির্ম্মল হাসি হাসিয়া নন্দন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, “মিথ্যে কথা। সীতা দেবী রামের অনুচরকে তাড়াতে পারেন নি, তুমিও পারবে না।” অতঃপর মুখের ভাব গম্ভীর করিয়া আবার সুরু করিল, “কিন্তু, আমি তখন ভুল করেছিলাম! আমার মনেই ছিল না—আমি পুরুষ মানুষ, আর তুমি স্ত্রীলোক! এ দুই পক্ষের সব কাজের হিসেব-নিকেশ এক নিয়মে চলে না। সেদিন বুঝিনি চিত্রা—যে নিয়মে আমরা চলি, সে নিয়মে তোমরা চল না। তখন টের পাইনি—বিধাতাপুরুষ তোমাদের জন্যে কোন নির্দ্দিষ্ট আইন, কোন বৈধ নিয়ম, এমন কি বুকের সঠিক অনুভূতি পর্য্যন্ত আমাদের মতো ক’রে তৈরী করতে পারেন নি। এ কথাটা বুঝিছি আজ! মেয়েমানুষ—অমৃত দিয়ে তোমরা পুরুষকে বাঁচাতে পার, আবার বিষ দিয়ে মারতেও তোমাদের বাধে না!”

এমন সময়ে কঙ্কন আসিয়া চিত্রার হাতে একখণ্ড কাগজ দিল। চিত্রা ত্রস্ত হইয়া উঠিল, প্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! নন্দনকে কহিল, “আচ্ছা, নমস্কার! আপনি

এখন যেতে পারেন।" তারপর কঙ্কনের দিকে ফিরিয়া নবাগত প্রার্থীকে ভিতরে আনিবার আদেশ দিল।

কঙ্কন চলিয়া গেল। কিন্তু নন্দন উঠিল না। চিত্রা ব্যস্ত হইয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "যান আপ্‌নি—"

নন্দনের মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। কহিল, "আত্মসম্মান সঙ্গে নিয়ে আসিনি, ও নিয়ে ফিরেও যাবো না—"

এমন সময়ে অদূর রাজপথ হইতে এক কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—"

সঙ্গে সঙ্গে নন্দনের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অস্ফুট আতঙ্কে বলিয়া উঠিল, "ওই শোনো! ও গলা চেন কি? ওই কঙ্কন—"

চিত্রা একটি বার ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়াই তার পর দ্বারদেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে নন্দনকে বলিয়া উঠিল, "আপনি এখনি বেরিয়ে যান!"

কিন্তু নন্দন এতটুকুও বিচলিত হইল না। কহিল, "এক কথায় তা কি পারি?" অতঃপর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল, "চিত্রা! সে আজ আর দশজনের একজন নয়—ভিক্ষু!--নিঃসম্বল এক ভিক্ষু! তার মাথায় হাজার লাঠি পড়্‌বে!"

চিত্রা আবার অপর দিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দন তথাপি দমিল না। ঘুরিয়া গিয়া চিত্রার চোখের উপর চোখ ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "এক কাজ করতে পার?—মা-দুর্গার মত তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও না!"

চিত্রার মুখে এক নির্ম্মম হাসির আলো দেখা দিল। শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "আমি?"

"হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ! এই মুহূর্ত্তের এই তুমি! নগরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকা—অপরূপ রূপবতী শ্রীমতী চিত্রা! যার হাতে—এ অঞ্চলের ধর্ম্ম, সমাজ, সমাজপতি!"

চিত্রার মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, যেন তার বুকের ভিতরটা মুচড়িয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সহজ মাত্রায় দাঁড় করাইয়া নন্দনকে ঘা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আর ভিক্ষুর হাতে—'পরমার্থ'!" বলিয়াই উঠিয়া গিয়া কক্ষের এক কোণে এটি-উটি সরাইয়া-নামাইয়া, নামাইয়া-সরাইয়া মানানসই করিতে লাগিল, যেন বা এই বিশেষ কাজটা হঠাৎ তার মনে পড়িয়াছে!

নন্দনও বিভ্রান্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থিরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সময় নেই, চিত্রা!"

চিত্রা ফিরিয়া দাঁড়াইল, যাহার দিকে চোখ ফিরায় সেই যেন এক অচেনা লোক? কহিল, "আমাকে ডাক্‌ছেন?"

এক আকস্মিক ক্রোধে নন্দনের চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল। বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না! তোমাকে যারা ডাকে তারা মাতাল!" বলিয়াই দৃঢ়পদক্ষেপে ঘর কাঁপাইয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে, থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—সমাজপতি?

কেহ যে ভিতরে আছে 'সমাজপতি' তাহা টের পান নাই; ভৃত্য চঞ্চলের মুখে ভিতরে প্রবেশের অবাধ আমন্ত্রণ পাইয়াছেন যে! নন্দনকে দেখিয়াই তাঁহার মুখখানা কালি হইয়া গেল।

আর নন্দন? বাঘের মুখে শিকার পড়িবার মত তার চোখ দুটা অস্বাভাবিক বড় হইয়া ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল! ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া অট্ট হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "স্বাগতং! শিবের ঘরে শিব!"

সমাজপতির পা দুটা তখন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সময়োচিত সামর্থ্যে কোনও রূপে নিজেকে খাড়া রাখিয়া বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই নন্দন বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই কি হয়!"

সমাজপতি থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। সভয়ে নন্দনের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি গীতার ব্যাখ্যা শুন্‌তে এসেছিলাম।"

"ব্যাখ্যা করতে আমিও প্রস্তুত।" বলিয়াই নন্দন অপর হাতে চিত্রার পরিত্যক্ত সেই সুরা পাত্রটা উঠাইয়া লইয়া চিত্রার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিল, "এইবার এই জিনিষ কাজে লাগ্‌বে।" বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া পাত্রটা সমাজপতির মুখের গোড়ায় ধরিল।

ব্যাপারটা যে কতদূর গুরুতর তাহা সমাজপতি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ছেড়ে দাও! আমি তোমার দাবী শুনতে রাজি!"

"হুঁ! সমাজপতি—পারের মাঝি!" বলিয়া নন্দন কি-যেন বিশেষ চিন্তা করিতে-করিতে সুরা পাত্রটা নামাইয়া রাখিল—তারপর হঠাৎ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা পারি! কিন্তু—"

সমাজপতি প্রবল আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "বল বাবা, বল—"

"একটা বিধেন!" বলিয়াই নন্দন ইতস্তত চাহিয়া কক্ষের এক কোণ হইতে একখণ্ড কাগজ ও কালি-কলম আনিয়া সমাজপতির সম্মুখে রাখিল, রাখিয়া কহিল, "লিখুন, স্বীকার করছি—বড় ভিক্ষুরই ধর্ম্ম!"

সমাজপতির মুখখানা আবার ছাই হইয়া গেল। নিস্ফল আক্রোশে তিনি মুহূর্ত্তকাল ফুলিয়া উঠিয়াই এতটুকু হইয়া গেলেন। অতঃপর অসহায়ের ন্যায় নন্দনের দিকে তাকাইতেই নন্দন গম্ভীরভাবে কহিল, "লিখে যান—কারণ, ভিক্ষুর ধর্ম্মে উন্নত হয়েছে কঙ্কন, আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে পতিত আমার ন্যায় নারকী!"

তর্ক করা বৃথা। সমাজপতি নির্দ্দেশমত লিখিয়া দিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেলেন; যেন এক নর-ঘাতক তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া রক্ত দেখিয়া তাঁহাকে নিস্তেজ করিয়া গোপনে রাস্তায় নামিয়া গিয়াছে।

নন্দনও আর অপেক্ষা করিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল—তখন এক অপ্রত্যাশিত জয়ের আলোকে তাহার সারা মুখ আলোকিত! আকস্মিক এক-ঝোঁকের মাথায় চিত্রার দিকে সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "স্বামী তার গর্ব্ব—এতে যদি স্ত্রীর গর্ব্ব হয়, তা হলে অহঙ্কার—সে তোমারই!"

বলিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পনের

নির্দ্দেশমত কঙ্কন পরদিন প্রভাতেই নগরে প্রবেশ করিয়াছিল। যাত্রাকালীন ত্রিবর্ণ করিলেন আশীর্ব্বাদ, মঠবাসী দিল বিদায়। একে-একে সকলেরই কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন সে কৌমুদীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কৌমুদী মুখ ফিরাইয়া ত্রিবর্ণকে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আমিও যাবো, বাবা?"

সকলেরই বিস্মিতচক্ষু কৌমুদীর উপর পড়িল। কিন্তু ত্রিবর্ণের চোখে এক অপরিমেয় স্নেহ আর পরিপূর্ণ কৌতুক! স্মিতমুখে কহিলেন, "কঙ্কনের গৌরব—এ ভাগাভাগী হবার নয়, মা!"

কৌমুদীর মুখটি একটিবার অবনত হইল। পরক্ষণেই আবার মুখ তুলিয়া কহিল, "কিন্তু সবায়ের সঙ্গে সবাই ত যায়! আমিও গেছি অনেকের সঙ্গে—"

"সবায়ের সঙ্গে তুলনা করে কঙ্কনকে এখানে আনি নি মা! বলেছি ত সেদিন, ভূমিষ্ঠ হয়েই ও দাঁড়াতে শিখেছে!"

"আহত হ'লে—"

"শুশ্রূষা? সেবা?—ও সবের প্রয়োজন ভিক্ষুর খুবই কম, একথা তুমিও জান!" কথাগুলি ত্রিবর্ণ স্নেহকণ্ঠে বলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। একটু পরেই আবার কহিলেন, "তবুও কেন ও-কথা বল্‌ছ, তা আমিও জানি! ধরিত্রী—এর একই বুকে শ্মশানও জ্বলে, আবার সন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়!"

কৌমুদীর মুখটি ঝুলিয়া পড়িল—লজ্জায়।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ত্রিবর্ণের। পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "প্রয়োজন যখন সত্যিই হবে, তখন কেউ তোমাকে ধরে রাখ্‌তে পারবে না। কিন্তু সে-বার্ত্তা এখনো তোমার কাছে পৌছয় নি!" বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

বিদায় মিলিয়াছে। কঙ্কনও আর অপেক্ষা করিল না।

* * * *

আকস্মিক হইলেও নিমেষেই কঙ্কনের অভিযান-বার্ত্তা নগরময় ছড়াইয়া পড়িল। রাজপথে পদার্পণ করিতেই উন্মত্ত নাগরিক দলে-দলে আসিয়া কঙ্কনের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—প্রত্যেকের হাতে লাঠি! সহস্র রক্তচক্ষু—তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া কঙ্কন, এক স্থির চন্দ্রালোক!

কঙ্কন হাসিয়া কহিল, "আমাকে মারবে? কিন্তু আমি যদি মার না খাই!"

জনতার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সচল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকের মুখে-চোখে যেন এক অপ্রতিহত মোহের স্পর্শ। কঙ্কনের পরিচিত মুখ, সৌম্য মূর্ত্তি, সুগৌর অবয়ব, সবচেয়ে তার নির্ভীক অথচ নির্বিষ কথাবার্ত্তা সকলকেই যেন বিহ্বল করিয়া তুলিল—ওই সেই সর্ব্বত্যাগী! কাহারো মুখে শব্দ নাই, যেন ওই পরামাশ্চর্য্য 'বিদ্রোহীর' মুখের এক দুর্লঙ্ঘ্য 'শাসন' সকলকেই বলিয়াছে—'চুপ্!'

একমুখ হাসি। কঙ্কন পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "কে-ন? আমি যে তোমাদের ভালবাসি!"

দলের যে অগ্রণী তাহার ঠোঁট দু'টা একবার নড়িয়াই থামিয়া গেল, যেন কিছু বলিতে চায়, পারিতেছে না!

কঙ্কনের দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। তৎক্ষণাৎ আবার কহিল, "এক রক্তে জন্ম আমাদের!"

লোকটির মুখ দিয়া এইবার কথা বাহির হইল। কণ্ঠে ঈষৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "না। বিধর্ম্মী তুমি শত্রু!"

"তা হ'লে আমারও হাতে লাঠি থাক্‌তো—"

"তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেছ!"

এই প্রশ্নের জবাব দিতেই বুঝি-বা কঙ্কনের ধরাতলে আবির্ভাব। মৃদুকণ্ঠে কহিল, "সে কি, আমি করেছি ভাই—না, তোমরা?"

মুহূর্ত্তেই সমগ্র জনতা ঝড় তুলিল—"আমরা?"

"হ্যাঁ! মানুষের ধর্ম্ম মানুষের গলা জড়িয়ে ধরা! কিন্তু তোমরা আমাকে মারতে এসেছ—এ-নির্দ্দেশ ত ধর্ম্মে নেই!" বলিয়াই কঙ্কন এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "মানুষ! ইহলোকের ওপর তার যা প্রথম কর্ত্তব্য, তাই তার ধর্ম্ম। ভূমিষ্ঠ হ'য়েই সে মায়ের কোলে ওঠে, তারপরই মায়ের গলা ধরে, দু' হাতে জড়িয়ে! 'মা' মানেই—মাটি, এই ইহলোক—পৃথিবীর সবাই!"

অপর পক্ষের লোকটিও প্রস্তুত হইয়াছিল। অবিলম্বেই সে প্রতি-জবাব দিল, "ঋষির শাস্ত্র তা বলে না!"

কঙ্কন সহাস্যে জবাব দিল, "হ্যাঁ ভাই, ঋষির শাস্ত্রও তাই বলে। তোমরা তা জান, কিন্তু মান না। ধর্ম্ম মনে ক'রে যা নিয়ে তোমরা এখন রয়েছ, আসলে ওটা ধর্ম্মই নয়—ধর্ম্মের বিকার মাত্র!"

সকলেই চমকিয়া উঠিল। কঙ্কনের কথা তখনও শেষ হয় নাই, কহিল, "কলঙ্ক! ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক—একেই একেই দূর করতে 'ভিক্ষু'র আবির্ভাব! আসলে 'ভিক্ষু'ও হিন্দু!"

কঙ্কনের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষের একে-একে সকলেই দেখিতে পাইল, যেন তাহার চোখ দিয়া এক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। একটু পরেই সে আবার সুরু করিল, "এই পৃথিবী—বিধাতার হাতে-গড়া এ উপবন! গাছপালা ভেঙে পথ করে চল্‌বার আমাদের অধিকার নেই! ধীর সন্তর্পণে পল্লব সরিয়ে প্রত্যেক পাতাটির ওপর মমতা রেখে আমাদের চল্‌তে হবে। হিন্দুধর্ম্ম—এই পথ-চলারই সঙ্কেত! এই সঙ্কেত তোমাদের হাতে পণ্ড হয়েছে!"

এক অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনী! প্রতিপক্ষের মুখের ভাব দেখিয়া প্রতীয়মান হইল যেন তাহারা প্রবল বিস্ময়ে ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ, স্বর্গীয় আত্মীয়স্বজন যে-ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হইয়া দেব-নিবাসে সিংহাসন পাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের অচল বিশ্বাস, উহাই কি আজ এই লোকটার মুখের এক খোঁচায় টলিয়া হইবে? মুহূর্ত্তেই সমাজপতির রক্তচক্ষু তাহাদের চোখে দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইল এবং ত্রস্ত হইয়া তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল, "তা হলে কি বল্‌তে চাও—আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ সবাই গেছেন নরকে?"

কঙ্কন মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, "আগেকার কথা আমি তুলিনি বন্ধু। আমি তুল্‌ছি, আজকের কথা! চেয়ে দেখো—আমরা এসেছি কি নিয়ে, আর তোমরা এসেছ কি দিতে! একদল—আনন্দময় নবজীবন, আর একদল—নিষ্ঠুর মৃত্যু!"

অপরপক্ষ নীরব হইয়া রহিল, যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল পরেই অগ্রণী প্রশ্ন করিল, "তোমরাও তা হ'লে হিন্দু!"

একমুখ হাসিয়া কঙ্কন জবাব দিল, "নিশ্চয়ই। পৃথিবীতে ধর্ম্ম—এক আর এক, দুই নয়! তবে যা মলিন হয়ে পড়েছে তাকে নির্ম্মল করা চাই!"

"তার মানে?"

"তোমাদের ধর্ম্ম, তার যা নির্দ্দেশ বর্ত্তমানে, তা তোমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য—তাই তোমরা একে বিকৃত ক'রে তুলেছ অহঙ্কারকে আদর্শ করে! কিন্তু ভিক্ষুর ধর্ম্ম সহজ সরল সুস্পষ্ট!"

অগ্রণী সম্মোহিতের ন্যায় প্রশ্ন করিল, "বুঝিয়ে বলো!" বলিয়াই সে মাটিতে বসিয়া পড়িল, আর-আর সকলেও বসিল। হাতের লাঠি ও তাদের মুঠি খুলিয়া পড়িয়া গেল।

এক বিরাট জনতা! সকলেই স্তব্ধ, সকলেই অলস, সকলেই তন্ময়, অথচ সকলেই সজীব। উহাদেরই সম্মুখে—দাঁড়াইয়া কঙ্কন—একাকী?

কঙ্কন কহিল, "ভিক্ষুর ধর্ম্ম—'আমি' আর 'তুমি' আলাদা নয়—পৃথিবীর সকল লোকের ভেতর 'তুমি' আর 'আমি' সবাই মিলে মিশে 'মানুষ'—একটি!"

একজন তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে—ছেলেপিলে নিয়েও সপরিবারে ভিক্ষু হ'তে পারি—এও তবে হ'তে পারে?"

কঙ্কনের মুখে তখনো হাসি মিলায় নাই। কহিল, "স্ত্রীপুত্র পরিবার কি তুমিআমি ছাড়া, ভাই?"

আর একজন কি বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না, এইবার যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, "ঘরে যুবতী বউ থাক্‌লেও?"

কঙ্কন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "যার বউ নেই, সে অসম্পূর্ণ মানুষ! বেশী ক'রে মানুষকে 'ভিক্ষু' করে ওঁরাই—সংসারে থেকেই!"

এমন সময়ে অদূরে যুক্তকণ্ঠের আওয়াজ উঠিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" এবং দেখিতে-দেখিতে একদল নাগরিক ভিড় ঠেলিয়া কঙ্কনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের মুখে-চোখে, সর্ব্বাঙ্গেই যেন এক নবজীবনের ঝড়!

আকস্মিক দৃশ্য! ও-পক্ষের সকলেই চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর অগ্রণী ইহাদের প্রত্যেকেরই মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সংশয়ে ও বিস্ময়ে কহিল, "তোমরা—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই নব-দলের একজন প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মানুষ, মানুষের পশু বৃত্তি ছেড়ে—ভিক্ষু!"

অগ্রণী চোখ মুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভি—ক্ষু?"

"সাক্ষী—সমাজপতি!"

অগ্রণীর চোখ মুখ স্থির হইয়া গেল, যেন আকাশের এক ঝলক্ বিদ্যুৎ তার দেহের চেতনা স্তব্ধ করিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল!

বুঝিতে পারিয়া নব দলের একজন হর্ষোজ্জ্বল মুখে কহিল, "না হ'লে, কি পারি?"

বলিয়া রাখি, ইহারাই সেদিন কঙ্কনের গৃহ হইতে দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল, বুঝি বা অবিচল এই সঙ্কল্প লইয়াই!

প্রতিপক্ষরা পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেই নব-দলের একজন অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরাও বল—সঙ্ঘং শরণং—"

অগ্রণী ত্রস্ত হইয়া হাত তুলিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও! আর একটু অপেক্ষা করো! সমাজপতি?—সমাজপতির মুখের একটা কথা, একটা বাণী—তারপর!" বলিয়াই বিভ্রান্তের ন্যায় সদলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

* * * *

পথে আর বাধা নাই। কঙ্কন আবার পথ ধরিল—সম্মুখে সে, পশ্চাতে তাহার নব-দল। অতঃপর নগরের নাট্যশালার যে দৃশ্য উন্মোচন হইল, তাহা অভূতপূর্ব্ব। যতই উহারা অগ্রসর হয়, ততই দলে দলে লোক ঝাঁপাইয়া পড়ে—মেয়ে, পুরুষ! কেহ কাহারো অনুমতি গ্রহণ করে না, কেহ কাহাকে প্রশ্নও করে না। বর্ত্তমান এই মুহূর্ত্ত—এ-সময়ে প্রত্যেকের যাহা করণীয়, যেন তাহাই সে করিতেছে—আত্মদান, ভিক্ষুর ব্রতে, ধর্ম্মে, জীবনে! দেখিতে দেখিতে সমগ্র নগরের যেন এক অভিনব, অপরূপ, অ-কল্পিত মূর্ত্তি ফিরিয়া গেল। ইহার যে সমস্ত অধিবাসী—তাহাদের কাহারো প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যেন এতদিন হয় নাই, হইয়াছে আজ! প্রকৃতিপুঞ্জ—তাহাদের অভিষেক যেন এতকাল ধরিয়া হয় নাই, হইয়াছে—এইমাত্র!

বিরাট বাহিনী। দুই-একটি মোড় ফিরিয়া আর একটি প্রশস্ত রাস্তা—সেই রাস্তায় পড়িয়া উহারা এক বাঁকের মুখে আসিতেই, পার্শ্বের এক বৃহৎ অট্টালিকার বারান্দায় একটি নারীমূর্ত্তি দেখা দিল এবং তৎক্ষণাৎ সে দ্রুতবেগে নীচে নামিয়া আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া কঙ্কনের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে হাসি, চোখে কৌতুক! কহিল, "আমি! চিন্‌তে পারেন আমাকে?"

সঙ্গে-সঙ্গে জবাবটা দিল বাহিনীর যুক্তকণ্ঠ—"নাগরিকা!"

কঙ্কনের নির্ব্বিকার মুখখানা নাগরিকার দিকে নামাইতেই নাগরিকা বাহিনীর জবাবটা সমর্থন করিল, "তাই!" বলিয়াই কঙ্কনকে কহিল, "একটা কথা আছে, শুন্‌বেন?"

"বলো।"

"আড়ালে! ঠাকুর-দেবতার কাছে নিবেদন কি-না!"

কঙ্কনের মুখে এইবার ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। কহিল, "আমি মানুষ—দশের একজন, দেশের সন্তান!" বলিয়াই বাহিনীকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিয়া নাগরিকাকে কহিল, "কোথায় যাবে, চলো।"

রাস্তা, তাহারই অপর পার্শ্বে একটি বড় গাছ—সেইখানে গিয়া উভয়ে দাঁড়াইল, মুখোমুখী হইয়া। একটু পরেই নাগরিকা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল ; হাসিয়াই কহিল, "এ রাস্তার ধার, এখানে আপনাকে নিয়ে দাঁড়ালে এখ্‌খুনি লোকে লোকারণ্য হবে! চলুন ওই ঝোপটার ভেতর—ওই যে বাগান, ওরই ঠিক ও-পারে।" বলিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইল।

দেহকে বাদ দিয়া আত্মাকে লইয়াই যাহার কারবার, তাহার নিকট স্থান বা পাত্র-পাত্রীর বিশেষ কোন অর্থ থাকে না। সুতরাং কঙ্কনও কোন আপত্তি করিল না। উভয়ে সেই ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিয়া একখানি প্রস্তর-খণ্ডের উপর উপবেশন করিল—পাশাপাশি।

উভয়েই চুপ্‌চাপ। কাহারো মুখে কথা নাই, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া। তারপর এক সময়ে নাগরিকা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। অকারণ এক হাসি, চাপিতে হইবে—তাই বুঝি-বা তাহা চাপিতে-চাপিতে নাগরিকা থাম্‌কা বলিয়া উঠিল, "চিত্রা আর কঙ্কন—কঙ্কন আর চিত্রা! কোথায় তারা আজ?"

"এই নাও, মৃত পুরাতনের বিস্ময় মুগ্ধ আকস্মিক নমস্কার!" কঙ্কন মুখখানা ঈষৎ নত করিয়া কহিল, "কি কথা বল্‌বে, বল্‌লে না?"

"আপনি ভিক্ষু—আপনার ধর্ম্ম কি? এককথায় বলুন!"

"ভালবাসা।"

হাসিতে কেহ বলে নাই। তথাপি একমুখ হাসিয়া নাগরিকা বলিয়া উঠিল, "জানি গো, জানি! নইলে তোমার জন্য ঘর ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়ি?" এক বিলোল কটাক্ষ করিয়াই সে আবার সুরু করিল, "জানি তোমার বুক আর কুবেরের ভাণ্ডার—দুই-ই সমান! নইলে অত লোক—ওরা কি পোষ মান্‌তো তোমার? কিন্তু—" হঠাৎ মুখের ভাব কঠিন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বল্‌তে পার, ওই বুক আর ওই ভালোবাসা—ওই দুটোর মালিক কে? তুমি, না আর কেউ?"

কঙ্কন চুপ করিয়া রহিল, বুঝি-বা মঠের অধ্যক্ষ এ-প্রশ্নের উত্তর তাহাকে শিখাইয়া দেন নাই।

কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটি ছাড়িবার পাত্রী নহে। এদিক-ওদিক একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই আবার গলা চাপিয়া কহিল, "একদিন! তুমি আর সে,. সে আর তুমি—এক-দুই, দুই-এক—মাত্র একটি মানুষ ছিলে! এ ছাড়া, এই এত বড় পৃথিবীর ভেতর আর কেউ ছিল কি?"

একজোড়া অবশ চোখ—সেই চোখ দুটি তুলিয়া কঙ্কন নাগরিকার দিকে তাকাইল। তাকাইতেই নাগরিকা আবার বলিয়া উঠিল, "কঙ্কন আর চিত্রা কোথায় তারা আজ?"

কঙ্কন তাড়াতাড়ি মুখ নামাইতেই নাগরিকা শাসন-কঠিন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তা হয় না, ভিক্ষু? তোমার মুখ চেয়ে আজ লক্ষ লোক—আমি একা নই! উত্তর দাও—ছিল কি তাদের মধ্যে আর কেউ?"

সম্মোহিতের ন্যায় কঙ্কন জবাব দিল, "না!"

নাগরিকা আবার সুরু করিল, "ঠিক সেইদিন—সেইদিন প্রয়োজন হ'য়েছিল, কাকে—কার? তোমাকে তার, না, তাকে তোমার?"

"যদি বলি—"

"থেমো না!"

"যদি বলি—আমাকেই তার!"

নাগরিকা এক মর্ম্মভেদী হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তাহ'লে জেনে রাখ্‌বো—পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত কলঙ্ক একদিন এক জায়গায় জড় হ'য়ে একটা মূর্ত্তি নিয়েছিল, সেই মূর্ত্তি—চিত্রার!"

কঙ্কনের মুখখানা কাঁপিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, "না। তাকেই—আমার!"

নাগরিকা নির্নিমেষনেত্রে কঙ্কনের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "কেন?"

কঙ্কন চুপ করিয়া রহিল, যেন প্রশ্নটা সে বুঝিতে পারে নাই, যেন বা উহার অর্থ ভিক্ষুর অভিধানে নাই।

নাগরিকা মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। ক্ষণপরেই আবার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "এ কথার জবাব দিতে তুমি পার না, ভিক্ষু! কেন পার না—তাও আমি জানি!"

চিত্রা থামিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তকাল। তারপর হঠাৎ শ্লেষ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষু, ঠকিয়ে ধার্ম্মিক হওয়া চলে, কিন্তু প্রেমিক হওয়া চলে না! 'ভালবাসা', ওই-ধর্ম্ম—ও তোমার নয়!" বলিয়াই উঠিয়া পড়িয়া বাহির হইয়া আলেয়ার ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

পশ্চাৎ হইতে পিঠের উপর হঠাৎ চাবুক পড়িলে মানুষ যেমন করিয়া উঠে তেম্‌নি করিয়াই কঙ্কন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তৎক্ষণাৎ সম্মুখের দিকে ঝোঁক দিয়া যেমন পা বাড়াইবে, পা উঠিল না, যেন পিছন হইতে টান পড়িয়াছে। কঙ্কন চমকিয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিল, দেখিল—যেন এক অতি-পরিচিত নারীমূর্ত্তি দুটি হাত জড় করিয়া একটিবার মাথা নোয়াইয়াই সরিয়া গেল, তার মুখে মিনতি, চোখে জল, সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া স্তব-স্তুতি! অনুমানে নহে, কঙ্কন স্পষ্ট করিয়াই বুঝিল, ও মূর্ত্তি—চিত্রার! * * * ওদিকে সে আর মুখ রাখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি যেমন মুখ ফিরাইবে, দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া—কৌমুদী!

(ক্রমশ)

নববর্ষা

শ্রীসুনীলবরণ রায়চৌধুরী

পুঞ্জীত মেঘে আঁধার আজিকে বরষা-প্রভাত বেলা।
দূরে বনশিরে চমকে বিজলী—যেন সে আলোর মেলা॥
উতলা বাতাসে শিরীষের সাড়ি,
উঠে পড়ে আর খেতেছে আছাড়ি;
দূর বেনুবনে সুরু হোল ওই কোন উন্মাদ খেলা।
পুঞ্জীত মেঘে আঁধার আজিকে বরষা প্রভাত বেলা॥

কালো দিঘীজলে তীরের তরুর ছায়া কেঁপে কেঁপে মরে,
গাঁয়ের বধূরা ওপার হইতে শূন্য কলস ভরে,
আকাশের পানে চাহে বারবার;
দূর পথে ফেরা যাবে না'ক আর,
সকাল বেলার বাসী কাজগুলো তাড়াতাড়ি সবে করে,
কালো দিঘী জলে তীরের তরুর ছায়া কেঁপে কেঁপে মরে।

দিগন্তরেরে আড়াল করিয়া সঘন বরষা ধারা;
শিঞ্জিনী তালে পুলকিত-চিত এল রে পাগল পারা,
এল পল্লীর ঘন বনতলে,
ঝরাল নিঝর কালো দিঘী জলে,
জল টগরের তনুলতা খালি জলতলে হোল হারা,
দিগন্তরের ওপার হইতে এল রে বরষা ধারা।

"দে জল" "দে জল"—চাতক যুগল উড়ে গেল কত দূরে,
বাতাসে সে ধ্বনি কেবলি যে শুনি গুমরে করুণ সুরে।
সিক্ত মাধবী কুঞ্জের ফাঁকে,
ক্লান্ত শালিক থেকে থেকে ডাকে,
ভিজা বায়ু পশে ঘরের দুয়ারে—যূঁইফুলবাস মাখা,
"দে জল" "দে জল" চাতক যুগল ছড়ায় আকাশে পাখা।

এমনি বরষা এসেছিল বুঝি দূর সে অতীত বরষে;
নীপের পরাগ বহিয়া পবনে দুকূল বাহিয়া হরষে।
বুঝি কালিদাস আপনারে হারা,
মেঘদূত তার কোরেছিল সারা,
মেঘমল্লার ছন্দে গাঁথিয়া প্রাণের অমিয় পরশে,
এমনি বরষা ছিল বুঝি সেই সুদূর অতীত বরষে!

বেহুলার ব্যথা বাজিতেছে বুকে। ডেকে গেল দেয়া সুদূরে,
কলার ভেলায় ভাসে কি সে আজও সাথে লয়ে প্রাণবধূরে?
নব বরষার জলে ভরা নদী,
সেই গান আজো গাহে নিরবধি,
তারই সে মেদুর মধুর রাগিণী ঝর ধারে বাজে শুকুরে।
বেহুলার ব্যথা আজো বাজে বুকে—ডাকে যবে দেয়া সুদূরে।

ডাহুক ডাহুকী ডাকিয়া মরিছে বেতসের বন আড়ালে,
চখা চখী দল কাঁদিয়া বিহ্বল—কেহ কারে বুঝি হারালে!
ভিজে শালিকের ছায়া পড়ে জলে,
গাঙ্ বেয়ে নেয়ে গান গেয়ে চলে,
জলধারা সাথে কেতকীর রেণু পথে পথে কেগো ছড়ালে?
ডাহুক ডাহুকী কেঁদে মরে আজ বেতসের বন আড়ালে।

যাদুবিদ্যা ও বাঙালী

যাদুকর পি-সি-সরকার

একদা ভারতের স্বর্ণযুগে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এমন বিদ্যা ছিল না, যাহা নিষ্ঠাসহকারে অধীত না হইত। সে ছিল ভারতের জাগরণ যুগ! তারপর পতন যুগের এক অশুভ মুহূর্ত্তে ভারতের সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার স্রোতে ভাঁটা পড়িল। বস্তুর বিজ্ঞান অতলে ডুবিল, সংগোপনের প্রয়াস সেখানে পাইল প্রাধান্য। ফলে জ্ঞানচর্চ্চা লোপ পাইল, সকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহ্যিক চাকচিক্যে তখন অন্ধ ও মুগ্ধ। সমাহিত হইয়া এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে ব্যথা ও বেদনায় বুক হাহাকার করিয়া ওঠে। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞানগবেষণামন্দিরের দ্বারে মাথা ঠুকিয়া যখন আত্মসম্বিৎহারা এই জাতিই আবার জাগিবে, তখন সে বুঝিবে তাহাদের কি ছিল এবং আলোচনার অভাবে তাহারা আজ কি অমূল্য সম্পদহারা হইয়াছে।

যে বিদ্যাদ্বারা একব্যক্তি অপরকে মোহিত বা বশীভূত করিয়া ফেলিতে পারে বা চক্ষুর সম্মুখে নানারূপ অদ্ভূত, চমকপ্রদ বা লোমহর্ষণ ক্রিয়া দেখাইতে পারে তাহাকেই যাদুবিদ্যা বলা হয়। যাদুকরগণ সাধারণের চক্ষে ধূলা দিয়া যে সকল কৌতূহলোদ্দীপক ও বিস্ময়কর রহস্যের সৃষ্টি করিয়া তোলে তাহা সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা বা সাধারণ দৃষ্টি দিয়া উদ্ঘাটন করা সহজসাধ্য নহে। যাদুবিদ্যার চমকপ্রদ ও লোমহর্ষণ ক্রিয়াদর্শনে কেবল বিস্ময়াবিষ্টই হইতে হয়। বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতগণকেও সময় সময় ইহার ভেল্কীতে পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। সেইজন্য যুগে যুগে সর্ব্বদেশেই যাদুবিদ্যা প্রভূত সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিয়াছে। যাদুবিদ্যার রোমাঞ্চকর অভিনয় দেখিলে ইংরেজী প্রবাদ—"Facts are sometimes stranger than fiction," অর্থাৎ—"সময়ে বাস্তব ঘটনা উপন্যাস অপেক্ষাও চমকপ্রদ হয়"—কথাটাই বার বার মনে আসে।

ভারতবর্ষকে যাদুবিদ্যার দেশ বলা হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এদেশে যাদুবিদ্যার যথেষ্ট সম্মান পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভারতীয় যাদুবিদ্যার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা আধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বলিত (spiritual) এবং অনেক অনেক যৌগিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতে আবিষ্কৃত সম্মোহনবিদ্যাও এই যাদুবিদ্যারই একটি অংশবিশেষ। বর্ত্তমানকালে বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের হিপ্নোটিজ্‌ম্ ও মেসমেরিজ্‌ম্ বিদ্যা অতিশয় আধুনিক। সম্মোহনবিদ্যা অধিকতর উচ্চাঙ্গের বিদ্যা।*

যাদু ও সম্মোহনবিদ্যা এতদ্দেশে অতিশয় প্রাচীন। ইহা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত অনিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির মধ্যে 'বশিত্ব' সিদ্ধির পর্য্যায়ভুক্ত। তন্ত্রশাস্ত্রের মারণ, উচাটন প্রভৃতির মধ্যে ইহা বশীকরণ অধ্যায়ের অন্তর্গত। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে প্রচুর সাধনার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের নামই সাধনা। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এই বিদ্যা মাঝে মাঝে প্রদর্শিত হইত, সেই জন্য ইহার নাম 'ইন্দ্রজালবিদ্যা' এবং ইহা দেবসেনানী কার্ত্তিকেয় আবিষ্কৃত চৌর্য্যবিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু ব্যাপারটি চুরি হইলেও তন্ত্রশাস্ত্রের অপরাপর বিভাগের ন্যায় প্রচুর সাধনাসাপেক্ষ। আজও প্রচলিত প্রবাদ শুনা যায় যে, বাঙলাদেশে ভোজরাজা নামক এক রাজা এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতেই ইহা ভোজরাজার খেলা, ভোজবাজী বা ভোজবিদ্যা নামে প্রচলিত। তাঁহার স্ত্রী রাণী ভানুমতীও

* 'হিপ্নোটিজ্‌ম্' এই ইংরেজী শব্দটি নিদ্রা অর্থে ব্যবহৃত গ্রীক শব্দ 'হিপ্নস্' (Hypnus) হইতে গঠিত এবং ইহার প্রকৃত অর্থ মায়ানিদ্রা বা নিদ্রাকর্ষণবিদ্যা—মেসমেরিজ্‌ম্ ও হিপ্নোটিজ্‌ম্ মূলত একই বিদ্যা। মেস্‌মেরিজ্‌ম্ এই শব্দটি উক্ত বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা ভিয়ানা শহরের ডাক্তার মেসমার সাহেবের নাম হইতে গঠিত। হিপ্নোটিজ্‌ম্ ও সম্মোহন বিদ্যায় পার্থক্যও যথেষ্ট। সম্যক্‌রূপে মোহিত হইলেই তবে সম্মোহন। সম্মোহিতাবস্থায় পাত্রের আত্মবোধ থাকে না ও বাহ্যজ্ঞান থাকে না, হিপ্নোটিজ্‌মে তাহা থাকিতেও পারে।—লেখক।

নাকি এই বিদ্যায় সমধিক পটিয়সী ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতেই ইহা "ভানুমতীর খেলা" নামে পরিচিত। এই সমস্ত হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে অতি পুরাতনকাল হইতেই এতদ্দেশে এই বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল। ধনী, দরিদ্র,রাজা,প্রজা সকলেই এই খেলা অত্যন্ত পছন্দ করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রচলিত প্রবাদ হইতে আজকাল একটি বাদানুবাদ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে ভোজরাজা ও ভানুমতী অবাঙালী ছিলেন। তাঁহাদের নাম হইতে ইহার প্রকৃত সত্য এখন নির্দ্দিষ্ট না হইলেও একথা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, সেকালে বাঙলাদেশে বহু প্রতিভাবান যাদুকর ছিলেন। ভোজরাজা ও ভানুমতীর নাম হইতে পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ—বিহার সংযুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা 'ভোজরাজকা খেল', 'ভানুমতীকা খেল' নামে সুপরিচিত। ভোজরাজা বা ভানুমতী বাঙালী বা অবাঙালী ছিলেন কি-না তাহা তাঁহাদের নাম হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান না হইলেও সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী অপর দুইজন প্রতিভাবান যাদুকরের নাম হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে বাঙালীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভাবান যাদুকর ছিলেন। তাঁহাদের নাম আত্মারাম সরকার ও বাঞ্ছারাম। যাদুবিদ্যা ব্যবসায়ীদের নিকট এই নাম দুইটি প্রায়ই শুনা যায়। বাঞ্ছারাম সরকার ও আত্মারাম সরকার যে বাঙালী নাম ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

মোগল-রাজত্বকালেও কয়েকজন বাঙালী যাদুকর সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মোগল বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তাঁহার স্বরচিত (আত্মচরিত) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে :

"আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বাঙলার কয়েকজন যাদুকর হাত সাফাই ও ভোজবাজীতে এরূপ দক্ষ ছিল যে, তাহাদের কাহিনী আমার এই আত্মজীবনীতে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি।

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে :

"এক সময়ে আমার দরবারে এইরূপ সাতজন বাঙালী বাজীকরের আবির্ভাব হয়। তাহারা তাহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল। আমাকে তাহারা গর্ব্ব করিয়া বলে যে, এমনই খেলা তাহারা দেখাইতে পারে যে মানুষের বুদ্ধি সেই খেলায় তাক্ লাগিয়া যাইবে। বস্তুত তাহারা বাজী দেখাইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি এমনিই অত্যদ্ভুত খেলা দেখাইল যে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়। বাস্তবিকই কৌশলগুলি এমনই আশ্চর্য্যজনক ছিল যে, আমরা যে যুগে বাস করিতেছি সেই যুগে এমন বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য।"—(মেজর প্রাইস কর্ত্তৃক অনূদিত 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী')।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এককালে বাঙালী যাদুকরগণ অত্যাশ্চর্য্য যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া লোক-সমাজে কিরূপ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করিয়াছিল, উহা সত্যই নিখিল-বঙ্গ, কেন, ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। কিন্তু বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে ও ইউরোপ-ভাবাপন্ন মনোভাবে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিদ্যা বিসর্জ্জন দিয়া আমরা নিঃস্ব হইয়া চলিয়াছিসাম। আমাদের স্বকীয় বিদ্যাটিও বৈদেশিক আবহাওয়ায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল। নতুবা শুধু বাঙলা কেন, মধ্যযুগে সমগ্র ভারতবর্ষে এই বিদ্যা প্রায় লোপ পাইয়াছিল। সে সময়কার কোন নাম-করা ঐন্দ্রজালিক বা যাদুবিদ্যার ইতিহাসও পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বিশিষ্ট বিদ্যাটির আবার পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সর্ব্বদেশেই এই বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ও বহুল প্রচার এই সময়েই পরিলক্ষিত হয়। যাদুকর হুডিনি, থ্রষ্টন, গলষ্টন, হফম্যান, ডেভাণ্ট, ম্যাস্কেলীন,ডেভেনপোর্ট প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের ভারতবর্ষও এই নবজাগরণে বাদ পড়ে নাই। তবে খুব প্রসিদ্ধ যাদুকর তখন কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই অবহেলিত বিদ্যাটি জন কয়েক বিশিষ্ট যাদুকরের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অপরিসীম সাধনায় ভারতের অতীত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বহুলাংশে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, যাঁহাদের চেষ্টায় ও সাধনায় ভারতবর্ষ আবার তাহার লুপ্তগৌরব ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে এবং বিশ্বসমক্ষে ভারতীয় যাদুবিদ্যার বিশেষত্বকে প্রকাশ করিয়া দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে তন্মধ্যে বাঙালী যাদুকরের দানই অধিক।

ভারতীয় যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে এখনও গবেষণার অনেক অবসর আছে, প্রকৃত গুণীর দৃষ্টি এই দিকে পড়িলে ভারতীয় যাদুবিদ্যার প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

পাগলের রোজনামচা *

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ তিনি মৃত—এক বড় আদালতের তিনি প্রধান বিচারক ছিলেন। তাঁর ন্যায়বিচারের সুনাম ছিল। নামটি তাঁর প্রবাদের মত ফরাসী বিচারালয়ে সকলে মানত। য়্যাডভোকেট, উকিল, বিচারকের দল তাঁকে দেখলে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নুইয়ে নমস্কার ক'রত;—তাঁর মহীয়ান্ মুখ—সমুজ্জ্বল ঘন-সন্নিবিষ্ট চোখ দুটিতে আরও উদ্ভাসিত দেখাত।

দুর্বলকে রক্ষা আর অপরাধের পিছনে তাড়না ক'রেই তিনি তাঁর জীবন কাটিয়েছিলেন। প্রতারক ও হত্যাকারীর এমন ঘোরতর শত্রু আর কেউ ছিল না; কারণ তিনি তাদের মনের গোপন চিন্তা, তাদের মুখের পানে চেয়েই ধ'রে ফেল্‌তে পারতেন।

আজ বিরাশী বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন। সমগ্র জাতির দুঃখ ও প্রশংসা তার সঙ্গে গেল। রক্ত-পোষাক পরিহিত সৈন্যদল তাঁর মৃতদেহ পাহারা দিল, শ্বেত-পোষাকে জনসাধারণ তাঁর কবরে চোখের জল ফেলল—যে অশ্রুধারা সত্যি ব'লেই মনে হ'য়েছিল।

কিন্তু এই বিচারকের নিজস্ব ডেস্ক খুঁজে যে অদ্ভুত রোজনাম্‌চা পাওয়া যায়, তাই শুনুন। বড় বড় অপরাধীদের মামলার রেকর্ডের সঙ্গে সেগুলিও ছিল। তার নাম দেওয়া ছিল:

কেন?

২০ জুন, ১৮৫১। এই মাত্র আমি কোর্ট থেকে উঠে আসছি। ব্লণ্ডের প্রাণদণ্ড দিলাম! কেন সে তার পাঁচটি ছেলে-মেয়েকে মেরে ফেলেছে? প্রায় এমন লোক দেখা যায়—হত্যা করা যাদের একটা আনন্দ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আনন্দ হওয়াই উচিত—হয়ত সব চেয়ে বড় আনন্দ, কারণ হত্যা করা খাওয়ার মতনই নয় কি? তৈরী করা আর ভেঙে ফেলা, নষ্ট করা! এই দুটি কথাতেই পৃথিবীর ইতিহাস আছে, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস! তবে হত্যা করা কেন এত মদ-বিহ্বল হবে না?

২৫ জুন। এমন একটা প্রাণী আছে—যে জীবিত, যে হাঁটে, যে দৌড়ায়—ভাব্‌বার কথা বটে! একটা প্রাণী? প্রাণী কি? এক সজীব পদার্থ—যা গতিবাদের প্রমাণ দেয় এবং সেই নীতিও যার ইচ্ছাশক্তিতে নিয়ন্ত্রিত। এই পদার্থ কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। মাটী থেকে মুক্ত তার পা দুটি। জীবনের একটী পরমাণু যা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় এবং জীবনের এই পরমাণুটিকে যে কেউ ইচ্ছামত বিনষ্ট করতে পারে, যদিও বলতে পারি না—এটার উদ্ভব কোথা থেকে। তারপর আর কিছুই থাকে না। এটা নষ্ট হয়—এর লীলা শেষ হ'য়ে যায়।

২৬ জুন। তবে কিসের জন্যে হত্যা করা অপরাধ? হ্যাঁ, কি কারণে? বরং এটাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রত্যেক প্রাণীর হত্যা করার চরম উদ্দেশ্য আছে। সে বাঁচবার জন্যে হত্যা করে, আবার হত্যা করার জন্যে বাঁচে। পশুশক্তি অবাধে হত্যা ক'রে যায়, প্রতি দিন, তার জীবদ্দশার প্রতি মুহূর্তে। মানুষ না-থেমে হত্যা ক'রে চলে—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে; কিন্তু যেহেতু এর উপর আনন্দের জন্যেও তাকে হত্যা ক'রতে হয়, তাই সে নানা রকমের শীকার করা আবিষ্কার ক'রেছে। হাতের মধ্যে যে পতঙ্গটিকে শিশু পায়, সেটিকে সে হত্যা করে—যত ছোট পাখী, ছোট ছোট প্রাণী—যা তার সামনে পড়ে। কিন্তু যে অদম্য হত্যার কামনা চিরদিন আমাদের মধ্যে আছে, তার জন্যে এসব পর্য্যাপ্ত নয়। পশু-হত্যা করাই পর্য্যাপ্ত নয়, মানুষও মারতে হবে। বহুকাল আগে নর-বলি দিয়ে এই প্রয়োজন পূর্ণ করা হ'ত। বর্ত্তমানে সমাজে বাস করার প্রয়োজনে হত্যাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হচ্ছে। আমরা হত্যাকারীকে দণ্ড দিই, শাস্তি দিই! কিন্তু যেহেতু আমরা

* গী-দ্য-মোপাসাঁ হইতে।

এই প্রাকৃতিক অথচ দাম্ভিক মৃত্যুর প্রবৃত্তিকে পথ না দিয়ে বাঁচতে পারি না, তাই আমরা থেকে থেকে শান্তি পাই—যুদ্ধ ক'রে। তখন একটা জাতি আর একটা জাতিকে হত্যা করে। রক্তের ভোজ লেগে যায়, যে ভোজে সৈন্যদল ক্ষেপে উঠে, জনসাধারণ মাতাল হয়। নারী, এমন কি, শিশুও রাত্রে শুয়ে শুয়ে বাতির আলোকে এই সব বিরাট হত্যার কাহিনী প'ড়ে মেতে ওঠে।

মানুষের এই কসাই-বৃত্তি যারা চালাচ্ছে—তাদের কি আমরা অপছন্দ করি? না, তাদের আমরা সম্মান দিয়ে ভরিয়ে দিই। সোনা ও রঙীন পোষাকে তাদের সাজাই, বুকে তাদের অলঙ্কার, মাথায় তাদের পালক এবং মেডাল, পুরস্কার, পদবী প্রভৃতি কত কিছু দিয়ে তাদের আমরা আরও বড় ক'রে দিই। তারা অহঙ্কারী এবং মাননীয়, মেয়েদের কাছে তারা ভালবাসার মত লোক, জনতা তাদের চীৎকার ক'রে অভিনন্দিত করে,—একমাত্র কারণ এই যে, তাদের লক্ষ্য মানুষের রক্তে নদী বইয়ে দেওয়া! মৃত্যুর যন্ত্রগুলি তারা রাস্তা দিয়ে দেখিয়ে টেনে নিয়ে যায় এবং কৃষ্ণপোষাক পরিহিত জনতা সেগুলি দেখে হিংসা করে। জীবিতের মর্মস্থলে হত্যা করার মহান নিয়ম প্রকৃতিই দিয়ে রেখেছে! হত্যা ছাড়া আর কিছুই সুন্দরতর এবং অধিকতর সম্মানজনক নাই!

৩০ জুন। হত্যা করা জীবনের নীতি, কারণ প্রকৃতি অনন্ত-যৌবন ভালবাসে। সে যেন তার সমস্ত জ্ঞানহীন কাজে চেঁচিয়ে বলে: "তাড়াতাড়ি কর! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!" যত বেশী সে বিনাশ করে, ততোধিক নিজেকে সে নতুন ক'রে গ'ড়ে নেয়।

৩ জুলাই। হত্যা করা নিশ্চয় এক অতুলনীয় ও রুচিকর আনন্দ। তোমার সামনে এক জীবন্ত চিন্তাশীল প্রাণীকে দাঁড় করানো হ'ল, তার বুকে একটা ছোট্ট ছিদ্র ক'রে দেওয়া হ'ল—মাত্র একটি ছিদ্র এবং সেই ছিদ্র দিয়ে লোহিত-তরল পদার্থ বাহির হ'তে লাগল,—দেহতত্ত্ববিদ যাকে বলে রক্ত, বলে প্রাণ। তারপর তোমার সম্মুখে এক গাদা মাংস রইল প'ড়ে শক্তিহীন, শীতল এবং চিন্তাহীন!

৫ আগষ্ট। আমি বিচার ক'রে আমার জীবন কাটিয়ে দিলাম। আমার মুখের কথায় দিলাম দণ্ড, হত্যা করলাম;—যারা ছুরি দিয়ে খুন ক'রেছে তাদের গিলোটিনে হত্যা করলাম। যে সব হত্যাকারীকে শাস্তি দিয়েছি, তাদেরই মত আমারও কি হত্যা করা ঠিক হয়েছে? কে জানে?

১০ আগষ্ট। কে পারবে জানতে কোনও কালে? কে আমাকে সন্দেহ করবে কোনও দিন, বিশেষ ক'রে যাকে মারতে আমার কোন অভিরুচি নাই—এমন কাউকে যদি আমি হত্যার জন্য মনোনীত করি?

২২ আগষ্ট। আমি আর নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারি না। পরীক্ষা করতে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীকে হত্যা ক'রেছি—সুরু হিসাবে। আমার চাকর জীনের একটী গোল্ডফিন্‌চ্ পাখী আফিসের জানালাতে খাঁচায় ছিল। তাকে কোন অজুহাতে কাজে পাঠিয়ে ছোট পাখীটাকে নিলাম, হাতের মধ্যে তার হৃৎ-স্পন্দন অনুভব ক'রলাম। কি গরম পাখীটার পালক! আমার উপরের ঘরে গেলাম। থেকে থেকে পাখীটাকে জোরে চাপ্‌তে থাকি, তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়; নিষ্ঠুর হলেও কি আনন্দদায়ক! প্রায় সেটার দমবন্ধ করে ফেলি আর কি! কিন্তু রক্ত দেখ্‌তে পাই না।

কাঁচি—নখ কাটার কাঁচি বাহির করে নিই, আর ধীরে ধীরে তিনটি আঘাতে পাখীটার গলা কেটে ফেলি। ঠোঁট খুলে সেটা, পালাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করে, কিন্তু চেপে ধরে থাকি। ওঃ! আমি ধ'রে থাকি—হয়ত একটা ক্ষেপা কুকুরকেও ধ'রে রাখতে পারতাম তখন!—রক্ত বেরিয়ে আসে—দেখতে পাই।

তারপর ঠিক হত্যাকারীদের মতই আমিও করি। কাঁচিখানি ধুয়ে ফেলি, আমার হাতও। জল ছিটিয়ে সেই দেহ, সেই পাখীটার ছোট্ট মৃতদেহ নিয়ে যাই—বাগানে লুকিয়ে ফেলতে। একটি স্ট-বেরী গাছের নীচে সেটাকে পুঁতে ফেলি। আর কিছুতেই সে পাখীটাকে দেখা যাবে না। প্রত্যেক দিন সেই গাছ থেকে একটা ক'রে স্ট্র-বেরী খেতে পারি। জীবন এম্‌নি ক'রে উপভোগ করা যায়, যদি উপায় জানা থাকে!

ফিরে এসে চাকর চেঁচামেচি করে, সে ভাবে তার পাখী উড়ে পালিয়ে গিয়েছে। কি ক'রে সে আমাকে সন্দেহ করতে পারে? আঃ!

২৫ আগষ্ট। মানুষ একটা হত্যা ক'রতেই হবে! মারতেই হবে!

৩০ আগষ্ট। মেরেছি। কিন্তু কত ছোট! ভার্নের বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কিছুই ভাবি নি—একেবারে কিছুই না। একটা ছোট ছেলে পথ দিয়ে আসে—একটা ছেলে—হাতে তার মাখম-মাখানো এক টুকরো রুটি। সে আমাকে দেখে দাঁড়ায়, বলে—"সুদিন-সুপ্রভাত বিচারক মশায়!"

আমার মাথায় সেই চিন্তা জেগে ওঠে: "হত্যা ক'রব এই ছেলেটাকে?"

উত্তর দিই—"তুমি একা নাকি, খোকা?"

"হ্যাঁ মশায়।"

"এই বনে একেবারে একা তুমি?"

"হ্যাঁ মশায়।"

মদের মত তাকে খুন করার নেশা লাগে। ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে যাই, যেন সে সন্দেহ ক'রে না পালায়। হঠাৎ তার গলা চেপে ধরি। তার ছোট হাত দিয়ে সে আমার কব্জী চেপে ধরে এবং তার দেহ আগুনের উপর পাখীর পালকের মত কাঁপতে থাকে। তার পর আর সে নড়ে না। খালে তার দেহ ছুঁড়ে ফেলে তার উপর কিছু ঘাস চাপিয়ে দিই। বাড়ী ফিরে এসে সান্ধ্য-ভোজন ভালই জমে। কত ছোট্ট সে। সন্ধ্যা বেলায় খুব খোশ-মেজাজে থাকি, যেন পুনর্যৌবন ফিরে এসেছে। রাত্রে ধর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে কাটাই। তাঁরা আমাকে হাস্য-রসিক বলেন। কিন্তু রক্ত আমি দেখ্‌তে পাই নি। স্থির হ'তে পারি না।

৩১ আগষ্ট। মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। তারা হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সেপ্টেম্বর ১। দুজন বেকার পথিককে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে। প্রমাণ মিলছে না কোনও।

২ সেপ্টেম্বর। ছেলেটার বাপ-মা আমার কাছে আসে। তারা কাঁদে! আঃ!

৬ অক্টোবর। কিছুই পাওয়া যায় নি আর। কোন পথচারী বেকার নিশ্চয় একাজ ক'রেছে। আঃ! যদি রক্ত দেখতে পেতাম, তবে এখন স্থির হ'তে পারতাম!

১০ অক্টোবর। আবার আর একটা। সকালে ব্রেক-ফাষ্টের পর নদীর ধারে ঘুরে বেড়াই। এক উইলো গাছের নীচে দেখি—এক জেলে ঘুমাচ্ছে। প্রায় দুপুর বেলা। কাছের আলুর ক্ষেতে পড়ে আছে একখানি কোদাল—যেন আমারই জন্যে।

সেটা তুলে নিই। ফিরে আসি; মুগুরের মত সেটা উঠিয়ে এক আঘাতে জেলের মাথাটা দেহ থেকে ছিঁড়ে ফেলি। ওঃ, রক্ত—রক্ত বেরিয়েছে। গোলাপের মত রাঙা রক্ত। ধীরে ধীরে রক্তের ধারা নদীর জলে গিয়ে মিশে। খুব গম্ভীর ভাবে আমি চ'লে যাই। যদি কেউ দেখত আমাকে! আঃ, আমাকে দিয়ে চমৎকার এক হত্যাকারীকে দেখানো যেত তবে আজ!

২৫ অক্টোবর। জেলের ব্যাপারটায় বড় সোরগোল হয়। তার ভাইপো, যে তার সঙ্গে মাছ ধরত, হত্যার অপরাধে তাকে ধরা হয়।

২৬ অক্টোবর। ম্যাজিষ্ট্রেট ভাইপোকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শহরের প্রত্যেকে তাই বিশ্বাস করে। আঃ!

২৭ অক্টোবর। ভাইপো নিজেকে বাঁচাতে যা-তা বলে। সে বলে—সে গ্রামে গিয়েছিল রুটি কিন্‌তে। সে শপথ করে যে তার খুড়োকে তার অনুপস্থিতিতে হত্যা করা হ'য়েছে! কে সে কথা বিশ্বাস ক'রবে?

২৮ অক্টোবর। ভাইপো প্রায় স্বীকার করে আর কি! তারা তার বুদ্ধি লোপ করিয়ে দিয়েছে দেখি! হায়—ন্যায় বিচার!

১৫ নভেম্বর। তার বিরুদ্ধে অগুণ্‌তি প্রমাণ, তার মধ্যে প্রধান কারণ সে তার খুড়োর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। দায়রা আদালতে আমিই সভাপতি হব।

১৮৫২, জানুয়ারী ২৫। প্রাণদণ্ড! প্রাণদণ্ড! প্রাণদণ্ড! আমি তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। য়্যাড-ভোকেট জেনারেল দেবদূতের মত ব'ল্‌লেন! আঃ! আবার আর একটা! তার মৃত্যু আমাকে দেখতেই হবে।

১০ মার্চ। কাজ শেষ। আজ সকালে তাকে গিলোটিনে দিল। ভাল ভাবে সে মরল—খুব ভাল ভাবে! আমার আনন্দ হ'ল! একটা মানুষের গলা কাটা দেখ্‌তে কি ভাল লাগে!

এখন—আমি অপেক্ষা ক'রব, অপেক্ষা ক'রতেও পারব। আমার ধরা পড়তে—এই রোজনামচা, এই সামান্য জিনিষটাই যথেষ্ট।

যুদ্ধ ও প্রগতি

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়চৌধুরী এম-এ

শত সহস্র যুগের অর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যখন প্রয়োগ হয় উগ্রলোভাতুর কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির উদ্দেশ্য সাধনে, তখন তার ফলাফল ভোগ করতে বাধ্য হয় সমগ্র জগৎ, সমগ্র সভ্যতা এবং সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ। তিল তিল ক'রে যে বিরাট প্রলয়শক্তি আজ পর্য্যন্ত মানুষের হাতে জমা হয়েছে, তার তুলনায় প্রকৃতির বিধ্বংসী ক্ষমতা খুবই তুচ্ছ।

এই প্রলয়ের ইতিহাসে এখন পর্য্যন্ত শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাসমর। এই যুদ্ধে সাতশ ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবন বিনষ্ট হয়েছে বা তাদের স্বাস্থ্যসুখ ও গৃহ-শান্তির বিলোপ ঘটেছে চিরদিনের জন্যে। এই বিরাট নরমেধ-যজ্ঞে বলি হয়েছিল একশ ত্রিশ লক্ষ যোদ্ধা এবং একশ ত্রিশ লক্ষ শান্তিপ্রিয় নিরীহ নাগরিক। এর ফলে পিতৃমাতৃহীন শিশুর সংখ্যা দাঁড়ায় নব্বই লক্ষ এবং পঞ্চাশ লক্ষ নারী হন স্বামীহারা। খাদ্যাভাব ও অন্যান্য কঠোর অবস্থার জন্যে যে ব্যাপক মহামারী প্রত্যেক দেশে হানা দিয়েছিল, তাতে যে কত লোক প্রাণ হারিয়েছে সংখ্যা তার এখনও সঠিক গণনা করতে পারা যায় নি। মিঃ এডউইন্ স্মিথের গণনা অনুসারে এই কারণে কেবলমাত্র আফ্রিকা মহাদেশেই যা লোকক্ষয় হয়েছে তার সংখ্যা মহাসমরের পূর্ব্ব পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত সেই দেশের গোষ্ঠীবিরোধে যা প্রাণহানি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী।

এ ত গেল কেবলমাত্র লোকক্ষয়ের কথা। এখন দেখা যাক্, ঐ যুদ্ধে যে অর্থব্যয় হয়েছিল তা মানবের সুখ সুবিধা ও কল্যাণের জন্যে ব্যয় করলে কি হতে পারত। এ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত অধ্যাপক নিকোলাস মারে বাটলার একটা হিসাব করেছেন। এই যুদ্ধে মোট এক শত বিশ হাজার কোটী টাকা খরচ হয়েছিল। অধ্যাপক বাটলার দেখিয়েছেন এই অর্থ যদি গঠনমুলক কাজে প্রয়োগ করা হ'ত তা হ'লে গ্রেটবৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, রুশিয়া, জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়ার প্রত্যেক পরিবারের এক একর ক'রে ভূমি, ছ হাজার পাঁচ শত টাকা মুল্যে একখানা ক'রে বাড়ী এবং দু হাজার ছ শত টাকার আসবাবপত্র হ'তে পারত। এ ছাড়া যে সকল শহরের লোকসংখ্যা বিশ লক্ষ বা তদূর্দ্ধ তার প্রত্যেকটিতে এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকার একটি ক'রে সাধারণ পাঠাগার ও দু কোটী ষাট লক্ষ টাকার একটি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারা যেত। আরও বন্দোবস্ত হতে পারত এক শত পঁচিশ হাজার শিক্ষক এবং ঐ সংখ্যক নার্সের জন্যে একটা 'চিরস্থায়ী ফণ্ড্'। এর পরেও যা উদ্বৃত্ত থাকত তা দিয়ে সমগ্র ফ্রান্স এবং বেলজিয়মকে ক্রয় করতে পারা যেত অনায়াসে।

লোকক্ষয় ও ধনক্ষয়ের একটা আভাষ পেলাম। এবার দেখা যাক্, গত মহাসমর জনসাধারণের দারিদ্র্য বাড়িয়ে দিয়েছে কতটা। যুদ্ধের খোরাক জুগিয়ে তখনকার দুর্ম্মূল্যের বাজারে মোটা মোটা মুনাফা লুফে নিয়ে বড় বড় ধনকুবের ব্যবসায়ী যারা—তারা হলেন আরও ধনী, সাধারণ অবস্থার লোক যারা—তারা হ'ল গরীব, আর যে ছিল গরীব —সে হ'ল আরও গরীব। যুদ্ধের পর থেকেই পর পর যে অর্থসঙ্কট দেখা দিচ্ছে তাতে দারিদ্র্যের সমস্যাকে দিনে দিনে তীব্র হ'তে তীব্রতর ক'রে তুলেছে। কয়েক বছর আগে বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘের গণনায় পৃথিবীর বেকার সংখ্যা ছিল তিনশ লক্ষ। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে অনাহারে এবং বার লক্ষ লোক ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে।

মহাসমরের মহাযজ্ঞ শেষ হবার পর বিশটি বছর কেটে গেল। আবার যুদ্ধের বিরাট আয়োজন চল্‌ছে। বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘ থেকে প্রকাশিত "আর্মামেণ্ট্‌স্ ইয়ার্ বুক"এ দেখা যায়, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আগামী যুদ্ধের জন্যে যা সামরিক ব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ গত যুদ্ধের দ্বিগুণ। বর্ত্তমানে বৃটেনের করদাতাগণ প্রতি মিনিটে তিন শত পাউণ্ড ওয়ার্-আপিসকে দিচ্ছেন।

এই যুদ্ধের যে প্রচ্ছদপট গড়ে উঠেছে তাও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। এ সময়ের মধ্যে ফলিত বিজ্ঞানের যা উন্নতি হয়েছে তারও তুলনা ইতিহাসে আর নেই।

রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টা আজ নিয়োজিত হচ্ছে—কি ক'রে প্রলয়শক্তি আরও উগ্র, আরও দ্রুত, আরও সহজ হতে পারে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিমান ছিল শিশু—আজ সে মৃত্যুর পূর্ণতেজী বাহন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের তুলনায় আধুনিক সমর-বিমান চার গুণ সমরোপকরণ বহন ক'রে তিনগুণ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।* বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধজয়ের চেষ্টা চল্‌বে শত্রুদেশের বেসামরিক অসহায় বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ওপর আগ্নেয় বোমা, বিষবাষ্প ও জীবাণু সংক্রামণের মারফৎ মৃত্যু বৃষ্টি ক'রে। আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের রণভূমিতে যে বর্ব্বর হত্যাকাণ্ড চলেছে তা অনাগত ভবিষ্যতের একটা ক্ষুদ্র পূর্ব্বাভাষ মাত্র। গত মহাসমর দীর্ঘ চার বছর ধরে চলেছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেন—সমরলিপ্সুদের হাতে যে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হয়েছে তার সঠিক ব্যবহার হ'লে আগামী বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র মানবসমাজ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভস্মস্তূপে পরিণত হ'তে পারে—সভ্যতার চিহ্নমাত্র আর থাকবে না।

বর্ত্তমানের উগ্র যুদ্ধবাদী দেশগুলি তাদের সমরলিপ্সার যে সকল কৈফিয়ৎ দিচ্ছে তার একটি হচ্ছে অস্তি (haves) এবং নাস্তির (have-nots) যুক্তি। আর একটি যুক্তি হচ্ছে জনবৃদ্ধির আধিক্যের চাপ (pressure of overpopulation) ও তজ্জন্য সম্প্রসারণের (expansion) প্রয়োজনীয়তা। সযত্ন প্রচারিত এই যুক্তিগুলি যে একেবারেই মেকি তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

স্যর টমাস হল্যান্ড তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর নিতান্ত অপরিহার্য্য পঁচিশটি দ্রব্যের মধ্যে বৃটীশ সাম্রাজ্যের মাত্র পাঁচটি নেই, ফ্রান্সের নেই উনিশটি, জাপানের সতের, জার্মানীর উনিশ এবং ইটালীর একুশটি। অস্তি-নাস্তির যুক্তি যদি সত্য হ'ত তা হ'লে ফরাসী রাষ্ট্রের বর্ত্তমান সমরবিমুখতার পরিবর্ত্তে দেখা যেত যুদ্ধের জন্যে তার তীব্র উন্মাদনা এবং য়ুরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি "যৌথ নিরাপত্তা"র (collective security) স্তম্ভ না হয়ে স্থান নিত সমরলিপ্ত দলগুলির পুরোভাগে।

জনসংখ্যার আধিক্যের কৈফিয়তও অস্তি-নাস্তি তর্কের মতই ফাঁকা। মজার কথা এই যে, জনসংখ্যার আধিক্য (overpopulation) এবং দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন (over production of commodities) এই দুটো একই সময়ে আজ আমাদের শুনতে হচ্ছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় দুই শত কোটী এবং বাৎসরিক বৃদ্ধির হার এর প্রায় একশতাংশ অর্থাৎ দুই কোটি। এই বর্দ্ধিত সংখ্যার জন্য খাদ্যাভাব ঘটবে এ হ'তেই পারে না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার যে সব অসাধ্যসাধন করছে—পৃথিবীর সকল দেশে তার সম্পূর্ণ প্রয়োগ করলে এই বর্দ্ধিত মানব-সংখ্যার আহার জুগিয়ে কিছু সঞ্চয়ও হ'তে পারে। একথা ভুল্‌লে চলবে না যে, আগে যেখানে এক একর ভূমির ধান থেকে শস্য তৈরী করতে পঞ্চাশ ঘণ্টা লাগত, আজ সেখানে ট্রাক্টর (Tractor) কাজ শেষ করে এক ঘণ্টায়। বিজ্ঞানের গতি মন্থর নয়। বিজ্ঞান আজ ক্ষিপ্রতালে নব নব আবিষ্কার ক'রে যাচ্ছে—একথা কে অস্বীকার করবে? গত মহাসমরের সময় লর্ড লিভারহুল্‌মে হিসাব ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত কলকারখানা, খনি প্রভৃতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে উৎপাদন হয় তার সার্ব্বভৌম প্রয়োগ (universal application) হ'লে পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার স্বচ্ছন্দ জীবনধারণের জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির সপ্তাহে মাত্র একঘণ্টা ক'রে কাজ করলেই চলতে পারে।*

বাস্তবিক পক্ষে, আক্রমণ ও সম্প্রসারণ নীতির মূলে যদি সংখ্যাধিক্যের সমস্যাই থাকত তা হ'লে চীন মহাদেশের "গড্ডালিকা প্রবাহ" সমগ্র ধরিত্রীকে গ্রাস ক'রে ফেলত বহু দিন আগেই। ইটালী আবিসিনিয়াকে জয় করেছে এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে যুদ্ধ ক'রে চীনের প্রকাণ্ড একটা অংশ দখল ক'রে জাপান কায়েম হয়ে বসেছে। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক রাজকর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ী ছাড়া ইটালী ও জাপানের কয়জন অধিবাসী আবিসিনিয়া ও বিজিত চীনখণ্ডে বসবাস করতে গিয়েছে?

আজকাল জনসংখ্যার আধিক্যের একটা ধুয়া উঠেছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতি থেকে আহৃত বিরাট দ্রব্যসম্ভার স্বেচ্ছায় নষ্ট ক'রে ফেলবার প্রতিযোগিতায় প্রায় সকল দেশই

* আগামী যুদ্ধে বিমানের স্থান সম্বন্ধে মিঃ উইনটিংহাম প্রণীত 'দি কামিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার'-এর দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

* "মিঃ উইনটিংহাম্ প্রণীত 'দি কামিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার'-এর নবম অধ্যায় এবং মিঃ আর. এল্ ওয়রাল্ প্রণীত 'ফুটষ্টেপস্ অফ ওয়ারফেয়ার'-এর পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পরস্পরকে যেন টেক্কা দেবার চেষ্টা করছে। অর্থসঙ্কটের সময় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পাঁচশত ষাট লক্ষ পাউণ্ড সংরক্ষিত (Preserved) মাংস এবং চোদ্দ লক্ষ গাড়ী বোঝাই বিভিন্ন শস্য নষ্ট ক'রে ফেলা হয়েছে। ১৯৩১-এর জুন মাস থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৩-এর জুন পর্য্যন্ত ১৬০ লক্ষ বস্তা ব্রেজিলিয়ান কাফি "ধ্বংস" করে পোড়ান হয়েছে। আর বিলেতের কৃষিমন্ত্রীর হুকুমে ১৯৩৪-এ সংখ্যাতীত গ্যালন দুধ নিক্ষিপ্ত হয়ে ক্লাইড্-এর জলকে প্রায় শাদা ক'রে ফেলেছিল। এ ছাড়া তুলা, চিনি, মাখন এবং আরও অনেক জিনিষ যে কত নষ্ট হয়েছে তার পরিমাণ নিশ্চিতভাবে হিসাব করতে পারা যায় নি।* অবশ্য এই সব স্বেচ্ছাকৃত অপচয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে মালের পরিমাণ কমিয়ে বাজারে বর্দ্ধিত মূল্যের মারফৎ লাভের হার (rate of profit) বজায় রাখা।

বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধবাদীদের কষ্ট-কল্পিত যুক্তিগুলি যে একেবারেই ভুয়া এতে আর কোন সন্দেহ নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির ও দেশের সঙ্গে দেশের প্রকৃত কোন বিরোধই নেই—যুদ্ধ গণস্বার্থের প্রতিকূল। যুদ্ধের আসল ষড়যন্ত্রকারী হচ্ছেন বড় বড় শিল্পপতি, খনির মালিক ও ব্যাঙ্কার। এরাই রাষ্ট্রকে মুখপাত্র ক'রে অভিযান ঘোষণা ক'রে থাকেন। এদের রাশীকৃত মূলধনের পূর্ণ প্রয়োগ স্বদেশে হবার পর উদ্বৃত্ত মূলধনের সেখানে যখন আর একটুও স্থান হয় না, তখনই হয় উপনিবেশের দরকার এবং এই উপনিবেশ সৃষ্টি-কল্পেই জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার বিকৃত ভাষ্য ক'রে এরাই জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে সমর-মত্ততায়। পরদেশ লুণ্ঠন ক'রে বা সেই সব জায়গায় প্রভাব বিস্তার ক'রে নতুন বাজার সৃষ্টি হয় মূলধনের প্রয়োগ-কল্পে। গত মহাসমরের ইতিহাস, পুঁজিপাতির মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে বণ্টন করবার জন্যে লড়ায়ের ইতিহাস। আবিসিনিয়া, স্পেন এবং চীনের দৃষ্টান্ত নিলেও দেখা যাবে, ঐ-ঐ দেশের আক্রমণ-স্থলগুলি নানা প্রকারের খনি ও শিল্প সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

মুনাফাবৃত্তি বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার গোড়ার কথা। সমাজের ধনোৎপাদনের উপায়গুলি সংখ্যালঘিষ্ঠদের কর্ত্তৃত্বে থাকায় হয় অসঙ্গত ধনবণ্টন। প্রকৃত ধনোৎপাদনকারী যারা তারা তাদের ন্যায্যদাবী থেকে হয় বঞ্চিত। ফলে দেশের দারিদ্র্য যায় বেড়ে। অন্য দিকে, এই মুনাফাবৃত্তির উগ্র লোভ পর্য্যবসিত হয় পরদেশ লুণ্ঠনে।

সুতরাং ধনোৎপাদনের উপায়গুলিকে যদি ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের বদলে সমাজের আয়ত্তে আনা যায় তবেই ঘট্‌বে যুদ্ধ ও দারিদ্র্যের স্থায়ী বিলোপ। এই সম্ভাবনা যে একেবারে আকাশকুসুম নয় তার প্রমাণ—ইতিহাস। প্রগতির পথে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজের উদ্ভব হয়েছে, আবার উন্নততর সভ্যতার ভিত্তিতে এই সকল সমাজের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়েছে।

তাই আজ শান্তিকামীদের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র হবে প্রত্যেক দেশের সংখ্যাতীত নরনারীকে দারিদ্র্য ও যুদ্ধের মূল উৎস সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা। তাদের কাছে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার বিকৃত ভাষ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এবং আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-আন্দোলনকে ব্যাপক ও সুদৃঢ় ক'রে তোলা। দেশের জনগণ যত দ্রুত বুঝতে পারবে—যুদ্ধ তাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এর লভ্যাংশ যায় মাত্র কতিপয় ব্যক্তির ভোগ দখলে, আর তাদের হয় সকল দিকেই ক্ষতি—তত দ্রুত সমরলিপ্সু দলের শক্তি পাবে হ্রাস। আজ যদি প্রত্যেক শান্তিকামী ব্যক্তি তার অবসর সময়ে নিজ নিজ পরিবার ও পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা মারফৎ একটা সুনির্দ্দিষ্ট সমরবিরোধী মনস্তত্ত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করেন তা হ'লে শান্তির কাজ অনেকটাই যাবে এগিয়ে।

কৃষ্টি সম্মিলনীর কলিকাতা অধিবেশনে দার্শনিক রাধাকিষণ বলেছিলেন:—"ভিত্তিতে ফাঁটল ধরেছে। পুরাতন বনিয়াদকে আশ্রয় ক'রে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।" তাই পরিপূর্ণ শান্তির ভিত্তিতে নয়াসমাজের পাকা বনিয়াদ গড়ে তোলাই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল।

এই প্রচেষ্টা যে দিন সফল হবে, সেই দিন থেকে হবে প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের পরিসমাপ্তি এবং প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভ।

---

* এই স্বেচ্ছাকৃত অপচয়ের বিস্তৃত বিবরণ "ফুটষ্টেপস্ অফ্ ওয়ার্-ফেয়ার্"এর পঞ্চম অধ্যায়, "রিপোর্টস্ অফ্ দি ইউ এস্ প্লানিং কমিশন," এবং মিঃ জন্ ষ্ট্রাচি প্রণীত "দি কামিং ষ্ট্রাগল্ ফর্ পাওয়ার্"-এ পাওয়া যাইবে।

পথে যাদের ঘর

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্পোরেশনের ফুটপাথের উপর পাঁচজন বাঙালী ভিক্ষুক আশ্রয় লইয়াছে। পথের পরেই পার্ক। পার্কের একটা শিমুল গাছের ডাল আসিয়া রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহারই ছায়ায় ইহাদের বাসস্থান।

খানিকটা দূরেই আর একদল পশ্চিমা ভিখারীর দল বসবাস করে। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক নাই। ভিক্ষুক হইলেও জাত্যাভিমানটুকু এখনও পূরামাত্রায় বজায় রহিয়াছে, ছাতুখোর বলিয়া বাঙালীদল উহাদের অবজ্ঞার চোখেই দেখে।

পাঁচজন গৃহহীন ভিক্ষুক-ভিক্ষুণী পথের উপর সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রতিদিন তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসে। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিতে কোন দিন দেখা যায় না।

একেবারে পশ্চিম পার্শ্বে বসে বিশুর মা। বাতাসী, কেষ্ট, ছিদাম আর কালীতারা পর পর বসিয়া থাকে। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি পথচারীদের দয়া আকর্ষণ করিয়া ভিক্ষা মাগে।

ভিক্ষা চাহিবার পদ্ধতিটা সকলের একরকম নয়। বিশুর মা তাহার শীর্ণ ডান হাতখানি প্রসারিত করিয়া অশ্রান্তভাবে কান্নার সুরে বলিয়া চলে, "একটা পয়সা দিয়ে যাও বাবা। আমার ছেলেটা কৃষ্ণনগরে অসুখ হ'য়ে পড়ে আছে; দেখ্‌তে যাবো, টিকিটের পয়সাটা দিয়ে যাও বাবা।"

পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিবার পক্ষে ভিক্ষা মাগিবার এই বুলিটা সুষ্ঠু নয়। তথাপি বিশুর মা এতগুলি কথা ক্রমাগত উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে। এই পথ দিয়া যাহারা প্রত্যহ যাতায়াত করে বিশুর মাকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করে। কারণ এক বৎসর যাবৎ বিশুর ব্যারাম নিরাময় হইল না, কৃষ্ণনগরে যাইবার পয়সাও এতদিনে তাহার জুটিল না।

বিশুর মাকে এই অঞ্চলে বৎসরখানেক যাবৎ দেখা যাইতেছে। এই দীর্ঘকাল একই প্রার্থনা শুনিতে শুনিতে পথচারীদের কান অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

বিশুর মা কিন্তু সত্য কথাই বলে। যদিও একদিনের সত্য ঘটনাটা আজ অলীকত্বে পরিণত হইয়াছে। বিশু তখন বিশ বৎসরের যুবক। কৃষ্ণনগরে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকুরী লইয়া গেল। বিশু যখন দুই বৎসরের তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। নিরবলম্ব নিঃস্ব বিশুর মা সেই হইতে ছেলেকে অনেক দুঃখে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। বিশু চাকুরী করিতে আরম্ভ করিল, এবার তাহার সকল দুঃখ ঘুচিবে ভাবিয়া বিশুর মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু দুঃখ তাহার নিদারুণতম মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া দেখা দিল। হঠাৎ একদিন কৃষ্ণনগর হইতে 'তার' আসিল, বিশু ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছে—মাকে সে দেখিতে চায়।

চাঁপাতলা হইতে কৃষ্ণনগরের ভাড়া দুই টাকা তেরো আনা। বিশুর মার হাতে চার-পাঁচ আনার পয়সা ছিল মাত্র। ভাড়ার টাকার জন্য সে গ্রামের প্রত্যেকের নিকট ধার চাহিল। কোথাও পাইল না। কে তাহাকে কিসের প্রত্যাশায় ধার দিবে?

একটা দিন কাটিয়া গেল। অর্থসংগ্রহ করিতে পারিল না। পরদিন সে ভিক্ষায় বাহির হইল। ধার না দিক্, একটা করিয়া পয়সা ভিক্ষা কি পাইবে না? সে বন্দরে যাইবে, পথের লোকের কাছে ভিক্ষা চাহিবে। তাহার পীড়িত পুত্রের শয্যাপার্শ্বে যাইবার মূল্যটুকু তাহাকে সঞ্চয় করিতেই হইবে। কিছু সময় লাগিবে, তথাপি সফলকাম হইবে।

ভিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়া গেল। যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে বিশু কাজ করিত তিনি দুই দিন পরে সংবাদ পাঠাইলেন, বিশু মারা গিয়াছে। তিনিই চেষ্টা করিয়া তাহার শেষ-কৃত্যের ব্যবস্থাটা করিয়া দিয়াছেন।

ইহার পর আরও চার-পাঁচ বছর বিশুর মা গ্রামেই কাটাইয়াছে। দুইটি চোখের দৃষ্টি হারাইয়া তাহার দুরবস্থা চরমে পৌছিল। অনাহারে মৃতপ্রায় দেখিয়া কে একজন

গ্রামবাসী তাহাকে কলিকাতার ফুটপাথে রাখিয়া গিয়াছে। সেই হইতে ভিক্ষুকদলের সহিত বিশুর মা কলিকাতার এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চল ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই সব অনেক দিনের কাহিনী। কত দিনের বিশুর মাও আজ সঠিক করিয়া বলিতে পারে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরিবর্ত্তিত পরিবেষ্টনীর প্রভাবে তাহার শোকের গাঢ় রং আজ অনেকখানি ফিকে হইয়া উঠিয়াছে। তবে বিশুকে সে ভোলে নাই, আর কৃষ্ণনগরের ভাড়ার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিবার কথাও সে বিস্মৃত হয় নাই। শুধু বেদনার জ্বালাটা নিভিয়া গিয়াছে। যেন ফটোগ্রাফের ছবি; বিশুকে ঘিরিয়া তাহার জীবনের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার ক্ষুদ্রতম অংশটুকুও অদ্যাবধি অম্লান রহিয়াছে। কিন্তু শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মত তাহাতে প্রাণের স্পর্শ নাই, অনুভূতি নাই। বর্ত্তমান জীবনের চূড়ায় দাঁড়াইয়া বিগত জীবনের ছবিগুলি নির্লিপ্ত-ভাবে দেখিয়া যাওয়া শুধু। বিশুর মার সহিত যেন ইহাদের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক মাত্র নাই।

জীবনের মর্ম্মান্তিক সত্যটাকে এই জন্যই সে ভিক্ষার বাহন করিয়া অবলীলাক্রমে বলিয়া চলে, "একটা পয়সা দিয়ে যাও, বাবা। কৃষ্ণনগরে আমার ছেলেটাকে দেখ্‌তে যাব বাবা। দিয়ে যাও একটা পয়সা।"

বিশুর মার পরেই বাতাসীর স্থান। তাহার জীবনের ইতিহাস ছোট। অতি শিশুকালে বিধবা হইয়া তাহার দাদার ঘরে জঞ্জাল হইয়া দিন কাটাইতেছিল। যৌবনের উন্মাদনায় বাতাসী একদিন এক প্রতিবেশীকে সঙ্গে করিয়া সুখ ও শান্তির সন্ধানে কলিকাতা আসিয়াছিল। সুখ ও শান্তির স্বপ্ন যেদিন ভাঙ্গিল, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের তখন উপায় নাই। তাই পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেষ্ট এবং ছিদাম ভিক্ষুকদের মধ্যে কৌলিন্যের দাবী করে। এই দাবী অন্যায় নয়। ইহাদের জন্ম হইয়াছে পথের উপরে; শিশুকাল হইতে ডাষ্টবিন্ ঘাঁটিয়া ভিক্ষা মাগিয়া দিন কাটিয়াছে। ইহারা একান্ত করিয়া পথের মানুষ; বাতাসী অথবা বিশুর মার মত ইহাদের বর্ত্তমান জীবনের পটভূমিকা গৃহের আবেষ্টনীতে অঙ্কিত হয় নাই।

কালীতারার ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। সে এই দলে থাকিয়াও একটু স্বতন্ত্র। কালীতারা এই দলে অধিক দিন যোগ দেয় নাই। যেদিন দিল, সেদিন হইতে তাহার কোলে একটি ক্ষুদ্র শীর্ণকায় মৃতকল্প শিশু দেখা গেল। কালীতারা বলে, তাহার মেয়ে। বাতাসীর মেয়েটিকে দেখিয়া হিংসা লাগে—তাহার যদি অমন একটি থাকিত! বাতাসী রাগাইবার জন্য বলে, হুঁঃ, তোর মেয়ে না! কোন্ নর্দ্দমা থেকে তুলে এনেছিস্।

কালীতারা সত্যই রাগিয়া যায়। বলে, তুই দেখেছিস্ পোড়ারমুখী? মা হ'তে সাত জন্মের পুণ্যি লাগে। তোদের মত পাপীর মা হওয়া সাজে না।

এই খোঁচাটা বাতাসীর অন্তরে গিয়া বিঁধে। তাই সে চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু ওদিক্ হইতে বিশুর মা গর্জ্জন করিয়া ওঠে; ভিক্ষার বুলি বন্ধ করিয়া সে বলে, মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্ কালী। বিশু আমাকে বিশ বছর ধরে মা ডাকে নি? কেমন ছেলে পেটে ধরেছিলাম জিজ্ঞেস করে আসিস্ চাঁপাতলা গাঁয়ে! তুই আর কদিনের মা যে মায়ের মর্ম্ম নিয়ে ঝগড়া কর্‌তে আসিস্?

বিশুর মার বক্ষ মাঝে মাঝে তৃষিত হইয়া ওঠে। সে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলে, তোর মেয়েটাকে আমার কোলে একটু দিয়ে যা তো। কালীতারা এই অনুরোধ রক্ষা করে না। তাহার মনে সন্দেহ জাগে। বাতাসী আর বিশুর মা তাহার সন্তান-সৌভাগ্যকে ঈর্ষ্যা করে। সুযোগ পাইলে ইহারা মেয়ের অকল্যাণ করিতে পারে। তাই কালীতারা মেয়েকে রাখিয়া কোথাও যায় না।

এই দলের মধ্যে কালীতারার উপার্জ্জন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সে সকলের নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া ভিক্ষায় বসে। মাথার উপর আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দেয়। ফুটপাথের উপরে কাপড় পাতিয়া মেয়েটাকে শোয়াইয়া রাখে। কাঠির মতো সরু সরু হাত-পা লইয়া মেয়েটা নির্জ্জীবের মতো পড়িয়া থাকে। হঠাৎ দেখিলে বুঝা যায় না মৃত কি জীবিত। কালীতারা ঘোম্‌টার মধ্য হইতে অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে ভিক্ষা মাগে, আমার মেয়েটাকে একটা পয়সা দিয়ে যান বাবু।

একজন ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক দারিদ্র্য পীড়িত হইয়া নিরুপায়ভাবে সন্তানের জন্য ভিক্ষায় নামিতে বাধ্য হইয়াছে,—এই ভূমিকায় কালীতারা চমৎকার নিখুঁত অভিনয় করে। এই অভিনয়ের জন্যই তাহার বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন হয়।

সন্ধ্যা হইলে অভিনয়ের মুখোস খুলিয়া কালীতারা

স্বস্থানে গিয়া বসে। মেয়েকে খাওয়ায়, মেয়েকে লইয়া আদর করে। দিনের উপার্জ্জন হিসাব করিয়া গুনিয়া রাখে।

পয়সা উপার্জ্জন যদিও কালীতারা বেশী করে, তথাপি দলের মধ্যে বাতাসীর প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দেখিতে সে কুৎসিত। কিন্তু যৌবনের যে অস্তমান আভা আজও তাহার দেহে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহাই বাতাসীকে এই দলভুক্ত দুইটি পুরুষের নিকট সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। বাতাসীর বয়স কম, সে আজও সম্পূর্ণ সক্ষম। তাই বাতাসীর উপর নির্ভর করিয়া সকলেই স্বস্তি পায়।

কেষ্ট আর ছিদাম দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। বাতাসীকে উহাদের সাহায্য করিতে হয়। বিশুর মা অন্ধ, তাহাকে স্নান করানো, খাওয়ানো সব বাতাসীর কাজ।

বিশুর মা তাহার সেবায় মুগ্ধ হইয়া বলে, আর জন্মে তুই আমার মেয়ে ছিলি বাতাসী।

বাতাসী কোন স্নেহের বন্ধনই মানিতে চায় না। হৃদয়-বৃত্তির খেলায় একবার সে হারিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, পুনরায় সে পথে যাইবে না। যাহা সে করে তাহা না করিলে চলে না বলিয়া।

বাতাসী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া ওঠে, কোন্ দুঃখে মেয়ে হ'তে যাব? আমরা একাদশ তিলি, আর তোমরা হ'লে শূদ্র! তোমাদের হাতের জল খেলেও জাত যায়।

পথের জীবনকে বরণ করিয়াও বাতাসী তাহার পূর্ব্বতন বংশমর্য্যাদার কথা কারণে-অকারণে প্রচার করিতে দ্বিধা করে না।

বাতাসী তাহার নিজের কথা কাহারও নিকট গোপন করে নাই। কালীতারা তাহা লইয়া টিপ্পনী কাটে; বলে, জানি লো সব জানি; কুলের গরব আর ওমুখে করিস্ না।

বাতাসীর উষ্ণপ্রকৃতি এই ইঙ্গিতে ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। সে কালীতারার নিকট উঠিয়া আসিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলে, ঘর ছেড়েছি? বেশ করেছি! লাথি ঝাঁটা খেয়ে ভাইয়ের ঘরে দাসীবৃত্তি করতে যাব কেন? শাক-ভাত খাই, উপোস করে পড়ে থাকি, যা-ইচ্ছে করি কেউ একটি কথা বলতে পারবে না। কার তোয়াক্কা রাখি আমি?

তাহাকে শান্ত করিবার জন্ম কেষ্ট কহিল, লোকটা চামার বলেই না তোকে ছেড়ে গেল বাতাসী! হ'তো আমার মতন—

ছিদাম তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলে, হ্যাঁ, তুই তো ভারী একটা রত্ন। দশ বছর আছি তোর সঙ্গে, না জানি কি?

দুইজনের মধ্যে কথার কাটাকাটি হাতাহাতিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। বাতাসী আসিয়া তাহাদের নিরস্ত করে।

বাতাসীকে কেন্দ্র করিয়া এই দুইজনের মধ্যে কলহ লাগিয়াই আছে। বাতাসী কেষ্টর পার্শ্বে বসে বলিয়া ছিদাম বুঝিতে পারে না—কেষ্টর মধ্যে এমন কি আছে যাহার জন্ম বাতাসী তাহার প্রতি আসক্ত হইতে পারে। মারাত্মক কুষ্ঠ কেষ্টকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিয়াছে। তাহার হাতের আঙুল কয়টা পড়িয়া গিয়াছে; পায়ে উন্মুক্ত ভয়াবহ ঘা। নাকের অগ্রভাগটা খসিয়া পড়িয়াছে। ইহার তুলনায় ছিদাম অনেক ভাল আছে।

ছিদাম বাতাসীকে চুপি চুপি বলে—এই ঘাটের মড়াটার সঙ্গে পিরীত করে কি হবে? আমার কাছে আয় না তুই।

বাতাসী স্বীকৃত হয় না। জবাব দেয়, কেষ্টর রোজগার তোর চার গুণ। ওর সঙ্গে আছি বলেই তবু দু-চারটে পয়সা হাতে পাই। তুই অত পয়সা দিতে পারবি?

সত্যই কালীতারার পরেই কেষ্টর উপার্জ্জন। কুষ্ঠের এই ভয়াবহ রূপ দেখিয়া পথচারীদের দয়ার উদ্রেক হয়। দু-একটা পয়সা অনেকেই স্বচ্ছন্দচিত্তে দিয়া যায়।

এই ভিক্ষুকদলের সর্দ্দার রাখহরি সন্ধ্যার পর প্রতিদিন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেদিন যে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ তাহার প্রাপ্য। ভিক্ষা-লব্ধ সামান্য দুই-চারিটা পয়সার উপর বাহিরের কেহ আসিয়া ভাগ বসাইবে, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নয়। অথচ রাখহরির শরণাপন্ন না হইলেও চলে না। প্রতিদিন সমান উপার্জ্জন হয় না। এমন দিনও যায় একটি পয়সাও কেহ দেয় না। তখন রাখহরি ইহাদিগকে উপবাসের হাত হইতে বাঁচায়। শীতকালে দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইতে দরবার করিয়া পুরাণো কম্বল, পুরাণো কাপড় আনিয়া দেয়। কোথায় কতদিন থাকিতে হইবে, কোন্ স্থানটা উপার্জ্জনের পক্ষে ভাল এই সব নির্ব্বাচনের ভারও রাখহরির উপর।

রাখহরিকে বেশী প্রয়োজন পুলিশের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্ম, ফুটপাথের উপর স্থায়ী ভাবে বাস করিতে

গেলেই পুলিশ আসিয়া তাড়াইয়া দিতে চায়। পুলিশের লাল পাগড়ী দেখিয়া দলের সব কয়টি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে। রাখহরি ইহাদের হইয়া পুলিশের সঙ্গে কথা বলে।

রাখহরি এমনি চার-পাঁচটি ভিক্ষুকদলের অধিনায়ক। ইহাদের উপার্জ্জনের উপর ভাগ বসাইয়া তাহার দিনগুলি স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়।

কালীতারা প্রথমে রাজী হয় নাই, বলিয়াছিল তোমার দলে আমি যাব না। কিসের অভাব আমার?

রাখহরি ভয় দেখাইয়া বলিল, দেখ্‌বো তবে; রাখহরি ছাড়া কে তোকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করে। পুলিশ এসে যখন বল্‌বে ঐ মেয়ে তোর নয়, চুরি করে এনেছিস্ কি বল্‌বি তখন? প্রমাণ দিতে না পারলে পুলিশ তোর মেয়ে নিয়ে যাবে।

পুলিশ তাহার মেয়ে লইয়া যাইবে, এই আতঙ্কে কালীতারা রাখহরির শরণ লইয়াছে।

বিশুর মা প্রথমে তাহার উপার্জ্জিত পয়সা হইতে দু-একটা লুকাইয়া রাখিত। রাখহরিকে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সম্ভব অসম্ভব সকল স্থান হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া লুকানো পয়সা সে বাহির করিবেই। রাখহরিকে প্রবঞ্চিত করিবার দুরাশা এখন আর কেহ করে না।

রাখহরির দৃষ্টিও বাতাসীর উপর পড়িয়াছে। বাতাসীকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া যায়। পরিপাটি করিয়া গাঁজার কলিকাটা সাজিয়া টানিতে থাকে আর বাতাসীর সঙ্গে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গল্প করে। বলে, কোন্ দুঃখে এখানে প'ড়ে আছিস্? আয় না আমরা দু'জনে ঘর বাঁধি।

বাতাসী সম্মত হয় না। সে আজ পথের মুক্ত বিহঙ্গ, ঘরের খাঁচায় আর ফিরিয়া যাইবে না।

রাখহরির সহিত এই ঘনিষ্ঠতায় কেষ্ট অভিমান করে। বাতাসীকে বলে, যা না তুই বড়লোকের ঘরে। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের সঙ্গ মানায় না তোকে।

বাতাসী জবাব দেয় না, শুধু হাসে।

ভোর হইতেই বাতাসী দল ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়। এদিকের ছোটখাটো চায়ের দোকানের কারিকরদের সহিত সে পরিচয় করিয়া লইয়াছে। একগাল পানমুখে দিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে দোকানের বাহিরে দাঁড়াইয়া গল্প করে। কিছুক্ষণ পরে বলে, ও কারিকরদা, একটু চা দাও না!

কারিকর ছোট একটা মাটির পাত্র পূর্ণ করিয়া চা দেয়। চা-এ চুমুক দিয়া আবার সে গল্প আরম্ভ করে।

পাইস্ হোটেলের চাকরদের সহিতও সে আলাপ করিয়া লইয়াছে। প্রত্যহ ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন তাহার নিজের এবং দলের অন্য সকলের জন্য সংগ্রহ করে। অবশ্য বিনা পয়সায় নয়; চুক্তি অনুযায়ী কিছু দিতে হয়।

দলের যাহার যাহা সামান্য কিছু প্রয়োজন হয় বাতাসী কিনিয়া আনে। ছিদাম এবং কেষ্টর বিড়ি না হইলে চলে না। এই বৃদ্ধ বয়সে বিশুর মার শিশুকালের লোভী প্রকৃতিটি জাগিয়া উঠিয়াছে। আমের দিনে একটা আম, শীতকালে একটা কমলালেবু তাহার চাই। কালীতারা তাহার মেয়ের জন্য একটু দুধ আনিতে বাতাসীর হাতে পয়সা দেয়।

বাতাসী সানন্দে সকলের সওদা করিয়া আনে। অন্য কেহ যাইতে চায় না; কারণ উঠিয়া গেলেই রোজগারের ক্ষতি হয়। বাতাসীকে পয়সার জন্য ভাবিতে হয় না। ছিদাম, কেষ্ট, রাখহরি—এদের সকলের কাছেই সে পয়সা পাইতে পারে।

দ্বিপ্রহরে যখন লোক চলাচল কমিয়া যায় তখন ইহাদের স্নান ও খাওয়ার সময়। গরু ঘোড়ার জল খাইবার জন্য পথের উপরে কোন্ এক পুণ্যবতী মহিলা লোহার চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই চৌবাচ্চার চারদিক ঘিরিয়া সকলে আসিয়া বসে। কেষ্ট যদিও কুৎসিত রোগগ্রস্ত তথাপি সে একটু সৌখীন। দু পয়সা দিয়া লাল রঙের একটা জাপানী সাবান কিনিয়া আনিয়াছে। তাহার হাতের আঙুল নাই, তাই বাতাসীকে বলে সাবান লাগাইতে। বাতাসী সাবান মাখায় আর বলে, যা ছিরি, সাবান মেখে আর কি হ'বে?

কেষ্ট আহত হইয়া বলে, গর্ব্ব করতে নেই বাতাসী; একদিন তোরও হ'বে।

হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয়। পথ চলিতে গেলে যেমন ধূলায় পা জড়াইয়া ধরে, তেমনি পথকে যাহারা ঘর করিয়া লইয়াছে রোগ তাহাদের নিত্যসঙ্গী।

প্রথমে বাতাসী কেষ্টকে ঘৃণা করিত, তাহার রোগকে ভয় করিত। কিন্তু পথের জীবনে যখন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল, তখন রোগকে সে নির্লিপ্তভাবে দৈনন্দিন জীবনের আর পাঁচটা স্বাভাবিক ঘটনার মতই গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে।

পথের জীবনে একটা ভাবনাহীন নিশ্চিন্ততা আছে; ইহা তাহাদের ভয় এবং ঘৃণার বৃত্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখে। এই জন্যই ইহারা বাঁচিয়া থাকে।

পাইস্ হোটেল হইতে আনা উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জন বাতাসী সকলকে পরিবেশন করিয়া দেয়। বণ্টন করিয়া দিতে দিতে নিজের ভাগে তাহার প্রায়ই কম পড়ে। কেষ্ট ভাত তুলিয়া খাইতে পারে না, তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। ছিদাম দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ওঠে। তাহার হাতের ঘা বাড়িতেছে; আঙুলগুলি খসিয়া পড়িতে বেশী দেরী লাগিবে না। তখন তো বাতাসীকেই মুখে ভাত তুলিয়া দিতে হইবে—এই সম্ভাবনায় সে আশান্বিত হয়।

বিশুর মা বড় একা। কালীতারা তাহার মেয়ে লইয়া ব্যস্ত। কেষ্ট, ছিদাম এবং বাতাসী একটি উপদল সৃষ্টি করিয়াছে। চোখের দৃষ্টি আমাদের সঙ্গীর কাজ করে। বিশুর মার তাহাও নাই। সে ক্রমাগত ভিক্ষার বুলি আওড়াইয়া চলে। যখন ভিক্ষা মাগে না, তখন চুপ করিয়া থাকে।

বিশুর মা একদিন একটি সঙ্গী পাইয়া গেল। কোথা হইতে ক্ষুদ্র একটি কুকুরছানা তাহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। বিশুর মা হাতে তুলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিল কি জিনিষ। না পারিয়া বাতাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, ছাখ ত বাতাসী এটা কি?

বাতাসী চাহিয়া দেখিল, ওমা, এ যে সুন্দর একটা কুকুরছানা।

বিশুর মা কুকুরছানাটিকে বুকে তুলিয়া লইল। নরম, উষ্ণ তাহার স্পর্শ। গলায় একটা দড়ি দিয়া পার্কের রেলিংএর সহিত বাঁধিয়া রাখে। রাত্রিতে বাঁধন খুলিয়া বুকে লইয়া শুইয়া থাকে। কুকুরছানার সহিত কথা বলে, মুখের উপর চুমু দেয়, একই শালপাতায় ভাত খায়। বাতাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, রং কেমন? শাদা না কালো? কত বড় হ'য়েছে?

বাতাসীর কাছে বিশুর মা তাহার কুকুরছানার গুণ বর্ণনা করে।

বিশুর মা কুকুরছানার নাম রাখিয়াছে বিশু।

কালীতারার মেয়ের জ্বর হইয়াছে। কালীতারা বড় ভাবনায় পড়িয়াছে। তিন দিন কাটিয়া গেল, জ্বর কমিতেছে না। হাতের পুঁজি নিঃশেষ হইতে চলিল। মেয়েকে পথের উপরে শোয়াইয়া পূর্ব্বের মত অভিনয় করিতে পারে না। অথচ অভিনয় না করিলে কেহ পয়সা দেয় না।

একদিন কালীতারা বাতাসীকে ডাকিয়া কহিল, ছাখ্ বাতাসী, কেমন করছে ও!

মেয়েটা অস্থির হইয়া ক্রমাগত হাত-পা ছুঁড়িতেছে। চোখ্ দুইটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, ফুটিয়া বাহির হইতে চায় যেন।

কালীতারা কাঁদিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, কি হ'বে বাতাসী?

বাতাসী রাগিয়া বলে, কি হবে আবার? মরবে। ভারী তো মা! এককোঁটা ওষুধ দিতে পারলি না মুখে। যাই ফকির ডেকে আনি গে।

কালীতারা বলিল, কিন্তু পয়সা নেই যে আমার!

ওদিক হইতে বিশুর মা শুনিতেছিল। কহিল, তোর পয়সা নেই বলে মেয়েটা অচিকিচ্ছায় মরবে?

বিশুর জন্য একটা লোহার শিকল কিনিবে বলিয়া অনেক কষ্টে সে দুই আনার পয়সা পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। তাহা বাতাসীর হাতে তুলিয়া দিল।

ফকির আসিয়া মেয়েটার সারা দেহ ফুঁ দিয়া, হাত বুলাইয়া, মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িয়া দিল। একটা ঔষধও খাইতে দিয়া গেল। বাতাসী চারি আনার পয়সা দিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

বাতাসী অসময়ে কমলালেবু সংগ্রহ করিয়া আনিল, চড়া দাম দিয়া বেদানা কিনিল। কালীতারার চিন্তার অংশ স্বেচ্ছায় সে আপনার মাথায় তুলিয়া লইল।

মেয়ে ভাল হইয়া উঠিলে কালীতারা প্রায়ই মেয়েকে বাতাসীর কোলে আনিয়া দেয়। বলে, নে, মেয়ে তো তোরই। তুইই যমের সঙ্গে লড়াই করে ওকে ফিরিয়ে এনেছিস্।

এই নির্জ্জীব শিশুটাকে বুকে লইলে তাহার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগিয়া ওঠে। এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা

পূর্ব্বে তাহার কখনও হয় নাই। বাতাসীর অন্তররাজ্যের এক অজানিত মহলের অনুদ্ঘাটিত দ্বার আজ সহসা কাহার যাদুময় স্পর্শে খুলিয়া যায়।...

কেষ্টর প্রতি বাতাসীর পক্ষপাতিত্ব লইয়া ছিদামের সহিত প্রায়ই কলহ বাধে। এক দিনের ব্যাপারে বাতাসী অত্যন্ত চটিয়া গেল। বলিল, আজ থেকে আমার সঙ্গে তোর আর কোন সম্বন্ধ নেই। রোজ রোজ এই ঝগড়া-ঝাঁটি ভাল লাগে না।

ছিদাম কহিল, ওঃ, তোকে ছাড়া চল্‌বে না আমার ভেবেছিস্? তোর মত মেয়ে পথে ঘাটে পাওয়া যায়। কিসের এত অহঙ্কার করিস্?

পরদিন বর্ষার আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিল। রাস্তার ওপারে ফুটপাথের উপরে একটা বড় বাড়ীর বারান্দা আসিয়া পড়িয়াছে। বাতাসী সকলকে লইয়া তাহার নীচে গিয়া আশ্রয় লইল। বৃষ্টি সারাদিনে থামিল না। পথে লোক চলে না, তাই উপার্জ্জন বন্ধ। রাখহরির দেখা নাই। বাতাসী বৃষ্টি মাথায় করিয়া হোটেলের উচ্ছিষ্ট ভাত ধারে কিনিয়া আনিল। বাতাসী বলিয়াই তাহারা ধার দেয়।

ছিদামের জন্য বাতাসী কিছুই আনে নাই। সকলে খাইয়া উঠিল; ছিদাম তাহার কাপড়ের আঁচল দিয়া চোখ মুখ ঢাকিয়া একপাশে শুইয়া রহিল।

কালীতারা তাহার ভাগ হইতে একটা অংশ ছিদামকে দিতে চাহিয়াছে। কিন্তু সে গ্রহণ করে নাই; বাতাসীর দয়া সে চায় না।

রাগ করিয়া যাহাই বলুক, ক্ষুধায় ছিদামের পেট জ্বলিতেছিল। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি থামিল। একটা খাবারের দোকানের একজন লোক সারাদিনের সঞ্চিত ঠোঙাগুলি নিকটের ডাষ্টবিনটায় ফেলিয়া গেল। তিন-চারিটা লোমহীন, ঘা-যুক্ত পথের কুকুর এই ঠোঙাগুলির মধ্যে খাবারের সন্ধানে ছুটিয়া গেল।

ছিদাম কুকুরগুলির পূর্ব্বেই ডাষ্টবিনের নিকট দৌড়াইয়া পৌছিয়াছে। এক হাত দিয়া কুকুরগুলিকে দূরে খেদাইয়া রাখিল: আর এক হাতে ঠোঙা ঘাঁটিয়া নিম্‌কি-সিঙাড়ার টুক্‌রা, আলুর তরকারী, ছোলার ডাল ইত্যাদি খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে লাগিল।

বাতাসী কেষ্টকে ছিদামের কাণ্ড দেখাইয়া কহিল, বাতাসীর সঙ্গে ঝগড়া করলে কেমন মজা বুঝে নাও চাঁদ!

সন্ধ্যার পরে রাখহরি আসিলে তাহার নিকট হইতে পয়সা লইয়া ভাত আনিল। ছিদামকে সে সকলের আগে ভাত বাড়িয়া দিল। পরিমাণও তাহার ভাগে বেশী। ছিদাম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর খাইতে আরম্ভ করিল। বাতাসী একটি বিদ্রূপের কথাও উচ্চারণ করিল না; যেন কিছু হয় নাই এমনি তাহার ভাব।

বর্ষা কাটিয়া গিয়া শীত পড়িয়াছে। সেবার গঙ্গাস্নানের একটা দুর্লভ লগ্ন পড়িয়াছে। পুণ্যকামী হিন্দু নর-নারীর দল দেশ-দেশান্তর হইতে গঙ্গাস্নান করিবার মানসে কলিকাতা আসিয়াছে।

সকলের উপার্জ্জনই বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল। স্নান সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে পুণ্যার্থীর দল ভিক্ষুকদের কিছু দিয়া যায়। ইহা ধর্ম্মের একটা অঙ্গ।

লগ্নের দিন বিশুর মা অনেক পয়সা পাইল। তাহার পরিধেয় বস্ত্রের একটা কোণ পয়সায় ভরিয়া গিয়াছে। বিশুর মা বাতাসীকে কহিল, গুণে দ্যাখ্‌ত কত হয়েছে। যদি কৃষ্ণনগরে যাওয়ার ভাড়াটা হ'য়ে থাকে তা হ'লে তোকে নিয়ে যাবো একবার।

তাহার পর গলা খাটো করিয়া, যেন ভারী একটা গোপনীয় কথা বলিতেছে, এমনি ভাবে বাতাসীর কানে কানে কহিল, জানিস্ বাতাসী, কাল রাত্রে আমার বিশু এসেছিল। স্বপ্ন দেখলাম বিশু এখনও বেঁচে আছে, সেই বাবুর বাড়ীতে কাজ কর্‌ছে। যেদিন চাক্‌রী কর্‌তে বাড়ী ছেড়ে গেল, সেদিন ও কেঁদেছিল। আমাকে ছেড়ে কোন দিন থাকেনি কি-না, তাই। আমিই জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলাম। ঘরে বসে থাক্‌লে গরীবের ছেলের চল্‌বে কেমন করে? কাল স্পষ্ট দেখ্‌লাম, ও কাঁদ্‌ছে। আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না বলে কাঁদ্‌ছে।

বাতাসী চুপ্ করিয়া পয়সা গুণিতে লাগিল। হঠাৎ বিশুর মা যেন মনের দ্বন্দ্বকে জোর করিয়া বন্ধ করিবার জন্য বলিয়া উঠিল, না, না বিশু বেঁচে আছে। নইলে এতদিন পরে আমাকে দেখা দেবে কেন? কেউ শত্রুতা ক'রে ওর মৃত্যু-সংবাদ রটিয়েছিল।

বাতাসী গুণিয়া কহিল, সাড়ে দশ আনার পয়সা হয়েছে। দেখ্‌তে অনেক, কিন্তু আধ-পয়সাই বেশী।

বিশুর মা শুধু বলিল, মোটে !—এই একটি কথাতেই তাহার আশা-ভঙ্গের বেদনাটা মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। এই সামান্য পুঁজি লইয়া কৃষ্ণনগর যাইবে কেমন করিয়া ?

কুকুরছানাটা কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিশুর মা অন্য দিনের মত আজ তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিল না। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। আজ সহসা তাহার পূর্ব্বজীবনের হারানো পথটা সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। এই পথ বাহিয়া সে আসিয়া পৌছিয়াছে একটি জীর্ণ গৃহে। এখানে দারিদ্র্য আছে, কিন্তু পথের জীবনযাত্রার মত তাহা কদর্য্য নয়, শ্রীহীন নয়। এই গৃহকে ঘিরিয়া আছে দুঃখ, আছে দৈন্য। একটি শঙ্কাতুর স্নেহব্যাকুল মাতৃহৃদয় দিনের পর দিন দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে তাহার শিশুপুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিবার আশায়······

শীত শেষ হইয়া যাইতেই কেষ্ট শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। কুষ্ঠ এখন আর তাহার কোমল অংশগুলিতে আবদ্ধ নাই ; দেহের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শরীরের রং অঙ্গারের মত কালো হইয়া উঠিয়াছে ; ত্বক ফাটিয়া আঁকা-বাঁকা রেখার সৃষ্টি করিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে গোসাপের পিঠ বলিয়া ভুল হয়।

রোগ মারাত্মক হইলেও একটা যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি কখনও কেষ্টর মুখ হইতে শোনা যায় না। জন্ম হইতে ইহারা দুঃখ ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের পরিসমাপ্তি যে একদিন এইরূপেই ঘটিবে ইহাও তাহারা জানে। বেদনা-বোধের শক্তিটা লোপ পাইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর এই ভয়াবহ রূপটাও ইহাদের নিকট অস্বাভাবিক ঠেকে না, নীরবে পশুর মত সব-কিছু সহিয়া যাওয়াই যেন স্বাভাবিক।

বাতাসী মাঝে মাঝে বড় ঘা'গুলি ধোয়াইয়া দেয়। কখনও কখনও একটু দুধ সংগ্রহ করিয়া আনে। বাতাসীর এই একটুখানি যত্নে এত যন্ত্রণার মধ্যেও একটু শান্তি পায়।

মাছির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কেষ্ট আপাদমস্তক কম্বলে আচ্ছাদিত করিয়া পড়িয়া থাকে। একদিন সকালে বাতাসী কম্বল উঠাইয়া দেখিল রাত্রিতে কেষ্ট কখন সকলের অজ্ঞাতে মরিয়া রহিয়াছে।

ছিদামের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া মৃতদেহটা একটু দূরে সরাইয়া রাখিল। পার্কের হিন্দুস্থানী মালীর বাসা হইতে বাতাসী কয়েকটা তুলসীপাতা আনিয়া মৃতের বুকের উপরে ছড়াইয়া দিল। একজনকে ধরিয়া শিয়রের কাছে খড়ি দিয়া রাম নাম লেখাইয়া লইল।

সংবাদ পাইয়া একজন পুলিশ মৃতদেহের পাহারা দিতে আসিল। বাতাসী মাথার নিকটে বসিয়া আছে। পুলিশ দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয়। পথচারীর দল নিঃস্ব হিন্দুর মৃতদেহ দেখিয়া পয়সা দিয়া যায়। অর্থের অভাবে যেন মৃতদেহ হিন্দুপ্রথানুযায়ী সৎকারের বিঘ্ন না ঘটে—এই তাহাদের ভাবনা।

বাঁচিয়া থাকিতে যাহাকে কেহ একটা পশুর অধিক মর্য্যাদা দেয় নাই, তাহারই মৃতদেহের সদ্গতির জন্য ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু পথিক ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই পয়সা জমিয়াছে অনেক। মৃতদেহের আচ্ছাদন কম্বলটার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পয়সায় ভরিয়া গিয়াছে।

পুলিশটা একটু এদিক ওদিক চাহিলেই বাতাসী সুযোগ বুঝিয়া কয়েকটা পয়সা তুলিয়া লয়।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটা হিন্দু-প্রতিষ্ঠানের লোক আসিয়া মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল।

প্রথম ফাল্গুনের শুক্লা সপ্তমী। সপ্তমীর তরল জ্যোৎস্না শিমূল গাছের ডালের মধ্য দিয়া আলো-ছায়ার জাল বুনিয়া ফুটপাথের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পথের জন-প্রবাহ বিরল হইয়া আসিয়াছে। বিশুর মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কালীতারাও জাগিয়া নাই ; সে বুকের উপর পোকার মতো কালো মেয়েটাকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

ছিদাম এবং বাতাসী এখনও ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে। কেষ্টর শূন্য স্থানটা ছিদাম অধিকার করিয়া বাতাসীর পাশ ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিয়াছে। ছিদাম আজ উৎফুল্লচিত্তে বাতাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপনের সর্ত্তগুলি স্থির করিয়া লইতেছে।

বাতাসীর উপর আজ ছিদামের অবিসংবাদী দাবী। কেষ্ট বাধা দিবার জন্য মাঝখানে বসিয়া নাই।

প্রতীক্ষা

শ্রীমাধবলাল ঘোষাল

লিলি রাস্তায় ছুটে এসে রিক্সায় চ'ড়ে বসে বললে, "চল, এইদিকে।"

লিলিই উপরের বারান্দা থেকে রিক্সাটাকে ডেকে দাঁড় করিয়েছে, কিন্তু লিলি অসম্ভব ধরণের ছোট, এত ছোট যে রিক্সায় একলা সওয়ারী হয়ে যাওয়ার পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, তাই রিক্সাওয়ালা অন্য কোন যাত্রীর অপেক্ষায় লিলিদের বাড়ীর দরজার দিকে চাইল। লিলি আবার ব'লে উঠল, "কই, চল্ দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

চালক একটু অবাক হ'য়ে নূতন সোয়ারীর দিকে একটু তাকাল। তারপর গাড়ীটা একটু তুলে ঠুং—ঠুং শব্দ ক'রে এগিয়ে চলল। রিক্সা এগিয়ে চ'লে—আর লিলি রাস্তার এদিক্ ওদিক্ দেখতে থাকে।

অল্পদূর গেলেই লিলি ভয় পায়—তাই তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, "এই, এবার বাড়ী চল্।"

লিলির কথায় পথের মাঝে থামে—ঘোরে—আবার চল্‌তে সুরু করে বাড়ীর দিকে।

বাড়ী এল।

গাড়ী থেকে নেমেই লিলি তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটি পয়সা গাড়ীওয়ালাকে দিয়ে বলে, "আবার কাল যাব।" বলেই ছুট্টে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

গাড়ীওয়ালা একটু অবাক হয়ে একবার লিলিদের দরজার দিকে আর একবার লিলির দেওয়া পয়সার দিকে তাকাল, তারপর কি ভেবে গাড়ী নিয়ে এগিয়ে গেল।

লিলি ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। লিলির বেশীর ভাগ সময় ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটে। তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যত রিক্সা যায় সবগুলিই সে লক্ষ্য ক'রে দেখে।

তারপর দিন আবার ঠিক সময়েই রিক্সা এসে হাজির হ'ল। লিলিও গম্ভীরভাবে এসে গাড়ীতে চ'ড়ে বসল। গাড়ীওয়ালা হাত দেখিয়ে বলে—"আজ এদিকে যাব খুকীমা?"

লিলি বলে—"না—না, ওদিকে যায় নি তো, এদিক দিয়ে গেছে, এই দিকেই চল।"

রিক্সাওয়ালা কিছু বুঝতে পারে না, তাই ঠুং-ঠুং করতে করতে এগিয়ে চলে—কাল যেদিকে গেছল সেইদিকে। অল্পক্ষণ পরেই সোয়ারী হুকুম করে—"এবার ফিরে চল্।"

গাড়ী ফিরল, বাড়ীও পৌছাল। সোয়ারী ভাড়া চুকিয়ে উপরে উঠে আসবার সময় খালি বললে—"আবার কাল এস।"

রাত্রে লিলি তার বাবার কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প শুন্‌ছে। বাবা বল্‌ছেন—"অনেকদিন আগে এক দেশে এক রাজপুত্র তার মায়ের সঙ্গে বাস করত। সেই—"

লিলি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ব'লে উঠল—"কোন্ দেশে বাবা?"

বাবা বললেন, "সে এক দেশে।" বলে আবার আরম্ভ করেন—"সেই রাজপুত্র তার মাকে খুব ভালবাসত।"

লিলি আবার বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে—"বাবা, মা কতদিনের জন্য গেছে?"

বাবা একটু অন্যমনস্কভাবে ব'লে ফেলেন—"চিরকালের জন্যে।"

লিলি বুঝতে পারে না, খানিকক্ষণ ভেবে বলে—"হ্যাঁ বাবা, চিরকাল কত দিনে হয়?"

বাবা তার তাড়াতাড়ি উত্তর দেন—"অনেক দিন।" সঙ্গে সঙ্গে লিলিকে বুকে চেপে ধরেন। লিলি একটা ছোট্টো নিশ্বাস ছেড়ে—'অনেক দিন' যে কতদিনে হয় তাই হিসাব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। গল্প শোনাও ঐখানেই থেমে যায়।

ভোর হয়, লিলির ঘুম ভাঙ্গে। দুপুর হয় আবার রিক্সাও হাজির হয়। লিলি কিন্তু ঠিক করেছে মিছামিছি যাবে না। তাই লিলি তাকে চেঁচিয়ে বলে—"আজ যাব না, চিরকাল পরে এসো।"

পরদেশী গাড়ীওয়ালা বুঝতে না পেরে কেবল চেয়ে থাকে তার ক্ষুদ্র যাত্রীটির দিকে।

লিলি আবার বলে—"অনেক দিন পরে এসো, আজ আর যাব না।"

রিক্সা নিয়ে চলে যায়, লিলিও বারান্দায় না দাঁড়িয়ে ভিতরে চলে আসে।

কিছুদিন আগে লিলির মা একটা রিক্সা ক'রে যেদিকে লিলি যেত সেইদিকেই গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন—আর ফেরেন নি।

ইউরোপের চিত্রশিল্পে রেনল্ড্‌স্‌ ও গেন্‌স্‌ব্রো

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

মধ্য-ইউরোপে চিত্রকলার চরম উন্নতি সপ্তদশ শতাব্দীতে; ইটালী, ফ্লোরেন্স, ভেনিস্‌, য়্যার্কওয়ান, আমস্টারডাম, প্যারিস, মাড্রিড্‌, মায় লণ্ডনে পর্য্যন্ত এই সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীয় বাস্তব ধারায় চিত্রকলার রীতিমত কাল্‌চার চলতে থাকে। রেম্‌ব্রাণ্ট্‌, রুবেন্‌স্‌, ভ্যানডাইক্‌, ভেলাজকেজ্‌, টিশিয়ান প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের অভ্যুদয়ে যুরোপের চিত্রকলা বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বৃটীশ জাতির শিল্পীরা

ব্লু বয়

ছিল পিছনে, কিন্তু লণ্ডনের রাজা চার্লস্‌ ছিলেন তেমনি কলারসিক এবং শিল্পপ্রিয়। রুবেন্‌স্‌ এবং ভ্যানডাইক্‌ তাঁর উৎসাহে লণ্ডনে এসে বাস করেন এবং সাধারণের মধ্যে চিত্রকলার আদর এই সময় হতেই আরম্ভ। ফ্লেমিশ্‌ আর্ট অর্থাৎ রুবেন্‌স্‌ ও ভ্যানডাইক্‌—এঁদের আর্ট লণ্ডন কেন ইংলণ্ডেই প্রথম উচ্চস্তরের চিত্রধারা প্রবর্তন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটীশ শিল্প উন্নতিলাভ করে; তার পরিচয় হোগার্থ, উইলসন, রেনল্ড্‌স্‌, গেন্‌স্‌ব্রো, রোম্‌নে প্রভৃতি যশস্বী চিত্রশিল্পীদের আবির্ভাব। রাজপরিবারে এবং অবস্থাপন্ন ও সুখী সমাজে চিত্রের সমাদর করা একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়ায়। রাজদরবারে একটু নাম করলেই নাইট্‌ হুড্‌ বাঁধা। ফটোর সৃষ্টি হয়নি সেজন্য পোর্ট্রেট্‌ শিল্পীদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। এই রকম ভাগ্য নিয়ে

ডাচেস্‌ অব ডেভন্‌সায়ার

জন্মেছিলেন সার যশুয়া রেনল্ড্‌স্‌। তাঁর এবং পূর্ব্বোক্ত শিল্পীদের এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আনুকূল্যে এই সময় লণ্ডনে প্রথম রয়েল একাডেমি স্থাপিত হয়—চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধনে। সর্ব্বপ্রথম সভাপতি হলেন যশুয়া এবং ছত্রিশ জন মূল সদস্যের অন্যতম হলেন টমাস গেন্‌স্‌ব্রো। উইলসন (রিচার্ড) এবং গেন্‌স্‌ব্রো এঁরা দুজনে মূলত

ছিলেন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রকর ; কিন্তু জীবিকা উপার্জ্জনের খাতিরে টমাস শেষ বয়সে অতি সুন্দর সুন্দর প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছবিগুলির মধ্যে ডাচেস্ অব্ ডেভন্‌সায়ার ও ব্লু বয় এই ছবি দুখানি এখানে দেওয়া গেল।

রেণল্ড্‌স্ ছিলেন খাঁটি পোর্ট্রেট্ চিত্রশিল্পী—জীবনের গোড়া থেকেই চিত্রাঙ্কন অভ্যাসের ফলে অভিজাত ধনী পরিবারে এবং সুধী সমাজে পসার সুরু করেন। কিন্তু যথার্থ মণীষা ছিল সমসাময়িক যশস্বী শিল্পী টমাস গেন্সব্রোর। ইনি বয়সে রেণল্ডসের চেয়ে মাত্র চার বৎসরের

হর্ণেক্ ভগ্নীদ্বয়—রেণল্ড্‌স্

ছোট ছিলেন—১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে এর জন্ম—সাফোকের একটী পল্লীগ্রামে (সাড্‌বেরী); পিতা সামান্য লোক—তাঁর নয়টী পুত্রসন্তানের কনিষ্ঠ ছিলেন টমাস। ১৪ বৎসর বয়স থেকে টমাস গাছপালা নদী বনানী প্রভৃতি আশেপাশের পল্লীদৃশ্য প্রভৃতির স্কেচ্ করতেন। আটটী নীরস ভাইবোনের পর টমাস চিত্রকলায় যে রসের সন্ধান পেয়েছিলেন তা নিতান্ত আকস্মিক ভাবে। প্রকৃতিকে তিনি শিশুকাল হতে ভালবেসেছিলেন—তাই তিনি সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় অল্প অল্প মনের ভাব প্রকাশ করতেন। চিত্রাঙ্কনে তাঁর ক্রমশ ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত বাপের অনুমতি নিয়ে লণ্ডনে চিত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করতে আসেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এসে টমাস বিবাহ করেন। ইপমউইচে তাঁর গার্হস্থ জীবন তাঁর সুপ্ত প্রতিভাকে প্রথমে জাগিয়ে তুল্লেও জীবিকার্জ্জনের চাহিদা ব্যস্ত করে তোলে। কিন্তু এই সময়ে তিনি কতকগুলি এত সুন্দর ল্যাণ্ড্‌স্কেপ্ এঁকেছিলেন যা খাঁটি ইংলিশ পল্লীচিত্রের প্রথম অপূর্ব্ব নিদর্শন।

শিল্পীর কন্যাদ্বয়

"He was among the first English artist who represented the scenery of their own native land, thus breaking with the tradition followed by his predecessors and contemporary painters of painting imaginery Italian scenery."

অর্থাৎ এতদিন পর্য্যন্ত শিল্পীরা কাল্পনিক ইটালীয় দৃশ্যকে ইটালীয় স্কুলের ধারায় রূপ দিয়ে আসছিলেন ; সেই

ধারাকে ব্রটীশ ছাঁচে ঢেলে গেন্সব্রো সর্বপ্রথম নিজস্ব দেশীয় চিত্রকে রূপ দিতে থাকেন।

গেন্স্‌ব্রোর "হার্ভেষ্ট্‌ ওয়াগন," "মার্কেট কার্ট," "দি ব্রিজ" চিরদিন অমর হয়ে থাক্‌বে। এগুলির মূল চিত্র আছে লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীতে। বৃটীশ চিত্রশিল্পে ল্যাণ্ডস্কেপ স্কুলের স্টার্ট্‌ দেন বলতে গেলে প্রথম উইলসন (রিচার্ড) এবং গেন্সব্রো* এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। যেহেতু এর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মণীষী রুবেন্স্‌ ভিন্ন কোন বড় চিত্রশিল্পী প্রকৃতিদৃশ্যাঙ্কনে (landscape) বিশেষ ভক্ত ছিলেন না। অতি দুঃখের বিষয় যে গেন্স্‌ব্রো নিজের কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, সম্ভবতঃ লণ্ডনে উপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে

বিমল বয়স

বেশীর ভাগ পোর্ট্রেট্‌ আঁক্‌তে হত বলে এবং আরও একটা কারণ যা শেষ পর্য্যন্ত টমাসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রেণল্ড্‌স্‌ও বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে—ইংলণ্ডে যদি সত্যিকার চিত্রকলানুরক্ত ছেলে থাক্‌ত তাহলে এতদিনে গেন্সব্রোর স্কুল বলে একটী ধারা আজও বর্ত্তমান থাক্‌ত।

ইপ্‌স্‌উইচে বাস করার সময় উইলসনের ষ্টুডিওতে এবং স্থানীয় গবর্ণরের প্রাসাদে ভ্যান্‌ডাইকের ছবিগুলি টমাস বিশেষভাবে ষ্টাডি করেন এবং ক্রমশঃ সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিত্রকর স্যার অ্যাটনী ভ্যানডাইকের বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তারই ফলে গেন্সব্রোর প্রতিকৃতি অঙ্কনে হাত খুলিতে থাকে এবং পল্লীচিত্র-অভ্যস্ত তুলি পোর্ট্রেটগুলিতেও :আকাশের নীল রং বা মাঠের ঘাসের সবুজ রংএর ছোঁয়াচ দেওয়াতে ছবিগুলি হয়ে উঠ্‌ত ডেলিসিয়াস্‌—যেমনতরো ব্লুবয় ছবিখানি। মাষ্টার বুটালের পোষাক আগাগোড়া নীল, তাতে মুখখানি যেন বেশী ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়। ছবিখানিতে গেন্সব্রোর যথেষ্ট খ্যাতিলাভ হয়। ভ্যান্‌ডাইকের ধারা হলেও
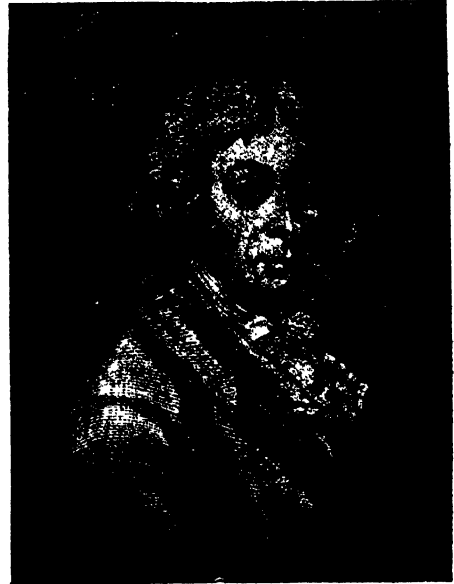
টমাস গেন্সব্রো

টমাসের নিজস্ব ষ্টাইল এবং রং চাপাবার মৌলিক ভঙ্গিমা এত সুন্দর ভাবে ছবিখানিকে প্রতিমূর্ত্ত করেছে যে চিরকাল এই ছবিটী শিল্পীকে অমর করে রেখেছে। মুখের ভাবখানি পর্য্যন্ত এমন বাস্তব, সজীব এবং অর্থপূর্ণ।

ডাচেস্‌ অব্‌ ডেভন্‌সায়ার এলিজাবেথ ছিলেন অসামান্য রূপসী—তাঁর চক্ষুঝল্‌সানো রূপ এবং সদানন্দময়ী ভাবকে টমাস গেন্সব্রো যেরূপভাবে ক্যানভাসের উপর রূপায়িত করেছিলেন সেরকমটী আর কেহ পারেনি—যদিও অনেক শিল্পীকেই ডাচেস্‌ সিটিং দিয়েছিলেন। ছবিখানি এত জীবন্ত এবং সুন্দর হয়েছিল যে রেণল্ডসেরও আঁকা এলিজাবেথ তার কাছে হার মেনে যায়। ছবিখানি টমাস

---

* "...Wilson and Gainsborough laid the foundation of our school of landscape, their works are full of the truest nature and purest fancy"—Cunningham.

গেন্সব্রোর প্রবীণ বয়সে আঁকা। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এটী লণ্ডন আর্ট গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয় এবং দশ হাজার গিনীতে বিক্রী হয়। কিন্তু এই বিখ্যাত চিত্রটীর সৌন্দর্য্য বোধ করি কোন অজ্ঞানিত দর্শককে অতিমাত্রায় প্রলুব্ধ করে—যার ফলে ওই প্রদর্শনীতেই অতি অদ্ভুত ভাবে ছবিখানি ফ্রেম হতে বিচ্যুত অবস্থায় অপহৃত হয়। গেন্‌সব্রোর নাম বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়ল—সৌভাগ্য-সূর্য্যও সুপ্রসন্ন হলেন। ২৫ বৎসর বাদে গোয়েন্দা লাগিয়ে ছবির উদ্ধার হয় আমেরিকা থেকে।

অর্থসংস্থানের জন্য যৌবনের শেষে টমাস পল্লীদেশ ত্যাগ
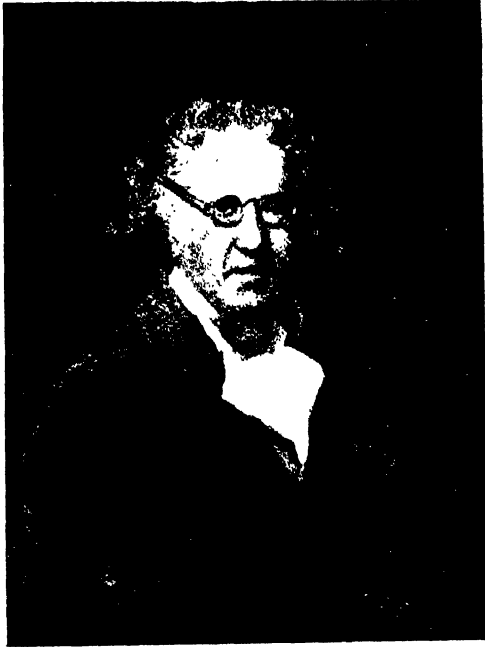
সার যশুয়া রেণল্ড্‌স্

করে লণ্ডনে এসে বাস করেন। প্রতিভা চিরদিন অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে না—আলোর মত ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। রাজা হতে আরম্ভ করে গণমান্য ধনী অভিজাত সকলেই তাঁকে সমাজে টেনে নিল। এই হল রেণল্ড্‌সের হিংসা। কারণ সার যশুয়া এই সমাজে পূর্ব হতেই প্রতিষ্ঠিত—তিনি দেখলেন তাঁর মত টমাসও রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ পাচ্ছে—তৃতীয় জর্জ্জের, রাণীর এবং রাজ পরিবারের ছবি আঁকছে—শুধু তাই নয় রাজা তৃতীয় জর্জ্জ রীতিমত গেন্সব্রোর বন্ধু হয়ে উঠলেন। লণ্ডনের প্যাল্‌ম্যালে টমাস থাকিতেন বলে রেণল্ড্‌স্ হিংসাভরে টমাসকে that man of the Pallmall বলে পরিচয় দিতেন। এঁদের দুজনের মধ্যে আলাপ থাকলেও স্যার যশুয়া অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, যদিও টমাসের প্রতিভাকে (genius) তিনি মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন।

সার যশুয়া রেণল্ড্‌স্ গোড়া থেকেই লণ্ডনের বাসিন্দা; বহুদিন ইটালীতে ছবি আঁকা শিক্ষা করে লণ্ডনের অবস্থাপন্ন ঘরে ঘরে পোর্ট্রেট্ বা প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন করে অর্থোপার্জ্জন করতেন্। বর্ণ্ জিনিয়াস না হলেও বৃটীশ পোর্ট্রেট্ চিত্রকরের মধ্যে রেণল্ড্‌স্ ছিলেন প্রথম শ্রেষ্ঠ পেণ্টার। টমাসের যেমন সঙ্গীত ও কবিতায় ভয়ানক taste ছিল সার যশুয়ার তেমনি অনুরাগ ছিল সাহিত্যে। তাঁর আড্ডা ছিল শেরিডান, বার্ক, জনসন্, ব্ল্যাকষ্টোন্, গোল্ড্‌স্মিথ ও গ্যারিক্ প্রভৃতি সাহিত্যমণ্ডলীতে। রয়াল একাডেমির প্রতিষ্ঠা এবং পালনে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। রয়েল একাডেমিতে তিনি বহুবার লেক্‌চার দিয়েছিলেন; সেই সমস্ত লেক্‌চারে তাঁর চরিত্রের তিনটী গুণ প্রকাশ পায়—সাহিত্যিক, কলা-সমালোচক এবং কলা-শিক্ষক। বহু-সংখ্যক চিত্র তিনি এঁকেছিলেন এবং বহু ছাত্রকে চিত্রশিল্পে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রেণল্ড্‌সের ছবি বোধ হয় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও তার মধ্যে মাত্র কয়েকখানি বিশেষ নাম করতে পেরেছে। তার কারণ তিনি মোটেই ভাববাদী ছিলেন না এবং ইটালীয় পদ্ধতিতে বাস্তব-শিল্পী ছিলেন; বিশেষ কোন মৌলিক জিনিষ দিয়ে যেতে পারেন নি। অনেক সময় তিনি লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি, র‍্যাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর ছবির অনুকরণ করতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হতেন না। সেইজন্য অনেকের মতে প্রতিভাবান খাঁটী চিত্রশিল্পী বলতে রেণল্ড্‌সের নাম গেন্সব্রোর পরে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর্ট গ্যালারীতে এবং কলিকাতার কয়েকটী ধনী পরিবারের চিত্রসংগ্রহে সার যশুয়া রেণল্ড্‌সের ছবি চোখে পড়ে। নাইট্‌হুড্ পেয়েছিলেন বলেই অফিসিয়ালদের চিত্রই তিনি বেশী এঁকে থাকতেন। সার যশুয়া গেন্সব্রোর একখানি ছবি এঁকেছিলেন কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ করেন নি।

পান্থ

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

গ্রামের হরিশ মৈত্তির—

অনেক কাল আগে যখন তিনি এ গ্রামে আসেন, তখন যারা ছিল বৃদ্ধ আজ তারা হয়েছে গতায়ু, যারা ছিল শিশু তারা হয়েছে আজ সবল যুবক, তাদের ঘর ভরে গেছে আজ ছোট ছোট শিশুতে।

সে নেহাৎ আজকের কথা নয়, প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা যেদিন হরিশ মৈত্তির গ্রামে আসেন।

আজ হরিশ মৈত্তির গাঁয়ের সবচিন লোক।

গ্রামে যখন প্রথম পোষ্ট অফিসটা স্থাপিত হয়, হরিশ মৈত্তির নিজেই তার ভার গ্রহণ করেন; আজও সেই পোষ্ট অফিসের ভার তাঁর 'পরে রয়েছে।

শুধু তাই নয়—তাঁর আছে ডাক্তারীতে একটু অভিজ্ঞতা, একটা হোমিওপ্যাথী বাক্স সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ঠিক পৌনে দশটায় তিনি পোষ্ট অফিসের দরজা খোলেন। হাতে থাকে ঔষধের বাক্সটা। চারটা পর্য্যন্ত পোষ্ট অফিস খোলা থাকে।

আজ তিরিশ বৎসরের পুরানো পোষ্ট অফিস। একটা চালা ঘর, চারিদিকে মাটির দেয়াল; ঘরের ভেতর একখানা বিবর্ণ টেবল, একখানা ভাঙ্গা চেয়ার। পাশে একখানা বেঞ্চ, সেখানা তিরিশ বৎসরে তবু দু তিনবার বদল হয়েছে, বদলায়নি টেবল, চেয়ার।

এই অফিস ঘরটা মৈত্তির মশায়ের যেন নিজের ঘর, এখানে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট।

কত দেশের কত চিঠিপত্র তাঁর হাতে আসে, ঠিকানা-গুলো একবার দেখে নিয়ে সবগুলো গুছিয়ে ফেলে ডাক দেন—"ভোলা—"

ভোলাপিয়ন দরজাতেই বসে থাকে, এগিয়ে এসে গুণে-গুণে চিঠিগুলো ব্যাগে ফেলে।

চিঠিপত্র বিদায় করে মৈত্তির মশাই টেবলের পরে পা দুখানা তুলে দিয়ে চেয়ারে লম্বা হয়ে পড়ে আড়ামোড়া ছাড়েন।

বেতন মাত্র দশটাকা, ভোলার বেতন চৌদ্দ টাকা।

ভোলার কাজ আর মৈত্তির মশায়ের কাজে অনেক তফাৎ। ভোলাকে বাড়ী বাড়ী চিঠি বিলি করতে হয়, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হয়, তার খাটনী বড় সোজা নয়।

(২)

পোষ্ট অফিসের গায়েই মৈত্তির মশায়ের থাকবার ঘর।

একখানি ঘর, একটা বারাণ্ডা। সেই বারাণ্ডারই এক কোনে মৈত্তির মশায়ের রান্না হয়। যোগাড় করে দেয় ভোলা। উনানটা ধরিয়ে মাজা এনামেলের হাঁড়িতে চাল জল দিয়ে বসিয়ে দেয়, ভাতটা হতে মৈত্তির মশাই নামিয়ে নেন।

ভোলাও আছে অনেককাল—আজ প্রায় পঁচিশ বছর।

বয়স তার অনেক হয়েছে, দেহটা তার সামনে ঝুঁকে পড়েছে। পত্রের উপরকার ঠিকানা পড়তে আজকাল তার ভুল হয়ে যায়, তাই রামের পত্র যায় শ্যামের বাড়ি, শ্যামের পত্র যায় উমেশের বাড়ি। এ নিয়ে আগে গোলমাল বাধতোনা, আজকাল গোলমাল বাধে।

গ্রামের লোকেরা এই ব্যাপার নিয়ে পোষ্ট মাষ্টারের কাছে আসে।

মৈত্তির মশাই মাথার টাকে হাত বুলান ও বলেন, "আচ্ছা, এবার হতে সাবধান করে দেব ভোলাকে।"

গ্রামের লোকেরা বলে, "ওর এখন ছুটি নেওয়া উচিত; অত বুড়ো হয়েছে চোখে দেখতে পায় না—"

ভোলা এর পর হতে সাবধান হয়ে চিঠি বিলি করে।

ভোলার নামে তবু ও সদরে পত্র যায়। সদর হতে পোষ্টমাষ্টারের নামে পত্র আসে—নূতন পিয়ন রাখতে হবে।

মৈত্তির মশাই ভোলাকে কাছে ডাকেন, শুষ্কহাসি হেসে

বলেন, "তোর এখানকার অন্ন উঠলো রে ভোলা, তোকে এখন সদরে গিয়ে কাজ করতে হবে।"

নির্ব্বোধ ভোলা হাউ হাউ করে কাঁদে।

তবু ও তাকে যেতে হল। তাকে বিদায় দিয়ে মৈত্তির মশাই শূন্য মনে শূন্য ঘরে ফিরে আসেন।

ভোলার পঁচিশ বছরের কাজ এককথায় চলে গেল, তাঁর ত্রিশ বৎসরের কাজ—সে ও তো বড় সোজা কথা নয়।

তা ছাড়া তিনিই এই পোষ্ট অফিস স্থাপন করেছেন, তাঁকে এখান হতে সরাবে কে? গাঁয়ের লোকে তো বলেই থাকে—তিনি গেলে পোষ্ট অফিস অচল হয়ে পড়বে, গাঁয়ের লোক মরবে কোন জায়গা হতে কারও খবর না পেয়ে।

মনের মধ্যে একটু অহঙ্কার হয় বই কি।

(৩)

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে অনেক লোকজন আসে, গল্প চলে; আশ পাশের কৃষকেরা মাষ্টারবাবুর বড় বাধ্য, তাঁর গুণে একেবারে মুগ্ধ। এরা কেউ তাঁর অতীত জীবনের কথা জানে না, কেবল জানে তাঁর বর্ত্তমানকে।

তাদের অসুখ বিশুখ হলে মৈত্তির মশাই দেখাশোনা করেন, ওষুধ পত্র দেন, বিপদে সাহায্য করেন। গ্রামের প্রত্যেকের ভালোমন্দের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। ভোলাকে বাদ দেওয়া চলে, তাঁকে বাদ দেওয়া চলে না।

ষাট বৎসর বয়সেও তিনি কর্ম্ম তৎপর, পোষ্ট অফিসের কাজে এতটুকু ত্রুটী নাই; যে কোন রোগে ডাকলে দেখা-শোনা করা—বেছে বেছে ওষুধ দেওয়া—এরও ত্রুটী নাই।

তাঁর অতীত জীবন অতীতেই কেটে গেছে, কেউ কোনদিন সন্ধান পায় নি তিনি কোথায় ছিলেন, কোথা হতে এসেছেন। সর্ব্বদা সদানন্দ এই লোকটীর মধ্যে কোনও দুঃখময় অতীতের স্মৃতি যে থাকতে পারে, সে কথা লোকে বিশ্বাস করবে না, হেসে উড়িয়ে দেবে।

পঁচিশ বছর কাছে থেকে ভোলাও জানতে পারে নি, রাত্রের অন্ধকার যখন নিবিড় হয়ে গ্রামের বুকে ঘনিয়ে আসতো, সেই নিশীথে সকলে যখন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়তো, তখন একা বিনিদ্র মৈত্তির মশাই বিছানায় পড়ে ছটফট করতেন।

কত দণ্ড কত প্রহর কেটে যেত; তারপর কখন যে কত আরাধনার পর ঘুম আসতো, তাও কেউ জানতো না।

(৪)

গ্রামের বর্ত্তমান জমীদার এসেছেন—।

ক্ষুদ্র গ্রাম ওতোপ্রোত হয়ে উঠেছে। জনে জনে প্রজারা নূতন জমীদার সন্দর্শনে গেছে, যান নি কেবল বৃদ্ধ মৈত্তির মশাই।

কত লোক ডেকেছে; মৈত্তির মশাই হেসে বলেছেন "আমি না গেলেও এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না; কারও কিছু আসবে না, যাবে না। তোমরা দেশের মানুষ, তোমরা যাও।"

কথাটা নূতন জমীদার ব্রতীন্দ্রের কানে পৌছতে দেরী হল না।

সামান্য একটা পোষ্টমাষ্টার, তার অহঙ্কারও তো বড় কম নয়—

ব্রতীন্দ্রের পা হতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো।

সে আদেশ দিয়ে পাঠালে—হরিশ মৈত্তির যেন আজই বৈকালে তার সঙ্গে একবার অবশ্য দেখা করেন।

আদেশ শুনেও মৈত্তির মশাই চুপ করে রইলেন, যাবেন—কি যাবেন না কিছুই বললেন না।

সেদিন পোষ্ট অফিসে মণিঅর্ডার করতে চিঠি ফেলতে দুচার জন লোক যারা এসেছিল, তাদের সম্বোধন করে শুষ্কহাসি হেসে তিনি বললেন, "আমি এখানে আর কয়দিনই বা আছি। আজ কয়দিন ধরে মনে করছি আর কেন—অনেককাল সংসারে থাকা হল, এবার কাশী যাত্রা করা যাক। দু একদিনের মধ্যেই যাব মনে করছি।"

কথাটা চকিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, মৈত্তির মশাই কাশীবাস করতে যাচ্ছেন, নতুন পোষ্টমাষ্টার আসছে।

সকলেই ব্যগ্রভাবে ছুটে এলো, সবাই জানতে চায় কেন তিনি যাবেন। তাঁর তো যাওয়ার কথা ছিল না, তিনি তো চিরকালই এখানে থাকবেন কথা ছিল।

চিরকাল—

মৈত্তির মশায়ের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো; তিনি বললেন, "মন টেনেছে বিশ্বেশ্বরের পায়ের দিকে, আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না।"

তিনি আগেই ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন। মাস শেষ হতে আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি, এর মধ্যে নূতন পোষ্টমাষ্টার এলে তিনি সব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবেন।

যাত্রার আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন।

(৫)

নূতন জমীদার ক্রোধে ফেটে পড়েন।

এত বড় স্পর্দ্ধা একটা সামান্য পোষ্ট মাষ্টারের, তাঁর আহ্বান শুনেও সে এলো না। নূতন জমিদারকে সবাই সেলাম দিয়ে গেল, এলো না এই লোকটা।

আবার জমীদারের আদেশ এলো—মৈত্তিরকে এখনই যেতে হবে। আদেশ নিয়ে এসেছে জমিদারের দ্বারোয়ান, তার সঙ্গেই যাওয়া চাই।

মৈত্তির মশাই দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "যাও, তুমি তোমার মনিবকে গিয়ে বল, আমি আমার অফিস ফেলে এখন এক মিনিটের জন্যেও কোথাও যেতে পারব না।"

পাড়ার নিমাইহরি ভয়ে ভয়ে বললে, "কিন্তু শুনেছি আমাদের নতুন জমীদার ভারি শক্ত লোক, আপনি তাঁকে চটিয়ে দিয়ে ভালো করছেন না মৈত্তির মশাই।"

মৈত্তির মশাই একটু হেসে বললেন, "আমার আর ভালোমন্দ কি নিমাইহরি; আমি তো চিরকালের মত এখান হতে চলেই যাব, জমীদার আমার কি ক্ষতি করতে পারবেন ?"

এ কথাও সালঙ্কারে জমীদারের কানে গিয়ে পৌঁছলো।

যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন এসে পৌঁছলো ভোলা। সহরে সে টিকতে পারে নি, ছুটি নিয়ে দেশে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে সে একবার তার অতদিনের পুরাণো গ্রাম আর চিরপরিচিত মাষ্টার মশাইকে দেখতে এসেছে।

গ্রামের বুকের পরিবর্ত্তন দেখে ভোলা অবাক হয়ে গেল। মাত্র ছয়মাস হল সে গেছে, এই ছয়মাসে পুরাণো সব বদল হয়ে গেছে, নূতন পিয়ন এসেছে, নূতন পোষ্ট মাষ্টারও আজ সকালে পৌঁচেছেন। গ্রামের লোক দলে দলে এসে নূতন মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ করছে, যাওয়ার সময় পথে তারা বলাবলি করে যাচ্ছে—"এবার নতুন মাষ্টারবাবুর হাতে পোষ্টাফিসের চেহারা ফিরবে, কাজও ভালো চলবে।"

নূতন মাষ্টার মশাই ভ্রূ কুঞ্চিত করে চারিদিক দেখছেন, মৈত্তির মশাইকে জানাচ্ছেন—পোষ্ট অফিসটাকে ডাক্তারখানা করা কর্ত্তাদের ইচ্ছা নয়, সে জন্যে তাঁরা বেতন দিয়ে লোক রাখেন নি। এ ঘরটাকে এমন নোংরা করে রাখা হয়েছে যে ঘরে প্রবেশ করতে ঘৃণা হয়। ভাঙ্গা ও ছারপোকাভরা টেবল চেয়ারটাকে এতদিন বদলানো উচিত ছিল, মেঝেটায় সিমেণ্ট দিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, তাতে মৈত্তির মশাইকে কিছু ঘর হতে পয়সা খরচ করতে হতো না—ইত্যাদি।

মৈত্তির মশাই কেবল হাত দুখানা কচলাতে থাকেন।

তরুণ পোষ্ট মাষ্টারের আকৃতি এবং অবশেষে প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেছলেন।

জমীদার বাড়ী হতে প্রস্তাব এলো—নবাগত পোষ্টমাষ্টার যতদিন না নিজের থাকার সুবিধা করতে পারেন, ততদিন জমীদার বাড়ীতে থাকবেন।

মৈত্তির মশাই বিদায় নেওয়ার যোগাড় করতে লাগলেন।

(৬)

ব্রতীন্দ্রের হাতে এলো একখানা পত্র, পত্র লিখেছেন মৈত্তির মশাই নিজে।

মহামহিমময় গর্ব্বিত জমীদার—

তুমি আমায় বার বার ডেকে পাঠিয়েছ, আমি যাই নি। তোমার কাছে যাওয়ার প্রবৃত্তি আমার নেই, কারণ আমি নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পারি নে। হয় তো উত্তেজিত হয়ে উঠব, হয় তো ক্ষতি করে ফেলব—কাজ নেই তাতে।

তুমি নূতন জমীদারি কিনেছ—আমি যেদিন শুনেছি সেইদিনই ছুটির দরখাস্ত করেছি। নূতন লোক এসেছে, তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ভেবেছিলুম জীবনের বাকি কয়টা দিন এখানে—এই সব গ্রাম্যলোকের মধ্যে থেকে কাটিয়ে দেব। হতো ও তাই, যদি এ পর্য্যন্ত তোমরা আমায় না অনুসরণ করতে। আমায় এখানে—এতদূরেও তোমরা শান্তিতে থাকতে দিলে না, তাই আমি চললুম।

আমি পান্থ; পথই আমার সম্বল—পথ বেয়েই চলেছি, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত পথ বেয়েই চলব। পথই আমায় দেবে আশ্রয়, শেষ। শয্যা বিছাব এই ধূলাময় পথের পরে।

হ্যাঁ, আমায় হয় তো তুমি জানো, নামটা হয় তো শুনেছ। তোমার বাপ অবনী ছিল আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, তাকে আমি বড় বিশ্বাস করতুম।

একদিন কোথায় ছিল তোমাদের এই অতুল ঐশ্বর্য্য, কোথায় ছিল নাম যশ, কোথায় ছিল ক্ষমতার অহঙ্কার? পথ হতে পীড়িত অবনীকে আমি কুড়িয়ে নিয়ে আসি, তাকে আশ্রয় দেই, আর দেই সহোদরাধিক ভালোবাসা।

তাই না সে আমার সর্ব্বনাশ করলে—

একদিন আমার না ছিল কি? সুখের সংসার, অগাধ অর্থ। যে অর্থে আজ এই জমীদারি তুমি কিনেছ, এ অর্থ ছিল আমার; এ অর্থ আমি আমার সুখ শান্তি, নাম যশের সঙ্গে দান করে এসেছি।

আমার স্ত্রীকে আমি হত্যা করেছি, কেন—তা আর তোমায় বলবার দরকার নেই। আমি নারীহত্যাকারী, আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ জীবনে হবে না তা আমি জানি।

ফাঁসীর দড়ি হতে নিজেকে বাঁচালুম আমি পালিয়ে, ষ্টেশন হতে আঠারো মাইল দূরে এই পল্লীগ্রামে থেকে—নাম গোপন করে। আর আমার সম্পত্তি নিয়ে অবনী হল লক্ষপতি, সে আজ কাশীবাস করছে রাজার মত, তার ছেলে আজ জমীদার।

আর আমি—?

নারীহত্যাকারী, ফাঁসীর আসামী, হরিশ মৈত্তির আমার নাম, দশ টাকা বেতনে কাজ করি এই পল্লীতে।

আমি যাব তোমার কাছে করযোড়ে মাথা নত করে দাঁড়াতে, তার চেয়ে আমার আত্মহত্যা করাও ভালো।

আমি বিদায় নিলুম। নিঃশব্দে নীরবে যে পথে এসেছিলুম, সেই পথ বেয়ে চললুম। শত্রুপুত্র, তোমায় তবু যাওয়ার বেলায় আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি তোমার পিতার পাপ যেন তোমার না অর্শে।

বিদায়—

শ্রীজানকীনাথ মৈত্র।

হাঁফাতে হাঁফাতে ব্রতীন্দ্র যখন নদীর ঘাটে পৌছালো, তখন নৌকাখানা ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে গেছে। নৌকার উপর দেখা গেল পলিত কেশ বৃদ্ধ মৈত্তির মশাইকে।

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন পেছনে ফেলে আসা গ্রামের দিকে।

চল্লিশ বৎসরের পরিচিত স্থান—

ওই ভাঙ্গা ঘাট, প্রকাণ্ড বড় বট গাছটা, কৃষকদের পর্ণকুটীর; গ্রামের পথ, মাঠ, পাখী, আজ সবাই তাঁকে ডাকছে—"আয়, ওরে আয়—"

পান্থ চলেছে পথ বেয়ে; পথের ধূলায় রইলো তার পায়ের দাগ; পথ তাকে ধরে রাখতে পারলে না—রাখলে—সে এসেছিল সেই চিহ্নটুকু।

কবি ও কাব্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসাক

তমসাতীরের ক্রৌঞ্চ বধূর শোক
আজো রহে ভরে কবির মানসলোক,
নিষাদের চলা হত্যার অভিযানে
কালো যবনিকা নিতি নব রূপে টানে।
ব্যথা পেল রূপদ্বন্দ্বে, সুরের মাঝে,
কবির বীণায় বিরহের গান বাজে।

ছন্দে যখন অন্তর পেল সাড়া
কবিতার সুর অসীমের বুকে হারা,
বীণার তারেতে গান চাহিবে না শেষ
দিকে দিকে তাই জাগে মুক্তির রেশ।
ভাষার শায়ক লক্ষ্যে বিরাম চায়
কাব্য মাঝারে অসীমের সীমানায়॥

'শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাবলম্বনে ষোড়শ শতাব্দী হইতে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গলার ন্যায় উড়িয়া, হিন্দী এবং অসমীয়া ভাষাতেও যে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহা এখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অবিদিত নহে। কিন্তু সেই সমস্ত চরিতগ্রন্থই কি শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান? অথবা তন্মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ বা তাহার কোন কোন অংশবিশেষই শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান? এখানে বলা আবশ্যক যে "উপাদান" শব্দটি সংস্কৃত। সংস্কৃত গ্রন্থে 'উপাদান' শব্দের যে যে অর্থে প্রয়োগ পাইয়াছি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু এখন বঙ্গভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতের যে উপাদান লিখিত হইতেছে সেই উপাদান কি? ইহাই আমার প্রশ্ন।

সেই সমস্ত চরিতগ্রন্থ অথবা তন্মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ অথবা তাহার কোন কোন অংশই শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান বলিলে উহার মূলভূত প্রমাণ কি, ইহাও বিচার-পূর্ব্বক বক্তব্য। ভারতের বেদাশ্রিত পূর্ব্বাচার্য্যগণ যখন বেদেরও প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহা করিতে বিরুদ্ধবাদিগণের বহু পূর্ব্বপক্ষও সমর্থন করিয়া তাহার উত্তর বলিয়াছেন—তখন সেইরূপে নানা চরিতগ্রন্থের প্রামাণ্য পরীক্ষাও অকর্ত্তব্য হইতে পারে না।

অবশ্য শ্রীচৈতন্যচরিতের চর্চ্চায় আমরা বহুবিজ্ঞ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থই সাদরে আশ্রয় করিয়াছি। কারণ কবিরাজ গোস্বামী সংস্কৃত সাহিত্যে এবং অনেক শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে—বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ে শ্রীবৃন্দাবনধামে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বহু অনুসন্ধান ও বহু প্রাচীন উপদেশ লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য চরিত-প্রসঙ্গে সুবৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীর 'চরিতামৃত' গ্রন্থ অপূর্ব্ব অতুলনীয়। তাই উহা এখন সর্ব্বত্র সমাদৃত।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী মুরারিগুপ্ত এবং সমসাময়িক কবিকর্ণপূর ও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-বর্ণনে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অবশ্য সাদরে পাঠ্য। আর ঐ সমস্ত গ্রন্থে পরস্পর-বিরুদ্ধ যে সমস্ত কথা পাওয়া যায় তাহারও নিরপেক্ষ সমালোচনার দ্বারা কোন সমাধান করিতে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এখানে প্রথমে ইহার দৃষ্টান্তরূপে একটি বড় কথার উল্লেখ করিতেছি।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থে (যাহা পরে কোন কারণে "চৈতন্য-ভাগবত" নামে কথিত হইয়াছে) বর্ণন করিয়াছেন যে—শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ৺পুরীধামে যাইয়া তত্রত্য বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন—

> "জগন্নাথ দেখিতে যে আইনাঙ্ আমি।
> উদ্দেশ্য আমার মূল এথা আছ তুমি।"
> "তোমাতে যে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
> তুমি যে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি॥" ইত্যাদি
>
> (—অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় পঃ)

পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের মস্তক মুণ্ডন-পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া সকলেরই যে দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই পরম কর্ত্তব্য ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছিলেন—

> "সভার জীবন কৃষ্ণ জনক সভার।
> হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥"
> "যদি বোল শঙ্করের মত সে হো নহে।
> তাঁরও অভিপ্রায় দাস্য তারি মুখে কহে॥
>
> (ঐ অন্ত্য)

বৃন্দাবনদাস পরে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—"তথা চাহ শঙ্করাচার্য্যঃ প্রভুঃ"—"সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং" ইত্যাদি। অর্থাৎ উক্ত শ্লোকের দ্বারা শঙ্করাচার্য্যও নিজ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই সকলের কর্ত্তব্য। বৃন্দাবনদাস উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন—

"এই শঙ্করের শ্লোক এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়॥"

অবশ্য আরও কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে উক্ত শ্লোকটি শঙ্করাচার্য্যের শ্লোক বলিয়াই কথিত হইয়াছে। 'বৃহদ্-ভাগবতামৃতে'র (২য় অঃ ১৮১ শ্লোকের) টীকায় সনাতন গোস্বামী উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি যে বেদান্ত-ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যেরই রচিত, এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ আছে। আর তাহা হইলেও বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় উক্ত শ্লোকের দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের যেরূপ মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। শারীরক ভাষ্যাদি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য বিচার-পূর্ব্বক যেরূপ মতের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভৃতিও বিশেষরূপেই জানিতেন এবং তাঁহারা নিজ গ্রন্থে তাহাও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, মূল কথা বৃন্দাবনদাসের মতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা বা কোন বিচার করেন নাই।

কিন্তু পরে কবিরাজ গোস্বামী 'চরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য বেদান্ত শ্রবণ করাইতে নিজ গৃহে তাঁহার নিকটে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুসারে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরে অষ্টম দিনে শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণামবাদ ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥"

পরে তিনি তাঁহার নিজসম্মত পরিণামবাদ অনুসারে বেদান্ত মত ব্যাখ্যা করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের 'বিতণ্ডা' প্রভৃতিরও খণ্ডন পূর্ব্বক নিজ মত সংস্থাপন করিলে—

"শুনি ভট্টাচার্য্য হইল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥"

পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকের নানারূপ অতিগূঢ় অর্থ শ্রবণ করিয়া—তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই বিশ্বাস করেন। পরে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে কৃপা করিবার ইচ্ছায়—

"দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশী মুখ স্বকীয় স্বরূপ॥১৮৩
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর জুড়ি॥"১৮৪

বৃন্দাবনদাস বর্ণন করিয়াছেন—

"অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেল সার্ব্বভৌম মহাশয়॥" অন্ত্য ৩য়

কিন্তু কবিকর্ণপূরও "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গে বর্ণন করিয়াছেন, "প্রদর্শয়ামাস চতুর্ভুজত্বং দিবাকরাণাং শতকোটিভাস্বৎ" অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে শতকোটি সূর্য্যসম তেজঃপূর্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন।

কাঁচনাপাড়ার ভক্ত শিবানন্দ সেন মহাশয়ের পুত্র পরমানন্দই কবিকর্ণপূর নাম লাভ করেন। তিনি শিশুকালে পিতার সহিত ৺পুরীধামে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের পরেই অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি লাভ করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের শেষে "যস্যোচ্ছিষ্ট-প্রসাদাদয়-মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী" ইত্যাদি শ্লোকেও ঐ কথা পাওয়া যায়।

কবিকর্ণপুর চৈতন্যদেবের তিরোধানের নয় বৎসর পরে ১৪৬৪ শকাব্দে প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় যে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' মহাকাব্য রচনা করেন—তাহার দ্বাদশ সর্গে তিনি শ্রীচৈতন্যদেব ও সার্ব্বভৌমের শাস্ত্রবিচার ও পরে সার্ব্বভৌমের পরাভবের বর্ণন করিয়াছেন। চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী উক্ত স্থলে কবিকর্ণপূরের নাম না করিলেও উক্ত বিষয়ে তিনি তাঁহার কথাই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়।

কবিরাজ গোস্বামী বহু স্থলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রতি অসামান্য ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি চরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদেও লিখিয়াছেন—

> "চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
> তাহার আজ্ঞায় করো তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥
> ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
> শেষ লীলার সূত্র এ বে করিবে বর্ণন॥"

কিন্তু পরে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ‘সার্ব্বভৌমোদ্ধার’ বর্ণনে তিনি তাঁহার মহামান্য বেদব্যাসকেও মান্য করেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকর্ণপূরও বৃন্দাবনদাসকে বেদব্যাস বলিয়া বহু সম্মান করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরে "গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়" বৃন্দাবনদাসকেও গৌরগণের মধ্যেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন —"বেদব্যাসো যত্র বাসীদ্দাসোবৃন্দাবনোঽধুনা" ইত্যাদি। এইরূপ শ্রীচৈতন্যচরিত প্রসঙ্গে নানা চরিতগ্রন্থে আরও অনেক কথা পাওয়া যায়—যাহা পরস্পরবিরুদ্ধ। অতএব তাহাও অবশ্য বিচার্য্য।

শ্রীচৈতন্যচরিত প্রসঙ্গে অনেক দিন হইতে অনেক বিষয়ে অনেক বহুদর্শী সমালোচকের নানারূপ সমালোচনা ও মন্তব্য পাঠ করিয়াও আমি আরও অনেক বিচার্য্য জানিতে পারিয়াছি। কিছুদিন হইল,—**‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’** নামে এক নূতন বৃহৎ পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপহাররূপে প্রাপ্ত হইয়া এখন তাহাও মধ্যে মধ্যে সাগ্রহে পাঠ করিতেছি। পাটনা বি-এন কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ ভাগবতরত্ন মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় এই নিবন্ধ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহা আমাদিগের মাতৃভাষা ও বাঙ্গালীর বড় গৌরবের কথা।

বিমানবাবুর এই নিবন্ধ যিনি কিছু পাঠ করিবেন, তিনিও আলোচ্য বিষয়ে বিমানবাবুর বহু অধ্যয়ন ও অতি কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় পাইবেন। তিনি এই নিবন্ধে কত বিষয়ে কিরূপভাবে কত আলোচনা করিয়াছেন এবং সেজন্য তিনি কতকাল হইতে কতস্থানে গিয়া কত গ্রন্থ পাঠ ও কত মাসিকপত্রের কত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, ইহাও এই নিবন্ধের সূচীপত্র, পরিশিষ্ট এবং নির্ঘণ্ট-পত্র পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। শ্রীচৈতন্যচরিত প্রসঙ্গে বঙ্গভাষায় একই গ্রন্থে বহু বিষয়ে এইরূপ নূতনভাবে এইরূপ বহু আলোচনা আমি আর কোন গ্রন্থে পাই নাই। বিচারশীল পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক এই নিবন্ধ পাঠ করিলে শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাইবেন, যাহা অনেকের অচিন্তিত বা অজ্ঞাত।

কিন্তু এই নিবন্ধ পাঠকালে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা-পুস্তক নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যাপুস্তকও নহে। কিন্তু নানা চরিত গ্রন্থে অনেক বিষয়ে যে নানারূপ কথা পাওয়া যায়, তাহার তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা যথামতি সত্য নির্ণয়ই এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই ইহাতে অনেক চরিতগ্রন্থের কালনির্ণয় এবং প্রামাণ্য-পরীক্ষার জন্যও অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে ‘সহজিয়া’ ছিলেন না, এই মহাসত্যের ঘোষণার জন্য নির্ভয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। আর কোন কোন বিষয়ে অনেক খ্যাতনামা বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্যের উল্লেখ ও তন্মধ্যে কোন কোন মন্তব্যের সমালোচনা পূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়া সে বিষয়ে যথামতি নিজ মন্তব্যেরও সমর্থন করা হইয়াছে।

বিচারশীল বিমানবাবু পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে আধুনিক রীতিতে তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা তাঁহার আলোচ্য বিষয়ে যথামতি সত্য নির্দ্ধারণ করিতে অনেক সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক চরিতগ্রন্থকেও সর্ব্বাংশে প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারেন নাই। কারণ পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা কথার সমন্বয় অসম্ভব হইলে সকল কথারই সত্যতা স্বীকার করা যায় না। সেই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা কথার বিরোধ ভঞ্জনের জন্য অগত্যা কল্পভেদকে আশ্রয় করিলে এখন শিক্ষিত সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিমানবাবু কোন কোন স্থলে বিভিন্ন গ্রন্থকারের কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াও বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন।

অবশ্য বিমানবাবুর সমস্ত বিচার ও মন্তব্যই যে সর্ব্বসম্মত হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। বিমানবাবু নিজেও তাহার আশা করেন না। তিনি নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া পরমবৈষ্ণব অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর দৌহিত্র।

তাই তিনি প্রথমে বৈষ্ণবভাবেই তাঁহার প্রাণের কথা লিখিয়াছেন—

'বৃন্দাবনদাস, লোচন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রেমিক কবিজন শ্রীচৈতন্তের যে চরিতসুধা পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহা পান করিয়া বহু সাধুহৃদয় ভক্ত বৈষ্ণব ও সাহিত্যরসিক যুগ যুগ ধরিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেছেন। আর আমি শুষ্ক ঐতিহাসিক, অরসজ্ঞ কাকের ন্যায় শ্রীচৈতন্তের বহিরঙ্গ জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনারূপ নিম্বফল আস্বাদন করিয়া বলিতেছি—এ ঘটনা এইরূপে ঘটে নাই, ও ঘটনা একেবারেই ঘটে নাই।'

বিমানবাবু পরেও তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "এইরূপ তুলনামূলক ঐতিহাসিক প্রণালী ধরিয়া শ্রীচৈতন্তের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ও সমাজ-বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন, আমার তাহা নাই। আর বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস লিখিতে হইলে লেখকের ব্যক্তিগত সংস্কার ও আবেষ্টনীর প্রভাব হইতে যেরূপ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন, সেরূপ নৈর্ব্যক্তিক ভাবও আমি সর্ব্বত্র অনুসরণ করিতে পারি নাই। সুতরাং আমি এরূপ প্রণালীতে যদি বিচারে অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমার ভুল ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহা জানিয়াও এপথে অগ্রসর হইতে চাই; কেন না, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীর এরূপ আলোচনা এ পর্য্যন্ত আর কেহই করেন নাই। **শ্রীচৈতন্যদেব আমার উপাস্য দেবতা** বলিয়া তাঁহার কথা আলোচনা করিতে আমার ভাল লাগে।" ১৬ পৃঃ।

আরও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিমানবাবু অনেক স্থলে বিচারপূর্ব্বক অনেক বিষয়ে নিশ্চিতরূপে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। অনেক বিষয়ে সংশয় বা সম্ভাবনাই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত বিচারই যে সম্পূর্ণ এবং সমস্ত সংস্কারই যে বিশুদ্ধ, ইহা আমিও বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার অনেক মন্তব্য ও অনেক কথায় আমারও অনেক বক্তব্য আছে। এই প্রসঙ্গে তাহাও কিছু বলা আবশ্যক—যদিও তাঁহার গ্রন্থ-সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু কোন কোন বিচার্য্য বিষয়ে যথামতি আলোচনাই উদ্দেশ্য।

বিমানবাবু 'সার্ব্বভৌম উদ্ধার কাহিনীর বিচার' করিতে প্রথমে লিখিয়াছেন—(১) "সার্ব্বভৌম উদ্ধার বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা একেবারেই গ্রাহ্য করেন নাই। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় সার্ব্বভৌম উদ্ধার একদিনেই হইয়াছিল। চরিতামৃত অনুসারে উহা অন্ততঃ ১২ দিনের ঘটনা। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্তের কৃপা পাইবার পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম ভক্ত এবং ঈশ্বরে দাস্যবুদ্ধি-সম্পন্ন"। ইত্যাদি (৩৫৮ পৃঃ)। পরে বিমানবাবু উক্ত বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিত মন্তব্যের প্রকাশও সমর্থন করিতে লিখিয়াছেন—

"বৃন্দাবনদাসের প্রদত্ত এই বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রহণ না করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম যদি পূর্ব্ব হইতেই ভক্তি পথের পথিক হইবেন, তবে আর তাঁহাকে ভক্ত করায় শ্রীচৈতন্তের মহিমা কোথায়? একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত-পরিবর্ত্তন করার পক্ষে এক দিনের ঘটনা যথেষ্ট নহে। সার্ব্বভৌম উদ্ধারের সময় নিত্যানন্দ প্রভু কাছে বসিয়া ছিলেন না। সুতরাং এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।" ৩৫৯ পৃঃ।

দেখিতেছি, বিমানবাবু পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের কথা লিখিতে সর্ব্বত্রই কেবল 'সার্ব্বভৌম' লিখিয়া পরে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে "নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম" লিখিয়াছেন। সুতরাং পরে সার্ব্বভৌমের নৈয়ায়িকত্ব প্রকাশে তাঁহার প্রয়োজন আছে। তবে কি তাঁহার মতেও নৈয়ায়িক পণ্ডিত স্বভাবতঃ "ভক্তি পথের পথিক" হন না? অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ন্যায় শাস্ত্র এবং নৈয়ায়িক পণ্ডিত সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক দৃঢ় সংস্কার আছে ইহা আমি জানি, কিন্তু তাহা হইলে দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সাধন-রাজ্যে কোন্ পথ গ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহারা কি সকলেই চিরজীবন কেবল তর্করাজ্যেই যে-কোন পথে সিংহবিক্রমে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন? নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও প্রাচীন সাধনপদ্ধতির সংবাদ না জানিলে এ বিষয়ে কোন কথা বলা যায় না।

বস্তুতঃ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ও ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে পরমেশ্বরে দাস্যভাবসম্পন্ন। খৃঃ দশম শতকে সুপ্রসিদ্ধ মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকের শেষে ভগবদ্গীতার "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী

মাং নমস্কুরু" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভক্তি পথের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পরে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক দাস্যভাবে জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকটে করুণাপ্রার্থী হইয়া বলিয়াছেন—"অস্মাকন্তু নিসর্গ সুন্দর! চিরাচ্চেতো নিমগ্নং ত্বয়ি"…"তন্নাথ! ত্বরিতং বিধেহি করুণাং।"

পরন্তু কুসুমাঞ্জলি-ব্যাখ্যাকার নবদ্বীপের নৈয়ায়িক হরিদাস তর্কাচার্য্য গ্রন্থারম্ভে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করিতে বলিয়াছেন…"কোঽপি গোপতনয়ো নমস্যতে।" তাঁহার ঐ গ্রন্থের টীকাকার মহানৈয়ায়িক রাধামোহন বিদ্যা-বাচস্পতি গ্রন্থারম্ভে সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন, "শিশুরসি দুগ্ধমুখঃ কলয়সি মুরলীংকুতোঽতিচিত্রং। ইতি গোপীস্মিত-বচনৈঃ সুস্মিতবদনো হরিঃ পাতু।" নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ মহানৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ গ্রন্থারম্ভে লিখিয়া দেন "নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং।" আর নবদ্বীপের বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের "ভাষা পরিচ্ছেদ" যাহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত, প্রথম পাঠ্য গ্রন্থ—তাহার প্রথমে তিনি মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন, "গোপ-বধূটী দুকূলচৌরায় তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায়।"

পূর্ব্বে ন্যায়শাস্ত্র পাঠারম্ভে অধ্যাপকগণ প্রথম দিনেই ছাত্রদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামে মধুর লীলার রহস্য বুঝাইতেন। নচেৎ বিশ্বনাথের উক্ত শ্লোকে "গোপবধূটী-দুকূলচৌরায়" এই পদের প্রয়োজন বুঝা যায় না। বিশ্বনাথ পরে "ন্যায়সূত্রবৃত্তি"র প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবধূসঙ্গে মধুর লীলার স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে প্রেম-ভক্তির প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন,—"স কোঽপি প্রেমানং প্রথয়তু মনোমন্দিরচরস্ত্রিলোকীলোকানাং সজলজলদশ্যামল-তনুঃ।" এইরূপ আরও কত নৈয়ায়িক গ্রন্থকার যে নিজ গ্রন্থে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণন করা এখানে সম্ভব নহে।

বস্তুতঃ চিরকাল হইতেই বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক। প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির প্রচারের পূর্ব্বেও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সুবিখ্যাত শিষ্য নব্যন্যায়-প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় গিয়া কোন কারণে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক কৃষ্ণভক্তির গর্ব্ব প্রকাশ করিতে বলিয়া-ছিলেন—"**কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে।**"

যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ে বিমানবাবুর অনুমানের পরীক্ষা করা আবশ্যক। বিমানবাবুর অনুমান আমি এইরূপ বুঝিয়াছি যে, যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে ভক্ত করিয়া ছিলেন—অতএব তিনি পূর্ব্বে ভক্তি পথের পথিক ছিলেন না। কারণ ভক্তকে ভক্ত করায় শ্রীচৈতন্যের মহিমা কোথায়? অতএব বৃন্দাবনদাস যে সার্ব্বভৌমকে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরমবৈষ্ণব বলিয়াছেন, উহা সত্য হইতে পারে না।

এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে বিমানবাবু চরিতা-মৃতকার কবিরাজ গোস্বামীর কথা মানিয়া লইয়াই তাঁহার কথার সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার উক্তরূপ অনুমানের হেতু সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রীচৈতন্য-দেবই যে প্রথমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তি পথের পথিক করিয়াছিলেন, ইহা বৃন্দাবনদাস বলেন নাই। বৃন্দাবন-দাসের কথাই সত্য? অথবা, কবিরাজ গোস্বামীর কথাই সত্য? এইরূপ সংশয়ই বিচারের অঙ্গ। সুতরাং ঐ রূপ সংশয় মূলক বিচারে পূর্ব্বেই কবিরাজ গোস্বামীর কথা মানিয়া লইয়া ঐরূপ কথা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে ফলে ইহাই বলা হয় যে, যেহেতু চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে ভক্ত করিয়াছিলেন, অতএব বৃন্দাবনদাসের কথা সত্য হইতে পারে না।

এইরূপ বিমানবাবু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত-পরিবর্ত্তনের কথা লিখিয়া তাঁহার অনুমানের যে হেতুর সূচনা করিয়াছেন, সেই হেতু সিদ্ধ করিতেও পূর্ব্বেই কবিরাজ গোস্বামীর কথাই মানিয়া লইতে হইবে। কারণ বৃন্দাবনদাসের মতে ঐ হেতু সিদ্ধ নহে। অতএব উক্ত বিচারে বৃন্দাবনদাসের পক্ষগ্রাহী প্রতিবাদী বলিবেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্ত বিচারের দ্বারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত-পরিবর্ত্তন করেন নাই। কারণ তাহা আবশ্যকই হয় নাই। সার্ব্বভৌম পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি মায়াবাদী বৈদান্তিক ছিলেন না। পরে তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবের ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরক্ষণেই তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন। তাহাতে একদিনের ঐ ঘটনাই যথেষ্ট।

ফল কথা, অনুমান স্থলে বাদীর কথিত যে হেতু প্রতিবাদীর মতে অসিদ্ধ বা বিবাদগ্রস্ত, তাহাও প্রকৃত হেতু

হয় না। উহা "অন্যতরাসিদ্ধ" নামক হেত্বাভাস। আর যেহেতু সন্দিগ্ধ, তাহাও "সন্দিগ্ধাসিদ্ধ" নামক হেত্বাভাস।

পরন্তু নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে অভক্ত থাকিলে তিনি কিরূপ অভক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার অভক্তের লক্ষণ কি, ইহাও বিচার করা আবশ্যক। তিনি কি পূর্ব্বে বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন, অথবা, তিনি কি ভক্তি শাস্ত্রের কোন কথাই জানিতেন না বা মানিতেন না? অথবা তিনি ৺জগন্নাথ বিগ্রহও মানিতেন না?

কিন্তু "চরিতামৃত"কার কবিরাজ গোস্বামীই মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণন করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব ৺পুরীধামে গিয়া জগন্নাথ মন্দিরে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তৎকালে জগন্নাথ দর্শনার্থ উপস্থিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত ও বিস্মিত হন। তখন—

"বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥১০
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই—নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদ্দীপ্ত ভাব হয়॥১১
অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার॥"১২

উদ্ধৃত পয়ারে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত কৃষ্ণ-প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার এবং তাহাতে 'সুদ্দীপ্ত', 'প্রলয়' ও অধিরূঢ় ভাব—যাহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ববেত্তা না হইলে বলা যায় না। পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকে সেই অবস্থাতেই সাদরে নিজগৃহে লইয়া যান। পরে—

"উচ্চ করি করে সভে নাম সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হৈল চেতন॥৩৬
হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি হরি' বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম লৈল তাঁর পদধূলি॥"৩৭

পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বহু ভক্তি ও সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করাইয়া তাঁহার সঙ্গী ও নিজের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যকে নবীন সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইনি নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম বিশ্বম্ভর। তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলেন যে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী এবং মিশ্র পুরন্দরও (জগন্নাথ মিশ্রও) আমার পিতার মান্য ছিলেন। অতএব পিতার সম্বন্ধে তাঁহারা উভয়েই আমার পূজ্য। পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপের সম্বন্ধবশতঃ পরম সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন—

"সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব জান হ তুমি আমি নিজ দাস॥"৫৫

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি প্রথমেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ঐরূপ উক্তি কি তাঁহার পরমবৈষ্ণবোচিত দীনভাবের পরিচায়ক নহে? বৈষ্ণব ভক্তগণই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—"তদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরেও বলিয়াছেন—"মহাভাগবত হয় চৈতন্য গোসাঞি।" কিন্তু যিনি অবৈষ্ণব, তিনি কি ঐরূপ 'মহাভাগবতে'র লক্ষণ বুঝিতে পারেন? আর বৈষ্ণব বিদ্বেষী হইলে তিনি কি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে পারেন? আর সার্ব্বভৌম মায়াবাদী বৈদান্তিক হইলে প্রথমেই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর ঐরূপ পূজা করিতে পারেন কি না, ইহাও চিন্তনীয়।

সত্য বটে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাই যদি তাহার অভক্তের লক্ষণ বলিতে হয়, তাহা হইলে বৃন্দাবনদাসের মতেও তিনি পূর্ব্বে অভক্তই ছিলেন। পরে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক তখন হইতে সেইভাবেই তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন। অতএব বিমানবাবুর ঐ হেতুর দ্বারাও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার অসত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ ঐ হেতু বৃন্দাবনদাসের কথারও বিরুদ্ধ হয় না। অবশ্য যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের তৎকালে ষড়্ভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ বিশ্বাস করিবেন না, তাঁহাদিগের নিকটে ঐ সমস্ত কথা বলা যায় না। কিন্তু বিমানবাবু সে কথার কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

পরন্তু পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রকৃত হেতু কি, ইহাও বিচার করা আবশ্যক। কবিকর্ণপূর বর্ণন

করিয়াছেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রবিচারে পরাভবের পরেই তজ্জন্য অতি বিস্ময়প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তদেষ কৃষ্ণঃ খলু নান্যথৈব।" (মহাকাব্য—১২।৩১) কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কি তখন ইহাও মনে করিতে পারেন না যে, এই সন্ন্যাসী কোন বাক্‌স্তম্ভন মন্ত্রপ্রয়োগে আমাকেও নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ভারতে কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত কত স্থানে কত তার্কিকসিংহকে পরাস্ত করিলেও তাঁহারা ত তখন সেই দিগ্‌বিজয়ীকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করেন নাই।

কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনানুসারে বুঝা যায় যে, সার্ব্বভৌম পরে শ্রীচৈতন্যদেবের মুখে "আত্মারামাশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকের বহু প্রকার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল উক্ত শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াই যে তখনই সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়াই নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ইহা সকলে বিশ্বাস করিতে পারেন না। বৃন্দাবনদাসও কিন্তু তখনও সার্ব্বভৌমের সংশয় ব্যক্ত করিয়াই বর্ণন করিয়াছেন—

"ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে গণে এই কিবা ঈশ্বর বিদিত॥" অন্ত্যখণ্ড ৩য় অঃ

বিমানবাবুর শেষ কথা এই যে, "সার্ব্বভৌম উদ্ধারের সময় নিত্যানন্দ প্রভু কাছে বসিয়া ছিলেন না।" কিন্তু তিনি তখন কোথায় ছিলেন, ইহাও ত বলা আবশ্যক। তিনি কি তখন দূর দেশেই চলিয়া গিয়াছিলেন ? কিন্তু আমরা জানি, তিনি তখন মহাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যান নাই। আর যাঁহারা তখন সার্ব্বভৌমের গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ যে পরে কবিকর্ণপূরের নিকটে সেই বেদান্ত-বিবাদাদির কথা যথাযথ বর্ণন করিয়াছিলেন, এ বিষয়েও ত কোন প্রমাণ নাই। তাহা হইলে কবিকর্ণপূর তাহা লিখিয়া যাইবেন না কেন ? নিজের কথার মূলভূত প্রমাণের স্পষ্ট উল্লেখ না করিবার হেতু কি ? "চরিতামৃত" গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামীও ত উক্ত স্থলে তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু বৃন্দাবনদাস আদিকাণ্ডে (৫ম পঃ) লিখিয়া গিয়াছেন,—"আপনে কহিয়া আছেন, ষড়্‌ভুজ দর্শনে।" অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভু যে কোন সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পরে তিনি নিজেই তাঁহার প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাসকে বলিয়াছিলেন। তাহা হইলে তিনি ৺পুরীধামে শ্রীকৃষ্ণভক্ত পরমবৈষ্ণব সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের মিলনকালের সেই সমস্ত বার্ত্তাও নিত্যানন্দদাসকে বলিতে পারেন—যাহা পরে নিত্যানন্দ-দাস পূর্ব্বোক্তরূপে লিখিয়া গিয়াছেন।

পরন্তু উক্ত বিষয়ে অনুমান দ্বারা কবিকর্ণপূর ও কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনাকেই সত্য বলিয়া নির্ণয় করিতে হইলে এইরূপ অনুমানকেও আশ্রয় করিতে হইবে যে, ৺পুরীধামে সার্ব্বভৌম গৃহে কয়েক দিন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে শঙ্করমতানুসারে সার্ব্বভৌমের বেদান্ত ব্যাখ্যা ও পরে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার তুমুল বিচার ও পরে তাঁহার পরাভব প্রভৃতি যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা নিত্যানন্দ প্রভু কাহারও নিকটে কিছুমাত্র শুনেন নাই, অথবা শুনিলেও তিনি পরে কখনও তাঁহার প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাসকেও তাহা বলেন নাই। কিন্তু ঐরূপ অনুমানেও বিশুদ্ধ হেতু আবশ্যক।

ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বিমানবাবুর অনুমান, অনুমান-প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হয় না। আর ঐভাবে অনুমান করিলে অনেকে অন্যরূপ অনুমানও করিতে পারেন। বিমানবাবু যেমন অনেক স্থলে বিচারপূর্ব্বক কবিরাজ গোস্বামীর কথাও গ্রহণ করেন নাই; তদ্রূপ অনেকে তাঁহার কথা গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে এইরূপও অনুমান করিতে পারেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রবিচারে শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে পারেন না। যেহেতু তিনি তৎকালে অপরাজয়ী মহানৈয়ায়িক ও মহাবৈদান্তিক ছিলেন। শঙ্করের মতানুসারে 'বিবর্ত্তবাদ' সমর্থনে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের নানা গ্রন্থের সমস্ত কথাই তিনি অবশ্য জানিতেন। অদ্বৈতবাদী শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে"ও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল সন্দেহ নাই। পরন্তু বেদান্ত-বিচারে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের কোন্ কথার প্রতিবাদ করিতে কি বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ উভয়পক্ষে যথানিয়মে কিরূপ বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল, ইহা কবিরাজ গোস্বামীও কিছুই বলে নাই। কিন্তু উভয়পক্ষের সমস্ত কথা না জানিলে সে বিচারে কাহারও জয়-পরাজয় নির্ণয় করা যায় না।

আর সাত্ত্বিকবুদ্ধিসম্পন্ন অনেকে এইরূপ অনুমান করিতে পারেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত কোন বিচারই করেন নাই। যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেবের সেই মনোমোহিনী প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিলে তখন তাঁহাকে বিচার দ্বারা পরাভূত করিবার ইচ্ছা কাহারই জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বেই তাঁহার দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পদধূলিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ দীন বৈষ্ণবসেবক পরে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিজগৃহে 'বিতণ্ডা'র দ্বারা আক্রমণ করিতে পারেন না। পরন্তু প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবেরও তৎকালে কাহাকেও পরাভূত করিবার ইচ্ছাই জন্মিত না। তাই তিনি ৺পুরীধামে গোবর্দ্ধন মঠে এবং ৺কাশীধামে শঙ্কর সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদিগের সহিত যথানিয়মে শাস্ত্রবিচার করেন নাই এবং শঙ্করাচার্য্য ও মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় নিজ মত সমর্থক গ্রন্থ রচনাও করেন নাই।

এইরূপ অনেকে স্বাধীনভাবে আরও অনেক প্রকার অনুমান করিতে পারেন এবং কবিকর্ণপূর ও কবিরাজ গোস্বামী কেন ঐরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহারও উদ্দেশ্য-বিশেষের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু উক্তরূপে কোন অনুমানের দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে প্রকৃত সত্য নির্ণয় হইতে পারে, ইহা আমি বুঝি না। আমি বুঝি যে বিমান-বাবু অনুমানদ্বারা সত্যনির্ণয়ের যে পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া কিছু দূরে গেলে সহসা কোন অনুমান করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া আসা যায়। কিন্তু ঐ পথ ধরিয়া বহু দূরে গেলে পরে অজ্ঞানের ঘনান্ধকারে দিশেহারা হইয়া সেখানেই বসিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু সেই সুদুর্গম বহু দূরে অনেকেই যাইতে চাহেন না। (ক্রমশঃ)

আনন্দ

শ্রীমানকুমারী বসু

তুমি যে আনন্দময়ী ওমা বিশ্ব জননি !
যতই পেয়েছি ব্যথা ও কথা যে ভুলিনি !
কতই আনন্দ মাগো, দিয়েছ এ ধরাতে,
হোক শত নিরানন্দ—অভাগার বরাতে !
যখন জলদ আসে সাথে নিয়ে বিজলী,
ঘুমানো আনন্দ ওঠে হিয়া মাঝে উছলি !
ঝম্ ঝম্ বারি পড়ে দিশাহারা অবনী,
আকুল আনন্দ-ধারা ছোটে যেন অমনি !
"বউ কথা কও" ডাকে নীলাকাশে ঘুরিয়া,
অজানা আনন্দ রহে সে ব্যথায় ভরিয়া !
উষার অরুণ-রথে উদিলে তরুণ রবি,
আনন্দের শিহরণে মরতে যে জাগে সবি।
শরত-আকাশে রহে তারা শশী ফুটিয়া
জ্যোছনা আনন্দ-বন্যা, বিশ্ব যায় ভাসিয়া !
বসন্তের ফুলবন মধু মাখা অনিলে,
আনন্দ উথলে—আরো কলকণ্ঠ গাহিলে।
সমুদ্র ভূধর ভীম, নিরজন কান্তারে,
আনন্দ জাগাতে নিতি প্রকৃতির বাগ্নারে ?
অনাথ বালক ডাকে 'মা' বলিয়া দুয়ারে
ব্যথীর আনন্দ সে যে—আয় আয় বাছারে !
রোগী, শোকী, ক্ষুধাতুর, পিপাসীর পিপাসা
জুড়াইতে কি আনন্দ, দরিদ্রের দুরাশা !
যে আমারে ছেড়ে গেছে—দেখা যদি দেবে না,
শান্তির আনন্দ সে তো ভব-জ্বালা পাবে না !
হারিয়েছি সোনামুখ পাই যদি ফিরিয়া
সে দিনে আনন্দভরে বুক যাবে ছিঁড়িয়া !

পরিকল্পনা—শ্রীযুক্ত মিহিরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষার চাঁদিনী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
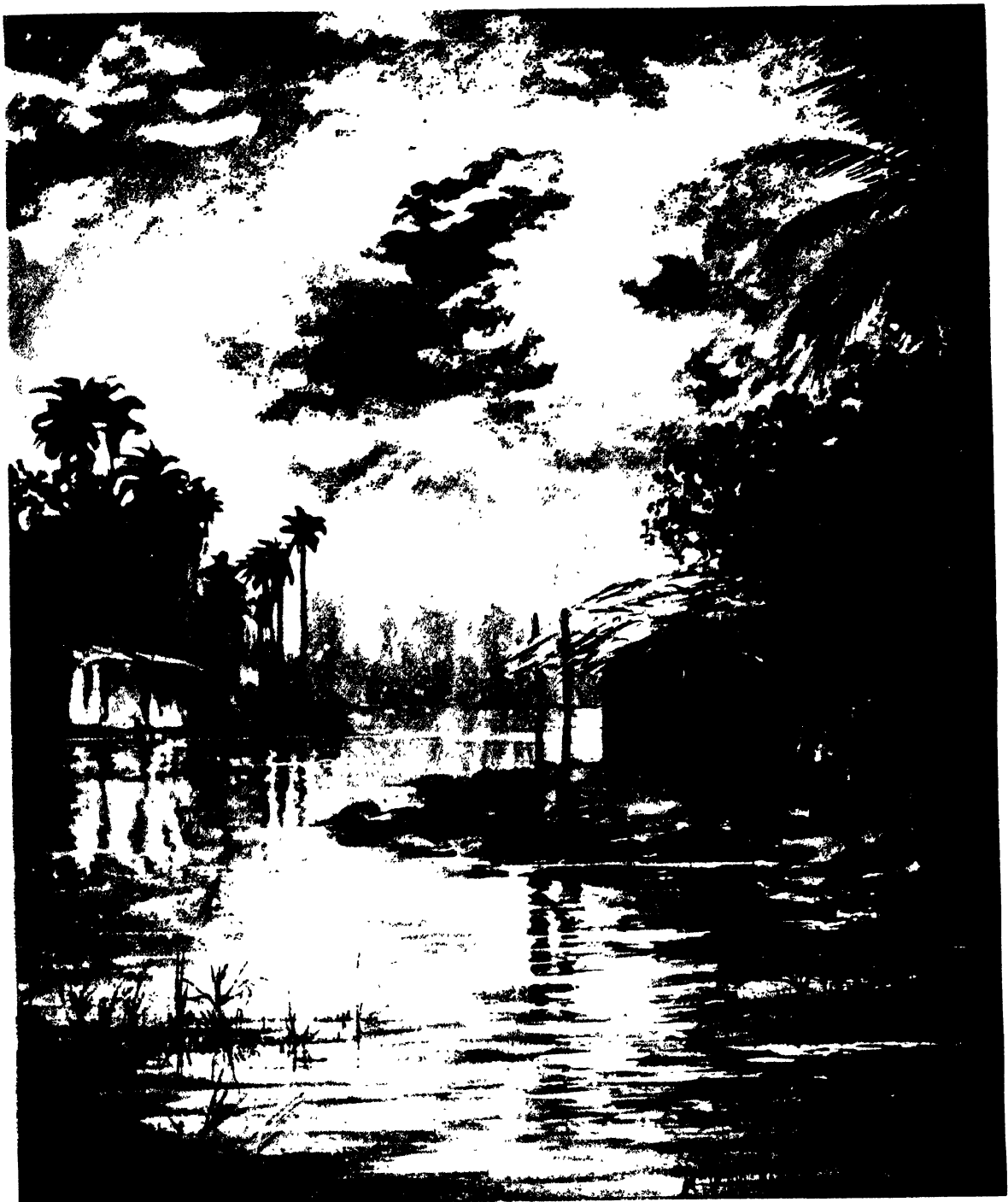
শিল্পী—মিষ্টার এন এ ডেভিড

'বনফুল'

৬

সেদিন সকালে শঙ্কর যখন বোস সাহেবের বাড়ি গেল তখন সবে সাতটা বাজিয়াছে।

বোস সাহেব লোকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—তিনি রেলে চাকুরি করেন, শঙ্করের বাল্যসখী শৈলর স্বামী এবং সাহেবিভাবাপন্ন। সাহেবিয়ানার নানা বাধা সত্ত্বেও তিনি সাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব সারবান মতামত আছে এবং সে মতামতগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে অসঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না। বোস সাহেব বাড়িতেও সাহেবি পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন, আহারাদিও সাহেবি কেতায় টেবিল চেয়ারে প্লেট-কাঁটা-চামচ-সহযোগে সম্পন্ন হয়, তাঁহার খাস বাবুর্চি তাহার জন্য বাহিরে পৃথকভাবে সাহেবি খানা প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাঁহার আহারাদি বাহিরের ঘরেই নিষ্পন্ন হয়। বোস সাহেবের অন্দর মহলের সহিত সম্পর্ক কম। তাহার নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি তিনি বাহিরের ঘরে বিভিন্ন আলমারিতে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়াছেন। স্নান করিবার সময় সাবান বা জামা পরিবার সময় বোতামের জন্য হাঁকাহাঁকি করিয়া তিনি বাড়িসুদ্ধ সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা পছন্দ করেন না। এ সকল বিষয়ে তিনি স্বাবলম্বী ও স্বাধীন।

শঙ্কর গিয়া শুনিল তিনি প্রাতরাশে বসিয়াছেন। বাহিরে দণ্ডায়মান চাপরাশির মারফত নিজের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেই বোস সাহেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বোস সাহেবের ধপধপে ফরসা রঙ। শক্ত কফ-কলারওয়ালা ঘোর নীল রঙের শার্টটি তাঁহাকে মানাইয়াছিল ভালো। কোলের উপর একটি সাদা ন্যাপকিন প্রসারিত, খাবার পড়িয়া পরিচ্ছদ যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায়। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন, এই যে, এত সকালে কি মনে করে? বসুন বসুন!

তাঁহার প্রত্যেক কথাটি প্রয়োজন মাফিক ওজন করা। এত কৃত্রিমতা পূর্ণ যে মনে হয়, যেন প্রত্যেক কথাটি কহিবার পূর্ব্বে সেগুলির মুখ মুছাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছেন। পুনরায় স্মিতমুখে বলিলেন, বসুন না ওই সামনের চেয়ারটাতে!

আসন গ্রহণ করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, একটু দরকার আছে আপনার সঙ্গে—

অর্থাৎ?

পাঁউরুটির একখানা টোস্ট্ বাঁ হাতে ধরিয়া কামড়াইতে কামড়াইতে বোস সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অর্থাৎ ভন্টুর মেজকাকার জন্যে এসেছি। পারেন ত তার চাকরিটা আবার করে দিন। বেচারিদের বড় কষ্ট! ভন্টুকে সংসারের জন্যে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে!

এই বলিয়া শঙ্কর ভন্টুদের দুর্দ্দশা, ভন্টুর দাদার অসুখ প্রভৃতির যথাযথ বর্ণনা করিয়া বোস সাহেবের করুণা উদ্রেক করিবার প্রয়াস পাইল।

ভন্টুর মেজকাকার কথা শুনিয়া বোস সাহেব চা-পাঁউরুটি-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, এক্স্কিউজ মি, হি ইজ এ হোপলেস্ চ্যাপ্!

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

তাহার পর বোস সাহেব বলিলেন, নিন এক কাপ চা খান—বলিয়া তিনি নিজেই উঠিয়া দেওয়াল আলমারি হইতে একটি পেয়ালা বাহির করিলেন এবং টি পট্ হইতে চা ঢালিয়া শঙ্করকে দিলেন।

আর কিছু খাবেন? টোস্ট কি বিস্কুট? ডিম খাবেন?

না।

শঙ্কর নীরবে চা-পান করিতে লাগিল।

একটি হাফ্‌বয়েল্ড ডিম নিপুণভাবে ভাঙিতে ভাঙিতে বোস সাহেব বলিলেন, দেখুন শঙ্করবাবু, পারসোনালি স্পিকিং, ভন্টুর মেজকাকার মত লোকের উপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই! আই উড্ লাইক্ টু কিক্ আউট্ সাচ্ ফেলোজ্ ফ্রম মাই অফিস। আই অ্যাম্ স্পিকিং ফ্র্যাঙ্কলি, এক্স্কিউজ্ মি!

বলিয়া তিনি সাহেবি কায়দায় স্কন্ধযুগলকে ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইলেন।

শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিল।

বোস সাহেব আবার বলিলেন, আপনাকে আমি যতদূর জানি তাতে ওরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের ওপর সিম্প্যাথি হওয়ার কথা.ত নয় আপনার!

শঙ্কর চায়ে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিল এবং বলিল সত্যিকার সিম্প্যাথি হতভাগাদেরই ওপর হওয়া উচিত!

বাধা দিয়া বোস সাহেব বলিলেন, এ ত হতভাগা ঠিক নয়, এ একটা 'রোগ্'—

বিশেষ তফাৎ ত চোখে পড়ছে না!

বলিয়া শঙ্কর একটু মিনতির কণ্ঠেই বলিল, আমার নিজের বড্ড কষ্ট হয় ভনটুটার জন্যে! ওদের বাড়ির সব অবস্থা জানি কি না আমি, ওর দাদা হাফ্ পে-তে ছুটি নিয়ে চেঞ্জে গেছেন—সংসার চলা দায়। আপনি যদি ভনটুর মেজকাকার চাকরিটা করে দেন তাহলে ভনটুর লেখাপড়াটা হয়!

এই বলিয়া সে নীরব হইল। যদিও পরের জন্য তথাপি ইহা লইয়া আর বেশী অনুরোধ করিতে শঙ্করের কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল। তাহার কেমন যেন সহসা মনে হইল, নিজের উচ্চপদের সুযোগ লইয়া বোস সাহেব যেন তাহাকে একটু কৃপামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। মনে হইবামাত্র শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। বোস সাহেব বলিলেন, এখন দেবার মত কোন চাকরিও আমার হাতে নেই!

শঙ্কর নীরবেই রহিল। তাহার পর সহসা বলিল, আমার যা বলবার তা ত বললাম এখন আপনার যদি কিছু করবার থাকে করুন।

বোস সাহেব আর এক পেয়ালা চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, কিছুদিন পরে একটা কম্পিটিটিভ্ পরীক্ষা করে কতকগুলি লোক নেওয়ার কথা আছে। ভনটুর মেজকাকাকে বলুন না তাতেই য়্যাপ্লাই করতে! আই মে সিলেক্ট হিম্, লেট্ হিম্ টেক্ এ চান্স!

আচ্ছা, বোলব তাই। ধন্যবাদ! চলি তাহলে? নমস্কার!

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। দ্বারের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় বাচ্চা গোছের একটা চাকর ভিতর দিক হইতে আসিয়া বলিল, মাঈজি একবার ডাকছেন আপনাকে ভেতরে!

এখন আমার সময় নেই, পরে আসব।

অকারণে রাগ করিয়া শঙ্কর হন্হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রতীক্ষমানা শৈল চাকরের মুখে এই বার্ত্তা শুনিয়া সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ও—আচ্ছা।

৭

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভনটু আসিয়া হাজির হইল।

তাহার সহিত দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ পাতলা ছিপছিপে আর একটি ভদ্রলোকও ছিলেন। শঙ্কর ইঁহাকে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই। দেখিবামাত্র কিন্তু আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রশস্ত উন্নত ললাট, ধপধপে ফরসা রঙ্। মাথার চুলগুলা পর্য্যন্ত ঈষৎ কটা। দেখিলেই মনে হয় যেন একটা শিখা। ভনটু পরিচয় করাইয়া দিল।

ইনি হচ্ছেন ক্যান্ড্ল্ অর্থাৎ মোমবাতি—আর ইনি হচ্ছেন চাম লদ্, চাম গ্যান্ড্ও বলতে পার!

শঙ্কর প্রতিনমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল, মোমবাতি?

আগন্তুক ভদ্রলোক মৃদু হাস্য সহকারে বলিল, ভনটুর কথা ছেড়ে দিন, মোমবাতি আমার নাম নয়, আমার নাম মৃন্ময়—মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়।

ভনটু অকারণে মুখ বিকৃতি করিয়া তাহার দিকে তাকাইল।

শঙ্কর বলিল, অমন করে তাকাচ্ছিস্ কেন? গাধা কোথাকার!

ভনটুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পর মৃন্ময়কে বলিল, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা, আমার এখানে দেরি হবে এখন একটু। বোস্ না একটু লদ্কালদ্কি করা যাক—

মৃন্ময় হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, না আমায় যেতে হবে, এমনিই দেরি হয়ে গেছে দেখছি—

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আমি যাই তাহলে। পরে আলাপ হবে। আপনার নামটা নিশ্চয়ই চামলদ্ নয়—

ভনটু পুনরায় মুখবিকৃতি করিল।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, না আমার নাম শঙ্কর-সেবক রায়।

আচ্ছা, নমস্কার!

মোমবাতি চলিয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, অদ্ভুত চেহারা ভদ্রলোকের! যেন জ্বলছে।

ওই জন্যেই ত ওর নাম আমরা দিয়েছি মোমবাতি! সাংঘাতিক চাম গ্যান্ট্অ—

এমন সময় হস্টেলের চাকরটা কিছু জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর বলিল, তুই আপিস থেকে আসচিস্ ত? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব! নে, খা—

ভন্টু তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া শঙ্করের পায়ের ধূলা লইয়া ফেলিল। শঙ্কর পা-টা সরাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—চা খাবি, না, কোকো?

ভন্টু সোৎসাহে বলিল—দুইই খাব।

চাকরটা খাবার রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শঙ্কর তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, দু কাপ চা আর এক কাপ কোকো দিয়ে যা চট্ ক'রে।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

ভন্টু আহারে প্রবৃত্ত হইল—

সিঙাড়ায় একটা কামড় দিয়া ভন্টু বলিল, বাবাজীর সম্বন্ধে কি সেট্‌ল্ করলি, বল সব! বোস সাহেবের ওখানে গিয়েছিলি? হ'ল কিছু?

পরে বলব এখন, অনেক কথা আছে!

মানে?

শঙ্কর কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল এমন সময় 'শঙ্কর-দা, আপনিই বলুন ত, ট্র্যাজেডি বড় না কমেডি বড়' বলিয়া একটি ছোকরা চটি ফট্‌ফট্ করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন। উভয়েরই হস্তে চায়ের পেয়ালা।

হস্টেলে শঙ্করের একটি দল আছে। যুবকদ্বয় সেই দলভুক্ত। ইহাদের মধ্যে একজন ভন্টুকে দেখিয়া বলিল এই যে ভন্টু-দা, আপনাকে আজকাল কলেজে ত দেখি না।

সিঙাড়া চিবাইতে চিবাইতে ভন্টু উত্তরে শুধু একটু হাসিল।

শঙ্কর বলিল, হঠাৎ এখন ট্র্যাজেডি-কমেডির কথা কেন?

একজন যুবক বলিল, কুমুদবাবু নীচের ঘরে খুব লেকচার ঝাড়ছেন যে কমেডিই হল শ্রেষ্ঠ জিনিষ!

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, তাই নাকি?

যুবকটি বলিল, ওঃ, নীচে মহা আস্ফালন লাগিয়েছেন কুমুদবাবু। তিনি বলছেন ট্র্যাজেডি হচ্ছে নগ্ন সত্য। সাহিত্যে নগ্ন সত্যের স্থান নীচে। সাহিত্যে আমরা চাই আনন্দ—কমেডিই নির্ম্মল আনন্দ দিতে পারে। ট্র্যাজেডি তা পারে না।

শঙ্কর ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, কে বললে পারে না! তবে ট্র্যাজেডির মধ্যে আনন্দ পেতে হলে মনটাও সেই রকম হওয়া দরকার। উঁচু দরের রসিক না হলে ট্র্যাজেডির রসাস্বাদন করতে পারে না।

আসুন না আপনি একবার নীচে—

ভন্টু, তুই একটু বোস্—আমি আসছি এক্ষুনি।

শঙ্কর চলিয়া গেল। ভন্টু সাহিত্যরসের ধার ধারে না। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল। ভৃত্য যথাসময়ে চা ও কোকো আনিল। শঙ্কর কুমুদবাবুর ঘরে গিয়াছে শুনিয়া তাহার চা-টা সেখানেই সে লইয়া গেল।

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। আসিয়া দেখিল ভন্টু অকাতরে ঘুমাইতেছে। জুতাসুদ্ধ পা চেয়ারের হাতলের উপর তুলিয়া দিয়া, গুটানো বিছানা-স্তূপের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া ভন্টু নিদ্রিত। দক্ষিণ বাহু দিয়া মুদিত চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেও ভন্টু ঘুমাইতেছে!

শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বেচারা! আপিসের সারাদিন-ব্যাপী হাড়ভাঙা খাটুনিতে বেচারি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত ক্লান্ত না হইলে এমনভাবে কেহ ঘুমাইতে পারে না।

এই ভন্টু ওঠ্—ওঠ্! ঘুমুচ্ছিস কেন এই অসময়ে!

ভন্টু জুতাসুদ্ধ পা টা মৃদু মৃদু নাচাইতে লাগিল। তাহার পর চোখ হইতে হাতটা সরাইয়া বলিল—খেপেচিস্? ঘুমোব কেন? থিঙ্ক্ করছিলাম!

চল বেরোনো যাক্—

চল। বাবাজীর সম্বন্ধে কি সেট্‌ল্‌ করলি?

চল রাস্তায় সব বলছি।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

৮

কীর্ত্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল।

ভন্‌টুর মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজী খোল বাজাইতেছিলেন। মুদিতনেত্র, তন্ময়, বিহ্বলভাব। পরিধানে গৈরিক আল্‌খাল্লা, মাথায় অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশভার, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন। কীর্ত্তন জমিয়াছিল বাবাজীরই এক বন্ধুর বাড়ীতে। তিনি বড়লোক এবং ভন্‌টুর মেজকাকাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। পুরাকালে অর্থাৎ যখন তাঁহার রক্তের তেজ ছিল তখন এই বাড়ির এই হলেই বহুবার বাঈনাচ হইয়া গিয়াছে। এখন কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মে মতি হইয়াছে এবং ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া যতপ্রকারে সঙ্গীত-উৎসব করা সঙ্গত তাহাই তিনি ইদানিং করিতেছেন। অর্থাৎ আসলে ভদ্রলোক সঙ্গীত-অনুরাগী। গীতবাদ্যে পারদর্শিতার জন্যই সম্ভবত তিনি ভন্‌টুর মেজকাকাকে স্নেহ করেন। যাই হোক—কীর্ত্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। কীর্ত্তনিয়া পুরুষ হইলেও সুদর্শন ও সুকণ্ঠ। গৌর ললাটে চন্দনের তিলক, গলায় বেলফুলের শুভ্র মালা, পরিধানে পট্টবস্ত্র—ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। সুরসমারোহে সকলেই সম্মোহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে কীর্ত্তনিয়ার মুখের পানে চাহিয়াছিলেন। হলের মধ্যে ভীষণ ভিড়। ভন্‌টু ও শঙ্কর হলের বাহিরে বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কীর্ত্তনের সুরে শঙ্করও কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার একধারে স্বল্প অন্ধকারে একটি বেঞ্চি পাতা আছে দেখিয়া শঙ্কর ধীরে ধীরে গিয়া তাহারই উপর উপবেশন করিল। তাহা দেখিয়া ভন্‌টু মৃদুহাস্য করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—তুইও বসে পড়লি যে রে!

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

ভন্‌টু কোন জবাব না পাইয়া হাস্যদীপ্তচক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া পুনরায় বলিল, কি রে, তুইও লদ্‌কে গেলি না কি?

চুপ কর্—কথা বলিস্‌ না!

ভন্‌টু কপাল কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি তাহলে ততক্ষণ পেছনের চাকাটায় একটু পাম্প করে নি! এইখানে কার একটা বাইকে পাম্প রয়েছে দেখছি, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, কি বলিস্‌!

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

ভন্‌টু গিয়া অসঙ্কোচে নিকটে দেওয়ালে ঠেসানো অপর একটি বাইকের পাম্পটি খুলিয়া লইল ও একটি থামের গায়ে নিজের বাইকটিকে দাঁড় করাইয়া উবু হইয়া বসিয়া পাম্প করিতে লাগিয়া গেল।

সেই স্বল্পান্ধকারে বেঞ্চির উপর বসিয়া বসিয়াই শঙ্কর কিন্তু স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি! তাহার মনে হইতে লাগিল যেন অশ্রুর বিরাট সাগর সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। তরঙ্গসমাকুল ফেনিল সমুদ্র। তাহাতে যেন কোটি কোটি রক্তকমল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কি সুন্দর কমলগুলি। এক একটি দল যেন আগুনের শিখা; ফেনিল নীল জলে গাঢ় রক্তবর্ণ অগ্নিকমলদল ফুটিয়া রহিয়াছে। মদির গন্ধে ও নিরুদ্ধ উত্তাপে বিশাল সমুদ্র উদ্বেলিত।

দেখিতে দেখিতে সমুদ্র মিলাইয়া গেল।··· দিগন্তপ্রসারী জনহীন প্রান্তর। মৃদু জ্যোৎস্নায় গভীর রাত্রি স্বপ্নাতুর। প্রান্তরে কে যেন একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কি খুঁজিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী গভীর নিশীথিনীর অন্তরলোকে অসম্ভবের সম্ভাবনা আশায় কল্পনামুগ্ধ মূঢ় একা একা কে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কে সে! চেনা যায় না। প্রান্তরও অদৃশ্য হইল।···চতুর্দ্দিক অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কীর্ণ একটা গলি দেখা যাইতেছে। সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি। দুই পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রহরীপরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গলিটি আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে কে জানে। সহসা অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল। গলিটা কাঁদিতেছে। তাহার অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে অন্ধকার গুমরিয়া উঠিতেছে, নক্ষত্রকুল স্পন্দিত হইতেছে। কীর্ত্তনিয়া আবেগভরে গাহিয়া চলিয়াছে—"পাষাণ হইলে ফাটিয়া যেত!"

ভন্‌টুর কণ্ঠস্বরে শঙ্করের স্বপ্নভঙ্গ হইল।

পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে, হু হু শব্দে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে! টায়ারটাই জখম হয়েছে, বুঝলি?

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, তাই নাকি, তাহলে উপায়!

প্রোটোটাইপের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই! অরিজিনাল সম্ভবত এখন বাড়ি গেছে। এই ফাঁকে প্রোটো-টাইপকে তিলিয়ে যদি কিছু হয়! চল, তাই করা যাক, কেত্তনের এখন ঢের দেরি, বাবাজির নাগাল পাওয়া শক্ত!

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রোটোটাইপ কে?

আয় না তুই--

শঙ্করের মন তখনও স্বপ্নের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে নাই। তথাপি কিম্বা হয়ত সেইজন্যই বিনা বাক্যব্যয়ে সে ভন্টুর অনুসরণ করিল। তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই লইয়া অধিক বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেও তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। তাই সে নীরবে অনেকটা যন্ত্রচালিতবৎ ভন্টুর পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল এবং এই চলমান অবস্থাতেও তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার শরীর যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে, সে যেন বাতাসে ভর করিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর সহসা ভন্টুর কনুইএর আঘাতে তাহাকে আবার কঠিন মাটিতে নামিয়া পড়িতে হইল।

তাহারা একটা গলিতে ঢুকিয়াছিল।

ভন্টু বলিল, দেখ্ দেখ্, ওরিজিনাল বসে আছে, মাটি করলে, দাঁড়া এইখানে একটু—

শঙ্কর ভন্টুর তর্জ্জনীনির্দ্দিষ্ট স্থানটায় দেখিল একটা সাইকেলের দোকান রহিয়াছে এবং দোকানের সম্মুখভাগে এককোণে চেয়ারে একব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভদ্রলোকের পরিধানে একটি টাইট ফিটিং গলাবন্ধ চকোলেট্ রঙের সোয়েটার এবং খাকি হাফ্ প্যাণ্ট। পায়ে আজানু কপিশবর্ণের গরম মোজা এবং মস্তকে কানঢাকা কালো টুপি। ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হইতে ধূম্রপান করিতেছিলেন। ভন্টু চুপি চুপি বলিল, ইনিই হচ্ছেন ওরিজিনাল মিষ্টার ফাইভ্!

মিষ্টার ফাইভ? সায়েব না কি?

সোনার বেনে! থাম একটু বসা যাক এখানে কোথাও, ওরিজিনাল বাড়ি না গেলে সুবিধে হবে না। প্রোটোটাইপ্ এলেই ওরিজিনাল খসবে—আসবার সময় হয়ে গেছে অলরেডি!

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

ভন্টু পুনরায় বলিল, প্রোটোটাইপ আসে নি বলে ওরিজিনাল রেগে টং হয়ে বসে তামাক খাচ্ছে। কি রকম নাক দিয়ে ভর ভর করে ধোঁয়া ছাড়ছে—দেখ্—দেখ্—

শঙ্কর দেখিল।

ভন্টু আবার বলিল, দেরি আছে দেখছি, প্রোটোটাইপ্ ডুব মেরেছে আজ। একটু বসতে হবে এখানে কোথাও—

নিকটেই একটি চায়ের দোকান ছিল। ভন্টু বাইকটা ঠেলিয়া লইয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল। শঙ্করও পিছনে পিছনে গেল। চায়ের দোকানে খরিদ্দার কেহ ছিল না। যিনি দোকানের মালিক তিনি এককোণে চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া অপর একজন ওয়েস্টকোট-পরিহিত ব্যক্তির সহিত তন্ময় হইয়া পাশা খেলিতেছিলেন। দুইজনের মধ্যে একটি অয়েলক্লথ-পাতা টেবিল প্রসারিত। ভন্টু রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিল, তাহার পর বলিল, আসতে পারি দাদা?

কোন উত্তর আসিল না।

ভন্টু তখন বাইকের ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

'কচে বারো—' বলিয়া ভদ্রলোক ভন্টুর দিকে তাকাইলেন। তাকাইবামাত্র ভন্টু সহাস্য মুখে আবার বলিল, আসতে পারি দাদা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন আসুন—কি চান আপনারা?

এই যে আসি, এসে বলছি—

ভন্টু বাইকটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিল এবং শঙ্করকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া বলিল, চল্, একটু বসা যাক্?

ভন্টু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভদ্রলোকের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। ভদ্রলোক ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

করেন কি, করেন কি মশায় আপনি!

ভন্টু হাত দুইটি জোড় করিয়া সহাস্য মুখে বলিল, অগ্রজ আপনি—বসুন, বসুন, কি চান আপনারা?

একটু বসতে চাই শুধু দাদা, চা কিন্তু খাব না, পয়সা নেই! একজনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে খানিকক্ষণ, যদি বসতে দেন একটু দয়া করে'—

ছতিন্ নয়!

ওয়েস্টকোট-পরা ভদ্রলোকটি দান ফেলিলেন এবং চকিতে এই আগন্তুকদ্বয়কে একনজর দেখিয়া লইয়া আবার পাশার ছকে মন দিলেন।

বেশ ত, বসুন না ওধারের বেঞ্চিটায়!

শঙ্কর বলিল, চা-ই দিন আমাদের, আমার কাছে পয়সা আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ খান না চা, পয়সার জন্যে কিছু আসছে যাচ্ছে না। এই চায়ের জন্যেই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি মশয়, পয়সার দিকে দেখলে আজ এমন আবস্তা হত না আমার, কি বল মাস্টের!

ওয়েস্টকোট-পরিহিত ভদ্রলোক এতদুত্তরে কেবল বলিলেন—হাঃ!

ওরে কেলো, চা দিয়ে যা, তুমি খাবে না কি আর এক কাপ মাস্টের—

মাস্টার দক্ষিণ তর্জ্জনীটি দক্ষিণ কর্ণে ঢুকাইয়া মুখ বিকৃতি করিয়া সজোরে বেশ খানিকক্ষণ কর্ণ-কণ্ডুয়ন করিয়া লইলেন। তাহার পর ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, দাও, আর একবার ইস্‌টিম্ করে নেওয়াই যাক্—

ভন্টু ও শঙ্কর একটু দূরে একটি বেঞ্চিতে উপবেশন করিয়াছিল। ভন্টু এমন স্থানটিতে বসিয়াছিল যেখান হইতে ওরিজিনালকে বেশ দেখা যায়।

দোকানের মালিক আবার হাঁকিলেন, ওরে কেলো, তিন কাপ্ চা দিয়ে যা—আচ্ছা চার কাপই আন্, আমিও খাই আর এক কাপ্, কি বল মাস্টের?

মাস্টার নীরবে সম্মুখের দন্তগুলি বিকশিত করিলেন।

এই চায়ের জন্যেই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি মশয়, বুঝলেন, চা-কে আমি খেয়েছি, চা-ও আমাকে খেয়েছে!

ভন্টু এই কথা শুনিয়া সস্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া তাহার পর বলিল, এ আর নতুন কথা কি শোনালেন দাদা। ভাললোকের দুর্দ্দশা চিরকালই! মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘটে আসছে। হাতটা একবার দেখাবেন দাদা দয়া করে?

হাত দেখতে জানেন নাকি আপনি?

যৎসামান্য।

তবে আপনি ত গুণী লোক মশয়!

পাশা ফেলিয়া দোকানের মালিক করতল প্রসারিত করিয়া ভন্টুর নিকট আসিয়া বসিলেন। ওয়েস্টকোট-পরিহিত মাস্টার জমাটি খেলাটা এইভাবে পণ্ড হইয়া যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং বলিলেন, তুমি আবার নতুন হুজুগে মাতলে দেখছি! আশ্চর্য্য লোক বটে তুমি!

কেহ ইহার কোন উত্তর দিল না। ভন্টু ভদ্রলোকের দক্ষিণ করতলটি লইয়া তাহাতে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়াছিল। কেলো নামক ভৃত্যটি ভিতরের একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া চা দিয়া গেল।

সকলেই নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন। ভন্টু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোক বাঁ হাতে চায়ের পেয়ালা ধরিয়া মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে করকোষ্ঠি ব্যাপারে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। ওয়েস্টকোট-পরিহিত মাস্টার ডিশে ঢালিয়া ঢালিয়া অল্প সময়েই চা-টুকু নিঃশেষ করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি মরিচা ধরা কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটি অতি নিপুণতার সহিত ধরাইয়া বেশ জুৎ করিয়া বসিলেন এবং মুখের এমন একটা ভাব করিয়া ভন্টু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোকের দিকে তাকাইতে লাগিলেন যে, যেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি দুই জন শিশুর ছেলেমানুষি কাণ্ডকারখানা নিরুপায় হইয়া সহ্য করিতেছে এবং উপভোগও করিতেছে।

কীর্ত্তন শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনটা কেমন যেন হইয়া গিয়াছিল। সে এসব কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে চা খাইতে খাইতে বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভন্টু অবশেষে দোকানের মালিক ভদ্রলোকের করতলটি ছাড়িয়া দিল এবং বামহস্তধৃত পেয়ালা হইতে বাকি চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

কি দেখলেন মশয়?

ভন্টু কোন উত্তর না দিয়া পকেট হইতে একটি অত্যন্ত মলিন রুমাল বাহির করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে মুখটি মুছিল এবং তাহার পর বলিল, যা দেখলাম তাতে আপনার পায়ের ধূলো আর একবার নিতে হবে—এর বেশী আর কিছু বলব না এখন।

বলিয়া সে সত্য সত্যই আর একবার চট্ করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলেন।

আহা, কি যে করেন আপনি খালি খালি! কি দেখলেন তাই বলুন!

কিছু বলব না দাদা, খালি পায়ের ধূলো নেব। শঙ্কর, পায়ের ধুলো নে এঁর—সঙীন ব্যাপার!

শঙ্কর মৃদু হাসিল। দোকানের মালিক ভদ্রলোক ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা লোক ত আপনি মশয়।

ভন্টু স্মিত মুখে বলিল, কিছু বলতে হবে না, হদিস্ পেয়ে গেছি দাদা আপনার! এখন মাঝে মাঝে এসে জ্বালাতন করব আপনাকে! আজ সময় কম।

ভন্টু দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মৃদুস্বরে শঙ্করকে বলিল, প্রোটোটাইপ এসে গেছে, ওঠ্।

শঙ্কর চায়ের দাম বাহির করিয়া দিতে গেলে দোকানী ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, মাপ করবেন, আপনাদের চা ত আমি বিক্রি করিনি। মনে রাখবেন অধীনকে, তাহলেই যথেষ্ট!

ভন্টু হাসিয়া বলিল, হাত দেখেই সে বুঝেছি!

ভন্টু ও শঙ্কর দোকান হইতে নামিয়া পড়িল। ভন্টু স্মিতমুখে ওয়েস্ট-কোট-পরিহিত ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বলিল, আপনাকে আর একদিন এসে চাঙ্গাব দাদা, আজ সময় বড় কম!

নিশ্চয়, নিশ্চয়—তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন।

শঙ্কর ও ভন্টু বাইকের দোকানের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

কিছুদুর অগ্রসর হইয়া ভন্টু বলিল—থাম্!

বাইকের দোকানের সন্নিহিত একটি স্বল্পান্ধকার স্থানে উভয়ে থামিল। শঙ্কর দেখিল একটি যুবক দোকানে আসিয়াছে এবং ভন্টু যাহাকে ওরিজিনাল নামে অভিহিত করিয়াছিল তিনি যুবকটিকে উচ্চকণ্ঠে ভৎর্সনা করিতেছেন।

সমস্ত বিকেলটা পার করে দিয়ে এলে অথচ একটি পয়সা আদায় হয়নি কি রকম? তাগাদায় বেরিয়েছিলে, না আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছিলে! পাশের বাড়ির এক গাইয়ে মেয়ে জুটেছে সে ত তোমার মাথাটি খেলে দেখছি! মৃগেনবাবুর ওখানে কি বললে? আজ ত তার দেবার কথা!

যুবক অপ্রতিভ হইয়া আড়চোখে চাহিতে চাহিতে উত্তর দিল, বাড়ি ছিলেন না!

বাড়িতে জনপ্রাণী কেউ ছিল না!

কেউ সাড়া ত দিলে না, অনেকক্ষণ কড়া নাড়ানাড়ি করলাম।

ভূতের কাছে মামদোবাজি! দাও বিলটা আমাকে দাও, ফেরবার মুখে দেখি যদি ধরতে পারি! স্পষ্ট কথাটি হচ্ছে, কোন কাজেরই তুমি নও বাবা, বি-এ পাশ করলে কি হবে! ফিন্‌ফিনে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়েছ কেন এই শীতে? সোয়েটার কোথা, ঠাণ্ডা লাগিয়ে আবার একটা অসুখ বাধাও, কিছু টাকা লম্বা হয়ে যাক আমার! সোয়েটার কোথা?

এখানেই আছে।

গায়ে দাও দয়া করে সোয়েটারটি, আর এই নাও এই টুপিটাও পর, বেশ করে কান-টান ঢেকেঢুকে ব'স। দশটার আগে দোকান বন্ধ ক'র না যেন।

এই বলিয়া ওরিজিনাল মঙ্কি ক্যাপটি খুলিয়া ফেলিলেন।

ভন্টু শঙ্করের কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল, ঘোর জালে পড়েছে প্রোটোটাইপ্। দেখ্ দেখ্ মিস্টার ফাইভকে দেখ্ এইবার!

শঙ্কর দেখিল টুপি খুলিয়া ফেলাতে ওরিজিনালের অনাবৃত মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। মুখখানির বিশেষত্ব আছে, দেখিতে ঠিক বাঙলা পাঁচের মত। কিছু গোঁফদাড়িও আছে। শঙ্কর ইহাও লক্ষ্য করিল যে, যুবকটির মুখও ওরিজিনালের অনুরূপ, কেবল গোঁফদাড়ি নাই।

ভন্টু চুপি চুপি আবার বলিল—মিলিয়ে দেখ, ওরিজিনাল আর প্রোটোটাইপ্ পাশাপাশি রয়েছে—দেখ্ দেখ্ ভাল করে দেখ্ না রাসকেল্!

ভন্টু শঙ্করকে একটা খোঁচা মারিল।

অরিজিনাল বলিতেছে শোনা গেল—দাও আমার সাইকেলটা দাও, মৃগেনবাবুর বিলটাও দাও, দেখি যদি ব্যাটার নাগাল পাই!

প্রোটোটাইপ একটি সেকেলে ধরণের বাইক বাহির করিল এবং তদুপরি আরোহণ করিতে করিতে ওরিজিনাল পুনর্ব্বার প্রোটোটাইপকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেন।

তোমার একে কোফো ধাত, ঠাণ্ডা লাগিও না যেন,

সোয়েটার আর টুপিটা পরে ফেল। যাই দেখি, মৃগেনবাবুকে যদি ধরতে পারি।

ওরিজিনাল চলিয়া গেলে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, প্রোটোটাইপ ওরিজিনালের কে হয়?

ছেলে। আয় এইবার যাওয়া যাক্—কোস্ট ইজ ক্লিয়ার!

উভয়ে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া বাইকের দোকানের সম্মুখবর্ত্তী হইল। ভন্টুকে দেখিবামাত্র প্রোটোটাইপ নমস্কার করিলেন এবং হাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন, সেদিন আপনি কোথায় চলে গেলেন ভন্টুবাবু! আমি রাশিচক্রের ছকটা টুকে নিয়ে এসে প্রায় রাত দশটা পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম! কোথায় গেলেন বলুন ত, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে!

ভন্টু হাস্যস্নিগ্ধ মুখে কেবল তাহার দিকে একবার চাহিয়া বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিল।

প্রোটোটাইপ আবার বলিলেন, কোথা গেলেন সেদিন বলুন দেখি, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে।

সব বলছি। ওই টিনের চেয়ারটা নাবান ত আগে!

বলিয়া ভন্টু দোকানের অভ্যন্তরস্থ একটি টিনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

হ্যাঁ—এই যে—

প্রোটোটাইপ নানাভাবে-জখম নানাবিধ বাইকের জঙ্গলের ভিতর হইতে টিনের চেয়ারটি বাহির করিয়া ভন্টুর হাতে দিলেন। ভন্টু সেটি ফুটপাথে পাতিয়া দিয়া শঙ্করকে বলিল, ব'স্ তুই! শঙ্কর বসিল। দোকানের ভিতর এক কোণে একটা ময়লা চট্ পাতা ছিল, ভন্টু তাহাতেই গিয়া বেশ জমায়েত হইয়া বসিল এবং তাহার বুক খোলা জামার ভিতরের পকেট হইতে একটি ছোট নোট বুক বাহির করিয়া বলিল, কই দেখি রাশি চক্রটা?

প্রোটোটাইপ কোমর হইতে চাবি বাহির করিয়া একটি টিনের বাক্স খুলিল এবং এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া ভন্টুর হাতে দিলেন। উহাতেই রাশিচক্র টোকা ছিল। ভন্টু কাগজখানি লইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সেটির দিকে তাকাইয়া রহিল এবং তৎপরে তাহা নোট বুকে টুকিয়া লইয়া বলিল, জটিল ব্যাপার দেখছি। এ বক্‌সি মশায়ের কাছে না গেলে হবে না। আমি বক্‌সি মশায়ের কাছে যাব ভাবছিলাম আজই, কিন্তু বাইকের পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে। রাম দক্‌চান্ দক্‌চেছে।

বাইক ঠিক করে দিচ্ছি আপনার ভয় কি! কি হল বাইকের?

ভন্টু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমাকে ঠ্যাঙালেও আধ পয়সা বেরুবে না।

প্রোটোটাইপ আহত আত্মমর্য্যাদার স্বরে বলিলেন—আপনার সঙ্গে কি আমার খদ্দের-দোকানী সম্পর্ক! কেবল দেখবেন, বাবা না জানতে পারেন—বাস্। জানেন ত সবই!

ভন্টু কিছু না বলিয়া সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া প্রোটোটাইপের দিকে চাহিয়া রহিল।

দাঁড়ান সোয়েটারটা পরে নি আগে। তারপর আপনার বাইক ঠিক ক'রে দিচ্ছি এক্ষুনি। ওরে মটরা, বাইকটা তোল্ ত।

আড়ময়লা ফতুয়া ও লুঙ্গী-পরা একটি ছোকরা বিড়ি টানিতে টানিতে পিছনের একটা ঘর হইতে বাহির হইল এবং ভন্টুর প্রতি একটা অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এসব মেরামতি কাজ সকালের দিকে আনলেই সুবিধে হয় বাবু বুঝলেন, মিসিনারির কাজ—

ভন্টু কিছু না বলিয়া কেবল স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

প্রোটোটাইপ ধমক দিয়া উঠিলেন।

তুই বাজে কথা ছেড়ে যা বলছি কর্ দিকিন্—তোল্ বাইকটা।

বিড়িটাকে শেষ টান দিয়া মটরা সেটা দূরে ফেলিয়া দিল এবং অস্ফুট স্বরে গজর গজর করিতে করিতে বাইকটা তুলিয়া ফেলিল। প্রোটোটাইপ বাইকটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, আমরা চল্ না ততক্ষণ মেজকাকার ব্যাপারটা সেরে আসি। কীর্ত্তন শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণ।

ভন্টু প্রোটোটাইপের দিকে মিটি মিটি চাহিয়া বলিল, লক্ষণবাবু রাজি হলেই যেতে পারি, উনিই এখন মালিক!

লক্ষণবাবু অর্থাৎ প্রোটোটাইপ এই কথায় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন ও বলিলেন, কি যে বলেন আপনি ভন্টুবাবু! কোথা যাবেন এখন আবার, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে—

ইহাতে ভন্টু এমন একটা মুখভাব করিয়া শঙ্করের দিকে

চাহিল যেন মেজকাকার সহিত দেখা করাটা শঙ্করেরই প্রয়োজন এবং ভন্টুকে বাধ্য হইয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে।

শঙ্কর লক্ষ্মণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল—আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি, বাইকটা ততক্ষণ সারা হোক! আয় ভন্টু।

ভন্টু করজোড়ে লক্ষ্মণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, অনুমতি দিচ্ছেন ত, এ ছোকরা কিছুতে ছাড়বে না!

সম্পূর্ণরূপে অপ্রতিভ হইয়া লক্ষ্মণবাবু বলিলেন, মানে, নিশ্চয়! তবে সেদিনকার মতন আবার করবেন না যেন, আসা চাই।

বাইক জামিন রইল।

একবার ত বাইক ফেলেই পালিয়েছিলেন। বাবার কাছে নানারকম মিথ্যে কথা ব'লে শেষটা নিস্তার পাই সেদিন!

না ঠিক আসব।

ভন্টু ও শঙ্কর মেজকাকার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইতে যাইতে ভন্টু অযাচিতভাবেই ওরিজিনাল ও প্রোটোটাইপের কাহিনী শঙ্করকে শুনাইতে লাগিল। ওরিজিনালের নাম দশরথ। দশরথের দুই পুত্র, রাম ও লক্ষ্মণ। রাম মারা গিয়াছে, নিউমোনিয়া হইয়াছিল। স্ত্রীও বহু আগে মারা গিয়াছেন। লক্ষ্মণই এখন ওরিজিনালের সবে-ধন নীলমণি। ওরিজিনাল টাকার কুম্ভীর। বাইকের দোকান আছে, মহাজনি কারবার আছে, কলিকাতায় দুইখানা বাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে বেশ কিছু নগদ টাকাও আছে। তথাপি ওরিজিনালের এক পয়সা বাপ-মা! এদিকে প্রোটোটাইপ অন্য প্রকৃতির। কৃপণ ত নয়ই—রসিক। পাশের বাড়ির একটি মেয়ের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস থাকায় গোপনে মেয়েটির কোষ্ঠি সংগ্রহ করিয়াছে। মেয়েটির কোষ্ঠির সহিত যদি প্রোটোটাইপের কোষ্ঠির মিল হয় তাহা হইলে প্রণয়ব্যাপারে নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইবে এবং ওরিজিনালের নিকট কাহারও মারফত প্রস্তাবটা করিবে। ওরিজিনালও কোষ্ঠি-পাগল লোক। সুতরাং কোষ্ঠির মিল সর্ব্বাগ্রে দরকার। কোষ্ঠির মিল না হইলেই সর্ব্বনাশ। তখন যে প্রোটোটাইপ কি করিবে তাহা ভন্টুর কল্পনাতীত।

গলিটা হইতে বাহির হইয়া তাহারা শুনিতে পাইল কীর্ত্তন চলিতেছে। একটু কাছাকাছি হইতেই শঙ্কর শুনিতে পাইল—রসভরে দুঁহুঁ তনু, থরথর কাঁপই—। আর একটু কাছে যাইতেই তাহারা দেখিতে পাইল ভন্টুর মেজকাকা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, অপর আর একজন খোল ধরিয়াছেন।

ভন্টু কাছে গিয়া বলিল, মেজকাকা, শঙ্কর এসেছে।

শঙ্কর? কই, এই যে এস এস এস।

মেজকাকা শঙ্করকে দুই হাত দিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভেতরে বসবে না কি তোমরা? বসিয়ে দেব?

শঙ্কর বলিল, না থাক। আমাকে আবার এখুনি হস্টেলে ফিরতে হবে। তার চেয়ে আপনার সঙ্গে চলুন একটু গল্প করা যাক, অনেক ঘুরে এলেন আপনি!

বেশ, বেশ, বেশ—চল, তাই চল! ওদিককার ঘরটায় যাওয়া যাক, চল তাহলে—

শঙ্কর ও ভন্টুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পিছনের দিকে একটা ঘরে গেলেন। ঘরের ভিতর একটি প্রকাণ্ড চৌকিতে ফরসা চাদর বিছানো ছিল। তিনজনে গিয়া তাহাতেই বসিলেন। ভন্টু কপাটটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

মেজকাকা সহাস্য সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই ভন্টুও হাসিমুখে বলিল, আসুন নিরিবিলিতে একটু লদকা-লদকি করা যাক! শঙ্কর এসেছে—

মেজকাকা শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, ভন্টুটা চিরকালই একরকম রইলো! ওর শিশুত্ব আর ঘুচল না, কি বল?

শঙ্কর বলিল, কিন্তু ও হঠাৎ পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এটা ত ঠিক নয়।

না, না, না, পড়তে হবে ওকে! আমরা অর্থাভাবে পড়তে পাইনি ভন্টুকে কিন্তু পড়তে হবে, সেটি হবে না!

এই বলিয়া মেজকাকা চক্ষু বুজিয়া কি যেন প্রণিধান করিতে লাগিলেন। 'অর্থাভাবে পড়তে পাই নি' কথাটা অবশ্য সত্য নয়—মেজকাকা খেয়ালবশত পড়াশোনা ছাড়িয়াছিলেন। সে যাই হোক খানিক চক্ষু বুজিয়া থাকিবার পর পুনরায় মেজকাকা চাহিলেন এবং বলিলেন, ঠাকুর বলেন অশিক্ষিত পুরুষ এবং বিধবা নারী সমান দুর্ভাগা। দুজনেরই জীবনের সম্ভাবনা ছিল অনেক, কিন্তু হল না কিছুই। এ যেন প্রদীপে তেল সলতে সবই রয়েছে কেবল শিখাটি কেউ

জ্বালিয়ে দিলে না। নাঃ, ওসব কাজের কথা নয়, ভন্টুকে পড়তে হবে। ভন্টু, কালই তুমি কলেজে ভরতি হয়ে যাও।

ভন্টু সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রুধির ?

'ওসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কেন? সে দায়িত্ব আমাদের ; কি বল শঙ্কর ?

শঙ্কর সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

তাহার পর বলিল, আপনি কি তাহলে আবার চাকরি নেবেন ?

দেখি, তাই বোধ হয় নিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত! কর্ম্মের বন্ধন ইচ্ছে করলেই ত আর ছিন্ন করা যায় না। বিস্‌টুর অসুখ হয়েই মুস্কিল হয়ে পড়েছে! অসুখ হবে না? ব্রহ্মচর্য্যই হল স্বাস্থ্যের ভিত্তি। বৌমাই অন্তঃসারশূন্য করে ফেল্লেন বিস্‌টুকে!" বলিয়া মেজকাকা সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং চক্ষু বুজিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত শ্মশ্রুরাজির মধ্যে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ও ভন্টু নীরব হইয়া রহিল। ভন্টু পিছনের দিকে বসিয়াছিল, সে একবার ওষ্ঠ-ভঙ্গী করিয়া মেজকাকাকে ভ্যাঙাইল।

কিছুক্ষণ পরে মেজকাকা চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন এবং বলিলেন, নাঃ, ভন্টুর জন্যেই আমাকে শেষকালে চাকরি নিতে হবে! ওর পড়া বন্ধ হতে দিতে পারি না আমি। আবার তিনি চক্ষু বুজিলেন ও দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর বলিল, আমি আজ বোস সায়েবের বাড়ি গিয়েছিলাম। কথায় কথায় আপনার চাকরির কথা উঠল, বোস সায়েব বললেন, কিছুদিন পরে কয়েকজনকে নেওয়া হবে। কিন্তু তার জন্যে একটা কম্‌পিটিটিভ্‌ পরীক্ষা দিতে হবে। সে কি সুবিধে হবে আপনার ?

ভন্টু সহাস্যে বলিল, শুনলেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা! ও আপনাকে পরীক্ষার ভয় দেখাতে চায়!

মেজকাকা কিছু না বলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, পরীক্ষার জন্য ভাবি না, পরীক্ষা অনেক দিয়েছি, আরও দিতে হবে—সমস্ত জীবনটাই পরীক্ষার ফলাফল ঠাকুরের হাতে! না, আমি পরীক্ষার জন্যে ভাবছি না, আমি ভাবছি ঠাকুরের কথা! চাকরি যদি নিতে হয় তাহলে ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে। তিনি এখন অনুমতি দেবেন কি-না সেইটে হ'ল সমস্যা। এমনিই ত তাঁর বিনা অনুমতিতে এখানে এসেছি—থাকবার কথা আমার কাশীতে!

শঙ্কর বলিল, চিঠি লিখুন না একটা তাঁকে, কোথায় আছেন তিনি আজকাল ?

ভন্টু বলিল, শুনছেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা! ঠাকুরকে চিঠি লিখে অনুমতি নিতে বলছে। ষাঁড়ের গোবর কি গাছে ফলে! ঠাকুর কি আপিসের বড়বাবু না কি, যে করেসপনডেন্স করলে জবাব পাওয়া যাবে! কি সুডোল গাড়োল রে তুই!

মেজকাকা একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া বলিলেন, আহা সে শঙ্কর জানবে কি করে!

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, না ভাই, চিঠিপত্র লিখলে কাজ হবে না। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, কোথায় পাবেন কাগজ দোয়াত কলম—তাঁর কাছে নিজেই যেতে হবে। কিন্তু তাঁকে ধরাই শক্ত। চল না সবাই মিলে যাই একদিন—আলাপও হয়ে যাবে। ভন্টুও ঠাকুরকে দেখে নি এখনও। ভন্টুকে দেখলে আর ভন্টুর কথা শুনলে ঠিক অনুমতি দেবেন উনি।

ভন্টু বলিল, আসচে শনিবার চলুন তাহলে—সোমবারটাও ছুটি আছে। কোথা আছেন তিনি ?

মেজকাকা উত্তর দিলেন, ভাগলপুরে।

ভন্টু বলিল, শঙ্কর যাবি? চল না ঘুরে আসি!

এমন সময় হঠাৎ কে বাহির হইতে কপাটে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল। কপাট খুলিয়া দিতেই একজন ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ করিয়া মেজকাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একবার আসুন ত, মৃন্ময়বাবু মূর্চ্ছা গেছেন হঠাৎ কীর্ত্তন শুনতে শুনতে!

ভন্টু বলিয়া উঠিল, কে, মোমবাতি? সে কি কেত্তন শুনছিল নাকি এখানে বসে ?

মেজকাকা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বলিলেন, হ্যাঁ সে ত সন্ধে থেকেই এসে বসেছে!

সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ভন্টু দেখিল মোমবাতিই মূর্চ্ছা গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দৃঢ়নিবদ্ধ অধর দুইটিও মাঝে মাঝে কাঁপিতেছে। চক্ষু দুইটি মুদিত।

মেজকাকা বলিলেন—ও কিছু নয়, ভাব লেগেছে, মুখে চোখে জল দিলেই এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

তাহাই করা হইতে লাগিল।

একটু পরে শঙ্কর বলিল, আমাকে এইবার ফিরতে হবে, আটটা বেজে গেছে।

প্রোটোটাইপের ওখানে যাবি না ?

না ভাই, আজ আর সময় নেই।

আমাকে কিন্তু যেতে হবে, তার আগে মোমবাতিটার একটা হিল্লে করতে হবে আবার! রাস্‌কেলটার কাণ্ড দেখেছিস্; আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে বসে কেত্তন শুনছিল! চল্ তোকে একটু এগিয়ে দি।

পথে বাহির হইয়া ভনটু আবার বলিল, বাবাজিকে আর ঠাকুরের কাছে যেতে দেওয়া নয়, দেখা হ'লেই আবার ডুব মারবে—খেপেচিস তুই! অনুমতি-টনুমতি বাজে ওজর!

শঙ্কর কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।

বলিল, আমি চলি ভাই এখন।

আচ্ছা যা।

যদিও হস্টেলে ফিরিবার সময় হইয়াছিল কিন্তু কিছু দূর গিয়াই শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল যে, এখন তাহার হস্টেলে ফেরা চলিবে না। তাহাকে একবার শৈলর সহিত দেখা করিতেই হইবে। সকালে অমন করিয়া চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই। সে দ্রুতবেগে বোস সায়েবের বাড়ির দিকে চলিল। অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর বোস সায়েবের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এই অসময়েও সে গিয়া শৈলকে প্রথমেই এককাপ চা করিতে ফরমাস করিবে। দোকানের চা-টা তেমন সুবিধার হয় নাই। তাহা ছাড়া শৈলকে খুশি করিবার সহজ উপায়ই হইতেছে ওই—তাহাকে নানা ফরমাসে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা। শৈল গন্‌গন্ করিবে, উপদেশ দিবে, নানা অসুবিধার উল্লেখ করিবে—কিন্তু চা-টুকু শেষ পর্য্যন্ত করিয়া দিয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিবে। ইহাই তাহার স্বভাব। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, শুধু চা নয়, শৈলকে দিয়া প্রস্তুত করাইয়া কিছু খাবারও তাহাকে খাইতে হইবে। ছেলেবেলার কথা তাহার মনে পড়িল। মিত্তির বাড়ির উঠানে একটা ভাল পেয়ারা গাছ ছিল। মিত্তির বাড়িতে শৈলর যতটা অবাধ গতিবিধি ছিল, অপর কাহারও ততটা ছিল না। শৈলর মধ্যস্থতায় অনেকেই সেই পেয়ারা ভক্ষণ করিত। শৈলকে মিত্তির বাড়ির পেয়ারা আনিয়া দিতে বলিলে সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত বটে, কিন্তু মনে মনে খুশি হইত এবং নানা কৌশলে পেয়ারা চুরি করিয়া আনিয়া দিত। শৈলর সেই স্বভাব আজও বদলায় নাই। তাহাকে গিয়াই চা এবং মোহনভোগের ফরমাস করিতে হইবে।

হঠাৎ একটা মোটর-হর্নের চীৎকারে শঙ্কর সচকিত হইয়া উঠিল। দেখিল বোস সাহেবেরই মোটর। মোটরখানা তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর দেখিল বোস সাহেব নিজেই ড্রাইভ করিতেছেন, পাশে সুসজ্জিতা শৈল বসিয়া আছে। শঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

হস্টেলে ফিরিয়া শঙ্কর তিনখানি পত্র পাইল।

একখানি বাবার, মায়ের পাগলামি অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

একখানি মিষ্টিদিদির, আবার নিমন্ত্রণ। আর একখানি সুরমা বম্বে হইতে লিখিয়াছে। রহস্যময় পত্র।

(ক্রমশ)
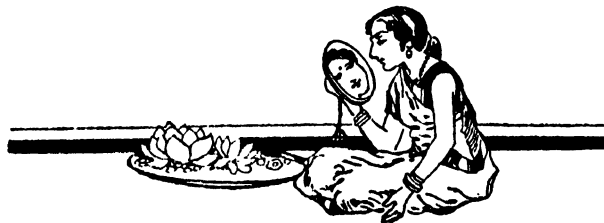
দেবগড়

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশাল মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায়, যখন বিভিন্ন মহারাষ্ট্র সর্দ্দার স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্বাধীনতা অবলম্বন

গর্ভগৃহের অভ্যন্তরীণ মূর্ত্তি—দেবগড়—অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণু

করিয়া রাজত্ব করিলেন, তখন সুপ্রাচীন মালবদেশ বহুধা বিভক্ত হইয়া গেল। এই বিস্তীর্ণ দেশের অংশবিশেষ লইয়া বর্ত্তমান ইন্দোর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি করদ রাজ্যের অবস্থিতি। মালবের যে অংশ যুক্তপ্রদেশের সন্নিকট, তাহা লইয়া পর্ব্বতসঙ্কুল উপত্যকাময় প্রদেশে আরও একটি ক্ষুদ্র রাজত্ব ছিল। ইহার নাম ঝান্সি। সিপাহীবিদ্রোহের রুদ্র নৃত্য থামিয়া যাইবার পর এই ক্ষুদ্র রাজত্ব ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গেল। প্রথমে এই প্রদেশটিকে ঝান্সি ও ললিতপুর এই দুই জেলায় বিভক্ত করা হয়। পরে ললিতপুরকে ঝান্সি জেলার একটি মহকুমায় পরিণত করা হইয়াছে।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে মালব প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। সাঁচীতে, কাকপুরে, মান্দাশোরে ও উজ্জয়িনীতে ইহার বহু কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই মালবের অংশবিশেষে যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ললিতপুরের অনতিদূরেই ইতিহাস-বিশ্রুত চন্দেরি দুর্গ অবস্থিত। ললিতপুরের মহকুমার দক্ষিণাংশ পর্ব্বতসঙ্কুল ও জঙ্গলাকীর্ণ। এই স্থানে লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়া প্রাচীন যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ মানুষ ও কালের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে। দেবগড় পর্ব্বত তাহাদের অন্যতম। দেবগড় যাইতে হইলে দুই পথে যাওয়া যায়। প্রথমে ঝাকলুল ষ্টেশন হইতে যাওয়া যায়, কিন্তু এস্থানে যানবাহনাদি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় ঝান্সি রোড হইতে একটি কাঁচা শড়ক দ্বারা।

আর একটি দ্বিতল মন্দির, দেবগড়

দেবগড় পর্ব্বতের ঠিক তলায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত একটি বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র মন্দিরটি মধ্যযুগের দেবালয় হইতে একটু বিভিন্ন। কেবলমাত্র

দশাবতার মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ—দেবগড়

গর্ভগৃহ ছিল—মণ্ডপ নাই। গর্ভগৃহের চতুর্দ্দিকে আচ্ছাদিত প্রদক্ষিণ-পথ ছিল। কালের প্রভুত্বে এই প্রদক্ষিণ-পথ বহুদিন ধরাশায়ী হওয়াতে গর্ভগৃহের প্রাচীর এখন মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। গর্ভগৃহের তিনদিকের প্রাচীরের ভাস্কর্য্য ও দ্বারের উপরস্থ অনন্ত নাগের উপর উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়া অনুমিত হয় যে, মন্দির নির্ম্মাতাগণ ইহাতে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যে শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, মন্দিরের গর্ভগৃহে তিনি এখনও বিরাজমান।
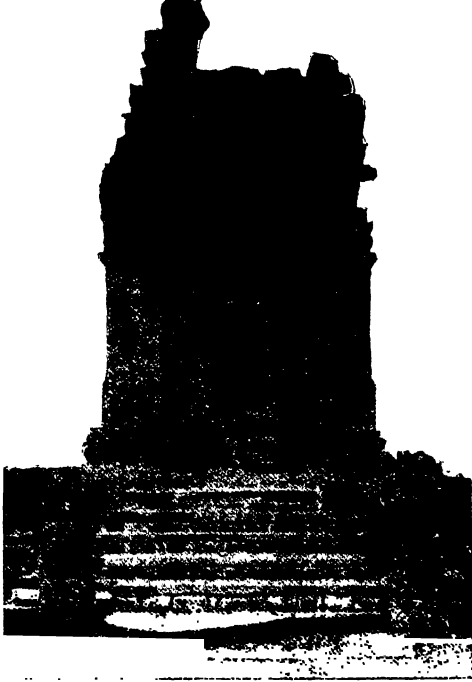
দেবগড় পর্ব্বতের মধ্যস্থলের জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
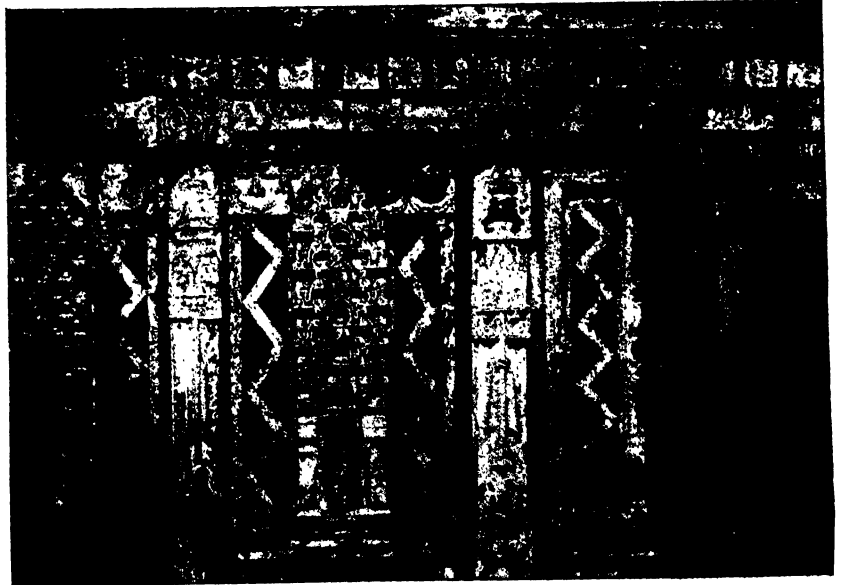
দেবগড় উপত্যকার বৃহৎ মন্দিরের পাষাণ নির্ম্মিত বাতায়ণ

মন্দির প্রাচীরে তিনটি প্রতিলিপি পাওয়া যায়, তাহার একটি অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণু নাগদেহের উপর নিদ্রামগ্ন। নীচে অসুরগণ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত এবং শূন্যে নারায়ণের নাভি-দেশ হইতে উত্থিত পদ্মের উপর ব্রহ্মা, ময়ূরের উপর উপবিষ্ট কার্ত্তিকেয় এবং বৃষভারূঢ় শিবদুর্গার মূর্ত্তি প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এই প্রতিলিপিটি অনায়াসে বিষ্ণুর অনন্ত-শায়ীন মূর্ত্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। লিঙ্গের পশ্চাদভাগস্থ প্রাচীরের মূর্ত্তি বৈষ্ণব বলিয়া অনুমিত হয়। একটি হস্তী সর্প দ্বারা সম্মুখস্থ কুর্ম্মের সহিত বদ্ধ অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয় এবং উপরের অংশে গরুড়ের উপর উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। পার্শ্বস্থিত প্রাচীরে দুইটি দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। অপূর্ব্ব বশেষ কালের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আজিও বিদ্যমান আছে। সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটি বোধ হয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে সেই সময়ে ও পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেবগড় উপত্যকার গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়।

দুর্গ হইতে উপত্যকায় যাইবার পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বৃহৎ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দিরের ছাদ বহুদিন পূর্ব্বে অদৃশ্য হইয়াছে কেবল তাহার দীর্ঘদেহ স্তম্ভগুলি বিকটাকার দৈত্যের ন্যায় নীল নভঃস্থলের দিকে তাকাইয়া আছে। মন্দিরের ভিত্তির মধ্যস্থলে একটি সুউচ্চ বেদী দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উপরে চতুর্ব্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্করের ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে জিন উপদেবতাদের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। দেবগড় উপত্যকায় পৌঁছিলে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত সুবৃহৎ দেবালয়টি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে। বৃহৎ মন্দিরের সম্মুখে একটি উন্মুক্ত মণ্ডপ, তাহার পরে অন্তরাল। অন্তরালের পাষাণ প্রাচীর জালি বাতায়নযুক্ত। এইরূপ জালি বাতায়নযুক্ত অন্তরাল সুদূর দাক্ষিণাত্যে আইহোলি এবং পটকদলের মন্দিরে দৃষ্টিগোচর হয়। অন্তরাল মধ্যে প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান আছে, সূর্য্যালোক এস্থলে প্রবেশ করিতে পারে না। স্থানটিতে পরবর্ত্তীকালে আর একটি প্রাচীর তুলিয়া দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রথম ভাগে দুইটি নারী-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি অম্বিকা বা অরিলা নামক যক্ষিণী মূর্ত্তি, তাহার বাম অঙ্কে একটি শিশু ও পদের নিকট তাঁহার বাহন সিংহ উপবিষ্ট। দ্বিতীয় ভাগে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ১৫´ হইতে ২০´ ফিট উচ্চ
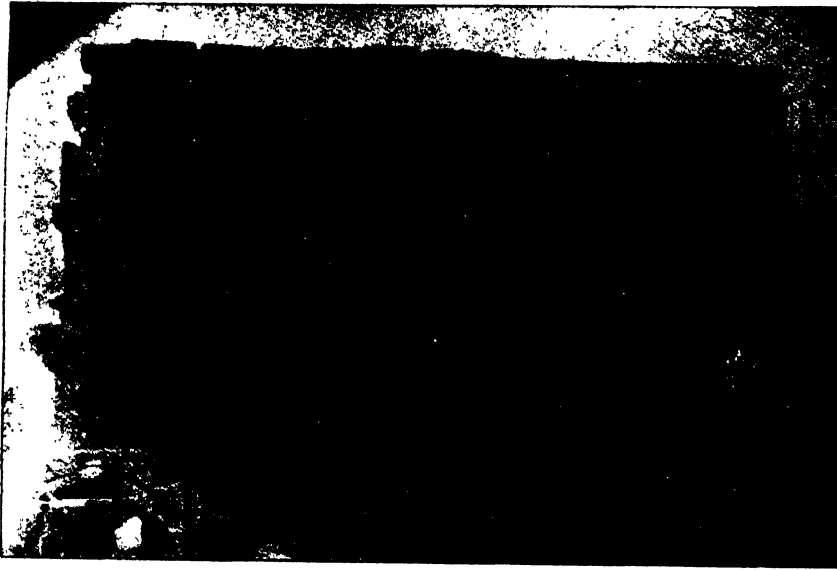
দেবগড় উপত্যকার উপরস্থ দ্বিতল একটী মন্দির

কারুকার্য্য মণ্ডিত একটি দ্বারের দ্বারা গর্ভগৃহে প্রবেশ করা যায়। দেবালয়ের প্রাঙ্গণে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা গর্ভ হইতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছে। দশাবতার মন্দিরের প্রায় এক মাইল দূরে একটি নির্ঝরিণীর উপর পাষাণ নির্ম্মিত বাঁধ আছে। বাঁধের পরপারে একটি প্রস্তরাচ্ছাদিত পার্ব্বত্য পথের দ্বারা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত একটি গিরি-দুর্গে উপস্থিত হওয়া যায়। এই পর্ব্বতের শিখরস্থ উপত্যকার নাম দেবগড়। এই দুর্গম উপত্যকায় ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত বহু জৈন মন্দিরের ধ্বংসা-

একটি তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি আছে। বৃহৎ মন্দিরের সর্ব্বাংশেই বহু মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। চক্রমণের আচ্ছাদিত পথে বৃহৎ ক্ষুদ্র বহু মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। অনুমান হয় যে যখন বৃহৎ মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয়গুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখন সেই সকল স্থান হইতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই মূর্ত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত মন্দিরগাত্রে বহু খোদিতলিপি দৃষ্টিগোচর হয়। এই লিপিগুলি মূর্ত্তির পাদপীঠে, ভগ্ন প্রস্তর ও স্তম্ভগাত্রে এবং মন্দিরের প্রাচীরে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কতকাংশ আধুনিক এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তীর্থযাত্রীদের দ্বারা খোদিত হইয়াছিল।

এই মন্দিরের বামভাগে এক নুতন রকমের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলি শিখর-বিহীন এবং একতল কিম্বা দ্বিতল। পশ্চাৎভাগে তাহাদের একটি কিম্বা দুইটি গৃহ থাকে এবং সম্মুখভাগে স্তম্ভ সমন্বিত মণ্ডপের ন্যায় আছে। দ্বিতল মন্দির আমাদের দেশে প্রাচীনকালে বড় বিরল। অন্যান্য মন্দিরগুলি শিখরযুক্ত।

স্থানটির প্রাচীনত্বের বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। গুপ্ত যুগের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুপ্রাচীন মালবের একাংশে অবস্থিত পার্ব্বত্যময় শ্যামল বনভূমি এক সময়ে হিন্দু ও জৈনদের পবিত্র তীর্থ ছিল। যুগে যুগে মানবের অন্তর্নিহিত ভক্তিধারা ইহার পাষাণ বক্ষ প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। এখন তাহার গৌরব রবি অস্তমিত হইয়াছে। পড়িয়া আছে, জীর্ণ পাষাণ স্তূপ, অতীতের স্তিমিত সাক্ষীরূপে—মানুষকে সচেতন করিবার জন্য।

বৃহৎ মন্দিরের সভামণ্ডপ

স্বপ্ন

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বপ্ন আমার ভগ্ন প্রাণের সুপ্ত রাতের কল্পনা,
অন্ধ চোখের দৃষ্টি সে যে, নীরব মুখের জল্পনা।

নীরব বীণার শান্ত হিয়ার কোন্ তারে
সেই ত' তোলে আনন্দ-সুর ঝঙ্কারে,

কুন্দ-চাঁপার শুভ্র বুকের মন ভুলানো গন্ধ না!
নীল আকাশের বিশাল বুকের গুপ্ত কথার ছন্দ না,

শ্বেত কুমুদের স্নিগ্ধ চাঁদের সোহাগ রাশির গল্প না;
নিরাশ প্রাণের বুক ভাঙ্গা সেই গুঞ্জরণ—

পুষ্প কলির গুপ্ত ভাষার প্রস্ফুরণ,
গভীর রাতের লুকিয়ে থাকা অন্ধকারের মন্ত্রণা॥

মা-বাপের দেওয়া নাম কৃষ্ণচরণ—গ্রামের লোকে ডাকিত কেষ্টা। আমরা বলিতাম 'কেষ্ট কুটুম-টু'-ইষ্ট অকুটুম'। আর বলিতে হইত না, কেষ্ট তাহার খেলাধুলা ফেলিয়া বাঁশরী না খুঁজিয়া সোজা বাঁশ লইয়া তাড়া করিত এবং আমরা অগত্যা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতাম।

শুনা যায়, এখন যেখানে কলিকাতা শহর বসিয়াছে পূর্ব্বে সেখানে কোথায় গোবিন্দপুর নামে একটি গ্রাম ছিল। গোবিন্দপুর থাকুক না-থাকুক, কলিকাতাকে গোকুল বলিতে আপত্তি করা চলে না। কারণ কেষ্ট তাহার মাসিমার কাছে কলিকাতার গোকুলে আসিয়া বাড়িতে লাগিল। মেশোমশাই নন্দলাল ঘোষ শ্রীযুক্ত এবং সম্পত্তি-শালী প্রফেসর বা অধ্যাপক, জীবিকা গো-চারণ বা ছেলে চরাণ। কেষ্ট দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যের ঘৃত ননী ছানায় পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহার দৌরাত্ম্যে কলিকাতার পাঠ্য অপাঠ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বৈ-ত্রৈ ষাণ্মাষিক এবং বার্ষিক পত্র পত্রিকাগুলি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। সম্পাদককুল নাকের জলে চোখের জলে হইতে লাগিলেন—তবু কেষ্টকে শায়েস্তা করিতে পারা গেল না।

বলা বাহুল্য, কলিকাতায় আসিয়া কেষ্ট আর কৃষ্ণের চরণ শরণ করিয়া থাকিতে রাজি হইল না এবং অনতিবিলম্বে নিজেকেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জাহির করিল। নন্দের আলয়ে শ্রীকৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন।

মাসিমা কেষ্টকে অত্যন্ত ভালো বাসিতেন—কারণ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং বোনপোটিকে পুত্ররূপে লালন করিতেছিলেন। মেয়ে-মহলে তাহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং নিজে শতমুখে কেষ্টর গুণ সকলের মধ্যে প্রচার করিতেন। কেষ্ট ভালো বাঁশী বাজাইতে জানে, শ্লীল অশ্লীল সাহিত্য রচনা করিতে জানে, স্নানের ঘাটে বান্ধবীদের স্নাপ নিতে জানে, হাসিতে জানে, গাহিতে জানে, এমন কি, সভ্যসমাজে মিশিতে অর্থাৎ পরিচিত অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে সহজে খাতির জমাইয়া লেক সিনেমায় বোটানিকালে লইয়া যাইতে জানে—ইত্যাকার অনেকানেক এবং অশেষ গুণ ছিল। মাসিমা সমস্তই উজ্জ্বল বর্ণনায় প্রকাশ করিয়া করিয়া কেষ্টকে এতই যশস্বী করিয়া তুলিলেন যে তাহাকে কেষ্টর মা যশোদা বলিয়া কাহারও আর সন্দেহ রহিল না।

কেষ্ট গোচারণে যাইত। কোশ্চেন আউট করিতে, মার্ক জানিয়া লইতে, নিদেন শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্যে

অক্ষয় কলেজ-জীবন লাভ করিতে শ্রীদাম সুদাম তো জুটিয়া ছিলই—অধিকন্তু একদল অবলা জীববিশেষও জুটিয়া গিয়াছিল। কেষ্ট তাহাদের যে মাঠে চরাইত সেই মাঠেই চরিত—কিছু বিচার করিত না, বিরোধ করিত না। সময় অসময়ে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে জমায়েত হইয়া রাখাল-রাজাকে সম্বর্দ্ধনা করিত। তাহার পর হেদো, গোলদীঘি, লালদীঘি, লেক, শিবপুর, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, মেট্রো, লাইট-হাউস, চিত্রা, রূপবাণী, ছায়া সর্বত্র চরিয়া বেড়াইত।

কেষ্টর দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হইয়া এতদিন পুরুষ-সমাজ নন্দ ঘোষকে জানাইতেছিলেন, কালক্রমে মা যশোদার নিকটেও অভিযোগ আসিতে লাগিল। আজ অভিযোগ আসে, বসুদের বীণা ক্লাস পলাইয়া কেষ্টর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিল। সোনাবুড়ী পূজা দিতে গিয়াছিল—তাহার সঙ্গে দেখা হইতেই কেষ্ট সরিয়া গেল। কাল অভিযোগ আসে—রায়েদের অনিমার দেরাজে কেষ্টর কবিতা দেখা গিয়াছে। পরশু অভিযোগ আসে—মুখার্জ্জিদের মায়া নাকি কেষ্টর নামে চিঠি লিখিয়া রাখিয়াছিল—ইত্যাদি। এইরূপে পাড়া বে-পাড়ার যে ঘরে ক্ষীর, ননী, ছানা, ঘি যাহাই থাকুক সেইদিকে কেষ্টর দৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

কেষ্ট কাহারও কথা গ্রাহ্য করে না। যা খুশী তাই লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম জাহির করিতেছে। পার্কে, কমন-রুমে, ট্রামে, বাসে তাহার পালিত অবলা জীবগুলি সেই সব জাবর কাটে। শ্রীদাম সুদাম শতমুখে রাখালরাজের জয়গান গায়। ধেনুদল না বুঝিয়া সুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাম্বা হাম্বা রব করে।

এইবার আয়ান ঘোষের আবির্ভাব সম্ভাবনা দেখা গেল।

শ্রীমতী অর্থাৎ মিস্ রাধিকা দেবী বি-এ পোস্ট গ্রাজুয়েট ঘাটে তাহার ডিগ্রির কলসী পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন। আসিয়া শুনিলেন মোহন বংশী বাজিতেছে। বাঁশী বন-মাঝে কি মন-মাঝে তাহা স্থির করিতে না করিতেই তাহা কানের ভিতর দিয়া একেবারে মরমে পশিয়া গেল।

স্থান—য়ুনিভার্সিটি হল, বিষয়—ছাত্রছাত্রী সম্মেলন। সময়—সায়ংসন্ধ্যা, অল্‌টারে ম্লান আলো জ্বলিতেছে—কেষ্ট তাহার বাঁশীতে পূরবী ধরিয়াছে। সমস্ত হলটি নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া শুনিতেছে। কি সুরের গমক—কি লীলায়িত লহরী—রাধিকা দেবী বি-এ আত্মহারা হইলেন। যখন নিজেকে কুড়াইয়া পাইলেন—দেখিলেন কি তাহার চক্ষু, কি মনোরম চশমা। নাম শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণ—বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এটা যে কলিযুগ—তাহে রূঢ় কলিকাতা, হায়—হায়—হায়। কোথায় সেই শান্ত মধুর যমুনা-পুলিন, আকাশে ময়ূরকণ্ঠী মেঘ, দূর গ্রামে বনানী-শীর্ষে

আয়ান ঘোষ লোকটা সুবিধার নহে

সন্ধ্যা নামিতেছে। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি উঠিল। এমন সন্ধ্যায় রাধা জল লইতে আসিয়াছে—আর বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কলসী ভরা হইল না, ভরা হইলেও উঠা গেল না, উঠিলেও পা চলে না, চলিলেও কদম্বমূলে আসিয়া থামিয়া গেল। ত্রিভঙ্গিমঠামে শ্যাম দাঁড়াইয়া আছে—হাতের মধুর মুরলী বন্ধ হইয়াছে।

রাধিকা দেবী বি-এর চমক ভাঙ্গিল, দেখিল অল্‌টারে কেহ নাই। মিঃ আয়ান ঘোষ হাতে চাপ দিয়া বলিলেন—চল, ওঠা যাক্।

উঠিতে হইল, কিন্তু পা চলিলেও মন যে চলে না।

পরদিন। সুপ্রভাত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ

নাই, কারণ রাধিকা দেবী পরিষ্কার দেখিলেন—সেই শ্যাম, সেই কানাইয়ালাল, সেই বাঁশরীওয়ালে। হাতে একটা লেদার বাউণ্ড খাতা লইয়া লিফট্‌ দিয়া নামিতেছে। কলসী নাই যে বগ্‌বগ্‌ করিয়া শব্দ করিবে। অগত্যা হাতের ভারী পেন্‌সন্‌খানা সে মেজেতে ফেলিয়া দিল। শব্দে শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া তাকাইল—চোখোচোখি হইয়া গেল। বিদ্যুৎ নয়, শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটা লজ্জার তরঙ্গ বহিয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ আগাইয়া আসিয়া বইটা তুলিয়া দিল। কোন সুযোগ সে অপব্যয় করে না। বলিল—ইকনমিক্‌স্‌ পড়েন বুঝি ?

রাধিকা দেবী বলিলেন—হ্যাঁ, আপনি ?

আমি ? শ্রীকৃষ্ণ কি উত্তর দিবে ? ফোর্থ ইয়ারে এই চার বছর হইল। মেশোমশাই বলেন—তুই বরং আমার বদলি চেয়ারে বসা আরম্ভ কর্‌। ও ক্লাসটায় আমার চেয়ে তোর বেশী অধিকার জন্মেছে। কেষ্ট মাথা চুলকাইয়া বলিল—মানে, ইয়ে—আমি বি-এ পরীক্ষা দিয়ে থাকি। মা যশোদা বলেন—কানু আমার কক্ষণো মিথ্যে কথা বলে না।

রাধিকা দেবীর মনে হইল—ইকনমিক্‌স্‌ ক্লাস ছাড়িয়া দিবেন। কয়েক দিন ক্লাসে না যাইয়া অস্বস্তি বাড়িল এবং অবশেষে আবার বাহির হইতে লাগিলেন।

ইহার পর কেষ্টকে যখন তখন য়ুনিভার্সিটির কাছাকাছি পাওয়া যাইতে লাগিল। শ্রীদাম সুদামের দল কেষ্টর নাগাল পায় না। দেখা হইলে কেষ্ট বলে—এ বছরটাও মাটি করিস নে—এখন থেকে পড়াশুনা আরম্ভ কর। মুখে যে এত দীর্ঘচ্ছন্দী উপদেশ দিতে পারে ক্লাসে তার পাত্তা পাওয়া যায় না কেন ? কেষ্ট অবশ্য বলে—নোটস্‌ সবই আমার নেওয়া আছে, ঘরে বসে স্টাডি করি। কিন্তু ঘরেও দেখা না, মেলায় খোঁজাখুঁজিতে সব রহস্য বাহির হইয়া পড়িল।

মা যশোদা সত্যই বলেন—কানু কক্ষণো মিথ্যা বলে না। কেষ্ট স্টাডিই করিতেছিল। রাধিকা দেবী বি-এর সঙ্গে সে এইরূপ চুক্তি করিয়াছে যে, সে তাঁহাকে আধুনিক কবিতা লিখিতে শিখাইবে এবং বাঁশী শুনাইবে। রাধিকা দেবী বি-এ কেষ্টকে পলিটিক্‌স্‌ পড়াইবেন। ইহাকেই বলে ভবিতব্য—ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাণ্ড রাজনৈতিক সমস্যার টাল সামলাইতে হইবে তাই বুঝি পলিটিক্‌স্‌টা এখনই ঝালানো সুরু হইল।

দিনের পর দিন যায়—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকুঞ্জে যাতায়াত করেন। পলিটিক্‌স্‌ পড়েন, রাধিকা দেবীর সঙ্গীত শুনেন। চা চলে, বাঁশী চলে, হাসি চলে। মাসি কিছুটা শুনেন, কিছুটা শুনেন না। দশজনের কথা তিনি কানে তোলেন না। শেষে কি-না মাসি সঙ্গী পাইয়া কাশী গয়া শ্রীক্ষেত্র ভ্রমণে বাহির হইলেন। কেষ্টকে আর পায় কে !

কিন্তু আয়ান ঘোষ লোকটা সুবিধার নহে। উৎকট পুরুষ—না আছে রসজ্ঞান, না আছে স্তুতিবাদ। যাহা বলে একেবারে পরিষ্কার সোজা কথা। কচিৎ কখনও আসে—আসে একেবারে ঝড়ের মত। যতক্ষণ থাকে যেন জ্বলন্ত বহ্নি, তাহার কাছে এতটুকু শীতল কোমলতা নাই। অমন বিরাট পৌরুষ চেহারা—যেন শতমুখে শাণিত। তাহার কাছে কোন কারুণ্য নাই, নির্দয় কঠিন বিচারে সমস্তই বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। কেষ্ট তাহার সামনে যেন কেঁচো হইয়া যায়, বাঁশী লুকাইয়া রাখে, কবিতার খাতা বন্ধ করে, পলিটিক্সের পাতা এলোমেলো উল্টাইয়া যায়। এত চতুর, এত মুখর শ্রীকৃষ্ণ যেন পাথরের ঠাকুর বনিয়া যায়। রাধিকা দেবী আয়ানের সঙ্গে আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দেন। আয়ান শুধু কথায় কথায় বলে—'এক্‌জাক্‌ট্‌লি', বলার ভঙ্গিতে মনে হয়, এক একটা বুলেট বাহির হইতেছে। এক কথায় কেষ্ট আয়ান ঘোষকে পছন্দ করে না। তবু রাধিকা দেবীর নিকট তাহার অনেক তত্ত্বই শুনিয়াছে। নাম ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—অর্থাৎ মিঃ আই-এন-ঘোষ। আই-এন মুখে মুখে আয়ান হইয়াছে। আইন কলেজে নাম আছে—কিন্তু যাহা করিয়া বেড়ায় প্রায় সবই বে-আইনি। কিন্তু সেজন্য সে কাহাকেও ভয় করিয়া চলে না। ভাবে ভঙ্গিতে বুঝা যায়, রাধিকা দেবী তাহার অনুরক্তা শিষ্যা—মুখ্যত এবং গৌণত—সর্ববিষয়ে।

সূর্যবতী বসু বর্দ্ধমানের মেয়ে—কলিকাতায় আসিয়া নৃত্যকুশলা বলিয়া নাম অর্জন করিয়াছেন। তাহারই বোন চন্দ্রাবতীর বেথুনে বি-এ ফোর্থ ইয়ার। য়ুনিভার্সিটি জলসায় তিনি নাচিতেন—দিদির কাছে শেখা নাচ। চন্দ্রাবতী

নাচিল—কেষ্ট বাঁশী বাজাইল। গ্রীনরুমে ফিরিয়া চন্দ্রা বলে—চমৎকার আপনার বাঁশী, আমার নাচ খুলে দিয়েছেন। কেষ্ট বলে—আপনার নাচের তালেই আমার বাঁশীর সুর ফুটেছে। পরদিন কাগজে কাগজে চন্দ্রার নৃত্যচপলামূর্তির পাশে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের ফোটো ছাপা হইল। চন্দ্রাবতী এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরিচয় নীচে লেখা। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবতী কুঞ্জে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন—চায়ের নিমন্ত্রণ লঙ্ঘন করিতে নাই।

রাধিকা দেবী সব দেখিলেন—শুনিলেন। ছাত্রটি যে প্রায়ই অনুপস্থিত হইতেছেন তাহাতে তিরস্কার অভিমানও করিলেন। অবশেষে একদিন ললিতা আসিয়া সংবাদ দিল—শ্রীকৃষ্ণ আর এক পাঠ সুরু করিয়াছেন। চন্দ্রাবতীর নিকট কেষ্ট ষ্টিয়ারিং ধরিতে শিখিতেছে। কে জানে ভবিষ্যতে গাণ্ডীবীর সারথ্য করিবার ইহাই ভূমিকা কি-না।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। কাগজে কাগজে রাষ্ট্র হইয়া গেল—ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রাজদ্রোহীরূপে বন্দী হইয়াছে। ইন্দ্রনারায়ণ অর্থাৎ আমাদের পূর্বপরিচিত আয়ান। শ্রীকৃষ্ণ সুযোগ বুঝিয়া রাধিকা দেবীর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখে সর্বনাশ। এ আর অভিনয় নয়, অভিমান নয়, তিরস্কার নয়, রাধিকা দেবী গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পলিটিক্‌সের কথা তুলিল—রাধিকা দেবী মার্ক্‌স্‌বাদ বুঝাইলেন। বলিতে বলিতে সবহারাদের বেদনায় তাহার চিত্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ চমকিয়া গেল—কবিতা নাই, বাঁশী নাই—রাধিকা দেবী যেন সহসা কত কঠিন, কঠোর এবং দুরধিগম্য হইয়া পড়িয়াছেন। আয়ানের অনুপস্থিতিতে তাহার সত্তাটাই যেন রাধিকা দেবীতে বর্তাইয়াছে। কেষ্টর মনে হইল—এখনি বুঝি তিনি আয়ানের মত 'এক্‌জাক্‌টলির' বুলেট ছাড়িতে আরম্ভ করিবেন। গতিক সুবিধার নয় বুঝিয়া কেষ্ট সরিয়া পড়িল।

কিছুকাল পরের ঘটনা। এবারও যথা সময়ে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল, চন্দ্রাবতী ইংরেজীতে অনার্স পাইল, তাহার দিদির সঙ্গে য়ুরোপ গেল—শ্রীকৃষ্ণ জাহাজ ঘাটে রুমাল নাড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, শ্রীদাম সুদামের দলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও ক্রস লিস্টে উঠিয়াছেন। এইবার ধরিয়া পাঁচবার হইল। মাসিমা সেই যে গিয়াছেন

চন্দ্রার নৃত্যচপলা মূর্তির পাশে বংশীবদন
শ্রীকৃষ্ণের ফোটো ছাপা হইল

আর এখনও ফিরে নাই, মেশোমশাই একদিন ডাকিয়া বলিলেন—পঞ্চাঙ্ক নাটক এখানেই শেষ হ'ল। বি-এ পাশ করেও তো কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বরং পাইলট্ হ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে দেখা গেল, মাস্টার বুইকে দমদমায় উড়িতে যাইতেছেন। এখন আর আমাদের সন্দেহ নাই যে, ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্রে তাঁহাকেই অর্জ্জুনের সারথ্য করিতে হইবে।

বঙ্গভাস্কর্য্যে সূর্য্যমূর্ত্তি

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সান্যাল

মানবমন স্বভাবতই সৌন্দর্য্যপ্রিয়। ভারতের অগণ্য মূর্ত্তি-শিল্পের নিদর্শনে ভারতবাসীর স্বভাব-সৌন্দর্য্যই প্রতিভাত হয়। আজ রসবিদ্‌দের সম্মুখে এক নূতন শিল্পজগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর শিল্পজগৎ, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তিনিচয় বাংলার কারুশিল্পের পরিচায়ক। বাঙ্গালীর গৌরব-গরিমা-মণ্ডিত অতীত বিস্মৃত বিদ্যার দ্যুতিচ্ছটা আজ অনুসন্ধিৎসু সুধীসমাজের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রকাশ পাইয়াছে। ধীমানের ধীশক্তির প্রভা, বীতপালের নির্ম্মাণচাতুর্য্য পাষাণ প্রতিমায় খাঁটি নির্ভাঁজ বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে।

সূর্য্যপ্রতিমা ভাস্করের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কৃষ্ণ প্রস্তরে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত অলোকসাধারণ মনোহর দেবপ্রতিমা। দিনমণির মুখেচোখেওষ্ঠেনয়নেনাসিকায় সর্ব্ব অবয়বে কিশোরের কোমলতা, জীবনের সাড়া যেন ফুটিয়া উঠিতেছে।

চতুর্ভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি—মঙ্গলবাড়ী (দিনাজপুর)

সূর্য্যপূজা বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। সূর্য্য-মূর্ত্তির সর্ব্বপ্রথম পরিকল্পনার নিদর্শন আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে দাক্ষিণাত্যের ভাজা বিহারের ভিত্তি-গাত্রে খোদিত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। তথায় সূর্য্যদেব চতুরশ্ব সংযোজিত একচক্র রথে সমাসীন। অনন্ত গুম্ফা ও লাহুলের সূর্য্যমূর্ত্তি যদিও ভাজার সমসাময়িক, তথাপি এখানে সূর্য্যের উভয়পার্শ্বে ধনুর্ব্বাণ হস্তে উষা ও প্রত্যুষাকে দেখিতে পাই। তৎপরবর্ত্তী যুগে মথুরার শক-কুষাণ শিল্পীগণ-কৃত সূর্য্য প্রতিমায় বহু পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। কখনও বা সূর্য্যদেব রথমধ্যে পদ্মোপরি দণ্ডায়মান, কখনও বা

মার্ত্তণ্ড ভৈরব 'মান্দা' (রাজসাহী)

উপবিষ্ট। তাঁহার বামহস্তে অসি এবং দক্ষিণ হস্তে গদা—পরিচ্ছদ উদীচ্যরীতির, যথা—সুদীর্ঘ শিরোভূষণ, আজানুলম্বিত গাত্রাবরণ ও পদদ্বয়ে বুট জুতা। পরবর্ত্তী গুপ্ত যুগের শিল্পীগণ এবম্প্রকার পাষাণ প্রতিমাই নির্ম্মাণ করিতেন বটে, তবে তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব অঙ্গলালিত্য ও ভাবের অনবদ্য অভিব্যক্তি ফুটাইয়া তুলেন। তারপরে পাল যুগের শিল্পীগণ তাঁহাদিগের অনন্য প্রতিভা দ্বারা সূর্য্যমূর্ত্তির আমূল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করেন। বৈদেশিক উদীচ্য বেশের পরিবর্ত্তে নূতন দেশী আবরণ প্রচলন করেন। সূর্য্যদেবের পরিধানে সাধারণ ধুতি, উত্তরীয় উরুদেশ হইতে উঠিয়া গলদেশে স্থান পাইয়াছে। যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে এবং মস্তকে ষট্-কোণ্‌বিশিষ্ট কিরীট মুকুট। উদীচ্য বেশের শেষ চিহ্ন-স্বরূপ শুধু বুট জুতা রহিয়া গিয়াছে।

পাল-শিল্পী সূর্য্যমূর্ত্তি নূতন সাজে সাজাইলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের পাষাণ প্রতিমায় যে ভাববৈশিষ্ট্য ও অঙ্গলালিত্য পরিলক্ষিত হইত তাহা আর ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেন না। অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য পাল-শিল্পীগণের বৈশিষ্ট্য, বোধ হয় ভাবের অভিব্যক্তি ও অঙ্গলালিত্যের অভাব পরিপূরণের জন্যই পাল-শিল্পী অলঙ্কারপারিপাট্যে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। উপরন্তু সূর্য্যপ্রতিমায় আরও তিনটি স্ত্রী-মূর্ত্তির পরিকল্পনা করিলেন। ইঁহারা সূর্য্যদেবের তিন নারী: রাজ্ঞী বা সুরেলু, নিক্ষুভা বা ছায়া এবং পৃথিবী বা মহাশ্বেতা।

সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণের নির্দ্দেশ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে মুসলমান আগমন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজার পর সূর্য্যমূর্ত্তি পূজা যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহা উক্ত মূর্ত্তিনিচয়ের সংখ্যাধিক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। অধুনা যদ্যপি সূর্য্যমূর্ত্তি পূজা বিশেষ দেখা যায় না, তথাপি আমাদের অন্তপুরিকারা এখনও নানা ব্রতানুষ্ঠানে সূর্য্য পূজা করিয়া থাকেন। (মাঘমণ্ডল ব্রত) বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রথম উপবিষ্ট, দ্বিতীয় দণ্ডায়মান। এক্ষণে আমরা এই বিভিন্ন শ্রেণীর মূর্ত্তির পরিচয় একে একে বিবৃত করিবে।

উপবিষ্ট সূর্য্যমূর্ত্তি চতুর্ভুজ ও দ্বিহস্তবিশিষ্ট পাওয়া গিয়াছে। দ্বিহস্ত সমন্বিত পাষাণে খোদিত সূর্য্যমূর্ত্তিখানি এখন কলিকাতা যাদুঘরে রহিয়াছে। সপ্তাশ্ব সংযোজিত একচক্র রথে দিনমণি পদ্মোপরি বজ্রপর্য্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট। পদদ্বয়ে বুট জুতা, পরিধানে কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধুতি, তৎসহিত সকোষ অসি সংরক্ষিত, গলায় হার, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে বলয় ও বাহুবন্ধ এবং শিরে কিরীট মুকুট। উভয়হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম। সূর্য্যদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে লেখনী ও মসীর

ষড়্‌ভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি মহেন্দ্র (দিনাজপুর)

আধার, হস্তে পিঙ্গল বা ধাতা এবং বামে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে দণ্ড বা দণ্ডী। উভয়পার্শ্বে তাঁহার পত্নীদ্বয় রাজ্ঞী বা সুরেলু ও নিক্ষুভা বা ছায়া। পশ্চাৎ শিলায় সূর্য্যদেবের উভয়পার্শ্বে নবগ্রহের অষ্ট মূর্ত্তি বিরাজমান। মস্তকের উপর পশ্চাৎ শিলায় অগ্নিশিখা ও দুইটি প্রতীক্ রহিয়াছে।

অপস্নখানি তাম্রে খোদিত। এক্ষণে উহা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে রহিয়াছে। ধুতি ও উত্তরীয় সজ্জিত চতুর্ভুজ সূর্য্যদেব সপ্তাশ্ব চালিত রথে উপবিষ্ট। উপরের দুই হস্তে পদ্ম এবং নীচের দুই হস্তে বরদ (বাম) এবং অভয় (দক্ষিণ) মুদ্রা। সূর্য্যদেবের পশ্চাতে পদবিহীন সূর্য্য-সারথি অরুণ রশ্মিহস্তে রহিয়াছে। তন্ত্রসারে এবম্প্রকার সূর্য্যমূর্ত্তির এইরূপ ধ্যান পাওয়া যায়:

রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়া ভয়বরান্ দধত করাব্জৈ
মাণিক্য মৌলিমরুণাঙ্গ রুচিনং নমামি।

দণ্ডায়মান মূর্ত্তি তিন প্রকারের পাওয়া যায়। প্রথম, দ্বিহস্ত-সমন্বিত সূর্য্যদেব সপ্তাশ্ব চালিত একচক্র রথে পদ্মোপরি দণ্ডায়মান। উভয় হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম। উভয়পার্শ্বে উষা

দ্বিভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি ঝেড়া (রাজসাহী)

ও প্রত্যুষা—সূর্য্যদেবের দুই নারী সুরেলু এবং ছায়া। পুরোভাগে পৃথিবী। দুই পার্শ্বে দুইটি পুরুষ মূর্ত্তি যথাক্রমে পিঙ্গল ও দণ্ডী এবং সম্মুখে সূর্য্য-সারথি অরুণ রশ্মি হস্তে। বিশ্বকর্ম্ম শিল্পে ইহার ধ্যান এই প্রকারের পাওয়া যায়—

একচক্রং সসপ্তাশ্বং সসারথিং মহারথম্।
হস্তদ্বয়ং পদ্মবরং কঞ্চুকঞ্চর্ম্ম তক্ষসং।

* * *

নিক্ষুভা দক্ষিণে পার্শ্বে বামে রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা
একবক্ত্রাঙ্গিতো দণ্ডো স্কন্ধস্তেজো করাম্বুজং।
চতুর্বাহু দ্বিহস্তোবা * * *
দণ্ডশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপালো চ খড়্গিনী।

ইহা ছাড়া অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর এবং মৎস্য পুরাণেও সূর্য্যদেবের অনুরূপ ধ্যান পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকারের দণ্ডায়মান যে মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা ষড়ভুজ। ইহা এক বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে আছে। সূর্য্যদেবের পরিধানে উদীচ্য বেশ এবং সপ্তাশ্ব চালিত একচক্র রথে পদ্মোপরি দণ্ডায়মান। উভয়পার্শ্বে গতানুগতিক পার্শ্বচরবৃন্দ ও স্ত্রীমূর্ত্তি। স্বাভাবিক দুই হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম অপর দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে অক্ষমালা ও বরদ মুদ্রা এবং বাম হস্তদ্বয়ে অভয় মুদ্রা ও কমণ্ডলু।

এক্ষণে যে সূর্য্যমূর্ত্তির আলোচনা করিব তাহা সূর্য্য ও ভৈরবের সমাবেশে খোদিত হইয়াছে। ইহা মার্ত্তণ্ড ভৈরব নামে পরিচিত। এই প্রকার সূর্য্যমূর্ত্তির ধ্যান সারদা-তিলকে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

হেমাম্ভোজ প্রবালপ্রতিমণিজরুচিং চারু খট্টাঙ্গ পদ্মৌ
শক্তিং চক্রং চ পাশং শৃণিমতি রুচিরামক্ষমালাং কপালং
হস্তাম্ভোজৈর্দধানং ত্রিনয়নং বিলসদ্বেদবক্ত্রাভিরামং
মার্ত্তণ্ডং বল্লভার্দ্ধং মণিময় মুকুটং হারদীপ্তং ভজাম।

কিন্তু উল্লিখিত ধ্যানে আট হাত সমন্বিত সূর্য্যদেবের বর্ণনা রহিয়াছে এবং আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিখানি দশ হাত বিশিষ্ট। এই সামান্য পার্থক্য ছাড়া আলোচ্য সূর্য্য-প্রতিমাখানি উল্লিখিত ধ্যানানুমোদিত।

সূর্য্যদেবের শিরে জটা মুকুট রহিয়াছে। মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-সমন্বিত ও ঈষদুন্মুক্ত। দশ হস্তের ছয় হস্ত বিদ্যমান ও

ভগ্নমূল হইতে বুঝা যায় আরও চারি হস্ত ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বের বিদ্যমান তিন হস্তে যথাক্রমে নীলোৎপল, ডমরু ও সর্প রহিয়াছে। পরিধানে ধুতি, যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার এবং পদদ্বয়ে বুট জুতা রহিয়াছে। উভয়পার্শ্বে স্ত্রী মূর্ত্তিদ্বয় সুরেণু এবং ছায়া এবং পুরুষ মূর্ত্তিদ্বয় পিঙ্গল ও দণ্ডী রহিয়াছে। তীর ধনু হস্তে উষা ও প্রত্যুষা। পুরোভাগে সূর্য্যদেবের পদদ্বয়ের মাঝে মহাশ্বেতা ও তৎসম্মুখে সূর্য্য-সারথি পদবিহীন পক্ষযুক্ত অরুণ রশ্মি হস্তে রহিয়াছে। পশ্চাৎশিলায় অগ্নি-শিখা এবং সর্ব্বোপরি কীর্ত্তিমুখ।

শিল্পনৈপুণ্যের দিক দিয়া উল্লিখিত মূর্ত্তিনিচয় অনিন্দ্যনীয়; এমন কি, যাঁহারা কলাবিদ্ নহেন তাঁহারাও প্রথম দৃষ্টিতে এই সকল পাষাণপ্রতিমার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না।

ভাদরে

কাদের নওয়াজ

১

আজ ভাদরে আদর উথল্
　　শস্পে-ঢাকা গাঙের কূলে—
উড়্ছে ধবল উত্তরী কার
　　ঢেউ খেলানো কাশের ফুলে ;
　ছায়ায় ঘেরা কুঞ্জবনে
　উঠ্ছে গীতি গুঞ্জরণে,
ত্বল্‌ছে কচি মঞ্জরী ওই,
　　সবুজ কাঁচা ধানের ক্ষেতে,
বাদর ধারায় গান গেয়ে আজ
　　ভাদর এল হর্ষে মেতে।

২

বিলের জলে, ডাহুক ডাকে
　　শুশুকগুলা পলায় ত্রাসে,
চক্রবাকের বক্রসারি
　　ঐ ভেসে যায় নীল আকাশে।
　স্বপন দেখে কাজ্‌লা পুকুর,
　ঝিলিক্ ঝলে জলের মুকুর,
স্বচ্ছ শীতল সে আয়নাতেই
　　ভাদর-রাণী মুখ দেখে আর—
সিঁদুর পরে সিঁথিতে তার,
　　জড়িয়ে খোঁপায় সাত-নরী-হার।

৩

ভাদর-রাণী উড়িয়ে আঁচল,
　　দেখ্ছে শোভা বকের সারির,
প্রজাপতি উড়্তেছে তার
　　কল্কা হয়ে সবুজ সাড়ির,
　সন্ধ্যা তাহার অলক-গুচ্ছি,
　কপালে টিপ্ মেঘের কুচি ;
আল্‌তা-রাঙা চরণতলেই
　　রক্ত-কমল উঠ্ছে ফুটি,
ভোম্‌রা হ'য়েই উড়্তেছে তার
　　কাজল-কালো নয়ন ত্বটি।

৪

চেয়েই আছি আকাশ পানে,
　　ছেয়েছে মাঠ সবুজ ধানে,
বন্-জুঁয়েরি পাই যে সুবাস,
　　মুগ্ধহৃদি চাষার গানে,
　ভাব্ছি হয়ে আত্মহারা,
　অনশনেই ম'রছে যারা,—
ভাদরে হায় তাদের ঘরেও
　　জ্বলবে না কি আশার বাতি
নয়নে মোর অশ্রু-ছাপায়
　　পাইনে খুঁজে ব্যথার সাথী

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বানুস্মৃতি

মাণিক পেয়াদার আখড়ায় পুলিস দিয়েছে হানা। ওরা ধরা প'ড়েছে—মাণিক, রাধা, পদ্ম, গোলাম, আরও অনেকে।

অতসীরা উঠে এসেছে নতুন বস্তিতে। কিন্তু ঠাঁই বদ্‌লালেই পয় বদ্‌লায় না। কপাল এসেছে ওর সঙ্গে। পথ তবুও ছিল ভাল। এখানে এসে জুট্‌ল আবার এক নতুন বিপদ। এরাও অনেকে ভিক্ষে করে; কিন্তু সেটা শুধু দিনের বেলায়। রাতের অন্ধকারে এদের রূপ বদ্‌লে যায়। সকাল থেকে সারাটা দিন এত বড় বস্তিতে পুরুষের সাড়া-শব্দও থাকে না; মনে হয়, মেয়ে রাজ্য। কালো, মোটা, রোগা, ঘেয়ো—রকমারি ঝি আর বোষ্টুমির দল ভাড়া নিয়েছে এক-একখানা পায়রার খোপের মত ছোট ঘর। মাণিক পেয়াদার মত ঠিকে-ভিখিরীর সর্দ্দার কেউ নেই বটে, কিন্তু আখড়াওয়ালা আছে। তাকে এরা বাবাজী বলে। সে-ই ভাড়া নিয়েছে এদিকে সবগুলো ঘর, তাই থেকে এক-একখানি বিলি ক'রেছে খুচ্‌রো ভাড়াটেদের কাছে।

লোকটার নাম শিবু মহান্ত। গোল-গাল মোটা কালো চেহারা; মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের মস্ত একটা টিকি, গলায় কাঠের মালা। তিলক আঁকে না, কিন্তু নেশা করে। বড় তামাকের ছোট কল্‌কে আর সাঁপিথানা ট্যাঁকেই থাকে।

অতসী যেদিন অন্ধ বাপের হাত ধ'রে এসে ভাড়া চাইলে একখানা ঘর, শিবু একমুখ হেসে দেখিয়ে দিল ঠিক ওরই পাশের ঘরখানা। মাসিক ভাড়া সাড়ে-তিন টাকা। ভাড়াটা মাসের শেষে একসঙ্গে দিতে হবে শুনে অতসী প্রথমটা সাহস পায় নি। কিন্তু শিবু যখন আগাগোড়া শুনে ওর কথাতেই হ'ল রাজী, তখন অতসীর আপত্তি করবার আর রইল না বিশেষ কিছু। তবে শিবুর চোখদুটো দেখে গোড়া থেকেই লাগ্‌ল কেমন একটা খট্‌কা।

অতসী ইতস্তত ক'রে কোন কথা ব'ল্‌বার আগেই শিবু তেমনি হাসির সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে—"কোন নাকাল হবে না তোমাদের। দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। শিবু মহান্ত থাক্‌তে—হেঁ—হেঁ।"—আবার হাসে। চোখদুটো ওর ভাঁটার মত ঘোরে।

বেলা তখন শেষ হ'য়ে এসেছে। সারাটা দিন তেতে-পুড়ে অতসী অতি কষ্টে খুঁজে বের ক'রেছে এই ঘরখানা। রাতের মুখে এটা ছেড়ে নতুন ক'রে খুঁজে দেখ্‌বার ধৈর্য্য ওর সত্যি আর ছিল না তখন।

ঘরখানা আগেকার চেয়ে অনেক বড়। তাই কোন রকমে কুলিয়ে যায়। এবার আর অতসী দীনুর জন্যে আলাদা ঘর ভাড়া করে নি। এক পাশে থাকে অতসী আর ওর বাবা; অন্য দিকে দীনুর সেই বিছানা।

দীনু যেন হঠাৎ কেমন ব'দ্‌লে গেছে। অতসী প্রাণপণ শক্তিতেও তাকে সব দিন পারে না আট্‌কে রাখ্‌তে। নিজের খেয়াল-খুশী মত কখনো তিন দিন পড়ে থাকে ও সেই ছেঁড়া মাদুরখানায়, কখন বা তিন দিন পর অতসী সারা শহর খুঁজে ধরে আনে জোর ক'রে। অতসীর জোরে সে অবশ্য বাধা দেয় না কোন দিন; কিন্তু নিজেকে মাঝে মাঝে এমন ক'রে সরিয়ে নেয় তার নাগালের বাইরে যে, অতসী প্রাণান্ত চেষ্টাতেও পারে না ফিরিয়ে আন্‌তে ওর সেই পোষমানা দুরন্ত মানুষটাকে।

অতসী কাঁদে। কখন কখন দিনের পর দিন নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে ওর চোখের জল। উপেন হয় ত বুঝ্‌তে পারে তার সেই আর্দ্রতা; কিন্তু সাবধানে এড়িয়ে চলে, পাছে ওর বালির ঘর ভেঙে পড়ে। মেয়েটাকে এতদিন ও শুধু ফাঁকি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।—উপেন কতদিন লক্ষ্য ক'রেছে, অতসী রাস্তার ভিখিরী ছেলেগুলোকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে, তাদের হাতে তুলে দেয়—ওর ভিখ্‌ মেগে আনা টুকিটাকি খাবারগুলো।

দীনু যখন থাকে না, অতসীর ওপর শিবু মহান্তর নজরটা অপ্রত্যাশিত ভাবে যায় বেড়ে। অতসী বিব্রত হ'য়ে পড়ে। শিবুর চোখদুটো দেখ্‌লে ওর ভয় হয়। শাদা, লাল আর কালো, তিনটি রঙের অদ্ভুত সংমিশ্রণে চোখদুটোর চেহারা যেন কেমন বীভৎস হ'য়ে উঠেছে।

অতসী ভাবে: দুটো সেবাদাসীতেও মিন্‌সের মন ওঠে না! ও যেন কি। মনে হয়, ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে অন্য বস্তিতে পালিয়ে বাঁচে; কিন্তু ভরসা হয় না, পাছে দীনু এসে ফিরে যায় সন্ধ্যের মুখে। সারাদিনের উপোস ঘাড়ে ক'রে একবার যদি এসে ফিরে যায় ওর দরজা থেকে, তা হ'লে আর হয় ত সারা শহর খুঁজেও অতসী পাবে না তার দেখা।

দীনুর মাথার কাছে ব'সে এক-একদিন অতসী কথায় কথায় ব'লে ফেলে—"চল আর কোথাও উঠে যাই। ভাল লাগে না এখানে।"

দীনু হাসে। হয় ত বা একটুক্ষণ কি ভেবে অতসীর পিঠের ওপর দিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে বলে—"বেশ ত। কিন্তু ভাল কি সেখানেই লাগ্‌বে অতসী? ভাল লাগা ত সবারই জন্যে নয়।"

অতসীর দুঃখ হয়। মনে হয়, দীনু বোঝে না ওর কষ্ট। অভিমানের সুরে বলে—"তোমার কি বল? যখন খুশী পালিয়ে বেড়াও; পথে পথে ঘুরে তোমার কাটে ভালই। আর আমি রাত কাটাই ওই অন্ধ বাপের আড়ালে ব'সে। ভয়ে মরি। লোকটার চোখে যেন ঘুম নেই; সারা রাত পায়চারি করে ঘরে আর বাইরে। আমাদের দরজার সাম্‌নে খস্‌খস্ করে ওর পায়ের শব্দ।"

"মানুষের পায়ের শব্দে ভয় পাও অতসী? শুনে আমার হাসি পায়।—তোমার দোষ নেই। সারাটা দুনিয়া জুড়ে ওই ভয়! একদল মানুষ শুধু চোখ রাঙাতেই এসেছে পৃথিবীতে, আর একদল তাদের সেই চোখ-রাঙানির ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর গুটিয়ে সরে' দাঁড়িয়েছে পথের পাশে। এরা শুধু শিখেছে কাঁদতে; নিজের অন্নমুষ্টি পরের হাতে তুলে দিয়ে, এরা আঁচল পেতে কাঁদে।"—দীনু হেসে ওঠে।

ওর এই বেয়াড়া হাসির অর্থ অতসী কোন দিনই বোঝে না, হয় ত বুঝ্‌বেও না আর। ও শুধু হতভম্বের মত চেয়ে থাকে দীনুর মুখপানে।

দীনু আবার হেসে বলে—"কোকেন-খোর দেখেছ অতসী, যারা কোকেনের নেশা করে?"

"না।—ও ঘরের ওই খোট্টা বুড়িটা কি বলে জানো?" কণ্ঠস্বর একটু খাটো ক'রে অতসী ঝুঁকে পড়ে দীনুর কানের কাছে।—"বুড়ি বলে, লোকটা নাকি আগে চালানি কারবার ক'রত।"

—"কোকেন?"

—"না গো, না। মেয়েমানুষ চালান দিত চা-বাগান আর মরিচ বনে।" অতসীর মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়।

—"যখন দিত, তখন দিত। এখন ত আর দেয় না চালান? দিতে চাইলেই বা পাবে কোথায়?"—একদৃষ্টে অতসীর মুখপানে চেয়ে থেকে দীনু হঠাৎ প্রসঙ্গটা উল্টে দিয়ে বলে—"আচ্ছা অতসী, তুমি পার না আমাকে মুক্তি দিতে?"

দীনুর কথায় অতসী বোধ হয় প্রথমটা আঁৎকে ওঠে; তার পর নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বলে—"আমি ত তোমাকে ধরে' রাখি নি দীনু! বামন হ'য়ে চাঁদ ধরতে চাইবই বা কেন? তুমি পথে পথে ঘুরে বেড়াও, এই নোংরা বস্তিতে তোমার মন তন্‌ছট করে, তা কি বুঝি না আমি! ভিখিরী হ'লেও আমরা মানুষ দীনু। তুমি কি মনে কর, এটুকু বুঝ্‌বার বুদ্ধিও নেই আমার?"

দীনু উঠে বসে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অতসীর মুখপানে। ওর চোখদুটো যেন অতসীর সমস্ত জীবনটাকে নিমেষে ভেদ ক'রতে চায়।—"অতসী!"

অতসী নির্ব্বাক্ ব'সে থাকে; মাথাটা ধীরে ধীরে নুইয়ে প'ড়তে চায় মাটির বুকে। ও পারে না সইতে দীনুর সেই ধারাল দৃষ্টি।

—"চুপ ক'রে রইলে যে?"

—"কি ব'ল্‌ব?"

—"ব'ল্‌বার কি কিছুই নেই তোমার?"

"না।"—অতসী মুখ তুলে চায়।

দীনু উঠে দাঁড়াবার উপক্রম ক'রতেই ওর হাতখানা ধরে' অতসী অনুনয়ের সঙ্গে বলে—"রাগ ক'রো না দীনু। আমি ভিখিরীর মেয়ে; ভিখিরীর মেয়ে হ'য়ে তোমাকে ধ'রে রাখ্‌বার সাহস আমার সত্যি হয় নি। কোন দিনও ভাব্‌তে পারি নি যে—"

বলা হয় না। অতসীর চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

উপেন হঠাৎ আড়ামোড়া দিয়ে ঠাকুরদের নাম নিয়ে উঠে বসে। দীনু মন্ত্রমুগ্ধের মত আবার ব'সে পড়ে অতসীর পাশে।

শিবু মহান্ত যেন একতিলও সইতে পারে না দীনুকে। ওকে দেখ্‌লেই তার মুখখানা কেমন বিষিয়ে ওঠে। চোখ-দুটো মিটমিট করে বিদ্বেষে।—দীনু বোঝে; কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না।

বস্তির লোকগুলো শিবুকে বাঘের মত ভয় করে। শিবু সারাদিন ব'সে থাকে ঘরে; রাস্তায় বড় একটা বেরোয় না। দুপুরে যখন বস্তিটা ফাঁকা হ'য়ে আসে, শুধু কয়েক-জন ঝি আর রাঁধা-বোষ্টুমি ছাড়া আর কেউ থাকে না, তখন যেন শিবুর মূর্ত্তি ফুটে ওঠে সতেজ রূপ নিয়ে। মাঝে মাঝে টহল দেয় বস্তির চারিপাশে, আর মাঝে মাঝে দু'জন সেবাদাসীকে নিয়ে ব্যস্ত হয় কি একটা গোপনীয় কাজে। ওর ঘরের পিছন দিকে যে ছোট্ট রান্নার জায়গাটুকু আছে, সেইখানে ওরা কি যেন করে! দীনু আগেও লক্ষ্য ক'রেছে, কিন্তু তার বেশী অন্য কিছু তলিয়ে দেখবার অবকাশ ওর হয় নি, হয় ত বা দরকারও ছিল না।

সেদিন সকাল থেকে দীনু চুপটি ক'রে বিছানাতেই পড়ে ছিল। জীবনে এবার ওর সত্যি জমে উঠেছে গ্লানি; বেঁচে থাকার অবসাদ ঘনিয়ে উঠেছে মজ্জায় মজ্জায়। পথও আর লাগে না ভাল; ভাল কেন, কেমন একটা বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হ'য়েছে ওই বৈচিত্র্যময় পথ, আর প্রবহমান জনস্রোত। তার চেয়ে এই বস্তির অপরিসর ঘরে ওর ছেঁড়া মাদুরখানার বুকেও যেন আছে একটু মমতা; ওকে উৎক্ষিপ্ত করে না, হাঁটু দুটো অসাড় হ'য়ে আসে না ব্যথায়।—সকাল থেকে দুপুর অবধি তেমনি নিশ্চল পড়ে থাকে।

বস্তিটা নিঝুম হ'য়ে আসে। ওপাশের ঘরে যে ঝিগুলো থাকে, তারা বোধ হয় নিস্তব্ধ দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ে, না-হয় বেরিয়ে যায় কাজে। রাতে ওদের চোখে ঘুম থাকে না। সারা রাত করে কোলাহল। মিস্ত্রি, ফেরিওয়ালা, ড্রাইভার—নানা শ্রেণীর লোকের ভিড় জমে ওদের ঘরে। দিশি মদের গন্ধ আর কুৎসিত রসিকতার কলরবে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে আশপাশের লোক। শিবু মহান্ত সরবরাহ করে মদ। দীনু কত দিন চোলাই-এর গন্ধ পেয়েছে এইখানে শুয়ে শুয়ে।

হঠাৎ শিবুর চীৎকার শুনে দীনু উঠে বসে। লোকটা অকথ্য ভাষায় কার উদ্দেশে গালাগালি করে। অথচ কেউ প্রতিবাদ করে না তার সেই কদর্য্য উদ্‌গীরণের। নিশুতি দুপুরে শিবুর ওই বেয়াড়া গালাগালির কোন অর্থ দীনু ভেবে উঠ্‌তে পারে না। একবার মনে হ'ল, হয়ত ওকে লক্ষ্য করেই শিবু বিদ্বেষের ঝাল মিটাচ্ছে। কিন্তু কেন?—দীনু আস্তে আস্তে দরজার পাশে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখে।

আশ্চর্য্য! শিবুর সেই যমদূতের মত চেহারাটা নিমেষে কেমন আতঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিতে সে প্রখরতা নেই। বক্‌বক্ ক'রে আপন মনে অজস্র গালাগালি দিয়ে চ'লেছে, আর ন্যাতা দিয়ে মুছে বেড়াচ্ছে চালাঞ্চির পানের পিক্। বস্তিরই কেউ, কিম্বা কারো দুপুরের খদ্দের বোধ হয় পান খেয়ে পিক ফেলেছে শিবুর ঘরের সাম্‌নে।—কিন্তু তাই নিয়ে শিবু অমন করে কেন? ফেল্‌লেই বা ওখানে পানের পিক্; উঠানের একপাশে চালাঞ্চির ওই নর্দ্দমায় কি দরকার আছে শিবুর?

দীনু অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে। শিবু যেন ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছে। সন্দিগ্ধ চকিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চায়, আর বার বার ন্যাতাটা জলে ভিজিয়ে এনে মুছে দেয় সেই পানের দাগগুলো।—ওর গালাগালি শুনে পুঁটি আর বিন্দুবাসিনী—দুজনেই বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে; কিন্তু কোন কথা ব'ল্‌তে পারে না ভয়ে।

বিস্ময়টুকু কাটিয়ে উঠ্‌তে দীনুর দেরী হ'ল না। ও সহজেই অনুমান ক'রে নেয় যে, লোকটা ক্রিমিনাল—খুনে। রক্তের দাগ বা ওই রকম কিছু দেখ্‌লেই ওর মাথাটা যায় বিগ্‌ড়ে। ও সইতে পারে না। ওর ওই প্রচণ্ড পৌরুষ নিমেষে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে। পানের পিক দেখেও ওর বলিষ্ঠ দেহটা ভয়ে পঙ্গু হ'য়ে আসে।

সেই সন্ধ্যাতেই শিবুর ঘরভাড়া মিটিয়ে ওরা আবার

উঠে গেল অন্য বস্তির সন্ধানে। দীনু এক রকম জোর ক'রেই নিয়ে গেল অতসীকে। ওর কাণ্ড দেখে কোন কথা জিজ্ঞেস ক'রবারও অবসর পেল না সে। তা ছাড়া, দীনু যে ওর ওপর এমনি ক'রে জোর ক'রবে কোন দিন, একথা ছিল অতসীর স্বপ্নের অগোচর। ওর সারা মন ভ'রে উঠল অকারণ আনন্দের প্রাচুর্য্যে।

* * * *

ব্রততীর জীবনে যে পরিবর্ত্তন দ্রুত প্লাবনের মত এসে পড়েছে, স্যার সি-কে প্রাণপণ চেষ্টাতেও পারেন নি তার গতি রোধ করতে। ওঁর গণ্ডী ছাড়িয়ে তাতু যেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে সরে দাঁড়িয়েছে অনেক দূরে।—ও মানে না আভিজাত্যের শাসন, ও চায় না ঐশ্বর্য্যের উর্ব্বর মাটিতে স্বচ্ছন্দে জীবনের শিকড়গুলো ছড়িয়ে দিতে।—প্রথম প্রথম স্যার সি-কে'র মনে হ'য়েছিল, হয় ত ওই মণি অধিকারীই দিয়েছে তাতুর জীবনে এই বিপ্লব এনে। কিন্তু সে ভুল তাঁর তাতুই দিল ভেঙে।

স্যান্‌চিট্‌ ক্লাবের চাঁদার খাতায় স্যার সি-কে যেদিন দশ হাজার টাকার চেক্‌ জমা দিয়ে, তাতুর হাতে এনে দিলেন মেম্বারশিপের কার্ডখানা, বাপের মুখপানে চেয়ে তাতুর চোখদুটো যেন ধ্বক্‌ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল।—"বাবা!"

ব্রততীর কণ্ঠস্বরে স্যার সি-কে ভয় পেয়ে গেলেন! অপ-রাধীর মত কার্ডখানা ওর সাম্‌নে থেকে তুলে নিয়ে ব'ল্‌লেন—"ওরা যে বল্‌ছিল মা, তু-ই ওদের প্রধান নেত্রী।"

—"আমি?" ব্রততীর শরীরটা উত্তেজনায় ঝাঁকিয়ে ওঠে।

"হাঁ। তোর কল্পনাকেই ওঁরা নাকি আজ রূপ দিয়েছেন বাস্তবে। ওই স্যান্‌চিট্‌ ক্লাব, সাঁ-সুচি ষ্টেজ; তারই সঙ্গে লাইব্রেরী, মিউজিয়ম আর নাচের এম্‌ফি-থিয়েটার!"—স্যার সি-কে হঠাৎ যেন ব্রততীর সাম্‌নেও কেমন বিব্রত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

—"ওঁরা! ওঁরা মানে ত তোমার ওই বন্ধুপুত্র আর আমার বান্ধবীর দল? কিন্তু বাবা, যে দেশে পেটের দায়ে ভাত কুড়িয়ে খায় ডাষ্ট্‌বিন থেকে—শিশুকে অন্ধ করে চোখে লোহার কাঁটা ফুটিয়ে, সেখানে—না, থাক। ওদের কথা ব'লো না তুমি।—আমি চাই ওই বন্ধুদের হাত থেকে মুক্তি।"—ব্রততী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চেয়ে থেকে স্যার সি-কে ওর মাথায় হাত দিয়ে ডাকেন—"তাতু!"

ব্রততী মুখ না তুলেই উত্তর দেয়—"কি বাবা?"

—"আমি ত ওদের জন্যে চাঁদা দিই নি। দিয়েছিলুম তোরই কথা ভেবে। কিন্তু তুই ত আমায় কোন দিনের জন্যেও বলিস্‌ নি তাতু! বলিস্‌ নি, তোর মনের কথা!"

চোখ মুছে ব্রততী বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে বলে—"তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই নি বাবা।"

—"পাগ্‌লি! তোর মুখের হাসি মিলিয়ে গেলে যে কষ্ট পাই, তার চেয়ে বেশী কষ্ট কি তুই দিতে পারিস্‌?"—স্যার সি-কে'র চোখে জল আসে।

ব্রততী একটু ইতস্তত ক'রে বলে—"আমার চোখের সাম্‌নে থেকে পুরনো পৃথিবীটা যেন মুছে গেছে বাবা। দীনু—না; আমি ভুল্‌তে পারি না। ভুল্‌তে পারি না মানুষের দুঃখ।"

—"দীনু?"

—"মিষ্টার সেন। নিঃস্ব হ'য়েছে, তবুও মনে এতটুকু দৈন্য নেই। অদ্ভুত!"—

ব্রততী আবার স্থির হ'য়ে ব'স্‌ল।

স্যার সি-কে পাশের চেয়ারখানা আরও কাছে টেনে নিয়ে ব'স্‌লেন ব্রততীর পিঠের ওপর সস্নেহে হাতখানা রেখে।

ব্রততী আপন মনে বলে—"এত বড় দেশে ওদের মাথা গুঁজ্‌বার একটু ঠাঁই নেই।"

—"তাতু!"—পর্য্যাপ্ত মমতার সুরে স্যার সি-কে ডাকেন।

—"য়্যাঁ।"—ব্রততী করুণ দৃষ্টিতে চায়।

—"তোর মায়ের কথা একটুও মনে পড়ে না আর?"—দীর্ঘশ্বাসে বুকখানা কেঁপে ওঠে।

—"একটু একটু পড়ে। ছবিখানা দেখে এখন বেশ ভেবে নিতে পারি।"

স্যার সি-কে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ব্রততীর মুখপানে। বাপের চোখে এমন নিষ্পলক শাণিত দৃষ্টি ব্রততী আর কোন দিনও দেখে নি। মনে হয়, চোখের ভিতর দিয়ে সমস্ত অন্তরটা যেন বেরিয়ে আস্‌তে চায়।

—"আশ্চর্য্য! সেই আগুন এখনও নেবে নি। তার না-বলা কথা, গোপন অনুভূতির চাপা কান্না বিক্ষোভের

মত জ্বলে উঠেছে তাতুর বুকে।—অম্‌নি আজে-বাজে নানা ভাবনায় বিনিদ্র হ'য়ে উঠ্‌ত শীতের রাত—"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্যার সি-কে আকস্মিক চঞ্চলতায় অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। উনি দেবেন না, কোন মতেই দেবেন না ওদের প্রশ্রয়।—স্যান্‌চিট্‌ সোসাইটির কার্ডখানা টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে তিনি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—"এ তোমার বাড়াবাড়ি তাতু! কার মাথা গুঁজ্‌বার ঠাঁই নেই, তাই নিয়ে নিজের মাথা খারাপ করার কোন মানে হয় না। ওরা এসেছে ওদের ভাগ্য নিয়ে; তুমি পার না শত চেষ্টাতেও তার একতিল লাঘব ক'রতে।"

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে তিনি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্রততী হাসে। সেই কান্নার ভিতরেও ও চেপে রাখ্‌তে পারে না ওর হাসি:—"ভাগ্য! শক্তিমানের হাতে-গড়া ওদের সেই ভাগ্য মাটির বুকে কেঁদে মরে। ওরা মানুষ, সেকথা মানুষেরাই দিয়েছে ওদের জন্মের মত ভুলিয়ে।"

হঠাৎ ব্রততী চম্‌কে উঠ্‌ল—লীলা হালদার, শিপ্রা আর মুরলা নন্দীকে দেখে। ওরা হয় ত আগেই এসে দাঁড়িয়েছিল ওর মুখের দিকে চেয়ে।—পিছনে ব্যানারজি!

* * *

দীনু চেয়েছিল মুক্তি। কিন্তু অনিবার্য্য বিপর্য্যয়ের মাঝখানে পড়ে ওর জীবনের আগাগোড়া গেল আবার উল্টে। ওর কল্পনা, ওর বিশৃঙ্খল জীবনের অবাধ গতি সহসা কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল অতসীর দুর্ভাগ্যকে ঘিরে। একটা ভিখিরী মেয়ে, যার প্রতিদিনের অন্নমুষ্টি আসে চোখের জলে ধুয়ে, তার মুখপানে চেয়েও দীনুর সর্ব্বাঙ্গ আজ আড়ষ্ট হ'য়ে আসে আর্ত্ততায়।

ওদের পল্লীতে লেগেছে মড়ক। আশ-পাশে, বস্তির ঘরে ঘরে মানুষগুলো ম'রছে, কেউ বাইরে, কেউ উঠানে, কেউ বা তলগড়ের চৌকাঠে মাথা রেখে। দীনু বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাদের পানে; কখন বা এগিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে অতসীর পীড়াপীড়িতে।—ওরা মরে; যেন বেঁচে থাকাটাই ছিল ওদের অনধিকার। জন্মের সাথে সাথে বাঁচ্‌বার অধিকার নিয়ে আসে নি এই হতভাগ্যের দল; এনেছিল অপ্রতিবাদে মরবার জন্মগত অধিকার, আগুনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া ঝাঁক ঝাঁক পঙ্গপালের মত। তবুও কাঁদে, হাহাকার ক'রে কাঁদে কেউ। বদ্ধ কান্নার গুমট-বাঁধা শ্বাসগুলো ঘুরে মরে বস্তির ঘরে ঘরে। ওদের নিশ্বাসের বিষাক্ত বাষ্প বাতাসে মিশিয়ে যায় না। ওরা যেমন অযাচিত অতিথির মত এসে আশ্রয় নিয়েছিল মানুষের পান্থশালায়, তেমনি অবারিত যাত্রীর মত একে একে চলে যায় জীবনের বোঝা মাটির বুকে নামিয়ে রেখে।—জীবন্ত পৃথিবীর উৎসবের অন্তরালে অজ্ঞাতে মুছে'যায় মানুষের অবজ্ঞার গ্লানি।

দুদিন দুরাত পথে পথে ঘুরে দীনু যখন ক্লান্তপদে এসে দাঁড়াল অতসীর ঘরের সাম্‌নে, অতসী মেঝেয় পড়ে লুটোপুটি করে কান্নায়; ঘরের এককোণে কচি ছেলেটার প্রাণান্ত চীৎকারে গলা শুকিয়ে উঠেছে।

দীনু একতিলও বিচলিত হ'ল না। ওর অনশন-শুষ্ক ঠোঁট দুখানা একবার মাত্র বিকৃত হ'ল কান্নার আবেগে।—উপেনের মৃতদেহটা ডোমেরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে। উপেন! অতসীর বাবা এতদিন পরে পেয়েছে মুক্তি। ওর জীবন-জোড়া অন্ধকারের হ'য়েছে অবসান, প্রভাত হ'য়েছে সীমাহীন অমানিশা। অসহায় পঙ্গু জীবনটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে রাত্রিদিন পৃথিবীর পথে কেঁদে বেড়ানোর লাঞ্ছনা থেকে উপেন আজ পেয়েছে নিষ্কৃতি।

--"অতসী!"

অতসীর কান্নার বেগ উথ্‌লে ওঠে। ঘরের মেঝেয় মাথা ঠুকে আরও ছট্‌ফট্‌ করে হাহাকারে। লোকগুলোর পা জড়িয়ে ধরে দুহাত দিয়ে; ও কেড়ে নিতে চায়, ছিনিয়ে নিতে চায় ওর বাপের মৃতদেহটা।

—দিনের পর দিন না খেয়ে ম'রেছে খোকা; তার পর ওর মা। এবার উপেন নিল ছুটি!

ওরা চ'লে গেল। দীনু ধীরে ধীরে গিয়ে ব'সল অতসীর পাশে। মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পাণ্ডুর মুখখানার দিকে; অতসীর তখন দাঁতি লেগেছে।

° ° ° °

যেমন করে যাচ্ছিল দিন, আবার তেমনি ক'রেই চলে পর পর আলো-ছায়ার জাল বুনে। কাল যে দিনটাকে মনে হ'চ্ছিল মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর, আজ সেটা সহজ হ'য়ে আসে আগামী কালকে শঙ্কাজড়িত ক'রে।—ওদের জীবনের গতিতেও অমনি করে পর পর নেমে আসে এক একটা সন্ধ্যা; কোলের অন্ধকার কাট্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই ঘনিয়ে ওঠে সাম্‌নের পথে সাজানো আঁধার।—এখন আর ওরা কাঁদে না; ওদের অশ্রু স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে যায় অবসন্ন পিঙ্গলার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।

উপেন পেয়েছে মুক্তি, কিন্তু অতসী পায় নি ছাড়া। ওর পিছু টানের বোঝা ছিঁড়ে পড়বার আগেই, খোকা দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রেছে অতসীর শাখা-প্রশাখা—কচি আলোক-লতার মত নিবিড় আবেষ্টনে।

কেন এলো খোকা! ওর দুর্ভাগ্যের মাঝখানে এমনি অযাচিত আসা, ও ত চায় নি কোন দিন। ও চায় নি মা হ'তে, তবুও খোকা এলো ওর গোপন মনের আশা-আকাঙ্খাকে উদ্বেলিত ক'রে।

অতসী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে খোকার মুখপানে। কখন ওর সারা গা রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে আনন্দের শিহরণে, কখন-বা চোখ ছাপিয়ে আসে জল—ওর সেই ছোট ভাই-এর কথা, মায়ের কথা ভেবে। হঠাৎ মনটা শিউরে ওঠে আতঙ্কে। ম'রেছে, ওরা ম'রেছে, দিনের পর দিন একটু একটু ক'রে ক্ষয় হ'য়ে!—খোকা যদি মরে! তেমনি না খেয়ে যদি তিল তিল ক'রে শুকিয়ে যায়!—ও পারবে না, পারবে না সইতে। নির্নিমেষ দৃষ্টি ধীরে ধীরে নিশ্চল হয় খোকার মুখের ওপর। অমনি ক'রে চেয়ে থাকতে থাকতেই ওর বুকের আঁচল ভিজে যায় দুধে। পর্য্যাপ্ত অমৃত-প্রবাহে দুটি স্তন ব'য়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে ঝ'রে পড়ে দুধ!

দীনু পাশে ব'সে ভাবে। ভাবে ওর অতীত জীবনের কথা, ভাবে অতসীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত্তের কথা। বুকের ভিতরটা আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে হাহাকারে।—ভুল, ভুল; জীবনের প্রতিপদক্ষেপে জমে উঠেছে শুধু ভুলের বোঝা। অতীত মুছে গেছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে; বর্ত্তমান ঘোলাটে হ'য়ে উঠেছে অন্ধকারে, কুয়াসাচ্ছন্ন নির্ম্মম অন্ধকারে ওর চোখ দুটো কেমন ধাঁধিয়ে যায়। এই অতসী কাঁটা তারের বেড়ার মত ঘিরে ধ'রেছে ওর দুর্দ্দান্ত গতিকে। তাই ফলেছে আচম্বিতে ওই ভুলের ফসল: ওর ক্ষণিক দুর্ব্বলতার সিঞ্চনে গ'ড়ে ওঠা আগামী সহস্র ভিক্ষুক বংশের আর-এক আদি পুরুষ। ওই খোকাকে আশ্রয় ক'রেই আবার পৃথিবীতে আস্‌বে অগণিত ভিখিরী; ওরই শাখায় শাখায় ফল্‌বে অসংখ্য অসহায় অন্ধ শিশু!—উঃ।

অতসীর দৃষ্টিটা হঠাৎ ছল্‌কে পড়ে দীনুর মুখের ওপর। —"কি ভাব্‌ছ তুমি অমন ক'রে?"

—"আমি? ভাব্‌ছি—ভিক্ষে আর ক'রব না অতসী।"

—"বেশ ত! আমিই ক'রব ভিক্ষে। তোমাকে ত আর বলি নি কোন দিন।"

দীনু একটুক্ষণ ভেবে আপনমনেই বলে—"তুমি বল নি সত্যি, কিন্তু পুরুষ হ'য়ে আমি পারি না এমনি নিশ্চিন্তে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে।"

কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দীনু কেমন আন্‌মনা হ'য়ে যায়। বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে বলে—"মোট খাট্‌ব;—না হয়, না-হয় রাস্তার লোকের হাত থেকে জোর ক'রে নেব কেড়ে।" তারপর হঠাৎ অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে ব'লে ওঠে—'অতসী, চল্‌ পালিয়ে যাই! পালিয়ে যাই এই মানুষের কোলাহল, এই শহর—লোকালয় ছেড়ে দূর পাড়াগাঁয়ের মাঠে, না-হয় অন্ধকার একটা বনে, যেখানে কেউ কোন দিন নেবে না আমাদের মুখের ভাত কেড়ে। তুমি বাঁধ্‌বে ঘর; আমি মাটি কাট্‌ব।"

অতসী সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে। ওর বুঝ্‌তে সময় লাগে না মোটেই যে, হঠাৎ মাঝে মাঝে দীনুর মাথাটা যেমন বিগ্‌ড়ে যায়, তেমনি বিগ্‌ড়ে গেছে আবার। আবার হয় ত পালিয়ে যাবে কোন দিকে, না-হয় উঠ্‌বে ঝড়।

সরে' এসে ওর গায়ে গা দিয়ে ব'সে অতসী হাত বুলিয়ে দেয় দুটি পায়ে।

অদম্য বেগে দীনুর বুক ছাপিয়ে উঠ্‌তে চায় কান্না। দু'চোখে টলটল করে জল।—"আমার চোখেও জল আস্‌ছে অতসী, পাথরের দেয়ালেও এবার বুঝি ধরল ফাটল! মরীচিকা নয়, জল—জল! মরুভূমিতেও দেখা দিয়েছে জল!"—উৎকট হাসির ঝাপ্‌টায় জলটা কর্ণিকার কোলেই শুকিয়ে যায়।

*   *   *   *

ভিক্ষে নয়, কাজের চেষ্টায় দীনু আবার উঠে-পড়ে লেগেছে। যেমন ক'রে হোক্, একটা কিছু জোগাড় ক'রতেই হবে তার। নইলে—নইলে খোকা আর অতসীকে ক'রতে হবে ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত।—দীনু ঘুরে বেড়ায়, আবার ঘোরে লোকের দরজায় দরজায়। রাস্তার মোড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে একটা মোট পাবার আশায়। কিন্তু জোটে না। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম বিধান ওর ওপর! এত লোক মোট-খেটে করে পেটের সংস্থান, কিন্তু ওর জোটে না দিনান্তে একটি মজুরি।

পথ চল্‌তে চল্‌তে নিজেই কখন ভুলে যায় ওর উদ্দেশ্যের কথা। আন্‌মনে অতিবাহন ক'রে চলে মহানগরীর পথ। মাঝে মাঝে ফিরে চায় পিছনের কোলাহল শুনে, কিন্তু পা-দুটো থামে না।

দীনু যখন চৌরাস্তার মোড়টা ছাড়িয়ে প্রায় এসে প'ড়েছে বীমা কোম্পানীর পাথর কুঠির সাম্‌নে, হঠাৎ ওর নজর প'ড়ল বাদামি রঙের বড় মোটরখানার ওপর। গাড়ীখানা বেগে চল্‌তে চল্‌তে আচম্‌কা ব্রেক দিয়েছে ওপারের ফুটপাথের পাশে!—ভিতরে ব'সে মণি অধিকারী, আর ব্রততীর পাশে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বোধ হয় ওর বাবা—স্যার সি-কে রায়।

ওরা নাম্‌বার উপক্রম করে! দীনু মুহূর্ত্তে কেমন হক্‌চকিয়ে গেল। তারপর পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল বীমা অফিসের পিছন দিয়ে ফিরিঙ্গী-পাড়ার ছোট গলিটার ভিতর।—পিছনে পায়ের শব্দ শুনে হৃৎস্পন্দন যেন অস্বাভাবিক গতিতে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছিল ওর। মনে হ'ল, মণি এসে পড়েছে পিছু পিছু। নিরুপায় হ'য়ে দীনু বাঁকা গলিটার বাঁকে ব'সে প'ড়ল।

সত্যি এসেছে ওরা!—মণি অধিকারী, তার পিছনে ব্রততী। বীমা অফিসের এদিকে, পেভ্‌মেণ্টের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা আশে-পাশে চেয়ে দেখে। ব্রততী উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে চায়, হয়ত ওকেই খোঁজে চঞ্চল দুটি চোখে সেই অফুরন্ত করুণা নিয়ে! কিন্তু কেন? কেন খুঁজ্‌বে সে দীনুর মত একটা অপগত মানুষকে?—ভাব্‌তে গিয়ে দীনুর শরীরের রক্ত হিম হ'য়ে আসে। ওর জীবনে যা ছিল একদিন রোমাঞ্চকর কল্পনা, আজ তার আভাস মাত্রও হ'য়েছে জীবন্ত বিভীষিকা।

ব্রততীর পরণে নিতান্ত সাধারণ একখানা শাড়ি। হাতে ভ্যানিটি কেসটা নেই আর। সর্ব্বাঙ্গের সেই চলমান দ্রুত ভঙ্গী যেন আপনা-আপনি কেমন শ্লথ হ'য়ে এসেছে।

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হ'য়ে আসে।—যদি এসে পড়ে! আর একটু এগিয়ে যদি এসে দাঁড়ায় গলিটার মোড়ে!

কিন্তু আসে না। যেমন আগে-পিছে দু'জনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি আবার যায় ফিরে।—ব্রততী কি বলে; হয়ত ওর কথাই, কিম্বা অন্য কারো।

দীনু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এমনি ক'রে আরও তিন-চার দিন ও ক'রেছে আত্মরক্ষা ব্রততীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে।

ফিরিঙ্গী পাড়ার ভিতর দিয়ে ডানে-বাঁয়ে বেঁকে দীনু উঠ্‌ল একেবারে মিউনিসিপাল মার্কেটের সাম্‌নে এসে। তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। রাস্তার দু'পাশে কলগুঞ্জন তুলে আলোকময় পথরেখাকে মুখর ক'রে চলেছে রকমারি পুরুষ আর নারী।

মোড়টা ফিরে দীনু ময়দানের পথ ধরল। বিস্তৃত পথ, তবুও অবাধে চলা যায় না। দুপাশের ফুটপাথেই জীবন্ত মানুষের ভিড়! ওদের বেঁচে থাকার মাদকতায় দেহ আর মন উথ্‌লে ওঠে পথের পরিসর ছাপিয়ে। ওরা যেন বাঁচ্‌তেই এসেছে পৃথিবীতে। পরিপূর্ণ মন ফেনিল হ'য়ে উঠেছে দিনান্তের প্রমোদবিলাসে। ওদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছুটে চলে স্যাম্পেনের উদ্দাম সজীবতা।

বাঙালী মেয়েদের ভিড় জমেছে;—তরুণ তরুণী, কচিৎ দু-একজন বৃদ্ধ ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে সাম্‌নের গেরুয়া রঙের নতুন বাড়ীটার ফটকে। দীনু থম্‌কে দাঁড়ায়।—"সাঁ-সুচি!"—"স্যান্‌চিট্‌ ক্লাব!"—"প্রগতি ভবন!" ওর মাথার মধ্যে পিল পিল ক'রে ওঠে মগ্ন চেতনার কীটগুলো। মনে হয়, স্বপ্ন; কোন্ সুদূর অতীতের বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নে আঁকা হ'য়েছিল ওর মনে এই "সাঁ-সুচি"; আর তারই সঙ্গে

ক্লাব, লাইব্রেরী, এম্‌ফি-থিয়েটার। ওদের সবুজ সত্ত্বের রেজল্যুশান্!—চোখের কোণ থেকে মগজের ভিতর পর্য্যন্ত ঝিম্‌ঝিম্ করে। সাম্‌নের ছবিগুলো অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। ইলেকট্রিক নিউজের আলো ছড়িয়ে পড়ে ময়দানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি; রূপালি জোয়ারের মত ঢেউ খেলে যায় সবুজ ঘাসের বুকে।

সাঁ-সুচির উদ্বোধন উৎসব শেষ ক'রে ওরা বাড়ী ফিরে যায়। ওদের কল্প-প্রসাদ ধীরে ধীরে নীরব হ'য়ে আসে ঘুমের ছোঁয়ায়।—সাহেবদের হোটেলে তখনও জীবনের উৎসব ধ্বনিত হ'চ্ছে। পিয়ানোর মৃদু শব্দে ঘুমের গান—

*　　*　　*　　*

—"ওদের জন্মের জন্তে কি ওরা দায়ী শিপারিন ?"

—"জন্মের জন্তে হয় ত দায়ী নয়, কিন্তু পরিণতির জন্তে ওদের দায়িত্ব যে নিতান্ত কম, তা স্বীকার ক'রতে আমি মোটেই রাজী নই তাতু!"—শিপ্রা ইংরেজী কাগজখানার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে চোখ বুলিয়ে যায়। তারপর একটু থেমে বলে—"স্ট্রীট নুইস্যান্স বন্ধ ক'রতে হ'লে কর্পোরেশনের হেল্‌প নিতে হয় তাতু, প্রোপাগ্যাণ্ডায় হয় না।"

ব্রততী একটু চাপা তীব্রতার সঙ্গে বলে—"তা জানি। কিন্তু পরিণতির কথা ব'ল্‌তে হ'লে এই কথাই বল্‌তে হয় যে, ওদের ওই পরিণতির জন্তে ওরা যতখানি দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী আমাদের দেশ—আমাদের এই সমাজ, রাষ্ট্র আর নীতি। আমাদেরই কষাইখানায় প্রতিদিন বলি দিয়ে চলেছি আমরা ওই অসংখ্য অসহায় মানুষ-গুলোকে। তুমি কি অস্বীকার ক'রতে চাও সে কথা? এর ফল আস্‌বেই একদিন না একদিন!"

—"নিশ্চয়ই। আস্‌তেই হবে।—যাদের করেছ অপমান অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

অন্য সময় হ'লে লীলা ও মুরলা হয়ত খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ত শিপ্রার কথা শুনে। কিন্তু এখন আর ওরা ঠিক সাহস পায় না ব্রততীকে পুরোপুরি অসন্তুষ্ট ক'রতে। ও প্যাট্রোনাইজ্ না ক'রলেও ওকে উপলক্ষ্য ক'রেই যে স্যার সি-কে দিয়েছিলেন ওদের ক্লাবে দশ হাজার টাকা চাঁদা—আরও হাজার দশেক স্বচ্ছন্দে যাবে আদায় করা, এটুকু শিপারিন না বুঝ্‌লেও ওরা দু'জনে বেশ বোঝে।

ডক্টর ক্যারী তখন ব্যানারজির সঙ্গে কি একটা পরামর্শ নিয়ে ব্যস্ত। শিপ্রার উক্তির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব্রততী বলে—"মণিবাবু, সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমরা চাই আমাদের দাবীকে ষোল আনা স্বীকার ক'রে অন্যের বেঁচে থাক্‌বার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত অস্বীকার ক'রতে। ভেবে দেখা ত দূরের কথা, আমরা চেয়ে দেখ্‌তেও রাজী নই—হোয়াট্ ম্যান্ হ্যাজ্ মেড্ অফ্ ম্যান্—"

—"ম্যান্ হ্যাজ্ মেড্ ?"—শিপ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

এবার ব্রততী কোন কথা ব'ল্‌বার আগেই মণি অধিকারী ব'লে ওঠে—"তা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে বলুন? মাটির বুকে জন্মেও যাদের মাটির ফসলে নেই তিলমাত্র অধিকার, তাদের বঞ্চিত ক'রেছি আমরাই। দেশের মাটি নয়।"

আলোচনাটা উঠেছিল ওদের প্রগতি-ভবনের প্রতিষ্ঠা নিয়ে, কিন্তু কথায় কথায় এসে দাঁড়িয়েছে ব্রততী আর ডক্টর ক্যারীর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 'ওয়েল ফেয়ার' সমিতির প্রসঙ্গে।

মিস্ হালদার আর মুরলার মোটেই ভাল লাগে না ও সব কথা। শিপ্রা ভালবাসে যে-কোন কথার সূত্র নিয়ে নিজের পেডান্‌ট্রি দেখাতে। তাই অন্তত তর্ক ক'রবার লোভেই ও চায় না প্রসঙ্গ উল্টে দিতে।

ওদের আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দেবার মতলবে লীলা হালদার বলে—"কেতকীর উপন্যাসটা হ'য়েছে আশ্চর্য্য রকম রিয়ালিষ্টিক। তোমাদের ওই প্রব্লেমটাই যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে ওর লেখায়।—"তৃষিত দেবতা।"

—"কেতকী ?"—শিপ্রা সকৌতুকে জিজ্ঞেস করে।

—"বোধ হয় পেন্-নেম। কেউ কেউ বলে—ওটা নাকি সাগর ঘোষের লেখা।"

"কেউ কিছু বলুক আর না-বলুক, অন্তত আমাদের কবি সুকুমার চ্যাটার্জ্জী বলেন যে, ওটা তাঁর "মহানগরীর পথ"-এর অবিকল নকল। এমন কি, তিনি নাকি লাইন-গুলো পর্য্যন্ত লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখেছেন।"—মুরলার গাম্ভীর্য্যটা যেন বেশ জমাট বেঁধে আসে।

ডাক্তার অধিকারী বোধ হয় এতক্ষণ কথাটা মন দিয়ে শোনেন নি। মুরলার শেষ কথাটুকু কানে যেতেই ব'লে উঠ্‌লেন—"মোষ্ট ন্যাচারাল! গ্রেট মেন থিঙ্ক য়্যালাইক। হয় ত আগাগোড়াই মিলে গেছে দু'জনের চিন্তাধারা!"

মুরলা ঈষৎ সলজ্জ হাসির সঙ্গে উত্তর দেয়—"আগা-গোড়া ঠিক নয়, তবে মিষ্টার চ্যাটার্জ্জীর একটা ইম্পরটেণ্ট সিন্‌-এর সঙ্গে ওঁর একটা ইন্‌সিডেণ্ট-এর অনেকখানি মিল আছে।"

—"আই সী। নো ফার্দার?—সে কথা আগে ব'লতে হয়। ও রকম সাদৃশ্য ত ঘাসের সঙ্গে অশথগাছেরও আছে। অন্তত একটা ইম্পরটেণ্ট য়্যাস্‌পেক্ট: পাতার রঙ। তাই ব'লে অশথ গাছকে শাঁওয়া ঘাসের নকল বলা চলে না।"—ডাক্তার অধিকারী স্বভাবসিদ্ধ প্রচণ্ড হাসিতে ঘরখানা মুখর ক'রে তুল্‌লেন।

ব্যানারজি এতক্ষণ ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি যে, হালদার আর মুরলার চেষ্টিত ইঙ্গিতটা ওঁকে লক্ষ্য ক'রেই নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে। ওঁরই কথার য়্যানালজি! কা'ল মুরলাকে সাম্‌নে রেখে মিস হালদারকে উনি ব'লেছিলেন—শিপ্রার চালচলনের হাওয়া লেগেছে ওদের দুজনের গায়ে। অবিকল নকল! ব্লাউসের রঙ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে মিলে যাচ্ছে শিপ্রার পছন্দর সঙ্গে।

মুরলার বক্র হাসিতে মুহূর্ত্তে ব্যানারজির মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

ব্রততী অনেকক্ষণ থেকেই ইতস্তত ক'রছিল ব্যানারজিকে কি ব'ল্‌বে ব'লে। কিন্তু সকলের সাম্‌নে সে প্রশ্ন উত্থাপন ক'রতে ওর কেমন বাধে। নানা কথার ভিড়েও মাঝে মাঝে ব্যানারজি আর মুরলার চোখে যে দীপশিখা ঝলক দিয়ে উঠ্‌ছিল, সেটা অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও তাতুর দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন ক'রতে পারে নি। কিন্তু আশ্চর্য্য! ওর মনে তাতে এতটুকুও ক্ষোভ হয় না; বরং স্বস্তিতে হাল্‌কা হ'য়ে আসে ওর ভারাক্রান্ত মনের পর্দ্দাগুলো।

ব্রততীকে নীরব দেখে, শিপ্রা হেসে বলে—"সাঁঝের খেয়ায় কি শেষে ঝড় উঠ্‌বে তাতু?"

—"ঝড় উঠ্‌বে না শিপার, বরং কেটে যাবে চৈতালি মেঘের নিরর্থক সমারোহ। আর, ঝড় উঠ্‌লেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না আমার, আমি করি না সে ভয়। বাঁচ্‌বার পথে ঝড়কে আমি যতটুকু ভয় করি, তার চেয়ে ঝড়ের পথে বাঁচ্‌তে এখন আমার বেশী ভাল লাগে।"—ব্রততী হাসে।

ব্যানারজি একটু বিস্মিত হ'য়ে চায় ওর মুখপানে। মুরলার হাসিতে কেমন একটা লঘু উল্লাসের রঙ!

"ওটা—"

—শীলা কটাক্ষ ক'রে কি ব'ল্‌তে চায়। কিন্তু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্রততী এক নিঃশ্বাসে বলে—"আমার ইডিওসিন্‌ক্রেসী দেখে আপনারা হয় ত আক্রমণ ক'রবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারেন না, কেমন মিস্‌ হালদার? কিন্তু আমি কি চাই জানেন? —আমি চাই পৃথিবীর এই নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বের মাঝখানে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে দিতে। এতকাল যারা নিশ্চিন্তে বেঁচেছে, এবার তারা করুক প্রায়শ্চিত্ত।"

—"ব্রেভো! তুমি কি সিভিল ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রবে তাতু? কিন্তু এ যে স্রেফ্‌ অটো-এগ্রেশন্‌! ডক্টর জাঙ্গ্‌,—আই মীন্‌ বাৎস্যায়ন বলেন—"

শিপ্রার কথা শেষ না হ'তেই মিষ্টার ব্যানারজি ব'লে উঠ্‌লেন—"পার্ভারশন!"

ব্যানারজির শ্লেষটা যেন তাতুর গায়ে টিকের আগুনের মত ছিট্‌কে প'ড়ল। তবুও ব্রততী জোর ক'রে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে শান্ত অথচ প্রখর স্বরে বলে—"মিঃ ব্যানারজি, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে আপনাদের তরফ থেকে যে শিষ্টতা-বোধ আপনা হ'তেই থাকা উচিত, আমার মনে হয় সেটা সম্বন্ধে রিমাইণ্ড ক'রবার সুযোগ অন্তত মেয়েদের যতখানি না দেওয়া যায় ততই ভাল।"

শিপ্রা ও শীলা—দু'জনেই চম্‌কে ওঠে। ডাক্তার অধিকারী স্পষ্ট শুনেও ব্রততীর সঙ্গে তার কথাগুলো মিলিয়ে নিয়ে যেন ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারছিলেন না।—নির্ব্বাক্‌ চেয়ে রইলেন।

মুরলার মুখখানা কেমন অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রত্যন্তর আবহাওয়ার সূচনাটা অনুমান ক'রে ওঁরা সকলেই তখন উঠ্‌বার চেষ্টা ক'রছিলেন। মিষ্টার ব্যানারজির মুখে-চোখে কেমন একটা আড়ষ্টতা!

শিপ্রা কি ব'ল্‌তে যাচ্ছিল; কিন্তু তার কথাটা মাঝপথে আট্‌কে দিয়ে ব্রততী আবার ব'লে উঠ্‌ল—"এক্সকিউজ মি মিঃ ব্যানারজি। সেদিনের মত আমি বদ্‌লে ফেলেছি; সেই সঙ্গে কোর্সটাও।"—মুহূর্ত্তে ওর সর্ব্বাঙ্গে যেন আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল কালবৈশাখীর ঝড়; বর্ষণোন্মুখ, কিন্তু আসন্ন ঝড়ের মত্ততায় চঞ্চল!

ওদের কোন কথা ব'ল্‌বার সুযোগ না দিয়ে ব্রততী

দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শিপ্রা আর হালদার স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ব্যানারজির মুখপানে।

* * * *

অতসী শোনে নি ওর নিষেধ। ওই দুর্ব্বল শরীর নিয়েই ছেলেটাকে বুকে ক'রে বেরিয়েছিল ভিক্ষেয়।—দীনু যা পারে না, যা সয় না তার ধাতে, অতসী প্রাণ থাক্‌তে সে-কাজে হাত দিতে দেবে না ওকে। হ'লই বা কাঙাল, পুরুষ ত! পুরুষ হ'য়ে লোকের দরজায় হাত পাত্‌তে সত্যি হেঁট হয় ওর মাথা। পেটের দায়ে প্রতিদিন কত আর মাথা হেঁট ক'রে বেড়াবে ও!

দীনু যতবারই অতসীকে ব'লেছে—"ভিক্ষেয় বেরিও না, ওই শরীর আর কচি ছেলেটাকে নিয়ে।" অতসী শোনে নি; ও বাধা দিয়েছে। ওর নিষ্প্রভ বড় বড় চোখদুটো তুলে কাকুতির সঙ্গে বলে—"আমার কোন কষ্ট হয় না ওতে। যা পারি, দুমুঠো আন্‌বই কোনরকমে জোগাড় ক'রে। তুমি বরং সেই ফাঁকে খুঁজে দেখ একটা কাজ।—কত দিন ত হ'য়ে গেল! ঠাকুর কি এবারও চাইবে না মুখ তুলে?"

চোখে আগেকার সেই স্বচ্ছতা নেই, তবুও জলে ভ'রে উঠ্‌লে টলটল করে সজীবতায়। সজীবতাও হয় ত আর নেই একবিন্দু;—ওটা মরীচিকা, ওর অতীত নিশ্চিন্ততার সাময়িক সঞ্চয় যে-টুকু লুকিয়ে আছে রেটিনার আনাচে-কানাচে, তা-ই হঠাৎ ঝলক দিয়ে ওঠে কান্নার আবেগে।

সারাদিন পথে পথে টহল দিয়ে দীনু যখন বাড়ী ফিরল, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। এর মধ্যেই বস্তি গুল্‌জার হ'য়ে উঠেছে। ওপাশের ঘরে যে লোকটা কাল সকালে এসে উঠেছিল ঘর-পালানো মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে, তাকে ঘিরে একপাল লোক দাঁড়িয়ে কি কাণাকাণি করে। মেয়েটাকে হয়ত এনেছিল ফুস্‌লিয়ে, দুপুরে আবার পালিয়েছে কার সঙ্গ পেয়ে।

অতসী আজ আর আলোটাও জ্বালে নি। ঘাড়ি-মুড়ি দিয়ে প'ড়ে ঘুমচ্ছে; ছেলেটা কোলের কাছে নির্জীব হ'য়ে পড়ে' আছে। হয় ঘুমিয়েছে, না-হয় হাত-পা গুটিয়ে অন্ধকারে একলা জেগে জেগে ভাব্‌ছে ওর জন্মান্তরের কথা।

একবার মনে হ'ল, জাগাবে না। ঘুম'ক, এমনি ক'রে বোধ হয় কতকাল ঘুম নামে নি ওর চোখে। আবার মনে হয়, সারাদিনের উপোসে শরীরটা ভেঙে পড়েছে ক্লান্তিতে। চা'ল এনেছে দু'মুঠো সেধে, কিন্তু ফুটিয়ে নেবার ধৈর্য্য আর ছিল না ওর অবসন্ন দেহে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত ব'সে থেকে দীনু কেরোসিনের ডিবেটা জ্বাল্‌ল।—অতসী ঘুমোয় নি! ঘোর হ'য়ে পড়ে আছে জ্বরে। গায়ে খই-ফুটান জ্বর! ছেলেটা কুকুর-মাছির মত লেগে আছে বুকে।

মাথার কাছে ব'সে দীনু কপালে হাত দিয়ে ডাকে—"অতসী!"

অতসী অতিকষ্টে চোখ মেলে চায়। চোখদুটো জবাফুলের মত লাল হ'য়ে উঠেছে। কথা ব'ল্‌তে ওর কষ্ট হয়: বুকে পিঠে অসহ্য ব্যথা।

আঁচলে বাঁধা চা'লগুলো দেখিয়ে বলে—"রাঁধ্‌তে আর পারি নি আজ। ভুজাওয়ালার দোকানে বদল দিয়ে মুড়ি আর ছোলা ভাজা এনে খাও।"—অতসী হাঁপায়। দম যেন ওর বন্ধ হ'য়ে আসে ওই কয়েকটি কথা ব'ল্‌তে।

"খাবো অতসী, খাবো। আজ না-হয় কাল নিশ্চয়ই খাবো আবার। খাবার জন্যেই ত এঁটো পাতা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি।"—দীনু কেরোসিনের ডিবেটা তুলে ধ'রে অতসীর মুখখানা ভাল ক'রে দেখে।

কষ ব'য়ে লালা গড়াচ্ছে। লালা!—না, শুধু লালা নয়; তারই সঙ্গে রক্ত!—তাজা রক্ত!

দীনুর মগজের মধ্যে রক্তকণিকাগুলো সিম্‌সিম্ ক'রে উঠল। ডিবেটা নামিয়ে রেখে দু'হাতে অতসীর চোয়াল দুটো ফিরিয়ে ধ'রে ডাক্‌ল—"অতসী!"

অতসী কাঁদে। হু হু ক'রে গড়িয়ে পড়ে উষ্ণ অশ্রু। চোখের জলে দীনুর হাত ভিজে ওঠে।—"রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আচম্‌কা গাড়ীখানা—"—ব'ল্‌তে পারে না। নিঃশ্বাস ঘন হ'য়ে আসে। শ্বাসকষ্টে চোখমুখ কেমন চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।

—"গাড়ী! ধাক্কা লেগেছে মোটরের?"—দীনুর কণ্ঠস্বর কাঁপে।

—"হাঁ। কি ভাগ্যে লাগে নি ছেলেটার গায়ে।"—অতসী পাশ ফিরবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

দীনুর বুকের ভিতর বিকৃত একটা হাসি গুম্‌রে ওঠে।—“ছেলেটাকে লাগ্‌লেও ক্ষতি ছিল না। একটা, একটা কেন, একশোটা ভিক্ষুকবংশের মূল উপ্‌ড়ে যেত।”

কিছুক্ষণ থেমে অতসী আবার বলে—“এই বেলা আন গে মুড়ি। দোকানটা হয় ত বন্ধ হ’য়ে যাবে।”

—“তা যাক্।”—দীনু গুম্ হ’য়ে ব’সে কি ভাবে। তারপর আপন মনে বিড়বিড় ক’রে বলে—“রাত্রিদিন যে লোহার চাকা বুকের পাঁজরাগুলোকে চুরমার ক’রে দিচ্ছে, তার কাছে মোটরের চাকা কতটুকুই বা!”—দীনুর মুখে ফুটে ওঠে একটা বিকৃত হাসি।

—“কাল যদি না-পারি উঠ্‌তে! একমুঠো চা’ল রেখে দিও, সকালে ভিজিয়ে খাবে। কাল, না হয় পরশু—” আরও কি ব’ল্‌তে গিয়ে অতসী থেমে যায়। একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে আবার বলে—“ভিক্ষে ক’রতে দেবে না তোমাকে; কিছুতেই দেব না আমি। যে ক’টা দিন বাঁচ্‌ব—”

—“জানি। যে ক’টা দিন বাঁচ্‌বে, এমনি তিল তিল ক’রে নিজের জীবনটা দিয়ে বাঁচাবে আমাকে, আর বুকের রক্ত দিয়ে বাঁচাবে ওই ছেলেটাকে। কিন্তু কেন? কেন বাঁচাবে অতসী? চিরকাল ধ’রে মৃত্যুযন্ত্রণা সইবার জন্যে মানুষকে রেখ না বাঁচিয়ে। মেরে ফেলো; অজান্‌তে তাজা বিষ মুখের ভিতর গুঁজে দিয়ে মেরে ফেলো—”

দীনু অস্থির হ’য়ে উঠে পড়ে। হঠাৎ অপদেবতা-ভর-করা মানুষের মত চঞ্চলভাবে পায়চারি করে; ঘুরপাক খায় ওই একফালি ঘরের ভিতর।

অবসন্নতার গাঢ় প্রলেপ ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে রাত্রি। বস্তির ঘরে ঘরে লোকগুলো ঘুমিয়ে পড়ে; সারা পল্লী নিঝুম হ’য়ে আসে ঘুমে। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে আবার ঘুমিয়ে প’ড়েছে অতসীর কোলের ভিতর। এতক্ষণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক’রে অতসীও হয়ত ঘুমিয়েছে এবার, কিম্বা অচেতন হ’য়ে আছে জ্বরের ঘোরে।—ডিবেটা জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে আপনি নিবে গেছে কখন! তেল নেই।

* * * *

নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে চলে রাত্রি, নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ে মহানগরীর কোলাহল, কিন্তু দীনুর চোখে একটীবারও লাগে না ঘুমের ছোঁয়া।—উপেন মরেছে, এবার মরবে অতসী—তার পর? তার পর ম’রবে ওই কচি ছেলেটা: পৃথিবীর বুকে পথভুলে-আসা ওই উলঙ্গ পথিক। জন্মের পর জন্ম ওরা অমনি ক’রেই পথ ভুলে এসেছে পৃথিবীতে, আবার নিশ্চিহ্ন হ’য়ে মুছে গেছে গুরুভার ষ্টীম রোলারের নির্ম্মম নিষ্পেষণে। মানুষের হাতে-গড়া লৌহচক্রের চাপে দিনের পর দিন লুপ্ত হ’য়েছে মানুষের অস্তিত্ব। তবুও ক্ষান্ত হয় নি তাদের সেই অবারিত আসা।—ওরা আসে; দলের পর দল রক্তবীজের মত আসে জীবন্ত মানুষের পথে মৃত্যুর বিভীষিকা মাথায় নিয়ে।—ওদেরই সঙ্গে হাত ধরাধরি ক’রে এসেছিল অতসী: আবার ওদের সঙ্গেই ফিরে যাবে। ওর জীর্ণ পাঁজরাগুলোয় ধ্বনিত হ’য়ে উঠেছে মরণের ডাক। চলন্ত মোটরের ঝাপ্‌টায় অচল যাত্রী ওরা ছিট্‌কে পড়ে আবর্জ্জনার মত।

রক্ত!—ওর লালার সঙ্গে একটু একটু ক’রে চুঁইয়ে পড়ে তাজা রক্ত!—ওই রক্তে অতসীর ছিল না কোন অধিকার। করুণার দান কুড়িয়ে কুড়িয়ে যে-রক্তের প্রতিটি বিন্দু সচল হ’য়েছে ওর ধমনীতে, তার ওপর নেই ওর এতটুকু দাবী। যাদের দরজায় কেঁদে কেঁদে হাত পেতে ও চেয়ে নিয়েছে ওর দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা, তাদেরই পায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে ওর বেঁচে থাক্‌বার দাবী।—দীনুর মগজের ভিতরটা টন্ টন্ করে; ফুস্‌ফুসের মধ্যে সুরু হ’য়েছে আগ্নেয়গিরির দাহন।

ঘুমের ঘোরে যেন অতসী কি বলে! বলে—“এই একমুঠো চাল ভিজিয়ে খেয়ে সারাটা দিন পারবে না তুমি থাক্‌তে। একটা দিন! একটা দিন বৈ ত নয়! কাল আবার বেরুব নতুন কোন পাড়ায়।”

দীনু কান পেতে শুনবার চেষ্টা করে। আবার কি ব’ল্‌ছে অতসী! হয় ত প্রলাপ ব’ক্‌ছে “পুরুষ মানুষ; তুমি চেয়ো না কারো কাছে ভিক্ষে। লোকের দরজায় মাথা হেঁট ক’রে—ছি ছি। না না, দেব না আমি, কিছুতেই দেব না তোমায় ভিক্ষে ক’রতে। আজ না-হয় কাল ঠাকুর চাইবেই মুখ তুলে।”

“অতসী!”—দীনু এগিয়ে যায়; ঝুঁকে পড়ে অতসীর মাথার কাছে। না; জেগে নেই। ঘুমিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ ধ'রে অতসীর নাকের কাছে হাত দিয়ে দীনু অনুভব করে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস। মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় না; তবুও মনে হয়, যেন নিঃশ্বাসের প্রতিটি স্পন্দনে কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর সারা গা।

দীনু নিস্পন্দ বসে' ভাবে। ওর চোখের সাম্‌নে কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেসে ওঠে অসংখ্য জগৎ; স্তরে স্তরে সাজানো মৃতকল্প অসংখ্য মানুষের কঙ্কাল! দলে দলে অসহায় অন্ধ শিশু কেঁদে বেড়ায় ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে—ওদের বস্তির বাইরে, রাস্তার চলমান জনস্রোতের মাঝখানে, ফুটপাথে, বাগানে, ফিরিঙ্গীপাড়ার হোটেলের সাম্‌নে, স'াসুচির ফটকটার দু'পাশে!

গলির মোড়ে, ডাষ্টবিনটা ঘিরে ভিড় জমিয়েছে কতকগুলো উলঙ্গ ভিখিরী! ছাই, মরা ইঁদুর, ব্যাঙেজের নেকড়া ঠেলে ঠেলে খুঁজছে পচা ভাত!—দীনু সইতে পারে না। হঠাৎ ওর বুকের ভিতরটা আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে হাহাকারে। মনে হয়, মগজটা বুঝি চৌচীর হ'য়ে ফেটে পড়বে এবার।

অতসী কি বলে;—আবার কি বলে আপন মনে বিড়-বিড় ক'রেঃ "সারাটা দিন না খেয়ে আছ। এর পর দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে। ভুজাওয়ালার কাছে দু'মুঠো চা'ল বদল দিয়ে মুড়ি আর ছোলাভাজা এনে খাও।"

দীনু আর সইতে পারে না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চঞ্চল পদে পায়চারি করে। আজ ওর কান্না পায়। ইচ্ছে করে, চীৎকার ক'রে কাঁদে। কিন্তু বুকের ভিতর দমটা আট্‌কে আসে। তালুটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে।

—ওদের স'াসুচি ষ্টেজের উৎসব শেষ হ'য়ে গেছে। কবিগুরু উদ্বোধন ক'রে গেছেন। সুরেখা গেয়েছে উদ্বোধন সঙ্গীত। মল্লিকা, টুটুল, ডলি, রেবা, অমিয়, দীপা—ওরা সবাই দেখিয়েছে নাচঃ কবিগুরুর নির্ম্মাল্য মাথায় নিয়ে ওরা ভগীরথের মত মাটির মরুভূমিতে আহ্বান ক'রে এনেছে উর্ব্বশীর নৃত্যধারা! ওরিয়েণ্টাল ডান্স! সেই সঙ্গে ঝর্ণা বাজিয়েছে সেতার, রাবেয়ার এস্‌রাজে দুলে দুলে উঠেছে সুরের মূর্চ্ছনা!

—এম্‌ফিথিয়েটারের খিলানে খিলানে সাজানো দেবদারুর ঝালর; ষ্টেজে ছড়িয়ে আছে ছিন্ন-গোলাপের অর্দ্ধ-দলিত পাঁপড়ি; লাইব্রেরীর টেবিলে, মেঝেয়, রাশি রাশি বই-এর মাথায়, অগ্রগামী মানুষের প্রস্তর মূর্ত্তিগুলোর চারিপাশে ছড়িয়ে আছে মুঠো মুঠো শ্বেত-টগর। অগুরু ধূপের গন্ধে ঘরের বাতাস তন্দ্রালু হ'য়ে উঠেছে।

ওদের ওই অমৃত ধারায় স্নান ক'রে বেঁচে উঠ্‌বে মুমূর্ষু পৃথিবী; মুক্ত হবে প্রেতায়িত মানুষের নগ্ন কঙ্কালগুলো! —দীনু হো হো শব্দে হেসে ওঠে। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে নিজের হাসি শুনে ও নিজেই চম্‌কে ওঠে ভয়ে।

হঠাৎ ওর শিরায় শিরায় চঞ্চল হয় রক্তপ্রবাহ। শ্বাস-নালীর ভিতরেও যেন উথ্‌লে উঠেছে রক্তধারাঃ টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফোটে রুদ্ধমুখ কাৎলির জলের মত।—দীনু পাগলের মত ঘরে গিয়ে দেশলাইটা খোঁজে। কেরোসীনের ডিবেটায় আর একবিন্দুও তেল নেই। দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে একবার ভাল ক'রে দেখে নেয় অতসীর মুখখানা।—ঘুমিয়েছে, এবার সত্যি ঘুমিয়েছে অতসী। গালের ওপর জমাট বেঁধে গেছে শুক্‌নো রক্তের কালো দাগ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনু একবার চেয়ে থাকে অতসীর মুখপানে, আর-একবার চায় সেই ঘুমন্ত শিশুটার দিকে। ওর ইচ্ছে করে, অতসীর গলাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধ'রে শ্বাসরোধ ক'রে দেয়, তারপর চেপে ধরে ছেলেটার মুখ। দীনু অস্থির হ'য়ে ওঠে। ও পারে না নিজেকে সম্বরণ ক'রতে;—মুছে দেবে, ওদের অস্তিত্ব চিরদিনের মত মুছে দেবে মাটির বুক হ'তে। বাঁচ্‌বার জন্যে এমনি তিল তিল ক'রে দেবে না ওদের ম'রতে। কব্জির পেশিগুলো শক্ত হ'য়ে ওঠে; আঙুলগুলো বাঘ নখের মত বক্র হয় বুভুক্ষায়।

অদম্য ইচ্ছার আবেগে হাত দুটো কেমন অবশ হ'য়ে আসেঃ সর্ব্বাঙ্গ শির্‌শির্‌ করে কাঁপুনিতে। বিছানার পাশ থেকে অতসীর ছেঁড়া কাপড়খানা নিয়ে দীনু গায়ে জড়ায়; তারপর দেশলাইটা ট্যাঁকে গুঁজে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

* * * *

স'াসুচির পাশেই মস্ত বড় গ্যারেজ। গ্যারেজের উঠানে যমদূতের মত বড় বড় বাসগুলো ঝিম'চ্ছে। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। সব ঘুমিয়েছে। করগেট-শেডের নীচে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে ঘুম'চ্ছে কয়েকজন লোকঃ হয়ত ড্রাইভার, কিম্বা ওদের কারখানার মিস্ত্রি।

চারিদিকে চেয়ে দীনু পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ে সেই

গ্যারেজের ভিতর। একবার ভয় হয়, হয়ত জেগে উঠ্‌বে কেউ ওর পায়ের শব্দে; পরক্ষণেই আবার জেগে ওঠে অসীম সাহস।—একটা টিন, কোন রকমে একটা টিন পেট্রোল যদি হাতে পায় ও!

তেমনি ক'রে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দীনু সন্ত্রস্ত-পদে এসে দাঁড়াল করগেট-শেডটার সাম্‌নে।—ওরা ঘুম'চ্ছে, তেমনি অচেতন হ'য়ে আছে ঘুমে। মাথার কাছে সাজানো টিনের পর টিন পেট্রোল! দীনুর বুকের ভিতর লুটোপুটি করে উল্লাস! শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ ক'রে চেয়ে থাকে ওদের পানে। তারপর ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়।

গায়ের ছেঁড়া কাপড়খানায় ঢেকে পেট্রোলের টিনটা বুকে ক'রে দীনু যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল, তখন গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বাজল তিনটে। সবুর সইছিল না আর। ওর হৃৎপিণ্ডে জমেছে যেন পর্য্যাপ্ত অক্সিজেন; জীবনের প্রাচুর্য্য মুহূর্ত্তে ছাপিয়ে ওঠে অঙ্গে অঙ্গে। দ্রুতপদে দীনু এগিয়ে চলে সাঁস্যুচির দিকে।

গেটে তালা বন্ধ। ছোট ঘরখানায় দারোয়ানটা ঘুম'চ্ছে। দীনু স্বপ্নাহতের মত একবার গিয়ে দাঁড়ায় ফটকটার সাম্‌নে; তারপর নিমেষে কি ভেবে নিয়ে ছুটে যায় ও পাশের ছোট গলিটার মুখে। ওর শরীরে যেন কতকাল পরে ফিরে এসেছে অসুরের বল; ওর কৈশোরের, ওর প্রথম যৌবনের উদ্দাম সজীবতা।

অনায়াসে দীনু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে ঢুকে প'ড়ল ভিতরে। চেনা—আগাগোড়া সবই চেনা ওর। এই পোর্টিকো, কোরিডোর, আর্চ, সাম্‌নের এন্‌গ্রেভ-করা দরজা, সবই যেন ওর চেতনার ভাঁজে ভাঁজে আঁকা! কোথাও এতটুকু অসুবিধা হয় না খুঁজে নিতে।

দরজা খোলা। দীনু কোরিডোর পার হ'য়ে এসে দাঁড়াল এম্‌ফিথিয়েটারের সাম্‌নে। হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সুইচটা টিপে দিতেই জ্বলে উঠ্‌ল একশো পাওয়ারের বাতি। —ওর অতীত কল্পনার স্বপ্নলোক!

সেখান থেকে ক্লাব ঘর, লাইব্রেরী, লাউঞ্জ—সব ফিরে দীনু এসে দাঁড়াল সাঁস্যুচির হলে। এবার একসঙ্গে সব বাতিগুলো দিল জ্বেলে। ঝক্‌মক্ করে ষ্টেজ বর্ণতুলিকার বিচিত্র রেখায় সুসজ্জিত প্রমোদভবন। ষ্টেজের মাথায় নটরাজের ব্রোঞ্জমূর্ত্তি। বাইরে, একপাশে কবিগুরুর ষ্ট্যাচু; অন্যদিকে ছোট পিলারের ওপর শ্বেতপাথরের নগ্ন নারীমূর্ত্তি।

দীনু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ও ভেবে উঠ্‌তে পারে না, হাস্‌বে না কাঁদবে। মনে হয়, প্রচণ্ড হাসিতে ঘরখানা ফাটিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আসে কান্না।

ওদের প্রগতি ভবন! চলমান পৃথিবীর বুকে অগ্রগামী মানুষের পূজার দেউল! চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে দীনুর চোখদুটো ধাঁধিয়ে আসে। ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে ওর দৃষ্টি। মানস চক্ষে ভেসে ওঠে অতসীর রক্তাক্ত মুখ, অন্ধ ছেলেটার করুণ কাকুতি, আর গীর্জ্জার সাম্‌নে সেই মেয়েটার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা: একটা ঘেয়ো ভিখিরীর অর্দ্ধভুক্ত রুটির টুক্‌রো!—দীনু সইতে পারে না, আর তিলমাত্র দেরী সইতে পারে না ও।

ছুটে যায় কবিগুরুর ষ্ট্যাচুটার দিকে; কিন্তু তুল্‌তে পারে না, দুহাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতেও তুলে আন্‌তে পারে না সেই গুরুভার মর্ম্মরমূর্ত্তি। টান্‌তে টান্‌তে সেটাকে নিয়ে যায় খিলানের নীচে; সযত্নে লুকিয়ে রাখে একটা পাশে। তারপর?

—তারপর পেট্রোলের টিন্‌টা দেয়ালে ঠুকে ঢেলে দেয় ষ্টেজে—অডিটোরিয়মে—নগ্ন উর্ব্বশীর দেহে। দেশলাই জ্বেলে দিয়ে দীনু ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে, একেবারে পাঁচিল টপ্‌কে এসে দাঁড়ায় ফুটপাথে। ওর সর্ব্বাঙ্গ তখন থর্‌থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে।

দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল আগুন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছড়িয়ে পড়ে এম্‌ফিথিয়েটার, লাইব্রেরী আর ক্লাব ঘরে। দীনু হাসে, বীভৎস উল্লাসে ওর দেহমনে উথ্‌লে ওঠে হাসি।

—ওদের সভ্যতার দেউলে জ্বেলে দিয়েছে আহবাগ্নি! ওর আপন হাতে জ্বালা পূর্ণাহুতির শিখা পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষ হ'য়ে জ্বলে উঠেছে অগ্রগামী মানুষের বিলাস মন্দিরে।

লোকজন, ফায়ার ব্রিগেড—মানুষের কোলাহল। প্রগতি ভবনের চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে সব।

দীনু ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল ময়দানে। একবার মনে হ'ল, গিয়ে ধরা দেয় ওদের কাছে; কিন্তু প্রবৃত্তি হ'ল না। হঠাৎ বুকের ভিতরটা হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল। মনে হ'ল,

কি যেন গেল ওর! আপনার, নিতান্ত আপনার কোন মহামূল্য সম্পদ গেল আজ ছাই হ'য়ে পুড়ে।—দীনু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো বড় রাস্তার কাছে। কিন্তু পা-দুটো আর এগিয়ে যেতে চায় না।—ট্রামের তারগুলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করে আগুনের আভা। সাহেবি হোটেলের কাঁচের শার্সিতে পড়েছে লাল আলোর ছটা।

দীনু আবার ফিরে গেল ময়দানের পথ ধ'রে হনহন ক'রে এগিয়ে চল্‌ল সাম্‌নের দিকে। সহরের আলো তখন ম্লান হ'য়ে এসেছে। দিক্‌চক্রে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির সোনালি স্নেহ। দূর পল্লীর নীলাঞ্জন তরুশ্রেণী আকাশের গায়ে। স্নিগ্ধ কাজলের মত চেয়ে আছে ওর মুখপানে। ভোরের বাতাসে ওরা হাতছানি দেয় শাখা-প্রশাখা দুলিয়ে। দীনু একবার স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়ায়: মাটীর বুকে এখনও আছে মানুষের অফুরন্ত ঠাঁই।

সমাপ্ত

ঝরো ঝরো আজ ঝরিছে শাওন

শ্রীনিখিলেশ রুদ্রনারায়ণ সিংহ

আকাশে কেবল সজল কাজল—
　　দামিনী খেলিয়া যায়।
আজি এ নিশিতে তারকার মালা
　　মিটি মিটি নাহি চায়॥

ব্যথায় ব্যথায় গুমরি উঠিবে
ব্যথা নাহি বাজে বুকে;
নিদালি আঁখিতে নিদ নাহি হায়
ভাষা নাই আজ মুখে।

বাদল ঝুরিছে, দাদুরি ডাকিছে
কাঁদিছে আমার মন;
উতলা হইয়া প্রিয়ারে খুঁজিয়া
নাহি পায় দরশন।

বরষা আমারে দেয় নি কো সাড়া—
　　সুদূর অজানা গায়॥
সে কাঁদন শুধু ঘুরিয়া মরিছে—
　　আকাশে বাতাসে যায়॥

ঝরো ঝরো আজ ঝরিচে শাওন
শ্রবণে পশিবে গীতি;
পরাণ আমার খুঁজিয়া ফিরিছে
কাহার পরশ প্রীতি।

পথের দু-ধারে অতসীর বন
উপরে মেঘের রাশি—
ব্যাকুলা বাতাস দোল দিয়ে যায়
ঘন ঝাউ বনে পশি'।

নদীর বুকেতে কল-কল ধ্বনি
মেঘের আঁখিতে জল—
আমার বুকেতে অশ্রু-সায়র
উথলিছে অবিরল।

মন কেঁদে ফেরে ঘন বরিষায়
　　নয়নহীনের প্রায়॥
আঁধারের মাঝে প্রিয়ারে আমার
　　খুঁজিয়া নাহি কো পায়

বের্লিনে এক সপ্তাহ

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ রায় বাহাদুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উণ্টার ডেন লিণ্ডেন থেকে গেলাম আমরা অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে (Stadium)। এর নিকটেই একটি রেলওয়ে ষ্টেশন হয়েছে। এখান থেকে পঙ্গপালের মত দর্শকদল ষ্টেডিয়ামে যেতে পারবে, তার ব্যবস্থা হয়েচে। দর্শকদের জলপানের ব্যবস্থা আছে, কেউ মূর্চ্ছাপন্ন হলে তার জন্যে মোড়ে মোড়ে এম্বুল্যান্স, ডাক্তার প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। ষ্টেডিয়ামে এক লক্ষ বিশ হাজার লোকের বসবার স্থান হয়েছে। তারপর সন্তরণের জন্য পুকুর ও ষ্টেডিয়াম আছে, তাতে বিশ হাজার লোক বস্‌তে পারে ; এমনি আরও দু'চারটি ষ্টেডিয়ম আছে। যার যেখানে অভিরুচি, সেখানে সে বসে' স্বচ্ছন্দে খেলা দেখতে পারে। ষ্টেডিয়ামের নীচে রাস্তা এবং তার ধারে খাবারের ঘর, বিশ্রামাগার ও নানাবিধ দোকানপসারের বন্দোবস্ত রয়েচে।

জার্ম্মাণীর প্রমোদ গৃহ

অলিম্পিক উৎসব দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নি। ভীড়ের বহরটা আগেই ঠাহর করতে পেরেছিলাম, কাজেই আমার ভ্রমণ-পঞ্জীতে বের্লিনের যে সময়টা নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, সেটা ঐ উৎসবের ঠিক পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত। এতে আমি যে অনেক দ্রষ্টব্য জিনিষ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম, সে কথাটা পরে অনেকবার মনে হয়েছিল। কারণ এই অলিম্পিক ক্রীড়া-উৎসব এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞের যিনি হোতা—হের হিট্‌লার—তিনি এই উপলক্ষে জার্মাণীর অর্থ জলের মত ব্যয় করেছেন। যে জার্মাণী ঋণভারে কাতর, যে জার্মাণীর ব্যাঙ্কগুলি অল্প দিন পূর্ব্বেও moratorium ঘোষণা করেছিল, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দেনা শোধ করতে যাদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছিল, এ কি সেই জার্মাণী ? জগতের অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে এই ছেলেপিলের খেলাধূলার জন্য প্রায় আট কোটী টাকা উড়িয়ে দিলে! আমাদের কাছে ত এ নিছক পাগলামি বলে মনে হয়।

দুর্গ, গির্জ্জা ও ফ্রেডারিকের মূর্ত্তি

কিন্তু ইউরোপে অন্যরকম। ইউরোপে 'তরুণসম্প্রদায়' (Youth movement) বলে একটি বাস্তব জিনিষ ক্রমশঃ গড়ে' উঠ্‌ছে। আমাদের দেশ নিস্তেজ, ম্রিয়মাণ, তাহলেও পশ্চিমের ঢেউ আমাদের জীবনের উপকূলে একটু আধটু লাগ্‌ছে। তারই ফলে দেখা যাচ্চে, তরুণ সংঘ (Youth League), ছাত্র-সংহতি (Students' Federation) প্রভৃতি আন্দোলন ধূমায়িত হয়ে' উঠ্‌ছে। কিন্তু ওদেশের তরুণের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত। সব দেশেই তাদের মধ্যে একটা চেতনার সাড়া পড়ে' গেছে। আমরা মুখস্ত বুলির মত আউড়ে আস্‌ছি যে তারা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার

স্থল (young hopefuls)। কিন্তু আমরা কাজের বেলায় তাদের পশ্চাতে ফেলেই চলেছি। ইংলণ্ডে এখনও
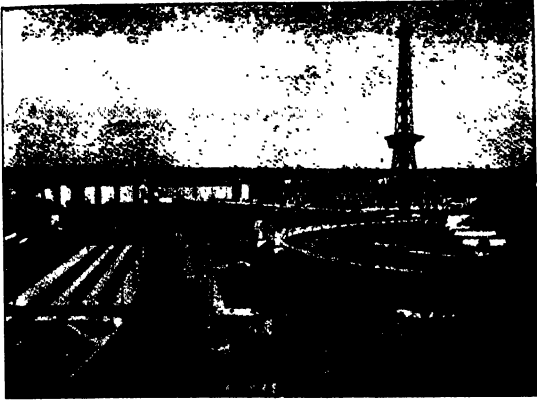
বের্লিন—নূতন ধরণের রাস্তা, বেতার মাস্তুল

কতকটা এই মনোভাব আছে। সেইজন্য বিলাতের বিখ্যাত বাগ্মী পার্লিয়ামেন্টের সদস্য লর্ড ইউষ্টন পার্সি (Lord Euston Percy) এই তরুণ-সম্প্রদায়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌স্‌এ। আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে এই তরুণ সম্প্রদায় মহাদেশে (Europe) এক ভীষণ ক্ষমতাশালী সংঘ হয়ে' দাঁড়াচ্চে (formidable power)। এদের আর অগ্রাহ্য করলে' চলে না। ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামে তরুণেরা হবে অগ্রণী। দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে এদের

বিজয় স্তম্ভ ও ক্রোল রঙ্গমঞ্চ

মতই হবে বলবৎ, কারণ এরা জোট বাঁধলে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষমতা এদের করায়ত্ত হবে।

গত ১৮ই মে লণ্ডনের অ্যালবার্ট হলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ষ্ট্যান্‌লি বল্‌ডুইন সাম্রাজ্যিক তরুণ সভায় বলেছিলেন 'জগতে স্বাধীনতা আজ বিপন্ন; গণতন্ত্রশাসনকে রক্ষা করতে হবে। বাইরের আক্রমণ থেকে গণতন্ত্রশাসনকে (Democracy) রক্ষা করবার ভার তোমাদের; ভিতরের বৈরতা হতেও এ শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে তোমাদেরই এবং হয়ত গণতন্ত্রশাসনের হাত থেকেও গণতন্ত্রশাসনকে রক্ষা করতে হবে। (It may be, you will have to save democracy from itself)।' দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ সেনাপতি স্মাট্‌স্ বলেছেন—
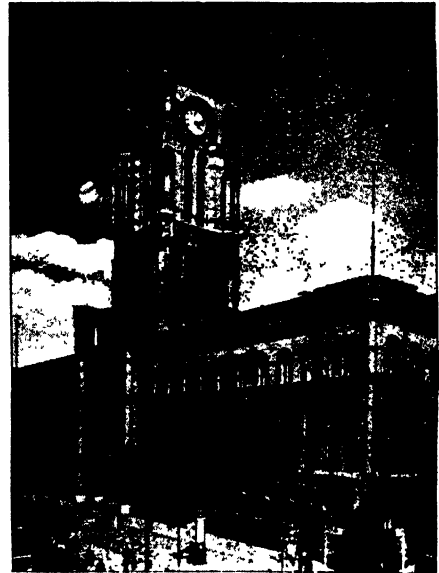
বের্লিনের টাউন হল

'মানব তার তাঁবু তুলেছে এবং যাত্রা সুরু করেছে। কিন্তু সে এগিয়ে যাবে তার আশার আলোকরাজ্যে অথবা পিছিয়ে চল্‌বে দুঃখ ও দৈন্যের গভীর অরণ্যে তা' ঠিক বলা যাচ্চে না।'*

ইউরোপ এখন সশস্ত্রভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে (Standing at armed attention—Stanley Baldwin) এই মরণ-বাঁচন সমস্যায় তরুণের দল যে একটি

* "Humanity has struck its tents and is once more on the march; but it is not certain whether it will march forward to the promised land or backward to the wilderness of sorrow and suffering."—General Smuts.

বিশিষ্ট স্থান করছে, এ ধ্রুব সত্য। তাই হিট্‌লার জগতের তরুণদলকে ক্রীড়াঙ্গনে আহ্বান করেছিলেন এবং তাদের কাছে জার্মাণীর ক্ষমতা, জার্মাণীর প্রতিষ্ঠা এবং জগতের সহিত জার্মাণীর সখ্য এই সব প্রচার করবার বিরাট আয়োজন তিনি করেছিলেন।

যে সকল খেলোয়াড় পৃথিবীর নানাদেশ থেকে জার্মাণীতে এই উপলক্ষে সমবেত হয়েছিলেন, তাদের যত্ন অভ্যর্থনার এরূপ বন্দোবস্ত হয়েছিল যে তা কল্পনা করা যেতে পারে না। বাইরে জার্মাণীর যে তত সুনাম নেই, সে কথা জার্মাণরা জানে। তাই ওরা জগতের তরুণদের কাছে ওদের আবেদন পেশ করবার জন্যই এই অলিম্পিক যজ্ঞের আয়োজন করেছিল। ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের বিবরণ পূর্ব্বেই বেরিয়েছে। তাঁদের কারও কারও সঙ্গে আমারও দেখা হয়েছিল ফিরবার সময়। দারা—

বের্লিনের অস্ত্রশালা

যিনি ভারতবর্ষের নাম হকি খেলায় রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন—আমাকে বললেন যে ওদের যত্ন আপ্যায়নের তুলনা নেই। সে বিষয়ে ওরা চরম করে' ছেড়ে দিয়েছে। সহরের বাইরে যে অলিম্পিক সহর হয়েছিল, জগতের বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড় দল এক একজনের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। প্রত্যেক দলের জন্য একখানা বা দুখানা মোটর গাড়ী (Rolles Royce) দিন রাত্রি হাজির থাকতো। এতদ্ভিন্ন খেলোয়াড়রা তাঁদের বিশিষ্ট চিহ্ন কোটে লাগিয়ে যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই বিনামূল্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন, ট্রামে বিনা ভাড়ায় যেতে পেরেছেন। এসব ছাড়া প্রীতিভোজ, উদ্যান-সম্মিলন প্রভৃতির ত কথাই নেই।

হিট্‌লার স্বয়ং এই খেলা দেখ্‌তে আসতেন এবং তরুণদের মতই আনন্দ করতেন। এই সকল কারণে অলিম্পিক ক্রীড়া-কৌতুক খুবই আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল, আর হিটলারের প্রতিষ্ঠা জগতের কাছে এবং জার্মাণীর কাছে দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল। একদিন একজন যুবতী ত সহস্র সহস্র লোকের মাঝে হিট্‌লারকে আলিঙ্গন করে' চুম্বন করেছিলেন। হিট্‌লার অবিবাহিত। সদ্য-সমাগত-যৌবনা বালিকার মত তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তারে এবং বেতারে বাহিত হয়ে এই সংবাদ পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে তখনই ঘোষিত হয়েছিল। এর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের অধুনা পরিত্যক্ত-রাজ্য সম্রাট্ অষ্টম এড্‌ওয়ার্ডের প্রাণ-নাশের চেষ্টা হয়েছিল হাইড্ পার্কে। এর থেকেই বোঝা যায় যে বাতাস কোথায় কোন দিকে বইছে। এক দেশে চুম্বন, অন্য দেশে পিস্তল!

বের্লিনের রাজপ্রাসাদ (castle)

অলিম্পিক মল্লভূমি থেকে ফিরবার সময় দেখলাম বের্লিনের বে-তারবার্ত্তা ভবন (Broad casting), প্রকাণ্ড প্রাসাদ। তার সম্মুখে একটি হ্রদ। সু-উচ্চ বে-তারের মাস্তুল বহুদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়।

এর পরে আমরা এলাম জার্মাণীর সুবিখ্যাত চিত্রশালায়। পাঁচটি চিত্রশালা প্রায় পাশাপাশি রয়েছে। সবগুলি দেখবার অবকাশ আমার হয় নি। পারগামন (Pargamon) চিত্রশালাটি ভাল করে' দেখতে সারা সকাল বেলা কেটে গেল। আমাদের দেশে নোট, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি একরকম কাগজে ছাপা হয়, তাকে পার্চমেণ্ট (parchment) বলে। চামড়া থেকে এই কাগজ প্রস্তুত হয়।

সম্ভবতঃ এই পার্চমেণ্ট কথাটি থেকে ওর আবিষ্কর্ত্তাদের দেশের নাম পার্গামন হয়েছিল। এসিয়া মাইনর, ব্যাবিলন, আস্থর (Assur), উরুক প্রভৃতির প্রাচীন নিদর্শন এই পার্গামন চিত্রাগারে রক্ষিত আছে। ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শনও একস্থানে দেখলাম। যাঁরা প্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করেন, তাঁদের জন্য প্রাচীন সহর ব্যাবিলনের সিংহদ্বার, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির চিহ্ন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তার ভিতর গেলেই মনে হয় যেন সুদূর প্রাচীনকালের কোনও সহরের ভিতর পথশ্রান্ত পথিকের মত বেড়াচ্ছি। এই যাদুঘর দেখবার জন্য একজন প্রদর্শকের সাহায্য নিয়েছিলাম, তাকে দক্ষিণাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কিছু উপকার তার দ্বারা হয় নি। কয়েকটি ঘর দেখিয়ে সে হস্ত প্রসারিত করলো, বললো যে এই পর্য্যন্ত তার সীমানা। অন্য ঘর সম্বন্ধে সে হয় কিছুই জানে না, নয় ত তার অন্য ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পার্গামন চিত্রশালার প্রবেশ-দ্বারটি অতি সুন্দর। এই চিত্রশালার পাশে একটি ছোট খাল ; খালের উপর প্রশস্ত সেতু ; সেই সেতু পার হয়ে প্রবেশ করতে হয় এই চিত্রশালায়।

বের্লিনের একটি থিয়েটার

এই চিত্রশালার নিকটেই জার্মাণ চিত্রশালা (Deutsh Museum); তার ভিতরেও অনেক বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রাদি রক্ষিত হয়েছে। এই সব দেখে স্প্রী নদীর তীরে এলাম। অনতিদূরে একটি পুরাতন ফ্রান্সিস্কানদের গির্জা ও স্কুল। শুন্‌লাম এই স্কুলে বিস্মার্ক পড়েছিলেন। এর কাছেই একটি যায়গায় সমস্ত ঘর বাড়ী ভেঙ্গে ফেলছে। নতুন প্রণালীতে বাড়ী তৈরী হবে এবং সরকারী দপ্তরখানা কতক কতক এই অঞ্চলে থাকবে। সেখান দিয়ে আলেকজাণ্ডার প্লাজায় এলাম—তার অনতিদূরে নেপ্‌চুন ফোয়ারা। নেপচুনের বৃহৎ মূর্ত্তিটি শক্তির এবং তার নীচে রমণীগুলির মূর্ত্তি স্নিগ্ধতার প্রতীক ; এ দুয়ে মিশে বেশ একটু মাধুর্য্যের সৃষ্টি করেছে—যা' ঝর্ণাধারার বেগ ও কমনীয়তা সুন্দর প্রকাশ করে।

ফিরে আসতে বেলা হয়েছিল। উণ্টার ডেন লিণ্ডেন যেখানে ফ্রিড্‌রিশ ষ্ট্রাসে এসে মিশেছে, তারই মোড়ে একটি বৃহৎ রেস্তঁরায় বসে' কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল এবং কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। একদল সৈন্য ব্যাণ্ড বাজিয়ে উণ্টার ডেন লিণ্ডেনের বুকের মাঝখান দিয়ে গর্ব্বিত পদক্ষেপে চলেছে। আর একজন রমণী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে'

জার্মাণীর জাতীয় যাদুঘর

আমাদের ভোজনবিলাসীদের মধ্য দিয়ে 'ছিগারেট ছিগারেট' বলে ফিরি করে' বেড়াচ্চে। সিগার ও সিগারেটের ট্রে-খানি তার গলদেশ থেকে ঝুলছে। মেয়েটি যৌবনের প্রান্তে উপনীত হয়েছে। কিন্তু তার সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্য যেন উছলে পড়ছে। সে কোনোদিকেই তাকাচ্ছে না, কেবল ডেকেই চলেছে। অবাক হয়ে তাকে দেখলাম, কিন্তু কেউ যে তার কাছ থেকে কিছু কিন্‌ল না এজন্য দুঃখ বোধ হতে লাগলো। ইউরোপের মহাদেশে তামাকখোরের সংখ্যা বোধ হয় কম। কোনও কোনও সহরে দেখেছিলাম Tabac Bar—অর্থাৎ তামাকের 'শুঁড়িখানা'! মদের দোকান আর তামাকের দোকান বোধ হয় ওদের চোখে তুল্য-মূল্য।

বের্লিনের নিকটে পট্‌স্‌ড্যাম একটি অতি রমণীয়

উপবন। ফ্রেডারিক দি গ্রেট এখানে সরোবরে ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, ফোয়ারা নির্ম্মাণ করেছিলেন এবং প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ তৈরী করেছিলেন, তার নাম সাঁ সুসি (Sans Souci) অর্থাৎ 'নিশ্চিন্ত'—যেখানে চিন্তা, ভাবনা, উদ্বেগ কিছু নেই। পট্‌স্‌ড্যাম আমার দেখা হয় নি। সুতরাং তার বর্ণনা করবো না।

বের্লিনে কতকগুলি ব্যবহার্য্য জিনিষ কিনেছিলাম—যথা জুতো, মোজা, কালি ইত্যাদি। একটি ক্যামেরাও কিনেছিলাম। সর্ব্বত্র দোকানদাররা কি স্ত্রী, কি পুরুষ ভদ্র, বিনয়ী এবং ব্যবসাভিজ্ঞ। দরাদরি বিশেষ দেখলাম না। জুতোর দাম তার পিছনেই মুদ্রিত অক্ষরে লেখা আছে। লণ্ডনেও জুতো কিনেছিলাম, সেখানে লেগেছিল এক গিনি, এখানে ১২½ মার্ক। অর্থাৎ প্রায় একই দাম। কিন্তু জিনিষপত্র যেন বের্লিনেই ভাল।

আলেকজাণ্ডার প্লাজা (পার্ক)

দুই একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হোটেলে আলাপ হলো। তাঁদের মনোভাব কথাবার্ত্তায় বড় একটা ধরা দিতে চান না। বিশেষতঃ বিদেশীর সঙ্গে অল্প পরিচয়ে তাঁরা দেশের কোনও খবরই দিতে চান না। তবে যেটুকু সংগ্রহ করতে পারলাম তার নিষ্কর্ষার্থ এই যে যুদ্ধের দাগ তাদের মনের পট থেকে মুছে যায় নি এবং রাগটা বেশী ইংরেজদের উপর। যুদ্ধের আগেও ওদের এই রকম মনোবৃত্তি ছিল বলে' শুনেছি। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া ওরা ওদের এই হিংসা প্রচার করতো।

যুদ্ধে ইংরেজরা জয় লাভ করেছে, জার্মাণীর হা'র হয়েছে। সেজন্যে অবশ্য জার্মাণীর একটা বিজাতীয় রাগ থাকা সম্ভব। কিন্তু সে রাগ ক্রমশঃ পড়ে' যায়। এদের মধ্যে এত বিজাতীয় ঘৃণা কি করে' আবির্ভূত হলো, তাই ভাবতে লাগলাম। মনে হলো যে এ আর কিছু নয়, হ্যাভ ও হ্যাভনটের (Have and Have nots) চিরন্তন বিবাদ। ইংলণ্ডের দূরবিসর্পী (far-flung) সাম্রাজ্য আছে, অর্থবল আছে, উপনিবেশ (colonies) আছে। জার্মাণীর কিছু নেই, কাজেই জার্মাণী ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে' যাচ্চে। এইজন্যে ইংলণ্ডের কোনও কোনও রাজনীতিজ্ঞ বলেন যে জার্মাণীকে তাদের উপনিবেশগুলি (যুদ্ধের আগে যা ছিল) ফিরাইয়া দেওয়া ভাল। কারণ তা হলে তারা শান্ত হবে। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়। যাঁরা

জার্মাণীর সরকারী দপ্তরখানা

উপনিবেশ ফিরিয়ে দেবার কথা বল্‌ছেন, তাঁরা বোধ হয় মনে ভাবছেন যে একদিন না একদিন জার্মাণ-জটায়ু ছোঁ মেরে' নেবেই। মানে মানে ফিরিয়ে দেওয়া ভাল।

জার্মাণীও ধীরে ধীরে উপনিবেশগুলি ফেরত চাইবার জোগাড় করছে। ওদের প্রথম কথা হচ্চে যে ওদের প্রসারের জন্য উপনিবেশগুলির দরকার। দ্বিতীয় কথা এই যে জার্মাণীর শিল্প-উপাদান (Raw Materials) সীমাবদ্ধ। দিন কতক বাদেই সে সব শেষ হয়ে যাবে। তখন উপায় কি হবে? প্রথম কথা সম্বন্ধে বলা যায় যে, বাপু তোমাদের জনসংখ্যা ত খুব প্রবলবেগে বাড়ছে না। তোমরা ছড়িয়ে পড়বার জন্য এত ব্যস্ত কেন? লোকসংখ্যার গড় ইউরোপের মধ্যে বরং বেলজিয়মে বেশী, ইংলণ্ডের প্রত্যেক বর্গ মাইলে

২৭০, জার্মাণীর ১৪০। ইংলণ্ডে জন্মের হার হাজারে ৭, জার্মাণীতেও তাই। রাসিয়ায় ১৭। তার পরে শিল্প-উপাদান সম্বন্ধে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ বলে যে উপনিবেশ থেকে উপাদান শতকরা মাত্র ৩ ভাগ পাওয়া যায়। ফ্রান্সের মত শ্রমশিল্পবহুল দেশেও ত তামা, পারা, গন্ধক, পেট্রল নাই। সুতরাং জার্মাণীর যে উপনিবেশ না হলে চলছে না, একথা সর্ব্বৈব বাজে। যাই হোক, জার্মাণীর মনে এই উপনিবেশ নিয়ে একটা মস্ত ক্ষত হয়ে আছে এবং যতদিন সেটা থাকবে ততদিন জার্মাণী ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারছে না।*

* অনেকদিন আগেকার লেখা। কিন্তু বর্ত্তমান জটিল রাষ্ট্রনীতির কিছু কিছু আভাস হয় ত এর মধ্যে পাওয়া যাবে। —লেখক

পট্‌স্‌ড্যাম পার্ক—বের্লিন

বিরহিণী

শ্রীকালিদাস রায়

চারিদিকে অন্নকষ্ট হাহাকার ব্যাধির পীড়ন,
অবিচার, অত্যাচার, দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব হরণ,
রণাঙ্গনে আহতের আর্ত্তনাদ ঘরে ঘরে শোক,
অসংখ্য জ্বালায় আজ জ্বলে' মরে জগতের লোক ;

তার মাঝে এ বর্ষায় বাতায়নে বসি একাকিনী,
প্রবাসী দয়িত লাগি কে গো তুমি দীনা বিরহিণী
করিতেছ অশ্রুপাত ? সাধ ক'রে বিলাসব্যসন,
সুকোমল শয্যাসুখ, রূপসজ্জা, সর্ব্ব প্রসাধন

তেয়াগেছ। ব্যর্থ হয় হেন ঘন বরষার দিন,
তাই ভাবি নেত্র তব অশ্রুভরা, তনু তব ক্ষীণ,
মুখ শতদল ম্লান। কাঁদ কাঁদ বিরহিণী নারী
তোমার সখের দুঃখে ফেলিবে না নয়নের বারি

কোন কবি এই যুগে। তব গূঢ় হৃদয়বেদনা
বিশ্বেরে জানাতে কেহ করিবে না শ্লোকের রচনা

বিনাইয়া বিনাইয়া, অপব্যয় কবিকল্পনার
করিবে না কেহ তব অতি তুচ্ছ বিরহ ব্যথার
কথা নিয়ে। এই যুগে তাহাদের নাহি অবসর,
হংসদূত রচিবার কল্পনাই এবে হাস্যকর।

সে যুগ গিয়াছে চলি যেই যুগে তোমাদের কথা,
উপজীব্য করি কাব্য রচিবার ছিল চিরপ্রথা,
ছিল কিছু সার্থকতা। তোমাদের বিরহবিলাস
যাহাদের কাব্যচ্ছন্দে বিরচিত দিব্য রসোল্লাস

নির্ম্মূল সে কবিকুল। যুগ গেছে নিয়ে কাব্যধারা,
দরদী কবির দল, কালসিন্ধু মাঝে আজ হারা।
বিরহ তেমনি আছে পুরাকালে আছিল যেমন
এখন বিরহ শুধু হাস্যকর অরণ্যে রোদন।

কাঁদ বিরহিণী নারী। চাহিবে না কেহ আজ ফিরে
দশমী দশায়ও যদি উপনীত হও ধীরে ধীরে।

বিজ্ঞান-প্রবাহ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ঘূর্ণায়মান ফাইল

জরুরি চিঠির অনুসন্ধানে কেরাণীবাবুদের অনেক সময় নাজেহাল হ'তে হয়। সম্প্রতি সাগরপারের অফিসগুলিতে ঘূর্ণায়মান ফাইলের আবিষ্কারে সেখানের কেরাণীরা আশ্বস্ত হ'য়েছেন। এই ফাইলে ২৫০০০ চিঠির উপযোগী স্থান আছে। দ্রুত এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অল্প আয়াসে ফাইলের চাকা

ঘূর্ণায়মান ফাইল

ঘুরিয়ে দরকারী চিঠির সন্ধান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। এমন কি এক হাত দিয়ে প্রত্যেক চিঠিগুলি স্বতন্ত্র ভাবে স্থানান্তরিত করা বা ফাইল মধ্যে সংরক্ষিত করা যায়। আমাদের দেশে এইরূপ ফাইলের চলন হ'লে কেরাণীকুল রক্ষা পায়।

অপরাধী ব্যক্তির মাথার মাপ

খরিদদারগণের টুপির মাপের জন্য যে উপায় টুপি-বিক্রেতারা অবলম্বন করে, তা' বর্ত্তমানে অপরাধী ব্যক্তিগণকে সনাক্ত করতে পুলিশকে সাহায্য করছে। বর্ত্তমানে রাসায়নিক বিজ্ঞানের ও অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যার প্রসার লাভে অপরাধী ব্যক্তি অনায়াসে আঙ্গুলের ছাপ পরিবর্ত্তন করতে পারে। কিন্তু মানুষ তার মাথার খুলির আকার পরিবর্ত্তন করতে পারে না। পরীক্ষা দ্বারা আরও দেখা গেছে এক-জনের মাথার মাপ অন্যজনের সহিত সমান নয়। সেইজন্য বর্ত্তমানে অপরাধীদের মাথার সঠিক মাপের জন্য এক যন্ত্রের

মাথার মাপ লইবার যন্ত্র

আবিষ্কার করা হ'য়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে অপরাধী বেশী দিন আর আত্মগোপন করতে পারবে না।

আলোর কাচ অপসারণ

বর্ত্তমানে এক প্রকার বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের আবিষ্কার হ'য়েছে। তার সাহায্যে মোটর গাড়ীর বড় আলোর কাঠাম-বিহীন কাচগুলিকে নিরাপদে স্থানচ্যুত করা যায়। যন্ত্রটিকে

কাচ অপসারণ যন্ত্র

আলোর কাচের মধ্যভাগে বসিয়ে যন্ত্রের উপরের হাতল সাহায্যে বায়ু নিষ্কাশন করা হলে যন্ত্রটি কাচের সহিত

দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়। এইরূপ যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বেশী হ'লেও ইহার সাহায্যে কত আলোর কাচ যে নিঃশব্দে বেহাত হ'বে তা ভেবে অনেকেই সশঙ্কিত হবেন।

শিক্ষানবিস চালকদের ব্যবস্থা

যানবহুল সহরে শিক্ষানবিস মোটর চালকদের নিরাপদে মোটর শিক্ষার জন্য জন এল ইয়ঙ্গ এক অভিনব উপায়

আবিষ্কারক জন এল ইয়ঙ্গ

আবিষ্কার করেছেন। চিত্রে মোটরের সম্মুখ ভাগে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি লাগান হ'য়েছে। এই বিজ্ঞপ্তির মর্ম্ম অপর মোটর চালকগণের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং তাহারা এইরূপ গাড়ীর আবির্ভাব লক্ষ্য করলেই পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করে।

অভিনব মোটর

এই সভ্যতার যুগে নূতনের আবির্ভাব নিত্য। মনোরম যানবাহন হিসাবে যার আজ আদর বেশী কিছুদিন পরে তারও আর অস্তিত্ব থাকবে না। বর্ত্তমানে একটি সুদৃশ্য মোটর যানের আবির্ভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নিখুঁত ইস্পাতে গাড়ীর বহির্ভাগ দৃঢ়ভাবে আবৃত হ'লেও অনায়াসে তা খুলে ফেলা যায়। গাড়ীর যন্ত্রাদি যথাস্থানে পুনরায় সংযুক্ত করতে মাত্র পনের মিনিট সময় লাগে। যিনি এই মোটর যানের আবিষ্কারক তিনি বলেন, গাড়ীর

সুদৃশ্য মোটর যান

সকল যন্ত্রপাতি দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছে। গাড়ীর ছাদের আলোটি সম্মুখের রাস্তা ও গাড়ীটিকে একই সময়ে আলোকিত করে। ফলে অন্ধকারেও গাড়ীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বজায় থাকে। উত্তপ্ত যন্ত্রাদি ঠাণ্ডা রাখবার জন্য পার্শ্বস্থ পথ দিয়া বায়ু চলাচল করে।

অভিনব পেলিকেন 'এ্যাস ট্রে'

অসাবধানতার জন্য সাধারণ 'এ্যাসট্রে' হ'তে অগ্নিকাণ্ডও হয়েছে—তাই অভিনব 'এ্যাস ট্রে'র আবিষ্কার। আবিষ্কারকের বিশ্বাস এইরূপ পাত্রই একমাত্র নির্ভরশীল।
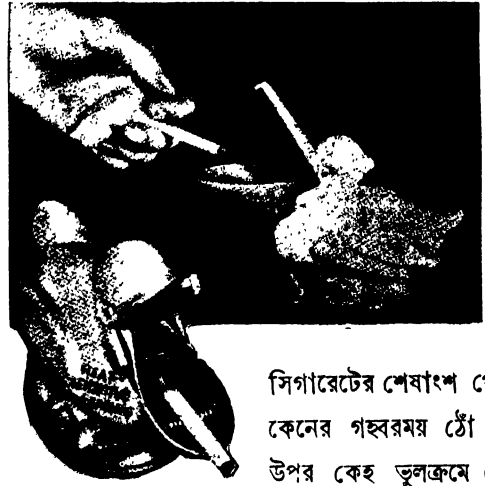
পেলিকেন 'এ্যাস ট্রে'

সিগারেটের শেষাংশ পেলিকেনের গহ্বরময় ঠোঁটের উপর কেহ ভুলক্রমে রেখে গেলেও উত্তাপ অনুভবনীয় স্প্রীংটী উত্তপ্ত হ'লেই পেলিকেনের ঠোঁট দু'টিকে বন্ধ করে দেয়—ফলে সিগারেট খণ্ড তার শরীর মধ্যস্থ গহ্বরে সমাধিলাভ করে।
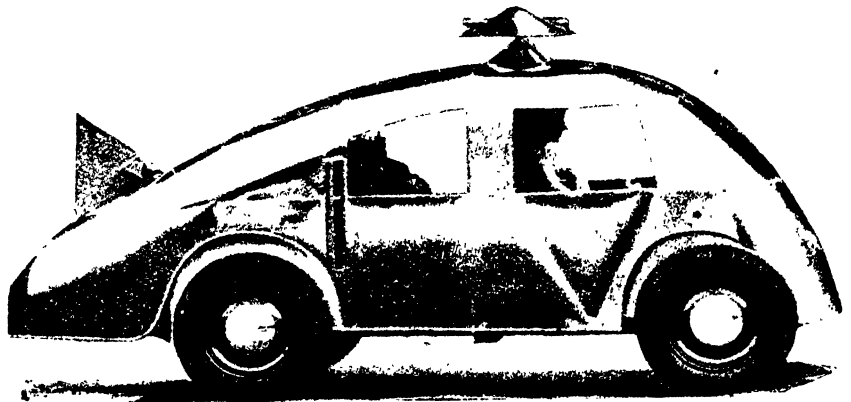
শাকশব্জীর তৈয়ারী পুতুল

ব্যঙ্গচিত্রে ক্রীড়ারত খেলোয়াড়দের বিচিত্র ভঙ্গি দেখে আমরা আমোদ পাই। দশ বৎসর বয়সের মেধাবী বালক হ্যারোগু ব্রাউন শাকশব্জী থেকে খেলোয়াড়দের বিচিত্র ভঙ্গিমাকে রূপ দিয়েছে। এই ছেলেটির বুদ্ধিকৌশলে আলু, পটল, কমলালেবু প্রভৃতি কিরূপে মানুষ ও তাদের খেলার সরঞ্জামে রূপান্তরিত হয়েছে তা' ছবিতে দেখান হ'ল।

ডান দিকের ছবিটিতে ব্রাউন মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। বাম দিকের ছবিটি একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের। খেলোয়াড়ের শরীর আলু দিয়ে, হাত পা গুলি শাকের ডাটা থেকে আর পায়ের বুট বাদাম থেকে তৈয়ার হয়েছে।

উপরের ছবিটিএকজন সাইকেল চালকের। চালকের বিস্ফারিত চক্ষু, লম্বা নাসিকার অগ্রভাগ ও সাইকেল চালনার ভঙ্গিমা প্রভৃতির সংমিশ্রণ ছবিটিকে সত্য সত্যই বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

বাম দিকের ছবিটি একজন পোলো খেলোয়াড়ের।

রাশিয়ান ট্যাঙ্ক

একটি রাশিয়ান ট্যাঙ্ক অদ্ভুত কৌশলে নগ্ন সেতুর উপর দিয়ে নদী অতিক্রম করছে।

রাশিয়ান ট্যাঙ্ক

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শব্দ শৃঙ্খল প্রতিযোগিতা

শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতার ছড়াছড়ি চারিদিকে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতার খবর কয়জনে রাখেন?

সম্প্রতি ইউরোপের বাজারে একটি শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা বের হয়েছে। তাতে সর্ব্বসমেত ৩০৭১টি শব্দ আছে। কুপনের কাগজটি লম্বায় ৩৪ ইঞ্চি ও চওড়ায় ২৮ ইঞ্চি। এর সমাধান করতে পূর্ণ এক বৎসর লাগবে। হতাশ হ'বার কারণ নেই—সময় এখনও আছে। অন্যান্য সকলের ন্যায় ইহারও সমাধান শীলযুক্ত খামে পাঠাতে হ'বে। পুরস্কারের পরিমাণ আশাপ্রদ।
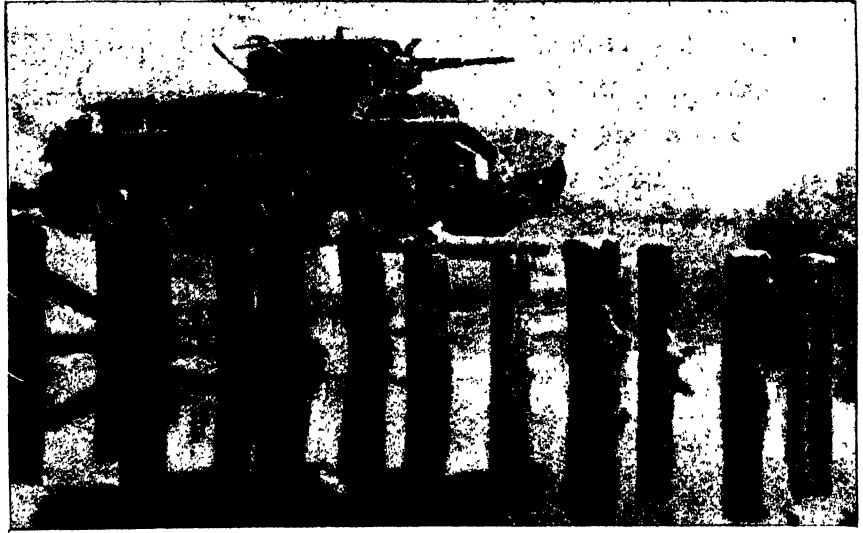
সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শব্দ শৃঙ্খল কুপন

শিশুদের গ্যাস মুখোস

তিন বৎসরের গবেষণার ফলে বৃটিশ নক্সাকাররা বিষাক্ত গ্যাসের হাত থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য গ্যাস মুখোস তৈয়ার করেছে।

সকলপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে এই জাতীয় মুখোস

শিশুদের গ্যাসমুখোস

শিশুদের উপযোগী। চিত্রে জনৈক ইংরাজ মহিলা তার সন্তানকে মুখোস পরান অভ্যাস করছেন। মুখোসে আলোক-সঞ্চারী আবরণ থাকায় শিশুকে দেখা যাচ্ছে। নিম্ন-ভাগের একটি যন্ত্রে বায়ু পূর্ণ থাকে। প্রয়োজনীয় সময়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ঐ যন্ত্র হ'তে শিশুকে বিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহ করা হয়।

সাধারণ পিঙ্গলবর্ণের গিরগিটিকে বিচিত্র বর্ণে রূপান্তরিত করা হ'য়েছে

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ডাঃ টিউটী গিরগিটির ভাগ্য পরি-বর্ত্তন করছেন ; ডান দিকে গিরগিটির ভ্রূণকে বৃহৎ আকারে দেখান হ'য়েছে

প্রাণীর দৈহিক গঠন পরিবর্ত্তন

প্রকৃতির খেয়ালে জীবজগতে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই না সংঘটিত হয়। বর্ত্তমানে কালিফোরনিয়ার ষ্ট্যানফোর্ড· ইউনিভারসিটির অধ্যাপক ডাঃ ভিক্টর সি টুইটী বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবের দৈহিক গঠন ও বর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করে বিজ্ঞানের এক নূতন যুগ এনেছেন। গিরগিটি জাতীয় এক উভচর প্রাণীর দেহে অস্ত্রোপচার দ্বারা সাধারণ পিঙ্গল বর্ণের ঐ জাতীয় প্রাণীকে তিনি বিচিত্র বর্ণের গিরগিটিতে রূপান্তরিত করেছেন। সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার দ্বারা ঐ জাতীয় উভচর প্রাণীর দেহে অতিরিক্ত পা এবং অস্বাভাবিক স্থানে চক্ষু, মাথা প্রভৃতি উৎপাদন করতেও সক্ষম হ'য়েছেন।

এইরূপ পরীক্ষার ফলে একদিন মানুষের দৈহিক গঠন ও বর্ণ বৈচিত্রের উপর যে কৃত্রিম শক্তি ধারণ করা যেতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করেন। ডাঃ টুইটী সাধারণ বিচিত্র বর্ণের গিরগিটির বর্ণপ্রস্তুতকারী রঙ্গগুলি (Pigment cells) সাধারণ একবর্ণের গিরগিটির প্রথম অবস্থার ভ্রূণে সংযুক্ত করে তাহাকে বিচিত্র বর্ণের গিরগিটিতে রূপান্তরিত করেছেন।

মাছ ধরা ছিপ রাখার ব্যবস্থা
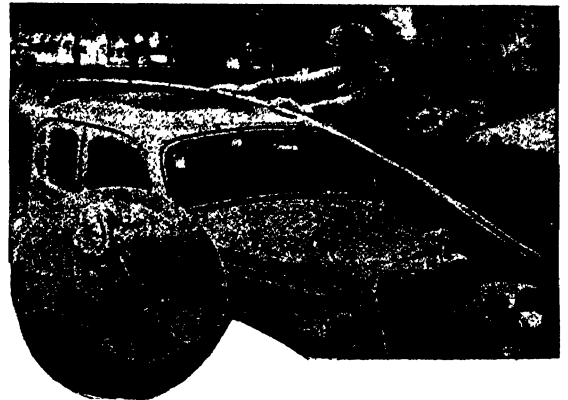
গাড়ীর চালে মাছধরা ছিপ

মাছ ধরা সখ মিঃ চেম্বারলেনেরও যখন আছে তখন আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত কেরাণীদের এ খেয়ালকে অবজ্ঞা করা যায় না। ছুটির দিনে তাঁদের ছিপ হাতে ট্রামে, বাসে, সাইকেলে ও হেঁটে যাওয়ার ব্যস্ততা লক্ষ্য করবার মত।

প্রলোভন দেখিয়ে মাছকে কাবু করবার ব্যবস্থা অনেক রকম থাকলেও এই লম্বা ছিপটিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই অসুবিধা ভোগ করেন। সম্প্রতি ছিপটিকে নিরাপদে রাখবার ব্যবস্থা করে কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁদের এই দুর্গতির ভার লাঘব করেছেন। অবশ্য আমাদের দেশে এইরূপ ব্যবস্থায় বেশী সংখ্যক লোকই খুসী হ'বেন না। মটর গাড়ীর চালে চিত্রে বর্ণিত অবস্থায় ছিপটিকে রাখবার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

বেড়ার আড়াল

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চিতার বেড়াটি কুটীর দুটিরে রেখেছে আড়াল করি—
প্রকৃতির বোনা পর্দ্দাটি যেন—পাতার নীলাম্বরী!

তারি পার হ'তে সকালে ও সাঁঝে কানে আসে মাঝে মাঝে
কাঁচের চুড়ীর আওয়াজটি কা'র বাসন-মাজার কাজে!

কূপের ধারটি মুখরিত তার কলসে ও কঙ্কণে
স্নানের বেলাটি নিতি নিতি মোর জাগায় চকিত মনে।

গৃহ-গাভীটির উদ্দেশে তার কলকণ্ঠটি শুনি—
বেড়ার এপারে তাই নিয়ে আমি জল্পনা-জাল বুনি!

অনুকূল বায়ে ভেসে আসে যবে মাথাঘষা-সৌরভ,
ঘরে বসে করি কত কল্পনা সম্ভব-অসম্ভব!

মনে-মনে ভাবি একলা-ঘরের আকুল আকিঞ্চন
চির-অভাগিনী প্রতিবেশিনীর প্রগল্ভ প্রসাধন!

ন'ড়ে উঠে বেড়া—কেঁপে উঠে মন—চোখ মেলে দেখি চেয়ে
ছায়াখানি শুধু—গাভীরে টানিয়া সরায় তরুণী মেয়ে।

নিতি প্রাতে যবে মৃদু সুকণ্ঠে গীতিগুঞ্জন শুনি,
বেড়ার এপারে একা শুয়ে আমি বাসনার জাল বুনি।

সেদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে' সহসা দেখিনু চেয়ে—
মোরই আঙিনায় গাভীর দড়িটি টানাটানি করে মেয়ে!

বেড়াখানি ভাঙা! এপার-ওপার অবাধ অবন্ধন—
জীবনে যেন-বা প্রথম খুলিল দক্ষিণা-বাতায়ন।

নূতন আলোকে ভ'রে গেল আঁখি, বাধা আর নাই কিছু।
ভাঙা বেড়া হ'তে কহিল কাতরে, নয়ন করিয়া নীচু

ভারী দুরন্ত গরুটি—দেখ তো—ভেঙেচুরে একাকার!
হাসিয়া কহিনু—নহিলে কি আলো আসিত পূর্ণিমার?

ভ্রূকুটি হানিয়া হাসিমুখে বালা শিরে টানি দিল বাস—
ওপারে-ওপারে মরা-গাঙে ভরি' জুয়ারের উচ্ছ্বাস!

আচার্য্য মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত জ্ঞান মানুষকে কুসংস্কারের দাস করে এবং সকল প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতি উদাসীন করে এইরূপ একটি ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু সে ধারণা কখনও সম্পূর্ণরূপে সত্য হতে পারে না; কারণ সংস্কৃত কৃষ্টির বয়সের প্রাচীনতার দোষে বাইরে ময়লা জমলেও তা ভিতরকে কলুষিত করতে পারে নি, ভিতর সত্যই সাঁচ্চা আছে। এমনও দেখা যায় যে সংস্কৃত শিক্ষা এবং সংস্কৃত কৃষ্টির আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েও কোন কোন ব্যক্তি সমাজ-সংস্কারের অনুরাগে, স্বাধীন চিন্তার প্রতি নিষ্ঠায় এবং সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিতে সকলের অগ্রণী হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী তার অন্যতম উদাহরণ।

চব্বিশ পরগণায় খাঁটুরা গ্রামে এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয় ২৪শে এপ্রিল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১০ই বৈশাখ ১২৭২ অব্দে। তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মাতামহ ভগবানচন্দ্র তর্কালঙ্কার এই অঞ্চলের এক বিশিষ্ট টোলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার কয়েক বছর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। এই সংস্কৃতের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়ে বাল্যকালে তিনি কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষা করেছিলেন এবং স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে হয় ত তিনি আস্তেন না।

কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ঘট্‌ল অন্য রকম। তাঁর পিতা ধরণীধর শিরোমণি মারা গেলেন তাঁকে মাত্র দশ বছরের বালক রেখে। ফলে এক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, তাঁর বিধবা মাতা তাঁর একমাত্র পুত্রের প্রতি কেবল আদরের মাত্রা পরিবর্দ্ধিত ক'রেই তাঁর পিতার অভাব মোচন করতে চেষ্টা করলেন এবং তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে হলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। এইরূপে দু-এক বছর কাট্‌ল। কৈশোরের প্রারম্ভেই এই বালকের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হ'ল। তিনি নিজেই নির্দ্ধারণ করলেন যে, কলিকাতায় গিয়ে বিদ্যা শিক্ষা করবেন। মায়ের আদর এবং মায়ের প্রতিবাদ তাঁর সে প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে বিচলিত করল না। তিনি বেশ বয়স্ক অবস্থায় সংস্কৃত কলেজের স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন, কিন্তু প্রতি বছর ডবল প্রমোশন লাভ ক'রে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯০ অব্দে তিনি সংস্কৃত এম.এ পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে উত্তীর্ণ হন।

এমন অনেকে থাকেন যাঁদের মানসিক শক্তি এত পরিবর্দ্ধিত যে কেবল একটি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি তাঁদের তৃপ্তি দেয় না। মুরলীধরের প্রতিভা সেই ধরণের ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে এম্-এ হয়েও তাঁর ইংরেজীতে অধিকারের খ্যাতি এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে, ইংরেজীর অধ্যাপক রূপেই প্রথম চাকুরী পেতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি। ১৮৯১ সালে তিনি কটক রেভন্‌শ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৯০৩ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তিনি ইতিহাসের, দর্শনের এবং সংস্কৃতের অধ্যাপকতা কার্য্য করেছিলেন। পরে ১৯১৭ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয় তখন তাঁর উপর প্রাকৃত ভাষা অধ্যাপনার কার্য্য ন্যস্ত হয়। বলা বাহুল্য তার কারণ এই যে, এ বিষয়ের ভার গ্রহণ করবার উপযুক্ত অপর ব্যক্তির তখন অভাব ঘটেছিল। তিনি ১৯১০ সাল থেকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর পর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পরেও তাঁর অধ্যাপনা কার্য্যের সহিত বিচ্ছেদ হয় নি। তিনি বরাবর, মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্য করেছিলেন। মোটামুটি বহু বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যই তাঁর প্রতিভার বিশিষ্টতা ছিল।

মুরলীধর যে সমস্ত পুস্তক রচনা ক'রে গেছেন তা সংখ্যায় বেশী নয়; কিন্তু চিন্তাধারায় তাদের মৌলিকতা আছে, তাই হ'ল তাদের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষায় অন্ধভাবে কেবলমাত্র নিছক স্মরণ শক্তির সাহায্যে বিষয় আয়ত্ত করা তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। সকল বিষয়ই বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে
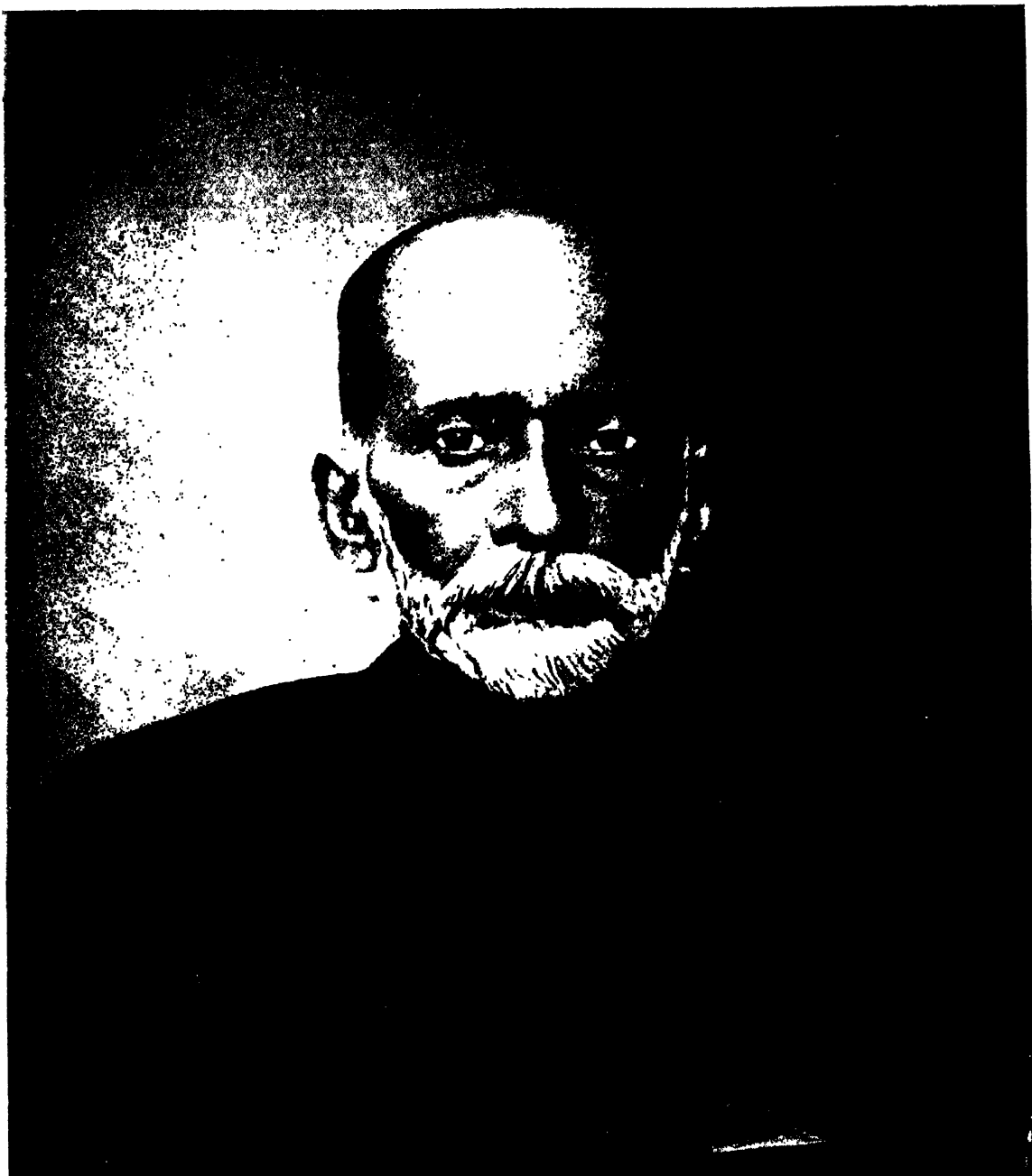
জন্ম—২৯শে এপ্রিল, ১৮৬৬ আচার্য্য মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যু—১০শে নভেম্বর, ১৯৩৩

হজম ক'রে তারপর আয়ত্ত করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি, ছোট ছেলেদের বর্ণ শিক্ষাতেও তিনি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির এই কারণে বিরোধী ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি "বাংলা অক্ষরপরিচয়" প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে তিনি বর্ণশিক্ষা পদ্ধতির দুইটি আমূল সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন: (১) অক্ষরগুলিকে শব্দ অনুসারে না সাজিয়ে তিনি আকৃতি অনুসারে সাজিয়ে ছিলেন; তার যুক্তি এই যে, শিশুর শব্দ এমনি আয়ত্ত হয়েছে এবং যে অবস্থায় তার বর্ণশিক্ষার প্রয়োজন হয় তখন সেই শব্দের আকৃতির সহিত পরিচয় ঘটানই তার বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। (২) দ্বিতীয়ত তিনি অক্ষরের আকৃতির জন্মের ইতিহাস আবিষ্কার করেন এবং যে ধারা অনুসারে অক্ষরের জন্ম হয়েছে, সেই ধারা অনুসারে শিশুকে অক্ষর শিখানর ব্যবস্থা করেন এবং এই শিক্ষা প্রণালীকে "জননানুক্রমিক পদ্ধতি" নাম্ দেন।[১] এই প্রণালী তাঁর গবেষণা মতে বিজ্ঞানসম্মত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হ'তে তিনি দুখানি পুস্তক সঙ্কলন করেন। "হেমচন্দ্রের দেশী নামমালা" অতি প্রসিদ্ধ প্রাকৃত অভিধান। তার একটি সংস্করণ জার্ম্মাণ পণ্ডিত পিশেল প্রকাশ করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এখন সে বই দুষ্প্রাপ্য। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তিনি দেশী নামমালার একটি আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেছেন তার তিনি ১৯২৮ সালে আমূল সংস্কার করেন।

কিন্তু তাঁর চিন্তাধারায় মৌলিকতা সব থেকে বেশী পরিস্ফুট হয় তাঁর দার্শনিক গবেষণায়। বিশ্বের সকল দর্শনের তুলনামূলক সমালোচনা করে দর্শনের ইতিহাস লেখা তাঁর একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। এই ইতিহাস রচনার জন্য তিনি আলোচনার একটি বিশেষ প্রণালীও বার করেন এবং তার নামকরণ করেন "জননানুক্রমিক আলোচনা" (Genetic Method)। বিষয়টি এত পারিভাষিক (technical) যে তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সার্থক হবে না। সংক্ষিপ্ত ভাবে এইটুকু বল্‌লেই হবে যে, এই প্রণালী যে ক্রম অনুসারে দার্শনিক জগতে কোন সমস্যার জন্মলাভ হয় এবং ক্রমবিকাশ লাভ করে তা নিজের সার্থকতা খুঁজে নেয় সেই প্রণালীতেই তিনি প্রতি দার্শনিক সমস্যার আলোচনার প্রস্তাব করেন। মোটামুটি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, জগতের সকল দর্শনের মধ্যেই অল্প বিস্তর সত্য নিহিত আছে। এই মতগুলির পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, তারা কেউ একা সমগ্র সত্যকে হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারে না। সমগ্র সত্যকে লাভ কর্‌তে হলে এই পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য আন্‌তে হবে এবং সেই সামঞ্জস্যের মধ্যেই পূর্ণ সত্য আত্মপ্রকাশ কর্‌বে। গল্পে কথিত পাঁচটি অন্ধ ব্যক্তির হাতী সম্বন্ধে অভিমত যেমন তাদের নিজেদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অনুসারে পরস্পরবিরোধী অথচ অন্য ভাবে সত্য, এও সেইরূপ। তাদের সকলের মতের সামঞ্জস্য আন্‌লে যেমন হাতীর পূর্ণরূপের বিবরণ পাওয়া যায়, এখানেও প্রতি দার্শনিক সমস্যা সম্বন্ধে সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্যের মাঝখানে সেই সমস্যার পূর্ণ সমাধান পাওয়া যায়। তিনি এই পুস্তক শেষ কর্‌তে পারেন নি, কেবল একটি খসড়া এবং প্রথম কয়েকটি পাতা লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পুস্তকটি সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন।[২] ঠিক দার্শনিক সমস্যার তুলনামূলক আলোচনা মাত্র এই পুস্তকটি নয়। এটি একটি নূতন দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করে। বিশেষ বিবরণের জন্য আসল পুস্তক দ্রষ্টব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তক প্রকাশ করেছেন।

দেশের নিকট তাঁর সব চেয়ে বড় দান তাঁর সমাজ সংস্কারের চেষ্টা। কোন রকমে প্রাচীন কাল হতে মাত্র টিকে থাকায় তিনি হিন্দুসমাজের সার্থকতা দেখ্‌তে পেতেন না। হিন্দুসমাজ ছাই চাপা আগুন, ভিতর তার সাঁচ্চা; কিন্তু বাহির তার বার্দ্ধক্যের দোষে ক্লেদযুক্ত। সেই ক্লেদ, সেই আবর্জ্জনা হল আমাদের কুসংস্কার, আমাদের জাতিভেদ, আমাদের নারীনিগ্রহ। সেই ক্লেদকে অপসারিত কর্‌বার প্রয়োজন যে কেবল হিন্দুসমাজের উন্নতি সাধনের

(১) তাঁর "বাংলা অক্ষর পরিচয়" চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং প্রকাশিত পুস্তকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(২) A Genetic History of the Problems of Philosophy, Published by the Calcutta University

উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত তা নয়, তার প্রয়োজনীয়তা আরও বড় কারণের জন্য। তাঁর মতে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এমন মহত্ব নিহিত আছে যে, সে মহত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই সেই সকল সংস্কার, যা নীচতা, যা জাতি বিদ্বেষ বা যা সম্প্রদায়-বিশেষের সুবিধা খোঁজে—তাদের সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করতে হবে। সাম্য প্রচার করা যে ধর্ম্মের মূল নীতি তার মাঝে জাতিভেদের যুক্তি নাই; সর্ব্বভূতে যে ধর্ম্ম ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে তার মাঝে নীচতার স্থান নাই; নারীকে শ্রদ্ধা করা এবং পূজা করা যে ধর্ম্মের শিক্ষা সেখানে নারী পুরুষের বিভিন্ন ব্যবস্থার অনুমোদন নাই। ১৯১৯ সালে যখন প্যাটেল ভারতীয় আইন সভায় অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক আইনের প্রস্তাব করেন তিনি তীব্র সংস্কার বিরোধী দলের সমালোচনা সত্ত্বেও সেই প্রস্তাবিত আইনের সপক্ষে তুমুল আন্দোলন চালান। ফলে বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতি স্থাপিত হয় এবং পরে ঐ সমিতির তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই সমিতির চেষ্টায় মেদিনীপুরে ১৯২০ সালের এপ্রিলে বাংলার প্রথম সমাজ সম্মিলনীর বৈঠক হয়। সেই সম্মিলনীর সভাপতি রূপে তিনি হিন্দু সমাজ সম্পর্কে উল্লিখিত উদার আদর্শের বাণী প্রচার করেন। এই সম্পর্কে তাঁর সেই বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"মন্ত্র ও উপনিষদাত্মক শ্রুতি যে ধর্ম্মের মূল, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম যাহার শাখা, গীতা পুরাণ ও তন্ত্র যাহার সমন্বয়, তাহা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ই সেই ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও গৌরব। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' যে ধর্ম্মের উপদেশ, কেবল মানুষের নয়—সর্ব্ব জীবে দয়া ও প্রীতি যে ধর্ম্মের বিধান, স্বদেশ প্রীতি নহে, জগদ্ধিত যাহার নীতি, যে ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নহে, যাহার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অন্য সম্প্রদায়কে বহিষ্কৃত করিতে হইবে।"

ঘরের কোণে বা লাইব্রেরীর কোণে বসে নির্ব্বাক ভাবে যিনি অধ্যয়নে অভ্যস্ত তিনি আবার প্রয়োজন হলে কর্ম্মেও কুশল হতে পারেন। সে কথা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। সমাজ সংস্কারের জন্য, নারীর পুরুষের সহিত শিক্ষায় অধিকারে সমান সুযোগ দেবার জন্য, জাতিভেদ দূর করার জন্য তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন। কত বিধবা-বিবাহে, কত অসবর্ণ-বিবাহে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, যেখানে লোকনিন্দার ভয়ে পুরোহিতের সাহচর্য্য পাওয়া যায় নাই, সেখানে তিনি নিজে পৌরোহিত্যের কার্য্য সানন্দে সম্পাদন করেছেন।

শেষ জীবনে অবসর গ্রহণের পরও তিনি জনহিতকর নানা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। দক্ষিণ কলিকাতায় বালিগঞ্জ তাঁর বাসস্থান ছিল। এই বালিগঞ্জের সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানেরই তিনি উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বালিগঞ্জের প্রথম উচ্চ ইংরাজি স্কুল জগদ্বন্ধু বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন এবং বহু বৎসর তার সম্পাদক ছিলেন। বালিগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক। বালিগঞ্জের ছেলে ও মেয়েদের অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসা-লয়েরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৩৩ সালের ৩০শে নভেম্বর কয়েক দিনের রোগ ভোগের পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। সেদিন বালিগঞ্জবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে কার্পণ্য করে নাই।

গান

শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী

মাটীর ধরায় ওরে আজি জাগে মানুষের দেবতা,
ভুলে যা রে তুই স্বর্গের কথা, ভুলে যা রে সে-কথা।
মাঠের সবুজ শস্যের সাথে
আপনা বিলায়ে মিতালি যে পাতে,
তারি ঘরে মোর নারায়ণ জাগে, তারি লাগি যত ব্যথা
দেবতা নহে গো মন্দির-মাঝে,
তার পদধ্বনি কুটীরে যে বাজে,
নর-নারায়ণ, সে নহে গোলকে, আমি গাহি তারি কথা

পোলাণ্ডের কথা

শ্রীশিশির সেন

জার্ম্মানী ও ইতালী জাতীয়-রাষ্ট্রের পরিকল্পনার উনবিংশ শতাব্দীতেই বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করলে। এই শতকেই পোলিশ জাতীয়তাবোধও বৃদ্ধি পায়। মধ্যযুগে পোলাণ্ডের এমন একদিন ছিল যখন য়ুরোপীয় বিশিষ্ট শক্তিসমূহের ভিতরে তার একটি স্বতন্ত্র আসন ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে পোলাণ্ডীয় সামরিক শক্তির জয়ডঙ্কা কণ্টিনেণ্টের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিনাদিত হ'ত। কিন্তু সব কিছু পোলাণ্ডের ইতিহাসকে বিক্ষিপ্ত করে তুললে এর আভ্যন্তরিক মতবাদ ও স্বদেশীয় যোগ্য ব্যক্তিগণের কূটমন্ত্রণা। ১৭৭২, ১৭৯৩ এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এর সীমা-প্রাচীর বণ্টিত হ'ল অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া এবং রুশিয়ার মধ্যে। নেপোলিয়নীয় মধ্য-অঙ্ক পরিসমাপ্তির পর ভিয়েনা কংগ্রেস ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বণ্টনকারীদের মনুষ্যদ্বেষী কার্য্যের জন্য এর নিজস্ব খোদিত শীল সন্নিবেশিত করলে। গত নিরনব্বুই বৎসর ধরে অর্থাৎ—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কার্য্য সহ্য করা হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই কোটি পোলাণ্ডবাসী রুশিয়ার প্রজা হিসেবে গণ্য হ'ল; পঞ্চাশ লক্ষ অষ্ট্রিয় সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করল এবং অবশিষ্টাংশ জার্ম্মান রাইখ দলের সঙ্গে সম্মিলিত হ'ল। য়ুরোপের মানচিত্র হ'তে জাতীয়-রাষ্ট্র হিসেবে পোলাণ্ডের চিত্র উঠে গেল—কারণ পোলাণ্ডের অধিবাসীরা বৈদেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

কিন্তু পোলিশ জাতীয়তাবাদ ধ্বংস হবার কোনরূপ আশঙ্কা ছিল না এবং তার নিজস্ব জাতীয়তা রক্ষার জন্য ফ্রান্সের সাহায্যের জন্য উন্মুখ ছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানকার বিদ্রোহকারীগণ জায়গীর প্রথার মূলচ্ছেদ করলে। ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও আত্ম-প্রকাশ নীতি সমর্থিত হ'লো। রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ এবং বিদ্রোহীদিগের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন তরুণ-পোলবাসীদিগকে নেপোলিয়ান ও প্রজাতন্ত্র গঠনের পক্ষে উদ্বুদ্ধ করলে। যখন পোলিশদিগের বিরুদ্ধাচরণ ১৮৩০ সালে অকৃতকার্য্যতায় পর্য্যবসিত হ'লো তখন স্বদেশভক্তগণ ওয়ারশ থেকে প্যারীতে এসে সমবেত হ'লেন। তখন থেকেই পোলাণ্ড ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক জীবন ও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সহায়তা ক'রে আসছে। গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স খোলাখুলিভাবে পোলিশদের দৃঢ়তা সমর্থন করে। একবার তার সহযোগী রুশিয়ার অভিসন্ধি ফেঁসে যায়। ১৯২০ সালে যখন নব পোলাণ্ড ও সোভিয়েট রুশিয়া পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে, ফ্রান্স তখন পুনরায় পোলাণ্ডকে সামরিক সাহায্য করে। সেই বৎসর থেকেই ফ্রাঙ্কো-পোলিশ কুটুম্বিতা স্থাপিত হয়—সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিতরেও তারা সমব্যথায় ব্যথী।

বিসমার্কের অভিপ্রায় ছিল রুশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা। সেই অভিপ্রায় কর্ণধার কাইজারকে পরিত্যাগ করায় বিপর্য্যস্ত হয়ে ওঠে এবং ১৯১৪ সালে রুশিয়া ও জার্ম্মানীতে যুদ্ধ বাধে। বর্ত্তমানে হিটলারও তাঁদের সাবেকী বিচক্ষণতায় ফিরে গেছেন—অন্তত প্রকাশ্যভাবে তাঁরা রুশিয়ার বিরুদ্ধবাদী নন। পোলিশরাও তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, কারণ বিসমার্কের মানসিক ভাব তাদের অজানা নয়। তাঁর সময়ই জার্ম্মানী পোলিশদিগের ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করবার সুযোগ অন্বেষণ করে। অধিকন্তু পোলিশ জেলাসমূহে জার্ম্মান কৃষকগণকে বসিয়ে তাদের জার্ম্মান মনোভাবাপন্ন ক'রে তোলবার চেষ্টাও চলে; কিন্তু পোলিশরা অতি সংলগ্নতাশীল জাতি।

গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে পোলাণ্ডের পক্ষে জয়ের আশা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ফ্রান্স ছিল ধূর্ত্ত-উৎপীড়ক রুশিয়ার সহায়ক। জারের রাজত্বে অষ্ট্রিয়ান এবং জার্ম্মান পোল-বাসীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে তোলে। তবুও পোলিশ জাতীয়তাবোধের ভিতরে ছিল একটা অদ্ভুত শক্তি এবং এর মূলে ছিলেন চার্লস্ জোসেফ পিলসুড্স্কি। জার-বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তিনি সাইবেরিয়াতে পাঁচ বৎসরের জন্য ১৮৮৭ সালে কারারুদ্ধ হন। ছয় বৎসর

পরে তিনি একটি বিপ্লবাত্মক সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন। ছাপার কাজ গোপনে করা হ'ত বলে পুনরায় তার জেল হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি লণ্ডনে ছিলেন। মাইল-এণ্ডের একটি বাড়ীতে পোলিশ স্বদেশপ্রেমিকদের গোপন সভা বসত। ১৯০২ সালে পোলাণ্ডে ফিরে বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের সর্ব্বজন-স্বীকৃত প্রতিনিধি হন। চার বৎসর পরে ১৯০৫-৬ সালের আন্দোলনের সময় তিনিই রুশিয়ার সৈন্যবাহিনী আক্রমণের বিলি ব্যবস্থা ও পোলিশ বন্দিগণের মুক্তির উপায় করেন। এর ফলে তিনি অষ্ট্রিয়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি সামরিক সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করেন এবং সত্যি সত্যিই তাঁর সৈন্যবাহিনী বিনা বিরোধে যুদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তে আরম্ভ করে।

১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় পিলসুড্স্কি পোলিশ ইণ্ডিপেনডেণ্ট্ পার্টিতে যোগ দেন। ক্রাকোতে একটি ঘোষণা-পত্রে পোলবাসীদিগকে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আবেদন জানান। ৫ই আগষ্ট পিলসুডস্কি ও তাঁর সেনাগণ অষ্ট্রিয়া ও রুশিয় পোলাণ্ড অতিক্রম করেন এবং কীলেস্ অধিকার করেন। কীলেস্ শহর ক্রাকোর পচাত্তর মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। সেই হেতু অষ্ট্রিয়ার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম নব-পোলিশ শক্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করেন। ইতিমধ্যে রুশিয়ার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস্ একটি ঘোষণা-পত্রে পোলিশদিগের পৃষ্ঠপোষণের জন্য আবেদন জানান। জারের অধীনে পোলাণ্ড পুনরায় ধর্ম্মগত, ভাষাগত ও স্বায়ত্তশাসন অধিকার লাভ করে নবজীবন লাভ করতে পারবে। রুশিয়ার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, যে তরবারি টানেনবার্গের শত্রুকে আঘাত করেছে তাতে এখন মরচে পড়েনি অর্থাৎ ১৪১০ সালের পোলদিগের জার্ম্মানদের উপর মহান জয়ের উল্লেখই এতে নিহিত আছে। ডমোস্কির উদাহরণ স্বরূপ ওয়ারশতে চারটি পোলিশ দল সম্বর্দ্ধিত হয়। অষ্ট্রিয়া থেকে একটি শ্রেষ্ঠতর প্রস্তাব প্রস্তুত করা হ'ল এবং অধিকাংশ রুশীয় পোলেরা জার সরকারকে তাদের সমর্থন দিলে। ফ্রান্সে হাজার হাজার পোলেরা সাধারণ-তন্ত্রে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হয়ে কাজ করে। আমেরিকাতে প্রসিদ্ধ পিয়ানো-বাদক পিডারেস্কির অধীনে দুর্ভাগ্য দেশের প্রতিকার কল্পে একটি দল গঠিত হয়। ঠিক এই প্রকারের কমিটি লণ্ডনেও ১৯১৫ সালে সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়ান কর্ম্মকর্ত্তারা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচকিত হয়ে ওঠেন। এই সব কারণে পিলসুড্স্কি ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, পোলেরা অবশ্যই জার্ম্মানদের প্রতিরোধ করবে। তাঁর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা বলশালী হয়। গুপ্ত বিপক্ষতা পোলদের পক্ষে সম্ভব হয় এবং সৈন্যবাহিনী অষ্ট্রিয়ার সেবা করতে থাকে।

পোলিশ সমস্যার শুভাশুভ নিয়ে পশ্চিমে আজ ঔৎসুক্যের শেষ নেই। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় পার্লিয়ামেণ্ট এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পোলিশ রাজ্য বহু শতাব্দী ধরে সভ্যতার একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল তাকে একতার নিদর্শন স্বরূপ স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনপূর্ণ রাষ্ট্র হিসাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। পিলসুড্স্কি ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে কর্ম্মে ইস্তফা দিলেন। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, কেন্দ্রীয় শক্তি রুশীয়দের রুশীয়া-পোলাণ্ড হ'তে বিতাড়িত ক'রে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে পারে নি। পর বৎসর তিনি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট দেশনেতাগণ প্রমাণ করলেন যে, পোলিশ যোদ্ধ্দল স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে ও প্রাণ দিচ্ছে। অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় শক্তির ভাবগতিকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যোদ্ধ্দল সাময়িকভাবে পুরোভাগ হতে অবসর গ্রহণ করলে।

জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বর্ত্তমানে লোকের প্রয়োজন। কাজেই পোলাণ্ডকে পাথেয় স্বরূপ পাবার জন্য ঘোষণা করা হয় যে পোলরাষ্ট্র অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর গোপন চুক্তিতে জার্ম্মানী বা অষ্ট্রিয়-পোলাণ্ডের কোন অংশের অন্তর্গত হবে না—কোন স্বাধীন বৈদেশিক রাজনীতি থাকবে না এবং সেনাদল জার্ম্মানীর অনুমোদন ক্রমেই পরিচালিত হবে। এমন কি, সীমান্ত প্রদেশসমূহের বিষয়গুলোও শান্তির পরে মীমাংসা করা হবে। পোলবাসীরা এ প্রস্তাব রাষ্ট্রের মতই সন্দেহের চোখে দেখলে। সুতরাং তারা এ আহ্বানে খুব অল্প সাড়াই দিলে। কিন্তু রুশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূচনা দেখা দিল। অগ্রগামী বিদ্রোহী দল পেট্রোগার্ডে প্রাদেশিক গভর্মেণ্টের অভিষেক করলে। শীঘ্রই প্রচার

করা হ'ল যে এই পোলিশ রাষ্ট্র স্বাধীন ও একীভূত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কেবল রুশিয়ার সঙ্গে স্বাধীন সামরিক মিলন এবং শ্লাভ জনগণের জার্ম্মান পেষণের দুর্গ-প্রাচীর হিসাবে সংস্থবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। এই প্রস্তাবে ফরাসী, ব্রিটিশ, ইতালীয় ও আমেরিকার জনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হ'ল। পিলসুড্স্কি যোদ্ধৃগণকে জার্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ার সেনাদলের অনুরুক্তি প্রতিজ্ঞা-পত্রে বিরুদ্ধতা করবার আদেশ দিলেন। যারা পিলসুড্স্কির আদেশ পালন করলে জার্ম্মান সরকার তাদের নিরস্ত্র করে বন্দী করলে। ১৯১৭ সালে জুলাই মাসে পিলসুড্স্কি ও পোলাণ্ডের সমর-মন্ত্রী সস্নোস্কিকেও গ্রেপ্তার করলে। এর ফলে পিলসুড্স্কি স্মিগ্‌লি-রিজের উপর পোলিশ সামরিক ব্যবস্থার ভার দিলেন। বর্ত্তমানে তিনিই পোলাণ্ডের সেনাধ্যক্ষ।

রুশিয়া ও জার্ম্মানীতে বলশেভিক্ ক্ষমতা বিস্তারের পর পুনরায় নতুন ক'রে পোলিশ চিন্তাধারায় আঘাত লাগে। কারণ পোলেরা উক্‌রেনিয়ন রিপাব্লিককে তাদের নিজেদের দেশেরই একটি অঙ্গস্বরূপ মনে করত। অপরপক্ষে ত্রয়োদশ প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে ইউ, এস কংগ্রেসের কাছে তাঁর চতুর্দ্দশ দফার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিলেন: 'An independent Polish State should be erected which should include the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea and whose political and economic independence and territorial integrity should be granted by international covenant.' ব্রিটেনের পক্ষ হতে লয়েড্ জর্জ্জ বললেন: 'independent Poland is a necessity for western Europe's stability.' মহাযুদ্ধের শেষ বৎসর বিশৃঙ্খলার সময় জার্ম্মান, রাশীয় ও অষ্ট্রিয়ানগণ পোলিশ সেনাবাহিনীর পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করে। এর ফলে ওয়ারশতে একটি মন্ত্রণাসভা গড়ে ওঠে এবং এতে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামের প্রস্তাবই গৃহীত হয়। অক্টোবর মাসের মধ্যেই যোদ্ধগণ পোলাণ্ডের দাবী দৃঢ়তর করবার পক্ষে আরও অনেকটা এগিয়ে যায়। কেন্দ্রীয় শক্তি ভেঙ্গে যায় ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। ১১ই নভেম্বর পিলসুডস্কি জেল থেকে মুক্তি পান এবং তাঁকে ওয়ারশতে রিজেন্সি কাউন্সিল কর্ত্তৃক সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত পোলাণ্ড স্বাধীন হয়।

পিলসুড্স্কি দেখতে পেলেন, পোলাণ্ড আজ বিধ্বস্ত। এর কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা-প্রাচীর নেই। জার্ম্মান সৈন্যের প্রাবাল্য এখনও বিদ্যমান। রুশীয় সৈন্যরা আক্রমণশীল। লউ নেবার জন্য উক্‌রেনিয়ান প্রচেষ্টা বলবৎ। জার্ম্মানেরা বিনা ক্লেশে সরে দাঁড়াল, কিন্তু উক্‌রেনিয়ানদের দিয়ে একটি সুষ্ঠু যুদ্ধ ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত পরিচালনা করলে। স্মিগ্‌লি রিজের প্রতিষ্ঠানকে স্তম্ভ স্বরূপ রেখে পিলসুড্স্কি তিন মাসের মধ্যে এক সেনাবাহিনী গঠন করলে। সরকারীভাবে কার্য্য পরিচালনার জন্য তিনি অধিকার পেলেন, যদিও প্রকৃত-পক্ষে তিনিই রাষ্ট্রের অধ্যক্ষ স্বরূপ ছিলেন। পেডারেস্কি পোলাণ্ডে ফিরে গিয়ে জাতীয় গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা ক'রে একটি দুঃসাধ্য রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দেশকে রক্ষা করেন। শান্তি বৈঠকে তিনি ও ডেমোস্কি প্রতিনিধি ছিলেন।

পোলাণ্ডের সীমান্ত সমস্যার ব্যাপারে সুপ্রিম কাউন্সিল পোলিশ কার্য্যকলাপ অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের অনুসন্ধানের ফল এই দাঁড়াল যে, পোলিশদিগের পশ্চিম সীমান্ত পোজনানিয়া এবং পশ্চিম প্রুশিয়া পোলাণ্ড ও জার্ম্মানীর সীমান্ত বলে গণ্য হবে। ডানজিগ্ ও সেই প্রদেশ যাহা Danzig—Eylan—Warsaw রেলওয়ে দ্বারা প্রতিবদ্ধ তাহা পোলাণ্ডের। আপনার সিলিসিয়ান জেলাসমূহ যাহা পোলদের দ্বারা জনাকীর্ণ, তাহা পোলিশদের এবং আলেনষ্টিনের ন্যাশানালিটি প্লেবিসাইটদের দ্বারা স্থিরীকৃত হবে। পোলিশ ডেলিগেটদের মধ্যে ইহাই প্রধান জিজ্ঞাস্য ছিল। লয়েড জর্জ্জ পোলাণ্ডকে ডানজিগ্ দেবার বিপক্ষে ছিলেন; কারণ ডানজিগ্ প্রধানত জার্ম্মান অধিবাসীদ্বারাই জনাকীর্ণ। লয়েড জর্জ্জের এই মত সুপ্রিম কাউন্সিল দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়, যদিও ক্লিমেনসিউ এবং ইতালিয়ানরা পোলিশ দাবীর আনুকূল্য প্রদর্শন করে। সেই অনুসারে শান্তি চুক্তির ধারাটি এইভাবে গঠিত হ'ল যে, ডানজিগ্ স্বাধীন নগরী হিসাবেই থাকবে কিন্তু মারিয়েনওয়েরডার প্লেবিসাইটদের প্রজারূপে গণ্য হবে। ভার্সাই সন্ধির ৮৭ ধারায় আছে: 'Germany recognises, as the Allied and Associated powers have already recognised, the

complete independence of Poland. ফলে পোলাণ্ড পোজনানিয়া ও পশ্চিম প্রুশিয়ার অধিকাংশ ফিরে পায়, যদিও ডানজিগ্ স্বাধীন নগরী হিসাবে লীগ অফ্ নেশনের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। তবুও পোলাণ্ড তার সমুদ্রপথের প্রবেশানুমতি ডানজিগ্ ও বিস্তৃত বাল্টিক সাগর উপকূলের মধ্য দিয়ে পায়। এই প্রকারে পোলাণ্ডের পশ্চিম সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়। পূর্ব্ব সীমা রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসের রিগা সন্ধির অগ্র পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় না।

১৯১৯ সালে এপ্রিল মাসে পোলাণ্ডকে উত্তর-পূর্ব্বে বলশেভিক এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে উক্রেনিয়ান্দের সম্মুখীন হ'তে হয়। এতে পিলসুড্স্কি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, বলশেভিকরা জারেদের মতই সাম্রাজ্যপিপাসু—মিত্র রাজ্যের আপত্তি সত্ত্বেও তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে। ল্যাটেভিয়া ও রুমানিয়ার সহযোগিতায় পিলসুড্স্কি শত্রুদের উদ্যম ব্যর্থ করতে সমর্থ হন।

ইতিমধ্যে পোলিশরা তাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরে পায়। পোলেরা রুশীয়দের পোলাণ্ডে বলশেভিক গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠার মতলব বুঝতে পেরে পূর্ণ উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় করতে সুরু করে। পিলসুড্স্কি ক্ষিপ্রগতিতে রুশিয়ার কেন্দ্র খণ্ড বিখণ্ড ক'রে দেন এবং এই প্রকারে ওয়ারশকে রক্ষা করেন। নীমেন ও স্কজারা যুদ্ধে পিলসুড্স্কি পুনরায় রুশিয়ানদের পরাজিত করেন। ১৯২১ সালে মার্চ্চ মাসে এই দুই জাতির ভিতর রিগাতে এক সন্ধি হয় এবং তাতে পোলাণ্ডের পূর্ব্ব সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

১৯২১ সালে আপার সাইলিসিয়ার প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন প্লেবিসাইট প্রকাশ করেন যে, পশ্চিমে ৭,০৭,৬০৫ ভোটার জার্ম্মানী পক্ষে এবং পূর্ব্বে পোলাণ্ডের পক্ষে ৪৭৯, ৩৫৯ ভোটার। রাইখগণ আপার সাইলিসিয়া এই যুক্তিতে দাবী করে বসলেন যে, অর্থনৈতিকভাবে একে বিভক্ত করা অসম্ভব। কাজেই সমগ্র অংশই আমাদের প্রাপ্য। পোলেরা উত্তর দেয় যে, শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণে নিযুক্ত 'ত্রিকোণ-ক্ষেত্র' (বেউথেন, গ্লিউইজ এবং কোটোইস্) সম্বন্ধে তাদের অধিকারই অধিক যুক্তিসঙ্গত। লীগ সভা অবশেষে জাতীয় বসতির উপর নজর রেখে সীমান্তের সীমা নির্দ্দেশিত করে। কেবলমাত্র কেটোইস্ পেল পোলেরা এবং অবশিষ্ট সমস্ত আপার সাইলিসিয়াই জার্ম্মানী পায়।

শান্তি সন্ধির পর জার্ম্মান-পোলিশ সম্বন্ধ ক্রমশই জটিল হয়ে ওঠে। ডানজিগ্, করিডর, সাইলিসিয়া নিয়ে সীমা-নির্দ্দেশ এবং অন্যান্য বিবাদ-বিসম্বাদ ১৯৩৪ সালে এক নতুন মূর্ত্তি ধারণ করে।

১৯৩৪ সালের ৫ই মে রুশিয়ার পোলাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকবে। ঠিক এক বৎসর পরে একটি বিখ্যাত পোলিশ পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট হের হিটলার বলেন: The racial teaching of Nazism:rejected the de-nationalizing of foreign peoples living on Germany's frontiers? তিনি আরও বলেন: 'I would not repeat the mistakes made in the past centuries and that the reconstitution of the relations between the Germany and Polish people was an instance of my point of view.'

এই জার্ম্মান-পোলিশ চুক্তিকেই হের হিটলার এবৎসর এপ্রিল মাসে বোহেমিয়া, মোরাভিয়া এবং মৃত চেকোশ্লোভো-কিয়ার কিয়দংশ গ্রহণের পর প্রকাশ্যে নিন্দা করেন। গত অক্টোবর মাসে চেকোশ্লোভাকিয়া কর্ত্তৃক সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মানীর হস্তে সমর্পণ করা হয়। পোলাণ্ডও তাদের তেস্কেন জেলার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে দাবী জানায়। ফলে তেস্কেন ফিরে পায়। তেস্কেন জেলায় পোলদিগেরই বসতি এবং গত কুড়ি বৎসর এই নিয়ে তাদের বিবাদ ছিল।

শারদা-হিন্দোল

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আজ থেমে গেছে বর্ষার চঞ্চল নাচনের ঝম ঝম নূপুরের ছন্দ,
ওই নির্ম্মল গগনের অন্তরতল থেকে ঝরে' পড়ে নীল মকরন্দ।
আজ নিম্নেতে কাঁদে প্রেম-বিরহীর পারাবার মিলনের গান বাজে উর্দ্ধে,
এই উর্দ্ধের সাথে আজ নিম্নের গান গেঁথে বন্ধু গো আয় তোরা সুর দে।
ওই পদ্মার বানজলে গাঙ্ করে থই থই তাল দেয় নেচে মহানন্দা।
নাচে গৈরিক দরিয়ার গঙ্গায় লাল জল ঝর্ণারা হ'ল মধুছন্দা।
ওরে ডুবে গেছে পথ ঘাট ছেলেদের উৎসব রচবে যে আজ তারা স্বর্গ,
ওই গঙ্গার পশ্চিম গৈরিক বুকে আজ নেমে এ'ল জীবনের বর গো।
হোথা পদ্মের বন দোলে বিলভরা কহ্লার সুন্দর শোভা মধু গম্ভীর,
যেন তার সাথে লাজভরা দোলে মধুযৌবন সুন্দরী লক্ষ নিতম্বীর।
ওই রং করা ধানখেতে সবুজ সিংহাসনে দুলে ওঠে কার মধু অঞ্চল,
ওরে দুলে ওঠে কাশবন দোল খায় মাঠবন প্রাণ মন করে দেয় চঞ্চল।
গ্রাম প্রান্তের কোল ঘিরে বন্যার মাটী ধোয়া ঘোলা জলে ডুবাইয়া অঙ্গ,
হৃদি অঞ্চল সরাইয়া চঞ্চল তরুণীরা তুলিয়াছে হাসির তরঙ্গ।
তারা চলে কটি চঞ্চল কুম্ভ ছলাৎছল স্বর্গের মধু বুঝি ঝরবে,
এই মৃত্যুঞ্জয় মধু বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজ বুঝি শিব এসে ধরবে।
ওই গঙ্গায় পাল তুলে নেচে চলে নৌদল ঝরকায় বসে চাহে বৌ গো,
ওরে 'বৌ কথা কও' পাখী এই বেলা ডেকে ওঠ্ সন্ন্যাসী আজ তুমি শোও গো।
মধু সন্ধ্যায় নেমে আসে চাঁদিনীর স্বপ্নরে তারকারা জ্বালে লাল দীপ যে,
ভোর রাত্রির শুকতারা ঘুমভাঙ্গাবার গানে শিরে দেয় জাগাবার টীপ্ যে।
আজ নেচে নেচে ঊষা নামে ঝরে মুক্তির গান সোনা রোদে রবি ঢালে হাস্য,
আমি বিহ্বল মনে আজ খুলে দিয়ে বাতায়ন পড়ি এই রূপায়ন-ভাষ্য।
ওরে এই নীল সিন্ধুর সোপানেতে দাঁড়াইয়া মনে হয় আজি এই প্রৌঢ়ে,
সেই স্বপ্নের মধুভরা সুন্দর যৌবনে ফিরে বুঝি এনু এক দৌড়ে।
এই যৌবন দিয়া মোর গেঁথে রসে মণিহার আজ সখা সাধ যায় রঙ্গে,
ওগো সুন্দরী শারদার চঞ্চল চরণেতে লুটাইয়া পড়ি সারা অঙ্গে।
ওরে ঘরে মোর প্রিয়া হাসে রাঙা হাসি নীল চোখ বাহিরেতে যাদুকরা বিশ্ব,
ওগো কারে ফেলে কারে দেখি হয়ে গেছি ধন্দ গো এরি মাঝে হয়ে গেছি নিঃস্ব।
ওরে কুচি কুচি সাদা মেঘ জলহারা চঞ্চল তোর সাথে হব আজ সঙ্গী,
চল শারদার কাব্যের মেঘদূত গেয়ে গেয়ে চলে যাই এ ধরণী রঙ্গি।
আজ ওঠ্ জাগ্ বিরহিনী দ্বারে ডাকে প্রিয়তম দেবতার আগমন দ্বার খোল্,
সব কুঞ্জের তলে সবে হিন্দোল বেঁধে আজ দে দোল দে দোল দেগো দোল্ দোল্।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও বাঙ্গালা কংগ্রেস—

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করায় ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে তিন বৎসরের জন্য কংগ্রেসের সমস্ত নির্ব্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। "ইচ্ছা করিলে" তিনি কংগ্রেসের চারি আনা সদস্য থাকিতে পারিবেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি হিসাবে বিনা নির্ব্বাচনেই সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য। কিন্তু আচার্য্য কৃপালানীর বিবৃতিতে মনে হয়, শাস্তি ব্যবস্থার ফলে সে অধিকারও তাঁহার লুপ্ত হইয়াছে। যে অধিকার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে অর্জ্জন করিয়াছেন, যাহা ওয়ার্কিং কমিটির খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করে না—কি করিয়া তাহাও লুপ্ত হইতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়।

এই সম্পর্কে উভয় পক্ষের অনেক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এক পক্ষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—শাস্তি সঙ্গতই হইয়াছে, কংগ্রেসে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য শাস্তি ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। সুভাষচন্দ্র যত বড়ই নেতা হোন, অপরাধ করিলে তাঁহাকেও শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। অপর পক্ষ এই কথা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, কংগ্রেসের প্রস্তাব "অমান্য" করিলে তবেই শাস্তির কথা উঠিতে পারে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রস্তাব "অমান্য" করেন নাই, উহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন মাত্র এবং উহার বিরুদ্ধে জনমত যে কত তীব্র সেই সম্বন্ধে কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষকে সচেতন করিয়াছেন। সে অধিকার নিশ্চয়ই প্রত্যেক কংগ্রেস সেবকের আছে। ইহার বিরুদ্ধে অপর পক্ষের বক্তব্য এই যে, সে অধিকার কংগ্রেসের সাধারণ সেবকের থাকিতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের কোনো দায়িত্বশীল কর্ম্মকর্ত্তার নাই। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সাধারণ সেবক নহেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

মহাত্মার বিবৃতি—

আইনের কূট তর্কের সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ বিচারকের সিদ্ধান্তই সেখানে চূড়ান্ত। মহাত্মাজি বলিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের খসড়া তিনিই রচনা করিয়াছেন। সুতরাং শাস্তি বিধান সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব সুস্পষ্ট। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধেও তাঁহার বিরূপতা অপরিচিত নয়। গত রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কার্য্যে ও বাক্যে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্লেষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, সুভাষচন্দ্র যে প্রকার জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেসের বিধান তাঁহার কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। শ্লেষ করিয়া বলিলেও কথাটা আমরা সত্য বলিয়াই মনে করি। ত্যাগে ও আন্তরিকতায়, দুঃখের দহনে ও নিঃস্বার্থপরতায় জনগণের অন্তরে তিনি শ্রদ্ধার আসন পাতিয়াছেন, তিনি কংগ্রেসের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকুন বা না থাকুন, কিছুই যায় আসে না। তার দৃষ্টান্ত স্বয়ং মহাত্মাজি। কংগ্রেসের চারি আনা সদস্য না হইলেও আজ তিনিই কংগ্রেসের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহারই বিধানে একটা প্রদেশের কংগ্রেস-সভাপতি তিন বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত হইলেন।

আইনের ঔচিত্য-অনৌচিত্য ছাড়িয়া দিয়াও একটা অনুরোধ আমরা তাঁহাকে জানাইতেছি। শৃঙ্খলা রক্ষা তিনি করিতে পারেন, শাস্তি বিধানও যদৃচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু রোগ সারাইতে গিয়া রোগী না মারা পড়ে! শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সরিয়া আসিয়াছেন। খারে, নরীম্যান বিতাড়িত। দেশব্যাপী বিক্ষোভের অন্ত নাই। ধীরে ধীরে কংগ্রেস কোথায় নামিয়া আসিতেছে সে খবর রাখাও কি তিনি প্রয়োজন বোধ করেন না?

সুভাষচন্দ্রের শূন্য পদ—

সুভাষচন্দ্রের প্রতি শাস্তি বিধানের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সভাপতির পদ শূন্য হইয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক সভায় সুভাষচন্দ্রকে "খামখেয়ালী, অবৈধ এবং সম্পূর্ণ অসঙ্গতভাবে অপসারিত করায়" ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রকে সভাপতির পদ হইতে অপসারণ এবং কার্য্য নির্ব্বাহক মণ্ডলীর নির্ব্বাচন অসিদ্ধ করা—ওয়ার্কিং কমিটির এই দুইটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে, যদি জনমত অনুসারে কাজ করা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় সমিতিকে উভয় সিদ্ধান্তই অমান্য করিয়া চলিতে হয়। রাষ্ট্রীয় সমিতি ততদূর চরম পন্থা অবলম্বন করার পক্ষপাতী নহে। সমিতি আপোষ রফা করিতেই ইচ্ছুক। সমিতি আশা করেন, ওয়ার্কিং কমিটি এখনও সিদ্ধান্ত দুইটি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবেন। যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন সভাপতির পদ শূন্যই থাকিবে। প্রস্তাবটি ২১৩—১৩৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪১। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের দল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। কিন্তু সভা শেষে উচ্ছৃঙ্খল জনতা যে ব্যবহার করিয়াছে তাহাও বাঙ্গালার পক্ষে গভীর লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

যুক্ত প্রদেশে শিক্ষা সংস্কার—

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজি যে নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং ডক্টর জাকির হোসেন প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণের সাহায্যে যাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তদনুযায়ী যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট ১৭৫০টি নূতন মডেলের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। পরিচিত বস্তুর সাহায্যে শিশুদের অক্ষর পরিচয়ের এই অভিনব ব্যবস্থা শিশুদের শিক্ষাকে সহজ এবং মনোরম করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। যুক্তপ্রদেশ সরকার অবিলম্বে বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথাও চিন্তা করিতেছেন। অর্থাভাব তো আছেই, কিন্তু দেশসেবার সত্যকার আগ্রহ যেখানে আছে, সেখানে অর্থাভাব অনতিক্রমণীয় বাধা নয়।

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের কেবল একটি কথা বলিবার আছে। যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুস্থানীকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র বাহনরূপে স্থির করিয়াছেন। ফলে অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়া যাঁহারা যুক্তপ্রদেশে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের ছেলেদের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। প্রদেশের প্রধান হিসাবে হিন্দুস্থানীর প্রাধান্য আমরা অস্বীকার করিতে চাই না। প্রবাসীদের মাতৃভাষারও একটা স্থান থাকা কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সুবিচার করিবেন।

নারীহরণ—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ দক্ষিণ মালদহের বড়ঘরিয়া এবং সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের হিন্দুদের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সত্যই ভয়াবহ! তিনি জানাইতেছেন, গত কয়েক বৎসরে এই অঞ্চল হইতে ৬০টি হিন্দুনারী অপহৃতা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ নারীও আছে। সংবাদপত্রে তিনি তাহাদের নাম ধামও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার সহিত কয়েকটি বিশিষ্ট মুসলমান জমিদার পরিবার সংশ্লিষ্ট বলিয়াও তিনি অভিযোগ করিয়াছেন; অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। আমরা বাঙ্গলার মুসলীম মন্ত্রীমণ্ডলের দৃষ্টি দক্ষিণ মালদহের এই শোচনীয় ঘটনাবলীর দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

বাহিরে সৈন্য প্রেরণ—

ভারত হইতে কয়েকটি সৈন্যদল মিশর, এডেন ও মালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, পূর্ব্বাহ্নেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে জানানো হইয়াছে। এই সংবাদে ভারতের জনসাধারণ কৃতার্থ বোধ করিবে সন্দেহ নাই। সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার ভারতবর্ষ জোগাইলেও তাহার গতিবিধির উপর ভারতের কোন অধিকার নাই এ অভিযোগ অনেকবার করা হইয়াছে। তাহাদের ভারতের বাহিরে পাঠাইতে হইলে আইন সভার অনুমতি লওয়ার আবশ্যক হয় না। আবশ্যক এবারও হয় নাই এবং অনুমতিও লওয়া হয় নাই। মাত্র আইন সভার বিভিন্ন দলের নেতাকে সৈন্য প্রেরণের

পূর্ব্বে কথাটা জানানো হইয়াছে। তাঁহাদের সম্মতিও লওয়া হয় নাই, প্রতিবাদেরও অবকাশ দেওয়া হয় নাই। অনুগ্রহ ও ভদ্রতার নামে এ পরিহাস না করিলেই কি চলিত না?

বন্যার প্রকোপ—

এবারে বাঙ্গালায়, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে বন্যার যে প্রকোপ দেখা গিয়াছে এমন বহুদিন দেখা যায় নাই। পশ্চিম বঙ্গে গঙ্গা, অজয় ও দামোদরের বন্যা আসে। কিন্তু দামোদর ও অজয়ের বন্যা ছাড়া আর কিছুতে তেমন ক্ষতি বড় একটা করে না। এবারে মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, নদীয়া, হুগলী ও মেদিনীপুরে বন্যার ফলে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আউস ধান একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোথাও আমন ধানেরও আশা নাই। চারিদিকে বন্যার্ত্তদের হাহাকার উঠিয়াছে। কংগ্রেসের সেবকগণ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া যথাসাধ্য তাহাদের সেবা করিতেছে। এই দুঃসময়ে বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডল কি করিতেছেন, জানিতে বড় আগ্রহ হয়।

জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি—

কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিযুক্ত জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী সমিতির বিভিন্ন সাব-কমিটিতে সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেও সমিতির সহিত সহযোগিতা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার খুঁটায় আবদ্ধ মন্ত্রীমণ্ডলের এই ঔদার্য্য বিস্ময়কর হইলেও আনন্দজনক।

স্কুলের ঘণ্টা—

স্কুলের সময় দুপুরে না করিয়া সকাল ৬টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত করিবার জন্য একটা কথা উঠিয়াছে। প্রস্তাবটা নূতন নয়, প্রথাও নূতন নয়। ইংরেজ আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই নিয়মই প্রচলিত ছিল। তারপরে শীতপ্রধান ইংলণ্ডের অনুকরণে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও বর্ত্তমান ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। মফঃস্বলে অধিকাংশ স্কুলেই পাখা ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা নাই। বৎসরের নয় মাস মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে কি কষ্ট হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। আমাদের অভিমত, বিদ্যালয় সকালে করাই উচিত; কিন্তু ৬-১১টা নয়, ৬-১০টা; শীতকালে ৭-১১টা। তাহাতে পড়া এক ঘণ্টা কম হইবে বটে, কিন্তু সে ক্ষতি স্বাস্থ্যের দিক দিয়া পোষাইয়া যাইবে।

পাটের দর নিয়ন্ত্রণ—

অনেক অনুরোধ, উপরোধ, অনুযোগ ও আন্দোলনের পরে বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডল পাটের নিম্নতম দর অর্ডিন্যান্স করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন। ৮৸৵০ আনার কম দরে কেহ পাট কেনার কণ্ট্রাক্ট করিতে পারিবে না। করিলে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। ফাটকা বাজারের কল্যাণে নিরীহ চাষীর শ্রমজাত পাট লইয়া যে খেলা চলে তাহার দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্স যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু চাষী যে মিলওয়ালা ও দালালদের হাত হইতে অনেকখানি রক্ষা পাইল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের কর্ত্তব্য—

আসন্ন মহাসমরে ভারতের কর্ত্তব্য কি সে সম্বন্ধেও নানা দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। হায়দরাবাদ, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া রামপুর পর্য্যন্ত প্রায় সকল দেশীয় রাজাই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ এবং বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেব বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই সঙ্কটক্ষণে হিন্দু-মুসলমানকে সকল বিরোধ বিস্মৃত হইয়া মহাসমরে রক্তদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

ইঁহারা দুইজনে লীগের যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম বাহু। কিন্তু লীগ এ সম্বন্ধে এখনও পাকাপাকি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। বরং দিল্লীতে যে লীগ কাউন্সিলের সভা বসিয়াছিল, বৃটেনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য তাহাতে স্যার সেকেন্দারের বিরুদ্ধে নিন্দার প্রস্তাবই উঠিয়াছিল। বৃটেনকে কোন প্রকার সাহায্য না করিবারও একটা প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু মিঃ জিন্না সুকৌশলে প্রথম প্রস্তাবটি উঠিতে দেন নাই এবং দ্বিতীয়

প্রস্তাবটি ধামা চাপা দিয়া অপেক্ষাকৃত নরম একটা প্রস্তাব পাশ করাইয়া লন। তাহাতে বৃটেনকে অর্থ ও সৈন্য দিয়া সাহায্য করা হইবে কি-না সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, কেবল যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে মুসলমানদের জন্য আরও অধিক সংখ্যক সদস্যপদ ভিক্ষা করা হইয়াছিল। ভারতে হিন্দুর জনসংখ্যার শতকরা হার ৭২ ও মুসলমানের ২২। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুর আসনের শতকরা হার ৪২ ও মুসলমানের ৩৩। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, এই অবিচার দূর করিয়া মুসলমানের সদস্য সংখ্যা আরও বাড়ানো হোক।

যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিতেই "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"ও মুখর হইয়া সাম্প্রদায়িক মিলন-গীতি গাহিতে সুরু করিয়াছেন এবং প্রস্তাব করিয়াছেন, এতদিন উভয় সম্প্রদায়ে যে কলহ করিয়াছে, কিন্তু সাম্রাজ্যের এই ঘোর দুর্দ্দিনে এখন উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে রক্তদান করা উচিত। জিন্না সাহেব এবং দেশাই মহাশয় যদি এখন হাতে হাত মিলাইয়া প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র চালু করিয়া দেন তাহা হইলে তো সোনায় সোহাগা হয়। এমন কি, বর্ত্তমান বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া অস্থায়ীভাবে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রও চালাইতে পারেন। ইতিমধ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র অনুযায়ী নির্ব্বাচন ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে।

বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধে কোন সরকারী প্রস্তাব উঠে নাই এবং ভারতের দাবী মিটাইবার আগ্রহও কোন তরফ হইতে বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করা হয় নাই।

কংগ্রেসের মনোভাব—

আগামী যুদ্ধে কংগ্রেস বৃটেনকে সাহায্য করিবে কি-না, সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে অস্পষ্টতা কোথাও নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল স্বেচ্ছায় এবং সহজে পদত্যাগ হয় তো করিবেন না। কিন্তু গবর্ণরের সঙ্গে প্রতি পদে সংঘর্ষের ফলে অবশেষে যে তাঁহাদের পদত্যাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে তাহা তাঁহারা জানেন। দায়িত্ববিহীন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সহিত দায়িত্বশীল প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বেশী দিন সমান্তরাল ভাবে চলিতে পারে না। যুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এমন অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, যাহা আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীমণ্ডলের পক্ষে সমর্থন করা অসম্ভব। সুতরাং কংগ্রেসী প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াই রহিলেন।

ওদিকে ভারত সরকারও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। বিশ্বমানবতা, গণতন্ত্র, মানবের জন্মগত অধিকার এবং পোলিশ স্বাধীনতার জন্য বৃটেন সত্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে কি না জানি না। কিন্তু ভারতের সম্বন্ধে তাহার দৃঢ়মুষ্টি এতটুকু শিথিল হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না। কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করিলে কি ভাবে গবর্ণর শাসনভার গ্রহণ করিবেন এবং দমননীতি পরিচালনার কি সুব্যবস্থা হইবে এখন হইতেই তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। উভয় পক্ষের এই মনোভাব দেখিয়া মনে হয়, কংগ্রেসের সহিত আবার একটা সংঘর্ষ অত্যাসন্ন।

বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন—

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনের সভাপতিত্বে যে বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন হইয়া গেল তাহার অপূর্ব্ব সাফল্যে বোঝা যায়, এই সম্বন্ধে বাঙ্গলার জনসাধারণের মনোভাব কত তীব্র। সম্মেলনে শুধু যে হিন্দুরাই যোগদান করিয়াছিলেন তাহা নয়, জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরাও উপস্থিত ছিলেন।

পৃথক নির্ব্বাচন জাতীয়তা বিকাশের পরিপন্থী। তবু সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ এই ব্যবস্থা দিতেই হয়, তাহাতে যেন পক্ষপাত দোষ না থাকে। এ সম্পর্কে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতায় যে সকল রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে জবরদস্তি পক্ষপাতিত্বের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সম্মেলনে কংগ্রেসের "না-গ্রহণ, না-বর্জ্জন" নীতিরও তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ—

অবশেষে মহাযুদ্ধ বাধিল। একদিকে জার্ম্মানী, অন্যদিকে বৃটেন, ফ্রান্স ও পোলাণ্ড মহাসমারোহে সমরানলে ঝাঁপ দিয়াছে। বার্লিনে সমর মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট লণ্ডন ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট প্যারিস খালি করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন। যাহারা এখনও পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ আছে, তাহাদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। হলাণ্ড এবং বেলজিয়ামেও সৈন্য সমাবেশ চলিতেছে।

শেষ পর্য্যন্তও একটা আপোষের কথা চলিতেছিল। হের হিটলার এবং মিঃ চেম্বারলেনের মধ্যে স্যার নেভিল হেণ্ডারসন তাঁতের মাকুর মত ছুটাছুটি করিলেন। কিন্তু তাহাতে যে শান্তির সকল সম্ভাবনাই ব্যর্থ হইল! জার্ম্মানী পোলাণ্ডকে বার্লিনে আসিয়া আপোষের কথা পাকা করিবার ২৪ ঘণ্টা মাত্র সময় দিয়া পোলাণ্ড আক্রমণ করিল।

ডানজিগ জার্ম্মানীর চাই, চাই পূর্ব্ব প্রাশিয়া হইতে জার্ম্মানীকে সংযুক্ত করিবার জন্য আরও এক ফালি ভূখণ্ড—করিডর ডানজিগকে পোলাণ্ডের নাসিকা বলিলেও চলে। বাহিরের হাওয়া এই পথেই পোলাণ্ডের হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ডানজিগ পোলাণ্ডেরও নয়, ইহা স্বাধীন নগরী। তাহার শুল্ক বিভাগ শুধু পোলাণ্ডের হাতে। ইহাই পোলাণ্ডের একমাত্র বন্দর এবং পোলীশ বাণিজ্যের কল্যাণেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি।

পক্ষান্তরে ডানজিগের প্রায় বারো আনা অধিবাসী জার্ম্মান। মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ইহা জার্ম্মানীর হাতেই ছিল। মহাযুদ্ধের পরে পোলাণ্ডকে যখন স্বাধীন রাজ্যরূপে সৃষ্টি করা হয়, তখন পরাজিত জার্ম্মানীর নিকট হইতে লইয়া ইহা স্বাধীন নগরী'তে পরিণত করা হয়। শক্তিমান বর্ত্তমান জার্ম্মানী সেই অবিচার সংশোধন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেলট্, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা বর্ত্তমান ডিউক অফ উইণ্ডসর হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মাজি পর্য্যন্ত সকলেই শান্তির আবেদন জানাইয়াছিলেন। ফল হয় নাই। জার্ম্মানী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পোলাণ্ডও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বৃটেন পোলাণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে যুদ্ধ এবারে বাধিল নৃশংসতায়, ধ্বংসলীলার ব্যাপকতায় ও ভীষণতায় গত মহাযুদ্ধ ইহার তুলনায় ছেলেখেলায় পরিণত হইবে। সেই আশঙ্কায় বিশ্ববাসী আজ ত্রস্ত।

জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি ও তাহার প্রতিকার—

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় প্রায় সকল জিনিষের দামই অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়, ইহাতে জনসাধারণকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। একদিনের মধ্যে চিনি, লবণ, দেশলাই প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির মূল্য দ্বিগুণ হয়। সুখের বিষয়, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তখনই ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা হওয়ায় দেশবাসী বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় আচরণকারী ব্যবসায়ীদিগকে গ্রেপ্তার করায় সুফল ফলিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্য তৎপরতার সকলেই প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঔষধ ব্যবসায়ীরা এখনও বহু ঔষধ বিক্রয় বন্ধ রাখিয়াছেন—সেগুলি পরে উচ্চমূল্যে বিক্রী করিবার আশায়। কাগজওয়ালারাও কাগজের মূল্য হ্রাস করেন নাই—তাহার ফলে সংবাদপত্রাদির মালিকগণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। পরে বিদেশী কাগজের আনয়নের খরচ বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু সেজন্য এখন হইতে ব্যবসায়ীদের পক্ষে কাগজ আটকাইয়া রাখা বা অন্যায়রূপ অধিক দরে বিক্রয় করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আমরা আশা করি, গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য জিনিষের মত জনসাধারণের নিত্য-ব্যবহারের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী কাগজেরও দর নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইবেন।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—

খ্যাতনামা প্রবীণ কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। ১২৬৬ সালে হাওড়া জেলার নারিট গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও তৎকালের বহু মাসিকে তাহার কবিতা প্রকাশিত হইত। তিনি ছেলেদের জন্য প্রকাশিত 'সখা' পত্রের সম্পাদক ছিলেন ও টুকটুকে রামায়ণ প্রভৃতি বহু শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালের 'প্রচার'-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে—

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন,
গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি গুঞ্জরণ।

দুলাতে মৃদু লতিকা বনে
খেলিতে নব কলিকা সনে
মধুরতর নাহি সে আর সমীর ধীর সঞ্চরণ।
কাননে ঢালি জ্যোছনা রাশি
ভাসে না চাঁদ গোকুলে আসি
নাহি সে হাসি প্রমোদ রাশি,
নাহি সে সুখ সম্মিলন।

ইত্যাদি। তাঁহার রচিত এইরূপ বহু কবিতা এখনও বহু প্রবীণ সাহিত্যিকের মুখে মুখে শুনা যায়। তিনি কখনও খ্যাতি বা অর্থের সন্ধান করেন নাই এবং তাহা পানও নাই। তথাপি আজ তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী সাহিত্যিক-মাত্রই তাঁহার কথা সাশ্রুনয়নে স্মরণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ৪দিন কলিকাতা সাহিত্য বাসরের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন এবং ৪ দিন যথাক্রমে ৪ জন উদ্বোধন করেন ও ৪ জন সভাপতিত্ব করেন—উদ্বোধক—(ক) ভাইস চ্যান্সেলার খান বাহাদুর আজিজল হক (খ) শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (গ) শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও (ঘ) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। সভাপতি—(ক) শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক (খ) শ্রীমতী নিরুপমা দেবী (গ) শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু ও (ঘ) রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রথম দিনে কবিতা, দ্বিতীয় দিনে ছোটগল্প, তৃতীয় দিনে সংবাদ সাহিত্য ও চতুর্থ দিনে সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল। আলোচনা ও লোকসমাগমের দিক দিয়া সম্মিলন সম্পূর্ণভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কলিকাতা শহরে শহরবাসীর নিজস্ব এই ধরণের সম্মিলন এই প্রথম হইল। যাহাতে বৎসর বৎসর এইরূপ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে কলিকাতাবাসী সকল সাহিত্যিক সমবেত হন, সেজন্য আমরা সম্মিলনের উদ্যোক্তাদিগকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

মহাজাতি সদন—

গত ১৯শে আগষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথ "মহাজাতি সদন" গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজনৈতিক সংগ্রামে যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে, প্রচণ্ড ঝাপ্টায় যাহাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়া গিয়াছে; শুধু যে তাহাদের আশ্রয়ের জন্য এই গৃহ পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা নয়, এই গৃহের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড হল থাকিবে, তাহাতে ২৫০০ লোকের বসিবার স্থান সঙ্কুলান হইবে। তাহা ছাড়া একটি সমৃদ্ধ পুস্তকাগার, ব্যায়ামাগার, পাঠাগারও

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থাকিবে। বাহিরের বিশিষ্ট অতিথিগণও এখানে থাকিতে পারিবেন।

সুভাষচন্দ্র জানাইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত এই কার্য্যের জন্য ৩১ হাজার টাকা তিনি পাইয়াছেন এবং ৫০ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন। আরও ২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বাঙ্গলা দেশে কোন বড় কার্য্যের জন্য অর্থের অভাব হয় নাই। আশা করি, এক্ষেত্রেও হইবে না। প্রার্থনা করি, সুভাষচন্দ্রের এই মহৎ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক।

ও যে মোর ফুলের নির্ঝর

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শতাব্দীর মহাসিন্ধু বুকে সভ্যতার দুরন্ত বাতাসে
প্রাণের তরণী
ডুবে যায় আর্ত্তনাদ করি ;

কেঁদে কেঁদে উড়িতেছে পাখী, আলো নাই অনন্ত আকাশে,
আঁধার বরণী
মেঘপুঞ্জে উঠিছে গুমরি'।

মুষ্টিমেয় যুগযাত্রিদল লভিয়াছে জীবনের আলো,
ভাগ্য-সবিতার
করুণায় দিবস মধুর।

বাকী পঙ্গু প্রাণীদের চোখে দুঃখ আর নাহি লাগে ভালো,
অশ্রু-কবিতার
বাজে ব্যথা বেদনার সুর !

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়া যে-জীবন দুর্য্যোগের পানে
করে আত্মদান
সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে,

ধরণীর ইতিবৃত্ত মাঝে স্থান যার নাহি কোন খানে,
তারি ব্যর্থ গান
গেয়ে যাই বেদনার সাথে।

জানি তার বসন্ত-পুর্ণিমা আসে নাই দক্ষিণ সমীরে,
ফোটেনি কুসুম,
সাধ ছিল ফুটিবার কত !

অনন্তের অন্তরের ধ্বনি ভাসে নাই ভগ্ন চিত্ততীরে
আসে নাই ঘুম,
সুখস্বপ্ন চির অনাগত !

জানি তার অভিশপ্তপথে বিভীষিকা করে আনাগোনা,
মায়ার ছলনে
শিহরিয়া কাঁদে পথচারী,

সকলের মাঝখানে জানি,—আপনারে নাহি জানাশোনা
দুঃখের দলনে
পারাবারে দিতে চায় পাড়ি,

তবু তারে লাগে মোর ভালো, বন্ধু ব'লে করি সম্বোধন
আলিঙ্গন দিয়া
ছায়ামগ্ন বনবীথি তলে।

সারল্যের শুভ্র মাধুরিমা ছেয়ে আছে তারি তনুমন
তাহারি লাগিয়া
পুষ্প মোর ফোটে অশ্রুজলে।

দৈন্যদাহে দগ্ধ চিত্ত তার কারুণ্যেরে করেছে সন্ধান,
ধরণীর পথে
ব্যর্থ হ'য়ে করে হাহাকার !

মদমত্ত রত্নগর্ব্বীদল গেয়ে চলে ঐশ্বর্য্যের গান,
পুষ্পরথ হ'তে
তার পানে চাহে না ক আর

ধরণীতে নহে তুচ্ছ কভু—হোক্ না ক চির-নিরক্ষর,
হোক্ না ভিখারী,
তার মাঝে আপনারে পাই।

তার পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি—সে যে মোর যুগের নির্ঝর
স্বপন-পসারী
পথহারা পথিকেরে চাই।

কাশ্মীরের মেষপালক

শিল্পী—সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা
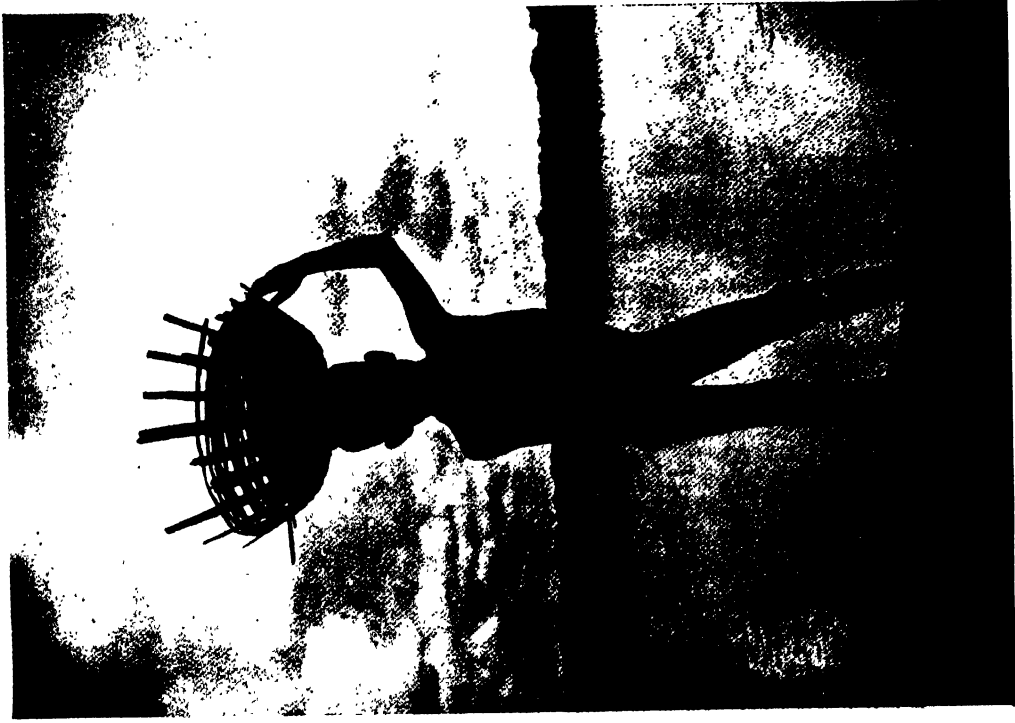
উড়ো মেঘ

শিল্পী—অমিয়লাল চৌধুরী, ময়মনসিংহ
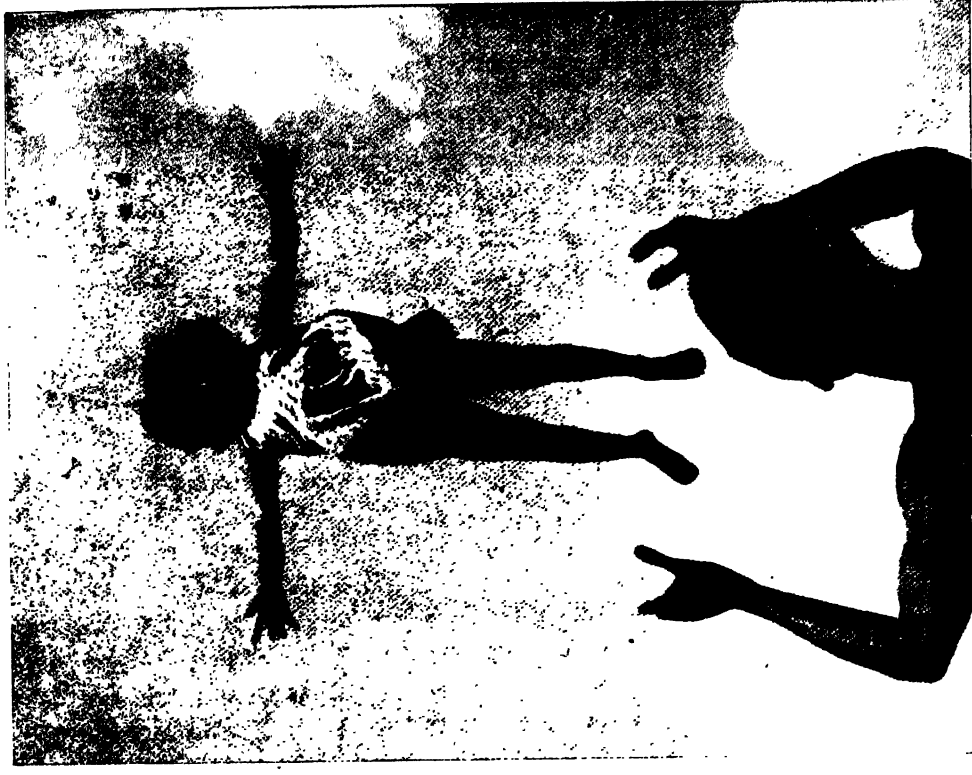
এই পড়লে

শিল্পী—পান্না সেন, কলিকাতা

মহাশয়

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ, বি-এল্

আশ্বিনের সুন্দর সন্ধ্যা। লেক রোডের একটি নাতিবৃহৎ মনোরম অট্টালিকার সংলগ্ন বাগানে দুইটি বর্ষীয়সী মহিলা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; অদূরে একটি যুবতী উল দিয়া ব্লাউজ বুনিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে তাঁহাদের কথোপকথনে যোগদান করিতেছিলেন। বর্ষীয়সীদের মধ্যে একজন মিসেস্ ডি-কে-বোস। ইনিই গৃহ-কর্ত্রী, মিঃ বোসের মৃত্যুর পর একাকিনী এই বাটীতে বাস করিতেছেন। অপরটি তাঁহার বান্ধবী মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি, আর যুবতীটি মিসেস্ বোসের একমাত্র সন্তান মিসেস্ ইভা দত্ত—উদীয়মান ব্যারিস্টার মিঃ এ-আর-দত্তর সহিত পরিণীতা।

দুটি বান্ধবীতে আজ মিলিত হইয়াছেন ইভার জন্ম-তিথি উপলক্ষে। আপাতত উহাদের কথা হইতেছিল মিঃ ডি-কে-বোসের অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ সুদর্শন রায়ের সম্বন্ধে। তিনিও আজ নিমন্ত্রিত; আগেই আসিয়াছিলেন ও বৈকালিক চা-পানের পর একটু বেড়াইয়া আসিবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছেন।

মিসেস্ বোস মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিকে বলিলেন, "কেমন লাগ্‌ল সুদর্শনবাবুকে তোমার?"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "বেশ লাগল—কিন্তু, দোষ নিও না, কেমন একটু খাপ-ছাড়া ব'লে মনে হয় নাকি ওঁকে?"

"খাপছাড়া মানে যদি অনন্য-সাধারণ বল, তা হ'লে তুমি তা বলতে পার ওঁর সম্বন্ধে। সব বিষয়ে মৌলিকত্ব ওঁর একটা চিরদিনকার বিশেষত্ব। আমার স্বামী ও উনি বরাবর স্কুলে একত্র পড়তেন। স্কুল থেকে পাশ ক'রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান উনি লাভ করেছিলেন। ছেলে বয়স থেকেই ওঁরা দুটিতে ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে অভেদাত্মা। কতবার কতরকমে ওঁকে দেখেছি; কখনও ওঁর স্বভাবজাত সুন্দর মধুর ব্যবহারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম আমি দেখিনি। এত ভাল, তাই বোধহয় এ সংসারের উপযুক্ত উনি ততটা নন। মিঃ বোসের মৃত্যুর পর ওঁর দুঃখ যদি দেখ্‌তে! এত দুঃখ বোধ হয় অন্তরঙ্গ সহোদর ভাইয়ের জন্যও কারুর হয় না।" কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুদর্শনবাবুর কথা মিসেস্ চাটার্জ্জির কাছে বল্‌ছিলাম, ইভা।"

ইভা বলিল, "কাকাবাবুর চেহারা কত খারাপ হ'য়ে গেছে, লক্ষ্য করেছ মা?"

মিসেস্ বোস বলিলেন, "খারাপ কিছু দেখ্‌লাম; কিন্তু চেহারা ওঁর প্রায় ঐ রকমই বরাবর—"

তাহার পর মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিকে বলিলেন, "অবস্থা ওঁর খুবই ভাল—তার উপর তিনি বিয়ে করেন নি। কোনো ঝঞ্ঝাটও ওঁর নেই। তা সত্ত্বেও কি উনি এখন করেন, জান? শহরের এক অত্যন্ত দরিদ্র পল্লীতে উনি এখন বাস করেন। কোথায় যেন, ইভা?"

"আহিরীটোলা অঞ্চলে"

"হাঁ, সেখানে এক হীন খোলার ঘর ওঁর আধুনিক বাসস্থান। উদ্দেশ্য, গরীবদের মধ্যে থেকে তাদের জীবনের সব দুঃখ-দৈন্য স্বচক্ষে অনুধাবন ও যথাসাধ্য তার প্রতিকার করা। জীবনের সব সুখ ও ভোগ-বিলাস থেকে আজ উনি বিচ্ছিন্ন এরই জন্য। ভদ্র-সমাজে ওঁকে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। বোধ হয় শুধু আমাদেরই বাড়ীতে উনি যা দু-একবার আসেন। এই যে অমানুষিক স্বার্থত্যাগের ব্রত তিনি নিয়েছেন মাথা পেতে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য, সে সম্বন্ধে কেউ বোধ হয় কিছুই জান্‌তে পারেনি। উনিও পারতপক্ষে ও বিষয়ের আলোচনা মোটেই করেন না। কি মহানুভব লোক; কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণে কিছু বুঝতে পেরেছিলে তুমি এ সম্বন্ধে?"

"মোটেই না। কিছুই ত উনি বিশেষ বলেন নি। ওঁর কথা থেকে শুধু জান্‌তে পেলাম—সখ্ ক'রে কাঠের খেল্‌না তৈরী করা ও রাজনীতি আলোচনা ওঁর খুব ভাল লাগে।"

একটু হাসিয়া ইভা বলিল, "বরাবরই ও-দুটো 'হবি' কাকাবাবুর কাঁধে চেপে আছে। যখন ছোট ছিলাম—কত রকমের কত খেল্‌নাই না উনি আমায় এনে দিতেন, নিজ হাতে তৈরী ক'রে! তারপর আমার বি-এ, এম্-এ পড়বার সময় কত সহজ ও সুন্দরভাবেই যে উনি ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের জটিল বিষয়গুলি আলোচনা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন আমায়—যা কোনো প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের কাছ থেকেও কখনো পাইনি আমি!"

মিসেস্ বোস ব'ল্‌লেন, "কিছুই অসম্ভব নয় এই সুদর্শনবাবুর পক্ষে! আমার স্বামীর দেখা-দেখি উনিও এই অঞ্চলেই বাস করতে লাগ্‌লেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কি যে হ'ল, উনি বাড়ীখানা ছেড়ে দিয়ে কোথায় উধাও হ'লেন—কোন মতেই ওঁর খোঁজ এই দু বছরের ভেতর পাইনি। হঠাৎ সেদিন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বারান্দায় সাক্ষাৎ পেলাম। কি যে ওঁর হয়েছিল বল্‌তে পারি না; তবে এটা ঠিক্, এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য ওঁর জীবনের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালিত হচ্ছে। সম্ভবত

গরীবের ক্রন্দন ওঁর কোমল প্রাণের এত করুণ এক তন্ত্রীতে আঘাত করেছে যার জন্য আজ এই অবস্থা।—তাই আজ উনি আত্ম-ত্যাগী কর্ম্মী তাপস।"

এই সময় সদর দরজায় পায়ের শব্দ শোনা গেল ও অব্যবহিত পরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন কয়েকটি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক, আর তাদের মধ্যে সুদর্শনবাবু। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের কাছাকাছি, গৌরবর্ণ, নাতিদীর্ঘ গঠন, সামান্য অবনতাকৃতি, মুখে একভুবনভোলা হাসি—তাহা সত্বেও সমস্ত মুখে দৃঢ়তার এক স্পষ্ট ছাপ। লাজুক স্বভাববশত সবাইকার পিছনে মাথা নীচু করিয়া আসিতে আসিতে বোধ হয় তিনি এক কোণেই নীরবে বসিয়া পড়িতেন, যদি না ইভা উঠিয়া গিয়া তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া বসাইত। চেয়ারটা তাঁহার কাছে আরও একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া ইভা বলিল, "পূজোর সময় নিশ্চয় আপনি বাইরে কোথাও যাবেন কাকাবাবু?"

দ্বিধাভরে সুদর্শনবাবু বলিলেন, "হাঁ, যাব বোধ হয় কোথাও—ওঃ না, নাও যেতে পারি, ঠিক মোটেই নেই।"

"কিন্তু কাকাবাবু, শরীরটা আপনার ভেঙ্গে পড়েছে ব'লে স্পষ্টই মনে হয়। যদি না মনে করেন কিছু, তা হ'লে আপনাকে আন্তরিক অনুরোধ করছি—চলুন, আমাদের সাথে এবার পুরীতে। শরীটাও আপনার শুধ্‌রে যাবে, তার উপর খুবই আনন্দ পাব আমরা আপনাকে ক'টা দিনের জন্যে কাছে পেয়ে। যত খুশী রাজনৈতিক আলোচনা করবেন ওঁর সঙ্গে। বলুন, আমাদের এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন না কাকাবাবু!"

"তোমার এই স্নেহের উপরোধ খুবই আনন্দ আমায় দিল মা ইভা, তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু মা, আমার বোধ হয় যাওয়া ঘটবে না তোমাদের সঙ্গে। বোধ হয় কেন, হবে নাই একরকম; কারণ এমন একটা কাজে আমি ব্যাপৃত আছি, যা ছেড়ে যাওয়া আমার চলবেই না এখন।"—ধীরে ধীরে দ্বিধা-ভরে সুদর্শনবাবু একথাগুলি বলিলেন—যা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল তাঁহার হৃদয়ে কি যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

"কিন্তু এই শরীর নিয়ে, পরের দুঃখে মনটা সর্ব্বদা অস্থির ক'রে আহিরীটোলার ঐ নোংরা বস্তিতে বেশি দিন একাদিক্রমে প'ড়ে থাকলে কি দেহটাকে সুস্থভাবে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌তে পারবেন? মাপ করবেন কাকাবাবু, কিন্তু শরীর রক্ষার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি দেওয়া সবারই কর্ত্তব্য নয় কি?"

"তা ত একশ বার। কিন্তু আমি ত ভালই আছি। কাকাবাবুর উপর অন্ধ স্নেহ ভুল ধারণা এনে দিয়েছে তোমার মনে—আমার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে। তা ছাড়া আহিরীটোলা ত নিতান্ত মন্দ স্থান নয়। যে জায়গাটায় আমি থাকি সেটা বস্তির মধ্যে হ'লেও গঙ্গা যে তার খুবই কাছে। আর দুবেলাই ত খানিকটা সময় গঙ্গার ধারে গিয়ে ব'সে নির্ম্মল হাওয়া আমি পেয়ে থাকি। কিছুমাত্র শঙ্কিত হ'য়ো না আমার জন্য। শরীর যদি বাস্তবিকই খারাপ বোধ করি, তা হ'লে তোমাদের না জানিয়ে—কে আর আছে আমার যাকে জানাব?"

আহারাদির পর সবাই একে একে বিদায় লইলেন—সুদর্শনবাবুও বাহির হইয়া পড়িলেন মিষ্ট মধুর বিদায় অভিবাদন করিয়া। কেহ গেল মোটরে, কেহ ট্রামে বাসে, কিন্তু সুদর্শনবাবু ধীরগতিতে পদব্রজে চলিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া মোটেই মনে হইল না, স্বেচ্ছায় তিনি এই নৈশ-ভ্রমণ উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছিলেন। উপরোক্ত যতই অগ্রসর হইতেছিলেন ততই যেন তিনি অবসন্নভাবে পা-দুখানি টানিয়া টানিয়া চলিতেছিলেন। অবশেষে রাত্রি প্রায় একটার সময় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এক গলিপথে একটি বস্তিতে ঢুকিয়া তাহার শেষ প্রান্তে একখানি জীর্ণ খোলাঘরের একটি কামরায় তিনি প্রবেশ করিলেন ও জামাটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া পুরাতন একটি তক্তপোষের উপর পাতা মলিন বিছানায় দেহ এলাইয়া দিলেন এবং অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন ঘুম যখন তাঁহার ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় আটটা। তিনি উৎকণ্ঠাভরে বিছানায় উঠিয়া সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্বরাত্রের পরিহিত পোষাকগুলি সযত্নে পাট করিয়া তুলিয়া রাখিলেন! তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে একটা টিনের কৌটা হইতে খানিকটা চিঁড়া একটা লোহার বাটীতে ঢালিয়া জলে ধুইয়া চিনি দিয়া কোন মতে গলাধঃকরণ করিয়া শ্রমিকের পোষাকে বাহির হইয়া গেলেন। কয়েকটি গলি-ঘুঁজি ঘুরিয়া তিনি একটি দপ্তরীর কারখানায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজন বৃদ্ধ দপ্তরী একটি বাক্সের উপর বসিয়া সট্‌কায় তামাক টানিতেছিল। চারিদিকে তাহার কাগজ আঠা মলাট বই আরও কত কি সব ছড়ান। সুদর্শনবাবু সেখানে প্রবেশ করিয়া হাত তুলিয়া বলিলেন, "সেলাম ওস্তাদজি!" ওস্তাদজি সট্‌কা হইতে ঈষৎ মুখখানি তুলিয়া প্রত্যভিবাদন বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় সট্‌কায় মনো-নিবেশ করিলেন। সুদর্শনবাবু নিজেকে বই বাঁধান কার্য্যে ব্যাপৃত করিলেন। ওস্তাদজিও নিজ কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁহাকে কাজ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন। এই ভাবে আগ্রহশীল শিক্ষার্থীর ন্যায় পূর্ণ উদ্যমে একাদিক্রমে আটঘণ্টা কাল পরিশ্রম করা আজকাল সুদর্শনবাবুর দৈনন্দিন কার্য্য।

সদ্বংশজাত, ধনীর একমাত্র সন্তান, হিন্দুস্কুল-প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব মেধাবী ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী প্রভৃত কোম্পানী-কাগজের উপস্বত্ব-ভোগী সুদর্শন রায়ের আজ এই অবস্থা! পাঠ সাঙ্গ করিয়া কিছুদিন তিনি কোন একটা কিছু করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়া

ছিলেন। কিন্তু কোন কিছু করিবার কোনও আবশ্যকতাই তাঁর মোটে ছিল না। তাই তিনি নিরস্ত হইয়া বালিগঞ্জ অঞ্চলে তাহার আবাল্য সহপাঠী অন্তরঙ্গ সুহৃদ মিঃ বোসের বাটীর সন্নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। বিবাহের চেষ্টাও ক-একবার তিনি করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিবারই বীতরাগ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইয়াছিল নিজ প্রকৃতির সহিত সে সব স্ত্রী প্রকৃতির দারুণ অসামঞ্জস্যতার তাড়নায়। তাহার পর হইতে তাঁহার জীবন চলিল স্বাধীন, সানন্দ, স্বচ্ছন্দ গতিতে।

মিঃ বোস ছিলেন সেয়ার মার্কেটের নাম করা জহুরী। প্রায়ই তিনি সুদর্শনবাবুকে তাহার টাকা উচ্চ-উপস্বত্বভোগী ভাল সেয়ারে না লাগাইয়া কোম্পানীর কাগজের কম সুদে ফেলিয়া রাখিবার জন্য অনুযোগ করিতেন। তিনি বলিতেন —এমন অনেক কাজ আছে সেয়ার বাজারে, যাহাতে টাকা নিয়োজিত করিলে ক্ষতির আশঙ্কা বিন্দুমাত্র নাই। সেগুলি কোম্পানীর কাগজের মতই নিরাপদ, অথচ উহাদ্বারা অন্তত চতুর্গুণ বেশী লাভবান হওয়া যায় কোম্পানী-কাগজের তুলনায়। বন্ধুর একথায় সুদর্শনবাবু বহুদিন কোন আমল দেওয়া আবশ্যকই মনে করেন নাই, কারণ কাগজগুলি হইতে তাঁহার যে আয় তাহা তাঁর প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক। অবশেষে মিঃ বোসের এই আশ্বাসের কথা তাঁহার মনে ধরিল—তাঁহার খুল্লতাতপুত্রী ভগ্নী সুনন্দাকেও নিয়মিত কিছু অর্থ সাহায্য করিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া। সুনন্দার স্বামী পাটনায় ব্যারিষ্টারী করিতেন। কিন্তু ব্যবসাদ্বারা সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা লাভ তিনি কখনও করিতে পারেন নাই। তাই ছয়টি পুত্র ও স্ত্রীকে ভালভাবে ভরণ পোষণ করিতে গিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। সুনন্দা সে কথা জানাইলে সুদর্শনবাবু সে ঋণ পরিশোধের একটি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন ও তাহাদের ভরণপোষণের জন্য মাসে মাসে কিছু পাঠাইবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মিঃ বসুর উপর সম্পূর্ণ আস্থা তাঁহার বরাবরই ছিল। তাই সুনন্দার সাহায্য বিষয়ে অনুকূল হইবে বলিয়া তিনি তাঁহার কোম্পানীর কাগজগুলি বিক্রয় করিয়া সেই টাকা মিঃ বোসের নির্দেশ অনুযায়ী সেয়ারে নিয়োজিত করিলেন। ফলে কিছুকাল পরে যে সংবাদ তিনি পাইলেন তাহাতে ইহাই দাঁড়াইল যে তিনি সর্ব্বনাশের শেষ সীমায় উপনীত, প্রায় পথের ভিখারীর মত অবস্থায় তিনি পতিত।

তাঁহার এই সেয়ার ঘটিত সর্ব্বনাশের কাহিনী মিঃ বোস ভিন্ন আর কেহই জানিত না। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ বোস কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া মারা গেলেন। সেয়ারের এই দুর্ঘটনায় মিঃ বোসের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা খুব বেশী নয়, কিন্তু সুদর্শনবাবুকে সত্য সত্যই ইহার জন্য পথে বসিতে হইল। তিনি এ বিষয়ে মিসেস্ বোসকে কিছুমাত্র না বলিয়া এটর্ণীর সাহায্যে ধ্বংসাবশিষ্ট তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া অকিঞ্চিৎকর যাহা পাইলেন তাহা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া কেবলমাত্র ভগ্নীকে এই আকস্মিক বিপৎপাতের কথা জানাইয়া সকলের অগোচরে নীরবে লেক রোডের বাড়ী হইতে সরিয়া পড়িলেন।

দারুণ দুর্দ্দশায় তিনি পড়িলেন। ধ্বংসাবশিষ্ট যে টাকা তিনি ব্যাঙ্কে রাখিয়াছিলেন তাহা ব্যয় করিতে তিনি সাহস করিলেন না। তাহা হইতে যে সুদ পাওয়া যাইতে পারে তাহাও নগণ্য—অত্যন্ত দরিদ্র শ্রমজীবীর জীবন যাপনের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। আত্মীয়বন্ধুদের দয়ার উপর নিজেকে নিক্ষেপ করিবার চিন্তা তাঁহার মনকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। এমন কি, হীনভাবে পরিচিত লোক-সমাজে মুখ দেখাইতেও অন্তরাত্মা তাঁহার বাঁকিয়া বসিল। তাই নিজেকে পরিচিত সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া শারীরিক শ্রম দ্বারা যে কোনও উপায়ে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া লইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমে তিনি চিৎপুরের এক মুসলমান পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র ঘর লইয়া কাঠের খেলনা তৈয়ারী করিয়া একটি লোকের সাহায্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে মাসে তাহার চারি-পাঁচ টাকার বেশী আয় দাঁড়াইল না। তাই উহা ত্যাগ করিয়া তিনি আহিরীটোলার এক দরিদ্র বস্তিতে উঠিয়া গিয়া এক বৃদ্ধ দপ্তরীর নিকট কার্য্য শিক্ষা সুরু করিলেন। ওস্তাদ দয়া করিয়া যাহা তাঁহাকে দিত ও ব্যাঙ্কের সামান্য কয়টি সুদের টাকা দ্বারা কোনও রকমে তিনি নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিলেন। পূর্ব্বেকার অবস্থার সিগারেটের খরচ দ্বারা তাঁহাকে এখন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। তাই শরীর ও মনের এত অবনতি সহ্য কবিতে যে দ্বন্দ্ব তাঁহার মনে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিত তাহার সহিত নিজেকে আংশিক খাপ খাওয়াইয়া লইতেও তাঁহার অনেক দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর ক্রমে এই নূতন অবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া বহু নূতন জ্ঞান তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আয়ত্ত করিতে হইল। এ বিষয়ে কোনও চিন্তাও কখনো যে তাঁহাকে করিতে হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বে কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় কি করিলে কত কম মূল্যে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে জীবন যাপন করা যায় তাহাই হয় মানুষের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা। সুদর্শনবাবুকেও তাই এ বিষয়ে নজর দিতে হইল বাধ্য হইয়া। জিনিষের দর, কোথায় কি সস্তা, কোন্ খাদ্য মূল্যানুপাতে বেশি পুষ্টিকর ইত্যাদি বহু বিষয় তাঁহাকে চিন্তা ও অনুধাবন করিয়া শিখিতে হইল।

এই অবস্থার মধ্যে একদিন তিনি সুদের টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে গেলে সেখানে হঠাৎ তাঁহার দেখা হইল মিসেস্ বোসের সঙ্গে। আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার দিকে ছুটিয়া গিয়া তিনি বলিলেন, "এই যে সুদর্শনবাবু!

কি হয়েছিল আপনার এত দিন? কোথায় উধাও হ'য়ে গিয়েছিলেন আপনি? বিদেশে গিয়েছিলেন কি?"

হঠাৎ তাঁহার সহিত এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়ায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া প্রায় যন্ত্র-চালিতের মত তাঁহারই কথার যেন প্রতিধ্বনি করিয়া সুদর্শনবাবু বলিলেন, "হাঁ, বিদেশেই গিয়েছিলাম…"

তাঁহাকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া মিসেস্ বোস অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "বিদেশে গেলে কি আমাদের একখানা চিঠি লিখেও একটু খোঁজ কর্‌তে বা দিতে নেই, সুদর্শনবাবু? কি মমতাহীন আপনি! কেন যে আপ্‌নি আমাদের ঘুণাক্ষরে এতটুকু আভাষ মাত্র না দিয়ে ওভাবে নিরুদ্দেশ হলেন তা আজ পর্য্যন্ত আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। ইভা ত প্রায়ই বলে—হয় ত আমরা কোন ব্যবহারে আপনার প্রাণে গভীর দুঃখ দিয়েছি। বলুন, কি করেছি আমরা আপনার—"

লজ্জিত হইয়া সুদর্শনবাবু বলিলেন, "কি যে ওসব বল্‌ছেন আপ্‌নি! দোষ আমারই সম্পূর্ণ। কেন যে আমি ওভাবে উধাও হ'য়ে গিয়েছিলাম ও আপনাদের কোন কিছু জানাই নি তার জবাব দেওয়া সহজ নয়—অনেক কিছু বল্‌তে হবে। শুধু জেনে রাখুন, ওটা আমার একটা খেয়াল বা পাগ্‌লামো বই আর কিছু নয়—তাতে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব আপনাদের নেই।"

মিসেস্ বোস বলিলেন—"থাক, যা করেছেন বেশ, তার কারণ না হয় পরে জানা যাবে। বলুন ত এখন, কবে যাচ্ছেন আপ্‌নি আমাদের ওখানে? ইভা ত আপনার জন্য অস্থির! জামাতা বাবাজিকে দিয়ে সে কত যে খোঁজ করিয়েছে আপনার! যাক আসা চাই কিন্তু আপ্‌নার আমাদের ওখানে। কাল আশা করতে পারি কি আপ্‌নাকে?"

"আচ্ছা, কালই যাব।"

"ঠিক ত? কাল বিকেলে আপনার জন্য পথ চেয়ে থাক্‌ব কিন্তু। ইভা আর অজয়কে খবর দিয়ে আনিয়ে রাখ্‌ব, বুঝলেন?"

সারা পথ সেদিন ও তার পরদিন তাঁহার কাটিয়া গেল; কি জবাব তিনি দিবেন মিসেস্ বোসকে তাদের সঙ্গে ঐরূপ আকস্মিকভাবে সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া এত দিন অজ্ঞাতবাস করার। তাঁহার বর্ত্তমান শোচনীয় দারিদ্র্যের এবং কর্ম্ম ও বাসস্থানের কথা ও তাহার কারণ তাহাদিগকে বলিবেন কি? বলিলে, তাহাদের দয়ার নিষ্পেষণে মনের অবস্থা তাঁহার যেরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া সমস্ত অন্তরটা তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তদুপরি তাঁহার এই অশেষ দুর্দ্দশার করুণ কাহিনী উহাদের প্রাণে যে দুঃখের কারণ হইবে তাহা তাহাদিগকে না দেওয়াই বোধ হয় ভদ্রোচিত। কিন্তু অপরপক্ষে, তাঁহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে। তাহাও কি ঠিক? কিন্তু অপ্রিয় সত্যটা কি না বলাই শ্রেয়তর নয় এ ক্ষেত্রে? আবার ইহাও ঠিক যে, তাঁহার দুর্দ্দশার কাহিনীর সত্য বিবৃত্তি তাঁহার মৃত সুহৃদ মিঃ বোসের নিন্দাবাদের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইবে—ইহা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত ইহার বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাবে সাড়া দিল।

ফলে যখন তিনি পরদিন মিসেস্ বোসের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন তখনও মন তাঁহার এ বিষয়ে দোদুল্যমান। ড্রইং-রুমে গিয়া তিনি দেখিলেন মিসেস্ বোস, ইভা ও অজয় তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তাঁহাদের আন্তরিক অভ্যর্থনায় মন তাঁহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই তাহাদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে ইতস্তত করিয়া তিনি তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা প্রায় একটা নভেলের ঘটনার মত হইয়া দাঁড়াইল। সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হইলেও অনেকটা ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিয়া তিনি যখন উহার তাৎপর্য্যটা উপলব্ধি করিতে পারিলেন তখন এই নিছক্ মিথ্যা সৃষ্টির জঘন্যতা তাঁহার মনকে গভীর ভাবে পীড়িত করিয়া তুলিল।

উহাদের প্রশ্নোত্তরে যাহা তিনি বলিয়াছিলেন মোটামুটি তাহা এই দাঁড়াইয়াছিল যে, তিনি এখন আহিরীটোলা অঞ্চলে এক গরীব বস্তিতে ছোট একখানি ঘর লইয়া বাস করিতেছেন। উদ্দেশ্য, গরীবদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া গিয়া তাহাদের দুঃখ দৈন্য, অভাব অভিযোগ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা অর্থাৎ লোক-সেবাই তাঁহার এই অজ্ঞাতবাসের উদ্দেশ্য; এক কথায়, যাহা তিনি মিসেস্ বসুকে পূর্ব্বদিন বলিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার একটা খেয়াল বই আর কিছু নয়।

তাহার পর সকলের আলোচনার বিষয় হইল সুদর্শনবাবুর মহত্ত্ব ও তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য। তাঁহাদের এই প্রশংসাবাদ নিদারুণ কশাঘাতের মতই তাঁহার মনটিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। দারুণ অনুশোচনায় মন তাঁহার ভরিয়া উঠিল। অপ্রস্তত হইয়া তিনি প্রায় বাক্‌রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সুদর্শন-বাবুর এই অস্বস্তিভাব তাহারা তাঁহার মহত্ত্বের অন্যতর নিদর্শন বলিয়া ধারণা করিয়া লইলেন। তাই ও বিষয় ত্যাগ করিয়া তাহারা অন্য বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সুদর্শন-বাবুর এই কাহিনী অবিশ্বাস করিতে বা তাঁহার বর্ত্তমান কঠোর দারিদ্র্যের কথা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। কারণ সবাই জানিত তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল। পূর্ব্বদিনও তাঁহাকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে দেখা গিয়াছিল। তাহারও তাৎপর্য্য এই যে তিনি ধনী। তদুপরি সকলেই তাহাকে খেয়ালী বলিয়া জানিত। তাই তাঁহার এই কাহিনীর সত্যতা সবাই নিঃসন্দেহে মানিয়া লইয়া তাহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইলেন। কেবল সুদর্শনবাবুর মন এই

মিথ্যা সৃষ্টির জন্য নিদারুণ ধিক্কার ও অনুশোচনায় বিদ্ধ হইতে লাগিল।

বৎসরাধিক কাল এইভাবে কাটিল। ইতিমধ্যে সুদর্শনবাবু পনের-কুড়িবার মিসেস্ বোসের বাড়ীতে উঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট, দুঃখপূর্ণ জীবনের একঘেয়ে দংশন হইতে অন্তত কিছুকালের জন্য এই বিরামটুকু তাঁহার ভাল লাগিত। শুধু তাঁহার বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলেই বিবেকের তাড়না তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত—তাহার প্রকৃত অবস্থার কথা মিসেস্ বোসের কাছে বলিলে হয় ত জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে আর এই অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। সুদ ও দপ্তরীর কার্য্য করিয়া তাঁহার যে আয়, তাহা দিয়া কোন মতে মাসের কুড়ি-পঁচিশ দিন তাঁহার চলিত; বাকী কয়দিন প্রায় অর্দ্ধাশনে কাটাইতে তিনি বাধ্য হইতেন।

এ অবস্থায় মিসেস্ বোসের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া একদিন অপরাহ্নে তিনি তাঁহার অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় পিওন তাঁহাকে একখানি চিঠি দিয়া গেল। চিঠি তাঁর নামে আসে না বড় একটা, তাই কম্পিত হস্তে খুলিয়া দেখিলেন, ইভা লিখিয়াছে ও তাহাতে সংলগ্ন পাঁচশত টাকার একখানি চেক।

ইভা লিখিয়াছে:—

"পূজনীয় কাকাবাবু,

আপনার অসাধারণ আত্মত্যাগ ও মহৎ ব্রত সম্বন্ধে সব সময়ই ভাবি ও গর্ব্বে আমাদের বুক ভ'রে ওঠে, আমরা আপনারই একজন ভেবে। যাদের কল্যাণের জন্য আপনি নিজের সব ঐহিক সুখ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়েছেন তাদের অবস্থার কথা ভাব্‌লে খুবই দুঃখ হয়। কত অর্থ কত দিকে আমরা বৃথা অপচয় করি প্রতি দিন—যা পেলে বোধ হয় ওদের অনেকের জীবন রক্ষা পায় দুটি খেতে পেয়ে। তাই ছুটিতে পুরী যাবার আগে তাদের উদ্দেশ্যে এই সামান্য টাকাটা আপনার হাতে সঁপে দিলাম। আশা করি তাদের জন্য গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ করবেন।

কালই আমরা পুরী রওনা হচ্ছি। আপনিও আসুন না কাকাবাবু ক'দিনের সময় ক'রে। খুব সুখী হব আমরা দু'জনে ক'টি দিনের তরে আপনার সেবা করবার সুযোগ পেলে। ইতি

প্রণতা
ইভা

চেকখানি অনশনক্লিষ্ট হতভাগ্যের সম্মুখে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যের মত সুদর্শনবাবুর নিকট মনে হইল। দারুণ অর্থাভাব-জনিত তাঁহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যাগুলি একে একে তাঁহার মনে জাগরূক হইয়া এক নিদারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাঁহার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। শীঘ্র কোনো ব্যবস্থা না করিলে শরীরটা তিনি আর বেশী দিন খাড়া রাখিতে পারিবেন না তাহা তিনি বেশ অনুভব করিতেছিলেন। পুরাতন পোষাক পরিচ্ছদের সাহায্যে তিনি মিসেস্ বোসের বাড়ীতে এখনও যাতায়াত করিতে পারিতেছেন—তাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না হইতে দিয়া, সেগুলিও জীর্ণতার শেষ দশায় পৌছিয়াছে। দপ্তরীর কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হইলে সেই সংক্রান্ত কিছু টাকার যন্ত্রপাতি তাহাকে খরিদ করিতে হইবে। আরো অনেক কিছু দরকারী বিষয় ছাড়িয়া দিলেও ভদ্রোচিত পোষাক ও কিছু যন্ত্রপাতি তাঁহার না হইলেও নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ খরচ চালাইবার মত অর্থ সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে অনাহারে মরিতে হইবে ইহা নিশ্চিত। এই সব চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু এসবের পূর্ব্বে ইভার চিঠিখানার জবাব দেওয়া সর্ব্বপ্রথম দরকার বিবেচনা করিয়া সুদর্শনবাবু নগ্ন কেরোসিনের আলোটি জ্বালিয়া লিখিতে বসিলেন। কিন্তু কত বার কালী উঠাইলেন লিখিবার জন্য—কতবার সে কালী শুকাইয়া গেল, লেখা অগ্রসর হইল না। অবশেষে তিনি লিখিলেন—

"ইভা, মা আমার,

—আবার বসিয়া রহিলেন কি লিখিবেন, খুঁজিয়া না পাইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার ঘুম পাইল। এক ঝাঁকুনি দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া তিনি লিখিতে লাগিলেন—

"আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার অশেষ দয়ার নিদর্শন চেকখানি আমি গ্রহণ করিলাম। অন্তরের সহিত ইহার জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাইতেছি। টাকাটা··[আরও খানিকক্ষণ চিন্তার পর তিনি শেষ করিলেন] তোমার নির্দ্দেশমত ব্যয় করিব ও পরে কি ভাবে ব্যয়িত হইল বিস্তারিত তোমাকে জানাইব।"

লিখিতে এত বাধা জীবনে তিনি আর কখনও পান নাই। যাহা লিখিলেন তাহাও তাঁহার পছন্দ হইল না। কিন্তু আর কিছু লিখিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। এ পর্ব্বের শেষ করিয়া চিন্তার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য তখনই তিনি সেটা ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। চিঠিখানা লিখিতে যেন তাঁহার শরীরের সমস্ত শক্তি তিরোহিত হইয়াছে। তাই তিনি শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিদ্রা তাঁহার আসিল না। সারা রাত্রি তাঁহার বিনিদ্র কাটিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এই দান গ্রহণের উপযোগী দরিদ্র কোথায় তিনি পাইবেন? তাঁহার বাড়ীর চারিপাশের সবাই গরীব, কিন্তু উহাদের ও তাঁহার দারিদ্র্য কি একই প্রকারের? তাহাদের প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ যাহাদের ঘটিয়াছে তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই এই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, তাহাদের

দারিদ্র্য সম্বন্ধে অধিকাংশ কথাই অতিশয়োক্তি। অর্থ তাহারা উপার্জ্জন করে, কিন্তু দারিদ্র্য তাহারা নিজেরাই ডাকিয়া আনে—নানা দুর্নীতিবশত সেই অর্থের অপব্যবহার করিয়া। এইভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহার মত দরিদ্র লোক বোধ হয় বেশী খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য।

চিন্তাধারা তাহার অন্য পথে ধাবিত হইল। ধনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া কে তাহাকে এই চরম দুর্দ্দশার আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াছে? ইভার পিতাই নয় কি? এই ধারায় চিন্তা করিলে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় জীবন-রক্ষার অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়-বহনে এই অর্থ নিয়োজিত করিলে অন্যায় হইবে কি? হঠাৎ তাঁহার মনে অন্য এক চিন্তা উদিত হইল—হয়ত বা ইভা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইচ্ছা করিয়াই এই অর্থ তাঁহারই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছে!···

ভোরে উঠিয়া নিজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও তৎসম্পর্কে মিঃ বোসের দায়িত্বের ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধ-মূল হইল। এক লম্ফে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি চেকখানি বাহির করিয়া আনিলেন ও প্রায় ঘণ্টাখানেক উহা লইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার খেয়াল হইল কাজের সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। তাই তিনি ছুটিলেন দপ্তরী-খানায়। দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া চেক ও তাহার হাতের টাকা ক'টি পকেটে করিয়া তিনি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন ও প্রায় যন্ত্রচালিতবৎ একটি জুতার দোকানে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং বড় কিছু না দেখিয়াই একজোড়া জুতা তিনি ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। চেক্ ত ভাঙ্গান হয় নাই। জুতা জোড়াটার দাম দিতে তাহার বহু মূল্য অর্থের প্রায় সবই শেষ হইয়া গেল। পুরাতন জুতা জোড়াটি বগলদাবা করিয়া নূতন জোড়াটা পরিয়া মচ্-মচ্ করিয়া তিনি চলিলেন। বাড়ী পৌছিয়া তিনি প্রথম অনুভব করিলেন যে জুতা জোড়াটি বিশ্রী মচ্-মচ্ শব্দ করিতেছে ও পা দুখানি তাঁহার আহত। কি বিশ্রী ব্যাপার!···কিন্তু সব নূতন জুতাই ত ঐরূপ শব্দ করে ও প্রথম প্রথম পায়ের ব্যথার কারণ হয়! বহুদিন নূতন জুতা ক্রয় করেন নাই—তাই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।···শ্রান্তিতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর এলাইয়া পড়িতেছিল। ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নাও তাহাকে উৎপীড়িত করিতেছিল। তাই তিনি যৎসামান্য কিছু গলাধঃকরণ করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

সারা রাত্রি তাঁহার কাটিল এক বেখাপ্পা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে! তিনি যেন নূতন জুতাজোড়াটি পায়ে দিয়া খঞ্জের মত খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিয়াছেন—হাতে তাঁহার সেই চেকখানি। সকলেই তাহাকে চাপা হাসিতে বিদ্রূপ করিতেছে। এমন অবস্থায় তাঁহার দেখা হইল ইভার সঙ্গে। ইভা তাহাকে দেখিয়া অভিবাদন না করিয়া ঘৃণাভরে তাকাইয়া রহিল—কিছুই বলিল না। তিনি চলিলেন চেক ভাঙ্গাইতে—মচ-মচ শব্দ করিতে করিতে, খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া। সে শব্দও যেন বাক্‌রূপী হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি দেখিলেন দৈহিক শ্রান্তি তাঁহার মোটেই কমে নাই, কিন্তু চিন্তাশক্তি তাঁহার ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কেন মূর্খের মত তিনি তাঁহার এত প্রয়োজনীয়—শরীরের রক্ত সদৃশ এত অর্থ ঐ উদ্ভট জুতাজোড়াটি ক্রয়ে ব্যয় করিয়াছেন। বর্ষাটা তাঁহার বেশ চলিয়া যাইত পুরাতন জুতাজোড়াটি দ্বারা। কি মনে করিয়া তিনি ঐ জুতার দোকানে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন? তবে কি তিনি সত্য-সত্যই চাহিয়াছিলেন ইভার টাকাটা নিজে আত্মসাৎ করিতে? হা ভগবান, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ তাঁহার শরীর, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সব চুরমার করিয়াও কি ক্ষান্ত হয় নাই—ধাওয়া করিয়াছে তাঁহার সাধারণ নৈতিক বুদ্ধির মূলেও কুঠারাঘাত করিতে? ইহার পূর্ব্বে যে তাহার মৃত্যুই ছিল শ্রেয়!

সহসা তিনি উঠিয়া পড়িলেন। মুখে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। ক্ষিপ্রহস্তে একখানি চাদর টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়া ওস্তাদজির নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া দুই দিনের ছুটি লইলেন।

দ্বিতীয় দিন তিনি ইভার নিকট চিঠি লিখিতে বসিলেন। এবার আর কোন বাধা তাঁহার সম্মুখে রহিল না। স্বাভাবিক সরল রচনা ভঙ্গিতে তিনি ইভার নিকট লিখিয়া গেলেন—

"তোমার প্রেরিত টাকা সদ্ব্যয়ে অর্পণ করিয়াছি। হিন্দু-মিশনের কর্ম্মসচিব কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ স্বামীজির হাতে তোমার চেকখানি দিয়াছি, তিনি যে যে কার্য্যে উহা অর্পণ করিয়াছেন তাহা এতৎসংযুক্ত কাগজে লিখিয়া দিয়াছেন ও এই দানের জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। তোমার অর্থের যথার্থ সদ্ব্যয় হইয়াছে জানিয়া আশা করি তুমি সুখী হইবে।

"স্বভাবতই তুমি জিজ্ঞাসা করিবে কেন আমি যে দুঃস্থদের সহিত সম্পর্কিত ও যাহাদের কল্যাণ আমার জীবনের ব্রত তাহাদের জন্য তোমার ও টাকাটা ব্যয় না করিয়া স্বামীজির শরণাপন্ন হইয়াছি। তাহার সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট জবাব এই যে, আমি এতদিন তোমাদের কাছে মিথ্যা বলিয়া আসিয়াছি।

"বর্ত্তমান স্থানে বাস আমি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লই নাই। লোক-সেবার উদ্দেশ্যে অনুচালিত হইয়া আমি কোন মহৎকার্য্যে ব্রতী নই। কোনওরূপ ত্যাগ স্বীকার আমি উহার জন্য করি নাই। আমি এখন দারুণ দুর্দ্দশাপন্ন নিরতিশয় দরিদ্র সামান্য একটি ভদ্রলোক মাত্র।···একদিন হঠাৎ আমি দেখিলাম রাস্তার ভিখারীর চেয়েও অধিক শোচনীয় অবস্থায় আমি উপনীত। অধিক লাভের আশায় মূর্খের মত আমার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে

কতকগুলি সেযার ক্রয় করার সমুচিত দণ্ড বলিয়া উহা আমি গ্রহণ করিলাম ও লজ্জায় বন্ধু-বান্ধবদের কিছু না বলিয়া আমি উধাও হইলাম। দুর্দ্দশার উপর মিথ্যার কলঙ্ক-কালিমা আমার চরিত্রকে মলিন করিল। আরও যে কি পঙ্কে নিপতিত হইব জানি না।

"দপ্তরীর কাজ আমি শিখিয়াছি। আমার অভাব কমাইয়া ফেলিয়াছি। ঐ কাজের সাহায্যে কোনমতে আমি জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিব। যদি পার, তোমরা আমায় ক্ষমা করিও। আর আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমার এই হতভাগ্য কাকাকে ভুলিয়া যাইও। ইতি—"

একটী গ্রাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রূপটী তাহার ত্রিশটী বরষ
তিয়াসা মিটেনি দেখে
শান্ত সজল শ্যামল সুষমা
চক্ষে রয়েছে লেগে।
অমার মুক্ত নিবিড় আঁধার—
এলো কালো কেশ যেন শ্যামা মা'র,
আসিত লক্ষ্মী সম পূর্ণিমা
পারিজাত রেণু মেখে।

অশথের নব পত্রোদ্গম
মনে পড়ে ফাল্গুনে,
গৃহ-কপোতের মঞ্জু কূজন
শ্রান্তি হ'ত না শুনে।
ঝিঁঝিঁরও শব্দ লাগিত মধুর
ইঙ্গিতে যেন ডাকিত সুদূর,
জোনাকি ফিরিত অথই আঁধারে
আলোকের জাল বুনে।

মুগ্ধ করিত বরষার শোভা,
জলের কলধ্বনি,
রুদ্ধ দুয়ারে ডাকিত আসিয়া
সমীরণ সন্‌সনি।
নিম্নে ছুটিত ছলছল জল,
ঊর্দ্ধে ঘুরিত জলদ চপল,
মেঘলা দিবস হ'লে এনে দিত
হারানো মুক্তা মণি।

ভালবাসিতাম উদার আকাশ,
উদাস মাঠের হাওয়া,
বনবিহগের সাথে তাল রেখে
রাখালের গান গাওয়া।
ভালবাসিতাম চেনা তরুতল,
দীঘির সলিল, কমলের দল,
শুধু অকারণ আনন্দে সেই
অজানার পথ চাওয়া।

সে কি লাবণ্যে ভরিয়া ভুবন
আষাঢ়ে উঠিত মেঘ,
আমার হিয়ার অমৃতে তার
নিতি হ'ত অভিষেক।
পথের দুধারে তরুলতা গায়ে,
স্নেহ যে আমার দিতাম বিছায়ে,
অনিলে ভ্রমর টেনে রেখে যেত
ফুল পরাগের রেখ্।

ক্ষুদ্র বৃহৎ কাজের মাঝারে
আমি যাপিতাম দিন,
কর্ণে আমার দুঃখ পাসরা
কে যেন বাজাতো বীণ্।
মধুর করিত বেদনা আমার,
উৎসবময় নিতি চারিধার,
কার স্নেহ হাসি করিত আমারে
সদা সন্দেহহীন!

কার বরাভয় ব'লে দিত কানে—
আমি মৃত্যুঞ্জয়,
প্রেমামৃতের অধিকারী আমি
নাই নাই মোর ভয়।
অতি সাধারণ, অতি যা সুলভ
কার পরশনে হ'ত দুর্লভ,
শান্তির জল হ'ত আঁখিজল
পরাজয়ে হ'ত জয়।

আমিই সৌধ, আমি প্রাঙ্গণ,
আমি তার শশী রবি,
আমি আলোছায়া, গীতি ও গন্ধ,
মাঠ দিগন্তশোভী।
আমি তার বায়ু, আমি তার জল,
আমিই কুমুদ, আমিই কমল,
আমি তার রূপ, আমি তার প্রাণ—
আমি তার দীন কবি।

ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড—৩৫২ ও ৩৬৬ (৩ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—৪৯৮

সময়াভাবে খেলা ড্র হওয়ায় ইংলণ্ডই রবার পেল। প্রথম টেষ্টে ইংলণ্ড জয়ী হ'য়েচে ; দ্বিতীয় টেষ্ট হ'য়েচে ড্র। ইংলণ্ড টসে জিতে ব্যাট ক'রতে নাবলো। উভয় পক্ষেরই উত্তেজনা প্রবল। দর্শক সমাগম হ'য়েচে ছ' হাজার। আকাশের অবস্থা খুব ভাল, উইকেট ব্যাটসমানদের অনুকূলে ; আরম্ভ ভাল হয় নি ; কীটনকে এসেই ফিরে যেতে হ'ল। হ্যাটন ও ওল্ডফিল্ড খেলার গতি ঘোরালে। ৭৩ রানের সময় জনসন হ্যাটনকে নিজের বলে লুফে নিলে। তার খেলায় ৮টা 'চার' ছিলো ; আউট করবার সুযোগ একবারও দেয় নি। লাঞ্চের পর দর্শক সংখ্যা তের হাজারে উঠেছে। ওল্ডফিল্ড ৮০ রান ক'রে কন্সটাণ্টাইনের হাতে বোল্ড হ'য়ে গেলো। তার খেলাতে চার ছিলো ৮টা। হ্যামণ্ডকে লুফলো গ্রান্ট ৪৩ রানের মাথায়। হার্ডষ্টাফ মাত্র ছ রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পারলে না, চারের বাড়ি দিয়েছে ১২টা। হার্ডষ্টাফের অফ ড্রাইভ দর্শনীয়। ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হ'ল ৩৫২ রানে। কন্সটাণ্টাইন ৫টা উইকেট পেয়েছে ৭৫ রানে। ওল্ডফিল্ড, হার্ডষ্টাফ ও হ্যামণ্ড আউট হ'য়েচে তার বলে।

হার্ডষ্টাফ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ব্যাটিং সুরু করে দিনের শেষে এক উইকেটে ২৭ রান তুল্‌লে।

দ্বিতীয় দিনে আবহাওয়া খুব চমৎকার। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত ব্যাটসমান হেডলে দুর্ভাগ্যবশতঃ ৬৫ রানের মাথায় রান-আউট হ'য়ে গেলো। তার অফ্ কাট্ ও ড্রাইভ চমৎকার। ৬৫ রান তুলতে লেগেছিল ১৪০ মিনিট, চার ছিলো ৫টা। ভিক্টর ষ্টোলমায়ার মাত্র চার রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পেলে না, সবশুদ্ধ ১৪৫ মিনিট খেলেচে ; চার ছিলো ১১টা। উইকস ১৩৭ রান ক'রে নিকলসের বলে হ্যামণ্ডের হাতে ধরা দিলে ; সে উইকেটের চারদিকে চমৎকার পিটিয়ে খেলেচে। ১৩৭ রান

কন্সটাণ্টাইন্

জর্জ্জ হেডলে

অম্বুবাচী মেলা—কামাখ্যা

শেষ রশ্মি

শিল্পী—কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য, গৌহাটী

কলিকাতায় বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত এম এস আনে বক্তৃতা করিতেছেন।
বামপার্শ্বে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার উপবিষ্ট ছবি—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডাড

এম্পায়ার এয়ার ডে প্রদর্শনীতে আর এফ এর বোমানিক্ষেপক বিমানের ক্রীড়া প্রদর্শন।
বিমানশ্রেণীকে মেঘের উপরে দেখা যাইতেছে

তুলতে সময় তার লেগেছে মাত্র ১৩৫ মিনিট, ছয় ছিলো ১টা, চার ১৮টা। দিনের শেষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৬ উইকেটে রান উঠলো ৩৯৫।

তৃতীয় দিনে দর্শক সমাগম বেশী হয় নি, মাত্র দু' হাজার। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের আগের দিনের রান সংখ্যার ওপর মাত্র ১০৩ রান যোগ হ'য়েছে। কন্সটান্টাইন ৭৯ রান ক'রে উডের হাতে আটকে যায়, ১১টা চার ও একটা ছয় ছিলো। শেষ টেষ্টে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে তার সমান কৃতিত্ব। পার্কস্ ১৫৬ রানে পাঁচটা উইকেট পেয়েছে।

হ্যামণ্ড

১৪৬ রান পেছিয়ে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস সুরু ক'রলো। কীটন আর ওল্ডফিল্ড অল্পে গেল। হ্যামণ্ড হ্যাটনের সঙ্গে যোগ দিয়ে খেলার গতি ঘুরিয়ে দিলে। হ্যাটন ১৬৫ রান ক'রে নট আউট রইলো, হ্যামণ্ড ১৩৮ রান ক'রে জনসনের বলে সীলির হাতে ধরা দিলে। হ্যাটন ও হ্যামণ্ডের সহযোগিতায় তৃতীয় উইকেটে ২৬৪ রান উঠেছে। ১৯২৯ সালে হ্যামণ্ড ও জার্ডিনের রেকর্ড ছিল ২৬২ রান, সে রেকর্ডও এবার ভঙ্গ হ'ল। দিনের শেষে ৩ উইকেটে ইংলণ্ডের রান সংখ্যা উঠলো ৩৬৬। ইংলণ্ড 'রবার' রক্ষা করলে।

এল হ্যাটন

স্পোর্টস্ ও বর্ত্তমান

যুদ্ধ ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে তাঁদের শেষ পাঁচটি খেলা না খেলেই যুদ্ধের জন্য দেশে ফিরে যেতে হয়েছে। ইউরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য আগামী এম সি সির ভারত-অভিযানও বাতিল হয়েছে। ইংলণ্ডে ফুটবল লীগ খেলাও বন্ধ হয়ে গেছে; ঘোড়দৌড় খেলাও বন্ধ হয়েছে।

কুচবিহার কাপ ঃ

কুচবিহার কাপ ফাইনালে এরিয়ান্স দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান স্পোর্টিং ইউনিয়নকে অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ গোলে পরাজিত ক'রে কাপ বিজয়ী হ'য়েচে। এরিয়ান্স এবারে ক্রিকেটেও কুচবিহার কাপ পেয়েছে। কুচবিহার কাপে স্পোর্টিংএর ভাগ্য চিরদিনই খারাপ, তারা সাত বছরের ভেতর পাঁচ বার ফাইনালে ওঠে এবং হারে। এবার তারা ২-১ গোলে জিতছিলো, শেষ মুহূর্ত্তে এরিয়ান্স গোলটি পরিশোধ করে। অতিরিক্ত সময়ে স্পোর্টিং ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে সেই সুযোগে এরিয়ান্স এক গোলে জয়ী হয়। এরিয়ান্সের পক্ষে ডি ব্যানার্জ্জি ২টি ও টি ব্যানার্জ্জি ১টি এবং স্পোর্টিংএর পক্ষে পি ব্যানার্জ্জি ও সি বিশ্বাস গোল করে।

ইয়ঙ্গার কাপ ঃ

ডালহৌসী ক্যালকাটাকে ১-০ গোলে হারিয়ে ইয়ঙ্গার কাপ বিজয়ী হ'য়েচে। ক্যালকাটার পরাজয় দুর্ভাগ্য বশতঃ হ'য়েচে। গোল পরিশোধ করবার অনেক সহজ সুযোগ পেয়েও তারা গোল ক'রতে পারে নি, এমন কি পেনাল্টি পেয়েও গোল হয় নি।

ট্রেডস কাপ ঃ

মোহনবাগানের দ্বিতীয় বিভাগ রবার্ট হাডসনকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে ট্রেডস কাপ বিজয়ী হ'য়েচে। মোহন. বাগানের পক্ষে এন মুখার্জ্জি গোল করে। প্রথম দিনের খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

গ্রিফিথ শীল্ড ঃ

ফাইনালে মোহনবাগান প্রথম দিন ড্র করার পর দ্বিতীয় দিনে ক্যালকাটাকে ৩-২ গোলে পরাজিত ক'রে গ্রিফিথ শীল্ড বিজয়ী হ'য়েচে। মোহনবাগানের পক্ষে প্রেমলাল ২টি ও ডি সেন ১টি এবং ক্যালকাটার পক্ষে বিয়ার্ড ২টি গোল করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ বিদ্যাসাগর কলেজকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী হয়েচে। প্রেসিডেন্সী কলেজের পক্ষে প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড় আর ভট্টাচার্য্য, আব্বাস, ডি মিত্র, নাসিম খেলেছিল। নাসিম ও ডি মিত্র কতদিন কলেজের হ'য়ে খেলবে! প্রেসিডেন্সীর পক্ষে আব্বাস গোলটি করে। দীর্ঘ নয় বৎসর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ শীল্ড বিজয়ী হ'বার সৌভাগ্য লাভ করলে।

এপর্য্যন্ত তারা আটবার শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে। এ বৎসরে তারা একটীও গোল খায় নি। বিদ্যাসাগর কলেজ এ পর্য্যন্ত পাঁচবার শীল্ড পেয়েছে এবং বহুবার ফাইনালে উঠেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল খেলা ঃ

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এথেলেটিক, হকি ও ক্রিকেটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুদিন হ'য়ে আসচে। পাঞ্জাবের কাছে কলিকাতা হকি ও এথেলেটিক্‌সে মোটেই সুবিধা ক'রতে পারে না। ক্রিকেটে বরং সমান সমান।

অফিস ইণ্টার-ন্যাসনালের ভারতীয় ও ইউরোপীয় খেলোয়াড় দল ছবি—আনন্দবাজার

পূর্ণচন্দ্র মেমোরিয়াল কাপ বিজয়ী বৌবাজার দল ছবি—আনন্দবাজার

এবার থেকে ফুটবল প্রতিযোগিতা সুরু হ'লো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নততর খেলা দেখিয়ে ৩-১ গোলে জয় লাভ ক'রেচে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত খেলোয়াড় আছে তা'তে দুটো প্রায় সমান শক্তিশালী দল গঠন করা যেতে পারে। পাঞ্জাবের গোলকিপার, লেফট্‌ব্যাক ও রাইট ইনের খেলা বেশ ভাল হ'য়েছিল। পাঞ্জাবের গোল রক্ষকের দোষে প্রথম দু'টি গোল হয়? কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে সে বহু অবধারিত গোল রক্ষা করে তার পূর্ব্ব ত্রুটি সংশোধন করে প্রশংসার্জ্জন করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আর ভট্টাচার্য্য, পি চক্রবর্ত্তী, রহমন, সাধু, টি ব্যানার্জ্জি ও সোমানার খেলা ভাল হ'য়েছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—আর ভট্টাচার্য্য (প্রেসি-ডেন্সী), আর মজুমদার (পোষ্ট গ্রাজুয়েট) ও পি চক্রবর্ত্তী (বঙ্গবাসী); রহমন (বঙ্গবাসী), আর মুখার্জ্জি (রিপন), এইচ সাধু (মেডিক্যাল); এন চ্যাটার্জ্জি (প্রেসিডেন্সী), টি ব্যানার্জ্জি (মেডিক্যাল), এস দে (রিপন), সোমানা (বঙ্গবাসী) ও আব্বাস (প্রেসিডেন্সী, ক্যাপটেন)

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—পি মজুমদার; রমজান, ফৈজ; করমৎ (ক্যাপটেন), বাজোয়া, খুদাবক্স; ইয়াটিকার, রসিদ, মহম্মদ আলি, হরি ও হাসান।

রেফারীঃ—হাণ্ডিসাইড।

রাগবীঃ

বেথেল কাপঃ

লাইট হর্স' ও স্কটিসের মধ্যে এবার বেথেল কাপের ফাইনাল হয়। কোন পক্ষই পয়েণ্ট লাভ ক'রতে না পারায় খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। অতিরিক্ত সময় খেলার পরও কোন ফলাফল না হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে উভয় পক্ষ ছ'মাস ক'রে কাপটি রাখবে স্থিরীকৃত হয়। টসে জয়ী হয়ে স্কটিস্ প্রথম ছ' মাস কাপটি রাখবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করে। বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুর পুরস্কার বিতরণ করেন। লাইট হর্স' দল গত বৎসর বিজয়ী ছিল।

আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা বিজয়ী মণীন্দ্রকুমার চ্যাটার্জ্জি ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের ফিক্সড বোর্ড ডাইভিং বিজয়ী অজিতরায়ের ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সাত মাইল সন্তরণে দ্বিতীয় মহাদেবচন্দ্র দাস (বাগবাজার তরুণ সঙ্ঘ) ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ানসিপঃ

ইয়র্কসায়ার এবারও কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ

ক'রেচে। এবার নিয়ে তারা পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ান-সিপ পেলো।

বার্ষিক জলক্রীড়া ঃ

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বার্ষিক জলক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উক্ত ক্লাবের সভ্য মদনমোহন সিংহ ১৬ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছে। ১১ পয়েণ্ট পেয়ে কলেজ স্কোয়ারের দুর্গাদাস দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে। ন্যাসনাল সুইমিং ক্লাব ৪০০ মিটার রীলে রেস ৪ মিনিট ৪৩ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেছে। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ৪ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ড। ক্লাব হিসেবে কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের সভ্যগণ অনেক বিষয়ে সাফল্য লাভ ক'রে কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রেচেন।

মদনমোহন সিংহ

শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের পঞ্চম বার্ষিকী জলক্রীড়া কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হ'য়েচে। শ্রেষ্ঠ সাঁতারু পুরস্কার পেয়েচে মেয়েদের গীতা ব্যানার্জ্জি আর পুরুষদের সুষেণ সরকার। ১১০ গজ ফ্রি ষ্টাইলে ন্যাসনাল সুইমিংএর দিলীপ মিত্র ১ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেচে।

রোভার্স কাপ ঃ

ফাইনালে মৌ আগত ২৮নং ফিল্ড রেজিমেণ্ট ২-০ গোলে হাওড়া ডিষ্ট্রিক্টকে হারিয়ে রোভার্স বিজয়ী হয়েছে। ফিল্ড রেজিমেণ্ট সর্ব্বাংশে ভাল খেলেছিল। হাওড়ার পক্ষে ব্যাকে কে ব্যানার্জ্জি চমৎকার খেলে, নাহ'লে আরো গোলে তারা পরাজিত হতো।

রোভার্স কাপে ক'লকাতা থেকে দুটি দল রেঞ্জার্স ও হাওড়া ডিষ্ট্রিক্টস্ প্রতিযোগিতা করতে যায়। তারা বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচে। হাওড়া ডিষ্ট্রিক্টস্ কে ও আর, আর কে ৩-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে এবং তৃতীয় ফিল্ড ব্রিগেড আন্তর্জ্জাতিক গোলযোগের জন্য যোগ না দেওয়ায় ফাইনালে যায়। গত দু'বারের বিজয়ী বাঙ্গালোর মুসলীম ২৮ ফিল্ড ব্যাটারীর কাছে ২-০ গোলে হেরে গেছে। রেঞ্জার্স সাফোককে ২-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে এবং ২৮ ফিল্ড ব্যাটারীর কাছে হেরে যায়।

ওয়াটার পোলো ঃ

বৌবাজার ক্লাব ওয়াটার পোলোর ফাইনালে সেণ্ট্রাল এস সিকে ৫-৩ গোলে পরাজিত করে পূর্ণচন্দ্র মেমোরিয়াল কাপ বিজয়ী হ'য়েছে।

হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড ঃ

ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী প্রেসিডেন্সি কলেজ হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ডের ফাইনালে রিপণ কলেজকে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছে। রিপণ কলেজের পক্ষে এস দে গোলটি দেন।

কলেজে পেশাদার খেলোয়াড় ঃ

বৈদেশিক খেলাধূলার মধ্যে একমাত্র ফুটবলেই বাঙ্গালী কিছু প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল, তাও ক্রমশঃ হারাতে বসেছে। বিদেশী পেশাদার খেলোয়াড় আমদানী এবং সেই জন্য তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের খেলবার সুযোগের অভাবে নবীন বাঙ্গালী খেলোয়াড় গঠনের সম্ভাবনা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হচ্ছে। বিদেশী খেলোয়াড় আমদানী বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন করেও বিশেষ ফল হ'য়নি। কলিকাতার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের একমাত্র চিন্তা কোন প্রকারে দলের জয়ী হওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারত এমন কি ভারতের

দুর্গাদাস

বাইরে থেকেও খেলোয়াড় আমদানী করতে তাঁদের বাধে নাই। কিন্তু খেলা যাদের পেশা নয়, জাতির

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের এবং শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের বার্ষিক জলক্রীড়ায় ১০০ মিটার সন্তরণে বালিকাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারিণী বৌবাজার সুইমিং ক্লাবের কুমারী সুখলতা পাল

ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

ভবিষ্যৎ ইতিহাস গড়বার ভার যাদের হাতে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও এই মনোভাব ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে দেখে, আমরা ফুটবলে বাঙ্গালীর উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ হতাশ হ'চ্ছি। কলিকাতার কোন কোন বিশিষ্ট কলেজের হ'য়ে যে কয়েকজন নামকরা প্রথমশ্রেণীর খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা যায়, তাঁদের সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুগত-ছাত্র কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ আছে। যে সব কলেজে ছাত্রদের প্রবেশের বিধি-নিয়মের খুব কড়াকড়ি, নিতান্ত মেধাবী ছাত্র ব্যতীত যেখানে প্রবেশ লাভ একেবারে অসম্ভব, সেখানেও ফুটবল খেলার পূর্ব্বাহ্ণে বা পরেও খেলোয়াড় ছাত্রের প্রবেশ লাভ ঘটছে। সেই কলেজের হয়ে খেলবার জন্যই তাদের নেওয়া হয়, পড়বার জন্য নয়।

যাঁরা এই রকমে দলের শক্তিবৃদ্ধি করেন, তাঁরা আইনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অতএব আইনের ফাঁদে তাঁরা পড়েন না; কিন্তু নীতির দিক দিয়ে, বিশেষতঃ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখলে কর্তৃপক্ষের এই প্রকারে খেলোয়াড় সংগ্রহ না করাই উচিত।

"বড়খোকা আর কতদিন কলেজে খেলবে'—খেলার মাঠে বিপক্ষ ছাত্রদের এই রকম চীৎকার শুনে 'বড়খোকার' লজ্জা হয় বলে মনে হয় না। কারণ, বড়খোকাকে পরের বৎসরেও খেলতে দেখা যায়। আর কলেজ কর্তৃপক্ষরাও এইরূপ বড়খোকাদের খেলা পড়ে যাবার পূর্ব্বে তাদের ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয় না। তথাপি বিজয়ীদলের বিজয় উল্লাসের মাঝেও কিছু সঙ্কোচের ভাব মনে থাকে কি না, তা' তারাও জোর করে বলতে পারে না।

আই এফ এ—বি এফ এ ঃ

বিদ্রোহী ক্লাবেরা বি এফ এতে সত্যসত্যই যোগদান করেছেন কি না আই এফ এ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনটি দল প্রায় একই ধরণের উত্তরে বলেছেন যে তাঁরা কেহই বি এফ এতে যোগ দেন নাই, তবে তাঁদের কতিপয় সভ্য অবশ্য ঐ নূতন এসোসিয়েশনের অনুরাগী। এই সংবাদ ৩১শে আগষ্ট তারিখের সংবাদপত্রে বাহির হয়।

৪০০ মিটার রীলে রেস বিজয়ী

ন্যাসনাল সুইমিং ক্লাব　ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, বিদ্রোহী ক্লাব ত্রয় আই এফ এ থেকে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে বি এফ এতে যোগদান করলেন। পূর্ব্বদিনে আই এফ একে ঐরূপ পত্র দেওয়াটা কি নিতান্ত হাস্যকর হয় না?

শৈলেন মেমোরিয়াল ক্লাবের ১১০ মিটার বিজয়ী দিলীপকুমার মিত্র
ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

তিনটি ক্লাব আই এফ এর সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের ব্যতিক্রম করে সংবাদপত্রে পত্র প্রকাশ করেন এবং তাঁদের তথাকথিত অভিযোগের প্রতিকার না হ'লে সেইদিনের নির্দ্ধারিত খেলা খেলতে অসম্মত হন। এক দল তাঁদের মাঠের গোলপোষ্ট তুলে নেন, যাতে সেই মাঠে সে দিনের নির্দ্ধারিত খেলাটি ঘটতে না পারে। এটা আই এফ এর নিয়মের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন। তাঁদের প্রতিনিধিরা ৬ই জুলাই তারিখের সভায় স্বীকার করেন যে তাঁরা আইন নিজেদের হাতে নিয়ে ইচ্ছা করেই পূর্ব্ব প্রস্তাবের বিদ্রোহীতা করেছেন।

কোন পক্ষ না নিয়ে এইটুকু বলা যেতে পারে, তাঁদের প্রতি অবিচার হয়েছে তা' ধরে নিলেও, তাঁরা যে আই এফ এর আইন অমান্য করেছেন ইহা সত্য—তাঁরাও তা' অস্বীকার করেন নি। সেই অভিযোগের বিচারে তাঁদের অধিক (!) (যদি ধরে নেওয়াও হয়) শাস্তি হয়েছে, তবে সেই শাস্তির পরিমাণ কমাতে তাঁদের আপীল করা চলে, কিন্তু পুনরায় বিদ্রোহীতা করা চলে না। মিটমাট করতে হলে তাঁদের ত্রুটী স্বীকার করতেই হবে। তার পরে তাঁদের মতে যা' অবিচার তার প্রতিকারের জন্য নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা।

বিদ্রোহী দলরা বি এফ এ গঠন করেছেন। এ আই এফ এ সার্কুলার পত্রে তাঁদের অধীনস্থ ক্লাব ও এসোসিয়েশনদের ঐ দলে যোগদান করতে নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু ব্রাবোর্ণ কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান সম্বন্ধে এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করেছেন,—নবগঠিত বেঙ্গল ফুটবল এসোসিয়েশন এ আই এফ এফ কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে, সুতরাং যে সকল ক্লাব ও দল এ আই এফ এফ এর সদস্য, প্রাদেশিক এসোসিয়েশন সমূহের অনুমোদিত, সেই সকল ক্লাব ও দলকে ব্রাবোর্ণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে নিষেধ করা যায়।

আর্ম্মি স্পোর্টস এ আই এফ এর সংশ্লিষ্ট। বিদ্রোহী ক্লাবের সঙ্গে সৈনিক দল নর্থদামটনসায়ার রেজিমেণ্ট কেন ম্যাচ খেলেছে, তার কৈফিয়ৎ আর্ম্মি স্পোর্টসের নেওয়া কর্ত্তব্য। ইউনিভার্সিটি দলও বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রাকৃটিস ম্যাচ খেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের বিদ্রোহী দলের সঙ্গে সহযোগিতা করা অনুচিত। আই এফ এরও উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিকে গভার্নিং বডিতে অবিলম্বে স্থান দেওয়া।

শোনা যায়, বি এফ এ পরিচালিত ব্রাবোর্ণ কাপ প্রতিযোগিতা ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে কলিকাতায় চলবে। তাতে নাকি বিদেশ থেকে ও ভারতের নানা স্থান থেকে নানা দল যোগদান করেছে। দেখা যাক, সত্যই কতটা ঘটে।

গোলপোষ্ট তুলে নেওয়া সম্বন্ধে সেই ক্লাবের সেক্রেটারী সম্প্রতি সংবাদপত্রে জানিয়েছেন যে, এরিয়ান ক্লাবও তাঁদের দলভুক্ত থাকায় তাঁদের সেই দিনের খেলা উক্ত মাঠে না হবার সম্ভাবনায় তাঁরা গোল সন্নিধানের মাঠের উন্নতির জন্য গোলপোষ্ট তুলেছিলেন এবং যখন কোন দল বা

আমেরিকাবাসী লে ষ্টীয়ার্স হোয়াইট সিটিতে হাইজাম্প ক্রীড়ার অনুশীলন করছেন

রেফারী সেদিন ঐ মাঠে উপস্থিত হন নাই, তখন ঐ জন্ম তাঁরা দায়ী হবেন কেন? চমৎকার যুক্তি! ঠিক সেই দিনই গোলপোষ্টের কাছের মাঠের অবস্থা এমন খারাপ হয়ে পড়লো যে মেরামতীর বিশেষ প্রয়োজন হয়। এ পর্য্যন্ত ফুটবল মরসুমে গোলপোষ্ট তুলে মাঠ মেরামতী করতে কোন ক্লাবকে কখন দেখা যায় নাই। সেদিনও ঐ মাঠ মেরামতী করতে কেহ দেখে নাই। ক্লাবদের পত্র সংবাদ পত্রে বাহির হবার পরে এবং গোলপোষ্ট নেই জেনেও কোন দলের বা রেফারীর পক্ষে ঐ মাঠে উপস্থিত হওয়া কি সম্ভব? সাধারণে এরূপ অজুহাত দিতেও একটু বাধ্‌লো না—আশ্চর্য্য! রেফারিং খারাপ হচ্ছে, অতএব খেলবো না। কোন দলের সভ্য রেফারী এসোসিয়েশনে আছেন, অতএব তাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে হবে। এই সব মনোবৃত্তি খেলোয়াড় জনোচিত নহে। খেলায় হার-জিতের উপরেও স্পোর্টিং স্পিরিট—তা' যাদের নেই, তাদের খেলা থেকে অবসর নেওয়াই উচিত। ক্যালকাটা ক্লাবের মিষ্টার পুলার রেফারী এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, শীল্ড প্রতিযোগিতায় তিনি বহুবার খেলা পরিচালনা করেছিলেন, ক্যালকাটাও তখন শীল্ড খেলেছে নিশ্চয়। তবে কি তাঁর যোগ্যতার উপর সন্দেহ আরোপ করতে হবে। কোন ক্লাবের উপর আক্রোশের কথা প্রেসিডেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করায় আপত্তি জানান হয়, কিন্তু প্রতি Statementতেই যে সেই মনোভাবই প্রকাশ হচ্ছে।

গত দশ বৎসরে আই এফ এ তিন লক্ষ টাকা চ্যারিটিতে দিয়েছেন। এর উত্তরে মিষ্টার নূরউদ্দিন বলেছেন যে কোন দল কত পরিমাণ টাকা দিয়েছেন, বিশেষতঃ মহমেডান স্পোর্টিং দল কত দিয়েছেন তা' প্রকাশ করলে, বেশী শোভন হতো আই এফ এর পক্ষে।

এই দশ বৎসরের মধ্যে শেষ পাঁচ বৎসর মহমেডানদের অস্তিত্ব হয়েছে। চ্যারিটিতে কোন সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যাধিক্য ছিল তার পরিমাণ টিকিট বিক্রয়ের তালিকায় পাওয়া যায় না; অতএব কোন সম্প্রদায়ের লোক বেশী পরিমাণ টাকা দিয়েছে তাও স্থির করা সম্ভব নয়। গ্যালারীতে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকের আধিক্য হ'য়ে থাকলেও, অধিক মূল্যের আসনে অন্য সম্প্রদায়দের সংখ্যা গরিষ্টতা দৃষ্ট হয়েছে। পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকের প্রাধান্য চ্যারিটি ম্যাচে মোটেই ছিল না। সাম্প্রদায়িতা হিসাবে চ্যারিটির টাকা সংগৃহীত হয় না, বা বিতরিতও হয় না। ইতিপূর্ব্বে মোহনবাগানের খেলায় কি পরিমাণ টাকা সংগৃহীত হয়ে চ্যারিটিতে বিতরিত হয়েছিল—তার ধারণা কি তাঁদের মোটেই নেই? মোহনবাগান কিন্তু কখনও ঐ বিষয় উল্লেখ করে নিজেদের জনসাধারণের চক্ষে খেলো করে নি।

রাজা শীল্ড ঃ

মোহন বাগান ৩-২ গোলে রেঞ্জার্স'কে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে। গতবৎসর বিজয়ী ছিল রেঞ্জার্স'।

ডেভিস কাপ ঃ

এবারের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকাকে ৩-২ ম্যাচে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েচে। আমেরিকা ২৮ বার ডেভিস কাপের রাউণ্ডে খেলেচে এবং বিজয়ী হ'য়েচে ১৩বার। ১৯২০-১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত সাত বছর পর পর তারা বিজয়ী হ'য়েছিলো। পরের চার বছর তারা ফ্রান্সের কাছে হেরে যায়। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে তারা যথাক্রমে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েচে। ডেভিস কাপে আমেরিকার এই রেকর্ড কোন দেশ ভাঙ্গতে পারবে ব'লে মনে হয় না। এবারও আমেরিকাই বিজয়ী হবে ব'লেই সকলের বিশ্বাস ছিলো—প্রথম দুটো ম্যাচে তারা জিতে ছিলো কিন্তু কুইষ্টের কাছে উইম্বলডন বিজয়ী রিগসের আকস্মিক পরাজয়ে আমেরিকার ডেভিস কাপ বিজয়ের সকল আশা নষ্ট হ'ল।

রিগস (আমেরিকা) ৬-৪, ৬-০, ৭-৫ গেমে ব্রোমউইচকে পরাজিত ক'রেচেন।

নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের টেনিস শিক্ষক রণভির সিং দিল্লীতে তরুণ টেনিস খেলোয়াড়কে শিক্ষা দিচ্ছেন

পার্কার (আমেরিকা) কুইষ্টকে হারিয়েছেন ৬-৩, ২-৬, ৬-৪, ১-৬, ৭-৫ গেমে।

কুইষ্ট (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৬ ৪, ৩-৬, ৬-৪ গেমে রিগসকে হারিয়েছেন।

ব্রোমউইচ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-০, ৬-৩, ৬-১ গেমে পার্কারকে হারিয়েছেন।

ব্রোমউইচ ও কুইষ্ট (অষ্ট্রেলিয়া) ৫-৭, ৬-২, ৭-৫, ৬-২ গেমে ক্রামার ও হাণ্টকে (আমেরিকা) পরাজিত ক'রেছেন।

হার্ডকোর্ট টেনিস ঃ

কলিকাতা সাউথ ক্লাবের হার্ডকোর্ট টেনিস ফাইনাল সমাপ্ত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির সিং ৬-৩, ২-৬, ৬-২ গেমে খসু সেনকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

পুরুষদের ডবল ফাইনাল বিজয়ী হয়েছেন যুধিষ্ঠির সিং ও সি এল মেটা ৭-৫, ১০-৮ গেমে এল ব্রুক এডওয়ার্ডস ও পি এন মূর্ত্তিকে পরাজিত করে।

মিক্সড ডবল বিজয়ী হয়েছেন সি এল মেটা ও মিস হার্ভে জনষ্টন ৬-৩, ৬-২ গেমে পি এন মূর্ত্তি ও মিসেস ম্যাসেকে হারিয়ে

যুধিষ্ঠির সিং

খসু সেন

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী প্রণীত গল্প পুস্তক "রক্ত গোলাপ"—১৲
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত মেয়েদের নাটক "আকাশ মল্লিকা—।৵০
শ্রীঅমলেন্দু সেন প্রণীত সাধারণ জ্ঞানের বই "অনুসন্ধানী"—১৷০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "ড্রাগণের দুঃস্বপ্ন"—৷৷৵০
জগত দাস ও সন্তোষকুমার ঘোষ প্রণীত গল্প পুস্তক "ভগ্নাংশ"—১৷০
শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন প্রণীত ঐতিহাসিক "ইউরোপে মহাসমর"—১৲
কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত পরিচয়গ্রন্থ "মানুষ রবীন্দ্রনাথ"—১৷৷০
প্রভাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "অসতী কেন হলুম"—২৲
ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বল প্রণীত "বেদের পরিচয়"—৩৲
পাগল গুরুদাস ঠাকুর প্রণীত "গান আরাধনা"—৸০
শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "সুরলোকের সন্ধানে"—১৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাহুগ্রস্ত শশী"—
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—"শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব"—২৲
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত "মিলন"—১৲
মন্মথরায় প্রণীত নাটক "ছোটদের নাটমঞ্চ"—৸০
শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "নক্ষত্র পরিচয়"—৷৷০
শ্রীগোপালচন্দ্র সেন প্রণীত "দর্শন পরিচয়"—২৲
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "আত্মজীবনী"—২৲
শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্যাকরণতীর্থ প্রণীত "গল্পে দশাবতার"—৸০
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত ছোটদের উপন্যাস "মহাদুঃসাহসের কাহিনী"—৷৷/০
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে প্রণীত "উদ্ভট সাগর" তৃতীয় প্রবাহ পঞ্চমাবৃত্তি—১৷০
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—রোমাঞ্চ গ্রন্থ "প্রলয়ের আলো"—১৷০
৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত ছোটদের উপন্যাস "সোনার হরিণ"—১৲
শ্রীভীমচরণ চৌধুরী প্রণীত সম্পাদিত "ভক্তজীবন"—১৷৷০
আশু চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস "স্বামী নেই বাড়ী"—১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী ২রা কার্ত্তিক হইতে ৺দুর্গাপূজা আরম্ভ। ভারতবর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যা ১৯শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) প্রকাশিত হইবে। কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপনের নূতন বা পরবর্ত্তিত কপি ১০ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। তাহার পর আর কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মজুমদার

প্রেমের স্বর্গ

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কার্ত্তিক—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য*

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি এচ্-ডি, ভাইস্-চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১। কুলগ্রন্থের পরিচয়

বিগত পঁচিশ বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ বসু বহু অনুসন্ধানপূর্ব্বক যে অসংখ্য কুলশাস্ত্র আবিষ্কার করেন এবং তৎসমুদয়ের সাহায্যে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন; প্রথমতঃ তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কুলশাস্ত্র আলোচনার সূত্রপাত হয়। তৎকালে ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি আধুনিক বিচারমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষিত বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ প্রায় একবাক্যে কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ৺নগেন্দ্রনাথ বসু কুলশাস্ত্রকে ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া

* এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত পাঁচটি প্রবন্ধে এই বিষয়টি আলোচিত হইবে। এই প্রবন্ধগুলির পাদটীকায় নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে।

বসু ১ =৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথম অংশ। (গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ নাই। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে জানা যায়, ইহা ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল)।

বসু ২ =ঐ ব্রাহ্মণ কাণ্ডের দ্বিতীয় অংশ (১৩৩৫)।

বসু ৩ =ঐ দ্বিতীয় ভাগ, ব্রাহ্মণকাণ্ড, তৃতীয়াংশ হইতে পঞ্চমাংশ

বহুসংখ্যক সামাজিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এককালে এই বাদানুবাদ কিরূপ উগ্রভাব ধারণ ও ব্যক্তিগত বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এখনও আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। সেই সমুদয় বিরোধী দলের অনেকেই এখন লোকান্তরিত এবং যে কয়েকজন জীবিত আছেন তাঁহারাও রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত। বাঙ্গালী সাহিত্যিকের সেই গ্লানিকর দ্বন্দ্বের কাহিনীও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে। সুতরাং কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচারের সময় আসিয়াছে। কুলশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) এ দেশে যে কয়টি উচ্চজাতি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বিদ্যমান, সাধারণ ভাবে তাহাদের ও তাহাদের প্রধান প্রধান শাখার উৎপত্তি ও বিস্তৃতির ইতিহাস।

(২) উক্ত জাতি বা শাখাসমূহের মধ্যে কালক্রমে যে কারণে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং এই সমুদয় বিভাগের মধ্যে পরস্পর আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় পরিচালনা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সমুদয় রীতিনীতি ও নিয়মপ্রণালীর উদ্ভব হয় তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস।

(৩) যথাসম্ভব উক্ত বিভাগসমূহের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিবারের বংশাবলী ও তাহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রচলিত আখ্যান বর্ণন। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র প্রথমটিই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। কারণ কুলশাস্ত্রের এই অংশেই প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন বাংলার হিন্দু রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। কুলশাস্ত্র ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না এবং বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তাহার মূল্য কি, একমাত্র এই অংশ আলোচনা করিলেই তাহা নির্ণয় করা যাইবে।

কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচারমূলক আলোচনায় যে একটি গুরুতর বাধা আছে প্রথমেই তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক।

কুলশাস্ত্র নামে পরিচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনন্ত। ঘটক উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থানে ও কালে এই সমুদয় গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন এবং বংশানুক্রমে তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ এই সমুদয় গ্রন্থের রক্ষণাবেক্ষণ ও আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকগণ কেবল যে নূতন নাম ও বংশাবলী যোজনা করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক স্থলে অজ্ঞতাবশত পুরাতন পুঁথি নকল করিতে ভুল করিয়াছেন; অথবা নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়া তাহা সংযোগ করিয়াছেন। তৎকালে সামাজিক মর্য্যাদা লাভ যেরূপ আকাঙ্ক্ষনীয় ছিল, সামাজিক গ্লানি ও অপবাদও সেইরূপ মর্ম্মপীড়াদায়ক ছিল। বস্তুত মুসলমান-যুগে বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে উচ্চতর কোন জাতীয় জীবনের আদর্শ বা উদ্দেশ্য না থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও তৎসম্পর্কিত বিচারবিতর্কই জাতীয় জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক যে, ঘটকগণকে অর্থদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে বশীভূত করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষ নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব বৃদ্ধি অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের সামাজিক গ্লানি ঘটাইবার জন্য প্রাচীন কুলশাস্ত্রের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন অথবা নূতন কুলশাস্ত্র লিখিয়া পুরাতন কোন ঘটকের নামে চালাইয়াছেন। কুলশাস্ত্র গ্রন্থ সাধারণত ঘটকদিগের গৃহেই

বসু ৪, ৫ (চতুর্থও পঞ্চমাংশের পৃষ্ঠাঙ্ক পৃথক হওয়ায় উহা যথাক্রমে বসু—৪, বসু—৫ নামে উল্লিখিত হইবে)।

সং নিং =৺লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য কৃত সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ, ১৩১৫ (ইং ১৯০৯) [ইং ১৮৭৪ সালে প্রথম প্রকাশিত]।

গৌ—বা =৺মহিমাচন্দ্র মজুমদার কৃত গৌড়ে ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সংস্করণ (ইং ১৯০০), [১৮৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত]।

তত্ত্ব =শ্রীকালীপদভট্টাচার্য্য কৃত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলতত্ত্ব (ইং. ১৯৩৪)।

আদিশূর =৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ (১৯৩৩)।

কুল =কুলতত্ত্বার্ণব, সর্ব্বানন্দ মিশ্র কৃত, মেদিনীপুর ব্রাহ্মণ সভা হইতে প্রকাশিত (১৯২৭)।

মো—মু =বল্লাল মোহমুদ্গর, শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত (১৩১২, ইং ১৯০৫)

থাকিত এবং লোকের মুখে মুখে আবৃত্তি হইত। সুতরাং এই সমুদয়ের পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল।

এমতস্থলে কোন্ কোন্ কুলশাস্ত্র গ্রন্থকে প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার কোন প্রকার সমাধান না হইলে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা সম্ভব নহে। দুঃখের বিষয় যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এই গুরুতর বিষয়টির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। শতাধিক বৎসর আগে এই কার্য্যটি যতদূর সহজসাধ্য ছিল, এখন আর তাহা নাই। কারণ বিগত একশত বৎসরের মধ্যে একদিকে প্রধানত ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর অধ্যবসায় ও যত্নে যেমন বহু লুপ্ত কুলশাস্ত্রের উদ্ধার হইয়াছে, তেমনি আবার নিয়মিত ভাবে কুলশাস্ত্র জাল করার রীতিও এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অভিযোগটি খুবই গুরুতর, সুতরাং ইহার সমর্থনকল্পে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগে বসু মহাশয় ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য করেন :—

"কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী টালা নিবাসী গোরালীয় বশিষ্ঠ ৺গুরুচরণ বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে এই জীর্ণ শীর্ণ তালপত্রে লিখিত ঈশ্বর বৈদিকের যে কুলপঞ্জী পাইয়াছি এইখানি দেখিলেই দ্বিশতাধিক বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হস্তলিপি বলিয়া সহজেই মনে হইবে। সানন্তসারের সমাজদার বংশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মতে ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জীই সর্ব্বপ্রাচীন।" (পৃঃ ৵০)

উক্ত গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় এই বৈদিক কুলপঞ্জী হইতে শ্যামল বর্ম্মার পরিচায়ক যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই :

"স্বর্ণরেখ নদীতটে কাশীপুরী নগরীতে মহারাজ ত্রিবিক্রম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেন নামক এক পুত্র জন্মে। রাজা বিজয়সেন তাঁহার পত্নী বিলোলার গর্ভে মল্লবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মা নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। শ্যামলবর্ম্মা গৌড়দেশের রাজা হন।"

রামদেব বিদ্যাভূষণের বৈদিক কুলমঞ্জরী দ্বারাও উক্ত বিবরণ সমর্থিত হয়।

তেইশ বৎসর পরে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ) গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লিখিত অংশ সম্বন্ধে বসু মহাশয় মন্তব্য করেন :

"অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত এই গ্রন্থের প্রথমাংশে...... বিজয় সেন ও শ্যামলবর্ম্মাকে একই বংশীয় বলা হইয়াছে; কিন্তু নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন দ্বারা তাহা ভ্রমাত্মক স্থির হইয়াছে। বাস্তবিক সামলবর্ম্মা বর্ম্মাবংশীয় জাতবর্ম্মার পুত্র হইতেছেন।" (পৃঃ [৩])

কিন্তু কিছুকাল পরেই ঈশ্বর বৈদিককৃত কুলপঞ্জীর নূতন এক পুঁথি বসু মহাশয়ের হস্তগত হইল। ইহাতে শ্যামল বর্ম্মার যে পরিচয় আছে তাহার সহিত তাম্রশাসনের কোন অসঙ্গতি নাই। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় পুঁথির পার্থক্য অতি গুরুতর। এ সম্বন্ধে ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: "তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার দ্বিতীয় পুঁথিতে "কাশীপুর" স্থানে "দেশে কাশী", "স্বর্ণরেখা নদী" স্থানে "স্বর্ণরেখা পুরী", "বিজয়সেনকং" স্থানে "কর্ণসেনকং", "পত্নী তস্য বিলোলা" স্থানে "কন্যা তস্য বিলোলা", "স্ত্রিয়াং" স্থানে "শ্রিয়াং" পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন সমেত দ্বিতীয় পুঁথিখানি বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কারের অল্পদিন পরেই বসুজ মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল। বেলাবো তাম্রশাসনে শ্যামল বর্ম্মার মাতামহ চেদিরাজ কর্ণদেবের নাম আছে, সুতরাং উক্ত তাম্রশাসন আবিষ্কারের পরে ঈশ্বর বৈদিক কৃত দ্বিতীয় পুঁথি আবিষ্কার হওয়ায় সন্দেহ হইতেছে যে কোন দুষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক কতকগুলি কুলশাস্ত্র রচনা করিয়া বারংবার বসুজ মহাশয়কে প্রতারিত করিয়াছে।" (বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৬০ পৃঃ)। নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই রাখালবাবুর উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। কারণ নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কারের ফলে যখন ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, ঈশ্বর বৈদিক কৃত কুলপঞ্জীর ন্যায় প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থোক্ত ঐতিহাসিক তথ্য সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তখনই নূতন পুঁথির আবিষ্কারের ফলে কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মনে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে যে, কুলশাস্ত্রের মহিমা ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্যই এই নূতন পুঁথি জাল করা হইয়াছে। পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টত

এই অভিযোগ আনয়ন করা সত্ত্বেও ৺বসু মহাশয় নবাবিষ্কৃত পুঁথিখানি জন সাধারণ্যে উপস্থিত করিয়া তাহার প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করিতে কোন প্রয়াস করেন নাই।

২। দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন তাহার প্রকৃত তারিখ পড়িতে পারা যায় নাই। তখন ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, কেশব সেনের পৌত্র দনৌজামাধবের নাম এডুমিশ্র, হরিমিশ্র, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, মহেশ্বর প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণের কোন কোন গ্রন্থে দনুজমর্দ্দনরূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পরে দনুজ-মর্দ্দনদেবের নূতন মুদ্রা আবিষ্কার হওয়ায় নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। সুতরাং তিনি ও দনৌজামাধব এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। এমতাবস্থায় যে সমুদয় কুলগ্রন্থে দনৌজামাধবের পাঠান্তর দনুজমর্দ্দন পাওয়া যায়, তাহা দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা আবিষ্কারের পরে রচিত এরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে।

৩। অস্পষ্ট একটি নবাবিষ্কৃত পাণ্ডু নগরের টাঁকশালে প্রস্তুত মুদ্রার তারিখ পড়িতে ভুল হওয়ায় পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে উক্ত মুদ্রায় উল্লিখিত মহেন্দ্রদেব দনুজ-মর্দ্দনদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই সংবাদ বাহির হইবার পরেই ময়মনসিংহ জিলার পুড়্যা গ্রামে বটু ভট্ট রচিত "দেববংশ" নামক একখানি প্রাচীন কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, 'গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত, কিন্তু ইহার অক্ষর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ন্যায়' (বাংলার ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৫৪)। এই গ্রন্থে দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডু নগরের রাজা মহেন্দ্রদেবের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে নূতন কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কার হওয়ায় নিঃসংশয়ে জানিতে পারা গিয়াছে যে, মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনের পরবর্ত্তী। সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বটুভট্টের "দেববংশ" আধুনিক কালের রচিত, সুতরাং জাল পুঁথি এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

৪। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের বাড়ীতে একখানি কুলগ্রন্থের কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আদিশূরের সময় নিরূপণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি তাঁহাদের সহকারী পুস্তক রক্ষক শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যতীর্থকে ব্রাহ্মণডাঙ্গায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষার ফলে জানিতে পারা যায় যে, ৺বসু মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত অন্যান্য শ্লোকগুলি একখানি কুলগ্রন্থে আছে, কিন্তু আদিশূরের কালজ্ঞাপক শ্লোকটি উহাতে নাই; তাহার স্থানে অন্য একটি শ্লোক আছে। আদিশূর ও জয়ন্তের অভিন্নত্বজ্ঞাপক যে শ্লোকের পাঠান্তরের কথা ৺বসু মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও উক্ত ঘটকের গৃহস্থিত কোন কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। ৺বসু মহাশয়ের জীবিতকালে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ (মানসী, মাঘ ১৩২১) ও ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত করেন। বিষয়টির গুরুত্ববোধে ইহা আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতায় একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয় এবং ৺বসু মহাশয়কে বিশেষভাবে ইহাতে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ৺বসু মহাশয় এই সভায় যোগদান করেন নাই। ৺বসু মহাশয় ইহার পরেও প্রায় চব্বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন কথা বলেন নাই।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন তাঁহারা ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাংলার ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৩৩-১৩৮, ১৫২-১৬১) ও সম-সাময়িক মাসিকপত্র পাঠ করিতে পারেন। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু এই সমুদয় বিবেচনা করিলে সহজেই সন্দেহ জন্মে যে, ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা কুলশাস্ত্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং সাম্প্রদায়িক কারণে বর্ত্তমান যুগে বহু কৃত্রিম কুল-শাস্ত্রের আমদানি হইতেছে।

এরূপ কৃত্রিমতার কথা ৺নগেন্দ্রনাথ বসু নিজেও ক্ষেত্রান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিজে কুলশাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। সুতরাং তাঁহার নিজের উক্তি এ বিষয়ে মূল্যবান বিবেচনা করিয়া আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কায়স্থ জাতির উৎপত্তিসূচক প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধৃত অনেক শাস্ত্রীয় বচন এবং অনেক তথাকথিত প্রাচীন সংহিতা ও তন্ত্রগ্রন্থ যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিককালে রচিত ইহা ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের কয়েকটি মাত্র স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) "আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্ বিপ্রাঃ সদারকাঃ" ইত্যাদি কতকগুলি শ্লোক "অগ্নিপুরাণ" হইতে উদ্ধৃত বঙ্গজ কুলাচার্য্যকারিকার বচন বলিয়া শব্দকল্পদ্রুমে স্থান পাইয়াছিল। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র অগ্নিপুরাণের কোন পুঁথিতে ইহাদের সন্ধান পান নাই। এগুলি যে জাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (জাতিতত্ত্ব বারিধি, ৪০১ পৃষ্ঠায় রাজেন্দ্রলালের এই বিষয়ক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে)

(খ) "আচারনির্ণয় তন্ত্র" নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বলেন উহা "কোন বিশেষ উদ্দেশে আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে।" (বিশ্বকোষ, কায়স্থ শব্দ)।

(গ) ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, যমস্মৃতি, মহাকাল-সংহিতা, হারীত, আপস্তম্ব, মেরুতন্ত্র, ব্যোমসংহিতা, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া পরিচিত বহু শ্লোক যে আধুনিককালে রচিত এবং ঐ সমুদয় গ্রন্থে অজ্ঞাত, তাহা নগেনবাবু বিশ্বকোষ কায়স্থ শব্দে এবং কায়স্থের বর্ণনির্ণয় গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন।

(ঘ) "বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ" ইত্যাদি কায়স্থোৎপত্তি বিষয়ক কতকগুলি শ্লোক সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"পদ্মপুরাণীয় পাতাল খণ্ডের দোহাই দিয়া অনেকে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের কোন বন্ধু একখানি জাল পাতালখণ্ডের পুঁথি দেখাইয়া আমাদিগকেও প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে বিশ্বকোষে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন পুনার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত পদ্মপুরাণ ও নানাস্থানের বারখানি পুঁথি অনুসন্ধান করিয়াও ঐ বচনগুলি বা বিবরণটির সন্ধান পাইলাম না।" (কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—২৯ পৃঃ)। পরবর্ত্তীকালে উক্তগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে বসু মহাশয় এইমত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা যুক্তিসহ নহে।

যেখানে জাতির মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য সুপরিচিত পুরাণ ও সংহিতার নামে প্রক্ষিপ্ত বচন চালান এবং প্রাচীন তন্ত্র ও সংহিতার নামে নূতন গ্রন্থ রচনা সম্ভব হইয়াছে, সেখানে অনুরূপ উদ্দেশ্যে কুলশাস্ত্র যে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও আধুনিক যুগে রচিত হইবে তাহার বিচিত্রতা কি? সুতরাং এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে ৺বসু মহাশয় যে সমুদয় কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক কৃত্রিমতা আছে। ক্ষেত্রবিশেষে কৃত্রিমতার প্রকারভেদ আছে। হয় আগাগোড়া পুঁথিখানাই হালের লেখা, নয় ত কয়েকটা পাতা অদল বদল, নয় ত প্রাচীন গ্রন্থের প্রতিলিপিতে নূতন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে পাবনা সাহিত্য সম্মিলনীতে গিয়াছিলাম। পথে ষ্টীমারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পুরাতন পুঁথি (বিশেষত, কুলশাস্ত্র) প্রস্তুত করিবার প্রণালী আমার নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। লেখা কাগজের উপর কি য়্যাসিড দিয়া মাসখানেক বালুর নীচে রাখিলে নূতন পুঁথি ঠিক কীটদষ্ট পুরাতন পুঁথির মত দেখায়। যেভাবে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় এই সমুদয় বর্ণনা করিলেন তাহাতে আমার সন্দেহ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি নিজেই এই কার্য্য করিয়াছেন কি-না। বলিলেন, অর্থাভাবে তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছে। কে তাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল তাহাও বলিলেন।

সুতরাং একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সমুদয় কুলশাস্ত্র অজ্ঞাত ছিল এবং যাহা এক্ষণে ৺বসু মহাশয়ের সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে, তাহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এমতস্থলে কেবলমাত্র এই সমুদয় পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। ৺বসু মহাশয় অসীম অধ্যবসায় ও অক্লান্ত শ্রম সহকারে বহু কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি না থাকায় এবং তাঁহার পুঁথিসংগ্রহকারীদের সততা ও সত্যনিষ্ঠার অভাবে এই বিপুল গ্রন্থরাজি বাংলার ইতিহাসের বিশেষ কোন কাজে লাগিল না ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে কোন কুলগ্রন্থ জাল হয় নাই একথা বলিতেছি না। বরং ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে এরূপ কৃত্রিমতা যে খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্যাপক ও

বিধিবদ্ধভাবে এবং কোন বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য সমর্থনের জন্য কুলগ্রন্থ জাল করা হইয়াছে, এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই। সুতরাং যে সমুদয় প্রাচীন কুলগ্রন্থের বহুল প্রচলন ছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যাহার পুঁথি আবিষ্কৃত ও পরিচিত হইবার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, প্রধানত সেই সমুদয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা বিচার করিতে হইবে।..

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বের গ্রন্থমাত্রই যে অকৃত্রিম তাহাও নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়েও ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি :

"পুরাণের দোহাই দিয়া কতশত বচন রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তাই নাই। কমলাকর ভট্টের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ ও রাজা রাধাকান্ত দেবের সময় পর্য্যন্ত ঐ সকল শ্লোকের প্রাদুর্ভাব। তৎপর যজ্ঞোপবীতপ্রার্থী কতিপয় কায়স্থের আগ্রহেও দেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় দুই-একটি শ্লোক গড়িয়াছেন ও উপবীতপ্রিয় কায়স্থগণের মনোরঞ্জনে অগ্রসর হইয়াছেন। সে সকল কথার উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন।" (কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, ১৮ পৃঃ)।

'পুরাণ', 'যজ্ঞোপবীতপ্রার্থী (উপবীতপ্রিয়) কায়স্থ' ও 'রাধাকান্ত দেব' ইহার পরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'কুলশাস্ত্র', 'ব্যক্তিগত বা সামাজিক মর্য্যাদাপ্রার্থীগণ' ও '৺নগেন্দ্রনাথ বসু' এই তিনটি শব্দ বসাইলেও উল্লিখিত মন্তব্য তুল্যরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণীয়। বর্ত্তমান কালে কুলগ্রন্থ জালের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি—আরও অনেক দেওয়া যায়। "চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ধ্রুবানন্দকৃত গৌড়বংশাবলী" অথবা গৌড়কায়স্থ বংশাবলী (বিশ্বকোষ, ৪।৩৪১) নামে একখানি কুলগ্রন্থ হইতে নগেন্দ্রবাবু তাঁহার জাতীয় ইতিহাসে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু পাতালখণ্ডের "বিচিত্রো জগতাং হেতুঃ" প্রভৃতি যে সমুদয় জাল শ্লোক দ্বারা নগেনবাবু প্রতারিত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এই কুলগ্রন্থের প্রারম্ভেই সেই সমুদয় শ্লোক "পাদ্মে পাতালখণ্ডে" এই দোহাই দিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি যে (নগেনবাবুর ভাষায়) "কোন বিশেষ উদ্দেশে আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে" তাহার অন্যান্য অনেক প্রমাণ আছে।

আধুনিক যুগে লিখিত যে সমুদয় গ্রন্থে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা আছে তন্মধ্যে লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য কৃত সম্বন্ধনির্ণয়ই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইং ১৮৭৪ সালে ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রন্থমধ্যে তিনি কুলগ্রন্থগুলির কোন প্রকার বিবরণ দেন নাই, কিন্তু তাঁহার উক্তির পোষকতার জন্য অনেক কুলগ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহিমচন্দ্র মজুমদার রচিত 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ঘটকদিগের নিকট যে "কুলগ্রন্থসকল সচরাচর দৃষ্ট হয়" গ্রন্থকার তাহার নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন :

রাঢ়ীয়

১। ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত মহাবংশাবলী
২। মিশ্রাচার্য্যকৃত মিশ্রগ্রন্থ
৩। ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা
৪। ফুলিয়া কুলবর্ণন
৫। বাচস্পতি মিশ্র ঘটককৃত কুলরাম
৬। রামহরি তর্কালঙ্কার কৃত মেলমালা

এতদ্ব্যতীত কুলার্ণব, সাগরপ্রকাশ, কুলচন্দ্রিকা, কুলদীপিকা প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে।

বারেন্দ্র

১। কুলপঞ্জিকা
২। গাঞিমালা
৩। ভাদুড়ি কুলব্যাখ্যা
৪। কুলীনগণের বংশাবলী
৫। শ্রোত্রিয়গণের বংশাবলী
৬। ঢাকুর অর্থাৎ করণাদির গ্রন্থ
৭। নিগূঢ় গ্রন্থ

এতদ্ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রভৃতির ঐতিহাসিক রচনায় এবং শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক কুলগ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার গ্রন্থাবলীতে অনেক নূতন কুলগ্রন্থের উল্লেখ

করিয়াছেন। কিন্তু যে কারণে এগুলি বিশ্বাসযোগ্য ও অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান যুগে যে সমুদয় নূতন কুলগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাও ঠিক ঐ একই কারণে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত অকৃত্রিম ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ঠিক কুলগ্রন্থের শ্রেণীভুক্ত না হইলেও কয়েকখানি গ্রন্থে কুলশাস্ত্রোক্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আনন্দ ভট্টকৃত বল্লালচরিত বোধ হয় এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তাঁহার কোন সভাসদ্ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত নামক গ্রন্থে অনেক কুলগ্রন্থোক্ত বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১৮৫২ অব্দে বার্লিন নগরে মূল ও ইংরেজী অনুবাদসহ মুদ্রিত হয়। পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপের রাজবাটীর দেওয়ান শ্রীকার্ত্তিকেয় রায় কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত আকারে বাঙ্গালা ভাষাতে ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত মুদ্রিত হইয়াছে। (১ক)

কুলগ্রন্থগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীন ও প্রামাণিক. ঐতিহাসিক উপাদানহিসাবে তাহাদের ব্যবহার করা বিষয়েও একটি গুরুতর বাধা আছে। যে সমুদয় প্রাচীন লেখক এইগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা আলোচ্য পুঁথির কোনরূপ বিবরণ দেন নাই। যে সমুদয় পুঁথির উপর তাঁহারা নির্ভর করিয়াছেন তাহা কোথায় কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং বর্ত্তমানে কোথায় রক্ষিত, পুঁথির লেখার আনুমানিক প্রাচীনতা, ভাষা ও বর্ণশুদ্ধি, পৃষ্ঠা, পংক্তি প্রভৃতি যে সমুদয় বিবরণ থাকিলে কোন পুঁথির সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় এবং একই নামে প্রচলিত অন্য পুঁথি উহার সহিত অভিন্ন কি-না তাহার নির্ণয় সম্ভব হয় সে সমুদয় বিবরণ প্রায় কেহই দেন নাই। ফলে অনেক কুলগ্রন্থের আর সন্ধান পাওয়া যায় না এবং উনবিংশ শতাব্দীতে পরিচিত কোন কুলগ্রন্থ ও বর্ত্তমানকালে ঐ নামে প্রচলিত কুলগ্রন্থের সহিত সাদৃশ্য ও বিভিন্নতার পরিমাণ নিরূপণ করা যায় না। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সুপরিচিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও কুলগ্রন্থের অংশবিশেষের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দিয়াছি। সুতরাং প্রাচীন কুলগ্রন্থের নামের দোহাই দিলেই তাহার কোন উক্তি প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করা সঙ্গত নহে। এই সমুদয় উক্তি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মূল পুঁথিখানি পরীক্ষা করা আবশ্যক এবং ঐ গ্রন্থের অন্যান্য পুঁথিতে ঐরূপ উক্তি আছে কি-না তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

এডুমিশ্রের কারিকা ও হরিমিশ্রের কারিকা নামক দুইখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত কুলগ্রন্থের বিবরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

এডুমিশ্রের কারিকা

৺নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন যে, এডুমিশ্র মহারাজ কেশব সেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠী কথা অনুসারে এডুমিশ্র (লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক) রোষাকরের পৌত্র ও দনুজমাধু রাজার সমসাময়িক অথবা পরবর্ত্তী এবং হরিমিশ্রের মতে এই দনুজমাধু অথবা দনৌজামাধব সেনবংশ ধ্বংসের পর রাজা হন। (প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্। দনৌজা মাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥) (৩)। গোষ্ঠী কথার এই অংশ ৺লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার সম্বন্ধ নির্ণয়ের উপসংহারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৪) ৺বসু মহাশয় এই মতখণ্ডনের কোন প্রয়াস পান নাই। তবে অন্যত্র এডুমিশ্রের কারিকা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে যবনহস্তে পরাজিত কেশব সেন স্বীয় রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া কুলপণ্ডিত এডুমিশ্র সহ অন্য রাজার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এইরূপ উক্তি আছে। (৫) এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

এডুমিশ্র কুলাচার্য্যদের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন। তাঁহার

(১ক) গো—বা

(২) বসু ১ (১২৫)

(৩) সং—নিং (৭১১)। দনৌজামাধব যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাবে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা পরে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি কেশব সেনের সমসাময়িক হইতে পারেন না।

(৪) "এডুমিশ্র গিরিসুত, রোষাকর পৌত্র",
"এডুমিশ্র সুবিজ্ঞ লেখে সমাজকথা।
তার সময় যা ছিল সমাজপ্রথা॥
তিনি বলেন দনুজমাধু যদা রাজা।
কামরূপ আদি কাশী পর্য্যন্ত যে প্রজা॥" সং নিং (৭১৩)

(৫) বসু—১ (১৫৬—৭)। কুলতত্ত্বার্ণব মতে এই রাজার নাম দনৌজামাধব (৬৯ পৃঃ)।

কারিকার কোন কোন অংশ সম্বন্ধনির্ণয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই গ্রন্থের কোন পরিচয় নাই। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে এড়ুমিশ্রের "কারিকা মধ্যে অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ এবং মধ্যে মধ্যে আধুনিক কুলাচার্য্যের লিখিত বিবরণাদি প্রক্ষিপ্ত থাকায় তাঁহার কারিকা হইতে তৎসাময়িক মৌলিকাংশ নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা অতীব কঠিন। (৬) বসু মহাশয় যাহাকে অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য বলিয়াছেন তাহার কোন কোন ঘটনা বল্লাল সেনের সময়কার অর্থাৎ এড়ুমিশ্রের জীবিতকালে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। প্রায় সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে যদি কাহারও উক্তি অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য হয় তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় গ্রন্থখানি কৃত্রিম, নয় ত গ্রন্থকার বিচারশক্তিহীন। সর্ব্ব প্রাচীন কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য কুলশাস্ত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

বসু মহাশয় এড়ুমিশ্রের কারিকার যে অসম্পূর্ণ পুঁথি পাইয়াছেন তাহার কোন বিশিষ্ট পরিচয় দেন নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় এড়ুমিশ্রের কারিকার কোন পুঁথি দেখিয়াছেন কি-না সন্দেহ; সম্ভবত অন্য কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত এড়ুমিশ্রের কারিকার বচন তিনি স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। এড়ুমিশ্রের কারিকার কোন পুঁথি সন্ধান করিয়া পাই নাই।

হরিমিশ্রের কারিকা

হরিমিশ্র নামে দুইজন কুলাচার্য্য ছিলেন। নুলো পঞ্চানন (ষোড়শ শতাব্দী) ইঁহাদের দুই জনেরই পরিচয় দিয়াছেন। নুলো পঞ্চাননের নিম্নলিখিত ও অন্যান্য বচনগুলি সম্বন্ধনির্ণয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। (৭) বন্দ্যবংশীয় হরিমিশ্র কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দের বৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং বল্লাল পূজিত মহেশ্বর বন্দ্যোর প্রপৌত্র। সুতরাং তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশশতকে বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

পঞ্চানন মুখোবংশীয় হরিমিশ্রের যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় তিনি বল্লালের নিকট কৌলীন্যপ্রাপ্ত উৎসাহ নামক ব্রাহ্মণের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। সুতরাং তিনি সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। ধ্রুবানন্দের মহাবংশে ইনি অষ্টষষ্টিতম সমীকরণে উল্লিখিত হইয়াছেন। ধ্রুবানন্দের মতে একষষ্টিতম সমীকরণ সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হয় এবং অষ্টসপ্ততিতম সমীকরণ হয় তাহার এক-পুরুষ পরে। সুতরাং এই হিসাবেও মুখোবংশীয় হরিমিশ্রের সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে।

নুলো পঞ্চানন গোষ্ঠীকথায় লিখিয়াছেন—

"পঞ্চাননে বলে কিবা দিব পরিচয়
এড়ু হরি জানে কুলকথা সমুদয়।"

এই শ্লোকেও হরি উল্লিখিত মুখোবংশীয় হরিমিশ্র।

হরিমিশ্র নামক এই দুই কুলাচার্য্য যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে আদৃত হইতেন। উক্ত গোষ্ঠীকথায় পঞ্চানন লিখিয়াছেন:

"বন্দ্য হরিমিশ্র বাক্য পূর্ব্বদেশে ধৃত।
মুখমিশ্র হরি গাথা গঙ্গাতীরে গীত॥"

৺নগেন্দ্রনাথ বসু যে হরিমিশ্র কারিকাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক কুলগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কোন্ হরিমিশ্রের রচিত সে সম্বন্ধে স্পষ্টত কিছুই বলেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী যে সমুদয় লেখকেরা হরিমিশ্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাঁহারাও এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায় বন্দ্যহরিমিশ্রকৃত 'বংশাবলী' এবং মুখহরিমিশ্রকৃত 'সারাবলী' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। (৭ক) ইহার কোন্‌টি ৺বসু মহাশয় উল্লিখিত 'হরিমিশ্রের কারিকা' তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে হরিমিশ্র "খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ দনৌজামাধবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।" (৮) কিন্তু তিনি ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ দেন নাই।

হরিমিশ্রের কারিকা সম্বন্ধে ৺বসু মহাশয় বলেন যে, এড়ুমিশ্রের কারিকা ইহা অপেক্ষা প্রাচীন হইলেও "সৌভাগ্যক্রমে হরিমিশ্রের কারিকায় আধুনিক কুলাচার্য্যের

(৬) বসু—১ (১২৫)
(৭) সং নিং (৭১২, ৭২৬—৭)
(৭ ক) বন্দ্যবংশ—(৩৬ পৃঃ)
(৮) বসু ১ (১২৫)

হস্তক্ষেপের কোন নিদর্শন না থাকায় এই কারিকাখানি সর্ব্বপ্রাচীন ও মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। (৯)

৺বসু মহাশয় হরিমিশ্রের কারিকা ও এডুমিশ্রের কারিকার পুঁথি পাইয়াছেন এবং এ দুইখানিই অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক কুলগ্রন্থ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ৺বসু মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আধুনিক কোন লেখক এই দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সাধারণের নিকট এই দুইখানি গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া ৺বসু মহাশয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটি ঘটনায় তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। তথাপি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও প্রকাশ্য সংবাদপত্রে আন্দোলন সত্ত্বেও ৺বসুমহাশয় তৎসংগৃহীত এই দুইখানি গ্রন্থ কাহারও সমক্ষে উপস্থিত করেন নাই এবং ইহাদের বিশিষ্ট কোন বিবরণও প্রকাশ করেন নাই।

কয়েকমাস পূর্ব্বে বসু মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থগুলি বিক্রয় করিবেন শুনিয়া আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে উহা ক্রয় করার উদ্দেশ্যে আমাদের পুঁথিরক্ষক শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতায় পাঠাই ও বসু মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত কুলগ্রন্থগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে উপদেশ দেই। উক্ত তালিকায় হরিমিশ্র বা এডুমিশ্রের কারিকার নাম নাই। ঐ দুইখানি গ্রন্থ বসু মহাশয়ের গ্রন্থাগারে নাই—কোথায় আছে তাহারও কোন সন্ধান মিলিল না। ইহার কিছুদিন পরে বসু মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মরণকাল পর্য্যন্ত যক্ষের ধনের ন্যায় এই গ্রন্থ দুইখানি বসু মহাশয় কি কারণে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সমুদয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বসু মহাশয় সংগৃহীত এই দুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বতই সন্দেহ জন্মে। এই সন্দেহের সমর্থন কল্পে বলা যাইতে পারে যে, দনৌজামাধব সম্বন্ধে হরিমিশ্রের যে বচন ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের প্রথমভাগে (১৫৬ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বিশ্বকোষে (৪।৩৪৩) উল্লিখিত হরিমিশ্রের কারিকার উক্তির সামঞ্জস্য করা কঠিন। যদি বাস্তবিকই এই গ্রন্থ দুইখানি অকৃত্রিম হয় তবে বসু মহাশয়ের আচরণে তাহা কোন দিন বঙ্গদেশের ইতিহাসের উপকরণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিল না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

হরিমিশ্র ও এডুমিশ্রের কারিকার কোন বিশুদ্ধ পুঁথি না পাওয়া পর্য্যন্ত এই দুইখানি কুলগ্রন্থকে প্রাচীন ও প্রামাণিকরূপে ব্যবহার করা যায় না।

এই দুইখানি গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন কোন কুলগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মহিমাচন্দ্র মজুমদার 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "বল্লাল সেন কর্ত্তৃক শ্রেণীবিভাগ এবং ঘটকনিয়োগ হইবার পূর্ব্বে রাঢ়দেশগামী শ্রীহর্ষতনয় শ্রীনিবাস গৌড়ে পঞ্চব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লেখেন।" (১০) কিন্তু এই গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

কুলতত্ত্বার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে রাজা বল্লাল সেন ১১০৩ শকে ক্ষিতীশাদি পঞ্চব্রাহ্মণের কুলবর্ণনা করিয়া একখানি কুলগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই কুলগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কুলতত্ত্বার্ণবে বল্লাল সেনের রচিত বলিয়া যে বংশাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে অন্য সমর্থক প্রমাণ অভাবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। (১১)

মহেশকৃত নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা অনুসারে মহেশ লক্ষ্মণ-সেনের সমসাময়িক। (১২) কিন্তু ইহা সত্য কি-না এবং সত্য হইলেও এই দুই মহেশ অভিন্ন কি-না এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার একখানি পুঁথি আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থে আদিশূরের কোন উল্লেখ নাই।

বস্তুত যে সকল কুলগ্রন্থ সচরাচর প্রচলিত এবং যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া কুলশাস্ত্র আলোচিত হয় তাহাদের কোনখানিই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বে রচিত নহে।

---

(৯) বসু ১ (১২৬)

(১০) গৌ ব্রা, উপক্রমণিকা (পৃঃ।০)

(১১) কুল(২৪৩—৩০২ শ্লোক)। শব্দকল্পদ্রুমধৃত রাঢ়ীয় ঘটকারিকায় এবং রামজীবন কৃত কুলপঞ্জিকায় বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কুলশাস্ত্র-নিরূপণের উল্লেখ আছে (সং নিং ১২৭ পৃঃ, ২১৯ পৃঃ)।

(১২) সং নিং (৭১০)

উপসংহারে কয়েকখানি কুলগ্রন্থের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। এইগুলিতে প্রধানত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয় আছে। বৈদিক প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণশ্রেণীর ও ব্রাহ্মণেতর জাতির বংশপরিচায়ক কুলগ্রন্থ তত্তৎপ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

১। ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃত মহাবংশাবলী

মহাবংশাবলী সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। ১৩২৩ সনে 'মহাবংশ বা মিশ্রগ্রন্থ' নামে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ৺বসু মহাশয়ের মতে "মহাবংশ রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলপরিচায়ক গ্রন্থ।" ইহাতে আদিশূরের এবং কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু বল্লাল সেনের সভায় যাঁহারা কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশপরিচয় ও প্রত্যেকের আদানপ্রদানের বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থ 'মিশ্রগ্রন্থ' নামেও পরিচিত। (১৩) ৺বসুমহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত 'কুলকারিকা' অনুসারে "দেবীবর ১৪০২ শকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে মেল প্রচার করেন এবং ১৪০৭ শকে ধ্রুবানন্দ মহাবংশ রচনা করেন।" (১৪)

ধ্রুবানন্দের পুত্র সর্ব্বানন্দকৃত কুলতত্ত্বার্ণবের (২নং দেখ) উপসংহার ভাগ হইতে জানা যায় যে, দেবীবরের পর ১৪০৭শকে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) ধ্রুবানন্দ কুলাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং মেলী কুলীনদিগের মেল ব্যতিক্রম দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে তিনি মেলকারিকা রচনা করেন। (১৫)

৺বসুমহাশয় লিখিয়াছেন,"মহাবংশের একষষ্টিতম সমীকরণ-কারিকায় ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন যে, ১৩৭৭ শকে অর্থাৎ ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে পূতি শোভাকরের মৃত্যু হয়।" ইহা ঠিক নহে। কারণ ৺বসুমহাশয় কর্তৃক মুদ্রিত গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায় "সপ্তসপ্ততীতে শাকে পূতিশোভাকরে মৃতে" মাত্র এই শ্লোকটি আছে। ইহাতে অনুল্লিখিত শতাব্দীর সাতাত্তর বর্ষের উল্লেখ আছে, ১৩৭৭-এর উল্লেখ নাই। অবশ্য বংশীবদন বিদ্যারত্নের কারিকা ও সর্ব্বানন্দের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য করিতে গেলে ইহাকে ১৩৭৭ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। ধ্রুবানন্দ অষ্টসপ্ততিতম সমীকরণে শোভাকরের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের কুলপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পুত্রগণের উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ধ্রুবানন্দ শকাব্দের পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

৺লালমোহন বিদ্যানিধি বলেন—"ধ্রুবানন্দ হরিমিশ্রের পৌত্র ও বিষ্ণুমিশ্রের পুত্র। ইঁহার প্রপিতামহ দুর্ব্বলী ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রসিদ্ধ মহেশ্বর বন্দ্যো, যিনি মহারাজাধিরাজ বল্লালের নিকট বন্দ্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হয়েন।"(১৬) কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় ভট্টনারায়ণবংশের যে তালিকা দিয়াছেন(১৭) এবং ৺নগেন্দ্রনাথ বসু 'মহাবংশের' উপক্রমণিকায় ধ্রুবানন্দের গ্রন্থ অনুযায়ী যে বংশাবলী দিয়াছেন, তদনুসারে তিনি বল্লাল পূজিত মহেশ্বর বন্দ্যোর সপ্তম অধস্তন পুরুষ। সাত পুরুষে তিনশত বৎসরের অধিক ব্যবধান কল্পনা করা কঠিন। সুতরাং এই বংশাবলীও গ্রহণযোগ্য নহে। এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই দেখা যাইবে যে, প্রামাণিক গ্রন্থোক্ত প্রাচীন বংশাবলীও সর্ব্বত্র সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।

সর্ব্বানন্দমিশ্রকৃত কুলতত্ত্বার্ণব

এই গ্রন্থখানি ১৯২৭ সনে মেদিনীপুর ব্রাহ্মণ-সভা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বানন্দমিশ্র ধ্রুবানন্দমিশ্রের পুত্র। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন যে বহু কুলগ্রন্থের সারসঙ্কলন পূর্ব্বক তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্যত্র তাহা আলোচিত হইবে। এ পর্য্যন্ত প্রাচীন বা বর্ত্তমান কোন লেখক এই গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে এমন অনেক উক্তি আছে যাহা

(১৩) ৺বসু সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা (পৃঃ [২])। মহিমাচন্দ্র মজুমদার মিশ্রাচার্য্যকৃত মিশ্রগ্রন্থ নামে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন (গৌ বা, উপক্রমণিকা, পৃঃ ।/০)।

(১৪) ভূমিকা (পৃঃ ১—২)

(১৫) কুল (৬৬৩—৫ শ্লোক)

(১৬) সং নিং (৭২৫)

(১৭) সং নিং (৪৩১)

আর কোন কুলগ্রন্থে নাই। ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর অনেক নূতন মতবাদ (যে সম্বন্ধে তিনি কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দেন নাই) এই গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হয়। কিন্তু ৺বসুমহাশয় এই গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই।

বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরাম

এই কুল গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্র দেবীবরের পরবর্ত্তী অর্থাৎ ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বলিবেন মেলবন্ধন হইবার পর কুলরাম রচিত হয়।···হরিমিশ্রের প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে বাচস্পতি মিশ্র কুলরাম প্রকাশ করেন।"(১৮) প্রবাদ আছে যে, বাচস্পতি মিশ্র বৃদ্ধ ধ্রুবানন্দের নিকট কুলশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।(১৯)

বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ এই নামে প্রচলিত। ইহাদের গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, গ্রন্থেরও কোন নাম নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিয়াছেন, "বারেন্দ্রকুল পঞ্জিকার ঐতিহাসিক অংশ 'আদিশূর রাজার ব্যাখ্যা' নামে পরিচিত। লালোর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুকুটমণির, মাঝগ্রামের শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সার্ব্বভৌমের এবং রামপুর বোয়ালিয়ার শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় মহাশয় সংগৃহীত পুঠিয়ানিবাসী ৺মহেশচন্দ্র শিরোমণির ঘরের পুস্তক মধ্যে পাঁচ প্রকার 'আদিশূর রাজার ব্যাখ্যার' পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে দুইখানিতে বল্লাল সেন আদিশূরের দৌহিত্রবংশোদ্ভব বলিয়া কথিত।"(২০)

৺লালমোহন বিদ্যানিধি, ৺মহিমাচন্দ্র মজুমদার ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা হইতে আদিশূর সম্বন্ধে যে বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা আদিশূরের প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। শেষোক্ত দুইজন বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা হইতে আদিশূরের সময়জ্ঞাপক যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন যে "যে যে কুলজ্ঞগণের সহিত আলাপ করিয়াছি তাঁহারা এই সকল বচনের কোনটির বিষয়ই অবগত নহেন।"(২১) ৺নগেন্দ্রনাথ বসুও বলেন—"বারেন্দ্র কুলাচার্য্যের নিকট হইতে এখন যে সকল কুলীনবংশাবলী পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সমস্তই আধুনিক।"(২১ক) এই সমুদয় হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে 'বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা' নামে পরিচিত কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করা সমীচীন নহে।

নুলো পঞ্চাননকৃত গোষ্ঠীকথা

পঞ্চানন দেবীবর ও ধ্রুবানন্দের সমসাময়িক, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা কনিষ্ঠ। সুতরাং তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার হস্তে শক্তির অল্পতা ছিল বলিয়াই প্রথম বয়সে নুলো বলিয়া উপহসিত হইতেন, কিন্তু শেষকালে উহাই তাঁহার গৌরবান্বিত উপাধি হইয়াছিল। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইঁহার গ্রন্থাদি হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।(২২)

নুলো পঞ্চানন, এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র ও ধ্রুবানন্দের কুলগ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটি বচন পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬। দেবীবরের মেলপর্য্যায় গণনা
৭। ধনঞ্জয় কৃত কুলপ্রদীপ
৮। কুলার্ণব
৯। রামানন্দ শর্ম্মকৃত কুলদীপিকা
১০। কুলচন্দ্রিকা
১১। সাগরপ্রকাশ

সাত হইতে এগার সংখ্যক গ্রন্থের বিশিষ্ট কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সুতরাং ইহাদের রচনাকাল ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না। তবে নুলো পঞ্চানন কৃত কুলার্ণব, ধনঞ্জয় কৃত কুলপ্রদীপ ও

(১৮) বসু ১ (১২৮—৯)
(১৯) লালমোহন মুখোপাধ্যায়—বন্দ্যবংশ (পৃঃ ৩৬)।
(২০) গৌড়রাজমালা (পৃঃ ৫৮)
(২১) গৌড়রাজমালা (পৃঃ ৫৮)
(২১ ক) বিশ্বকোষ, চতুর্থ ভাগ (৩১১ পৃঃ)
(২২) সং নিঃ (৬৭৫, ৬৯০, ৬৯৫, ৭০০, ৭০৮, ৭১২—৭২৬—৭৩২, ৭৩৪—৭৩৯)

কুলদীপিকা—এই সমুদয় গ্রন্থোক্ত শ্লোক ৺লালমোহন বিদ্যানিধি 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুলচন্দ্রিকা ও সাগরপ্রকাশ এই দুই গ্রন্থোক্ত শ্লোক ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ১ম ভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে কোন বিবরণ নাই। গৌড়ে ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থেও কুলার্ণব, সাগরপ্রকাশ, কুলচন্দ্রিক, কুলদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম আছে, কিন্তু কোন বিবরণ নাই। ৺উমেশচন্দ্র গুপ্তের মতে কুলার্ণবের প্রণেতা ধনঞ্জয় (২৩) ও কুলচন্দ্রিকার প্রণেতা বৈদ্য দুর্জ্জয় দাস (২৪)। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ পাই নাই।

এই বিস্তৃত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, যে সমুদয় কুলগ্রন্থ সাধারণ্যে পরিচিত তাহার কোনখানিই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল—এরূপ মনে করিবার কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ নাই। হরিমিশ্রের কারিকা ও এডুমিশ্রের কারিকা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও বর্ত্তমানে তাহাদের কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই—যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার উপরেও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। প্রাচীন আরও অনেক কুলগ্রন্থ হয় ত ছিল, কিন্তু তাহা আর এখন পাওয়া যায় না।

বৈদ্যকুলপঞ্জিকার মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত মাত্র দুইখানি গ্রন্থ আছে—রামকান্ত দাস প্রণীত কবিকণ্ঠহার ও ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা। সৌভাগ্যক্রমে দুইখানি গ্রন্থেরই রচনাকাল গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমখানি ১৫৭৫ শকে অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রণীত (পঞ্চসপ্ততিপৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা)। দ্বিতীয় খানির রচনাকাল ১৫৯৭ শকাব্দ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৭৫ অব্দ। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত কোন বৈদ্যকুলপঞ্জিকার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহার পূর্ব্বে কোন কায়স্থ কুলপঞ্জিকা রচিত হইয়াছিল এরূপ প্রমাণও পাই নাই।

সুতরাং যে সমুদয় কুলগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা প্রাচীন হিন্দুযুগের সামাজিক ইতিহাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহার সমস্তই হিন্দু রাজত্বের অবসানের তিন-চারি শত বৎসর পরে রচিত। এই সুদীর্ঘ ব্যবধান ও জাতীয় জীবনের অবসাদ ও অবনতির ফলে প্রাচীন ঐতিহাসিক ধারার সহিত বাঙ্গালী জীবন কিরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল সংস্কৃত রাজাবলী নামক গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল (২৫)। এই গ্রন্থে বাংলার রাজগণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অথচ ইতিহাসে সুপরিচিত সম্রাট শশাঙ্ক, ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতি কাহারও নাম নাই এবং বিজয় সেন, বল্লাল সেন দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থোক্ত অনেক শ্লোক দেবীবর ঘটকের বচন বলিয়া পরিচিত। সুতরাং এই গ্রন্থখানিতে কুলশাস্ত্র গুলি রচনার কালে (পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে) প্রচলিত জনশ্রুতি স্থান পাইয়াছে—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যে সময় প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান এতদূর বিকৃত ও ভ্রান্ত ছিল, সে সময় প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে যে লোকের মনে সঠিক ধারণা ছিল, বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাহা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং বিগত তিন-চারি শত বৎসরে রচিত কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন হিন্দুযুগের সামাজিক বা রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে কোন তথ্য নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। এগুলির মধ্যে যে কোন সত্য নাই এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু ইহার কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং স্বতন্ত্র ও বিশ্বস্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহাদের কোন উক্তিই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ইহা সত্ত্বেও যে পাঁচটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কুলশাস্ত্রে বর্ণিত সমাজবিধির ও সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার প্রধান কারণ তিনটি। প্রথমত, সাধারণের মনে কুলশাস্ত্রের প্রতি যে আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে তাহা কি পরিমাণ যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত নিরপেক্ষ বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা। ইহাতে অনেক ভ্রান্ত মত নিরাকৃত হইয়া ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হইবে এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত অনেক সামাজিক রীতিনীতির

(২৩) মোমু (পৃঃ ২৯)

(২৪) ঐ (৩১ পৃঃ)। কিন্তু ১৭০ পৃষ্ঠায় তিনি জয়বিশ্বাস কৃত কুলচন্দ্রিকার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(২৫) এই গ্রন্থখানি এখনও অপ্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় আমি ইহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

অসারতা প্রতিপন্ন হইয়া তাহাদের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইবে। দ্বিতীয়ত, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে প্রাচীন হিন্দুযুগের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার যথার্থ বিবরণ পাওয়া যাইবে। এই ধারণা প্রাচীন হিন্দুযুগের দিক দিয়া সত্য না হইলেও পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী যুগের বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। তৃতীয়ত, বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের নব নব তথ্য ক্রমশই আবিষ্কৃত হইতেছে। পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত জনশ্রুতির সহিত সম্যক্ পরিচয় থাকিলে এই নবাবিষ্কৃত তথ্যের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ কোন কোন স্থলে সহজসাধ্য হইবে এবং ইহার সাহায্যে উক্ত জনশ্রুতির কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিয়া প্রাচীন ইতিহাস গঠনে অধিকতর অগ্রসর হওয়া যাইবে।

এই সমুদয় উদ্দেশ্য লইয়াই কুলশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করিয়া বাংলার ইতিহাস প্রণয়নে তাহার উপর নির্ভর করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা কখনও বিস্তারিত ভাবে কুলশাস্ত্রের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন নাই। সুতরাং অনেকের মনে এমন বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহারা যথোচিত বিচার না করিয়াই কুলশাস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছেন। এইরূপ মত অনেকেই প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। জনসাধারণের এই প্রকার সন্দেহ দূর করাও আমার কুলশাস্ত্র আলোচনার আর একটি উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান এবং পরবর্ত্তী চারিটি প্রবন্ধে আমি যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আশা করি নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে বর্ত্তমান কালে যে সমুদয় কুলগ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহা প্রাচীন হিন্দু যুগের প্রকৃত রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাসের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করা যায় না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কুলগ্রন্থগুলি অধিকাংশই অপ্রকাশিত ও সুদুর্লভ। সুতরাং অনেক স্থলেই অন্য আধুনিক গ্রন্থের বিবরণের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। এমতস্থলে এই প্রবন্ধগুলিতে অনেক ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। যে কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সমুদয় ভুলভ্রান্তির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন অথবা নূতন তথ্যের সন্ধান দিবেন তিনিই আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। সমুদয় কুলগ্রন্থগুলি স্বয়ং যথোচিত পরীক্ষা ও আলোচনা করিবার সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও আমি এই প্রবন্ধগুলি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কারণ ইহাতে বিতর্ক ও আলোচনা দ্বারা প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের সহায়তা হইবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কুলগ্রন্থগুলি রক্ষিত আছে এবং অনেক স্থলেই যাহা আমার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য তাহা অন্যের পক্ষে সুলভ। সুতরাং একটু আয়াস স্বীকার করিলেই অনেকে নূতন কুলগ্রন্থের সন্ধান অথবা এই সমুদয় প্রবন্ধে আলোচিত কুলগ্রন্থের সম্বন্ধে কোন নূতন অথবা ভিন্ন বিবরণ আমাকে জানাইতে পারেন। কুলশাস্ত্রের আলোচনা ও অধ্যয়ন পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে এইরূপে দশের সাহায্য প্রয়োজন। এই দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও এই প্রবন্ধগুলি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রহিবিশন্

(হাফিজ্)

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

সুরা যদিও আনন্দ দেয় বটে এবং
বায়ুতে নিস্থত হয় গোলাপের বাস,
শ্রান্ত বীণার মত—
পূর্ণমাত্রায় সুরাপান কোরো না বন্ধু,
কারণ প্রহরী রয়েছে সজাগ।

ওরা মদ্যশালার দ্বার দিয়েছে রুদ্ধ ক'রে,
হা ভগবান!
দুঃখ কোরো না বন্ধু,
ওদের উন্মুক্ত করতেই হ'বে—
ঐ প্রতারণা এবং আত্মপ্রবঞ্চনা-গৃহের দ্বার!

মোহ-মুক্তি

নাটক

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রমণ মিত্রের বহির্বাটী

সময়—সকাল

ভাইপো শ্রীপতি মিত্র-মশার সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছেন

(পদচারণ)

শিরোমণি-মশার কাছে থেকে আহত মনে বাড়ী ফিরে, সামনেই ভাইপো শ্রীপতিকে দেখে—

রমণ। 'হরের্ণামৈব কেবলম্', 'হরের্ণামৈব কেবলম্'—একি, সকালে তুমি আবার এখানে কেনো! যাদের মিথ্যা না কোয়ে পেট চলে না, সকালে তাদের সঙ্গে কথা কোয়ে দিনটা নষ্ট করতে চাই না…

শ্রীপতি। কখন আসি বলুন কাকাবাবু! গিয়েই তো কাছারি ছুটতে হবে, ফিরতে রাত আটটা। মিথ্যে কোয়ে পেট্ চালাবার মত' কেস্ পেলেও এখন আসতুম না, তাও যে পাচ্ছি না কাকাবাবু। দু'মাসের ভাড়া পড়ে গিয়েছে, আমাকে দয়া করুন—পশ্চিম দিকের দুখানা ঘর আর বাইরের একখানা—বাবা যা ব্যবহার করতেন—ছেড়ে দিলে আমি তাগাদা আর দুর্ভাবনা থেকে বাঁচি। সেগুলো তো আপনার ব্যবহারে আসছে না।

রমণ। এই যে, উকীল হয়ে বেশ কথা কইতে শিখেছ। ব্যবহারে না থাকলেই বুঝি অপরকে বিলিয়ে দেওয়াই বিধি!

শ্রীপতি। অন্যকে কেনো দেবেন—ভাইপো তো আর অপর নয়—

রমণ। তোমার বাবাই তো অপর কোরে গেছেন।

শ্রীপতি। বাবাকে এর মধ্যে টানছেন কেনো কাকা। আমি উত্তরাধিকারসূত্রে যেটুকু পাই তার বেশী তো চাচ্ছি না।

রমণ। তাহ'লে তাঁর দেনাটাও উত্তরাধিকারসূত্রে তোমায় বর্ত্তেছে—স্বীকার করো তো? তার কি করছো?

শ্রীপতি। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) বাবার দেনা! এ কথা তো এই শুনছি। তিনি দেনা করবেন কেনো? না মেয়ের বিয়ে না ··

রমণ। তোমার জ্ঞান হ'য়েছে, সে সব কথা শুনলে লজ্জা পাবে, অসুখী হবে, তাই কোনো দিন প্রকাশ করিনি। না বলেই ভুল করেছি! যাও—আর বকিও না—

শ্রীপতি। যে এখন রাস্তার লোক, তার আর লজ্জা সরম কি? দেনাটা কেনো, কতো, কার কাছে, আমার যে জানা দরকার—

রমণ। আমি যেটা চাপতে চাচ্ছি, সেটা যাতে প্রকাশ হয় তার চেষ্টা করবে বই-কি! বাপ লেখাপড়া শিখিয়ে গিয়েছেন—সার্থক হওয়া চাই তো,—বাপের সম্মান, বংশের সুনাম, হানি করা চাই তো?

শ্রীপতি। আমার জানা আবশ্যক বলেই জানতে চাচ্ছি—

রমণ। (বিরক্তভাবে)—শুনবে! তোমার বাবা আপিসের ক্যাস্ ভেঙেছিলেন! কেউ সে কথা জানে কি, না আমি কা'কেও তা জানতে দিয়েছি! সাহেব পুলিসে দিতে প্রস্তুত। আমি সেই দেড় হাজার টাকা পুরো কোরে দিয়ে—সাহেবকে ঠাণ্ডা করি। দাদা বাড়ী এসে তোমার খুড়িমাকে আভরণ শূন্য দেখে—শয্যা নিলেন। তার পর আর ওঠেন নি। শেষ সময় বলে' গেলেন—"আমার অংশের বাড়ী ঘর, জমি সব তোমার রইলো।" বললুম—"করছেন কি—ও কি বলছেন?—শ্রীপতি"··· বললেন—"তার জন্যে চিন্তা রেখ না, শ্বশুর বড়-লোক, তাঁর সঙ্গে আমার" এই পর্য্যন্ত বলে' তাঁর কথা বন্ধ হ'য়ে যায়। সেখানে একা আমিই ছিলুম না। শুনলে! এইবার বাপের নাম জাহির করবার চেষ্টা পাও—ছেলের কাজ করো—

শ্রীপতি। আমি অভাবে পড়েই আপনার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি। ছ'মাস আগেও বলেছিলেন—"অতো ব্যস্ত হয়ো না, বাড়িটা মেরামত করবার ইচ্ছা রয়েছে; সম্ভ্রান্ত লোকেরা মধ্যে মধ্যে এসে থাকেন। এখন তুমি এলে বাড়ির কাজে হাত দেওয়ার অসুবিধে হবে—সবুর করো"

রমণ। বংশের দুর্নাম প্রকাশ করতে চাইনি—তাই বলেছিলুম—

শ্রীপতি। যদি তাই হয়, আপনি এতো করেছেন, ঘর দু'খানা ভাইপোকে দানই করুন না। আমার যে বড় অভাব···

রমণ। (বিকৃত কণ্ঠে) "যদি তাই হয়" মানে কি? আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছো না বুঝি—বেইমান! এখানে আর মুখ দেখাতে এসো না! ভেবেছিলুম···নাঃ আর নয়। জেনে বুঝে শত্রু ঢোকাতে···

শ্রীপতি। (আহত প্রাণে) জেনে বুঝে বাড়িতে শত্রু কেউ ঢোকায় না কাকাবাবু, শত্রু আপনিই এসে ঢোকে···

রমণ। (রাগে কাঁপতে কাঁপতে)—বেরও এখান থেকে—দূর হও রাস্‌কেল্! বেইমানের মুখ দেখতে চাই না।

বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। পত্নী তাড়াতাড়ি উপরের জানলা থেকে সরে গেলেন

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীপতি ধীরে ধীরে চিন্তাকুল, অন্যমনস্ক ও হতাশভাবে রাস্তায় পা বাড়ালে।

চন্দ্র চৌধুরী মশাই রমণ মিত্রের কাছে আসছিলেন, শ্রীপতিকে তদবস্থ দেখে—

চন্দ্রবাবু। একি! তোমাকে এমন দেখছি কেনো?

শ্রীপতি। (চমকে ফিরে চন্দ্রবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে)—কাকাবাবুর কাছে গিয়েছিলুম জ্যাঠামশাই—

চন্দ্রবাবু। ডেকেছিলেন বুঝি—দেখা হোলো?

শ্রীপতি। ডাকবেন কি—আমাকে এড়াতেই চান্। দেখা হ'লে বিরক্তই হন্! কি করবো জ্যাঠামশাই—বড় কষ্টে পড়েছি। দু'মাসের বাসা-ভাড়া ৬০৲ টাকা চেপেছে। তাই আমার অংশের ঘর দু'খানা আর বাইরের একখানা চাইতে গিয়েছিলুম। ছ'মাস পূর্ব্বে বলেছিলেন—"বাড়িটে আগে মেরামত করি।" কিন্তু আজ যা শোনালেন, সে যে ভয়ঙ্কর কথা! বাবা নাকি আপিসের ক্যাস্ ভেঙে···

চন্দ্রবাবু। কে—চণ্ডী? নারায়ণ, নারায়ণ! এমন কথা মুখে আনতে কেউ পারে না। তার মত মানুষ কি আর দেখতে পাবো! কি শুনতে কি শুনেছ···

শ্রীপতি। না জ্যাঠামশাই—আমি ঠিকই শুনেছি। কাকাবাবু নাকি দেড় হাজার টাকা দিয়ে—তাঁকে বাঁচান। তাই তিনি তাঁর অংশ—কাকাবাবুকে দিয়ে গেছেন—

চন্দ্রবাবু। (সহাস্যে)—তোমার কাকাবাবুকে চেন না শ্রীপতি—গাঁয়ের অনেকেই চেনেন না! এখন তাঁর জপের সময়—এ-তো আমাদের জপ্ নয়! তাই ও-সব বৈষয়িক কথা শুনে বিরক্ত হয়ে থাকবেন। (চিন্তিত-ভাবে ইতস্তত কোরে)—তোমায় বলি—আরো কারণ আছে বাবা, তার কিছু কিছু আভাস আমি পেয়েছি; স্পষ্ট ব'লতে পারেন না তো। ধর্ম্মপ্রাণ লোক, আপন বাড়ির ছেলেপুলের স্বভাব চরিত্র—নির্ম্মল দেখতেই চান। পাপ-কথা যে আর উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে পারেন না—নইলে নিজেই বলতেন। তাই বিরক্ত দেখে থাকবে···

শ্রীপতি। (আশ্চর্য্য হয়ে) আমি যে কিছু বুঝতে পারলুম না জ্যাঠামশাই! আপনিও কি তাহ'লে···

চন্দ্রবাবু। (স্নেহের হাসি টেনে) আরে পাগল—তাঁর মত উচ্চ অবস্থার লোকের কথায় কি আমাদের প্রতিবাদ চলে!

শ্রীপতি। আপনার মত' সরল উদার প্রকৃতির লোক তো আমার নজরে পড়ে না···

চন্দ্রবাবু। (ব্যস্তভাবে) ও সব কথা থাক শ্রীপতি। তা যাই হোক্, ব্রজ লাহিড়ীর বাড়ির ঝি কদমের সঙ্গে তুমি কথা কও, সম্পর্ক রাখো, তাতে যে তোমার কাকাবাবুর মর্য্যাদার কতটা হানি করা হয় ও হ'তে পারে, সেটা কি তুমি বুঝতে পার না? কলকেতার সব বড় বড় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকেরা যাঁর পায়ে মাথা ঠ্যাকায়, তাঁর সেই মাথা হেঁট করা হয় যে তাতে! তুমি যে তাঁর বংশের ছেলে—

শ্রীপতি। কদম সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু শুনিনি জ্যাঠামশাই, জানবার দরকারও মনে করিনি। আমি এই নতুন ওকালতী আরম্ভ করেছি; আমার কাছে যাঁরা আসেন,

প্রায়ই সব অপরিচিত। কদম ব্রজবাবুর বিধবা পত্নীকে দেখা শোনার জন্যে তাঁর সাহায্যের জন্যে আছে—এইমাত্র শুনেছি। আমরা ব্রজবাবুর একপ্রকার বন্ধুই ছিলাম—নিকট প্রতিবাসীও। তাই তাঁর কিছু জানবার দরকার হ'লে—কদমকে পাঠান, সে আসে। তাতে এমন কি…

চন্দ্রবাবু। তোমার কাকাবাবুর মুখেই শুনেছি—কদমের স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল না—

শ্রীপতি। অনেকের বাড়িতেই তো ঝি আছে—কে কি ছিল সে খবর কয়জন রাখেন জ্যাঠামশাই? আর কাকাই বা এসব—

চন্দ্রবাবু। তোমরা আজকালের ছেলে—বুঝবে না

শ্রীপতি। ওঁর এখন যে অবস্থা—ওঁর অগোচর কিছু আছে কি! সব যে ওঁর এখন নখদর্পণে! গ্রামের শুভ চিন্তার ভার যে ওঁর উপর আপনিই গিয়ে পড়েছে! যাক্—তুমি বাবা কদমের কোনো সংশ্রব রেখ না। দেখ্‌বে সব ঠিক্ হয়ে যাবে। বাড়ী-ঘর তো ওঁর এখন বন্ধন—তুচ্ছ কথা! কোন্ দিন কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে পড়বেন কেউ জানতেও পারবে না। আমরা পালা কোরে—চোখে চোখে রেখেছি—

শ্রীপতি। আপনার মত জ্ঞানী লোকের (ক্ষমা করবেন) এ কাজটি কি ভালো হচ্ছে জ্যাঠামশাই! টেনে রেখে ওঁর অনিষ্ট করাই কি আমাদের উচিত? শুনেছি—বংশের একজন তাঁর কৃপা পেলে—উপর নীচের সাত পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়—

চন্দ্রবাবু। কথা ঠিক্ বটে! কিন্তু আমরা ঘোর সংসারী, স্বার্থপর, তাই নিজেদের মঙ্গলের জন্যই ওঁকে রাখা। যাক্—সে অনেক কথা। তুমি কিন্তু বাবা—যা বললুম তা শুনো—ভালো হবে। ওসব স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশায় ভদ্র সন্তানদের—বুঝলে…অপযশ আছে—

শ্রীপতি। (একটু স্তম্ভিত থেকে) আজ কি কুক্ষণেই বেরিয়েছিলুম! কাকাবাবু শোনালেন—বাবা আপিসের ক্যাস্ ভেঙে ছিলেন! আপনিও আমার চরিত্রের উপর—

চন্দ্রবাবু। না—না—আমি কেনো তোমার কাকাবাবুর কাছে—

শ্রীপতি। হ্যাঁ—তাই হেলো—এবং আপনি তা—

চন্দ্রবাবু। আহা—ওকথা ভাবচো কেনো? তাঁর বাক্য অগ্রাহ্য—

শ্রীপতি। করা যখন যায় না, তখন তাই তো হোলো জ্যাঠামশাই—

চন্দ্রবাবু। না—না, আমি বলছি—কাজ কি দুশ্চরিত্রার সঙ্গে কথা কোয়ে! গুরুজন যা চান্ না—বুঝলে—

হাঁপাতে হাঁপাতে কদমের দ্রুত প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। (বেশ সহজভাবে) এই যে—এস মা।

কদম। বাবা! (পদানতভাবে প্রণাম) মা, ছেলে-মেয়েরা সব ভালো আছেন বাবা? এমন ফুরসৎ পাই না যে গিয়ে দেখে আসি। (শ্রীপতির প্রতি) বাবা—বাবা! এত ছোটাতেও পারেন—

চন্দ্রবাবু। বউমা কেমন আছেন কদম?

কদম। সে আর কি শুনবেন বাবা! শরীরের উপর মানুষের এমন অযত্ন—কখনো দেখিনি। খেতে হয় তাই তিন-পোর বেলায় এক-মুঠো ভাতে-ভাত ফোটান্। কিছু বললে—তাঁর চোখে জল গড়িয়ে আসে—

চন্দ্রবাবু। (ব্যস্তভাবে) থাক্ কদম থাক্! (দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত) নারায়ণ!—শ্রীপতিকে খুঁজছিলে?

শ্রীপতি। না—আমাকে খোঁজবার কোনো দরকার নেই; আমার দ্বারা কিছু হবে না—

কদম। (আশ্চর্য্য হয়ে) আমি মরছি ছুটোছুটি কোরে, আমারি ভুল হয়েছে! দাদাবাবু উকীল মানুষ—শুধু হাতে কাজ করতে ওঁদের আইন্ যে মাথার দিব্যি দেয়!

চন্দ্রবাবু। (সহাস্যে) বেশ বলেছ কদম—ঠিক কথা বলেছ—

শ্রীপতি। না জ্যাঠামশাই, আপনিই ওকে বারণ কোরে দিন। আমার কাছে আসবার কোনো দরকার নেই। তাতে আমার অনিষ্ট আছে—

চন্দ্রবাবু। ওকি শ্রীপতি! ও এলো হাসতে হাসতে—তাকে অমন রূঢ় কথায়—

কদম। (সহসা অভাবনীয় আঘাতে, সবিস্ময়ে) না বাবা, দাদাবাবু ঠিকই করেছেন। ভগবান যাদের দুর্দ্দশায় ফেলেছেন, তাদের সাহায্য করা মানুষের উচিত কি!

কদমের চক্ষু জলে ভেসে গেল

চন্দ্রবাবু। (কথা খুঁজে না পেয়ে) কি কাজ ছিলো কদম ? অতো ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলে—

কদম। (চোক মুছতে মুছতে সামলে) নিজের বুদ্ধির দোষে বড় কষ্ট পেয়েছি বাবা—অবস্থার কথা মনে থাকে না ! আগেকার অভ্যাস যায় না—আপনাদের পায়ে পায়ে ঘুরি, দুটো মিষ্টি কথা পেলে বর্ত্তে যাই। আপনারাও ভালবাসেন—'দূর ছাই' করেন না, তাই আবদারও বেড়ে গিয়েছে। নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ে না। দুটো মিষ্টি কথা আর বামুন-বাড়ির দু'মুঠো অন্ন ছাড়া আর তো কিছুই চাই না বাবা ! বউদি সে দুই-ই আমাকে দেন - নিজের বোনের মতো দেখেন। যতটুকু পারি তাঁর কাজ করবার চেষ্টা পাই। অনেক দেখলুম, অমন মেয়ে দেখিনি বাবা। তাঁর যে এ-দশা ঘটেছে, সেটা ভগবানের পরীক্ষা বলেই মনে হয়। (মুখে হাসি এনে) কি সব বলে' চলেছি—মনের ঠিক্ নেই ! হ্যাঁ—উকীল দাদা আজ আমাকে শুধু চেতিয়ে দেন্ নি, শিউরে দিয়েছেন ! আমি তাঁর কাছে দরকারে এলে—তাঁর অনিষ্ট আছে ! সর্ব্বনাশ !

চন্দ্রবাবু। না, না, কদম—ও কি সত্যই তা মনে করে !

শ্রীপতি। (দৃঢ়ভাবে) হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, আমি আজ থেকে সত্যই তা করি—

চন্দ্রবাবু। সত্য হলেও, এমন রূঢ় কথা কদমের মুখের উপর তুমি বলো কি কোরে ?

কদম। আপনারা দয়া কোরে ভালোবাসায় দিন্ দিন্ আমার স্পর্দ্ধা সত্যিই বেড়ে যাচ্ছিলো। ভাবিনি যে আমি ঝি-চাকর বই আর কিছুই নই ! দাদাবাবু, আমার উপকারই করলেন—

চন্দ্রবাবু। না না, তোমাকে কোনোদিন কেউ—ঝি-চাকর ভাবে নি—ভাবতে পারে না। তোমাকে আমি মেয়ের মতো দেখি। যাক্ ও-সব কথা। শ্রীপতির মনটা আজ নানা কারণে ক্ষুব্ধ অশান্ত রয়েছে। ও-কথা তুমি ভেব না কদম—হ্যাঁ কি কাজ ছিল বললে না ?

কদম। (চোখ মুছে) সে কাজ আমার মিটে গিয়েছে বাবা, আর দরকার হবে না। বউদির ব্রত আছে, এক জোড়া ধুতির দরকার—তাই…। এখন আমিই তা কিনে আনতে পারবো। আমার আবার লজ্জা সরম কি ! কথাটা ভুলে গিয়েই তো—

চন্দ্রবাবু। (সে কথায় কান না দিয়ে)—টাকা এনেছো—দাও। (কদমের অনিচ্ছা দেখে)—না, আমি কোনো কথা শুনব না—দাও…(হাত পাতলেন)

কদমের জিদ্ রইল না ; চন্দ্রবাবুর হাতে দুটি টাকা দিতে হোলো

শ্রীপতি। দিন্—আপনি কোথায় যাবেন ! আমার রাস্তাই ওই—

কদম চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল

চন্দ্রবাবু। নাও—আমি তোমাকেই দিতুম—

শ্রীপতির হাতে টাকা দিলেন

দেরি হয়ে' গেল'—প্রভুর দেখা পেলে হয়। জপে না বসে' পড়েন—

দ্রুত রমণ মিত্রের বাড়ির দিকে চললেন

শ্রীপতি। (অবাক হয়ে' তাঁর দিকে চেয়ে) আশ্চর্য্য লোক ! ডুবতে আর বিলম্ব নেই দেখছি। একেবারে গ্রহের গ্রাসে গিয়ে পড়েছেন ! জমিদার বংশে এমন সাদাসিদে আত্মভোলা উদার লোক, কোথা থেকে এসে যে জন্মেছিলেন—ভেবে পাই না। ধর্ম্মের আবরণে কাকাবাবু ওঁকে মন্ত্রমুগ্ধ কোরে রেখেছেন ! ভগবান ওঁকে রক্ষা করুন।

এখন আমিই বা করি কি (চিন্তা)—নন্দকে জানানো তো দরকার ! সে কি বলে শুনি—তার পর…

চলে গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ব্রজ লাহিড়ীর বাড়ী

সময়—বৈকাল

উপস্থিত—বাড়ীর দ্বার বন্ধ

বন্ধদ্বারে চন্দ্র চৌধুরী মশাই

চন্দ্রবাবু। কদম, কদম ! বাড়ী আছো কি ?

কদম। কে গা ?

চন্দ্রবাবু। আমি গো—একবার দোরটা খোলো—

কদম। তুমি কে গা—কি দরকার ?

বলিতে বলিতে ভিতর হইতে দ্বারোদ্ঘাটন। চৌধুরী মশাইকে দেখিয়া সলজ্জে মাথার কাপড় টানা

কদম। চৌধুরী মশাই আপনি ! মাপ করবেন, আমি বুঝতে পারিনি—

পদধূলি গ্রহণ

চন্দ্রবাবু। তুমি তো ঠিকই করেছ কদম। বাড়িতে তো পুরুষ কেউ নেই—ডাকলেই তো যাকে তাকে দোর খুলে দিতে পার না। তোমাকে অবলম্বন করেই বউমা রয়েছেন—সাবধান হওয়াই তো উচিত—

কদম। বউদিকে কিছু বলবেন কি? তিনি এই দোরের পাশেই আছেন—

চন্দ্রবাবু। না—বিশেষ কিছু নয় মা; এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলুম, একবার খবরটা নেবার জন্যেই ডাকলুম। নেওয়া তো দুবেলাই উচিত—পেরে উঠিনা মা—মনে সর্ব্বদাই থাকে। বলাই তো আছে—যখনি কিছু দরকার পড়বে বা কিছু বলবার থাকবে—আমাকে জানাতে সঙ্কোচ কোরো না। ব্রজ চলে' গেছে—আমার আপন ভাই গিয়েছে। ভগবান যা ভালো বুঝেছেন—করেছেন! তার উপর তো মানুষের কোনো হাত নেই মা। এখন মানুষে যেটুকু পারে, তা যেন করতে পারি। যাক্—দিন তো কাটাতেই হবে মা, সেটা শ্রীহরির নাম, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সেবা, এই সব নিয়েই থাকবার চেষ্টা কোরো। পরকালটাই মা হিঁদুর প্রধান লক্ষ্যের জিনিষ। গ্রামে কিছুই ছিল না, এখন শ্রীভক্তিভূষণের কৃপায় তার উপায়ও দিন দিন হচ্ছে···

কদম। আজ আবার একখানা ছাপানো কাগজ দিয়ে গেলো—সিদ্ধি-সভায় সংকীর্ত্তন, আরো কি সব আছে। সেখানে কি মেয়েরাও যেতে পারবে বাবা! কই কাগজ বিলি করতে তো কখনো দেখিনি···

চন্দ্রবাবু। শ্রীহরির কৃপায় দিন দিন উন্নতিই দেখবে। ওই সম্বন্ধেই তো বলে' যাবো ভেবেছিলুম। মেয়েরা থাকেন বই কি। আমাদের বড় ভাগ্য যে শ্রীভক্তিভূষণকে পেয়েছি! উনি যে ভিতরে ভিতরে এতটা বেড়ে গেছেন—কেউ বুঝতে পারিনি মা। হঠাৎ কাল যে ভাব তাঁর দেখলুম···

কদম। কার কথা বলছেন বাবা?

চন্দ্রবাবু। (বাধা দিয়ে) মন দিয়ে শোনো—আপনিই বুঝবে। তারপর শুনলুম—বউমার ওই বাগান বাড়ি বিক্রির চেষ্টায় ক'দিন—কোথায় ভদ্রেশ্বর, বরাকর, কোথায় কোতোলপুর অনবরত ঘুরেছেন। বলেন—ভার নেওয়ার চেয়ে বড় দায়িত্ব আর নেই—কথা দেওয়া কি-না—শব্দ যে ব্রহ্ম! ফেরবার সময়—কলকেতায় এক ব্যারিষ্টার শিষ্যের বাড়ী রাত কাটান। কলকেতায় যে ওঁর এত সব বড় বড় শিষ্য আছেন, সে কথা কোনোদিন মুখে আনেননি। কি ত্যাগ, কি আত্মগোপন!

কদম হাত জোড় কোরে মাথায় ঠেকালে

চন্দ্রবাবু। তারপর শোনো—সেই ব্যারিষ্টারের স্ত্রী আর মেয়ে কীর্ত্তন গান করেন। শ্রীভক্তিভূষণ—ভাব চাপতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন—

কদম। ওমা কি হবে গো।

চন্দ্রবাবু। বড়লোক ভয় পেয়ে ডাক্তার ডাকেন। সেই অবস্থায় প্রভু নানা আশ্চর্য্য কথা ক'ন্। সবই যেন কোনো অদৃশ্য পুরুষের সঙ্গে কথা—"আমায় কেনো এ ভার দিলে—আমি তাদের কি বলবো—কে বিশ্বাস করবে—সবাই যে মর্ত্তের ময়লা মাখা···"

কদম। গা যে শিউরে ওঠে গো!

চন্দ্রবাবু। শিউরোবারই কথা যে! তখনো তাঁর সংজ্ঞা নেই। ডাক্তার ভয় পেয়ে বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় কবিরাজ ও আরো প্রবীণদের আনান। তাঁরা দেখেই তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বলেন—"এ যে সমাধি—তোমরা কি এঁকে চিনতে না! এটা যে এখন ওঁর সমাধি ভঙ্গের অবস্থা। এমনটা হবার পূর্ব্বে ভগবৎপ্রসঙ্গ কিছু হয়েছিল কি?" শুনে সবাই অবাক্।

কদম। হবে না—ব্যাপারখানা কি!

চন্দ্রবাবু। ডাক্তার-কবিরাজকে ভিজিট্ দিতে যাওয়ায়, তাঁরা বলেন—"যা পেয়েছি তা এ জন্মের জন্যে যথেষ্ট। এ রোগের ভিজিট্ মহাপুরুষের পায়ের ধূলো—ভাগ্যে তা মিলেছে।—সেই সব ব্যারিষ্টার, ডাক্তারেরাই তো—এই সভার ব্যয় আর নোটিস্ ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ সব কথা কি চাপা থাকে মা—

কদম। (বউয়ের প্রতি) এখন বুঝলে—আমাদের মিত্তির মশাই—ভক্তিভূষণ···

চন্দ্রবাবু। 'শ্রী' বলতে হয়—শ্রীভক্তিভূষণ। তুমি ঠিকই বুঝেছ কদম। কিন্তু এখানকার লোক এখনো ধারণা করতে পারেনি—দোষ নেই—যেরূপ গোপন সাধন, আমরাই ধরতে পারি নি! যাক্—যার ভাগ্যে আছে

এইবার দিন কিনে নেবে। যেও, বউমাকেও নিয়ে যেও—তার মনটা শান্তি পাবে।

কদম। শুনেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—যাব না আর!

চন্দ্রবাবু। যাবে বই কি, যেও যেও—

কদম। (বিষণ্ণ মুখে) পাপ যে ছাড়ে না বাবা। কবে আবার আপনাকে পাবো - তাই ··

চন্দ্রবাবু। কেনো? কিছু বলবার থাকে—বল না।

কদম। সংসারে জড়িয়ে থাকলে—চাই তো সবই। ওই পাপ বাগান-বাড়িটার কথা···

চন্দ্রবাবু। প্রভু সবে এই ফিরেছেন, একবার মাত্র দেখা। উদাস হয়েই রয়েছেন—বড় আঘাত পেয়েছেন—

কদম। (উৎকণ্ঠার সহিত)—আহা—পড়ে' গিছলেন নাকি? ও অবস্থায় আর একা—

চন্দ্রবাবু। (একটু হাসি টেনে) না রে পাগ্‌লি। ও অবস্থায় যে তিনিই আগ্‌লে বেড়ান—সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তা নয়। বললেন—"চন্দোর, বিষয়ের কথা আর আমাকে শুনিও না—বিষ—বিষ, কান দুটো জ্বোলে যায়!—বউয়ের বাড়ির ভার আমার উপর পড়েছে কেনো—তা জানো? জানলে আমিই কি ওতে মাথা পাততুম!—ওটা রাধারাণীর পরীক্ষা চন্দোর—আর এই অধমের অগ্নিপরীক্ষা! শুনে আশ্চর্য্য হয়ো না—জগতে আশ্চর্য্য কিছু নেই চন্দোর—কিছু নেই। মানুষে সব পারে! যেখানে যাই শুনি—"ওটা না কি ভূতের বাড়ী!" কেউ টেঁকতে পারে না—ব্রজরও তাই সয় নি। তাই নিতে কেউ সাহস পায় না। আজ মনে হয়, জানি না কেনো—বাবা আমাকে ও জমিতে খেলতে যেতে বারণ করতেন। অন্য কারণও থাকতে পারে। আমার মনে হয়—এ সব মন্দ লোকের কাজ—শিরোমণির পুকুর-সংলগ্ন কি না—বুঝতে পারছো? কিন্তু আমিও দেখবো—কে কি করতে পারে! রাধারাণীকে দিন রাত জানাচ্ছি—আমি ও-বাড়ী শোধন কোরে দেখিয়ে দেবো! যখন ভারই পড়েছে—কারো দুরভিসন্ধি খাটবে না।" এর বেশী আর ভাংলেন না—

কদম। (চিন্তামাখা মুখে) তবে কি হবে বাবা!

চন্দ্রবাবু। উনি যখন হাতে নিয়েছেন, জেদ্‌ও পড়েছে,—তখন তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। যার তার হাতে পড়ে নি কদম। এখনো আত্ম-প্রকাশ করেন নি—তাই! বউমা যেন উতলা না হন্। উনি যেমন যেমন বলেন—কোরে যাওয়া চাই। না হয় দু দিন দেরিই হ'বে—বুঝলে?—

কদম। বউদি বলছেন—আপনি ছাড়া ওঁর আর কেউ নেই—

চন্দ্রবাবু। আমাকে কিছু বলতে হবে না মা। আমি ওর উপায়—ওঁকে দিয়েই করাবো। (এক পা এগিয়ে, নিম্ন কণ্ঠে) কারুকে বোলো না কদম—রাধারাণী ওঁর হাত-ধরা, এ আমি বিশেষ জানি।—আচ্ছা মা, এখন আমি চললুম।

কদম। বউদি প্রণাম করছেন।

চন্দ্রবাবু। ধর্ম্মে মতি হোক্—শান্তি পান্—

চলে গেলেন

অপর্ণা। (বেরিয়ে এসে, বিমর্ষ মুখে)—এ সব কি শুনছি কদম!

কদম। ভেব না—ও সব ভক্তদের লীলা আস্বাদন ··

অপর্ণা। লীলা কি বল্!

কদম। ওই ভূতের কথা গো! সত্যি তো আর ছিল না···

অপর্ণা। (ক্ষোভে-দুঃখে) কিছু খোঁজ খবর না নিয়ে, সাত্ তাড়াতাড়ি বাড়ী কোরে—আমার একি দশা কোরে গেলেন! (চোখে আঁচল দিলেন)—নিত্তিব মশাই নিজেই তো বললেন—ওঁর বাপও ওঁকে ওদিকে যেতে মানা করতেন।

কদম। আমার বিশ্বাস হয় না।

অপর্ণা। সাধু দেবতার কথায় বিশ্বাস হয় না কি বল্! তোর তবে বিশ্বাস হয় কা'কে?

কদম। কাকেও হয় না।

অপর্ণা। ওমা—অমন কথা বলিস নি কদম! কা'কেও বিশ্বাস না কোরে কি মানুষ থাকতে পারে? করতেই হয়। তা—এখন সে কিছু বুঝতে পারলুম না···

কদম। নাই বা বুঝলে? ওতে বোঝবার আর বড় কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চৌধুরী মশাই—সাধুবাক্যই শুনিয়ে গেছেন।—বাকিটা সভায় গিয়ে শুনে আসবার নেমন্তন্ন কোরে গেলেন।

অপর্ণা। আগে থেকে মনটাকে অতো ময়লা কোরে রাখিস নি কদম। যাঁকে সকলে ভক্তি করছেন ··

কদম। (হাসি টেনে)—আর বলতে হবে না গো। এই ময়লা কাচতে চললুম। বাপরে—তোমার যে একটু ময়লা সয় না!

আনলা থেকে কাপড় গামছা নিয়ে বেরিয়ে গেলো

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মধু মোদকের দোকান

সময়—বেলা ১০টা

উপস্থিত—মধু মোদক

হারান ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

হারু। আজ তোমার সুপ্রভাত মধু। তাতে আজ একাদশী তিথৌ—ফলং রাশি রাশি—

মধু দোকান ছেড়ে উঠে এসে মেরুদণ্ড বক্র করে প্রণাম

আশীর্ব্বাদ করি, এখন তোমার প্রভাতগুলো সব সুপ্রভাত হয়ে দেখা দিক্। ব্রহ্ম বাক্য—দেবেও তাই, নিশ্চিন্ত থাকো···

মধু। আপনার শ্রীমুখে ফুল চন্নন পড়ুক্। এক ঘর কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারচি না দেবতা—

হারু। কোনো চিন্তা নেই—ব্রহ্ম বাক্য, দেখে নিও। সন্দেহ রেখ না মধু। তোমার ছেলেপুলে কয়টিই বা!

মধু। সে কি ঠাকুর মশাই! এর চেয়ে বেশি হলে যে দেশে মন্বন্তর হবে! এখন সেটা বাড়িতেই ভোগ করছি!

হারু। ওকি বলতে আছে মধু, মা-ষষ্ঠীর কৃপা। কতগুলি শুনি?

মধু। গণ্ডা হিসেবেই বলতে হয়—পউনে তিন পুরবে এই বোশেকে। আহা মাগী আর বাঁচে না দেবতা—তার শরীল আর বয়না ঠাকুর। কতো করে, তার কতো সাধের ঘর বানালুম—দু'দিন পা-মেলে, শুতে পেলে না;—আঁতুড়েই তার কাট্‌ছে! (দীর্ঘনিশ্বাস) গঙ্গা পিসি বলে,—"ওকে দু'বচর ওর বাপের বাড়ী থাক্‌তে দাও!" শুনলেন জ্ঞেতের কথা? দেবতা-বামুনে বিশ্বেস থাকলে আর ও-কথা কয়! সবই তো তাঁদের ইচ্ছেয়—তাঁদের কৃপায় হয়।

হারু। ও-সব নাস্তিকদের কথায় কান দিও না—কান দিও না।

মধু। বলুন তো দেবতা! (চিন্তিত ভাবে) কিন্তু এদিকে যে আওলাদ্ অগুন্তি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে······

হারু। না না, ও কথা মুখে এনো না, দ্বিধা রেখ না, যে আসে সে ভাগ্য সঙ্গে করে' আসে। ওদিকে যেমন বিশ্বাস রেখেছো—এদিকেও রেখো। দেখলে না, আমার ভূতোও ভূমিষ্ঠ হল, সিদ্ধি সভাও উত্তিষ্ঠ হ'ল—আবার ঘেঁচিও জন্মেছে প্রভুও পেকে উঠেছেন। এতদিন ভেতরে ভেতরে সব গোপনই ছিলো···

মধু। কার কথা বলছেন?

হারু। গ্রামে আর প্রভু-পদবাচ্য কে আছে? যাঁকে মিত্তির মশাই বলতে গো—সিদ্ধি সভার মাথা-মস্তক—মুণ্ড হে—মুণ্ড—

মধু। তাঁর এমন কি হল ঠাকুর—পিষ্টব্রণ? আহা ভেতরে ভেতরে পেকে উঠেছে—কেউ নজর করেনি? আমারও বাকি সাড়ে পাচ টাকা, যায় যাক্‌গে তিনি বেঁচে উঠুন। নন্দবাবু ডাক্তার হোলো—আহা দেখে যান······.

হারু। কি পাগলের মতো বোক্‌চো? কণ্ঠি রাখো আর এত বড় ভীষণ খবরটা রাখ না। প্রভু সিদ্ধি সভা নিয়েই মেতে থাকেন—সবাই এই-ই জানতো! কাউকে ধরা দেন নি। ভেতরে মহা সমুদ্রের ঢেউ খেল্‌ছিলো—চাপাচাপি হ'লে, ওপ্‌চাবেই, কে রুকবে? আগে আগে ভর হোতো বটে—সেটা যে সমাধির গোড়া-পত্তন তা কি করে বুঝবো। ও বস্তু সেই কুম্ভকর্ণাদির পর আর তো কেউ দেখেনি। কিন্তু কলকেতা রাজধানী বটে, ইঙ্গিতে সব বুঝে নেয়। একদিন মাত্র ছিলেন, ধরে' ফেলেছে! সে তো তোমার হাবাতে অভিরামপুর নয়! তারা গুণের আদর জানে। কাগজ ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সিদ্ধি সভায় জাঁকালো উৎসব। তুমি কাগজ পাওনি?

মধু। (অপরাধীর মত) তরফ্‌দার মশাই কি একখানা দিয়েছিলেন—তখন তেল মাখচি। মেয়েটা তাতে সন্দেশ মুড়ে কাকে দিয়ে ফেলেছে······

হারু। আ-হতভাগ্য।—যাক্ প্রভু কিন্তু তোমাকে ভোলেন নি। বললেন্—"মধুকে বলে এসো, বৃহস্পতিবার সে যেন—সন্দেশ সওয়া পনের' সের, আর বাতাশা সওয়া পনের' সের বৈকালেই সিদ্ধি সভায় দিয়ে যায়।" কই

পেল্লাদের নাম করলেন না তো! যাক্, চন্দোর বাবু হাজার হোক্ বিজ্ঞ সমজদার লোক, প্রভুর সমাধি-অংশ কিছু কিছু দেখে ফেলেছেন আর চাপতে পারছেন না—এইবার সকল ভাগ্যবানেই দেখবে। এ সুযোগ খুইও না মধু, যেও, ভাগ্যে থাকে……

মধু। একি ছাড়তে পারি ঠাকুর, ভাগ্যে আপনি দয়া করে' পায়ের ধুলো দিলেন—তাই না শুনতে পেলুম। আর ও-সব কতো কতো বললেন?

হারু। (সহাস্যে) তুমি তন্ময় হয়ে গেছ দেখছি—হবারই কথা। হ্যাঁ, সন্দেশ সওয়া পনেরো সের, আর বাতাসা সওয়া পনেরো সের। এখন ফি হপ্তা বাড়তেই যাবে। লোক এই ভেঙ্গে পড়ে দেখো না।

মধু। আপনি আমার অবস্থা সবই জানেন তো, কিছু

হারু। আহা, তোমাকে বলতে হবে কেনো, আমি আর কি না জানি। তবে এটা এই বোধন, আজ আর ও-কথা মুখে এনো না। লিখে রাখো, লেখার কড়ি বাঘে খায় না, জান তো।

মধু। আজ্ঞে, আমায় যে বাঘেও ছাড়েনি দেবতা। যাক্ গে—আচ্ছা, সৈরব কি দেখতে পারে না দেবতা? (নিম্নকণ্ঠে) পোড়া কপালীর ওই ওটা আছে কি না… গর্ভ যে—

হারু। থাকলেই বা—তাতে কি হয়েছে? বারো মেসে জিনিষে পাপ নেই—কেনো পারবে না? হুঁঃ, কলিতে কার ভাগ্যে এ সৌভাগ্য ঘটে! তোমায় কি বোঝাবো—শাস্ত্র যে দেখনি। আরে শকুন্তলাও যে ওই নিয়ে রাজসভা পর্য্যন্ত দেখেছিলো। এ পারবে না? কত দিন হোলো?

মধু। এই তিন কব্‌লাচ্ছে।

হারু। বেশ পারবে, খুব পারবে, ও-তো কিছুই নয়, ডাক্তার রায় বোলেন—পঞ্চমে গর্ভ—ও এখন গর্ভাঙ্ক মাত্র। সাহিত্যিকরা দৃশ্য বলেন। তবে ভক্তি থাকা চাই।

মধু। তা খুব আছে ঠাকুর। কিছুতেই অভক্তি নেই—ষষ্ঠীতলা-মনসাতলা, ইস্তোক আমার পাদোদক, পাকুই ধরিয়ে দিলে! আহা কবে মরবে, সমাধিটে দেখে রাখুক। আর তো কিছুই হ'ল না।

দীর্ঘনিশ্বাস

হারু। ভক্তি থাকলেই হোলো।—তবে আর চিন্তা কি? সন্দেশ আর বাতাসার সঙ্গে সৌরবকেও নিয়ে যেও। আমি আছি, শাস্ত্র তো আমার কাছে হে, ভয় কি? এখন চল্লুম—মনে থাকবে তো—কাল বৈকালে।

মধু। আজ্ঞে তা কি আর ভুলি—

প্রণাম

হারু ভট্‌চাযের প্রস্থান

ক্রমশঃ

রাগিণীর পথে

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা

অস্তরাঙা পশ্চিমের কুহেলি-আলোয়
কোথা হতে ভেসে আসে বলাকার হিয়া!
দিগন্ত আঁধারে হারা—নিশার নিলয়,
তবু একি শুভ্ররাগ উঠিল ছন্দিয়া!

এখনো কাঁপেনি নীল পাখার ঝঙ্কারে,
উৎসারিয়া ওঠে নাই স্বপ্নভোলা গান:
সন্ধ্যার অঞ্চলসুপ্ত হীরকের তারে
শিহরে…শিহরে তবু হংস-অভিযান!

ওই বুঝি ছিন্ন হ'ল নীহার-গুণ্ঠন—
সারি সারি স্ফটিকের প্রসূন-আরতি
জপিতেছে উর্দ্ধমুখে অকূল গগন।
অনুসরি' সেই শ্বেত-দীপালি-প্রণতি
তমসা যে ভেসে গেল ছন্দময় স্রোতে…
সুর যথা ছুটে যায় রাগিণীর পথে!

বঙ্কিম সাহিত্যে প্রেম

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর

আমি যে বিষয়টি নির্ব্বাচন করেছি সে-টা সকলের পক্ষে উপযোগী হবে কি না সে সন্দেহ যে আমার মনে নেই, তা নয়। তবুও আমি প্রেমের কথা লিখ্‌বো বলে' সংকল্প করেছি। তার কারণ এ নয় যে আমি গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় পরাঙ্মুখ, কারণ এই যে যদি কোথাও থাকে তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগীদের কাছে প্রেমের কিছু মূল্য থাক্‌লেও থাকতে পারে। আমাদের জগৎ এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে যে মূল্যের বাজারে আগুন লেগে গেছে। যাঁরা 'জগৎ' নামটি উদ্‌ভাবন করেছিলেন, তাঁদের মস্তিষ্কের তারিফ করতে হয়। 'গতিশীল' বলেই তাঁরা আমাদের এই অচলপ্রতিষ্ঠ পৃথিবীর নাম দিয়েছিলেন জগৎ। এখনকার দিনে পৃথিবী যেন অস্থির হয়ে উঠেছে, চারিদিকেই 'মূল্য' টলমল করে উঠ্‌ছে। এই ক্ষিপ্ত জগতে বাস করে' মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমাদের মস্তিষ্ক স্থির আছে ত? 'প্রেমের' মূল্য আগে যা ছিল, এখন যে আর তা নেই, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। পাতিব্রত্য, সতীত্ব, লজ্জাশীলতা, কৌলীন্য এ সব কথার সাবেক অর্থ আর নেই। Value বদলে গেছে বর্ত্তমান সমাজে। সেদিন দেখেছি একজন বলেছেন যে রামায়ণে পিতার আদেশে রামের বনগমন উচিত হয় নি। বাপ বড় জোর বাপ হ'তে পারেন; কিন্তু তার কথায় বনে যেতে হবে, রাজ্য সিংহাসন সব ত্যাগ করে'—এর কি মানে আছে? সমালোচক হয়ত ঠিক কথাই বলেছেন, কিন্তু তাঁর মতে একটু গোল হতো এই যে রাম বনে না গেলে রামায়ণ হতো না।

কিন্তু প্রেমের মূল্য যতই কম হয়ে থাক, মাঝে মাঝে এর সাবেক কদরটুকু এই বিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যুচ্চমকের মত ঝল্‌কে ওঠে এবং তখন তার দিকে এই অবিশ্বাসী জগৎ প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত চেয়ে থাকে অকূল বিস্ময়ে। আমাদের ভূতপূর্ব সম্রাট্ যখন প্রেমের জন্য সাম্রাজ্য, উচ্চ রাজসিংহাসন ত্যাগ করে' অজ্ঞাতবাস বরণ করে নিলেন, তখন অর্দ্ধজগৎ ভাব্‌লে 'কী বোকা'! কূটবুদ্ধি বল্‌ডউইনের বিরলকেশ মস্তকে জাগতিক মূল্যের বোঝা গিস্‌গিস্ করছিল; তিনি বল্‌লেন, প্রেম এবং সিংহাসনের মধ্যে একটিকে ছাড়তে হবে, এ-ই রাজনীতি, রাজার নীতি, সাম্রাজ্যের নীতি। মন্ত্রী ভাবলেন, আমার মন্ত্রণা অব্যর্থ, সূর্য্যাস্ত-বিরহিত সাম্রাজ্য—আর সামান্যা রমণীর প্রেম—ছিঃ। তুলনা হয় না। রাজাধিরাজ! বেছে নাও, একদিকে সব, অন্যদিকে তোমার প্রেম। বিদ্রূপের হাসি মুখে মাখিয়ে তিনি যখন ১০ নম্বর ডাউনিং ষ্ট্রীটে ফিরে এলেন—আমি কল্পনায় সে চিত্র আঁকতে পারি, তখন তিনি ভাবলেন, half a second and the boy will come to his senses. কিন্তু সম্ভবতঃ আধ সেকেণ্ডও তাঁর লাগে নি। তিনি প্রেমকেই গ্রহণ করলেন, তাঁর নতুন করে' রাজ্যাভিষেক হলো। ছিলেন তিনি আপনার রাজ্যে আপনি বন্দী সম্রাট্, আর হলেন প্রেমিকের স্বর্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র। অগণিত সম্রাট্, শাহানশাহা বাদশাহ, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে, কিন্তু হে প্রেমিক সম্রাট! তোমার কথা জগৎ সহজে ভুলবে না। সম্রাট্ নেপোলিয়ন রাজনীতির হাঁড়িকাঠে যখন জোসেফাইনকে বলি দিলেন, তাঁর উচ্চাশার অগ্নিশিখা যখন সেই অভাগিনীকে ভস্মীভূত করতে উদ্যত হলো, তখন জগৎ ত তার প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠে নি। কাজেই যেমন বলেছি যে, এই আত্ম-প্রতারিত জগতের সব মূল্যই যে খাঁটি মূল্য একথা কোন মতে বলা চলে না। আমরা যাকে অগ্রাহ্য করবো বলে মনে মনে কোমর বেঁধেছি, সে যে আবার কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে আমাদের মনকে বেঁধে ফেলেছে, সে কথাটি আমরা সব সময়ে খেয়াল করে' দেখি না। প্রেমকে আমরা ত্যাগ করলেও, প্রেম আমাদের সহসা ত্যাগ করে না।

তাই প্রেমের কথা বলবার দরকার আছে। বিশ্বের কানে কানে যে কথাটি বলা যায়, তা মর্ম্মে গিয়ে প্রবেশ করতে পারে। যুদ্ধের জয়ঢাক, তুরীভেরী-নিনাদও মনের মধ্যে এমন করে' বিঁধে থাকে না। সুতরাং বিশ্বের ভোজে প্রেমকে অপাংক্তেয় করতে গেলে, আমাদেরই হয়ত

অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে' থাকতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা কাব্য-পরিচয়ের ভূমিকায় বলেছেন যে, তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে প্রেমের বা আদিরসের কবিতা বাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "মানুষের যে প্রবৃত্তি সহজেই অত্যন্ত প্রবল, পাঠকের মন অল্পেই তাতে সাড়া দেয়, তাকে স্বাদু করে তুলতে অধিক নৈপুণ্যের দরকার হয় না। এই কারণেই গৃহিণীর রন্ধন-বিদ্যায় যথার্থ গুণপনা প্রকাশ পায় তাঁর নিরামিষ রান্নায়।" কিন্তু কথা এই, বাংলা দেশের কোনও ভোজে যদি কবি যেতেন, তা হলে দেখতে পেতেন নিরামিষ রান্না গৃহিণীর গুণপনা নিয়ে পাতার অনাদৃত কোণে আশ্রয় নিয়েছে। নিরামিষের খদ্দের দু'দশজন—কিম্বা তাও নয়; যখন সেই বড়িবাটীর সুলভ ব্যঞ্জন আস্বাদন করে' গৃহিণীর গুণপনার তারিফ করছেন, তখন শত শত নিমন্ত্রিতের আমিষতর্পণে গৃহস্থ তাঁর আয়োজনের অল্পতার দিকে ব্যাকুলভাবে দৃষ্টিপাত করছেন। বিশ্বভোজেও মানুষ যা খোঁজে, তাই তাকে দিতেই হবে। না দিলে সে ভোজে বহুপংক্তি শূন্য পড়ে থাকবে এবং গৃহস্থকে মৌন ধিক্কার দেবে।

কিন্তু আদিরসকে বর্জন করতে হবে কেন? প্রেমের মধুচক্র কি হঠাৎ মধুশূন্য হয়েছে? মানুষের হৃদয় কি একদিনে হঠাৎ নীরস শুষ্ক কাঠকঠিন হয়ে গেছে? হায় রবীন্দ্রনাথ! এতদিন যে গান শুনিয়ে বাঙ্গালীকে, বিশ্বকে মুগ্ধ করে রেখেছ, যে গীতে আজও সহস্র সহস্র নরনারী মুগ্ধ, বিভ্রান্ত, উচ্চকিত, সেই গীত ভুললে? যে প্রেম তোমাকে বিশ্ববরেণ্য করেছে, আজ তাকে তুমি অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করলে? করলে বটে, কিন্তু তাতে প্রেমের কিছুই এসে যাবে না, তোমার কাব্যপরিচয় Pisaর সৌধের ন্যায় চিরদিন কাৎ হ'য়ে থাকবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যা-ই বলুন তিনি প্রেমিক। দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই, তাঁর শত শত গল্প, কবিতায় ও গানে প্রেমের ছবি ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁরই পূর্ব্বগামী। তিনিও প্রেমের বিজয়বার্ত্তা বহন করেছেন, তাঁর সাহিত্য ও উপন্যাসে। উভয়েরই পরিচয় প্রেমে, উভয়েরই কল্পনার উৎকর্ষ প্রেম-চিত্রে। প্রেম বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের থাকে সম্ভবতঃ কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত এবং বিশ্ব-পরিচয় এবং বঙ্কিমের থাকে গীতাভাষ্য ও সমালোচনা। বিশ্ব-পরিচয়ের রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভুলতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের গীতাপাঠ নিষ্প্রয়োজন মনে করতে পারি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুমিত্রা, চিত্রাঙ্গদা ও বিনোদিনী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা, ভ্রমর বা প্রতাপকে আমরা সহজে ভুলতে পারব না।

কালিদাস থেকে আরম্ভ করে', নানা কবি, নানা ভাবুক প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন ছবি এঁকেছেন। অনুকরণ মানসিক দৈন্যের লক্ষণ। যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা অনুকরণ করেন না। তাঁদের ছবি নানা রঙের বিচিত্র সমাবেশে অভিনব হয়ে ওঠে। আমরা তাই দেখে পুলকে আত্মহারা হই, সৃষ্টির বৈচিত্র্যে গৌরব অনুভব করি। বৈষ্ণব কবির অনবদ্যসৃষ্টি শ্রীরাধা শকুন্তলার ন্যায় পতি কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হয়ে' প্রেমের পবিত্র স্বর্গে প্রয়াণ করেন নাই, তিনি এই মাটির জগতেই দিনের পর দিন গণিয়া মাস এবং মাসের পর মাস গণিয়া বর্ষ অতিবাহিত করেছিলেন দুরন্ত বিরহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রেমচিত্র আয়েষা। আয়েষা জগতে অতুলনীয়া। এই মহীয়সী মুসলমান রমণীর চরিত্র-চিত্রণে বঙ্কিম যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের তুলি ধরেছেন, তাতে কেউ বল্‌তে পারে না যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে মুসলমান ধর্ম্ম বা সমাজের প্রতি বিদ্বেষভাব ছিল। আয়েষার প্রেম আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। এইখানে তুলির দুই একটি টানে তিনি যে ছবিটি এঁকেছেন, তার মূল্য দিতে কেউ কৃপণতা করবে না। প্রেমের গতি কুটীল। অহেরিব গতি প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটীলা ভবেৎ। আলঙ্কারিক এই ইঙ্গিত করে' দেখিয়েছেন যে প্রেমের চিত্র-সম্ভাবনা অফুরন্ত। অশোক বনে সীতা প্রেমের একটি দিক, আবার বীররমণী প্রমীলা প্রেমের অন্যদিক্। পতিবিরহিণী বনবাসিনী সীতা, আর মৃতপতির অনুগামিনী শ্মশান-বিলাসিনী প্রমীলা—দুইটি চিত্রই আমাদের মন মুগ্ধ করে। আয়েষার প্রেম বিশুদ্ধ হয়েছে আত্মত্যাগের হোমাগ্নিতে। প্রেম সুরের পর্দার মত মানুষের হৃদয়কে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে নিয়ে যায়। লক্ষ্য করলে আমাদের জীবনে এর সব ক'টি পর্দার সুরসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যায়। সুর যেমন সর্ব্বোচ্চ স্তরে গিয়ে অনন্তের মধ্যে আপনাকে আপনি হারিয়ে ফেলে—সেখানে গায়ক থাকে না, শ্রোতা থাকে না, থাকে শুধু সুরের লহরী। গায়ক সেই সুরের নিবিড় অনুভূতিতে আপনার

সত্তা ভুলে যায়, শ্রোতাও সেই সুরের মধ্যে আপনার মনকে গলিয়ে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়, তেমনি উচ্চতম কোটীতে প্রণয়ীর সত্তা থাকে না, প্রণয়িণীর কথা মনে থাকে না, জেগে থাকে শুধু প্রেম।

না সো রমণ, না হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জনি।—রায় রামানন্দ

প্রেম যেন দু'জনের মন পিশে মিলিয়ে দিয়েছেন। পৃথক সত্তা কারও নেই। প্রেমিকা তখন ধন্য হয়ে বলতে পারেন

হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।—গোবিন্দ দাস

আমার হৃদয়দেবতা আমার হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে চিরস্থির হয়ে' ঘুমাচ্চেন, আমিও সেই আনন্দে বিবশা, তন্ময়ী। জেগে আছে শুধু প্রেম—প্রেমই পাহারা দিচ্চে—কেউ যে আমার প্রাণবন্ধুকে চুরি করবে তার সাধ্য কি?

আয়েষা জগৎসিংহকে লিখ্ছেন, "আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নহি। আমি যাহা দিবার তাহা দিয়াছি; তোমার নিকটে প্রতিদান কিছুই চাহি না। আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী……।" এই বঙ্কিমের প্রেমের নিখুঁত ছবি। আয়েষা প্রতিদান চায় না, সে দেখ্তেও চায় না। কারণ দেখ্তে গেলে দেখা দিতে হয়। কিন্তু কি জানি কি হয়! 'রমণী হৃদয় যেরূপ দুর্দমনীয়, তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত'। অর্থাৎ সে তার চোখের পিপাসাকে গলা টিপে রুদ্ধ করতে চায়, কেননা তার হৃদয়কে যে বিশ্বাস নাই। তিলোত্তমার বিবাহ হয়ে' গেল জগৎসিংহের সঙ্গে। সেই রাত্রিতেই আয়েষা তিলোত্তমাকে বলল, 'তোমার সাররত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।' 'তোমার সাররত্ন' বলিতে আয়েষার কণ্ঠরুদ্ধ হ'ল। এযে আমার সাররত্ন, আমার প্রাণারাম, আমারই আরাধ্য ধন। তোমাকে দিলাম। এ রত্নের অমর্য্যাদা ক'র না। এই রকম যখন মনের ভাব, মনের মধ্যে প্রেম-সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তখন চোখের জল কি বারণ মানে? দরদরিত ধারায় আয়েষার নয়নবারি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্ল। "তিনি আর তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া দোলারোহণ করিলেন।" তাঁর বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'লো। 'যজ্ঞং সর্বস্বদক্ষিণং' এ যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়। আয়েষার প্রেমযজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়লো।

কালিদাস দেখিয়েছেন তপোবনের স্নিগ্ধশ্যামতরুচ্ছায়ায় যুবকযুবতীর মধ্যে যে স্বাধীন প্রেমসঞ্চার হয়, তার অগ্নি পরীক্ষা হয় অনুতাপে, বিরহে, অবজ্ঞায়। বঙ্কিমও স্বাধীন প্রেমের যবনিকা পাত করলেন বিরহে। তিনি প্রেমের যত চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে, তাতে একটি কথা বিশেষ করে' চোখে পড়ে—সেটি সমস্ত সমাজশৃঙ্খলার মূলভিত্তি। বিবাহিত প্রেম বা দাম্পত্য প্রেমই প্রেমের চরম চরিতার্থতা। কিন্তু তিনি প্রেমের স্বৈরগতিকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি দেখিয়েছেন যে রূপজমোহে যে প্রেমের অভ্যুদয়, তার পরিণাম শুভ নয়। কিন্তু রূপজমোহকে বাদ দিলে মানবিকতাকে অস্বীকার করতে হয়। মানুষ চিরদিনই মানুষ। দুই এক স্থলে যে দেবত্বের আভাস পাওয়া যায়, তাই মানুষের আদর্শ, তাই তার সান্ত্বনা। কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রকে ভালবাসিল। কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে আকাঙ্ক্ষার দুর্দমনীয় বেগ ছিল। কাজেই সে প্রবৃত্তি প্রেমের উচ্চতর কোঠায় পৌঁছুতে পারল না। কমলমণি কুন্দকে জিজ্ঞাসা করলোঃ তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস—না? কুন্দ উত্তর দিল না, কমলমণির বক্ষে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলো। কমলমণি বলিল, "বুঝেছি—মরিয়াছ। মর, তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?" কমলের রমণী-হৃদয় বুঝিল, প্রেমের গ্রাসে পড়লে দুর্বলমতি নারীর নিস্তার নাই। কাজেই তর্ক করা বৃথা। হৃদয়ের বৃত্তি যুক্তির ধার ধারে না। তাই বলিল, মর তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তার ফলাফল চিন্তা করে' কমলমণি বিচলিত হলেন এবং শুধু সেই কথাটি বল্লেন 'সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে'—

হরদেব ঘোষালের মুখ দিয়ে বঙ্কিম যে কথা বলিয়েছেন, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমতত্ত্বের একটি অংশ বলে' গ্রহণ করলে ভুল করা হবে না হয়ত। "মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।……সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে

পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না।... ......প্রেম বুদ্ধিবৃত্তি-মূলক। প্রণয়াস্পদের গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকলগুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং তৎপ্রতি সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। .... গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে, কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এইজন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজমোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দমনীয় হয় যে অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি —ইহা স্থায়ী প্রণয় কিনা—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকাল স্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়।"

হরদেব ঘোষাল হয়ত একটু বেশী বলে' ফেলেছেন। অনেকে হয়ত তাঁর এই বিশ্লেষণ বিনা বিতর্কে গ্রহণ করতে পারবেন না। শ্রীমতী যখন মানে মগ্না, কলহান্তরিতা অবস্থায় কৃষ্ণবিরহে কাতরা—তখন সখীরাও এই কথাই বলেছিলেন !

বিনি গুণ পরখি পরশ-রস-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়বি ইহ রূপ লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা।'—গোবিন্দ দাস।

অভিমানিনী যখন প্রণয় করেছিলে, তখন গুণ পরীক্ষা করে' দেখ নাই। সহজেই রূপ দেখে ভুলে' গেলে। এখন দিনে দিনে তোমার রূপ লাবণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং জীবন সন্দেহস্থল হয়ে দাঁড়াবে।

কথাটি হয়ত ঠিক। কিন্তু আবার দেখ্‌তে হবে, হিসেব করে' পরীক্ষা করে' যুক্তিতর্ক দিয়ে সমঝে বুঝে যে প্রেম হয়, তাকে প্রেম বলা যায় না। তাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, আস্থা—যা ইচ্ছে বল্‌তে পারা যায়; ঠিক প্রেম তাকে বলা চলে না। You cannot make love by an act of Parliament. শুনতে যতই হাসির কথা হোক্‌, এ কথাটির মূলে কিছু সত্য আছে। যুক্তিতর্ক দিয়ে ভালবাসা হয় না। আবার এ কথাও ঠিক যে—যখন প্রেমের প্রথম জোয়ারে যুক্তিতর্কের হালটি ভেঙ্গে গেছে, সাধের তরণী সকাল বেলা ভাস্‌তে ভাস্‌তে অকূলে চলেছে, তখন সে প্রেমতরী ডুবেই মরে। তাকে বাঁচানো কঠিন।

সেইজন্য শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো। সে মরতে মরতে বেঁচে গেল। কিন্তু প্রতাপকে বঙ্কিম মেরে তবে ছাড়লেন। তার প্রেমের মূলে ছিল যুক্তি, কিন্তু সে যুক্তির জন্য মরলো না, মরলো তার প্রেমের জন্য। তার প্রেম ক্ষণিকের মোহ নয়, সে শৈবলিনীকে ভালবেসেছিল সমস্ত প্রাণমন দিয়ে। সংযমের জন্য সে প্রেমের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তার পরে সে দেখলো যে সে বেঁচে থাকলে শৈবলিনী বাঁচে না।..."আমি বাঁচিয়া থাকিলে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরমপ্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম।......আমি থাকিলে শৈবলিনীর চিত্ত কখন না কখনও বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে প্রতাপ মরল তার নিজের জন্য নয়। পাছে শৈবলিনীর চিত্ত-বিভ্রম ঘটে—'কখনও না কখনও বিচলিত' হবার সম্ভাবনা নহে—প্রতাপ জানতো শৈবলিনীর চিত্ত বিচলিত হবেই—তা নইলে মরবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রতাপ নিজেকেও কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিলো? বলা যায় না। প্রেমিক প্রেমিকার প্রত্যেক কথাই তার নগদ মূল্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। হৃদয়ের ভাব কথার পিছনে অনেক সময় উঁকি মারে। আমরা সহজেই বুঝতে পারি প্রতাপ ঠিক উদাসীনের মত কথা বলে নি। তার হৃদয় যে মধুরসে অভিষিক্ত ছিল, তা আমরা তার দুই একটি কথার ভিতর থেকে অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারি। তার মরবার সংকল্পের পশ্চাতে শুধু যে মঙ্গলের হস্ত দেখতে পাই তা নয়। তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। প্রেমের সঙ্গে সংযমের সংগ্রামে সে জয়ী হয়েছে বটে; কিন্তু তার সংশয় ঘুচে নি। কাজেই তার মরা আবশ্যক হয়েছিল। এ মরা philanthropic উদ্দেশ্যে মৃত্যু নয়, পরোপকারের মহৎ উদ্দেশ্যে মৃত্যু নয়। রমানন্দ স্বামীকে প্রতাপ সে কথা ভাল করে'ই বলেছিল। 'আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই বলিয়া মরিলাম।' 'এ জন্মে

এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম।' 'আপনি বলুন আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী।' রমানন্দ স্বামী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন 'তাহা জানি না।' মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ, শাস্ত্র এখানে মূক।' মানুষের সংস্কৃতি ও সাধনার শেষ প্রশ্নের উত্তর এই বই আর কি? গ্রন্থকার বলিলেন "যাও প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও সেখানে ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও।" এইভাবে তিনি প্রশ্নটি চাপা দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের একটি পবিত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমাজের কল্যাণ, ব্যক্তির কল্যাণ, হৃদয়ের প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার মনে প্রেমের কল্পনায় সাহায্য করেছিল—সেই উদ্দেশ্যে যে তিনি লিখেছিলেন তা' নয়। আর সর্বোপরি ছিল তাঁর দেশের সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর, সীমাহীন শ্রদ্ধা। যা আমাদের যুগযুগান্তব্যাপী সংস্কৃতির পরিপন্থী, তাকে প্রশ্রয় না দিয়েও তিনি প্রেমের নানা বিচিত্র কাহিনী শুনিয়ে বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাই ঠানদি দিদিমারা সুতোয় বাঁধা চশমা নাকের ডগায় নামিয়ে পুরাণ পাঠ ত্যাগ করে' তাঁর উপন্যাস পড়েছিলেন। তেমনটি আর কোনও লেখকের ভাগ্যে ঘটে নি।

বিরহ

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

নামিছে সন্ধ্যা ঝরিতেছে জল
ডাকে দে'য়া গুরু গুরু,
আকাশ-কন্যা কাঁদে অবিরল
শ্রাবণ হইল সুরু।
বিরহ ব্যাকুল সজল নয়ান
বাঁধন নাহি যে তার,
ঘনশ্যামরূপ মাতিয়া উঠিছে
নয়নসাগরপার।

গোপনে বালার হৃদয় বিদরি'
দলে গেছে কোন্ রাজ;
কোথায় কে যেন হারায়ে গিয়েছে
ধরিয়া মোহন সাজ।

আজিকে এমন ঘন বারি-পাতে
শীতল সন্ধ্যাকালে,
রাজার কুমার স্মরণে ভাসিয়া
লুকাল অন্তরালে।

মনে হয় তারে দেখেছে কোথায়,
ভুলেছে তাহার নাম;
নয়নে বাদল আজি তাই ঘন
বিরহের পরিণাম।
কে যেন তাহারে করেছে পাগল
এমনি নিবিড় দিনে;
আজি রে সকল অঙ্গ কাঁদিছে
তাহারি সঙ্গ বিনে।

এমনি বিশ্ব ঘনায়ে সেদিন
সেজেছিল দিক সীমা;
এমনি সুদূর নীলিম ধারায়
লভেছে তার মহিমা।

এ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডস্

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নূতন অফিস—বেঙ্গল-গ্লোরি ইনসিওরান্স অফিস।

বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। অনন্ত আসিয়া অবসন্ন-ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তার দু' চোখে হতাশার নিরুপায় দৃষ্টি!

পাশের চেয়ারে বসিয়া নীলাদ্রি খাতা দেখিয়া পলিশির কাগজ লিখিতেছিল; অনন্তর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—হলো কি অনন্ত?

অনন্ত বলিল—হোপ্‌লেশ!··· চৌধুরীর জুলুম।

চৌধুরী এ-অফিসের সেক্রেটারি।

অনন্তর কথায় নাটকের ইঙ্গিত! নীলাদ্রির কৌতূহল জাগিল। নীলাদ্রি কহিল—তার মানে?

অনন্ত বলিল—এক বছরের খাতা পেড়ে রাজ্যের ভাউচারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে আজকের মধ্যে—যত রাত্তিরই হোক্। কাল অডিটর আসবে!

নীলাদ্রি কহিল—কিন্তু ও তো মাণিকের কাজ।

অনন্ত বলিল—তা বললে কি হয়! মাণিক ওঁর বাড়ীতে বিনা-মাইনেয় টুইসনি করে। সন্ধ্যা ছটায় তাকে এ্যাটেণ্ডান্স দিতে হবে; না হলে গিন্নী হবেন অগ্নিশর্ম্মা!

চাপা গলায় চৌধুরীর উদ্দেশে নীলাদ্রি একটা কটু গালির ভাষা উচ্চারণ করিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্ত বলিল—আজ ছ'টায় আমার ইম্‌পর্টাণ্ট এনগেজমেণ্ট্। এক বন্ধুকে নিয়ে সিনেমায় যাবো। কথা একদম্ পাকা। দু' টাকা চার আনা খরচ করে' স'-ছটার শোয়ে দুখানি টিকিট কিনে এনেছি। সীট রিজার্ভ · ঐ নতুন বাঙলা ছবি বেরিয়েছে "মন্দোদরী" ···তা দ্যাখো একবার বিপদ!

অনন্ত আর-একটা নিশ্বাস ফেলিল।

নীলাদ্রি বলিল—টিকিট দুটো চেঞ্জ করিয়ে নিয়ো·· কালকের জন্য।

সখেদে অনন্ত বলিল—তা হবার নয়, বিশ্রী দেখাবে। বন্ধু মানে মহিলা-বন্ধু!

মহিলা-বন্ধু! আবার নাটকের ইঙ্গিত! নীলাদ্রির দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বিস্ফারিত চোখের সে দৃষ্টিতে একসঙ্গে এক হাজার প্রশ্ন ফুটিল।

নীলাদ্রি কহিল—মহিলা-বন্ধু! তার মানে?

অনন্ত কহিল · আমাদের পাড়ায় ছিলেন হরগোবিন্দ-বাবু। বাবার বন্ধু। তিনি মারা গেছেন। বাড়ীতে আছেন হরগোবিন্দবাবুর বিধবা স্ত্রী আর একটিমাত্র মেয়ে নন্দিনী। ···ও বাড়ীতে প্রায় আসি যাই কি না। ওঁদের সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা। নন্দিনী প্রায় বলে, একদিন সিনেমায় নিয়ে চলুন···। তাই আজ টিকিট কিনেছি। বলেছি, স' ছটার শোতে নিশ্চয়। এখন কি যে করি!

অনন্ত যেন অকূল পাথারে পড়িয়াছে! কূলের সন্ধানে যে-দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল—অনন্ত মনে মনে হাসিল; বলিল—তাকে একটা খপর দাও যে, sorry···আপিসে বড্ড কাজ পড়েছে।

অনন্ত কহিল—বিশ্বাস করবে না। ভাববে, পয়সা-খরচের ভয়ে পাশ কাটাচ্ছি।·· নন্দিনীকে তো জানো না! সে ভারী স্পষ্ট কথা কয়···তার কথাগুলো হয় বেজায় কড়া! অর্থাৎ বুঝছো কি না, এই নন্দিনী হয়তো একদিন হবে আমার ··

ইঙ্গিত বুঝিয়া নীলাদ্রি বলিল—বুঝেছি, তোমার জীবন-সঙ্গিনী! অর্থাৎ শুভবিবাহ!

—তাই!···

অনন্তর মাথায় চলিয়াছে তখন মহাযুদ্ধ! কামান দাগিতেছে ·বোমা ফাটিতেছে···শেল্ ছুটিতেছে! চোখের সামনে ধোঁয়ার রাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে!

হঠাৎ একটা কথা মনে জাগিল।

অনন্ত কহিল—তুমি পাবো এ বিপদে সাহায্য করতে। মানে, টিকিট দুখানা তোমায় দেবো। তুমি যদি ছুটির পরে নন্দিনীদের বাড়ীতে গিয়ে নন্দিনীকে নিয়ে সিনেমায় যাও! স'ছটার শো···আমি অবশ্য চিঠি লিখে দেবো···তোমার পরিচয় দিয়ে···ব্যাপার বুঝিয়ে।

নীলাদ্রির গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। সে যেন ঝুম্‌ করিয়া আকাশ হইতে পড়িয়াছে, এমনি ভাব!

নীলাদ্রি কহিল—তা কখনো হয়! হুঁ! আমাকে চেনেন না, জানেন না! ইয়ং লেডি! আমার সঙ্গে হঠাৎ···

অনন্ত কহিল—আঃ, বুঝচো না, নন্দিনী তেমন জড়ভরত মেয়ে নয় মোটে! খুব ফরোয়ার্ড, স্কটিশে ইণ্টার-মিডিয়েট পড়্‌চে···সেকেণ্ড ইয়ার। ট্রামে চড়ে' রোজ কলেজ যায়।···তাছাড়া ওদের বাড়ীতে সেকেলে মামুলি কুসংস্কারের নামগন্ধ নেই!···মানে, সে চায় সিনেমা দেখতে —তার মা চান্‌, একা না যায়—জানাশোনা একজন কম্‌পানিয়ন্‌ থাকবে সঙ্গে···তোমাকে তাঁরা চেনেন না, জানেন না, সত্যি! কিন্তু না চিনলেও তোমার নাম শুনেচেন আমার মুখে। তা থেকে জানেন, তুমি আমার বন্ধু! সুতরাং···

গর্ব্বে নীলাদ্রির বুকখানা ফুলিয়া উঠিল। এ যুগের মেয়েদের কাছে তার কথা তবে হয়!

তবু চট্‌ করিয়া সে বলিতে পারিল না, বেশ, আমি হইব কম্‌পানিয়ন! এ-কথা বলিতে গিয়া আরো এত কথা কণ্ঠে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল···

অনন্ত কহিল—তোমার অসুবিধা হবে?·· আর কোথাও কোনো কাজ আছে?

নিশ্বাস ফেলিয়া নীলাদ্রি বলিল—না। তবে···

অনন্ত কহিল—তবে আবার কি! না, কোনো ওজর নয়, নীলাদ্রি।·তুমি জানো না, নন্দিনী কি রকম ফিল্ম-ম্যাড্‌। আশা করে' বেচারী বসে আছে···যদি যাওয়া বন্ধ হয়, তাহলে কিছুকাল আর ও বাড়ীতে আমার মাথা গলাবার উপায় থাকবে না।···লক্ষীটি, তোমাকে এ সাহায্যটুকু করতেই হবে।···ভয় নেই···বলেছি তো, নন্দিনী খুব ফরোয়ার্ড। কথায়-বার্ত্তায় তাকে মেয়ে বলে মোটে ফীল্‌ করবে না··পুরুষ-বন্ধু বলে' মনে হবে! তোমাকে মোটে সলজ্জ থাক্‌তে হবে না।

তরুণ বয়সের প্রবল মোহ···

নীলাদ্রি কহিল—বেশ···তুমি চিঠি লিখে দাও···

অনন্তর চিঠি লইয়া নীলাদ্রি গিয়া দাঁড়াইল নন্দিনীদের গৃহে। বেশে-ভূষায় একটু পারিপাট্য করিয়া গিয়াছিল; —জামায় ও রুমালে একটু সেণ্ট্‌, সেই সঙ্গে পার্শে দু'চারিটা বেশী টাকা। গল্প-উপন্যাস পড়িয়া এ সমাজের সম্বন্ধে যে-ধারণা সঞ্চয় করিয়াছিল, সে-ধারণাকে মনে-মনে বার বার আওড়াইয়া লইতে ভোলে নাই।

নন্দিনীদের গৃহে পৌছিয়া বুকখানা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল—কি বলিয়া চিঠি দিবে এবং এ চিঠির উত্তরে কি কথা শুনিবে···

কিন্তু কোনো গোলযোগ ঘটিল না। নন্দিনী যে-রকম সহজে চিঠি এবং তাকে গ্রহণ করিল, তাহাতে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গল্প-উপন্যাসেও এমন হয় না।

অর্থাৎ গল্প-উপন্যাসে এমন অবস্থায় দু'চারিটা কথার হেঁয়ালিতে আদান-প্রদান চলে--সেই সঙ্গে নায়কের মনে দ্বিধা-সংশয়, নায়িকার মনে কৌতুক-বাসনা···এক্ষেত্রে তার কিছু ঘটিল না। চিঠি পাইবামাত্র পড়িয়া নন্দিনী তার মুখের পানে চাহিল··খুব সহজ দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে বলিল—ও, আপনি তাঁর বন্ধু··নীলাদ্রিবাবু। তার পরেই তার সঙ্গে বাহির হইয়া সিনেমায় আসিল।

ট্রাম! নীলাদ্রি শুনিয়াছে অনন্তর মুখে, ট্রামে চড়িয়া নন্দিনী কলেজে যায়!

ছবি দেখিতে দেখিতে এত রকমের আলোচনা করিল যে সে হাওয়ায় মনের উপর হইতে সঙ্কোচের পাথর সরিয়া গেল—বাতাসে পাৎলা কাগজ যেমন উড়িয়া সরিয়া যায়, তেমনি ভাবে। নীলাদ্রির মনে হইল, নন্দিনীর সঙ্গে যেন তার কত কালের পরিচয়!

ইন্‌টারভালের সময় বেয়ারা আসিল একেবারে নন্দিনীর সামনে। তার হাতে ট্রে; ট্রেতে আইশক্রীম্‌। নন্দিনী লইল আইশক্রীম-পট্‌···নীলাদ্রিকেও একটা পট্‌ লইতে হইল; পার্শ খুলিয়া দাম দিল নীলাদ্রি দুটি পটের।

চকোলেট আসিল···সল্টেড্‌ বাদাম···আলোচনা করিতে করিতে নন্দিনী চকোলেট লইল, সল্টেড্‌ বাদাম লইল··· অত্যন্ত অবলীলায় সহজ ভঙ্গীতে। দেখিয়া নীলাদ্রি বুঝিল, এগুলা নন্দিনীর অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। সিনেমায় আসিয়া আইশক্রীম ও চকোলেট খাওয়া মজ্জাগত, কাজেই নিশ্বাস পড়িলেও নীলাদ্রি আবার দাম দিল নিজের পার্শ খুলিয়া।

দাম দিবার এমন ভঙ্গী, সেও যেন দেখাইতে চায় সিনেমা দেখিতে আসিলে এ-সব কেনা নীলাদ্রির স্বভাব !

ছবি শেষ হইলে দুজনে বাহিরে আসিল।

প্রচণ্ড ভিড়। ট্রামে-বাসে তিল-ধারণের স্থান নাই।

নন্দিনী বলিল—ব্যস্ রে, কি ভিড়! ওঠবার জো নেই।

নীলাদ্রির বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল।···জো নাই, সত্য !

নন্দিনী বলিল—ভেতরে কি গরম। মাথা যা ধরেছে! ··আপনার মাথা ধরেনি নীলাদ্রিবাবু ?

নীলাদ্রি কহিল—ধরেছে একটু! মানে, সব সিনেমা-হাউসে এয়ার-কুলিংয়ের বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

নন্দিনী কহিল—নিশ্চয়! ··

ফিটন্, ট্যাক্সি সাম্‌নে হাঁকিতেছে—বাবু···

নীলাদ্রি চাহিল ট্যাক্সির পানে; তার পর নন্দিনীর পানে।

নন্দিনী বলিল—ট্যাক্সিতে অনেক পড়বে। না হলে··· যেতে আরাম ছিল !

এ-কথার পর টাকা-পয়সার হিসাব কষিতে মন মার-মূর্ত্তি ধারণ করে! মন বলিল, ভাবো একবার স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালের কথা ·

মনের সে ইঙ্গিতে উৎসাহিত নীলাদ্রি ডাকিল—ট্যাক্সি···

নন্দিনী বলিল—ট্যাক্সি ডাকছেন ?

নীলাদ্রি বলিল—না হলে দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবেন কি? এই ভিড়ে?···ভালো দেখায় না!

ট্যাক্সিতে চড়িয়া বাড়ী। ভাড়া দিয়া নীলাদ্রি ভাবিল, এবারে সরিয়া পড়িবে।

নন্দিনী বলিল—এখনি চলে যাবেন? একটু বসবেন না? গল্পস্বল্প করতুম!

এ-নিমন্ত্রণ নীলাদ্রির ভালো লাগিল! জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা! যেন উপন্যাসের কল্পলোকের ফটক খুলিয়া গিয়াছে এবং সেই খোলা ফটক দিয়া সে প্রবেশ করিতেছে আলো-ছায়ায় মেশা কল্পলোকে!

অনন্তর কথা মনে পড়িল। অফিসে মোটা খাতার পাতায় মুখ গুঁজিয়া এখনো টাকা-আনা-পয়সার হিসাব মিলাইতেছে। বেচারী অনন্ত!

নন্দিনী ডাকিল—মা···

মা আসিলেন।

নন্দিনী বলিল—ইনি নীলাদ্রিবাবু···অনন্তবাবুর বন্ধু। দুজনে এক-অফিসে কাজ করেন। ভারী চমৎকার লোক ইনি। সিনেমায় আমাকে কি যত্নই করেছেন! আইশ-ক্রীম, চকোলেট্ খাওয়ানো! এক-শিশি সল্টেড্ বাদাম দেছেন।·· তার পর ট্রামে-বাসে খুব ভিড় বলে' ট্যাক্সিতে করে নিয়ে এলেন! অনেক পয়সা খরচ করেছেন!

নীলাদ্রি ভাবিতেছিল অনন্তর কথা। সিনেমার টিকিট কিনিয়াছে অনন্ত ··সিনেমার এ আয়োজন সব সে করিয়াছে, অথচ তার নাম নাই!

মা নীলাদ্রির পরিচয় চাহিলেন!

সখেদে নীলাদ্রি জানাইল, মাতামো ভারী কঞ্জুষ। অনেক টাকার মালিক। কাজেই নীলাদ্রিকে চাকরিতে ঢুকিতে হইয়াছে। তবে মাতামোর শরীর ভালো নয়। বয়স প্রায় সাতাশি·· ব্লড-প্রেশার। তিনি চক্ষু মুদিলে সকলকে নীলাদ্রি একবার দেখাইয়া দিবে, পয়সা কি করিয়া ইত্যাদি।

নন্দিনীও একাগ্র মনে এ কথা শুনিল।

এ-গল্প শুনিয়া মায়ের প্রাণ মমতায় গলিয়া গেল। মা বলিলেন—রাত দশটা বাজে বাবা—এইখানে দুটি খেয়ে যাও।

'বাবা' এ-কথায় না বলিতে পারিল না।

খাওয়া-দাওয়া চুকিতে রাত এগারোটা বাজিয়া গেল। নন্দিনী ইতিমধ্যে দুখানা গান শুনাইয়া দিল।

নীলাদ্রি বলিল, এমন গান সে জীবনে শোনে নাই!

সেই সঙ্গে আরো অনেক কথা বলিল। বলিল—রেডিয়োতে আপনি গান গান্ না কেন? গ্রামোফোনে রেকর্ড দিতে আপনার আপত্তি আছে?

নীলাদ্রি বলিল, রেডিয়োর দু'চার-জন মুরুব্বিকে সে জানে। নন্দিনীর যদি আপত্তি না থাকে, নীলাদ্রি তাহা হইলে রেডিয়োর আসরে মাসে দু' একটা প্রোগ্রামে নন্দিনীর গান গাহিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে।

এ-কথায় নন্দিনী মাতিয়া উঠিল। বলিল—বেশ, গাইবো—আপনি ব্যবস্থা করে' দিন। আধুনিক সঙ্গীত।

নীলাদ্রি কহিল—দেবো ব্যবস্থা করে’…

তার পর কথার শেষে একটু বিষ ঢালিয়া দিবার লোভ নীলাদ্রি সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল—অনন্তও তো তাদের জানে! কেন যে সে এ ব্যবস্থা করে নি এ্যাদ্দিন!

মা বলিলেন—তার কথা আর বলোনা বাবা! তার ঐ রকম…কোনো-কিছুতে আগ্রহ নেই!

তারপর বিদায়ের পালা…

উঠিতে-উঠিতে আরো দশ-পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল।

মা বলিলেন—মাঝে মাঝে এসো বাবা।

নন্দিনী বলিল—কালই আসবেন রেডিয়োয় আমার প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে’…নিশ্চয়! কেমন?

নীলাদ্রি বলিল—বেশ।

অনন্ত আসিয়া দেখা দিল। কহিল—সিনেমা দেখা হলো?

নীলাদ্রি কহিল—হ্যাঁ। তারপরে এই জ্যাঠোমা কি যত্ন! না খাইয়ে কিছুতে ছাড়লেন না! সত্যি, আমার মা মারা গেছেন আজ সাত বছর…তারপরে এমন স্নেহ আর কোথাও পাইনি!

কথার শেষে কণ্ঠকে নীলাদ্রি বেশ জমাট এবং গাঢ় করিয়া তুলিল।…

অনন্ত যে-দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল, সে-দৃষ্টির কাঁটা লইয়া নীলাদ্রি সেখানে আর এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না।

সে রাত্রে অনন্ত এখানে মোটে পাত্তা পাইল না। হাই তুলিয়া নন্দিনী বলিল—বড্ড tired…ঘুম যা পাচ্ছে, ওঃ!

তারপর হইতে নীলাদ্রি এ গৃহে নিত্য-অতিথি…অনন্তর সঙ্গে। গল্প যা জমে, তা নীলাদ্রিকে লইয়া।

মা প্রশ্ন করেন—দাদামশায় কেমন আছেন, বাবা?

নীলাদ্রি বলে—আর বলবেন না। কালই শরীর যা হয়েছিল…ভাবলুম, বুঝি-বা…

অনন্ত আসরে বসিয়া থাকে বেচারা বিমূঢ়ের মতো। নীলাদ্রির জন্য চা আসে। নীলাদ্রির জন্য গরম গরম নিম্‌কি আসে। প্রশংসায় নীলাদ্রি উচ্ছ্বসিত হয়, অনন্ত গুম্ হইয়া থাকে।

অনন্ত বুঝিল, এখানে তার আসন টলিয়াছে! তবু আসে, আসিয়া বসিয়া থাকে। মন এখনো বলে, ভাবিস কেন?

সেদিন নীলাদ্রি অফিসে আসিল না। চৌধুরীকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল—

কাল রাত্রে দাদামশায় মারা গিয়াছেন। ছুটি চাই।

সন্ধ্যার পরে অনন্ত আসিল নন্দিনীদের বাড়ী। সারাদিন অফিসের কাজে-অকাজে নীলাদ্রির মাতামহর আত্মার মুক্তি সে কামনা করিয়াছে।

আসিয়া দেখে, নীলাদ্রি খালি-পায়ে আগে আসিয়া আসর জমাইয়া বসিয়াছে।

নন্দিনী বলিল—নীলাদ্রি বাবুকে কন্‌গ্রাচুলেট্ করবো, না, কন্‌ডোলেন্স্ জানাবো, বুঝতে পারছি না! দাদামশায় মারা গিয়ে ওঁর লাভ হয়েছে দশ-হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ, আর কলকাতায় একখানি বাড়ী।

মা বলিলেন—অনন্তর জ্যাঠামশাই উইল করেছেন—তিনি মারা গেলে অনন্ত পাবে পাঁচ-হাজার টাকা। তা তাঁর যা শরীর অমন ইনফ্লুয়েঞ্জার হিড়িক গেল, তাতেও একটি দিনের জন্যে জ্বর কি মাথাব্যথা হয়নি তাঁর।

নীলাদ্রি বলিল—ও…মহেন্দ্রবাবু তো! হ্যাঁ, এখনো তিনি যেরকম শক্ত আছেন…অনন্তকে তাই আমরা বলি, তুমি ওঁর উইলের টাকা ভোগ করবে কি! উনিই তোমার উইলের টাকা ভোগ করবেন, দেখে নিয়ো!

দশ-বারো দিন পরের কথা। অনন্ত আসিয়া শুনিল, নীলাদ্রির সঙ্গে নন্দিনীর বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেছে; দু'মাস পরে বিবাহ।

মা বলিলেন, দাদামশায়ের শ্রাদ্ধ চুকিলে অন্তত একটা মাস কাটুক—নহিলে লোকে কি বলিবে!

রাগে অনন্তর গা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু রাগ করিয়া কি-বা করিবে? অভিমান? কার উপরে অভিমান?

রাগিয়া কাঁপিয়া অনন্ত চলিয়া গেল।

অফিসে নীলাদ্রির সঙ্গে অনন্ত কথা কয় না। নীলাদ্রি কথা কয়—অনন্ত কোনোমতে 'হাঁ' 'হুঁ' বলিয়া কোনো-মতে সারিয়া লয়। নীলাদ্রি হাসে; হাসিয়া অনন্তর

পাশের চেয়ারে বসিয়া রসিদের বই দেখিয়া পলিশির কাগজ লেখে।

হঠাৎ সেদিন অনন্তর বুকের উপর হইতে পাথর সরিয়া গেল অর্থাৎ তার জ্যাঠামশায় স্বর্গলাভ করিলেন।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া অনন্ত ছুটিল নন্দিনীদের গৃহে। নীলাদ্রি নাই। মা ও মেয়ে দুজনে কাঠ হইয়া বসিয়া আছে।

অনন্ত বলিল—জ্যাঠামশায় মারা গেছেন।

মা নিশ্বাস ফেলিলেন—বটে!···টাকাটা তাহলে পাবে এবার!

অনন্ত কহিল—হ্যাঁ। মানে, প্রোবেট নেওয়া হলেই! ভাবছি, ঐ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে একটা সিনেমার ছবি তুলবো। সিনেমার কারবারে অনেক লাভ।

মা বলিলেন—নীলাদ্রির টাকাকড়ি তো বিশ-বাঁও জলে! আমাদের উকিল সন্ধান নিয়েছে। উকিল বলছে, ওর মাতামো বাড়ীখানি বন্ধক দিয়ে গেছেন—সুদে-আসলে তাদের পাওনা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ও বাড়ী রক্ষা করা যাবে না।

মা আবার নিশ্বাস ফেলিলেন। এবারের নিশ্বাস বেশ বড় রকম!

নন্দিনী ডাকিল—অনন্তবাবু···

অনন্ত চাহিল নন্দিনীর পানে।

নন্দিনী বলিল—নীলাদ্রিবাবুর দাদামশায় নাকি কোম্পানির কাগজ সব বেচে দিয়ে গেছেন?

মা বলিলেন—আমাদের উকিলের মুখে সব খবরই শুনলুম। নীলাদ্রিকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সে কোনো জবাব দ্যায়নি। তার পর কদিন আর এ-বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ায়নি।

নন্দিনী ফোঁশ করিয়া উঠিল; বলিল—আপনার বন্ধুর এটা কি রকম ভদ্রতা, বলতে পারেন?

মা বলিলেন—তোমার সঙ্গে বরাবর যেমন কথা আছে বাবা অনন্ত···এবারে ওদিককার ফাঁড়া যখন কাটলো, টাকা পাচ্ছো—তখন সংসার-ধর্ম্মে মন দাও।··· নন্দিনীকে ডাগর বয়স অবধি এমনি রেখেছি, তার বিয়ে দিইনি সে শুধু তোমার জন্যে!···না হলে পাত্র কি মিলতো না? মিলতো।

অনন্ত মনে-মনে হাসিল।

ক'দিন পরের কথা।

দুই বন্ধুতে কথা হইতেছিল।

নীলাদ্রি বলিল—দাদামশায়ের টাকাটা উদ্ধার হয়েছে। কোম্পানির কাগজ বেচে তিনি কিনেছিলেন আদর্শ-খাবার কোম্পানির শেয়ার। শেয়ারের দাম কমে' অর্দ্ধেকে দাঁড়িয়েছে। সে সব শেয়ার বেচে আজ নগদ টাকা পেয়েছি চার হাজার নশো বাহান্ন টাকা এগারো আনা পাঁচ পাই।

অনন্ত কহিল—জ্যাঠামশায়ের উইলের টাকাটা পাবো সামনের মাসে।

নীলাদ্রি বলিল—তোমার নন্দিনী দেবী কি বলেন?

অনন্ত কহিল—আমার নন্দিনী দেবী? না, তোমার?

নীলাদ্রি হাসিল, কহিল—বেশ, তিনি দুজনেরই, মানলুম। এখন বলো তাঁদের কথা··

অনন্ত কহিল—নন্দিনী কিছু বলে নি। তবে তার মা বলেছেন, আমার সঙ্গে যখন অনেকদিনের কথা, তখন নন্দিনীর ভার আমাকেই নিতে হবে। কিন্তু মাসখানেক সবুর।

নীলাদ্রি কহিল—নিশ্চয়। মানে, টাকাটা হাতে পাও কিনা, আগে ওঁরা দেখবেন।

অনন্ত কহিল—আমার মন পিচড়ে গেছে ভাই নীলাদ্রি। এ বয়সে যে-মেয়ে টাকাটাকেই এত বড় করে' দেখতে শিখেছে···

নীলাদ্রি পাদপূরণ করিয়া বলিল—তাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করলে অঙ্গের সিকির-সিকিও বজায় রাখা যাবে না।··· অর্থাৎ ওঁদের যে-পরিচয় পেয়েছি···

অনন্ত কহিল—আমারো ঐ কথা, নন্দিনীকে বিবাহ? নৈব নৈব চ!

টাকা মিলিয়াছে। আইন আদালতের দুই-চারিটা দ্বার পার হইয়া দুই বন্ধুর টাকা এখন তাদের হাতে আসিয়াছে।

নীলাদ্রি ডাকিল··অনন্ত···

অনন্ত কহিল—নীলাদ্রি···

নীলাদ্রি কহিল—চৌধুরী ব্যাটা থাকতে এ অফিসে উন্নতির কোনো আশা নেই। তাই আমি ভাবছি, তোমার টাকা থেকে দু'হাজার, আমার টাকা থেকে দু'হাজার—

এই চার হাজার টাকা নিয়ে এসো আমরা ব্যবসা খুলি। পার্টনারশিপ্!

অনন্ত কহিল—বললে বিশ্বাস করবে না ভাই, কাল সারা রাত ঘুমোতে পারিনি···বিছানায় পড়ে আমিও এই কথা ভেবেছি।

নীলাদ্রি বলিল,—তার উপর জানো তো, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী!

অনন্ত বলিল—আমারো ঠিক ঐ মত। তবে কিসের বাণিজ্য করবো···

নীলাদ্রি বলিল—শোনো, এ টাকাটা দেহ বা মাথা খাটিয়ে আমাদের রোজগার করতে হয়নি! এ টাকাটা দৈবেন দেয়ং। কাজেই বুঝছি, দৈব সহায় হবে। দশ-বারোটা ব্যবসার নাম লিখে লটারি করা যাক, যে-কারবারের নাম লটারিতে উঠবে, সেইটেই হবে আমাদের অবলম্বন!··· বুঝচো না, দৈব সহায় না হলে একসঙ্গে দুজনের ভাগ্যে এমন অঘটন ঘটবে কেন?

অনন্ত কহিল—তাই দৈবের উপরে নির্ভর করে' জ্যাঠামশায়ের নাড়ীটির দিকে আমি চেয়ে বসেছিলুম! দৈব সহায় না হলে এমন হয় না! দেখছো তো, কত শক্ত-শক্ত অসুখে জ্যাঠামশায় সেরে উঠেছেন আর এবারে একটি বেলার জ্বরেই কুপোকাৎ!···মানে, ডাক্তার ডাকবার সময় মিললো না!

নীলাদ্রি বলিল—কিন্তু এই ব্যবসাতে নামবার আগে একটা প্রতিশ্রুতি···

অনন্ত বলিল—যাকে বলে word of honour? বেশ, বলো···

নীলাদ্রি বলিল—বিবাহ আমরা করবো না কেউ! নন্দিনীকে নিয়ে এ যুগের মেয়েদের যে-পরিচয় পাওয়া গেছে, ভয় হয়···

অনন্ত কহিল—যা বলেছো! ভয় বলে' ভয়। শাড়ী দেখলে আমার গা ছম্‌ছম্ করে' ওঠে!

নীলাদ্রি বলিল—একালের মেয়েরা টাকা-পয়সাটাকে এত বেশী চিনেছে যে সে চেনার মধ্যে স্বামীকে চেনবার সুযোগ বা সময় তাদের নেই! ও-জাতকে বয়কট্ করা উচিত। বিবাহে নৈব নৈব চ।

অনন্ত কহিল—নন্দিনীর মা কাল নেমন্তন্ন করেছিলেন। রাত্রে ওখানে খাবার নেমন্তন্ন। বলেছিলেন, অনেকদিন দেখিনি বাবা···এসে এইখানে খেয়ো! আমি বলে পাঠিয়েছি, সময়াভাব!

নীলাদ্রি বলিল—পরশু রাত্রে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। আমি বলেছি, একটা ব্যবসার পত্তন করছি, সেজন্য নাবার-খাবার অবসর নেই! কি বলো, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ?

—নিশ্চয়।

নীলাদ্রি কহিল—আমরা কেউ বিয়ে করবো না। এ প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে যে বিবাহ করবে, তাকে একহাজার টাকা খেশারত দিতে হবে···নগদ একহাজার টাকা।

অনন্ত কহিল—রাজী।

নীলাদ্রি কহিল—Come ··shake hands ··

দুই বন্ধু হাতে হাত মিলাইল। দুজনে সমস্বরে কহিল—O. K.

ব্যবসা খোলা হইয়াছে। লটারিতে নাম উঠিয়াছে বস্ত্র। ফার্মের নাম হইয়াছে 'এ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডস্'।

দুজনে এক মেশে থাকে। একসঙ্গে দোকানে আসে। দুপুরবেলায় একজন থাকে দোকানে, অপরজন মেশে যায় স্নানাহার করিতে। তারপর সে ফিরিলে এ যায় স্নানাহার করিতে। কাজে দুজনের নিষ্ঠা অসাধারণ।

ছ'মাস পরের কথা। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ছোট ঘর ছাড়িয়া বড় ঘর লওয়া হইয়াছে। দুজনে নাইবার-খাইবার অবসর পায় না।

বেলা প্রায় বারোটা। অনন্ত দোকানে আছে, নীলাদ্রি মেশে আসিয়াছে স্নানাহার করিতে।

একখানা চিঠি পাইল। বিবাহের নিমন্ত্রণ-চিঠি। নন্দিনীর বিবাহ।

আগামী শনিবার ১০ই আষাঢ় হাওড়া পঞ্চাননতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ শ্রীধর বাবাজীবনের সঙ্গে ··

নীলাদ্রির মুখে অন্ন উঠিল না। কণ্ঠ কে যেন সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে! মনে হইতেছিল, এ নিমন্ত্রণ করার অর্থ? নিশ্চয় ব্যঙ্গ···পরিহাস! অর্থাৎ ছাখো, তোমাদের অভাবে নন্দিনীর বিবাহ পড়িয়া রহিল না!

মাথার মধ্যে সুদর্শন-চক্র ঘুরিতে লাগিল !

নীলাদ্রি দোকানে আসিল। অনন্তকে এ-কথা বলিল না···বলিতে পারিল না।

তারপর অনন্ত আসিল বাসায়···উদ্দেশ্য ঐ স্নানাহার। স্নান সারিয়া খাইতে বসিবে, নন্দিনীদের ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত। অনন্তর হাতে সে চিঠি দিল। নিমন্ত্রণের চিঠি। দিদিমণির বিবাহ···আগামী শনিবার ১০ই আষাঢ়।

ভৃত্য বলিল—নিশ্চয় যাওয়া চাই। মা আর দিদিমণি ···দুজনে অনেক করে' বলে' দেছেন।

রাগে অনন্ত জ্বলিয়া উঠিল। জ্বলিয়া যে-চোখে ভৃত্যের পানে চাহিল, সে-চোখ দেখিয়া ভৃত্যের মুখে আর দ্বিতীয়-বাক্য নিঃসারিত হইল না। সে সরিয়া পড়িল—

অনন্ত দোকানে ফিরিল। কাজে মন নাই। খরিদ্দারকে দেড়টাকা জোড়ার কাপড় দিয়া দাম বলিল সাত সিকা! মন কেমন ভারী-ভারী! নিশ্বাসের ভারে বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইবে, এমন!

সন্ধ্যার পরে দোকানে ভিড় একটু-কম।

নীলাদ্রি ডাকিল—অনন্ত···

নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্ত বলিল—নীলাদ্রি···

নীলাদ্রি বলিল—তোমার নন্দিনীর যে বিয়ে হচ্ছে হে, আসছে শনিবারে। মানে, ১০ই আষাঢ়!

অনন্ত বলিল,—আবার ঐ কথা! আমার নন্দিনী? না, তোমার নন্দিনী!

নীলাদ্রি কহিল,—যারই হোক্, মানে, সেই নন্দিনীর বিয়ে···

অনন্ত কহিল,—জানি। নেমন্তন্নর চিঠি পেয়েছি।

নীলাদ্রি বলিল—আমিও পেয়েছি।···পেয়ে অবধি চিন্তা করছি। চিন্তায় কি স্থির করেছি, জানো?

সোৎসাহে অনন্ত কহিল—কি?

নীলাদ্রি বলিল—আমরা দুজনেও যদি ঐ ১০ই আষাঢ় তারিখে বিয়ে করতে পারি, তাহলেই এ নেমন্তন্নর রীতিমত জবাব দেওয়া হয়।

অনন্ত কহিল—আশ্চর্য্য! আমার মনের কথা তুমি জানলে কি করে?

নীলাদ্রি বলিল,—জানবো না! এ যে সাইকলোজি, ভাই···হিউম্যান্ সাইকলোজি!

অনন্ত কহিল—ঠিক!···কিন্তু আজ হলো সোমবার··· শনিবারের আর ক'দিন বা বাকী। এর মধ্যে মনের মতো দু'টি মেয়ে পাওয়া···

হাসিয়া নীলাদ্রি বলিল—কলকাতার সহরে···বলে, শীতকালে বোম্বাই আম পাওয়া যায়,—বোশেখ মাসে পাওয়া যায় দিব্যি ফুলকপি বাঁধাকপি! আর আমরা এ্যাণ্ড্ ফ্রেণ্ডস্···উঠ্‌তি বয়স, চল্‌তি ব্যবসা···আমরা মনের মতো দুটি মেয়ে পাবো না?

দ্বিধা-সংশয়-জড়িত স্বরে অনন্ত কহিল,—পাবো?

নীলাদ্রি বলিল,—আলবৎ পাবো।···এখনি আমি ডাকিয়ে পাঠাচ্ছি প্রজাপতি লিমিটেডের সেক্রেটারী বংশগোপালকে তার খাতাপত্র-সমেত। হুঁঃ, দুজনে যদি ঐ একই দিনে অর্থাৎ ১০ই আষাঢ় শনিবার সুতহিবুক-যোগে বিবাহ করি, তাহলে চুক্তি-মাফিক হাজার টাকা খেশারতীর দায় কারো থাকবে না ··

অনন্ত কহিল—ঠিক বলেছো। তাহলে এখনি ডাকিয়ে পাঠাও তুমি তোমার ঐ প্রজাপতি লিমিটেডের বংশলোচনকে!···

নীলাদ্রি বলিল,—বংশলোচন নয়···গোপাল।···

অনন্ত বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বংশলোচন নয়, গোপাল। আগামী শনিবার ১০ই আষাঢ় মনের মতো দুটি মেয়ের সঙ্গে আমাদের বিবাহ হোক! বিবাহ মানে, নন্দিনীর বিয়ের নেমন্তন্নর জবাব···মুখের মতো জবাব!

নীলাদ্রি বলিল,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, অনন্ত! প্রজাপতি-লিমিটেডের শক্তি সামান্য নয়! দুটি কেন, চাও যদি চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে ওরা এক-ডজন মেয়ে এনে সামনে ধরে দিতে পারে···মনের মতন···কাকে রেখে কাকে ছেড়ে দেবে···ঠিক করতে পারবে না তুমি!

অনন্ত বলিল—না, এক-ডজন নয়···দুটির অর্ডার পাঠাও ···ঐ ১০ই আষাঢ় তারিখে দুজনে বিয়ে করে' ওদের এ নেমন্তন্নর মুখের মতো জবাব দি'···

নীলাদ্রি বলিল—যাকে বলে রীতিমত জবাব!

'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে সার্ব্বভৌম উদ্ধার কাহিনীর আলোচনা করিতে দেখাইয়াছি যে, "চৈতন্যভাগবতে" বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত পরমবৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী কবি কর্ণপূরের বর্ণনানুসারে 'চরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জিগীষামূলক বেদান্তবিচারের বর্ণন করিয়াছেন। এখন কবি কর্ণপূর উক্ত বিষয়ে কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সমস্ত কথাই যথাযথ গ্রহণ করিয়াছেন কি না, ইহাও দেখা আবশ্যক। তিনি কবি কর্ণপূরের কোন কথা গ্রহণ না করিলে কেন তাহা করেন নাই, ইহাও বুঝা আবশ্যক। আর কোন গ্রন্থের সর্ব্বাংশে প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে হইলে অন্যান্য কথারও বিচার করা আবশ্যক হয়। পরে তাহাও কিছু বলিব। এখন প্রথমে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে কবি কর্ণপূরের কথাই বক্তব্য।

কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন,—"প্রভোঃ সমীপে ধরণী সুরাগ্র্যো বভূব সংপাঠয়িতুং প্রবৃত্তঃ।" (মহাকাব্য—১২।২১), অর্থাৎ—ভূসুরশ্রেষ্ঠ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্য প্রভুর নিকটে নিজ শিষ্যদিগকে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই বেদান্ত পড়াইয়াছিলেন, ইহা কিন্তু কবিকর্ণপূরও বলেন নাই।

এখানে এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, ১২৯১ বঙ্গাব্দে কবিকর্ণপূরের উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক ও প্রকাশক বহরমপুর নিবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত শ্লোকের শেষে "বভূব সংপাঠয়িতুং প্রমত্তঃ" এইরূপ পাঠই মুদ্রিত করিয়া অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন,—"দ্বিজবর সার্ব্বভৌম এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার প্রভুর নিকট উন্মত্তের ন্যায় পাঠ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার প্রাপ্ত আদর্শ পুস্তকে উক্ত শ্লোকের শেষে "প্রমত্তঃ" এইরূপ পাঠ দেখিয়া উহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। এ পর্য্যন্ত উক্ত পাঠের কোন প্রতিবাদের কথা শুনি নাই। কিন্তু "প্রমত্তঃ" এই পদের দ্বারা "উন্মত্তের ন্যায়" এইরূপ অর্থ কিরূপে বুঝা যায় এবং তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উন্মত্তের ন্যায় অধ্যাপনা কিরূপ, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর অনুবাদক বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত শ্লোকে "সংপাঠয়িতুং" এই একপদের দ্বারাই "পাঠ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন"—এইরূপ ব্যাখ্যা কেন করিয়াছেন, ইহাও বুঝা আবশ্যক। বস্তুতঃ ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, কবি কর্ণপূরের উক্ত শ্লোকের চতুর্থপাদে "বভূব সংপাঠয়িতুং প্রবৃত্তঃ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

কবি কর্ণপূর পরে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি রূপে লিখিয়াছেন—

> "কিমুচ্যতে কঃ খলু পূর্ব্বপক্ষঃ
> কিম্বাস্য রাদ্ধান্তিত মাতনোসি।
> বেদান্ত শাস্ত্রস্য নচায়মর্থ
> তচ্ছ্রূয়তাং যত্ত্ নিরূপয়ামঃ॥ ২৩

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'আপনি কি বলিতেছেন? পূর্ব্বপক্ষই বা কি? আর ইহার সিদ্ধান্তই বা কি করিতেছেন? বেদান্ত শাস্ত্রের ইহা অর্থ নহে, আমি যাহা নিরূপণ বা ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহাই শ্রবণ করুন।'

কিন্তু 'চরিতামৃত' গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী ঐরূপ বর্ণন করেন নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অধ্যাপনাকালে তাঁহার নিকটে সহসা শ্রীচৈতন্যদেবের ঐরূপ প্রগল্‌ভতা বা সগর্ব্ব উক্তি তিনিও বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার মতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষার্থই

সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে শঙ্করভাষ্যানুসারে বেদান্তসূত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন সপ্তাহমধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব কোন কথা বলেন নাই। পরে অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে তিনি অতি বিনীতভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করেন। তাই কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন—

"সাতদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভালমন্দ নাহি কহে বসিমাত্র শুনে॥ ১১৫
অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥ ১১৬
ভালমন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ—ইহা বুঝিতে না পারি॥ ১১৭
প্রভু কহে—মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥ ১১৮
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি॥ ১১৯
ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার॥ ১২০
তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি॥ ১২১
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥ ১২২

(মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পঃ)

পরে কবিরাজ গোস্বামী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে শ্রীচৈতন্যদেবের নিজ সম্মত বেদান্ত মত-ব্যাখ্যার বর্ণন করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেব যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের "বিতণ্ডা" ও "ছল" প্রভৃতির খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাও পরে বলিয়াছেন। কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও নিজমত স্থাপনের কথা লিখিলেও তাহা ঐরূপ ব্যক্ত করিয়া বর্ণন করেন নাই। কিন্তু তিনিও পরে বলিয়াছেন,—

"অসৌ বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদ্যৈ
র্নিরস্ত ধীরপ্যথ পূর্ব্বপক্ষং।
চকার বিপ্রঃ প্রভুনা স চাশু
স্বসিদ্ধ সিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ॥ ২৬

বিমানবাবু তাঁহার "শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান" গ্রন্থে কবি কর্ণপূরের মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গের পূর্ব্বোক্ত কোন শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া কেবল শেষোক্ত "অসৌ বিতণ্ডা ছল,"—ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তৎপূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"বেদান্ত বিচারের কথা মহাকাব্যে আছে, নাটকে নাই। মহাকাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনুবাদ কবিয়াছেন। ...ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল। বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল" ইত্যাদি। ৩৬২-৬৩ পৃঃ।

কিন্তু কবি কর্ণপূরের উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়,— 'অসৌ বিপ্রঃ (সার্ব্বভৌমঃ) বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদ্যৈঃ নিরস্ত-ধীরপি (নিরস্ত বুদ্ধিরপি) অথ (অনন্তরং) পূর্ব্বপক্ষং চকার। সচ (পূর্ব্বপক্ষঃ) স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা প্রভুনা (শ্রীচৈতন্য দেবেন) আশু (শীঘ্রং) নিরস্তঃ। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, কবি কর্ণপূরের মতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই 'বিতণ্ডা' ও 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা সার্ব্বভৌমকে নিরস্ত-বুদ্ধি করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বিতণ্ডাদির দ্বারা নিরস্ত-বুদ্ধি হইয়াও পরে একটি পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সেই পূর্ব্বপক্ষেরও শীঘ্র খণ্ডন করিয়াছিলেন। কিন্তু 'চরিতামৃতে' কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"এই মত কল্পনাভাষ্যে শতদোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল॥১৬০
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল" ॥১৬১

কবিরাজ গোস্বামীর উক্ত বর্ণনার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যই শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে বিতণ্ডাদি করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেব সেই সমস্ত খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী যে, কবিকর্ণপূরের পূর্ব্বোক্ত "অসৌ বিতণ্ডা" ইত্যাদি শ্লোকেরই অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। বিমানবাবু কিন্তু তাহাই বলিয়াছেন।

বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝিতে হইলে "বিতণ্ডা" কি, "ছল" কি এবং "নিগ্রহ" কি, ইহাও বুঝা আবশ্যক। বঙ্গভাষায় 'চরিতামৃতে'র ব্যাখ্যাকারগণ উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত পদার্থের

প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পরিশ্রম করেন নাই। কিন্তু ন্যায়-শাস্ত্রের কথা বলিয়া উপেক্ষা করিলে উক্ত স্থলে কবিরাজ গোস্বামীর কথার ব্যাখ্যা করা হয় না। আর কবিকর্ণপূর ও কবিরাজ গোস্বামীর ঐরূপ উক্তিভেদের কারণও বুঝা যায় না। পরন্তু "বিতণ্ডা" পদার্থে অজ্ঞতাবশতঃ অনেকদিন হইতে বঙ্গভাষায় কলহাদি নিন্দিত অর্থে "বিতণ্ডা" শব্দের অপপ্রয়োগ হইতেছে এবং 'বাদবিতণ্ডা' ও 'বাগ্ বিতণ্ডা' প্রভৃতি শব্দেরও প্রয়োগ হইতেছে। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী নিশ্চয়ই "বিতণ্ডা" শব্দের অপপ্রয়োগ করেন নাই। অতএব আবশ্যক বোধে এখানে সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত 'বিতণ্ডা' প্রভৃতির স্বরূপও বক্তব্য।

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, "তিস্রঃ খলু কথা ভবন্তি, বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি।" অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিয়মে বাদ প্রতিবাদরূপ যে 'কথা', তাহা তিন প্রকার। (১) 'বাদ' (২) 'জল্প' ও (৩) 'বিতণ্ডা'। কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ জিগীষাশূন্য গুরুশিষ্য প্রভৃতির যে 'কথা', তাহার নাম "বাদ"। ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে উহা দশম পদার্থ এবং "জল্প" ও "বিতণ্ডা" একাদশ ও দ্বাদশ পদার্থ। গোতমোক্ত ঐ "বাদ" পদার্থকেই গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"বাদঃ প্রবদতা মহং" (গীতা—১০৩২)। উক্ত 'বাদ' 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'র স্বরূপ ও ভেদ না বুঝিলে ভগবদ্গীতার ঐ কথাও বুঝা যায় না।

জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদী মধ্যস্থ সদস্যগণের নিকটে যথানিয়মে নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষখণ্ডনরূপ যে বিচার করেন, তাহার নাম "জল্প"। আর জিগীষু প্রতিবাদী নিজ পক্ষের স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষেরই খণ্ডন করিলে সেই বিচারের নাম 'বিতণ্ডা'। ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গোতম উহার লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন, "স প্রতিপক্ষস্থাপনা-হীনো বিতণ্ডা।" (১।২।৩) যিনি ঐরূপ 'বিতণ্ডা' করেন তাঁহার নাম 'বৈতণ্ডিক'। বাৎস্যায়ন পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"বিতণ্ডয়া প্রবর্ত্তমানো বৈতণ্ডিকঃ।"

কিন্তু বিচারস্থলে যিনি বাদী, তিনি বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না। কারণ, প্রথমেই কাহারই বিতণ্ডা করা সম্ভবই হয় না। প্রথমে কোন বাদী নিজ পক্ষ স্থাপন করিলেই পরে প্রতিবাদী তাহার খণ্ডন করিতে পারেন। অতএব শ্রীচৈতন্যদেব ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সেই বিচারে বাদী কে এবং প্রতিবাদী কে, ইহা বুঝা আবশ্যক। কবিকর্ণপূর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের পরেই সপ্তবিংশ শ্লোকের প্রথমে বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতবাদী প্রথমঃ"। অর্থাৎ অদ্বৈত-বাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যই বাদী এবং শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিবাদী। অতএব বিতণ্ডা করিতে হইলে প্রতিবাদী শ্রীচৈতন্যদেবই তাহা করিতে পারেন। তাই কবিকর্ণপূর পূর্ব্ব-শ্লোকে বলিয়াছেন,—"অসৌ বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদ্যৈর্নিরস্তধীঃ।" অর্থাৎ বাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রতিবাদী শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক 'বিতণ্ডা' 'ছল' ও 'নিগ্রহাদি'র দ্বারা নিরস্ত-বুদ্ধি হইয়াছিলেন।

ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রে মহর্ষি গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে চতুর্দ্দশ পদার্থের নাম 'ছল' এবং চরম ষোড়শ পদার্থের নাম 'নিগ্রহস্থান'।* বক্তার অভিপ্রেত শব্দার্থ বা বাক্যার্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনার দ্বারা কোন দোষ প্রদর্শক যে অসদুত্তরবিশেষ, তাহাকে 'ছল' বলা হইয়াছে। গোতম মতে সেই ছল ত্রিবিধ। (১) 'বাক্ ছল', (২) সামান্য ছল' ও (৩) 'উপচার ছল'। প্রাচীন চরক মতে ছল দ্বিবিধ, "বাক্ ছল" ও "সামান্য ছল"। ("চরক সংহিতা"র বিমান স্থান অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

'বাক্ ছলে'র প্রসিদ্ধ উদাহরণ যথা,—কোন ব্যক্তি একখানা নূতন কম্বল পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে দেখিয়া কোন বাদী বলিলেন, "নেপালাদাগতোঽয়ং নবকম্বলবত্বাৎ।" অর্থাৎ এই ব্যক্তি নেপাল হইতে আসিয়াছে,—যেহেতু ইহাতে নবকম্বলবত্ব আছে। উক্ত বাক্যে 'নবকম্বল' শব্দের দ্বারা নূতন কম্বল অর্থই বক্তার অভিপ্রেত। কিন্তু কোন প্রতিবাদী উক্ত 'নবকম্বল' শব্দের নবসংখ্যক কম্বল অর্থের কল্পনা করিয়া প্রতিবাদ করিলেন—

---

* কবিকর্ণপূরের উক্ত শ্লোকে "ছল" শব্দের পরে "নিগ্রহ" শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত "নিগ্রহস্থান"ই বুঝিতে হইবে। পরে "আদ্য" শব্দের দ্বারা গোতমোক্ত পঞ্চদশ পদার্থ "জাতি" নামক অসদুত্তরবিশেষও তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় বাদী বা প্রতিবাদীর নিগ্রহের অর্থাৎ পরাজয়ের কারণবিশেষই 'নিগ্রহস্থান'। ন্যায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্বিংশতি প্রকার "জাতি" ও দ্বাবিংশতি প্রকার 'নিগ্রহস্থান' বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

একোঽস্য কম্বলঃ কুতো নবকম্বলাঃ।" অর্থাৎ এই ব্যক্তির নবসংখ্যক কম্বল না থাকায় ইহাতে নবকম্বলবত্ত্ব হেতু অসিদ্ধ। উক্তরূপ অসদুত্তরকে 'বাক্ ছল' বলে। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত প্রকার 'ছল'ই অসদুত্তর। কবিকর্ণপূরের উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব 'বিতণ্ডা' করিতে কোন সময়ে কোন প্রকার 'ছল'ও করিয়াছিলেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'য় প্রতিবাদী সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইলেই তখন তিনি পরাজয় ভয়ে অগত্যা উক্তরূপ 'ছল' নামক অসদুত্তরও করেন, ইহাই ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাই কবিরাজ গোস্বামী উক্ত বিচারে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা লিখিতে পারেন নাই, ইহা বুঝা আবশ্যক।

পরন্তু শ্রীচৈতন্যদেব নিজ পক্ষেরও সংস্থাপন করায় তাঁহার সেই বিচারকে "বিতণ্ডা" বলা যায় না। কারণ নিজপক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিলেই সেই বিচারকে "বিতণ্ডা" বলে। তাই কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন যে, প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেব নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যই তাঁহার পক্ষে অনেক দোষ প্রদর্শন করিয়া "বিতণ্ডা" করিয়াছিলেন এবং তিনিই তখন কোন সময়ে সদুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া পরাজয়-ভয়ে কোন প্রকার 'ছল'ও করিয়াছিলেন। কিন্তু —"সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল।"

কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহানৈয়ায়িক হইয়াও মধ্যস্থব্যতিরেকে নিজগৃহে ঐরূপ অবৈধ "বিতণ্ডা" করিবেন কেন? পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদীর সম্মানিত উপযুক্ত মধ্যস্থ নিযুক্ত না হইলে পূর্ব্বোক্ত 'জল্প' ও "বিতণ্ডা" নামক বিচার হইতে পারে না,—ইহা ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সেই বিচারে কাহারা মধ্যস্থ ছিলেন, ইহা কবিকর্ণপূরও বলেন নাই।

পরন্তু কবিরাজ গোস্বামী উক্ত স্থলে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিরূপে অতিরিক্ত যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন,—তাহাতেও অনেক প্রশ্ন হয়। সংক্ষেপে তাহাও কিছু এখানে বলিতেছি। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়?
(মধ্য ষষ্ঠ ১৪৩)

কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যও ত ব্রহ্মকে নিঃশক্তি বলেন নাই। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মের পরিপূর্ণ শক্তিই বলিয়াছেন।* তথাপি বহু-বিজ্ঞ কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পয়ারে "নিঃশক্তি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? "নিঃশক্তি" শব্দের অর্থ নির্গুণ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। আর তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী উক্ত স্থলে 'নির্গুণ' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই কেন? পরন্তু শঙ্করের ব্যাখ্যাত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের খণ্ডনে তিনি অনেক প্রাচীন কথা বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনিও যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহা কিরূপ? সেখানে "নির্ব্বিশেষ" শব্দের অর্থ কি? তিনি সেখানে বলিযাছেন—"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়॥"

কবিরাজ গোস্বামী পরে বলিয়াছেন—

"ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥" (ঐ মধ্য ১৫৬)

আদি-লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদেও তিনি বলিয়াছেন,—

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ॥ ১১৪

কিন্তু বিবর্ত্তবাদী ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য কি বেদান্তসূত্রকার বেদব্যাসকেও ভ্রান্ত বলিতে পারেন? যাহা অসম্ভব, তাহা ত বলা যায় না। তবে কেন বহু-বিজ্ঞ কবিরাজ গোস্বামীও ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন? উক্ত স্থলে কোন ব্যাখ্যাকার অগত্যা কষ্ট কল্পনা করিয়া "ব্যাসসূত্রের পরিণামবাদমূলক অর্থ ভ্রান্ত," এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু কোন অর্থকে ভ্রান্ত বলা যায় না। এই অর্থ ভ্রান্ত বা ভুল,

---

* বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪শ সূত্র ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"পরিপূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম। ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ ভবতি, "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি।" (শ্বেতাশ্বতর—৬।৮) তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাদ্ ক্ষীরাদিবদ্ বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে।" পরেও (২।১।৩০ সূত্রভাষ্যে) বলিয়াছেন—"সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতা ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্।" অন্যত্রও অনেকবার ঐরূপ কথা বলিয়াছেন।

এইরূপ কথা পূর্ব্বকালে পণ্ডিতগণ বলিতেন না। আর কবিরাজ গোস্বামীর তাহাই বিবক্ষিত হইলে তিনি "ব্যাস ভ্রান্ত" এইরূপ কথা লিখিবেন কেন?

বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্যও বেদান্তসূত্রকার বেদব্যাসকে অভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মান্য করিয়াই তাঁহার সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারা 'বিবর্ত্তবাদের' ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে কল্পনা করিয়া উক্ত মত স্থাপন করিলে বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য করিবেন কেন? আর ঐ মত তাঁহার বুদ্ধি কল্পিত হইলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণও উহার খণ্ডন করিতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতানুসারে উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছেন কেন? শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ বহু বিচার দ্বারা নিজমত স্থাপন করিতে শ্রীভাষ্যের প্রথমে শঙ্করের মতের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত মতকেই মহা-পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন। পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও নিজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতানুসারে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতেই সম্প্রদায়ভেদে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যাভেদ হইয়াছে। পরে শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত নৈয়ায়িক বৈদান্তিক অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি বেদান্ত-সূত্রের "সমঞ্জসা" নামে যে লঘুবৃত্তি রচনা করেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারে কোন কোন সূত্রের নূতন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। ঐ বৃত্তির প্রকাশ অত্যাবশ্যক। কিন্তু বিমানবাবুর প্রদত্ত বহু সংস্কৃত বৈষ্ণব-গ্রন্থতালিকায় ঐ গ্রন্থের নাম দেখিলাম না। *

পরন্তু কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিরূপে বলিয়াছেন,—

"বেদ না মানিঞা বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক॥"

(মধ্য ষষ্ঠ ১৫২)।

কিন্তু ইহাতেও প্রশ্ন হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেব কি সত্যই শঙ্করাচার্য্যকেও নাস্তিক বলিয়াছিলেন? ইহা কি সম্ভব? পাণিনির "অস্তি নাস্তি দিষ্টংমতিঃ"—এই সূত্রানুসারে "দিষ্টং পরলোকোনাস্তি ইতি মতির্যস্য" এই অর্থে "নাস্তিক" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং পরলোকের নাস্তিত্ববাদীই "নাস্তিক" শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ। আর মনু বলিয়াছেন, "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।" কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন অর্থেই শঙ্করাচার্য্যকে নাস্তিক বলাই যায় না। অতএব কবিরাজ গোস্বামীর "বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক", এই কথার অর্থ কি?" *

অনেক দিন হইতেই "চরিতামৃতে"র উক্ত স্থলে কবিরাজ গোস্বামীর ঐ সমস্ত কথায় ঐরূপ অনেক প্রশ্ন হইতেছে। অনেক জিজ্ঞাসু সজ্জন আমার নিকটেও ঐরূপ অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু "চরিতামৃতে"র স্বাধীন সমালোচনায় বহুলেখক বিমানবাবুও ঐ সমস্ত প্রশ্নের কোন অবতারণা করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ঐ বৃত্তির পুথি দ্রষ্টব্য। উহার সংখ্যা—১৩৬৭। উহার শেষে শ্লোক দেখিয়াছি,—"কৃষ্ণ-প্রেম সুধাব্ধি মগ্ন মনসোরূপ স্বরূপাদয়ো জাতা যৎ কৃপয়ৈব সম্প্রতিবয়ং সর্ব্বেকৃতার্থা যতঃ। এষা বৃত্তিরনন্তবৈষ্ণবমনোমোদায় সাধীয়সী, শ্রীচৈতন্যহরেদয় ময় তনোস্তস্তোপহারায়তাং।"

* কোন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ঐকথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ—বেদের আশ্রয় স্বীকার করিয়াও (বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও) যাহারা নাস্তিকবাদ প্রচার করে, তাহারা বৌদ্ধেতে অধিক—বৌদ্ধ অপেক্ষাও ঘৃণিত অধম"। কিন্তু বৈষ্ণবগণ সকলেই জানেন,—"সতাংনিন্দা নাম্নঃ প্রথমমপরাধং বিতনু তে।" আচার্য্যগণের নিন্দাই প্রথম নামাপরাধ। আর যিনি প্রথমে সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন —"মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন,"—সেই 'তৃণাদপি সুনীচ' নাম-ধর্ম্ম প্রচারক লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব কি তখন শঙ্করাচার্য্যেরও ঐরূপ অনাবশ্যক নিন্দা করিতে পারেন? উক্তরূপ বর্ণনার দ্বারা তাঁহার সেই জগৎপূজ্য আদর্শ চরিত্রের খর্ব্বতারই প্রকাশ করা হয় নাকি?

'বনফুল'

৯

শিয়ালদহ অঞ্চলে গলির মধ্যে ছোট একটি বাসা। সেই বাসার ক্ষুদ্র একটি ঘরে মৃন্ময় মুখোপাধ্যায় ওরফে মোমবাতি নিবিষ্ট চিত্তে একখানি পত্র লিখিতেছিলেন। ঘরটিতে আসবাবপত্রের মধ্যে ছোট একখানি সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিল, একটি দেওয়াল-ঘড়ি, একখানি চেয়ার এবং কাছেই একটি রিভলভিং বুক শেল্ফ্ রহিয়াছে। টেবিলের উপর একটি ইলেকট্রিক আলো। আলোর ডোমটি গাঢ় রক্তবর্ণ, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড রক্তজবা বাঁকা বৃন্তের উপর বিদ্যুৎতাড়িত হইয়া উঠিয়াছে। রঙীন চিঠির কাগজে গভীর মনোনিবেশ সহকারে মৃন্ময়বাবু যে পত্রখানি লিখিতেছিলেন তাহা এই:

প্রিয়তমাসু,

কাল নানা গোলমালের মধ্যে ছিলাম বলিয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই। লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ করিও না। কাল এক জায়গায় কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিতে শুনিতে এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, শেষ পর্য্যন্ত আমি মূর্চ্ছা যাই। রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন বিরহ-কাহিনীর মধ্যে আমি তোমারই গভীর বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। আমার মনে হইতেছিল যেন কীর্ত্তনিয়ার কণ্ঠে রাধার জবানিতে তোমারই অন্তরের আকুলতা তুমি নিবেদন করিতেছ। সে নিবেদন এত করুণ, এত মর্ম্মস্পর্শী যে আমি নিজেকে ঠিক রাখিতে পারি নাই, জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। জ্ঞান হইলে দেখিলাম ভণ্টু আমাকে শুশ্রূষা করিতেছে। সে-ই আমাকে গভীর রাত্রে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেইজন্য কাল আর আমি তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। কিন্তু সেই কীর্ত্তন শুনিবার পর হইতে অহরহ তুমি আমার মন জুড়িয়া বসিয়া আছ। তোমার অশ্রু ছলছল ডাগর চক্ষু দুইটি আমার মনের মধ্যে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কোথায় তুমি? বিশ্বাস কর, আমি তন্ন তন্ন করিয়া তোমাকে খুঁজিয়াছি। এখনও খুঁজিতেছি এবং চিরকাল খুঁজিব। তোমাকে খোঁজাই আমার জীবনের ব্রত। সেই জন্যই পুলিশ অফিসারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পুলিশে চাকুরি লইয়াছি—তোমাকে খুঁজিয়া আমি বাহির করিবই। ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য, পুলিশে চাকুরি করা অথবা পুনরায় বিবাহ করা উপলক্ষ মাত্র। এই কথাটি আমি প্রতিদিন লিখি, আজও আবার লিখিলাম। কারণ ইহাই আমার জীবনের মন্ত্র। মন্ত্রকে জাগ্রত রাখিতে হইলে প্রতিদিন তাহা জপ করিতে হয়। হাসিকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছি তাহা সত্য, কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি তাহাই আমাদের দেশে আমার মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানের পক্ষে এক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। পুলিশে চাকুরি লইলে ভাল করিয়া তোমার সন্ধান করিতে পারিব। কিন্তু পুলিশ অফিসারের জামাই হওয়া ছাড়া এ লাইনে ঢুকিবার অন্য কোন প্রকার উপায় বা যোগ্যতা আমার ছিল না। হাসি নির্দ্দোষ তাহা জানি, কিন্তু উপায় নাই। দেবীপূজায় চিরকাল নিরীহ জীবহত্যা হইয়া আসিতেছে—ইহা সনাতন নিয়ম। ইহা পরিবর্ত্তন করিবার সাধ্য আমার ছিল না। হাসিকে মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিয়াছি বটে কিন্তু অন্তরে স্থান দিতে পারি নাই। কারণ সেখানে তুমি বিরাজ করিতেছ। এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার অন্তর তুমি ত্যাগ কর নাই। হাসিকে স্থান দিব কোথায়? পাশের ঘরেই সে আমার অপেক্ষায় শুইয়া আছে। একটু পরেই আমিও তাহার পাশে গিয়া শয়ন করিব। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কিন্তু ঘুচিবে না। আমার এবং হাসির মধ্যে তুমি তোমার সমস্ত সত্তা লইয়া দাঁড়াইয়া আছ। তোমাকে অতিক্রম করে এমন সাধ্য হাসির নাই।

কিন্তু তুমি কোথায় আছ? এসো, আমার স্বপ্নের মধ্যে আজ। রোজই ত তোমায় স্বপ্নে দেখা দিতে বলি, কই আস না ত! আমার জাগ্রত লোকের প্রতি মুহূর্ত্তটি তুমি অধিকার করিয়া থাকো, স্বপ্নলোকে তোমায় তেমনভাবে

পাই না কেন? ঘুমের ঘোরে তোমাকে যেন হারাইয়া ফেলি। তাই মনে হয়, জাগিয়া বসিয়া থাকি। জাগিয়া বসিয়া তোমার কথা চিন্তা করি। আমার মনের আকুলতা লিখিয়া বোঝান অসম্ভব। তবু রোজ লিখি, না লিখিয়া পারি না। আজ স্বপ্নে নিশ্চয় দেখা দিও। তোমার জন্য তৃষিত হইয়া আছি। কবে তুমি আসিবে? ইতি—

তোমারই
মৃন্ময়

পত্রখানি শেষ হইলে মৃন্ময়বাবু একটি রঙীন খাম বাহির করিয়া পত্রখানি তাহার মধ্যে পুরিলেন এবং সেটি শিল করিয়া তাহার উপর লিখিলেন—শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী। তাহার পর টেবিলের দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি চন্দন কাঠের বাক্স বাহির করিলেন এবং সেই বাক্সের মধ্যে পত্রখানি রাখিয়া দিলেন। বাক্সে অনুরূপ আরও অনেক পত্র ছিল। চন্দনের বাক্সটি দেরাজে পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিয়া মৃন্ময়বাবু উঠিয়া পড়িলেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল। মৃন্ময়বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার ঘড়িটার পানে চাহিলেন ও তৎপরে টেবিল ল্যাম্পটি নিভাইয়া দিয়া ধীরপদসঞ্চারে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন হাসি ঘুমাইতেছে। নিরীহ কিশোরী মূর্ত্তি। বয়স বড় জোর চৌদ্দ কি পনর। পরনে একখানি রাঙা ডুরে শাড়ি। সুডোল হাতে সোনার চুড়ি। পাড় বসানো গোলাপী রঙের একখানি র‍্যাপার গায়ের উপর পড়িয়া আছে। নির্নিমেষ নেত্রে মৃন্ময় কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে ডাকিলেন।

হাসি, ওঠ, চল এবার খাওয়া দাওয়া করা যাক্—

হাসি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল ও চক্ষু দুইটি কচলাইতে কচলাইতে বলিল, ওই দেখ, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া বলিল, চল, নেচি কেটেই রেখেছি, শেকে দিতে আর কতক্ষণ যাবে? গরম গরম শেকে দিই গে চল। অনেক রাত হয়ে গেছে, নয়? কি করছিলে এতক্ষণ বাইরের ঘরে বসে?

মৃন্ময় অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, আপিসের কাজকর্ম্ম করছিলাম।

হাসি হাসিয়া বলিল, আর আমি শুয়ে কেমন ঘুমুচ্ছিলুম! সত্যি ভারি স্বার্থপর আমরা, তোমরা মুখে রক্ত উঠিয়ে রোজগার করে আনবে আর আমরা দিব্যি মজা করে তা খরচ করব। তুমি বেচারি ওঘরে খেটে মরছ আর আমি কেমন আরাম করে ঘুমুচ্চি! মুখে আগুন আমাদের—

ম্লান হাসি হাসিয়া মৃন্ময় বলিলেন, উপায় কি।

হাসি গা ভাঙিয়া সহাস্য মুখে বলিল, সত্যি, আমারও না ঘুমিয়ে উপায় নেই! বাপ মা বাঙলা লেখাপড়াটা পর্য্যন্ত শেখায় নি যে বইটই পড়ে সময় কাটাই! নিজের বাপ মাই মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় বড়, আমার এ ত পাতান বাপ মা—বলিয়া হাসি কাপড়টাকে বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া বলিল, উঃ, শীত করছে, র‍্যাপার জড়িয়ে রান্নাবান্না করা যে কি মুস্কিল, তোমাকে ত বলে বলে হার মানলাম, সোয়েটার একটা তুমি কিনে দিলে না! চল, উনুন ধারে যাই, বড্ড শীত করছে—

রোজই ভুলে যাই, কাল কিনে আনব ঠিক!

নিজের বাপ মা থাকলে শীতের তত্ত্ব করত, পাতানো বাপ মা কি-না তাই ওসব বাজে খরচের দিকে যেতে চায় না!

হাসি বড় পুলিশ অফিসারের কন্যা বটে, কিন্তু পালিতা কন্যা। আসলে ভদ্রলোক হাসির দূর সম্পর্কের পিসামহাশয়। অসহায়া পিতৃমাতৃহীনা বালিকাটিকে মানুষ করিয়াছিলেন এবং চাকুরির প্রলোভন দেখাইয়া মৃন্ময়ের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন।

মৃন্ময়ের পূর্ব্বপত্নী যে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন কিন্তু হাসিকে সেকথা ঘুণাক্ষরে জানান নাই। মৃন্ময় প্রশ্ন করিলেন, চিন্ময় খেয়েছে?

কোন্ সকালে খেয়ে নিয়েছে ঠাকুরপো নটা বাজতে না বাজতেই! কলেজে সমস্ত দিন থাকে, ছেলেমানুষ ত, খিদে পেয়ে যায়! চল, উনুনও বোধ হয় এতক্ষণ নিবে ধুস হয়েছে! মৃন্ময়ের ভাই চিন্ময় মফঃস্বল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আসিয়া এই বছর কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। উপরের ঘরখানায় সে থাকে। সেইটিই তাহার পড়িবার ও শুইবার ঘর। হাসি ও মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সামান্য একফালি উঠানের পরই

সাগর কূলে

রান্নাঘর। রান্নাঘরে ঢুকিয়াই হাসি বলিল, যা ভেবেছি তাই, এতক্ষণ কি আর আঁচ থাকে? আঁচের আর অপরাধ কি! স্টোভটা জ্বালি, থাম।

হাসি স্টোভ বাহির করিয়া জ্বালিতে বসিল এবং স্পিরিট ঢালিতে ঢালিতে বলিল, স্টোভে আবার রুটি ভাল হয় না।

মৃণ্ময় নিকটস্থ একটি বালতি হইতে জল লইয়া হাতমুখ ধুইতে লাগিলেন, এ মন্তব্যের কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিল। তাহার পর হাসি জ্বলন্ত স্পিরিটের দিকে চাহিয়া মৃণ্ময়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, হ্যাঁগা, একটা কথা রাখবে আমার?

কি কথা?

পরেশবাবুদের বাড়িতে এমন সুন্দর সুন্দর বেরালছানা হয়েছে! তুমি যদি বল—নিয়ে আসি একটা চেয়ে!

বেশ ত! এনো।

একটা ধপধপে সাদা বাচ্চা—এমন মিষ্টি হয়েছে দেখতে যে কি বলব!

তাই নাকি?

স্টোভটায় পাম্প করিতে করিতে মহা উৎসাহে হাসি বলিল, দেখবে? নিয়ে আসব এখন? এই ত পাশের বাড়ি, ওরা ঠিক জেগে আছে এখনও—

এখন থাক, কাল এনো।

মায়ের ল্যাজে ছোট্ট ছোট্ট থাবা মেরে মেরে এমন সুন্দর খেলা করছিল আজ দুপুরে, সে যদি দেখতে! কি দুষ্টু দুষ্টু চোখ!

হঠাৎ দুয়ারে কড়া নড়িল। এতরাত্রে কে আবার আসিল!

কে?

মৃণ্ময় বাহির হইয়া গেলেন। কপাট খুলিতেই বড় বড় চুল গোঁফ দাড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোক সহাস্যমুখে বলিলেন, মৃণ্ময় নাকি, ভাল আছ ত সব?

কে, মুকুজ্যে মশাই, আসুন, আসুন—এত রাত্রে হঠাৎ কোথা থেকে?

মুস্কিলে পড়ে এসেছি, চল ভেতরে, সব বলছি।

মৃণ্ময়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুকুজ্যে মশাই আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।

হাসি একমুখ হাসি লইয়া বলিল, ওমা, আপনি!

তাড়াতাড়ি আসিয়া সে মুকুজ্যে মশায়ের পদধূলি লইল—তাহার দেখাদেখি মৃণ্ময়ও প্রণাম করিলেন। মুকুজ্যে মশাই উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া হাস্যস্নিগ্ধমুখে হাসির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভাল আছিস ত পাগলি!

ভুলেও ত খোঁজ নেন না একবার! আজ যে কি ভাগ্যি এলেন!

হাসি অভিমান ভরে ঠোঁট দুইটি ফুলাইল। মুকুজ্যে মশাই একটু হাসিয়া বলিলেন, স্বামীর কাছে আছিস্—এখন আর খোঁজ নেবার দরকার নেই ত!

দরকার না থাকলে বুঝি আসতে নেই!

মুকুজ্যে মশাই সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। মুকুজ্যে মশাইকে দেখিলেই আপনার জন বলিয়া মনে হয়। যদিও মুখময় কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি, মাথায় তৈলবিহীন চুল—কিন্তু এমন একটি স্নিগ্ধ হাস্য-শ্রী তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলকে ও আয়ত রক্তাভ চক্ষু দুইটিকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিবামাত্রই ভিতরকার স্নেহময় মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব হয় না।

হাসি বলিল, কোথায় এসে উঠেছেন আপনি? আজ আপনাকে ছাড়ছি না, এখানে খেয়ে যেতে হবে।

মৃণ্ময়ও বলিলেন, আপনি কোলকাতায় কবে এসেছেন? কিচ্ছু জানি না ত!

হাসি বলিল, ওঁর ওই রকমই কাণ্ড।

মুকুজ্যে মশাই আর একটু হাসিয়া বলিলেন, এসেছি তিন-চার দিন হ'ল। শিরিষের ছেলের অসুখের খবর পেয়ে এসেছিলাম। ছেলেটি এই কিছুক্ষণ হ'ল মারা গেছে। শিরিষ বেচারা পড়েছে মুস্কিলে। তাকে ত এখানে এখনও বিশেষ কেউ চেনে না, সে এই অল্প ক'দিন হ'ল এখানে বদলি হয়ে এসেছে। সৎকার করবার লোক জুটছে না, তাই আমাকে বেরুতে হ'ল। তোমাদের দু'ভায়ের মধ্যে একজনকে যেতে হয়। একজন বাড়িতে থাকো, পাগলিটা আবার না হ'লে ভয় পাবে। চিনি ত ওকে, ভয়ানক ভীতু—

বলিয়া মুকুজ্যে মশাই হাসির দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

হাসি এতক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে এই মৃত্যু-সংবাদ শুনিতেছিল। হঠাৎ ভীতু অপবাদে মুকুজ্যে মশায়ের দিকে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল এবং বলিল, এক্ষুণি যেতে হবে? তা হ'লে রুটি কটা তাড়াতাড়ি তৈরি করে দি!

তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়নি বুঝি এখনও ?

ঠাকুরপোর খাওয়া হয়ে গেছে, উনি এতক্ষণ কাজ করছিলেন !

মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, চিনুই চলুক। একজন হ'লেই হবে। তিনজন পেয়েছি, তাছাড়া আমি আছি, পাড়া থেকেও দু-একজন হয় ত জুটতে পারে—

মৃণ্ময় বলিলেন, আপনি যাবেন ? যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় আপনার ?

মৃণ্ময়ের চিন্তার কারণ ছিল। মুকুজ্যে মশায়ের অঙ্গে একটি সুতির বোম্বাই চাদর ভিন্ন আর কোন আবরণ ছিল না। খালি পা। চিরকালই তাঁহার এই বেশ। মৃণ্ময়ের কথা শুনিয়া মুকুজ্যে মশায়ের বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমার ? আমার কিচ্ছু হবে না !

হাসি পাকা গিন্নির মত পুনরায় মন্তব্য করিল—ওঁর ওই রকমই কাণ্ড !

মৃণ্ময় বলিলেন, তার চেয়ে বরং আপনি হাসিকে আগলান, ঠিকানাটা ব'লে দিন, আমি আর চিনু যাই—

না, না—সেটা ঠিক হয় না। চিনুকে ডাকো তুমি, আমি না গেলে ভাল দেখায় না।

অগত্যা চিনুকে ডাকিতে হইল। ডাকাডাকিতে চিনু উপরের ঘর হইতে নামিয়া আসিল। সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে মিটি মিটি মুকুজ্যে মশায়ের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিবা-মাত্র সহাস্য মুখে আসিয়া পদধূলি লইল। এই বাড়িতে হাসি ছাড়া চিনুও মুকুজ্যে মশায়ের অতিশয় প্রিয়। চিন্ময়ের চেহারা মৃণ্ময়েরই অনুরূপ, কেবল তাহার বয়স কম ও মাথার চুল কটা নয়, কালো। সমস্ত শুনিয়া চিন্ময় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মুকুজ্যে মশায়ের সাহচর্যে এই শীতের রাত্রে মড়া পোড়াইতে যাইতে হইবে ! সে যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া নিজের র‍্যাপারখানা লইয়া আসিল।

চিন্ময়কে লইয়া মুকুজ্যে মশাই চলিয়া গেলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে হাসি মৃণ্ময়কে বলিল, ওগো, তুমি আর একটু সরে এসো, আমার ভারি ভয় করছে।

মৃণ্ময় চোখ তুলিয়া একটু হাসিল।

না, তুমি সরে এসো লক্ষ্মীটি, মড়ার কথা শুনলে আমার বড্ড ভয় করে !

আর একটু হাসিয়া মৃণ্ময় হাসির নিকটে গিয়া বসিলেন। হাসি রুটি শেকিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

১০

নির্জ্জন দ্বিপ্রহর।

নিজের শয়নকক্ষে ঘন নীল রঙের একটি সুন্দর আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া একটি গদি-আঁটা আরাম চেয়ারে বসিয়া মিষ্টিদিদি একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বাড়ীতে কেহ নাই। সোনা তাহার এক বান্ধবীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। রিণি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে। মিষ্টিদিদি তন্ময় চিত্তে উপন্যাসখানি পাঠ করিতেছিলেন, গ্রাস করিতেছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিছনের জানালা দিয়া একফালি রোদ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ও বামগণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে। বাম কর্ণের সোনার দুলটা রৌদ্রকিরণে চকমক করিতেছে। মিষ্টিদিদির চক্ষু দুইটিও চকমক করিতেছে, অধর মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত। উপন্যাসে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যাহা মুখরোচক এবং উত্তেজনাপূর্ণ। মিষ্টিদিদির নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ একটা শব্দে মিষ্টিদিদি ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন। বাতায়ন-পথে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল ছাতের ওধারে আলিসার উপর একজোড়া পারাবত আসিয়া বসিয়াছে। পুরুষ পারাবতটি গলা ফুলাইয়া ফুলাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বকবকম ধ্বনিতে প্রণয় নিবেদন করিতেছে। তাহার স্ফীয়মান কণ্ঠদেশে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া ময়ুর কণ্ঠের শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রতি গ্রীবাভঙ্গীতে ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য্য ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মিষ্টিদিদি আবার পুস্তকে মন দিলেন।

এমন সময় নীচে ফোন বাজিয়া উঠিল। 'বয়' আসিয়া খবর দিল যে সাহেব তাঁহাকে ফোনে ডাকিতেছেন। মিষ্টি-দিদি নামিয়া গিয়া ফোন ধরিলেন। মিত্র সাহেব ফোনে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার ফিরিতে অনেক রাত হইবে। বৈকালেও তিনি আসিতে পারিবেন না, কলেজে একটা মিটিং আছে এবং তৎপরে তাঁহাকে এক বন্ধুর বাড়িতে

ডিনার খাইতে যাইতে হইবে। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন পারাবত দম্পতী উড়িয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে ঘরের কোণে তেপায়াতে রক্ষিত ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটি সবল নগ্ন পুরুষ একটা বিরাটকায় অজগরকে বিধ্বস্ত করিতেছে। তাহার শরীরের সমস্ত পেশী শক্তির উন্মাদনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মিষ্টিদিদি কিছুক্ষণ প্রতিমূর্ত্তিটির পানে তাকাইয়া উঠিয়া বিছানায় গেলেন ও সবলে পাশ বালিশটাকে আঁকড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি বালিশে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

১১

শঙ্কর সুরমার পত্রখানি আবার পড়িতেছিল। এখানি সুরমার দ্বিতীয় পত্র। প্রথম পত্রের উত্তর না পাইয়া আর একখানি পত্র লিখিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে জিনিসটা একটু অস্বাভাবিক, সাধারণত এ রকম হয় না। কিন্তু অসাধারণ ব্যাপারও পৃথিবীতে অসম্ভব নহে। সুরমাও সাধারণ শ্রেণী-ভুক্তা নহেন। সুতরাং সুরমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন একটু-আধটু খটকাজনক ঘটনা ঘটিবেই। সাহিত্য-প্রীতিরূপ দুষ্টবায়ু যাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে তাঁহার চালচলন আচার-ব্যবহার সাধারণ আইন-কানুন মানিয়া চলিবে না ইহাই স্বাভাবিক—তা তিনি নারীই হউন আর পুরুষই হউন।

শঙ্করের দ্বিপ্রহরে দুই পিরিয়ড্ ছুটি আছে, কলেজ-স্কোয়ারের নির্জ্জন কোণটুকুও ভারি সুন্দর লাগিতেছে। সুরমার পত্রখানি ইতিপূর্ব্বে সে বহুবার পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে। সুরমা যাহা লিখিয়াছে তাহার অর্থবোধ করা খুব কঠিন নহে। কিন্তু শঙ্করের মনে হইতেছে পত্রখানিতে অর্থাতীত এমন কিছু আছে যাহা একবার দুইবার পড়িয়াই নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায় না, বারম্বার পড়িতে হয়। একস্থানে সুরমা লিখিয়াছে—

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কত অল্প, অথচ আপনার চিঠি না পেয়ে এত খারাপ লাগছে! এর থেকে কি প্রমাণ হয় বলুন ত। হয় ত কিছুই প্রমাণ হয় না, কিম্বা হয় ত এর থেকেই কোন নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ মস্ত বড় কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন। সে যাই হোক, একথা কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই যে আপনার চিঠি না পেয়ে ভারি খারাপ লাগছে। আপনার সঙ্গে আত্মীয়তাটা অবশ্য তত ঘনিষ্ঠ নয় যে অভিমান আবদার করা চলে, তাই আপনাকে শুধু অনুরোধ করছি চিঠির উত্তর দেবেন এবার নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ অবশ্য স্বল্প। কিন্তু স্বল্প পরিচয়েই আপনার বিশিষ্ট রূপটি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে যেন। আজকালকার দিনে বেশ তাজা জীবন্ত মানুষ কমই চোখে পড়ে। জীবন্ত মানুষ মানে বাঘ ভালুকের মত বন্য পশু নয়, জীবন্ত মানুষ মানে যে মানুষ সভ্যতার অতিবর্ষণে গলিত হয়ে যায় নি, সভ্যতার রসে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রশংসা করছি বলে যেন অহঙ্কারে ফুলে উঠবেন না। আপনার সম্বন্ধে সত্যি যা মনে হয়েছে তাই লিখলাম। আপনাকে আর একটা কথা বলব? রাখবেন কথাটা? আপনার যে কবিতাগুলো দেখিয়েছিলেন সেগুলো ছাপিয়ে ফেলুন। সত্যিই ওগুলো ছাপাবার যোগ্য। আমাকে দিন বরং আমি ছাপিয়ে দিই। এমন সুন্দর করে ছাপিয়ে দেব, দেখবেন তখন। আর নতুন কিছু লিখেছেন না কি? লিখলে আমাকে পাঠাতে হবে কিন্তু। আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মনে আছে ত? কবিতা লিখে আগে আমাকে দেখাতে হবে। আমাকে প্রথমে দেখিয়ে তবে অপরকে দেখাতে পারবেন। আমি হতে চাই আপনার কবিতার প্রথম পাঠিকা। কাল এখানে সমুদ্রের ধারে বসে বসে আপনার "কল-কল্লোল" কবিতাটার লাইনগুলো মনে পড়ছিল। কবিতাটা টুকে পাঠিয়ে দেবেন? সত্যি বলছি ভারি সুন্দর কবিতাটি।

এই কথাগুলি বারম্বার পড়িয়াও শঙ্করের তৃপ্তি হইতেছিল না। কয়েকবার পড়িয়া শঙ্কর পত্রখানি পকেটে রাখিয়া দিল ও স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, গতকল্য যে চিঠিখানা সে সুরমাকে লিখিয়াছে তাহাতে ও কথাটা সে না লিখিলেই পারিত। নানা কাজের ভিড়ে সুরমার কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সেই জন্য পত্র দিতে পারে নাই এই সত্যভাষণটুকু সে না করিলেই পারিত। আর তা ছাড়া সত্যই ত সে বিস্মৃত হয় নাই। সে সুরমাকে পত্র লেখে নাই সঙ্কোচভরে, পাছে কেহ কিছু মনে করে। সহজ সত্য কথাটা লিখিলেই

ঢুকিয়া যাইত। অনর্থক একজন ভদ্রমহিলার মনে আঘাত দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। কি করিয়া পরবর্ত্তী পত্রে এই গ্লানিটুকু মুছিয়া ফেলা যায় সে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল ওধারের গেট দিয়া রিণি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে আর একটি তরুণী। তাহারা কাছাকাছি আসিতেই শঙ্কর নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশ্ন করিল, কোথায় চলেছেন?

রিণি সলজ্জ হাসিয়া উত্তর দিল, পুরানো বই-এর দোকান-গুলো ঘুরব একটু—

চলুন, আমিও যাই, আমারও বই কেনার দরকার আছে কয়েকটা।

ইহা শুনিয়া অপর মহিলাটি বলিল, তবে আমাকে এইবার ছুটি দে রিণি, সঙ্গী ত একজন পেয়েই গেলি, তাছাড়া অপূর্ব্ববাবুও ত আসবেনই—বোধ হয় এসেছেন এতক্ষণ।

রিণি তথাপি বলিল, না, তবু তুমি চল বেলা-দি।

নামটা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্যে তাঁহাকে নমস্কার করিল এবং বলিল—আপনার নাম শুনেছিলাম অপূর্ব্ববাবুর কাছে, আজ দেখাটা হয়ে গেল!

বেলাদিদি একবার চকিতে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্করকে প্রতি-নমস্কার করিলেন ও বলিলেন, আপনার পরিচয়টিও দিন তা হ'লে?

রিণি বলিল, উনি শঙ্করবাবু, সেই যে মিষ্টিদিদি সেদিন তোমায় বলছিলেন। উৎপলবাবুর বন্ধু উনি!

ও, আপনিই শঙ্করবাবু? বেলাদিদি স্মিতমুখে শঙ্করের পানে চাহিলেন ও দন্তদ্বারা অধরোষ্ঠ ঈষৎ দংশন করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন, আপনি নাকি খুব বড় কবি? অপূর্ব্ববাবু বলছিলেন।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, লিখি বটে মাঝে মাঝে, তবে সে এমন কিছু নয়—

তিনজনে গল্প করিতে করিতে কলেজ স্কোয়ার হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শঙ্কর আবার রিণিকে প্রশ্ন করিল, পুরোনো বই-এর দোকানে কি বই কিনবেন আপনি?

বেলাদিদি অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বঙ্কিম চাহনিতে রিণির পানে একবার চাহিলেন ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

রিণি সঙ্কুচিত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্তত করিয়া উত্তর দিল, কিছু ঠিক করিনি এখনও। পুরানো বই আমার খুব ভাল লাগে। নতুন বই কেনার চেয়ে পুরোনো বই কিনতে আমার বেশী ইচ্ছে করে।

বেলাদি এই উক্তিতে সহাস্য ওষ্ঠ-ভঙ্গী করিলেন ও বলিলেন, সবাই কবি!

শঙ্কর বলিল, আপনিও নন কি?

আমি? বেলাদি অধর দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গী সহকারে প্রশ্ন করিলেন।

নিশ্চয়! কবি না হ'লে ব্লাউসের রঙের সঙ্গে শাড়ির রঙের এমন সামঞ্জস্য করতে পারতেন? অমন সুন্দর নাগরা জোড়া, অমন সুন্দর দুল দু'টি পছন্দ করা আপনার পক্ষে সম্ভবই হ'ত না—যদি আপনি কবি না হতেন! কবি সবাই—কেউ কবিতা লেখে, কেউ লেখে না।

মোটেই না - ও সব বাজে কথা।

বেলাদি হাসিতে হাসিতে সজোরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া সস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

বেলাদি আবার অধর দংশন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, আপনি শুধু কবিই নন দেখছি, আরও অনেক গুণ আছে আপনার।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, নিশ্চয়! আমি নির্গুণ ব্রহ্ম নই একথা মুক্ত-কণ্ঠেই স্বীকার করছি।

বেলাদির চক্ষু দুইটি ছদ্মকোপে ভাষাময় হইয়া উঠিল।

তাঁহারা কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে পুরাতন পুস্তকের দোকানগুলির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। বেলাদি ও শঙ্করই এতক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। রিণি চুপ করিয়াছিল, সে এবার কথা কহিল, অপূর্ব্ববাবু এসেছেন দেখছি—ভোলেন নি!

ভুলবে? বলিস্ কি?

বলিয়া বেলাদি চকিত দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। শঙ্কর তাঁহার সে চাহনি দেখিতে পাইল না, কারণ সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপূর্ব্ববাবুকেই

দেখিতেছিল। দিবালোকে লোকটাকে আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। নাকের কাছে খানিকটা পাউডার লাগিয়া রহিয়াছে, লম্বা কোঁচাটা খর্ব্বাকৃতির সহিত মোটেই খাপ খায় নাই, পাঞ্জাবিটাও হাঁটু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে। পাঞ্জাবির রঙও অদ্ভুত! এ রকম অদ্ভুত পাঞ্জাবি পরে না কি পুরুষ মানুষে! আশ্চর্য্য মেয়েলি রুচি লোকটার। লাজুক চক্ষু দুইটি তুলিয়া বিনয়-নম্র মিহি-কণ্ঠে অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনি এসেন কোথা থেকে?

প্রতিনমস্কার করিয়া শঙ্কর বলিল, কলেজে পড়ি সুতরাং কলেজ ষ্ট্রীটে আমার আবির্ভাবের হেতু খুঁজে পাওয়া ত শক্ত নয়; কিন্তু আপনি ত ক্লাইভ ষ্ট্রীটের লোক, আপনাকেই কলেজ ষ্ট্রীটে দেখে আমার আশ্চর্য্য লাগছে।

অত্যন্ত কাচুমাচু হইয়া অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, তা বটে, মিস্ মিত্রের সঙ্গে এনগেজমেণ্টটা ছিল তাই, মানে ঘণ্টাখানেক ছুটি নিয়ে—আমাদের বড়বাবুও আবার, অর্থাৎ—

অপূর্ব্ববাবু কথা আর শেষ করিতে পারিলেন না; নতচক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি এসেন্স-সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও কপাল মুছিতে মুছিতে চকিতদৃষ্টিতে একবার বেলাদির পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনিও এসে গেছেন, ভালই হয়েছে! আপনাকেও এ সময় এ স্থানে দেখব প্রত্যাশা করিনি। অপ্রত্যাশিত জিনিস ত অহরহই ঘটবে—কি বলেন শঙ্করবাবু?

বেলাদি শঙ্করের দিকে চাহিতেই শঙ্কর বলিল, নিশ্চয়।

মোড়ের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, তা হ'লে চলুন বইগুলো দেখা যাক্। আসুন।

একটা দোকানে তাহারা ঢুকিয়া পড়িল।

অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর শেলির কাব্যগ্রন্থাবলী একখণ্ড রিণির পছন্দ হইল। বেশ সুন্দর দামী সংস্করণ। অপূর্ব্ববাবু তাহার দাম দিলেন ও পুস্তকটি হস্তে লইয়া বলিলেন, পরশু ঠিক সময়ে নিয়ে যাব আমি। কিছু লিখে দিতে চাই—অর্থাৎ —বলিয়া একটু অপ্রস্তুত মুখে থামিয়া গেলেন।

শঙ্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বেলাদির পানে চাহিতেই তিনি ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন, পরশু রিণির জন্মদিন। অপূর্ব্ববাবু রিণিকে একটা উপহার দেবেন। সাধারণত লোকে নিজেই কিনে নিয়ে যায় ওসব জিনিস, কিন্তু অপূর্ব্ববাবুর সব বিষয়ই একটু বিশেষত্ব আছে ত—উনি রিণিকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে তবে কিনবেন! বলিয়া বেলাদি তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে অধর দংশন করিয়া অপূর্ব্ববাবুর প্রতি একটা ব্যঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ওমা, ঠিক এই এডিসনের একটা কীট্‌স্‌ও রয়েছে যে—

রিণি একটা বুক শেল্‌ফের কোণ হইতে কীট্‌স্‌কে টানিয়া বাহির করিল। শুধু বাহির করিল নয়, লুব্ধভাবে তাহার পাতাগুলি উলটাইতে লাগিল। অপূর্ব্ববাবু একটা ঢোক গিলিয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া গম্ভীরভাবে বেলাদি বলিলেন, ওটাও নেওয়া উচিত। ওটাও কিনে নিন অপূর্ব্ববাবু!

বেশ ত বেশ ত!

অপূর্ব্ববাবু কিন্তু মনে মনে ঘামিতে লাগিলেন। তাঁহার কাছে আর পয়সা ছিল না।

এটাও নিই তা হ'লে? ঘাড় ফিরাইয়া রিণি স্মিত হাস্যে অপূর্ব্ববাবুকে প্রশ্ন করিলেন।

বেশ ত বেশ ত! আমি নিয়ে যাব ওটা পাঁচটার পর এসে, মানে এখন আমার কাছে দামটা ঠিক নেই—মানে, দশটাকার নোট আনতে ভুলে একটা পাঁচটাকার নোট—মানে, তাড়াতাড়িতে—

অপূর্ব্ববাবু অকারণে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া সেটা খুলিয়া সেই দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। শঙ্করের কাছে টাকা ছিল। সে তৎক্ষণাৎ একটা দশটাকার নোট বাহির করিল ও অপূর্ব্ববাবুকে বলিল—এই যে নিন না, আমার কাছে আছে।

বেলাদির চক্ষু দুইটিতে দুষ্টামির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রিণি একটু কুণ্ঠিত সলজ্জকণ্ঠে বলিলেন, থাক, আর দরকার নেই তা হ'লে।

আমার দরকার আছে।

শঙ্কর বহিখানি কিনিয়া লইল। অপূর্ব্ববাবুর মুখ চোখের ভাব এমন করুণ হইয়া উঠিল—যেন কেহ তাঁহার গালে চড় মারিয়া তাঁহার মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইয়াছে।

বেলাদি হাসিয়া বলিলেন, এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না

শঙ্করবাবু, অপূর্ব্ববাবুকেই ওটা কিনতে দেওয়া উচিত আপনার—

হ্যাঁ, অপূর্ব্ববাবুর জন্যেই ত কিনলাম ওটা। এখন টাকা নেই ওঁর কাছে—বইটা যদি বিক্রি হয়ে যায় আবার! এই নিন্। শঙ্করবাবু বইখানি অপূর্ব্ববাবুকেই দিল।

ধন্যবাদ, দামটা আপনাকে নিতে হবে কিন্তু।

বেশ দেবেন।

শঙ্কর নূতন পুস্তকের খোঁজে একটা শেল্‌ফের পিছনের দিকে গেল। দেখিল যে পিছনের দিকে একই সংস্করণের বায়রন ও বার্ণস্‌ও রহিয়াছে। সে দুটিও সে কিনিয়া লইল। তাহার পর একটু ভাবিয়া পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া অপর সকলের অগোচরে বহি দুইখানিতে কি যেন লিখিল। তাহার পর বই দুটি বগল-দাবা করিয়া সে বলিল, এইবার যাওয়া যাক তা হ'লে! মিস মিত্র কি কলেজ যাবেন নাকি?

হ্যাঁ।

আর আপনি?—বেলাদিকে সে প্রশ্ন করিল।

আমিও ওই দিকেই যাব। অপূর্ব্ববাবু ত আপিস যাবেন?

হ্যা, আমাকে আপিসে ফিরতে হবে।

চারিজনে বাহির হইয়া ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন।

অপূর্ব্ববাবুর ট্রাম আসিতে তিনি সবিনয় নমস্কারাদি শেষ করিয়া ট্রাম ধরিয়া আপিসে চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল, চলুন না হাঁটাই যাক একটু।

তিনজনে হাঁটিতে সুরু করিলেন।

বেলাদি বলিলেন, আপনি কি বই কিনলেন, দেখি!

দেখাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

কি অনুরোধ?

অনুরোধটা সামান্যও বলতে পারেন, অসামান্যও বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে আজ আমার প্রথম আলাপ, আজই আপনাকে একটা কিছু উপহার দেওয়া স্পর্দ্ধার মত দেখাবে; কিন্তু আজকের এই প্রথম আলাপটাকে স্মরণীয় করে রাখতে ইচ্ছে করছে। রাগ করবেন?

না, রাগ করব কেন?

তা হ'লে এইটে নিন।

বায়রণের কাব্য গ্রন্থাবলীটি শঙ্কর তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিল।

বেলাদি অধর দংশন করিয়া মলাটটি খুলিয়া পড়িলেন, গোটা গোটা অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা রহিয়াছে—Please accept Byron.—Shankar. তাহার পর চক্ষু তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, I accept. Thanks

তাহার পর রিণির হাতে বার্ণস্‌খানি দিয়া শঙ্কর বলিল, আপনার জন্মদিনের নেমন্তন্ন আমিও পেয়েছি মিস্ মিত্র। যাব ঠিক। কিন্তু একটা উপহার বগলে করে যেতে আমার লজ্জা করবে। ও জিনিসটা ভারি ভাল্‌গার ঠেকে আমার কাছে; তাই ও ব্যাপারটা এখনই সেরে দিলাম। আপনি যে এত কবিতা ভালবাসেন তা ত জানা ছিল না আমার। আমার ধারণা ছিল, সোনাদিই বুঝি কবিতা-পাগল।

এই শুনিয়া বেলাদি বলিলেন, সোনাদি কবি দেখলে কবিতা-পাগল হন, শিল্পী দেখলে ছবি-পাগল হন, বৈজ্ঞানিক দেখলে বিজ্ঞান-পাগল হন!

রিণি কিছু বলিল না। লজ্জিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বেলাদি রিণির হাত হইতে বার্ণস্‌খানি লইয়া বলিলেন, দেখি তোর বইটাতে কি কবিত্ব করলেন উনি!

তার আগে দাঁড়ান আমি যাই—

বলিয়া শঙ্কর আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একখানা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

বেলাদি খুলিয়া দেখিলেন লেখা রহিয়াছে—It Burns.—Shankar.

রিণিও দেখিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল মাটির সহিত মিলাইয়া যাইতে!

বেলাদি অধর দংশন করিয়া ধাবমান ট্রামটার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। (ক্রমশঃ)

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম্　　　　স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

গান

নারায়ণী*—তৃতাল

নারায়ণী উমা খেলে হেসে হেসে।
হিম-গিরির বুকে পাহাড়ী বালিকা বেশে ॥
গিরিগুহা হ'তে জ্যোতির ঝরণা
ছুটে চলে যেন চল-চরণা,
তুষার-সায়রে সোনার কমল যেন
বেড়ায় ভেসে ॥

মাধবী চাঁদ উঠে কৈলাস-চূড়ে,
খেলা ভুলিয়া যায় অনিমেষ চোখে চায়
পাষাণ প্রতিমা প্রায় সেই সুদূরে।
সতীহারা যোগী পাগল শঙ্করে
মনে পড়িয়া তার নয়নে বারি ঝরে,
শিব-সীমন্তিনী পাগলিনী প্রায়
"শিব শিব" ব'লে ধায় মুক্তকেশে ॥

ｏ　　　　　　১　　　　　　+　　　　　　৩
II । সা ণ্া ধ্া | সা -া রা মা | ণা ণধা -া পা | মা -া রা সা I
ｏ না রা য় নী ｏ উ মা খে লে ｏ হে সে ｏ হে সে

I । মা মরা সা | রা -মা পা ধা | র্সা র্সর্রা র্র্সা র্সণা | ধা পধা পা মা II
ｏ হি ম গি রি র্ বু কে পা হা ড়ী বা লি কা০ বে শে

II । ণধা পমা মরা | রমা -পা পা পা | । র্সর্রা র্সর্রা র্সণা | ধা পধান পধা র্সা I
ｏ গি০ রি০ গু হা ｏ হ' তে ｏ জ্যো তি র ঝ র০ ণা০ ｏ

I । পধা র্সর্রা র্র্মা | র্রা -া র্সা র্সা | রমা -পপা -ণণা -ধা | পমা মরা রসা -া I
ｏ ছু০ টে০ চ লে ｏ যে ন চ০ ০০ ০০ ল চ০ র০ ণা০ ｏ

I ৷ রা ণ্‌া সা | রা মা পধা -ণধণধা | ণপা পা -া পা | পণধপা -ণধপা পা পা I
০ তু ষা র সা য় রে০ ০০ সো না র্ ক ম০০০ ০০ল্ যে ন

I ৷ পধা পমা পা | ধর্সা -র্রা র্সর্সা -া | ণা ণধা -া পা | মা -া রা সা II
০ বে০ ড়া০ য়্ ভে০ ০ সে ০ খে লে ০ হে সে ০ হে সে

II মপা -ধর্সা র্রা র্রা | র্সার্র্ র্সা -ণর্সণা পা মা | -া মপমা রা সা | ণ্‌া -ধ্‌া ধ্‌সা -া I
মা০ ০০ ধ বী চাঁ ০ ০ দ্ উ ঠে ০ কৈ ০ লা স চ্ ০ ড়ে ০

I ৷ রা ণ্‌া সা | রা রমা মরা মার | রা মা পা ধণধা | পা পা পা -া I
০ খে লা ভু লি য়া০ যা য়্ অ নি মে ষ ০ চো খে চা য়্

I ণা ণধা ধপা মা | মরা রা সা ণ্‌া | ণ্‌সা -রমা -পধা ণধা | ণপা -া মা -া I
পা ষা ণ প্র তি মা প্রা য়্ সে০ ০০ ০ই সু দূ ০ রে ০

I ৷ রা মা পা | পধা র্সা র্সা র্সা | ধা -র্সা র্রা র্মর্মা | মর্রা -া র্সর্সা র্সা I
০ স তী হা রা ০ যো গী পা ০ গ ল শ ঙ্ ক রে

I ৷ র্সা র্রা র্সা | ণা ণধা পধা মা | ৷ রা মা পা | ধণধা ণপণ মা রা সা I
০ ম নে প ড়ি য়া তা০ র্ ০ ন য় নে বা ০ রি ০ ঝ রে

I ৷ মা রা পা | পমা -পরা রা সা | -া ণধা পমা রসা | রা মা মপা -া I
০ শি ব সী ম ন্ তি নী ০ পা০ গ০ লি০ নী ০ প্রা য়্

I র্রা র্সা র্রা র্সা | ণা ণধপধাপ মা -া | মা রা -া রসা | সরা -ণ্‌সা সা -া II II
শি ব্ শি ব ব লে০০০ ধা য়্ মু ০ ক্ ত কে০ ০০ শে ০

* এই রাগ আমাদের দেশে অপ্রচলিত কিন্তু কর্ণাটদেশে ইহার চলন বেশ দেখা যায়। নানা কারণে অনেক রাগরাগিণী গায়কমহলে অব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; ইহার ফলে ঐ সকল রাগ-রাগিণী বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। এই সকল রাগ-রাগিণীর সংখ্যা কম নহে। ইহাদের কতকগুলির লক্ষণ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়; কতকগুলি বিশিষ্ট গায়ক বা ওস্তাদগণ শুধু আপনারাই গাহিয়া থাকেন,—(ঐ সকল রাগ ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসায়, দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া উঁহাদের অনেকেই ঐ সকল রাগের প্রসার কমাইয়া আপনাদের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত অপরকে শিখাইতে অনিচ্ছুক); এবং এই সব অপ্রচলিত রাগের কতকগুলি এখনও কর্ণাটের মত কোন কোন প্রদেশে সমধিক প্রচলিত দেখা যায়।

"নারায়ণী"—খাম্বাজ ঠাটের ও ওড়ব-খাড়ব জাতীয়। সকল সময়েই গাওয়া হয়। বাদী=সা; সম্বাদী=পা। —স্বরলিপিকার

মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্, পিএইচ্-ডি

গত জুন মাসে আমরা মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত দেখিতে গিয়াছিলাম। মাদ্রাজ শহরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত থাকায় কলিকাতা অপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে হয়। এখানকার সমুদ্রতটটি মনোরম ও শান্তিপূর্ণ। বালুকাময় তটের নিকটে ভাল চলন-পথ আছে; তাহার পর বড় রাস্তা এবং রাস্তার অপর-দিকে আবার চলন-পথ আছে। চলন-পথের ধারে বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অট্টালিকার মধ্যে অধিকাংশই সরকারী আপিস। মাদ্রাজের পথগুলি পিচ দিয়া বাঁধান এবং প্রশস্ত। সমুদ্রতটের সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয়, বিধবাদের কলেজ, সেনোটপ, সেণ্টজর্জ্জ দুর্গ, মহীশূর মহারাজের প্রাসাদ প্রভৃতি সুবৃহৎ অট্টালিকা অবস্থিত। সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গটি ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বপ্রথমে ইহা একটি কারখানা ছিল। এই দুর্গের মধ্যে একটি বহু পুরাতন প্রোটেস্টাণ্ট গীর্জ্জা আছে। এই গীর্জ্জায় লর্ড ক্লাইবের বিবাহ হইয়াছিল। এখন ইহার মধ্যে সরকারী আপিস দেখিলাম, যথা—য়্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল-এর আপিস। মাদ্রাজ শহর হইতে কিছু দূরে একটি সুরম্য স্থান আছে তাহার নাম আদিয়ার। এখানে আনি বেশান্ত কর্ত্তৃক স্থাপিত থিওজফিকাল সোসাইটি একটি বৃহৎ উদ্যানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা থিওজফিকাল সোসাইটির সুবিখ্যাত গ্রন্থশালা দেখিলাম। আমরা এই উদ্যানে একটি পুরাতন বটবৃক্ষ তলে বসিয়াছিলাম এবং সমুদ্রের শোভা এই স্থান হইতেও উপভোগ করিতেছিলাম। আদিয়ারের সমুদ্রতট ইলিয়টবীচ্ নামে সুপরিচিত এবং ইহা মাদ্রাজের সমুদ্রতট অপেক্ষা ভাল। এই নির্জ্জন স্থান আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। এখানে আমরা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে আসিতাম এবং সমুদ্রতটে বসিয়া রত্নাকরের অহরহ কল্লোল শ্রবণ করিতাম। মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ধনী আন্নামল চিট্টিয়ার-এর সুন্দর এবং বিশাল অট্টালিকা আদিয়ারের পথে দেখিতে পাওয়া যায়।

মাদ্রাজ শহর কলিকাতার ন্যায় এরূপ জনাকীর্ণ নহে। তবে এখানকার কতকগুলি পল্লী আছে—যেগুলি আমাদের কলিকাতার বড়বাজারের ন্যায়, যথা—চায়না বাজার, মাড়োয়ারী পটি, মায়লাপুরের বাজার, জর্জ টাউন, এস্‌প্লানেড প্রভৃতি। এখানে আমরা চিড়িয়াখানা দেখিলাম। ব্যাঘ্র এবং সিংহের সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। ইহা
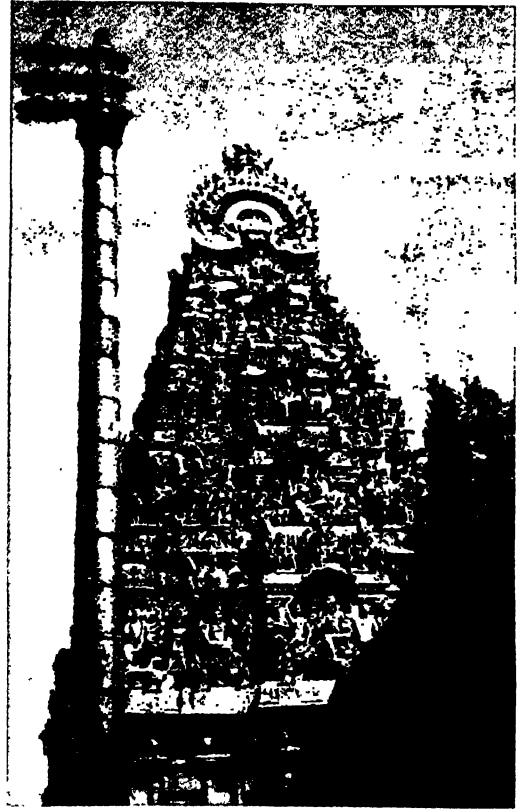
তিরোবত্তুর মন্দির

ব্যতীত একটি সুন্দর জেব্রা দেখিলাম। চিড়িয়াখানাটি ছোট কিন্তু সুরক্ষিত। যাদুঘর দেখিলাম, কলিকাতার যাদুঘরের ন্যায় বড় নহে। এখানকার যাদুঘরের মৃত জীব-জন্তুর সংগ্রহ প্রশংসনীয়। ইহা ব্যতীত প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি, শিলালিপি, স্তূপের ধ্বংসাবশেষ, অমরাবতীর ভাস্কর্য্য

সুন্দরভাবে এবং যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে। এখানকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শিবরাম মূর্ত্তি মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হইল এবং তাঁহার সহিত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহগুলি বেশ ভাল করিয়া দেখিলাম; কিন্তু সময় সংক্ষেপের জন্য আর একদিন দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। যাদুঘরটি শহরের নিকটে এবং নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। মাদ্রাজে একটি নূতন জিনিষ দেখিলাম যাহা অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সমুদ্রতটস্থ জীবন্ত মৎস্য, সর্প এবং বহুপ্রকার জলজ জন্তুর সংগ্রহ স্থান, য়্যাকোয়ারিয়াম নামে বিখ্যাত। বড় বড় কাঁচের পাত্রে ইহাদিগকে রাখা হইয়াছে; সন্ধ্যার সময়ে ইলেকট্রিক আলোকে এই পাত্রগুলি আলোকিত করা হয় এবং সেই সময়ে এই জলজ প্রাণীর শোভা দেখিবার জিনিষ। ইহা একটি ভারতের আশ্চর্য্যের বস্তু। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বড় নহে; কিন্তু যে স্থানে ইহা স্থাপিত হইয়াছে সে স্থানটি সমুদ্র সৈকতের সন্নিকটে এবং কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান অপেক্ষা অনেক ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালা, রেজিষ্ট্রার-এর আপিস প্রভৃতি সব দেখিলাম এবং দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। মাদ্রাজে একটি আর্ট কলেজ আছে এবং রায় চৌধুরী মহাশয় ইহার অধ্যক্ষ। মাউণ্ট রোডে ইংরেজ এবং ভারতবাসীর বহু দোকান দেখিতে পাইলাম, যথা—হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল’, ল্যরেন্স মেয়ো, মহীশূর আর্ট্‌স্ ও ক্রাফ্‌ট্ প্রভৃতি। দক্ষিণ ভারতের নানারকম চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত চেয়ার টেবিল প্রভৃতি মহীশূর আর্ট্‌স্ ও ক্রাফ্‌ট্‌স্-এ রাখা হইয়াছে। এই দোকানটী প্রত্যেক বিদেশীর দেখা কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত এখানে হিগিন-বোথম্‌স্-এর একটি বড় পুস্তকের দোকান আছে। এখানে বহুপ্রকার পুস্তক পাওয়া যায়। এখানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে। এই শহরে দুইটি রেলওয়ে স্টেশন আছে—মাদ্রাজ (সেণ্ট্রাল) এবং এগ্‌মোর্। এগ্‌মোর্ স্টেশন হইতে দক্ষিণ ভারতে রেলপথে যাইতে পারা যায়। মাদ্রাজে স্পেন্সার কোম্পানী কর্ত্তৃক চালিত কনেমারা নামে একটি বিখ্যাত হোটেল আছে। এই হোটেলটি বোম্বাই-এর তাজমহল হোটেল অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু সুন্দর ও সুরক্ষিত।

মাদ্রাজে অনেকগুলি সবাক ছবিঘর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ইংরেজী এবং তামিল সবাক চিত্র দেখান হয়। আমরা দুই-একটী তামিল সবাক চিত্র দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি।
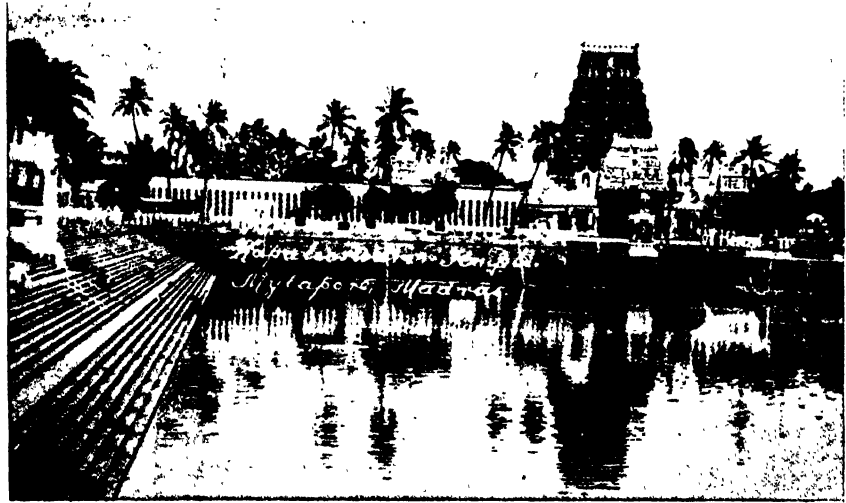
মান্দ্রাজ সহরের মাইলাপুরের মন্দির

মাদ্রাজ শহরের মধ্য দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে এবং এই নদীর সহিত সমুদ্রের যোগ আছে। মাদ্রাজের সমুদ্রতরঙ্গ পুরীর সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় অধিক উত্তাল নহে। প্রত্যেক সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রতীরে বহু লোকের সমাগম হয়। এখানে একটি রেডিওর দ্বারা সংবাদ এবং গান প্রচার করা হয়। সমুদ্রের সন্নিকটে রাস্তার অপর দিকে একটি ফোয়ারাও দেখিলাম, রত্নাকরের বালুকাময় তটে সভা-সমিতির আহ্বানের স্থান এবং প্রত্যেক সোমবার এখানে গোরাদের বাজনা শোনা যায়।

এদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম। আদিয়ার সমুদ্রতটে আমাদের সহিত কেবলমাত্র একটি বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত জি-সি-চন্দ্র। তিনি বলিলেন, এখানে মাত্র পঁচাত্তর জন বাঙ্গালী আছে। অধিকাংশ লোক তামিল ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। তেলেগু ভাষা খুব কম লোকে জানে। বিদেশীর পক্ষে ইংরেজী ভাষা বলা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। বাজারের সব লোক ইংরেজী জানে না। মোটর চালকের মধ্যে সবাই ইংরেজী বোঝে না। এদেশের লোকেরা বিদেশীদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করে; তাহারা পরোপকারী, ধর্ম্মভীরু এবং সজ্জন। এখনও মাদ্রাজের অনেক ঘরে বৈদিক পণ্ডিতের দ্বারা বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রামচন্দ্র দীক্ষিত মহোদয়ের ভবনে আমরা বৈদিক পণ্ডিতদিগের বেদমন্ত্র উচ্চারণ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখানে অধিকাংশ লোক মৎস্য ও মাংস খায় না এবং গোঁড়া হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী।

মাদ্রাজ শহরে অনেকগুলি মন্দির আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে পার্থসারথীর মন্দির এবং কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পার্থসারথীর মন্দির ট্রিপ্লিকান্ নামক স্থানে অবস্থিত। মাদ্রাজ শহর দখল করিবার পর ইংরেজেরা ট্রিপ্লিকান্ দখল করিয়াছিল। মাদ্রাজের অপর একটি পুরাতন স্থানের নাম ময়লাপুর। এখানে কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। পার্থসারথীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। প্রত্যেক মন্দিরে তোরণ, মণ্ডপ ও পুষ্করিণী আছে। পার্থসারথীর মন্দিরের কারুকার্য্য মন্দ নহে। মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ রথ দেখিলাম এবং শুনিলাম, এই রথ সুসজ্জিত করিয়া দেবতাকে এখানে বসান হয়, কিন্তু টানা হয় না। মাদ্রাজ শহর হইতে ষোল মাইল দূরে তিরোবদুর নামে একটি পুরাতন মন্দির দেখিলাম, এই মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ আছে। বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিতে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ; কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ দেখিলাম যে ইহা ঠিক নহে। মন্দিরের পূজারীরা দর্শকের জাতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে না, সকলকেই তাহারা সাদরে আহ্বান করে এবং প্রতিমা দর্শনও বেশ ভাল করিয়া লাভ করা যায়।

তান্জোরের মন্দিরের গোপুরম
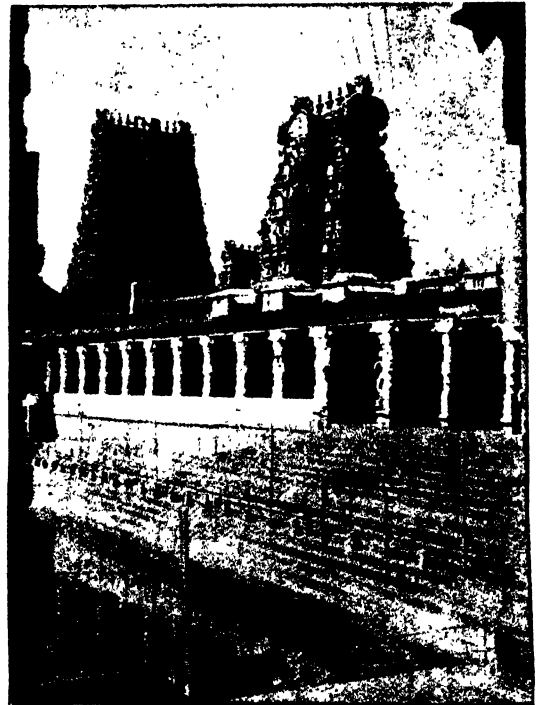
মাদুরার মীনাক্ষিমন্দিরের অভ্যন্তরে পুষ্করিণী

মাদ্রাজের সাধারণ লোকের একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে। এখানে সুন্দর সুন্দর বাস্ ও ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ীও পাওয়া যায়। ট্রাম গাড়ীও আছে; কিন্তু কলিকাতার ট্রাম গাড়ীর মত এত সুন্দর ও সুনির্ম্মিত নহে। সমুদ্রতট অবধি ট্রাম গাড়ী করিয়া যাওয়া যায়।

মাদ্রাজের স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া মনে হইল। সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া ইহা নাতিশীতোষ্ণ। আমরা যতদিন এই শহরে ছিলাম মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় নির্ম্মল ও শীতল বায়ু আমাদিগকে আনন্দ দিত। দুই-এক দিন বৃষ্টিও পাইয়াছিলাম।
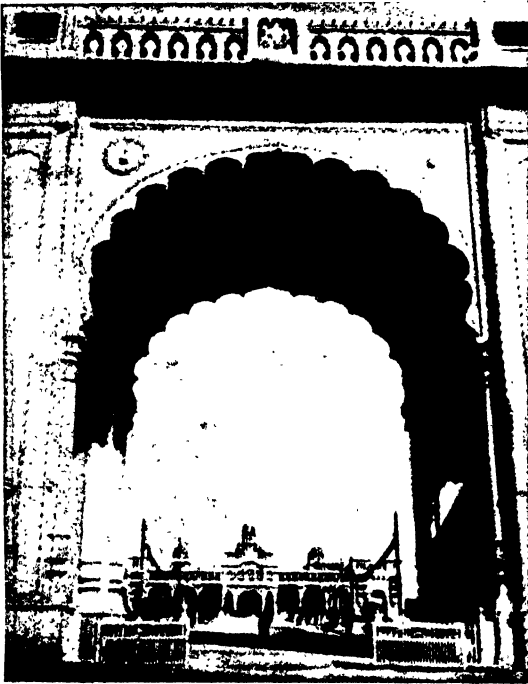
মাদুরার মীনাক্ষিমন্দিরের প্রবেশদ্বার

মোটের উপর স্থানটি ভালই লাগিল। এখানে বাড়ী ভাড়া বোম্বাই এবং কলিকাতার বাড়ীভাড়া অপেক্ষা অধিক নহে; তবে অধিকাংশ বাড়ীতে স্নানঘরের অভাব।

মাদ্রাজের সমুদ্রতট ব্যতীত আরও অনেক বেড়াইবার জায়গা আছে। লাটসাহেবের প্রাসাদের সন্নিকটে কলিকাতার গড়ের মাঠের ন্যায় ছোট ছোট মাঠ আছে এবং দুই-একটি পার্কও আমরা দেখিয়াছি। ভেপারি এবং সান থম্ নামে দুইটি পল্লী আছে, যেখানে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা বাস করে। মাদ্রাজের ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বাকিংহাম এবং কারনাটিক নামক কাপড়ের কল, পেনসিলের কল ইত্যাদি বিদেশীর দেখিবার বস্তু। ইহা ব্যতীত এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে, যথা—হাইকোর্ট, মেডিকাল কলেজ, টাউনহল্, লাইট হাউস, ভিক্টোরিয়া টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট ইত্যাদি। ভারতবর্ষের তৃতীয় শহর মাদ্রাজ দেখিয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। এই শহর দেখিবার পর আমরা দাক্ষিণাত্য দেখিতে বাহির হইলাম।

মাদ্রাজে কিছুদিন বাস করিয়া আমরা রাত্রি নয়টার সময়ে মাদ্রাজ হইতে ইন্দো-সিলোন এক্সপ্রেস ধরিয়া ভোর সাড়ে পাঁচটায় তানজোরে পৌছিলাম। কাবেরী নদীর সন্নিকটে তানজোর দেশ অবস্থিত। ইহা একটি বহু পুরাতন স্থান। তানজোর স্টেশন হইতে এক মাইলের মধ্যে বৃহদেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। মন্দিরটি দুইশত সতর ফুট উচ্চ এবং নিপুণ কারুকার্য্য শোভিত। এই মন্দিরের বহির্চত্বরে দুইটি গণপতির মন্দির দেখিলাম। বড় মন্দিরের সম্মুখে বিশাল প্রস্তরনির্ম্মিত বৃষ আছে। মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সোমসুন্দর পিলাই মহাশয় আমাদিগকে ভাল করিয়া সমস্ত দেখাইলেন। এত বড় শিবলিঙ্গ আমরা আর কোথাও দেখি নাই। শিবলিঙ্গের কপালে একটি বড় চন্দনের ফোঁটা রহিয়াছে। বড় মন্দিরের চারিদিকে প্রস্তর ভাস্কর্য্যের চরম উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দ্বারপাল, গণেশ, কার্ত্তিক, সশস্ত্র সৈনিক প্রভৃতির খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে। বড় মন্দিরের একদিকে বৌদ্ধ জাতকের একটি নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। আমাদের দেশে কার্ত্তিক পাখা-খোলা ময়ূরের পৃষ্ঠের উপরে বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এখানে পাখা-বন্ধ ময়ূরের পৃষ্ঠের এক দিকে কার্ত্তিক বসিয়া আছে দেখিলাম। মন্দিরের মধ্যে একটি ছোট যাদুঘর আছে। এই ঘরে তানজোরের নায়েক ও মহারাষ্ট্র নৃপতিদের পুরাতন অস্ত্র, আচ্ছাদন চিত্র প্রভৃতি রহিয়াছে। মন্দির দেখিয়া আমরা নায়েক রাজাদের প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। প্রাসাদ ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে, এখন এখানে কোম্পানির আপিস আছে। নায়েক রাজাদের পর ঐ প্রাসাদ মহারাষ্ট্রদের হস্তগত হইয়াছিল। এই প্রাসাদে ত্রিশ একর জমি আছে। চোড়, নায়েক এবং মহারাষ্ট্র রাজাদের রাজধানী ছিল তানজোর। এখানে

ছোট ছোট অনেক মন্দির আছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির বৃহদেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের চারিদিকে পরিখা রহিয়াছে। ষ্টেশন হইতে মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

মীনাক্ষি মন্দিরের অভ্যন্তরের কারুকার্য্য

তানজোর দেশটি খুব বড় নহে; কিন্তু অত্যন্ত জনাকীর্ণ। অনেক ছোট ছোট অট্টালিকা, আদালত, নায়েক রাজাদের দরবার হল, বিখ্যাত তালপাতার পুঁথিশালা ইত্যাদি আছে। এই পুঁথিশালাটি বুধবার দিন বন্ধ থাকে। ইহা ব্যতীত তানজোরে শিবগঙ্গা পুষ্করিণী, শিবগঙ্গার বাগান প্রভৃতি আছে। এই শহরে মিউনিসিপাল ডাকবাংলা এবং রাজার ছত্রম (পথিকদিগের থাকিবার স্থান) আছে। তানজোর জেলার প্রধান শহর তানজোর দেখিয়া আমরা মাদুরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় আমরা তানজোর ত্যাগ করিলাম এবং সেই রাত্রেই ত্রিচিনোপলিতে পৌছিলাম। শ্রীরঙ্গমের দেশে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর দিবস মাদুরায় পৌছিলাম। মাদুরা শহরটি বৈগী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বাণিজ্যস্থান এবং বহু জনাকীর্ণ। তন্তুবায়েরা এখানে বস্ত্র তৈয়ারী করে এবং বিক্রয়ের জন্য বহু দেশে পাঠায়। মাদুরা ষ্টেশন হইতে বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুমন্দিরটি কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত এবং সুনিপুণ কারুকার্য্যে সুশোভিত। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরে পরিক্রমণ করিবার জন্য চারি ধারে রাস্তা আছে। বিষ্ণুমন্দির দেখিয়া আমরা মীনাক্ষী মন্দির দেখিতে গেলাম। এই মন্দিরটি মাদুরার সর্ব্বাপেক্ষা বড় মন্দির। ইহার মধ্যে বাজার, পুষ্করিণী, চত্বর, মণ্ডপ, তোরণ সবই দেখিতে পাইলাম। মীনাক্ষী দেবী স্বুবর্ণ নির্ম্মিত। মৎস্যের ন্যায় ইঁহার চক্ষু বলিয়া ইঁহার নাম হইল মীনাক্ষী। ইঁহা আমাদের লক্ষ্মী। এই মন্দিরের সীমানায় শিবের মন্দির রহিয়াছে এবং এই শিবের মন্দিরের উপর সোনার পাত দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরে স্বর্ণ নির্ম্মিত ধ্বজা আছে এবং উৎসবের দিনে ঐ ধ্বজা সুসজ্জিত করা হয়। মাদুরার সুবিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দিরে একষট্টি একর জমি আছে। এই মন্দির হইতে দুই মাইলের মধ্যে একটি পুষ্করিণী আছে এবং ঐ পুষ্করিণীর মধ্যভাগে একটি মণ্ডপ আছে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে উৎসব হয় এবং এই স্থানে মীনাক্ষী দেবীকে আনা হয়। এই উৎসবে বহুলোক যোগদান করে।

মাদুরা শহরটী ব্যবসাস্থান বলিয়া এখানে বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে। আমরা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক দেখিলাম এবং অনেকগুলি বড় বড় দোকানও দেখিতে পাইলাম। শহরের
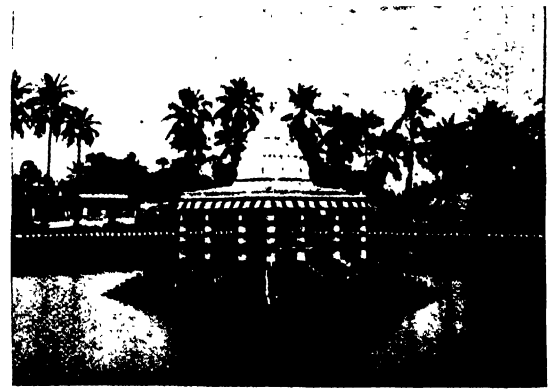
মাদুরা সহর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত মণ্ডপ, পুষ্করিণী, ইত্যাদি

রাস্তাগুলি পিচ দিয়া বাঁধান। এই শহরে ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ী প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। মাদুরা একটি বহু

পুরাতন নগর এবং এক সময়ে পাণ্ড্য রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এখানে অনেকগুলি কাপড়ের কল আছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর মাদ্রাজ এবং তাহার পর মাদুরা। মাদুরা শহর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়া আমরা রামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রামেশ্বর হিন্দুদিগের একটি বিখ্যাত পুণ্য স্থান। ইহা একটি দ্বীপ। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমুদ্রের উপর সুদীর্ঘ পোল নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং এই পোল নির্ম্মাণের ফলে যাত্রীরা খুব সহজেই এই পুণ্য স্থানটি দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে। স্থানটি খুব মনোরম বলিয়া মনে হইল। আমরা খুব ভোরে সুপ্রসিদ্ধ রামনাথস্বামীর মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। মন্দিরটি সুদীর্ঘ এবং সুবিস্তৃত; ইহার চত্বরও তদ্রূপ। প্রবেশ-পথের চারিধারে সুন্দর এবং অসংখ্য উচ্চ স্তম্ভ

মাদুরার বিষ্ণুমন্দির

দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইতে হয়। রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া পার্ব্বতী, অন্নপূর্ণা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমানের মূর্ত্তি দেখিলাম। দ্রাবিড় ভাস্কর্য্যের চরমোৎকর্ষ দেখিয়া মন্দিরটিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই

সমুদ্রতটে মহাবলীপুরের মন্দির

মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত নন্দী বৃষ আছে। তানজোরের বৃষ অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হইল। ইহার পর আমরা আর একটি আশ্চর্য্যজনক জিনিষ দেখিলাম। একটি বৃহৎ হস্তী সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিয়া দেবতার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সেই জল দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিল। অর্পণ করিবার পর দেবতাকে প্রণাম করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। রামেশ্বরের সমুদ্রতীর হইতে ধনুষ্‌কোডির বালুকাময় স্থানটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপটিকে একটি গ্রাম বলিলেও চলে। কতকগুলি দোকান এবং কতকগুলি অট্টালিকা লইয়া রামেশ্বর দ্বীপ সমুদ্রতীরে অবস্থিত। উৎসবের দিনে এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। পূজারীরা পুরী এবং অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় অর্থের জন্য দর্শকদিগকে বিরক্ত করে না। এখানে আমরা ট্রাষ্টি মহাশয়ের বাংলায় গেলাম, সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বেলা দুইটার ট্রেনে রামেশ্বর ত্যাগ করিয়া কাঞ্জিভরম দেখিতে গেলাম। রামেশ্বর দ্বীপটি এত সুন্দর ও মনোরম যে আমার বার বার দেখিবার ইচ্ছা হয়।

কাঞ্জিভরম একটী বহু পুরাতন স্থান। শিবকাঞ্চি এবং বিষ্ণুকাঞ্চি নামে কাঞ্চির দুইটি বিভাগ আছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—বড় কাঞ্চি, ছোট কাঞ্চি এবং পিলায়ারপলিয়ম। শিবকাঞ্চির মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং বিষ্ণুকাঞ্চির মন্দির পরবর্ত্তীকালে

নির্ম্মিত। কাঞ্জিভরম একটি ব্যবসাস্থান বলিয়া মনে হইল। এখানে অনেক দোকান আছে এবং রেশমের বস্ত্র এইখানে তৈয়ারী হয় বলিয়া এই স্থান বিখ্যাত। এখানে বহু লোকের বাস আছে এবং চিঙ্গেলপুট স্টেশনের নিকটে অবস্থিত। ইহার পর আমরা মহাবলীপুরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

মহাবলীপুর সমুদ্রতটে অবস্থিত। সমুদ্র গর্ভগত বলিলেও চলে। ইহার অপর একটি নাম সপ্ত প্যাগাডো। এখানে মন্দির, অট্টালিকা, পর্ব্বতখোদিত মন্দিরগুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে দুইটি লাইট্ হাউস আছে—একটি নূতন এবং একটি পুরাতন। যাঁহারা পক্ষীতীর্থ দেখিয়া মহাবলীপুরের দিকে অগ্রসর হন তাঁহাদিগকে নৌকায় করিয়া খাল পার হইতে হয় এবং খাল পার হইয়া এক মাইল পথ অতিক্রম করিলে পর মহাবলীপুরে পৌছান যায়। মহাবলীপুর ভাল করিয়া দেখিয়া আমরা পক্ষীতীর্থ দেখিতে গেলাম; কিন্তু শুনিলাম যে সেদিন পক্ষীরা চলিয়া গিয়াছে। আমরা হতাশ হইয়া মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলাম এবং দুই-এক দিনের মধ্যে পক্ষীদ্বয়কে দেখিবার জন্য আবার ঐ স্থানে আসিলাম।

বেলা দশটার সময়ে পক্ষীদ্বয়ের আকাশমার্গে আগমন দেখিলাম এবং খুব অল্প সময়েব মধ্যে তাহারা আবার কোথায় উড়িয়া গেল দেখিতে পাওয়া গেল না; কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিল এবং পর্ব্বতোপরি মন্দিরের একপার্শ্বে বসিল। মন্দিরের পূজারী প্রদত্ত ঘৃত মধু খাইয়া তাহারা উড়িয়া গেল। আমরা যতদূর দেখিলাম

পক্ষীতীর্থ

তাহাতে মনে হইল যে, পক্ষীদ্বয় আমাদের দেশের শকুনি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রবাদ আছে যে, বহু যুগ যুগান্তর হইতে এই পক্ষী দুইটি এইরূপভাবে ঐ মন্দিরে প্রত্যহ আসে এবং দেবতার ভোগ খাইয়া উড়িয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যের যতগুলি মন্দির আমরা দেখিলাম তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পল্লব, চোড়, পাণ্ড, নায়েক রাজন্যবর্গ
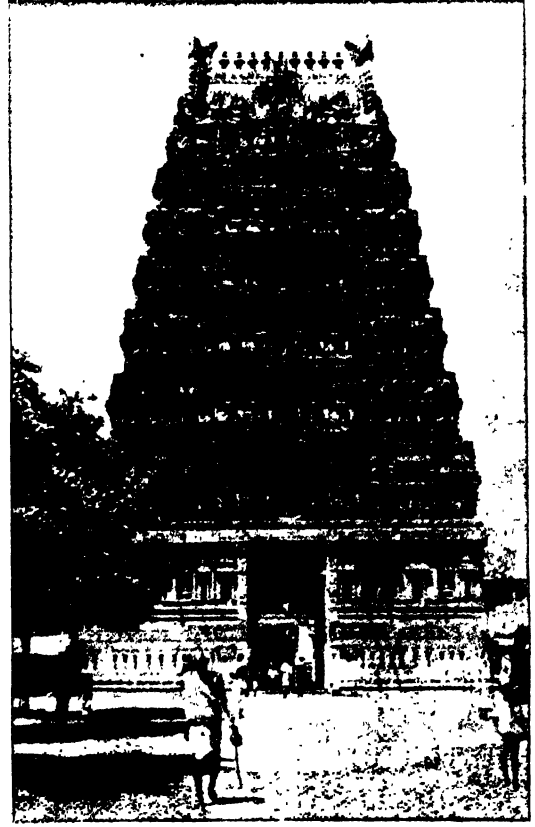
রামনাথস্বামীর মন্দির—রামেশ্বর

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং ভাস্কর্য্য হিসাবে সবগুলি একপ্রকার। আকারে কোনটি ছোট, কোনটি বড়। কাঞ্চিভরমের বিষ্ণু মন্দিরের কারুকার্য্য উল্লেখযোগ্য। মাদুরার ভাস্কর্য্য প্রশংসনীয়। মাদুরায় মীনাক্ষী মন্দিরের পুষ্করিণীর চতুর্থ দিকে যে বারান্দা আছে তাহার এক অংশে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি দেখিলাম এবং কলি ও সত্যের মূর্ত্তিও দেখিতে পাইলাম।

দাক্ষিণাত্যের লোকেরা বিদেশীদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং তাহারা অমায়িক, সদালাপী, পরোপকারী বলিয়া মনে হয়। স্বাস্থ্য হিসাবে এই সকল দেশ ভাল বলিয়াই মনে হইল; কারণ এই সকল দেশের লোকেদের স্বাস্থ্য দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, তাহাদের দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। অধিকাংশ লোক নিরামিষভোজী এবং গোঁড়া হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যে আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

নাগরিকা

শ্রীচরণদাস ঘোষ

ষোলো

কৌমুদীর চোখে যেন কৌতুকের ঝড় উঠিয়াছে। সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "বলি, জিত্ হলো কার—তোমার, না নাগরিকার?"

সময়োচিত প্রশ্ন! ইহারই একটা বোঝাপড়া করিতে কঙ্কণও যেন প্রস্তুত! কিন্তু উহা পুরাতন, অথচ বারবার করিয়া নূতন হইয়া তাহার নির্ব্বিবাদ আত্মার কাছে আসে কেন? এই 'কেন'র জবাবটা নিজের কাছে খুঁটিয়া গ্রহণ করিতে গিয়াই তাহার মুখখানা এক আকস্মিক হর্ষে আলোকিত হইয়া উঠিল; নির্ভয়ে কি বলিতে যাইবে, থামিয়া গেল; যেন কি একটা ধোঁকা মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে নিষেধ করিল!

কৌমুদীর কাছে উহা গোপন রহিল না। ঈষৎ হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "এখানকার কাণ্ড সবই শুনিছি—সমস্ত। একজন সব বলে দিয়েছে!"

কঙ্কণ বিস্ময়ে কৌমুদীর দিকে তাকাইতেই কৌমুদী তেমনি করিয়াই বলিয়া উঠিল, "যে রক্ষক, সেই ভক্ষক—নাগরিকা!" একটু হাসিয়াই আবার খোঁচা মারিয়া কহিল, "তাই হয়! লোকালয়ের একপাশ মহাপুরুষদের দরকার হয়! শাক্যঠাকুরের দরকার হয়েছিল নিবিড় অরণ্য, আর তোমার না-হয়—এই এক-ফোঁটা বন-ঝোঁপ! আসলে, ও একই!"

কঙ্কণ মুখ নামাইল।

কৌমুদী যেন সেদিকে লক্ষ্যই করে নাই এম্‌নি ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, তুমি কি জয় করলে? শাক্যঠাকুর ত জয় করেছিলেন 'মার'—শয়তান, আর তুমি?"

কঙ্কণ এইবার মুখ তুলিল, দেখিল—সম্মুখে একটি মূর্ত্তি, আশ্চর্য্য—অপরূপ, চোখ মেলিয়া না দেখিলে তাহাকে দেখা যায় না, কল্পনায় সে নিরাকার, ধ্যানে—নিশ্চিহ্ন! কয়েক মিনিট একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "অহঙ্কার! তোমাদের ওপর আমাদের!"

কৌমুদী ধীরে-ধীরে মাথা নীচু করিল; যেন নারী-সমাজের শাশ্বত নমস্কার সে ওই নিরহঙ্কার মানুষটির পদমূলে চিরতরে নামাইয়া দিতেছে! তারপর এক সময়ে নিঃশব্দে যেমন চলিয়া যাইবে, কঙ্কণ ডাকিল, "কৌমুদী—"

কৌমুদী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কঙ্কণ কহিল, "চলে যাচ্ছ?"

"দাঁড়িয়ে আর কি করবো?"

কঙ্কণ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তা ঠিক্! যেমন করবার সব কিছুই শেষ করে চলে গেল—আর একজন!"

কৌমুদী ধীরকণ্ঠে জবাব দিল, "মিথ্যে একতিল ও নয়! 'থাক্‌বো' বলে তোমার ওই 'আর-একজন' আসেনি! নাগরিকা—সে কী জান?—মেয়েমানুষ, তার সমাজ, তার মুখ!"

কঙ্কণ ততোধিক ধীর ও সংযতকণ্ঠে কহিল, "আর তুমি?—মেয়েমানুষ, তার সমাজ—তারই অনুভূতি!"

কৌমুদীর মুখটি রাঙা হইয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এইবার ত ছুটি?"

"আর একটু! মঠ ছেড়ে—হঠাৎ?"

কৌমুদী অবিলম্বেই জবাব দিল, "একথা জেনেই এসেছ! দরকার হ'য়েছিল, কেউ ধরে বেঁধে রাখ্‌তে পারে নি!" আর দাঁড়াইল না।

সঙ্গে-সঙ্গে কঙ্কণের সম্মুখে যেন এক নূতন পৃথিবী সরিয়া আসিল, যাহার ভিতর সারি-সারি পূজার বেদী, তাহার এক-একটির উপর দাঁড়াইয়া এক-একটি নারী প্রতিমা, আর প্রত্যেকের পদমূলে বসিয়া এক-একটি নর! কঙ্কণ সেইদিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, একপা—একপা করিয়া অগ্রসর হইয়া রাজপথে নামিয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*

এম্‌নিই সময়ে নগরের আর একদিকে আর এক বিশেষ সমারোহ চলিয়াছে—চিত্রার জন্মোৎসব।

নিমন্ত্রিত—নগরের বাছাই-করা অধিবাসী—সম্ভ্রান্ত মহল, সর্ব্বোপরি—রাজা! নগরের নাগরিকা—তাহাদের জীবনেতিহাসে এতাদৃশ সৌভাগ্য আর কাহারো দেখা যায় নাই। চিত্রা রাজ-দরবারে আসন পায়, এমন কি তাহার দর্শন-প্রার্থীর তালিকায় স্বয়ং রাজার নামও উঠিয়াছে। নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌতুকময়ী নারী—চিত্রা!

চিত্রার অট্টালিকার সম্মুখে বিস্তৃত অঙ্গন, সেইখানে বসিয়াছে আসর—রচনা করিয়াছে নগরের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা। আসরে লোক আর ধরেনা—কাহারো হাতে পুষ্পহার, কাহারো হাতে রত্নহার, কাহারো হাতে বা রত্নখচিত মুকুট! সবাই আজ মানবজন্ম সার্থক করিবে এক দেব-দুর্লভ নারী-প্রতিমাকে ওই-সমস্ত উপহার নিবেদন করিয়া। উপহার দিবেন সর্ব্বপ্রথমে—স্বয়ং রাজা, তারপর আর সকলে।

চিত্রা দ্বিতলে স্বীয় কক্ষে বসিয়া। তাহার হস্তে নিমন্ত্রিতের তালিকা, তাহারই উপরে সে তন্ময় হইয়া চোখ পাতিয়া—কেন যে, সেই জানে!

কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই, চঞ্চল শশব্যস্তে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল—রাজা আসিয়াছেন।

চিত্রা হাতের তালিকাটি ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর সব?"

চঞ্চলের চোখে-মুখে তখন যেন ঝড় উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "ঝেঁটিয়ে!"

চিত্রা পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "শ্রেষ্ঠী-নন্দন?"

প্রশ্নটা চঞ্চল বুঝিতেই পারে নাই এম্‌নিভাবে তাকাইতেই চিত্রা আবার বলিয়া উঠিল, "যাঁর বাড়ী-ঘর ঠিক রাজারই মতন, বাড়ীর সুমুখেই 'নন্দন-বন', তার ভিতর দিয়ে রাস্তা—ঠিক যেন 'রাজ-পথ', আর ওপরে উঠ্‌তেই এক হরিণ-ছানা—"

চঞ্চল চালাক্ লোক, বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্রবল-বেগে মাথা নাড়িয়া জবাব দিল—"না।"

"ফের যাও! লোকের পর লোক চিনে দেখে এসো—"

"মিথ্যে যাওয়া—"

"তবু যেতে হবে, চঞ্চল—" চিত্রার কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমার নিমন্ত্রণ!" বলিয়াই তালিকাটি আবার উঠাইয়া লইয়া তাহার উপর মনোনিবেশ করিল।

মনিবের এরূপ সর্ব্বনেশে মূর্ত্তি চঞ্চল ইতিপূর্ব্বে আর কোনও দিন দেখে নাই। সভয়ে একবার তাকাইয়াই বাহির হইয়া গেল।

নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল চিত্রা—ক্ষণকাল। তারপর একটু হাসিল, তারপর হাতের কাগজখানা কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চঞ্চল পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই চিত্রা বলিয়া উঠিল, "গাড়ী বার কর্‌তে বল্—"

চঞ্চলের ঘাড়ে তখন আগেকার এক আদেশ ছিল; তাই বুঝিবা তাহারই উপর তার মন বেশী করিয়া বিঁধিয়াছিল। কহিল, "আসেন নি!"

"ওকথা আমি জান্‌তে চাইনি! গাড়ী—" বলিয়াই চিত্রা নীচে নামিয়া গেল।

তখন গৃহের প্রত্যেক মানুষটিই নীচে ব্যস্ত, চঞ্চল! প্রত্যেকেই এক মত্ত-উল্লাসে আত্মহারা! বাহিরে সভামণ্ডপ—তাহার উপর চোখ ফেলিলে চোখ আর নামে না—এম্‌নিই অপূর্ব্ব সে! পদার্পণ করিয়াছেন রাজা, এইবার আবির্ভাব হইবে আর এক পরমাশ্চর্য্য মূর্ত্তির, যাহারই প্রতীক্ষায় সহস্র বুকের ভিতর হৃদপিণ্ড যেন অধীর আগ্রহে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে!

চিত্রা প্রবেশ করিল—নগরের নবীনা নাগরিকা!

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রত্যেকেই ঈষৎ সুমুখের দিকে ঝুঁকিয়া—প্রত্যেকেরই চোখে স্বপ্ন, মুখে নিঃশব্দ স্তুতি! প্রধান পুরোহিত' রাজা—তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চিত্রার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর তাঁর শ্রদ্ধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—রত্নহার স্বীয় গলদেশ হইতে খুলিয়া যেমন চিত্রাকে অর্পণ করিবেন, চিত্রা সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া বাধা দিয়া কহিল, "এখন নয় মহারাজ!"

রাজা বিস্ময়ে তাকাইতেই চিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, "সম্মান সেই পায়, যার এক-ডাকে দেশের লোক একযোগে এসে জড় হয়! এখানে, এখনো একজন বাকী!"

সঙ্গে-সঙ্গে সভামণ্ডপে এক রণ-সজ্জার উদ্যোগ সুরু

হইল। সবাই যেন পরশুরামের মত বীর দর্পে বলিয়া উঠিল, "এত স্পর্দ্ধা কার? বলুন, চুলের টিকি ধরে নিয়ে আস্‌ছি—"

চিত্রার মুখে তেম্‌নিই হাসি। এক দৃষ্টিতে সকলেরই প্রতি চাহিয়া বিনয়-নম্র কণ্ঠে কহিল, "তাতে মান বাড়্‌বে তাঁরই!"

রাজা এতক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে চিত্রার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, কহিলেন, "নগণ্য এক প্রজা! রাজার ইচ্ছার ওপর যার মরা-বাঁচা নির্ভর করে—মান বাড়্‌বে তার?"

চিত্রা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। হাসিয়া কহিল, "মরা-বাঁচা, তার ওপর মানুষের আত্ম-মর্য্যাদার দরদ নেই! তা'হ'লে, আমিই পারতাম!" এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "রাজার ফাঁসিকাঠ, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর আমার হাতে 'মৃত্যু'—রূপের আগুনে!" বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

কোথায় গেল কেহই প্রশ্ন করিল না; যেন ঐ মেয়েটির মায়ামন্ত্রে সবাই প্রস্তর মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সবাই একে-একে চলিয়া গেল, কেনই বা ছাই আসিয়াছিল তাহাও যেন তাহাদের মনেই নাই!

বহির্দ্দেশে গাড়ী প্রস্তুত ছিল, চিত্রা গিয়া উঠিয়া বসিল—বিসর্জ্জনের প্রতিমার ন্যায়। কিয়দ্দূর গিয়াছে, এক পরিচিত কণ্ঠের গান তাহার কাণে আসিল—'স্বচ্ছ সমীর, তাহাই পৃথিবীবাসীর পরমায়ু, তাহারই উপাদানে প্রস্তুত আশা আর আকাঙ্ক্ষা!' আর একটু গিয়াই অবলোকন করিল—এক গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই নাগরিকা! আজ তাহার এক বিচিত্র রূপ—রুক্ষ কেশরাশি এলায়িত, পরিধানে গেরুয়া, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি!

চিত্রা গাড়ি থামাইয়া নামিয়া রাস্তার একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর গান থামিতেই নাগরিকার কাছে গিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি?—তোমার এ দশা কেন?"

তখন বাড়ীর ভিতর হইতে একটি ছোট মেয়ে ভিক্ষা দিতে আসিয়াছিল, নাগরিকা চিত্রার দিকে একটিবার তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া ঝুলি পাতিল। তারপর যেন নিশ্চিন্ত হইয়াই চিত্রার দিকে ফিরিয়া জবাব দিল, "হবে না?—তুমি যে আমার সতীন!" কথাটা বলিয়াই নাগরিকা যেমন পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবে, চিত্রা ডাকিয়া উঠিল, "নাগরিকা—"

নাগরিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার আর এক মহিমাময়ী মূর্ত্তি—মুখে হাসি আর ধরে না, চোখে এক দুর্দ্দান্ত মিনতি! ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সময় নেই, বোন! সারা-জীবনের সঞ্চয়—হাতে একহাত 'আমি'!" কাছে একটু সরিয়া আসিয়া গলা চাপিয়া কহিল, "আর, নেবার মানুষ—একটি ত ভিক্ষু, তাঁকে ঘিরে আবার এক লক্ষ মেয়ে মানুষ!" বলিয়াই উল্কার ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

আচম্‌কায় নিকটে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন চম্‌কিয়া উঠিয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি চিত্রা একটিবার শিহরিয়া উঠিয়াই নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সে অত্যল্পক্ষণ! তারপর তাহার মুখে এক শ্লেষের হাসি দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়া নির্গত হইল—'ভিক্ষু'! তারপর নিজেকে যেন প্রবলবেগে ঝাড়া দিয়া ঝড়ের ন্যায় গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

দেখিতে-দেখিতে গাড়ী যেখানে আসিয়া থামিল, সেইখান হইতেই সরু হইয়াছে কঙ্কণের পরিত্যক্ত নিকেতন—সেই পরিচিত গৃহ! তারপর যেমন করিয়া এক অতিবড় গর্ব্বিতাকে নামিলে মানায় তেম্‌নি করিয়াই চিত্রা গাড়ী হইতে নামিল। নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—সেই সব!—প্রশস্ত অঙ্গন—মাঝখান দিয়া দৌড় দিয়াছে প্রশস্ত রাস্তা, উভয় পার্শ্বে ছড়ানো ফুলগাছ, গাছে-গাছে ফুল, আর পায়ে-পায়ে তাহাদের পরিচিত নমস্কার—সব সেই! * * * চিত্রা পায়ে জোর দিল। অতঃপর অট্টালিকার মুখে গিয়া পড়িতেই দেখিতে পাইল মূর্ত্তিমান নন্দনকে। সে তখন সাজগোছ করিয়া এক বিশেষ কাজে ব্যস্ত—একটি হৃষ্টপুষ্ট শ্রীমান্ গর্দ্দভের পিঠে কম্বল জড়াইয়া বাঁধিতে গিয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে, অবুঝ জানোয়ারটা কিছুতেই ছাই স্থির হইয়া থাকিবে না! মানুষের হাত-পা লইয়া চলা-ফেরা করে, এমন একটা যা-হোক্ মূর্ত্তি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে, কাজেই তাহাকে চোখ তুলিতে হইল, কিন্তু সে এক নিমেষ! পরক্ষণেই আবার হাতের কাজে মনোনিবেশ করিল।

চল্‌তি-জীবনে এতবড় অবহেলা আর কাহারো কাছে এতাবৎ চিত্রা পায় নাই, সুতরাং এক কথায় সৃষ্টিকে রসাতলেই দিবার তার কথা! কিন্তু না-জানি-কেন, সে নিশ্চেষ্ট হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল এক দৃষ্টে

সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "এইখানে একদিন একটা হরিণ বাচ্ছা থাক্‌তো!"

নন্দন সায় দিল না।

চিত্রা আবার কহিল, "তার জায়গায় কিনা—একটা গাধা!"

এবারেও নন্দন নীরব।

চিত্রা আর সহ্য করিতে পারিল না। মুখ বাঁকাইয়া একটু ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "যত সব অনাসৃষ্টি!—দেখুন, আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আসি নি!"

নন্দন এইবার কথা কহিল। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কিছু বল্‌বে?" বলিয়াই গাধাটাকে অনতিদূরে বাঁধিয়া রাখিয়া চিত্রার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি মনে করেন আপ্‌নি?"

"তোমার নিজের ঘরে তুমি ফিরে এলে!"

চিত্রা অপর দিকে মুখ ফিরাইল। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া খোঁচা মারিয়া কহিল, "সবাই গেরুয়া প'রে ঝুলি কাঁধে করেছে, আপ্‌নি যে এখনো—"

নন্দন চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "বাপ্‌রে! আবার গেরুয়া!"

জবাবটার মূলে যে-ইতিহাস, তাহা মনে পড়িতেই চিত্রা হাসিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি আবার নিজেকে গাম্ভীর্য্যের মাত্রায় আনিতে গিয়া গাধাটার দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনার কি সবই বিশ্রী?"

"নইলে তোমার যে মুখ থাকে না!" বলিয়াই নন্দন চকিত হইয়া গাধাটার কাছে ফিরিয়া আসিল; তারপর বাহনটির উপর উঠিতে যাইতেই চিত্রা এক নিস্ফল গর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "বাড়ী বয়ে এসেছি এখানে—তীর্থ কর্‌তে নয়!"

"নিশ্চয়ই না, যেহেতু এ তোমার স্বামীর ঘর!" বলিয়াই নন্দন গাধার উপর উঠিয়া বসিল।

চিত্রার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। রোষগম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অপমান করে সে, যে নিমন্ত্রণ না রাখে!"

নন্দন গাধার পিঠে চাবুক মারিল।

চিত্রার মুখখানা এইবার কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল—একটা ব্রহ্মাণ্ডের কাহিনী মুখে করিয়া সে আসিয়াছে যে—একটিও ত বলা হয় নাই! ভারি গলায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কারুর বাড়ী অতিথি হওয়া কারুর ভাগ্যির কথা!"

নন্দন তখন খানিক দূর চলিয়া গিয়াছে, আবার তাহাকে ফিরিতে হইল। চিত্রার কাছাকাছি হইয়া বলিল, "তা আর বল্‌তে!"

চিত্রার চোখ দুটা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই জ্বলন্ত চোখ নন্দনের দিকে একবার উঠিয়াই নামিয়া পড়িল।

এদিকে এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় হইল না। নন্দন তৎক্ষণাৎ এক সাক্ষাৎ অপরাধীর ভাণ করিয়া সবিনয়ে বলিয়া উঠিল, "রাগ করো না! যাবার সময় নেই, নাগরিকা! কোথায় যাচ্ছি জান?—এই নকল সমাজ, তারই যে 'সমাজপতি', তারই শ্রাদ্ধ-সভায়; সেখানে আর এক জনের জন্মোৎসব—তার নাম কঙ্কণ!" বলিয়াই আবার বাহন ছুটাইয়া দিল।

চিত্রা নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল—কতক্ষণ তাহা সে জানে না—এক সময় সে টের পাইল বাহির হইয়া গিয়া গাড়ির উপর বসিয়াছে। তারপর গৃহে ফিরিয়া দ্বিতলে উঠিয়া গিয়া দেখিল—তাহার 'প্রার্থী' বসিবার কক্ষে উপবেশন করিয়া—স্বয়ং রাজা!

সতের

চিত্রার্পিতার ন্যায় চিত্রা দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখের আকৃতি দেখিয়া প্রতীয়মান হইল যে, এই-একটু-পূর্ব্বেকার পৃথিবীটা তার সম্মুখ হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

রাজারও চোখে আর পলক পড়ে না, যেন এক আনাড়ির দৃষ্টি এক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা-ছবির উপর অকস্মাৎ পড়িয়া নিথর হইয়াছে!

মিনিট কয়েক পরে চিত্রার মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। কহিল, "কি ভাগ্যি!"

রাজা অবশ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি!"

"আমাকে?"—চিত্রার চোখে কুণ্ঠা, বাক্যে মিনতি, মুখে হাসি!

রাজা তেম্‌নি করিয়াই কহিলেন, "হ্যাঁ! তখন ভালো করে দেখা ত দাও নি!"

চিত্রা সরমে মুখ নীচু করিল। একটু পরেই আবার মুখ তুলিয়া বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এখানে নয়, আসুন—" বলিয়াই স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, রাজাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তদনুসরণ করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর চিত্রা যেন-একটু কৈফিয়ৎ

দিয়াই কহিল, "ও-ঘরে প্রার্থী বসে, অর্থাৎ—" মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া কথাটা শেষ করিল, "অর্থাৎ, যারা আমাকে একবার দেখেও আবার দেখ্‌তে আসে!" বলিয়াই স্বতন্ত্র একটি আসনে বসিয়া পড়িল।

রাজা মুখ নামাইলেন, যেন সুমুখের ওই মেয়েটির দিকে চোখ আর না রাখাই ভাল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নহে, মিনিটখানেক পরেই আবার মুখ তুলিলেন, যেন হঠাৎ তাঁর এক বিশেষ কথা মনে পড়িয়াছে! বলিয়া উঠিলেন, "আমি রাজা—তোমার ওপর আমার এক সুনিশ্চিত কর্ত্তব্য আছে!"

চিত্রা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "রাজার কর্ত্তব্য—আমার ওপর?"

রাজার মাথাটা আবার অবনত হইয়া পড়িল। কহিলেন, "হ্যাঁ!" পরক্ষণেই আবার মাথা তুলিয়া কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্বীকার তুমি করনি, কেন না, তা' করবে না! কিন্তু আমার নগর, এর পরিপূর্ণ অনুভূতি অস্বীকার করে নি যে শ্রেষ্ঠ নাগরিকা তুমিই! তাই আমার হাতের দেবার বস্তু, তোমাকে উপহার দেব!"

চিত্রা রাজার দিকে তাকাইয়াছিল, তেমনি করিয়াই রহিল—নিষ্পলক নেত্রে।

রাজা সুরু করিলেন, "রাজ-আয়োজনে কাল তোমার শোভাযাত্রা!"

চিত্রার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, যেন এক দুর্লভ-বিদ্যুৎ আচম্‌কায় আকাশ হইতে পড়িয়া তার বুকে উঠিয়াছে! সুমুখের দিকে আর চোখ পাতিয়া রাখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি মুখটা নামাইয়া লইল।

সঙ্গে-সঙ্গে রাজার দৃষ্টিও চিত্রার মুখটায় গড়াইয়া নীচে নামিল। কহিলেন, "আমার গর্ব্ব—অবহেলা করো না!"

"তা কি পারি!" বলিয়াই চিত্রা মুখ তুলিল। আর তার সময় নাই, সঙ্কোচ নাই, যেন নীচে হইতে তাহার চিবুকে হাতুড়ির আঘাত পড়িয়াছে! সেই মুখখানি রাজার আগ্রহ-ব্যাকুল চোখের উপর রাখিয়া মুহূর্ত্তেই আবার বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, বড় করবেন কাকে?"

"তোমাকে।"

"আমি নিঃস্ব! কতটা যে, আপনি জানেন না!"

"প্রয়োজন নেই জান্‌বার! মাটির প্রতিমার বুকে ছুরি মেরে কেউ কোন দিন তার রক্ত পরীক্ষা করেনি!"

চিত্রার মুখে ম্লান হাসির এক আভা পড়িল। কহিল, "মাটির প্রতিমার বুকে রক্ত থাকে না, সে-কথা সবাই জানে—তাই!"

রাজা যেন চিত্রার মুখের কথাগুলা একটি-একটি করিয়া লুফিয়া ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "না! তাহ'লে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে কেউ তার আরতি করতো না।"

এমনি সময়ে নীচে এক উচ্চ কোলাহল উঠিল এবং উভয়েই ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া উভয়েই নেত্রপাত করিয়া দেখিল, নীচেকার উঠানে চিত্রার পরিচারিকা রাক্ষসীমূর্ত্তি ধরিয়া বজ্রমুষ্টিতে চঞ্চলের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছে,—"ঝেঁটিয়ে বিষ ছাড়্‌বো!" আর চঞ্চল তাহার দিকে চাহিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিতেছে—"ছেড়ে দাও!"

চিত্রা আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না, দ্রুতপদে নামিয়া উহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, রাজাও পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন ছায়ার ন্যায়।

রাজাকে দেখিয়াই পরিচারিকা তাঁহার পদতলে আছ্‌ড়িয়া পড়িয়া রোদনকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নিই রক্ষে করুন্! আমার সর্ব্বনাশ করতে বসেছে—"

রাজা ঈষৎ পিছাইয়া গিয়া চিত্রার দিকে বিস্ময়ে চাহিতেই চিত্রা সহাস্যে পরিচারিকাকে প্রশ্ন করিল, "হলো কি তোদের?"

পরিচারিকা উন্মত্তার ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিবর্ণমুখে কহিল, "এত কাণ্ড হচ্ছে—ওমা, তুমি কিছুই টের পাওনি?

"না!"

"সভা বসেছে!—সেই যমের বাড়ী ইনি যাবেন!"

চিত্রা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "সভা?—কিসের?"

পরিচারিকা কপালে সজোরে করাঘাত করিয়া কহিল, "আমার তে-রাত্রের শ্রাদ্ধর!" বলিয়াই মুখখানা কাঁদ-কাঁদ করিয়া কহিল, "ঘরসংসার ভাসিয়ে দেবার!"

"মিথ্যে কথা!"—চঞ্চল প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

সাপের লেজে পা পড়িয়াছে! পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঝাঁটা—"। পরক্ষণেই

আবার চিত্রার দিকে মুখ করিয়া সুরু করিল, "আদ্দেক নোক স্ত্রীপুত্তুর ত্যাগ দিয়েছে, আদ্দেক নোক আজ দেবে! মাগো! সে আঁটকুড়ির দেব-পুত্তুরকে চোখে দেখ্‌লে কেউ কি আর ফেরে!" বলিয়াই ফোঁপাইয়া উঠিল!

চিত্রার দৃষ্টি তখন বাহিরের একটি গাছের উপর, সেখানে একটি ক্ষুদ্র পাখী বসিয়া—সে কেমন করিয়া উড়িয়া যাইবে, তাহাই সে দেখিবে, আজ—এই প্রথম! চট্ করিয়া দৃষ্টি নামাইয়া একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই নাকি? কে তোর দেব-পুত্তর?"

পরিচারিকা গলা ঝাড়িয়া জবাব দিল, "ওই পোড়ার-মুখোদের মঠ, মঠের একজন কি-যেন!"

চঞ্চল তাড়াতাড়ি কথাটাকে পরিষ্কার করিয়া দিতে গেল—"তা বোলে মানুষ নয়—" উদ্‌গত অশ্রু কণ্ঠ তাহার নিরোধ করিয়া দিল।

চিত্রা ও রাজা উভয়েই চাহিয়া দেখিলেন—চঞ্চলের চোখ দিয়া মুখ বহিয়া বসুধারা পড়িতেছে!

কাপড়ে চোখ মুছিয়া গলা ঝাড়িয়া চঞ্চল পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "ঠা-কুর!—অমন রূপ তোমারও নেই, মা!"

চিত্রা রাজার দিকে চাহিয়া মুচ্‌কিয়া ঈষৎ হাসিল।

রাজাও সেই হাসিতে যোগ দিয়া পরিচারিকা ও চঞ্চলকে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রশ্ন করিলেন, "ওরা?"

"স্বামী-স্ত্রী—" জবাবটা দিতে গিয়া চিত্রার গলার স্বরটা যেন ভাঙিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

তখনও পরিচারিকা চঞ্চলের দিকে ক্রুদ্ধচক্ষে চাহিয়া আছে, চক্ষে দাবানল, যেন এখনিই অপরপক্ষকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে! ক্রোধে, ক্ষোভে ও দুঃখে কাঁপিতে-কাঁপিতে চিত্রার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, "শুন্‌লে ত মা! এইবার আমার মুখে সাত ঝাঁটা মারো—"

চিত্রার বুঝিবা আজ হাসিয়া গড়াগড়ি দিবারই দিন। তাই সে মুখ ভরিয়া হাসিয়া কহিল, "ভিক্ষু!—তাকে এত ভয়?" পরক্ষণেই দেখা গেল, তাহার মুখ-চোখের ভাব বদ্‌লিয়া গিয়াছে, যেন সে অন্যমনস্ক! একটু পরেই স্বাভাবিক মুখে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু ওদের ত দুর্গতিই হয়—মারও খায়, মরেও যায়!"

পরিচারিকা মুখের এক প্রকার ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কি সেই ভিক্ষু?—ও মন্তর জানে! তুমি জান কি—লাঠি নিয়ে মারতে গিয়েছিল হাজার—হাজার নোক, সক্কলের হাত থেকে লাঠি খসে পড়েছে! উল্টে—" হঠাৎ চোখে আঁচল চাপিল।

চিত্রা সকৌতুকে প্রশ্ন করিল—"উল্টে—কি?"

পরিচারিকা ধরাগলায় কহিল, "সবাই মাগ-ছেলে ত্যাগ দিয়ে ঝুলি কাঁধে ক'রেছে!" আঁচলে সে চোখ মুছিল।

চঞ্চল অস্থির হইয়া উঠিল, যেন তাহার সুমুখে মানুষ খুন হইয়াছে। বলিয়া উঠিল—"না, মা! ওর মিছে কথা!"

পরিচারিকা তাড়াতাড়ি দুই-একটা ঢোক গিলিয়া রুখিয়া চঞ্চলের দিকে ফিরিবে, চিত্রা বাধা দিল। দিয়াই চঞ্চলকে প্রশ্ন করিল, "তোমার মতলবটা কি, শুনি?"

"ছেলে-পরিবার সক্কলকে নিয়ে—"

"ভিক্ষু হয়েছো?"

চঞ্চল প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল. "মঠের ভিক্ষু নয়! সে তুমি জান না মা!" পরক্ষণেই অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল, "মা, আমি যাই—"

চিত্রা পরিচারিকাকে দেখাইয়া কহিল, "একে নিয়ে ত?"

পরিচারিকা ক্রোধে ও ক্ষোভে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ফোঁপাইয়া উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার গরজ—" বলিয়াই অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া চঞ্চলের দিকে ফিরিতেই সে গোটা দুই লাফ মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে পরিচারিকাও যেন বুকের ভিতর হইতে একবজ্র টানিয়া বাহির করিয়া সুমুখের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমিও যাচ্ছি! দেখ্‌ছি, কেমন তুমি, আর তোমার ঠাকুর—" বলিয়াই অগ্নিগোলকের ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল!

চিত্রা সেইদিকে তাকাইয়াছিল, মুখ নামাইল। রাজারও চোখ দুটা দিক-নির্ণয় যন্ত্রের ন্যায় চিত্রার আনত-মুখের দিকে ফিরিয়া স্থির হইয়া রহিল। তখন নীচে আর-কেহই ছিল না, চারিদিক নিঃশব্দ। রাজা চিত্রার দিকে আড়চোখে চাহিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিয়া কহিলেন—"অভিনয়টা করলে মন্দ নয়!"

চিত্রা চম্‌কিয়া রাজার দিকে তাকাইল, তাকাইয়া আবার মুখ নামাইয়া লইল।

রাজা একহাতে খপ্ করিয়া চিত্রার একটি হাত ধরিলেন এবং অপর হাতে তাহার চিবুকটা ধরিয়া তুলিয়া বিলোল কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "চাইলে, চেয়ে আবার চোখ নামালে ?"

চিত্রা তাকাইয়া রহিল—চোখের পলক পড়িল না, যেন সে পাষাণ-প্রতিমা, যেন বা তাহার ভিতরে স্পন্দন, সাড়া, অনুভূতি সমস্তই এইমাত্র কে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়াছে।

রাজা নিজের মনোমত চিত্রার মুখটিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "নামিয়ো না!" বলিয়াই স্বীয় গলদেশ হইতে আর-একক্ষণের সেই উপেক্ষিত রত্নহারটা চিত্রাকে পরাইয়া দিলেন। তারপর তাহার দিকে তন্ময় হইয়া খানিক তাকাইয়া রহিলেন, তারপর—তারপর নিজের মুখখানা চিত্রার মুখের কাছে সরাইয়া আনিতেই চিত্রা চম্‌কিয়া খানিক পিছাইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমার শোভাযাত্রা—"

"প্রস্তুত !"

রাজা আর অপেক্ষা করিলেন না :

* * * * *

একই সময়ে নগরের আর এক অংশে এক বিস্তৃত পটভূমির উপর আর এক অভিনয়ের একটি দৃশ্যের মুখ খুলিয়াছিল।

বিরাট সভা বসিয়াছে।

লোকে লোকারণ্য—আবালবৃদ্ধবনিতা। তিল-পরিমাণ স্থান নাই, তত্রাপি লোক প্রবাহের বিরাম নাই। সভার ঠিক মাঝখানটিতে এক উচ্চ শিলাখণ্ডের উপর করযোড়ে দাঁড়াইয়া কঙ্কণ—এক মহিমাময় মানব মুর্ত্তির অপূর্ব্ব বিকাশ ! তাহার মুখে হাসি, চোখে মিনতি, সকলকেই যেন ডাক দিয়াছে—'এসো !'

সভার উদ্যোগী সেইদিনের সেই বিদ্রোহী-দল। তাহারা সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চঞ্চল সকলেই অস্থির! প্রত্যেকেই করিতেছে ভিতর-বাহির, এক অনাগত মুর্ত্তির অপেক্ষায়—সমাজপতির !

মুহূর্ত্ত, পল, দণ্ড অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তত্রাপি সমাজপতির দেখা নাই। ভিক্ষুপক্ষ ব্যস্ত হইয়া অপর পক্ষকে তাগাদা দিল, "কোথায় তোমাদের সমাজপতি ?"

কঙ্কণ হাত তুলিল—নিষেধ! সকলেরই চোখ সেই-দিকে ফিরিল, ফিরিতেই কঙ্কণ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিল, "ভিক্ষু—তোমাদের কথা, ও নয় !"

যুগপৎ সকলেরই মস্তক অবনত হইল—সকলেই অপ্রতিভ!

প্রতিপক্ষ যাহারা তাহাদের প্রত্যেকেরই মুখে তখন যেন কালি পড়িয়াছে! যে অগ্রণী, সে একজনকে তাড়া দিয়া নির্দ্দেশ দিল, "যাও, শীগ্‌গীর—যদি অসুস্থ হয়েও থাকেন, উঠিয়ে নিয়ে পিঠে ফেলে ছুট্ দেবে –

এমন সময়ে জনতায় কলরব উঠিল। প্রথমে—গোড়ায়, তারপর মাঝে, তারপর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া! অতঃপর সকলেরই যুক্ত দৃষ্টি যেন প্রচণ্ড কৌতুকে প্রবেশ-দ্বারে ঝাঁপাইয়া পড়িল—গাধায় চড়িয়া নন্দন !

নন্দন গম্ভীরভাবে কহিল, "আমি সমাজপতি নই—গাধাপতি।" বলিয়াই কষিয়া গাধাটার লেজ মলিয়া ছুট্ করাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তারপর বাহনটিকে উপস্থিত ভারমুক্ত করিয়া তাহার পিঠে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া চারিদিকটায় দৃষ্টি-বিনিময় করিল। দৃষ্টির এক সীমানায় কঙ্কণ, তাহারও সঙ্গে চোখ মিলিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ এমনিই ভাবে চোখ ফিরাইয়া লইল, যেন ওই লোকটির সহিত তাহার চোখের দেখাও ইতিপূর্ব্বে কখনো কোনদিন কোথাও হয় নাই। অতঃপর তাহার চোখ ফিরিল প্রতিপক্ষের উপর। একে-একে প্রত্যেকের চোখে চোখ মিলাইয়া তাহাদের অগ্রণীকে দেখিতে পাইয়াই তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল এবং সে সরিয়া আসিতেই স্বীয় গাত্রাবরণের ভিতর হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল—"সমাজপতিরা"

অগ্রণী তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলিয়া ফেলিল এবং তাহার কৃষ্ণ অক্ষরগুলার উপর চোখ পাতিয়াই মস্তক অবনত করিল।

দলের প্রত্যেক লোকই উন্মুখ হইয়াছিল, প্রত্যেকেরই মুখ ওই মারাত্মক লিপির উপর একযোগে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং সকলেই যেন দিশেহারা হইয়া বিভ্রান্তের ন্যায় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তারপর প্রত্যেকেই আপন মনে—যেন নিজের আত্মাকেই পালাক্রমে একই প্রশ্ন করিয়া উঠিল—'ভিক্ষুর ধর্ম্মই বড় ?'

"ভিক্ষুর ধর্ম্মই বড়..."সমাধিমুক্তের ন্যায় কথাটি মুখ

দিয়া বাহির করিয়াই অগ্রণী মুখ তুলিল, যেন তাহার মুখে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। পরক্ষণেই নিজেকে যেন ধরাধরি করিয়া নন্দনের পদপ্রান্তে নামাইয়া দিল! বিস্ময়ে বিহ্বল দল—তাহারই অনুসরণ করিল। কঙ্কণ হাত বাড়াইয়া ছিল, অগ্রণী কাছে আসিতেই তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। তখন ভিক্ষুপক্ষের মেয়েদের মুখে 'উলু' আর শাঁখ।

অতঃপর কঙ্কণ অগ্রণীকে সস্নেহে বুক হইতে খুলিয়া পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া হাত দুটি জড় করিল; তারপর সেই যুক্তকর স্বীয় ললাটে একবার স্পর্শ করিয়াই নামিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন তাহার পশ্চাতে এক বিরাট বাহিনী, যেন তাহারা অভিশাপমুক্ত—নবজীবনে সবাই আত্মহারা!

রাস্তায় পড়িতেই কঙ্কণের গতি হঠাৎ থামিল—পথরোধ করিয়া চিত্রার পরিচারিকা। তাহার মাথার চুল বিত্রস্ত, চোখ রক্তবর্ণ, মুখ রোদনে বিকৃত! কঙ্কণ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "কে তুমি, বোন্?"

চঞ্চল দাঁড়াইয়াছিল কঙ্কণের ঠিক্ পশ্চাতেই। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আমার—" কথাটা সমাপ্ত না করিয়াই উভয়ের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কঙ্কণ সহাস্যে চঞ্চলের দিকে এক গুরুতর কটাক্ষ করিয়া কহিল, "তোমার স্ত্রী?"

চঞ্চল দুই একটা ঢোঁক গিলিয়া মুখ নামাইয়া জবাব দিল—'হুঁ!'

পরিচারিকা ফোঁপাইয়া উঠিল, তারপর মুখস্থ বলার মত বলিয়া ফেলিল, "আমাকে ত্যাগ দিয়েছে—"

কঙ্কণ তেম্‌নিই হাসিয়া কহিল, "ভালোই ত! আজ নতুন করেই একজনের সঙ্গে একজনের বিয়ে হোক্!" বলিয়াই পরিচারিকার হাত ধরিয়া চঞ্চলের হাতে গুঁজিয়া দিল। দিয়াই আবার পথ ধরিল। আর সকলেও তেম্‌নিই পশ্চাতে, মেয়ে আর পুরুষ—পাশাপাশি।

দাঁড়াইয়া রহিল মাত্র চঞ্চল আর পরিচারিকা—"বর আর কনে!"

চঞ্চল পরিচারিকাকে তাগাদা দিয়া কহিল, "বাড়ী চল!"

পরিচারিকা নতমুখে পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে জবাব দিল, "না।"

চঞ্চলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কহিল, "তবে?"

কঙ্কণ তখনও তাহাদের দৃষ্টির আড়াল হয় নাই, পরিচারিকা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে আঙুল বাড়াইল।

চঞ্চল প্রথমে সংশয়ে, তারপর হর্ষে, তারপর মূঢ়ের ন্যায় মেয়েটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেই সে ঠোঁট ফুলাইয়া স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া ফেলিল।

আঠারো

কয়েক পদ গিয়াই কঙ্কণ তাহার নব দলকে আদেশ দিল—"বাড়ী যাও!"

বিস্ময়ের কথা! একজন কহিল, "কেন, মঠ?"

কঙ্কণের মুখে হাসি আর ধরে না। কহিল, "মঠ?—বাড়ীই যে তোমাদের মঠ!" পরক্ষণেই মুখের ভাব প্রশান্ত করিয়া কহিল, "বউ, ছেলে, মা, বাপ—এই নিয়েই তোমাদের মঠ!"

বুঝিবা এক অত্যাশ্চর্য্য নির্দ্দেশ! সকলেই বিহ্বল হইয়া কঙ্কণের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কঙ্কণ তেম্‌নি করিয়াই আবার বলিতে লাগিল, "তারই ভিতর ভিক্ষু—বাপ, মা, ছেলে, বউ! কঠোর বলে যা-কিছু সে ত কারাগার, মানুষের মুক্তির মঠ সে নয়!"

অতঃপর কঙ্কণ চলিয়া যাইতেই আর একজন অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "দীক্ষা"—

কঙ্কণ বলিতে যাইবে, অদূরে ত্রিবর্ণের আবির্ভাব হইতেই সে থামিয়া গেল। সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "অধ্যক্ষ আস্‌ছেন! এসো—" বলিয়াই বাহিনীকে যেন এক জোর টান দিয়া অগ্রসর হইয়া ত্রিবর্ণের সম্মুখে গিয়া সদলে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিল।

ত্রিবর্ণের মুখে হাসি, চোখে দীপ্তি, আর সর্ব্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত আশীর্ব্বাদ! তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এক কৌতুকময়ী—কৌমুদী!

ত্রিবর্ণ আশীর্ব্বাদ করিলেন; হাত তুলিয়া—যেন সকলেই অনুভব করিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই মস্তকে ওই মহা-পুরুষের স্পর্শ পড়িয়াছে। অতঃপর ত্রিবর্ণ কৌমুদীর দিকে ফিরিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আজ তোমার একটি কথা নেব, মা! বলত, জিত্‌লো কে—তুমি, না আমি?"

কৌমুদীর মুখখানি সহসা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াই নামিয়া পড়িল।

ত্রিবর্ণ কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলিয়া উঠিলেন, "আবার

সেই পুরোনো লজ্জা ?" বলিয়াই কৌমুদীর মুখটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমিই বলি শোনো—তুমি! কেন না—"

কঙ্কণকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "তোমারি খেলাঘরে ও আজ তোমারি পুতুল !"

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি বাহিনীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, "ওঁদের দীক্ষা ?"

ত্রিবর্ণ স্মিতমুখে জবাব দিলেন,"প্রয়োজন নেই !" বলিয়াই মেয়েদের কাছে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "মা, তোমরা সজীব প্রকৃতি, দীক্ষা দেবার তোমাদের ওপরওয়ালা কেউ নেই ! কিন্তু—" পুরুষদের নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "এঁদের ভার নিয়ো তোমরা !"

মেয়েরা লজ্জায় মুখ নীচু করিতেই ত্রিবর্ণ পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, সিদ্ধার্থ—ওঁর নাম কেউ জান্‌তো না, যদি না গোপার অনুগ্রহ ওঁর ওপর পড়তো !"

একটি মেয়ের বিস্মিত মুখ দিয়া থাম্‌কা প্রশ্ন পড়িল, "গোপার অনুগ্রহ ?"

ত্রিবর্ণ শিশুর ন্যায় হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, মা !" পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হইয়া কহিতে লাগিলেন, "ইতিহাসে নেই ? তার কারণ—হয় ইতিহাস মেয়েমানুষের হাতে তৈরী হয় নি, নয় ফলের পরিচয়ে মানুষ গাছেরই নাম করে, মাটির কথা মুখেও আনে না !" একটু নীরব থাকিয়াই আবার সুরু করিলেন, "গোপা আঁচল থেকে চাবি খুলে না দিলে সিদ্ধার্থ বড়লোক হ'তে যে পার্‌তেন, একথা ইতিহাস বিশ্বাস করুক, কিন্তু—আমি করিনে! আমি করিনে! আমি বলি—গোপা ইতিহাসের উপেক্ষিতা !"

মেয়েটি যেন দুঃসহ হর্ষে বলিয়া উঠিল—"আমরাও তাই বলি, বাবা !"

"বল্‌বে বৈকি মা! পুরুষমানুষকে এঁকে ছবি করবার রঙ্ তুলি তোমাদেরই যে হাতে। সুখে তাকে নিস্তেজ করতেও পারো, আবার দুঃখে তাকে মাতিয়ে দিতেও তোমাদের জোড়া মেলে না।" বলিয়া ত্রিবর্ণ আর দাঁড়াইলেন না।

কৌমুদীরও বুঝি বা আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল না। সেও যেমন ত্রিবর্ণের অনুসরণ করিতে পা বাড়াইবে, তাহার সম্মুখ দিয়া এক অশ্বারোহী ছুটিয়া গেল। কৌমুদী চম্‌কিয়া উঠিয়া চোখ তুলিতে দেখিল—একটু দূরে দৃষ্টির মাথায় এক বিরাট নর-বাহিনী তালে তালে পা ফেলিয়া সরিয়া আসিতেছে! কাছাকাছি হইতেই টের পাইল—উহারা রাজ-পদাতিক, বিচিত্র সাজে সাজিয়া—প্রত্যেকের হাতে এক একটি করিয়া নানা রঙের পতাকা—প্রত্যেকটির গায়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা—"শ্রেষ্ঠ নাগরিকা —চিত্রা !"

অনন্তবিস্তারি আকাশ, তাহাকে ছাইয়া ঘন মেঘ একখানি - তাহার সঙ্গে আচম্‌কায় বিদ্যুতের আঁচড় পড়িলে যেমন হয়, ঠিক তেম্‌নি ধারা কৌমুদীরও মুখের চেহারা হইল এবং তন্মুহূর্তেই কঙ্কণের কাছে সরিয়া গিয়া চোখে চোখে ফেলিয়া সেইদিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই রাস্তায় যে-দিকটায় খালি, লোকজন ছিল না, সেইদিকে হেলিয়া পড়িয়া মিশিয়া গেল !

অতঃপর 'এক-পৃথিবী' নরনারীর 'পরলোক' হাতে করিয়া যে দেবদূত দাঁড়াইয়া, তাহার সম্মুখ দিয়া একে-একে চলিয়া গেল—এক বিরাট শোভাযাত্রা—রাজ-পদাতিক, অশ্বারোহী, তারপর এক উন্নতকায় শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া নগরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকা !

চিত্রা !

চোখাচোখী হইল। হইতেই চিত্রা চোখ ফিরাইয়া লইল, যেন সহস্র সহস্র দর্শকের ন্যায় কঙ্কণও একজন অপরিচিত। কিন্তু, নামিল না কঙ্কণের চোখদুটি !

কঙ্কণ! তাহার চোখের উপর এক শ্মশান, শ্মশানে মাত্র একটি চিতা, এই মাত্র জ্বলিয়াছে, আগে নয়—হু-হু করিয়া তারপর নিমেষেই নির্ব্বাপিত হইল! * * * কঙ্কণ —তাহার মুখে হাসির একটু আভা পড়িল, পড়িয়াই বিলীন হইল। তারপর সে চোখ নামাইল—চোখের নীচে চেনা পথ, চেনা মাটি, চেনা গাছপালা, চেনা ঘর-বাড়ী! তারপর পা বাড়াইয়া আস্তে-আস্তে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। তখন তাহার পশ্চাতের পৃথিবী একটু-একটু করিয়া দ্রব হইতে সুরু হইয়াছে।

মনে-মনে এক প্রশ্ন উঠে। মানব আত্মার এই যে চরম বিকাশ, হঠাৎ উহা ম্লান হইয়া পড়িল কেন এমন করিয়া ? হয় নাই—এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি—মানব সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আজিও! তাই বলিয়াই বুঝিবা ত্রিবর্ণ নগরের নারীশক্তিকে

বেচারা পুরুষের অভিভাবক করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

সন্ধ্যা হইয়াছে। চারিদিক ব্যাপিয়া প্রকৃতির কালোরূপ। কঙ্কণ রাস্তার একপাশ ধরিয়া একমনে চলিয়াছে। কতদূর গিয়াছে তাহা তাহার হুঁস নাই, হঠাৎ কাহার গায়ে পা পড়িল! পড়িতেই সে চমকিয়া পিছাইয়া আসিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই এক যন্ত্রণা-কাতর নারীকণ্ঠে নিঃসৃত হইল 'মাগো!'

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি আবার সরিয়া আসিল। রাস্তার অন্যত্র আলো থাকিলেও সে-স্থানটায় ছিল গাঢ় অন্ধকার —গাছগুলা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লতাপাতায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কঙ্কণ বসিয়া পড়িয়া শায়িত দেহটাকে হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিয়াই ভীতি-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

"উঃ—"

কঙ্কণ আর কাল বিলম্ব না করিয়াই সেই আর্ত্তব্যক্তিকে সযত্নে ধরিয়া বাহুর উপর উঠাইয়া লইল তারপর হাওয়ার ন্যায় আলোয় উড়িয়া আসিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াই অস্ফুট বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "নাগরিকা—"

নাগরিকার মাথাটি নীচের দিকে লট্‌কিয়া পড়িল।

কঙ্কণ চট্ করিয়া মাথাটা হাতের উপর রাখিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, "তোমার বাড়ী?"

যে দিকে বাড়ী—নাগরিকা আস্তে-আস্তে হাত বাড়াইয়া সেইদিকে আঙুল দেখাইল।

কঙ্কণ আর অপেক্ষা করিল না, বিদ্যুৎবেগে নাগরিকার বাড়ী গিয়া উঠিল, তারপর আতুরার নির্দ্দেশ মত তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া আস্তে-আস্তে শয্যায় শোয়াইয়া দিল। দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "লেগেছে খুব, নয়?"

নাগরিকা চোখ বুজিয়া অস্ফুট শব্দ করিয়া যেন অসহ্য যন্ত্রণায় পাশ ফিরিল।

কঙ্কণের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। নাগরিকা যেদিকে ফিরিল, সেও সেইদিকে উঠিয়া গিয়া আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় লেগেছে? কোন খানে?"

নাগরিকা হাত দিয়া দেখাইল। যেখানে হাত পড়িল সে তাহার বুক।

কঙ্কণের মুখখানা একটিবার কাঁপিয়া উঠিয়াই স্থির হইয়া গেল, যেন মেয়েটির অঙ্গের ওই আঘাত সে তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লইয়া নিজের বুকেই সংস্থাপন করিয়াছে। তারপর মুখ দিয়া কহিবার কি কথা তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। দুই একবার মেয়েটির মুখে অকারণ দৃষ্টি ফেলিয়াই নেহাৎ আনাড়ির ন্যায় আপন মনে বলিয়া উঠিল, "রাস্তা—অন্ধকার —ওখানে কেউ শুয়ে থাকে?"

নাগরিকা এইবার আস্তে-আস্তে চোখ খুলিয়া কঙ্কণের দিকে অবশনেত্রে তাকাইয়া কহিল, "হাট্‌তে যে আর পারিনি!"

কঙ্কণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইতেই নাগরিকা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া নিস্তেজকণ্ঠে পুনরায় বলিয়া উঠিল, "অনাহারে আছি —সাতদিন!"

"খাওনি কিছু?"

"ভিক্ষে মেলে নি!"

ইন্দ্রালয়ের ন্যায় অট্টালিকা—যতদূর দৃষ্টি যায়, উহার প্রত্যেক অংশে কঙ্কণ বিস্ময়-দৃষ্টিতে তাকাইয়া হঠাৎ মেয়েটির দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি ভিক্ষে কর?"

নাগরিকা মাথাটা এধারে ফিরাইয়া কঙ্কণের দিকে একটিবার তাকাইল—তাহার মুখে নিষ্প্রভ হাসি, তিক্ত এক অভিযোগের! তারপর যেন কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়াই কহিল, "জানেন না আপনি?" থামিল। একটু পরেই আবার সুরু করিল, "সন্ন্যাস নিয়েছে নগরের সবাই—আদর আমাকে কে আর করবে?—একটু জল দিতে পারেন?" —বলিয়াই কক্ষের এক কোণে আঙুল বাড়াইয়া একটা জলপাত্র দেখাইয়া দিল।

কঙ্কণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল এবং জল আনিয়া মুখে ধরিয়া পান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভিক্ষে কোথাও পেলে না কেন?"

নাগরিকার মুখে জল লাগিয়াছিল। আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া যেন অবসরমতই ঈষৎ হাসিল—ম্লান! কহিল— "আপনি শিশুর মতো অবোধ! যেখানে ঘরে-ঘরে ভিক্ষু, ছেলেবুড়ো সকলে—ভিক্ষা কে কাকে দেবে?" বলিতে— বলিতে মাথাটা বালিশ হইতে নীচে পড়িয়া গেল, যেন হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে।

কঙ্কণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি এ-পাশে আসিয়া মাথাটি ধীরহাতে বালিশের উপর তুলিয়া দিল, তারপর ঝুঁকিয়া কি বলিতে যাইবে, নাগরিকা হাত নাড়িয়া নিষেধ

করিল। একটু পরে পার্শ্বের একটি কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "ওই ঘরে—আছে একটি, তার আধখানি—তার এক কুচি ফল—এনে দেবেন?"

"দিই" বলিয়া কঙ্কণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। করিতেই দ্বারদেশে, চৌকাঠের ও-পারে, নাগরিকার ঠিক চোখের উপর আর-এক মানব-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল, সে—নন্দন! তাহার চোখে অস্বাভাবিক এক পুলক, মুখে মারাত্মক চোরা-হাসি! নাগরিকার মুখেও তখন যেন ঘন ঘন বিদ্যুৎ খেলিয়া চলিয়াছে! কিন্তু সে ক্ষণিকের। মুহূর্ত্তেই আবার সে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল এবং কি-এক আদেশ-কঠিন সঙ্কেত করিতেই নন্দন অদৃশ্য হইয়া গেল।

উনিশ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

রাত্রির কালো ছায়ার ন্যায় চিত্রা বাড়ী ফিরিল। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া মনে হইল, যেন সে টক্কর খাইয়া কোথায় মুখ থুব্‌ড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল, এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে—মুখে খানিক কাদা জল। সটান উপরে উঠিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

কতক্ষণ কাটিয়াছে তাহার ঠিক নাই, মেঝেয় কাহার পদশব্দ হইতেই চিত্রা চম্‌কিয়া উঠিল। হাতে ভর দিয়া ঈষৎ উঠিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল—রাজা! দেখিয়াই আবার তেম্‌নি করিয়াই শুইয়া পড়িল।

রাজা অগ্রসর হইয়া একেবারে চিত্রার শয্যায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "এমন করে?"

চিত্রা উঠিয়া বসিল এবং মাথার কাপড়টা খুলিয়া ফেলিয়া রাজার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আপনি মদ খান?"

চিত্রার মুখের ঐ মুক্ত দৃশ্য, চোখের সেই অভিনব শ্রী রাজাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। কহিলেন, "খাই, যখন কেউ হাতে তুলে দেয়—তুমি দেবে?"

চিত্রা তৎক্ষণাৎ ও-ঘর হইতে একটি পাত্র ভরিয়া সুরা আনিয়া রাজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"চিত্রা—"

বাহির হইতে এক অস্থির কণ্ঠ ছুটিয়া আসিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই নন্দন ঝড়ের ন্যায় কক্ষে প্রবেশ করিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রা তখন সবে সুরার পাত্রটা রাজার মুখের গোড়ায় তুলিয়াছে, হাতের চাপ খুলিয়া পাত্রটা মেঝেয় পড়িয়া গেল। নন্দন ও মুখ নামাইয়া মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া নন্দনের আর পা উঠে না, যেন সে এক নিবাসহীন পান্থ, আশ্রয়ের নির্দ্দেশ নাই, যত্ন করিয়া ডাকিয়া আনিবে—এমন কোন আমন্ত্রণও নাই! সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে চোখের দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা ঠেকিতে লাগিল, হঠাৎ যেন এক ঝড় উঠিয়া চোখে ধূলা পড়িয়াছে। নীচে নামিয়া অঙ্গনে পা দিয়াছে, সহসা ঠিক পশ্চাতেই এক শব্দ হইল, চাহিয়া দেখিল চিত্রা—পায়ে কাপড় জড়াইয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। চোখের পলকেই চিত্রা উঠিয়া নন্দনের সুমুখে পড়িয়া গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌তে এসেছিলেন?"

নন্দন যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে! বিস্ময়ের ভাণে সসম্ভ্রমে কহিল, "আপনাকে?"

চিত্রা পথ ছাড়িয়া এক পাশে দাঁড়াইল।

নন্দনও পায়ে জোর দিল। কিয়দ্দূর গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল, যেন হঠাৎ কি মনে পড়িয়াছে। চিত্রার কাছা-কাছি হইয়া শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা! এই কঙ্কণ—না থাক্!" আবার সে পিছন ফিরিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

চিত্রা নীরব অচঞ্চল, যেন কোথায় কার বাঁশী বাজিয়াছে, সেই দিকেই সে একমনে কাণ পাতিয়া।

কিন্তু এবার আর নন্দন পা বাড়াইল না। মুখ ফিরাইয়া আবার তেম্‌নি করিয়াই বলিয়া উঠিল, "কথাটা হ'ল—নাগরিকা, তাকে চেনো ত? তারই ঘরে এক বিছানায়, মুখে মু—"

"মিথ্যে কথা!"—চিত্রার চোখ দিয়া এক ঝলক অগ্নিশিখা নির্গত হইল।

গঙ্গাজল আর তুলসী—এ যেন নন্দনের হাতেই! এম্‌নিই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না—মিথ্যে নয়!" অতঃপর এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়াই আবার কহিল, "ভালোবাসা! চেন কি? নাগরিকা কত ভালোবাসে—জান তুমি?"

চিত্রার মুখখানা কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "ভালোবেসেও তাকে আপন করতে পারি নি!

"দেখ্‌বে এসো!"—বলিয়াই নন্দন মুখ ফিরাইয়া রাস্তা ধরিল।

চিত্রা অকস্মাৎ থর্‌থর্ করিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিয়াই স্থির হইয়া গেল। তারপর দেখা গেল, তাহার দেহে স্পন্দন আসিয়াছে—চোখে এক চোখ জ্যোৎস্না! ধীরে ধীরে সে পা বাড়াইল, কোথায় যেন সে জানে না, কেনই বা তাহাও তাহার অবিদিত, অথচ এখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহার চলিবে না—যেন এই জন্মের পূর্ব্বে তাহার আর-এক জন্ম ছিল, সেই জন্মে বসবাস করিবার ছিল এক পত্রকুটীর, ধরিত্রীর একান্তে—আজ সেই দিকটাই হঠাৎ তার মনে পড়িয়াছে!

এম্‌নিই সময়ে পশ্চাৎ হইতে এক তীক্ষ্ণকণ্ঠের ডাক পড়িল—"চিত্রা!"

চিত্রা ফিরিয়া দেখিল—রাজা!

কাছে আসিয়া রাজা কহিলেন, "চল্‌লে কোথায়?"

যেন আনমন হইয়া আছে, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া চিত্রা প্রত্যুত্তর দিল, "আমি? মেয়েমানুষ যেখানে যায়!"

অট্ট হাসিয়া রাজা কহিলেন, "গিয়ে লাভটা কি?—সেখানে ত' আর সুবিধে হবে না।" বলিয়াই চিত্রার মুখের কাছে মুখ আনিয়া এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "তোমারও নয়, নাগরিকারও নয়—গিয়ে দেখবে দ্বার বন্ধ!

চিত্রার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। রাজা সেই মুখের দিকে তেম্‌নি করিয়াই চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তা ছাড়া—"

কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামাইয়া আবার সুরু করিলেন, "এমন রূপ—ভিক্ষু—ভিখিরীদের জন্যে নয়! সে জ্ঞান আছে কি?—কে কার বুকে আগুন জ্বেলেছে? এত বড় আমার বুকে এতদিন ছিল না, চিত্রা! হাতে করে তুলে দিয়েছ—তুমিই! সুতরাং নামিয়ে দেবার ভার আমার—নগরের নবীনা নাগরিকার নয়!"

চিত্রার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, মুখ দিয়া একটি কথাও কহিতে পারিল না।

রাজার মুখ ছুটিয়াছিল, তেম্‌নি করিয়াই আবার বলিয়া উঠিলেন, "মুখ রাঙা কোরো না—ওতে রূপ বাড়ে!" বলিয়াই পিছাইয়া গেলেন।

চিত্রার আপাদমস্তক টলিয়া উঠিল, তারপর সুমুখের দিকে একবার ঝুঁকিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে রাস্তার অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

কুড়ি

দশজন একসঙ্গে সহজেই বশ হয়, কিন্তু পৃথকভাবে একজনকে হাতে আনা কত যে মুস্কিল, কঙ্কণ তাহা হাড়ে-হাড়ে বুঝিতে পারিল। এইমাত্র সে সমস্ত নগরবাসীকে এক কথায় বশ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু একা এই নাগরিকার কাছে সে হার মানিল। ফলের কুচিটা কাছে আনিতেই নাগরিকা ঠোট ফুলাইয়া বলিয়া উঠিল, "ধ্যান উপাসনা বুঝি আপ্‌নাদেরই একচেটে?"

কথাটা কঙ্কণ বুঝিতে পারিল না। বিস্মিতনেত্রে নাগরিকার পানে তাকাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "সকাল থেকেই রাস্তায়-রাস্তায়—অশুচি-বাস, ধুলো-পা, ইষ্টদেব্‌তার নাম নিইনি—এ কথা আপনি জানেন না?

কঙ্কণ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কি করে জান্‌বো?"

নাগরিকা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা জান্‌বেন কেন?" থামিল, যেন একসঙ্গে এতকথা কহিয়া হাঁপ ধরিয়াছে। একটু পরেই কহিল, "বলিনি আমি—ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলাম?" তারপর যেন এক অভিমানের কটাক্ষ করিয়া সুরু করিল, "আমাদের মতন যারা ভিখিরী—আমার মতন—তারাই জানে, পরের বাড়ী আঁচল পাত্‌তে হ'লে নিজের অবসর মত বাড়ী থেকে বেরুলে চলে না—সব কাজ সেরে যাওয়া কি যায়?"

"তা হ'লে, সেরে নাও—"

নাগরিকার মুখ দিয়া ঈষৎ হাসি বাহির হইল—দুষ্টামির হাসি। কহিল, "হুকুম—এখ্‌খুনি তামিল করতে হবে!" পরক্ষণেই আবার অবসন্নার ন্যায় কহিল, "করতাম, যদি শক্তি থাক্‌তো!"

"তবে?"

"এক কাজ করবেন? এই যদি—না থাক্—"

"বল না?"

"একটু উঠিয়ে আমাকে যদি বসিয়ে দেন!"

কঙ্কণ তৎক্ষণাৎ নাগরিকাকে সন্তর্পণে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিল। দিয়া কহিল, "এইবার—"

"এইবার হুকুম প্রতিপালন!" বলিয়াই নাগরিকা একমুখ হাসিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তপরেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "আর একটি—"

কঙ্কণের দৃষ্টি সপ্রশ্ন হইতেই নাগরিকা কহিল, "একটিবার বসবেন আমার সুমুখে—বিছানায়?"

"কেন?"

"ধ্যানের রূপ একটি ত চাই!"

কঙ্কণ এইবার হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "সে কি আমি?"

"'আমি' মানে মহাশ্রেষ্ঠী 'কঙ্কণ' নয়, 'ভিক্ষু' শ্রমণ কঙ্কণও নয়!—অপরিচিত পথিক একজন; মাত্র রাস্তার লোক!" একটু চুপ করিয়াই নাগরিকা আবার আরম্ভ করিল, "কেন জানেন? চিরটা কাল অন্যে মানুষকেই ভালবেসে এসেছি! তাই ধ্যানের সময় রাস্তায় যাকে দেখ্‌তে পাই, তাকেই হাত ধরে এনে সুমুখে বসাই!"

কঙ্কণকে কে-যেন তখন কৌতুকের দোলায় চাপাইয়া দোল দিয়াছে। কহিল, "সত্যি?"

নাগরিকা নির্ব্বিবাদে জবাব দিল, "যা মনে করেন! সত্যি যদি মনে করেন—সত্যি! মিথ্যে যদি মনে করেন—মিথ্যে!" বলিয়াই একবার আড়চোখে চাহিল, চাহিয়াই আবার কহিল, "ভালোবাসা!—যাকে আমি ভালবাসি, তাকে যদি আর-একটু বেশী করে প্রাণ দিই অর্থাৎ—তারই রূপ স্মরণে নিয়ে যদি—ধ্যানে বসি, তাহ'লেই—দেবতা লাভ!—ওকি, বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

কঙ্কণ অপ্রস্তত হইয়া পড়িল, তারপর মন্ত্রচালিতের ন্যায় নাগরিকার শয্যার উপর উপবেশন করিল, কাছাকাছি, মুখোমুখী—'ভক্তের' মনোমত!

নাগরিকা আর কঙ্কণ, কঙ্কণ আর নাগরিকা! নাগরিকা মুদ্রিতনেত্র, তন্ময়—স্থিরমূর্ত্তি! আর তাহারই অগ্রে বসিয়া কঙ্কণ—উৎকণ্ঠায় চঞ্চল, চোখ খুলিয়া কখন্ চাহিবে! যেন হিমালয়ের এক গোপন প্রান্তে এক পর্ব্বত-বালিকা তপস্যায় ভোর হইয়া আছে, আর তাহারই সম্মুখে তাহার আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তি কখন্ যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা ওই মেয়েটি জানেই না!

দ্বার উন্মুক্ত ছিল, হঠাৎ কাহার পদশব্দ হইতেই কঙ্কণ ফিরিয়া দেখিল—চিত্রা!

চিত্রা!—সেই পুরাতন 'মহিমা!'

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া মুখ খুলিয়া কি বলিতে যাইবে, চিত্রা দুই হাত তুলিয়া শাসন-কঠিন চক্ষে নিষেধ করিল—'চুপ্!' পরক্ষণেই পা টিপিয়া-টিপিয়া নাগরিকার কাছে সরিয়া গেল, গিয়া মিনিটখানেক অপলক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথমেই তাহার চোখে উঠিল ঝড়, তারপর—রৌদ্রের খরতেজ, তারপর—চন্দ্রের অনাবিল জ্যোৎস্না! তারপর—তারপর আস্তে-আস্তে বসিয়া পড়িল নতজানু হইয়া, গলায় আঁচল ফেলিয়া ধীরে ধীরে নাগরিকার পায়ের উপর মাথা রাখিল।

স্পর্শ পড়িতেই নাগরিকা চোখ খুলিয়া তাকাইল। বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "চি-ত্রা?"

চিত্রা স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল—"না—সতীন!"

নাগরিকার বুঝিবা আজ হাসিবার দিন, তাই হাসিয়া সারা হইয়া বলিয়া উঠিল, "তাই বুঝি এত ভক্তি?"

চিত্রা নির্ব্বিকারকণ্ঠে কহিল, "হিংসে!—যাঁকে আমি পাই নি, তাঁকে তুমি পেয়েছ!"

নাগরিকার মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল, "ও-কথার জবাব দেবে দেবতা!" বলিয়াই কঙ্কণের দিকে ফিরিল। তারপর তাহার প্রতি এক ভারি কটাক্ষ করিয়া একটি-একটি করিয়া কহিল, "মেয়েমানুষের পাঠশালায় না প্রাথমিক পাঠ পড়লে পুরুষ মানুষের পাঠশালা খোলা চলে না!" বলিয়াই আচম্‌কায় কঙ্কণের হাতটা চিত্রার হাতের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ তোমার এই হাতে খড়ি—এইখানে!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাহিরে যেন এক প্রচণ্ড ঝড় উঠিল এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই মূর্ত্তিমান বজ্রের ন্যায় প্রবেশ করিলেন রাজা, পশ্চাতে সশস্ত্র লোকজন। কক্ষের ভিতর পদার্পণ করিয়াই তিনি থম্‌কিয়া গেলেন—যেন পটে-আঁকা একখানি ছবি আর সুমুখেই তাহার—অনন্যসাধারণ চিত্রকর!

চিত্রার বুকটা উড়িয়া গেল। কঙ্কণের হাত হইতে নিজের হাতটা টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় অগ্রসর হইয়া রাজার পথরোধ করিয়া বলিয়া

উঠিল, "আমি প্রস্তুত! এই নিন্—" আর্ত্তনাদ করিয়া রাজার পায়ের উপর আছ্ড়িয়া পড়িল।

রাজা ঈষৎ পিছাইয়া গেলেন। তারপর পশ্চাতের লোকগুলাকে ইঙ্গিত করিতেই তাহারা নতশিরে অন্তর্ধান হইল। অতঃপর চিত্রার দিকে স্থিরচক্ষে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ একটু হাসিলেন—পলকমাত্র! তারপর মুখের চেহারা তেম্‌নিই শক্ত করিয়া কহিলেন, "আমার দণ্ড, আর তোমার উৎকোচ—এক নয়!"

চিত্রা মাথাটা একটু খাড়া করিয়াছিল, আবার উহা মেঝেয় লট্‌কিয়া পড়িল। পরক্ষণেই সে নিজেকে যেন এক জোর টান দিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইয়া কি বলিতে যাইবে, পারিল না—তাহার মুখের উপর রাজার চোখের এক গুরুতর শাসন পড়িয়াছে! কণ্ঠ অধিকতর তীক্ষ্ণ করিয়া রাজা পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "রক্ত মাংস মেদ মজ্জা রূপ রং—তারই গড়ন—এ নিয়ে মেয়েমানুষ নয়!"

চিত্রা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তবে?" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল।

বর্ষার পর শরৎ, শরতের এক উষা, সেই উষায় পৃথিবীর উপর যেমন সোনালী আলো পড়ে, ঠিক তেম্‌নি ধারা আকস্মিক এক আলোকে রাজার মুখখানা চক্‌চক করিয়া উঠিল। সরিয়া আসিয়া চিত্রার সজল মুখের দিকে একটিবার চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "মেয়েমানুষ পৃথিবী গড়ে! অসম্পূর্ণকে পরিপূর্ণতা এনে দেয়!" বলিয়াই চিত্রাকে টানিয়া আনিয়া কঙ্কণের পাশে দাঁড় করাইয়া কহিলেন, "এইখানেই তোমার আসন!"

মুহূর্ত্তেই দ্বারদেশে সহসা যেন একখানি চাঁদ উঠিল। রাজা, কঙ্কণ, চিত্রা—সকলেই অবলোকন করিল—কৌমুদী! আর তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নন্দন।

নাগরিকা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন আচম্‌কায় তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে! সহাস্যে দ্রুতপদে কৌমুদীর কাছে সরিয়া আসিয়া খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "এসো, ভাই!" তারপর হাত ছাড়িয়া পিছনে দাঁড়াইয়া আর-তিনটি যে মূর্ত্তি, তাহাদের দিকে একবার চাহিয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "সব মাটি!"

কৌমুদী!—এক 'মৃত্যু-বাসরেই' বুঝিবা তাহার ডাক পড়িয়াছিল, কিন্তু—একি! * * * তাহার দুটি চোখই বড় হইয়া আর্দ্র হইয়া উঠিল, যেন বুকের ভিতরকার এক কঠিন পুলক দ্রব হইয়া চোখে পড়িয়া জমা হইয়াছে। ঝটিতি চোখের সে-ভাবটা পরিবর্ত্তন করিয়া রোষের ভাণ করিয়া নন্দনের দিকে চাহিল. চাহিতেই নন্দন থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি কিন্তু!" তারপর সেই মুখ আর-একজনের দিকে ফিরাইতেই নিমেষ-কঠিন এক কটাক্ষ পড়িল। নন্দন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল ও যেমন সে তাড়াতাড়ি মুখ নামাইবে কৌমুদী একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্! লক্ষ্মণের লজ্জা ঢাক্‌তে বসুমতী আর দ্বিধা হলেন না!" অতঃপর কঙ্কণের দিকে মনের মত একবার আড়-চোখে চাহিয়াই রাজার পানে ফিরিয়া হাত জোড়ে কহিল, "আপ্‌নাকে কিন্তু নমস্কার!"

রাজা তখন তন্ময় হইয়া তাকাইয়া ছিলেন আর একটি মূর্ত্তির পানে—নাগরিকার কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইতেই কৌমুদী কপালে হাত ঠেকাইল।

রাজাও প্রতি-নমস্কার করিলেন। তারপর আনমনে নাগরিকার কাছে সরিয়া গিয়া মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন; তারপর—তারপর কটিবন্ধ হইতে তরবারি খুলিয়া নিঃশব্দে মেয়েটির পদমূলে নামাইয়া রাখিলেন।

কঙ্কণ, চিত্রা, কৌমুদী, নন্দন—প্রত্যেককেই দৃশ্যটা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দোল দিয়া গেল। অত্যধিক বিস্ময়ে ও হর্ষে বিহ্বল হইয়া কঙ্কণ ছুটিয়া গিয়া রাজার হাত ধরিয়া কি বলিতে গেল, পুরাপুরি পারিল না। বুকের কোণ্ ভাঙিয়া মাত্র এইটুকুই বাহির হইল, "রাজা—"

রাজা নীচু হইয়া কঙ্কণের পদস্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশান্তকণ্ঠে কহিলেন, "না। আজ থেকে আমিও ভিক্ষু! কিন্তু, শিষ্য তোমার নই—" নাগরিকার প্রতি আঙুল বাড়াইয়া কহিলেন, "ওঁর!" বলিয়াই চিত্রার দিকে আড়চোখে তাকাইলেন।

চিত্রা বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল।

শেষ

আক্‌তার সাহেবের ব্যাঘ্র শিকার

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

সন্ধ্যা কখন অতীত হয়ে গেছে। পৌষ মাস, শীতার্ত্ত রজনী। পার্ব্বত্য অঞ্চল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। "একতারা"র ডাক-বাংলো ঠিক পাহাড়ের পাদপ্রান্তে। কপাট জানালা বন্ধ ক'রে একটা টেবিলের চারিপাশে জুটেছি কয়েকটা শিকারী-বন্ধু। গোটা আষ্টেক বন্দুক ও রাইফেল, একটা ছোট-খাটো যুদ্ধের উপযোগী গোলা-গুলি, আর দুই-একখানা নেপালী ভোজালী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কখন জল বন্ধ হবে তারই প্রতীক্ষা হ'চ্ছে। সমস্ত ঘরখানা উত্তেজনায় পূর্ণ। রাত বারোটায় বেরোব জঙ্গলে তাই মাঝে মাঝে জানালা খুলে আকাশের অবস্থাটা দেখে নিচ্ছি। সমস্ত আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন। ক্বচিৎ বিদ্যুৎশিখায় গাঢ়তর হ'চ্ছে চতুর্দ্দিকের নিরন্ধ্র অন্ধকার।

গরম চায়ের সঙ্গে শিকার-প্রসঙ্গ আরও জমে উঠেছে। আক্‌তার সাহেব বর্ণনা করছেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর শেষের বাঘ-শিকার। আমাকে ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। একদিন শিকার-সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘুরে আমার কবি-বন্ধুর ইচ্ছানুসারে সেই রাত্রেই একতারা থেকে ফিরে এসেছিলাম। বর্ণনা হচ্ছে সেই রাত্রেরই অভিজ্ঞতা।

রাত তখন একটা। জমিদার সাহেব পূর্ব্বরাত্রের মত আজও শিকারে বেরিয়েছেন। টুরার কার, হুড নামান হয়েছে, সামনের উইণ্ডগ্লাসখানাও খুলে রেখে দেওয়া হয়েছে। শুধু বন্দুক চালানর সুবিধার জন্যই নহে। স্পট্ লাইট শিকারে এই কাচ খুলে না ফেললে আলোর রশ্মি কাচে প্রতিফলিত হয়ে মোটর-চালককে বিভ্রান্ত করে। বন্দুকের নিশানার জন্যও তার অপসারণ প্রয়োজন। এক পাশে দাঁড়িয়ে আক্‌তার সাহেব চতুর্দ্দিকে লাইট ফেলে জঙ্গলের জানোয়ার সন্ধান করছেন, আর এই লাইট সঞ্চালন ক'রে মোটর-চালককে রাস্তাও দেখাচ্ছেন। পথ ভুল হ'লে বিপদ অনেক। মোটরে চ'ড়ে স্পট্ লাইটের শিকার অভিজ্ঞ শিকারীদের চোখে হেয়। স্পট্ লাইটের শিকার নিন্দনীয়—কিংবা মাচায় বসে বাঘ শিকারই ধন্য, এখানে সে তর্ক তুলছিনে—যা ঘটেছে তা-ই বলছি।

তীব্র আলোক-শিখায় পাহাড়ের উপর এক জোড়া বড় চোখ জ্ব'লে উঠেছে। দুই চোখের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট। আক্‌তার সাহেবের বিভীষিকা-ভরা চাপা-গলায় আওয়াজ হ'ল —"টাইগার—টাইগার, গো অন্।" শিকারী সাহেব বললেন, "ওটা শেয়াল!" কিন্তু অভিজ্ঞ আক্‌তার সাহেবের ভুল হয় না। বাঘের চোখে স্পট্ লাইট প্রথম মনে হবে লাল—তার পরে নীল। তারপরে চোখ বন্ধ করে দেবে। যখন চোখ খুলবে আবার সেই, প্রথমে মনে হ'বে উজ্জ্বল লাল, তার পরেই নীল। আক্‌তার সাহেবের উত্তেজিত ড্রাইভারের ঔদাসিন্যে ক্রুদ্ধ--বার বার জিদ করছেন "গো অন্"—এগিয়ে চল। ড্রাইভার নিশ্চল। হঠাৎ রাইফেলের আওয়াজ, পর পর দুবার। সাহেব গুলি ছুঁড়েছেন—সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গর্জ্জন। রাইফেলের আর বাঘের হুঙ্কারে পাহাড় যেন কাঁপছে। আক্‌তার সাহেব বধির। একটা রবারের নলের সঙ্গে নিকেলের চোঙ লাগান। কানে নলটা লাগিয়ে চোঙে মুখ রেখে কেউ চেঁচিয়ে কথা বললে তিনি শুনতে পান। এই ব্যবস্থা না হ'লে তিনি রাইফেলের আওয়াজও শুনতে পান না। এবারেও রাইফেলের শব্দ তিনি শোনেননি—কিন্তু রাইফেলের ব্যারেল নিঃসৃত দীর্ঘ অগ্নিশিখা তিনি দেখেছেন। বাঘের উল্লম্ফন তাঁর চোখে পড়েছে। চেঁচিয়ে আবার হুকুম দিলেন, "গো অন্!" শিকারে আক্‌তার সাহেবের আদেশ অলঙ্ঘ্য—কিন্তু সোফার মালিকের আদেশে গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দিলে। মোটর ছুটে চলল—ক্রোশ দুই দূরে বস্তী অভিমুখে। আক্‌তার সাহেব লাইট বন্ধ ক'রে মোটরে দেহ এলিয়ে দিলেন। দারুণ হতাশায় ও রোষে বাক্যহারা।

দুপুর রাতে জমিদার সাহেবের ত্রস্ত আবির্ভাবে বস্তিখানি চঞ্চল। উত্তেজিত, কিন্তু প্রায় সকলেই নির্ব্বাক।

মাঝে মাঝে এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে গুঞ্জিত হ'চ্ছে সাহেবের বিলাপ। দুঃখ তাঁর দুঃসহ। বহু বৎসরের বহু ব্যর্থতার পরে এই তাঁর প্রথম সার্থক প্রয়াস। বাঘ ঘায়েল, কিন্তু তাহা সহজলভ্য নহে। খড়-শয্যায় অর্পিত দেহ আক্‌তার সাহেব ভোরের দিকে জানালেন—হুজুরের হুকুম হ'লে তিনি বাঘের সন্ধানে যাবেন। একটী মাত্র সঙ্গী চাই। ইঙ্গিতে ইসারায় এই বধির শিকারীকে বাঘের চলাচল জানিয়ে দেবে। "বাঘ ঘায়েল হ'লে অনুসরণ করা হবে না" এই ছিল হুজুরের হুকুম। আজ বাঘ হাত ছাড়া হওয়ার ক্ষোভে তাঁহার সঙ্কল্প শিথিল হ'ল। তিনি জানালেন, তাঁর আপত্তি নাই। কিন্তু সঙ্গে যাবে কে? এই দারুণ বিপদকে বরণ ক'রে কে হ'বে আক্‌তার সাহেবের মৃত্যু-পথের সাথী। কেউ রাজী হ'ল না—হুজুর ত নিশ্চয়ই নন। অনেকেরই জরুরী কাজ আছে—কারও বা তবিয়ৎ খারাপ। একটী লোক এই দল থেকে দূরে তৃণাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে চাদর মুড়ি দিয়ে তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছিল। আহ্বান কানে পৌঁছতেই সে এগিয়ে এল। সে পুনোয়া। এমন অনেক দুঃসাহসিক অরণ্য-যাত্রায় সে আক্‌তার সাহেবের পার্শ্বচর। গায়ের রং কালো, দোহারা চেহারা, মাথায় নাতি-দীর্ঘ রুক্ষ চুল—চোখ দুটো অনবরত লাল। তাড়ি খেয়ে বেহুঁস না হ'লে পুনোয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত। তিন ক্রোশ দূরে শিকারের আয়োজন হচ্ছে, কখন্ নিঃশব্দে পুনোয়া এসে দলে ভিড়ে গেছে। কখন্ সে খবর পেয়ে তিন ক্রোশ অতিবাহন ক'রে এসেছে, ভেবে আমরা বিস্মিত হয়েছি।

পুনোয়া বেছে নিলে একটা উনচেস্টার রাইফেল, আর আক্‌তার সাহেব নিলেন হল্যাণ্ড এণ্ড হল্যাণ্ড ডাব্‌ল ব্যারেল। এই দারুণ শীতেও আক্‌তার সাহেব গায়ের গরম সেরোয়ানী খুলে ফেললেন। গায়ে রইল খাকি শার্ট, আর পরণে ব্রিচেশ। কামিজ ব্রিচেশের ভিতরে গুঁজে নিয়ে স্মার্ট সাজা তাঁর আসে না। হ্যাট তাঁর মাথায় কখনও দেখিনি। পকেটে একখানা সুতীক্ষ্ণ ছুরী—হাতে রাইফেল। পুনোয়ার গায়ে মলিন কামিজের উপর একটা লাল র‍্যাপার। বাঘ শিকারে ইহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী, রেড্ র‍্যাগ্ টু এ বুল্-এর মত রেড্ র‍্যাগ্ টু এ টাইগার্ সমানই উত্তেজক।

সকলেই মোটরে উঠেছে। কতকটা রাস্তা মোটরে যাওয়া যাবে—তারপর মোটর ছেড়ে আক্‌তার ও পুনোয়া যাবে বাঘের সন্ধানে—গহন অরণ্যে। আক্‌তার সাহেব জানিয়ে দিলেন—বন্দুকের ঘন ঘন আওয়াজ শুন্‌লে বুঝ্‌তে হবে বিপদ হয়েছে। আহত হ'লে তার দেহটা হাসপাতাল পর্য্যন্ত টেনে যেন নিয়ে যাওয়া হয়। বিপদ অনিবার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেখানে বাঘ গুলি বিদ্ধ হ'য়ে গর্জ্জন ক'রেছিল সেখানে রক্ত জমাট হয়ে আছে। এবারে রক্তের দাগ দেখে সুরু হ'বে বাঘের অনুসরণ। এ এক বিষম ব্যাপার। রাইফেল বাগিয়ে রেডি হ'য়ে সামনে এগিয়ে যেতে হ'বে—নিঃশব্দে, রুদ্ধশ্বাসে। কথাবার্ত্তা চল্‌বে না। সংবাদ আদান-প্রদান হবে ইঙ্গিতে, চোখের ইসারায়, গা টিপে। চোখ থাক্‌বে একাগ্র, শ্রুতিপথ উদগ্র। শুষ্ক পত্রের মৃদু শব্দটুকুও না এড়ায়। একটী অসতর্ক পদক্ষেপ, এক লহমার ভুলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এতবড় বিশাল দেহ বাঘ এতটুকু লতা-গুল্মের অন্তরালে বেমালুম লুকিয়ে যায়—শিকারীর তীক্ষ্ণ নজরে তাকে খুঁজে পায় না। বাঘের সন্ধানে এটা সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিস্ময়। আর বাঘের এই অদ্ভুত আর নিঃশব্দ আত্মগোপনের জন্য কত শিকারীই না অকালে প্রাণ হারিয়েছে!

আক্‌তার সাহেবের পক্ষে এই রকমের দুঃসাহস এই প্রথম নয়। এর বিপদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট। এরূপ এবং আরও অনেক প্রকারের অভিজ্ঞতা! হরিণ শিকার করতে গিয়ে বাঘ বেরোল—একটার পরে একটা, তার পর আরও একটা। আহত শার্দ্দূল বিরাট হাঁ ক'রে দীর্ঘ উল্লম্ফনে ছুটে এসেছে একটুখানি লতাপাতার আড়ালে উপবিষ্ট আক্‌তার সাহেবের দিকে। পাশের সঙ্গী দারুণ আতঙ্কে বেহুঁস হয়ে প'ড়ে গেছে। কিন্তু আক্‌তার সাহেব অটল। স্থির লক্ষ্য। ভয়লেশহীন তাঁর মুখখানা মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে সংকল্পে কঠিন হয়েছে, কিন্তু স্থৈর্য্য হারায় নি। কিন্তু আজিকার এই শিকার-যাত্রায় মনে হ'চ্ছে তিনিও একটুখানি বিচলিত। রবারের নল আর চোঙ্‌টা কোন কাজেই আসবে না। শিকারে আর যে কোন শব্দ যদিই বা চলে, মানুষের একটুখানি কথাবার্ত্তার শব্দ জানোয়ারের কাণে বিশেষ অর্থপূর্ণ, অদ্ভুত বিপদের ইঙ্গিত। আক্‌তার সাহেব গম্ভীর, পুনোয়া উদাসীন। রক্তলোভী অদৃশ্য ব্যাঘ্রের বিরুদ্ধে এই

দুটী মাত্র লোক। চেহারা নেহাৎ সাধারণ। ব্যাঘ্রের বিশাল দেহের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

দুর্ভাগা দেশ, দুর্ভাগ্য তার পরিস্থিতির। আহত শার্দ্দূলের সঙ্গে লড়াই-এ যে এগিয়ে যাচ্ছে—অরণ্যের সেই মৃত্যুভয়হীন সাহসী বীর লোকালয়ে চৌকীদারের সম্মুখে তটস্থ—জমিদারের পিয়াদার ভয়ে অঞ্চলস্থ। ভাব্ছি এর জন্য জবাবদিহি কার? দেশের নেতৃদের, না জমিদারদের? এরা অন্নহীন কাঙাল। শীত বর্ষায় মাথা রাখবার ডেরাটুকুও নাই। বস্ত্রাভাবে দেহ অর্দ্ধনগ্ন। পুরুষানুক্রমে নিরক্ষর। প্রতিবাদ জানে না—আশার উত্তেজনা নাই। এই মৌন পুরুষকার নিঃশেষ হ'চ্ছে রোগের পীড়নে—পিয়াদার তাড়ায়। শুধু একতারায় নহে, চাত্রায় দেখেছি, পালামৌতে দেখেছি, শিঙ্গারে দেখেছি—সশাবামে, আরও কত জায়গায়। শিঙ্গারের ধুন্দু সিংকে মনে পড়ে। এই ক্ষীণ-দেহ লোকটী রয়াল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে লড়েছে—বাঘের কবল থেকে ছিনিয়ে আনত আক্রান্ত মোষকে। বাঘের দাঁত ও নখের ছিন্নভিন্ন তার দেহটা তীব্র এসিডে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেমন ক'রে এই ছাতুতে গড়া প্রাণটা তার রক্ষা পেল! সর্ব্বাঙ্গে গভীর ক্ষত নিয়ে এই লোক সেদিন থেকে প্রত্যেক বাঘশিকারীর সঙ্গী। সেই লড়াই-এর পরে বুঝি তার সঙ্কল্প হয়েছে—তার আর বাঘের একই অরণ্যে স্থান অসম্ভব। একজনকে বাঁচতে হ'লে আর একজনকে জায়গা ছেড়ে দিতে হ'বে। এই জঙ্গলে আর একটী লোক ল'ড়েছিল—ভালুকের সঙ্গে। তার মুখে চোখে ভালুক দাঁত ও নখরের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। জীবনান্ত পর্য্যন্ত তার এই বীভৎস চেহারা ভালুকের হিংস্রতার সাক্ষী হ'য়ে থাকবে। আজ সে অতি-বৃদ্ধ, কিন্তু প্রত্যেক শিকারে সে অগ্রগামী। বনের বাঘ-ভালুকের কাছে এরা নির্ভীক, কিন্তু জমিদারের পিয়াদার কাছে এরা ভয়ে বিমূঢ়।

যেখানে খানিকটা রক্ত জমাট হ'য়েছিল—অনুসন্ধানে তার আশে পাশে পাহাড়গাত্রে সামান্য ধূলায় বাঘের পা ও নখরের দাগ পাওয়া গেল। আক্তার সাহেব নিবিষ্ট হ'য়ে পায়ের দাগ ও রক্ত দুইই পরীক্ষা ক'রে পুনোয়াকে রাস্তা নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন। মাঝে মাঝে রক্তের দাগ তাঁদের রাস্তা দেখাচ্ছে। প্রায় একশত গজ এমনি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলে হঠাৎ পুনোয়ার গতিরুদ্ধ হ'ল। আক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়েই তাঁর রাইফেলের মুষ্টি দৃঢ়, আর সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হ'য়ে উঠ্ল। ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তাকিয়ে দেখ্লেন। তার পর রাইফেল নামিয়ে কি একটা পরীক্ষায় ব্যস্ত হ'লেন। সেখানে আবার খানিকটা রক্ত, এবারে টাট্কা রক্ত। পুনোয়াকে বুঝিয়ে দিলেন বাঘ ঘায়েল বটে, কিন্তু অশক্ত নয়। ফুসফুসে আহত হয় নাই। রক্ত ফেনযুক্ত (frothy) নহে। খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে এগোতে হ'বে। তাঁরা বাঘকে দেখ্তে পাবে না বটে, কিন্তু খুব সম্ভব বাঘ তাদের গতিবিধি দেখ্তে পারে। এই মাত্র বাঘ এইখানেই শুয়েছিল—তাজা রক্ত তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। অনুসরণকারীদের সাড়া পেয়ে এই মাত্র বিরক্ত হয়ে উঠে গেছে।

আবার নিঃশব্দে অনুসন্ধান সুরু হ'ল। এবার আরও সতর্ক। মাথা সামনে ঝুকিয়ে রাইফেলে অদৃশ্য বাঘকে লক্ষ্য ক'রে নতজানু হ'য়ে এই কণ্টকাকীর্ণ প্রস্তরময় পথে এগিয়ে চলা কতটা দুঃসাধ্য তা এই কার্য্যে অভ্যস্ত ব্যক্তি ছাড়া কাহারও অনুমান করা অসম্ভব। খানিকটা এগিয়ে যেতেই এই শীতের প্রভাতেও তাঁরা স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছেন। কাঁটায় তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার তাঁদের অবসর নাই।

কিসের একটু শব্দ, পুনোয়া ইসারায় জানালে। উত্তেজনায় তাঁদের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে একটুখানি শুষ্ক পাতায় পায়ের শব্দ। উভয়ের রাইফেলের দৃষ্টি এবার দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে—এবার শুষ্ক লতাপাতা দেখেও বাঘ ভ্রম হ'চ্ছে। তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে তাদের চোখ যেন ঠিক্রে পড়্ছে। কিছুই দেখা গেল না; কিন্তু এরা ঠিক বুঝতে পারলে বাঘ থেকে এদের দূরত্ব বেশী নয়। চড়াই পথে চলেছে। উভয়ে অবাক হ'ল। বাঘ ক্ষীণবল হ'লে এই চড়াই পথ ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত সমতল রাস্তা বেছে নিত।

আহত ব্যাঘ্রের অনুসরণ কতটা বিপদসঙ্কুল তার দীর্ঘ বর্ণনা অনাবশ্যক। শুধু এটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হ'বে যে আড়াল থেকে নিদ্রিত বাঘকে গুলি করা চলে, কিন্তু শায়িত না থাকলে শিকারীর হাতে বন্দুক থাকা বা না-থাকার মধ্যে পার্থক্য অতি যৎসামান্য। জঙ্গলের চারিপার্শ্বে সমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও যেমন অসম্ভব, লুক্কায়িত বাঘকে অকস্মাৎ দেখ্তে পাওয়াও তেমনি ভাগ্যের উপরেই

নির্ভর করে। অরণ্যে একটুখানি শব্দ আর বাঘের উল্লম্ফন ও অতর্কিতে আক্রমণ এতই সহসা ও ক্ষিপ্র হওয়া সম্ভব যে অনুসরণকারীদের গুলি করার অবকাশ থাকে না। তবু আমাদের শিকারীদ্বয় এগিয়ে চলেছেন। ফলাফল অনিশ্চিত। হয়ত বাঘ নিহত হ'বে অথবা তার দংষ্ট্রাঘাতে প্রাণ দিতে হ'বে; নিদেন পক্ষে চিরতরে বিকলাঙ্গ হ'য়ে বিড়ম্বিত জীবন যাপন।

শিকারীদ্বয় এগিয়ে চলেছেন। অগ্রগমনের ভঙ্গী তেমনি। দ্বিপ্রহর কখন পেরিয়ে গেছে। ক্ষুৎপিপাসা বোধের সময় নাই—দেহ শ্রান্ত কিন্তু সঙ্কল্পে তাঁরা অটল। কোথাও একটু শব্দ হয়ত জানোয়ারের একটা কল্পিত নিশ্বাস তাঁদের সাম্‌নে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে। এক সময়ে তাঁরা সভয়ে দেখ্‌তে পেলেন বাঘ তাঁদের কালীপাহাড়ীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বাঘ কালীপাহাড়ী পৌঁছিতে পারলেই তার সন্ধান অসম্ভব। আবার কি একটু শব্দ শোনা গেল—এক টুকরো পাথর গড়িয়ে নীচে পড়েছে। মনে হ'ল চড়াই পার হ'য়ে বাঘ এবার উৎরাই ধরেছে। তারই পায়ের আঘাতে এক-টুকরো পাথর গড়িয়ে নীচে পড়েছে। এ তারই শব্দ।

এ স্থানটা ছোট ঝোপঝাড়, লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। একবার মনে হ'ল, দূরে ঝোপের ভিতর দিয়ে একটা বড় জানোয়ার এগিয়ে চলেছে। লতাগুল্মে তারই আন্দোলন। তারপর লতাগুল্মের সে আন্দোলনও থেমে গেল। জঙ্গল ঘন হ'য়েছে, বাঁয়ে অদূরে কালীপাহাড়ীর গম্বুজায়িত চূড়া চোখে পড়্‌ছে। অরণ্য-পথ ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে এল—এখন আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না—অনেক দূর পর্য্যন্ত রক্তের চিহ্নও দেখা যায়নি। শিকারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। আক্‌তার সাহেব বাম হাতে কপালের ঘাম মুছে নিলেন। আশে-পাশে, ডাইনে ও বাঁয়ে স্বতন্ত্রভাবে দুজনে রক্তের সন্ধানে নিবিষ্ট হলেন। রক্তের দাগ হারিয়ে ফেললে আজকের অভিযান ব্যর্থ। আর একটা আশঙ্কা প্রবল হ'তেই আক্‌তার সাহেব পুনোয়াকে ইসারায় ডেকে নিলেন। কাছেই কোথাও বাঘ লুকিয়ে নেই ত? এমন বেসামাল হ'য়ে অনুসন্ধান চলবে না—তাতে অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও প্রচুর। আক্‌তার সাহেব খানিকটা ভেবে কর্ত্তব্য স্থির করে নিলেন। পুনোয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, জল কত দূরে? পুনোয়া জানালে, অর্দ্ধ মাইলের ভিতরেই জল আছে। ঝরণার একটুখানি ক্ষীণধারা সেখানে প্রস্তর বালির মধ্যে জমা হচ্ছে। সমুদ্রে দিকহারা নাবিক যেমন ধ্রুবতারা দেখ্‌তে পেয়ে উল্লসিত হয়, আক্‌তার সাহেবেরও বিবর্ণ মুখখানা জলের সন্ধান জেনে তেম্‌নি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তৃষ্ণা নিবৃত্তির সম্ভাবনায় নয়—বাঘের লক্ষ্যস্থল যে জল তাতে সন্দেহ নাই। জলের দিকে যাওয়ার সহজ রাস্তাটা ধ'রে আবার তাদের যাত্রা সুরু হ'ল। খানিকটা দূরে যেতেই পুনোয়া ঝুঁকে প'ড়ে কি দেখ্‌লে—তারপরে একটা শুকনো পাতা তুলে আক্‌তার সাহেবকে দেখালে। পাতার উপরে এক বিন্দু তাজা রক্ত। চল,

নবাব আক্‌তার (বিহারের প্রসিদ্ধ বাঘ শিকারী)

এগিয়ে চল—সাবধানে সন্তর্পণে। আবার সেই উৎকর্ণ অভিনিবেশ; রুদ্ধশ্বাস, চকিতদৃষ্টি, রাইফেলের লক্ষ্য। কতক্ষণ এইভাবে খোঁজা হ'ল কারুরও হুঁস নাই। শীতের সূর্য্য কখন মাথার উপর থেকে স'রে গেছে। বনের ভিতরে অপরাহ্নের ঈষৎ তরল অন্ধকার দ্রুত নেমে আস্‌ছে। এবারে উভয়ের বেশ শীত বোধ হচ্ছিল। ঘড়ি খুলে দেখা গেল বেলা চারটা। আক্‌তার সাহেবেরও গতি রুদ্ধ হ'ল। আর এক ঘণ্টায় সমস্ত বনভূমি অন্ধকারে ডুবে যাবে—ফিরে যেতে হ'বে যে! একটী টর্চ্চও সঙ্গে নেই। রাইফেল নামিয়ে এবারে তারা ফেরবার পথ সন্ধানে ব্যস্ত হ'ল। জঙ্গলে রাস্তা একটু ভুল হ'লে সে ভুল সংশোধন কত কষ্টসাধ্য—

যারা পাহাড় অরণ্যে অভ্যস্ত নয় তাদের পক্ষে ধারণা করাও অসম্ভব। কিন্তু আশৈশব জঙ্গলের মধ্যে বাস করেও আজ উভয়ের বার বার রাস্তা ভুল হচ্ছিল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে—জঙ্গলের রাস্তা ক্রমেই অস্পষ্ট হচ্ছে। একটা কি জানোয়ার হঠাৎ তাদের ঠিক সাম্‌নে উপস্থিত হয়েই ছুটে পালাল। ওটা বন-শূয়োর হ'বে। হাতে রাইফেল আছে, কিন্তু এদিকে ভ্রূক্ষেপ করার তাদের অবসর নাই। আজ কত রাত জঙ্গলে কাটাতে হ'বে কে জানে—জঙ্গল থেকে বেরুতে পারবে কি-না তারই বা নিশ্চয়তা কি? হঠাৎ বৃক্ষশীর্ষে স্পট্ লাইটের আলোক রেখা দেখা দিল। মোটরের হর্নও শোনা গেল। আশ্বস্ত হ'য়ে উভয়ে হর্নের শব্দ লক্ষ্য করে অগ্রসর হ'লেন।

হায়না

মোটরে যখন তাঁরা পৌচেছেন—তখন অনেকটা রাত হয়েছে। মোটরে যারা ছিলেন তাঁরাও ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লিষ্ট—দীর্ঘ প্রতীক্ষায় অসহিষ্ণু। উৎকণ্ঠারও অবধি ছিল না। আক্‌তার সাহেব পৌছতেই অসংখ্য প্রশ্ন তাঁকে করা হ'ল। এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া তিনি অনাবশ্যক বোধ ক'রে ডাক-বাংলার দিকে গাড়ী চালাতে আদেশ করলেন। পুনোয়া প্রশ্নের উত্তরে হাত তুলে আক্‌তার সাহেবকে দেখিয়ে দিল।

জমিদার সাহেব বিষণ্ন। "চা লাও"—"খানা জলদি" এ গর্জ্জন আর শোনা যাচ্ছে না। খানসামা বাবুর্চ্চি ভৃত্যের অভাব নেই—কিন্তু সকলেই নির্ব্বাক। পুনোয়া সাহেবের জন্য চায়ের কথা বলতেই সকলের চৈতন্য হ'ল। চা এসেছে, আক্‌তার সাহেব একটা আরাম কেদারায় শুয়ে চোখ বুজে। হয়ত তাঁর দু চোখ ভ'রে জ্বলে উঠেছে গত রাত্রে স্পট্ লাইটে উদ্ভাসিত এক জোড়া বড় চোখ—দুটো মশালের মত।

সাহেব লেপের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন। চা ও নাস্তা যখন টেবিলে রাখা হ'ল তিনি বেরিয়ে এলেন। বাঘের জন্য হতাশা আর বিলাপের অন্ত নাই। আক্‌তার সাহেব তাঁর অনুসন্ধানের কাহিনী বর্ণনা ক'রে জানিয়ে দিলেন, ভোর হ'লে তিনি আবার বাঘের সন্ধানে যাবেন। বাঘের আশ্রয়স্থল নির্ণীত হয়েছে, তিনি ভরসা করছেন এ চেষ্টা তাঁদের সার্থক হবে। উপসংহারে শুধু এইটুকুই বললেন, বাঘ নজরে এলে হয়—বাঘ অথবা আক্‌তার সাহেবের মৃতদেহ তিনি ফিরে পাবেন। কিন্তু বাঘ যদি কালী-পাহাড়ীতে অদৃশ্য হয় তিনি নাচার। আক্‌তার সাহেবের দৃঢ়সংকল্পের অনেক পরিচয় তিনি পেয়েছেন। আশ্বস্ত হ'য়ে তিনি লেপ আশ্রয় করলেন। আক্‌তার সাহেব চোখ বুজে প্ল্যান করছেন আগামী অভিযানের। সকলেই আহারের প্রতীক্ষা করছেন। সমস্ত বাংলো নিঃশব্দ। কপাট জানালা বন্ধ। রুদ্ধদ্বার বাংলোর বাইরে খোলা বারান্দায় একাকী উপবিষ্ট পুনোয়া। নিদ্রা তার একান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যক। সকলের আহারের পরে তার ভাগ্যে এক মুঠো জুটবে কি-না কে জানে।

তার চোখের সাম্‌নে অদূরে অন্ধকার গাঢ়তর ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে একতারার পাহাড়। উচ্চ পাহাড়ের কোন অদৃশ্য গহ্বর থেকে উৎক্ষিপ্ত জলধারা সশব্দে প্রতিহত হ'চ্ছে পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়ের শীর্ষ থেকে শীর্ষান্তরে আছাড় খেয়ে সে স্রোত নেমে এসেছে ধরণীর বুকে। বাংলো থেকে তার শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু দিনের বেলায় পাহাড়গাত্রে তার জল-প্রবাহ চোখে পড়ে। এই ঝরণা থেকে দিকে দিকে বেরিয়ে গেছে কত স্রোত-ধারা। এরই একটা ধারা ব'য়ে এসেছে ডাকবাংলোর ঠিক সম্মুখে। আর একটা বয়ে যাচ্ছে সশব্দে ডাকবাংলোর পশ্চাৎভাগে। এই দুই ধারার মিলন হয়েছে বাংলোর দক্ষিণ প্রান্তে, যেখানে অরণ্যের প্রথম আভাস হাতছানি দিয়ে ডাকছে পথিককে, ঘন অরণ্য আর ঝর্ণার দিকে। ঐ ঝর্ণায় যেখানে উৎস পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর—

সেখানে বাস করে বিশালকায় সম্বর, মৃগ, ভালুক, বন্য-বরাহ, শার্দ্দূল আর চিতা। এমনি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে চিতা বাঘ নেমে আসে শস্যক্ষেত্রে মৃগের সন্ধানে, সুপ্ত পল্লীর আশে পাশে ভেড়া-ছাগলের রক্ত-লোভে। মাঝে মাঝে নৈশ নীরবতা ছিন্ন করে ক্যানেস্তারা, কাড়া, নাকাড়া বেজে ওঠে। বস্তির লোক হুঁসিয়ার হয়—বস্তিতে বাঘ ঢুকেছে। কোথায় আকের ক্ষেতে ভুট্টার ক্ষেতে বাঁশের তৈরী মাচা থেকে টিনের শব্দে প্রান্তর ধ্বনিত হয়, ভালুকের গ্রাস থেকে বাঁচাতে ফসল। পুনোয়া অরণ্যের অন্ধকারের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে—হয়ত বহু রজনীর বহু দুঃসাহসের স্মৃতি তার মনকে আলোড়িত করছে।

যখন আহারের পালা শেষ হল তখন রাত প্রায় শেষ হ'য়েছে। ড্রাইভারকে আদেশ করা হ'ল, আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটর চাই। শিকারীরা একটা জলের কেরিয়ার সঙ্গে নিলেন। রাইফেল, গুলি, গোলা—আর একটা বড় ভোজালি। আজ হয়ত বাঘের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ, হয়ত বা এই শেষ শিকারযাত্রা, কে জানে।

গ্রাম্য শিকারীদের আহ্বান করা হ'ল। আক্তার সাহেব তাঁর আজকার প্ল্যান তাদের বুঝিয়ে দিলেন। তাদের বাঘের অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, গাছে চ'ড়ে ডা'নে বাঁয়ে বাঘের গতি জানিয়ে দিতে হ'বে আক্তার সাহেবকে। বাঘ সামনে না গিয়ে অন্য দিকে গেলে যারা গাছে থাকবে, হাঁক্ ডাক্ ক'রে বাঘকে তারা সম্মুখের দিকে তাড়া করবে। আক্তার সাহেব আর পুনোয়া এগিয়ে যাবেন বাঘের সম্ভাবিত আশ্রয়স্থান পশ্চাতে রেখে সাম্‌নে। পিছন থেকে তাড়া খেয়ে বাঘ ছুটে এলে আক্তার সাহেব তাঁর কর্ত্তব্য করবেন। বাঘের আশ্রয়স্থান জান্‌তে পেলে এই ব্যবস্থাই উত্তম। আক্তার সাহেব সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছেন—বাঘ ঝর্ণার জল পান ক'রে তারই নিকটের ঘন জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

পূর্ব্ব দিন আক্তার সাহেব আর পুনোয়া অক্ষত দেহে অরণ্য থেকে ফিরে এসেছে, রাত্রে জঙ্গলে পথ অতিবাহন করেছে। এই ঘটনায় অনেকেই আশ্বস্ত হ'য়ে এগিয়ে এল। এদের যথাযোগ্য উপদেশ দিয়ে আক্তার সাহেব তাদের পায়ে চলা পথে আগে পাঠিয়ে দিলেন—তাঁদের যাওয়া হ'বে মোটরে। আজ কন্‌কনে শীত—হাত পা শীতে আড়ষ্ট হ'চ্ছে। আক্তার সাহেব গরম সেরওয়ানী প'রে নিলেন, পুনোয়ার পোষাক শীত-গ্রীষ্মে ঐ একই। কামিজ আর লাল র‍্যাপার। বার মাস পাহাড়ে বাস ক'রে শীত-গ্রীষ্ম সে জয় করেছে। এই র‍্যাপার পুনোয়ার নিত্য সহচর। শীতের সময় গায়ে, রোদের সময় পাগড়ী। রাত্রে খড়ের শয্যায় লেপের কাজ করে। স্নানের পরে র‍্যাপার প'রে শুকিয়ে নিচ্ছে ভিজে ধুতি। আর ক্ষুধা পেলে দোকান থেকে বেঁধে নিয়ে আস্‌ছে মুড়ি চিঁড়ে ছাতু। দেহাতির পক্ষে এই একটা র‍্যাপারই যথেষ্ট।

আজ অনেকটা রাস্তা অল্প সময়েই অতিক্রম করা যাবে। কাল যে জঙ্গল তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হয়েছে—আজ সেগুলি খুঁজে দেখার প্রয়োজন নাই। সোজা চলে যেতে হবে ঝর্ণার দিকে। তারপর ঝর্ণা পিছনে রেখে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আরও দূরে। পুনোয়া দেখে নিলে সব আয়োজন প্ল্যান অনুযায়ী ঠিকই হয়েছে। গাছের উপরে সর্দ্দার হ'য়েছে মোদিয়া। তার হাতে বন্দুক। ঝরণার অতি নিকটে যে গাছ, মোদিয়া থাকবে সেই গাছে। বাঘ সেখান থেকে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোদিয়াও এগিয়ে যাবে এক গাছ থেকে নেমে অন্য গাছে।

বন্যশূকর

বাঘ নজরে এলে তার গতি লক্ষ্য ক'রে পুনোয়াদের জানিয়ে দেবে—বাঘ ডানে কি বাঁয়ে, পূর্ব্বে কি পশ্চিমে। কোন বিপদ উপস্থিত হ'লেই মোদিয়া ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ দেবে। যাঁরা দূরে মোটরে অপেক্ষা করবেন এ বন্দুকের আওয়াজ তাঁদেরই জন্য। আক্তার সাহেব নিজে সব ব্যবস্থা দেখে খুশী হ'য়ে নিঃশব্দে পুনোয়াকে নিয়ে

এগিয়ে গেলেন। জলের কাছে এসে বাঘের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। আক্‌তার সাহেবের অনুমান মিথ্যা হয়নি। পায়ের দাগ পরীক্ষা ক'রে বোঝা গেল, বাঘের একখানি সামনের পা আহত। নরম মাটীতে সব জায়গায় তার ছাপ আসেনি। যেখানে ছাপ পড়েছে তাও সামান্য। দুই-এক জায়গায় রক্তের দাগও দেখা গেল।

অদূরে একটী অনুচ্চ পাহাড়। একে একটা টিবি বা টীলা বলাই সঙ্গত। আমাদের শিকারীদ্বয় এই টীলার উপর তাদের আসন স্থির ক'রে নিলেন। টীলার ঠিক নীচেই জঙ্গল। উপরে কোন গাছপালা নেই। পাথর আর শক্ত মাটীর একটা স্তূপ। তার সর্ব্বত্র পাথরের টুকরো ছড়ানো। উভয়ে নিজ নিজ রাইফেল পরীক্ষা ক'রে নিলেন।

ব্যাঘ

ভোজালিখানাও দেখে নিয়ে আবার কোমরে বেল্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। দূরে গাছের সর্ব্বোচ্চ শাখায় আরোহণ ক'রে মোদিয়া হাত নেড়ে নিজের আর আশে পাশে ও পশ্চাতের বৃক্ষারোহীদের অবস্থান জানিয়ে দিল। একটু পরেই যারা গাছে চড়েছে তাদের আঁচলে কুড়োনো পাথরের টুকরো জঙ্গলে ছোঁড়া হ'বে। সকলের হাঁক্‌ডাকও সুরু হ'বে। আর মোদিয়া একটা বন্দুকের আওয়াজ করবে। উদ্দেশ্য, আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে বাঘকে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে দেওয়া।

পনর মিনিট পরে ব্যবস্থা অনুযায়ী হাঁকডাক সুরু হ'বে, কিন্তু পুনোয়া আক্‌তার সাহেবের রকম লক্ষ্য ক'রে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। আক্‌তার সাহেবের চোখ নিমীলিত, মাঝে মাঝে হাই তুলছেন, দেহ শ্লথ হ'য়েছে। পুনোয়া বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে দেখ্‌তে পেলে আক্‌তার সাহেব তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। আজ এই আসন্ন সঙ্কটে তাঁর এ কি আচরণ! পুনোয়া তাঁকে তুলে দিয়ে ইসারায় জঙ্গল দেখিয়ে দিল। আক্‌তার সাহেব জানালেন চেষ্টা বৃথা; তাঁকে ঘুমুতে হবেই। এই নিদ্রার হাত থেকে তাঁর অব্যাহতি নাই। চোখের দৃষ্টি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল। পাঠক বিস্মিত হ'বেন, জীবনে এই মহাসন্ধিক্ষণে আক্‌তার সাহেব নিদ্রার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর অবচেতনার ভিতরে মাত্র একটী কথা ওতপ্রোত হয়েছে। "এ আমার কালনিদ্রা, অতলস্পর্শ সুষুপ্তি! চোখের পাতায় নেমে আস্‌ছে অন্ধ তমসা—রোধ ক'রবার শক্তি আমার নেই—হয় ত এ কালনিদ্রার শেষ অঙ্কে এ ধরণীর মোহ থেকে চির-নিস্কৃতি।"

তারপর? তারপর দিনরাত্রি শার্দ্দূলের সান্নিধ্য, আকাশ অরণ্য সব একাকার হ'য়ে নিঃশেষে মুছে গেল। এই নিদ্রার রহস্য কে জানে! এই সন্ধিক্ষণে আহত ব্যাঘ্রের সঙ্গে আসন্ন সংগ্রামের শঙ্কটাকুল মুহূর্ত্তে আক্‌তার সাহেবের এ অদ্ভুত নিদ্রা আর একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই ব্যাপারের মত তারও প্রতি বর্ণ সত্যি।

আমাদের এক বিশেষ পরিচিতা মহিলা যৌবনের প্রারম্ভে স্বামীর বিশ্বাস ও স্নেহ হারিয়ে একমাত্র সন্তানকে বুকে করে নিয়েছিলেন। দুঃখিনীর ছেঁড়া আঁচলের মণি। এই সন্তানের জ্বর বিকারে দুই মাস সুশ্রূষা ক'রে তাকে মৃত্যুর কবল থেকে সেবার বাঁচালেন বটে—কিন্তু কয়েক দিন পর জ্বরের পাল্টা আক্রমণ দেখা গেল—অবস্থা বুঝে ডাক্তার চোখ মুছে জবাব দিলেন। জননী এবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সন্তানের শিওরে জায়গা ক'রে নিলেন। পলকহীন নেত্রে সন্তানের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর বিশ্বাস—তাঁর চোখের সাম্‌নে থেকে ঈশ্বরও তার প্রাণটুকু কেড়ে নিতে পারবে না। এই সন্তানের মৃত্যু হ'লে প্রতিবেশী সকলে এসে দেখতে পেলে—মৃত সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে মহিলা গভীর নিদ্রার ক্রোড়ে সমাহিত!

জীবন-মরণের বেলাভূমিতে এমনি ধারা বিস্মৃতির কাহিনী আরও কত আছে—আজ সে প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য নহে।

টীলার উপরে তারপর যে ঘটনা ঘটেছে তা বর্ণনা

করার কৃতিত্ব আমার নাই। পাঠক আপন কল্পনায় সে দৃশ্যের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করুন, আমি আভাস দিব মাত্র। অনুমান বিশ মিনিট পরে—পুনোয়ার হস্ত তাড়নায় নিমেষে আক্‌তার সাহেবের চেতনাফিরে এসেছে। যে অনুচ্চ টীলার উপরে ব'সে তাঁরা বাঘের প্রতীক্ষা করছিলেন ঠিক তার নীচেই বাঘ। একে বাঘ বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। এর বিপুল আয়তন, এর বিরাট বিচিত্র মাথা, এর গুম্ফ এবং শ্মশ্রু, এর দুই চোখের সন্ত্রাসবর্ষী দৃষ্টি যাঁর চোখে পড়েছে সেই আতঙ্কে অভিভূত হ'য়েছে। এর রং গাঢ় পিঙ্গল, না পাটকিলে বল্‌তে পারছি না। দেহের কোন অংশ পিঙ্গল, কোথাও সাদা, তার পাশেই কালো, আবার পাটকিলে। আর এই বর্ণ-সমাহারকে ভীষণ ভয়াল করেছে এর দেহ;

দাঁড়িয়ে, উপরের আততায়ীদের নিরীক্ষণ করছে। দুই চোখে তার আগুন।

লক্ষ্য ব্যর্থ হ'য়েছে, আক্‌তার সাহেবের উৎকণ্ঠার অবধি নাই; পুনোয়া চঞ্চল হ'য়ে হুকুমের প্রতীক্ষা করছে, আদেশ না পেলে গুলি করার তার অধিকার নাই। এ কি, বাঘ টীলার উপরে উঠে আস্‌ছে। এক মুহূর্ত্ত, কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই আক্‌তার সাহেবের প্ল্যান সাব্যস্ত হ'ল। পুনোয়াকে অনুসরণের আদেশ করে বাঘকে বাঁয়ে রেখে আক্‌তার সাহেব দ্রুত অবতরণ করছেন। উদ্দেশ্য, সমান্তরাল অবস্থান থেকে বাঘের একপাশ থেকে গুলি চালাবেন। আবার দুবার রাইফেলের নির্ঘোষ। পাহাড়ে দূরে দূরে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'ল। কিন্তু বাঘ নির্ব্বিকার! পুনোয়া

চিতা

হরিণ

মস্তক আর বৃহৎ লাঙ্গুলের সর্ব্বত্র গাঢ় কৃষ্ণ তীর্য্যক্ রেখা। এই তীর্য্যক্ রেখার জন্য কেউ কেউ একে বলেন—মিঃ তীর্য্যক রেখা। এর বলিষ্ঠ বপু, উজ্জ্বল বিচিত্র দেহ, আর এর দীর্ঘ চোখের তীক্ষ্ণ ও নির্ভীক দৃষ্টি রোমাঞ্চকর। অরণ্যপথে এর গতি শব্দ-লেশহীন, কিন্তু এর চিত্রিত দেহ, মস্তক ও লাঙ্গুল প্রতি পদক্ষেপে নিঃশব্দে একটী কথাই বল্‌ছে—"খবরদার!"

আক্‌তার সাহেব সভয় ও সোৎসাহে দেখলেন—বিশ্ব-স্রষ্টার সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাঁর সম্মুখে।

গুড়ুম্, গুড়ুম্! নিশানায় সিদ্ধহস্ত আক্‌তার সাহেবের হল্যাণ্ড এণ্ড হল্যাণ্ড দুবার গর্জ্জন করলে। আক্‌তার সাহেবের দেহের রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌ছে।

এ কি! বাঘের গতি রুদ্ধ হ'য়েছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বাঘ ভূলুণ্ঠিত হয় নি। সে নিশ্চল হ'য়ে টীলার নীচে

দেখলে বাঘের মুখখানা জিঘাংসায় আরও ভয়ঙ্কর হয়েছে। একবার শত্রুকে চোখের চাহনীতে শাসন জানিয়ে টীলার নীচে মুহূর্ত্তে জঙ্গলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। লক্ষ্য ব্যর্থ, আক্‌তার সাহেব ক্ষিপ্ত হ'য়ে গেছেন। ছুটে নীচে নেমে এলেন। উদ্দেশ্যহীন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল হয়ত গুলি লেগেছে। পুনোয়াকে বললেন, ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হ'বে। জঙ্গল ন'ড়্‌ছে না। গাছের উপর থেকে মোদিয়া জানালে—বাঘ দেখা যাচ্ছে কিন্তু জীবিত কি মৃত বোঝা যাচ্ছে না। আধঘণ্টা পরে উভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগলেন। বুক আর কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে চলা। হাতে উদ্যত রাইফেল। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে বাঘ দেখা গেল। মনে হ'ল দুই পায়ে ভর ক'রে বাঘ ব'সে আছে। হয়ত ভুল দেখা, কিন্তু এগিয়ে

যাওয়া আর হ'বে না। পুনোয়াকে জানালেন, এক সঙ্গে উভয়ে বাঘ লক্ষ্য করে গুলি করবেন। মুহূর্ত বিলম্ব নয়। বাঘ জীবিত থাক্‌লে অবিলম্বে আক্রমণের সম্ভাবনা। দুইটি রাইফেলের ব্যারেল থেকে অগ্নিশিখা বিদ্যুৎশিখারই মত বেরিয়ে এল। মোদিয়া চীৎকার করে বললে—বাঘ মরেছে! পুনোয়া সায় দিল। আক্‌তার সাহেবকে ইসারায় তাই জানিয়ে দিলে। আক্‌তার সাহেব নিঃশব্দে পুনোয়ার হাত ধরে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। ইঙ্গিতে বৃক্ষারোহীদের নীচে নেমে আসতেও নিষেধ জানালেন। আর আধ ঘণ্টা। তার পর এগিয়ে দেখ্‌তে হ'বে। আধ ঘণ্টা পরেই এগিয়ে দেখা গেল রক্তাক্ত বিগতপ্রাণ ব্যাঘ্রের দেহ ভূলুণ্ঠিত।

আক্‌তার সাহেব বাঘের ক্ষত পরীক্ষা ক'রে পুনোয়াকে দেখালেন—জমিদার সাহেবের সে রাত্রের গুলিতে বাঘের একটা থাবা জখম হ'য়েছে। আর একটা গুলি তার চোয়াল ভেঙ্গে দিয়েছিল। আক্‌তার সাহেব আরও জানালেন এই দাঁত ও চোয়াল ভাঙ্গা ছিল বলেই বাঘ বারংবার লক্ষ্য করেও তাঁদের আক্রমণ করেনি—এ না হ'লে এই ঘটনা হয়ত অন্য ভাবে লিখিত হ'ত।

ডাকবাংলোয় যখন বাঘের দেহ আনা হ'ল তখন রাত হয়েছে। দারুণ শীত উপেক্ষা ক'রে জমিদার সাহেব সপারিষদ বাঘ ঘিরে বসে আছেন—গোঁফ আর নখ কেউ উপড়ে নিতে পারে নি। টিপয়ের উপরে রক্ষিত গরম চা'র পেয়ালা থেকে ধূঁয়া উড়্‌ছে। নাস্তাও দেখ্‌তে ভাল। আক্‌তার সাহেব হুজুরকে অনুসরণ বৃত্তান্ত জানাচ্ছেন। আর সকলের পশ্চাতে বারান্দার এক কোণে লাল র‍্যাপারখানা মুড়ি দিয়ে পুনোয়া নিদ্রার ক্রোড়ে মগ্ন।

কল্প-প্রিয়া

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মোর কল্পলোকে—
এসো আজ মন্থর চরণে,
বরণে বরণে—
আনন্দের শিহরণে স্তিমিত রহস্যভরা চোখে।
হেথা শুধু তুমি আর আমি
রচিব সুরার পাত্রে সুরলোক স্বপ্ন দিবা যামি।
তোমার অঙ্গের গন্ধে চন্দনের লাজক্ষুব্ধ মুখ
ব্যথিত উন্মুখ—
চেয়ে রবে বেদনামন্দ্রিত আঁখি মেলি
অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে গুরুভার হৃদয় উদ্বেলি'
মোর মুখপানে,
সায়াহ্নের গানে—
নমিবে তন্দ্রার ঘোর ধীরে মোর তনুমন ছাপি,
শালের শাখায় মৌন কামনার স্পর্শাবেশ কাঁপি
ছড়ায়ে পড়িবে বিস্ময়;
তুমি আর আমি রবো চেয়ে মুখোমুখি,
কোন কথা নয়;
দৃষ্টি দিয়ে আমি শুধু লেহন করিব তব তনু,
অণু-পরমাণু—
প্রতি লোমকূপে মোর মাগিবে আশ্রয়;
সেই মোর জয়—
রহিবে অক্ষয় চির-যুগান্তের সুনীল আকাশে,
তারই আশে পাশে—
কামনার জ্যোতিহীন অস্পষ্ট তারকাসম মোর ব্যাকুলতা
বহিবে ব্যর্থতা।
পদপ্রান্তে কাঁদিবে একাকী
নগ্ন বসুন্ধরা;
তুমি লোকোত্তরা
উর্ব্বশীর লইবে প্রণাম নববধূ বেশে।
তোমারই প্রেমের মন্ত্র অফুরন্ত রবে দেশে দেশে।

রহস্যময়ী

শ্রীগৌতম সেন

অনেকদিন পরে যতীনের সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হ'লো। এ সেই যতীন যাকে ছোটবেলায় আমরা ইন্দ্রনাথ বল্‌তাম। অদ্ভুত একটা টাইপ : না পারে এমন কাজ নেই। সাপের লেজ ধ'রে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে তাকে ছুঁড়ে দিতো—যেমন ক'রে লোকে ঢিল ছোঁড়ে।

একদিন বল্লে, চল্‌ নবাবের কবরখানা দেখে আসি। পৌছুতে রাত্রি হ'য়ে গেলো। বল্লে, কুছ্‌পরোয়া নেই, আজ খোসবাগেই খিচুড়ি পাকাবো। আর ঐ যে দেখ্‌ছিস লুৎফা উন্নিসার কবর—ঐখানে চুপ ক'রে কান পেতে শোন্‌, শুনতে পাবি।

শুনতে অবশ্য কিছুই পেলাম না, তব্‌ বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো।

শ্মশানঘাটের সুরঙ্গপথে অবলীলাক্রমে যতীন একদিন নেমে গেলো। বল্লে, থাক্‌ তোরা দাঁড়িয়ে—ব্যাপারটা কি দেখে আসি।

এই সুরঙ্গ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বল্‌তো। কেউ বল্‌তো, নবাব সিরাজদ্দৌলার গুপ্তপথ—কেউ বল্‌তো, জগৎশেঠের ধনাগার—আবার কেউ বল্‌তো রঘুডাকাতের আড্ডা ছিলো ঐ মাটির মধ্যে। কথা যাই থাক্‌, লোকচক্ষে ঐ স্থানটি ভীতিপ্রদ ছিলো সন্দেহ নেই। প্রকাণ্ড একটি সুড়ঙ্গ। অন্তত বাইরের বিস্তার দেখে তাই মনে হয়। নীচে নামবার সিঁড়ি আর তারই পাশ দিয়ে নেমেছে একগাছা লোহার শিকল।

কিন্তু যতীন আর ফির্‌লো না। সেই যে লোহার শিকল ধ'রে নেমে গেলো, তারপর ভগবান জানেন সে এতকাল কোথায় কিভাবে ছিলো।

বল্লে, খুব মোটা হয়েছিস দেখ্‌ছি। দেশের খবর কি? বাজপেয়ী তেমনি বিনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লিখ্‌ছে তো?

বল্লাম, ঠিক পনের বছর হবে, নয় রে?

—ও আর ক'টা দিন। মানুষের আয়ুর কাছে ওটা কিছুই নয়। ব'লে যতীন হাসলে।

—কিন্তু কি হ'য়েছিলো তারপর?

—সে অনেককথা। বল্‌বো একসময়। কাল যাস্‌, আমার ওখানেই খাবি। ব'লে যতীন তার ঠিকানা লিখে দিয়ে ঝড়ের মত অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

পরদিন গেলাম ঠিকানা খুঁজে খুঁজে। এক অন্ধকার গলি এবং ততোধিক অন্ধকার জীর্ণ একখানা বাড়ী। দরজার কড়া নাড়্‌তেই গেলো খুলে। নারীকণ্ঠে উত্তর এলো, আপনি কি নির্ম্মলবাবু?

—হাঁ। যতীন নেই?

উত্তর এলো, ভেতরে আসুন।

—যতীন কি নেই?

—না।

—তাহ'লে থাক্‌, আর-একদিন আস্‌বো।

—কিন্তু আপনার যে এখানে খাবার কথা।

বল্লাম, বেশ তো, আর একদিন খাবো না হয়।

—তিনি আপনার খাবার সমস্ত ব্যবস্থাই ক'রে গিয়েছেন। আপনি অত লাজুক কেন? বল্‌তে বল্‌তে মহিলাটি—সম্ভবত বৌদিই হবেন, খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।

—কিন্তু এই বা কি-রকম ভদ্রতা, খেতে ব'লে খাওয়াবার মালিকই রইলো অনুপস্থিত! অনুযোগের সুরেই বল্লাম।

—কিন্তু মালিক তো তিনি একা ন'ন। এতবড় মানুষটাকে আপনার নজরে পড়লো না এও তো আশ্চর্য!

—আচ্ছা, হতভাগাটা আস্‌বে কখন? বল্লাম।

—তা তো জানি না ঠাকুরপো। আজ নাও আসতে পারেন, আবার পাঁচ সাত-দিন দেরি ক'রে আসাও তাঁর অভ্যেস আছে।

—চমৎকার! স্বামীভাগ্য তাহ'লে আপনার ভালই দেখ্‌ছি।

—হাঁ, তা খুব। ব'লে মহিলাটি মুখ টিপে হাস্‌লেন।

কিন্তু অদ্ভুত সপ্রতিভ এই মেয়েটি। ঠিক যে-সময়টিতে নিজেকে ধিকৃত করবো মনে করেছি, সেই সন্ধি মুহূর্তে পরম নিষ্কৃতির মত মেয়েটি এলো একটি স্নিগ্ধ-অধিকার নিয়ে। অকুণ্ঠিত-কণ্ঠে কত পরিচিতের মত ডাক্‌লে, ঠাকুরপো। লজ্জায় মাথাটা আপনিই পড়্‌লো নুয়ে।

—কি ভাব্‌ছো ঠাকুরপো? তারচেয়ে হাতমুখ ধুয়ে ভাল হ'য়ে ব'সো, আমি রান্নাটা সেরেনি।

আশ্চর্য এই যতীন। আর ততোধিক আশ্চর্য তার এই বৌটি। বন্ধু হ'লেও, এক অপরিচিত যুবককে এমন অসঙ্কোচে আহ্বান করার কল্পনাও আমি করিনি কোনদিন। মনটা বিষিয়ে উঠ্‌লো। মনে হ'লো চীৎকার ক'রে বলি, এ আমার সইবে না—আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু কি জানি কেন, এতবড় আঘাত দিতেও প্রাণ চাইলো না।

আকাশে উঠেছিলো মেঘ। বৌদির উৎকণ্ঠার আর অন্ত নাই। বল্লে, এই মেঘ মাথায় ক'রে নাই বা গেলে ঠাকুরপো!

বলে :কি এই মেয়েটি! বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। একটা পরিচ্ছন্ন সরলতায় সেও ঠিক আমারই দিকে আছে চেয়ে। বল্লাম, তা হয় না বৌদি!

—কেন হবে না। মেঘ না কাট্‌লে তোমার কিছুতেই যাওয়া চল্‌বে না।

—কিন্তু তাই বা কি ক'রে সম্ভব। যতীন বাড়ী নাই—

বাধা দিয়ে বৌদি বল্লে, সম্ভব অসম্ভবের কথা আমি বুঝ্‌বো। তিনি বাড়ী নেই, সেকথাটা তোমার চেয়ে আমি বেশী জানি ঠাকুরপো!

লজ্জিত হ'লাম। বল্লাম, তার জন্যে নয় বৌদি। এই একখানা ঘর—আমাকে ছেড়ে দিয়ে হয়তো তোমার খুব খানিকটা আত্মপ্রসাদ হবে, কিন্তু আমি সেটাকে গ্রহণ করবো কিসের জোরে?

—আমাকে যে কৃচ্ছ্রসাধনই করতে হবে, এই বা তোমাকে কে বল্লে।

—কিন্তু ঘর তো এই একখানিই।

বৌদি খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, একঘরে রাত্রিবাস করলে জাত যায়, এ আমিও যেমন স্বীকার করি না—আমার স্বামীও তেমনি ঐ কথাগুলোকে অবজ্ঞা করেন।

বুঝ্‌লাম, যতীন কিসের জোরে তার স্ত্রীর উপর এমন ক'রে নির্ভর করতে পেরেছে। কিন্তু মন সায় দেয় না। কিছুতেই পারি না এই নির্লজ্জ পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে! আজন্ম সংস্কারের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনে মনের এই বিক্ষুব্ধতাকে কোন দিক দিয়েই গোপন করতে পার্‌লাম না। বৌদির তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি এড়ায় নি। বল্লে, না হয় নাই থাক্‌লে, মেঘটা অন্তত দেখে যাও।

এরপর সাতদিন কেটে গিয়েছে। যতীনের বাড়ী যেতে সাহস হয়নি। হয়তো সে এখনো ফেরেনি এবং বৌটি তেমনি একলাই আছে। কি জানি কোথায় আমার মনের কোনে একটু সঙ্কোচ জমে উঠেছে যেটাকে দূর করতেও মমতা হচ্ছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন বারবার ক'রে মনে আস্‌ছে, যতীন যদি নাই এসে থাকে, তবে তার সংসার চল্‌ছে কি ক'রে? তাদের সাংসারিক দৈন্য তো নিজের চোখেই দেখে এসেছি। একটা বিশ্রী ব্যাকুলতায় মনটা ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়্‌লাম।

ডাক্‌তেই, বৌদি এসে দরজা খুল্‌লে। বল্লে, মনে পড়্‌লো ঠাকুরপো!

সেকথার উত্তর না দিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন কর্‌লাম, যতীন আসেনি?

বৌদি তেমনি ক'রেই হেসে উত্তর দিলে, না। বোধ করি এখনো তাঁর সময় হয়নি।

—মানে, সে কি সেই থেকেই বাড়ী নেই?

—এসো, ভেতরে এসো। ব'লে হাত ধ'রে বৌদি আমাকে একেবারে নিজের ঘরে নিয়ে এলো। অমন ক'রে দোর ধ'রে দাঁড়িয়ে কোন মেয়েছেলের সঙ্গেই কথা বল্‌তে নাই: তাতে পাঁচজনে পাঁচকথা বলে, এ বুদ্ধিটুকুও কি তোমার হয়নি? ব'লেই বৌদি হেসে ফেল্লে।

অদ্ভুত এই মেয়েটি! ও যেন হাস্‌বার জন্যেই পৃথিবীতে এসেছে। যে দৈন্য ওর ক্ষুদ্র পরিবেশটিকে অক্টোপাসের মত অহোরাত্র রয়েছে ঘিরে—ভাবি, তাকে ও তুচ্ছ করলো কিসের জোরে! হয়তো এ ক'দিন ওর অনাহারে অর্দ্ধাহারেই কেটেছে, কিন্তু মুখ দেখে কিছুই বোঝ্‌বার উপায় নাই।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | শারদোৎসব | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অনেকক্ষণ চুপ ক'রেই কাট্‌লো। কি-ই বলা যেতে পারে। হয়তো অতি সহজেই কথাটা তোলা যায়, কিন্তু এতদিন পরে এই আত্মীয়তার অভিনয় করতে আমার নিজেরই লজ্জা হ'লো।

—কি ভাব্‌ছো ঠাকুরপো?

—ভাব্‌ছি, আজ এইখানেই দুটো খেয়ে যাবো কিনা।

বৌদি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো। বল্লাম, বুঝতে পেরেছি: এইটুকুই জান্‌তে চাইছিলাম। একটা অপদার্থের হাতে পড়ে এরকম উপবাস তোমাকে আর কতদিন করতে হয়েছে বৌদি?

—তুমিও তো কোন খোঁজ নাওনি ঠাকুরপো! হয়তো তিনি এইভেবেই নিশ্চিন্ত আছেন, তুমি যখন আছো একটা উপায় হবেই।

—এ সে ভাব্‌তেই পারে না। তা ছাড়া আমি নাও আস্‌তে পারি, এইটিই তার সর্বাগ্রে ভাবা উচিত ছিলো।

—কি ক'রে ভাববে বল, বন্ধুকে সে কোনদিনই অত ছোট ক'রে দেখেনি।

কথা যাই হোক্, আমার অপরাধও যে সামান্য নয় বৌদির কথায় চৈতন্য হ'লো। বল্লাম, একটা সত্যি কথা ব'ল্‌বে বৌদি, ক'দিন তুমি অনাহারে আছো?

আমার চোখের দিকে চেয়ে বৌদি হেসে ফেল্লে। বল্লে, অতি সামান্যতেই মেয়েদের মত তোমার চোখে জল আসে ঠাকুরপো!

—কিন্তু আমার কথার তো কোন উত্তর পেলাম না বৌদি?

—আচ্ছা, তুমি চাল-ডাল নিয়ে এসো। তারপর দুজনে একসঙ্গে খেতে খেতে বল্‌বো।

রাজ্যের বাজার মুটের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলেছি, পিছন থেকে যতীন ডাক্‌লে—অত ছুটিস না একটা 'য়্যাক্‌সিডেণ্ট্' হবে।

বল্লাম, তুমি একটি রাস্কেল। বৌটাকে এমন ক'রে ফেলে যেতে তোমার পৌরুষে বাধ্‌লো না?

যতীন তেমনি স্বভাব-দৃপ্ত হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, খাবার কি আমি জোটাই রে! ওর জন্যে ভগবান আছে।

আশ্চর্য ওর কথা! বল্লাম, আমাকে ক্ষমা করিস্ ভাই; আমারই নির্বুদ্ধিতায় বৌদিকে উপোস্ করতে হ'লো। আমিই বৌদিকে ভুল বুঝেছিলাম, ইচ্ছা ক'রেই সংস্রব করেছিলাম ত্যাগ।

যতীন আবার হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, মোটরখানা আছে, না বিক্রী ক'রে ফেলেছিস?

—না, আছে এখনো।

যতীন কি যেন ভাব্‌লে। তারপর বল্লে, তবে আর কি—তুই তো রাজা। যার বাড়ী আর গাড়ী আছে, সেই এ সংসারে টি'কে গেলো। আমরা তো চিনির বলদ, চিনি ব'য়েই জীবনটাকে কাটিয়ে দিলাম।

যতীনের কথায় ব্যথা পেলাম। চোখের উপর একটা দুস্থ উলঙ্গ পৃথিবী বীভৎস হ'য়ে উঠ্‌লো। কিল্‌বিল ক'রে বেড়াচ্ছে সব বুভুক্ষু নর-নারীর দল! আর্তনাদ করছে রুগ্না-মায়ের কোলে সদ্যজাত শিশু। একফোঁটা নাই দুধ: শুষ্ক-স্তন টেনে টেনেও পায়না রক্তবিন্দু। বার্লির জলে আর সাবুর ক্বাথে ঘর আলো-করা মাণিকগুলো তাদের পৃথিবীর দিকে প্যাট্ প্যাট্ ক'রে আছে চেয়ে। বল্লাম, বেঁচে থাকার মত পাপ আর নাই—না রে?

—তোরা বুঝিস এসব কথা? যতীন হেসে বল্লে।

—বুঝ্‌বো না কেন, ভাগ্যের জোরে একখানা মোটর আর বাড়ী পেয়েছি বই তো নয়!

যতীন হো হো ক'রে আবার হেসে উঠ্‌লো। খুব ভাল লাগে ওর ঐ হাসিটি। এক এক সময় বিস্ময় লাগে, ঐ শরীরে ও অমন হাসে কি ক'রে!

খাওয়ার পর্ব শেষ হ'লে, সেই পুরোণো কথা পাড়্‌লাম। বল্লাম, তোর শ্মশানঘাটের গল্প বল্ যতীন।

—ও আর কতটুকু গল্প রে! তোরা রইলি ওপরে, আমি গেলাম নেমে। কিন্তু কোথায় যাবো? সব অন্ধকার। চুপ ক'রে ঐ অন্ধকারেই ব'সে রইলাম। তারপর যখন টের পেলাম, তোরা চলে গিয়েছিস তখন ওপরে উঠ্‌লাম। ভাব্‌লাম, বাড়ী গেলেই তো ধরা প'ড়ে যাবো—আর বাড়ীর টানই বা আমার কোথায় ছিলো। বেরিয়ে পড়্‌লাম ঐ একবস্ত্রে। তারপর তো দেখ্‌ছিস, কেটে যাচ্ছে কোনরকমে।

—বুড়ো বাপ আর ছোটভাইটার কথাও কি মনে পড়্‌লো না কোনদিন?

—কার ভাবনা কে ভাবে। কেউ কি [illegible]সে কারো

মুখাপেক্ষী হ'য়ে? জানি, আমিও যেমন ক'রে বেঁচে আছি, তারাও তেমনি ক'রে থাক্‌বে। জানোয়ারগুলো বড় হ'লেই বেরিয়ে পড়ে। কোন 'সেন্টিমেন্ট'ই ওদের রক্তের মধ্যে নাই। শ্মশানঘাটের গল্প শুন্‌তে চাচ্ছিলি, কিন্তু তার চেয়েও বড় গল্প জমে উঠেছে এখন। একদিন জান্‌তে পার্‌বি।

বল্লাম, কোনদিন কোনকথাই স্পষ্ট ক'রে শুন্‌তে পেলাম না তোর মুখ থেকে। কি ক'রে চল্‌ছে এ জান্‌তে চাইলে হয়তো জোরেই হেসে উঠ্‌বি।

বাধা দিয়ে যতীন বল্লে, একটা বিরাট কারবার ফেঁদে বসেছি। কিছুদিন থেকে লোকসান যাচ্ছে। তবে বড় রকম একটা টোপ ফেলেছি, হয়তো এবার কিছু পেলেও পেতে পারি।

—গল্প পেলে যে আর উঠ্‌তেই চাওনা ঠাকুরপো! আর তোমারও তো বেশ আক্কেল। ঠাকুরপো অবেলায় খেয়েছে, ওকে একটু বিশ্রাম করতেই দাও। ওঠো, বিছানাটা ক'রে দি। ব'লে বৌদি হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে এলো।

যতীন সত্যিই উঠে গিয়ে বস্‌লো নিজের চেয়ারটায়।

সন্ধ্যেবেলায় যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি বৌদি স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে। বল্লে, ওঠো মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নাও।

—যতীন কই?

—কেন, বন্ধুকে না দেখে কি চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছো? বাবারে বাবা! এত যত্ন করি, তবু আমি যেন কেউ নই। ব'লে বৌদি তেমনি ক'রে মুখ টিপে হাস্‌লে।

—না, না, সত্যি; যতীন কি আবার বেরিয়ে গেলো?

—ওঁর কি চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে চলে।

হয়তো চলে না। কিন্তু মনটা খুসী হ'তে পার্‌লো না। এতদিন পরে একটা দিনও কি সে বাড়ীতে থাক্‌তে পারে না! প্রকাশ্যে বল্লাম, এবারও কি কিছুদিনের মত সে গৃহত্যাগ কর্‌লো?

—তাও তো কিছু পূর্বাহ্ণে জান্‌বার উপায় নাই ঠাকুরপো!

—থাক্‌, আর আমার জেনেও কাজ নাই। চা দাও, আমি চলি।

—ইস্‌, তাই বই কি। আমি যে কষ্ট ক'রে মাংস রাঁধ্‌লাম, খাবে কে?

—কিন্তু যে-লোকটার খাবার সব চেয়ে প্রয়োজন, তাকে তো কই অনুরোধ কর না বৌদি?

—তাকে অনুরোধ ক'রে আট্‌কাতে পারি, এতবড় জোর আমার কই ঠাকুরপো! বল্‌তে বল্‌তে বৌদির স্বর ভারী হ'য়ে এলো।

—তাই জুলুমের সবটুকুই বুঝি আমার ওপর এসে পড়েছে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাইলাম।

বৌদি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর হেসে বল্লে, দুধের সাধ ঘোলে মিটাই।

রাত্রি বারটায় বৌদির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, আর ও-বাড়ীর ছায়াও মাড়াবো না। মরুক যতীন, আর ঐ যতীনের বৌ। এতবড় পৃথিবী—কে কার সন্ধান রাখে। এইতো এতদিন ওদের কোন সন্ধানই রাখ্‌তাম না। আজো না-হয় না রাখ্‌লাম। স্বামী যদি তার কর্তব্য পালন না করে—আমি কে? আমার এ-দুর্বলতার কি কোন মানে হয়?

সেদিন মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি বালীগঞ্জের দিকে। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে এস্‌প্লানেডের মোড়ে এসে গাড়ীর তেল গেলো ফুরিয়ে। দেখি, আমারই মত অবস্থা হয়েছে রজত রায়ের। বল্লে, তেল ফুরোবার এমন কেন্দ্রস্থল আর দুটি নাই। অতি দুর্লভ বস্তুকেও অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে এখানে দেখা যায়।

—আমিও কি তোমার মতে দুর্লভ?

—আজকাল তো তাই মনে হচ্ছে। দুদিন গিয়েও দেখা পাইনি।

বল্লাম, তা হয়তো সত্যি। কদিন যতীনের বাড়ী গিয়েছিলাম।

রজত প্রকাণ্ড একটা 'হাঁ' ক'রে বল্লে, কে যতীন—যতীন ভট্‌চায? সর্বনাশ! তার পাল্লায় পড়েছো? তার সেই বৌটি আছে তো? ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি তার সেই সর্বগ্রাসী বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছি।

—তুমি একটি স্কাউণ্ড্রেল। যতীন আমার বাল্যবন্ধু। ছি, ছি—নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

উত্তর শুনে রজত শুধু দাঁত বের ক'রে হাসলে। 'গুড্ বাই টু ইয়োর চ্যারিটি, এণ্ড্ উইশ্ ইউ গুড্ লাক্।' বল্‌তে বল্‌তে সে মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো।

আমার মাথায় তখন ভূত চেপেছিলো। সোজা এসে ঢুক্‌লাম বৌদির ঘরে। রজত রায় যাই বলুক, আমি দেখ্‌বো—নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শেষপর্যন্ত দেখ্‌বো। তারপর যা ঘটে ঘটুক।

বল্লাম, বৌদি, কদিন রাগ ক'রে আসিনি; কিন্তু আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তোমার ওপর রাগ করা যায় না।

—না, রাগ ক'রো না। ছোট্ট একটু কথা, এইটুকু ব'লে বৌদি কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো।

বল্লাম, তোমার মন কি আজ ভাল নাই বৌদি ?

—না। উনি রাগ ক'রে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছেন। সঙ্গে একটি পয়সাও নেই, অথচ আজ পাঁচদিন কেটে গেলো।

মনটা সত্যিই খারাপ হ'য়ে গেলো। যতীনের এই নিরুদ্দেশ অবশ্য নতুন নয়, কিন্তু তার জন্যে কোনদিনই বৌদিকে এমন বিচলিত হ'তে দেখিনি। ভবঘুরে স্বামীটির প্রতি এতখানি দরদ, জানিনা ওর এতকাল কোথায় লু্কোনো ছিলো। বল্লাম, একি তোমার কাছে নতুন বৌদি ?

—না। কিন্তু এমন ক'রে যাওয়া বোধ হয় নতুন। বল্‌তে বল্‌তে বৌদির বড় একটা নিঃশ্বাস পড়্‌লো।

স্কাউণ্ড্রেল্—স্কাউণ্ড্রেল্—এই রজত রায়। নিজের মনেই উচ্চারণ কর্‌লাম।

—একটু ব'সো। তোমার চা তৈরি ক'রে আনি।

—না, আমি আজ চা খেতে পার্‌বো না।

বৌদি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর ছোট্ট ক'রে শুধু বল্লে, আচ্ছা।

বাড়ী ফিরে এলাম। যে কাঁটাটা আমার মনের মধ্যে ছিলো বিঁধে, তাকে মুক্তি দিয়ে ঐ ভাগ্যহীনা মেয়েটির উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানালাম।

সকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে। কোথাও যেন কাজ নাই, এমনি মানুষের দেহ-মনকে দিয়েছে আজ পঙ্গু ক'রে। কি বিশ্রী সেই অলস দিন-যাপনের গ্লানি। মানুষ যেন নিজেরই নিঃশ্বাসভারে হাঁপিয়ে উঠেছে। বেরুতেও ইচ্ছা কর্‌ছে না, অথচ না বেরুলেও কিছু ভাল লাগ্‌ছে না—মনের যখন এইরকম অবস্থা তখন এলো একটি ছেলে একখানা চিঠি নিয়ে। বৌদি লিখেছে: একবার এসো, বিশেষ প্রয়োজন।

অদ্ভুত যোগাযোগ। মনও যেন ঠিক এইটুকুই চাইছিলো, কেউ এসে তাগিদ দিয়ে আমাকে ঘরের বার করুক। তাই তো বল্‌ছিলাম, বেরুবার ইচ্ছা ছিলো—ছিলো না শুধু তাকে সঞ্চালিত কর্‌বার সম্যক উত্তাপ।

এসে বল্লাম, বৌদি নিশ্চয়ই এই বাদলা-দিনে উনুনে মাংস চাপিয়ে আমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছো ?

বৌদি হেসে বল্লে, হাঁ। বাদ্‌লা দিনেই তো প্রিয়জনকে মনে পড়ে। ঘরে গিয়ে ব'সো, আস্‌ছি।

আজো যতীন নেই। কি বিশ্রী এই পরিবেশ। তার অনুপস্থিতির তিক্ততায় মনটা বিষিয়ে উঠ্‌লেও দিনের পর দিন সেই অপ্রতিরোধ্য বিষ আমাকেই একটু একটু ক'রে উদরস্থ কর্‌তে হচ্ছে মনে হ'লে নিজের কাছেও নিজের লজ্জা হয়। কিন্তু উপায় নেই। অনাবশ্যক আমার পালিয়ে বেড়ানোও যেন এই মেয়েটির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে ব'লে মনে হ'লো। তবুও আজ অনেক রূঢ় কথা শান-দেওয়া পালিসের মত বৌদির প্রত্যাশায় প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌লাম। কিন্তু তার অপ্রত্যাশিত প্রবেশাভিব্যক্তি আমার সকল সঙ্কল্পকে চুরমার ক'রে দিলে।

—ঠাকুরপো, একবছরের ঘরভাড়া বাকি। এইমাত্র বাড়ীওয়ালা এসে অপমান ক'রে গেলো। লাঞ্ছনার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাই বা হ'তে দি' কেন: আমার এই গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে শ'দুয়েক টাকা এনে দাও। ব'লে বৌদি একটা ছোট্ট পুঁট্‌লি আমার সাম্‌নে রেখে দিলে।

আমার চোখের সাম্‌নে গোটা পৃথিবীটা যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুরতে লাগ্‌লো। এই আমাদের নীড়, আর তাই বাঁধ্‌বার জন্যে এত মায়া! বল্লাম, গয়না তুমি রাখো বৌদি, টাকা আমি দিয়ে যাবো।

—তা হয় না ঠাকুরপো। তুমি হয়তো দিতে পারো, কিন্তু আমি তা নিতে পারি না।

—কেন পার না বৌদি, আমি কি তোমার পর ? আর তা ছাড়া এখন সে-সব ভাববার অবসরই বা কোথায়! বাড়ীওয়ালার টাকা মিটিয়ে দিয়ে, তখন না হয় স্থির করা

যাবে আমাদের মধ্যে কে কতটুকু নিতে পারে, আর কে কতটুকু দিতে পারে।

বৌদি আর কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

বল্লাম, যতীন এলে বস্‌তে ব'লো; আমি আস্‌ছি।

—কাকে বল্‌বো ঠাকুরপো, সে তো কদিন ধ'রে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

—পা[illegible] বেড়াচ্ছে! যতীন?

আমার [illegible] দিকে চেয়ে বৌদি জোরে হেসে উঠ্‌লো। বল্লে, এবার খানিকটা গালাগাল বেরুবে তো তোমার মুখ দিয়ে?

—কই আর বেরুতে দিলে বৌদি। তোমারই পূণ্যের জোরে ও ভগবানের কাছেও ক্ষমা পেয়ে গেলো।

টাকা নিয়ে এসে দিতেই বৌদি আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরলো। বল্লে, তুমি আমাদের বাঁচালে ঠাকুরপো! কিন্তু আজ তোমাকে ছেড়ে দেবো না। তুমি আমার হাতে মাংস খেতে চেয়েছো: যাও, ভাল দেখে কিছু মাংস নিয়ে এসো। আমার শিরা-উপশিরায় তখন রক্তের নাচন সুরু হয়েছে। বল্লাম, কে আর যেতে চাইছে।

রাত্রির অন্ধকারে যতীন চুপি চুপি এসে ঘরে ঢুক্‌লো। বল্লে, একটা সিগ্রেট্ দে, অনেকক্ষণ খাইনি।

সিগারেটের বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কথা বল্‌বার প্রবৃত্তি আর ছিলো না। কিন্তু যতীন নির্বিকার চিত্তে একটির পর একটি সিগারেট টেনে যেতে লাগ্‌লো।

বৌদি এসে বল্লে, খালি পেটে অতগুলো ধোঁয়া গিল্‌লে, বেলুনের মত ঊর্দ্ধপথে উড়্‌তে থাক্‌বে। তার চেয়ে খাবে এসো, ভাত দিয়েছি।

যতীন আকণ্ঠ খেয়ে গেলো। যেমন ক'রে সে খাচ্ছিলো এতক্ষণ সিগারেট। কী অপরিসীম ক্ষুধা ওর পেটে! মনে হ'লো, ও যেন একমাস ঐ ভোজ্যদ্রব্যগুলো চোখে দেখে নি!

বৌদি চুপি চুপি এসে ব'লে গেলো, পালিও না কিন্তু। আমরা না হয় তিনজনেই আজ রাত জাগ্‌বো।

সর্বনাশ! রাত জাগ্‌বার এই অহেতুক কল্পনায় হয়তো কিছু রোমান্স থাক্‌তে পারে—কিন্তু তাতে না আছে চরিতার্থতা, না আছে মিষ্ট-অনুভূতি। নিজেকে শক্ত ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লাম।

—উঠ্‌লে যে? বৌদি বল্লে।

—তাস খেলে রাত জাগবার মত নির্বুদ্ধিতা আমার নাই। ব'লে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ী এসেই মনে হ'লো, খুব অন্যায় ক'রে এলাম। বৌদি আমার জন্যে কি-ই বা করতে পারতো! যতীন তার স্বামী: আমি উপকারী বন্ধু হ'লেও তাকে সে অবহেলা করতে পারে না। বরং করলেই সেটা অশোভন হ'তো। ঠিক করলাম, কাল সকালেই বৌদির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আস্‌বো। একটি রাত্রির এই লজ্জাকর-ব্যবহার আমাকে যেন দংশন করতে লাগ্‌লো।

কিন্তু সকালে বৌদির ঘরে এসে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। এ কি হয়েছে ঘরের শ্রী! সমগ্র বিশৃঙ্খল সংসারটি কাছে নিয়ে বৌদি কাঠের মত আছে ব'সে! বল্লাম, কি ব্যাপার বৌদি?

বৌদি হেসেই উত্তর দিলে, 'ঝড় হ'য়ে গেছে কাল রজনীতে রজনীগন্ধার বনে।'

বল্লাম, পরিষ্কার ক'রে বল বৌদি, কাব্য তোমার এখন রাখো।

—এত দুঃখেও যদি কাব্য না করবো, তবে করবো কবে বল? চুরি হয়েছে।

—চুরি! কি চুরি হ'লো?

—তোমার দেওয়া বাড়ীভাড়ার দু'শো টাকা, আমার গয়না—সবই।

—যতীন বাড়ী ছিলো না? উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিগ্যেস্ করলাম।

—হাঁ, ঐগুলো নিতেই তো সে কাল এসেছিলো। ব'লে, বৌদি ক্ষীণ-শুষ্ক একটুখানি হাস্‌লে।

চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম; কি বল্‌ছো বৌদি?

ছোটবেলায় দেখেছি এই যতীনকে, নির্ভীক, সত্যবাদী, একটা উচ্ছল-নদীর মত। বল্লাম, এ যে কল্পনারও অতীত বৌদি!

বৌদি তেমনি ক'রেই ছোট্ট একটুখানি হাস্‌লে। বল্লাম, যাক্, ওসব না হয় পরে হবে। এখন রান্না-বান্নার আয়োজন কর। ওরকম ব'সে থাক্‌লে তো আর পেট মানবে না।

—তুমি বলো কি ঠাকুরপো! এখুনি হয়তো ঘ

ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে—এই কি আমার থাবার সময় !

—বাঃ, মন্দ নয়। আমিও বুঝি তোমার সঙ্গে উপোস ক'রে মর্‌বো ? আর রাস্তাতেই বা দাঁড়াতে হবে কেন, আমি তো আর মরিনি।

—না, তোমার টাকা আর আমি নিতে পার্‌বো না ঠাকুরপো! স্বামীই যদি এতখানি শত্রুতা করতে পারেন, তবে আমার কিসের সংসার! বল্‌তে বল্‌তে বৌদির স্বর কান্নায় ভ'রে উঠ্‌লো।

একটা বিশ্রী আবহাওয়ার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। বল্লাম, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার স্পর্দ্ধা আমি কর্‌বো না; কিন্তু তাই ব'লে এও তোমাকে বল্‌তে দেবো না, একটি লোকের অভাবে তোমার সব শূন্য হ'য়ে গেলো।

বৌদি ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্লে। বল্লে, শুনে লোভ হয় বটে। আচ্ছা, কি থাবে বল, রান্না চড়িয়ে দি।

—আজ সম্পূর্ণ সাত্বিক মতে খাবো।

—সেই ভাল। মাছ-মাংসে শুধু উত্তেজনাই আনে।

বৌদির হাতখানা জোরে চেপে ধর্‌লাম। বল্লাম, তোমার গয়নাগুলো গড়াতে তুদিন দেরি হবে, কিন্তু বাড়ী ভাড়ার ঐ তু'শো টাকা আমি এখুনি নিয়ে আসছি। তুমি স্নান ক'রে রান্নার ব্যবস্থা কর।

উত্তেজনায় সর্বশরীর আমার সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। নিজের চলৎশক্তির ওপর একটা অথণ্ড বিশ্বাস অর্জন কর্‌লাম। ফিরে এলাম মুহূর্তের মধ্যেই।

যতীনের বাড়ীর দরজার কাছে এসেই থম্‌কে দাঁড়ালাম। নিজের কানকেও বিশ্বাস কর্‌তে প্রবৃত্তি হ'লো না। বেশ স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি যতীনের গলা: একখানা সুন্দর মুখ থাক্‌লে এ পৃথিবীতে কি না হয়!—লোকগুলো কি বোকা!

—হঁ্যা। কিন্তু আর আমি পার্‌বো না: এই শেষ।

—যাই বল, চমৎকার হয়েছে তোমার অভিনয়। সিনেমায় নাম্‌লে, তুমি একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হ'তে।

—লজ্জা করে না? তোমার বন্ধু এলে ব'লো, সে যেন আর এ-বাড়ীতে না আসে।

—খাবে কি এর পর?

—গলায় দড়ি দেবো, সেও ভাল। তুমি আর কি কর্‌তে বল আমাকে! এই কি মেয়েদের রূপ! ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—আমায় মুক্তি দাও: আর পারি না, পারি না এমন ক'রে—না, না, আমি আর পার্‌বো না—আর পার্‌বো না আমি। বল্‌তে বল্‌তে বৌদি কান্নায় ফেটে পড়্‌লো।

—যাক্, আরো একসেট্ গয়না হ'লো তাহ'লে। রজত রায়ের একসেট, আর—

আর শুন্‌বার শক্তিও বুঝি আমার লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। টল্‌তে টল্‌তে এসে দাঁড়ালাম, বড় রাস্তার ধারে। কোথাও হাওয়া নাই: একটা বিশ্রী তুর্গন্ধে পৃথিবীর দম যেন আট্‌কে আছে। বিদায় বন্ধু এবং বিদায় আমার রহস্যময়ী বৌদি! একটা চলন্ত-ট্রামে উঠে বস্‌লাম। কণ্ডাক্‌টার জিগ্যেস কর্‌লে, কোথায় যাবেন?

বল্লাম, জাহান্নমে: যেখানে ইচ্ছা চলুক।

প্রশ্ন

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি মোরে ভুলে যাবে;—আমার স্মরণে
আসেনা এ কথা কভু। জীবনে মরণে
যে প্রেম নিয়ত থাকে পবিত্র অমল,
যৌবন সরসী-জলে শুভ্র শতদল

ফুটে থাকে নিষ্কলুষ কামনার মত
দেয় প্রাণে আনন্দের পরশ সতত।
সে প্রেমের প্রতিলিপি হৃদয়ের পরে
চিরস্থায়ী থাকে। কভু ভ্রান্তির গোচরে

আসেনা বলিয়া জানি, তবুও শুধাই
তোমার অন্তরে মোর স্মৃতি কিগো নাই?

অন্ধতার কারণ ও তাহার নিবারণ

ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এফ-আর-সি-এস (এডিন) ; ডি-ও (অক্সন্) ;
ডি-ও-এম-এস (লণ্ডন)

অনেকেই বোধ হয় জানেন না বা খবর রাখেন না যে আমাদের দেশে কত লোক অন্ধ।

ভারতবর্ষে প্রায় দশ লক্ষ অন্ধ লোক আছে এবং ত্রিশ লক্ষ লোক আছে যাহাদের একটি চক্ষু নাই কিম্বা কোন চক্ষুরোগ আছে যাহার জন্য তাহারা দৃষ্টিহীন।

এ কথা জানা উচিত যে, উপযুক্ত চিকিৎসাদ্বারা অন্ধদিগের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে। যেমন ছানি হইলে অনেকেই দৃষ্টিশক্তিহীন হয়। বিশেষত, যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই এই ছানি রোগ দেখা যায়। ছানি হইলে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া যদি কোন চক্ষুচিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করা যায় তাহা হইলে সহজেই এই রোগমুক্ত হইয়া দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায়।

যখন অনেক স্থলেই অন্ধতা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় আছে তখন এত লোকের অন্ধ হওয়া উচিত নয়। সামান্য উপায় দ্বারা দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা যায়। চক্ষুর প্রতি অযত্নের জন্য অনেক শিশু অন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু অতি সহজেই তাহাদের দৃষ্টিলোপ নিবারণ করা যায়। দেখা গিয়াছে যে অন্ধতার প্রধান কারণ এইগুলি :

অজ্ঞতা

অনবধানতা

কুসংস্কার

অসহযোগ

কেরাটোম্যালেসিয়া এবং রাত্র্যন্ধতা

উপদংশ এবং গনোরিয়া (দুষ্ট মেহ)

ট্রাকোমা বা দূষিত ব্রণযুক্ত চক্ষুপত্র

বিপজ্জনক বা উগ্রবীর্য্য ঔষধ সেবন এবং ধূলা ময়লা দ্বারা চক্ষুর উত্তেজনা।

শিশুদিগের চক্ষুব্রণ

আঘাত

বক্রদৃষ্টি এবং অল্পদৃষ্টি

ছানি—অশ্রু থলির স্ফীতি

গ্লকোমা।

কেরাটোম্যালেসিয়া

এই রোগ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিশুদিগের মধ্যে দেখা যায়। ইহা উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে হইয়া থাকে। ইহাতে চক্ষুর শ্বেত অংশটি কৃষ্ণবর্ণ, ধূম্রবর্ণ, শুষ্ক এবং তৈলাক্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়। শুষ্কতা ক্রমশ চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ অংশে চলিয়া যায় ও এই স্থানটি হলদে ব্রণযুক্ত হয় এবং

GLAUCOMA
RAIN-BOWS
রামধনুর রং

CROSS EYES
"A MONUMENT OF NEGLECT"
Nature will not cure.
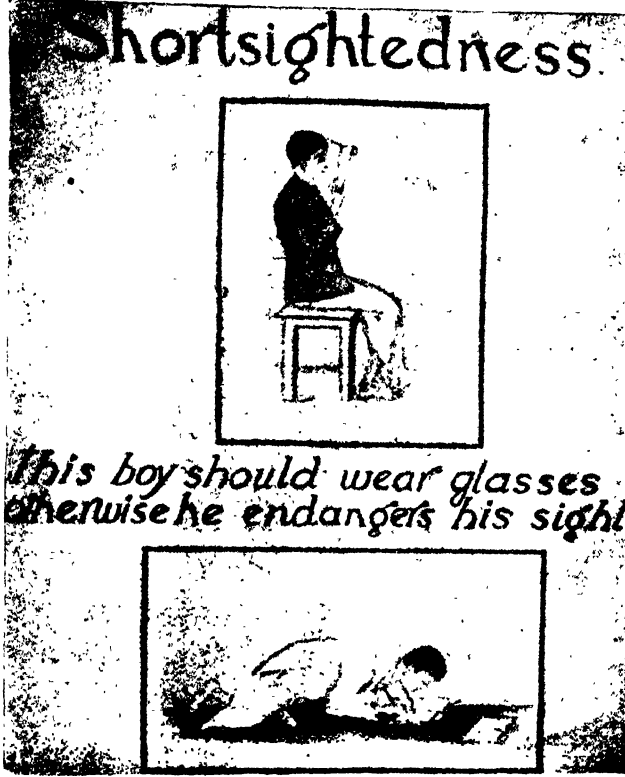
প্রায়ই দৃষ্টিশক্তির লোপ হয়। রাত্র্যন্ধতা আরও সাধারণ রোগ এবং কেরাটোম্যালেসিয়ার ন্যায় ইহা একই কারণে জন্মায়। এই সকল রোগ নিবারণের উপায়—প্রত্যহ আড়াই পোয়া আন্দাজ টাট্‌কা দুধ খাওয়া, কিম্বা দুই আউন্স মাখন খাওয়া, কিম্বা টাট্‌কা শব্জি, গাজর, কপি, টম্যাটো প্রভৃতি খাওয়া। স্তন্যপায়ী শিশুর এই রোগ হইলে এবং শিশুর মাতা স্বাস্থ্যবতী না হইলে শিশুর মাতাকে প্রত্যহ দুইবার করিয়া এক হইতে চারি চামচ কডলিভার অয়েল দেওয়া দরকার।

এই সকল রোগ হইলে কড্‌লিভার অয়েলই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কড্‌লিভার অয়েল দুষ্প্রাপ্য হইলে পাঁঠা বা ভেড়ার মেটে অল্প মসলার সহিত পাক করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। কেরাটোম্যালেসিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চক্ষু দুটি পরিষ্কার রাখিতে হইবে। চক্ষু দুইটি দিবসে চারি হইতে ছয় বার বোরিক লোসন্ বা লবণ জল দিয়া ধুইয়া চক্ষুর মধ্যে কয়েক ফোঁটা ক্যাষ্টর অয়েল (খাঁটি রেড়ির তৈল) দিবে। (এক পাইট ফুটন্ত জলে দুই চায়ের চামচ বোরিক এসিড পাউডার কিম্বা এক চায়ের চামচ সাধারণ লবণ ফেলিয়া দিয়া জল ঠাণ্ডা হইলে এই লোসন ব্যবহার্য্য)।

(ক) শিশুদিগের পেটের দোষ (পরিপাক যন্ত্রের দোষ) থাকিলে সর্ব্ব প্রথমে ইহার চিকিৎসা করা উচিত।

উপদংশজনিত রোগ

(ক) সিফিলিস্ (সাধারণ লোক যাহাকে গরমি বলে)—ভারতের নানা স্থানে, বিশেষত কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের ন্যায় বড় বড় নগরে উপদংশই বহু লোকের অন্ধতার কারণ। এই কারণে অন্ধতা হইলে বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। যত দিন না রক্ত পরীক্ষার দ্বারা বুঝা যায় যে, রোগ সমূলে বিনষ্ট হইল তত দিন চিকিৎসা চালাইতে হইবে। যুবকেরা বিবাহের পূর্ব্বে উপদংশ রোগাক্রান্ত হইলে কোন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে চলা তাহাদের বিশেষ দরকার। উপদংশ রোগে ভুগিয়াছে এমন কোন লোকের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া

Chronic inflammation of the tear Sac.

দৃষ্টি হীনতা
(কেরাটোম্যালেসিয়া)
অনেক দুর্বল ও রোগা ছেলের চোখ গলিয়া
অন্ধ হয়
উহার প্রতিকার—
সাবধান!

জন্মান্ধ
উপদংশ জনিত
(সিফিলিস)
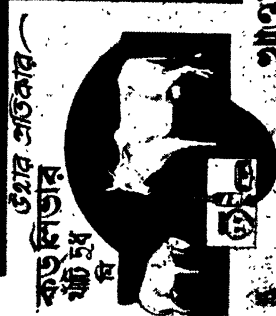
গেলে কিম্বা—চক্ষু লাল ও বেদনাযুক্ত হইলে অবিলম্বে কোন চক্ষু চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া উচিত।

গনোরিয়া

(দুষ্ট মেহ, যাহাকে জনসাধারণ ধাতের ব্যামো বলে) —গনোরিয়ার উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে ভীষণ চক্ষু-রোগ উপস্থিত হইতে পারে। রোগের প্রারম্ভেই যদি ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা না হয় তাহা হইলে চক্ষুর বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে বা চক্ষু দুইটি অন্ধ হইতে পারে। গনোরিয়া আক্রান্ত রোগী যতদিন না সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য

হয় ততদিন তাহাকে চিকিৎসাধীন থাকিতে হইবে। তাহাকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন দূষিত স্রাব কোনরূপে হস্ত বা তোয়ালে বা গামছার সহযোগে নিজের বা অপরের চক্ষু স্পর্শ না করে। গনোরিয়া আক্রান্ত রোগীর চক্ষুরোগ উপস্থিত হইলে অবিলম্বে চক্ষু চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া উচিত।

ট্রাকোমা বা ব্রণযুক্ত চক্ষুপত্র

এই রোগে চক্ষু স্ফীত হয়। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক। ভারতে ইহা খুবই দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিশু-দিগের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। অধিকাংশ স্থলে এই রোগ চক্ষুর উপরের পাতার নিম্নভাগ আক্রমণ করে। ইহাতে রোগীর চক্ষুর পাতা ভারি দেখায়। রোগের প্রারম্ভে চিকিৎসা করিলে এই রোগ সারিয়া যায়। কিন্তু যদি সুচিকিৎসা না হয় তাহা হইলে ইহা হইতে কর্নিয়ায় অর্থাৎ চক্ষুর বাহ্যদৃষ্টিতে কাল অংশের উপর ঘা প্রভৃতি হইয়া থাকে এবং ইহাতে চিরকালের মত দৃষ্টিশক্তির হানি হয় এবং অনেক স্থলে রোগী অন্ধ হইয়া যায়।

যদি কোন শিশুর এই রোগ হইয়াছে বলিয়া

সন্দেহ হয় তাহা হইলে তাহাকে চিকিৎসকের নিকট পাঠাইতে হইবে; কিন্তু যদি চিকিৎসক পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কোন ভাল ঔষধালয় হইতে বিশুদ্ধ ক্যাস্টর অয়েল (রেড়ির তেল) আনাইয়া চক্ষু মধ্যে প্রয়োগ করিলে চলিবে। এই ক্যাস্টর অয়েল প্রয়োগের পূর্ব্বে প্রত্যহ চারি হইতে ছয় বার চক্ষু দুইটি লবণ জলে কিম্বা বোরিক লোসানে ধুইতে হইবে। (এক পাইট ফুটন্ত জলে এক চায়ের চামচ সাধারণ লবণ বা দুই চায়ের চামচ বোরিক এসিড পাউডার

The Sari carrying
infection from
Mother to Child

ERECT
POSITION
ON SLANTING DESK
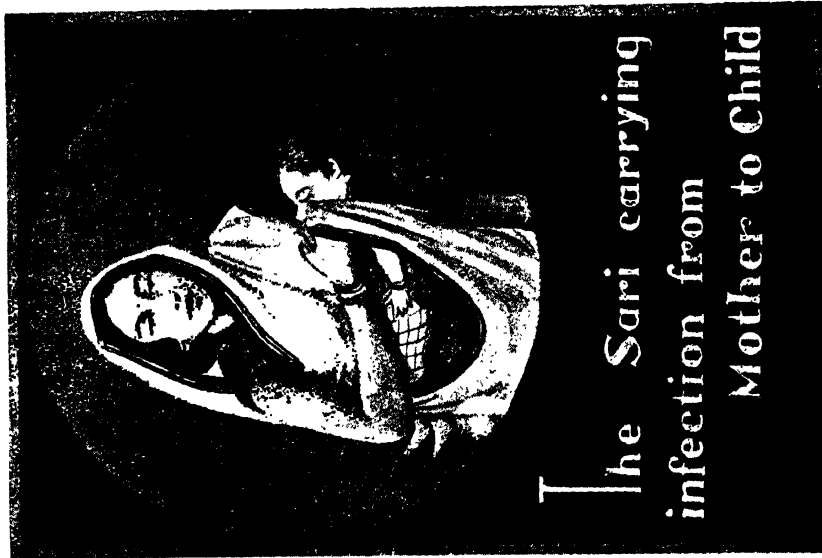
ফেলিয়া শীতল হইলে ব্যবহার করিবে)। তুলা পাঁচ মিনিট উত্তমরূপে জলে ফুটাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা হইলে সেই ভিজা তুলা দিয়া আক্রান্ত চক্ষু মুছাইয়া দিবে। এই রোগে আক্রান্ত শিশুদিগকে নীরোগ শিশুদিগের সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নয়। সাবান জলে হাত মুখ ধুইয়া পরিষ্কার রাখিলে, অপরের ব্যবহৃত গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি, অন্যের ব্যবহৃত সুরমা, সুরমার কাঠি, কাজল প্রভৃতি ব্যবহার না করিলে এবং (মাছি দুষিত চক্ষু হইতে নির্দ্দোষ চক্ষুতে বিষ বহন

করে বলিয়া) চক্ষুতে মাছি বসিতে না দিলে এই রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ট্র্যাকোমা রোগী দেখিবার পর কার্বলিক-সাবান ও জল দিয়া উত্তমরূপে হাত ধুইয়া ফেলিবে।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদিগের মধ্যে যদি কেহ ট্র্যাকোমা আক্রান্ত হয় তাহা দেখিবার জন্ম মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা হওয়া উচিত। এই রোগাক্রান্ত ছাত্রদিগের সুচিকিৎসা হওয়া উচিত এবং নীরোগ ছাত্র হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখা উচিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা কতদূর প্রয়োজনীয় ইহাও তাহাদিগের শিক্ষা হওয়া উচিত।

বসন্ত

অন্ধতার একটি প্রধান কারণ বসন্ত। প্রত্যেক শিশুকে পুনঃ পুনঃ টিকা দিলে এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। জন্মের অল্পকাল পরে টিকা দিয়া শিশুদিগকে সাত বৎসর অন্তর টিকা দেওয়া উচিত ; বিশেষত যে সময়ে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয় সে সময়ে টিকা দেওয়া দরকার। কোন লোকের বসন্ত হইলে তাহার চক্ষু দুই ঘণ্টা অন্তর গরম লবণ জলে কিম্বা বোরিক লোসনে ধৌত করা উচিত এবং প্রত্যহ রাত্রে একটু বিশুদ্ধ ভেস্‌লিন্ তাহার চোখের পাতায় কাজলের মত দেওয়া উচিত। এই রোগের বৃদ্ধির সময় চোখের পাতা বন্ধ রাখা উচিত এবং ধুইবার সময় কেবল খোলা উচিত। বসন্তরোগে চিকিৎসকের পরামর্শ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এন্‌টারিক জ্বরে, হামে, কলেরায় এবং অপরাপর স্থায়ী রোগে রোগীর চক্ষুর যত্ন লওয়া বিশেষ দরকার।

বিপজ্জনক ও উগ্রবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ

ভারতে হাজার হাজার লোক অচিকিৎসকের (হাতুড়ের) হাতে পড়িয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল অশিক্ষিত লোক রোগীকে নানা কথায় মুগ্ধ করিয়া সুচিকিৎসকের আশ্রয় লইতে দেয় না এবং সময় থাকিতেও তাহাদের চোখের চিকিৎসা হইতে দেয় না। এই সকল হাতুড়ে চক্ষুর মধ্যে বিপজ্জনক ও উগ্রবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এবং দুষিত যন্ত্র চক্ষুমধ্যে প্রয়োগ করিয়া চক্ষুর বিশেষ অনিষ্ট করে। ইহারা একই কাঠির সাহায্যে নানা লোকের চোখে সুরমা দিয়া বা একই আঙুলে কাজল দিয়া ট্র্যাকোমার সংক্রমণ বহন করে। চক্ষুরোগ হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ লইবে, কখন হাতুড়ের কাছে যাইবে না। স্মরণ রাখা উচিত যে চোখ ফুলিলে বা চোখ উঠিলে, উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে দৃষ্টিশক্তি বিশেষভাবে হীন হইতে পারে।

ধুলা বা ময়লার উত্তেজনায় চক্ষু সহজেই ফুলিয়া ওঠে এবং ইহা অগ্রাহ্য করিলে কর্নিয়ায় ঘা হইতে পারে

এবং দৃষ্টিশক্তির লোপ হইতে পারে। হাত মুখ দিনে দুইবার সাবান জলে ধুইবে এবং পরিষ্কার রাখিবে। যে সময় ধূলা উড়িতে থাকে সে সময় চক্ষুর আবরণ ব্যবহার করা উচিত। রেল গাড়ীতে চাপিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া এন্‌জিনের দিকে চাহিবে না। চোখে ধূলা কিম্বা ময়লা পড়িলে পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিবে, লবণ জল হইলে আরও ভাল হয়, (কখন চোখ রগড়াইবে না) এবং কয়েক ফোঁটা ক্যাষ্টর অয়েল চোখে দিবে। যদি ইহাতে আরাম না হয়, চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। তোমার মঙ্গলকামী কোন বন্ধুকে অপরিষ্কার রুমালের কিংবা কাপড়ের খুঁট দিয়া ধূলা কিম্বা ময়লা বাহির করিতে দিবে না ; ইহাতে অনিষ্টকারী কোন পদার্থ চোখে প্রবেশ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে।

শিশুর চক্ষুব্রণ

(চোখের ঘা—অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া নিওনেটোরাম) : ইহা গনোরিয়া বা ধাতু-পীড়াজনিত চক্ষুর স্ফীতি। নবজাত শিশুর ইহা অতি সাধারণ রোগ। জন্মের সময় শিশুপ্রসবদ্বার হইতে এই বিষ গ্রহণ করে এবং তিন-চার দিন পরে বা এক সপ্তাহের মধ্যে শিশুর চক্ষু হইতে এক প্রকার হল্‌দে স্রাব নির্গত হয় এবং চোখের পাতা ফুলিয়া যায় ও লাল হয়। এই স্রাব অত্যন্ত সংক্রামক এবং অপরের চোখে প্রবেশ করিলে এই রোগ উৎপাদন করে। কোন শিশুর এই রোগ হইলে তাহাকে অবিলম্বে চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাওয়া উচিত। শীঘ্র চিকিৎসা না হইলে চক্ষু নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই ধাত্রী যদি কয়েক ফোঁটা ১% সিল্‌ভার নাইট্রেট্‌ সলিউসন্‌ শিশুর চক্ষুতে প্রয়োগ করে তাহা হইলে এই রোগের আশঙ্কা কম হইয়া যায়। গ্রেট্‌ ব্রিটেন্‌, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই ফলপ্রদ অথচ নির্দোষ ঔষধ প্রয়োগ এক প্রকার বাধ্যতামূলক হইয়াছে। প্রত্যেক চিকিৎসক ও ধাত্রী ইহা জানেন এবং প্রত্যেক গৃহস্থেরই ইহা জানা উচিত।

দুর্ঘটনা, আঘাত বা অপঘাত :—

যে স্থানে অনেক কলকারখানা আছে, সে স্থানে আঘাত বা অপঘাতে অনেকের চক্ষু নষ্ট হয়। এই সমস্ত কল-কারখানায় যাহারা কাজ করে এবং যাহাদের চক্ষুর বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহাদের চক্ষু রক্ষা করিবার জন্য গগল্‌ (ঠুলি চশ্‌মা) মুখোস্‌ প্রভৃতি ধারণ করা উচিত। লাঠি ঘুরাইলে, ঢিল ছুঁড়িলে বা পটকা বাজি লইয়া খেলা করিলে চোখে কিরূপে আঘাত লাগিয়া চোখ নষ্ট হইতে পারে তাহা ছেলেদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ঠুলি চশ্‌মা না পরিয়া ছেলেরা যেন কখন পটকা বাজি লইয়া খেলা না করে।

প্রসবের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা যদি চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া জানিতে পারে যে প্রসব সহজ হইবে না অর্থাৎ কষ্টসাধ্য হইবে, তখন প্রসবের সময় সন্তানের চোখে কোনরূপ আঘাত আশঙ্কা করা স্বাভাবিক। এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না যদি প্রসবের সময় স্ত্রীলোকেরা হাসপাতালে যায় বা কোন সুদক্ষা স্ত্রী-চিকিৎসকের সাহায্য লয়।

যখন কোন আঘাতে চোখ কাল হইয়া যায় তখন

ঠাণ্ডা জলে চোখ ধুইয়া ফেলিয়া এক টুকরা পরিষ্কার কাপড় বরফ জলে ভিজাইয়া কয়েক পাট করিয়া জল নিংড়াইয়া ফেলিয়া চোখের উপর দিয়া একখানি রুমাল দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। যদি আঘাত সাংঘাতিক হয়, চিকিৎসককে দেখাইতে দেরী করিবে না।

ট্যারা বা গজচক্ষু, মাইওপিয়া বা অদূরদৃষ্টি

ট্যারা বা গজচক্ষু : ট্যারা বা গজচক্ষু সাধারণত তিন

হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে প্রকাশ পায়। যখনই ইহা প্রকাশ পাইবে তখনই শিশুকে কোন চক্ষুচিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইবে। শিশুর বয়স যত কম হইবে আরোগ্যের সম্ভাবনা তত বেশি থাকিবে এবং আরোগ্যও তত অল্প সময়ের মধ্যে হইবে। চিকিৎসা যদি খুব দেরীতে হয় তাহা হইলে ট্যারা চোখটি অকর্ম্মণ্য কিম্বা অন্ধও হইতে পারে।

যে-লোকের অদূরদৃষ্টি হইয়াছে সে বিশ ফুট তফাতে কোন জিনিষ স্পষ্ট দেখিতে পায় না, ঝাপসা ঝাপসা দেখে; কিন্তু খুব কাছের জিনিষ বেশ দেখিতে পায়। এইজন্য সে কোন বই পড়িতে হইলে বা সূক্ষ্ম কাজ দেখিতে হইলে বইখানি বা সূক্ষ্ম কাজটি চোখের খুব নিকটে ধরে। এই রোগ শৈশবে আরম্ভ হয় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সে শিশু যখন পড়িতে আরম্ভ করে কিংবা কোন সূক্ষ্ম বা মিহি কাজ দেখিতে আরম্ভ করে সেই সময়ে জোর করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে গিয়া এই রোগে আক্রান্ত হয়। যে সময়ে শিশু জোর করিয়া এই ভাবে তাহার দৃষ্টিশক্তিকে কোন জিনিষে নিয়োগ করে সেই সময়ে যদি শিশুকে দৃষ্টিশক্তি জোর করিয়া ব্যবহার করিতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে এই রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই সময়ে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা উচিত :

(১) শিশু যে পুস্তক পড়িবে তাহার অক্ষর বড় বড় হওয়া দরকার। শিশুর বয়স যত কম হইবে অক্ষর তত বড় হওয়া চাই।

(২) পুস্তক কিম্বা কোন জিনিষ দেখিতে হইলে চোখ হইতে এক ফুটের বেশি কাছে ধরিবে না।

(৩) আলো মাথার পিছন হইতে একটি কাঁধের উপর দিয়া আসা চাই।

(৪) মাথা খাড়া করিয়া রাখা চাই। শিশু যেন ঝুঁকিয়া লেখা পড়া না করে বা শুইয়া শুইয়া না পড়ে।

(৫) শিশুকে প্রচুর আলোকে পড়িতে বা কাজ করিতে দিতে হইবে। কৃত্রিম আলোক অপেক্ষা দিনের আলোকই ভাল। সাধ্যমত শিশুকে রাত্রে পড়িতে দিবে না। সাদা আলোক অপেক্ষা কোমল হলদে আলোক ভাল।

(৬) ছয়-সাত বৎসরের শিশুকে একসঙ্গে আধ ঘণ্টার বেশি পড়িতে দিতে নাই কিম্বা সমস্ত দিনে দুই-তিন ঘণ্টার বেশি পড়িতে দিবে না।

(৭) শিশুকে খালি পেটে অর্থাৎ প্রাতরাশের পূর্ব্বে পড়িতে দিবে না।

যে সকল শিশুর পিতামাতার অদূরদৃষ্টি রোগ আছে সেই সকল শিশুর চোখের বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত।

যে শিশু বার ইঞ্চিরও বেশি নিকট হইতে বই পড়ে বা কোন কাজ দেখে, কিম্বা দূরের জিনিষ দেখিতে গেলে চোখের পাতা সঙ্কুচিত করে বা ২০ ফুট দূর হইতে বোর্ড দেখিতে পায় না, তাহাকে অদূরদৃষ্টি রোগে আক্রান্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং একজন চক্ষুচিকিৎসকের নিকট তাহাকে পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য পাঠাইতে হইবে।

অদূরদৃষ্টি রোগ (শর্ট সাইট্) ভাল হয় না, কিন্তু চক্ষুচিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত চশ্মা ব্যবহার করিলে ইহার গতি বন্ধ হয়। উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা এবং প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু ও ঘরের বাহিরে ব্যায়ামাদির সাহায্যে রোগীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে। এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করার পরও যদি রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে রোগীর লেখাপড়া বা চোখের নিকটের কাজ সমস্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইবে যে পর্য্যন্ত না রোগের বৃদ্ধির প্রবৃত্তি কমিয়া যায়।

ছানি

বৃদ্ধ বয়সে যখন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে তখন চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। হাতুড়ের হাতে কখনও যাইবে না। ছানি হইতে যে অন্ধতা জন্মে সে অন্ধতা চিকিৎসা দ্বারা দূর হয়, কিন্তু হাতুড়ে অনেকের চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়।

গ্লকোমা

আলোর চারিদিকে রামধনু রং-এর চাকা বিপদের লক্ষণ।

এইরূপ হইলেই চক্ষুচিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। অধিক বয়সে বিকালের দিকে মধ্যে মধ্যে মাথা ধরা এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিক দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা কখনও অবহেলা করিবে না।

বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের প্রায় অশ্রুথলির স্ফীতি দেখা যায়। চক্ষুর নাকের দিকের কোণে ভিতর দিকে চাপ দিলে পুঁজ নির্গত হয়। যদি ইহার বিধিমত চিকিৎসা না হয় তাহা হইলে চক্ষু ভীষণভাবে ফুলিতে পারে এবং নষ্টও হইতে পারে।

মরণে জাগরণ

শ্রীসুভদ্রা রায়

এ কি জাগরণ　　এ আমার ঘুম
　আমি কি আমিই জানি না বুঝি।
স্বপ্ন জীবন　　ছুটিয়া চলেছে
　মরণের ঘোর সুপ্তি খুঁজি॥
অপরূপ লোকে　　ভাঙ্গিবে সে ঘুম
　চির-জাগরণে জাগিব সেথা।
পিছনে পড়িয়া　　রবে দিগন্ত
　অতীতে ডুবিবে অতীত কথা॥
পৃথিবী আমার　　মদের বোতল
　আছি অচেতন চেতনাহীনা।

মরণ আসিয়া　　ছুঁইলে হাসিয়া
　চক্ষু মেলিব চক্ষুহীনা॥
সুখের অধিক　　দুঃখই হেথা
　অবসাদ আছে সুখের মাঝে।
মায়ার মাল্য　　কাজলের ফুল
　দিনের আলোকে মরে সে লাজে॥
ওপারে নাহিরে　　এ পারের ছায়া
　অনিমেষ চোখে পলক নাই।
জাগিব সেথায়　　আমি অনন্ত
　মরণের পারে মুক্তি চাই॥

ভূস্বর্গ-চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

উষা!

তোমার কথা ভূস্বর্গ-চঞ্চলে ইতিপূর্বেই লিখেছি তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। এবারো তোমাকেই তাগ ক'রে মোচন করি আমার উনশেষ পত্রবাণ। আমাকে তুমি দুষতে পারবে না, যেহেতু আমি তোমাকে যথাবিধি শাসিয়ে রেখেছিলাম। তাছাড়া, তোমার সঙ্গে আলাপ সেদিনের হ'লেও মনে হয় যেন বহু দিনের বহু বিচিত্র। বিশেষ ক'রে ৺ধরণীদার সূত্রে। জুনে তোমার সঙ্গে শিলঙে আমাদের দেখা আনন্দের উচ্ছল লগ্নে। তারপরো এ পরিচয় তাঁরি তর্পণে পরিণতি লাভ করে তাঁরই বিয়োগ-বেদনার মধ্য দিয়ে—পত্রালাপে। মানুষে মানুষে একটা সুন্দর বন্ধন গ'ড়ে ওঠে নানা পথে। তাদের মধ্যে একটা সেরা পথ হ'ল—যখন দুজনেই দুজনকে ছোঁয় আর একজনের স্নেহমাধ্যস্থের প্রণালীতে। জীবনে 'কমন য়্যাডমিরেশন' বড় সুন্দর জিনিষ। ৺ধরণীদার আনন্দ-সান্নিধ্যের মধ্যে দিয়ে তোমার আমার পরিচয় এইভাবে আরো গ'ড়ে উঠেছিল—তুমি জানো। কেবল তুমি জানো না, তিনি তোমাকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন। স্নেহ করা আমাদের পক্ষে খানিকটা সহজ—তার মালমশলার অনেকখানিই জোগায় আমাদের প্রাণশক্তি। আত্মীয়তা করা আরো সহজ—যেহেতু এর জোগান দেয় শুধু আমাদের সমাজ নয়—আমাদের সমাজপুষ্ট মিশুকে বৃত্তিগুলি। কিন্তু কঠিন হ'ল স্নেহের প্রাণশক্তিকে শ্রদ্ধার আন্তর শক্তি দিয়ে সুসম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ক'রে তোলা। এ কঠিন কাজটি ধরণীদা পারতেন তুমি জানো। তোমার সরলতাকে তাই তো তিনি এত বড় ক'রে দেখতে পেরেছিলেন। অমন কর্মকৌশলী হ'য়েও তিনি নিজের স্বভাবের শ্যামলতাকে রেখেছিলেন সতেজ। সরলতা স্বভাব-শ্যামল, শ্যামলতা স্বভাব-সরল। তোমাদের মধ্যে জানাজানি হয়েছিল এই জন্যেই। সরলতা যেন ফুল, শ্যামলতা যেন লতা। এদের মধ্যে মৈত্রী হবে এতে বিস্ময়ের কী আছে? অথচ তুমি বিস্মিত হয়েছিলে অনুভব ক'রে যে, ধরণীদা তোমাকে শাসন করা সত্ত্বেও এত আপনমনে করতেন। আপনমনে করতেন ব'লেই তো শাসন করতেন ভাই। তিনি আমাকে জনান্তিকে বলতেন প্রায়ই: উষা এত বেশি সহজে অন্যকে বিশ্বাস করে যে আমার ভয় হয় ও ঠকবে অনেকের কাছেই। তখন ও ভারি ঘা খাবে।

ধরণীদা উদার লোক ছিলেন, শ্যামল মানুষ ছিলেন, কিন্তু ঠকতে একান্তই নারাজ। তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে কোমলতা যথেষ্ট থাকলেও গাঁথুনি ছিল পাকা। তিনি জানতেন ফুলধনু কাব্য কথা, শুধু ফুল দিয়ে ধনুক গড়া যায় না—যদি না ফুলের নীচে থাকে বাঁকারি। লালিত্য ভালো জিনিষ, কিন্তু নির্ভেজাল লালিত্য দিয়ে কোনো পাকা কাজ হয় না—বনেদের মধ্যে থাকাই চাই কাঠিন্য। তোমার কুসুম-কোমলতায় তাই তিনি সময়ে সময়ে শঙ্কিত হ'য়ে উঠতেন—বিশেষ ক'রে পেট্রিয়টদের বাগ্মিতায়ও তুমি অভিভূত হ'তে ব'লে। (অথচ মনে রেখো পেট্রিয়ট বলতে এখানে আমি খাঁটি দেশভক্ত বুঝছি না) খাঁটি মানুষ যেখানেই দেখি শ্রদ্ধা আসে—যেহেতু সংসারে ভেজালই যে সাড়ে পনর আনা। পেট্রিয়ট বলতে আমি বুঝছি—(কি বলব?) পেট্রিয়ট আর কি। এদের ধরণীদা কোনো দিনও নেকনজরে দেখেন নি। তাই তোমাকে সভ্রূভঙ্গে বলতেন থেকে থেকে (মনে আছে?)—

নিতি করে যারা বক্তৃতা—তারা
যা বলে প্রায়ই মেকি।
তাই বলি: "উষা! ভুলো নাকো ভূষা
বাহিরের শুধু দেখি'।

ঠিক এই কথা বলতেন আমার আর এক প্রিয় বন্ধু ৺ধর্মবীর। ধরণীদার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মারা গেলেন—কাগজে পড়লাম এই সেদিন। আমাদের দেশের দুজন খুব ভালো লোকের তলব হ'ল একই মাসে—এই জুলাইয়ে। অথচ এই সেদিনো এ দুটি মানুষ কত গল্পালাপই যে করেছে লাহোরে!

ধর্মবীরের কথা ইতিপূর্বে ভূস্বর্গ-চঞ্চলে লিখেছি। আমার মনটা তুমি জানো—যাকে বলে প্রগতিশীল, আমি ঠিক সে ভাবের ভাবুক নই। আমি স্বভাব-বুর্জোয়া একথা স্বীকার করতে একটুও লজ্জা পাই না। আমাকে ভুল বুঝো না। আমি বলি না যে বুর্জোয়া-সংস্কৃতির মধ্যে নিন্দনীয় কিছুই নেই। কোন্ সংস্কৃতির মধ্যে নেই? আমি শুধু বলি যে বুর্জোয়া-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নমুনা যেসব মানুষ, তাদের চরিত্র সব জড়িয়ে মনুষ্যত্বের মুখোজ্জ্বল করেছে একথা অকুতোভয়ে বলা চলে। ধরণীদা ও ধর্মবীরের কথা স্মরণ ক'রে একথা বলতে আজ আরো একটু জোর পাচ্ছি—distance lends perspective to the view ব'লে।

পেশোয়ার থেকে ফিরে যখন ধর্মবীরের ওখানে পুনরায় দ্বাদশ ভৌতিক আতিথ্য স্বীকার করি তখনো মনে হয়েছিল একথা। ওখানে সমস্ত বড় হিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। শুধু টাকা দিয়ে নয়—(দানেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত—না জানে কে ?)—নিজের শ্রম ও স্বাস্থ্য দিয়েও তিনি জনসেবা করতেন অকাতরে। সামান্য অবস্থা থেকে তিনি ধনশালী হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির মাধুর্য একটুও হারান নি ধনাগমে—যেমন অনেকেই হারান দেখি। এখানে ধরণীদা ও ধর্মবীরের মিল ছিল গভীর। হয়ত বিশেষ ক'রে সেই কারণেই এ দুটি মানুষ প্রথম দর্শনেই পরস্পরের কাছে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।

এ-বন্ধুত্ব হয় ওদের আরো একটা কারণে। ধর্মবীর ধরণীদাকে ও আমাকে ধরেন—লালা লাজপৎ রায়ের যক্ষ্মা-হাসপাতালের জন্যে একটা জলশা ক'রে কিছু টাকা তুলে দিতে। ধরণীদা তৎক্ষণাৎ রাজি। উমা ও এষা থাকায় আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল, কারণ উমার গানের সঙ্গে এষার নাচ সহজেই জ'মে যেত। কিন্তু হ'লে হবে কি—"খাবে?" প্রশ্নে যেমন শিশুর মুখে তৎক্ষণাৎ জোগায় "হাঁ—কোথাও "গান গাইবে?" প্রশ্নে উমার মুখে তেমনি সহজে জোগাত—না। কিন্তু ধরণীদা এসব ক্ষেত্রে ছিলেন নাছোড়বন্দ, বললেন: "হাসি, গান গেয়ে যদি পরের এ হেন উপকার হয় তবে গানের আরো বেশি সার্থকতা।" আর যাবে কোথা? ঝোপ বুঝে আমিও মারলাম কোপ। বললাম ও কে: "হাসি, এ হ'ল লাহোর—বাঘা উর্দুর দেশ, এখানে ভেতো বাংলা চলবে না, তোমাকে গাইতে হবে উর্দু গজল—অমজদের, আরো নিভাও উলফৎকা ইন্দো নাজুকোঁমে সখ্‌তমুশকিল হয়। চ্যারিটিতে তোমার গজল গাওয়ার হাতে খড়ি হোক।"

ওমা! মেয়ে মূর্চ্ছা যায় কি শুনে!

ছল ছল চক্ষে গদগদ কণ্ঠে বলল আমাকে বেপথুমানা উমা:

এই বিভূঁয়ে গান গাওয়া! আর
চ্যারিটিতে? কাঁপছে গা!

এষা—নৃত্যরতা

তার ওপরে উর্দু গজল!
পা মাটি আর পাচ্ছে না।
মানি—মিঠে উর্দু গজল
কিন্তু—ভেবে রক্ত হিম—
ও গালভরা উচ্চারণে
ফল যদি হয় ঘোড়ার ডিম?
জিভের সাথে ঝগড়া তালুর
দাঁতের সাথে ঠোঁটের হায়!

এক ফোঁটা এই বঙ্গবালার
বেঘোরে প্রাণ বুঝি যায়।

অমনি ধরণীদা ধম্‌কে উঠত :

পারবি যখন বলছে দাদা
গানের গুরু—তবুও তোর
এ কী মিছে ভয় বল্ তো
মনের কেন হয় না জোর ?
রাগাস নে আর আমায় হাসি !
ভয়ে মেয়ের কাঁপছে গা ?
শোন্ কথা—তোর গান নিয়ে কি
বাপ মা মাসিও ভাবছে না ?
উচ্চারণের ক্যাশুয়াল্‌টি
জিভ-তালব্য লড়াইয়ে
না হয় হ'লই দুটো—শেষে
সুর বাঁচাবে—ধরাই এ।

উমাকে এইভাবে অনেক তুতিয়ে পাতিয়ে, আগে থাকতে বাচনিক সান্ত্বনার গন্ধমাদনের জোগাড় রেখে হবু-লঙ্কাকাণ্ডের ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবস্থা ক'রে, সারঙ্গি-ওয়ালাদ্বয়ের উৎসাহ-পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণের পরে ওকে দিয়ে তবে তো ঐ উর্দু গজল দুটি গাওয়ানো গেল। এ দুটি গ্রামোফোনেও বড় সুন্দর হয়েছে ওর কণ্ঠলাবণ্যের গুণে। ওস্তাদরা যতই কেন বলুন না উষা, গানে অসামান্য কণ্ঠ-লাবণ্য সময়ে সময়ে অসাধ্যসাধন করতে পারে। নইলে বাঙালি বালিকার গাওয়া উর্দু গজলে হয় কখনো এমনতর হৈ হৈ কাণ্ড! কারণ বিশ্বাস কোরো, এ একটুও বাড়ানো কথা নয় যে উমার নাইটিংগেল নাম সারা শহরে গেল র'টে। জজ-হাকিমরা সব নিমন্ত্রণ করে আর কি! ও এ-প্রশংসায় আরো যেন মিইয়ে গেল। আমি মাঝে মাঝে ভাবি উষা, মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি! প্রশংসার আলোয় কেউ বা পেখম মেলে নৃত্য সুরু করে, কারুর বা বুক ওঠে দুরু দুরু ক'রে। ধরণীদার বিষম ভয় ছিল মেয়ের পাছে মাথা গরম হ'য়ে যায় এত বেশি প্রশংসায়, কিন্তু আমার ভয় ছিল উল্টো দিকে—পাছে আত্মঅবিশ্বাসের বহু-প্রশ্রয়ে ওর অসামান্য প্রতিভার বিকাশপথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। তোমাকে আমি নিত্যই বলতাম না যে, আমি কোনো দিনো এই তথাকথিত বিনয়কে বড় ক'রে দেখি নি? আমার মনে ধরে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা যে—পারব না পা'রব না বলতে নেই—যে বলে—'আমি বদ্ধ আমি বদ্ধ', সে বদ্ধই হ'য়ে যায়: যে বলে—'আমি মুক্ত আমি মুক্ত' সে মুক্তই হ'য়ে যায়। এই নিয়ে তীর্থঙ্করে শ্রীঅরবিন্দের চিঠিটি পোড়ো। তিনিও বলেন যে, লোকে যাকে বলে "sense of superiority" তার স্বপক্ষেও বলবার নিতান্ত কম নেই। গীতাও বলে নি কি—"ন আত্মানম্ অবসাদয়ে?"

এ নিয়েও অনেক ভেবেছি উষা। জীবনে ঠেকেছিও কম না—ঠেকেছিও যথেষ্ট নিজের অহমিকায়। অবশ্য একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, লৌকিক নম্রতা অন্তঃসারশূন্য হ'লেও বিনয়ের একটা সুষমা আছেই আছে। কিন্তু সেবার মতন বিনয়েরও দুটো রূপ—একটা মৌখিক তথা সামাজিক, আর একটা আধ্যাত্মিক তথা আন্তরিক। যে-বিনয়ের লক্ষ্য "অমায়িক" নাম কেনা, যে বিনয় মনে যা জানে মুখে তারই প্রতিবাদ করে শুধু দস্তুর মেনে, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি। কেন না এ-বিনয় অজ্ঞাতে আমাদের কপটতারই দীক্ষা দেয়—তাই এহেন বিনয়ের চেয়ে আমি সরল জাঁক করাকেই বেশি ভালো বলি। কিন্তু আর এক শ্রেণীর বিনয় আছে—যা শুধু শ্রীমন্ত নয়—গভীর জ্ঞান-সম্ভব। এ-বিনয় নিজের শক্তিকে নিজের মনে করে না, মনে করে ভগবানের দান; এ-বিনয় হাজার বাহবা পেলেও সে-স্তুতিকে আস্বাদরের ইন্ধনের কাজে লাগায় না, ফিরিয়ে দেয় তাঁর চরণের অর্ঘ্য ক'রে—যিনি প্রতি বিভূতির স্রষ্টা; এক কথায় এ-বিনয়ের মূল অনুভব দীনতার দৈবী মহিমা—যে দীনতাকে শ্রীঅরবিন্দ বর্ণনা করেছেন তাঁর অপূর্ব গভীর কবিতায়:

Thou who pervadest all the worlds below
Yet sitst above !
Master of all who work and rule and know
Servant of love !
Thou who disdainest not the worm to be
Nor even the clod,
Therefore we know in that humility
That thou art God.

এই দীনতার মর্ম কোনো কবি ঠিক বুঝতে পারেন নি অনুবাদ করবার সময়ে। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের টীকা উদ্ধৃত করি আধ্যাত্মিক দীনতার প্রাণের কথাটি বোঝাতে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন: "To have no contempt for the clod or the worm does not indicate that the non-despiser is the Divine: Such an idea would be absolutely meaningless and in the last degree feeble. Any yogi could have that equality or somebody much less than a yogi. The idea is that, being omnipotent, omniscient, infinite, supreme, the Divine does not seem to disdain to descend even into the lowest forms, the obscurest figures of nature and animate them with the Divine Presence: that shows his Divinity. The whole sense has fizzled out in the translation."

বলাই বেশি যে, মানুষের পক্ষে এ-দীনতায় পূর্ণসিদ্ধি-লাভ অসাধ্য। কিন্তু দেবতার দিব্যভাবের কিছু ছোঁয়াচ তো মানুষে লাগে—তাই মানুষ এ-দীনতার খানিকটা প্রকাশ করতে পারে দিব্যচেতনায় আরূঢ় হ'লে। তখন সে এই ভাবেরি ভাবুক হ'য়ে ওঠে যে নগণ্যতম জীবকেও অশ্রদ্ধা করতে নেই—যেহেতু নগণ্যতম জীবের মধ্যেও সেই একই ভগবান। এ-চেতনায় আধুনিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও মানুষ নিজের কোনো শক্তির জন্যে আত্মম্ভরী হ'য়ে ওঠে না, ভুলেও মনে করে না—যারা অশক্ত অক্ষম তাদের সঙ্গে পংক্তিভোজনে তার গৌরব-কৌলিন্যের জাত যাবে।

শক্তির ক্ষেত্রে যে-মনোভাব বরেণ্য সেটা হ'ল এই যে, প্রতি শক্তিই ভগবানের বিভূতি—নিজের মধ্যেও, পরের মধ্যেও। তাই অপরের মঙ্গল-শক্তিকেও যেমন শ্রদ্ধা করব, নিজের শক্তিরও তেম্‌নি বিকাশ করব যথাসাধ্য—নিজে বড় হ'তে না, ভগবানের হুকুম তামিল করতে। পরমহংসদেব এই ভঙ্গিকেই বলতেন—প্রতি প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। গীতায় বলেছে যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌। আমি কিছুই নয়, আমি অক্ষম, আমি ব্যর্থ—এ-ধরণের মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া তাই বাঞ্ছনীয় নয়, যেহেতু একে প্রকৃত বিনয় বলে না—এতে ক'রে ভগবানের দানেরি অমর্যাদা করা হয় যে।

* * * * *

লাহোরে বাংলা গানেরও আদর যথেষ্ট—পঞ্চবিদের মাঝে। এ নিয়ে যদি গৌরব বোধ করি সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না—যেহেতু বড়কে বড় বলাই তো চাই। বাংলার শ্রেষ্ঠ কাব্য-সঙ্গীতের নিজকীয় বিকাশের মধ্যে যে মূর্ত হয়েছে গানের এক নব-ধারা—তাকে শিরোপা না দিলে সেটা হবে পূজ্যপূজাব্যতিক্রম। লাহোরে লালাজির যক্ষ্মা-হাসপাতালের জন্যে চ্যারিটি জলশায় তাই আরো বেপরোয়া হ'য়ে বাংলা গান গাইয়েছিলাম উমাকে দিয়ে। সে সময়ে এতটুকু গোলমাল হয় নি। শুনলাম ওখানে

শ্রোতারা নাকি গানের সময়ে অনেকেই গোলমাল করে। তাই আরো খুশি হয়েছিলাম বাংলা গানকেও ওরা এমন সমাদর করলে দেখে। এমন কি, উমার সঙ্গে যে দুজন সারঙ্গিওয়ালা বাজিয়েছিল, তারাও উচ্ছ্বসিত ওর "সুরেলি আওয়াজে" গানের "মজা" উপভোগ ক'রে। আমাকে বলল এসে—এত সুন্দর কণ্ঠ ওরা শোনেনি কখনো কোনো ভদ্রগৃহে।

উমার কণ্ঠলাবণ্যের সৌন্দর্যের কথা আমি এত বেশি

বলি জেনেশুনে যে, অনেকের কাছেই এটা বাড়াবাড়ি মনে হবে। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই এ-প্রশংসার দরকার। আমি বহুবার ঠেকে শিখেছি যে, আমাদের দেশের সঙ্গীতানুরাগীরা প্রায়ই গানে কণ্ঠলাবণ্যের খুব বেশি দাম দেন না। মানে, গানে তাঁরা কণ্ঠলাবণ্যের দিকে তেমন কানই দেন না, দেন কণ্ঠকৃতিত্বের দিকে। গানে কণ্ঠ-কৃতিত্বের মূল্য অস্বীকার্য নয়, কিন্তু তাই ব'লে কণ্ঠলাবণ্যকে তার প্রাপ্য মূল্য না দিলে গানের পরমানন্দের অনেকখানিই আমাদের কাছে অগোচর থেকে যাবে। কারণ অন্তরাত্মার স্পন্দন সবচেয়ে সহজে বেজে ওঠে এই কণ্ঠলাবণ্যের লহরী-লীলায়। অথচ মজা এই যে ক্লাসিকাল মাইণ্ডেড ওরফে ওস্তাদী-পন্থীরা এত বড় সহজ কথাটা বুঝেও বোঝেন না। একটা উদাহরণ দেই কী বলতে চাইছি। শিলঙে একদিন উমা গাইল কয়েকজন ওস্তাদপন্থীর কাছে। আমি লাটুকে বলছিলাম—"দেখ, ওরা উমার গানে কী শুনছে।" উমা ধরেছে (খুব ঠায়ে একতালায়) ভীষ্মর শেখানো একটি জৌনপুরী তোড়ির খেয়াল। ওরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে কখন সে শমে আসে। ওদের সমস্ত চেতনাটা নিবিষ্ট কেন্দ্রীভূত ঐ শমের যাথাতথ্যে। যে-ই উমা তান টান দিয়ে শমে ফিরে আসে ওদের আনন্দ আর ধরে না। ওদের ভাবটা :

> সূক্ষ্ম সুরের আলোছায়া ওর
> কণ্ঠে যে ফোটে হেন—
> অপরূপ পিককণ্ঠে যে মিড়
> রাঙে জলধনু যেন—
> দরদে নিবিড় কণ্ঠে যে তান
> ফুল ঢেউ সম ধায়—
> সবি ভালো বটে, শুধু আমাদের
> ওস্তাদি কান চায়
> শমের হিসাব রাগের খাতায়
> তাই তো ভাবনা এত
> কী ভীষণ হ'ত ভাবো—যদি
> শম্-এ বুড়ি ছুঁয়ে ও না যেত !

সত্যি, আমাদের দেশে সব সময়ে না হ'লেও প্রায়ই ওস্তাদীপন্থীরা এই রাগের হিসাব ও শমের ব্যাপারটাকে এত বড় ক'রে দেখেন যে, দুঃখ হয় তাঁদের শ্রুতিভক্তি দেখে—তাঁরা গানের শাঁস ছেড়ে খোলামকুচি নিয়েই এত মাতামাতি করেন দেখে, অথচ হায় রে, "Z-নতি পারেন না" কণ্ঠলাবণ্য ও দরদী ব্যঞ্জনার দিকে অভিনিবেশ রাখতে না শেখার দরুণ কী ধরণের ঠিকে ভুল হচ্ছে। উমার কণ্ঠ শুনে অনেক ওস্তাদিপন্থীই তেমন মুগ্ধ হ'ল না এই কারণে। তাঁরা জহুরী বটে কিন্তু শুধু রাগের তালের বা কায়দা গাওয়ার—আসল জিনিষের নয়। এ আসল জিনিষের মধ্যে প্রথম পংক্তিতে ঠাঁই পাওয়া উচিত কণ্ঠলাবণ্যের, আন্তরিকতার, সুরদরদের ও গীতিভঙ্গির স্বকীয়তার। উমার মধ্যে প্রথম তিনটি গুণ রয়েছে অজস্র। শেষ গুণটি ফুটলেই ওকে প্রথম শ্রেণীর গায়িকা বলতে পারা যাবে অকুতোভয়ে। কেবল এই বিকাশের জন্যে সব আগে ওর আত্মপ্রত্যয়। তাই আমি ওর মামুলি বিনয়ের এত বিরোধী।

* * * * *

না, একটা কথা আরো বলা হয় নি। গানের যে আবেদন সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয় সে আরো গভীর আরো সূক্ষ্ম—বলতে কি সেটা অবর্ণনীয়। কারণ গানে কণ্ঠলাবণ্য, দরদ, সরলতা ও স্বকীয়তা থাকলেও মন ভ'রে ওঠে না—যদি না গানে পাই অন্তরাত্মার স্পর্শ। এ পরশটি যে কী বস্তু তা ব'লে বোঝানো একরকম অসম্ভব, তবে কান পেতে শুনলে এর মহিমা মরমে পশেই পশে—যদি শ্রুতিসাধনায় গভীর সাঙ্গীতিক চেতনা জেগে ওঠে। গভীর সাঙ্গীতিক চেতনা জেগে ওঠার কথা বলছি এই জন্যে যে, অনেকে মনে করেন গানের মিষ্টতা এমন একটি জিনিষ যা সর্বজনবোধ্য ও সংস্কৃতিনিরপেক্ষ। একহিসেবে হয়ত একথা অসত্য নয়। সে হিসেবটা হ'ল এই যে, গীতিনিপুণ হ'লেই যে এ-চেতনা জাগে একথা সত্য নয়। এ হ'ল একটা সহজ স্ফুরণ যার আলো চেতনায় যখন ফোটে—ফোটে আপনিই। শিশুর কণ্ঠেও গানের গভীরতম আলো ঝলকে ওঠে এ আমি প্রত্যক্ষ অনুভবে জানি—যেমন অপরপক্ষে অসামান্য সঙ্গীতবিশারদের কণ্ঠেও লক্ষ্য করেছি আসল জায়গাটাই অন্ধকার। তবু বোধ হয় একথা বলা যায় যে, গানের গভীরতম চেতনা জেগে ওঠে বহুশ্রুতিসাধনায়। আর এ-চেতনা যখন জাগে তখন তার মনে হয়ই হয়—

হোক না সুন্দর স্বরের ভঙ্গি হোক না শুদ্ধ তান ও লয়
গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার, তাহার সেই গান গানই নয়।

কণ্ঠলাবণ্য বলতে আমি বুঝি না কণ্ঠের সেই সস্তা আবেদন—যাকে চলতি কথায় বলি সুমিষ্ট কণ্ঠ, বুঝছি কণ্ঠের সেই প্রকাশশক্তি, সেই বিভূতি—যার মাধ্যস্থ্যে অন্তরাত্মা সবচেয়ে সহজে নিজেকে জানান দিতে পারে সুষমার রূপায়নে।

* * * *

ওরা চ'লে গেল সবাই—আমাকে একা রেখে লাহোরে। কারণ দিদি—মিসেস ধর্মবীর—ছাড়লেন না। বললেন: "তোমার সঙ্গে এ জলশা, অভিনন্দন, নিমন্ত্রণাদির হট্টগোলে একটা কথাও হ'ল না দিলীপ। অন্তত একদিন থাকো আমাদের কাছে।"

দিদির মতনই কথা। সেই স্নেহ ওঁর এখনো আছে। থেকে গেলাম।

কত কথাই যে হ'ল সুভাষ, ক্ষিতীশ, আরো নানা বন্ধুকে নিয়ে। দিদি বললেন ভারি এক মজার গল্প। সুভাষ ছিল ওদের কাছে ডালহৌসিতে ওঁদেরই অতি সুন্দর বাড়িতে। কয়েক মাস থেকে সুভাষ ভাবল—ফিরি। কোথায় ফেরা যায়! উদ্দেশ্য বিশ্রাম। কেউ বলল—কার্সিয়াঙে তোমার দাদা শ্রীশরৎ বসুর বাড়িতেই বিশ্রাম পাবে। কেউ বলল—না, তোমার বিশ্রাম হবে না এদেশে, যাও ভিয়েনায়। সুভাষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে লিখল মহাত্মাজিকে—কোথায় যাই? দিদি তাঁর বালিকাসরল দুষ্টু হাসি হেসে বললেন: "আমি পই পই ক'রে সুভাষকে বললাম—মহাত্মাজিকে জিজ্ঞাসা কোরো না—কোরো না—কোরো না। কিন্তু ও কি জানি কি ভেবে শুনল না আমার বিচক্ষণ উপদেশ—মহাত্মাজিকে লিখল এই দু'জায়গার কোন্‌খানে যাওয়া যায় বিশ্রামার্থে? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—তিনি লিখলেন:

"কোথা যাবে?—এ তো প'ড়েই রয়েছে, ভিয়েনা বিদেশ—
সবাই জানে:
কার্সিয়াঙের আভিজাত্যও সমতল-দেশপ্রেমী না মানে।
যাও তাই এবে ভাই পেশোয়ারে—যেথা আবদুল গফুর খাঁ
পর্ণকুটীরে দেবে 'বিশ্রাম'—যদিও 'আরাম' মিলবে না।"

ব'লে দিদির সে কী হাসি!

* * * *

ওখানে বাঙালিরা আমাকে পরদিন সকালে ধ'রে নিয়ে গেল—সেদিন ছিল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। আমার জীবনের ভারি একটি সুন্দর ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল সেদিন। তিন-চারটি বাঙালি ভদ্রলোকের ঘরে পর পর যেতে হ'ল ও যথাবিধি বহু মেয়ে এসে আমাকে দিল ভাইফোঁটা। আমার নিজের বোন তো নেই আর—তাই হয়ত ভগবান দিলেন এত বাইরের বোন্। সত্যি এই ভাইফোঁটার রীতিটি আমার যে কী ভালো লাগে বলতে পারি না। কারণ হয়ত এই যে, আমার কাছে নরনারীর যত সম্বন্ধ আছে তার মধ্যে

কৃষ্ণভক্ত কবি আবুল হাফিজ জলন্ধরী

সবচেয়ে সুন্দর সম্বন্ধ লাগে ভাই বোনের সম্বন্ধ। কারণ অন্য সব সম্বন্ধের মধ্যেই প্রত্যাশা বেশি আমল পায় কোনো না কোনো ছদ্মবেশে—তা সে হোক না কেন বাপ-মেয়ে মা-ছেলে বা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু ভাই-বোনের সম্বন্ধে প্রায়ই ফুটে ওঠে অনাবিল স্নেহের দানছন্দ—অধিকারবোধ তেমন উগ্র হ'য়ে উঠতে পারে না এই সম্বন্ধে। আমি জানি আজকের দিনে বহুলোকই একথা বিশ্বাস করে না (ফ্রয়েডের দীক্ষায়!) যে অনাত্মীয়ার সঙ্গে বোনের সম্বন্ধ সত্য হ'তে পারে। কিন্তু মলিন মনের চেতনা নিম্ন চেতনা, তাই তার ব্যঙ্গবিদ্রূপকে হেসে উড়িয়ে দিলে একটুও অন্যায় হয় না।

* * * *

ফের কাছে পেলাম বন্ধু ৺ধর্মবীরকে, যদিও মাত্র দু'দিনের জন্যে। কী সুন্দর চরিত্র ছিল তাঁর! দিদিও কী স্নিগ্ধ যে! ওঁদের মেয়ে লীলাও এত মিষ্ট! সীতাও। একেবারে পর যখন এত আপন হয়, যখন তাদের স্নেহ এভাবে দীর্ঘজীবী হয়—মন চায় যেন কৃতজ্ঞতায় উপ্‌ছে পড়তে, নয়? শিলঙে তোমাদের পরিবারেও এই কথাই মনে হ'ত। তোমার মা ও তোমার ভাইকে কই আমাদের একটুও তো অনাত্মীয় মনে হয় নি। মুখে যতই বলি না কেন উষা, যেখানেই কোনো না কোনো মুখোষ প'রে অধিকারবোধ নিজের দখল দাবি করে, যেখানেই স্নেহের রূপটি একেবারে ঢাকা না পড়লেও পারে না তার নির্মলতম রূপে ফুটে উঠতে। তাই না কবি বলেছেন:

"আমার আমার ব'লে ডাকি—
আমার এ, ও, আমার তা
তোমার নিয়ে তুমি থাকো
নিও না কো আমার যা।"

কাশ্মীরে তন্দ্রা দেবীদের পরিবারের সঙ্গে এসেও এম্‌নিই মনে হ'ত, তোমায় বলেছিলাম না? একবারও মনে হ'ত না এঁরা ইংরেজ। যেমন প্যাট্রিক, তেম্‌নি মেরি, তেম্‌নি জোন, তেম্‌নি উইলিয়াম—তন্দ্রা দেবীর তো কথাই নেই। পরে—লাহোর থেকে ফেরবার পথে—দিল্লীতে আলাপ হয়েছিল তন্দ্রা দেবীর স্বামী জন ফোল্ডসের সঙ্গে। এঁর কথা আগে উল্লেখ করেছি। ইনি একজন সত্যিকার সঙ্গীতকার ছিলেন। তাই দুঃখ হয়েছিল যখন শুনলাম, এই সেদিন ইনি হঠাৎ মারা গেলেন। সংসারে যত শোকাবহ ঘটনা আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রতিভার অকালমৃত্যু। ফোল্ডস্‌ সাহেব ছিলেন ওদের হিসেবে যুবক বই কি। পূর্ণ স্বাস্থ্য, দীপ্ত আনন, জ্বলন্ত উৎসাহ—তার উপরে অসামান্য সঙ্গীতপ্রতিভা। দিল্লীতে এসেছিলেন স্টেশনে। আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্টুডিয়োতে। সেখানে নানান্‌ ভারতীয় যন্ত্রসহযোগে ইনি গঠন করছিলেন একটি ভারতীয় অর্কেস্ট্রা। কী সুন্দর যে লাগছিল তাঁর রচিত সুরগুলি। নিজে অসামান্য পিয়ানিস্ট—বাজালেন পঞ্চমাত্রিক, সপ্তমাত্রিক তাল—কত কী ভঙ্গিতে। বললেন: "আমার উদ্দেশ্য আপনাদের অপূর্ব ভারতীয় মেলডিকে য়ুরোপীয় সঙ্গীতে তর্জমা করা।" তর্জমা বলতে ইনি বুঝতেন খুব অল্প য়ুরোপীয় হার্মনির সহযোগে আমাদের সুরগুলিকে যেন স্বাধীন প্রেরণায় রচনা করা—to compose the Indian melodies anew with simple harmonic accompaniment."

আমার খুবই ভালো লেগেছিল এঁর রচনাভঙ্গি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এসব ওদেশে প্রচার হ'লে একটা কাজের মতন কাজ হ'ত, আমাদের সঙ্গীতের সাঙ্গীতিক মূল্য খানিকটাও তো বুঝত য়ুরোপের লোকে। উনি ঠিকই বলেছেন—এ হ'ত তর্জমা। কিন্তু এ-তর্জমার মধ্যে ছিল নবরস—তাই একে সৃষ্টির কোঠায় ফেলা চলে। দুঃখ এই, এ-হেন প্রতিভা না ফুটতে ঝ'রে গেল! তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হবে অন্য কোনো য়ুরোপীয় প্রতিভার হাতে। অবশ্য সেজন্যে চাই তাঁর ভারতে এসে এঁর মতন উৎসাহ নিয়ে আমাদের গান সুর তাল রাগ সবই ঠিক ছাত্রের মতন শেখা। তাহ'লে সঙ্গীতের একটা নতুন আনন্দলোকের দিশা পাবে মানুষ।

* * * *

ধর্মবীরের ওখানে আলাপ হ'ল ওখানকার বিখ্যাত কবি আবুল আসর হাফিজ জলন্ধরীর সঙ্গে। ওখানকার এক কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিত দৌলতরাম প্রথম বলেন আমাকে এঁর কথা। বললেন এমন সুন্দর সরল উর্দুতে লেখেন হাফিজ কবি যে মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। আর শুধু সরলতাই নয়—কী স্বকীয়তায়! মামুলি চালে গজল বা শের ইনি রচনা করেন না। নব নব ছন্দে—নব নব ভঙ্গিতে লেখেন গান কবিতা দুই-ই। কি স্বতঃস্ফূর্তি! আর কী উদারতা!—এঁকে দেখে মনে পড়ত প্রায়ই রাহানার কথা—মুসলমান হ'য়েও কৃষ্ণভক্ত—ভাবো দেখি! এঁর আরো নানা ঔদার্যের কথা বলতে বলতে দৌলতরামের চোখ দুটি উঠত জ্ব'লে। এ লোকটির মতন কাব্যানুরাগী জীবনে কমই দেখেছি। নাছোড়বন্দ—বললেন এ অদ্বিতীয় উর্দু কবিটির সঙ্গে করতেই হবে আলাপ। কাঙালকে তিনি ভাত খেতে ডাকলেন—একে কবি তার উপর কৃষ্ণভক্ত! সাগ্রহে গেলাম দৌলতরামের বাড়ি।

দেখা হ'ল না সেদিন। খাঁটি কবি তো—অতএব

উদয় হ'তে এত দেরি করলেন যে থাকতে পারলাম না, যেহেতু একটি বন্ধুর ওখানে ছিল গানের নিমন্ত্রণ।

যাহোক কবি এলেন পরে নিজেই ধর্মবীর-সদনে। আমার গানও শুনলেন। সত্যিই গানভক্ত। মীরাবাঈয়ের গান সম্বন্ধে পরে আমাকে কী উচ্ছ্বসিত পত্র যে লিখেছিলেন!

খুব ভালো লাগল লোকটিকে। তাঁর একটি কথা মনে গাঁথা থাকবে। বললেন তিনি দিদিকে, "মিসেস ধর্মবীর! আমি বিলেত গিয়ে আপনাদের সভ্যতার অনেক বিকাশেই মুগ্ধ হয়েছি—আপনাদের স্থাপত্য, আপনাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবস্থা, ডিসিপ্লিন, প্রাণশক্তি—কী নয়? আপনাদের যন্ত্র-সঙ্গীতও আমাকে গভীর আনন্দ দেয়। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে আপনারা এযাবৎ ভুল পথে চলেছেন ব'লেই আমার মনে হয়েছে। আমাদের বহু দোষ, কিন্তু এখানে আমাদের কাছে আপনাদের এইটে শিক্ষা করবার আছে যে, a singer sings only when his soul sings—not his throat."

মিসেস ধর্মবীর রাঙা হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু এ স্পষ্টবক্তা অন্যমনস্ক কবি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ব'লে চললেন: "রাগ করবেন না মিসেস ধর্মবীর। আমি বলছি না আপনারা আপনাদের নিজেদের সঙ্গীতে আনন্দ পান না। নিশ্চয়ই পান। কিন্তু যে-জিনিষে আনন্দ পান সেটা হ'ল voice-production, অন্তরাত্মার আনন্দ-ঝঙ্কার নয়। আপনাদের কণ্ঠ আপনারা বহু সাধনায় তৈরি করেন—কী ক'রে সতেজ হবে, সমৃদ্ধ হবে, স্বরনিপুণ হবে সবই আপনারা বহু যত্নে সাধনা করেছেন। কিন্তু সব মেনেও মানতে পারব না—আপনারা এখনো টের পেয়েছেন what happens when the soul sings and not the throat.

ভাববার কথা বই কি।

*   *   *   *

এ-কবিটির সঙ্গে আলাপ ক'রে ভালো লাগল খুবই। ইনি নিজের গান বেশ গেয়ে শোনাতে পারেন। গায়ক নন—কিন্তু ভালো লাগে। লোকটির মধ্যে ভাবাবেশ সত্য ও অকৃত্রিম। এঁর কয়েকটি গানে আমি সুর দিয়েছি। এর মধ্যে দুটি গান "মুরলীওয়ালে নন্দকে লালে বাঁসুরি বাজায়ে জা" ও "বসা লে আপনে মনমে প্রীত" তোমাদের শুনিয়েছি শিলঙে। প্রথমটি গ্রামোফোনে দিয়েছে উমা, দ্বিতীয়টি আমি। বেরুলে শুনো কিন্তু। বিশেষ ক'রে শেষেরটি ছন্দে মিলে ভাবে প্রেরণায়—সর্বোপরি আধ্যাত্মিক রসালতায় এত ভালো হয়েছে যে অনুবাদ সহ উদ্ধৃত না ক'রেই পারলাম না—এ থেকে বোঝা যাবে এ-কবির ব্যক্তিত্বের দিকটাও। এ গানটি প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ ওঁকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন।

বসা লে অপনে মনমে প্রীত।
মন-মন্দিরমে প্রীত বসা লে
ও-মূরখ ও ভোলেভালে!
দিলকী দুনিয়া কর্ লে রৌশন
অপনে অন্দর জ্যোতি জগা লে।

গফুরখাঁর পেশোয়ারি আতিথ্য

প্রীত হয়্ তেরী রীত পুরানি
ভুল গয়া ও-ভারতবালে!
প্রীত হয় তেরি রীত।

ক্রোধ-কপটকা উৎরা ডেরা
ছায়া চারোঁ খুঁট অঁধেরা
শেখ ব্রহমন দোনো রহজন
একসে বঢ়কর এক লুটেরা
জাহির দারোঁকি সঙ্গতমে
কোই নহি হয় সঙ্গী তেরা
মন হয় তেরা মীত।

ভারতমাতা হয় দুখিয়ারী
দুখিয়ারেঁ হঁয় সব নরনারী

তূহি উঠা লে সুন্দর মুরলী
তূ হি বন্ জা শ্যাম মুরারি
তূ জাগে তো দুনিয়া জাগে
জাগ উঠেঁ সব প্রেম-পূজারি
গায়েঁ তেরে গীত।

নফরৎ এক আজার হয় প্যারে!
দুখকা দারু প্যার হয় প্যারে!
আ জা, অস্‌লী রূপমে আ জা
তূ হী প্রেম অবতার হয় প্যারে
য়ে হারা তো সব কুছ হারা
মনকে হারে হার হয় প্যারে
মনকে জীতে জীত।

দেখ্ বড়োঁকী রীত ন জায়ে
সর্ জায়ে পর্ মীত ন জায়ে
ময় ডরতা হুঁ—কোঈ তেরী
জীতী বাজী জীৎ ন জায়ে
জো করনা হয় জলদি কর্ লে
থোড়া রক্ত হয় বীত ন জায়ে
রক্ত ন জায়ে বীত।

এ গানটির অনুবাদ করেছি আমি মোটামুটি এই ভাবে :

House in thy soul the flickerlesss lamp
of love,
O way-lost dupe, relume the olden flame
In the wistful temple of dream. Nurse
in faith's grove
The memorial rose of peace no thorn
can shame.

Delivered from thy passions' lurid gleams
And shadowing greeds, foes in the guise
of friends,
Know : in the deep of hush the soul
redeems :
She is the vanguard morn to darkness
sends.

Be pledged to noble ways—of the
ancient Sun :
If lose thou must, let it be life, not love.
Shall clouds besiege thy star-dominion ?
"Up ! time is fleeting !"—the clarion
calls above.

Hate never pays, though sorrows purify,
Be poised in thy Self of love : incarnate,
free ;
If she resigns, who shall reveal the sky ?
Soul's night's defeat : her dawn sure
victory.

Her children in gloom, thy Motherland
mourns and sighs,
Play Beauty's flute like Krishna :
thou art He.
If thou wilt wake, the world, aquiver,
shall rise
And mitred priests of love will sing
with thee.

(Translated from the Hindi song of Abul Hafiz Jalandhari—by Dilip Kumar Roy)

আগমনী

শ্রীমতী শোভা দেবী

জননী তোমার চরণ কমলে
প্রণাম করি ;
লহ মা প্রাণের দীন অর্চ্চনা
হৃদয় ভরি।

তোমার সোনার বাংলাতে আর
নাহি সম্পদ বিত্ত অপার ;
চোখের জলেই মুক্তার মালা
তাই মা গড়ি।
এস গো ভবানী এ দীন ভবনে
করুণা করি।

গরিমা-গরব নাহি এ শরতে
ভারতে আর ;
শক্তিময়ী কি প্রতিমাই শুধু
হবে মা সার ?

সুজলা সুফলা শ্যামলা বঙ্গ
সে কি মা শুধুই গীতির অঙ্গ ?
ফিরে কি দিবে না জননী গো মোর
বিভব তার ?
জ্যোতির্ম্ময়ী কি লবে না ঘুচায়ে
অন্ধকার ?

মহামায়া তব অভয় চরণে
শরণ মাগি ;
কাঁদিছে বঙ্গ কর মা করুণা,
উঠ মা জাগি।

দাও মা মুক্তি, দাও মা শক্তি,
এ অসাড় প্রাণে দাও মা ভক্তি ;
দাও মা কণ্ঠে অভয় মন্ত্র
পূজার লাগি।
জাগো মা ভবানী, ও রাঙা চরণে
শরণ মাগি।

সন্তান তব আগমনী গান
গা'ক মা আজি ;
তোমার পূজায় জ্বলুক
পঞ্চপ্রদীপরাজি।

শ্রীপদে লহ মা কোটি অঞ্জলি,
সার্থক হয়ে উঠুক উজলি।
বরিতে তোমায় শারদলক্ষ্মী
আসুক সাজি।
তব শুভাশীষ করুক মোদের
বিজয়ী আজি।

দুর্গোৎসব

চতুরঙ্গ

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১) ঐতিহাসিক

বাংলা ৯৯০ সাল। স্থান—উত্তরবঙ্গের তাহিরপুর রাজসভা, মন্ত্রণাকক্ষ। সময়—অপরাহ্ন

অর্ধবাংলার সামন্ত মহারাজাধিরাজ কংসনারায়ণ সভাসীন. পার্শ্বে উপবিষ্ট মন্ত্রী দনুজমাধব, সেনাপতি বিশ্বরূপ ভট্ট, কোষাধ্যক্ষ শ্রীকর তলাপাত্র, সভাপণ্ডিত আচার্য রমেশ শাস্ত্রী ও কবি কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস। শাস্ত্রীজি, মহারাজ কংসনারায়ণ আজ বঙ্গগৌরব সম্রাট তুল্য। তাঁর বিশাল রাজ্য সমগ্র উত্তর ও মধ্যবাংলায় সুপ্রতিষ্ঠ। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে দিল্লীর বাদশাহ পর্যন্ত স্বীকার ক'রে নিয়েচেন। বাংলার সুবেদার ত তুচ্ছ। একদিকে যেমন তাঁর সুবিশাল সুশিক্ষিত সৈন্যবল, তেমনি গুণমুগ্ধ জনবল—অপরিমিত—অফুরন্ত রাজকোষ, কুশাগ্রধী মন্ত্রী ও কর্তব্যনিষ্ঠ বীর সেনাপতিগণ। সম্রাটের যেমন লোকবল, জনবল, অর্থবল ও সেনাবল প্রয়োজন, মহারাজাধিরাজের এর কোনটিরই ত অভাব নেই। তদুপরি সমগ্র পঞ্চগৌড়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আচার্য মহোপদেশক আপনাকে তিনি পেয়েছেন গুরুরূপে, এ সৌভাগ্য—

শাস্ত্রী। আরো বলো কবি, বাদ দিচ্ছ কেন, বলো বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কৃত্তিবাস তাঁর কীর্তিমুখর, বলো এটুকু বাদ দিচ্ছ কেন বন্ধু ?

মন্ত্রী। সত্যি শাস্ত্রীজি, কবির প্রত্যেকটি কথাই অভ্রান্ত। কিন্তু তবুও কি মহারাজের এই কামনা-পূরণের কোনো শাস্ত্রসঙ্গত উপায়ই নেই ? শাস্ত্রের এমন কোন বিধি কি নেই আচার্য, যাঁর বলে মহারাজের এই বিশ্বজিৎ-লোকযজ্ঞ পূর্ণ হয় ?

রাজাকংস। শাস্ত্রীজি, আবাল্য কঠোর ভাগ্যচক্রের সঙ্গে নিত্য যুদ্ধ ক'রে আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সাফল্যের, ঐশ্বর্যের ও প্রতিষ্ঠার সিংহাসনে বসেছি সত্য, কিন্তু সর্বদাই মনে জাগে এই আশঙ্কা, এই ভীতি যে ঐশ্বর্যের এই উন্মাদ কুহক যেন আমার জাতির বৈশিষ্ট্য বংশের গৌরব ভুলিয়ে না দেয়—নষ্ট না ক'রে দেয় আমার বিপ্রত্ব, আমার মনুষ্যত্ব, আমার রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রতি সুমহান্ কর্তব্য। তাই ঐকান্তিক কামনা—এই ঐশ্বর্যকে বিলিয়ে দিতে সৎপাত্রে, সৎতীর্থে, সৎক্ষেত্রে—যথেচ্ছ—আজীবন। প্রপিতামহ পুণ্যশ্লোক কুল্লুক ভট্টপাদের রক্তধারা যেন ঐশ্বর্যের মোহে আত্মবিদ্রোহী না হ'য়ে ওঠে—ভোগের দিকে, কামনার প্রেরণায়—দুর্বল মানবের মূঢ়তায় !

শাস্ত্রী। সবই জানি মহারাজ, কিন্তু শাস্ত্র বড় কঠোর, বড় নিষ্ঠুর—আবার পরম কারুণিক। শাস্ত্রে বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারটি মহাযজ্ঞ রূপে কীর্তিত। অশ্বমেধ ও গোমেধ কলিবর্জ্য, সুতরাং অকার্য ; আর আপনি স্বাধীন সম্রাট নন, তাই শাস্ত্রীয় বিশ্বজিৎ ও রাজসূয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী।

কৃত্তি। তা হ'লে মহারাজের মনোবাসনা পূরণের কোনো উপায়ই শাস্ত্রে নেই আচার্য! মহাযজ্ঞ না হয় তৎকল্প—তম—তর। আপনি সর্বশাস্ত্রবিৎ ঋষিকল্প, যা হয় একটা বিধান করুন।

মন্ত্রী। আমাদেরও এই একান্ত বাসনা পণ্ডিতজি, মহারাজের মহাযজ্ঞের মহাদানের একটা—শাস্ত্রীয় উপায় আপনার যেরূপেই হোক্ বিধান দিতে হচ্ছে।

শাস্ত্রী। নিরুপায়ের উপায় যিনি দুর্গতিহারিণী—একমাত্র তাঁর চরণ শরণ ব্যতীত আর কোনো উপায়ই নেই মহারাজ ! আপনার সদুদ্দেশ্যের কথা অনেক চিন্তা করেছি, মনন সাধন করেছি, কিন্তু শাস্ত্রীয় কোনো মহাযজ্ঞেরই অধিকারিত্ব আপনার নেই। কিন্তু মায়ের প্রত্যাদেশ পেয়েছি—তাঁর শাস্ত্রোক্ত পূজা। মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের সপ্তশতী অংশে আছে—"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে য চ বার্ষিকী—শরৎকালে দুর্গামহাপূজার বিধি। আর দেবীপুরাণও এর সমর্থন করেছেন—"মহাব্রতং মহাপুণ্যং শঙ্করাদ্যৈরনুষ্ঠিত

কর্ত্তব্যং সুররাজেন্দ্র দেবীভক্তিসমন্বিতৈঃ।" এই মহাপূজা "দুর্গোৎসবে"র অনুষ্ঠান আপনি করুন। কলিতে এই উৎসবই মহাযজ্ঞরূপে কীর্তিত। সত্যযুগে মহারাজ সুরথও এর অনুষ্ঠান করে মন্বন্তরা বিপত্য লাভ করেছিলেন, আর সমাধি বৈশ্য পেয়েছিলেন পরম সমাধি—মুক্তি। আপনি এই "দুর্গোৎসব" অনুষ্ঠান করুন মহারাজ।

রাজা। আনন্দম্, এ উত্তম আদেশ আচার্য। আমি সম্পূর্ণ সম্মত। পূজার আর বেশী দেরী নেই। মন্ত্রী, এই বৎসরই এর অনুষ্ঠান বোধ হয় সম্ভব?

মন্ত্রী। নিঃসন্দেহে মহারাজ, পরম আনন্দে!

রাজা। উত্তম। শাস্ত্রীজি, পূজার বিধান।

শাস্ত্রী। সমস্ত পৌরাণিক গ্রন্থ ও স্মৃতিনিবন্ধ সংগ্রহ দেখে আমি দুর্গোৎসব-বিধি সংস্কার করেছি। আপনি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখেতে পারেন।

রাজা। আমার দেখবার প্রয়োজন নেই আচার্য্য, বৃহস্পতিকল্প আপনি বিধিবদ্ধ করেছেন—এর আর আমরা কিই-বা দেখব? তা হ'লে এই ঠিক। আগামী আশ্বিনের শুক্লপক্ষে দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানই সংকল্প। মন্ত্রী, খাজাঞ্চি, সেনাপতি, পরিচালকগণ, আপনারা এর যথাবিহিত করবেন। আর আচার্য এর তন্ত্রধারক হতে হবে আপনাকে, শ্রীচরণে দীনের এই নিবেদন।

শাস্ত্রী। আমার যথাসাধ্য সাহায্য পাবেন রাজা।

রাজা। পরম কৃতার্থ!

রাজা। কবি, আজ হ'তে প্রতিদিন দুপ্রহরে আমায় শুনাতে হবে আপনাকে মায়ের গুণমাহাত্ম্য—সপ্তসতী।

কৃত্তি। পরমানন্দে মহারাজ, এ ত মহাসৌভাগ্য।

রাজা। আচ্ছা আজ আপনারা বিদায় নিতে পারেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

তাহিরপুর রাজবাটী পূজামণ্ডপ

দশভুজা দুর্গাপ্রতিমা বিবিধোপচারে অর্চিত, সম্মুখে স্বর্ণকলসাদি পূজোপকরণ। পার্শ্বে যজ্ঞবেদীতে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি। পট্টবস্ত্রপরিহিত মহারাজ কংসনারায়ণ দণ্ডায়মান, পার্শ্বে রাণী ভুবনেশ্বরী। যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে ঋত্বিবেশে শাস্ত্রী। অদূরে—মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি দণ্ডায়মান। সময় দিনাস্ত।

শাস্ত্রী। মায়ের উৎসব সর্বাঙ্গ শাস্ত্রানুযায়ী সম্পূর্ণ হয়েছে মহারাজ, এইবার পূর্ণাহুতি দিয়ে যজ্ঞশান্তি করি?

রাজা। একটু অপেক্ষা করুন আচার্য! মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি সমস্ত যথাযথ হ'য়েছে কি-না? মন্ত্রী—

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। আমার নিবেদন, আপনারা যথাসাধ্য যথোপযুক্ত করেছেন? এখন মায়ের পূজার পূর্ণাহুতি দিতে পারি?

মন্ত্রী। আপনার আদেশে একমাস পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশের প্রতি গ্রামে ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলাম আমরা। এই তিন দিন তাহিরপুর নগরে সকলকে যথেচ্ছ দান করা হয়েছে। সমস্ত প্রার্থী দীন, দুঃখী আতুর, কাঙাল, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র জাতি-বর্ণ-অবস্থা-বয়সনির্বিশেষে প্রার্থনার পূর্তি লাভ করেছে আপনার এই কাজে।

রাজা। আমার কাজ নয় মন্ত্রী, মায়ের কাজ; আমি দীন নিমিত্ত মাত্র।

মন্ত্রী। মায়ের সেবায় সাত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছি মহারাজ। রাজ্যের একটি নগণ্য প্রাণীও বিফল হ'য়ে যায়নি—সব সুসম্পূর্ণ হয়েছে। এবার মায়ের যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে পারেন আচার্য।

রাজা। মায়ের দক্ষিণা—

মন্ত্রী। স্বর্ণপাত্রে দক্ষিণার দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ঐ আচার্যের সম্মুখে রেখেছি।

শাস্ত্রী। এইবার পূর্ণাহুতি দেই মহারাজ?

রাজা। পূর্ণাহুতি! পুত্র কি মায়ের পূজার পূর্ণাহুতি দেবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে পারে কখনো আচার্য?

শাস্ত্রী। যজ্ঞীয় সংস্কারাঙ্গ পূর্ণাহুতি—

রাজা। একটু বিলম্ব হবে আচার্য, রাণী প্রস্তুত হও—ঠিক করে ধর ত পাত্রটি।

রাণীর ঘৃতপূর্ণ স্বর্ণপাত্র রাজার সম্মুখে ধারণ ও রাজার খড়্গে বক্ষের কতকটা মাংস ছিন্ন করে পাত্রে প্রদান ও উভয়ে অগ্রসর হয়ে যজ্ঞে প্রদান।

শাস্ত্রী। এ কি—এ কি মহারাজ!

রাজা। এ আমার সংকল্পের পূর্ণাহুতি, মায়ের দুধে পুষ্ট দেহের কণিকা মাত্র—মাকে নিবেদন। রাজা সুরথ দিয়েছিলেন "নিজ গাত্রা স্বগুক্ষিতম্"—সপ্তশতী বলেছেন, আমাদের কি সে প্রাণ সে শ্রদ্ধা আছে? আচার্য, আপনি এবার যজ্ঞপূর্ণ করুন।

শাস্ত্রী। মহারাজ কংসনারায়ণ, আপনার এই শাস্ত্র ও দেবতার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস, ভক্তির দান মা গ্রহণ করেছেন—আশীর্বাদ করি, আপনার এই অনুপম মাতৃ-উৎসব আজ থেকে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অনুষ্ঠিত হোক্—মায়ের সাধক বাঙালী আবার মাকে জানুক, মানুষ হোক্, আপনার এ কীর্তি অক্ষয় হোক্!

রাজা। আচার্য, আপনার এ মঙ্গলেচ্ছা দাস মাথা পেতে নিচ্ছে।

কৃত্তিবাস। আপনি মানুষ নন মহারাজ, শাপভ্রষ্ট দেবতা।

রাজা। মায়ের নাম নেও কবি। মানুষের এই কর্ণপ্রিয় কথাগুলো মায়ের মন্দিরে উচ্চারণ ক'রে এর পবিত্রতা নষ্ট করো না। মায়ের মন্দিরে রাজা-প্রজা দীন-দুঃখী—সবাই সমান। আনন্দময়ী মাকে ডাকো, আনন্দ করো, বলো—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥"

(২) দুর্গোৎসব—অতীত

বাংলা—১২৮০, সময় প্রাতঃকাল—সাড়ে নয়টা

পূর্ববঙ্গের আশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ জমিদার মহারাজ রামকান্ত রায়ের অন্তঃপুর দালানের অলিন্দ। জমিদার রামকান্ত একটি কেদারায় অর্দ্ধ-শায়িত, হাতে ফড়সির নল, তামাক সেবন করিতেছেন; অদূরে ষোড়শী পৌত্রী মহামায়া, সিঁড়িতে দেওয়ান রঘুনাথ মজুমদার অলিন্দে উঠিতেছেন।

রাম। ও কেডারে, ও কেডা আইচে নতুন বৌ, কার য্যান্ পায়ের শব্দ শুনচি না?

মহামায়া। নায়েব জেঠামশোয় আইচেন ঠাকুদ্দা, আপনি তাক্ সকালে ডাক্চিলেন না।

নায়েবের আগমন ও প্রণাম

রাম। কে রঘুনাথ নাক্হি? বাইচা থাকো। ক্যামন আছ? বইস—বইস। এই শালী, বস্বার দিছিস তোর জ্যাঠাক্?

রঘু। আজ্ঞা আমি বইচি।

মহামায়া। গাইল্ পারো ক্যা ঠাকুদ্দা, আমাক যে শুধাশুধি গাইল্ পারো, আমি আর তোমার তামুক লাগাইয়া দিমু না কইল্। তখন মজা টের পাইবা নি।

রাম। আরে না না, 'শালী' কি আবার একটা গাইল হইল নাকি? ওতো নতুন বৌর আদর রে—শা—। ওহুঁ—আচ্ছা, তুমিই কও না রঘুনাথ, এডা কি য়্যাক্টা গাইল নাকি?

রঘু। (হাসিয়া) আজ্ঞা না, অমন তো আমরাও নাতনীগোরে বইলা থাকি।

রাম। শুনচিস্নি শা—না না, নতুন-বৌ, রঘুনাথও তার 'নূতন-বৌ'রে এই কইয়া থাকে—রাগ হইলো নাকি? এদিক আয়, শোন্ শোন্। অ নতুন-বৌ এদিকে কাছে আইস। বুড়ামানুষ, ভালো চোখে-টোখে দেখি না।

মহামায়া। থাইক্গা, আর আদরের কাম নাই ঠাকুদ্দা। বিনা আদরেই ভাল আছি—কানা ঠাকুদ্দা উচ্‌বগ্—বুইড়া। (ঠাকুরদ্দার নিকট গমন)।

রামকান্ত। রঘুনাথ, (নাতনীকে আদর ক'রে মাথায় হাত দিয়ে) বুইড়া কিন্তু নূতন-বৌর—আমার প্রতি বেজায় টান্, কেমন রঘুনাথ, তাই না? তোমার কি মনে হইচে?

মহামায়া। আবার ঠাকুদ্দা, তাহ'লে আমি এই চৈল্লাম।

রামকান্ত। না, না, আচ্ছা, এইবার রঘুনাথের সঙ্গে আলাপ করি—তুমি তোমার জায়গায় যাও। (মহামায়ার নিজ স্থানে গমন) তা তোমাদের বাড়ীর সব ভালটাল আছে ত? বুইড়া হইয়া গেচি, যাইবারও পাই না—দেখ্‌বারো পাই না। তোমার পোলাপান ঝি-বউ ভাল ত?

রঘুনাথ। আজ্ঞা ঈশ্বর ভালই রাখ্‌চেন মহারাজ।

রামকান্ত। দেখো রঘুনাথ, তোমাগোর কতবার কইয়া দেখ্‌চি, যে ঐ যে একটা কি চক্রান্ত কইর‍্যা তোমরা আমার নামের সঙ্গে জুইড়া দিচ মইরা* বল্দের ঘারে জুয়ালের মতো ওটা তোম্‌রা ফাইলা রাখো—তা না, কেবল মহারাজ, মহারাজ। মহারাজ, কিসের মহারাজ হইমু আমি—রাজা মহারাজা হওয়া মুখের কথা কি-না? কইলেই হইলো, আর কি। ও তোমাগোর কত্তাবাবুরে কওগা, বেশী কইলে বক্‌শিসও মিল্‌বার পায়। যারা সাহেব পূইজা কইর‍্যা মহারাজ হইচেন—তাগরে কইও, আমাক্ না।

* মইরা—মুমূর্ষু

মহামায়া। তুমি ত সত্যি সত্যি মহারাজ ঠাকুর্দা, এই ত সেদিন ম্যাজিস্টর্ সাহেব তোমাকে মহারাজা কইরা গেলেন—

রামকান্ত। থাম্ শালী, রাগাইস্ না। আমি মইলে তোর বাবাক্ না মহারাজা কইরা তোরা রাজকুমারী হৈস্—হঃ—তারা মা! রঘুনাথ, তোমারে ডাক্‌চি ক্যান্ তা নি জানো। মা'র পুইজা তো আইসা গ্যাচে, সব জোগাড় টোগার নি ঠিক রাইখ্‌চ? বয়স ত হইচে—আরো পুইজা যে দেখ্‌মু তার ভরসা কি? তাই, এবার একটু জুত কইরা পুইজা কর্‌বার চাই। ফর্দ্দটর্দ্দ কর্‌চ নাকি? আমি ত আর দেখবারো ভাল পাই না—তোমাগোর উপরি ভরসা। একটা মাত্র ছাইলা, তা তো মেলেচ্ছই হইয়া গ্যাচে, ঠাকুর-দ্যাবতায় বিশ্বাসটিশ্বাস নাই। এই আমি যে কয়দিন আছি—তার পর ত তোমরা মায়ের মণ্ডপে ম্যাম্ সাহেব পুইজা করবা। তোমাগোর কর্তাবাবুর ব্যামন তানিগোর উপর শ্রদ্ধা ভক্তি!

রঘু। আজ্ঞে, সবই ঠিক মতই হৈচে—আগের মতোই সব। ক্যাবল—খাওয়ানদাওয়ান কিছু কমাইবার ইচ্ছা বাবু বল্‌চেন। সেদিন অতোগুলো টাকা খরচ হইয়া গেল আপনার উৎসব্—

রাম। থামো, হৈচে। আমি কিন্তু চৈট্‌বার লাগ্‌চি। রাগাইও না আমাক্—মহারাজ পুইজায় টাকার ছেরাদ্দ করছ, তাই মায়ের পুইজায় খাওয়ান বন্ধ করবার চাও? ক্যান্, কে কইচিলো মহারাজ পুইজা কইর্‌বার তোমাগোর? মায়ের পুইজার যা বরাদ্দ আছে, তার উপর এবার আমার এলাকার সব রাইয়তগোর আমি খাওয়ামু, আর জীবনে কুলাইবো কি-না য়্যাক্‌বার শেষ দেইখা যাই। শুন্‌চনি? পাঁচ হাজার টাকা বেশী ধরোগা—এতেই হইবো।

বসু। কিন্তু কর্ত্তাবাবু এতে মোটেই মত দিবেন কি-না সন্দে হয়। তাঁর মত, দুই হাজারের বেশী খরচ না করা। গত সনের চেয়ে এবার বছরো ভালো না। গত বছর চাইর হাজার ফর্দো উট্‌চিলো', এবার সাড়ে তিন হাজার ধর্‌চি। তিনি দু হাজার ক'ইরবার বল্‌চেন। এখন আপনি যা বল্‌লেন তাতে কম পক্ষে দশ হাজার—

রাম। দশ হাজার না হয় বিশ হাজার লাগ্‌বো। তোমাগোর বড়লাটের 'ফণ্ডে' না কিসে যদি তোম্‌রা পঞ্চাশ হাজার দিয়া মহারাজ হৈবার পাও—আমার মার পুইজায় আমি দশ হাজারও খরচ করবার পারমু না। ক্যান্, আমি আর কয়দিন? শরীরের যা অবস্থা আর তোম্‌রা যা দিন দিন করবার লাগ্‌চ, তাতে গ্যালেই ত বাচি। কিন্তু মা বেটী তো কানের মাথা খাইচে। যাও ফর্দ্দ ধরোগা, শুন্‌চ না?

রঘু। আজ্ঞে, এক্‌বার কত্তাবাবুকে জিজ্ঞাসাটা করি।

রাম। না; তুমিও তারই দলে ভিরচ দেখ্‌চি। আরে এ সম্পত্তিটা কার তা জানোনি? এডা আমারই 'বামুন' বাপ-দাদার—তোমাগোর কত্তাবাবুর বাবা মহারাজের না। তানাগোর মণ্ডপে আমি যদ্দিন বাঁচ্‌মু—তানাগোর মতই এসব কর্‌মু। তার পর তোম্‌রা যা কইর্‌বা সে ত দেখ্‌বারই পাই। আমার ছেরাদ্ধের পিণ্ডি দেওয়াইবা ওই জজ্ মাজিষ্টর দিয়া। বাইচা থাক্‌তেই ত মহারাজা কইরা পিণ্ড দিয়া থুইচ। যাও, আর রাগাইও না—কইও তোমার বাবুরে, সম্পত্তি আমার বাবার—তার বাবার না। তানাগোর মত আমি সবই কর্‌মু। হঃ—সব মেলেচ্ছ, তারা মা—দুখহরা কাইল ঠিক ঠিক ফর্দ্দ কইরা আইনো জ্যান্। ওসব কত্তাটত্তা আমি মইলে তার পর জিজ্ঞাসা কইরো। যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মায়ের মন্দির, নবমী পূজা, মায়ের পূজা শেষ, পুরোহিত যজ্ঞান্তে পূর্ণাহুতি দিয়ে শান্তির জন্য কর্তাকে ডেকেছেন—নাতনীর হাত ধ'রে জমিদার রামকান্তের মায়ের মন্দিরে আগমন ও প্রণাম।

রাম। নতুন-গিন্নি, আজ য্যামন তোমর হাত ধইরা মন্দির আস্‌তেচি, তোমার ঠাকুমার হাত ধইরাও য়্যাকদিন য়্যামনি আইচিলাম—তোমার ঠাকুমার বয়স তের আর আমার তখন বয়স বিশ। ওঃ—সে আজ ষাইট্ বছরের কথা—তারা মা, দুখহরা, তারিণি!!

মহামায়া। এইখানেই বসেন ঠাকুদ্দা, ওদিক সব বন্ধ আছে।

রাম। হঃ, এই বস্‌চি, ভটচায্ মশোয়, মার পূইজা নির্বিঘ্নে হইচে তো—ভোগ হইয়া গ্যাচে নাকি?

পুরোহিত। আজ্ঞে, এই ত ভোগ হ'ল।

রাম। ভোগ হইচে, বেশ। বেশ পূন্নাহুতিও দিচ নাকি?

পুরোহিত। দিচি।

রাম। বেশ, ও নতুন-বৌ, কৈ গো, ছাও ত তোমার পুরুত-কাকাকে আমার সেই পেন্নামীটা।

মহামায়া। এই নিন পুরুত-কাকা (দশটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

রাম। ভট্চায, এবারকার বিশেষ দক্ষিণা। মার পূইজার কি আবার দক্ষিণা হয় নাকি? তবে তোমাগোর শাস্ত্রে আছে তাই। মা'র কাচে ভালো কইরা জানাও ভট্চায, মায়ের কোলে জ্যান শীগগীর কইরা জায়গা পাই। আর না, এসব অনাচার আর দেইখ্‌বার ইচ্ছা নাই। নায়েব আছো না? রাইয়তগোর খাওয়ান দাওয়ান ত সব ঠিক মতো হইচে?

নায়েব। রাইয়তেরা আনন্দে মহারাজের গুণ—

রাম। থামো। হইচে। নতুন-বৌ, তোর বাবা কইরে? শাস্তি নিলো না? তোর মা?

মহামায়া। মা ভোগ-দালানে আছেন, ঐ আস্‌চেন। বাবা তো খেয়েদেয়ে ঘুমাইচেন।

রাম। খাইচেন—ঘুমাইচেন! বেশ বেশ, মার ভোগ হয় নাই, পূইজা শেষ হয় নাই, তানি খাইচেন—ঘুমাইচেন! মহারাজার ব্যাটা কি-না? ভাল শিক্ষা দিচিলাম যে। সাহেব রাইখ্যা পড়াইছিলাম, এম্‌-এ পাশ করাইচিলাম—তারা মা—তারা মা—

পুরোহিত। এই মার প্রসাদ ও শান্তিজল নিন।

রাম। আর শান্তি, ছাও—শান্তি হইবো মার কোলে, তার আগে না। ভট্চায, এ মেলেচ্ছের রাজ্যে না। তা পারচি কই, মা বেডি ত পাষাণী, বুড়ার কথা কানেই যায় না। ভট্চায, একটা কথা মার কাছে বলো, ভাল কইরা বলো তো —তোমরাইতো বলার ক্ষ্যাম্‌তা রাখো—আমার এই নতুন-বৌর জন্যে একটা ময়ুর-ছাড়া কার্ত্তিকের মতো বর নি জুটাইয়া ছায়। তা হ্যাঁ—তোমাগোর একালের ঐ কোচা-ছাড়া বুট্ পায়ে নবাব কার্ত্তিক না, আমাগোর জুয়ান কালের কার্ত্তিক—"ছাব্‌তা" কার্ত্তিকের মতো হয়। কেমন নতুন-বৌ, সে কার্ত্তিকের ময়ূর না হইলে চইল্‌বো না—?

মহা। ঠাকুদ্দা, আবার মন্দিরেও তুমি আমার রাইসে লাগচো। আমি চৈল্‌লাম, থাকো তুমি (রাগে প্রস্থানোদ্যত)।

রাম। ও নতুন-বৌ, শোন্, শোন্, রাগ কর্‌লি নাকি সত্যি সত্যি? আরে তুই রাগ কর্‌লি, বুড়াডার উপায় কি হইবো? এডারে কে ছাখ্‌বো, আরে মার আশীর্বাদ ডা লইয়া যা, আচ্ছা কার্ত্তিক না হয়, ঐ গণ্‌শার মত শুড়ওয়ালা লাল টুকটুকে বর হৈব। শুড় দিয়া জড়াইয়া আদর কইর্‌ব—কান দিয়া বাতাস কইরব। ছাও ভটচায, মায়ের শান্তি—(শান্তি জল গ্রহণ) আঃ—তারা মা, দুঃখহরা—দুর্গা!

(৩) দুর্গোৎসব

বর্ত্তমান—১৩৪৬ সাল

আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমী। প্রাতঃকালে জমিদার-বাড়ীর মণ্ডপে মায়ের প্রতিমার রং হচ্চে। পার্শ্বে ঠাকুরদালান, অলিন্দে বিধবা বর্ষীয়সী জমিদারপত্নী পূজোর জোগাড় করছেন। পার্শ্বের দালানে জমিদারপুত্রের গৃহের মধ্যে কৌচে শায়িতা অধ্যয়নরতা শিক্ষিতা পুত্রবধূ। অলিন্দের সামনে ছড়ি হস্তে ভ্রমণ প্রত্যাগত যুবক পুত্র।

গৃহিণী। বাবা কমল, সত্যি তা হ'লে তোরা পূজোতে বাড়ী থাক্‌ছিস্‌নে? বাড়ীতে আনন্দময়ী মা আস্‌ছেন। কোথায় তোরা সবাই মিলে আমোদ-আহ্লাদ করবি, তা নয় আমার দাদুদের নিয়ে বিদেশে বিভূয়ে ঘোরা। ওরে শুন্‌ছিস্, আমার বড্ড প্রাণে লাগ্‌বে রে—আজ পঞ্চমী - আর চার-পাঁচটা দিন; এ কটা দিন থেকে যা, বিজয়ার দিন যাস্। বৌমাকে বুঝিয়ে বল্‌গে লক্ষ্মী বাপ আমার।

কমল। আমার ত তেমন আপত্তি ছিল না মা, কিন্তু ওঁর শরীরটা আজকাল মোটেই ভাল যাচ্ছে না, মাথার অসুখ লেগেই আছে—পূজোতে ঢাকের শব্দ, লোকজনের চীৎকার, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হবে তাই যেতে চাচ্ছেন। একটু স্বাস্থ্যকর স্থানে চ্যাঞ্জে গেলে যদি শরীরটা আবার সারে। বাড়ীও ঠিক করা হয়েচে—মধুপুর, অর্দ্ধেক ভাড়াও দিয়ে দিয়েছি। পুরুত মশাই বল্‌ছিলেন, কাল প্রাতে দিনও ভালো, তাই কাল যাবার কথা একরকম ঠিক ক'রে ফেলেছি কি-না?

মা। তাতে আর কি হ'লো, আমি নায়েবকে ডাকিয়ে সব বলে দিচ্ছি। বিজয়ার দিন গেলে যাত্রার দিনও দেখ্‌তে হবে না। তোরা কেউ বাড়ী থাক্‌বিনে, দাদু দিদিরা থাক্‌বে না, আমার মা-লক্ষ্মীটিও না, আমি কি মন দিয়ে মাকেই ডাক্‌তে পার্‌ব দুদণ্ড?

কমল। আমি ত তোমাকে বলেছিই মা। ওঁর যদি

আপত্তি না থাকে, আমি অমত করবো না—তুমি ডেকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখো না।

মা। বৌমা ছেলেমানুষ। তার আবার মত কি নেবো রে? কিই যে বলিস্—তোদের ভাব বোঝাই আমার দায় হয়েচে।

কমল। তা মা, এ নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমি এখন ঝগড়া করতে পারব না। শেষে আবার মাথার অসুখ বেড়ে গেলে ডাক্তার ডাকার পাল্লায় পড়বে কে? প্রাতঃকালেই আমি একটা তেমন ফ্যাসাদে পড়ি—এই তোমার ইচ্ছে নাকি?

মা। বালাই, ষাট্। তা কেন? তোরাই ত আমার সুখ-আনন্দ—সবই রে। তোদের বাদ দিয়ে কি আমার সুখ-আহ্লাদ কিছু আছে নাকি? আচ্ছা, ডাক্ দেখি বৌমাকে। (অদূরে নাতনী পটুকে লক্ষ্য করে) এই পটু, তোর মাকে একবার ডাক্ ত।

পটু। মা ত ঐ দরজার পাশেই বসে পড়ছেন ঠাক্মা। ওমা, শুনচ, ঠাক্মা ডাক্ছেন।

মা। (অগ্রসর হইয়া) বৌমা, লক্ষ্মীটি আমার, তোমরাই আমার সব—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। বল্চি কি, বাড়ীতে পূজো, মা আস্ছেন। তোমরা এ ক'টা দিন থেকে যাও, বিজয়ার দিন যেয়ো। এত দিনই রয়েছ, আর তিন-চারটা দিনে তোমার শরীর এমন বেশী কিছু খারাপ কি হবে মা? মা'র চরণে পুষ্পাঞ্জলি দাও—আশীর্বাদ নাও, সব ভাল হ'য়ে যাবে মা। কেমন রাজি?

বধূ। ওহ্ সিলী আইডিয়া, নন্সেন্স! তা আমি ত কাকেও বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি না মা, আপনার ছেলে থাকুক না বাড়ীতে। আমার দাদাকে আজই তার ক'রে দিচ্ছি—তিনি এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। তবে খোকা-খুকীকে ফেলে রেখে যেতে আমি পারব না—শেষে অসুখ-বিসুখ কিছু এই ক'দিনের অনিয়মে হ'লে আমাকেই ত ট্রাব্‌ল্ দেবে।

কমল। শুনচ, মাত্র পাঁচটা দিন থেকে গেলেই মা'র- -

মা। না বাবা, কাজ নেই, আমারই ভুল হয়েচে। যাও মা, তোমার স্বামী—তাকে আমার জন্য কেন রেখে যাবে? তোমার শরীর শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভালো হ'য়ে উঠুক, আশীর্বাদ করচি। আমার সাধ-আহ্লাদ সে ত কর্ত্তার সাথেই সব চিতায় শেষ ক'রেছি। বাবা কমল, তোমরা কালই যাও—আমি আর বাধা দেব না—আমার শ্বশুরের ভিটের পূজো আমিই করব। মা ভগবতী তোমাদের মঙ্গল করুন!

(৪) দুর্গোৎসব

(ভবিষ্যৎ—)সন—১৩৭৫

৩০শে ভাদ্র—১৩৭৫—প্রাতঃকাল। কলিকাতা ৮নং আমহার্ষ্ট রো, পত্রিকাপাঠনিরত পেলবপ্রসূন দে—বন্ধু নলিনীলোভনরে'র প্রাতর্ভ্রমণ অন্তে আগমন।

নলিনী। গুড্ মর্নিং কম্‌রেড্ পেলব ডে, "প্রগতি" পড়ছেন, খবর কি?

পেলব। গুড্ মর্নিং কম্‌রেড্ রে, খবর? ডক্টর আইভি চৌড্রির বিলটা ভোটে পাশ হয়ে গেচে।

নলিনী। গুড্ নিউজ্ ইন্‌ডিড! সেই "দুর্গোৎসব নিরোধ" বিলটা? আরে ওটা ত পাশ হবেই, হওয়া উচিতও। পড়ুন, পড়ুন কি লিখেছে।

পেলব "দৈনিক প্রগতি" পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলেন

গত কল্য বঙ্গীয় শাসনপরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা কুমারী ডক্টর আইভি চৌড্রির আনীত "দুর্গোৎসব নিরোধ" বিলের আলোচনা আরম্ভ হয়। ডক্টর চৌড্রি বিলটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন—"দুর্গোৎসবকে যাঁরা জাতীয় উৎসবরূপে স্বীকার করেন তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিশাল ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এই উৎসবের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নাই। ত্রিশ বৎসর পূর্বে দু-এক স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে এর অনুষ্ঠান হ'ত, পুরাতন পত্রিকাতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল প্রদেশে কংগ্রেস-শাসন প্রবর্তনের পর উহা ক্রমশ বঙ্গীয়তা প্রচারক জন্য প্রাদেশিক শাসকগণ কর্তৃক বন্ধ হয়। বর্তমান যুগে বাংলার সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্মগত জীবনে এমন কিছু থাকাই সঙ্গত নয় যার উদ্দেশ্য নিখিল-ভারতীয় জাতীয়তা ও ঐক্যসাধনের বিরোধী। দুর্গোৎসব বাংলা দেশের, উহা সমগ্র জাতির উৎসব কোনো দিনই ছিল না। সীমাবদ্ধ গোড়া হিন্দু ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই উহার প্রচার, সুতরাং ইহাকে আভিজাত্যেরই একটা প্রকাশ-রূপ মনে করা অসঙ্গত নয়। প্রকৃত শিক্ষিতদের মধ্যে উহা কোনো দিনই

ছিল না। কিন্তু এই উপলক্ষে হিন্দু ও অহিন্দু ভাইদের মধ্যে একত্র আহার ও মন্দির-প্রবেশ নিয়ে আর মুসলমান ভাইদের সঙ্গে বিগ্রহ বিসর্জ্জন নিয়ে এই সময় বিশেষ অজাতীয় মনোভাবের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই বিবাদের কারণটি আইন দ্বারা বন্ধ করলে বিশাল ভারতের জাতীয় মুক্তি ও সম্মেলনের বাধা দূর হবে।

দ্বিতীয়ত, এই উপলক্ষে বহু দোকানদার ও ব্যবসাদার অযুক্তরূপে দ্রব্যাদির মূল্য অল্প কয়দিনের জন্য বৃদ্ধি ক'রে বহু লোককে ন্যায়ত প্রতারিত করে। শ্রেণীগত ব্যবসায়ী-স্বার্থের মোহে সমষ্টির ও সমাজের স্বার্থহানির সুযোগ বন্ধ করা সামাজিক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

তৃতীয়ত, সব চেয়ে গুরুতর প্রয়োজনীয়তা বিলটির এই যে, দুর্গোৎসব মূর্তিটির উদ্দেশ্য রূপকের সহায়তায় বর্ণভেদ ও ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের খড়্গো শ্রমিক ও অনুন্নত শ্রেণীর পরাভব চিত্রের পূজা। সিংহ অশিক্ষিত—অনুন্নত কৃষকশ্রেণীর দ্যোতক, অসুরটি অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত বর্ণহিন্দু। দুর্গামূর্তিটি বর্ণ ও ধনিক শক্তি—নাগপাশটি আর্থিক পরবশ্যতার প্রতীক। অশিক্ষিত কৃষক ও অনুন্নত শ্রেণীর পিঠে চড়ে ও সহায়তায় সিংহ বলে বলী হ'য়ে অর্থের নাগপাশে বন্ধ ক'রে বর্ণহিন্দুর অল্প শিক্ষিত অসুর শক্তির পরাজয় হচ্ছে ধনিক ও শিক্ষিত শক্তির হস্তে। লক্ষ্মী ধনশক্তি, সরস্বতী বিদ্যাশক্তি, গণেশ গণশক্তি, কার্তিক সামরিক শক্তি—সমস্তই ধন ও আভিজাত্যের সহায়।—এই যে মূর্তি পূজার মধ্য দিয়ে সমগ্র অখণ্ড ভারতের জাতীয়তার বিরুদ্ধ মত প্রচার বাংলাতে করা হচ্ছে কয়েক শতাব্দী ধরে'—প্রত্যেক জ্ঞানী শিক্ষিত ভ্রাতাভগ্নীরই এর সমূলে উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। কুমারী ডক্টর চৌদ্রির এই উক্তি কংগ্রেস দলের প্রধান চাবুক ব্যারিস্টার প্রসূনেশমঞ্জুল সেন সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সমর্থন করেন এবং ডক্টর চৌদ্রীর এই মহৎ কার্য্য সমগ্র ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি পত্তন ও মিলনের এভেনিউ ব'লে গণ্য হবে আশা করেন। ল' মেম্বার স্যর এস্তাম্বুল কাদিরও এর যুক্তি-যুক্ততা ও সারবত্তা স্বীকার করেন। কেবল বর্ণাশ্রমীদের মধ্য হ'তে পণ্ডিত পাতঞ্জলি মুখোপাধ্যায় বিরুদ্ধে বলেন—দুর্গোৎসব বাংলার জাতীয় উৎসব—মহাযজ্ঞ—সুদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসরের জাতীয়তা এর স্মৃতিতে জড়িত। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গানের মধ্যেও এর বিশিষ্ট উল্লেখ পূর্বে ছিল, সুতরাং এর প্রতিরোধে আইন করা শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুর প্রাণে গুরুতর আঘাত দান—অত্যাচার, জাতীয়তার, বাঙালীত্বের ধ্বংসসাধন। এরূপ আইন বাংলার শাসন-পরিষদে সমর্থিত ও পাশ হ'লে বাংলার জাতীয় সর্বনাশেরই কারণ হবে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে প্রেসিডেণ্ট খান বাহাদুর স্যর এবাদতালী বিষয়টি ভোটে দেন। বিলটির স্বপক্ষে ৩১০ ও বিপক্ষে ৪০টি মাত্র ভোট গৃহীত হয়। প্রবল আনন্দধ্বনির সঙ্গে বিলটি পাশ হয়।

নলিনী। একটা আপদ গেল বল্‌তে হয়। এই ত একমাস পরেই পূজোর তত্ত্বের চোটে অস্থির হ'তে হ'ত। পূজোই গেল তার আবার তত্ত্ব। বরং সেই টাকা ক'টা দিয়ে এবার পুরী কি মধুপুর চেঞ্জে যাওয়া যাবে। ই. আই, আর. ত চমৎকার কন্‌সেসনও দিচ্ছে।

পেলব। যা বলেছ, ডক্টর চৌদ্রীকে আমি প্রাণ খুলে কংগ্রেচুলেট্ করছি। দুর্গোৎসব না ত গরীবের দুঃখোৎসব। এর তাগাদা, ওর তাগাদা। পূজো-টুজো এ যুগে যত না থাকে ততই ভাল। যত সব য়্যান্টিকোয়েটেড্ ফুলিশ্ ডগ্-ম্যাটিজম্ য়্যাণ্ড ব্লাইণ্ড হিপোক্রেসি, মানুষ পূজো করেই নিশ্বাস ফেলবার উপায় নেই, তা আবার এই সব আইডিয়েলিজম্-এর পূজা। ও সব স্যাভেজ্ বার্‌বেরিজ্‌ম্-এর অড্ ব্রিট্‌ল্ রেম্‌নেণ্ট—যত যায় ততই ভাল।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

পেন্সিল সংগ্রহের হবি

খ্যাতনামা ব্যক্তির স্বাক্ষর, ডাকটিকিট, দেশলাইয়ের খোল, প্রাচীন কালের মুদ্রা সংগ্রহ প্রভৃতিকে পুরাতন হবি বলা চলে।

সাগর পারে কেবল ছেলে মেয়ে নয়, বুড়োদের ভিতরও এ সব সংগ্রহের সখ আছে। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের কাছে এ জিনিষটী একেবারে অপরিচিত নয়।

কিন্তু ব্যবহৃত পেন্সিল সংগ্রহের হবি একেবারে নূতন। টেক্সের ফোর্টওয়ার্থে ই এইচ কাশবার্ণ নামক এই ভদ্রলোকের পেন্সিল সংগ্রহের হবি আছে। তাঁর কাছে খ্যাতনামা ব্যক্তির ব্যবহৃত পেন্সিল আছে ১,০০০,০০০। এই সংগ্রহের মধ্যে একত্রিশটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারী কার্য্যে, গভর্ণর কর্তৃক ব্যবহৃত পেন্সিলের নাম উল্লেখযোগ্য।

কতকগুলি পেন্সিলের ইতিহাসও আবার রহস্য পূর্ণ। সংগৃহীত পেন্সিলের মধ্যে একটি ডবলিউ আরভিল বেল কর্তৃক তাঁর নিজের মৃত্যু-নিদর্শন পত্রে (Death Certificate) স্বাক্ষরের নিমিত্ত ব্যবহৃত হ'য়েছিল। ঘটনাটি রহস্যপূর্ণ: মিঃ বেল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শোচনীয় পীড়ায় আক্রান্ত হন, একদিন সকাল দশটায় তাঁর জীবনের অবসান ঘটল। মৃত্যু যে নিশ্চিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। তাঁর মা পুত্রের মৃত্যু-নিদর্শন পত্রে স্বাক্ষর করলেন; সামাধি স্তম্ভ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের আদেশও দিলেন। কিন্তু এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। ঐ দিনই মিঃ বেল বেলা চার ঘটিকায় পুনর্জীবন লাভ করলেন। শয্যা-পার্শ্বে নিজের মৃত্যুনিদর্শন পত্র দেখতে পেয়ে মিঃ বেল কৌতুক উপভোগের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে সেই পত্রে নিজের নাম স্বাক্ষর করে দিলেন।

ই এইচ কাশবার্ণ

উপরে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট গার্ণার, নিউ ইয়র্কের গভর্ণর লেহেম্যান এবং টেক্সাসের ও' ডানাইলের ব্যবহৃত পেন্সিল ও হস্তাক্ষর

দীর্ঘকাল ব্যাপী পেন্সিল সংগ্রহ করে মিঃ কাশবার্ণ কয়েকটি তথ্য আবিষ্কার করেছেন। বিভিন্ন লোকের স্বভাব এবং ব্যক্তিত্ব তাদের ব্যবহৃত পেন্সিল পরীক্ষা করে তিনি বলতে পারেন।

তাঁর মতে সাধারণত মানুষ হল্‌দে রংয়ের পেন্সিল ব্যবহার করে। তাঁর সংগৃহীত একত্রিশটি বিভিন্ন গভর্ণরের ব্যবহৃত পেন্সিলের মধ্যে উনত্রিশটি হল্‌দে রংয়ের। মেয়েরা নানা রংয়ের পেন্সিল পছন্দ করে। আর তাদের ব্যবহৃত পেন্সিলগুলি প্রায় দাঁত দিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়। ছোট ছেলেমেয়েরা সকল রংয়ের পেন্সিলই চায়।

পেন্সিল সংগ্রহ ছাড়া বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির হস্তাক্ষর সংগ্রহও তাঁর এক বাতিক।

পুরাতন মোটর হর্ণ

মোটর হর্ণ এতদিন অসাবধানী পথিককে সতর্ক ক'রেই এসেছে। কিন্তু ইংলণ্ডে খরিদ্দাররা পুরাতন মোটর
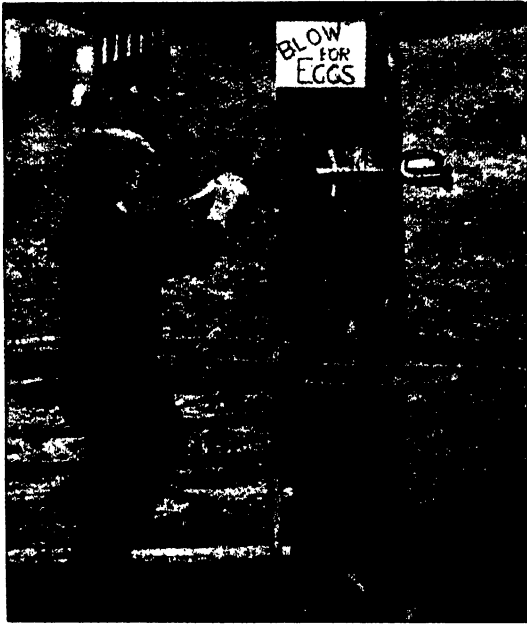
দোকানদারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পুরাতন মোটর হর্ণ

হর্ণ সাহায্যে পোল্‌ট্রি ফার্ম্মের কর্ম্মব্যস্ত দোকানদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হর্ণের আওয়াজে খরিদদার যে ডিম কিনতে এসেছে তা' দোকানদার বুঝতে পারে। সাধারণের সুবিধার জন্য পোল্‌ট্রি ফার্ম্মের নিকটস্থ বৃক্ষে পুরাতন মোটর হর্ণগুলি লাগান থাকে।

বৃক্ষের সবুজ পত্র

বৃক্ষের জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটনে বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যের জন্য ডাঃ আর্ল এস জনষ্টোন একটি নিখুঁত যন্ত্রের আবিষ্কার
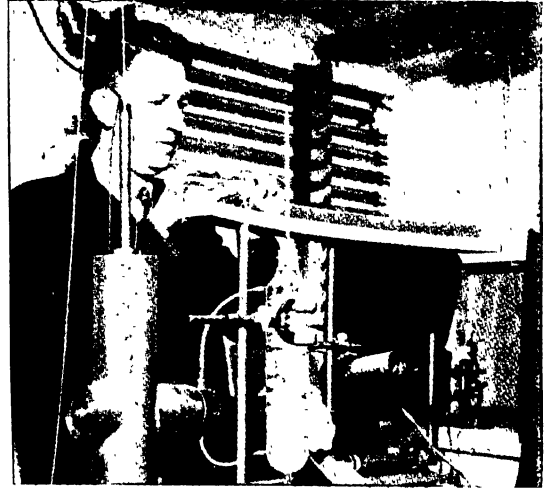
যন্ত্র দ্বারা বৃক্ষের ক্লোরোফিলের ঘনীভূতকরণ পরীক্ষা

ক'রেছেন। এই যন্ত্রটি বৃক্ষে যে ক্লোরোফিল নামক প্রাণদায়ক সবুজ দ্রব্য বিদ্যমান থাকে তার ঘনীভূতকরণ পরিমাপ করে। বৃক্ষ হ'তে নিষ্কাশিত আলোক-পোষণকারী ক্লোরোফিলের মধ্যে আলোকমালা সঞ্চালন দ্বারা উহার ঘনীভূতকরণের ওজন নিরূপণ করা হয়।

পরিপাক ক্রিয়ার মানযন্ত্র

আমাদের পাকস্থলী মধ্যস্থ খাদ্য কিরূপে পরিপাক হয়

যন্ত্র সাহায্যে পরিপাক ক্রিয়া পরীক্ষা

তার রহস্য বর্ত্তমানে ফিলাডেলফিয়া কলেজে এক যন্ত্র সাহায্যে উদ্ঘাটন করা হ'য়েছে। এই পরীক্ষার নিমিত্ত চিত্রে একজন মহিলাকে রবার টিউবের শেষাংশের Electrode গলাধঃকরণ করিয়ে খাদ্য ভক্ষণ ক'রতে দেওয়া হ'য়েছে। এই টিউব মধ্যস্থ একটি তার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকায় পাকস্থলী মধ্যে যে পরিপাক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তার বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত কলেজের জনৈক উৎসাহী ছাত্র 'antimony gastric electrode' গলাধঃকরণের জন্য প্রতিবার দু' ডলার পারিশ্রমিক পেত। তা ছাড়া বিনা মূল্যে কলেজ হোষ্টেলে তার আহারেরও ব্যবস্থা ছিল।

আমাদের দেশে এইরূপ যন্ত্রেরও বালাই নাই আর সে রকম উৎসাহী ছাত্রই বা কোথায় ?

টাইপ রাইটারে ছবি

মিঃ রোসাইরি জে বেলাঙ্গার নামে একজন বিচক্ষণ টাইপিষ্ট টাইপ রাইটারে বহু সুন্দর ছবি এঁকেছেন। প্রথমে সাদা কাগজের উপর মনোমত পেন্সিল স্কেচ্ ক'রে টাইপ রাইটারের বিভিন্ন চিহ্নে ছবিটির আউট লাইন এবং যথাযথ স্থানে সেড্ দেওয়া হয়। ছবিটি আঁকা শেষ হ'লে কিছুদূর থেকে কার্পেটের কাজ বলে সকলেই ভুল করেন।

মিঃ বেলাঙ্গার অবসর সময়ে এইরূপ ছবি এঁকে আনন্দ পান।

সামুদ্রিক পীড়ার চিকিৎসা

ডাঃ ওয়ালটার বোথবাইয়ের গবেষণায় অক্সিজেন চিকিৎসার সাহায্যে বর্ত্তমানে সামুদ্রিক পীড়া আরোগ্য হ'চ্ছে।

সামুদ্রিক পীড়ার চিকিৎসা

মিঃ রোসাইরি জি বেলাঙ্গার টাইপ রাইটারে ছবি আঁকছেন।
উপরে—তাঁর আঁকা ছবি 'জর্জ্জ ওয়াশিংটন'
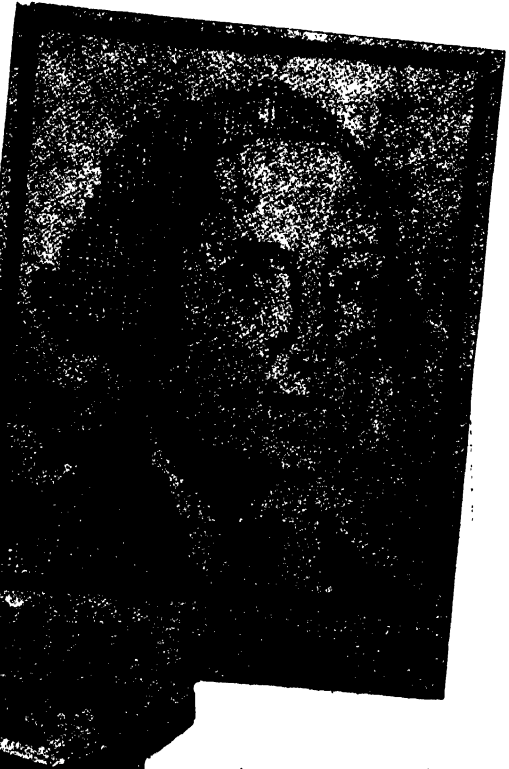
রোগের লক্ষণ আরম্ভ হ'লেই রোগীকে একটি মুখোস পরাণ হয়। মুখোসটির সম্মুখ ভাগ খোলা থাকায় রোগীকে খাদ্য গ্রহণে এবং

কথাবার্ত্তায় অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয় না। একটি রবারের নলের সাহায্যে নাকের ভিতর দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হয়।

কৃত্রিম চক্ষুর সাহায্যে দৃষ্টির ক্ষীণতা নিরীক্ষণ

যানবহুল রাস্তায় সুশৃঙ্খলভাবে যান পরিচালনের নিমিত্ত যে সকল সঙ্কেত-চিহ্নের ব্যবহার হয় সেগুলি Astigmatismএ আক্রান্ত মোটর চালকদের চোখে কিরূপ বিকৃতভাবে দৃষ্ট হয় তা ফ্রেড্‌রিক হ্যামিলটন কৃত্রিম চক্ষু সাহায্যে অনুকরণ করেছেন। এই পরীক্ষার নিমিত্ত দুটী সমান প্রোজেক্টার সাহায্যে পর্দ্দার উপর একটি মূর্ত্তিকে উপস্থিত করা হয়। ইহার পর বিশেষ কাচ সাহায্যে দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তির চক্ষু যেরূপ কোন বস্তুর প্রতিবিম্বিত রূপ সম্মুখ মস্তিষ্কে (cerebrum) সঞ্চালন দ্বারা বিকৃত করে সেইরূপভাবে কৃত্রিম উপায়ে ছবিটিকে বিকৃত করা হয়।

দৃষ্টিশক্তিহীন মোটর চালকদের মোটর চালনা কতখানি বিপদজনক তা' এই যন্ত্রটি প্রমাণ করেছে। চশমা ব্যবহার না ক'রে এই অবস্থায় সতর্ক-সঙ্কেত চিহ্নের কিয়ৎ অংশই তাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

কৃত্রিম চক্ষু সাহায্যে ক্ষীণ দৃষ্টি শক্তির দোষ অনুকরণ। ডানদিকের উপরে দৃষ্টি শক্তিহীন চোখে অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব ও নীচে সাধারণ চোখে স্পষ্ট অক্ষর

লণ্ডন সহরে যানবাহনের ভীড় অত্যধিক হওয়ায় উহারা গন্তব্য স্থানে সময়ে পৌছতে পারে না। বিলম্বে

সময় নির্দ্দেশক মোটর

পৌছানর সঠিক কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত 'লণ্ডন ইভনিং নিউজ পেপার' প্রতিদিন সহরের যে সকল স্থানে মোটর চালকদের এই দুর্ভোগ ভোগ ক'রতে হয় সেই সকল স্থানে 'সময় পরীক্ষক মোটর' প্রেরণ করে। মোটরের

চালের উপর সাধারণের সুবিধার জন্য পাশাপাশি চারিটি ঘড়ি থাকে।

মোটরের প্রথম যাত্রা স্থানের নাম ও সেই সময় এবং গন্তব্য

স্থানের নাম উল্লেখ থাকে। গন্তব্য স্থানসমূহে পৌছতে কতসময় লাগে তার ফলাফল কাগজের পরবর্ত্তী সংস্করণে মুদ্রিত হয়। জনসাধারণ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলির অসুবিধা দূরকরণের নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা!

গুটান ছাতাটি গোলক আকার ধারণ ক'রেছে
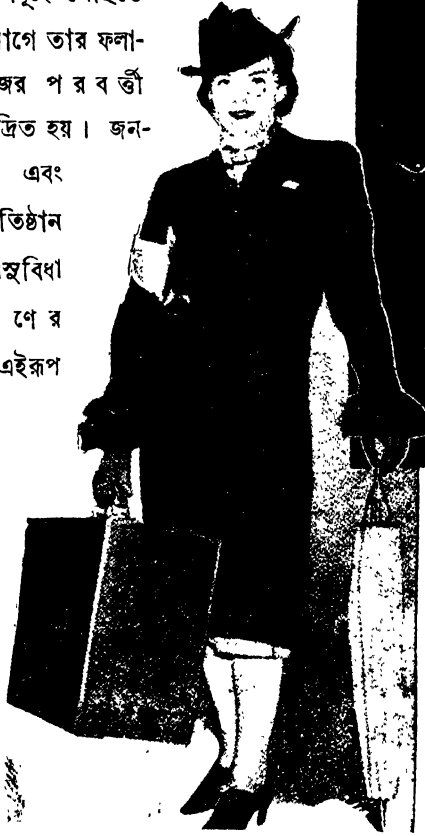
গোলকটিকে ছাতার মত গুটিয়ে স্বচ্ছন্দে হাতে রাখা হয়েছে

পৃথিবীর গোলক

সাধারণত পৃথিবীর যে গোলক (Globe) পাওয়া যায় তাকে এক স্থান থেকে অন্য যায়গায় নিয়ে যাওয়া অসুবিধাজনক। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য বর্ত্তমানে এক অভিনব গোলকের আবিষ্কার হ'য়েছে। গোলকটিকে ইচ্ছা অনুযায়ী ছাতার মত গুটিয়ে স্বচ্ছন্দে হাতে করে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় সময়ে হাতলের উপরিভাগস্থ আংঠাটী উপরদিকে ঠেলে তুললেই গোলকের আকার ধারণ করে। মজবুত কাপড়ের উপর গোলকটি মুদ্রিত। ইউরোপের ছাত্রমহলে এই অভিনব গোলকটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ ক'রেছে।

আলোক-সঞ্চারী থলে

লাল মাছের সখ অনেকেরই। বাজার থেকে লাল মাছ কিনে আনার অসুবিধাও অনেক। বেশীর ভাগ

আলোক-সঞ্চারী থলের মধ্যে লাল মাছ

সময়েই মাছগুলি মারা পড়ে। সম্প্রতি একটি থলে তৈয়ার করা হ'য়েছে। থলেটিতে মাছগুলি বহুক্ষণ জীবিত থাকে।

সেলুলয়েড জাতীয় দ্রব্য থেকে থলেটি তৈয়ার হওয়ায় থলি মধ্যস্থ মাছগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায়।

যন্ত্র সাহায্যে রাত-কাণা পরীক্ষা

রৌদ্র থেকে কোন ছায়াচিত্র গৃহে প্রবেশ ক'রলে সকলেই কিছুক্ষণের জন্য চক্ষে অস্পষ্ট দেখেন। যাঁদের এ অস্পষ্টভাব প্রায় দশ মিনিট কাল বিদ্যমান থাকে তাঁরা রাতকাণা রোগে আক্রান্ত হ'য়েছেন বুঝতে হবে। চোখের এইরূপ অবস্থার কথা রোগীও সকল সময় বুঝতে পারে না।

সম্প্রতি এক নূতন যন্ত্র সাহায্যে রাতকাণাকে পরীক্ষা করা হ'চ্ছে। রোগীকে প্রথম একটি উজ্জ্বল আলোর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রতে দেওয়া হয় পরে এক অস্পষ্ট—তীরের গতিবিধি লক্ষ্য করতে বলা হয়। রাত-কাণার কারণ 'এ' ভিটামিনের অভাব। আহারের কিছু পরিবর্ত্তনে এই রোগ হ'তে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করা যায়।

বামদিকের উজ্জ্বল আলোতে রোগীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা শেষ হ'লে ডানদিকের যন্ত্রটিতে রোগীকে একটি তীরের গতি পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়

শরতে

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

আজি প্রভাতের নির্ম্মল নীল আকাশ ভরিয়া মাধুরী হাসে—
তরুণ রবির স্বর্ণ-কিরণে নিখিল ধরণী পুলকে হাসে!
শিশির-সিক্ত শুভ্র শেফালী
যতনে সাজায় অর্ঘ্য-সমালী;
বনে উপবনে তরু ও লতায় শোভে রাশি রাশি বিকচ ফুল,
হরষে মাতিয়া আগমনী কার গাহিছে মধুর বিহগ কূল!

সুরভিত, মৃদু, স্নিগ্ধ পবন-পরশে আজিকে জুড়ায় প্রাণ,
আকাশে-বাতাসে ঝঙ্কারি' ওঠে সুমধুর কা'র বীণার তান!
নাহি বান ভরা তটিনীর বুকে,—
বেয়ে চলে মাঝি তরী মহাসুখে;
বর্ষা-ধৌত শ্যাম প্রকৃতির শোভা যেন আর নাহি রে ধরে—
গভীর দীঘির কালো জলে আজ শত শতদল নৃত্য করে!

সবুজ-সোনালী ধান্যের ভার শীর্ষ লুটায় মাঠের বুকে—
যেন কমলার স্নেহ-পারাবার উদ্বেলিয়া ওঠে শতেক মুখে!
রাঙা পায়ে কা'র পড়িতে লুটিয়া
লাল জবা কত উঠেছে ফুটিয়া;
রসের প্রবাহে, রূপে ও গন্ধে বিশ্ব আজিকে গিয়াছে ভরি,
চারিধারে এত সমারোহ ওরে কাহারে লইতে বরণ করি?

বেহিসাবী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বলরাম ভদ্র পূজার ফর্দ্দ করিতেছিল। পূজার এখনও মাসখানেক দেরী আছে। আরও একটা মাসের মাহিনা পাওয়া যাইবে। কিন্তু এক মাসের মাহিনাতে সমস্ত জিনিস কেনা সম্ভব নয় বলিয়া এই মাসের মাহিনা হইতেও সে কিছু কিছু কিনিয়া রাখিতে চায়। খরচটা দুই মাসের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে পূজার মাসের উপর চাপ কম পড়িবে। পূজার সময় জিনিসপত্রের দামও কিছু চড়িয়া যাইবে। আগে হইতে কিনিতে পারিলে সেদিক দিয়াও কিছু সস্তা হইবে।

শনিবারের সন্ধ্যায় মেসে লোক থাকে না বলিলেই হয়। সকলেই প্রায় বাড়ী যায়। বলরামের ঘরের অপর দুইটি বিছানা গুটানো। তাহারা বাড়ী গিয়াছে। দুই নম্বর ঘরে বুড়াদের পাশার আড্ডা এবং ছয় নম্বর ঘরের ছোকরাদের তাসের আড্ডাও নীরব। বলরামও প্রতি শনিবারে বাড়ী যায়। রবিবারে বাজার করিবে বলিয়াই এ শনিবারে বাড়ী যায় নাই।

গত সপ্তাহে বাড়ী হইতে একটা ফর্দ্দ সে লইয়া আসিয়াছে—মায়ের দেওয়া ফর্দ্দ। তাহাতে ছোট খোকার ভেলভেটের সুট হইতে আরম্ভ করিয়া বধূমাতার জর্জ্জেট শাড়ী পর্য্যন্ত সমস্তই আছে। কেবল নিজেরই জন্য বিশেষ কিছুর উল্লেখ ছিল না। বলরাম কলিকাতা পৌছিতে না পৌছিতে মায়ের ত্রুটি সংশোধন করিয়া গৃহিণী পত্র লিখিয়া জানাইয়াছে, মায়ের জন্য রাঙ্গাপাড় গরদের শাড়ী একখানি নিতান্তই চাই। অন্য সকল খরচ কমাইয়াও তাহা যেন আনা হয়।

বলরাম মায়ের ফর্দ্দখানি সামনে রাখিয়া নূতন একখানি ফর্দ্দ করিতেছিল :

মায়ের গরদের শাড়ী	১২৲ টাকা
গৃহিণীর জর্জ্জেট শাড়ী	১২৲ "
বাবার লংক্লথের পাঞ্জাবী	৲ "
ছোট খোকার সুট	৬৲ "

বলরাম মনে-মনে একবার টাকার অঙ্কটা যোগ দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, বাবা!

চট করিয়া আর একখানা চিরকুট লইয়া বলরাম এদিকের হিসাবটা করিতে লাগিল :

সিটভাড়া	৩৸৴০
খাওয়া	১১।৴১০
ধোপা, নাপিত ইত্যাদি	২৷৷০
তিনবার বাড়ী যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া	৭৷৷০
জলখাবার	৩৷৷০
ট্রাম	২৲
সিগারেট, পান	২৲

বলরাম এই হিসাবটা মনে-মনে যোগ দিয়া আর একবার বলিল, বাবাঃ! বেচারা ষাট টাকা মাহিনা পায়। মহামুস্কিলে পড়িল। নিজের একজোড়া জুতা না কিনিলেই নয়। বর্ষার নাম করিয়া অচল ছেঁড়া জুতাজোড়া দুই মাস চালাইয়াছে। এখন তাহা যে-কোনো মুহূর্ত্তেই সত্যাগ্রহ করিতে পারে। বলরাম হিসাব দুইটা আবার পর্য্যবেক্ষণ করিতে বসিল :

মায়ের গরদের শাড়ী কাটা চলিতেই পারে না। জীবনে কখনও তাঁহাকে একটা ভালো জিনিস দেয় নাই। পূজা-আহ্নিকেরও তাঁহার অসুবিধা হইতেছে। গৃহিণীর জর্জ্জেট শাড়ী? সর্ব্বনাশ! অত আশা দিয়া এখন জর্জ্জেট না কিনিলে তাহার কাছে মুখ দেখানো যাইবে না। অত আগে হইতে তাহাকে আশা দেওয়া ঠিক হয় নাই। একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নিজের শক্তি-সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়াই দিয়া বসিয়াছে। বলরাম এখন তাহার জন্য অনুতপ্ত। কিন্তু অনুতাপ করিয়া তো ফল হইবে না। শাড়ী তাহাকে কিনিতেই হইবে।

বাকি ছোট খোকার সুট। ছোট খোকার কথা ভাবিতেই বলরামের চিত্ত কোমল হইয়া আসিল। বৎসরে এই একটিবার দেওয়া। বাপ হইয়া সে তাহার জিনিস

বাদ দিবে কি করিয়া? মা এবং গৃহিণীই বা কি বলিবেন? সে হয় না। বরং সে নিজের মেসের খরচ কমাইবে।

কিন্তু কোন্‌টা? বলরাম স্বচ্ছন্দে তাহার বাড়ী যাতায়াতের খরচের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ছাঁটিয়া দিতে পারে। আর পারে তাহার জলখাবারের খরচের কিয়দংশ ছাঁটিয়া দিতে। কোন্‌টা বাদ দেওয়া অপেক্ষাকৃত কম ক্লেশকর বলরাম তাহাই ভাবিতে বসিল।

সাড়ে নয়টায় নাকে-মুখে দুটি গুঁজিয়া আপিসে যায়। দুইটা বাজিতে না বাজিতেই জঠরগুহায় মুষিকের নৃত্য আরম্ভ হয়। সে সময় যাহা সে খায় তাহার পরিমাণ কোনো দিনই দুই আনার অধিক নয়। তাহাও বাদ দিলে সে টিকিবে কি করিয়া? ওদিকেও মাসে চারিটি তো মাত্র রবিবার। এই চারিটি দিনও যদি গৃহসুখ ভোগ করিতে না পায় তাহা হইলে জীবনে আনন্দ বলিতে থাকে কি?

বলরাম অনেক চিন্তা করিয়া এবং অনেক অঙ্ক কষিয়া স্থির করিল, এই দুইটা মাস জলখাবারের পরিমাণ দুই আনা হইতে এক আনায় নামাইবে এবং গৃহসুখ চারিদিনের জায়গায় দুই দিন করিবে। তাহাতে মাসিক প্রায় সাত টাকা বাঁচিবে। এই ব্যবস্থা করিয়া সে রাত্রে সে অনেকটা সুস্থ হইয়া আহারাদি সমাপন করিল।

আহারান্তে বলরাম কেবল বিছানায় গা গড়াইয়াছে এমন সময় মশ্ মশ্ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে দীনবন্ধু প্রবেশ করিল।

—ঘুমিয়ে গেলেন নাকি?

—না—বলরাম চোখ মেলিয়া চাহিল।

—এঁরা সব শনিবার করতে গেছেন বোধ হয়। আপনি যাননি যে বড়?

বলরাম হাসিল।

—হুঁ। এসব ভালো কথা নয়, ভালো কথা নয়। মাইনে তো কাটা যাবেই, তা ছাড়াও বোধ হয় শাস্তি আছে। কি বলেন?

—আছেই তো।

—তবে আপনি গেলেন না কেন?

—পূজোর বাজার কিছু করতে হবে।

—পূজোর বাজার!—দীনবন্ধু চমকিয়া উঠিল—পূজো তো এখনও অনেক দেরী।

—দেরী মানে একটা মাস। কিন্তু আমাদের মতো মাছি-মারা কেরাণী দু'মাসে নইলে কুলিয়ে উঠতে পারে?

—পারে না? এত কি কিনবেন শুনি? থানকয়েক শাড়ী, আর থানকয়েক ধুতি, আর কি?

দীনবন্ধু হাসিল। তারপর গম্ভীরভাবে বলিল, পূজোর দিন একটি একটি ক'রে এগিয়ে আসছে, আর বুকের রক্ত জল হচ্ছে। এ মাসেও ত্রিশ টাকা ধার হয়েছে, তার উপর মেসের টাকা দিতে পারিনি।

—কিন্তু মাইনে তো পান দুশো টাকা। একটা বিয়ে পর্য্যন্ত করেননি। কি হয় টাকাগুলোর?

—শ্রাদ্ধ, মানে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। খেতাম সিগারেট, বিড়ি ধরেছি। বোধ করি কৌপীনবন্ত না হ'লে আর ভাগ্যবন্ত হতে পারছি না।

—কি করেন?

—কি করি? শুনুন বলি: দুটি বোনের বিয়ে দিয়েছি। সেই যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার করেছিলাম, তার জের এখনও মেটেনি। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর সেই ঋণের টাকা কেটে নিয়ে আফিস থেকে দেয় একশো কুড়ি টাকা তিন আনা। তার মধ্যে বাড়ীতে পাঠাতে হয়, একটি ভাই এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে তাকে পাঠাতে হয়। বোনেদের ছোট-খাটো দাবী লেগেই আছে। এর ওপর, একান্নবর্ত্তী পরিবার—খুড়তুতো, জাঠতুতো ভাই-বোনও আছে। মাইনে পাওয়া মাত্রই নেই।

বলরাম বিরক্তভাবে বলিল, কিন্তু আপনি যা পারবেন, তাই তো করবেন। তার বেশী···

দীনবন্ধু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা নেই তাই বলছেন। এর মধ্যে আর পারা-পারি নেই, পারতেই হবে। শুনুন তবে: আমার জ্যাঠামশাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। গোটা পরিবার বাসুকীর মতো তিনিই ঘাড়ে ক'রে ছিলেন। অনেক বয়সে তাঁর ছেলে হয়। আমিই থাকতাম তাঁর কাছে কাছে।

—তিনি নিশ্চয় অনেক টাকা রেখে গেছেন?

—টাকা? কি ক'রে রাখবেন? যেমনভাবে তিনি নিজে

থাকতেন, দেশে যাঁরা থাকতেন তাঁদেরও ঠিক তেমনিভাবে রেখেছিলেন। যদি জ্যাঠাইমার জন্মে একখানা গহনা গড়িয়েছেন তো সব বৌ-এর জন্যেই সেই গহনা গড়িয়েছেন।

—তাঁর আর ভাইরা কিছু করতেন না?

—কি করতে করবেন? ব'সে খেতে পেলে কে পরের দোরে খাটতে চায় বলুন।

—এ ভারি অন্যায়!

—অন্যায়। জ্যাঠাই-মা এ নিয়ে কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু আমার জ্যাঠামশায়ের মুখে কোনো দিন হাসি ছাড়া কিছু দেখিনি। এই পুজোয় তাঁর যে কত খরচ হ'ত আমি ভাবতেও পারি না। তখন তিনি দেশে যেতেন। বড় দালানে আমরা খেতে বসতাম। তিনি বসতেন দুই সারের মাথায়, মধ্যেখানে, যেখান থেকে দুই সারের প্রত্যেককে দেখা যায়। অত বড় দালানের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত লম্বা সার। আমাদের ছেলেদের প্রত্যেকের গায়ে এক রঙের জামা, এক পাড়ের কাপড়। মেয়েরা যাঁরা পরিবেশন করতেন তাঁদেরও তাই। জ্যাঠামশাই চেয়ে চেয়ে দেখতেন, আর আনন্দে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। তাঁর সে মুখ আমি এখনও কল্পনা করতে পারি।

দীনবন্ধু চোখ বন্ধ করিয়া বোধ করি তাহাই কল্পনা করিতে লাগিল।

বলরাম একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু তাঁর পক্ষে যা আনন্দ ছিল আপনার পক্ষে তা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—দাঁড়িয়েছেই তো। গেল বারে হ'ল কি জানেন?—দীনবন্ধু একটা ঢোঁক গিলিল,—হিসেব ক'রে দেখলাম, সকলের একখানা ক'রে ন্যাকড়া কিনে দিতে গেলেও দুশো টাকা লাগে। আমি একশো টাকা ইন্সিওরে পাঠিয়ে দিয়ে এইখানেই ব'সে রইলাম। যা খুশি কর তোমরা।

বলিয়া এমন এক আশ্চর্য্য ভঙ্গিতে হাসিল যে, বলরামের বুকের ভিতর পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া দীনবন্ধু বলিল, আপনি বলবেন কাপুরুষতা। কিন্তু বাড়ীর সবাই কাপড় পেল না এ কি চোখে দেখা যায়?

বলরাম কিছুই বলিল না। দীনবন্ধু চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চোখে ঘুম নামিল না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার সেই আশ্চর্য্য হাসি মনে পড়ে আর পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ বিস্বাদ হইয়া যায়।

কাপড় চোপড় কিনিতে এ মেসে হরিহরের জোড়া নাই। কোন্ মিলের কত নম্বরের কাপড় কোথায় এক পয়সা সস্তায় পাওয়া যায়, তাহা পর্য্যন্ত সে বলিয়া দিতে পারে। দোকানে গিয়া যখন সে কাপড়ের ফরমাস করে, দোকানদার বুঝিতে পারে ইহার কাছে চালাকি চলিবে না। তাহাকে না লইয়া এ মেসের কেহ কাপড় কিনিতে যায় না।

বলরামের ইচ্ছা ছিল, কাপড় কেনার হাঙ্গামটা সকাল বেলাতেই চুকাইয়া লইবে। কিন্তু কি একটা কারণে সকালে হরিহরের সময় হইল না। স্থির হইল, খাওয়া-দাওয়ার পরে দুপুরে দুজনে বাহির হইবে। ক'খানাই বা কাপড়! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হইয়া যাইবে।

স্নান করিবার সময় হরিহর উঁকি দিয়া দেখিল, বলরাম কি একখানা পত্র মনোযোগের সঙ্গে দেখিতেছে।

হরিহর বলিল, স্নান করতে যাবেন না?

বলরাম প্রথমটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর যেন চমক ভাঙ্গিয়া বলিল, হাঁ চলুন।

হরিহর দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, কিছু দুঃসংবাদ আছে নাকি?

বলরাম হাসিয়া বলিল, দুঃসংবাদ? সে তো থাকবেই।

—অসুখ-বিসুখ?

—না। পুজোর ফর্দ্দের ক্রোড়পত্র।

মুখে একটা ফুৎকার দিয়া হরিহর বলিল, ও! ও অনেক আসবে মশাই। চাপা দিয়ে রাখুন।

—চাপা দিয়ে রাখব কি মশাই! ছোট বোনের ফর্দ্দ! বছর দুই হ'ল বিয়ে হয়েছে।

—কি লিখছে?

—লিখছে, এবারে যেন পূজার তত্ত্ব গেলবারের চেয়ে ভালো হয়। ধুতিটা আরও দামী হওয়া উচিত। গেল বারে মটকার পাঞ্জাবী দেওয়া হয়নি। সেটা যেন এবারে দেওয়া হয়। সে শুনেছে, তার বৌদির জন্যে জর্জ্জেট কেনা হচ্ছে। সেজন্যে নিজের দাবী আর চড়ায়নি। শুধু লিখেছে যে, তার বৌদির জন্যে যে রকম শাড়ী কেনা হবে, তাকেও তাই দিলেই হবে।

—তাহ'লেই তো গেছেন!

—হাঁ। মুস্কিল হয়েছে কি জানেন। এই বোনটি সব চেয়ে ছোট, কাজেই মায়ের আদরের। তার উপর

এর বিয়েতে পাত্র পক্ষ নগদ একটি পয়সাও নেয়নি। তাদের অবস্থাও ভালো। গেল বারের তত্ত্বে যে খুব বেশী খরচ করতে পারিনি তাও সত্যি। জানেনই তো ছোট খোকার আগ্মাশয়ে কি ভোগালে! তাই ভাবছি···

—কই দেখি আপনার ফর্দ্দ?

বলরাম পকেট থেকে ফর্দ্দটা বাহির করিয়া দিল।

হরিহর ফর্দ্দ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল: করেছেন কি মশাই! এ তো পোষাকী। এর পরে আটপৌরেও আছে নিশ্চয়!

—আছে বই কি।

—আর বোন নেই?

বলরাম হাসিল। বলিল, একটি দিদি আছেন। তাঁর আবার দুঃখ শুনুন। জামাইবাবু ভালো চাকরী করতেন, রিট্রেঞ্চমেণ্টে সেটি গেছে। এখন গ্রামের ইস্কুলে মাস্টারী করেন। যখন চাকরী ছিল, আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছেন এবং যথেষ্ট দিয়েছেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী মানুষ। এবং অত বড় আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আর কখনও দেখিনি। আজকে তাঁর দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু কোনো দিন একটি ছুঁচের ফরমাসও করেননি। না তিনি, না দিদি।

—গেল বারে তাঁদের কিছু দেননি?

কুণ্ঠিতভাবে বলরাম বলিল, সে না দেওয়ারই মধ্যে। শুধু দিদির জন্যে একখানা আটপৌরে শাড়ী পাঠিয়েছিলাম। তাতেই কত আশীর্ব্বাদ যে করেছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই।

হরিহর চিন্তিতভাবে বলিল, হুঁ।

—কোত্থেকে দোব? এই ক'টি টাকা তো মাইনে। দিতে কি আর ইচ্ছে হয় না?

হরিহর আবার বলিল, হুঁ।

—কি ভাবছেন?

—ভাবছি, বাজার করা আজ থাক বলরাবাবু। খেয়ে-দেয়ে এসে দু'জনে মিলে একটা ফর্দ্দ করা যাবে। তারপরে ধীরে সুস্থে কিনলেই হবে। কি বলেন?

বলরাম শশব্যস্তে বলিল, না না, টাকা রাখা চলবে না। কিনতে এখন থেকেই হবে। নইলে হাতে টাকা থাকবে না। সে আর একটা বিপদ হবে।

হরিহর হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, খেয়ে-দেয়ে আসি তো। তারপরে দেখা যাবে।

হরিহর যে ফর্দ্দ করিয়া দিল তাহা দেখিয়া বলরামের বাজার করিবার আনন্দ আর রহিল না। ফর্দ্দের মধ্যে সিল্কের একটা টুকরা পর্য্যন্ত নাই। সমস্ত মিলের ধুতি ও শাড়ী, ধোলাই করিলে তাহা নাকি রূপার পাতের মতো ঝক ঝক করিবে। ছেলেমেয়েদের জামাও সমস্ত আটপৌরে। ওদের গায়ে নাকি আবার সিল্ক দেয়! দুই দিনে ধূলায়-বালিতে আর জলে ন্যাকড়া বানাইয়া তুলিবে। তার চেয়ে মোটা পুরু কাপড়ের জামা দিলে ঠাসিয়া মারিয়া প'রিলেও রাজার হালে একটা বৎসর চলিয়া যাইবে। ষাট টাকার মধ্যে সমস্ত পরিবারের মায় দিদি-জামাইবাবু এবং তাঁহাদের ছেলেমেয়েগুলির পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া হরিহর দিগ্বিজয়ীর মতো সোজা হইয়া বসিল।

বলিল, ষাট টাকা মাহিনার কেরানীর এর চেয়ে বেশী বাজার করা উচিত নয়। করা ক্রিমিনাল, বুঝলেন?

বলরাম বুঝিল, কিন্তু তাহার মনটা প্রসন্ন হইল না। হরিহর ছা-পোষা গৃহস্থ; পাকা লোক। তাঁহার যুক্তি দুর্ভেদ্য। বলরামের পক্ষে পূজার বাজারে ষাট টাকার বেশী খরচ করা অন্যায়, হয়তো ক্রিমিনালই। কিন্তু সংসারে হিসাব করিয়া চলাটাই কি একমাত্র সত্য পদার্থ? বেহিসাবী চলার আনন্দও কি একেবারে উপেক্ষার বস্তু?

দুই বৎসর ধরিয়া বলরাম তাহার স্ত্রীকে রীতিমত ভোগা দিয়া আসিতেছে, একখানা জর্জ্জেট দিবে। কিন্তু বলরাম মনে মনে জানে, তাহা ভোগা নয়, তাহার মধ্যে চাতুরীর বিন্দুমাত্রও ছিল না। দিতে পারিলে তাহার নিজের চেয়ে বেশী কৃতার্থ আর কেহই বোধ করিত না। এই অক্ষমতার গ্লানি আর একজনের না-পাওয়ার দুঃখের চেয়ে যে কত বেশী, তাহাও একমাত্র তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন।

বলরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

হরিহর চমকিয়া বলিল, কি হ'ল?

—কিছুই না। ভাবছি, মানুষ কত অসহায়! যত বড় তার সাধ, সাধ্য এবং আয়ু তার তুলনায় কতটুকু?

বলরাম হরিহরের তৈরী ফর্দ্দটার উপর চোখ বুলাইতে লাগিল। নিখুঁৎ ফর্দ্দ। অভিজ্ঞ হরিহর কোথাও ত্রুটি রাখে নাই। মূল্য যাহা ফেলিয়াছে, বলরাম জানে, তাহারও একচুল এদিক-ওদিক হইবে না। কিন্তু মায়ের গরদের শাড়ী? ছোটখোকার ভেলভেটের সুট? গৃহিণীর

জর্জেট ? হরিহর ফর্দ্দের মধ্যে এমন অনেক নূতন জিনিস ফেলিয়াছে, যেমন লাল-নীল দেশলাই, তারাকাঠি, তাহা বলরামের মাথায় আসিতই না। কিন্তু ছোট বোনটি যে মুখ ফুটিয়া আবদার করিয়াছে, তাহার ব্যবস্থা কোথায় ?

হরিহর পাটোয়ারী মানুষ। এত কথা বুঝিল না। কেবল ইহাই বুঝিল যে, এত কষ্ট এবং এত হিসাব করিয়া যে ফর্দ্দ সে তৈরী করিল তাহাতে বলরাম প্রসন্ন হয় নাই। সে বলরামকে তাহার ভাগ্যের উপর ফেলিয়া দিয়া বিরক্ত-ভাবেই চলিয়া আসিল। যে মানুষ নিজের ভালো বুঝিবে না, তাহাকে সে কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। সে বিড়ম্বনা সহ্য করিবার পাত্র হরিহর নয়।

দিন যেন পাখায় ভর দিয়া উড়িতে উড়িতে মহালয়ায় আসিয়া পৌঁছিল। হরিহর বলরামকে সাহায্য করে নাই। সেও চাহে নাই। নিজের চেষ্টাতেই সে একটি দু'টি করিয়া অনেকগুলি প্যাকেট জড় করিয়াছে। কাপড় সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তাহার নাই। কিন্তু জ্ঞান সে সঞ্চয় করিল কিছু শো-কেসের সাজান কাপড়-জামা দেখিয়া, কিছু সঞ্চরণশীল নর-নারী দেখিয়া।

সে মাসাধিক কাল হইতেই জলখাবার খাওয়া বন্ধ করিয়াছে। সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি ধরিয়াছে। ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া জুতাজোড়ার আর কিছু নাই। কেহ সেদিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বলে, পূজায় জুতার দাম যা চড়িয়াছে, পূজা কাটিয়া না গেলে উহার আর অবসর মিলিবে না। সময়াভাবে দাড়ি পর্য্যন্ত নিয়মিত কামাইতে পারে না।

গত দুই বৎসর তাহাদের আপিস বোনাস দেয় নাই। এবারে শোনা যাইতেছে, এক মাসের মাহিনা বোনাস দিবে। সংবাদটা শোনামাত্র বলরাম দুই হাত তুলিয়া বড় সাহেবকে এবং সেই সঙ্গে ভগবানকেও অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল এ সংবাদের পর তাহাও আর অবশিষ্ট রহিল না। দুই বেলা সে জনস্রোতের ঢেউএ-ঢেউএ ঘুরিয়া বেড়ায় আর টুকিটাকি যাহা পারে কেনে। ছোট-ছোট প্যাকেটে এবং বড়-বড় বাণ্ডিলে তাহার সঙ্কীর্ণ মলিন কক্ষের একটি কোণ বোঝাই হইয়া উঠিল।

চতুর্থীর দিন মেসের প্রাপ্যের তাগাদা আসিল। বলরামের মন তখন সোনালি আলোয়, শানাইএর মিঠা সুরে পালকের মতো উড়িতেছিল। যেন একটা ধাক্কা খাইয়া মাটিতে নামিল। যে কয়টা টাকা তাহার কাছে অবশিষ্ট আছে, তাহাতে তাহার যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া আর পূজার কয়দিনের বাড়ীর খরচ কোনো রকমে চলিতে পারে।

বলরাম ম্যানেজারকে বহু অনুরোধ করিল, টাকাটা সে পূজার পরে দিবে। কিন্তু ম্যানেজার কোনো অনুরোধই শুনিল না। ঠাকুর-চাকরকে মাহিনা দিতে হইবে, একখানা করিয়া কাপড়ও দিতে হইবে। যাহারা ছুটি পাইবে না, মেসেই থাকিবে, তাহাদের জন্যও ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে। অন্য সময়ে তাহাকে অনুরোধ করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এখন অনুরোধ শুনিবার উপায় নাই।

বলরাম রাগ করিয়াই তাহাকে টাকাটা দিয়া দিল। দুই-একটা প্রসাধনের দ্রব্য তখনও তাহার কিনিবার ছিল। সে চুলায় যাক, কয়েক বাক্স লাল-নীল কাঠির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহা আর হইবার নয়। বলরাম হিসাব করিয়া দেখিল ট্রেন ভাড়া বাদ দিয়া তাহার হাতে আর একটি টাকা মাত্র রহিল। তাহাতে পূজার কয়দিনের সংসার-খরচের কি হইবে, তাহাই এক চিন্তার বিষয়।

বলরাম যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে।

এক মাসের উর্দ্ধকাল সে বাড়ী আসে নাই। কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথ হইতে পল্লীর এই সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথে পা দিয়া তাহার মনে হইল, নীচু-নীচু খড়ের ঘরগুলি বুঝি এখনই তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িবে। স্যাকরার দোকানে তখনও ঠুক্‌ঠুক্‌ করিয়া কাজ চলিতেছিল। গুড়ের ভিয়ানের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। বাঁশবনে জোনাকীর মেলা বসিয়াছে। চৌধুরীদের পূজার দালানের সামনে একদল ছেলে হৈ হৈ করিয়া খেলা করিতেছিল। ভিতরে মালাকার নিবিষ্ট মনে ঠাকুর সাজাইতেছিল। গোটা চার-পাঁচ কুলীর মাথায় মোট চাপাইয়া বলরাম নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কলরব উঠিল। বাবা আসিলেন, মা আসিলেন, ছেলেরা আসিল, পাড়া-প্রতিবেশী একটি-দুইটি করিয়া জুটিতে লাগিল, নিতান্ত নিস্পৃহভাবে গৃহিণীও একবার মোট-ঘাটের স্তূপের পাশ দিয়া চলিবার সময় গুণ্ঠনের ফাঁক দিয়া অপাঙ্গে সেদিকে চাহিয়া গেল। কেবল বলরামের মুখে হাসি নাই।

—আহা! ট্রেনে বড় কষ্ট হয়েছে। যা পূজোর ভিড়!

বলরাম কথা কহিল না, শুধু কপালের ঘাম মুছিল।

—কত কাপড় এনেছিস? অত আনতে হ'ত না।

বলরাম বুঝিল, মা ভিতরে ভিতরে গৌরবে ও আনন্দে কতখানি পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। গৃহিণীর চোখে এক সময়ে চোখ পড়িতেই দেখিল, কাপড়ের আনন্দে তাহারও চোখ ঝকমক করিতেছে।

—কই গো, ছেলে কি কাপড় আনলে দেখাও।

বলরামের বুক পকেটে মনিব্যাগের মধ্যে বেতন ও বোনা-সের ধ্বংসের শেষ একটিমাত্র রজত মুদ্রা থাকিয়া থাকিয়া কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করিতেছে। পূজার কয়দিন কি করিয়া চলিবে সেই দুশ্চিন্তা কালো ধোঁয়ার মতো মাথার মধ্যে তাল পাকাইতেছে।

তবু তাহাকে উঠিতে হইল। সকলের সসম্ভ্রম ও সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে এক একটী করিয়া পোঁটলা খুলিয়া দেখাইতে হইল, মায়ের টকটকে লাল পাড় গরদের শাড়ী, গৃহিণী ও ছোট বোনের জর্জ্জেট, ছোট খোকার ভেলভেটের সুট, দিদির চমৎকার দেশী শাড়ী, তাহার ছেলেমেয়েদের বিবিধ বর্ণের জামা-কাপড়, শান্তিপুরের ধুতি, আরও কত কি…

বলরাম উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, সমস্ত মুখ লেপিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

রূপায়ৎ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাঠক পাঠিকে মনে যেন শুধু রয়
ওমর খৈয়ম তর্জ্জমা এটা নয়।
টক্কা সাগর-কাঁকড়ার মত
কামড়াতে মোরে আসে
মোরে ভয় করে, আমি ভীত তার ত্রাসে।
বাঁকা বাঁকা তার দাড়া ভীতিময়
বসুধার বসু আঁকড়িয়া রয়,
দূর হতে আমি সম্ভ্রমে নমি
যারা তারে ভালবাসে।

২

কীর্ত্তি তাহার বিশ্ব জুড়িয়া
অসীম্ শক্তিশালী,
মেকীতে খাঁটির গুরুত্ব দেয় ঢালি।
তাহার রূপালী তার গিল্‌টিতে,
চিনি মোড়া তার বিষ পিল্‌টীতে,
ফাঁপা মস্তকে জড়োয়ার তাজ
মিথ্যার ফুলডালি।

৩

রস-রসিকের ভাবের সায়রে
ভবের বাঁধানো ঘাটে,
এই কাঁকড়াই সূতা ও বড়শী কাটে।
দ্বিপ্‌ত ইহার পায় না নাগাল,
করে না ক কিছু করে উল্‌চাল,
শুধু তোড়জোড়ে দিবস ফুরায়
রবি ঘুরে বসে পাটে।

৪

নেত্র জুড়ানো এই যে উগ্র
কাঁকড়ার কাট্‌লেট,
পাতালপুরীর নরাধিপ চায় ভেট।
ভক্তি এবং দিলে অনুরাগে,
শ্যামার পূজায় লাগিলেও লাগে,
নিরামিষাশীর পাতায় পড়িলে
করে তার মাথা হেঁট।

সর্পের শ্রবণশক্তি

ডাক্তার বারজেস্ বার্নেট্

Victoria Memorial Park
September 3rd., 1938.

Dear Dr. Kundu,

I have extended my letter about the hearing power of snakes into what I hope will oneday be part of a chapter on snakes in a Zoo Book I have had on hand for some time ....here it is.

I doubt whether, with the war news, any editor will want to publish it at the present time, but please make any use of it you like. I must call it "first serial rights," however, so that I can use it myself later.

* * ! ! *

Yours sincerely,
Sd/ Burgess Barnett.

সাপেরা শুনতে পায় কি-না, এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে 'হাঁ' বা 'না' বলা যায় না। যে সব স্পন্দনকে আমরা শব্দ নামে অভিহিত করি, তার কতকগুলি সাপেরা গ্রহণ করতে পারে কয়েকটি বিশেষ অবস্থায়। ঐ শব্দগ্রহণ যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় এ মনে করা অসঙ্গত নয়।

আমি দেখেছি সাপেরা বায়ুবাহিত শব্দ (air-borne sound) অথবা দু'শো পঞ্চাশের অধিক স্পন্দনবেগসম্পন্ন পরিবাহিত শব্দ (conducted sound) শুনতে পায় না। আমি দুটি ক্ষুদ্র নির্বিষ সাপকে একটি পিয়ানোর মাথার উপর রেখে পিয়ানো বাজাতে সুরু করলাম। যখন উঁচু পর্দায় আঙুল চলতে লাগল তখন সাপেরা বাজনা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হ'ল না, কিন্তু যেই আমি সি পর্দার নীচে বাজাতে সুরু করলাম অমনি সাপ দুটির মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। সাপ দুটি নড়াচড়া না ক'রে এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল, আর মাথা উঁচু ক'রে চারিদিকে যেন অনুসন্ধিৎসুভাবে তাকাতে লাগল ও জিভটা ঘন ঘন বার করতে লাগল। আমার মনে হয়—যদিও এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই—খাদের পর্দায় উচ্চতর শব্দে সাপেরা অস্বস্তি বোধ করে এবং মৃদু গম্ভীর শব্দে আনন্দিত হয়। শেষে আমি পিয়ানোর দু-তিনটে চাবি একসঙ্গে টিপলাম এবং একটি সাপ আস্তে আস্তে এগিয়ে পিয়ানোর ভিতরকার তারের মধ্যে ঢুকে পড়ল—যেন সে ঐ শব্দের কারণ অনুসন্ধান করতে উৎসুক! সেই সাপটিকে তারের ভিতর থেকে ছাড়িয়ে আনতে মিনিট কয়েক লাগল।

সাপ দুটিকে যখন কার্পেট-ঢাকা মেঝের উপর সরিয়ে রাখা হ'ল তখন আমার মনে হ'ল যে, পিয়ানোর শব্দ তারা আর মোটেই শুনতে পাচ্ছে না। দরজাটা জোরে বন্ধ করলে বা মেঝেতে জোরে পায়ের শব্দ হ'লে তারা চমকে ওঠে বটে, কিন্তু পিয়ানোর বাজনার দিকে তাদের আর খেয়াল নেই। বেহালার সাহায্যে অনুরূপ কয়েকটি পরীক্ষার পর আমি বুঝতে পারলাম, আমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত নয়। মৃদুস্পন্দনবিশিষ্ট শব্দই সাপেরা শুনতে পায় এবং সেটা সম্ভব হয় যখন শব্দ ও সাপের মধ্যে একটি সুবিস্তৃত পরিবহন-ক্ষেত্র থাকে।

একবার এক বহু-বিজ্ঞাপিত বেতার সেটের প্রচার-বিভাগের কর্তা লণ্ডনের চিড়িয়াখানার সাপের ঘরে একটি চমকপ্রদ কৌতুক (stunt) দেখাবার অনুমতি চাইলেন। ঘরের সিমেন্ট-করা মেঝের উপর একটি সুদৃশ্য বড় রেডিও গ্রামোফোন বসানো হ'ল, সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানরা আমন্ত্রিত হ'লেন এবং যখন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল তখন কয়েকটি কোব্‌রা এবং ছোট ছোট পাইথনকে সেটের কাছে রেখে এলাম। বেতার সেটওয়ালাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের যন্ত্রের উৎকর্ষ দেখানো—বাজনা শুনিয়ে সাপদের মুগ্ধ ক'রে। প্রথম বাজানো হ'ল একটি কন্‌সার্ট—তারপর একজন ভারতীয় সাপুড়ের বাঁশীর রেকর্ড বাজতে সুরু করল। কোব্‌রা বা পাইথন বাঁশীর সুরে মোটেই আকৃষ্ট হ'ল না। মনে হ'ল যেন বাঁশীর শব্দ তাদের কানে আদৌ পৌঁছচ্ছে না—খানিক পরে যখন একটি সাপকে উত্যক্ত ক'রে ফণা ধরতে বাধ্য করা হ'ল তখনই কোনরকমে একখানি ফটো তোলা হ'ল সাধারণের সন্দেহ দূর করবার জন্য। পরে যখন ঐ সাপগুলিকে একটি একটি ক'রে বেতার সেটের উপর রাখা হল, তখন কিন্তু কয়েকটি বাজনার দিকে আকৃষ্ট হ'ল।

সাপ ধরবার সময় প্রায়ই আমি লক্ষ্য করেছি, খালি পায়ে গাইড্ সাপের যত নিকটে যেতে পারে, ভারী বুট পায়ে দিয়ে আমি তত নিকটে যেতে পারি না—অথচ সে বেশ চেঁচিয়ে আমায় ডাক দিতে পারে সাপকে সচকিত না ক'রে।

কিন্তু এটা কি ঠিক যে স্পন্দন (vibrations) সাপেরা শুনতে পায়, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কোন স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব ক'রে না ?

সম্পূর্ণ না হ'লেও প্রায় তাই বটে। সাপের স্পর্শানুভূতি ও যাতনাবোধ খুব কম এবং এ-কথা বলার কোন আবশ্যকতা নেই যে, শব্দতরঙ্গ (sound-waves) সে স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করে, যখন বেশ বোঝা যায় তার দেহের অভ্যন্তরে এমন শ্রবণযন্ত্র (auditory mechanism) আছে যার শক্তি নিতান্ত কম নয়। এটা সত্য যে, বাইরে তার কোন কান নেই—স্পন্দন তার দেহের ভিতর দিয়ে তার ভিতরকার কানে (inner ear) গিয়ে পৌছয় আর তার দেহটা হচ্ছে একটি স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন মাধ্যম (elastic medium) বিশেষ—যা উচ্চতর শব্দগ্রামকে মন্দীভূত করে।

সাপের পূর্ব্বপুরুষদের অবশ্য দেহের বহির্ভাগেই শ্রবণেন্দ্রিয় ছিল এবং তারা শুনতে পেত অন্যান্য প্রাণীর মতো। যখন ও যে কারণে তারা পা হারিয়েছিল ঠিক সেই সময় ও সেই কারণেই তারা কান হারায়। অবস্থার চাপে তাদের মাটির নীচে আশ্রয় নিতে হয়—তাতে পা তাদের অনাবশ্যক বোঝা হয়ে ওঠে আর কানের গহ্বর অনবরত বুজে যায় বালি ও মাটিতে। সাপের চোখের উপরে যে একটা স্বচ্ছ আবরণ আছে তাও তার চোখকে ধূলা মাটি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতির দান।

এ সমস্ত অনুমান মাত্র নয়। পেরুর মরুময় প্রদেশে ঐরকম অসুবিধার ফলে গিরগিটির দেহেও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিলাম। তার কানের গহ্বরের সামনে একটি ক্ষুদ্র দন্তবিশিষ্ট ঝালর (denticulated fringe) আছে এবং তার চোখের পাতায় ছোট ছোট স্বচ্ছ ছিদ্র আছে যাতে ক'রে চোখ বুজলেও সে ঐ ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে খানিকটা দেখতে পায়। শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য সে নরম বালির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং যতক্ষণ না শত্রু প্রস্থান করে ততক্ষণ সে লুকিয়ে থাকে বালির ভিতরেই। আত্মরক্ষার এই কৌশল অবলম্বন করার ফলে তার চোখ ও কান বালুকণায় নষ্ট হয়ে যেত যদি প্রকৃতি তাকে সাহায্য না করতো ঐ দুটি ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করতে। ওদের অন্তর্ধানের এই কৌশল জানবার আগে অনেক সময় আমি লক্ষ্য করেছি, ওরা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু যখন এই কৌশল আমি টের পেলাম তখন গিরগিটির পায়ের ছাপ যেখানে মিলিয়ে গেছে সেইখানকার খানিকটা বালি তুলে ফেলে অনায়াসে ঐ ক্ষুদ্র যাদুকরকে ধরে ফেলেছি।

মাঝে মাঝে এমন কথাও অনেককে বলতে শুনেছি যে, সাপেরা শোনে জিভের সাহায্যে। কিন্তু এ-কথার তাৎপর্য্য তেমন বুঝি না। হয়তো একথার অর্থ এই যে, শব্দতরঙ্গ তাদের মস্তিষ্কে পৌছয় স্বাদগ্রাহী স্নায়ুর (nerves of taste) ভিতর দিয়ে—কান অথবা শ্রাবণী স্নায়ুর (auditory nerves) সাহায্যে নয়। অথবা তাঁরা হয়তো বলতে চান, সাপের জিভ সূক্ষ্মস্পর্শানুভূতিসম্পন্ন ষ্টেথোস্কোপের মতো। কিন্তু আমার মনে হয়, সাপের জিভ শব্দ-পরিবহনের (sound conduction) বিশেষ উপযোগী নয় এবং যে-বোধ কানের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু জিভের দ্বারাই পরিবাহিত তাকে 'শ্রবণ' আখ্যা দেওয়া চলে না।

তথাপি জিভ সাপের কী প্রয়োজনে আসে—এ এ-কটি সমস্যা এবং এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

প্রথমে সাপের খাঁচা থেকে তিন-চার গজ দূরে, আমি গোপনে ভ্যালেরিয়ান তৈলের একটি বোতলের ছিপি খুললাম এবং ফল কি হয় দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক মিনিটের মধ্যেই সাপটি সজাগ হয়ে উঠল এবং জিভ বার করতে সুরু করল। নতুন খাঁচায় সাপকে স্থানান্তরিত করলে সে অনবরত জিভ দিয়ে সব কিছু স্পর্শ করে তার নতুন পরিবেষ্টনীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে, কিন্তু এখন সে কিছুই স্পর্শ করলে না। নাসিকা তাকে যে খবর দিয়েছে সে হয়তো সেই খবরটা ভালো ক'রে জানতে চায় জিভের সাহায্যে।

এর পর আমি সাপের জিভ পাতলা কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত ক'রে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, ওর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্গ্যান্ আছে যা দেখতে স্বাদ-কোরকের (taste-buds) মতো। ঐগুলি আমি দেখালাম আমার

এক সহকর্ম্মীকে যিনি আমার চেয়ে দক্ষ হিস্টোলজিষ্ট (সূক্ষ্মশারীরদর্শী)।

সহকর্ম্মী বললেন, "হাঁ, ঐগুলি স্বাদ-কোরকই বটে।"

আমি তখন তাঁকে সঙ্গে ক'রে সাপের ঘরে এনে ভোজনরত একটি সাপকে দেখালাম। সাপটি খাচ্ছে বটে, কিন্তু জিভ সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে একটি খাপের মধ্যে—খাবার সময় যাতে কোন অনিষ্ট না হয় জিভের। খাদ্যের সঙ্গে জিভের সংস্পর্শ ঘটছে না মোটেই এবং মনে হচ্ছে খাওয়ার তৃপ্তি পাওয়া দূরের কথা, সাপটি যেন একটা নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করছে।

স্বাদ-কোরক তবে সাপের কী প্রয়োজনে আসে—মনে মনে ভাবি।

সাপের ঘরে আটটি সাপের বাচ্ছা ছিল। তারা নিয়মিত আহার করত স্বচ্ছন্দে। আমি তাদের নিয়ে এলাম আমার পরীক্ষাগারে। চারটির মুখ আস্তে আস্তে ফাঁক ক'রে কুইনিন অভ সালফেট ছিটিয়ে দিলাম, তারপর আমি আটটি সাপকেই তাদের সাপ্তাহিক খাদ্য—ব্যাঙ—পরিবেশন করলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যেকটি সাপই আহার সমাপ্ত করলে। কুইনিনের তিক্ত আস্বাদ—যা চারটি সাপের উপলব্ধি করা উচিত ছিল—তাদের ক্ষুধা নষ্ট করতে পারেনি—এমন কি, তারা যে ঐ স্বাদটি পেয়েছিল তারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এক সপ্তাহ পরে, আমি পুনরায় ঐ পরীক্ষাটি করলাম, কিন্তু এবার কুইনিন না দিয়ে কয়েক ফোঁটা দারুচিনির জল (cinnamon water) প্রয়োগ করলাম। এবার যে সাপগুলিকে দারুচিনির জল দেওয়া হয় নি (এদের দূরে পৃথক একটি খাঁচায় রাখা হয়েছিল) তারা পূর্ব্বের মতোই আহার করতে লাগল, কিন্তু যাদের মুখে দারুচিনির জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা আর ব্যাঙ খেলে না—সারাদিন উপবাসী থাকার পরও।

কুইনিন—যার তিক্ত আস্বাদ আছে, কিন্তু গন্ধ নেই—সাপের অনুভূতির বাইরে, কিন্তু দারুচিনি—যার আস্বাদ ও গন্ধ দুই-ই আছে—সাপের আহারের স্পৃহাকে নষ্ট করে।

আর একবার একটি পরীক্ষায় সাপের ঘ্রাণশক্তির পরিচয় পেয়েছিলাম। চিড়িয়াখানার বড় বড় সাপগুলি যাতে তাদের ঘরে সিমেণ্ট-করা মেঝের উপরেই বাচ্ছা পাড়তে পারে সেজন্যে আমি শুক্‌নো ব্র্যাকেন (এক জাতীয় ফার্ন) মেঝের উপর ছড়িয়ে দিতে বললাম। ব্র্যাকেন দেখতে খড়ের চেয়ে সুন্দর, কিন্তু এর একটা গন্ধ আছে, যদিও তা বিরক্তিকর নয়। এই নতুন গন্ধটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ার পর কোনো সাপই ছয় সপ্তাহ আহার করলে না।

সাপের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আমরা যা জেনেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই: মাটিতে অবস্থানকালে তাদের দৃষ্টির সীমা সঙ্কীর্ণ, কারণ সামান্য একগাছি তৃণও তাদের দৃষ্টি ব্যাহত করে এবং খোলস ছাড়ার আগে কয়েকটি দিন তারা মোটেই দেখতে পায় না। তাদের শ্রবণশক্তি পরিবাহিত শব্দের একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ—অবশ্য মানুষের কান যে স্তরের শব্দ শুনতে পায় তার চেয়ে নিম্নস্তরের শব্দ তারা শুনতে পায় না এটা যদি ধরে নেওয়া যায়। স্বাদ-গ্রহণের শক্তি তাদের আছে কি-না জানা যায় না, তবে থাকলেও ঐ শক্তির ব্যবহার তারা সম্ভবত করে না। তাদের স্পর্শবোধ এত কম যে, তাদের গায়ে ইঁদুর কামড়ালেও তারা বুঝতে পারে না। তাদের একমাত্র বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় যার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি এবং যার শক্তি কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, সেটি হচ্ছে তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

এটা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, সাপেদের অন্য কোনো উপায় আছে যার সাহায্যে তারা বহির্জগতের পরিচয় পেতে পারে—কারণ এত কম শক্তিসামর্থ্য নিয়ে কোন জীবই বাঁচতে পারে না। যদি তাদের এমন কোন ইন্দ্রিয় থাকে যা আমাদের নেই, তবে তা কোন দিনই আমরা হয়তো বুঝতে পারব না—অন্ধ যেমন বুঝতে পারে না রঙের বৈচিত্র্য। তবু যখন আমরা সাপকে জিভ বার করতে দেখি তখন এটা বেশ বুঝতে পারি যে, সে নিশ্চয়ই আমাদের ভেঙচি কাটছে না জিভ বার ক'রে, অশিষ্ট ছেলেরা যেমন করে। এ চিন্তা স্বতই আমাদের মনে জাগে, ঐ জিভের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গোপন শক্তির রহস্য লুকানো আছে।

কখনো কখনো মনে প্রশ্ন জাগে, ওদের কি তাড়িত শক্তিসম্পন্ন কোন ইন্দ্রিয় (electrical sense) আছে?

সেটা কি জিভের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দুটিকে কেন্দ্রস্থল (focus) রূপে ব্যবহার ক'রে অনুভূত বস্তুর দূরত্ব নির্ণয়ে সাপকে সাহায্য করে ?

কিন্তু এখানেই আমার নিরস্ত হওয়া উচিত। আশা করি, একদিন হয় তো আমার চেয়ে শক্তিশালী কোনো বৈজ্ঞানিক ঐ প্রশ্নের সমাধান করবেন।*

* অনুবাদক—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়ের সর্প প্রবন্ধের সর্পের শ্রবণশক্তি সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ হয়। প্রতিবাদের উত্তরে প্রবন্ধলেখক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের লিখিত মত উল্লেখ করিয়া দেখান যে সর্প বুঝিতে পারে। বর্ম্মার হারকোট বাট্‌লার ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডাক্তার কামাখ্যাপ্রসাদ কুণ্ডু বিলাতের বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ ডাক্তার বারজেস্ বার্নেটকে সর্প বধির কি-না ঐ বিষয়ে তাঁহার মতামত জানাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। ডাক্তার কুণ্ডুরও ধারণা সর্পের বহির্ভাগে কোন শ্রবণযন্ত্র না থাকিলেও ইহাদের bony ear আছে। ডাক্তার বার্নেটের লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। সর্প সম্বন্ধে ডাক্তার বার্নেটের অভিজ্ঞতা বিশ্ববিখ্যাত।

—সম্পাদক

বৈরাগ্য

শ্রীকালিদাস রায়

দেশে দেশে যুগে যুগে করেছেন ঘোষণা প্রচার
বৈরাগ্যের মহাবাণী,—বলেছেন 'সংসার অসার',
যত ধর্ম্মগুরুগণ। সন্ন্যাসের মহিমা কীর্ত্তন,
করিয়াছে কত শাস্ত্র। কত জন সমগ্র জীবন
বৈরাগ্যসাধনে রত। সাহিত্যেরও শেষ অর্থখানি
মহাপ্রস্থানের পথে ক'রে যায় বৈরাগ্যের বাণী ;—
শুনিয়াছি বহুবার। জরা আর্ত্তি ব্যাধির চীৎকার,
মৃত্যুর হুঙ্কার-ধ্বনি—শোকার্ত্তের ক্ষুব্ধ হাহাকার
শুনিয়াছি। মর্ম্মে কই পাইনি ত বৈরাগ্যের সাড়া!
সংসার-সংগ্রামে ভীরু, শক্তিহীন পলাতক যারা
তারাই বৈরাগী হয়,—বার বার হইয়াছে মনে।

দেহে মনে শক্তি যত ক'মে আসে আজি ক্ষণে ক্ষণে
মনে হয়—মিথ্যা নয়, ভ্রান্ত নয় বৈরাগ্যের বাণী,
বৈরাগ্য সহজ ধর্ম্ম। আজি তারে মর্ম্মে মর্ম্মে জানি,
মানি তারে সত্য বলি'। বাহিরের কোন উদ্দীপনা,
প্রেরণা দেয়নি বলি' নহে তাহা অলীক কল্পনা।
যে উৎসে জনমে রাগ সে উৎসেই বিরাগও জনমে,
সর্ব্ব রস শান্তরসে পরিণত হয় ক্রমে ক্রমে
উষ্ণ বাষ্পে পরিণত গ্রীষ্মে যথা বাসন্ত স্বপন,
ইহাই জীবন-ধর্ম্ম। দাবানলে দগ্ধ যবে বন
বিহঙ্গ ত্যজিয়া নীড় উড়ে যায় দূর নীলাকাশে,
পাথারে ঘরের চাল নৌকা হ'য়ে দরিয়ায় ভাসে,
একান্ত স্বভাবধর্ম্মে। দিন শেষ হ'য়ে আসে যত
দেখি এ মনের রঙ হইয়াছে গেরুয়ার মত,
দেহে মনে মিল নাই। মন মোর মাগিছে বিদায়
দেহ বলে 'শিরে তুমি সাধ ক'রে নিয়েছ কি দায়
ভেবেছ তা? সে দায়িত্ব ফেলে আজ কোথা
যাবে চ'লে?'
মনে হয় এ সংসারে নিতান্তই খেলা পাতি ব'লে,
তবু তাহাতেই মাতি—মাঝে মাঝে পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
স্বপ্ন ব'লে মনে হয় জীবনের উৎসব-উল্লাস।
টানিয়া চলিতে হয় নিত্য কর্ম্মপদ্ধতির ধারা,
ভুল হয় পদে পদে, লুকাইয়া তপ্ত অশ্রুধারা
সকলি সাধিতে হয়, পদে পদে ঘটে অপরাধ,
তুচ্ছ নিয়ে মারামারি, কাড়াকাড়ি বাদ-বিসংবাদ
দ্বেষ, দম্ভ, স্তুতি, নিন্দা—এ সকলে আজি হাসি পায়,
সকলের কাছে মন কৃতাঞ্জলি যেন ক্ষমা চায়।

দেহ জীর্ণ হ'য়ে আসে তবু আজো সে ঘোর সংসারী,
গোপনে গোপনে মন গুটাইছে তার পাততাড়ি।
কড়িতে ভরিতে থলি দেহ মোর শ্রমে মুহ্যমান,
নিভৃতে পারের কড়ি মন মোর করিছে সন্ধান।

মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

অপ্রিয় হইলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ইংরেজী-শিক্ষিতগণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়কে কোন দিনই শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করেন নাই। অবশ্য ইহা সত্য যে, কোন কোন বিশিষ্ট ইংরেজী-শিক্ষিতও পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার অকুণ্ঠ-অকৃপণ ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন কিন্তু তাহা সর্ব্বক্ষেত্রেই যেমন ব্যতিক্রম আছে—সেই ব্যতিক্রম মাত্র। এই কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, এখানে আমরা 'বামুনপণ্ডিত'-এর কথা বলিতেছি না, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত"এর কথাই বলিতেছি।

আমরা যে ইউরোপকে ডাকিয়া বলি—তোমরা যখন অসভ্য বর্ব্বর অবস্থায় বনে বনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতে, তখন আমরা এই হিন্দুজাতি সভ্যতার আলোকে দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়াছিলাম; প্রমাণ—আমাদের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও জ্যোতিষ; প্রমাণ—আমাদের ষড়্‌দর্শন, ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র, কাব্য ও নাটক। কিন্তু আমাদের সভ্যতার প্রমাণ-নিদর্শনস্বরূপ এই সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিবার সময় আমরা কি একবারও মনে করি, এই গ্রন্থসমুদয় কাহাদের চিন্তায় ও সাধনায় রচিত হইয়াছে? শুধু রচনা নহে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অগণিত বৈদেশিক আক্রমণ এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের মাঝেও কাহারা উহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—কাহারা উহার চর্চ্চা রাখিয়াছিল বলিয়া আজ আমরা উহার অর্থ অনুধাবন করিতে সমর্থ হইতেছি—জগৎসভায় আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিয়াছি!

আমেরিকার চিকাগো নগরীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ধর্ম্ম মহাসভায় অনাহুত বিবেকানন্দ যেদিন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মেঘ-মন্দ্রিত কণ্ঠে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা বিঘোষণা করিলেন এবং যাহা শুনিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিনিধিগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল—"It is foolish to send missioneries in India." বিবেকানন্দের সেই বাণী যে ভারতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরই জ্ঞান-তপস্যাজাত বেদান্ত-দর্শনের মূল সূত্র মাত্র, একথা কি আমরা একবারও ভাবিয়া দেখিব না—এই ঐতিহাসিক সত্যকে একেবারে অস্বীকার করিব!

অন্য কিছুর জন্য না হউক—সহস্র সহস্র বৎসরের পরপদানত জাতি আমরা, যাঁহাদের সাধনার উত্তরাধিকার-সূত্রে আজ বিশ্বের বিবুধ-সমাজে আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছি, অন্তত তাহার জন্যও প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার স্রষ্টা, ধারক ও বাহক এই "ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত"সম্প্রদায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ যদি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি তবে তাহা যে একটুও অহেতুকী হইবে না—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এখানে আজ আমরা যে মহাপুরুষের প্রসঙ্গ আলোচনা করিব, সেই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম বর্ত্তমানযুগে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার একজন শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক, প্রকৃত "ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত" ছিলেন।

১২৫৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ-ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শিবরাত্রির দিন জন্ম বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রকে সম্যক জানিতে হইলে যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়ের আবশ্যক; কারণ মানব-জীবনে বংশের প্রভাব (influence of heredity) বিজ্ঞান-স্বীকৃত অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত।

ভট্টপল্লীর যে বশিষ্ঠ-বংশে শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ অন্যূন চারিশত বর্ষ ধরিয়া তাঁহাদের আচারনিষ্ঠাপূত ব্রাহ্মণ্যে, অত্যুজ্জ্বল পাণ্ডিত্য গৌরবে, অসাধারণ ত্যাগ, নির্লোভতা ও তেজস্বিতায় সমগ্র বঙ্গের হিন্দু-সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া আছেন। এই বংশের সর্ব্বতোমুখী অসামান্যতায় আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া প্রায় অর্দ্ধবঙ্গের ব্রাহ্মণপরিবার (১)

(১) ভট্টপল্লীর পাশ্চাত্য-বৈদিকশ্রেণীর এই বশিষ্ঠ-ব্রাহ্মণবংশ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী।

ভূস্বামী ও রাজকুল ইঁহাদিগকে আপন দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া আসিতেছেন। অদ্যাবধি এই বংশে কুশাগ্রবুদ্ধি নৈয়ায়িক, ব্যাকরণবিদ্, আলঙ্কারিক, কবি ও শাব্দিক, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, তন্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণ, জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ বহু মণীষী এবং কাব্য, নাটক ও ধর্ম্মসংগ্রহাদি গ্রন্থের প্রণেতা সংস্কৃতভাষাব্যুৎপন্ন কেশরী বহুকোবিদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষার অপ্রতিদ্বন্দী প্রাচীনতম কেন্দ্র নবদ্বীপকেও একদা এই ভট্টপল্লীর পাণ্ডিত্য-গৌরবদীপ্তির নিকট নিষ্প্রভ হইতে হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ বিদুষী রমাবাঈ সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া একদিন এই ভট্টপল্লীতেই শাস্ত্রপ্রসঙ্গের সদুত্তর পাইয়াছিলেন। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ৺দয়ানন্দ সরস্বতী যখন দিগ্বিজয়ী হইয়া পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রবিচারে সর্ব্বত্র অপ্রতিভ করিতেছিলেন, তখন একদিন বর্দ্ধমান-মহারাজাহূত বিচার-সভায় এই বংশের অন্যতম উজ্জ্বলরত্ন ৺তারাচরণ তর্করত্নই (২) বিজয় পতাকা লইয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শুধু বর্দ্ধমানে নহে, চুঁচুড়ায় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ঐ দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত আবার একবার সাকার নিরাকার বিষয় লইয়া বিচার হয়, সেখানেও এই তারাচরণই জয়ী হয়েন; দয়ানন্দ নিরাকার সমর্থন করিতে পারেন নাই। ভট্টপল্লী হইতে এই বংশের প্রায় পঁচাত্তর জন সংস্কৃতব্যুৎপন্নকেশরী উক্ত বিচার-সভায় তারাচরণের সহিত গমন করেন।

শিবচন্দ্রের পিতা রঘুমণি বিদ্যাভূষণ একজন আজন্মশুদ্ধ পূতচরিত্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জ্ঞানে কখন কোনও অন্যায় করেন নাই ও মিথ্যা বলেন নাই বলিয়া ইঁহার এমনই সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল যে, তাঁহার চান্দ্রায়ণ করাইবার সময় সংকল্পবাক্যে "জ্ঞানকৃত পাপক্ষয়কাম" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের খুল্লতাত জয়রাম ন্যায়ভূষণ একজন দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ভট্টপল্লীতে ব্যাকরণের চতুষ্পাঠি বিরল হওয়ায় স্বজনগণের অনুরোধে এই তীক্ষ্ণধী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের অধ্যাপনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রেও ইঁহার বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মণীষিগণ এই ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট আসিয়াই ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়ন করিতেন। শিবচন্দ্রেরও প্রথম পাঠারম্ভ হয় তাঁহার খুল্লতাত জয়রাম ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠিতে। উত্তরকালে শিবচন্দ্র যে একজন ভারত বিখ্যাত নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন তাহার পূর্ব্বাভাষ তাঁহার ছাত্রজীবনের সূচনাতেই সুপরিব্যক্ত হয়।

বাল্যকাল হইতেই ইঁহার অত্যদ্ভুত মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি অধ্যাপকবর্গকে বিস্মিত ও আকৃষ্ট করে। অতুলনীয় দার্শনিক প্রতিভার সহিত ইঁহার আজন্মসিদ্ধ কবি-প্রতিভা ছিল। মাত্র ষোড়ষ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে "পাণ্ডবচরিত" নামক ইনি এক অপূর্ব্ব সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। পরবর্ত্তীকালে এই "পাণ্ডবচরিত" নাটক মুদ্রিত হয় ও তাহা বিবুধ-সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

মাত্র আট-নয় বৎসর বয়স হইতেই মুখে মুখে সুললিত সংস্কৃত শ্লোক রচনায় ইঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা সুধিজনের বিস্ময় সঞ্চার করে। কথিত আছে শিবচন্দ্রের বয়স যখন দশ-এগার বৎসর তখন তিনি রথযাত্রা উপলক্ষে পিতার সহিত সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবনে উপস্থিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে প্রণামানন্তর শিবচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারেন যে, ছেলেটি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র এবং বিশেষ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আদেশে বালক শিবচন্দ্র সেইখানে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই মুখে মুখে কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনান—ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব্ব বিস্ময় অনুভব করেন ও শিবচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ছেলেটিকে তিনি কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে মনস্থ করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিবচন্দ্রকে ন্যায়শাস্ত্র পড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রের নীরন্ধ্র যুক্তির চাপে ছেলেটির কবি-প্রতিভা স্বাভাবিক বিকাশলাভে বঞ্চিত হইবে। যাহা হউক, উত্তরকালে যদিও শিবচন্দ্র তাঁহার সমগ্র জীবন ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তথাপি অবসর সময়ে তিনি যে কবি-

---

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পিতা।

প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-জনিত অনবসর তাঁহার কাব্য-প্রণয়ন-পথের অন্তরায় হইলেও অন্তর্নিহিত তাঁহার কবি-প্রতিভাকে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া শিবচন্দ্র তাঁহার পিতা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং পরে এই বংশেরই উজ্জ্বলতম রত্ন ভারতজয়ী পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর আপন গৃহ-সংলগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী খুলিয়া শিবচন্দ্র অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া দেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় নানা দিগ্‌দেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠিতে সমবেত হইতে লাগিল। শিবচন্দ্রও বিপুল উদ্যমে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তিনি, এতগুলি ছাত্রের ভরণপোষণের চিন্তা তাঁহাকে একেবারে আকুল করিয়া তুলিল। এই সময় তাঁহার এমন অনেক দিন গিয়াছে যে গৃহে তণ্ডুলের কণামাত্র নাই, তখন নিরুপায় শিবচন্দ্র পণ্ডিত-বিদায়ের পিতল কাঁসার তৈজস বিক্রয় করিয়া ছাত্রগণের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে এমনও হইত যে, ছাত্রগণের আহারের পর কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না, তখন সস্ত্রীক শিবচন্দ্র ভাতের ফেন আহার করিয়াই দিন যাপন করিয়াছেন।

তাঁহার এইরূপ চরম দুরবস্থার দিনে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে বলেন যে, মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের পদ খালি হইয়াছে—আপনি আবেদন করুন। শিবচন্দ্র চাকুরী গ্রহণে তাঁহার অসম্মতি জানান; কিন্তু ন্যায়রত্নের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে তিনি দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিত আবেদন পত্রের নিম্নে আপন নাম স্বাক্ষর করেন। কয়েক দিন পরে আবেদন-পত্র যখন নামঞ্জুর হইয়া ফিরিয়া আসিল তখন শিবচন্দ্র অত্যন্ত উল্লসিত চিত্তে গ্রামের সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"যাক্ বাঁচিয়া গিয়াছি—আমাকে চাকুরী করিতে হইবে না।" চাকুরী গ্রহণ তাঁহার নিকট এতই ক্ষোভের কারণ ছিল। অবশ্য কয়েক বৎসর পরে তাঁহার চরমতম দুর্দ্দিনে ঐ মূলাজোড় কলেজেরই কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ঐ অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন ও জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শিবচন্দ্র সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে তাঁহার মত ছাত্র-সম্পদ-সৌভাগ্য এই দেশের কোনও নৈয়ায়িক অধ্যাপকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। এখনও বাঙ্গলা দেশে ন্যায়ের এমন চতুষ্পাঠী নাই বলিলেই চলে, যেখানে তাঁহার ছাত্র বা ছাত্রধারা ন্যায়ের অধ্যাপনায় ব্রতী নহেন। শুধু বঙ্গদেশেই নহে, সুদূর উড়িষ্যা, মিথিলা, বৃন্দাবন ও পাঞ্জাব হইতেও বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশ্বনাথ ঝা, উমেশ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যই যে তাঁহার ছাত্র-সম্পদ-সৌভাগ্যকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল তাহা নহে—অত কৃতী ছাত্রের অধ্যাপকতা-সৌভাগ্যও অপর কোন নৈয়ায়িকের জীবনে দেখা যায় নাই। তাঁহার কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে—পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ও বর্ত্তমানে এই বংশের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ৺গুরুচরণ তর্কদর্শন-তীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীবীরেশ্বর তর্কতীর্থ, ভট্টপল্লীর ৺রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমন্মথনাথ পঞ্চতীর্থ, কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য ও শ্রীতারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ, কাশী কুইন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীচন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ, নবদ্বীপ পাকাটোলের অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত তর্কতীর্থ, নোয়াখালীর রাজপণ্ডিত শ্রীনিশি-মোহন তর্কতীর্থ, দৌলতপুর কলেজের আচার্য্য শ্রীযামিনীকান্ত তর্কতীর্থ, রাজসাহী সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীরমেশ তর্কতীর্থ, ঝরিয়ার রাজপণ্ডিত শ্রীসূর্য্যনাথ তর্কতীর্থ, ত্রিপুরার শ্রীনবীন তর্কতীর্থ, কুমিল্লার শ্রীকৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রীহট্ট রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীঅখিল-চন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রীচারুকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজগণ—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, শ্রীসতীশচন্দ্র তর্কতীর্থ ও শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থের নামোল্লেখই যথেষ্ট।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দিগ্বিজয়ী বহু পণ্ডিত শিবচন্দ্রের সহিত শাস্ত্রবিচার করিতে আসিতেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশকেই শিবচন্দ্রের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই বাঙ্গালী মণীষীর অতুলনীয় চরিত্র-মাধুর্য্য সর্ব্বপ্রদেশের পণ্ডিতগণের অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। শিবচন্দ্র "কুসুমাঞ্জলী"র এক নবীন টীকা রচনা করেন এবং তাহা এই বংশেরই অন্যতম উজ্জ্বলরত্ন ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রী সম্পাদিত "বিদ্যোদয়" নামক আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইনি বহু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা রক্ষার যত্ন থাকিলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক হইতে পারিত। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই পণ্ডিত কুলতিলককে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

বঙ্গগৌরব স্যার আশুতোষ, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শিবচন্দ্রকে দেবতুল্য সম্মান করিতেন।

এই অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতিও প্রবল অনুরাগ ছিল। আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ কাব্যরত্ন মহাশয় তাঁহার সমগ্র অবসর সময় শিবচন্দ্রের সহিত নানা শাস্ত্র-বিষয়ের আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি মাঝে মাঝে পিতৃদেবকে বলিতেন, "হরিচরণ, আজ বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি উপন্যাস তুমি পাঠ কর, আমি শুনি। আবার কখনও কখনও তিনি গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরব', 'বুদ্ধদেব-চরিত' প্রভৃতি নাটকও ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন।

পারিবারিক জীবনে শিবচন্দ্রকে বহু শোক সহ্য করিতে হইয়াছে। যখন তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইবে তখন তাঁহার চির-সুখ-দুঃখভাগিনী সাধ্বী পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। সর্ব্বসমেত তাঁহার একুশটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি মাত্র দুই পুত্র ও একটি কন্যাকে জীবিত দেখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-পণ্ডিত এবং দ্বিতীয়টি পণ্ডিত শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ বি-টি বর্ত্তমানে কলিকাতা হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন।

জীবনের অর্দ্ধেককাল চরমতম দারিদ্র্যের সহিত অবিরত সংগ্রাম এবং সমগ্র জীবন ধরিয়া অগণিত ও অসহনীয় বিয়োগ-ব্যথার মাঝেও শিবচন্দ্রকে কেহ কোন দিন ধৈর্য্যহীন অথবা কর্ত্তব্যচ্যুত হইতে দেখে নাই। মৃত্যুর কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে উন্মাদগ্রস্ত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যখন আত্মহত্যা করে, তখন সপ্ততিপর বৃদ্ধ এই শিবচন্দ্র যে অপূর্ব্ব ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তুলনাবিহীন। একদিন প্রত্যূষে উক্ত উন্মাদগ্রস্ত পুত্রটির কোনও সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহার কতিপয় ছাত্র ও আত্মীয় তাহার সন্ধান করিতে গিয়া নিকটবর্ত্তী রেল-লাইনের উপর তাহার বহু খণ্ডিত মৃতদেহ শোচনীয় অবস্থায় পতিত দেখিতে পায়। পুত্রের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত শিবচন্দ্র তখন উৎকণ্ঠার সহিত ছাত্র ও আত্মীয়গণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাহারা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পিতার নিকট সন্তানের এই শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ তাহারা কেমন করিয়া জানায়! শিবচন্দ্র তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে সকলেই নীরব নতমস্তকে দণ্ডায়মান। তখন ন্যায়াধীশ এই মহাপ্রাজ্ঞ ছাত্র ও আত্মীয়গণের দিকে চাহিয়া ধীর অবিকম্পিত কণ্ঠস্বরে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করেন—

"দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং
যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তে চলাঃ।"

অর্থাৎ:—বৃক্ষ এবং পর্ব্বত উভয়েই যদি বায়ুপ্রবাহে আন্দোলিত হয়—তবে উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য রহিল!

ইহার পর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন—"আমার ধৈর্য্য সম্বন্ধে তোমরা কেন আস্থাহীন হইতেছ? পর্ব্বত সদৃশই আমার সহনশীলতা। আঘাত যত গুরুই হউক না কেন, সাধারণ জনের মত আমি যদি তাহাতে বিচলিত হই, তবে এই যে আজীবন আমি শাস্ত্রচর্চ্চা করিলাম তাহার কি মূল্য রহিল? আমার নিমিত্ত তোমাদের কোনও চিন্তার কারণ নাই—যাও, তোমরা তাহার যথাবিহিত সৎকারের ব্যবস্থা কর।" অপূর্ব্ব বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হইয়া সকলে এই লোকোত্তর-চরিত মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল।

এক দিকে অতুল্য পাণ্ডিত্য যেমন ইঁহাকে বিবুধ-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি উদার ও মধুর প্রকৃতি গুণে ইনি আপামরসাধারণের হৃদয়ে পরমাত্মীয়ের

আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরের দুঃখকষ্টে ইনি একেবারে গলিয়া পড়িতেন। কত ঋণগ্রস্তের বাস্তুভিটা যে ইনি রক্ষা করিয়াছেন, কত কন্যাদায়, মাতৃদায় ও পিতৃদায়গ্রস্তকে যে ইনি দায়-মুক্ত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিজে ধনী ছিলেন না বটে, কিন্তু ধনিগণ, ভূস্বামী ও রাজন্যবর্গ ইহাঁকে দেবতুল্য সম্মান করিতেন এবং ইঁহার অনুরোধ তাঁহাদিগের নিকট দেব-নির্দ্দেশের মতই ছিল। তাই যখনই শিবচন্দ্র দুর্গতদের সাহায্য করিবার অনুরোধ জানাইয়া তাঁহাদিগকে পত্র দিয়াছেন, তখনই তাঁহারা বিনা দ্বিধায় তাহা দেবাদেশের মতই পালন করিয়াছেন।

শিবচন্দ্র আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতিদিন স্নান-আহ্নিক ও গৃহ-দেবতার পূজা সমাপনান্তে তিনি অধ্যাপনায় বসিতেন। সাংসারিক-জীবনে সামান্য আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুর্গোৎসব আরম্ভ করেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন প্রতি বৎসরই সমারোহের সহিত তিনি দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন। স্বজন প্রতিপালন ও অতিথিকে নিত্য অন্নদান তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। কোন দিন কোনও অতিথি তাঁহার গৃহ হইতে অভুক্ত ফিরিয়াছে, এরূপ শুনা যায় না।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২রা পৌষ এই নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ লোকান্তরিত হন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে ন্যায়-প্রচারের যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে—তাহা অপূরণীয়।

চিরসুন্দর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি এচ্-ডি

নয়নের পটে হৃদয়ের তটে
ফেলেছ ফেলেছ তোমার ছায়া,
প্রভাত কাননে বিহগ কূজনে
শ্রবণে ঢেলেছ সুরের মায়া।
সে মায়া উষার গগনে গগনে
জ্বেলেছে রূপের রঙিন শিখা,
কিশলয় দলে মালতীর ফুলে
রেখে যায় তার সবুজ লিখা;
ধানের শীষের সোনার বসনে
লীলায় দোলায় আঁচলখানি
মন্দ পবন ছন্দ চরণে
দূরের গন্ধ আনিছে টানি।
যে দিকে আমার নয়ন ফিরাই
সাগরে ভূধরে কানন মাঝে,
আমারে হেরিতে তোমারে নেহারি
মরি যে আপনি গভীর লাজে।
ভরিয়া রেখেছ হৃদয় আমার
মধুর তোমার মোহন রূপে,
তোমার পরশে হরষ ঢেলেছ
জ্বেলেছ গন্ধ পুণ্য ধূপে।
মোর অজানায় হৃদয় রেখায়
যে রূপ এঁকেছে তোমার তুলি,
দিন যামিনীর পাত্র ভরিয়া
যে সুধা ঢেলেছ, কেমনে ভুলি।
তব আননের ছন্দ রচেছে
নিয়ত যে মধু মঞ্জু শ্লোক,
তাই ত গড়েছে হৃদি কন্দরে
সুন্দরে ভরা অরূপ লোক।
তাইত সে ছবি বাহিরে আসিয়া
ঝলকি তোমার আননে হাসে,
সুন্দর বলি যা হেরি বাহিরে
সে আছে ভিতরে তোমার পাশে
আমার সকল অন্তর ভরি,
জড়ায়ে রয়েছ নিয়ত তুমি,
তারি এক কণা ছড়ায়ে রয়েছে
ভূধর সাগর কানন ভূমি।

খেতাব-বিভ্রাট

শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এম-বি-ই

কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে শহর হইতে বহু দূরে যাদবপুর গ্রামে তিনকড়িবাবু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় গণৎকার পঞ্চানন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এ-ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে রাজা-উজির একটা কিছু না হইয়া যায় না। সে আজ প্রায় চার যুগ আগের কথা, তখন পিসিমা জীবিতা। ঠাকুর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ বাণীর উপর তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল।

পিতৃমাতৃহীন এই ক্ষণজন্মা শিশুটিকে মানুষ করিবার ভার পড়িয়াছিল পিসিমার উপর। ভবিষ্যৎ বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় বালক তিনকড়িকে পরিপক্ক বয়স পর্য্যন্ত যাবতীয় মাদুলি, গাছের শিকড় এবং ফুল ভূষিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইত। বিভিন্ন মাদুলির ক্ষমতা দৈবদুর্বিপাকের উপর বিভিন্নভাবে কার্য্য করে, সুতরাং কাহাকেও অবহেলা করিবার উপায় ছিল না। কোনটিকে প্রাতে ধৌত করিলেই যথেষ্ট হইত, কোনটি তুলসীতলায় তিনবার স্পর্শ করাইলেই চলিত, কোনটিকে সামনে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করার ব্যবস্থা ছিল।

কাপ্তেন সাহেব কুচকাওয়াজে যেভাবে প্যারেড দেখেন পিসিমা প্রত্যহ প্রাতে তিনকড়িকে সামনে দাঁড় করাইয়া উক্ত সাধনায় নিযুক্ত করিয়া ছাড়িতেন। ফলে শান্তিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের বয়স বাড়িতেছিল। বিঘ্ন আসিল প্রাপ্ত বয়সে—অকস্মাৎ রায় বাহাদুর খেতাব-প্রাপ্তির সম্ভাবনায়।

রাজসম্মান আগতপ্রায় হইবার পূর্ব্বে তিনকড়িবাবুর পুরাতন কথা কিছু জানা দরকার। তাঁহার পিতা সাতকড়ি বাঁড়ুজ্যেকে গ্রামের সকলেই বিশেষভাবে চিনিত। তাঁহার আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর কাহারও ক্রূর কটাক্ষ যে একেবারে ছিল না একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না—যদিও গ্রাম্য স্বচ্ছলতার অর্থে যাহাই হউক না কেন, চার-পাঁচটি গরু, মরাই ভরা ধান, একটি নিজস্ব স্ত্রী ও ঢেঁকি ছাড়া আর কিছু বুঝায় না; অধিকন্তু কিছু থাকিলে অবৈতনিক একটি বিকলাঙ্গ চাকর যোগ দেওয়া চলিতে পারে। পিতা গত হইবার পর উক্ত সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন পিসিমার ভ্রাতুষ্পুত্র। স্বচ্ছলতার প্রভাব ও পিসিমার নিত্য বাঁধা স্নানের প্রয়োজন উপযুক্ত সময় উভয়ের স্কন্ধ ভর করিল। স্থির হইল তিনকড়ির উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ—অন্তত একটা পাশ না করিলে ভবিষ্যৎ জীবন মাটি হইয়া যাইতে পারে। গ্রামে পাশ করা চলে এমন একটি পাঠশালা নাই, সুতরাং শহরে যাওয়া সাব্যস্ত হইল। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিবার নিমিত্ত তিনকড়ি কৈশোর অবস্থাতেই পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্বশুর মহাশয়ের জমিদার মিঃ রেই আজীবন কলিকাতাবাসী। অফুরন্ত সময় ভোগ করিবার জন্য নিত্য নব কৌশল আবিষ্কার করিয়া আসিতেছেন। বয়স পিসিমার নাগাল ধরিলেও ঘসামাজার ফলে তাহা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে। মিঃ রেই আসলে বাঙালী হইলেও ধর্ম্মত স্বভাবটি সাহেবী। ইহার জন্য তাঁহার বিরাট সম্পত্তি ও ভগ্নাংশভাবে ইংরেজী শিক্ষা দায়ী। হস্তবুদ হইতে সরকারী পেশকস দিয়া তাঁহার যাহা মুনাফা থাকিত তাহাতে তিনটি বিরাটকায় নামজাদা মোটর গাড়ী ও তদুপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সব কিছু সাজাইয়া না রাখিলে তাঁহার ইজ্জৎ হানি হইবার সম্ভাবনা ছিল। বাড়ীর বাহির মহলে পদার্পণ করিলে খাস বিলাতী কোন লর্ডের প্রাসাদ বলিয়া ভ্রম হইত। ডাইনিং রুম্, বিলিয়ার্ড রুম্, ড্রইং রুম্ ছাড়া সীমার মধ্যে অসীম ধরণের নাচঘর—যাহাতে ফরাসের চিহ্নমাত্র নাই। কাঠের ফ্লোর কাঁচের মত মসৃণ, অনভ্যস্তের পা পড়িলে শ্যাওলার মত পিছলাইয়া যায়। কারণ অকারণে তাঁহার বাড়ীতে পার্টি ও মজলিস হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিমন্ত্রিতেরা সাহেবী মহল হইতে আসিতেন। এহেন মহাপুরুষের বিরাট অট্টালিকায় পিসিমা ভ্রাতুষ্পুত্র সহ বসবাস আরম্ভ করিয়া দিলেন কোন এক দূর আত্মীয়তার দাবী সূত্রে।

স্নেহের আতিশয্যে পিসিমার দখল ছিল, যাহার

সময়োপযুক্ত প্রয়োগকে ফাইন আর্ট বলা চলে। এই আর্ট অতি অল্প সময়ের ভিতর মিঃ রেইকে এমন ভাবেই নিস্তেজ করিয়া আনিল যে, অন্দরমহলের সব কাজে পিসিমার তত্ত্বাবধান না থাকিলে সাহেবের মনস্তুষ্টি হইত না। কানা-ঘুসা শুনা যায়, তিনি নাকি যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও টেবিলের বিলাতী খানা ছাড়িয়া অন্দরমহলে খাঁটি পুঁইডাঁটা, শুক্তনির ঝোল ইত্যাদির আস্বাদ লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কথাটা বিশ্বাস করিবার দুঃসাহসিকতা সকলের না থাকিলেও নূতন বাহাল করা ভীয়ান ঠাকুর সত্য বলিয়া জানিত।

সময় কাহারও অপেক্ষা রাখে না, সে তার চিরন্তন গতির ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। রেই সাহেব রাজা মহারাজা ইত্যাদি বড় বড় খেতাবের ধাপ উত্তীর্ণ হইয়া বার্দ্ধক্যের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নাচঘরে ক্বচিৎ বাতি জ্বলে, পার্টি ও ভোজের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, কারণ তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা ছিল তাহা যতটা সম্ভব মহারাজা আদায় করিয়া ছাড়িয়াছেন, তদুপরি খেতাবের উপর ঋণ ভর করিলে যাহা হইয়া থাকে মহারাজা তাহার পীড়নের বাহিরে থাকিবার অবসর পান নাই, ফলে ধর্ম্ম চিন্তায় তাঁহার আশক্তি দেখা দিয়াছে। লোকের মুখ বন্ধ করা যায় না। তাহারা বলাবলি করিতেছে মহারাজা নাকি পিসিমার সহিত কাশীবাসী হইবেন ঠিক করিয়াছেন।

অন্যদিকে তিনকড়ি আর তিনকোড়ে নাই। মহারাজার সুপারিসে কোন প্রকারে এণ্ট্রান্স পাশ করার পরই সবডেপুটির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন (উপরওয়ালাকে খুশী রাখিবার টেকনিক তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন সুতরাং ফাণ্ডামেণ্টাল রুলস্-এর অনেক আইনপাশ কাটাইয়া তাঁহার ডেপুটি হইতে সময় লাগে নাই)। ডেপুটি খাঁটি হাকিম—সাধারণে তাঁহাকে জজ ও বোনার্জি সাহেবের আসনে উঠাইয়া দিয়াছে।

ডেপুটির পদপ্রাপ্তির পর হইতে তাঁহার সহজ জীবন-যাত্রার পরিবর্ত্তন ঘটিল। একদিন প্রাতে অযথা সাহেবদের মত আঁট সাঁট পোষাক পরিয়া মরণিং ওয়াকের প্রবল ইচ্ছা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। হাঁটুর শর্ট তদুপরি বহু কষ্টে বেল্ট আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। হাঁটা অভ্যাস নাই অথচ হাঁটিতে পারিলে এবং দৈব সহায় থাকিলে উপর আলা

মিঃ বোনার্জী মর্ণিং ওয়াক্ করিতেছেন

কলেক্টার সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিবার সুযোগ মিলিতে পারে। মনকে দৃঢ় করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন।

সুদর্শন না হইলেও মা-লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার ব্যক্তিত্বে আকর্ষণী শক্তি ও বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা নিঃসন্দেহে আরাম ভোগের পরিচয় দিত, অর্থাৎ—উদরের পরিধি এমন একটি আকার ধারণ করিয়াছিল যাহার সঠিক মাপের কোন কিছুই বাজারে পাওয়া যাইত না। জামা-কাপড় ত দূরের কথা, ঈশ্বরদত্ত শরীরে যেটুকু সামঞ্জস্য ছিল তাহাও ভুলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন তিনি ইচ্ছা করিলেই করজোড়ে নমস্কার করিতে পারেন না, রীতিমত চেষ্টা করিলে অঙ্গুলী প্রান্ত স্পর্শ করে মাত্র।

উক্ত দেহকে মরণিং ওয়াকে নিযুক্ত করা যে কি বিড়ম্বনা, ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তিনি চলিয়াছেন অথচ মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখিতেছেন না। অবশেষে তুত্তোর বলিয়া মাঠের উপরই বসিয়া পড়িলেন। ক্লান্তি দূর হইবার পূর্ব্বেই হৈ হৈ করিতে করিতে সওয়ার সহ বিরাটাকার এক ঘোটক—তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে আর কি।

যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে পাশ কাটাইয়া হাঁটু জানু ইত্যাদি অঙ্গে ভর করিয়া যখন প্রায় সোজা হইয়াছেন তখন সাহেবি সওয়ার ক্রুদ্ধ ভাষার অর্দ্ধ-উচ্চারিত বিশেষণগুলি সংযত করিয়া বলিলেন, তুমি! তোমার জানা উচিত ছিল এটা টার্ফ—যেখানে আমাদের ঘোড়া ছোটে, সেখানে আরাম করিতে যাও কোন্ সাহসে।

মস্তক উত্তোলন করিয়া যখন দেখিলেন, মিষ্টভাষী সাহেব স্বয়ং ভগবান কালেক্টার, তখন তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—'গুড মরণিং' বলিবেন কি ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিবেন, স্থির হইবার পূর্ব্বেই সাহেব ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে আর একটি গোল বাধিয়াছে। কালেকটারকে সম্মান দেখাইবার জন্য ব্যস্ততার প্রয়োজন ছিল। তাড়াতাড়ি শরীরের গুরুভার উত্তোলন কালীন সাহেবী স্মার্ট (smart) ফিটিং তাঁহার বিপুল দেহের চাপ সহ্য করিতে পারে নাই। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ স্মার্ট ফিটিং লইয়া দেশীভাবে বসিবার কথা ছিল না। কুকার্য্য করিলে দণ্ডভোগ করিতে হয়। দুর্ভোগ কপালে যাহা ছিল তাহা ঘটিল। এমৎ অবস্থায় রাস্তায় হাঁটা যায় কি ভাবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধ গাড়ী সামনে থাকিলেও তাহাতে ঢুকিবার সাহস নাই কারণ অল্পদিন আগের অভিজ্ঞতায় বাহির হইয়া আসিতে প্রাণান্ত হইয়াছিল; তাহার পর শপথ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী চড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। একমাত্র উপায় গাড়োলী মনকে যদি কোন প্রকারে উদার করা যায় তাহা হইলে তাহার সাহায্যে একটি ট্যাক্সি জুটিতে পারে। এ চেষ্টাও বিপদসঙ্কুল। বেলা তখন প্রায় আট ঘটিকা, রাস্তার লোকের ভিড়ের সহিত দুই-একটি জ্যাঠা ছেলে চলিতে সুরু করিয়াছে। দুইশত গজ হাঁটিবার সময় পিছনে যে কোন জ্যাঠা ছেলের আবির্ভাব কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আতঙ্কে তিনি আড়ষ্টভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভক্তের জন্য ভগবান ডারবি সুইপ পর্যন্ত জোগাইয়া থাকেন, এ বিপদ ত কিছুই নয়। হঠাৎ এক ছাতাওয়ালার দর্শন পাইলেন। বুদ্ধিও আসিল তৎক্ষণাৎ। সে যৎসামান্য দক্ষিণা লইয়া এমন একটি ব্যবস্থা করিয়া দিল যাহাতে পিছনে গোরা থাকিলেও দুর্গানাম করিয়া অগ্রসর হওয়া চলে। এ যাত্রা মিঃ বোনার্জ্জী সুস্থ দেহে বাড়ী ফিরিলেন।

শরতের হাওয়ায় পূজার আগমনী সুর বাঙলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বোনার্জ্জী সাহেব এবার উৎসবে যোগ দিবেন ঠিক করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থার সহিত কিছুমাত্র মিল না থাকিলেও দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের ফলে মহারাজার অভিজাতসুলভ আচরণ ও বাবুগিরি বোনার্জ্জী সাহেব সস্তায় ভোগ করিবার সুবিধা পাইলে ছাড়িতেন না। তিনকোড়ে নামে যাঁহারা তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন তাহাদের উপর এযাবৎ-কাল মস্ত ক্রোধ পুষিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাহারাই সর্ব্বাগ্রে চায়ের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। চায়ের জন্য কখন কেহ নিমন্ত্রণ করে একথা অনেক প্রাচীনপন্থী জানেন না। তদুপরি এক পক্ষ আগে 'আর-এস-ভি-পি'-যুক্ত কার্ড আসিয়া উপস্থিত হইলে আদালতের সমনজারীর মত হইয়া দাঁড়ায়। এতদিন ধরিয়া সামান্য চা খাইবার কথা মনে রাখা সকলের পোষায় না।

দেশী আচরণ মানিতে হইলে ইহা দোষণীয় মনে করি না, কারণ চা ত অতিথি হইলেই পাওয়া যায়, তাহা আবার দিন-ক্ষণ দেখিয়া খাইতে হইবে না কি?

মোটের উপর চায়ের পার্টি জমিয়াছিল ভাল। পরিচিত সাহেবী দোকানদার কেহ বাদ পড়েন নাই। ছোটখাট মহল অন্তর্ভুক্ত রায়তদারও অনেক উপস্থিত ছিলেন।

আবহাওয়া (weather), ঘোড় দৌড় ও পাশের বাড়ীর কেলেঙ্কারীর কথা লইয়া চায়ের আসর জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ওহে তিনকোড়ে—

সম্বোধনটা বজ্রাঘাতের মত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কি সর্ব্বনাশ, এ যে যাদবপুরের হরে খুড়োর গলা। লোকটির আকাট বুদ্ধি ও স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈন মতাড়য়ৎ।

শিল্পী—ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী, কলিকাতা

প্রকৃতির গান

শিল্পী—এস সি বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনা

সেই সবল দীর্ঘকায় ও ভীতিপ্রদ দেহটি এখনও ঠিক রাখিয়াছেন, হস্তেও সেই পুরাতন বাঁশের সোঁটা—যাহার ইতিহাস গ্রামে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

ভদ্রাচারে দীক্ষিত মিঃ বোনার্জ্জী মুখে সাহেবী কায়দায় অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া অত্যন্ত বিনীত ভাবে ইঙ্গিত করিলেন—চাৎকার করিও না। মার্জ্জিত ইঙ্গিত হরে খুড়ো বুঝিলেন না। সোঁটা সহ জজ সাহেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

খুড়া মহাশয় পার্টির খবর জানিতেন না, তিনি কালীঘাটে আসিয়াছিলেন, তথা হইতে বৈদ্য-বাড়ীতে কিছু পুরাতন গব্য ঘৃত ক্রয় করিয়া—জীবন্ত যাদুঘর দেখিয়া তিনকোড়ের বাড়ী উঠিয়াছেন—ইচ্ছাটা রাত্রবাস এখানে সারিয়া লইবেন।

বাড়ীর প্রবেশ-পথে অর্দ্ধদগ্ধ সাদা চামড়া দেখিয়া একটু ইতস্তত করিয়াছিলে ... সোঁটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই আত্ম-সম্মান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া-ছিলেন। বিনা আড়ম্বরে গামছা স্কন্ধে কপালে সিন্দূরের ফোঁটা সহ একেবারে গায়ের আসরে আসিয়া উপস্থিত। এক হস্তে মা-কালীর প্রসাদ, অন্য হস্তে সদ্যক্রত সিগারেটের টিনে দোদুল্যমান পুরাতন গব্য ঘৃত। বারংবার ওষ্ঠে অঙ্গুলী স্পর্শিত হইতেছে দেখিয়া খুড়া মহাশয় ঠিক করিয়া লইলেন বেচারা তিনকোড়ের ঠোঁট ফাটিয়াছে। বাল্যকাল হইতে খুড়া মহাশয় তিনকোড়েকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। নিকটে আসিয়াই তিনি জাপটাইয়া ধরিলেন—কতকালের পর দেখা, চক্ষে তাঁহার জল আসিয়া পড়িল।

জজ সাহেব লৌহভীম চূর্ণের অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছেন। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাহু বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। খুড়া মহাশয়ের ঘর্ম্মে গলিত সিন্দূর বিন্দু ও তৎসহ চোখের জলে বোনার্জ্জী সাহেবের দুগ্ধফেননিভ সাদা কলার রঙীন হইয়া উঠিল। ফ্যাসান যাঁহারা মানেন তাঁহারা বুঝিবেন ইহা কি দারুণ সঙ্কট অবস্থা। বিশেষ করিয়া লেডিজ্‌দের সামনে।

এইখানে দৃশ্যের পট পড়িলে রক্ষা হইত, কিন্তু খুড়া কালীঘাটের সিন্দূর জোর করিয়া কপালে এবং গব্য ঘৃত ওষ্ঠে মাখাইয়া দিলেন। বয়স বাড়িলে কি হয়, খুড়ার কাছে তিনকোড়ে তিনকোড়েই আছেন—এই ত সেদিনকার কথা—তিনিই ত সাঁতলতলার মাদুলি দিয়ে সেবার তিনকোড়ের প্রাণ বাঁচান।

সামান্য দক্ষিণা লইয়া ছাতাওয়ালা এমন একটি ব্যবস্থা করিয়া দিল

ঘৃত ও সিন্দুর ভূষিত হইয়া যখন বোনার্জ্জী সাহেব

দৃঢ় হস্তের বন্ধনমুক্ত হইলেন তখন তিনি জানিতে পারেন নাই—তাঁহার মুখশ্রীর কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

নব সাজে সজ্জিত হইয়া বোনার্জ্জী সাহেব সমবেতদের আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—হঠাৎ দেখা গেল, সময়ের আগে আধা-সাহেবদের দল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের সাহেব তাহাতে বিচলিত হইলেন না, কারণ কাঁচা হাতের অনেক এপয়েণ্টমেণ্ট থাকিতে পারে। উঠিয়া যাওয়া ত খুব স্বাভাবিক—কিন্তু সত্যের গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইল বিদায়কালীন মেম সাহেবের সহিত গুড্ বাই করিতে গিয়া। মহিলাটির কি উগ্র মূর্ত্তি—তিনি জোর দিয়া বলিলেন, তুমি খাঁটি হিন্দু আমি জানিতাম না, তোমাকে enlightened ভাবিয়াছিলাম—

সব কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই যেমন উঠিতে যাইবেন, অমনি চায়ের তেপায়া টেবিলে যাহা কিছু ভক্ষণীয় ও অভক্ষণীয় ছিল সব আসিয়া পড়িল মিঃ বোনার্জ্জীর পাৎলুনের উপর। নিম্ন অঙ্গে আইসক্রীমের শেষাংশ—চায়ের, জলের নির্ভুল চিহ্ন ও উর্দ্ধাঙ্গে সিন্দুর ও গব্যঘৃতের মিলনে তিনি অদ্ভুর সাজে সজ্জিত হইলেন।

তাহার পর যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা ভদ্র সমাজে বর্ণনা করিবার বাধা আছে।

উৎসব শেষ করিয়া জজ সাহেব এবার দেহ মন উৎসর্গ করিয়া পাবলিক্ ওয়ার্কসে লাগিয়া গিয়াছেন। কালেক্টর হুঙ্কার দিলেও প্রত্যহ প্রাতে তাঁহাকে 'গুডমর্‌নিং' না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। অধ্যবসায়ে আন্তরিকতা থাকিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। যথাসময়ে বোনার্জ্জী সাহেবের উপর বাজারের তত্ত্বাবধান হইতে মোটর গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আসিয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে পয়লা জানুয়ারি আগতপ্রায়। অথচ কালেক্টরের নিকট হইতে এখন পর্য্যন্ত খেতাবের কিছুমাত্র আভাষ পান নাই। খেতাবের হিসাব চিরকাল গোপনে হইলেও চালাক পিয়নদের ধরিতে পারিলে আসল খবর জানিয়া লওয়া যায়—কিন্তু বোনার্জ্জী সাহেব এমন একটি আসনে অধিষ্ঠিত যে পিয়নদের সহিত প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠতা করিবার সাহস নাই। মনের ভিতর তর্ক উঠিল—বড় বড় সাহেবরা যখন সামান্য সহিসদের নিকট ঘোড়দৌড়ের টিপ লইতে পারে তখন তাঁহার খবরটা জানিয়া লওয়ায় কি দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু সুবিধার অভাবে তিনি উৎকণ্ঠায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিলেন। রায় বাহাদুর খেতাব প্রাপ্তির কথা সকলেই বলাবলি করিতেছে, অথচ নির্দ্দয়েরা সূত্রটি ধরাইয়া দেয় না কেন। ইতিমধ্যে একদিন কালেক্টর সাহেব নিজের কামরায় ডাকাইয়া পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত সংযোগে এমন একটি গোপন কথা জানাইয়া দিলেন, যাহার ফলে গৃহদাহের পুরাপুরি ব্যবস্থা হইয়া গেল।

পিতৃদত্ত নাম ভুলাইতে দেশী খেতাব অপেক্ষা সহজ উপায় আর কিছু আবিষ্কার হইয়াছে কি-না জানি না—মিঃ বোনার্জ্জী নাম উচ্ছেদ অথবা ডুবাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

আপিস হইতে ফিরিয়াই কালেক্টরের অনুকরণে রাসভারী গলায় ভৃত্য ভগাকে ডাকিলেন। ভগা গ্রাম হইতে আসিয়াছে এবং আজীবন কাল আমাদের সাহেবের সংসারেই ভৃত্যগিরি করিতেছে। কোন সময় হসন্ত যুক্ত নামে কেহ তাহাকে ডাকে নাই। এই পরিবর্ত্তনের গোড়ায় যাহাই থাকুক না, কোন অশুভ লক্ষণের সঙ্কেত নিশ্চিত জানিয়া প্রভুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রভু—এতক্ষণ ধরে ডাকছি—করছিলি কি?

ভৃত্য—বাবু—

প্রভু—তালব্য শ্—আমি বাবু!

কিছুদিন হইতে বাবু সম্বোধনে তাঁহার বীতরাগ আসিয়া পড়িয়াছিল। এত বড় অপমান সহ্য করিতে হইবে সাহেব ধারণা করিতে পারেন নাই। নিরীহ হসন্তযুক্ত ভগ্‌কে অনেক কটূক্তি সহ্য করিতে হইল, তথাপি সে বুঝিল না তাহার নাম ভগা হইতে ভগ্ হইল কেন।

অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া ভগ্ সোজা গিন্নিমার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। নালিশ করিবার সাহস না থাকিলেও দুঃখ জানাইবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিল না।

এযাবৎকাল ভগার পৃষ্ঠপোষণ স্বয়ং সাহেব করিয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ সেই ভগা কর্ত্তার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চায় দেখিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী প্রসন্না হইয়া উঠিলেন।

এই ভগা সম্বন্ধে কত নালিস সাহেব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সাহেবের ভগা-প্রীতি এককালে এমনই ছিল যে তাঁহাকে স্বামীর ভালবাসা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে হইয়াছে। আজ সেই ভগাই কর্ত্তার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চায়—তিনি ভগবানের নিরপেক্ষ বিচারকে সশ্রদ্ধে নমস্কার করিলেন।

বিবাহের পর হইতে স্বামীর সহিত পাল্লা দিয়া তিনি গতরটি ঠিক রাখিয়াছিলেন, সুতরাং উঠিতে বসিতে তাঁহার কাপড় গুছাইয়া না লইলে অসুবিধায় পড়িতে হইত। তিনি চাকরের একটু রুচিসম্পন্ন নামকরণ করিয়াছেন—তাহার জন্য এতটা বাড়াবাড়ি তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না। হসন্তযুক্ত নাম সাহেবরা ত প্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে। গড্—হগ্—বোস্—ইহারা কি মানুষ নয়! ভগাকে ভগ্ বলিয়া ডাকিলে দোষের কি থাকিতে পারে। আজ বাদে কাল তিনি রায় বাহাদুর হইতে চলিয়াছেন, আর তাঁহার বাড়ীর খানসামা কি না ভগা—ইহা হইতেই পারে না। মনে মনে যতই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করুন না কেন, গৃহিণীর

আবার উভয়ে বলপ্রয়োগ করিলেন

কোমরে স্কুল-গার্লের মত কাপড় আঁট করিয়া পরিয়া লইলেন 'যুদ্ধং দেহি'র মত। সোজা সাহেব যে ঘরে কাপড় ছাড়িতে-ছিলেন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছুমাত্র আড়ম্বর না করিয়াই বলিলেন—ওগো, এ কি কাণ্ড, ভগাকে যাচ্ছেতাই তুমি সব কি বলেছ? এতদিনকার পুরাণ চাকর যদি চলে যায় ত আমি তোমার সংসার চালাতে পারব না। আমায় বাপু ভায়ের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

দিকে নিশ্চিন্তভাবে তাকাইবার সাহস ছিল না। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে উত্তর করিলেন—অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি, সাড়া দেয় নি—বোঝ না সমস্ত দিন কোর্টে কাজ করার পর জামাকাপড় না ছাড়তে পারলে কত কষ্ট হয়।

কর্ত্রীঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া উত্তর করিলেন—আহা কি জামাকাপড় ছাড়াই গো—এক বালিসের খোল ছেড়ে আর এক বালিসের খোলে ঢোকা। বাঙালীর ছেলে, বাড়ীর

ভিতর সাহেব সেজে থাকা কেন বাপু। কিছুদিন থেকে তোমার অনেক বিষয়ে মতিভ্রম দেখছি—এর আগে আমার কত কাছে এসে 'ওগো' বলতে, এখন···

আপিস-ফেরতা কেরাণীরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলে বাঁচে—আর তুমি সব সময় গলায় ফাঁস না লাগিয়ে থাকতে পার না। গলায় ফাঁসটা কি?—কেন তোমরা টাই না কি বল—ও ত গলায় দড়ি দেবারই মত। এই ত সেদিন নারকেল নাড়ু ক'রে তোমাকে খাওয়াতে এলাম, কি-না তোমার হাঁটুর ভারে একটু ভর ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম—তুমি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা চেহারা ক'রে চেঁচিয়ে উঠলে—ক্রীজ্ ক্রীজ্—

ইংরেজীতে গালাগালি আমরা না হয় বুঝতে পারি না, তাই বলে ক্রীজ বলবে কেন?

সাহেব কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—ক্রীজ মানে কাপড়ের ভাঁজ, গালাগালি নয়।

কর্ত্রীঠাকুরাণী—হ্যাঁ ক্রীজ মানে কাপড়ের ভাঁজ—আমি কচি খুকি, কিছু বুঝি না—তোমাকে সোজা বলে দিচ্ছি—ক্রীজ আর ভগ্ চলবে না। তোমার কাজ ত কোর্টে যাওয়া এবং সেখান থেকে বাড়ী ফেরা—সংসার চালান কি জিনিস যদি বুঝতে তা হ'লে মেজাজ দেখাবার চেষ্টা করতে না।

সাহেব দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার ফাঁক খুঁজিতেছিলেন, অথচ দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন সশরীরে মহিয়সী মহাশক্তি, এমৎ অবস্থায় একমাত্র দীনত্রাতা ভগবান উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু সে দিক দিয়াও ইনার্ ম্যান্ কোন সাড়া দিতেছে না। কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণীর দিকে একবার গদগদভাবে তাকাইলে কি হয় ভাবিতে-ছিলেন, এমন সময় ভগা আসিয়া একটি ভিজিটিং কার্ড দিয়া গেল। গোদের উপর বিষ ফোড়া—বেচারা ভগা কয়লা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কার্ডটি তাহার কর-কমলের অভ্যন্তরস্থিত করিয়াছিল—ফলে কার্ডের মালিকের নাম নিরাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। জলে ভাসিয়া যাইবার সময় সামান্য তৃণও নাকি হতভাগ্যের আশ্রয় দেয়, তাই মনে করিয়া জজ সাহেবের কার্ড সহায় করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবেন ঠিক করিয়াছেন, ইতিমধ্যে ভগা এক ফিরিঙ্গি মহিলাকে লইয়া তথায় উপস্থিত। দেখিতে মন্দ নয়—তাহার উপর বয়স উত্তেজক, বেশভূষা মাদকতায় পূর্ণ। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কর্ত্রী-ঠাকুরাণী এমন একটি মুখভঙ্গী করিলেন, যাহার অর্থ ভুল করা যায় না; ভগা যে এতবড় বোকা ও পাষণ্ড হইবে জজ সাহেব অনুমান করিতে পারেন নাই। দুই-চার মিনিট পরে আনিলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হইত। খেতাবপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একজন লেডি-স্টেনোগ্রাফার রাখিবেন ঠিক করিয়াছিলেন—আপিসের কাজ এত বেশী যে······

সাহেবের বুঝিতে বাকি রহিল না, মহিলাটি বন্ধু প্রেরিত স্টেনোগ্রাফার। আকর্ষণের দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন এমন সাহস নাই, অথচ মেম সাহেবের বয়স কম বলে সাহেবের মন বিগড়াইয়া গেল। সাহেব কপাল মুছিবার ছলে নিজের দৃষ্টি আড়াল করিয়া মহিলাটিকে ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী তখন সবে গা ধুইয়া আসিয়াছেন। মেম সাহেব নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ভিতরে ঢুকিবার পথ চাহিলেন। যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়; এতটা গড়াইবে কে ভাবিয়াছিল। ম্লেচ্ছগাত্র স্পর্শ করায় অসংখ্যবার দুর্গানাম করিতে করিতে কর্ত্রীঠাকুরাণী পুনরায় গামছা পরিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিলেন। এই ঘটনায় ফলাফল কি হইল শুনিতে হইলে হৃদয়কে পাষাণের মত কঠিন করিয়া লইতে হয়। এইটুকু বলিতে পারি—দুর্ব্বল মেষ হিংস্র শার্দ্দূল দ্বারা আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে যে অবস্থায় থাকে—আমাদের জজ সাহেব তাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র ভাল মনে ছিলেন না। নবাগতা মহিলাটির সহিত বিজনেসের কথা ছাড়া আর কিছু কথা হইয়াছিল কি-না জানিবার সুযোগ ছিল না। মহিলাটি জজের স্টেনোগ্রাফার হইবার পর এক সপ্তাহ কাটিতে চলিল—কর্ত্তা-গৃহিণীর বাক্যালাপ বন্ধ।

সাহেবেরও নানা রকম চাঞ্চল্য দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অনেক বিষয়ে কেমন একটা কাঁচা কাঁচা ভাব দেখাইবার জন্য অত্যধিক ব্যস্ততা দেখা দিল। হঠাৎ অনেক বৎসর পরে ড্রেসিং টেবিলের উপর ফরাসী দেশীয় লেভেণ্ডার আসিয়া হাজির। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা এই সব লক্ষণ রহস্যময় মনে করিতে লাগিলেন। জজ সাহেবের

সেদিকে দৃকপাত নাই, তিনি নির্ভীকভাবে আনন্দকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং প্রত্যহ বিজনেসের জন্ম তাঁহাকে আদালতের ছুটির পরেও দীর্ঘকাল থাকিতে হইতেছে। আজকাল তিনি নিজে ফাইলের মর্ম্ম বুঝাইয়া না দিলে চলে না। ওদিকে পুঁটিকে (তৃতীয়া কন্যা) দেখিবার জন্য বরকর্ত্তারা নোটিশ পাঠাইয়াছেন—ওমুক দিন সন্ধ্যা অত ঘটিবার সময় তাঁহারা মেয়ে যাচাই করিতে আসিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় বরকর্ত্তারা জজ সাহেবের গৃহে উপস্থিত, অথচ অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার কিছু মাত্র ব্যবস্থা নাই। সাহেব তখন কোর্টে স্টেনোগ্রাফারের সহিত জরুরী কাজে ব্যস্ত। বাড়ী হইতে কর্ত্রীঠাকুরাণী তাগিদের পর তাগিদ পাঠাইতেছেন, কিন্তু খাস-আর্দ্দালী কড়া হুকুম অমান্য করিয়া সাহেবের কামরায় ঢুকিতে সাহস পাইতেছে না। হঠাৎ সশব্দে সাহেবের ঘরের কবাট খুলিয়া গেল। লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইত, মেম সাহেবের চির-নৃত্যপরায়ণা ভ্রূযুগল ভীতির সঙ্কেত দিতেছে—চলার গতিও বেশ দ্রুত—সাহেব তাঁহার পিছনে সমান বেগে আসিতেছেন। আর্দ্দালীকে সামনে দেখিয়া নিজেকে সংযত করিলেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সাহেব জানিতেন সব কাজে সাক্ষী রাখা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। স্থির করিলেন পরে মিটমাট করিয়া লইবেন। জরুরী কাজ করিতে গিয়া উপরন্তু যে সব কাজ তিনি করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, অর্থাৎ আনুমানিক যৌবনের তাড়া তিনি সামলাইতে পারেন নাই—উপযুক্ত সময়ের আগেই মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আর্দ্দালীর নিকট কর্ত্রীঠাকুরাণীর তাগাদার কথা শুনিয়া তিনি প্রথমটা রাগিয়া উঠিবার চেষ্টায় ছিলেন, তাহার পর যখন মনে পড়িল আজ পুঁটিকে বরকর্ত্তাদের দেখিতে আসার কথা, তখন তাঁহার টনক নড়িল। এ বিস্মরণের ত ক্ষমা নাই—কি কুক্ষণেই তিনি বুড়া বয়সে স্টেনোগ্রাফার রাখিতে গিয়াছিলেন। স্টেনোগ্রাফারই বা রাখিতে যাইবেন কেন—যদি না তাঁহার অনতিবিলম্বে রায় বাহাদুর হইবার সম্ভাবনা থাকিত? যত শীঘ্র পারিলেন বাড়ী ফিরিলেন। অভ্যাগতদের গম্ভীর মুখ দেখিয়া নানাভাবে তাঁহাদের খুসী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাবি জামাতা একটি সচল রত্ন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সগু ব্রিলিয়াণ্ট স্কলার ছাপ মারিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। অবশেষে এমন ছেলে ফসকাইয়া যাইবে না ত? ভিতর-বাড়ীতে কি হইতেছে জানিবার উপায় নাই। বিপদে পড়িলে অনেকেই দার্শনিক হইয়া থাকেন—সাহেব বুঝিলেন, যথাস্থান হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, সুতরাং আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। অগ্নির শিখা কতখানি জানিতে পারিলে সাবধানে অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু উপদেশ দিতে পারে এমন কাহাকেও সামনে দেখিতেছেন না। ভগার পুরাতন নাম ধরিয়া ডাকিলে হয়ত সে প্রথমবারেই সাড়া দিতে পারে, কিন্তু তাহার টিকি দৃষ্টিগোচরের বাহিরে। বিপুল অরণ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। একটু বসুন, আপনাদের বড় কষ্ট হয়েছে ইত্যাদি রসাল কথায় কতক্ষণ চিনি ভেজে! বরকর্ত্তারা অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমত মেয়ে দেখাইবার নাম নাই, দ্বিতীয়ত তামাক পান সিগারেট কেহ দেয় নাই, তৃতীয়ত এখানে জলযোগ করিতে বাধ্য হইবেন জানিয়া সমস্ত বিকালটা নিজেদের অভুক্ত রাখিয়াছেন। শেষের প্রয়োজনীয়তা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন, অথচ ও বিষয় কন্যাকর্ত্তার ঔদাসীন্যই বেশী প্রকাশ পাইতেছে। সংক্ষেপে—ত্রয়োস্পর্শ যোগ ঘটিল। একজন ভদ্রতার আইন অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন—কি মশাই, আর কত দেরী?

জজ সাহেব নিজের প্রত্যুৎপন্নমতির উপর নির্ভর করিয়াও সঠিক উত্তর জোগাইতে পারিলেন না, বলিলেন—এ—এ—এই যে। বিদরীর কাজ করা রূপার ফরসি থাকা সত্ত্বেও ভগা দুই ছিলিম তামাক দুইটি নোংরা শ্রাদ্ধের বেঁটে হুঁকার উপর চড়াইয়া আনিল। স্বচক্ষে এই কাণ্ড দেখিয়াও কিছু বলিতে পারিলেন না।

দরজার আড়ালে ভগাকে ডাকিয়া প্রথমেই একটি মুদ্রা বকশিস দিলেন, তাহার পর অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—ওরে পুঁটির আসতে আর কত দেরী, বাবুদের জলখাবার দেওয়া হয়েছে ত? এঁনারা অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি ইত্যাদি—মনের এই অপ্রত্যাশিত আবেগ দেখিয়া ভগা সাহেবের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িল। কখনও ত সে এই রকম ব্যবহার বাবুর নিকট পায় নাই, তবে কি বাবুর কিছু হইল নাকি। বিমর্ষভাবে মা-ঠাকরুণকে জানাইল—বাবুর কি হয়েছে?

দূর হইতে কর্ত্রীঠাকুরাণী দেখিলেন, সাহেব অস্থিরভাবে

পাইচারি করিতেছেন এবং শীতকালের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া সত্ত্বেও ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছিতেছেন। ব্যাপার কি অনুমান করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। চরিত্রদোষ ঘটিলে তাহার আনুসঙ্গিক সব কিছুই পিছু লইবে তাহা আর বিচিত্র কি। এই রকম ঘটনা আগেও একবার ঘটিয়াছিল, তখন মেমসাহেবের খবর জানিতেন না। বিলাতী খানার রাত্রের নিমন্ত্রণে কি সব ছাইভস্ম খাইয়া আসিয়াছিলেন। সে রাত্রে যমের সহিত টানাপোড়েন করিয়া বাঁচাইতে হইয়াছিল—চক্ষুর সে কি দৃষ্টি, রক্ত যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল—কথা বলার ভঙ্গিই বা কি চমৎকার। ঘটনার সূত্রগুলি যতই বাছিতে লাগিল, ততই পুরাতন বীভৎস দৃশ্যগুলি একের পর এক চাক্ষুষ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যতক্ষণ না বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, আজও সেই দিনকার ব্যবস্থা করিতে হইবে নাকি—ছি ছি, কি কেলেঙ্কারীর কথা। পুঁটির বিবাহ কিছুতেই পণ্ড হইতে দিবেন না। পাশের বাড়ীর অরুণের আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া আবার তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কর্ত্তার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, অরুণকে দিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। অরুণ শহরের হাল-ফ্যাসানের ছেলে—বেশের পারিপাট্য তাহার কাছে একটা বড়দরের কৃষ্টি—গায়ে ইকনমিক দেশী কোর্ত্তা—গলার সামনে রুদ্রাক্ষের একটি বোতাম। দৃষ্টিভ্রমে কোর্ত্তাটি খাট শার্ট ও ফতুয়ার মাঝামাঝি লাগে। সযত্নে রাখা রুক্ষ কেশ, থান ধুতি কোঁচান, পায়ে রেশমি বোতামযুক্ত কাবুলী চটি। ভদ্রলোক হাসিতে হাসিতে আসিতেছিলেন, হঠাৎ পাতান-খুড়িমার মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। খুড়িমা অস্থির হইয়া বলিলেন—এখন কি আর মাথা চুলকাবার সময় আছে বাবা—আয় দুজনায় মিলে ভিতরে নিয়ে আসি ওখানে থাকতে দিলে শেষ পর্য্যন্ত একটা কেলেঙ্কারী না হয়ে যাবে না। অরুণ প্রস্তুত, আগে আগে চলিল এবং নিকটে আসিয়াই বিনা বাক্যব্যয়ে সাহেবের হাত ধরিয়া টান মারিল। ততক্ষণে খুড়িমা আর একহাত ধরিয়াছেন। সাহেব হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হয়েছে কি?

কর্ত্রীঠাকুরাণী ওষ্ঠ চাপিয়া উত্তর করিলেন—চেঁচামেচি করো না, দোহাই তোমার, ভিতর-বাড়ীতে এস, সব বলছি।

সাহেব টানা-হেঁচড়ায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—এখন আব্দার ভাল লাগে না।

—বাবা অরুণ, শুনলি ত বুড়া বয়সে কথার ভঙ্গী—এখন আর সন্দেহ আছে, ভিতরে নিয়ে চল্ বাবা, কেলেঙ্কারীর হাত থেকে বাঁচা।

দুই জনে আবার বলপ্রয়োগ করিলেন। প্রথমটা সাহেব বেঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন কিন্তু হৃদরোগের কথা মনে পড়িতেই হাল ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর দম্পতির শুভমিলনে কি হইয়াছিল বর্ণনা করিব না, কারণ তাহা শুনিবার শক্তি আনিতে হইলে পাষাণের মত হৃদয় শক্ত করিতে হয়।

পয়লা জানুয়ারী। ভোর হইবার পূর্ব্বেই উপযুক্ত স্থান হইতে অভিনন্দনসহ তার আসিল—তাঁহার রায়বাহাদুর খেতাবপ্রাপ্তির বার্ত্তা লইয়া। একই ছত্র বহুবার পড়িলেন, তথাপি আশ মিটিতে চায় না। গৃহিণীকে খবরটা জানান দরকার, কিন্তু সংসার-ধর্ম্মের যে সব বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাহাতে খেতাব-সংবাদ ত তুচ্ছ, জড়োয়ার কাজসহ দুইটি নিরেট সোনার অনন্ত ঘুস্ দিলেও কোপের উপশম হইবার সম্ভাবনা নাই। রাগ আসিয়া পড়িল পুঁটির উপর, তাহাকে দেখিতে না আসিলে এ বিপদে পড়িতে হইত না। মনকে স্তোক দিলেন, ছেলেটা এমন কি আহা মরি—ও রকম ছেলে অনেক জুটিবে। পুঁটি ওদিকে শত্রুর মুখে ছাই দিয়া বাড়ন্তের ডেঞ্জার জোন্-এ আসিয়া পড়িয়াছে; রং-এর জৌলস আব্‌লুস কাঠ পাশে না রাখিলে বুঝিবার উপায় নাই। এ ছাড়া আরও অনেক শুভলক্ষণ আছে—যাহা বিবাহের বাজারে মোটা টাকা নজর না দিলে মালিকানী স্বত্ব হস্তান্তর করা চলে না। রায় বাহাদুর সবই জানিতেন, তবু মনে বল পাইবার জন্য তর্ক উঠাইতেছিলেন। অবশেষে পুঁটুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আজ মহাআনন্দের দিনে তিনি সবার মাঝে একা। গৃহলক্ষ্মী আইন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। পুত্রকন্যারা এখনও বাবা বলিয়া ডাকে, স্ত্রী ওগো ছাড়া আর কিছু বলিতে প্রস্তুত নন। স্বগৃহে রাজসম্মানের যদি এতটা আদর পান, ত বাহিরের লোক রায় বাহাদুরের জন্য মাথা ঘামাইবে কেন। আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম—উপর-আলার নির্দ্দয় অত্যাচার সবই সহ্য করিয়াছেন খেতাবপ্রাপ্তির আশায়, সেই খেতাব যখন তিনি পাইলেন তখন কেহই তাঁহার ক্ষমতার উপযুক্ত মূল্য দিল না—রায় বাহাদুর টেলিগ্রামটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

শ্রীভুবনমোহন দাশ

১২৯০ সালে শ্রাবণমাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বরিশাল জিলায় নবগ্রামে ব্রহ্মর্ষির জন্ম হয়।

তাঁহার পিতামাতার প্রদত্ত নাম ছিল শরৎচন্দ্র। তিনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় ও পরে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ করিয়া অবশেষে সংস্কৃত শিক্ষালাভ মানসে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে কাব্য, ব্যাকরণ ও বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে উপাধি ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ১৩১৬ সালে কলসকাঠী গ্রামে তত্রত্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। শৈশব হইতেই তাঁহার মনপ্রাণ ভগবানে সমর্পিত ছিল। সুবিধা পাইলেই নির্জ্জনে বসিয়া ভগবৎচিন্তায় বিভোর হইতেন এবং অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া দিতেন। হিন্দুর তথা ব্রাহ্মণদের প্রাণহীন ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পূজা দেখিয়া তাঁহার গভীর দুঃখ হয় এবং এই কারণেই তথাকার ব্রাহ্মণ ও জমিদারগণের সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায় কলসকাঠী গ্রাম ত্যাগ করেন। প্রাণের গভীর অধ্যাত্ম পিপাসা লইয়া তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন, কিন্তু অন্নবস্ত্রের সমস্যা তাঁহাকে বিচলিত করিল। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কলিকাতা মহানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন।

একদিন শোভাবাজারের ডাঃ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে গৃহশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়েও তাঁহার একটি শিক্ষকতার কর্ম্ম জোটে। এই প্রকারে সামান্য আয়ে তাঁহার পিতামাতার সংসার চলিয়া যাইতে লাগিল।

শরৎচন্দ্র প্রাণের তীব্র অধ্যাত্ম ক্ষুধা লইয়া হাওড়ায় আচার্য্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট আত্মবিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করিয়া দিব্যচক্ষু লাভ করেন।

এইরূপে শরচ্চন্দ্র তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের মধ্য দিয়া সাধনার সিদ্ধপীঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে আসিলে যোগযুক্ত ব্যক্তির বাহ্যকর্ম্ম করিবার আর শক্তি থাকে না; তিনিও বৈষয়িক কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার তপস্যা প্রভাবে তাঁহার নিজেরও কোন অভাব হইল না এবং তাঁহার আশ্রিতজনও কোন অভাব অনুভব করিলেন না। ভগবানই এই যোগযুক্ত তপস্বীর যোগক্ষেম বহন করিলেন। কাশীতে কঠোর তপস্যাবলে—যাঁহাকে জানিলে মানুষের জানিবার ও পাইবার কিছু বাকী থাকে না, সমাধিবলে সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, তিনি সিদ্ধ হন।

তিনি খুবই প্রচ্ছন্নভাবে জীবনযাপন করিতেন। এমন কি তাঁহার প্রণীত কোনও গ্রন্থেই তাঁহার নামের উল্লেখ থাকিত না। আত্মজ্ঞান লাভের পর ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে
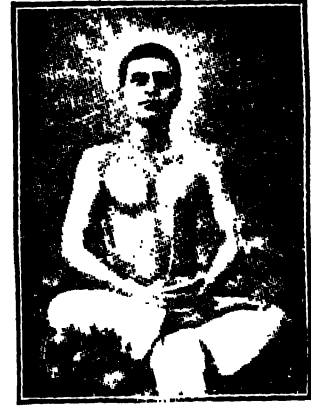
ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

তাঁহাকে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হয় এবং ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন জীবের তথা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত উপদেশ দান ও পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা অমূল্য ধর্ম্মতত্ত্ব পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন।

তিনি বলিতেন—অবস্থার পরিবর্ত্তন বা বেশভূষার পরিবর্ত্তনের মধ্যে বা কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে আত্মজ্ঞান লাভের সম্বন্ধ খুবই কম। যে যে অবস্থায় অবস্থান করিতেছে সেই অবস্থা হইতেই সাধনা আরম্ভ কর, তোমার অনুকূল অবস্থা তোমার সাধনা বলেই আসিবে। তোমাকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না—গৃহ, সংসার, আহার, বিহার, তোমার

দৈনন্দিন কর্ম্ম—কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না। যে যেমন অবস্থায় আছ এবং যে কোন বর্ণ, জাতি বা সমাজে থাক—সকলেরই মাকে ডাকিতে—ভগবানকে ডাকিতে সমান অধিকার আছে। সকলেই যে মায়ের সন্তান, সেখানে ছোট-বড় বিচার নাই, নীচ-উচ্চ প্রভেদ নাই।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, সব ছাড়, সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হও—তবে বেদান্ত পাঠের বা আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হইবে। ব্রহ্মর্ষি বলিতেন, কিছুই ছাড়িতে হইবে না—সে ত্যাগ বৈরাগ্য তোমাদের নাই; সাধনা কর—মাকে ডাক আন্তরিকভাবে কায়মনোবাক্যে। মা সন্তুষ্ট হইলে তোমায় তিনি আদর করিয়া বরণ করিবেন, গ্রহণ করিবেন—তাহা হইলেই মাকে পাওয়া হইবে—লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে—তোমার পথের কণ্টক আপনা হইতেই দূর হইবে।

বহুর মধ্যে একের কিরূপে উপাসনা করা যাইতে পারে এবং বাক্য ও মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দেবতা কিরূপে জাগ্রত হন তাহাই দেখাইবার জন্য ব্রহ্মর্ষি বিশেষ করিয়া দেবার্চ্চনা করিতেন। মুমুক্ষু সাধকের মুক্তির পথও এই দৈবপূজা হইতেই নিষ্কণ্টক হয়। গুরুশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া মন্ত্র-চৈতন্য পূর্ব্বক দেবতাকে আহ্বান করিলে দেবতা আসেন—দেবতা পূজা গ্রহণ করেন ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। যিনি যে জাতিভুক্ত হউন, যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন—এইরূপ শক্তিমান হইলে তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। ব্রহ্মর্ষি একসঙ্গে শিষ্যদের লইয়া বিভিন্ন দেবতাদিগের যে অলৌকিক পূজা করিতেন তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। শুধু মুক্তির জন্য নয়, লাঞ্ছিত ভারতের জন্য, দেশের ক্লীবত্ব নাশের জন্য, দেশের তামসিক মনোবৃত্তি দূর করিবার নিমিত্ত মায়ের পূজা করিতেন। এখনও হাওড়ায়, বরাহনগরে ও কলিকাতায় সেইরূপ অলৌকিক পূজা দেখা যায়।

তুমি আর আমি

শ্রীঅনুরাধা দেবী

এসো আজ এইখানে পাশাপাশি বসি দুইজনে
আকাশে উঠেছে চাঁদ! কত কথা পড়ে আজ মনে।
মনে হয় তুমি আমি যুগে যুগে চলেছি এ-পথে;
মনে হয় কানাকানি কত খেলা ছেলেবেলা হ'তে—
করেছি পথের পাশে ওইখানে শিউলিতলায়,
তখন হয় নি রাঙা সরমের কোমল ছোঁয়ায়
আমার এ তনু-মন। তুমি ছিলে দুরন্ত চপল;
বারে বারে ছুটে এসে করি কোলাহল
ভেঙে দেছ খেলার ঘরখানি, মাননিকো মানা।
বই ফেলে চুপি চুপি চোরের মতন দিয়ে হানা
চমকে দিয়েছ এসে এমনি নিরালা রাতে একা;
আনমনে দুইজনে চকিতের চোখে চোখে দেখা
হয়েছে শতেক বার। তখন হয়নি মনে লাজ;
হয় ত ছিল না কথা, তবু কথা-বলা ছিল কাজ!
আজকে চাঁদের রাতে মুখপানে চেয়ে ভাবি তাই,
দুনিয়ার কোনখানে তুমি ছাড়া নেই বুঝি ঠাঁই।
তোমার চোখের পাতা যখন সজল হবে দুখে,
নিবিড় বাঁধনে আমি জড়ায়ে ধরিব মোর বুকে।
তোমার আমার মাঝে রবে না কো ব্যবধান কিছু,
তুমি যাবে আগে আগে, আমি ছায়া তব পিছু পিছু
চলিব অনন্তকাল সম্মুখের পথ বাহি ধীরে;
হয় ত কখনো ক্লান্তি নামিয়া আসিবে দুটি তীরে,
জীবনের পটভূমে সায়াহ্নের কালো ছায়া সম,
ঘনাবে বৈশাখী ঝড় নিস্পন্দ আকাশে গাঢ়তম;
তবুও দুজনে মোরা যাবো না কো দুই পথে চলি,
এমনি ছাতিম তলে আঁধার বা আলোকে উজলি।
বিশ্রাম করিব পাশাপাশি। তুমি রবে তন্দ্রাতুর,
আমার বুকের তলে বাজিয়া উঠিবে ভীরু সুর;
হয় ত বাতাস লাগি তালের শাখায় তরুশিরে
কাঁপিবে আঁধার ছায়া; বনের গহন বীথি ঘিরে
নামিবে শ্রাবণ মেঘ ঝলকিয়া চকিতে বিজরি,
আমি বধূ ভীরুমনা ক্ষণে ক্ষণে উঠিব শিহরি'।
তোমার বুকের তলে আনমনে ঢেকে মুখখানি
জপিব প্রেমের মন্ত্র, শুনিব গোপন মনোবাণী
অফুরন্ত উল্লাসের রোমাঞ্চিত আবেশে মধুর,
যা কিছু কামনা মোর অপুষ্পিত বেদনা-বিধুর—
মঞ্জুরিত হবে প্রিয় ফুলে ফলে আনন্দ উল্লাসে;
মাতাল এ তনু মন প্রতিক্ষণে তব অঙ্গবাসে
গাঁথিবে স্মৃতির ফুলে সৃজনের নব নব মালা;
আমি নারী, সে-সৃষ্টির শতদলে ভরে' নেবো ডালা।

ব্রহ্মপুত্রে মৌসুমির বিক্রম

শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটী
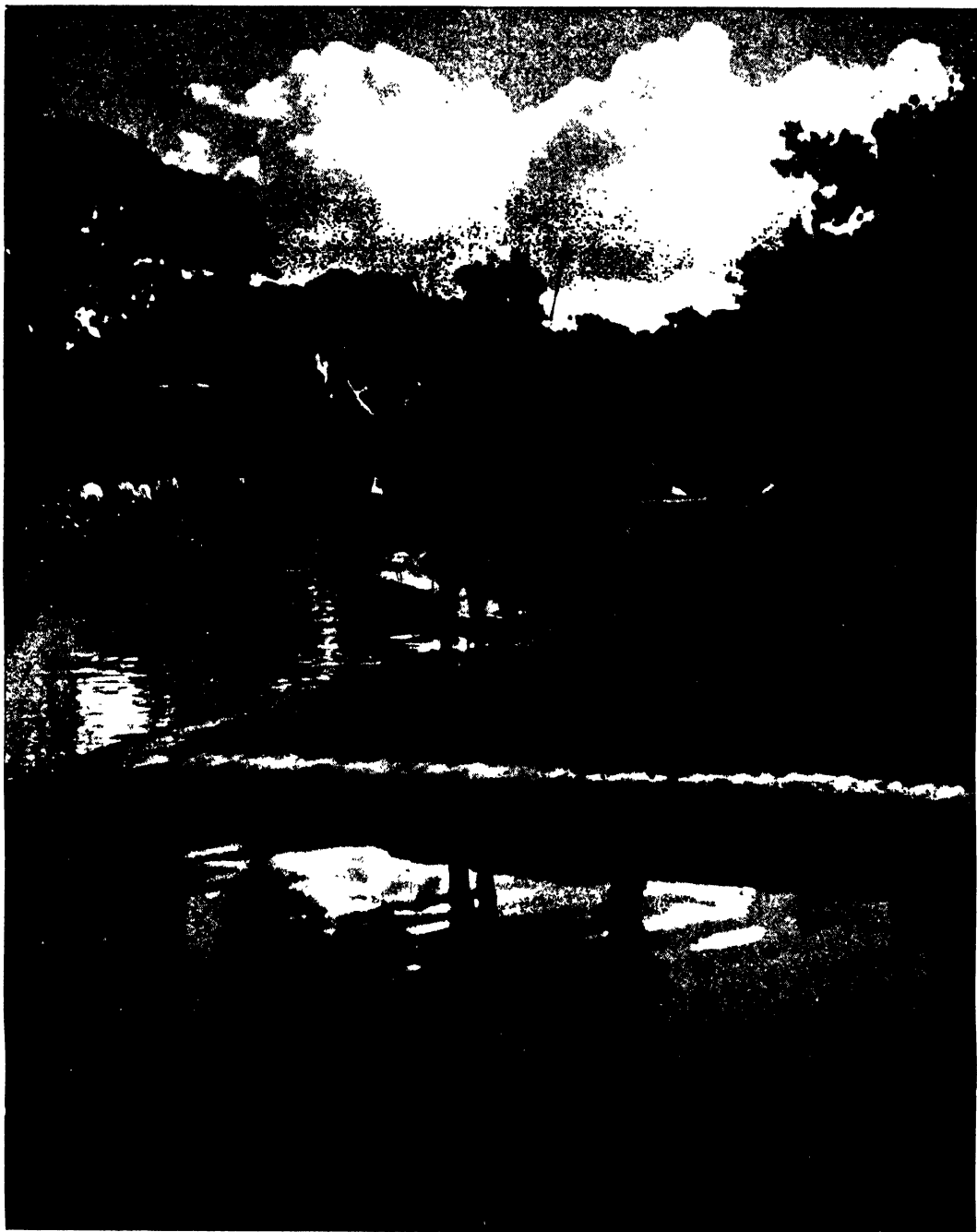
রূপান্তর

শিল্পী—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারভাঙ্গা

প্রলয়ের সূচনা

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

মহাসমরের কালো ছায়া আজ বিদ্যুৎগতিতে সারা ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়্ছে। রণদেবতার দামামা-ধ্বনি এতদিন ছিল মৃদু এবং ক্ষীণ, এবার কিন্তু তা অস্পষ্টতার আবরণ অতিক্রম ক'রে গভীর নির্ঘোষে সারা জগৎকে উচ্চকিত ক'রে তুলেছে। হিংসার যে দুরন্ত ধারা এতদিন লোক-লোচনের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতো আত্মগোপন ক'রে ছিল তা অকস্মাৎ কূলহারা নদীর মতো বিপুলবেগে সমগ্র ইউরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করছে। 'যুদ্ধ বাধ্বে কি বাধ্বে না' এই ভেবে আমাদের মন এতদিন যে সন্দেহ-দোলায় দুল্ছিল এতদিনে তার অবসান ঘটেছে। এবার আর সুধু গর্জন নয়, রীতিমত বর্ষণ সুরু হয়েছে। অমিত-বিক্রমে জার্মানী আক্রমণ করেছে পোল্যাণ্ডকে; জার্মান বিমান-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে আজ পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস বিধ্বস্ত। সেই শ্মশান-স্তূপের ওপর জার্মানী তার স্বস্তিক-লাঞ্ছিত বৈজয়ন্তী উড়িয়েছে। এই হচ্ছে ফ্যাসিস্ট শান্তির নমুনা। পোলিশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত—সেখানে আজ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা হচ্ছে মহাশ্মশানের স্তব্ধতা—প্রেতপুরীর বিজন নীরবতা। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয় পোলেরা তবুও তাতে কিছুমাত্র দমে-নি; পূর্ণ-উৎসাহে তারা স্বদেশ-উদ্ধারের চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে। বৃটেন এবং ফ্রান্স এতদিন পরে তাদের ফ্যাসিস্ট তোষণ-নীতি পরিহার ক'রে পোল্যাণ্ডের সহায়তা করবার জন্য সম্মুখ-সমরে এগিয়ে এসেছে। ফলে, মরণ-মহাদেবের চরণ-ক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী উঠেছে কেঁপে—ইউরোপ মেতে উঠেছে এক মর্মন্তুদ মরণ-মহোৎসবে।

পঁচিশ বছর আগে সারাজিভোতে (Sarajevo) এক আততায়ীর গুলি যে দাবানল জ্বালিয়েছিল তা ইউরোপের প্রাচীন-পন্থী সমাজ-ব্যবস্থার অন্তিমদশার নির্দেশ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল সেই তীব্র সংঘাতে। ভের্সাই সন্ধির ফলে সেই অগ্নিশিখা সাময়িক ভাবে নির্বাপিত হয়েছিল মাত্র—তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নি। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থ হচ্ছে পরস্পর-বিরোধী; এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এ সমস্যার সুমীমাংসা বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি; বরঞ্চ তাদের অসামঞ্জস্য ক্রমশ আরও সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। তার ওপর ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রগুলির মাঝখানে সাম্যবাদী রুশিয়ার আবির্ভাব সেই বিরোধকে আরও জটিলতর ক'রে তুলেছে।

বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার হয়েছে মুখ্যত অর্থনৈতিক কারণে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির ধনোৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় দ্রুতগতিতে। তারা যে পরিমাণে ধন উৎপাদন করতে থাকে তা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এই অতিরিক্ত পণ্যসম্ভার নির্বিবাদে বিক্রয় করবার জন্য তারা সাম্রাজ্য স্থাপন করে বিভিন্ন দেশে—যেখানে তাদের উৎপন্ন বস্তুর চাহিদা রয়েছে। এই পদানত দেশগুলি সুধু যে তাদের পণ্যদ্রব্যই কিন্বে তাই নয়—এরা যোগাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং খাদ্য দ্রব্য। আবশ্যক হলে এরা হবে প্রভু, রাষ্ট্রগুলির বাসিন্দাদের উপনিবেশ—তাদের বাড়্তি অধিবাসীদের স্থায়ী আস্তানা।

সাম্রাজ্যবাদের প্রথম দিকে এ ব্যবস্থা সুচারুভাবেই চল্ছিল। তখন মাত্র স্বল্প কয়েকটি রাষ্ট্র ছিল এই পথের পথিক। বৃটেনে শিল্প-বিপ্লবের উৎপত্তি; কাজেই নবযুগের সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত হচ্ছে গ্রেট-বৃটেন। ফলে গ্রেট-বৃটেন এমন এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে যার তুলনা ইতিহাসে নেই। ফরাসী ওলন্দাজ দিনেমার পর্তুগীজ প্রভৃতি জাতিরও ইউরোপের বাইরে অধিকার কিছু কম নয়। পরস্পরের সঙ্গে একটা আপোস ক'রে এরা সবাই যে যার অধিকার নির্ঝঞ্ঝাটে ভোগ করছিল;—এসিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার বহু অঞ্চলেই এই সাম্রাজ্যবাদী বণিক সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত হয়েছিল এবং এর অগ্রগতি ছিল অপ্রতিহত।

কিন্তু গোল বাধ্ল জার্মানীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে। বর্তমান জার্মানীর জন্মদাতা হচ্ছেন—অটো ফন বিসমার্ক।

তাঁরই প্রতিভা প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীতে এনে দেয় জাতীয় ঐক্য ; একটি অখণ্ড জার্মান রাষ্ট্র স্থাপনের কামনা রূপায়িত হয় তাঁরই কল্পনালোকে। এই কূট-কৌশলী রাষ্ট্রনায়কের চেষ্টায় আফ্রিকায় জার্মান অধিকার স্থাপিত হোলো বহু অঞ্চলে। জার্মানী হোয়ে দাঁড়াল অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে জেগে উঠ্‌ল এক তীব্র জাতীয়তা এবং তা চাইল জার্মানীকে পৃথিবীর প্রবলতম রাষ্ট্রে পরিণত করতে। যে কুহকে প্রলুব্ধ হয়ে মাসিডন-পতি আলেকজাণ্ডার ছুটে এসেছিলেন সুদূর পঞ্চনদের তীরে—যে মরীচিকা সীজারকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নীলনদের উপত্যকায়—যে আলেয়ার পিছনে ছুটে নেপোলিয়ন রাজ্যের পর রাজ্যে তাঁর জয়-পতাকা উড়িয়েছেন—সেই পৃথিবী ব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখ্‌ল জার্মানী কাইজার উইলহেল্‌মের অধিনায়কত্বে। ফলে রণদুন্দুভি বেজে উঠ্‌ল ইউরোপে এবং তার প্রাণকেন্দ্র হোলো জার্মানী। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চার বৎসর ধ'রে ইউরোপে যে নৃশংস নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হোলো তার গোড়ার কথা হচ্ছে এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে জার্মানীর উৎকট জাতীয়তাবোধ।

জার্মানীর উচ্চাভিলাষের সমাধি হোলো ভের্সাইতে। মিত্রশক্তিপুঞ্জের হাতে পরাজয় বরণ ক'রে জার্মানী বাধ্য হোলো ভের্সাই-সন্ধির শৃঙ্খল পরতে। জার্মানীকে নখদন্তহীন নিরীহ জীবে পরিণত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন-নি ভের্সাই-সন্ধির রচয়িতারা—বিশেষ ক'রে ফরাসী রাজনীতি-ধুরন্ধরেরা; চিরকালের মতোই জার্মানার বিষদাঁত ভেঙে দেওয়াই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। জার্মানীর উপনিবেশ হলো হস্তচ্যুত, সৈন্য-সংখ্যা হোলো নিয়ন্ত্রিত; তার বুকের ওপর চেপে বস্‌লো এক অসহ ঋণের বোঝা এবং ক্ষতিপূরণের দাবী। এ ছাড়া জার্মান, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান এবং রাশিয়ান সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর জেগে উঠ্‌ল কয়েকটি নাতি-বৃহৎ স্বাধীন রাষ্ট্র। এদের অস্তিত্ব সম্ভবপর হোলো মিত্রশক্তিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় এবং সহায়তায়। যদিও মিত্র-শক্তিবর্গ সোৎসাহে প্রচার করলেন যে, এতগুলি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হোলো সর্বজাতির আত্মকর্তৃত্ব-স্থাপন নীতির অনুসরণ করে (right of self-determination) ;—কিন্তু বস্তুত এ পরাজিত জার্মানীর (এবং তার সুহৃদ্‌বর্গের) ক্ষমতা হরণের প্রয়াস ব্যতীত কিছুই নয়। মহাসমরের অবসানে বৃটেনের গৌরব হোলো ঘরে-বাইরে সুপ্রতিষ্ঠিত ; কন্টিনেণ্টে ফরাসী প্রভাব হোলো অবিচলিত এবং সর্বজাতি-স্বীকৃত এবং জার্মান-মহিমা হোলো রাহুগ্রস্ত। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতাপ রইল অক্ষুণ্ণ।

সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে আবার পট পরিবর্তিত হয়েছে। জার্মানী আবার নববিক্রমে রাজ্য-বিস্তারে অগ্রসর হয়েছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভের্সাই সন্ধির সর্তাবলীর পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। জার্মানী তাকে কোনও দিনই সদ্ভাবে মেনে নিতে পারে-নি; কিন্তু তখন সে নিরুপায়। অক্ষম রোষে গজ্‌রান ছাড়া প্রতিকারের কোনো পন্থা তার চোখে পড়ে-নি। কিন্তু এই পরাজয়ে কাইজারের প্রাধান্যের অবসান ঘট্‌লেও জার্মানীর মনোবৃত্তির পরিবর্তন কিছুই হয়-নি। তার জাতীয় ঐক্য বরঞ্চ আরও দৃঢ় এবং গভীর হয়ে দাঁড়ায়। রাজকীয় শাসনতন্ত্রের (monarchy) অন্তিমদশা ঘনিয়ে এলেও সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের বিলোপ ঘটে-নি; যবনিকার অন্তরালে তার কামনার গগনস্পর্শী শিখা রইল সংগুপ্ত। সাম্যবাদী মতবাদের কিছু প্রসার ঘট্‌ল, কিন্তু তা ক্ষণিক দীপ্তি বিকীরণ ক'রে অচিরেই আত্মগোপন করলে। জার্মানীর উগ্র দেশাত্মবোধ, রণক্ষেত্রে ভাগ্য-বিপর্যয়-হেতু ক্ষুণ্ণ জাতীয় অহমিকা এবং সাম্যবাদী-পরিপন্থী-মনোভাব এই—ত্রিবিধ শক্তির সমন্বয়ে জার্মানীতে এক নতুন আন্দোলন বিস্তার লাভ করলে যা মহাযুদ্ধের পূর্বযুগের সাম্রাজ্যবাদের সমরোত্তর কালের রূপান্তর। নাৎসীবাদ বা National Socialism নামে এই মতবাদ সাম্প্রতিক কালে শান্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিট্‌লারের পরিচালনায় নাৎসী জার্মানী আজ গণতন্ত্রী বৃটেন এবং ফ্রান্সকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছে পোল্যাণ্ডকে উপলক্ষ ক'রে।

নাৎসী জার্মানীর অভিযান ভের্সাই সন্ধির অবিচার দূর করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এমন একটা ধারণা বর্তমান কালে বিস্তার লাভ করছে। এ হচ্ছে নাৎসী প্রচারকার্যের সাফল্যের পরিচায়ক। নাৎসী-আন্দোলন সাফল্যলাভ করবার পরেই বৃটেনের মনোভাব পরিবর্তিত

হয়েছিল জার্মানীর সম্বন্ধে। হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের আগেই জার্মানীর ন্যায়-সঙ্গত দাবী অনেক কিছুই মেটানো হয়েছে বিনা যুদ্ধে এবং বিনা হুমকিতে। জার্মানীকে জাতি-সঙ্ঘের সদস্য নির্বাচন (১৯২৬ সালে) মিত্রশক্তিপুঞ্জের জার্মানীর প্রতি পরিবর্তিত মনোভাবের ইঙ্গিত। এর আগে লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫) এই মৈত্রীভাব প্রসারের সহায়তা করেছে। স্টেস্‌মানের আমলে (Stresemann) ১৯৩০-এ রাইনল্যাণ্ড থেকে বৈদেশিক বাহিনী অপসারিত হয়। ব্রুইনিং (Bruning) এবং ফন পাপেন (Von Papen)-এর আমলে ক্ষতিপূরণের ভার তিরোহিত হ'ল। পাপেন-শ্লেশেরের (Papen-Schleicher) কালে মিত্রশক্তিবৃন্দ স্বীকার করল অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে জার্মানীর সামরিক ঐক্যের অধিকার।

হিট্‌লার এলেন জার্মানীর নতুন দুটি দাবী নিয়ে—মধ্য-ইউরোপে জার্মানীর অক্ষুণ্ণ অধিকার-বিস্তার এবং উপনিবেশের অংশ। জার্মানীর এই অভিলাষ নিয়ে পূর্বেই 'ভারতবর্ষে' আলোচনা করেছি। (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫—বর্তমান লেখকের 'এবার কার পালা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) নাৎসী জার্মানী ধুয়া ধরেছে—তাদের চাই 'বাঁচবার জায়গা' (living space)। 'Lebensraum' (লেবেন্স্রাউম) বা living space হচ্ছে সাম্প্রতিক ইউরোপ সুধু নয়—সমগ্র সভ্য জগতের সমস্যা। ১৯৩৮ সালে অগ্‌সবার্গে হিট্‌লার ঘোষণা করেছিলেন—"We must raise the demand for colonial living space. What people do not care to hear today they will be unable to ignore in a few years' time, and in four or five years they will have to take it into proper account." [উপনিবেশে বাঁচবার জায়গা আমরা চাইব-ই। আজ যা লোকে শুন্‌তে চাচ্ছে না কয়েক বৎসরের মধ্যে তা উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং চার-পাঁচ বছরের মধ্যে এ দাবী তাদের সমঝে চল্‌তে হবে।] জার্মানীর এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হয়েছে ডক্টর লে'র রচনায় যখন তিনি বল্‌ছেন—As long as Germany is a nation without sufficient space, we are not free. While a small number of British and a small number of French rule over more people than their population numbers, we Germans, who with 80 million people are the largest racial unit in Europe, have no colonial territory whatsoever ; without colonies we are not free. The French and British have small population but large possessions. We have large populations and no possessions [জার্মানীর মুক্তি সম্পূর্ণ হবে না যতদিন পর্যন্ত না তার যথেষ্ট পরিসর জোটে। মুষ্টিমেয় বৃটিশ, এবং মুষ্টিমেয় ফরাসী, তাদের জাতির লোক-সংখ্যার চেয়েও অধিকসংখ্যক লোকের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করছে, অথচ ৮ কোটি জার্মান—আমরা হলাম ইউরোপের গরিষ্ঠতম জাতি—আমাদের কোনই উপনিবেশ নেই। উপনিবেশ না হলে আমরা স্বাধীন নই। ফরাসী এবং বৃটেনের লোকসংখ্যা অল্প, অথচ তাদের আছে বিস্তীর্ণ উপনিবেশ। আমাদের লোকসংখ্যা প্রচুর—অথচ আমাদের রয়েছে উপনিবেশের অভাব।] 'আরও স্থান চাই'—এই বলে জার্মানী তার প্রাক্‌সামরিক কালের সীমান্ত রেখা ফিরিয়ে আন্‌তে তো চায়ই—আরও চায়, জার্মান ভাষা-ভাষী সমস্ত ব্যক্তিকে একই রাষ্ট্রের অধীনতায় একসূত্রে গ্রথিত করতে। এ দাবী প্রায়ই ন্যায়সঙ্গত নয় ; এবং ইতিহাস বহুক্ষেত্রেই জার্মানীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

এ যাবৎ হিট্‌লার তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধি করেছেন বিনা রক্তপাতে। রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র তাঁর কুক্ষিগত হয়েছে অথচ যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে নি—এর প্রধান কারণ হচ্ছে বৃটেনের উদাসীনতা। বৃটেন নিষ্ক্রিয় থাক্‌বে এই ভরসাতেই তিনি তাঁর নীতি নির্ধারিত ক'রে এসেছেন। জার্মানীর ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর কন্টিনেণ্টে ফ্রান্সের প্রভাব বিস্তার পায় অত্যন্ত বেশী ; এটি বৃটেনের বৈদেশিক-নীতি-বিরোধী ব্যবস্থা। কেন না, কোনও একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের বিপুল শক্তি সঞ্চয় বৃটেন চায় না। বৃটেন চায় ব্যালান্স অফ্‌ পাওয়ার বজায় রাখ্‌তে—বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধন করতে। তাই হিট্‌লার লিখ্‌ছেন তাঁর আত্মজীবনীতে—"However terrible have been and are the consequences for Germany of England's policy during the War, this must not blind us to the fact that *today it is no longer in the interest of England to see that Germany is crushed.* On the contrary, from year to year, English policy must be more and more directed to restricting the immo-

derate attempts of France to establish French hegemony over the Continent." [যুদ্ধের সময় অনুসৃত বৃটিশ নীতির ফল জার্মানীর পক্ষে যতই বিসময় হয়ে থাকুক না কেন, বর্তমানে জার্মানীর ধ্বংস বৃটেনের স্বার্থ-সম্মত নয়। বরঞ্চ, অদূর ভবিষ্যতে কন্টিনেন্টে ফরাসী প্রভুত্ব খর্ব করাতেই বৃটিশ প্রভাব নিয়োজিত হবে।] ১৯২৩-এ এরকম ধারণা পোষণ করতেন হিট্‌লার এবং অনেকেই মনে করেন তা একেবারে ভ্রান্ত নয়। ফ্রান্সের অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্তি ছিল বৃটেনের অনভিপ্রেত; সুতরাং নাৎসীবাদের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক কালে তাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন বৃটেন অনুভব করে নি। অথচ ১৯৩৬ সনের ৭ই মার্চ হিট্‌লারের ঝটিকা-বাহিনী যখন রাইনল্যাণ্ডে প্রবেশ ক'রে তা বিবিধ সমরোপকরণে সুসজ্জিত কর্‌ল তখন যদি বৃটেন বাধা দিত, তা হলে নাৎসী প্রভাব হয়ত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত।

ফরাসী প্রভাব প্রশমিত করা ছাড়া আরও একটি কারণে বৃটেনের জার্মানীকে বাধা দেওয়া ঘটে ওঠে নি; এবং তা হচ্ছে সাম্যবাদ-ভীতি। এক্ষেত্রে বৃটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে নীতির মিলন ঘটেছে। ফরাসী-বৃটিশ শাসক সম্প্রদায় নাৎসী জার্মানীর থেকে অনেক বেশী ভয় করে সাম্যবাদী রুশিয়াকে। এই ফ্যাসিস্ট্‌ মনোভাবাপন্ন শাসকবৃন্দ হিটলারকে [এবং কতকটা মুসোলিনীকেও] সাম্যবাদী ভাবধারা প্রসারের বিপক্ষে রক্ষাকবচ স্বরূপ গণ্য ক'রে এসেছেন। কোমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে এদের ছিল অটল বিশ্বাস। সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত বৃটেনের দৃঢ়ধারণা ছিল যে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না ক'রে জার্মানী কোনও দিন বৃটেন কি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না। কাজেই, হিটলার যে ইউরোপে সমরানল প্রজ্বালিত করবেন সোভিয়েটের সঙ্গে আপোষ ক'রে তা এদের পক্ষে ছিল কল্পনাতীত; এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়েই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁর ফ্যাসিস্ট্‌-তোষণ নীতি অনুসরণ ক'রে এসেছেন। শান্তি-সংহতি গঠন করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে সুধু এই রুশিয়ার আতঙ্কে।

ফ্যাসিজ্‌মের ঔদ্ধত্যকে দমন করবার একমাত্র বাস্তব উপায় ছিল শান্তিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একতা ও মিতালী-স্থাপন—প্রয়োজন ছিল গণতন্ত্রী ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির একটি সুচিন্তিত কর্মপন্থা অবলম্বন। কয়েক মাস আগে (১৫ই এপ্রিল) যখন বৃটিশ এবং রুশ সরকারের মধ্যে আপোষের আলোচনা সুরু হয় তখন যুদ্ধভীত জনমণ্ডলী উল্লসিত এবং আশান্বিত হযে উঠ্‌ল। কিন্তু তার অকারণ দীর্ঘসূত্রতা এ আলোচনার ব্যর্থতার দিকেই ইঙ্গিত করছিল। যখন আবার সামরিক কর্মচারিবৃন্দ এ আলাপনীতে যোগদান করতে আহূত হল তখন অস্তমান আশা-সূর্য আবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল; কিন্তু অচিরেই প্রতিপন্ন হ'ল, এ নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ রশ্মি মাত্র। নাটকীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি হলো নিষ্পন্ন—বৃটিশ-রুশ আলোচনা হ'ল ব্যর্থ (অগস্ট্‌, ১৯৩৯)।

রুশ-বৃটেন-ফরাসী-মিতালীর উপক্রমণিকা নিষ্ফল হওয়ার কারণ হচ্ছে বৃটেন এবং ফরাসীর সোভিয়েটকে অবিশ্বাস এবং এ সম্বন্ধে আন্তরিকতার অভাব। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে আতঙ্কিত করা। দুদিক থেকে আক্রান্ত হলে জার্মানীর অবস্থা যে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হবে তা জার্মানী নিজেই সবচেয়ে ভাল জানে। কাজেই শান্তি-সংহতি-গঠনের প্রয়াসকে, জার্মানীকে ঘিরে ফেল্‌বার (policy of encirclement) দুশ্চেষ্টা বলে জার্মান সংবাদপত্রগুলি অভিহিত করেছে। মনে করা গিয়েছিল যে, সাম্‌নে আসন্ন রুশ-বৃটেন-চুক্তিরূপ খড়্গ দোদুল্যমান থাক্‌লে জার্মানী তার দুর্মদ অভিযান সংযত করবে। কিন্তু অকস্মাৎ রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জার্মানী বুর্জোয়া রাষ্ট্রনেতাদের কর্‌ল হতভম্ব; পরিণামে জ্বলে উঠ্‌ল প্রলয়ের আগুন।

রুশ-জার্মান-চুক্তিকে ব্যঙ্গ ক'রে কেউ কেউ বল্‌ছেন—সোভিয়েট এবার কোমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এর জন্য কতকটা দায়ী ইঙ্গ-রুশ আলাপনীর বিফলতা। মলোটফ বলেছেন যে, এ আলোচনা যে ফলপ্রসূ হয়-নি তার কারণ এ চুক্তি সম্পাদনের অভিপ্রায় কোনও দিনই বৃটেনের ছিল না। ফলে অযোগ্য ব্যক্তির হাতে আলোচনার ভার দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যস্থতায় এমন একটি গুরুতর কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব ছিল। তা ছাড়া সোভিয়েট চেয়েছিল বৈদেশিক অত্যাচার নিবারণে চুক্তিবদ্ধ জাতিদের দায়িত্ব হবে পারস্পরিক। বৃটেন এবং ফ্রান্স বা তাদের আশ্রিত কোনও রাষ্ট্র (যেমন পোল্যাণ্ড, গ্রীস কিংবা রুমানিয়া) যদি

আক্রান্ত হয় তা হলে যেমন সোভিয়েট তাদের সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে, তেমনি সোভিয়েট বা তার সীমান্তবর্তী কোনও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হ'লে ফ্রান্স এবং বৃটেনকে এদের আনুকূল্যে যুদ্ধে ব্রতী হতে হবে। কিন্তু এই পারস্পরিক সহায়তা করতে বৃটিশ বা ফরাসী প্রতিনিধিরা ছিলেন নারাজ। তাঁরা চেয়েছিলেন জার্মানীর পক্ষে সোভিয়েটের সাহায্য; কিন্তু সোভিয়েটের সহায়তার সঙ্কল্প তাঁদের ছিল না। ফলে এই একদেশদর্শী চুক্তির প্রস্তাব গেল ভেঙে।

অপর পক্ষে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি আকস্মিক হ'লেও একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। সোভিয়েট পর-রাষ্ট্রসচিব লিটভিনফের পদত্যাগ রুশিয়ার বৈদেশিক-নীতির পরিবর্তন সূচিত করেছিল। সোভিয়েট একথা বার বার বলে এসেছে যে, কোমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তি বাস্তবিক পক্ষে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে উদ্যত নয়, তা হচ্ছে বৃটেন-ফ্রান্স-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সম্মিলন। এরা চায় বস্তুত বৃটেন ও ফ্রান্সের আধিপত্য বিলোপ এবং তার জায়গায় আপনাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। স্ট্যালিন তাঁর ১১ই মার্চের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমিতে, কি মাঞ্চুরিয়ার অরণ্যে বা মরক্কোর বনভূমিতে কিংবা ইথিওপিয়ার প্রান্তরে কোমিণ্টার্নের সন্ধানে অভিযান নিঃসন্দেহ হাস্যকর। বাস্তবিক, এই তথাকথিত সাম্যবাদী-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির অভিযান হচ্ছে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বিপক্ষে। হিট্‌লারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মানীর একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার। এ অভিলাষ পূর্ণ করতে গেলে সর্ব বিষয়ে এক বিশেষ নীতি অনুসরণ করা সব সময় সম্ভব না হতেও পারে। বরঞ্চ যেখানে স্বার্থের সঙ্গে আদর্শের, অভীষ্টের সঙ্গে নীতির বিরোধ ঘটে সেখানে কূটকৌশলী রাজনীতিবিদেরা আদর্শ এবং নীতিকে পরিহারই ক'রে থাকেন। হিট্‌লারও এই পন্থাই অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করেন-নি। যে রুশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর অহি-নকুল সম্বন্ধ, তারই সঙ্গে আজ হিট্‌লার মিতালী করেছেন তাঁর স্বার্থসিদ্ধির আশায়।

এই রুশ-জার্মান চুক্তি এবার ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবেশকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। হিট্‌লারের এবার লক্ষ্য ডানজিগের দিকে। এবং তা স্বল্প আয়াসেই তাঁর কবলে এসে পড়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার পর তাঁর শ্যেনদৃষ্টি যে এদিকেই পড়ছে তা বহুদিন আগেই জানা গিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত, ডান্‌জিগের অভ্যন্তরেও নাৎসী অনুচরবৃন্দ উদগ্র আগ্রহে রাইখের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে; অথচ এতদিন পর্যন্ত হিট্‌লার অপেক্ষা করছিলেন কেন? এর প্রধান কারণ ছিল বৃটেনের মতি-গতি সম্বন্ধে হিট্‌লার এবার স্থির-সিদ্ধান্তে আসতে পারেন-নি। আশা ছিল, এবারও হয়তো বা বিনা যুদ্ধে কাজ উদ্ধার হবে; হয়তো বা মিউনিক চুক্তির দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এতদিনে বৃটেন এবং ফ্রান্স তাদের ফ্যাসিস্ট-তোষণ-নীতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রনায়কেরা এবার বেশ বুঝেছেন যে, পোল্যাণ্ডকে সহায়তা করবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—যদি তার মর্যাদা না রাখা হয় তবে নাৎসীবাদের বেড়াজালে ধরা পড়বে সারা মধ্য-ইউরোপ; ফ্রান্স হবে শক্তিহীন এবং নির্বান্ধব বৃটেনের বিশাল সাম্রাজ্য অচিরেই কাহিনীতে পরিণত হবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনেকেরই আশা ছিল, হয় তো বা বৃটেন এবং ফ্রান্সের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে হিট্‌লার পিছিয়ে পড়বেন এবং অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত হবে।

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় হিট্‌লারের পক্ষে পিছিয়ে আসা অসম্ভব। ফ্যাসিস্ট্ শাসনযন্ত্র সামরিক মনোভাব নিয়ে রচিত। নাৎসী আমলে সারা জার্মানী একটা বিরাট সেনা-নিবাসে পরিণত হয়েছে। সমগ্র জাতি সৈনিক-সুলভ কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সুচারু প্রচারকার্যের ফলে তাদের মনে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তীব্র প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি—তাদের শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হচ্ছে অদম্য রণোন্মাদনা। তারপর, গত চার বছরের ইতিহাস—জার্মানীর বিজয় অভিযান—তাদের সঙ্কল্পকে করেছে দৃঢ়তর। বিজয়ের নেশায় অভিভূত হয়ে তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে চাইছে নব নব অভিযানের সূচনা করতে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ অনিবার্য। নাৎসী-নায়ক বা তাঁর তন্ত্রধারক কোনও জার্মান-নেতার আর ক্ষমতা ছিল না যে, এই রণ-পিপাসু নাৎসী-জার্মানীকে সংযত করতে পারেন—তাদের মহাসমরের পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করাতে সমর্থ হন। তাঁরা যদি সে প্রচেষ্টা করতেন তবে তাঁদের আসন উঠ্‌ত টলে এবং তাঁদের ক্ষমতা হত অচিরে বিলুপ্ত। অতএব বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ অনিশ্চিত জেনেও হিট্‌লারকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে সমর-সমুদ্রে।

এবার যে ঝড় উঠ্‌বে পোল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে তা বোঝা গেল যখন হিট্‌লার জার্মান-পোলিশ-চুক্তির অবসান ঘোষণা করলেন (মার্চ, ১৯৩৯)। পোল্যাণ্ডের একদিকে জার্মানী, আর একদিকে সোভিয়েট রুশিয়া। পোল-শাসক সম্প্রদায়ের কাছে এই দুইয়ের প্রভাবই অবাঞ্ছনীয়। তাঁরা না-ফ্যাসিস্ট্—না-সাম্যবাদী। কাজেই যখন ১৯৩৪ সালে জার্মানী প্রস্তাব করলে দশ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি কর্‌তে তখন সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পোল্যাণ্ড বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে-নি। একে একে যখন পোল্যাণ্ডের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ওপর জার্মানীর খড়্গ পড়্‌তে লাগ্‌ল তখনও পোল্যাণ্ড এই চুক্তির সর্ত স্মরণ ক'রে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়-নি। বরঞ্চ, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পোল্যাণ্ড আপনার অবস্থার উন্নতির চেষ্টা দেখল। বিগত মহাসমরের অবসানে লিথুয়ানিয়ার ভিল্‌না শহরটি কেড়ে নেয় পোল্যাণ্ড (১৯২০)—ফলে বিশ বছব এই দুই রাষ্ট্রের সীমান্ত ছিল রুদ্ধ। কিন্তু এই দুর্যোগে চরমপত্র দিয়ে পোল্যাণ্ড সেই পথ খুল্‌তে বাধ্য করেছে লিথুয়ানিয়াকে (১৯৩৮)। তারপর চেক্‌-বিভ্রাটের সময় জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে পোল্যাণ্ড গ্রাস করল তেসেন (Teschen) প্রদেশ। কিন্তু এতে পোল্যাণ্ড হোলো জার্মানীর বিরাগ-ভাজন। কেন না, ঐ ভূতপূর্ব চেক প্রদেশের মধ্যে রয়েছে বোহুমিন রেলওয়ে জংশন। বলকানে আক্রমণ চালাতে গেলে এটি জার্মানীর প্রয়োজন।

পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যখন জার্মানী মিতালী করে তখনও নাৎসী-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়-নি; চতুর্দিকে তখন জার্মান-বিরোধী সম্মিলন গড়ে উঠ্‌ছে। বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী জার্মানীর বিপক্ষে মিলিত হয়েছে এবং ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি তখন আসন্ন। আত্মরক্ষার প্রয়াসে নির্বান্ধব জার্মানী বন্ধুতা স্থাপন করতে চাইল প্রতিবেশী পোল্যাণ্ডের সঙ্গে। মার্শাল পিলসুদস্কি তখন পোল্যাণ্ডের ভাগ্যবিধাতা। তিনি তৎক্ষণাৎ ইতস্তত না ক'রে এ চুক্তি সম্পন্ন করলেন।

আজ আর পোল্যাণ্ডের সম্প্রীতি জার্মানীর কাম্য নয়—কেন না, সে চায় তাকে পদানত করতে। পাঁচ বছর আগের দুর্বল জার্মানী আজ অমিত বলশালী—তুচ্ছ পোল্যাণ্ডের বন্ধুত্বের আর কি মূল্য? চারটি পোলিশ অঞ্চলে জার্মানী তার দাবী উত্থাপন করলে—স্বাধীন নগরী ডান্‌জিগ, পোলিশ অলিন্দ (Polish Corridor), পোজেন প্রদেশ এবং আপার সাইলেশিয়া। এ চারটি অঞ্চলেই জার্মান ভাষা-ভাষী বাসিন্দার অভাব নেই এবং এককালে এরা জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এটাও ঐতিহাসিক সত্য। তবুও সর্বক্ষেত্রে এদের ওপর জার্মানীর দাবী ন্যায়সঙ্গত তা বলা চলে না।

ডান্‌জিগ বন্দরটির অবস্থান ভিশ্‌চুলা নদীর মোহানায়। এর ওপরে জার্মান প্রভাব সুস্পষ্ট। বহুবার ডান্‌জিগ হাত বদ্‌লেছে; কিন্তু মধ্যযুগের টিউটনিক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ছাপ আজও তার ওপর থেকে মিলিয়ে যায়-নি। অথচ ঐ হোলো পোল্যাণ্ডের সমুদ্রের দ্বারপথ। এ দ্বার রুদ্ধ হওয়া মানে পোল্যাণ্ডের আত্মহত্যা বরণ করে নেওয়া। তাই গত যুদ্ধের অবশেষে এটিকে জাতি-সঙ্ঘের অভিভাবকত্বে দেওয়া হয়েছিল স্বাধীনা নগরীর মর্যাদা। কিন্তু নাৎসীবাদের কল্যাণে ডান্‌জিগ হয়ে উঠ্‌ল মনে-প্রাণে জার্মান। কয়েকটি বিশেষ অধিকার ছাড়া এখানে পোল্যাণ্ডের কোনই প্রাধান্য ছিল না; তবু ডান্‌জিগ চাইল তৃতীয় রাইখের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে। পোল্যাণ্ডকে দাবান ছাড়া ডান্‌জিগ নিয়ে জার্মানীর বিশেষ কোন লাভ হবে না—কিন্তু তবুও একেই কেন্দ্র ক'রে জার্মানী বিশ্বব্যাপী মহাসমরের অবতারণা করেছে।

ডান্‌জিগের সমস্যা পোল্যাণ্ড বহুদিন আগেই উপলব্ধি করেছিল। তাই এ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিশ কোটি পাউণ্ড খরচ ক'রে পোল্যাণ্ড এক নতুন বন্দর গড়ে তুলেছিল পোলিশ অলিন্দে। 'ডিঙ্গেন' (Gdingen) বা গ্‌ডিনিয়া (Gdynia) এককালে ছিল একটি ছোট জেলেদের গ্রাম। আজ এটি একটি সমৃদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়েছে পোল-সরকারের চেষ্টায়। 'পোলিশ অলিন্দ' ব'লে যে ভূভাগটির ওপর জার্মানী দাবী জানিয়েছিল তা একটী সঙ্কীর্ণ অপ্রশস্ত জন-বিরল বালুকাময় অঞ্চল। অর্থনৈতিক দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তা সামান্য—কিন্তু তা পূর্ব-প্রুশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করেছে জার্মানী থেকে। একটি অখণ্ড জার্মান রাষ্ট্র গঠনের সে অন্তরায়। হতে পারে সে বাল্টিকের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের যোগ-সূত্র—অতএব, তার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু বলদৃপ্ত জার্মানীর কামনা—আত্মপ্রসার। কাজেই 'ডান্‌জিগ' এবং 'পোলিশ করিডর'

এ দুটিকে উদ্ধার করবার জন্য জার্মান বাহিনী দুর্বার বেগে আক্রমণ করলে পোল্যাণ্ড এবং পৃথিবীতে সূচনা করেছে এক মহাপ্রলয়ের।

জার্মানীর বিশাল-বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারে এমন ক্ষমতা ক্ষীণ-প্রাণ পোল্যাণ্ডের কোনও দিনই ছিল না। কিন্তু এবার তার সহায় বৃটেন এবং ফ্রান্স। তাদের ভরসায় সোভিয়েটের সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে পোল্যাণ্ড তার সমস্ত শক্তি সংহত করল জার্মানীর অভিযান প্রতিহত করতে। পোল্যাণ্ডে সুরু হ'ল মৃত্যুর তাণ্ডবনৃত্য। জার্মানী এ কথা ঠিকই জানত যে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে পোল্যাণ্ডকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা ঘটে উঠবে না। এই ভরসায় রুশের আক্রমণ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই ফ্যাসিস্ট্ জার্মানী অগ্রসর হলো পোল্যাণ্ড গ্রাস করতে। বৃটেন এবং ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন ক'রে সমরে প্রবৃত্ত হলেও জার্মানীর অভিযানের তীব্রতা কিছুমাত্র শিথিল হলো না। ক্ষিপ্রগতিতে জার্মান বিমান-বহর এগিয়ে এলো পোল-রাজধানী ওয়ারসর মাথার ওপর—তাদের অবিরাম গোলা-বর্ষণে শহরটি অচিরেই পরিণত হলো এক বিরাট ধ্বংস-স্তূপে। প্রায় তিন সপ্তাহ কাল আত্মরক্ষার তীব্র প্রয়াস ক'রে ওয়ারস আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হলো (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। বিভিন্ন অঞ্চলে অপূর্ব শৌর্য দেখিয়ে জার্মান-বাহিনীকে বাধা দিলেও পোল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত শত্রুর গতি-রোধ করতে অক্ষম হলো। ফ্যাসিজমের যে দানবীয় রূপ দেখা গিয়েছিল স্পেনে—তারই পুনরাবির্ভাব ঘটলো পোল্যাণ্ডে। পোল সরকার দেশ ছেড়ে আশ্রয় নিলেন রুমানিয়ার সীমান্তে। পঁচিশ বছর পরে পোল্যাণ্ডের অস্তিত্বের আবার অবসান হলো।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এবার জার্মানীর অগ্রগতি পেলো বাধা। পোল্যাণ্ডের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলো সোভিয়েট রুশিয়া। মহাসমরের অবসানে নব-গঠিত পোলিশ-রাষ্ট্রের যে সীমারেখা নির্দ্ধারিত হয়েছিল রুশ-পোল্যাণ্ড্ বিরোধের (১৯২০) ফলে তা আরও বেড়ে যায়। পোল্যাণ্ড্ পূর্বাঞ্চলে তার অধিকার-সীমা বিস্তৃত করে নেয় এবং হোয়াইট রুশিয়া এবং ইউক্রেনের কিছু অংশ এসেছিল তার কবলে। এই সংখ্যা-লঘু হোয়াইট-রাশিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ানদের সাহায্য-কল্পে লাল-ফৌজ এলো পোল্যাণ্ডের সমর-ক্ষেত্রে। হিটলারের ঘটলো উভয় সঙ্কট। সোভিয়েটের মৈত্রীই এখন তাঁর কাম্য। কেন না, সোভিয়েট যদি তার নিরপেক্ষতা বর্জ্জন ক'রে গণতন্ত্রী রাষ্ট্র দুটির সঙ্গে সম্মিলিত হয় তা হলে তার ফল জার্মানীর পক্ষে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে;—হয় ত ফ্যাসিজমের পতন হবে অনিবার্য। সুতরাং বার্ণার্ড শ'র ভাষায়, হিটলার পড়লেন স্ট্যালিনের মুঠোর মধ্যে। পোল্যাণ্ডের কয়েকটি প্রদেশ রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো। তার বিপক্ষাচরণ করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব হলো না—তাকে মেনে নিতে হলো তার চির-বৈরী সোভিয়েটের দাবী। হিটলার এবং স্ট্যালিন এবার একযোগে এক নতুন পোল-রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেছেন—তা হবে জার্মানী এবং সোভিয়েটের মধ্যবর্তী প্রহরী-স্বরূপ।

রুশিয়ার এই পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তন বস্তুত নাৎসী-স্বৈরাচারের তীব্রতা প্রশমিত করেছে। মধ্য-ইউরোপে জার্মানীর একচ্ছত্র আধিপত্য-বিস্তারের কল্পনা আপাতত আকাশ-কুসুমই রইল। রুমানিয়ার তৈলক্ষেত্রের দিকে নাৎসী-নায়কের যে লোলুপ-দৃষ্টি ছিল তা তাঁকে ফেরাতে হয়েছে এবং পোল্যাণ্ডে রুশিয়া এসে পড়ায় সেখানকার তৈলখনির শতকরা ৮০ ভাগ গেল হাতছাড়া হয়ে। রুশিয়া যদি এ ভাবে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ না হতো তা হলে সমগ্র পোল্যাণ্ড হতো জার্মানীর করতলগত - হয়তো বা রুমানিয়া এসে পড়ত তার কবলে। জার্মানীর সীমারেখা এসে মিলত সোভিয়েটের সীমান্তে; তাতে সোভিয়েটের নিরাপত্তা হতো বিপন্ন এবং নাৎসী প্রতাপ হতো সুদৃঢ়। এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও অন্যান্য বাল্টিক রাষ্ট্রে সোভিয়েটের প্রভাব-বিস্তারে আশঙ্কার কারণ জার্মানীরই সবচেয়ে বেশী—যে কোনও মুহূর্ত্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে দাবানল জ্বালাতে পারে নাৎসী জার্মানীতে। তাতে অন্তর্বিপ্লব জেগে উঠবে সেখানে এবং নাৎসীর স্বেচ্ছাতন্ত্রের হবে অবসান।

যুদ্ধ ও কংগ্রেস—

ইউরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই ওয়ার্দ্ধায় ভারতের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে। তৎপূর্ব্বে বড়লাটের সহিত মহাত্মার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাক্ষাৎ শেষে মহাত্মা যে বিবৃতি দেন, তাহাতে তাঁহার মনোভাব স্পষ্টই প্রকাশ পায়। তিনি নাৎসী ও ফাসিস্ত নীতির বিরোধী। গণতন্ত্রের পূজারী বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে ধ্বংস হইয়া যাইবে, বিশ্ব-সভ্যতার প্রতীক লণ্ডন ও প্যারিসের সৌধচূড়া শত্রু-পক্ষের বোমার আঘাতে ধূলায় লুটাইবে, ইহা কল্পনা করিতেও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার একান্ত অনুগত নেতৃবৃন্দকে লইয়া গঠিত হইলেও কমিটি এক্ষেত্রে তাঁহার মনোভাবের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ছাড়াও অন্যান্য প্রভাব-শালী নেতৃবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। সম্ভবত তাঁহাদের মতামতও ওয়ার্কিং কমিটির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণের এবং বৃহত্তর জনসমাজের কথাও কমিটিকে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পোল্যাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং যে নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বৃটেন এবং ফ্রান্স অস্ত্রধারণ করিয়াছে তাহারও প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এই যুদ্ধে ভারতের কর্ত্তব্য কি সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। বিপন্ন স্বাধীনতা ও বিপন্ন গণতন্ত্রের জন্য যে বৃটেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেই বৃটেনের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণার উপর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে।

সম্প্রতি বড়লাট পুনরায় মহাত্মা গান্ধীকে সিমলায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল আলোচনা হইয়াছে। এত দীর্ঘকাল আলোচনা উভয়ের মধ্যে আর কখনও হয় নাই। আলোচনার ফলাফল জানিবার উপায় নাই। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং যুদ্ধ সাব-কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালকে ৩রা অক্টোবর তারিখে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বড়লাট আমন্ত্রণ করিয়াছেন। মনে হইতেছে, এই সাক্ষাৎকারের পরেই কংগ্রেস বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিবেন।

লীগ ও বর্ত্তমান যুদ্ধ—

কংগ্রেসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুসলীম লীগও বারো শত শব্দ যুক্ত এক বিরাট প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। জিন্না সাহেবের দুই হস্ত—স্যার সেকান্দার হায়াৎ খাঁ এবং মৌলবী ফজলুল হক, ইতিপূর্ব্বেই বিনাসর্ত্তে বৃটেনকে ধন ও জন দ্বারা সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিভিন্ন প্রকার অর্থ করা হইতেছে। মৌলবী ফজলুল হক ইহাকে বিনাসর্ত্তে সাহায্যের আশ্বাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা বলিতেছেন, বিবিধ প্রকার কাল্পনিক দুঃখের তালিকা ছাড়া ইহাতে আর কিছুই নাই। অথচ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে উহাতে দর-কষাকষি যে করা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকে না। ইহার সত্যকার অর্থ যে কি, তাহা একমাত্র জিন্না সাহেবই বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি নীরব আছেন। এমন কি, বড়লাটের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াও সিমলা যাইতে পারেন নাই।

স্যার সেকেন্দার ও মিঃ জিন্না—

"সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটে" এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ মহাত্মাজি ও জিন্না সাহেবকে পরস্পর মিলিত হইয়া ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে,

ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্দ্ধা বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জিন্না সাহেবকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। জিন্না সাহেব সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। শুধু জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রতিষ্ঠানই নয়, চিন্তাশীল মুসলমান সমাজেই লীগ ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। ভারতের জাতীয়তার দিক দিয়া ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতা—

লর্ড-সভায় ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লর্ড জেটল্যাণ্ড বলিয়াছেন, কংগ্রেসের নেতারা পূর্ণতর স্বায়ত্ত শাসনের লক্ষ্য ঘোষণার জন্য বর্ত্তমান অবস্থার যে সুযোগ লইয়াছেন তাহা স্বাভাবিক হইলেও সময়োচিত হয় নাই। "আমাদের জীবন-মরণ সংগ্রামের সময় আমাদিগকে বিব্রত করিবার উদ্দেশ্যে কিছু করিবার জন্য যদি বর্ত্তমান সুযোগ বাছিয়া লওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ওই দাবীতে যতটা কর্ণপাত করিতে রাজি হইব, তাহার চেয়ে অনেক বেশী রাজি হইব যখন উপযুক্ত সময় আসিবে।" উপযুক্ত সময় বলিতে তিনি সম্ভবত যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "কোন বিশেষ সময়ে উচিত ও সম্মানজনক ব্যবহার বৃটিশ জাতি স্মরণ করিয়া রাখে।"

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা স্মরণ হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ বৃটেনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। এই উচিত ও সম্মানজনক ব্যবহারের বিনিময়ে তদানীন্তন ভারত সচিব মণ্টেগু সাহেব যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী যে মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা সন্তোষজনক হয় নাই। গোল টেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন (বর্ত্তমানে লর্ড হ্যালিফাক্স) "ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের" যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন-আইনে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড একটা ভুল করিয়াছেন। যুদ্ধে বৃটেনকে বিপন্ন দেখিয়াই কংগ্রেস স্বায়ত্ত শাসনের দাবী জানায় নাই। লর্ড স্নেলও স্বীকার করিয়াছেন, "এই সব দাবী কিছু নূতন নয়। ইহা তাঁহাদের পুরাতন কর্ম্মসূচীর একটা অংশবিশেষ। দাবীগুলি শুধু নূতন করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে।" সুতরাং যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণের কথা উঠিতেই পারে না। পণ্ডিত জওহরলাল স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, "দর-কষাকষির কোনো অভিপ্রায় আমাদের নাই। স্বাধীনতার দাবীর সহিত দর-কষাকষির সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না।"

আমরা জানি না, ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে ভারত সচিব যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই বৃটিশ জনসাধারণের অভিমত কি-না। বিলাতী সংবাদপত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব ভারতের দাবীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর লিণ্ডসেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 'নিগেটিভ্ য়্যাটিচিউড্'-এর বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করিয়া বিশ্বের নূতন রূপের অনুবর্ত্তী ধারায় চিন্তা করিতে সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন।

মহাত্মার উত্তর—

লর্ড জেটল্যাণ্ডের বিবৃতির উত্তরে মহাত্মাজি এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ স্পষ্টতার সহিত বলিয়াছেন, "বৃটেন সকলের স্বাধীনতার জন্যই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, এ কথা সত্য হইলে তাহার প্রতিনিধিদের অতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা আবশ্যক যে, ভারতের স্বাধীনতাও তাহার অন্তর্ভুক্ত। এই স্বাধীনতার স্বরূপনির্ণয়ও একমাত্র ভারতীয়েরাই করিতে পারে।" কংগ্রেসের দাবীর বিরুদ্ধে লর্ড জেটল্যাণ্ড যে অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজি বলিয়াছেন, "আমার বক্তব্য এই যে, এইরূপ ঘোষণার দাবী করিয়া কংগ্রেস কোন অদ্ভুত বা অসম্মানজনক কাজ করে নাই। স্বাধীন ভারতের সহায়তারই মূল্য আছে। সুতরাং কংগ্রেস যাহাতে লোকের নিকট গিয়া বলিতে পারে যে, যুদ্ধের শেষে বৃটেনের স্বাধীনতার যতটা নিশ্চয়তা থাকিবে, ভারতের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা তদপেক্ষা কম থাকিবে না। বৃটিশ জাতির বন্ধু হিসাবে আমি বৃটিশ রাজনীতিকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বের ভাষা ভুলিয়া গিয়া নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবেন।"

মহাত্মার এই উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। লর্ড জেটল্যাণ্ডের উক্তিতে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীর সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। যে সময় বড়লাট ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনায় লিপ্ত, যে সময় সকলেরই চিত্ত বৃটেনের প্রতি ধীরে ধীরে অনুকূল হইয়া আসিতেছে, সেই সময় লর্ড জেটল্যাণ্ডের এই বক্তৃতা সময়োচিত হয় নাই।

পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স বাঙলা গভর্ণমেণ্টকে পাটের নিম্নতম মূল্য আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুবোধ করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য পাটের রপ্তানি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মিল-ওয়ালারাই কাঁচা পাটের একমাত্র খরিদ্দারে দাঁড়াইয়াছেন। নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া তাঁহারা পাটের উচ্চতম মূল্য ৭৷৷০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ফলে ফাটকা বাজারে পাটের দর চার-পাঁচ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। কাঁচা পাটের খরিদ্দার না থাকিলেও চটের বস্তার চাহিদা ক্রমেই বাড়িতেছে। সুতরাং পাটের দর নামিয়া যাওয়া অন্যায়! আমরা আশা করি,

বাঙলা সরকার এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অচিরেই অবলম্বন করিবেন।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই চাল-ডাল-নুন-তেল হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধপত্র পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যের মূল্য কোথাও দ্বিগুণ, কোথাও বা তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ অধিকতর লাভের আশায় মাল বিক্রয় বন্ধ করিয়া মজুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সকল প্রদেশেই এই একই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। সকল প্রদেশের গবর্ণমেণ্টই অসাধারণ তৎপরতায় ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যবসায়ীদের অন্যায় লোভ সংযত করিয়া দিয়াছেন। বাঙলা সরকার লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়াইতে পারা যাইবে না বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ফলে জিনিস-পত্রের দাম অসম্ভব রকম চড়িতে পায় নাই। নানা ভাবে সরকারের উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট একজন আই-সি-এসের সভাপতিত্বে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও বাহির হইতে বারোজন সদস্য লইয়া একটি মূল্য-নিয়ন্ত্রণ পরামর্শ কমিটি গঠন করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ক্যাশমেমো দিতে চাহিতেছে না। নুন, চাল প্রভৃতির ক্যাশমেমো পাওয়া যায় না। খরিদ্দারের পক্ষে সর্ব্বক্ষেত্রে অভিযোগ করাও সম্ভব নহে। সরকারের লোক নিযুক্ত করিয়া বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্রমশই মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। কাগজ প্রভৃতির মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান আর যেন মূল্য বৃদ্ধি করিতে ভীত নহে। বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের ইহা রোধ করার চেষ্টা করা উচিত।

হিন্দু নেতৃবর্গের প্রতি অশিষ্টতা—

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবর্গ কুমিল্লায় শফরে গেলে একশ্রেণীর মুসলমান জনতা ছাত্রদের সহযোগে তাঁহাদের গাড়ী আক্রমণ করিয়া যে গুণ্ডামি করিয়াছিল, আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, যে সম্বন্ধে তদন্তের জন্য মৌলবী ফজলুল হক সাহেব স্বয়ং কুমিল্লা গিয়াছেন। মৌলবী ফজলুল হক সাহেব নিজেকে বাঙ্গলার মুসলমান সমাজের একচ্ছত্র নেতা বলিয়া মনে করেন। যাহারা কুমিল্লায় এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে তাহারা যে রাজনৈতিক মতবাদের জন্যই করিয়াছে এরূপ সন্দেহ করা স্বাভাবিক। সুতরাং এই শোচনীয় ঘটনার অত্যল্প পরেই স্বয়ং কুমিল্লা যাত্রা করিয়া হক সাহেব যে তাঁহার নেতৃত্বের মর্য্যাদা রক্ষায় যত্নবান হইয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা আশা করি, তাঁহার চেষ্টায় এই ঘটনার যথোপযুক্ত তদন্ত ও প্রতিকার হইবে।

ভারতবর্ষ ও বৃটেন—

ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার ফলে ভারতের সর্ব্বস্তরে একটা বিশেষ চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইহা বৃটেনের ভারত সম্বন্ধে সত্যকার অভিমত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বৃটিশ জনসাধারণের সত্যকার অভিমত কি আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে বিলাতের দুইখানি পত্রিকায় যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান এণ্ড নেশন" বলিতেছেন :

> "কংগ্রেস এখন আর দায়িত্বহীন বিরুদ্ধবাদী একটা দলমাত্র নয়। আজ জগৎসমক্ষে ভারতবর্ষের নিকটে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে,—এই যুদ্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য, না বর্ত্তমান ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্য কায়েম রাখিবার জন্য? ভারতবর্ষকে আপন ভাগ্যনিয়ন্তা জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রতিশ্রুতি আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিতেই হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে নামে না হোক, কার্য্যত ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি করিলে আমরা ভারতবর্ষকে স্বপক্ষে পাইব, এবং সভ্য জগৎ আমাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিবে। ওয়াশিংটন হইতে মস্কো পর্য্যন্ত সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমরা কি জন্য যুদ্ধ করিতেছি? আমরা যদি ভারতকে স্বাধীনতা দান করি, তাহা হইলে একটা স্বাধীন জাতির নেতৃত্ব আমরা লাভ করিব। আর যদি আমরা ভারতকে দমিত রাখি, তাহা হইলে ইউরোপ বা আমেরিকায় কেহ কি ভুল করিয়াও ভাবিবে আমার গণতন্ত্রের সমর্থক?"

"ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান" একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

> "ভারতের কংগ্রেস এই দাবী করিয়াছে যে, বৃটেন যদি এই যুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অধিকারসমূহ রক্ষা করিবার জন্যই ব্রতী হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের ব্যাপারেও বৃটেনকে ওই নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। বৃটিশ সরকার যদি মনে করেন যে, মহাত্মা গান্ধী এই দাবী উত্থাপনকারী কংগ্রেসের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবেন না, তাহা হইলে তাঁহারা গুরুতর ভ্রমে পতিত হইবেন। আমাদের সম্মুখে এক বিরাট সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সরকারকে এই সপ্তাহেই একথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যদি পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতের পূর্ণ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতাই অর্জ্জন করিতে চাহেন।"

বিলাতের প্রগতিপন্থী সংবাদপত্রের সুর এই প্রকার হইলেও বিরুদ্ধ সুর গাহিবার পত্রিকারও অভাব নাই।

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ঃ

মুসলিম—৩১৯

হিন্দু—৯০ ও ২০৪

হিন্দুদল ১ ইনিংস ও ৮৪ রানে পরাজিত হ'য়েচে।

নাওমল

হিন্দুদল টসে জিতে ব্যাট ক'রতে নামে কিন্তু লাঞ্চের আগেই মাত্র ৯০ রানে সকলে আউট হ'য়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি ও এত কম রানে তাদের ইনিংস শেষ হবে তা কেউ ভাবতেই পারেনি। সর্ব্বোচ্চ রান ক'রেচেন আম্বেপ ৩৬। মুসলিম বোলারদের কৃতিত্ব অদ্ভুত; লাক্‌ড়া মাত্র ১২ রানে ৪টে ও লানেওয়ালা ২৮ রানে ৩টে উইকেট পেয়েচে।

মুসলিমরা ইনিংস শেষ ক'রলো ৩১৯ রানে। লাক্‌ড়া ৮১ রান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট্ আউট রইলো; ব্যাট ও বলে সে সমান কৃতিত্ব দেখিয়েচে। আব্বাস খাঁ ৫৮ এবং দাউদ খাঁর ৪৬ রানও উল্লেখযোগ্য।

২৮৯ রান পিছিয়ে হিন্দুরা দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ ক'রলো। আরম্ভ এবারও ভাল হ'ল না। ৩৫ রানে ৩টে উইকেট পড়ে গেল। দীপচাঁদ ও গোপাল দাস এসে খেলা একটু ঘোরালে। তাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দীপচাঁদ ৫৯ ও গোপালদাস ৪১ রানে আউট হ'ল। হিন্দুদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল ২০৪ রানে। হায়দার ৫২ রানে ৩টে উইকেট পেয়েচে।

গোপাল দাস

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য বাঙ্গলা থেকে আগামী বারের রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখবার জন্য যে প্রস্তাব করা হয় তাতে বোম্বাই, মাদ্রাজ, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ষ্টেট্, বরোদা, দিল্লী, মহারাষ্ট্র, বিহার ইউনাইটেড প্রভিন্স, নওনগর ও হায়দ্রাবাদ প্রতিযোগিতা বন্ধ না করার পক্ষপাতী। মহীশূর ও এন, ডবলউ, এফ সি বাঙ্গলাকে সমর্থন ক'রেচে।

প্যালেষ্টাইন ফুটবল দল। ইঁহারা অষ্ট্রেলিয়া অভিযানের ফেরত পথে বোম্বাইয়ে কয়েকটি প্রদর্শনী খেলা খেলেছেন

জো'লুইয়ের সাফল্য ঃ

পৃথিবীর হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপের আর এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী বব্ পাষ্টোরকে পরাজিত ক'রে জো'লুই স্বীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেচেন। দর্শক সংখ্যা হ'য়েছিল চল্লিশহাজার।

জো'লুই

জেমস ব্রাডডকের কাছ থেকে চ্যাম্পিয়ানসিপ কেড়ে নেবার পর থেকে দু'বছরে জো'কে এবার নিয়ে আট বার নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য লড়তে হ'য়েচে। তার ফলে নাথান ম্যান, হ্যারি টমাস, টমি ফার, ম্যাক্স স্মেলিং হেনরী-লুই, জ্যাকরপার ও টনি গ্যালেণ্টোকে ইতিপূর্ব্বেই পরাজিত হ'তে হ'য়েচে। মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে এটি একটি নূতন রেকর্ড।

অনেকের মতে বব্ পাষ্টোরই নাকি জো'র সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। এগার রাউণ্ড লড়ে জো' তাঁকে হারাতে সক্ষম হ'ন।

জো' প্রথম থেকেই ভীষণভাবে লড়তে আরম্ভ করেন, ফলে বব্‌কে অল্পক্ষণের জন্য চারবার ভূতলশায়ী হ'তে হয়।

ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের সাধারণ বয়েজ স্কাউটসের ২০০ মিটার রীলে রেস বিজয়ী প্রথম-একাদশ ক্যালকাটা ট্রুপ্
ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সপ্তম রাউণ্ডের পর থেকে জো'কে একটু ক্লান্ত মনে হ'তে লাগলো। এই সময় বব্ প্রাণপণে লড়তে আরম্ভ করেন, এবং ৮ম, ৯ম ও ১০ম রাউণ্ডে চ্যাম্পিয়ান জো'কে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করেন। ১০ম রাউণ্ডে দর্শকরা দেখে বিস্মিত হ'লো যে বব্ লুইকে মারতে মারতে দড়ির ধারে নিয়ে গেছেন।

লাহোরের ইণ্টার-ন্যাসানাল মল্লযুদ্ধে রত মিচেল গিল (ইংলণ্ড) ও নাজিম (ভারতবর্ষ); তৃতীয় রাউণ্ডে মিচেল গিল পরাজয় স্বীকার করেছে

প্রতিশোধ তুলতে জো' পরের রাউণ্ডে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করলেন যে, ফলে বব্‌কে ভূতলশায়ী হ'তে হ'লো।

লক্ষ্মীবিলাস

বি জি প্রেস ৩-১ গোলে বার্ম্মাসেলকে হারিয়ে লক্ষ্মী-বিলাস শীল্ড বিজয়ী হ'য়েচে। বি জি প্রেসের পক্ষে কে চ্যাটার্জ্জি ২ ও ডি ব্যানার্জ্জি

১ এবং বার্ম্মাসেলের পক্ষে কামিং ১ গোল করেন। বার্ম্মাসেল পেনাল্টি পেয়েও গোল দিতে পারেনি।

ভার্সিটি বাচ প্রতিযোগিতা ঃ

বাচ প্রতিযোগিতার লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ ও নক্ আউট টুর্ণামেণ্টে বিজয়ী হ'য়ে বিদ্যাসাগর কলেজ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচে। লীগে তারা প্রত্যেকটি খেলায় জয় লাভ করে। টুর্ণামেণ্ট ফাইনালে তারা সেণ্ট জেভিয়ার্সের কাছে অতি সহজে দেড় লেংথে বিজয়ী হয়।

ইউনিভার্সিটি বাচ-প্রতিযোগিতার লীগ ও নক্-আউট বিজয়ী বিদ্যাসাগর কলেজ দল, উভয় ট্রফী সঙ্গে

বিদ্যাসাগর		সেণ্ট জেভিয়ার্স
এ ব্যানার্জ্জি	'বো'	কৃষনান্
এন চ্যাটার্জ্জি		সি এস পাই
পি সেন		এস দে
এস মুখার্জ্জি		এস চক্রবর্ত্তী
এস মুখার্জ্জি	'কক্স'	জে এম কাউল

গভর্ণরস্ শীল্ড ঃ

হাজারীবাগের প্রদর্শনী খেলায় মোহনবাগান ১৯৩৭ ও ৩৮ সালের রোভার্স বিজয়ী বাঙ্গালোর মুসলিমকে ৪-০ গোলে পরাজিত ক'রে গভর্ণরস্ শীল্ড বিজয়ী হ'য়েচে। বাঙ্গালোর মুসলিম মোহনবাগানের কাছে দাঁড়াতেই পারে নি। মোহনবাগানের পক্ষে গোল ক'রেচেন এ রায় চৌধুরী ২, জে ঘোষ ও এ দে। বিমল, প্রেমলাল ও এস মিত্র খেলায় যোগদান ক'রতে পারেন নি। বাঙ্গালোর মুসলিমের পক্ষেও তাদের দু'জন নিয়মিত খেলোয়াড় খেলেনি।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ ঃ

মোহনবাগান ১-০ গোলে ডালহৌসীকে পরাজিত ক'রে লক্ষ্মীবিলাস কাপ বিজয়ী হ'য়েচে। এস মুখার্জ্জি গোল দেয়।

ঢাকার বাচ-প্রতিযোগিতা বিজয়ী জগন্নাথ ইণ্টার কলেজ

ইউনিভার্সিটি নক্ আউট টুর্ণামেণ্ট ঃ

ইউনিভারসিটি নক্ আউট টুর্ণামেণ্টে রিপণ কলেজ ৩-২ গোলে সিটি কলেজকে পরাজিত ক'রে ডাক্তার হেরম্ব মৈত্র শীল্ড বিজয়ী হ'য়েচে। সিটি কলেজ ডাক্তার ইওয়ান কাপ পেয়েচে।

হেরম্বচন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড বিজয়ী রিপণ কলেজ ফুটবল দল

মহেন্দ্র কাপ ঃ

দিল্লীর বিখ্যাত মহেন্দ্র কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ঢাকা ফার্ম্ম ২-১ গোলে দিল্লী চ্যাম্পিয়ানকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েচে। ঢাকার পক্ষে জলিল তুটি গোল দেয়।

সরযু কাপ ঃ

কাষ্টমস রিক্রিয়েশন বেঙ্গল কেমিক্যালকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েচে। বিজয়ী দলের পক্ষে সীম্যান গোল করেন।

ইউ এস এ টেনিস ঃ

ইউ এস এ টেনিস প্রতিযোগিতায় ববি রিগস্ ও কুমারী এলিস মার্ব্বেল যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গল বিজয়ী হ'য়ে উইম্বলডনের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেচেন। ববি রিগস্ ৬-৪, ৬-২, ৬-৪ গেমে ভন্ হর্ণকে পরাজিত ক'রেচেন।
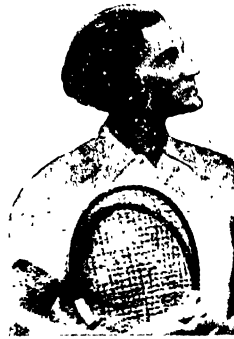
হেলন জ্যাকব

কুমারী এলিস মার্ব্বেল ৬-০, ৮-১০ ও ৬-৪ গেমে কুমারী হেলেন জেকবকে পরাজিত ক'রে বিজয়িনী হ'য়েচেন।

মার্ব্বেল রিগস

ইণ্টার কলেজিয়েট সুইমিং ঃ

এবার ইণ্টার কলেজিয়েট সুইমিং প্রতিযোগিতায় তিনটি বিষয়ে নূতন রেকর্ড স্থাপিত হ'য়েচে।

বিদ্যাসাগর কলেজের সন্তোষ চ্যাটার্জ্জি ¼ মাইল ফ্রি ষ্টাইলে ৬ মিঃ ১৯⅘ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নূতন রেকর্ড ক'রেচেন। ১০০ মিটার ব্রেক ষ্ট্রোকে এইচ ব্যানার্জ্জি ১ মিনিট ২৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে নূতন রেকর্ড করেচেন। ইনি এবার নিয়ে পর পর তিনবার উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হ'লেন।

রিপন কলেজ ৩×১০০ মিটার রীলে রেস ৪ মিঃ ২৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে নূতন রেকর্ড ক'রেচে।

টীম চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়েচে রিপন কলেজ।

তালতলা ইনষ্টিটিউট স্পোর্টসের এক লেংথ পিট সাঁতার (জুনিয়ার) বিজয়ী প্রতীপ মিত্র (ন্যাসনাল) ; সময়—১ মিনিট ৭⅘ সেকেণ্ড রেকর্ড) ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

ইণ্টার-কলেজিয়েট বাস্কেট বল লীগ চ্যাম্পিয়ন ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন ছবি—ডি রতন এণ্ড কোং

মেয়েদের বাস্কেট বল ঃ

মেয়েদের ইণ্টার কলেজিয়েট বাস্কেট বল লীগ প্রতিযোগিতায় ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন বিজয়িনী হয়েছে। গতবারেও তারা বিজয়িনী ছিল। লীগের সব খেলাতেই তারা জয়লাভ ক'রেছে। বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে জিততে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হ'য়েছিলো, ১৯-১৬ পয়েণ্টে জেতে। মেডিক্যাল কলেজ একটিও পয়েণ্ট না পেয়ে শেষ স্থান অধিকার ক'রেছে।

স্কটিসচার্চ কলেজ দল। মেয়েদের বাস্কেট বল লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে

ব্রাব্রোর্ণ কাপ ঃ

ব্রাব্রোর্ণ কাপ প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু বিশেষ লোক সমাগম হচ্ছে না। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাতেও লোক নেই। প্রথম খেলা অপেক্ষা তাদের দ্বিতীয় খেলাতে কিছু ভিড় হ'য়েছিল, সভ্যদের গ্যালারীরও বহু অংশ খালি ছিল। সে উত্তেজনা, উল্লাস, চীৎকার কিছুই নেই। দুটো করে খেলা এক দিনে এক মাঠে হয়েছে। কোন কোন দলকে পর-পর দু' দিনও খেলতে হয়েছে। আই এফ এর অধীনে খেলতে হলে ঐ নিয়েই কত গোলযোগের সৃষ্টি হতো। এতগুলি দল কোথায় লুকিয়ে ছিল। উদ্যোক্তাদের বাহাদুরী আছে স্বীকার করতেই হবে, দেশ-বিদেশ থেকে এতগুলি (খ্যাত নাই হোক) দলকে সংগ্রহ করা সহজ কথা নহে।

রেফারিং কি নিখুঁত হচ্ছে—উদ্যোক্তরা কি বলেন ? আই এফ এর মতনই রেফারিংয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে। হওয়াই সম্ভব, নিখুঁত রেফারিং বিলাতেও হয় না। খেলোয়াড় দণ্ডিত ও সতর্কীত হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মাসুদ অন্যদলের হয়ে খেলে রেফারি সিরাজীর সঙ্গে বাগবিতণ্ডা করায় মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হয়। সিংহল দল ব্যতীত নামজাদা একটি দলও আসেনি, বা এপর্য্যন্ত একটিও উৎকৃষ্ট বিশেষ প্রতিযোগিতা-মূলক খেলা হয় নাই। কেবল ভিজাগাপট্টম আগত মর্ণিং ষ্টার দলের খেলাটি দর্শনীয় হয়েছিল। তারা প্রথমার্দ্ধে একগোলে অগ্রগামী থেকেও ৩-১ গোলে মহামেডানদের কাছে হেরে গেছে। রেফারির অবিবেচনায় তাদের বিপক্ষে পেনালটি দেওয়া হ'লে মহামেডানরা গোল শোধ করতে পারে। শেষার্দ্ধে আত্মরক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা তাদের ভুল হয়, তাতেই খেলার গতি ঘুরে যায়।

ইষ্টবেঙ্গল ৪-১ গোলে জয়ী হয়েও রেফারির অযোগ্য পরিচালনার জন্য সিংহল একাদশের সঙ্গে পুনরায় খেলতে বাধ্য হয়েছে। পরিচালক প্রথমার্দ্ধে ৫ মিনিট কম খেলিয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোলটি আউট থেকে বল মাঠে টেনে নিয়ে করা হয়। রেফারিং যথা পূর্ব্বং তথা পরং—বিদ্রোহী দলরা কি আবার বিদ্রোহ করবেন? এ খেলাতেও লোক সমাগম আশানুরূপ হয় নি।

এই প্রতিযোগিতায় দেখা যায়, মুসলমান দলের ও মুসলমান খেলোয়াড়দের প্রাধান্যই বেশী।

ইষ্টবেঙ্গল দলে এরিয়ান্সের প্রসাদ ও ডি ব্যানার্জ্জিকে খেলতে দেখা গেছে। জোসেফ কালীঘাটের হয়ে খেলে আবার ইষ্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছে। বি এফ এর কি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-কানুন নেই ? এস দেবরায় মোহনবাগান থেকে ন্যাসনাল স্পোর্টিসে খেলেছে। প্রথমে বি এফ এতে যোগদান সম্বন্ধে সে প্রতিবাদ করে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাকে খেলতে দেখা গেল! এ পর্য্যন্ত তিনটি বিদ্রোহীদলের খেলোয়াড় ব্যতীত ২৩জন বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড় ব্রাবোর্ণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। খেলোয়াড়রা যে কিসের লোভে অন্য দলে সুবিধা পেলেই ভিড়ে পড়ে তা' বুঝতে কারো বাকী নেই। অথচ সবাই অবৈতনিক খেলোয়াড় শ্রেণীভুক্ত হয়ে আছে। এখনও পেশাদারী ও অবৈতনিকের পৃথক শ্রেণী ভাগ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বি এফ এর প্রদর্শনী খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং অবশিষ্ট দলের কাছে এক গোলে পরাজিত হয়েছে। এ'টি বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ ও উচ্চদরের খেলা হয়েছিল। দর্শক সমাগম খুব বেশী হয় নি। সিংহলের আরিফ ঐ একমাত্র গোলটি দেয়। মহমেডানরা অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে। অবশিষ্টের বিরুদ্ধে পি দাশগুপ্তের হ্যাণ্ডবল দেওয়া অনুচিত হয়েছিল।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ প্রণীত "কারটুন"—১।০
রেজাউল করীম প্রণীত "জাতীয়তার পথে"—২৲
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "চৌ চৌ"—২৲
শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী প্রণীত "আমার ধর্ম্ম"—।০ ও "ছেলেদের গীতা"—।৵০
মিঃ সি রবার্টস্ সম্পাদিত "What India Thinks"—৭৲
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত উপন্যাস "পরকীয়া"—১।০
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তুহুঁ মম জীবন"—২৲
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গীতাভিনয় "পুষ্প-সমাধি"—১॥০
শ্রীসন্নিতকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অহি-নকুল কথা"—১৲
শ্রীবিশ্বনাথ সান্যাল প্রণীত "রন্ধ্রগত শনি"—১৲
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় প্রণীত ছোটদের গল্প "বলি ত হাসব না"—।৵০
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রতন দীঘির জমিদার বধূ"—২৲
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "প্লাবন"—২॥০ ও "আবহাওয়া"—২৲
আবদুল কাদের প্রণীত "তুরস্কের ইতিহাস, ২য় খণ্ড"—২৲
শ্রীমতী দীপিকা দে প্রণীত উপন্যাস "কামরূপের মেয়ে"—২॥০
শ্রীসুকুমার দে সরকার প্রণীত ছেলেদের "অরণ্য রহস্য"—।৵০
শ্রীগোপাল ভৌমিক প্রণীত ছেলেদের গল্প "দেশী ও বিলাতী"—।০
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত ছেলেদের গল্প "ময়দানবের বাতি"—।৵০
শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত সংস্কৃত মূলসহ "পঞ্চগীতা"—১।০
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "আগে ও পরে"—১॥০
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "একান্ত গোপনীয়"—১৲
শ্রীমহেন্দ্র দত্ত প্রণীত নাটক "অভিযান"—১৲
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ছেলেদের "দুর্য্যোগের মাঝে"—।৵০
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ছোটদের "ওল্ড কিউরিসিটি শপ"—৸০
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্বপ্রাপ্তি"—॥০
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত উপন্যাস-সংগ্রহ "উপচয়নী"—৫৲
প্রসাদচন্দ্র দে প্রণীত উপন্যাস "মলিনা"—১৲
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত সচিত্র ভ্রমণকাহিনী "মলয় যাত্রী"—১।০
শ্রীপ্রকাশকুসুম বড়ুয়া প্রণীত "নারী—বিভিন্ন রূপে"—১৲
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত প্রণীত "রত্নমন্দির"—॥০
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "কোণার্ক মন্দির"—॥০
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "জয়ন্তী"—২॥০
শ্রীসরোজকুমার নন্দী প্রণীত উপন্যাস "প্রকৃতির পুতুল"—১।০
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত "পৃথিবী ছাড়িয়ে"—১৲
শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ দেবশর্ম্মা প্রণীত "ছেলেদের বারভুঁইয়া"—৸০
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "শনি-রবি-সোম"—১৲

সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjee & Sons.

শিল্পী- শ্রীযুক্ত সর্বেশ্বর সাহ

দীপান্বিতা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
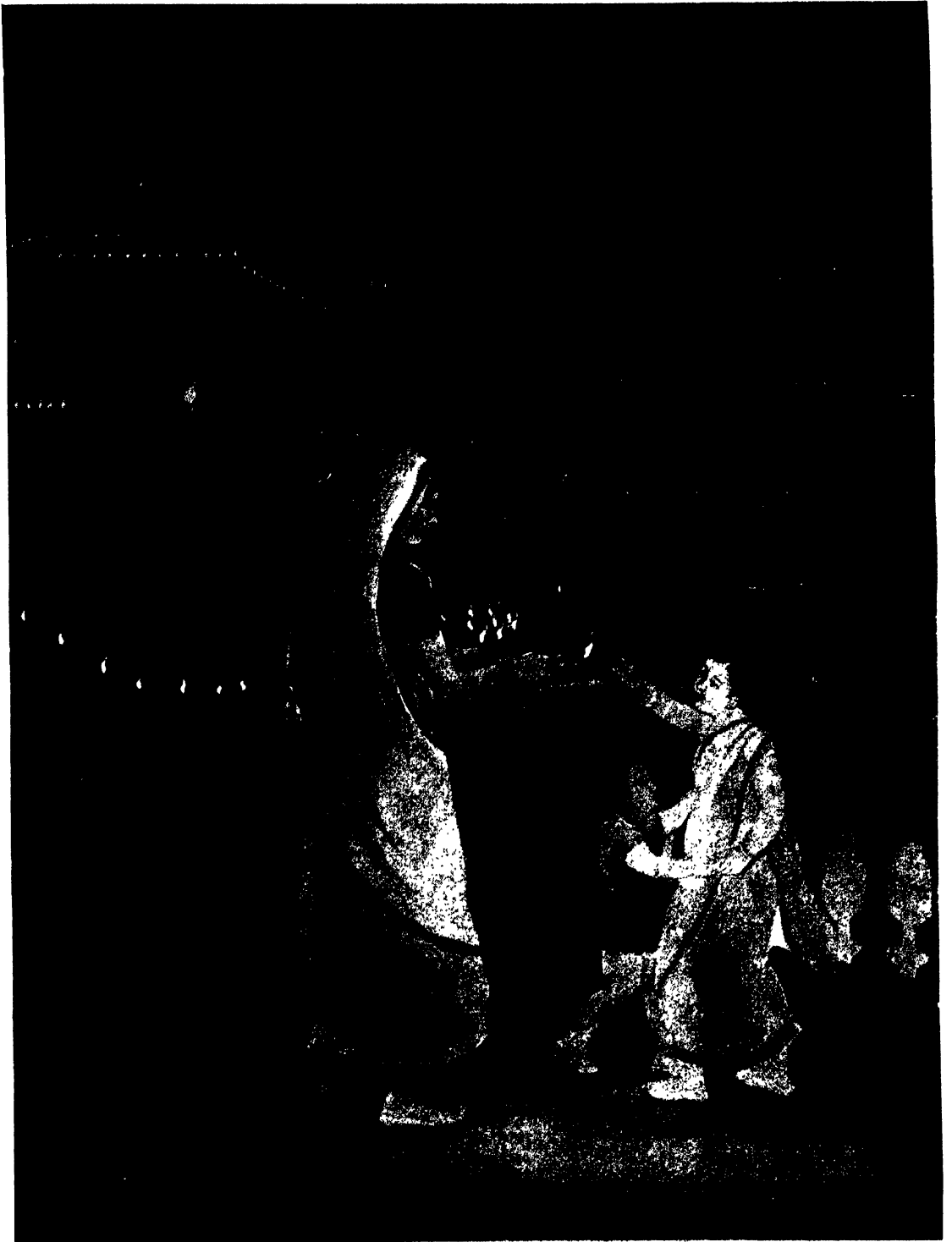
অগ্রহায়ণ—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত?

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ব্রহ্মসূত্র নামক গ্রন্থখানি ভগবদ্ ব্যাস প্রণীত। ইহা বহু নামে প্রসিদ্ধ, যথা—বেদান্তদর্শন, শারীরকসূত্র, উত্তর-মীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা ইত্যাদি। এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে ব্যাসদেব, উপনিষদের অর্থাৎ বেদান্তের সিদ্ধান্ত কি, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। উপনিষদের নানা স্থলে যে সব কথা আছে, তাহাতে প্রথমতঃ অনেকেরই উপনিষৎ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ বা ভ্রম হইতে পারে, এই জন্য ব্যাসদেব উপনিষদের তাদৃশ স্থলগুলির একটা মীমাংসা করিয়া উপনিষদের কি সিদ্ধান্ত, তাহা দার্শনিক রীতির অনুসরণ করিয়া সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এজন্য ব্যাসদেব যে সূত্রগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহা, ঐ সূত্রগ্রন্থের বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্যের মতে ৫৫৫টী মাত্র। কিন্তু উক্ত প্রাচীনতম ভাষ্যের পরে যে সব ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মতে ঐ সূত্রসংখ্যা অন্যরূপ। যেমন ভাস্কর মতে ৫৪১, রামানুজ মতে ৫৪৫, নিম্বার্ক মতে ৫৪৯ এবং মধ্ব মতে ৫৬৪ ইত্যাদি। ইহার কারণ, কেহ কোথায় দুইটী সূত্রকে একটী করিয়াছেন, কেহ কোথায় একটী সূত্রকে দুইটী করিয়াছেন, কেহ কোথায় বা পূর্ব্বপঠিত সূত্রকে বর্জ্জন করিয়াছেন, কোথায় কেহ বা আবার অতিরিক্ত সূত্রযোজনা করিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ শঙ্করভাষ্যের পরবর্ত্তী সমস্ত ভাষ্যগুলির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্য পাওয়া যায় না, এজন্য এই ব্যাপারটী শঙ্করভাষ্যে আছে কি-না বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু যদি ইহারও কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে বহু কথাই আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার প্রধান কারণ, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি উপনিষদের মীমাংসাবিশেষ, কোন ঋষি বা কোন সিদ্ধ-পুরুষ, অথবা কোন যোগী ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতামূলক

মতবাদ ইহা নহে। দ্বিতীয় কারণ, ভগবান্ নারায়ণের অবতার মহর্ষি বেদব্যাস, বেদার্থমীমাংসার জন্য যে "লোক ও বেদ সাধারণ নিয়মাবলী" আছে, সেই নিয়মাবলীর অনুসরণ করিয়া উপনিষদের মীমাংসা করিয়াছেন, আর তজ্জন্য "আদি বিদ্বান্" মহর্ষি কপিলের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ঋষির মতবাদও ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ বলিয়া, তাহার অনুসরণ করা অবৈধ, ইহাও ঘোষণা করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। এজন্য ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ২।১।১ সূত্র দ্রষ্টব্য। আর এজন্য যেখানে তাঁহার নিজমত প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে, সেখানে তিনি নিজ নামেই সেই মীমাংসা বা সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয় কারণ, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি উপনিষদেরই মীমাংসা বলিয়া তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বেদসেবী বেদপ্রামাণ্যবাদীরই কোনরূপ বাধা বা আপত্তি হইতে পারিবে না। পরিশেষে চতুর্থ কারণ এই যে, উপনিষদই সর্ব্বজ্ঞের উক্ত নিত্য অপৌরুষেয় বাক্যবিশেষ বলিয়া অলৌকিক বিষয়ে তাহারই প্রামাণ্য একমাত্র ও সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণে মহর্ষি ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের এত আদর, এত প্রামাণ্য ; অপর সকল দর্শন অপেক্ষা এজন্য বেদান্তদর্শনের এত প্রাধান্য। বস্তুত, সকলেই ইহাকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। সকলেই এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের উপর ভাষ্যাদি রচনা করিয়া নিজ নিজ মতের প্রামাণ্য সুদৃঢ় করিয়াছেন। আর সেই কারণেই এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সূত্রসংখ্যায় এইরূপ মতভেদ, এবং সূত্রপাঠাদি বিষয়ে এইরূপ মতভেদ ঘটিয়াছে। আর এই জন্যই এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের এত পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাষ্যাদিরও আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল ভাষ্যাদির আবির্ভাব, ব্যাসদেবের সূত্র রচনার কিছু পর হইতেই ঘটিয়াছে, তাহাও উপলভ্যমান ভাষ্যাদি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সকল ভাষ্যাদির সংখ্যা কত, ও তাহাদের মতভেদই বা কিরূপ, তাহার সবিশেষ জানিতে পারা যায় না। সে সমস্ত ভাষ্যাদিই আজ বিলুপ্ত। বর্ত্তমানে যে সমস্ত ভাষ্যাদি পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রসিদ্ধ তাহারা—১। শঙ্করভাষ্য, ২। ভাস্করভাষ্য, ৩। যাদবপ্রকাশভাষ্য, ৪। রামানুজভাষ্য, ৫। নিম্বার্কভাষ্য, ৬। মধ্বভাষ্য, ৭। শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৮। শ্রীকরভাষ্য, ৯। বল্লভভাষ্য, ১০। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য, ১১। বলদেবভাষ্য এবং ১২। বৈখানসভাষ্য ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে যাদবপ্রকাশভাষ্য এখনও মুদ্রিত হয় নাই, অন্যগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এই সব ভাষ্য ভিন্ন আরও অনেক অমুদ্রিত ভাষ্যের নাম পাওয়া যায়। এজন্য মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এই সকল ভাষ্যের পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলি পর পর ভাষ্যের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শঙ্করভাষ্যটী প্রাচীনতম, এবং যথাক্রমে বলদেবভাষ্যটী আধুনিকতম। অবশ্য এতদ্ ভিন্নও আরও কয়েকখানি ভাষ্য মুদ্রিত হইয়াছে, যথা—রামাৎ সম্প্রদায়ের ভাষ্য, বৈখানস সম্প্রদায়ের ভাষ্য, ইত্যাদি কিন্তু তাহারা আরও আধুনিক। প্রাচীন বিষয়ে আধুনিক অপেক্ষা প্রাচীনেরই প্রামাণ্য সাধারণত অধিকই হয়, এজন্য তাহারা পরিত্যক্ত হইল। আর ব্যাসদেবের পর এবং শঙ্করভাষ্যের আবির্ভাবকালের মধ্যে যে সব প্রাচীনতর ভাষ্যের নামাদি পাওয়া যায়, তাহারাও বহু, যথা, বোধায়নবৃত্তি, উপবর্ষবৃত্তি, ব্রহ্মনন্দীভাষ্য, ব্রহ্মদত্তভাষ্য, ভর্তৃপ্রপঞ্চভাষ্য (?), ভর্তৃহরিভাষ্য (?), দ্রমিড়ভাষ্য, রেণুকভাষ্য ইত্যাদি। কিন্তু এই সব ভাষ্য আজ বিলুপ্ত। ইহাদের নাম বা মতবাদ বা বাক্য মাত্রই শাঙ্করাদি ভাষ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পরিচয় কাশী হইতে প্রকাশিত অচ্যুত গ্রন্থাবলীর বেদান্তদর্শনের ভূমিকা মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কর্ত্তৃক সংক্ষেপে সরলভাবে প্রদত্ত হইয়াছে দেখা যায়।

এখন দেখা যাউক, উপলভ্যমান মুদ্রিত প্রসিদ্ধ ভাষ্যগুলির মধ্যে কোন্ ভাষ্যটী কতদূর ব্যাস-সম্মত? এজন্য আমরা ১০খানি ভাষ্য এস্থলে অবলম্বন করিলাম। যথা—

১। শাঙ্করভাষ্য (ব্রাহ্মমতে)
(অদ্বৈতবাদী)

২। ভাস্করভাষ্য (ঐ)
(দ্বৈতাদ্বৈতবাদী)

৩। রামানুজভাষ্য (বৈষ্ণব মতে)
(বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী)

৪। নিম্বার্কভাষ্য (ঐ)
(ভেদাভেদবাদী)

৫। মধ্বভাষ্য (ঐ)
(দ্বৈতবাদী)
৬। শ্রীকণ্ঠভাষ্য (শৈবমতে)
(বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী)
৭। শ্রীকরভাষ্য (ঐ)
(বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী)
৮। বল্লভভাষ্য (বৈষ্ণব মতে)
(শুদ্ধাদ্বৈতবাদী)
৯। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য (ঐ)
(ভেদাভেদবাদী)
১০। বলদেবভাষ্য (ঐ)
(অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী)

কারণ, এইগুলি অপেক্ষাকৃত সুলভ ও সুপ্রচারিত।

কিন্তু এই কয়খানি ভাষ্য তুলনা করিয়া কোন্ ভাষ্যখানি ব্যাস-সম্মত বা ব্যাস-মতসন্নিকটবর্ত্তী, ইহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কোন্ পথে এই কার্য্যটী সাধিত করা উচিত এবং সম্ভব তাহার বিষয় একটু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ, "উপেয়" চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে "উপায়" চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য—এইরূপ একটী প্রবাদই আছে। পথ ভুল হইলে গন্তব্য স্থানে গমন সম্ভবপর হয় না। অতএব এখন দেখা যাউক, কোন্ পথে ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয় করা যাইতে পারে।

এই চিন্তা করিলে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মসূত্রের উক্ত ভাষ্যকারগণ, সকলেই প্রায় আচার্য্য পদবাচ্য হইয়াছেন বা হইবার যোগ্য, সকলেই মহাত্মা ও সিদ্ধ পুরুষ, সকলেই অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সকলেরই সম্প্রদায় প্রায় বর্ত্তমান, সকলেরই বহু শিষ্য প্রশিষ্যাদি, সকলেরই অনুগামী বহু ব্যক্তি। আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে ইহাদের তুলনা করা বা ইহাদের গুণাগুণ বিচার করা পিপীলিকার হিমালয় অতিক্রমের প্রযত্ন তুল্য। এজন্য আমাদের পক্ষে এ কার্য্য অসম্ভব, অধিক কি, অসঙ্গত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু তথাপি এরূপ সমস্যা যথাসাধ্য মীমাংসা না করিতে পারিলে কে কোন্ পথে চলিবে, তাহার নির্ণয় হয় না। যিনি যতই ক্ষুদ্র হউন, যতই অজ্ঞ হউন, তাঁহার কি কর্ত্তব্য, কি অবলম্বনীয়, কি ভজনীয়—ইত্যাদি বিষয়ে একটা কিছু নির্ণীত না হইলে তাঁহার জীবনগতি অচল হইয়া উঠিবে। ঈশ্বরকে আমরা জানি না বটে, কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমরা সকলেই একটা না একটা সিদ্ধান্ত করিয়া আমরা আমাদের জীবনপথে চলিতে থাকি ইহাই আমাদের প্রকৃতি। এজন্য এই আচার্য্যগণের তুলনা বা সমালোচনার যোগ্য—আমরা না হইলেও আমাদিগকে ইহা করিতেই হইবে। এরূপ কার্য্য সকলেই করিয়া থাকেন, বুঝিয়াই হউক অথবা না বুঝিয়াই হউক, সকলেই নিজ কর্ত্তব্য, নিজ উপাস্য প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া নিজ গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদিগকেও ইহা করিতেই হইবে, আর করিলেও কোন দোষ হইতে পারে না।

এজন্য বোধ হয়, যদি বলা যায় যে, সকল আচার্য্যই যখন মহাত্মা মহাপুরুষ, অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, তখন অধিক সংখ্যক আচার্য্য যে ভাবে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে ভাবে সূত্র পাঠাদির গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভাবটীই ব্যাস-সম্মত, আর তজ্জন্য অল্পসংখ্যক আচার্য্যের যে সূত্র ব্যাখ্যাদি, তাহা ব্যাস-সম্মত নহে ইত্যাদি, তাহা হইলে বোধ হয় বড় বেশী অন্যায় কল্পনা করা হইবে না। আজকাল "ভোটের" বলে সকল কার্য্যই যখন হইতেছে; ন্যায়অন্যায়, সত্যাসত্য সবই যখন নির্ণীত হইতেছে, অজ্ঞের ভোটে বিজ্ঞ যখন বাধ্য হইতেছেন, মূর্খের ভোটে যখন পণ্ডিত নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন, তখন সময়ের হাওয়া অনুসারে, যদি আমরাও চলি, তাহা হইলে বোধ হয়, অধিক নিন্দাভাগী হইতে হইবে না। বস্তুত, এই পথ অবলম্বন করিয়া আজকাল অনেক মণীষীই "ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য" নির্ণয় করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রথমে আমরা দেখিব অধিকের সম্মতি অনুসারে বা ভোটের বলে কোন্ ভাষ্যখানি ব্যাস-সম্মত হইবার যোগ্য অর্থাৎ আমরা প্রথমেই দেখিব, অধিক-সংখ্যক আচার্য্য যে সকল বিষয়ে একমত, সেই সকল বিষয়ে সেই দলে কাহারা অবস্থিত এবং কাহারা অবস্থিত নহেন। এইরূপে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার অধিকাংশের দলভুক্ত হইবেন, তাঁহার ভাষ্যই ব্যাস-সম্মত ভাষ্য হইবে, ইহাই আমরা মনে করিব। এস্থলে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাস-সম্মত ভাষ্য নির্ণয়ের জন্য ইহাই আমাদের প্রথম পথ বা প্রথম উপায়, এরূপ হইলে বোধ হয় বিশেষ অন্যায় হইবে না।

দ্বিতীয় পথ বা উপায়টী কিন্তু একটু অন্যরূপ। ইহাকে

"দুর্গম পথ" বা "সূক্ষ্ম উপায়" বলা যাইতে পারে। এই পথে আমরা দেখিব—ব্যাসদেব তাঁহার এই সূত্রগ্রন্থ রচনা করিবার জন্য যে নিয়মসমূহের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই নিয়মসমূহ এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ হইতেই অধিক সংখ্যক ভাষ্যের সম্মতিতেই নির্ণয় বা আবিষ্কার করিয়া সেই নিয়ম দ্বারা উক্ত ভাষ্য দশখানিকে তুলনা করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়। অর্থাৎ উক্ত নিয়মসমূহ দ্বারা উক্ত ভাষ্য দশখানির তুলনা বা সমালোচনা করাই আমাদের এই দ্বিতীয় পথ। এতদ্দ্বারা যিনি একবার উক্ত নিয়মের অনুসারী বা অধীন হইবেন, তিনি যদি পরে কোথাও তাহার লঙ্ঘন করিতেছেন দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে সেইস্থলে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইবে, অর্থাৎ সেইস্থলে তাঁহাকে "ব্যাস-মত" হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এইরূপে যে ভাষ্যখানি যত অল্প দোষযুক্ত হইবে, সেই ভাষ্যখানি তত অধিক ব্যাস-সম্মত বলিয়া বিবেচিত হইবে। বলা বাহুল্য, এই নিয়মগুলি ব্যাসদেবের অনুসৃত নিজ নিয়ম হইলেও ইহারা যুক্তিবহির্ভূত হওয়া উচিত নহে। কারণ, একমাত্র যুক্তিই সর্ব্ববাদিসম্মত বিষয় হইয়া থাকে, যুক্তিসিদ্ধ কথাই সকলে বুঝিতে সমর্থ হয়, যুক্তিবহির্ভূত বিষয় লোকের বুদ্ধিগম্য হয় না। তথাপি এই নিয়মগুলিতেই ব্যাসদেবের কতকটা নিজত্ব বা স্বাতন্ত্র্যও আছে বলিয়াও বুঝিতে হইবে। কারণ, এই নিয়মগুলি তাঁহারই রচিত সূত্র সম্বন্ধীয়, অন্য রচিত সূত্র সম্বন্ধীয় নহে। এজন্য এই নিয়মগুলি সূত্রের প্রকৃতি দেখিয়া অধিকের সম্মতি অনুসারে যুক্তিসঙ্গত ভাবে নির্ণয় করিতে হইবে। আর যুক্তিটী মনুষ্যের চিন্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া নির্ণয় করিতে হয়। যেমন মানুষ যাহাকে যে ভাবে "হাঁ" বলে সে ভাবে আর তাহাকে "না" বলে না। ইহা মানবের প্রকৃতি। এই বিষয়গুলি মনুষ্য-চিন্তার প্রকৃতি দেখিয়া স্থির করিতে হয়। যুক্তি ও নিয়মের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। যাহা হউক, এইরূপে ব্যাসসূত্র রচনার নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়া তাহার দ্বারা তুলনাই এস্থলে আমাদের অবলম্বিত দ্বিতীয় পথ হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি কতকটা হইবে মনে হয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ভাষ্য তুলনার আরও একটী পথ আছে। সেটী সূত্রার্থবিচার। অর্থাৎ সূত্রের অর্থ করিবার কালে সূত্রস্থ পদসমূহের অর্থের প্রসিদ্ধিও একরূপতা এবং অন্বয়ের স্বাভাবিকতা প্রভৃতি রক্ষিত হইতেছে কি-না তাহার পরীক্ষা, এবং পরিশেষে সূত্রার্থটী যুক্তিসঙ্গতভাবে শ্রুতির অনুকূল হইতেছে কি-না তাহার বিবেচনা। অবশ্য এই তৃতীয় পথটী এস্থলে আমরা অবলম্বন করিলাম না। কারণ, ইহা একটী অতি বিরাট ব্যাপারবিশেষ। এ কারণ, ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয়ের জন্য এই তিনটী উপায়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় উপায়টী যত সহজসাধ্য, তৃতীয় উপায়টী তত সহজসাধ্যও নহে। আর তজ্জন্য এস্থলে আমরা প্রথম দুইটীর দ্বারা কোন্ ভাষ্যটী ব্যাস-সম্মত হয়, তাহাই দেখিব। অবশ্য সমুদয় নিয়ম বা সেই সব নিয়মের আবিষ্কার কৌশল প্রভৃতির কথা আর এস্থলে আমরা আলোচনা করিব না। কারণ, তাহা প্রবন্ধ মধ্যে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হইতে পারে না। তজ্জন্য পৃথক্ গ্রন্থ প্রণয়নই আবশ্যক হয়। তথাপি এই নিয়ম সম্বন্ধে আমরা এস্থলে দুই-একটী কথা আলোচনা করিতেছি। ইহা হইতে সুধী পাঠকবর্গ, আমাদের অবলম্বিত সমুদয় নিয়ম সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ হইতে এই নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে, ব্যাসদেব যে উদ্দেশ্যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রথমত শ্রুতির মীমাংসা, এবং তৎপরে তদ্দ্বারা দার্শনিকতত্ত্বের অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের নির্দ্ধারণ। বস্তুত এই দার্শনিকতত্ত্ব বা দর্শনশাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় বলিতে, এস্থলে তিনটী বিষয় বুঝিতে হইবে। যথা—প্রথমটী, তত্ত্ব বা সত্যনির্ণয়, দ্বিতীয়টী তাহার ব্যবহার এবং তৃতীয়টী তাহার ফলনিরূপণ।

ইহাদের মধ্যে প্রথমটী আবার দুইপ্রকার, যথা—স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন। অর্থাৎ যাহা তত্ত্ব বা সত্য বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা প্রথমে যুক্তিসহকারে প্রতিপাদন করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করিতে হয়, এবং সেই সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে অপরে কে কি আপত্তি করেন, তাহার মীমাংসা করিতে হয়, এবং তৎপরে পরপক্ষ খণ্ডন করিতে হয়, অর্থাৎ বিপক্ষের মতের যে দোষ, তাহাও প্রদর্শন করিতে হয়। এইরূপে স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করিতে পারিলে, তত্ত্বনির্ণয় বা সত্য নির্দ্ধারণ কার্য্যটী সম্পূর্ণ হয়, নচেৎ সে নির্ণয়ে আপত্তি বা সংশয়ের অবকাশ থাকিয়া যায়। তত্ত্বনির্ণয়ের ইহাই দার্শনিকরীতি। সুতরাং

দার্শনিকতত্ত্ব বা প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটীর মধ্যে ইহা "একটী" তত্ত্ব। বস্তুত, সকল দর্শনেরই ইহা প্রতিপাদ্য, সকল দর্শনেই ইহা করা হইয়া থাকে।

অতঃপর দার্শনিকতত্ত্বের দ্বিতীয় বিষয়টী—সেই নির্ণীত তত্ত্বের বা সত্যের ব্যবহার। ইহারই নামান্তর সাধন, অর্থাৎ জীবনটীকে সেই দার্শনিক সত্যের অনুসারে পরিচালিত কিরূপে করিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ। ইহাও সকল দর্শনেই করা হইয়া থাকে। সুতরাং সকল দর্শনেরই ইহাও একটী তত্ত্ব বা প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরিশেষে দার্শনিকতত্ত্বের তৃতীয় বিষয়টী এই যে, উক্ত সাধনের ফলে মনুষ্য জীবনের পরিণতি কিরূপ হয়, তাহার নির্ণয় করা, অর্থাৎ উক্ত সাধনের ফল নির্দ্দেশ করা। ইহাও দার্শনিকতত্ত্বের একটী বিষয় হয়। কারণ, আমরা কি জন্য সাধন করিতেছি, তাহা যদি না জানিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সে সাধনে প্রবৃত্ত হইব কেন? ফল জানিয়া কার্য্য করাই ত মানবের স্বভাব। এজন্য ইহাও দর্শনশাস্ত্রের একটী তত্ত্ব বা প্রতিপাদ্য বিষয়। এইরূপে এই তিনটী বিষয়ই সকল দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় বলা হয়। ব্যাসদেব এই তিনটী বিষয়কে যথাক্রমে সাজাইয়া তাঁহার ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের চারিটী অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। যথা—প্রথম সমন্বয়াধ্যায়, দ্বিতীয় অবিরোধ অধ্যায়, তৃতীয় সাধন অধ্যায় এবং চতুর্থ ফলাধ্যায়।

ইহাদের মধ্যে "সমন্বয় ও অবিরোধ অধ্যায়ে" শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া তত্ত্ব বা সত্য নির্ণয় করা হইয়াছে, "সাধন অধ্যায়ে" সেই তত্ত্বের অভ্যাস বা অনুষ্ঠান কি করিয়া করিতে হয়, শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং "ফল অধ্যায়ে" মনুষ্য জীবনের শেষ লক্ষ্য কি, তাহার পরিচয় শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে নির্ণয় করা হইয়াছে। এই জন্য বলা হয়, ব্যাসদেব এই বেদান্তদর্শনে একাধারে শ্রুতিমীমাংসা ও দার্শনিকতত্ত্বের নির্ণয় করিয়াছেন। বস্তুত, এই দুইটী কার্য্য একাধারে কোন বৈদিকদর্শন গ্রন্থে দেখা যায় না। ইহাই দেবান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের বিশেষত্ব।

এজন্য সমন্বয় অধ্যায়ে যে ১৩৪টী সূত্র আছে তাহাদিগকে "বেদান্ত বাক্যগুলি ব্রহ্মে সমন্বয়পর" করিয়া, এবং অবিরোধ অধ্যায়ে যে ১৫৭টী সূত্র আছে তাহাদিগকে "বিরোধভঞ্জনপর" করিয়া এবং সাধন অধ্যায়ে ১৮৬টী সূত্র আছে, তাহাদিগকে "সাধনপর" করিয়া এবং ফলাধ্যায়ে যে ৭৮টী সূত্র আছে, তাহাদিগকে "ফলপর" করিয়া ব্যাখ্যা করাই ব্যাস-সম্মত সূত্র-ব্যাখ্যার একটা নিয়ম বা রীতি বা পদ্ধতি। ইহার যিনি অন্যথা করিবেন, তিনি ব্যাস-মতে সূত্রব্যাখ্যা করিবেন না, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহাই হইল সূত্ররচনার ব্যাসদেবের একটী নিয়ম বা কৌশল। ইহাকে অধ্যায়সঙ্গতির অনুসরণ করা বলে। আমাদের তুলনাকার্য্যের মধ্যে এই নিয়মটীও অবলম্বন করা হইয়াছে।

অতঃপর আমাদের অবলম্বিত দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি শ্রুতির মীমাংসা অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত বিষয়ের আপাতপ্রতীয়মান বিরোধপরিহার, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থের সকল সূত্রেই শ্রুতিবাক্য-সমূহের আপাতপ্রতীয়মান বিরোধপরিহার থাকিবে। আর তাহা হইলে সকল সূত্রের দ্বারা লক্ষিত এক বা একাধিক শ্রুতিবাক্যও থাকিবে। শ্রুতিতে নাই এমন কথা এই সূত্রগ্রন্থে আলোচিত হইবে না, অথবা শ্রুতির উপদিষ্ট বিষয়, উপেক্ষা বা বর্জ্জন করাও চলিবে না। যদি কেহ এই ভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা না করেন, শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সূত্রব্যাখ্যা করেন তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা ব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যা হইবে না। যেমন, যেখানে সাংখ্যমত বা বৌদ্ধমত বা জৈনমত প্রভৃতি অন্য মত খণ্ডন করা হইতেছে, সেখানেও সেই মতানুকূল সেই মতের মূল শ্রুতি বাক্যদ্বারা সেই মত প্রতিপাদন করিয়া এবং শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়া যিনি সূত্রব্যাখ্যা করিবেন, তিনিই ব্যাস-সম্মত সূত্রার্থ করিবেন, বুঝিতে হইবে। অথবা যেমন শ্রুতিতে "সদ্যঃ মুক্তি বা জীবন্মুক্তি" এবং "বিদেহ মুক্তির" কথা আছে। কিন্তু যদি কেহ একটী স্বীকার করিয়া সূত্রের অর্থ করেন তাহা হইলে তাঁহার অর্থ ব্যাস-সম্মত অর্থ হইবে না। এই নিয়মের অনুসরণ যিনি যত না করিবেন, তিনি ততই ব্যাস-মত হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার নাম এই শাস্ত্রে শ্রুতিসঙ্গতির অনুসরণ করা বলে। আমাদের অবলম্বিত নিয়ম মধ্যে ইহাকেও গ্রহণ করা হইয়াছে।

তদ্রূপ এস্থলে আমাদের অবলম্বিত তৃতীয় নিয়মটী এই যে, এই গ্রন্থে এক বা একাধিক সূত্রে এক একটী বিচার বা আলোচ্য বিষয় বা "অধিকরণ" স্থান পাইয়াছে। এইরূপ বিচার বা "অধিকরণ" এই গ্রন্থে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মতে

১৯১টী এবং ইহা ৫৫৫টী সূত্রে রচিত। প্রত্যেক অধিকরণ বা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে,—সঙ্গতি, ফলভেদ, বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত—এই ছয়টী অঙ্গ থাকে। তাহার পর যে সূত্রে এই বিচার বা "অধিকরণ" আরম্ভ হইবে, তাহাতে প্রথমান্ত পদ থাকিবে, বা উহ্য থাকিবে। কারণ, প্রথমান্ত পদের দ্বারা লোকে বক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এজন্য ইহা সর্ব্বরাদিসম্মতরূপে ব্যাসদেবের সূত্র রচনার একটী কৌশল বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এইরূপ আরও বহু নিয়ম আছে আমরা সেগুলি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং তাহার দ্বারাই এই তুলনা করিয়াছি। সূত্র ব্যাখ্যায় এই সব নিয়মের যিনি যত লঙ্ঘন করিবেন, তিনি তত ব্যাস-মত হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, আর যিনি যত পালন করিবেন, তিনি তত ব্যাস-মতের নিকটবর্ত্তী হইবেন। ইহাই হইল এই ব্রহ্মসূত্র রচনার ব্যাসদেবের কৌশলের মধ্যে কতিপয়ের দৃষ্টান্ত। আমরা এস্থলে এইরূপ কতিপয় নিয়ম গ্রহণ করিয়াছি। আশা হয়, এতদ্দারাই আমাদের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী সম্বন্ধে সুধী পাঠকবর্গ একটা ধারণা করিতে পারিবেন।

আমাদের মনে হয়, এই সকল নিয়মদ্বারা বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাসসম্মতি নির্ণয় করা যে কতকটা সম্ভবপর হইবে, তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ভোটের দ্বারা যেমন ব্যাসসম্মতি নির্ণয় কতকটা সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, বলা হইয়াছে, এই পথেও তদ্রূপ তাহা আরও অধিক সম্ভবপর বলিতে পারা যায়। প্রত্যুত এইপথে আরও সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, ইহার "মূল সূত্র" হইতেছে এই যে, যিনি যে নিয়ম পূর্ব্বে মান্য করিয়াছেন, তাঁহাকে যদি পরে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে তিনি দোষী হইবেন। আর যিনি যত অধিক দোষী হইবেন তিনি ততই ব্যাসসম্মতি হইতে দূরবর্ত্তী বলিযা বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি। অতএব এই নিয়ম দ্বারা তুলনার ফল, ভোটের দ্বারা তুলনার ফল অপেক্ষা অধিক বলবৎ এবং নিশ্চায়ক।

আমরা এই দুইটী পথে ব্রহ্মসূত্রের উক্ত দশখানি ভাষ্যের তুলনা করিয়াছি। অর্থাৎ ভোটের দ্বারা এবং যুক্তি ও ভোট এই উভয় দ্বারা নিরূপিত যে নিয়ম, সেই নিয়মদ্বারা তুলনা করিয়াছি। কেবল তৃতীয় পথে অর্থাৎ সূত্রার্থ বিচার-রূপ তৃতীয়পথে এই তুলনা করি নাই। এখন এতাদৃশ তুলনার যে ফল, তাহাই এস্থলে আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। ক্ষুদ্রের বৃহৎ চেষ্টা বলিয়া উপেক্ষণীয় হইবে না আশা করি।

এস্থলে তৃতীয় পথে তুলনা না করিবার, অর্থাৎ সূত্রার্থ বিচারদ্বারা তুলনা না করিবার একটী কারণও আছে, তাহাও এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল। উহা যে কেবল অতি বিরাট্ ব্যাপার বলিয়া আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হই নাই, তাহা নহে, কিন্তু ব্যাস-সম্মত ভাষ্যনির্ণয়ে ইহার উপযোগিতা অল্প বলিয়া প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি "শ্রুতির মীমাংসা"। সুতরাং শ্রুতির অর্থই সূত্রের অর্থ হইবার কথা। ইহাতে ব্যাসের নিজ মত প্রকটিত করা ব্যাসদেবের উদ্দেশ্যই নহে। ইহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। সুতরাং সূত্রার্থ মধ্যে ব্যাস-মত প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তবে ব্যাস-মত প্রকাশের সম্ভাবনা কেবল সূত্রগ্রন্থের "সূত্র-ক্রমের" মধ্যে এবং "বিষয়বিন্যাসের" মধ্যেই থাকা সম্ভব। কারণ, বিষয়বিন্যাসাদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার অধীন বিষয়। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এইরূপ স্থলেই থাকে। পরমতবর্ণনকালে এই স্থলেই বর্ণন-কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য থাকে। সুতরাং সংক্ষেপে সহজে ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয় করিতে হইলে "বিষয়-বিন্যাসাদির" বিচার বা তুলনাই মুখ্য উপায় হইবার কথা। "সূত্রার্থবিচার" মুখ্য উপায় নহে। কারণ, উহা সূত্রার্থের অধীন, আর সেই সূত্রার্থ আবার শ্রুত্যার্থের অধীন। অতএব সূত্রার্থ বিচার অপেক্ষা বিষয়বিন্যাসের বিচারই অধিক ফল-প্রদ। আমরা এজন্য প্রথমে অধিক সম্মতি বা ভোটের দ্বারা ইহার নির্ণয়ের জন্য সাতটী বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছি, যথা—১। অধিকরণ রচনা, ২। সূত্রপাঠ, ৩। সূত্র-বিভাগ, ৪। সূত্রযোগ, ৫। পূর্ব্বস্বীকৃত সূত্রবর্জ্জন, ৬। অতিরিক্ত সূত্র গ্রহণ, এবং ৭। সূত্রক্রম বিপর্য্যয়। এই সাতটী বিষয়ে ভোটের দ্বারা তুলনার ফল এস্থলে আমরা প্রথমে প্রদর্শন করিব। তৎপরে অধিকরণ রচনার আবিষ্কৃত নিয়ম সাহায্যে ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয়ের জন্য "অধিকরণ রচনা"-রূপ একটী মাত্র বিষয়কে অবলম্বন করিয়াছি। ইহা হইতে প্রত্যেক ভাষ্যের অধিকরণ রচনা-বিষয়ক নির্ণয়ের ফল প্রদর্শন করিব। ইহাতে যিনি অধিক সংখ্যকের দলভুক্ত যত অধিক হইবেন, ততই তিনি ব্যাস-সম্মত হইবেন, আর যিনি অল্প সংখ্যক দলভুক্ত, যত হইবেন,

তিনি ততই কোণী বা ব্যাস-মত হইতে দূরবর্ত্তী হইবেন। এইরূপে এই দোষ কাহার কত অল্প বা কত অধিক হইয়াছে, তাহা এই তুলনার ফল হইতে জানিতে পারা যাইবে, আর তাহার ফলে কোন্ ভাষ্যটী কতটা ব্যাসদেবের সম্মতি লাভের যোগ্য তাহা কল্পনা করিতে পাঠকবর্গের বড় বেশী অসুবিধা হইবে না। এস্থলে ব্যাস-সম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নির্ণয়ের জন্য এই দুইটী উপায় আমরা অবলম্বন করিয়াছি।

এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিবার জন্য আজ প্রায় পনর বৎসর প্রযত্ন হইয়াছে। ইহার পথ-প্রদর্শক আমার স্বর্গীয় অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহোদয় ছিলেন। প্রথমে তিনি স্বয়ংই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় আরম্ভেই বিঘ্ন ঘটে। অতঃপর আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা, তবে তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমি কোনরূপে ইহার সম্পূর্ণতা সাধনে সমর্থ হইয়াছি। "ভারতবর্ষ" পত্রিকার পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে কোন এক ভাদ্র মাসের "ভারতবর্ষে" ইহার সূচনা করিয়া এই নাম দিয়াই আমি একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে পাঠকবর্গকে আমার এই দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার ফলটী উপহার প্রদান করিব। আমার এই পরিশ্রমটী পুস্তকাকারে রচিত হইলেও তাহা প্রকাশিত হইবে কি-না জানি না। এইজন্য প্রবন্ধাকারে ইহার ফলটী অতি সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। প্রথমে গ্রন্থখানি বঙ্গ ভাষায় রচিত হয়, পরে কাশী ও হরিদ্বারের কতিপয় মহামান্য সন্ন্যাসিবৃন্দের ইচ্ছানুসারে ইহা সংস্কৃত ভাষাতেও রচিত হইয়াছে। মুদ্রিত হইলে ইহা প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপি পুস্তক হইবে। যাহা হউক, তুলনার ফল এই—

১। অধিক সম্মতি বা ভোট অনুসারে তুলনার ফল :—

ভাষ্যের নাম	অধিকরণ রচনায় দোষ	সূত্রপাঠে দোষ	সূত্রযোগে দোষ	সূত্রবিভাগে দোষ	অতিরিক্ত সূত্রগ্রহণে দোষ	গৃহীত সূত্রবর্জ্জনে দোষ	সূত্রক্রম বিপর্য্যয়ে দোষ	দোষ-সমষ্টি
শাঙ্করভাষ্য	১৩	১০	১	.	.	.	.	২৪
ভাস্করভাষ্য	১১	৪৬	৪	.	.	৪	.	৬৫
রামানুজভাষ্য	২৩	৩৬	১৪	৬	৩	২	২	৮৬
নিম্বার্কভাষ্য	৪৩	৩৩	৮	২	৩	২	.	৯১
মধ্বভাষ্য	১০৬	৪৭	১	৬	৬	৩	১	১৭০
শ্রীকণ্ঠভাষ্য	২৮	২৬	১৪	৬	৩	২	২	৮১
শ্রীকরভাষ্য	১৯	৬৩	১১	০	২	০	৪	৯৯
বল্লভভাষ্য	৭৬	২৪	২	.	১	১	.	১০৪
বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য	.	২৯	১	.	১	.	.	৩১
বলদেবভাষ্য	.	৪১	২	.	১	.	.	৪৪
	৩১	৩৫৫	৫৮	২০	২০	১৪	৯	৭৯৫

অর্থাৎ অধিকরণ রচনা ও সূত্র পাঠাদি সাতটী বিষয়ে "নিয়মনিরপেক্ষ তুলনার বা ভোটের ফলে যে ভাষ্যের যত দোষ তাহা এই—

১। শাঙ্করভাষ্যে ২৪টী দোষ
২। ভাস্করভাষ্যে ৬৫টী দোষ
৩। রামানুজভাষ্যে ৮৬টী দোষ
৪। নিম্বার্কভাষ্যে ৯১টী দোষ
৫। মধ্বভাষ্যে ১৭০টী দোষ
৬। শ্রীকণ্ঠভাষ্যে ৮১টী দোষ
৭। শ্রীকরভাষ্যে ৯৯টী দোষ
৮। বল্লভভাষ্যে ১০৭টী দোষ
৯। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্যে ৩১টী দোষ
১০। বলদেবভাষ্যে ৪৪টী দোষ

ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য ও বলদেবভাষ্যের অধিকরণ রচনা-বিষয়ক তুলনার ফল প্রদর্শিত হইল না, পাঠভেদাদি অন্য ছয়টী বিষয়ের ফলই প্রদত্ত হইল। কারণ, ঐ দুইটী ভাষ্য, অধিকরণনির্দ্দেশ পূর্ব্বক মুদ্রিত হয় নাই। ভাস্করভাষ্যটী ও অধিকরণনির্দ্দেশ-পূর্ব্বক মুদ্রিত হয় নাই। তবে, উহা মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে গৃহীত হইল।

এইবার দেখা যাউক, সূত্র রচনার নিয়ম সাহায্যে তুলনার ফল কিরূপ হয়। ইহাতে "অধিকরণ রচনা-বিষয়ক" ফল, অর্থাৎ দোষ মাত্র প্রদর্শিত হইল। আর, এজন্য শাঙ্করাদি আটটী ভাষ্যেরই তুলনা করা হইয়াছে। যেহেতু বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য এবং বলদেবভাষ্য অধিকরণ নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক মুদ্রিত হয় নাই।

২। সুতরাং অধিকরণ রচনায় নিয়মসাপেক্ষ তুলনার ফলটী এইরূপ—

১ শাঙ্করভাষ্যে দোষ নাই।
২ ভাস্করভাষ্যে দোষ ৩টী
৩ রামানুজভাষ্যে দোষ ৪৯টী
৪ নিম্বার্কভাষ্যে দোষ ৬৯টী
৫ মধ্বভাষ্যে দোষ ১২১টী
৬। শ্রীকণ্ঠভাষ্যে দোষ ৪৭টী
৭। শ্রীকরভাষ্যে দোষ ৩৯টী
৮। বল্লভভাষ্যে দোষ ৮৮টী

এখন এই নিয়মসাপেক্ষ তুলনার ফলটী যদি নিয়ম-নিরপেক্ষ তুলনার ফলের সহিত একত্রিত করা যায়, তাহা হইলে সেই দোষ সংখ্যা এইরূপ হয়, যথা—

ভাষ্যের নাম	নিয়মনিরপেক্ষ দোষ	নিয়মসাপেক্ষ দোষ	সমষ্টি দোষ
শাঙ্করভাষ্য	১৩	০	১৩
ভাস্করভাষ্য	১১	৩	১৪
রামানুজভাষ্য	২৩	৪৯	৭২
নিম্বার্কভাষ্য	৪৩	৬৯	১১২
মধ্বভাষ্য	১০৬	১২১	২২৭
শ্রীকণ্ঠভাষ্য	২৮	৪৭	৭৫
শ্রীকরভাষ্য	১৯	৩৯	৫৮
বল্লভভাষ্য	৭৬	৮৮	১৮৪
	৩১৯	৪১৬	৭৩৫

ইহাই হইল কেবলমাত্র অধিকরণরচনাবিষয়ে ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের আটখানি ভাষ্য তুলনার ফল। পাঠভেদাদি সহকৃত সাত বিষয়ের তুলনার ফল উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। এখন সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিবেন কোন্ ভাষ্যখানি কত দূর ব্যাস-সম্মত? বিশেষ বিবরণ প্রবন্ধ মধ্যে প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়া উহা এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

রাঙা রাখী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আজি সন্ধ্যায় কেবল তোমায়
পড়িতেছে সখী মনে,
শরৎ-সন্ধ্যা-হিমেল হাওয়ায়
দেহে আনে শিহরণ;
সুন্দর তব অনিন্দ্য মুখ
ভাসে নভো দর্পণে
মেঘলেশহীন দূর দিগন্তে
হারাল আমার মন।

এমন আকাশ জীবনে দেখিনি
যেন সে নীল পাথার,
অতল গহীন সীমানাবিহীন
তোমার হৃদয়খানি,
নিলখে যেন সে মিলন-মায়ায়
হয়ে গেছে একাকার,
কি যে রহস্য গোপন সেথায়
কি তার মর্ম্মবাণী?

দূরে উঠিতেছে দ্বিতীয়ার চাঁদ
—আরো দূরে দুটি তারা,
দেওদার শিরে প্রদোষ আঁধারে
জোনাকির তারা জ্বলে,
শ্রান্ত পাথায় পাখী উড়ে যায়
সে বুঝি দোসর-হারা
তারি বেদনায় অশ্রু ঘনায়
আমার নয়নতলে।

আমার বাগানে ফুটিয়াছে ফুল
সেফালি গন্ধরাজ,
রজনীগন্ধা ভালবাস তুমি
এখনো কিছুটা আছে,
দোলন-চাঁপা যে পরিতে খোঁপায়
শুকায়ে ঝরিছে আজ
দুয়ারের পাশে লবঙ্গলতা
কত ফুল ফুটিয়াছে!

তুলসী-মঞ্চে মাটির প্রদীপ
হে গৃহলক্ষ্মী মোর,
আজি জ্বালিবার কেহ নাহি আর
শূন্য এ আঙিনায়,
দুয়ার খুলিয়া বৃথা পথ-চাওয়া
নিশি হয়ে যায় ভোর,
আশা গিয়ে ফের আশা ফিরে আসে
তাই মোর হাসি পায়।

কেমনে না জানি ঘেরিয়া তোমায়
করিয়াছি গুঞ্জন,
নিশিদিন-মান তোমা পানে মোর
আরতির দীপ জ্বালা,
স্মৃতির আধারে রেখেছি যতনে
সেই ক্ষণ ভুঞ্জন
সকাল সন্ধ্যা ঝরা শেফালির
আদরে পূর্ণ ডালা।

হাসি পায় যত স্মরণ-পথের
চিহ্ন চিনিয়া চলি,
দুঃখের হাসি হাসিতে তাই ত
লজ্জায় মরে যাই,
কুঞ্জবিতানে ঝরা বকুলেরে
গিয়েছ চরণে দলি,
দ্বার খোলা পড়ে—কখন গিয়েছ
কিছু মোর মনে নাই!

আমার ডালার ফুল দেখে মোর
আমারি লজ্জা পায়,
কুয়াসা আঁধারে কেমনে আমারে
বল না লুকায়ে রাখি,
কত দূরে তুমি আমি কত দূরে
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়
ক্ষণিকের তরে এসো প্রিয়তমে
হাতে দিই রাঙা রাখী।

১৯৪৯

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

এক

জ্যৈষ্ঠের প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন, পৃথিবীটা যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে পুড়িয়া মরিতেছে। সহর কলিকাতা, রাস্তায় লোক চলাচল নাই বলিলেও হয়; গলির মোড়ে একটা রোয়াকের উপর হিন্দুস্থানী 'কাপড়াওলা' হাঁকিয়া শ্রান্ত হইয়া, কাপড়ের বোঝা মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; 'বেনারস্‌কা বোম্বাই আঁব'ওলাও তাহার পাশে বিশ্রাম-শয্যা রচনা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময় বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের একটী সৌখীন নারী সূক্ষ্ম ছাতা মাথায় দিয়া, একটা ছোট বাড়ীর বারান্দায় উঠিয়া কড়া আস্তে আস্তে নাড়িতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে সাড়া আসিল, কে?

—আমি সবিতা, দরজা খোল্," বলিয়া আগন্তুক রমণী ছাতা বন্ধ করিলেন। দ্বার খুলিয়া প্রায়-ঐ বয়সের আর একটি মেয়ে বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ভরা স্বরে বলিল, এই রৌদ্রে, কি কাণ্ড!

—বলছি, চ' ভেতরে।

উভয়ে ভিতরে আসিয়া বসিল। ঘরটি যাহার, সেই মেয়েটি ছোট একখানি টেবিল ফ্যান সবিতার কাছে বসাইয়া চালাইয়া দিল। হাওয়া যত না হোক্, আওয়াজ খুব। সবিতা যখন পাখাখানিকে কখন এদিক, কখন ওদিক করিয়া, কাছে টানিয়া, দূরে সরাইয়াও হাওয়া আদায় করিতে পারিল না, তখন রাগতভাবে বলিল, সরা তোর ঘ্যানর ঘ্যানর!

সবিতা তাহার হাত-ব্যাগের ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ চোখ চশমা ঘাড় হাত মণিবন্ধ বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিল; ছোট একখানি আর্সিতে মুখখানি, চুলগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, ব্যাগ বন্ধ করিতে করিতে বলিল, তোর মা কোথা শুকি?

শুকি, ওরফে শুক্লা বলিল, ওঘরে ঘুমুচ্ছে! তুমি এই দুপুরে কোত্থেকে ভাই? স্কুল ত বন্ধ।

—হ্যাঁ; বাড়ী থেকে আসছি। শোন্, তোর বর পেয়েছি।

শুক্লা হাসিয়া বলিল, মাইরী?

—সত্যি! সব বলছি,—

—দাঁড়া ভাই, যতটা বলেছিস, তারই পুরস্কার দিই আগে। কি খাবি বল্? কীল, চড়, চিমটি, হামি—

—জ্যাঠামি রাখ্! কাগজ কলম আন্?

—বিয়ের আগেই প্রেমপত্র লিখতে হবে নাকি?

সবিতা বলিল, যা বলি, তাই কর্ দেখি! বাজে কথা ক'য়ে আমার দেরী করিয়ে দিস্ নে। আজ আবার ওঁর বিদেশ যাবার কথা আছে, কলেজ থেকে এসে খেয়ে দেয়েই বেরুবেন। চট্‌পট্ নিয়ে আয়।

শুক্লা কাগজ কলম আনিতে গেল। সবিতা ব্যাগ খুলিয়া সংবাদপত্রের একটি কর্ত্তিতাংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। শুক্লা আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপর ঘাড় দিয়া বসিলে, পাঠ্যবস্তুটা উভয়েই পড়িল:

> চাই: কোনও সুন্দরী সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা, সদ্বংশজাতা বয়স্কা কুমারীর সহিত পরিণয়োদ্দেশ্যে পরিচয় করিতে চাই। প্রোফেসর, বাঙ্গালাদেশের বাহিরে স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিতি। তরুণী সুগায়িকা হইলে ভাল হয়; উদ্যান-পরিচর্য্যায় আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়। উত্তম সাহিত্য-জ্ঞান না থাকিলে পত্রালাপ করা বৃথা; ন্যাকামী বাঙ্গালী তরুণীদের ভূষণ। আমি সেই ভূষণবিবর্জ্জিতা নারীর সহযোগিতা কামনা করি। বিজ্ঞাপনের উত্তরে ফটোসহ স্বহস্তে পত্র লিখুন। আমার দুই চক্ষু ব্যতীত কেহ ফটো বা পত্র দেখিবে না। বক্স নম্বর ৪২; অমৃতবাজার পত্রিকা।

পড়া শেষ হইলে সবিতা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেখলি ত?

শুক্লা হাসিয়া বলিল, দে, ভাল ক'রে দেখি।

কাগজটি হাতে লইয়া তক্তপোষের উপর চাপটালি খাইয়া বসিয়া উচ্ছ্বসিত হাস্যে কহিল, বাছার না-চাই কি তাই ভাবছি! সুন্দরী হওয়া চাই; সুশিক্ষিতা হওয়া চাই; আবার সচ্চরিত্রা—মাথাখারাপ নাকি? সদ্বংশজাতা, সুগায়িকা—

সবিতা বলিল, সুসাহিত্যিকা!

—হ্যাঁ, তা'ও চাই! তারপর ভাল মালী হওয়া চাই! মরি মরি!

—আবার ন্যাকামী-ভূষণবর্জ্জিতা নারী হওয়া চাই!

শুক্লা বলিল, এক কাজ করুক না ভাই, একটা পুরুষ মানুষ বিয়ে করুক না, ন্যাকামী থাকবে না!

সবিতা বলিল, দূর দূর! ওগুলো ন্যাকার রাজা; থাকে ভিজে বেড়ালটির মতো। নিজেরা ন্যাকার শিরোমণি, তাই বউ খোঁজবার সময় ন্যাকামী-ভূষণবর্জ্জিতা নারী খুঁজে হয়রাণ।

শুক্লা বিজ্ঞাপন পড়িতেছিল, বলিল আচ্ছা সবিতা, সাহিত্যিক বউয়ে ওর দরকারটা কি বল্ ত?

—ও থিসিস্ লিখবে আর ওর বউ কবিতা দিয়ে পাদপূরণ করবে! মাসিক পত্রিকায় দেখিস্ নি, কেউ হয়ত একটা খুব গম্ভীর প্রবন্ধ লিখলে, নীচে একটুখানি জায়গা খালি, সম্পাদক মশাই একটা আজে-বাজে কবিতা ঢুকিয়ে দিয়ে বসলেন! পাছে গম্ভীর প্রবন্ধ প'ড়ে পাঠক-পাঠিকার মাথা ধরে যায়, তাই এই ব্যবস্থা। তোর ভাবী বরও থিসিসের পাদপূরণ করবে তোকে দিয়ে!—বলিয়া সবিতা হাসিয়া, বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে আবার বলিল, 'উদ্যান-পরিচর্য্যায় আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়'। কেন, মালী রাখলে চলে না! কিন্তু তা হোক্‌গে, বাগানের কাজ করা ভাল—খিদে হয়, শরীরের বাঁধুনী ভাল থাকে; সাঁওতালদের দেখেছিস্ ত! তবে লোকটা ভালমানুষ হ'বে; ভাল জায়গায় থাকে, ভাল চাকরী ক'রে—একে হাত-ছাড়া করা নয়।

—কিন্তু সেই প্রোফেসর!—শুক্লার মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

—তা আর কি করবি বল্? এত কাল ত আশায় আশায় কাট্‌ল, মালঞ্চের মালাকর ত জুট্‌ল না। প্রোফেসর প্রোফেসরই সই!

—ওগুলো না কি মানুষ? দাদাকে দিয়েই দেখছি ত!

—আমিও দেখছি, সবিতা হাসিল। তাহার স্বামীও প্রোফেসর—দর্শনশাস্ত্রের প্রোফেসর।

—না-মানুষ, না-জন্তু—

সবিতা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, কিম্ভূত! খাবার সময় ব'লে দিতে হ'বে, ওগো খাও; কলেজ যাবার সময় মনে করিয়ে দিতে হ'বে, দুটোয় ক্লাশ; শোবার সময় বলে দিতে হ'বে, ওগো, দয়া ক'রে শোও—

শুক্লা বলিল, তোকে আদর করবার সময়ও মনে করিয়ে দিতে হয় না কি ভাই?

—মনে করিয়ে দিয়েও কাজ হ'লে ত ভালই ছিল! হুঁসও নেই। জোর জার ক'রে যতটা আদায় ক'রে নেওয়া যায়।

ঘরে কেহ নাই, দুটি এক বয়সের তরুণী, অভিন্নহৃদয়া বান্ধবী, কথায় বার্ত্তায় আগড় না থাকিবারই কথা; তবে ততখানি বেপরোয়া ইহারা নয়। ইঙ্গিতে, ভাবে খানিক হাসিয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া অনেক অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিল।

সবিতা হাত ঘড়িতে দেখিল, চারটা বাজে। বলিল, তোর সেই ফটোটা বের কর্!

—কোন্‌টা?

—সেই যে-টা দেবীকারাণী-মডেলে তুলিয়েছিলি। আছে ত, না কাউকে দিয়ে বসে আছিস্?

শুক্লা ম্লানমুখে কহিল, কাকে আর দোব সই? কে আছে নেবার? বলিয়া গুনগুন সুরে গাহিল—

"আমি ত বিলাতে চাই আমারে!"

সবিতা বলিল, কেন কলেজের ম্যাড়াগুলো কি হলো?

শুক্লা হাসিল, বলিল, ম্যাড়াদের যা হয় তাই, শিং নাড়াই সার!

সবিতা বলিল, নে চট্ ক'রে চিঠিখানা লিখে ফেল্, আমার আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

শুক্লা বলিল, হ্যাঁ ভাই, জানাজানি হয়ে পড়বে না ত? আমার কেমন যেন—

—কিছু না, ওটা নার্ভাস ডেবিলিটি, ওষুধ খা।

—মা যদি জানতে পারেন?

—পারলেই বা! স্বয়ম্বর প্রথা এদেশে হাজার বছর

ধ'রে চলে আসছে, তা জানিস্? লেখ লেখ্! আমারও ত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে—

শুক্লা রঙ্গভরে বলিল, কিন্তু তুমি ত নিজেই বলছ, না-মানুষ না-জন্তু, একটি কিম্ভূত!

সবিতা কহিল, হ'লোই বা কিম্ভূত! হুকুম শুনে চললেই হ'ল।

শুক্লা বডিসে আঁটা ফাউণ্টেন পেনটি বাহির করিয়া দাঁতে চাপিয়া বলিল, কি জানি ভাই, বড্ড বেশী য়্যাডভেঞ্চারাস্ ব'লে মনে হচ্ছে।

সবিতা চটিয়া উঠিয়া বলিল, হচ্ছেই ত! কেনই বা না হ'বে? বাড়ীর লোক যদি বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখে, খুঁটে খাবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। বি-এ, এম্-এ পাস্‌গুলো বিফলে যাবে নাকি?

সবিতা এম্-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই; শুক্লা এই বছর আই-এ পাশ করিয়াছে। সবিতা একটি স্কুলে মাষ্টারীও করে; শুক্লাও মাষ্টারী খুঁজিতেছিল। এমন সময়ে, ঐ বিজ্ঞাপন!

শুক্লা বলিল, কিন্তু—

সবিতা এবার সত্য সত্যই রাগিয়া উঠিল; ব্যাগ প্যারাসোল্ প্রভৃতি হাতের কাছে টানিয়া গুছাইয়া লইয়া বলিল, লিখবি নে ত, আমি চললুম্।

শুক্লা বলিল, ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে কাজ করাই ভাল নয়?

—তুই ভাব্; আমি উঠি।

—বোস্, বোস্, অত রাগতে হবে না। দাঁড়া—

সবিতা হাসিয়া বলিল, একবার বলে বোস্, একবার ব'লে দাঁড়া; বিয়ের নামেই তোর মাথা খারাপ হ'ল নাকি?

—তা যা বলিছিস্ ভাই! দাঁড়া, একটা একটা ক'রে পয়েণ্টগুলো ক্লিয়ার ক'রে নেওয়া যাক্।

—কি আবার পয়েণ্ট?

বিজ্ঞাপনটির উপর চোখ রাখিয়া শুক্লা বলিল, এক নম্বর পয়েণ্ট—সুন্দরী?

—ন্যাকামী রাখ্। আমি তা বলে বঙ্কিমবাবুর মত আয়েষার রূপবর্ণনা করতে বসছি নে; অত ফুর্সতও নেই।

শুক্লা বলিল, সুশিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা—

সবিতা বলিল, পরীক্ষা করুক না; আর সচ্চরিত্রা কি না, সেটাও—

শুক্লা তাহাকে ঠেলা দিয়া, থামাইয়া দিল।

—সদ্বংশজাতা, বয়স্কা কুমারী—

—বয়স্কা কি-না যদি বলে, দাঁত দেখাবি।

—দাঁত দেখিয়ে কি হবে?

—ওমা, তা জানিস্ নে বুঝি? গরুর বয়স ঠিক ক'রে দাঁত দেখে।

—আমি বুঝি গরু?

—শুধু গরু! মুলতানি গাই! নে আর তোর কি পয়েণ্ট আছে বল্।

—সুগায়িকা—

—হার্মোনিয়ম বাজিয়ে চিঁ হিঁ করলেই ওদের মুণ্ডু ঘুরতে থাকে; নে, তুই যথেষ্ট সুগায়িকা।

—উদ্যান-পরিচর্য্যা—

—সটনের ক্যাটালগ সঙ্গে দিয়ে দোব; রোজ দামী দামী গাছ আর বীজের অর্ডার দিবি; ভি-পি খালাস করতে করতে বাছাধনের বাগানের সখ কর্পূর হয়ে যাবে। আর কি পয়েণ্ট আছে, বল?

—না, আর তেমন কিছু ত দেখছি নে।

—তবে লেখ্।

—কিন্তু যদি ভাই, কিছু ফ্যাসাদ হয়—

—তুই ভারি কা-পুরুষ—না, না, কা-রমণী! আমি চলি—

শুক্লা বলিল, এই দেখ, কলম খুলেছি।

দুই

পাঠিকা মহাশয়াকে এখন আমাদের সঙ্গে অনেক দূর-দেশে যাইতে হইবে। কলিকাতা হইতে দুই রাত্রির পথ; তবে ভয় নাই, যেহেতু আমরা, বায়ুরাজ্যে বিচরণকারী, মিনিটখানেকের মধ্যেই পঁহুছিয়া যাইব। কোনও কষ্ট হইবে না। সহর ডেরাদুন। এখান হইতেই মুসুরী পাহাড়ে উঠিতে হয়। মুসুরীর বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলা এখান হইতে বেশ দেখা যায়—মোটে ত উনিশ মাইল দূর।

প্রকাণ্ড পাচিলঘেরা একটা বাঙলো-বাড়ীর ভিতরের একটি ঘরে দুইজন লোক বসিয়া রাজনীতি-চর্চ্চা করিতেছিল। একজন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রের ব্যাকনাম্বার গান্ধীর কোষ্ঠি কাটিতেছিল; অপরজন অপদার্থ বাঙ্গালীর

অপদার্থতার ওয়্যাগন্ খালাস্ করিতেছিল। প্রথম ব্যক্তি, বাঙ্গালী; অপরজন ছাতু বা লাড্ডু অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশীয়।

বেহারা ট্রে সাজাইয়া চা ও চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া পার্শ্বের ছোট টেবিলে রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, গৃহস্বামী বেহারাকে বলিল, লিচু তৈয়ার থাকে ত লইয়া আইস।

বাড়ীটার হাতায় যতগুলি গাছ, সবগুলিতেই লিচু ফলিয়াছে। এত লিচু, লিচুর এত ঘোর লাল রঙ, লীচুর পীঠস্থান মজঃফরপুরেও হয় কি-না সন্দেহ। বেহারা কয়েকগুচ্ছ লিচু প্লেটের উপর রাখিয়া গেল।

—মুলুক, চা ঢালি?

—ঢাল; কিন্তু তোমাদের বাঙ্গালী অপদার্থ!

—চা খাও। তোমাদের ছাতুরা জুয়াচোর, ভণ্ড।

এমন সময় পিওন আসিয়া কয়েকখানি পত্র, একটি পুলিন্দা টেবিলের উপর রাখিল। একটা কাগজে সহি দরকার। গৃহস্বামী উঠিয়া আসিয়া সহি করিয়া দিল। পুলিন্দা দেখিয়াই মনে হয়, ভিতরে ছবি আছে। গৃহস্বামী বাঙ্গালী; নাম, হিরণকুমার রায়। গামা-প্যাটার্ণের চেহারা বলিয়া ছাত্রেরা নামকরণ করিয়াছে, হিরণ্যকশিপু! সামরিক কলেজের অধ্যাপক। মুলুকচাঁদ আগরওয়ালা তাহার বন্ধু ও সহকর্ম্মী। ১৯৩৯ সালের জার্মান-পোলাণ্ড যুদ্ধের পরেই ভারতবর্ষে ভারতীয়গণের সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটা দশ বৎসর পরের ১৯৪৯ সালের পাঠক-পাঠিকাকে বলিয়া দেওয়ার দরকার না থাকিলেও অধিকন্তু ন দোষায়ঃ করা গেল।

মুলুকচাঁদ বলিল, ফটো এল?

—মনে হচ্ছে। বলিয়া হিরণ্যকশিপু পুলিন্দাটা খুলিয়া, চায়ের টেবিলে ফিরিয়া আসিল। দু'জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি করিল এবং মনে মনে বলিল, মন্দ নয়!

হিরণ্যকশিপু বলিল, কি রকম মনে হচ্ছে?

মুলুকচাঁদ বলিল, বড্ড স্কিনি, গায়ে মাংস নেই বললেই হয়!

হিরণ্যকশিপু কহিল, আজকালকার ফ্যাসানই ঐ!

মুলুক বলিল, দাঁড়ানো, হাত রাখা, চাওয়া সবই সিনেমা ঢঙের।

হিরণ্যকশিপু কহিল, এটা ত সিনেমারই যুগ।

—চোখে কাজল দিয়েছে নাকি?

—আপ-টু ডেট্ মেয়েরা দেয়।

—ফুলহাতা শার্ট পরেছে না-কি?

—সেটা কলকাতা সহর, মেড়োর দেশ ডেরাডুন নয়। সম্ভ্রান্তঘরের শিক্ষিতা মেয়েরা ফুলহাতা ব্লাউজই এখন পরে।

মুলুকচাঁদ মনে মনে রঙ্গ অনুভব করিতেছিল; বলিল, তা যেন হ'ল। কিন্তু, জুতোর হিল্ এত লো কেন বাপু? হাই হিল্ই ত ফ্যাসান। হা হা।

হিরণ্যকশিপু বলিল, তা জান না বুঝি? প্লেনে লো হিল্ আর হিল্স-এ হাই হিল হচ্ছে মডার্নিজ্ম্!

মুলুক বলিল, কানে ও দু'টো কি রে বাবা? ঘুড়ী নয় ত?

—না, ওকে অজন্তার কর্ণাভরণ বলে। তোমরা এ সবের জান্‌বে কি? এক সের ছাতুতে ক'টা কাঁচা লঙ্কা চট্‌কাতে হয়, তারই হিসেব কর গে যাও।

মুলুক কৃত্রিম-মলিনমুখে বলিল, তা হ'লে আর তর্ক করব না ভাই; তুমি বিয়ে ক'রে ফেলো।

হিরণ্যকশিপু বলিল, দাঁড়া, চিঠি পড়ি আগে।

মুলুক বলিল, চিঠি এসেছে নাকি?

—নিশ্চয় এসেছে। তুই যে কিছুই খেলি নে মুলুক! দু'খানা কচুরী খানা।

মুলুক বলিল, চিঠি আন্।

চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত:

> মহাশয়, অপরিচিতার নমস্কার গ্রহণ করুন। অপরিচয়ের যেটুকু বাধা, সেটুকু অতিক্রম করার জন্য আমার ছবি পাঠালাম। আপনার ছবি আসিলে পরিচয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে। ভরসা করি অবিলম্বে বাসনা পূর্ণ করিবেন।
>
> বিনীতা
>
> শুক্লা সেন

হিরণ্যকশিপু বলিল, লেখাপড়া জানে বলেই মনে হচ্ছে। ছোট চিঠির ভেতরে সব কথাই বলেছে।

মুলুক বলিল, হ্যাঁ। হাতের লেখাটাও ভাল।

—সেটা স্কুলে-কলেজে পড়া মেয়ে মাত্রেরই ভাল আর এক টাইপ। তুমি দু'জন পুরুষের লেখা একরকমের

পাবে না; কিন্তু দু'শ মেয়ের লেখার মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাওয়া ভার।

বেহারা ঘরে ঢুকিয়া চায়ের পাত্রাদি বাহির করিয়া লইয়া যাইবার সময় আলোর সুইচ্ টিপিয়া দিয়া গেল; আলো জ্বলিল।

মুলুক বলিল, বেরোবে না কি ?

—আর একটু পরে, বাইরে এখনও বড্ড ঝাঁজ।

আরও কতকগুলি পত্র ছিল, হিরণ্যকশিপু সেগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল; মুলুক ফটোখানায় মনোনিবেশ করিল। চিঠি পড়িতে পড়িতে হিরণ্যকশিপু কহিল, লোকটা কি বোকা! মেয়ের হয়ে দরখাস্ত পাঠাচ্ছে। আমার মেয়ে খুব সুন্দরী, সুরালয় থেকে গীতশ্রী খেতাব পেয়েছে, বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছে, সম্প্রতি টাইফয়েড থেকে উঠেছে ব'লে ছবি তুলিয়ে পাঠাতে পারলুম না। মহাশয় কিসের প্রোফেসর, কত বেতন পান্, মহাশয়ের লেখা টেক্সট বুক্ ক'খানি আছে, সেগুলা ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত কি-না এবং কতগুলি স্কুলে ধরাতে পেরেছেন, কত ক'রে সংস্করণ ছেপেছেন, কতগুলো কেটেছে, টেক্সট্ বুকগুলির জন্য ক্যানভাসার আছে কি-না। সমস্ত ইউ-পি'তে চালাবার চেষ্টা হয়েছে কি-না—নিশ্চয় মাথা খারাপ! রিটায়ারড হেড মাষ্টার, তাই! নইলে এত বুদ্ধি! এই যাও, তোমার যোগ্য স্থানে!—বলিয়া হিরণ্যকশিপু সেই চিঠিখানিকে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া বাতিল-বাক্সে ফেলিয়া দিল।

মুলুক তখনও ফটোখানা দেখিতেছিল, হিরণ্যকশিপু কহিল, বড্ডই মনে ধরে গেল নাকি মুলুক ?

মুলুক মলিনমুখে কহিল, বেশী ধরলেই বা কি, কম ধরলেই বা কি! তুমি কি আর হস্তান্তর করবে!—বলিয়া সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল; আবার বলিল, বেল্ পাকলে কাকের কি বল্ ?

হিরণ্যকশিপু কহিল, তোর জন্যেও একটা বিজ্ঞাপন দিই, কি বলিস্? এই রকম আর একটি কি পাওয়া যাবে না ?

—বাঙ্গালী ?

—দোষ কি ?

—ছোঃ ছোঃ! তার চেয়ে লকনৌয়ের বাঈজী ভাল! ঢংও জানে, গানও জানে। বাঙ্গালীরা ঢংটাই শেখে, গানের বেলা শেয়াল ডাকে।

—তুই ভারি নিন্দুক। বোস্ সাহেবের মেয়ের গান, সেদিন শুনলি ত! কি সুন্দর গাইলে, কেমন চড়া গলা—

—নাকের খানিকটা কেটে দিলে ভাল হ'ত।

হিরণ্যকশিপু বলিল, একটু নাকি সুর, তা বটে!

মুকুন্দ বলিল, ভগবান নাক দিয়েছিলেন নিশ্বেস ফেলবার জন্যে, গন্ধ শোঁকবার জন্যেও হতে পারে; মানুষ খোদার ওপর খোদকারী ক'রে সেই নাকে চশমা পরলে; সর্দ্দি ঝাড়তে সুরু করলে; তাতেও সন্তুষ্ট নয়, নস্যি গাদতে লাগল: আবার গানের ভেতরও যদি সেই নাক ঢোকাতে আসে, বরদাস্ত হবে কেন বল? খোদার অসীম ধৈর্য্য, তিনি যদি বা বরদাস্ত করেন, আমি পারি নে।

উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

পরমুহূর্ত্তে সমস্যা জাগিল, হিরণ্যকশিপুর ভাল ফটো নাই। ফটো এখনই উঠান যায় বটে; কিন্তু কি ভাবে, কি রকম ধাঁজে উঠান হইবে, সেইটাই সমস্যা। মুলুকচাঁদ বলে, লেঙট-আঁটা ছবি পাঠান সঙ্গত হইবে না, মেয়েটি মূর্চ্ছা যাইবে; ইউনিফর্ম্ম-এও সে আশঙ্কা আছে; এক্স-প্যাণ্ডেড চেষ্ট ও এক্সপ্যাণ্ডেড মাস্‌ল-আর্মের ছবি পাঠান মন্দ নয় বটে; কিন্তু তাহাতে কাব্যের কিছু অসদ্ভাব ঘটে। হিরণ্যকশিপুর খাওয়ার ছবি একখানা উপহার দেওয়া যাইতে পারে। একটি ছাগবৎস, দুইটি লেগহর্ণ কুক্কুট, দুই ডজন কলা, অর্দ্ধ ডজন ডিম, দিস্তাখানেক রুটীর পার্শ্বে বসিয়া ছবি তুলাইলে ঠিক হয় সত্য; কিন্তু মেয়ের আত্মীয় স্বজন ভয় পাইবে। শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত ত হইবেই, অকস্মাৎ জামাতার আবির্ভাব হইলে বাড়ীর কচি কাচা সামাল্ সামাল্ করিতে করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইবে।

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইল, বাস্ট ফটো তুলিয়া পাঠানই যুক্তিযুক্ত। আগামী কল্য ইংরেজ ফটোগ্রাফার্সে'র স্টুডিও হইতে তসবীর উঠাইয়া পাঠাইবার সঙ্কল্প পাকা করিয়া, উভয় বন্ধুতে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইল।

তিন

হিরণ্যকশিপু পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পত্রের একাংশ খুবই ভাল লাগিয়াছে, বারম্বার সেই অংশটি পাঠ করিতেছেন:

সেকালের সেই দিনের কথা মনে করুন। বল্কল-পরিহিতা কণ্বদুহিতা যখন আলবালে জলসেচন করিতেছিলেন, তখন বৃক্ষান্তরাল হইতে প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা দেখিতেছিলেন আর ভাবিতে-ছিলেন, ঐ নবনীত কোমল দেহে জলসিঞ্চনের কষ্ট আশ্রমবালিকা সহ্য করিতেছেন কিরূপে? রাজার ইচ্ছা হইতেছিল, তিনিই জল তুলিয়া দেন, প্রাণমনোমোহিনীর কষ্টের লাঘব করেন। সেকালে ও একালে কতই প্রভেদ! একালের সবই যেন বস্তুতান্ত্রিকতায় ভরা—কাব্যের স্পর্শ-মাত্র নাই। যাহাদের মনে কাব্যের লেশমাত্রও আছে, তাহাদের যেন এই অবস্থার মধ্যে দম বন্ধ হইয়া আসে। নীলিমাবিহীন আকাশ, তরঙ্গশূন্য সাগর, প্রেমহীন হৃদয়, কাব্যবোধহীন মানবহৃদয় কি ভয়াবহ! আমি ত কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারি না।

পত্রের আর-এক অংশও তুলনারহিত :

এই পৃথিবী কি একটা পণ্যশালা? থরে বিথরে পণ্য সাজান আছে, দাম ফেল, লইয়া যাও—বাড়ী গিয়া দেখ, যাহার যাহা মিলিয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। এই কি সৃষ্টির বিধান? নিশ্চয়ই নয়। বিধান যদি ঐরূপই হইবে, তবে চক্ষু কেন, কর্ণ কেন, বাক্য কেন, গন্ধ কেন, স্পর্শ কেন? বিচার-বুদ্ধি কেন, যুক্তি তর্ক কেন, ভাল-মন্দ বিভেদ কেন? পৃথিবীটাকে নিছক পণ্যশালা বলিয়া মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

শেষাংশ আরও মধুর :

নদী বুঝিতে পারে, সাগর বহুদূর নয়। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে, দেহ স্ফীত হয়; মিলন-কামনায় উত্তাল, অধীর হইয়া পড়ে। এ সত্য শাশ্বত—চিরন্তন সত্য। যে দিন নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, সাগর সৃজিত হইয়াছে, নদী আসিয়া সাগরের বুকে মিশিয়াছে, সাগর তাহাকে শত বাহু মেলিয়া বুকে ধরিয়াছে, সেই দিন হইতে এই সত্য জগতে প্রকাশ। নদী এই 'শুভদিন, শুভক্ষণ, শুভ মুহূর্ত্তটির আশায় দূর দুরান্ত হইতে, বিরহমিলনের গান, সুখদুঃখের গাথা, হর্ষ বিষাদের কাহিনী আশা নিরাশার ব্যথা বহিয়া, কখনও কাঁদিয়া, কখনও হাসিয়া, কখনও নীরবে, কখনও ভৈরব-রবে বহিয়া আসিতেছে—বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই—মিলনের অজানা, অচেনা, অদেখা, অপূর্ব্ব দৃশ্যটির কল্পনায় হৃদয় ভরিয়া, কখনও অনুকূল স্রোতে কখনও বা উজানে বহিয়া চলিতেছে—চলিতেছে।"

হিরণ্যকশিপু কতবার যে পড়িল, বলা যায় না। তাহাতেও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া চিঠিখানাকে ভিতরকার বুক পকেটে ভরিয়া, ভ্রমণে বহির্গত হইল। মুলুকচাঁদের বাসায় আসিয়া দেখিল, মুলুকচাঁদ গোটা দুই-তিন রাইফেল বাহির করিয়া মহাসমারোহে সাফ্-সুতরা করিতেছে। মুলুকচাঁদ খাতির করিয়া বসাইল। বলিল, শিকারে যাইতেছি।

—কবে?

—কাল।

—আমায় বল নি কেন?

মুলুকচাঁদ হাসিয়া বলিল, তুমি ত সেরা জন্তু শিকারে ব্যস্ত, এখন বাঘ-হরিণে মন উঠবে কেন?

হিরণ্যকশিপু বলিল, তোমার সঙ্গে সেই পরামর্শই করতে এলুম। আমি শীঘ্র কলকাতা যাচ্ছি।

—বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে নাকি?

—না। কলকাতায় গিয়ে ঠিক করব।

—আমাদের ভোজটা এইখেনে হবে ত?

হিরণ্যকশিপু বলিল, ভেবেছিলুম, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

মুলুকচাঁদ হাসিয়া বলিল, নিতবরের রেওয়াজ কি আজও আছে?

—কি জানি! এর আগে ত বিয়ে করি নি কখনও।

—তা বটে! বলিয়া মুলুক রাইফেলে শিরীষ্ কাগজ ঘসিতে লাগিল।

হিরণ্যকশিপু বলিল, টাকাকড়ি কি নিয়ে যাব না যাব তাই ভাবছি। কলকাতায় চেনা-শোনা লোকও ত কেউ

নেই, কে কেনাকাটা করে, কেই বা কি করে! তুমি থাকলে তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত!

—'ডোণ্ট্ ওরি'! কলকাতায় গিয়ে একটা হোটেলে উঠবে। হোটেলের ম্যানেজারকে বলবে, সাড়ীওলা, ঘড়িওলা, জুয়েলার, ফুলওলা, টোপরওলা, সন্দেশওলা, লুচিওলা, ভাজিওলা।…ব্যস্ আধঘণ্টার মধ্যে সব হাজির! টেণ্ডার দিতে বল্‌বে, উইথ স্পেসিফিকেসন!

—বল কি। লুচিওলা, ভাজিওলা পর্য্যন্ত?

—মায় টুথপিক্‌ওলা পর্য্যন্ত! বিয়ের রাত্রে তোমার ত কোন হাঙ্গামাই নেই হে, যা কিছু তারা করবে। পরের দিন তোমার পার্টিতে যে ক'জন লোক, সেই ক'জনের মত ডিস্ অর্ডার দেবে। হয়ে গেল। কলকাতা সহরে আবার ভাবনা কিসের?

হিরণ্যকশিপু মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না, না ভাবনা ঠিক নয়! তবে কি জান, বন্ধু একজন সঙ্গে না থাকলে আমোদটা পূর্ণ হয় না।

—দি আদার সাইড্ মাইট্ নট্ লাইক্ ইট্। একালে আই ও ইউর মধ্যে হি অথবা দে যত না আসে, ততই ভাল, তা জান ত!—বলিয়া সে একটা বাঁকা হাসি হাসিল।

হিরণ্যকশিপু গূহ্য অর্থ বুঝিল না; সে পূর্ব্বের মতই চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে বলিতে লাগিল, আমি ভাই, এ সব বিষয়ে সেকেলেই আছি।

—ন্যাকামী রাথ না চাঁদ। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, ফটো আনিয়ে, করেস্পণ্ডেন্স চালিয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছ, কার মেয়ে, কেমন বংশ খোঁজ করা নেই, শাড়ী-সন্দেশের কণ্ট্রাক্ট দিচ্ছ, আবার ন্যাকামী হচ্ছে, আমি কিছু জানি নে! চীয়ার আপ্ ওল্ড বয়। এটা ১৯৪৯ সাল; আর যেখানে যাচ্ছ সেটা কলকাতা সহর! কলকাতায় ভাবনার কিছু নেই। শুনেছি সেখানে এমন কল আছে, যে কলের একদিকে একটি গাই গরু, যবের বস্তা, আলু পটোলের ঝুড়ি পুরে দেয়, অন্যদিকে বামুনদের ঢুকিয়ে দেয়, আধঘণ্টা পরে ভেউ ভেউ ক'রে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে দক্ষিণা হাতে বামুনরা বেরিয়ে আসে। তোমার প্রিয়তমাই সব ক'রে ক'ম্মে নেবেন, তুমি প্যাসিভ্ থাকলেও ক্ষতি হবে না। তা, কবে যাচ্ছ?

—সে পরামর্শও ত তোমার সঙ্গে করব বলেই এসেছিলুম। তা তোমার আশা ত ছাড়া দেখছি। —আর এক কথা। তোমাদের নাইনিতালের বাড়ীটা পাব?

—সুইট্ হনিমুন? নিশ্চয়ই পাবে। আমি কালই চিঠি লিখে দিয়ে যাব।

—বাড়ীটি লেকের কাছে ত?

—কাছে কি বলছ? লেকের ওপরে, বিছানায় শুয়ে ঢেউ গোণা যায়।

পরদিন কলিকাতায় টেলিগ্রাম চলিয়া গেল।

আর একটু হইলেই টেলিগ্রামটা শুক্লার দাদার হাতে পড়িত। দাদা সেই মাত্র সান্ধ্য-সংবাদপত্র হস্তে ঘরে ঢুকিলেন—সাইক্ল-পিওন হাঁকিল, তার হ্যায়।

'তার' যে তাহার ছাড়া আর কাহারও নয়, শুক্লার মন তাহা বলিয়া দিল।

শুক্লা সেন

নন্দনকানন রোড

কলিকাতা

শুক্রবার এক্সপ্রেসে রওনা হইতেছি।

প্রেরকের নাম নাই—নিষ্প্রয়োজন; যেহেতু প্রেরণের স্থান, ডেরাডুন। শুক্লা তারটা 'বুক-পকেটে' ফেলিয়া সবিতার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। ১৯৪৯ সাল, তবুও সে খানিকটা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ নিয়মেরও ব্যতিক্রম থাকে বই কি!

সবিতা বলিল, খাওয়া এখন?

শুক্লা বলিল, কি খাবি?

সবিতা উত্তরটা মুখেই দিল বটে, তবে কথা কহিয়া নয়। শুক্লা বলিল, ভোগের আগেই পেসাদ করলি!

সবিতা রঙ্গ করিয়া বলিল, শ্রীক্ষেত্রে ভোগ পায় কে, সবই ত পেসাদ!

—দূর হতচ্ছাড়ী।

রঙ্গ তামাসার পরে, শুক্লা বলিল, এখন কি করতে হ'বে তাই বল্?

—করা করি আর কি! রবিবার ভোর ৬টার সময় হাওড়া স্টেশনে হাজির থাকবি।

—তোমাকেও থাকতে হবে।

—দূর! আমি থাকব কেমন ক'রে?

—আমি যেমন ক'রে থাকব, তেমনই করে।

—যদি তোর হাত ধরতে আমার হাতই ধরে বসে?

—আমি ভুল ভেঙ্গে দেব।

—ইচ্ছাকৃত ভুল, ভাঙ্গালেও ভাঙ্গে না, জানিস্ ত?

—তা হ'লে আমি এসে ঐ খাটে শুয়ে পড়বো।

—মাইরি আর কি! আমি ব'লে পাঁচ বচ্ছর ধরে ঘ'সে মেজে তৈরী করলাম, উনি এসে বাড়া ভাতে বসে পড়বেন! টিয়া এখন একটি দু'টি বুলি কাটছে, শিস্ দিচ্ছে, এখন বুঝি ছাড়া যায়!

—ভাল রাঁধুনী, রান্নাতেই সুখ পায়। আমরা আনাড়ী লোক, তৈরী জিনিষই আমাদের ভাল। তুমি ভাই করিৎকর্ম্মা লোক, আবার তৈরী ক'রে নিও।

শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হইল, সবিতার তাঁহাকে দিয়া, পূর্ব্ব-রাত্রে একখানা মোটর ভাড়া করাইয়া রাখা হইবে। সবিতা ভোর ৫টার সময় শুক্লাকে তুলিয়া লইয়া বিজয়াভিযানে বাহির হইবে। বাকী যে সব কথা, তাহা পরে আলোচনা করিলে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

চার

ফটোগ্রাফে দেখা লোককে জীবন্তে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। সবিতার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাহাকে প্ল্যাটফর্মের বাহিরে মোটরে বসিয়া থাকিতে দিয়া শুক্লা প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়াইয়াছিল। দেরাদুন এক্সপ্রেস 'ইন্' হইবামাত্র একখানা প্রথম শ্রেণীর ছোট কামরার দরজায় চেনা মুখখানা দেখিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে শুক্লা অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু গাড়ী যখন থামিল এবং সেই চেনা-লোকটি যখন দু' কাঁধে দু'টা বন্দুকের মত বস্তু ফেলিয়া নামিল, শুক্লা সভয়ে ও বাবাঃ করিয়া উঠিল। মনে হইল সবিতাকে ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই। লোকটিকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করা দায়; লোকটি অতটা লম্বা আর অতটা চওড়া না হইলেই ভাল হইত! এক মুহূর্ত্ত পরেই লোকটি শুক্লার কাছে আসিয়া শুদ্ধ বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি শুক্লা ত?

এতদিন পত্রে 'আপনি'ই চলিতেছিল; আজ প্রথম দর্শনেই 'তুমি' হইয়া গেল; কিন্তু শুক্লা ক্ষুণ্ণ হইল না। ঐ বিরাটকায় ব্যক্তি আবার আপনি বলিবে কাহাকে? প্ল্যাটফর্মের যত লোক, সকলকেই তুমি বলিবার অধিকার সে কণ্ঠায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে।

শুক্লা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। কিন্তু কোথায় থাকা যায় বল ত?

এই সময়ে গোটাকতক লোক তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল—ইহারা হোটেলের লোক। দেশী, বিদেশী, পরদেশী অনেক হোটেলের লোকই জমিয়া গিয়াছে।

হিরণ্যকশিপু শুক্লাকে বলিল, এদের মধ্যে কোন্‌টা ভাল, তুমি কিছু জান?

শুক্লা বলিল, বিলিতে হোটেল সবগুলোই ভাল।

—তবে তাই, বলিয়া উহাদের মধ্য হইতে একটি বাছিয়া বাক্স, বিছানা প্রভৃতি হোটেলের লোকের জিম্মা করিয়া দিয়া হিরণ্যকশিপু বলিল, তুমি আমার সঙ্গে হোটেলে আসবে ত এখন? সেখানে ব'সেই কথাবার্ত্তা হ'বে, কেমন?

শুক্লা ঘাড় নাড়িল।

হোটেলের গাইড সবিনয়ে নিবেদন করিল, গাড়ী প্ল্যাটফর্মের বাহির আছে।

—আমরা ট্যাক্সি নিয়ে যাব, কি বল?

মোটর যে অপেক্ষা করিয়া আছে একথা বলিবার দরকার আছে বলিয়া তাহার মনে হইল না: ভাবিল, সবিতার পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় অকস্মাৎ চিনিয়া ফেলিবার ভান করিলে সব দিক দিয়াই ভাল হইবে। সবিতাও কতকটা বিস্মিত হইবে, এই লোকটিও জানিবে যে একলা আসিতে ১৯৩৯ সালেও বঙ্গললনারা ভীত হইত না; ১৯৪৯ সালেও কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু সবিতা নাই! সে গাড়ীও নাই! সে-যে এমন ছোটলোক শুক্লা তাহা জানিত না। দেখা হোক্, তখন বুঝাপড়া হইবে।

হোটেলে বসিয়া ইহাই স্থির হইল যে, আগামী কল্য প্রভাতে হিরণ্যকশিপু শুক্লাদের বাড়ী যাইয়া শুক্লার মাতার নিকট শুক্লার পাণি প্রার্থনা করিবে। তাহার পর উভয়ে বাহির হইয়া মার্কেটিং করিবে। হিরণ্যকশিপুর সহিত এক টেবিলে ব্রেক ফাষ্ট করিয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া শুক্লাকে উঠাইয়া দিয়া, হিরণ্যকশিপু ঝুঁকিয়া পড়িয়া, নাঃ ১৯৩৯ই ভাল ছিল।

কিন্তু না, রাস্তার কোনও লোকের চোখই এদিকে নাই; থাকিবার কথাও নয়; লোকের চোখও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, নূতনত্ব না পাইলে হাঁ করিয়া তাকায় না।

বাড়ী আসিয়া দেখিল, সবিতা তাহার মায়ের সঙ্গে খুব গল্প জমাইয়া দিয়াছে। শুক্লা মুখ অন্ধকার করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বেশ বাস পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। জামা কাপড় বদলাইতে বেশী সময় লাগে না, সেগুলাকে আল্‌নায় ফেলিতেও যথেষ্ট দেরী হয় না; কিন্তু পাটকরা কাপড় খুলিয়া আবার পাট করিতে এবং বারবার ঝাড়া জামা নূতন করিয়া ঝাড়িতে মুছিতে সময় লাগে বৈ কি! এতটা সময়ের মধ্যেও দুইটি অভিন্নহৃদয় বন্ধুর মধ্যে বাক্যবিনিময় হইল না দেখিয়া, শুক্লার মা মনে মনে হাসিয়া, "সবি, কিছু খাবি না কি রে?" বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সবিতা বসিয়াছিল, উঠিয়া আল্‌নার কাছে আসিয়া বলিল—

বাপ্,
ইয়া একটা বাঘ
দেখে দিলুম লাফ!

ও শুকি, জালার পাশে নেংটি ইঁদুর হয়ে যাবি যে ভাই!

শুক্লা চটিয়া উঠিয়া বলিল, হয়ে যাই, হয়ে যাব, আমি হয়ে যাব, তা'তে কারও কথা বলবার দরকার আছে ব'লেত মনে করি নে।

সবিতা বলিল, সেকালে কথা ছিল, বিয়ে ফুরোলে ছালনায় লাথি! তোর যে দেখছি বিয়ে পর্য্যন্ত তর সইছে না। তা' ভাল!

শুক্লা বলিল, বাঘ হ'লেও তোমায় খেত না।

—অমন কচি নধর মাংস পেলে বুড় মাংসে কার রুচি হয় বল্!

—তবে পালিয়ে এলে কেন, শুনি?

—সত্যি বলছি ভাই, চেহারা দেখে ভড়কে গেলুম।

—তোমার ভড়কাবার কি ছিল? ভয় পেতে হয়, ভড়কাতে হয়—আমি ভয় পাব, আমি ভড়কাব। তোমার কি?

সবিতা এতক্ষণে রঙ্গ পরিহাস ছাড়িয়া বলিল, দূর তা' নয়। দেখলুম তোরা কথা কইতে কইতে প্ল্যাটফর্ম থেকে বার হলি; আমি তোদের আলাপ জমাবার সুযোগ দেবার জন্যেই সরে গিয়ে রইলুম। আমি থাক্‌লে তোদের আলাপে কতকটা ব্যাঘাত ত হোতই; অন্ততঃ আর কিছু না হোক্, আগে কে কথা কইবে, মনের এই তর্ক মিট্‌তে মিট্‌তে রাস্তা ফুরিয়ে যেত! না হোত কথা, না হোত ভাব! হোল, ভাব টাব হোল?

—তা হোল, বলিতে বলিতে শুক্লা হাসিয়া ফেলিল।

—হাসলি যে! কি ভাই, বল্‌না ভাই! আচ্ছা, বলবিনে ত! বেশ, বলিস্‌নে। কিন্তু পেলি কার জন্যে, সেটা যেন মনে থাকে!

—বলছি বলছি, অত রাগ করতে হবে না। ভেরী র‍্যাস্!

সবিতা চোখ দু'টা পিট্‌পিট্ করিতে করিতে বলিল, হুঁ?

শুক্লা সহাস্যনেত্রে কহিল, হুঁ।

সবিতা প্রশ্ন করিল, মাইরি?

শুক্লা হাসিয়া বলিল, মাইরি?

আঙুল দেখাইয়া সবিতা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে বলিল; শুক্লা তর্জ্জনী উত্তোলন করিল।

—কখন্?

—আসবার সময়, ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে।

—হি ইজ ব্রেভ্, ডিজার্ভস্ ইউ।

সবিতা, অন্য কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিল আসল কথা কিছু হোল?

শুক্লা বলিল, কাল আসবে।

সবিতা বলিল, নিজে সোজা?

—হ্যাঁ।

—হি ইজ ব্রেভ! ডিজার্ভস্ ইউ!

—তোকে কিন্তু ভাই, কাল সকালে থাক্‌তে হবে।

—সে তুই না বললেও থাক্‌ব! উঃ কি দুঃসাহসী লোক! রাস্তার ধারে ট্যাক্সিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোকে কিস্ করলে?

—ঝাঁপিয়ে অবিশ্যি পড়েনি, ঝুঁকে পড়েছিল বটে!

—তারপর নিজেই এসে বলবে, শুক্লাকে বিয়ে করতে এসেছি! হ্যাঁ দুঃসাহস বটে! এ লোক ন্যাকা মেয়ে পছন্দ করতে পারে না—ঠিক। একটা কথা তো'কে ব'লে রাখি শুকি, মনে রাখিস্। 'কেন' কথাটা একদম ভুলে

যাস্। কোন সময়ে 'কেন' করবি নে। ওটায় যত বা ন্যাকামী ফুটে ওঠে, তত বা অশান্তি ডাকে। মনে থাকে যেন।

—'কেন'র ওপর তোর বিষম রাগ দেখি! তুই বলিস্‌নে ওঁর কাছে?

—না।

—কোন কিছু জানতে হোলে?

—'কেন' না ব'লে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি। আমি শতকরা নিরানব্বইটা কেসে, শুনেছি ও দেখেছি, কেন-টা পুরুষদের ভ্যানিটিতে লাগে। জাতটা ভ্যানিটিতে ভরা, তা স্বীকার করিস্ ত? ভাবে—কৈফিয়ৎ চাইছে। চটে যায়! গাধা, গাধা, একেবারে ধোপার গাধা, বুদ্ধি সাধ্যি যদি কিছু থাকে!

পরদিন সকালে অভিনব কাণ্ড কিছুই হইল না। 'হিরণকুমার রায়, ভারতীয় সামরিক কলেজের অধ্যাপক, ডেরাডুন' এই কার্ড দেখিবামাত্র শুক্লার প্রোফেসর দাদা বাহির হইয়া আসিলেন। আগন্তুককে দেখিবামাত্র তিনিও মনে মনে ও সভয়ে কহিলেন, ও বাবাঃ!

আগন্তুক বলিল, শুক্লা সেন, আপনার কে?

—আমার বোন। কেন?

—আমি তাঁকে বিয়ে করতে এসেছি। পরশু ভাল দিন আছে, বিয়ে ক'রে তারপর দিনই আমরা নইনিতাল যাব, হনিমুন করতে।

প্রোফেসর দাদার মাথা ঘুরিতেছিল। জানা নাই, শোনা নাই, নৈনীতালে একেবারে হনিমুন পর্য্যন্ত! লোকটি স্থবির গোছের, বই, কলেজ, ট্রাম, নস্যের ডিবা পর্য্যন্ত দৌড়, এত দ্রুত দৌড়িতে পারিবে কেন? খালি মালগাড়ী যেমন ষ্টেশন হইতে যাই যাই করিয়াও চলিতে পারে না, প্রোফেসার দাদার কথাগুলিও তদ্রূপ; বাহির হয়-হয় হয় না! বলিল, আপনি, আমার বোন—আপনাকে ত, আপনার দেশ, নইনিতালে কেন—আপনার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে, আপনাকে আমরা চিনিনে জানিনে—

আচম্বিতে, সবিতা বাহিরে আসিয়া বলিল, এই যে আপনি এসেছেন, নমস্কার, আসুন, আসুন।

সবিতা তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। প্রোফেসরদাদা নাসিকারূপ হাউইট্জার গানে নস্যরূপ বারুদ গাদিয়া ভাবিলেন, তাহ'লে বোঝা গেল, সবিতাই ঘটক। বাঁচা গেল বাবা! যা ভয় হইয়াছিল! যাক্, একটু বেরিয়ে পড়া যাক্। পাছে পুনরায় কোন কঠিন, জটিল ও দুর্ভেদ্য সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, অবিলম্বে কাঁধে জামাটা ফেলিয়া তিনি মধ্যাহ্ন ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হিরণ্যকশিপু শাড়ীর, জুতার, জড়োয়ার ক্যাটালগগুলি খুলিয়া বলিল, আপনারা পছন্দ ক'রে নম্বরগুলোর পাশে পাশে দাগ দিয়ে দিন, ওরা বিকেলেই সব ডেলিভারী দিয়ে যাবে।

সবিতা বলিল, আমরা আসল জিনিষ ছাড়া আর কিছুই বাছাই করিনে।

লোকটি ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, সে কি! এ সবই জোচ্চুরী নাকি?

সবিতা বলিল, না, না, তা' বলিনি। আমরা বলছি কি, শুক্লার আসল জিনিষটা আমরা পছন্দ করিছি, বাকী যা-কিছু তা' তিনিই পছন্দ করুন; আমরা আর পরিশ্রম করতে নারাজ!

—ওঁরও কি সেই মত?

—আমরা সকল বিষয়ে একমত।

—শুক্লা কথা বলে না কেন? ও বোধ হয় আড়ালে কিছু বলতে চায়?

—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারেন; তবে মনে রাখবেন, এটা ট্যাক্সি নয়; ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা চেষ্টাকৃত ঠুলিবদ্ধ চক্ষু; দেখলেও দেখে না। এখানে মা বিদ্যমানা এবং দুই চক্ষে দুই জোড়া পাওয়ারফুল লেন্স। আর শুক্লার প্রোফেসার-দাদাকে দেখলেন ত? "আপনারা? কোন্ জাতি, কোন্ বর্ণ, কোন্ ঘর, কুলীন না মৌলিক"!—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সবিতা উঠিয়া গেল। শুক্লা আসিল।

—আমি বলি কি, তুমি চল, পছন্দ ক'রে সব কিনে আনবে চল?

—সেই কথাই ত ছিল।

—তা' ছিল, তবু এগুলো নিয়ে এলুম, যদি দেখে শুনে কতকটা ধারণা ক'রে যাওয়া যায়, সুবিধে হয়।

সবিতা শুক্লার মা'কে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, নাও মা, তোমার মেয়ের শাড়ী, জুতো, জড়োয়া গয়না তুমি পছন্দ ক'রে দাও। পর্শু দিন ঠিক হয়েছে—!!

শুক্লা বলিল, আমরা বেরুচ্ছি, দেখে শুনে সব কিনে আন্‌ব।

সবিতা বলিল, সেই ভাল। মা, তুমি চট্ ক'রে জামাইকে চা' করে দাও দিকি!

বাহিরে আসিয়া শুক্লার মা সবিতাকে একরাশ গালি পাড়িলেন—হতচ্ছাড়ী, শতেকখোয়ারী, টেবো-গালি, ইত্যাদি! গোপনে গোপনে এত কাণ্ড করা হইয়াছে, তাঁহাকে বলিতে দোষটা কি ছিল, পোড়ারমুখী! বাঁদরী, ছুঁচোমুখী।

গালিগালাজের অভিধানগুলা কি সৃষ্টিনাশের তারিখ পর্য্যন্তই বলবৎ থাকিবে! হায় রে! এক হাজার নয় শত উনপঞ্চাশ সালেও তাহাদের সমান দাপট!

পাঁচ

নইনিতাল। এবার নইনিতালেও ভীষণ গরম। বাজারে হাতপাখা বিক্রীত হইতে দেখা যাইতেছে। আগেকার দিনে পাখার নাম শুনিলে লোকে আকাশের পানে চাহিয়া পাখীর খোঁজ করিত। তবে হঁ্যা, মধুচন্দ্র যাপন করিবার যোগ্যস্থান বটে! লেকের জলে যখন জ্যোৎস্না ভাসে, পাহাড়ের গায়ের আলো যখন সেই জলে ঝিকিমিকি করে, তখন যাহাদের মধুচন্দ্রের দিন অবসান হয় নাই, তাহারা দিল্লীর শেষ বাদশাহের অনুকরণে অবশ্যই বলিতে পারে, ওগো ধরায় স্বর্গ যদি কোথায়ও থাকে, তবে এই স্বর্গ, এই স্বর্গ! তোমরা শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে, এই দূর দেশেও পাখী ডাকে এবং মিষ্ট সুরেই ডাকে। বোধ করি মধুচন্দ্রীদের মনের মাধুর্য্য বৃদ্ধির জন্য তাহারাও দেশান্তর হইতে আসিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের আমদানী।

ছোট বাড়ীটি; কিন্তু বড় সাজান-গোছান। বাগানটি যেন ছবিতে আঁকা। শুক্লা সীজন ফ্লাওয়ার বেডে জল দিতেছিল, হিরণ্যকশিপু আসিয়া সংস্কৃতে বলিল, প্রিয়তমে, মক্ষিকাটি তোমাকে বড়ই পীড়িত করিতেছে; কিন্তু আর ভয় নাই, আমি-দুষ্মন্ত আসিয়া পড়িয়াছি।

শুক্লা হাসিয়া চাহিল মাত্র।

'দুষ্মন্ত' কহিল, প্রিয়ে আজ্ঞা দাও, ঐ দুষ্ট মাছিটাকে [illegible] করি।

[illegible]নয়। [illegible]ল, কোথায় আবার মাছি?

[illegible]বার হলি;

হিরণ বলিল, রূপক বলছিলাম। শকুন্তলার গল্প নিশ্চয়ই পড়েছ?

—না; আমাদের বছরে শকুন্তলা টেক্সট্' ছিল না। একটু একটু জানি গল্পটা। তুমি নিশ্চয়ই সবটা জান?

—তা জানি।

—বল-না।

—এখন! পাগল নাকি? চল, বেড়িয়ে আসি।

—রাত্রে বল্‌বে?

—বলব?

শকুন্তলার গল্প শুনিতে শুনিতে রাত্রি কাটিয়া গেল। ভোরের দিকে হিরণ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমার সঙ্গে জুয়াচুরি করেছ।

—কি আবার জুয়াচুরি দেখলে?

—চিঠিগুলো তোমার লেখা নয়।

—আমার লেখা। মিলিয়ে দেখ।

—তোমার হাতের লেখা বটে, রচনা তোমার নয়।

শুক্লা হাসিতে লাগিল।

—এই ত জুয়াচুরি!

—তুমিও করেছ।

—আমি?

—হঁ্যা। তুমি বিজ্ঞাপনে লিখলে, প্রোফেসর! আমরা কলেজের প্রোফেসর, প্রেমের কবিতা লেখ, প্রেমের গল্প টল্প লেখ এই ভেবে রইলাম, ছিপছিপে ফিট্‌ফাট; তিরিক্ষি মিরিক্ষি দুর্ভিক্ষের দেশের চেহারা, সেই ভাবে তৈরী হ'লাম; কিন্তু এলে একেবারে গুণ্ডোর সর্দ্দার! মীনে পেশোয়ারী! এটা জুয়াচুরি নয়?

—তা'তে তোমাদের কোনও ক্ষতি হয়েছে?

—চিঠির রচনা আমার নয়, তা'তে তোমার কোন ক্ষতি হয়েছে?

—না, তা' না, ক্ষতি—না, তা' এমন—

—আমারও না, তা' না, ক্ষতি,—না, তা এমন—

—কিন্তু কে লিখ্‌ত, বলতে হবে?

শুক্লা বলিতে যাইতেছিল—"কেন," সবিতার নিষেধবাক্য মনে পড়িয়া গেল; বলিল, কি হবে আর সে-সব জেনে? সাহিত্য নিয়ে ধুয়ে খাবার ইচ্ছে থাকে ত বল! না নিজে ঘুমোবে, না আমায় ঘুমোতে দেবে! কি মুস্কিলেই পড়লুম গা!

—তোমার মা'র চিঠির জবাব দিয়েছ ?

—না।

—দিলে না কেন ? কত ভাবছেন—

শুক্লা বলিল, ভাবছেন বলেই ত দিলাম না। ভাবনাটা কিসের শুনি ? জানেন আমরা মধুচন্দ্র করতে এসেছি, উনি ভেবে সারা। দস্তুরমত ন্যাকামী!—একটু থামিয়া আবার বলিল, তুমি ত বিজ্ঞাপনে বলেছিলে, ন্যাকামী পছন্দ ক'র না; এই সব ন্যাকামী, 'ভাবনা', 'সারা হলুম' এ গুলো সহ্য হয় ?

হিরণ্যকশিপু মাসল্ ফুলাইতে ফুলাইতে জবাব ঠিক করিতেছিল, শুক্লা বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখলুম, মা-গুলো সেই কৌশল্যার যুগেই পড়ে আছে; আর পুরুষ-গুলোও সেই বোকারাম যুধিষ্ঠিরই থেকে গেছে।

তখন না হোক্, পরে কোন-একটা সময়ে পত্র-লেখিকার নামটা প্রকাশ করিতে হইল। শুনিয়া হিরণ বলিল, তাহ'লে প্রকৃতপক্ষে আমার বিয়েটা তার সঙ্গেই হয়েছে। কি বল ?

শুক্লা বলিল, প্রকৃতপক্ষটিকে আনতে যাও-না! গিয়ে একবার মজাটা দেখ-না। তার তিনিটি লজিকের প্রোফেসার, এইসা লজিক ঝাড়বেন, বন্দুক ফন্দুক ফেলে ছুটতে পথ পাবে না। তুমি ত তুমি, তাঁর গিন্নীই লজিকের ঠেলায় মাসের আর্দ্ধেক দিন আমাদের বাড়ীতে এসে লুকিয়ে থাকে। তাঁর লজিকের প্রবন্ধ পড়ে বিলেতের লোকসুদ্ধ কাঁপতে থাকে।

—বল কি !

—বিশ্বাস না হয়, একবার দেখ না পরখ করে! তোমার সোর্ড-এর চেয়ে তাঁর পেন ঢের মাইটিয়ার।

—তবে আর কাজ নেই কি বল ? ওকি লেপ্‌টা সবই তুমি টেনে নিচ্ছ যে; আমি যে শীতে কাঁপি।

শুক্লা লেপটা আরও টানিয়া লইল ও পাশ ফিরিয়া আড়ষ্টভাবে শুইয়া রুষ্টস্বরে বলিল, আমার কাছে কেন, যাও না প্রকৃতপক্ষের কাছে লেপ চাওগে না!

প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের অভিমানের কারণ, রূপ ও ধারা ১৯৪৯-এ'ও অপরিবর্ত্তিত, ইহাই প্রমাণিত হইল।

মধুচন্দ্র সমাপ্ত করিয়া তাহারা যখন ডেরাডুনে ফিরিল, তখন ১৯৪৯ পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৯৫০ হইয়া গিয়াছে।

—তবু—

কমলরাণী মিত্র

প্রতি দিবসের আলো গানগুলি
　　হারায়েছে প্রতি রাতে,
কতো আশা হায় ব্যর্থ নিরাশে
　　ঝ'রেছে নয়ন-পাতে;
তবু ফুটিয়াছে ফুল—
　　নেমেছে জ্যোৎস্না-ধারা;
বারে বারে তাই উন্মনা হ'য়ে
　　তবুও দিয়েছি সাড়া!
দুঃখ-দৈন্য রূঢ়তমরূপে
　　ফিরিতেছে ঘরে ঘরে,
শুধু ক্রন্দন, হাহাকার শুধু
　　কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে;

তবু অমৃত গান
　　গেয়েছি কণ্ঠ ভরি',
মুক্ত-অসীম-গগন-সাগরে
　　বয়েছি স্বপ্ন-তরী!!
থাক ক্ষয়-ক্ষতি জীবন ভরিয়া,
　　থাক্ যতো পরাজয়,
হারায় যদি বা হারাইয়া যাক্
　　জীবনের সঞ্চয়;
তবুও হাসিবে ধরা
　　শারদ-শুভ্র হাসি,
তবুও নিখিল ভুবন-ভবনে
　　বাজিবে প্রেমের বাঁশি!!

আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি ভাইস্‌-চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কনৌজ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ও বঙ্গদেশে তাহাদের প্রতিষ্ঠা এই মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রায় সমুদয় প্রাচীন কুলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরগণের সামাজিক ইতিহাসই কুলগ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়, সুতরাং প্রথমেই এই আখ্যানটির আলোচনা করা যাউক। বলা বাহুল্য যে এই আখ্যানটি সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই আখ্যানের স্থূলমর্ম্মটুকু প্রায় সকল কুলগ্রন্থেরই অনুমোদিত—তাহা এই :

"মহারাজ আদিশূর গৌড়ের রাজা ছিলেন। তিনি কোলাঞ্চ অথবা কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। অভীষ্টকার্য্য সিদ্ধ করিয়া পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জে প্রত্যাগত হন। কিন্তু গৌড়দেশে গমন হেতু তাঁহারা সমাজে গৃহীত না হওয়ায় পুনরায় গৌড় দেশে ফিরিয়া আসেন। মহারাজ আদিশূর পরম যত্নে তাঁহাদিগকে বাসযোগ্য গ্রামাদি দান করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ ভৃত্য আসিয়াছিলেন তাঁহারাও গৌড়ে বাস-স্থাপন করেন।"

এই আখ্যানটি সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলগ্রন্থের মতভেদ সম্যক বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পৃথকভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

১। মহারাজ আদিশূর কে?

২। কোন্ সময়ে তিনি পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন?

৩। পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ কি?

৪। কি উপায়ে এবং কোথা হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন?

৫। পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র।

৬। কোথায় কিভাবে আদিশূরের সহিত তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়?

৭। বঙ্গদেশে পঞ্চব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা।

১। মহারাজ আদিশূর কে?

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' প্রণেতা লিখিয়াছেন :

"কুলাচার্য্যগ্রন্থে আদিশূরের বংশাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু ধারাবাহিকরূপে লিখিত নাই। কুলাচার্য্যগ্রন্থ এবং প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের কথানুসারে নিম্নলিখিত বংশাবলী জানা যায়—"(১)

[মাধবশূর হইতে ধরাশূর পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার পুত্র। শেষ তিনজন রাজার পরস্পর ও পূর্ব্ববর্ত্তীগণের সহিত সম্বন্ধ জানা যায় না।] অনুশূরের পরেই বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন রাজা হন।

'কুলতত্ত্বার্ণব' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বংশাবলী পাওয়া যায়—

(১) গৌ—ব্রা (২৮)

|
ক্ষিতিশূর
|
মহীশূর
|
পৃথ্বীশূর
|
ধরাশূর
|
চন্দ্রশূর
|
সোমশূর

অপুত্রক সোমশূরের মৃত্যু হইলে বল্লালসেন তদীয় রাজ্যে রাজা হইলেন।

কোন কোন কুলগ্রন্থে নিম্নলিখিত বংশাবলী পাওয়া যায় (১ ক)

অনেক কুলগ্রন্থে তিনি বৈদ্যবংশীয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে (২)

'বিপ্রকুল-কল্পলতা'র মতে বঙ্গদেশাধিপতি বৈদ্যবংশীয় শালবান নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে প্রতাপচন্দ্র এবং তদ্বংশে তেজঃশেখর জন্মগ্রহণ করেন। তেজঃশেখরের বংশে রাজা আদিশূর জন্মগ্রহণ করেন।(২ক)

কোন কোন কুলগ্রন্থে আদিশূর বল্লালসেনের মাতামহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, আবার অন্যত্র বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্র-কুল-জাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (২খ)

'কুলতত্ত্বার্ণব' অনুসারে গৌড়রাজ আদিশূর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কেরল, কামরূপ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, মালব, গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং কান্যকুব্জ-রাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল নরপতি তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন।(৩)

ধনঞ্জয়কৃত 'কুলপ্রদীপে' উক্ত হইয়াছে যে, "অবনীপতি শ্রীশ্রীমান্ আদিশূর বৌদ্ধগণকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।"(৪) ভাদুড়িকুলের বংশাবলীতে আর একটু বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে যে, আদিশূর 'বৌদ্ধনৃপপালবংশ' পরাজিত করিয়া গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন।(৫) ইহাতে বৌদ্ধ পাল-রাজগণের পরাজয়ের কথা সূচিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 'লঘু-ভারতে'ও এই উক্তি আছে।(৬) সংস্কৃত রাজাবলী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে আদিশূর রাঢ়, বরেন্দ্র, গৌড়, বঙ্গ, ও উৎকল জয় করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিমে বিক্রমপুরের 'রামপল্যাখ্য' স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।(৬ক)

এস্থলে বলা আবশ্যক যে কুলগ্রন্থোক্ত এই সমুদয় উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং বাংলার ইতিহাস যতটুকু আমরা জানি তাহাতে আদিশূরের দিগ্বিজয় কাহিনীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে রাজ-তরঙ্গিনীতে উল্লিখিত কাশ্মীর-রাজ জয়াদিত্যের শ্বশুর গৌড়াধিপ জয়ন্ত জামাতা কর্ত্তৃক পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইলে আদিশূর উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কৃত্রিম

(১ক) ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এই বংশলতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু উক্ত গ্রন্থে এই বংশলতা নাই; যাহা আছে তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। (Journal of the Asiaic Society of Bengal, 1908, p 230, f.n.)

(২) মো—মু (৩৪২) পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী—আদিশূর ও বল্লালসেন (১৮-২০)।

(২ক) মো—মু (৩৪৫)।

(২খ) পরবর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) ৬ শ্লোক।

(৪) সং নিং (২৫৭)।

(৫) গৌ—বা (৮৩)।

(৬) ৩য় খণ্ড, ১৫৭ পৃঃ। গৌ—বা (৩২)।

(৬ক) অপ্রকাশিত রাজাবলী গ্রন্থের বিবরণ শীঘ্রই সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(৭) বসু—১ (১০১)।

বলিয়া প্রমাণিত একটি সংস্কৃত শ্লোক ভিন্ন ইহার অন্যবিধ কোন প্রমাণ নাই।

২। পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের তারিখ

আদিশূর কোন্ সময়ে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তৎসম্বন্ধে কুলগ্রন্থে বহুমত প্রচলিত। এই সময়-জ্ঞাপক যে বহু শ্লোক প্রচলিত আছে-নিম্নে তাহার তালিকা দিতেছি।

১। বেদচন্দ্রাঙ্ক (৯১৪) শাকে তু গৌড়ে
বিপ্রাঃ সমাগতাঃ (৮)

২। বেদবাণাঙ্ক শাকে (৯৫৪)······
—বংশীবদন বিদ্যারত্ন ধৃত কুলপঞ্জিকা।(৯)

৩। অঙ্কে অঙ্কে বামাগত বেদযুক্ত তদা···(৯৯৪)
—বাঙ্গালার ভট্টগ্রন্থ।(১০)

৪। নবনবত্যধিক নবশতী শকাব্দে···(৯৯৯)
—ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত—২পৃঃ (১১)

৫। বেদবাণাহিমে শাকে···(৮৫৪)
—মুলো পঞ্চাননের 'সারাবলী'-ধৃত কুলার্ণব গ্রন্থ।(১২)

৬। শাকে বেদকলঙ্কষট্‌কবিমিতে···(৬৫৪)
—বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা।(১৩)

৭। বেদবাণাঙ্গ শাকে···(৬৫৪)
—বাচস্পতি মিশ্র কৃত রাঢ়ীয় ঘটক-কারিকা।(১৪)

৮। শাকে শরাব্ধি-ঋতুমে···(৬৭৫)
—কুলতত্ত্বার্ণব।(১৫)

৯। বেদাষ্টশতাব্দকে···(৮০৪)
—দত্তবংশমালা।(১৬)

১০। বেদবাণ নবমান শকাব্দে (৯৫৪)
—প্রেমবিলাস।(১৭)

(৮) গৌ—বা (৩৩)।
(৯) গৌ—বা। (৩২)।
(১০) গৌ—বা (৩৪)। বসু—১ (৯৭)।
(১১) বসু—১ (৯৭)।
(১২)। বসু—১ (৯৭)। সং নিং (৬৩৭)।
(১৩) বসু—১ (৮৩)।
(১৪) বসু—১ (৮৩)।
(১৫) শ্লোক ৫৪।
(১৬) বসু—১ (৯৭)।
(১৭) ২৩ ম বিলাস, ২৬২ পৃঃ—২য় স্তম্ভ। আদিশূর (৪৯)।

১১। যে অঙ্কের নান্তগতি ত্রিরাবৃত্তি তার মাঘ মাস
(৯৯৯ সংবৎ=৮৬৪ শাকে) (১৮)

১২। বিক্রমের উনবর্ষ দশ শত অব্দ
(৯৯৯ সংবৎ=৮৬৪ শাকে)
—মুলো পঞ্চানন।(১৯)

উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে কোনটিই কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে আছে এরূপ প্রমাণ নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ইহাদের কয়েকটির উল্লেখ করিয়া বলেন, "যে যে কুলজ্ঞগণের সহিত আলাপ করিয়াছি তাঁহারা এই সকল বচনের কোনটির বিষয়ই অবগত নহেন। সুতরাং এই সকল বচন প্রবল জনশ্রুতি-মূলক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।"(২০)

ব্রাহ্মণ আনয়নের সময়জ্ঞাপক এই সকল উক্তি ব্যতীত কুলগ্রন্থে আদিশূরের সময়-জ্ঞাপক অন্যবিধ প্রমাণ আছে।

'লঘু ভারত' মতে কলির ৪১৩০ অব্দ গত হইলে (অর্থাৎ ৯৫১ শাকে) আদিশূর সিংহাসনে আরোহণ করেন।(২১)

বিপ্রকুল-কল্পলতা অনুসারে আদিশূর ৯৫১ শাকে জন্মগ্রহণ করেন ও ৯৬৪ শাকে সিংহাসনে আরোহণ করেন।(২২)

(১৮) সং নিং (৩১১)।
(১৯) সং নিং (৩৭৪)।
(২০) গৌড়রাজমালা (৫৮)।
(২১) শূণ্যবহ্নিবিধুবেদমিতে কল্যব্দকে গতে।
তেজঃশেখরবংশৈক আদিশূরো নৃপোঽভবৎ॥
—লঘুভারত, ২য় খণ্ড, ১১০ পৃঃ।
(২২) বিধুবাণগ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ।
বেদষট্‌ফণিমানাব্দে শাকে সদ্‌গুণসাগরঃ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সন্নভিষিক্তো মহামতিঃ॥
(মো—মু ৩৪৫)

মো—মু ও আদিশূর (৪৭) এই উভয় গ্রন্থেই 'বেদষট্‌-ফণি' অর্থে —৮৬৪ ধরা হইয়াছে। বিধুবাণগ্রহ অর্থাৎ ৯৫১ শাকে যাঁহার জন্ম, ৮৬৪ শকে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইতে পারে না, সুতরাং উভয় গ্রন্থকারই নানাপ্রকার কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু 'ফণি' শব্দে ৯ বুঝায় (আপ্তের সংস্কৃত অভিধানে 'ফণভৃৎ' শব্দ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ৯৫১ শকাব্দে আদিশূরের জন্ম এবং ৯৬৪ শকাব্দে তাঁহার রাজ্যারোহণ এই সঙ্গত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যে বর্ষ ব্যবধান কত তাহা জানিতে পারিলেও আদিশূরের সময় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। কুলতত্ত্বার্ণব ও গৌড়ব্রাহ্মণ-ধৃত যে বংশাবলী পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তদনুসারে আদিশূর ও বল্লালসেন এই দুই রাজার মধ্যে সাত জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। গড়পড়তা পঁচিশ বৎসর করিয়া প্রতি রাজ্যকাল ধরিলে এবং বল্লালসেনের রাজ্যলাভ কাল ১১৬০ খৃষ্টাব্দ ধরিলে আদিশূর শকাব্দের দশম শতকের প্রথমে রাজত্ব করেন এরূপ অনুমান করিতে হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথম, দ্বিতীয় ও দশম সময়জ্ঞাপক বচনের সহিত ইহার সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে।

অপর পক্ষে বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা অনুসারে—"আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণের অল্পকাল পরেই তাঁহার দৌহিত্রকুলে বল্লালসেনের জন্ম হয়।"(২৩) রামজীবনকৃত কুল-পঞ্জিকায় বল্লালসেনকে আদিশূরের দৌহিত্র ও শ্রীধরের সুত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।(২৪) সময়-জ্ঞাপক—৩, ৪, ১১, ১২ ও আদিশূর বৌদ্ধ পালবংশ পরাজয় করিয়াছিলেন পূর্ব্বোল্লিখিত এই উক্তির সহিত এই মতের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

কিন্তু ৺লালমোহন বিদ্যানিধি বলেন যে, "বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্র-বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ।" এই মতের সমর্থনকল্পে তিনি বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার কয়েকটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।(২৫)

৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন "প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন পালবংশীয় রাজা দেবপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন"।(২৬) কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোন বচন উদ্ধৃত করেন নাই।

লাহেড়ী বংশাবলী মতে আদিশূর কর্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকে রাজা ধর্ম্মপাল ধামসার নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপালকে যদি পালবংশীয় স্বনামধন্য নৃপতিরূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে আদিশূরকে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের সমকালীন বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এই সিদ্ধান্তের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত সময়-জ্ঞাপক ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বচনের সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু আদিশূর পালবংশ ধ্বংস করিয়া গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন পূর্ব্বোল্লিখিত এই প্রবাদ এই সমুদয় উক্তি ও সিদ্ধান্তের বিরোধী।(২৭)

কেহ কেহ আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণকে 'বেণীসংহার' নাটকের গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। বেণীসংহার সপ্তম শতাব্দের শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দের প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল এরূপ মনে করার কারণ আছে। এই যুক্তিবলে আদিশূরেরও ঐ সময় নির্দ্ধারণ করা হয়। কিন্তু আদিশূর আনীত ভট্টনারায়ণ যে বেণীসংহারের গ্রন্থকর্ত্তা ইহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। কোন বিশ্বস্ত কুলগ্রন্থেই ভট্টনারায়ণ গ্রন্থকার বলিয়া উল্লিখিত হন নাই।(২৮)

মোটের উপর দেখা যায় যে, আদিশূরের সময় সম্বন্ধে দুইটি বিশিষ্ট ও বিরোধী মত ছিল। একমতে তিনি পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এবং মতান্তরে তিনি পাল-রাজবংশ ধ্বংসের প্রাক্কালে গৌড়রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। আদিশূরের সময়জ্ঞাপক কুলগ্রন্থের যে সমুদয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার পঞ্চম ও নবম ব্যতীত অন্য

---

(২৩) গৌড়রাজমালা (৫৮)। মো—মু (৩৪২) ধৃত বৈদ্যকুলচন্দ্রিকা।

(২৪) আদিশূর মহারাজ জগতে বিখ্যাত।
তাঁর দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥
(সং নিঃ ২১৯)

(২৫) সং নিং (৩১৬)।

(২৬) বসু—১ (৯৮)। বিশ্বকোষ, (চতুর্থ ভাগ, ৩০৮ পৃষ্ঠায় হরিমিশ্রের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২৭) বসু—১ (৯৮)। গৌ—বা (৯৬)। বিশ্বকোষ ৪।৩১২।

(২৮) 'আদিশূর' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর ভট্টনারায়ণকে বেণীসংহারের প্রণেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার সময় নির্দ্দেশ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন (পৃঃ ৸/০)। কিন্তু 'আদিশূর' গ্রন্থকার স্বয়ং যথার্থই বলিয়াছেন: "কুলগ্রন্থে ভট্টনারায়ণকে মুনিসত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি মহত্ত্বব্যঞ্জক নানা বিশেষণে বিশেষিত করিলেও কোথাও তাঁহাকে গ্রন্থকার বলিয়া অভিহিত করিতে দেখি না।... আমরা জানি না, এই বেণীসংহার নাটককে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ-পুত্র ভট্টনারায়ণ রচিত বলিয়া নিশ্চিতরূপে ধরিতে পারি কি-না। (আদিশূর, পৃঃ ২০১-২)।

সকলগুলিই এই দু'য়ের মধ্যে একের অনুবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ কুলপর্য্যায় ধরিয়া আদিশূরের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ বল্লালসেনের নিকট যাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন তাঁহারা আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের অধস্তন কত পুরুষ তাহা হিসাব করিয়া গড়পড়তা তিন বা চারি পুরুষে একশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নির্ণয় করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে এত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন স্থিরসিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৺লালমোহন বিদ্যানিধি ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বংশাবলীর পর্য্যায় নিম্নে উল্লেখ করিতেছি (২৯) :—

গোত্র	পর্য্যায়ের শেষ ব্রাহ্মণ	বিদ্যানিধির মতে যে কয় পুরুষ	বসুর মতে যে কয় পুরুষ
শাণ্ডিল্য	মহেশ্বর	১০	১০
বাৎস্য	শিব	৪	১১
সাবর্ণি	শিশু গাঙ্গুলি	৮	১২
কাশ্যপ	বহুরূপ	৮	৮
ভরদ্বাজ	উৎসাহ	১৩	১২

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে উভয়েই প্রচলিত ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন।

বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ অনুসারে আদিশূরানীত বীজপুরুষ হইতে উক্ত পঞ্চ গোত্রের যথাক্রমে ১৪শ, ৪র্থ, ১৩শ, ১৫শ ও ১৩শ পুরুষ বল্লালের সভায় উপস্থিত ছিলেন।(৩০)

৺নগেন্দ্রনাথ বসু কুলগ্রন্থে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন এবং বহু কুলগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তৎসাহায্যে বাংলার সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালের ঐতিহাসিকগণের মতে কুলগ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন এবং অন্ধ বিশ্বাসের পরিচায়ক। তিনি কুলগ্রন্থোক্ত বংশাবলী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

(২৯) বসু—১ (১৪০)। সং নিঃ (৩৩৪)।
(৩০) বসু—২ (৩৫)।

"বল্লালসেনের কুলবিধি প্রবর্ত্তন ও ঘটক নিয়োগ হইতেই রীতিমত কুলপর্য্যায় রক্ষা প্রথা কুলীনসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। এই সময় হইতে বংশ ধরিয়া ধ্রুবানন্দাদি যে সকল বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কোন দোষ পাওয়া যায় না বা বংশাবলীর পর্য্যায় গণনায় কোন প্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী সেইরূপ নির্ব্বিরোধ নহে। এড়ুমিশ্র, ধ্রুবানন্দ, দেবীবর প্রভৃতি এ সম্বন্ধে নিরুত্তর। কোন কোন কুলাচার্য্য লিখিয়াছেন মুসলমানের দৌরাত্ম্যে ও বর্গির উৎপাতে নানা কারণে প্রাচীন কুলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, আধুনিক ঘটকগণ পরে নানা স্থান হইতে বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন কুলগ্রন্থ নষ্ট হওয়াতেই এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। হরিমিশ্র দুই-একজনের বংশাবলী মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল মহেশের 'নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা', কুলরাম ও আধুনিক মু(কু ?)ল গ্রন্থে পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণবংশাবলী লিখিত থাকিলেও পরস্পর অনৈক্য। বিশেষতঃ আধুনিক গদ্যে লিখিত কুলপঞ্জিকায় যেরূপ বংশতালিকা পাওয়া যায়, তাহা সহজেই বিশ্বাস করা যায় না।"(৩১)

বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের বংশাবলী সম্বন্ধে ৺বসুজ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কেবল বংশাবলী নহে কুলগ্রন্থোক্ত অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক তথ্য সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ৺বসুজ মহাশয় ইহা সত্ত্বেও এই সমুদয় কুলগ্রন্থের ক্ষীণ ভিত্তির উপর প্রাগ্-বল্লাল-যুগের বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস-রূপ বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বল্লালের পরবর্ত্তীকালের বংশপর্য্যায় সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও তাহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতেই প্রতীয়মান হইবে যে, বল্লালের পরবর্ত্তীকালের বংশাবলীও নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ধ্রুবানন্দ মিশ্র নিজের গ্রন্থে যে বংশাবলী দিয়াছেন তদনুসারে তিনি বল্লাল-পূজিত মহেশ্বর বন্দ্যোর সপ্তম অধস্তন পুরুষ। ধ্রুবানন্দ যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন

(৩১) বসু—১ (১৩৯)।

তাহার নানারূপ প্রমাণ আছে এবং ৺বসু মহাশয়ও তাহা স্বীকার করেন। বল্লালসেন আনুমানিক ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। সুতরাং ধ্রুবানন্দ মিশ্র বল্লালের মৃত্যুর তিনশত বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন। সাত পুরুষে তিনশত বৎসরের ব্যবধান স্বীকার করা কঠিন এবং যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বংশপর্য্যায়ের গড়পড়তা ধরিয়া সময় হিসাব করার কোন মূল্য থাকে না। সুতরাং ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে প্রদত্ত তাঁহার নিজের বংশাবলী সম্বন্ধেই সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। যে সময়ে রীতিমত বংশাবলী রক্ষা করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন এবং যে সময়ের বংশাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে অনেকটা ঐক্য দৃষ্ট হয়, সেই সময়কার বংশাবলীই যদি নির্ভরযোগ্য নয় বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন-চারি শত বৎসরের বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া আদিশূরের সময় নিরূপণ করা যে কতদূর অবিধেয় তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

বিশেষতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কুলগ্রন্থ-মতে আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যে অনধিক সাতজন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন (কাহারও মতে মাত্র দুই-এক জন) অথচ ব্রাহ্মণের পর্য্যায় হিসাবে গণনা করিলে উভয়ের মধ্যে অনধিক পনর পুরুষের ব্যবধান। এ দুয়ের সামঞ্জস্য করাও অসম্ভব। সুতরাং কনৌজাগত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশাবলীর পর্য্যায় গণনা করিয়া আদিশূরের সময় নির্দ্ধারণ করার ঐতিহাসিক কোন মূল্য নাই।

৩। পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ কি?

বিভিন্ন কুলগ্রন্থে নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে—

১। আদিশূরের রাণী চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করেন। গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বেদে অনভিজ্ঞতা হেতু ("বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীম্") উক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে না পারায় রাণীর অনুরোধে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া রাণীর ব্রত সম্পন্ন করেন।

—(বারেন্দ্র কুলপঞ্জী) (৩২)

২। রাজা আদিশূর অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

—(বংশীবদন বিদ্যারত্ন-ধৃত বচন) (৩৩)

৩। রাজা আদিশূর অপুত্রক ছিলেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

(১। কুলতত্ত্বার্ণব) (৩৪)

(২। হরিমিশ্রের ও এডুমিশ্রের কারিকা দৃষ্টে রাজভাটের কাহিনী) (৩৫)

(৩। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা প্রেমনারায়ণের সভাস্থ ধ্রুবানন্দের মত) (৩৬)

৪। আদিশূর দূতমুখে কাশীরাজকে আদেশ করিলেন, 'হয় কর দিন, নচেৎ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হউন।' প্রত্যুত্তরে কাশীরাজ কর দিতে অস্বীকৃত হইয়া যে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন তাহাতে আদিশূরের রাজ্যকে 'দ্বিজবেদযজ্ঞ রহিত' বলিয়া নিন্দা করায় আদিশূর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন।

—(বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম) (৩৭)

৫। অনাবৃষ্টি নিবারণকল্পে বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদনার্থ আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

—(দুর্গামঙ্গল, রাজাবলী) (৩৮)

৬। আদিশূরের প্রাসাদের উপর এক গৃধ্র পড়িয়াছিল। অমঙ্গল দূর করিবার জন্য আদিশূর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তজ্জন্য পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন।

—(ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত)(৩৯)

৭। ভগবৎপ্রীতি সাধনের ইচ্ছায় আদিশূর যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ও তাহার জন্য পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

—(কায়স্থকুলদীপিকা) (৪০)

(৩২) গৌ—বা (৩৭-৮)।

(৩৩) গৌ—বা (৩৮)।
(৩৪) শ্লোক—১০।
(৩৫) সং নিং (৩৭৩)।
(৩৬) বসু—১। (৭৮)।
(৩৭) বসু—১ (৮০)।
(৩৮) আদিশূর, (পৃঃ ৮০, ১৩৯) রাজাবলী (১৩১২) ৪১ পৃঃ।
(৩৯) পৃঃ ১—২। আদিশূর, পৃঃ ৮০, ১৪২—১৪৩।
(৪০) আদিশূর (১৪৩-৪)।

৪। কি উপায়ে এবং কোথা হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন ?

পঞ্চব্রাহ্মণ যে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন এ বিষয়ে প্রায় সব কুলগ্রন্থই একমত। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার মতে আদিশূর কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া সাগ্নিক ও বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ আনাইয়া রাজ্ঞীর ব্রত সম্পন্ন করেন।(৪১)

মতান্তরে কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহ প্রথমে আদিশূরের প্রার্থনামত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইতে স্বীকার করেন নাই, কারণ শাস্ত্রমতে তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কারণে বঙ্গদেশে আসিলে পতিত হইতে হয়। তখন আদিশূর কান্যকুব্জ-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।(৪২)

কান্যকুব্জেশ্বরকে ছলে যুদ্ধে হারাইবার জন্য আদিশূর সাতশত ব্রাহ্মণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া গোবাহনে কান্যকুব্জ-রাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গো-বিপ্র-প্রতিপালক কান্যকুব্জ-রাজ 'ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে পরাজয় শ্রেয়স্কর' ইহা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং আদিশূরের নিকট ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া শান্তি-স্থাপন করিলেন।(৪৩)

কোন কোন কুলগ্রন্থের মতে আদিশূর প্রথমবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তারপর এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।(৪৪)

বাচস্পতি মিশ্র বীরসিংহকে কাশী-রাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুলাচার্য্য হরিমিশ্রও আদিশূরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে কাশী-রাজ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মতেও পঞ্চব্রাহ্মণ কোলাঞ্চ অর্থাৎ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন।

৫। পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র

আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে গৌড়ে আনয়ন করেন তাঁহারা শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ এবং সাবর্ণিগোত্রজ ছিলেন। এবিষয়ে সকল কুলগ্রন্থই একমত। কিন্তু এই পাঁচজনের নাম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। নিম্নে বিশিষ্ট কয়টি মত উদ্ধৃত করিলাম।

বাচস্পতি ও অন্যান্য রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণের মতে পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, হর্ষ এবং বেদগর্ভ।(৪৫)

বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতে উক্ত গোত্রজ ব্রাহ্মণগণের নাম যথাক্রমে নারায়ণ, সুষেণ, ধরাধর, গৌতম এবং পরাশর এবং আদিম বাসস্থান জম্বুচত্বরগ্রাম, কোলাঞ্চ, তাড়িতগ্রাম, উড়ম্বরগ্রাম ও মদ্রগ্রাম।(৪৬)

এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র, দেবীবর, মহেশ প্রভৃতি প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের মতে এবং কুলতত্ত্বার্ণব অনুসারে উক্ত ব্রাহ্মণগণের নাম যথাক্রমে ক্ষিতীশ, বীতরাগ, সুধানিধি, তিথিমেধা (অথবা মেধাতিথি) ও সৌভরি।(৪৭)

কুলতত্ত্বার্ণব, রাঢ়ীয় ঘটকপ্রধান বংশীবদন বিদ্যারত্নের যে কয়টি শ্লোক 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ৺নগেন্দ্রনাথ বসু হরিমিশ্রের উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসমুদয় হইতে অনুমিত হয় যে শেষোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণই গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি পুত্র রাঢ়ে এবং অপরটি বরেন্দ্রে বসবাস করেন। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ এই সন্তানগণকেই আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।(৪৮)

নিম্নলিখিত বংশাবলীদৃষ্টে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে।

---

(৪১) গৌ—বা (৩৭)।

(৪২) চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা প্রেমনারায়ণের সভাস্থ ধ্রুবানন্দের মত। বসু-১ (৭৮)। কুল (শ্লোক ১৭—২৫)। বাচস্পতি মিশ্রের মতে বীরসিংহ কাশীর রাজা ছিলেন—(পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ আনয়নের সম্পূর্ণ কারণ দ্রষ্টব্য।)

(৪৩) বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরাম (বসু—১, পৃঃ ৮০—৮২)। কুল (শ্লোক ৩৬-৪৯)।

(৪৪) ধ্রুবানন্দের মত (বসু—১, পৃঃ ৭৮)।

(৪৫) বসু—১ (১০১)। গৌ—বা (৪২)।

(৪৬) বসু—১ (১০৩)। গৌ—বা (৪৩)।

(৪৭) বসু—১ (১০৩)। গৌ—বা (৪৪)। কুল (শ্লোক ৬৪—৬৭)।

(৪৮) কুল (শ্লোক ৮৭—৯৭)। গৌ—বা (৪৪-৪৭)। বসু—১ (১০৩)।

আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ	গোত্র	যে পুত্র রাঢ়ে বাস করেন	যে পুত্র বরেন্দ্রে বাস করেন
১। ক্ষিতীশ	শাণ্ডিল্য	ভট্টনারায়ণ	দামোদর এবং ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি-ওঝা
২। বীতরাগ	কাশ্যপ	দক্ষ	সুষেণ
৩। সুধানিধি	বাৎস্য	ছান্দড়	ধরাধর
৪। তিথিমেধা বা মেধাতিথি	ভরদ্বাজ	হর্ষ	গৌতম
৫। সৌভরি	সাবর্ণ	বেদগর্ভ	পরাশর

বরেন্দ্র কুলাচার্য্যগণোক্ত নারায়ণ ও রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থোক্ত ভট্টনারায়ণকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলে উল্লিখিত বংশাবলী দ্বারা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়। তবে এই বংশাবলীর সমর্থন কল্পে কোন প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রমাণ আছে কি-না অথবা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতভেদের নিরাসকরণের জন্যই উহা পরবর্ত্তীকালে কল্পিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

৬। পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত আদিশূরের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ

কুলতত্ত্বার্ণব বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম প্রভৃতি কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং চর্ম্মপাদুকা ধারণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে আগমন করেন। তাঁহাদের এই যোদ্ধবেশ দর্শন করিয়া আদিশূর বিষাদপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করেন না। তখন ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ক্ষমতা দেখাইবার নিমিত্ত আশীর্মন্ত্র পাঠ করিয়া নির্ম্মাল্য অথবা অর্ঘ্য একটি শুষ্ক স্তম্ভ-কাষ্ঠের উপর দেওয়া মাত্রেই উক্ত কাষ্ঠখণ্ড অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। ইহা শ্রবণ করিয়া আদিশূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণদের যথোচিত সৎকারাদি করিলেন।(৪৯)

কোন্ স্থানে আদিশূরের সহিত পঞ্চব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। লালমোহন বিদ্যানিধি (৫০) ও পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরীর (৫১) মতে পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূরের রাজধানী বিক্রমপুরে আগমন করেন। কিন্তু কেহই এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেন নাই। রায়চৌধুরী মহাশয় মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী রামপালের গজাড়ী বৃক্ষের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "সকলেই এই গজাড়ী বৃক্ষটিকে আদিশূরনীত পঞ্চব্রাহ্মণ প্রদত্ত আশীর্ব্বাদে জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।" এইরূপ জনপ্রবাদ আমরাও শুনিয়াছি এবং মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গজাড়ী বৃক্ষটি মরিয়া গিয়াছে! কিন্তু এই জনপ্রবাদের সমর্থক কোন বিশিষ্ট প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, আদিশূরের রাজধানী বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপলী বা রামপল্যাতে ছিল। শেষোক্ত নামটি রামপালের বিকৃতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম ও বরেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিয়াছিলেন। কুলতত্ত্বার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে আদিশূর তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতে ছিলেন।(৫২) আদিশূর রাজার প্রকৃত পরিচয় এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে না পারিলে এ তর্কের মীমাংসা হইবে না।

৭। বঙ্গদেশে পঞ্চব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণের মতে যজ্ঞসমাপনান্তে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে পঞ্চগ্রাম দান করিয়া এদেশে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন।(৫৩)

বারেন্দ্রকুলাচার্য্যগণ বলেন যে, উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণ যজ্ঞ-সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তথায় অন্য ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশ গমন-হেতু পতিত জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া স্ত্রীপুত্র-ভৃত্যাদিসহ তাঁহারা পুনরায় আদিশূর রাজার নিকট প্রত্যাগমন করেন। আদিশূর ইহাতে পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বাসের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন।(৫৪)

(৪৯) কুল (শ্লোক ৫৬-৬৩)। কুলরাম (বসু—১ পৃঃ ১০৬)। সং নিঃ (৬৩৬)। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা (গৌ—বা—পৃঃ ৪০—৪১)।
(৫০) সং নিঃ (৫০)।

(৫১) আদিশূর ও বল্লালসেন (পৃঃ ৪)।
(৫২) শ্লোক —৫১
(৫৩) বসু—১ (১০৯)।
(৫৪) গৌ—বা—(৫২-৫৭)।

কুলগ্রন্থ অনুসারে এই পাঁচটি গ্রাম গঙ্গাতীরবর্ত্তী এবং তাহাদের নাম কামঠি, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি উদ্ধৃত বাঙ্গালা বচন অনুসারে এই পঞ্চগ্রামের নাম পঞ্চকোটি, কামকোটি হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম। এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ সামান্য; হরিকোটি এবং কামঠি-ও কামকোটি অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায়, কেবল ব্রহ্মপুরী স্থানে পঞ্চকোটি।(৫৫)

৺বিদ্যানিধি মহাশয় ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসু এই পঞ্চগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থিতি নির্ণয় করিতে যত্নবান হইয়াছেন। কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ অভাবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

৮। সাধারণ মন্তব্য

আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের আখ্যান শেষ করিবার পূর্ব্বে দুই-একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, এড়ুমিশ্রের কারিকা, মহেশের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা, এমন কি ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত মহাবংশ প্রভৃতি খুব প্রাচীন ও প্রামাণিক কুলগ্রন্থসমূহে আদিশূরের কোন উল্লেখ নাই।

৺নগেন্দ্রনাথ বসু হরিমিশ্রের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।(৫৬) তাহার সারমর্ম্ম এই যে মহারাজ আদিশূরের সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি কোলাঞ্চ দেশ হইতে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি নামক পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়মণ্ডলে আনিয়াছিলেন। অন্যত্র বসু মহাশয় বলেন—"হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, পালবংশীয় রাজা দেবপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"(৫৭) যে কারণে ৺বসু মহাশয়ের সংগৃহীত হরিমিশ্রের পুঁথি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না পূর্ব্বে তাহা আলোচনা করিয়াছি। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি ও ৺মহিমাচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ কেহই আদিশূর সম্বন্ধীয় হরিমিশ্রের এই সমুদয় উক্তি জানিতেন না। সুতরাং ৺বসু মহাশয়-ধৃত হরিমিশ্রের উপরোক্ত উক্তিদ্বয় বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে অকৃত্রিম ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

৺লালমোহন বিদ্যানিধি পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে দুইটি রাজভাটের কাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন।(৫৮) উভয়েরই উপসংহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আখ্যানটি হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের গ্রন্থ দেখিয়া রচিত। ইহাতে পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থোক্ত আখ্যানটি আছে কিন্তু আদিশূরের নাম নাই।

একদিকে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু সংগৃহীত হরিমিশ্রের কারিকায় আদিশূরের ও পঞ্চব্রাহ্মণের নাম আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ আনয়নের 'অপূর্ব্ব' কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই, অপরদিকে হরিমিশ্রের কারিকার সাহায্যে রচিত ভাটের কাহিনীতে 'অপূর্ব্ব'কাহিনী আছে কিন্তু আদিশূরের নাম নাই। এই সমুদয় বিবেচনা করিলে প্রকৃত হরিমিশ্রের কারিকায় আদিশূর সম্বন্ধে আদৌ কিছু উল্লেখ ছিল কি-না তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ জন্মে।(৫৯)

মহেশের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকায় ক্ষিতীশাদি পঞ্চব্রাহ্মণের গৌড়ে আগমনের কথা আছে কিন্তু আদিশূরের নাম নাই।

মোটের উপর একথা বলা যায় যে, যে সমুদয় কুলগ্রন্থে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের আখ্যান বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোনখানিই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত এরূপ কোন প্রমাণ নাই।

আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের উপাখ্যানের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সম্বন্ধে যে সমুদয় বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটিকে অন্যের অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। এই সমুদয় আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী ও তাহার পরে যে সময়ে প্রচলিত কুলগ্রন্থগুলিতে আদিশূরের আখ্যান লিপিবদ্ধ হয় সে সময়ে আদিশূরের প্রকৃত ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থ ত দূরের কথা, কোন বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য সর্ব্ববাদীসম্মত প্রবাদও প্রচলিত ছিল না। আদিশূরের কথা তখন উপকথায় (legend or myth)

(৫৫) বসু—১ (১০৯—১১২)।

(৫৬) বসু—১ (১০১)।

(৫৭) বসু—১ (৯৮)

(৫৮) সং নিং (৭৭৩, ৭০৬)।

(৫৯) ৺বসু মহাশয় লিখিয়াছেন: "রাজতরঙ্গিণী হইতে যে ঐতিহাসিক বিবরণ বিবৃত হইল, আধুনিক ইতিহাসানভিজ্ঞ ঘটকবর্গের হস্তে পড়িয়া বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্বতন ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র জাগিয়া আছে। প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র এই কারণে ব্রাহ্মণাগমনের অপূর্ব্ব কাহিনীর অবতারণা করেন নাই। (বসু—১, পৃঃ ১০২)।

পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং যেমন সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে, লোকের মুখে মুখে নানা কাল্পনিক ঘটনাযুক্ত হইয়া ইহার বহু রূপান্তর হইয়াছে।(৬০)

উপকথার একটি বিশেষত্ব এই যে, কতকগুলি আশ্চর্য্য ও চমকপ্রদ ঘটনা প্রায় সব উপকথাতেই থাকে (যেমন রাক্ষস কর্ত্তৃক বিনষ্ট রাজপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যার সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ)। কুলগ্রন্থেও সেইরূপ প্রাসাদোপরি শকুনিপতন, তন্নিবন্ধন যজ্ঞের আবশ্যকতা ও তদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন এবং নবাগত ব্রাহ্মণের অলৌকিক শক্তিতে শুষ্ক কাষ্ঠ সঞ্জীবিত হওয়া প্রভৃতি যেমন আদিশূরের আখ্যানে দেখিতে পাই তেমনি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রসঙ্গে শ্যামলবর্ম্মার আখ্যানেও উক্ত হইয়াছে। আবার কুলগ্রন্থ মতে আদিশূর যেমন পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন রাজা শূদ্রকও তেমনি উক্ত যজ্ঞের জন্য সাতশতী ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ সারস্বত ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। কুলগ্রন্থোক্ত বিভিন্ন আখ্যান যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করিলে সম্ভবতঃ এইরূপ আরও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। এই সমুদয় স্মরণ রাখিলে কুলগ্রন্থোক্ত ব্রাহ্মণ আনয়নের বিভিন্ন উপাখ্যানের প্রকৃতি ও মূল্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হইবে।

৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন যে, আদিশূর সম্বন্ধীয় "জনশ্রুতি এদেশে অত্যন্ত প্রবল ও বদ্ধমূল হইলেও কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইহাকে মোটেই আমল দিতে চান না।"(৬১) তিনি বলেন, "অন্যান্য দেশে যাহাই হউক না কেন, আমাদের দেশে ইতিহাস সংরচনে জনশ্রুতিকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না। প্রত্যুত, জনশ্রুতিকে ইতিহাস রচনার অন্যতর প্রধান উপকরণ বলিয়া ধরিতে হইবে।"(৬২) বঙ্গদেশের অনেকেই এবিষয়ে অনুরূপ মত পোষণ করেন। আমাদের মত এই যে, জনশ্রুতিমাত্রেই নির্ব্বিচারে গ্রহণীয় বা ত্যজ্য নহে। কিন্তু তাহার উৎপত্তি, সঙ্গতি ও প্রকৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক তাহার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই নির্দ্ধারণের সহায়তার জন্যই আদিশূর উপাখ্যানের বিভিন্ন অঙ্গের বিশ্লেষণ করিয়াছি। ইহার সাহায্যে আদিশূর আখ্যানের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তাহার বিচার পঞ্চম প্রবন্ধে করা হইবে।

(৬০) কুলগ্রন্থে শ্রদ্ধান্বিত ৺বসু মহাশয়কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কুলগ্রন্থে অনেক অলীক গল্প স্থান পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন: "সপ্তশতী বিবরণে কুলপঞ্জিকা ও প্রবাদ হইতে যে সকল আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আরব্যোপন্যাসের গল্প বলিয়া মনে করাই উচিত। তন্মধ্যে যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।" (বসু—১, পৃঃ ১১৪-৫)।

প্রাচীন কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্রের কারিকায় "অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ এবং মধ্যে মধ্যে আধুনিক কুলাচার্য্যের লিখিত বিবরণাদি প্রক্ষিপ্ত" থাকার কথাও ৺বসু মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন (বসু—১, পৃঃ ১২৫)।

প্রাচীন কুলগ্রন্থ যে অধিকাংশই বহু পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছিল গোপাল শর্ম্মা তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "বর্গিকেন হৃতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ" (গো—বা, পৃঃ।৵)। কুলতত্ত্বার্ণবে দেবীবরের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, কুলগ্রন্থও বংশাবলী যবন কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল, দেবীবর কোন উপায়েই ঐ সমুদয় উদ্ধার করিতে পারিলেন না। (৫৮৭ শ্লোক)। সুতরাং আধুনিক ঘটকগণ যে স্বরচিত পুঁথি বা শ্লোক প্রাচীন আচার্য্যের নামে চালাইয়া থাকিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক ও সম্ভব। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া আধুনিক ঐতিহাসিক যদি কুলগ্রন্থের বিবরণে আস্থা স্থাপন করিতে না পারেন তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

(৬১) আদিশূর (৫)।

(৬২) আদিশূর (৭)

প্রেম ও কবিতা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

"—দিন চলে না ঘুরি ফিরি ভিক্ষা ক'রে খাই!" দিন না চলার এই যে করুণ অভিব্যক্তি সঙ্গীতের একটি মাত্র ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে—সে কেবল তারাই বোঝে—যাদের দিন যথার্থই নানা অভাবে অচল। তেমনি, সময় যেন আর কাটিতে চায় না—এ কথাটার মধ্যে যে কতখানি অন্তর্গূঢ় বেদনা নিহিত আছে, সেটা শুধু তাঁরাই অনুভব করতে পারবেন, যাঁদের সময় কাটাবার জন্য নানা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করতে হয়। তাশ নিয়ে 'পেশেন্স্' খেলা থেকে সুরু করে খবরের কাগজ মাসিকপত্র ও বই পড়া, পোস্টেজ স্ট্যাম্প সংগ্রহ, সিনেমা দেখা, এমন কি, 'শব্দ-সন্ধান' সমাধান পর্য্যন্ত তাঁদের করতে হয়। আড্ডায় আড্ডায় দু'বেলা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সঙ্গে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করা সত্ত্বেও তবু যখন তাদের হাতে সময় পড়ে থাকে পর্য্যাপ্ত, তখন বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকা ও দিবানিদ্রার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন তাদের আর—নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

ব্যাপারটা হাস্যকর ব'লে মনে হ'লেও এর চেয়ে দুঃখের বিষয় কিন্তু আর কিছু নেই! আমাদের মত মুটে মজুর মানুষ, যাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের তাড়ায় নিত্য স্নানাহারের পর্য্যন্ত ফুরসুৎ থাকে না, স্ত্রীপুত্রের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখবারও যাদের অবসর নেই, তারা হয়ত—এই একদল হতভাগ্যদের সময় কাটানো যায় কি করে? —সমস্যাটা যে কতখানি পীড়াদায়ক, তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে না।

পুরাকালে দেখা যায়, বড় বড় যাগ-যজ্ঞ ছাড়াও রাজা রাজড়ারা দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, স্বয়ম্বর-সভায় উৎপাত ও দিগ্বিজয়ে দিন কাটাতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আচার্য্য-স্থানীয় ব্যক্তিরা শাস্ত্রচর্চ্চা, পূজা ধ্যান, জপ তপ প্রভৃতি নিয়ে থাকতেন, কবিরা অতিকায় মহাকাব্য রচনা করতেন আর শিল্পীরা ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরী বা মহাকালের মন্দিরের ন্যায় বিরাট কিছু না কিছুর কল্পনা ও সৃষ্টি করতেন! এ সবই যে সময় কাটাবার তাড়ায়—তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না!

চারুদত্তের হাতে অফুরন্ত সময় না থাকলে বসন্তসেনার প্রেম যে ব্যর্থ হ'ত তাতে আর কোনো ভুল নেই! দণ্ডীরাজ এক ঘোটকীর সেবায় দিন কাটাতে পারতেন না। বর্দ্ধমান থেকে কাঞ্চিপুর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন একটা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার! আর, একথা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে 'সাত কাণ্ড রামায়ণ' বা 'অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত' অল্প সময়ের মধ্যে লিখে ওঠা বাল্মিকী-বেদব্যাসের পক্ষেও সম্ভব নয়।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে প্রেম ও কবিতা ও দুটোর জন্যই দরকার মানুষের অফুরন্ত সময়। সে যুগে যা সত্য ছিল এ যুগেও তা অব্যাহত আছে। সময় যখন কাটে না, এ যুগের মানুষও তখন কবিতা লিখতে বসে, অথবা প্রেমাসক্ত হয়। অতএব, এ থেকে বোঝা যায় যে প্রেম ও কবিতার সঙ্গে কালের প্রভাবের একটা ঘনিষ্ঠতর যোগ থাকা একেবারে অনিবার্য্য!

মিহির গুপ্তর সঙ্গে মণিকা রায়ের বিবাহ আগামী নব-ফাল্গুনের বাসন্তী সন্ধ্যায় মহাসমারোহে সম্পন্ন হবে স্থির হয়েছে। সুতরাং তাদের কাছে এবার শরৎ এসেছে সত্যই যেন সোনার বরণ রূপ ধ'রে। তার আলো ঝলমল সুন্দর প্রভাত, তার জ্যোৎস্না বিধৌত চাঁদনী রাত, তার নিবিড় স্নিগ্ধ নীলাকাশে লঘু শুভ্র মেঘের খেলা সবই হ'য়ে উঠেছে তাদের কাছে আজ একান্ত মনোরম!

কিন্তু অমল সেনের দিন আর যেন কাটছে না! "উদাসী" নামে প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের সম্পাদক সে, সুকবি বলে শিক্ষিত সমাজে তার একটা সুনামও আছে। প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী মানুষ। তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা বহুচেষ্টা করেও কিন্তু এ পর্য্যন্ত অমলের বিবাহ দিতে পারেন নি। চিরকুমার থাকবেন বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন তিনি। অগত্যা তাঁরা একে একে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

অমলের অবস্থা ভাল। ভরণ পোষণের সংস্থান আছে বলে উপার্জ্জনের কোনো তাগিদ নেই, কাজেই হাতে তার পর্য্যাপ্ত সময়। কাটতে যেন আর চায় না! কবিতা লিখে, খবরের কাগজ ও মাসিকপত্র পড়ে, অনেকগুলো লাইব্রেরীর সমস্ত বই একাধিকবার শেষ করেও যখন বাড়্‌তি সময় হাতে রয়েই যেতে লাগলো, তখন দিগদারি হ'য়ে অমল নিজেই এক নূতন ধরণের মাসিকপত্র বার ক'রে ফেললে। নাম দিলে তার "উদাসী"। প্রথম পাতার উপর বড় বড় হরফে লিখে রাখলে এই 'মটো'—"আমি একলা চলেছি এই ভবে!" উদাসীর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'ল—'কোনো বিবাহিত লেখকের রচনা এ পত্রিকায় স্থান পাবে না।' সুতরাং বলা বাহুল্য যে অল্পদিনের মধ্যেই 'উদাসী' দেশের কুমার-সমাজে ও কুমারী-মহলে বিশেষ আদরণীয় হয়ে উঠলো!

তরুণ সাহিত্যলোকে 'উদাসী'র জয়যাত্রা সুরু হ'য়ে গেল যেন জগঝম্প ও কাড়ানাকড়া বাজিয়ে!

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উদাসীর পাঠকগণ লক্ষ্য করলেন যে প্রায় প্রতিমাসেই উদাসীর প্রথম পৃষ্ঠায় পাইকা বা ইংলিশ টাইপে সযত্নে ছাপা হচ্ছে কুমারী বিজয়িনী দেবীর রচিত বিচিত্র ছন্দের বড় বড় সব প্রেমের কবিতা! কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, মনোজ্ঞ ও মর্ম্মস্পর্শী। কাজেই কুমারী বিজয়িনী দেবীর কবিখ্যাতি অচিরে প্রচারিত হ'য়ে পড়লো। সকলের মুখেই শোনা যেতে লাগলো বাংলা সাহিত্যে এইবার সত্যকার একজন প্রতিভাশালিনী মহিলা কবির আবির্ভাব হয়েছে!

কিন্তু একথা তখনও পর্য্যন্ত কেউ জানতে পারলে না যে, 'উদাসী'র সম্পাদক অমল সেনের সঙ্গে এই নবাগতা মহিলা-কবিটির পত্রযোগে যে পরিচয় ঘটেছিল তা ক্রমে টেলিফোন যোগে আলাপ ও শেষে নিমন্ত্রণ ও দেখাসাক্ষাতের ভিতর দিয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। কবিতার তরঙ্গছন্দে ভেসে এসেছে প্রেমের সুবর্ণ তরণী প্রণয়ের অনুকূল বাতাসে দুটি হৃদয়ের শূন্যকূলে।

অমলের অন্তরঙ্গরা কেউ কেউ তার আধুনিক রচনাবলীর ভঙ্গী দেখে ব্যাপারটা কতক সন্দেহ করলেও সাহস করেনি সেটা প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করতে। কারণ, অমলের সেই নারীজাতি সম্বন্ধে উদাস ভাবটা সে তখনও বহির্জগতে বর্জ্জন করেনি।

'উদাসী' কার্য্যালয়ে অমল আজ অসময়ে এসে সম্পাদকের ঘর আগলে বসেছিল। কাগজপত্র এটা ওটা নাড়ছিল বটে, কিন্তু কোনো কাজেই যেন তার মন বস্‌ছিল না! ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল আর 'সময় যেন কাটছে না!'—ব'লে বেশ একটু অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠছিল।

আজ প্রায় একমাসের উপর হবে কুমারী বিজয়িনী দেবীর সঙ্গে অমলের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। কারণ বিজয়িনী দেবী এখানে ছিলেন না। বি-এ পরীক্ষার পর বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি মাসাধিককাল শিলঙে অবস্থান করছিলেন। যাবার সময় তিনি অমলকে বলে গেছলেন—"শিলঙ থেকে চিঠিপত্র লেখার সুবিধা হবে না। আমি যাঁদের অতিথি হ'য়ে থাকবো সেখানে, তাঁরা কেউ এ সব পছন্দ করেন না। তা ছাড়া, আমিই যে 'বিজয়িনী দেবী' এই ছদ্ম নামে 'উদাসী'তে কবিতা লিখি, এ খবরও তাঁরা কেউ জানেন না—সুতরাং—

অমল তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল—"কোনো ভয় নেই বিজয়িনী! আমি অবশ্য পত্র তোমাকে রোজ লিখবো বটে, কিন্তু একখানিও ডাকে দেব না। আমার কাছেই জমা থাকবে, তুমি ফিরে এলে সেই পত্রাঞ্জলি দিয়ে আমি তোমার শুভ প্রত্যাগমনকে অভিবাদন করবো।"

বিজয়িনী উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বলেছিল—"চমৎকার আইডিয়া! আপনি যথার্থই কবি, এই জন্যই আপনাকে আমার এত ভাল লাগে।"

অমল বলেছিল—"আমার জন্য শিলঙ্ থেকে কি উপহার নিয়ে আসবে বিজয়িনী?—

বিজয়িনী জিজ্ঞাসা করলে—"আপনিই বলুন কি আনবো? কী পেলে আপনি খুশী হবেন?"

অমল বললে—"একমাসের জন্য দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাবে বিজয়িনী, এই একমাস আমি কাটাবো শুধু তোমাকে চিঠি লিখে, অথচ তোমার চিঠি আমি পাব না একখানিও—এইটেই আমাকে সবচেয়ে কাতর ক'রে তুলেছে, আচ্ছা, তুমি কি—"

বিজয়িনী বললে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমিও রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে লুকিয়ে আপনাকে একখানি ক'রে চিঠি লিখে রেখে তবে ঘুমাবো।"

"তোমার সে ঘুম হোক্ সুখস্বপ্নের আনন্দে মধুময়। ফিরে এসে সে চিঠিগুলি কিন্তু স্বহস্তে আমায় বিলি করে যাবে কথা দাও—" বলতে বলতে অমল মিনতি ভরে বিজয়িনীর হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রেছিল।

বিজয়িনীর মুখখানি সেদিন যে অপূর্ব্ব সুন্দর ও মধুর মনোহর লজ্জার অরুণরাগে রক্তিম হ'য়ে উঠেছিল—আজ কেবলই থেকে থেকে অমলের চোখের সামনে সেই কমনীয় মুখখানি ভেসে উঠ্‌ছে! বিজয়িনী আজ শিলঙ্ মেলে কলকাতায় ফিরছে। গোপনে সে টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়েছে "স্টেশনে আসবেন না যেন! সঙ্গে মাসীমা থাকবেন। আমি বাড়ী পৌছেই আপনাকে ফোন করবো।"

শিলঙ মেল সওয়া একটায় শেয়ালদহে এসে পৌছবে। অমল কিন্তু বেলা বারোটার আগেই 'উদাসী' অফিসে এসে বসে আছে। মনে মনে কেবলই হিসাব করছে সওয়া একটায় শিলঙ্ মেল এসে পৌছলে বিজয়িনীর বাড়ী ফিরতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে? কাপড়-চোপড় বদলে মুখহাত ধুয়ে লাঞ্চ্ খেয়ে তারপর সে নিশ্চয় সবার আগেই তাকে টেলিফোন করবে! সেটা বড়জোর দুটো-স' দুটো নাগাদ। ঘণ্টাখানেক ত লাগবেই তার প্রস্তুত হ'তে। অমল ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চায়! সময় আর কাটে না! বারটা থেকে একটা বাজলো। অমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। কিন্তু বাকি পনেরো মিনিট সময়ের যেন একেবারে কুর্ম্মগতি! মাত্র এক কোয়াটার সময় যে এতখানি—তা ইতিপূর্ব্বে অমলের ধারণাই ছিল না! তার কানের ভিতর যেন সে সময় ট্রেন চলার ঘড় ঘড় শব্দ আসছিল, শিলঙ্ মেলের সঙ্গে তার মনও তখন দৌড়চ্ছিল সমানে পাল্লা দিয়ে।

—ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং! টেলিফোন রিঙ্ ক'রে উঠলো! চম্‌কে ধড়মড়িয়ে কম্পিত হাতে অমল রিসিভারটা তুলে নিলে। তার বেপথু বুকের মধ্যে তখন প্রিয়-মিলনের থর থর কম্পন!...

"হ্যালো!"

গলা যতদুর সম্ভব কোমল মিহি ও মিষ্টি ক'রে অমল ফোনের মুখে মুখ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যালো, বিজয়িনী? কখন এলে?" মোটা হেঁড়ে গলায় ফোনের অপর দিক থেকে কে বলে উঠলো "আরে কেঁও লালাজী?—রাম রাম! শেঠ যম্‌না..."

সজোরে রিসিভারটা যথাস্থানে নিক্ষেপ ক'রে অমল বলে উঠলো—'ড্যাম ইট!'

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে—কাঁটায় কাঁটায় সওয়া একটা!

ঝন্ ঝন্ ক'রে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। ব্যস্ত হ'য়ে অমল ধরলে! ভাবলে ট্রেন থেকে নেমে শেয়ালদা স্টেশন থেকেই বোধ হয় বিজয়িনী 'কল' করছে।

কিন্তু, না। এবারও অমলকে হতাশ হ'তে হ'ল। সেই মাড়োয়ারীরই হেঁড়ে গলা! "ক্যা হুয়া শেঠজী?"—'রং নাম্বার' বলে ধমক দিয়ে অমল আবার ফোন্ কেটে দিলে। তার মুখ চোখে একটা তীব্র বিরক্তি ফুটে উঠলো!

অধীর আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে মানুষ যখন কিছুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে, সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি যেন তখন তার কাছে অনন্তকালের নিরবচ্ছিন্ন রূপ ধ'রে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে! সময় আর কাটতে চায় না!

এমনই কাতর অস্থিরতার মধ্যে আরও পনেরো মিনিট উত্তীর্ণ হ'ল। 'উদাসী' অফিসের দেওয়ালে বড় ঘড়িটায় ঢং করে দেড়টার ঘণ্টা বাজল! অমলের বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠলো।

"ক্রিং ক্রীং ক্রীং ক্রীং—" টেলিফোনে রিং হ'তে লাগলো। অমল ভাবলে বিজয়িনী কি এর মধ্যেই বাড়ী এসে পৌছল? বাড়ী ঢুকে ধূলো পায়েই তাকে ফোন্ করছে!—

ব্যগ্র হয়ে রিসিভার কানে তুলে নিলে অমল। তার প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস এসে পড়লো ফোঁস করে হর্নের গহ্বরের মধ্যে! একটু দম নিয়ে ধীরে ধীরে অমল বললে—'হ্যালো!'

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে উচ্ছল কণ্ঠে এক পরিচিত পুরুষের গলা বলে উঠলো—"গুড্ লাক্! হ্যালো! অমল, তুমি নাকি? আরে! তোমাকে যে এ সময় 'উদাসী' অফিসে পাবো—I never expected it!—আমি জানি বেলা তিনটের আগে তুমি আস না! মণিকা বললে—একবার ট্রাই ক'রে দেখই না যদি ধ'রতে পারো! ভাগ্যিস্ ওর পরামর্শ শুনে রিং করলুম! নইলে তোমাকে হয়ত miss করতুম!..."

অমল ঘড়ির দিকে চেয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে

চলেছে। বিজয়িনী যদি এসময় ফোন্ করে—তাকে পাবে না। এক্সচেঞ্জ থেকে বলে দেবে "engaged"—আঃ! মিহির স্টুপিড্ কি আর সময় পেলে না—ফোনে আড্ডা দেবার? বিরক্ত হয়ে বললে—"কি দরকার তোমার চট্ ক'রে সেরে নাও মিহির! আমি ভয়ানক্ busy! ডিকেন্সন কোম্পানীর সাহেব এসে wait করছে—"

"আরে রেখে দাও তোমার ডিকেন্সন্ কোম্পানী! কাল সন্ধ্যের সময় আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে তোমাকে অতি অবশ্য আসতে হবে। কাল আমরা একটা পার্টি দিচ্ছি, বুঝলে—কেবলমাত্র আমাদের intimate friendsদের। আমাদের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে এটা একটা "অধিবাস-উৎসব" বলতে পারো। মণিকা "মণিপুরী" dance দেখাবে। তোমার কাগজে তার একটা বেশ কবিত্বপূর্ণ বিবরণ ছাপা চাই কিন্তু—মিস্ সেন রবীন্দ্রনাথের নূতন গান শোনাবেন—

অমল এবার রীতিমত অধৈর্য্য হয়ে উঠলো—ব্যস্ত হয়ে বললে—"আচ্ছা—আচ্ছা! সে হবে এখন, সন্ধ্যের পর নিশ্চয়ই যাবো—O. K!"

"দূর গাধা! আজ সন্ধ্যেবেলা নয়। কাল, কাল, কাল সন্ধ্যেবেলা—বুঝলি? আজ আমি সন্ধ্যের সময় থাকবো না!—মণিকাকে নিয়ে ছ'টার শোতে 'লাইট হাউসে' যাচ্ছি—'She Loves Me' ছবিখানা দেখতে!—চমৎকার ছবি। Charming!—"

অমলের মন অস্থির। দৃষ্টি ঘড়ির কাঁটার দিকে নিবদ্ধ। মিহিরের এ সময় এই বেয়াদপি তার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। তাড়াতাড়ি বললে—"আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে! ছ'টার শো'তে লাইট হাউসেই যাবো—গুড্ বাই!

"নন্‌সেন্স! I don't want any intruder this evening. I want to have her all to myself! দোহাই তোমার বন্ধু! আজ আর ধূমকেতুর মত 'লাইট হাউসে' এসে উদয় হ'য়ো না!—কাল বরং একটু সকাল করে—"

অমলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়লো। ভদ্রতা বুঝি আর রক্ষে করা চলে না!—"অল রাইট!—কাল সকালেই যাচ্ছি, গুডবাই!" বলে তাড়াতাড়ি অমল ফোন নামিয়ে রেখে অত্যন্ত রেগে বলে উঠলো—"একটা nuisance! হতভাগা—বাঁদর! আর সময় পেলেন না ডাকবার! হয় ত টেলিফোন্ করে বিজয়িনী এর মধ্যে 'নো রিপ্লাই' শুনে—I mean 'engaged' শুনে ফিরে গেল! একটা স্টুপিড! নিজের মনের আনন্দেই মশ্‌গুল হ'য়ে আছেন! যেন বিয়ে আর কেউ কখনো করে নি—করবেও না?—"

"ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং"—টেলিফোন বেজে উঠলো!

অমল তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে—ঠিক পৌণে ছটা!—

হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে রিসিভারটা সে কানে তুলে নিলে।…

"হ্যালো!"

এবার যে মধুময় কোমল কণ্ঠ টেলিফোনের ওপার হ'তে সাড়া দিলে তা দিলরুবার সুরের চেয়েও মিঠে!…এই তো বিজয়িনীর গলা! অমল যেন আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পড়লো!

"হ্যালো! এটা কি 'উদাসী' অফিস? সম্পাদক মহাশয় আছেন? সম্পাদক মশাইকে একবার ডেকে দিন ত!"

"সত্যিই তবে তুমি ফিরে এসেছ বিজু?

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অমল সাগ্রহে এই প্রশ্ন করলে।

"এ্যাঁ? কি বললেন? সম্পাদক মশাই বেরিয়েছেন?"

ব্যাকুল হ'য়ে অমল বললে—"না না বিজু, এই যে আমি—আমিই ত কথা বলছি—উদাসীর সম্পাদক, অমল সেন—"

"ও! আপনিই বুঝি, নমস্কার! আমি মনে করেছি আপনার কাগজের সেই দুঃসহ সহকারী মশাই বুঝি ফোন্ ধরেছেন—"

"না না, আজ আর কেউ নেই অফিসে। সবাইকে ছুটি দিয়েছি। আমি একলাই বেলা বারটা থেকে—তোমার প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করছি!"

"বেলা বারটা থেকে?—বলেন কি?"

"হ্যাঁ বিজু।"

"কেন? একি পাগলামী?—আমি তো তখন 'ঈশ্বরদী'তে—"

"হ্যাঁ, আমি টাইম টেবিল খুলে—ঘড়ি ধ'রে—"

"ট্রেনের পদক্ষেপ গুণছিলেন বুঝি?"

"একরকম তাই! তুমি কখন এলে বিজু?—"

"ঠিক্ স'একটায় আমাদের ট্রেন punctually প্ল্যাটফর্মে in করেছে।"

"না না, সে ত জানি, বাড়ী এসে পৌছলে কখন ?—"

"এই মিনিট পনেরো হবে। মাসীমাকে তালতলায়—নামিয়ে দিয়ে আসতে একটু দেরী হ'য়ে গেল।"

"ও! তাহ'লে বাড়ী ঢুকেই আমাকে ফোন ক'রেছো দেখছি, কাপড়-চোপড় বদলানো—মুখহাত ধোয়া এখনও কিছুই হয়নি নিশ্চয়—"

"ফোনে আমাদের পক্ষে ঐ একটা মস্ত সুবিধে। চক্ষু-লজ্জার বালাই নেই! যা অবস্থায় আছি এখন—একেবারে ভূতের মত! এ বেশে কারুর সামনেই বেরোতে পারতুম না; আপনার—সামনে ত নয়ই।"

"আমি কিন্তু বিজু ফোনেও দু-একজনের চক্ষুলজ্জা দেখেছি—একবার কোনো একজন প্রসিদ্ধ রায়-বাহাদুরের বাড়ীতে সকালে কি একটা কাজে গেছলুম। তাঁর সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় ফোন এলো। তাঁর সেক্রেটারী দৌড়ে এসে ফোন ধরলেন এবং একটু পরেই রায় বাহাদুরকে বললেন, 'গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে চীফ্ সেক্রেটারী সার মরিসন্ হামফ্রে আপনাকে ডাকছেন। রায় বাহাদুর শশব্যস্তে উঠে পড়ে ফোন ধ'রে চীফ সেক্রেটারীর উদ্দেশে এক আভূমিপ্রণত সেলাম ঠুকে বললেন—Yes sir! Rai Bahadur speaking sir! at your service sir!—"

টেলিফোনের ওপারে একটা সুধা কণ্ঠের কলহাস্য যেন 'পিয়ানো'র ঝঙ্কারের মত বেজে উঠলো!

অমলের পক্ষে সে যেন একেবারে কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—আকুল করিল মন প্রাণ!

অমল বিগলিত কণ্ঠে বললে—"উঃ! কত দিন যে তোমায় দেখিনি বিজু! এক একটা দিন আমার মনে হয়েছে যেন এক একটা যুগ!"

উত্তর এল—"আমারও ঠিক ওই অবস্থা।

"সত্যি বলছো বিজু!"—অমলের চোখমুখ একটা চাপা খুশীতে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো!

"সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন। শিলঙ্ এসময় একেবারে ফাঁকা! এটা তো এখন ওখানকার season নয় কিনা—কাজেই, সময় যেন আর কাটে না!"

অমল একটা ঢোক গিলে বললে—"ও! হ্যাঁ, তা বটে।" অমলের মুহূর্ত্তপূর্ব্বের সে খুশীর ভাবটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন মুষড়ে পড়ল। বললে—"তা, এতটা ট্রেনজার্নির পর একটু বিশ্রাম করলে পারতে বিজু! বাড়ীতে এসেই একেবারে ব্যস্ত হ'য়ে আমায় ফোন করা—"

উত্তর এলো—"একটা বিশেষ দরকারে পড়ে আপনাকে ফোন করতে হ'ল। মিহির গুপ্তর ফোন নম্বরটা কি বলতে পারেন? আমি ত টেলিফোন গাইড হাত্ড়ে—কোথাও পেলাম না।"

"শুধু কি ওই সংবাদটুকু জানবার জন্যই আমাকে ব্যস্ত হ'য়ে ফোন করছ বিজু?"

অমলের কণ্ঠে একটা ক্ষুব্ধ অভিমানের আমেজ দেখা দেয়।

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে শোনা যায়—"বা-রে! একমাস আপনার কোনও খবর পাইনি, সেটা বুঝি—"

"সত্যি বলছো বিজু? আমার খবর কি সত্যিই তুমি জানতে চাও?"

"বা-রে! জানতে চাই না বুঝি?—আপনি ত এই একমাসের মধ্যেই দেখছি আমাকে ভুলে গেছেন, তাই বলে কি—"

"ভুলিছি! তোমাকে ভুলবো বিজু? এ জীবনে ত নয়ই—হয় ত পর-জীবনেও!—"

"যান! ওই সব বলেই ত আমাকে—"

"বিজু, আমি যে তোমাকেই জীবনে প্রথম—"

"দেখুন, যুগে যুগে মেয়েরা পুরুষদের বিশ্বাস করে ঠকেছে, তবু কি জানি কেন আপনাকে আমি কিছুতেই অবিশ্বাস ক'রতে পারিনি।"

"তোমার বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি বিজু! এই একমাস তোমার জন্য অহরহ আমার কী যে মন কেমন করেছে—"

"শুনবেন তবে?...একটা কথা চুপি চুপি আপনার কানে কানে তা হ'লে আজ বলি—সেই প্রথম যেদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা—মনে পড়েকি—?"

অমল একেবারে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলো। টেলিফোনের রিসিভারটা ভাল করে বাগিয়ে কানে একেবারে সজোরে চেপে ধরে সামনে একটু ঝুঁকে পড়লো।—

অকস্মাৎ একটা খুব মোটা ভারি পুরুষের গলা অমলের

কানে এল। "নমস্কার! আপনিই কি উদাসীর সম্পাদক?"

"না—না—আমি না"—অমল ভীষণ রেগে গর্জ্জন করে উঠলো—

"ও! আপনি তাঁর সহকারী বুঝি? তা দেখুন—আমারই নাম প্রিয়তোষ পাল। একটু পরে গেলে সম্পাদক মশায়ের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে কি?"

"তোমার কোনো কথা আমি—শুনতে চাইনি! সরে যাও এখনই টেলিফোন ছেড়ে—সরে যাও বলছি—"

"বেশ, তা হ'লে সরেই যাচ্ছি, আপনি যখন শুনতে চান না—"

এবার গানের সুরের মত মিষ্টি মেয়েলী গলায় এই কথাগুলি—কানে এল। শশব্যস্ত হয়ে অমল বলে উঠলো—"আরে না না, বিজু, আমি তোমাকে কিছু বলিনি। লক্ষীটি, তুমি যেও না—দেখ না—কে কোথাকার এক ছোটলোক এই সময় টেলিফোনে জ্বালাতে এসেছে—"

"ক্রস-কনেক্‌শান হয়েছিল বুঝি? ও! তাই ত বলি, হঠাৎ আপনি আমার ওপর—এমন রূঢ় হ'য়ে উঠলেন কেন—?

"এই দেখ না সম্পাদকতা করা কী এক বিষম ঝকমারী—একটু নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাটে টেলিফোন করবারও উপায় নেই! হ্যাঁ, তুমি কি বলছিলে বিজু?"—অমলের গলা যেন সুধাসিক্ত!"

"বলছিলুম—মিহিরবাবুর—"

"ও! হ্যাঁ, তার ফোন নম্বরটা—না?

"হ্যাঁ, আমি বাড়ী ফিরেই দেখি মণিকাদি' কাল সন্ধ্যের সময় মিহিরবাবুদের বাড়ীতে উপস্থিত হবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রে আমায় একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, ওদের নাকি বিয়ের দিনটা—"

অমলের এ অবান্তর আলোচনা এসময় একটুও ভাল লাগছিল না। মিহির গুপ্তর বিয়ে নিয়ে তাদের কিসের এত মাথা ব্যথা?—কিন্তু, এ প্রসঙ্গ চাপা দেবারই বা উপায় কি? কাজেই বলতে হ'ল—"হ্যাঁ, আমাকেও যেতে বলেছে ওরা—"

"যাচ্ছেন নাকি?"

"তুমি কি যাবে?—তুমি যদি যাও ত, দু'জনে একসঙ্গে যেতে পারি—"

"আমার বোধ হয় যাওয়া হবে না। ঠিক ঐসময়—মাসীমার মেয়ের পাকা দেখা যে কাল! কাল আমরা বাড়ীশুদ্ধ তালতলায় যাবো।"

"ও! আচ্ছা। তা হ'লে ত আর কথাই নেই।" অমল মনে মনে বললে—আঃ! কোথা থেকে যে আবার এই এক মাসীমা এসে জুটলেন?—একটু পরেই অমল অনুরোধ করলে—"হ্যাঁ, কাল বিকেলে 'লাইট-হাউসে' এস না কেন বিজু! অনেক দিন তোমার সঙ্গে একসঙ্গে ছবি দেখা হয়নি। খুব চমৎকার একখানি ফিল্‌ম এনেছে ওরা—"

"কি ছবি?

"She Loves Me!"

"তাই নাকি?—ছবির নামটা যেন 'উদাসী' সম্পাদকের কবি-কল্পনা-প্রসূত ব'লে মনে হ'চ্ছে না?—"

অমল খুশীতে একমুখ হেসে উঠলো—গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললে—"না না, সত্যি! তুমি আজকের 'স্টেট্‌স্‌ম্যানের য়্যামিউজমেন্ট্ পেজটা খুলে দেখ না কেন—"

"তা' না হয় হ'লো, কিন্তু বিজ্ঞ সম্পাদক মশাই!—কাল কেমন ক'রে আপনার যাওয়া হবে শুনি?—কাল ত আপনি মিহিরবাবুদের ওখানে engaged."

"আরে বেং, তোমার যাবার যখন কোনো ঠিক নেই বলছো, তখন আমার আর ওখানে যাবার কোনো interest-ই নেই। তার চেয়ে বরং তোমার সঙ্গে 'লাইট হাউস'-এ দু'ঘণ্টা—"

"কিন্তু, আমি যে মাসীমার মেয়ের পাকা দেখায় কাল তালতলায়—

"ওঃ! হ্যাঁ, তাও ত বটে!" কিন্তু স্বগত উক্তি হ'ল—'ওফ্! Hang this মাসীমা!' প্রকাশ্যে বললে—"আমি একেবারে ওকথা ভুলে গেছলুম বিজু, আঃ! এই সামাজিক সুসভ্য মানুষের সময় যে একটা দিনও তার নিজের নয়—এটা এ ব্যাপার থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে!—Primitive যুগটাই দেখছি ছিল ভাল!"

ঝর্ ঝর্ করে এক ঝলক হাসির ঝর্ণা ঝরে এসে অমলের কর্ণকুহর তৃপ্ত করে দিলে—সেই কলকণ্ঠের সুরলহরীর মধ্যে শোনা গেল—"কিছু মনে করবেন না অমলবাবু! সে আদিম যুগের বর্ব্বরতা কিন্তু পুরুষদের ভিতর থেকে এখনও একেবারে নিঃশেষে লোপ পায়নি!"

অমল বললে—"তোমার কথাটা অভ্রান্ত বলে মেনে নিতুম

বিজু, যদি আমি জোর কোরে তোমাকে কাল তালতলা থেকে তুলে এনে 'লাইট হাউসে' বসাতে পারতুম !"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনাকে অতটা disappointed হ'য়ে পড়তে হবে না। চলুন আমরা পরশু গিয়ে ছবিখানা দেখে আসি—"

অমল অত্যন্ত হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—"পরশু যে ওদের change of programme !"

"ওঃ ! তা হ'লে ত আর হয় না !"—ক্ষণকাল দু'জনেই চুপ চাপ ! তারপর ওদিক থেকে শোনা গেল—"আচ্ছা ; শুনুন ; এক কাজ করা যাক আসুন—আজই সন্ধ্যেয় 'লাইট হাউসে যাওয়া যাক্ ! কেমন ? রাজি আছেন ?—"

অমল উৎসাহে উত্তেজিত হ'য়ে উঠে ব'লে ফেললে—"তাহলে ত খুব ভালই হয় !" কিন্তু, পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে বললে—"না, না, থাক, একে এই এতটা ট্রেন জার্নি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে এসেছো—আজই সন্ধ্যের পর বেরুনো—"

"তার জন্য ভাববেন না ! আপনি সঙ্গে থাকলে—আমি একটুও ক্লান্তি বোধ করবো না।"

অমল যেন হাতে স্বর্গ পেলে ! একেবারে—উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো—"বিজু ! তোমার কবিতা যে কেন আমার রবি ঠাকুরের লেখার চেয়েও ভাল লাগে তা কি এখনও বোঝ নি ?"

"আচ্ছা, আমি এখন চল্লুম—মা ডাক্‌ছেন—গুডবাই ! তা হ'লে আজ সন্ধ্যেবেলা 'লাইট হাউসে' দেখা হবে, কেমন—?"

"O-k ! গুডবাই Love !"

ফোন নামিয়ে রেখে অমল ফিরে দেখে—সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—শ্রীমান প্রিয়তোষ পাল !

একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আরে ! তুমি কতক্ষণ এসেছ ?"

এক মুখ হেসে প্রিয়তোষ বললে—"একটু আগে টেলিফোনে আপনি আছেন কি-না জেনে—তখনি বেরিয়ে পড়িছি ! আপনাকে ত সহজে ধরা যায় না। কতবার যে এসে ফিরে ফিরে গেছি, তার ঠিক নেই !—যখনই আসি—শুনি, আপনি নেই, বা এইমাত্র চলে গেছেন, কিংবা আজ আর আসবেন না—"

হো হো ক'রে হেসে উঠে অমল বললে—"কি করি বলো, তোমার মত সব ছন্দ-ছোঁয়াচে—কাব্যাক্রান্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষার যে আর কোনো উপায় নেই !"

প্রিয়তোষ পালের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। হাসি মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বললে—"আমাকে ত আপনি পত্র লিখে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ! নইলে আমি কখনই আপনাকে বিরক্ত করতে আসতুম না।"

"ডেকে পাঠিয়েছিলুম নাকি ? কী আশ্চর্য্য !—"

"এই দেখুন না, আমি কি মিথ্যে কথা বলছি ? সে চিঠি আমার পকেটেই রয়েছে।"

"থাক্ থাক্, আর চিঠি দেখাতে হবে না—"

"কিন্তু, আমি ত ইতিমধ্যেই এ চিঠি অনেককেই দেখিয়েছি—আমার বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই জানে 'উদাসীর' সম্পাদক আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—"

"ও ! বুঝিছি, চিঠিখানা কাউকে দেখাতে আর বাকি রাখ নি ? পকেটে পকেটে নিয়েই ঘুরছো ! —তা বেশ ক'রেছ। কিন্তু, কেন ডেকে পাঠিয়েছিলুম বলতে পারো ?—"

"সেই যে আমি 'পল্লীপথ' নামে একটি ছোট্ট কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলুম 'উদাসী'র পূজাসংখ্যায় প্রকাশ করবার জন্য। আপনি সে কবিতাটি ফেরত দিয়ে আমায় লিখে-ছিলেন—'এখন আর আমাদের গতি পল্লীর সেই পায়ে-চলা সংকীর্ণ পথের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না—তাকে এগিয়ে আসতে হবে—বড় বড় বিশাল নগরীর প্রশস্ত রাজপথে। তোমরা তরুণের দল ! তোমাদের উপরই জাতির এই অভিনিষ্ক্রমণ—এই জয়যাত্রার মহৎ কর্ত্তব্য নির্ভর করছে—যদি পারো তো তোমার কবিতাটি বদলে লিখে নিয়ে এসো—"

মাথাটা একটু চুলকে অমল জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি বদলে আবার লিখে এনেছ নাকি কবিতাটা ?"

সলজ্জ ভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে প্রিয়তোষ পাল বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ ! সেটা বদ্‌লে এবার 'রাজপথে'র উপর লিখেছি ! আপনাকে পড়ে শোনাবার জন্য আমি নিজে লেখাটি সঙ্গে নিয়ে এসেছি—"

"ও ! তা বেশ করেছ', কিন্তু…হ্যাঁ, তোমার কবিতাটা কি আকারেও প্রশস্ত রাজপথের মত খুব বড় হয়ে প'ড়েছে ?"

"আজ্ঞে না, অল্প কয়েক লাইন মাত্র ! একটা brief

sketch বলা চলে!—তুলির দু-একটা আঁচড়ে একখানা ছবি ফুটিয়ে তোলার মতো! এই যে পড়ি—শুনুন না, শুনলেই বুঝতে পারবেন—'বড় রাস্তা'—"

"কবিতার নাম দিয়েছো কি—'বড় রাস্তা'?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"কেন, 'রাজপথ' দিলেই ত পারতে।"

"আজ্ঞে, কবিতার প্রথম লাইনটি ধরেই নামকরণ করিছি যে—"

"ও! প্রথম লাইনেই আছে বুঝি—'বড় রাস্তা'? তা ওর সঙ্গে মিল দিয়েছ কি? খুব সম্ভব 'খাস্তা'?—কারণ, ওছাড়া ত আর কোনো ভালো মিল নেই! কি ছন্দে লিখেছ?—"

"আজ্ঞে, দয়া করে একটু শুনলেই বুঝতে পারবেন। মিল ত আপনিই রাখতে আমায় নিষেধ ক'রেছিলেন। এই যে চিঠিতে লিখেছেন—'এ যুগে আমাদের জীবনে 'মিল' কোথা?—না সমাজে, না রাষ্ট্রে, না কর্পোরেশনে, না কংগ্রেসে, না সাহিত্য সম্মিলনে! সুতরাং আধুনিক সাহিত্যে তার ছাপ ত পড়বেই! কবিতায় বর্ত্তমান সময়ে মিল থাকাটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, সে মিল হবে হিন্দু-মুসলমানের মিলের মতই কৃত্রিম! যে দেশে স্বামী স্ত্রী হ'য়েও দু'টি নরনারীর মনের মিল নেই সে দেশে কবিতার 'মিল' ভণ্ডামির নামান্তর—!"

"ও! আমি বুঝি এইসব কথা—তোমাকে লিখেছিলুম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এতে আমার খুব সুবিধে হয়ে গেছে কিন্তু, কবিতা লেখবার পরিশ্রম অনেক হালকা হ'য়ে গেছে! মিলের জন্য আমাকে এত বেগ পেতে হ'ত—"

অমল মনে মনে নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো! কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে এই তরুণ কবিযশপ্রার্থীকে—এসব লিখে পাঠানো তার খুবই অন্যায় হয়েছে বুঝতে পারলে; সাধে কি আর জ্ঞানী মহাপুরুষেরা বলে গেছেন—শতং বদ 'মা' লিখ—কিন্তু, ঢিল যখন ছোঁড়া হয়ে গেছে তখন আর উপায় কি? অত্যন্ত অনুতপ্তের মত অমল বললে—"মিল দুর্লভ বটে, তুমি ঠিকই বলেছ—মিলের জন্য অবশ্যই অত্যন্ত বেগ পেতে হয়, কিন্তু যাই বলো প্রিয়তোষ, মিল যদি খুঁজে পাওয়া যায় তার চেয়ে মধুময় পৃথিবীতে বোধ হয় আর কিছু নেই—"

প্রিয়তোষ বিস্মিত হয়ে বললে—"আজ্ঞে—আপনি—

অমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—"এই ধর যেমন -

"মনসিজ ফুলশর
দুটি প্রিয় অন্তর
　　বিঁধিল যবে
কাঁপে হিয়া থর থর;
ব্যাকুল পরস্পর
মিলিবে কবে?" এর কাছে কি আর?—"

"আজ্ঞে, আমার রচনা কিন্তু 'অতি আধুনিক।' আপনি যা বললেন—ও তো pre-war Poetry—"

"আচ্ছা, পড়ো তো শুনি, Post-war Poem তুমি কি রকম লিখেছ—"

প্রিয়তোষ বার দুই গলাটা ঝেড়ে নিয়ে, একটু কেসে, লুকিয়ে পকেট থেকে একটা লবঙ্গ বার করে মুখে পুরে দিয়ে পড়তে সুরু করলে—

"বড় রাস্তা, ওগো নিঠুরা কঠিনা পাষাণী বড় রাস্তা,
নগরীর বুক চিরে চলে গেছ তুমি,
দৃক্‌পাত নেই তোমার কোনো দিকেই যেন!
ওগো বড় রাস্তা, তুমি কি শুধু বড় লোকেরই?
শুধু জুড়ি চৌঘুড়ি মোটরেরই সমাদর তোমার কাছে?
পায়ে হেঁটে বহু কষ্টে চলে আসে যারা—সর্ব্বহারা—
মাথায় মোট নিয়ে—পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে
　　　　　　　　গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে—
তারাই শুধু চাপা পড়বে তোমার ওই প্রশস্ত আঙিনায়?
ক্ষত বিক্ষত ক'রে—হাসপাতালে পাঠাও তুমি
　　　　　　　　—তাদের,
কেউ কেউ প্রাণেও মরে তোমার ওই
　　　　　　　　চিরমুক্ত দ্বারে এসে।
তাদের ভালবেসে একটু কি তোমার চক্র-বিরল
　　　　　　নির্জ্জন সঙ্গ দান করতে পার না?
ধন্য হবে তারা তোমার সে অনুগ্রহ রঞ্জিত
　　　　　　ধূলি ধূসর প্রেমের ছায়া লেগে—"

"ব্যস! ব্যস্!—আর পড়তে হবে না! চমৎকার হয়েছে। দাও ওটা এ মাসের 'উদাসী'র প্রথম পাতাতেই

ছেপে দেবো—প্রেম! প্রেম! বুঝলে প্রিয়তোষ! কবিতার আসল 'প্রাণ-বস্তু'ই হ'লো প্রেম! অর্থাৎ, কবিতার 'ভাইটামিন্!" কারণ, প্রেম থেকেই কবিতার উদ্ভব!—প্রেমেতেই ওর সার্থকতা—প্রেমেতেই লয়! মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন বিশ্বজগৎ হয়ে ওঠে তার কাছে কবিত্বময়! তখন তার হাত দিয়ে শুধু কবিতা ছাড়া আর কিছু বেরোয়ই না!—"

"আজ্ঞে হ্যা, ঠিক বলেছেন—আর সে কবিতা হয় সমস্তই প্রেমের কবিতা!

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি ক'রে জানলে? তুমি কি কখনো কারুর প্রেমে পড়েছো প্রিয়তোষ?—"

"আজ্ঞে না, আমি খুব সতর্ক হ'য়ে আছি। সেই যে আপনি আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে লিখেছিলেন—প্রেম মানুষের পক্ষে একটা মারাত্মক ব্যাধি স্বরূপ! প্রেমের ভীষণ সংক্রামক বিষাক্ত বীজাণু বহন করে বেড়ায় দেশের যত সুন্দরী তরুণীরা! প্রেমে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে বরং প্লেগে আক্রান্ত হওয়াও ঢের বেশী নিরাপদ!—সেই থেকে আমি ওদিকে আর ঘেঁসিনি—"

"বটে! আমি আবার কবে তোমাকে এসব লিখলুম?"

"আজ্ঞে, সেই যে আমি যখন অভিযোগ করিছিলুম যে—উদাসীর প্রথম পৃষ্ঠা কেন প্রত্যেক মাসে এমন কলঙ্কিত করতে দেওয়া হ'চ্ছে—কুমারী বিজয়িনী দেবীকে? যত সব 'এফিমিনেট্' প্রেমের প্রলাপ তাঁর সাদরে ছাপা হ'চ্ছে—একটা লাইনেও একটু passion নেই! শুধু brain work! যা ওয়েস্ট্ পেপার বাস্কেটে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল—তখন আপনি আমাকে ঐ মহিলা-কবিটির শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে ঐ সব কথাই ত লিখেছিলেন—"

অমল ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"সে চিঠিখানা কি তোমার কাছে আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কোনো চিঠিই আমি ফেলিনি।

"কই দেখি সে চিঠিখানা?"

প্রিয়তোষ চিঠিখানা বার করে দিলে। অমল সেটা নিয়ে বার দুই পড়ে শুষ্কমুখে বললে—"এখানা আমার কাছেই থাক। তবে এটা ঠিক জেনো প্রিয়তোষ যে, প্রেমের ব্যাপারে মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থা যাই হোক, কবিতা কিন্তু প্রেম ছাড়া হ'তে পারে না! কানুছাড়া বৃন্দাবনে যেমন গীত নেই, প্রেমছাড়া তেমনি পৃথিবীতে কবিতা নেই।"

প্রিয়তোষ একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল। কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না। সম্পাদককে চটালে যদি 'বড়রাস্তা' না 'উদাসী'তে বেরোয়! একটা ঢোক গিলে শুধু বললে—"কিন্তু, দেখুন একটা কথা জানতে চাই! আমাদের এই বিংশশতাব্দীর রিয়েলিষ্টিক জগতে বর্ত্তমান কর্ম্মব্যস্ততার যুগে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ যখন কঠোর থেকে কঠিনতম হয়ে উঠেছে এ অবস্থায় বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের প্রেম নিয়ে বিলাসিতা করবার কি অবসর আছে?"

অমল উঠে পড়লো। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে। তাকে ছটার মধ্যে 'লাইট হাউসে' যেতে হবে পাশাপাশি দু'খানা সীটবুক করতে হবে—বললে—"আচ্ছা, এ আলোচনা আর একদিন করা যাবে, আজ উঠলুম প্রিয়তোষ, আমার একটু বিশেষ দরকার আছে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আজ শুধু এইটুকুই বলতে পারি—যে 'বড়রাস্তা' নিয়ে বড় বড় কাব্য করবার যদি এদেশের ছেলেমেয়েদের নিরবচ্ছিন্ন অবসর থাকে, তা হ'লে প্রেম নিয়ে বিলাসিতা করবার সময়েরও তাদের অভাব হবে না! প্রেম ও কবিতা ও দুটো পরস্পর allied and interrelated. *

* বিদেশী বীজ অবলম্বনে।

সামাজিক ও দাম্পত্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

ডাঃ সুবোধ মিত্র এম বি (কলিঃ) এম-ডি (বার্লিন) এফ্-আর-সি-এস্ (এডিন) এফ্-সি-ও-জি

যে বিষয়ের অবতারণা করছি তার একটা কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আজও নির্দ্দিষ্ট হয়নি। বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগেই এমন কতকগুলি কথা ব্যবহার হয় যার বেশ পরিষ্কার অর্থ কিছু ধরা যায় না এবং ভালো ক'রে সেটা লোককে বোঝানোও যায় না। আজ যা নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি এটা ওই ধরণেরই একটা ব্যাপার। 'পরিণয় ও পারিবারিক বা সামাজিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব' বললে কথাটা বেশ ওজনে ভারি ব'লে মনে হয় বটে কিন্তু বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নিশ্চয়ই হয় না। কিন্তু উপায় কি? এর চেয়ে নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা এ সম্বন্ধে আর কিছু পাওয়া যায়নি এখনও।

একজন খুব বড় জার্মান বৈজ্ঞানিক বলতেন "নারীর জীবন কোনো দিনই সুসম্পূর্ণ হ'তে পারে না—যে পর্য্যন্ত না সে পত্নী ও জননী হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে আমাদের এই বাংলাদেশে মেয়েদের অবস্থা একেবারে অন্য রকম। বিবাহ ও মাতৃত্ব বঙ্গনারীর জীবনের যেন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা! একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলেই চোখে পড়ে আমাদের মা-বোনেরা, আমাদের স্ত্রী ও কন্যারা কি শোচনীয় অবস্থার মধ্যেই না তাদের অভিশপ্ত জীবনের অস্তিত্বটুকু টেনে নিয়ে চলেছে! নানা দিক থেকে সম্প্রতি চেষ্টা চলেছে বটে এ দেশের নারীজাতির অনন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা কতকাংশে মোচন করবার, কিন্তু সে কেবল নিশীথের অন্ধকার আকাশে কালো মেঘের কোলে প্রভাতের ঈষৎ আলোর রেখাটুকুর মত ক্ষীণ! অবস্থা এখনও সেই যে তিমিরে সেই তিমিরে!

একমাত্র আশার কথা এই যে, আমাদের মেয়েরা এইবার ধীরে ধীরে তাঁদের সকরুণ অবস্থা সম্বন্ধে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছেন। নিজেদের দুর্দ্দশা যেদিন তাঁরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন, তাঁদের মুক্তির সন্ধানও সেদিন আর সুদূর বা অজ্ঞাত থাকবে না।

অতি অল্পবয়সে মেয়েদের বিবাহ দিয়ে ভারতবর্ষ যে শুধু সভ্যজগতের নিকট নিন্দাভাজন হ'য়ে প'ড়েছে তাই নয়, বাল্য-বিবাহের কু-প্রথার জন্য আমাদের সমগ্র জাতিকে দীর্ঘকাল ধরে গুরুদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে!

বালবিধবার ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা যেমন একদিকে আমাদের কলঙ্ক ও লজ্জা বাড়িয়ে চলেছে—তেমনি পঙ্গু বিকলাঙ্গ দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ শিশুর জন্মের হারও আমাদের দেশেই সব চেয়ে বেশী। অল্প-বয়স্কা প্রসূতির মৃত্যুও আমাদের ঘরে ঘরে যেন সংক্রামক ব্যাধির মতই বৃদ্ধি পাচ্ছে! তবে পারিবারিক কল্যাণের দিক দিয়ে—বাল্য-বিবাহের স্ব-পক্ষে বলবারও কিছু আছে। এ দেশের মেয়েরা বিবাহের পরই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বাস করে! সে কেবলমাত্র তার পতিগৃহ নয়; সেখানে শ্বশুরশাশুড়ী, হয় ত বা দাদাশ্বশুর দিদিশাশুড়ী, স্বামী, দেবরগণ, ননন্দারা, স্বামীর খুল্লতাত ও পিতৃস্বসা প্রভৃতিও আছেন। এই বৃহৎ পরিবারের বধূ হয়ে অল্প বয়সেই তারা আসে। যে বয়সে আসে তখন মন থাকে তাদের কচি। শ্বশুরবাড়ীর হালচাল, সেখানকার রীতিনীতি পদ্ধতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'তে তাদেরই সংসারের একজন হয়ে সে বেড়ে ওঠে। তারা স্বামীকে শুধু ভালবাসতেই শেখে না, ভক্তি করতে এবং শ্রদ্ধা করতেও শেখে। স্বামীর আত্মীয়-স্বজন পরিবার ও কুটুম্বদের আপনজন ব'লে গ্রহণ করতে শেখে। স্বামীর ভাই-বোনেদের সঙ্গে সহোদরার মত একটা মধুর স্নেহের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে পড়ে! শ্বশুরশাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদের সেবা ও পরিচর্য্যায় আনন্দ পায়। তাদের আশীর্ব্বাদ, প্রীতি ও ভালবাসাকে সে জীবনের মস্ত বড় সহায়, সম্পদ ও সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করতে শেখে।

এমনি ক'রেই ছোট্ট মেয়েটি শ্বশুরগৃহে এসে বড় হয়ে উঠতে থাকে তার পারিপার্শ্বিকীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে দৈনন্দিন জীবনের নিত্যতালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। তার কোনো দিনই মনে হয় না, সে এ বাড়ীর কেউ নয়, সে এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে! অথবা এ কথাও সে কোনো দিনই ভাবতে পারে না যে, তার স্বামীটি একমাত্র তারই সম্পত্তি। স্বামীর উপার্জ্জনে

একমাত্র তারই অধিকার, স্বামী ছাড়া আর সকলেই তার কাছে নিতান্ত পর!

হিন্দুবিবাহের যে আদর্শ—হয় ত তার নানা দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, অন্য কোনো ধর্ম্ম-বিবাহই এরচেয়ে ত্রুটিহীন নয়। পাশ্চাত্য প্রগতি হয় ত অনেক বিষয়েই জগতকে আজ অগ্রবর্ত্তী ক'রে দিয়েছে। কিন্তু পারিবারিক সুখ-শান্তি মাধুর্য্য ও আনন্দ সে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি।

প্রতিদিন পত্নীর নানা প্রয়োজনীয় বিলাস-উপকরণ সংগ্রহের ব্যয়ভার বহনে কাতর স্বামীর শোচনীয় মানসিক অবস্থা, স্ত্রীর বহির্মুখী মনের নিয়ত একটা উত্তেজিত ভাব, অপর পক্ষের অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ও ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার শেষ পর্য্যন্ত ও দেশের পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট ক'রে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ ঘটায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে ওদেশের বিবাহ-প্রথা যতই উচ্চতর হোক না কেন পারিবারিক সুখশান্তির স্থান নেই সেখানে।

ভারতবর্ষের মেয়েরা কোনো একটি বিশেষ মানুষকে বিবাহ করে না, তারা বরমাল্য দেয় তাদের আশৈশবের আদর্শ ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতীক—স্বামীকে। ছেলেবেলা থেকেই তারা মনের মধ্যে পতিদেবতার একটা আদর্শ গড়ে তোলবার সুযোগ পায়। কল্পনায় সকল সদ্‌গুণের অধিকারী ব'লে মনে করে তারা স্বামীকে—স্বামী যথার্থই তার ভক্তিশ্রদ্ধা ও প্রেমের যোগ্য কি-না সে বিচারের কোনো প্রয়োজনই বোধ করে না তারা—তাদের মনের সেই নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের প্রতি যে গভীর প্রেম ও অনুরাগ সঞ্চিত থাকে, হিন্দুবিবাহে স্বামী সহজেই তা পত্নীর কাছে লাভ করে। এর জন্যে তাকে কোনো কৃচ্ছ সাধন করতে হয় না।

আপাতদৃষ্টিতে এ ব্যাপারটাকে যদিও একান্ত কৃত্রিম হাস্তকর অস্বাভাবিক ও অন্যায় বলে মনে হয়, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, এর একটা অন্তর্নিহিত গভীর অর্থ আছে। এ এক প্রকার আত্ম-দানের সাধনা! নিজেকে এইভাবে জীবনের একটি আদর্শের উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে দেওয়ার ফলেই আমাদের মায়েরা মেয়েরা, স্ত্রী ও ভগ্নীরা মানসিক ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে মহিয়সী হয়ে ওঠেন। সংসারে হয় ত তাঁরা অনেক স্থলেই নির্য্যাতিতা লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হ'ন, তাঁদের মহৎ অন্তরের ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার সুযোগও নেয় জানি একাধিক অক্ষম ও নির্ম্মম স্বামী—কিন্তু এর ফলে তাঁদের চিত্তবৃত্তির বিকৃতি না ঘ'টে বরং অধিকতর আত্মোন্নতি ও মনের প্রসারতা লাভ হয়। এঁদেরই কাছে আমরা শিখি নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মহিমা, প্রেম ও ক্ষমার অতুলনীয় আদর্শ, তাই আমরা এঁদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, এঁদের সম্মান করি।

শিশুই গৃহের শোভা ও আনন্দ বর্দ্ধন করে। নরনারীর রহস্যময় সম্বন্ধ যথার্থ প্রেমে পরিণত হয়। পিতা সারাদিন কাজ করে বটে কিন্তু তার মন পড়ে থাকে সেই কুটীরখানিতে যেখানে তার বড় স্নেহের শিশু সন্তান অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছে তার সুমিষ্ট আধ আধ ভাষায় 'বা-বা' বলে ডেকে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য—আর শিশুর জননী দাঁড়িয়ে আছেন পথ-চেয়ে দুয়ারের কাছে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্যে। দুটি চোখে তার সে কি ব্যগ্র কোমল মধুময় স্নিগ্ধ চাহনি! সারাদিন জননী তাঁর শিশুটিকে ও গৃহকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। দেবমন্দিরের মত তিনি বাসগৃহকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, প্রিয়তমের জন্য স্বহস্তে বিবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করেন। দিনের সকল কর্ম্ম সাঙ্গ হ'লে নিজের প্রসাধন শেষ ক'রে স্বামীর অভ্যর্থনার জন্য তাঁর গৃহ-প্রত্যাগমের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকেন, সামান্য পদশব্দে সচকিত হয়ে ওঠেন—ঐ বুঝি তিনি আসছেন। কি মধুর, কি প্রীতিপ্রদ সে প্রতীক্ষা!

নারী—প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা। স্বামীপুত্র তার প্রাণ! ওদের জন্য সে না পারে এমন কাজই নেই! পৃথিবীতে ওদের বাড়া তার কাছে আর কেউই নয়।

এদেশের মেয়েরা শুধু স্ত্রী নয়, সে গৃহিণী, সখী, সচিব, মিত্র, প্রিয়শিষ্যা। দুঃখের দিনে বিপদের দিনে অভাবের দিনে যখন সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যায়—সে থাকে পাশে পাশে সকল দুঃখের অংশ নেবার জন্যে! সকল কষ্ট নিজের উপর নিয়ে স্বামীপুত্রকে সে প্রাণপণে দুঃখের আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে।

পারিবারিক জীবনের শান্তিপূর্ণ সঙ্গতির মধ্যে বেসুরো কিছু নিয়ে আসার মত নিষ্ঠুরতা আর নেই। সংসারে

জননীর স্থান সবার চেয়ে বড়। স্ত্রীলোক সমাজ ও পরিবারের অধিকতর কল্যাণ সাধন করতে পারে পত্নী ও জননী রূপেই। কেরাণী, টাইপিস্ট, টিকিট-বিক্রেতা, টেলিফোঁ গার্ল ইত্যাদি জীবিকা-অর্জ্জনের কাজে তাকে নিয়োগ করা মানেই সমাজ-ব্যবস্থার একটা ওলোট-পালট করা। এ ব্যবস্থায় স্বামী-পুত্র-সংসার কারুরই মঙ্গল হয় না। স্ত্রীও তার জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ লাভে বঞ্চিত থাকে। সংসারে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর দায়িত্ব বেশী। সমস্ত সংসারের হাল ধরে থাকে সে-ই! তারই তত্ত্বাবধানে সংসারের শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনের ভার মায়েরই উপর।

জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা নির্ভর করছে যে জননীর উপর, দেশের আদর্শ বীরপুরুষ সম্ভব হ'তে পারে যাঁদের চেষ্টায় ও যত্নে, সংসারে নারীর সেই মহিয়সী মাতৃরূপই অধিকতর কাম্য—না জীবিকার্জ্জনের জন্য কোন একটা বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁদের সংসারের বাইরে থাকাই বাঞ্ছনীয়?

কিন্তু, 'পুরাতন নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়।' মহাকবি টেনিসন বলেছেন—"নূতনের জন্য তাকে স্থান ছেড়ে দিতে হয়। ভগবান নানা উপায়ে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করেন—একই সুনিয়মে দীর্ঘকাল চললে ধরণীর নীতি ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়তে পারে।" পৃথিবীর পরিবর্ত্তন খুব দ্রুত সাধিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রীতিনীতিপদ্ধতি সমস্তই উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। কে জানে এ নব জীবনের লক্ষণ, না ধ্বংসের সূচনা! তবে নানা দিকে এর বিচিত্র বিকাশ ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সকলেই আজ সচেতন! নারী আজকের দিনে শুধু কেবল তার জননী ও পত্নীর মর্য্যাদা নিয়েই পরিতুষ্ট থাকতে পারছে না। সে চায় সকল বিষয়ে আজ পুরুষের সমকক্ষ হ'তে। সমষ্টিগত সুখশান্তির চেয়ে আজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণ-স্বাধীনতা তাদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। স্ত্রী আজ আর স্বামীর সহধর্ম্মিণী নয়, সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা গৃহকর্ত্রী নয়, সে আজ পুরুষের জীবনে মাত্র একজন সম-অংশীদার; সে রাজনীতির বড় বড় কথা কয়, পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে মাথা ঘামায়, ওলিম্পিক গেম্‌স্, আর্ট এক্‌জিবিশন, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস, এমন কি সমাজ-বিজ্ঞান ও সুপ্রজনন সমস্যারও আলোচনা করে। আবার রেডিয়ো এবং সিনেমা না হ'লেও তার দিন যেন অচল!

নারীর জীবনে এই যে আজ অতি আধুনিক বিপ্লববাদের প্রবল তরঙ্গ এসে ধাক্কা দিয়ে তার সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে, একে বাধা দিয়ে ঠেকাতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই আজ পৃথিবীর কোনো দেশে। ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্, এ প্রবাহ বন্ধ হবে না। এর গতি রোধ করবার চেষ্টা করলে শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, সামাজিক জীবনেও নানা বিরোধের সৃষ্টি হবে। শিক্ষার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ সম্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর আত্মচেতনা বা আত্মোপলব্ধি—একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ বা স্বকীয়তা এবং অর্থ ও জীবিকা-সম্পর্কে নিজের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাকে সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে টেনে বাইরের বিশাল ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়েছে।

পুরুষের সঙ্গে কাজের প্রতিযোগিতায় মেয়েরা ওদেশে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করে দিয়েছেন। অনেক স্থলে পুরুষদের একেবারে হটিয়েও দিয়েছেন। বিশেষ ক'রে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটা প্রায়ই দেখা যায়। সমস্ত কারখানাগুলোরও অধিকাংশ বিভাগ একেবারে সম্পূর্ণই মেয়েদের অধিকারে। এ ছাড়া, টাইপিস্ট, টেলিফোন অপারেটর, স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রী, বুকিং ক্লার্ক, দোকানের কর্ম্মচারীর মধ্যে কোথাও আর পুরুষের স্থান নেই। শিল্পী হিসাবে, সাংবাদিক হিসাবে, বিমান-পরিচালক ও মোটর-চালক-হিসাবে, এমন কি পুলিশ-সার্জ্জেন ও সৈনিকের কাজেও তাঁরা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। অধিকাংশ ব্যাঙ্ক, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ্ এবং রেলওয়ে প্রভৃতি সরকারী ও বেসরকারী অফিসে কেরাণীর কাজে মেয়েরাই অধিকতর যোগ্যতা দেখাচ্ছেন।

পৃথিবীর অনেক দেশে, যেখানে অতি-আধুনিকতারই জয়জয়কার, সেখানে মাতৃত্ব বা জননীর গৌরব লাভের জন্য আর মেয়েদের বিবাহ-বন্ধনের অধীন হ'তে হয় না। মেয়েরা সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল। যাকে খুশী তারা ভালবাসতে পারে, যে কোনো মনোমত পুরুষের সঙ্গ ও সাহচর্য্যে তাদের কোনই বাধা নেই, তারা সন্তানও প্রসব করে কিন্তু মায়ের দায়িত্ব নেয় না। রাষ্ট্রীয় শিশু-সদনে তাদের পাঠিয়ে দেয়। সরকারী ব্যয়ে ও সরকারের

তত্ত্বাবধানে তারা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়। গৃহমুক্ত, সংসারের ভারমুক্ত ও পরিবারের দায়মুক্ত মেয়েরা আনন্দে স্বৈরাচারে দিনযাপন করে। ইহকালের পুণ্যফলে, পরকালে স্বর্গলাভের লোভ নেই—পাপের ভয়ে নরক ভোগেরও আতঙ্ক নেই এতটুকু কোথাও তাদের মনে। কারণ দেশের আইনে এসব বিশ্বাস করতে তাদের মানা!

জীবনের এই যে আর একটা দিক, হয় ত কালে সমস্ত পৃথিবীর মেয়েই এর প্রভাবে অভিভূতা হয়ে পড়বে। এটা ভাল কি মন্দ তা নিয়ে সমালোচনা ক'রে কোনো লাভ নেই, কারণ যা ঘটবার তা ঘটবেই! অতি-আধুনিকতার মোহ এবং তার চুম্বকের মত প্রবল আকর্ষণী শক্তির প্রভাব থেকে নারীকে বর্ত্তমান যুগে রক্ষা করা অসম্ভব।

আমি একালের মেয়েদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর দোষ-গুণ বিচার করতে বসিনি, বা তাদের হাল আমলের হালচালের নিন্দা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। নারী-প্রগতির এই নব-জাগরণকে দূর থেকে লক্ষ্য ক'রে আমি শুধু মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চাই যে এর ফলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে, সমাজগত সুপ্রজননের দিক থেকে এর পরিণাম কি হবে?

স্যার ফ্রান্সিস্ গ্যাল্টন এই সুপ্রজনন বিধি সম্বন্ধে বলেছেন যে, এটা সমাজের শাসনাধীন এমন একটা ব্যবস্থা—যার ফলে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বা অবনতি সহজে সাধিত হ'তে পারে। সুপ্রজনন বিধি শুধু একটা অনুশীলন যোগ্য বিদ্যামাত্র নয়, এ প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ সামাজিক আদর্শকে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে এবং উদ্দেশ্য আর অন্য কিছু নয়—জাতীয় উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ক'রে তোলা, তাদের মনে পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের একটা গুরু দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেওয়া এবং তাদের নিজেদের যা-কিছু শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণ তা বংশ পরম্পরায় উত্তর-বংশীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে যাবার একটা আগ্রহ বা প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করা।

বিষয়টাকে দুদিক থেকে দেখা যায়—যেমন, একটা হ'চ্ছে 'মুখ্য প্রজনন' (Positive Eugenics), অর্থাৎ যেটার কাজ শুধু নির্দ্দোষ ও সুস্থ স্বগোষ্ঠীর উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা—তাদের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা ও তার ক্রমোন্নতি সাধন করা। আর একটা দিক হচ্ছে—'পরোক্ষ প্রজনন' (Negative Eugenics) অর্থাৎ যার কাজ হচ্ছে দুষ্ট ও অসুস্থ বংশের বৃদ্ধিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে তার প্রসার ক্রমশ হ্রাস করা।

একথা আমরা সকলেই জানি বোধ হয় যে দেহে মনে সুস্থ সবল বুদ্ধিমান ও সমাজের কল্যাণসাধনে সক্ষম নরনারীর মিলনই আদর্শ পরিণয় এবং তাদের পরিবার তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই ভাল; কিন্তু 'জানি' বললেই ত হয় না, মানি কই আমরা এ নিয়ম? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সুপ্রজনন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতটা অভিজ্ঞ ছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁদের প্রবর্ত্তিত যে বিবাহ-বিধিকে বর্ত্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা বর্ব্বর যুগের অসভ্য প্রথা বলে ঘৃণা করে, তার মধ্যে বংশ বা গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠধারা এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য নির্দ্দোষ ও অক্ষুণ্ন রাখবার একটা প্রয়াস বিদ্যমান ছিল। তাঁরা পাত্র-পাত্রীর ঘর-বর-বংশ-কুল-পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক মর্য্যাদা বিচার করে সৎপাত্রের জন্য সুকন্যা নির্ব্বাচন করতেন। এ প্রথা এখন কুসংস্কার বলে গণ্য!

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বা গর্ভ-নিরোধ প্রথাটাকে এখনও অনেকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর স্বপক্ষের চেয়ে বিপক্ষের দলই সংখ্যায় বেশী। 'জন্ম-নিয়ন্ত্রণ'—অর্থাৎ 'Birth Control' কথাটাই দুর্ভাগ্যক্রমে একটা অতি নিরর্থক অপশব্দ! এর প্রকৃত অর্থ অনেকেই বোঝেন না! 'Birth Control' বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মানে কেবলমাত্র গর্ভ-নিরোধ বোঝায় না। 'Birth Control' বলতে তিনটে জিনিস বোঝায়—Proception অর্থাৎ গর্ভ-ধারণের অনুকূল ব্যবস্থা, Contraception অর্থাৎ গর্ভ-ধারণের প্রতিকূল ব্যবস্থা এবং Geroception অর্থাৎ গর্ভধারণ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবধানের ব্যবস্থা। গর্ভ-নিরোধের চেয়ে গর্ভধারণের ব্যবস্থা অর্থাৎ Proception কোনো অংশে কম প্রয়োজনীয় নয়। অনেক মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়—যারা চিকিৎসকেদের বহু যত্ন চেষ্টা ও ব্যবস্থা সত্ত্বেও সন্তানবতী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। শোনা যায়, কৃত্রিম উপায়ে জরায়ুর মধ্যে ভিন্ন বীর্য্য সঞ্চারের দ্বারা বহু অপুত্রক নারীকে মাতৃত্বের মর্য্যাদা দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু এদেশের মেয়েরা আজীবন অপুত্রক থাকবে, তবু এ উপায়ে সন্তান লাভে

সম্মত হবে না। কাজেই চিকিৎসক হিসাবে এদিকে আমার অভিজ্ঞতা লাভের এখনও কোনো সুযোগ হয়নি। মহাভারতের যুগের সেই ক্ষেত্রজ সন্তান লাভের ব্যবস্থা নাকি ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে আজও বর্ত্তমান আছে। অবশ্য এ সংবাদ কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে আমি কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারিনে। এই যে নিঃসন্তান পত্নীকে কোনো সুস্থ সবল ও সাধু প্রকৃতির মহৎ ব্যক্তির সেবা ও পরিচর্য্যার দ্বারা সৎপুত্র লাভের জন্য অনুমতি দেওয়া হ'ত বা এখনও হয় এটা প্রত্যক্ষ সুপ্রজনন বিধির অন্তর্ভুক্ত!

আপনারা শুনে হয় ত আশ্চর্য্য হবেন যে, শতকরা পঁচিশ-জন নারীর নিঃসন্তান অবস্থার জন্য দোষী তাদের স্বামীরাই। সুতরাং ছেলেপিলে না হওয়ার জন্য স্ত্রীকে চিকিৎসা করাবার আগে প্রত্যেক চিকিৎসকের উচিত প্রথমে ভাল ক'রে স্বামীকে পরীক্ষা করা।

তারপর গর্ভনিরোধ বা Contraception. এর নানা নির্দ্দোষ উপায় আজকাল উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু গর্ভ-নিরোধের চেয়ে Geroception বা স্বেচ্ছা-সংযমের দ্বারা প্রতিবার গর্ভধারণ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবধান রাখবার চেষ্টা—এটা সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর ও অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় প্রসূতি সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আবশ্যকীয় একটা সময় পায়। সন্তানকেও উপযুক্ত মাতৃস্তন্য দিয়ে লালন করবার শক্তি ও সামর্থ্য প্রসূতির বজায় থাকে, যদি তার গর্ভধারণের মধ্যে একটা উপযুক্ত ব্যবধান সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়। শুধু তাই নয়, গর্ভধারণের এই উপযুক্ত ব্যবধান রক্ষার ফলে গর্ভপাত, অকাল প্রসব বা মৃতবৎসা হবার সম্ভাবনা থাকে না; অথবা ক্ষীণ, দুর্ব্বল, পঙ্গু, অঙ্গহীন রুগ্ন সন্তান প্রসব ক'রে সমাজে দুর্ভাগাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে না। প্রত্যেকবার সন্তানপ্রসবের পর পুনরায় গর্ভধারণের মধ্যে প্রত্যেক মাতার অন্তত তিন-চার বৎসর কাল ব্যবধান পাওয়া একান্ত আবশ্যক।

যে সকল পিতার সন্তানকে উপযুক্ত-ভাবে লালন-পালন ও শিক্ষাদানের সামর্থ্য নেই, তাদের পিতা হবার কোনো অধিকারই নেই। কোনো নিরপরাধ শিশুকেই এই কঠিন ধরণীর বুকে টেনে নিয়ে আসা তাঁদের উচিত নয়। এক্ষেত্রে Contraception বা গর্ভনিরোধের ব্যবস্থা সকল দিক দিয়েই কল্যাণকর। সুস্থ ও অভাবমুক্ত জাতির অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে সম্ভব হতে পারে আজ একমাত্র এই Contraception বা গর্ভনিরোধের উপায় অবলম্বনে।

জগতের লোকসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভারতের জনগণনার হিসাব থেকে যা জানা যায়, তাতে আশঙ্কা হয় যে এইভাবে লোকসংখ্যা বেড়ে চললে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে আর ভারতবাসীর অন্ন ও আশ্রয় মিলবে না। ত্রিবিধ উপায়ে এই অতিরিক্ত লোকসংখ্যা হ্রাস পেতে পারে। এক যুদ্ধের ফলে, দ্বিতীয় সংক্রামক রোগের আক্রমণে, তৃতীয় জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা। জ্ঞানে বিজ্ঞানে অগ্রসর উচ্চশিক্ষিত সুসভ্য য়ুরোপ ঘন ঘন বিরাট যুদ্ধের ফলে তাদের জনসংখ্যার সমতা রক্ষা ক'রে আসছে। ভারতবর্ষ টিকে আছে নানা কঠিন ও সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নরনারী বিনষ্ট হয়ে। আমেরিকা জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে আশ্রয় করেছে।

আমার মনে হয়, কোনো সুস্থপ্রকৃতির স্বাভাবিক বুদ্ধিবিবেচনাযুক্ত মানুষই দেশের অতিরিক্ত লোকসংখ্যা কমাবার জন্য তাদের লড়াইয়ে ধ্বংস বা রোগে বিনষ্ট হওয়াই উপযুক্ত বলে মানতে পারবেন না। আমরা য়ুরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির নামে পুলকে উত্তেজিত হয়ে উঠি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ! সাদাচামড়া মানুষ-গুলোকে আমরা মনে মনে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করি; ওদের নানা গুণের আলোচনায় আনন্দে হয় ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। অবশ্য ওদেশে এমন সব মহামণীষী জন্মেছেন যাদের পায়ে পৃথিবীর মাথা নত হয়ে পড়ে! শেক্স্পীয়র, হাক্স্লে, আইনস্টাইন্, শোপেনহোর, গ্যেটে, ডারউইন, নিউটন—কত নাম করবো! এমন হাজার জ্ঞানী গুণীর সন্ধান পাই আমরা ওদেশে। কিন্তু যখন দেখি দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ বিজ্ঞানকে ওরা মানুষ মারার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে সুরু করেছে, ধ্বংস করছে নিরীহ প্রতিবেশীর সমৃদ্ধ প্রদেশ—সুদৃশ্য নগর, তাদের ধন প্রাণ গৃহ মন্দির—নির্দ্দোষ নিরপরাধ ভাইবোনেদের নৃশংস ভাবে বিনাশ করছে, নিজেদের পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি ও দুর্দ্দমনীয় লোভ চরিতার্থ করবার জন্য—তখন ওদের নির্ব্বোধ ও হতভাগ্য না বলে থাকতে পারিনে!

য়ুরোপ যখন এইভাবে পরস্পরকে পশুর মত হত্যা

করতে ব্যাপৃত, তখন আমরা এই দীনহীন ভারতবাসীরা ভীরু নিরুপায়ের মত দলে দলে রোগের কবলে প্রাণ হারাচ্ছি। কেমন ক'রে বেঁচে থাকতে হয় আমরা তা জানিনে! কেমন ক'রে জীবন-উপভোগ করতে হয় তাও আমাদের অজ্ঞাত। আমরা কাউকে কিছু দিতেও পারিনি—নিতেও পারিনি। ত্যাগেও অক্ষম, ভোগেও অশক্ত! আমার আজকের বক্তব্য অবশ্য এ নয় যে, মানুষ কি ভাবে জীবন যাপন করলে সুস্থ ও নীরোগ দেহে দীর্ঘায়ু ভোগ করতে পারে;—তবু শ্রীযুক্ত রক্‌ফেলার এ সম্বন্ধে যে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন সেটা এখানে উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে। তিনি বলেছিলেন, যদি সুস্থদেহে শতায়ু হ'য়ে বেঁচে থাকতে চাও তাহ'লে মিতাহারী হও, পর্য্যাপ্ত নিদ্রা যাও, লঘু ব্যায়াম অভ্যাস করো এবং কখনো কোনো মানসিক কষ্ট বা উৎকণ্ঠাকে প্রশ্রয় দিও না।

দেশের লোকসংখ্যা একটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বর্ত্তমানে প্রত্যেক আধুনিক সুসভ্য জাতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কার্য্যকরী উপায়ের আলোচনা ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করব।

গর্ভনিরোধ অথবা গর্ভধারণের মধ্যে দীর্ঘ-ব্যবধান রক্ষা যে স্ত্রীসহবাস সম্পূর্ণ বর্জ্জনের দ্বারা অনায়াসে সম্ভব হ'তে পারে এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কোন পক্ষের সংযমের অভাব থাকলে অন্তত ঋতুকালের পর তিন সপ্তাহ সহবাস বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। অথবা সহবাস কালে এমনভাবে সতর্ক থাকা উচিত যাতে রেতঃপাত জরায়ুমুখে না হ'য়ে বাইরে হয়। এ ব্যবস্থাও যেখানে দুঃসাধ্য বলে মনে হবে সে স্থলে পেসারী বা কোন রসায়নিক পদার্থের সাহায্য নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত স্বামীরা স্বার্থপরের মত এ বিষয়ে একেবারেই দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত অসাবধান।

স্ত্রীসহবাস সম্পূর্ণ বর্জ্জন ক'রে বিবাহিত ব্যক্তিদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করবার উপদেশ আমি দিতে চাই না। সেটা দেবেন মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষেরা—যাঁরা গর্ভনিরোধের কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করাকে পাপাচরণ বলে মনে করেন। ঋতুকালের অব্যবহিত পরের দু-তিন সপ্তাহ বাদ দিয়ে স্ত্রীসহবাস করা অনেকটা নিরাপদ। এটা বহুকাল থেকে সকলেই জানেন এবং অনেকেই এ নিয়ম পালন করেন। কিন্তু কিছুদিন হ'ল এ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে যে 'নিরাপদ সময়' বলে যথার্থ কিছু নেই। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এটা কার্য্যকরী হতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে এ সময় সহবাসের ফলে নিশ্চিত গর্ভসঞ্চার হবে না—এ কথা জোর ক'রে বলা চলে না। তারপর দ্বিতীয় পন্থাই—বাইরে বীর্য্যপাতের ব্যবস্থা। এটা সকল স্বামীর পক্ষে সহজসাধ্য নয়। মাত্র অল্প কয়েকজনই এ বিষয়ে দক্ষতার দাবী করতে পারে। তা ছাড়া এটা নেহাৎ একপক্ষের খেলা হয়ে পড়ে। স্ত্রী এরূপ স্বামীসহবাসে তৃপ্ত হতে পারে না। ফলে শীঘ্রই তার মেজাজ হয়ে ওঠে রুক্ষ এবং শেষ পর্য্যন্ত স্নায়ুবিকারে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। রাসায়নিক পদার্থের সাহায্য নেওয়া সম্বন্ধে মুস্কিল হ'চ্ছে এই যে, বাজারে হরেক রকমের জিনিষ বেরিয়েছে এবং তার মধ্যে বেশীর ভাগই কার্য্যকরী নয়, সুতরাং ওটা একেবারেই নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। অতএব এখন বাকী রইল হাতে মাত্র দুটি উপায়, পেসারী ও কন্‌ডোম। মেয়েদের জন্য পেসারী ও পুরুষদের জন্য কণ্ডোম বা ক্যাপ। কিন্তু এও বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, ক্যাপ ফেটে গিয়ে বহুক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। অবশ্য সেজন্য হয় ত কতকটা দায়ী উত্তেজিত স্বামীর গোয়ার্ত্তুমি, নয় ত সস্তার খেলো জিনিস ব্যবহার বা একই ক্যাপ একাধিকবার ব্যবহার করা। এছাড়া এই রবার আচ্ছাদন ব্যবহার করার ফলে আর একটা অসুবিধা হয় এই যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই অঙ্গের প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ ঘটে না, কাজেই সঙ্গমসুখের কতকটা হানি হয়ই। তবে ওরই মধ্যে রবার পেসারী যদি ঠিকভাবে লাগানো যায় তা হ'লে সহবাস অনেকটা নিরঙ্কুশ হ'তে পারে। কিন্তু দেখতে হবে যে, পেসারী দ্বারা জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়েছে কি-না। এইখানেই জন্মনিরোধবিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কারণ, একমাত্র তারাই এ সব ব্যবহার করা সম্বন্ধে শিক্ষা, উপদেশ ও পরামর্শ দিতে সক্ষম।

উপসংহারে আমি শ্রীযুক্তা মেরী স্টোপ্‌স্ বিবাহিত দম্পতির যৌন-স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধিনিয়ম নিবদ্ধ ক'রে দিয়েছেন তারই কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করতে চাই।

১। সুস্থ প্রকৃতির সাধারণ যুবকযুবতীর পক্ষে স্বাভাবিক সহবাস স্বাস্থ্যকর।

২। মানসিক চরিতার্থতা বা আত্মতৃপ্তি এবং প্রেমানুরাগজনিত শৃঙ্গাররসোপভোগ ছাড়া সহবাসের দ্বারা দ্বিবিধ দৈহিক প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়, যথা—সৃষ্টিরক্ষা বা নবজীবোৎপাদন অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে প্রথম ভ্রূণের সঞ্চার এবং সঙ্গমফলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দৈহিক পুষ্টি সাধন।

৩। সঙ্গমের যে দুটি প্রধান বা বিশেষ কার্য্য সম্পাদন তা পরস্পর সংযুক্ত বা একাত্ম হ'লেও প্রয়োজন-বোধে বিভক্ত ক'রে নেওয়া চলে।

৪। সঙ্গমফলে যেখানে সন্তানোৎপাদনের সম্ভাবনা অনিবার্য্য সেখানে সহবাস পালনে এমন সংযম থাকা উচিত, যার প্রধান লক্ষ্য হবে মাতা ও ভাবী সন্তান উভয়ের পক্ষেই যা শুভ ও কল্যাণকর।

৫। প্রথম ও দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের মধ্যে এমন একটা দীর্ঘ অবকাশ বা সময়ের ব্যবধান থাকা দরকার যেটা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যক্তিগত মঙ্গলেচ্ছার অনুকূল।

৬। সুস্থ সবল ও সমর্থ যুবকযুবতীর পক্ষে সঙ্গম ফলে সন্তানোৎপাদন বন্ধ রাখা, অথবা গর্ভধারণের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান রক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে জন্মনিরোধের উপযোগী বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

এরপর আমার মনে হয়, শুধু এই কথা বললেই যথেষ্ট যে, বিবাহিত জীবনের শান্তি ও সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে কেবল মাত্র এর দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার দিকটাতেই লক্ষ্য রাখলে চলবে না, মানসিক উৎকর্ষ ও আত্মিক তৃপ্তির দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। নারীকে কেবল মাত্র গৃহের আসবাব-স্বরূপ বা নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও কামনা চরিতার্থ করবার যন্ত্রস্বরূপ মনে করলে চলবে না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে স্ত্রী তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমার জীবনের সকল কার্য্যের সুযোগ্যা সঙ্গিনী। তবেই সুসন্তান লাভের সৌভাগ্য হতে পারে।

ব্যথার পূজা

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

তরুশীর্ষে শিহরণ কম্পমান বিপুল বনানী
দোলাইছে ধরণীরে মৃদুচ্ছন্দে মধু সমীরণ—
'শরৎ আসিল পুনঃ' এই বার্ত্তা করে কানাকানি
যেন কার আবাহনে হিল্লোলিছে দূরে বেণুবন।

কাশ-পলাশের বনে শাল পিয়ালের রূপশোভা
শ্রীহীন গ্রামেরে যেন দিল রূপ সহজ শোভায়—
গ্রামে ছিল হাসি গান রূপ রস প্রাণ মনোলোভা
সে প্রাণ চলিয়া গেল—কাটে দিন বিফল আশায়।

এখনো পল্লীরে ঘেরি বেজে ওঠে সন্ধ্যার আরতি
গলায় আঁচল দিয়া জ্বালে বধূ সাঁঝের প্রদীপ—
সুদূর তাহার আশা বুঝি আজ হবে ফলবতী
তাই সে জাগিয়া রয় মনঃকুঞ্জে ফুটাইয়া নীপ।

শরৎ আসিল পুনঃ হাসে বধূ চিরন্তনী প্রিয়া—
বুকের ব্যাকুল বন প্রিয়তরে উঠিছে ব্যথিয়া।

কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীদিলীপকুমার রায়

তাল—চতুর্মাত্রিক ছন্দ—কার্ফার ঠেকায় গেয়।

উধাও

(গান)

অকূলে সদাই চলো ভাই ছুটে যাই,
ভালোবেসে বাঁশি-রেশে ডাকে যে সে ঃ "ভয় নাই"

(কোরাস)

ধাও প্রাণ, গাও গান বরদান এই চাই
কূল ছাড়ি' যেন তারি অভিসারী তরী বাই
ধাও প্রাণ···গাও গান···ছুটে যাই···তারি ঠাঁই

রঙিন মেলায় বাসনায় উছলি'
শুনি হায় আলেয়ায় ধ্রুবতারা মুরলী
ধাও প্রাণ···ইত্যাদি

অপার-বিজয় বরাভয় স্বনিল
হৃদি-তারে ঝংকারে সে-রাগিণী রণিল।
ধাও প্রাণ···ইত্যাদি

উধাও ধাও, নাও বাও, প্রাণ গাও গান, ছুটে যাই তারি ঠাঁই।

+ ০ + ০ +
II সা রা গা মা | পা -া সা সা | ধা -া মা ধা | পা -া পা পা | পধপপা মা গা মা
অ কূ লে স দা ই চ লো ভা ই ছু টে যা ই ভা লো বে সে বাঁ শি

০ + ০ +
মপমমা গা রা গা | গপমগা রা ধ্া ন্া | সা -া পা পা | প্া প্া ধ্া ন্া
রে শে ডা কে যে সে ভ য় না ই ধা ও প্রা ণ গা ও

০ + ০ +
সা -া গা পা | র্সা নর্সা না ধা | পা -া পক্ষা পা | পধপপা মা গা মা
গা ন ব র দা ন এ ই চা ই কূ ল ছা ড়ি যে ন

শিল্পী—লালা বরদাপ্রসন্ন দাস

অশোক সিংহলে বোধিবৃক্ষের চারা পাঠাইতেছেন

মপমমা গা রা গা | গপমগা রা ধ্া ন্া | সা -া -া -া | ন্সা রগা মগা রসা |
তা রি অ ভি সা রী ত রী বা ই - - ধা - - -ও

ন্সা রগা পা -া | ক্ষাপা ধমা র্সনা ধপা | ক্ষনা ধক্ষা পা -া | ক্ষক্ষা পপা ধধা পপা |
প্রা - - ণ গা - - -ও গা - - ন ছু - টে -

ক্ষক্ষা মমা গগা -া | রগা মপা গমা পধা | পমা গরা সা -া | II
যা - - ই তা - বি - ঠাঁ - - ই

সা গা রা মা | গা পা ক্ষা ধা | পধা পপা পগা মা | গা -া গা পা |
র ঙি ন মে লা য় বা স না -য় উ ছ লি - শু নি

গপধনা র্সর্সা ধনা ধণপা | পক্ষা পা পধা পধা | গপা গপা পা মা | গা -া পা -া |
তা য় আ লো য়া য় ধ ব তা রা মু র লী - ধা ও

র্সা না ধা পা | ক্ষা গা রা সা | সসা ধ্া গা রা |
"প্রাণ গাও গান……যাই" গাহিয়া এই তান ঃ— ধা - - ও প্রা - - ণ গা - - ও

পপা গা না ধা | ক্ষাধা পা পনা ধা | র্সনা ধা ক্ষাধা পা | ক্ষা ক্ষাধা পা মপা |
গা - - ন ছু - টে - যা - - ই তা - রি -

গা গমা রা রগা | সরা রগা গক্ষা ক্ষাপা | পধা ধনা র্সনা ধনা | পধা পক্ষা গক্ষা পধা |
ঠাঁ - - - - - - - - - - - - - - -

নধা পক্ষা পা -া | II
- - ই -

সা সা সা সা | সরা সসা ন্া ধ্ন্া | প্া ন্া সা রা | গা সা সা সা |
অ পা র বি জয়্ - ব রা ভ য় স্ব নি ল - হৃ দি

সধ্া রসা গরা মপা | পগা মপা নধা না | র্সা নর্সা ধা পা | ধগা -া পা -া |
তা রে ঝ ঙ্ কা রে সে রা গি ণী র ণি ল - ধা ও

\+ °
ন্‌ন্‌া ররা গগা পা | গগা পপা ধধা ননা |
"প্রাণ গাও গান···বাই" গাহিয়া এই তান :— উ - - - ধা - - ও -

\+ ° + °
পপা ধধা পপা র্সর্সা | ননা ধধা পপা -া | র্সনা ধনা পা -া | ধপা হ্মপা গা -া |
না - - - - - ও - বা - ও - প্রা - - ণ

\+ ° + °
রগা মপা ধণা ধপা | মগা রসা ন্‌া -া | ন্‌া রা গা পা | গপা ধনা র্সা -া |
গা - - -ও গা - - ন ছু - টে - যা - ই -

\+ °
র্সা ধা পা গা | পমা গরা সা -া II II
তা - রি - ঠা - ই -

এ গানটি গ্রামোফোনে গাওয়া হয়েছে ডুয়েটে—শ্রীমতী উমা বসু গেয়েছেন আমার সঙ্গে—নানা তানও দিয়েছেন আলাদা। এ গানটির মূল সুর নেওয়া হয়েছে একটি রুষ গান থেকে—যে গানটি শিখেছিলাম আমি শ্রীমতী ধর্মবীরের কাছে—"ভূস্বর্গ চঞ্চলে" লিখেছি একথা। কিন্তু এ গানের তানাদি সবই নূতন ভঙ্গিতে প্রযুক্ত হয়েছে সেইটেই লক্ষণীয়। শ্রীমতী উমা বসুর কণ্ঠে এ গানটির মিড় ঢুল্‌কি চাল প্রভৃতি যেভাবে উঠেছে গ্রামোফোনে, সেই ঢঙই হ'ল এ গানটির শ্রেষ্ঠ ঢঙ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত আমার "গাঙ্গীতিকী" পুস্তকে মূল গানটি দ্রষ্টব্য।

ইতি—সুরকার

শরত-সখী

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ

আসে জোয়ারের জল্‌ বেয়ে নবীন্‌ নেয়ে
দেখে ঘোম্‌টার ফাঁকে হাসে তন্বী মেয়ে।
হাসে জলদের ফাঁক্‌ দিয়ে শরত-আলো
অই অন্বী মেয়ের মত হাস্‌ছে ভালো।
তার ঝলমল রূপ করে দীপ্ত দিশি
তার পূর্ণিমা-চাঁদ্‌ করে তৃপ্ত নিশি
তাই তৃপ্তিতে কেয়া-বনে থাম্‌ল' কেকা
মুছে নীপ-বনে বর্ষার অশ্রু-রেখা।

সেথা দাদুরী থামায়ে উঠে দোয়েলের গান
শ্যাম প্রান্তরে বয়ে যায় পুলকের বান।
তারি কল্লোল-রোল্‌ জাগে পল্লী-বাটে
কচি ধান্যের দোল্‌ লাগে সবুজ মাঠে।
দোলে পূর্ণা নদীটি তাই জোয়ার বেয়ে
ভরা যৌবন-ভারে যেন তন্বী মেয়ে।
তারি আঁচ্‌লার হাওয়া লাগে কমল-দলে
তারি চুল্‌ হ'তে ফুল্‌ ঝরে শিউলি-তলে।

তার সৌরভে দূর হ'ল দুঃখ যত
তাই শরতের আলো হাসে সখীর মত।

জঙ্গম

বনফুল

১২

করালীচরণ বক্‌সি নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া কোষ্ঠি-গণনা করিতেছিলেন। সম্মুখে প্রসারিত একটি কাগজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। কাগজটিতে রাশি-চক্রের ছক টোকা। তাহার পাশেই শালপাতার ঠোঙায় কিছু তেলে ভাজা ফুলুরি পড়িয়া রহিয়াছে। বকসি মহাশয়ের কিন্তু ফুলুরির দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি রাশিচক্রটির দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি। বামহস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট রহিয়াছে। পারিপার্শ্বিকের অবস্থা অনেকটা পূর্ব্ববৎ। মদের বোতল এবং ফাটা গেলাস ঠিকই আছে, বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতিও জ্বলিতেছে। আলমারির কপাট দুইটি তেমনিই উন্মুক্ত রহিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে আলমারির অধিকাংশ বইই তক্তপোষের উপর স্তূপীকৃত। ঘরটাতে পুরাতন পুস্তকের গন্ধে, ধূলার গন্ধে, সিগারেটের গন্ধে ও মদের গন্ধে একটা গন্ধ-বৈচিত্র্য হইয়াছে। নূতন আসবাবের মধ্যে একটা নূতন সচিত্র ক্যালেণ্ডার টেবিলের সম্মুখে ঝুলিতেছে। ছবিটি সুন্দর। একটি নয়-দশ বৎসরের সুন্দরী বালিকা কয়েকটি ধপধপে সাদা খরগোসকে কপি পাতা খাওয়াইতেছে। এমন সুন্দর ছবিখানি কিন্তু সুন্দর ভাবে টাঙানো নাই, বাঁকাভাবে কোনক্রমে ঝুলিয়া আছে। একটি সুদীর্ঘ টান মারিয়া বকসি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন এবং একটি পঞ্জিকা খুলিয়া তাহা হইতে কি সব টুকিয়া লইলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। বকসি মহাশয় যে ঘরটিতে বসিয়া-ছিলেন সেই ঘর হইতে ভিতরের দিকে যাইবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। দ্বারটি আলমারির পাশে কোণের দিকে বলিয়া সহসা চোখে পড়ে না। সেই দ্বারপ্রান্তে স্বল্পালোকে একটি ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অস্পষ্ট অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতে লাগিল।

করালীচরণ কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়াই বলিলেন—মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

ছায়ামূর্ত্তি ইহার কোন উত্তর দিল না, বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিল মাত্র। অগ্রসর হইয়া আসাতে তাহার গায়ে আলো পড়িল। আলোকপাত হইলে দেখা গেল, মোস্তাক লোকটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি কিন্তু উলঙ্গ। গায়ে বহুরকম তালি দেওয়া শতছিন্ন একটি কোট রহিয়াছে, আর কিছু নাই। মুখময় গোঁফ দাড়ি, ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত। একটু ঝুঁকিয়া সে হস্তস্থিত একটি অর্দ্ধদগ্ধ বিড়িকে লক্ষ্য করিয়াই আপন মনে কি যেন বকিয়া চলিয়াছিল। বাই নারায়ণ, মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

করালীচরণের এক চক্ষু মোস্তাকের মুখে নিবদ্ধ হইবামাত্র মোস্তাক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল ও তৎক্ষণাৎ মিলিটারি কায়দায় দাঁড়াইয়া স্যালিউট্ করিল। তাহার পর বিড়িটি দেখাইয়া বলিল—জুৎ পাচ্ছি না!

করালীচরণ বলিলেন, জুৎ পাবে কি করে, ও যে নিবে গেছে! সরে এসো ধরিয়ে দিই—

মোস্তাক আবার মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল এবং বিড়িটা মুখে দিয়া মুণ্ডটা আগাইয়া আনিল। বিড়িটি গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে দেখিয়া বকসি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, ও ধরাতে গেলে গোঁফ দাড়িতে আগুন লেগে যাবে। ওটা ফেলে দাও, এই নাও একটা সিগারেট নাও—মোস্তাক অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল। বাই নারায়ণ, দাও তা হ'লে, ভোগালে দেখছি—

বিড়িটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠিতে খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াও বকসি মহাশয় যখন দেখিলেন সেটি ধরিতেছে না তখন তিনি মোস্তাককে বলিলেন—দেখছ ত?

মোস্তাক অত্যন্ত কৌতূহল ভরে দেখিতেছিল।

বলিল, খাসা আগুন।

আগুন ত খাসা, বিড়ি ধরছে কই?

মোস্তাকও সঙ্গে সঙ্গে একমত হইয়া কহিল, জুৎ হচ্ছে না!

মোস্তাকের হাত হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বকসি মহাশয় তখন এঁটো বিড়িটাই মুখে লইয়া টান দিয়া ধরাইয়া দিলেন ও বলিলেন, এই নাও, এইবার শোওগে যাও! কম্বলটা কোথায়?

মোস্তাক জ্বলন্ত বিড়িটা লইয়া স্যালিউট করিয়া আলমারির পাশের সেই দরজাটা দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। কম্বল-সম্বন্ধে কোনরূপ উত্তর দিল না।

বাই নারায়ণ!

বকসি মহাশয় আবার একটি সিগারেট ধরাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কোষ্ঠি-গণনায় মনোনিবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা তিনি রাশিচক্রসমন্বিত কাগজখানা হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব!

তাহার পর সিগারেটটা ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন। মদ্যপান করিতে করিতে সহসা করালীচরণ নিজের দক্ষিণ হস্তটি আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং নিবিষ্টচিত্তে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এক চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন তাঁহার হস্তরেখাগুলির উপর সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া উঠিল। চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল।

আসতে পারি দাদা?

করালীচরণ চমকাইয়া উঠিলেন, প্রসারিত হাতটা উল্টাইয়া এমন ভাবে বদ্ধদ্বারের দিকে চাহিলেন যেন দ্বারে কোন শত্রু হানা দিয়াছে! এক নিশ্বাসে মদটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন—কে?

আমি গ্যান্‌ঢো খুজ্‌বুজ্—

ও, ভনুটুবাবু, আপনি! আসুন আসুন!

বকসি মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ভনুটুর সহিত প্রোটোটাইপও আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং আসিয়াই ভক্তিভরে বকসি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। ভনুটুর আগে হইতেই শেখানো ছিল।

বকসি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—ইনি কে?

ভনুটু বলিল, ইনি হচ্ছেন লক্ষ্মণবাবু, সেই যার ছক সেদিন—

বুঝেছি—বসুন আপনারা।

বকসি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন ও বোতল হইতে পুনরায় গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণবাবু অতিশয় ভয়ে ভয়ে এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে উপবেশন করিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি যেন কোন রহস্যময় মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। ভনুটুও লক্ষ্মণবাবুর পাশে বসিয়া চোখ টিপিয়া কি যেন একটা ইসারা করিল, ভাবটা লক্ষ্মণবাবু যেন ব্যস্ত হইয়া কোন কথা এখন না বলেন। এ ইসারার প্রয়োজন ছিল না, কারণ লক্ষ্মণবাবু এমনই নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন।

করালীচরণ নিঃশেষিতপ্রায় মোমবাতিটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ধীরে ধীরে চুমুকে চুমুকে মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল। ভনুটু একবার সশব্দে গলা খাঁকারি দিল। এই শব্দে বকসি মহাশয় ভনুটুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন ও মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, সর্দ্দি হয়েছে না কি? এই ঠাণ্ডায় বেরিয়েছেনও ত!

ভনুটু বলিল, লক্ষ্মণবাবু না-ছোড়, তা ছাড়া আপনার এখানে আসার কোন উপলক্ষ্যই ত আমি ছাড়ি না জানেন।

করালীচরণ মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, ওঁদের দুজনেরই রাশিচক্র মিলিয়ে দেখলাম, মিল হয় নি—অসম্ভব।

লক্ষ্মণবাবুর মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

ভনুটু বলিল, গভীর গাড্ডায় ফেললেন দেখছি!

করালীচরণ আর একটি সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, গাড্ডা আবার কি! মনের মিল যখন হয়েছে তখন সেইটেই আসল মিল! লাগান আপনি, কুষ্টির মিল না-ই বা হল!

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বকসি মহাশয় হাসিতে লাগিলেন। লাগিয়ে দিন!

ভনুটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, পারবেন?

লক্ষ্মণবাবু বিমর্ষভাবে একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না।

ভনুটু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, গভীর গাড্ডা, বুঝেছি!

করালীচরণ আবার ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, আলো কিন্তু আর বেশীক্ষণ টিকবে না। ভনুটুবাবু, ওই বইগুলোর ওদিকে আর একটা মোমবাতি আছে দেখুন ত, এটা ত গেল।

ভন্টু মোমবাতির সন্ধান করিতে করিতে বলিল, এত বই সব বার করেছেন কেন আজ ?

নানারকমে বেয়ে চেয়ে দেখছিলাম—কুষ্ঠি দুখানা যদি মেলাতে পারি, দেখ্‌লাম—ও অসম্ভব।

ভন্টু মোমবাতিটি লইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ মোমবাতি ধরাইয়া সেটি যথাস্থানে স্থাপন করিল। লক্ষ্মণবাবু নীরবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার ম্রিয়মান মুখের দিকে চাহিয়া করালীচরণ বলিলেন, দেখুন, জ্যোতিষচর্চ্চা করি বটে, কিন্তু এটা আমি আপনাকে বলছি, মনের মিলই হ'ল শ্রেষ্ঠ মিল। সে দিকে যদি আপনার কোন গলদ না থাকে, লাগিয়ে দিন দুর্গা ব'লে—

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং টং করি দশটা বাজিল। লক্ষ্মণবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

অনেক রাত হয়ে গেল, এবার আমি উঠি। ভন্টুবাবু, আপনি যদি বসতে চান ত বসুন, আমার জানেন ত—

ভন্টু বলিল, হ্যাঁ আপনি যান, কাল আপনার ওখানে যাব। আপনি দ'কচে যাবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে!

বকসি মহাশয়ের পদধূলি লইয়া লক্ষ্মণবাবু বিদায় লইলেন।

লক্ষ্মণবাবু চলিয়া গেলে ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম বুঝলেন ?

বোঝাবুঝি আর কি আছে এতে! ও মেয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ জ্যোতিষ মতে অসিদ্ধ। তা ছাড়া ও মেয়ের কপালে দুঃখ আছে—

মানে, একাধিক পুরুষের সংশ্রবে আসতে হবে ওকে! শুধু আসতে হবে নয়, অনেক দুঃখ ভোগও করতে হবে! একাধিক পুরুষের সংশ্রবে এলে তাকে দুঃখ ভোগ করতে হবে বই-কি!

ভন্টু একটু ঝুঁকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভীমজাল তা হ'লে বলুন! প্রোটোটাইপ অতি নিরীহ লোক! মেয়েটি দেখতে ভাল, গান-টান গায় শুনেছি, লেখাপড়াও কিছু জানে, গোবেচারি প্রোটোটাইপ একেবারে লদকে গেছে!

করালীচরণ কর্কশ কণ্ঠে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহার পর বলিলেন, শুক্রের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

ভন্টু বলিল, এ যে সঙীন শুক্র দেখছি! বেচারি প্রোটোটাইপের মুণ্ডুটি একেবারে হাড়কাঠে গলিয়ে দিয়েছে।

করালীচরণ শালপাতার ঠোঙা হইতে একটা ফুলুরি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বিয়ের কথাবার্ত্তা কি অগ্রসর হয়েছে ?

পাগল! বাঘ অরিজিন্যাল বসে আছে—খুন ক'রে ফেলবে তা হ'লে! ছোকরা গোপনে গোপনে প্রেমে পড়েছে! ওর নিজের কুষ্ঠিতে খুব বিশ্বাস, মেয়েটিরও নাকি খুব বিশ্বাস! মেয়েটিই না কি নিজের কুষ্ঠির ছক প্রোটোটাইপকে দিয়েছে! বলেছে যে কুষ্ঠির মিল যদি হয় তা হ'লে সে তার দাদাকে বলবে যেন অরিজিন্যালের কাছে কথাটা পাড়েন—

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, প্রণয়-ব্যাপারে এমন হিসেব ক'রে চলার কথা আগে কখনও শুনিনি!

ভন্টু বলিল, প্রোটোটাইপের কাণ্ডকারখানাই ফ্রগিশ!

করালীচরণ সহসা কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর আবার একটা ফুলুরি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ভন্টুবাবু, শ' পাঁচেক টাকা কি ক'রে সংগ্রহ করতে পারি বলুন ত!

কেন, এত টাকার কি দরকার এখন ?

দ্রাবিড় যাব।

দ্রাবিড় ?

হ্যাঁ।

কেন ?

শুনেছি, দ্রাবিড়ে একজন জ্যোতিষী আছেন তিনি হস্তরেখা থেকে জন্মনির্ণয় করতে পারেন। তাঁর কাছে গিয়ে এ বিদ্যেটা আমি আয়ত্ত করতে চাই। যেমন করে হোক্—

হঠাৎ এ খেয়াল চাপলো কেন ?

বাই নারায়ণ, খেয়াল বলছেন একে! দুনিয়ার লোকের কুষ্ঠি গুণছি, ভবিষ্যৎ বলছি অথচ নিজের সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমার নিজের জন্মসময়, এমন কি, জন্ম-তারিখটা পর্য্যন্ত আমার জানা নেই। হস্তরেখা থেকে যদি জন্মসময় নির্ণয় করতে পারি তা হ'লে নিজের কুষ্ঠিটা একবার দেখি ভাল করে—

আর একটি ফুলুরি তিনি মুখের মধ্যে দিলেন।

ভন্টু নির্ব্বাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আপনি নিজে যা রোজকার করেন তার থেকেই তো অনায়াসে পাঁচশ'

টাকা জমে যেতে পারে, অবশ্য যদি একটু বুঝে সুঝে খরচপত্র করেন।

করালীচরণ ভন্টুর দুটি হাত ধরিয়া সাগ্রহে বলিলেন, দিন না আপনি জমিয়ে! আমার যা কিছু উপার্জ্জন সব আমি আপনার হাতে দেব, আপনি যা আমাকে খরচের জন্যে দেবেন তাইতেই আমি চালিয়ে নেব। কিন্তু আমার কাছে টাকা থাকলে আমি খরচ না করে পারব না। নেবেন ভার?

একচক্ষু ভন্টুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া করালীচরণ একদৃষ্টে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

ভন্টু কহিল, এ আর অসম্ভব কি। আপনি যা দেবেন, একটা পাশ বুক করবেন।

কিন্তু আপনার নামে। আমি নিজেকে একটুও বিশ্বাস করি না, বাই নারায়ণ!

ভন্টু হাসিয়া বলিল, বেশ ত, এ আর বেশী কথা কি—

তা হ'লে আসুন, আজ থেকেই সুরু করুন।

করালীচরণ একটা পাঁজির ভিতর হইতে দুইখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন ও বলিলেন, এই এখন আমার যথাসর্ব্বস্ব। কিছু মাল আর সিগারেট কিনে দিয়ে বাকিটা আপনি নিয়ে যান।

বেশ, কাল নিয়ে যাব এসে।

না, না, না—এখুনি নিয়ে যান আপনি, নিয়ে পালান!

করালীচরণের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বেশ দিন।

ভন্টু নোট দুইটি লইয়া পকেটে পুরিল।

আলমারির কোণের দ্বারপ্রান্তে আবার সেই ছায়া মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল ও বিড় বিড় করিয়া বকিতে সুরু করিল।

ভন্টু চমকাইয়া উঠিল।

আর কেউ ঘরে আছে না কি!

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, ও মোস্তাক।

মোস্তাক? মোস্তাক কে!

ও আমার একজন বন্ধু, মাঝে মাঝে আসে। মোস্তাক এদিকে এসো—

মোস্তাক অগ্রসর হইয়া আসিল ও আসিয়াই মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট করিল। এই উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখিয়া ভন্টু ত বিস্ময়ে নির্ব্বাক।

বকসি মহাশয় বলিলেন, উঠে এলে কেন মোস্তাক, বিড়ি আবার নিভে গেছে না কি?

জুৎ হচ্ছে না!

দাও আবার ধরিয়ে দিই, কই বিড়ি?

মোস্তাক কিছুক্ষণ বকসি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, হোথা চলে গেছে।

তা হ'লে একটা সিগারেট নাও।

সিগারেট খাইতে মোস্তাকের ঘোর আপত্তি, সে ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল। তাহার পর বলিল, ছবি দেখতে এলাম—

ছবি? ও, তুমি একটা ছবি এনেছ বটে—ভুলেই গেছি! এই নাও দেখ।

বকসি মহাশয় উঠিয়া ক্যালেণ্ডারের ছবিখানি পাড়িয়া তাহার হাতে দিলেন। মোস্তাক টেবিলের উপর ছবিখানি প্রসারিত করিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটিতে শিশুসুলভ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চাহিয়া থাকিয়া মোস্তাক বালিকাটির মুখের উপর ময়লা আঙুলটা রাখিয়া বলিল, এ কে?

ও খুকি।

এগুলো কি?

খরগোস।

এগুলো কি?

কপি পাতা, খরগোসরা খাচ্ছে।

খুকি—খরগোস—খাচ্ছে—সব 'খ'।

মোস্তাক এমন একটা মুখভাব করিয়া করালীচরণের দিকে তাকাইল যেন সে ছবির মধ্যে 'খ'এর প্রাধান্য আবিষ্কার করিয়া একটা মস্ত কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে।

করালীচরণ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিলেন, বাঃ ঠিক বলেছ, যাও এবার শুয়ে পড় গিয়ে—যাও। ছবিটা নিয়েই যাও।

সুন্দর ছবিখানা মুড়িয়া মোস্তাক সেটাকে বগলদাবা করিল, আবার স্যালিউট করিল এবং ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কিছু দূর গিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্যালিউট করিয়া প্রশ্ন করিল—কেন?

বাই নারায়ণ, কি কেন ?

খুকি আর খরগোস একসঙ্গে কেন ?

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিবার ভান করিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, প্র্যাকটিস করছে। খুকি যখন বড় হবে, খরগোসগুলোও বড় হবে ! বড় হলে খরগোসগুলোর চেহারা কিন্তু মানুষের মত হয়ে যাবে।

মানুষ-খরগোসকে যাতে তখন ভাল করে পোষ মানাতে পারে তারই রিহার্স্যাল দিচ্ছে আর কি—

এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্যালিউট করিয়া মোস্তাক চলিয়া গেল। করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, কত অল্পে সন্তুষ্ট হয় ও।

ভন্টু বলিল—এ কে বকসি মশায় ?

বললাম ত আমার একজন বন্ধু। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তাম, এফ-এ পর্য্যন্ত পড়েছিল ও, তারপর মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে চলে যায়। হঠাৎ একদিন দেখি কোলকাতার রাস্তায় এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজ-খবর নিয়ে শুনলাম, পাগল হয়ে যাওয়াতে ওর চাকরি যায়। আত্মীয়স্বজনরা কে কোথায় আছেন, আছেন কি-না ভগবান জানেন। আমি রাস্তায় দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে আসি, মাঝে মাঝে নিজেও আসে ও। আজ বিকেলে হঠাৎ ওই ক্যালেণ্ডারের ছবিখানা নিয়ে এসে হাজির ! বদ্ধ পাগল—

বকসি মহাশয় আবার খানিকটা মদ গ্লাসে ঢালিলেন ও বোতলটা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, ভন্টুবাবু, রাত হয়ে গেলে মাল পাবেন না, আমার এদিকে ফুরিয়েছে !

ভন্টু পশ্চাৎ হইতে ওষ্ঠভঙ্গী করিয়া তাহাকে ভ্যাঙাইল ও তৎপরে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলিল, এই যে যাই।

ভন্টু বাহির হইয়া বাইকে সওয়ার হইল। লক্ষ্মণবাবু বাইকটি নিখুঁতভাবে সারাইয়া দিয়াছিলেন।

১৩

শঙ্কর একমনে আপনার ঘরে বসিয়া ইতিহাস পাঠ করিতেছিল। এত একাগ্রচিত্তে সে তাহার নিজের পাঠ্য-পুস্তকও কোনদিন পাঠ করে নাই। সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র। মডার্ন ইয়োরোপ তাহার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত নহে। আগামী কল্য ফিজিক্স প্র্যাকটিকাল' ক্লাস আরম্ভ হইবে, অধ্যাপক মহাশয় সে সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনাও করিয়া আসিতে বলিয়াছেন। শঙ্করের সেদিকে কিন্তু খেয়াল নাই। মডার্ন ইয়োরোপের এই বইখানা সম্ভব হইলে আজ রাত্রের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিতে হইবে। জ্ঞান-পিপাসা নয়, রিণিকে তাক্ লাগাইয়া দিতে হইবে। রিণিকে দেখাইতে হইবে যে, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিতই যে কেবল ইতিহাসে কৃতবিদ্য তাহা নয়, শঙ্করও ইতিহাসের কিছু কিছু জানে—যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্র। গতকল্য রিণির জন্মতিথি উৎসবে সে গিয়াছিল। মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, রিণির পড়াশোনায় সাহায্য করিতে পারে এমন একটি ভাল ছেলে শঙ্কর জোগাড় করিয়া দেয় তাহা হইলে বড় উপকার হয়। প্রফেসার মিত্র নিজের পড়াশোনা লইয়া এত তন্ময় থাকেন যে, এসব দিকে, বস্তুত সংসারের কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, আর কারো সঙ্গে ত আমার তেমন আলাপ নেই, আমাকে দিয়ে যদি চলে বলুন—

আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত মিষ্টিদিদি বলিয়াছিলেন, ওমা, তাহলে ত সবচেয়ে ভাল হয় ! পারবেন আপনি ?

পারতে পারি।

সোনাদিদি সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে ও একবার মিষ্টিদিদির দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, একেই বলে ভাল ছেলে ! সায়েন্স কোর্সের স্টুডেণ্ট আর্ট কোর্সের মেয়েকে পড়াবার ভার নিতে চায়। উঃ, আপনাদের মাথার ভেতরটাতে কি আছে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যি বলছি—

উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছিল, চেষ্টা করলে সব জিনিসই সবাই করতে পারে। আপনি কিম্বা মিষ্টিদিদি যদি চেষ্টা করেন মিস মিত্রকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন। মিষ্টিদিদি ত পারেনই, বি-এ পাশ করেছেন উনি—

মিষ্টিদিদি হাস্যতরল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, রক্ষে করুন, আবার ওই সব। ওসব আপনাদের মতন ভাল ছেলেদেরই পোষায় ! সেদিন রিণি কি একটা সামান্য জিনিস জিগ্যেস করেছিল রোমান হিষ্ট্রির, কিছুতে মনে এলো না ছাই। ভাগ্যে অপূর্ব্ববাবু ছিলেন, তিনি শেষকালে আমায় উদ্ধার করেন !

অপূর্ব্ববাবু আসেন না কি রোজ ?

এ প্রশ্নটি অনিবার্য্যভাবে শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উত্তরে সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিলেন। মিষ্টিদিদিও রহস্যময় হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ, অপূর্ব্ববাবু আসেন প্রায়ই। তাঁকে বললে তিনি অবশ্য রিণিকে পড়াতে রাজি হয়ে যাবেন, কিন্তু সেটা তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়। তিনি বেলাকে সন্ধেবেলা গান শেখান, আরও একজায়গায় কোথায় পড়ান না কি —

গম্ভীর মুখ করিয়া সোনাদি বলিয়াছিলেন, না, সেটা ঠিক হয় না।

শঙ্কর প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে সে রিণিকে পড়াইবে। সেইদিনই রিণিদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া শঙ্কর প্রফেসার গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সাহিত্যরসিক বলিয়া প্রফেসার গুপ্ত শঙ্করের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত শঙ্করের লেখা 'ট্রাজেডি ও কমেডি' শীর্ষক প্রবন্ধটি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং তিনি নিজেই আসিয়া প্রবন্ধের লেখক শঙ্করসেবক রায়ের সহিত আলাপ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই আলাপের পর হইতে শঙ্করও দুই-একবার তাঁহার বাসায় গিয়াছে। প্রফেসার গুপ্তের সহিত আলাপ করিয়া সুখ হয়। লোকটি মার্জ্জিতরুচি ও বিদ্বান। শুধু বিলাত নয়, ইয়োরোপের অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে, প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু আলাপ করিলে মনে হয় ঠিক যেন সমবয়সী। শঙ্করের সহিত বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর রিণিদের বাড়ি হইতে সোজা প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়া ইতিহাসের এই বহিখানি আউট বুক হিসাবে পড়িবে বলিয়া চাহিয়া আনিয়াছে এবং তাহাই এখন তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। বি-এ কোর্সের ইতিহাসের বহিগুলি তাহাকে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া ফেলিতে হইবে। ইংরেজীটা তাহার মোটামুটি জানাই আছে। সংস্কৃতটা একটু-আধটু দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন, কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। সংস্কৃতে সে খুব ভাল ছেলে ছিল। ফিলজফি? ফিলজফিতে রিণিকে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে না। যদিই বা হয় তাহা আয়ত্ত করাও শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। অন্তরের নিভৃত প্রদেশে অবনতমুখী রিণি বসিয়া রহিয়াছে। সেই লাজনম্রা, স্বল্পভাষিণী, শ্রীমণ্ডিতা তন্বীকে শুনাইয়া শুনাইয়া তন্ময় শঙ্কর পড়িয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের কঠিন নাম ও তারিখগুলা সঙ্গীতের মত মনে হইতেছে।

হঠাৎ শঙ্করের তপোভঙ্গ হইল।

নীচে কে তাহাকে ডাকিতেছে।

চাকরটা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল যে ভন্টুবাবু তাঁহার সহিত দেখা করিতে চান, নীচে কমন রুমে বসিয়া আছেন।

শঙ্কর নামিয়া গেল। কমন রুমে আর কেহ ছিল না, ভন্টু একাই বসিয়াছিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল—কি রে, এমন সময় হঠাৎ ?

ভীমজাল এবং গভীর গাড্ডা টু দি পাওয়ার থ্রি। মেজকাকা আবার সরেছে, বৌদিদির খুব জ্বর, ট্যাঁক গড়ের মাঠ—

শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শঙ্করের বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া ওষ্ঠবিকৃতি করিয়া ভন্টু বলিল, অমন করে চেয়ে আছিস কেন গাড়োল! যা হবার হবে! এক কাপ চা খাওয়া ত আগে—

শঙ্কর চাকরকে ডাকিয়া দোকান হইতে চা আনাইয়া দিল।

চা পান করিতে করিতে ভন্টু বলিল, কানা করালীর কাছে যাবি ?

কানা করালী কে ?

সেই জ্যোতিষী, সেই যে তোর কুষ্ঠি দেখেছিল একদিন, এত ভুলিস্ তুই—

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—

চল্ না যাই সেখানে। তোর কুষ্ঠিটা গোণাবি বলেছিলি ত একদিন!

শঙ্করের তখন যাহা মনের অবস্থা তাহাতে নিজের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাকে হিষ্ট্রির পড়া করিতে হইবে।

সুতরাং সে বলিল, এখন যাওয়া অসম্ভব।

ভন্টু চা টুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, আজ কনসেশন ডে ছিল, সস্তায় হ'ত। আজ বুধবার ত ?

কনসেশন ডে, মানে ?

মানে বুধবার দিন তার হাফ ফি। অন্য দিন দশটাকা নেয়, আজ পাঁচ টাকা।

তাই নাকি, বেশ ত পাঁচটা টাকা দিচ্ছি তোকে, তুই গুণিয়ে নিয়ে আয়—সব ঠিক ঠিক বলে দেবে ত ?

ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভন্টু বলিল, বলে দেবে মানে ? এরকম নির্ভুল গণনা আর কোথাও পাবি না। করালী একেবারে চাম ল—দ্।

তুই তা হ'লে গুণিয়ে নিয়ে আয়, আমি টাকা দিচ্ছি তোকে—

শঙ্কর উপরে চলিয়া গেল ও পাঁচটি টাকা আনিয়া ভন্টুকে দিল। টাকা আনিল অবশ্য সে ধার করিয়া। তাহার নিজের কাছে কিছুই ছিল না। রিণির জন্মদিন উপলক্ষে তিনখানা দামী বই কিনিয়া তাহার যাহা কিছু ছিল নিঃশেষ হইয়াছে। টাকা দিয়া সে ভন্টুকে বলিল—ন'টা ত বাজে ; এত রাত্রে তুই বাড়ি না গিয়ে জ্যোতিষীর ওখানে যাবি ? বৌদির জ্বর বলছিলি—

ভন্টু টাকা কয়টি ভিতরদিককার পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল, জ্বর ত বটেই—আমি আর বাড়ি বসে থেকে তার কি করব। যা করবার তা ত করেই এসেছি। করালীর সঙ্গে একটু লদ্‌কালদ্‌কি ক'রে আবার ফিরব এখুনি—

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, মেজকাকা সরেছে কবে ?

কাল সন্ধ্যে থেকে না-পাত্তা !

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

ভন্টু বলিল, একটা দেশলাই আন্ দেখি, বাইকের আলোটা জ্বালতে হবে—

শঙ্কর পাশের ঘর হইতে দিয়াশলাই আনিয়া দিল ও ভন্টুকে আগাইয়া দিবার জন্য তাহার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিল। ভন্টুর বাইকটি গেটের কাছেই ঠেসানো ছিল। ভন্টু পকেট হইতে একটি সরু মোমবাতি ও একটি কাগজের ঠোঙা বাহির করিল। তাহার পর বাতিটি জ্বালাইয়া ঠোঙার ভিতর স্থাপন করিয়া শঙ্করকে বলিল, ধর দিকি, আমি বাইকে চড়ি তারপর আমার হাতে দিস্।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, তোর ল্যাম্প কি হ'ল ?

ভন্টু হাস্যদীপ্ত চক্ষে উত্তর দিল—খুজ্‌বুজ্ !

খুজবুজ মানে ?

মানে, বিক্রমপুর এবং তস্য মানে বেচে ফেলেছি। সংসার চালাতে হবে ত !

ভন্টু বাইকে সওয়ার হইল।

ভন্টুকে বিদায় দিয়া শঙ্কর আবার আসিয়া পড়িতে বসিল।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে।

হস্টেলের সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলেই নিজের নিজের ঘরে খিল দিয়াছে। ষোল নম্বর ঘরের রামকিশোরবাবু খড়ম খট্‌খট্ করিতে করিতে বাথ্‌রুমের দিকে চলিয়াছেন। শঙ্কর নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া তাঁহার গলার-সাঁকি-বাত্তির-করা মূর্ত্তি কল্পনানেত্রে দেখিতেছিল। হাতকাটা ফতুয়া পরা, কানে পৈতা-জড়ানো। রামকিশোরবাবু তিনবার বি-এ ফেল করিয়া চতুর্থবারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রামকিশোরবাবুর খড়মের শব্দ পাইয়া শঙ্কর বুঝিল, এখনই আলো নিবিয়া যাইবে। কারণ আলো নিবিবার ঠিক দশ মিনিট পূর্ব্বে রামকিশোরবাবু খড়ম্ পরিয়া বাথরুম অভিমুখে যান ও ফিরিয়া আসিয়া কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া সশব্দে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া শয়ন করেন—ইহা তাঁহার বাঁধা নিয়ম। রামকিশোরবাবু ফিরিয়া আসিলেন ও বিধিমত হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে নিজের ঘরে গিয়া খিল দিলেন। তখন শঙ্কর ধীরে ধীরে নিজের ঘর হইতে বাহির হইল ও এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কপাটে তালা লাগাইতে লাগিল। ভন্টুর সহিত দেখা হইবার পর কিছুক্ষণ সে ইতিহাস পাঠ করিয়াছিল এবং পুস্তকটার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়াও ফেলিয়াছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ আর সে পড়িতে পারিল না। যে কারণে সে ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই তাহাকে এখন ইতিহাস-পড়া স্থগিত রাখিতে হইল। সে আশা করিয়াছিল, ভন্টু একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কোষ্ঠি গণনার ফলাফল তাহাকে জানাইয়া যাইবে। কিন্তু ভন্টু ত কই আসিল না। এগারোটা প্রায় বাজে। ভন্টু তাহার সম্বন্ধে কি তথ্য আবিষ্কার করিল জানিবার জন্য তাহার মনটা ছটফট করিতেছিল ; ইতিহাস পড়ায়

মন বসিতেছিল না। এতক্ষণ সে রামকিশোরবাবুর শয়নের প্রতীক্ষায় ছিল। রামকিশোরবাবু এই ব্লকের প্রবীণতম ছাত্র এবং 'মনিটার'। অনেক জোগাড় যন্ত্র করিয়া শঙ্কর একটি সিংগ্‌ল্‌-সিটেড্‌ রুম লইয়াছে, সুতরাং বাহিরে যাইতে হইলে তালা লাগাইয়া যাইতে হইবে। এ সময় শঙ্করের ঘরে তালা লাগানো দেখিলে তাহা রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি এড়াইবে না। এ সকল বিষয়ে রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি শ্যেনদৃষ্টি এবং তাঁহার এই শ্যেনদৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া নব-বিবাহিত সুপারিনটেনডেণ্ট মহাশয় (জনশ্রুতি, তিনি রামকিশোরবাবুর সহপাঠী ছিলেন) যখন তখন কলিকাতাস্থ শ্বশুরালয়ে রাত্রিযাপন করিবার সুবিধা পান এবং রামকিশোরবাবুর রিপোর্টকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং রামকিশোরকে ভয় করিয়া চলিতে হয়।

শঙ্কর ঘরে তালা লাগাইতে লাগাইতেই আলো নিভিয়া গেল। অন্ধকারে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। নীচে গিয়া দারোয়ানকে চুপি চুপি কি বলিল। দারোয়ান প্রথমটা একটু আপত্তি করিয়া অবশেষে শঙ্করের পীড়াপীড়িতে রাজি হইল এবং গেট খুলিয়া দিতে দিতে নিম্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল যে সে শঙ্করবাবুর কথা অমান্য করিতে পারে না বলিয়া এই অন্যায় কার্য্যটি করিতেছে কিন্তু এ 'বাত' প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহার 'নোক্‌রি' থাকিবে না। শঙ্কর তাহাকে আশ্বাস দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভন্টুর সহিত আজ রাত্রে তাহার দেখা করিতেই হইবে। হাতে পয়সা ছিল না, সুতরাং হাঁটিয়াই সে চলিল। একা অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে শঙ্কর কখন যে একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। যদিও অন্যমনস্কভাবে ঢুকিয়াছিল কিন্তু ভুল গলিতে সে ঢোকে নাই। এ গলিটা দিয়া গেলেই সোজা সে বেলেঘাটার মোড়ে গিয়া হাজির হইতে পারিবে। অন্যমনস্কভাবে সে চলিতেছিল, সজ্ঞান-ভাবে পথের সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। তাহার সমস্ত অন্তর একাগ্রভাবে যাহার দিকে উন্মুখ হইয়াছিল সে রিণি। লজ্জিতা রিণি, কুণ্ঠিতা রিণি, স্বল্পভাষিণী রিণি, কাব্যানুরাগিণী রিণি, আনতনয়না রিণি, ঈষৎ হাস্যস্নিগ্ধা রিণি, বিরক্ত রিণি, বিপন্ন রিণি—রিণির নানা মূর্ত্তি তাহার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। আনাগোনার আর বিরাম নাই। অপলকদৃষ্টিতে শঙ্কর রিণির সঞ্চরমান নানা মূর্ত্তির দিকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার দেখারও আর বিরাম নাই, সে আর কিছু দেখিতেছে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে রিণিকেই দেখিতেছে, ভাবিতেছে মনে মনে স্পর্শ করিতেছে। তাহারই জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন, তাহারই জন্য সমস্ত সত্তা উন্মুখ, তাহারই জন্য সে টাকা ধার করিয়া ভন্টুকে দিয়াছে এবং তাহার মনের গোপন বাসনাটির ভবিষ্যৎ পরিণতি কোষ্ঠি গণনায় কিছুমাত্র আভাসিত হইয়াছে কি-না তাহাই অবিলম্বে জানিবার জন্য এত রাত্রে হাঁটিয়া সে চলিয়াছে। অথচ এই কয়েক দিন পূর্ব্বেও সে রিণির কথা একবারও ভাবে নাই। দেখা হইলে সহজ শিষ্টতাসঙ্গত আলাপ পরিচয় করিয়াছে, নমস্কারের পরিবর্ত্তে প্রতিনমস্কার করিয়াছে। সহসা এ কি হইয়া গেল! অকারণে সহসা যেমন আকাশের একটা কালো মেঘ সূর্য্য-কিরণ-রঞ্জিত হইয়া মহিমময় হইয়া ওঠে, বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহসা যেমন বিরাট অগ্নিকাণ্ডের গরিমায় শিখায়িত হইয়া ওঠে, শঙ্কর তেমনি সহসা রিণির প্রেমে পড়িয়া আশা-আশঙ্কার তীব্র-মধুর উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া পথ চলিতেছিল।

সহসা তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

একটা খামের চিঠি স-জোরে আসিয়া তাহার গালে লাগিল। রঙীন খামের চিঠি। গলির স্বল্পালোকে সে পড়িয়া দেখিল উপরে লেখা রহিয়াছে স্বর্ণলতা দেবী। ঘাড় ফিরাইতেই তাহার চোখে পড়িল একটি খোলা জানালা। জানালার ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে সবিস্ময়ে দেখিল সেদিনকার সেই লোকটি অর্থাৎ ভন্টু যাহাকে মোমবাতি বলিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছিল তিনি এবং একটি কিশোরী কথা-বার্ত্তা বলিতেছেন। সম্মুখের টেবিলে রক্তজবার মত একটা আলো। শঙ্কর সবিস্ময়ে পত্রখানা লইয়া ভাবিতেছিল কি করা উচিত, পত্রখানা সে মৃন্ময়বাবুকে দিয়া যাইবে কি-না। ওই উন্মুক্ত বাতায়ন পথেই যে পত্রখানা আসিয়াছিল তাহাতে শঙ্করের সন্দেহ ছিল না। কে এই স্বর্ণলতা!

হঠাৎ শঙ্করের কানে গেল সেই কিশোরীটি বলিতেছে, ওটা কি ফেলে দিলে?

মৃন্ময়বাবু বলিলেন, ও একখানা বাজে কাগজ। তোমার রান্না হয়ে গেছে?

ওমা, রান্না ত ভারি! সব শেষ হয়ে গেছে কখন। তোমার রুটির নেচিগুলি করা আছে এখনো বেলা শেকা হয় নি। ঠাকুরপো কখন খেয়ে নিয়েছে!

শঙ্করের মনে হইল মৃন্ময়বাবু একটু যেন রূঢ় স্বরেই প্রশ্ন করিলেন, হঠাৎ এ ঘরে এলে কেন?

ইহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিতে লাগিল, একটা মজার জিনিস দেখাতে এলুম, চুপি চুপি এস এ ঘরে। বেড়াল ছানাটা কেমন গোল হয়ে ফুলে তোমার বিছানার একধারে কেমন চোখটি বুজে বসে আছে, বেচারির শীত করছে বোধ হয়। তোমার মলিদার গলাবন্ধটা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। তুষ্টু তুষ্টু মুখটি বেরিয়ে আছে খালি। দেখবে এসো না, কেমন মজার দেখতে হয়েছে—

শঙ্কর আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। পত্রখানি পকেটে পুরিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল। নিজের তাগিদ ছিলই, তা ছাড়া এমনভাবে লুকাইয়া আড়ি পাতাটা তাহার ভদ্র অন্তঃকরণে ভাল লাগিতেছিল না। পরে চিঠিখানা মৃন্ময়বাবুকে ফিরাইয়া দিলেই চলিবে। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ভনুটুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কলিকাতা শহর ক্রমশ নীরব হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে এক একটা রিক্‌শার টুং টুং শব্দ, দুই-একটা ইতস্তত অপেক্ষমান ফেটিন গাড়ির গাড়োয়ানের আহ্বান অথবা ধাবমান মোটরের আকস্মিক আবির্ভাব ছাড়া চতুর্দ্দিক ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে এক-আধটা পানের দোকানে কদাচিৎ দুই-একজন পুরুষ অথবা নারী দেখা যাইতেছে। কোন বৃহৎ অট্টালিকার গাড়ি-বারান্দার নীচের আলোটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। এই শীতের রাস্তার ফুটপাথের উপর ঘুমন্ত দরিদ্র নর-নারী স্থানে স্থানে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় নানা জিনিস দেখিতে দেখিতে শঙ্কর অবশেষে ভনুটুর বাসায় পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল গভীর নীরবতায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। ওদিককার একটা ঘরে যেন একটু আলো জ্বলিতেছে।

ভনুটু, ভনুটু—শঙ্কর ডাকিতে লাগিল।

অনেক ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শনুটু, ভনুটুর ভাইপো, মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে?

আমি শঙ্কর, ভনুটু কোথায়?

কাকাবাবু এখনও বাড়ি ফেরেন নি।

ইহার পর শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শনুটুই আবার বলিল, এখুনি ফিরবেন বোধ হয় আপনি একটু বসবেন?

বেশ, চল।

বসিবার মত বাহিরের কোন পৃথক ঘর ছিল না। শঙ্করকে একেবারে অন্তঃপুরেই যাইতে হইল। গিয়াই তাহার বৌদিদির সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি শঙ্করের সাড়া পাইয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছেন। জ্বর হওয়াতে মুখখানি থমথম করিতেছে। কিন্তু তাঁহার ঢলঢলে কালো মুখখানি শঙ্করকে দেখিয়াই হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মেঘলা দিনে যেন সহসা এক ঝলক রৌদ্র দেখা দিল। তাম্বুলরঞ্জিত শুষ্ক অধর দুইটি সহসা যেন সজীবতা প্রাপ্ত হইল। শঙ্কর দেখিল, বৌদিদির কালো ডাগর চক্ষু দুইটি জ্বরের উত্তাপে আরও যেন আবেশময় হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া গায়ের ছিন্ন ব্যাপারটি সর্ব্বাঙ্গে জড়াইতে জড়াইতে বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, দেখছো কি শঙ্কর ঠাকুরপো? এত রাত্রে হঠাৎ এলে যে—

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শঙ্কর বলিল, জ্বর হয়েছে না কি?

হ্যাঁ।

ভনুটু এখনও ফেরে নি?

ওষুধ আনছি বলে সেই যে সন্ধ্যে থেকে বেরিয়েছে এখনও ফেরে নি। চেনই তো তাকে, একবার কোথাও বসলে আর ওঠবার নামটি করবে না।

শঙ্কর মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল—ভনুটু ত তাহারই জন্ত জ্যোতিষীর বাড়ি গিয়াছে। কিছু না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, আপনার ওষুধ-বিস্‌দের কোন ব্যবস্থা না করেই বেরিয়েছে সে। আশ্চর্য্য ত!

বৌদিদি বলিলেন, সন্ধ্যের সময় পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিল এবং একটু হাসিয়া বলিলেন, খুব ভাব করেছে তার সঙ্গে। তিনিই এসে একটা প্রেসক্রপশন্ লিখে দিয়েছেন, তাই আনতেই ত বেরুলো। কোথাও আটকে গেছে বোধ হয়। কিংবা কি জানি—

বৌদিদির মুখে ক্ষণিকের জন্ত ছায়াপাত হইল।

না, খিদে পেয়েছে—

শনটুর ভাই ননটু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে। দিগম্বর মূর্ত্তি, বয়স বছর পাঁচেক হইবে। সে শঙ্করকে দেখিয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এই স্বল্প পরিচিত লোকটির সমক্ষে ক্ষুধার জন্য মাকে বিব্রত করা যে অশোভন হইবে তাহা সে যেন অনুভব করিল। মায়ের পাশটিতে দাঁড়াইয়া বাঁ হাতে চোখ কচলাইতে কচলাইতে আড়চোখে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে সে চাহিতে লাগিল।

বৌদিদি বলিলেন, তুমি একটু বস শঙ্কর ঠাকুরপো, আমি এটাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। চল্ খাবি চল্—

শিশুকে লইয়া বৌদিদি ঘরের ভিতর ঢুকিলেন।

শঙ্কর শুনিতে পাইল—শিশু বলিতেছে, সাবু খাব না!

লক্ষ্মী সোনা আমার, কাল সকালে কেমন বেগুন ভাজা দিয়ে ভাত করে দেব—কেমন? এখন এইটুকু খেয়ে শুয়ে পড় ত ধন—ননটুবাবু ভারি লক্ষ্মীছেলে, খেয়ে ফেলো ত বাবা চোঁ চোঁ করে'—

এত মিনতি সত্ত্বেও কিন্তু সাবু খাইতে সে সহসা রাজী হইল না। বায়না করিতে লাগিল। বৌদিদিরও ধৈর্য্য অসীম, অনেক কষ্টে তাহাকে ভুলাইয়া সাবুটুকু খাওয়াইলেন ও বিছানায় শোওয়াইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে শঙ্করের সহিত গল্প করিতে বসিবেন এমন সময় ফন্তি উঠিয়া আসিল ও মায়ের কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল যে তাহারও ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। শঙ্করকাকার সম্মুখে ক্ষুধার কথাটা চেঁচাইয়া বলিতে তাহার লজ্জা হইল। হাজার হোক, সে একটু বড় হইয়াছে ত।

বৌদিদি বলিলেন, ওই যে কড়াতে ঢাকা দেওয়া আছে, একটু ঢেলে নিয়ে খেয়ে শুয়ে পড় না মা, আমি শঙ্করকাকার সঙ্গে একটু কথা বলি।

ফন্তি ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে ভিতর হইতে সে প্রশ্ন করিল, একটু দুধ মিশিয়ে নেব মা?

দুধ আবার কেন ফন্তু, একটুখানি দুধ আছে, বাবা আবার এখুনি হয়ত চা চাইবেন।

ভিতর হইতে আর কোন উত্তর আসিল না।

শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না—এদের সবারই জ্বর নাকি, সব সাবু খেতে দিচ্ছেন যে?

বৌদিদির মুখে যেন মেঘ নামিয়া আসিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। সহাস্যমুখে তিনি বলিলেন, জ্বর না হলেও গা ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে সবগুলোরই; তা ছাড়া, নিজে জ্বরে মরছি, এদের জন্যে আর ভাতের হাঙ্গাম করিনি রাত্তিরে। বাবাকে অবশ্য খানকতক লুচি ক'রে দিয়েছি সন্ধ্যেবেলা। আমাদের জন্যে আর কিছু করিনি এবেলা—বলিয়া বৌদিদি হাসিয়া গায়ের কাপড়টা আর একটু জড়াইয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিলেন।

শীত করছে বৌদি? আমার গায়ের কাপড়টা নেবেন?

না না থাক, এতেই আমার বেশ গরম হচ্ছে।

পাশের ঘরে খুটখুট করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

বৌদিদি বলিলেন, বাবা উঠেছেন।

পরমুহূর্ত্তেই দরাজকণ্ঠে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, বৌমা ভন্টু এসেছে না কি?

বৌদিদি উঠিয়া ভিতরে গেলেন। একটু পরেই সে শুনিতে পাইল বৃদ্ধ বলিতেছেন, কে, শঙ্কর এসেছে না কি? এত রাত্তিরে হঠাৎ, খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো, জিগ্যেস করো সেটা! এখানেই ডেকে আনো না, এই শীতে বাইরে কেন?

বৌদিদি বাহিরে আসিয়া ডাকিতেই শঙ্কর ভিতরে গেল। গিয়া দেখিল ভন্টুর বাবা কলিকায় ফুঁ দিতেছেন। গায়ে একটি দামি সাদা সোয়েটার। কলিকার আগুনের আভায় তাঁহার গৌরবর্ণ মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন, এস, এস, এত রাত্তিরে কি মনে করে? বাইরেই বা বসে কেন, যা ঠাণ্ডাটা পড়েছে…

ভন্টুর কাছে দরকার ছিল একটু—বলিয়া শঙ্কর নিকটস্থ টুলটিতে বসিল। বৌদিদি বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া শঙ্করের উক্তি তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। ভন্টুর বাবা কালা। খুব চীৎকার করিয়া কথা না বলিলে তিনি শুনিতেই পান না। কানের খুব কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলে অবশ্য শুনিতে পান। সাধারণত ভন্টুর বৌদিদিই সকলের কথা তাঁহাকে এইভাবে শুনাইয়া থাকেন।

শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, ও ভন্টু এখনও ফেরে নি বুঝি, ক'টা বাজে? এই বলিয়া বৃদ্ধ বালিশের নীচে হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন ও দেওয়ালের

ব্র্যাকেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, রাত ত খুব বেশী হয় নি, দশটা বাজে মোটে, এইবার ফেরবার সময় হয়েছে ভন্টুর।

শঙ্কর বিস্মিত হইল। সে-ই ত হস্টেল হইতে বাহির হইয়াছে এগারোটার পর। সে বলিতে যাইতেছিল যে ঘড়িটা বোধ হয় স্লো আছে, বৌদিদি চোখ টিপিয়া নিষেধ করিলেন।

বৃদ্ধ কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছ ত, না এসে থাকো ত বৌমা খানকয়েক লুচি ভেজে দিক।

আমি খেয়ে এসেছি।

বৌদিদির মারফৎ এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, চা একটু হোক তা' হ'লে, চায়ের ত আর সময় অসময় নেই, কি বল বৌমা, আমাকেও একটু দিও।

পুরু লেন্সের চশমায় আলো বিকীরণ করিয়া তিনি বৌমার দিকে চাহিতেই বৌদিদি বলিলেন—হ্যাঁ, দিচ্ছি ক'রে।

বৌদিদি একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল ইঁহাদের সংসারের নানাবিধ অভাব সত্ত্বেও বৃদ্ধের কোনরূপ অস্বচ্ছলতা নাই। তাঁহার পরিষ্কার বিছানাপত্র, নেটের ফরসা মশারি, সারি সারি কলিকা, দামী গড়গড়া, দামী চটিজুতা, আলনায় পরিষ্কার কাপড়-জামা, চকচকে গাড়ুর উপর পাটকরা লাল গামছাখানি—দেখিয়া মনে হয় যেন কোন ধনী বৃদ্ধ দুই-চারিদিনের জন্য আসিয়া এই দরিদ্র পরিবারে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহার ঘরের বাহিরেই যে দৈন্য নানা মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া রহিয়াছে, তাহার লেশমাত্র আভাসটুকুও এ ঘরের মধ্যে নাই।

বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া শঙ্করকে বলিলেন, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, নানাদিক থেকে চিঠিপত্র লিখে উত্যক্ত ক'রে তুলেছে আমাকে—বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া আবার তাম্রকূটে মন দিলেন। একটু পরেই আবার চোখ খুলিয়া বলিলেন, ভন্টুর বিয়ের কথা গো! তোমরা দেখে শুনে একটা ঠিক করে ফেলো। বয়সও ত হয়েছে। আজকালই সব ধেড়ে ধেড়ে ছেলের বিয়ে হয়, আমাদের কালে—বৃদ্ধ আবার চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ টানিয়া পুনরায় বলিলেন, আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ষোল বছর আর ভন্টুর গর্ভধারিণীর বয়স তখন আট কি নয়। আমার পিতার বিবাহ হয় আরো সকাল সকাল—বারো বছর বয়সে।—পুনরায় তামাকে মন দিলেন।

বাহিরে ভন্টুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বৌদি, বৌদি! শন্টু!

শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে যাইবার জন্য দাঁড়াইতেই ভন্টুর বাবা চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, যাচ্ছ কোথা, বস, এইখানেই বৌমা চা আনবে এখন।

শঙ্কর বলিল, ভন্টু এসেছে।

য়্যাঁ, কি বললে?

শঙ্কর তখন তাঁহার কাছে গিয়া একটু চীৎকার করিয়াই তাহার কথার পুনরুক্তি করিল এবং বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়াই শুনিতে পাইল বৌদিদি বলিতেছেন, ছি ছি, এত রাত্তির করে মানুষে! তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ছেলেমেয়েগুলো ঘুমিয়ে পড়ল, উনুনের আঁচ গেল। শঙ্করঠাকুরপো এসেছে, বসে আছে বাবার ঘরে। এই যে—

শঙ্কর ও ভন্টু মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল ও নিমেষের জন্য নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। নিমেষের জন্য।

তাহার পর ভন্টু বলিল, কি রে, তুই হঠাৎ?

জানতে এলাম—

জানতে এলি! আচ্ছা, উন্মাদ ত তুই। আয় বাইকটা ধরে তুলি দু'জনে।

বৌদিদি বলিলেন, তা হ'লে তোমরা এস তাড়াতাড়ি, চায়ের জল হয়ে গেছে।

শঙ্কর বলিল, স্টোভের আওয়াজ পেলাম না, চায়ের জল করলেন কি ক'রে?

বৌদিদি বলিলেন, উনুনে আঁচ ছিল।

বৌদিদি এই বলিয়া ভন্টুর দিকে চাহিলেন। ভন্টু ও বৌদিদির ভাষাময় একটা দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। শঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়াছিল। বলিল, ব্যাপার কি?

ওসব মেয়েলি ব্যাপারে তোর ঢোকবার দরকার কি, আয় বাইকটা তুলি।

শঙ্কর ও ভন্টু বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া শঙ্কর দেখিল, বাইকটি বারান্দার নীচে

ঠেসানো রহিয়াছে। অন্ধকারেই শঙ্কর দেখিতে পাইল যে, বাইকের পশ্চাতে ও সম্মুখে নানারূপ জিনিস বাঁধা ও ঝুলানো রহিয়াছে। থাম্ মোমবাতিটা জ্বালি।

পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতেই শঙ্করের চোখে পড়িল সেই কাগজের ঠোঙাটা বারান্দায় নামানো রহিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে ক্ষুদ্র মোমবাতিটি বাহির করিতে করিতে ভন্টু বলিল, উঃ, রাস্তায় এতগুলো জিনিস নিয়ে যেন সার্কাস করতে করতে এসেছি!

জিনিসপত্র সমেত বাইকটা দুইজনে ধরিয়া উপরে তুলিয়া ফেলিল। তাহার পর ভন্টু বাইকটাকে ঠেলিয়া ভিতরে আনিতে আনিতে নিম্নকণ্ঠে শঙ্করকে বলিল, সব হদিস্ পেয়েছি তোর!

কি হদিস?

পরে সব বলব। এখানে সে সব কথা বলার সুবিধে হবে না।

দুই পেয়ালা চা লইয়া বৌদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন ও ভন্টুর কথার শেষার্দ্ধ শুনিয়া বলিলেন, কি সুবিধে হবে না! নাও, চা নাও! কি সুবিধে হবে না?

ভন্টু গম্ভীর মুখে বলিল, শঙ্করের সব ক্রগিশ য়্যাফেয়ার, ঢুকো না ওতে।

বৌদিদি হাস্যদীপ্ত চক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন ও আর এক পেয়ালা চা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভন্টু প্রশ্ন করিল, আবার কার চা?

বাবার।

চা লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

ভন্টু মুখ সূচালো করিয়া তাহার স্থূল শরীরের উপরার্দ্ধ নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিল, বা কুর কুর কুর কুর—

শঙ্করের চা খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। ভন্টু তাহার কি হদিস পাইয়া আসিয়াছে না শোনা পর্য্যন্ত তাহার আর স্বস্তি ছিল না। ভন্টুকে সে বলিল, চল, বাইরে যাই।

থাম্, জিনিসপত্রগুলো বিড্‌ডিকারের জিম্মায় দিয়ে দিই আগে, বিড্‌ডিকার মানে বৌদিদি। চা দিয়া বৌদিদি বাহির হইয়া আসিলেন। ভন্টু উঠিয়া বাইক হইতে খুলিয়া খুলিয়া জিনিসগুলি তাঁহাকে দিতে লাগিল। ভন্টু জিনিস আনিয়াছিল কম নয়। চাল, ডাল, মশলা, শিশিতে করিয়া তেল, কিছু কমলালেবু, এক শিশি ঔষধ ও সেফ্‌টিপিন প্রভৃতি টুকিটাকি নানারকম জিনিস। সব নামাইয়া দিয়া ভন্টু বলিল, তুমি এবার শুয়ে পড় বৌদিদি। এই নাও তোমার জন্যে কমলালেবু এনেছি, শুয়ে শুয়ে ধ্বংস কর গে যাও। চারটি ভাতে ভাত আমিই ফুটিয়ে নিচ্ছি।

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, ও বাহাদুরী আর করে কাজ নেই। হাত-পা পুড়িয়ে সেবারের মত শেষে এক কাণ্ড ক'রে বস আর কি!

ভন্টু মুখ-বিকৃতি করিয়া তাহাকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বৌদিদি হাসিতে হাসিতে জিনিসপত্র তুলিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, বৌদি, আপনার জ্বর এখন কত?

আছে বোধ হয় একটু—সামান্যই হবে।

ভন্টু ভিতরে গিয়া একটা থার্মোমিটার লইয়া আসিয়া বলিল, এটা বাগিয়েছি আজ ধীরেনবাবুর কাছে। লাগাও ত দেখি।

বৌদিদি প্রথমে রাজি হল না। অনেক বলা-কহার পর রাজি হইলেন। থার্মোমিটার লাগাইয়া দেখা গেল জ্বর ১০২°। শঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এত জ্বর লইয়াও বেশ স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে রহিয়াছেন ত। বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন।

ভন্টু গম্ভীরভাবে বলিল, কেন ইউস্‌লেস্ য়্যাফেয়ারে ঢুকছিস। চল্, বাইরে যাই। বিড্‌ডিকার is as obstinate as a mule.

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, পাগল হয়েছ তোমরা, অত জ্বর আমার নেই, ও থার্মোমিটার তোমাদের ভুল। ভাঙা থার্মোমিটার বলেই ধীরেন ডাক্তার দিয়ে দিয়েছে।

এতদুত্তরে ভন্টু মুখ বিকৃত করিয়া একবার তাঁহাকে ভ্যাঙাইল ও শঙ্করকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে ভীষণ শীত। শঙ্কর প্রথমেই প্রশ্ন করিল, কি হ'ল কুষ্ঠির?

অনেক প্যাঁচ তোর, করালী বললে একদিনে হবে না।

প্যাঁচ? কি প্যাঁচ?

সঙীন প্যাঁচ এবং রঙীন প্যাঁচ। এর বেশী করালি আর কিছু বললে না। সব খুলে বলবে বলেছে আর একদিন। তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব সেদিন এখন।

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভন্টুর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর কিছু বললে না ?

না। উঃ কি শীত রে—চল্ ভেতরে চল্।

আসিতে আসিতে শঙ্কর বলিল, কোন খবর পেলি মেজকাকার ?

কিচ্ছু না। ঘড়েল বাবাজি কোন খবর রেখে যায় নি।

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, করালী লোকটা রিলায়ব্ল্ ত ?

ভনুটু দাঁড়াইয়া হাত দুটি বিস্তার করিয়া সংক্ষেপে বলিল, গোদা চাম্।

ভনুটু গমনোদ্যত হইলে শঙ্কর বলিল, দাঁড়া আর একটা কথা জিগ্যেস করি। তুই এত রাত্রে বাজার করে নিয়ে এলি মানে ? ছেলেগুলো সব সাবু খাচ্ছে—

ভনুটু দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিয়া বলিল, নো মানি ! দাদা টাকার অভাবে পড়ে পুরি থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তাকে টি. এম. ও. করতে গিয়ে অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ-গোছ হয়ে দাঁড়াল। কি করব বল ! উপায় কি ! অনেক কষ্টে ধার ধোর করে জোগাড় করলাম কিছু টাকা। সব ফুরিয়ে গেছল, মায় চাল পর্য্যন্ত। চল্ ভেতরে চল্, বাইরে বড় ঠাণ্ডা।

ভিতরে আসিতেই বৌদিদি ভনুটুকে বলিলেন, আর একটু হলেই শঙ্করঠাকুরপো সব মাটি করেছিল। বাকুর ঘড়ি যে তুমি যাবার সময় দম দেবার নাম করে' দু'ঘণ্টা স্লো ক'রে দিয়েছিলে আর একটু হলেই সব ফাঁস হ'য়ে গেছল।

ভনুটু বলিল, সর্ব্বনাশ ! বাকুর ঘড়ি দরকার মত স্লো ফাস্ট্ আমরা হরদম করছি। খবরদার ও বিষয়ে কক্ষনো কিছু বলিস না। বরং এমন ভাব করবি যে, ওইটেই বেস্ট্ ঘড়ি ইন্ ক্যালকাটা !

বৌদিদি হাসিতে লাগিলেন।

ভনুটু বলিতে লাগিল, মেজকাকা যে সরেছে তাই বাকু জানে না এখনও। বাকু জানে মেজকাকা প্রাণপণে চাকরির চেষ্টা করছে—সেই জন্যেই বাইরে যেতে হয়েছে, খবরদার বেফাঁস কিছু বলে ফেলিস নি যেন কোন দিন।

শঙ্কর একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, আমি এবার যাই ভাই, রাত হয়েছে। এতটা আবার হাঁটতে হবে ত—

থেকে যা না আজ রাত্তিরে, লদকালদকি করা যাক্।

না, তা হয় না। হস্টেল থেকে পালিয়ে এসেছি ত, ফিরে না গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। যা রামকিশোরবাবু আছেন, সেই তোর বক—

ভনুটু বলিল, ও, মিস্টার ক্রেন !

হ্যাঁ।

তাহলে যা। কাল আবার দেখা করব।

হ্যাঁ, নিশ্চয় আসিস। যাই তাহলে বৌদি।

এসো।

হ্যারিসন রোড দিয়া শঙ্কর একা হাঁটিয়া চলিয়াছিল।

নানারূপ এলোমেলো চিন্তার আলোছায়ায় সমস্ত মনখানা তাহার বিচিত্র। মৃন্ময়বাবু ও তাহার চিঠির কথাটা সে এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া রাস্তার আলোকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এ কি, এ যে রীতিমত প্রেমপত্র ! কে এই স্বর্ণলতা ! হঠাৎ পিছন দিক হইতে একখানা মোটরকার আসিয়া তাহার পাশে থামিল।

শঙ্করবাবু যে, এখানে কি করছেন এত রাত্রে ?

শঙ্কর চমকাইয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানি পকেটস্থ করিল। ফিরিয়া দেখিল, অচিনবাবু। সেদিন প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে রিণির জন্ম-তিথি উৎসবের দিন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। অচিনবাবু মোটরকারের দালাল। দালালি করার মত সঙ্গতি আছে, দক্ষতাও আছে। শ্যামবর্ণ নাতিস্থূল বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মাথায় সুবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। ভাসাভাসা চোখে দামি সোনার চশমা। কালো রঙে সোনার চশমা মানাইয়াছিল ভালো। মোটরখানিও দামি।

এখানে কি করছেন ?

একটি বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, ফিরছি।

আসুন তাহলে লিফ্ট্ দিয়ে দি।

চলুন।

মৃন্ময়বাবুর বাড়িতে ফিরিয়া তাঁহার জানালা গলাইয়া পত্রটি তাঁহার বাহিরের ঘরটিতে ফেলিয়া দিয়া যাইবে, এই উদীয়মান ইচ্ছাটি আর পূর্ণ হইল না। শঙ্কর অচিনবাবুর গাড়িতে চাপিয়া বসিল। গাড়িতে উঠিয়াই একটা তীব্র এসেন্সের গন্ধ সে পাইল। হাসিয়া বলিল, খুব গন্ধের ছড়াছড়ি দেখছি আপনার গাড়িতে !

গাড়িটা স্টার্ট করিয়া খুব গম্ভীর ভাবে অচিনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, এইমাত্র একজন সুরভিত প্রাণীকে নাবিয়ে দিয়ে এলাম।

জিগ্যেস করতে পারি কি, কে তিনি?

জিগ্যেস আপনি অবশ্যই করতে পারেন কিন্তু উত্তর দেওয়ার স্বাধীনতা আমার নেই।

স্টিয়ারিং ধরিয়া গম্ভীরমুখে অচিনবাবু সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দ্রুত নিঃশব্দ বেগে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে।

শঙ্কর মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, আর প্রয়োজনও নেই, উত্তর পেয়ে গেছি—

অচিনবাবু তথাপি নীরব।

শঙ্করের মনে হইল যেন তাঁহার চোখের কোণে একটা অতি চাপা মৃদুহাস্য উঁকি দিতেছে। মুখ কিন্তু গম্ভীর। একটা রিক্‌সাওয়ালা গলি হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাহির হইল। তাহাকে পাশ কাটাইয়া অচিনবাবু আপন মনেই যেন বলিলেন, মানুষ মাত্রেই অহঙ্কারী। এইটেই বোধ হয় মানুষের বিশেষত্ব।

শঙ্কর কিছু বলিল না। একটু পরেই গাড়ি আসিয়া শঙ্করের হস্টেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর নামিয়া পড়িল। অচিনবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকবেন না যেন শঙ্করবাবু। যাঁর গন্ধ এতক্ষণ উপভোগ করতে করতে এলেন, তিনি নারী নন—পুরুষ।

এটা তা হ'লে কার?

শঙ্কর একটা সোনার মাথার কাঁটা অচিনবাবুর হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল, গাড়ির সিটে ছিল।

অচিনবাবুর গাম্ভীর্য্য এতটুকু বিচলিত হইল না।

ও, ওটা আর একজনের, দিন। অনেক ধন্যবাদ চলি তবে—গুড্ নাইট্!

মোটর চলিয়া গেল।

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া সেদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

করস্পর্শ

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

আমার চোখে ছিলনা চশ্‌মা।
তুমি এসে বস্‌লে পাশের চেয়ারে।
চশ্‌মাটা যেই ভুলে পরতে যাব,
ধর্‌লে হাত চেপে, বল্‌লে কাজ কি প'রে?

আমি বল্লাম—বিলক্ষণ।
তোমার মুখ যে ঠেক্‌বে ঝাপ্‌সা
মুখ দেখতে না পেলে
কথা কয়ে হয় না তৃপ্তি।

বল্লে—না-ই বা কইলে কথা।
অবচনে কি কথা বলা যায় না?
বল্লেম হেসে, ঝাপ্‌সা যদি দেখি
কথাগুলো হবে অস্পষ্ট স্বগতোক্তি।

এলে ত দেখা দিতে, কথা বলাতে,
তুমি এলেই আমার কথার কলে জল আসে।
নইলে আসে গলা পর্য্যন্ত
রসনায় পৌঁচায় না।

আজ নিলে চোখের দৃষ্টি কেড়ে,
অবচনে বল্‌তে হবে কথা,
অর্থাৎ, তুমি থেকেও থাক্‌বেনা চোখে,
শুন্‌বে শুধু অকথিত বাণী?

কিছু না বলে আমার হাত খানি নিলে হাতে,
এই প্রথম পেলেম তোমার সত্যিকার করস্পর্শ
চোখে দৃষ্টি রসনায় বাণী ফুট্‌ল আমার হাতে,
বুঝ্‌লেম চোখবুঁজে মৌনে কথা চলে।

"শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান" সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

(৩)

কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের কোন কোন স্থলে পূর্ব্বাপর সংগতির বিচার করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, "চরিতামৃত"-গ্রন্থে পরে অনেক পয়ার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু "চরিতামৃতে"র সমালোচনায় বহুলেখক বিমানবাবু ঐরূপ কোন কথা লেখেন নাই। অবশ্য "চরিতামৃতে"র প্রত্যেক কথাকে বেদবাক্যের ন্যায় মানা যায় না, ইহা তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে, শ্রদ্ধার সহিত "চরিতামৃত"-গ্রন্থের কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাও এখানে বক্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গলা সাহিত্যের অভ্রভেদী স্তম্ভস্বরূপ। ইহাতে কাব্য ও দার্শনিকতার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় গোস্বামিগণ যে সমস্ত দুরূহ-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ যথাসম্ভব সরল করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজী কাব্য সাহিত্যে পাল্‌গ্রেভ্ যে কার্য্য করিয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ভাবকে আস্বাদন করিয়া যদি সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া আর গতি নাই।" (৪১২পৃঃ)

বিমানবাবু পূর্ব্বে 'চরিতামৃত'কার কবিরাজ গোস্বামীর পাণ্ডিত্যেরও যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে, কত শাস্ত্রের কত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, ইহাও তিনি বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সেবিষয়ে কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু বিমানবাবুর কোন কোন কথায় যে বক্তব্য আছে, তাহা এখানে লেখা আবশ্যক। বিমানবাবু লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণদাস বাঙ্গলা দেশে থাকিতেই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা "উদ্বাহতত্ত্ব" "একাদশীতত্ত্ব" পঠনপাঠনা করিতেন না। অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১।১৫।৩ শ্লোক উদ্বাহতত্ত্ব হইতে ও ১।২।১৪ শ্লোক "একাদশীতত্ত্ব" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, ঝামটপুরে বাস করার সময়েই তিনি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।" (৩০৫পৃঃ)

বিমানবাবু তাঁহার ঐ দৃঢ় ধারণা প্রকাশ করিয়াও নিম্নে আবার পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—

"ষোড়শ শতাব্দীতে বৈদ্যেরা কি স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনা করিতেন? নবদ্বীপের টোলে এখনও ব্রাহ্মণেতর জাতিকে স্মৃতিশাস্ত্র পড়ান হয় না।"

কিন্তু এই পাদটীকার প্রয়োজন কি, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তবে কি বিমানবাবু পরে আবার ঐ পাদটীকার দ্বারা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের বৈদ্যত্ব বিষয়ে তাঁহার সেই সংশয়ই ব্যক্ত করিয়াছেন? কারণ, তিনি পূর্ব্বেই (৩০৪পৃঃ) লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণদাস খুবসম্ভব জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।" 'খুব সম্ভব' এই কথা বলিলেও কিন্তু সংশয় প্রকাশই হয়। কারণ সম্ভাবনাও সংশয়বিশেষ। উৎকট-কোটিক সংশয়ের নামই সম্ভাবনা।

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যে, বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলেই জন্মগ্রহণ করেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। উক্ত বিষয়ে কোন বিবাদ বা মতভেদও আমরা জানি না। তাঁহার পরিচয় লিখিতে অন্যান্য লেখকগণও নিঃসন্দেহে তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। সে বিষয়ে প্রমাণেরও অভাব নাই। ঝামটপুরে এখনও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের পাট্ আছে। তাঁহার বৈদ্যত্ব বিষয়ে সংশয় থাকিলে ঝামটপুরে গিয়াও সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমি ঝামটপুরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাটিকুরী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে কোন কারণে দুইবার গিয়া সেখানকার বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকটেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈদ্য, ইহাই শুনিয়াছি। কাহারও

নিকটে সে বিষয়ে কোন সংশয়ের কথাও শুনি নাই। বিমানবাবু সে বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ চাহিতে পারেন। কিন্তু তিনি "পরিশিষ্টে" যে সমস্ত ভক্তকে নিঃসন্দেহেই বৈদ্য বলিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কি বৈদ্যত্ব বিষয়ে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইয়াছেন? তাহা পাইলে সেই সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করাও তাঁহার উচিত ছিল। কারণ, সে বিষয়েও অনেকের ঐতিহাসিক প্রমাণ-প্রশ্নও হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য-কুলচূড়ামণি কবিরাজ গোস্বামীর বৈদ্যত্ব বিষয়ে কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করিলেও কিন্তু অনেক গোলে পড়িতে হয়।

যাহা হউক, আমরা বিমানবাবুর ঐ পাদটীকার কোন প্রয়োজন না বুঝিলেও ঐ কথায় সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতের টোলে গিয়া যথানিয়মে অধ্যয়ন এক কথা নহে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গের ব্যবহারাজীব সুপ্রসিদ্ধ কাণে মহোদয় ইংরেজীতে স্মৃতিশাস্ত্রের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে বহু স্মৃতিনিবন্ধ দেখিয়াছেন। আর একাদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য পণ্ডিত 'চরক চতুরানন' চক্রপাণিদত্ত এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে নানা গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য পণ্ডিত ভরত মল্লিক মূল স্মৃতিশাস্ত্র মন্বাদি সংহিতাও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না, ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই বুঝিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে কবিরাজ গঙ্গাধর যে, "মনুসংহিতা"রও টীকা করিয়াছিলেন, ইহাও জানা আবশ্যক। পরন্তু বিমানবাবুও পরে আবার লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, তিনি (কৃষ্ণদাস কবিরাজ) স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও স্মৃতির কিছু অংশ সে যুগে প্রত্যেক শিক্ষিত লোককেই পড়িতে হইত।" (৩১০পৃঃ)

তাহা হইলে বুঝিলাম,—ষোড়শ শতাব্দীতেও প্রত্যেক শিক্ষিত বৈদ্যই স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইহা বিমানবাবুর নিশ্চিত। তবে কেন তিনি পূর্ব্বে ঐরূপ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন? আমরা জানি, নিশ্চিত বিষয়ে সংশয় জন্মে না। পরন্তু বিমানবাবুর ঐ শেষ কথাও কি নিশ্চিত সত্য? ষোড়শ শতাব্দীতে প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই স্মৃতিশাস্ত্র পড়িয়াছেন, ইহাও কি শপথ করিয়া বলা যায়? এবিষয়ে আর অধিক লেখা অনাবশ্যক।

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্ব" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করায় বিমানবাবু ঐ হেতুর দ্বারা যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত উক্তির ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কারণ, "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্ব" কোন্ সময়ে কাহার রচিত কিরূপ স্মৃতিশাস্ত্র এবং কবিরাজ গোস্বামী তাহা হইতে কোন্ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা বিমানবাবু বলেন নাই। অতএব এখানে প্রথমে বলা আবশ্যক যে, উক্ত "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্ব"—স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রণীত স্মৃতিনিবন্ধ।

রঘুনন্দন "একাদশীতত্ত্বে" ব্রত লক্ষণের বিচার করিতে পরে "অনুবাদ্যমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "চরিতামৃতে"র আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়,—"তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ:— "অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ" ইত্যাদি। পরে ষোড়শ পরিচ্ছেদেও আবার ঐরূপে ঐ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।* ঐ শ্লোকের প্রতিপাদ্য এই যে, উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাব স্থলে প্রথমেই উদ্দেশ্য পদার্থ বলিয়া পরে বিধেয় পদার্থ বক্তব্য। প্রথমে উদ্দেশ্য না বলিয়া বিধেয় বক্তব্য নহে।

---

* "চরিতামৃতে"র ব্যাখ্যাকারগণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এখানে বক্তব্য এই যে, রঘুনন্দনের "একাদশীতত্ত্বে" উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকে "অনুবাদ্য-মনুক্ত্বা তু" এইরূপ পাঠই আছে। "অনুবাদমনুক্ত্বা তু" এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। শকুন্তলা নাটকের প্রথম শ্লোকের টীকায় বহুবিজ্ঞ রাঘব ভট্ট এবং সাহিত্যদর্পণে (৭ম পঃ) "বিধেয়াবিমর্ষ" দোষের ব্যাখ্যায় টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ উক্ত শ্লোকে "অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব" এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিলেও প্রথম পদে 'অনুবাদ্য' পাঠ সর্ব্বসম্মত। সাহিত্য দর্পণেও 'অনুবাদ্য' শব্দেরই প্রয়োগ হইয়াছে। প্রয়োজনবশতঃ সিদ্ধ পদার্থের কথনকে 'অনুবাদ' বলে। অতএব সেই সিদ্ধপদার্থকে বলা হইয়াছে "অনুবাদ্য"। উহার ফলিতার্থ উদ্দেশ্য। 'অনুবাদ্যং উদ্দেশ্যং অনুক্ত্বা বিধেয়ং ন উদীরয়েৎ ন কথয়েৎ', ইহাই ঐ শ্লোকের দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে। "একাদশীতত্ত্বে" উক্ত স্থলে রঘুনন্দনের বিচারও অবশ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু 'চরিতামৃতে' উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় পয়ারেও "অনুবাদ" শব্দই দেখা যায়। প্রকৃত পাঠনির্ণয়ের জন্য অনুসন্ধান করিয়াও আমি অতি প্রাচীন 'চরিতামৃতে'র পুঁথি দেখিতে পাই নাই।

কারণ তাহা বলিলে "বিধেয়াবিমর্ষ" দোষ হয়। উহা অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত কাব্যের দোষ বিশেষ।

রঘুনন্দন "উদ্বাহতত্ত্বে"র প্রথমে "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু-র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" ইত্যাদি স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "চরিতামৃতে"র আদিলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায়,— "তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে—ন গৃহং গৃহমিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" ইত্যাদি। অতএব ঐ হেতুর দ্বারা বিমানবাবু অনুমান করিয়াছেন যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝামট্পুরে বাস করার সময়েই স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কিন্তু ঐরূপ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারা বিমানবাবুর ঐ সাধ্য অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ কোন গ্রন্থ নিজে না দেখিয়াও অপরের মুখে শুনিয়া অথবা অপরের গ্রন্থে দেখিয়াও তাহার কথা উদ্ধৃত করা যায়। বিমানবাবুও কি কুত্রাপি তাহা করেন নাই? আর এই যে, এখন অনেকে বেদাদিশাস্ত্রের অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছেন, তাঁহারা কি সকলেই সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন? পরের কথা লিখিলে যে, অনেকস্থলে তাহা ঠিক হয় না, ইহাও আমরা অনেকের গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি।

পরন্তু রঘুনন্দন "উদ্বাহতত্ত্বে" উক্ত বচন উদ্ধৃত করিতে পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, "অতএব ভট্টভাষ্যে স্মৃতিঃ।" অর্থাৎ উক্ত বচনটি ভট্টভাষ্যে উদ্ধৃত স্মৃতিবচন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী রঘুনন্দনের "উদ্বাহতত্ত্ব" স্বয়ং পাঠ করিয়া ঐ কথা লিখিলে তিনিও "তথাহি ভট্টভাষ্যে স্মৃতিঃ" অথবা "উদ্বাহতত্ত্ব ধৃতা স্মৃতিঃ" এই কথা লিখিবেন না কেন? ঐ "উদ্বাহতত্ত্ব" যে, মূল স্মৃতিশাস্ত্র নহে, ইহা তিনি অবশ্যই জানিতেন।

বস্তুতঃ বিমানবাবুর নিজের কথানুসারেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার পূর্ব্বে ঝামট্পুরে বাস করার সময়ে রঘুনন্দনের ঐ গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভব নহে। কারণ, বিমানবাবু ঐ কথার পরেই তাঁহার মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে ৺শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার কথা লিখিয়াছেন। (৩০৫ পৃঃ) কিন্তু রঘুনন্দনের "জ্যোতিস্তত্ত্ব" গ্রন্থ ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমার প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ বিমানবাবু নিজেই পরে 'পরিশিষ্টে' (৬৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন, —"তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রন্থে ১৪৮৯ শকের অর্থাৎ ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ আছে।"

কিন্তু রঘুনন্দন ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে "জ্যোতিস্তত্ত্ব" রচনা করিলে "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্ব" কোন্ সময়ে রচনা করিয়াছেন? তিনি যে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের পরে নয় বৎসর মধ্যে ঐ দুই গ্রন্থ রচনা করেন নাই, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের ৺বৃন্দাবন যাত্রার অনেক পূর্ব্বেই উহা রচনা করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই। বিমানবাবু উক্তস্থলে সে বিষয়ে কোন চিন্তা করেন নাই। আর সেকালে যে, হস্তলিখিত ঐরূপ নূতন গ্রন্থের অন্যত্র শীঘ্র প্রচার সম্ভব হইত না, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ক্রমশঃ রঘুনন্দনের গ্রন্থের প্রচার ও কোন কোন গ্রন্থের পঠনপাঠনার আরম্ভ হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে বিষয়ে সকল কথা বলা এখানে সম্ভব নহে। এখানে বক্তব্য এই যে, ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ঝামট্পুরে বাস করার সময়ে রঘুনন্দনের ঐ গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভব নহে।

অনেকদিন পূর্ব্বে কোন সুপণ্ডিত গোস্বামীকে আমি ঐ কথা বলিলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মনে হয়, পরে কোন অনুসন্ধিৎসু অভিজ্ঞ লেখক 'চরিতামৃতে'র পুঁথি লিখিতে যথাস্থানে "উদ্বাহতত্ত্বে" এবং "একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ"—এই কথা লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা কিন্তু এইরূপও অনুমান করিতে পারি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীবৃন্দাবনধামে কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"-গ্রন্থ রচনাকালে নবদ্বীপ হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শনার্থ উপস্থিত কোন পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করিয়া আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার নিকটে রঘুনন্দনের "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্বে"র ঐ কথা সংক্ষিপ্তরূপে জানিয়াছিলেন। তিনি পরম জিজ্ঞাসু হইলেও তখন তাঁহার নিকটেও রঘুনন্দনের ঐ সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। তখনও রঘুনন্দনের গ্রন্থের সম্পূর্ণ পঠনপাঠনা প্রচলিত হয় নাই। এ বিষয়ে আর অধিক লেখা অনাবশ্যক।

কিন্তু রঘুনন্দনের গ্রন্থের কথার প্রসঙ্গে অন্য একটি কথা মনে হইতেছে,—তাহা লেখা আবশ্যক। বিমানবাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকার পরে অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকায় লিখিয়াছেন,—৫৭। রঘুনন্দন প্রাণতোষিণীতন্ত্রম্। পরে "পরিশিষ্টে (২৯শ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর উক্ত গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশলতায় দেখা যায় যে,

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পিতার নাম মহেশ বা মহেশ্বর। উক্ত বংশলতায় আরও পাওয়া যায় যে, "প্রাণতোষণী"তন্ত্র প্রণেতা রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার" ইত্যাদি। বিমানবাবু এখানে নগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থের কথা লিখিলেও তদ্দ্বারা রঘুনন্দন যে "প্রাণতোষণী"কার নহেন, ইহাও পরে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কথার ঐরূপে সংশোধনও হইয়াছে।

বস্তুতঃ খড়্দহনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও পরমধার্ম্মিক প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহোদয় রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দ্বারা ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করেন। প্রাণকৃষ্ণ নামের "প্রাণ" শব্দ ও রামতোষণ নামের "তোষণ" শব্দ গ্রহণ করিয়া ঐ গ্রন্থের নামকরণ হয়, 'প্রাণতোষণী'। (প্রাণতোষিণী' নহে)। রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগে—(বসুমতী সং, ৩য় পৃঃ) লিখিয়াছেন,—"শাকে নেত্র-যুগাদ্রি-কাশ্যপি মিতেঽতীতেক্ষয়ায়াং তিথৌ।" [নেত্র, ৩, যুগ ৪, অদ্রি ৭, কাশ্যপি (সূর্য্য) ১,] 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই নিয়মানুসারে উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় যে, ১৭৪৩ শকাব্দ (১৮২১ খৃঃ) অতীত হইলে বৈশাখ মাসে ঐ গ্রন্থের আরম্ভ হয়।

উক্ত রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ঐ সময়ে প্রবীণ পণ্ডিত, ইহা নিশ্চিত। তৎপূর্ব্বে কলিকাতার হাতীবাগানে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। তখন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহার নিকটে অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করেন। তিনি নিজেই আত্মপরিচয় বর্ণনে লিখিয়া গিয়াছেন,—"রামতোষণ-সংজ্ঞস্য বিদ্যালঙ্কারধীমতঃ। ছাত্রোঽহং সুপ্রসিদ্ধস্যালঙ্কার-গ্রন্থ-পাঠনে॥ উক্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া প্রথমে সালিখায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অনেক দিন ন্যায়াদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রথম ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিমাই শিরোমণির পরলোক গমন হইলে তাঁহার স্থানে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি কাশীলাভ করেন।

রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় "প্রাণতোষণী" গ্রন্থে (বসুমতী সং, ১৪৬ পৃঃ) "ধীমান্ শ্রীমান্ ভুবনবিদিত-স্তন্ত্রসারস্য কর্ত্তা, কৃষ্ণানন্দোঽজনি ভুবি নবদ্বীপদেশ প্রদীপঃ", —ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা নিজেই যে পূর্ব্বপুরুষ-পরিচয়-বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়,—তিনি "তন্ত্রসার"-কর্ত্তা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাঁহার পিতা কৃষ্ণমঙ্গল বিদ্যাবাগীশ কৃষ্ণানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। তিনি কৃষ্ণানন্দের অত্যতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র।

এত কথা লিখিবার প্রয়োজন এই যে, 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দির' হইতে প্রকাশিত 'প্রাণতোষণী' গ্রন্থের ভূমিকায় (২১ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে,—"তন্ত্রসার-সংকলয়িতা শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধপ্রপৌত্র তান্ত্রিকাচার্য্য রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার।" পরে (২৩ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে,— "যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের মহাগ্রন্থ তন্ত্রসার।" আরও অনেকে ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক হইলে তাঁহার বৃদ্ধ-প্রপৌত্ররূপে রামতোষণ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক।

'বিশ্বকোষ' সম্পাদক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে"র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ডে (১৬০ পৃঃ) লিখিয়া গিয়াছেন যে, রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার "প্রাণতোষণী" গ্রন্থে গুরুশিষ্য লক্ষণে লিখিয়াছেন, "আমার অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের তন্ত্রসারে এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।" কিন্তু উক্ত স্থলে আমরা রামতোষণের ঐরূপ কোন কথাই পাই না। পরন্তু নগেন্দ্রবাবু পূর্ব্বে আরও লিখিয়া গিয়াছেন,—

"কৃষ্ণানন্দ, শ্রীচৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে একই গুরুর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। কৃষ্ণানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথমে হরিহর আত্মা ছিল। যৎকালে শ্রীচৈতন্য সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে আকৃষ্ট হন, তদবধি দুই জনের মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। কৃষ্ণানন্দ গৌরকে সখীভাবে ভজনা করিতে নিষেধ করিয়া অপমানিত হন এবং সেই সময় হইতে দুইজনে পৃথক্‌ভাবে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হন।" ১৫৭ পৃঃ।

কিন্তু তাহা হইলে "শ্রীচৈতন্যচরিত"-গ্রন্থে ঐ কথার কোনরূপ উল্লেখ নাই কেন? শ্রীচৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী মুরারি গুপ্তও নিজ গ্রন্থে আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দের কোন কথা বলেন নাই। দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, কোন প্রমাণ না দিয়া কোন বিচার না করিয়া এযুগেও ঐরূপ অনেক গল্প ইতিহাসরূপে লিখিত হইয়াছে। আর

অনেক স্থানে অনেক প্রবাদ এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে যে, বহু প্রতিবাদ করিলেও তাহার প্রভাব নষ্ট হয় না, এবং অনেকে সে বিষয়ে কোন বিচারই করেন না। কিন্তু বিচার করা অত্যাবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অধ্যাপক যে রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার ১৮২২ খৃষ্টাব্দে—"প্রাণতোষণী" রচনা করিয়াছেন, তাঁহার উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ কৃষ্ণানন্দ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। আমাদিগের বিচারে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আমরা কিন্তু প্রবাদমাত্রকেই অসত্য বলি না। যে প্রবাদ চিরপ্রসিদ্ধ এবং যাহাতে কোন বিবাদ নাই, তাহা কোন প্রমাণ বিরুদ্ধ না হইলে মূলতঃ সেই প্রবাদকে অসত্য বলা যায় না। যেমন—পূর্ব্বোক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ হইতে মিথিলায় গিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া আসিয়াছিলেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার ছাত্র, ও রঘুনাথ কাণ ছিলেন, এইরূপ প্রবাদ বঙ্গদেশে চিরপ্রসিদ্ধ। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ঐরূপ অমূলক প্রবাদের সৃষ্টি করেন নাই। নবদ্বীপ হইতে কখনও কেহ অন্যত্র পড়িতে যান নাই, চিরকাল হইতেই নবদ্বীপ সর্ব্ববিদ্যাপীঠ, এইরূপ বলিয়া তাঁহারাও কখনও নবদ্বীপের গৌরব খ্যাপন করেন নাই। উক্তরূপ প্রবাদের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। ৺কাশীধামে বহুবিজ্ঞ গবেষক মঃ মঃ বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী এবং মঃ মঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় প্রভৃতিও উক্ত প্রবাদকে অসত্য বলেন নাই। রাধানগরে সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে বহুবিজ্ঞ ঐতিহাসিক ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও নিঃসন্দেহেই লিখিয়া গিয়াছেন—"অনেক বড় বড় বাঙ্গালী পুরুষোত্তমে যাইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম সর্ব্বপ্রধান। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমই সর্ব্বপ্রথম মিথিলায় গিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া আসেন।"

কিন্তু বিমানবাবু তাঁহার নিবন্ধের পরিশিষ্টে (৮৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন,—"লক্ষ্মীধর কৃত "অদ্বৈতমকরন্দে"র টীকায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম নিজ পিতাকে "বেদান্তবিদ্যাময়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পিতা মহেশ্বর বিশারদ "প্রত্যক্ষমণি মাহেশ্বরী" নামে "তত্ত্ব-চিন্তামণি" গ্রন্থের এক টীকা লেখেন (গোপীনাথ কবিরাজ Saraswati Bhaban Studies, IV, P. 60)। সুতরাং সার্ব্বভৌম যে, মিথিলায় গিয়া "তত্ত্ব-চিন্তামণি" মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন এই কিম্বদন্তি বিশ্বাস করা যায় না। বস্তুতঃ, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে বাংলা দেশে ন্যায়ের চর্চ্চা হইয়াছিল, ন্যায়কন্দলীর লেখক শ্রীধর রাঢ়ের লোক। শ্রীচৈতন্য বা রঘুনাথ শিরোমণি যে, সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।"

বুঝিতেছি,—বিমানবাবু এখানে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে উপযুক্ত অধ্যয়ন ও সম্পূর্ণ বিচার না করিয়াই সহসা অসংকোচে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কথায় বক্তব্য এই যে, শ্রীধর ভট্ট "ন্যায়কন্দলী"র শেষে লিখিয়া গিয়াছেন,— "এ্যধিকদশোত্তরনবশতশাকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা ॥" ৯১৩ শকাব্দ ৯৯১ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু তৎপূর্ব্বে নবম শতাব্দীতেও যে, বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা হইয়াছে, এ বিষয়ে বিমানবাবু কোন প্রমাণ বলেন নাই। "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধরভট্ট "রাঢ়ের লোক" হইলেও তিনি দশম শতাব্দীর শেষে বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের "ন্যায়কন্দলী" নামে টীকা রচনা করেন। উহা ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ না হইলেও উহাতে ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের অনেক কথা আছে। সুতরাং তৎকালে বঙ্গে যে প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছে,—ইহা নিশ্চিত।

কিন্তু পরে মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় "তত্ত্ব-চিন্তামণি" নামে যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন, উহাই নব্যন্যায়ের মূলগ্রন্থ। গঙ্গেশ প্রথমে "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র দ্বারা মিথিলায় নব্যন্যায় মন্দিরের যে মণিময়ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার উপরেই ক্রমে মিথিলার বহু সুদক্ষ টীকাকার নব্যন্যায়ের সুবিশাল মহামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ভারতের বিদ্বৎসমাজকে চমৎকৃত করেন। তৎকালে গঙ্গেশের ঐ "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র এমন প্রতিষ্ঠা হয় যে, যিনি উহা পড়েন নাই, তিনি ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থে সুপণ্ডিত হইলেও নৈয়ায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। আর যিনি ঐ "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র নূতন টীকা করিতে পারিতেন,—তিনি তখন ভারতের বিদ্বৎসমাজে অসামান্য গৌরব লাভ করিতেন। তাই তখন ভারতের নানা দেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী গঙ্গেশের "তত্ত্ব-চিন্তামণি" পাঠ করিবার জন্য

মিথিলায় গমন করিতেন। কারণ তখন অন্যত্র "তত্ত্ব-চিন্তামণি" প্রভৃতি নব্যন্যায়গ্রন্থের অধ্যয়ন সম্ভব হইত না।

বিমানবাবুর মনের কথা এই যে, নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদই যখন "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র টীকা করিয়াছিলেন, তখন তৎপুত্র বাসুদেবের "তত্ত্ব-চিন্তামণি" পাঠ করিতে মিথিলায় যাওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু তাহা হইলে মহেশ্বর বিশারদ কোথায় গিয়া "তত্ত্ব-চিন্তামণি" পাঠ করিয়াছিলেন? ইহা বলা আবশ্যক। আর তিনি—"তত্ত্ব-চিন্তামণি"র প্রত্যক্ষ খণ্ডের "প্রত্যক্ষ-মণিমাহেশ্বরী" নামে টীকা করিলেও সুবিস্তৃত অনুমান খণ্ড প্রভৃতিও যে, তিনি সম্পূর্ণ পাইয়াছিলেন এবং তাহাও তিনি নিজ পুত্র বাসুদেবকে পড়াইয়াছিলেন এবং বাসুদেব নবদ্বীপেই মহানৈয়ায়িক হইয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে প্রমাণ কি আছে? তাহাও কি সহসা ঐরূপ অনুমান দ্বারাই নিশ্চিত হইতে পারে?

বস্তুতঃ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদই যে, "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র প্রত্যক্ষখণ্ডের "প্রত্যক্ষ-মণিমাহেশ্বরী"র টীকাকার, ইহা নিশ্চিত হয় নাই। 'মাহেশ্বরী' এই নামের দ্বারাই তাহা নিশ্চয় করা যায় না। পরমানন্দ চক্রবর্ত্তীর পরে "কাব্যপ্রকাশে"র টীকাকার মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারও নব্যন্যায়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অথবা অন্য কোন মহেশ্বর যে, ঐ "মাহেশ্বরী" টীকার কর্ত্তা নহেন, এ বিষয়েও প্রকৃত প্রমাণ আবশ্যক। বিমানবাবু মঃ মঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধ দেখিয়াই ঐরূপ নিশ্চিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বহু-গ্রন্থদর্শী উক্ত কবিরাজ মহাশয়ও নিশ্চয়পূর্ব্বক ঐ কথা লেখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

It cannot now be ascertained whether Visarada was an author, but I believe that Ms. no. 240, a comm. on Tattva Chintamani (Ist section), deposited in the Govt. Sanskrit Library, Benares, and labelled as Pratyaksa-manimahesvari was *his* production. This is avowedly a mere conjecture, with no claim to the stability of an established thesis, but the following considerations, weighed together, would seem to bear this sufficiently out. (Sarasvati Bhaban Studies, Vol. iv p. 60).

পরন্তু বাসুদেব সার্ব্বভৌম বন্দ্যবংশসম্ভব (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে"র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকাণ্ডে বন্দ্যবংশ বিবরণে মুদ্রিত "কুলপঞ্জিকা"য় বাসুদেবের পিতার নাম 'নরহরি' ইহা পাওয়া যায়। বিমানবাবু পূর্ব্বোক্ত পরিশিষ্টে (৯০ পৃঃ) পরে ঐ কথারও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"কিন্তু সার্ব্বভৌমের নিজের লেখায় ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে (২।২১) যখন তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ পাওয়া যাইতেছে, তখন নাতিপ্রামাণিক কুলজী শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।"

কিন্তু সার্ব্বভৌমের নিজের লেখায় কোথায় তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ পাওয়া যাইতেছে,—ইহা ত বিমানবাবু দেখান নাই। পরন্তু তিনি মঃ মঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের যে প্রবন্ধ দেখিয়া ঐ সমস্ত কথা লিখিয়াছেন,—সেই প্রবন্ধেই কবিরাজ মহাশয় নিম্নে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"শ্রীবন্দ্যান্বয়কৈরবামৃতরুচো বেদান্তবিদ্যাময়াদ্ ভট্টাচার্য্যবিশারদান্নরহরেঃ" ****॥*

"অদ্বৈতমকরন্দে"র টীকার প্রারম্ভে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়,—ভট্টাচার্য্যবিশারদ নরহরি বন্দ্যবংশরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ ও বেদান্তবিদ্যাময় ছিলেন। বিমানবাবু লিখিয়াছেন,—"অদ্বৈতমকরন্দে"র টীকায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম নিজ পিতাকে বেদান্তবিদ্যাময়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন"। কিন্তু উক্ত শ্লোকে সার্ব্বভৌম যাহাকে "বেদান্তবিদ্যাময়" বলিয়াছেন, তিনি যে, উক্ত শ্লোকে নরহরি নামেই কথিত হইয়াছেন, ইহাও ত দেখা আবশ্যক। তাহা হইলে সার্ব্বভৌমের নিজের লেখায় কোথায় তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর পাওয়া যাইতেছে এবং নরহরিই বা কে? ইহাও বলা আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে সহসা কিছু বলা যায় না।

ক্রমশঃ

* কবিরাজ মহাশয় সম্পূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকে পরে দেখা যায়,……নরহরের্য প্রাপ ভাগীরথী। গৌড়াচার্য্যবরেণ তেন রচিতা লক্ষ্মীধরোক্তেরিয়ং শুদ্ধিঃ কাচন বাসুদেব কৃতিনা বিদ্বজ্জনপ্রীতয়ে॥" দ্বিতীয় চরণে "যঃ প্রাপ ভাগীরথীং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত মনে হয়। তাহা হইলে বাসুদেব নরহরি হইতে গঙ্গাতীরবাসী হইয়াছিলেন,ইহা ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায়। আমার এইরূপ জানা ছিল যে, বাসুদেবের পিতামহ নরহরি স্থানান্তর হইতে পুত্র মহেশ্বর ও পৌত্র বাসুদেবকে লইয়া নবদ্বীপের নিকটে গঙ্গাতীরবাসী হন। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে নবদ্বীপে ভট্টাচার্য্যবিশারদ নামে খ্যাত হন। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায়ও দেখা যায়—"ভট্টাচার্য্যবিশারদো নরহরিঃ খ্যাতো নবদ্বীপকে।" তাঁহার পুত্র মহেশ্বর কেবল বিশারদ নামেই খ্যাত হন। কবিরাজ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে বাসুদেবের পিতার নামই নরহরি বলিয়া তাঁহারই অপর নাম মহেশ্বর বলিয়াছেন। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' নগেন্দ্রবাবুও (২৪৪ পৃঃ) "নরহরি (মহেশ্বর)" এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে বাসুদেব নরহরির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি, তাহা বলেন নাই, ইহাও লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্যক। প্রশ্ন এই যে, ভট্টাচার্য্য-বিশারদ বেদান্তবিদ্যাময় নরহরি তাঁহার পিতা হইলে তিনি উক্ত শ্লোকে তাঁহার পিতৃত্ববোধক কোন শব্দ প্রয়োগ করেন নাই কেন? পিতার পরিচয় বর্ণনে সমস্ত গ্রন্থকারই 'তাত' প্রভৃতি কোন শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে পরে আবার আলোচনা করিব।

পল্লী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তোমারে যে আমি ভালবাসিয়াছি
কাব্য পড়িয়া নহে,
নহে ক' নিবিড় মমতার লাগি
অন্যে যে কথা কহে।
হয়েছি তোমার সুখ-দুখভাগী
নহে ক' নেহাৎ অভাবের লাগি,
আমার ভক্তি এ অনুরক্তি
হৃদয়-রক্তে বহে।

২

তোমার আদরে মানুষ হয়েছে
মোর পিতা পিতামহ,
তব অণুকণা সে পুণ্যকথা
কহে মোরে অহঃরহ।
তুমি মোর গয়া তুমি মোর কাশী
সকল তীর্থ মিলিয়াছে আসি,
এক দিকে তুমি "ভ্রমরা' আমার
একদিকে কালিদহ।

৩

মোর চোখে তুমি অর্দ্ধেক কায়া
অর্দ্ধেক ছায়াময়ী
স্বরগের সাথে মিতালি পাতাই
তোমার নিকটে রহি।
চৌদিক হ'তে স্নেহের কি ডাক,
ডুবায় অপর শব্দ বেবাক,
অক্ষয় কি যে গড়িয়া তুলিছ
লয়ে এই দেহ ক্ষয়ী।

৪

প্রতিভাদীপ্ত মহতে বৃহতে
হেরি দূরে পুরোভাগে,
ক্ষুদ্র যে আমি উল্লাসে ভাসি,
হিংসা ত নাহি জাগে।
সাগরের তলে শুক্তির মত,
মুক্তারই কথা ভাবি অবিরত,
মহাসাগরের বিশালতা স্মরি
ভরে বুক অনুরাগে।

৫

জয়যাত্রা ও শোভাযাত্রায়
দিই আমি বলিহারী,
আমি তৃপ্তির স্নানযাত্রার
হতে চাই অধিকারী।
নহি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ দীপ
আমি কুটীরের মাটীর প্রদীপ,
ক্ষণিকের তরে তুলসীতলায়
ক্ষীণ আলো দিতে পারি।

৬

ভালবাসি হেথা ভক্তিতে জ্বলা
শান্তিতে ধীরে নেভা।
ভালবাসি এই অনটন মাঝে
দিন-অতিথির সেবা।
আছি আমি লয়ে হেথা কোন্ দূরে
দীনতা এবং দীন বন্ধুরে,
খ্যাতি যশ মান জয় যুদ্ধের
খবর রাখিছে কেবা?

৭

আমি নর্ম্মদা মর্ম্মরতটে
বাঁধিতে চাহি না ঘর।
উচ্চ প্রাসাদ অলিন্দ হেরি
ভীত মোর মধুকর।
লেবুর কুঞ্জ, মাধবীর শাখে
ছোট মৌচাক বাঁধিয়া সে থাকে,
কাশ্মীর ডাল কমল-কানন
নয় তার প্রিয়তর!

৮

মোর কাছে তব পথের এ ধূলি
রজের গরিমা পায়,
আমি ভালবাসি গড়াগড়ি দিতে
এ প্রেমের নদীয়ায়।
তিমির সদয় বন্ধুর মত
সরাইয়া দেয় বাজে ভিড় যত,
মুদিত চরণ পঙ্কজে মন
গুঞ্জন ভুলে যায়।

মোহ-মুক্তি

নাটক

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম দৃশ্য

স্থান···রমণ মিত্রের (ভক্তিভূষণের) বহির্দ্দালান
সিদ্ধিচক্র বা সিদ্ধিসভা

সম্মুখে পূর্ণ-কলস ও কদলীবৃক্ষদ্বয়, উপরে আম্রপল্লব ও পুষ্পাদির টানা
—এক দিকে পুরুষগণ, অপর দিকে (অন্দর পথে) স্ত্রীলোকেরা
কয়েকজন, খোল-করতালসহ সংকীর্ত্তনে মত্ত

শ্রীভক্তিভূষণ এসে দু'হাত তুলে তন্ময় ভাবে যোগ দিলেন। তাঁকে মধ্যস্থানে নিয়ে চন্দ্রবাবু, হারু, আশু বিশ্বাস ঘিরে সতর্ক ভাবে, বাহুবেষ্টনী মধ্যে রেখে, ঘোরা ফেরা করতে লাগলেন।

কীর্ত্তন গীত

যমুনা জল হতে কেবা উঠি যায়
সিক্ত নীলাঞ্চল গায়।
কেনো ফিরি চায়?
সে তো শুধু যায় না, সে যে লয়ে যায়,
প্রাণ হরণ করি রেখে যায় কায়,—
কেনো চলি যায়?
যাও, কেনো ফিরি ফিরি চাও
আহতে আঘাতি তুমি—কিবা সুখ পাও?
ওই আঁখি ঢল ঢল,
মোর, পরশি হৃদয় তল—
করে যে মরম অধিকার!
ওই অধীর অঞ্চল লুটি,
মোর, যা ছিল নিল যে লুটি,
কিছু যে গো রাখে না আমার!
ওগো যেও না, মোর প্রাণ ফিরায়ে দিয়ে যাও,
মোর মরণে চরণে নাহি নূপুর বাজাও।
আমি না বুঝি চাহিয়াছিনু বদন পানে,
এবে, কেমনে ফিরিব ঘরে হারাণো প্রাণে?
অবোধ রাখালে রাখো—মিনতি তোমায়।
'যা ছিল নিল যে লুটি'

এই পদটির দ্বিতীয় ফেরতা শেষ হ'তেই শ্রীভক্তিভূষণ সহসা তেউড়ে কেমন হয়ে গেলেন। থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলেন। পরে উচ্চৈস্বরে "এসো—এসো—জয় শ্রীরাধে, জয় শ্রীরাধারাণী—জয় শ্রীমতী" বলতে বলতে আর উর্দ্ধে হাত্ড়াতে হাত্ড়াতে, শিবনেত্র হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে এলেন।—

অবস্থা দেখে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চন্দ্রবাবু, উমেশবাবু, আর হারু ভট্‌চায্ পতনোন্মুখ প্রভুকে ধোরে বসিয়ে দিলেন। তিনি অভ্যাসগুণে পদ্মাসন হয়ে পড়লেন।—

মেম্বারেরা তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলো। কদম একটি মেয়ের খোঁপায় জড়ানো একগাছি মালা তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে প্রভুর গলায় পরিয়ে দিলে।

মেয়েদের দিক হতে "কি হল' গো, কি হবে গো!" শুনতে পাওয়া গেল। মিত্র-গৃহিণীর কান্নার সুর শোনা গেল। হারু বিচলিত হয়ে চন্দ্রবাবুর দিকে চেয়ে বলে উঠলো—"এ কি হ'ল চৌধুরী মশাই?"

চন্দ্র। আপনারা সব স্থির হোন্, কোনো চিন্তা নেই।

হারু। (ব্যস্তভাবে) প্রভু কি যেন বলচেন···

সকলে উৎকর্ণ

প্রভু। "বড়ো ব্যাকুল হয়ে আসছে, আহা বড় কাতর, বড় ভক্ত—উপবাসী—কিছু বোল না···

হারু। কে আসছে প্রভু?

প্রভু। (দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ)

সহসা ব্যাকুল ভাবে দুইজন বৈষ্ণবের প্রবেশ
বড়টির মুণ্ডিত-মস্তক, তিলক, মালা, দেহ চন্দন-চর্চ্চিত। সুন্দর কান্তি। যুবাটির প্রলম্ব কেশ, দীন ভাব। দেখে সকলে সবিস্ময়ে সচকিত

বৈষ্ণব। (অতি দীনভাবে) এই 'ব্রজ-মন্দির'? সংকীর্ত্তন এইখানেই হচ্ছিল বাবা?

আশু। এটা "ব্রজ-মন্দির" নয়। সংকীর্ত্তন এইখানেই হচ্ছিল। আপনারা দয়া করে' বসুন—আমরা···

বৈষ্ণব। (শিষ্যের প্রতি) তবে আমাদের ভুল হয়েছে

বাপ্। (উমেশের দিকে) বাবা, আজ দুদিন 'ব্রজমন্দির' খুঁজে বেড়াচ্ছি। "ব্রজমন্দিরে চললুম" বলে আমাদের রাধা মা চলে এসেছেন…

দীর্ঘনিশ্বাস

শিষ্য। এই স্থানটিই অভিরামপুর কি?

আশু। হাঁ, এইটাই অভিরামপুর। আমরা এখন বড় বিপন্ন বড় উদ্বিগ্ন রয়েছি বাবা। প্রভু ভাবাবেশে রয়েছেন। পূর্ব্বে আমরা এরূপ অবস্থা তাঁর দেখিনি। বড় ভয় পাচ্ছি…

বৈষ্ণব। কি বললেন—ভাবাবেশ? কই কই প্রভু? (দর্শনান্তে) এই যে—জয় রাধারাণী। ধন্য, ধন্য হলাম।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত, শিষ্যের তথাকরণ

কি? ভাবাবেশ? কে বললে বাপ্? এ যে পূর্ণ বেগ্-সমাধির লক্ষণ—"কুটিচক্" অবস্থা। ধন্য হলাম—ভয় আবার কি বাবা। উনি এখন ভব-ভয়-নাশন। জন্ম জন্মান্তরের সাধনালব্ধ সিদ্ধি আজ ওঁর করতলগত। ওঁর কাছেই আমার রাধারাণীজির সংবাদ পাবো। (শিষ্যের প্রতি) হরিকুমার—ওঁর দেহময় দিব্যজ্যোতির খেলাটা লক্ষ্য করো। বহু বাঞ্ছিত অবস্থা—দেবতাদেরও কাম্য…

চন্দ্র। (বিস্ময় ভাব) এইমাত্র প্রভু বলেছিলেন—"ভক্ত ব্যাকুল হয়ে আসছে"…

বৈষ্ণব। আমি প্রভুর সঙ্গে কথা কইতে পারি?

হারু। (ব্যস্তভাবে) না—না শ্রীহরি কি শ্রীমতী ভিন্ন, অন্য কথা—বিষয়ের কথা—চলবে না বাবা—

বৈষ্ণব। (সহাস্যে) আমি তা জানি—বাপ্ (প্রভুর কর্ণে ধীরে কথন) প্রভো, রাধাপদাশ্রিতে করুণা কুরু—(প্রণিপাত)

প্রভু। (চক্ষু বুজেই) কে—রাধানন্দ এসেছ? যাও, আপন স্থানে যাও। আমি এখন ব্রজমন্দিরেই রইলুম। আমার প্রিয় ভক্ত আমায় টেনেছে, সে বড় কাতর। সেখানে তুমিই তো আমাকে থাকতে দিলে না; ভুলু মুচির মালা নাওনি—আমাকে বড় লেগেছে…

বৈষ্ণব। সন্তানের অপরাধ হয়েছে মা—অজ্ঞান, বুঝতে পারিনি, ক্ষমা করো জননী। সে বড় অশুচি অবস্থায় এসেছিল দেখে—সংস্কার দোষে…

প্রভু। তোমার যে অবস্থা, তাতে অন্তর দেখবার কথা—কেবল বাহিরটাই দেখেছ, যাও। আমি ব্রজমন্দিরেই থাকবো। ব্রজ একান্ত মনে এই চেয়েছিল যে…

বৈষ্ণব। মা, সন্তানের কত অপরাধ হয়, ক্ষমা করো জননী। তুমি না থাকলে আমি আর ওখানে কি করতে থাকবো!

প্রভু। তবে কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে থেকে এসো—চিত্ত-শুদ্ধি করে এসে।

বৈষ্ণব। তারপর আসবো? তারপর পাবো?

প্রভু। পাবে—দিবসে। রাত্রে আমি ব্রজপুরেই রবো। ভক্তের অন্তিম ইচ্ছা আমাকে রাখতেই হবে—অনাথার শান্তির উপায় করতেই হবে।

বৈষ্ণব। বুঝেছি এও তোমার লীলা লীলাময়ী! এঁরাই সব ধন্য! তবে—তোমার আদেশ পালন করতে চললুম মা। ভুলু মুচিকে পাঠিয়ে তোমার এই কাণ্ড? আমাকে অপরাধী করলে! যেখানেই রাখ মা—তুমি সঙ্গে থেকো জননী।

প্রভু। থাকবো—

বৈষ্ণব। আর কিছু চাই না—চললুম—

(বৈষ্ণব সাশ্রুনয়নে ভক্তিভূষণের পদধূলি নিয়ে চক্ষু মুছতে মুছতে গমনোদ্যত হতেই)

হারু। সে কি হয় ঠাকুর, উপবাসী সেবা নিয়ে যেতে হবে।

বৈষ্ণব। (কাতরে) ক্ষমা করুন—সে কাজ শ্রীবৃন্দারণ্যে গিয়ে। আপনারা ধন্য—ধন্য সৌভাগ্য আপনাদের—মহাপুরুষকে সযত্নে সেবা করে ধন্য হোন। দেখবেন—নির্ব্বিকল্পে যেতে দেবেন না। এসো হরিকুমার—

শিষ্যসহ প্রস্থান

চন্দ্র। (শশব্যস্তে) কি—কি বলে গেলেন? 'নির্ব্বিকল্পে' বললেন না? সেটা তো বুঝি না। বড় প্রয়োজনীয় কথা যে।

হারু! যাও যাও জিজ্ঞাসা করে এস।

হারুর বহির্গমন

হারু। (ফিরিয়া—সবিস্ময়ে) কই কোনো দিকেই

তো দেখতে পেলুম না। কি—অলৌকিক ব্যাপার! অ্যাঁ—

চন্দ্র। (চিন্তা করে')—প্রভু কাল থেকে কতবারই বললেন—"চন্দোর কেবল রাধারাণীকেই দেখছি"—এখন তার কারণ বুঝতে পারলুম। তিনি ওঁর মধ্যে প্রবেশ করেছেন—রয়েছেন। যা শুনলে সবই রাধারাণীর নিজের মুখের কথা।

হারু। অজ্ঞান আমরা, ওর কিই বা বুঝি। কি অলৌকিক কাণ্ড! হাত পা কাঁপচে। দেখ না (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ) এখনো সর্ব্বাঙ্গে দিব্যজ্যোতি···

মেয়েরা সব গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগলো এবং মাথা নেড়ে এ-ওর সঙ্গে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে বলাবলি করতে লাগলো। কেউ চোখ মুছলে—কেউ হাত জোড় করলে।

উমেশ। মা বলচেন "ব্রজমন্দিরে" থাকবেন—সে কোথায়?

আশু। তিনি যেখানেই থাকেন, সেইখানেই ব্রজমন্দির।

হারু। আরে না, না, এটা বুঝলে না! এই সহজ কথাটা বুঝলে না—অন্তিমের কথা আর কার? এ আমাদের ব্রজভায়া ছাড়া আর কে? তার অন্তরটা আমি জানি—ভীষণ—ভীষণ আধ্যাত্মিক ছিল যে!

হারু। আমার মামলাগুলোয় এক পয়সা নিত না, অত্যন্ত আধ্যাত্মিক ছিল···

চন্দ্র। থাক্—এখন প্রভু যে এক ভাবেই রইলেন। অনেক্ষণ হয়ে গেল যে! (চঞ্চল হ'য়ে) সেই নির্ব্বিকল্পের আশঙ্কা রয়েছে যে···

আশু। শুনেছি কীর্ত্তনে সমাধি হ'লে কীর্ত্তনেই উত্থান···

চন্দ্র। তাই হোক্—তাই করো—তাই করো উমেশ···

কীর্ত্তন

কোথায় নুপুর বাজে ওই—
আমি শুনি শুনি শুনি গো।
পরশে অরূশ করে হৃদে,
রণি রণি রণি গো।
যেন যুগ যুগ হতে
সাড়া দেয় অনাহতে,
আমাতে কি আমি তাতে
ওঠে ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনি গো।
কোথায় নুপুর বাজে ওই···

প্রভু উৎকর্ণ

আহা কি শুনালে, কে শুনালে। এ কার অনুভূতি? আমার না তোমার?

প্রভু। যেওনা, যেওনা, আমি থাকতে পারব না।

বলতে বলতে সটান উঠে পড়লেন। চোখ চেয়ে দেখেন—চন্দরবাবু, হারু তাঁকে আগলাচ্ছে

"তোমরা? আমি কোথায়? আমি ব্রজমন্দিরে যাবো।"

চতুর্দ্দিকে চাইলেন

চন্দ্র। আপনি সমাধি চক্রে

প্রভু। ওঃ (ভাব ভেঙে গেল) আমার একি হোলো? (ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কান্না) আমি কি পাগল হলুম।

চন্দ্র। আপনি শান্ত হোন্—স্থির হোন্··

প্রভু। স্থির হবার উপায় নেই। না—আমি পারব না। ব্রজর স্ত্রীকে ডাকো—আমি মাপ চাইবো। আমায় ক্ষমা করুন। আমার দ্বারা হবে না। মন্দের প্রভাব অসীম, কে এ বিষ ছড়িয়েছে জানি না। সবাই বলে অলুক্ষুণে—ভূতের বাড়ি। আমি তাতেও দমিনি চন্দোর। ঠাউরে ছিলুম—তাঁকে বলে ঐ বাড়ীতেই কিছুদিনের জন্যে সভা নিয়ে যাব। কলিতে নাম আর দানই প্রধান, নির্দ্দোষ হয়ে যাবে···

চন্দ্র। বেশতো, তাতে তিনি অমত করবেন না··

প্রভু। আমার সে বিশ্বাস ছিল চন্দোর—

হারু। তবে আবার কি?

প্রভু। আর আমাকে জিজ্ঞাসা কোর না—আমি বলতে পারব না। সে কেউ বিশ্বাস করবে না—সে আধার কই (এই বলে শিউরে উঠলেন); তুমিই রক্ষা করো রাধে, আর পরীক্ষা কোর না। এই দীনের কুটিরেই দয়া করে থাকো—

কাঁদতে লাগলেন

কদম ঝি এগিয়ে এসে বললে

কদম। বউমা এইখানেই উপস্থিত আছেন, সব শুনেছেন। তাঁকে কিছু বলতে হবে না। বলচেন—ও বাড়ী বিক্রির জন্যে আপনি আর ভাববেন না। সে যা হয়···

প্রভু। পাগল বৌ, সরলা! আমার ভাবনা মেটবার কি আর পথ আছে? আমি তো পথ ঠাউরেই ছিলুম। —যখন ভার দিয়েছেন—বাড়ির অপবাদটা শোধন করে উপায় করে দেবো। এখন আর (দীর্ঘনিশ্বাস) যাক্ তিনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমিও বাড়ী বিক্রির কোন কথাতেই আর থাকতে পারব না; ও-কথা মুখে আনবারও আমার আর অধিকার নেই। হারু প্রসাদ উৎসর্গ করে দাও।

কদম। বউমা সবই শুনেছেন। বলচেন, এখন তাঁর মনের ঠিক নেই, ভেবে বলবেন। (নিম্ন কণ্ঠে) এই টাট্‌কা টাট্‌কা কপাল পুড়েছে তায় কেবল কেবল বাবুর নাম হ'ল কি না—তাই···

প্রভু। (তদ্রূপ স্বরে) সেই তো ইচ্ছা করে' গেছে। তার তীব্র ইচ্ছা না থাকলে আর—

কদম। তাই তো।

প্রভু। আমার শরীরের ঠিক নেই, মাথারও ঠিক নেই। হারু সকলকে প্রসাদ বিতরণ করে দাও। মা স্বয়ং এসেছেন, কেউ না বঞ্চিত হয় (ভাব মগ্ন)।

সকলে প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে চললো

চন্দোর। দেখুন আমি একটা উপায় ঠাওরাচ্ছি। ওবাড়ী রাধারাণীর জন্যে রাখতেই হবে। চাঁদাতুলে যতটা টাকা সংগ্রহ হয়, বউমাকে···

প্রভু। চন্দর, তুমি কিছুই বোঝনি। সাপ নিয়ে খেলা চলে না। রাধারাণীর তো সে অভিপ্রায় দেখলুম না! তিনি ব্রজর উপর কৃপা করে' তার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান, ওই সঙ্গে বধুর শান্তি। তাই তো মুস্কিলে পড়েছি—বিক্রয়ের কথা যে আসতেই পারে না। কিন্তু এ কথা যে সাধারণকে বলবার নয়। ১৭ হাজার টাকার বাগান-বাড়ী অসহায়া বিধবার ধন। আমার উপর নির্ভর। একি সাধারণ পরীক্ষা আমার ওপর! মুখ ফুটে বলবার জো নেই, বুঝচো তো? ভালো মন্দ লোক তো···

আশু। তা তো বুঝচি। কিন্তু সত্যটা চেপে রাখাও তো দুর্ব্বলতা, বিশেষ দেবাদেশ। আবার এটাও তো বুঝতে হবে—উনি স্বামীপুত্রহীনা, ওঁর অত টাকা থাকা মানেই অশান্তি আর বিপদ পোষা। সে একদিন অন্যের হাতে পড়বেই, তখন যে পাগল হয়ে যাবে? এ মায়ের সেবায় রইলো—স্বামীর ইচ্ছাও পালন করা হ'ল, তাঁর আত্মাও শান্তি পেলে।

প্রভু। আহা—সব বুঝচি, উচিতও তো তাই। পারে তো পর-কাল কিনে নেবে—তাও বুঝচি। কিন্তু আমি বলতে গেলেই পাঁচ জনে পাঁচ রকম্ বোঝাবে, স্ত্রীলোক। তাঁর ভাগ্যে থাকে, মতি শ্রীমতীই দেবেন। যাক্, আমি আর পারচি না যে চন্দোর—

চন্দ্র। চলুন, এখন ভেতরে চলুন। কিছু খাইয়ে, আপনাকে শুইয়ে—বাড়ীতে বলে কয়ে, আমরা যাবো—

প্রভুকে সযত্নে হাত ধরে নিয়ে পুরুষদের প্রস্থান।

অপর্ণা, কদম আর কয়েকটি রমণী তখনো অলক্ষ্যে ছিলেন। প্রভুর কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। তাঁরা সামনে এলেন। অপর্ণা একটা আশ্রয় ধরে দাঁড়ালেন। তার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল, মাথা ঘুরছিল।

অপর্ণা। কদম। আমি দাঁড়াতে পারচি না, মাথা কেমন করচে, বাড়ী চল্।

কদম। তা আমি অনেক্ষণ টের পেয়েছি। ওঁদের সামনে দিয়ে যেতে পারবে না বলেই—কিছু বলিনি। একটু সামলে নিয়ে চলো···

বিরলা। (সকলে শুনতে পায় এমন স্বরে অলক্তকে) দেবী নিজে চাচ্ছেন, এর ওপর আর কথাই বা কি—তা তো বুঝি না। আমাদের থাকলে—সে ভাগ্যি কি করেছি···

অলক্ত। লোকে তালুক মুলুক লিখে দেয়। জানতো লালাবাবু—

নীরদ। বক্‌চিস্ ক্যানো, ভাগ্যি চাই! আমাদের কি দিয়েছেন যে জন্ম সার্থক কোরবো···

বিরলা। যখন নেই—না-কথা কওয়াই ভালো। তা না তো যার বাড়া নেই দেবতা···নিজের মুখে···গা শিউরে ওঠে! টাকাও সঙ্গে যাবে না—বাড়ীও সঙ্গে যাবে না···

নীরদ। হ্যাঁ—খাবার পরবার দুখ্‌খু থাকলে বটে, মাথাও ঘোরে—কথাও ওঠে—

অলক্ত। দেবতায় চাইলে—ওমা বলো কি! কারধন, দিয়েছে কে বলো?

কদম। (অপর্ণাকে) প্রসাদ ক্রমেই ভারি ঠেকচে বউ-ঠাকরুণ—সকলেই চলে গেছেন, এইবার চলো রাত হয়েছে—

অপর্ণাকে লইয়া প্রস্থান

বিরলা। দেওয়া কি যার তার কাজ; একটি কথা কইলে কি? আমাদের কেবল প্রাণটাই আছে। যাক্—আর থেকে কি হবে, চল আমরাও যাই। একটা কথাও কইলে না। তবু যদি না কপাল পুড়তো। দেখে নিত এই বিরলা বামনীর কথা—সাত ভূতে যদি না খায় তো কি আর বলিচি—

সকলের প্রস্থান

নবম দৃশ্য

স্থান…৺মঙ্গলা হিড়ীর বসত বাড়ী
সময়…সকাল ৭টা
উপস্থিত…অপর্ণা (ব্রজর বিধবা পত্নী)
কদম ঝি মুখ ভার করে কাজ করচে

অপর্ণা। কই কিছু বলচিস না যে কদম। আমি ত' কিছু ঠাওরাতে পারলুম না। একটুও ঘুমুতে পারিনি—

কদম। (ভার ভার) আমার সারা রাত নাক ডেকেছে…

অপর্ণা। তুই আমার চেয়েও ভাবচিস্—তা আমি জানি।

কদম। কে বললে, এতোটুকুও না! ওতে ভাববার কি আছে?

অপর্ণা। তা হলে যে বাঁচতুম। এখন কি করি বল্ দিকি?

কদম। আমি কি বল্‌বো?

অপর্ণা। না—তবু—

কদম। 'তবু' বলো তো—যেমন আছো থাকো—বাগান বাড়ীও যেমন আছে থাক্। বেচেও কাজ নেই—দান-খয়রাত করেও কাজ নেই—

অপর্ণা। রাধারাণীকে দান খয়রাৎ কি বল্?

কদম। তবে জিজ্ঞেস করে আমার পাপ বাড়াও কেনো? তোমাদের ও ধম্মের কথায় আমাকে টেনো না।

অপর্ণা। রাগ করলি কদম? আমার আর কে আছে যে এই সঙ্কটে তার সঙ্গে কথা কবো।

কদম। আমারই বা কে আছে যার ওপর রাগ করবো? রাগ করে ফল্? রাধারাণীর যদি বিধবার ওই বাড়ীটি না হলে না চলে, তা হলে—দান-খয়রাতের কথাই তো আসে। সে-দিন যা শুনে এলে—সে আর কিসের কথা? তবু—সে কথা মুখে আনাও তোমার সয় না যে…

অপর্ণা। সমাধি অবস্থার কথা তো, তার নিজের কথা নয়—তাই ভয় হয় যে। তোর কি বিশ্বাস হয় না!—শুনে এতটা লোক কাট হয়ে গেলো!

কদম। এতোটুকুও না। কাট্ কেনো—কয়লা হয়ে গেলেও না।

অপর্ণা। ওমা—বলিস কি! সেই সাধুটি পর্য্যন্ত ওঁর অবস্থা দেখে—মহাপুরুষ বলে'—পায়ের ধূলো নিয়ে—আহা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন? ভট্‌চায্যি মশাই সঙ্গে সঙ্গে গিয়েও তাঁদের দেখতে পেলেন না—যেন উপে গেলেন! এসব দেখেও—

কদম। (বাধা দিয়ে) কেনো আমার আর পাপ বাড়াও দিদিমণি! আমার মনকে সারা গঙ্গার জল দিয়ে ধুলেও ও ময়লা যাবে না। বামুন বাড়ী দাসীবিত্তি স্বীকার করেছি, তোমাদের পেসাদ পাবো বলে—। সেই আমার সাধন-ভজন ধর্ম্ম-কর্ম্ম। আমার কাছে ওদের কথা কোয়ো না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমি বিশ্বাস করতে পারবো না। ফিরে এসে রাতে ও-কথা উঠতেই—আমার কথা তোমার ভালো লাগে নি; তাই না বলেছিলে—"বড়ো ঘুম পেয়েছে—শুয়ে পড়ি চল্"। ওই ব্যাপারের পর, ঘুম পাবার কথাই বটে! শুনে আমি মনে মনে হাসলুম,—"তাই ভালো" বলে' উঠে পড়লুম! তোমার ঘুম যা হবে তা জানতুম। কারই বা হয় দিদিমণি!

অপর্ণা। মেয়েরা যা বলছিল—শুনলি তো?

কদম। ওঃ—সে কথার মূল্য তো ভারি, পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙতে সবাই পারে। শুনবো না কেনো—শুনিছি—শুধু তোমার জন্যে—কিছু শোনাই নি! যাদের নেই, চিরকালই তাদের জিভ্ লম্বা। ১৭ হাজার যে কতো, আর কি করে হয়েছিল, তা তো জানা নেই। সেটা জামাই-বাবুই জেনেছিলেন। তোমার বসে পাওয়া ধন বইতো নয়,

তাই তাদের কথায় কান্ দিয়েছিলে, আর তাই নিয়ে এখনো ভাবচো।

অপর্ণা। আমি আজও জানি না কতো—! (হাসি মুখে) অত টাকা নিয়ে কি করবো কদম ?

কদম। তা বটে—ভাবনার কথা বটে! বৈষ্ণবেরা বলছিল না 'টাকা পোষা না আপদ পোষা'! তবে তাঁদের প্রভুটি ৭০ টাকার আপোদ—মাসে মাসে ঘরে ঢোকাতে পরের চাকরি কোরে মরেন কেনো ?

অপর্ণা। তার জন্যে করেন না, শুনেছি "দাস্যভাব" সর্ব্বক্ষণ সজাগ থাকবে বলে'—

কদম। (সাগ্রহে) বলে না কি ? তা আমার মত গোসাইবাবুদের বাড়ী বাসন মাজেন না কেনো—এক ডাঁই বাসোন—তাতে দিনে সাতশো বার তাঁর দাস্য ভাব জেগে উঠবে—এক মিনিট মাটি হবে না—বৃথা যাবে না!—ওটা তবে চাকরি নয়—দাস্যভাবের মণ্ডলা! বউঠাকরুণ, সাবধান। ওদের পাল্লায় পোড়ো না— পোড়ো না—

অপর্ণা। (একটু বিরক্ত রোষে) ওকি কদম! কাকে কি বলিস ? তোর মুখের যে একটু আগোল নেই—ছিঃ।

কদম। মাপ করো—দিদিমণি! আমি তো আগেই বলেছিলুম—ও-কথায় টেনে আমার পাপ বাড়িও না—

অপর্ণা। থাক্। আমি ভাবচি গ্রামের অনেকেই—কর্ত্তারা পর্য্যন্ত ওঁর ভক্ত। তাদের ঝোঁকও যে ওই দিকে! মেয়েদের কথাও তো শুনলি ? অনাথা অসহায়া হয়ে যেখানে থাকতে হয়···

কদম। সেখানে অভক্ত আর একঘোরে হয়ে থাকবে কি করে ? এই না ? নাই বা রইলে। ১৭ হাজার টাকা থাকলে, বাপের বাড়ী আছে, কাশী বিন্দাবন আছে, পুরী আছে। যেখানে ইচ্ছা হয় থাকতে পারো। এখানে তোমার আছে কে ? কি সুখে থাকা ?

অপর্ণা। (দীর্ঘনিশ্বাসান্তে বিষাদমলিনমুখে ধীরে ধীরে করুণকণ্ঠে)—এইখানেই যে আমার সব রয়েছে কদম। এটা যে তাঁর শোবার ঘর। এই ঘরে এলে আমি যে তাঁর প্রতিদিনের প্রত্যেক কথাটি শুনতে পাই। ঐ চেয়ারে তাঁকে দেখতে পাই। (চক্ষু মুছে) একদিন এই পোড়া চোখে একটা কুটো পড়েছিল। তাঁর সে কি ভয়, কি ব্যাকুলতা! কাছারি যাওয়া হল না। আমাকে নিজের চেয়ারে বসিয়ে—কি সন্তর্পণে কতো যত্নে চোখ দেখা! তাঁর সেই স্পর্শ, ঐ চেয়ারে বসলে, আজো আমি পাই। তাঁর সেই ব্যাকুল চোখের ছাপ্, আমার চোখের মধ্যে আজো তেমনি আঁকা রয়েছে যে কদম। (চোখ মুছে) তখন সেই নিয়ে কত না হেসেছিলুম, কত কি বলেছিলুম! আর আজ কুটো নয়—আকাশ ভেঙে পড়েছে—তবু যে একবার দেখচেন না! কোথায় তিনি কদম ?

অপর্ণা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো

কদম অপর্ণাকে কেঁদে একটু হাল্‌কা হতে দিয়ে সরে গেল—পরে

অপর্ণা। (সিক্ত স্বরে) এ ভিটেতে এমন স্থান আছে কি কদম—যেখানে তাঁর পা পড়েনি, যেখানে তাঁর পায়ের ধূলো নেই! এর সবটুকু মাটিই যে আমার মাথার জিনিষ! এর চেয়ে আমার বড়ো তীর্থ কোথায় আছে—কোথায় পাবো? এ ছেড়ে আমি যাব কি করে—এ যে আমার দেবতার মন্দির কদম—

চোখ মুছলেন

কদম। (অপ্রতিভ ও ব্যথিত ভাবে) দিদিমণি আমায় মাপ করো—আমি টাকাটাই দেখেছিলুম। মাপ করো দিদি, যাও চোখে মুখে জল দিয়ে এসো

অপর্ণা তাই করতে গেল

তাই তো! দিদিমণি ভাব নিয়ে বসে থাকবেন, আর এক-রাশ টাকার জিনিষ—সয়তানে ফাঁকি দিয়ে নেবে। আমার ঘুম গেলো দেখচি! উনি তো দেখচি—এরি মধ্যেই হাত ধুয়ে বসেছেন···

অপর্ণা ফিরে এলো

(অপর্ণার প্রতি) তা একবার দাদাবাবুদের জানাতে তো হবে। ছোটদাদাবাবুর কাজ নয়, হাঁ বড়দাদাবাবু পুরুষ বটে, যেন শঙ্কর মাছের চাবুক—কেটে চলে—

অপর্ণা। তাতে আর আমার কি? কই একবার কেউ আসতে পারলেন? বড়দা লিখলেন এখন তিন মাস তাঁর নাগপুর থেকে নড়বার উপায় নেই—তিনি সরকারের উকিল। এলেই বা এমন কি সুবিধে হোতো! এলে আমাকে তাঁর বাড়ী গিয়ে থাকতে বলতেন। আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না কদম।

কদম। যাক্, কিন্তু তেমন আর কাকেও তো দেখতে

পাচ্ছি না যে পরামর্শ নি। আমরা তো তবু মেয়েমানুষ, চন্দোর বাবুটি মেদী মানুষ। আমার তো কাউকেই বিশ্বাস হয় না। তবে শিরোমণি মশাই কি বলেন—শুনলে হয় না? ঐ মানুষটিই খাঁটি বলে আমার মনে হয়।

অপর্ণা। (উদাসভাবে) শুনেই বা কি হবে কদম? বলচিস্ যখন—আচ্ছা, ঐ মানুষটির ওপর আমারও শ্রদ্ধা হয়, কিন্তু তিনি ...

কদম। সেই ভালো দিদিমণি, আমি গিয়ে একবার তাঁকে দেখে আসি—

সহসা উৎকর্ণ হয়ে

তাঁর গলা না—হ্যাঁ তাঁরই তো। তিনি বেরোন না তো—দেখি—

প্রস্থান

(পরক্ষণেই ফিরে) আমাদের বড় ভাগ্যি তিনিই আসচেন—

অপর্ণা তাড়াতাড়ি আসন এনে পাতচেন এমন সময় শিরোমণি মশাই গলার সাড়া দিতে দিতে প্রবেশ। গলবস্ত্র হয়ে অপর্ণার প্রণাম।

শিরোমণি। এসো মা এসো (বলেই একটু বিচলিত ভাবে) তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করবো মা—ভগবান তোমাকে কৃপা করুন; তুমি যেন তাঁকে ভালোবেসে শান্তি পাও। এদিকে আসতে আর পা ওঠে না মা—

কদম। (কথা বাড়াতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি) ওই আপনাদের পুকুরের ওপর বাবু বাগান-বাড়ী করেছিলেন—

শিরোমণি। আহা—আহা—সেকথা আর কেনো মা—

কদম। সে-বাড়ী রেখে আর কি হবে বাবা, দেখবেই বা কে, তাই মিত্তির মশার ওপর বিক্রির ভার দেওয়া হয়েছিল—

শিরোমণি। এখন তাই ভাল মা···

কদম। তিনি তার জন্যে দয়া করে অনেক জায়গায় ঘুরে-ফিরে এসেছেন। সকলেই ও বাড়ী নিতে নাকি ভয় পায়। তারা শুনেছে ওটা ভূতের বাড়ী, তাই নাকি বাবুরও ভোগ হল না—

শিরোমণি। নারায়ণ, নারায়ণ, একথা কে বলে—মিথ্যে কথা। এসব কি কথা!

কদম। তাই তো বললেন। সেদিন ওঁদের সিদ্ধি সভা বা মুক্তি সভা ছিল—তাঁর আজকাল সমাধি হচ্ছে কিনা, সেই অবস্থায় তাঁর মধ্যে দিয়ে নাকি রাধারাণী বললেন—"আমি ওই ব্রজমন্দিরে থাকবো—ব্রজ অন্তিম কালে মনে প্রাণে সেই ইচ্ছা করে গেছে—ভক্তের ইচ্ছা আমি পূর্ণ কোরবো—তার আত্মাকে দুঃখী করতে পারব না। মিত্তির মশার ইচ্ছা ছিল—ঐ বাড়ীতে কিছু দিন নামকীর্ত্তন আর দানের ব্যবস্থা করে ওবাড়ী শোধন করে ভূতের অপবাদ মিটিয়ে, মন্দ লোকের মন্দ অভিপ্রায় সফল হ'তে দেবেন না—

শিরোমণি। তার পর?

কদম। তার পর ভূত-শুদ্ধি আর করতে হল না, রাধারাণী নিজেই ও বাড়ীতে থাকবেন, পুজা, সংকীর্ত্তন আর দানও চলবে। এখন দিদিমণির কর্ত্তব্য কি, সেইটে আপনার কাছে তিনি শুনতে চাচ্ছেন—

শিরোমণি। (মাথা চুলকে, অত্যন্ত বিব্রত ভাবে) মা, আমি কঠোপনিষদের মধ্যেও এত বড় কঠিন সমস্যা পাই নি। যা শুনলুম তাতে বুঝতে পারচি—আমিও তোমাদেরই মত মেয়েমানুষ। সমাধি আমার কখনো হয়নি, তার সঙ্গে পরিচয়ও নেই। ওতে ভক্ত আর বিশ্বাসীর অধিকার থাকতে পারে। আমি ও দুয়ের কোনটাই নই—বেদান্ত নাড়াচাড়াই করেছি। দুই আর দুয়ে চার হয়—তাও বুঝতে পারি, কিন্তু ভক্তি আর সম্পত্তিতে মিশে যে কি হয়, তা বলতে পারি না মা। রাধারাণী তাঁর ইচ্ছাটা বউমাকে জানালেই তো বিষয়টা সহজ হত; আর তার স্মৃতিটা বউমার জীবনটাকে শান্তি দিতে পারতো। তিনি তা করলেন না যে কোনো—এইটুকুই বুঝতে পারলুম না মা—

কদম। আজ ভোরে বার-বাড়ী ঝাঁট দিচ্ছি, চৌধুরী মশাই যাচ্ছিলেন, বললেন—'বুঝ্‌তে পেরেছ ঐ সমাধির ব্যাপারটা? ওকে বলে দৈবী পরীক্ষা—ওটা বউমার বিশ্বাসের ওপর রাধারাণী পরীক্ষা করচেন। তাঁর আর অভাবটা কিসের? কৃপা না থাকলে আর—'

শিরোমণি। তা হবে মা। আমাদের মত দুর্ব্বল সংসারীর ওপর মায়ের এ যে বড় কঠিন পরীক্ষা—

অপর্ণা। (পশ্চাত হতে কদমের আঁচল টেনে মৃদু কণ্ঠে) আমার মত পাপীকে তিনি দেখা দেবেন কি করে'—আমার মধ্যে আসবেন কি করে?

শিরোমণি। (শুনতে পেয়ে) সে কি মা, সবই তাঁর

দেহ, সব দেহই তাঁর মন্দির যে! ও কথা যাক্, তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে—ও বাগান-বাড়ী রাধারাণীরই রইলো। তিনি তো আর হাতে করে কিছু নিয়ে যাবেন না, রেজেষ্ট্রী করে নিতেও আসবেন না। তবে—তার বেশি কিছু থাকে তো—তোমার ভায়েদের সামনে হওয়াই উচিত। তাড়াতাড়ি তো নেই। এখন তবে উঠি মা, অতখানি যেতে হবে—একটুতে হাঁপ ধরে।

অর্পণা ও কদম প্রণাম করলে

ভগবান শান্তি দিন

প্রস্থান

কদম অপর্ণার মুখের দিকে চাইলে

অপর্ণা। (একটু নীরব থেকে) স্বামীর সখের জিনিষ, দেবতাকে দিতে পারলেই তো স্বস্তি···

কদম। (অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে একটু সামলে) হাঁ—সে তো দেবতাকে দিতে পারবার কথা

অপর্ণা। এও তো তাই···

কদম। (উদাসভাবে) তা—হবে!

অপর্ণা। এটা কি দেবতাকে দেওয়া হবে না?

কদম। তুমি দিলেই হবে। বিশ্বাস থাকলেই হ'ল।

অপর্ণা। সে ভয় তুই করিস নি। আমার যেন কেবল মনে হচ্ছে—ও ঝঞ্ঝাট্ যত শীগ্‌গির মেটে, ততই ভালো। আমি দোটানায় পড়ে থাকতে পারচি না কদম।

কদম। তবে আর ও-নিয়ে ভাবনা কেনো?

অপর্ণা। (তুলসীতলায় প্রণাম) ঠাকুর তুমি আমায় বল দাও

কদম দ্রুত একটা কলসী নিয়ে জল আনতে বেরিয়ে গেল

অপর্ণা। (প্রণামান্তে উঠে চিন্তা) কদম বুঝচে না—চটুচে। রাগ করে' গেলো। আমি ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা অসহায়া। স্বামীর বিষয়ের ওপর ঠাকুর দেবতার নজর! গ্রামের প্রায় সব মেয়ে-পুরুষই ভক্তিভূষণ ঠাকুরের শিষ্য সেবক। একদিকে এই অসহায়ার ওপর তাঁদের ইচ্ছার দাবী—অন্যদিকে সমাধি-বাক্যের প্রভাব। তার ওপর এই ২৩ বছরের ব্রাহ্মণের বিধবা। মা রক্ষা করো। ও-সমাজ কোনদিন আমাদের মুখ চায়নি। দোষ পেলে তো কথাই নেই, না পেলে সৃষ্টি করেও অসহায়াদের সর্ব্বনাশ করে। এই গাঁয়েই তো তা দেখেছি—এর মাঝেও তো সেই সব কর্ত্তারাই রয়েছেন! তখন মা গঙ্গা আমাকে স্থান দিতে পারলেও মরণেও তা মরবে না। মানুষের মুখের পথ ধরে সে যে পর-পারেও পৌছুঁতে চায়! কদম সে কথা ভাবতে চায় না। আমি যখন এ-ভিটে ছাড়তে পারব না, তখন আমার আর কোন্ উপায় আছে?

দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে চোখ মুছতে মুছতে ঘরে চলে গেলেন;

জলের কলসী কক্ষে গব্ গব্ করতে করতে কদমের প্রবেশ

কদম। না—এ আমি সইতে পারব না। এতো শুধু লোকসান নয়—সজ্ঞানে ঠকা! এ যে নির্ব্বোধ সেজে ভাড়াটে-ভক্তির ঢোলের বোল্ শোনা। ১৭ হাজার টাকার বাড়ী—ন দেবায়—ন ধর্ম্মে! সত্যিই ভূতের বাড়ী হবে গা!

সজোরে ঝনাৎ কোরে দোর বন্ধ করলে

ক্রমশঃ

নহে সেতো বসুধার মৃণ্ময়ী কায়া

শ্রীসমরেন্দ্র দত্তরায়

তোমার ধ্যানেতে যবে মগ্ন রই প্রিয়া,
পূর্ণরূপে ধরণীর সব বিস্মরিয়া,
অসীম গগনতলে অপার পুলকে
খুঁজে মরি রূপ-জ্যোতি দ্যুলোকে ভূলোকে,
তখন যে মূর্ত্তি তব মোর প্রাণপুটে
সত্য-শিব-সুন্দরের স্পর্শ হতে ফুটে।

নহে সে তো বসুধার মৃণ্ময়ী কায়া
চিন্ময় আত্মার সে যে চিন্ময়ী ছায়া।
সীমাহীন জীবনের দীপ্ত দীপখানি
জ্বালাতে সে পারে; চির উন্মেষের বাণী
দিয়া নিত্য নবরূপে আশার সঙ্গীতে
ভরে ওঠে চিত্ততল প্রেমমুগ্ধ চিতে।

নারী শিক্ষা সম্বন্ধে আবেদন

শ্রীবীণাপাণি দেবী

আজকালকার এই রাশি রাশি স্ত্রী-শিক্ষা এবং স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিভিন্ন-রূপ মতামতের মধ্যে আমার এই ক্ষুদ্র মত এবং অনুরোধ যে আমাদের এই বিরাট সমাজের কতটুকু কল্যাণ-সাধনের প্রয়াস পাইবে বলিতে পারিনা। তবে সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিব। লেখক ও লেখিকা কেহ স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে, কেহ বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন, যদিও ইহা নূতন নয়। জগতের সকল ক্ষেত্রে সেকালের ও একালের, প্রাচীন ও নবীনের এ বিভেদ আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়াই আসিতেছে এবং চলিতে থাকিবে। ইহা আশার—কি নিরাশার কথা বলিতে পারিনা। কিন্তু প্রাচীনের সমূলে ধ্বংস ত কই আজ পর্য্যন্তও দেখা গেল না। যদি স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকিত ; যদি প্রাকৃতিক বিধানে নারী সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ হইবার যোগ্য হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজও নারীর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিতে হইত না। প্রাকৃতিক বিধানানুযায়ী বিচার পক্ষে, নারী পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র ভেদ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান সর্ব্বত্রই পুরুষ নারীর উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে। অবশ্য তাহার মধ্যে প্রাচীনের বীর রমণী যেরূপ ঝাঁসীর রাণী, যোন্ অফ্ আর্ক এবং অধুনার ম্যাডাম চিয়াং কাইশেক্ ইঁহাদের বিষয় ধর্ত্তব্য নয়। কেননা সে রকম ধরিতে গেলে পুরুষের পৌরুষের উদাহরণ ত আর ওরূপ দুদশটার মাঝে সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের স্ত্রীলোকের মাঝে যে যথার্থ জ্ঞানের প্রতিভা কাহারও মাঝে নাই তাহা বলিনা। বরং কাহারও মাঝে এত বেশী আছে যে তাহা যে কোন পুরুষের পৌরুষত্বকে খর্ব্ব করিতে পারে এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানপ্রতিভাকে যথার্থরূপে প্রকাশের সর্ব্বতোভাবে বিশেষরূপে সাহায্যও করা উচিত।

তবে আমাদের এই সাধারণ স্ত্রীলোকদের যথার্থতঃ চাই কি ? চাই উন্নতি। উন্নতি কাহাকে বলিতে পারা যায় ? আধ্যাত্মিক উন্নতি বা সামাজিক উন্নতি। উন্নত হইলে মানুষ কি পায় ? উন্নত মানুষের জীবন সুখময়—না দুঃখবিড়ম্বিত ? অধুনা যে উন্নতির দ্বারা পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যাইতেছে সে উন্নতির আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে কিনা। ইহাই আমাদের অতি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া নর-নারীর কার্য্যক্ষেত্রকে একীকৃত করা কর্ত্তব্য। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে স্ত্রী-শিক্ষার যথেষ্টই প্রয়োজন। কিন্তু বিকৃত শিক্ষার ফল কখনও সুফল হইতে পারেনা। নারীকে পত্নী ও মাতা থাকিতে দিয়া তাঁহাদের যত কিছু উচ্চ-শিক্ষার দরকার সেই শিক্ষায় তাঁহাদের শিক্ষিত হইতে হইবে। অনেক আধুনিক শিক্ষিত নরনারী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও এত সঙ্কীর্ণ মনের দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকে (যাহারা সে হিসাবে একেবারেই অশিক্ষিত) ইঁহাদের তুলনায় যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা কিসের ফল ? যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের সম্যক্ বিকাশ হয়না তাহা ঠিক শিক্ষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ বটে। শিক্ষিতা স্ত্রী সমাজে সংসারে সুশৃঙ্খলা আনিবেন, সন্তানকে সুপালন করিবেন ও সুশিক্ষা দিবেন, ইহাই হইল স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা। আমার মনে হয়, যদি চেষ্টা করিতে হয় তবে যেটা মানুষের সব চেয়ে বড় অভাব—তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যা করিলে এ স্বাস্থ্যহীন ধ্বংসোন্মুখ জাতির স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে পারে—ধর্ম্মোন্নতি ঘটিয়া মনুষ্যত্ব লাভের সহায়ক হয়। সেই শিক্ষার প্রবর্ত্তন জন্য আমাদের সমবেত চেষ্টা ও যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাচীনকালে নারীর স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলিয়া অনেকে দোষারোপ করেন। কিন্তু ভারতীয় নারী স্বাতন্ত্র্য-বর্জ্জিত না হইয়াও কি যে কোন দেশের নারীর অপেক্ষা কোনও রূপে অবনত ছিলেন ? তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষা এতই প্রগাঢ় ভাবে হইত, যে স্বধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহারা সুখ আশাপূর্ন অতৃপ্ত মানব জীবনকে সামান্য তৃণের ন্যায় অনায়াসে হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডে প্রদান করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না।

আমার বক্তব্য এই যে, মেয়েরা শিক্ষিতা হউন। পারেন ত পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করুন। কিন্তু তাঁহাদের পুরুষ হইয়া কাজ নাই। তাঁহারা পুরুষের সহকর্ম্মিণী না হইয়া সহধর্ম্মিণী থাকুন, সন্তানের নামে-মাত্র গর্ভধারিণী না হইয়া প্রকৃত মা হৌন, যাতে তাঁদের সন্তান ধর্ম্মশিক্ষার, নীতিশিক্ষার অভাবে কু-সন্তানে পরিণত না হয়। তাঁদের পুরুষ হইয়া কাজ নাই এইটুকু আবেদন।

জগতে পুরুষের সহিত সমকক্ষতা লাভই যে উন্নতির চরমোৎকর্ষ, ইহাই বোধ হয় প্রমাণ নহে। যাহাতে আমাদের জাতির প্রকৃত উন্নতি লাভ হয় তাহাই আমাদের সমবেত চেষ্টা হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আজ এই উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতায় ইউরোপীয় সমাজই সমগ্র ইউরোপীয় জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তে ভয়ের উদ্রেক আনিয়াছে, তাহাও তাঁহাদের দেশেরসংবাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অথচ আমরা মোহমুগ্ধ অন্ধের মত সেই সর্ব্বনাশী মোহে মত্ত।

আমার আবেদন এই যে নারীরা শিক্ষিতা হউন এবং সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হউন, যে শিক্ষায় আমাদের মহিমান্বিতা নারী—সীতা, সাবিত্রী, সতী, অরুন্ধতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী। সকলে শিক্ষিত হইয়া আজও ভারতের চক্ষে দেবী বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন।

ব্যথার পূজা

শ্রীনিত্যহরি ভট্টাচার্য্য

পাড়াগাঁ, আশেপাশে বনবাদাড়, ডোবা পুকুর। এধারে ওধারে খড়োঘর, পাকা বাড়ী—তারি মাঝে একখানা দোতালা বাড়ী।

বাড়ীখানায় যিনি রয়েছেন—নাম তাঁর শরৎ রায়। কোলকাতাতেই থাকেন—অফিসে চাকরী করেন। মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ীতে এসেছেন।

আছে তাঁর স্ত্রী মাধবী—দুটি মেয়ে, আর একটি ছেলে।

কমলা বড়—বিয়ে হয়ে গেছে; খোকা একটি কোলে পেয়েছে সম্প্রতি। শরীর খারাপ—বাপের সঙ্গে এসেছে এখানে বেড়াতে।

মেজ সলিল—বয়স বছর সাতেক, ছোট অমলা—তার বছর দুয়েকের ছোট।

মিঃ রায় তখন চাএর পেয়ালাটা সবে মুখের কাছে ধরেছেন এমন সময় সলিল কাঁদতে কাঁদতে এসে বলে উঠলো—অমু আমার দাঁত হারিয়ে দিয়েছে—য়ঁ্যা, য়ঁ্যা···

পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়ে মিঃ রায় বললেন—কিসের দাঁত হারিয়ে ফেলেছে অমু?

সলিল বললে—কাল রাতে আমার দাঁত পড়ে গিয়েছিল। বড়দি বললে, রেখে দিতে—সকালে ইঁদুরের গর্ত্তে দিলে তবে দাঁত হবে! বালিসের তলায় রেখেছিলাম, অমু দেখছিল, কোথায় ফেলে দিয়েছে—য়ঁ্যা, য়ঁ্যা···

ব্যাপারটা বুঝে মিঃ রায় তাকে কোলের কাছে টেনে বললেন—এরই জন্যে কান্না! পাগল ছেলে—দাঁত তোর ঠিকই হবে। যেখানেই দাঁত ফেলুক অমু, ইঁদুর ঠিক খুঁজে তার গর্ত্তে নিয়ে যাবে, আর দেখবি ঠিক ইঁদুরের মত ছোট্ট দাঁত হবে।

মুখের দিকে চেয়ে সলিল বললে—বড়দি যে বললে ইঁদুরের গর্ত্তে দাঁত না দিলে আর দাঁত ওঠে না—ফোকলা হয়ে থাকে—

এমন সময় অমলা ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে—এই নে দাদা, তোর দাঁত পেয়েছি—খাটের পায়ের পাশে পড়েছিল—

সলিল লাফিয়ে গিয়ে তার রাতে পড়ে-যাওয়া দাঁতটা হাতে ক'রে নিলে। বৃষ্টি—রৌদ্রের খেলার মত—চোখের জলের মাঝে তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো!

মিঃ রায় বললেন—দেখলি তো, তুই কাঁদছিলি বলে ইঁদুর দাঁতটা খুঁজে খাটের পায়ের কাছে রেখে গিয়েছে। এইবার ইঁদুরের গর্ত্তে দিগে যা।

কি মন্ত্র আছে বাবা বল না, বড়দি বলছিল—বলে সলিল আবার তাঁর কোলের কাছটিতে সরে এলো।

মুস্কিলে পড়লেন মিঃ রায়, বললেন—আমার দাঁত তো সে অনেকদিন আগে পড়েছিল, মন্ত্র ভুলে গিয়েছি—যাও তোমার বড়দির কাছ থেকে জেনে নাওগে—

দুই ভাইবোনে হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে চলে গেল।

চাএর পেয়ালাটা রেখে দিয়ে—একটা সিগারেট ধরিয়ে মিঃ রায় একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইলেন।

কমলার কাছে এসে সলিল বললে—বড়দি ভাই, দাঁত পেয়েছি, মন্ত্রটা শিগ্গীর করে বলে দাও, ইঁদুরের গর্ত্তে ফেলে দিই।

কমলা তখন তার খোকাকে জামা পরিয়ে দিচ্ছিল, বললে—ইঁদুরের গর্ত্তে দাঁতটা ফেলে দিয়ে তিনবার বলবি—ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই, আমার এই ভাঙ্গা দাঁত নিয়ে তোমার মত ছোট দাঁত দাও···

সলিল বললে—তারপর কি করবো?

কমলা বললে—করবি আর কি, চলে আসবি!

একটু চুপ করে থেকে সলিল আবার বললে—কোথায় ইঁদুরের গর্ত্ত আছে দিদি?

নিজের ছোট খোকাটিকে নিয়ে তখন মহাব্যস্ত কমলা। প্রেমের পরম ও প্রথম সার্থকতায় নূতন ছোট অতিথিটি এসে তাহার হৃদয় রাঙিয়ে দিয়েছে, তাতেই সে দিশেহারা, তাতেই সে মশগুল, তারি মাঝে থেকে বললে—ঘুঁটের ঘরে একটা গর্ত্ত দেখে তার সামনে রেখে আসবি।

দুই ভাইবোনে নাচতে নাচতে মনের আনন্দে চললো—যেন কি এক মহামণির সন্ধান তারা পেয়েছে।

নীচে একপাশে একটা ছোট মেটে ঘর আছে—তার মধ্যে থাকে ঘুঁটে, কাঠ, টুকি টাকি সব বাজে জিনিষ! ঘরটা স্যাঁৎসেতে—আলোও কম আসে; তার উপর ক'দিন এক-ঘেয়ে বৃষ্টিতে তারি আউতায় আরো স্যাঁৎসেতিয়ে উঠেছে!

ঘরের মধ্যে ঢুকে একপাশে একটা গর্ত্ত দেখলে, দুই ভাই-বোনের দেখাশুনায় ঠিক হলো ঐটাই ইঁদুরের গর্ত্ত, তারপর দাঁতটা গর্ত্তর সামনে রেখে দিদির বলে দেওয়া মন্ত্রটা সলিল বলার সঙ্গে সঙ্গে অমলাও বলতে লাগলো—!

সলিল দাঁতটা সেখান থেকে তুলে নিয়ে বললে—তোর তো দাঁত ভাঙ্গেনি, তুই বলছিস কেন, চুপ কর। তারপর দাঁতটাকে আবার সেখানে রেখে, মন্ত্রটা তিনবার বলে সেইদিকে চেয়ে রইলো।

...ওপর থেকে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে এসে সলিল দেখলে—দাঁতটা সেইভাবে পড়ে আছে।

ছুটে এলো সে ওপরে দিদির কাছে—বললে—কই দিদি, ইঁদুর তো দাঁত নিয়ে যায়নি—নেবে না দিদি?

কমলা হেসে বললে—হ্যাঁ রে হ্যাঁ নেবে, তুই বুঝি ঘুরছিস ফিরছিস আর গিয়ে দেখছিস! বারে বারে ওর কাছে গেলে ইঁদুর ভয় পাবে—আর দাঁত নেবে না।

সলিল বুঝলে—হবেও বা তাই।

খানিক পরে আবার সে অমলার হাত ধরে দেখতে গেল—তখনও সেটা সেই ভাবে পড়ে।

এবারও সে কমলাকে বললে।

কমলা বললে—তুমি খালি খালি যাচ্ছ, ইঁদুরে কখনও দাঁত নেবে না, দেখিস তোর দাঁতও বেরোবে না।

সলিল বললে—আচ্ছা দিদি, আর দেখবো না, বেরোবে তো? তুমি একবার গিয়ে লুকিয়ে দেখো—ইঁদুর যেন দেখতে না পায়।

কমলা হাসতে হাসতে বললে—আচ্ছা সে হবেখন—তুমি খেলগে যাও।

সলিল চলে গেল কিন্তু থেকে থেকে তার অস্বস্তি হতে লাগলো দাঁতটার জন্যে। জিভটা ভাঙ্গা দাঁতটার খালি জায়গাটায় ঠেকাতে লাগলো। ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগলো, মন্ত্রটা আস্তে বলেছিলাম, গর্ত্তের মধ্যে থেকে ইঁদুর তো শুনতে পেয়েছিল? না, মন্ত্র ঠিক শুনতে পেয়েছে, এতক্ষণে দাঁতটা নিশ্চয়ই নিয়ে গেছে!

ঘরের মধ্যে এক ফাঁকে এসে ছোট আরসিটা নিয়ে মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—হাঁ করে, দাঁতগুলো বের করে, তারপর ভাঙ্গাজায়গাটায় খুব ভাল করে দেখতে লাগলো যদি এতক্ষণে একটুখানি বেরিয়ে থাকে! আঙুলটা সে খালি জায়গায় দিয়েও বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলে না। বাড়ীর চাকর মধু বলেছে—বুড়ো—ফোকলা বরকে কেউ বিয়ে করবে না!

না, দিদি হয়তো দেখতে ভুলে গেছে—নিশ্চয়ই ইঁদুরে দাঁত নেয়নি।

আপন মনে গুটি গুটি করে এসে চারদিকে একবার তাকিয়ে গর্ত্তটার সামনে দাঁড়ালো। দেখলো দাঁতটা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে, শুধু লাইনবন্দি ভাবে খুদে লাল পিঁপড়ের দল গর্ত্তর ভিতরে ও বাইরে যাওয়া আসা করছে।

সলিল বুঝলে—পিঁপড়েগুলো ইঁদুরটাকে কামড়াচ্ছে... এদেরই জন্যে সে বাইরে এসে তার দাঁত নিয়ে যেতে পারছে না।

একটা কাঠি নিয়ে সে পিঁপড়েগুলোকে নেড়ে ছাড়িয়ে দিতে লাগলো, তারপর ছোট একটা ইঁট নিয়ে বিজয় গর্ব্বে সেগুলোকে ঘসে ঘসে মেরে ফেলতে লাগলো।

কি করছিস ভাই দাদা?—বলে অমলা সেখানে এসে দাঁড়ালো।

সলিল তখনও পিঁপড়েগুলোকে মেরে চলেছে। তারি মাঝ থেকে উত্তর দিলে—ইঁদুরটা কিছুতেই দাঁতটা নিয়ে যেতে পারছে না, শালা পিঁপড়েগুলো গিয়ে কামড়াচ্ছে কি না তাই, তুইও একটা ইঁট নিয়ে মার।

দুই ভাইবোনে আপন মনে বিজয়-উল্লাসে তাই করে চললো।

খাবার সময় হয়ে গেল—মা বাড়ীময় খুঁজে নীচে এসে দেখলে ঘুঁটের ঘরের মধ্যে দু'জনে উপুড় হয়ে বসে পিঁপড়ে মারছে।

মা বললে—এখানে এই সাপ খোপের এঁদো ঘরের মধ্যে

বসে কি হচ্ছে শুনি? ভাতটাত আজ খেতে হবে না —না কি!

সলিল বললে—পিঁপড়েগুলোকে মারছি মা—এদের জন্যে ইঁদুরটা আমার দাঁত নিয়ে যেতে পারছে না।

মা হাত ধরে তুলতে তুলতে বললে—চ্ খাবি চ। ওরকম ভাবে বসে থাকলে বুঝি ইঁদুর আসে! হ্যাঁরে, বসে বসে এতগুলো পিঁপড়ে মারলি দুজনে—পাপ হবে দেখবি···ব'লে হাত ধরে দু'জনাকে তুললে··!

সলিল বললে—দাঁড়াও, ঐ দেখ দুটো লাল পিঁপড়ে গর্ত্তের ভেতরে ঢুকছে, ও দুটোকে মেরে যাব।

মা ধমকে উঠে বললে—না, পিঁপড়ে মারতে হবে না—এমন পাগল ছেলে কোথাও দেখিনি। বলে দু'জনের হাত ধরে নিয়ে গেল।

উপরে এসে মা কমলাকে বললে—ওখানে বসে দু'জনে পিঁপড়ে মারছিল। পিঁপড়েগুলো নাকি ইঁদুরকে কামড়াচ্ছে, তাই ওর দাঁত নিয়ে যেতে পারছে না।

কমলা বললে—আবার তুই ওখানে গিয়েছিলি, দেখিস না, ইঁদুর কিছুতেই তোর দাঁত নেবে না—বেশ হবে ফোকলা হয়ে থাকবি।

সলিল ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে গুম হয়ে বসলো।

মা বললে—খেয়ে নে—

সলিল কাঁদতে কাঁদতে বললে—কেন বড়দি বলছে ফোকলা হয়ে থাকবি—য়্যাঁ, য়্যাঁ—

মা হেসে ভাত মেখে দিতে দিতে বললে—না, ফোকলা হয়ে কেন থাকবি, ইঁদুরের মত বেশ ছোট্ট দাঁত বেরোবে—নে, খেয়ে নে, দুপুরে আজ একটা ভাল গল্প বলবো।

সলিল খেতে লাগলো কিন্তু মন তার পড়ে রইলো—সেই মেটে ঘরে—গর্ত্তের মুখে সেই ভাঙ্গা দাঁতটার উপর। ইঁদুরের উপর। পিঁপড়েগুলোকে মেরে ফেলেছে, এতক্ষণে ইঁদুরে নিশ্চয়ই দাঁতটা নিয়ে গেছে।

এক সময় হঠাৎ বলে উঠলো—মা, কখন আমার দাঁত বেরোবে?

মা হাসতে হাসতে বললে—বেরোবে, ঠিক বেরোবে। একটা দাঁত ভেঙ্গেই এই; সব দাঁতগুলো যখন একটা একটা করে পড়বে, তখন দেখছি পাগল করে মারবি বাবা! আস্ত ভাতগুলো যে গিলছিস—চিবিয়ে খা—

কমলা বললে—ওর মন এখন পড়ে রয়েছে ওখানে, খাওয়াটা হলে হয়, এখনি ওখানে গিয়ে ঘুরঘুর করবে।

আস্তে আস্তে কমলা উঠে গেল। নীচের সেই ঘরে এসে দাঁতটা গর্ত্তের মুখ থেকে তুলে নিয়ে ঘরের এককোণে ফেলে রেখে ঘুঁটে একখানা চাপা দিয়ে রাখলে।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে সলিল খানিকটা এঘর ওঘর করে বেড়াতে লাগলো, তারপর আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল।

একটু পরে হাসিমুখে লাফাতে লাফাতে এসে বললে—বড়দি, ইঁদুরে আমার দাঁত নিয়ে গেছে, পিঁপড়েগুলোকে মেরে ফেলেছি, এবার ঠিক নিয়ে গেছে। দেখলে?

কমলা হাসতে হাসতে বললে—যাক্, নিয়ে গেছে তো—আর যেন ওখানে গিয়ে বসে থেক না!

একদিন, দু'দিন করে পাঁচদিন গেল—সলিলের দাঁতের কোন লক্ষণই দেখা দিল না। দিনের মধ্যে একফাঁকে অন্তত একবারও সে ঘরের মধ্যে থেকে ঘুরে এসেছে!

সেদিন সকাল থেকে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। মা বারণ করেছে ঘর থেকে বেরোতে—বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে, অমুর সঙ্গে বসে লেখাপড়া করবে। পাশের ঘরে কমলা নিজের ছেলের ভিজে ক্যাঁথা সব কি করে শুকোবে তাই নিয়ে ব্যস্ত··। পোড়া বৃষ্টিরও যেমন বিরাম নেই··· ছেলেটাও তেমনি আজ দিনবুঝে যেন বাদ সেধেছে!

রান্নাঘরে মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। চালে ডালে চড়িয়ে দিয়ে আনাজগুলো কুটছে। বৈঠকখানা ঘরে বাবা পাড়ার দু-চারজন বন্ধুদের সঙ্গে জমাটি আড্ডা বসিয়েছেন। অমু সেলেটের উপর "ক, খ, গ, ঘ" মক্স করে চলেছে!

সকাল থেকেই সলিলের দাঁতটার জন্য মনটা উসখুস করছে: এতদিনেও দাঁতটা বেরোল না। তবে কি ইঁদুর মন্ত্র শুনতে পায়নি!

অমুকে বললে—যাবি অমু, একবার ওখানটায় দেখে আসি। লুকিয়ে যাব আর দেখেই চলে আসবে।"

একে অমুর "খ" লেখাটা ঠিক হচ্ছিল না, মেজাজ খারাপ ছিল, তাই বললে—না, বড়দি বকবে—

সলিল বললে—বড়দি ত ও ঘরে—দেখতে পাবে না—

অমু বললে—আমি যাব না, তুমি গিয়ে দেখে এস।

আপনমনে সলিল চললো। চালের ঘরের গা ঝরে জল পড়ছিল! সলিল হাত বাড়িয়ে ধরলো—টপটপ করে হাতের উপর জল ঝরে পড়তে লাগলো! বাড়ীর পিছনটায় ব্যাঙেরা সব একঘেয়ে মনের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। শিশুমন সব ভুলে গিয়ে একমনে শুনতে লাগলো! নিজে নিজেই বলে উঠলো—"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে"! অমুর কথা মনে হলো—ডেকে আনি, বেশ দু'জনে জল ধরবো, তখনি মনে পড়লো দাঁতের কথা।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সে একটুখানি গর্ত্তটার সামনে বসলো, তারপর ঘাড় নীচু করে গর্ত্তটার ভিতর দেখবার চেষ্টা করলো। ভিতরটা অন্ধকার, কিছুই দেখতে পেল না—কেবল গর্ত্তটার প্রায় মুখের কাছে, একটু ভিতরে কি একটা চক্‌চক্ করছিল।

সলিল ভাবলে বোধ হয় তার দাঁত—ইঁদুরটা নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখেছে। নীচু হয়ে ভিতরটায় আঙুল দিতেই—যন্ত্রণায় চাৎকার করে উঠে আঙুলটা বের করে নিলে তারপর চীৎকার করতে করতে বাইরে আসতে গিয়ে চৌকাঠের কাছে পা পিছলে পড়ে গেল।

ঠিক সেইমুহূর্ত্তে রান্নাঘরে মা থালায় করে কোটা আনাজগুলো কড়ায় চাপান তেলে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বুকটা কেমন করে উঠে হাত থেকে থালাটা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সলিলের মা-রে, দিদি-রে চীৎকার কানে এলো।

বৈঠকখানা ঘর থেকে বাবা, উপর থেকে মা, কমলা, চাকর, মধু সকলেই ছুটে এলো। মা সলিলকে বুকের উপর তুলে নিয়ে কেঁদে উঠলো—ওগো, কি হলো—কি হলো বল না, এ রকম করছে কেন?

সলিল তখন যন্ত্রণায় কাঁদছে, বললে কোন রকমে—ইঁদুর গর্ত্ত থেকে আঙুলে কামড়ে দিয়েছে···

বন্ধু ক'জন চেঁচামেচিতে ছুটে এসেছিল, তারা দেখে বললে—সাপে কামড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

সাপের খোঁজে ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাবে, ঠিক সেই সময় সকলের চোখের সামনে দিয়ে ঘর থেকে একটা কেউটে সাপ বেগে বেরিয়ে বাড়ীর পিছনে বনবাদাড়ের দিকে চলে গেল।

সলিলকে কোলে করে উপরে আনা হয়েছে। ডাক্তার এসে কাটাকুটি—কত কি করলে। সাপের ওঝার তুক-তাক মন্ত্র কোন কিছুরই ফল হলো না। ক্রমে তার দেহ অবশ হয়ে নেতিয়ে আসতে লাগলো।

কমলার মনে পড়লো দাঁতটা সে সরিয়ে রেখেছিল। সব ফেলে ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে দাঁতটা নিয়ে এসে সলিলের অন্য একটা হাতে দিতে দিতে বললে—এই নাও ভাই, তোমার দাঁত, আমি রাক্ষসী লুকিয়ে রেখেছিলাম। ওরে, যে ভয়ে রেখেছিলাম, তাই তো হলো রে··

দাঁতটা হাতে নিয়ে যন্ত্রণার মাঝেও সলিলের মুখে খুব ক্ষীণ একটু হাসি যেন ফুটে উঠ্‌লো! হাতখানা তুলতে গেল, পারলে না।

সমস্ত নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ বনানী—নিস্তব্ধ বাতাস। আকাশও নিস্তব্ধ। ধরেছে সবে সমস্ত দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। গুমটে আবহাওয়ায় যেন এক আসন্ন প্রলয়ের সূচনা দিচ্ছে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকা, ব্যাঙেরা সব আনন্দের কি দুঃখের এক ঘেয়ে গান গেয়ে চলেছে।

যে মার দেহের প্রতি অণুপরমাণু দিয়ে তৈরী সলিলের দেহটা—সেই মারই বুকের তলায় সেটাকে ফেলে রেখে তার ভিতরের বদ্ধ পাখীটা মুক্তি পেল নিশীথিনীর ঐ মুক্ত বুকে।

ছোট্ট সলিলের ছোট্ট সেই দাঁতটা রূপার ফ্রেমে বাঁধানো—নীচে লেখা "স্মৃতি"! ছোট একটা জলচৌকির উপর পেতে বসান হয়েছে সেইখানে—যেখানে সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—নিষ্পাপ নির্ভীক মন নিয়ে ঘুর ঘুর করে বেড়াত—মৃত্যু যেখানে এসে তার প্রথম স্পর্শ দিলে—সেইখানে—সেই স্মৃতিবাসরে···

কত দিন, মাস, বরষ কেটে যায়। আবার সেই দিন আসে···

সেই দিনের সেইখানটিতে ঝরে পড়ে চোখের জল বাপ-মার দুজনারই—স্মৃতির দুয়ার খুলে।

শান্ত, মৌন ভক্তের মত দু'জনাই বসে থাকে সামনে রেখে মালায় সাজানো—বাঁধানো সেই দাঁতটা…

পাথরে বাঁধানো দেউড়ি গড়ে উঠেছে সেই আবর্জ্জনা ঘরের অস্তিত্ব মুছে নিয়ে।

মন্দিরের মত পবিত্র—শ্মশানের মত নিস্তব্ধ করুণ—ছমছমে তার ভাব।

তারি মাঝে খোলা একটু মাটির বুকে বেড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে একটা শিউলি গাছ…! ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে শিউলি ফুল—পাথরের ঐ দেউড়ির বুকে!

কেউ দেখে না, কেউ জানতেও পারে না—শুধু পারে বাপ মা সেদিন—যেদিন বন্ধ ঘরের দুয়ার খুলে তারা আসে স্মৃতির বেদীমূলে!

কোলকাতা থেকে এসে তারা ঐ দিনটা ওইখানে কাটিয়ে যায়—স্মৃতির বাতি জ্বালিয়ে।

ছোট্ট মুখের মিষ্টি কটি কথা যেন শুনতে পায়—কই দিদি, ইঁদুর তো দাঁত নিয়ে যায় নি, নেবে না দিদি? কবে দাঁত বেরোবে? পিঁপড়েগুলোকে মারছি মা, এদের জন্যে ইঁদুরে আমার দাঁত নিয়ে যেতে পারছে না! আচ্ছা, আর যাব না দিদি, তুমি একবার গিয়ে লুকিয়ে দেখে এস, ইঁদুর যেন দেখতে না পায়…

প্রলয়ের বাঁশী

শ্রীনকুলেশ্বর পাল বি-এল্

হে মোর অন্তরতর! হে চির-সুন্দর!
এক হাতে গড়ি বিশ্বে সৃষ্টি অনুপম
অন্য হাতে ভাঙ্গ নিরন্তর।

এ যেন পুতুলখেলা চির নব নব;
নিখিল ভুবনব্যাপী খেলাঘরে তব।
মধুর মাধবীরাতে জোছনার হাসি;
ছড়ায়ে বিশ্বের বুকে শুভ্র মুক্তারাশি;—

যবে গায় মিলনের গান
আকুল করিয়া মুগ্ধ বিরহীর প্রাণ?
সহসা বাজাও তব সর্ব্বনাশা বাঁশী
আঁধার ঘনায়ে আসে, কৃষ্ণ মেঘরাশি

উড়ায়ে পিঙ্গল জটা যেন মহেশ্বর;
ধ্বংসের খেলায় মাতে কাঁপায়ে অম্বর,
মুহুর্মুহু ঝঞ্ঝাবাত অট্ট-অট্ট-হাসি
সম্বর, সম্বর তব প্রলয়ের বাঁশী।

তোমার সৃষ্টিরে তুমি হে শ্যামসুন্দর!
নিতি নিতি কেন গড়ি ভাঙ্গ নিরন্তর?

কেন?

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

চাঁদের আলোয় বসুধা যখন ঘুমায়ে পড়ে,
তখন কেহ কি জাগিয়া দেখেছ গভীর রাতে;
দেখেছ পরীরা উড়িয়া বেড়ায় আকাশ ভরে
খুঁজিয়া পেয়েছ ঘুম কেন নাই নয়নপাতে?

শুন নাই বুঝি বনের কিনারে চরণধ্বনি
শকুন্তলার হৃদয় সেথা যে গুমরি কাঁদে?
চমকি ওঠনি সহসা বনের বেদনা শুনি,
ভাল ক'রে বুঝি দেখনি চাহিয়া রাতের চাঁদে?

সেদিন কি জানি ঘুম ভেঙে গেল সহসা কেন,
চেয়ে দেখি আলো—চাঁদের আলোয় ভুবন ভরা।
মনে হ'ল রাতি অনেক দেখেছি—দেখিনি হেন
চাঁদ যেন নেমে হৃদয়ে আমার দিতেছে ধরা।

ঘর ছেড়ে ছুটে বাহিরে আসিনু উঠিনু ছাদে,
আকাশের নদী ভরে গেছে রূপে আলোর বানে;
বুঝিলাম মানে এমন নিশীথে কাহারা কাঁদে,
বনের দেবীরা উতলা কেন যে আলোর গানে।

সেরাইকেলা ভ্রমণ

শ্রীকাননগোপাল বাগ্‌চী

কর্ম্মব্যস্ত জীবনের পর অবকাশ এলেই ভ্রমণের ইচ্ছা জেগে উঠা স্বাভাবিক। এবার পূজাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। পূজা আরম্ভ হতেই সেরাইকেলায় চলে এলাম—তবে নিছক ভ্রমণের জন্যে নয়, তার সঙ্গে এখানকার ভূতত্ত্বেরও কিছু পরিচয় জানতে। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কাজ করতে হলেই সে দেশের পথ ঘাট, নদী নালা, বন জঙ্গল সমস্তই পায়ে চলে দেখতে হয়। কাজেই এই ভাবে শুধু ভূতত্ত্ব নয়,

জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি—সেরাইকেলা

সেখানকার ভূপ্রকৃতি ও অধিবাসীদেরও সঙ্গে ঘটে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কোন দেশকে জানতে হ'লে সমস্ত অঞ্চল পায়ে হেঁটে কষ্ট করে না বেড়ালে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। কোন জাতির পরিচয় নিতে হলে, তার ভেতরের তথ্য অবগত হ'তে হলে প্রথমে আত্মীয় বা বন্ধুজ্ঞানে তাদের সঙ্গে মিশতে হয়। হঠাৎ গিয়ে দু-পাঁচ মিনিটের আলাপে আমরা তথ্যসংগ্রহের যে চেষ্টা করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ বা ভ্রমাত্মক।

বি এন্-আর লাইনে জামসেদপুর ছাড়িয়ে খড়্‌কায় নদী অতিক্রম করলেই সেরাইকেলা রাজ্যে পৌছুন যায়; উড়িষ্যা স্টেটস্‌এর অন্তর্গত হলেও ভূপ্রকৃতির দিক্ থেকে একে ছোটনাগপুরের মধ্যেই ধরা চলে। বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়ে ট্রেন যেই ছোটনাগপুরের মধ্যে প্রবেশ করে, দুপাশের দৃশ্যে জেগে উঠে নূতন এক ছবি। দিগন্তবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে উপস্থিত হয় উঁচু নীচু মালভূমি—শালের বনে আচ্ছাদিত, আর তারই বুকচিরে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু ডুঙ্‌রি বা টীলা। কোলভাষায় এদের বলে "বুরু"। বনের ভিতর দিয়ে ডুঙ্‌রিকে প্রদক্ষিণ করে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়ে নদী। গ্রীষ্মের সময় এরা সব শুকিয়ে যায়, কিন্তু বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় এদের কল্লোলিত জীবন। আয়ু এদের অল্প, কিন্তু যৌবনের উচ্ছ্বাসে এরা ভরপুর। পাহাড়ের গা বয়ে পাথরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এই সব নদী অসংখ্য জলপ্রপাত ও আবর্ত্তনের সৃষ্টি করে, যার ফলে শক্ত শক্ত পাথরের উপর গোল গোল ছিদ্রের উৎপত্তি হয়, যাকে "পট্ হোল" (pot holes) বলা হয়। সে সময় এদের বেগ অত্যন্ত প্রখর হয় এবং আঘাত খেয়ে জলে যে শব্দ হয় তাতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠে। জ্যোৎস্না রাত্রে বা সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় এই শব্দ সত্যই অনুভবনীয়।

বাঙ্গলা বা বিহারের একটানা সবুজপ্রান্তর ছাড়িয়ে এসে প্রথমেই আমাদের যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে হচ্ছে এখানকার বিচিত্র ভূমি। কোথাও এর উপর জন্মেছে ঘন বন, আবার কোন স্থানে শীর্ণ উদ্ভিদ্ অতি কষ্টে প্রাণধারণের চেষ্টা পাচ্ছে—"স্ট্রাগল্ ফর্ দি এক্সিস্টেন্স-এ"র মূর্ত্ত প্রতীক্। শুধু এই নয়, কোন স্থান একেবারেই তৃণশূন্য। এর মূলে রয়েছে জমির উপাদানগত পার্থক্য—উপাদান আবার কতকাংশে নির্ভর করে উৎপত্তিগত পার্থক্যের উপর। ছোটনাগপুরের জন্ম-ইতিহাস অতি প্রাচীন। সে আজ প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের কথা—পৃথিবীর অভ্যন্তর হতে আগ্নেয় উৎপাতের ফলে গলিত পাথর উপরে এসে

জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে উঁচু এক পর্ব্বতের। পরবর্ত্তী যুগে তাপ, জল ও বাতাসের প্রভাবে আরম্ভ হয় তার ক্ষয় ও পলির পর পলি সঞ্চিত হয়ে পাথরের গঠন করে। এইভাবে উঁচু পাহাড় এসে পরিণত হয় নাতি-উচ্চ এক মালভূমিতে। অবশ্য এর ঠিক পরেই আর একদফা আলোড়ন, আগ্নেয় উদ্ভেদ ও বিচ্যুতির নিদর্শন এর বুকে সঞ্চিত দেখা যায়। তবে বহুদিন ধরে এ অঞ্চল একেবারেই শান্ত অবস্থায় আছে—এমন কি, বিহার যখন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত—বাঙ্গলাও যখন বাদ পড়ে নি—ছোটনাগপুর সে সময় একেবারেই নির্ব্বিকার।

এই সব বিভিন্ন উপাদানের পাথর অল্পবিস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েই গড়ে তুলেছে ডুংরি, তলদেশ ও নীচু অধিত্যকা বা টাঁড়। প্রকৃতিগতবৈষম্য আমাদের কতখানি প্রভাবান্বিত করে, সেরাইকেলার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণে তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা যায়। পাহাড়ে দেশ বলে এখানকার অধিবাসীদের সাধারণত পরিশ্রম করতে হয় বেশী। বাঙ্গলা দেশের মত কোন রকমে চাষ দিয়ে দুটো বীজ ছড়িয়ে দিলেই ফসল উৎপন্ন হয় না। পাথর কেটে জমি তৈয়ারী করে সার দিয়ে অত্যন্ত যত্নে আবাদ করতে হয়। গ্রীষ্মের সময় একেবারেই বৃষ্টি হয় না বলে এবং ঢালু প্রকৃতির জন্য এ সব জমিতে জল না জমায় বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় চাষ দেখা যায় না। পাহাড়ে নদী ভিন্ন ছোট বাঁধ বা কূয়োই গরমের সময় জল সরবরাহ করে।

এখানে প্রধানত তিন শ্রেণীর অধিবাসী দেখা যায়। এক শ্রেণী—অধিকাংশই কোল ও সাঁওতাল—পাহাড়ের কোলে বা জঙ্গলে বাস করে। এরা অপেক্ষাকৃত অসংস্কৃত এবং পূর্ব্ব রীতিনীতি অনেকাংশে বজায় রেখেছে। এর প্রধান কারণ হ'ল, এ সব স্থানের দুর্গমতা ও অনুর্ব্বর জমি। এখন আর এরা পাতার পোষাক পরে না বটে, তবে পাতার ছাতা ইত্যাদির প্রচলন আছে। অল্প স্বল্প কৃষিকার্য্য ও সামান্য পশুপালন করলেও বনের স্বাভাবিক উৎপত্তি হতে এরা যথেষ্ট সাহায্য নেয়। তীরধনুকের ব্যবহার এদের ভিতর প্রচুর এবং তা দিয়ে শীকারও ভাল করে। সরিষা বা তিলের চাষ নেই বলে বনের নিম, করঞ্জ, রেড়ী বা মহুয়া বিচির তেলই এরা ব্যবহার করে। তেল তৈয়ারীর জন্য ঘানির সাহায্য এরা নেয় না—প্রাচীন কালের "সুরুম পাটাই" যথেষ্ট। দুটো তক্তার মাঝে, বিচিগুলো গুঁড়িয়ে ভাপিয়ে দিয়ে, খুব জোরে চাপ দেয় ও তাতেই তেল বেরিয়ে আসে। একেই সুরুম পাটা বলে।

বন হতে বাবুই ঘাস, গাছের ছাল বা বাঁশ ইত্যাদি আহরণ করে এনে তাই দিয়ে দড়ী, মাদুর, বাঁশের ঝুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করে; তার বিনিময়ে সমতলপ্রদেশ হতে এরা কাপড়, নুন, তামাক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে আসে। এই সুযোগেই যা বাহিরের সভ্যতার সঙ্গে আদানপ্রদান। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগ থাকায় প্রাকৃতিক সারল্য এরা এখনও বজায় রেখেছে এবং ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের মনেও বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। ধান কাটা হয়ে গেলে পর, সমস্ত দিক্ ধ্বনিত করে

হো-দের শ্মশানদিরি বা সমাধি স্থান

বেজে উঠে মাদল ও বুয়াং, আর তার সঙ্গে তালে তালে পড়তে থাকে নরনারীর সম্মিলিত পা। এর সঙ্গে তোয়েলার সুরে সুর মিলিয়ে গ্রাম্য সঙ্গীতের আওয়াজ প্রাণে একটা আবেশ এনে দেয়। অন্যান্য পাহাড়ে জাতির মত এদেরও শোক বা আনন্দ উভয় উৎসবেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'ল নাচ আর গান। বাজনার তালে তালে নিটোল স্বাস্থ্যবান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন বেশ প্রীতিপ্রদ মনে হয়।

কোল বা সাঁওতালদের গয়না বা প্রাচীর-চিত্রেও আমরা প্রকৃতির প্রভাব দেখতে পাই। ওদের মাথার গয়না হ'ল সবুজ পাতা আর সময়োচিত ফুল। হাতে বা পায়ে অনেকে পরে খাড়ু ও পাহুড়। দেওয়ালে হাতী, বিভিন্ন

পাখী, জ্যামিতির চিত্র, আয়না ইত্যাদি সৌখীন জিনিষ আঁকা থাকে। কেউ কেউ হাতে ও পায়ে লতাপাতা বা ফুল এই সবের চিত্র উল্কি দিয়ে এঁকে রাখে।

এদের গানের কবিতাগুলিও খুব সরল ছোট এবং আশ-পাশের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত। সেরাইকেলা শহরের মাইল ছয়-সাত দক্ষিণে খড়কায়ের তীরে 'কোপে' নামক একটা গ্রাম থেকে সংগৃহীত একটা কোল গানের নমুনা দিচ্ছি।

"পুকুরে আনিয়ে বারিপদ রাজা হোন দুরাতনা ভি
দুরং আয়ুং আয়ুংতে সারোইকোলা রাণী হোন্ হিজুলেনা ॥"

বাঙ্গলাতে অনুবাদ করলে এটার মানে হয়ঃ—

"পুষ্করিণীর ধারে বারিপদার (ময়ুরভঞ্জের)
রাজপুত্র গান গাইছেছিলেন।
সেই গান শুনতে শুনতে সেরাইকেলার
রাজকন্যা সেখানে উপস্থিত হলেন ॥"

সেরাইকেলায় নির্ম্মিত দড়ি

এদের বিবাহ ইত্যাদি এখনও পূর্ব্বপ্রথায়ই অনুসৃত হয়—আজকাল হিন্দুপ্রভাবিত গ্রামগুলোতে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে। কোন কোল যুবক যদি কোন অনূঢ়া যুবতীর সিঁথিতে সিন্দুর ঘষে দিতে পারে বা কোন উপায়ে তাকে হরণ করে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়, তা হ'লেই সে ঐ যুবতীকে বিবাহ করতে পারে। অবশ্য এই ব্যাপারটা খুব সহজেই সম্পন্ন হয় না এবং সময়ে সময়ে অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেই এ নিয়ে খুন জখমও হয়ে যায়। তবে আজকাল এই প্রথা অনেকটা কমে আসছে। "ঘুপুং" নামের একটা সাঁওতাল গ্রামে 'প্রধান' বলে একটা সাঁওতাল বললে যে, তার ছেলে ও মেয়ের বিবাহের সময় সে নিজেই সম্বন্ধ ঠিক করেছিল। এটা সম্ভবত হিন্দুসভ্যতার প্রভাব। এই সব ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকে যৌতুকাদি—গরু ছাগল ইত্যাদি দিতে হয় এবং বিবাহ উৎসবে প্রচুর ব্যয়ে হাঁড়িয়া ও মাংসের ভোজ দিতে হয়।

কেউ মারা গেলে পর এখনও এরা সমাধির উপর পাথরের স্মৃতিচিহ্ন খাড়া করে রাখে। কোন কোন আধুনিক স্মৃতিচিহ্নের উপর সমাধিস্থ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনীও লেখা দেখতে পাওয়া যায়। তাতে, সে কোথায় কাজ করত—কত বয়সে মারা যায়—কি অসুখ হয়েছিল—লেখাপড়া জানত কি না—কি প্রকৃতির লোক ছিল—সমস্ত বৃত্তান্তই বর্ণিত থাকে। কেউ মারা গেলে আট দিন ধরে এরা অশৌচ পালন করে। এই সময়ের মধ্যে মাছ বা মাংস খাওয়া নিষেধ, তবে মদ বা হাঁড়িয়া খাওয়া যেতে পারে। আট দিন পর কামান হয়ে গেলে বন্ধু ও আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করে সকলে একসঙ্গে মাছ বা মাংস খায় এবং নাচগান করে। শবানুগমন করে নারী ও পুরুষ সকলেই—তবে শব বহন করে কেবল পুরুষেই। গ্রামের সব কোলকেই একটি সমাধিক্ষেত্রে—"শ্মশানদিরি"—সমাধিস্থ করে না। ভিন্ন ভিন্ন "কিলি" বা গোত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্মশানদিরি আছে। এদের কিলির নাম হেমব্রোম্, তোপে ইত্যাদি। কোন এক কিলির আদিবাস যদি দূরের ভিন্ন গ্রামে হয় ও সেখানেই আদি "শ্মশানদিরি" থেকে থাকে, তা'হলে কেউ মারা গেলে তাকে নিকটস্থ স্থানে সমাধিস্থ করে, সুবিধামত অস্থি আদি-শ্মশানদিরিতে দিয়ে আসে। মৃত ব্যক্তির সম্মান ও পদমর্য্যাদার তারতম্য অনুসারে তার উপরের পাথরেরও আকার ও গঠনের পার্থক্য হয়ে থাকে।

কোল-সাঁওতালদের ভিতর এখনও প্রকৃতি পূজার প্রাধান্য দেখা যায়। "হাসুবঙা" অসুখের দেবতা, বুরুর দেবতা, শস্যের দেবতা ইত্যাদি কত যে দেবতা আছে তার ঠিক নেই! সমাধি ও পূজা ইত্যাদি ব্যাপারে এরা অনেকটা আসামের খাসিদের মত হলেও সামাজিক একটা পার্থক্য দেখি মেয়েদের সম্মান বা পদমর্য্যাদায়। খাসিদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় নারী ও পুরুষ সব বিষয়েই তার নিম্নস্থান পেয়ে থাকে। এখানে কিন্তু পুরুষই মালিক—স্ত্রী গৃহকর্ত্রী মাত্র। তবে স্ত্রী-স্বাধীনতা এদের ভিতর পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই রয়েছে। এরা পূর্ব্ব প্রথাকে কতদূর আঁকড়ে

থাকতে চায় তার একটা উদাহরণ দিই। আজকাল দেশলাই এত সস্তা ও সুলভ হলেও এখনও এরা কাঠে কাঠ ঘসে আগুন তৈয়ারী করে। সজনে বা পাকুড়ের শুক্‌না ডাল ঘসে দু আড়াই মিনিটেই আগুন জ্বালাতে দেখেছি। এ ছাড়া লোহার দণ্ড দিয়ে পাথরের (কোয়ার্টজ) উপর আঘাত করেও এরা আগুন জ্বালায়।

যে সব অধিবাসীরা পাহাড় জঙ্গল ইত্যাদি দুর্গম স্থানে থাকে তাদের ভিতর অন্য সভ্যতার প্রভাব অত্যন্ত আস্তে সঞ্চারিত হচ্ছে। তবে হিন্দু লোকালয়ের নিকটে বা সেরাইকেলা শহরের আশপাশে যে সব কোল বা সাঁওতাল

হো অধিবাসী, সেরাইকেলা

থাকে তারা অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে এবং তাদের উৎসবেও বাঙ্গলা গান ইত্যাদি প্রবেশ করেছে। নরডিতে একটি কোলের বাড়ী "করম নাচ" দেখতে গিয়ে সমস্ত গানই বাঙ্গলাতে হতে শুনলাম। এই উৎসবে কিন্তু কোল ছাড়া অন্যান্য জাতিও—যেমন লোড় ইত্যাদি যোগ দিয়ে একসঙ্গে নাচছিল। ধীরে ধীরে কোল-সাঁওতালদের ভিতরও লেখাপড়া শিক্ষার একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এ বিষয়ে উৎসাহিত করে। সেরাইকেলা হাই স্কুলেও মাঝে মাঝে কোল ছাত্র দেখা যায়। কোল-সাঁওতালরা—সাধারণত স্বাস্থ্যবান, সরল ও সাহসী হয়। ঘরদোর বা জিনিষপত্রও এরা বেশ পরিচ্ছন্ন রাখে।

আমোদের ভিতর এরা নাচগান, শিকার, মাছধরা ও মুরগী লড়াই করাতে ভালবাসে। প্রতি শুক্রবারে সেরাইকেলায় সাপ্তাহিক বাজার-হাট-উপলক্ষে বহু গ্রাম থেকে দলে দলে লোক মুরগী নিয়ে আসে। তাদের পায়ে ধারাল সরু ছুরী বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দেয়। পরস্পর যুদ্ধ করে কোন একটি মুরগী আহত বা পরাস্ত হলেই যার মুরগী জিতবে সে দুটোই পায়। লড়ায়ের পূর্ব্বে অবশ্য দেখে নেওয়া হয় মুরগী দুটো সমান জোরের কি না। এই সময় "রেস" খেলার মত মুরগীর উপর বাজি রাখাও হয়ে থাকে। এই কোল-সাঁওতাল ভিন্ন অনেক নিম্নস্তরের হিন্দুও এই মুরগী লড়ায়ে যোগ দেয়।

এক্ষমর্থা মুর্ত্তি, ইউপুকুরে প্রাপ্ত

এই তো গেল পাহাড় বা জঙ্গলে, অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রকৃতির উৎপন্নের উপর নির্ভর করে যারা থাকে তাদের কথা। এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হচ্ছে যারা চাষবাস করে খায় ও অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর স্থানে বাস করে। চাষ করতে হলেই চায় কৃষির উপযোগী জমি, পশু পালন ইত্যাদি। এ সবের জন্য এদের অনেক সময় ব্যাপৃত থাকতে হয়, ফলে এরা হয়ে আসে অনেকটা শান্ত ও সঙ্ঘবদ্ধ। কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থান—টাঁড়—বেছে নিয়ে জলের কাছে এরা বসবাস করে। এতে চাষের কাজের সুবিধা হয়। এদের ভিতর সরল জীবনের মাধুর্য্য অনেক কমে

অনুক্রম

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

(১)

শ্রীবৃন্দাবনে সেবাকুঞ্জের অপরিসর গলির ভিতরে এক মহতী জনশ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্যে একটি নাতি বৃহৎ কীর্ত্তনের সম্প্রদায় ধীরে ধীরে সেবাকুঞ্জকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ক্রমে পরিসর পথের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সম্প্রদায়টি যত অগ্রসর হইতেছে জনসমাগম ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। দর্শকদিগের অত্যন্ত মুগ্ধাবস্থা। ক্রমবর্দ্ধিত জনতায় তাহারা এক একবার পেষিত হইবার মত অবস্থায় পড়িতেছে তবু কাহারো সরিবার চেষ্টামাত্র নাই। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কখনো বা সুযোগ মত মধ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে পাইয়া দ্বিগুণ বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে কীর্ত্তনীয়াগণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিতেছে, আবার তখনি ভিড়ের সংঘর্ষে দূরে পড়িয়া কেবল সেই মোহময় সুর তালের দিকে কর্ণ ও মনকে একত্র করিয়া দলের অনুসরণ করিয়া যাইতেছে।

কীর্ত্তনের মাঝখানে এক অপরূপ দৃশ্য। এক গৈরিকধারী তরুণ উদাসীন-মূর্ত্তি কীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবের অনুরূপে দুইহস্তে এবং সর্ব্বাঙ্গেই যেন তাহার অভিনয় করিতে করিতে পদের পর পদ গাহিয়া চলিয়াছেন। যখন পদের ভাব বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে "আখরের" মূর্চ্ছনা তুলিতেছেন তখন মৃদঙ্গ শব্দ এবং তাঁহার সঙ্গীগণের কণ্ঠস্বর উদ্দাম হইয়া উঠিয়া সেই জনপ্রবাহকে তরঙ্গের পর তরঙ্গে যেন অধীর উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। গায়ক গাহিতেছিলেন—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয় !
দেই তুলসী তিল দেহ সঁমপিল দয়া জানি ছোড়বি মোয়।"

ইহার পরে 'আখরে'র অমৃত বর্ষণ—

"আমায় দয়া ছেড়না হে !
আমি পতিত অধম বলে আমায় দয়া ছেড়না হে !
আমি ভুলে থাকি বলে তুমি আমায় ভুলনা হে !"

গায়কের মুখ উত্তেজনাধিক্যে সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অমৃত নদীর মত সুদীর্ঘ বিশাল নয়নযুগল হইতে অবিরত প্রবাহিত জলের ধারা যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গে সেই লোচন নদীর প্রান্তসীমার আরক্ত কুল এবং দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষযুক্ত তটরেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারে বন্যার মত অতি শুভ্র বালুকা বেলার ন্যায় প্রশস্ত বক্ষে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। সুদীর্ঘ সুগৌর দেহ ভাবের পর ভাবের আবেগে কণ্টকিত, ঘন ঘন কম্পিত, ক্ষণে ক্ষণে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত বাহু দুটি দর্শকদিগের চক্ষে যেন সমৃণাল মৃণালিনীর তুলনাকে মনে পড়াইয়া আবার কখনো বিদ্যুৎ বিভ্রমের মত ফিরিতেছে ঘুরিতেছে।

"গণইতে দোষ গুণ লেশ নাহি পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার।
(ওহে শত দোষের আকর আমি,
অদোষ দরশি তুমি! আমার বিচার তুমি কর—
আর কারে দিওনা ভার, আমার বিচার তুমি কর!)
তুহুঁ জগত নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নহি মুই ছার!"
(আমি কি জগৎ ছাড়া, ওহে জগতের নাথ, আমার নাথ,
আমার নাথ!)

গায়ক সম্বিতহারা হইয়া বার বার পড়িয়া যাইবার মত হইতেছেন আর সঙ্গীরা সতর্ক ভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে মৃদঙ্গ করতালের দ্রুত উচ্চ সঙ্গতে তাহাদের সমবেত 'দোহারিয়া' পালি গানে মূল গায়কের ভাবকে যেন মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতেছে।

দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের পর গায়ক যখন মাঝে মাঝে স্তব্ধভাবে যেন নিজের মধ্যে ডুব দিয়া রহিতেছেন, সঙ্গীরা তখন পদের বা আখরের কোন এক স্থানের ধুয়া ধরিয়া গাহিয়া চলিতেছে, আর দর্শকেরা সেই অবসরে তরুণ সন্ন্যাসীর ললাটে ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের তিলক আঁকিয়া ও লেপন করিয়া কেহ বা সুন্দর সুপ্রশস্ত বক্ষেও সুগৌর কম্বুকণ্ঠে দীর্ঘ দীর্ঘ ফুলের মালা লম্বিত করিয়া দিতেছে। গায়কের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই, নিজের মনে তিনি যেন একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

চারিদিকে দর্শকের অস্ফুট কলরব ও কথোপকথনের শব্দ সেই সময়ে ফুটিয়া উঠিতেছে "কে ইনি? আর কখনো কোন কীর্ত্তনে তো এঁকে দেখা যায় নি!" কেহ বলিতেছে "এতদিন শ্রীবৃন্দাবনে আছি কখনো এ মূর্ত্তি তো চক্ষে পড়ে নি।" "এ কীর্ত্তন দলটি তো আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জের সম্প্রদায়! এঁরা ওঁকে কোথায় পেলেন?" কচিৎ কেহ উচ্চারণ করিতেছে "আমি এঁকে একদিন খুব ভোরে শ্রীযমুনায় স্নান করতে গিয়ে দেখেছি, বালির মধ্যে এমন ভাবে প'ড়ে আছেন, দেখে মনে হ'ল সমস্ত রাত্রি ঐ মাঠের মধ্যে চড়াতেই প'ড়ে আছেন! দেখে যা মনে হল—" কেহ বলিতেছে "শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে চকিতের মত একবার এই মূর্ত্তিটি চোখে পড়েছিল, তখনি কিন্তু বিদ্যুতের ন্যায় চলে গেলেন। হাতে তখন একগাছি দণ্ড। সেই দণ্ড হাতে গৈরিক কাপড়ে আর ঐ বর্ণে সে চলে যাওবার দৃশ্য এখনো আমার যেন চোখে ভাস্‌ছে! বিদ্যুতের মতই সে চলন—"

সেবাকুঞ্জের গলির ভিতরে যাত্রীতোলা বাড়ীগুলির মধ্যে একখানি অপেক্ষাকৃত সুন্দর সুশ্রী অনতিক্ষুদ্র গৃহ; সেই গৃহের দ্বিতলের গবাক্ষে বসিয়া এক বর্ষীয়ান্ বারে বারে গবাক্ষ পথে মস্তক বাহির করিবার বিফল প্রয়াসের সঙ্গে সম্মুখের পথে আগত কীর্ত্তনের অনুসঙ্গী জনতাকে দেখিতে দেখিতে একমনে অদূবাগত সেই মধুময় সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। তাঁহার নিকটে একটী কিশোরী দাঁড়াইয়া; ক্ষণে ক্ষণে বর্ষীয়ান্ উচ্ছ্বসিত ভাবে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিতেছিলেন "শুনছিস্ ললিতে শুনছিস্? তোর গানের মাষ্টারের যে ভারি প্রশংসা, মেলা পদক ঝোলে তার বুকে, এমন কীর্ত্তন গাইতে পারে সে? এ শ্রীবৃন্দাবনেব কীর্ত্তন বুঝেছিস্? এই সেবাকুঞ্জেরই কোন সেবকের দল হবে বোধহয়। বিদ্যাপতির "আত্ম নিবেদনের" পদটিকে কি জীবন্ত করেই এঁরা গাইছেন। কোন্ ভাগ্যবানেরা এমন করে শ্রীরাধাশ্যামের সেবা করছে না জানি। লোকের যে শেষই হয় না—কি মজা করে এরা পেছু হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে কীর্ত্তনীয়াদের দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছে ত্যাখ্, আমাকে একবার নাম্‌তে দে ললিতে।"

কিশোরী স্থিরভাবে সমস্ত মনকে যেন শ্রবণের পথেই প্রেরণ করিয়াছিল। এইবার একখানি হস্তপ্রসারণে বৃদ্ধের গতিরও যেন বাধা জন্মাইয়া মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল— "পিষে যাবে দাদু।"

জনতার মধ্যে ক্রমে কীর্ত্তনের কয়েকটি পতাকা, হরিনামাঙ্কিত ধ্বজা, সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন কীর্ত্তনীয়াকেও গবাক্ষ হইতে দৃষ্ট হইল। "ঐ ঐ দেখা গিয়েছে—ললিতে ত্যাখ্ ত্যাখ্ দলের মাঝখানে—" বৃদ্ধ গবাক্ষপথে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং কিশোরীও তাঁহার আগ্রহে আগ্রহান্বিত ভাবে তাঁহার পার্শ্বে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। "একি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবনে কীর্ত্তনে নেমেছেন! ত্যাখ্ ললিতে—" ললিতা মৃদুস্বরে বলিল "ইনিই প্রধান গাইয়ে তা দেখ্‌ছ। এক একবার এঁরই গলা শোনা যাচ্ছিল বোধ হচ্চে!" কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের মধ্যস্থল তখন ঠিক্ সেই গৃহের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই সেই অপরূপ গায়ক মূর্ত্তি! দুই পার্শ্বের গৃহ হইতে এবং সম্মুখ পশ্চাৎ হইতেও লাজ বৃষ্টি হইতেছিল; সেই সঙ্গে স্ত্রীকণ্ঠের উলু শব্দে জনতার ঘন ঘন হরি ধ্বনি! তাহার মধ্যস্থানে সেই দীর্ঘায়ত চম্পকগৌর দেহ, অপূর্ব্ব ভাবময় মুখমণ্ডল, দর্শকের দেহে মনে বিদ্যুৎ সঞ্চারকারী ঘন উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহুযুগল! কীর্ত্তন চলিতেছে—

"কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গে
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ মতি রহু তুয়া পর সঙ্গে!"

ক্রমে গবাক্ষ পথের সম্মুখ হইতে সে দৃশ্য অপসারিত হইল। চোখের সম্মুখে চঞ্চল জনতার অধীর স্রোত, কানে আসিতেছে সেই ভাবময় সুরের ও ভাষার ইন্দ্রজাল "শ্রীচরণ সঙ্গছাড়া করো না হে! যেখানে প্রসঙ্গ তোমার —আমার মতিরে সেই সঙ্গ দিও! যেখানে যেমনে থাকি, তোমারে না ভুলি যেন!"

ক্রমে উত্তাল কলরোলে সেই কণ্ঠধ্বনি ক্ষীণ হইয়া আসিতেই অবশ বৃদ্ধ সহসা যেন লাফাইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে কক্ষ এবং নিকটস্থ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে করিতে পশ্চাতে সেই কিশোরীর আর্ত্তকণ্ঠ শুনিলেন "এতক্ষণ কেন উঠ্‌লে না দাদু, কীর্ত্তনের দল যে অনেক দূরে চলে গেছে! এই ভীড় ঠেলে কি করে পৌঁছুবে!" সে কথা বৃদ্ধের মনের কর্ণ স্পর্শ করিল না, কিন্তু বহিঃকর্ণে আবার বাজিল "আমিও যাব তাহ'লে—আমিও।"

সেই জনতরঙ্গের মধ্যে নামিয়া মাতামহের হস্ত ধরিয়া

চলিতে চলিতে জনতার দেহ সংঘর্ষে কিশোরীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। অত্যন্ত বিচলিত ও লজ্জিত ভাবে চারিদিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল তাহাদের আশে পাশে অনেকগুলি রমণীই সেই কীর্ত্তনে আকৃষ্টা হইয়া চলিতেছে। অনেকগুলি বয়োবৃদ্ধা, যুবতী, কিশোরী ও বালিকা সবই সে দলে আছে। তাহাদের মধ্যে যে বিপ্লব চলিতেছিল জনতার মুখে মুখেও সেই আন্দোলন চলিতেছিল "এ কি মানুষে কীর্ত্তন কর্‌ছে! এই শ্রীবৃন্দাবনেও তো এমন বস্তু কখনো দেখিনি—এমন কীর্ত্তনও কখনো শুনিনি! মহাপ্রভুই কি এসেছেন আবার শ্রীবৃন্দাবনে?" কিশোরী ক্রমে বুঝিল তাহাদের মত নবাগত কতকগুলি ব্যক্তিও সেই দলের মধ্যে আছে, তাহারা অধিকতর ব্যাকুল ভাবে যাহাকে নিকটে পাইতেছে তাহাকেই বৃন্দাবনবাসী জ্ঞানে গায়কের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া ঐ ভাবেরই উত্তর লাভ করিতেছে। কিশোরী একটু পরেই দেখিল তাহাদের অনুচরবৃন্দ সবেগে জনতার মধ্যে পথ করিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং তাহাদের সমবেত চেষ্টায় কিছুক্ষণ পরে তাহাদের হস্তরচিত ব্যূহের মধ্যে মাতামহের সহিত আশ্রয় লাভ করিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

ভীড় ঠেলিয়া অনেকক্ষণ পরে তাহারা যখন কীর্ত্তনের নিকটস্থ হইল তখন গায়ক পদের শেষ করিতেছেন—

"ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর—
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে
সাঁজক বেরি সব কোই মাগয়ি—
হেরইতে তুয়া পদ লাজে!"

(আমি লাজে বদন তুল্‌তে নারি, কি বলে দাঁড়াব কাছে, লাজে চরণ হের্‌তে নারি! জীবনের সাঁঝ ঘনাইছে! কি বলে দাঁড়াব কাছে—লাজে চরণ হের্‌তে নারি!) অনুচরগণের বাহুবন্ধন ব্যূহ হইতে একেবারে ছিট্‌কাইয়া গিয়া বৃদ্ধ গায়কের চরণতলে পড়িলেন! সেই কিশোরীর দেহও যেন নিজের অজ্ঞাতে তাহার অভিভাবকের অনুসরণ ও অনুকরণ করিতেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি হস্ত তাঁহাদের ধরিবার জন্য প্রসারিত হইল তাই রক্ষা, নহিলে তখনি তাঁহারা জনতার চরণতলে পিষ্ট হইয়া যাইতেন। মুহূর্ত্তে জনতার মধ্যে একটা "গেল গেল হায় হায়" শব্দ উঠিয়া পড়িয়াছিল। জনমণ্ডল সহসা তাহাদের প্রত্যেকেরই যেন গতিরোধ করিয়া 'কোথায় কি হইল' দেখিবার জন্য দাঁড়াইতেই কীর্ত্তনের নিকটস্থ জনমণ্ডলী সেই বৃদ্ধের দৃষ্টান্তেই যেন সংসজ্ঞ হইয়া গায়কের চরণে প্রণত হইয়া গেল, কেহবা শুইয়া পড়িয়া সেখানের ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ভাবই ভাবের দ্যোতক! বৃদ্ধকে তাহার অনুচরেরা সেখান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—

"ললিতে—ললিতে—চরণ ছাড়িস্‌নে! বড় ভাগ্যে দেখা পেয়েছি এই সাঁঝের বেলায়—এই অবেলায়! তোদের তো সে লজ্জার দিন আসে নি—সময় আছে তোদের, তা যেন হেলায় হারাস্ নে! প্রভুর চরণে পড়্ এসে—আমার যে দিন কেটে গেছে সব"।

ভাববিহ্বল অনেকগুলি নর নারী বৃদ্ধের এই কথায় ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ললিতা তাহার বিহ্বল মাতামহের দেহ অনুচরেরা যেদিকে সরাইতেছিল নিঃশব্দে সেই দিকেই ফিরিল কেবল একটা অজানা উত্তেজনায় তাহার দেহটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল এবং চোখেও খানিকটা জল আসিয়া পড়িতেছিল মাত্র। তাহার বৈষ্ণব মাতামহের ভাবপ্রবণতার বিষয় সে অনেকটাই জানিত, কিন্তু আজিকার ব্যাপারটি সম্পূর্ণই নূতন।

* * * *

বৈকালে পূর্ব্বোল্লিখিত গৃহের সেই কক্ষে সেই কিশোরী হস্তে একখানি বৈষ্ণব পদাবলী পুস্তক, নিকটে বর্ষীয়ান্ একটী শয্যায় শুইয়া ছিলেন। এক হাতে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে অন্য হাতে বইয়ের পাতা উল্টাইয়া কিশোরী বলিতেছিল "দাদু, কীর্ত্তন গাইয়ে ঠাকুর কিন্তু গানে ভুল করেছেন। এই দ্যাখ ঐ পদের শেষটায় কি লেখা আছে—

'ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর তরইতে এ ভবসিন্ধু
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন তিল আধ দেহ দীনবন্ধু'

তিনি যা গাইলেন শেষটায়, সেটুকু তো এই পদটার শেষে র'য়েছে—

'যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়নু মেলি পরিজনে খায়
মরণ কো বেরি কৈ নাহি পুছয়ি করম সঙ্গে চলি যায়।'

বৃদ্ধ ক্লান্ত চক্ষু না খুলিয়াই বলিলেন "আমার জন্যে - ওরে আমার জন্যেই ওটুকু গেয়েছেন! ও কি ওঁদের ভুল? ও যে কৃপা!"

"নাঃ তোমাকে আর পারা যায় না দাদু, সবই বাড়াবাড়ি তোমার! না হয় বল যে ভাবের ঝোঁকে মনের বেগে গেয়ে গেছেন, ওঁরা অত কবির হুকুমে লাইন্ মিলিয়ে গাইবার পাত্র নন্! যেখানে যা মনে আসবে তাই গাইবেন! তা না—তোমার উপরই কৃপা!" কিশোরী মৃদু হাসিল, বৃদ্ধ একটুও বিচলিত না হইয়া একই ভাবে উত্তর দিলেন "তাই তো! ঠিক্ তাই! আমার জন্যই ওটুকু তখন ওঁর মনে এসেছিল"! "বেশ! তোমারি জিত্ দাদু! হ'ল তো?"

(২)

অদূরে অনতিউচ্চ গোবর্দ্ধনগিরি যেন কোন অজানা বস্তুর রক্ষণকার্য্যে দীর্ঘ প্রাচীরের মতই কয়েক ক্রোশ ব্যাপিয়া তাহার দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রীদল চলিয়াছে। অতি প্রত্যুষে তাহারা রাধাকুণ্ড গ্রাম হইতে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড নামা দুইটি বিস্তৃত সরোবরকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রশস্ত পথে দলে দলে যাত্রা করিতেছে, সার্দ্ধ তিন ক্রোশব্যাপী এই গিরিদেহের পরিক্রমায় সপ্তক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া আবার শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া তাহারা রাধাকুণ্ড গ্রামে ফিরিবে।

এই পরিক্রমার দৃশ্য অতি সুন্দর। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ বালবৃদ্ধযুবা ধনী দরিদ্র গৃহী উদাসীন বৈষ্ণব ভিখারী ভিখারিণী প্রভৃতি সকল ব্যক্তির একমুখী যাত্রার এক সম্মিলিত উৎসব। নানা দেশবাসী এই দলে আছে। বিচিত্রবর্ণের ঘাগ্‌রা ওড়না উড়াইয়া অঙ্গের ভূষণ ও পাদালঙ্কারের ঝঙ্কার তুলিয়া ব্রজবাসিনী মহিলার দল চলিয়াছেন, মুখে তাঁহাদের চির-আদরের চিরনিত্য যুগল কিশোর 'ব্রজলালি' এবং ব্রজ'লালের' রূপ গুণ ও লীলার জয়গান। ততোধিক শব্দসমষ্টি সৃজন করিয়া মাড়োয়ারী মহিলারা চলিয়াছেন। মাদ্রাজী উড়িয়া বাঙালি নারীর দল অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে চলিতেছে। খঞ্জনী বাজাইয়া বাঙালী বৈষ্ণবের দল চলিয়াছেন। মুখে তাঁহাদের প্রভাত-মঙ্গল আরতির পদ, "জয় মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর মঙ্গল আরতি জোড় হি জোড়" (যুগলকিশোর) কোন দল গাহিতেছেন "জয় জয় রাধে শরণ তুহারি! ঐছন আরতি যাঁউ বলিহারী!" কেহ বা মৌন ধরিয়া জপ করিতে করিতে চলিয়াছেন। সেই যাত্রাদলের মধ্যে ডুলি, গোযান এবং অশ্ববাহিত টাঙ্গার ও অভাব নাই। অশক্তরা তাহাতে আরোহণ করিয়াই পরিক্রমা দিতেছে। এই পরিক্রমণ কার্য্য বারোমাসই চলে, তবে শ্রীহরিশয়নের চারি মাস এবং তাহারও মধ্যে রাধা দামোদরের প্রিয় কার্ত্তিক-মাসে এ উৎসব মাসব্যাপী ভাবেই চলিতে থাকে।

হেমন্তের প্রভাত-স্নিগ্ধ বায়ুতে জয় গান গাহিতে গাহিতে যাত্রীদল 'কুসুম সরোবর' অতিক্রম করিয়া গোবর্দ্ধন গ্রামের নিকটস্থ হইল এবং সেখানে 'মানসী গঙ্গা' নামে একটী বৃহত্তর দীর্ঘিকায় স্নানান্তে "গিরিরাজের" "মুখারবিন্দ" পূজা করিয়া আবার অভীষ্ট পথে দলে দলে যাত্রা করিল।

একটা বৃহৎ দলের পশ্চাতে জনতার একটু দূরে দূরেই আমাদের পূর্ব্বদৃষ্ট বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি চলিতেছিলেন, পার্শ্বেই তাঁহার দৌহিত্রী সেই কিশোরী—কয়েকজন অনুচরও অগ্রে পশ্চাতে চলিয়াছে। বৃদ্ধের ও কিশোরীর একেবারে কাছে কাছে তাঁহাদের রাধাকুণ্ডের "ব্রজবাসী" অর্থাৎ পাণ্ডা আর বৃন্দাবনের 'ব্রজবাসীর' একজন ছড়িদার! এই ধনী যজমান্‌কে ক্ষণকালও হাতছাড়া করিতে শ্রীবৃন্দাবনের 'ব্রজবাসী' নারাজ! এখানে সর্ব্বতীর্থেই স্থানীয় 'ব্রজ-বাসীর' দল আছেন, তবুও তিনি তাঁহার নিজস্ব অনুচর একজন সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদাই ইহার সঙ্গে রাখিতেছেন। রাধাকুণ্ডের ব্রজবাসী চারিদিকের পরিচয় দিতে দিতে চলিয়াছেন। শ্রীসমৃদ্ধ গোবর্দ্ধন গ্রামের কথা, সেখানে রাজা মহারাজাদিগের কীর্ত্তি, প্রাসাদতুল্য "ছত্র," ধরমশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনর্গল ভাবে বকিয়া চলিতেছেন ও সেজন্য গোবর্দ্ধন "মানসী গঙ্গা" তীর্থের ব্রজবাসী বড়ই অসুবিধায় পড়িতেছেন। তিনিও সঙ্গ ছাড়েন নাই। মানসী গঙ্গাকূলস্থ গিরিরাজের 'মুখারবিন্দ' পূজা যে তাঁহার মত শেঠের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই এ বিষয়ে তিনি মাঝে মাঝে বড়ই ক্ষোভ জানাইতেছেন। বুঝা যাইতেছে আর কিছু আদায় না করিয়া তিনি ছাড়িবেন না। কোন বাঙালী যাত্রী 'মানসগঙ্গার' নামে ভাব জন্মাইয়া জ্ঞানদাসের পদ ধরিয়াছে "মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল, কল দুকুল

বহিয়া যায় ঢেউ। গগনে উঠিল মেঘ, পবন বাড়িল বেগ, তরণী রাখিতে নারে কেউ। দ্যাখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।" তাহারই সঙ্গী কেহ তাহার সহিত দোহার দিতেছে। "মানস সুরধুনী দুকূল পাথার, কৈছ নে সহচরী হোয়ব পার।"

যাত্রীরা ক্রমে বালুময় প্রান্তরে পড়িলেন। দক্ষিণে 'গ্রেনাইট্‌ প্রস্তরের অনতি উচ্চ গিরি শ্রেণীর স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব চিক্কণতা! প্রভাত রৌদ্রে তাহার মিশ্র শ্যামকান্তির উজ্জ্বল শোভা আবার স্থানে স্থানে তরু গুল্ম লতাচ্ছন্ন বনময় দেহ! পথের বায়ুরাশি ক্রমে গভীর এবং প্রান্তর ছায়াদানের উপযুক্ত বৃক্ষবিরল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া বর্ষীয়ান্‌ কিশোরীর পানে চাহিলেন "ললিতে এইবার গাড়ীতে ওঠ্‌!" বলিয়া তিনি পশ্চাতে অনুসরণকারী টাঙ্গা নামক অশ্বযানের দিকে চাহিলেন। নাতিনী প্রতিবাদ জানাইল "এইটুকু হেঁটেই? কাকার সঙ্গে যখন এদেশ ওদেশ বেড়াতে যাই তখন কত যে হাঁটি তাতো জান না দাদু!" "তা হোক্‌, তোর কাকা এবার আমার ওপর দয়া করেছে যখন, তখন তার 'দায়' আমার মনে রাখ্‌তে হবে ত'! অসুখ বিসুখ করে যদি, ওঠ্‌ বাপু তুই!"

"কিছুতেই না দাদু! আমাদের দৌড়াদৌড়ি আর হাঁটার সম্বন্ধে তোমার আন্দাজই নেই। তুমিই বরং ওঠো, তোমারি কষ্ট হবে। তোমাদের 'এ টাঙ্গা'য় বৃন্দাবন থেকে রাধাকুণ্ড এই বত্রিশ মাইল আসতেই আমার হাড় গোড় চূর্ণ হয়েছে! ওতে আর আমি সহজে উঠ্‌ছি না! তুমিই বরং এইবার ওঠো দাদু!"

পাণ্ডারাও সমস্বরে একথার অনুমোদন করিলেন এবং একঠো 'বয়েল্‌' গাড়ী কেরায়া করিলে যে 'মাঝির' কষ্ট হইত না এ বিষয়ে ক্ষোভ জানাইয়া বালিকার মুখে কলহাস্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। উভয়পক্ষকে বাধা দিয়া বৃদ্ধ সম্মুখস্থ একটি দৃশ্যে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলেন। কয়েকটি ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ প্রণামের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ভূলুণ্ঠন করিতে করিতে পরিক্রমার পথে চলিয়াছে। ঊর্দ্ধ প্রসারিত হস্তদ্বয় যেখানের ভূমি স্পর্শ করিতেছে, তাহারা সেই সেই স্থানে এক একটি দাগ কাটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে এবং সেই দাগের উপর দাঁড়াইয়া আবার পথের মধ্যে শুইয়া পড়িতেছে। কেহ কেহ বা তাহারি মধ্যে ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ অবলুণ্ঠিত করিয়া লইল। মৌনভাবে কেহ জপে রত কেহ বা গভীর স্বরে এক একবার হাঁক দিয়া উঠিতেছে—'জয় গিরিরাজকী, জয় গিরিধারীলালকি।' বৃদ্ধকে স্তব্ধভাবে সেই দৃশ্যে আকৃষ্ট দেখিয়া সকলেই দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। ললিতা সত্রাসে বলিয়া উঠিল "এম্‌নি ক'রে এরা সাত ক্রোশই চল্‌বে নাকি? এই কাঁটা আর এই বালিও যে তেতে উঠবে ক্রমে! এত পথ কি করে যাবে এরা?' 'ব্রজবাসী' হাস্যমুখে উত্তর দিলেন "যত দিনে হয়! পাঁচ, সাত, দশ, যে'দিনে যে পার্‌বে! কষ্ট কি এদের হয় দিদি? গিরিরাজের মহিমায় কত বুড়া অন্ধ আতুর এমনিভাবে 'পর্‌কম্মা' দেয়! রাধাকুণ্ডবাসী কত বৈষ্ণব বাবাজী, কত মাতা, নিত্য তাঁরা এই পর্‌কম্মা দিচ্ছেন!"

"এমনিভাবে নাকি? কি সর্ব্বনাশ!" "না তাঁরা পায় দলেই দেন্‌, কত লোক মানসিক করে এইভাবে পরকম্মা দেয়—আর জীবনে একবার এইভাবে প্রণিপাতের সঙ্গে "প্রদাচ্ছিনা" অনেকে ইচ্ছা করেও করেন।" বৃদ্ধ গভীর দৃষ্টিতে নাতিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "এ দেখেও কি এই স্থানে যানবাহনে উঠ্‌তে ইচ্ছে করে রে? আমরা তো চির অক্ষম, তবু দেখি কতটুকু পারি।" রাধাকুণ্ডের ব্রজবাসী নিজের শাস্ত্রজ্ঞান প্রকটিত করিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই গিরিরাজের মহিমা প্রকাশ করে এঁর পরিক্রমার কথাই বলেছেন—উপবাস বা পায়ে হেঁটে কষ্ট করার কথা বলেননি। বরং বলেছেন 'স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তা সুবাসসঃ, প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্‌'। আর গোযানের বিধিও ঐখানে দেওয়া আছে, কিনা—'অনাংস্যনডুদ্‌যুক্তানি তে চারুহা স্বলঙ্কৃতাঃ!' অনডুহযুক্ত কি না বৃষবাহিত যান।" কিশোরী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল "ও দাদু! তবে আর কি! লাড্ডু খেতে খেতে পরকম্মা'ই বিধি যখন তখন আর ভাবনা কিসের! তুমিও একটী অনডুহ্‌যুক্ত বয়েল্‌ গাড়ীতেই ওঠো দাদু—'হয়' যানে আর কাজ নেই! ওদাদু! ভাগ্যে সেবার তুমি আমায় খানিকটা সংস্কৃত উপক্রমণিকা পড়িয়েছিলে, তার কতকগুলো রূপ এখনো আমার মনে আছে। ব্রজবাসী ঠাকুরের 'অনডুহ্‌'কে তাইতো চিন্‌তে পার্‌লাম! ওর রূপ শুন্‌বে দাদু—"অনড্বান্‌ অনড্বাহৌ অনড্বাহঃ" কিশোরীর কলহাস্য

শিল্পী— শ্রীযুত অখিলকুমার রায় লক্ষ্মীনারায়ণ ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ঝঙ্কারে ব্রজবাসীকে লজ্জিত দেখিয়া বৃদ্ধ ব্যস্তভাবে নাতিনীকে নিজপার্শ্বে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "ঠাকুর ও পান চিবুতে চিবুতে প্রদক্ষিণ তোমাদের 'লালা' তোমাদের জন্যই ব্যবস্থা করে গেছেন! আমরা অমনি বুকে হেঁটে এ সৌভাগ্য পেলেও বর্ত্তে যাব।" ব্রজবাসী তখন মহা উৎসাহে "হাঁ হাঁ শেঠজী,—সে তো ঠিক্ কথাই আছে, গিরিরাজের এমনি মহিমা" ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিলেন। "যত সাধু মহাত্মা সব এইদিকেই বাস করেন। যাঁরা ঠিক্ ভজন করতে চান তাঁরা তো সহর বৃন্দাবনে বাস করেন না, এই গিরিরাজের চারি পাশে কত যে কঠিন ভজনকারী সাধু মহাত্মা আছেন, দিনান্তে তাঁরা একবার মাধুকরীতে বাহির হন্। গোবর্দ্ধন গ্রামে কি অন্য সব গাঁয়ের ব্রজবাসীর ঘরে শুখ্না রুটির টুক্রা মাত্র তাঁরা পান্।" ললিতার ললিত-হাস্য কখন্ থামিয়া গিয়াছিল। সে শুনিতে শুনিতে বলিয়া উঠিল, "সেই যে দাদু আমরা সন্ধ্যাবেলায় বৃন্দাবনেও দেখ্‌লাম ঝোলা নিয়ে এক এক জন বৈরাগী বেরিয়েছেন কিন্তু কারুর কাছে তো তাঁরা ভিক্ষা করছেন না, কোথায় যান্ তাঁরা? কে তাঁদের ভিক্ষা দেয়?"

"ব্রজবাসীদের দুয়ার ছাড়া তাঁরা আর কোথাও দাঁড়ান্ না! তাও প্রত্যহ একই বাড়ীতে নয়! আজ এপাড়ায় কাল অন্য পাড়ায়! মুষ্টি অন্ন বা রুটির টুকরা ছাড়া তাঁর অন্য কিছু নেন্ না। দিনের বেলায় যারা মাধুকরী করে তারা প্রায় সকল স্থানেই এ ভিক্ষা নেয় কিন্তু ওঁদের কথাই আলাদা! তাঁরা এক এক জন—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "শুনেছি ব্রজের বনে বনে এমন সব ভজনী বৈষ্ণব আছেন যাঁদের সহজে দর্শনই মেলে না। তাঁরা এমন এমন স্থানে আছেন যার দু-চার ক্রোশের মধ্যে লোকালয়ই নেই! অতি কঠোর বৈরাগ্য তাঁরা সাধনা করেন, অনাহারেই তাঁরা বেশীর ভাগ থাকেন।"

ব্রজবাসী অধীরভাবে বাধা দিয়া বলিল, "নেই, নেই মহারাজ! রাধারাণীর এই ব্রজভূমে কেউ উপাসী থাক্‌বেন না। যেখানে যে মহাত্মা থাকুন না কেন ব্রজবাসী তার তল্লাস রাখ্‌বেই! দু-চার ক্রোশের কি তারা তোয়াক্কা রাখে! তারা সাধুদের রাত্রির আহার 'বিয়ালু' পর্য্যন্ত পৌছে দেয়। ব্রজবাসীদের 'আধা দুধ আর আধাপুত' সাধু সন্তদের/সেবার জন্যই আছে। কোন মহাত্মা যদি এমন করেই থাকেন যে কেউ তাঁর তল্লাস পাব না, তাহলে তিনিই তাঁর খবরদারি করেন যিনি শ্রীগীতায় বলেছেন 'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যহং।' এদেশে এবিষয়ে অনেক কাহিনী লোকের মুখে মুখে আছে যদি শোনেন মহারাজ—"

কিশোরী তাঁহার বক্তৃতার স্রোতে বাধা দিয়া অতি অধীর-ভাবে বলিল, "দাদু, তুমি বৃন্দাবনেই সমস্ত সময়টা কাটিয়ে দিলে, আজমীর জয়পুরও গেলে না, ঐ সব 'বনে' বেড়াবে বলেছিলে তাই বা কৈ গেলে! আমার তো ছুটি ফুরিয়ে এল, কিছু দেখা হ'ল না আমার! ঐ সব সাধু একজনও দেখ্‌তে পেলাম না।" বৃদ্ধ চারিদিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "তাঁদের দেখার সৌভাগ্য কি সকলের হয় ললিতে! যদিই কচিৎ কারো দর্শন মেলে, চকিতে তিনি লুকিয়ে যান্! কোন্ ভাগ্যে সেদিন কীর্ত্তনের মধ্যে যাঁর দর্শন পেয়েছিলাম সারা বৃন্দাবন খুঁজে আর খুঁজিয়েও তো আর তাঁর সন্ধান মিল্‌লো না।"

পাণ্ডা মধ্য হতে বলিল, "সে সব বনে দিদি, বন পরিক্রমার সময় না হলে মানুষ চলে না। ভাদ্র মাসে যখন মহাবন যাত্রায় রাজার লোকের 'পরকম্মা' চলে তখনি যাত্রীদের নিয়ে আমরা সেই সঙ্গে চলি। তখন সঙ্গে হাট বাজার চলে, হাসপাতাল চলে, পুলিশ চৌকিদারের ফাঁড়ি চলে, তবে তো লোক যেতে পারে। তার পরে আবার 'গোসাই-বনযাত্রা' তাতে তো বিষম ধূম চলে। কত—"

বৃদ্ধ নাতিনীর ক্ষোভপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আস্‌ছে বছর তোকে ভাল ক'রে এদিকের সব দেখাতে আন্‌ব।'

"হ্যাঁ, আস্‌ছে বছর বলে আমার পরীক্ষা! আমি তখন এই সব বেড়াতে পাব কি-না! কাকা এইই বড় আস্‌তে দিচ্ছিলেন! তোমায় কি বলে তারা তা তো জান না! বলে সে বোষ্টম বোরেগীর সঙ্গে ও কোথায় যাবে! কতকগুলো বাজে জিনিষ ঢুকিয়ে ওর মন বিগ্‌ড়ে দেবে ছেলেবেলা থেকে, এই কাকার মত, তা জান? কাকিমা যাই কত বল্লেন তাই শেষে নরম হয়ে এবারের ছুটিতে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"আর আমি যে তোর মাবাপ-হারা অবস্থা থেকে বুকের রক্তে তোকে মানুষ করেছি! আমার রাধাগোবিন্দের

আরতির সময় তুই যে কত নাচ্‌তিস কত গান গাইতিস্ ছোট্টটি হ'তে! বড় সাধেই যে তোর 'ললিতা' নাম দিয়েছিলাম। তোর বাবার উইলের জোরে সে আমার বুক থেকে তুই পাঁচ বছরেরটি হতেই কেড়ে নিয়ে তার নিজের রুচির মত শিক্ষা দিচ্চে! তা দিক্, আমি কিন্তু জানি ও নাম বৃথা যাবে না! তুই—"

দূরে পর্ব্বত ক্রোড়ে ঘন সুগভীর সারি গাথা বনশ্রেণী! ব্রজবাসী সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এইবার আমরা শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডে পৌছাব।"

(৩)

চারিদিকে বন, সম্মুখের অপেক্ষা পশ্চাতে গভীরতর। কুণ্ডের চতুর্দ্দিকই প্রস্তর চত্তর ও সোপান শ্রেণী দ্বারা গ্রথিত। সেই সোপানের একদিকে একটু গভীর বৃক্ষ-রাজির নিম্নস্থ চত্তরে একজন রক্তবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী বসিয়া আর একজন ব্রহ্মচারীবেশী বয়োধিক ব্যক্তি নিকটে দাঁড়াইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত। ব্রহ্মচারী বলিতেছিলেন :

"কতদিন পরে দেখা! শ্রীবৃন্দাবনের পথে কীর্ত্তনের মধ্যে দেখে আনন্দে আত্মহারা হ'লেও তোমার সে ভাবের মধ্যে উৎপাৎ করতে কাছে গেলাম না! পরদিন অনেক কষ্টে যেখানে উঠেছ তার খোঁজ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হতেই মহান্ত বাবাজীর মুখে শুন্‌লাম, ভোরেই তিনি বেরিয়ে গেছেন! কত লোক তাঁর সন্ধানে এসে ফিরে যাচ্চে। কে কোথায় থাকেন কিছুই তিনি জানেন না! হঠাৎ এসে আবার হঠাৎই চলে গেছেন।" ভাব্‌লাম আবারও হারালাম বুঝি! এখানে এসে রাধারাণীর কৃপায় যে আবার তোমায় দেখ্‌তে পাব এ একবারও ভাবিনি!"

"তুমি আমায় এখনো খুঁজ্‌ছ ব্রহ্মচারী! তোমার ওপর তোমার রাধারাণীর এ কি বিড়ম্বনা!" সন্ন্যাসী হাসি মুখে এই উত্তর দিলে ব্রহ্মচারী একটু ম্লানভাবে বলিলেন, "এ বিড়ম্বনা রাধারাণী কবে হ'তে আমার উপরে বিধান করেছেন তা কি মনে আছে? না, তাও ভুলে গেছ?" "তা ভুল্‌লে যে অকৃতজ্ঞ হব তাঁর দুয়ারে। অকৃতজ্ঞত্ব এক, গুরুদ্রোহ দুই, দুটি অপরাধই যে আমায় স্পর্শ করবে।" "ও কথা থাক্, কাশী হতে বৃন্দাবনে কবে এলে? বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের শেষে এই বৃন্দাবনের ভেকধারীদের মধ্যে কাশীর বিখ্যাত বৈদান্তিকাচার্য্যের প্রিয়তম ছাত্র দণ্ডধারী যতির এই আবির্ভাব? শুধু তাই নয়, বৈষ্ণব বৈরাগীর কীর্ত্তনের মধ্যে ঐ রকম ক'রে মেতে যাওয়া এবং লোকসমাজকে মাতানো?" তরুণ উদাসীন গভীর দৃষ্টিতে ক্ষণেক বনভাগের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উভয় করযোড়ে কাহারো উদ্দেশে যেন ললাট স্পর্শ করিলেন। উদ্দেশে কাহাকে এইরূপে প্রণাম নিবেদন করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার চিরকৃপা দৃষ্টিই এই অধমের উপর আছে যে!" দুই পদ অপসৃত হইয়া ব্রহ্মচারীও সেই ভাবে ললাটে যুগ্ম কর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "অপরাধ দিও না। তোমার উপর আজীবনই মহাত্মা সাধুর কৃপাদৃষ্টি আছে। এর বেশী আর কিছু ব'লে তোমায় বিরক্ত করব না।"

"না, বলো না! তুমি আমার খোঁজ না রেখেছ কবে? কাশীর কথাও অনেক জান দেখ্‌ছি।"

"এমন কিছু না, তবে গত কুম্ভের ফেরত্ কয়েকজন কাশীর দণ্ডী শ্রীবৃন্দাবনে এসেছিলেন, তাঁদেরই মুখে তাঁদের আচার্য্যদেবের এক সকল বিষয়ে অদ্ভুত মেধা সম্পন্ন এবং অপরূপ দর্শন তরুণ ছাত্রের কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল এ তুমি!"

"তাই আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে দেখে অত আশ্চর্য্য হয়েছিলে বুঝি?"

"আরও বিস্মিত হয়েছিলাম, তুমি আমার প্রভুপাদের কাছে তাঁর সাধনসম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকারী হয়েও বেদান্ত পড়্‌তে গিয়েছ শুনে!"

"আমাকে তাহলে তুমি ভুলে গিয়েছিলে! ভুলে গিয়েছিলে আমার প্রথম জীবনের সেই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কথা! তার যেন জগতে যত কিছু জ্ঞাতব্য বোদ্ধব্য আছে সবই জানবার—পাবার দরকার ছিল তখন। এখনি কি সে ক্ষুধা মিটেছে? কি জানি।"

"সত্য, তোমাকে বুঝি ভুলেই ছিলাম। উপস্থিত এখন শ্রীগোবিন্দকুণ্ডেই বাস হবে কি?" "কিছুই জানি না। তবে চিরদিনের যে গূঢ় সাধটি অতৃপ্তই আছে এখনো—বৃন্দাবনে—" "গভীর বনে? আমাকে সঙ্গে নেবে ভাই? আমি দেখব তোমার সে সাধনসাফল্য—" "ব্রহ্মচারী, যে শিশুকে তুমিই সহায় হয়ে একদিন ঘরের বাঁধন কাটিয়েছ আজ তাকে আবার এ কি বাঁধনে বাঁধ্‌তে যত্ন করছ?

আত্মবিস্মৃত হয়ো না ভাই।" ব্রহ্মচারী ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া পরে মৃদু মৃদু বলিলেন, "এ কি একা আমারই ? আমি যে তোমার অনেক জানি। অন্য কথা থাক্—এই যে বৃন্দাবনে তুমি দুটি দিন যে ঠাকুরবাড়ীর মহান্তের আশ্রয়ে ছিলে তারও তোমার জন্য কি ব্যাকুলতা! সন্ধান পেলে তোমার সংবাদ অবশ্য জানাতে কি অনুরোধ! তুমি যেখানে যাবে যোগমায়া সেইখানেই তোমার জন্য স্নেহবক্ষ বিস্তার করবেন।" "তাই বল, তিনি যোগমায়া, মহামায়া নন্। সেই সাধু মহান্তটিই কি আমার কম হিতৈষী! সেই কীর্ত্তনের পরে কি যে একটা উন্মাদনা এসেছিল যাতে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করেই ফেলেছিল। সে ক'দিন পরমস্নেহেই আমাকে তিনি পালন করেছিলেন আর তাঁরই শিক্ষার মৃদু কশাঘাতে আমার বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে। সেই উন্মাদনার সময় বুঝি কি সব বলে সেই কুঠুরীর মধ্যে প'ড়ে প'ড়ে চেঁচিয়েছিলাম—তাহারই উত্তরে তিনি পরমপ্রশান্তমুখে বলেছিলেন, "আর কেন 'দাও দাও আরও দাও' বলে কাঁদছ বাবা, প্রাপ্তির আর তোমার কি বাকি আছে ? অত লোকের প্রশংসার পূজা, অত চোখের ঐ দৃষ্টি, এর চেয়ে জগতে পাবার বেশী আর কি আছে ?"

ব্রহ্মচারী একেবারে যেন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বল কি! অতদিনের বৈরাগ্যাশ্রয়ী বৃদ্ধ মহান্ত! তাঁর মুখে এই কথা ? কি সর্ব্বনাশ!" তরুণ সন্ন্যাসী শান্তমুখে বলিলেন, "অত উতলা হয়ো না। সত্যই হয়ত মনের কোন কোণে ঐ বাসনাটি লুকানো ছিল! নৈলে অমন ক'রে কীর্ত্তনে নাচতে গেলাম কেন? না, প্রতিবাদ করো না। ভবিষ্যতের জন্যও তো সতর্ক হ'তে পারব এ উপদেশে। এটি তাঁর কশাঘাত হ'লেও শিক্ষকেরই বেত্রাঘাত। আমার উপকারই করেছেন তিনি।" ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে কেবল একবার 'অদোষদর্শি মনই ধন্য।' এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। "এখানে কি থাকবে দু-চার দিন ?

"থাকতেও পারি আবার যে কোন মুহূর্ত্তে চলে যেতেও পারি।"

কুণ্ডের অপর তীরে যাত্রীদের কোলাহলশব্দ নিকটতর হইতেছিল। কোন ব্রজবাসী পাণ্ডার গম্ভীর কণ্ঠ তাহার ধনী যজমানকে গোবিন্দকুণ্ডের ইতিহাস এবং মাধবেন্দ্র পুরীর এই গোবিন্দকুণ্ড তীরস্থ জঙ্গলেই যে গিরিধারী গোপালপ্রাপ্তির ঘটনা তাহা বুঝাইতে বুঝাইতে আসিতেছিল, "বাবু, আপনাদের কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তো পড়া আছে! এ সেই স্থান, সেই শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড—সেই গিরিধারী গোপালের প্রকট স্থান—" কোথা হইতে একটি কিশোর কণ্ঠে বিদ্রোহের আভাস প্রকাশ পাইল, "শুধু স্থান দেখালে কি হবে—সে গোপাল দেখাও! তিনি তো শুনি নাথদ্বারে—মুসলমানের ভয়ে তোমাদের ঠাকুর দেশ ছেড়ে পালায় এই তো তাঁর মুরোদ!" ব্রহ্মচারী ও উদাসীন সন্ন্যাসী উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। ব্রজবাসী ব্যাকুল ও ব্যস্তভাবে "আরে দিদি" বলিয়া কি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, ইতিমধ্যে সেই কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা কুণ্ডের তীরে তীরে বাজিয়া উঠিল, "হ্যাঁ দাদু, তিনিই বোধ হচ্চে। গাছের ফাঁকে যেটুকু দেখা যাচ্চে!" সঙ্গে সঙ্গেই একটি গম্ভীর আকুল কণ্ঠ "এমন ভাগ্য কি হবে! তুই আগে ছুটে যা ললিতে, অন্তর্দ্ধান হ'য়ে যাবেন এখনি।"

উভয়ে তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন কুণ্ডের অপর তীরে একটি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ, সঙ্গে কতকগুলি অনুচর এবং দলের সর্ব্বাগ্রে একটি সুবেশা সুন্দরী কিশোরী কুণ্ডকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের দিকেই যেন ছুটিয়া আসিতেছে। বিস্মিত ব্রহ্মচারী তরুণ উদাসীনের পানে ফিরিয়া চাহিতে গিয়া দেখিলেন সে স্থান শূন্য! তিনি কখন বনের মধ্যে কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী কর্ত্তব্যমূঢ় হইয়া স্তব্ধভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)
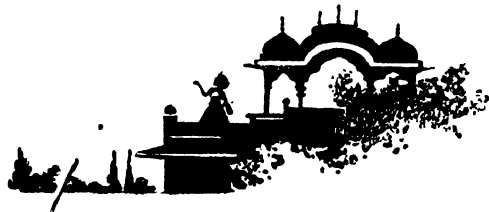
হে সমুদ্র, হে অনন্ত

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য, এম্, এস্-সি

(১)

হে সমুদ্র, হে অনন্ত, বারিধি সুনীল,
জলদমন্দ্রিত স্বরে অব্যক্ত ফেনিল
কাহারে কি কহিছ, অপরূপ ভাষে !
ঢেউগুলি দিবারাত্রি কিসের প্রয়াসে
ধরণীর কূলে কূলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে ;
সেই সব বৃথা চেষ্টা তোমার অন্তরে
করে কিগো ক্ষোভ-সৃষ্টি, হে বিরাট্ জল,
তাই বুঝি এত কথা—অশান্ত চঞ্চল।

(২)

কেন ক্ষোভ তব ?—অতীতে একদিন
তোমার গহ্বর মাঝে সুষুপ্তি বিলীন
ছিল এই ধরা-পৃষ্ঠ ; মাতৃত্ব-বেদনা
প্রতিটি শিরায় তব তুলিল মূর্চ্ছনা—.
আকাশের সাথে তব হইল বিচ্ছেদ
তখনি ধরার জন্ম, সুরু হ'ল ভেদ।
তারপর বহুকাল কেটে গেছে কত
আজো তারে ঘিরি তুমি রয়েছ সতত।

(৩)

আজও ছিঁড়েনি নাড়ী—রক্ত চলাচল
আজও তেমনি আছে,—সেই অবিকল
অতীতের একদিন—গর্ভলীন ধরা
তেমনি তোমার সাথে অষ্টপৃষ্ঠে ঘেরা।
তেমনি সকল আছে, তাহার আকাশে
তোমার সুনীল জল, তার ছায়া ভাসে।
তাহার বাতাস সাথে তোমার মেঘেরা
নিরন্তর হাসে খেলে করে চলা ফেরা।

(৪)

সেই সব ; তবু কেন অন্তরে তোমার
জাগিছে বিয়োগ-ব্যথা ? বিচ্ছেদের ভার
কেন বা অসহ এত ? তাহারে বেষ্টিয়া
কেন এই মায়াজাল ? অনন্ত ধরিয়া
উঠিছে ডুবিছে শুধু তরঙ্গের মালা
একের পরেতে আর ; এক সুরে ঢালা
তোমার বক্তব্য-রাশি ; অব্যক্ত গুঞ্জন
ভাষাহীন অর্থহীন শুধু আলোড়ন।

(৫)

"আমারে ফিরায়ে দাও আমার ধরণী"
বুঝি তব অন্তরের লক্ষ লক্ষ বাণী
কহিছে এই কথা তরঙ্গিত সুরে ;
তাই বুঝি লক্ষ বাহু ধরি ধরণীরে
জোর করি নিতে চায়।
কিন্তু, হে অপার,
তোমার ধরণী আর নাহি যে তোমার
তাহারো কর্ত্তব্য আছে, দূর হতে দূরে
বাঁধা সে অনন্তের চিরন্তন সুরে।

(৬)

তাহারে ডাকিছে তারা অনন্ত আকাশে ;
প্রভাতে অরুণালোক সান্ধ্য ছায়ে মিশে'
রচিছে তাহার পথ,—তাহার আহ্বান
ছেয়ে গেছে দিগন্তে, বিশ্ব ভরা প্রাণ
হয়েছে আচ্ছন্ন তাহে ; অই নীহারিকা
বহে তার প্রাণধারা ; আলোক-বর্ত্তিকা
অই ছায়াপথ মাঝে তাহার স্বপন
অনন্ত কাল ধরি রয়েছে গোপন।

(৭)

দিক হতে দিগন্তরে এসেছে আহ্বান,
চলে সে কর্ত্তব্য পানে দিন রাত্রিমান,
নাহি অবসর ;
"কে কোথায় আছিস্ ওরে
এই বেলা চল্—যেতে হবে বহুদূরে,
ফেলে দিয়ে ভাররাশি—আয় ওরে আয়—"
মায়ের আহ্বান শুনি যাত্রী বাহিরায়
যাত্রী তারা সুদূরের,—অনন্তের পথে
চলে তারা চিরদিন কর্ত্তব্যের রথে।

(৮)

চলে আর চলে তারা—কত না নূতন
কত কি আসিল পথে,—যাহা পুরাতন
কত কি শেষ হ'ল ; জন্ম মৃত্যু লয়
এই নিয়ে নিত্য নব হয় পরিচয়
অনন্ত পথিক সনে ; ক্ষয় ক্ষতি লাজ
ঢেকে রাখে বক্ষ মাঝে বর্ম্মাবৃত সাজ ;

দুর্জ্ঞেয় অনন্ত মাঝে কি রহস্য তরে
যাত্রিদল চলে শুধু অনন্ত গহ্বরে।

(৯)

এ পথে মুক্তি নাই,—শেষ নাই কভু,
যাত্রিদল চলিয়াছে—চলিয়াছে তবু
অনন্ত অলক্ষ্য পানে দিবস রজনী ;
কখনো হতেছে ভুল, অজ্ঞাত সরণী
আনিছে বিপদ কত ,—তবুও এ চলা
শেষ নাই—শেষ নাই, আবেশ-বিহ্বলা।
আলো তারে ডাকিতেছে, ডাকিছে আঁধার
প্রাণ তারে চাহিতেছে, বিশ্ব দরবার।

(১০)

জগতে যত না আলো—যত প্রাণ আছে,
ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি অণু তাহারে ডাকিছে ;—
তাহার আহ্বান-বাণী গ্রহে উপগ্রহে,
বাতাস বারতা তার বক্ষে করি' বহে ;—
ধরণীর প্রতি কণা—শিলা, লতা পাতা
পেয়েছে অনন্ত হতে অনন্ত বারতা,
অনন্ত যাত্রার কথা ; অনন্ত উদ্দেশে
চলেছে ধরণী তাই সীমাহীন দেশে।

(১১)

চলিয়াছে—এ চলার হবে না তো শেষ,
প্রভাতে উষার আলো দিয়েছে নির্দ্দেশ—
সায়াহ্নে জোছনা রাতে চাঁদিনীর আলো
তার পথ দীপ্ত করি' সাজিয়াছে ভালো ;
অন্ধকার অমানিশি রুদ্ধ পথ 'পরে
জ্বলেছে তারার দীপ থরে বিথরে।
বাতাসে দেখালো পথ নিশ্চিহ্ন অম্বরে,
সাধ্য নাই এ চলায় বাধা সৃজিবারে।

(১২)

হে সমুদ্র, হে অনন্ত, তোমার ধরণী
তোমার আশ্রয়মুক্ত, হে মাতঃ জননী !
তাহার কর্ত্তব্যপথ টানিছে তাহারে
যাত্রারম্ভ চলিয়াছে বিশ্ব দরবারে।
শেষ নাই, হে মাতা, তুমি বুঝি তাই,
ধরণীরে বুকে বাঁধি ফিরিছ সদাই,
তার সঙ্গে দিকে দিকে পথ পথান্তরে
টানিছ সবলে তারে আপন অন্তরে।

(১৩)

দিন যায়, রাত্রি আসে, আকাশের তারা
কাহার ইঙ্গিতে যেন সব দিশেহারা
চেয়ে থাকে কার মুখ পানে ; শুধু তুমি
তোমার বিরাট শিশু পৃথিবীরে চুমি'
কাটাও সমস্ত ক্ষণ ; তোমার ক্রন্দন
আনিয়াছে এই বিশ্বে অদ্ভুত স্পন্দন ;
তুলিতেছে মহাধ্বনি ব্যথা অবিরল
লক্ষ মুখে এক ভাষা বাণী অচপল।

(১৪)

অথবা আমারি ভুল—ধরণীর বুকে
অনাচার, অত্যাচার, সেই সব দুখে
দুলিছে তোমার বুক ; মৌন বেদনা
আর্ত্তের কাতর কণ্ঠ দিতেছে যন্ত্রণা ;
তোমার বিরাট বক্ষে ক্ষুব্ধ আন্দোলন
অসহায় দুর্ব্বলের করুণ ক্রন্দন,
তোমার উদার প্রাণে তোলো এই ধ্বনি
শঙ্খের নির্ঘোষ সম দিবসরজনী।

(১৫)

অত্যাচারে জর্জ্জরিত ক্লান্ত, শ্রান্ত, দেহ
যাহাদের অবিচারে কাঁদে নাই কেহ,
ঈশ্বর যাদের মূক—অন্ধ যার বিধি
বধির অদৃষ্টে যারা সেবে নিরবধি,
সেই সব ভাষাহীন নির্য্যাতিত দল
সমস্বরে ঘোষে ব্যথা ; তরঙ্গিত জল
ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, লক্ষ প্রাণে উর্দ্ধে তুলি হাত
নিষ্ঠুর বিধিরে বুঝি দিতেছে সম্পাত।

(১৬)

তাহাদের ভাষা নিয়া, মূক বারি রাশি,
তুমি বুঝি শব্দময়, উঠিছ উচ্ছ্বসি।
তাহাদের কর্ম্মক্লান্ত দিবসরজনী,
তাহাদের ব্যথা দ্বন্দ্ব, দুঃখ শোক গ্লানি,
সফেন জলোচ্ছ্বাসে, রুদ্ধ গরজনে
বলিছ ধরণী-পারে, প্রলয় নিঃস্বনে।
স্তব্ধ, ক্ষুব্ধ বারিধির এ মহাগর্জ্জন
নির্য্যাতিত দুর্ব্বলের করুণ ক্রন্দন।

(১৭)

অথবা—অতীতের কোন্ এক দিন
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড মাঝে ক্ষীণ, অতিক্ষীণ
একটি শব্দ মাত্র জন্ম নিল যবে
সেই হ'তে সমুদ্রেতে, নাহি জানি কবে,
হইতেছে প্রতিধ্বনি ; সেই শব্দটুকু
বিরাট পৃথিবী বক্ষে স্পন্দে ধুকুধুকু ;
সেই শব্দ ছড়ায়েছে গ্রহ-উপগ্রহে
প্রতিধ্বনি সাগরেতে তারি অহরহ।

(১৮)

অথবা—কি জানি কবে কোন্ মায়া-বলে
সৃষ্টির প্রথম শব্দ নীলাম্বুর জলে
বাঁধা পড়ি গেল,—কি জানি কেমন ক'রে
নিয়ত উঠিছে শব্দ সেই এক সুরে।
প্রতিদিন হেরিতেছি এই নীল জল
সুনীল—সুদৃপ্ত নীল—নিয়ত চঞ্চল,
উদ্ধত বিদ্রোহভরা লক্ষ ফণা তুলি
গর্জ্জিছে বারিধি বক্ষ; শুনেছি কেবলি।

(১৯)

বহুরূপে বহুবার হেরেছি তোমায়
হেরেছি প্রভাত বেলা; হেরেছি সন্ধ্যায়;
প্রখর মধ্যাহ্নদীপ্ত উষ্ণ বেলাভূমি
তোমার জলোচ্ছ্বাস গিয়াছে যে চুমি';
হেরিয়াছি তারাহীন নিস্তব্ধ নিশীথে,
হেরিয়াছি জ্যোৎস্নালোকে একান্ত নিভৃতে;—
সেই তব নীল জল,—প্রলয় গর্জ্জন
বিশ্বের বিদ্রোহ ভরা ক্রুদ্ধ অচেতন।

(২০)

প্রভাতে নবীন সূর্য্য রক্তরাঙা জলে
স্নান করি' বাহিরায় ফোটাতে কমলে,
আকাশে পূবের শেষে তোমার তরঙ্গে
সূর্য্যেরে স্পর্শ করি' খেলে কত রঙ্গে;—
মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত রবি মুহূর্ত্তের তরে
হেরে নিজ প্রতিবিম্ব তব বক্ষ পরে;
মুহূর্ত্তেতে বেড়ে যায় তব আলোড়ন
আসিল জোয়ার জলে—প্রলয় গর্জ্জন।

(২১)

সূর্য্য যায় ডুবে—দিগন্তের অস্তাচলে
রক্ত-রাঙা যাত্রা-পথ তব নীল জলে।
কমল মুদিল আঁখি; জাগিল চকোর,
চাহিয়া আকাশ পানে রহিল বিভোর।
তোমার সুনীল জল আর নীলাকাশ
পরিহিত জোছনার শুভ্র রৌপ্য বাস;
তোমার তরঙ্গ শীর্ষে চূর্ণীকৃত জল,
দিগন্তে ছিটায়ে পড়ে অস্থির চপল।

(২২)

পরিপূর্ণ অন্ধকারে হিংস্র বারিরাশি
অশান্ত গর্জ্জনে শুধু উঠিছে উল্লাসি,'
ধরণীর প্রান্ত 'পরে মুহুর্মুহু ঘাতে
জ্বলে ওঠে ঝিকিমিকি কি জানি কি হতে,—
মাথাতে মুকুটমালা—দুরন্ত রাক্ষস
বুঝি বা গ্রাসিতে চায়, ধরণী বিবস,
ভীষণ গর্জ্জন শুনি'; শুধু অন্ধকার—
আকাশ সাগর আজি সব একাকার।

(২৩)

আবার দেখেছি তোমা শান্ত ছোট মেয়ে
নীলাম্বর—জননীর কোলটুকু ছেয়ে
বুঝি-বা শান্তির কোলে; স্তব্ধ মাধুরিমা
আকুল বিস্ময়ে হেরি প্রশান্ত নীলিমা।
তখনো পাতিলে কান দূর হতে দূরে
মনে হয় ভেসে আসে কোন্ এক সুরে
তোমার অমোঘ বাণী—অস্পষ্ট গুঞ্জন,
কোন্ এক মহামুনি ধ্যান নিমগন।

(২৪)

প্রভাতে ঝিনুক, শঙ্খ, ঢেকে থাকে বেলা,
তাই নিয়ে মোরা শুধু করে থাকি খেলা;
জানি না কত না ব্যথা তব নীল জলে
শুক্তির বুকেতে হীরা কেমনে বা ফলে;
জানি না বিরাট বক্ষে কত ব্যথা পেলে
একটি প্রবাল সৃষ্টি কত অশ্রুজলে;
জানি না তোমার কথা; তীরে বসি শুনি
অনন্তকালের তরে উঠিতেছে ধ্বনি।

(২৫)

জানি না তোমার সুখ, দুঃখ-ইতিহাস
বিস্মিত শ্রবণে শুনি তব কলভাষ;
জানি না কতকাল এই মত করে
থেমে যাবে সব গতি নিস্তব্ধ নীরবে।
বসে থাকি বেলাভূমে, চক্ষে হেরি জল
মনোরম, কমনীয়, অশান্ত, চপল;
বসে থাকি আর শুনি তব স্ফুটধ্বনি
বুঝি না অর্থ কি যে;—তবুও তো শুনি।

(২৬)

মনে হয় বুঝি সাগর, দুয়ারে তোমার
এসেছে আহ্বান বাণী বাঁধা টুটিবার;
মনে হয় আকাশের লক্ষ তারা বুঝি
চাহিছে তোমার স্পর্শ; পথ খুঁজি খুঁজি
তুমি বুঝি চলিয়াছ অনন্তের পানে,
তোমার চলার গতি আনন্দে ও গানে
বুঝি-বা পথিক রূপ; তোমার ধেয়ান
তোমার গর্জ্জনে বুঝি পাইল পরাণ।

(২৭)

তোমার সুনীল জলে জোয়ার সঞ্চার
বুঝি-বা অলক্ষ্য পানে প্রেমের প্রচার;
তোমার ভাটার জল, অস্ফুট গুঞ্জন
বুঝি-বা প্রেমিক-মনে বিরহবেদন।
যাই হোক হবে কিছু, একা আমি তীরে
চেয়ে থাকি জল পানে বিস্ময়ের ঘোরে,
ও কি কথা, ও কি সুর—কি হবে কি জানি,
সুনীল সমুদ্র মাঝে অব্যক্তের ধ্বনি।

জগন্নাথদেবের অদ্ভুত দারুমূর্ত্তির পরিচয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের অদ্ভুত মূর্ত্তি-গঠনের রহস্যধারা প্রত্নতাত্ত্বিক ও দার্শনিকের গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে গবেষণা করিলে দেখা যায় যে, অনার্য্য, হিন্দু ও বৌদ্ধ তত্ত্বের, ত্রিধারার মধ্যে ইহা উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।

আদিম মানবসভ্যতার প্রথম বিকাশে মানবের চিত্র অঙ্কন বা মূর্ত্তি গঠনের প্রথম নমুনা হইতেছে—সোজা। সরল ও গোলাকৃতি রেখাপাত—পুতুলের আকৃতিতে মানবের প্রতিকৃতি। ইহা হইতে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি কল্পনা এবং বৃক্ষপূজার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম সূত্রধারার নিদর্শন পাওয়া যায়; সেই প্রথম ভাবধারার বিশেষত্ব আজ পর্য্যন্ত জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে মন্দিরের নানা পূজা ও উৎসবের পদ্ধতিতে।—

১। পাণ্ডারা যে বেত্রগুচ্ছ সকলের গাত্র ও মস্তকে স্পর্শ করায় তাহা অনার্য্যদিগের শক্তিপ্রেরণ বা শক্তি-সঞ্চালন পদ্ধতির সাক্ষ্য; সাধারণত অনার্য্যমণ্ডলীর মোড়ল তাহার প্রতিনিধির অঙ্গে ভৌতিক দণ্ড (magical wand) দ্বারা এইরূপে শক্তি সঞ্চারিত করে।

২। রথের সময় যে সকল অশ্লীল গান সারথির দ্বারা গীত হয় তাহা অনার্য্যদের অশ্লীল গানের (evil songs) দ্বারা ভূত প্রেত (evil powers) বিতাড়নের ব্যবস্থা মনে করাইয়া দেয়।

৩। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রেশমী দড়ি দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন ও হেঁচ্‌কা টানের মধ্যে অনার্য্যদিগের জাবজন্তু পূজায় পূজার সামগ্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়ার সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষত শবরবংশীয় দৈত্যপতি পাণ্ডা দ্বারা এই অনুষ্ঠানটি বরাবর চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ইহাকে অনার্য্যমূলক মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

৪। জগন্নাথদেবের নবকলেবর নির্ম্মাণ ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় অনুষ্ঠান, এমন কি, মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠাও আদিম শবরজাতীয় দৈত্যপতি পাণ্ডাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়; এবং মূর্ত্তির বাম অংশ তাহাদের চিরাগত আদিম অধিকার। মূর্ত্তি সম্বন্ধে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন দ্রাবিড়সভ্যতার সংস্পর্শে লিঙ্গপূজার (Phallus worship) ধারা অনুসারে লিঙ্গমূর্ত্তির অনুপাতে ইহা পরিকল্পিত এবং শিবশক্তিধারার ত্রিশূলের চিহ্ন ইহার মধ্যে বিকশিত; বিশেষত, সুদর্শন চক্রটি দেখিলেই (worship of Phallic emblem without Ograpatta)—প্রাচীন দ্রাবিড়সভ্যতার লিঙ্গপূজার সংজ্ঞা বলিয়া প্রতীত হয়।

আর্য্য-সভ্যতার আগমনে বিষ্ণু বা নারায়ণ পূজার প্রবর্ত্তনের মধ্যেও যথেষ্ট অনার্য্য সংস্পর্শ রহিয়া যায়। জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত গুপ্ত নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তভ মণি বা নীল মণিটি (ডিম্বাকৃতি, Blue Sapphire) নীলাচলের নীলমাধবের স্মৃতিরই উদ্রেক করে। অনার্য্য-দেবতার প্রতীক এই মণি আর্য্যদেবতার দারুব্রহ্মের হৃদয় অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া আর্য্য-অনার্য্যের মিলনের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দেয়।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নই প্রথম মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভোগরাগাদির ব্যবস্থা করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের যুগ ভারত-ইতিহাসে প্রাচীন অন্ধকারের যুগ; তাহার ক্ষীণ আলোক-ধারা হিন্দুর সনাতন ঐতিহ্য (tradition)-এর মধ্যে পর্য্যবসিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইন্দ্রদ্যুম্নের যুগকে কিম্বদন্তী বা পরিকল্পিত গল্পের (myth) অধ্যায় বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত ভূগর্ভের খননকার্য্যের দ্বারা তাঁহাদের এই মত খণ্ডিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভূগর্ভের গভীরতা ও ঊর্দ্ধ-নিম্নভাগের তারতম্য বিশ্লেষণ দ্বারা আদি, অন্ত ও বর্ত্তমান যুগের নিদর্শন নির্দ্ধারিত করেন।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বর্ত্তমান মন্দিরের বহির্ভাগের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি পরীক্ষা করিলে ইহা উপলব্ধি হয় যে, অন্ত একটি সভ্যতার স্তর ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে—

প্রথমত, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে কপালমোচন শিবমন্দির শঙ্খক্ষেত্রের দ্বিতীয় আবর্ত্তের শাস্ত্রোক্ত অতি পুরাতন

ক্ষেত্র। জগন্নাথমন্দিরস্থ বিমলামন্দির হইতে একশত ফিট্ দূরে সদর রাস্তার অপর পারে ভূগর্ভনিম্নে ইহা বিদ্যমান ও ঐ রাস্তাটির কুড়ি ফিট্ নিম্নে ইহা অবস্থিত।

দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাবী মঠে (মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে) একটি কূপখননের সময় নিম্নস্থ আর একটি কূপের সহিত তাহার যোগাযোগ হয় এবং নিম্নে সভ্যতার একটি স্তরের কয়েকটি নিদর্শন দেখা যায়। কিন্তু মঠওয়ালা তাহা পাথর দিয়া বাঁধাইয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

তৃতীয়ত, পুরীর সর্ব্বপ্রাচীন জলাশয় মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও মন্দির এবং যমেশ্বর মন্দির বর্ত্তমান রাস্তা হইতে প্রায় কুড়ি ফিট্ নিম্নে অবস্থিত। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ইন্দ্রদ্যুম্নের যুগ মৃত্তিকাস্তরের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। বৌদ্ধযুগের কথা কহিতে গেলে প্রথমেই সম্রাট অশোকের নাম করিতে হয়। কলিঙ্গ-রাজের সহিত সম্রাট্ অশোক আট বৎসর স্থলে ও জলে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া খৃঃ-পূঃ ২৬১ সালে কলিঙ্গ বিজয় করেন। কলিঙ্গের ভয়াবহ যুদ্ধই অশোকের চরিত্রকে সহসা পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়; এই যুদ্ধই কলিঙ্গের পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বলকে নষ্ট করিয়া ফেলে—এই যুদ্ধে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কলিঙ্গ পদাতিক বন্দী হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও এক লক্ষ কলিঙ্গ সৈন্য নিহত হয়; এবং ঐ সংখ্যার তিন গুণ লোক শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত, লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। কলিঙ্গদেশকে অমানুষিক অত্যাচারে ধ্বংস করার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত অশোকের হৃদয় অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়াছিল। তিনি সেই জন্যে একদিন মৈত্রী, সাম্য ও করুণায় সমস্ত কলিঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা ঐ ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত করিয়াছিলেন। সেই সময় জগন্নাথ-দেবের মন্দির বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িয়াছিল এবং ত্রিমূর্ত্তিটি ত্রিরত্নে পরিণত হইয়া বহুকাল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতীক বলিয়া পরিচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানের ত্রিমূর্ত্তিটি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের ত্রিরত্নের সহিত চমৎকার মিলিয়া যায়।

বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের সংজ্ঞার চিহ্ন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা আকৃতির মধ্যে রূপান্তরিত এবং এইরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তিত্রয়ের বিশেষত্ব বৌদ্ধ স্মৃতিকাযন্ত্রের অনুকরণে পরিকল্পিত। আরও অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধর্ম্মসংজ্ঞাটি স্ত্রীলিঙ্গ বা সুভদ্রা; এবং দেবতাত্রয়ের ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বন্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের মৈত্রীগত ভ্রাতৃত্ব ও ভগ্নীত্ব ভাব (brotherhood and sisterhood) হইতে উদ্ভূত। জগন্নাথমন্দিরের স্থাপত্যের মধ্যেও বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট; কারণ, স্তূপ ও সংঘারামের সদৃশ পরিকল্পনায় শ্রীমন্দির গঠিত। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যেই হিন্দুর জাতিভেদ প্রথায় কুঠারাঘাত করিয়া অন্ন মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবার প্রণালী ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং এখনও দশ অবতার মূর্ত্তির কল্পনার মধ্যে উড়িষ্যায় বুদ্ধ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি পরিকল্পিত অঙ্কন-রীতির মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্য ও মূর্ত্তি পরিকল্পনা ব্যতীত উৎসব-পদ্ধতিকেও বৌদ্ধরীতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল, যথা—রথোৎসব। রথোৎসবটি পূর্ব্বকালে দন্তোৎসব নামে কথিত হইত। রথোৎসবের বৌদ্ধ সম্পর্ক সম্বন্ধে বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের গ্রন্থেও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের সন্ধিক্ষণে।

ফা-হিয়ান্ চীন সম্রাটের আদেশক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব অনুসন্ধানে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক কোস্থান (তার্‌তার এর অন্তর্গত খোটান্) নামক নগরে উপনীত হয়েন। খোটান্ তখন বৌদ্ধরাজ্য ছিল; তথায় রথযাত্রা দর্শন করিয়া তিনি স্বীয় গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এদেশের ন্যায়ই খোটানেও রথোৎসব হইত। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের ন্যায় প্রতি বৎসর নূতন রথ নির্ম্মিত হইত এবং রথযাত্রার পূর্ব্বদিন রাজপথ পরিষ্কৃত হইয়া চন্দ্রাতপ ও পুষ্প-তোরণাদিতে পরিশোভিত হইত। নগরপ্রান্তে চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত উচ্চ চারি চক্র-বিশিষ্ট রথ নির্ম্মিত হইয়া সপ্তরত্নে ভূষিত ও কৌষেয় চন্দ্রাতপ, পতাকা ও নানা মণি-রত্নগ্রথিত ঝালরাদির দ্বারা সুশোভিত হইত। ভূপতি কর্ত্তৃক সম্মানিত মহাযানপন্থী পাণ্ডাদের দ্বারা বাহিত হইয়া তিনটি দেবমূর্ত্তি রথোপরি নীত হইতেন এবং মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইলে মহাসমারোহে রথাকর্ষণ আরম্ভ হইত। উৎসবের সমস্ত অঙ্গই পুরুষোত্তমের প্রথার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ; কেবল সেখানে রথোৎসব চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী হইত; জগন্নাথদেবের রথযাত্রা নয় দিন স্থায়ী হইয়া থাকে।

সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া জগন্নাথ পূজায়

বৌদ্ধপ্রভাব ও অদ্ভুত মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য যে প্রামাণ্য রূপে প্রকাশ পায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং আমাদের দেশের আধুনিক যুবক সম্প্রদায় জগন্নাথদেবের কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি দর্শনে নানারূপ বিদ্রূপ করেন এবং ইহা হিন্দুদের অসুন্দর ও নিম্নতর মনোবৃত্তির পরিচয় দান করে বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু এই ধারণা কত দূর ভ্রমাত্মক, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

জগন্নাথদেবের অদ্ভুত দারুমূর্ত্তিত্রয় হিন্দু দার্শনিক ও যোগীদের অপূর্ব্ব অবদান; অরূপের মধ্যে রূপের পরিকল্পনা, অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের সমাবেশ, অন্ধকারের মধ্যে আলোকের রেখাপাত, অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার দার্শনিক ইঙ্গিত—এই দারুমূর্ত্তির মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। সেই রহস্যধারা উপলব্ধি করিতে হইলে যোগীদের অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন এবং সবিশেষ অনুধাবন আবশ্যক।

এই অদ্ভুত মূর্ত্তির পরিকল্পনার মধ্যে কয়েকটি বিষয়বস্তুকে প্রথমে বিচার করিতে হইবে—

প্রথমতঃ, হিন্দুদের কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি গঠনের তাৎপর্য্য কি? উৎকৃষ্ট মুগ্নী (chlorite) সবুজ প্রস্তরে বা স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু-পদার্থে মূর্ত্তি গঠন না করিয়া ক্ষণভঙ্গুর নিকৃষ্ট কাঠের মূর্ত্তি গড়িবার কারণ কি? বিশেষত স্থায়িত্বের দিক দিয়া যখন দারুমূর্ত্তির কোনই মূল্য নাই।

দ্বিতীয়ত, কাষ্ঠমূর্ত্তির গাত্রে রেশমী কাপড় জড়াইয়া তিনপ্রকার বিভিন্ন বর্ণের তিনটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন কি? মূর্ত্তিগুলি বিশালকায় করিবারই বা কারণ কি?

তৃতীয়ত, হিন্দুরা তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদের (presiding deities) সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত মনোরম মূর্ত্তি গঠন না করিয়া এইরূপ কারুকার্য্য ও মনোহারিত্ববিহীন কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তিতে কল্পনা করার অর্থ কি?—বিশেষত যখন আমরা উড়িষ্যার স্থাপত্যের মধ্যে হিন্দু শিল্পীদের অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি গঠনে সবিশেষ দক্ষতার অসংখ্য পরিচয় পাইয়া থাকি?

চতুর্থত, রথোৎসবের মধ্যে হিন্দুর মৌলিকতা কোথায়?

প্রথমত, অপঃ হইতে নারায়ণ সংজ্ঞার • উৎপত্তি; সমুদ্রের বিশাল নীলাম্বুরাশির অন্তবিহীন ⁄চিত্রের মধ্যে আর্য্যদিগের নারায়ণ মূর্ত্তির পরিকল্পনা। বারিরাশির উপর কাষ্ঠভেলা ভাসমান অবস্থায় থাকিতে পারে—পাথর বা ধাতুপদার্থ স্বাভাবিক থাকিতে পারে না। প্রলয়কালে যখন ব্রহ্মাণ্ড সলিল-সমাধিতে নিমগ্ন তখন মৃত্যুঞ্জয় বীর মুনি মার্কণ্ডেয় বটবৃক্ষের উপর ভাসিতে ভাসিতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় নীলাচলে আসিয়া ব্যাকুলচিত্তে জগৎনাথের শরণাপন্ন হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তখন দারুব্রহ্মরূপ জগন্নাথ প্রলয়-সলিলের মধ্য হইতে উঠিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। কিম্বদন্তী ব্যতীত কাব্যের দিক দিয়া বলা যায় যে, এই মহাসমুদ্রের নীলাম্বুরাশির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে কাষ্ঠনির্ম্মিত ভেলা যেরূপ সম্বল, সেইরূপ সংসার-

রথে জগন্নাথদেব, পুরী

সাগর পার হইতে হইলে কলিকালে একমাত্র কাণ্ডারী—দারুব্রহ্ম। সুতরাং দেখা যায়, নীলাম্বু সাগরের পারে দারুমূর্ত্তি অসীমের ইঙ্গিতস্বরূপ হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা রূপে বিরাজিত রহিয়া জীবনের পরপারে উত্তীর্ণ করিবার একমাত্র যান বা উপায় সূচিত করিতেছেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি পুরুষোত্তম নামে এই শঙ্খক্ষেত্রে বিরাজমান। যোগীদের অন্তর্নিহিত হৃদয়গুহার মধ্যে যে অগ্নি জ্বলিতেছে, সেই অগ্নির ত্রিরূপের মধ্যে অন্তরতম মূর্ত্তি হইতেছে পুরুষোত্তম (অর্থাৎ পুরুষ, পুরুষতর, পুরুষতম)।

পুরুষোত্তমের মূর্ত্তিত্রয় যোগীদের ধ্যানের মধ্যে উপলব্ধির বিষয় ; ইহাদের রহস্যময় তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে ধ্যানযোগীর অন্তর্দ্দৃষ্টির গভীর অভিব্যক্তির মধ্যে ;—

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্ন ধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বল্‌বে অনুক্ষণ॥"

"Concentrate in the heart: go deep and far, as far as you can. A fire is burning in the deep quietude of the heart. It is a divinity in you—your true being."

—*Aurobindo.*

স ব্রহ্ম, স শিবঃ, স হরিঃ, সেন্দ্র,
সোঽক্ষরঃ পরমস্বরাট্।"

—নারায়ণ উপনিষদ্।

দার্শনিক দিক্ দিয়া এই মূর্ত্তিত্রয়ের ব্যাখ্যা হৃদয়ে নিহিত বহ্নিশিখার পর্য্যায়ে যেরূপ পরিকল্পিত, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক মতে ফায়ার বা অগ্নির জোন্ বা মণ্ডলের তিনটি স্তরবিভাগের দ্বারাও তেমনই সমর্থিত। এই তিনটি স্তর যথাক্রমে আউটার্ জোন বা বহির্ভাগ, মিড্‌ল্ জোন বা মধ্যভাগ এবং ইনার জোন বা অন্তরতম ভাগ। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আউটার জোন বা বহির্ভাগের রং হোয়াইটিশ বা শুভ্রবর্ণ, মিড্‌ল্ জোন বা মধ্যভাগের রং ইয়লইশ বা হরিদ্রাবর্ণ, ইনার জোন বা অন্তরতম প্রদেশের রং ব্লুইশ বা নীলাভ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যাহা স্থূল দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছে, হিন্দুযোগী তাহাই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়া মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যথা বলরাম—শুভ্রবর্ণ, শুভদ্রা—হরিদ্রাবর্ণ ও জগন্নাথ—কৃষ্ণনীল।

পুরীতে রথোৎসবের ভীড়

যোগীরা হৃদয়ান্তর মধ্যে নিরলম্বভাবে গভীর ধ্যান করিতে করিতে স্বতই দেখিতে পান একটি উজ্জ্বল দীপশিখা মানবের অন্তরতম প্রদেশে—হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্বলিতেছে; এই শিখার আলোক প্রথমে শুভ্রবর্ণে যোগীর সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হয়; ক্রমে আরও গভীর প্রদেশে আবির্ভূত হয়—সোনালীবর্ণে; আরও গভীরতম অন্তর্প্রদেশে প্রতিভাত হয় ঘন নীলবর্ণে।

"তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অনীয়োর্দ্ধা ব্যবস্থিতঃ।
নীলতয়োদ্ মধ্যস্থাদ্ বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা॥
নীবারশূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা।
তস্য শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।

তৃতীয়ত, প্রাচীন শিল্পীর সর্ব্বস্তরের শিল্পসাধন সেই পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া জীবনকে সার্থক করিতেন এবং শিল্পের সাধনার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান রাখিতেন। সেই জন্য তাঁহাদের অন্তরতম প্রদেশের অভীষ্ট দেবতাকে তাঁহারা শুধু উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহাকে রূপকলা দিয়া প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা তাঁহাদের ছিল না। যে সত্যম্, শিবম্, সুন্দরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া কবি, দার্শনিক, চিত্রকর, শিল্পী ও যোগী নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অতীত পরমপুরুষের মধ্যে; যাঁহার হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা পঞ্চেন্দ্রিয়াদি সৃষ্টির সর্ব্বত্র আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় সর্ব্বদা আমাদের অন্তরাত্মার

মধ্যে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে, সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র সাক্ষীস্বরূপ পুরুষোত্তমই আমাদের আরাধ্য দেবতা। যিনি হিন্দুদের জগন্নাথ বা জগৎনাথ (the universal God), সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া তিনি প্রকাশিত! সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মধ্যে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপে বিরাজিত ও সত্ত্ব, রজঃ, তম গুণের সমন্বয়ে বিকশিত— ঋক্ সাম যজুর্ব্বেদের ধ্বনির মধ্যে তিনি ওঙ্কাররূপে স্থাপিত; মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর সম্মিলিত মহাশক্তিত্রয়ের ক্রিয়াশীল অদৃশ্য গতির মধ্যে তিনি উদ্ভাসিত। যিনি মহাকাল ভৈরবরূপে এই জগৎকে ধারণ করিয়া জন্ম-মৃত্যু-স্থিতির মধ্যে লালিত পালিত ও ধ্বংস করিতেছেন, যিনি ভীষণ হইতে ভীষণতর, করুণাময় ও পতিতপাবন—ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, পাপী-ধার্ম্মিক, আলোক আঁধার, অমৃত-হলাহল—সমস্তই ধারণ করিয়া জগৎনাথ নামে এই কলিতে দারুব্রহ্মরূপে জীব-জগৎকে ত্রাণ করিবার জন্য আবির্ভূত—তাঁহার এই অপূর্ব্ব চিত্র শিল্পী ও যোগী-দের অন্তর্দৃষ্টি হইতে উদ্ভাসিত। শিল্পী তাহার সৌন্দর্য্যসুষমার রূপসম্ভার ফুটাইয়া তুলিয়াছে মন্দিরের বহির্ভাগে, ভিতরে কোন খানেই রূপকের স্থান নাই, কারণ সেখানে সে অরূপের সাধনায় নিমগ্ন, যাহার কতকাংশের আভাস আউট্‌লাইন্ বা নক্সা মাত্র আঁকিতে পারে, পূর্ণরূপ দিতে কোন দিনই পারে না।

হিন্দু যোগীদের প্রাণবস্তু প্রাণায়াম-পদ্ধতির মধ্যেও মূর্ত্তি-ত্রয়ের সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রাণায়াম-প্রণালী অনুসারে, ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঞ্চরণপ্রক্রিয়ায় জীবের হৃদয় অভ্যন্তরস্থ প্রাণের গতি ও ধ্বনি স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকে। এই নাড়ীত্রয় পূরক, কুম্ভক ও রেচক গতিতে বাম, মধ্য ও দক্ষিণে ধারাবাহিকরূপে চলিয়াছে; সুতরাং শ্রীমন্দিরে অদ্ভুত দেবমূর্ত্তিত্রয়ের সংস্থাপন পরিকল্পনার মধ্যেও এই তিন নাড়ীর গতিবিভঙ্গ লীলায়িত। অধিকন্তু এই নাড়ীত্রয়ের বর্ণসজ্জা যথাক্রমে, শ্বেত, স্বর্ণ ও নীলাভ। দৃশ্যত হিন্দুদের যোগসম্মত দেহের সঞ্জীবনী নাড়ীত্রয়ের গতিও এই অদ্ভুত মূর্ত্তিত্রয়ের রহস্যের মধ্যে পর্য্যবসিত। কুলকুণ্ডলিনীর তীব্র শক্তি জাগ্রতরূপে যোগীদের হৃদয় অভ্যন্তরে স্ফুরিত হইয়া থাকে—যোগী শিল্পীরা তাহারই ইঙ্গিত মন্দিরের গুহ্যাতিগুহ্য অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়াছেন।

হস্তপদবিহীন মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কারণ—শিল্পীদের সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণে অক্ষমতা নহে; ইহার প্রকৃত কারণ হিন্দুরা প্রথমে পৌত্তলিক ছিলেন না। তাঁহারা নিরাকার

পুরীর রথ— ফটো—সি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং

পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। উত্তরমীমাংসায় হস্তপদ-রহিত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে। নিরাকার উপাসনাতে শ্রদ্ধা কমিয়া আসিলে সাধকের হিতার্থে ওঙ্কারযন্ত্রানুযায়ী জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। ওঁকার নিরাকার ব্রহ্মের হস্তপদ বিহীন পূর্ণ মূর্ত্তি ও ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম এই ত্রিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে।

পুনরায়,

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"—গীতা

জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি ধ্যানযোগে যোগী হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া ব্যক্ত করিতেছে—

"অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি"

—কঠোপনিষদ।

সেই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরমপুরুষ হইতেছে শ্রীপুরুষোত্তমের ধ্যানস্থ ছায়াচিত্র—যাহা দর্শকের নিকট দূর হইতে দিবীব-চক্ষুরাততম্-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই সম্পর্কে মন্দিরের গঠন-সংস্থাপন লক্ষ্য করিবার বিষয়—

প্রধান মন্দিরটি গম্ভীরা বা ভগবানের স্থান।
দ্বিতীয় মন্দিরটি জগমোহন বা ভক্তের স্থান।
তৃতীয় মন্দিরটি নাটমন্দির বা উপাসনার স্থান,
এবং চতুর্থ মন্দিরটি ভোগমন্দির বা নিবেদনের স্থান।

মার্কণ্ডেয় সরোবর ও মন্দির—পুরী

গম্ভীরা হইতে বিশাল চক্ষু-বিশিষ্ট দারুব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠমাত্র চিত্রের দ্বারা ভক্তের হৃদয়ে বিস্ময়, ভক্তি ও আনন্দের উৎস সৃজন করিতেছে। জগমোহন হইতে সেই বিশাল দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি দেখিয়া সাধক নাটমন্দিরে তন্ময়ভাবে ধ্যানমগ্ন হইয়া সমাধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং সর্ব্বশেষে ভোগমন্দিরে আত্মসমর্পণ যোগে নিজেকে জগৎনাথের নিকট বিশ্বের হিতার্থে নিবেদন করিতেছে। বোধ হয় এই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভু গরুড় স্তম্ভের নিকট হইতে জগন্নাথ-দেবের অরূপ রূপের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া দরদর আনন্দাশ্রুপাতে ধরণী প্লাবিত করিতেন। অপর অনেক সাধক মহাপুরুষেরাও যে দূর হইতে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া আত্মহারা অবস্থায় সমাধিপ্রাপ্ত হ'ন তাহার ভূয়োভূয় ঘটনাবলী দেখা যায়।

চতুর্থত, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং পুরীধামের শ্রেষ্ঠ উৎসব বলিয়া পরিগণিত হয়; এই পুণ্যতম উৎসব দর্শনের জন্য মুক্তিকামী ও ভক্ত লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পুরীধামে আসিয়া থাকেন। পুরাণে উক্ত আছে—

যে পশ্যন্তি জগন্নাথং রথস্থং কমলেক্ষণং।
তেষাং নাস্তি পুনর্জন্ম সংসারে সর্ব্বদুঃখদে॥
রথারূঢ়ং জগন্নাথং ভক্ত্যা পশ্যতি যো নরঃ।
ছিনত্তি ভগবাংস্তস্য জৈমিনে ভববন্ধনং॥

অর্থাৎ যাহারা শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে অবস্থিত দেখিতে পান, এই দুঃখময় সংসারে আর তাঁহাদের জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে মানব ভক্তি সহকারে রথারূঢ় জগন্নাথদেবকে দর্শন করে, ভগবান তাহার ভববন্ধন ছিন্ন করেন।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি,
শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি,
মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

—কঠোপনিষদ্।

শরীর মানিবে রথ, আত্মা রথী তার।
মন রশ্মি, সূত বুদ্ধি রথ যে চালায়॥

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু, মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

—কঠোপনিষদ্।

বিজ্ঞান সারথি যার বসি রথোপরে
অশ্ব রশ্মি মন যাঁর ধৃত সদা করে॥
শ্রীবিষ্ণুর সেই পদ লাভ হয় তাঁর।
যার পারে ভগবতি নাহি রহে আর॥

হিন্দু দার্শনিকদের মতে—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"; ইহার গভীর রহস্য ও তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের হৃদয়-রথের অন্তরতম প্রদেশে যে বামনরূপ জগন্নাথ

মহাপ্রভু অধিষ্ঠান করিতেছেন সাধক তাহাকে দর্শন করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় এবং পুনর্জ্জন্মের আবর্ত্তন হইতে পরিত্রাণ পায়।

রথযাত্রা উৎসব শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হইতে মথুরাযাত্রালীলা বলিয়া বৈষ্ণব সাধকেরা অভিহিত করেন—গুপ্ত বৃন্দাবন বা রাসলীলা রাখালবেশে সাঙ্গ করিয়া তিনি ভ্রাতাভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া কংসকে ধ্বংস করিবার জন্য মথুরাপুরী যাত্রা করিতেছেন। রাজধর্ম্ম পালন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনে ব্রতী আদর্শ গৃহীর এই চিত্র পুরীধামে রথ-উৎসবের মধ্যে সূচিত হইতেছে।

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা আরম্ভ হয়; ঐ দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রথে চড়িয়া বড়দাণ্ড রাস্তা দিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী গুণ্ডিচা বাড়ীতে গমন করেন। এই গুণ্ডিচা বাড়ীতেই জগন্নাথদেবের প্রথম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত আছে। গুণ্ডিচাবাড়ীতে তাঁহারা সাত দিন অবস্থান করেন এবং পুনরায় রথারোহণ করিয়া শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। প্রতি বৎসর নূতন রথ প্রত্যেক দেবমূর্ত্তির জন্য নির্ম্মিত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—ইহা পঁয়তাল্লিশ ফুট উচ্চ এবং ইহার প্রত্যেক দিকের বিস্তার পঁয়ত্রিশ ফুট, ইহা ষোলটি চাকার উপর অবস্থিত এবং প্রত্যেক চাকার পরিধি সাত ফুট। রথোৎসব উপলক্ষে রথখানি রঙীন কাপড় ও ঝালরাদির দ্বারা পরিশোভিত হয়।

রথোৎসবের মধ্যে হিন্দুর মৌলিকতার তাৎপর্য্য খুঁজিতে গেলে দেখা যায় যে ইহার পরিকল্পনা অতি প্রাচীন এবং হিন্দুদের সৌর উপাসনার তত্ত্ব ইহাতে বিকশিত। (সৌর উপাসনা উড়িষ্যার অতি প্রাচীন পূজা; উড়িষ্যার সর্ব্ব-প্রাচীন সূর্য্য ও চন্দ্রমূর্ত্তি খণ্ডগিরির অনন্ত গুহায় পরিদৃষ্ট হয়। অনন্ত গুহা ২০০-২৫০ খৃঃ-পূঃ অব্দে খোদিত বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন।) রথের উপর সূর্য্যদেবের যাত্রার রূপক হিসাবে হিন্দুধর্ম্মে রথোৎসবটি একটী প্রধান উৎসব বলিয়া পরিগণিত হয়। অধিকন্তু উত্তরায়ন হইতে দক্ষিণায়ন-পথে সূর্য্যের গতি সৌরজগতের জ্যোতিষতত্ত্ব অনুসারে আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথোৎসবের সৃজন করিয়াছে। রথের উপর হইতে ভগবানের দিবীব-চক্ষুরাততম্ জ্বলন্ত দৃষ্টি ভক্তের নিকট সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর-রূপে পরিলক্ষিত হয়।

জগন্নাথাদি ত্রিমূর্ত্তির ভাবকল্পনায় বিভিন্ন ধর্ম্মধারায় বিভিন্ন রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং ভক্ত তাহার আপন ভাবের দ্বারা ইহাকে ধারণা করিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে সুভদ্রা (মহামায়া) হইতেছেন একানংশা এবং বলরাম ও জগন্নাথদেব হইতেছেন আবরণ-দেবতা—(দ্বার দেবতাদ্বয়)।

তন্ত্রমতানুযায়ী জগন্নাথদেব দক্ষিণ-কালিকা, বলরাম ভৈরব ও সুভদ্রা—ভুবনেশ্বরী। দক্ষিণকালিকার রূপ কালীঘাটের কালীমূর্ত্তির সহিত মিলিয়া যায়, ভৈরবের বর্ণ

কপালমোচন শিবমন্দিরের বৃহৎ বৃসভ বাহন—পুরী

শুভ্র এবং ভুবনেশ্বরী হরিদ্রাবর্ণা। দ্বৈতবাদী বেদান্ত অনুসারে—

জগন্নাথ— পরমাত্মা বা পরমপুরুষ
সুভদ্রা— প্রকৃতি
বলরাম— শুদ্ধজীব

শঙ্করাচার্য্য মত অনুযায়ী—

জগন্নাথাদি ওঙ্কাররূপক, অ, উ, ম্ এই তিন অংশে বিভক্ত।

বলরাম— অ
সুভদ্রা— উ
জগন্নাথ— ম্

রামানুজ সম্প্রদায় অনুযায়ী—

অনন্তং শেষ দেবাখ্যং।
সুভদ্রা লক্ষ্মী সংজ্ঞকম্।
বাসুদেব জগন্নাথঃ।
চতুর্ধা মূর্ত্তয়ে নমঃ

অর্থাৎ এই ত্রিরত্ন শেষনাগের কোলে লক্ষ্মীনারায়ণরূপে উদ্ভাসিত ও সুদর্শন চক্র ইহাদের রক্ষী।

উড়ম্ব তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী—

জগন্নাথ— মহাকালী।
সুভদ্রা— মহালক্ষ্মী।
বলরাম— মহাসরস্বতী।

এই ত্রিমহাশক্তির বর্ণ যথাক্রমে কৃষ্ণ, কাঞ্চন ও শুভ্র;

নিম্নস্তরে কপালমোচন শিবমন্দির—পুরী

সুতরাং মূর্ত্তিত্রয়ের রূপকল্পনার সহিত এই বর্ণত্রয়ও আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত সাধনপন্থানুযায়ী 'দিব্য-লীলা প্রসঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য (আদি, মধ্য ও অন্ত) লীলা কলিকালে গুপ্তভাবে এই নীলাচলে প্রকটিত হইতেছে; এই ভাবের লীলা রসিকজনই কেবল জগন্নাথের মধ্যে আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছে। বাল্যে—ভ্রাতাভগ্নীর মধুময় স্নেহ-প্রীতি ভাব; যৌবনে—বৃন্দাবনধামে রাধাকৃষ্ণের রসময় প্রেমের ভাব; বার্দ্ধক্যে—সারথিবেশে রথের উপর মধুর সখ্যভাব এবং শোকতাপ ব্যাধিমরণগ্রস্ত মানবের কল্যাণার্থ গীতার অমৃতময় বাণীর ঝঙ্কার।

যে পুরুষোত্তম এই মহাতীর্থে দারুব্রহ্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনি ত্রিসংখ্যক নিম্ববৃক্ষ মাত্র এবং ইনি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের উজ্জ্বল ত্রিরত্ন—সমস্ত হিন্দুধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন এই ত্রিমূর্ত্তি—অনার্য্য, শবর, আর্য্য সভ্যতার স্তরে স্তরে বিকশিত বৈদিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন, গাণপত্য, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব সমস্ত ধর্ম্মের ও নানা সম্প্রদায়ের নানারূপ অলঙ্কারে সুসজ্জিত রহিয়াছেন। আমাদের এই পুরুষোত্তমের একধারে বিশাল বারিরাশির মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের তরঙ্গনিচয়, অন্য দিকে আকাশভেদী উচ্চ মন্দিরের শৃঙ্গে ভক্তি ও বিশ্বাসের উড্ডীয়মান ধ্বজা, আর মধ্যে নীলাচলের সমতলক্ষেত্রে আসিয়া মিশিয়াছে পঞ্চভূত এক বিশাল অন্তহীন অবস্থায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ সমস্তই মহানের আকারে এখানে বিরাজমান—বায়ুরন্ধ্রের সীমা নাই, শব্দব্রহ্মের সীমা নাই, বালির স্তরের সীমা নাই, তেজোময় সৌরকরের সীমা নাই—সমস্তই অসীম, সমস্তই মহান—আর এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিরাজিত ঐ বৃহৎ দারুব্রহ্ম ও অন্নব্রহ্ম—একটি অব্যক্ত, অন্যটি ব্যক্ত—একটি পুরুষ, অন্যটি প্রকৃতি—একটি সাক্ষি-স্বরূপ, অন্যটি প্রাণস্বরূপ—একটি জ্ঞান, অন্যটি ভক্তি, একটি পটেনশিয়াল্ বা বৃক্ষ শক্তি, অন্যটী কিনেটিক্ বা বীজশক্তি!
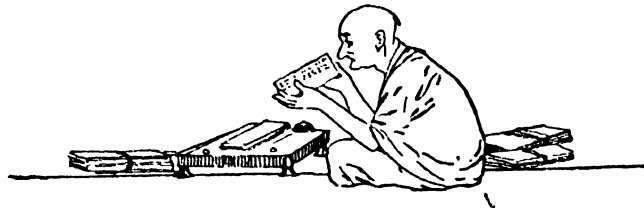
শিশু-চৈতন্য ও ফ্রয়েড

শ্রীজনরঞ্জন রায়

মনীষী সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের চিন্তাধারা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ নামে খ্যাত হইয়াছে। তাঁহার দরদী অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তিনি শিশুদের অপরিপুষ্ট চৈতন্য আঘাত-ব্যাঘাতে কিরূপ ক্ষুণ্ণ হয় তাহা দেখিয়াছেন এবং তাহা পুনস্ফুরণের উপায় কি তাহারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আজ সামান্যভাবে তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। শৈশব হইতে কৈশোর আমাদের আলোচ্য কাল।

তিনি এই মগ্নচেতনার আধারের একটি কল্পিত ছবি দিয়া তাহার ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যেন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে দুইটি ঘর আছে। ছোট ঘরে রাজপাট, সেখানে আছেন রাজা। আর অত বড় ঘরে রাজদর্শনপ্রার্থীর দল ভিড় করিতেছে। সিংহাসনে জ্ঞানরাজ বিরাজ করিতেছেন। দর্শনপ্রার্থীরা সব কুপোষ্য অজ্ঞান। তাহারা রাজার কাছে আবেদন-নিবেদন লইয়া দরবার করিতে যাইতে চায়। কিন্তু রাজদ্বারে যে পাহারা আছে সে প্রত্যেকের আবেদন পরীক্ষা করিতেছে। যাহার আবেদন নামঞ্জুর করিতেছে সে রাজ-সন্দর্শন পাইতেছে না। এইরূপে অনেকেই জ্ঞানসান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হইতেছে। তবে ফাঁকি দিয়াও কেহ কেহ প্রবেশ করিতেছে। কারণ, এই সব মায়াবীরা ছদ্মবেশ গ্রহণে পটু। আবার প্রহরীকে নিদ্রিত বা সজাগ নহে দেখিলে তাহারা রাজপাটে গিয়া তাণ্ডব সুরু করিতেছে। যাহাদের দরখাস্ত বাতিল হয় তাহারা দল বাঁধে, বিদ্রোহ করিতেও ছাড়ে না।

এই রূপকটি ভাঙিলে আমরা কি পাই ? আমরা পাই যে আমাদের মনোরাজ্যে অনেক রকম চিন্তা, স্বপ্ন, আকাঙ্খা প্রকাশ পায়। কিন্তু সবগুলি জ্ঞানপুষ্ট নয়। অজ্ঞানপ্রসূ যাহা কিছু তাহা দেহমনকে বিকারগ্রস্ত করে।

জ্ঞানবাদী হিন্দুর নিকট এই রূপকটি জ্ঞান-বিবেকের সহিত রিপুগণের দ্বন্দ্বের একটা কাহিনী। সে দ্বন্দ্ব চিরদিন চলিতেছে। সেখানেও বিবেক দ্বারী আর রাজা জ্ঞান। বিবেকের তাড়নায় রিপুগণ সন্ত্রস্ত। তবুও রিপুগণ বিদ্রোহ করে।

এতদিন পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহীদের সেই এক অমোঘ দাওয়াই দেওয়া হইতেছিল অর্থাৎ প্রহার করা হইত। মূর্চ্ছিত শিশুকেও প্রহার করা হইত অথবা কটু ধূম বা নিশাদলের তীব্র গন্ধে তাহার সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইত। কিন্তু দেখা গেল, এই সব হিংস্র উপায়ে রোগের বীজ নষ্ট হয় না। আবার সে চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, আবার তার মূর্চ্ছা হয়। মানুষের দৃষ্টি তখন অন্য দিকে ফিরিল। সে অহিংস উপায় অনুসন্ধান করিল। কৃত্রিম প্রণালীতে রোগীকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া তাহার রোগের কথা জানিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। অবৈজ্ঞানিক রোজা সরিষা-পড়া দিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন রোগীর কাছে ভূতের খোঁজ লইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক ডাক্তার 'পাস্' দিয়া হিপ্নোটাইজ-করা রোগীর নিকট তাহার হিষ্টিরিয়ার কারণ জানিতে লাগিলেন। ফ্রয়েড এইভাবে হিপ্নোটাইজ না করিয়া অব্যাহত সংস্মৃতি প্রথার প্রবর্ত্তন করেন।

কৈশোরেই ভগবানের বৃন্দাবন-লীলা হইয়াছিল ইহা যে চির-সত্য। সেই গোপীকুল-মন-ব্যাকুলকারী মুরলীধর ফ্রয়েডকেও দর্শন দিয়াছিলেন নবকিশোররূপে। কৈশোরে যৌনরস স্ফুরণের সঙ্গে শিশুদেহে নব-সৃষ্টির সূচনা হয়। ফ্রয়েড-বিজ্ঞানের ইহা একটা বিশিষ্ট অংশ। আমরা এই গঠনকালকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম প্রীতি প্রণয় অনুভূতির কাল। দ্বিতীয় অবস্থায় সে আপন দেহের বিকাশে মোহিত হয়। সে তখন দেহকে সাজায়। তাহার আত্মগৌরব ও আত্মপ্রতীতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বন্ধু হয় তখন সমলৈঙ্গিকগণ। বালকেরা বালিকাদের ছায়া এড়াইয়া চলে, বালিকারাও বালকদের দৃষ্টির আড়ালে থাকিতে চায়। তৃতীয় অবস্থায় ভিন্নলৈঙ্গিকদের মধ্যে আকর্ষণ প্রবল হয়। তখন বালকবালিকাদের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাসময় প্রণয় দেখা দেয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিকটেও তখন বালকবালিকারা স্নেহের দাবী লইয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধে এ সব কথা অতি বিস্তার করিয়া বলা চলিবে না। তথাপি প্রসঙ্গত দুইটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। ইহা ফ্রয়েড সাহিত্যের মাদকতা।

এখন আমরা কয়েকটি প্রধান প্রধান অবস্থার কথা আলোচনা করিতেছি :

স্বপ্ন—বিবেক দ্বারী ঘুমাইয়াছে। তাই ভূতের নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। জ্ঞান ইহাদের বাগ মানাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না—অবস্থা এই প্রকার। এ বিষয়ে ফ্রয়েড পন্থীদের অ-পূর্ব্ব অনুশীলনের আলোচনা করিবার লোভ ত্যাগ করিতে হইল। আমরা শুধু শিশুর ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পাওয়ার বিষয় লইয়া আরম্ভ করিতেছি। ইহা একটা রুদ্ধ ভয়ের প্রতিক্রিয়া। প্রহার, তিরস্কার বা ভূতের গল্প শুনিলে শিশুর মনে যে দারুণ ভয় সঞ্চিত থাকে স্বপ্নাবস্থায় তাহা উহাকে অভিভূত করিয়া প্রবলভাবে অভিব্যক্ত হয়।

কখনও শিশু স্বপ্নে 'পড়িয়া গেলাম' বলিয়া চীৎকার করে। তাহার কারণ খুঁজিলে দেখা যায়, সে কোনও গুরুজনকে অসম্মান করিয়াছিল তজ্জন্য অনুশোচনা আসিয়াছে।

স্বপ্নাবেশ শিশু ঘুমের ঘোরে বেড়ায়, অঘটন ঘটায়। ইহা স্নায়ুবিকার। অসহ্য দুঃখ শোক বা অপমানে স্নায়ু দুর্ব্বল হইলে এরূপ অবস্থা হয়। সজ্ঞানে থাকা কালে আঘাতপ্রাপ্ত যে সকল স্নায়ু নিষ্ক্রিয়-প্রায় ছিল গার্ড

সাহেবের ঘুমের সুযোগে তাহারা প্রতিশোধ নিতে চাহিল। ইঞ্জিনের হাতল ধরিয়া দিল তাহারা টানিয়া, চলিল গাড়ি। তা সে যেখানে গিয়া ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ হউক না কেন।

সুতরাং শিশু কবে কোন্ আঘাত পাইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। পরে স্নেহ-সদয় ব্যবহারে তাহার অন্তরের সেই ব্যথা দূরীভূত করিতে হইবে। ইহাই প্রতিকার। আর তাহা করিতে হইবে অভিভাবক ও শিশুর শিক্ষককে।

'দিবা-স্বপ্ন'.—এইরূপ স্বপ্নবিলাসী যুবকেরাই হয় বেশী। কোন কোন শিশুরও যে না থাকে তা নয়। কাহারও অবস্থা হঠাৎ মলিন হইলে সে পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া এরূপ করিতেছে ভাবিতে হইবে। সে অনুচিত দুরাশা করে সেই পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে। বড়াই করিয়া অনেক মিথ্যা কথা বলে।

এই অবস্থায় শিক্ষক ও অভিভাবক তাহাকে পরিশ্রম করিতে উৎসাহিত করিবেন। ভবিষ্যৎ জীবনে সে স্বীয় চেষ্টায় আবার দশজনের একজন হইয়া উঠিবে এইরূপ আশা দিবেন। তাহাকে আলস্যবিমুখ করা ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

দুরাচার—কৈশোরেই ইহা অধিক হয়। এই উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার রক্তে সঞ্চিত পাপের বীজাণুসকলের প্রকটলীলা—এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। তাহা দেহের কোন নিয়মিত ব্যবস্থার ত্রুটির পরিণাম ফল। যৌন-পিপাসার জন্য ইহা ঘটে। তাহার আত্ম-সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া না পড়ে অভিভাবককে তাহা দেখিতে হইবে।

মিথ্যা কথা—যে শিশু অধিক মিথ্যা কথা বলে মনে করিতে হইবে তাহার অলীক কল্পনার বাহুল্য ইহার কারণ। তাহার মন অসুস্থ না থাকিলে সে এইরূপ বলিত না। নাটকীয় মিথ্যা ও তাজা মিথ্যা কথা সে তখনই বলে যখন সে তাহার আত্ম-অহঙ্কারে দারুণ আঘাত পায়। কোথায় সে আঘাত পাইল তাহা খুঁজিয়া দেখিয়া প্রতিকার করিতে হইবে। অনেক সময়ে সে নিজে তাহার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে এবং কল্পিত রাজ্যে বিচরণ করিতে গিয়া একটা মিথ্যার পরিপোষক বহু মিথ্যা কথা বলে। তাহার ভ্রম ঘুচাইবার ভার অভিভাবক ও শিক্ষকের।

চুরি—না বুঝিয়া এ কাজ কেহ করে না। কিন্তু ইহাও ভুল বুঝা। ইহা ঠিক 'দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটান।' যাহা সে পাইতে পারে না তাহার পরিবর্ত্তে আর কিছু পাইয়া ভুলিয়া থাকার মত। যৌনপ্রবৃত্তির অতৃপ্তি সে পরের একটা কিছু গ্রহণ করিয়া সাময়িক তৃপ্তি পায়। এই ধরণের ছেলেরা পরে গুণ্ডার দল গড়ে। বিদ্যালয়ে ভাল ছাত্র-সমিতি থাকিলে ইহারা সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

অতি-বিজ্ঞতা—কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিতে গিয়া এই অবস্থা দাঁড়ায়—ইহাই ফ্রয়েড-তত্ত্ব। এ ক্ষেত্রে অভিভাবককে তাঁহার দায়িত্ব চিন্তা করিতে হইবে।

অতি-শুচিতা—মনের গুপ্ত পাপকে ঢাকিতে গিয়া এরূপ হয়। তাহার অন্তর হইতে ইহা করায়। বারে বারে সে হাত-পা ধোয়, কখন কি মাড়াইবে ভাবিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। তাহার মনে কোন্ পাপের স্মৃতি আঘাত করিতেছে অভিভাবককে অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। নতুবা তাহার অশৌচাতঙ্ক যাইবে না।

অতি-উৎসাহ—জটিল ন্যূনতার অভিমানে ইহা হয়। সে নিজের 'ওজন' অপরের কাছে বাড়াইতে গিয়া এরূপ আচরণ করে। যে খেলার প্রতিযোগিতায় সে কখনই জিতিতে পারিবে না, যে পড়া সে আধঘণ্টায় কখন মুখস্থ করিতে পারিবে না তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়া লাগিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবক শিশুকে নিবৃত্ত করিবেন। সে যতটা ভারবহনে সক্ষম তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবার জন্য তাহাকে প্রেরণা দিতে হইবে।

অতি-বিষন্ন ও খিটখিটে—স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিলে ছেলেরা অতি-বিষন্ন হইয়া পড়ে।

নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট ছাত্রেরা প্রায়ই খিটখিটে হয়।

এরূপ উভয় অবস্থায় শিক্ষক ও অভিভাবককে মমতাপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা শিশুর মনে শান্তি আনিতে হইবে।

অতি-ভয়—কোন কাজের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল। যেমন ঐ ছুরিটি দিয়া শিশুটি পেন্সিল বাড়ে না। তাহা দেখিলে মনে করিতে হইবে সে কোন দিন ঐ ছুরিতে পেন্সিল বাড়িতে গিয়া হাত কাটিয়াছিল। ছেলে ঐ বিড়ালটা দেখিলেই পালায়, পরের গাড়িতে চড়িতেও কাঁদিয়া ওঠে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বিড়ালটা তাহাকে কবে কামড়াইয়াছিল, অথবা গাড়ি হইতে কবে সে পড়িয়া গিয়াছিল—ইত্যাদি। অভিভাবকের কর্ত্তব্য ছেলের প্রতি জোর না দেখাইয়া তাহাকে ভালভাবে বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া যে, সে সাবধান হইয়া পেন্সিল বাড়িলে হাত কাটে না, গাড়ি হইতে ঝুঁকিতে গিয়াই সে পড়িয়া গিয়াছিল, বিড়ালের লেজ ধরিয়া না টানিলে সে কামড়াইত না—ইত্যাদি। এই ভাবের অতি-ভয় ধরা পড়িবামাত্র তাহার ভয় ঘুচাইবার চেষ্টা করা উচিত।

ছেলেদের বাড়ী-পালান দোষের গোড়াতেও এই অতি-ভয় থাকে। অভিভাবক কবে তাহাকে নির্ম্মমভাবে মার ধর করিয়াছিলেন, তাই অভিভাবক বাড়ী আসিবার সময়ে সে বাড়ী ছাড়িয়া পালায়। অভিভাবক ইহাকে আদরযত্ন দ্বারা ভয় ভাঙ্গিয়া দিবেন।

তোতলামির কারণও অতি-ভয়। পিতার তাড়া খাইয়া ভয়ে সে কবে ভাল করিয়া কথা উচ্চারণ করিতে পারে নাই। সেই হইতে সে তোতলা হইয়া গিয়াছে। প্রতিকার—অভিভাবকের আদরযত্ন।

বেঁয়ো। ছেলে ডান হাতের কাজ বাঁ হাতে করিতেছে। ইহা দেখিলে মনে করিতে হইবে পিতার প্রতি শিশুর দারুণ অভিমানের অভিব্যক্তি।

যৌবন আসিবার সঙ্গে তোতলামি ও বেঁয়ো স্বভাব প্রায়ই চলিয়া যায়।

পল্লবগ্রাহীর ন্যায় আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্বদর্শীর নির্ণীত বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি। চিন্তানায়ক ফ্রয়েডের অবদান নব সৃষ্টির ন্যায় গণ্য হইবে। আমরা ফ্রয়েড-আলোকপাতে দেখাইবার চেষ্টা করিলাম যে, শুধু ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারাই শিশু-মনে বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়। সকল ক্ষেত্রেই প্রতিকার অভিভাবক ও শিক্ষকদের হাতে। কারণ, অনেক সময়ে তাঁহাদেরই অসম ব্যবহারে শিশু-মনকে আহত করে। শৈশব-উদ্যানে তাঁহারাই মালী। বাগানের মালী অতি ক্ষুদ্র গাছটিকেও মরমী জনকের ন্যায় প্রাণ ঢালিয়া যত্ন করে। অভিভাবক ও শিক্ষককেও তেমনি শিশুদেহের ১০৭-টি মর্ম্মের প্রতি সমভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, অপরিণতজ্ঞান শিশু তাহার মর্ম্মব্যথা প্রকাশে অক্ষম। অভিভাবক মর্ম্মগ্রাহী হইবেন, কিন্তু তাঁহাকে মর্ম্মকাতর হইলে চলিবে না। কারণ অতিস্নেহে অনেক ছেলে ঘরবোলা ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আবার কৈশোরের চঞ্চলতাকে ক্ষমাশীল চক্ষে দেখিতে হইবে। তখন রূপরস-গন্ধের যে প্রবাহ হঠাৎ আসিয়া পড়ে তাহাতে সে আত্মবিহ্বল হয়। তাহাকে সে সময় উচ্ছৃঙ্খল বলা চলে না। যে উচ্ছৃঙ্খল তাহার মস্তিষ্ক-বিকার থাকে। কিন্তু কৈশোরের ব্যাকুলতা স্বাভাবিক।

বিপিন ডাক্তার

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম-এ

নিতান্ত আকস্মিকভাবেই চাকরীটা জুটে গেল। দুই দিন ভরে আত্মীয়-অনাত্মীয় শুভানুধ্যায়ীদের শুভ-সংবাদটা দিয়ে বেড়ালাম এবং সেই প্রসঙ্গে বিপিন ডাক্তারের বাড়ীতেও এক দিন হাজির হলাম।

বিপিন ডাক্তার অমায়িক লোক। বয়স ষাটের কাছাকাছি।

সারাজীবন সাবজজগিরির হাড়ভাঙা খাটুনির পর অবসর গ্রহণ করেছেন। হাঁ, তবু এ শহরে সবাই তাঁকে বিপিন ডাক্তার বলেই চেনে ও ডাকে। জীবনভরে মামলার রায় লিখে আঙুল পাকিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির ফাইল নেড়ে হাতও পাকিয়েছেন বেশ। পাড়ায় ও বাইরে ডাক্তার-হিসাবে বিপিন রায়ের প্রসিদ্ধি জজিয়তীর চেয়ে কম নয়, বরং বেশী।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বিপিন ডাক্তার একখানা বই পড়ছিলেন। আমার সাড়া পেয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: হেল্‌লো ব্রাদার, এসো—এসো।

প্রায় উঠে তিনি আমায় বসতে বললেন। 'থাক্-থাক্' বলতে বলতে আমি পাশের চেয়ারখানা টেনে নিলাম।

স্মিতহাস্যে বিপিন ডাক্তার শুধালেন: তারপর, খবর কি বাবুজী?

বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললাম: আজ্ঞে, একটা সুখবর নিয়েই এসেছি।

আত্মপ্রসাদের হাসি ঠোঁটে মেখে বললেন: তাই বলো। আমার দেওয়া পাল্‌সিটিলায় কখনো ফল না হয়ে পারে! তোমার বাবা তো সেদিন তাচ্ছিল্য করে ওষুধ নিতেই চায় না। এখন দেখলে তো ব্রাদার। তা-কেমন আছে তোমার বোন?

ছোট বোন মিনুর অসুখের কথা শুনে বিপিন ডাক্তার ব্যবস্থা দিলেন পাল্‌সিটিলা। বাবা য়্যালোপ্যাথির পরম ভক্ত। ওষুধ নিতে নারাজ। বিপিন ডাক্তারও নাছোড়-বান্দা। অগত্যা ওষুধ বাবাকে আনতেই হল। কিন্তু মিনুর মুখে তা ওঠে নাই। তার জন্য য়্যালোপ্যাথিরই ব্যবস্থা হয়েছিল।

কিন্তু এ ইতিহাস আমি আপনাদের জানিয়ে রাখলাম নেপথ্যে। দেখবেন, বিপিন ডাক্তারের কানে যেন এ কথা না যায়। এদিকে বিপিন ডাক্তারের কথার ঢেউয়ে আমার আসল বক্তব্যের নৌকা যে বানচাল হবার জোগাড়। তাকে আগে সামলাই।

কোনমতে বললাম: আজ্ঞে, মিনু এখন বেশ ভাল আছে। কিন্তু, আমি বলছিলাম অন্য কথা।

বিপিন ডাক্তার হতাশভাবে বললেন: কি কথা আবার?

: আজ্ঞে, নতুন চাকরী হয়েছে আমার।

: কংগ্রাচুলেসন্‌স্ মাইডিয়ার ব্রাদার: বিপিন ডাক্তার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে আমার দিকে হাতবাড়িয়ে দিলেন। জজিয়তি কায়দায় কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন: আরে, এতক্ষণে বলতে হয় সে কথা। তারপর কি খবর, হঠাৎ কোথায় হ'ল চাকরী? কত মাইনে? বল—বল।

আমার মনে তখন উত্তরে হাওয়া বইছে। কথা ঝাপসা হয়ে আসছে সেই বাতাসের দৌরাত্ম্যে। কোন মতে কেটে কেটে দিলাম চাকরীর বিবরণ। আকস্মিক প্রাপ্তি, চাকুরীর স্থায়িত্ব, মাইনের গুরুত্ব, পদমর্যাদার উচ্চতা—কাঁপা গলায় একে একে বললাম সবই। বিপিন ডাক্তার আনন্দের অতিশয়তায় হাতপা ছুঁড়তে লাগলেন।

ধাপে ধাপে ক্রমে আলাপের তীব্রতা নীচে নেমে এল।

বিপিন ডাক্তার পিঠ চাপড়ে বললেন: চিয়ারিও মাই বয়, উইস্ ইউ অল সাক্‌সেস্। কিন্তু বাবুজী, চেহারাটা তোমার বড্ড কাহিল, এইবারে ওটাকে বাগাতে হবে কিন্তু।

রামধনুর দেশ হতে এক নিমেষে যেন সাহারা মরু-ভূমিতে পপাত হলাম। নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যহীনতা

সম্পর্কে একটা লজ্জাকর হীনতাবোধ-সংস্কারের যাতনা আমার ছিল। তাড়াতাড়ি দোষ ঢাকবার চেষ্টায় বললাম: এবার নিশ্চয় চেষ্টা করব। আপনি তো সব জানেন ডাক্তারবাবু। কি হাড়ভাঙা খাটনী এতদিন খেটেছি। স্কুলের মাস্টারী আর ট্যুইশনী ক'রে এতবড় একটা সংসার চালিয়ে আসছি দিনের পর দিন। না আছে উপযুক্ত আহার, না আছে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম। এতে কি কারো শরীর টিকতে পারে। আপনিই বলুন ডাক্তারবাবু?

আমার কাতর আহ্বানে বিপিন ডাক্তারের মনে সত্যি আঘাত লাগল। সহানুভূতিভরা নরম গলায় তিনি বললেন: তা কি আর আমি জানি না নারাণ, সবি জানি ভাই, সবই জানি। শশীনাথের ভাগ্য ভাল, তাই তোমার মত ছেলে পেয়েছে।

বিপিন ডাক্তার অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাই বলে নিজের শরীরকে তো কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। পরে বড় অনুতাপ হয়। এই তো আমাকেই দেখ না। প্রথম জীবনে কষ্ট আমিও বড় কম পাই নি। কলেজে যখন পড়তাম, বিকেলে টিফিন ছিল দুপয়সার রুটি, নয় তো চিড়ে। তাও সবদিন জুটতো না। খালি পেটে ইডেন গার্ডেনের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক পয়সার চিনেবাদাম খেতে কত ইচ্ছে হয়েছে, পারি নাই। তারপর অনেক টাকা রোজগার করেছি। আজ চারদিক থেকে টাকা আসছে। খাবারের আজ অভাব নেই। কিন্তু যে খাবে সে আজ মরেছে। বুড়ো পেট বলে—এটা খেও না, বেতো শরীর বলে—ওটা খেও না।

বিপিন ডাক্তারের এ রূপ কোন দিন দেখি নাই। সদাহাস্যময় সদালাপী বৃদ্ধ। ছেলেবুড়ো সকলের তিনি এক বয়েসী। তাই স্তম্ভিত হলাম। নির্বাক বিস্ময়ে মুখ তুলে চাইলাম। অনাগত জীবনের বেদনা তাঁর মুখের রেখায় রেখায় ঝরে পড়ছে। করুণ!

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেকটা সামলে নিয়ে বিপিন ডাক্তার বললেন: তাই বলছি ব্রাদার, নিজের প্রতি অবিচার করো না। এইবারে ভাল চাকরী-বাকরী হ'ল। নিজেও ভোগ কর, দশজনের ভোগেও লাগাও। নইলে নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়ে যতই ঢালো, সংসার-কুমীরের এ বিরাট হাঁ তুমি কোন দিন ভরাতে পারবে না। সে আরো চাইবে। আরো বড় হাঁ ক'রে তোমাকেই গিলতে আসবে।

* *

*

নতুন চাকরী নিয়েই ব্যস্ত আছি।

অনেক দিন বিপিন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয় নাই। বিকেলের দিকে তাই বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরেই বিপিন ডাক্তারের বড় ছেলে সত্যবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি উকীল। শুধালাম: ডাক্তারবাবু বাড়ীতে আছেন সত্যবাবু?

: না, তিনি তো বাইরে গেছেন। বোধ হয় পার্কে বেড়াচ্ছেন।

: আজকাল তাঁর শরীর যাচ্ছে কেমন?

ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে সত্যবাবু বললেন: একই রকম। কারো কথা শুনবেন না। ওষুধ এনে দিলে খাবেন না। পথ্যাপথ্যের বিচার নেই। বুড়ো বয়সে কখনো এমন করলে রোগ সারে!

সত্যবাবুর কথাগুলো সত্য। তবু কেমন ভাল লাগল না। বিপিন ডাক্তারের সন্ধানে পার্কের দিকে পা বাড়ালাম।

কিন্তু পার্কে তাঁর সন্ধান পেলাম না। এদিক-ওদিকে অনেক খুঁজলাম। কোথাও দেখা মিলল না।

* *

*

আর একদিন বিকেলে হাজির হলাম বিপিন ডাক্তারের বাসায়। শুনলাম: বেলা পড়বার আগেই তিনি পার্কে গেছেন।

এক-পা দু-পা ক'রে পার্কে এলাম। সন্ধ্যার এখনও দেরী আছে। লাল আকাশের ছায়া পড়ে পাশের নদীর জলে শোভিত রাঙা ছিটে লেগেছে। ওপারের দিগন্তবিস্তৃত ধানের ক্ষেত আসন্ন সন্ধ্যার বন্দনায় নতশির।

পার্কে জনতার বিচিত্র পদক্ষেপ। নানা ভঙ্গী, নানা ব্যঞ্জনা। একদল ছেলে বেলুন উড়িয়ে খেলা করছে। পাশের বেঞ্চিতে বসে একদল বুড়ো তাই দেখছে। জীবনের বেলুন তাদের কালের বাতাসে ফেটে চুপসে গেছে। রঙ নেই, মোহ আছে।

কিন্তু কোথায় বিপিন ডাক্তার? সারা পার্কটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম। তাঁর দর্শন পেলাম না।

ওপাশে কিসের একটা জটলা। অনেকগুলি লোক জড় হয়েছে। গেলাম। সেখানেও নাই।

অনেক দিন দেখা হয় না। চাকরী হবার পর সেই যে দেখা হয়েছিল—

একখানি ব্যথাতুর মুখ মনে পড়ল। আর একবার ঘুরে যাই পার্কটা, যদিই বা দেখা হয়।

কিন্তু দেখা হল না।

বিক্ষুব্ধ মনে অগত্যা বাড়ী ফিরতে হ'ল।

কি মনে ক'রে বড় রাস্তায় না গিয়ে নদীর ঢালু পাড়ের পথ ধরলাম। অনেক দিন এ পথে হাঁটি নি। বড় চমৎকার পথ। ঠিক নীচেই নদী। জল খুব অল্প। কেমন একটা নীল তার রং। বাঁ দিকে উঁচু পাড়। তার উপর সুরকির লাল রাস্তা। নীচ থেকে দেখা যায় না। কিন্তু মোটরের শব্দ, এমন কি পথচারীদের উচ্চ হাসিটি পর্য্যন্ত কানে আসে।

খানিকটা দূরে নদী ও পাড়ের রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি একটা ছোট বটগাছ। নীচে একটা লোক বসে আছে। নদীর দিকে পিছন ফিরে গাছের আবডালে। সহজে কারো নজর সেখানে যায় না। উঁচু পাড় আর গাছের মাঝে ঠিক এমনি জায়গাতেই সে বসেছে।

আর একটু এগিয়েই চিনলাম—লোকটি বিপিন ডাক্তার। কৌতূহল হ'ল। আস্তে আস্তে তাঁর পিছন দিক দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

আশ্চর্য! বিপিন ডাক্তার আপন মনে চিবিয়ে চিবিয়ে কি যেন খাচ্ছে!

আরও কাছে গিয়ে বললাম: এই যে ডাক্তারবাবু, কেমন আছেন?

বিপিন ডাক্তার চমকে কেঁপে উঠলেন। মুখে অপরাধীর বিহ্বলতা। চোখে যেন ক্ষমা-প্রার্থনার দৃষ্টি।

তাঁর সামনে গিয়ে বললাম: কি করছেন এখানে বসে? এ কি! এ যে চীনেবাদাম?

বিপিন ডাক্তারের সামনে একরাশ চিনেবাদামের খোসা। ডান পাশে দুটি মুখখোলা বাদামের ঠোঙা।

মুখে করুণ হাসি টেনে বিহ্বলভাবে বিপিন ডাক্তার বললেন: এই—বসে বসে দুটো চীনে বাদাম খাচ্ছিলাম ব্রাদার। বড় ভাল জিনিষ—পুষ্টিকর। আর খেতেও বেশ। ছোটবেলা থেকেই চিনেবাদাম আমি বড় ভালবাসি।

বাধা দিলাম: কিন্তু এখানে—এই রাস্তার পাশে আপনি—

ছোট ছেলের মত আব্দারের সুরে বললেন বিপিন ডাক্তার: তা ছাড়া আর উপায় কি ভাই। বাড়ীতে যে ওরা খেতে দেয় না। মুখে একটা কিছু দিয়েছ কি সবাই তেড়ে আসবে হৈ হৈ ক'রে।

আলাপ জমাবার জন্য বললাম: আপনার ভালর জন্যেই তো আসে। বুড়ো বয়সে এসব ভাজাভুজি খেলে যে ব্লাডপ্রেশার বেড়ে পড়বে।

বিপিন ডাক্তার সহসা ধনুকের ছিলার মত বেঁকে উঠলেন। রুক্ষস্বরে বললেন: হুঃ, ব্লাডপ্রেশার বাড়বে। দুটো বাদাম খেলেই ব্লাডপ্রেশার বেড়ে যাবে। যত সব! আরে বাপু, আমি যে সারাজীবন কিছু খেলাম না, তবে আমার ব্লাডপ্রেশার হ'ল কেন?

স্বরের রুক্ষতা ক্রমেই ভিজে উঠল: দিনরাত শুধু ঐ এক কথা। ব্লাডপ্রেশার আর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। আরে বাবু, না খেয়ে তো তোদের জন্য সব করলাম এতদিন। আজ দুটি খেয়ে না হয় ব্লাডপ্রেশারেই আমি মরব। তাই বলে দিনরাত এই সর্দারী।

মাঝপথে বিপিন ডাক্তার চুপ করলেন। হয়তো কথা আর বেরুল না।

আমিও চুপ। বুঝলাম, কথা বলা সঙ্গত নয়। সব মানুষেরই অল্পবিস্তর এমন একটি উত্তেজনাপ্রবণ স্থান আছে, যেখানে আঘাত লাগলে শান্ত পর্বতের মুখেও আগ্নেয়গিরি উৎসারিত হয়ে ওঠে। বেশ বুঝলাম, বিপিন ডাক্তারের সেই স্থানটিতেই আমি আঘাত করেছি।

দুজনেই চুপ।

বিপিন ডাক্তার মুখ নীচু করে ডান হাতে বাদামের খোসাগুলো নাড়াচাড়া করছে।

এক সময় বললাম: উঠি ডাক্তারবাবু, সন্ধ্যা হয়।

মাথা তুলে বিপিন ডাক্তার বললেন, একদিন বাড়ীতে যেও।

পথে থেমে অনেকদিন আগেকার একটা ছবি মনে পড়ল। ইডেন গার্ডেনের পথে বেড়াতে বেড়াতে একটি তরুণ ছেলে পাশের চিনেবাদামওলার দিকে ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

পিছন ফিরে তাকালাম। বিপিন ডাক্তার আবার চিনে-বাদাম ভোজনে মন দিয়েছে।

ইতিহাসের উপর রান্নাঘরের প্রভাব

শ্রীসুবলচন্দ্র ভড়

মানব-জীবনের উপর খাদ্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে। রাসায়নিক খাদ্যই ফরাসী-বিপ্লবের কারণ এবং ভবিষ্যতে জার্মানীতে ঐ একই কারণে সাংঘাতিক রাষ্ট্রবিপ্লব হতে পারে। পেঁয়াজ খাওয়ার জন্য নেপোলিয়ন একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। বৃটেনের এই পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের মূল হচ্ছে শালগম। প্রধানত খাওয়ার পরিবর্ত্তনের জন্যই বানরের কুশ্রী মুখ মানুষের সুশ্রী মুখে রূপান্তরিত হয়েছে। মোটর-চালকেরা বেশী পরিমাণে সবুজ তরি-তরকারী খেলে মোটর দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে—আধুনিক খাদ্যবিৎগণের এইরূপই মত।

ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না কি? কিন্তু সত্যই—প্রথম যেদিন ইভ্ নিষিদ্ধ আপেল ভক্ষণ করে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হন—মানব-ইতিহাসের সেই আদিমতম যুগ হইতেই খাদ্য অতি বিচিত্র ঘটনার জন্য দায়ী।

পেঁয়াজ দিয়ে ভেড়ার মাংস খেয়েছিলেন বলে নেপোলিয়ন লিপজিগ-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। পেঁয়াজ খাওয়ার দরুণ পরিষ্কার ভাবে চিন্তা করবার শক্তি তাঁর কমে গিয়েছিল। মাংস সংরক্ষণের জন্য মসলা খুঁজতে বেরিয়েই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয়ের মূল হচ্ছে দুধ ও টাটকা শাকসব্জী! যুদ্ধের আগে জাপানের সৈন্যদলের প্রায় সিকি অংশ সব সময়েই বেরিবেরিতে ভুগতো—কলে ছাঁটা, লাল খোলা বাদ দেওয়া চাল খাওয়ার দরুণ।

সুইডেন থেকে গাজর আমদানী ক'রে ইংলণ্ড গরু ও ভেড়াদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছিল। ফলে নিজেদেরও কখনও খাদ্যের অভাব হয় নি। সেই জন্যই ইংরেজ আজ পৃথিবীর সিকি অংশ শাসন করছে।

মিশরের মমীর দাঁত পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন যে, খৃষ্টের জন্মের ৪০০০ বছর আগে থেকেই মিশরের অধঃপতন সুরু হয় এবং তার মূল কারণ ভাইটামিনশূন্য খাবার খাওয়া।

ক্লিওপেট্রার জন্য সুন্দর খাবার তৈরী করায় পুরস্কার স্বরূপ মার্ক এন্টনি তার পাচককে একটা শহর দান করেছিলেন।

রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ রোমক রাজাদের পেটুক স্বভাব। কথিত আছে যে, রাজা গায়িয়ুস্ জুলিয়াস্ ভেরাস্ ম্যাক্সিমাস্ প্রত্যহ আধ মণ মাংস ও ছয় গ্যালন মদ খেতেন। এরূপ গুরুভোজনের ফলে রোমানদের ভুঁড়ি হল ও বুদ্ধিও কিছু কমে গেল। দিদিয়াস যখন সম্রাট হলেন তখন বিপদ বুঝে তিনি নিয়ম করে অতি-ভোজন নিবারণ করতে চেষ্টা করলেন! কিন্তু রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ ক্ষুধা কমাতে রাজী হলেন না। ফলে ছ' মাসের মধ্যেই দিদিয়াস গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। এরূপ অতিভোজনের জন্যই রোমানরা পরে একদল ক্ষুধার্ত্ত জার্মান অসভ্যদের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

আজ জার্মানীর খাদ্য-অন্বেষণই ইতিহাসে নব নব অধ্যায়ের সৃষ্টি করছে। জার্মানীর চেকোস্লোভাকিয়া-বিজয়, অনেকেরই মতে ইউক্রেনীয় গম ক্ষেতগুলির জন্য। ডানজিগ ও পোলাণ্ড-করিডর দাবীও অনুরূপ কারণেই। জাপানের চীনবিজয়ও প্রধানত হলদে ধানগাছের জন্য।

জার্মানী রাসায়নিক খাদ্য নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। তারা কাঠের মণ্ড থেকে রুটি চিনি এমন কি চকোলেট পর্য্যন্ত তৈরী করছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, জার্মানীর ভাগ্যেও কি তাই ঘটবে? ফরাসী রাজা পরিত্যক্ত জঞ্জাল থেকে জিলাটিন-জাতীয় এক রকম খাদ্য দিয়ে চাষাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে চেয়েছিল। ফলে ক্ষুধার্ত্ত চাষারা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের সূচনা করলে।

"জার্মানরা প্রচুর আলু খেত বলে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের জার্মান-বিপ্লব সফল হয় নি" খাদ্যবিৎ Ludwig Andreas Feuerbach এই মত পোষণ করেন।

খাদ্য পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের মুখের গঠনও যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কাঁচা বা আধপোড়া মাংস ছেড়ে সুসিদ্ধ মাংস ও নরম খাবার খেতে শিখেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পেশীময় চোয়াল ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়ে বর্ত্তমান মানুষের এত সুন্দর মুখে রূপান্তরিত হয়েছে। চর্ব্বণ করবার মাংসপেশী যথেষ্ট দুর্ব্বল হয়েছে এবং দাঁত ক্ষুদ্রকায় ও ঘনসন্নিবিষ্ট হয়েছে—মুখ ডিম্বাকার হয়েছে ও সুদৃশ্য চিবুকের আবির্ভাব হয়েছে। নরম খাবার খাওয়ার দরুণ মাথার খুলিতে কম চাপ পড়ায় মাথা গোল ও কপাল উন্নত হয়েছে ও কোটরাগত চোখ একটু উপরে এসেছে। খাদ্য-পরিবর্ত্তনের ফলে সুদূর ভবিষ্যতে মানুষের চেহারার আরও অনেক পরিবর্ত্তন আসতে পারে। তখনকার মানুষ মিউজিয়মে আমাদের চেহারার মডেল দেখে হয়ত ঘৃণায় মুখ সেঁটকাবে। খাদ্য-বিষয়ে মানুষ ক্রমেই জ্ঞান লাভ করছে এবং ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের তুলনায় শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে অনেক বড় হবে এরূপ আশা করা যায়। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কঙ্কাল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তারা নিকৃষ্ট খাদ্যের জন্য রিকেট ও বাতে ভুগত। খাদ্যের গুণাগুণ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেক দুরারোগ্য রোগ বিতাড়িত হয়েছে। আয়োডিনযুক্ত খাবার গলগণ্ডকে (Goitre) এবং পাতিলেবু ও চুণ

স্নায়ুকে দমন করেছে। দুধ যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা কমিয়ে এনেছে (ভারতে নয়)। খর্ব্বদৃষ্টি ও নৈশ অন্ধত্বের কারণ নিকৃষ্ট খাদ্য। মোটর-চালকেরা শালগম ও সবুজ তরিতরকারী খেলে মোটর-দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে।

দুর্ভিক্ষের সময় ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সুইডেনের চাষারা গাছের ছাল খেয়ে থাকে। এখনও আফ্রিকার সন্তানসম্ভবা রমণীরা ছাই ভক্ষণ করে (ছাইএর মধ্যস্থিত ক্যালসিয়াম বা চুণ সন্তানের দাঁত ও হাড় গঠনের সহায়তা করে)।

আফ্রিকার অসভ্য অধিবাসীরা পূর্ব্বে শত্রু বধ করে তাদের পুড়িয়ে খেত। বর্ত্তমান কালের মানুষও ছাগল, ভেড়া, গরু, মুর্গী ছাড়াও কুকুর, বিড়াল, হাতী, ঘোড়া, বাঘ সিংহ সবই খেয়ে থাকে, ব্যাঙের ঊরু ও কুমীরের জিব খাদ্যবিলাসীর ডিসে শোভা পায়। আরসোলা ও ফড়িংএর ন্যায় ক্ষুদ্র পতঙ্গেরাও নিস্তার পায় না।*

* ইংরেজী থেকে।

স্বর্গ

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

স্বর্গ নহে যে কবি-কল্পনা, এইখানে এনিমেষে
আছে মোরে বেরি, বুঝালে আমারে শুধু মোরে ভালবেসে!
ধূলায় অন্ধ দুচোখে
যেন সুধা দিয়ে ধুয়ে দিলে বালি মলা আঁখি মেলি উষালোকে।
এ ধূসর ধরা ধূলিগুণ্ঠন খানি
সহসা কি নিল টানি?
ত্রিদিব কান্তি উথলিল চৌদিকে,
রাখিলে যখন আঁখি অচপল মোর পানে অনিমিকে।

তুমি আর আমি অজ্ঞাতসারে এ জীবনধারা দিয়া
একটি শ্লোকের দুইটি চরণ রচিনু কি না জানিয়া?
কোথায় আসিয়া দুজনে
মিলাব ছন্দ মিত্রাক্ষরে নয়ন রাখিয়া নয়নে?
আনন্দ ঘন একি নব জাগরণী!
পুরাতন এ ধরণী
গুণ্ঠন তার সহসা কি দিল ফেলি?
নন্দন শোভা হেরি চৌদিকে তোমাপানে আঁখি মেলি!

সাড়া

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ঢেউ পরে ঢেউ দোলালাগে
আমার বালুকা সিকতায়,
বুঝি তুমি স্মরিছ আমায়
তোমার নিগূঢ় অনুরাগে।

নয়নে স্বপনছবি জাগে,
চিরমৌন তোমার হিয়ার,
প্রেমকম্প্র সুর মূর্চ্ছনায়
বাজে বীণা ভীম পলশ্রী রাগে।

আঁখি মুদি শুনি সে ঝঙ্কার।
নিথর পাষাণ ওঠে কাঁপি,
বিদরি মূর্চ্ছার হিম ঝাঁপি
সুপ্ত ফণী মেলে ফণা তার।

মোর অন্তঃসলিলার ধারা
তোমা পানে ধায় বন্ধহারা।

সঙ্গীতবিকাশ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল বি-এস্-সি (গ্লাসগো), এ-এম-আই-ই

কোনো বিষয় শিক্ষা করতে গেলেই, সেটিকে এমন ভাবে আরম্ভ করা উচিত যাতে কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সেটি প্রথম সোপান রূপে খাপ খেয়ে যায়। প্রত্যেক বিষয়ের আরম্ভ শক্ত এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেটিকে আরও শক্ত ক'রে দেওয়া হয় অনর্থক কতকগুলি জটিল বিষয়ের অবতারণা ক'রে, অথবা নীরসভাবে শিক্ষার্থীর কাছে সেটিকে প্রকাশ ক'রে। শিক্ষাপ্রণালী সেই জন্যে হওয়া উচিত এমন—যাতে শিক্ষার্থীর ভাল লাগে এবং তার আরও শিখতে ইচ্ছা করে। এই আদর্শটিকে সামনে রেখে আমি "সঙ্গীতবিকাশ" লিখেছি। গতানুগতিক পন্থায় দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল সঙ্গীত শিক্ষা করেছি, অনেক ছাত্রছাত্রীকে সঙ্গীত শিখিয়েছি, তাদের ভালমন্দ লাগার বিষয়ে সহানুভূতি ও মনোযোগের সহিত দৃষ্টি রেখেছি। এতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আগে গান পরে জ্ঞান। ছোট ছেলেদের বর্ণপরিচয় শেখাবার আগে যদি তাদের কথা বলতে না দেওয়া হয় তা হ'লে তাদের কি অবস্থা হয় অনুমান করাই শক্ত। এও দেখেছি যে, যে ছেলেমেয়েরা ঘরে আয়া বা বাপ-মা'র কাছে ইংরেজী বলতে শিখেছে তারা অনেক পাশ করা গ্র্যাজুয়েটদের চেয়েও ভাল ইংরেজী বলতে পারে এবং যখন তারা গতানুগতিক শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করে তখন তার ব্যবহার তারা সহজ ও সুন্দরভাবেই করতে পারে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এমন কেন না হবে? কেন ছেলেরা স-র-গ-ম না শিখে গান আগে শিখবে না? কেন তারা গান শিখে তাদের ইমন, কাফি, বাগেশ্রী, ভৈরবী ইত্যাদি বলে চিনবে না, যেমন তারা লোক দেখে তাদের মা, বাবা, দাদা বা মেসোমশায় বলে চেনে, অথচ এসব কথার বানান শেখে না বা মানে জানে না।

সঙ্গীত-শিক্ষাপদ্ধতি যদি স্বাভাবিক ও সরস হয় তা হ'লে সঙ্গীতশিক্ষা ভাষাশিক্ষার চেয়ে কঠিন হওয়া উচিত নয়। 'অ' থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্য্যন্ত স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ শেখা অপেক্ষা বারটি সঙ্গীতের স্বর শেখা শক্ত হবে কেন? সঙ্গীতে ভাল শিক্ষক ও সুচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধতির একান্ত অভাব। এ অভাব পূরণ করা তখনই সম্ভব হবে, যখন নূতন প্রণালীতে উপযুক্ত সঙ্গীত-শিক্ষক তৈরী করতে বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপিত হবে, কিংবা উপযুক্ত গ্রামোফোন রেকর্ডের দ্বারা সহজ ও উপভোগ্য সুরগুলির গান সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ সুপ্রচারিত হবে। হয়ত এসব আদর্শবাদীর স্বপ্ন, কিন্তু যদি এদেশে সঙ্গীত কখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় তা হ'লে সেটা কখনই সঙ্গীতশাস্ত্রের বেড়াজালের মধ্য দিয়ে হবে না—গানের সুমিষ্ট আবেদনের মধ্য দিয়েই হবে। এই ভারতবর্ষের পঁয়ত্রিশ কোটি লোক, কোন না কোন কথিত ভাষার সাহায্যে নিজের মনের ভাব অপরকে বোঝাচ্ছে। তার মধ্যে কয়জন বর্ণপরিচয়ের ধার ধারে এবং তারও কত অল্পাংশ ব্যাকরণ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে? কেন তবে গান গেয়ে বা গানের সুর গেয়ে লোকে ভাববিনিময় করবে না? কেন সুরের জন্যে এ অত্যাচার—যে তার বিকাশের পূর্ব্বে তাকে নিজের বর্ণপরিচয় ও ব্যাকরণের শিকল পায়ে পরে লোক-সমাজে আসতে হবে? এর একমাত্র উত্তর এই যে সমাজ, শাসনকর্ত্তা ও অভিভাবকেরা সঙ্গীতের বহুল প্রচার চান না। কিন্তু যুগ যুগ ধরে ত এ অত্যাচার, পীড়ন ও অনুশাসন অবাধে চলবে না এবং চলতে পারে না। তাই বিদ্রোহবার্ত্তা বহন ক'রে আমার এই "সঙ্গীতবিকাশ" প্রকাশ করলাম। শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যে নয়, শিক্ষকদেরও জন্যে। আমার একান্ত অনুরোধ যেন শিক্ষকেরা আমার "সঙ্গীত বিকাশ" এর এই গানগুলি আয়ত্ত ক'রে শিক্ষার্থীদের শেখান এবং যেমন ভাবে বিষয়গুলির ক্রমবিকাশ হবে সেই ভাবেই শিক্ষার্থীর সামনে ধরে দেন। কিন্তু সম্যক জ্ঞানের অধিকারী না হয়ে কেউ যেন শিক্ষা দিতে চেষ্টা না করেন; কারণ তাতে শিক্ষার্থীর বিশেষ অপকার হবার সম্ভাবনা।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্বরলিপি ব্যবহার

উত্তর ভারতের সঙ্গীত-পদ্ধতিকে সাধারণত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি বলে। এটি শিক্ষা করতে হ'লে, হয় পণ্ডিত

ভাতখণ্ডে, নয় পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর রচিত বইয়ের সাহায্য নেওয়া একান্ত আবশ্যক। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতই বহুল প্রচার লাভ করেছে, অনেক কারণে—সে বিষয়ে বিচার করা এখন অনাবশ্যক। অতএব আমরা পণ্ডিত ভাতখণ্ডেরই পদানুসরণ করব। তাঁর রচিত বহু গান শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য্য। তিনি চণ্ডীদাস, তানসেন প্রভৃতির মত নিজের নাম পরিষ্কারভাবে কোন গানে দেননি; চতুর শব্দ ভণিতা হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখলেই বুঝতে হবে যে সে গানটি তাঁর রচিত। আমাদের উদ্দেশ্য সরল, সরস হিন্দুস্থানী গানের প্রচার। বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীর লেখা সঙ্গীতের বইএর বাজারে অভাব নেই। প্রয়োজন হলে পরে কবি অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান, কথা ও সুরের ব্যাখ্যা সহ প্রচার করব, যদি ইতিমধ্যে কোন সুরসিক এই কাজটিকে সুসম্পন্ন না করেন। আমি স্বরলিপিতে হিন্দী বর্ণ ব্যবহার করেছি একটি বিশেষ কারণে—বাংলায় সা রে গা মা লিখলে শিক্ষার্থীরা ভাষা পড়ার মত প'ড়ে মুখস্থ ক'রে। আমি চাই, স্বর লেখা দেখলেই লোকে সেটা গাইবে সুর ক'রে—বই পড়ার মত পড়বে না। ইংরেজী স্বরলিপির সঙ্কেত-চিহ্ন এই কারণেই উদ্ভাবিত হয়েছে এবং আমাদের দেশের ব্যাণ্ডওয়ালারা, এক অক্ষরও লেখাপড়া না শিখে তা দেখে করনেট, ক্লারিওনেট, বাঁশী ইত্যাদি অবাধে বাজায়। হিন্দী স্বরলিপিও বাঙালী ছেলেদের মনে সুরসংশ্লিষ্টছাপ রাখবে, এই আমার উদ্দেশ্য এবং স্বরলিপি যেন সর্ব্বদা সকলে সুর ক'রে বলেন। প্রথম প্রথম ভুল হলেও পরে ঠিক সুর নিজ হতেই বেরোবে।

উপক্রমণিকা

সঙ্গীত (সম+গীত) বলতে বোঝায়—নৃত্য, গীত ও বাদ্য। কিন্তু সাধারণত 'সঙ্গীত', গীত শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যারা গান শিখবার উপযোগী নয়, তারা যেন সঙ্গীত-রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে এই ভেবে নেয়, অথবা তাদের এই কথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এটা কিন্তু একেবারেই ভুল। যাদের কণ্ঠস্বর ফ্যারিন্-জাইটিস্, ডিপ্‌থিরিয়া বা গলনালী অথবা শব্দযন্ত্রের কোন গোলযোগের জন্য গানের অনুপযোগী হয়ে পড়ে অথচ তাদের কান সুর গ্রহণের বা সুরের প্রভেদ বুঝতে সক্ষম থাকে তাদের স্বরযন্ত্র, যথা—সেতার, এস্রাজ বা সোজা বাঁশী সহজেই শেখান যেতে পারে এবং তারা সুর-রাজ্যে প্রবেশ ক'রে সহজেই সঙ্গীতরস আস্বাদনের অধিকারী হতে পারে। যাদের কাণ কোন কারণে, সুর গ্রহণের বা সুরের প্রভেদ বুঝতে অক্ষম তারা তবলা ইত্যাদি বাদ্য শিখতে পারে। অনেক সময় এও দেখেছি যে, যে-কোনো বিষয় শিক্ষার্থী সহজে শিখতে পারে, সেটা শিখতে শিখতে এবং তাতে উৎকর্ষ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের অন্য দিকগুলি তারা নিজেরাই শিখে নিতে পারে। যেহেতু অন্য বিষয়গুলির সঙ্গে তার স্বভাবতই পরিচয় হতে থাকে, যথা—তবলা-বাদককে গান শুনতেই হয়, গায়ক বা সেতার বাদককে তবলা শুনতেই হয় এবং এই সাহচর্য্যে পরস্পর পরস্পরের মোটামুটি বিষয়গুলি অনায়াসে জেনে নেয়। অতএব সঙ্গীতশিক্ষার মুল মন্ত্রই হ'ল 'এক সাধে সব সধে, সব সাধে সব যায়।" অর্থাৎ একটা জিনিসের সাধনা করলে সব তাতেই সিদ্ধি লাভ হয়, পরন্তু এক সঙ্গে সব বিষয় সাধনা করলে সর্ব্বস্বই যায়, অর্থাৎ কিছুই হয় না। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়ে বড় বড় বিকট তালের গান শেখান হয়। পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোক-সমাজে সেই গান গাইয়ে অভিভাবকেরা নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বাল্যের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে অনেকেই পারে না। আমরা সব দিক বজায় রেখে খেলার ছলে, উৎসবের মধ্য দিয়ে, "সঙ্গীতবিকাশ"-এ সকলের সহানুভূতি সহকারে অগ্রসর হব।

শিক্ষার্থীর উপযোগিতা

সর্ব্বপ্রথমে দেখে নিতে হবে, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ; তার শরীর তথা বায়ুযন্ত্র, শব্দযন্ত্র, কণ্ঠনালী অথবা নাসারন্ধ্র পরিশ্রম করলে অসুস্থ হবার ভয় আছে কি-না। যদি লেশমাত্র এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তা হ'লে একটু অপেক্ষা ক'রে তাকে সুস্থ ও সবল ক'রে তারপর সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত। অনর্থক তাড়াতাড়ি ক'রে অনেক শিক্ষার্থীকে বিপন্ন হতে দেখেছি। এ বিষয় অবহেলা যাতে না হয় সে বিষয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকের দায়িত্ব সমান। স্বাস্থ্যের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এইবার তাকে

তিনটি সাধারণ বিষয়ে পরীক্ষা করতে হবে। (১) দুটি বা তিনটি বিভিন্ন স্বর গাইলে বা বাজালে শিক্ষার্থী তার সঙ্গে কণ্ঠস্বর মেলাতে পারে কি-না। যদি পারে, তা হ'লে তার গান শেখা হতে পারে। (২) দুটি স্বর গাইলে বা বাজালে যদি শিক্ষার্থী প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েও বলতে পারে কোন্‌টি উঁচু বা কোন্‌টি নীচু তা হ'লে তার যন্ত্রশিক্ষা হতে পারে। (৩) কোনো সোজা ছন্দের গান গেয়ে বা বাজিয়ে তাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিক্ষার্থীও ঠিক মত তাল দিতে পারে তা হ'লে সে নৃত্য ও তবলা প্রভৃতি যন্ত্র শিখতে পারে। মনে রাখতে হবে, আমাদের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ভগবানদত্ত ক্ষমতার আবিষ্কার ও বিকাশ করা। যা তার নেই সেটা তার মধ্যে প্রবেশ করানো মানুষের অসাধ্য এবং এ বিষয়ে সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় করার কোনো মানেই হয় না, বরং শিক্ষার্থীকে সঙ্গীত-বিমুখ ক'রে দেওয়া হয়। সাধারণত শিক্ষার্থীর দশ বৎসর থেকে বার বৎসর বয়সের মধ্যে সঙ্গীতে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ ও শেষ করা উচিত। তাই ব'লে দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ছেলেরা একেবারে গান গাইবে না, এমন নয়। খেলার ছলে, আনন্দ ক'রে, যতটুকু তারা শিখতে চাইবে সেটা অনায়াসে তাদের শিখতে বা গাইতে দেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, খিদে না পেলে, জোর ক'রে খাওয়ালে যেমন অজীর্ণ হয়, তেমনি গান না পেলে জোর ক'রে গাওয়ালে অযথা পরিশ্রমই হয় এবং এ গান গাওয়া দম দেওয়া কলের কার্য্যকলাপের মত প্রাণহীন হয়—শিশুর সাবলীল খেলার মত আনন্দদায়ক হয় না। শিক্ষার্থী প্রকাশ্যে গান গাইবার উপযোগী তখনই হয় যখন সে নিজে হতে সে ক্ষমতা অর্জ্জন ক'রে নিজেকে তার উপযুক্ত মনে করে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে লোকের সামনে গাইতে বাধ্য ক'রে অথবা ইচ্ছা থাকলেও বারণ ক'রে, অনেক অভিভাবকই শিক্ষার্থীর উপর অত্যাচার করেন। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষার্থীকেও সঙ্গীতের অনুপযোগী হয়ে যেতে দেখেছি। এ বিষয়ে সুবিবেচনা করতে আমি তাঁদের সাগ্রহে মিনতি করছি।

হিন্দী উচ্চারণ ও তার বাংলায় লিখন-পদ্ধতি

সাধারণত লোকের মনে সুন্দর ও সরস ছবি আঁকা যায় তার চোখ অথবা কানের সাহায্যে। চোখ ছবি, গতি ও বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখে সৌন্দর্য্য উপলব্ধির সহায়তা করে। কাণ গ্রহণ করে ভাষা ও সুর। ভাষা আবার তখনই আনন্দদায়ক হয় যখন সেটা সুউচ্চারিত ও সুব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষার উচ্চারণ বাঙালীদের শেখাতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু হিন্দী বা উর্দ্দুর উচ্চারণের বিষয় কিছু বলা কর্ত্তব্য। Easyর উচ্চারণ বাঙালীর মুখে 'ঈজী' শুনলে যেমন কষ্ট হয় বা স্কুল, স্কুল-এর উচ্চারণ পাঞ্জাবীর মুখে 'সুকুল' বা 'সুটুল' শুনলে ভাল লাগে না, সেই রকম বাঙালীর মুখে বিকৃত হিন্দী উচ্চারণ মনক্ষোভের কারণ হয়। বাঙালী ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশী ভাষা অনায়াসে আয়ত্ত ক'রে সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে পাবে, তখন কেন সে হিন্দী ভাষা ভাল ক'রে উচ্চারণ করতে পারবে না বা করবে না? সামান্য চেষ্টাতেই হিন্দী উচ্চারণ শেখা যায়। বাংলা ও হিন্দী স্বরবর্ণের উচ্চারণ প্রায় এক, শুধু তফাৎ মুখ্যত 'অ'-এর উচ্চারণে। বাংলাতে 'অ' এর উচ্চারণ হয় ball কথার 'a'-র উচ্চারণের মত। হিন্দীতে 'অ' "अ" উচ্চারিত হবে cup শব্দের 'u'-র উচ্চারণের মত, এইটুকু স্মরণ রাখলে স্বরবর্ণ উচ্চারণের সমস্ত গণ্ডগোল চুকে যাবে। বাংলায় 'ঐ' উচ্চারিত হয় 'অই' বা 'ওই'। "ऐ" হিন্দী ঐ উচ্চারিত হয় "अए" হিন্দী অ+এ, অ+ই নয়। মনে রাখতে হবে, হিন্দীতে 'অ'-র উচ্চারণ সর্ব্বদা cup শব্দের 'u'-র মত ছোট ও চাপা হবে—কাপ, কিন্তু কওপ হবে না। এই উচ্চারণটি আমরা 'অ্য' দিয়ে বোঝাব। আবার "ऐसा"-র উচ্চারণ 'আয়সা' বা 'এইসা' হবে না। হবে cup কথার 'u'-এর উচ্চারণ, পরে 'এ' এবং তারপরে 'সা'। আমরা লিখব 'অ্যএসা'। দন্ত 'স'-এর উচ্চারণ 'soon'-এর 's'-এর মত হবে। 'শ'-এর উচ্চারণ shame-এর 'sh'-এর মত হবে। 'ই'-র উচ্চারণ 'fit'-এর 'i'-এর মত হবে। 'ঈ'-র উচ্চারণ 'bee'-এর 'ee'-র মত হবে। 'উ'-র উচ্চারণ 'put'-এর 'u'-এর মত ছোট হবে—boot-এর 'oo'-র মত দীর্ঘ হবে না—ওটা 'ঊ'-র উচ্চারণ। হ্রস্ব ও দীর্ঘের সঠিক উচ্চারণের উপর হিন্দুস্থানী ভাষার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ন নির্ভর করে। অতএব এ বিষয়ে খুব বেশী দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। হিন্দিতে 'স'-র উচ্চারণ 'শ' ও 'ষ'-র উচ্চারণ থেকে একেবারে আলাদা

হবে। 'ব'-এর উচ্চারণ হিন্দীতে দুরকম হয়। এক 'bell'-এর 'b'-এর মত, আর 'well'-এর 'w'-র মত। এই দ্বিতীয় উচ্চারণের জন্য আমরা উড়িয়া ৱ ব্যবহার করবো। হিন্দিতে হসন্তর ব্যবহার নেই বললেই চলে। আমরা বলি রাম্, ওরা বলে রাম্য (সাবধান, রাম্য নয়—রাম+অ্য)। হিন্দি গান গাইবার সময় 'ন্দ' ওঁ+দ্য ভাবে উচ্চারিত হয় (ওংদ্দ নয় তা বলে—নাকী সুরে 'ও' আর হিন্দী প্রথায় দ্ উচ্চারণ হবে।) সেইভাবে 'সুন্দর' উচ্চারিত হবে সো-উঁদ্যর্য ইত্যাদি। সাবধান, য-ফলা দেখে বাংলা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের উচ্চারণের মত যেন উচ্চারণ করা না হয়। ঐ রকম উচ্চারণের জন্যে আমরা হিন্দি গান বা ভাষা বাংলায় লিখতে উপযুক্ত চিহ্ন ব্যবহার করব। যথা—'হ্ম', 'ঝ্য' উচ্চারিত হবে না, 'hum'-এর 'hu'-এর মত হবে। হিন্দি গানে যুক্তাক্ষরের ধমক দিয়ে উচ্চারণ নেই বললেই চলে। অতএব ধর্ম্ম, গর্ব্ব ও কীর্ত্তির পরিবর্তে ধরম, গরব ও কীরতই ব্যবহৃত হয়। এটা হয়ত লজ্জার কথা যে আমাকে হিন্দি শেখাবার জন্যে ইংরেজী উচ্চারণের সাহায্য নিতে হচ্ছে। কিন্তু কি করব, লিখে বোঝাবার মত এর চেয়ে ভাল উপায় আর পাওয়া গেল না। উর্দ্দু উচ্চারণের সম্বন্ধে প্রয়োজন হলে পরে আলোচনা করব।

স্বরলিপি ও তার ব্যবহার

শুনে যা করা উচিত তা দেখে করতে চাইলে, প্রয়োজন হয় তখন সংকেত বা ইসারা। রেলের ড্রাইভারকে স্টেশন মাস্টার চেঁচিয়ে শোনাতে পারে না যে রাস্তা পরিষ্কার আছে। তাই তার টেনে একটি সিগ্‌ন্যালের হাত নীচু করে সেটি জানিয়ে দেয়। চেঁচিয়ে চুপ কর যখন বলা চলে না, তখন নিজের বন্ধ মুখের উপর আঙ্গুল রেখে ইসারায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম কত সংকেতই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে চলে। এমন কি, ভাষাও লিপিবদ্ধ করা হয় নানা দেশের বিভিন্ন প্রকারের সাংকেতিক অক্ষরের দ্বারা। এইরূপেই স্বর ও (সুরের বর্ণমালা) লিপিবদ্ধ হয় কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে; ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাঁচটি শোয়ানো লাইন টেনে তাতে ফোঁটা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সুর বোঝান হয়। আমাদের দেশের মত তাদেরও স্বরের নাম আছে। কিন্তু তা নিয়ে তারা আর মাথা ঘামায় না।

আমাদের দেশের সঙ্গীত-পণ্ডিতেরা এক সময় সংকেত-চিহ্ন প্রচলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁরা সফলকাম হন নি। আমরা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাটা যুক্তিসঙ্গত মনে করেছি এবং তাই আমাদের স্বরগুলির নাম (ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ)-এর পরিবর্ত্তে স্বরলিপিতে সা রে গা মা পা ধা ও নি ব্যবহারই শ্রেয় মনে করেছি। কিন্তু কেন যে করেছি তা বোঝা যায় না। কারণ, যদি স্বর-নামের আদি অক্ষর থেকে এগুলি গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে 'সা'-র পরিবর্ত্তে 'ষ', 'রে'-র পরিবর্ত্তে 'ঋ', 'মা'-র পরিবর্ত্তে 'ম', 'পা'-র পরিবর্ত্তে 'প' ও 'ধা'-র পরিবর্ত্তে 'ধৈ' ব্যবহার করাই উচিত ছিল। হিন্দিতে এই স্বরগুলি সা রি গ ম প ধ নি লেখা হয়। কিন্তু তাতেও উচ্চারণকরবার সময় গা মা পা ধা-ই বলা হয়—বোধ হয় সংস্কারের দাবী গ্রাহ্য ক'রে। আমরা শুধু সংকেত-চিহ্ন হিসাবে (উচ্চারণের দিকটা গায়কের উপরে ছেড়ে দিয়ে) সংস্কার ও সত্যের মাঝামাঝি পথ বেছে নিয়ে **স র গ ম প ধ ন** ব্যবহার করব এবং আমরা হিন্দি পদ্ধতিতেই চলব। কারণ আমাদের ইচ্ছা, শিক্ষার্থীকে এমনি ভাবে তৈরী করা—যাতে সে আমাদের বই লেখা আয়ত্ত করার পর পণ্ডিতজীর বইগুলি ব্যবহার করতে পারে। এখন মোট সাতটি হিন্দি বর্ণশিক্ষা করতে হবে মাত্র। যারা এত বড় একটা বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্যে এটুকুও করতে কুণ্ঠিত তাদের সঙ্গীত শিখতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। আমার ইচ্ছা বাঙালীকে তৈরী করা এমনি ভাবে—যাতে বাঙলার বাইরের সম্পদেরও সে অধিকারী হতে পারে। এইবার আরও দু-তিনটি স্থূল বিষয়ের চিহ্ন ঠিক করতে হবে। প্রথম একই স্বরের বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশক, দ্বিতীয় একটি স্বরের স্থায়িত্ব জ্ঞাপক অর্থাৎ মাত্রা নির্দ্দেশক।

(১) কেবলমাত্র সাতটি স্বর, যথা—স র গ ম প ধ ন-তে যদি আমাদের সব গান গাওয়া যেতে পারত তা হ'লে এক স্বরেরই দুরকম ব্যবহার প্রয়োজন হত না। কিন্তু সাধারণত আমাদের সা-এর চেয়েও নীচের দিকে স্বর নামাতে হয় এবং নি-এর চেয়েও অনেক উপরে উঠতে হয়। সাধারণ গানে ষোলটি স্বর ব্যবহৃত হয়, যথা :—

ম প ধ ন { সর গম প ধ ন } স র গ ম প।
এতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তিনটি ম, তিনটি প এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি স্বর দুবার ক'রে আছে। স্বরলিপিতে কোনো স্বরের উল্লেখ করলেই স্বভাবতই মনে জাগতে পারে যে এর মধ্যে কোন্‌টি লাগবে। বাঙলা ও হিন্দি স্বরলিপিতে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে স্বরগুলি রয়েছে সেগুলির সঙ্গে কোন চিহ্নই ব্যবহার হয় না। ব্র্যাকেটের পূর্ব্বের স্বরগুলির নীচে বাঙলাতে হসন্ত ও হিন্দিতে বিন্দু এবং ব্র্যাকেটের পরের স্বরগুলিতে বাঙলাতে রেফ্‌ ও হিন্দিতে উপরে বিন্দু ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো পণ্ডিত স্বরলিপিতে তিন লাইন স্বর ব্যবহার ক'রে স্বরের স্থান নির্দ্দেশ করেন, যথা :—

কিন্তু এ নিয়ম সুপ্রচারিত হয় নি।

(২) স্বরের স্থায়িত্ব—ইংরেজীতে বিন্দুর আকার বদলে স্বরের স্থায়িত্ব বোঝায়।

বাংলাতে (ক) দণ্ডমাত্রিক (অর্থাৎ স্বরের মাথায় খাড়া দাঁড়ি দিয়ে), (খ) শূন্যমাত্রিক (অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্বর একমাত্রা এবং অতিরিক্ত মাত্রাগুলির জন্যে এক একটি শূন্য) ও (গ) আকারমাত্রিক (অর্থাৎ শূন্যের পরিবর্ত্তে আকার ব্যবহার) এই তিন প্রথাই চলেছিল। তার মধ্যে আকার মাত্রিকেরই প্রভাব বেশী। শূন্যমাত্রিক লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু দণ্ডমাত্রিক এখনও জোর ক'রে অল্পবিস্তর টিকে আছে। হিন্দিতে শূন্য এবং দণ্ডের পরিবর্ত্তে (—) ব্যবহার হয়। বিভিন্ন প্রথাগুলির দৃষ্টান্ত নীচে দিলাম। আমরা হিন্দি মতেরই অনুসরণ করব।

সা (দণ্ড)	= সা ০ ০ (শূন্য)	= সা । । (আকার)	= सा —— (হিন্দি)

প্রত্যেকটি তিন মাত্রা।

যদি শুধু এই সাতটি "শুদ্ধ" (সাধারণ বা স্বাভাবিক) স্বরই আমাদের সঙ্গীতে লাগত তা হ'লে মোটামুটি স্বরলিপি লেখার জন্যে যা জ্ঞাতব্য ছিল তা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের র গ ধ ন কোমল ও ম তীব্র (কড়ি বা চড়া)ও ব্যবহার করতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথায় কোনো স্বরের পূর্ব্বে ফ্ল্যাট চিহ্ন '♭' বসালে কোমল ও শার্প চিহ্ন '♯' বসালে তীব্র বুঝায়। দণ্ডমাত্রিকে স্বরের মাথায় △ বসালে কোমল ও ৮ বসালে তীব্র বোঝায়। শূন্যমাত্রিকে 'গা' কে 'গো' 'রে'-কে 'রো' ইত্যাদি লিখে কোমল ও 'মা'-কে 'মী' লিখে তীব্র বোঝান হত। আকারমাত্রিকে প্রত্যেক স্বরের জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে স্বরের তলে একটি ছোট লাইন দিয়ে কোমল ও মাথায় একটি খাড়া দাঁড়ি দিয়ে তীব্র বোঝান হয়। বিভিন্ন প্রথার শুদ্ধ ও বিকৃত (কোমল ও তীব্র) স্বররূপ নীচে দিলাম।

দণ্ড—সা ঋ ঋ গা গা মা মা পা ধা ধা নি নি।
আকার—সা ঋা রা জ্ঞা গা মা হ্মা পা দা ধা ণা না।
হিন্দী—**स रि रि ग ग म म प ध ध नि नि।**
এই সম্পর্কেও আমরা হিন্দি প্রথাই ব্যবহার করব।

সুন্দরভাবে স্বরলিপি করতে গেলে আরও কতকগুলি চিহ্নের প্রয়োজন হয়। সেগুলি নীচে দিলাম। কিন্তু যত সূক্ষ্ম স্বরলিপিই হোক্‌ না কেন, গানের সঠিক ছবি সেটা হতে পারে না, তবে স্বরলিপির উদ্দেশ্য হচ্ছে গানের সুরকে যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করা। গায়ক সুরের কাঠামটি স্বরলিপি থেকে নিয়ে গানকে নিজের ক্ষমতা মত রূপ দেন। আমরা আগেই দেখেছি যে, (১) নীচে লাইন দিলে কোমল স্বর বোঝায়, (৩) নীচে বিন্দু দিলে মন্দ্র-সপ্তকের স্বর বোঝায়, (৫) কোন চিহ্ন না থাকলে মধ্য-সপ্তকের শুদ্ধ স্বর বোঝায়, (২) উপরে খাড়া লাইন দিয়ে তীব্র ম লেখা হয়, (৬) (ড্যাস)—দিয়ে একটি মাত্রা কাল পূর্ব্বের স্বরের স্থায়িত্ব বোঝায়। উপরন্তু—(৭) ( )-এর মধ্যে কোনো স্বর দিলে, তার পরের স্বর, সেই স্বর, তার আগের স্বর ও আবার সেই স্বর এই চারটি এক মাত্রায় বোঝায়। যথা—
(प)=धप मप, (सा)=रसानसा, (ध)=नधपध ইত্যাদি। (৮) S চিহ্ন দিয়ে গানের ভাষার 'আ' 'ই' ইত্যাদি স্বরবর্ণের জের বোঝানো হয় এক মাত্রায়।

(৯) স্বরের উপরে ও পূর্ব্বে ছোট স্বর লিখে "গ্রেস্‌নোট্‌" বা 'ক্যণ' বোঝায়—প্রথম শিক্ষার্থী এগুলি না শিখলে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না।

আমি এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে প্রত্যেক পদ্ধতির স্বরলিপিই গুণসম্পন্ন, কোনটিই হীন নয় এবং প্রত্যেকটি নিজের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ ক'রে সঙ্গীতের প্রচারে প্রচুর সাহায্য করেছে। মতভেদ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্বগামী স্রষ্টাদের প্র‌তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন শিক্ষার মূল মন্ত্র।

গান ও গাইবার বিষয় কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা

পরে কতকগুলি গান দেওয়া হ'ল। এই গানগুলি শুধু শিক্ষার্থীকে সনাতন সঙ্গীতের প্রবেশিকা হিসাবে শেখাবার জন্য। আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয় যে শিক্ষার্থী অন্য কোনো গান শিখবে না। সহজ সুন্দর বাংলা গান, কীর্ত্তন, বাউল, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী ইত্যাদি বয়সোপযোগী ভাষা বিশিষ্ট রেকর্ড সঙ্গীতও শেখার একটা দাম আছে। তাতে শিক্ষার্থীর কোনো ক্ষতি হয় না, উপরন্তু একটা স্বাধীনতার আনন্দ ও স্বাভাবিকতার উল্লাস স্ফুরিত হয়। এটা শিক্ষার্থীর সঙ্গীতমুখী বৃত্তিগুলি ফোটাবার কাজে বিশেষ সহায়তা করে, এমন কি নকল ক'রে বেসুরো উদ্ভট তান দিলেও প্রথম শিক্ষার্থীকে বারণ করা উচিত নয়। আমাদের সঙ্গীত-বিকাশের কারখানায় এই সব জিনিষগুলি কেটে ছেঁটে হীরা তৈরী হবে। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে তাকে গন্তব্য পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। (১) মুখ খুলে তার স্বাভাবিক স্বরে তাকে গান গাওয়াতে হবে। উঁচু সুরে গান গাইলে (বিশেষত, শিক্ষার সময় যখন এককালীন শব্দযন্ত্রকে অনেকক্ষণ কাজ করে যেতে হয়) গলনালী ও তার চারিদিকের শিরাগুলিকে অনর্থক পরিশ্রান্ত ক'রে দেওয়া হয়। গলার শির ফোলা, মুখ লাল হওয়া, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসা—এগুলি অস্বাভাবিক এবং যাতে এগুলি না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এমন কি, কথাবার্ত্তায়ও যতদূর সম্ভব তাকে চেঁচামেচি করতে বারণ করা উচিত। প্রথম শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপলক্ষে কখনও এককালীন আধঘণ্টার বেশী গাইতে দেওয়া উচিত নয় এবং একবার গাওয়ার পরে চার-পাঁচ ঘণ্টা বিশ্রাম দিয়ে (তারপর প্রয়োজন হ'লে) আবার গান গাওয়ানো যেতে পারে। মুখ নীচু ক'রে, (যথা—হারমনিয়মের দিকে তাকিয়ে) বা বুকে হাঁটু চেপে (যথা—তম্বুরা নিয়ে) গান করলে কণ্ঠনালী ও শ্বাসযন্ত্রের উপরে অযথা চাপ পড়ে। দাঁড়িয়ে, চেয়ারে বসে অথবা সোজা হয়ে স্বাভাবিক ভাবে ব'সে গান করা ভাল। আমার মতে দাঁড়িয়ে গান করা, সম্ভব হলে সব চেয়ে ভাল। প্রয়োজন হ'লে হারমোনিয়ম বা তম্বুরা কোন উঁচু জায়গায় (টেবল চেয়ার ইত্যাদির) উপর রেখে কাজ চলতে পারে। বসলে শরীর স্বভাবতই অল্পবিস্তর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাতে শরীরের ভিতরকার যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক অবস্থা থেকে যায় না—আবার, সোজা হয়ে বসাও একটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই, আমার মতে দাঁড়িয়ে গান করাই সবচেয়ে ভাল। (২) শিক্ষার্থীকে "সহজে যা জীর্ণ হয়" এমন রকম খাবার খাওয়াতে হবে। কারণ, পরিপাকযন্ত্রের সঙ্গে স্বরযন্ত্রের নিকট-সম্বন্ধ আছে। মৌরী, সুপারী, ধনে প্রভৃতি শক্ত ধারাল মসলা গলাকে ক্ষত বিক্ষত করে। তাতে পরে ময়লা জ'মে একটা পরদা গোছের পড়ে যায়, যেমন—ধারাল চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়ালে মাথার চামড়া লাঙ্গল চসা জমির মত হয়ে যায় এবং তাতে আরও বেশী ক'রে ময়লা জমবার সুবিধা হয়। এই ময়লা পরদার জন্যে গল-নালীর স্বাভাবিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ অনেকটা বাধা পায় এবং সহজ সুরসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। পান খেলে জিব মোটা হয় এটা সর্ব্বৈব ভুল। সুপারী, বেশী চুণ খয়ের ও মসলার জন্যে এই রকম পরদা পড়ে। তার জন্যে পানের মত একটা অপূর্ব্ব ভাল জিনিষকে ত্যাগ করতে বলা হয়। আমার মতে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে খাবার পরে একটি ক'রে অল্প চুণ খয়ের এবং নামমাত্র মিহি সুপারী দিয়ে পান সেজে খেতে দেওয়া উচিত। অবশ্য পরে দেখতে হবে যেন সে মুখটা ধুয়ে ফেলে। তা না হলে দাঁতের পেছন দিকে ময়লা জমবে। সিগারেট বিড়ি ইত্যাদিও একই কারণে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর অনুপযোগী। পরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থী, প্রয়োজন হ'লে হুঁকা খেতে পারেন। তবে যতদূর সম্ভব খুব জোরে টেনে না খাওয়াই ভাল। নাসারন্ধ্র পরিষ্কার রাখা উচিত এবং নাকে সরষের তেল দেওয়া এবং সম্ভব হ'লে

নাসাপান প্রভৃতিতে উপকার দর্শে। যাদের সর্দ্দিকাশীর ধাত তাদের গরম জলে নুন দিয়ে অথবা লবণাক্ত চায়ের জল দিয়ে প্রত্যহ দুবার গলগলা (gargle) করা একান্ত উচিত। দৈহিক কাজের জন্যে যে রকম অল্পবিস্তর ব্যায়াম প্রয়োজনীয়, স্বরযন্ত্রের কাজের জন্যে সেই রকম মুখ-গহ্বর, নাসারন্ধ্র ও বায়ুযন্ত্রের ব্যায়ামও একান্ত প্রয়োজনীয়। দৌড়ান, খেলা ও অন্যান্য দৈহিক পরিশ্রম, যাতে মানুষ হাঁপিয়ে পড়ে, সেটা পরিমিত ভাবে, শরীরের শক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে করাই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু এই রকম পরিশ্রমের পর তিন-চার ঘণ্টা বিশ্রাম না নিয়ে কদাচ সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত নয়। এ বিষয়ে ডাক্তারের মত নেওয়াই শ্রেয়। শোবার সময়, হাতপা সমস্ত আলগা ক'রে নাক দিয়ে মনে মনে গুণে পাঁচ থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ বাড়িয়ে বিশবার পর্য্যন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস নেওয়া উচিত। যখন আর নিশ্বাস নেওয়া যায় না তখনই ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়বে, কদাচ নিশ্বাস এক সেকেণ্ডও বন্ধ করে রাখা উচিত নয়। আবার নিশ্বাস নিতে যত গোণা হবে—ছাড়তে তার চেয়ে যেন অন্তত পক্ষে চার বেশী গণা হয়। সাবধান, ছাড়বার সময় তাড়াতাড়ি গুণে ফাঁকি দিলে চলবে না। (৩) শিক্ষার্থী গান গাইবার সময় জিভ চামচের ভিতর দিকটার মত (concave) করে রাখবে। এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে না বুঝে, স্বর সাধনার সময় অনেকে 'আ' না বলে 'অ্যা' বা 'অ' উচ্চারণ করে। হাঁ করলেই কচ্ছপের পিঠের মত জিভ উঁচু হয়ে আছে, কিংবা দুপাটি দাঁতের ফাঁকে বেরিয়া আছে, দেখতে কদর্য্য লাগে। তবে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, জিভ মুখে ঠিক ভাবে থাকলে মুখ-গহ্বর reflector-এর কাজ করে এবং মুখ ঠিক ভাবে খুললে (অর্থাৎ এমন ভাবে যাতে দুপাটি দাঁতের মধ্যে একটি আঙ্গুল সহজে প্রবেশ করান যেতে পারে) ছোট সুরও অনেক দূর পর্য্যন্ত শোনান যায়। যেমন মোটরের আলো reflector-এর সাহায্যে সহস্রগুণ উজ্জ্বলতা লাভ করে। (৪) সম্ভব হ'লে, মুদ্রাদোষ নিবারণের জন্য আরসির দিকে তাকিয়ে গান করা ভাল নিয়ম।

আত্মনির্ভর

রসরাজ অমৃতলাল বসু

ষেটেরা পূজার রাতে বিধাতা ললাটে।
'সুখে থাক' এই কথা লিখেছেন শাঁটে॥
চঞ্চল ইন্দ্রিয় অঙ্গ খুঁতখুঁতে মন।
সহজ সুখের পথে ফেলে না চরণ॥
দোলায় দুলিতে মন দোল খায় তার।
ঈশ্বরনির্ভর ভুলে বিদ্রোহ সঞ্চার॥
রসনা ফুটিতে কথা, বলে 'হামি হামি'।
'হামি' 'হামি' হ'তে হ'তে শেখে 'আমি' আমি॥'
মায়ের কোলেতে দুধ খেতে নাহি চায়।
নিজে মুখে মাটী তুলে কাঁদিয়ে ভাসায়॥
মায়ের আঁচল ভুলে আমি বুলি শিখে।
হাত ধ'রে হাঁটাইতে ছোটে অন্য দিকে॥
টলিয়া হাঁটিতে ছুটে আছড়িয়া পড়ে।
তবু না মায়ের কোলে আদরেতে চড়ে॥*

অসিভূষণ বসুর সৌজন্যে।

আবহমান

শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় বি-এল্

আজিকার ভালোবাসা—নাহি জানি কোথা আদি তার!
সে কোন্ আদিম দিনে সময়ের উৎস-মুখ হ'তে
প্রাণের আনন্দ লয়ে ভেসে এল বহি শঙ্কাভার
এ মোর প্রথম প্রেম মুক্তধারা জীবনের স্রোতে।

তাই মোর বক্ষঃ-তটে যুগান্তের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস্—
অন্তরে গুমরি ওঠে শত-কোটী প্রেমিকের ব্যথা,
আমার চুম্বনে ঝরে অতীতের মদির-নির্য্যাস,
মনের মন্দিরে জাগে চিরন্তন জীবন-দেবতা।

হে সুন্দর, সনাতন! যুগ-জয়ী তোমারি এ দান
অন্তর ছাপায়ে মোর অন্তরের (অনাগত) পানে বহি যায়;
হয় তো আমারো প্রেমে ভবিষ্যৎ প্রাণের সন্ধান
গোপনে ভাসিছে সেই দুর্নিবার অজস্র ধারায়!

এমনি চলিছে স্রোত, এমনি বহিবে এর পর—
আজিকার ভালোবাসা বুকে ধরে কি চির-স্বাক্ষর!

ঘরের কাব্য

শ্রীমতিলাল দাশ

১

শরতের সোনালি রোদ উছলে পড়ছে—মন আজ খুশী। ছুটি—অনেক দিনের ছুটি। নিত্যাভ্যস্ত পথে আর ঘানি টানতে হবে না—তাই বেপরোয়া স্ফূর্ত্তিতে মনকে ভাসিয়ে দিলাম।

বাতায়নের ফাঁকে চোখে পড়ে নারিকেল-শাখা—ঝাউয়ের বন। ওর চিকণ-পাতার আড়ালে হলুদ-পাখী ডাকছে—একটা খোকা হোক, একটা খোকা হোক—

এলা এসে পাশে দাঁড়াল—তরুণী বধূ।

শোনো পাখী কি বলছে!

ওর মুখে জাগল ভ্রুকুটি—রক্তিমগণ্ডে রক্ত-রেখা বেশ মানাল; কিন্তু কাব্য-ভোগের অবসর হ'ল না—গর্জ্জন এল—'তুমি আমায় অপমান করছ?'

অবাক হয়ে ভীতকণ্ঠে বললাম—আমি!

তুমি—তোমাদের অসভ্য মনোভাব—কিছুতেই যাবে না।

জড়িতকণ্ঠে বললাম—'আমার দোষ কি? বনের পাখী গাইছে আপন মনে—আমি ত শেখাইনি—'

'বনের পাখী যেমন বেয়াদপ—তুমিও তেমনই—'

রোদের আলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে—বুকে যেন শেল ফোটে—দুঃসহ দুর্ব্বার শেল।

উদ্যানের ফরিয়পসিল তার পুষ্পের অর্ঘ্য সাজিয়েছিল—সে ফুল যেন ম্লান হয়ে চাইল।

পাখীর মধুর সুর যেন বেসুরা লাগল।

বেয়াদপি—তা অনেকটা সত্য। এলার কথা রূঢ়, সে আঘাত দেয়—প্রাণের তারে ব্যথা বাজায়, কিন্তু তার দোষ নেই—তার সঙ্গে সর্ত্ত ছিল—আমরা হব দুজনে শুধু বন্ধু—প্লেটোনিক বন্ধু।

কিন্তু নর ও নারী—তারা কি শুধু বন্ধু হতে পারে?

আকাশের তারা তাদের মনে জাগায় পিপাসা—বনের পাখী তাদের সাথে শত্রুতা করে—কাননের ফুল তাদের আকুল করে—বাতাস তাদের মনে দেয় দোলা।

চিন্তায় বাধা পড়ল, এলা বলল—'এসব বাঁদরামি না ক'রে যে বইটা লিখবে বলেছিলে তাতেই হাত দাও না কেন?'

সদুপদেশ—বন্ধুর সদুপদেশ—প্রণয়িনীর নয়।

ম্লানমুখে চাইলাম; বললাম—'আচ্ছা দেখি—'

'আচ্ছা দেখি নয়—কুঁড়েমির চেয়ে কাজ ভাল—'

নীতিকথা—কাব্যসম্মত নয়—তবু নীতিকথা—স্কুলে ও কলেজে অনেক হজম করেছি, কিন্তু ওদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বোধহয় চলে না।

কাগজ ও কলম বাহির করিলাম। এলা খানিক আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল। কিন্তু মন বসে না, ভাবের ছন্দ কথার সাথে মিল পায় না।

ভাবছি আকাশ-পাতাল—তার নেই সূত্র—তার নেই জটা। এলা সুন্দরী—সর্ব্বনাশীর মত ওর মোহিনীরূপ—ও যে আকর্ষণ করে বিহ্বল করে—ও বোধ হয় তা জানে না। বুদ্ধি ওর নিরঙ্কুশ।

ছুটির দিনটা এমন কলহে আরম্ভ হ'ল—এর পরিণতি কোথায়? কে জানে।

কাজের দিনে হয় ত ভুলে থাকা যায়, কিন্তু ছুটির দিনে—না—বিদায় নিতে হবে—যেতে হবে হয় কাশ্মীরের জাফরাণ খেতে, না হয় গোপালপুরের বালু-বেলা-তীরে।

নির্ম্মল তড়াগ তীরে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে বসে থাকা—আর যে পারুক—আমি পারব না।

চুক্তি—তা ঠিক। কল্পনায় যা ছিল সহজ, কাজে তা সম্ভব নয়।

উপায় কি? হয় ত ব্যবধান—হয় ত—না, এ 'হয়ত'র শেষ নেই।

কাশ্মীর—লোকে বলে ভূস্বর্গ—ওখানেই যাব।

২

চুক্তির ইতিহাসটা হয় ত জানা ভাল।

বন্ধু অচলের বিয়েতে প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণে এলার সঙ্গে পরিচয় হয়। বন্ধুপত্নী অচলার লজ্জারুণ মুখের পাশে এলার দৃপ্ত মহিমা আমায় মুগ্ধ ক'রে দেয়। এলা তখন এম-এ পড়ছে—গোপন আলাপের একটা সুযোগ ঘটে কয়েক দিন পরে।

আমার প্রণয়-নিবেদন শুনে এলা বলল—সে নারীত্বের গৌরবের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে--বিয়ের বাঁধন তার জন্যে নয়।

আমি বললাম—'বন্ধন নয়, তুমি চল আমার ঘরে—শুধু আষাঢ়ের রজনীগন্ধার সৌরভের মত—তুমি হবে বন্ধনহীন।'

এলা বলল—'সে হয় না, আপনি বন্ধু নিয়ে তৃপ্ত হতে পারবেন না। আপনি চাইবেন আপনার হৃদয়-গেহিনী, আপনার শয্যাসঙ্গিনী—আপনার সন্তানের জননী—'

যৌবনের অন্ধমোহে বললাম—'না, না, তুমি আমি হব শুধু বন্ধু—দুজনের থাকবে জীবনে চলবার সমানাধিকার, বর্ব্বরতার বন্ধন তোমায় আমায় নয়—তুমি হবে শুধু সহচর--আনন্দের দূত—'

অচলা কখন ধূমকেতুর মত রসভঙ্গ করতে উপস্থিত হ'ল—সে শুনল, বলল—'আমি জানি এটা এলার বৃথাযুক্তি। নভেলিয়ানা নিয়ে দিন কাটে না—তবে ভাববেন না যোগেশবাবু, এলার মন মাখমের মত—ও যেদিন গলবে, প্রেমের বান যখন ডাকবে—তখন ওর উচ্ছ্বাসেই প্রাণান্ত হবে আপনার।'

এলা অচলার কথায় ক্রোধান্বিত হ'ল—সগর্ব্বে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল—'দেখলেন, এসব ফাঁকা কথার কাজ নয়—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন—'

তাই প্রতিজ্ঞা করলাম।

কিন্তু তখন কি জানি? বাসনার নাগপাশের অপ্রতিহত শক্তি তখন অজ্ঞাত—কল্পনার রসে তখন কাব্যবনে বিচরণ করি—কাজেই অজ্ঞানে চুক্তি করলাম।

এলা নির্ম্মম—সেদিনের সে চুক্তিকে সে কঠোরভাবে আঁকড়ে আছে।

বুঝি না—নারী চির-রহস্যময়ী। স্নেহের চিরন্তন নির্ঝর যারা বুকে বয়, তারা এত নিষ্ঠুরতা কোথায় পায়? সৃষ্টির যে সনাতন ডাক পুরুষকে মদমত্ত করে, নারী কেমন ক'রে তার আহ্বানকে তুচ্ছ করে?

সমস্যা সমস্যাই রয়ে যায়—পাষাণী এলা পাষাণীই থাকে। বাঁচবার জন্য খেয়াল চাই—আমার কোনও খেয়াল নাই। জীবন একান্ত ফাঁকা ঠেকে।

পৃথিবীর নিত্যদিনের যাতায়াতের মাঝে সৌন্দর্য্য নাই—খেয়ালী তার খেয়ালের রঙে অতিপরিচিতকে রঙীন করিয়া তোলে—সে খেয়াল কোথায় পাই?

এলা সুখে আছে। পদ্মপাতার মত সে নির্লিপ্ত—তাকে আসক্তির সলিল আসক্ত করে না—সে দিব্য স্ফূর্ত্তিতে চলে। অনেকে আমার দুঃখ জানে না--বিষাদের এই ইতিহাস পড়ে না—তারা আমাকে বিদ্রূপ করে। বলে আমি দুঃখবাদী—মিথ্যাই দুঃখ গড়ি।

কিন্তু জীবনব্যাপী এই নির্ভরসার সম্মুখে কে সুখবাদী হ'তে পারে, বুঝি না—যে পারে সে হয় অতি-মানব, নয় অ-মানব; আমি দেবতা নই—আমি সংসারের একান্ত অতি-সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ—

৩

চাকর সাধুই দিন-চলার সঙ্গী—

সন্ধ্যারাতে অঙ্গমর্দ্দন করে, আর পৃথিবীর খবর বলে।

ওকে বলি—'কাশ্মীর যাব।'

সাধু প্রশ্ন করে—'মা, জীব?'

চুপ করিয়া থাকি—বলি—'না।'

সাধু বলে—'একটা গাড়ী কেনো বাবা—তারপর—'

উত্তর পায় না। গাড়ী কেনার আগ্রহ নেই। জিজ্ঞাসা করি—'তোর মা কি করছে?'

'মা সভা করিথিলা—বনমালী গাড়ী নি আইলা—মা চলি গেলা—'

দুঃখনিবারণী সভা—শহরের মহিলাদের অধিনায়িকা এলা—সকলের দুঃখ নিবারণ হয়—ঘরেই শুধু ব্যথার অনল দাউ দাউ জ্বলে।

সাধু বলে—'মা বলিথিলা, মা কাশ্মীর জীব—আমি কোথায় থাকিবু—আমি বাসায় রইবু না—আমি জীব—'

অনেকদিনের পুরাতন ভৃত্য। বলি—'কখন বল্‌ল ?'

'কাল বলিথিলা।'

কিন্তু এ কি অন্যায় !

গৃহেই রচনা করেছ অপ্রীতির জগদ্দল বিহার—আর কেন, এবার মুক্তি দাও।

সাধু বলে—'আমি রইবু না বাবা—আমি জীব—'

সাধু অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হয়—এলার পদধ্বনি। সাধু পলায়।

এলা পাশে এসে বসে—সন্ধ্যার অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময়ী পরীর মতন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলি—'সভা কেমন চলছে ?'

এলা কথা বলে না—চুপ করেই থাকে।

জিজ্ঞাসা করি—'কি কাজ করলে আজ ?'

'সে সব কথা যাক, তুমি তা হ'লে কাশ্মীর যাবে ?'

'হাঁ, বিনয় তার গাড়ীটা বেচবে—কমদামেই পাব—গাড়ী নিয়েই বেরিয়ে পড়ব—তেপান্তরের পথে—যাত্রী—'

'তারপর ?'

'তারপর ত কিছু নেই—যেখানে রাত হবে, সেখানে বাঁধব বাসা—পরদিন ভাঙব সে নীড়—চলব পথের পানে—নির্ব্বন্ধ অনাসক্তিতে—'

'অভিনয় করছ ?'

'অভিনয় কোন জন্মেও করিনি এলা, কিন্তু সে কথা কেন বলছ ?'

'আমি কি তোমার পথের কাঁটা হয়েছি ?'

'সে প্রশ্ন অবান্তর এলা ?'

'অবান্তর ?'

'অবান্তর নয় কি—তুমি শক্তিময়ী—আমি দুর্ব্বল—আমি পালাতে চাই—তুমি থাক তোমার সাম্রাজ্যে সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্ঞী—'

'উপহাস করছ ?'

'মোটেই না।'

'তবে ?'

'আমি চুক্তি রাখতে পারছিনে এলা—'

মুক্তাকান্তির মত হাসি—অন্ধকারকে দীপ্ত করে—সে বলে—'তাই বুঝি যাচ্ছ কাশ্মীরী বধূর চিত্ত-জয়ে—'

'সে শক্তি নেই, তাই আঘাত করতে পার তুমি।'

'শক্তি নেই, বল কি—যুগে যুগে পুরুষ বহুগামী—'

ব্যথিত কণ্ঠে বলি—'এ তোমার সভা নয় এলা—'

'আমি কি তোমায় ভালবাসিনে ?'

'জানিনে।'

এলা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—'বেশ, যে ভালবাসে তার কাছেই যাও।'

দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কূলে হতবুদ্ধি হয়ে থাকি।

আকাশের পথে গ্রহের ভ্রমণ চলে—রাশিচক্রের আবর্ত্তন অগ্রসর হয়। বাতাস ফুলের গন্ধ আনে।

বলি—'এ কি এলা ? আমায় ক্ষমা করো। কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন ?'

'যদি আমায় ভালবাসতে বুঝতে—'

এ কি নিষ্ঠুর পরিণাম !

'আমি কি তোমায় ভালবাসিনি ?'

এলা চুপ করে—পরে বলে—'না, বাসনি। তুমি বীর, তুমি হবে দিগ্বিজয়ী—তুমি ভিক্ষুক হয়ে চাইবে কেন—তুমি জয় করবে—'

এ কি হেঁয়ালি! ভয়ে বলি—'এলা, তোমার কি অসুখ করেছে ?'

'হাঁ, অসুখই করেছে। আমি তোমায় কোথাও যেতে দেব না।'

এই বলে সে কাছ ঘেঁসে এসে বসল—বলিল—'তুমি কোথাও যেতে পাবে না।'

অন্ধকারে আলো জ্বলল—এলাকে বক্ষে টেনে নিয়ে বললাম—'তুমি বিজয়িনী !'

এলা আলিঙ্গনের আবেশে এলাইয়া পড়িল, বলিল—'না, না, তুমি আমায় মান দিও না—লাঞ্ছনা দিয়ে আপন করে নাও।'

জাপান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(২)

পাহাড়ী কাঠের কাঠামো, টালিখোলার চাল, মাদুরের মেজে আর কাগজের বেড়া—এই নিয়ে জাপানীদের ঘর। অবশ্য এ বর্ণনা দিয়ে আসল বস্তুটির আন্দাজ করা শক্ত—যেমন খড়, মাটি ও রং বল্‌লে প্রতিমার পরিচয় জানা যায় না। অথচ এই কয়টি জিনিসের সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের যে সৌন্দর্য্য, তা' এর চেয়ে বেশী কথায় বর্ণনা করতে গেলে হয়তো ভাষার বাহাদুরি দেখানো যেতে পারে, কিন্তু বর্ণনীয় বস্তুটিকে চোখ যে-রকম দেখে ঠিক তেমনটি করে উপস্থিত করা চলে না। প্রতিমার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভাষা বড় জোর 'অতসীপুষ্পবর্ণাভা' 'নবদূর্ব্বাদলশ্যাম' প্রভৃতি কতকগুলি মামুলি বাঁধাবুলি ছাড়া আর এমন কিছু যোগান দিতে পারে না, যা দিয়ে প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে চোখের সামনে ফুটে ওঠে—লেখক যতই শক্তিমান্ হোক্—ভাষা যতই সমৃদ্ধ হোক্—ছবির যে সৌন্দর্য্য তুলির টানে টানে রেখায় রেখায় ফুটে উঠে' নয়ন-মন মুগ্ধ করে—ভাষা সে সৌন্দর্য্যকে একমাত্র 'সুন্দর' ছাড়া আর কোন বাক্যে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারে নি। মনের সব-কিছু ভাব, সব-কিছু সৌন্দর্য্যবোধ অক্ষরের রেখা অঙ্কনে প্রতিফলিত করবার দাবী কোন ভাষাই আজ পর্য্যন্ত কর্‌তে পারে নি। সেই অক্ষম ভাষার সাহায্য নিয়ে জাপানের এই ছবির মত বাড়ীগুলির ছবি আঁকতে গিয়ে শুধু যদি নিজেকেই হাস্যাস্পদ কর্‌তুম্ তাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না—যদি না খেলো করা হ'তো ভাষাকে! তার অসম্পূর্ণতার জন্য আপশোষ করতে পারি, কিন্তু তার অপমান করতে পারি না।

তা'ছাড়া, বর্ণনার শোভাযাত্রা তার জন্যই সাজানো চলে—যার অলঙ্কার আছে, আয়োজন আছে, আড়ম্বর আছে। যা' নিঃস্ব—একমাত্র রিক্ততার মাধুর্য্য ছাড়া আর কোন পুঁজিই যার নেই, তার সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করা চলে, কিন্তু উপন্যাস করা চলে না। গোলাপ বেলা মল্লিকা নিয়ে কবিতার পর কবিতা রচনা হয়েছে। এমন কি, কণ্টকিতা কেতকী পর্য্যন্ত কাব্যের তোষাখানায় সযত্নে তোলা আছে—বাদ্‌লা দিনের ব্যবস্থিত সঞ্চয়! কমল-কুমুদশুদ্ধ সমারোহের খাতিরে সূর্য্য-চন্দ্র পতিলাভ করেছে; সে বিবাহোৎসবে কাব্যরসিকেরা ভূরিভোজন ক'রে আসছেন আবহমান কাল থেকে, তবুও তাঁদের বদ্‌হজম হয়নি। কিন্তু কল্‌মি-ফুলের দিকে কেউ কখনও ফিরেও তাকায় নি—কারণ তার আড়ম্বর নেই। সারা আকাশের ছায়াপথ ঘুরেও কবিরা তার জন্য একটি বরও যোগাড় করতে পারেন নি। আদর পেয়েছে কুন্দ-কামিনী, কিন্তু নেবুফুল অনাদৃতই রয়ে গেছে, কারণ তার আড়ম্বর নেই। সীতার মর্ম্মন্তুদ দুঃখে যুগ-যুগান্তর ধরে' কত কবির অশ্রুর বন্যা বয়ে গেছে—কিন্তু উর্ম্মিলা চিরদিন কাব্যের উপেক্ষিতা। তাজমহলের মর্ম্মর-স্বপ্ন সারা দুনিয়াকে বিমুগ্ধ করেছে তার ঐশ্বর্য্যের সমারোহে, কিন্তু সিরাজ-মহিষী লুৎফার সমাধি-পাশে দীপ জ্বালাতে মাসে ছ'আনার বেশী বরাদ্দ নেই। রাজপ্রাসাদের নিখুঁত বর্ণনায় ভাষার যাদুকরেরা হয়রাণ হ'য়ে গেছেন, কিন্তু পর্ণকুটীরের দরিদ্রতা চিরকাল পঙ্গু করেছে তাঁদের উৎসাহকে। দুনিয়া আড়ম্বরের পূজারী; দরিদ্র সারল্যকে সে সত্য সত্যই ভালবাস্‌তে পারে না, তাকে সে অনুকম্পা করে শুধু নিজের উদারতার গৌরব বাড়া'তে!

জাপানের এই বাড়ীগুলির আড়ম্বর নেই, কিন্তু সৌষ্ঠব আছে। এই আয়োজনহীন সরলতার সৌন্দর্য্যই তার বড় বিশেষত্ব। কোথাও তার আতিশয্যের চিহ্নমাত্র নেই। কি ভিতরে, কি বাইরে, কোথাও তার এতটুকু রং নেই, বার্নিশ নেই, পালিশ নেই। অথচ কাঠের স্বাভাবিক রং বজায় রেখে শুদ্ধ ঘসে' মেজে তাকে কতখানি সুন্দর করে তোলা যায়, চোখে না দেখ্‌লে তা ঠিক বোঝা যায় না।

শহরের কথা বল্‌ছি না। সেখানে আমেরিকার

অনুকরণে কুড়ি-তলা বাইশ-তলা স্কাই-স্ক্র্যাপার দিন দিন অভ্র ভেদ ক'রে উঠ্ছে। কি আকারে, কি অলঙ্কারে—তার আড়ম্বরের অন্ত নেই। বাইরের বিশালতা তার বিস্ময় আনে, ভিতরের সাজগোজ আকর্ষণ করে। পাশ্চাত্যের যত কিছু বিলাসের উপকরণ তার কোনটারই অভাব সেখানে নেই। তার এক-একটা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে জাপানে আছি কি নিউ-ইয়র্কে আছি, বোঝা যেত না—যদি তার সাজ-সজ্জায়, আস্‌বাব-উপকরণে জাপানী চরিত্রের সহজ-সুন্দর বৈশিষ্ট্যের ছাপ না থাকত!

কিন্তু জাপানীদের প্রায় কেউই শহরে বাস করে না। কাজেই শহরের মাপকাঠি দিয়ে জাপানী-জীবনকে বিচার কর্‌তে গেলে ভুল করা হবে। শহরের সীমানার বাইরে দু-চার মাইল গেলেই পাহাড়ের পাশে, নদীর ধারে, মনোরম স্থানের অন্ত নেই; সেখানে শহুরে জীবনের চাঞ্চল্য নেই, কোলাহল নেই,—আছে একান্তের শান্তি। সেইখানে ছোট ছোট বাড়ী ক'রে এবং প্রতি বাড়ীর সঙ্গে একটি ক'রে সুন্দর বাগান তৈরী ক'রে তারা বাস করে। সেইখানেই পাওয়া যায় তাদের প্রকৃত জীবনের স্পন্দন। তাই শহরের পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য্যের পাশাপাশি এই সামান্য গৃহসজ্জার সারল্য, এই কাঠের বাড়ীগুলির সহজাত সৌন্দর্য্য, তার প্রাচ্য জীবনযাত্রার বিলাসহীনতা বিস্মিত করে, মুগ্ধ করে।

শহরের অট্টালিকাও খুব বেশী দিনের নয়। ভূমিকম্পের ভয়ে বড় বাড়ী তৈরীর কল্পনা কেউ কখনও করেনি। কংক্রীটের যুগ আরম্ভ হওয়ার পরে লোহার ফ্রেমের পরে কংক্রীটের দেওয়াল দিয়ে এই সব আধুনিক ইমারত তৈরী হয়েছে, তাতে ইট'পাথরের নাম গন্ধ নেই। তার সংখ্যাও খুব বেশী নয়—সারা শহরে শতকরা দশভাগের অধিক হবে না। বাকী সব সেই কাঠের ফ্রেম, কাগজের বেড়া আর টালিখোলার চাল। বড় বড় দোকানপাট, হোটেল-রিয়কান, আবাস-মন্দির, এমন কি রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত কাঠের বাড়ী।

আশ্চর্য্য জাপানের এই কাঠগুলি। বছরের পর বছর রোদে বৃষ্টিতে পড়ে থেকেও তাতে ঘুণ ধরে না, পচন ধরে না, তার কোথায়ও এতটুকু চিড় খায় না। কাগজের বেড়া শুন্‌তে ভারী আশ্চর্য্য লাগে, কিন্তু সত্যি সত্যিই এই কাগজ দিয়েই তারা বেড়া দেয়, যদিও সাধারণ লেখার কাগজের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। কিন্তু তাই ব'লে তা কাচের মতো নয়, কিংবা কাঠের মতো নয়। ঋতু অনুসারে তার পরিবর্ত্তন করা হয়, তার সহন-শীলতা এবং

মাটীর নীচে রেল ষ্টেশন—টোকিও

রংয়ের উপযোগিতার দিকে নজর রেখে। কৌতূহলী হয়ে জাপানী বন্ধুদের কাছে প্রশ্ন করেছি—কাগজের ঘরে বাস করে চোর ডাকাতের ভয় তারা এড়ায় কি করে? তাসের ঘরে বাস করা না কি নিরাপদ নয়, কিন্তু এও তো তাসের ঘরের মতোই। শ্রীরামচন্দ্র কখনও জাপানে গিয়ে রাজত্ব করেছিলেন বলে' শুনিনি, অথচ এ রামরাজত্ব তারা পেল কোথায়? উত্তর যা পেয়েছি তার মর্ম্মার্থ এই যে, জাপানীদের অনাড়ম্বর সরল জীবন শুদ্ধ করেছে তাদের দেশের চুরি-ডাকাতিকে। তার মানে এ নয় যে, সে দেশের লোক সকলেই পরমহংস! অর্থ এই যে গৃহস্বামীর অবস্থা যাই হোক, এই গৃহগুলি কিন্তু একেবারেই নিঃস্ব। চুরি

ডাকাতি না থাকার কারণ প্রবৃত্তির অভাব হয়তো ততটা নয়—যতটা বস্তুর অভাব।

জাপানীদের ঘরে অলঙ্কারের বালাই নেই। হাতভর্ত্তি সোনার চুড়ি, গলায় হার, কোমরে বিছে, কানে দুল, নাকে নাকছাবি, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের এই আড়ষ্ট বন্ধনে জাপানী মেয়েরা বাঁধা পড়েনি। একমাত্র বিবাহের বরণের আংটি ছাড়া তাদের সারা দেহে সোনার চিহ্নমাত্র নেই। যে সোনাকে ভিত্তি করে সারা দুনিয়ার অর্থনীতির ইমারত গড়ে উঠেছে, তাকে বন্ধ্যা ক'রে সিন্দুকে বন্ধ রেখে তার অলস পেশল সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হতে তারা অভ্যস্ত হয়নি। সিন্দুকে সোনা আর মাটীর নীচে টাকা রাখার পঙ্গু আভিজাত্য নিয়ে গর্ব্ব করতে তারা শেখেনি। শিল্প-বাণিজ্যের লীলাভূমির নারী তা'রা, নিজেরা যেমন আলস্যে দিন কাটায় না, অর্থকেও তেমনি নিরর্থক পড়ে থাকতে দেয় না। তারা যখের ধন আগ্‌লে প'ড়ে থাকে না। তাদের কষ্টার্জ্জিত সঞ্চয় তারা রাখে ব্যাঙ্কে, তারা নিয়োগ করে মিল ফ্যাক্টরির শেয়ারে। সমস্ত জাতির এইরূপ অকুণ্ঠিত সহায়তা পায় বলেই জাপানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির গণেশ-বাবাজিরা সোজা হয়েই বসে থাকতে পারেন; তাঁদের ইঁদুর-বাহনেরা অল্পে অল্পে আসনের তলার মাটী খুঁড়ে ফাঁক করে ফেলে না এবং বাবাজিদেরও ল্যাণ্ডশ্লিপ-এর দরুণ উল্‌টে পড়তে হয় না।

অলঙ্কার যখন নেই, অর্থ যখন মিলে আর ব্যাঙ্কে, তখন চোর ডাকাতের লোভনীয় বস্তু আর বিশেষ কিছু রইল না। মূল্যবান বাসন-কোসন জাপানীদের ঘরে থাকে না। পিতল কাঁশা বা রূপার ব্যবহার তাদের নেই। পোর্সিলেনের ডিস্‌-কাপ তারা ব্যবহার করে—জাপানে মাটীর জিনিস মাটীর দামেই বিকোয়। তা' ছাড়া আছে, কাঠের ল্যাকার-করা তৈজসপত্র—দেখ্‌তে সুন্দর, দামে সস্তা এবং টেকসই হিসাবে উইল করে দিয়ে যাওয়া চলে। তারপর পোষাক পরিচ্ছদ, তাও অতি সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ; তার যতখানি সৌন্দর্য্য—সে পরিমাণ দাম নয়। তা'তে না আছে সাচ্চা জরির কাজ, না আছে সল্‌মা-চুমকির বাহার। গালিয়ে নিয়ে একরতি সোনা-রূপা পাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। একমাত্র দামী জিনিস ওবি—অর্থাৎ যে কাপড়টা মেয়েরা পেটে বাঁধে প্রজা-পতির পাখার মতো। অবস্থা অনুসারে ওবির দাম অনেক সময় তিন অঙ্ক ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু তা নিয়ে বিক্রী করতে গেলে ধরা-পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তা'ছাড়া শুধু একখানা কাপড় চুরি করতে হানা দেওয়ার মজুরি পোষায় না। ডাকাতদের ত নয়ই, ছিঁচকে চোরেরও নয়!

ক্রিসন্থিমাম ফুল

জাপানীদের ঘরে আসবাবপত্রের বালাই নেই। যে জাপানী মাদুর আমরা এখানে সচরাচর দেখে থাকি, সেই রকম মাদুর দিয়ে প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু গদি তৈরী হয়, ভিতরে একজাতীয় মোলায়েম ঘাস দিয়ে। লম্বায় ছ' ফুট, চওড়ায় তিন ফুট। সকল জাপানীর বাড়ীই এই গদির মাপে তৈরী—ছয় গদির ঘর—আট গদির ঘর—এই হিসাবে। মাটী থেকে প্রায় তিন ফুট উপরে কাঠের ফ্রেমের

উপর এই-সব গদি বসানো থাকে—এই ঘরের মেজে। মেজের নীচেটা থাকে একেবারে ফাঁকা—স্যাঁৎসেঁতের ভয় থাকে না। এই গদির মেজের উপর জাপানীরা কখনও বজ্রাসনে কখনও সিদ্ধাসনে বসে, ছোট ছোট কুশান অর্থাৎ তুলার বালিস পেতে—কুশাসন পেতে নয়। চেয়ার টেবিল খাট পালঙ্কের বালাই নেই। থাকবার মধ্যে কেবল একখানা ল্যাকার-করা হাল্কা টেবিল, ফুট দেড়েক উঁচু। খাওয়ার সময় এই টেবিল তারা ঘরের মেজেয় পেতে খানা খায়, খাওয়া শেষ হলে আবার ধুয়ে-মুছে অন্য জায়গায় রেখে দেয় এবং সেই মেজেতে তারা বিছানা

বাঁশের বেড়ার সম্মুখে জাপানী তরুণী

পেতে শয়ন করে। সকাল বেলায় বিছানা তারা ভাঁজ করে' তুলে রেখে দেয়, ঘরের এক পাশে কাগজের ঠেলা দরজা খুলে দেওয়ালের গায়ে আল্মারির ভিতর। ঘরের ভিতর থাকে না বিছানা বালিসের ছড়াছড়ি।

ঘরের একদিকে ফুটখানেক উঁচু একটা মঞ্চ থাকে। তার নাম টোকোনোমা অর্থাৎ সম্মানের স্থান। ঘরের একদিকের খানিকটা অংশ, প্রায় তিনফুট চওড়া জায়গা, অনেকটা ষ্টেজের মত করা। তার উপর তারা সাজিয়ে রাখে ফুলের সাজি, ঝুলিয়ে রাখে দু-একখানা ছবি এবং তাদের প্রিয় কোন একটা কবিতার দু'চার লাইন—মোটা কাগজের ওপর তুলি দিয়ে লেখা। ঘরের আর কোথায়ও ছবির বাহার বা ফুলদানির আড়ম্বর নেই। ঋতু অনুযায়ী এই ফুলের, ছবির এবং কবিতার অদলবদল হয়। কোন সম্মানিত অতিথি এলে, তাকে বসতে হয় এই টোকোনোমার দিকে এবং গৃহস্থ বসে সেই দিকে মুখ ক'রে। মঞ্চের উপর কারও বসবার নিয়ম নেই। কিন্তু তার সামনে বসে' আমার কেবল মনে পড়েছে আমাদের দেশের কথকঠাকুরদের কথা। এখানে বস্‌তে পেলে তাঁরা হয়তো অষ্টপ্রহরই পাঠ

ম্যাপেল

চালাতে পারতেন। ভাগবত পাঠের এমন উপযুক্ত মঞ্চ আমাদের দেশে বড় একটা পাওয়া যায় না।

ল্যাকার-করা সুন্দর টেবিলের উপর জাপানীরা যে খাদ্য আহার করে তার বর্ণনায় কারও জিহ্বায় জল-সঞ্চারের সম্ভাবনা নেই, সে কথা আগেই বলে রাখা ভাল। আহার জিনিসটাকে জাপানীরা বড় সংক্ষেপ ক'রে নিয়েছে। তা'তে না আছে কালিয়া-কোর্ম্মার খোশ্‌বো, না আছে সুক্ত-ডালনার স্বাদ। জাপানীরা ভাত খায় তিন বেলা। মোটা

আতপচালের ভাত—ফেন গড়ানো নয়, ভিতরেই শুকিয়ে-নেওয়া। আমাদের দেশে যাদের সরু দাদ্‌খানি বালামের ঝুরঝুরে ভাত খাওয়া অভ্যাস—এ ভাত খেতে তাদের জীবন্তে পিণ্ড-আস্বাদনের অভিজ্ঞতা লাভ হবে। অন্যান্য আয়োজনও খুব রুচিকর নয়। একটা পাতলা সুপ—আমাদের ঝোল খাওয়া মুখে তা ভাল লাগবে না। তারপর সিদ্ধ এবং কাঁচা তরকারি—আমাদের পোড়ার মুখে তা' রুচবে না। তার পরেরটি শোনবার আগে বরফের কুঁচি মুখে রাখ্‌তে অনুরোধ কচ্ছি, কারণ গা-বমি করাটা অতি সহজেই অনেকের সুরুচির পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু সাঁতলানো, ঢেঁকিশালে, এখন লক্ষীর মত তিনি হেঁসেলে ঢুকেছেন, তাদের দেশেও তেমনি। কিন্তু সংস্কারের আইনে না বাধলেও সচরাচর তার বড় একটা প্রচলন নেই—আমাদের দেশের বিধবা-বিবাহের মতো।

মুরগীর ডিম জাপানীরা ব্যবহার করে খুব বেশী। ডিমগুলির বিশেষত্ব আছে। আমাদের দেশের হাঁসের ডিমকে তারা আকারে হার মানিয়েছে। এখানে মুরগীর ডিম যাঁরা গোপনে খান, তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'ছোট ডিম'। কিন্তু জাপানের এই ডিমগুলি ঠিক রাজহাঁসের ডিমের মত। শুন্‌লাম তাদের দেশে এর আকার আগে এমনই ছোট ছিল, চেষ্টা ক'রে তারা বড় বানিয়েছে। আমাদের সখ আছে—কিন্তু চেষ্টা নেই।

চেরি ফুল

জাপানীদের খাওয়ার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে, তার নাম সিকি-য়াকি। কোন বিশিষ্ট অতি-থিকে নিমন্ত্রণ করলে তারা এর আয়োজন করে। আয়োজনটি একটু বিচিত্র রকমের। খাওয়ার টেবিলের মাঝখানে তোলা উনুনে কড়া বসিয়ে তাতে হাড়বিহীন মাংস, কাঁটাহীন মাছ এবং খোসা-ছাড়া তরকারি চাপিয়ে দেওয়া হয়। টেবিলের চারিপাশে এক একটা বাটি হাতে করে সকলে ঘিরে বসে। যেমন যেমন সিদ্ধ হতে থাকে, খাওয়ার কাঠি দিয়ে তারা খেতে আরম্ভ করে। এ খাওয়ায় স্বাদ ও তৃপ্তি যেমন আছে তার চেয়ে বেশী আছে পরস্পরের ভিতর একটা ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতার সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধকে জাপানীরা বড় মূল্যমান মনে করে এবং এই আন্তরিকতার সূত্র দিয়ে তারা পরকে আপন করে নিতে চায়।

শুঁটকি এবং কাঁচা মাছ জাপানীদের খুব প্রিয় খাদ্য। এক রকম কালো রংয়ের সস্‌ দিয়ে তারা তা' খায়। নেহাৎ মন্দ লাগে না। অবশ্য ভোজনবিলাসীদের কথা স্বতন্ত্র।

দধি দুগ্ধ ঘৃত মাখম জাপানীরা কখনও চোখেও দেখে না। মাংস তারা খায় খুব কম—যেমন সখ ক'রে এক-আধ দিন আমরা খেয়ে থাকি। এ খাওয়ার ভিতর আগে তাদের বাচ্‌-বিচার ছিল—এখন আর নেই। মুরগী, শূকর, এমন কি, তার বড়টা পর্য্যন্ত তারা এখন চালিয়ে নিয়েছে, যদিও এমন কুসংস্কারাপন্ন বুড়োবুড়ী এখনও আছে, যারা বাড়ীতে ও-সব রান্না করতে দেয় না। আমাদের দেশে নিষিদ্ধ পক্ষীমাংসের যেমন প্রথম সৎকার হয়েছিল

সাহেবী ধরণে খাবারের পাত্র পাস্‌ করবার দস্তর জাপানীদের নেই। বাঙ্গালীদের মতো আহারের সব কিছু উপকরণ তা'রা একসঙ্গে ভোক্তার সাম্‌নে উপস্থিত করে

এবং গৃহিণীরা নিজের হাতে গরম খাবার পরিবেশন করে' ভোক্তাকে পরিতুষ্ট করে। জাপানীরা গরম খাবার খেতে ভালোবাসে। অনেক সময় এত গরম তারা খায় যে অনভ্যস্ত যা'রা, তা'দের হয়তো জিভ্ পুড়ে যাবে! জাপানে শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধাম নাই বলেই বোধহয় পান্তাভাতের প্রচলন সেখানে নাই।

খাওয়ার সময়েও জাপানীদের আদব-কায়দা আছে অনেক-কিছু। খাওয়ার সময় গৃহিণীরা যখন সাম্‌নে বসে, তা'দের হাতে তখন হাত-পাখা থাকে না বটে—ঠাণ্ডা
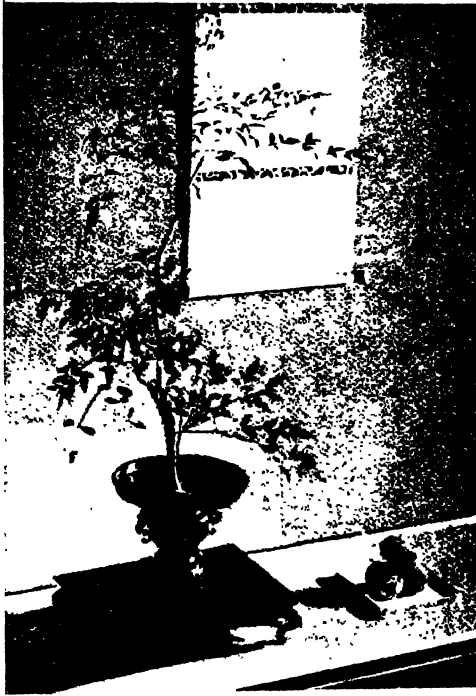
টোকোনোমার বৃক্ষসজ্জা

দেশে তার প্রয়োজনও হয় না—কিন্তু তা'রা কাছে বসে' নানা রকম আলাপে-আলোচনায় আহার জিনিসটাকে একঘেয়ে গর্ত্তপূরণের বিড়ম্বনা থেকে উপভোগ্য করে' তোলে। হাসি-ঠাট্টায়, আমোদে-আহ্লাদে তা'রা সারা দিনের কর্ম্মক্লান্ত পরিজনের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। শত অভাব-অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি বা গয়নার ফর্দ্দ পেশ করবার এই মাহেন্দ্রক্ষণটি তাদের পাঁজিতে লেখা নাই।

কিন্তু তা'দের শ্রুতি ও স্মৃতির ভাণ্ডারে যে-সব বিধি-ব্যবস্থার পুঁজি আছে, তাও নিতান্ত কম নয়। তার একটুখানি ব্যত্যয় হলেই বিপর্য্যয় বাধ্‌বার সম্ভাবনা। জাপানী মাত্রেই বড় ভাবপ্রবণ। ব্যবহারের একটু তারতম্য হলেই তা'রা বড় আহত হয়। আহারের সময়ে তরী-তরকারি যেমন-তেমন, ভাত অন্ততঃ দু-বার না নিলে তারা ব্যথিত হয়—মনে করে আহার্য্য ভোক্তার রুচিকর হয় নি, —অথবা সে তাকে অবহেলা করছে। তেম্‌নি আবার শুধু ভাত নিয়েই নিস্তার নাই—যতটা নেওয়া হবে, তার সবটাই নিঃশেষে খাওয়া চাই—সদ্‌ব্রাহ্মণের শত-অন্নের দোহাই দিয়েও রেহাই নাই—তারা ব্যথিত হবে। ভাত দু-তিনবার চেয়ে নিয়ে যিনি নিঃশেষে খেতে পারবেন, তাঁর উপর জাপানীরা ভারী খুশী হয়—নেওয়ার সময় পরিমাণ কম করে' নিলে অবশ্য কোন আপত্তি নাই।

তাদের এই যাচাই করার ভিতর এইটুকু বিশেষত্ব আছে যে, তা'তে যত্ন আছে, কিন্তু পীড়ন নাই। শাস্ত্রের আর সমস্ত বিধান সযত্নে মেনে চ'লেও আমরা কিন্তু 'ন

টোকোনেমোর পুষ্পসজ্জা

দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনের" বিধানটা সব সময় মান্‌তে চাই না। আদরের আতিশয্যে অনেক সময় ব্যাঘ্র-ঝম্পিতের মাথার উপরই আমরা পরিবেশন করে ফেলি এবং ভোক্তার উদরের থলিটি চামড়ার কি রবারের তৈরী, তা'র স্থির সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাকে ছাড়্‌তে চাই না। কিন্তু জাপানীদের যত্নের ভিতর ভোক্তাকে খুশী করবার চেষ্টা আছে—তার উদর-ব্লাডারকে পাম্প করবার ব্যবস্থা নাই।

কাঁচা মাছ খাওয়ার প্রসঙ্গে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার

আছে। অনেকের ধারণা, জাপানীরা চীনেদের মতোই সাপ-ব্যাং আর্শলা-টিক্‌টিকি খেয়ে থাকে। চীনেদের সঙ্গে জাপানীদের আকার ও চেহারার সাদৃশ্যের দরুণ এবং দুই জাতিরই কাঠি দিয়ে খাওয়ার রীতির নিমিত্ত তাদের খাদ্যকেও আমরা একই শ্রেণীর ধরে নিয়ে থাকি। চীনে পাড়া দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আহার্য্য বস্তুর যে সুগন্ধ আমাদের নাকের ভিতর দিয়া উদরে পশিয়া সমস্ত শরীরটাকে আলোড়িত করে তোলে, জাপানীদের সুট্‌কি-মাছের আতরদানিতেও আমরা সেই সুগন্ধের কল্পনা করে নিয়েছি—সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই বলেই—আদতে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই উল্‌টো। চীনেরা যেমন অপরিচ্ছন্নতা এবং কুরুচির জন্য বিশ্ববিদিত—জাপানীরা তেমনি পরিচ্ছন্নতা এবং সুরুচি সম্বন্ধে অতিরিক্ত খুঁৎখুঁতে। দুর্গন্ধ জিনিসটা তা'রা একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

জাপানের পার্লামেণ্ট গৃহ

চীনেরা খায় খুব বেশী এবং তার পরিমাণও যথেষ্ট। লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যায়, প্রায় অনবরতই তাদের মুখ চল্‌ছে। কিন্তু জাপানীরা খায় খুব কম এবং তার আয়োজনও খুব সংক্ষিপ্ত। মাছ বা তরকারীর একটা সুপ, কিছু কাঁচা বা সিদ্ধ শাক বা মাছ, দুধ-চিনি-না-দেওয়া সবুজ চা আর ভাত—জাপানীদের এই সাধারণ আহার। সে স্বল্প আয়োজন দেখে আমাদের মতো চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারীদের হয় তো আশঙ্কাই হবে যে পেট ভর্‌বে না। কিন্তু দেখেছি, কুমীরের পেট না হ'লে ভর্ত্তি হ'তে কিছুই বাকী থাকে না।

কাঁচা মাছ খায় বলেই যে তারা সব কিছুই কাঁচা খায়, তা' নয়। একরকমের কাঁটাবিহীন সামুদ্রিক মাছ আছে, যার আঁশ নেই এবং আঁশ্‌টে গন্ধ নেই। সে মাছ কাঁচা খেতে কোন অসুবিধা নাই। কাঁটা-ওয়ালা বা আঁশ-ওয়ালা মাছ তা'রা সাঁত্‌লে খায়। চিংড়ি মাছের কাট্‌লেট্‌ তা'রাও খেয়ে থাকে। জাপানী আহার্য্যের খাদ্য মূল্য (Food value) প্রচুর, কারণ আহার্য্য বস্তুর ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ তা'রা অতিরিক্ত সিদ্ধ করে' নষ্ট হ'তে দেয় না। যে জাতির পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্য-বোধের তুলনা নাই, তাদের রুচিকে অতখানি কদর্য্য কল্পনা করবার কি কারণ আছে, তা' রুচিবাগীশেরাই বল্‌তে পারেন।

অবশ্য একথা হল্‌প করে' বল্‌তে পারি না যে, কুরুচি-কর খাদ্য খাওয়ার লোক সে দেশে একেবারেই কেউ নেই। আমাদের এই আচার-শাসিত আহারের দেশেও এক শ্রেণীর লোকে ধেঁাড়া সাপ খেয়ে থাকে। শামুক-গুগ্‌লির ঝোল চিকিৎসা-শাস্ত্রের সুপারিশ নিয়ে আমাদের রুচির সঙ্গে একটা কম্‌-প্রোমাইজ করে' ফেলেছে। জাপানেও যদি সেই শ্রেণীর লোক থাকে তা'তে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। কিন্তু তার দ্বারা সমস্ত জাপানীকে বিচার করা চলে না।

ভেতো বাঙালী বলে' আমাদের একটা দুর্ণাম আছে। অথচ তিনবেলা ফেন-ভাত খেয়েও জাপানীদের সে দুর্ণাম যে নাই কেন—তার বিচার করা দরকার। ক্ষীর ননী দুধ-ঘি খেয়ে আমরা কুষ্মাণ্ডের মতো ভুঁড়ি দুলিয়ে বেড়াই, মশলার রসায়ন খেয়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ঢেঁকুর তুলি, আর

কাঁচা-মাছ-তরকারী খেয়ে জাপানীরা যে শক্তি সঞ্চয় করে, আমরা তা' পাই কোথায়? সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভিতর জিহ্বাটাকেই আমরা বড় করে' তুলেছি। ভীম নাগ, দ্বারিক ঘোষের বাড়-বাড়ন্ত হোক্—কিন্তু কাঁচা ফলমূলের খাবার বেচ্‌বার দোকান আমাদের দেশে কবে হবে?

খাওয়ার আয়োজনের জন্য জাপানীরা দিনের কতটুকু সময় ব্যয় করে, শুন্‌লে অবাক্ হ'তে হয়। আমাদের দেশে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকল গৃহস্থেরই ভোর থেকে আরম্ভ করে' গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত শুধু খাওয়ার ধান্ধাতেই কেটে যায়। এমন অনেক গৃহস্থ আছেন, যাঁদের বাড়ীতে উনুন জ্বলে ঠিক সাগ্নিকের চির প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখার মতো। কিন্তু জাপানীরা রাঁধে শুধু দু'বার এবং প্রতিবারে তাদের আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। শুধু ভাতটা সিদ্ধ হ'তে যতক্ষণ। তা'র ভেতরেই তা'রা যৎসামান্য তরকারীর যোগাড় করে' নেয়—অধিকাংশই কাঁচা। আতপ চালের ভাত হ'তে বেশীক্ষণ লাগে না, সাঁত্‌লানোর কাজও অল্প সময়েই সারা যায়। তারপর স্যুপটা তৈরী হ'লেই উনুনের নিবৃত্তি।

পুরুষেরা সকাল ৭টায় খেয়ে কাজে বেরিয়ে যায়, দুপুরের খাওয়াটা তা'রা বাইরেই খায়। অনেক আফিসে টিফিনের বন্দোবস্ত আছে। যাদের নেই, তারা হোটেলে খুব সস্তায় সেরে নেয়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়ার সময় বাঁশের কৌটায় করে' খাবার নিয়ে যায়। মেয়েরা বাড়ীতে সকালের রান্না দিয়েই চালিয়ে নেয়। কাজেই সারাটা দিন তাদের সময় থাকে প্রচুর। এই সময়ের ভিতর তারা হাঠ বাজার দোকান-পশারের কাজ সারে, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, সেলাই-বোনা বা ছেলেমেয়ের জামা তৈরী করে এবং ঘরের খুঁটিনাটি সাতশ' রকম কাজের ব্যবস্থা করে। যেখানেই তারা যাক্ না কেন, সন্ধ্যার আগে ঠিক বাড়ীতে ফিরে আসে, কেননা স্বামী-পুত্রকে নিজের হাতে রেঁধে-খাওয়ানো তা'রা তাদের বিশেষ অধিকার বলে' মনে করে, ঝি-চাকরের প্রাচুর্য্য থাক্‌লেও তাদের এ অধিকারের উপর কাউকেই তারা হস্তক্ষেপ করতে দেয় না।

এদের সঙ্গে আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীদের একটু তুলনা করবার দুষ্প্রবৃত্তি কিছুতেই দমন করা যায় না। সারাদিন তরকারি কুটেই তা'রা অবসর পান্ না একটু পানদোক্তা খেতে। নিজের হাতে রান্না করাটা তো অক্ষমতার চেয়ে অপমানের বিষয় হয়ে পড়েছে। অত্যাবশ্যকীয় দিবানিদ্রার পর একটু নভেল পড়্‌বার বা পাড়ার আর দু-দশজনের সঙ্গে সংসারের সকলের দোষকীর্ত্তন এবং নিজের অশেষ গুণের সবিশেষ বর্ণনা দেওয়ার সময়টুকু পাওয়া যায় না বলে' তা'দের আক্ষেপের অন্ত নাই। অতিরিক্ত খাটুনীর ফলে তাঁদের স্থুল দেহ যে আরও স্থুলত্বপ্রাপ্ত না হ'য়ে কেন কৃশ হ'য়ে আস্‌ছে, এই দুশ্চিন্তায় তা'রা অস্থির। আধুনিকাদের কথা না-ই বল্‌লাম, কেননা প্রাচীনাদের চেয়ে তাঁদের শিক্ষা বেশী, কিন্তু ধৈর্য্য কম। তা'ছাড়া, স্বরূপ-বর্ণনা মাত্রেই নিন্দার মতো শোনায—এমন কি দেবতাদেরও!

মন্দির দ্বার—টোকিও

জাপানে ঘুরে এবং জাপানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে, শুধু একটা কথাই আমার অনবরত মনে জেগেছে যে—জাপানীদের পূর্ব্বপুরুষ বাঙালী ছিল কিনা! নতুবা সহস্র যোজনদ্বারা দূরীকৃত এই দুটি জাতির ভিতর এমন আশ্চর্য্য রকমের মিল সম্ভব হ'ল কি করে? শুধু আহার, বিহার ও জীবন-যাত্রার প্রণালীতে নয়—শিক্ষায়, সংস্কারে, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিতে, এমন কি মনোবৃত্তিতে পর্য্যন্ত এই দুই জাতির ভিতর অতি সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে। এতখানি মিলের মূলে কোন বিশেষ কারণ না থাক্‌লে শুধু একসিডেন্ট বলে' একে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এই সাদৃশ্যের যোগসূত্র খুঁজে বার করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়—কারণ আমার অক্ষমতা আছে এবং বিনয় আছে। তা'ছাড়া,

আহার এবং নিদ্রা, এই দু'টিতেই আমার প্রয়োজন যথেষ্ট। কোন বিশেষজ্ঞ নৃতত্ত্ববিদ এই সঙ্কেত গ্রহণ করে' আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গবেষণা করতে পারলে হয়তো জগতে একটা অদ্ভুত কীর্ত্তি রেখে যেতে পারবেন।

এম্‌নি করেই তো জগতের বড় বড় তথ্যের আবিষ্কার
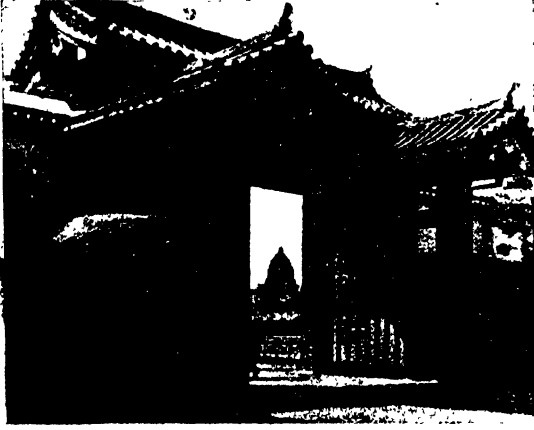
রাজবাড়ীর তোরণ—টোকিও

হয়েছে। এম্‌নি করেই সারনাথের সার-সংগ্রহ হয়েছে, মহেঞ্জদারো, হরপ্পা, নালন্দা, নগরজুনকোন্ডা পাতাল-পুরী থেকে প্রমাণ দিয়েছে পৌরাণিক বিচিত্র সভ্যতার। এম্‌নি করেই মধ্য এশিয়ায় নির্দ্দিষ্ট হয়েছে ভারতীয় আর্য্যদের আদি বাসস্থান। বুদ্ধিমান বিশেষজ্ঞ চেষ্টা করলে জাপান ও বাঙলার ভিতর রক্তের সম্বন্ধ আবিষ্কার করা হয়তো খুব কঠিন হবে না। হয়তো প্রমাণ হয়ে যাবে যে অতি প্রাচীনকালে বাঙলার সুকৃতি সন্তান ভগবান্ তথাগতের বিজয়-বৈজয়ন্তী নিয়ে গিয়েছিল সুদূর জাপানে। সেখানে তারা অসভ্য আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে' তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশের নিভৃত প্রকোষ্ঠে, যেখানে তা'রা আজও তাদের অবিকৃত সত্ত্বা বজায় রেখে চেয়ে আছে মুগ্ধ হয়ে, বিস্মিত হয়ে, নবসভ্যতার আলোকদীপ্ত তুষারশীর্ষ ফুজিয়ামার দিকে! হয়তো সে শুভদিন আস্‌বে, যেদিন গৃহমণ্ডুক বাঙালীর এই অতীত বিজয়বাহিনীর বিস্ময়কর কাহিনী প্রমাণিত প্রচারিত হয়ে সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে' দেবে। সেদিন কারও মনে পড়বে না এই হতভাগ্যকে, যে এই বিংশশতাব্দীর এক বর্ষানিষিক্ত সন্ধ্যায় এতবড় একটা মহা আবিষ্কারের সন্ধান দিয়ে গেল। সেদিন তা'র এই ঋণ হয়তো কেউ স্বীকার পর্য্যন্ত করতে চাইবে না! সেই অনাগত দুর্দ্দিনে আজিকার পাঠকদের সম্ভবতঃ তাদের বংশধরদের, সাক্ষীমানার প্রয়োজন হবে। আজই তার নোটিশ দিয়ে রাখ্‌লাম, দয়া করে' নোট করে' রাখ্‌বেন।

ক্ষণিকা

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল্

মনের পরশ মনে মনে
চুপি চুপি কথা
কখন হাসা, কখন কাঁদা
কখনো নীরবতা।
ভুলে যাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
অনেক কাজের মাঝে

হঠাৎ প্রদীপ জ্বলে ওঠে
চমক দিয়ে সাঁঝে
নিমেষ তরে মনের দেশে
দীপালী উৎসব
গান গেয়ে যায় ক্ষণিক সুরে
ক্ষণেই সে নীরব।

বানর-সমস্যা সমাধান

শ্রীগঞ্জিকাসেবী

উদ্যোগ পর্ব্ব

বৃন্দাবনে বড়ই বাঁদরের উপদ্রব। বাঁদরের জ্বালায় বাড়ীতে বৌঝিদের টেকা দায়। বানরগণ নারীর সম্মান তো কিঞ্চিন্মাত্র জানেই না, পরন্তু ভয়ও করে না। ইহাদের বোধ করি পুরুষানুক্রমিক একটা ধারণা আছে যে মেয়ে মাত্রেই সীতার মত নিরীহ গোবেচারা, ছিঁচকাঁদুনে। উহাদের কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। আমার ইচ্ছা হয়, বালিগঞ্জের গোটাকতক বাছা বাছা মেয়ে বৃন্দাবনে ছাড়িয়া দিয়া বানরদের এই পর্ব্বতপ্রমাণ ভুলটা (Himalayan blunder) ভাঙ্গিয়া দিয়া দেখি ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়। বাঁদরের অত্যাচারে পুরুষেরাও ব্যতিব্যস্ত। ছোট ছেলে-মেয়েগুলিও দেখিয়া দেখিয়া নানাপ্রকার বাঁদরামি শিখিতেছে। অথচ পাণ্ডাদের বাধায় ইহার কোন প্রতিকার করিবার উপায় নাই। ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ হনুমানচন্দ্র (নামটি বোধ হয় মান্দ্রাজী হনুমন্তরাওএর আর্য্য-সংস্করণ) নাকি রামচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধের সময় বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন ; সুতরাং রামচন্দ্রের বংশধরগণেরও ইহাদিগের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ঝামেলা করিবার এক্তিয়ার নাই।

সদ্য বৃন্দাবন হইতে বায়ুপরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়াছি। বালিগঞ্জে ডোভার লেনের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া নিজেদেরই বাঁদর-ঘটিত কয়েকটি দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া সকালবেলা মনটা খারাপ হইয়া গেল। চিত্তবিনোদনার্থে একটা মাসিক পত্রিকায় মনঃসংযোগ করিলাম।

নাঃ, ইহাদের এড়াইবার উপায় নাই। মাসিকের দু-চার পৃষ্ঠা উল্টাইয়াই চোখে পড়িল—একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। আরম্ভেই লেখা : স্থান—অরণ্য, কাল—প্রাগৈতিহাসিক, পাত্র—বিশ্বামিত্র, পাত্রী—মেনকা। বিশ্বামিত্র সবে ধ্যান সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন। মেনকা বেদিং স্যুট পরিয়া আসিয়া বড়ই বাহানা ধরিয়াছেন, আজ মিক্সড বেদিং-এ যাইতেই হইবে। বিশ্বামিত্র অনেক করিয়া বুঝাইতেছেন যে এ নিবিড় অরণ্যে মিক্সড বেদিং-এ গিয়া কোনও লাভ নাই। একে তো অরণ্যের নদীতে স্নানার্থে অধিক লোকসমাগম হয় না। যাহারাও আসে, তাহারা অত্যন্ত হুঁসিয়ার ঋষি অথবা ঋষিপুত্র। মেনকা মুখনাড়া দিয়া বলিলেন, ওসব ঢের ঢের ঋষি আমার দেখা আছে। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া চলিলেন, হয়ত তাঁহারা তোমাকে দেখিলেই চক্ষু বুঁজিয়া মন্ত্রতন্ত্র সুরু করিয়া দিবেন। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ থাকিলেও হয়ত কিছু না বুঝিয়া-সুঝিয়া তোমার সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কিছুদিন হইল লোমপাদ রাজার আড়কাটিরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মেনকা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, চা-বাগানে না কি ?

স্লীপিং স্যুটের উপরে রেশমের ড্রেসিং গাউন চাপাইয়া দুইটি যুবক ঘরে ঢুকিলেন। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি সজনে ডাটা ও যোগী গুহ। গুটিপোকা অবস্থায় ইহাদের নাম ছিল সজনীকুমার দত্তগুপ্ত ও যোগেন্দ্রনাথ গুহ। সম্প্রতি বিলাত হইতে কোকুন কাটিয়া সজনে ডাটা ও যোগী গুহা হইয়া ফিরিয়াছেন।

ডাটা একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "বীরেনদা, একটা গুরুতর কাজে আপনার কাছে এসেছি। আপনার এ আয়েসী জীবন কিছুদিনের মত ছাড়তে হবে। আমাদের একটা কাজে আপনার সাহায্য বিশেষ দরকার।"

জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলাম।

ডাটা বলিয়া চলিলেন, 'বৃন্দাবনে বাঁদরের অত্যাচারে জীবন দুর্ব্বিসহ—আপনিও তো সদ্য সদ্য দেখে এলেন! কিন্তু পাণ্ডাদের বাধায় এর কোন প্রতিকার করবার উপায় নেই। তাই আমরা কজনে মিলে ঠিক করেছি, আমরা একটা দল করে বৃন্দাবনে যাব। গিয়ে পাণ্ডাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হয় তো ভালই, তা নইলে সত্যাগ্রহ ক'রে বৃন্দাবনকে এ অত্যাচার থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করব। অমন একটা হলিডে রিসর্ট তো এমন ক'রে কুসংস্কারের বশে নষ্ট করতে দেওয়া যায় না! কি বলেন ?'

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, 'হলিডে রিসর্ট

হিসেবে যা বললে তা কিছু মিথ্যে নয়। দ্বাপরযুগ থেকে ওর প্রসিদ্ধি আছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাকি ওখানে অনেক দিন কাটিয়েছিলেন। তেমন ফুর্ত্তি নাকি আজকাল মণ্টি কর্লোতেও হয় না। কিন্তু সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কংগ্রেসের বিবৃতি পড়েছ তো? সত্যাগ্রহ যদি আরম্ভ করতে হয় তবে করবেন হয় মহাত্মা স্বয়ং, নয় নিদেন এ, আই, সি, সি। তুমি আমি সত্যাগ্রহ সুরু করলে ডিসিপ্লিনারী য়্যাক্‌সন্ নেওয়া হবে।'

ডাটা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, 'আপনাকে নিয়ে ঐ তো মুস্কিল, বীরেনদা। এলাম একটা গুরুতর কথা বলতে, আর আপনি ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিচ্ছেন।'

তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, আরে না না—তা আমাকে কি করতে হবে তা তো কিছুই বললে না।

ডাটা ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, আপনাকে আমাদের দলের সভাপতি হতে হবে।

আমি প্রমাদ গণিয়া হাসিয়া বলিলাম, দেখ, তোমরা এই বালিগঞ্জের ছেলেরা সারা বাংলার তথা ভারতের ফর্‌ওআর্ড ব্লক্। সভাপতির নিকুচি করেছে—সব জায়গায় সভাপতি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল—তোমরা একটি সভাপত্নীর আদর্শ দেখিয়ে দাও দেখি!

কিন্তু কথায় চিঁড়া ভিজিল না। আমার ন্যায় একটি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বয়স্থ লোক সভাপতি রূপে না থাকিলে নাকি কাজ কিছুই আগাইবে না। কাজেই আমাকে সভাপতি হইতেই হইবে। বরং নারীপ্রগতির নমুনাস্বরূপ একটি সম্পাদিকা রাখা হইবে।

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, সম্পাদিকা কি হে? কাগজ টাগজ বের করবে নাকি?

যোগী গুহ হাসিয়া বলিল, না, না বীরেনদা, সম্পাদিকা মানে সেক্রেটারী।

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, তা ভায়া, চল্লিশের ওপর বয়স হ'ল, তোমাদের আধুনিক কৃষ্টির একখানা অভিধান না হলে সব সময় তাল রাখতে পারি না—দেখি কুড়ুলরামের গমস্তিকায় কাজ হয় কি না।

যাহা হউক, সম্পাদিকাও স্থির হইয়া গেল। মিস্ নোরা শীল অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী আর নাই। তাঁহার বাবার পয়সাও অগাধ—আবশ্যক হইলে মোটা গোছের কিছু চাঁদাও পাওয়া যাইবে।

নোরা শীলের বাবা ফটিকচাঁদ শীল ১৯১৪ সালে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিতে সুরু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডালভাত ছাড়িয়া ব্রেকফাস্ট ডিনার খাইতে আরম্ভ করেন ও ছেলেমেয়েদের জন্য ফিরিঙ্গি গভর্ণেস্ রাখিয়া দেন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা গোলমাল বাধাইল। তাহারা ইতিপূর্ব্বেই কৈ মাছ-চচ্চড়ির স্বাদ পাইয়াছে। চাকরদের জন্য ঐরূপ একটা কিছু রান্না হইলেই বাহানা ধরিত, আমরা সার্ভেণ্টদের খাওয়া খাব। ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবী তাহাদের অনেক বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেন—আরে, তোরা সাহেব হয়েছিস্, সাহেব হ'লে আর মাছ-চচ্চড়ি খেতে নেই। কিন্তু এসব বিশেষ ফলপ্রসূ হইত না। সাহেবীর মর্য্যাদা রক্ষার্থে মাছ-চচ্চড়ি ছাড়িবার মত বয়স তাদের তখনও হয় নাই।

এই সময় মিস্ শীলের জন্ম হয়। নিস্তারিণী দেবীর ক্ষেমঙ্করী, ক্ষ্যান্তমণি, মোক্ষদা ইত্যাদি বাছা বাছা ক্ষ-সংযুক্ত সুলক্ষণ নামগুলি সমস্তই অপছন্দ করিয়া যখন ফটিক শীল আদর করিয়া মেয়ের ইংরাজি নাম রাখিলেন 'নোরা', তখন নিস্তারিণী দেবী বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন, আহা কি নামই রাখা হ'ল নোরা, এরপর নাম রাখবে, হামানদিস্তে, গুণ্ঠট! বলি ও ফটিক, এর পর এই মেয়ে বড় হয়ে যখন 'তোরই শীল তোরই নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' করবে তখন সামলাতে পারবি তো? কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। বরং ফটিক শীল কন্যাকে গোড়া হইতেই ইংরেজী কায়দায় মানুষ করিতে লাগিলেন—যাহাতে এও বড় হইলে বিগড়াইয়া গিয়া সার্ভেণ্টদের খাওয়া খাইবার বাহানা না ধরে।

ইহারই কিছুকাল পরে চাষাধোপাপাড়া লেনের পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া ফটিক শীল যখন সেণ্ট্রাল এভিনিউতে ফ্ল্যাট্ লইয়া উঠিয়া আসেন তখনও নিস্তারিণী দেবী কিছু করিতে পারেন নাই। নিজের গোটা-বাড়ীটা ছাড়িয়া দিয়া পরের বাড়ীর খানকয়েক ঘর ভাড়া করিয়া থাকাকে তাঁহার বুদ্ধিতে উঞ্ছবৃত্তি বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এ ফ্ল্যাটও ছাড়িতে হইল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সেণ্ট্রাল এভিনিউর নাম যখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইল তখন ফটিক শীল ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ী কিনিয়া উঠিয়া আসিলেন। সম্প্রতি শোনা

যাইতেছে যে, এই ল্যান্সডাউন রোডেরই কিয়দংশের 'বিপিন পাল রোড' নাম দেওয়া হইবে। ফটিক শীল শাসাইয়া রাখিয়াছেন যে তাঁহার বাড়ী এই অংশে পড়িলে তিনি কর্পোরেশনের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবেন, কেন-না ল্যান্সডাউন রোডের পরিবর্ত্তে বিপিন পাল রোড নাম হইলে তাঁহার বাড়ীর মূল্য শতকরা নিদেন দশ-পনের টাকা কমিয়া যাইবে।

যাহা হউক, মাসখানেকের মধ্যে বাঁদর-নিবারণী সভায় একটা খসড়া প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটরী ও সজনে ডাটা, যোগী গুহা, ষোড়শী মহিলানবীশ প্রমুখ পাঁচ জন মেম্বর বৃন্দাবনে গিয়া একটা কিছু হেস্তনেস্ত করিয়া আসিবে। মেম্বরগণ সকলেই নামের দ্বিতীয় পদ বর্জ্জন করিয়া মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সাজিয়া বসিয়াছেন—কেবল মহিলানবীশ নিজের পুরুষত্ব বিজ্ঞাপনার্থে মধ্যে মধ্যে লুপ্ত অকারের চিহ্নের ন্যায় ব্র্যাকেটে "কান্ত" লাগাইয়া থাকে। বৃন্দাবন যাইবার বন্দোবস্তও সমস্তই নির্ব্বিঘ্নে ঠিক হইয়া গেল। কেবল বৃন্দাবনযাত্রী মেম্বর নির্ব্বাচনের সময় সভাপতির আসনে বসিয়া স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—মেমের বর-মেম্বর, ষষ্ঠীতৎপুরুষ—তাহাতে সমস্ত মেম্বরগণই যারপরনাই মনঃক্ষুণ্ণ হন। যাহা হউক, এ সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবন-যাত্রা করা গেল। কোনমতেই সভাপতির পদ হইতে অব্যাহতি না পাইয়া আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইলাম যে বৃন্দাবনে গিয়া যথাসম্ভব আড়ালে থাকিব।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

পথে আগ্রায় দুই দিন কাটাইয়া প্রত্যূষে বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। শীতকাল—বিলক্ষণ কোয়াশা হইয়াছে। বৃন্দাবনে নামিতেই—বাঁদর তাড়াইব কি, পাণ্ডারাই আমাদের বাঁদর নাচাইতে সুরু করিল। ইহাদের নামের নির্ঘণ্ট-প্রণালী অনুধাবনযোগ্য। আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের কেহ কখনও বৃন্দাবন গিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা ছিল না—মেয়েরা কেহ কেহ গিয়াছিলেন বটে। পাণ্ডারা শুধুমাত্র নাম ও ধাম জানিয়া লইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মোটা মোটা খাতা সহ আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নামধাম স্বাক্ষর ইত্যাদি অকাট্য প্রমাণ দিয়া দেখাইয়া দিল যে, বৃন্দাবনে কৃপানাথ আচার্য্য আমার ও কৃতপ্রসাদ বর্ম্মা ডাটার কুলপুরোহিত। এই কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার চরেরা আমাদের নামধাম শুনিয়া স্টেশনেই আমাদের গ্রাম ও বংশ ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য মুখস্থ বলিয়া সজনে ডাটাকেও চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল।

স্টেশন হইতে বাড়ী যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিয়া তিক্ত কণ্ঠে ডাটা বলিল, 'কত প্রতিভাই আমরা হেলায় নষ্ট করি বীরেনদা! বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে এদের জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বিলেতে হ'লে কত কাজেই লাগাত। টিকটিকি পুলিশ বিভাগের মাথায় বসে হয়ত সারা ইংলণ্ডের বংশাবলী মুঠোর মধ্যে নিয়ে বসে থাকত—কারো সাধ্যি হ'ত না একটু ট্যাঁ-ফোঁ করে। এরাও মোটা মাইনে পেত, দেশেরও কত উপকার হ'ত। আমাদের দেশে তো তা নয়, যত বোগাস কাণ্ড!'

যোগী গুহা সায় দিয়া বলিল, 'সত্যি বীরেনদা, সেবার বদ্যিনাথ গিয়েছিলাম—এক জায়গায় দেখি একটা গরুকে তীর্থযাত্রীরা সব রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপার কি? শুনলুম গরুটা নাকি কামধেনু, তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়, তাই তীর্থযাত্রীরা তাকে রসগোল্লা খাইয়ে তুষ্ট করছে—গরুটা নাকি রসগোল্লা খেতে বড় ভালবাসে। গরুটার বিশেষত্ব এই যে, তার কখনও বাছুর হয় না কিন্তু সম্বৎসর দিনে আধসের ক'রে দুধ দেয়। আমি তো বুঝি এই কথা যে, অত রসগোল্লা খাইয়ে যদি মোটে আধসের ক'রে দুধ পাওয়া যায় তবে লাভের গুড় তো পিঁপড়েয় খেল। আবার বলে দুধ নাকি ভারী মিষ্টি—আরে, অত রসগোল্লা খেলে যে আমাদের ঘামশুদ্ধ মিষ্টি হয়ে যেত। আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুপালনের দিনে কি-না এই অপব্যয়! বিলেতে হলে ওর পেছনে অত পয়সা না ঢেলে সামার-এ ব্ল্যাকপুলে ঐ গরু দেখিয়ে কত পয়সা রোজগার করত।

ইহাদের বিলাতী গল্পে হাঁপাইয়া উঠিলাম। ও প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলাম, ওঃ কি কোয়াশাই হয়েছিল, এখন কিছুটা ফর্সা হচ্ছে।

কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। ডাটা একটু হাসিয়া বলিল, "এ আর কি কোয়াশা বীরেনদা। কোয়াশা দেখেছিলাম সেই ম্যাঞ্চেস্টারে ১৯৩৬ সালে—পনের দিন

ধরে একটানা কী কোয়াশাই চলল! ডিনারের পর রাস্তায় বেরিয়েছি, ভাবলুম একটা সিগারেট ধরাই। পাঁচ-সাতখানা কাঠি পোড়ালুম কিন্তু সিগারেট আর ধরে না। ভাবলুম—ব্যাপার কি? হঠাৎ খেয়াল হ'ল, সিগারেটটা মুখ থেকে খুলে চোখের কাছে ধরে দেখি সিগারেট দিব্যি জ্বলছে, আধখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কোয়াশা এমন যে তার মাথার আগুনটা এতক্ষণ চোখে দেখতে পাই নি।

আমি হাসিয়া বলিলাম, তোমার সিগারেটের গল্প শুনে আমারও যে বড় সিগারেট খাবার ইচ্ছে হচ্ছে—দাও দেখি দেশলাইটা, একটা ধরাই।

ষোড়শী মহিলানবীশ নিতান্ত ছেলেমানুষ—দূরসম্পর্কে আমার ভাগিনেয়। সুতরাং আমার সাক্ষাতে সে কখনও সিগারেট খায় না। একবার তাহাদের বাড়ীতে হঠাৎ আমার গলার খ্যাঁকর শুনিয়া তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত সিগারেটটা পিছন দিকে লইয়া পাঞ্জাবীর তিন ইঞ্চি পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে বলিয়াছিল, ঠাকুমাকে বলে বলে আর পারা গেল না—ধূপের ধোঁয়ায় ঘরটাকে কি ক'রে রেখেছে, দেখুন না! আমি তখন ষোড়শীর পিছনে পাঞ্জাবীর ধোঁয়া দেখিতে ব্যস্ত ছিলাম। দেখিলাম আর দেরী করিলে দমকল ডাকিতে হইবে—বলিলাম, গরম লাগছে না তোমার? পাঞ্জাবীটা গিয়ে খুলে ফেল না!

ডাটা এত বৃত্তান্ত জানে না—বলিল, আমার কাছে তো দেশলাই নেই—ষোড়শীর কাছে আছে। ষোড়শীও দেখি খেয়াল না করিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি সজোরে বলিলাম, না, ওর কাছে নেই। —ষোড়শী সড়াক করিয়া খালি হাতটা পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিল। তখন যোগী গুহার দেশলাইতে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতেই গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া গেলাম।

দিন দশেক পরের কথা। পাণ্ডাদের বুঝাইয়া বুঝাইয়া হয়রাণ হইয়া আজ তিন দিন যাবৎ চারজন মেম্বর মন্দিরের দরজায় সত্যাগ্রহ সুরু করিয়াছেন। মিস্ নোরা শীল বেলা এগারটায় একবার সত্যাগ্রহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়া বাড়ীতে আধুনিক নিয়মানুযায়ী মশলা না পিশিয়া কলম পিশিয়া থাকেন—অর্থাৎ ডাটাদের বর্ণিত পূর্ব্বদিনের সত্যাগ্রহবৃত্তান্ত রিপোর্ট আকারে লিখিয়া ফেলেন। সম্পাদিকার ফাউণ্টেন পেনে কালী ভরিয়া দিবার জন্য ষোড়শী মহিলানবীশ বাড়ীতেই থাকেন। আমি সকাল সন্ধ্যা উত্তমরূপে আহার করিয়া দিবাভাগে নিদ্রা যাই। বাহির হইবার বড় একটা প্রবৃত্তি হয় না—পাণ্ডারা বদনাম রটাইয়াছে, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী ধৌম্য সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনে আসিয়া বড়ই ঝামেলা সুরু করিয়াছে। পাছে দ্বাপর যুগের ন্যায় জয়দ্রথ আসিয়া হঠাৎ কোনরূপ উৎপাত ঘটায়, তাই তৃতীয় পাণ্ডবকে দ্রৌপদীর পাহারায় রাখিয়া বাকি চারি ভাই দুপুরবেলা শীকার অন্বেষণে বাহির হন।

শীকার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু শুনিতে পাই সত্যাগ্রহীরা নাকি মহিলাদেরই বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। কাল ডাটা ও গুহার মুখে শুনিলাম, দুটি বাহিরের স্বেচ্ছাসেবিকার নিকট হইতে নাকি তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইতেছেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রকম দেখতে হে তাঁরা?

ডাটা। ভয়ানক সুন্দরী বীরেনদা, আই-সি-এসের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে।

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "তাহ'লে সুন্দরীবটে!"—বুঝিলাম সুন্দরীর থার্ম্মোমিটারে আই-সি-এসের সঙ্গে বিয়ে হওয়াই বয়্লিং পয়েণ্ট।

আমি। চুল কত বড়?

ডাটা—আমার মাথার চেয়ে বড় তাদের খোঁপা।

আমি—বটে? কি জাত?

ডাটা—মিস্ গীতালি গুপ্তা—বৈদ্য।

গুহা—মিস্ চয়নিকা চৌধুরী—কায়স্থ।

আমি—কি গোত্র?

এইবার ডাটা চটিয়া উঠিল, ঐ তো আপনাকে নিয়ে মুস্কিল বীরেনদা—কাজের কথা নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দেন!

কিন্তু তবু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিয়া লইয়াছিলাম, গীতালি গুপ্তার বাবা আমারই সহপাঠী বন্ধু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত—নিকটেই থাকেন। আজ বৈকালে তাঁহারই উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সুরেশ গুপ্ত অমায়িক হাসি-খুশী লোক। প্রৌঢ় হইলেও এখনও ছেলে-ছোকরাদের মত হাসিতামাসা করেন।

পূর্ব্বে রাসবিহারী এভিনিউতে থাকিতেন। বছরখানেক আগে স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে একমাত্র কন্যাসহ বৃন্দাবনে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন। কিছুক্ষণ খুঁজিয়া তাঁহার বাড়ী বাহির করিলাম। ফটকের সামনে কাঠের ফলকে সংযুক্তাক্ষরে লেখা আছে—শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। বাহিরের বৈঠকখানা ঘর হইতে সুরেশের গলার আওয়াজ পাইলাম—বোধ করি কন্যাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আচ্ছা, তোর যদি এরকম একটি বর জোটে যে সবদিক দিয়ে ভাল—স্বাস্থ্যবান, ধনী, বিদ্বান—শুধু মাত্র এই দোষ যে সকাল সন্ধ্যে এক ছিলিম করে গাঁজা খায়—তা হ'লে তুই তাকে বিয়ে করবি?

বাস্, আর শুনিতে হইল না। জানালা দিয়া হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া সুরেশ প্রায় দৌড়াইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। অভ্যর্থনা-পর্ব্ব শেষ হইলে ফটকের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই, রামমাণিক্য পণ্ডিত মশায় যে বলে দিয়েছিলেন যে শুধু হরিশ্চন্দ্র শব্দটিই যুক্তাক্ষরে হয়, তা ছাড়া দীনেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, নরেশচন্দ্র কোনটাই হয় না, তা কি ভুলে গেছ?

সুরেশ খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল:

সংস্কৃতর গণ্ডপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও হংস, সারস কিংবা বক।

তুমি আমায় কি পেয়েছ বল দেখি—আমরা কি সেই পুরোনো জিনিস নিয়েই পড়ে থাকব? আমি তো বাপু, হয় নিজে একটা কিছু বের করব, আর নয় অপরের বিধিনিষেধ যদি মানতেই হয়, তবে সাহিত্যক্ষেত্রে আমার একমাত্র অবতার—বুদ্ধদেব।

আমি বলিলাম, ভাই, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, একটু বুঝিয়ে বলবে কি? তুমি কোন্ বুদ্ধদেবের কথা বলছ? যিনি সেই বোধিদ্রুমের তলায়—

সুরেশ—আরে না না, কি বিপদ! সে বুদ্ধ তো কবে মরে ভূত হয়েছে।

'আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে?
রইল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে।'

আমি আধুনিক বুদ্ধদেবের কথা বলছিলাম।

এ প্রসঙ্গ গেল। আরও অনেক প্রসঙ্গও গেল। শেষে বানর-প্রসঙ্গ উঠিল।

সুরেশ বলিল, গীতালি তো বাঁদরের জ্বালায় আর একদিনও এখানে থাকতে চায় না। একটি ভাল পাত্র পেলে ভাবছিলুম ওকে বালিগঞ্জে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দি। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একটি পাত্র জুটেও গেছে—সবদিক দিয়েই ভাল—স্বাস্থ্যবান, ধনী, বিদ্বান—শুধু কার্য্য-কলাপ দেখে মনে হয়, বোধ হয় সকাল-সন্ধ্যে এক ছিলিম ক'রে গাঁজা খায়।

বুঝিলাম লক্ষ্যটা সজনে ডাটার দিকেই। কিন্তু সুরেশ নামধাম বলিলেন না—আমারও মেয়ে আছে!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—লেখাপড়া কতদূর?

সুরেশ—বিলেত-ফেরৎ।

আমি—ও বাব্বা, তা হ'লে দিয়েই ফেল। কিন্তু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তুমি থাকবে কি ক'রে?

সুরেশ রহস্য করিয়া বলিল, আর একটি বিয়ে করব ঠিক করেছি।

আমি হাসিয়া বলিলাম, তোমায় আমায় আর কে মেয়ে দেবে বল? কুড়ি বছর তো এক বৌ নিয়ে ঘর করলুম।

সুরেশ বলিল, আমাদেরই তো দেবে হে, হাজার হোক অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে তো?'

আমি—সে কি হে? তুমি না য়্যাকাউণ্টেন্সী পড়েছিলে? এরই মধ্যে ভুলে গেলে? স্পষ্ট যে লেখা আছে—স্লিপিংপার্টনার এর অভিজ্ঞতার দরকার নেই।

গীতালিকেও দেখিলাম। সত্যই সুন্দরী—তবে আমার মনে হইল আই-সি-এস্ না হইয়া বি-সি-এস্ গ্রেডের হইবে। বাঁদরামী বা উদ্দাম চাপল্য মোটেই নাই, কিন্তু খুবই স্মার্ট—দেখিয়াই বোঝা যায় বালিগঞ্জ-মার্কা—মেড্ ইন্ বালিগঞ্জ। সজনে ডাটাকে চিবাইয়া খাইতে ইহার অধিক দিন সময় লাগিবার কথা নয়। ডাটারও তাহাতে লাভ বই ক্ষতি নাই—মেয়েটিকে দিব্যি লক্ষ্মী বলিয়াই বোধ হইল। গীতালির কাছে শুনিলাম, চয়নিকা তাহারই বন্ধু, তাহারই নিমন্ত্রণে মাসখানেক হইল বৃন্দাবনে বেড়াইতে আসিয়াছে, কিন্তু বাঁদরের জ্বালায় অস্থির, তাই আর থাকিতে চায় না। অতঃপর চা-টা খাইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

বাড়ী আসিয়া দেখি ডাটা ও গুহা পাশাপাশি দুখানি

চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সে শ্রী আর নাই। পাঞ্জাবী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, চুলগুলি উস্কো-খুস্কো, ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। শ্রীমতী চয়নিকা গুহার ও মিস্ নোরা শীল ডাটার সুশ্রূষায় ব্যস্ত। ষোড়শী মহিলানবীশ মিস্ শীলকে সাহায্য করিতেছেন। শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হ'ল হে ?'

বিশ্বের বিরক্তি মুখের উপর টানিয়া আনিয়া বদনব্যাদান করিয়া ডাটা জবাব দিল, 'দেখুন না খোট্টাই বুদ্ধি! পিঠটা রয়েছে কি জন্যে ? তা নয়, মেরে দিলে ঠোঁটের ওপর—বুঝলে না যে রক্ত বেরিয়ে যাবে। এর নাম কি রকম ইয়ার্কি ?'

গুহা বলিল, 'ওরা আগে মেঠাই খেয়ে পরে তরকারী খায়—পিঠে না মেরে ঠোঁটে মারবে তা আর আশ্চর্য্যি কি ?'

দেখিলাম এখন আর জিজ্ঞাসাবাদ না করাই ভাল। ইহার উপর শুনিলাম গোদের উপর বিস্ফোটক হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ঠোঁটের রক্ত বন্ধ করিতে গিয়া মিস্ নোরা শীল অতর্কিতে একটু আঘাত করিয়া ফেলিয়াছেন—তাহাতে ডাটার একটা দাঁতের গোড়া একটু নড়নড় করিতেছে।

সৌপ্তিক পর্ব্ব

সেদিন সকলেই সকাল সকাল খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি গোটা নয়েকের সময় বাহিরে ডাক শুনিলাম, 'বাবুজী, এ বাবুজী!' সকলেই বোধ করি নিদ্রামগ্ন। আমি আলোটা জ্বালিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখি কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা। ঘরে আনিয়া বসাইলাম। তাঁহারা দিনের ঘটনা বর্ণনা করিলেন। সত্যাগ্রহীরা মহিলাদের দিকটায় বড় বেশী উৎপাত ও বাঁদরামী আরম্ভ করেন। মেয়েদের আব্রু রাখা দায় হইয়া ওঠে। পাণ্ডাগণ প্রথমে নিষেধ করে—পরে কয়েকটি পর্দ্দানশীন হিন্দুস্থানী পুণ্যার্থিনীর কাকা-দাদারা মিলিয়া উত্তম মধ্যম দিয়া ছাড়িয়া দেয়। পাণ্ডাদের কথা সত্যই বোধ হইল—বাঁদরামীটা সম্পূর্ণই একতরফা। শুনিতে শুনিতে মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কৃতবর্ম্মা বলিলেন, —'বাবুজী, আপকো কলকাত্তামে এত্তা বান্দর হ্যায়, তা সত্ত্বেও বৃন্দাবনের বাঁদর তাড়াইতে এদের এত উৎসাহ কেন ? একেই কি কলোনিয়াল্ এক্সপেন্শন্ বলে ?' লজ্জায় অধোবদন হইলাম।

কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে বিদায় দিয়া আলোটা নিবাইয়া বিছানার উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। বিরক্তিভরে অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলাম, মহাভারত, মহাভারত!

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ সুষুপ্ত। কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য এইমাত্র শুইতে গিয়াছে। একা আমি অশ্বত্থামা জাগিয়া বসিয়া আছি। বিরক্তিতে মুখও পেচকের ন্যায় হইয়াছে। অতএব এই-বেলা—কিন্তু কি করিব ? বাঙ্গালীর ছেলে—পলায়নটাই আগে মাথায় আসে। স্থির করিলাম—আর নয়, এই বেলা পলায়ন করিব। ষ্টেশনে গিয়া এখন কলিকাতার ট্রেন না পাইলে পূর্ব্বদিকগামী যে-কোন একখানা ট্রেনে উঠিয়া পড়িব—পরে ট্রেন বদলাইয়া কলিকাতা যাইবার ব্যবস্থা করা যাইবে। আলো জ্বালিতে সাহস হইল না, অন্ধকারেই জিনিসপত্র গুছাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘণ্টাখানেক পরে একটা ট্রেনে উঠিয়া কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

ট্রেনে একটা স্বপ্ন দেখিলাম। আনন্দমঠের দেশে গিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখেই মন্দির—"মা যা আছেন।" ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—বেদীর উপর গীতালি ও চয়নিকা যুগপৎ আসীনা। দুই পার্শ্বে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান সজনে ডাটা ও যোগী গুহা। পদপ্রান্তে দুইটা মুমূর্ষু বৃহল্লাঙ্গুল বানর। সম্মুখে দণ্ডায়মান স্বামী সত্যানন্দ—নয়নে দর-বিগলিতধারা, বলিতেছেন, হায় মা, তোমাদের উদ্ধার করিতে পারিলাম না। আবার তোমরা বানরের হস্তে পড়িলে।

পার্শ্বস্থিত মহাপুরুষ বলিলেন, বানর কই ? বানর আর নাই। ইহাদিগের বানরত্ব মুমূর্ষু অবস্থায় মাতৃ-যুগলের পদপ্রান্তে পড়িয়া আছে। মালক্ষ্মীদের কৃপায় ইহারা শীঘ্রই মানুষ হইয়া উঠিবে।

বিপিনচন্দ্র পাল

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

যাঁহারা কোন সমাজের চিন্তা-জগতে ও কর্ম্ম-জগতে কোন বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করেন, ইতিহাস তাঁহাদের নাম অক্ষয় করিয়া রাখে। এমন ঐতিহাসিকের কথা পাঠ করিয়াছি যাঁরা বলেন যে, এই যুগ-প্রবর্ত্তকদের জীবন-কথা পাঠ করিলে সমাজ-জীবনের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়; ইতিহাস ইঁহাদের জীবন-কথার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মাত্র। আর এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মত এই যে, যাঁহাদিগকে আমরা মহাপুরুষ বড়লোক বা যুগ-প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করি তাঁহারা সমাজ-মন ও সমাজ-জীবনের অন্তরালে যে বিরাট প্রাণশক্তি কার্য্য করিতেছে তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, তাহার সাক্ষী মাত্র। সমাজ-জীবনে কোন পরিবর্ত্তনের যখন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, সমাজ-মনে যখন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন জাগিয়া ওঠে; সমাজ-জীবনের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যখন কোন বিশেষ উপায়ের অবলম্বন অপরিহার্য্য হইয়া ওঠে তখন যিনি বা যাঁহারা এই প্রয়োজনের অনুভূতিকে ভাষা দিতে পারেন, এই উপায় অবলম্বন না করিলে সমাজ-জীবন বিপন্ন হইবে এই ভাবনা ও চিন্তা সমাজের মনে জাগাইয়া তুলিতে পারেন এবং তাহা সমাজের স্ত্রী-পুরুষের বুদ্ধি-গ্রাহ্য করিতে পারেন, তাঁহারা এই বিপ্লব বা পরিবর্ত্তনের সাক্ষী মাত্র, প্রতিনিধি মাত্র সমাজ-মন বিপ্লবের ক্ষেত্র, সমাজের প্রাণশক্তি বিপ্লবের জনক-জনয়িত্রী। মহাপুরুষ, বড়লোক বা যুগ-প্রবর্ত্তক এই পরিবর্ত্তনের প্রচারক মাত্র।

এই দুই মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য তৎসম্বন্ধে তর্ক ও বিচারের যথেষ্ট অবসর আছে। এই তর্ক ও বিচারের স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধ নয়। যার যার জ্ঞান, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রত্যেকে এই তর্কে পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিবেন। উভয় পক্ষেই যুক্তি আছে, এই কথা বলিয়া এই তর্কের পাশ কাটাইয়া যাওয়াই নিরাপদ এবং এই বিশ্বাসের আলোকেই বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের জীবন-কথার চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিব। যাঁহার জীবন-কথার আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে, তাঁহার মত ও বিশ্বাস এইরূপ ছিল বলিয়া মনে করি এবং এই আলোকেই তাঁহাকে বোঝা যাইবে বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। "সত্তর বৎসর" নামে বিপিনচন্দ্রের একখানি আত্মচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। সৃষ্টি-বিধানে মানব-শিশুর স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন:

> "মানুষের কর্ম্মের দায় একপুরুষের বা দুইপুরুষের নহে। প্রথম মানব যেদিন এই পৃথিবীর আলোকে চক্ষু খুলিয়াছিল, সেই দিন হইতে অদ্যকার সদ্যজাত শিশুর কর্ম্মের বোঝা জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথবা প্রথম মানবের কথাই বলি কেন! যেদিন হইতে এই সৃষ্টির সূত্রপাত, সেইদিন হইতেই এই সদ্যজাত শিশুর সংসারের জাল অদৃশ্য হস্তে বোনা আরম্ভ হইয়াছে। মাথার উপর জ্যোতিষ্কমণ্ডল, পায়ের নীচে এই পৃথিবী—ইহাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে তিলে তিলে, 'অনাদি কাল অনন্তগগন' এই ক্ষুদ্র জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। এই সৃষ্টিতে জড় ও চেতন যাহা কিছু ছিল ও যাহা কিছু আছে, সকলের সঙ্গেই এই সদ্যজাত মানবশিশুর জীবন জড়াইয়া আছে।"

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের এই নাড়ীর টানের কথা স্বীকার ও স্মরণ করিয়া অন্য স্থানে বিপিনচন্দ্র কহিয়াছেন:

> "এ-জগতে আসিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি, ইহা সৌভাগ্যের কথা।...এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা। সর্ব্বোপরি, এই বাংলাদেশে এযুগে জন্মিয়াছি, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। মৃত জাতি কি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়, এযুগে এই বাংলাদেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি। এ পরম সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।"

এই সৌভাগ্যের কথা কালির রেখায় ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিব। বাগ্মী, লেখক, সাংবাদিকরূপে, দার্শনিক সমাজতত্ত্বজ্ঞরূপে বিপিনচন্দ্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। "স্বদেশীযুগে" তিনজন রাজনীতিজ্ঞের নাম লোকমুখে ধ্বনিত হইত—'লাল-বাল-পাল'। লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল—এই তিনটি নাম সংক্ষেপ করিয়া লোকপ্রিয় করা হইয়াছিল। কর্ম্ম-জগতে ইহাই বিপিনচন্দ্রের পরিচয়। তাঁহার জন্মস্থানের পরিচয় ও পিতৃ-পরিচয়ও দিতে হয়। শ্রীহট্ট জিলার পৈল গ্রামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে ১২৬৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের ২২ তারিখে বিপিনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারে এইরূপ একটা কিম্বদন্তী ছিল যে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ একজন কোন দূর অতীতে দক্ষিণ রাঢ়ের মঙ্গলকোট গ্রাম হইতে আসিয়া বুড়ীগঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানে পৈল নামে গ্রাম স্থাপন করিয়া বসতি আরম্ভ করেন। ঐ ভদ্রলোকের নাম হিরণ্য পাল। অদ্যাপি বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া সব্‌ডিভিসনে মঙ্গলকোট নামে এক গ্রাম আছে। পৈল গ্রামের দুই মাইল দূরে একটি নদী আছে, তার নাম খোয়াই। হইতে পারে পাঁচশত-ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলের বুক বহিয়া বুড়ী-গঙ্গা নদী চলিত। আজ ঢাকা শহরের গায়ে বুড়ীগঙ্গা নদীর একাংশ দেখা যায়। তিনশত বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ যখন একশত মাইল পশ্চিমে সরিয়া আসিয়াছে, তখন বুড়ীগঙ্গার উৎপত্তি স্থানের নিরুদ্দেশের, গতি পরিবর্ত্তনের বা নাম পরিবর্ত্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া কঠিন হইতে পারে। হিরণ্য পাল হইতে বিপিনচন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান সাতাশ পুরুষ। এই পাঁচশত-ছয়শত বৎসরের মধ্যে দেশের চেহারা অনেক বদলাইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিপিনচন্দ্রের পিতা রামচন্দ্র পাল মহাশয় যখন ঢাকার কলেক্টরের পেস্কার ছিলেন, তখন বিপিনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। "সিপাহী-বিদ্রোহ" নামে পরিচিত বিপ্লব-চেষ্টা তখন দেশের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ঢাকা শহরেও একদল সিপাহীর রক্তে ঢাকার মাটি রাঙ্গা হইয়া-ছিল। চট্টগ্রাম হইতে একদল সিপাহী বিপ্লব ছড়াইয়া শ্রীহট্ট জিলার লাতু পরগণা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তাহাদের রসদ জোগাইয়া অনেকে পরে জমিদারী কিনিয়াছিলেন। বিপিন-চন্দ্রের জন্মস্থান এই সিপাহীদের পথে পড়ে নাই। কিন্তু তাঁহাদের আবির্ভাবে দেশময় আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছিল দিকে দিকে, তাহা পরে তিনি শুনিয়াছিলেন। এই বিপ্লব-চেষ্টা পশ্চিমে দিল্লী হইতে পূর্ব্বে বিহার ও দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যদিও বাংলাদেশে তার ছিটাফোঁটা পড়িয়াছিল, তবুও বাঙ্গালী সমাজপতিদের মধ্যে কেহ এই আন্দোলনে যোগদান করেন বা তাতে উৎসাহ দেন এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশও নিশ্চেষ্ট ছিল। কেবল পাঞ্জাবের শিখ সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে সক্ষম হন। 'পশ্চিমা' সিপাহীরা পাঞ্জাব-জয়ে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া তার প্রতিশোধস্বরূপ শিখেরা "সিপাহী-বিদ্রোহ" দমনে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিল, এরূপ কথাও ইতিহাসে পড়িয়াছি।

বিপ্লবের সময়ে জন্মগ্রহণ করাতে বিপিনচন্দ্র সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লবীর মতন কাজ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ ধারণা বিচারসহ কি-না জানি না। কিন্তু এই কথা সত্য যে, প্রথম যৌবনেই তিনি এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। বিপিনচন্দ্রের পিতা রামচন্দ্র পাল কয়েক বৎসর মুন্‌সেফী করেন। এই কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে নানা স্থানে ঘুরিতে হইত। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের যখন স্কুলে যাইবার বয়স হইল, তখন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্ট শহরে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কালে ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৭৭ খৃঃ এণ্ট্রান্স (বর্ত্তমানে মাট্রিকুলেশন) পরীক্ষা পাশ করিয়া বিপিনচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট আর্ট্‌স্ (বর্ত্তমানে আই-এ, আই-এস্‌সি) পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন। সেই বৎসরই শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলাকে বাংলা দেশ হইতে ছিন্ন করিয়া আসামপ্রদেশের সৃষ্টি হয়। এই দুই জিলার রাজস্বে আসামপ্রদেশের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রীহট্টের নেতৃবর্গ আপত্তি জানাইয়াছিলেন; আজিও তাহা করিতেছেন। সেইরূপ বাংলা দেশের পশ্চিম সীমান্তে মানভূম, সিংহভূম, ভাগলপুর, দেওঘর প্রভৃতি স্থানের অংশবিশেষ বিহার প্রদেশের প্রয়োজনে বাংলা দেশ হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে।

বিপিনচন্দ্র যখন উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন তখন বাংলার জীবনে বান ডাকিয়াছে। আপাত-

বিপিনচন্দ্র পাল
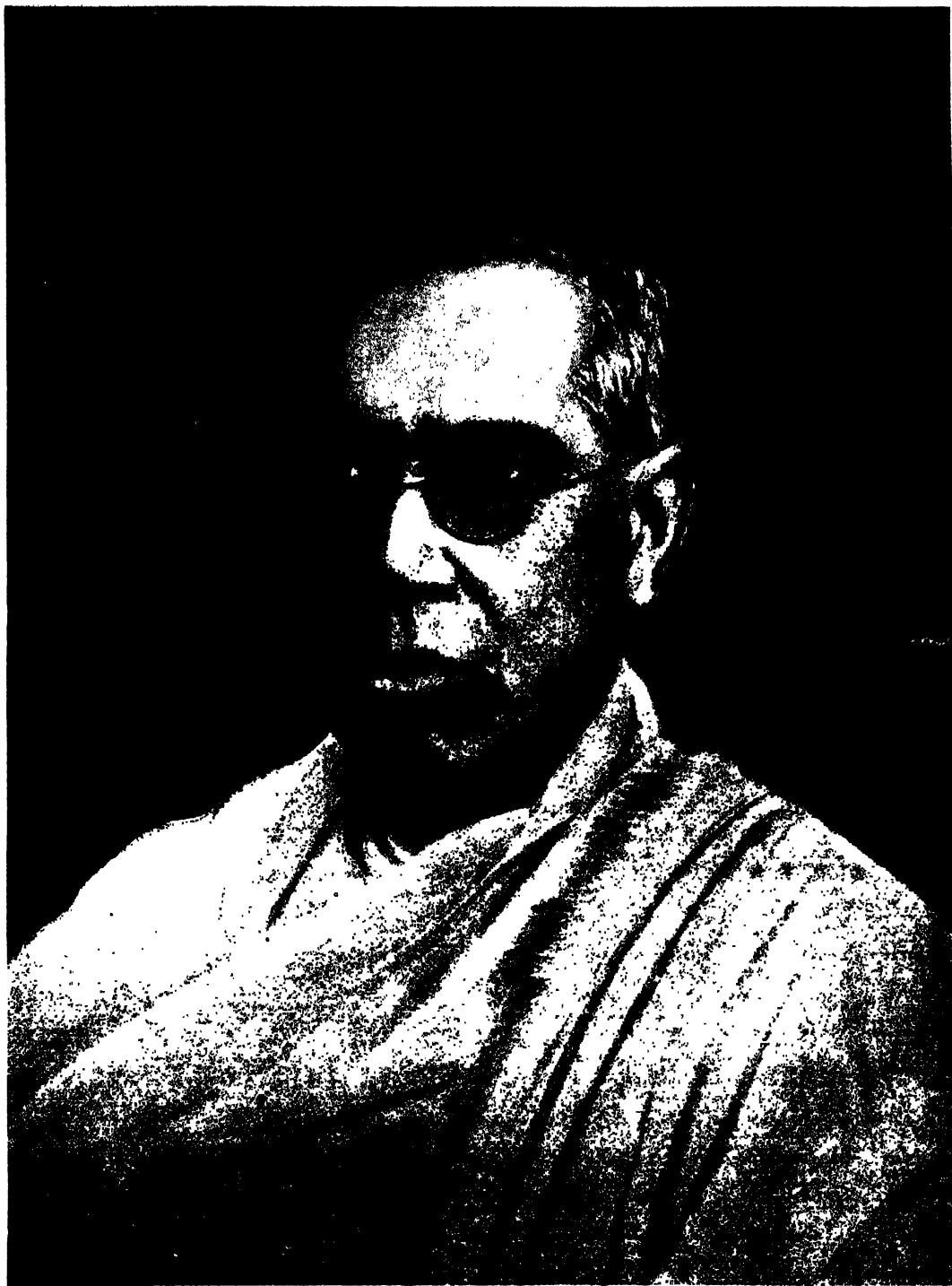
বিরুদ্ধ দুইটি শক্তি তখন বাঙ্গালীর মনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিকে ধর্ম্ম ও সমাজজীবন সংস্কারের আন্দোলনে উচ্ছ্বসিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ এই আন্দোলনের নেতা। ইঁহাদের অনুপ্রাণনায় অনেক বাঙ্গালী যুবক পৈত্রিক ধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই যুবকবৃন্দের মধ্যে বিপিনচন্দ্র অন্যতম। অন্যদিকে দেশের সভ্যতা সাধনা সম্বন্ধে লোকের মনে সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে নিজেদের সমাজের ও ধর্ম্মের নবকলেবর দান করিতে হইবে, এই চেষ্টার বিরুদ্ধে দেশের লোকের মনে একটা ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" ও মহারাষ্ট্রে বিষ্ণুশাস্ত্রী বিপুলঙ্কারের "নিবন্ধমালা"—এই দুইখানি মাসিক পত্রিকায় এই পরানুকরণের বিরুদ্ধে দেশের লোকের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছিল। প্রায় সেই সময়ে পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরস্বতী ও মান্দ্রাজে থিয়োসফিকাল সোসাইটি প্রাচীন আদর্শে আমাদের দেশের জীবন নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার কথা প্রচার করিতেছিলেন এবং সেই সময়ে যুক্তপ্রদেশের মুসলমান-সমাজে নবজীবনের প্রবর্ত্তকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—সৈয়দ আহাম্মদ। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, শিশিরকুমার শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি রাজনীতিক নূতন পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এইরূপ নানা প্রভাবের মধ্যে বিপিনচন্দ্রের প্রথম যৌবন গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ষোল বৎসর বয়স্ক বিপিনচন্দ্র লেখার ও বক্তৃতার সাহায্যে গণ-মত ও গণ-মন সংগঠন করিবার কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন। কেশবচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায়, বঙ্কিমচন্দ্র শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায় নিজের জীবনের কর্ম্ম-পথের সন্ধান পান। সেইজন্যই দেখিতে পাই বাঁধাধরা পাঠ্য-পুস্তকের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিপিনচন্দ্র জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণ করিতেছেন। কলেজের কাছে ক্যানিং লাইব্রেরী নামে একখানি পুস্তকের দোকান ছিল। কলেজের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকিয়া এই পুস্তকের দোকানে বসিয়া দিনের পর দিন তিনি পুস্তক ঘাঁটিতেন। তাহার ফলে ফার্স্ট আর্ট্‌স্ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। এই ব্যর্থতায় কিন্তু তাঁহার জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং এই অনুশীলনের প্রসাদে বাইশ বৎসর বয়সে তিনি কটক শহরের প্যারীমোহন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এই বিদ্যার জোরে পরে তিনি শ্রীহট্ট শহরের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকপদ লাভ করেন। এই বিদ্যার জোরে মহীশূরের বাঙ্গালোর শহরের আরকট নারায়ণ নারায়ণস্বামী নাইডু হাই স্কুলেও এইরূপ উচ্চপদ লাভ করেন। উত্তরকালে ইংরেজী ভাষার উপর অধিকার বলে মেটকাফ্ হল (বর্ত্তমানে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) নামক গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান পদ লাভ করেন। বিপিনচন্দ্রের লেখায় ও বক্তৃতায় যে বাকবিভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই ভাবেই তাঁহার প্রথম জীবনে লাভ হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট শহরের জাতীয় বিদ্যালয়ের সেবায় যখন নিযুক্ত ছিলেন তখনই বিপিনচন্দ্র "পরিদর্শক" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কলিকাতা হইতে কম্পোজিটার আনাইয়া এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক সময়ে ইহাদের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া নিজেদের প্রবন্ধ নিজেরা কম্পোজ করিয়া নিজেরা ছাপিয়া প্রকাশিত করেন। এই হাতেখড়ি ব্যর্থ হয় নাই। জীবনের বিশিষ্ট অংশ সংবাদপত্রের লেখক, সংবাদপত্রের সম্পাদক-রূপে তাঁহার কাটিয়াছে। কত সংবাদপত্রে যে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষায় তাঁহার তুল্যাধিকার ছিল। লেখায় বক্তৃতায় কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার মতন বাঙ্গালী লেখক ও বাগ্মী কম দেখা গিয়াছে—দুইটি ভাষায় যাঁহার ভাবের স্রোত বন্যার মতন বহিয়া গিয়াছে। কয়েকখানি পত্রিকার নাম করিলে বিপিনচন্দ্রের লেখক-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন'—চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ ইহার সম্পাদক ছিলেন; বিপিনচন্দ্র ছিলেন সহকারী সম্পাদক। 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' ও লাহোরের সহরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকা তখন সাপ্তাহিক ছিল; প্রায় এক বৎসর বিপিনচন্দ্র ট্রিবিউনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন; মাস দুই-তিনের জন্য সম্পাদক ছিলেন। 'বেঙ্গলী' পত্রিকা যখন দৈনিক হয় তখন তাঁহার নিয়মিত লেখক ছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ তাহার সম্পাদক। 'নিউ ইণ্ডিয়া'

সাপ্তাহিকের সম্পাদক; 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক; বিলাতে 'স্বরাজ' মাসিকের সম্পাদক; 'হিন্দু রিভিউ' মাসিকের সম্পাদক; 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নিয়মিত লেখক; 'ডিমোক্রাট' সাপ্তাহিকের সম্পাদক; 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক—শেষের দুইখানি এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত।

'ইংলিশম্যান' পত্রিকার নিয়মিত লেখকরূপে প্রায় চার-পাঁচ বৎসর তিনি বিশেষ প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। এই ইংরেজী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার জন্য বিপিনচন্দ্র নিজের স্বদেশবাসী অনেকের নিকটে নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু যে অবস্থায় পড়িয়া তাঁহাকে এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে হয়, তাহার ইতিহাস লোকচক্ষুর গোচরীভূত করা প্রয়োজন। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-১৯২১ খৃঃ) গান্ধিজী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপন্থার বিরোধী হইলেও কোন কোন বিষয়ে বিপিনচন্দ্র তাহার স্বপক্ষে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত করেন। যখন স্কুল-কলেজ বর্জ্জন করিয়া ছাত্রদিগকে দেশের সেবায় আহ্বান করা হয়, তখন বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠেই—'এডুকেশন ক্যান্ ওয়েট্, স্বরাজ ক্যান্নট'—গতানুগতিক শিক্ষা স্থগিত করিয়া স্বরাজই দেশের ধ্যান-ধারণা হউক—এই বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু বেশীদিন তিনি এই সাহায্য দিতে পারিলেন না। কারণ, গান্ধিজী-প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের নীতি, যুক্তি ও কৌশল সম্বন্ধে প্রথম হইতে একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব তাঁহার মনে ক্রিয়া করিতেছিল এবং লেখা ও বক্তৃতায় তাহা প্রকাশ পাইতেছিল। বাঙ্গালা দেশে এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য যে সব পত্রিকায় বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধাদি নিয়মিত প্রকাশিত হইত তাহাদের স্বত্বাধিকারীদের উপর চাপ দেন। বিপিনচন্দ্রের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয় যে, তিনি নিজের নামে প্রবন্ধাদি লিখিবেন এবং এই প্রবন্ধের জন্য কোন আর্থিক প্রতিদান গ্রহণ করিবেন না। এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইলে পর নিজের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার হইতে এইরূপে বঞ্চিত হইবার কল্পনায় বিপিনচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া এই বিষয়ের ব্যবস্থা করিলেন। সপ্তাহে তিন দিন তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং অন্য স্তম্ভে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সম্পাদক প্রবন্ধের উপর কলম চালান নাই।

বিপিনচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও যে সব প্রভাবের মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় না দিলে তাঁহার দেশসেবা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়। তাঁহার আত্মজীবনীতে দেখিতে পাই যে, নিজের পথ নিজে কাটিয়া লইবার স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার মন সদা জাগ্রত ছিল; নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মতে চলিবার স্বাধীনতা এবং নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস, যুক্তি-তর্কের প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা সম্বন্ধে এমন সাবধানী লোক অতি অল্পই আমার চোখে পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে লোকের চিন্তাজগতে যে পরিবর্ত্তন দেখা দেয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাহার মধ্যে প্রধান। ইহা 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই উপলব্ধির বৈজ্ঞানিক রূপ। বিপিনচন্দ্র এই যুগের লোক। তাঁহার সহজাত সংস্কার নূতন বৈজ্ঞানিক পরিবেশের অনুপ্রাণনায় জীবনে নানারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্ম, সামাজিক ও রাজনীতিক মতামত ও কর্ত্তব্য এই ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে জন্যই দেখিতে পাই যে, প্রথম যৌবনেই তিনি নিজের সমাজ ও ধর্ম্মের নানা সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। নয় জন সভ্য এই সমিতির ব্রত গ্রহণ করেন; নিজের বুকের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাহা অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা বিরাজ করিবে ইহাই ছিল সমিতির মূল মন্ত্র। সেইজন্য সামাজিক জীবনে বর্ণভেদ ও জাতিভেদ এবং রাজনীতিক জীবনে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার ব্রত এই সমিতির নয় জন সভ্য গ্রহণ করেন; তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় আজিও কর্ম্মক্ষম হইয়া বাঁচিয়া আছেন। 'স্বায়ত্ত শাসনই ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট রাজনীতিক ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণীয়'—এই আদর্শের প্রেরণায় সভ্যগণ প্রতিজ্ঞা করেন যে—"বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার অধীনে তাঁহারা কখনও কোন চাকুরী করিবেন না।" আজীবন তাঁহারা এই ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন।

দেশের উন্নতির জন্য, দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সমাজ-জীবনকে দোষমুক্ত, সবল করিতে হইবে—এই আকাঙ্ক্ষাই সমাজ-সংস্কার চেষ্টার মূল কথা। সংস্কারকগণ সেইজন্য সমাজ-শরীরে যত সব ব্রণ, যত সব রোগ আছে, তাহার নিদান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই কার্য্যের একটা বিপদও আছে। সংস্কারকগণ ক্রমশ সমাজ হইতে দূরে চলিয়া যান; সমাজের দোষ উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন। সমাজও প্রতিশোধে সংস্কারকগণের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজ ও সংস্কারকগণের মধ্যে এইরূপ একটা সংগ্রাম চলিতেছিল। শিক্ষিত ভারতবাসী সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন—ইচ্ছা করিয়া নয়, কর্ম্মের তাড়নায়। শিক্ষিত সমাজের মধ্য হইতেই এই বিপদের সম্বন্ধে সাবধান বাণী উত্থিত হয়। মহারাষ্ট্র দেশে বালগঙ্গাধর তিলক এই বিষয়ে প্রথম হইতেই সজাগ ছিলেন; বাংলা দেশে বঙ্কিম-চন্দ্র, শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, স্বামী বিবেকানন্দ এই বিচ্ছেদ ও ব্যবধান সম্বন্ধে সমাজকে সাবধান করিয়া দেন। সমাজশক্তির মূলাধার যে জনগণ—তাহাদের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশের স্বাধীনতা আনয়ন করিবার চেষ্টা সফল হইতে পারে না; নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবাসীকে ভালবাসিয়া, সেবা করিয়া তাহাদের মনে বুদ্ধি ও বুকে সাহস জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তাহাদের বলে বলীয়ান হইয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। বিপিনচন্দ্রের জীবনে এই বিশ্বাস জাগিয়া ওঠে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি ভারত সভ্যতার প্রাণবস্তুর পরিচয় লাভ করেন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সাহচর্য্যে এই পরিচয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রমাণের উপর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সভ্যতা-সাধনার মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করিবার নানা ইঙ্গিত তাঁহার মানসপথে ফুটিয়া ওঠে। ১৮৯৮ খৃঃ তিনি বিলাত গমন করেন। বিলাতের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকবর্গের শিক্ষার সুবিধার জন্য একটি বৃত্তি দান করিতেন; অক্সফোর্ডের মানচেস্টার কলেজে এক বা দুই বৎসর পাঠ করিবার জন্য এই বৃত্তি দান করা হইত। বিপিনচন্দ্র এই বৃত্তি লাভ করিয়া তথায় গমন করেন। চারি-ছয় মাস পাঠ করিবার পরেই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কলেজে পাঠ করিবার দায় হইতে তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। বিপিনচন্দ্র ভারতীয় সভ্যতা-সাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সাধনার তুলনামূলক বিচার করিয়া বিলাতে ও মার্কিনে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে থাকেন। এই সময়ে হাইণ্ডম্যান প্রভৃতি চিন্তানায়কদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় লাভ হয়। হাইণ্ডম্যান ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিরোধী ছিলেন; বিলাতে সমাজ-তন্ত্র-বাদের একজন প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলোচনায় বিপিনচন্দ্র বর্ত্তমান জগতের রাজনীতির অনেক গুহ্য কথা ও তথ্য পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারেন।

মার্কিন দেশে যখন ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছিলেন, তখন একটা অভিজ্ঞতায় বিপিনচন্দ্রের জীবনের মোড় ফিরিয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব তখন মার্কিনে প্রবল। বিবেকানন্দের দেশের লোক ধর্ম্মের কথা বলিলে লোকে তাহা নতশিরে শুনিত। বিপিনচন্দ্রও সর্ব্বত্র আদর-যত্ন পাইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় ভারত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেন; বিধাতাপুরুষ ভারতবর্ষকে আধুনিক জগতের আচার্য্য পদে বরণ করিয়াছেন এই বার্ত্তা প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেন; ভারতবর্ষই কেবল আধুনিকতার মধ্যে বাঁচিয়া আছে, কারণ এখনও তাহার বিশ্বকে কিছু দিবার আছে। তাঁহার একজন মার্কিন বন্ধু এই গুরুগিরিতে খোঁচা মারিয়া বিপিনচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদন করেন। বিপিনচন্দ্র যেদিন নিউ-ইয়র্কে পদার্পণ করেন, সেইদিন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি বিপিনচন্দ্রকে দেখিবামাত্র হস্ত-মর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আপনি এক বিরাট দেশ হইতে আসিতেছেন; আপনারা জগতের শিক্ষা-গুরু, দীক্ষা-গুরুপদে বিধাতা কর্ত্তৃক বৃত হইয়াছেন; কিন্তু যতদিন না আপনারা জগতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়াইয়া তাহাদের চোখের দিকে সমানভাবে চাহিতে পারিতেছেন, ততদিন এই বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন না। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিতে হয়—"কথাগুলি যেন আমার প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত খোঁচাইয়া দিল। আর নিউ ইয়র্কের

হোটেলের পাঠাগারে এই মার্কিন-বন্ধুর এই অপ্রত্যাশিত সম্বর্দ্ধনার মধ্যেই মনে হয় আমার অজ্ঞাতসারে সেই মাঘের অপরাহ্নে আমার অন্তরে আমার নূতন স্বাদেশিকতার জন্ম হয়। তখন হইতেই বুঝিলাম···যতদিন না ভারতের রাষ্ট্রীয় দাসত্ব ঘুচিয়াছে এবং আমরা চারিদিকের স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ জাতি সকলের মাঝখানে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি ততদিন আমাদিগের যাহা দিবার আছে, জগতের লোকে তাহা গ্রহণ করিবে না।··· ভারতবর্ষ যতদিন য়ুরোপের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে ততদিন তাহার রত্নভাণ্ডার বিদেশীয়েরাই লুটিয়া লইবার চেষ্টা করিবে, সে নিজের হাতে সে ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া বিশ্বমানবের জ্ঞানকোষের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না—এই কথাটা এমন সোজাসুজিভাবে আগে কেহ কহে নাই। আর আমিও আধুনিক ভারতের সকল সাধনের পূর্ব্ববর্ত্তী-সাধন যে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ, একথাটা সমুদয় জ্ঞান ও সমুদয় ভাব দিয়া ধরিতে পারি নাই।"

মার্কিন-প্রবাসের এই "সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়" লইয়া বিপিনচন্দ্র ১৯০০ খৃঃ দেশে ফিরিয়া আসেন এবং নিউ ইণ্ডিয়া নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া রাজনীতিক জীবনে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিবার কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এরূপ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের "লোকরহস্য"-এ পাওয়া যায়; রাজ-দরবারে "আবেদন-নিবেদনের পালা" বহিয়া লইবার হীনতার কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে প্রচারিত হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র এই কথাটা সারা ভারতময় প্রচার করেন। লর্ড কার্জ্জন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট। তাঁহার দাম্ভিকতায় দেশের শিক্ষিত সমাজ উত্যক্ত। শাসনকার্য্যের সুবিধার নামে বাঙ্গালী জাতিকে দুই প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন তিনি। বাঙ্গালী জাতির শক্তি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে, এই আশঙ্কায় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া দাঁড়াইল। দেশব্যাপী এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ১৯০৫ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-ভঙ্গ হইল। তাহার প্রতিকারের জন্য বিলাতের পণ্য-দ্রব্য বর্জ্জন করা হইল। এই অর্থ-নীতিক অস্ত্র-প্রয়োগ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র প্রথমে সন্দেহাকুল ছিলেন। কিন্তু এই বর্জ্জনের অস্ত্রকে বিলাতের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সংস্রবের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়, এই ভাবিয়া তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ বর্জ্জন দ্বারা আত্মপ্রত্যয় জন্মিবে, আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে এবং আত্মশক্তির বলে জাতি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবে এই কথাটা প্রচার করিবার জন্য বিপিনচন্দ্র পাগলপারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন! ১৯০৬ খৃঃ তিনি "বন্দে-মাতরম" নামে একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা স্তম্ভে একটি প্রবন্ধে 'অটোনমী ফ্রি ফ্রম্ বৃটিশ্ কন্ট্রোল্'—বৃটিশের প্রভুত্বমুক্ত স্বাধীনতার কথা বলেন। সেইদিন এই কথা বলা কম সাহসের কাজ ছিল না। এই পত্রিকার সম্পাদকের পদ তিন-চারি মাস পরে তিনি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাহার সম্পাদক হন। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করার অপরাধে বিপিনচন্দ্র ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। বক্‌সার জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যেদিন বিপিনচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, সেদিন যে অভ্যর্থনা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা রাজার ভাগ্যেও বড় একটা জোটে না। ইহার এক বৎসর পরে বিপিনচন্দ্র বিলাত চলিয়া যান। সেখানে প্রায় তিন বৎসর ছিলেন। বর্ত্তমান জগতের রাজনীতিক খেলার কেন্দ্রে বসিয়া তিনি দুনিয়ার শক্তি-নিচয়ের কুটিল গতিবিধির বিশেষ পরিচয় লাভ করেন। এই অভিজ্ঞতার কথা তাঁর 'ন্যাশনালিটি এণ্ড এম্পায়ার' বই-খানিতে লিপিবদ্ধ আছে। এই বইয়ে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেওয়া ছাড়া ইংরেজের গত্যন্তর নাই, যেমন কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে বৃটিশের সাহচর্য্যের প্রয়োজন। ১৯০৯ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত, যতদিন বিপিনচন্দ্র বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন নানাভাবে তিনি এই কথাটাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আজ দুনিয়া, আজ বৃটিশ সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষ যখন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তখন এই চিন্তা-নায়কের কথা মনে হয়।

বিপিনচন্দ্র কেবল রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। সাহিত্য-রসিক সমালোচকরূপে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আসন উচ্চে

স্থাপিত। 'বিজয়া,' নবপর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শন,' ও 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকায় তার চিন্তা-ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তত্ত্বান্বেষী ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অলক্ষ্য অনু-প্রেরণায় বাংলা দেশের, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক ও সাধনা সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পণ্ডিত-সমাজ গ্রাহ্য করিয়াছেন। 'নারায়ণ' পত্রিকার পৃষ্ঠার বিচ্ছিন্ন এই প্রবন্ধাবলী, 'হিন্দু রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, এই বিষয়ে নূতন আলোক নিক্ষেপ করিয়াছে। ইংরেজী প্রবন্ধগুলি 'বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম্' নামে পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নবযুগের চিন্তা নায়ক, রাজনীতিক নেতৃ-বৃন্দের চরিত-কথা তিনি যেভাবে বাংলা ইংরেজীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-জগতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। 'সোল্ অফ ইণ্ডিয়া' নামীয় বইয়ে হিন্দু সভ্যতার গোড়ার কথা তিনি যেমন করিয়া পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়া-ছেন, তাহার মূল্য-নির্দ্ধারণ করিবার দিন কবে আসিবে জানি না। দেশ যখন জ্ঞানে, কর্ম্মে, চিন্তায় স্বাধীনতা লাভ করিবে তখন বাংলা দেশ এই চিন্তা-নায়কের প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিবে, এই ভরসায় তাঁহার জীবন-কথার সামান্য পরিচয় দিলাম।

পিতৃ-জীবন

শ্রীকালিদাস রায়

সারা রাত্রি জাগিয়াছি। গেছে রাত বেঘোরে খোকার,
কত জ্বর কেবা জানে? ভয়ে ভয়ে থারমোমিটার
দিই নি বগলে তার—দিয়ে গেছি বরফ মাথায়,
ভোরে মনে হ'ল কম, কম্প্রহস্তে দেখিলাম হায়
তখনো একশ' দুই। যেতে হয় ডাক্তারের বাড়ী,
রাতজাগা ছিল ভালো, এখন যে যেতে হয় ছাড়ি'।
গৃহিণীরে যেতে হয় অনিচ্ছায় রান্নাঘর পানে,
দশ বছরের মেয়ে অমিয়ারে বসায়ে সেখানে।

আমাদের খাওয়া সে-ত পিণ্ডগেলা, মুখপানে চেয়ে
অন্য ছেলেমেয়েদের, রাঁধিবারে যেতে হয় নেয়ে,
ছুটিয়া আসিতে হয় রান্নাঘর হ'তে শতবার
খোকার কাঁদন শুনে।
চুকাইতে ঔষধ ডাক্তার,
নয়টা বাজিয়া যায়। তাড়াতাড়ি কলে স্নান ক'রে
আলু সিদ্ধ ভাত গুঁজে নাকেমুখে দগ্ধোদর ভ'রে
যেতে হয় কর্ম্মস্থানে। শতবার চেয়ে পিছুপানে
খোকার মুখের দিকে, গৃহিণীরে উপদেশ দানে
বিশেষ সতর্ক ক'রে অবশেষে ফেলি দীর্ঘশ্বাস
ছাতা হাতে নিতে হয়, নতুবা সবার উপবাস
চলিবে দুদিন পরে অন্নাভাবে। হ'য়ে যায় দেরি
পঁহুছিতে কর্ম্মস্থানে। সেথা গিয়ে রক্তচক্ষু হেরি,
কাজে লাগে-নাক মন, তবু কাজ করিতেই হয়
নিতান্ত অভ্যাস বশে। মাঝে মাঝে চমকে হৃদয়
স্মরিয়া বাড়ীর কথা, ভুল হয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলি,
দিনের খেয়ার নায়ে প্রাণপণে চলি লগি ঠেলি,
বেলা যত শেষ হয় পোড়া কাজ যায় তত বেড়ে,
সাথীদের আনুকূল্যে তাড়াতাড়ি বাকি কাজ সেরে
ছুটে যাই বাড়ী পানে। ভাবিতে ভাবিতে পথে যাই
বাড়ী গিয়ে দেখি যদি খোকাটির আর জ্বর নাই,
গৃহিণী দুয়ার খুলি বলে যদি হাসি হাসিমুখে
'আজ জ্বর ছেড়ে গেছে।' প্রাণ তবে কি অপূর্ব্বসুখে
ভ'রে যায়, কি আনন্দ, এর চেয়ে কি আনন্দ আছে?
সৌভাগ্য ইহার চেয়ে এ জীবনে কবে মিলিয়াছে?
ভাবিতে ভাবিতে চলি, দূর হ'তে বাড়ীটি দেখিয়া
বুক করে দুরু দুরু। কাণ পেতে শুনি দাঁড়াইয়া
সেথায় উঠিছে কি না শোকধ্বনি, দেখি লক্ষ্য ক'রে
সম্মুখে জমেছে কি না লোকজন সারা পথ ভ'রে।
পাশের বাড়ীর দ্বারে মোটর দাঁড়ানো দেখি ছুটি
নিজের বাড়ীর দ্বারে মনে করি চমকিয়া উঠি,—
মহানবমীর ছাগ আমি যেন, কাঁপিতে কাঁপিতে
চলি নিজ গৃহপানে। কি জানি কি দেখিব বাড়ীতে,
শঙ্কায় আকুল প্রাণ। এই চিত্র একদিনকার
নহে, নহে। এই নিয়ে আমাদের বিচিত্র সংসার।
এই দিনগুলি দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ বেদনা নিবিড়
বিপুল বিশাল হ'য়ে পান করি বুকের রুধির,
গ্রাস করি ফেলিয়াছে জীবনের বাকী দিনগুলি
ভুবনেরে অন্ধকার, জীবনেরে অন্ধ ক'রে তুলি।

বাংলা পুঁথিতে বানান ও লিপিকৌশল

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে বঙ্গভাষার চর্চ্চা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভাষায় বহু গ্রন্থাদি লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল পুস্তক শিক্ষার্থী ও জ্ঞান অন্বেষণকারীগণ নকল করিয়া বা করাইয়া পাঠ করিতেন, পরে শিষ্য বা পুত্রগণকে পাঠের নিমিত্ত দিতেন।

আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় হুগলীতে, ঈস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর উইলকিন্স সাহেবের দ্বারা, মাত্র ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে। তাহার পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র আমাদের দেশে ছিল না। অবশ্য মুদ্রাযন্ত্র ছিল না বলিয়াই যে মুদ্রণ হইত না এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। দীনেশবাবু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বলিয়াছেন—"বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথিতে আমরা মুদ্রিত লিপির নমুনা পাইয়াছি। প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন একখানি বাঙ্গালা পুঁথিতে কাষ্ঠের উপর খোদিত লিপির সাহায্যে কাগজে মুদ্রিত লিপির নমুনা দেখিয়াছি। তদ্দ্বারা মনে হয় সাধারণের মধ্যে মুদ্রিত লিপির প্রচলন না থাকিলেও ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় সেইরূপ মুদ্রণকার্য্য মধ্যে মধ্যে হইত। ইহা অবশ্যই নিষ্কর্ম্মা লিপিকরের স্বীয় চিত্তবিনোদনের জন্যই সম্পাদিত হইত।"

সে যাহাই হউক, এইরূপ মুদ্রণের সংখ্যা এত কম যে, উহা নিষ্কর্ম্মা লিপিকরের স্বীয় চিত্ত বিনোদনের অথবা অপর কাহারও চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত করা হইত, সে অনুসন্ধানের তাগিদ মিটান বর্ত্তমানে মুলতুবি রাখিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার সুপ্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লেখকগণ যাহা রচনা করিতেন, নকলনবীশগণ অতি পরিচিত হরিদ্রাবর্ণের তুলট কাগজে উহার নকল করিতেন, ক্রমেই এইরূপ হস্তলিখিত পুঁথির সংখ্যা বাড়িতে থাকিত ও রচিত গ্রন্থ-সকল সুপ্রচারিত হইত।

মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যামোদী ও অনুসন্ধিৎসুগণ হস্তলিখিত পুঁথি হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া ঐ সকল পুস্তক মুদ্রণ করাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই মুদ্রণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথির বিবরণ বা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথির তালিকা-দৃষ্টে অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সমগ্র পুঁথির সংখ্যার একটী অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

এইসকল গ্রন্থে এমন বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যাহার প্রচারে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের উপর আলোকসম্পাত করা হইবে। ঐ সকল পুঁথির অনেকগুলির ঐতিহাসিক

মূল্যও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যাহা অপঠিত হইয়া গৃহকোণে পড়িয়া রহিয়াছে হয়ত সেই সকলের পাঠ ও প্রচারের ফলে বাংলার ইতিহাস, বিশেষ করিয়া বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস, ধর্ম্মের ইতিহাসও বটে, নূতন করিয়া লিখিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

কিন্তু উহা পাঠ করে কে? একে ত বহু পুঁথি পাওয়াই যায় না। তাহার উপর যাঁহাদের নিকট আছে তাঁহারা হয়ত উহাকে অনাদরে কোন মাচার উপর বহু অব্যবহার্য্য জিনিসের সহিত রাখিয়াছেন, কালক্রমে কীটদষ্ট হইয়া অথবা অন্য প্রকারে লোপ পাইতেছে, আবার কেহ-বা উহাদিগকে সাধারণের অগোচরীভূত রাখিয়া দেবতার সিংহাসনের পার্শ্বে একটু স্থান দিয়া সযত্নে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট আছেন। প্রকৃষ্টরূপে ব্যবহার করিতেছেন কয়জন? আবার যে সব পুঁথি সাধারণে দেখিবার বা পড়িবার সুযোগ পাইতে পারেন, উহা দেখিয়া বা পড়িয়া সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারই বা কয়জন করেন! অনেকে করেন না, অনেকে পারেন না।

না করার কারণ যাহাই থাকুক, না পারার কারণ আছে বহু। বাংলাপুঁথির বানান ও লিপিকৌশল জানা না থাকা, বাংলা পুঁথি পাঠ না করিতে পারার অন্যতম কারণ।

লিপিকৌশলের আলোচনা করার পূর্ব্বে বানান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমানে প্রচলিত বাংলার বানানের সহিত বাংলা পুঁথির বানানের অসাদৃশ্য বহু পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর এক একটী করিয়া অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

'ই'-কারের প্রভাব অত্যন্ত বেশী, মনে হয় 'ঈ'-কারকে অতি যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা হইয়াছে। যে বানানগুলি অতি সাধারণ সেরূপ স্থলেও 'ঈ'-কারের পরিবর্ত্তে 'ই'-কার দৃষ্ট হয়। উকার সম্বন্ধেও প্রায় তাই, দু-এক স্থল ব্যতীত 'ঊ'কার নাই, প্রায় সর্ব্বস্থলেই 'উ'কার লিখিত হইয়াছে। দুটী ন স্থানে মাত্র দন্ত ন ব্যবহার করা হইয়াছে। তিনটী স স্থলেও এইরূপ পক্ষপাতিত্ব ঘটিয়াছে। দন্ত 'স'ই বেশী। 'ষ' যদিও দেখিতে পাওয়া যায়, 'শ' প্রায় নাই বলিলেই চলে। বানানে 'য' স্থানে 'জ'-এর ব্যবহার বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। এমন কি যুগ, যুবতী ইত্যাদি অতি সাধারণ কথায়ও। ং স্থানে ঙ ও 'য়াঁ' স্থানে এ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে।

যুক্ত অক্ষরকে পারতপক্ষে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, আবার অনেক স্থলে অযথা বহু জটিল যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যে সকল স্থলে সমঅক্ষরের যুক্তাক্ষর হওয়া উচিত, সে সকল স্থলে সাধারণত 'য'-ফলা বা 'ব'-ফলা দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে অন্ন স্থানে অর্ন বা অন্ত প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে। রেফের প্রাদুর্ভাব, যুক্তাক্ষরের সহিত, বিশেষ করিয়া উল্লিখিতরূপ যুক্তাক্ষরের সহিত, অতি অধিক। "ন্ম" বা ম্ম স্থলে ন্ধ লিখিত হইয়াছে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে সরল করিতে গিয়া 'চ্ছ' স্থানে 'ৎস' লিখিত হইয়াছে (যথা আচ্ছাদিয়া স্থলে আৎসাদিয়া)।

অনেকে হয়ত বলিবেন, এ সকল অতি সাধারণ ভুল। আজও নকলনবীশগণ বানান ঠিক রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন আমরা দেখি, সকলেরই এক প্রকার ভুল তখন কি আমরা উপরিউক্ত যুক্তি বলে ধরিয়া লইব যে, সকল নকলকারীই মূর্খ ছিল? আবার ইহাও দেখি যে, যে সকল পুঁথির বয়স দেড়শত-দুইশত বৎসরের বেশী নহে তাহাতে এই সকল বানানবিভ্রাট বেশী নহে। যে সকল বানানের কথা বলিলাম, উহা সত্যই অজ্ঞতাপ্রসূত অথবা তৎকালীন বাংলা বানানের কোন নিয়ম না থাকাজনিত তাহা কে বলিতে পারে! সকল নকলকারীই মূর্খ ছিল, এ অনুমান বোধ হয় অতি অসঙ্গত হইবে।

কিন্তু সে যাহাই হউক, আমরা দেখিতে পাই, যে কারণেই হউক, দেড়শত-দুইশত বৎসরের বেশী পুরাতন প্রাচীন পুথিতে এইরূপ বানান সর্ব্বত্র, সুতরাং এ সম্বন্ধে পুঁথিপাঠকারীগণের ওয়াকিবহাল থাকা উচিত।

বানানের প্রশ্ন হইতে আপাতত লিপিকৌশলের প্রসঙ্গে আসা যাউক। পুঁথির লিপি সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকিলে পুঁথি পাঠ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র; কেন না, বর্ত্তমানে ছাপার হরফ পাঠে অভ্যস্ত চোখ আমাদের পুঁথির হরফ পড়িতে গিয়া পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

প্রথমেই কয়েকটী সাধারণ অক্ষরের কথা ধরা যাউক:—

'ন' ও 'ল' এ তফাৎ বিন্দুমাত্রও নাই, অবশ্য সে বৈশিষ্ট্য এখনও প্রাচীনপন্থীদের হস্তলিপিতে দৃষ্ট হয়। এখনও বহু ব্যক্তি 'ন'-কারের নিম্নে বিন্দু প্রয়োগ করিয়া 'ল' লিখিয়া থাকেন—তফাৎ এই যে, পুঁথিতে এই বিন্দুটীও নাই, উহা বিসর্জ্জিত হইয়াছে এবং উহার ফলেই বহু বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

তারপর আর একটী বিভ্রাট ব ও র লইয়া। বহুস্থলে 'ব' ও 'র' পরস্পরের সহিত রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। কখনও 'ব'য়ের পেট কাটিয়া আবার কখনও বা 'ব'এর দক্ষিণ পার্শ্বে মাত্রার সমান্তরাল একটী রেখা টানিয়া 'র' বোঝান হইয়াছে (১নং চিত্র)। 'য' ও 'য়'-এও বিভ্রাট মন্দ নহে, তবে উহা বুঝা বিশেষ কষ্টসাধ্যও নহে। বাংলা পুঁথিতে 'ঙ' হইয়াছে সংখ্যাবাচক ২ চিহ্ন ও অনুস্বারের মাত্র বিন্দুটীই অবশিষ্ট আছে, পুচ্ছটী লোপ পাইয়াছে—ঠিক যে ভাবে দেবনাগরীতে অনুস্বার বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। দীর্ঘ উকারের উপরের আঁকড়ির লোপ ঘটিয়াছে। বহুস্থলে 'চ' ও 'ঠ'-এ পার্থক্য বোঝাই দায়। ড় ও ঢ়-এ যে বিন্দুর বালাই কুত্রাপি নাই একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

বর্ত্তমান বাংলায় 'ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত উ কারের তিনটী রূপ, একটী দেখি 'র'-এ উকারে (রু), আর একটী দেখি 'ত'-এ 'উ-'কারে (তু) ও অপরটী দেখিতে পাই সাধারণ ক্ষেত্রে (সু)। কিন্তু পুঁথির 'উ'-কার বিভিন্ন অক্ষরের সহিত যুক্ত হইবার সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া নিজের রূপ ত পরিবর্ত্তন করিয়াছেই, উপরন্তু যাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে তাহারও ভোল ফিরাইয়া দিয়াছে। কয়েকটী নমুনা দিতেছি। 'ক'-এ যুক্ত হইয়া কু আঁকড়িবিহীন দীর্ঘ 'ঈ' বা চন্দ্রবিন্দু-বিহীন 'ঙ্গ'-এ পরিণত হইয়াছে (২নং চিত্র)। আবার বহুস্থলে প্রায় এই ভাবেই 'দ'-এ 'দ'-এ লিখিত হইয়াছে। 'প'-এর সহিত যুক্ত হইয়া তাহার রূপের যে পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহা মুখে বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া আঁকিয়া দেখানই যুক্তিসঙ্গত ও সহজসাধ্য (৩নং চিত্র)। 'থ'-এর মাথায় একটী পাগড়ি বাঁধাইয়া (৪নং চিত্র) 'থু' করা হইয়াছে। 'ভ'-এর সহিত উ-কার যুক্ত হইয়া অসহায় 'ভ'-কে চতুষ্কোণ করিয়া ফেলিয়াছে,তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই; একটী দীর্ঘলাঙ্গুল সংযোগ করিয়াছে (৫নং চিত্র)। একটী স্থলে দুইটী 'পুঁটুলির' বোঝা বহিয়া 'ম' উকারের সম্মান রাখিয়াছে (৬নং চিত্র) যেন 'ম'-এ 'ভ'-এর শেষাংশের আঁকড়িটুকু মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। নির্ব্বোধ 'ষ' 'উ-কারের চাপে 'হ'-এ 'ব'-এ হইয়া গিয়াছে (৭নং চিত্র)।'

ঋকারের বিভ্রাটও বড় কম নয়। 'ক'-এ ঋফলাযুক্ত হইয়া বাংলা 'ক'-এর রূপ হইয়াছে প্রায় তেলেগু 'ক-'এর মতই। যেন একটী উল্টা ইংরেজী 'এস্' অক্ষরে ঋকার-জ্ঞাপক বা 'র'-এ 'উ'-কারের 'উ'-কারজ্ঞাপক চিহ্নটী বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে (৮ ও ৯নং চিত্র)। হৃ লিখিতে গিয়াও বিপদ বড় কম নহে, সর্ব্বত্রই 'দ'-এ র-ফলা লিখিয়া তাহাতে 'ই'-কার (দ্রি) ও 'হ'-এ ঋ-ফলার ঋ-কার বা 'রূ'-র 'উ'-কারজ্ঞাপক চিহ্ন যোগ করিয়া হৃ লিখিত হইয়াছে (১০নং চিত্র) এবং 'হৃ' বুঝাইতে উহার 'ই'-কারটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছে (১১ নং চিত্র)। অর্থাৎ হৃ লিখিতে পুঁথির 'হ'-এ 'র'-ফলায় 'ই'-কার যোগ করা হইয়াছে এবং সেই 'হ'-এ 'র'-ফলা হইতেছে 'দ'-এ 'র'-ফলায় 'উ'কার বা 'দ'-এ 'র'-ফলায় 'ঋ'-ফলা। পুঁথিতে বহুস্থলে 'বেরুল' বা বাহির হইল স্থলে বাহ্রাল লিখিত হইয়াছে, যথা— "নাসাপথে বরাহ বাহ্রাল আচম্বিতে।" এক্ষণে চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, পুঁথির লিপি অনুসারে লিখিলে এই 'বাহ্রাল'র কি রূপ দাঁড়ায়। 'ব' 'র'-এর আকারে, 'হৃ' যেরূপ বলিলাম সেইরূপে ও 'ল'টী দন্ত ন রূপে লিখিত হইয়া 'বাহ্রাল হইল "রাদ্র্যান" গোছের। ঠিক 'রাদ্র্যান'ও নহে, হইল 'র'-এ আকার, 'দ'-এ র-ফলা ঋ-ফলা য-ফলা আকার ও ন (১২ নং চিত্র)।

সামান্য স্বরবর্ণ সংযোগের ফলেই এত বৈচিত্র্য, এবার ব্যঞ্জনবর্ণ যোজনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। দেখিতে পাইব পুঁথির লিপি কত ভিন্ন।

সম অক্ষরের দ্বিত্ব (যথা—অন্ন, পট্ট) জ্ঞাপন করিতে 'ঞ'-তে 'এ'-র পরের চিহ্নটুকুর সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া মূল একক অক্ষরটীর পার্শ্বে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে (১৩নং চিত্র)। দু-এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে—'ন্ন' লিখিতে গিয়া 'ন'-কারে দীর্ঘ উ-কারজ্ঞাপক চিহ্নের সংযোজন ঘটিয়াছে (১৪ নং চিত্র)।

য-ফলা লিখিতে হাঙ্গামা বিশেষ কিছুই নাই, সামান্য গোল বাধাইয়াছে চতুর্থ বর্গের প্রথম ও চতুর্থ অক্ষরটী। 'ত'-এ 'য'-ফলার আকার অনেকটা '৯'-র ন্যায়, তবে পার্থক্য এই যে প্রথমোক্তের শেষাংশ সরল, উহা মাত্রা উঁচাইয়া যায় নাই (১৫নং চিত্র); এটী লেখার টানেই ঘটিয়াছে, ও বিশেষ কিছুই নয়। আসল হইতেছে 'ধ্য'-র সময়ে। 'ধ'-এ 'য'-যুক্ত হইয়া যুগ্ম অক্ষরটীর আকার হইয়াছে যেন 'ঘ'-এ ৮ যুক্ত হইয়াছে (১৬ নং চিত্র)।

'য'-ফলার ব্যাপার অল্পে শেষ হইলেও 'র'-ফলা কিন্তু এত অল্পে নিষ্কৃতি দেয় নাই। 'প'-এর যুক্ত হইয়া রূপ হইয়াছে অপরূপ ও 'স'-এর সহিত যুক্ত হইয়া হইয়াছে বিশ্রী। পরস্পরের সংযোগের ফল যা দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতা এ অধমের নাই, চিত্রকরের সাহায্য লইলেই ভাল হয় (১৭ ও ১৮নং চিত্র)।

সংযুক্ত বর্ণ লিখিতে বহু স্থলে এইরূপ জটিলতার সৃষ্টি করা হইয়াছে।—'ণ'-এ 'ঠ'-এ (১৯নং চিত্র) বোঝা বিশেষ কষ্টকর না হইলেও দ-এ ধ-এ, 'ঞ'-য় 'জ'-এ ইত্যাদি যুক্তাক্ষর বোঝা বিশেষ আয়াসসাধ্য। বহু স্থলে 'দ্ব' লিখিত হইয়াছে হৃ লিখিয়া (২০নং চিত্র)। 'জ' টানের দোষে কখনও হইয়াছে ৫, কখনও হইয়াছে 'দ'-এর সামিল (২১নং চিত্র)।

প্রবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, বলিবার বিষয় বহু থাকিলেও ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় এখানেই সমাপ্ত করা ভাল, সুতরাং অতি সামান্য দু-চারিটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পুঁথি পড়িবার সময় ইহার বানান ও লিপি-কৌশলের কথা অতি সাবধানে মনে রাখিতে হইবে, নচেৎ বহু স্থলে ত পাঠ করিতেই পারিবে না। আবার যে সকল স্থলে উহা সম্ভব হইবে, সেস্থানে যে-কোন মুহূর্ত্তে লুচি হইবে হুচি, সুন হইবে থন, রাবণ হইবে বারণ, কুম্ভ হইবে কুর্ম্ম; অকুল হইবে অঙ্গন, পঞ্চানন হইবে পঞ্চানল ইত্যাদি। এবং এইরূপ পাঠ-বিভ্রাটের ফলে "গৌরী সেথা তপ করে জ্বালিয়া পঞ্চানল" স্থলে হইবে "গৌরী সেথা তপ করে জ্বালিয়া পঞ্চানন", অর্থাৎ—যে পঞ্চাননের তুষ্টি বিধানার্থে গৌরীর তপস্যা, পুঁথি-পাঠকারীর অতি সাধারণ ভুলের জন্য গৌরী সেই পঞ্চাননকেই পোড়াইয়া মারিবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

পঙ্গপাল

মানুষের শত্রু অনেক। আজ সারা পৃথিবীর নরনারী যে যুদ্ধের বিভীষিকার কথা কাগজে পড়ে আতঙ্কিত হ'য়ে পড়ছেন সে-যুদ্ধ এক সভ্য জাতির সহিত অপর এক সভ্য জাতির।

এইভাবে মানবকে নিজের আধিপত্য বজায় রেখে জীবন ধারণ করতে কেবল যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে হ'য়েছে এমন নয়। মানবের বুদ্ধি এবং শক্তির তুলনায় অতি নিকৃষ্ট এইরূপ বহু ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের সঙ্গেও তাদের যুদ্ধ সংঘটিত হ'য়েছে। এবং বেশীর ভাগ সময়ে শ্রেষ্ঠজীব মানব পরাজয় স্বীকার ক'রেছে।

কীটপতঙ্গের মধ্যে মানবের সবচেয়ে পুরাতন শত্রু পঙ্গপাল। এই পঙ্গপাল যে মানবের কিরূপ ক্ষতিকারক তা পুরাতন বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কোন স্মরণাতীত যুগ থেকে মানব এই পঙ্গপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে আসছে কিন্তু এখনও বর্ত্তমান বিজ্ঞান সভ্যতার যুগেও ইহাদের আক্রমণে পৃথিবীর বেশীর ভাগ অংশের কৃষিকার্য্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। সহস্র সহস্র বৎসরের মেলামেশার পরও ইহাদের জীবন-ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায় এখনও আমাদের নিকট রহস্যাবৃত।

স্ত্রী-পঙ্গপাল মাটির নীচে প্রায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি গর্ত্ত খনন ক'রে তার মধ্যে ডিম রাখছে; ডিমগুলি গর্ত্তের তলদেশ হ'তে লম্বা নলের ন্যায় স্তূপাকারে সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে

পঙ্গপালের অত্যধিক বংশ বিস্তারে এবং ক্ষতির পরিমাণ অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধি হওয়ায় ইহাদের বিনাশের নিমিত্ত দেশবাসীর সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন হয়। সেইহেতু এই পঙ্গপাল পতঙ্গের বিরুদ্ধে কয়েকটি দেশ সমবেত হ'য়ে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছিল। ফ্রান্স, ইটালী এবং গ্রেটবৃটেন এই তিনটি দেশের আন্তরিক চেষ্টায় লণ্ডন সহরে পঙ্গপাল পতঙ্গ-নিবারণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং উক্ত সঙ্ঘের প্রায় ষাটটি বৃটিশ উপনিবেশ এবং পঁচিশটি বৈদেশিক শাখা-সঙ্ঘ থেকে পঙ্গপাল সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ বিবরণী সংগ্রহ করে।

ইহাদের জন্মস্থান, ভ্রমণ-পথ এবং এই সকল দৈব-দুর্ব্বিপাকের কারণ কি তা অনুসন্ধানের নিমিত্ত ঐ সকল বিভিন্ন প্রদেশের বিবরণগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন দেশের সহিত উহাদের কিরূপ সম্বন্ধ তা আলোচিত হয়।

পঙ্গপাল নির্দ্দিষ্ট কোন সীমানার মধ্যে অবস্থান করে না; একবার আকাশ-পথে ভ্রমণ আরম্ভ ক'রলে কোথায় এবং কখন যে ইহারা তাদের ভ্রমণ হ'তে বিরত হবে তা আজও বিশেষজ্ঞরা নির্দ্ধারণ ক'রতে পারেন না। পথমধ্যে সবুজ শস্যের বংশ লোপ করবার পূর্ব্বে ইহারা শত শত মাইল উড়িয়া চলে।

আফ্রিকা এবং এসিয়ার প্রায় ত্রিশ কোটী বর্গমাইল শস্যপূর্ণ ভূখণ্ড পঙ্গপালের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ১৯৩০ সালের বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে অত্যধিক পঙ্গপালের আগমনে প্যালেষ্টাইন গভর্ণমেণ্টকে ৫০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতি স্বীকার

ক'রতে হয়। ঐ সময় শস্যক্ষেত্র রক্ষার জন্য পঙ্গপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে প্রায় ৭৫,০০০ হাজার লোক নিযুক্ত হ'য়েছিল।

ইহার পূর্ব্ব বৎসরে এই পঙ্গপালের আক্রমণের ফলে কেনিয়া গভর্ণমেণ্ট ৮০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করে। এবং এই দৈব-দুর্ব্বিপাকের ফলে সহস্র সহস্র নরনারী অনাহারে প্রাণ দেয়।

আর এক প্রদেশে প্রায় ১,৩০,০০০অধিবাসী খাদ্যাভাবে পড়ে। ফলে সেই প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট পাঁচ মাসকাল উহাদের খাদ্য দানে সাহায্য ক'রতে বাধ্য হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঈজিপ্ট, সুদান, টাঙ্গানিকা, উগাণ্ডা এবং ট্রান্সভাল প্রভৃতি দেশগুলি পঙ্গপালের অত্যাচারে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাছাড়া, আফ্রিকা ও যুক্তপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলেও ইহাদের অভিযান সুরু হ'য়েছিল।
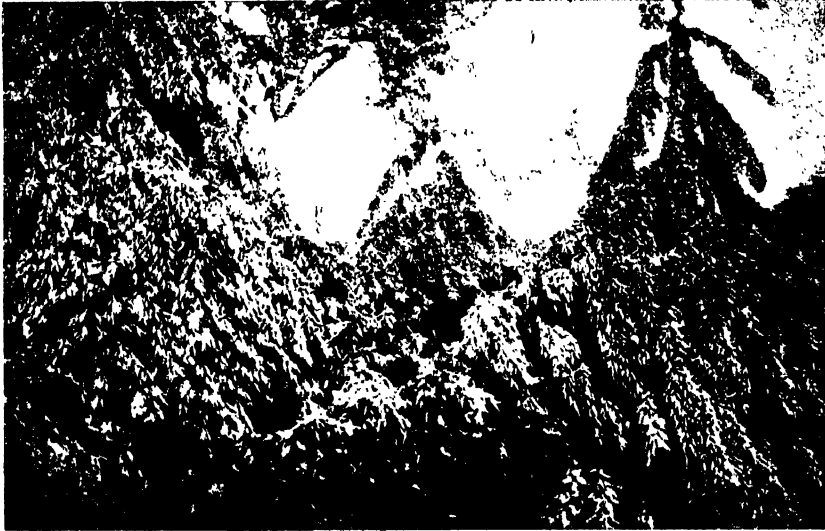
পঙ্গপালের বিচিত্র সমাবেশ

দক্ষিণ দাকোতার ১৬০০ একর শস্যপূর্ণভূমিকে বিধ্বস্ত ক'রতে পঙ্গপালের মাত্র কয়েকমিনিট সময় লেগেছিল। ইহাতে সেখানকার অধিবাসীদের বিশেষ ক্ষতি হয়; কংগ্রেস এই পতঙ্গশ্রেণীর বংশ ধ্বংস ক'রতে এক কোটী টাকা ঐ সময়ে সাহায্য করে।

পঙ্গপালের বংশ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বিশেষজ্ঞ Mr. H. J. Shepstone, F. R. G. S বলেন, মাত্র একটি জীবিত পতঙ্গ বংশ-বিস্তার ক'রে ইংলণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর দেশকে পূর্ণ ক'রতে পারে।

সবচেয়ে অসুবিধা এই যে, ইহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বলক্ষণ কেহ অনুমান ক'রতেও পারে না।

ইহাদের আবির্ভাব হয় অকস্মাৎ। আকাশে প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং সময়ে সময়ে ঝড়ের ন্যায় শব্দ শুনা যায়। সংখ্যায় ইহারা এত অধিক থাকে যে, সূর্য্যকেও ঢাকিয়া ফেলে। উপযুক্ত স্থান বুঝিলে নীচে নামে এবং কুয়াশার ন্যায় ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে নিজেদের বিস্তার ক'রে ফেলে।

বাইবেলের যুগ থেকে প্যালেষ্টাইনে পঙ্গপালের অভিযান চলে আসছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের অভিযানে প্যালেষ্টাইনে কিরূপ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছিল তা সেখানের অধিবাসীরা এখনও ভুলতে পারেনি।

কয়েকবার দৈবকৃপায় সেখানকার অধিবাসীরা ইহাদের কবল হ'তে রক্ষা পায়। একবার জেরুজেলামে পঙ্গপালের মেঘ দেখা গেল। সংখ্যায় অধিক থাকায় সূর্য্যদেবকেও আবৃত ক'রেছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ পবিত্র নগরে পদার্পণ করে নি। সহস্র সহস্র নরনারীর ভয়-বিহ্বল দৃষ্টির উপর দিয়ে সেই বিরাট সৈন্যবাহিনী কোন দূর দেশের সন্ধানে চলে গেল। আর একবার জাফাতে কোটী কোটী পঙ্গপাল অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকা এবং বৃষ্টির প্রকোপে সমুদ্র বক্ষে নিমজ্জিত হয়। পরে সেই সকল মৃত পঙ্গপালের স্তূপ সমুদ্রতটে উপস্থিত হ'লে সেখানকার অধিবাসীরা তা সংগ্রহ ক'রে জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করে।

শস্য রক্ষার জন্য কৃষকেরা সমবেত হ'য়ে ওদেশে সহস্র সহস্র টন্ পঙ্গপাল হত্যা করে। এই কার্য্যে তারা গভর্ণমেণ্টের কিছু কিছু সাহায্যও পায়। কিন্তু সকল প্রকার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও ইহাদের দ্বারা যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তা অপূরণীয়।

কোন স্থান পরিত্যাগ করবার পূর্ব্বে পঙ্গপাল ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে ডিম প্রসব করে। জর্ডন নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে, লবণ সমুদ্রের পার্শ্বস্থ জলাভূমিতে, সুউচ্চ পর্ব্বতে, উপত্যকায়, মনোরম অলিভ্ কুঞ্জে, টায়ার, সিডোন ও গাজার সমুদ্রতটে—ডান থেকে বিয়ারসেবারের সর্ব্বত্রই পঙ্গপাল তাদের বংশ বিস্তারের নিমিত্ত ডিম প্রসব করে। প্রত্যেক স্ত্রী-পঙ্গপাল একশত ডিম প্রসব ক'রতে পারে।
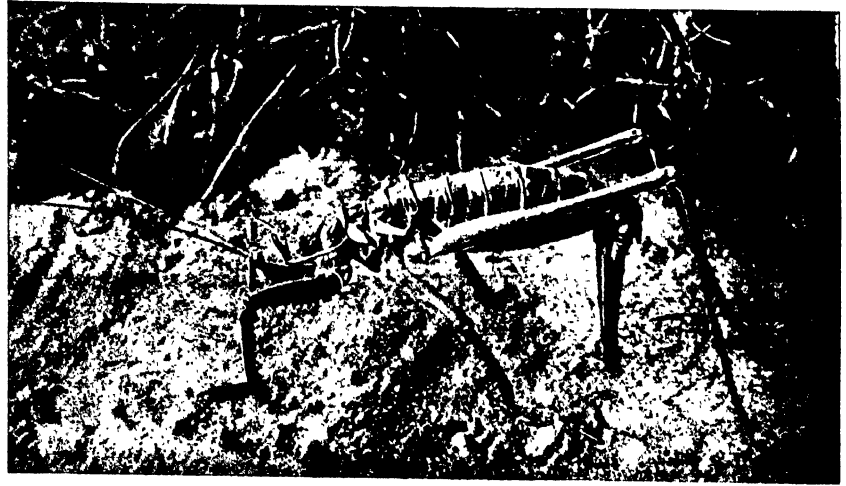
"Horse-headed" পঙ্গপাল কঠিন মাটির উপর অণ্ড-যোনি সাহায্য কিরূপভাবে গর্ত্ত তৈয়ার ক'রছে

বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, এক বর্গ গজ পরিমিত ভূখণ্ডে কখন কখনও ৭৫,০০০ ডিম অবস্থান করে। তাঁদের মতে, যদি তা দেবার সময় শতকরা ত্রিশটি ডিম নষ্ট হয় তাহ'লে ছত্রিশ বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থান হ'তে ৫০,০০০ হাজার পঙ্গপালের বংশধর জন্মলাভ ক'রবে। ডিম প্রসব করবার পূর্ব্বে স্ত্রী-পঙ্গপাল অণ্ড-যোনি সাহায্যে মাটির মধ্যে প্রায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত খনন ক'রে তার মধ্যে ডিম রাখে। ডিমগুলি গর্ত্তের তলদেশ হ'তে লম্বা নলের ন্যায় স্তূপাকারে সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে। এইরূপ ক্ষুদ্র পতঙ্গ কি অদ্ভুত কৌশলে কঠিন ভূখণ্ডে গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে তা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। ডিম প্রসবের পর স্ত্রী-পঙ্গপালের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। ডিমে তা দেবার ভার তারা প্রকৃতি দেবীর হস্তে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা মৃত্যু-বরণ করে।

পূর্ণ-বয়স্ক পঙ্গপাল ও তাহাদের ডিম

ভূমিকর্ষণ ক'রে ইহাদের ডিমগুলিকে ধ্বংস করা হয়। ইহাই একমাত্র কার্য্যকরী উপায়। একবার ডিমগুলি বাতাসের সংমিশ্রণে এলে তা থেকে আর নূতন পঙ্গপালের জন্মলাভ সম্ভব হয় না।

ইহাদের কবল হ'তে শস্য রক্ষার জন্য কৃষকেরা শত শত একর ডিমপূর্ণ ভূমি কর্ষণ ক'রেছে আর এইরূপ কার্য্যের জন্য সহস্র সহস্র কৃষকের শক্তি নিয়োজিত হ'য়েছে। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে তারা ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা ভেবে কাজ করে। ফলে অসংখ্য পঙ্গপালের ডিম বিনষ্ট হয়।

প্রথম অবস্থায় ডিমগুলি কাল, ডানাবিহীন বড় পিপীলিকার মত। কিন্তু ক্রমঃ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত ক'রে পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রধানতঃ এই তিনটি অবস্থা উল্লেখযোগ্য :—

(১) অণ্ড-নির্ম্মুক্ত কীট অর্থাৎ ডানাবিহীন অবস্থা, (২) পতঙ্গগুটি—ছোট ডানাযুক্ত অবস্থা এবং শেষ (৩) পূর্ণ-পতঙ্গ অবস্থা।

পতঙ্গ গুটি অবস্থায় ইহাদের নিঃসন্দেহে 'Hoppers' বলে অভিহিত করা চলে। এবং এই অবস্থায় চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণে যেরূপ শস্যের ক্ষতি করে তার পরিমাণ অনেক
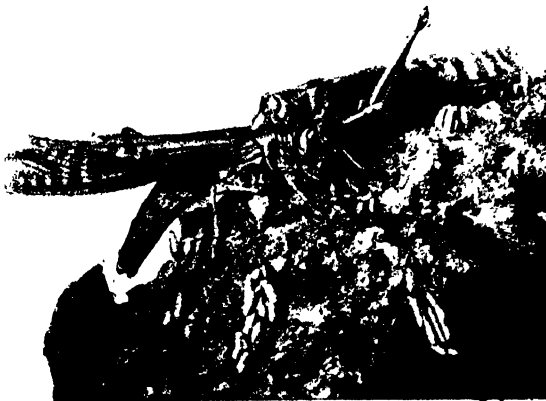
সময় বিশ্বাসযোগ্য বলে কেউ মনে ক'রতে পারে না। পূর্ণ পতঙ্গ অবস্থায় পরিণত হবার পর প্রথমে প্রতিদিন একত্রে ৪০০।৫০০ ফিট পথ হাঁটিয়া চলে এবং ইহাদের সংখ্যাধিক্যে রাস্তাঘাট এরূপ পিচ্ছিল হয় যে, ঘোড়ার খুর কদাচিৎ পা ঠিক রেখে চলতে পারে। এমন কি, এরূপ সংবাদও বহুবার পাওয়া গেছে যে, পঙ্গপালের স্তূপ রেলপথের উপর এসে পড়ায় কয়েক ঘণ্টাকাল রেল চলাচল বন্ধ থাকে।

ফাঁদ পেতে পঙ্গপাল ধরবার কৌশলও আছে। পতঙ্গগুটি অবস্থায় ইহাদের ছোট ডানার আবির্ভাব হ'লেও উড়তে সক্ষম হয় না। এই অবস্থাতেই পঙ্গপালকে ফাঁদে ধরা যায়। একবার পূর্ণঅবস্থাপ্রাপ্ত হ'লে এইরূপ কৌশল অচল হ'য়ে পড়ে।

পঙ্গপাল বিনাশের ফাঁদ

প্রথমে পতঙ্গগুটির ভ্রমণ-পথে মাটির নীচে খুব বড় এক গর্ত্ত তৈয়ার করা হয়। গর্ত্তের চারিপাশ আবার মসৃণ টিন দ্বারা আবৃত থাকে। ফলে ভূগর্ভস্থ নীত পতঙ্গ উপরে উঠতে পারে না। গর্ত্তের উপরিভাগের চারিপাশের মাটিও মসৃণ টিন দ্বারা আবৃত রাখা হয়।

ইহার পর মাটির উপর এক বৃহৎ পতাকার ছায়া ফেলে সুকৌশলে পতঙ্গগুটিদের গর্ত্তের মধ্যে আনা হয়। গর্ত্তটী পূর্ণ হ'লে অগ্নিসংযোগে সেই সকল ধৃত পতঙ্গগুটিকে হত্যা করা হয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন কৌশলও আবিষ্কার হ'য়েছে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গদের ফাঁদে ধরা সহজ নয়। এরোপ্লেন সাহায্যে উড্ডীয়মান পঙ্গপালকে অনুসরণ ক'রে বায়ুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত বিষাক্ত জলবিন্দু সিঞ্চনে তাহাদের ধ্বংস করবার কৌশলও আবিষ্কার হ'য়েছে। একবার নেব্রাসকায় এক বৃহৎ পঙ্গপালবাহিনীকে অনুসরণ করা হয়। কিন্তু যন্ত্র বিকল হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত নিরাশ হ'য়ে এরোপ্লেনটি নীচে নেমে আসতে বাধ্য হয়। পরীক্ষার পর দেখা গেল এরোপ্লেনের রেডিয়েটার পতঙ্গের স্তূপে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হ'য়েছে।

পঙ্গপালের মুখ হ'তে একপ্রকার গাঢ় লালা নিঃসৃত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে উক্ত লালা যন্ত্রণাদায়ক।

সাধারণের বিশ্বাস ইহারা নিরামিষভোজী। কিন্তু তাহা নহে। সঙ্গীরা দৈবক্রমে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লে অন্যেরা সেই সুযোগে তৎপরতার সহিত তাদের হত্যা ক'রে ভক্ষণ করে। এমন কি, ইহারা সময়ে সময়ে মৌচাকে প্রবেশ ক'রে মধু ও মৌমাছি উভয়কেই খেয়ে ফেলে। সুযোগ পেলে ইন্দুর প্রভৃতির ন্যায় ছোট জীবকেও আক্রমণ ক'রে ভক্ষণ ক'রতে এদের একটুও বাধে না।
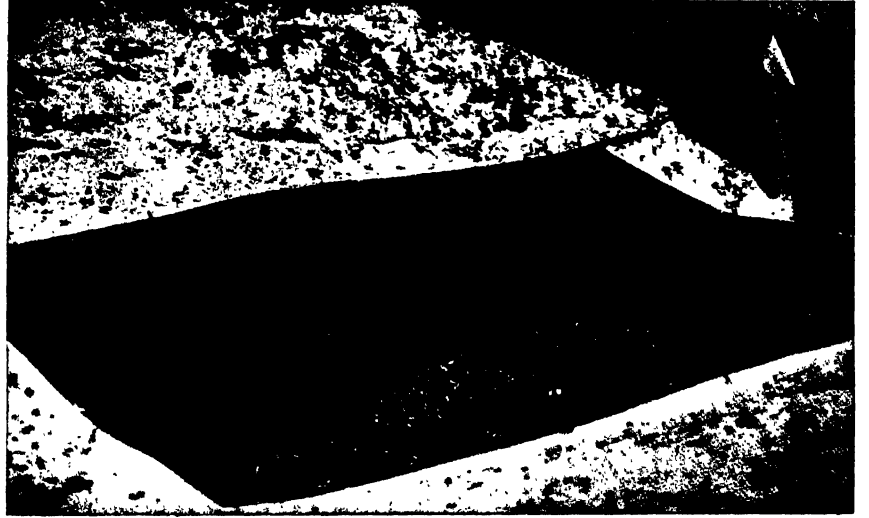
পঙ্গপালের ইন্দুর শিকার

বর্ত্তমানে বিশেষজ্ঞগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে

ইহাদের উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় ক'রতে বিশেষ উদ্বিগ্ন। তাঁদের এইরূপ বিশ্বাস, যে পঙ্গপালবাহিনী প্যালেষ্টাইন এবং সিনায়িতে অভিযান ক'রেছিল তারা মধ্য-আরব এবং সুদানের মরুময়প্রদেশ হ'তে আগত। অনুর্ব্বর জন্মভূমিতে তাদের সংখ্যাধিক্য হ'লেই তারা দেশান্তরে গমন ক'রতে বাধ্য হয়।

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ও ট্রান্সভালের পঙ্গপালদের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা চলে না। পূর্ব্ব-আফ্রিকার সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র মাইল প্রায় দশ ফিট লম্বা ঘাসে পূর্ণ। এইখানে পঙ্গপাল নিরাপদে ডিম প্রসব করে এবং বংশ বিস্তার হ'লে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে পররাজ্য লুণ্ঠনে অগ্রসর হয়।

তুরস্কের নবজন্ম

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

ইউরোপের মহাযুদ্ধ এগিয়ে চলেছে নিতান্ত শ্লথগতিতে। আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি কোনো পক্ষেই নেই; স্থলেজলে অন্তরীক্ষে সর্বত্রই সংগ্রাম চলেছে অল্পবিস্তর; কিন্তু এখনও পর্যন্ত আগুনের চেয়ে ধোঁয়ার উৎপাতই বেশী। আপাতত যা চলেছে সে সমস্তই ব্যাপক অভিযানের উপক্রমণিকা মাত্র। সমুদ্রে তবু ডুবোজাহাজের অত্যাচারে কিছু কমব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে;—কিন্তু পশ্চিম সীমান্ত আজও প্রশান্ত। মাঝে মাঝে কামানের হুঙ্কার সেখানকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেও সেখানে সৈন্য-সমাবেশ হয়েছে এই মাত্র—যুদ্ধ এখনও সুরু হয়-নি। বর্মাবৃত কূর্মের মতো দুর্ভেদ্য 'মাজিনো লাইন' এবং 'সীগ্‌ফ্রিড শিবিরের' অন্তরালে আত্মগোপন করে দুই বাহিনী তাদের সীমান্তপ্রদেশ সুরক্ষিত করছে এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ব্যাপক অভিযানের প্রতীক্ষায়।

আপাতত উদ্যোগ-পর্বের যে অধ্যায় চল্‌ছে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে, 'মিত্রভেদ এবং মিত্রপ্রাপ্তি'। হিতোপদেশের যুগ থেকে এটি সর্বদেশে কূটনীতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে মিত্র-নির্বাচনে বিচক্ষণ-তার ওপর,—বিশেষত, সঙ্কটকালে। বাস্তবিক, শক্তিশালী মিত্রের সহায়তা পাওয়া এবং শত্রুর সঙ্গে তার মিত্রদের মনান্তর ঘটান মানেই বিনা-লোক-ক্ষয়ে সংগ্রামক্ষেত্রে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়া। এ সত্য উপলব্ধি ক'রে বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন রাষ্ট্র অন্যান্য শক্তির সঙ্গে মিতালী পাতাবার চেষ্টায় মন দিয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সম-স্বার্থ-বিশিষ্ট এবং একমতাবলম্বী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক একটি মিলনী গড়ে উঠ্‌ছিল। এই নীতির অনুসরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিক কালে বল্‌কান আঁতাৎ এবং রোম-বার্লিন এক্সিস্ প্রভৃতি। এই সব চুক্তির উদ্দেশ্য মুখ্যত পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরের অধিকার এবং স্বার্থ অটুট রাখা।

কিন্তু সহসা ধূমকেতুর মতো ইউরোপের রাষ্ট্রীয়-গগনে আবির্ভূত হয়ে সমস্ত ওলট পালট করে দিল সোভিয়েট রুশিয়া। রুশ-জার্মান মিতালীর ফলে কোমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তির হলো অবসান - রোম-বার্লিন মৈত্রী হলো নিস্তেজ— এবং মিত্র-শক্তিবর্গ হলো আতঙ্কিত। জার্মানীর মুখের গ্রাস পোল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলে অধিকার বিস্তার ক'রে রুশিয়া ক্ষিপ্র-গতিতে তার রক্ত-পতাকা প্রোথিত করলে বাল্‌টিক অঞ্চলে। স্বল্পায়তন বাল্টিক রাষ্ট্র তিনটি—লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং এস্থোনিয়া মেনে নিল সোভিয়েটের দাবী এবং তার সঙ্গে হলো পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। সোভিয়েট দিলো তাদের অভয়; ফলে জার্মানীর Drang nach Osten (প্রাচ্য অভিযান) নীতি পেলো বাধা। তারপর যখন ফিনল্যাণ্ড্ (১২ই অক্টোবর) এবং তুরস্কের (১৩ই অক্টোবর) সঙ্গে সুরু হলো মিতালী-স্থাপনের জন্য আলাপনী তখন মনে করা গেলো পূর্বাঞ্চলে, উত্তর মহাসমুদ্র থেকে ভূমধ্য-সাগর পর্যন্ত রুশিয়া এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করছে যা প্রশমিত করবে জার্মানীর দুরাকাঙ্ক্ষা। এতে মিত্রশক্তিবর্গের লাভ বই ক্ষতি নেই—যতদিন পর্যন্ত সোভিয়েট থাকবে নিরপেক্ষ।

কিন্তু রুশিয়া যদি জার্মানীর পক্ষে সমরে অবতীর্ণ হয় তা হ'লে বাল্‌টিক এবং বল্‌কান অঞ্চলে তার প্রাধান্য মিত্রশক্তির উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ ক'রে তুরস্কের সহায়তায় যদি রুশিয়া দার্দানেলিস্‌ প্রণালী অবরুদ্ধ করতে পারে তাহ'লে বৃটেনের সমূহ ক্ষতি। কাযেই তুরস্কে রুশিয়ার প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা বৃটেন এবং ফ্রান্সের উদ্বেগের সঞ্চার করলো।

কিন্তু তুরস্কের বৈদেশিক নীতি এবার মিত্রশক্তিপুঞ্জকে অকারণ উদ্বেগের হাত থেকে রক্ষা করলে। তুরস্কের পররাষ্ট্র-সচিব সারা জোগ্‌লু গিয়েছিলেন রুশিয়ায়, তুরস্কের তরফ থেকে সোভিয়েটের সঙ্গে আলোচনা চালাতে;—১৮ই অক্টোবর তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন মস্কো থেকে নতুন কোনো চুক্তি না ক'রে; এবং পরের দিন (১৯শে অক্টোবর) আংকারাতে বৃটেন, ফ্রান্স এবং তুরস্কের মধ্যে এক পারস্পরিক সহায়তার চুক্তি সম্পাদিত হলো। এই চুক্তি নিষ্পন্ন ক'রে তুরস্ক গণতন্ত্রাবলম্বী রাষ্ট্রগুলির মিত্র বলে গণ্য হলো এবং ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আসরে তার আসন হলো সুপ্রতিষ্ঠিত। বিগত মহাসমরের পর ইউরোপে তুর্কীদের প্রাধান্য লোপ পায়—সেখানে তার পূর্বকালীয় গৌরব এতকাল বিলুপ্ত হয়েছিল। এতদিনে এই যুদ্ধের সুযোগে তুর্কী তার পুরাতন মর্যাদা কতকটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছে।

গত মহাযুদ্ধে তুরস্ক নিয়েছিল পরাজিত জার্মানীর পক্ষ। সুতরাং সমরাবসানে তাকে অনেকটা লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল বিজেতাদের হাতে। তার দুর্গতি চরম-সীমায় উপনীত হয়েছিল মহাসমরের শেষের দিকে; যার ফলে তুরস্কের বহু-শতাব্দী-খ্যাত অটোমান সাম্রাজ্যের হলো পতন। অটোমান সাম্রাজ্য এককালে সুবিস্তীর্ণ থাকলেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তার আয়তন ছিল পূর্বের তুলনায় নিতান্তই সংক্ষিপ্ত; তারও সমাধি হলো সেভ্‌রের সন্ধিপত্রের (Treaty of Sevres) সঙ্গে ১৯২০ সালে। এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী তুরস্ক ইউরোপের প্রত্যন্ত স্পর্শ করে রইলো মাত্র—তার সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলে কতক অংশ বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হোলো গ্রীসকে এবং সেই চিতাস্তূপের ওপর কয়েকটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন ক'রে অধিকাংশের কর্তৃত্ব এবং অভিভাবকত্ব দেওয়া হোলো ফ্রান্স এবং বৃটেনকে।

ইস্তাম্বুলে সুলতান এ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেও এঙ্গোরাতে জাতীয় পরিষদ একে অস্বীকার করলে। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে তখন এক নতুন জাতীয় দলের অভ্যুত্থান হোলো এবং তুর্কীবাহিনী ফরাসী এবং ইতালীয়ানদের হটিয়ে দিলে দক্ষিণ আনাতোলিয়া এবং সিলিসিয়া থেকে। তারপর ১৯২২ সালে তুর্কীরা গ্রীকদের এশিয়া মাইনর থেকে উচ্ছেদ ক'রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত করলে। সেভ্‌রে সন্ধির ফলে বৃটেনের লাভই হয় বেশী, ফলে তা ফ্রান্স এবং ইতালীতে ঈর্ষার সঞ্চার করে। এ কারণে মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে একযোগে কামালকে বাধা দেওয়া ঘটে ওঠে নি। তুর্কী-বাহিনীর অগ্রগতি এর ফলে হোলো অপ্রতিহত। কামালের অধিনায়কত্বে তুরস্কের হলো পুনর্জন্ম। তার জরাজীর্ণ প্রাচীন-পন্থী সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলো কামালপন্থী নব্য তুর্কীর হাতে। ১৯২২ সালেই সুলতান হলেন পদচ্যুত এবং তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত হলো অভাবনীয়ভাবে সাধারণতন্ত্র। কামাল হলেন সার্বভৌম রাষ্ট্রনায়ক। তারপর তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি যে ভাবে তুরস্কের সংস্কার সাধন করেছেন তার তুলনা ইতিহাসে আর মেলে কি-না সন্দেহ। তাঁর নেতৃত্বে তুরস্ক পাঁচশত বৎসরের পথ অতিক্রম করেছে পনের বৎসরে এবং মধ্যযুগীয় অন্ধকার পার হয়ে সে এসে পড়েছে আলোকোদ্ভাসিত বিংশ-শতাব্দীতে। তাঁর সহকর্মী এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি ইস্‌মেত ইনোনুও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছেন।

কামাল আতাতুর্কের বিজয় অভিযান সেভ্‌রে-সন্ধিপত্র পরিকল্পিত ব্যবস্থা উল্‌টে দিল। অদূর প্রাচ্যে এর ফলে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো—যা স্বীকৃত হলো লোসান সন্ধিতে (Treaty of Lausanne) ১৯২৩ সালে। গ্রীসকে স্মার্না, থ্রেস এবং গ্যালিপলি প্রত্যর্পণ করতে হলো তুরস্ককে; উপরন্তু ডোডোকেনিস দ্বীপমালা ছেড়ে দিতে হলো ইতালীকে। তবে হেজাজ, প্যালেস্টাইন, ট্রান্স-জর্ডন প্রদেশ, ইরাক এবং সিরিয়ার ওপর দাবী তুরস্ক ছেড়ে দিলে; তার আয়তন পূর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হ'লেও সীমারেখা হলো কতকটা সুনির্দিষ্ট এবং সে পেলো আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। মোটামুটি, লোসান সন্ধি তুরস্কের মর্যাদা খানিকটা বৃদ্ধি করলে এবং এতে তার লাভই হলো বেশী যদি চ তার অসন্তোষের কারণও কিছু কিছু বর্তমান রইলো।

তুরস্কের ভৌগোলিক অবস্থান রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে তার প্রতিপত্তি অনেকটা বাড়িয়েছে। তুরস্ক ইউরোপকে যুক্ত করেছে এশিয়ার সঙ্গে। কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ মর্মর সাগর, এবং দার্দানেলিস ও বসফোরাস প্রণালীর অবস্থান হচ্ছে তুরস্ক অধিকৃত ভূখণ্ডের মধ্যে। রুশিয়া এবং বল্‌কান উপদ্বীপ থেকে ভূমধ্য সাগরে আস্‌তে হলে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই; অথচ লোসান চুক্তি অনুসারে এগুলির ওপর তুর্কীর কোনো কর্তৃত্ব রইলো না। এগুলি রইল অরক্ষিত এবং সর্বজাতি পেলো সেখানে যাবার অবাধ অধিকার। তুরস্কের দিক থেকে এ ব্যবস্থা কখনই ন্যায়সঙ্গত ঠেক্‌তে পারে না; কিন্তু কতকটা নিরুপায় হয়েই তাকে এ ব্যবস্থায় সায় দিতে হয়।

কামাল-পন্থী তুরস্ক বৈদেশিক ব্যাপারে শান্তিবাদী হয়ে দাঁড়াল। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব পরিহার ক'রে নব্য তুরস্ক তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর্‌ল বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জঞ্জাল সাফ করতে; কাজেই, পর-রাজ্য-গ্রাসের লিপ্সা তার অন্তর্হিত হলো। জার্মানীর মতো সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের দাবী রক্ষার অজুহাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ওপর হানা না দিয়ে তুরস্ক তাদের সঙ্গে মিতালী পাতাবার প্রয়াস পেলো। ফলে একে একে সে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হলো তার পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে। এতে বৈদেশিক নীতি হলো সরল এবং তার নিরাপত্তার ভিত্তি হোলো সুদৃঢ়।

নব্য তুরস্কের প্রথম বান্ধব হোলো সোভিয়েট রুশিয়া। ১৯২১ সালে তুরস্কের সঙ্গে সোভিয়েটের যে সন্ধি হয় তাতে রুশিয়া সেভ্‌রে সন্ধির নিন্দা করে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে তুর্কীর অভিযানকে অভিনন্দিত করে। রুশিয়ার সঙ্গে তার পূর্বকালের শত্রুতা আজ তুরস্ক বিস্মৃত হয়েছে এবং তাদের মৈত্রী এ যাবৎ অটুট রয়েছে। কৃষ্ণসাগরের দুই তীরে তুরস্ক এবং রুশিয়ার বসতি। কাজেই রুশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ যে তুরস্কের অভিপ্রেত নয় তা সহজেই বোঝা যায়। সাম্যবাদের জয়-যাত্রা এ মৈত্রী বন্ধন কিছুমাত্র শিথিল করে-নি; কেন না, রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মের প্রাধান্য কামাল আতাতুর্ক বহুকাল পূর্বেই অস্বীকার করে এসেছেন। তা ছাড়া, তুরস্কের চরম দুর্ভাগ্যের সময় সোভিয়েট তার সহায়তা করে এসেছে একথা নব্য তুরস্ক সহজে ভুলবে বলে মনে হয় না। বর্তমান বৃটিশ-ফরাসী-তুর্কী চুক্তিতে এমন কিছুই নেই যা রুশিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী। কাজেই, একে যাঁরা রুশিয়ার বিরোধী বলে মনে করছেন তাঁরা যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লোসান সন্ধির পর ধীরে ধীরে তুরস্ক তার সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন কর্‌ল। ইরাণের সঙ্গে তার মৈত্রী দৃঢ়তর হলো যখন ১৯৩৪ সালে ইরাণের ভাগ্য-বিধাতা রেজা শা পহ্‌লবী এলেন তুরস্ক ভ্রমণে। ইরাকের সঙ্গেও তার অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়েছে, এখানকার তৈল-বহুল মোসুল (Mosul) অঞ্চলটির ওপর আধিপত্যের দাবী তুরস্ক বহুদিন ত্যাগ করে-নি। ১৯২৬ সালে আংকারা সন্ধির ফলে এ সমস্যার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে গিয়েছে—তুরস্কের কিছু অধিকার স্বীকৃত হয়েছে ও অঞ্চলে এবং সে পেয়েছে ক্ষতিপূরণ। ইরাকের সীমান্ত রেখাও এই সঙ্গে সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারপর ১৯৩৭ সালে ইরাক, আফগানিস্থান এবং ইরাণের সঙ্গে তুরস্কের একটি পারস্পরিক সহায়তার চুক্তি নিষ্পন্ন হয়েছে; তার ফলে এসিয়ার ইসলামপন্থী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে একটি নীতিগত ঐক্য দেখা দেবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তুরস্কের শান্তিকামী নীতির নিদর্শন হলো গ্রীসের সঙ্গে সৌহার্দ্য। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীসের সঙ্গে তুরস্কের যে সন্ধি হলো তাতে এ দুটি দেশের মধ্যে যে বিরোধ চল্‌ছিল বহু বর্ষ ধরে তার হলো অবসান। এই দুই দেশে যে তুর্কী এবং গ্রীক্ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল তাদের সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হলো প্রজা-বিনিময় ব্যবস্থায়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে প্রায় পনের লাখ তুর্কী গ্রীস ছেড়ে তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং বহু গ্রীক পরিবার ফিরে গিয়েছে স্বদেশে। ফলে সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় দেশে অসন্তোষের অগ্নি জ্বাল্‌তে সমর্থ হয়নি। গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া এবং তুরস্ক—এই চারটি রাষ্ট্র নিয়ে যে বলকান আঁতাত্ গড়ে উঠেছে তারও পুরোধা হচ্ছে নবীন তুরস্ক। বল্‌কান অঞ্চলে তার নেতৃত্ব এখন সর্ববাদিসম্মত।

মুসোলিনী এবং হিটলারের অভ্যুত্থান তুরস্ককেও আতঙ্কিত করে। ইথিওপিয়া গ্রাসের পর অরক্ষিত কৃষ্ণোপ-সাগর তীরবর্তী অঞ্চলের কথা ভেবে তুরস্ক চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল এবং লোসান-সন্ধি পরিবর্তনের দাবী কর্‌লে। এবার আর

তার দাবী উপেক্ষিত হলো না। এক বৈঠকের অধিবেশন হলো সুইজার্লাণ্ডের অন্তর্বর্তী মঁত্রো (Montreux) নামক এক স্থানে—এই সমস্যার সমাধানের জন্য। এই বৈঠক বসফোরাস এবং দার্দানেলিস্ প্রণালীর ওপর তুরস্কের কর্তৃত্ব মেনে নিল এবং তাকে ওঅঞ্চল সুরক্ষিত করবার দিল অধিকার। সোভিয়েট ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের রণতরীর গতায়াতও নিয়ন্ত্রিত হলো। সামরিক প্রয়োজনে প্রণালী দুটি বন্ধ করে দেওয়ার অধিকারও তুরস্ক পেল।

বিগত মহাসমরের সময় বৃটিশ-বিরোধী যে ভাবধারা তুরস্ক অঞ্চলে প্রসার পেয়েছিল সমরোত্তর কালে তা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়েছে; আংকারা সন্ধি (১৯২৬) যার ফলে ইরাকের সীমারেখা নির্ধারিত হয়—তুর্কো-বৃটিশ সম্প্রীতির পথ সুগম করে। কিন্তু মঁত্রো বৈঠকে বৃটেনের আনুকূল্য সেই বৃটিশ-পরিপন্থী-ভাব সম্পূর্ণ মুছে দেয়। ১৯৩৮ সালের ১২ই মে বৃটেনের সঙ্গে তুরস্কের এক অর্থনৈতিক চুক্তি হয়। তার ফলে কারাবুকে বৃটিশ মূলধনের সাহায্যে এক বিরাট লোহার কারখানা গড়ে উঠেছে। এই প্রীতিরই পরিণতি হচ্ছে ২০শে অক্টোবর সম্পাদিত বৃটিশ-ফরাসী-তুর্কী-চুক্তি।

ফ্রান্সের সঙ্গে তুরস্কের মনান্তর ঘটে সিরিয়া অঞ্চল নিয়ে। মহাসমরের অবসানে এই ভূতপূর্ব তুর্কী প্রদেশটি ফ্রান্সের অভিভাবকত্বে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। এখানকার অধিবাসীরা অবশ্য তুর্কী নয়—আরব। লোসান সন্ধির সময় এ দেশটির ওপর আধিপত্যের অভিপ্রায় পরিহার করলেও উত্তর-সিরিয়ায় অবস্থিত আলেকজান্দ্রেতা বন্দরটির ওপর তুরস্ক দাবী জানায়। ফ্রান্স প্রথমে এ দাবী অস্বীকার করে; এমন কি, সিরিয়াকে স্বাধীনতা দান করবার সময়ও একে তুরস্ক-প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীনা নগরীতে পরিণত করবার পরিকল্পনা হয়। কিন্তু সম্প্রতি এটি তুরস্ক ফিরে পেয়েছে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে তার মনোমালিন্য মিটে গিয়েছে।

এই পটভূমিকায় বৃটেন এবং ফ্রান্সের পক্ষে তুরস্কের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া কিছুমাত্র কঠিন হয়-নি। পক্ষান্তরে, জার্মানীর পক্ষে এ রকম চুক্তি বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়-নি; তার কারণ, হিটলারের আত্মবিস্তার-নীতি (laben sraum) সম্বন্ধে অন্যান্য বল্কান রাষ্ট্রগুলির মতো তুরস্কও সন্দিগ্ধ। তার পরিণতি যে কী সে বিষয়ে কিছুই স্থিরতা নেই। এ কথা ঠিক যে যদি জার্মানী তুরস্কের সঙ্গে সম্মিলিত হতো তা হ'লে দানিয়ুব নদী-পথে জার্মান ইউবোট এসে পড়ত কৃষ্ণসাগরে এবং সেখান থেকে সহজেই আসা চল্‌ত ভূমধ্যসাগরে। তাতে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল তাদের অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ত এবং বৃটেন এবং ফ্রান্সের নৌবহর হত বিপন্ন। কিন্তু এই চুক্তির ফলে দার্দানেলিস এবং বসফোরাস রইল উন্মুক্ত বৃটিশ এবং ফরাসী রণতরীর জন্য। তা ছাড়া, ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে কোনও রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে কিংবা রুমানিয়া বা গ্রীসের নিরাপত্তা বিপন্ন হলে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহায়তাকল্পে তুরস্ক যুদ্ধে ব্রতী হবে। তবে সোভিয়েটের বিপক্ষতা করতে তুরস্ক বাধ্য থাকবে না।

এই চুক্তিকে বলা হয়েছে—মিত্রশক্তিপুঞ্জের বিশিষ্ট বিজয় এবং জার্মানীর কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজয়। কেন না, জার্মাণ-প্ররোচনায় রুশিয়া তুরস্ককে কৃষ্ণ-সাগরের দ্বারপথ রুদ্ধ করতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু মঁত্রো চুক্তি ভঙ্গ ক'রে এ ব্যবস্থা করতে তুরস্ক রাজী হয়নি। জার্মানী ও ইতালীতে উষ্মার সঞ্চার হলেও তাতে তুরস্কের আশু বিপদের সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে যুদ্ধের গতি যে এই চুক্তি প্রভাবিত করবে তা মনে করবার কোনও কারণ না থাকলেও ভবিষ্যতে এর প্রয়োজনীয়তা সামান্য না হওয়াই সম্ভব। রুশিয়ার কাছে আশ্বাস পেয়ে তুরস্ক যদি কৃষ্ণসাগরের দ্বার বন্ধ করে দিত তা হলে সে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির বৈরী বলে গণ্য হত এবং তাতে তার বিপদ ঘনিয়ে আস্‌ত। যদিও তুর্কী-রুশিয়া আলোচনা আপাতত ব্যর্থ হয়েছে, তবুও সোভিয়েট-বিরোধী কোনও চুক্তিতে তুরস্ক যোগ দেয়-নি। সুতরাং নতুন করে সে আলোচনা সুরু হতে কোনও বাধাই নেই। আপাতত রাষ্ট্রপতি ইস্‌মেত ইনোনু বিশেষ কোনও ভুল করেছেন বলে মনে হয় না। অন্তত, এ কথা ঠিক যে, এই চুক্তির কল্যাণে তুরস্ক আবার ইউরোপে জাতে উঠ্‌ল।

হে সম্রাট কবি, এই তব হৃদয়ের ছবি,

এই তব নব মেঘদূত, অপূর্ব্ব অদ্ভুত—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা

জেলে ডিঙ্গি

শিল্পী—রবীন কর, সীলেট

স্যার স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতা—

কংগ্রেসের দাবীর উত্তরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার স্যামুয়েল হোর যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। "ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের" কোন প্রতিশ্রুতি তাহার মধ্যে নাই। সুদীর্ঘ বক্তৃতা; শিশুকালের সুমধুর ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কথা তাহার মধ্যে আছে। ভারতের সম্বন্ধেও অনেক আন্তরিকতা দেখানো হইয়াছে। নাই কেবল প্রার্থিত দাবী পূরণের আশ্বাস। স্যার স্যামুয়েল হোরের কথায় প্রকাশ, তাহা যে তিনি দিতে পারিলেন না সে তাঁহার বদান্যতা ও উদারতার অভাবে নয়, আমাদেরই অদৃষ্ট দোষে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি কংগ্রেস-শাসন চাহে না, কংগ্রেসকে বিশ্বাসও করে না। রাজন্যবর্গ কংগ্রেস-প্রাধান্যের আশঙ্কায় ইহারই মধ্যে রীতিমত আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। এতগুলি সম্প্রদায়কে মনঃক্ষুণ্ণ করিয়া কি করিয়া "ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস" দেওয়া যায়? যেদিন তাহারা মিলিত হইবে সেইদিনই ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে। তৎপূর্ব্বে দিলে অভিভাবক হিসাবে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যহানি হইবে। তাহাদিগকে নিরাপত্তার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা তো পালন করিতে হইবে!

সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ—

স্যার স্যামুয়েল হোর যে অসম্ভব সর্ত্ত দিয়াছেন তাহা ভালো ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। মেজরিটি-মাইনরিটি প্রত্যেক গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশেই আছে। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে মেজরিটি-মাইনরিটি রাজনৈতিক মতবাদের উপর নির্ভর করে না। এখানে দলভেদের ভিত্তি সম্প্রদায়গত কৃত্রিম বিভেদ। লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিতেও শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ই বোঝায় না। শিখ আছে, পার্শী আছে, খৃষ্টান আছে, অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায় আছে, দেশীয় রাজন্যবর্গ আছেন—এমন কি ইউরোপীয় সম্প্রদায়ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত অসংখ্য সম্প্রদায় যেদিন এক-বাক্যে স্বায়ত্তশাসন চাহিবে, মাত্র সেইদিনই ভারতের ভাগ্যবিধাতাগণ ঊর্দ্ধাকাশ হইতে ভারতের উপর স্বায়ত্ত-শাসন বর্ষণ করিবেন। তৎপূর্ব্বে নয়। যতদিন কংগ্রেসের উপর হইতে তাহাদের আশঙ্কা বিদূরীত না হইতেছে, ততদিন—কংগ্রেস যত চেষ্টাই করুক না কেন—তাহারা বৃটিশ শাসনের সুশীতল স্নেহচ্ছায়ার বাহিরে এক পাও আসিতে প্রস্তুত নয়।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

কংগ্রেসের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠদের কেন এই আশঙ্কা, কি তাহারা চায়, কোথায় তাহাদের স্বার্থহানি হইতেছে সে সম্বন্ধে কলরব যথেষ্ট উঠিলেও কোনো সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ এখনও পর্য্যন্ত কেহ তোলে নাই। জিন্না সাহেব লীগের পক্ষ হইতে কংগ্রেসী প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ তুলিয়াছেন তাহা যেমন এলোমেলো, তেমনি ভিত্তিহীন। মহাত্মাজি এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গায়ারকে দিয়া তদন্ত ও আবশ্যক বিচার করাইতে প্রস্তুত ছিলেন। মিঃ জিন্না অত্যন্ত তুচ্ছ যুক্তি দিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার এই একটা মাত্র অর্থই হইতে পারে যে, তিনি অথবা তাঁহার লীগ অভিযোগের তদন্ত ও সত্য হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য ততটা ব্যগ্র নন, যতটা ব্যগ্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে। তাঁহার স্বার্থও কংগ্রেসের সহিত আপোষে নয়, কংগ্রেসের বিরোধিতায়।

মহাত্মার অভিমত—

মহাত্মাজি হরিজনপত্রে এই কথাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"Janab Jinna Saheb looks to the British power to safeguard the Muslim rights. Nothing that the Congress can do or concede can satisfy him. For he can always, and naturally from his own standpoint, ask for more than the British can give or guarantee. Therefore, there can be no limit to the Muslim League demands."

ইহার অর্থ :

"জনাব জিন্না সাহেব মুসলীম স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য বৃটিশ শক্তির মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন। কংগ্রেস যাহা কিছু করিতে পারে অথবা দিতে পারে তাহাতে তাঁহার মন উঠিবে না। কারণ তিনি সর্ব্বদাই বৃটিশের নিকট হইতে তাহারা যাহা দিতে অথবা দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, তাহার চেয়ে বেশী চাহিতে পারেন। সুতরাং মুসলীম লীগের দাবীর কোনো সীমা নাই।"

বস্তুতপক্ষে তথাকথিত সংখ্যালঘিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি ও স্থিতি বিবেচনা করিলে বোঝা যায়, কংগ্রেসের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা ছাড়া ইহাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। ইহাদের অস্তিত্ব ও শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মেহেরবাণীর উপরই নির্ভর করিতেছে। মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র নিজেদের শক্তির উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন এবং কংগ্রেস ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলীম লীগ তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁহারা প্রতিনিয়তই করিতেছেন সত্য। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা কোথায় চলিতেছে তাহা স্যার সেকান্দার হায়াৎ খাঁ অথবা মৌলবী ফজলুল হক জানাইয়া দিলে দেশবাসীর কৌতূহল চরিতার্থ হয়।

অন্যান্য মুসলীম প্রতিষ্ঠানের অভিমত—

যুক্তপ্রদেশ মুসলীম লীগ দলের ডেপুটি লীডার মিঃ জেড্, এইচ, লারী পর্য্যন্ত বিরক্তভাবে বলিয়াছেন, মিঃ জিন্না স্বাধীনতা ধামাচাপা দিয়া এখন মুসলীম লীগ যে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস এবং গবর্ণমেণ্টকে দিয়া তাহাই স্বীকার করাইবার চেষ্টায় আছেন। মিঃ জিন্না জানেন, বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন প্রতিক্রিয়াপন্থীদের লইয়া জোড়াতালি দিয়া গঠিত এই লীগ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্পর্দ্ধাই করিতে পারে, সত্যিকার সংগ্রাম করিতে পারে না। ভারতের যত বিখ্যাত মডারেট—নবাব বাহাদুর, স্যার আর খাঁ বাহাদুর—লইয়া এই লীগ গঠিত। ইঁহাদের অনেকেই খয়ের খাঁ হিসাবে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। উত্তেজনার প্রথম ঘোরটা কাটিয়া যাইতেই মুসলীম লীগের তরুণ দলে এখন সংশয়ের তরঙ্গ জাগিয়াছে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য লীগের উপর কতখানি ভরসা করা যায়।

দিল্লী বৈঠকে মিঃ জিন্না গান্ধীজির নিকট মুসলীম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার দাবী তুলিয়াছেন বলিয়া একটা কথা উঠিতেই অন্যান্য মুসলীম দল, যথা—জমিয়ৎ-উল-উলেমা, অহ্‌রর দল, শিয়া সম্প্রদায়, মোমিন সম্প্রদায় প্রভৃতি গান্ধীজি ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট তার করিয়া এই দাবীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলিয়া রাখা ভাল, ভারতের সাত কোটি মুসলমানের মধ্যে তিন কোটি মোমিন সম্প্রদায়ের লোক। ইঁহাদের দাবী সংখ্যাগণনার হিসাবে উপেক্ষা করা যায় কি করিয়া?

গণতন্ত্র অচল—

জিন্না সাহেবের নূতন চাল—ভারতে গণতন্ত্র অচল। তৎপরিবর্ত্তে কি চলিবে, কোন্ শাসনতন্ত্র ভারতের প্রতিভা ও ভারতের মাটির পক্ষে উপযোগী অবশ্য তাহাও তিনি খুলিয়া বলেন নাই। তাহা রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র যাহাই হউক না কেন, নিরক্ষর, নিরন্ন ও রোগশীর্ণ মুসলীম জনসাধারণের শাসনতন্ত্র যে নয় তাহা নিঃসন্দেহ। বাস্তবিক পক্ষে আরাম চেয়ারে বসিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তিনি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত-ভাবে চালাইতেছেন, তাহাতে "আমীর-এ-মিল্লৎ" জিন্না সাহেব যদি একটা বাদশাহগিরি না পান তবে আর কি পাইবেন! তাঁহাকে "গ্রেট-মোগলের" ভূমিকায় দেখিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ আছে।

কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের খটকা বাধিয়াছে। গণতন্ত্র যদি ভারতে অচলই হয়, গণতন্ত্রের ব্যর্থতা যদি প্রতিপন্নই হইয়া গিয়া থাকে, তবে লীগের গঠনতন্ত্র এখনও গণতান্ত্রিক কেন? আর লীগ মন্ত্রীগণকেই বা তিনি গণতান্ত্রিক মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিবার হুকুম দিতেছেন না কেন? "গ্রেট মোগলই" বটে! কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার দুই সুবেদার যে ভিন্ন পথ ধরিয়াছেন!

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ—

বর্ত্তমান বর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ. বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও সীমান্তের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। আসামও (এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়) পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রদেশে ব্যবস্থা পরিষদে বিভিন্ন দলের শক্তি নিম্নলিখিতরূপ:

	কংগ্রেস	অকংগ্রেস	মোট সংখ্যা
যুক্তপ্রদেশ···	১৪৭	৮১	২২৮
মাদ্রাজ···	১৬২	৫৩	২১৫
বোম্বাই···	৮৯	৮৬	১৭৫
বিহার ··	৯৮	৫৪	১৫২
উড়িষ্যা···	৩৫	২৫	৬০
মধ্যপ্রদেশ···	৭১	৪১	১১২
সীমান্ত···	২১	২৯	৫০
„ কোয়ালিশন···	২৯	২১	৫০
আসাম···	৩২	৭৬	১০৮
„ কোয়ালিশন···	৫৮	৫০	১০৮

ইহাতে বোঝা যায়, আসাম ছাড়া আর কোথাও নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার আশা নাই। অন্যান্য প্রদেশে গবর্ণর সে চেষ্টা একবার করিয়া স্বয়ং প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইজন্য কয়েক-জন করিয়া আই-সি-এস'কে লইয়া পরামর্শ সভা গঠন করিয়াছেন।

কংগ্রেস বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের উদ্দেশ্য এবং যুদ্ধশেষে সেই উদ্দেশ্য কি ভাবে ভারতে প্রযোজ্য হইবে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণা চাহিয়াছিলেন। বড়লাটের এবং তাহার পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার স্যামুয়েল হোরের ঘোষণায় তাহার সন্তোষজনক উল্লেখ না থাকায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল তাহার প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। কংগ্রেসী প্রদেশে তাঁহাদের পদত্যাগ এবং গবর্ণর কর্ত্তৃক শাসনভার গ্রহণের কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহাই দেখিবার বিষয়।

লাটপ্রাসাদে বৈঠক—

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল কর্ত্তৃক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই বড়লাট কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এবং মুসলীম লীগের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নাকে আমন্ত্রণ করেন। ইহাতে অনেকের মনে এই আশার সঞ্চার হয় যে, হয় তো বা একটা আপোষ হইয়া যাইবে এবং মন্ত্রিগণ আবার ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সে আশাও ব্যর্থ হইয়াছে। দিল্লী বৈঠকে কংগ্রেসের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন আপোষ সম্ভব হয় নাই।

এই সম্পর্কে বড়লাট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে মতভেদের ফলেই দিল্লী বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে ব্যাপার যে তাহা নয় তাহা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর উক্তিতে প্রকাশিত। আলোচ্য বৈঠকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিষ্পত্তির কোনো কথা ওঠে নাই। সে সম্বন্ধে জিন্না সাহেবের সহিত পণ্ডিতজির যে আলোচনা চলিতেছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই। এমন কি, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কংগ্রেস যে ঘোষণার দাবী করিয়াছে, তাহার সহিত জিন্নাসাহেবের কোনও মতবিরোধ নাই।

বড়লাট নাকি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্বন্ধে লীগ-কংগ্রেস একমত হইলেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে কি পরিবর্ত্তন করা যায় তাহার ব্যবস্থা হইবে। কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ফলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে জিন্নাসাহেবের সহিত কোনো আলোচনাই হয় নাই।

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রার্থিত ঘোষণা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিতেই

প্রস্তুত নন। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল কর্ত্তৃক পদত্যাগ করার পরে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই অবান্তর।

এসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুস্পষ্ট ভাষায় বড়লাটের নিকট লিখিত অভিমত প্রেরণ করিলেও জিন্নাসাহেব তাঁহার পত্রে লীগের কোন অভিমতই জানান নাই। তিনি শুধু ইহাই জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস বড়লাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁহার সহিত কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই সম্ভব হয় নাই। এই "ধরি মাছ না ছুঁই পাণি" নীতি জিন্নাসাহেবের বিশেষত্ব এবং ইহাই তাঁহার তুরুপের তাস।

'টাইম্স-এর' দুঃখ—

দিল্লী বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় সুদূর বিলাতে বসিয়াও 'টাইম্স্' পত্র অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিয়াছেন এবং কংগ্রেসকে আর কালবিলম্ব না করিয়া সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের সঙ্গে অর্থাৎ মুসলমান, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত আপোষে মিটমাট করিয়া লইয়া অবিলম্বে 'ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস' হস্তগত করিবার সুপরামর্শ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য সুপরিচিত সৌজন্যের সহিত 'টাইম্স্' সাম্প্রদায়িক মতভেদকেই দিল্লী বৈঠকের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি, কংগ্রেসী প্রদেশে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, 'টাইম্স্' তাহারও উল্লেখ করিয়া অনেক 'কুম্ভীরাশ্রু' বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

মহাত্মাজি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় ইহার চমৎকার উত্তর দিয়াছেন: "ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক মতভেদের অজুহাত ব্যবহার করিয়া থাকেন," এবং "দেখা যাইতেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগকে খেলাইবার সেই কদর্য্য দৃশ্য এখনও চলিতেছে।"

কিন্তু এবার আর শুধুই লীগ নয়। পাছে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে লীগ কংগ্রেসের সহিত আপোষ করিয়া ফেলে সেজন্য নূতন আর একটি সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে—দেশীয় রাজন্যবৃন্দ। ভগবান জানেন, এই স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসকসম্প্রদায় কি চাহেন! 'গ্রেট মোগলের' এই দুর্ব্বল এবং অক্ষম অনুকারকগণের সহিত 'মুসলীম ভারতের' ভবিষ্যৎ 'গ্রেট মোগলের' মতের কিছু মিল থাকিতে পারে। কিন্তু কি মতবাদে, কি দৃষ্টিভঙ্গীতে, কংগ্রেসের সহিত ইঁহাদের ক্ষীণতম যোগসূত্রই বা কোথায়? মহাত্মা বলিয়াছেন:

The mention of Princes in this connection is particularly unfair. They owe their existence to the Paramount power and have no status independent of it. Strange as the assertion may appear, they can do nothing big or good without the consent, tacit or implied, of the Paramount power. They represent nobody but themselves. To invite the Congress to settle with the Princes is the same as inviting to settle with the Paramount power.

দেশীয় রাজন্যগণ প্রজা সাধারণের প্রতিনিধি নন। তাঁহারা বৃটিশ সার্ব্বভৌম শক্তির সম্মতি ছাড়া কোন কাজ করিতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত কংগ্রেসকে আপোষ করিতে বলা, আর সার্ব্বভৌম শক্তির সহিত আপোষ করিতে বলা যে একই কথা—তাহা অস্বীকার করিবার পথ কোথায়?

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ—

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে লীগ অবিশ্রান্তভাবে নানা অভিযোগ তুলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা যে ঠিক কি তাহা কোন দিন সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলে না; লীগ এ বিষয়ে তদন্ত করাইতেও ইচ্ছুক নয়। 'টাইম্স্'-এর অভিযোগের উত্তরে মহাত্মা এ সম্বন্ধে সত্য ঘটনা বিবৃত করিবার ভার কংগ্রেসী প্রদেশের গবর্ণরদের উপর দিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে মুসলীম-সংবাদপত্রদলনের যে অভিযোগ মৌলবী ফজলুল হক সাহেব তুলিয়াছিলেন, সেখানকার মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতেই তিনি তাহা বোম্বায়ের কাঁধ হইতে যুক্তপ্রদেশের কাঁধে ফেলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবারে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। উত্তেজনাবশে হক সাহেবও তাঁহার

'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত যুক্তপ্রদেশে তদন্ত করিতে রাজি হইয়াছেন। অবশ্য সম্প্রতি তিনি কটিবাতে শয্যাগত। রোগমুক্তির পরে একটা ভাল দিন দেখিয়া তিনি যুক্তপ্রদেশ যাত্রা করিবেন বলিয়া অনেকেই প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

কিন্তু যুক্তপ্রদেশের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াই তাঁহার মহৎ কর্ত্তব্য শেষ হইবে না বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। ইতিপূর্ব্বে হক সাহেবের এক বিবৃতির উত্তরে সুভাষচন্দ্র জানাইয়াছিলেন, বাঙ্গলার মফঃস্বল হইতেও হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের অনেক অভিযোগ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। আমরা আশা করি, হকসাহেব সে সম্বন্ধেও যথাবিহিত তদন্তে ব্রতী হইবেন।

ইতিমধ্যে যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলিয়াছেন, পাঞ্জাবে তিনশত সংবাদপত্রের জামিন তলব করা হইয়াছে। তাহার পরিমাণ বহু টাকা। বাজেয়াপ্ত জামিনের পরিমাণও সামান্য নয়। হকসাহেব পাঞ্জাব বলিতে ভুল করিয়া যুক্তপ্রদেশে বলেন নাই তো?

পরলোকে ফণীন্দ্রনাথ পাল—

গত ১১ই কার্ত্তিক শনিবার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। ফণীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল অধুনালুপ্ত "যমুনা" ও "গল্পলহরী" যথেষ্ট কৃতিত্ব ও যশের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি বাঙ্গলার পাঠকসমাজে যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার রচিত "স্বামীর ভিটা", "সুকুমার" "বন্ধুর বৌ", "ইন্দুমতী" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি সে সময়ে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই সম্পাদিত "যমুনা"য় অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। সুদূর বর্ম্মায় শরৎচন্দ্র যখন বাস করিতেন, যখন বাঙ্গলা দেশে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, তখন হইতেই ফণীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত জীবনের অনেক কথা তিনি জানিতেন যাহা শরৎচন্দ্রের জীবনী-রচয়িতার পক্ষে উপাদানরূপে গৃহীত হইতে পারিত। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগবেদনা অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কংগ্রেস কি হিন্দু প্রতিষ্ঠান?

সম্প্রতি ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড জিন্না সাহেবের অনুকরণে কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। কংগ্রেসের শক্তি ও স্বরূপ তিনি ভাল করিয়াই জানেন। সমস্ত জানিয়াও যদি তিনি ও কথা বলিয়া থাকেন তাহা হইলে আর বলিবার কি থাকিতে পারে? ভারতে কংগ্রেসই একমাত্র অসাম্প্রদায়িক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহাতে সকল ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীরই যোগদান করিবার অধিকার আছে। এই প্রতিষ্ঠানকে ছোট করিতে পারিলে ভারতের অগ্রগতি যে ব্যাহত হইবে এ কথা মিঃ জিন্নার মত লর্ড জেটল্যাণ্ডও জানেন। কিন্তু তাঁহারা একটা কথা জানেন না যে, কংগ্রেসের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও শক্তি আরাম চেয়ারে বসিয়া অর্জ্জিত হয় নাই, তাহা সংবাদপত্রের কোলাহল ও কটূক্তির উপরও নির্ভর করে না।

আজাদ মুসলীম সম্মেলন—

পাঞ্জাবের মুক্তিকাম মুসলমানদের লইয়া গঠিত আজাদ মুসলীম সম্মেলনের একটি জরুরী বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :

"মিঃ এম, এ, জিন্না মুসলীম লীগকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করিবার উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। যদিও সত্য কথা এই যে, মুসলীম লীগের মোট সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যের সংখ্যা অনেক বেশী। অধিকন্তু জমিয়ৎ-উল-উলেমা, মজলিস-ই-অহ্‌রর প্রভৃতি অনেক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিয়া থাকে।

তৎসত্ত্বেও যদি মুসলীম লীগকে স্বীকার করার সমস্যাই জাতীয় ঐক্যের একমাত্র অন্তরায় হইয়া থাকে তাহা হইলে জাতীয় মুসলমানগণের সে পথ রোধ করিবার ইচ্ছা নাই; মিঃ জিন্না এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণ তাঁহাদের অমুসলমান

ভ্রাতৃবৃন্দের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। এই সভার মতে, লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ স্বষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া এই সময়ে যখন মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে। আমাদের কমিটি আরও বিশ্বাস করে যে, কংগ্রেসই একমাত্র জাতীয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যাহা সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি এবং যাহার দ্বার জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই জন্য উন্মুক্ত আছে।"

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। কিন্তু ইহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং তাঁহাদের ভেরীবাদক সংবাদপত্রগুলির চোখ ফুটিবে কি ?

স্যার মন্মথনাথের মাতৃবিয়োগ—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী গত ১৮ই কার্ত্তিক শনিবার সকালে ৯০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার ৫ পুত্র ও ৪ কন্যার মধ্যে ৪ পুত্র ও দুই কন্যা পূর্ব্বেই পরলোক গমন করায় তাঁহাকে বহু শোকভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি বিশেষ সদয়হৃদয়া ও সুগৃহিণী ছিলেন। সার মন্মথনাথের মত উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার কম সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। আমরা সার মন্মথনাথের এই দারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে হেমনলিনী কর—

বহু চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণেতা, কলিকাতা মেডিকেল স্কুল ও কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত ডাক্তার ৺রাধাগোবিন্দ (আর-জি) কর মহাশয়ের পত্নী হেমনলিনী কর পরিণত বয়সে গত ২১শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার সকালে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। হেমনলিনী কর মহাশয়া স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা হইয়া পরোপকারব্রতী হইয়াছিলেন। ডাক্তার করের কোন সন্তানাদি ছিল না—তাঁহার কয়েকটি ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান। সুবিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ডাক্তার করের ভ্রাতার অন্যতম জামাতা।

এক রাত্রির ইতিহাস

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী

শ্রাবণ মাস। আকাশে বর্ষার ঘনঘটা।

তারপর আজ কয়দিন থেকে অবিশ্রাম বর্ষণ চলেছে, চারদিকে একটা গম্ভীর নিস্তেজ থম্‌থমে ভাব—যেন মেঘ-মেদুর আকাশের ম্লান মায়া তার ছায়া ফেলেছে মানুষের মনে, আচ্ছন্ন করেছে বিশ্ব-প্রকৃতিকে, বর্ষণ-শ্রান্ত ধরণীর ছবি আজ ব্যথিতের দীর্ঘ নিশ্বাসের মত নীরব, নিবিড়।

এমন দিনে আর যাই চলুক, আড্ডা চল্‌তে পারে না। ভবতোষের বাড়ীতেই আমাদের প্রাত্যহিক সান্ধ্য আড্ডাটি বসত, এ কয়দিন সেখানে কেউ যায় নি এ খবর পেয়েছি। কিন্তু আজ আর ভাল লাগছিল না—আড্ডার নেশায় মনটা উতলা হয়ে উঠ্‌ছিল। "এমন দিনে তারে বলা যায়" এই ধরণের কবিতা পড়ে কাব্যচর্চ্চা করবার মত যৌবন আমার ছিল না, স্ত্রীরও ছিল না। কারণ একদিন যিনি তন্বীশ্যামা বধূরূপে আমার জীবনে স্বপ্নের মত উদিত হ'য়েছিলেন, তিনি আজ আর স্বপ্ন নন, বধূ নন—প্রবীণা স্থূলাঙ্গিনী গৃহিণী, জননী—ধরণীর ধূলিতে একান্তই বাস্তব, সংসার নিয়েই তিনি ব্যস্ত, আর তদধিক ব্যস্ত ছেলেদের নিয়ে। বর্ষার দিনে তাদের উৎপাতও বড় কম নয়—বাইরে যাবার উপায় নেই, ঘরের মেঝেই হ'য়েছে তাদের রণক্ষেত্র। তাদের নৃত্য, হাসি, কান্না,

তর্ক সমানভাবে চল্‌ছে। সারাদিন টেবিল, চেয়ার, বাক্স, পেটরা—অত্যাচারে জর্জ্জরিত, ক্ষত বিক্ষত, মেঝেতে ছেঁড়া কাগজ, কাপড়ের টুকরো, ছাতি লাঠি, দোয়াত কালিকলম চারদিকে বিক্ষিপ্ত—আর তার মধ্যে চল্‌ছে অবিরাম তাণ্ডব নর্ত্তন, ঘন ঘন সিংহনাদ, ঠিক সেকালের যুদ্ধক্ষেত্রের মত, যদিও যুদ্ধক্ষেত্র দেখবার সৌভাগ্য আমার কখনো ঘটেনি। আজ তাদের বীরত্বের মাত্রাধিক্য, সুতরাং খণ্ডপ্রলয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা। গৃহিণী এখনো নীচে কি কার্য্যে ব্যস্ত, নতুবা খণ্ডপ্রলয়টা অনেক পূর্ব্বেই ঘটিয়া যাইত। এখন যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি উপরে উঠিতে পারেন। সুতরাং এই আসন্ন বিপদের মধ্যে জড়িত না থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখি—সন্ধ্যা হয় হয়; নিঃশব্দে আড্ডার দিকে রওনা হলুম।

আড্ডায় এসে দেখি—বেশ জম্‌জমাট। পাটের দালাল ঘনশ্যাম চা পান করছে, বৈজ্ঞানিক সীতাংশু "চয়নিকা" খুলে নিবিষ্ট মনে ইজিচেয়ারে এলিয়ে আছে—বোধ হয় সে বর্ষার কবিতা মনে মনে উপভোগ করছে। কবি প্রভাত-কুসুম টেবিলে পা তুলে দিয়ে বিড়ি টানচে, ঔপন্যাসিক নিবারণ তেল-সংযুক্ত মুড়ি চর্ব্বণে ব্যস্ত, ভবতোষ আর দার্শনিক অজয় হ্যাভ্‌লক এলিস, না, ম্যারি ষ্টোপ্‌সের সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্কে মশ্‌গুল, মৃদঙ্গগণ্ডার অক্ষয় মৃদঙ্গ অভাবে টেবিলের উপর তাল ঠুক্‌ছে। অক্ষয় এ তল্লাটে ভাল মৃদঙ্গ বাজিয়ে, তার বাজনার শব্দ এক মাইল দূরের থেকেও নাকি শোনা যায়। তাই ঘনশ্যাম ওর উপাধি দিয়েছি মৃদঙ্গ-গণ্ডার। আর যে দু-চারজন আছে, তাদের নাম না করলেও তারা চট্‌বে না, কারণ তারা "জুনিয়র" দলের।

আমি ঢুকতেই তারা সশব্দে আমার অভ্যর্থনা করল। অভ্যর্থনা কথাটা নেহাতই ভদ্রগোছের হ'ল—চল্‌তি ভাষায় বল্‌তে গেলে বল্‌তে হ'ত চেঁচামেচি। আমি কোন কথা না বলে একটা চেয়ার টেনে বসলুম।

বৈজ্ঞানিক সীতাংশু 'চয়নিকা'খানা সশব্দে বন্ধ করে আমার দিকে চেয়ে বলল—এ কিন্তু ভারি অন্যায়—

আমার অনুপস্থিতির সম্বন্ধে হয়ত সে কিছু বল্‌তে যাচ্ছিল। তাকে তার কথা শেষ করতে দিলুম না। সীতাংশুর কথার জের টেনে আমি ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে বল্লুম—নিশ্চয়ই, পাটের দর যে নেমে যাবে গবর্ণমেণ্টের একথা আগেই···

ঘনশ্যাম আমাকে বাধা দিল—কলকাতার পাটের বাজার সুবিধা নয়, আর মনটাও বোধ হয় তার ভাল ছিল না—সে বল্ল—থামো, যার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই তা নিয়ে তর্ক করো না।

চায়ের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়ে তা সশব্দে নামিয়ে রাখল।

প্রভাতকুসুম কবি হ'লেও তার্কিক, সে জবাব দিল—ঘনশ্যাম, কথাটা তোমার ঠিক হ'ল না। জ্ঞান যেখানে নেই তর্ক সেখানেই চলে, কারণ জ্ঞানীর পক্ষে অসতর্ক হ'বার সম্ভাবনা কম।

ঘনশ্যাম চটে উঠল—চট্‌বার মুখে সে যখন কথা বলে তখন তার তর্কের খেই হারিয়ে যায় এবং বাক্যগুলি হ'য়ে উঠে অসংলগ্ন।

ঘনশ্যাম জবাব দিল—তাহ'লে পাটের তথ্য ছেড়ে স্ত্রীতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কর।

কি কথায় কি কথা এল। কিন্তু নিবারণ কথাটাকে যেন লুফে নিল। সীতাংশুর দিকে কটাক্ষ করে নিবারণ বল্ল—তাই ভাল, তথ্য ও তত্ত্ব দুইই আলোচনা করা যাক। প্রথম ধরো ফ্রয়েডের কথা—

সীতাংশুর ফ্রয়েড-বিশারদ বলে খ্যাতি কিংবা অখ্যাতি ছিল, কারণ স্ত্রীতত্ত্ব সম্বন্ধে যখনই কোন আলোচনা হ'ত তখনই সে ফ্রয়েডের কথা তুল্‌ত। আমরা তাকে ফ্রয়েড সম্বন্ধে 'অথরিটি' বলে নির্ব্বিবাদে মেনে নিয়েছিলুম, যেহেতু আমাদের আড্ডার আর কেউ ফ্রয়েড পড়েনি।

সীতাংশুর জবাব দিবার কথা কিন্তু জবাব দিল প্রভাত-কুসুম—থামো, এই বর্ষার দিনে ফ্রয়েড চল্‌বে না। এস রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা পড়া যাক্।

সে চয়নিকা খুল্‌তে সুরু করল।

কেন জানি না ঘনশ্যামের মেজাজ আজ ভাল ছিল না। প্রভাতের কথা শুনে সে বলে উঠল—তা হ'লে পড় তোমরা, আমি দোসরা আড্ডার চেষ্টা দেখি। ন্যাকামি করে এখন দিলটাকে আমি মাটি করতে রাজী নই।

কথা শেষ করে সে এমনভাবে সরে বসল যেন সে উঠেই যায়।

ভবতোষ বলল—ঘনশ্যাম ঠিকই বলেছে। কবিতা আজ চলবে না। বই তুমি বন্ধ কর প্রভাত, মৃদঙ্গ-গণ্ডার অক্ষয় টেবিলটার উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে বলল—কবিতা-টবিতা কিছু নয়—দুই-একটা প্রেমের গল্প চলুক।

কথাটা সকলের মনেই সায় দিল। আমরা সকলেই খুশী হ'লুম এই ভেবে যে, সত্যিই অক্ষয় আজ একটা রুচি-সম্মত কথা বলেছে—যা বলতে তাকে আমরা কদাচিৎ শুনি।

সত্যি কথা বলতে হলে, এমন বর্ষার দিনে একমাত্র প্রেমের গল্পই চল্‌তে পারে—আর আমাদেরও তা ভাল লাগবার সম্ভাবনা, কারণ প্রেমের যুগ আমাদের জীবনে এখন অতীত এবং অতীতের অল্প ছবিরই সে আকর্ষণ আছে, তার প্রবলতা কম নয়। সুতরাং আমাদের অনেকেরই মন সজাগ হ'য়ে উঠল।

বাইরে অবিরাম বর্ষণ চল্‌ছে, আকাশে মেঘের গুরু গুরু ডাক, নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, বাগান হ'তে ফুলের গন্ধ এলোমেলো ভেসে আসছে—

এই পরিবেশের মধ্যে ঘনশ্যামই প্রেমের গল্প বলবার জন্ত প্রস্তুত হ'ল।

ঘনশ্যাম গল্প বল্‌বে এই ভেবে অনেকেই বোধ হয় অস্বস্তি বোধ কর্‌ল। গল্প সাধারণত মিথ্যেই হয়, কিন্তু আমরা তা শুন্‌তে চাইনি। কারো জীবনের সত্যিকার প্রেমের ইতিহাস আমরা শুনব—এই ছিল আমাদের অভিপ্রায়। ঘনশ্যামের কাছ থেকে এ ধরণের ইতিবৃত্ত শোনা সম্ভব নয়, কারণ সে প্রায়ই সত্যি কথা বলে না। আর তা ছাড়া সচ্চরিত্র বলে তার একটা বিশেষ খ্যাতি আছে।

অক্ষয় এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। আমাদের মনের কতকটা আন্দাজ করে নিয়ে সে বল্‌ল—'প্রেমের জেপলিন' কিংবা 'চুম্বনে খুন' গোছের আমরা শুন্‌তে চাইনি।

ঘনশ্যাম জবাব দিল—আরে না, সত্যিকার গল্পই বল্‌ব—আমার জীবনের ঘটনা।

অনেকেই বিস্মিত হ'ল।

নিবারণ বল্‌ল—সে কি হে ঘনশ্যাম! তোমার জীবন-নাটকের আদি ও অকৃত্রিম নায়িকা ত তোমার স্ত্রী। তোমার জীবন-নাটকে আর কোন উপনায়িকা ছিল বা আছে—এমন একটা সুসমাচার আমরা জানি বলে ত মনে হয় না। আর তা ছাড়া, তুমি সচ্চরিত্র বলে একটা খ্যাতি আছে।

দার্শনিক অজয় এবার নড়েচড়ে বল্‌ল—তর্কের গন্ধে সে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছে বলে মনে হ'ল এবং অবিলম্বে তর্কটা সুরু করিয়া দিল—চরিত্রের সঙ্গে প্রেমের সে সম্বন্ধটা তুমি আবিষ্কার করেছ নিবারণ, তা একদম মৌলিক—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কথা শেষ করে সে হো—হো করে হেসে উঠ্‌ল।

হঠাৎ বেমক্কা একটা ধাক্কা খেয়ে নিবারণও উত্তেজিত হ'য়ে সুরু করল—মৌলিকতার দাবি অবশ্য আমি করিনে, কিন্তু কতগুলি বাঁধা বুলিতে আমার মনের ঝুলি যে ভর্ত্তি হয়নি, একথা আমি মানি। অর্থাৎ—

—অর্থাৎ তুমি শুধু বইই পড় আর ধার করা বুলি আওড়াও। স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে জান না। তাই একটা নূতন কথা শুন্‌লে একেবারে চমকে ওঠো। প্রেম—

বোঝা গেল, তর্ক যেভাবে উদ্দাম হ'য়ে উঠল তাতে আজকার বাদলার আসর একদম মাটি হ'বার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ভবতোষ পাকা আড্ডাধারী—সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এবং সভাপতির মত গম্ভীর স্বরে বলল—নিবারণ, তোমাদের তর্কটা কালকের জন্য মুলতুবী রইল।

তার পর আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—আশা করি, এতে তোমাদেরও কারো আপত্তি নেই?

বস্তুত আপত্তি কারো ছিল না; বরঞ্চ আমরা যথেষ্ট শঙ্কিতই হয়েছিলুম। ভোট-গণনা করে দেখা গেল, সভাপতির প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'য়েছে।

ভবতোষ ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে বলল—তুমি আরম্ভ কর।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক কাপ চায়ের অর্ডার হয়ে গেল।

ঘনশ্যাম সুরু করল—তোমরা বোধ হয় জান, আমি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের পাটের আফিসে প্রথম চাকুরী সুরু করি এবং ইতিও করি এইখানে। এই ইতির সঙ্গেই এ ঘটনার সম্পর্ক।

আমার কাজ ছিল পাট কেনার তদারক করা, আর বর্ষাকালে মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে পাট চাষ সম্বন্ধে কোম্পানিতে রিপোর্ট দেওয়া এবং বড়সাহেবের উপদেশমত চাষীকে দাদন দেওয়া। ফলে সমস্ত বর্ষাকালটাই আমাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। অবশ্য তাতে যে আমার দু'পয়সা অতিরিক্ত আয় হ'ত, তা তোমাদের বলাই বাহুল্য।

এমন সময় চাকর রামধনিয়া ট্রে করে চা দিয়ে গেল।

চা-পর্ব্ব সুরু ও শেষ হ'ল। তার পর হ'ল ধূম্রলোকের সৃষ্টি।

ঘনশ্যাম সিগারেটে গোটা কয়েক মার টান দিয়ে আবার আরম্ভ করল—

তখনো আমি বিয়ে করিনি বা আমার জীবনে অন্য কোন নারীর আবির্ভাব ঘটেনি।

সেবার এমনি বর্ষাকাল, বোধ হয় মাসটাও শ্রাবণ। আমি মফস্বলে রওনা হলুম। খুব বেশী দূর যেতে ইচ্ছে হ'ল না—মনে ভাবলুম, কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসি। আর তা ছাড়া ঠিক এ সময় পাড়াগাঁয়ে ঘুরে বেড়ান যে খুব লোভনীয় তা নয়। তবে কবিদের কথা স্বতন্ত্র, কারণ তারা যা বলেন তা সত্যি নয়, আর যা সত্যি তা বলেন না। প্রমাণ, আমাদের কবি প্রভাতকুসুমের কবিতা—বর্ষার পল্লীশ্রী।

দীর্ঘ দুই পৃষ্ঠাব্যাপী প্রভাতকুসুমের এক গদ্য কবিতা সম্প্রতি এক মাসিকে প্রকাশিত হয়েছে। কবি সেটাকে 'মাষ্টার পিস্' বলে মনে করে, সুতরাং ঘনশ্যামের এই অতর্কিত বিরুদ্ধ সমালোচনায় প্রভাত রুষ্ট হ'য়ে জবাব দিল—ধান ভান্‌তে শিবের গীত গেয়ো না ঘনশ্যাম। কবিতা কমলদল-বিহারিণী সরস্বতী—পাটের গায়ে কমলদলের বিশেষ কোন সাদৃশ্য আছে বলে ত আমাদের জানা নেই।

এই রূঢ় ভাষণে ঘনশ্যামকে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হ'তে দেখা গেল না। সে হেসে জবাব দিল—নেই ঠিক কিন্তু আবিষ্কৃত হ'তে কতক্ষণ? গলিত মৃত্তিকা—অর্থাৎ সাদা কথায় যাকে আমরা বলি কাদা, যদি তা সুগন্ধ চন্দন হ'তে পারে তবে পাটের বনও যে একদিন তোমাদের মত কবির কলমে কমলবন হ'য়ে উঠবে তাতে আর বিচিত্র কি? যাক্—যা বলছিলুম—

লোভনীয় হোক আর না হোক—গোলামের স্বাধীন ইচ্ছার বালাই নেই, সুতরাং রওনা হলুম। কলকাতা থেকে রাণাঘাট, রাণাঘাটের কয়েকটা ষ্টেশন পরে হালসা—যে

বিমুগ্ধ বিস্ময় শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটী

পরেশনাথের মন্দির—বেলগেছিয়া
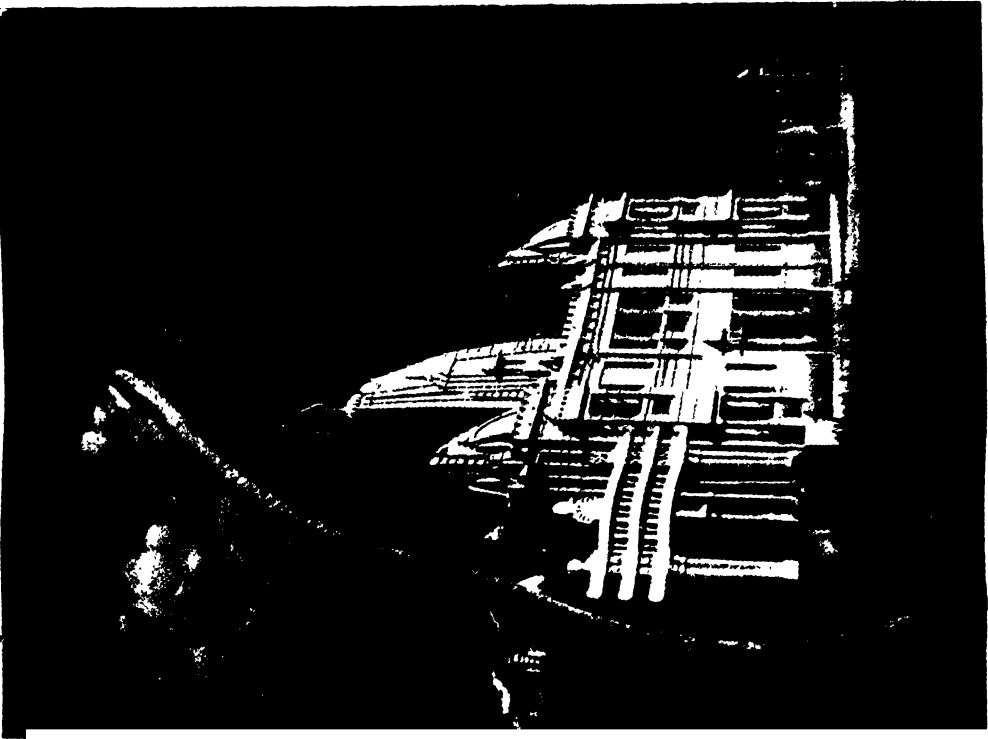
শিল্পী—বি দালাল, কলিকাতা
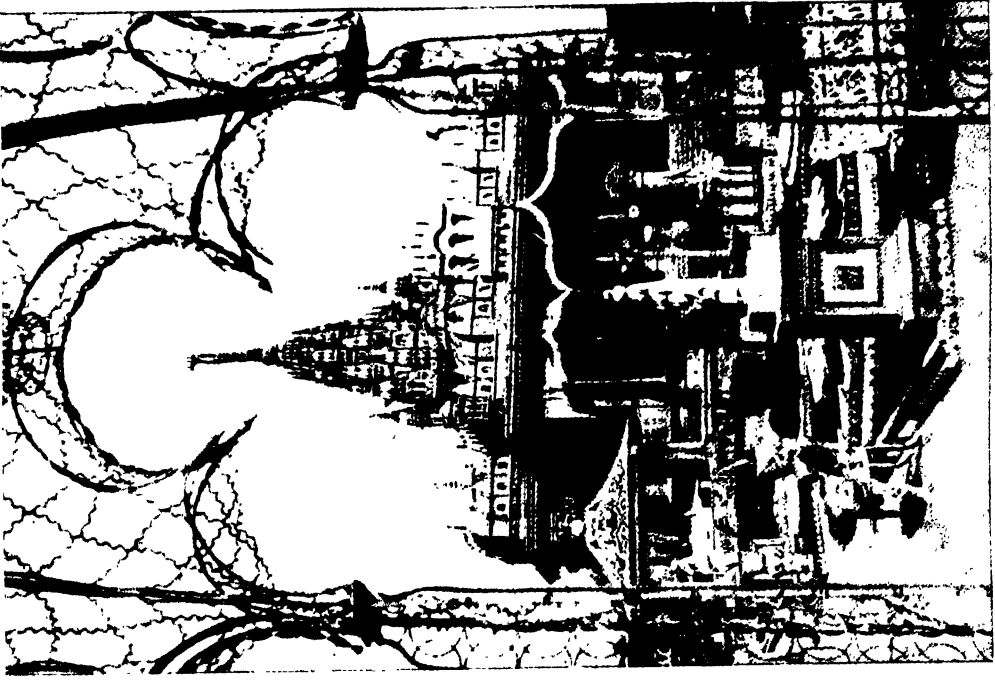
পরেশনাথের মন্দির—গৌরীবেড়ে

শিল্পী—কিরণ নাহার, কলিকাতা

হালসায় একবার ঢাকা মেল চুরমার হ'য়ে গেছল—বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। সেখানে একটা ডাকবাংলো আছে, ডাকবাংলো শুনলে যে ধরণের ছবি তোমরা মনে মনে আঁকবে এ তা নয়, ভ্রাম্যমান রাজ-কর্ম্মচারীদের সাময়িক বিশ্রামের জন্যই বোধ হয় এটা তৈরী। একজনের এখানে স্বচ্ছন্দে থাকা চলে কিন্তু একাধিক হ'লেই বিপদ, কারণ একটি মাত্র কক্ষ আর একাধিক খাটিয়া পাত্‌বার স্থান নেই বলে শোবার খাটিয়াও এক এবং অদ্বিতীয়।

এই বাংলোতেই আশ্রয় নিলুম।

সারাদিন নিজের কাজকর্ম্মেই ব্যস্ত রইলুম—আর দিনটাও ছিল বেশ। কিন্তু বিকেলের দিকে আবার বৃষ্টি এল, বাইরে একটু কাজ ছিল, স্থগিত রাখ্‌তে হল।

একটা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় বসলুম। বৃষ্টিও চেপে এল। মাঠের মাঝে বাংলো, আশেপাশে বাড়ীঘর নেই—মাঠের পরে মাঠ, ধান ও পাটে ভর্ত্তি—শ্যামলতায় ঝলমল। মাঝে মাঝে দুই-একটা বাবলা গাছ—দুই-একটা নিঃসঙ্গ দীর্ঘ তাল গাছ—আর কিছু নেই।

ভাল লাগছিল না।

একবার মনে হ'ল—কলকাতায় ফিরে যাই। আর একদিন না হয় আসা যাবে।

হঠাৎ আমার সুমুখে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। বিপর্য্যয় কথাটা বোধ হয় ঠিক হ'বে না—মানে ঠিক—

মৃদঙ্গ গম্ভার বল্ল—আছে। হ'ল বিপর্য্যয়—তুমি বল। আমরা ঠিক বুঝে নেব।

ঘনশ্যাম বলতে লাগল—দেখি, একটী তরুণী বাংলোর দিকে আস্‌ছে। মাথায় ছাতি, গায়ে ওয়াটার প্রুফ, পায়ে হাই হিল জুতো, হাতে এটাচি কেশ।

আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল, শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত দ্রুত তালে নাচ্‌তে লাগল। তখনকার অবস্থাটা হয়ত আমি ঠিক বোঝাতে পাচ্ছি না।

প্রভাত জবাব দিল—বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তুমি বল—

তরুণী এসে দাঁড়াল আমার সাম্‌নে। আমিও উঠে দাঁড়ালুম—দুজনে একেবারে মুখোমুখী।

সে বোধ হয় পদ্মকলির মত দু'টী হাত তুলে আমাকে নমস্কারও করেছিল। তবে আমি যে প্রতি-নমস্কার করেনি, এ আবার বেশ মনে আছে—আমার বুকে তখন চল্‌ছে ইঞ্জিন, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ, পা দুটো কাঁপ্‌ছে—আমি যেন একটা অশরীরী মূর্ত্তি যার সঙ্গে ধরণীর যোগ সূত্র মুহূর্ত্তমাত্র ছিন্ন হ'য়েগেছে।

ভেবে দেখ আমাদের অবস্থান, কল্পনা কর আমাদের অবস্থা—কেউ কোথাও নেই; বৃষ্টির নাই বিরাম, মেঘের গুরু গুরু ডাক, জলো হাওয়ার এলোমেলো ঝাপ্‌টা—এই পরিবেশের মধ্যে ছোট্ট একটি বাংলো আর সেই বাংলোয় দাঁড়িয়ে মুখোমুখী দুই তরুণ-তরুণী—অজানা অচেনা—এমনি এক বর্ষার সন্ধ্যায় অন্ধকারে নীরব নির্জ্জন পথের মাঝে তাদের প্রথম দেখা—

যাক্।

আমরা কঠিন পৃথিবীর মানুষ—স্বপ্নে বিচরণ বেশীক্ষণ চলে না। পরিচয় হ'ল। বাংলোর চৌকিদারকে দু'কাপ চা করতে বলে তরুণীকে বল্লুম—চলুন ভেতরে গিয়ে বসি।

দু'জনেই দু'খানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আমিই আবার প্রশ্ন করলুম—এই ত একখানা কামরা। আপনিই বা কোথায় থাকবেন, আর আমিই বা কোথায় থাকি?

তরুণী হেসে জবাব দিল—সে কথাটা এখন আর না-ই ভাব্‌লেন। যা হোক একটা উপায় হ'বে।

আমি চুপ করে রইলুম। উপায়টা কি এবং সেটা যে কি ধরণের হ'বে তা আমি ধারণা করতে পারলুম না।

চৌকিদার চা দিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—মাপ করবেন, একটা কথা জিগ্‌গেস করতে পারি?

নিতান্ত সপ্রতিভভাবে তরুণী জবাব দিল—খুব পারেন।

এবং মৃদু হেসে চায়ে চুমুক দিল। কানের ঝুম্‌কো দুটো হ্যারিকেনের আলোতে চিক্ চিক্ করে উঠল।

আমি প্রশ্ন করলুম—আপনাকে এমন দিনে এক ডাক-বাংলোয় দেখা—

—অস্বাভাবিক! কেমন না?—তরুণী জবাব দিল।

আমি কতকটা আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লুম—না, ঠিক—তা নয়—ইত্যাদি।

তরুণী উত্তরে যা বল্লে তা থেকে আমি এই মাত্র বুঝলুম—সে অল-ইণ্ডিয়া বীমা কোম্পানীতে মহিলাবিভাগে কাজ করে এবং হালসার এক জমিদার-গৃহিণীর মোটাটাকার ইনসিওরেন্স করবার জন্য এসে জানতে পারে যে, তার মক্কেল কয়েক দিনের জন্য কোথায় বেড়াতে গেছেন। তারপরে এই দুর্ব্বিপাক এবং ভোর চারটার পূর্ব্বে কলকাতা ফেরবার আর ট্রেন নেই বলে বাংলোয় আশ্রয় গ্রহণ।

অক্ষয় ফস করে প্রশ্ন করল—তরুণী বাংলোয় এলেন কেন? তিনি ত এই কয়ঘণ্টা জমিদার বাড়ীতেই কাটাতে পারতেন?

ঘনশ্যাম নিতান্ত সপ্রতিভভাবে জবাব দিল—কাটাতে পারতেন কিন্তু কাটাননি। আর আমিও এসব কথা খুঁটিয়ে জিগ্‌গেস করিনি।

অক্ষয় চুপ করে রইল।

ঘনশ্যাম পুনরায় সুরু করল—অনেক দিনের কথা—আজ সে সব কথা স্মৃতি থেকে বলা শক্ত—উপন্যাস কখনো লিখিনি, তাই কি ভাবে বানিয়ে এবং ফেনিয়ে বলতে হয় তাও জানি না। তারপর অনেক কথাই আমাদের হয়েছিল, তার সঙ্গে এ কাহিনীর প্রত্যক্ষ যোগ নেই, সুতরাং সে সব

খুঁটিনাটি বাদ দিলেও চলে, আর তা ছাড়া মনেও নেই। মোটের উপর শেষ পর্য্যন্ত শয়ন-সমস্যাটাই প্রধান হ'য়ে দাঁড়াল।

আমি এ সমস্যাসমাধান-কল্পে কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিলাম—

তরুণী বাধা দিয়ে বল্ল—সমস্যা যখন দাঁড়িয়েছে তার সমাধানও নিশ্চয়ই আছে। এর জন্য খুব বেশী চিন্তা করে কি লাভ বলুন?

আমি হেসে জবাব দিলুম—লাভ-অলাভের প্রশ্ন নয়—সমাধান ত আছে, কিন্তু সেটা কি?

মধুর হাসি হেসে তরুণী বল্ল—আসলে এটা একটা সমস্যাই নয়। এক ঘরেই আমরা থাকব।

আমি অবাক্ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

—অবাক্ হচ্ছেন, কিন্তু কেন?—তরুণী প্রশ্ন করল। এ 'কেন'র উত্তর আমি কি দিব? আর উত্তর দিতে গেলেও তা খুব প্রাঞ্জল ভাবে দেওয়া চলে না। সুতরাং চুপ করেই রইলুম এবং এত বড় একটা জটিল সমস্যার এত সহজ সমাধানে মনে মনে বেশ খুশীই হ'লুম—এ কথা আমি স্বীকার করছি।

পাছে ব্যবস্থাটা পাল্টে যায় এ ভয়েই তাড়াতাড়ি আমি বল্লুম—বেশ—আমি এ চেয়ারটায় শুই, আর আপনি ওই খাট্‌টায় শুয়ে কোন মতে রাত্রিটা কাটিয়ে দিন।

রাতও হয়েছিল। তরুণী উঠল এবং আমার দিকে একটি মধুর কটাক্ষ হেনে বিছানার দিকে অগ্রসর হ'ল—আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠল।

নারীর নয়নভঙ্গিতে যে কত মধু সঞ্চিত থাকতে পারে আমি সেদিন তা বুঝতে পারলুম। এমন সহজ সরল অথচ গভীর রহস্যময় কটাক্ষ জীবনে আর কখনো দেখিনি—নারীর অন্তরের অন্তরতম বাণী যেন প্রাণ পেয়ে লীলায়িত হ'য়ে জেগেছিল সে দু'টি নয়নের কোণে—আমি সে ছবি এখনো ভুল্‌তে পারিনি—

আর ভুলতে পারিনি আজও সে রাত্রির কথা—প্রথম যৌবনের সে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। মানুষ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, আমি জেগে স্বপ্ন দেখতে লাগলুম।

তরুণী শুয়েছে—হ্যারিক্যানটা প্রায় নিবানো—ঘরে তরল অন্ধকার···

এই স্তিমিত দীপালোকে, এই প্রায়ান্ধকারে আমি কতক্ষণ জেগে ছিলুম আজ আর আমার তা মনে নেই, হঠাৎ মনে হ'ল—একটা গভীর আবেশে আমার দেহযন্ত্র শিথিল, অবসন্ন; আমার বুকের পরে পাখীর পালকের কোমল লঘু ভার, গালে উষ্ণ পরশ, কণ্ঠে পেলব বাহুলতার নিবিড় নীরব বন্ধন—যেন আমাকে কেন্দ্র করে আজ উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে বিশ্বের যত রস যত মধু—বিচিত্র বর্ণে গন্ধে গানে যার মধ্যে হারিয়ে গেছে আমার আকাশ, আমার বাতাস, আমার অতীত, আমার ভবিষ্যৎ—আমার সত্তা। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আদি-অন্তহীন অনুভূতির মধ্যে যেন আমি অনাদি কাল বেঁচে আছি।

* * * *

ভোরের দিকে জেগে উঠলুম। কখন যে ঘুমিয়ে গেছি মনে নেই। ঘুমের ঘোর ভাল করে' কাটেনি—দেখি ইজিচেয়ারটাতেই শুয়ে আছি—সামনের বিছানাটার দিকে নজর পড়ল—বিছানায় কেউ নেই—খালি।

মনটা ধ্বক করে উঠল, ডাকলুম—চৌকিদার!

চৌকিদারকে তরুণীর কথা জিজ্ঞেস করতে সে জবাব দিল, তিনি ত ভোর চারটার গাড়ীতে চলে গেছেন।

চলে গেছেন?—

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠলুম। এতক্ষণে টেবিলটার উপর নজর পড়ল। দু'টী এটাশি কেস পাশাপাশি ছিল—একটি আছে, কিন্তু সেটি আমার নয়।

সর্ব্বনাশ—তার মধ্যে কোম্পানীর দরুণ প্রায় পাঁচশত টাকা ছিল—আর তা ছাড়া ছিল আমার দামী রিষ্ট ওয়াচ, শেফার পেন, নিজের সামান্য টাকা-পয়সা, রিটার্ন টিকিট, আরও টুকিটাকি জিনিষ। বোধ হয় তাড়াতাড়িতে অদল-বদল হয়ে গেছে। কিন্তু এখন উপায়?—কলকাতায় ফিরে যাই কি করে? তরুণীর এটাশি কেসটা খুলতে চেষ্টা করলুম—চাবি দেওয়া ছিল, খুলতে পারলুম না।

ঘনশ্যাম চুপ করল।

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করল—তার পর?

ঘনশ্যাম জবাব দিল—তার পরে আর কিছু নেই।

নিবারণ বল্‌ল—তরুণীর আর খোঁজ কর নি?

করেছি, পাইনি।

প্রভাত প্রশ্ন করল—কোম্পানির নামটা জানতে। সেখানে—

কলকাতায় ও নামের কোন কোম্পানি নেই।

অজয় বলল—এটাশি কেশটা?

ঘনশ্যাম জবাব দিল—এখনো আমার কাছে আছে, ইচ্ছা করলে তোমরা দেখতে পার—তার মধ্যে শাদা কাগজ এবং টয়লেটের টুকিটাক জিনিষপত্র ছাড়া আর কিছু ছিল না।

ঘনশ্যাম এবার উঠে দাঁড়াল—ফিল্ম ষ্টারের ভঙ্গিতে আমাদের সকলকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করে সে বৃষ্টির মধ্যেই চলে গেল।

একজন বলে উঠল—বিলকুল মিথ্যে।

অজয় জবাব দিল—জীবনটাই ত মিথ্যে, সুতরাং জীবনের ঘটনাগুলি···

ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। অজয়ের কথা শেষ হ'ল না। আমরা উঠে দাঁড়ালুম—বাড়ী যেতে হ'বে।

দেখি বাইরে তখনো সমানভাবে বর্ষণ চলছে।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

নওনগর—২৮৭

বোম্বাই—৩৫১

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'য়েছে। পশ্চিম অঞ্চলের খেলায় নওনগর ৩৬ রানে বোম্বাইয়ের নিকট জয়লাভ ক'রেছে। রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় পিচের অবস্থা খারাপ ছিল তাই নির্দ্ধারিত সময়ে খেলা আরম্ভ হ'ল না। বোম্বাই টসে জিতেও নওনগরকে ব্যাট করতে সুযোগ দেয়।

খ্যাতনামা বোলার এস্ ব্যানার্জ্জি নিজ দলের সর্ব্বোচ্চ ১০৬ রান করেন। তাঁর ৭টা 'চার' ছিল। শতরাণ পূর্ণ করতে ২০৭ মিনিট সময় নেয়। অমরসিংয়ের ৭৬ রান ও মানকাদের ৫৮ রানও উল্লেখযোগ্য। বোম্বাইয়ের তারাপুর ৯১ রানে ৮ উইকেট নিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

নওনগর দলের ৪০৫ মিনিটে প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল।

বোম্বের প্রথম ইনিংসে ৩৫১ রান উঠে। অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট একাই ১৭০ রান করেন; আউট হ'বার একবারও সুযোগ দেন নি। তাঁর খেলা সত্যই অতুলনীয় হ'য়েছিল। এর পর তাঁর ভাই উদয় মার্চ্চেণ্টের ৯৪ রান উল্লেখযোগ্য। নির্ভুলভাবে খেলে খোটে ৫২ রান তুলেন। শেষ খেলোয়াড়গণ মোটেই কিছু করতে পারেন নি। বোলিংএ মানকাদ ৮৭ রানে ৪ উইকেট পান।

মান্দ্রাজ—১৭২ ও ২০০ (৮ উইকেট)

মহীশূর—১০৭ ও ২৬৩

মান্দ্রাজ ২ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েছে।

মহীশূরের সহিত রঞ্জি ট্রফির খেলায় মান্দ্রাজ প্রতিবারই বিজয়ী হ'য়েছে। মান্দ্রাজের এবারের বিজয় রামসিংএর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্য। উভয় ইনিংসেই ব্যাটিং ও বোলিংএ তিনি নিজ দলের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ব্যাটিংএ তিনি ১ম ইনিংসে ৫৫ এবং ২য় ইনিংসে ৯১ রান করেন আর বোলিংএ ১ম ইনিংসে ৩৫ রানে এবং ২য় ইনিংসে ৪৫ রানে ৫ উইকেট পান। মহীশূরের রামকৃষ্ণাপ্পা মাত্র ১ রানের জন্য সেঞ্চুরী নষ্ট করেন। বিজয় সারথীর ৫৬ রানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইনিংসে একটু ধীরভাবে খেলতে পারলে মহীশূর মান্দ্রাজকে পরাজিত ক'রতে পারতো।

অমরসিং

বিজয় মার্চ্চেণ্ট

এস্ ব্যানার্জ্জি

মানকাদ

রঞ্জি প্রতিযোগিতা ও বাঙ্গলা ঃ

যুদ্ধের জন্য এবারের রঞ্জি প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকবে কি না এসম্বন্ধে সমস্ত প্রদেশের মতামত জানবার জন্য বাঙ্গলা থেকে

মেয়েদের বাস্কেট বল প্রদর্শনী খেলায় 'ব্লু' দল। ইহারা ১৮-১৬ পয়েন্টে 'রেড্স' দলের নিকট পরাজিত হয় ছবি—পান্না সেন

প্রস্তাব করা হয়। বেশীরভাগ প্রদেশ প্রতিযোগিতা চালানোর পক্ষপাতী হওয়ায় প্রতিযোগিতা চলছে এবং বাঙ্গলাও তাতে যোগ দেবে। কিন্তু বাঙ্গলার উপরোক্ত প্রস্তাব নিয়ে বোম্বের একাধিক কাগজে যে কুশ্রী মন্তব্য করা হ'য়েছে তা অখেলোয়াড়ী মনোভাবের ও হীন মনের পরিচয় দেয়। খবরের কাগজে জনসাধারণের মনের নাকি পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু এই যদি বোম্বের ক্রীড়ামোদিদের পরিচয় হয় তাহ'লে আমরা তাঁদের প্রশংসা ক'রতে পাচ্ছি না। বোম্বের আজ হঠাৎ রঞ্জি ট্রপির ওপর দরদ বাড়লো কেন বুঝতে পারি না। পেণ্টাঙ্গুলারই সেখানকার প্রধান আকর্ষণ যদিও খেলার গুরুত্ব অনুযায়ী দর্শক সমাগম সেখানে বেশী হয় না। Illustrated Weeklyর উক্তি যে বাঙ্গলার শক্তিশালী দল না থাকার জন্যই তারা এবার খেলা না হবার পক্ষপাতী। এই অভিযোগ যে মিথ্যা তার প্রমাণ পূর্ব্বের জামনগর ও বাঙ্গলার ফাইনাল খেলা। বাঙ্গলা থেকে তিন চারজন নিয়মিত খেলোয়াড় ছুটির অভাবে যেতে পারলে না। জামসাহেব তাতেও নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে এস্ ব্যানার্জ্জিকে তার নিজ প্রদেশের হ'য়ে না খেলতে বাধ্য করালেন।

পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা ঃ

১৫ই নভেম্বর বোম্বাইয়ে পেণ্টাঙ্গুলার খেলা সুরু হবে। যদি কোন অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটে তাহ'লে হিন্দু ও মুসলীম দলই ফাইনালে খেলবে। মুসলীম গত দুবছর বিজয়ী হ'য়েচে। গত বছর তারা হিন্দু দলকে পরাজিত করে। তার আগের বছর হিন্দুদল যোগদান করে নি। মুসলীম গত বছরের চেয়ে এবার বেশী শক্তিশালী। জাহাঙ্গীর খাঁ এবার মুসলীমদের পক্ষে খেলবেন। পতৌদীর নবাবও হয়ত খেলতে পারেন। খেললে তিনিই মুসলীমদের অধিনায়ক হবেন নতুবা ওয়াজির আলি। বোলিংয়ে যেমন নিসার, জাহাঙ্গীর, মহম্মদ সৈয়দ, আমীর

ন্যাসনাল সুইমিং স্পোর্টসের বালিকাদের (সাধারণ) ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল বিজয়িনী প্রথম—মিস ই সণ্ডার্স, দ্বিতীয়—কুমারী সুখলতা পাল, তৃতীয়—পার্ব্বতী দত্ত ছবি—পান্না সেন

ইলাহি, ব্যাটিংয়ে সেইরূপ ওয়াজির, মাস্তাক, জাহাঙ্গীর, দিলওয়ার ও নাজির। মোটের উপর তাদের দল বেশ
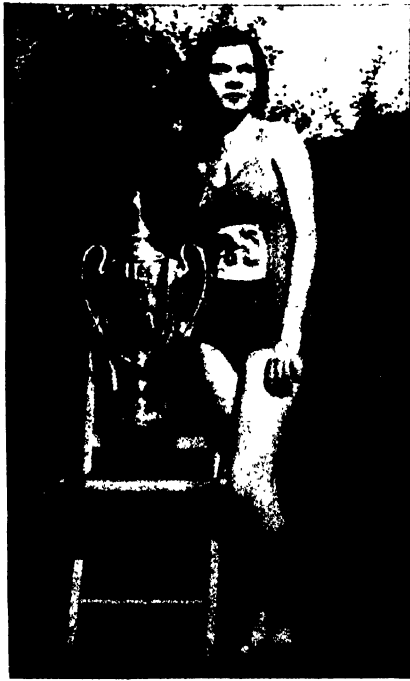
দক্ষিণ কলিকাতা সুইমিং এসোসিয়েশনের মেয়েদের সাধারণ ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল বিজয়িনী মিস্ এভেলিন সণ্ডার্স
ছবি—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

শক্তিশালী। হিন্দুদলের শক্তিও মুসলীমদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়, তবে সহযোগিতার অভাব। ব্যাটিংএ

হুগলী স্কালস: বিজয়ী কে সি সেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রবি দত্তকে এক লেংথে পরাজিত করেন

সি কে নাইডু, মার্চ্চেণ্ট, অমরনাথ, মানকাদ, হিন্দেলকার ছাড়া অনেক উদীয়মান ভাল খেলোয়াড় আছেন। বোলিংয়ে অমরসিং, সি এস নাইডু, ব্যানার্জ্জি, তা'ছাড়া সি কে, অমরনাথ, সি এস, অমরসিং প্রভৃতি অল রাউণ্ডার আছেন। হিন্দুদলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা এত বেশী যে, মনোনয়ন কমিটিকে বেশ মুস্কিলে পড়তে হবে। মেজর নাইডু এবারও হিন্দুদলের অধিনায়ক মনোনীত হ'য়েছেন। নাইডু যে যোগ্যতম অধিনায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই। গত বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ ক'রে হিন্দুদলের মনোনয়ন কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে

মেয়েদের বাস্কেট বল প্রদর্শনী খেলায় বিজয়ী 'রেড্স' দল
ছবি—পান্না সেন

ঠিক ক'রেছেন যে, যে কোন খেলোয়াড় তা তিনি যতই নামকরা হ'ন না, যদি নাইডুর অধিনায়কত্বে খেলতে কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ করেন তাহ'লে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হবে। নাইডুর অধিনায়কত্বে খেলতে সম্মত হ'য়ে পরে মাঠে নেমে খেলার নামে যেরূপ অভিনয় কোন বিখ্যাত খেলোয়াড় গতবার দেখিয়েছিলেন তার পূর্ব্বানুবৃত্তি যে হবে না তার নিশ্চয়তা কি? ইউরোপীয়ান দল খুব ভাল নয়। তাতে আবার এবার ক'লকাতা ও মাদ্রাজের নামকরা খেলোয়াড়রা যুদ্ধের কারণে যোগদান ক'রতে পারবেন না।

পার্শী ও রেষ্টদল গতবারেরই মত। রেষ্টদলে সিলোনের কয়েকজন খেলোয়াড় খেলবেন।
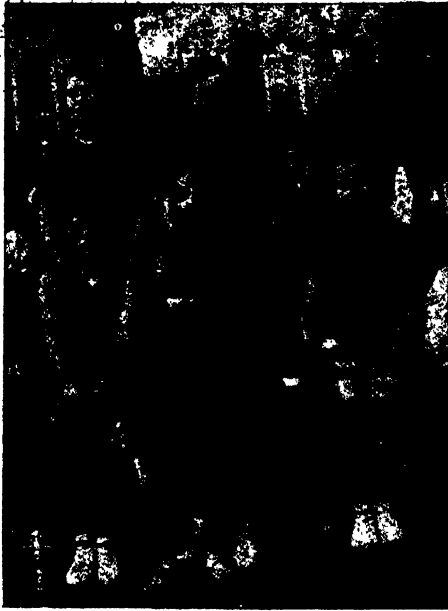
মেয়েদের বাস্কেট বল প্রদর্শনী খেলায় 'ওয়াণ্ডার্স' দল। ইহারা ভিক্টোরিয়া ইনসৃটিটিউশনকে পরাজিত করে

ছবি—পান্না সেন

ওয়াটার পোলো খেলায় ব্রাবোর্ণ কাপ বিজয়ী ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাব

ব্রাবোর্ণ কাপ ঃ

ব্রাবোর্ণ কাপ ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং সন্দেহজনক পেনাল্‌টিতে গোল ক'রে বিজয়ী হ'য়েচে। ইষ্টবেঙ্গলের দুর্ভাগ্য! যে কোন নিরপেক্ষ দর্শকই ইহা স্বীকার ক'রবেন।

রেফারিংয়ের ত্রুটিই বি এফ এ গঠনের অন্যতম কারণ। এবার আবার অন্য এসোসিয়েশন গঠন হবে! বোধহয় না—কারণ মহমেডানরা রেফারিংয়ের ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

বেঙ্গল টেবিল টেনিস ঃ

বেঙ্গল টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হ'য়েছে। এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্ব্বাধিক হ'য়েছিল। পুরুষদের সিঙ্গলসে ১০৬ আর ডবলসে ৩১ জুটি যোগদান করে। এ ছাড়া মিক্সড ডবলস্‌ খেলাটি এবারে নূতন হয়। পুরুষদের সিঙ্গলসে তরুণ খেলোয়াড় কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার মিত্রকে পরাজিত ক'রে জয়ী হ'য়েচে। সে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ভাসিনকে পরাজিত করতে সক্ষম হ'য়েছিল। ১৯৩৭ সালেও কমল এই প্রতিযোগিতায় জয় লাভ ক'রেছিল। পুরুষদের ডবল্‌সে অরুণ ঘোষ ও অমলেন্দু গুহ, হোসেন ও হাজ্‌লসকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েচেন। মহিলাদের

সিঙ্গলসে বিজয়িনী হন সালি লাড্ডি, বেঞ্জামিনকে পরাজিত ক'রে। মিক্সড্ ডবলসে অরুণ ঘোষ ও রমলা নাগ, অনিল গুপ্ত ও সালি লাড্ডিকে পরাজিত ক'রেচেন।

টেনিসের ক্রমপর্য্যায় ঃ

টেনিস জগতে আমেরিকার প্রাধান্যই বেশী। গতবারের মত না হ'লেও এবারেও আমেরিকা তার সম্মান অক্ষুণ্ণ

অষ্টিন

রেখেচে। গত বছর বিশ্বের টেনিসের ক্রমপর্য্যায় বাজ ও মুডী যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেছিলেন। বাজ পেশাদার হ'য়েছেন আর মুডী এবার কোন খেলায় যোগদান করেন নি; তথাপি এবারও আমেরিকাই শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেচে। পুরুষদের প্রথম স্থান পেয়েছেন রিগস আর মেয়েদের মার্ব্বেল।

রিগস

পুরুষদের :

(১) রিগস (আমেরিকা)
(২) ব্রোমউইচ (অষ্ট্রেলিয়া)
(৩) কুইষ্ট
(৪) ম্যাকনীল (আমেরিকা)
(৫) পুনসেক (যুগোশ্লোভিয়া)
(৬) কুক (আমেরিকা)
(৭) হেঙ্কেল (জার্ম্মানী)
(৮) অষ্টিন (গ্রেটবৃটেন)
(৯) হর্ট (আমেরিকা)
(১০) কুকুলজেভিক (যুগোশ্লোভিয়া)

ম্যাকনীল

মহিলাদের ঃ

(১) মার্ব্বেল (আমেরিকা)
(২) ষ্টামার্স (গ্রেটবৃটেন)
(৩) জেকবস্ (আমেরিকা)
(৪) স্পারলিং (ডেনমার্ক)
(৫) মাথিউ (ফ্রান্স)
(৬) জেদ্রজোস্কা (পোল্যাণ্ড)
(৭) ফেবিয়ান (আমেরিকা)
(৮) হার্ডউইক (গ্রেটবৃটেন)
(৯) স্কট "
(১০) বাণ্ডি (আমেরিকা)

জেকবস্ মার্ব্বেল

টেনিস টুর ঃ

সঠিকভাবে জানা গেছে, ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের তত্ত্বাবধানে বাজ, ভাইন্স, টিলডেন ও ষ্টাফেনের যে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের কথা ছিল তা বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জন্য বন্ধ হ'লো। তবে পুনসেক, মিটি ও খো-সীন-কী ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও অল-ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপের সম্মিলিত খেলায় যোগদান ক'রবেন।

হেলেন উইল্‌স্ মুডি ঃ

বিশ্ববিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় হেলেন উইল্‌স্ মুডি

আয়ার্ল্যাণ্ডের আন্তর্জ্জাতিক পোলো খেলোয়াড় এইফেন রোয়াকের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছেন। এটি উভয়েরই দ্বিতীয় পরিণয়।

উইলস্ মুডি

জলক্রীড়া ঃ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক তৃতীয় বার্ষিক জলক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হ'য়েছে। ন্যাশানাল ও বৌবাজার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। ওয়াটার পোলো নক্-আউট-টুর্ণামেণ্টে হাটখোলার সঙ্গে যে গোলযোগ হয় এবং বি এ এস এ তার যে রায় দেয় তার প্রতিবাদের জন্যই তারা যোগদান করেনি। বৌবাজারের যোগদান না করার কারণ অজ্ঞাত। সেণ্ট্রালের মদন সিং ৪৩ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

অল্-ইণ্ডিয়া-ফুটবল-ফেডারেশন ঃ

মিঃ ডি ময়ের ও মিঃ ই জে টার্ণার যথাক্রমে অল-ইণ্ডিয়া-ফুটবল-ফেডারেশনের সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন।

হল্যাণ্ড ভ্রমণ ঃ

ভারতীয় হকি ফেডারেশন একটি শক্তিশালী ভারতীয় দল হল্যাণ্ডে পাঠাবার জন্য সেখান থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। হল্যাণ্ডে দল পাঠান সম্ভব হবে কিনা এবং পাঠাতে হ'লে তার আর্থিক বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্য নভেম্বরের মাঝামাঝি ক'লকাতায় ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এক সভা হবে। সেই সভায় আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা সম্বন্ধেও আলোচনা হবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "হারজিত"—১॥০
শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী বি-এ প্রণীত ছেলেদের বই "গল্পে বারভুঁইয়া"—৮০
শ্রীঅঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'চার ধাম ভ্রমণ"—১৲
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ"
শ্রীশচীন সেনের "রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়"—৩৲
শ্রীপঞ্চানন রায় প্রণীত "বিবেকের দান"—২॥০
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের "কল্পলোকের কথা"—॥০
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের 'কায়াহীনের প্রতিশোধ"—॥০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মায়ের গৌরব"—॥৵০
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষের 'হরবোলা"—॥০
শ্রীপ্রভাতকিরণ বসুর 'জগাপিসি"—॥০
শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্তের 'পাতালপুরীর আংটি"—॥৵০
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে'র "গল্পবেণু"—৷৵০
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর "মালাই বরফ"—৷৵০
শ্রীসুনির্ম্মল বসুর "পাহাড়ে জঙ্গলে"—৷৵০
শ্রীমতিলাল দাশের "শিশু-মনের চলচ্চিত্র"—১৲
"জীবনের চলস্রোতে"—২৲ ও "মনীষা"—১৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের "মানুষের প্রথম এ্যাডভেঞ্চার"—১৲
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ব্যাখ্যাত "মন্ত্র ও পূজা রহস্য"—৷৵০
শ্রীআশুতোষকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "নবরত্ন"—৮০
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভুলের মাশুল"—১॥০
মির্জ্জা সোলতান আহমদের "আরুন-অল-রসিদ"—৮০ ও "রঙ্গরস"—॥০
শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর "জাহ্নবী"—১৲
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের "গণ্ডগোল"—২৲
শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত "পিশাচ ব্যাধের জাল"—৮০
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদারের "বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী"—৷৵০
শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়ের "হে কিশোর চিত্ত"—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়ের "পিশাচের কর্ম্মফল"—১।০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "ব্যথিতা ধরিত্রী"—১॥০
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "মরণ আহব"—৮০
নন্দগোপাল সেন গুপ্ত প্রণীত গল্পপুস্তক "মিছে কথা"—১৲
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "বৃদ্ধ বিধাতা"—১৮০
শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "পঞ্চচন্দ্র"—।০
শ্রীঅজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "হত্যার ইতিহাস"—৮০
শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়ার "অরু"—১॥
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের "বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল"—॥৵০
'জনৈকা'—র "কেন এ-পথে এলাম"—২৲
সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্গভাষা গীত"—১॥০
শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গোপেশ্বর গীতিকা"—১৲
মায়া দে প্রণীত উপন্যাস "তাসের ঘর"—১॥০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বর সহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৩৵০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩॥০ টাকা। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন।
—কার্য্যাধ্যক্ষ, ভারতবর্ষ

সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,